আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

১

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

প্রথম খণ্ড

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ
অগাস্ট ১৯৮৯

সপ্তম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০৪

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. I) Written by Muhammad Abdul Ma'bud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition August 1989 Seventh Edition April 2004 Price Taka 80.00 only.

সূচীপত্র

●	ভূমিকা	৫
১।	হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)	১৩
২।	হযরত আবুবকর ইবন আবী কুহাফা (রা)	২১
৩।	হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)	২৯
৪।	হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)	৩৯
৫।	হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা)	৪৭
৬।	হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)	৫৭
৭।	হযরত তালহা ইবন উবাইদিল্লাহ (রা)	৬৭
৮।	হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)	৭২
৯।	হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)	৮১
১০।	হযরত আবু উবাইদাহ্ ইবনুল জাররাহ (রা)	৯০
১১।	হযরত সাঈদ ইবন যায়িদ (রা)	৯৬
১২।	হযরত হামযা ইবন আবদিল মুত্তালিব (রা)	১০২
১৩।	হযরত আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব (রা)	১০৮
১৪।	হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা)	১১২
১৫।	হযরত জাফর ইবন আবী তালিব (রা)	১১৭
১৬।	হযরত যায়িদ ইবন হারিসা (রা)	১২৫
১৭।	হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)	১৩১
১৮।	হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)	১৪০
১৯।	হযরত আল আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা)	১৪৭
২০।	হযরত আবু হুরাইরা আদ-দাওসী (রা)	১৫০
২১।	হযরত আবু যার আল-গিফারী (রা)	১৫৭
২২।	হযরত সালমান আল-ফারেসী (রা)	১৬৬
২৩।	হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা)	১৭৪
২৪।	হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)	১৮০
২৫।	হযরত তুফাইল ইবন 'আমর আদ-দাওসী (রা)	১৮৫
২৬।	হযরত সাঈদ ইবন 'আমের আল-জুমাহী (রা)	১৯০
২৭।	হযরত সুরাকা ইবন মালিক (রা)	১৯৭
২৮।	হযরত ইকরিমা ইবন আবী জাহল (রা)	২০৩
২৯।	হযরত আসমা বিনতু আবী বকর (রা)	২০৯
৩০।	হযরত মুসয়াব ইবন উমাইর (রা)	২১৪
●	গ্রন্থপঞ্জী	২২০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

সাহাবা কারা?

'সাহাবী' শব্দটি আরবী ভাষার 'সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 'সাহেব' ও 'সাহাবী' এবং বহুবচনে 'সাহাবা' ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সংগী, সাথী, সহচর, এক সাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামী পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সংগী-সাথীদের বুঝায়। 'সাহেব' শব্দটির বহুবচনের আরো কয়েকটি রূপ আছে। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী-সাথীদের বুঝানোর জন্য 'সাহেব'-এর বহুবচনে 'সাহাবা' ছাড়া 'আসহাব' ও 'সাহব'ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবন হাজার (রাহ) *'আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা'* গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে বলেন ঃ ইন্নাস সাহাবিয়্যা মান লাকিয়ান নাবিয়্যা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মু'মিনান বিহি ওয়া মাতা আলাল ইসলাম'– অর্থাৎ সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

উপরোক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান (২) ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (আল-লিকা) (৩) ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাউত 'আলাল ইসলাম)।

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন লোক সাহাবী বলে গণ্য হবে না যারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ তো লাভ করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি। যেমন ঃ আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ মক্কার কাফিরবৃন্দ। দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি হুজুরের তো সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু অন্ধত্ব বা এ জাতীয় কোন অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন ঃ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)।

তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত 'আলাল ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবীদের দলে শামিল হবেন, যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। এটাই সর্বাধিক সঠিক মত। যেমন ঃ হযরত আশয়াস ইবন কায়েস (রা) ও আরো অনেকে। হাদীস বিশারদগণ আশয়াস ইবন কায়েসকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যান এবং হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে আবার ইসলামে ফিরে আসেন।

শেষোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবী বলে গণ্য হবেনা যে ইসলামের অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, কিন্তু পরে মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে। যেমন ঃ আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরাত করার পর খৃষ্টান হয়ে যায় এবং সেখানে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, রাবীয়া ইবন উমাইয়্যা প্রমুখ মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ। সাহাবী হওয়ার জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ শর্তটি উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহচর্য বেশী বা অল্প দিনের জন্য হউক, রাসূলুল্লাহর (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক, রাসূলুল্লাহর সংগে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, এমন কি যে ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সাক্ষাত লাভ ঘটেছে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এমন সকলেই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

যারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান আনেনি; কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ লাভ করেছে, তারা সাহাবী নয়। আর 'বুহাইরা' রাহিবের মত যাঁরা পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন– এমন ব্যক্তিদের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম মনীষীরা তাঁদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেননি।

উল্লেখিত সংজ্ঞার শর্তাবলী জ্বীনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জ্বীনরাও 'সাহাবা' ছিলেন। কুরআন মজিদে এমন কিছু জ্বীনের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। নিঃসন্দেহে তারা অতি মর্যাদাবান সাহাবা ছিলেন।

সাহাবীর উল্লেখিত সংজ্ঞাটি ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলসহ অধিকাংশ পণ্ডিতের নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত। অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। যেমন, কেউ কেউ সাক্ষাতের (আল-লিকা) স্থলে চোখে দেখার (রু'ইয়াত) শর্ত আরোপ করেছেন। কিন্তু তাতে এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যাঁরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে রাসূলুল্লাহকে (সা) চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন ঃ আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। অথচ তিনি অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন ঃ সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, এক বা দু'বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য অথবা তাঁর সাথে দু'একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ। কিছু সংখ্যক উলামায়ে উসূল ও উলামায়ে ইলমুল কালাম-এর মতে, সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য ও সুন্নাতে নববীর (সা) অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি। কেউ কেউ আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। একদল আলিমের মতে যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর এক নজর রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন, তিনি সাহাবী। আর যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন,

তিনিও সাহাবী। তবে এ হিসেবে যে, রাসূল (সা) তাকে দেখেছেন। তিনি রাসূলকে (সা) দেখেছেন সে হিসেবে নয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে এমন ব্যক্তি সাহাবী নন, বরং তাবেঈর মর্যাদা লাভ করবেন। প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর দাফনের পূর্বে তাকে দেখে থাকেন, যেমনটি ঘটেছিল প্রখ্যাত আরবী কবি 'আবু জুয়ায়িব আল-হুজালীর' ক্ষেত্রে– তাঁর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে? আলিমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, এমন ব্যক্তি সাহাবীদের দলভুক্ত হবেন না।

ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য বা 'সুহবত' এমন একটি মর্যাদা, যার সমকক্ষ আর কোন মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহবতের মর্যাদা ছাড়াও দ্বীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করা, ইসলামের তাবলীগ ও শরীয়াতের খিদমতের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবায়ে কিরামের একটি পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা আছে। এ কারণে কোন কোন আলিমের মতে সাহাবীদেরকে হেয় প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি 'যিন্দীক'। আবার কারো মতে, এটা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাহাবীদের মর্যাদা

সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক হোন না কেন কেউই একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইজমা একমত।

এই সাহাবীরাই আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর উম্মাতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পরবর্তী উম্মাত আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসূলের পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দ্বীনের সবকিছুই একমাত্র তাঁদেরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এই প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে অথবা তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দ্বীনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

'হাফেজ ইবন আবদিল বার' সাহাবীদের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত ও তাঁর সুন্নাতের হিফাজত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা এইসব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা 'খায়রুল কুরুন' ও 'খায়রু উম্মতিন' এর মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

হাফেজ আবু বকর ইবন খতীব আল-বাগদাদী বলেন ঃ "উল্লেখিত ভাব ও বিষয়ের হাদীস ও আখবারের সংখ্যা অনেক এবং সবই 'নাসসুল কুরআনের' ভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাতে সাহাবীদের সুমহান মর্যাদা, আদালাত, পবিত্রতা ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক তাদের আদালাতের ঘোষণা দানের পর পৃথিবীর

আর কোন মানুষের সনদের মুখাপেক্ষী তাঁরা নন। আল্লাহ ও রাসূল (রা) তাঁদের সম্পর্কে কোন ঘোষণা না দিলেও তাঁদের হিজরাত, জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর রাহে ধন-সম্পদ ব্যয়, পিতা ও সন্তানদের হত্যা, দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ, ঈমান ও ইয়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড এ কথা প্রমাণ করতো যে, আদালাত, বিশ্বাস, পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ন্যায় পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁরা ছিলেন সকলের থেকে উত্তম।"

কোন কোন সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসূল (সা) তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে সাহাবীদের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইবন হাযামের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'আস-সাহাবাতু কুল্লুহুম মিন আহলিল জান্নাতী কাতআন— সাহাবীদের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।'

রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের গালি দেওয়া বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আল্লাহ, আল্লাহ! আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করো না। তাদেরকে যারা ভালোবাসে, আমার মুহাব্বতের খাতিরেই তারা ভালোবাসে, আর যারা তাদেরকে হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে।"

সাহাবী চিনবার উপায়

প্রশ্ন হতে পারে, কে সাহাবী এবং কে সাহাবী নয়, তা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে? 'রিজাল ও হাদীস' শাস্ত্র বিশারদগণ এ ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন। প্রথমতঃ 'খবরে তাওয়াতুর' অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতিটি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা বা সাক্ষ্য দেবে যে তিনি সাহাবী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ 'খবরে মাশহুর' অর্থাৎ প্রতিটি যুগের প্রচুর সংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক সাহাবী। তৃতীয়তঃ কোন একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। চতুর্থতঃ কোন একজন প্রখ্যাত তাবেঈর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে। পঞ্চমতঃ কেউ নিজেই যদি দাবী করেন, আমি সাহাবী। সে ক্ষেত্রে দু'টি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা দেখতে হবে। (১) 'আদালাত' বা ন্যায়নিষ্ঠতা। এটি সাহাবীদের বিশেষ গুণ। সাহাবিয়্যাতের দাবীদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে। (২) 'মুয়াসিরাত' বা সমসাময়িকতা। সাহাবীদের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। কারণ, রাসূল (সা) তাঁর ইনতিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন, আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে, আজ থেকে একশ' বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না। সুতরাং হিজরী ১১০ সনের পর কেউ জীবিত থাকলে এবং সে সাহাবী বলে দাবী করলে, 'রিজাল' শাস্ত্র বিশারদরা তাকে সাহাবী বলে মেনে নেননি। অনেকে এমন দাবী করেছিলেন; কিন্তু সে দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাদের জীবনীও 'রিজাল' শাস্ত্রে লিখিত আছে। এ ছাড়াও সাহাবী নির্ধারণের আরো কিছু নিয়ম নীতি মুহাদ্দিসগণ অনুসরণ করেছেন।

সাহাবীদের সংখ্যা

সাহাবীদের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম আবু যারআ আর-রাযী বলেছেন, রাসূল (সা) যখন ইনতিকাল করেন, তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাহলে যে সকল সাহাবী কোন হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। আবু যারআর একথার সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত কা'ব ইবন মালিকের একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মানুষের সংখ্যা অনেক। কোন দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।"

সাহাবীদের যথাযথ হিসেব কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করে। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী। তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা। তাছাড়া হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত হলো ঃ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইন্‌জীলেও।" (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ২৯)

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা কামিয়াবী।" (সূরা আত-তওবা ঃ ১০০)

"এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে (মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।" (সূরা আল-হাশর ঃ ৮-৯) এ আয়াতে প্রথমে মুহাজির ও পরে আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে।

এমনিভাবে সূরা আল-ফাত্হ-১৮, সূরা আল-ওয়াকিয়া-১০, এবং সূরা আল-আনফালের ৬৪ নাম্বার আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা এসেছে।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও তাঁর সাহাবীদের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

"আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী। তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে।"

"তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দেবেনা, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করো তবুও তাদের যে কোন একজনের 'মুদ' বা তার অর্ধেক পরিমাণ যবের সমতুল্য হবে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ "তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তার ওপর আমল করতে হবে। তা তরক করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আল্লাহর কিতাবে কোন সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাতে খোঁজ করতে থাক। যদি তাতেও না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবীদের কথায় তালাশ করতে হবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ। তার কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে। আর আমার সাহাবীদের পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ।"

সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

"আমার পরে আমার সাহাবীদের পারস্পরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে আমার 'রব'— প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হে মুহাম্মাদ, তোমার সাহাবীরা আমার কাছে আকাশের তারকা সদৃশ। তারকার মত তারাও একটি থেকে অন্যটি উজ্জ্বলতর। তাদের বিতর্কিত বিষয়ের কোন একটিকে যে আঁকড়ে থাকবে, আমার কাছে সে হবে হিদায়াতের ওপরে।"

ইমাম শাফেঈ হযরত আনাস ইবন মালিকের সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে ও আমার সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। তাদের সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে আমার আনসার বানিয়ে দিয়েছেন। শেষ যামানায় এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা তাদের অবমাননা করবে। সাবধান, তোমরা তাদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে করবে না তাদের কাছে ছেলে-মেয়ে বিয়েও দেবে না। সাবধান, তাদের সাথে নামায পড়বে না, তাদের জানাযাও পড়বে না। তাদের ওপর আল্লাহ লা'নত।

মিশকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন। আমার উম্মাতের মধ্যে একটি ফিরকাই নিশ্চিত জান্নাতী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কে? বললেন ঃ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

অন্য একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আমার উম্মাতের মধ্যে সাহাবীদের স্থান তেমন, যেমন খাবারের মধ্যে লবণের স্থান।'

সাহাবীদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। তাঁদের কর্মকাণ্ড মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা স্বরূপ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ ও সদাচরণ তুলনাবিহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। গরীব ও মুহতাজ শ্রেণীর প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজীরবিহীন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইত্তেবা বা অনুসরণ ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য।

হযরত রাসূলে করীম (সা) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি রেখেছিলেন, সাহাবায়ে কিরাম হচ্ছেন সেই সমাজের প্রথম নমুনা। রাসূলে পাকের (সা) সুহবতের বরকতে তাঁরা মহান মানবতার বাস্তব রূপ ধারণ করেছিলেন। 'আদল, তাকওয়া, দিয়ানাত, ইহসান এবং খাওফে খোদার তাঁরা ছিলেন সমুজ্জ্বল প্রতীক। তাঁদের মধ্যে এই অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল যে, এই পৃথিবীতে তাঁদের আগমন ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করা ও মানব জাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা বিশ্বাসী রূপে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে।

পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তাঁদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, হক ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁরা যেমন নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করতেন, তেমন মনে করতেন অন্যদেরকেও। তাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়-বন্ধুদের শরয়ী বিধানের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেননি, বাঁচাতে চেষ্টাও করেননি।

মোটকথা ঈমান ও বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক যোগ্যতাকে আলোকিত করে দিয়েছিল। তাঁরা খুব অল্প সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক অংশ প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁদের সামরিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতার ভুরিভুরি নজীর ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান।

সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ সমাজের অনুরূপ সমাজ যদি আজ আমরা গড়তে চাই, আমাদের অবশ্যই তাঁদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁদের মত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কুরআনী সমাজ গড়ার যে চেতনা দেখা যাচ্ছে, তাকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হলে সাহাবীদের জীবনীর ব্যাপক চর্চা হওয়া দরকার। তাঁদের জীবন থেকেই দিক নির্দেশনা নিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে সাহাবীদের জীবনের চর্চা খুব কম। এখানে পীর-আওলিয়ার জীবনের কাল্পনিক কিস্‌সা-কাহিনী যে পরিমাণে আলোচিত হয় তার কিয়দংশও সাহাবীদের জীবনীর আলোচনা হয়না।

আরবী-উর্দুসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় সাহাবীদের জীবনীর ওপর বহু বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। মাসিক 'পৃথিবী'-র নির্বাহী সম্পাদক ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে সাহাবীদের জীবনের কিছু কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মূলতঃ তাঁরই উৎসাহে আমি ধারাবাহিকভাবে 'পৃথিবী'র পাতায় লিখতে থাকি। 'পৃথিবী'র পাতার লেখাগুলিই 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা' নামে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে লেখা ও বই আকারে প্রকাশের ব্যাপারে অধ্যাপক নাজির আহমদের উৎসাহ ও ভূমিকা না থাকলে হয়তো আমি কখনো লিখতাম না এবং বই আকারে প্রকাশও হতো না। তাই দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা'র প্রথম খণ্ডে মোট তিরিশজন সাহাবীর জীবনের আলোচনা এসেছে। তাঁরা সকলেই মুহাজিরীন তাবকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মধ্যে 'আশারা মুবাশ্‌শারা'র সেই গৌরবান্বিত দশ জন সাহাবীও সন্নিবেশিত হয়েছেন। লেখাগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যসমূহ আরবী-উর্দুর মূল সূত্রসমূহ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিতর্কিত বিষয় যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে, পাঠকবৃন্দ এই লেখা থেকে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমার কষ্ট সার্থক বলে মনে করবো। কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমার গোচরে আনার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রকাশনার সাথে জড়িত ভাই কামরুল ইসলাম সহ সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ পাক আমার এ সামান্য শ্রমটুকু কবুল করুন। আমীন।

২৭-২-১৯৮৯ ইং

মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা

খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

নাম তাঁর খাদীজা। কুনিয়াত 'উম্মু হিন্দ' এবং লকব 'তাহিরা'। পিতা খুওয়াইলিদ, মাতা ফাতিমা বিনতু যায়িদ। জন্ম 'আমুল ফীল' বা হস্তীবর্ষের পনের বছর আগে মক্কা নগরীতে। পিতৃ-বংশের উর্ধ পুরুষ কুসাঈ-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। জাহিলী যুগেই পূতপবিত্র চরিত্রের জন্য 'তাহিরা' উপাধি লাভ করেন। (আল-ইসাবা) রাসূলুল্লাহ (সা) ও খাদীজার (রা) মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর সম্পর্ক ছিল। এ কারণে, নবুওয়াত লাভের পর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' সম্ভবতঃ বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছিলেন।

পিতা খুওয়াইলিদ তৎকালীন আরব সমাজের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নাওফিলকে খাদীজার বর নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু কেন যে তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব। শেষ পর্যন্ত আবু হালা ইবন যারারাহ আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর 'আতীক বিন আবিদ আল-মাখযুমীর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। (শারহুল মাওয়াহিব, আল-ইসতিয়াব) তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায়, তাঁর প্রথম স্বামী 'আতীক, অতঃপর আবু হালা। ইবন ইসহাকও এ মত সমর্থন করেছেন বলে ইউনুস ইবন বুকাইর বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ঃ ৪/২৮১) তবে প্রথমোক্ত মতটি ইবন আবদিল বার সহ অধিকাংশের মত বলে ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন।

খাদীজার পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গোত্রের কমাণ্ডার। তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জনক। প্রথম পুত্র হিযাম। এই হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হাকীম জাহিলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়ার' পরিচালনভার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হযরত খাদীজা। তৃতীয় সন্তান 'আওয়াম' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যুবাইরের (রা) পিতা। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু এবং হযরত হামযার আপন বোন হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন 'আওয়ামের' স্ত্রী বা যুবাইরের (রা) মা। সাফিয়্যা ছিলেন খাদীজার ছোট ভাইয়ের বউ। চতুর্থ সন্তান হালা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে হযরত যয়নাবের (রা) স্বামী আবুল আস ইবন রাবী'র মা। আবুল আ'স রাসূলুল্লাহর (সা) বড় জামাই। পঞ্চম সন্তান রুকাইয়া। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে হিযাম, আওয়াম এবং রুকাইয়া ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মারা যান। হযরত খাদীজা ও হালা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

খাদীজার পিতার মৃত্যু কখন হয়েছিল, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, 'ফিজার' যুদ্ধে মারা যান। ইমাম সুহাইলীর মতে ফিজার যুদ্ধের আগেই মারা যান। তখন খাদীজার বয়স পঁয়ত্রিশ। কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের পর তিনি মারা যান। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২)

পিতা বা স্বামীর মৃত্যু বা যে কোন কারণেই হোক কুরাইশ বংশের অনেকের মত খাদীজাও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। ইবন সা'দ তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কে বলছেন ঃ 'খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।' ইবন সা'দের এ মন্তব্য দ্বারা খাদীজার ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায়। অংশীদারী বা মজুরী বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তখন পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন আল-আমীন। তাঁর সুনামের কথা খাদীজার কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তাঁর ছোট ভাই-বউ সাফিয়্যার কাছে আল-আমীন মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন।

হযরত খাদীজা একবার কেনাবেচার জন্য সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিদী থেকে যারকানীর বর্ণনা ঃ 'আবু তালিব মুহাম্মাদকে (সা) ডেকে বললেন ঃ ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সঙ্কটজনক। মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি যদি তার কাছে যেতে, হয়তো তোমাকেই সে নির্বাচন করতো। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তার জানা আছে। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করিনে এবং ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশঙ্কা করি, তবুও এমনটি না করে উপায় নেই।' জবাবে রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবতঃ সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবু তালিব বললেন ঃ হয়তো অন্য কাউকে সে নিয়োগ করে ফেলবে। চাচা-ভাতিজার এ সংলাপের কথা খাদীজার কানে গেল। 'তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লোক পাঠালেন।' (টীকা, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮) উল্লেখ থাকে যে, কৈশোরে একবার রাসূল (সা) চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন পাদরী 'বুহাইরা' রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আবু তালিবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত বর্ণনায় আবু তালিব সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

খাদীজা লোক মারফত মুহাম্মাদের (সা) কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি যদি ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান, অন্যদের তুলনায় খাদীজা তাঁকে দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন। মুহাম্মাদ (সা) রাজী হলেন।

খাদীজার (রা) পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সঙ্গে করে মুহাম্মাদ (সা) চললেন সিরিয়া। পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি। গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মায়সারা বললেন ঃ 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি

লোক।' পাদ্রী বললেন ঃ 'এখন এই গাছের নীচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। (টীকা, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮) তবে ইবন হাজার 'আসকালানী এই পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা' বলেছেন। (আল-ইসাবা ঃ ৪/২৮১) তিনি আরো বলেছেন, এই বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে রাসূল (সা) বসরার বাজারে গিয়েছিলেন। তাবারী ইবন শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার পণ্য নিয়ে সিরিয়া নয়, বরং ইয়ামনের এক হাবশী বাজারে গিয়েছিলেন। তবে সিরিয়া যাওয়ার বর্ণনাটাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (তারীখুল উম্মাহ আল ইসলামিয়া, মুহাম্মদ আল-খিদরী বেক ঃ ১/৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল (সা) তাঁর উটের ওপর সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফিরিশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজার পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো। বাড়ী ফিরে বিশ্বস্ত ভৃত্য মায়সারা তাঁর মনিব খাদীজার নিকট পাদ্রীর মন্তব্য এবং সফরের অলৌকিক ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন এক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতি ভদ্র মহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল। তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন। মায়সারার মুখে সবকিছু শুনে খাদীজা নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে। তবে খাদীজাই যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সে ব্যাপারে সব বর্ণনা একমত।

একটি বর্ণনায় এসেছে, খাদীজা (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন এবং তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, দারিদ্রের কারণে হয়তো খাদীজার পিতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশেষে খাদীজার পিতা যখন অতিরিক্ত মদপান করে মাতাল অবস্থায় ছিলেন তখন খাদীজা নিজেই বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করেন এবং সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু সুস্থ হয়ে আবার তিনি বেঁকে বসেন। তবে খাদীজা পুনরায় তাঁর সম্মতি আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজার বান্ধবী 'নাফীসা বিনতু মানিয়্যা' এ ব্যাপারে পুরো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম খাদীজার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন ঃ 'আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন ?.... এ কথাগুলি ছিল হযরত খাদীজা সম্পর্কে।

কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব, হামযাসহ রাসূলুল্লাহর (সা) খান্দানের আরো কিছু ব্যক্তি খাদীজার বাড়ী উপস্থিত হলেন। খাদীজাও তাঁর খান্দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন। সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে এ খুতবা জাহিলী যুগের আরবী-গদ্য সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা মোহর ধার্য্য হয়। খাদীজা নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রুপো রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে বলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২) এভাবে হযরত খাদীজা হলেন 'উম্মুল মুমিনীন'। এটা নবুয়াত প্রকাশের পনের বছর পূর্বের ঘটনা। সে সময় তাঁদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য থাকলেও সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ।

বিয়ের পনের বছর পর হযরত নবী করীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। তিনি খাদীজাকে (রা) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অবহিত করেন। পূর্ব থেকেই খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। সহীহ বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন। খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হিরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে একাধারে কয়েকদিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন ঃ আপনি পড়ুন। তিনি বললেন ঃ 'আমি তো পড়া-লেখার লোক নই।' ফিরিশতা তাঁকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ 'পড়ুন'। তিনি আবারো বললেন ঃ 'আমি পড়া-লেখার লোক নই'। ফিরিশতা দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও তাঁর সাথে প্রথমবারের মত আচরণ করলেন। অবশেষে বললেন ঃ 'পড়ুন' আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে.....' রাসূল (সা) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি ঢেকে দিলেন। তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল। তিনি খাদীজার নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশংকার কথা ব্যক্ত করলেন। খাদীজা বললেন ঃ না, তা কক্ষণো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) সংগে করে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহিলী যুগে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজা (রা) বললেন ঃ 'শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ভাতিজা তোমার

বিষয়টি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে ওয়ারাকা বললেন ঃ 'এতো সেই 'নামূস'– আল্লাহ যাঁকে মুসার (আ) নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসুস! সে দিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।' রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো। (বুখারী, ১ম খণ্ড) এ ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওয়ারাকার মৃত্যু হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা তাঁর সকল ধন-সম্পদ তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াকফ করেন। রাসূল (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে খাদীজার দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন। আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'মুশরিকদের প্রত্যাখান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (সা) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার কাছে এলে তা দূর হয়ে যেত। কারণ, তিনি রাসূলকে (সা) সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।' (তাবাকাত-৩/৭৪০)

নবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা 'শিয়াবে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাদীজাও সেখানে অন্তরীণ হন। প্রায় তিনটি বছর বনী হাশিম দারুণ দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে খাদীজাও হাসি মুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে হযরত খাদীজা (রা) নিজের প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা– হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুময়া ইবনুল আসওয়াদ— তাঁরা সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ভিন্নভাবে মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। একদিন হাকীম ইবন হিযাম তাঁর চাকরের মাধ্যমে ফুফু খাদীজার (রা) কাছে কিছু গম পাঠাচ্ছিলেন। পথে আবু জাহল বাধা দেয়। হঠাৎ আবুল বুখতারী সেখানে উপস্থিত হন। তিনি আবু জাহলকে বললেন, এক ব্যক্তি তাঁর ফুফুকে সামান্য খাদ্য পাঠাচ্ছে, তুমি তা বাধা দিচ্ছ? (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯২)

নামায ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হয়নি, হযরত খাদীজা (রা) ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সেই প্রথম থেকেই নামায আদায় করতেন। (তাবাকাত-৮/১০) ইবন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী (রা) দেখতে পেলেন, তাঁরা দু'জন অর্থাৎ নবী (সা) ও খাদীজা (রা) নামায আদায় করছেন। আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুহাম্মাদ, এ

কি? রাসূল (সা) তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলীর কাছে পেশ করলেন এবং একথা কাউকে বলতে নিষেধ করলেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৭০) এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদীর (সা) মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন।

আফীফ আল-কিন্দী নামক এক ব্যক্তি কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। হযরত আব্বাসের (রা) বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন তিনি। একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন, এক যুবক কাবার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দু'জনের পেছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। দৃশ্যটি আফীফ কিন্দী দেখলেন। আব্বাসকে তিনি বললেন ঃ 'বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন ঃ 'হ্যাঁ' তিনি আরো বললেন ঃ 'এ নওজোয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ।' কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মাদের স্ত্রী।.... আমার জানামতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী।' (তাবাকাত ঃ ৮/১০-১১)

ইবনুল আসীর বলেন, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা হয়েছে যে, হযরত খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তাঁর পিতৃকুলের লোকদের ওপরও পড়ে। ইসলামের আবির্ভাবের সময় পিতৃকুল বনু আসাদ ইবন আবদিল উয্যার পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য পাঁচজন কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পঁচিশ বছর দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার পর নবুওয়াতের দশম বছরে দশই রামাদান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে হযরত খাদীজা মক্কায় ইনতিকাল করেন। জানাযা নামাযের বিধান তখনো প্রচলিত হয়নি। সুতরাং বিনা জানাযায় তাঁকে মক্কার কবরস্তান জান্নাতুল মুয়াল্লায় দাফন করা হয়। হযরত নবী করীম (সা) নিজেই তাঁর লাশ কবরে নামান। (আল-ইসাবা ঃ ৪/২৮৩)

হযরত খাদীজা (রা) ওয়াফাতের অল্পকিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ হিতাকাঙ্খী চাচা আবু তালিব মারা যান। অবশ্য আল-ইসতিয়াবের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর খাদীজা ইনতিকাল করেন। বিপদে-আপদে এ চাচাই রাসূলুল্লাহকে (সা) নানাভাবে সাহায্য করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দুই নিকটআত্মীয়ের ওয়াফাতের কারণে মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট এ বছরটি 'আমুল হুয্‌ন' বা শোকের বছর নামে অভিহিত হয়েছে।

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দু'ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিন্দ বদর মতান্তরে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। উটের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে শাহাদাত বরণ করেন। দ্বিতীয় স্বামী 'আতীকের ঔরসে হিন্দা নাম্নী

এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। (শারহুল মাওয়াকিব, আল-ইসতিয়াব, হাশিয়া, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৭) অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম পক্ষে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মলাভ করেন। দুই ছেলে– হিন্দ ও হারিস। হারিসকে এক কাফির কাবার রুকনে ইয়ামনীর নিকট শহীদ করে ফেলে। এক কন্যা যয়নাব। আর দ্বিতীয় পক্ষের কন্যাটির কুনিয়াত ছিল উম্মু মুহাম্মাদ। (দাখিরা-ই-মা'রিফ-ই-ইসলামিয়া)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর ছয় সন্তান। প্রথম সন্তান হযরত কাসিম। অল্প বয়সে মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। তাঁর নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহর (সা) কুনিয়াত হয় আবুল কাসিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান হযরত যয়নাব। তৃতীয় সন্তান হযরত আবদুল্লাহ। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জন্মলাভ করেছিলেন, তাই 'তাইয়্যেব ও তাহির' লকব লাভ করেন। অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন। চতুর্থ সন্তান হযরত রুকাইয়া। পঞ্চম সন্তান হযরত উম্মু কুলসুম। ষষ্ঠ সন্তান হযরত ফাতিমা (রা)। উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভজাত সন্তান।

হযরত খাদীজা (রা) সন্তানদের খুব আদর করতেন। আর্থিক সচ্ছলতাও ছিল। উকবার দাসী সালামাকে মজুরীর বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশোনার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন।

হযরত নবী কারীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত খাদীজার স্থান সর্বোচ্চে। তিনি প্রথম স্ত্রী, চল্লিশ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে হয়। তাঁর জীবদ্দশায় নবী করীম (সা) আর কোন বিয়ে করেননি। হযরত ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সব সন্তানই তার গর্ভে পয়দা হয়েছেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা নিঃসঙ্কোচে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই। সেই ওহী নাযিলের প্রথম দিনটি, ওয়ারাকার নিকট গমন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা– সবকিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজা যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন— তিনি নবী হবেন। তাই জিবরাঈলের আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তার মনে কোন রকম ইতস্ততঃভাব দেখা দেয়নি। এতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্মান করেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করেছেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে কোন প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন পূতঃপবিত্র। কখনো মূর্তিপূজা করেননি। নবী করীম (সা) একদিন তাঁকে বললেন ঃ 'আমি কখনো লাত-উযযার ইবাদত করবো না।' খাদীজা বলেছিলেন ঃ লাত-উয্যার কথা ছেড়ে দিন। তাদের প্রসঙ্গই উত্থাপন করবেন না। (মুসনাদে আহমাদ-৪/২২২)।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) ওপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তাঁর সাথে প্রথম সালাত আদায়কারীই শুধু তিনি নন। সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পরামর্শ দাত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। যায়িদ বিন হারিসা ছিলেন তাঁর প্রিয় দাস। তাকেও তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদকে বেশী ভালোবাসতেন, তাই তাঁকে খুশী করার জন্য তাকে আযাদ করে দেন।

মক্কার একজন ধনবতী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন। একবার তিনি বরতনে করে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য কিছু নিয়ে আসছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলকে (সা) বললেন,'আপনি তাঁকে আল্লাহ তা'আলা ও আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিন।' (বুখারী)

হযরত রাসূলে করীম (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার (রা) স্মৃতি তাঁর মৃত্যুর পরও ভোলেননি। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ীতে যখনই কোন পশু জবেহ হতো, তিনি তালাশ করে তাঁর বান্ধবীদের ঘরে ঘরে গোশত পাঠিয়ে দিতেন। হযরত আয়িশা বলেন ঃ যদিও আমি খাদীজাকে (রা) দেখিনি, তবুও তাঁর প্রতি আমার ইর্ষা হতো। অন্য কারো বেলায় কিন্তু এমনটি হতো না। কারণ, নবী কারীম (সা) সবসময় তাঁর কথা স্মরণ করতেন।' মাঝে মাঝে হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) রাগিয়ে তুলতেন। রাসূল (সা) বলতেন ঃ 'আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

হযরত খাদীজার (রা) ওয়াফাতের পর তাঁর বোন হালা একবার রাসূলে কারীমের (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই বলে উঠলেন 'হালা এসেছো'? রাসূলুল্লাহর (সা) মানসপটে তখন খাদীজার স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। আয়িশা (রা) বলে ফেললেন, 'আপনি একজন বৃদ্ধার কথা মনে করছেন যিনি মারা গেছেন। আল্লাহ তার চেয়ে অনেক উত্তম স্ত্রী আপনাকে দান করেছেন।' জবাবে নবী কারীম (সা) বললেন ঃ 'কক্ষনো না। মানুষ যখন আমাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, সে তখন আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। সবাই যখন কাফির ছিল, তখন সে মুসলমান। কেউ যখন আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি, তখন সে আমাকে সাহায্য করেছে। তাঁর গর্ভেই আমার সন্তান হয়েছে।' আমরা মনে করি হযরত খাদীজার মূল্যায়ন এর চেয়ে আর বেশী কিছু হতে পারে না।

হযরত খাদীজার ফজীলাত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে ঃ ধরাপৃষ্ঠের সর্বোত্তম নারী মরিয়ম বিনতু ইমরান ও খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ। হযরত জিবরাঈল (আ) বসে আছেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। এমন সময় খাদীজা আসলেন। জিবরাইল (আ) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, 'তাঁকে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বেহেশতী মহলের সুসংবাদ দিন। (বুখারী)

আবু বকর সিদ্দীক (রা)

আবদুল্লাহ নাম, সিদ্দীক ও আতীক উপাধি, ডাকনাম বা কুনিয়াত আবু বকর। পিতার নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু কুহাফা। মাতার নাম সালমা এবং কুনিয়াত উম্মুল খায়ের। কুরাইশ বংশের উপর দিকে ষষ্ঠ পুরুষ 'মুররা'তে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর জন্মের দু'বছরের কিছু বেশী সময় পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অনুরূপ সময়ের ব্যবধানে তাঁরা উভয়ে ইনতিকাল করেন। তাই মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বয়সের সমান।

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে ও প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। শেষ বয়সে চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মেহেন্দীর খিজাব লাগাতেন। অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন।

তিনি ছিলেন সম্মানিত কুরাইশ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য আপামর মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাহিলী যুগে মক্কাবাসীদের দিয়াত বা রক্তের ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ তাঁর কাছে জমা হতো। আরববাসীর নসব বা বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কাব্য প্রতিভাও ছিল। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল-ভাষী ছিলেন। বক্তৃতা ও বাগ্মিতায় খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, দানশীল ও চরিত্রবান। জাহিলী যুগেও কখনো শরাব পান করেননি। তাঁর অমায়িক মেলামেশা, পাণ্ডিত্য ও ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে অনেকেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করতো। তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়মিত বৈঠক বসতো।

হযরত আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা কুরাইশদের মধ্যে যথেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়োঃবৃদ্ধ ও সচ্ছল। তাঁর গৃহ কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হতো। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট না হলেও পুত্র আবু বকরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন– এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত আলীকে (রা) তিনি দেখলে মাঝে মধ্যে বলতেন ঃ 'এই ছোকরারাই আমার ছেলেটিকে বিগড়ে দিয়েছে।' মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন। হিজরী ১৪ সনে প্রায় এক শ' বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

হযরত আবু বকরের মা উম্মুল খায়ের স্বামীর বহু পূর্বে মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বামীর মত তিনিও দীর্ঘজীবন লাভ করেন। প্রায় ৯০ বছর বয়সে ছেলেকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আবু বকর ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। অত্যন্ত আদর যত্ন ও বিলাসিতার মধ্যে পালিত হন। শৈশব থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিশ বছর বয়সে পিতার ব্যবসা বাণিজ্যের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

শৈশব থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে আবু বকরের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকাংশ বাণিজ্য সফরের সংগী ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া যান। তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠারো এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স বিশ। তাঁরা যখন সিরিয়া সীমান্তে; বিশ্রামের জন্য রাসূল (সা) একটি গাছের নীচে বসেন। আবু বকর একটু সামনে এগিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। এক খৃষ্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর দেখা হয় এবং ধর্ম বিষয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। আলাপের মাঝখানে পাদ্রী জিজ্ঞেস করে, ওখানে গাছের নীচে কে? আবু বকর বললেন, এক কুরাইশ যুবক, নাম মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ। পাদ্রী বলে উঠলো, এ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন। কথাটি আবু বকরের অন্তরে গেঁথে যায়। তখন থেকেই তাঁর অন্তরে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রকৃত নবী হওয়া সম্পর্কে প্রত্যয় দৃঢ় হতে থাকে। ইতিহাসে এ পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা' বা 'নাসতুরা' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের ঘোষণায় মক্কায় হৈ চৈ পড়ে গেল। মক্কার প্রভাবশালী ধনী নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। কেউবা তাঁকে মাথা খারাপ, কেউবা জীনে ধরা বলতে থাকে। নেতৃবৃন্দের ইংগিতে ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেরাও ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে। কুরাইশদের ধনবান ও সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আবু বকর রাসূলুল্লাহকে (সা) সংগ দেন, তাঁকে সাহস দেন এবং বিনা দ্বিধায় তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেন। এই প্রসংগে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছি।' এভাবে আবু বকর হলেন বয়স্ক আযাদ লোকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কার আশপাশের গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে লোকদের দাওয়াত দিতেন। বহিরাগত লোকদের কাছে ইসলামের ও রাসূলের (সা) পরিচয় তুলে ধরতেন। এভাবে আরববাসী রাসূলুল্লাহর (সা) প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান, যুবাইর, আবদুর রহমান, সা'দ ও তালহার মত ব্যক্তিরা সহ আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন, আবু বকরের নিকট তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সকল সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে দেন। কুরাইশদের যেসব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, এ অর্থ দ্বারা তিনি সেই সব দাস-দাসী খরীদ করে আযাদ করেন। তেরো বছর পর যখন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন তখন তাঁর কাছে এ অর্থের মাত্র

আড়াই হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্পদিনের মধ্যে অবশিষ্ট দিরহামগুলিও ইসলামের জন্য ব্যয়িত হয়। বিলাল, খাব্বাব, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়্যা, সুহাইব, আবু ফুকাইহ প্রমুখ দাস-দাসী তাঁরই অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে মি'রাজের কথা শুনে অনেকেই যখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দোল খাচ্ছিল, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ 'মি'রাজের কথা শুনে বহু সংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে। লোকেরা আবু বকরের কাছে গিয়ে বলে ঃ আবু বকর, তোমার বন্ধুকে তুমি বিশ্বাস কর? সে বলেছে, সে নাকি গতরাতে বাইতুল মাকদাসে গিয়েছে, সেখানে সে নামায পড়েছে, অতঃপর মক্কায় ফিরে এসেছে।'

আবু বকর বললেন ঃ তোমরা কি তাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, ঐতো মসজিদে বসে লোকজনকে একথাই বলছে। আবু বকর বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি যদি এ কথা বলে থাকেন তাহলে সত্য কথাই বলেছেন। এতে অবাক হওয়ার কি দেখলে? তিনি তো আমাকে বলে থাকেন, তাঁর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসে। আকাশ থেকে ওহী আসে মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। তোমরা যে ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করছো এটা তার চেয়েও বিস্ময়কর। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আপনি কি জনগণকে বলছেন যে, আপনি গতরাতে বাইতুল মাকদাস ভ্রমণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হে আবু বকর, তুমি সিদ্দীক। এভাবে আবু বকর 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত হন।

মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আবু বকরের বাড়ীতে গমন করা। কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করা। রাসূল (সা) দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও গেলে তিনিও সাধারণতঃ সংগে থাকতেন।

মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে একবার তিনি হাবশায় হিজরাত করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু 'ইবনুদ্দাগনাহ' নামক এক গোত্রপতি তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখে। সে কুরাইশদের হাত থেকে এ শর্তে নিরাপত্তা দেয় যে, আবু বকর প্রকাশ্যে সালাত আদায় করবেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন এ শর্ত পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইবনুদ দাগনাহর নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের যে অবস্থা হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের সেই কঠিন মুহূর্তে আবু বকরের কুরবানী, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও বন্ধুত্বের কথা ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর সাহচর্যের কথা তো

পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ইবন ইসহাক বলেন "আবু বকর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে হিজরাতের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলতেন ঃ তুমি তাড়াহুড়া করোনা। আল্লাহ হয়তো তোমাকে একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দেবেন। আবু বকর একথা শুনে ভাবতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হয়তো নিজের কথাই বলছেন। তাই তিনি তখন থেকেই দুটো উট কিনে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পুষতে থাকেন। এই আশায় যে, হিজরাতের সময় হয়তো কাজে লাগতে পারে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দিনে অন্ততঃ একবার আবু বকরের বাড়ীতে আসতেন। যে দিন হিজরাতের অনুমতি পেলেন সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়ীতে আসলেন, এমন সময় কখনো তিনি আসতেন না। তাঁকে দেখা মাত্র আবু বকর বলে উঠলেন, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। তা নাহলে এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আসতেন না। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলে আবু বকর তাঁর খাটের একধারে সরে বসলেন। আবু বকরের বাড়ীতে তখন আমি আর আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার এখানে অন্য যারা আছে তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনার কি হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে হিজরাত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, আমিও কি সংগে যেতে পারবো? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, যেতে পারবে। আয়িশা বলেন ঃ সে দিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও এত কাঁদতে পারে। আমি আবু বকরকে (রা) সেদিন কাঁদতে দেখেছি। অতঃপর আবু বকর (রা) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! এই দেখুন, আমি এই উট দুটো এই কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।'

তাঁরা আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতকে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য ভাড়া করে সাথে নিলেন। সে ছিল মুশরিক, তবে বিশ্বাস ভাজন। রাতের আঁধারে তাঁরা আবু বকরের বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে বের হলেন এবং মক্কার নিম্নভূমিতে 'সাওর' পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। হাসান বসরী (রা) থেকে ইবন হিশাম বর্ণনা করেন ঃ তাঁরা রাতে সাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রবেশের আগে আবু বকর (রা) গুহায় প্রবেশ করলেন। সেখানে কোন হিংস্র প্রাণী বা সাপ-বিচ্ছু আছে কিনা তা দেখে নিলেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) বিপদমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার ওফাতের পর রাসূলকে (সা) যখন আবু বকর (রা) বিমর্ষ দেখলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদব সহকারে নিজের অল্পবয়স্কা কন্যা আয়িশাকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। মোহরের অর্থও নিজেই পরিশোধ করেন।

হিজরাতের পর সকল অভিযানেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। কোন একটি অভিযানেও অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হননি।

তাবুক অভিযানে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী। এ অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে বাড়ীতে যা কিছু অর্থ-সম্পদ ছিল সবই তিনি

রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। আল্লাহর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলে-মেয়েদের জন্য বাড়ীতে কিছু রেখেছো কি?' জবাব দিলেন, 'তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই যথেষ্ট।'

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে প্রথম ইসলামী হজ্জ আদায় উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকরকে (রা) 'আমীরুল হজ্জ' নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় তাঁরই নির্দেশে মসজিদে নববীর নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। মোটকথা, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় আবু বকর (রা) তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর আবু বকর (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। 'খলীফাতু রাসূলিল্লাহ'– এ লকবটি কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়। পরবর্তী খলীফাদের 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায় ছিল তাঁর পেশা। ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও জীবিকার প্রয়োজনে এ পেশা চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে খলিফা হওয়ার পর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় ব্যবসার পাট চুকাতে বাধ্য হন। হযরত 'উমার ও আবু উবাইদার পীড়াপীড়িতে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক প্রয়োজন অনুপাতে 'বাইতুল মাল' থেকে ন্যূনতম ভাতা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। যার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক আড়াই হাজার দিরহাম। তবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে 'বাইতুলমাল' থেকে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরতদানের নির্দেশ দিয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সংবাদে সাহাবামণ্ডলী যখন সম্পূর্ণ হতভম্ব, তাঁরা যখন চিন্তাই করতে পারছিলেন না, রাসূলের (সা) ওফাত হতে পারে, এমনকি হযরত 'উমার (রা) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করে বসেন– 'যে বলবে রাসূলের (সা) ওফাত হয়েছে তাঁকে হত্যা করবো।' এমনই এক ভাব-বিহ্বল পরিবেশেও আবু বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি ঘোষণা করেন ঃ 'যারা মুহাম্মাদের ইবাদাত করতে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব— তাঁর মৃত্যু নেই।' তারপর এ আয়াত পাঠ করেন ঃ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিগগিরই আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৪৪) আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনার সাথে সাথে লোকেরা যেন সম্বিত ফিরে পেল। তাদের কাছে মনে হল এ আয়াত যেন তারা এই প্রথম শুনছে। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে প্রথম যে মারাত্মক সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) দৃঢ় হস্তক্ষেপে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাসূলুল্লাহর (সা) কাফন-দাফন তখনো সম্পন্ন হতে পারেনি। এরই মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্তির বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করলো। মদীনার জনগণ, বিশেষত আনসাররা

'সাকীফা বনী সায়েদা' নামক স্থানে সমবেত হলো। আনসাররা দাবী করলো, যেহেতু আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) আশ্রয় দিয়েছি, নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে দুর্বল ইসলামকে সবল ও শক্তিশালী করেছি, আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রাসূলুল্লাহর (সা) স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। মুহাজিরদের কাছে এ দাবী গ্রহণযোগ্য হলো না। তারা বললো ঃ ইসলামের বীজ আমরা বপন করেছি এবং আমরাই তাতে পানি সিঞ্চন করেছি। সুতরাং আমরাই খিলাফতের অধিকতর হকদার। পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় নিল। আবু বকরকে (রা) ডাকা হল। তিনি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মরদেহের নিকট। তিনি উপস্থিত হয়ে ধীর-স্থিরভাবে কথা বললেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণের কাছে আনসাররা নতি স্বীকার করলো। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর দ্বিতীয় যে সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তারও সুন্দর সমাধান হয়ে যায়।

আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হলেন। খলীফা হওয়ার পর সমবেত মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন ঃ 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি চাচ্ছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসূলুল্লাহর (সা) আচরণের মত হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌঁছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন নবী। ভুলত্রুটি থেকে ছিলেন পবিত্র। তাঁর মত আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবী আমি করতে পারিনে।... আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, আমার সহায়তা করবেন। যদি দেখেন আমি বিপথগামী হচ্ছি, আমাকে সতর্ক করে দেবেন। তাঁর সেই নীতিনির্ধারণী সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষণটি চিরকাল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়কদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

তাঁর চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তার আর এক প্রকাশ ঘটে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের অব্যবহিত পরে উসামা ইবন যায়িদের বাহিনীকে পাঠানোর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে মুতা অভিযানে শাহাদাত প্রাপ্ত যায়িদ ইবন হারিসা, জাফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন নওজোয়ান উসামা ইবন যায়িদকে। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে উসামা তাঁর বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা থেকে বের হতেই রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে রাসূলুল্লাহর (সা) রোগমুক্তির প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এ রোগেই রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। আবু বকর (রা) খলীফা হলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সংবাদে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে নানা অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কেউবা ইসলাম ত্যাগ করে, কেউবা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, আবার কেউবা নবুওয়াত দাবী করে বসে। এমনি এক চরম অবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিলেন উসামার বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারটি স্থগিত রাখতে। কিন্তু আবু বকর (রা) অত্যন্ত কঠোরভাবে এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যদি এ

বাহিনী পাঠাতে ইতস্ততঃ করতেন বা বিলম্ব করতেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এটা হতো রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ। কারণ, অন্তিম রোগশয্যায় তিনি উসামার বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আবু বকর (রা) উসামার বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তখন আনসারদের একটি দল দাবী করলেন, তাহলে অন্ততঃ উসামাকে কমাণ্ডারের পদ থেকে সরিয়ে অন্য কোন বয়স্ক সাহাবীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করা হোক। উল্লেখ্য যে, তখন উমাসার বয়স মাত্র বিশ বছর। সকলের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি হযরত উমার উপস্থাপন করলেন। প্রস্তাব শুনে আবু বকর (রা) রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি উমারের (রা) দাড়ি মুট করে ধরে বল্লেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) যাকে নিয়োগ করেছেন আবু বকর তাকে অপসারণ করবে?' এভাবে এ প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত উমারও ছিলেন উসামার এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একজন সৈনিক। অথচ নতুন খলিফার জন্য তখন তাঁর মদীনায় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। খলীফা ইচ্ছা করলে তাঁকে নিজেই মদীনায় থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি উসামার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন উমারকে মদীনায় রেখে যাওয়ার জন্য। উসামা খলীফার আবেদন মঞ্জুর করলেন। কারণ, আবু বকর বুঝেছিলেন উসামার নিয়োগকর্তা খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উসামার ক্ষমতা তাঁর ক্ষমতার ওপরে। এভাবে আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ থেকেও বিরত থাকেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর আবাস ও জুবইয়ান গোত্রদ্বয় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি নিয়ে খলীফার দরবারে পরামর্শ হয়। সাহাবীদের অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আবু বকর (রা) অটল। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে উটের যে বাচ্চাটি যাকাত পাঠানো হতো এখন যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।'

কিছু লোক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ছিল। আবু বকর (রা) অসীম সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে এসব ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। তাই ইতিহাসবিদরা মন্তব্য করেছেন ঃ আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার পর যদি আবু বকরের এ দৃঢ়তা না হতো, মুসলিম জাতির ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো।

এমনটি সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, হযরত আবু বকরের (রা) স্বভাবে দু'টি পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, সীমাহীন দৃঢ়তা ও কোমলতা। এ কারণে তাঁর চরিত্রে সর্বদা একটা ভারসাম্য বিরাজমান ছিল। কোন ব্যক্তির স্বভাবে যদি এ দু'টি গুণের কেবল একটি বর্তমান থাকে এবং অন্যটি থাকে অনুপস্থিত, তখন তার চরিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এ দু'টি গুণ তাঁর চরিত্রে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। হযরত আবু বকর (রা) যদিও মুসলমানদের নেতা ও খলীফা ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ছিল খুব অনাড়ম্বর। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মদীনার

অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা জানতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজও সময় সময় নিজ হাতে করে দিতেন। হযরত উমার (রা) বলেন ঃ 'আমি প্রতিদিন সকালে এক বৃদ্ধার বাড়ীতে তার ঘরের কাজ করে দিতাম। প্রতিদিনের মত একদিন তার বাড়ীতে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা বললেন ঃ আজ কোন কাজ নেই। এক নেককার ব্যক্তি তোমার আগেই কাজগুলি শেষ করে গেছে। হযরত উমার পরে জানতে পারেন, সেই নেককার লোকটি হযরত আবু বকর (রা)। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও এভাবে এক অনাথ বৃদ্ধার কাজ করে দিয়ে যেতেন। হযরত আবু বকর (রা) মাত্র আড়াই বছরের মত খিলাফত পরিচালনা করেন। তবে তাঁর এ সময়টুকু ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। আরবের বিদ্রোহসমূহ নির্মূল করা। রাষ্ট্রও সরকারকে তিনি এত মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানরা ইরান ও রোমের মত দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহসী হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়।

হযরত আবু বকরের (রা) আরেকটি অবদান পবিত্র কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ। তাঁর খিলাফতকালের প্রথম অধ্যায়ে আরবের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কয়েকশত হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। শুধুমাত্র মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে যে যুদ্ধ হয় তাতেই সাত শ' হাফেজ শহীদ হন। অতঃপর হযরত উমারের পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) সম্পূর্ণ কুরআন একস্থানে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং কপিটি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। ইতিহাসে কুরআনের এই আদি কপিটি 'মাসহাফে সিদ্দীকী' নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে হযরত 'উসমানের (রা) যুগে কুরআনের যে কপিগুলি করা হয় তা মূলতঃ 'মাসহাফে সিদ্দীকীর' অনুলিপি মাত্র।

পবিত্র কুরআন ও রাসূলের বাণীতে আবু বকরের সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মানের কথা বহুবার বহু স্থানে ঘোষিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা জাহাবী *'তাজকিরাতুল হুফফাজ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। অত্যধিক সতর্কতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় খুব কম। উমার, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, ইবন মাসউদ, ইবন উমার, ইবন আমর, ইবন আব্বাস, হুজাইফা, যায়িদ ইবন সাবিত, উকবা, মা'কাল, আনাস, আবু হুরাইরা, আবু উমামা, আবু বারাযা, আবু মুসা, তাঁর দু'কন্যা আয়িশা ও আসমা প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশিষ্ট তাবেয়ীরাও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩ হিজরীর ৭ জমাদিউল উখরা হযরত আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৫ দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর হিজরী ১৩ সনের ২১ জামাদিউল উখরা মুতাবিক ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইনতিকাল করেন। হযরত আয়িশার (রা) হুজরায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশের একটু পূব দিকে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিন মাস দশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

নাম 'উমার, লকব ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফ্স। পিতা খাত্তাব ও মাতা হান্তামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। 'উমারের অষ্টম উর্ধ পুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা 'হানতামা' কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ এই মুগীরার পৌত্র। মক্কার 'জাবালে 'আকিব'-এর পাদদেশে ছিল জাহিলী যুগে বনী 'আ'দী ইবন কা'বের বসতি। এখানেই ছিল হযরত উমারের বাসস্থান। ইসলামী যুগে 'উমারের নাম অনুসারে পাহাড়টির নাম হয় 'জাবালে 'উমার'– 'উমারের পাহাড়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ ৩/৬৬) 'উমারের চাচাত ভাই, যায়িদ বিন নুফাইল। হযরত রাসূলে কারীমের আবির্ভাবের পূর্বে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে জাহিলী আরবে যাঁরা তাওহীদবাদী হয়েছিলেন, যায়িদ তাঁদেরই একজন।

রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মের তের বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালেও তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, টাক মাথা, গন্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকেই সবার থেকে লম্বা দেখা যেত।

তাঁর জন্ম ও বাল্য সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। ইবন আসাকির তাঁর তারীখে 'আমর ইবন 'আস (রা) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে জানা যায়, একদিন 'আমর ইবন 'আস কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ বসে আছেন, এমন সময় হৈ চৈ শুনতে পেলেন। সংবাদ নিয়ে জানতে পেলেন, খাত্তাবের একটি ছেলে হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত 'উমারের জন্মের সময় বেশ একটা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তাঁর যৌবনের অবস্থাও প্রায় অনেকটা অজ্ঞাত। কে জানতো যে এই সাধারণ একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন 'ফারুকে আযমে' পরিণত হবেন। কৈশোরে 'উমারের পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে লাগিয়ে দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে একবার এই মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে ঃ 'এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নীরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার ওপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।' (তাবাকাত ঃ ৩/২৬৬-৬৭)

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যথা ঃ যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। বংশ তালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। আল্লামা যুবইয়ানী বলেছেন ঃ 'উমার ছিলেন এক মস্তবড় পাহলোয়ান।' তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের এক বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার। আল্লামা জাহিয বলেছেন ঃ 'উমার ঘোড়ায় চড়লে মনে হত, ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর শরীর মিশে গেছে।' (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন) তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলি পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি দখল ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। যৌবনে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। বালাজুরী লিখেছেন ঃ 'রাসূলে কারীমের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশ বংশে মাত্র সতের জন লেখা-পড়া জানতেন। তাদের মধ্যে 'উমার একজন।

ব্যবসা বাণিজ্য ছিল জাহিলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা। 'উমারও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন। মাসউদী বলেন ঃ 'উমার (রা) জাহিলী যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণে যেতেন। ফলে আরব ও আজমের অনেক রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।' শিবলী নু'মানী বলেন ঃ 'জাহিলী যুগেই 'উমারের সুনাম সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কুরাইশরা সর্বদা তাঁকেই দৌত্যগিরিতে নিয়োগ করতো। অন্যান্য গোত্রের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে পাঠানো হত।' (আল-ফারুক ঃ ১৪)

'উমারের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। তাঁর চাচাত ভাই যায়িদের কল্যাণে তাঁর বংশে তাওহীদের বাণী একেবারে নতুন ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যায়িদের পুত্র সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদ আবার 'উমারের বোন ফাতিমাকে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উমারের বংশের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আবদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'উমার ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। সর্বপ্রথম যখন ইসলামের কথা শুনলেন, ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর বংশে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনি পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে জানতে পেলেন, 'লাবীনা' নামে তাঁর এক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের ওপর তাঁর ক্ষমতা চলতো, নির্মম উৎপীড়ন চালালেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলামের মূল প্রচারক মুহাম্মাদকেই (সা) দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত। 'তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে 'উমার চলেছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আবদুল্লাহ) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস

করলেন ঃ কোন দিকে 'উমার? বললেন ঃ মুহাম্মাদের একটা দফারফা করতে। লোকটি বললেন, মুহাম্মাদের (সা) দফারফা করে বনি হাশিম ও বনি যুহরার হাত থেকে বাঁচবে কিভাবে? একথা শুনে 'উমার বলে উঠলেন ঃ মনে হচ্ছে, তুমিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছ। লোকটি বললেন ঃ 'উমার, একটি বিস্ময়কর খবর শোন, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বিধর্মী হয়ে গেছে। তারা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে। (আসলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, 'উমারকে তার লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।) একথা শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে 'উমার ছুটলেন তাঁর বোন-ভগ্নিপতির বাড়ীর দিকে। বাড়ীর দরজায় 'উমারের (রা) করাঘাত পড়লো। তাঁরা দু'জন তখন খাব্বাব ইবন আল-আরাত-এর কাছে কুরআন শিখছিলেন। 'উমারের আভাস পেয়ে খাব্বাব বাড়ীর অন্য একটি ঘরে আত্মগোপন করলেন। 'উমার বোন-ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের এখানে গুন্‌গুন্‌ আওয়ায শুনছিলাম, তা কিসের? তাঁরা তখন কুরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন ঃ আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। 'উমার বললেন ঃ সম্ভবতঃ তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছো। ভগ্নিপতি বললেন ঃ তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কি করবে 'উমার? 'উমার তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দু'পায়ে ভীষণভাবে তাঁকে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে এলে 'উমার তাঁকে ধরে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ সত্য যদি তোমার দ্বীনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে থাকে, তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

এ ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে 'উমারের মধ্যে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে একজনকেও ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা নীরবে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ী-ঘর ছেড়েছে, ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে 'উমারের মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তিনি একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রিয় সহোদরার চোখ-মুখের রক্ত, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি ধাক্কা দিল যে, তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কর্পূরের মত উড়ে গেল। মুহূর্তে হৃদয় তাঁর সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি পাক-সাফ হয়ে বোনের হাত থেকে সূরা ত্বাহার অংশটুকু নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে বললেন ঃ আমাকে তোমরা মুহাম্মাদের (সা) কাছে নিয়ে চল। 'উমারের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন ঃ 'সুসংবাদ 'উমার! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ, 'উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা 'আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।' খাব্বাব আরো বললেন ঃ রাসূল (সা) এখন সাফার পাদদেশে 'দারুল আরকামে'।

'উমার চললেন 'দারুল আরকামের' দিকে। হামযা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ীর দরজায় পাহারারত। 'উমারকে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ 'উমারের কল্যাণ চাইলে সে

ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসূল (সা) বাড়ীর ভেতরে। তাঁর উপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছে। একটু পরে তিনি বেরিয়ে 'উমারের কাছে এলেন। 'উমারের কাপড় ও তরবারির হাতল মুট করে ধরে বললেন ঃ 'উমার, তুমি কি বিরত হবে না?'..... তারপর দুআ করলেন ঃ হে আল্লাহ্, 'উমার আমার সামনে, হে আল্লাহ, 'উমারের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী কর।' 'উমার বলে উঠলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহ্বান জানালেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন।' (তাবাকাতুল কুবরা/ইবন সা'দ ৩/২৬৭-৬৯) এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দারুল আরকামে প্রবেশের পর 'উমার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ অথবা চল্লিশের কিছু বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 'উমারের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরীল (আ) এসে বলেন ঃ "মুহাম্মাদ, 'উমারের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছে।" (তাবাকাত ঃ ৩/২৬৯)

'উমারের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত হামযাও ছিলেন, তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় গিয়ে নামায পড়া তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। হযরত 'উমারের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যদের সংগে নিয়ে কা'বা ঘরে নামায আদায় শুরু করলেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর সেই রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে কট্টর দুশমন কে আছে। আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাবো। আমি মনে করলাম, আবু জাহলই সবচেয়ে বড় দুশমন। সকাল হতেই আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি মনে করে?' আমি বললাম ঃ 'আপনাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের (সা) প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণীকে মেনে নিয়েছি।' একথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো ঃ 'আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলংকিত করুক।' (সীরাতু ইবন হিশাম)

এভাবে এই প্রথমবারের মত মক্কার পৌত্তলিক শক্তি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন ঃ 'তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ নেয়।' আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন ঃ 'উমার ইসলাম গ্রহণ করেই কুরাইশদের সাথে বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কা'বায় নামায পড়ে ছাড়লেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে নামায পড়েছিলাম।' সুহায়িব ইবন সিনান বলেন ঃ তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা কা'বার পাশে জটলা করে বসতাম, কা'বার তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রূঢ় ব্যবহার করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের ওপর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতাম। (তাবকাত ঃ ৩/২৬৯)। তাই

রাসূল (সা) তাঁকে– 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কারণ, তাঁরই কারণে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'উমারের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তাআলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। (তাবাকাত ঃ ৩/২৭০)

মক্কায় যাঁরা মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, রাসূল (সা) তাদেরকে মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। আবু সালামা, আবদুল্লাহ বিন আশহাল, বিলাল ও 'আম্মার বিন ইয়াসিরের মদীনায় হিজরাতের পর বিশজন আত্মীয়-বন্ধুসহ 'উমার মদীনার দিকে পা বাড়ালেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই যায়িদ, ভাইয়ের ছেলে সাঈদ ও জামাই খুনাইসও ছিলেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি রিফায়া' ইবন আবদুল মুনজিরের বাড়ীতে আশ্রয় নেন।

'উমারের হিজরাত ও অন্যদের হিজরাতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরাত ছিল চুপে চুপে। সকলের অগোচরে। আর উমারের হিজরাত ছিল প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সুর। মক্কা থেকে মদীনায় যাত্রার পূর্বে তিনি প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি মদীনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায়, সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদীনার পথ ধরলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করলো না। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ : খিদরী বেক, ১/১৯৮)

বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে 'উমারের দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। আবু বকর সিদ্দীক, 'উয়াইস ইবন সায়িদা, ইতবান ইবন মালিক ও মুয়াজ ইবন আফরা (রা) ছিলেন 'উমারের দ্বীনী ভাই। তবে এটা নিশ্চিত যে, মদীনায় হিজরাতের পর বনী সালেমের সরদার ইতবান ইবন মালিকের সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাত ঃ ৩/২৭২)

হিজরী প্রথম বছর হতে রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত 'উমারের (রা) কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কর্মময় জীবনেরই একটা অংশবিশেষ। রাসূলকে (সা) যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যত চুক্তি করতে হয়েছিল, কিংবা সময় সময় যত বিধিবিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই, যা 'উমারের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদিত হয়েছে। এইজন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা 'উমারের (রা) জীবনী না হয়ে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনীতে পরিণত হয়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

হযরত 'উমার বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু 'সারিয়্যা' (যে-সব ছোট অভিযানে রাসূলুল্লাহ সা. নিজে উপস্থিত হননি)-তে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শদান ও

সৈন্যচালনা হতে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসূলে কারীমের (সা) সাথে দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শই আল্লাহর পসন্দসই হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা নিম্নরূপ ঃ

(১) এ যুদ্ধে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে লোক যোগদান করে; কিন্তু বনী আ'দী অর্থাৎ 'উমারের খান্দান হতে একটি লোকও যোগদান করেনি। 'উমারের প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

(২) এ যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে 'উমারের সাথে তাঁর গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারো জন লোক যোগদান করেছিল।

(৩) এ যুদ্ধে হযরত 'উমার তাঁর আপন মামা আ'সী ইবন হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।

উহুদ যুদ্ধেও হযরত 'উমার (রা) ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসূল (সা) আহত হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ের এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন, তখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চস্বরে মুহাম্মাদ (সা), আবু বকর (রা) 'উমার (রা) প্রমুখের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বেঁচে আছ কি? রাসূলের (সা) ইঙ্গিতে কেউই আবু সুফিয়ানের জবাব দিল না। কোন সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করলো ঃ 'নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে।' এ কথায় 'উমারের পৌরুষে আঘাত লাগলো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।' বলে উঠলেন ঃ 'ওরে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত।' আবু সুফিয়ান বললো, 'উ'লু হুবল– হুবলের জয় হোক।' রাসূলুল্লাহর (সা) ইঙ্গিতে 'উমার জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহু আ'লা ও আজাল্লু– আল্লাহ মহান ও সম্মানী।'

খন্দকের যুদ্ধেও 'উমার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খন্দকের একটি বিশেষ স্থান রক্ষা করার ভার পড়েছিল 'উমারের ওপর। আজও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থেকে তাঁর সেই স্মৃতির ঘোষণা করছে। এ যুদ্ধে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আসরের নামায ফউত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসূল (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'ব্যস্ততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত নামায আদায় করতে পারিনি।' (আল-ফারুক ঃ শিবলী নু'মানী ঃ ২৫)

হুদাইবিয়ার শপথের পূর্বেই হযররত 'উমার যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। পুত্র আবদুল্লাহকে পাঠালেন কোন এক আনসারীর নিকট থেকে ঘোড়া আনার জন্য। তিনি এসে খবর দিলেন, 'লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করছেন।' 'উমার তখন রণসজ্জায় সজ্জিত। এ অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলি বাহ্য দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলো। 'উমার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রথমে আবু বকর, তারপর খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বল্লেন ঃ 'আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ আমি করিনে।' 'উমার শান্ত

হলেন। তিনি অনুতপ্ত হলেন। নফল রোযা রেখে, নামায পড়ে, গোলাম আযাদ করে এবং দান খয়রাত করে তিনি এ গোস্তাখীর কাফ্ফারা আদায় করলেন।

খাইবারে ইহুদীদের অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ ছিলো। কয়েকটি সহজেই জয় হলো। কিন্তু দু'টি কিছুতেই জয় করা গেল না। রাসূল (সা) প্রথম দিন আবু বকর, দ্বিতীয় দিন 'উমারকে পাঠালেন দুর্গ দু'টি জয় করার জন্য। তাঁরা দু'জনই ফিরে এলেন অকৃতকার্য হয়ে। তৃতীয় দিন রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন ঃ 'আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।' পর দিন সাহাবায়ে কিরাম অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির। প্রত্যেকেরই অন্তরে এই গৌরব অর্জনের বাসনা। 'উমার বলেন ঃ 'আমি খাইবারে এই ঘটনা ব্যতীত কোনদিনই সেনাপতিত্ব বা সরদারীর জন্য লালায়িত হইনি।' সে দিনের এ গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শের-ই-খোদা আলী (রা)।

খাইবারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হলো। হযরত 'উমার (রা) তাঁর ভাগ্যের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াক্ফ। (আল-ফারুক ঃ ৩০)

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত 'উমার (রা) ছায়ার মত রাসূলকে (সা) সঙ্গ দেন। ইসলামের মহাশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে 'উমার রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করেন ঃ 'অনুমতি দিন এখনই ওর দফা শেষ করে দিই।' এদিন মক্কার পুরুষরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে এবং মহিলারা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে 'উমারের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন।

হুনায়িন অভিযানেও হযরত 'উমার অংশগ্রহণ করে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ইবন ইসহাক বলেন ঃ মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এই বিপদকালে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, 'উমার ও আব্বাসের (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত 'উমার (রা) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের খবর শুনে হযরত 'উমার কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে যেয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা করেন, 'যে বলবে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।' এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর 'সাকীফা বনী সায়েদায়' দীর্ঘ আলোচনার পর 'উমার খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকরের হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ফলে খলীফা নির্বাচনের মহা সংকট সহজেই কেটে যায়।

খলীফা হযরত আবু বকর যখন বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে,

মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে 'উমার (রা) ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফকে (রা) ডেকে বললেন, 'উমার সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' তিনি বললেন ঃ 'তিনি তো যে কোন লোক থেকে উত্তম; কিন্তু তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে।' আবু বকর বললেন ঃ 'তার কারণ, আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে পড়লে এ কঠোরতা অনেকটা কমে যাবে।' তারপর আবু বকর অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো কাছে ফাঁস না করার জন্য। অতঃপর তিনি 'উসমান ইবন আফ্‌ফানকে ডাকলেন। বললেন, 'আবু আবদিল্লাহ, 'উমার সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' 'উসমান বললেন ঃ আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশী জানেন। আবু বকর বললেন ঃ তা সত্ত্বেও আপনার মতামত আমাকে জানান। 'উসমান বললেন ঃ তাঁকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁর বাইরের থেকে ভেতরটা বেশী ভালো। তাঁর মত দ্বিতীয় আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই। আবু বকর (রা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

এভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মতামত নেওয়া শেষ হলে তিনি উসমান ইবন আফ্‌ফানকে ডেকে ডিক্‌টেশন দিলেন ঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবু বকর ইবন আবী কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অঙ্গীকার। আম্মা বাদ'– এতটুকু বলার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তারপর 'উসমান ইবন আফ্‌ফান নিজেই সংযোজন করেন– 'আমি তোমাদের জন্য 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করলাম এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় কোন ত্রুটি করি নাই।' অতঃপর আবু বকর সংজ্ঞা ফিরে পান। লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শোনান হলো।' সবটুকু শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠেন এবং বলেন ঃ আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা গেলে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করবে। 'উসমানকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।

তাবারী বলেন ঃ অতঃপর আবু বকর লোকদের দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। সমবেত লোকদের তিনি বলেন ঃ 'যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য মনোনীত করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার কোন নিকট আত্মীয়কে এ পদে বহাল করিনি। আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলীফা মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন।' এভাবে 'উমারের (রা) খিলাফত শুরু হয় হিঃ ১৩ সনের ২২ জামাদিউস সানী মুতাবিক ১৩ আগস্ট ৬৩৪ খৃঃ।

হযরত 'উমারের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়। দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর

যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়। ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলতঃ তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।

হযরত 'উমার প্রথম খলীফা যিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেন, জন শাসনের জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন, মদপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, বহু রাজ্য জয় করেন, নগর পত্তন করেন, সেনাবাহিনীর স্তরভেদ ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিস্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরী করেন, কাযী নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

'উমার (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম কাতিব। নিজ কন্যা হযরত হাফসাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকরের (রা) মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান। কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে হযরত আলী (রা) সহ উঁচু পর্যায়ের সাহাবীরা পরামর্শ করে বাইতুল মাল থেকে বাৎসরিক মাত্র আট শ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। হিজরী ১৫ সনে বাইতুল মাল থেকে অন্য লোকদের ভাতা নির্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবীদের ভাতার সমান তাঁরও ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচ হাজার দিরহাম।

বাইতুল মালের অর্থের ব্যাপারে হযরত 'উমারের (রা) দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়াতিমের অর্থের মত। ইয়াতিমের অভিভাবক যেমন ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইয়াতিমের ও নিজের জন্য প্রয়োজন মত খরচ করতে পারে কিন্তু অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হিফাজত করে এবং ইয়াতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাইতুল মালের প্রতি 'উমারের (রা) এ দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদা তাঁর কর্ম ও আচরণে ফুটে উঠেছে।

হযরত 'উমার সব সময় একটি দুর্রা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন। শয়তানও তাঁকে দেখে পালাতো। (তাজকিরাতুল হুফফাজ) তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর প্রজাপালনের বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত ফারুকে আযমের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে এত বেশী ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য বাণী রয়েছে যে, সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে তা প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) নিকট তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এজন্য বলা হয়েছে, 'উমারের সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।' হযরত আলী (রা) মন্তব্য করেছেন ঃ 'খাইরুল উম্মাতি বা'দা নাবিয়্যিহা আবু বকর সুম্মা 'উমার—নবীর (সা) পর উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তারপর 'উমার।' হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন ঃ 'উমারের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরাত আল্লাহর

সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত।' 'উমারের যাবতীয় গুণাবলী লক্ষ্য করেই রাসূলে করীম (সা) বলেছিলেন ঃ 'লাও কানা বা'দী নাবিয়্যুন লাকানা 'উমার– আমার পরে কেউ নবী হলে 'উমারই হতো।' কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে 'উমারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবী কবিতা পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ; তাঁর সামনে ভাষার ব্যাপারে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দ্বীনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। আল্লামা জাহাবী *'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'উমার ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি তিনি তাকিদ দেন।

প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবন শু'বার (রা) অগ্নি উপাসক দাস আবু লু'লু ফিরোজ ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এই মহান খলীফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে আলী, উসমান, আবদুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ, যুবাইর ও তালহা (রা)– এ ছয় জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। হযরত সুহায়িব (রা) জানাযার নামায পড়ান। রওজায়ে নববীর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।

'উসমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা)

নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু 'আমর, আবু আবদিল্লাহ, আবু লায়লা এবং লকব যুন-নূরাইন। (তাবাকাত ৩/৫৩, তাহজীবুত তাহজীব) পিতা 'আফ্‌ফান, মাতা আরওরা বিনতু কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা শাখার সন্তান। তাঁর উর্ধ পুরুষ 'আবদে মান্নাফে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলীফা। তাঁর নানী বায়দা বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। জন্ম হস্তীসনের ছ'বছর পরে ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে। (আল-ইসতিয়াব) এ হিসাবে রাসূলে করীম (সা) থেকে তিনি ছয় বছর ছোট। তবে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে। (ফিত্‌নাতুল কুবরা, ডঃ তোহা হুসাইন)

হযরত 'উসমান (রা) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফী, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত।

হযরত 'উসমানের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবীর মত জাহিলী যুগের অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন এমনভাবে বিলীন হয়েছে যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলামপূর্ব জীবনের বিশেষ কোন তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের কাছে পৌছাতে পারেননি।

হযরত 'উসমান ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সব সময় তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকতো। জাহিলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসাবে 'গনী' উপাধি লাভ করেন।

হযরত 'উসমানকে 'আস-সাবেকুনাল আওয়ালুন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' এবং সেই ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয় যাঁদের প্রতি রাসূলে করীম (সা) আমরণ খুশী ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (সীরাতে ইবন হিশাম) মক্কার আরো অনেক নেতৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত হযরত 'উসমান রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং আজীবন জান-মাল ও সহায়

সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণব্রতী ছিলেন। হযরত 'উসমান বলেন ঃ 'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।' (উসুদুল গাবা) ইবন ইসহাকের মতে, আবু বকর, আলী এবং যায়িদ বিন হারিসের পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত উসমান।

হযরত 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দীসগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার সারকথা নিম্নরূপ ঃ

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি নবী করীম (সা) সম্পর্কে উসমানকে কিছু কথা বলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দেন। তারই উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল ফিত্‌নাতুল কুবরা) পক্ষান্তরে ইবন সা'দ সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত উসমান সিরিয়া সফরে ছিলেন। যখন তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দ্রালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেন ঃ ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমাদ নামের রাসূল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় ফিরে এসে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য। অতঃপর আবু বকরের আহবানে ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাবাকাত ঃ ৩/৫৫)

হযরত 'উসমান যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স তিরিশের উপরে। ইসলামপূর্ব যুগেও আবু বকরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর আবু বকরের বাড়ীতে যাতায়াত ছিল। একদিন হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করলেন। ঘটনাক্রমে রাসূল (সা)ও তখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ঃ 'উসমান, জান্নাতের প্রবেশকে মেনে নাও। আমি তোমাদের এবং আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি তাঁর রাসূল হিসেবে এসেছি। একথা শুনার সাথে সাথে তিনি ইসলাম কবুল করেন। হযরত 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন।

হযরত 'উসমানের সহোদরা আমীনা, বৈপিত্রীয় ভাই বোন ওয়ালীদ, খালিদ, আম্মারা, উম্মু কুলসুম সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা উকবা ইবন আবী মুয়ীত। দারু কুত্‌নী বর্ণনা করেছেন, উম্মু কুলসুম প্রথম পর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে তিনিই প্রথম কুরাইশ বধূ যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। হযরত 'উসমানের অন্য ভাই-বোন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল 'আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম মার দিত। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছ। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে হযরত 'উসমানের ঈমান একটুও টলেনি। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের যা ইচ্ছে কর, এ দ্বীন আমি কক্ষণো ছাড়তে পারবো না। (তাবাকাত ঃ ৩/৫৫)

হযরত উসমান ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ কন্যা 'রুকাইয়্যাকে' তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার ইনতিকাল হলে রাসূলুল্লাহ

(সা) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি 'যুন-নূরাইন'— দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন।

রুকাইয়্যা ছিলেন হযরত খাদীজার (রা) গর্ভজাত সন্তান। তাঁর প্রথম শাদী হয় উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে এবং উম্মু কুলসুমের শাদী হয় আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র 'উতাইবার সাথে। আবু লাহাব ছিল আল্লাহর নবীর কট্টর দুশমন। পবিত্র কুরআনের সূরা লাহাব নাযিলের পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল (হাম্মা লাতাল হাতাব) তাদের পুত্রদ্বয়কে নির্দেশ দিল মুহাম্মাদের কন্যাদ্বয়কে তালাক দেওয়ার জন্য। তারা তালাক দিল। অবশ্য ইমাম সুয়ূতী মনে করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই রুকাইয়্যার সাথে উসমানের শাদী হয়। উপরোক্ত ঘটনার আলোকে সুয়ূতীর মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরাত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরাতকারী উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়্যা।' রাসূল (সা) দীর্ঘদিন তাঁদের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সেই সময় এক কুরাইশ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। তার কাছে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনের কুশল জিজ্ঞেস করেন। সে সংবাদ দেয়, 'আমি দেখেছি, রুকাইয়্যা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং 'উসমান গাধাটি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন ঃ আল্লাহ তার সহায় হোন। লূতের (আ) পর 'উসমান আল্লাহর রাস্তায় পরিবার পরিজনসহ প্রথম হিজরাতকারী। (আল-ইসাবা) হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে এবং এ ছেলের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদিল্লাহ। হিজরী ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ মারা যান। রুকাইয়্যার সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতো কেউ যদি সর্বোত্তম জুটি দেখতে চায়, সে যেন উসমান ও রুকাইয়্যাকে দেখে।

হযরত উসমান বেশ কিছু দিন হাবশায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন এই গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর আবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি 'যুল হিজরাতাইন'– দুই হিজরাতের অধিকারী হন।

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল (সা) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, হযরত রুকাইয়্যা তখন রোগ শয্যায়। রাসূলের (সা) নির্দেশে হযরত 'উসমান পীড়িত স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌঁছুলো সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা ইনতিকাল করেন। রাসূল (সা) উসমানের জন্য বদরের যোদ্ধাদের মত সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন। (তাবাকাত ঃ ৩/৫৬) এ হিসেবে পরোক্ষভাবে তিনিও বদরী সাহাবী।

রুকাইয়্যার ইনতিকালের পর রাসূল (সা) রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মু কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন হিজরী তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূল (সা) উম্মু কুলসুমকে 'উসমানের সাথে বিয়ে দেন। হিজরী নবম সনে

উম্মু কুলসুমও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। উম্মু কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি 'উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।' (হায়াতু 'উসমান ঃ রিজা মিসরী)

হযরত উসমান উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে চলে যান। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবীদের মত অংশগ্রহণ করেছেন।

রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও ঘোষণা দিলেন এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য। ইসলামী ফৌজের সংগঠন ও ব্যয় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবীরা ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবু বকর তাঁর সকল অর্থ রাসূলের হাতে তুলে দিলেন। 'উমার তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার উসমান নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয় শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছনে হযরত উসমান এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন যে, তাঁর সমপরিমাণ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের প্রস্তুতির জন্য উসমান কোরচে করে এক হাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে ঢেলে দেন। রাসূল (সা) খুশীতে দীনারগুলি উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেন ঃ 'আজ থেকে 'উসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতিকর হবেনা।' এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি প্রাণ খুলে চাঁদা দিতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সা) তাঁর আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা)

হুদাইবিয়ার ঘটনা। রাসূল (সা) 'উমারকে ডেকে বললেন ঃ তুমি মক্কায় যাও। মক্কার নেতৃবৃন্দকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত কর। 'উমার বিনীতভাবে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরাইশদের কাছ থেকে আমার জীবনের আশঙ্কা করছি। আপনি জানেন তাদের সাথে আমার দুমশনি কতখানি। আমি মনে করি উসমানই এ কাজের উপযুক্ত। রাসূল (সা) 'উসমানকে ডাকলেন। আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট এ পয়গামসহ উসমানকে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ নয়, বরং 'বাইতুল্লাহর' যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) পয়গাম নিয়ে উসমান মক্কায় পৌছলেন। সর্ব প্রথম আবান ইবন সাঈদ ইবন আস-এর সাথে তাঁর দেখা হয়। আবান তাঁকে নিরাপত্তা দেন। আবানকে সঙ্গে করে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে রাসূলুল্লাহর (সা) পয়গাম পৌছে দেন। তারা 'উসমানকে বলে, তুমি ইচ্ছে করলে 'তাওয়াফ' করতে পার। কিন্তু 'উসমান তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন. আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা) যতক্ষণ 'তাওয়াফ' না করেন, আমি 'তাওয়াফ' করতে পারিনে। কুরাইশরা তাঁর এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে।

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, 'উসমানকে তারা তিনদিন আটক করে রাখে। এ দিকে হুদাইবিয়ায় মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে উসমানকে শহীদ করা হয়েছে। রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন 'উসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না। রাসূল (সা) নিজের ডান হাতটি বাম হাতের ওপরে রেখে বলেন ঃ হে আল্লাহ, এ বাইয়াত 'উসমানের পক্ষ থেকে। সে তোমার ও তোমার রাসূলের কাজে মক্কায় গেছে। হযরত 'উসমান মক্কা থেকে ফিরে এসে বাইয়াতের কথা জানতে পারেন। তিনি নিজেও রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করেন। ইতিহাসে এ ঘটনা বাইয়াতু রিদওয়ান, বাইয়াতুশ শাজারা ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ বাইয়াতের প্রশংসা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর যখন আবু বকরের হাতে বাইয়াত নেওয়া হচ্ছিল উসমান সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে যান এবং আবু বকরের হাতে বাইয়াত করেন। মৃত্যুকালে আবু বকর 'উমারকে (রা) খলীফা মনোনীত করে যে অঙ্গীকার পত্রটি লিখে যান, তার লিখক ছিলেন 'উসমান। খলীফা 'উমারের (রা) হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বাইয়াত করেন।

হযরত 'উমার (রা) ছুরিকাহত হয়ে যখন মৃত্যু শয্যায়, তাঁর কাছে দাবী করা হলো পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন ঃ আমি যদি খলিফা বানিয়ে যাই, তবে তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, যেমনটি করেছেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি, অর্থাৎ আবু বকর (রা) আর যদি না-ও বানিয়ে যাই তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমনটি করেছিলেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি আরো বললেন ঃ আবু 'উবাইদা জীবিত থাকলে তাকেই খলীফা বানিয়ে যেতাম। আমার রব আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি এই উম্মাতের আমীন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি। যদি আবু হুজাইফার আযাদকৃত দাস সালেমও আজ জীবিত থাকতো, তাকেও খলীফা বানিয়ে যেতে পারতাম, আমার রব জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, সালেম বড় আল্লাহ-প্রেমিক। এক ব্যক্তি তখন বললো, আবদুল্লাহ ইবন উমার তো আছে। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহর, আমি আল্লাহর কাছে এমনটি চাই না।... খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে, আমার বংশের থেকে আমি তা লাভ করেছি। আর যদি তা মন্দ হয় তাও আমরা পেয়েছি। উমারের বংশের এক ব্যক্তির হিসাব নিকাশই এজন্য যথেষ্ট। আমি আমার নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে মাহরূম করেছি। কোন পুরস্কারও নয় এবং কোন তিরস্কারও নয় এমনভাবে যদি আমি কোন মতে রেহাই পাই, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।

যখন একই কথা তাঁর কাছে আবার বলা হলো, তিনি আলীর (রা) দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমাদেরকে হকের ওপর পরিচালনার তিনিই যোগ্য। তবে আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এ দায়িত্ব বহন করতে রাজী নই। তোমাদের সামনে এই একটি দল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা হলেন–

আবদে মান্নাফের দুই পুত্র আলী ও উসমান, রাসূলের (সা) দুই মাতুল আবদুর রাহমান ও সা'দ, রাসূলের (সা) হাওয়ারী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তালহা। তাঁদের যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের কারো ওপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, যথাযথভাবে তোমরা তা পালন করবে।

হযরত 'উমার উল্লেখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেন, আপনাদের ব্যাপারে আমি ভেবে দেখেছি। আপনারা জনগণের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা উচিত। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগণের ব্যাপারে আমার কোন ভয় নেই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে।

তারপর তিনি নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তিন দিন তিন রাত্রি। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললেন, আমাকে কবরে শায়িত করার পর এই দলটিকে একত্র করবে এবং তাঁরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। সুহায়িবকে বললেন ঃ তিন দিন তুমি নামাযের জামায়াতের ইমামতি করবে। আলী, উসমান, সা'দ, 'আবদুর রাহমান, যুবাইর ও তালহার কাছে যাবে, যদি তালহা মদীনায় থাকে (তালহা তখন মদীনার বাইরে ছিলেন)। তাদেরকে এক স্থানে সমবেত করবে। আবদুল্লাহ ইবন উমারকেও হাজির করবে। তবে খিলাফতের কোন হক তার নেই। তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তাঁদের পাঁচজন যদি কোন একজনের ব্যাপারে একমত হয় এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে, তরবারি দিয়ে তার কল্লা কেটে ফেলবে। আর যদি চারজন একমত হয় এবং দু'জন অস্বীকার করে, তবে সে দু'জনের কল্লা উড়িয়ে দেবে। আর যদি তিনজন করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, আবদুল্লাহ বিন 'উমার যে পক্ষ সমর্থন করবে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। অন্য পক্ষ যদি আবদুল্লাহ বিন 'উমারের সিদ্ধান্ত না মানে, তাহলে আবদুর রাহমান বিন 'আউফ যে দিকে থাকবে তোমরা সে দিকে যাবে। বিরোধীরা যদি জনগণের সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে তাদেরকে মানাতে বাধ্য করবে।

হযরত 'উমারকে দাফন করার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ শূরার সদস্যদের মিসওয়ার ইবনুল মাখরামা মতান্তরে হযরত আয়িশার হুজরায় একত্র করলেন। তাঁরা পাঁচজন। তালহা তখনো মদীনার বাইরে। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন আবদুল্লাহ বিন 'উমার। বাড়ীর দরজায় প্রহরী নিয়োগ করা হলো আবু তালহাকে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলো। এক পর্যায়ে আবদুর রাহমান বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে তার দাবী ত্যাগ করতে পার এবং তোমাদের উত্তম বক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে পার? আমি আমার খিলাফতের দাবী ত্যাগ করছি। হযরত 'উসমান সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে আবদুর রাহমানের হাতে তাঁর ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবে খলীফা নির্বাচনের গোটা দায়িত্বটি আবদুর রাহমানের ওপর এসে বর্তায়।

হযরত আবদুর রাহমান দিনরাত রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যসব সাহাবী, মদীনায় অবস্থানরত সকল সেনা-অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই হযরত উসমানের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করলেন।

যেদিন সকালে 'উমার-নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হবে, সে রাতে আবদুর রাহমান এলেন মাখরামার বাড়ীতে। তিনি প্রথমে যুবাইর ও সা'দকে ডেকে মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসে এক এক করে তাঁদের সাথে কথা বললেন, এভাবে 'উসমান ও আলীর সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ করেন।

এদিকে মসজিদে নববী লোকে পরিপূর্ণ। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল। ফজরের নামাযের পর সমবেত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণের পর আবদুর রাহমান খলীফা হিসেবে হযরত 'উসমানের নামটি ঘোষণা করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। তারপরই হযরত আলীও বাইয়াত করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলী হযরত 'উসমানের হাতে বাইয়াত করেন। হিজরী ২৪ সনের ১লা মুহাররম সোমবার সকালে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ, খিদরী বেক)

হযরত 'উসমান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায়না। তবে শেষের দিকে বসরা, কুফা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মূলতঃ এ অসন্তোষ সৃষ্টির পশ্চাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইয়াহুদী শক্তি। ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং মদীনায় খলীফার বাসভবন ঘেরাও করে। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল না। তারা খলীফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাগ দাবী করে। খলীফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে তারা খলীফার বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলীফাকে হত্যা করে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ জিলহজ্জ, শুক্রবার আসর নামাযের পর। রাসূলের (সা) ওফাত ও হযরত উসমানের শাহাদাতের মধ্যে ২৫ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

জান্নাতুল বাকীর 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। যুবাইর ইবন মুতঈম (রা) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাযায় মাত্র সত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ৮২ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল। (আল-ফিত্নাতুল কুবরা)

খলীফা উসমান বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাদের নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান নিজের

জন্য কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত উসমান (রা) যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলীফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর স্থলে যদি কোন বাদশাহ হতো, নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যেকোন কৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাতে যত ক্ষতি বা ধ্বংসই হোক না কেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খলীফা রাশেদ। নিজের জীবন দেওয়াকে তুচ্ছ মনে করেছেন। তবুও যেন এমন সম্মান বিনষ্ট না হতে পারে যা একজন মুসলমানের সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া উচিত।' (খিলাফত ও মুলুকিয়্যাত ঃ আবুল আ'লা মওদূদী)

ইসলামের জন্য হযরত 'উসমানের অবদান মুসলিম জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিস্তর অর্থের বিনিময়ে ইয়াহুদী মালীকানাধীন 'বীরে রুমা'– কূপটি খরীদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। বিনিময়ে রাসূল (স) তাঁকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যিনি একদিন 'বীরে রুমা' ওয়াক্‌ফ করে মদীনাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়ীতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে আমিই বীরে রুমা খরীদ করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি।

হযরত উসমানের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা) হতে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসূল (সা) বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।' (তিরমিযী) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার বলেন ঃ নবীর (সা) সময়ে মুসলমানরা আবু বকর, 'উমার ও উসমানকে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেওয়া হতো না।

হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে 'কাতিবে অহী'– অহী লিখক ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ্জ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ্জ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা রাখতেন। সারা রাত ইবাদতে কাটতো। এক রাকআতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খিদমাত গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল। তিনি আরো বলেছেন ঃ উসমানকে দেখে ফিরিশতারাও লজ্জা পায়। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তাঁর গুণাবলী ও মর্যাদা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাবে না।

'আলী ইবন আবী তালিব (রা)

নাম আলী, লকব আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা, কুনিয়াত আবুল হাসান ও আবু তুরাব। পিতা আবু তালিব আবদু মান্নাফ, মাতা ফাতিমা। পিতা-মাতা উভয়ে কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার সন্তান। আলী রাসূলুল্লাহর (সা) আপন চাচাতো ভাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। আবু তালিব ছিলেন ছাপোষা মানুষ। চাচাকে একটু সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন আলীকে। এভাবে নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন। রাসূল (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, আলীর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে। একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন, রাসূলে কারীম (সা) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) সিজদাবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন, এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি। আলী তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করেন। মুসলমান হয়ে যান। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়্যাতের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। অবশ্য আবু বকর, আলী ও যায়িদ বিন হারিসা—এ তিন জনের কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। (তাবাকাত ঃ ৩/২১) ইবন 'আব্বাস ও সালমান ফারেসীর (রা) বর্ণনা মতে, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) পর আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা, বয়স্ক আযাদ পুরুষদের মধ্যে আবু বকর, দাসদের মধ্যে যায়িদ বিন হারিসা ও কিশোরদের মধ্যে আলী (রা) প্রথম মুসলমান।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূলে কারীম (সা) হুকুম দিলেন আলীকে, কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ উপস্থিত হল। আহার পর্ব শেষ হলে রাসূল (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে? সকলেই নিরব। হঠাৎ আলী (রা) বলে উঠলেন ঃ 'যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে।'

হিজরাতের সময় হল। অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেছেন। রাসূলে কারীম (সা) আল্লাহর হুকুমের প্রতীক্ষায় আছেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাসূলে কারীমকে (সা) দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (সা) এ খবর জানিয়ে দেন। তিনি মদীনায় হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয়, এ জন্য আলীকে রাসূল (সা) নিজের বিছানায় ঘুমাবার নির্দেশ দেন এবং সিদ্দীকে আকবরকে সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে মদীনা রওয়ানা হন। আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত

আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রাসূলে কারীমের (সা) স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তাআলা আলীকে (রা) হিফাজত করেন।

এ হিজরাত প্রসঙ্গে হযরত আলী (সা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যেসব আমানত তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেব। এ জন্যই তো তাঁকে 'আল-আমীন' বলা হতো। আমি তিনদিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বনী 'আমর ইবন আওফ– যেখানে রাসূল (সা) অবস্থান করছিলেন, আমি উপস্থিত হলাম। কুলসুম ইবন হিদ্‌মের বাড়ীতে আমার আশ্রয় হল।' অন্য একটি বর্ণনায়, আলী (রা) রবীউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি কুবায় উপস্থিত হন। রাসূল (সা) তখনো কুবায় ছিলেন। (তাবাকাত ঃ ৩/২২)

মাদানী জীবনের সূচনাতে রাসূল (সা) যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে 'মুয়াখাত' বা দ্বীনী-ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করছিলেন, তিনি নিজের একটি হাত আলীর (রা) কাঁধে রেখে বলেছিলেন, 'আলী তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তরাধিকারী।' (তাবাকাত ঃ ৩/২২) পরে রাসূল (সা) আলী ও সাহল বিন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন। (তাবাকাত ঃ ৩/২৩)

হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) জামাই হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

ইসলামের জন্য হযরত আলীর (রা) অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলে কারীমের (সা) যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দেন। এ কারণে হুজুর (সা) তাঁকে 'হায়দার' উপাধিসহ 'যুল-ফিকার' নামক একখানি তরবারি দান করেন।

একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরে তাঁর সাদা পশমী রুমালের জন্য তিনি ছিলেন চিহ্নিত। কাতাদা থেকে বর্ণিত। বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে আলী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাবাহী। (তাবাকাত ঃ ৩/২৩) উহুদে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলুল্লাহকে (সা) কেন্দ্র করে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, আলী (রা) তাঁদের একজন। অবশ্য পলায়নকারীদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে।

ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত। খন্দকের দিনে 'আমর ইবন আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হল। সে হুংকার ছেড়ে বললো ঃ কে আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'এ হচ্ছে 'আমর তুমি বস।' 'আমর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল ঃ আমার সাথে লড়বার মত কেউ নেই? তোমাদের সেই জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে

তোমাদের ধারণা? তোমাদের কেউই এখন আমার সাথে লড়তে সাহসী নয়? আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ বস। তৃতীয় বারের মত আহ্বান জানিয়ে 'আমর তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। আলী (রা) আবারো উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে তো 'আমর। আলী (রা) বললেন ঃ তা হোক। এবার আলী (রা) অনুমতি পেলেন। আলী (রা) তাঁর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'আমর জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি কে? বললেন ঃ আলী (রা)। সে বললো ঃ আবদে মান্নাফের ছেলে? আলী বললেন ঃ আমি আবু তালিবের ছেলে আলী। সে বললো ঃ ভাতিজা, তোমার রক্ত ঝরানো আমি পছন্দ করিনে। আলী বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানো অপসন্দ করিনে। এ কথা শুনে 'আমর ক্ষেপে গেল। নিচে নেমে এসে তরবারি টেনে বের করে ফেললো। সে তরবারি যেন আগুনের শিখা। সে এগিয়ে আলীর ঢালে আঘাত করে ফেঁড়ে ফেললো। আলী পাল্টা এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তারপর আলী নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে আসেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসীর ৪/১০৬)।

সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াহুদীদের কয়েকটি সুদৃঢ় কিল্লা ছিল। প্রথমে সিদ্দীকে আকবর, পরে ফারুকে আজমকে কিল্লাগুলি পদানত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তারা কেউই সফলকাম হতে পারলেন না। নবী (সা) ঘোষণা করলেন ঃ 'কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। তারই হাতে কিল্লাগুলির পতন হবে।' পরদিন সকালে সাহাবীদের সকলেই আশা করছিলেন এই গৌরবটি অর্জন করার। হঠাৎ আলীর ডাক পড়লো। তাঁরই হাতে খাইবারের সেই দুর্জয় কিল্লাগুলির পতন হয়।

তাবুক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) আলীকে (রা) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। আলী (রা) আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ হারুন যেমন ছিলেন মুসার, তেমনি তুমি হচ্ছো আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। (তাবাকাত ঃ ৩/২৪)

নবম হিজরীতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে প্রথম ইসলামী হজ্জ্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ছিলেন 'আমীরুল হজ্জ্ব। তবে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য রাসূল (সা) আলীকে (রা) বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

দশম হিজরীতে ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে পাঠানো হয়। ছ'মাস চেষ্টার পরও তিনি সকলকাম হতে পারলেন না। ফিরে এলেন। রাসূলে করীম (সা) আলীকে (রা) পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন। আলী (সা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে পাঠাচ্ছেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। উত্তরে রাসূল

(সা) বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে সঠিক রায় এবং তোমার অন্তরে শক্তিদান করবেন। তিনি আলীর (সা) মুখে হাত রাখলেন। আলী বলেন ঃ 'অতঃপর আমি কক্ষনো কোন বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।' যাওয়ার আগে রাসূল (সা) নিজ হাতে আলীর (রা) মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দুআ করেন। আলী ইয়ামনে পৌছে তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল ইয়ামনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। রাসূল (সা) আলীকে (রা) দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি দুআ করেন ঃ আল্লাহ, আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়। হযরত আলী বিদায় হজ্জের সময় ইয়ামন থেকে হাজির হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী (রা) গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরযার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

হযরত আবু বকর, হযরত উমার ও হযরত উসমানের (রা) খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বাইয়াত করেন এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শরীক থাকেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও হযরত উসমানকে পরামর্শ দিয়েছেন। যেভাবে আবু বকরকে 'সিদ্দীক', উমারকে 'ফারুক' এবং উসমানকে 'গণী' বলা হয়, তেমনিভাবে তাঁকেও 'আলী মুরতাজা' বলা হয়। হযরত আবু বকর ও উমারের যুগে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। হযরত 'উসমানও সব সময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। (মরুজুজ জাহাব ঃ ২/২)

বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত উসমান ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আলীই (৯রা) সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করেন। সেই ঘেরাও অবস্থায় হযররত উসমানের (রা) বাড়ীর নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইনকে (রা) নিয়োগ করেন। (আল-ফিত্নাতুল কুবরা ঃ ডঃ ত্বাহা হুসাইন)

হযরত উমার (রা) ইনতিকালের পূর্বে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের অসীয়াত করে যান। আলীও ছিলেন তাঁদের একজন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আলীর (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায়, তবে সে তাদেরকে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে। (আল-ফিত্নাতুল কুবরা) হযরত 'উমার তাঁর বাইতুল মাকদাস' সফরের সময় আলীকে (রা) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর বিদ্রোহীরা হযরত তালহা, যুবাইর ও আলীকে (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চাপ দেয়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আলী (রা) বার বার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনাবাসীরা হযরত আলীর (রা) কাছে গিয়ে বলে, খিলাফতের এ পদ এভাবে শূন্য থাকতে পারে না। বর্তমানে এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। আপনিই এর হকদার। মানুষের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তবে শর্ত আরোপ করেন যে, আমার বাইয়াত গোপনে হতে পারবে না। এজন্য সর্বশ্রেণীর মুসলমানের সম্মতি

প্রয়োজন। মসজিদে নববীতে সাধারণ সভা হলো। মাত্র ষোল অথবা সতেরো জন সাহাবা ছাড়া সকল মুহাজির ও আনসার আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেন।

অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে হযরত আলীর (রা) খিলাফতের সূচনা হয়। খলীফা হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল হযরত উসমানের (রা) হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করা। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না। প্রথমতঃ হত্যাকারীদের কেউ চিনতে পারেনি। হযরত উসমানের স্ত্রী হযরত নায়িলা হত্যাকারীদের দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে চিনতে পারেননি। মুহাম্মাদ বিন আবু বকর হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উসমানের এক ক্ষোভ-উক্তির মুখে তিনি পিছটান দেন। মুহাম্মাদ বিন আবু বকরও হত্যাকারীদের চিনতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ মদীনা তখন হাজার হাজার বিদ্রোহীদের কব্জায়। তারা হযরত আলীর (রা) সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাঁর এই অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমানই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা হযরত আলীর (রা) নিকট তক্ষুণি হযরত উসমানের (রা) 'কিসাস' দাবী করেন। এই দাবী উত্থাপনকারীদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) সহ তাল্‌হা ও যুবাইরের (রা) মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন। তাঁরা হযরত আয়িশার (রা) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সহ মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল বেশী। আলীও (রা) তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌছেন। বসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। হযরত আয়িশা (রা) আলীর (রা) কাছে তাঁর দাবী পেশ করেন। আলীও (রা) তাঁর সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠা তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। হযরত তালহা ও যুবাইর ফিরে চললেন। আয়িশাও ফেরার প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু হাংগামা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীরা উভয় বাহিনীতেই ছিল। তাই আপোষ মীমাংসায় তারা ভীত হয়ে পড়ে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে এক পক্ষ অন্য পক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে দেয়। ফল এই দাঁড়ায়, উভয় পক্ষের মনে এই ধারণা জন্মালো যে, আপোষ মীমাংসার নামে ধোঁকা দিয়ে প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপর হামলা করে বসেছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আলীর (রা) জয় হয়। তিনি বিষয়টি হযরত আয়িশাকে (রা) বুঝাতে সক্ষম হন। আয়িশা (রা) বসরা থেকে মদীনায় ফিরে যান।

যুদ্ধের সময় আয়িশা উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। ইতিহাসে তাই এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউস-সানী মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আশারায়ে মুবাশ্‌শারার সদস্য হযরত তাল্‌হা ও যুবাইরসহ উভয় পক্ষে মোট তের হাজার মুসলমান শহীদ হন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হযরত আলী (রা) পনের দিন বসরায় অবস্থানের পর কুফায় চলে যান। রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়।

এই উটের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ। অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগদান করেননি। এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের জন্য তাঁরা ব্যথিতও হয়েছিলেন। আলীর (রা) বাহিনী যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হয়, মদীনাবাসীরা তখন কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন।

হযরত আয়িশার (রা) সাথে তো একটা আপোষরফায় আসা গেল। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়ার (রা) সাথে কোন মীমাংসায় পৌছা গেল না। হযরত আলী (রা) তাঁকে

সিরিয়ার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বেঁকে বসলেন। আলীর (রা) নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল, 'উসমান (রা) হত্যার কিসাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি আলীকে (রা) খলীফা বলে মানবেন না।'

হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে 'সিফ্‌ফীন' নামক স্থানে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে যায়। এ সংঘর্ষ ছিল উটের যুদ্ধ থেকেও ভয়াবহ। উভয় পক্ষে মোট ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আম্মার বিন ইয়াসীর, খুযাইমা ইবন সাবিত, ও আবু আম্মারা আল-মাযিনীও ছিলেন। তাঁরা সকলেই আলীর (রা) পক্ষে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। উল্লেখ্য যে, আম্মার বিন ইয়াসির সম্পর্কে রাসূল (রা) বলেছিলেন ঃ 'আফসুস, একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে।' (সহীহুল বুখারী) সাতাশ জন প্রখ্যাত সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়াও হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী। অবশ্য হযরত মুয়াবিয়া (রা) হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এত কিছুর পরেও বিষয়টির ফায়সালা হলো না।

সিফ্‌ফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষে, যাকে 'লাইলাতুল হার' বলা হয়, হযরত আলীর (রা) জয় হতে চলেছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) পরাজয়ের ভাব বুঝতে পেরে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসার আহ্বান জানালেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে থাকে, এই কুরআন আমাদের এ দ্বন্দ্বের ফায়সালা করবে। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো। হযরত আলীর (রা) পক্ষে আবু মুসা আশয়ারী (রা) এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস হাকাম বা সালিশ নিযুক্ত হলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এই দুইজনের সম্মিলিত ফায়সালা বিরোধী দু'পক্ষই মেনে নেবেন। 'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে মুসলমানদের বড় আকারের এক সম্মেলন হয়। কিন্তু সব ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তটি পাওয়া যায় তা হলো, হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা) হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রা) সাথে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, শেষ মুহূর্তে তা থেকে সরে আসায় এ সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। দুমাতুল জান্দাল থেকে হতাশ হয়ে মুসলমানরা ফিরে গেল। অতঃপর আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ধি করলেন। এ দিন থেকে মূলতঃ মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এ সময় 'খারেজী' নামে নতুন একটি দলের জন্ম হয়। প্রথমে তারা ছিল আলী সমর্থক। কিন্তু পরে তারা এ বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন মানুষকে 'হাকাম' বা সালিশ নিযুক্ত করা কুফরী কাজ। আলী (রা) আবু মুসা আশয়ারীকে (রা) 'হাকাম' মেনে নিয়ে কুরআনের খেলাফ কাজ করেছেন। সুতরাং হযরত আলী তাঁর আনুগত্য দাবী করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা হযরত আলী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী। তাদের সাথে আলীর (রা) একটি যুদ্ধ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়।

এই খারেজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি আবদুর রহমান মুলজিম, আল-বারাক ইবন আবদিল্লাহ ও 'আমর ইবন বকর আত-তামীমী, নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন

বৈঠকে মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম উম্মার অন্তর্কলহের জন্য দায়ী মূলতঃ আলী, মুয়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল আস (রা)। সুতরাং এ তিন ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মুতাবিক ইবন মুলজিম দায়িত্ব নিল আলীর (রা) এবং আল-বারাক ও 'আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে মুয়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল আসের (রা)। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মারবে নয় তো মরবে। হিজরী ৪০ সনের ১৭ রমজান ফজরের নামাযের সময়টি এ কাজের জন্য নির্ধারিত হয়। অতঃপর ইবন মুলজিম কুফা, আল-বারাক দিমাশ্‌ক ও 'আমর মিসরে চলে যায়।

হিজরী ৪০ সনের ১৬ রমজান শুক্রবার দিবাগত রাতে আততায়ীরা আপন আপন স্থানে ওৎ পেতে থাকে। ফজরের সময় হযরত আলী (রা) অভ্যাসমত আস-সালাত বলে মানুষকে নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, পাপাত্মা ইবন মুলজিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। আহত অবস্থায় আততায়ীকে ধরার নির্দেশ দিলেন। সন্তানদের ডেকে অসীয়াত করলেন। চার বছর নয় মাস খিলাফত পরিচালনার পর ১৭ রমজান ৪০ হিজরী শনিবার কুফায় শাহাদাত বরণ করেন।

একই দিন একই সময় হযরত মুয়াবিয়া যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন, তাঁরও ওপর হামলা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তিনি সামান্য আহত হন। অন্য দিকে 'আমর ইবনুল আস অসুস্থতার কারণে সেদিন মসজিদে যাননি। তার পরিবর্তে পুলিশ বাহিনী প্রধান খারেজ ইবন হুজাফা ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। তাঁকেই 'আমর ইবনুল আস মনে করে হত্যা করা হয়। এভাবে মুয়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আস (রা) প্রাণে রক্ষা পান। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যা ঃ খিদরী বেক)

হযরত আলীর (রা) নামাযে জানাযার ইমামতি করেন হযরত হাসান ইবন আলী (রা)। কুফা জামে' মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে নাজফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আততায়ী ইবন মুলজিমকে ধরে আনা হলে আলী (রা) নির্দেশ দেন ঃ 'সে কয়েদী। তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে গেলে তাঁকে হত্যা অথবা ক্ষমা করতে পারি। যদি আমি মারা যাই, তোমরা তাকে ঠিক ততটুকু আঘাত করবে যতটুকু সে আমাকে করেছে। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না।' (তাবাকাত ঃ ৩/৩৫)

হযরত আলী (রা) পাঁচ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর সময়টি যেহেতু গৃহযুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, এ কারণে নতুন কোন অঞ্চল বিজিত হয়নি।

হযরত আলী (রা) তাঁর পরে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক করে যাননি। লোকেরা যখন তাঁর পুত্র হযরত হাসানকে (রা) খলীফা নির্বাচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল; তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ অথবা নিষেধ কোনটাই করছিনা। অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাচ্ছেন না কেন?

বললেন ঃ আমি মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই যেমন গিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)।

হযরত আলীর (রা) ওফাতের পর 'দারুল খিলাফা'– রাজধানী কুফার জনগণ হযরত হাসানকে (রা) খলীফা নির্বাচন করে। তিনি মুসলিম উম্মার আন্তঃকলহ ও রক্তপাত পছন্দ করলেন না। এ কারণে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইরাক আক্রমণ করলে তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে মুয়াবিয়ার (রা) হাতে খিলাফতের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। এভাবে হযরত হাসানের (রা) নজীরবিহীন কুরবানী মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দেয়। খিলাফত থেকে তাঁর পদত্যাগের বছরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল জামায়াহ'— ঐক্য ও সংহতির বছর নামে অভিহিত করা হয়। পদত্যাগের পর হযরত হাসান কুফা ত্যাগ করে মদীনা চলে আসেন এবং নয় বছর পর হিজরী পঞ্চাশ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। মাত্র ছয়টি মাস তিনি খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হযরত উমার (রা) আলী (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী আলী।' এমন কি রাসূল (সা)ও বলেছিলেন, 'আকদাহুম আলী– তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী।' তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করে হযরত উমার (রা) একাধিকবার বলেছেন ঃ 'লাওলা আলী লাহালাকা উমার– আলী না হলে 'উমার হালাক হয়ে যেত।'

আলী (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমান মনে করতেন এবং যে কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইয়াহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে নেয়। আলী বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে জোর করে তা নিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আইন অনুযায়ী ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। তিনি আলীর (রা) দাবীর সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। আলী (রা) তা দিতে পারলেন না। কাজী ইয়াহুদীর পক্ষে মামলার রায় দিলেন। এই ফায়সালার প্রভাব ইয়াহুদীর ওপর এতখানি পড়েছিল যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছিল, 'এতো নবীদের মত ইনসাফ। আলী (রা) আমীরুল মুমিনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।' তিনি ফাতিমার (রা) সাথে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলে করীমের (সা) পরিবারের সাথেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক বাড়ীতে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পুঁজি ও উপকরণ কোথায়? গতরে খেটে এবং গনীমতের হিস্‌সা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত উমারের (রা) যুগে ভাতা চালু হলে তাঁর ভাতা নির্ধারিত হয় বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম। হযরত হাসান বলেন, মৃত্যুকালে একটি গোলাম খরীদ করার জন্য জমা করা মাত্র সাত শ' দিরহাম রেখে যান। (তাবাকাত ঃ ৩/৩৯)

জীবিকার অনটন আলীর (রা) ভাগ্য থেকে কোন দিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি। (হায়াতুস সাহাবা ঃ ৩/৩১২) খলীফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্রের সাথে তাকে লড়তে

হয়েছে। তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। কোন অভাবীকে তিনি ফেরাতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ছিলেন দারুণ বিনয়ী। নিজের হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ করতেন। সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন। তাও ছেঁড়া, তালি লাগানো। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরী করছেন। তিনি এতই অনাড়ম্বর ছিলেন যে, সময় সময় শুধু মাটির ওপর শুয়ে যেতেন। একবার তাঁকে রাসূল (সা) এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন, 'ইয়া আবা তুরাব'– ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন। তাই তিনি পেয়েছিলেন, 'আবু তুরাব' লকবটি। খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে। হযরত 'উমারের (রা) মত সবসময় একটি দুররা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন, লোকদের উপদেশ দিতেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা)

হযরত আলী (রা) ছিলেন নবী খান্দানের সদস্য, যিনি নবীর (সা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আনা মাদীনাতুল ইল্‌ম ওয়া আলী বাবুহা'– আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার। (তিরমিযী) তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিজ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। কিছু হাদীসও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করলে, বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শপথ নিতেন। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ঃ ১/১০) তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী এবং তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফাতওয়া দিতেন। যথা ঃ 'উমার, উসমান, আলী, উবাই বিন কা'ব, মুয়াজ বিন জাবাল ও যায়িদ বিন সাবিত। মাসরুক থেকে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (রা) সাহাবীদের মধ্যে ফাতওয়া দিতেন ঃ আলী, ইবন মাসউদ, যায়িদ, উবাই বিন কা'ব, আবু মূসা আল-আশয়ারী। (তাবাকাত ঃ ৪/১৬৭, ১৭৫)

আলী ছিলেন একজন সুবক্তা ও ভালো কবি। (কিতাবুল উমদা ঃ ইবন রশীক ঃ ১/২১) তাঁর কবিতার একটি 'দিওয়ান' আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অনেকগুলি কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলি কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবী কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল, তাতে পণ্ডিতদের কোন সংশয় নেই। 'নাহজুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। (তারীখুল আদাব আল-আরাবী ঃ ডঃ উমার ফাররুখ, ১/৩০৯)

খাতুনে জান্নাত নবী কন্যা হযরত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। যতদিন ফাতিমা জীবিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ফাতিমার মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেছেন। তাবারীর বর্ণনা মতে, তার চৌদ্দটি ছেলে ও সতেরটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হযরত ফাতিমার গর্ভে তিন পুত্র হাসান, হুসাইন, মুহসিন এবং দু'কন্যা যয়নাব ও উম্মু কুলসুম জন্মলাভ করেন। শৈশবেই মুহসীন মারা যায়। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, মাত্র পাঁচ

ছেলে হাসান, হুসাইন, মুহাম্মাদ (ইবনুল হানাফিয়্যা), আব্বাস এবং উমার থেকে তাঁর বংশ ধারা চলছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলীর (রা) মর্যাদা ও ফজীলাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন, সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি। (আল-ইসাবা ঃ ২/৫০৮) ইতিহাসে তাঁর যত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কিয়দংশও তুলে ধরা সম্ভব নয়। রাসূল (সা) অসংখ্যবার তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একমাত্র মুমিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালোবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া কেউ তোমাকে হিংসা করবে না।

হযরত আলীর এক সাথী হযরত দুরার ইবন দামরা আল কিনানী একদিন হযরত মুয়াবিয়ার কাছে এলেন। মুয়াবিয়া তাঁকে আলীর (রা) গুণাবলী বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু মুয়াবিয়ার চাপাচাপিতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে আলীর (রা) গুণাবলী চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। ঐতিকহাসিকরা বলছেন এ বর্ণনা শুনে মুয়াবিয়া সহ তার সাথে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া মন্তব্য করেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এমনই ছিলেন।' (আল-ইসতিয়াব ঃ ৩/৪৪)

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)

নাম যুবাইর, কুনিয়াত আবু আবদিল্লাহ এবং 'হাওয়ারিয়্যু রাসূলিল্লাহ' লকব। পিতার নাম 'আওয়াম' এবং মাতা 'সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিব।' মা হযরত সাফিয়্যা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। সুতরাং যুবাইর ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা ছিলেন তাঁর ফুফু। অন্যদিকে হযরত সিদ্দিকে আকবরের কন্যা হযরত আসমাকে বিয়ে করায় রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাঁর ভায়রা। হযরত আসমা (রা) ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশার (রা) বোন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিল তাঁর একাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।

হযরত যুবাইর (রা) হিজরাতের আটাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকালীন জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত যে প্রথম থেকেই তাঁর মা তাঁকে এমনভাবে প্রতিপালন করেছিলেন, যাতে বড় হয়ে তিনি একজন দুঃসাহসী, দৃঢ়-সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হন। এ কারণে প্রায়ই মা তাঁকে মারধোর করতেন এবং কঠোর অভ্যাসে অভ্যস্ত করতেন। একদিন তাঁর চাচা নাওফিল বিন খুওয়াইলিদ তাঁর মা হযরত সাফিয়্যার ওপর ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'এভাবে মারতে মারতে ছেলেটাকে তুমি মেরেই ফেলবে।' তাছাড়া বনু হাশিমের লোকদের ডেকে বলেন, 'তোমরা সাফিয়্যাকে বুঝাওনা কেন?' জবাবে সাফিয়্যা বলেন, 'যারা বলে আমি তাকে দেখতে পারিনা, তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এজন্য মারধোর করি যাতে সে বুদ্ধিমান হয় এবং পরবর্তী জীবনে শত্রুসৈন্য পরাজিত করে গনিমাতের মাল লাভে সক্ষম হয়।

এমন প্রতিপালনের প্রভাব অবশ্যই তাঁর ওপর পড়েছিলো। অল্প বয়স থেকেই তিনি বড় বড় পাহলোয়ান ও শক্তিশালী লোকেদের সাথে কুস্তি লড়তেন। একবার মক্কায় একজন তাগড়া জোয়ানের সাথে তাঁর ধরাধরি হয়ে গেল। তাকে এমন মারই না মারলেন যে, লোকটির হাত ভেঙ্গে গেল। লোকেরা তাঁকে ধরে হযরত সাফিয়্যার নিকট নিয়ে এসে অভিযোগ করলো। তিনি পুত্রের কাজে অনুতপ্ত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে সর্বপ্রথম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যুবাইরকে কেমন দেখলে সাহসী না ভীরু ?'

যুবাইর (রা) মাত্র ষোল বছর বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

যদিও তাঁর বয়স ছিল কম তবুও দৃঢ়তা ও জীবনকে বাজি রাখার ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর একবার কেউ রটিয়ে দিয়েছিলো, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকে (সা) বন্দী অথবা হত্যা করে ফেলেছে। একথা শুনে তিনি আবেগ ও উত্তেজনায় এতই আত্মভোলা হয়ে পড়েছিলেন যে তক্ষুণি একটানে তরবারি কোষমুক্ত করে মানুষের ভিড় ঠেলে আল্লাহর রাসূলের (সা) দরবারে গিয়ে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে যুবাইর?' তিনি বললেন,

'শুনেছিলাম, আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন।' রাসূল কারীম (সা) অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর জন্যে দুআ করেন। সীরাত লেখকদের বর্ণনা, এটাই হচ্ছে প্রথম তলোয়ার যা আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে একজন বালক উন্মুক্ত করেছিলো।

প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মত তিনিও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হন। তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাওহীদের ছাপ যার অন্তরে একবার লেগে যায় তা কি আর মুছে ফেলা যায়? ক্ষেপে গিয়ে চাচা আরো কঠোরতা শুরু করে দেন। উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমন মারই না মারতেন যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবুও তিনি বলতেন, 'যত কিছুই করুন না কেন আমি আবার কাফির হতে পারিনা।' অবশেষে নিরুপায় হয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরাত করেন। হাবশায় কিছুকাল অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এলেন। এদিকে রাসূল (সা)ও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করলেন। তিনিও মদীনায় গেলেন।

রাসূল (সা) মক্কায় তালহা ও যুবাইরের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মদীনায় আসার পর নতুন করে হযরত সালামা ইবন সালামা আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপিত হয়। সালামা ছিলেন মদীনার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব এবং আকাবায় বাইয়াত গ্রহণকারীদের অন্যতম।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি বদর যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও নিপুণতার পরিচয় দেন। মুশরিকদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে তছনছ করে দেন। একজন মুশরিক সৈনিক একটি টিলার ওপর উঠে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালে যুবাইর তাকে মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে জাপ্টে ধরেন যে, দু'জনেই গড়িয়ে নীচের দিকে আসতে থাকেন। তা দেখে রাসূল (সা) বলেন, 'এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে, সে নিহত হবে।' সত্যি তাই হয়েছিলো। মুশরিকটি প্রথম মাটিতে পড়ে এবং যুবাইর (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। এমনিভাবে তিনি 'উবাইদা ইবন সাঈদের মুখোমুখি হলেন। সে ছিল আপাদ-মস্তক এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত যে কেবল দু'টি চোখই তার দেখা যাচ্ছিলো। তিনি খুব তাক করে তার চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুড়লেন। নিশানা নির্ভুল হলো। তীরের ফলা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। অতি কষ্টে তিনি তার লাশের উপর বসে ফলাটি বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তা কিছুটা বেঁকে গিয়েছিলো। স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাসূল (সা) এ তীরটি নিজেই নিয়ে নেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান পর্যন্ত এ তীরটি বিভিন্ন খলীফার নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তীরটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত এটি তাঁর নিকট ছিল।

বদরে তিনি এত সাংঘাতিকভাবে লড়েছিলেন যে তাঁর তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো এবং আঘাতে আঘাতে তাঁর সারা শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। এ দিনের একটি ক্ষত এত গভীর ছিল যে চিরদিনের জন্যে তা একটি গর্তের মত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর পুত্র হযরত উরওয়া বলেন, 'আমরা সেই গর্তে আংগুল ঢুকি খেলা

করতাম।' এ যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। তা দেখে রাসূল (সা) বলেন, 'আজ ফিরিশতাগণও এ বেশে এসেছে।'

উহুদের ময়দানে সত্য ও মিথ্যার লড়াই যখন চরম পর্যায়ে, তখন রাসূল (সা) স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন, 'আজ কে এর হক আদায় করবে?' সকল সাহাবীই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজ নিজ হাত বাড়ালেন। যুবাইর (রা)ও তিনবার নিজের হাত বাড়ালেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা লাভের গৌরব অর্জন করেন হযরত আবু দুজানা আনসারী (রা)। উহুদের যুদ্ধে তীরন্দাজ সৈনিকদের অসতর্কতার ফলে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলিমদের সুনিশ্চিত বিজয় পরাজয়ের রূপ নিল তখন যে চৌদ্দজন সাহাবী নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রাসূলে পাককে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন যুবাইর (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম নারীরা যেদিকে অবস্থান করেছিলেন, সে দিকটির প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার লাভ করেন যুবাইর (রা)। এ যুদ্ধের সময় মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইজা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসূল (সা) তাদের অবস্থা জানার জন্যে কাউকে তাদের কাছে পাঠাতে চাইলেন। তিনবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাদের সংবাদ নিয়ে আসতে পার?' প্রত্যেকবারই হযরত যুবাইর বলেন, 'আমি'। রাসূল (সা) তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হাওয়ারী যুবাইর।'

খন্দকের পর বনু কুরাইজার যুদ্ধ এবং বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। খাইবারের যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। খাইবারের ইয়াহুদী নেতা মুরাহহিব নিহত হলে বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী তার ভাই ইয়াসির ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত যুবাইর (রা) লাফিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয় আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হবে।' রাসূল (সা) বললেন, 'না। যুবাইরই তাকে হত্যা করবে।' সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যে যুবাইর তাকে হত্যা করেন।

খাইবার বিজয়ের পর মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি চলছে। মানবীয় কিছু দুর্বলতার কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হাতিব বিন আবী বালতায়া (সা) সব খবর জানিয়ে মক্কার কুরাইশদের নিকট একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিসহ গোপনে একজন মহিলাকে তিনি মক্কায় পাঠান। এদিকে ওহীর মাধ্যমে সব খবর রাসূল (সা) অবগত হলেন। তিনি চিঠিসহ মহিলাটিকে গ্রেফতারের জন্যে যে দলটি পাঠান, হযরত যুবাইরও ছিলেন সে দলের একজন। চিঠিসহ মহিলাকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসা হলো। হাতিব বিন বালতায়া লজ্জিত হয়ে তওবাহ করেন। রাসূলও (সা) তাঁকে ক্ষমা করেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) মুসলিম সেনাবাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করেন। সর্বশেষ ও ক্ষুদ্রতম দলটিতে ছিলেন রাসূল (সা) নিজে। আর এ দলটির পতাকাবাহী ছিলেন যুবাইর (রা)। রাসূল (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন। চারদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে হযরত মিকদাদ ও হযরত যুবাইর (রা) নিজ নিজ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে

রাসূলে পাকের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) উঠে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে তাঁদের উভয়ের মুখমণ্ডলের ধুলোবালি ঝেড়ে দেন।

হুনাইন যুদ্ধের সময় হযরত যুবাইর কাফিরদের একটি গোপন ঘাঁটির নিকট পৌঁছলে তারা তাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করে। অত্যন্ত সাহসের সাথে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ঘাঁটিটি সাফ করে ফেলেন। তায়িফ ও তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সিরিয়ার ইয়ারমুক প্রান্তরে বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা ছিল সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ। হযরত যুবাইর এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক চরম পর্যায়ে মুসলিম সৈনিকদের এক দল সিদ্ধান্ত নিল, হযরত যুবাইর রোমান বাহিনীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবেন এবং অন্যরা তাঁর সমর্থনে পাশে পাশে থাকবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত যুবাইর (রা) ক্ষিপ্রতার সাথে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে অপর প্রান্তে চলে যান কিন্তু অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেন না। একাকী আবার রোমান বাহিনী ভেদ করে ফিরে আসার সময় প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে ঘাড়ে দারুণভাবে আঘাত পান। হযরত 'উরওয়া বলেন, বদরের পর এটা ছিল দ্বিতীয় যখম যার মধ্যে আংগুল ঢুকিয়ে ছেলে বেলায় আমরা খেলতাম। তাঁর এ দুঃসাহসী আক্রমণের ফলে রোমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হযরত আমর ইবনুল 'আস মিসরে আক্রমণ চালিয়ে ফুসতাতের কিল্লা অবরোধ করে রেখেছেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'উমার তাঁর সাহায্যে দশ হাজার সিপাহী ও চার হাজার অফিসার পাঠালেন। আর চিঠিতে লিখলেন, এসব অফিসারের এক একজন এক হাজার অশ্বারোহীর সমান। হযরত যুবাইর ছিলেন এ চার হাজার অফিসারের একজন। মুসলিম সৈন্যরা সাত মাস ধরে কিল্লা অবরোধ করে আছে। জয়-পরাজয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে হযরত যুবাইর একদিন বললেন, 'আজ আমি মুসলিমদের জন্য আমার জীবন কুরবান করবো।' এ কথা বলে উন্মুক্ত তরবারি হাতে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লা প্রাচীরের মাথার ওপর উঠে পড়লেন। আরো কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রাচীরের ওপর থেকে অকস্মাৎ তাঁরা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে শুরু করেন। এ দিকে নিচ থেকে সকল মুসলিম সৈনিক এক যোগে আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন। খৃষ্টান সৈন্যরা মনে করলো, মুসলিমগণ কিল্লায় ঢুকে পড়েছে। তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হযরত যুবাইর কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফটক উন্মুক্ত করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উপায়ান্তর না দেখে মিসরের শাসক মাকুকাস সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং তা গৃহীত হয়। সকলকে আমান দেওয়া হয়।

হিজরী ২৩ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) এক অগ্নি উপাসকের ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছয়জন প্রখ্যাত সাহাবীর সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে তাদের ওপর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। তিনি বলেন, 'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রাসূল (সা) এদের প্রতি সন্তুষ্ট

ছিলেন।' হযরত যুবাইর ছিলেন এ বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে হযরত যুবাইর (রা) নিরিবিলি জীবন যাপন করছিলেন। কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। আসলে বয়সও বেড়ে গিয়েছিলো। ৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত 'উসমান অবরুদ্ধ হলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হযরত যুবাইর স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহকে নিয়োগ করেন। হযরত 'উসমান শহীদ হলে রাতের অন্ধকারে গোপনে তিনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করে দাফন করেন।

হযরত আলীর (রা) শাসনকালে তিনি এবং হযরত তালহা মক্কায় যেয়ে হযরত আয়িশার (রা) সাথে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা মুসলিম উম্মাহর তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন এবং মদীনায় না গিয়ে বসরার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁদের সহযোগী হয়। এদিকে হযরত আলী (রা) তাঁদেরকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং হিজরী ৩৬ সনের ১০ই জমাদিউল উখরা বসরার অনতিদূরে 'যীকার' নামক স্থানে দুই মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয়। ইতিহাসে এটি উটের যুদ্ধ নামে পরিচিতি।

ইসলামী ইতিহাসের এ দুঃখজনক অধ্যায়ের বিশ্লেষণ আমাদের এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় নয়। তবে একদিন যাঁরা ছিলেন ভাই ভাই, আজ তাঁরা একে অপরের খুনের পিপাসায় কাতর। ব্যাপারটি যাই হোক না কেন, এটা যে তাঁদের ব্যক্তিগত ঝগড়া ও আক্রোশের কারণে নয়, তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সত্য ও সততার আবেগ-উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁরা এমনটি করেছিলেন। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, একই গোত্রের লোক তখন দু'দিকে বিভক্ত। তাছাড়া দু'পক্ষের নেতৃবৃন্দের মূল লক্ষ্যই ছিল একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া। আর এ কারণেই দু'পক্ষের মধ্যে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো। আর একই কারণে আমরা দেখতে পাই, হযরত আলী একাকী ঘোড়ায় চড়ে রণাঙ্গণের মাঝখানে এসে হযরত যুবাইরকে ডেকে বলছেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তোমার কি সে দিনটির কথা মনে আছে, যে দিন আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাসূল (সা) তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তুমি কি আলীকে মুহাব্বত কর? বলেছিলে ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্মরণ কর, তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ 'একদিন তুমি অন্যায়ভাবে তার সাথে লড়বে।' হযরত যুবাইর জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার স্মরণ হচ্ছে।'

একটি মাত্র কথা। কথাটি বলে হযরত আলী (রা) তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এ দিকে যুবাইরের অন্তরে ঘটে গেল এক বিপ্লব। তাঁর সকল সংকল্প ও দৃঢ়তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশার (রা) কাছে এসে বললেন ঃ আমি সম্পূর্ণ ভুলের ওপর ছিলাম। আলী আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী স্মরণ করে দিয়েছে। আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এখন ইচ্ছা কি?' তিনি বললেন ঃ 'আমি এ ঝগড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।' তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বললেন, 'আব্বা আপনি আমাদেরকে গর্তে ফেলে আলীর ভয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আমি কসম করেছি, আলীর সাথে আর লড়বো না।' আবদুল্লাহ বললেন 'কসমের কাফ্ফারা সম্ভব।' এই বলে তিনি

স্বীয় গোলাম মাকহুলকে ডেকে আযাদ করে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী যুবাইর বললেন ঃ 'বেটা, আলী আমাকে এমন কথা স্মরণ করে দিয়েছে যাতে আমার সকল উদ্যম-উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আমি সুনিশ্চিত যে, আমরা হকের ওপর নেই। এসো তুমিও আমার অনুগামী হও।' হযরত আবদুল্লাহ অস্বীকার করলেন। হযরত যুবাইর একাকী বসরার দিকে রওয়ানা হলেন।

হযরত যুবাইরকে যেতে দেখে আহনাফ বিন কায়েস বললেন ঃ 'কেউ জেনে এসো তো তিনি যাচ্ছেন কেন।' আমর ইবন জারমুয বললো, 'আমি যাচ্ছি।' এই বলে সে অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হযরত যুবাইরের সঙ্গে মিলিত হলো। তখন তিনি বসরা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পৌছেছেন। কাছে এসে ইবনে জারমুয বললেন ঃ

– আবু আবদুল্লাহ! জাতিকে আপনি কি অবস্থায় ছেড়ে এলেন?

– তারা সবাই একে অপরের গলা কাটছে।

– এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

– আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। এ কারণে এ ঝগড়া থেকে দূরে থাকার জন্যে অন্য কোথাও যেতে চাই।

ইবন জারমুয বললো ঃ 'চলুন, আমাকেও এ দিকে কিছুদূর যেতে হবে।' দু'জন এক সংগে চললেন। জুহরের নামাযের সময় হযরত যুবাইর থামলেন। ইবনে জারমুয বললো, 'আমিও আপনার সাথে নামায আদায় করবো। দু'জন নামাযে দাঁড়ালেন। হযরত যুবাইর যেই তাঁর মা'বুদের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়েছেন, বিশ্বাসগাতক ইবন জারমুয অমনি তরবারির এক আঘাতে রাসূলুল্লাহ (সা) হাওয়ারীর দেহ থেকে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইবন জারমুয হযরত যুবাইরের তরবারি, বর্ম ইত্যাদিসহ হযরত আলীর (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে তার কৃতিত্বের বর্ণনা দিল। আলী (রা) তলোয়ার খানির প্রতি অনুশোচনার দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'তিনি অসংখ্যবার রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মুখ থেকে মুসিবতের মেঘমালা অপসারণ করেছেন। ওরে ইবন সাফিয়্যার হন্তা, শুনে রাখ, জাহান্নাম তোর জন্যে প্রতীক্ষা করছে।' এভাবে হযরত যুবাইর (রা) হিজরী ৩৬ সনে শাহাদাত বরণ করেন এবং 'আস-সিবা' উপত্যকায় সমাহিত হন। তিনি ৬৪ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।

হযরত যুবাইর ছিলেন অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাকওয়া, সত্য-প্রীতি, দানশীলতা, উদারতা ও বেপরোয়াভাব ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিশুদের মত তাঁর অন্তর ছিল কোমল। সামান্য ব্যাপারেই তিনি মোমের মত বিগলিত হয়ে যেতেন। যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো ঃ

'তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে।' (যুমার/৩১)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদের এ ঝগড়ার কি পুনরাবৃত্তি হবে?' রাসূল (সা) বললেন, 'হ্যাঁ। অণু-পরমাণুর হিসাব করে প্রত্যেক হকদারকে তার

হক দেওয়া হবে।' এ কথা শুনে তার অন্তর কেঁপে ওঠে। তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর। কেমন কঠিন অবস্থা হবে।'

একবার তাঁর দাস ইবরাহীমের দাদী উম্মু আতার কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, আইয়্যামে তাশরীকের পরেও তাদের নিকট কুরবানীদের গোশত অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বললেন, 'উম্মু আতা! রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে তিনদিনের বেশী কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।' উম্মু 'আতা বললেন, 'আমি কি করবো। লোকেরা এত হাদীয়া পাঠায় যে তা শেষই হয়না।' (মুসনাদে ইমাম আহমাদ ১/১৬৬)

হযরত যুবাইর যদিও রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী ও সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন, তবুও আল্লাহ-ভীতি ও সতর্কতার কারণে খুব কমই হাদীস বর্ণনা করতেন। একদিন পুত্র আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, 'আব্বা, অন্যদের মত আপনি বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করেন না– এর কারণ কি?' তিনি বললেন, 'বেটা, অন্যদের থেকে রাসূলের (সা) সাহচর্য ও বন্ধুত্ব আমার কোন অংশে কম ছিল না। যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন হইনি কিন্তু তাঁর এ সতর্কবাণীটি আমাকে দারুণভাবে সতর্ক করেছে– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।

ইসলামী সাম্যের প্রতি তিনি এতবেশী সতর্ক ছিলেন যে, দু'জন মুসলিম মৃতের মধ্যেও একজনকে সামান্য প্রাধান্য দান তিনি বৈধ মনে করেননি। উহুদের যুদ্ধে তাঁর মামা হযরত হামযা (রা) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা (রা) ভাইয়ের কাফনের জন্যে দু'প্রস্থ কাপড় নিয়ে আসেন। কিন্তু মামার পাশেই একজন আনসারী ব্যক্তির লাশ ছিলো। একটি লাশের জন্যে দু'টি কাপড় হবে আর অন্যটি থাকবে কাফনহীন– ব্যাপারটি তিনি মেনে নিতে পারেননি। উভয়ের মধ্যে ভাগ করার জন্যে কাপড় দু'টিকে মাপলেন। ঘটনাক্রমে কাপড় দু'খানা ছিল ছোট-বড়। যাতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হয়, সে জন্য লটারীর মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।

হযরত যুবাইর যে কোন ধরনের বিপদ-আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। মৃত্যু-ভয় তাঁর দৃঢ় সংকল্পে কোনদিন বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি। ইসকান্দারিয়া অবরোধের সময় তিনি সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেন। সঙ্গীরা বললেন, 'ভেতরে মারাত্মক প্লেগ।' জবাবে বললেন 'আমরা তো যখম ও প্লেগের জন্যেই এসেছি। সুতরাং মৃত্যুভয় কেন?' সেদিন তিনি ভীষণ সাহসিকতার সঙ্গে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লায় প্রবেশ করেছিলেন।

হযরত যুবাইরের সততা, আমানতদারী, পরিচালন ক্ষমতা ও সংগঠন যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। মৃত্যুকালে লোকেরা তাঁকে আপন আপন সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের মুহাফিজ বানাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করতো। মুতী ইবনুল আসওয়াদ তাঁকে অসী বানাতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন তিনি কাতর কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহ, রাসূল ও নিকট- আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি। আমি ফারুকে আজম উমারকে বলতে শুনেছি, যুবাইর দ্বীনের একটি রুকন বা স্তম্ভ। হযরত উসমান, মিকদাদ, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, আবদুর রহমান ইবন আউফ প্রমুখ সাহাবী মৃত্যুকালে

তাঁকে অসী নিযুক্ত করেছিলেন। অত্যন্ত সততার সাথে তিনি তাঁদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাঁদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করেন।

হযরত যুবাইর স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিশেষত ঃ পুত্র আবদুল্লাহ ও তাঁর সন্তানদেরকে অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদের তা'লীম ও তারবিয়্যাতের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন দারুণ সচেতন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি পুত্র আবদুল্লাহকে সংগে নিয়ে যান। তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। হযরত যুবাইর তাকে একটি ঘোড়ার ওপর বসিয়ে একজন সিপাহীর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন, যাতে সে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যগুলি দেখিয়ে তাকে বীরত্ব ও সাহসিকতার শিক্ষা দেয়।

বদান্যতা, দানশীলতা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে তিনি অন্য কারো থেকে কখনো পিছিয়ে থাকেননি। তাঁর এক হাজার দাস ছিল। প্রতিদিন তিনি তাদের ভাড়া খাটিয়ে মোটা অংকের অর্থ লাভ করতেন। কিন্তু তার একটি পয়সাও নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করতেন না। সবই বিলিয়ে দিতেন। মোটকথা, নবীর একজন হাওয়ারীর মধ্যে যত রকমের গুণ থাকা সম্ভব, সবই হযরত যুবাইরের মধ্যে ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল হযরত যুবাইরের প্রধান পেশা। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, যে ব্যবসায়ে তিনি হাত দিয়েছেন, কখনো তাতে লোকসান হয়নি।

আল্লাহর রাহে সংগ্রামে দুশমনদের তীর-বর্শার অসংখ্য আঘাত তিনি খেয়েছেন। আলী ইবনে খালিদ বলেন, আমাদের কাছে মুসেল থেকে একটি লোক এসেছিলো। সে বর্ণনা করলো ঃ 'আমি যুবাইর ইবনুল আওয়ামের একজন সফর-সঙ্গী ছিলাম। সফরের এক পর্যায়ে আমি তাঁর দেহের এমন সব ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম যা অন্য কারো দেহে আর কখনো দেখিনি। জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এ সবই ঘটেছে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে ও আল্লাহর রাহে।'

আলী ইবনে যায়িদ বলেন, 'যুবাইরকে দেখেছে এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, 'তাঁর (যুবাইরের) বুকে ঝরণার মত দেখতে তীর বর্শার অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল।'

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। তবে তাঁর তরবারিটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তরবারির হাতলটি ছিল চমৎকার নকশা অংকিত।

হযরত মুআবিয়া (রা) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তালহা ও যুবাইর সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাদের দু'জনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর কসম, তাঁরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, পুণ্যবান, সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণকারী, পূত-পবিত্র, পবিত্রতা অর্জনকারী ও শাহাদাত বরণকারী।'

হযরত যুবাইর বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমার জন্য এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রীদের জন জন্য দু'আ করেছেন।'

হযরত যুবাইরের সবচেয়ে বড় পরিচয় ও সৌভাগ্য এই যে, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারা অর্থাৎ দুনিয়াতে জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন।

তাল্‌হা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা)

আবু মুহাম্মাদ তাল্‌হা তাঁর নাম। পিতা উবাইদুল্লাহ এবং মাতা সা'বা। কুরাইশ গোত্রের তাইম শাখার সন্তান। হযরত আবু বকর (রা)ও ছিলেন এই তাইম কবীলার লোক। তাঁর মা সা'বা ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত 'আলা ইবনুল হাদরামীর বোন।

হযরত তালহা ইসলামের সূচনা পর্বেই মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে আবু বকরের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বড় চমকপ্রদ। তিনি গেছেন কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়া। তাঁরা যখন বসরা শহরে পৌঁছলেন, দলের অন্য কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারের বিভিন্ন স্থানে কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছেন, এমন সময় যে ঘটনাটি ঘটলো তা তালহার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি বলেন ঃ

'আমি তখন বসরার বাজারে। একজন খৃস্টান পাদরীকে ঘোষণা করতে শুনলাম ঃ ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন লোক আছে কিনা। আমি নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মক্কার লোক।' জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আহমাদ কি আত্মপ্রকাশ করেছেন?' বললাম 'কোন আহমাদ?' বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবন আবদিল মুত্তালিবের পুত্র। যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস। তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরাত করবেন। যুবক, খুব তাড়াতাড়ি তোমার তাঁর কাছে যাওয়া উচিত।' তালহা বলেন, 'তাঁর এ কথা আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করলো। আমি আমার কাফিলা ফেলে রেখে বাহনে সওয়ার হলাম। বাড়ীতে পৌঁছেই পরিবারের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমার যাওয়ার পর মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি? তারা বললো ঃ 'হাঁ, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবী করেছে এবং আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তাঁর অনুসারী হয়েছে।'

তাল্‌হা বলেন, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কথাকি সত্যি যে, মুহাম্মাদ নবুওয়াত দাবী করেছেন এবং আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন? বললেন ঃ হাঁ, তারপর তিনি আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তখন খৃস্টান পাদরীর ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। অতঃপর তিনি আমাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাদরীর কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি দারুণ খুশী হলেন। এভাবে আমি হলাম আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি।

তাল্‌হার ইসলাম গ্রহণে তাঁর মা বড় বেশী হৈ চৈ শুরু করলেন। কারণ, তাঁর বাসনা ছিল, ছেলে হবে গোত্রের নেতা। গোত্রীয় লোকেরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপাচাপি করে দেখলো তিনি পাহাড়ের মত অটল। সোজা আংগুলে ঘি উঠবে না ভেবে তারা নির্যাতনের পথ বেছে নিল। মাসুদ ইবন খারাশ বলেন ঃ 'একদিন আমি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, একদল লোক হাত বাঁধা একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে শুইয়ে তার পিঠে ও মাথায় বেদম মার শুরু করলো। তাদের পেছনে একজন বৃদ্ধ মহিলা চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ছেলেটির এ অবস্থা কেন? তারা বললো ঃ এ হচ্ছে তাল্‌হা ইবন উবাইদুল্লাহ। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বনী হাশিমের সেই লোকটির অনুসারী হয়েছে। এ মহিলাটি কে? তারা বললো ঃ সা'বা বিনতু আল-হাদরামী— যুবকটির মা।'

কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচিত নাওফিল ইবন খুয়াইলিদ তালহার কাছে এলো। তাঁকে একটি রশি দিয়ে বাঁধলো এবং সেই একই রশি দিয়ে বাঁধলো আবু বকরকেও। তারপর তাদের দু'জনকে সোপর্দ করলো মক্কার গোঁয়ার লোকদের হাতে নির্যাতন চালানোর জন্য। একই রশিতে তাঁদের দু'জনকে বাঁধা হয়েছে, তাই তাঁদেরকে বলা হয় 'কারীনান'।

ইসলাম গ্রহণের পর এভাবে তিনি আপনজন ও কুরাইশদের যুল্‌ম অত্যাচারের শিকার হন। দীর্ঘ তেরো বছর অসীম ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য করেন এবং একনিষ্ঠভাবে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। তিনি মক্কার আশ পাশের উপত্যকায় বিদেশী অভ্যাগতদের সন্ধান করতেন, বেদুঈনদের তাঁবু এবং শহরের পরিচিত অংশীবাদীদের গৃহে চুপিসারে উপস্থিত হয়ে তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' অন্যদের মত তিনিও নিয়মিত যেতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের এ দুঃসময়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা ও সাধনা করেছেন।

৬২২ সনের অক্‌টোবর মাসে আবু বকরকে সংগে করে রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। তাঁদের এ দুর্গম সফরের পথ প্রদর্শক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত। তিনি তাঁদেরকে মদীনায় পৌঁছে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহর নিকট তাঁদের সফরের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হযরত আবু বকরের পরিবার-পরিজন মদীনায় হিজরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় হযরত তালহা ও সুহায়েব ইবন সিনান তাঁদের সাথে যোগ দেন। তালহা হলেন সেই কাফিলার আমীর। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তালহা ও সুহায়েব হযরত আসয়াদ ইবন যারারার বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। ইবন হাজার বলেন ঃ হিজরাতের পূর্বে মক্কায় তালহা ও যুবাইরের মধ্যে রাসূল (সা) ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন এবং হিজরাতের পর মদীনার প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু আইউব আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল (সা) কা'ব বিন মালিকের সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং আপন ভায়ের মত আমরণ তাঁদের এ সম্পর্ক অটুট ছিল।

বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে করেছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে গণীমতের হিস্‌সা দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় একদল কাফির মদীনার মুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। রাসূল (সা) তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তালহাকে পাঠিয়েছিলেন। তালহা ছাড়াও সাত ব্যক্তিকে রাসূল (সা) বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এ কারণে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে তাঁদেরকে বদরী হিসাবে গণ্য করা হয়।

হিজরী তৃতীয় সনে মক্কার মুশরিকদের সাথে সংঘটিত হয় উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হযরত তালহা বীরত্ব ও সাহসিকতার নজীরবিহনী রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন উহুদ যুদ্ধের হিরো। তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী যখন দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক আল্লাহর রাসূলকে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, তালহা তাদের অন্যতম। এ সময় হযরত আম্মার বিন ইয়াযিদ শহীদ হন। কাতাদা বিন নু'মানের চোখে কাফিরের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষু কোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তাঁর গণ্ডের ওপর ঝুলতে থাকে। 'আবু দুজানা রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরো দেহটি ঢাল বানিয়ে নেন। এ সময় সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তীর ছুড়ছিলেন। আর তালহা এক হাতে তলোয়ার ও অন্যহাতে বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনসারদের বারোজন এবং মুহাজিরদের এক তালহা ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাসূল (সা) পাহাড়ের একটি চূড়ায় উঠলেন, এমন সময় একদল শত্রুসৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেললো। রাসূল (সা) তাঁর সংগের লোকদের বললেন ঃ 'যে এদের হটিয়ে দিতে পারবে, জান্নাতে সে হবে আমার সাথী।' তালহা বললেন ঃ আমি যাব ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল (সা) বললেন ঃ না, তুমি থাম। একজন আনসারী বললো ঃ আমি যাব। বললেন ঃ হাঁ, যাও। আনসারী গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে বার বার রাসূল (সা) আহ্বান জানালেন এবং প্রত্যেক বারই, তালহা যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, কিন্তু রাসূল (সা) তাঁকে নিবৃত্ত করে একজন আনসারীকে পাঠালেন। এভাবে এক এক করে যখন আনসারীদের সকলে শাহাদাৎ বরণ করলেন, তখন রাসূল (সা) তালহাকে বললেন ঃ এবার তোমার পালা, যাও।

হযরত তালহা আক্রমণ চালালেন। রাসূল (সা) আহত হলেন, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হলো এবং তিনি রক্ত রঞ্জিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তালহা একাকী একবার মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে একটু দূরে তাড়িয়ে দেন, আবার রাসূলের (সা) দিকে ছুটে এসে তাকে কাঁধে করে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকেন এবং এক স্থানে রাসূলকে (রা) রেখে আবার নতুন করে হামলা চালান। এভাবে সেদিন তিনি মুশরিকদের প্রতিহত করেন। হযরত আবু বকর বলেন ঃ এ সময় আমি ও আবু উবাইদা রাসূল (সা) থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা রাসূলের (সা) নিকট ফিরে এসে তাঁকে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি বললেন ঃ 'আমাকে ছাড়, তোমাদের

বন্ধু তালহাকে দেখো'। আমরা তাকিয়ে দেখি, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় এবং সারা দেহে তরবারী ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশী আঘাত। তাই পরবর্তীকালে রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঃ যদি কেউ কোন মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন তালহা ইবন উবাইদুল্লাহকে দেখে। এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলা হতো। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠলেই বলতেন ঃ 'সে দিনটির সবটুকুই তালহার।' এ যুদ্ধে হযরত তালহার কাজে আল্লাহর রাসূল (সা) এত প্রীত হন যে তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন।

পঞ্চম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদীদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে সালা পর্বতের পাশ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ হাত গভীর খন্দক খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ খন্দক খননের কাজে হযরত তালহাকেও ব্যস্ত দেখা যায়। খন্দক খননের কাজ শেষ হতে না হতেই মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করে। এদিকে মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী গোত্রগুলি, বিশেষতঃ বনু কুরাইজা চুক্তি ভংগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময় মুসলমানরা ভিতর ও বাইরের শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নিরাপত্তার চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই একটু অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের মনোবল এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের ঈমান অটল থাকে। তাঁরা নিজেদের জান-মাল সবকিছু আল্লাহর পথে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। হযরত তালহা ছিলেন শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকুতে মুসলমানদের এ সময়কার মানসিক চিত্র সুন্দরভাবে অংকন করেছেন।

খন্দকের ধারে দাঁড়িয়ে কতিপয় মুসলমান আলাপ-আলোচনা করছে। হযরত তালহা যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। তাঁর কানে ভেসে এলো, একজন বলছে ঃ আমাদের স্ত্রী পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিত। হযরত তালহা একটু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ 'আল্লাহু খায়রুন হাফিজান'— আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানকারী। যারা নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের ওপর ভরসা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। লোকেরা বললো ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকলো।

বাইয়াতে রিদওয়ান, খাইবার ও মুতাসহ সব অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের যে ক্ষুদ্র দলটির সাথে রাসূল (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন, তালহা ছিলেন সেই দলে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই তিনি পবিত্র কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

দশম হিজরী সনের ২৫শে যুলকা'দা রাসূল (সা) হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। এটাই ছিল ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ। রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সংগী হন তালহাও। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুলহুলায়ফা পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। এ সফরে একমাত্র রাসূল (সা) ও তালহা ছাড়া আর কারও সংগে কুরবানীর পশু ছিলনা। (সহীহুল বুখারী ঃ কিতাবুল হজ্জ)।

প্রিয় নবীর ইন্তিকালে হযরত তালহা দারুণ আঘাত পান। রাসূলুল্লাহর (সা) শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে বলতেন ঃ আল্লাহ তায়ালা সকল মুসীবতে ধৈর্য ধরার হুকুম দিয়েছেন, তাই তাঁর বিচ্ছেদে 'সবরে জামীল' অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং সংগে সংগে আল্লাহর কাছে তাওফীকও কামনা করি।'

হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে তিনি তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। চিন্তা, পরামর্শ ও কাজের মাধ্যমে সব ব্যাপারে তিনি তাঁকে সাহায্য করেন। রিদ্দার যুদ্ধের সময় অনেক বিশিষ্ট সাহাবী যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারী বেদুইনদের সাথে কিছুটা কোমল আচরণ করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা না করার জন্য প্রথমতঃ খলীফাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত তালহা স্পষ্ট করে বলে দেন ঃ 'যে দ্বীনে যাকাত থাকবে না তা সত্য ও সঠিক হতে পারে না।'

হিজরী ১৩ সনের জামাদিউস সানী মাসে হযরত আবু বকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগলো। একদিন হযরত তালহা গেলেন তাঁকে দেখতে। তিনি উপস্থিত হলে কিছুক্ষণ নিরবতার পর উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা হয় ঃ

– উমারকে কি স্থলাভিষিক্ত করবো? আবু মুহাম্মাদ (তালহা), আপনার মত কি?

– সাহাবীদের মধ্যে উমার সর্বোত্তম গুণের অধিকারী, তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।

– তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ চেয়েছি।

– তাঁর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা আছে এবং তিনি একটু বেশী কড়াকড়ি আরোপ করে থাকেন।

– তাঁর মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে?

– আপনার সময়ে তিনি যখন এত কঠোর, আপনার পরে স্বীয় দায়িত্বানুভূতিতে না জানি কত বেশী কঠোর হয়ে পড়েন।

– তাঁর ওপর যখন খিলাফতের গুরু দায়িত্ব এসে পড়বে, তিনি নরম হয়ে যাবেন।

সবশেষে তালহা বললেন ঃ তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতা যে সকলের থেকে বেশী, সে ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই। তাঁর স্বভাবের একটি দিক সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া তা ব্যক্ত করতে আমি কার্পণ্য করিনি।

হিজরী ১৩ সনে হযরত 'উমার খলীফা হলেন। তিনিও হযরত তালহাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিলেন এবং সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হলেন।

ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি জমি গণীমতের মালের মত মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করা হবে কি হবে না, এ প্রশ্নে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একদল বললেন, ভাগ করাই উচিত হবে। কিন্তু খলীফা সহ অন্য একটি দল ছিলেন ভাগের বিরোধী। অতঃপর মজলিসে শূরার বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর খলীফার মতই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে হযরত তালহা শূরার বৈঠকে দ্ব্যর্থহীনভাবে খলীফার মতকে সমর্থন করে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমারের (রা) ওফাতের পূর্বে যে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাঁদের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে যান, তার মধ্যে হযরত তালহাও ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজে খিলাফাতের দাবী থেকে সরে দাঁড়ান এবং হযরত উসমানের সমর্থনে নিজের ভোটটি প্রদান করেন।

হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলেন। একদিন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিদ্রোহী গ্রুপ ও মদীনার সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছেন? কেউ কোন উত্তর দিল না। এভাবে যখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন হযরত তালহা উঠে দাঁড়ালেন। হযরত উসমান তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ জনতার মধ্যে আপনার উপস্থিতি এবং তিনবার জিজ্ঞেস করার পর সাড়া দেবেন, এমন আশা আমি করিনি। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, একদিন অমুক স্থানে, যখন রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে আমি ও আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না, রাসূল (সা) আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ তালহা, প্রত্যেক নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে একজন সংগী থাকবে। উসমান ইবন আফফানই হবে জান্নাতে আমার সংগী। সে কথা আপনার স্মরণ আছে? তালহা সায় দিলেন, হাঁ। তারপর তিনি জনতার ভেতর থেকে উঠে চলে গেলেন।

হযরত উসমান শহীদ হলেন। মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কিসাস দাবী করলেন। হযরত তালহা ও যুবাইর মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে হযরত আয়িশার (রা) সাথে মিলিত হলেন। উসমানের হত্যাকারীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে তারা বসরায় উপনীত হলেন। বসরার উপকণ্ঠেই তারা হযরত আলীর (রা) সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হলেন। হযরত কা'কা ইবন 'আমরের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। হযরত আলী, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবাইর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছলেন। উভয় পক্ষ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললো। কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী ইবন সাবার লোকেরা এতে প্রমাদ গুণলো। মূলতঃ তারাই ছিল হযরত উসমানের হত্যাকারী। তারা হযরত আলীর সেনাবাহিনীর মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ছিল। রাতের অন্ধকারে তারা একদিকে হযরত আয়িশার এবং অন্য দিকে হযরত আলীর সেনাবাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। উভয় পক্ষের সৈন্যরা শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত হওয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতর্কিত এ আক্রমণে ঘুম থেকে জেগে তারা মনে করলো প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু করেছে। ইহুদী ইবন সাবার চক্রান্ত সফল হলো। সকাল হতে না হতে তুমুল লড়াই বেঁধে গেল এবং ইতিহাসে এ লড়াই 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত হলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দশ মতান্তরে তের হাজার লোক নিহত হলেন। এ যুদ্ধের সূচনা লগ্নেই সাবায়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর হযরত তালহার পায়ে বিঁধে। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না দেখে হযরত কা'কা ইবন আমর তাঁকে অনুরোধ করলেন বসরার 'দারুল ইলাজে' (হাসপাতাল) চলে যাওয়ার জন্য। তাঁরই অনুরোধে তিনি একটি

চাকরকে সংগে করে 'দারুল ইলাজে' চলে যান। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর দেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। বসরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইবন আসাকির বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, উটের যুদ্ধের দিন মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিক্ষিপ্ত তীরে হযরত তালহা আহত হন। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউল আউয়াল মতান্তরে ১০ই জামাদিউস সানী ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

হযরত তালহা ছিলেন একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ পুঞ্জিভূত করার লালসা তাঁর ছিলনা। তাঁর দানশীলতার বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে তাঁকে 'দানশীল তালহা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার হাদরামাউত থেকে সত্তর হাজার দিরহাম তাঁর হাতে এলো। রাতে তিনি বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আবু বকরের (রা) কন্যা উম্মু কুলসুম স্বামীর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– আবু মুহাম্মদ, আপনার কী হয়েছে? মনে হয় আমার কোন আচরণে আপনি কষ্ঠ পেয়েছেন।

– না, একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তুমি বড় চমৎকার। কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকে আমি চিন্তা করছি, এত অর্থ ঘরে রেখে ঘুমালে একজন মানুষের তার পরওয়ারদিগারের প্রতি কিরূপ ধারণা হবে?

– এতে আপনার বিষণ্ন ও চিন্তিত হওয়ার কি আছে? এত রাতে গরীব-দুঃখী ও আপনার আত্মীয় পরিজনদের কোথায় পাবেন? সকাল হলেই বন্টন করে দেবেন।

– আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! একেই বলে, বাপ কি বেটী।

পরদিন সকাল বেলা ভিন্ন ভিন্ন থলি ও পাত্রে সকল দিরহাম ভাগ করে মুহাজির ও আনসারদের গরীব মিসকীনদের মধ্যে তিনি বন্টন করে দেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে অপর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত তালহার নিকট এসে তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কিছু সাহায্য চাইলো। তালহা বললেন ঃ অমুক স্থানে আমার একখণ্ড জমি আছে। উসমান ইবন আফফান উক্ত জমির বিনিময়ে আমাকে তিন লাখ দিরহাম দিতে চান। তুমি ইচ্ছে করলে সেই জমিটুকু নিতে পার বা আমি তা বিক্রি করে তিন লাখ দিরহাম তোমাকে দিতে পারি। লোকটি মূল্যই নিতে চাইলো। তিনি তাঁকে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করেন।

আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা)

ইমাম বুখারীর মতে জাহিলী যুগে আবদুর রহমান ইবন 'আউফের নাম ছিল 'আবদু 'আমর। ইবন সা'দ তাঁর *'তাবাকাতে'* উল্লেখ করেছেন, জাহিলী যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদু কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাঁর নাম রাখেন 'আবদুর রহমান'। তাঁর মাতা-পিতা উভয়ে ছিলেন 'যুহরা' গোত্রের লোক। মাতার নাম শিফা বিনতু 'আউফ। দাদা ও নানা উভয়ের নাম 'আউফ।

ইবন সা'দ ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি 'আমুল ফীলের (হস্তীর বৎসর) দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বয়সে দশ বছর ছোট। রাসূল (সা) 'আমুল ফীলের ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইবন হাজার তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) তের বছর ছোট বলে উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদেরই একজন। মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায় প্রতিদিনই হযরত আবু বকরের বাড়ীতে বৈঠকে মিলিত হতেন। আবদুর রহমানও ছিলেন এ বৈঠকের একজন নিয়মিত সদস্য। আবু বকরের সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের বাড়ীর এ বৈঠকের নিয়মিত পাঁচজন সদস্যের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন ঃ উসমান, সা'দ, তালহা, যুবাইর এবং আবদুর রহমান। তাঁদের সকলেই আবু বকরের দাওয়াতে প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেন।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে, যে এগারজন পুরুষ ও চারজন নারীর প্রথম কাফিলাটি মক্কা থেকে হাবশায় হিজরাত করে তার মধ্যে আবদুর রহমানও ছিলেন। আবার রাসূলের (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তিনিও মদীনায় হিজরাত করেন। যাঁরা হাবশা ও মদীনা দু'স্থানেই হিজরাত করেছিলেন তাঁদেরকে বলা হয় 'সাহিবুল হিজরাতাইন'। মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবন রাবী' আল-খাযরাজীর গৃহে আশ্রয় নেন এবং তাঁর সাথেই রাসূল (সা) ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী একাধিক সনদের মাধ্যমে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ হিজরাত করে মদীনায় এলে রাসূল (সা) সা'দ ইবন রাবী'র সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন। সা'দ ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, 'আনসারদের সকলে জানে আমি একজন ধনী ব্যক্তি। আমি আমার সকল সম্পদ সমান দু'ভাগে ভাগ করে দিতে চাই। আমার দু'জন স্ত্রী আছেন। আমি চাই, আপনি তাদের দু'জনকে দেখে একজনকে পছন্দ করুন। আমি তাকে তালাক দেব। তারপর আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন।' আবদুর রহমান বললেন ঃ 'আল্লাহ আপনার পরিজনের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করুন! ভাই, এসব কোন কিছুর প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন।'

ইসলামী ভ্রাতৃত্বে হযরত সা'দের এ দৃঢ় আস্থা ও অতুলনীয় উদারতার দৃষ্টান্ত ইসলামী উম্মাহ তথা মানব জাতির ইতিহাসে বিরল। অন্যদিকে হযরত আবদুর রহমানের মহত্ব, আত্মনির্ভরতা ও নিজ পায়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্পও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মদীনায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিন আবদুর রহমান তাঁর আনসারী ভাই সা'দকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেচাকেনা হয় এমন কোন বাজার কি এখানে আছে?" বললেন ঃ "হাঁ, ইয়াসরিবে (মদীনায়) কায়নুকার বাজার তো আছে।" হযরত আবদুর রহমান এক স্থান থেকে কিছু ঘি ও পনির খরিদ করে বাজারে যান। দ্বিতীয় দিনও তিনি এমনটি করলেন। এভাবে তিনি বেচাকেনা জারি রাখেন। কিছু পয়সা হাতে জমা হলে তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর তিনি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। তাঁর কাপড়ে হলুদের দাগ দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?' বললেন, 'হাঁ'। জিজ্ঞেস করলেন কাকে?' তিনি বললেন, 'এক আনসারী মহিলাকে।' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'মোহর কত নির্ধারণ করেছ?' তিনি বললেন, 'কিছু সোনা।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও।'

তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিছুদিন পর তার হাতে আরও কিছু অর্থ জমা হলে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশমত ওয়ালিমার কাজটি সেরে নেন। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হয়। মক্কার উমাইয়া ইবন খালফের সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তিও সম্পাদন করেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফ বদর, উহুদ ও খন্দক সহ সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ইমাম বুখারী 'কিতাবুল মাগাযী'তে বদর যুদ্ধের একটি ঘটনা তাঁরই যবানে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "বদর যুদ্ধে, আমি সারিতে দাঁড়িয়ে। তুমুল লড়াই চলছে। আমি ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে আমার দু'পাশে দুই নওজোয়ানকে দেখলাম। তাদের ওপর আমার খুব একটা আস্থা হলো না। তাদের একজন ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "চাচা, বলুন তো আবু জাহল কোন দিকে?" বললাম, "ভাতিজা, তাকে দিয়ে কি করবে?" সে বলল, "আমি আল্লাহর সাথে অংগীকার করেছি, হয় আমি তাকে কতল করবো, না হয় এ উদ্দেশ্যে আমার নিজের জীবন কুরবান করবো।" একই কথা ফিসফিস করে আমাকে বলল অন্যজনও। আবদুর রহমান বলেন, "তাদের কথা শোনার পর আমার আনন্দ হলো এই ভেবে যে, কত মহান দু'ব্যক্তির মাঝখানেই না আমি দাঁড়িয়ে। আমি ইশারা করে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। অকস্মাৎ তারা দু'জন একসাথে বাজপাখীর মত আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই তাকে কতল করে। এ দু'নওজোয়ান ছিল 'আফরার দু'পুত্র মুয়ায ও মু'য়াওবিয।' বদর যুদ্ধে আবদুর রহমান পায়ে আঘাত পান।

উহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। রাসূল (সা) উহুদ পর্বতের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন, উবাই ইবন খালফ এগিয়ে এলো আল্লাহর রাসূলকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে। আবদুর রহমান তাকে জাহান্নামে পাঠাবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে রাসূল (সা) তাঁকে বাধা দেন। অতঃপর রাসূল

(সা) নিজেই হারিস ইবন সাম্মার নিকট থেকে বর্শা নিয়ে উবাই ইবন খালফের গর্দানে ছুড়ে মারেন। সামান্য আহত হয়ে সে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যায় এবং মক্কার পথে 'সারফ' নামক স্থানে নরক যাত্রা করে।

ইবন সা'দ *'তাবাকাতুল কুবরা'* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উহুদের যুদ্ধে আবদুর রহমান অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন। বালাযুরী তাঁর ফুতুহুল বুলদান, ইবনে হাজার তাঁর আল-ইসাবা এবং ইবন খালদুন তাঁর তারীখে বর্ণনা করেছেন, এ যুদ্ধে তিনি সারা দেহে মোট একত্রিশটি আঘাত পান।

ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে রাসূল (সা) মদীনা থেকে প্রায় তিন শো মাইল উত্তরে 'দুমাতুল জান্দালে' একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব দেন আবদুর রহমানকে। যাত্রার পূর্বে তিনি উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। রাসূল (সা) নিজ হাতে আবদুর রহমানের মাথার পাগড়ীটি খুলে রেখে দিয়ে অন্য একটি কালো পাগড়ী তার মাথায় বেঁধে দেন। তারপর যুদ্ধের পলিসি সংক্রান্ত কিছু হিদায়াত দিয়ে তিনি আবদুর রহমানকে (রা) বিদায় দেন।

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজিরদের যে ছোট্ট দলটির সংগে ছিলেন, আবদুর রহমানও ছিলেন সেই দলে।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) আরব উপদ্বীপে দাওয়াতী কাজের জন্য কতকগুলি তাবলীগী গ্রুপ বিভিন্ন দিকে পাঠান। তখনও আরব গোত্রগুলি মূর্খতা ও আসাবিয়্যাতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ কারণে রাসূল (সা) তাবলীগী গ্রুপগুলিকে সশস্ত্র অবস্থায় পাঠালেন। যাতে প্রয়োজনে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। এরকম তিরিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে বনু খুযায়মার লোকদের নিকট পাঠানো হলো। কিন্তু হযরত খালিদ ও বনু খুযায়মার মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে হযরত খালিদ বনু খুযায়মার ওপর হামলা করে তাদের বহু লোককে হতাহত করেন। এ ঘটনা অবগত হয়ে রাসূল (সা) হযরত খালিদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাঁর ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করেন। রাসূল (সা) নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত আদায় করেন। এমন কি কারও একটি কুকুরও মারা গিয়ে থাকলে তারও বিনিময় মূল্য আদায় করা হয়।

বনু খুযায়মার এ দুর্ঘটনা নিয়ে খালিদ ও আবদুর রহমানের মধ্যে বচসা ও বিতর্ক হয়। এ কথা রাসূল (সা) অবগত হয়ে খালিদকে ডেকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, 'তুমি সাবেকীনে আওয়ালীন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী) একজন সাহাবীর সাথে ঝগড়া ও তর্ক করেছ। এমনটি করা তোমার শোভন হয়নি। আল্লাহর কসম, যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিকও তুমি হও এবং তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দাও, তবুও তুমি আমার সেসব প্রবীণ সাহাবীর একজনেরও সমকক্ষ হতে পারবে না।' উল্লেখ থাকে যে, হযরত খালিদ আহযাবের যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

নবম হিজরীতে তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানগণ যে ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সে পরীক্ষায়ও তিনি কৃতকার্য হন। রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিয়ে এ অভিযানের জন্য হযরত আবু বকর, উসমান ও আবদুর রহমান (রা) রেকর্ড পরিমাণ অর্থ প্রদান

করেন। আবদুর রহমান আট হাজার দিনার রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে, 'সে একজন রিয়াকার– লোক দেখানোই তার উদ্দেশ্য।' তাদের জবাবে আল্লাহ বলেন, 'এ তো সেই ব্যক্তি যার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।' (সূরা তাওবাহ-৭১) অন্য একটি বর্ণনায় আছে, উমার (রা) তাঁর এ দান দেখে বলে ফেলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আবদুর রহমান গুনাহগার হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সে তার পরিবারের লোকদের জন্য কিছুই রাখেনি।' একথা শুনে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'আবদুর রহমান, পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি?' তিনি বলেন, 'হাঁ। আমি যা দান করেছি তার থেকেও বেশী ও উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের জন্য রেখেছি।' রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?' বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে রিযিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অংগীকার করেছেন, তাই।'

এ তাবুক অভিযানকালে একদিন ফজরের নামাযের সময় রাসূল (সা) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যান। ফিরতে একটু দেরী হয়। এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে যায়। তখন সমবেত মুসল্লীদের অনুরোধে আবদুর রহমান ইমাম হিসাবে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। এদিকে রাসূল (সা) ফিরে এলেন, এক রাকায়াত তখন শেষ। আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতি অনুভব করে পেছন দিকে সরে আসার চেষ্টা করেন। রাসূল (সা) তাঁকে নিজের স্থানে থাকার জন্য হাত ইশারা করেন। অতঃপর অবশিষ্ট দ্বিতীয় রাকায়াতটিও তিনি শেষ করেন এবং রাসূল (সা) তাঁর পেছনে ইকতিদা করেন। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) অন্তিম রোগশয্যায়। জীবনের আশা আর নেই। তাঁর পর খলীফা কে হবেন সে সম্পর্কে চিন্তাশীল বিশিষ্ট সাহাবীদের ডেকে পরামর্শ করলেন। হযরত আবদুর রহমানের সাথেও পরামর্শ করেন এবং হযরত উমারের কিছু গুণাবলী তুলে ধরে পরবর্তী খলীফা হিসাবে তাঁর নামটি তিনি প্রস্তাব করেন। আবদুর রহমান ধৈর্য সহকারে খলীফার কথা শুনার পর বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে স্বভাবগতভাবেই তিনি একটু কঠোর।

হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে আটজন বিশিষ্ট সাহাবীকে ফাতওয়া ও বিচারের দায়িত্ব প্রদানের সাথে সাথে অন্য সকলকে ফাতওয়া দান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবদুর রহমান ছিলেন এ আটজনের একজন।

হযরত উমারও তাঁর খিলাফতকালে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী সাহাবীদের ছাড়া অন্য সকলকে বিচার কাজ থেকে বিরত রাখেন। এমনকি যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদকে তিনি 'খাযিনাতুল ইলম' (জ্ঞানের ভাণ্ডার) বলে অভিহিত করতেন, তিনিও যখন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ফাতওয়া দিতে শুরু করেন, তাঁকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। জ্ঞানের যে শাখায় যিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন হযরত উমার তাকেই কেবল সে বিষয়ে মতামত প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন। এ সম্পর্কে সিরিয়া সফরকালে 'জাবিয়া' নামক স্থানে এক বক্তৃতায় বলেন, 'যারা কুরআন বুঝতে চায়, তারা উবাই বিন কা'ব, যারা ফারায়েজ সম্পর্কে জানতে চায়, তারা যায়িদ বিন সাবিত এবং যারা ফিক্‌হ সংক্রান্ত

বিষয়ে অবগত হতে চায়, তারা মুয়ায বিন জাবাল ও আবদুর রহমান বিন 'আউফের সাথে যেন সম্পর্ক গড়ে তোলে।"

খলীফা হযরত উমার হযরত আবদুর রহমানকে বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদা দেন। রাতে তিনি যখন ঘুরে ঘুরে নগরের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন, অনেক সময় সংগে নিতেন হযরত আবদুর রহমানকে এবং নানা বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

একদিন রাতে খলীফা উমার বের হলেন আবদুর রহমানকে সংগে নিয়ে নগর পরিভ্রমণে। দূর থেকে তাঁরা লক্ষ্য করলেন একটি বাড়ীতে আলো। কাছে গিয়ে দেখলেন বাড়ীর দরজা-জানালা সব বন্ধ; কিন্তু ভেতর থেকে কিছু লোকের উচ্চকণ্ঠ ভেসে আসছে। খলীফা উমার আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ভেতর থেকে আসা আওয়ায শুনতে পাচ্ছেন?'

– 'জী হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'

– 'কি বলছে, তা-কি বুঝতে পারছেন?'

– 'সমবেত কণ্ঠের আওয়ায। কেবল শোরগোল শোনা যাচ্ছে। কি বলছে তা বুঝা যাচ্ছে না।'

– 'আপনি কি জানেন বাড়ীটি কার?'

– 'বাড়ীটি তো রাবীয়া' ইবন উমাইয়্যার।'

উমার বলেন, 'সম্ভবতঃ তারা মদপান করে মাতলামি করছে। আপনার কি মনে হয়?'

– "আল্লাহ আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ওয়ালা তাজাস্‌সাসূ (গুপ্তচর বৃত্তি করোনা) এবং ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলমুন (যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না)।"

এ কথা শুনে উমার বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন এবং যথাসময়ে স্মরণ করে দিয়েছেন।'– এই বলে তিনি আবদুর রহমানকে সংগে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। হযরত আবদুর রহমান এ ক্ষেত্রে যে আয়াত দু'টি আমীরুল মুমিনীনকে স্মরণ করে দেন, তা হচ্ছে মুসলিম সমাজ জীবনে ব্যক্তির বুনিয়াদী অধিকারের প্রাণস্বরূপ।

১৬ হিজরী সনে ইরাক বিজয়ের ফলে ইরাকে কিসরা শাহানশাহীর পতন হয় এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর সিরিয়া থেকে রোমের কাইসার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। খলীফা জিযিয়া ও খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ, বিলাল ও আবদুর রহমানের প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। অবশেষে মজলিসে শূরার ক্রমাগত বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর খলীফার মতামতই গৃহীত হয়।

খলীফা হযরত উমার রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন। এ ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করলেন হযরত আবদুর রহমানের নিকট। তিনি পরামর্শ দিলেন, কুষ্ঠি বিদ্যায় পারদর্শী তিন ব্যক্তি– মাখযামা ইবন নাওফিল, খায়বর ইবন মাতয়াম এবং আকীল ইবন আবু তালিবের ওপর একটি তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণের জন্য। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী খলীফা তাঁদেরকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। তাঁরা তালিকা প্রণয়ন করে

খলীফার নিকট পেশ করলে আমীরুল মুমিনীন ও আবদুর রহমান দু'জনেই তা পরীক্ষা করেন। হযরত উমার তালিকা দেখার পর বললেন, "বর্তমান তালিকার ক্রমধারা পরিবর্তন করে আমার নিজের ও আমার গোত্রীয় অন্য লোকদের নাম রাসূলের (সা) সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে যখন আসবে তখন লিখবে"। হযরত আলী ও হযরত আবদুর রহমান আপত্তি করে বললেন, "আপনি আমীরুল মুমিনীন। তালিকার সূচনা আপনার নাম দিয়েই হওয়া উচিত।" তিনি বললেন, "না। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা 'আব্বাস (রা) থেকে শুরু কর, তারপর আলীর (রা) নামটি লিখ।" ভাতার পরিমাণ তিনি আবদুর রহমানের সাথে পরামর্শ করেই নির্ধারণ করেন। তারপর তা মজলিসে শূরায় পেশ করেন।

আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (রাসূলুল্লাহর সা. সহধর্মিগণ) বেশ আগে থেকেই হজ্জ্ব পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। তেইশ হিজরী সনে খলীফা উমার তাঁদের হজ্ব আদায়ের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেন। তিনি নিজেও তাঁদের সফরসংগী হন। তাঁদের সফর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব হযরত আবদুর রহমান ও হযরত উসমানের (রা) ওপর অর্পণ করেন। সফরের সময় আবদুর রহমান কাফিলার আগে এবং উসমান পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিয়ে চলতেন। কোন ব্যক্তিকে তাঁদের উটের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। তাঁরা যখন কোথাও অবস্থান করতেন, এরা দু'জন তাঁবুর প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন।

হযরত উমার তাঁর খিলাফতের প্রথম বছর আবদুর রহমানকে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। আর তাঁর সাথে পাঠান নিজের পক্ষ থেকে কুরবানীর একটি পশু। এ বছর বিশ্ব মুসলিম তাঁর নেতৃত্বেই হজ্ব আদায় করে।

খলীফা হযরত উমার (রা) ফজরের জামায়াতে ইমামতি করছিলেন। মুগীরা ইবন শু'বার পারসিক দাস ফিরোয তাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত অবস্থায় সংগে সংগে তিনি পেছনে দণ্ডায়মান আবদুর রহমানের হাতটি ধরে নিজের স্থানে তাঁকে দাঁড় করে দেন এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অতপর আবদুর রহমান অবশিষ্ট নামায দ্রুত শেষ করেন।

হযরত উমার আহত হওয়ার দশ ঘন্টা পর সমবেত লোকদের বললেন, 'আপনারা যেমন বলতেন আমিও চাচ্ছিলাম, এ উম্মাতের বোঝা বহনের ক্ষমতা রাখে এমন এক ব্যক্তি আমি আমীর বানিয়ে যাই। পরে আমি চিন্তা করলাম, এমনটি করলে আমার মৃত্যুর পরও এর দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। এ কারণে, আমার সাহস হলো না। এ ছ'ব্যক্তি– আলী, উসমান, আবদুর রহমান, সা'দ, যুবাইর ও তালহা। আল্লাহর রাসূল (সা) তাদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদের কোন একজনকে আপনারা আমীর নির্বাচন করে নেবেন। এ ছ'জন ছাড়া আমার পুত্র আবদুল্লাহও আছে। তবে খিলাফতের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। উল্লেখিত ছয় ব্যক্তি যদি খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনজন করে সমান দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ যে দলকে সমর্থন করবে সে দল থেকেই খলীফা হবে। কিন্তু আবদুল্লাহর মতামত যদি সর্বসাধারণের নিকট গৃহীত না হয় তাহলে আবদুর রহমান যে দলে থাকবেন তাঁদের মতই গ্রহণযোগ্য হবে।' হযরত উমারের এ পরামর্শের মধ্যে আবদুর রহমান সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

হযরত উমার ইনতিকাল করলেন। আবদুর রহমান খলীফা হতে রাজি ছিলেন না। এদিকে হযরত তালহাও তখন মদীনায় ছিলেন না। অবশিষ্ট চার ব্যক্তি খলীফা নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব আবদুর রহমানের ওপর ন্যস্ত করেন।

হযরত আবদুর রহমানের ওপর অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে পালন করেন। ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মত বিনিময় করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হযরত উসমানের পক্ষেই মত ব্যক্ত করেন। অবশেষে উমারের নির্ধারিত সময় তিন দিন তিন রাত শেষ হওয়ার আগে তিনি মানুষকে ফজরের জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য আবেদন জানান। নামায শেষে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে খলীফা হিসাবে হযরত উসমানের নামটি ঘোষণা করেন। হযরত উমারের ছুরিকাহত হওয়ার পর থেকে তাঁরই নির্দেশে তৃতীয় খলীফা হিসাবে উসমানের (রা) নাম ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জামায়াতের ইমামতি করেন এবং প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

চব্বিশ হিজরী সনের মুহাররম মাসে হযরত উসমান খলীফা নির্বাচিত হন। সে বছরই তিনি আবদুর রহমানকে আমীরুল হজ নিযুক্ত করেন। মুসলিম উম্মাহ সে বছরের হজটি তাঁরই নেতৃত্বে আদায় করে।

হযরত আবদুর রহমান আমরণ খলীফা উসমানের মজলিসে শূরার সদস্য থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিশেষ খিদমাত আঞ্জাম দেন। হযরত আবু বকর, উমার, উসমান (রা)– এ তিন খলীফার প্রত্যেকের নিকটই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও আস্থার পাত্র।

ইবন সা'দের মতে, হযরত আবদুর রহমান হিঃ ৩২ সনে ৭৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তবে ইবন হাজারের মতে, তিনি ৭২ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। ইবন হাজার এ কথাও বলেছেন, হযরত উসমান অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়। গোরস্থান পর্যন্ত তার লাশ বহনকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসও ছিলেন।

পূর্বেই আমরা দেখেছি সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে আবদুর রহমান মদীনায় এসেছিলেন। সামান্য ঘি ও পনির কেনাবেচার মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্যবসা শুরু করেন। কালক্রমে তিনি তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর একজন সেরা ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। রাসূল (সা) তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দুআ করেছিলেন এবং সে দুআ আল্লাহর দরবারে কবুলও হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পদের প্রতি তাঁর একটুও লোভ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতিকালের পরেও আমরণ তিনি সে সম্পদ অকৃপণ হাতে আল্লাহর পথে ও মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন।

একবার রাসূল (সা) একটি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বলেন, 'আমি একটি অভিযানে সৈন্য পাঠানোর ইচ্ছা করেছি, তোমরা সাহায্য কর।' আবদুর রহমান এক দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে এ চার হাজার আছে। দু'হাজার আমার রবকে করজে হাসানা দিলাম এবং বাকী দু'হাজার আমার

পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তুমি যা দান করেছ এবং যা রেখে দিয়েছ, তার সবকিছুতে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করুন।'

একবার মদীনায় শোরগাল পড়ে গেল, সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফিলা উপস্থিত হয়েছে। শুধু উট আর উট। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কার বাণিজ্য কাফিলা?' লোকেরা বলল, 'আবদুর রহমান ইবন আউফের।' তিনি বললেন, আমি রাসূলকে (সা) 'বলতে শুনেছি, আমি যেন আবদুর রহমানকে সিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযত আয়িশা বলেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দিন এবং তাঁর আখিরাতের প্রতিদান এর থেকেও বড়। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

হযরত আয়িশার এ কথাগুলি আবদুর রহমানের কানে গেল। তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আমাকে সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।' অতঃপর তিনি তাঁর সকল বাণিজ্য সম্ভার সাদকা করে দেন। পাঁচ শো, মতান্তরে সাত শো উটের পিঠে এ মালামাল বোঝাই ছিল। কেউ বলেছেন, বাণিজ্য সম্ভারের সাথে উটগুলিও তিনি সাদকা করে দেন। হযরত আবদুর রহমান ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য তিনি আজীবন অকাতরে খরচ করেছেন। তাঁদের নিকট তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। একবার তিনি কিছু ভূমি চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেন এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বনু যুহরা (রাসূলুল্লাহর সা. জননী হযরত আমিনার পিতৃ-গোত্র), মুসলমান, ফকীর মিসকীন, মুহাজির ও আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত আয়িশার নিকট তাঁর অংশ পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে পাঠিয়েছে?' বলা হলো, 'আবদুর রহমান ইবন আওফ।' তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমার পরে ধৈর্যশীলরাই তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।'

ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে জা'ফর ইবন বারকানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবদুর রহমান মোট তিরিশ হাজার দাস মুক্ত করেছেন। জাহিলী যুগেও মদ পানকে তিনি হারাম মনে করতেন।

হযরত আবদুর রহমান ছিলেন তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এক বাস্তব নমুনা। মক্কায় গেলে তিনি তাঁর আগের বাড়ী-ঘরের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বাড়ী-ঘরের প্রতি আপনি এত নাখোশ কেন?' তিনি বললেন, 'ওগুলি তো আমি আমার আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছি।'

একবার তিনি তাঁর বন্ধুদের দাওয়াত দিলেন। ভালো ভালো খাবার এলো। খাবার দেখে তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?' তিনি বলেন, 'রাসূল (সা) বিদায় নিয়েছেন। তিনি নিজের ঘরে যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পাননি।'

একদিন তিনি সাওম পালন করছিলেন। ইফতারের পর তাঁর সামনে আনীত খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুসয়াব ইবন উমায়ের ছিলেন আমার থেকেও উত্তম মানুষ। তিনি শহীদ হলে তাঁর জন্য মাত্র ছোট্ট একখানা কাফনের কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য দুনিয়ার এ প্রাচুর্য দান করলেন। আমার ভয় হয়, আমাদের বদলা না জানি দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়।' অতঃপর তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন।

হযরত উমার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আবদুর রহমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের একজন।' হযরত আলী একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুর রহমান আসমান ও যমীনের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।'

হযরত আবদুর রহমান রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি ও উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্রগণ, যেমন ইবরাহীম, হুমায়েদ, উমার, মুসয়াব, আবু সালামা, তাঁর পৌত্র মিসওয়ার, ভাগ্নে মিসওয়ার ইবন মাখরামা এবং ইবন আব্বাস, ইবন উমার, জুবাইর, জাবির, আনাস, মালিক ইবন আওস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বড় পরিচয়, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন।

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)

নাম আবু ইসহাক সা'দ, পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিক। ইতিহাসে তিনি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস নামে খ্যাত। কুরাইশ বংশের বনু যুহরা শাখার সন্তান। মাতার নাম 'হামনা'। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের। সা'দের পিতা আবু ওয়াক্কাস ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মাতা হামনাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রথমতঃ তাঁর পুত্র সা'দের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে হৈ চৈ ও বিলাপ শুরু করে লোকজন জড়ো করে ফেললেন। মায়ের কাণ্ড দেখে ক্ষোভে দুঃখে হতভম্ব হয়ে সা'দ ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ বিলাপ ও হৈ চৈ করার পর মা পরিষ্কার বলে দিলেন ঃ 'সা'দ যতক্ষণ মুহাম্মাদের রিসালাতের অস্বীকৃতির ঘোষণা না দেবে ততক্ষণ আমি কিছু খাব না, কিছু পান করব না, রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য ছায়াতেও আসব না। মার আনুগত্যের হুকুম তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মার সাথে তার কোন সম্পর্কও থাকবেনা।'

হযরত সা'দ বড় অস্থির হয়ে পড়লেন। রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে সব ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলের (সা) নিকট থেকে জবাব পাওয়ার পূর্বেই সূরা আল আনকাবুতের অষ্টম আয়াতটি নাযিল হল ঃ

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।'

কুরআনের এ আয়াতটি হযরত সা'দের মানসিক অস্থিরতা দূর করে দিল। তাঁর মা তিনদিন পর্যন্ত কিছু মুখে দিলেন না, কারো সাথে কথা বললেন না এবং রোদ থেকে ছায়াতেও এলেন না। তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে পড়ল। বার বার তিনি মার কাছে এসে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর একই কথা, তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে। অবশেষে তিনি মার মুখের ওপর বলে দিতে বাধ্য হলেন ঃ 'মা, আপনার মতো হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবুও সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' হযরত সা'দের এ চরম সত্য কথাটি তাঁর মার অন্তরে দাগ কাটে। অবশেষে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আল-ফাদায়িল' অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত সা'দের ভাই উমাইর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। ইবন খালদুন তাঁর 'তারীখে' উমাইরের পর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু বকর ছিলেন সা'দের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'আল-মানাকিব' অধ্যায়ে সা'দের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সা'দ বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান হিসেবে দেখতে পেলাম। আসলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু অনেকের মতই তখন তিনি ঘোষণা দেননি। আর একথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর মা'র ঘটনা এবং সূরা আনকাবুতের আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে। কারণ, এ আয়াতটি নবুওয়াতের চতুর্থ বছর নাযিল হয়। সম্ভবতঃ এ সময়ই তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি মায়ের নিকট প্রকাশ করেন।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে সুলাইম গোত্রের 'আমর ইবন 'আবাসা গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও প্রকাশ্য দাওয়াতের অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর 'আমর শিয়াবে আবী তালিবের এক কোণে নামায আদায় করছিলেন। কুরাইশরা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তা দেখে দু'একজন মুসলমানের সাথে সা'দও এগিয়ে এলেন এবং উক্ত কুরাইশ কাফিরদের সাথে তাদের ঝগড়া ও হাতাহাতি শুরু হয়। হযরত সা'দ তাঁর চাবুকটি দিয়ে এক কাফিরকে বেদম মার দিলেন। লোকটির দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কোন মুসলমানের হাতে কোন মুশরিকের রক্ত ঝরানোর এ ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম।

হযরত মুসয়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুমের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর যে চার ব্যক্তি মদীনায় হিজরাত করেন তাঁদের একজন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস। সহীহ বুখারীতে বারা ইবন আযিব থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-ঃ 'সর্বপ্রথম আমাদের নিকট আগমন করেন মুসয়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুম। এ দু'ব্যক্তি মদীনাবাসীদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বিলাল, সা'দ ও আম্মার বিন ইয়াসির আগমন করেন। ইবন সা'দ 'তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থে ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সা'দ ও তাঁর ভাই উমাইর মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় এসে তাদের অন্য এক ভাই 'উতবা ইবন আবী ওয়াক্কাসের নিকট অবস্থান করেন। তার কয়েক বছর পূর্বেই 'উতবা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয়।

আল্লাহর পথে জিহাদে হযরত সা'দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলাম-দুশমনদের খুব মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজেও বলতেন

– 'আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিল।'

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর বেশ কিছুকাল যাবত মুহাজির মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাদের না ছিল খাদ্য সম্ভার, না ছিল পরিধেয় বস্ত্র এবং না ছিল সুনির্দিষ্ট জীবিকার উপায় উপকরণ। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের চাপে মদীনায় সীমিত পরিসরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতটি নড়ে উঠেছিল। মদীনার আনসার-

মুহাজির নির্বিশেষে গোটা মুসলিম সমাজ চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়। এমন চরম দারিদ্রের মধ্যে তাঁরা ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ জারি রাখেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের এ চরম দারিদ্র সম্পর্কে হযরত সা'দ বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম; অথচ তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছুই থাকতো না। (তা খেয়েই আমরা জীবন ধারণ করতাম) আর আমাদের বিষ্ঠা হত উট ছাগলের বিষ্ঠার মত।' – (বুখারী ও মুসলিম ঃ মানাকিবু সা'দ রা.)

হিজরাতের এক বছর পর সফর মাসে রাসূল (সা) ষাটজন উষ্ট্রারোহীর একটি দলকে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে টহল দিতে পাঠালেন। এ দলে হযরত সা'দও ছিলেন। এক পর্যায়ে ইকরিমা ইবন আবী জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশদের বিরাট একটি দল তাঁরা দেখতে পেলেন। কিন্তু উভয় পক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল। তবে কুরাইশ পক্ষের কেউ একজন হঠাৎ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে হযরত সা'দ সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রবিউস সানী মাসে রাসূল (সা) দু'শো সাহাবীকে সংগে নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। উদ্দেশ্য, মদীনার আশে পাশে দুশমনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং দুশমনদের জানিয়ে দেওয়া যে মুসলমানরা ঘুমিয়ে নেই। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ (রা)। বাওয়াত নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে এবার ছোট খাট একটি সংঘর্ষও হয়। এর ছয়মাস পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদর যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন আগে রাসূল (সা) কুরাইশ কাফিলার সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিন জনের যে দলটি পাঠান তাদের একজন ছিলেন সা'দ (রা)। তাঁরা বদরের কূপের নিকট ওৎ পেতে থেকে প্রতিপক্ষের দু'জনকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) তাঁদের নিকট থেকে শত্রু পক্ষের অনেক তথ্য অবগত হন।

বদরে সা'দ ও তাঁর ভাই 'উমাইর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়েন। প্রত্যেকেই একাধিক কাফিরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠান। এ যুদ্ধে হযরত 'উমাইর (রা) শাহাদাত বরণ করেন। এবং সা'দ (রা) সাঈদ ইবন আ'সকে হত্যা করে তার তলোয়ারখানি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সমর্পণ করেন। তিনি রাসূলের (রা) নিকট তলোয়ারখানি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জবাবে তিনি বললেন ঃ এ তলোয়ার না তোমার না আমার। সা'দ রাসূলের (সা) নিকট থেকে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই সূরা আনফাল নাযিল হয়। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে ডেকে বলেন ঃ 'তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।'

উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের এক বছর পর। হযরত সা'দ এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় মুসলিম সৈনিকের ভুলের কারণে নিশ্চিত বিজয় যখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন মুষ্টিমেয় যে ক'জন সৈনিক নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসূলকে (সা) ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন, সা'দ (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম বুখারী এ ঘটনা সা'দের (রা) যবানেই বর্ণনা করেছেন ঃ

'উহুদের দিনে রাসূল (সা) তাঁর তুনীর আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

তীর মার! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।' ইবন সা'দ আরও বলেছেন ঃ 'ঘটনাক্রমে একটি তুনীর ফলা ছিলনা। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ এটাতো খালি। বললেন ঃ ওটাও ছুঁড়ে দাও।'

হযরত সা'দের এক ভাই 'উমাইর বদর যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধে সা'দ (রা) যখন কাফিরদের প্রবল আক্রমণ থেকে রাসূলকে (সা) হিফাজতের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে লড়ছেন, ঠিক তখনই তাঁর অন্য ভাই নরাধম 'উতবার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে প্রিয় নবীর মুখ আহত হয় এবং একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। সা'দ (রা) প্রায়ই বলতেন ঃ কাফিরদের অন্য কাউকে হত্যার এত প্রবল আকাঙ্খা আমার ছিল না যেমন ছিল 'উতবার ব্যাপারে। কিন্তু যখন আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের চেহারা রক্ত-রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে, তখন তার হত্যার আকাঙ্খা আমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে।

উহুদের যুদ্ধে তিনি এক অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি বলেন ঃ 'উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) ডানে ও বামে ধবধবে সাদা দু'ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। কাফিরদের সাথে তারা প্রচণ্ড লড়ছে। এর আগে বা পরে আর কখনও আমি তাদেরকে দেখিনি।'

খন্দকের যুদ্ধ হয় উহুদের দু'বছর পর। এ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং একজন চতুর কাফির ঘোরসওয়ারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তার চোখ এমনভাবে এফোঁড় ওফোঁড় করেন যে, তা দেখে রাসূল (সা) হঠাৎ হেসে ওঠেন। খন্দকের যুদ্ধে সালা পর্বতের এক উপত্যকায় রাসূলের (সা) জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। এক ঠাণ্ডার রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে রাসূল (সা) একাকী শুয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? উত্তর পেলেন ঃ সা'দ—আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। কি জন্য এসেছ? বললেন ঃ সা'দের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন তার প্রিয়তম। এ অন্ধকার ঠাণ্ডা রাতে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হল। তাই পাহারার জন্য হাজির হয়েছি। আল্লাহর নবী বললেন ঃ সা'দ! আমার চোখ খোলা ছিল। আমি আশা করছিলাম আজ যদি কোন নেককার বান্দা আমার হিফাজত করত!

হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের সংগী ছিলেন সা'দও। কিন্তু হজ্জের পূর্বেই মক্কায় তিনি দারুণভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। জীবনের আশা এক প্রকার ছেড়ে দিলেন। এ সময় রাসূল (সা) মাঝে মাঝে এসে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। হযরত সা'দ বললেন ঃ একদিন তিনি আমার সাথে কথা বলার পর আমার কপালে হাত রাখলেন। তারপর মুখমণ্ডলের ওপর হাতের স্পর্শ বুলিয়ে পেট পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দুআ করলেন ঃ হে আল্লাহ, আপনি সা'দকে শিফা দান করুন, তার হিজরাতকে পূর্ণতা দান করুন। অর্থাৎ হিজরাতের স্থান মদীনাতেই তার মৃত্যুদান করুন। হযরত সা'দ বলতেন, 'রাসলুল্লাহর (সা) হাতের সেই শীতল স্পর্শ ও প্রশান্তি আজও আমার অন্তরে অনুভব করে থাকি।' তিনি সুস্থ হয়ে আরও পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত আবু 'উবাইদা ও মুসান্নার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক জয় করে নিয়েছে। ইরাক এখন মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।

কিসরার স্বজনবৃন্দ নিজেদের সকল প্রকার মতভেদ ভুলে গিয়ে ইয়াজদিগির্‌দকে সিংহাসনে বসিয়ে সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে নতুন করে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের জন্য বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছে। হযরত উমার এ প্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি নিজেই মুসান্নার সাহায্যে একটি বাহিনী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু মজলিসে শূরার অনুমতি না পেয়ে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক সা'দকে পাঠালেন এবং তাঁকেই নিযুক্ত করলেন ইরানী ফ্রন্টের সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। হযরত সা'দ (রা) মদীনা থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া পৌঁছলেন। তাঁর পৌঁছার পূর্বেই মুসান্না ইনতিকাল করেন। এ কাদেসিয়া প্রান্তরে সেনাপতি সা'দের নেতৃত্বে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে এক চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ হয়ে যায় এবং একের পর এক তারা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে।

সাসানী সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের পথে মুসলিম বাহিনী 'বাহ্‌রাসীর' দখল করে আছে। এ বাহ্‌রাসীর ও মাদায়েনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দিজলা নদী প্রবাহিত। হযরত সা'দ খবর পেলেন, শাহানশাহ ইয়াজদিগির্‌দ রাজধানী মাদায়েন থেকে সকল মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। হযরত সা'দ সৈন্য বাহিনী নিয়ে দ্রুত মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। দিজলা তীরে এসে দেখলেন, ইরানীরা নদীর পুলটি পূর্বেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এ দিজলার তীরে তিনি মুসলিম মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

'ওহে আল্লাহর বান্দারা, দ্বীনের সিপাহীরা! সাসানী শাসকরা আল্লাহর বান্দাহদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা করতে বাধ্য করেছে। তাদের ঘামঝরা কষ্টোপার্জিত সম্পদ নিজেদের পুঞ্জিভূত করেছে। তোমরা যখন তাদের পরিত্রাণদাতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছ তখন তারা পালাবার পথ ধরেছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের ধন সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে বোঝাই করেছে। আমরা কক্ষণো তাদের এমন সুযোগ দেব না। তাদের বাহনের ওপর বোঝাইকৃত ধন-ভাণ্ডার যাতে আমরা ছিনিয়ে নিতে না পারি এজন্য তারা পুল ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু ইরানীরা আমাদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা জানে না আল্লাহর ওপর ভরসাকারীরা, মানবতার সেবকরা, পুল বা নৌকার ওপর ভরসা করে না। আমি পরম দয়ালু-দাতা আল্লাহর নামে আমার ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর। একজনের পেছনে অন্যজন, একজনের পাশে অন্যজন সারিবদ্ধভাবে তোমরা দিজলা পার হও। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও হিফাজত করুন।'

ভাষণ শেষ করে হযরত সা'দ বিসমিল্লাহ বলে নিজের ঘোড়াটি নদীর মধ্যে চালিয়ে দিলেন। অন্য মুজাহিদরাও তাঁদের সেনাপতিকে অনুসরণ করলেন। নদী ছিল অশান্ত। কিন্তু আল্লাহর সিপাহীদের সারিতে একটুও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল না। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে নদী পার হয়ে অপর তীরে পৌঁছলেন। ইরানী সৈন্যরা একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। অবলীলাক্রমে তারা চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'দৈত্য আসছে, দানব আসছে। পালাও পালাও।'

মুসলিম মুজাহিদদের এ আকস্মিক হামলায় বাদশাহ ইয়াজদিগির্‌দ অগণিত ধনরত্ন

ফেলে মাদায়েন ত্যাগ করে হালওয়ানের দিকে যাত্রা করে। হযরত সা'দ নির্জন শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। পরিবেশ ছিল ভয়াবহ। প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ ছিল যেন শিক্ষা ও উপদেশের স্মারক। হযরত সা'দের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সূরা দুখানের এ আয়াতগুলি ঃ

– 'তারা পেছনে ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ এবং কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এমনটিই ঘটেছিল এবং আমি এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে।' (সূরা দুখান ঃ ২৫-২৮)

হযরত সা'দ শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করে আট রাকয়াত 'সালাতুল ফাতহ' আদায় করেন। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, এ শাহী প্রাসাদে আজ জুমআর জামাআত অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর মিম্বর তৈরী করে জুমআর নামায আদায় করেন। এটাই ছিল পারস্যে প্রথম জুমআর নামায।

মাদায়েন বিজয়ের পর খলীফা উমার (রা) সেনাপতি সা'দকে নির্দেশ দেন, তিনি নিজে যেন ইরানীদের পেছনে ধাওয়া না করেন, বরং এ কাজের জন্য অন্য কাউকে নির্বাচন করে দায়িত্ব দেন। অতঃপর খলীফার আদেশে তিনি আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, প্রশাসনের পুনর্গঠন, ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নও মুসলিমদের তালীম ও তারবিয়াতে আত্মনিয়োগ করেন। যে মাদায়েন ছিল শত শত বছর ধরে অগ্নি উপাসকদের কেন্দ্রভূমি এবং যে মাদায়েন কখনও শোনেনি এক আল্লাহর নাম, সেখানে প্রথম বারের মত হযরত সা'দ নির্মাণ করেন এক জামে মসজিদ। ইরানের অন্যান্য শহরেও তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। আরব মুসলমানদের বসবাসের জন্য কুফা শহরের সম্প্রসারণ করেন। ইরাকের বসরা শহরের স্থপতিও তিনি।

খলীফা উমার হযরত সা'দকে কুফার গভর্ণর নিয়োগ করেন। কিছু দিন পর তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় কুফাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। কুফায় সা'দ নিজের জন্য যে প্রাসাদটি তৈরী করেছিলেন, 'উমারের (রা) নির্দেশে মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা মদীনা থেকে কুফা গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেন। (মাজমূ' ফাতাওয়া-ইবন তাইমিয়া, খণ্ড ৩৫ পৃঃ ৪০)

হযরত সা'দের বিরুদ্ধে উসামা ইবন কাতাদা নামক কুফার যে লোকটি খলীফা উমারের নিকট কসম করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সা'দ তার ওপর বদ-দুআ করে তিনটি জিনিস তার জন্য আল্লাহর নিকট কামনা করেন ঃ আল্লাহ যেন তাকে দীর্ঘজীবী করেন, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত করেন এবং তার সত্তাকে ফিতনার শিকারে পরিণত করেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তাঁর এ দু'আ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি তো ছিলেন 'মুজতাজাবুদ দাওয়াহ'। স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁর জন্যে দু'আ করেছেন ঃ 'হে আল্লাহ, আপনি সা'দের দু'আ কবুল করুন, যখন সে দু'আ করবে।

হযরত 'উমার (রা) সা'দের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তা কিন্তু ঠিক নয়। তাই তিনি বলেছেন ঃ 'আমি সা'দকে রাষ্ট্র প্রশাসনে অযোগ্য বা তার প্রতি আস্থাহীনতার কারণে বরখাস্ত করিনি।' (বুখারী ঃ কিতাবুল

মানাকিব) হযরত সা'দ যে খলীফা উমারের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে বোর্ডটি গঠন করে দিয়ে যান তাতে হযরত সা'দের অন্তর্ভুক্তির মধ্যে। সা'দ সম্পর্কে তাঁর অন্তিম বাণী ছিল ঃ 'যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দ পেয়ে যান, তাহলে তিনি তার উপযুক্ত। আর তা যদি না হয়, তবে যিনি খলীফা হবেন তিনি যেন তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন।' (বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব ও আল-ইসাবা)। হযরত উসমান তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই পুনরায় সা'দকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কুফার কোষাধ্যক্ষ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ও তাঁর মধ্যে কোন একটি বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় খলীফা সা'দকে প্রত্যাহার করেন।

ইবন সাবার আনসারী হাঙ্গামাবাজরা খলীফা উসমানকে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করেছে। খলীফা মসজিদে নববীতে জুমআর নামাযের খুতবার মধ্যে হাঙ্গামাবাজদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন। তারাও পাথর নিক্ষেপ করে খলীফাকে আহত করে। এ সময় তাদের প্রতিরোধে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন হযরত সা'দ। তারপর অন্যান্য সাহাবীরা একযোগে উঠে তাদের হটিয়ে দেন।

বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উসমান শহীদ হলেন। হযরত সা'দ তখন মদীনায়। মদীনাবাসীরা হযরত আলীকে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বাইয়াত করলেন। আলীর (রা) হাতে বাইয়াতের জন্য লোকেরা যখন সা'দের বাড়ীতে গেল, তিনি তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন ঃ 'যতক্ষণ না সব মানুষ বাইয়াত করেছে, আমি করব না। তবে আমার পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের ইতিহাসে যে বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সূচনা হয় তার আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে এ সময় হযরত সা'দের ভূমিকা বুঝার জন্য এতটুকু ইঙ্গিত প্রয়োজন যে, সে সময় ইসলামী উম্মাত তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত আলীর পক্ষে, একদল তাঁর বিপক্ষে এবং একদল নিরপেক্ষ। হযরত আলীর পক্ষে, বিপক্ষের উভয় দলেই যেমন বিশিষ্ট সাহাবীরা ছিলেন, তেমনিভাবে ছিলেন এ নিরপেক্ষ দলেও। তাঁরা কোন মুসলমানের পক্ষে বিপক্ষে তরবারি উত্তোলনকে জায়েয মনে করেননি। এ কারণে অমরা হযরত সা'দকে দেখতে পাই তিনি উট বা সিফফিনের যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগ দেননি, তখন তিনি মদীনায় নিজ গৃহে অবস্থান করছেন।

মোটকথা, হযরত উসমানের শাহাদাতের পর তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন। একবার তিনি তাঁর উটের আস্তাবলে তাঁর পুত্র উমারকে আসতে দেখে বল্লেন ঃ 'আল্লাহ এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' অতঃপর উমার এসে পিতাকে বললেন ঃ 'আপনি উট ও ছাগলের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন, আর এদিকে লোকেরা রাষ্ট্রীয় ঝগড়ায় লিপ্ত।' হযরত সা'দ পুত্রের বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করে বল্লেন ঃ 'চুপ কর!' আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ ভালোবাসেন নির্জনবাসী, মুত্তাকী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে মানুষের রাগ বিরাগের পরোয়া করেনা, তাকে।

হযরত সা'দ আলীর হাতে বাইয়াত করে পুনরায় তাঁর দলত্যাগী খারেজীদের ফাসিক বলে মনে করতেন। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর তাঁর পুত্র উমার তাঁর নিকট এসে বলেন ঃ খিলফাত পরিচালনার জন্য এখন উম্মাতে মুসলিমার একজন বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় আপনিই এর উপযুক্ত। এতটুকু বলতেই তিনি বলে ওঠেন ঃ 'থাক, হয়েছে। আমাকে আর উৎসাহিত করতে হবে না।'

হযরত সা'দ মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক উপত্যকায় কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ইনতিকাল করেন। জীবনীকারদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে হিজরী ৫৫ সনে ৮৫ বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয় বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি আছে। ইবন হাজার তাঁর *'তাহজীব'* গ্রন্থে এ মতই সমর্থন করেছেন। গোসল ও কাফনের পর লাশ মদীনায় আনা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান জানাযার ইমামতি করেন। সহীহ মুসলিমের একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর জানাযার বিষয়টি বিস্তারিত জানা যায়।

হযরত সা'দের ইনতিকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা ও অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাহ্ বলে পাঠালেন, তাঁর লাশ মসজিদে আনা হোক, যাতে আমরা জানাযায় শরীক হতে পারি। কিন্তু লোকেরা লাশ মসজিদে নেয়া যেতে পারে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। হযরত আয়িশা (রা) একথা জানতে পেরে বললেন ঃ 'তোমরা এত তাড়াতাড়িই ভুলে যাও? রাসূল (সা) তো সুহাইল ইবন বায়দার জানাযা এই মসজিদে আদায় করেছেন।' অতঃপর লাশ উম্মুহাতুল মু'মিনীনের হুজরার নিকট আনা হল এবং তাঁরা নামায আদায় করলেন।

মরণকালে হযরত সা'দ (রা) বহু অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি একটি অতি পুরাতন পশমী জুববা চেয়ে নিয়ে বলেন ঃ 'এ দিয়েই তোমরা আমাকে কাফন দেবে। এ জুব্বা পরেই আমি বদর যুদ্ধে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার ইচ্ছা, এটা নিয়েই আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই।'

হযরত সা'দের ছেলে মুসয়াব বলেন ঃ আমার পিতার অন্তিম সময়ে তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর ছিল। তাঁর মুমূর্ষ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বেটা কাঁদছ কেন? বললাম ঃ আপনার এ অবস্থা দেখে। বললেন ঃ 'আমার জন্য কেঁদোনা। আল্লাহ কক্ষনো আমাকে শাস্তি দেবেন না, আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাদের সৎকাজের প্রতিদান দেবেন এবং কাফিরদের সৎকাজের বিনিময়ে তাদের শাস্তি লাঘব করবেন।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪)

রাসূল (সা), খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীদের নিকট হযরত সা'দের মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অতি উচ্চে। তাঁরা তাঁর মতামতকে যে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন, বহু হাদীসের মাধ্যমে একথা জানা যায়। একবার সা'দ মোজার ওপর মসেহ সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার তাঁর পিতা হযরত উমার ফারুক (রা) থেকে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হাদীসটি কি সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস থেকে শুনেছ? বললেন ঃ 'হাঁ। উমার বললেন ঃ হাঁ। সা'দ যখন তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে সম্পর্কে অন্য কারও নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবে না।'

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে চারজন ছিলেন সর্বাধিক কঠোর ঃ উমার, আলী, যুবাইর, সা'দ রাদিআল্লাহু আনহুম।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় হযরত বিলালের অনুপস্থিতিতে সা'দ তিনবার আযান দিয়েছেন। রাসূল (সা) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমার সংগে বিলালকে না দেখলে তুমি আযান দেবে।' (হায়াতুস সাহাবা ৩/১১৬)

হযরত সা'দ রাসূল (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে-মেয়েরা, যেমন, ইবরাহীম, আমের, মুসয়াব, মুহাম্মাদ, আয়িশা এবং বিশিষ্ট সাহাবীরা, যেমন, আয়িশা, ইবন আব্বাস, ইবন উমার, জাবির (রা) এবং বিশিষ্ট তাবেয়ীরা, যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আবু উসমান আন-নাহদী, কায়িস ইবন আবী হাযিম, আলকামা, আহনাফ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ৩/৩৩)

হযরত সা'দের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। প্রাচীন সূত্রগুলিতে তাঁর কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত সা'দের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ' অর্থাৎ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম এবং তিনি এ দলের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'লিকুল্লি উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া আমীনু হাজিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা– 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।'

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও দীর্ঘদেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালোবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের ন্যায়। রাসূলের (সা) ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'আমীন'-বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

তাঁর পুরো নাম আমীর ইবন আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফিহরী আল কুরাইশী। তবে কেবল আবু উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম উর্ধ পুরুষ 'ফিহরের' মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মাও ফিহরী খান্দানের কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারের (রা) মন্তব্য হল ঃ 'কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন– আবু বকর সিদ্দিক, উসমান, ইবন আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন আবু উবাইদা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত আবু বকরের মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবন আউফ, উসমান ইবন মাজউন, আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম ও তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হন। সেখানে তাঁরা সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামী ইমারতের প্রথম ভিত্তি।

মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পর তিনিও মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় সা'দ বিন মুয়াজের সাথে তাঁর 'দ্বীনী মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার উর্ধে। যুদ্ধের ময়দানে এমন বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশরিকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিকবিদিক

পালাতে থাকে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর তিনিও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাত এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও আবু উবাইদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃতপক্ষে আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা আবু উবাইদা ও তাঁর পিতার শানে নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল করেন।

'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে– তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।' (আল মুজাদিলা-২২)

আবু উবাইদার এরূপ আচরণে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও ঈর্ষা পোষণ করতেন। মুহাম্মাদ ইবন জাফর বলেন ঃ 'খৃষ্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হয়ে বললো— হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার মনোনীত কোন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।' হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন ঃ 'আমি সেদিন সকাল সকাল জোহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মত আর কেন দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি রাসূলুল্লাহর (সা) এ প্রশংসার পাত্রটি।

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাথে জোহরের নামায শেষ করে ডানে বায়ে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন ঃ 'তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টির ফায়সালা করে দাও।' আমি

তখন মনে মনে বললাম ঃ আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

আবু উবাইদা কেবল একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূতও করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসূল (সা) একদল সাহাবীকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন আবু উবাইদাকে। পাথেয় হিসাবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন আবু উবাইদা তাঁর প্রত্যেক সংগীকে মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ অষ্টম হিজরীর রজব মাসে রাসূল (সা) আবু উবাইদার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া তাঁদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর। এই একটি খেজুর খেয়েই তাঁরা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মুহাম্মাদ কোথায়, মুহাম্মাদ কোথায়....'। তখন আবু উবাইদা ছিলেন সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসূলকে (সা) মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গণ্ডদেশে বর্মের দুটি বেড়ী বিঁধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক বেড়ী দু'টিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন। আবু উবাইদা তাঁকে বললেন, 'কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।' তিনি ছেড়ে দিলেন। আবু উবাইদা ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ী দু'টি তুললে রাসূল (সা) হয়ত কষ্ট পাবেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন আবু বকর (রা) মন্তব্য করলেন ঃ 'আবু উবাইদা সর্বোত্তম দাঁতভাঙ্গা ব্যক্তি।' খন্দক ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন। খাইবার অভিযানে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'জাতুস সালাসিল' অভিযানে হযরত আমর ইবনুল আসের বাহিনীর সাহায্যের জন্য দু'শ' সিহাপীসহ রাসূল (সা) আবু উবাইদাকে পিছনে পাঠান। তাঁরা জয়লাভ করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসংগী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করেন।

সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ 'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই

প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়োনা।' এক পর্যায়ে হযরত আবু বকর আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত করি। আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।' এর জবাবে আবু উবাইদা বললেন ঃ 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারিনা যাকে রাসূল (সা) আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।' একথার পর আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা হল। আবু বকরের খলীফা হবার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। আবু বকরের পর হযরত উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন।

হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবু উবাইদাকে হিমস, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ানকে দিমাশ্‌ক, শুরাহবীলকে জর্দান এবং 'আমর ইবনুল আসকে ফিলিস্তীনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন আবু উবাইদাকে। দিমাশ্‌ক, হিমস, লাজেকিয়া প্রভৃতি শহর বিজিত হয় আবু উবাইদার হাতে। ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। 'আমর ইবনুল 'আসের আহবানে সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা খোদ খলীফা 'উমারের সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে আবু উবাইদাই সে কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লেখেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 'জাবিয়া' পৌঁছলে আবু উবাইদাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশ্‌কের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে খলীফা উমার আবু উবাইদাকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 'তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমীনুল উম্মাত তোমাদের ওয়ালী।'

আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়। খলীফা হযরত উমার (রা) নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাজধানী মদীনা থেকে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আবু উবাইদা সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের পক্ষে মত দিলেন। হযরত উমার সবাইকে আহ্বান জানালেন তাঁর সাথে আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা বেঁকে বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আ ফিরারুম মিন কাদরিল্লাহ– একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন নয়?' খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন ঃ 'আফসুস! আপনি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। আবু উবাইদা তাঁর বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার মদীনা পৌঁছে দূত মারফত আবু উবাইদাকে একখানা পত্র পাঠান। পত্রে তিনি লেখেন ঃ "আপনাকে আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরীভাবে আপনাকে আমি তলব করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই

রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।" খলীফা উমারের এ পত্রখানি হাতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন ঃ 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান।' তারপর তিনি লিখলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝেছি। আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে মুসিবাদ আপতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে বাঁচানোর প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাইনা, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দান করুন।"

হযরত উমার এ পত্রখানি পাঠ করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এ কান্না দেখে তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ 'আমীরুল মু'মিনীন, আবু উবাইদা কি ইনতিকাল করেছেন?' তিনি বলেছিলেন ঃ 'না। তবে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।'

হযরত উমারের ধারণা মিথ্যা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন ঃ "তোমাদেরকে যে উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের পথেই থাকবে। তোমরা নামায কায়েম করবে, রমাদান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দান করবে, হজ্জ ও উমরা আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং দুনিয়ার সুখ সম্পদে গা ভাসিয়ে দেবে না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও জীবন লাভ করে, আজ আমার পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও এই একই পরিণতি হবে।" সকলকে সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর মুয়াজ ইবন জাবালের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ 'মুয়াজ! তুমি নামাযের ইমামতি কর।' এর পরপরই তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয়। মুয়াজ ওঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ লোক সকল! তোমরা এ ব্যক্তির তিরোধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে জানিনা। তোমরা তাঁর প্রতি রহম কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের ঘটনা।

এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে আবু উবাইদার মরদেহ বের করে আনলো। মুয়াজ বিন জাবালের ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হল। মুয়াজ বিন জাবাল, আমর ইবনুল আস ও দাহ্হাক বিন কায়েস কবরের মধ্যে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন। কবরে মাটিচাপা দেওয়ার পর মুয়াজ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর প্রশংসা করে বলেন ঃ "আবু উবাইদা, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলবো, অসত্য কোন কিছু বলবো না। কারণ, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, বিনম্রভাবে যমীনের ওপর বিচরণকারী ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম যারা তাদের 'রবের' উদ্দেশ্যে সিজদারত ও

দাঁড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম-মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের শত্রুদেরই একজন।'

খাওফে খোদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, স্নেহ ও দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদিন একটি লোক আবু উবাইদার বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ করে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে লাগলেন ঃ "একবার রাসূল (সা) মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিজয় ও ধন-ঐশ্বর্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেন ঃ 'আবু উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি তোমার সফরে সংগী হওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট মনে করবে। একটি তোমার, একটি তোমার খাদেমের এবং একটি তোমার জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য।' কিন্তু এখন দেখছি, আমার বাড়ী খাদেমে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। হায়, আমি কিভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) মুখ দেখাবো? রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।"

খলীফা হয়রত উমার সিরিয়া সফরের সময় দেখতে পেলেন, অফিসারদের গায়ে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি এতই ক্ষেপে গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেন ঃ তোমরা এত তাড়াতাড়ি অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো? কিন্তু আবু উবাইদা একজন সাদামাটা আরব হিসেবে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গায়ে অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। খলীফা উমার (রা) তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরো বেশী সরল-সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তাঁর বাড়ীতে আর কিছু নেই। খলীফা বললেন ঃ আবু উবাইদা, আপনি তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।' জবাবে আবু উবাইদা বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

একবার হযরত উমার (রা) উপঢৌকন হিসেবে চার শ' দীনার ও চার হাজার দিরহাম আবু উবাইদার নিকট পাঠালেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও রাখলেন না। হযরত 'উমার একথা শুনে মন্তব্য করেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও আছে।'

তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে পৃথক করা যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। একবার তো এক রোমান দূত এসে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'আপনাদের সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙ্গুল উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল, তখন তো সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

সাঈদ ইবন যায়িদ (রা)

নাম সাঈদ, কুনিয়াত আবুল আ'ওয়ার। পিতা যায়িদ, মাতা ফাতিমা বিন্‌তু বা'জা। উর্ধপুরুষ কা'ব ইবন লুই-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

সাঈদের পিতা যায়িদ ছিলেন জাহিলী যুগের মক্কার মুষ্টিমেয় সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন, সব রকম পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকেন। এমন কি মুশরিকদের হাতে যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌তও পরিহার করতেন। একবার নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে 'বালদাহ' উপত্যকায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে খাবার আনা হলে তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানান। যায়িদকে খাওয়ার অনুরোধ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত আমি খাইনে।'

হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ একবার আমি যায়িদকে দেখলাম, তিনি কা'বার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বলছেন, ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া দ্বীনে হানীফের ওপর তোমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।

জাহিলী যুগে সাধারণতঃ কন্যা সন্তান জীবন্ত দাফন করা হতো। কোথাও কোন কন্যা সন্তান হত্যা বা দাফন করা হচ্ছে শুনতে পেলে যায়িদ তার অভিভাবকের কাছে চলে যেতেন এবং সন্তানটিকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিতেন। তারপর সে বড় হলে তার পিতার কাছে নিয়ে গিয়ে বলতেন, ইচ্ছে করলে এখন তুমি নিজ দায়িত্বে নিতে পার অথবা আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে পার।

কুরাইশরা তাদের কোন একটি উৎসব পালন করছে। মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যায়িদ ইবন আমর ইবন নুফায়িল তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখছেন, পুরুষেরা তাদের মাথায় বেঁধেছে দামী রেশমী পাগড়ী, গায়ে জড়িয়েছে মূল্যবান ইয়ামনী চাদর। আর নারী ও শিশুরা পরেছে মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার। তিনি আরও দেখছেন, ধনী ব্যক্তিরা গৃহপালিত পশুকে মূল্যবান সাজে সুসজ্জিত করে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের দেব-দেবীর সামনে বলি দেওয়ার জন্য।

তিনি কা'বার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন ঃ

'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! এই ছাগলগুলি সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের পান করান, যমীনে ঘাস সৃষ্টি করে তাদের আহার দান করেন। আর তোমরা অন্যের নামে সেগুলি যবেহ কর? আমি তোমাদেরকে একটি মূর্খ সম্প্রদায়রূপে দেখতে পাচ্ছি।

এ কথা শুনে তাঁর চাচা ও উমার ইবনুল খাত্তাবের পিতা আল খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলল–

তোর সর্বনাশ হোক! সব সময় আমরা তোর মুখ থেকে এ ধরনের বাজে কথা শুনে সহ্য করে আসছি। এখন আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারপর তার গোত্রের বোকা লোকদের উত্তেজিত করে তুলল তাঁকে কষ্ট দিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলতে। অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন মক্কা ছেড়ে হিরা পর্বতে আশ্রয় নিতে। তাতেও সে ক্ষান্ত হল না। গোপনেও যাতে তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন, সেদিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখার জন্য একদল কুরাইশ যুবককে সে নিয়োগ করে রাখে।

অতঃপর যায়িদ ইবন আমর কুরাইশদের অগোচরে ওয়ারাকা ইবন নাওফিল, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, উসমান ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহর ফুফু উমাইমা বিনতু 'আবদিল মুত্তালিবের সাথে গোপনে মিলিত হলেন। আরববাসী যে চরম গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত সে ব্যাপারে তিনি তাদের সাথে মত বিনিময় করলেন। যায়িদ তাঁদেরকে বললেন ঃ

'আল্লাহর কসম আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আপনাদের এ জাতি কোন ভিত্তির ওপর নেই। তারা দ্বীনে ইবরাহীমকে বিকৃত করে ফেলেছে, তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। আপনারা যদি মুক্তি চান, নিজেদের জন্য একটি দ্বীন অনুসন্ধান করুন।'

অতপর এ চার ব্যক্তি ইয়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুদের নিকট গেলেন দ্বীনে ইবরাহীম তথা দ্বীনে হানীফ সম্পর্কে জানার জন্য। ওয়ারাকা ইবন নাওফিল খৃষ্ট ধর্ম অবলম্বন করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ উসমান ইবনুল হারিস কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আর যায়িদ ইবন 'আমর ইবন নুফায়িলের জীবনে ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। আমরা সে ঘটনা তাঁর জবানেই পেশ করছি।

'আমি ইয়াহুদী ও খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে অবগত হলাম; কিন্তু সে ধর্মে মানসিক শান্তি পাওয়ার মত তেমন কিছু না পেয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। এক পর্যায়ে আমি শামে (সিরিয়া) এসে উপস্থিত হলাম। আমি আগেই শুনেছিলাম সেখানে একজন রাহিব' 'সংসারত্যাগী ব্যক্তি আছেন, যিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কাহিনী বিবৃত করলাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন— 'ওহে মক্কাবাসী ভাই, আমার মনে হচ্ছে আপনি দ্বীনে ইবরাহীম অনুসন্ধান করছেন।'

বললাম 'হ্যাঁ আমি তাই অনুসন্ধান করছি।'

তিনি বললেন ঃ 'আপনি যে দ্বীনের সন্ধান করছেন, আজকের দিনেতো তা পাওয়া যায়না। তবে সত্য তো আপনার শহরে। আল্লাহ আপনার কওমের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি দ্বীনে ইবরাহীম পুররুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাকে পান তাঁর অনুসরণ করবেন।'

যায়িদ আবার মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। প্রতিশ্রুত নবীকে খুঁজে বের করার জন্য দ্রুত পা চালালেন।

তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা নবী মুহাম্মাদকে (সা) হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠালেন। কিন্তু যায়িদ তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। কারণ, মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই একদল বেদুঈন ডাকাত তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে।

এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন–

আল্লাহুম্মা ইন কুনতা হারামতানি মিন হাজাল খায়রি ফালা তাহরিম মিনহু ইবনী সাঈদান'– 'হে আল্লাহ, যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমার পুত্র সাঈদকে তা থেকে আপনি মাহরুম করবেন না।'

আল্লাহ তা'আলা যায়িদের এ দু'আ কবুল করেছিলেন। রাসূল (সা) লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথম ভাগেই যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) ওপর ঈমান আনলেন তাঁদের মধ্যে সাঈদও একজন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, সাঈদ প্রতিপালিত হয়েছিলেন এমন এক গৃহে, যে গৃহ ঘৃণাভরে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করেছিল কুরাইশদের সকল কুসংস্কার ও গুমরাহীকে। তাঁর পিতা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সত্যের সন্ধানে। সাঈদ একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, সাথে তাঁর সহধর্মিনী উমার ইবনুল খাত্তাবের বোন ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশ বংশের এ যুবকও অন্যদের মত যুলুম অত্যাচারের শিকার হন। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফেরানো দূরে থাক, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে বরং কুরাইশদের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন ইসলামের মধ্যে। তিনি হলেন তাঁর শ্যালক হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা 'উমারকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসেন।

হযরত সাঈদ তার যৌবনের সকল শক্তি ব্যয় করেন ইসলামের খিদমতে। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অন্য সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিরিয়ায় থাকার কারণে তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তবে বদর যুদ্ধের গণিমতের অংশ তিনি লাভ করেছিলেন। এ হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে বদর বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইসারের সিংহাসন পদানত করার ব্যাপারে তিনি মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিমদের সাথে তাদের যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার প্রত্যেকটিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেই তিনি তাঁর বীরত্বের চরম পরাকষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন,

"ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি। অন্যদিকে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার। তারা অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতের মত অটল ভংগিতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের অগ্রভাগে বিশপ ও পাদ্রী-পুরোহিতদের বিরাট এক দল। হাতে তাদের ক্রুশ খচিত পতাকা, মুখে প্রার্থনা সংগীত। পেছন থেকে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। তাদের সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তখন মেঘের গর্জনের মত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

মুসলিম বাহিনী এ ভয়াবহ দৃশ্য ও তাদের বিপুল সংখ্যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ভয়ে তাদের অন্তরও কিছুটা কেঁপে উঠলো, সেনাপতি আবু উবাইদা তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং মুসলিম সৈন্যদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের পা'কে দৃঢ় করবেন।

আল্লাহর বান্দারা! ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য হল কুফরী থেকে মুক্তির পথ, প্রভুর রিজামন্দী হাসিলের পথ এবং অপমান ও লজ্জার প্রতিরোধক। তোমরা তীর বর্শা শানিত করে ঢাল হাতে প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্তরে আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্য সব চিন্তা থেকে বিরত থাক। সময় হলে আমি তোমাদের নির্দেশ দেব ইনশাআল্লাহ।"

সাঈদ (রা) বলেন,

তখন মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আবু 'উবাইদাকে বলল,

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন কুরবানী করব। রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোন বাণী কি আপনার আছে?' আবু উবাইদা বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে। তাঁকে আমার ও মুসলিমদের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রব আমাদের সাথে যে অংগীকার করেছেন, তা আমরা সত্যই পেয়েছি।'

সাঈদ (রা) বলেন,

"আমি তাঁর কথা শুনা মাত্রই দেখতে পেলাম সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে আল্লাহর শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ অবস্থায় আমি দ্রুত মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে অগ্রসর হলাম এবং আমার বর্শা হাতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুপক্ষের প্রথম যে ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আমি তাকে আঘাত করলাম। তারপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর থেকে সকল প্রকার ভয়ভীতি একেবারেই দূর করে দিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পরাজিত করল।"

দিমাশ্‌ক অভিযানেও সাঈদ ইবন যায়িদ অংশগ্রহণ করেন। দিমাশ্‌ক জয়ের পর আবু 'উবাইদা তাঁকে সেখানকার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি হলেন দিমাশকের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম ওয়ালী। কিন্তু জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে এ পদ লাভ করে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি আবু উবাইদাকে লিখলেন ঃ 'আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি বঞ্চিত হবো, এমন আত্মত্যাগ ও কুরবানী আমি করতে পারিনে।' চিঠি পৌঁছার সাথে সাথে কাউকে আমার স্থলে পাঠিয়ে দিন। আমি শিগ্‌গিরই আপনার নিকট পৌঁছে যাচ্ছি। আবু উবাইদা বাধ্য হয়ে হযরত ইয়াযিদ ইবন আবু সুফিয়ানকে দিমাশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন এবং হযরত সাঈদ জিহাদের ময়দানে ফিরে গেলেন।

উমাইয়া যুগে হযরত সাঈদ ইবন যায়িদকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্যময় ঘটনা ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে মদীনাবাসীদের মুখে ঘটনাটি শোনা যেত।

ঘটনাটি হল, আরওয়া বিন্‌তু উওয়াইস নাম্নী এক মহিলা দুর্নাম রটাতে থাকে যে সাঈদ ইবন যায়িদ তার জমির একাংশ জবরদখল করে নিজ জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। যেখানে সেখানে সে একথা বলে বেড়াতে লাগল। এক পর্যায়ে সে মদীনার ওয়ালী মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য মারওয়ান কয়েকজন লোককে সাঈদের নিকট পাঠালেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হযরত সাঈদের জন্য বিষয়টি ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তিনি বললেন ঃ

"তারা মনে করে আমি তার ওপর যুল্‌ম করছি। কিভাবে আমি যুল্‌ম করতে পারি? আমি তো রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুল্‌ম করে নেবে, কিয়ামতের দিন সাত তবকা যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।' ইয়া আল্লাহ্! সে ধারণা করেছে অমি তার ওপর যুল্‌ম করেছি। যদি সে মিথ্যুক হয়, তার চোখ অন্ধ করে দাও, যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া করেছে, তার মধ্যেই তাকে নিক্ষেপ কর এবং আমার পক্ষে এমন আলোক প্রকাশ করে দাও যাতে মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমি তার ওপর কোন যুল্‌ম করিনি।"

এ ঘটনার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হল যে অতীতে আর কখনো তেমন হয়নি। ফলে দু' যমীনের মাঝখানের বিতর্কিত অদৃশ্য চিহ্নটি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, মুসলিমরা তা দেখে বুঝতে পারল সাঈদ সত্যবাদী। তারপর একমাস না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একদিন সে তার যমীনে পায়চারী করতে করতে বিতর্কিত কূপটির মধ্যে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলেন,

'আমরা শুনতাম লোকেরা কাউকে অভিশাপ দিতে গেলে বলত ঃ আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন অন্ধ করেছেন আরওয়াকে। এ ঘটনায় অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই, কারণ রাসূল (সা) তো বলেছেন ঃ

'তোমরা মাযলুমের দু'আ থেকে দূরে থাক। কারণ, সেই দু'আ আর আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।' এই যদি হয় সব মাযলুমের অবস্থা, তাহলে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ' জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন সাঈদ ইবন যায়িদের মত মাযলুমের দু'আ কবুল হওয়া তেমন আর আশ্চর্য কি?

আবু নুয়াঈম, বিরাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মুগীরা ইবন শু'বা একটি বড় মসজিদে বসে ছিলেন। তখন তাঁর ডানে বাঁয়ে বসা ছিল কুফার কিছু লোক। এমন সময় সাঈদ ইবন যায়িদ নামক এক ব্যক্তি এলেন। মুগীরা তাকে সালাম করে খাটের ওপর পায়ের দিকে বসালেন। অতঃপর কুফাবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে মুগীরার দিকে মুখ করে গালি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুগীরা, এ লোকটি কার প্রতি গালি বর্ষণ করছে? বললেন ঃ আলী ইবন আবী তালিবের প্রতি। তিনি বললেন ঃ ওহে মুগীরা! এভাবে তিনবার ডাকলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের আপনার সামনে গালি দেওয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ আমি দেখতে চাইনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আবু বকর জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর

রাহমান জান্নাতী, সা'দ ইবন মালিক জান্নাতী। এবং নবম এক ব্যক্তিও জান্নাতী, তোমরা চাইলে আমি তার নামটিও বলতে পারি। রাবী বলেন ঃ লোকেরা সমস্বরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল ঃ হে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, নবম ব্যক্তিটি কে? বললেন ঃ নবম ব্যক্তিটি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি একটি মাত্র যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেছে, রাসূলুল্লাহর সাথে তার মুখমণ্ডল ধূলি ধুসরিত হয়েছে, তার এই একটি কাজ যে কোন ব্যক্তির জীবনের সকল সৎকর্ম অপেক্ষা উত্তম—যদিও সে নূহের সমান বয়সই লাভ করুক না কেন। (হায়াতুস সাহাবা/২য়-৪৭০ পৃঃ)

তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের অন্যতম। সাঈদ ইবন হাবীব বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবু বকর, 'উমার, উসমান, আলী, সা'দ, সাঈদ, তালহা, যুবাইর ও আবদুর রাহমান ইবন আওফের স্থান ও ভূমিকা ছিল একই। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা থাকতেন রাসূলুল্লাহর (সা) আগে এবং নামাযের জামাআতে থাকতেন তাঁর পেছনে।

সাঈদ ইবন যায়িদের নিকট থেকে সাহাবীদের মধ্যে ইবন 'উমার 'আমর ইবন হুরাইস, আবু আত্ তুফাইল এবং আবু উসমান আন-নাহদী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, কায়েস ইবন আবী হাযেম প্রমুখ প্রখ্যাত তাবেয়ীগণও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকিদী বলেন ঃ তিনি আকীক উপত্যকায় ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় সমাহিত হন। মৃত্যুসন হিজরী ৫০। মতান্তরে হিজরী ৫১ অথবা ৫২। সত্তর বছরের ওপর তিনি জীবন লাভ করেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তবে হাইসাম ইবন 'আদীর মতে তিনি কুফায় ইনতিকাল করেন এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা ইবন শু'বা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)

নাম তাঁর হামযা, আবু ইয়ালা ও আবু 'আম্মারা কুনিয়াত এবং আসাদুল্লাহ উপাধি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) আপন চাচা। হযরত হামযার জননী হালা বিনতু উহাইব রাসূলুল্লাহর (সা) জননী হযরত আমিনার চাচাতো বোন। তাছাড়া হামযা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই। আবু লাহাবের দাসী 'সুওয়াইবা' তাঁদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছিল। বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অপেক্ষা দু' বছর মতান্তরে চার বছর বড়। ছোট বেলা থেকেই তরবারি চালনা, তীরন্দাযী ও কুস্তির প্রতি ছিল তার প্রবল আগ্রহ। ভ্রমণ ও শিকারে ছিল তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ। জীবনের বিরাট এক অংশ তিনি এ কাজে ব্যয় করেন।

বেশ কিছুকাল যাবত মক্কার অলি গলিতে তাওহীদের দাওয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলো। তবে হামযার মত সিপাহী-স্বভাব মানুষের এ দাওয়াতের প্রতি তেমন মনোযোগ ছিলো না।

একদিন তিনি শিকার থেকে ফিরছিলেন। সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এলে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের এক দাসী তাঁকে ডেকে খবরটি দিল। বললো ঃ 'আবু আম্মারা, ইস্, কিছুক্ষণ আগে এসে আপনার ভাতিজার অবস্থা যদি একটু দেখতেন! তিনি কা'বার পাশে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। আবু জাহল তাঁকে শক্ত গালি দিয়েছে, ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু মুহাম্মদ কোন প্রত্যুত্তর না করে নিতান্ত অসহায়ভাবে ফিরে গেছেন।' একথা শুনে তাঁর সৈনিকসুলভ রক্ত টগবগ করে উঠলো। দ্রুত তিনি কা'বার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, শিকার থেকে ফেরার পথে কারো সংগে সাক্ষাৎ হলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার সংগে দু'চারটি কথা বলা। কিন্তু আজ তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মাদ হয়ে পড়লেন। রাস্তায় কারো দিকে কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা কা'বার কাছে গিয়ে আবু জাহলের মাথায় ধনুক দিয়ে সজোরে এক আঘাত বসিয়ে দিলেন। আবু জাহলের মাথা কেটে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে বনু মাখযুমের কিছু লোক আবু জাহলের সাহায্যে ছুটে এলো। তারা বললো ঃ 'হামযা, সম্ভবতঃ তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছো।' জবাবে বললেন ঃ 'যখন তার সত্যতা আমার নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখন তা থেকে আমাকে বিরত রাখবে কে? হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যা কিছু তিনি বলেন সবই সত্যি। আল্লাহর কসম আমি তা থেকে আর ফিরে আসতে পারিনে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, আমাকে একটু বাধা দিয়েই দেখ।' আবু জাহল তার সাহায্যে এগিয়ে আসা লোকদের বললো ঃ 'তোমরা আবু আম্মারকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, কিছুক্ষণ আগেই আমি তাঁর ভাতিজাকে মারাত্মক গাল দিয়েছি।'

পরবর্তীকালে হযরত হামযা বলেছেন, আমি ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে কথাগুলি তো বলে ফেল্লাম; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ ও গোত্রের ধর্মত্যাগের জন্য আমি অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে লাগলাম। একটা সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে পড়ে সারা রাত ঘুমোতে পারলাম না। কা'বায় এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলাম, যেন আমার

অন্তর-দুয়ার সত্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, অন্তর থেকে সংশয় বিদূরিত হয়। দুআর পর আমার অন্তর দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার অন্তরের স্থিতির জন্য দুআ করলেন।

এটা মুসলমানদের সেই দুঃসময়ের কথা যখন রাসূল (সা) আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়ে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। মুসলমান বলতে তখন ছিলেন মুষ্টিমেয় কিছু নিরাশ্রয় মানুষ। এ অবস্থায় আকস্মিকভাবে হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণে অবস্থা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। মুমিনদের সাথে কাফিরদের অহেতুক বাড়াবাড়ি ও বেপরোয়া ভাব অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, তাঁর দুঃসাহস ও বীরত্বের কথা মক্কার প্রতিটি লোকই জানতো।

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের পর একদিন হযরত উমার (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দানের জন্য গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। তিনি তখন হযরত আরকামের গৃহে কতিপয় সাহাবীর সাথে অবস্থান করছেন। হযরত হামযাও তখন সেখানে। হযরত উমার ছিলেন সশস্ত্র। তাঁকে দেখেই উপস্থিত সকলে প্রমাদ গুণলো। কিন্তু হযরত হামযা বলে উঠলেন ঃ 'তাকে আসতে দাও। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে, আমরাও তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। অন্যথায় তারই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করা হবে।' হযরত উমার ভেতরে ঢুকেই কালেমা তাওহীদ পাঠ করতে শুরু করেন। তখন উপস্থিত মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। এই দুই মনীষীর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। মক্কার মুশরিকরা উপলব্ধি করে, মুহাম্মাদের (সা) গায়ে আঁচড় কাটা আর সহজ হবে না।

মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রিয় খাদেম যায়িদ ইবন হারিসার সাথে হামযার ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। যায়িদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হয় যে, যখন তিনি বাইরে কোথাও যেতেন তাঁকেই সব ব্যাপারে অসীয়াত করে যেতেন।

নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছরে আরো অনেকের সংগে হযরত হামযাও মদীনায় হিজরাত করলেন। এখানে তাঁর খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সাহসিকতা প্রকাশ করার বাস্তব সুযোগ এসে যায়।

হিজরাতের সপ্তম মাসে রাসূল (সা) 'ঈস' অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের দিকে তিরিশ সদস্যের মুহাজিরদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। উদ্দেশ্য, কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করা। এ বাহিনীতে আনসারদের কেউ ছিল না। এখানে তাঁরা সমুদ্র উপকূলে আবু জাহলের নেতৃত্বে মক্কার তিনশো অশ্বারোহীর একটি বাহিনীর মুখোমুখি হন। তারা সিরিয়া থেকে ফিরছিল। কিন্তু মাজদী ইবন 'আমর জুহানীর প্রচেষ্টায় এ যাত্রা সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। মাজদীর সাথে দু'পক্ষের সন্ধিচুক্তি ছিল। মদীনা থেকে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূল (সা) হযরত হামযার হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা তুলে দেন। ইবন আবদিল বারসহ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, এটাই ছিল রাসূল (সা) কর্তৃক কোন মুসলমানের হাতে তুলে দেওয়া প্রথম ঝাণ্ডা। (সীরাতু ইবন হিশাম)

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে ষাট জন সশস্ত্র সাহাবী নিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য চলাচল পথে 'আবওয়া' অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানেও হযরত হামযা ছিলেন পতাকাবাহী এবং গোটা বাহিনীর কমাণ্ডও ছিল তাঁর হাতে। মুসলিম বাহিনী পৌঁছার আগেই কুরাইশ কাফিলা অতিক্রম করায় এ যাত্রাও কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। এমনিভাবে হিজরী দ্বিতীয় সনের 'উশায়রা' অভিযানেও হযরত হামযা মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহীর গৌরব লাভ করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষ কাতারবন্দী হওয়ার পর কুরাইশ পক্ষের উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ সারি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর কাউকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। দ্বীনের সিপাহীদের মধ্য থেকে তিনজন আনসার জওয়ান তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যান। কিন্তু উতবা চিৎকার করে বলে উঠে ঃ 'মুহাম্মাদ, আমাদের সমকক্ষ লোকদেরই পাঠাও। এসব অনুপযুক্ত লোকদের সাথে আমরা লড়তে চাই না। রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ দিলেন ঃ হামযা, আলী ও উবাইদা ওঠো, সামনে এগিয়ে যাও।' তাঁরা শুধু আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এ তিন বাহাদুর আপন আপন নিযা ও বর্শা নিয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম আক্রমণেই হযরত হামযা জাহান্নামে পাঠালেন উতবাকে। হযরত আলীও বিজয়ী হলেন তাঁর প্রতিপক্ষের ওপর। কিন্তু আবু উবাইদা ও ওয়ালিদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো। অতঃপর আলীর সহযোগিতায় আবু উবাইদা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। শত্রুপক্ষের এ বেগতিক অবস্থা দেখে তুয়াইমা ইবন আদী' তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। হামযার সহযোগিতায় আলী (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এরপর মুশরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। মুসলিম মুজাহিদরাও ঝাঁপিয়ে পড়েন। তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। এ যুদ্ধে হযরত হামযা পাগড়ীর ওপর উটপাখির পালক গুঁজে রেখেছিলেন। এ কারণে যে দিকে তিনি যাচ্ছিলেন সুস্পষ্টভাবে তাকে দেখা যাচ্ছিল। দু'হাতে বজ্রমুষ্টিতে তরবারি ধরে বীরত্বের সাথে কাফিরদের ব্যূহ তছনছ করে দিচ্ছিলেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) দুশমনরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। উমাইয়্যা ইবন খালাফ হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ উটপাখির পালক লাগানো এ লোকটি কে? তিনি যখন বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হামযা, তখন সে বলেছিল ঃ 'এ ব্যক্তিই আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছে।'

মদীনার উপকণ্ঠেই ছিল ইয়াহুদী গোত্র বনু কাইনুকা'র বসতি। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাদের সাথে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভে তাদের হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ চুক্তি ভংগের কারণে রাসূল (সা) দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানেও হযরত হামযা পতাকাবাহীর দায়িত্ব পালন করেন।

বদরের শোচনীয় পরাজয়ে কুরাইশদের আত্ম অভিমান দারুণভাবে আহত হয়। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত বিশাল কুরাইশ বাহিনী হিজরী তৃতীয় সনে মদীনার দিকে ধাবিত হলো। আল্লাহর রাসূল (সা) সংগীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের গতিরোধ করেন। শাওয়াল মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। কাফিরদের পক্ষ থেকে 'সিবা' নামক এক বাহাদুর সিপাহী এগিয়ে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত হামযা কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানে এসে হুংকার ছেড়ে বললেন ঃ ওরে উম্মে আনমারের অপবিত্র পানির সন্তান, তুই এসেছিস আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়তে? এ কথা বলে তিনি এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন যে, এক আঘাতেই সিবার কাজ শেষ। তারপর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত হামযার ক্ষিপ্র আক্রমণে কাফিরদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল। এ যুদ্ধে তিনি একাই তিরিশ জন কাফির সৈন্যকে হত্যা করেন।

যেহেতু হযরত হামযা বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বাছাবাছা নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছিলেন, এ কারণে কুরাইশদের সকলেই তাঁরই খুনের পিয়াসী ছিল সবচেয়ে বেশী। হযরত হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী উহুদ ময়দানে হামযার হত্যা ঘটনাটি পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন। ইবন হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। ওয়াহশী বলেন ঃ 'আমি ছিলাম জুবাইর ইবন মুতয়িমের এক হাবশী ক্রীতদাস। বদর যুদ্ধে জুবাইরের চাচা তুয়াইম ইবন 'আদী হামযার হাতে নিহত হয়। মক্কায় ফিরে জুবাইর আমাকে বললো ঃ যদি তুমি মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার বদলা নিতে পার, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। আমাকে সে বিশেষভাবে ট্রেনিং দিল। আমি শুধু হামযাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই উহুদের দিকে রওয়ানা হলাম। যুদ্ধ শুরু হলো। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে হামযার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমার কাছাকাছি উপস্থিত হলে অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। তারপর আমার স্বপক্ষ সৈন্যদের নিকট ফিরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকলাম। যুদ্ধে আর অংশ গ্রহণ করলাম না। কারণ, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি মক্কায় ফিরে এলে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।'

এ মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি। হযরত হামযার বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি।

হযরত হামযার শাহাদাত লাভের পর কুরাইশ রমণীরা আনন্দ সংগীত গেয়েছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা হামযার নাক-কান কেটে অলংকার বানিয়েছিল, বুক, পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। একথা শুনে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে কি তার কিছু অংশ খেয়েও ফেলেছে? লোকেরা বলেছিল ঃ না। তিনি বলেছিলেন ঃ হামযার দেহের কোন একটি অংশও আল্লাহ জাহান্নামে যেতে দেবেন না।

যুদ্ধ শেষে শহীদের দাফন-কাফনের পালা শুরু হলো। রাসূল (সা) সম্মানিত চাচার লাশের কাছে এলেন। যেহেতু হিন্দা তাঁর নাক-কান কেটে বিকৃত করে ফেলেছিল, তাই এ দৃশ্য দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন হামযা হবে

'সাইয়েদ্যদুশ শুহাদা' বা সকল শহীদের নেতা। তিনি আরো বললেন ঃ তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার জানামতে তুমি ছিলে আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে অধিক সচেতন, অতিশয় সৎকর্মশীল। যদি সাফিয়্যার শোক ও দুঃখের কথা আমার মনে না থাকতো তাহলে এভাবেই তোমাকে ফেলে রেখে যেতাম, যাতে পশু-পাখী তোমাকে খেয়ে ফেলতো এবং কিয়ামাতের দিন তাদের পেট থেকে আল্লাহ তোমাকে জীবিত করতেন। আল্লাহর কসম, 'তোমার প্রতিশোধ নেওয়া আমার ওপর ওয়াজিব। আমি তাদের সত্তর জনকে তোমার মত নাক-কান কেটে বিকৃত করবো।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ কসমের পর জীবরীল (আ) সূরা নাহলের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ঃ

'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে, ধৈর্যশীলদের জন্য তাই-ই তো উত্তম। ধৈর্য ধারণ কর। তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।' (সূরা নাহল/১২৬-২৭)

এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। (তাবাকাতে ইবন সাদ)

হযরত সাফিয়্যা ছিলেন হযরত হামযার সহোদরা। ভায়ের শাহাদাতের খবর শুনে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য দৌড়ে আসেন। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে না দিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ভায়ের কাফনের জন্য হযরত সাফিয়্যা দু'খানি চাদর পাঠান। কিন্তু হযরত হামযারই পাশে আরেকটি লাশও কাফনহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। তাই চাদর দু'খানি দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বলেন, একটি চাদর ছাড়া হামযাকে কাফন দেওয়ার জন্য আর কোন কাপড় আমরা পেলাম না। তা দিয়ে পা ঢাকলে মাথা এবং মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাই আমরা চাদর দিয়ে মাথা এবং 'ইজখির' ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দিলাম। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৬) সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযাকে উহুদের ময়দানেই দাফন করা হয়। ইমাম বুখারী হযরত জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু'জন করে একটি কবরে দাফন করেছিলেন। হামযা ও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশকে এক কবরে দাফন করা হয়।

ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে 'ফাওয়ায়েদে আবিত তাহিরের' সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মুয়াবিয়া যে দিন উহুদে কূপ খনন করেছিলেন সেদিন আমরা উহুদের শহীদদের জন্য কান্নাকাটি করেছিলাম। শহীদদের আমরা সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় পেয়েছিলাম। এক ব্যক্তি হযরত হামযার পায়ে আঘাত করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে পড়ে।

হযরত হামযার হত্যাকারী হযরত ওয়াহশী (রা) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তুমি কি ওয়াহশী? জবাব দিলেন ঃ হাঁ। 'তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছো?' জবাব দিলেন ঃ 'আল্লাহর রাসূল যা শুনেছেন, তা সত্য।' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি কি তোমার চেহারা আমার নিকট একটু গোপন করতে পার?' তক্ষুনি তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং জীবনে আর কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) মুখোমুখি হননি। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফত কালে ভণ্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তিনিও সে অভিযানে অংশ নিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, মুসাইলামাকে হত্যা করে হযরত হামযার হত্যার কাফ্ফারা আদায় করবেন। তিনি সফল হলেন। এভাবে আল্লাহতাআলা তাঁকে দিয়ে ইসলামের যতটুকু ক্ষতি করেন তার চেয়ে বেশী উপকার সাধন করেন।

হযরত হামযার মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তখনকার অনুভূতি তিনি কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। সীরাতে ইবনে হিশামে "হামযার ইসলাম গ্রহণ" অধ্যায়ের টীকায় তার কিছু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।

আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)

নাম আবুল ফজল আব্বাস। পিতা আবদুল মুত্তালিব, মাতা নাতিলা, মতান্তরে নাসিলা বিনতু খাব্বাব। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা। তবে দু'জন ছিলেন প্রায় সমবয়সী। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সম্ভবতঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই বা তিন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ছোট বেলায় একবার তিনি হারিয়ে যান। মা মান্নত মানেন, আব্বাস ফিরে এলে কা'বায় রেশমী গিলাফ চড়াবেন। কিছু দিন পর তিনি সহি-সালামতে ফিরে এলে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আবদুল মুত্তালিব তাঁর মান্নত পুরা করেন।

জাহিলী যুগে তিনি ছিলেন কুরাইশদের একজন প্রতাপশালী রঈস। পুরুষানুক্রমে খানায়ে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। মক্কায় প্রকাশ্যে তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। হযরত আব্বাস যদিও দীর্ঘ দিন যাবত প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবে তিনি এ দাওয়াতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ কারণে মদীনার বাহাত্তর জন আনসার হজ্জের মওসুমে মক্কায় গিয়ে মিনার এক গোপন শিবিরে যে দিন রাসূলুল্লাহকে (সা) মদীনায় হিজরাতের আহ্বান জানান এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, সেই গোপন বৈঠকেও হযরত আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইতিহাসে এই বাইয়াতকে আকাবার দ্বিতীয় শপথ বলা হয়। এ উপলক্ষে তিনি উপস্থিত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন ঃ 'খাযরাজ কাওমের লোকেরা! আপনাদের জানা আছে, মুহাম্মাদ (সা) স্বীয় গোত্রের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার সাথেই আছেন। শত্রুর মুকাবিলায় সর্বক্ষণ আমরা তাঁকে হিফাজত করেছি। এখন তিনি আপনাদের নিকট যেতে চান। যদি আপনারা জীবন পণ করে তাঁকে সহায়তা করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো কথা। অন্যথায় এখনই সাফ সাফ বলে দিন।' জবাবে মদীনাবাসীগণ পরিপূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দান করেন। এর অল্পকাল পরেই রাসূলুল্লাহ মদীনায় হিজরাত করেন।

মক্কার কুরাইশদের চাপের মুখে বাধ্য হয়ে তিনি কুরাইশ বাহিনীর সংগে বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) অবহিত ছিলেন, এ কারণে তিনি সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যুদ্ধের সময় আব্বাস বা বনু হাশিমের কেউ সামনে পড়ে গেলে তাদের হত্যা করবে না। কারণ, জোরপূর্বক তাদের রণক্ষেত্রে আনা হয়েছে।'

বদর যুদ্ধে অন্যান্য কুরাইশ মুশরিকদের সাথে আব্বাস, আকীল ও নাওফিল ইবন হারিস মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। ঘটনাক্রমে, আব্বাসকে এত শক্তভাবে বাঁধা হয় যে, ব্যথায় তিনি কঁকাতে থাকেন। তাঁর সে কঁকানি রাসূলুল্লাহর (সা) রাতের আরামে বিঘ্ন ঘটায়। একথা সাহাবায়ে কিরাম অবগত হলে তাঁরা আব্বাসের বাঁধন ঢিলা করে দেন। আব্বাস কঁকানি বন্ধ করে দিলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কঁকানি শোনা

যায় না কেন? বলা হলো ঃ বাঁধন ঢিলা করে দেওয়া হয়েছে। তখুনি রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন সকল বন্দীর বাঁধন ঢিলা করে দাও'।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের কাছে অতিরিক্ত কাপড় ছিল না। রাসূল (সা) সকলকে পরিধেয় বস্ত্র দিলেন। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী। কোন ব্যক্তির জামা তাঁর গায়ে লাগছিল না। আব্বাসের মত দীর্ঘদেহী ছিল মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই। সে একটি জামা আব্বাসকে দান করে। এ কারণে, মুনাফিক হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যুর পর পুত্রের অনুরোধে রাসূল (সা) নিজের একটি জামা তার লাশের গায়ে পরানোর জন্য দান করেন। এভাবে তিনি চাচার প্রতি কৃত ইহসান পরিশোধ করেন।

বদর যুদ্ধের কয়েদীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। আব্বাসের জননী ছিলেন মদীনার আনসার-গোত্র খাযরাজের কন্যা। এ কারণে এ গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিবেদন করলো, আব্বাস আমাদের ভাগ্নে। আমরা তাঁর মুক্তিপণ মাফ করে দিচ্ছি। কিন্তু সাম্যের পরিপন্থী হওয়ায় এ প্রস্তাব আল্লাহর রাসূলের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো না। পক্ষান্তরে আব্বাস সম্পদশালী ব্যক্তি হওয়ার কারণে রাসূল (সা) তাঁর নিকট মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবী করেন। আব্বাস এত বেশী অর্থ আদায়ে অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন ঃ অন্তর থেকে আমি আগেই মুসলমান হয়েছিলাম। মুশরিকরা এ যুদ্ধে অংশ নিতে আমাকে বাধ্য করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ অন্তরের অবস্থা আল্লাহ জানেন। আপনার দাবী সত্য হলে আল্লাহ তার বিনিময় দেবেন। তবে বাহ্যিক অবস্থার বিচারে আপনাকে কোন প্রকার সুবিধা দেওয়া যাবে না। আর মুক্তিপণ আদায়ে আপনার অক্ষমতাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আমি জানি, মক্কায় উম্মুল ফজলের নিকট আপনি মোট অংকের অর্থ রেখে এসেছেন। বিস্ময়ের সাথে আব্বাস বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম, আমি ও উম্মুল ফজল ছাড়া আর কেউ এ অর্থের কথা জানে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি নিজের, ভ্রাতুষ্পুত্র আকীল ও নাওফিল ইবন হারিসের পক্ষ থেকে মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্তি লাভ করেন।

আব্বাসের একটা দীর্ঘ সময় মক্কায় অবস্থান এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা না দেওয়ার পশ্চাতে এক বিশেষ কারণ ছিল। তিনি সব সময় মক্কা থেকে কাফিরদের গতিবিধি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করতেন। তাছাড়া মক্কায় যেসব দুর্বল ঈমানের মুসলমান তখনো অবস্থান করছিল, তিনি ছিলেন তাদের ভরসাস্থল। এ কারণে একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হিজরাতের অনুমতি চাইলে তাঁকে এই বলে বিরত রাখেন যে, 'আপনার মক্কায় অবস্থান করা শ্রেয়। যেভাবে আল্লাহ আমার উপর নবুওয়াত সমাপ্ত করেছেন তেমনি আপনার উপর হিজরাত সমাপ্ত করবেন।'

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে হযরত আব্বাস হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন। সপরিবারে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং স্থায়ীভাবে মদীনায় বসবাস শুরু করেন। তিনি মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হুনাইন অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে আরোহী ছিলেন। তিনি বলেন ঃ এ যুদ্ধে কাফিরদের জয় হলো এবং মুসলিম মুজাহিদরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো, রাসূল (সা)

বললেন, 'আব্বাস, তীরন্দাজদের আওয়ায দাও।' স্বভাবগতভাবেই আমি ছিলাম উচ্চকণ্ঠ। আহ্বান জানালাম ঃ আইনা আসহাবুস সুমরা'— তীরন্দাজরা কোথায়? আমার এই আওয়াযে মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। তায়েফ অবরোধ, তাবুক অভিযান এবং বিদায় হজ্জেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন।

বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পর রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। দিন দিন অসুস্থতা বাড়তে থাকে। হযরত আলী, হযরত আব্বাস ও বনী হাশিমের অন্য লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) সেবার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ওফাতের দিন হযরত আলী বাড়ীর বাইরে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা কেমন? যেহেতু সে দিন অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, এ কারণে তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর অনুগ্রহে একটু ভালো।' কিন্তু হযরত আব্বাস ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আলীর একটি হাত ধরে বল্লেন ঃ 'তুমি কী মনে করেছো? আল্লাহর কসম, তিন দিন পরেই তোমরা গোলামী করতে শুরু করবে। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি এ রোগেই অল্প দিনের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিব খান্দানের লোকদের চেহারা দেখেই তাদের মৃত্যু আন্দাজ করতে পারি।'

ঐ দিন রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। হযরত আলী ও বনী হাশিমের অন্যান্যদের সহযোগিতায় হযরত আব্বাস কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত চাচা এবং বনী হাশিমের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, এ কারণে বহিরাগত লোকেরা তাঁর নিকট এসে শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করতে থাকে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) চাচা আব্বাসকে খুব সম্মান করতেন। তাঁর সামান্য কষ্টতেও তিনি দারুণ দুঃখ পেতেন। একবার কুরাইশদের একটি আচরণ সম্পর্কে হযরত আব্বাস অভিযোগ করলে রাসূল (সা) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্য আপনাদের ভালবাসেনা তার অন্তরে ঈমানের নূর থাকবে না।'

একবার রাসূল (সা) এক বৈঠকে আবু বকর ও উমারের (রা) সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় আব্বাস উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে নিজের ও আবু বকরের মাঝখানে বসালেন এবং কণ্ঠস্বর একটু নীচু করে কথা বলতে লাগলেন। আব্বাস চলে যাওয়ার পর আবু বকর (রা) এমনটি করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বলেন ঃ 'মর্যাদাবান ব্যক্তিই পারে মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা দিতে।' তিনি আরো বলেন ঃ 'জিবরীল আমাকে বলেছেন, আব্বাস উপস্থিত হলে আমি যেন আমার স্বর নিচু করি, যেমন আমার সামনে তোমাদের স্বর নিচু করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন।'

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীন হযরত আব্বাসের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। হযরত উমার ও হযরত উসমান (রা) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন এবং বলতেন ঃ 'ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা।' হযরত আবু বকর (রা) একমাত্র আব্বাসকেই নিজের আসন থেকে সরে গিয়ে স্থান করে দিতেন।

হযরত আব্বাস ৩২ হিজরীর রজব/মুহাররম মাসের ১২ তারিখ ৮৮ (অষ্টাশি) বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা) জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন। মদীনার বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ৩২ বছর এবং জাহিলী যুগে ৫৬ বছর জীবন লাভ করেন।

জাহিলী যুগে হযরত আব্বাস (রা) অত্যন্ত সম্পদশালী ছিলেন। এ কারণে বদর যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) তাঁর নিকট থেকে মুক্তিপণ স্বরূপ বিশ উকিয়া স্বর্ণ গ্রহণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাঁর জীবিকার উৎস। সুদের কারবারও করতেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ কারবার চালু ছিল। দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আজ থেকে আরবের সকল প্রকার সুদী কারবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিবের সুদী কারবার রহিত ঘোষণা করছি।'

সুদের কারবার বন্ধ হওয়ার পর রাসূল (সা) গণীমতের এক পঞ্চমাংশ ও ফিদাক বাগিচার আমদানী থেকে তাঁকে সাহায্য করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তিনি ও হযরত ফাতিমা প্রথম খলীফার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) উত্তরাধিকার দাবী করেন। নবীরা কোন উত্তরাধিকার রেখে যান না— এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী হযরত আবু বকরের (রা) মুখ থেকে শোনার পর তাঁরা নীরব হয়ে যান।

হযরত আব্বাস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। অতিথি পরায়ণ ও দয়ালু। হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ 'আব্বাস হলেন আল্লাহর রাসূলের চাচা, কুরাইশদের মধ্যে সর্বাধিক দরাজ হস্ত এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি অধিক মনোযোগী'। তিনি ছিলেন কোমল অন্তর বিশিষ্ট। দুআর জন্য হাত উঠালেই চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেত। এ কারণে তাঁর দুআয় এক বিশেষ আছর পরিলক্ষিত হতো।'

রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাস (রা) ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ করেছেন। তিনি তাঁদের সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অপরাধের মাগফিরাত কামনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আব্বাসের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। হুনাইন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তিনি একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তার কয়েকটি পংক্তি *'আল-ইসতিয়াব'* ও ইবন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।

বিলাল ইবন রাবাহ (রা)

আবু আবদুল্লাহ বিলাল তাঁর নাম। পিতা রাবাহ এবং মাতা হামামাহ। হাবশী বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস। তবে মক্কায় জন্মলাভ করেছিলেন। বনু জুমাহ ছিল তাদের মনিব।

হাবশী দাস হিসাবে তাঁর বাহ্যিক রং কালো হলেও অন্তর ছিল দারুণ স্বচ্ছ। আরবের গৌরবর্ণের লোকেরা যখন আভিজাত্যের ও কৌলিণ্যের বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে হকের দাওয়াত অস্বীকার করে চলেছিল, তখনই তাঁর অন্তর ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। অল্প কিছু লোক দাওয়াতে হক কবুল করলেও যে সাত ব্যক্তি প্রকাশ্য ঘোষণার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এ হাবশী গোলাম অন্যতম।

চিরকালই দুর্বলরা অত্যাচার উৎপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। বিলালের সামাজিক অবস্থানের কারণে তাঁর ওপর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে। শাস্তি ও যন্ত্রণার নানা রকম অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর সবর ও ইসতিকলালের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। গলায় উত্তপ্ত বালু, পাথরকুচি ও জ্বলন্ত অংগারের ওপর তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, গলায় রশি বেঁধে ছাগলের মত শিশুরা মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। তবুও তাওহীদের শক্ত রশি তিনি হাত ছাড়া করেননি। আবু জাহল তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের ওপর পাথরের বড় চাক্কি রেখে দিত। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, আবু জাহল বলতো ঃ 'বিলাল, এখনো মুহাম্মাদের আল্লাহ থেকে ফিরে এসো।' কিন্তু তখনো তার পবিত্র মুখ থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' ধ্বনি বের হতো।

অত্যাচারী মুশরিকদের মধ্যে উমাইয়্যা ইবন খালাফ ছিল সর্বাধিক উৎসাহী। সে শাস্তি ও যন্ত্রণার নিত্য নতুন কলা-কৌশল প্রয়োগ করতো। নানা রকম পদ্ধতিতে সে তাঁকে কষ্ট দিত। কখনো গরুর কাঁচা চামড়ায় তাঁকে ভরে, কখনো লোহার বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত রোদে বসিয়ে দিয়ে বলতো ঃ 'তোমার আল্লাহ লাত ও উয্যাহ' কিন্তু তখনো এ তাওহীদ প্রেমিক লোকটির যবান থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' ছাড়া আর কোন বাক্য বের হতো না। মুশরিকরা বলতো, তুমি আমাদের কথিত শব্দগুলিই উচ্চারণ করো। তিনি বলতেন ঃ 'আমার যবান ঠিক মত তোমাদের শব্দগুলি উচ্চারণ করতে পারে না।'

প্রতিদিনের মত সেদিনও হযরত বিলালের ওপর 'বাতহা' উপত্যকায় অত্যাচারের স্টীম রোলার চলছিল। ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীকও সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দারুণ মর্মাহত হলেন। মোটা অংকের অর্থ বিলালের মনিবকে দিয়ে তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আবু বকর, আমাকেও তুমি এ কাজে শরীক করে নাও। তিনি আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি তো তাঁকে আযাদ করেই দিয়েছি।'

মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবন খুসাইমার (রা) অতিথি হলেন। হযরত আবু রুওয়াইহা আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান খাসয়ামীর (রা) সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়

খলীফা হযরত উমার ফারুকের সময়ে হযরত বিলাল সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। খলীফা উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিলাল, তোমার ভাতা কে উঠাবে? জবাব দিলেন ঃ 'আবু রুওয়াইহা। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের দু'জনের যে ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।'

হিজরাতের আগ পর্যন্ত মক্কায় ইসলাম ছিল দুর্বল, হিজরাতের পর মদীনায় তা সবল হয়ে দাঁড়ায়। এই মাদানী জীবনের সূচনা থেকেই ইসলামী আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তির স্থাপনা শুরু হয়। মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং নামাযের জন্য আযানের প্রচলন হলো। হযরত বিলাল প্রথম ব্যক্তি, আযানের দায়িত্ব যাঁর ওপর অর্পিত হয়। বিলালের উচ্চ ও হৃদয়গ্রাহী আযান ধ্বনি শুনে নারী পুরুষ, কিশোর যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কেউ ঘরে স্থির থাকতে পারতো না। মসজিদে তাওহীদের ধারক-বাহকদের ভীড় জমে উঠলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরজায় গিয়ে আওয়ায দিতেন ঃ 'হাইয়ালাস সালাহ, হাইয়ালাল ফালাহ, আস্‌সালাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ— হে আল্লাহর রাসূল! নামায উপস্থিত।' রাসূল (সা) বেরিয়ে আসতেন, বিলাল তাকবীর দিতেন। কোনদিন হযরত বিলাল মদীনায় উপস্থিত না থাকলে হযরত আবু মাহযুরা এবং হযরত 'আমর ইবন উম্মে মাকতুম (রা) তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। বিলাল (রা) সাধারণতঃ সুবহে সাদিক হওয়ার আগেই ফজরের আযান দিতেন। এ কারণে সকালে দু'বার আযান দেওয়া হতো। শেষের আযান দিতেন হযরত 'আমর ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। এ জন্য রমজান মাসে হযরত বিলালের আযানের পর পানাহার জায়েয ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় অবস্থান বা সফরের সময়, উভয় অবস্থায় বিলাল ছিলেন তাঁর বিশেষ মুয়াজ্জিন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) কোন এক সফরে পথ চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। সাহাবাদের কেউ কেউ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখানে কোথাও রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু গাড়ার হুকুম দিলে ভালো হতো। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে ঘুম তোমাদের নামায থেকে উদাসীন করে না দেয়।' হযরত বিলাল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে সবাই তাঁবু গেড়ে বিশ্রামে গা এলিয়ে দিলেন। এদিকে বিলাল (রা) অধিক সতর্কতার সাথে হাওদার কাঠের সাথে হেলান দিয়ে সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ অবস্থায় তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এলো এবং গভীর ঘুমে এমন অচেতন হয়ে পড়লেন যে সূর্যোদয়ের আগে আর চেতনা ফিরে এলো না। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে সর্বপ্রথম বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার দায়িত্ব পালনের কি হলো? বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ আমি এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এমনটি আমার সাধারণতঃ হয় না। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আল্লাহ যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহ অধিকার করে নেন, আবার যখন ইচ্ছা তা ফিরিয়ে দেন। উঠে আযান দাও এবং লোকদের নামাযের জন্য সমবেত কর।'

হযরত বিলাল (রা) প্রধান প্রধান সকল যুদ্ধেই শরীক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি ইসলামের এক মস্তবড় দুশমন উমাইয়্যা ইবন খালাফকে হত্যা করেন। মক্কায় যাঁরা বিলালের ওপর নির্যাতন চালাতো, এ উমাইয়্যা ছিল তাদের অন্যতম। মক্কা বিজয়ের

দিনে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনিও কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে কা'বার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা) তাঁর প্রতি সর্বাধিক ইহসানকারী ব্যক্তি হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রা) নিকট আরজ করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি কি আমাকে আযাদ করেছেন আল্লাহর ওয়াস্তে না আপনার সংগী বানানোর উদ্দেশ্যে? তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর ওয়াস্তে।' বিলাল বললেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনেছি, মুমিনের উত্তম কাজ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এ কারণে আমি চাই, এই মহান কাজটিকে আমরণ আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করতে।' হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ 'বিলাল, তুমি আমার থেকে দূরে চলে গিয়ে বিচ্ছেদ বেদনায় আমাকে কাতর করে তুলো না।' হযরত আবু বকরের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় বিলাল কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

হযরত আবু বকরের পর খলীফা হযরত 'উমার। বিলাল তাঁর কাছেও অনুমতি চাইলেন জিহাদে অংশগ্রহণের। প্রথম খলীফার মত দ্বিতীয় খলীফাও তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর অত্যধিক উৎসাহ ও অনমনীয় মনোভাব দেখে খলীফা উমার তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন। ১৬ হিজরী সনে হযরত উমারের সিরিয়া সফরকালে অন্যান্য সামরিক অফিসারদের সাথে বিলালও 'জাবিয়া' নামক স্থানে খলীফাকে স্বাগত জানান এবং 'বাইতুল মুকাদ্দাস' সফরে তিনি খলীফার সংগী হন। সফরের এক পর্যায়ে একদিন খলীফা বিলালকে অনুরোধ করলেন আযান দেওয়ার জন্য। বিলাল বললেন ঃ 'যদিও আমি অঙ্গীকার করেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) পর আর কারো জন্য আযান দিব না, তবে আজ আপনার ইচ্ছা পূরণ করবো।' এ কথা বলে তিনি এমন হৃদয়গ্রাহী আওয়াযে আযান দিলেন যে উপস্থিত জনতার মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিল। হযরত 'উমার এত কাঁদলেন যে তাঁর বাক রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু 'উবাইদা ও হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) কান্নায় ভেংগে পড়েছিলেন। সবারই মনে তখন নবী-যুগের ছবি ভেসে উঠছিল, অন্তরে তখন এক বিশেষ অনুভূতি জেগে উঠেছিল।

সিরিয়ার সবুজ ও শস্য-শ্যামল ভূমি হযরত বিলালের খুবই মনঃপুত হয়। তিনি দ্বিতীয় খলীফার নিকট তাঁর ইসলামী ভাই আবু রুওয়াইহাসহ তাঁকে সিরিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দানের জন্য আবেদন জানান। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলো। তাঁরা দু'জন 'খাওলান' নামক ছোট একটি শহরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের পূর্বেই এ শহরে বসতি স্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু দারদা আনসারীর (রা) গোত্র। এখানে তাঁরা দু'জন এ গোত্রের দু'টি মেয়েকে বিয়ে করে তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

দীর্ঘদিন যাবত হযরত বিলাল (রা) সিরিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। একদিন স্বপ্নে দেখলেন ঃ রাসূল (সা) বলছেন ঃ 'বিলাল, এমন নিরস জীবন আর কতকাল? আমার যিয়ারতের সময় কি তোমার এখনো হয়নি?' এ স্বপ্ন তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার ক্ষত

আবার তাজা করে দিল। তখুনি তিনি মদীনা রওয়ানা হলেন এবং পবিত্র রওজা মুবারকে হাজির হয়ে জবাই করা মোরগের মত ছটফট করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কলিজার টুকরা হযরত হাসান ও হুসাইনকে (রা) জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকেন। তাঁরা দু'জন সে দিন সকালে ফজরের আযান দেওয়ার জন্য হযরত বিলালকে (রা) অনুরোধ করেন। তাঁদের অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। সুবহে সাদিকের সময় মসজিদে নববীর ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলছিলেন, আর সে ধ্বনি মদীনার অলিতে গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল। তাঁর সে আযান ধ্বনি শুনে মদীনার জনগণ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছিল।

তিনি যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললেন, তখন মদীনার নারী-পুরুষ সকলেই অস্থিরভাবে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। বর্ণিত আছে, এমন ভাব-বিহ্বল দৃশ্য মদীনায় আর কখনো দেখা যায়নি।

এ নিষ্ঠাবান রাসূলপ্রেমিক হিজরী ২০ সনে প্রায় ষাট বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। দিমাশকের 'বাবুস সাগীরের' কাছেই তাঁকে দাফন করা হয়।

চারিত্রিক সৌন্দর্য হযরত বিলালের (রা) মর্যাদা ও সম্মানকে অত্যধিক বাড়িয়ে দিয়েছিল। হযরত উমার বলতেন ঃ 'আবু বকর আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতা বিলালকে আযাদ করেছেন।'

হযরত রাসূলে পাকের সাহচর্য ও সেবাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আশেপাশে উপস্থিত থাকতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সংগী হতেন। ঈদ ও ইসতিসকার নামাযের সময় বল্লম হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) আগে আগে ময়দানে যেতেন। ওয়াজ নসীহতের মজলিসেও উপস্থিত থাকতেন। শত প্রয়োজন ও দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও হাতে কিছু এলেই তার একাংশ রাসূলকে (সা) উপঢৌকন পাঠাতেন। একবার উৎকৃষ্ট মানের কিছু খেজুর রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে আসেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'বিলাল, এগুলি কোথায় পেলে? জবাব দিলেন ঃ আমার কাছে কিছু নিম্নমানের খেজুর ছিল। যেহেতু আপনার খিদমতে কিছু পাঠানোর ইচ্ছা ছিল, এ জন্যই দু' সা'য়ের বিনিময়ে এর এক সা' খেজুর লাভ করেছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ হায়, হায়, এমন করোনা। এ তো এক ধরনের সুদ। যদি তোমাকে খরীদ করতেই হতো, তাহলে প্রথমে তোমার খেজুরগুলি বিক্রি করে দিতে এবং সেই অর্থ দিয়ে এগুলি খরীদ করতে।

মক্কায় যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন হযরত বিলাল সহ্য করেছিলেন, তাদ্বারাই তাঁর সহ্যশক্তি, ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। কেউ তাঁর কোন গুণের কথা বললে বলতেন ঃ 'আমি তো শুধু একজন হাবশী, কালপর্যন্তও যে দাস ছিল।' সততা, নিষ্কলুষতা ও বিশ্বস্ততা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত বিলাল যেহেতু রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ মুয়ায্যিন ছিলেন এ কারণে অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাতে হতো। রাত দিনের বেশী সময় ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। একবার রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কোন্ ভালো কাজটির

জন্য সবচেয়ে বেশী সাওয়াবের আশা করো? বললেন ঃ 'আমি তো এমন কোন ভালো কাজ করিনি। তবে প্রত্যেক অজুর পরে নামায আদায় করেছি।'

সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারে তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। হযরত আবু বকরের কন্যার সাথে রাসূল (সা) নিজে বিয়ে দিয়েছিলেন। বনু যুহরা ও আবু দারদার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু কোন পক্ষেই তাঁর কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি।

সহীহ *ইবন খুযাইমা* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, একদিন রাসূল (সা) বিলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিলাল, কিসের বদৌলতে তুমি আমার আগেই জান্নাতে পৌঁছে গেলে? গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তোমার 'খশ্‌খশা' আওয়ায শুনতে পেলাম।' বিলাল বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কোন গুনাহ করলেই দু'রাকায়াত নামায আদায় করি। আর অজু চলে গেলে তখনি আবার অজু করে আমি দু'রাকায়াত নামায আদায় করে থাকি।'

জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা)

আবু আবদিল্লাহ জা'ফর নাম, পিতা আবু তালিব এবং মাতা ফাতিমা। কুরাইশ গোত্রের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাত ভাই এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সহোদর। বয়সে আলী (রা) থেকে দশ বছর বড়।

বনী আবদে মান্নাফের পাঁচ ব্যক্তির চেহারা রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে এত বেশী মিল ছিল যে প্রায়শঃ ক্ষীণ দৃষ্টির লোকেরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলতো। সে পাঁচ ব্যক্তি হলেন ঃ ১। আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবন আবদিল মুত্তালিব। তিনি একাধারে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাইও। ২। কুসাম ইবনুল আব্বাস ইবন মুত্তালিব। তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। ৩। আস-সায়িব ইবন 'উবায়িদ ইবন আবদে ইয়াযিদ ইবন হাশিম। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর (রহঃ) পিতামহ। ৪। হাসান ইবন আলী— রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র। রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ছিল সর্বাধিক। ৫ম ব্যক্তি হলেন জা'ফর ইবন আবী তালিব।

কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অধিক সন্তান-সন্ততি ও পোষ্যের কারণে আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা ছিল দারুণ অসচ্ছল। মরার ওপর খাড়ার ঘা'র মত সেই অনাবৃষ্টির বছরটি তাঁর অসচ্ছল অবস্থাকে আরও নিদারুণ করে তোলে। সেই মারাত্মক খরার বছরে কুরাইশদের সব ফসল পুড়ে যায়, গবাদি পশুও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে একটা হাহাকার পড়ে যায়। এ সময় বনী হাশিমের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবদিল্লাহ এবং তাঁর চাচা আব্বাস অপেক্ষা অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না।

একদিন মুহাম্মাদ (সা) চাচা আব্বাসকে বললেন ঃ 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের তো অনেক সন্তানাদি। মানুষ এ সময় দারুণ দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের মধ্যে আছে। চলুন না আমরা তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর কিছু সন্তানের বোঝা আমাদের কাঁধে তুলে নেই। তাঁর একটি ছেলেকে আমি নেব এবং অপর একটিকে আপনি নেবেন।'

আব্বাস মন্তব্য করলেন ঃ তুমি সত্যিই একটি কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছ এবং একটি ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছ।'

অতঃপর তাঁরা দু'জন আবু তালিবের নিকট গেলেন। বললেন, 'আমরা এসেছি আপনার পরিবারের কিছু বোঝা লাঘব করতে, যাতে মানুষ যে দুর্ভিক্ষে নিপতিত হয়েছে তা থেকে আপনি কিছুটা মুক্তি পান।'

আবু তালিব বললেন, 'আমার জন্য আকীলকে (আকীল ইবন আবী তালিব) রেখে তোমরা যা খুশী তাই করতে পার।' অতঃপর মুহাম্মাদ (সা) নিলেন আলীকে এবং আব্বাস জা'ফরকে।

আলী প্রতিপালিত হতে লাগলেন মুহাম্মাদের (সা) তত্ত্বাবধানে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদকে (সা) নবুওয়াত দান করেন এবং যুবকদের মধ্যে আলীই তাঁর ওপর

প্রথম ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অন্যদিকে জা'ফর তাঁর চাচা আব্বাসের নিকট প্রতিপালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে স্বনির্ভর হন।

জা'ফর ইবন আবী তালিব ও তাঁর সহধর্মিনী আসমা বিনতু 'উমাইস ইসলামী নূরের কাফিলার যাত্রাপথেই তাতে যোগদান করেন। তাঁরা দু'জনই হযরত সিদ্দীকে আকবরের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) 'দারুল আরকামে' প্রবেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ('দারুল আরকাম' মক্কার একটি গৃহ। দারুল ইসলাম নামেও প্রসিদ্ধ। গৃহটি আরকাম ইবন আবদে মান্নাফ আল মাখযুমীর। মক্কায় রাসূল সা. এ বাড়ী থেকে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।) একদিন আবু তালিব দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়িয়ে আলী নামায আদায় করছেন। এ দৃশ্য আবু তালিবের খুবই ভালো লাগলো। পাশেই দাঁড়ানো জা'ফরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ জা'ফর, তুমিও তোমার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদের (সা) একপাশে দাঁড়িয়ে যাও। জা'ফর রাসূলুল্লাহর (সা) বাম দিকে দাঁড়িয়ে সেদিন নামায আদায় করেন। এ ঘটনা জা'ফরের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর অল্পকিছু দিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে মাত্র ৩১/৩২ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম যুগের মুসলমানরা যেসব দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করেছিল তার সবই এ হাশেমী যুবক ও তাঁর যুবতী স্ত্রী ভোগ করেছিলেন। কিন্তু কখনও তাঁরা ধৈর্যহারা হননি। তাঁরা জানতেন, জান্নাতের পথ বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। তবে যে বিষয়টি তাঁদের অন্যান্য দ্বীনী ভাইদের মত তাঁদেরকেও পীড়া দিত এবং ভাবিয়ে তুলতো তা হল, ইসলামী অনুশাসনগুলি পালনে এবং এক আল্লাহর ইবাদাতে কুরাইশদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কুরাইশরা তাঁদের জন্য ওঁৎ পেতে থেকে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ গড়ে তুলতো।

এমনি এক মুহূর্তে জা'ফর ইবন আবী তালিব, তাঁর স্ত্রী এবং আরও কিছু সাহাবা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাবশায় হিজরাতের অনুমতি চাইলেন। অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে এত কষ্টদায়ক ছিল এ জন্য যে, এসব সৎ ও পবিত্র-আত্মা লোক তাদের প্রিয় জন্মভূমি-শৈশব কৈশোর ও যৌবনের চারণভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তাছাড়া অন্য কোন অপরাধে তারা অপরাধী নয়। তারা দেশত্যাগ করছে, তাদের ওপর যুল্ম, উৎপীড়ন চলছে আর তিনি নিতান্ত অসহায়ভাবে তা তাকিয়ে দেখছেন।

মুহাজিরদের প্রথম দলটি জা'ফর ইবন আবী তালিবের নেতৃত্বে হাবশায় উপনীত হলেন। সেখানে তাঁরা সৎ ন্যায়নিষ্ঠ নাজ্জাশীর দরবারে আশ্রয় লাভ করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রথমবারের মত তাঁরা একটু নিরাপত্তার স্বাদ এবং নিঃশঙ্কচিত্তে স্বাধীনভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের মাধুর্য অনুভব করলেন।

মুসলমানদের এ দলটির হাবশায় হিজরাত এবং সেখানে বাদশার দরবারে আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারে কুরাইশরা অবহিত ছিল। তারা তাদেরকে হত্যা অথবা ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ করল। এই ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হযরত উম্মু

সালামা (রা) বলেন ঃ "আমরা যখন হাবশায় পৌছলাম, সেখানে সৎ প্রতিবেশী এবং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের ব্যাপারে আমরা কোন প্রকার যুল্ম-অত্যাচারের সম্মুখীন হলাম না অথবা আমাদের অপছন্দনীয় কোন কথাও আমরা শুনলাম না। এ কথা কুরাইশরা জানতে পেরে ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা তাদের মধ্য থেকে শক্তিমান ও তাগড়া জোয়ান দু'ব্যক্তিকে নির্বাচন করে নাজ্জাশীর কাছে পাঠাল। এ দু'ব্যক্তি হল, আমর ইবনুল 'আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়া। তারা তাদের দু'জনের সংগে নাজ্জাশী ও তার দরবারের চাটুকার পাদ্রীদের জন্য প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল, হাবশার রাজার সাথে আমাদের বিষয়টি আলোচনার পূর্বেই প্রত্যেক পাদ্রীর জন্য নির্ধারিত হাদিয়া তাদের কাছে পৌছে দেবে।

তারা দু'জন হাবশা পৌছে নাজ্জাশীর পাদ্রীদের সাথে মিলিত হল এবং তাদের প্রত্যেককে তার জন্য নির্ধারিত উপঢৌকন পৌছে দিয়ে বলল, "বাদশাহর সাম্রাজ্যে আমাদের কিছু বিভ্রান্ত সন্তান আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন তাদের সম্পর্কে বাদশাহর সংগে কথা বলবো, আপনারা তাদের দ্বীন সম্পর্কে কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তাদেরকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাদশাহকে একটু অনুরোধ করবেন। কারণ, তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দইতো তাদের বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তারাই তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন।"

দরবারী পাদ্রীরা তাদের কথায় সায় দিল।

উম্মু সালামা বলেন, 'বাদশাহ আমাদের কাউকে ডেকে তার কথা শুনুক, এর চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু 'আমর ইবনুল আস ও তার সংগীর নিকট ছিলনা।'

তারা দু'জন নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উপঢৌকন পেশ করল। উপঢৌকনগুলি নাজ্জাশীর খুবই পছন্দ হল। তিনি সেগুলির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অতঃপর তারা বাদশাহকে বলল ঃ "মহামান্য বাদশাহ, আমাদের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির ছেলে আপনার সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তারা এমন একটি ধর্ম আবিষ্কার করেছে যা আমরাও জানিনে এবং আপনিও জানেন না। তারা আমাদের দ্বীন পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনাদের দ্বীনও গ্রহণ করেনি। তাদের পিতা, পিতৃব্য ও গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের সৃষ্ট অশান্তি ও বিপর্যয় সম্পর্কে তাদের গোত্রীয় নেতারাই অধিক জ্ঞাত।"

নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত পাদ্রীদের দিকে তাকালেন। তারা বলল ঃ 'মহামান্য বাদশাহ, তারা সত্য কথাই বলেছে। কারণ তাদের গোত্রীয় নেতারাই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। গোত্রীয় নেতাদের নিকট আপনি তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন, যাতে গোত্রীয় নেতারা তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

পাদ্রীদের কথায় বাদশাহ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! তা হতে পারেনা। তাদের প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করা পর্যন্ত একজনকেও আমি সমর্পন করব না। সত্যিই তারা যদি এমনই হয় যেমন এ দু'ব্যক্তি বলছে, তাহলে তাদেরকে সমর্পণ করব। তা না হলে তারা

যতদিন আমার আশ্রয়ে থাকতে চায়, আমি তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে থাকতে দেব।"

উম্মু সালাম বলেন ঃ "অতঃপর নাজ্জাশী আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য। যাওয়ার আগে আমরা সকলে একস্থানে সমবেত হলাম। আমরা অনুমান করলাম, নিশ্চয় বাদশাহ আমাদের নিকট আমাদের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, যা আমরা বিশ্বাস করি তা প্রকাশ করে দেব। আর সবার পক্ষ থেকে জা'ফর ইবন আবী তালিব কথা বলবেন। অন্য কেউ কোন কথা বলবে না।"

উম্মু সালামা বলেন ঃ অতঃপর নাজ্জাশীর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সকল পাদ্রীদের ডেকেছেন। তারা তাদের বিশেষ অভিজাত পোশাক পরে সাথে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ মেলে ধরে বাদশাহর ডান ও বাম দিকে বসে আছে। আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়াকেও আমরা বাদশাহর নিকট দেখতে পেলাম। মজলিসে আমরা স্থির হয়ে বসার পর, নাজ্জাশী আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কোন্ ধর্মমত– যা তোমরা নতুন আবিষ্কার করেছ এবং যার কারণে তোমরা তোমাদের খান্দানী ধর্মকেও পরিত্যাগ করেছ, অথচ আমার অথবা অন্যকোন ধর্মও গ্রহণ করনি?'

জা'ফর ইবন আবী তালিব সবার পক্ষ থেকে বললেন ঃ "মহামান্য বাদশাহ! আমরা ছিলাম একটি মূর্খ জাতি। মূর্তির উপাসনা করতাম, মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম, এবং প্রতিবেশীর সাথে অসদ্ব্যবহার করতাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। আমরা ছিলাম এমনি এক অবস্থায়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালেন। আমরা তাঁর বংশ, সততা, আমানতদারী, পবিত্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন, যেন আমরা তার একত্বে বিশ্বাস করি, তাঁর ইবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষরা যেসব গাছ, পাথর ও মূর্তির পূজা করতাম তা পরিত্যাগ করি।

তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন সত্য বলার, গচ্ছিত সম্পদ যথাযথ প্রত্যর্পণের, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার, হারাম কাজ ও অবৈধ রক্তপাত থেকে বিরত থাকার। তাছাড়া অশ্লীল কাজ, মিথ্যা বলা, ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের নারীর প্রতি অপবাদ দেয়া থেকে নিষেধ করলেন।

তিনি আমাদের আরও আদেশ করেছেন এক আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক না করার, নামায কায়েম করার, যাকাত দানের এবং রমযান মাসে রোযা রাখার।

আমরা তাঁকে সত্যবাদী জেনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করেছি। সুতরাং যা তিনি আমাদের জন্য হালাল এবং হারাম ঘোষণা করেছেন, আমরা তা হালাল ও হারাম বলে বিশ্বাস করেছি।

মহামান্য বাদশাহ! অতঃপর আমাদের জাতির সকলেই আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। তারা আমাদের দ্বীন থেকে পুনরায় মূর্তিপূজার দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য

আমাদের ওপর অত্যাচার চালাল। তারা যখন আমাদেরকে অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জরিত করে তুলল এবং আমাদের ও আমাদের দ্বীনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল, তখন আমরা অন্য কোথাও না গিয়ে আপনার এখানে আসাকেই প্রাধান্য দিলাম এই আশায় যে, আপনার এখানে আমরা অত্যাচারিত হব না।"

উম্মু সালামা বলেন ঃ অতঃপর নাজ্জাশী জা'ফর ইবন আবী তালিবের দিকে একটু তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের নবী আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু অংশ কি তোমাদের সংগে আছে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। 'আমাকে একটু পাঠ করে শুনাও তো।' জা'ফর পাঠ করলেন ঃ "কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এ তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল গোপনে। সে বলেছিল, 'আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক সাদা হয়েছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনও ব্যর্থকাম হইনি।"

এভাবে তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা মরিয়মের প্রথম অংশ পাঠ করে শুনালেন।

আল্লাহর কালাম শুনে নাজ্জাশী এত কাঁদলেন যে অশ্রুধারায় তার শ্মশ্রু সিক্ত হয়ে গেল এবং দরবারে উপস্থিত পাদ্রীরা কেঁদে তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত ধর্মগ্রন্থসমূহ ভিজিয়ে দিল। কিছুটা শান্ত হয়ে নাজ্জাশী বললেন ঃ 'তোমাদের নবী যা নিয়ে এসেছেন এবং তাঁর পূর্বে ঈসা (আ) যা নিয়ে এসেছিলেন উভয়ের উৎস এক। অতঃপর আমর ও তার সংগীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চলে যাও। আল্লাহর কসম! তোমাদের হাতে আমি তাদেরকে সমর্পণ করব না।'

উম্মু সালামা বলেন ঃ আমরা নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলে আমর ইবনুল আস আমাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে তার সংগীকে বলল, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল আবার আমরা বাদশাহর নিকট আসব এবং তাঁর নিকটে তাদের এমন সব কার্যকলাপ তুলে ধরব যাতে তাঁর হৃদয়ে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে এবং তাদের প্রতি ঘৃণায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। তাদেরকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য আমরা অবশ্যই বাদশাহকে উৎসাহিত করব।'

একথা শুনে তার সংগী আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবীয়া বলল ঃ 'আমর, এমনটি করা উচিত হবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের বিরোধিত করলেও তারা তো আমাদের আত্মীয়।'

আমর বলল ঃ 'তুমি রাখ তো এসব কথা। আমি অবশ্যই বাদশাহকে এমন সব কথা অবহিত করব যা তাদের অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে। বাদশাহকে আমি বলব ঃ তারা মনে করে ঈসা ইবন মরিয়ম অন্যদের মতই একজন বান্দা।'

পরদিন সত্যি সত্যিই আমর নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ 'মহামান্য বাদশাহ! এসব লোক, যাদেরকে আপনি আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করছেন, তারা ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে একটা মারাত্মক কথা বলে থাকে। আপনি তাদের কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখুন তারা তাঁর সম্পর্কে কি বলে।'

উম্মু সালামা বলেন ঃ আমরা একথা জানতে পেয়ে ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম। আমরা পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'বাদশাহ যখন ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা তখন কি বলবে? 'সবাই ঐকমত্যে পৌছলাম; তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তার অতিরিক্ত আর কিছুই আমরা বলব না। আমাদের নবী তাঁর সম্পর্কে যা কিছু এনেছেন তা থেকে আমরা এক আংগুলের ডগা পরিমাণও বাড়িয়ে বলবনা। তাতে আমাদের ভাগ্যে যা থাকে তা-ই হবে। আমাদের পক্ষ থেকে এবারও জা'ফর ইবন আবী তালিব কথা বলবেন।

নাজ্জাশী আমাদের ডেকে পাঠালেন। আমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম, পাদ্রীরা পূর্বের দিনের মত একই বেশভূষায় বসে আছে। আমর ইবনুল আস ও তার সংগী সেখানে উপস্থিত হতেই বাদশাহ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে তোমরা কি বলে থাক?'

জা'ফর ইবন আবী তালিব বললেন ঃ 'আমাদের নবী তাঁর সম্পর্কে যা বলেন তার অতিরিক্ত আমরা কিছুই বলিনে।'

'তিনি কি বলে থাকেন?'

'তিনি বলেন ঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি তার রূহ ও কালাম– যা তিনি কুমারী ও পবিত্র মরিয়মের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন।'

জা'ফরের কথা শুনে নাজ্জাশী হাত দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে করতে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! ঈসা ইবন মরিয়ম সম্পর্কে তোমাদের নবী যা বলেছেন তা একটি লোম পরিমাণও অতিরঞ্জন নয়।' একথা শুনে নাজ্জাশীর আশেপাশে উপবিষ্ট পেট্রিয়ার্করা তাদের নাসিকা-ছিদ্র দিয়ে ঘৃণাসূচক শব্দ বের করল। বাদশাহ বললেন ঃ 'তা তোমরা যতই ঘৃণা কর না কেন।' তারপর তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ যাও, তোমরা স্বাধীন ও নিরাপদ। কেউ তোমাদের গালি দিলে বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তার বদলা নেওয়া হবে। আল্লাহর কসম! আমি সোনার পাহাড় লাভ করি, আর তার বিনিময়ে তোমাদের কারও ওপর সামান্য বিপদ আপতিত হোক– এটাও আমার পছন্দনীয় নয়। এরপর তিনি আমর ও তার সংগীর দিকে ফিরে বললেন ঃ 'এ দু'ব্যক্তির উপঢৌকন তাদেরকে ফেরত দাও। আমার সেগুলি প্রয়োজন নেই।'

উম্মু সালামা বলেন ঃ এভাবে আমর ও তাঁর সংগীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল এবং তারা ভগ্ন হৃদয়ে পরাজিত ও হতাশ অবস্থায় দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। আর আমরা উত্তম বাসগৃহে সম্মানিত প্রতিবেশীর মত নাজ্জাশীর নিকট বসবাস করতে লাগলাম।

অতঃপর জা'ফর ইবন আবী তালিব ও তাঁর সহধর্মিনী নাজ্জাশীর আশ্রয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে পূর্ণ দশটি বছর অতিবাহিত করেন। সপ্তম হিজরীতে তাঁরা দু'জন এবং আরও কিছু মুসলমান হাবশা থেকে ইয়াসরিবের (মদীনা) দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরাও মদীনায় পৌঁছলেন, আর এদিকে রাসূল (সা) খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাসূল (সা) জা'ফরকে দেখে এত খুশী হলেন যে, তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুমু দিয়ে বললেন ঃ 'আমি জানিনে, খাইবার বিজয় আর জা'ফরের আগমন– দু'টির কোন্‌টির কারণে আমি বেশী খুশী।'

সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজ এবং বিশেষভাবে গরীব মুসলমানদের আনন্দ ও খুশী জা'ফরের আগমনে রাসূলুল্লাহর (সা) থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিলনা। কারণ জা'ফর ছিলেন গরীব-মিসকীনদের প্রতি ভীষণ দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। এ কারণে তাঁকে ডাকা হত আবুল মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা বলে।

জা'ফর ইবন আবী তালিবের মদীনায় আসার পর একটি বছর কেটে গেল। অষ্টম হিজরীর প্রথম দিকে সিরিয়ার রোমান বাহিনীকে আক্রমণের জন্য রাসূল (সা) সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন। যায়িদ বিন হারিসাকে সেনাপতি নিয়োগ করে তিনি বললেন ঃ 'যায়িদ নিহত হলে আমীর হবে জা'ফর ইবন আবী তালিব। জা'ফর নিহত বা আহত হলে আমীর হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আর সে নিহত বা আহত হলে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।'

মুসলিম বাহিনী জর্দানের সিরিয়া সীমান্তে 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পেল, এক লাখ রোমান সৈন্য তাদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং তাদের সাহায্যের জন্য লাখম, জুজাম, কুদাআ ইত্যাদি আরব গোত্রের আরও এক লাখ খৃষ্টান সৈন্য পেছনে প্রতীক্ষা করছে। অন্যদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা মাত্র তিন হাজার। যুদ্ধ শুরু হতেই যায়িদ বিন হারিসা বীরের ন্যায় শাহাদাত বরণ করেন। অতপর জা'ফর বিন আবী তালিব তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং শত্রু বাহিনী যাতে সেটি ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য নিজের তরবারী দ্বারা ঘোড়াটিকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর পতাকাটি তুলে ধরেন রোমান বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে বহু দূর পর্যন্ত প্রবেশ করে শত্রু নিধন কার্য চালাতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর ডান হাতটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তিনি বাম হাতে পতাকা উঁচু করে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তরবারির অন্য একটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না। বাহু দিয়ে বুকের সাথে জাপ্টে ধরে তিনি ইসলামী পতাকা সমুন্নত রাখলেন। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ পর তরবারির তৃতীয় একটি আঘাতে তাঁর দেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।

অতঃপর পতাকাটি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তুলে নিলেন। শত্রু সৈন্যের সাথে বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে তিনিও তাঁর দুই সাথীর অনুগামী হলেন। তারপর খালিদ বিন ওয়ালিদ পতাকা হাতে নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে উদ্ধার করেন।

এ যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ জাফরের লাশ তালাশ করে দেখা গেল, শুধু তাঁর সামনের দিকেই পঞ্চাশটি ক্ষতচিহ্ন। সারা দেহে তাঁর নব্বইটিরও বেশী ক্ষত ছিল। কিন্তু তার একটিও পেছন দিকে ছিল না।

এ তিন সেনাপতির শাহাদাতের খবর শুনে রাসূল (সা) দারুণভাবে ব্যথিত হন। বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি তাঁর চাচাত ভাই জা'ফরের বাড়ীতে যান। তখন তাঁর স্ত্রী আসমা স্বামীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি রুটির জন্য আটা বানিয়ে রেখেছেন, ছেলেমেয়েদের গোসল করিয়ে তেল মাখিয়েছেন এবং তাদেরকে নতুন পোশাক পরিয়েছেন।

আসমা বলেন ঃ পাতলা ও পরিষ্কার একখানা কাপড় দিয়ে পবিত্র মুখমণ্ডল ঢেকে

রাসূলকে (সা) আমাদের বাড়ীর দিকে আসতে দেখে আমার মনে নানারকম ভীতি ও শঙ্কার উদয় হল। কিন্তু খারাপ কিছু শুনতে হয় এ ভয়ে আমি তাঁকে জা'ফর সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন ঃ 'জা'ফরের ছেলেমেয়েদের আমার কাছে নিয়ে এস।' আমি তাদেরকে ডাকলাম। তারা খুশিতে বাগবাগ হয়ে কে আগে রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছবে এরূপ একটা প্রতিযোগিতা নিয়ে দৌড় দিল। রাসূল (সা) তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগলেন। তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমি বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি কাঁদছেন কেন?' জা'ফর ও তার সংগী দু'জনের কোন দুঃসংবাদ পেয়েছেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আজই তারা শাহাদাত বরণ করেছেন। আর সেই মুহূর্তে ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের মুখের হাসি বিলীন হয়ে গেল। যখন তারা শুনতে পেল তাদের মা কান্না ও বিলাপ করছে, তারা নিজ নিজ স্থানে পাথরের মত এমন স্থির হয়ে গেল, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। প্রতিবেশী মহিলারা এসে আসমার পাশে ভিড় করল। রাসূল (সা) চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন। বাড়ীতে পৌঁছে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে বললেন ঃ 'আজ তোমরা জা'ফরের পরিবারবর্গের প্রতি একটু নজর রেখ। তারা আজ চেতনাহীন।'

হযরত জা'ফরের শাহাদাতের পর দীর্ঘদিন ধরে রাসূল (সা) শোকাভিভূত ও বিমর্ষ ছিলেন। অবশেষে হযরত জিবরীল (আ) তাঁকে সুসংবাদ দান করেন যে, আল্লাহ তা'আলা জা'ফরকে তাঁর দুটি কর্তিত হাতের পরিবর্তে নতুন দু'টি রক্তরাঙা হাত দান করেছেন এবং তিনি জান্নাতে ফিরিশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়, 'যুল-জানাহাইন' ও 'তাইয়ার'—দু' ডানাওয়ালা ও উড়ন্ত।

ইবন সা'দ তাঁর *তাবাকাতে* বর্ণনা করেন ঃ যায়িদ বিন হারিসা, জা'ফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদাতের খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে তাদের পরিচয় তুলে ধরে ও প্রশংসা করে এক সংক্ষিপ্ত খুতবা দেন এবং দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ, আপনি যায়িদকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, আপনি যায়িদকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আপনি জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে মাফ করে দিন।'

ইমাম আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জা'ফরকে বলতেন, 'সিরাত ও সুরাত—চরিত্র ও দৈহিক গঠনে তুমি আমার মত।'

হযরত জা'ফর ছিলেন গরীব মিসকীনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়। আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ "আমাদের মিসকীন সম্প্রদায়ের জন্য জা'ফর ইবন আবী তালিব ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সংগে করে তাঁর গৃহে নিয়ে যেতেন, যা কিছু তাঁর কাছে থাকত তা আমাদের খাওয়াতেন। যখন তাঁর খাবার শেষ হয়ে যেত তখন তাঁর ছোট্ট শূন্য ঘি-এর মশকটি বের করে দিতেন। আমরা তা ফেঁড়ে ভেতরে যা কিছু লেগে থাকত চেটেচুটে খেতাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ 'আমার আগে যত নবী এসেছেন তাঁদের মাত্র সাতজন বন্ধু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমার বিশেষ বন্ধুর সংখ্যা চৌদ্দ এবং জা'ফর তার একজন'। (বুখারী, মানাকিবু জা'ফর)

যায়িদ ইবন হারিসা (রা)

আবু উসামা যায়িদ নাম। হিব্বু রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহর প্রীতিভাজন) তাঁর উপাধি, পিতা হারিসা এবং মাতা সু'দা বিনতু সা'লাবা।

সু'দা বিনতু সা'লাবা তাঁর শিশু পুত্র যায়িদকে সংগে করে পিতৃ গোত্র বনী মা'নের নিকট যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। পিতৃ-গোত্রে পৌঁছার পূর্বেই একদিন রাতে বনী কায়নের লুটেরা দল তাঁদের তাঁবু আক্রমণ করে ধন সম্পদ, উট ইত্যাদি লুণ্ঠন এবং শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যায়। এই বন্দী শিশুদের মধ্যে তাঁর পুত্র যায়িদ ইবন হারিসাও ছিলেন।

যায়িদের বয়স তখন আট বছর। লুটেরা দল তাঁকে বিক্রির উদ্দেশ্যে 'উকাজ' মেলায় নিয়ে যায়, হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুয়াইলিদ নামে এক কুরাইশ নেতা চার শো' দিরহামে তাঁকে খরীদ করেন। তাঁর সাথে আরো কিছু দাস খরীদ করে তিনি মক্কায় ফিরে আসেন।

হাকীম ইবন হিযামের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে তাঁর ফুফু খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ দেখা করতে আসেন। ফুফুকে তিনি বলেন ঃ ফুফু উকাজ থেকে আমি বেশ কিছু দাস খরীদ করে এনেছি। এদের মধ্যে যেটা আপনার পসন্দ হয় বেছে নিন। আপনাকে হাদিয়া হিসাবে দান করলাম।

হযরত খাদীজা দাসগুলির চেহারা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করার পর যায়িদ ইবন হারিসাকে চয়ন করলেন। কারণ, তিনি যায়িদের চেহারায় তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির ছাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি তাঁকে সংগে করে বাড়ীতে নিয়ে এলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর সাথে খাদীজা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি স্বামীকে কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। প্রিয় ক্রীতদাস যায়িদ ইবন হারিসা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর কোন জিনিস তিনি খুঁজে পেলেন না। এ ক্রীতদাসটিকেই তিনি স্বামীর হাতে তুলে দিলেন।

এ সৌভাগ্যবান বালক ক্রীতদাস মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। তাঁর মহান সাহচর্য লাভ করে উত্তম চারিত্রিক সৌন্দর্য্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেলেন। এ দিকে তাঁর স্নেহময়ী জননী পুত্র শোকে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখের পানি কখনও শুকাতো না। রাতের ঘুম তাঁর হারাম হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বড় দুঃখ ছিল, তাঁর ছেলেটি বেঁচে আছে না ডাকাতদের হাতে মারা পড়েছে, এ কথাটি তিনি জানতেন না। তাই তিনি খুব হতাশ হয়ে পড়তেন। তাঁর পিতা হারিসা সম্ভাব্য সব স্থানে হারানো ছেলেকে খুঁজতে থাকেন। পরিচিত অপরিচিত, প্রতিটি মানুষের কাছে ছেলের সন্ধান জানতে চাইতেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিশিষ্ট কবি। এ সময় রচিত বহু কবিতায় তাঁর পুত্র হারানোর বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এমনি একটি কবিতায় তিনি বলেন—

"যায়িদের জন্য আমি কাঁদছি, জানিনে তার কি হয়েছে,
সে কি জীবিত?
তবে তো ফেরার আশা আছে, নাকি মারা গেছে?
আল্লাহর কসম! আমি জানিনে, অথচ জিজ্ঞেস করে চলেছি।
তোমাকে অপহরণ করেছে সমতল ভূমির লোকেরা, না পার্বত্য ভূমির?
উদয়ের সময় সূর্য স্মরণ করিয়ে দেয় তার কথা, আর যখন
অস্ত যায়, নতুন করে মনে করে দেয়।
আমি দেশ থেকে দেশান্তরে তোমার সন্ধানে
উট হাঁকিয়ে ফিরবো, কখনও আমি ক্লান্ত হবো না,
আমার বাহন উটও না। আমার জীবন থাকুক বা মৃত্যু আসুক।
প্রতিটি মানুষই তো মরণশীল—যত আশার পেছনেই দৌড়াক না কেন।"

এই হজ্জ মৌসুমে যায়িদের গোত্রের কতিপয় লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় এলো। কা'বার চতুর্দিকে তাওয়াফ করার সময় তারা যায়িদের মুখোমুখি হলো। তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পেরে কুশল বিনিময় করলো। লোকগুলি হজ্জ আদায়ের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে যায়িদের পিতা হারিসাকে তাঁর হারানো ছেলের সন্ধান দিল।

ছেলের সন্ধান পেয়ে হারিসা সফরের প্রস্তুতি নিলেন। কলিজার টুকরা, চোখের পুত্তলি যায়িদের মুক্তিপণের অর্থও বাহনে উঠালেন। সফরসংগী হলেন হারিসার ভাই কা'ব। তাঁরা মক্কার পথে বিরামহীন চলার পর মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলেন এবং বললেন ঃ

'ওহে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। অসহায়ের সাহায্যকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দানকারী। আপনার কাছে আমাদের যে ছেলেটি আছে তার ব্যাপারে আমরা এসেছি। তার মুক্তিপণও সংগে নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আপনার ইচ্ছামত তার মুক্তিপণ নির্ধারণ করুন।'

মুহাম্মাদ (সা) বললেন ঃ 'আপনারা কোন্ ছেলের কথা বলছেন?'

ঃ আপনার দাস যায়িদ ইবন হারিসা।

ঃ মুক্তিপণের চেয়ে উত্তম কিছু আপনাদের জন্য নির্ধারণ করি, তা-কি আপনারা চান?

ঃ কী তা?

ঃ আমি তাকে আপনাদের সামনে ডাকছি। স্বেচ্ছায় সে নির্ধারণ করুক, আমার সাথে থাকবে, না আপনাদের সাথে যাবে, যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, মুক্তিপণ ছাড়া তাকে নিয়ে যাবেন। আর আমার সাথে থাকতে চাইলে আমার করার কিছুই নেই।

তারা সায় দিয়ে বলল ঃ আপনি অত্যন্ত ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন।

মুহাম্মাদ (সা) যায়িদকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ দু'ব্যক্তি কারা?

বলল ঃ ইনি আমার পিতা হারিসা ইবন শুরাহবীল। আর উনি আমার চাচা কা'ব।

বললেন ঃ 'তুমি ইচ্ছা করলে তাঁদের সাথে যেতে পার, আর ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থেকে যেতে পার।'

কোন রকম ইতস্ততঃ না করে সংগে সংগে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'আমি আপনার সাথেই থাকবো।'

তাঁর পিতা বললেন ঃ 'যায়িদ, তোমার সর্বনাশ হোক! পিতা-মাতাকে ছেড়ে তুমি দাসত্ব বেছে নিলে?'

তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যক্তির মাঝে আমি এমন কিছু দেখেছি, যাতে আমি কখনও তাকে ছেড়ে যেতে পারিনে।'

যায়িদের এ সিদ্ধান্তের পর মুহাম্মাদ (সা) তাঁর হাত ধরে কা'বার কাছে নিয়ে আসেন এবং হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে উপস্থিত কুরাইশদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন ঃ 'ওহে কুরাইশ জনমণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থাক, আজ থেকে যায়িদ আমার ছেলে। সে হবে আমার এবং আমি হবো তার উত্তরাধিকারী।'

এ ঘোষণায় যায়িদের বাবা-চাচা খুব খুশী হলেন। তাঁরা তাঁকে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর নিকট রেখে প্রশান্ত চিত্তে দেশে ফিরে গেলেন। সেই দিন থেকে যায়িদ ইবন হারিসা হলেন যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ। সবাই তাঁকে মুহাম্মাদের ছেলে হিসেবেই সম্বোধন করতো। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের– 'তাদেরকে তাদের পিতার নামেই ডাক'– এ আয়াত নাযিল করে ধর্মপুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করেন। অতঃপর আবার তিনি যায়িদ ইবন হারিসা নামে পরিচিতি লাভ করেন।

যায়িদ নিজের পিতা-মাতাকে ছেড়ে মুহাম্মাদকে (সা) যখন বেছে নিয়েছিলেন, তখন জানতেন না কি জিতই না তিনি জিতেছেন। স্বীয় পরিবার-পরিজন ও গোত্রকে ছেড়ে যে মনিবকে তিনি চয়ন করলেন, তিনিই যে, সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, এর কোন কিছুই তিনি জানতেন না। তার মনে তখন একটি বারের জন্যও এ চিন্তা উদয় হয়নি যে, এ বিশ্বে এমন একটি রাষ্ট্র কায়েম হবে যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র কল্যাণ ও ন্যায়বিচারে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনিই হবেন সেই কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। না, এর কোন কিছুই তখন যায়িদের চিন্তা ও কল্পনায় আসেনি। সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি অঢেল দান করেন।

এ ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। যায়িদ হলেন পুরুষ দাসদের মধ্যে প্রথম বিশ্বাসী। পরবর্তীকালে তিনি হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বিশ্বাসভাজন আমীন, তাঁর সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনার অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক।

যায়িদ যেমন পিতা-মাতাকে ছেড়ে রাসূলকে (সা) বেছে নেন, তেমনি রাসূলও (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসলেন এবং তাঁকে আপন সন্তান ও পরিবারবর্গের মধ্যে শামিল করে নেন। যায়িদ দূরে গেলে তিনি উৎকণ্ঠিত হতেন, ফিরে এলে উৎফুল্ল হতেন এবং এত আনন্দের সাথে তাঁকে গ্রহণ করতেন যে অন্য কারো সাক্ষাতের সময় তেমন দেখা যেত না। কোন এক অভিযান শেষে হযরত যায়িদ মদীনায় ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন হযরত আয়িশা (রা)।

তিনি বলেন—

'যায়িদ ইবন হারিসা মদীনায় ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমার ঘরে। সে দরজার কড়া নাড়লো। রাসূল (সা) প্রায় খালি গায়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর দেহে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত একপ্রস্থ কাপড় ছাড়া কিছু ছিল না। এ অবস্থায় কাপড় টানতে টানতে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। তাঁর সাথে গলাগলি করলেন ও চুমু খেলেন। আল্লাহর কসম, এর আগে বা পরে আর কখনও রাসূলুল্লাহকে (সা) এমন খালিগায়ে আমি দেখিনি।'

যায়িদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) গভীর ভালোবাসার কথা মুসলিম জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে লোকে তাকে 'যায়িদ আল হুব্ব' বলে সম্বোধন করতো এবং তাঁর উপাধি হয় 'হিব্বু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর প্রীতিভাজন।

হযরত হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (সা) তাঁর সাথে যায়িদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এমন কি হামযা কখনও সফরে গেলে তাঁর দ্বীনি ভাই যায়িদকে অসী বানিয়ে যেতেন।

'উম্মু আয়মন' নামে রাসূলুল্লাহর (সা) এক দাসী ছিলেন। একদিন তিনি সাহাবীদের বললেন ঃ কেউ যদি কোন জান্নাতী মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, সে উম্মু আয়মনকে বিয়ে করুক। হযরত যায়িদ আল্লাহর রাসূলকে (সা) খুশী করার জন্য তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁরই গর্ভে প্রখ্যাত সেনানায়ক হযরত উসামা ইবন যায়িদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর তিনি হযরত কুলসুম ইবন হিদ্‌মের মেহমান হন। হযরত উসাইদ ইবন হুদাইরের (রা) সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম হয়। এত দিন তিনি নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে একসংগে থাকতেন। এখানে আসার পর তাঁকে পৃথক বাড়ী করে দেওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) আপন ফুফাতো বোন জয়নব বিনতু জাহাশের সাথে তার বিয়ে হয়। কিন্তু যয়নবের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তিনি তালাক দেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নবকে বিয়ে করেন।

হযরত যায়িদ ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দায। বদর থেকে মূতা পর্যন্ত সকল অভিযানেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র 'মাররে ইয়াসী' অভিযানে যোগদান করতে পারেননি। এ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হিজরী অষ্টম সনে একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। এ বছর রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্রসহ হারিস ইবন উমাইর আল-আযদীকে বসরার শাসকের নিকট পাঠান। হারিস জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছলে গাস্‌সানী সম্রাটের একজন শাসক শুরাহ্‌বীল ইবন 'আমর পথ রোধ করে তাঁকে বন্দী করে। তারপর তাঁকে হত্যা করে। রাসূল (সা) ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। কারণ, এর আগে আর কোন দূত এভাবে নিহত হয়নি। রাসূল (সা) মূতায় অভিযান পরিচালনার জন্য তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং পরিচালনার

দায়িত্ব দিলেন হযরত যায়িদ ইবন হারিসার হাতে। রওয়ানার পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (সা) উপদেশ দিলেন ঃ 'যদি যায়িদ শহীদ হয়, দলটির পরবর্তী পরিচালক হবে জা'ফর ইবন আবী তালিব। জা'ফর শহীদ হলে পরিচালক হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। সেও যদি শহীদ হয় তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে পরিচালক নির্বাচন করে নেবে।'

যায়িদের নেতৃত্বে বাহিনীটি মদীনা থেকে যাত্রা করে জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মায়ান' নামক স্থানে পৌঁছলো। রোম সম্রাট হিরাক্‌ল গাস্‌সানীদের পক্ষে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এক লাখ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো। তার সাথে যোগ দিল পৌত্তলিক আরবদের আরও এক লাখ সৈন্য। এ সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অনতি দূরে অবস্থান গ্রহণ করলো। 'মায়ানে' মুসলিম বাহিনী দু' রাত অবস্থান করে করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, পত্র মারফত শত্রু বাহিনীর সংখ্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করে পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকা উচিত। কেউ বললেন, আমরা সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের দ্বারা লড়াই করিনা। আমরা লড়াই করি এ দ্বীনের দ্বারা। যে উদ্দেশ্যে তোমরা বের হয়েছো, সেজন্য এগিয়ে চলো। হয় কামিয়াবী না হয় শাহাদাত—এর যে কোন একটি সাফল্য তোমরা লাভ করবে।

অতঃপর এই দুই অসম বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো। দু'লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে রোমান বাহিনী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তাদের অন্তরে ভীতিরও সঞ্চার হলো।

যায়িদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য যে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তীর ও বর্শার অসংখ্য আঘাতে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। অবশেষে, তিনি রণক্ষেত্রে ঢলে পড়েন। তারপর একে একে জাফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা তুলে নেন এবং বীরত্বের সাথে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তে খালিদ ইবন ওয়ালিদ কমাণ্ডার নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন নও মুসলিম। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী অনিবার্য পরাজয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এভাবে নবম হিজরীতে ৫৪ অথবা ৫৫ বছর বয়সে হযরত যায়িদ শাহাদাত বরণ করেন।

মূতার দুঃখজনক সংবাদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলে তিনি এতই শোকাতুর হয়ে পড়েন যে, আর কখনও তেমন শোকাভিভূত হতে দেখা যায়নি। তিনি শহীদ কমাণ্ডারদের বাড়ী গিয়ে তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। যায়িদের বাড়ী পৌঁছলে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলকে (সা) জড়িয়ে ধরে এবং রাসূলও (সা) উচ্চস্বরে কেঁদে ফেলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সা'দ ইবন উবাদা বলে ওঠেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ একি?

তিনি বলেন ঃ 'এ হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।'

রাসূল (সা) বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে যায়িদের অল্পবয়স্ক পুত্র উসামাকে পিতৃ হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য এক বাহিনী সহকারে পাঠান। এত অল্পবয়স্ক ব্যক্তির নেতৃত্ব

অনেকের পছন্দ হলো না। রাসূল (সা) একথা জানতে পেরে বললেন ঃ 'তোমরা পূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলে। এখন তার পুত্রের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট হতে পারছো না। আল্লাহর কসম! যায়িদ নেতা হওয়ার যোগ্য ছিল এবং সে ছিল আমার সর্বাধিক প্রিয়। তারপর আমার সবচেয়ে প্রিয় তাঁর পুত্র উসামা।' উসামা ছিলেন পিতার উপযুক্ত সন্তান। পিতৃহত্যার উপযুক্ত বদলা নিয়ে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই ছিল হযরত যায়িদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত উম্মু আয়মন (রা) ছিলেন বেশী বয়সের প্রায় বৃদ্ধা, বাহ্যিক রূপহীনা এক নারী। শুধু রাসূলকে (সা) খুশী করার উদ্দেশ্যেই হযরত যায়িদ (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত যয়নাবের (রা) সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে তিনি নিজেই আবার যয়নাবের (রা) কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের পয়গাম উত্থাপন করেন। শুধুমাত্র এজন্য যে, রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে হযরত যয়নাবের (রা) প্রতি সম্মানের খাতিরে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাননি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধু প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন। (মুসলিম)

হযরত যায়িদ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) সীমাহীন ভালোবাসা লক্ষ্য করে হযরত আয়িশা (রা) বলতেন ঃ 'যদি যায়িদ জীবিত থাকতেন, রাসূল (সা) মৃত্যুর পর হয়তো তাকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।'

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)

আবদুল্লাহ নাম, আবুল আব্বাস কুনিয়াত। পিতা আব্বাস, মাতা উম্মুল ফাদল লুবাবা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা) তাঁর আপন খালা।

মহান সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) নানান দিক থেকেই সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন। রক্ত-সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আরব জাতি তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীর 'হাবর ও বাহর' (পুণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র) উপাধি লাভ করেছিলেন। তাকওয়া ও পরহিযগারীর তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি দিনে রোযাদার, রাতে ইবাদাত গোযার এবং রাতের শেষ প্রহরে তাওবাহ ও ইসতিগফারকারী। আল্লাহর ভয়ে তিনি এত বেশী কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তাঁর গণ্ডদ্বয়ে দু'টি রেখার সৃষ্টি করেছিল।

ইনি সেই আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস যাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর রাব্বানী (আল্লাহকে জেনেছে এমন জ্ঞানী) বলা হয়েছে। আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী, তার ব্যাখ্যা ও ভাব সম্পর্কে অধিক পারদর্শী এবং তার রহস্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের তিন বছর পূর্বে তিনি মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশরা তাঁর গোত্র বনু হাশিমকে বয়কট করার কারণে তারা তখন শিয়াবে আবী তালিবে জীবন যাপন করছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় তিনি তের বছরের একজন কিশোর মাত্র। এতদসত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এক হাজার ছ'শ' ষাটটি বাণী বা হাদীস স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে মুসলিম জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেন, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যার অনেকগুলিই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহর পিতা হযরত আব্বাস দৃশ্যতঃ মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে হিজরী ৮ম সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন সাদের বর্ণনা মতে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার পর উম্মুল ফাদলই মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তাই হযরত আবদুল্লাহ জন্মের পর থেকেই তাওহীদের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন এবং বুদ্ধি বিবেক হওয়ার পর এক মজবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাঁর মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যা আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যায়। রাসূল (সা) নিজের পবিত্র মুখ থেকে একটু থু থু নিয়ে শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাঁর তাহনীক করেন। এভাবে তার পেটে পার্থিব কোন বস্তু প্রবেশের পূর্বেই রাসূলে পাকের পবিত্র ও কল্যাণময় থু থু প্রবিষ্ট হয়। আর সেইসাথে প্রবেশ করে তাকওয়া ও হিকমাত।

তাঁর পিতা হযরত 'আব্বাস হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে সপরিবারে মদীনায় হিজরাত করেন। আবদুল্লাহর বয়স তখন এগারো বছরের বেশী হবে না। কিন্তু তখনও তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে কাটাতেন। একবার বাড়ী ফিরে এসে তিনি বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যাকে আমি চিনিনে।' হযরত আব্বাস একথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ব্যক্ত করলে রাসূল (সা) আবদুল্লাহকে ডেকে নিজের কোলে বসান এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করেন; 'হে আল্লাহ, তাকে বরকত দিন এবং তার থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন।'

সাত বছর থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেবা ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। অজুর প্রয়োজন হলে তিনি পানির ব্যবস্থা করতেন, নামাযে দাঁড়ালে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে ইকদেতা করতে এবং সফরে রওয়ানা হলে তিনি তাঁর বাহনের পেছনে আরোহন করে তাঁর সফরসংগী হতেন। এভাবে ছায়ার ন্যায় তিনি তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং নিজের মধ্যে সর্বদা বহন করে নিয়ে বেড়াতেন একটি সজাগ অন্তঃকরণ, পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্ক এবং আধুনিক যুগের যাবতীয় রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি থেকে অধিক শক্তিশালী একটি স্মৃতিশক্তি।

হযরত আবদুল্লাহ যদিও স্বভাবগতভাবেই ছিলেন শান্তশিষ্ট, বুদ্ধিমান ও চালাক, তবুও তিনি জীবনের যে অধ্যায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভের সুযোগ লাভ করেন মূলতঃ সে বিষয়টি মানুষের জীবনের খেলাধূলার সময়। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ আমি অন্য ছেলেদের সাথে গলিতে, রাস্তা-ঘাটে খেলা করতাম। একদিন পেছনের দিক থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) আসতে দেখলাম। আমি তাড়াতাড়ি একটি বাড়ীর দরজার আড়ালে দিয়ে পালালাম। কিন্তু তিনি আমাকে ধরে ফেললেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ 'যাও, মুয়াবিয়াকে ডেকে আন।' মুয়াবিয়া ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাতিব বা সেক্রেটারী। আমি দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'চলুন, রাসূল (সা) আপনাকে ডাকছেন।'

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রা) হযরত আবদুল্লাহর খালা হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে কাটাতেন। অনেক সময় রাতে তাঁর ঘরেই শুয়ে পড়তেন। এ কারণে খুব নিকট থেকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন। রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাহাজ্জুদ নামায আদায় ও তাঁর অজুর পানি এগিয়ে দেওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন। একবার হযরত মায়মূনার ঘরে তাহাজ্জুদ নামাযে রাসূলুল্লাহর (সা) বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি আবদুল্লাহর মাথা ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে তিনি খুব খুশী হলেন। নামাযে যখন দাঁড়ালেন তখন আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্য ইংগিত করলেন। কিন্তু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। নামায শেষ করে আমার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদুল্লাহ আমার পাশে দাঁড়াতে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো? বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার দৃষ্টিতে আপনি মহা

সম্মানিত এবং আপনি এতই মর্যাদাবান যে, আমি আপনার পাশাপাশি হওয়ার উপযুক্ত বলে মনে করিনি।' সাথে সাথে তিনি আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, 'আল্লাহুম্মা আতিহিল হিকমাহ্'— 'আল্লাহ, আপনি তাকে হিকমাত বা বিজ্ঞান দান করুন।' আর একবার রাতের বেলা রাসূলুল্লাহর (সা) অজুর পানি এগিয়ে দিলে তিনি আবদুল্লাহর জন্য দু'আ করেন এই বলে ঃ 'আল্লাহুম্মা ফাক্কিহ্হু ফিদদীন ওয়া আল্লিমহুত তাবীল– হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের ফকীহ বানিয়ে দাও, তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যা পদ্ধতি শিখাও।'

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীর এ দু'আ কবুল করেন এবং হাশেমী বালককে এত অধিক জ্ঞান দান করেন যে, বড় বড় জ্ঞানীদেরও তিনি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। তাঁর অগাধ জ্ঞান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার বিচিত্র ঘটনাবলী ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় আবদুল্লাহর বয়স মাত্র তের বছর। এর সোয়া দুই বছর পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের খিলাফতকালে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে স্বীয় সান্নিধ্যে ও তত্ত্বাবধানে রাখেন। তাকে গুরুত্বপূর্ণ মজলিসে বড় বড় সাহাবীদের সাথে বসার অনুমতি দিতেন। বদরী সাহাবীদের সাথেও বসার অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয়। মুহাদ্দিস ইবন আবদিল বার বলেন ঃ 'উমার ইবন আব্বাসকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সান্নিধ্য দান করতেন।

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) যুগে হিজরী ২৭ সনে মিসরের ওয়ালী আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় একটি অভিযান পরিচালিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ মদীনা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম পক্ষের দূত হিসাবে আফ্রিকার বাদশাহ জারজীরের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ তাঁর প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেন ঃ 'আমার ধারণা, আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।'

হিজরী ৩৫ সনে হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলে তিনি আবদুল্লাহকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমীরে হজ্জ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। সে বছর তারই নেতৃত্বে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। হজ্জ থেকে যখন মদীনায় ফিরে আসলেন, মদীনা তখন উত্তপ্ত। খলীফা উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং মদীনা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। তাঁরা খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য হযরত আলীকে চাপ দিচ্ছে। হযরত আলী (রা) আবদুল্লাহর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুল্লাহ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর দায়িত্বভার গ্রহণ না করার জন্য আলীকে (রা) পরামর্শ দেন। হযরত আলী দায়িত্ব গ্রহণ করলে যেসব পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বলে তিনি ধারণা করেন, পরবর্তীকালে তা সবই সত্যে পরিণত হয়।

উটের যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ হযরত আলীর পক্ষে হিজাযী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন। বসরা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে তিনি সিফফিনের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য

যে, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সিফ্‌ফিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত আলী (রা) হযরত আবদুল্লাহকে তাঁর পক্ষে সালিশ নিযুক্ত করতে চান, কিন্তু অন্যদের আপত্তির কারণে তাঁর সে চাওয়া বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সময় আলীর (রা) কিছু সংগী যখন তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আলীকে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে তাঁদের কাছে গিয়ে একটু কথা বলার অনুমতি দিন।' তিনি বললেন, 'আমি তাদের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ির আশংকা করছি।' আবদুল্লাহ বললেন, 'ইনশাআল্লাহ তেমন কিছু হবে না।'

আবদুল্লাহ তাদের কাছে গিয়ে উপলব্ধি করলেন তাদের চেয়ে এত বেশী একাগ্রচিত্তে ইবাদাতে নিমগ্ন অন্য কোন সম্প্রদায় ইতিপূর্বে আর কখনও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তারা বলল, 'ইবন আব্বাস, আপনাকে খোশ আমদেদ! তবে আপনি কি জন্য এসেছেন?' বললেন, 'আপনাদের সাথে কিছু আলোচনার জন্য।' তাদের কেউ কেউ বলল, 'এর সাথে আলোচনার প্রয়োজন নেই।' তবে কেউ কেউ বলল, 'ঠিক আছে, বলুন, আপনার কথা আমরা শুনি।' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই, তাঁর জামাই এবং তাঁর ওপর প্রথম পর্যায়ে ঈমান পোষণকারী ব্যক্তি অর্থাৎ আলীর প্রতি এমন চরম মনোভাব পোষণ করছেন কেন?' তারা বলল, 'আমরা তাঁর তিনটি কাজের বদলা নিতে চাই।' তিনি বললেন, 'সে তিনটি কাজ কি কি?' তারা বলল,

১. সিফফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে আবু মুসা আশয়ারী ও আমর ইবনুল আসকে শালিশ নিযুক্ত করে তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করেছেন।
২. আয়িশা ও মুয়াবিয়ার সাথে তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের ধন-সম্পদ গনিমাত হিসাবে এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসাবেও গ্রহণ করেননি।
৩. মুসলমানরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁকে আমীর হিসাবে মেনে নেওয়া সত্ত্বেও তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি পরিহার করেছেন।

জবাবে ইবন আব্বাস বললেন,

'যদি আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস থেকে এমন কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করতে পারি যা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না, তাহলে আপনারা যে বিশ্বাসের উপর আছেন তা থেকে কি প্রত্যাবর্তন করবেন?' তাঁরা সম্মতিসূচক জবাব দিলে তিনি বললেন,

'আপনাদের অভিযোগ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক নিযুক্ত করে অপরাধ করেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় কোন কিছু শিকার করে, তাহলে তোমাদের অন্তর্গত দুইজন সুবিচারক সে সম্পর্কে যে আদেশ করে সে অনুযায়ী অনুরূপ একটি পশু বিনিময় হিসাবে কাবায় উপস্থিত করবে।" (আল-মায়িদা ঃ ৯৫)

'আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি, চার দিরহাম মূল্যের একটি নিহত খরগোশের ব্যাপারে বিচারক নিয়োগ করা থেকে মানুষের রক্ত ও জীবন রক্ষা এবং তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মানুষকে বিচারক নিয়োগ করা অধিক যুক্তিসংগত নয় কি?'

তারা বলল, 'হাঁ, মানুষের রক্তের নিরাপত্তা ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারক নিয়োগ অধিক সংগত।' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমরা তাহলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হাঁ।'

ইবন আব্বাস বললেন, 'আপনারা বলছেন, আলী যুদ্ধ করেছেন আয়িশা ও মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাদের বন্দী করে দাস-দাসী বানাননি। আপনারা কি চান আপনাদের মা আয়িশাকে দাসী বানানো হোক এবং অন্যান্য দাসীদের সাথে যেমন আচরণ করা হয় তাঁর সাথেও তেমন করা হোক? উত্তরে যদি হাঁ বলেন তাহলে আপনারা কাফির হয়ে যাবেন। (কারণ শরীয়াতে দাসীর সাথে স্ত্রীর ন্যায় আচরণ বৈধ।)'

আর যদি বলেন, 'আয়িশা' আমাদের মা নন, তাহলেও আপনারা কাফির হবেন। কারণ, আল্লাহ বলছেন ঃ

"নবী মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিকতর স্নেহশীল এবং তাঁর সহধর্মিনীগণ তাদের জননী।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৬)

'এখন এ দুটি জবাবের যে কোন একটি আপনারা বেছে নিন।' তারপর তিনি বললেন, 'আমরা তাহলে এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হাঁ।'

সবশেষে তিনি বললেন, "আলী 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধিটি পরিহার করেছেন, আপনারা এ অভিযোগ তুলেছেন। অথচ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয়, তাতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি লেখা হলে কুরাইশরা বলেছিল ঃ আমরা যদি বিশ্বাসই করতাম আপনি আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা আপনার কা'বা শরীফে পৌঁছার পথে প্রতিবন্ধক হতাম না বা আপনার সাথে সংঘর্ষেও লিপ্ত হতাম না। আপনি বরং এ বাক্যটির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ' কথাটি লিখুন। সেদিন কিন্তু রাসূল (সা) এ কথা বলতে বলতে তাদের দাবী মেনে নিয়েছিলেন– 'আল্লাহর কসম, আমি সুনিশ্চিতভাবে বলছি, আমি আল্লাহর রাসূল– তা তোমরা আমাকে যতই অস্বীকার করনা কেন।' আলী ঠিক একই কারণে 'আমীরুল মুমিনীন' লকবটি পরিহার করেছেন। কারণ, মুয়াবিয়া যদি তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে স্বীকারই করে নিতেন তাহলে তো কোন বিরোধই থাকতো না।" একথার পর তিনি বললেন, 'তাহলে আমরা এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম?' তারা বলল, 'হাঁ।'

হযরত আলীর পক্ষত্যাগীদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের এ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাঁরা তৃপ্ত হল এবং তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তিকে তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিল। এ সক্ষাতকারের পর বিশ হাজার লোক আবার আলীর দলে প্রত্যাবর্তন করে এবং অবশিষ্ট চার হাজার লোক আলীর শত্রুতার হঠকারী সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

চরমপন্থী খারেজীদের সাথে 'নাহরাওয়ান' নামক স্থানে হযরত আলীর (রা) যে যুদ্ধ হয় আবদুল্লাহ বসরা থেকে সাত হাজার সৈন্যসহ এ যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত আলী বসরার সাথে অধিকৃত সমগ্র ইরানেও আবদুল্লাহকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। তিনি ইরানের খারেজী বিদ্রোহ নির্মূল করেন।

একটি বর্ণনা মতে, আলীর (রা) খিলাফতকালেই হযরত আবদুল্লাহ বসরার গভর্নরের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে মক্কায় চলে যান। কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, বসরার কাজী আবুল আসওয়াদ দুয়ালী ও তাঁর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে, তিনি হযরত আলীর (রা) খিলাফতের শেষ পর্যন্ত বসরার ওয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতের সূচনাতে তিনি মক্কায় চলে যান এবং নির্জনে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে যখন মদীনা থেকে মক্কা হয়ে কুফায় রওয়ানা হচ্ছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে কুফাবাসীদের গাদ্দারীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কারবালায় ইমাম হুসাইনের সপরিবারে শাহাদাত বরণে হযরত আবদুল্লাহ ভীষণ আঘাত পান। মক্কায় অবস্থান করলেও হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তাঁকে খিলাফতের হকদার বলে মনে করতেন। বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ভিত্তিতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে তাঁর মক্কায় অবস্থান কিছুটা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তিনি তায়েফে চলে যান। শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে যান এবং তায়েফেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস জ্ঞানার্জনের জন্য অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সব ধরনের পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তিনি তাঁর অমিয় ঝর্ণাধারা থেকে দু'টি অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ওফাতের পর বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে থাকেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তিনি যে কত বিনয়ী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন তাঁর নিজের একটি বর্ণনা থেকেই তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন ঃ

"আমি যখনই অবগত হয়েছি, রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীর নিকট তাঁর একটি হাদীস সংরক্ষিত আছে, আমি তাঁর ঘরের দরজায় উপনীত হয়েছি। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে তাঁর দরজার সামনে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি। বাতাস ধূলাবালি উড়িয়ে আমার জামা-কাপড় ও শরীর হয়তো একাকার করে ফেলেছে। অথচ আমি সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তখনই অনুমতি দিতেন। শুধুমাত্র তাঁকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যেই আমি এমনটি করেছি। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এ দুরবস্থা দেখে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমাকে খবর দেননি কেন, আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে আসতাম। বলেছি, আপনার নিকট আমারই আসা উচিত। কারণ জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে দেয়ার বস্তু নয়। তারপর তাঁকে আমি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।"

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ইবন আব্বাস ছিলেন বিনয়ী। তিনি জ্ঞানীদের উপযুক্ত কদরও করতেন। এ প্রসংগে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন কাতিবে ওহী ও

বিচার, ফিকাহ, কিরায়াত ও ফারায়েজ শাস্ত্রে মদীনাবাসী পণ্ডিতদের নেতা যায়িদ বিন সাবিত (রা) তাঁর বাহনের পিঠে আরোহণ করবেন, এমন সময় হাশেমী যুবক আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস মনিবের সামনে দাসের দাঁড়াবার ভংগিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বাহনের লাগাম ও জিনটি ধরে তাঁকে আরোহণ করতে সাহায্য করলেন। যায়িদ (রা) তাঁকে বললেন, 'রাসূলের (সা) চাচাতো ভাই, এ আপনি কি করছেন, ছেড়ে দিন।' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমাদের উলামা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যই আমরা আদিষ্ট হয়েছি।' যায়িদ (রা) বললেন, 'আপনার একটি হাত বাড়িয়ে দিন।' তিনি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে যায়িদ (রা) ঝুঁকে পড়ে তাতে চুমু খেলেন এবং বললেন, 'আমাদের নবী-পরিবারের লোকদের সাথে এরূপ আচরণ করার জন্যও আমরা আদিষ্ট হয়েছি।'

জ্ঞান অন্বেষণে হযরত ইবন আব্বাসের অভ্যাস, একাগ্রতা কর্মপদ্ধতি দেখে সে যুগের বড় বড় জ্ঞানী ও মনীষীরা চরম বিস্ময়বোধ করেছেন। 'মাসরুক ইবনুল আজদা'– একজন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী, বলেন, "আমি যখন ইবন আব্বাসকে দেখলাম, বললাম, 'সুন্দরতম ব্যক্তি।' যখন তিনি কথা বললেন, বললাম, 'সর্বোত্তম প্রাঞ্জলভাষী' এবং যখন তিনি আলোচনা করলেন, বললাম, 'সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।"

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যখন তিনি কিছুটা আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন তখন মানুষকে শিক্ষাদানের ব্রত কাঁধে তুলে নিলেন। আর তখন থেকেই তাঁর বাড়ীটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যে অর্থে আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি সে অর্থে তার বাড়ীটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বললে অত্যুক্তি হয়না। তবে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ইবন আব্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যে পার্থক্য এখানে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন বহু শিক্ষক আর সেখানে ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইবন আব্বাসের এক সংগী বর্ণনা করেন, 'আমি ইবন আব্বাসের এমন একটি মাহফিল দেখেছি যা গোটা কুরাইশ গোত্রের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দেখলাম তাঁর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তাটি লোকে লোকারণ্য। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর দরজায় মানুষের প্রচণ্ড ভীড়ের কথা জানালাম। তিনি অজুর জন্য পানি আনালেন। অজু করলেন। তারপর বসে বললেন ঃ 'তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান লোকদের বল, যারা কুরআন ও কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর এত বিপুল সংখ্যক লোক ভেতরে প্রবেশ করল যে, কক্ষটি এমনকি সম্পূর্ণ বাড়ীটি পূর্ণ হয়ে গেল। তারা যা কিছু জানতে চাইলো তিনি তাদেরকে অবহিত করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা চলে গেল।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে বল, যারা কুরআনের তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে জানতে চাও, ভেতরে যাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে একথা বললাম। বলার পর লোকে ঘর ভরে গেল। তাদের সব জিজ্ঞাসারই তিনি জবাব দিলেন এবং অতিরিক্ত অনেক কিছুই অবহিত করলেন। তারপর বললেন, 'তোমাদের

অপেক্ষমান ভাইদের জন্য পথ ছেড়ে দাও।' তারা বেরিয়ে গেল।

তিনি আমাকে আবার বললেন, 'তুমি বাইরে গিয়ে যারা হালাল, হারাম ও ফিকাহ সম্পর্কে জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' আমি বেরিয়ে গিয়ে তাদেরকে পাঠালাম। তাদের সংখ্যাও এত ছিল যে ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব দানের পর তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল।

তিনি আমাকে আবার পাঠালেন এবং ফারায়েজ ও তৎসংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে আহ্বান জানালেন। এবারও ঘরটি ভরে গেল। তাদের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দানের পর পরবর্তী লোকদের জন্য স্থান ছেড়ে দিতে বললেন। তারা চলে গেল। তিনি আমাকে আবার পাঠালেন। বললেন, 'যারা আরবী ভাষা, কবিতা এবং আরবদের বিস্ময়কর সাহিত্য সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক তাদেরকে পাঠিয়ে দাও।' আমি তাদেরকে পাঠালাম। এবারো ঘর ভরে গেল। তিনি তাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে তুষ্ট করে বিদায় দিলেন। বর্ণনাকারী মন্তব্য করেন, 'সমগ্র কুরাইশ গোত্রের গৌরব ও গর্বের জন্য এই একটিমাত্র সমাবেশই যথেষ্ট।'

এমন ভীড়ের কারণেই ইবন আব্বাস পরবর্তীকালে একেকটি বিষয়ের জন্য সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারণ করেছিলেন। ফিকাহ্, মাগাযী, কবিতা, প্রাচীন আরবের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিনে তিনি আলোচনা করতেন। তাঁর এসব আলোচনার মজলিসে যত বড় জ্ঞানীই উপস্থিত হতেন না কেন, তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন।

হযরত ইবন আব্বাস তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির কল্যাণে অল্পবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতে রাশেদার মজলিসে শূরার সদস্য হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। হযরত উমার (রা) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রবীণ ও বিদ্বান সাহাবীদের আহ্বান জানাতেন। সেই সাথে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকেও ডেকে পাঠাতেন। তিনি উপস্থিত হলে হযরত উমার তাঁর যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, 'আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি, তুমি ও তোমার মত আর যারা আছ সমাধান বের কর।'

একবার প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের মজলিসে হযরত উমার অন্যদের তুলনায় আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে একটু বেশী গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিলেন। তখন আবদুল্লাহ একজন যুবক। এ ব্যাপারে তিনি প্রবীণ সাহাবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হন। কেউ কেউ বলেন, 'আমাদেরও তো তার বয়সী ছেলে ও নাতিরা রয়েছে, আমরাও তো তাদেরকে নিয়ে আসতে পারি।' হযরত উমার তখন কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করে আবদুল্লাহকে পরীক্ষা করেন। সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তখন উমার বলেন, 'আবদুল্লাহ তো বৃদ্ধদের মত যুবক। তার আছে একটি জিজ্ঞাসু যবান ও সচেতন অন্তঃকরণ।'

হিশাম ইবন উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়াকে ইবন আব্বাসের জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ইবন আব্বাসের তুল্য জ্ঞানী লোক আমার নযরে পড়েনি।'

আমর ইবন হাবশী বলেন, "আমি ইবন উমারকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ইবন আব্বাসের কাছে যাও এবং তাকেও জিজ্ঞেস কর। কারণ মুহাম্মাদের (সা) ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যাঁরা অবশিষ্ট আছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই অধিক জ্ঞানী।"

তাফসীর শাস্ত্র ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের মূলে ছিল প্রথমত তাঁর রাসূলে করীমের (সা) সান্নিধ্য লাভ ও সেবার সুযোগ। দ্বিতীয়ত তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ। তৃতীয়তঃ জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর অপরিসীম আগ্রহ এবং অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা।

যায়িদ ইবন সাবিত মারা গেলে হযরত আবু হুরাইরা মন্তব্য করেছিলেন 'এই উম্মাতের বিজ্ঞ আলিম মৃত্যুবরণ করলেন এবং আশা করি আল্লাহতা'আলা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

হযরত ইবন আব্বাস বিশিষ্ট ছাত্র ও ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের সাথে সাথে সাধারণ লোকদের সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। মাঝে মাঝে বিশেষ মাহফিলের মাধ্যমে তিনি জনসাধারণকে ওয়াজ-নসীহত করতেন।

নিজে না করে অন্যকে করতে বলেন, ইবন আব্বাস এ ধরনের লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন দিনে রোযাদার ও রাতে ইবাদাতগোযার। আবদুল্লাহ ইবন মুলাইকা বলেন "একবার আমি ইবন আব্বাসের সাথে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত সফর করলাম। বিশ্রামের জন্য যখনই কোথাও তাঁবু গেড়েছি, রাতের একটি বিশেষ অংশ তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। অথচ অন্য সফরসংগীরা তখন ক্লান্তি ও শ্রান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন। একদিন রাত্রে একাগ্রচিত্তে তাঁকে আমি পাঠ করতে শুনলাম ঃ

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ - ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ (سورة ق : ١٩)

'এবং মৃত্যুর বিকার সত্যভাবেই সমুপস্থিত। এ হচ্ছে তা-ই যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।' (ক্বাফ ঃ ১৯)

বারবার তিনি এ আয়াতটি আওড়াচ্ছেন আর কাঁদছেন। সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি এভাবে কাটিয়ে দিলেন।"

৬৮ হিজরী মুতাবিক ৬৮৬/৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তায়েফ নগরে তিনি ইনতিকাল করেন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল একাত্তর বছর। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। তায়েফ নগরে 'মসজিদে ইবন আব্বাস' নামক বিশাল মসজিদটি আজও তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। এ মসজিদেরই পেছনের দিকে এক পাশে এ মহান সাহাবীর কবর। তাঁকে কবরে সমাহিত করার পর কুরআনের এ আয়াতটি পঠিত হয়েছিল ঃ

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - اِرْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ، فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ - (سورة الفجر : ٣٠)

'হে পরিতুষ্ট আত্মা! তুমি প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর আমার বান্দাগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (আল-ফজর ঃ ২৭-৩০)

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে– সে যেন ইবন উম্মু আবদের পাঠের অনুসরণে কুরআন পাঠ করে।'

এটা সেই সময়ের কথা যখন তিনি একজন কিশোর মাত্র, তখনও যৌবনে পদার্পণ করেননি। কুরাইশ গোত্রের এক সর্দার 'উকবা ইবন আবু মু'ইতের একপাল ছাগল নিয়ে তিনি মক্কার গিরিপথগুলোতে চরিয়ে বেড়াতেন। লোকে তাঁকে 'ইবন উম্মু আবদ' বলে ডাকতো। তবে তাঁর নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম মাসউদ, কুনিয়াত আবু আবদির রহমান এবং মাতার নাম উম্মু আবদ।

তাঁর গোত্রে যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, সে সম্পর্কে নানা খবর এ কিশোর ছেলে সবসময় শুনতেন। তবে অল্প বয়স এবং বেশীরভাগ সময় মক্কার সমাজ জীবন থেকে দূরে অবস্থানের কারণে সে সম্পর্কে তিনি গুরুত্ব দিতেন না। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন সকালে উঠে 'উকবার ছাগলের পাল নিয়ে বের হয়ে যেতেন আর সন্ধ্যায় ফিরতেন।

একদিন এ কিশোর ছেলেটি দেখতে পেলেন, দু'জন বয়স্ক লোক, যাদের চেহারায় আত্মমর্যাদার ছাপ বিরাজমান, দূর থেকে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। তাঁরা ছিলেন এত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত যে, তাঁদের ঠোঁট ও গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। নিকটে এসে লোক দু'টি সালাম জানিয়ে বললেন, 'বৎস! এ ছাগলগুলি থেকে কিছু দুধ দুইয়ে আমাদেরকে দাও। আমরা পান করে পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং আমাদের শুকনা গলা একটু ভিজিয়ে নেই।'

ছেলেটি বললেন ঃ 'এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। ছাগলগুলি তো আমার নয়। আমি এগুলির রাখাল ও আমানতদার মাত্র।' লোক দু'টি তার কথায় অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং তাদের মুখ মণ্ডলে এক উৎফুল্লতার ছাপ ফুটে উঠলো। তাদের একজন আবার বললেন ঃ 'তাহলে এমন একটি ছাগী আমাকে দাও যা এখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি।' ছেলেটি নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছোট্ট ছাগীর দিকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। লোকটি এগিয়ে গিয়ে ছাগীটি ধরে ফেলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে হাত দিয়ে ধরে তার ওলান মলতে লাগলেন। অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি এ দৃশ্য দেখে মনে মনে বললেন ঃ 'কখনও পাঠার সংস্পর্শে আসেনি এমন ছোট ছাগী কি দুধ দেয়? কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাগীর ওলানটি ফুলে উঠে এবং প্রচুর পরিমাণ দুধ বের হতে থাকে। দ্বিতীয় লোকটি গর্তবিশিষ্ট পাথর উঠিয়ে নিয়ে বাঁটের নীচে ধরে তাতে দুধ ভর্তি করেন। তারপর তাঁরা উভয়ে পান করেন এবং ছেলেটিকেও তাদের সাথে পান করালেন। ইবন মাসউদ বলেন ঃ আমি যা দেখছিলাম তা সবই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আমরা সবাই যখন পরিতৃপ্ত হলাম তখন সেই পুণ্যবান লোকটি ছাগীর ওলানটি লক্ষ্য করে বল্লেন ঃ 'চুপসে যাও।' আর অমনি সেটি পূর্বের ন্যায় চুপসে গেল।

তারপর আমি সেই পুণ্যবান লোকটিকে অনুরোধ করলাম ঃ 'আপনি যে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, তা আমাকে শিখিয়ে দিন।' বললেন, 'তুমি তো শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক।'

ইসলামের সাথে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের পরিচিতির এটাই হলো প্রথম কাহিনী। এ মহাপুণ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আর তাঁর সংগীটি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)। কুরাইশদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য এ সময় তাঁরা মক্কার নির্জন গিরিপথ সমূহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাসূল (সা) ও তাঁর সংগীকে যেমন ছেলেটির ভালো লেগেছিল তেমনি তাঁদের কাছেও ছেলেটির আচরণ, আমানতদারী ও বিচক্ষণতা খুব চমৎকার মনে হয়েছিল। তাঁরা ছেলেটির মধ্যে কল্যাণ ও মংগলের শুভলক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এ ঘটনার অল্পকিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাসূলুল্লাহর (সা) একজন খাদিম হিসাবে উৎসর্গ করেন। রাসূল (সা)ও তাকে খাদিম হিসাবে নিয়োগ করেন। সেইদিন থেকে এ সৌভাগ্যবান বালক ছাগলের রাখালী থেকে সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠতম মানুষের খাদিমে পরিণত হন।

অবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ছায়ার মত নিজের মনিবকে অনুসরণ করেন। সফরে বা ইকামতে, গৃহের অভ্যন্তরে বা বাইরে সব সময় তিনি তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। রাসূল (সা) ঘুমালে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন, গোসলের সময় পর্দা করতেন, বাইরে যাবার সময় জুতো পরিয়ে দিতেন, ঘরে প্রবেশের সময় জুতো খুলে দিতেন এবং তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক বহন করতেন। তিনি যখন হুজরায় অবস্থান করতেন তখনও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। রাসূল (সা) তাঁকে যখনই ইচ্ছা তাঁর কামরায় প্রবেশ এবং কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংকোচ না করে তাঁর সকল বিষয় অবগত হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে 'সাহিবুস সির' বা রাসূলুল্লাহর (সা) সকল গোপন বিষয়ের অধিকারী বলা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ নবী-গৃহে প্রতিপালিত হন, তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তাঁরই মত আচার-আচরণ, ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। এ কারণে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'হিদায়াত প্রাপ্তি, আচার-আচরণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্তম ব্যক্তি।'

ইবনে মাসউদ খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) শিক্ষালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাই সাহাবীদের মধ্যে যারা কুরআনের সবচেয়ে ভালো পাঠক, তার ভাব ও অর্থের সবচেয়ে বেশী সমঝদার এবং আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধানের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

একবার হযরত উমার (রা) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ 'আমীরুল মু'মিনীন! আমি কুফা থেকে এসেছি। সেখানে আমি দেখে এসেছি, এক ব্যক্তি নিজের স্মৃতি থেকেই মানুষকে কুরআন শিখাচ্ছেন।' একথা শুনে তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, সচরাচর তাঁকে তেমন রাগ করতে দেখা যায় না। তিনি উটের হাওদার অভ্যন্তরে রাগে ফুলতে থাকেন। তারপর প্রশ্ন করেন– তোমার ধ্বংস হোক! কে সে লোকটি?'

– 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ।'

জ্বলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিলে যে অবস্থা হয়, ইবন মাসউদের নাম শুনে তাঁরও সে অবস্থা হলো। তার রাগ পড়ে গেল। তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন। তারপর বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! আল্লাহর কসম, এ কাজের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক যোগ্য কোন ব্যক্তি বেঁচে আছে কিনা আমি জানিনা। এ ব্যাপারে তোমাকে আমি একটি ঘটনা বলছি।' উমার (রা) বলতে লাগলেন– "একদিন রাতের বেলা রাসূল (সা) আবু বকরের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তাঁরা মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। কিছু সময় পর রাসূল (সা) বের হলেন, আমরাও তাঁর সাথে বেরুলাম। বেরিয়েই আমরা দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি মসজিদে নামাযে দাঁড়িয়ে; কিন্তু আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম না। রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দ পেতে চায়, যেমন তা অবতীর্ণ হয়েছে, সে যেন ইবন উম্মু আবদের পাঠের অনুরূপ কুরআন পাঠ করে।' এরপর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বসে দু'আ শুরু করলেন। রাসূল (সা) আস্তে আস্তে তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন ঃ 'চাও, দেওয়া হবে, চাও, দেওয়া হবে।'

উমার (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আগামীকাল প্রত্যুষেই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের নিকট গিয়ে তাঁর দু'আ সম্পর্কে রাসূলের (সা) মন্তব্যের সুসংবাদটি তাঁকে দিব। সকাল সকাল আমি তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার আগেই তাঁর কাছে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে সুসংবাদটি দিয়ে ফেলেছেন। সত্যিই যখনই কোন সৎকাজে আবু বকরের সাথে আমি প্রতিযোগিতা করেছি তখন তিনিই প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছেন।

আল্লাহর কিতাব কুরআনের জ্ঞানে তিনি কতখানি পারদর্শী ছিলেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই সেই আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাবের এমন কোন একটি আয়াত নাযিল হয়নি যে সম্পর্কে আমি জানিনা যে, তা কোথায় নাযিল হয়েছে এবং কি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার থেকে অধিক পারদর্শী কোন ব্যক্তির কথা আমি যদি জানতে পারি এবং তাঁর কাছে পৌঁছা সম্ভব হয়, তাহলে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হই।'

নিজের সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যে কথাটি বলেছেন তাতে অতিরঞ্জন নেই। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা পাঠকদের কাছে তুলে ধরা সমীচীন বলে মনে করি। একবার হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কোন এক সফরে রাত্রিবেলা একটি অপরিচিত কাফিলার সাক্ষাত লাভ করেন। রাতের ঘোর অন্ধকারে কাফিলার কোন লোকজনকে দেখা যাচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে সেই কাফিলায় আবদুল্লাহ ইবন মাসউদও ছিলেন; কিন্তু উমার (রা) তা জানতেন না। উমরা (রা) একজন লোককে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, কাফিলা কোথা থেকে আসছে? অন্য কাফিলা থেকে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ জবাব দিলেন–

– 'আমীক উপত্যকা থেকে।'

– 'কোথায় যাচ্ছে?'

– 'ইলাল বাইতিল আতীক– বাইতুল আতীকে (অর্থাৎ কাবা শরীফে)।' জবাব শুনে উমার (রা) বললেন ঃ 'নিশ্চয় তাদের মধ্যে কোন আলিম ব্যক্তি আছেন।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি?'

– 'আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তাখুজুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম– সেই চিরন্তন চিরঞ্জীব সত্তা আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্রাও তাকে স্পর্শ করেনা এবং নিদ্রাও তাঁকে পায়না।'

– 'সর্বাধিক ন্যায়-নীতির ভাব প্রকাশক আয়াত কোনটি?'

– ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ইতায়িজিল কুরবা– আল্লাহ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, পরোপকার এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার প্রশ্ন হলো ঃ

– 'সর্বাধিক ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত কোনটি?'

– 'ফামাই ইয়া'মাল মিসকালা জাররাতিন খাইরাই য়ারাহ্, ওয়ামাই ইয়া'মাল মিসকালা জার্‌রাতিন শাররাই য়ারাহ'– 'যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করবে সে তার বিনিময় লাভ করবে, তেমনিভাবে যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করবে তার বিনিময়ও সে লাভ করবে।'

– 'সর্বাধিক ভীতিপ্রদ আয়াত কোনটি?'

– 'লাইসা বিআমানিয়্যিকুম ওয়ালা আমানিয়্যি আহলিল কিতাবি মান ই'মাল সূআন ইউজযা বিহি ওয়ালা ইয়াজিদ লাহু মিন দুনিল্লাহ ওয়ালিয়্যান ওয়ালা নাসীরান'– 'না তোমাদের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী, আর না আহলি কিতাবদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী সবকিছু হবে। যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করবে তাঁকে তাঁর প্রতিফল ভোগ করতে হবে। আর আল্লাহ ছাড়া তার জন্য আর কোন অভিভাবকও পাবেনা এবং কোন সাহায্যকারীও না।'

'সর্বাধিক আশার সঞ্চারকারী আয়াত কোনটি?'

– 'কুল ইয়া 'ইবাদিল্লাজীনা আসরাফু 'আলা আনফুসিহিম লা-তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরজ্জুনুবা জামীয়া। ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহীম'– 'হে নবী আপনি বলুন। হে আমার বান্দারা, যারা নিজের ওপর বাড়াবাড়ি করছো, আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপই ক্ষমা করে দেবেন। তিনিই তো গাফুরুর রাহীম।'

– 'আচ্ছা আপনাদের মাঝে কি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আছে?'

– হ্যাঁ।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কেবল একজন ভালো ক্বারী, আলিম, আবিদ ও যাহিদই ছিলেন না, সেইসাথে তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং কঠিন বিপদ মুহূর্তে অগ্রগামী একজন মুজাহিদ। তাঁর জন্য এ গৌরবটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহর

(সা) পর তিনিই ভূ-পৃষ্ঠের প্রথম মুসলিম যিনি প্রকাশ্যে কুরাইশদের মাঝে কুরআন পাঠ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা একদিন মক্কায় একত্রিত হলেন। তাঁরা তখন সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল। নিজেদের মধ্যে তাঁরা বলাবলি করলেন, 'আল্লাহর শপথ, প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে কুরাইশদেরকে কখনও শুনানো হয়নি। তাদেরকে কুরআন শোনাতে পারে এমন কে আছে?'

আবদুল্লাহ উবন মাসউদ বললেন ঃ 'আমিই তাদেরকে শোনাবো।' অন্যরা বললেন, 'তোমার ব্যাপারে আমাদের ভয় হচ্ছে। আমরা এখন এক ব্যক্তিকে চাই, যার লোকজন আছে, কুরাইশরা তার ওপর কোনরূপ অত্যাচার করতে চাইলে তারা তখন বাধা দিতে পারবে।' ইবন মাসউদ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আল্লাহ আমাকে হিফাজত করবেন।' একথা বলে তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন এবং মধ্যাহ্নের কিছু আগে মাকামে ইবরাহীমে এসে পৌঁছলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে জোরে জোরে তিলাওয়াত শুরু করলেন ঃ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আররাহমানু আল্লামাল কুরআন, খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান.....।'

তিনি তিলাওয়াত করে যেতে লাগলেন। কুরাইশরা শুনে ক্ষণিকের জন্য চিন্তা করলো। তারপর একে অপরকে প্রশ্ন করলো, 'ইবন উম্মু আবদ কি বলে? তার সর্বনাশ হোক! মুহাম্মাদ যা বলে তাই তো সে পাঠ করছে।' তারা সবাই উঠে তাঁর দিকে ধেয়ে গেল এবং তাঁর মুখে নির্দয়ভাবে মারতে লাগলো। এ অবস্থায় আল্লাহ যতটুকু চাইলেন ততটুকু তিনি তিলাওয়াত করলেন। তারপর রক্তাক্ত দেহে সংগীদের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা এরই আশংকা করছিলাম।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর শত্রুরা এখন আমার কাছে অতি তুচ্ছ যা আগে ছিলনা। আপনারা চাইলে আগামী কালও আমি এমনটি করতে পারি।' তাঁরা বললেন, 'না, যথেষ্ট হয়েছে। তাদের অপছন্দনীয় কথা তুমি তাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছ।' হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ ইসলাম গ্রহণ করার পর কুরাইশদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন। বাধ্য হয়ে দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। অবশেষে মাদীনায় চিরদিনের জন্য হিজরাত করে চলে যান। মদীনায় প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত মুয়াজ ইবন জাবালের অতিথি হন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং তাঁর বসবাসের জন্য মসজিদে নববীর পাশে একখণ্ড ভূমি দান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে দু'জন আনসারী যুবক ইসলামের কট্টর দুশমন আবু জাহলকে হত্যা করে ময়দানে ফেলে আসে। যুদ্ধশেষে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'কেউ যেয়ে আবু জাহলের অবস্থা একটু দেখে আস তো।' আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ দৌড়ে চলে গেলেন। আবু জাহলের প্রাণস্পন্দন তখনও থেমে যায়নি। আবদুল্লাহ তার দাড়ি সজোরে মুট করে ধরে বললেন ঃ 'বল, তুই আবু জাহল কিনা।'

উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবারসহ মক্কা বিজয়েও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথী ছিলেন। হুনাইন যুদ্ধে কাফিরদের অতর্কিত আক্রমণে দশ হাজারের মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মাত্র আশিজন যোদ্ধা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) চতুষ্পার্শে অটল থাকেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ সেই আশিজনের একজন। এ যুদ্ধে রাসূল (সা) মুশরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে যে এক মুঠো ধূলো নিক্ষেপ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তা তুলে দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দীর্ঘদিন যাবত সকল কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকেন। তবে হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ১৫ সনে তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইয়ারমুক যুদ্ধে বেরিয়ে পড়েন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন।

হিজরী ২০ সনে খলীফা উমার (রা) তাঁকে কুফার কাজী নিয়োগ করেন। কাজীর দায়িত্ব ছাড়াও বায়তুল মাল, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কুফার ওয়ালীর উযীরের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়।

পুরো দশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এতগুলি দায়িত্ব তিনি পালন করেন। এ দীর্ঘ সময়ে খলীফা উমারের (রা) শাহাদাত বরণ, হযরত উসমানের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণসহ কুফার ওয়ালীরও রদবদল হয়েছে, কিন্তু আবদুল্লাহ বিন মাসউদ স্বীয় পদে বহাল থাকেন। খলীফা উসমানের খিলাফতের শেষ পর্বে আবদুল্লাহকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি সংগীসাথী ও পরিবার পরিজনসহ কুফা থেকে হিজাযের দিকে যাত্রা করেন। পথে মরুভূমিতে 'রাবজা' নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যার গিফার (রা) সেখানে অন্তিম শয্যায়। তাঁর পৌঁছার অল্পক্ষণ পরেই আবু যার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তাঁর জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি মক্কা চলে যান এবং উমরা আদায় করে মদীনায় পৌঁছেন। বাকী জীবন মদীনায় চুপচাপ কাটিয়ে দেন।

হিজরী ৩২ সনে আবদুল্লাহর বয়স যখন ষাট বছরের ওপরে, হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলো, 'আল্লাহ আমাকে আপনার জানাযা থেকে বঞ্চিত না করুন। গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, রাসূল (সা) একটি মিম্বরের ওপর আর আপনি তাঁর সামনে। তিনি আপনাকে বলছেন, 'ইবন মাসউদ, আমার পরে তোমাকে ভীষণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে। এস, আমার কাছে চলে এস। এ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হল। এর অল্প কিছুদিন পরেই তিনি রোগে আক্রান্ত হন এবং সেই রোগেই মারা যান।

হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, তখন উসমান (রা) একদিন তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– 'আপনার অভিযোগ কিসের বিরুদ্ধে?'

– 'আমার পাপের বিরুদ্ধে।'

– 'আপনার চাওয়ার কিছু আছে কি?'

– 'আমার রবের রহমত বা করুণা।'

– 'বহু বছর যাবত আপনার ভাতা নিচ্ছেন না, তাকি আবার দেয়ার নির্দেশ দেব?'

– 'আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

– 'আপনার মৃত্যুর পর আপনার কন্যাদের প্রয়োজনে আসবে।'

– 'আপনি কি আমার কন্যাদের দারিদ্রের ব্যাপারে ভীত হচ্ছেন? আমি তো তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে। কারণ আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা আল-ওয়াকিয়া পাঠ করবে, কখনও দারিদ্র তাকে স্পর্শ করবে না।'

দিনশেষে রাত্রি নেমে এলো, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ তাঁর রফীকে 'আলা—শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর সাথে মিলিত হলেন। খলীফা উসমান তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত উসমান ইবন মাজউনের (রা) পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম (রা)

নাম আবু আবদিল্লাহ আল আরকাম। পিতা আবুল আরকাম আবদু মান্নাফ, মাতা উমাইমা।

হযরত আরকামের খান্দান জাহিলী যুগের আরবে বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তাঁর দাদা আবু জুনদুব আসাদ ইবন আবদিল্লাহ তার যুগে মক্কার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত আরকাম এগারো অথবা বারো জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-বিদায়া গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর ইসলাম গ্রহণের পর উসমান ইবন আফ্‌ফান, তালহা ইবন উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্‌কাসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তাঁরা সকলে সাথে সাথে এ দাওয়াত কবুল করেন। পরদিন তিনি উসমান ইবন মাজউন, আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ্, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবু সালামা ইবন আবদিল আসাদ এবং আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আরকাম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সহ সকল মুসলমানের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। মক্কার পৌত্তলিক শক্তি চাচ্ছিল, শক্তি অর্জনের পূর্বেই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু ইসলাম তো নিশ্চিহ্ন হওয়ার জন্য আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আরকামের বাড়ীটি ইসলামের গোপন ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলেই ঘুরেফিরে 'দারুল আরকাম' বা আরকামের বাড়ীর কথাটি আমাদের সামনে আসে। ইসলামের দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ বাড়ীটির এক মহান ভূমিকা রয়েছে। রাসূল (সা) এ বাড়ীতে অবস্থান নিয়ে কুরাইশদের নজর এড়িয়ে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় যে ক'জন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা এখানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এখান থেকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এ ঐতিহাসিক বাড়ীতে বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সর্বশেষে যে ব্যক্তি এ বাড়ীতে ইসলামের ঘোষণা দেন, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। 'হায়াতুস সাহাবা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদের সংখ্যা যখন ৩৮ জনে উন্নীত হলো, আবু বকর ও অন্যরা তখন রাসূলুল্লাহকে (সা) চাপ দিলেন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তাঁদের দাবীর মুখে রাসূল (সা) রাজী হলেন। তাঁরা আরকামের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মসজিদে হারামে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর কা'বার চত্বরে উপস্থিত কুরাইশদের সম্বোধন করে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরতেই কুরাইশ গুণ্ডারা একযোগে আবু বকরের ওপর হামলা চালিয়ে আঘাত হানতে থাকে। নরাধম উতবা পায়ের জুতো খুলে হযরত আবু বকরকে জুতো-পেটা

করলো। আবু বকরের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লো। আবু বকরের গোত্র বনু তাইম তাঁকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এলো। আবু বকর চেতনা ফিরে পেয়েই রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর মা উম্মুল খায়েরকে পাঠালেন উম্মুল জামিলের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) খবর জানার জন্য। উম্মুল জামীল এসে চুপে চুপে খবর দিলেন, রাসূল (সা) নিরাপদে আছেন। অতঃপর রাতের অন্ধকারে তাঁরা তিনজন গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছেন। এখানে রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আর বরকতে হযরত আবু বকরের জননী উম্মুল খায়ের ইসলাম গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁরা এক মাস অবস্থান করেন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ এ পৌঁছে যায়। যেদিন আবু বকর (রা) আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে মার খেয়েছিলেন, ঘটনাক্রমে সেদিনই হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামপূর্ব যুগে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মক্কায় 'হিলফুল ফুজুল' নামে যে কল্যাণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আরকাম ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হিজরাতের আদেশ হলে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে হযরত আরকাম মদীনায় পৌঁছেন। হযরত আবু তালহা ইবন সাহলের সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে মদীনার বনু যুরাইক মহল্লায় এক খণ্ড ভূমি দান করেন।

হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ বদর-যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূল (সা) তাঁকে একখানি তরবারি দান করেন। উহুদ, খন্দক, খাইবারসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। রাসূল (সা) তাঁকে যাকাত আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

হিজরী ৫৩/৫৫ সনে ৮৩ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে অসীয়াত করে যান, হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তাঁর জানাযার নামায পড়াবেন। কিন্তু হযরত সা'দ মদীনা থেকে একটু দূরে 'আকীক' নামক স্থানে ছিলেন। তাঁর উপস্থিত হতে একটু বিলম্ব হলে মদীনার তৎকালীন ওয়ালী মারওয়ান ইবন হিকাম প্রতিবাদ করে বলেন, এক ব্যক্তির প্রতীক্ষায় জানাযা কতক্ষণ পড়ে থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলেন, নিজেই এগিয়ে গিয়ে জানাযার ইমামতি শুরু করে দেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ ইবন আরকাম অনুমতি দিলেন না। বনী মাখযুম গোত্রও উবাইদুল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে আসে। বাকবিতণ্ডা চলছে, এমন সময় হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি জানাযার নামায পড়ালেন এবং লাশ মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হলো।

তাকওয়া, দ্বীনদারী, দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসের প্রতি অনীহা ও সততা ছিল হযরত আরকামের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইবাদাত ও শববিদারীর প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। একবার তিনি বাইতুল মাকদাস সফরের ইচ্ছা করলেন। সফরের প্রস্তুতি শেষ করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এলেন বিদায় নিতে। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, না অন্য কোন প্রয়োজনে? উত্তরে আরকাম বললেন, 'আমার মা-বাবা, আপনার প্রতি কুরবান হোক, অন্য কোন প্রয়োজন নেই। শুধু বাইতুল মাকদাসে

নামায আদায় করতে চাই।' ইরশাদ হলো, 'আমার এ মসজিদের একটি নামায একমাত্র মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদের হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।' একথা শোনামাত্র হযরত আরকাম বসে পড়েন এবং সফরের ইরাদা বাতিল করেন।

হযরত আরকামের মূল পেশা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। হিজরাতের পর তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। মক্কার ঐতিহাসিক বাড়ীটি তিনি সন্তান-সন্ততিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে যান। দীর্ঘ দিন যাবত এ বাড়ীটি ভ্রমণকারীদের দর্শনস্থল হিসাবে বিবেচিত হতো।

হযররত আরকামের এ বাড়ীটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ' করার সময় ঠিক বাড়িটির দরজার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। আব্বাসী খলিফা মানসুরের সময়--১৪০ হিজরী পর্যন্ত বাড়ীটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। কিন্তু এ বছরই মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাসান মদীনায় আব্বাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। হযরত আরকামের পৌত্র আবদুল্লাহ ইবন 'উসমানও ছিলেন এ বিদ্রোহের একজন সমর্থক ও সহযোগী। এ কারণে খলীফা মানসুরের নির্দেশে মদীনার তৎকালীন ওয়ালী তাঁকে গ্রেফতার করেন। খলীফা মানসুর তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী শিহাব উদ্দীন ইবন আবদে বরকে পাঠালেন আবদুল্লাহর নিকট এই বাড়ীটি ক্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে। আবদুল্লাহ প্রথমতঃ বিক্রী করতে অস্বীকার করেছিলেন; কিন্তু কয়েদ থেকে মুক্তির শর্তে এবং উচ্চ মূল্যের লোভে শেষ পর্যন্ত বিক্রী করতে সম্মত হন। মানসুর সতেরো হাজার দীনারের বিনিময়ে এ মহান, কল্যাণময় ঐতিহাসিক বাড়ীটির মালিকানা লাভ করেন। বাড়ীটির অন্য শরীকরা প্রথমতঃ রাজী না হলেও আস্তে আস্তে তাঁরাও রাজী হয়ে যান।

খলীফা মানসুরের পর খলীফা মাহদী এ বাড়ীটি তাঁর প্রিয়তমা দাসী খায়যুরানকে দান করেন। তিনি বাড়ীটির পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন অট্টালিকা তৈরী করেন। এভাবে যুগে যুগে এ বাড়ীটির সংস্কার সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই মহান গৃহটি যেখানে ইসলামের সংকট পর্বে আল্লাহর রাসূল (সা) ও মুসলমানরা আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অহী ও ফিরিশতাদের অবতরণ স্থল ছিল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

আবু হুরাইরা আদ-দাওসী (রা)

, আবু হুরাইরা, এ নামটি জানে না মুসলিম জাতির মধ্যে এমন কেউ কি আছে? ইসলামপূর্ব জাহিলী যুগে লোকে তাঁকে ডাকতো– 'আবদু শামস' বলে। পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলামের দিকে হিদায়াত দান করে তাঁর ওপর অনুগ্রহ করলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ দানের মাধ্যমে তাঁকে গৌরবান্বিত করলেন, রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কি?' তিনি জবাব দিলেন, 'আবদু শামস (অরুণ দাস)।'

রাসূল (সা) বললেন, 'না আজ থেকে তোমার নাম আবদুর রহমান।'

আবু হুরাইরা (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার নামে কুরবান হোক। আমার নাম আজ থেকে– আবদুর রহমান-ই হবে।'

'আবু হুরাইরা' তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম। ছোট বেলায় একটি বিড়াল শাবকের সাথে তিনি সবসময় খেলতেন। তা দেখে সাথীরা তাঁর নাম দেন আবু হুরাইরা (বিড়াল শাবকওয়ালা)। আস্তে আস্তে এ নামেই তিনি সকলের মাঝে পরিচিত হন এবং তাঁর আসল নামটি ঢাকা পড়ে যায়। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যখন তাঁর সম্পর্ক গভীর হয় তখন মাঝে মাঝে তিনি আদর করে ডাকতেন 'আবু হিররিন'। তাই তিনি– আবু হুরাইরার পরিবর্তে– আবু হিররিন নামটিকেই প্রধান্য দেন। তিনি বলতেন ঃ আমার হাবীব আল্লাহর রাসূল আমাকে এ নামেই ডেকেছেন। তাছাড়া হিররুন পুং লিঙ্গ এবং হুরাইরা স্ত্রী লিঙ্গ।

আবু হুরাইরা ইসলামে দীক্ষিত হন প্রখ্যাত সাহাবী তুফায়িল ইবন আমর আদ-দাওসীর হাতে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বীয় দাওস গোত্রের সাথেই অবস্থান করতে থাকেন। ষষ্ঠ হিজরী সনে তাঁর গোত্রের একটি প্রতিনিধিদলের সাথে তিনিও এলেন মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে। আমর ইবনুল গালাস বলেন, মদীনায় তাঁর প্রথম আগমন হয় খাইবার বিজয়ের বছর সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে।

মদীনা আসার পর দাওস গোত্রের এ যুবক নিরবচ্ছিনভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমত ও সাহচর্য অবলম্বন করেন। রাত-দিন চব্বিশ ঘন্টা মসজিদেই অবস্থান করতে থাকেন। সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) কাছ থেকে তালীম ও তারবিয়াত লাভ করতেন এবং তাঁরই ইমামতিতে নামায আদায় করতেন। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তাঁর স্ত্রী বা সন্তান সন্ততি ছিল না। একমাত্র তাঁর বৃদ্ধা মা ছিলেন। তখনও তিনি পৌত্তলিকতার ওপর অটল। আবু হুরাইরা স্নেহময়ী মাকে সর্বদা দাওয়াত দিতেন, আর তিনি অস্বীকার করতেন। এতে তিনি গভীর ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করতেন। একদিন তিনি মাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানালে তিনি নবী (সা) সম্পর্কে এমন কিছু অশ্রাব্য কথা বলেন যাতে আবু হুরাইরা ভীষণ মর্মাহত হন। কাঁদতে কাঁদতে তখনই রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাঁদছো কেন?'

তিনি বললেন, 'আমি সব সময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিই, আর তিনি অস্বীকার করেন। প্রতিদিনকার মত আজও আমি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন যে আমাকে ভীষণ পীড়া দিয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আবু হুরাইরার মায়ের অন্তরটি ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।' রাসূল (সা) দু'আ করলেন।

আবু হুরাইরা বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে বাড়ীতে ফিরে গেলাম। দেখি ঘরের দরজাটি বন্ধ, তবে ভেতরে পানি পড়ার শব্দ শুনা যাচ্ছে। আমি ভেতরে প্রবেশ করতে যাব এমন সময় মা বললেন, 'আবু হুরাইরা, একটু অপেক্ষা কর' একথা বলে তিনি কাপড় ঠিকঠাক করে নিলেন। তারপর আমাকে ভেতরে ডাকলেন। আমি প্রবেশ করলাম। তখনই তিনি পাঠ করতে লাগলেন! "আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

আমি আবার রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে গেলাম। আনন্দে তখন আমি কাঁদছি, যেমন কিছুক্ষণ আগে দুঃখে কেঁদেছিলাম। বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সুসংবাদ! মহান আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করেছেন, তিনি আবু হুরাইরার মাকে হিদায়াত দান করেছেন, আবু হুরাইরার মা ইসলাম গ্রহণ করেছেন।'

আবু হুরাইরা রাসূলকে (সা) ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা ছিল গভীর। তিনি রাসূলের (সা) দিকে এক দু'বার মাত্র তাকিয়ে পরিতৃপ্ত হতেন না। তিনি বলতেন, 'রাসূল (সা) অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও দীপ্তিমান কোন কিছু আমি দেখিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্যের কিরণ ঝলমল করতে থাকে।'

তিনি নবীর (সা) সাহাবী হওয়ায় মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁর দ্বীনের অনুসারী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, এজন্য তিনি সব সময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। বলতেন, 'আবু হুরাইরাকে যিনি ইসলামের দিকে হিদায়াত দিয়েছেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর। আর সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আবু হুরাইরাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাহচর্য দান করে অনুগ্রহ করেছেন।'

আবু হুরাইরা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি যেমন নিবেদিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন জ্ঞানের প্রতিও কুরবান। জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানচর্চা তাঁর অভ্যাস ও প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। যায়িদ বিন সাবিত (রা) বলেন ঃ

একদিন আবু হুরাইরা, আমদের এক বন্ধু ও আমি মসজিদে আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলাম। এমন সময় রাসূলকে (সা) আমরা দেখতে পেলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমাদের মাঝখানে বসলেন। আমরা সবাই চুপ করে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ আবার শুরু কর।' আমি ও আমার বন্ধুটি আবু হুরাইরার আগেই আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম। রাসূল (সা) আমাদের দু'আর সাথে সাথে আমীন বললেন। তারপর আবু হুরাইরা দু'আ করলেন ঃ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই, আমার দু'বন্ধু যা কিছু চেয়েছে। আর সেইসাথে চাই এমন জ্ঞান যা কখনও ভুলে না যাই।' এবারও রাসূল (সা) আমীন

বললেন। আমরা দু'জনও বললাম, 'আমরাও চাই ভুলে না যাই এমন জ্ঞান।' রাসূল (সা) বললেন, 'দাওস গোত্রের এ লোকটি এক্ষেত্রে তোমাদের দু'জনকে হারিয়ে দিয়েছে।'

আবু হুরাইরা নিজের জন্য যেমন জ্ঞান ভালোবাসতেন, তেমনি অপরের জন্যও। ইতিহাসে এ সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ আছে। একদিন তিনি মদীনার বাজারে গেলেন। সেখানে বেচা-কেনা, লেন-দেন ইত্যাদির মধ্যে মানুষের নিমগ্নতা দেখে বিস্মিত হলেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওহে মদীনাবাসী, তোমরা দারুণভাবে বঞ্চিত।' লোকরা জিজ্ঞেস করলো, 'আবু হুরাইরা, আপনি আমাদের বঞ্চনার কি দেখলেন?'

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) মীরাস (উত্তরাধিকার) বন্টিত হচ্ছে, আর তোমরা এখানে বসে আছ? সেখানে গিয়ে তোমাদের নিজ নিজ অংশগুলি নিয়ে নাও না কেন?'

তারা বলল, 'কোথায়?'

তিনি বললেন, 'মসজিদে।

লোকেরা মসজিদের দিকে ছুটে গেল। আবু হুরাইরা তাদের অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পর তারা ফিরে এসে বলল, 'আবু হুরাইরা, আমরা তো মসজিদে গিয়েছি, ভেতরেও প্রবেশ করেছি, কিন্তু কোন কিছু বন্টন হচ্ছে এমন তো দেখলাম না।'

তিনি বললেন, 'মসজিদে তোমরা কাউকে দেখনি?'

তারা বলল, 'অবশ্য দেখেছি, কিছু লোক নামাযে দণ্ডায়মান, কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল এবং কিছু লোক হারাম-হালাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনারত।'

তিনি বললেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক, এ-ই তো রাসূলুল্লাহর (সা) মীরাস।'

আবু হুরাইরা মুসলিম উম্মাহর জন্য নবীর হাজার হাজার হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করে সংরক্ষণ করে গেছেন। সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরা থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন 'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র আবদুল্লাহ ইবন উমার ব্যতীত আর কেউ আমার থেকে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী নই। আর তাও এজন্য যে, তিনি হাদীস লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।'

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারটি অনেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। তাই তিনি বলেন, 'তোমরা হয়তো মনে করছো আমি খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করি। আমি ছিলাম রিক্তহস্ত, দরিদ্র, পেটে পাথর বেঁধে সর্বদা রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে কাটাতাম। আর মুহাজিররা ব্যস্ত থাকতো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং আনসাররা তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে।' তিনি আরও বলেন, "একদিন আমি বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার অনেক কথাই শুনি, কিন্তু তার অনেক কিছুই ভুলে যাই।' একথা শুনে রাসূল (সা) বল্লেন, 'তোমার চাদরটি মেলে ধর।' আমি মেলে ধরলাম। তারপর বললেন ঃ তোমার বুকের সাথে লেপ্টে ধর। আমি লেপ্টে ধরলাম। এরপর থেকে আর কোন কথাই আমি ভুলিনি।" ইমাম বুখারী বলেন ঃ আটশ'রও বেশী সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ইবন আব্বাস, ইবন উমার, জাবির, আনাস, ওয়াসিলা (রা) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞান অর্জনের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ এবং রাসূলের (সা) মজলিসে উপস্থিতির ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদানের কারণে জীবনে তিনি এত ক্ষুধা ও দারিদ্র সহ্য করছেন যে তার সমকালীনদের মধ্যে কেউ তা করেননি। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

"মাঝে মাঝে আমি এত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়তাম যে, কষ্ট সহ্য করতে না পেরে রাসূলুল্লাহর কোন কোন সাহাবীর নিকট কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম অথচ আমি তা জানতাম। আমার উদ্দেশ্য হত, হয়ত তিনি আমার এ অবস্থা দেখতে পেয়ে আমাকে সংগে করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে আহার করাবেন।

একদিন আমার ভীষণ ক্ষুধা পেল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমি পেটে একটি পাথর বেঁধে নিলাম তারপর সাহাবীদের গমনাগমন পথে বসলাম। আবু বকরকে যেতে দেখে তাঁকে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মনে করেছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর সাথে যেতে বলবেন। কিন্তু তিনি ডাকলেন না।

তারপর এলেন উমার ইবনুল খাত্তাব। তাঁকেও একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও কিছু বললেন না। সবশেষে এলেন রাসূল (সা)। তিনি আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করলেন। বললেন, আবু হুরাইরা? বললাম লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ একথা বলে পেছনে পেছনে আমি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলাম। রাসূল (সা) বাড়ীতে ঢুকে এক পেয়ালা দুধ দেখতে পেলেন। বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'দুধ কোথা থেকে এসেছে?'

তাঁরা বললেন, 'আপনার জন্য অমুক পাঠিয়েছে।' রাসূল (সা) বললেন, 'আবু হুরাইরা তুমি আহলুস সুফফার নিকট গিয়ে তাদের একত্রিত কর।' একথা বলার পর আমি খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলাম। আমি মনে মনে বলেছিলাম ঃ মাত্র এক পেয়ালা দুধ, আহলুস সুফফার এতগুলি লোকের কি হবে? আমি চাচ্ছিলাম, প্রথমে আমি পেট ভরে পান করি, তারপর তাদের কাছে যাই। যাইহোক, আমি আহলুস সুফফার কাছে গেলাম এবং তাদের ডেকে একত্র করলাম। তারা সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসলে তিনি বললেন ঃ

আবু হুরাইরা, তুমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদের হাতে দাও। আমি এক এক করে সবার হাতে দিলাম এবং তারা সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হল। তারপর পেয়ালাটি হাতে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে এলাম। তিনি মাথা উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন ঃ

'তুমি আর আমিই বাকী আছি।' বললাম ঃ 'সাদাকতা ইয়া রাসূলুল্লাহ– সত্যই বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল।' তিনি বললেন, 'তুমি পান কর' আমি পান করলাম। তিনি বললেন, 'আরও পান কর।' আমি আরও পান করলাম। এভাবে তিনি বার বার পান করতে বললেন, আর আমি বার বার পান করলাম। শেষে আমি বললাম, 'যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আমি আর পান করতে পারছিনে।' অতঃপর রাসূল (সা) পেয়ালাটি হাতে নিয়ে বাকীটুকু পান করলেন।

এত চরম দারিদ্র ও দুরবস্থার মধ্যে আবু হুরাইরাকে অবশ্য বেশী দিন থাকতে হয়নি। অল্প কালের মধ্যেই মুসলমানদের হাতে ধন ও ঐশ্বর্য আসে। চতুর্দিক থেকে প্রবহমান গতিতে গনিমাতের মাল মুসলমানদের হাতে আসতে থাকে। আবু হুরাইরা অর্থ, বাড়ী, ভূ-সম্পত্তি, স্ত্রী ও সন্তানাদি– সবকিছুর অধিকারী হন। কিন্তু এসব তাঁর মহান অন্তকরণের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি তাঁর অতীত দিনের কথা একদিনের জন্যও ভুলেননি। সবসময় তিনি বলতেন ঃ

"ইয়াতীম অবস্থায় বড় হয়েছি, রিক্ত হস্তে হিজরাত করেছি। পেটেভাতে, বুসরা বিনতু গাযওয়ানের মজদুরী খেটেছি। তারা যখন কোথাও তাঁবু ফেলত, তাদের নানা রকম ফুটফরমাশ পালন করতাম আর যখন তারা বাহনে আরোহণ করত, তাদের উটগুলি তাড়িয়ে নিতাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বুসরাকে আমার স্ত্রী হিসাবে দান করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং আবু হুরাইরাকে সে দ্বীনের একজন নেতা বানিয়ে দিয়েছেন।"

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) আবু হুরাইরাকে বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তাঁকে অপসারণ করেন। তারপর আবার নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং মদীনা ত্যাগ করে আকীক নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।

হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলে আবু হুরাইরা একাধিকবার মদীনার শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে শাসন ক্ষমতা তাঁর স্বভাবগত মহত্ব, উদারতা ও অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলীতে কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারেনি।

আবু হুরাইরা তখন মদীনার শাসক। নিজ পরিবারের জন্য কাঠের বোঝা পিঠে চাপিয়ে মদীনার একটি রাস্তা দিয়ে তিনি চলছেন। পথে সা'লাবা ইবন মালিকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, 'সা'লাবা, আমীরের জন্য পথটা একটু ছেড়ে দাও।' সা'লাবা বললেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। এত প্রশস্ত পথ দিয়েও আপনি যেতে পারছেন না?' তিনি বললেন, 'তোমাদের আমীর ও তার পিঠের বোঝাটির জন্য পথটা প্রশস্ত করে দাও।'

অগাধ জ্ঞান, সীমাহীন বিনয় ও উদারতার সাথে আবু হুরাইরার মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ প্রীতির এক পরম সম্মিলন ঘটেছিল। তিনি দিনে রোযা রাখতেন, রাতের তিন ভাগের প্রথম ভাগ নামাযে অতিবাহিত করতেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে দিতেন। তিনি রাতের দ্বিতীয় ভাগ নামাযে কাটিয়ে তাঁদের কন্যাকে জাগিয়ে দিতেন। কন্যা রাতের বাকী অংশটুকু নামাযে দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করতেন। এভাবে তাঁর বাড়ীতে সমগ্র রাতের মধ্যে ইবাদত কখনও বন্ধ হত না।

ইকরিমা বলেন, আবু হুরাইরা প্রতিদিন বার হাজার বার তাসবীহ পাঠ করতেন। তিনি বলতেন ঃ 'আমি আমার প্রতিদিনের পাপের সম পরিমাণ তাস্‌বীহ পাঠ করে থাকি।'

আবু হুরাইরার একটি নিগ্রো দাসী ছিল। একদিন তার আচরণে তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। চাবুকটি উঠিয়ে

আবার থেমে গেলেন। বললেন, 'কিয়ামাতের দিন যদি এর বদলার ভয় না করতাম তাহলে চাবুক মেরে তোমাকে কষ্ট দিতাম, যেমন তুমি আমাদের দিয়েছ। তবে তোমাকে আমি এমন একজনের কাছে বিক্রি করবো যিনি আমাকে তোমার ন্যায্য মূল্যই দেবেন। আর আমিও এ মূল্যেরই অধিকতর মুখাপেক্ষী। যাও আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে আমি আযাদ করে দিলাম।'

আবু হুরাইরার মেয়ে একদিন বললেন, 'আব্বা, অন্য মেয়েরা আমাকে লজ্জা দেয়। তারা বলে তোমার আব্বা তোমাকে সোনার গহনা বানিয়ে দেন না কেন?'

তিনি বললেন, 'বেটী, তাদের তুমি বলো, আমার আব্বা জাহান্নামের লেলিহান শিখার ভয় করেন।' মেয়েকে সোনার গহনা না দেওয়ার কারণ ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর লালসা ও কৃপণতা নয়। তিনি তো আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে সবসময় ছিলেন দরাজ-হস্ত। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে ইতিহাসে অনেক কথাই আছে। একদিন মারওয়ান ইবনুল হিকাম একশ' দিনার আবু হুরাইরার কাছে পাঠালেন। কিন্তু পরের দিনই মারওয়ান আবার লোক পাঠিয়ে জানালেন, 'আমার চাকরটি ভুলক্রমে দিনারগুলি আপনাকে দিয়ে এসেছে, ওগুলি আমি আপনাকে দিতে চাইনি, বরং অন্য এক ব্যক্তিকে দিতে চেয়েছিলাম' একথা শুনে আবু হুরাইরা লজ্জা ও বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ

'আমি তো সেগুলি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেলেছি। রাত পোহানো পর্যন্ত একটি দিনারও আমার কাছে ছিলনা। আগামীতে বাইতুল মাল থেকে যখন আমার ভাতা দেওয়া হবে, সেখান থেকে নিয়ে নেবেন।' আসলে মারওয়ান তাঁকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছিলেন।

মা যতদিন জীবিত ছিলেন আবু হুরাইরা তাঁর সাথে সর্বদা সদাচরণ করেছেন। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হতেন, মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে বলতেন, 'মা' আস্‌সালামু আলাইকি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।'

জবাবে মা বলতেন, 'প্রিয় সন্তান, ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।'

সালাম বিনিময়ের পর আবু হুরাইরা বলতেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর দয়া ও অনুগ্রহ করুন, যেমন আপনি করেছেন ছোট্ট বেলায় আমার ওপর।' মা বলতেন, 'বড় হয়ে আমার সাথে তুমি যে সদাচরণ করেছ, তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন।' বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পর মাতা-পুত্রের মধ্যে এরূপ দু'আ ও সালাম বিনিময় হতো।

আবু হুরাইরা নিজে যেমন মুরুব্বিজনদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, তেমনি সকলকে তিনি উপদেশ দিতেন মাতাপিতার সাথে সদাচরণের, আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক কায়েম রাখার। একদিন তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়স্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সংগের লোকটি তোমার কি হয়?'

সে বলল 'আব্বা।'

তিনি বললেন, 'তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে না এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।'

অন্তিম রোগ শয্যায় তিনি আকুল হয়ে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করা হলো কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, 'তোমাদের এ দুনিয়ার জন্য আমি কাঁদছি না। কাঁদছি, দীর্ঘ ভ্রমণ ও স্বল্প পাথেয়'র কথা চিন্তা করে। যে রাস্তাটি জান্নাতে বা জাহান্নামে গিয়ে পৌঁছেছে, আমি এখন সে রাস্তার শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি। জানিনে, আমি সেই দু'টি রাস্তার কোনটিতে যাব।'

অন্তিম রোগ শয্যায় তিনি শায়িত। মারওয়ান ইবনুল হিকাম তাঁকে দেখতে এলেন। বললেন, 'আবু হুরাইরা, আল্লাহ আপনাকে শিফা দান করুন।'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ, আমি আপনার দিদার ভালবাসি, আপনিও আমার দিদার পছন্দ করুন এবং আমার জন্য তা তাড়াতাড়ি করুন।'

মারওয়ান তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বের হতে না হতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন, 'ওয়ালিদ বিন উকবা' আসরের নামাযের পর তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। হযরত ইবন উমার, আবু সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ সাহাবী তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ালিদ তাঁর মৃত্যুর খবর হযরত মুয়াবিয়াকে অবহিত করলে তিনি তাঁকে লিখেন, 'তাঁর উত্তরাধিকারীদের খুঁজে বের করে দশ হাজার দিরহাম দাও এবং তাঁর প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ কর। কারণ, উসমানের গৃহবন্দী অবস্থায় তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

আল্লামা ইবন হাজার আসকিলানী *'আল ইসাবা'* গ্রন্থে আবু সুলাইমানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবু হুরাইরা আটাত্তর বছর জীবন লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন কালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছরের কিছু বেশী। অনেকের মতে তিনি ৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন; কিন্তু ওয়াকিদীর মতে তাঁর মৃত্যুসন ৫৯ হিজরী। তবে ইমাম বুখারীর মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫৭।

আবু যার আল-গিফারী (রা)

বাইরের জগতের সাথে মক্কার সংযুক্তি ঘটিয়েছে যে 'অদ্দান' উপত্যকাটি, সেখানেই ছিল 'গিফার' গোত্রের বসতি। মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা ওখান দিয়ে সিরিয়া যাতায়াত করত। এসব কাফিলার নিরাপত্তার বিনিময়ে যে সামান্য অর্থ লাভ করতো তা দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। ডাকাতি, রাহাজানিও ছিল তাদের পেশা। যখন কোন বাণিজ্য কাফিলা তাদের দাবী অনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী বা অর্থ আদায় করত না তখন তারা লুটতরাজ চালাতো।

জুনদুব ইবন জুনাদাহ, আবু যার নামেই যিনি পরিচিত– তিনিও ছিলেন এ কবীলারই সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসীম সাহস, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টির জন্য ছিলেন সকলের থেকে স্বতন্ত্র। জাহিলী যুগে জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর পেশাও ছিল রাহাজানি। 'গিফার' গোত্রের একজন দুঃসাহসী ডাকাত হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটে গেল এক বিপ্লব। তাঁর গোত্রীয় লোকেরা এক আল্লাহ ছাড়া যে সকল মূর্তির পূজা করত, তাতে তিনি গভীর ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন। সমগ্র আরব বিশ্বে সেসময় যে ধর্মীয় অনাচার, অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সয়লাব চলছিল তা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করতে থাকেন এমন একজন নবীর, যিনি মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তাদের নিয়ে আসবেন।

তিনি রাহাজানি পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যখন সমগ্র আরব দেশ গুমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল। হযরত আবু মা'শার বলেন ঃ 'আবু যার জাহিলী যুগেই মুওয়াহহিদ বা একত্ববাদী ছিলেন। এক আল্লাহ ছাড়া কাকেও তিনি উপাস্য বলে বিশ্বাস করতেন না, অন্য কোন মূর্তি বা দেবদেবীর পূজাও করতেন না। তাঁর বিশ্বাস ও আল্লাহর ইবাদাত মানুষের কাছে পরিচিত ছিল। এ কারণে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের সংবাদ তাঁকে দিয়েছিল, বলেছিল ঃ

"আবু যার, তোমার মত মক্কার এক ব্যক্তি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে থাকেন।"

তিনি কেবল মুখে মুখেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই জাহিলী যুগে নামাযও আদায় করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাতের তিন বছর পূর্ব থেকেই নামায আদায় করতাম।' লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাকে উদ্দেশ্য করে?' বললেন ঃ 'আল্লাহকে।' আবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কোন দিকে মুখ করে?' বলেছিলেন ঃ 'যে দিকে আল্লাহ ইচ্ছা করতেন।'

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও বেশ চমকপ্রদ। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে বসবাস করছিলেন। একদিন সংবাদ পেলেন, মক্কায় এক নতুন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি তাঁর ভাই আনিসকে ডেকে বললেন ঃ

'তুমি একটু মক্কায় যাবে। সেখানে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন এবং

আসমান থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তাঁর মুখের কিছু কথা শুনবে। তারপর ফিরে এসে আমাকে অবহিত করবে।'

আনিস মক্কায় চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিজ গোত্রে ফিরে এলেন। আবু যার খবর পেয়ে তখুনি ছুটে গেলেন আনিসের কাছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে নতুন নবী সম্পর্কে নানান কথা তাকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। আনিস বললেন ঃ

– 'কসম আল্লাহর। আমি তো লোকটিকে দেখলাম, মানুষকে তিনি মহৎ চরিত্রের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। আর এমন সব কথা বলেন যা কাব্য বলেও মনে হলো না।'

– 'মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী বলাবলি করে?'

– 'কেউ বলে তিনি একজন যাদুকর, কেউ বলে গণক, আবার কেউ বলে কবি।'

– 'আল্লাহর কসম! তুমি আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারলে না, আমার আকাঙ্খাও পূরণ করতে সক্ষম হলে না। তুমি কি পারবে আমার পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে, যাতে আমি মক্কায় গিয়ে স্বচক্ষেই তাঁর অবস্থা দেখে আসতে পারি?'

– 'নিশ্চয়ই। তবে আপনি মক্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন।'

পরদিন প্রত্যুষে আবু যার চললেন মক্কার উদ্দেশ্যে। সংগে নিলেন কিছু পাথেয় ও এক মশক পানি। সর্বদা তিনি শঙ্কিত, ভীতচকিত। না জানি কেউ জেনে ফেলে তাঁর উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় তিনি পৌঁছলেন মক্কায়। কোন ব্যক্তির কাছে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞেস করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। কারণ, তাঁর জানা নেই এ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিটি মুহাম্মাদের (সা) বন্ধু না শত্রু।

দিনটি কেটে গেল। রাতের আঁধার নেমে এল। তিনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। বিশ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি শুয়ে পড়লেন মাসজিদুল হারামের এক কোণে। আলী ইবন আবী তালিব যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়েই। দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, লোকটি মুসাফির। ডাকলেন, 'আসুন, আমার বাড়ীতে।' আবু যার গেলেন তাঁর সাথে এবং সেখানেই রাতটি কাটিয়ে দিলেন। সকাল বেলা পানির মশক ও খাবারের পুটলিটি হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলেন মসজিদে। তবে দু'জনের একজনও একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

পরের দিনটিও কেটে গেল। কিন্তু নবীর সংগে পরিচয় হলো না। আজও তিনি মাসজিদেই শুয়ে পড়লেন। আজও আলী (রা) আবার সে পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। বললেন ঃ ব্যাপার কি, লোকটি আজও তাঁর গন্তব্যস্থল চিনতে পারেনি? তিনি তাকে আবার সংগে করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ রাতটিও সেখানে কেটে গেল। এদিনও কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। একইভাবে তৃতীয় রাতটি নেমে এলো। আলী (রা) আজ বললেন ঃ

– 'বলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন?'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন আমার কাঙ্খিত বিষয়ের

দিকে আমাকে পথ দেখাবেন, তাহলে আমি বলতে পারি।' আলী (রা) অঙ্গীকার করলেন। আবু যার বললেন।

'আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছি, নতুন নবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং তিনি যেসব কথা বলেন তার কিছু শুনতে।'

আলীর (রা) মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি নিশ্চিত সত্য নবী।' একথা বলে তিনি নানাভাবে নবীর (সা) পরিচয় দিলেন। তিনি আরও বললেন, "সকালে আমি যেখানে যাই, আপনি আমাকে অনুসরণ করবেন। যদি আমি আপনার জন্য আশংকাজনক কোন কিছু লক্ষ্য করি তাহলে প্রস্রাবের ভান করে দাঁড়িয়ে যাব। আবার যখন চলবো, আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন। এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করি আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।"

প্রিয় নবীর দর্শন লাভ ও তাঁর ওপর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করার প্রবল আগ্রহ ও উৎকণ্ঠায় আবু যার সারাটি রাত বিছানায় স্থির হতে পারলেন না। পরদিন সকালে মেহমান সংগে করে আলী (রা) চললেন রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীর দিকে। আবু যার তাঁর পেছনে পেছনে। পথের আশপাশের কোন কিছুর প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। এভাবে তাঁরা পৌঁছলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। আবু যার সালাম করলেন।

– 'আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) জবাব দিলেন,

– 'ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।'

এভাবে আবু যার সর্বপ্রথম ইসলামী কায়দায় রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাম পেশ করার গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর সালাম বিনিময়ের এ পদ্ধতিই গৃহীত ও প্রচারিত হয়।

রাসূল (সা) আবু যারকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআনের কিছু আয়াতও তিলাওয়াত করে শুনালেন। সেখানে বসেই আবু যার কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে নতুন দ্বীনের মধ্যে প্রবেশের ঘোষণা দিলেন।

এর পরের ঘটনা আবু যার এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে আমি মক্কায় অবস্থান করতে লাগলাম। তিনি আমাকে ইসলামের নানান বিষয় শিক্ষা দিলেন, কুরআনের কিছু আয়াত পাঠের প্রশিক্ষণও দিলেন। আমাকে বললেন ঃ 'মক্কায় কারও কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করবে না। কেউ জানতে পেলে আমি তোমার জীবনের আশংকা করছি।'

বললাম, 'যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি মক্কা ছেড়ে যাবনা, যতক্ষণ না মাসজিদে গিয়ে কুরাইশদের মাঝে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি।' রাসূল (সা) চুপ হয়ে গেলেন।

আমি মাসজিদে এলাম। কুরাইশরা তখন একত্রে বসে গল্প গুজব করছে। আমি তাদের মাঝখানে হাজির হয়ে যতদূর সমস্ত উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করে বললাম, "কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

আমার কথাগুলি তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তারা ভীত-চকিত হয়ে পড়লো।

একযোগে তারা লাফিয়ে উঠে বলল ঃ এই ধর্মত্যাগীকে ধর। তারা দৌড়ে এসে আমাকে বেদম প্রহার শুরু করলো। রাসূলের (সা) চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব দেখে চিনতে পারলেন। তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর তাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা নিপাত যাও! গিফারী গোত্রের এবং তোমাদের বাণিজ্য কাফিলার গমনাগমন পথের লোককে হত্যা করছো? তারা আমাকে ছেড়ে দিল।

একটু সুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ফিরে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, 'তোমাকে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলাম না?' বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিজের মধ্যে আমি প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিলাম। সে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছি মাত্র।' তিনি বললেন, "তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও। যা দেখে গেলে এবং যা কিছু শুনে গেলে তাদের অবহিত করবে, তাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে। হতে পারে আল্লাহ তোমার দ্বারা তাদের উপকৃত করবেন এবং তোমাকে প্রতিদান দেবেন। যখন তুমি জানবে, আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিচ্ছি, আমার কাছে চলে আসবে।"

আমি ফিরে এলাম আমার গোত্রীয় লোকদের আবাসভূমিতে। আমার ভাই আনিস এলো আমার সংগে সাক্ষাৎ করতে। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কি করলেন?' বললাম, 'ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হয়েছি।' তক্ষুণি আল্লাহ তার অন্তর-দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেন। সে বলল, 'আপনার দ্বীন প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা আমার নেই। আমি ইসলাম গ্রহণ করে বিশ্বাসী হলাম।' তারপর আমরা দু'ভাই একত্রে আমাদের মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিলাম।' 'তোমাদের দু'ভাইয়ের দ্বীনের প্রতি আমার কোন অনীহা নেই'– একথা বলে তিনিও ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিলেন।

সেইদিন থেকে এই বিশ্বাসী পরিবার নিরলসভাবে গিফার গোত্রের মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকে। এ কাজে কখনও তারা হতাশ হননি, কখনও মনোবল হারাননি। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টায় এ গোত্রের বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে নামাযের জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এক দল লোক বলে, আমরা আমাদের ধর্মের ওপর অটল থাকবো। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। রাসূলের (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তারাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ গিফার গোত্র সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "গিফার গোত্র– আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন, আর আসলাম গোত্র- আল্লাহ তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়েছেন।"

আবু যার মক্কা ফিরে এসে গোত্রীয় লোকদের সাথে মরুভূমিতে অবস্থান করতে থাকেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মদীনায় এলেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য অবলম্বন করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আবেদন করলেন তাঁর খিদমতের সুযোগ দানের জন্য। তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করা হল। মদীনায় অবস্থানকালে সবটুকু সময় তিনি অতিবাহিত করতেন রাসূলুল্লাহর (সা) সেবায়। এটাই ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয় কাজ। তিনি নিজেই বলতেন ঃ

"রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমত করতাম, আর অবসর সময়ে মাসজিদে এসে বিশ্রাম নিতাম।"

ইবন ইসহাক বলেন ঃ আবু যার হিজরাত করে মদীনায় এলে রাসূল (সা) মুনজির ইবন 'আমর ও আবু যারের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মত হল, আবু যার মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদীনায় হিজরাত করে এসেছিলেন। সুতরাং ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের নিয়মটি তখন রহিত হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে তাঁর যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিস্তারিত তথ্য জানা যায় না। তবে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের একটি ঘটনা আল্লামা ইবন হাজার আসকিলানী– *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন লোকেরা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে ইতঃস্তত ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। কোন ব্যক্তিকে দেখা না গেলে সাহাবীরা বলতেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক আসেনি।' জবাবে তিনি বলতেন, 'যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় তাহলে শিগগিরই আল্লাহ তাকে তোমাদের সাথে মিলিত করবেন। অন্যথায় আল্লাহ তাকে তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার দিক থেকে তোমাদের নিরাপদ করেছেন।' এক সময় আবু যারের নামটি উল্লেখ করে বলা হল 'সেও পিঠটান দিয়েছে।' প্রকৃত ঘটনা হল, তাঁর উটটি ছিল মন্থরগতি। প্রথমে তিনি উটটিকে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নিজের কাঁধে উঠিয়ে পায়ে হাঁটা শুরু করেন এবং অগ্রবর্তী মানযিলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন। এক সাহাবী দূর থেকে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, রাস্তা দিয়ে কে যেন একজন আসছে।' তিনি বললেন ঃ 'আবু যারই হবে।' লোকেরা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে চিনতে পারল। বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, এতো আবু যারই।' তিনি বললেন ঃ

يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَاذَرٍ يَمْشِىْ وَحْدَهُ وَيَمُوْتُ وَحْدَهُ وَيُحْشَرُ وَحْدَهُ -

– 'আল্লাহ আবু যারের ওপর রহম করুন। সে একাকী চলে, একাকীই মরবে, কিয়ামাতের দিন একাই উঠবে।' (তারীখুল ইসলাম ঃ আল্লামা জাহাবী, ৩য় খণ্ড) রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত আবু যার ছিলেন প্রকৃতিগতভাবেই সরল, সাদাসিধে, দুনিয়া বিরাগী ও নির্জনতা-প্রিয় স্বভাবের। এ কারণে রাসূলে পাক (সা) তাঁর লকব দিয়েছিলেন– 'মসিহুল ইসলাম'। রাসূলের (সা) ওফাতের পর তিনি দুনিয়ার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। প্রিয় নবীর বিচ্ছেদে তাঁর অন্তর অভ্যন্তরে যে দাহ শুরু হয়েছিল তা আর কখনও প্রশমিত হয়নি। এ কারণে হযরত আবু বকরের ইনতিকালে তাঁর ভগ্ন হৃদয় আরও চুরমার হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে তখন মদীনার সুশোভিত উদ্যানটি পত্র-পল্লববিহীন বলে প্রতিভাত হয়। তিনি মদীনা ত্যাগ করে শামে (সিরিয়া) প্রবাসী হন।

আবু বকর ও উমারের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত ইসলামের সহজ ও সরল জীবন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বিজয় ও ইসলামী খিলাফতের বিস্তৃতির সাথে যখন ধন ও ঐশ্বর্যের

প্রাচুর্য দেখা দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই চাকচিক্য ও জৌলুস সে স্থান দখল করে নেয়। হযরত উসমানের (রা) যুগেই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শানশওকাতের সূচনা হয়। সাধারণ জনজীবনেও এর কিছুটা প্রভাব পড়ে। তাদের মধ্যে নবীর (সা) আমলের সরলতার পরিবর্তে ভোগ ও বিলাসিতার ছাপ ফুটে ওঠে। আবু যার মানুষের কাছে নবীর (সা) আমলের সেই সহজসরল আড়ম্বরহীন জীবনধারার অনুসরণ আশা করতেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল সকলেই তাঁর মত ধন-দৌলতের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হউক। তাঁর আল্লাহ নির্ভর বিশ্বাস ও মতবাদে আগামীকালের জন্য কোন কিছুই আজ সঞ্চয় করা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্যকে অভুক্ত ও উলংগ রেখে সম্পদ পুঞ্জিভূত করার কোন অধিকার কোন মুসলিমের নেই। হযরত মুআবিয়া (রা) ও অন্যান্য আমীরগণ মনে করতেন, সম্পদশালী লোকদের ওপর আল্লাহ যে যাকাত ফরয করেছেন তা সঠিকভাবে আদায় করার পর অতিরিক্ত অর্থ জমা করার ইখতিয়ার প্রতিটি মুসলিমের আছে। এ মতপার্থক্য বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া ও বচসার রূপ লাভ করে। আবু যার অত্যন্ত নির্ভীকভাবে ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণে তাদের কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের লক্ষ্যবস্তু বলে গণ্য করতে থাকেন। وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - (التوبة: ٣٤)

– 'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।' (আত্ তাওবাহ ঃ ৩৪)

এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের আলোচনা এসেছে। এ কারণে আমীর মুআবিয়ার বক্তব্য ছিল, এ আয়াতের সম্পর্ক ঐ সব বিধর্মীদের সাথে। আর আবু যার মনে করেন, আয়াতটির উদ্দেশ্য মুসলিম অমুসলিম সকলেই। দ্বিতীয়তঃ আবু যার আল্লাহর পথে ব্যয় না করার অর্থ এই বুঝাতেন যে, সে নিজের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেয় না। আর আমীর মুআবিয়ার ধারণা ছিল এটা কেবল যাকাতের সাথে সম্পৃক্ত। এভাবে হযরত আবু যার স্বীয় চিন্তা-দর্শন ও মত অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোরভাবে সমালোচনা আরম্ভ করেন। হযরত মুআবিয়া (রা) মনে করেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে শামে যে কোন সময় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তিনি খলীফা উসমানকে (রা) নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং অনুরোধ করলেন তিনি যেন আবু যারকে মদীনায় তলব করেন। হযরত উসমান তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান।

একদিন আবু যার বসে আছেন। তাঁরই সামনে খলীফা 'উসমান (রা) কা'বকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ পুঞ্জিভূত করে, তার যাকাত দেয় এবং আল্লাহর পথে ব্যয়ও করে– এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন?' কা'ব (রা) বললেন ঃ 'এ ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো আশা পোষণ করা যায়।' এ কথা শুনে আবু যার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কা'বের মাথার ওপর হাতের লাঠিটি তুলে ধরে বললেন, 'ইয়াহুদী নারীর সন্তান, (কা'ব ইয়াহুদীর সন্তান ছিলেন) তুমি এর মর্ম কি বুঝবে।

কিয়ামাতের দিন এমন ব্যক্তির অন্তরকেও বৃশ্চিক দংশন করবে।' হযরত উসমান শেষ পর্যন্ত আবু যারকে বললেন, 'আপনি আমার কাছে থাকুন, দুগ্ধবতী উটনী প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আপনার দরজায় হাজির হবে।' জবাবে তিনি বললেন ঃ 'তোমার এ দুনিয়ার কোন প্রয়োজন আমার নেই।' এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। অবশেষে হযরত উসমান তাঁকে অনুরোধ জানালেন, মদীনা থেকে বহুদূরে মরুভূমির মাঝখানে 'রাবজা' নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করার জন্য। অনেকের মতে তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। লোকালয়ে থেকে বহুদূরে নির্জন প্রান্তরে ভোগ বিলাসী জীবনকে পরিহার করে আল্লাহর রাসূলের (সা) পরকাল-আসক্ত জীবনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে আমরণ সেখানে পড়ে থাকেন। হযরত আবু যারের ওফাতের কাহিনীটিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং চমকপ্রদও বটে। হিজরী ৩১ মতান্তরে ৩২ সনে তিনি 'রাবজা'র মরুভূমিতে ইনতিকাল করেন। তাঁর সহধর্মিনী তাঁর অন্তিমকালীন অবস্থা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"আবু যারের অবস্থা যখন খুবই খারাপ হয়ে পড়লো, আমি তখন কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, কাঁদছো কেন? বললাম ঃ এক নির্জন মরুভূমিতে আপনি পরকালের দিকে যাত্রা করছেন। এখানে আমার ও আপনার ব্যবহৃত বস্ত্র ছাড়া অতিরিক্ত এমন বস্ত্র নেই যা দ্বারা আপনার কাফন দেওয়া যেতে পারে। তিনি বললেন ঃ কান্না থামাও। তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। রাসূল (সা)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'যে মুসলিমের দুই অথবা তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য তাই-ই যথেষ্ট। তিনি কতিপয় লোকের সামনে, তার মধ্যে আমিও ছিলাম, বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে একজন মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মরণ সময়ে মুসলিমদের একটি দল সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত হবে।' আমি ছাড়া সেই লোকগুলির সকলেই লোকালয়ে ইন্তিকাল করেছে। এখন একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সে ব্যক্তি আমি। আমি কসম করে বলছি, আমি মিথ্যা বলছিনা এবং যিনি এ কথা বলেছিলেন তিনিও কোন মিথ্যা বলেননি। তুমি রাস্তার দিকে চেয়ে দেখ গায়েবী সাহায্য অবশ্যই এসে যাচ্ছে।' আমি বললাম ঃ 'এখন তো হাজীদেরও প্রত্যাবর্তন শেষ হয়েছে, রাস্তায়ও লোক চলাচল বন্ধ।' তিনি বললেন, 'না' তুমি যেয়ে দেখ।' সুতরাং এক দিকে দৌড়ে গিয়ে টিলার ওপর উঠে দূরে তাকিয়ে দেখছিলাম, অপর দিকে ছুটে এসে তাঁর শুশ্রূষা করছিলাম। এরূপ ছুটাছুটি ও অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় দূরে কিছু আরোহী দৃষ্টিচোগর হলো। আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা দ্রুতগতিতে আমার নিকট এসে থেমে গেল। আবু যার সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করলো, 'ইনি কে?' বললাম ঃ 'আবু যার।' 'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী?' বললাম ঃ 'হাঁ।' 'মা বাবা কুরবান হউক'– একথা বলে তারা আবু যারের কাছে গেল। আবু যার প্রথমে তাদেরকে রাসূলের (সা) ভবিষ্যৎ বাণী শুনালেন। তারপর অসিয়ত করলেন, 'যদি আমার নিকট অথবা আমার স্ত্রীর নিকট থেকে কাফনের পরিমাণ কাপড় পাওয়া যায় তাহলে তা দিয়েই আমাকে দাফন দেবে।' তারপর তাদেরকে কসম দিলেন, যে ব্যক্তি সরকারের ক্ষুদ্রতম পদেও অধিষ্ঠিত সে যেন তাঁকে কাফন না পরায়। ঘটনাক্রমে এক আনসারী

যুবক ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য সকলেই কোন না কোন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবু যার তাকেই কাফন পরাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ কাফিলাটি ছিল ইয়ামনী। তারা কুফা থেকে আসছিল। আর তাদের সাথে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)। এ কাফিলার সাথে তিনি ইরাক যাচ্ছিলেন। তিনিই আবু যারের জানাযার ইমামতি করেন এবং সকলে মিলে তাঁকে 'রাবজার' মরুভূমিতে দাফন করেন।'

হযরত আবু যার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট আটাশ। তন্মধ্যে বারোটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। দু'টি বুখারী ও সাতটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম হওয়ার কারণ তিনি সবসময় চুপচাপ থাকতেন, নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং মানুষের সাথে মেলামেশা কম করতেন। এ কারণে তাঁর জ্ঞানের তেমন প্রচার হয়নি। অথচ হযরত আনাস ইবন মালিক, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস প্রমুখের ন্যায় বিদ্বান সাহাবীগণ তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। ইবন আসাকির তাঁর *'তারীখে দিমাশক'* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত আলীকে (রা) আবু যারের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, 'এমন জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন যা মানুষ অর্জন করতে অক্ষম। তারপর সে জ্ঞান আগুনে সেক দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু তা থেকে কোন খাদ বের হয়নি।' এ মহান সাধক ও দুনিয়া নিরাসক্ত সাহাবী সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'আসমানের নীচে ও যমীনের ওপরে আবু যার সর্বাধিক সত্যবাদী ব্যক্তি।'

হযরত উসমানের খিলাফতকালে আবু যার একবার হজ্জে গেলেন। এক ব্যক্তি এসে বলল, 'উসমান মিনায় অবস্থানকালে চার রাকা'আত নামায আদায় করেছেন (অর্থাৎ কসর করেননি)।' বিষয়টি তাঁর মনঃপূত হলো না। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর ও উমারের পেছনে আমি নামায আদায় করেছি। তাঁরা সকলে দু'রাকা'আত পড়েছেন।' একথা বলার পর তিনি নিজেই ইমামতি করলেন এবং চার রাকা'আতই আদায় করলেন। লোকেরা বলল, 'আপনিইতো আমীরুল মু'মিনীনের সমালোচনা করলেন আর এখন নিজেই চার রাকাআত আদায় করলেন।' তিনি বললেন, "মতভেদ খুবই খারাপ বিষয়। রাসূল (সা) বলেছেন, 'আমার পরে যারা আমীর হবে তাদের অপমান করবেনা। যে ব্যক্তি তাদের অপমান করার ইচ্ছা করবে সে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু স্বীয় কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলবে এবং নিজের জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দেবে।" (মুসনাদে আহমাদ, ৫/১৬৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর যখনই পবিত্র নামটি তাঁর জিহ্বায় এসে যেত, চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। আহনাফ বিন কায়েস বর্ণনা করেন, "আমি একবার বাইতুল মাকদাসে এক ব্যক্তিকে একের পর এক সাজদাহ করতে দেখলাম। এতে আমার অন্তরে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। আমি যখন দ্বিতীয়বার তার কাছে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কি বলতে পারেন আমি জোড় না বেজোড় নামায আদায় করেছি?' তিনি বললেন, 'আমি না জানলেও আল্লাহ নিশ্চয়ই জানেন।'

তারপর বললেন ঃ 'আমার বন্ধু আবুল কাসিম আমাকে বলেছেন' এতটুকু বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আমার বন্ধু আবুল কাসিম আমাকে বলেছেন।' এবারও কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। অবশেষে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বললেন ঃ 'আমার বন্ধু আবুল কাসিম (সা) বলেছেন ঃ যে বান্দা আল্লাহকে একটি সাজদাহ্ করে, আল্লাহ্ তার একটি দরজা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করে একটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন।' জিজ্ঞেস করলাম, – আপনি কে? তিনি বললেন ঃ আবু যার-রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী।"

একদিন এক ব্যক্তি আবু যারের নিকট এলো। সে তাঁর ঘরের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখলো। গৃহস্থালীর কোন সামগ্রী দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলো,

– 'আবু যার, আপনার সামান-পত্র কোথায়?

– 'আখিরাতে আমার একটি বাড়ী আছে। আমার সব উৎকৃষ্ট সামগ্রী সেখানেই পাঠিয়ে দিই।'

একদা সিরিয়ার আমীর তাঁর নিকট তিনশ' দীনার পাঠালেন। আর বলে পাঠালেন, এ দ্বারা আপনি আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করুন। 'শামের আমীর কি আমার থেকে অধিকতর নীচ কোন আল্লাহর বান্দাকে পেলনা?'– একথা বলে তিনি দীনারগুলি ফেরত পাঠালেন।

সালমান আল-ফারেসী (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'সালমান নবী পরিবারেরই একজন।'

এটি একজন সত্য-সন্ধানী ও আল্লাহকে পাওয়ার অভিলাষী এক ব্যক্তির জীবন কথা। তিনি হযরত সালমান আল-ফারেসী। সালমান আল-ফারেসীর যবানেই তাঁর সেই সত্য প্রাপ্তির চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

আমি তখন পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলের একজন পারসী নওজোয়ান। আমার গ্রামটির নাম 'জায়্যান'। বাবা ছিলেন গ্রামের দাহকান-সর্দার। সর্বাধিক ধনবান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম তাঁর কাছে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচে বেশী প্রিয়। আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসাও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে কোন অমঙ্গলের আশংকায় তিনি আমাকে মেয়েদের মত ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন।

আমার বাবা-মার মাজুসী ধর্মে আমি কঠোর সাধনা শুরু করলাম এবং আমাদের উপাস্য আগুনের তত্ত্বাবধায়কের পদটি খুব তাড়াতাড়ি অর্জন করলাম। রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা উপাসনার সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্বটি আমার ওপর অর্পিত হয়।

আমার বাবা ছিলেন বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। তিনি নিজেই তা দেখাশুনা করতেন। তাতে আমাদের প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো। একদিন কোন কারণবশত তিনি বাড়িতে আটকে গেলেন, গ্রামের খামারটি দেখাশুনার জন্য যেতে পারলেন না। আমাকে ডেকে তিনি বললেন ঃ

'বেটা, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছো, বিশেষ কারণে আজ আমি খামারে যেতে পারছিনা। আজ বরং তুমি একটু সেখানে যাও এবং আমার তরফ থেকে সেখানকার কাজকর্ম তদারক কর।'

আমি খামারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে খৃষ্টানদের একটি গীর্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় তাদের কিছু কথার আওয়ায আমার কানে ভেসে এলো। তারা তখন প্রার্থনা করছিলো। এ আওয়াযই আমাকে সচেতন করে তোলে।

দীর্ঘদিন ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণে খৃষ্টান অথবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তাদের কথার আওয়ায শুনে তারা কি করছে তা দেখার জন্য আমি গীর্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলাম। গভীরভাবে তাদেরকে আমি নিরীক্ষণ করলাম। তাদের প্রার্থনা পদ্ধতি আমার খুবই ভালো লাগলো এবং আমি তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম ঃ আমরা যে ধর্মের অনুসারী তা থেকে এ ধর্ম অতি উত্তম। আমি খামারে না গিয়ে সে দিনটি তাদের সাথেই কাটিয়ে দিলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

– এ ধর্মের মূল উৎস কোথায়?

– শামে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আমি বাড়িতে ফিরে আসলাম। সারাদিন আমি কি কি করেছি,

বাবা তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

বললাম ঃ 'বাবা কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম তারা তাদের উপাসনালয়ে প্রার্থনা করছে। তাদের ধর্মের যেসব ক্রিয়াকাণ্ড আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা আমার খুবই ভালো লেগেছে। বেলা ডোবা পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই কাটিয়ে দিয়েছি।' আমার কথা শুনে বাবা শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ

'বেটা, সে ধর্মে কোন কল্যাণ নেই, তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম তা থেকেও উত্তম।' বললাম, 'আল্লাহর শপথ, কখনো তা নয়। তাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকেও উত্তম।'

আমার কথা শুনে বাবা ভীত হয়ে পড়লেন এবং আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি বলে তিনি আশংকা করলেন। তাই আমার পায়ে বেড়ী লাগিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখলেন।

আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই সে সুযোগ এসে গেল। গোপনে খৃষ্টানদের কাছে এই বলে সংবাদ পাঠালাম যে, শাম অভিমুখী কোন কাফিলা তাদের কাছে এলে তারা যেন আমাকে খবর দেয়।

কিছুদিনের মধ্যেই শাম অভিমুখী একটি কাফিলা তাদের কাছে এলো। তারা আমাকে সংবাদ দিল। আমি আমার বন্দীদশা থেকে পালিয়ে গোপনে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। তারা আমাকে শামে পৌছে দিল। শামে পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ

– এ ধর্মের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তারা বললো ঃ বিশপ, গীর্জার পুরোহিত।

আমি তাঁর কাছে গেলাম। বললাম ঃ আমি খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খিদমত করা, আপনার নিকট থেকে শিক্ষালাভ ও আপনার সাথে প্রার্থনা করা। তিনি বললেন ঃ ভেতরে এসো।

আমি ভেতরে ঢুকে তার কাছে গেলাম এবং তার খিদমত শুরু করে দিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি বুঝতে পারলাম লোকটি অসৎ। কারণ সে তার সংগী সাথীদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, সওয়াব লাভের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; কিন্তু যখন তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য তার হাতে কিছু তুলে দেয়, তখন সে নিজেই তা আত্মসাত করে এবং নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে রাখে। গরীব মিসকীনদের সে কিছুই দেয় না। এভাবে সে সাত কলস স্বর্ণ পুঞ্জিভূত করে।

তার এ চারিত্রিক অধপতন দেখে আমি তাকে ভীষণ ঘৃণা করতাম। কিছু দিনের মধ্যেই লোকটি মারা গেল। এলাকার খৃষ্টান সম্প্রদায় তাকে দাফনের জন্য সমবেত হলো। তাদেরকে আমি বললাম ঃ তোমাদের এ বন্ধুটি খুবই অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। তোমাদের সে দান খয়রাতের নির্দেশ দিত এবং সেজন্য তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতো। কিন্তু তোমরা যখন তা তার হাতে তুলে দিতে সে সবই আত্মসাত করতো। গরীব-মিসকীনদের কিছুই দিত না।

তারা জিজ্ঞেস করলো ঃ তুমি তা কেমন করে জানলে?

বললাম ঃ তোমাদেরকে আমি তার পুঞ্জিভূত সম্পদের গোপন ভাণ্ডার দেখাচ্ছি।

তারা বললো ঃ ঠিক আছে, তাই দেখাও।

আমি তাদেরকে গোপন ভাণ্ডারটি দেখিয়ে দিলে তারা সেখান থেকে সাত কলস সোনা-চান্দি উদ্ধার করে। এ দেখে তারা বললো ঃ

– আল্লাহর কসম আমরা তাকে দাফন করবো না।

তাকে তারা গুলিতে লটকিয়ে পাথর মেরে তার দেহ জর্জরিত করে দিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা অন্য এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করলো। আমি তাঁরও সাহচর্য গ্রহণ করলাম। এ লোকটি অপেক্ষা দুনিয়ার প্রতি অধিক উদাসীন, আখিরাতের প্রতি অধিক অনুরাগী ও রাতদিন ইবাদতের প্রতি বেশী নিষ্ঠাবান কোন লোক আমি এর আগে আর দেখিনি। আমি তাঁকে অত্যধিক ভালোবাসতাম। একটা দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে আমি কাটালাম। যখন তাঁর মরণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আমি তাঁকে বললাম ঃ

– জনাব, আপনার মৃত্যুর পর কার সাহচর্যে কাটাবার উপদেশ দিচ্ছেন আমাকে?

বললেন ঃ বেটা আমি যে সত্যকে আঁকড়ে রেখেছিলাম, এখানে সে সত্যের ধারক আর কাউকে আমি জানিনা। তবে মাওসেলে এক ব্যক্তি আছেন, নাম তাঁর অমুক, তিনি এ সত্যের এক বিন্দুও পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। তুমি তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করো।

আমার সে বন্ধুটির মৃত্যুর পর মাওসেলে গিয়ে তাঁর বর্ণিত লোকটিকে আমি খুঁজে বের করি। আমি তাঁকে আমার সব কথা খুলে বলি। একথাও তাঁকে আমি বলি যে, অমুক ব্যক্তি তাঁর অন্তিম সময়ে আমাকে আপনার সাহচর্য অবলম্বনের কথা বলে গেছেন। আর তিনি আমাকে একথাও বলে গেছেন যে, তিনি যে সত্যের ওপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আপনি সে সত্যকেই গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছে থাক।

আমি তাঁর কাছে থেকে গেলাম। তাঁর চালচলন আমার ভালোই লাগলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর মরণ সময় নিকটবর্তী হলে আমি তাঁকে বললাম ঃ

– জনাব, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আল্লাহর ফায়সালা আপনার কাছে এসে গেছে। আর আমার ব্যাপারটি তো আপনি অবগত আছেন। এখন আমাকে কার কাছে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন?

বললেন ঃ বেটা, আমরা যে জিনিসের ওপর ছিলাম, তার ওপর অটল আছে এমন কাউকে তো আমি জানিনা। তবে 'নাস্‌সিবীনে' অমুক নামে এক ব্যক্তি আছেন, তুমি তাঁর সাথে মিলতে পার।

তাঁকে কবর দেওয়ার পর আমি নাস্‌সিবীনের সেই লোকটির সাথে সাক্ষাত করলাম এবং আমার সমস্ত কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম। তিনি আমাকে তাঁর কাছে থেকে যেতে বললেন। আমি থেকে গেলাম। এ ব্যক্তিকেও পূর্ববর্তী দু'বন্ধুর মত নিষ্কলুষ চরিত্রের দেখতে পেলাম। আল্লাহর কি মহিমা, অল্পদিনের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। অন্তিম

সময়ে তাঁকে আমি বললাম ঃ আমার সম্পর্কে আপনি মোটামুটি সব কথা জানেন। এখন আমাকে কার কাছে যেতে বলেন?

তিনি বললেন ঃ অমুক নামে 'আম্মুরিয়াতে' এক লোক আছেন, তুমি তাঁরই সুহবত অবলম্বন করবে। এছাড়া আমাদের এ সত্যের ওপর অবশিষ্ট আর কাউকে তো আমি জানিনা। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি আমার সব কথা বললাম।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ আমার কাছে থাক। আল্লাহর কসম, তাঁর কাছে থেকে আমি দেখতে পেলাম তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সংগীদের মত একই মত ও পথের অনুসারী। তাঁর কাছে থাকাকালেই আমি অনেকগুলি গরু ও ছাগলের অধিকারী হয়েছিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পূর্ববর্তী সংগীদের যে পরিণতি দেখেছিলাম, সেই একই পরিণতি তাঁরও ভাগ্যে আমি দেখতে পেলাম। তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে আমি তাঁকে বললাম ঃ আমার অবস্থা তো আপনি ভালোই জানেন। এখন আমাকে কি করতে বলেন, কার কাছে যেতে পরামর্শ দেন?

বললেন ঃ বৎস! আমরা যে সত্যকে ধরে রেখেছিলাম, সে সত্যের ওপর ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে বলে আমার জানা নেই। তবে, অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন নতুনভাবে নিয়ে আসবেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বড় বড় কালো পাথরের যমীনের মাঝখানে খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরাত করবেন। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শনও তাঁর থাকবে। তিনি হাদিয়ার জিনিস তো খাবেন; কিন্তু সাদকার জিনিস খাবেন না। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তুমি পারলে সে দেশে যাও।

এরপর তিনি মারা গেলেন। আমি আরো কিছুদিন আম্মুরিয়াতে কাটালাম। একদিন সেখানে 'কালব' গোত্রের কিছু আরব ব্যবসায়ী এলো। আমি তাদেরকে বললাম ঃ আপনারা যদি আমাকে সংগে করে আরব দেশে নিয়ে যান, বিনিময়ে আমি আপনাদেরকে আমার এ গরু ছাগলগুলি দিয়ে দেব। তাঁরা বললেন ঃ ঠিক আছে, আমরা তোমাকে সংগে করে নিয়ে যাব।

আমি তাঁদেরকে গরু-ছাগলগুলি দিয়ে দিলাম। তাঁরা আমাকে সংগে নিয়ে চললেন। যখন আমরা মদীনা ও শামে'র মধ্যবর্তী 'ওয়াদী আল-কুরা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তাঁরা আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক ইহুদীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিল। আমি তার দাসত্ব শুরু করে দিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বনী কুরাইজা গোত্রের তার এক চাচাতো ভাই আমাকে খরীদ করে এবং আমাকে 'ইয়াসরিবে' (মদীনা) নিয়ে আসে। এখানে আমি আম্মুরিয়ার বন্ধুটির বর্ণিত সেই খেজুর গাছ দেখতে পেলাম এবং তিনি স্থানটির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী শহরটিকে চিনতে পারলাম। এখানে আমি আমার মনিবের সাথে কাটাতে লাগলাম।

নবী (সা) তখন মক্কায় দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু দাস হিসাবে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বা আলোচনা আমার কানে পৌঁছেনি। কিছুদিনের

মধ্যে রাসূল (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে ইয়াসরিবে এলেন। আমি তখন একটি খেজুর গাছের মাথায় উঠে কি যেন কাজ করছিলাম, আমার মনিব গাছের নীচেই বসে ছিলো। এমন সময় তার এক ভাতিজা এসে তাকে বললো ঃ

আল্লাহ বনী কায়লাকে (আউস ও খাজরাজ গোত্র) ধ্বংস করুন। কসম খোদার, তারা এখন কুবাতে মক্কা থেকে আজই আগত এক ব্যক্তির কাছে সমবেত হয়েছে, যে কিনা নিজেকে নবী বলে মনে করে।

তার কথাগুলি আমার কানে যেতেই আমার গায়ে যেন জ্বর এসে গেল। আমি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করলাম। আমার ভয় হলো, গাছের নীচে বসা আমার মনিবের ঘাড়ের ওপর ধপাস করে পড়ে না যাই। তাড়াতাড়ি আমি গাছ থেকে নেমে এলাম এবং সেই লোকটিকে বললাম ঃ

– তুমি কি বললে? কথাগুলি আমার কাছে আবার বলো তো।

আমার কথা শুনে আমার মনিব রেগে ফেটে পড়লো এবং আমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বললো ঃ

– এর সাথে তোমার সম্পর্ক কি? যাও, তুমি যা করছিলে তাই কর।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার সংগৃহীত খেজুর থেকে কিছু খেজুর নিয়ে রাসূল (সা) যেখানে অবস্থান করছিলেন সেদিকে রওয়ানা হলাম। রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছে তাঁকে বললাম ঃ

– আমি শুনেছি আপনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। আপনার কিছু সহায়-সম্বলহীন সঙ্গী-সাথী আছেন। এ সামান্য কিছু জিনিস সদকার উদ্দেশ্যে আমার কাছে জমা ছিল, আমি দেখলাম অন্যদের তুলনায় আপনারাই এগুলি পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। এ কথা বলে খেজুরগুলি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সঙ্গীদের বললেন ঃ তোমরা খাও। কিন্তু তিনি নিজের হাতটি গুটিয়ে নিলেন, কিছুই খেলেন না। মনে মনে আমি বললাম ঃ এ হলো একটি।

সেদিন আমি ফিরে এলাম। আমি আবারও কিছু খেজুর জমা করতে লাগলাম। রাসূল (সা) কুবা থেকে মদীনায় এলেন। আমি একদিন খেজুরগুলি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'আমি দেখেছি, আপনি সদকার জিনিস খাননা। তাই এবার কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি, আপনাকে দেয়ার উদ্দেশ্যে।' এবার তিনি নিজে খেলেন এবং সঙ্গীদের আহ্বান জানালেন তাঁরাও তাঁর সাথে খেলেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ এ হলো দ্বিতীয়টি।

তারপর অন্য একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম। তিনি তখন 'বাকী আল-গারকাদ' গোরস্থানে তাঁর এক সঙ্গীকে দাফন করছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি গায়ে 'শামলা' (এক ধরনের ঢিলা পোশাক) জড়িয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর আমি তাঁর পেছনের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলাম। আমি খুঁজতে লাগলাম, আমার সেই আম্মুরিয়ার বন্ধুটির বর্ণিত নবুওয়াতের মোহরটি।

রাসূল (সা) আমাকে তাঁর পিঠের দিকে ঘন ঘন তাকাতে দেখে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর পিঠের চাদরটি সরিয়ে নিলেন এবং আমি মোহরটি স্পষ্ট

দেখতে পেলাম। আমি তখন পরিষ্কারভাবে তাঁকে চিনতে পারলাম এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাঁকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলাম ও কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসালাম। আমার এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– তোমার খবর কি?

আমি সব কাহিনী খুলে বললাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং আমার মুখ দিয়েই এ কাহিনীটি তাঁর সংগীদের শোনাতে চাইলেন। আমি তাঁদেরকেও শোনালাম। তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন, খুবই আনন্দিত হলেন।

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে সালমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। ফলে তিনি খুবই মর্মজ্বালা ভোগ করতে থাকেন। সালমান বলেন ঃ 'একদিন রাসূল (সা) আমাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি তোমার মনিবের সাথে মুকাতাবা (চুক্তি) কর। আমি চুক্তি করলাম, তাকে আমি তিন শ' খেজুরের চারা লাগিয়ে দেব এবং সেই সাথে চল্লিশ 'উকিয়া স্বর্ণও দেব। আর বিনিময়ে আমি মুক্তি লাভ করবো। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এ চুক্তির কথা অবহিত করলাম। তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য কর। তারা প্রত্যেকেই আমাকে পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশটি করে যে যা পারলেন চারা দিলেন। এভাবে আমার তিনশ' চারা সংগ্রহ হয়ে গেল। তারপর আমি রাসূলের (সা) নির্দেশে গর্ত খুড়লাম। তিনি নিজেই একদিন আমার সাথে সেখানে গেলেন। আমি তাঁর হাতে একটি করে চারা তুলে দিলাম, আর তিনি সেটা রোপন করলেন। আল্লাহর কসম, তাঁর একটি চারাও মারা যায়নি। (ঐতিহাসিকরা বলছেন, সালামান (রা) একটি মাত্র চারা রোপন করেছিলেন, আর সেটাই মারা যায়। বাকী সবগুলিই রাসূল (সা) রোপন করেছিলেন এবং সবগুলিই বেঁচে যায়।) এভাবে আমি আমার চুক্তির একাংশ পূরণ করলাম, বাকী থাকলো অর্থ।

একদিন রাসূল (সা) আমাকে ডেকে মুরগীর ডিমের মত দেখতে স্বর্ণজাতীয় কিছু পদার্থ আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও, তোমার চুক্তি মুতাবিক পরিশোধ কর। আমি বললাম, এতে কি তা পরিশোধ হবে? তিনি বললেন ঃ 'ধর, আল্লাহ এতেই পরিশোধ করবেন।' আল্লাহর কসম, আমরা ওজন করে দেখলাম তাতে চল্লিশ উকিয়াই আছে।

এভাবে সালমান (রা) তার চুক্তি পূরণ করে মুক্তিলাভ করেন। গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে হযরত সালমান (রা) মুসলমানদের সাথে বসবাস করতে থাকেন। তখন তাঁর কোন ঘড়-বাড়ী ছিল না। রাসূল (সা) অন্যান্য মুহাজিরদের মত প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু দারদার (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। গোলামীর কারণে হযরত সালমান (রা) বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে পূর্ববর্তী দু'টি যুদ্ধে অনুপস্থিতির ক্ষতি পুষিয়ে নেন। সারা আরবের বিভিন্ন গোত্র কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। খবর পেয়ে রাসূল (সা) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দেন। হযরত সালমান বলেন, পারস্যে পরিখা খনন করে নগরের হিফাজত করা হয়। মদীনার অরক্ষিত দিকে পরিখা

খনন করে নগরীর হিফাজত করা সমীচীন। এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহর (সা) মনঃপূত হয়। মদীনার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ পরিখা খনন করে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করা হয়। রাসূল (সা) নিজেও এই পরিখা বা খন্দক খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে এ অপূর্ব রণ-কৌশল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। ২১/২২ দিন মদীনা অবরোধ করে বসে থাকার পর শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। খন্দকের পর যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে হযরত সালমান অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত সালমান বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের শেষ অথবা হযরত 'উমারের খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি ইরাকে এবং তাঁর দ্বীনী ভাই আবু দারদা (রা) সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি হযরত উমারের যুগে ইরান বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। জালুলু বিজয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমার (রা) তাঁকে মাদায়েনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত সালমানের জীবনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয় রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবতে। এ কারণে তিনি ইলম ও মা'রেফাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। হযরত আলীকে (রা) তাঁর ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন ঃ 'সালমান ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে লুকমান হাকীমের সমতুল্য।' অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি বলেন ঃ 'ইলমে আউয়াল ও ইলমে আখের সকল ইলমের আলিম ছিলেন তিনি।' ইলমে আখের অর্থ কুরআনের ইলম। আরবে তার কোন আত্মীয় ও খান্দান ছিল না, তাই রাসূল (সা) তাঁকে আহলে বাইতের সদস্য বলে ঘোষণা করেন। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল, যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম ও মুজতাহিদ সাহাবী, বলেন ঃ চার ব্যক্তি থেকে ইলম হাসিল করবে। সেই চারজনের একজন সালমান।

হযরত সালমান থেকে ষাটটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি, একটি মুসলিম ও তিনটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী, আবুত তুফাইল, ইবন আব্বাস, আউস বিন মালিক ও ইবন আজযা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর ছাত্র ছিলেন।

হযরত সালমান সেইসব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) যেদিন রাতে সালমানের সাথে নিভৃতে আলোচনা করতে বসতেন, আমরা তাঁর স্ত্রীরা ধারণা করতাম সালমান হয়তো আজ আমাদের রাতের সান্নিধ্যটুকু কেড়ে নেবে।'

যুহ্‌দ ও তাকওয়ার তিনি ছিলেন বাস্তব নমুনা। ক্ষণিকের মুসাফির হিসেবে তিনি জীবন যাপন করেছেন। জীবনে কোন বাড়ী তৈরী করেননি। কোথাও কোন প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে যেতেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে ইজাযত চাইলো, তাঁকে একটি ঘর বানিয়ে দেওয়ার। তিনি নিষেধ করলেন। বার বার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ঘর বানাবে? লোকটি বললো ঃ এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায়

চাল বেঁধে যাবে এবং শুইয়ে পড়লে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথায় তিনি রাজী হলেন। তাঁর জন্য একটি ঝুপড়ি ঘর তৈরী করা হয়। হযরত হাসান (রা) বলেন ঃ 'সালমান যখন পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা পেতেন, তিরিশ হাজার লোকের উপর প্রভুত্ব করতেন তখনও তাঁর একটি মাত্র 'আবা' ছিল। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠ সংগ্রহ করতেন। ঘুমানোর সময় আবাটির এক পাশ গায়ে দিতেন এবং অন্য পাশ বিছাতেন।'

হযরত সালমান (রা) যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা) তাঁকে দেখতে যান। সালমান (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। সা'দ বললেন ঃ আবু আবদিল্লাহ, কাদছেন কেন? রাসূল (সা) তো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তাঁর সাথে আপনি মিলিত হবেন। বললেন ঃ আমি মরণ ভয়ে কাঁদছিনে। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসূল (সা) আমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশী না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলি জিনিসপত্র জমা হয়ে গেছে। সা'দ বলেন ঃ সেই জিনিসগুলি একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

উসামা ইবন যায়িদ (রা)

হিজরাতের পূর্বে মক্কায় নবুওয়াতের সপ্তম বছর চলছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীরা তখন কুরাইশদের চরম বাড়াবাড়ির শিকার। ইসলামী দাওয়াতের কঠিন দায়িত্ব ও বোঝা পালন করতে গিয়ে পদে পদে তিনি নানা রকম দুঃখ বেদনা ও মুসীবতের সম্মুখীন হচ্ছেন। এমন সময় তাঁর জীবনে একটু খুশির আলোক আভা দেখা দিল। সুসংবাদ দানকারী খুশীর বার্তা নিয়ে এলো, 'উম্মু আয়মন' একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সেই সৌভাগ্যবান নবজাতক, যার ধরাপৃষ্ঠে আগমন সংবাদে আল্লাহর রাসূল এত উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তিনি উসামা ইবন যায়িদ।

শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে রাসূলুল্লাহর (সা) এত উৎফুল্ল হওয়াতে সাহাবীরা কিন্তু বিস্মিত হননি। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শিশুটির মাতা-পিতার স্থান সম্পর্কে সবাই অবগত ছিলেন। শিশুটির মা 'বারাকা আল হাবাশিয়্যা'– যিনি 'উম্মু আয়মান' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) জননী হযরত আমিনার দাসী। তাঁর জীবনকালে এবং ওয়াফাতের পরও এ মহিলা রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রতিপালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়াতে চোখ মেলে তাঁকেই মা বলে বুঝতে শেখেন। অত্যন্ত গভীর ও অকৃত্রিমভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ভালোবাসেন। প্রায়ই তিনি বলতেন ঃ 'আমার মায়ের পর ইনিই আমার মা এবং আমার আহলদের অবশিষ্ট ব্যক্তি। এ সম্মানিত মহিলাই হচ্ছেন এ নবজাতকের গৌরবান্বিত মা।

শিশুটির পিতা হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহভাজন, ইসলাম-পূর্ব যুগের ধর্মপুত্র, বিশ্বস্ত সংগী, ইসলামের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি— যায়িদ ইবন হারিসা (রা)।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মক্কার সমগ্র মুসলিম সমাজ শিশুটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদে উৎফুল্ল হয়েছিল। শিশুর পিতাকে যেমন তারা উপাধি দিয়েছিল 'হিববু রাসূলিল্লাহ', তেমনি তারা তাকে উপাধি দিল 'ইবনুল হিব্‌ব' বা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রীতিভাজনের পুত্র। তাদের এ উপাধি দান কিন্তু যথার্থই হয়েছিল। রাসূল (সা) তাকে এত অধিক ভালোবেসেছিলেন যে, তা দেখে বিশ্ববাসীর ঈর্ষা হয়। উসামা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দৌহিত্র হাসান ইবন ফাতিমার সমবয়সী। হাসান ছিলেন তাঁর নানা রাসূলুল্লাহর (সা) মত দারুণ সুন্দর। আর উসামা ছিলেন তাঁর হাবশী মা'র মত কালো ও খাঁদা নাক বিশিষ্ট। কিন্তু রাসূল (সা) তাদের দু'জনকে স্নেহ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে মোটেই কম বেশী করতেন না। তিনি উসামাকে বসাতেন এক উরুর ওপর এবং হাসানকে অন্য উরুর ওপর। তারপর দু'জনকে একসাথে বুকের মাঝে চেপে ধরে বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ, আমি তাদের দু'জনকে ভালোবাসি, তুমিও তাদের উভয়কে ভালোবাস।'

শিশু উসামার প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ ও ভালোবাসা কত গভীর ও প্রবল ছিল তা বুঝা যায় একটি ঘটনা দ্বারা। শিশু উসামা একবার দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তার কপাল কেটে রক্ত বের হতে লাগলো। রাসূল (সা) প্রথমে হযরত

আয়িশাকে (রা) রক্ত মুছে দিতে বললেন। কিন্তু তাতে স্বস্তি পেলেন না। তিনি নিজেই উঠে গিয়ে রক্ত মুছে ক্ষতস্থানে চুমু দিতে লাগলেন এবং মিষ্টি মধুর ও দরদ মিশ্রিত কথা বলে তাকে শান্ত করতে লাগলেন।

শৈশবের মত যৌবনেও উসামা রাসূলুল্লাহর (সা) ভালোবাসা লাভ করেন। একবার কুরাইশদের অন্যতম নেতা হাকীম ইবন হিযাম ইয়ামনের 'যী ইয়াযিন' বাদশার একখানা মূল্যবান চাদর ইয়ামন থেকে পঞ্চাশ দীনার দিয়ে খরীদ করেন। চাদরখানি তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দিতে চাইলে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, হাকীম তখনও মুশরিক ছিলেন। তবে রাসূল (সা) তাঁর নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে চাদরখানি খরিদ করেন। এক জুমআর দিন একবার মাত্র সে চাদরখানি রাসূল (সা) পরেন। তারপর তিনি তা উসামার গায়ে পরিয়ে দেন। উসামা সে চাদরখানি প'রে তার সমবয়সী মুহাজির ও আনসার যুবকদের সাথে সকাল সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াতেন।

যৌবনে উসামার মধ্যে এমন সব চারিত্রিক সৌন্দর্য ও গুণাবলী বিকশিত হলো যা সহজেই রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ ও ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তীক্ষ্ণ মেধা, দুঃসাহস, বিচক্ষণতা, পূতঃপবিত্র চরিত্র এবং তাকওয়া ও পরহিযগারী ছিল তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

উহুদ যুদ্ধের দিন উসামা তাঁর সমবয়সী আরো কতিপয় কিশোর সাহাবীর সাথে উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে। তাদের সবার ইচ্ছা জিহাদে অংশগ্রহণ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে নির্বাচন করলেন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে অন্যদের ফিরিয়ে দিলেন। উসামা প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ীতে ফিরছেন। চোখ দু'টি তাঁর পানিতে টলমল। তাঁর ব্যথা, রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাতলে জিহাদের সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

খন্দকের যুদ্ধ সমুপস্থিত। উসামাও হাজির। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন কিশোর সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা) সৈনিক বাছাই করছেন। উহুদের মত এবারো তাঁকে ছোট বলে বাদ দেওয়া না হয়, এজন্য পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তর নরম হলো। তাকে নির্বাচন করলেন। তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে উসামা চললেন জিহাদে। তিনি তখন ১২/১৩ বছরের এক কিশোর।

কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে প্রথম পর্যায়ের অভিযান সমূহে তিনি অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি। 'হারকা' অভিযানে তিনি সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। সাত অথবা আট হিজরীতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ। কিন্তু তাঁর সীমাহীন যোগ্যতার কারণে রাসূল (সা) তাঁকে অভিযানের নেতৃত্ব দান করেন। এ অভিযানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ 'রাসূল (সা) আমাদেরকে 'হারকা'র দিকে পাঠালেন। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করলো। আমি এক আনসারী সিপাহীর সাথে পলায়নরত এক সৈনিকের পিছু ধাওয়া করলাম। যখন সে আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেল, জোরে জোরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠলো। তার এ ঘোষণায় আনসারী হাত গুটিয়ে নিল; কিন্তু আমি বর্শা ছুড়ে তাকে গেঁথে ফেললাম। সে মারা গেল। অভিযান থেকে ফেরার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা)

কর্ণগোচর হলো। তিনি আমাকে বললেন ঃ উসামা, কালিমা তাইয়্যেবা পড়ার পর তুমি একটি লোককে হত্যা করেছ! আমি বললাম, প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে এমনটি করেছে। তিনি আমার কথায় কান দিলেন না। একই কথা বার বার আওড়াতে লাগলেন। আমি তখন এত অনুতপ্ত হলাম যে, মনে মনে বললাম, 'হায়! আজকের পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে বলেন ঃ 'তুমি তার অন্তর ফেঁড়ে দেখলে না কেন?'

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে পালাতে লাগলো। উসামা তখন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আব্বাস, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিসসহ মাত্র ছ'জন সাহাবীর সাথে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে অটল হয়ে রুখে দাঁড়ালেন। বীর বিশ্বাসীদের ক্ষুদ্র এই দলটির সাহায্যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিন নিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ের রূপদান করেন এবং পলায়নরত মুসলিম বাহিনীকে মুশরিক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন।

মক্কা বিজয়েও উসামা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে সওয়ার হয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উসামা, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা এ তিন ব্যক্তিই সেদিন কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ চারজনের পরই কা'বার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

উসামা তাঁর পিতা সেনাপতি যায়িদ ইবন হারিসার সাথে মুতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তার বয়স আঠারো বছরেরও কম। এ যুদ্ধে তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন পিতার শাহাদাত। তবে তিনি মুষড়ে পড়েননি। পিতার শাহাদাত বরণের পর যথাক্রমে জা'ফর ইবন আবী তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নেতৃত্বে বাহাদুরের মত লড়াই করেন। যায়িদের মত এ সেনাপতিও শাহাদাত বরণ করলে তিনি সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে রোমান বাহিনীর পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করেন। মুতার প্রান্তরে পিতা যায়িদের মরদেহ আল্লাহর হাওয়ালা করে যে ঘোড়ার ওপর তিনি শহীদ হয়েছিলেন, তার ওপর সওয়ার হয়ে তিনি মদীনায় ফিরে এলেন।

একাদশ হিজরীতে রাসূল (সা) রোমান বাহিনীর সাথে একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বকর, 'উমার, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ প্রমুখ প্রথম কাতারের সমর বিশারদ সাহাবী এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। রাসূল (সা) উসামা বিন যায়িদকে এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করেন। তখন তাঁর বয়স বিশের কাছাকাছি। রাসূল (সা) গাযা উপত্যকার নিকটবর্তী 'বালকা' ও 'দারূম আল কিলয়ার' আশে পাশে সীমান্তে ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিলেন।

বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। এদিকে রাসূল (সা) পীড়িত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহর (সা) রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাহিনীসহ তিনি যাত্রাবিরতি করে মদীনার উপকণ্ঠে 'জুরুফ' নামক স্থানে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। সেখান থেকে প্রতিদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে আসতেন। উসামা বলেন 'রাসূলুল্লাহর (সা) রোগ বৃদ্ধি পেলে আমি দেখতে গেলাম। আরো অনেকে আমার সংগে ছিলেন। ঘরে প্রবেশ করে

দেখলাম, রাসূল (সা) চুপ করে আছেন। রোগের প্রচণ্ডতায় তিনি কথা বলতে পারছেন না। আমাকে দেখে প্রথমে তিনি আসমানের দিকে হাত উঠালেন, তারপর আমার শরীরের ওপর হাত রাখলেন। আমি বুঝলাম, তিনি আমার জন্য দু'আ করছেন।'

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল হলো। খবর পেয়ে তিনি মদীনায় ছুটে এলেন এবং কাফন দাফনে অংশগ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মরদেহ কবরে নামানোর সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন।

হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। তিনি উসামাকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আনসারদের ছোট্ট একটি দল মনে করলেন এ মুহূর্তে বাহিনীর যাত্রা একটু বিলম্ব করা উচিত। এ ব্যাপারে খলীফার সাথে কথা বলার জন্য তাঁরা হযরত উমারকে (রা) অনুরোধ করলেন। তাঁরা উমারকে এ কথাও বললেন, যদি তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে অন্ততঃ তাঁকে অনুরোধ করবেন, উসামা থেকে একজন অধিক বয়সের লোককে যেন আমাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন।

হযরত আবু বকর বসে ছিলেন। হযরত 'উমারের (রা) মুখে আনসারদের বক্তব্য শোনার সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ফারুকে আজমের দাঁড়ি মুট করে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ 'ওহে খাত্তাবের পুত্র! আপনার মা নিপাত যাক! আপনি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিয়োগ করা ব্যক্তিকে অপসারণ করতে? আল্লাহর কসম, আমার দ্বারা কক্ষণো তা হবেনা।'

'উমার (রা) ফিরে এলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সমাচার কি? বললেন ঃ তোমাদের সকলের মা নিপাত যাক! তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের খলীফার নিকট থেকে অনেক কিছুই আমাকে শুনতে হলো।

যুবক কমাণ্ডারের নেতৃত্বে বাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হলো। খলীফা আবু বকর (রা) চললেন কিছুদূর এগিয়ে দিতে। উসামা ঘোড়ার পিঠে, খলীফা পায়ে হেঁটে। উসামা বললেন ঃ 'হে রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফা! আল্লাহর কসম, হয় আপনি ঘোড়ায় উঠুন, না হয় আমি নেমে পড়ি।' খলীফা বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম, তুমিও নামবে না, আমিও উঠবো না। কিছুক্ষণ আল্লাহর পথে আমার পদযুগল ধুলিমলিন হতে দোষ কি?' তারপর উসামাকে বললেন ঃ 'তোমার দ্বীন, তোমার আমানতদারী এবং তোমার কাজের সমাপ্তি আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) যে নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন, তা কার্যকর করার উপদেশ তোমাকে দিচ্ছি।' তারপর উসামার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন ঃ 'তুমি যদি 'উমারের দ্বারা আমাকে সাহায্য করা ভালো মনে কর, তাকে আমার কাছে থেকে যাওয়ার অনুমতি দাও।' উসামা আবু বকরের আবেদন মঞ্জুর করলেন। উমারকে মদীনায় খলীফার সংগে থাকার অনুমতি দিলেন।

উসামা রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেন। মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী ফিলিস্তিনের 'বালকা' ও 'কিলায়াতুত দারূম' সীমান্ত পদানত করে। ফলে এ অঞ্চল থেকে মুসলমানদের জন্য রোমান ভীতি চিরতরে দূরীভূত হয় এবং গোটা সিরিয়া, মিসর ও উত্তর আফ্রিকাসহ কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের বিজয়দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এ অভিযানে তিনি তাঁর পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন। যে ঘোড়ার ওপর তাঁর পিতা শহীদ হয়েছিলেন, তার পিঠে বিপুল পরিমাণ গনিমাতের ধন সম্পদ বোঝাই করে তিনি বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে এলেন। খলীফা আবু বকর (রা) মুহাজির ও আনসারদের বিরাট একটি দল সহ মদীনার উপকণ্ঠে তাঁকে স্বাগত জানান। উসামা মদীনায় পৌঁছে মসজিদে নববীতে দু'রাকায়াত নামায আদায় করে বাড়ী যান। ঐতিহাসিরা তাঁর এ বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 'উসামার বাহিনী অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ ও গনিমাত লাভকারী অন্য কোন বাহিনী আর দেখা যায়নি।'

রাসূলুল্লাহর (সা) অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন এবং প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্য উসামা মুসলিম সমাজের ব্যাপক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) নিজ পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার অপেক্ষা উসামার ভাতা বেশী নির্ধারণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়ে অভিযোগ করেন ঃ 'আব্বা, উসামার ভাতা চার হাজার, আর আমার ভাতা তিন হাজার। আমার পিতা অপেক্ষা তাঁর পিতা অধিক মর্যাদাবান ছিলেন না এবং আমার থেকেও তাঁর মর্যাদা বেশী নয়।' জবাবে হযরত উমার বলেন ঃ 'আফসোস! তোমার পিতার চেয়ে তার পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) অধিক প্রিয় ছিলেন এবং তোমার থেকেও সে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশী প্রিয় ছিল।' হযরত আবদুল্লাহ (রা) আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

উসামার সাথে খলীফা 'উমারের দেখা হলেই বলতেন ঃ 'স্বাগতম, আমার আমীর।' এমন সম্বোধনে কেউ বিস্মিত হলে তিনি বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আমার আমীর বা নেতা বানিয়েছিলেন।

হযরত উসমানের (রা) খিলাফতকালে ফিতনা-ফাসাদের আশংকায় রাষ্ট্রীয় কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তবে হিতাকাংখী মুসলিম হিসাবে সর্বদা খলীফাকে সৎ পরামর্শ দিতেন এবং গোপনে গণ-অসন্তোষের বিষয়ে খলীফার সাথে আলোচনা করতেন।

হযরত উসমানের শাহাদাতের পর যখন বিশৃংখলা দেখা দিল, তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেন। হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার বিরোধ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকলেন। এ সময় হযরত আলীকে একবার তিনি বলে পাঠালেন, 'আপনি যদি বাঘের চোয়ালের মধ্যে ঢুকতেন, আমিও সন্তুষ্টচিত্তে ঢুকে যেতাম। কিন্তু এ ব্যাপারে অংশগ্রহণের আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।' মুসলমানদের রক্তপাতের ভয়ে যদিও তিনি এ দ্বন্দ্বে জড়াতে চাননি, তবে তিনি আলীকে (রা) সত্যপন্থী বলে মনে করতেন। এ কারণে, আলীকে সাহায্য না করার জন্য শেষ জীবনে তাওবাহ করেছেন।

হযরত উসামা প্রতিপালিত হয়েছিলেন নবীগৃহে। এ কারণে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া তাঁর উচিত ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়াফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আঠারো বছর। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য লাভের সুযোগ তিনি পাননি। এ কারণে, এ ক্ষেত্রে তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমার প্রমুখ বিদ্বান সাহাবীদের মত আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেননি। তা সত্ত্বেও যা তিনি অর্জন করেছিলেন তা মোটেও অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি নবীর (সা) বহু বাণী স্মৃতিতে

সংরক্ষণ করেছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবীরাও মাঝে মাঝে শরীয়াতের নির্দেশ জানার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস 'তাউন' বা প্লেগ সম্পর্কে শরীয়াতের কোন নির্দেশ না পেয়ে উসামাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তাউন' বা প্লেগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে কিছু শুনেছেন কি? তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী সা'দের নিকট বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট একশ' আটাশটি। তন্মধ্যে পনেরটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান, মুহাম্মাদ ইবন আব্বাস, আবু হুরাইরা, কুরাইব, আবু উসমান নাহদী, 'আমর ইবন উসমান, আবু ওয়ায়িল, আমের ইবন সা'দ, হাসান বসরী (রা) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু নবীগৃহে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর যাতায়াত ছিল অবাধ, এ কারণে নবীর (সা) শিক্ষার যথেষ্ট প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। অধিকাংশ সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে আরোহী হওয়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাতের সুযোগও বেশী পরিমাণে লাভ করেন। অজু ও পাক পবিত্রতার পানি তিনিই অধিকাংশ সময় এগিয়ে দিতেন।

অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। ইফ্‌ক বা হযরত আয়িশার (রা) প্রতি মুনাফিকদের বানোয়াট ও অশালীন উক্তি ছড়িয়ে পড়লে রাসূল (সা) ঘনিষ্ঠ যে দু'ব্যক্তির সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন, তারা ছিলেন হযরত আলী ও উসামা (রা)।

এ মহান সেনানায়ক হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফত কালের শেষ দিকে হিজরী ৫৪ সনে ৬০ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন।

আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম (রা)

মুয়ায্‌যিনুর রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম সেই মহান সাহাবী যাঁর জন্য সপ্তম আকাশের ওপর থেকে নবী করীমকে (সা) তিরস্কার করা হয়েছে এবং যাঁর শানে আল্লাহর নিকট থেকে হযরত জিবরীল (আ) অহী নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অবতরণ করেছেন। তিনি সেই গর্বিত মহাপুরুষ যাঁর সম্পর্কে আল-কুরআনের সর্বমোট ষোলটি আয়াত নাযিল হয়েছ।

মদীনাবাসীরা তাঁকে ডাকতেন আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম বলে। তবে ইরাকীদের নিকট তিনি 'উমার ইবন উম্মে মাকতুম' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ গোত্রের সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়ালিদের মামাতো ভাই। তাঁর পিতা কায়েস বিন যায়িদ ও মাতা আতিকা বিনতু আবদিল্লাহ। আবদুল্লাহকে অন্ধ অবস্থায় প্রসব করেন, এ কারণে মা 'আতিকা উম্মু মাকতুম' নামে পরিচিতি লাভ করেন। মাকতুম অর্থ অন্ধ এবং উম্মু মাকতুম— অন্ধের মা।

বাহ্যিক চক্ষু তাঁর ছিল না। তবে একটি তীক্ষ্ম অন্তর্চক্ষু তিনি লাভ করেছিলেন। মক্কায় ইসলামের আলোকরশ্মি আত্মপ্রকাশের সূচনা কালটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তর্চক্ষু উন্মুক্ত করে দেন। তিনি ঈমান আনেন। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের প্রথম পর্বের বিশ্বাসীদের অন্যতম। মক্কার মুসলমানদের কুরবানী, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার অংশীদার ছিলেন তিনিও। অন্যদের মত তিনিও শিকার হয়েছিলেন কুরাইশদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের। তাদের হাজারো জুলুম-অত্যাচারে তিনি একটুও দমেননি, একটুও সাহসহারা হননি, অথবা বলা যায়, তাঁর ঈমান কখনো দুর্বল হয়ে পড়েনি। তাদের জুলুম-অত্যাচার যতই বৃদ্ধি পেয়েছিল, তিনিও তত বেশী করে আল্লাহর-দ্বীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আর সংগে সংগে আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছিল, শরীয়াতের সমঝও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর সময় অসময়ে যাতায়াতও বেড়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ভক্তি-ভালোবাসা ও পবিত্র কুরআন হিফ্‌জ করার প্রতি তাঁর আগ্রহ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, এ ব্যাপারে প্রতিটি সুযোগকে তিনি গনিমত মনে করতেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে কাজে লাগাতেন। আগ্রহের আতিশয্যের কারণে অনেক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিজের জন্য এমনকি অন্যের জন্য নির্ধারিত সময়টুকুতেও তিনি ভাগ বসাতেন।

এটা সেই সময়ের কথা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার কুরাইশ নেতৃবর্গের ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তিনি দারুণ আগ্রহী। একদিন তিনি মিলিত হলেন, 'উতবা ইবন রাবীয়া, শায়বা ইবন রাবীয়া, আমর ইবন হিশাম উরফে আবু জাহল, উমাইয়া ইবন খালফ এবং খালিদ সাইফুল্লাহর পিতা ওয়ালিদ ইবন মুগীরার

সাথে। তিনি একেক জনের কাছে যাচ্ছেন, শরাপরামর্শ করছেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি আশা করছেন, তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করুক অথবা কমপক্ষে তাঁর সংগী-সাথীদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বিরত থাকুক। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি ব্যস্ত, এমন সময় সম্পূর্ণ অনাহূতভাবে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম এসে হাজির। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু আমাকে শিখিয়ে দিন। রাসূল (সা) তাঁর কথায় বিশেষ একটা গুরুত্ব না দিয়ে কুরাইশ নেতৃবর্গের প্রতি মনোযোগী থাকলেন। এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাতে আল্লাহর দ্বীনের সম্মান বৃদ্ধি পাবে ও দাওয়াতী কাজের সুবিধা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে আলোচনা-পরামর্শ শেষ করে যেইনা গৃহের দিকে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছেন অমনি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাকড়াও করলেন। তিরস্কার করে অহী নাযিল করলেন ঃ

'সে ভ্রু কুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে— সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো। ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করেনা, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। অন্যদিকে যে তোমার দিকে ছুটে এলো, আর সে সশংকচিত্ত, তাকে তুমি অবজ্ঞা করলে। না, এরূপ আচরণ অনুচিত। এ তো উপদেশবাণী। যে ইচ্ছে করবে স্মরণ রাখবে। তা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, পবিত্র, মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।' ('আবাসা ঃ ১-১৬)

এই অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমের শানে মোট ষোলটি আয়াত সহ হযরত জিবরীল আল-আমীন সেদিন অবতরণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তঃকরণে। আয়াতগুলি আজ পর্যন্ত পঠিত হয়ে আসছে এবং যতদিন এ ধরাপৃষ্ঠে মানব জাতির জীবনধারা অব্যাহত থাকবে ততদিন তা পঠিত হবে। সেই দিন থেকে রাসূল (সা) আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমকে বিশেষ সমাদর করতেন। তিনি এলে ডেকে কাছে বসাতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁর কিছু প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করতেন। হযরত আয়িশা (রা) তাঁকে লেবু ও মধুর সরবত বানিয়ে পান করাতেন, তিনি বলেন ঃ 'আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ ছিল তাঁর জন্য নির্ধারিত।' এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তিনি তো সেই ব্যক্তি যাঁর কারণে সপ্তম আকাশের ওপর থেকে তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

রাসূল (সা) ও মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের কঠোরতা ও অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছেড়ে গেল, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হিজরাতের অনুমতি প্রদান করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন তাঁদেরই একজন যারা খুব দ্রুত দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি এবং হযরত মুসয়াব ইবন 'উমাইর (রা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদীনায় উপনীত হন। আবদুল্লাহ ইবন উম্মে

মাকতুম মদীনায় পৌঁছে বন্ধু মুসয়াব ইবন উমাইরকে সংগে নিয়ে মানুষের বাড়ীতে যেয়ে যেয়ে কুরআন ও আল্লাহর দ্বীন শিক্ষা দিতে শুরু করেন। হযরত বাররা ইবন আযিব (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিজরাত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসেন মুসয়াব ইবন উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুম (রা)। তাঁরা মদীনায় এসেই আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে এলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম ও বিলাল ইবন রাবাহকে মুসলমানদের মুয়াযিযন নিয়োগ করেন। তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলিম উম্মাতের প্রথম মুয়াযযিন। এভাবে তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার কালেমাতুত তাওহীদের প্রচার, মানুষকে সৎকর্মের দিকে আহ্বান ও কল্যাণের প্রতি উৎসাহদানের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। বিলাল আযান দিতেন, আর ইবন উম্মে মাকতুম দিতেন ইকামাত। মাঝে মাঝে আযান দিতেন ইবন উম্মে মাকতুম, আর ইকামাত দিতেন বিলাল (রা)। রমযান মাসে তাঁরা অন্য একটি কাজও করতেন। মদীনার মুসলমানরা তাঁদের একজনের আযান শুনে সেহরী খাওয়া শুরু করতেন এবং অন্যজনের আযান শুনে খাওয়া বন্ধ করতেন। বিলালের আযান শুনে লোকেরা সেহরীর জন্য জেগে উঠতো। এদিকে আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম প্রতীক্ষায় থাকতেন সুবহে সাদিকের। সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে তিনি আযান দিতেন, আর সে আযান শুনে লোকেরা খাওয়া বন্ধ করতো।

রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পর যুদ্ধ-বিগ্রহের পালা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইবন উম্মে মাকতুম স্বীয় অক্ষমতার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অপরাগ ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর ওপর কিছু আয়াত নাযিল করেন। আয়াতগুলি মুজাহিদদের সুমহান মর্যাদা ও জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যারা গৃহে অবস্থান করেন, তাদের ওপর মুজাহিদদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়। আয়াতগুলির বিষয়বস্তু ইবন উম্মে মাকতুমের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মুজাহিদদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তিনি ভীষণ ব্যথিত হন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

–'গৃহে অবস্থানকারী মু'মিনগণ এবং আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ সমমর্যাদার অধিকারী হবে না।' রাসূলুল্লাহ (সা) কাতিবে অহী হযরত যায়িদ বিন সাবিতকে (রা) আয়াতটি লিখতে বললেন। এমন সময় ইবন উম্মে মাকতুম সেখানে পৌঁছলেন। আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সক্ষম হলে আমিও তো জিহাদে অংশগ্রহণ করে মুজাহিদদের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম।'

তারপর অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ আমার অপারগতা সম্পর্কে অহী নাযিল করুন, হে আল্লাহ আমার ওজর সম্পর্কে অহী নাযিল করুন।' তাঁর এ আকাঙ্খা আল্লাহর নিকট এতই মনঃপূত হয়েছিল যে, সংগে সংগে

অহী নাযিল করে অনন্তকালের জন্য জগতের সকল অক্ষম ব্যক্তিদের জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দান করেন।

নাযিল হয় ঃ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ-(سورة النساء ٩٥)

–'ওজরগ্রস্তরা ছাড়া যেসব মুসলমান গৃহে অবস্থান করে, মর্যাদায় তারা তাদের সমকক্ষ নয়, যারা জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।' এখানে [غَيْرَ أُوْلِى الضَّرَرِ] বাক্যাংশ দ্বারা সকল অক্ষম ব্যক্তিকে জিহাদের হুকুম থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে এই হুকুমের কারণে তাঁর জিহাদে গমনের উৎসাহ কমার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পেল। তাঁর মহান অন্তঃকরণ অক্ষমদের সাথে ঘরে বসে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ, মহান অন্তঃকরণ সর্বদাই মহৎ কাজ ছাড়া পরিতুষ্ট হতে পারে না। ইবন হাজার আসকিলানী *'আল ইসাবা'* গ্রন্থে বলেন ঃ অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। মানুষকে তিনি বলতেন, 'আমার হাতে পতাকা দিয়ে তোমরা আমাকে দু' সারির মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি অন্ধ, পালানোর কোন ভয় নেই।'

হযরত ইবন উম্মে মাকতুম যদিও অক্ষমতার কারণে জিহাদের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তবে তার থেকে বড় গৌরব ও সম্মান তিনি অর্জন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সংগে নিয়ে মদীনার বাইরে কোন অভিযানে গমন করতেন, তখন ইবন উম্মে মাকতুমকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। এ সময় তিনি মসজিদে নববীতে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন করতেন। সুতরাং আবওয়ার, বাওয়াত, যুল আসীর, জুহাইনা, সুয়াইক, গাতফান, হামরাউল আসাদ, নাজরান, যাতুর রুকা প্রভৃতি অভিযানের সময় মোট তের বার এ গৌরব তিনি অর্জন করেন। বদর যুদ্ধের সময় কিছুদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে হযরত আবু লুবাবাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর থেকে হযরত উমারের (রা) খিলাফত কালের শেষ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর পতাকা সমুন্নত রেখেছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তবে ইবন সা'দ তাঁর 'তাবাকাতে' যুবাইর ইবন বাককারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অধিকাংশ সীরাত লেখক এই বর্ণনাকে অধিকতর সহীহ মনে করেছেন।

চতুর্দশ হিজরী সনে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সিদ্ধান্ত নিলেন পারস্য বাহিনীর সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ালীদের লিখলেন ঃ

'যার একখানা হাতিয়ার, একটি ঘোড়া বা উষ্ট্রী অথবা বুদ্ধিমত্তা আছে, এমন কাউকে বাদ দিবে না। তাদের প্রত্যেককে আমার নিকট জলদি পাঠিয়ে দেবে।'

মুসলিম জনগণ হযরত ফারুকে আজমের এ আহ্বানে ব্যাপকভাবে সাড়া দিল। চর্তুদিক থেকে মানুষ বন্যার স্রোতের ন্যায় মদীনার দিকে আসতে লাগলো। অন্ধ আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুমও ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে চলে এলেন মদীনায়। খলীফা উমার (রা) এই বিশাল বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে (রা)। যাত্রাকালে খলীফা তাঁকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করে বিদায় জানালেন।

মুসলিম বাহিনী যখন কাদেসিয়ায় পৌঁছলো, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম বর্ম পরে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে সামনে এলেন এবং মুসলিম বাহিনীর আলাম বা পতাকা বহনের দায়িত্বটি তাঁকে দেয়ার আহ্বান জানালেন। বললেন ঃ হয় এ পতাকা সমুন্নত রাখবো, নয় মৃত্যুবরণ করবো।

এই কাদেসিয়া প্রান্তরে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় বিশ্বের সমর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। অবশেষে চূড়ান্ত যুদ্ধের তৃতীয় দিনে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্য ও সর্বাধিক গৌরবময় সিংহাসনের পতন ঘটে। আর সেইসাথে তাওহীদের পতাকা পত্ পত্ করে উড়তে থাকে এই সুবিশাল পৌত্তলিক ভূমিতে। অসংখ্য শহীদের প্রাণের বিনিময়ে এ মহাবিজয় অর্জিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাকতুমও ছিলেন সেই অগণিত শহীদদের একজন। যুদ্ধশেষে দেখা গেল রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তিনি মুসলমানদের পতাকাটি জড়িয়ে ধরে মাটিতে পড়ে আছে।

ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাড়ীটিও ছিল একটু দূরে। পথে নালা নর্দমা ঝোপ জংগল পড়তো। সব সময়ের জন্য কোন সাহায্যকারীও তাঁর ছিলনা। এত অসুবিধা সত্ত্বেও নিয়মিত মসজিদে নববীতে এসে নামাজ আদায় করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন অন্ধ, আমার বাড়ীটিও মসজিদ থেকে বেশ দূরে, আমাকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য একজন লোকও আছে, তবে সে আমার মনঃপূত নয়। এমতাবস্থায় আপনি আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেবেন কি? তিনি বললেন ঃ 'তুমি আযান শুনতে পাও?' বললাম ঃ হ্যাঁ। বললেন ঃ তোমার জন্য আমি কোন অনুমতির পথ দেখতে পাচ্ছিনা। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাড়ী ও মসজিদের মধ্যে খেজুর বাগান ও ঝোপ-জংগল রয়েছে। সব সময় পথ দেখানো লোকও আমি রাখতে পারিনে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে নামায আদায় করতে পারি? তিনি বললেন ঃ তুমি কি ইকামাত শুনতে পাও? বললাম ঃ হ্যাঁ, রাসূল (সা) বললেন ঃ তা হলে তুমি মসজিদে এসেই নামায আদায় করো। (হায়াতুস সাহাবা, ৩য়, ১২১) আযান ও ইকামতের আওয়াজ তাঁর ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতো এ কারণে তিনি অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঘরে নামায আদায়ের অনুমতি পাননি। হযরত উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে একজন রাহনুমা (পথ প্রদর্শক) দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফেজ। হযরত আনাস ও যার বিন জাইশ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুল কামাল, ২৮৯)

তুফাইল ইবন 'আমর আদ-দাওসী (রা)

নাম তাঁর তুফাইল। 'যুন-নূর' উপাধি। 'দাওস' গোত্রের সন্তান হওয়ার কারণে দাওসী বলা হয়। কবীলা-দাওস ইয়ামনে বসবাসকারী একটি শক্তিশালী গোত্র। তিনি ছিলেন এ গোত্রের 'রয়িস' বা সরদার। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তাঁর পেশা। এ কারণে মাঝে মধ্যে তাঁকে মক্কায় আসা-যাওয়া করতে হতো।

তুফাইল ছিলেন জাহিলী যুগের আরবের সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তাঁর চুলো থেকে হাঁড়ি কখনো নামতো না। অতিথির জন্য তাঁর বাড়ীর দরজা থাকতো সর্বদা উন্মুক্ত।

তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সহজাত কাব্য প্রতিভা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী। ভাষার মধুরতা, তিক্ততা ও ভাষার ইন্দ্রজাল সম্পর্কে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ।

একবার তুফাইল ইবন 'আমর ব্যবসা উপলক্ষে তাঁর গোত্রের আবাস স্থল তিহামা অঞ্চল থেকে মক্কায় উপস্থিত হলেন। মক্কায় তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। দু'টি দলই নিজ নিজ মতের সমর্থক সংগ্রহে তৎপর। একদিকে রাসূল (সা) আহ্বান জানাচ্ছেন মানুষকে তাঁর প্রভুর দিকে। অন্যদিকে কাফিররা সব ধরনের উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করে মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বলা চলে, তিনি সম্পূর্ণ অনভিপ্রেতভাবে এ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লেন। কারণ, তিনি তো এ উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেননি। ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ ও কুরাইশদের এ দ্বন্দ্বের কথা তাঁর মনে একবারও উদয় হয়নি। এ সংঘাতের সাথে তাঁর জীবনের এক অভিনব কাহিনী জড়িত আছে। তিনি বলেন, 'আমি মক্কায় প্রবেশ করলাম। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে সর্বোত্তম সম্ভাষণে আমাকে স্বাগত জানালো । আমাকে তারা তাদের সর্বাধিক সম্মানিত বাড়ীতে আশ্রয় দিল। তারপর তাদের নেতৃবৃন্দ ও জ্ঞানী-গুণীরা আমার কাছে এসে বললো ঃ 'তুফাইল, আপনি এসেছেন আমাদের এ আবাসভূমিতে। এই লোকটি, যে নিজেকে একজন নবী বলে মনে করে, আমাদের সকল ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, আপনিও তার কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন এবং আপনার নেতৃত্বে আপনার গোত্রেও আমাদের মত একই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে না উঠে। সুতরাং আপনি এই লোকটির সাথে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করবেন না, তার কোন কথায় কান দেবেন না। কারণ, তার কথা যাদুর মত কাজ করে। সে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয় পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।'

তুফাইল বলেন, 'আল্লাহর কসম, তারা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে অভিনব কাহিনী ও তাঁর নানা রকম আশ্চর্য কার্যাবলী বর্ণনা করে আমাকে ও আমার গোত্রকে সতর্ক করে দিল। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, তাঁর কাছে আমি ঘেঁষবোনা, তাঁর সাথে কথা বলবো না বা তাঁর কোন কথাও শুনবো না। সে সময় আমরা কা'বার তাওয়াফ করতাম এবং সেখানে রক্ষিত মূর্তিসমূহের পূজাও করতাম। যখন আমি কা'বার

তাওয়াফ ও মূর্তি পূজার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হলাম, আমার দু'কানে ভালো করে তুলো ভরে নিলাম যাতে কোনভাবেই মুহাম্মাদের (সা) কথা আমার কানে প্রবেশ করতে না পারে।

মাসজিদুল হারামে ঢুকেই আমি দেখতে পেলাম তিনি কা'বার পাশেই নামাযে দাঁড়িয়ে। তবে তাঁর সে নামায আমাদের নামাযের মত, তাঁর সে ইবাদাত আমাদের ইবাদাতের মত ছিল না। এ দৃশ্য আমাকে পুলকিত করলো, তাঁর সে ইবাদাত আমাকে আন্দোলিত করলো। আমার ইচ্ছে হলো তাঁর নিকটে যাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক পা দু'পা করে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। আল্লাহর ইচ্ছে ছিল তাঁর কিছু কথা আমার কানে পৌঁছে দেয়া। তাই, কানে তুলো ভরা সত্ত্বেও তাঁর কিছু উত্তম বাণী আমি শুনতে পেলাম। মনে মনে বললাম ঃ 'তুফাইল, তোর মা নিপাত যাক, তুই একজন বুদ্ধিমান কবি। ভালো-মন্দ বিচারের ক্ষমতা তোর আছে। এ লোকটির কথা শুনতে তোর বাধা কিসে? যদি সে ভালো কথা বলে, গ্রহণ করবি, আর মন্দ হলে প্রত্যাখান করবি।'

তুফাইল বলেন, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম। বললাম ঃ ইয়া মুহাম্মাদ, আপনার কাওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে এইসব কথা আমাকে বলেছে। তারা আমাকে আপনার সম্পর্কে এত ভয় দেখিয়েছে যে, আপনার কোন কথা যাতে আমার কানে ঢুকতে না পারে সেজন্য আমি কানে তুলো ভরে নিয়েছি। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা আপনার কিছু কথা না শুনিয়ে ছাড়লেন না। যা শুনেছি, ভালোই মনে হয়েছে। আপনি আপনার ব্যাপারটি আমার কাছে একটু খুলে বলুন। তিনি তাঁর বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে বলার পর সূরা ইখলাস ও সূরা আল-ফালাক তিলাওয়াত করে আমাকে শুনালেন। সত্যি কথা বলতে কি, এর থেকে সুন্দর কথা ও অনুপম বিষয় আর কখনো আমি শুনিনি। সেই মুহূর্তে আমার হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম এবং কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করে ইসলামের ঘোষণা দিলাম।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার কুরাইশরা তাঁকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তখন তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে সুন্দর একটি কবিতা রচনা করেন। কুরাইশদের নিন্দা, আল্লাহর একত্ব ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা—এই ছিল সেই কবিতার বিষয়বস্তু। ইবন হাজার *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে তার কয়েকটি চরণ সংকলন করেছেন।

তুফাইল বলেন, তারপর আমি মক্কায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা করলাম, সাধ্যানুযায়ী কুরআনের কিছু অংশও হিফজ করলাম। আমি আমার গোত্রে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে আমার বৃদ্ধ পিতা দৌড়ে এলেন। আমি বললাম ঃ আব্বা, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আমি আপনার কেউ নই বা আপনি আমার কেউ নন।

এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ এ কথা কেন, বেটা? বললাম ঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুহাম্মাদের (সা) দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। বললেন ঃ বেটা, তোমার দ্বীনই আমার

দ্বীন। বললাম ঃ যান, গোসল করে পবিত্র পোশাক পরে আমার কাছে আসুন। যা আমি শিখেছি, আপনাকে শেখাবো। তিনি চলে গেলেন। গোসল করে পবিত্র পোশাক পরে আমার কাছে ফিরে এলে আমি তাঁর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। তিনি সাথে সাথে ইসলাম কবুল করলেন। তারপর এলো আমার সহধর্মিনী। তাকেও আমি দূরে সরে যেতে বললাম। 'আপনার প্রতি আমার মা-বাবা কুরবান হোক'—এ কথা বলে সে এর কারণ জানতে চায়। আমি বললাম ঃ ইসলাম তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীনে মুহাম্মাদীর অনুসারী হয়েছি। সে বললো ঃ তাহলে আপনার দ্বীনই আমার দ্বীন। বললাম ঃ যুশশারা ঝর্ণার পানি দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো। ('যুশ-শারা' দাওস গোত্রের দেবী-মূর্তি। তার পাশেই ছিল পাহাড় থেকে প্রবাহিত একটি ঝর্ণা) সে বললো ঃ আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক, ধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে আপনি কি যুশ-শারাকে একটুও ভয় পাচ্ছেন না? বললাম ঃ 'যুশ-শারা ও তুমি নিপাত যাও। যাও, সেখানে গিয়ে মানুষের ভীড় থেকে একটু দূরে থেকে গোসল করে এসো। এই বধির প্রস্তর-মূর্তি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, সে যিম্মাদারী আমি নিলাম। সে চলে গেল একটু পরে গোসল সেরে ফিরে এলো। আমি তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। সে সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। তারপর আমি দাওস গোত্রের সকল মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলাম। কিন্তু একমাত্র আবু হুরাইরা ছাড়া প্রত্যেকেই ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করলো। দাওস গোত্রের মধ্যে একমাত্র তিনিই খুব তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করেন।

তুফাইল (রা) বলেন, 'অতঃপর আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলাম। এবার আমার সংগে আবু হুরাইরা। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুফাইল, তোমার পেছনের খবর কি? বললাম ঃ 'তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে, তারা মারাত্মক কুফরীতে লিপ্ত। দাওস গোত্রের ওপর পাপাচার ও নাফরমানী ভর করে বসেছে।'

আমার এ কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অজু করে নামায আদায় করলেন এবং আকাশের দিকে হাত উঠালেন। আবু হুরাইরা বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) এমনটি করতে দেখলাম, আমার ভয় হলো এই ভেবে যে, তিনি হয়তো আমার গোত্রের ওপর বদদুআ করবেন, আর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। মনে মনে আমি বললাম ঃ আল্লাহ আমার কাওমকে হিফাজত করুন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনলাম ঃ 'হে আল্লাহ, দাওস কবীলাকে তুমি হিদায়াত দান কর', এভাবে তিনি তিনবার বললেন। তারপর তুফাইলের দিকে ফিরে বললেন ঃ এবার তুমি তোমার কাওমের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথে কোমল আচরণ কর এবং তাদেকে ইসলামের দাওয়াত দাও।'

রাসূল (সা) যখন দাওস গোত্রের জন্য হাত উঠিয়ে দুআ করছিলেন, তুফাইল বললেন ঃ 'আমি এমনটি চাইনে।' এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ তোদের মধ্যে তোমার মত আরো অনেক লোক আছে।' কথিত আছে, জুনদুব ইবন 'আমর আদ-দাওসী জাহিলী যুগেই বলতেন ঃ এ সৃষ্টি জগতের একজন স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন, তবে

তিনি কে, তা আমরা জানিনে। রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের খবর শুনে তিনি ৭৫ জন লোকসহ মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তুফাইল বলেন, আমি ফিরে এসে দাওস কবীলায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করলেন। একে একে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমমে হাজির হলাম, আমার সংগে তখন দাওস কবীলার আশিটি পরিবার। তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমাদের দেখে রাসূল (সা) ভীষণ খুশী হলেন এবং খাইবারের গণীমতের অংশও তিনি আমাদের দিলেন। আমরা বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখন থেকে যত যুদ্ধে আপনি অংশ নেবেন, দক্ষিণ ভাগের দায়িত্ব থাকবে আমাদের ওপর।' তুফাইল বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংগে থেকে গেলাম। অবশেষে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় মক্কা বিজয় হলো।

তুফাইল (রা) তার গোত্রের উপাস্য যুল-কাফ্ফাইন মূর্তিটি ভস্মিভূত করে দেন। সাথে সাথে দাওস গোত্রের অবশিষ্ট শিরকও নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। এদিকে রাসূল (সা) তায়িফ অভিযানে রওয়ানা হয়েছেন। তুফাইল (রা) তার গোত্রের আরো চার শ' সশস্ত্র লোককে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তায়িফে মিলিত হন। তুফাইল ছিলেন তাঁর দলটির অধিনায়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার পতাকাবাহী হবে কে?' তিনি বললেন, 'নুমান ইবন রাবিয়া যেহেতু দীর্ঘকাল যাবত এ দায়িত্ব পালন করে আসছে, তাই এ ক্ষেত্রেও সে এ দায়িত্বটি পালন করবে।' রাসূল (সা) তাঁর এ যুক্তি পছন্দ করলেন।

এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) যতদিন জীবিত ছিলেন তুফাইল ইবন আমর তার সার্বক্ষণিক সংগী হিসেবে ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের খিলাফাতকালে তিনি তাঁর জীবন, তরবারি ও সন্তান-সন্ততি সবই খলীফার আনুগত্যে উৎসর্গ করেন। রিদ্দার যুদ্ধের আগুন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে তিনি ভণ্ডনবী মুসাইলামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে প্রেরিত একটি বাহিনীর অগ্রসৈনিক হিসেবে পুত্র আমরকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি যখন ইয়ামামার পথে, তখন একটি স্বপ্ন দেখলেন। সংগী-সাথীদের কাছে তিনি এর ব্যাখ্যা চাইলেন। সংগীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখেছো?' তিনি বললেন, 'দেখেছি, আমার মাথা ন্যাড়া করা হয়েছে; একটি পাখী আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, আমার স্ত্রী আমাকে তাঁর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল, আমার পুত্র আমর আমাকে দ্রুত টেনে বের করতে চাইলো; কিন্তু তার ও আমার মধ্যে প্রাচীর খাড়া হয়ে গেল।'

তাঁরা মন্তব্য করলেন, 'স্বপ্নটি ভালো।' তুফাইল বলেন, 'তবে আমি স্বপ্নের তাবীর করলাম এভাবে ঃ ন্যাড়া মাথার অর্থ ঘাড় থেকে আমার মাথা বিচ্ছিন্ন হবে। মুখ থেকে পাখী বের হওয়ার অর্থ আমার রূহটি বের হয়ে যাবে। স্ত্রীর পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার অর্থ মাটি খুড়ে কবর তৈরী করে আমাকে দাফন করা হবে। আমার প্রবল বাসনা, আমি যেন শহীদের মৃত্যু বরণ করতে পারি। আর আমার পুত্র 'আমর, সেও আমার মত শাহাদাত চাইবে; কিন্তু একটু দেরীতে সে তা লাভ করবে।' তাঁর এ ব্যাখ্যা সত্যে

পরিণত হয়েছিল। হিজরী ১১ সনে ইয়ামামার যুদ্ধে এই মহান সাহাবী বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং যুদ্ধের ময়দানেই শাহাদাত বরণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর একমাত্র পুত্র 'আমরের ডান হাতের কব্জিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। এভাবে তিনি যুদ্ধের ময়দানে নিজের হাতটি ও পিতাকে হারিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফাতকালে একবার 'আমর ইবন তুফাইল এলেন তাঁর কাছে। খলীফার জন্য খাবার উপস্থিত হলে তিনি তাঁর কাছে উপবিষ্ট সকলকে আহ্বান জানালেন খাবারের জন্য। সকলে সাড়া দিলেও 'আমর সাড়া দিলেন না। খলীফা তাঁকে বললেন, 'তোমার কী হলো? সম্ভবতঃ হাতের জন্য লজ্জা পাচ্ছ?' 'আমর বললেন, 'হ্যা, তাই।' খলীফা বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমার ঐ কাটা হাতটি দিয়ে এ খাবার ঘেঁটে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মুখে দেবনা। আল্লাহর কসম, একমাত্র তুমি ছাড়া মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন আর কেউ নেই যার এক অংশ জান্নাতে। অর্থাৎ তোমার হাতটি।' পিতার মৃত্যুর পর সব সময় তিনি শাহাদাতের স্বপ্ন দেখতেন। অবশেষে হিজরী ১৫ সনে রোমান বাহিনীর সাথে ইয়ারমুকের প্রান্তরে মুসলমানদের যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেখানে তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। এভাবে বাপ-বেটা দু'জনেই শাহাদাতের গৌরব অর্জন করেন।

মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের ওপর যখন যুলুম-অত্যাচারের মাত্রা চরমে পৌছে, তখন একদিন তুফাইল প্রস্তাব দিলেন রাসূলকে (সা) তাঁদের গোত্রে হিজরাত করে তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিফাজতের পূর্ণ যিম্মাদারীর আশ্বাসও তাঁকে দান করেন। কিন্তু এ গৌরব আল্লাহ তায়ালা মদীনার আনসারদের ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। তাই তিনি তুফাইলের আহ্বানে সাড়া দেননি।

ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় গোত্রে ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যস্ত থাকায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে দীর্ঘদিন কাটাবার সুযোগ তিনি পাননি। তবে তাঁরই চেষ্টায় গোটা দাওস গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। কবি হিসেবেও তিনি তৎকালীন কাব্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সাঈদ ইবন 'আমের আল-জুমাহী (রা)

ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ সাঈদ ইবন 'আমের এমন ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত খরিদ করে নেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সা) অন্য সব কিছুর ওপর প্রাধ্যান্য দান করেন।

তাঁর পিতার নাম 'আমের এবং মাতা আরওয়া বিনতু আবী মুয়ীত। খাইবার বিজয়ের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মক্কার কুরাইশরা ধোঁকা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী খুবাইব ইবন আদীকে (রা) বন্দী করে মক্কায় নিয়ে আসে এবং সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে প্রকাশ্যে জীবিত অবস্থায় অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তাঁকে শুলবিদ্ধ করে। এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য উপভোগ করার জন্য মক্কায় ঢেড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়। এ দৃশ্য দেখার জন্য মক্কার তানয়ীম এলাকা থেকে আগত লোকদের মধ্যে সাঈদ ইবন 'আমের আল-জুমাহীও ছিলেন।

তাঁর ধমনীতে তখন যৌবনের টগবগে রক্ত। মানুষের ভীড় ঠেলে তিনিও চলেছেন সামনের দিকে। এক সময় তিনি এসে দাঁড়ালেন প্রথম সারির কুরাইশ নেতৃবৃন্দ–আবু সুফিয়ান ইবন হারব, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা প্রমুখের পাশপাশি। কুরাইশদের বন্দীকে তিনি দেখলেন বেড়ী লাগানো অবস্থায়। নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর আংগিনার দিকে। তাঁর হত্যার মাধ্যমে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশদের বদলা নেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা পৈশাচিক উল্লাসে মাতোয়ারা।

বন্দীকে সংগে নিয়ে অগণিত মানুষ বধ্যভূমিতে উপস্থিত হল। দীর্ঘদেহী যুবক সাঈদ ইবন 'আমের দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। নারী ও শিশুদের চীৎকার ও শোরগোলের মধ্যে তাঁর কানে ভেসে এল খুবাইবের দৃঢ় ও শান্ত কণ্ঠস্বর। বলছেন ঃ 'আমাকে শূলীতে চড়াবার পূর্বে তোমরা যদি অনুমতি দাও, আমি দু'রাকা'আত নামায আদায় করে নিতে পারি।' তারা অনুমতি দিল।

সাঈদ ইবন 'আমের দেখলেন, তিনি কা'বার দিকে মুখ করে দু'রাকা'আত নামায আদায় করলেন। সে নামায কতই না সুন্দর, কতই না চমৎকার! তারপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দিকে ফিরে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি মনে না করতে, আমি মরণ-ভয়ে নামায দীর্ঘ করছি, তাহলে আমি নামায আরও দীর্ঘ করতাম।'

অতঃপর সাঈদ ইবন 'আমের স্বচক্ষে দেখলেন, তাঁর গোত্রের লোকেরা জীবিত অবস্থায় খুবাইবের দেহ থেকে একটার পর একটা অংগ কেটে ফেলছে। আর তাঁকে জিজ্ঞেস করছে ঃ

'তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে আনা হোক, আর তুমি মুক্তি পেয়ে যাও, তা কি তুমি পছন্দ কর?'

তাঁর দেহ থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, আর তিনি বলছেন ঃ

'আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি, আর বিনিময়ে মুহাম্মাদের (সা) গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক তাও আমার মনঃপূত নয়।' একথা শুনে চতুর্দিক থেকে লোকেরা হাত ওপরে উঠিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ 'হত্যা কর, ওকে হত্যা করা।'

অতঃপর সাঈদ ইবন 'আমর দেখলেন, শূলীকাষ্ঠের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বলছেন ঃ

'আল্লাহুম্মা আহসিহিম আদাদা– ওয়াকতুলহুম বাদাদা ওয়ালা তুগাদির মিনহুম আহাদা–ইয়া আল্লাহ, তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখ, তাদেরকে তুমি এক এক করে হত্যা কর এবং কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।' এই ছিল তাঁর অন্তিম দু'আ। তারপর তরবারি ও বর্শার অসংখ্য আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত করা হয়।

কিছুদিনের মধ্যে কুরাইশরা বড় বড় ঘটনাবলীতে লিপ্ত হয়ে খুবাইব ও তাঁর শূলীর কথা ভুলে গেল। কিন্তু যুবক সাঈদ ইবন 'আমের আল জুমাহীর অন্তর থেকে খুবাইবের স্মৃতি এক মুহূর্তের জন্য দূরীভূত হলনা। ঘুমালে স্বপ্নের মধ্যে, জেগে থাকলে কল্পনায় তিনি খুবাইবকে দেখতেন। তিনি যেন দেখতে পেতেন, খুবাইব শূলীকাষ্ঠের সামনে অত্যন্ত ধীর-স্থির ও প্রশান্তভাবে দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কুরাইশদের ওপর অন্তিম বদ-দু'আর বিনীত সুরও যেন তিনি দু'কান দিয়ে শুনতে পেতেন। তাঁর ভয় হত এখনই হয়ত তাঁর ওপর বজ্রপাত হবে অথবা আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হবে।

তাছাড়া খুবাইবের নিকট থেকে তিনি এমন কিছু শিক্ষালাভ করেন, এর পূর্বে যা তিনি জানতেন না। যেমন ঃ বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের পথে আমরণ জিহাদই হচ্ছে প্রকৃত জীবন। মজবুত ঈমান অনেক অভিনব ও অলৌকিক বিষয় সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া একজন মানুষ যাঁকে তাঁর সংগীরা এত গভীরভাবে মুহাব্বাত করতে পারে, তিনি আল্লাহ প্রেরিত নবী ছাড়া আর কিছু নন।

সেই সময় থেকে আল্লাহ তা'আলা সাঈদ ইবন আমেরের অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। একদিন তিনি জনমণ্ডলীর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে কুরাইশদের দেব-দেবী ও মূর্তির সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করে ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। খাইবার যুদ্ধের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাঈদ ইবন আমের হিজরাত করে মদীনায় এলেন এবং সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য অবলম্বন করেন। তিনি খাইবারসহ পরবর্তী সব যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) তিরোধানের পর তাঁর দু'খলীফা আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) খিলাফতকালে সাঈদ ইবন 'আমের উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে সেনাপতি আবু উবাইদা (রা) ইয়ারমুক যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য তলব করেন। খলীফা মদীনা থেকে

সাঈদের নেতৃত্বে এক বাহিনী পাঠিয়ে দেন। ইয়ারমুকে সাঈদ (রা) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে ক্রয় ক'রে এবং আল্লাহর রিজামন্দীকে অন্তর ও দেহের সকল কামনা বাসনার ওপর প্রাধান্য দান ক'রে মুসলিমদের জন্য তিনি এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম দু'খলিফা সাঈদ ইবন 'আমেরের সততা ও আল্লাহ-ভীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এ কারণে সব সময় তাঁরা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন।

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের প্রথম পর্ব তখন চলছে। একদিন সাঈদ ইবন আমের খলীফাকে বললেন ঃ

"ওহে উমার, আমি আপনাকে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দান করছি। তবে আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে ভয় করবেন না। আপনার কথা আপনার কাজের পরিপন্থী যেন না হয়। কারণ, কর্মদ্বারা সত্যায়িত কথাই সর্বোৎকৃষ্ট কথা।

ওহে উমার, দূর ও নিকটের যে মুসলিম উম্মার শাসক আল্লাহ আপনাকে বানিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে সর্বদা আপনি সজাগ থাকবেন। আপনার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য যা আপনি পছন্দ করবেন তাদের জন্যও তা আপনি পছন্দ করবেন। আপনার নিজের ও পরিবার বর্গের জন্য যা অপছন্দ করবেন তাদের জন্যও তা অপছন্দ করবেন। সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করবেন। আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় আপনি করবেন না।"

উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'সাঈদ, এ কাজ করতে সক্ষম কে?'

তিনি বললেন ঃ

'আপনার মত ব্যক্তি। আল্লাহ যাঁকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং আল্লাহ ও আপনার মাঝে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নেই।'

তখনই তিনি সাঈদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বললেন ঃ

'সাঈদ, আমি আপনাকে হিমসের ওয়ালী নিযুক্ত করছি।'

সাঈদ বললেন, 'উমার, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমার ওপর এ বিপদ চাপাবেন না, আমাকে এ দুনিয়ার দিকে টেনে আনবেন না।'

উমার রেগে গিয়ে বললেন,

'আপনাদের ধ্বংস হোক! খিলাফতের এ দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে এখন আমার থেকে দূরে থাকতে চান? আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ছাড়বো না।' একথা বলে তিনি সাঈদকে হিমসের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার ভাতা নির্ধারণ করে দেব কি?' সাঈদ বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীন, আমি তা দিয়ে কি করব? বাইতুল মাল থেকে যে ভাতা আমি লাভ করে থাকি তাইতো আমার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয়ে যায়।' সাঈদ হিমসে চলে গেলেন।

কিছুদিন পর আমীরুল মু'মিনীন উমারের কতিপয় বিশ্বস্ত লোক হিমস থেকে মদীনা

এল। উমার তাদেরকে বললেন ঃ

'তোমাদের গরীব মিসকিনদের একটা তালিকা তোমরা আমাকে দাও। আমি তাদেরকে কিছু সাহায্য করব। তারা একটি তালিকা প্রস্তুত করে 'উমারকে দিল। তাতে অন্যান্যের সংগে সাঈদ ইবন আমেরের নামটিও ছিল। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সাঈদ ইবন আমের কে?' তারা বলল, 'আমাদের আমীর।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের আমীরও কি এতো গরীব?'

তারা বলল ঃ 'হাঁ। আল্লাহর কসম! একাধারে কয়েকদিন যাবত তাঁর বাড়ীতে উনুনে হাড়ি চড়ে না।'

একথা শুনে খলীফা 'উমার এত কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তারপর এক হাজার দিনার একটি থলিতে ভরে বললেন, 'আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে; আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমীরুল মু'মিনীন এ অর্থ পাঠিয়েছেন।'

দিনার ভর্তি থলি নিয়ে তারা সাঈদের নিকট উপস্থিত হল। থলির মুখ খুলেই তিনি দেখতে পেলেন তাতে দিনার। অমনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইলাইহি রাজিউন' বলতে বলতে থলিটি এমনভাবে দূরে সরিয়ে দিলেন যেন তাঁর ওপর বড় ধরনের কোন বিপদ আপতিত হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'সাঈদ, কি হয়েছে আপনার? আমীরুল মু'মিনীন কি ইন্তিকাল করেছেন?'

তিনি বললেন, 'না। বরং তার থেকেও বড় কিছু।'

'মুসলিমদের ওপর কি কোন বিপদ আপতিত হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'না। তাঁর থেকেও বড় কিছু।'

স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই বড় জিনিস কি?'

তিনি বললেন, 'আমার পরকালের সর্বনাশের জন্য দুনিয়া আমার কাছে ঢুকে পড়েছে। আমার ঘরে বিপদ এসে পড়েছে।'

স্ত্রী বললেন, 'বিপদ দূর করে দিন।' তখনও তিনি দিনারের ব্যাপারটি জানতেন না।

সাঈদ বললেন, 'এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই।'

তারপর দিনারগুলি কয়েকটি থলিতে ভরে তিনি গরীব মুসলিমদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

কিছুদিন পর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বচক্ষে সিরিয়ার অবস্থা দেখার জন্য হিমসে এলেন। সেকালে হিমসকে বলা হত 'কুয়াইফা'। কারণ কুফাবাসীদের মত হিমসবাসীরাও তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে সব সময় অতিরিক্ত অভিযোগ উত্থাপন করতো। তাই বলা হত হিমসও যেন ছোট-খাট একটা কুফা। যাই হোক, খলীফার আগমনের পর হিমসবাসীরা তাঁকে সালাম জানাতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের আমীরকে কেমন পেলে?'

তারা আমীরের (সাঈদ) চারটি কাজের কথা উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করল। গুরুত্বের দিক দিয়ে সে চারটি কাজের প্রত্যেকটি সমান।

'উমার বলেন, 'আমি হিমসবাসী ও তাদের আমীরকে একসাথে উপস্থিত হতে বললাম। আল্লাহর কাছে আমি দু'আ করলাম, তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা যেন হতাশাব্যঞ্জক না হয়। কারণ তাঁর প্রতি ছিল আমার দারুণ বিশ্বাস।'

হিমসবাসী ও তাদের আমীর আমার নিকট এলে আমি জিজ্ঞেস করলাম,

'তোমাদের আমীরের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কি?'

তারা বলল, 'বেশ খানিক বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে দেখা দেন না।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঈদ, এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

"আল্লাহর কসম! বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করা আমার পছন্দনীয় নয়। তবে না বললেই নয়, তাই বলছি। আমার পরিবারের জন্য কোন চাকর-বাকর নেই। সকালে বাড়ীর সব কাজই আমাকে নিজ হাতে করতে হয়। আটা মাখা ও রুটি তৈরীর কাজও আমি করে থাকি। তারপর হাত মুখ ধুয়ে মানুষকে সাক্ষাৎ দিই। তখন খানিকটা বেলা হয়ে যায়।"

উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের আরও অভিযোগ আছে কি?'

তারা বলল,

'তিনি রাতের বেলা কাউকে সাক্ষাৎ দান করেন না।'

'উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'সাঈদ, এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?'

তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! এ বিষয়টিও প্রকাশ করা আমার মনঃপূত নয়। তবুও বলছি, আমি দিন মানুষের জন্য ও রাত আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করেছি।'

'উমার জিজ্ঞেস করলেন,

'তোমাদের আর কি অভিযোগ?'

তারা বলল,

'মাসে একটি দিন তিনি কাকেও সাক্ষাৎ দান করেন না।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'সাঈদ, বিষয়টি কি?'

তিনি বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আমার কোন খাদেম নেই। পরনের এ কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড়ও আমার নেই। মাসে একবার আমি নিজ হাতে তা পরিষ্কার করি এবং শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এজন্য দিনের প্রথমভাগে লোকদের সাক্ষাৎ দিতে পারিনা। তবে শেষ ভাগে সাক্ষাৎ দিই।'

উমার আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আছে?'

তারা বলল,

'মজলিসে মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।'

উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি সাঈদ?'

তিনি বললেন,

"আমি মুশরিক অবস্থায় খুবাইব ইবন আদীকে শূলীতে চড়ানোর দৃশ্য দেখেছিলাম। আমি আরও দেখেছিলাম কুরাইশরা তাঁর অংগ-প্রত্যংগ এক এক করে কেটে ফেলছে। সে সময় কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল,

'তোমার স্থানে মুহাম্মাদকে (সা) আনা হোক তা কি তুমি পছন্দ কর?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবার বর্গ ও সন্তান সন্ততির মাঝে নিরাপদে ফিরে যাই, আর এর বিনিময়ে মুহাম্মাদের (সা) গায়ে কাঁটার একটি আঁচড়ও লাগুক তাও আমার মনঃপূত নয়।, আল্লাহর কসম! যখনই আমার সে দিনটির স্মৃতি মনে পড়ে এবং কেন আমি সেদিন তাঁকে সাহায্য করিনি– এ অনুভূতি আমার মধ্যে জেগে ওঠে, তখন আমি চেতনা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, আল্লাহ আমার এ অপরাধ ক্ষমা করবেন না।'

উমার তখন বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেননি। তারপর তিনি সাঈদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এক লাখ দিনার পাঠালেন। তাঁর সহধর্মিনী দিনারগুলি দেখে বলে উঠলেন ঃ

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে আপনার সেবা গ্রহণ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যান, আমাদের জন্য খাদ্য-খাবার কিনে আনুন এবং একটি চাকর রাখুন।'

একথা শুনে তিনি স্ত্রীকে বললেন ঃ

'এর থেকে উত্তম কিছু লাভ কর তাকি তুমি চাওনা? স্ত্রী বললেন, 'সেই উত্তম বস্তু কী?"

তিনি বললেন, 'আমরা এ দিনারগুলি আল্লাহকে করজে হাসানা দিয়ে দিই। তিনি আমাদের উত্তম বিনিময় দান করবেন, আমরা তো সেই বিনিময়ের সর্বাধিক মুখাপেক্ষী।'

স্ত্রী বললেন, 'হাঁ, তা দিন। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'

সেই মজলিসে বসে তিনি দিনারগুলি কয়েকটি থলিতে ভরলেন। তারপর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের হাতে একটি করে থলি দিয়ে তিনি বললেন ঃ অমুক বিধবা, অমুক ইয়াতিম, অমুক গোত্রের মিসকীন এবং অমুক গোত্রের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলি করে এস।

নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যকে যাঁরা প্রাধান্য দেয়, সাঈদ সেই মহান ব্যক্তিদের একজন।

হিমসের ওয়ালী থাকা অবস্থায় খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে একবার মদীনায় ডেকে পাঠান। তিনি মদীনায় এলেন। হাতে তাঁর একটি লাঠি এবং খাওয়ার জন্য একটি মাত্র পিয়ালা। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাজ-সরঞ্জাম এতটুকুই? জবাব দিলেন, এর চেয়ে বেশী জিনিসের প্রয়োজন কি জন্য? পিয়ালায় খাই এবং লাঠিতে সাজ-সরঞ্জাম ঝুলিয়ে নিই।

ইবন সা'দের মতে, হিমসের ওয়ালী থাকা অবস্থায় হিজরী ২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। আবু উবাইদার মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ২১।

সুরাকা ইবন মালিক (রা)

কুরাইশদের মাঝে যখন এ কথাটি ছড়িয়ে পড়লো যে, মুহাম্মাদ (সা) মক্কায় নেই তখন একদিকে যেমন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ খবরটি বিশ্বাসই করতে পারছিলনা, অন্য দিকে মক্কায় একটা ভীতির ভাবও ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে তারা বনু হাশিমের প্রতিটি বাড়ীতে তল্লাশী শুরু করে দেয়। মুহাম্মাদের (সা) ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বাড়ী-ঘর তল্লাশী করতে করতে তারা আবু বকরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তাদের সাড়া পেয়ে আবু বকরের মেয়ে আসমা বেরিয়ে আসেন। কুরাইশ নেতা আবু জাহল তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আব্বা কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তিনি এখন কোথায় তাতো আমি জানিনা।'

নরাধম আবু জাহল আসমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলে তাঁর কানের দুলটি ছিট্‌কে পড়ে এবং তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

কুরাইশদের যখন স্থির বিশ্বাস হলো যে, মুহাম্মাদ (সা) সত্যি সত্যি মক্কা থেকে চলে গেছেন, তখন তাদের অস্থিরতা আরও বেড়ে যায়। তারা একদল পদচিহ্ন বিশারদকে পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য লাগিয়ে দেয়। পদচিহ্ন বিশারদরা 'সাওর' পর্বতের গুহার কাছে এসে কুরাইশদের বললো, আল্লাহর কসম, তোমাদের সাথী মুহাম্মাদ (সা) এ গুহা ছেড়ে এখনও কোথাও যায়নি।' আসলে তাদের এ অনুমান সঠিক ছিল। মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথী আবু বকর তখনও সেই গুহার মধ্যে। আর কুরাইশরা তাঁদের মাথার ওপরে। এমন কি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) গুহার ওপরের দিকে তাদের মাথার ওপর বিচরণকারী কুরাইশদের পা-ও দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ দু'টি পানিতে ঝাপসা হয়ে গেল। ভালোবাসা, দরদ ও ভর্ৎসনা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দিকে তাকালেন। ফিস ফিস করে আবু বকর বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমার নিজের জানের ভয়ে নয়, আপনার প্রতি তাদের কোন দুর্ব্যবহার আমাকে দেখতে হয়, এ ভয়ে আমি কাঁদছি। তাঁকে আশ্বস্ত করে রাসূল (সা) বললেন, 'আবু বকর, দুশ্চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'

আল্লাহ তায়ালা আবু বকরের অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন। তবে তিনি বার বার মাথার ওপর চলাচলরত কুরাইশদের পায়ের দিকে তাকাতে লাগলেন। এক সময় তিনি রাসূলকে (সা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাদের কেউ তার দু'পায়ের পাতার দিতে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে।' জবাবে রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি কি মনে করেছো আমরা মাত্র দু'জন? তৃতীয় একজন, আল্লাহও আমাদের সাথে আছেন।'

সেই মুহূর্তে তাঁরা দু'জন কুরাইশদের এক যুবককে বলতে শুনলেন, 'তোমরা সবাই গুহার দিকে এসো, আমরা একটু ভেতরটা দেখবো।' উমাইয়্যা ইবন খালফ তাকে একটু বিদ্রূপ করে বললো, 'গুহার মুখে এই মাকড়সা ও তার বাসা দেখতে পাওনা? এগুলি মুহাম্মাদের জন্মেরও আগে থেকে এখানে আছে।' তবে আবু জাহল বললো, লাত

ও উজ্জার শপথ, আমার মনে হচ্ছে তারা আমাদের ধারে কাছে কোথাও আছে। আমাদের কথা তারা শুনছে এবং আমাদের কার্যকলাপও তারা দেখছে। কিন্তু তার ইন্দ্রজালে আমাদের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না।'

যা হোক, কুরাইশরা মুহাম্মাদকে (সা) খুঁজে বের করার ব্যাপারে একেবারে হাত গুটিয়ে নিলনা এবং তাঁর পিছু ধাওয়া করার সিদ্ধান্তেও তাদের কোন নড়চড় হলো না। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত গোত্রগুলিতে তারা ঘোষণা করে দিল, কোন ব্যক্তি মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরে দিতে পারলে তাকে একশ'টি উন্নত জাতের উট পুরস্কার দেয়া হবে।

সুরাকা ইবন মালিক আল-মাদলাজী তখন মক্কার অনতিদূরে 'কুদাইদ' নামক স্থানে তার গোত্রের একটি আড্ডায় অবস্থান করছিল। এমন সময় কুরাইশদের একজন দূত সেখানে উপস্থিত হয়ে মুহাম্মাদকে (সা) জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দেয়ার ব্যাপারে কুরাইশদের ঘোষিত পুরস্কারের কথা প্রচার করলো।

একশ' উটের কথা শুনে সুরাকার মধ্যে লালসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। কিন্তু অন্যের মধ্যেও এ লালসা সঞ্চার হতে পারে এ ভয়ে সে কোন কথা না বলে নিজেকে সামলে নিল।

সুরাকা আড্ডা থেকে ওঠার আগেই সেখানে তার গোত্রের অন্য একটি লোক এসে বললো 'আল্লাহর শপথ, আমার পাশ দিয়ে এখনই তিন জন লোক চলে গেল, আমার ধারণা তারা মুহাম্মাদ, আবু বকর ও তাদের গাইডই হবে।'

সুরাকা বললো 'না, তা না। তারা হচ্ছে অমুক গোত্রের লোক। তাদের উট হারিয়ে গেছে তাই তারা তালাশ করছে।' 'তা হতে পারে'— এ কথা বলে লোকটি চুপ করে গেল।

আড্ডা থেকে সংগে সংগে উঠে গেলে অন্যদের মনে সন্দেহ হতে পারে, এ কারণে সে আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকলো। আড্ডায় উপস্থিত লোকেরা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলে এক সুযোগে সে চুপে চুপে বেরিয়ে গেল। আড্ডা থেকে বেরিয়েই সে বাড়ীর দিকে গেলো। বাড়ীতে পৌঁছেই দাসীকে বললো, 'তুমি চুপে চুপে মানুষে না দেখে এমনভাবে আমার ঘোড়াটি অমুক উপত্যকায় বেঁধে রাখবে।' আর দাসকে বললো, 'তুমি এ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ীর পিছন দিক থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেন কেউ না দেখে এবং ঘোড়ার আশে পাশে কোন একস্থানে রেখে দেবে।'

সুরাকা বর্ম পরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো এবং মুহাম্মাদকে পাকড়াও করার জন্য দ্রুত ঘোড়া হাঁকালো, যাতে মুহাম্মাদকে (সা) ধরে দিয়ে অন্য কেউ এ পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে না পারে। সে ছিল তার গোত্রের দক্ষ ঘোড় সওয়ারদের অন্যতম। সে ছিল দীর্ঘদেহী, বিশাল বপুধারী, পদচিহ্ন বিশারদ ও বিপদে দারুণ ধৈর্যশীল। সর্বোপরি সে ছিল একজন বুদ্ধিমান কবি। তার ঘোড়াটি ছিল উন্নত জাতের।

সুরাকা সামনে এগিয়ে চললো। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়াটি হোঁচট খেলো এবং সে

পিঠ থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়লো। এটাকে সে অশুভ লক্ষণ মনে করে বলে উঠলো, 'একি? ওরে ঘোড়া, তুই নিপাত যা।' এই বলে সে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠলো। কিছু দূর যেতে না যেতেই ঘোড়াটি আবার হোঁচট খেলো। এবার তার অশুভ লক্ষণের ধারণা আরও বেড়ে গেল। সে ফিরে যাওয়ার চিন্তা করলো; কিন্তু এক শ' উটের লোভ তাকে এ চিন্তা থেকে বিরত রাখলো।

দ্বিতীয়বার ঘোড়াটি যেখানে হোঁচট খেয়েছিল সেখান থেকে সামান্য দূরে সে দেখতে পেল মুহাম্মাদ (সা) তাঁর দু'সঙ্গীকে, সংগে সংগে সে তার হাত ধনুকের দিকে বাড়ালো; কিন্তু সে হাতটি যেন একেবারে অসাড় হয়ে গেল। সে দেখতে পেল তার ঘোড়ার পা যেন শুকনো মাটিতে দেবে যাচ্ছে এবং সামনে থেকে প্রচণ্ড ধোঁয়া উঠে ঘোড়া ও তার চোখ আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সে দ্রুত ঘোড়াটি হাঁকানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোড়াটি এমন স্থির হয়ে গেল, যেন তার পা লোহার পেরেক দিয়ে মাটিতে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর সুরাকা রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের দিকে ফিরে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'ওহে' তোমরা তোমাদের প্রভুর দরবারে আমার ঘোড়ার পা মুক্ত হওয়ার জন্য দুআ করো। আমি তোমাদের কোন অকল্যাণ করবো না।' রাসূল (সা) দুআ করলেন। তার ঘোড়া মুক্ত হয়ে গেল। সংগে সংগে তার লালসাও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে তার ঘোড়াটি আবার রাসূলের (সা) দিকে হাঁকালো। এবার পূর্বের চেয়েও মারাত্মকভাবে তার ঘোড়ার পা মাটিতে আটকে গেল। এবারও সে রাসূলের (সা) সাহায্য কামনা করে বললো, 'আমার এ খাদ্য সামগ্রী, আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র তোমরা নিয়ে নাও। আমি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করছি, মুক্তি পেলে আমি আমার পেছনে ধাবমান লোকদের তোমাদের থেকে অন্য দিকে হটিয়ে দেব।'

তাঁরা বললেন, 'তোমার খাদ্য সামগ্রী ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন আমাদের নেই। তবে তুমি লোকদের আমাদের থেকে দূরে হটিয়ে দেবে।' অতঃপর রাসূল (সা) তার জন্য দুআ করলেন। তার ঘোড়াটি মুক্ত হয়ে গেল। সে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে ডেকে বললো, 'তোমরা একটু থাম, তোমাদের সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আল্লাহর কসম, তোমাদের কোন অকল্যাণ আমি করবো না।'

রাসূল (সা) ও আবু বকর উভয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি আমাদের কাছে কী চাও?' সে বললো, 'আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মাদ, আমি নিশ্চিতভাবে জানি শিগগিরই তোমার দ্বীন বিজয়ী হবে। আমার সাথে তুমি ওয়াদা কর, আমি যখন তোমার সাম্রাজ্যে যাব, তুমি আমাকে সম্মান দেবে। আর এ কথাটি একটু লিখে দাও।'

রাসূল (সা) আবু বকরকে লিখতে বললেন। তিনি একখণ্ড হাড়ের ওপর কথাগুলি লিখে তার হাতে দিলেন। সুরাকা ফিরে যাবার উপক্রম করছে, এমন সময় রাসূল (সা) তাকে বললেন, 'সুরাকা, তুমি যখন কিসরার রাজকীয় পোশাক পরবে তখন কেমন হবে'?

বিস্ময়ের সাথে সুরাকা বললো, 'কিসরা ইবন হুরমুয?' রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ, কিসরা ইবন হুরমুয।'

সুরাকা পেছন ফিরে চলে গেল। ফেরার পথে সে দেখতে পেল লোকেরা তখনও রাসূলকে (সা) সন্ধান করে ফিরছে। সে তাদেরকে বললো, 'তোমরা ফিরে যাও।' আমি এ অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত তাকে খুঁজেছি। আর তোমরা তো জান পদ-চিহ্ন অনুসরণের ক্ষেত্রে আমার যোগ্যতা কতখানি। তার এ কথায় লোকেরা ফিরে গেল।

মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের খবর সে সম্পূর্ণরূপে চেপে গেল। যখন তার স্থির বিশ্বাস হলো এত দিনে তাঁরা মদীনায় পৌছে কুরাইশদের শত্রুতা থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছেন, তখন সে তার ঘটনাটি প্রচার করলো। রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে সুরাকার ভূমিকা ও আচরণের খবর যখন আবু জাহলের কানে গেল সে তার ভীরুতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার না করার জন্য ভীষণ তিরস্কার করলো। উত্তরে সে তার স্বরচিত দু'টি শ্লোক আবৃত্তি করলো ঃ

'আল্লাহর শপথ, তুমি যদি দেখতে আবু হিকাম,
আমার ঘোড়ার ব্যাপারটি, যখন তার পা ডুবে যাচ্ছিল, তুমি জানতে
এবং তোমার কোন সংশয় থাকতো না, মুহাম্মাদ প্রকৃত রাসূল–
সুতরাং কে তাঁকে প্রতিরোধ করে?'

ইবন হাজার *'আল ইসাবা'* গ্রন্থে শ্লোক দু'টি উল্লেখ করেছেন।

সময় দ্রুত বয়ে চললো। একদিন যে মুহাম্মাদ (সা) মক্কা থেকে রাতের অন্ধকারে গোপনে সরে গিয়েছিলেন, আবার তিনি বিজয়ীর বেশে হাজার হাজার সশস্ত্র সঙ্গীসহ প্রবেশ করলেন সেই মক্কা নগরীতে। অত্যাচারী ও অহংকারী কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, যাদের দৌরাত্মে সর্বদা প্রকম্পিত থাকতো মক্কা, ভীত-বিহ্বল চিত্তে হাজির হলো মুহাম্মাদের (সা) নিকট করুণা ভিক্ষার জন্য।

মহানুভব নবী (সা) তাদের বললেন, 'যাও তোমরা সবাই মুক্ত, স্বাধীন।'

সুরাকা ইবন মালিক চললো রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তার ইসলামের ঘোষণা দানের জন্য। সে সঙ্গে নিল দশ বছর পূর্বে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহর (সা) সেই অঙ্গীকার পত্রটি। পরবর্তীকালে সুরাকা বর্ণনা করেছেন ঃ

'আমি জি'রানা (মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলাম। আনসারদের একদল সৈনিকের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে তারা আমাকে তীরের বাট দিয়ে পিটাতে শুরু করে এবং বলতে থাকে, 'দূর হও, দূর হও, কি চাও?' তবুও আমি তাদের সারির মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কাছাকাছি গেলাম। তিনি তখন তার উটনীর ওপর সওয়ার। আমি সেই অঙ্গীকার পত্রটিসহ হাত উঁচু করে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সুরাকা ইবন মালিক। আর এই হলো আপনার অঙ্গীকার পত্র।'

রাসূল (সা) বললেন, 'সুরাকা, আমার কাছে এসো, আজ প্রতিশ্রুতি পালন ও সদ্ব্যবহারের দিন।'

আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছাকাছি গিয়ে তাঁর সামনে ইসলামের ঘোষণা দিলাম। এভাবে আমি তাঁর কল্যাণ ও বরকত লাভে ধন্য হলাম।'

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতে হযরত সুরাকা (রা) ব্যথিত ও শোকাভিভূত হন। একশ'টি উটের লোভে যেদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে দিনটির কথা ঘুরে ফিরে তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠতে থাকে। এখন পৃথিবীর সকল উটও রাসূলুল্লাহর (সা) একটি নখাগ্রেরও সমান নয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেই প্রশ্নটি বার বার আওড়াতেন, 'সুরাকা, যেদিন তুমি কিসরার পোশাক পরবে, কেমন হবে?' কিসরার পোশাক যে সত্যি তিনি পরবেন সে ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা।

সময় বয়ে চললো। ইসলামী খিলাফাতের দায়িত্ব হযরত উমার ফারুকের (রা) হাতে ন্যস্ত হলো। তাঁর গৌরবময় যুগে মুসলিম সেনাবাহিনী ঝড়ের গতিতে পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করলো। তাঁরা পারস্যের দুর্গসমূহ তছনছ করে দিয়ে তাদের বাহিনীকে পরাজিত করে পারস্য-সিংহাসন দখল করলো।

হযরত উমারের (রা) খিলাফাতকালের শেষ দিকে পারস্য জয়ের সুসংবাদ নিয়ে সেনাপতি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের দূত পৌছলেন মদীনায়। তিনি সংগে নিয়ে এলেন পারস্যের গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ। গনীমাতের ধন-দৌলত উমারের সামনে স্তূপীকৃত করা হলে তিনি বিস্ময়ের সাথে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। তার মধ্যে ছিল কিসরার মণি-মুক্তা খচিত মুকুট, সোনার জরি দেয়া কাপড়, মুক্তার হার, এবং তার এমন চমৎকার দু'টি জামা যা ইতিপূর্বে আর কখনও হযরত উমার দেখেননি। তাছাড়া আর ছিল বহু অমূল্য জিনিস। হযরত উমার হাতের লাঠিটি দিয়ে এই মূল্যবান ধন-রত্ন উল্টাতে লাগলেন। তারপর চারপাশে উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যারা এসব জিনিস থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে জমা দিয়েছে, নিশ্চয় তারা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন।

হযরত আলী (রা), তিনি তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, বলেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি, আপনার প্রজারাও ভঙ্গ করেনি। আপনি যদি অন্যায়ভাবে খেতেন, তাহলে তারাও খেত।

অতঃপর হযরত উমার (রা) সুরাকা ইবন মালিককে ডেকে নিজ হাতে তাঁকে কিসরার জামা, পাজামা, জুতো ও অন্যান্য পোশাক পরালেন। তাঁর কাঁধে ঝুলালেন কিসরার তরবারি, কোমরে বাঁধলেন বেল্ট, মাথায় রাখলেন মুকুট এবং তাঁর হাতে পরালেন বালা। সে বালা কতই না চমৎকার!

হযরত উমার (রা) সুরাকাকে পরাচ্ছেন কিসরার পোশাক, আর এ দিকে মুসলমানদের মুহুর্মুহু তাকবীর ধ্বনিতে মদীনার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে।

কিসরার পোশাক পরা শেষ হলে সুরাকার দিকে ফিরে হযরত উমার (রা) বললেন, 'সাবাশ, সাবাশ, মুদলাজ গোত্রের ক্ষুদে এক বেদুঈনের মাথায় শোভা পাচ্ছে শাহানশাহ কিসরার মুকুট এবং হাতে বালা।' তারপর তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, এ সম্পদ তুমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দাওনি, অথচ তিনি ছিলেন তোমার কাছে আমার থেকে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত। তুমি দাওনি এ সম্পদ আবু বকরকেও। তিনিও

ছিলেন তোমার নিকট আমার থেকেও অধিকতর প্রিয় ও মর্যাদাবান। আর তা দান করেছো আমাকে পরীক্ষার জন্য। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।' অতঃপর তিনি সূরা মুমিনুনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি পাঠ করলেন, 'তারা কি মনে করে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দ্বারা তাদের সকল প্রকার মঙ্গল তরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।' (৫৫-৫৬)

সকল সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন না করা পর্যন্ত তিনি সে মজলিস ত্যাগ করলেন না।

হযরত সুরাকা ইবন মালিকের এ কাহিনী ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদও আল-বারা ইবন আযিব ও আবু বকর সিদ্দীকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আবু আমর বলেন, সুরাকা ইবন মালিক খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে ২৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত উসমানের পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইকরিমা ইবন আবী জাহল (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ 'শিগগিরই ইকরিমা কুফর ত্যাগ করে মুমিন হিসেবে **তোমাদের কাছে আসছে। তোমরা তার** পিতাকে (আবু জাহল) গালি দেবেনা। কারণ মৃতকে **গালি দিলে জীবিতদের মনোকষ্টের কারণ** হয় এবং মৃতের কাছে তা পৌঁছেনা।'

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) **যখন মক্কায় দ্বীনের** দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন ইকরিমার বয়সের তৃতীয় দশকটি শেষ হতে চলেছে। কুরাইশদের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সর্বাধিক সম্মানিত ও ধনশালী। মক্কার সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্তান সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, মুস'য়াব ইবন উমাইর প্রমুখের মত তাঁরও উচিত ছিল প্রথম স্তরেই ইসলাম গ্রহণ করা। কিন্তু তাঁর পিতার জন্য তা সম্ভব হয়নি।

তাঁর পিতা আবু জাহল ছিল মক্কার সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাচারী, প্রথম যুগের মুশরিকদের নেতা ও কঠোর অত্যাচারী। আল্লাহ তা'আলা তার অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমান পরীক্ষা করেছেন এবং সে পরীক্ষায় তাঁরা সফলকাম হয়েছেন। তার ধোঁকার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সত্যতা যাচাই করেছেন এবং তাতে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পিতার নেতৃত্বে ইকরিমা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) শত্রুতায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁর অত্যাচারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাঁর এ নিষ্ঠুরতা দেখে তাঁর পিতা আবু জাহল পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করতো।

তাঁর পিতা বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের নেতৃত্ব দেয়। সে লাত ও উজ্জার নামে শপথ করে যে, মুহাম্মাদের একটা হেনস্তা না করে মক্কায় ফিরবে না। বদরে ঘাঁটি গেড়ে দিন তিন অবস্থান করলো, উট জবেহ করলো, মদ পান করে মাতাল হলো এবং গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে নাচ-গানে মত্ত হলো। আবু জাহল যখন এ যুদ্ধ পরিচালনা করছিল, ইকরিমা তখন তার ডান হাত– প্রধান সহযোগী। কিন্তু লাত ও উজ্জা এ যুদ্ধে আবু জাহলের ডাকে সাড়া দেয়নি, এ দু'টি উপাস্য মূর্তি তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি। পারা সম্ভবও ছিলো না।

বদরের ময়দানে আবু জাহল মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। ইকরিমা নিজ চোখেই দেখলেন কিভাবে মুসলমানদের তীরের ফলা তাঁর পিতার রক্ত পান করছে এবং তিনি নিজ কানেই শুনতে পেলেন তাঁর পিতার মুখের অন্তিম চিৎকার ধ্বনিটি।

কুরাইশ নেতা আবু জাহলের মৃতদেহটি বদরে ফেলে রেখে ইকরিমা মক্কায় ফিরে এলেন। শোচনীয় পরাজয় তাঁকে পিতার লাশটি দাফনের সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। মুসলমানরা বদরে নিহত অন্যান্য মুশরিক সৈন্যদের সাথে তারও লাশটি 'কালীব' নামক কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেয়। এভাবেই এ অহঙ্কারী অত্যাচারী কুরাইশ নেতার দর্প চূর্ণ হয়।

এ দিন থেকেই ইসলামের সাথে ইকরিমার আচরণ নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ

যাবত তিনি পিতার মান-মর্যাদা রক্ষার্থে ইসলামের সাথে দুশমনী করে এসেছেন। আর এখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন পিতার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের। বদরে অন্য যারা পিতৃহারা হয়েছিল, তিনি তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে মুহাম্মাদের (সা) বিরুদ্ধে মুশরিকদের অন্তরে শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দিতে শুরু করলেন এবং তাদেরকে বদরে নিহতদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। এভাবেই উহুদের যুদ্ধটি সংগঠিত হয়।

ইকরিমা ইবন আবু জাহল উহুদের দিকে যাত্রা করলেন। সংগে তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীমও বদরে স্বামী, ভ্রাতা ও পুত্রহারা নারীদের সাথে চললেন। উদ্দেশ্য, তারা সেখানে যুদ্ধরত সৈনিকদের পশ্চাতে অবস্থান করে বাদ্য বাজাবেন, কুরাইশদেরকে যুদ্ধে উৎসাহ দেবেন এবং পলায়ন উদ্যত সৈনিকদেরকে সাহস ও শক্তি যোগাবেন।

কুরাইশরা তাদের অশ্বারোহী সৈনিকদের ডান দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও বাম দিকে ইকরিমা ইবন আবী জাহলকে নিয়োগ করলো। সেদিন তারা দু'জন সাহসিকতা ও রণকৌশলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। তাঁরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীদের হাত থেকে বিজয়ের গৌরব ছিনিয়ে এনে কুরাইশদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাই সেদিনকার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বলতে পেরেছিলেন ঃ 'এটা বদরের দিনের প্রতিশোধ।'

এরপর এলো খন্দকের যুদ্ধ। মুশরিক সৈন্যরা কয়েকদিন যাবত মদীনা অবরোধ করে রেখেছে। ইকরিমার ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে যাচ্ছে, তিনি তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছেন। অবশেষে তিনি দেখতে পেলেন খন্দকের এক স্থানে সংকীর্ণ একটা পথ। তার মধ্য দিয়ে অতি কষ্টে তিনি তাঁর ঘোড়াটি ঢুকিয়ে দিলেন এবং খন্দক পার হয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে খন্দক পার হলো আরো কিছু মুশরিক সৈনিক। মুসলিম সৈনিকরা তাদেরকে তাড়া করে। ইকরিমা তাঁর অন্য সংগীদের সাথে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান, কিন্তু তাঁর একজন সংগী আমর ইবনু আবদে উদ্দ আল-আমিরী মুসলিম সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারায়।

মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশরা বুঝতে পেল মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীদের বাধা দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হবে না। তারা মুসলমানদের পথ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মুহাম্মাদ (সা) ঘোষণা করলেন ঃ মক্কাবাসীদের যারা মুসলিম সৈনিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, কেবল তাদের সাথেই যুদ্ধ করা হবে। তাছাড়া অন্য সকলকে ক্ষমা করা হবে।

ইকরিমা ইবনে আবী জাহল এবং আরো একদল সৈনিক কুরাইশদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিম সৈনিকদের ছোট্ট একটি দল তাদের এ প্রতিরোধ ব্যূহ তছনচ করে দেয়। তাঁরা তাদের অনেককে হত্যা করে এবং অনেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। এ পলায়নকারীদের মধ্যে ইকরিমা ইবন আবী জাহলও ছিলেন।

মুসলমানদের মক্কা বিজয়ের পর ইকরিমা ইবন আবী জাহল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি এই প্রথম বারের মত তাঁর শক্তি মদমত্ততা থেকে সম্বিত ফিরে

পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন মক্কা আর তাঁর জন্যে নিরাপদ নয়। এদিকে রাসূল (সা) মক্কাবাসীদের সকলের অতীত আচরণ ক্ষমা করে দেন। তবে তিনি কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে তাদেরকে এ ক্ষমার আওতা থেকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করেন। কা'বার গিলাফের নীচে পাওয়া গেলেও তিনি তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। হত্যার নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষস্থানে ইকরিমার নামটি। তিনি কোন উপায়ান্তর না দেখে গোপনে মক্কা থেকে বের হয়ে ইয়ামনের দিকে যাত্রা করেন।

এদিকে ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হাকীম ও হিন্দা বিনতু উতবা গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। তাদের সাথে গেলেন আরো অনেক মহিলা। উদ্দেশ্য তাঁদের, রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হওয়া। তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলেন, তখন তার কাছে বসা ছিলেন তাঁর দু' স্ত্রী, কন্যা ফাতিমা ও বনী আবদুল মুত্তালিবের আরো বহু মহিলা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় হিন্দা কথা বললেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে। হিন্দা ছিলেন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ও আমীর মুয়াবিয়ার মা। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবিয়েছিলেন ইনিই। তাই মক্কা বিজযের দিনে লজ্জা ও অনুশোচনায় মাথা ও মুখ ঢেকে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হন।

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর মনোনীত দ্বীনকে বিজয়ী করেছেন। আপনার ও আমার মাঝে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে সূত্রে আমি আপনার নিকট ভালো ব্যবহার আশা করি। এখন আমি একজন ঈমানদার ও বিশ্বাসী নারী' এ কথা বলেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে পরিচয় দেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হিন্দা বিনতু উতবা'। রাসূল (সা) বললেন, 'খোশ আমদেদ।' হিন্দা বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, হেয় ও অপমানিত করার জন্য আপনার বাড়ী থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয় বাড়ী ধরাপৃষ্ঠে এর আগে আর ছিলনা। আর এখন আপনার বাড়ী থেকে অধিক সম্মানিত বাড়ী আমার নিকট দ্বিতীয়টি নেই।'

রাসূল (সা) বললেন ঃ আরো অনেক বেশী।

এরপর ইকরিমার স্ত্রী উম্মু হাকীম উঠে দাঁড়িয়ে ইসলাম গ্রহণের স্বীকৃতি দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ইকরিমাকে হত্যা করতে পারেন, এ ভয়ে সে ইয়ামনের দিকে পালিয়ে গেছে। আপনি তাকে নিরাপত্তা দিন আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দেবেন। রাসূল (সা) বললেন, 'সে নিরাপদ'।

সেই মুহূর্তে উম্মু হাকীম তাঁর স্বামী ইকরিমার সন্ধানে বের হলেন। সংগে নিলেন তাঁর এক রূমী ক্রীতদাস। তারা দু'জন রাস্তায় চলছেন। পথিমধ্যে দাসটির মনে তার মনিবের প্রতি অসৎ কামনা দেখা দিল। সে চাইলো তাঁকে ভোগ করতে, আর তিনি নানা রকম টালবাহানা করে সময় কাটাতে লাগলেন। এভাবে তারা একটি আরব গোত্রে পৌঁছলেন। সেখানে উম্মু হাকীম তাদের সাহায্য কামনা করলেন। তারা তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিল। তিনি তাঁর দাসটিকে তাদের জিম্মায় রেখে একাকী পথে বের হলেন। অবশেষে তিনি তিহামা অঞ্চলে সমুদ্র উপকূলে ইকরিমার দেখা পেলেন। সেখানে তিনি এক মাঝির সাথে কথা বলছেন তাঁকে পার করে দেওয়ার জন্য, আর মাঝি তাকে

বলছেন ঃ

– 'সত্যবাদী হও'

ইকরিমা তাকে বললেন,

– 'কিভাবে আমি সত্যবাদী হবো?'

মাঝি বললেন,

– 'তুমি বলো, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

– 'আমি তো শুধু এ কারণেই পালিয়েছি।' তাদের দু'জনের এ কথোপকথনের মাঝখানেই উম্মু হাকীম উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

'হে আমার চাচাতো ভাই, আমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি। আমি তাঁর কাছে তোমার জন্য আমান চেয়েছি। তিনি তোমার আমান মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং এরপরও তুমি নিজেকে ধ্বংস করোনা।'

এ কথা শুনে ইকরিমা জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– 'তুমি নিজেই তাঁর সাথে কথা বলেছো?'

তিনি বললেন ঃ

– 'হা, আমিই তাঁর সাথে কথা বলেছি, এবং তিনি তোমাকে আমান দিয়েছেন'— এভাবে বার বার তিনি তাঁকে আমানের কথা শুনাতে লাগলেন ও তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন। অবশেষে আশ্বস্ত হয়ে তিনি স্ত্রীর সাথে ফিরে চললেন।

পথে চলতে চলতে উম্মু হাকীম তাঁর দাসটির কাণ্ড-কারখানার কথা স্বামীকে খুলে বললেন। ফেরার পথে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই ইকরিমা দাসটিকে হত্যা করেন।

পথিমধ্যে তাঁরা এক বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। ইকরিমা চাইলেন একান্তে তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে। কিন্তু স্ত্রী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

– 'আমি একজন মুসলিম নারী এবং আপনি এখনও একজন মুশরিক। স্ত্রীর কথা শুনে ইকরিমা অবাক হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন,

– 'তোমার ও আমার মিলনের মাঝখানে যে ব্যাপারটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা তো খুব বিরাট ব্যাপার।!'

এভাবে ইকরিমা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ 'খুব শিগ্‌গিরই ইকরিমা কুফর ত্যাগ করে মুমিন হিসেবে তোমাদের কাছে আসছে। তোমরা তার পিতাকে গালি দেবে না। কারণ মৃতকে গালি দিলে তা জীবিতদের মনে কষ্টের কারণ হয় এবং মৃতের কাছে তা পৌঁছে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইকরিমা তাঁর স্ত্রীসহ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখেই আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাদর গায়ে না জড়িয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রাসূল (সা) বসলেন। ইকরিমা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

– 'ইয়া মুহাম্মাদ, উম্মু হাকীম আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে আমান দিয়েছেন।'

নবী (সা) বললেন, 'সে সত্যই বলেছে। তুমি নিরাপদ।'

ইকরিমা বললেন, 'মুহাম্মাদ, আপনি কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?'

রাসূল (সা) বললেন, 'আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। তারপর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দান করবে।' এভাবে তিনি ইসলামের সবগুলি আরকান বর্ণনা করলেন।

ইকরিমা বললেন, 'আল্লাহর কসম, আপনি একমাত্র সত্যের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন এবং কল্যাণের নির্দেশ দিচ্ছেন।' তারপর তিনি বলতে লাগলেন ঃ

– 'এ দাওয়াতের পূর্বেই আপনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সবচেয়ে সৎকর্মশীল।' তারপর একথা বলতে বলতে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন এবং বলেন, 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' একথার পর তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বলতে পারি, এমন কিছু ভাল কথা আমাকে শিখিয়ে দিন।'

রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি বলো, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

রাসূল (সা) বললেন, "তুমি বলো, 'উশহিদুল্লাহা ওয়া উশহিদু মান হাদারা আন্নি মুসলিমুন মুজাহিদুন মুহাজিরুন'– আল্লাহ ও উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি, আমি একজন মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির।"

ইকরিমা তা-ই বললেন। এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে বললেন, 'অন্য কাউকে আমি দিচ্ছি, এমন কোন কিছু আজ যদি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।'

ইকরিমা বললেন, 'আমি আপনার কাছে চাচ্ছি, যত শত্রুতা আমি আপনার সাথে করেছি, যত যুদ্ধে আমি আপনার মুখোমুখি হয়েছি এবং আপনার সামনে অথবা পশ্চাতে যত কথাই আমি আপনার বিরুদ্ধে বলেছি– সবকিছুর জন্য আপনি আল্লাহর কাছে আমার মাগফিরাত কামনা করুন।' তক্ষুণি রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ, যত শত্রুতাই সে আমার সাথে করেছে, তোমার নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে যত পথই সে ভ্রমণ করেছে, সবকিছুই তাকে ক্ষমা করে দাও। আমার সামনে বা অগোচরে আমার মানহানিকর যত কথাই সে বলেছে, তা-ও তুমি ক্ষমা করে দাও।'

আনন্দে ইকরিমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য যতকিছু আমি ব্যয় করেছি তার দ্বিগুণ আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবো এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যত যুদ্ধ আমি করেছি, তার দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি আল্লাহর রাস্তায় করবো।'

এ দিন থেকেই তিনি দাওয়াতের মিছিলে প্রবেশ করলেন। তিনি হলেন যুদ্ধের ময়দানে দুঃসাহসী অশ্বারোহী, মসজিদে সর্বাধিক ইবাদতকারী, রাত্রি জাগরণকারী ও আল্লাহর কিতাব পাঠকারী। পবিত্র কুরআন মুখের ওপর রেখে তিনি বলতেন ঃ 'কিতাবু

রাব্বি কালামু রাব্বি—আমার রবের কিতাব, আমার প্রভুর কালাম।' একথা বলতেন, আর আকুল হয়ে কাঁদতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ইকরিমা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা যত যুদ্ধই করেছে, তার প্রত্যেকটিতে তিনি অংশ নেন এবং যত অভিযানেই তারা বের হয়েছে তিনি থাকেন তার পুরোভাগে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে গ্রীষ্মের দুপুরে পিপাসিত ব্যক্তি যেমন ঠাণ্ডা পানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি তিনি শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের কোন এক পর্যায়ে মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হলো, তিনি তখন ঘোড়া থেকে নেমে তরবারি কোষ-মুক্ত করেন এবং রোমান বাহিনীর অভ্যন্তরভাগে ঢুকে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর দিকে ছুটে যান এবং বলেন, 'ইকরিমা এমনটি করোনা। তোমার হত্যা মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক হবে।'

জবাবে তিনি বললেন ঃ

'খালিদ আমাকে ছেড়ে দাও। রাসূলের (সা) ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে তুমি আমার থেকে অগ্রগামী। আমার পিতা ও আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বড় শত্রু। আমাকে আমার অতীতের কাফফারা আদায় করতে দাও। অনেক যুদ্ধেই আমি রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে লড়েছি। আর আজ আমি রোমান বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যাব? এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' একথা বলে তিনি মুসলমানদের কাছে আবেদন জানলেন, 'মৃত্যুর ওপর বাইয়াত করতে চায় কে?' তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দিলেন তাঁর চাচা হারিস ইবন হিশাম, দিরার ইবনুল আযওয়ার ও আরো চার শ' মুসলিম সৈনিক। তাঁরা খালিদ ইবন ওয়ালিদের তাঁবুর সম্মুখভাগ থেকেই তুমুল লড়াই চালিয়ে ইয়ারমুকের ময়দানে বিরাট বিজয় ও সম্মান বয়ে এনেছিলেন। এই ইয়ারমুকের ময়দানেই হারিস ইবন হিশাম, আয়য়াশ ইবন আবী রাবিয়া ও ইকরিমা ইবন আবী জাহলকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। পিপাসায় কাতর হারিস ইবনে হিশাম পানি চাইলেন। যখন তাঁকে পানি দেয়া হলো, ইকরিমা তখন তাঁর দিকে তাকালেন। এ দেখে তিনি বললেন, 'ইকরিমাকে দাও।' পানির গ্লাসটি যখন ইকরিমার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আয়য়াশ তার দিকে তাকালেন। তা দেখে ইকরিমা বললেন, 'আয়য়াশকে দাও।' আয়য়াশের কাছে পানির গ্লাসটি নিয়ে যাওয়া হলে দেখা গেল, তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তারপর গ্লাসটি হাতে নিয়ে একে একে তার অপর দুই সাথীর কাছে গিয়ে দেখা গেল তাঁরাও তারই পথের পথিক হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের প্রতি রাজী ও খুশী থাকুন। আমীন।

আসমা বিনতু আবী বকর (রা)

ঐতিহাসিকরা বলেন, 'হযরত আসমা (রা) একশ' বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এ দীর্ঘ জীবনে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি বা তাঁর সামান্য বুদ্ধিভ্রষ্টতাও দেখা যায়নি।'

এ মহিলা সাহাবী সর্বদিক দিয়েই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, ভগ্নি, স্বামী ও পুত্র সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী। একজন মুসলমানের এর চাইতে বেশী সম্মান, মর্যাদা, ও গৌরবের বিষয় কি হতে পারে?

পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালের বন্ধু, ওফাতের পর তাঁর প্রথম খলীফা। মাতা কুতাইলা বিনতু আবদিল 'উয্যা। পিতামহ হযরত আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা বা আবু আতীক। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) তাঁর বোন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী বিশেষ সাহায্যকারী যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) তাঁর স্বামী ও সত্য এবং ন্যায়ের পথে শহীদ হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তাঁর পুত্র। এ হলো হযরত আসমা বিনতু আবু বকরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। হিজরাতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম যুগেই যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, আসমা (রা) তাঁদেরই একজন। মাত্র সতেরো জন নারী পুরুষ ব্যতীত আর কেউ তাঁর আগে এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি। তাঁকে 'জাতুন নিতাকাইন'—দু'টি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী বলা হয়। কারণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের সময় তিনি রাসূল (সা) ও তাঁর পিতার জন্য থলিতে পাথেয় ও মশকে পানি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ বাঁধার জন্য ধারে কোন রশি খুঁজে পেলেন না। অবশেষে নিজের কোমরের নিতাক বা বন্ধনী খুলে দু'টুকরো করে একটা দ্বারা থলি ও অন্যটি দ্বারা মশকের মুখ বেঁধে দেন, এ দেখে রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন ঃ আল্লাহ্ যেন এর বিনিময়ে জান্নাতে তাঁকে দু'টি 'নিতাক' দান করেন। এভাবে তিনি 'জাতুন নিতাকাইন' উপাধি লাভ করেন।

যুবাইর ইবনুল আওয়ামের সাথে যে সময় তার বিয়ে হয় তখন যুবাইর অত্যন্ত দরিদ্র ও রিক্তহস্ত। তাঁর কোন চাকর-বাকর ছিলনা এবং একটি মাত্র ঘোড়া ছাড়া পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোন সম্পদও ছিলনা। তবে যুবাইর একজন পুণ্যবতী ও সৎকর্মশীলা স্ত্রী লাভ করেছিলেন। তিনি স্বামীর সেবা করতেন, নিজ হাতে তাঁর ঘোড়াটির জন্য ভুষি পিষতেন ও তার তত্ত্বাবধান করতেন। অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁদেরকে প্রাচুর্য দান করেন এবং তাঁরা অন্যতম ধনী সাহাবী পরিবার হিসাবে পরিগণিত হন।

হযরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন। যুবাইর (রা) যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন একটি ঘোড়া ছাড়া তাঁর আর কিছু ছিলনা। ঘোড়াটি আমিই চরাতাম ও ভুষি খাওয়াতাম। খেজুরের আটি পিষে ভূষি বানাতাম। আমি যুবাইরের ক্ষেত থেকে– যে ক্ষেত রাসূল (সা) তাঁকে দিয়েছিলেন মাথায় করে খেজুরের আটি নিয়ে আসতাম। ক্ষেতটি ছিল পৌনে এক ফারসাখ দূরে। একদিন আমি খেজুরের আটি মাথায় করে ঘরে ফিরছি, এমন সময় পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা। তাঁর সাথে তখন আরও কয়েকজন লোক ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর বাহনের পিঠে উঠে বসার জন্য বললেন। কিন্তু আমি লজ্জা পেলাম এবং যুবাইর ও তার মান-মর্যাদার কথা মনে করলাম। রাসূল (সা) চলে গেলেন। বাড়ী ফিরে আমি এ ঘটনার কথা যুবাইরকে বললাম। এরপর পিতা

আবু বকর (রা) আমার জন্য একটি চাকর দেন। সে-ই তখন ঘোড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে যেন আমাকে মুক্তি দিল। (সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/২৯০-২৯১, তাবাকাত-৮/২৫০, মুসনাদে আহমাদ- ৬/৩৪৭, ৩৫২)

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের সময় ঘনিয়ে এলো। তিনি তখন পূর্ণ অন্তঃসত্তা, আবদুল্লাহ তাঁর গর্ভে। তা সত্ত্বেও এ কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণে ভয় পেলেন না, আল্লাহর নামে বেরিয়ে পড়লেন। কুবা পৌঁছার পরই তিনি প্রসব করেন আবদুল্লাহকে। এ আবদুল্লাহ ছিলেন মদীনার মুহাজিরদের গৃহে, মদীনায় আসার পর জন্মগ্রহণকারী প্রথম সন্তান। এ কারণে মুসলমানরা তাঁর জন্মের খবর শুনে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে। তাঁর মা আসমা সদ্য প্রসূত সন্তানটিকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান এবং তাঁর কোলে তুলে দেন। রাসূল (সা) নিজের জিহ্বা থেকে কিছু থু থু নিয়ে শিশুটির মুখে দেন এবং তার 'তাহনীক' (খুরমা বা কিছু চিবিয়ে মুখে দেয়া) করে তার জন্য দু'আ করেন। তাই পার্থিব কোন জিনিস তার পেটে প্রবেশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র থু থু তার পেটে প্রবেশ করেছিল।

হযরত আসমা বিনতু আবু বকরের মধ্যে সততা, দানশীলতা, মহত্ব ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার মত এমন সব সুষম চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল যা ছিল বিরল। তাঁর দানশীলতা তো একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ বলেনঃ 'আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়িশা থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ ছিল। আমার খালার স্বভাব ছিল প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে যথেষ্ট পরিমাণে জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই গরীব মিসকীনদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মার স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।'

আসমা (রা) ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন সংকটের সময়ে। ইবন হিশামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূল (সা) ও আবু বকরের হিজরাতের খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে পরদিন আবু জাহল ও আরো কতিপয় কুরাইশ নেতা আবু বকরের বাড়ীতে আসে এবং আসমাকে সামনে পেয়ে তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার বাবা আবু বকর কোথায়?' আসমা বলতে অস্বীকৃতি জানালে নরাধম আবু জাহল তাঁর গালে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। ফলে তাঁর কানের দুল দু'টি ছিটকে পড়ে যায়।

হিজরাতের সময় রাসূল (সা) ও আবু বকরের (রা) সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে রাতের অন্ধকারে আসমা তাঁদের জন্য খাবার ও পানীয় নিয়ে যেতেন।

তাঁর পিতা আবু বকর (রা) হিজরাতের সময় যাবতীয় নগদ অর্থ সাথে নিয়ে যান। দাদা আবু কুহাফা তা জানতে পেরে বলেন, 'সে জান ও মাল উভয় ধরনের কষ্ট দিয়ে গেল।' আসমা দাদাকে বললেন, 'না, তিনি অনেক সম্পদ রেখে গেছেন।' একথা বলে আবু বকর (রা) যেখানে অর্থ-সম্পদ রাখতেন সেখানে অনেক পাথর রেখে দিলেন। তারপর আবু কুহাফাকে ডেকে এসে বললেন ঃ 'দেখুন, এসব রেখে গেছেন।' আবু কুহাফা অন্ধ ছিলেন। তিনি আসমার কথায় বিশ্বাস করেন। আসমা বলেন ঃ 'আবু কুহাফাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমি এমনটি করেছিলাম। আসলে সেখানে কিছুই ছিল না।'

আসমা বিনতু আবু বকরের ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। তবে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর সাথে জীবনের শেষ সাক্ষাতের সময় তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক বল ও ঈমানী দৃঢ়তার পরিচয় দেন, ইতিহাসে তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ বিন মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর হিজায, মিসর, ইরাক ও খুরাসানসহ সিরিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলের লোকেরা আবদুল্লাহকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। কিন্তু উমাইয়া রাজবংশ তা মেনে নিতে পারেননি। তারা তাঁকে দমনের জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নেতৃত্বে বিরাট এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠায়। দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, এবং তাতে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। পরিশেষে তাঁর সংগী সাথীরা বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তের অনুসারীদের নিয়ে কা'বার হারাম শরীফে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে উমাইয়া সেনাবাহিনীর সাথে চূড়ান্ত সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি তার মা আসমার সাথে শেষবারের মত সাক্ষাত করতে যান। হযরত আসমা (রা) তখন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত ও অন্ধ। মাতা-পুত্রের জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ ঃ

– মা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

– আবদুল্লাহ, ওয়া আলাইকাস সালাম। হাজ্জাজ-বাহিনীর মিনজানিক হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার বাহিনীর ওপর পাথর নিক্ষেপ করছে, মক্কার বাড়ী-ঘর প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন চরম মুহূর্তে তোমার উপস্থিতি কি উদ্দেশ্যে?

– উদ্দেশ্য আপনার সাথে পরামর্শ।

– পরামর্শ! কি বিষয়ে?

– হাজ্জাজের ভয়ে অথবা তার প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে লোকেরা আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, এমনকি আমার সন্তান এবং আমার পরিবারের লোকেরাও আমাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন আমার সাথে অল্প কিছু লোক আছে। তাদের ধৈর্য ও সাহসিকতা যত বেশীই হোকনা কেন, দু' এক ঘন্টার বেশী তারা কোন মতেই টিকে থাকতে পারবে না। এদিকে উমাইয়ারা প্রস্তাব পাঠাচ্ছে, আমি যদি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিই এবং অস্ত্র ফেলে দিয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত হই তাহলে পার্থিব সুখ-সম্পদের যা আমি চাইবো তাই তারা দেবে—এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন। হযরত আসমা (রা) একটু উচ্চস্বরে বলেন ঃ

– ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজস্ব। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বেশী জান। যদি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তুমি হকের ওপর আছ এবং মানুষকে হকের দিকেই আহ্বান করছো, তাহলে তোমার পতাকাতলে যারা অটল থেকে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের মত তুমিও অটল থাকো। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার লোকদেরকে ধ্বংস করেছো।

– তাহলে আজ আমি নিশ্চিতভাবে নিহত হবো।

– স্বেচ্ছায় হাজ্জাজের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং বনী উমাইয়াদের ছোকরারা তোমার মুণ্ডু নিয়ে খেলা করবে, তা থেকে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াই উত্তম।

– আমি নিহত হতে ভয় পাচ্ছি না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমার হাত-পা কেটে আমাকে বিকৃত করে ফেলবে।

– নিহত হওয়ার পর মানুষের ভয়ের কিছু নেই। কারণ, জবেহ করা ছাগলের চামড়া তোলার সময় সে কষ্ট পায় না?

একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের মুখমণ্ডলের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'আমার কল্যাণময়ী মা, আপনার সুমহান মর্যাদা আরো কল্যাণময় হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার মুখ থেকে কেবলমাত্র এ কথাগুলি শোনার জন্য আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হইনি, আমি দুর্বল হইনি। তিনিই সাক্ষী, আমি যে জন্য সংগ্রাম করছি, তা কোন জাগতিক সুখ সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি লোভ-লালসা ও ভালবাসার কারণে নয়। বরং এ সংগ্রাম হারামকে হালাল ঘোষণা করার প্রতি আমার ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণেই। আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমি এখন সে কাজেই যাচ্ছি। আমি শহীদ হলে আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না এবং আপনার সবকিছুই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবেন।'

– যদি তুমি অসত্য ও অন্যায়ের ওপর নিহত হও তাহলে আমি ব্যথিত হবো।

– আম্মা, আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার এ সন্তান কখনও অন্যায় অশ্লীল কাজ করেনি, আল্লাহর আইন লংঘন করেনি, কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, কোন মুসলমান বা জিম্মীর ওপর যুলুম করেনি এবং আল্লাহর রিজামন্দী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন কিছু এ দুনিয়ায় তার কাছে নেই। এ কথা দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। আপনার অন্তরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি হোক— কথাগুলি শুধু এ জন্যেই বলছি। জবাবে আসমা (রা) বললেন ঃ

– আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী জা'আলাকা আলা মা ইউহিব্বু ওয়া উহিব্বু– সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর ও আমার পছন্দনীয় কাজের ওপর তোমাকে অটল রেখেছেন। বৎস! তুমি আমার কাছে একটু এগিয়ে এসো, আমি শেষবারের মত একটু তোমার শরীরের গন্ধ শুকি এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ, এটাই আমার ও তোমার ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

আবদুল্লাহ উপুড় হয়ে তাঁর মার হাত-পা চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে লাগলেন, আর মা তার ছেলের মাথা, মুখ ও কাঁধে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুকতে ও চুমু দিতে লাগলেন এবং তাঁর শরীরে নিজের দু'টি হাতের পরশ বুলিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি একথা বলতে বলতে তাঁকে ছেড়ে দিলেন ঃ

– আবদুল্লাহ তুমি এ কী পরেছো?

– আম্মা, এ তো আমার বর্ম।

– বেটা, যারা শাহাদাতের আকাঙ্খী এটা তাদের পোশাক নয়।

– আপনাকে খুশী করা ও আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে আমি এ পোশাক পরেছি।

– তুমি এটা খুলে ফেল। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সাহসিকতা ও আক্রমণের পক্ষে উচিত কাজ হবে এমনটিই। তাছাড়া এটা হবে তোমার কর্মতৎপরতা, গতি ও চলাফেরার পক্ষেও সহজতর। এর পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পর। তাহলে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হলেও তোমার সতর অপ্রকাশিত থাকবে।

মায়ের কথামত আবদুল্লাহ তাঁর বর্ম খুলে পাজামা পরলেন এবং এ কথা বলতে বলতে হারাম শরীফের দিকে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন – 'আম্মা, আমার

জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না।'

সাথে সাথে তাঁর মা হযরত আসমা (রা) দু'টি হাত আকাশের দিকে তুলে দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন তার জেগে জেগে দীর্ঘ ইবাদত ও উচ্চকণ্ঠে কান্নার জন্য আপনি তার ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ, রোযা অবস্থায় মক্কা ও মদীনাতে মধ্যাহ্নকালীন ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য তার ওপর রহম করুন। হে আল্লাহ, পিতামাতার প্রতি সদাচরণের জন্য তার প্রতি আপনি করুণা বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আমি তাকে আপনারই কাছে সোপর্দ করেছি, তার জন্য আপনি যে ফায়সালা করবেন তাতেই আমি রাজী, এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।'

সেদিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর তাঁর মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন। তাঁর শাহাদাতের কিছুদিনের মধ্যেই হিজরী ৭৩ সনে হযরত আসমাও (রা) ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল এক শ' বছর। মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন। (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৮)

হযরত আবদুল্লাহকে (রা) হত্যার পর হাজ্জাজ তাঁর লাশকে শূলিতে লটকিয়ে রেখেছিল। তাঁর মা আসমা এলেন ছেলের লাশ দেখতে। লটকানো লাশের কাছে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, 'এ সওয়ারীর এখনো ঘোড়া থেকে নামার সময় হলো না?' জনতার ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে নেওয়ার জন্য হাজ্জাজ লোক পাঠায়। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো লোক মারফত বলে পাঠায়, এবার না এলে, তাঁর চুলের গোছা ধরে টেনে আনা হবে। হযরত আসমা হাজ্জাজের ভয়ে ভীত হলেন না। তিনি গেলেন না। এবার হাজ্জাজ নিজেই এলো। তাদের দু'জনের মধ্যে নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো। হাজ্জাজ বললো ঃ

– 'বলুন তো আমি আল্লাহর দুশমন ইবন যুবায়েরের সাথে কেমন ব্যবহার করেছি?' আসমা বললেন, 'তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো। আর সে তোমার পরকাল নষ্ট করেছে। আমি শুনেছি, তুমি নাকি তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' তনয় বলে ঠাট্টা করেছো। আল্লাহর কসম, আমিই 'যাতুন নিতাকাইন'। আমি একটি নিতাক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) ও আবু বকরের (রা) খাবার বেঁধেছি। আরেকটি নিতাক আমার কোমরেই আছে। মনে রেখ, নবী করীমের (সা) কাছ থেকে আমি শুনেছি, সাকীফ বংশে একজন মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং একজন যালিম পয়দা হবে। মিথ্যাবাদীকে তো আগেই দেখেছি। (আল-মুখতার) আর যালিম তুমিই।' হাজ্জাজ এ হাদীস শুনে নীরব হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম ঃ ২য় খণ্ড)।

হযরত আসমা থেকে ৫৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তেরোটি মুত্তাফাক আলাইহি এবং বুখারী পাঁচটি ও মুসলিম চারটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বহু বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ তাঁর দুই ছেলে—আবদুল্লাহ ও 'উরওয়া, পৌত্র আবদুল্লাহ ইবনে 'উরওয়া, প্রপৌত্র 'উব্বাদ ইবন আবদিল্লাহ, ইবন আব্বাস, আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী, সাফিয়্যা বিনতু শায়বা, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কায়সান, আবূ নাওফিল মুয়াবিয়া ইবন আবী আকবার, আল-মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ ইবন হানতাব, ফাতিমা বিনতুল মুনজির ইবনুয যুবাইর, ইবন আবী মুলাইকা, 'উব্বাদ ইবন হামযা ইবন আবদুল্লাহ এবং আরও অনেকে। (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২/২৮৮)।

মুসয়াব ইবন 'উমাইর (রা)

নাম মুসয়াব, কুনিয়াত আবু মুহাম্মদ। ইসলাম গ্রহণের পর লকব হয় মুসয়াব আল-খায়ের। পিতা 'উমাইর এবং মাতা খুনাস বিনতু মালিক। পিতা-মাতার পরম আদরে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত মক্কার অন্যতম সুদর্শন যুবক ছিলেন তিনি। মা সম্পদশালী হওয়ার কারণে অত্যন্ত ভোগ বিলাসের মধ্যে তাঁকে প্রতিপালন করেন। তখনকার যুগে মক্কার যত রকমের চমৎকার পোশাক ও উৎকৃষ্ট খুশবু পাওয়া যেত সবই তিনি ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে কোনভাবে তাঁর প্রসংগ উঠলে বলতেন ঃ 'মক্কায় মুসয়াবের চেয়ে সুদর্শন এবং উৎকৃষ্ট পোশাকধারী আর কেউ ছিল না।' (তাবাকাত) ঐতিহাসিকরা বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন মক্কার সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি ব্যবহারকারী।'

সৌন্দর্য্য, সুরুচি ও সৎ স্বভাবের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরটি দারুণ স্বচ্ছ করে তৈরী করেছিলেন। তাওহীদের একটি মাত্র ঝলকেই তিনি শিরকের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন এবং হযরত রাসূলে পাকের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সেই সময়ের কথা যখন রাসূল (সা) হযরত আরকামের বাড়ীতে অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলেছিলেন এবং মুসলমানদের সামনে মক্কার মাটি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিলো।

মক্কার অলিতে-গলিতে, কুরাইশদের আড্ডায়, পরামর্শ সভায় তখন একই আলোচনা—মুহাম্মদ আল আমীন ও তাঁর নতুন দ্বীন আল ইসলাম। কুরাইশদের এই আদুরে দুলাল এসব আলোচনা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। অল্প বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও তিনি হতেন কুরাইশদের সকল বৈঠক ও মজলিসের শোভা ও মধ্যমণি। তাদের প্রতিটি বৈঠকে সবার কাম্য হতো তাঁর উপস্থিতি। তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্য তাঁর হৃদয়ের সকল দ্বার, সকল অর্গল উন্মুক্ত করে দেয়।

তিনি শুনতে পেলেন, রাসূল (সা) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীরা কুরাইশদের সকল অর্থহীন কাজ ও তাদের যুলুম অত্যাচার থেকে দূরে থেকে সেই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আল আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীতে সমবেত হন। সব দ্বিধা সব দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে একদিন সন্ধ্যায় তিনি হাজির হলেন দারুল আরকামে। রাসূল (সা) সেই দিনগুলিতে সেখানে তাঁর সাথীদের সংগে মিলিত হতেন, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের সাথে নামায আদায় করতেন।

মুসয়াব ইবন উমাইর দারুল আরকামে বসতে না বসতেই কুরআনের আয়াত নাযিল হলো। রাসূলের (সা) যবান থেকে সে আয়াত বের হয়ে তা যেন সকল শ্রোতার কর্ণকুহরে ও হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে লাগলো। সেই বরকতময় সন্ধ্যায় ইবন 'উমাইরও হয়ে গেলেন এক বিশ্বাসী অন্তঃকরণের অধিকারী। খুশী ও আনন্দে তিনি হয়ে পড়েন আত্মহারা। রাসূল (সা) তাঁর একটি পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিলেন মুসয়াবের বুকের ওপর। দারুণ এক প্রশান্তিতে বিভোর হয়ে পড়েন মুসয়াব। মুহূর্তে তিনি তাঁর বয়সের

তুলনায় বহুগুণ বেশী হিকমত ও জ্ঞান লাভ করলেন এবং এমন দৃঢ়তা অর্জন করলেন যে হাজারো বিপদ মুসীবাত তাঁকে আর কোনদিন বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি।

মুসয়াবের মা খুনাস বিনতু মালিক ছিলেন এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। মুসয়াব তাকে যমের মত ভয় করতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ধরাপৃষ্ঠে একমাত্র তাঁর মা ছাড়া আর কারো ভয় পেতেন না। কুরাইশ ও তাদের দেব-দেবীসহ সকল শক্তি তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হলো। কিন্তু মায়ের ভয় তিনি দূর করতে পারলেন না। তাই সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের সংবাদটি চেপে যাওয়ার। দারুল আরকামে যাতায়াত চলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে বসতে লাগলেন। কিন্তু তার মা কিছুই জানতে পেলেন না।

একদিন গোপনে তিনি দারুল আরকামে প্রবেশ করছেন, উসমান ইবন তালহা তা দেখে ফেললো। আরেক দিন তিনি মুহাম্মাদের (সা) মত নামায পড়ছেন, সেদিনও তা উসমানের চোখে পড়ে যায়। বাতাসের আগে খবরটি মক্কার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর মায়ের কানেও খবরটি পৌঁছে গেল।

মুসয়াবকে তাঁর মা, গোত্রের লোকজন ও মক্কার নেতৃবৃন্দের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো। তিনি অত্যন্ত স্থির বিশ্বাস ও প্রশান্ত চিত্তে তাদেরকে পাঠ করে শুনাতে লাগলেন কুরআনের সেই মহাবাণী যার ওপর তিনি ঈমান এনেছেন। মা তাঁর গালে থাপ্‌পড় মেরে চুপ করিয়ে দিতে চাইলেন। বকাঝকা, মারপিট চললো। তারপর তাঁকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

তিনি বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। রাত্রিদিন চব্বিশ ঘন্টা তাঁকে পাহারা দেয়া হয়। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন, তাঁরই মত কিছু মুমিন মুসলমান হাবশায় হিজরাত করছেন। তিনি মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে সেই দলটির সাথে হাবশায় চলে গেলেন।

একদিন মুসলমানদের একটি দল রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে আছেন। এমন সময় পাশ দিয়ে তারা মুসয়াবকে যেতে দেখলেন। তাঁকে দেখেই বৈঠকে উপস্থিত সকলের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। তাঁদের দৃষ্টি নত হয়ে গেল। কারো কারো চোখে পানি এসে গেল। কারণ, মুসয়াবের গায়ে তখন শত তালি দেওয়া জীর্ণ শীর্ণ একটি চামড়ার টুকরো। তাতে মারাত্মক দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁদের সকলের মনে তখন তাঁর ইসলাম পূর্ব জীবনের ছবি ভেসে উঠলো। তখনকার পরিচ্ছদ হতো বাগিচার ফুলের মত কোমল চিত্তাকর্ষক ও সুগন্ধিময়। এ দৃশ্য দেখে একটু মুচকি হেসে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'মক্কায় আমি এ মুসয়াবকে দেখেছি। তার চেয়ে পিতামাতার বেশী আদরের আর কোন যুবক মক্কায় ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে সবকিছু সে ত্যাগ করেছে।'

কিছুদিন হাবশায় থাকার পর তিনি মক্কায় ফিরে এলেন। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে আরেকটি দলকে সংগে করে হাবশায় চলে যান। কিন্তু মুসয়াব উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি মক্কায়, হাবশায় যেখানেই থাকুন না কেন, জীবন তাঁর নতুন-রূপ ধারণ করেছে। তাঁর একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা) এবং একমাত্র কাম্য মহাপ্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি।

তাঁর মা নতুন দ্বীন থেকে ফিরাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে সবকিছু দেওয়া বন্ধ করে দিল। যে ব্যক্তি তাঁদের দেব-দেবীকে ছেড়ে দিয়েছে, তাদের গালাগাল করে, তা সে নিজের পেটের ছেলেই হোকনা কেন, তাকে সে কোন মতেই খেতে পরতে দিতে পারে না।

মুসয়াব হাবশা থেকে ফিরে আসার পর তার মা আবারো তাকে বন্দী করতে চাইলো। তিনি মায়ের মুখের ওপর কসম খেয়ে বললেন ঃ যদি তুমি এমনটি কর এবং যারা তোমার এ কাজে সাহায্য করবে তোমাদের সবাইকে আমি হত্যা করবো। মা তার এই বেয়াড়া ছেলেকে জানতো। তাই কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বিদায় দিল, আর তিনিও মাকে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় দিলেন।

বিদায় মুহূর্তে মা যেমন কুফরীর ওপর ছেলেও তেমনি ঈমানের ওপর অটল। প্রাণ-প্রিয় ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে বের করে দিতে দিতে মা বলছে ঃ 'তোমার যেখানে খুশী যাও। আমাকে আর মা বলে ডেক না।' ছেলে একটু মায়ের দিকে এগিয়ে বললেন ঃ 'মা আমি আপনাকে ভালো কথা বলছি, আপনার প্রতি আমার দারুণ মমতা রয়েছে। আপনি একবার একটু বলুন, আশহাদু আন্-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' মা উত্তেজিত হয়ে নক্ষত্ররাজির নামে কসম খেয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করবো না। তোমার দ্বীন গ্রহণ করলে আমার মতামত ও বুদ্ধি বিবেক দুর্বল বলে মনে করা হবে।' এভাবে কুরাইশদের সেই চরম আদুরে ও বিলাসী যুবক মুসয়াব বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। এখন তিনি মোটা শতচ্ছিন্ন তালিযুক্ত পোশাক পরেন। একদিন খাবার জুটলে অন্যদিন অভূক্ত কাটান। কিন্তু বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত তাঁর অন্তরটি।

হজ্জের সময় মদীনা থেকে কতিপয় লোক মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গোপনে আকাবায় সাক্ষাৎ করলো এবং তাঁর ওপর ঈমান এনে বাইয়াত করলো। তারা মদীনায় ফিরে গেল। তাদেরকে দ্বীনের তালীম দেওয়ার এবং অন্যদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে, এবং মদীনাকে হিজরাতের জন্য প্রস্তুত করার লক্ষ্যে রাসূল (সা) মুসয়াবকে দূত হিসাবে মদীনা পাঠালেন। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম দূত।

মক্কায় তখন মুসয়াবের চেয়েও বয়সে ও মর্যাদায় বড় অনেক সাহাবী ছিলেন। তা সত্ত্বেও এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য রাসূল তাঁকেই নির্বাচন করেন। মুসয়াব তাঁর খোদাপ্রদত্ত বুদ্ধি, মেধা ও মহৎ চরিত্রের সাহায্যে অত্যন্ত আমানতদারীর সাথে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করেন। কঠোর সাধনা, নিষ্ঠা ও মহত্ত্বের সাহায্যে তিনি মদীনাবাসীদের হৃদয়ের সাথে সংলাপ করেন। ফলে দলে দলে তারা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।

মুসয়াব মদীনায় এলেন। এর আগে মদীনার মাত্র বারো জন লোক আকাবায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনায় আসার পর কয়েক মাস যেতে না যেতেই বহু মানুষ তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে মদীনাবাসী মুসলমানদের বাহাত্তর জনের একটি প্রতিনিধিদল তাদের ধর্মীয় শিক্ষক ও নবীর দূত মুসয়াবের সাথে মক্কায় এলো এবং আকাবায় আবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হলো।

মুসয়াব তাঁর দায়িত্ব এবং সে দায়িত্বের সীমা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং আল্লাহর এমন এক দ্বীনের সুসংবাদ দানকারী যা মানবসমাজকে হিদায়াত ও সরল সোজা পথের দিকে আহ্বান জানায়। তাঁর ওপর এ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই।

মুসয়াব মদীনায় পৌঁছে আসয়াদ ইবন যারারার অতিথি হলেন। তাঁরা দু'জন মদীনার বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন বাড়ীতে এবং সমাবেশে এক আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। নানারকম বাধারও সম্মুখীন হলেন। কিন্তু বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সাথে সব বাধা তাঁরা অতিক্রম করলেন।

একদিন তিনি কিছু লোককে দাওয়াত দিচ্ছেন। হঠাৎ বনী আবদিল আশহালের নেতা উসাইদ ইবন হুদাইর সশস্ত্র অবস্থায় দারুণ উত্তেজিতভাবে উপস্থিত হল। তার ভীষণ রাগ সেই ব্যক্তিটির ওপর যে কিনা মুহাম্মাদের দূত হিসাবে এখানে এসেছে এবং মানুষকে তাদের পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করতে উৎসাহিত করছে। সে তাদের উপাস্য দেব-দেবীকে গালাগালও করছে। উসাইদের এ রণমূর্তি দেখে মুসয়াবের পাশে বসা মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু না, মুসয়াব ভয় পেলেন না, সহাস্যে উসাইদকে স্বাগতম জানালেন। হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উসাইদ তখন তাঁকে ও আসয়াদ ইবন যারারাকে লক্ষ্য করে বলছে ঃ তোমরা আমাদের গোত্রীয় এলাকায় এসে এভাবে আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাচ্ছো কেন? যদি তোমাদের মরার সখ না থাকে তাহলে আমাদের এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও।

হাসতে হাসতে মুসয়াব তাকে বললেন ঃ আপনি কি একটু বসে আমার কথা শুনবেন না? আমার কথা শুনুন। ভালো লাগে মানবেন, ভালো না লাগলে আমরা চলে যাব।

উসাইদ ছিল একজন বুদ্ধিমান লোক। মুসয়াবের কথা তার মনে লাগলো। এ তো বুদ্ধিমানের কথা। শুনতে আপত্তি কিসের! সে অস্ত্র ফেলে মাটিতে বসে কান লাগিয়ে মুসয়াবের কথা শুনতে লাগলো।

মুসয়াব পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে নবী মুহাম্মাদ (সা) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার ব্যাখ্যা করছেন, আর এদিকে উসাইদের মুখমণ্ডল একটু একটু করে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মুসয়াব তাঁর বক্তব্য এখনও শেষ করতে পারেননি, এর মধ্যে উসাইদ ও তাঁর সংগী লোকটি বলে বসলো ঃ এ তো খুব চমৎকার ও সত্য কথা। তোমাদের দ্বীনে প্রবেশ করতে গেলে কি করতে হয়? মুসয়াব বললেন ঃ শরীর ও পোশাক পবিত্র করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই সাক্ষ্য দিতে হয়।

উসাইদ উঠে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এল তখন তার মাথার চুল থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।' এ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, সাদ ইবন মুয়াজ ও সাদ ইবন উবাদা ছুটে এলেন মুসয়াবের নিকট। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এসব নেতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণের পর সাধারণ মদীনাবাসী বলাবলি করতে লাগলো, আমরা পেছনে পড়ে থাকবো কেন। চল যাই মুসয়াবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করি।

এভাবে আল্লাহর রাসূলের প্রথম দূত এমনভাবে সফল হলেন যে, তার কোন তুলনা ইতিহাসে নেই। সময় দ্রুত গতিতে বয়ে চললো। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সংগী সাথীরা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে এসেছেন। হিংসায় কুরাইশরা জ্বলতে লাগলো। মদীনা থেকেও তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করার ষড়যন্ত্র করলো। বদরে তারা এমন শিক্ষাই পেল যে, তাদের হিংসা প্রতিশোধস্পৃহায় রূপান্তরিত হলো। তারা আবার উহুদে মুসলমানদের মুখোমুখি হলো। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে রাসূল (সা) মুসলিম বাহিনীর মাঝখানে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। চিন্তা করছেন কার হাতে আজ ইসলামের ঝাণ্ডাটি দেওয়া যায়। গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মুসয়াবকে ডাকলেন তাঁরই হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে দিলেন।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কুরাইশ বাহিনী পরাজয়ের মুখোমুখি। এমন সময় মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ ভুলে গিয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে কুরাইশদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু তাদের এ কাজ মুসলিম বাহিনীর সুনিশ্চিত বিজয় নস্যাৎ করে দিয়ে পরাজয় বয়ে নিয়ে এলো। মুসলিম তীরন্দায বাহিনীর ছেড়ে যাওয়া গিরিপথ দিয়ে কুরাইশ বাহিনী অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে বসলো। মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়লো। এই সুযোগে কুরাইশ বাহিনী তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে ফেললো।

মুসয়াব ইবন উমাইর বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করলেন। যতটুকু সম্ভব তিনি ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরলেন, গলা ফাটিয়ে নেকড়ের মত হুঙ্কার ছাড়তে এবং জোরে জোরে তাকবীর দিতে লাগলেন। আর সেইসাথে লম্ফ ঝম্ফ মেরে আস্ফালন দেখাতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো শত্রুদের দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ফিরিয়ে নিজের প্রতি নিবদ্ধ করা। এভাবে সেদিন তিনি নিজের একটি মাত্র সত্তাকে একটি বাহিনীতে পরিণত করেন। অত্যন্ত আমানতদারীর সাথে একহাতে ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরেন এবং অন্য হাতে প্রচণ্ড বেগে তরবারি চালাতে থাকেন। শত্রুবাহিনী তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাঁর দেহের ওপর দিয়ে তারা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছার চেষ্টা করে। হযরত মুসয়াবের অন্তিম অবস্থা সম্পর্কে ইবন সাদ বর্ণনা করে, "উহুদের দিনে মুসয়াব ইবন উমাইর ঝাণ্ডা বহন করেন। মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে মুসয়াব তখন অটল হয়ে রুখে দাঁড়ান। অশ্বারোহী ইবন কামীয়া তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তরবারির এক আঘাতে তাঁর ডান হাতটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মুসয়াব তখন বলে ওঠেন ঃ 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসূল— মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন।' মুসয়াব বাম হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে ধরেন। তরবারির অন্য একটি আঘাতে তাঁর বাম হাতটিও বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। আবারো তিনি 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল' এ কথাটি বলতে বলতে ঝাণ্ডার ওপর ঝুঁকে পড়ে দুই বাহু দ্বারা সেটি তুলে ধরেন। তারপর তাঁর প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করা হয়। পতাকাসহ তিনি মাটিতে ঢলে পড়েন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত

মুসয়াব শাহাদাতের পূর্বে যে বাক্যটি বার বার উচ্চারণ করছিলেন তখনও কিন্তু সেটি কুরআনের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়নি। উহুদের এ ঘটনার পরই 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল....' এ আয়াতটি নিয়ে হযরত জিবরীল (আ) উপস্থিত হন।"

যুদ্ধ শেষে হযরত মুসয়াবের লাশটি খুঁজে পাওয়া গেল। রক্ত ও ধুলোবালিতে একাকার তাঁর চেহারা। লাশের কাছে দাঁড়িয়ে রাসূল (সা) অঝোরে কেঁদে ফেললেন। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত বলেন ঃ 'আমরা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হিজরাত করেছিলাম। আমাদের এ কাজের প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের এ কাজের প্রতিদান মোটেও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁদের একজন মুসয়াব ইবন উমাইর।

উহুদে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য একপ্রস্থ চাদর ছাড়া আর কোন কাপড় পাওয়া গেল না। তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। শেষমেষ রাসূল (সা) আমাদের বললেন ঃ চাদর দিয়ে মাথার দিক দিয়ে যতটুকু ঢাকা যায় ঢেকে দাও, বাকী পায়ের দিকে 'ইযখীর' ঘাস দাও। রাসূল (সা) মুসয়াবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে পাঠ করলেন ঃ মিনাল মু'মিনীনা রিজানুল সাদাকু আহাদুল্লাহ আলাইহি.... মুমিনদের এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তারপর তাঁর কাফনের চাদরটির প্রতি তাকিয়ে বলেন ঃ আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর এবং সুন্দর যুলফী আর কারো ছিল না। আর আজ তুমি এখানে এই চাদরে ধুলি মলিন অবস্থায় পড়ে আছ। তিনি আরো বলেন ঃ 'আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিচ্ছে, কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে সাক্ষ্যদানকারী হবে।' তারপর সংগীদের দিকে ফিরে তিনি বলেন ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী, তোমরা তাদের যিআরত কর, তাদের কাছে এস, তাদের ওপর সালাম পেশ কর। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ তাঁদের ওপর সালাম পেশ করবে তারা সেই সালামের জওয়াব দেবে।'

হযরত মুসয়াবের ভাই আবুর রাওম ইবন উমাইর, আমের ইবন রাবীয়া এবং সুয়াইত ইবন সাদ তাঁকে কবরে নামিয়ে দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।

হযরত মুসয়াব ছিলেন প্রখর মেধাবী, উদার ও প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী। যে দ্রুততার সাথে ইয়াসরিবে (মদীনা) ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল তাতেই তাঁর এসব গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছিল, তিনি মুখস্থ করেছিলেন। মদীনায় সর্বপ্রথম তিনিই জুময়ার নামায কায়েম করেন। মদীনায় মুসলমানদের সংখ্যা যখন একটু বেড়ে গেল তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে হযরত সাদ ইবন খুসাইমার (রা) বাড়ীতে জুময়ার নামাযের সূচনা করেন। তিনিই ইমামতি করেন। নামাযের পর একটি ছাগল যবেহ করে মুসল্লীদের আপ্যায়ন করা হয়। (তাবাকাত)

— প্রথম খন্ড সমাপ্ত —

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইবন সা'দ– তাবাকাত,
২. ইবন হাজার আসকিলানী– আল ইসাবা,
৩. ইবন হিশাম– আস-সীরাহ্,
৪. ইবন কাসীর– আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,
৫. ইবন আবদিল বার– আল-ইসতিয়াব,
৬. আজ-জাহাবী– তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ,
৭. তাবারী– তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক,
৮. আজ-জাহাবী– তারীখুল ইসলাম
৯. ইবন 'আসাকির– তারীখু দিমাশ্ক আল-কাবীর,
১০. ইউসুফ কান্ধালুবী– হায়াতুস সাহাবা,
১১. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ– রিজালুন হাওলার রাসূল,
১২. ডঃ আবদুর রহমান রাফত আল-বাশা– সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা,
১৩. মুহাম্মদ আল-খিদরী বেক– তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা
১৪. মাওলানা মুঈনুদ্দীন নাদবী– মুহাজিরীন (উর্দু),
১৫. দায়িরাতুল মায়ারিফ আল-ইসলামিয়্যা,
১৬. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

২

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥ ৫
১। হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী (রা) ॥ ৭
২। হযরত সুহাইব ইবন সিনান আর রুমী (রা) ॥ ১৫
৩। হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ॥ ১৯
৪। হযরত উসমান ইবন মাজউন (রা) ॥ ২৫
৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) ॥ ২৯
৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) ॥ ৩৯
৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনিল আস (রা) ॥ ৪৩
৮। হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা) ॥ ৪৮
৯। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) ॥ ৫৩
১০। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা) ॥ ৬৪
১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ আস্‌সাহমী (রা) ॥ ৭৬
১২। হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) ॥ ৮২
১৩। হযরত মুগীরাহ ইবন শু'বা (রা) ॥ ৯০
১৪। হযরত আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা) ॥ ৯৭
১৫। হযরত আবু হুজাইফা ইবন উতবা (রা) ॥ ১০০
১৬। হযরত সালেম মাওলা আবী হুজাইফা (রা) ॥ ১০২
১৭। হযরত হাতিব ইবন আবী বালতায়া (রা) ॥ ১০৬
১৮। হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা) ॥ ১১০
১৯। হযরত আমের ইবন ফুহাইরা (রা) ॥ ১১৪
২০। হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুহাইল (রা) ॥ ১১৭
২১। হযরত যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা) ॥ ১১৯
২২। হযরত শুরাহবীল ইবন হাসানা (রা) ॥ ১২১
২৩। হযরত আবুল আস ইবন রাবী (রা) ॥ ১২৪
২৪। হযরত উমাইর ইবন ওয়াহাব (রা) ॥ ১২৯
২৫। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) ॥ ১৩৫
২৬। হযরত আবু সালামা ইবন আবদিল আসাদ (রা) ॥ ১৪০
২৭। হযরত আকীল ইবন আবী তালিব (রা) ॥ ১৪৩
২৮। হযরত হাকীম ইবন হাযাম (রা) ॥ ১৪৬
২৯। হযরত নাওফিল ইবন হারেস (রা) ॥ ১৫১
৩০। হযরত আবু রাফে' (রা) ॥ ১৫৩
৩১। হযরত উবাইদাহ ইবনুল হারিস (রা) ॥ ১৫৬

৩২। হযরত উকাশা ইবন মুহ্সিন (রা) ॥ ১৫৮
৩৩। হযরত শাম্মাস ইবন উসমান (রা) ॥ ১৫৯
৩৪। হযরত শুজা ইবন ওয়াহাব (রা) ॥ ১৬০
৩৫। হযরত মিহরাব ইবন নাদলা (রা) ॥ ১৬১
৩৬। হযরত শুকরান সালেহ (রা) ॥ ১৬৩
৩৭। হযরত উমাইর ইবন আবী ওয়াকক্কাস (রা) ॥ ১৬৪
৩৮। হযরত আবু সুফইয়ান ইবন হারিস (রা) ॥ ১৬৫
৩৯। হযরত বুরাইদাহ ইবন হুসাইব (রা) ॥ ১৭০
৪০। হযরত উকবা ইবন আমের আলজুহানী (রা) ॥ ১৭৩
৪১। হযরত আবু বারযাহ্ আল আসলামী (রা) ॥ ১৭৭
৪২। হযরত ফাদল ইবন আব্বাস (রা) ॥ ১৭৯
৪৩। হযরত তুলাইব ইবন উমাইর (রা) ॥ ১৮১
৪৪। হযরত সাওবান (রা) ॥ ১৮৩
৪৫। হযরত আমর ইবন আবাসা (রা) ॥ ১৮৫
৪৬। হযরত ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ (রা) ॥ ১৮৮
৪৭। হযরত সালামা ইবন হিশাম (রা) ॥ ১৯২
৪৮। হযরত আমের ইবন রাবীয়া (রা) ॥ ১৯৫
৪৯। হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) ॥ ১৯৭
৫০। হযরত হাজ্জাজ ইবন ইলাত (রা) ॥ ২০০
৫১। হযরত কুদামা ইবন মাজউন (রা) ॥ ২০২
৫২। হযরত হিশাম ইবনুল আস (রা) ॥ ২০৪
৫৩। হযরত ফুল শিমালাইন উমাইর ইবন আবদি আমর (রা) ॥ ২০৮
৫৪। হযরত মুয়াইকিব ইবন আবী ফাতিমা (রা) ॥ ২০৯
৫৫। হযরত আবান ইবন সাঈদ ইবনুল আস (রা) ॥ ২১১
৫৬। হযরত আমর ইবন উমাইয়া (রা) ॥ ২১৪
৫৭। হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা) ॥ ২১৭
৫৮। হযরত মারসাদ ইবন আবী মারসাদ আলগানাবী (রা) ॥ ২১৯
৫৯। হযরত আবু আহমাদ ইবন জাহাশ (রা) ॥ ২২১
৬০। হযরত আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আস (রা) ॥ ২২৩
৬১। হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদিল্লাহ (রা) ॥ ২২৫
৬২। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা) ॥ ২২৭

আবু মূসা আল-আশয়ারী (রা)

আবদুল্লাহ নাম, আবু মূসা কুনিয়াত। কুনিয়াত দ্বারাই তিনি অধিক পরিচিত। পিতা কায়েস, মাতা 'তাইয়্যেবা'। তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। তথাকার 'আল-আশয়ার' গোত্রের সন্তান হওয়ায় তিনি 'আল-আশয়ারী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

হযরত আবু মূসা ইসলামের পরিচয় লাভ করে ইয়ামন থেকে মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হন। মক্কার 'আবদু শামস' গোত্রের সাথে বন্ধু সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর স্বদেশবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইয়ামন ফিরে যান।

হযরত আবু মূসা ছিলেন তাঁর খান্দানের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা। খান্দানের লোকেরা খুব দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়। প্রায় পঞ্চাশজন মুসলমানের একটি দলকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাওয়ার জন্য ইয়ামন থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। সমুদ্রের প্রতিকূল আবহাওয়া এ দলটিকে হিজাযের পরিবর্তে হাবশায় ঠেলে নিয়ে যায়। এদিকে হযরত জাফর বিন আবী তালিব ও তাঁর সংগী সাথীরা—যাঁরা তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন, মদীনায় উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। আবু মূসা তাঁর দলটিসহ এই কাফিলার সাথে মদীনার পথ ধরলেন। তাঁরা মদীনায় পৌঁছলেন, আর এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী খাইবার বিজয় শেষ করে মদীনায় ফিরেন। রাসূল (সা) আবু মূসা ও তার সংগী সকলকে খাইবারের গনীমতের অংশ দান করেন।

হযরত আবু মূসা মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধে শরিক ছিলেন। হুনাইনের ময়দান থেকে পালিয়ে বনু হাওয়াযিন 'আওতাস' উপত্যকায় সমবেত হয়। রাসূল (সা) তাদেরকে সমূলে উৎখাতের জন্য হযরত আবু আমেরের নেতৃত্বে একটি দল পাঠান। তারা আওতাস পৌঁছে হাওয়াযিন সরদার দুরাইদ ইবনুস সাম্মাকে হত্যা করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে হাশামী নামক এক মুশরিকের নিক্ষিপ্ত তীরে হযরত আবু আমের মারাত্মকভাবে আহত হন। আবু মূসা আশয়ারী পিছু ধাওয়া করে এই মুশরিককে হত্যা করেন।

হযরত আবু আমের মৃত্যুর পূর্বে আবু মূসাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং আবু মূসার কাছে এই বলে অনুরোধ করেন যে, 'ভাই, রাসূলুল্লাহর (সা) খেদমতে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে বলবেন।' আবু আমের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবু মূসা তাঁর বাহিনীসহ মদীনায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবু আমেরের অন্তিম অসীয়াতের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং আবু আমেরের মাগফিরাত কামনা করে দুআ করলেন। আবু মূসা আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্যও একটু দুআ করুন।' রাসূল (সা) দুআ করলেন, "হে আল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন কায়েসের পাপসমূহ মাফ করে দিন। কিয়ামতের দিন সম্মানের সাথে তাকে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দিন।"

হিজরী নবম সনে তাবুক অভিযানের তোড়জোড় চলছে। আবু মূসার সংগী-সাথীরা তাকে পাঠালেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তাদের জন্য সওয়ারী চেয়ে আনার জন্য। ঘটনাক্রমে আবু মূসা যখন পৌঁছলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন যে কোন কারণেই হোক একটু উত্তেজিত ছিলেন। আবু মূসা তাঁর কাছে আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সাথীরা আমাকে পাঠিয়েছে, আপনি যেন

তাদেরকে, সওয়ারী-দান করেন। 'রাসূল (সা) বসে ছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন ঃ' আল্লাহর কসম, তোমাদের কোন সওয়ারী আমি দেবনা।' আবু মূসা ভীত হয়ে পড়লেন, না জানি কোন বেয়াদবী হয়ে গেল। অত্যন্ত দুঃখিত মনে ফিরে এসে সংগী-সাথীদের তিনি এ দুঃসংবাদ দিলেন। কিন্তু তখনও তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি, এর মধ্যে হযরত বিলাল দৌড়ে এলেন ঃ' আবদুল্লাহ ইবন কায়েস, কোথায় তুমি ? চলো রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে ডাকছেন।' তিনি বিলালের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হলেন।

রাসূল (সা) নিকটেই বাঁধা দু'টি উটের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ 'এ দু'টিকে তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও।' হযরত আবু মূসা উট দু'টি নিয়ে গোত্রীয় লোকদের কাছে ফিরে এসে বললেনঃ "রাসূল (সা) এ দু'টি উট তোমাদের সওয়ারী রূপে দান করেছেন, তবে তোমাদের কিছু লোককে আমার সাথে এমন একজন লোকের কাছে যেতে হবে যে রাসূলুল্লাহর পূর্বের কথা শুনেছিল। যাতে তোমাদের এ ধারণা না হয় যে, আমি আগে যা বলেছিলাম তা আমার মনগড়া কথা ছিল।" লোকেরা বললো ঃ আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলেই বিশ্বাস করি। তবে আপনি যখন বলছেন, চলুন।' এভাবে কিছু লোককে সংগে নিয়ে তিনি তাঁর পূর্বের কথার সত্যতা প্রমাণ করেন।

তাবুক থেকে ফেরার পর একদিন আশয়ারী-গোত্রের দু'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর কাছে গেল। তারা রাসূলুল্লাহর কাছে যে কোন একটি পদ লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করলো। রাসূল (সা) মিসওয়াক করছিলেন। তাদের কথা শুনে তাঁর মিসওয়াক করা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আবু মূসার দিকে ফিরে বললেন ঃ 'আবু মূসা, আবু মূসা !' আবু মূসা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাদের অন্তরের কথা জানতাম না। আমি জানতাম না এ ভাবে তারা কোন পদ লাভের আকাঙ্খা ব্যক্ত করবে।" রাসূল (সা) বললেন ঃ যদি কেউ নিজেই কোন পদের আকাঙ্খী হয়, আমি কক্ষনো তাকে সেই পদে নিয়োগ করবো না। তবে, আবু মূসা তুমি ইয়ামন যাও। আমি তোমাকে সেখানকার ওয়ালী নিয়োগ করলাম।"

সেই প্রাচীনকাল থেকে ইয়ামন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ ইয়ামন আকসা ও ইয়ামন আদনা, হযরত মুয়াজ বিনজাবালকে ইয়ামন আকসার এবং আবু মূসাকে ইয়ামন আদনার ওয়ালী নিয়োগ করা হয়। দু'জনকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে এই বলে উপদেশ দেন ঃ "ইয়ামনবাসীর সাথে নরম ব্যবহার করবে, কোন প্রকার কঠোরতা করবে না। মানুষকে খুশী রাখবে, ক্ষেপিয়ে তুলবে না। পরস্পর মিলে মিশে বসবাস করবে।"

নিজ দেশ হওয়ার কারণে ইয়ামন বাসীর ওপর হযরত আবু মূসার যথেষ্ট প্রভাব পূর্ব থেকেই ছিল। তাই সুষ্ঠু ভাবেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। পার্শবর্তী ওয়ালী হযরত মুয়াজ বিন জাবালের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। মাঝে মাঝে সীমান্তে গিয়ে তাঁরা মিলিত হতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর মত বিনিময় করতেন।

হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ হজ্জ আদায় করেন। হযরত আবু মূসা ইয়ামন থেকে এসে হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন কায়েস, তুমি কি হজ্জের উদ্দেশ্যে এসেছ ?' জবাব দিলেন ঃ হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমার নিয়ত কি ছিল ? বললেন ঃ আমি বলেছিলাম, রাসূলাহর (সা) যে নিয়াত আমারও সেই নিয়াত।' আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কুরবানীর পশু সংগে এনেছো কি ?' বললেন ঃ না।' রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন. তাওয়াফ ও সায়ী করার পর ইহরাম ভেঙ্গে ফেল। (সহীহুল বুখারী) উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা) হজ্জে 'কিরান' আদায় করেছিলেন। আর হজ্জে কিরানের জন্য কুরবানীর পশু সংগে নেওয়া জরুরী।

হজ্জ শেষে আবু মূসা ইয়ামন ফিরে আসেন। এদিকে আসওয়াদ আনাসী নামক এক ভণ্ড নবী নবুওয়াত দাবী করে, বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে। এমনকি হযরত মুয়াজ বিন জাবাল আবু মূসার রাজধানী- 'মারেব' চলে আসতে বাধ্য হন। এখানেও তারা বেশী দিন থাকতে পারলেন না। অবশেষে তারা হাদরামাউতে আশ্রয় নেন। যদিও ইবন মাকতূহ মুরাদী আসওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেন, তবুও রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালে আবার বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অতঃপর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) মদীনা থেকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে এই বিদ্রোহ নির্মূল করেন। ইয়ামনের দুই ওয়ালী নিজেদের স্থানে আপন আপন দায়িত্বে ফিরে গেলেন। হযরত আবু মূসা হাদরামাউত থেকে স্বীয় কর্মস্থল মারেব ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয় খলীফার খিলাফত কালের প্রথমপর্যায় পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা শুরু হলে আবু মূসা (রা) জিহাদে শরিক হওয়ার প্রবল আকাঙ্খায় ওয়ালীর দায়িত্ব ত্যাগ করে হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসের বাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। হিজরী ১৭ সনে সেনাপতি সা'দের নির্দেশে তিনি 'নাসিবীন' জয় করেন। এ বছরই বসরার ওয়ালী মুগীরা ইবন শু'বাকে (রা) অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু মূসাকে (রা) নিয়োগ করা হয়।

খুযিস্তান হচ্ছে বসরার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা। ঐ এলাকাটি তখনও ইরানীদের দখলে ছিল। হিজরী ১৬ সনে খুযিস্তান দখলের উদ্দেশ্যে হযরত মুগীরা (রা) আহওয়াযে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। আহওয়াযের সর্দার অল্প কিছু অর্থ বার্ষিক কর দানের বিনিময়ে মুগীরার সাথে সন্ধি করে। মুগীরা ফিরে যান। হিজরী ১৭ সনে মুগীরার স্থলে আবু মূসা দায়িত্ব গ্রহণ করলে আহওয়াযবাসী কর প্রদান বন্ধ করে দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাধ্য হয়ে আবু মূসা সৈন্য পাঠিয়ে আহওয়ায দখল করেন এবং মানাযির পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত রাখেন। বিশিষ্ট সেনা অফিসার হযরত মুহাজির ইবন যিয়াদ (রা) এই মানাযির অভিযানের এক পর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন। শত্রু বাহিনী তাঁর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে কিল্লার গম্বুজে ঝুলিয়ে রাখে। আবু মূসা হযরত মুহাজিরের ভাই হযরত রাবীকে মানাযির দখলের দায়িত্ব দেন। রাবী মানাযির দখলে সফল হন।

এদিকে হযরত আবু মূসা 'সোস' অবরোধ করেন। শহরবাসী কিল্লায় আশ্রয় নেয়। অবশেষে তাদের নেতা এই শর্তে আবু মূসার সাথে সমঝোতায় পৌঁছে যে, তাঁর খান্দানের এক শ' ব্যক্তিকে জীবিত রাখা হবে। নেতা এক এক করে এক শ' ব্যক্তিকে হাজির করলো এবং আবু মূসা তাদের মুক্তি দিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নেতা নিজের নামটি পেশ করতে ভুলে গেল এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী তাকে হত্যা করা হলো। 'সোস' অবরোধের পর আবু মূসা 'রামহরমুয' অবরোধ করেন এবং বার্ষিক আট লাখ দিরহাম কর আদায়ের শর্তে তাদের সাথে সন্ধি হয়।

চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে শাহানশাহে ইরানের সেনাপতি 'হরমুযান' শোশতার-এর মজবুত কিল্লায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। আবু মূসা শহরটি অবরোধ করে বসে আছেন। শহরটির পতনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এক ব্যক্তি গোপনে শহর থেকে বেরিয়ে আবু মূসার ছাউনীতে চলে এলো। সে প্রস্তাব দেয়, যদি তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, সে শহরের পতন ঘটিয়ে দেবে। লোকটির শর্ত মনজুর হলো। সে 'আশরাস' নামক এক আররকে সংগে নিল। আশরাস চাদর দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে চাকরের মত লোকটির পিছে পিছে চললো। তারা নদী ও গোপন সুড়ঙ্গ পথে শহরে প্রবেশ করে এবং নালা অলি-গলি পেরিয়ে হরমুযানের খাস মহলে গিয়ে হাজির হয়। এভাবে আশরাস শহরের সব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গোপনে আবার আবু মূসার কাছে ফিরে আসে এবং বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। অতঃপর আবুমূসার নির্দেশে আশরাস দু'শো জানবাজ সিপাহী সংগে করে হঠাৎ আক্রমণ করে দ্বার-রক্ষীদের হত্যা করে দরযা খুলে দেয়। এদিকে

আবু মূসা ও তাঁর সকল সৈন্যসহ দরজার মুখেই উপস্থিত ছিলেন। দরযা খোলার সাথে সাথে সকল সৈনিক একযোগে নগর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়। হরমুযান দৌড়ে কিল্লায় আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী কিল্লার পাশে পৌঁছলে হরমুযান কিল্লার গম্বুজে উঠে ঘোষণা করে যে, যদি আত্মসমর্পণের পর মদীনায় 'উমারের কাছে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি আত্মসমর্পণে রাজী। তাঁর শর্ত মনজুর করা হয় এবং তাকে হযরত আনাসের (রা) সাথে দারুল খিলাফাত মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

'শোশতার' বিজয়ের পর আবু মূসার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী 'জুনদিসাবুর' অবরোধ করে। এ অবরোধ বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল। একদিন শহরবাসী হঠাৎ শহরের ফটক উন্মুক্ত করে দেয়। তারা অত্যন্ত শান্তভাবে আপন আপন কাজে ব্যস্ত। মুসলিম বাহিনী শহরে প্রবেশ করে তাদের এমন নিঃশঙ্কভাব দেখে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলে তারা জানালো, কেন আমাদের তো জিযিয়ার শর্তে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, মুসলিম বাহিনীর এক দাস সকলের অগোচরে একাই এ নিরাপত্তার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সেনাপতি আবু মূসা দাসের এ চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন। শহরবাসী বললো, কে দাস, কে স্বাধীন তা আমরা জানিনে। শেষে বিষয়টি মদীনায় খলিফার দরবারে উত্থাপিত হলো। খলীফা জানালেন, 'মুসলমানদের দাসও মুসলমান। যাদেরকে সে আমান বা নিরাপত্তা দিয়েছে, সকল মুসলমানই যেন তাদের আমান দিয়েছে।' এভাবে আবু মূসার নেতৃত্বে গোটা খুযিস্তানে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং সেই সাথে তাঁর অবস্থান স্থল বসরা শত্রুর হুমকি থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

খুযিস্তানের পতনের পর হিজরী ২১ সনে ইরানীরা নিহাওয়ান্দে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। খলীফা উমার (রা) নু'মান ইবনে মুকরিনকে বিরাট এক বাহিনীসহ নিহাওয়ান্দে পাঠান এবং আবু মূসাকে তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দেন। খলীফার নির্দেশ পেয়ে বিরাট এক বাহিনীসহ তিনি নিহাওয়ান্দে পৌঁছেন। এ যুদ্ধেও ইরানী বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজয় বরণ করে।

খুযিস্তান জয়ের পর বিজিত এলাকা বসরার সাথে একীভূত করার জন্য আবু মূসা আবেদন জানালেন খলীফার কাছে। এদিকে কুফাবাসীরাও কুফার সাথে একীভূত করার দাবী জানালো তাদের ওয়ালী আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা) নিকট। খলীফা আবু মূসার দাবী সমর্থন করে বিজিত এলাকা বসরার সাথে একীভূত করলেন। এ দিকে কুফাবাসী তাদের দাবী পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় হযরত আম্মারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অবশেষে খলীফা কুফাবাসীদের দাবী অনুযায়ী আম্মারকে সরিয়ে হিজরী ২২ সনে আবু মূসাকে কুফার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। কিন্তু একবছর পর হিজরী ২৩ সনে আবার বসরায় বদলী হন।

এ বছরই [হিঃ ২৩] 'দাব্বা' নামক এক ব্যক্তি খলীফার কাছে আবু মূসার বিরুদ্ধে নিম্নের অভিযোগগুলি উত্থাপন করে ঃ

১. আবু মূসা যুদ্ধবন্দীদের থেকে ষাটজন সর্দার পুত্রকে নিজেই নিয়ে নিয়েছেন।

২. তিনি শাসন কার্যের যাবতীয় দায়িত্ব যিয়াদ ইবন সুমাইয়্যার ওপর ন্যস্ত করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যিয়াদই এখন সকল দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

৩. তিনি কবি হুতাইয়্যাকে এক হাজার দিরহাম ইনয়াম দিয়েছেন।

৪. 'আকলিয়্যা নাম্নী তাঁর এক দাসীকে দু'বেলা উত্তম খাবার দেওয়া হয়, অথচ তেমন খাবার সাধারণ মানুষ খেতে পায় না।

হযরত 'উমার নিজহাতে অভিযোগগুলি লিখলেন। আবু মূসাকে মদীনায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অভিযোগগুলির সত্য মিথ্যা নিরুপনের জন্য যথারীতি অনুসন্ধান চালালেন। প্রথম অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হলো। দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব দিলেন যে, যিয়াদ একজন তুখোড়

রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক। তাকে আমি উপদেষ্টা নিয়োগ করেছি। খলীফা যিয়াদকে ডেকে পরীক্ষা নিলেন এবং তাঁকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে দেখতে পেলেন। যিয়াদকে তাঁর পদে বহাল রাখার নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় অভিযোগের জবাবে বললেন, হুতাইয়্যা যাতে আমার হিজু (নিন্দা) না করে এ জন্য আমি তাকে আমার নিজস্ব অর্থ থেকে উপঢৌকন দিয়েছি। কিন্তু চতুর্থ অভিযোগের কোন জবাব তিনি দিতে পারলেন না। হযরত উমার (রা) একটু বকাবকি করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (তাবারী)

আবু মূসা এ বছরই (হিঃ ২৩) ইস্পাহানে অভিযান চালিয়ে অঞ্চলটি ইসলামী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইস্পাহান বিজয় শেষ করে ফিরে এলে সেই বছরই তাঁকে বসরা থেকে কুফায় বদলী করা হয়।

বসরাবাসীদের ভীষণ পানি-কষ্ট ছিল। বিষয়টি খলিফার দরবারে পৌছানো হলো। দিজলা নদী থেকে খাল কেটে বসরা শহর পর্যন্ত নেওয়ার জন্য খলীফা নির্দেশ দিলেন। আবু মূসার নেতৃত্বে দশ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করে বসরাবাসীর পানি-কষ্ট দূর করা হয়। ইতিহাসে এ খাল 'নহরে আবী মূসা নামে প্রসিদ্ধ।

হিজরী ২৩ সনে জিলহজ্জ মাসে দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত 'উসমান খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রশাসনের কাঠামোতে অনেক রদবদল করেন। কিন্তু হিজরী ২৯ সন পর্যন্ত আবু মূসা বসরার ওয়ালীর পদে বহাল থাকেন।

হিজরী ২৯ সনে কুর্দীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবু মূসা মসজিদে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ সম্পর্কে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। ভাষণে আল্লাহর রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলার ফজীলাত বর্ণনা করেন। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কিছু মুজাহিদ তাদের নিকট ঘোড়া থাকা সত্ত্বেও পায়ে হেঁটে চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু আবু মূসার কিছু সমালোচক তাদেরকে বললো : "আমাদের এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হবে না। দেখা যাক আমাদের আমীর আবু মূসা কি ভাবে চলেন।" আবু মূসাও ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বের হয়ে এলেন। মুজাহিদরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রতিবাদ করে বসলো।

আসলে আবু মূসার ভাষণের অর্থ এমন ছিলনা যে, যাদের ঘোড়া আছে তারা তাদের কাজে তা ব্যবহার করবে না। বস্তুতঃ তখন সময়টি ছিল ফিতনা ও ষড়যন্ত্রের। হাঙ্গামাবাজরা এই সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে মদীনায় চলে গেল এবং তাঁর অপসারণ দাবী করলো। খলীফা 'উসমান তাঁকে সরিয়ে নিলেন।

হিজরী ৩৪ সনে কুফাবাসীদের অনুরোধে সাঈদ ইবনুল 'আসের স্থলে খলীফা 'উসমান আবু মূসাকে আবার কুফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। খিলাফতের সর্বত্র তখন চলছে দারুণ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী আবু মূসার স্মরণে ছিল। তাই তিনি তাঁর বক্তৃতা-ভাষণে সর্বদা কুফাবাসীদের এ ভবিষদ্বাণীর কথা শোনাতেন। তাদেরকে সব ফিতনা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিতেন। হিজরী ৩৫ সনে হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাত ও হযরত আলীর (রা) খলীফা হওয়ার পর সেই ফিত্না আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) রক্তের কিসাসের দাবীতে সোচ্চার হয়ে হযরত আয়িশা, তালহা ও যুবাইর (রা) মক্কা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাঁদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে খলীফা হযরত আলী (রা) উপস্থিত হলেন যি'কার নামক স্থানে। অন্যদিকে তিনি আম্মার বিন ইয়াসিরের সাথে হযরত হাসানকে (রা) পাঠালেন কুফায়। হযরত হাসান যখন কুফা পৌছলেন, আবু মূসা আশয়ারী তখন কুফার মসজিদে এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণে তিনি জনগণকে এই ফিত্না থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। হযরত হাসান সেখানে উপস্থিত

হলেন এবং মূসার (রা) সাথে তার কিছু বাক বিতণ্ডা হয়। আবু মূসা নীরবে মসজিদের মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং কোন রকম প্রতিবাদ না করে সোজা সিরিয়ার এক অজ্ঞাত গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তিনি এ গৃহযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

সিফফিনে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন এই শর্তে যে, উভয় পক্ষে একজন করে দু'জন নিরপেক্ষ বিচারকের ওপর বিষয়টি নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হবে। তাদের মিলিত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মেনে নেবে। আলীর (রা) পক্ষ আবু মূসাকে এবং মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষ 'আমর ইবনুল 'আসকে (রা) বিচারক নিযুক্ত করেন।

উভয় পক্ষ 'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে একত্র হলেন। বিষয়টি নিয়ে দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হলো। অবশেষে তারা উভয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, উম্মাতের স্বার্থে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে খিলাফতের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে এবং মজলিসে শূরা তৃতীয় কাউকে খলীফা নির্বাচন করবে। তাঁরা উভয়ে জনগণের সামনে হাজির হলেন তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য। 'আমর ইবনুল আসের অনুরোধে আবু মূসা প্রথমে উঠে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন; কিন্তু 'আমর তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে হযরত মুয়াবিয়াকে খলীফা ঘোষণা করে বসলেন। আবু মূসা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

আসলে আবু মূসা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে প্রকৃতির। ধোঁকা ও কূটনীতি কি জিনিস তা তিনি জানতেন না। এ কারণে তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করার ব্যাপারে হযরত আলী (রা) দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষের লোকদের চাপাচাপিতে তিনিও মেনে নেন। 'আমর ইবনুল আসের কূটনৈতিক চালে পরাজিত হয়ে আবু মূসা অনুশোচনায় এত দগ্ধিভূত হলেন যে, সেই মুহূর্তে তিনি মক্কার পথ ধরলেন। জীবনে আর কোন ব্যাপারে তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যু সন ও স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে মক্কায় আবার কারো মতে তিনি কুফায় মৃত্যু বরণ করেন। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি মক্কায় ইনতিকাল করেন। অনুরূপভাবে তাঁর মৃত্যু সন হিঃ ৪২, ৪৪ ও ৫২ সন বলে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মতে হিঃ ৪৪ তাঁর মৃত্যু সন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ)

হযরত আবু মূসা (রা) জীবনের শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ নিষেধ পালনে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। এমন কি যখন তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে এবং তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেন, তখন মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সেই মারাত্মক মুহূর্তেও ক্ষণিকের জন্য চেতনা ফিরে পেয়ে বলে ওঠেন ঃ যে জিনিস থেকে রাসূল স্বীয় দায়িত্বমুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন আমিও তা থেকে দায়িত্বমুক্ত। রাসূল (সা) এমন বিলাপকারিনীদের থেকে দায়িত্ব মুক্তির কথা বলেছেন।'

প্রথম জীবনে দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু পরবর্তী জীবন সচ্ছলতায় কেটেছে। হযরত উমার (রা) তাঁর ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল হযরত আবু মূসা (রা) সেই সব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যে ছয় ব্যক্তি ফাতওয়া দানের অনুমতি পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ)। আসওয়াদ নামক একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী বলেন, আমি কুফায় হযরত আলী ও হযরত আবু মূসা (রা) অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর দেখিনি। হযরত আলী (রা) বলতেন ঃ 'মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবু মূসা ইলমের রঙে রঞ্জিত।' তিনি সব সময় জ্ঞানী-ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে থাকতেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। এ আলোচনা কখনও কখনও বাহাস-মুনাজিরা পর্যন্ত পৌছে যেত। বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদ ও মুয়াজ বিন জাবালের (রা) সাথে তাঁর বিশেষ তর্ক-বাহাস হতো। একবার তায়াম্মুমের মাসয়ালার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদ ও আবু মূসার (রা) মধ্যে বিতর্ক হয়। ইমাম বুখারী-'তায়াম্মুম' অধ্যায়ে এ বিতর্ক বর্ণনা করেছেন।

তিনি যে শুধু জ্ঞান পিপাসু ছিলেন তাইনা, জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্যও আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি মনে করতেন, যতটুকু তিনি জানবেন অন্যকে তা জানানো ফরয। একবার এক ভাষণে বলেনঃ 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ইলম দান করেছেন, তার উচিত অন্য ভাইদের তা জানানো। তবে যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে একটি শব্দও মুখ থেকে বের করবে না।' তাঁর দারসের পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন ধরনের। যথারীতি হালকায়ে দারস ছাড়াও কখনও কখনও লোকজন জড়ো করে তাদের সামনে ভাষন দিতেন। পথে-ঘাটে কোথাও এক স্থানে কিছু লোকের দেখা পেলে তাদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) দু' একটি বাণী পৌঁছে দিতেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি খুব কোমল আচরণ করতেন। কেউ অজ্ঞতা বশতঃ বোকার মত যদি কোন প্রশ্ন করে বসতো, তিনি উত্তেজিত হতেন না। অত্যন্ত নরম সুরে তাকে বুঝিয়ে দিতেন।

পবিত্র কুরআনের সাথে আবু মূসার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। রাত-দিনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ব্যয় করতেন। ইয়ামনের ওয়ালী থাকাকালে একবার মুয়াজ বিন জাবাল জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? বললেন ঃ রাত্র দিনে যখনই সুযোগ পাই একটু করে তিলাওয়াত করে নিই। তিনি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রাসূল (সা) বলতেনঃ 'আবু মূসা দাউদের (আ) লাহানের কিছু অংশ লাভ করেছে।'

তাঁর তিলাওয়াত রাসূলের (সা) খুবই পছন্দ ছিল।

তার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলেই রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার হযরত আশিয়াকে (রা) সংগে করে রাসূল (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবু মূসার কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান। কিছুক্ষণ শোনার পর আবার সামনে অগ্রসর হন। একবার মসজিদে নববীতে আবু মূসা জোর আওয়াযে ইশার নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। সুমধুর আওয়ায শুনে উম্মুহাতুল মুমিনীন হুজরার পর্দার কাছে এসে কান লাগিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকেন। সকালে যখন এ কথা জানতে পারলেন, বললেন, আমি যদি তখন একথা জানতে পারতাম তাহলে আরো চিত্তাকর্ষক আওয়াযে তিলাওয়াত করে তাঁদেরকে কুরআনের আশেক বানিয়ে দিতাম। তাঁর এই অসাধারণ খোশ লাহানের কারণেই রাসূল (সা) মুয়াজ বিন জাবালের সাথে তাঁকেও নওমুসলিমদের কুরআনের তালীম দানের জন্য ইয়ামনে পাঠান।

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে হাদীসের খিদমতেও তাঁর অবদান কোন অংশে কম ছিলনা। কুফায় তার স্বতন্ত্র হালকায়ে দারসে হাদীস ছিল। এই দরসের মাধ্যমে বড় বড় মুহাদ্দিসীন সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০। তন্মধ্যে ৫০ টি মুত্তফাক আলাইহি, ৪৫টি বুখারী এবং ২৫টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

কুরআন ও হাদীসে তাঁর প্রভূত দখল থাকা সত্বেও নিজের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তেমনিভাবে অন্যের জ্ঞানের কদরও করতেন। একবার তিনি মীরাস সংক্রান্ত একটি মাসয়ালায় ফাতওয়া দিলেন। ফাতওয়া জিজ্ঞেসকারী আবদুল্লাহ ইবন মাস্উদের কাছেও বিষয়টি জিজ্ঞেস করে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ অন্য রকম ফাতওয়া দিলেন। আবু মূসা নিজের ভুল স্বীকার করে মন্তব্য করেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ জীবিত থাকা পর্যন্ত তোমাদের আমার কাছে আসা উচিত নয়।

হযরত আবু মূসার জীবনটি ছিল রাসূলে পাকের জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। সর্বদা তিনি চেষ্টা করতেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথা, কাজ, চলন, বলন ইত্যাদি হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করতে। একবার তিনি মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। পথে ইশার নামায দুই রাকায়াত আদায় করলেন। তারপর আবার দাঁড়িয়ে সূরা আন নিসার ১০০টি আয়াত পাঠের মাধ্যমে এক রাকায়াত আদায়

করলেন। লোকেরা প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, আমি সব সময় চেষ্টা করি, যেখানে যেখানে রাসূল (সা) কদম রেখেছেন সেখানে সেখানে কদম রাখার এবং তিনি যে কাজ করেছেন, হুবহু তাই করার।

রামাদানের রোযা ছাড়াও নফল রোযা এ জন্য রাখতেন যে, রাসূল (সা) তা রেখেছেন। আশূরার রোযা তিনি বরাবর রাখতেন এবং মানুষকে তা রাখার জন্য বলতেন। সুন্নাত ছাড়া মুস্তাহাবেরও তিনি ভীষণ পাবন্দ ছিলেন। কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করা মুস্তাহাব। শুধু এ কারণে তিনি তাঁর নিজ কন্যাদেরকেও হুকুম দিতেন নিজ হাতে পশু জবেহ করার জন্য।

রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ ছিল কোন ব্যক্তি যখন কারো বাড়ীতে যাবে তখন ভিতরে প্রবেশ করার আগে যেন অনুমতি নেয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে সে যেন ফিরে আসে। একবার আবু মূসা গেলেন খলীফা উমারের সাথে দেখা করতে। এক এক করে তিনবার তিনি অনুমতি চাইলেন, কিন্তু খলীফা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় সাড়া দিতে পারলেন না। আবু মূসা ফিরে আসলেন। অন্য এক সময় খলীফা জিজ্ঞেস করলেন আবু মূসা ফিরে গেলে কেন ? বললেন, আমি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরেও সাড়া পাইনি তাই ফিরে গেছি। এই কথার পর তিনি এ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন। 'উমার (রা) বললেন, হাদীসটি তুমি ছাড়া অন্যকেউ শুনেছে এমন একজন সাক্ষী নিয়ে এসো। আবু মূসা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আনসারীদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত উবাই বিন কা'বও হাদীসটি শুনেছিলেন। তিনি উমারের (রা) কাছে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দেন।

শা'বী বলেন ঃ ছয়জনের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করা হয় ঃ 'উমার, আলী, উবাই, ইবন মাসউদ, যায়িদ ও আবু মূসা।'

খলীফা উমার (রা) তাঁকে বসরার ওয়ালী নিযুক্ত করে পাঠালেন। বসরায় পৌছে তিনি সমবেত জনতার সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন 'আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে আপনাদের রবের কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত শিক্ষা দেব এবং আপনাদের পথ ঘাট সমূহ আপনাদের কল্যাণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবো।' ভাষণ শুনে জনতাতো অবাক ! জনগণকে সংস্কৃতিবান করে তোলা, তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত করাতো শাসকের দায়িত্বের আওতায় পড়তে পারে। কিন্তু তাদের পথ ঘাটসমূহ পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব তিনি কেমন করে পালন করতে পারেন ? ব্যাপারটি তাদের কাছে ভীষণ আশ্চর্য্যের মনে হলো। তাই হযরত হাসান (রা) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ 'তাঁর চেয়ে উত্তম আরোহী বসরাবাসীদের জন্য আর কেউ আসেনি।' (রিজালুন হালার রাসূল)। রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে বলতেনঃ'আবু মূসা অশ্বারোহীদের নেতা।'

হযরত আবু মূসার সামনে উম্মাতের কল্যাণ চিন্তাটাই ছিল সবচেয়ে বড়। এজন্য সারাজীবন ব্যক্তিগত সব লাভ ও সুযোগের প্রতি পদাঘাত করেছেন। আলী ও মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে যখন যুদ্ধ চলছে, তখন একদিন মুয়াবিয়া আবু মূসাকে বলেছেন, যদি তিনি মুয়াবিয়াকে সমর্থন করেন, তাহলে তাঁর দু'ছেলেকে যথাক্রমে বসরা ও কুফার ওয়ালী নিয়োগ করবেন এবং তাঁর সুযোগ-সুবিধার প্রতিও যত্নবান হবেন। জবাবে আবু মূসা লিখলেন, 'আপনি উম্মাতে মুহাম্মাদীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন। যে জিনিস আপনি আমার সামনে পেশ করেছেন, তার প্রয়োজন আমার নেই।'

লজ্জা-শরম ঈমানের অঙ্গ। আবু মূসার মধ্যে এই উপাদানটি পরিপূর্ণরূপে ছিল। রাতে ঘুমানোর সময়ও বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নিতেন, যাতে সতর উম্মুক্ত হয়ে না যায়। একবার কিছু লোককে তিনি দেখলেন, তারা পানির মধ্যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করছে। তিনি বললেন, বার বার মরে জীবিত হওয়া আমার মনঃপূত, তবুও একাজ আমার পছন্দ নয়।'

সুহাইব ইবন সিনান আর-রুমী (রা)

নাম 'সুহাইব, কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। পিতা সিনান, মাতা সালমা বিনতু কাঈদ। পিতা আরবের বনী নুমাইর এবং মাতা বনী তামীম খান্দানের সন্তান। তাঁকে রুমী বা রোমবাসী বলা হয়। আসলে তিনি কিন্তু রোমবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আরব।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির আনুমানিক দু'দশক পূর্বে পারশ্য সাম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তার পিতা সিনান ইবন মালিক বসরার এক প্রাচীন শহর 'উবুল্লার' শাসক ছিলেন। সুহাইব ছিলেন পিতার প্রিয়তম সন্তান। তাঁর মা সুহাইবকে সংগে করে আরো কিছু লোক লস্করসহ একবার ইরাকের 'সানিয়্যা' নামক পল্লীতে বেড়াতে যান। হঠাৎ এক রাতে রোমান বাহিনী অতর্কিতে পল্লীটির ওপর আক্রমন করে ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। নারী ও শিশুদের বন্দী করে দাস ও দাসীতে পরিনত করে। বন্দীদের মধ্যে শিশু সুহাইবও ছিলেন। তখন তাঁর রয়স পাঁচ বছরের বেশী হবে না।

সুহাইবকে রোমের এক দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে বিক্রি করা হলো। তিনি এক মনিবের হাত থেকে অন্য মনিবের হাতে গেলেন ক্রমাগতভাবে। তৎকালীন রোম সমাজে দাসদের ভাগ্যে এমনিই ঘটতো। এভাবে ভেতর থেকেই রোমান সমাজের গভীরে প্রবেশ করার এবং সেই সমাজের অভ্যন্তরে সংঘটিত অশ্লীলতা ও পাপাচার নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তিনি লাভ করেন।

সুহাইব রোমের ভূমিতে লালিত পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পন করেন। তিনি আরবী ভাষা ভুলে যান অথবা ভুলে যাওয়ার কাছাকাছি পৌছেন। তবে তিনি যে মরু আরবের সন্তান, এ কথাটি এক দিনের জন্যও ভুলেননি। সর্বদা তিনি প্রহর গুনতেন, কবে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবেন এবং আরবে নিজ গোত্রের সাথে মিলিত হবেন। তাঁর এ আগ্রহ প্রবলতর হয়ে ওঠে যে দিন তিনি এক খৃষ্টান কাহিনের (ভবিষ্যদ্বক্তা) মুখে শুনতে পেলেন ঃ 'সে সময় সমাগত যখন জাযীরাতুল আরবের মক্কায় একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তিনি ঈসা ইবন মরিয়মের রিসালাতকে সত্যায়িত করবেন এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।'

সুহাইব সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকলেন। সুযোগ এসেও গেল। একদিন মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে মক্কায় চলে এলেন। মক্কার লোকেরা তাঁর সোনালী চুল ও জিহ্বার জড়তার কারণে তাঁকে সুহাইব আর রুমী বলতে থাকে। মক্কায় তিনি বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাঁর সাথে যৌথভাবে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেন। ব্যবসায়ে তারা দারুণ সাফল্য লাভ করেন। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে আরবের বনী কালব তাঁকে খরীদ করে মক্কায় নিয়ে আসে। আবদুল্লাহ ইবন জুদআন তাদের নিকট থেকে তাঁকে খরীদ করে আযাদ করে দেন।

সুহাইব মক্কায় তাঁর কারবার ও ব্যবসা বাণিজ্যের হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও এক মুহূর্তের জন্য সেই খৃষ্টান কাহিনের ভাবিষ্যদ্বানীর কথা ভুলেননি। সে কথা স্মরণ হলেই মনে মনে বলতেন ঃ তা কবে হবে ? এ ভাবে অবশ্য তাঁকে বেশী দিন কাটাতে হয়নি।

একদিন তিনি এক সফর থেকে ফিরে এসে শুনতে পেলেন, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ নবুওয়াত লাভ করেছেন। মানুষকে তিনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহবান জানাচ্ছেন, তাদেরকে আদল ও ইহসানের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন। সুহাইব মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাঁকে আল আমীন বলা হয় ইনি কি সেই ব্যক্তি ?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বাসস্থান কোথায় ? বলা হলো, 'সাফা পাহাড়ের কাছে আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীতে তিনি থাকেন। তবে সতর্ক থেকো

কুরাইশদের কেউ যেন তোমাকে তাঁর কাছে দেখে না ফেলে। যদি তারা মুহাম্মাদের কাছে তোমাকে দেখতে পায়, তোমার সাথে তেমন আচরণই তারা করবে যেমনটি তারা আমাদের সাথে করে থাকে। তুমি একজন বিদেশী মানুষ, তোমাকে রক্ষা করার কেউ এখানে নেই। তোমার গোত্র গোষ্ঠীও এখানে নেই।'

সুহাইব চললেন দারুল আরকামের দিকে অত্যন্ত সন্তর্পনে। আরকামের বাড়ীর দরযায় পৌছে দেখতে পেলেন সেখানে আম্মার বিন ইয়াসির দাঁড়িয়ে। আগেই তাঁর সাথে পরিচয় ছিল। একটু ইতস্ততঃ করে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'আম্মার তুমি এখানে ?'

আম্মার পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, 'বরং তুমিই বল, কি জন্য এসেছ ?'

সুহাইব বললেন, 'আমি এই লোকটির কাছে যেতে চাই, তাঁর কিছু কথা শুনতে চাই।'

আম্মার বললেন, আমারও উদ্দেশ্য তাই। 'সুহাইব বললেন, 'তাহলে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে ঢুকে পড়ি।'

দু'জনে এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌছে তাঁর কথা শুনলেন। তাঁদের অন্তর ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। দু'জনেই এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কলেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। সে দিনটি তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে থেকে তাঁর উপদেশপূর্ণ বাণী শ্রবণ করলেন। গভীর রাতে মানুষের শোরগোল থেমে গেলে তাঁরা চুপে চুপে অন্ধকারে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ আস্তানার দিকে বেরিয়ে পড়লেন। হযরত সুহাইবের পূর্বে তিরিশেরও বেশী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ কুরাইশদের ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। সুহাইব যদিও বিদেশী ছিলেন, মক্কায় তাঁর কোন আত্মীয় বন্ধু ছিল না, তা সত্বেও তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন না। তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দিলেন। বিলাল, আম্মার, সুমাইয়্যা, খাব্বাব প্রমুখের ন্যায় তিনিও কুরাইশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হলেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। তিনি জানতেন, জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরাতের সংকল্প করলেন, সুহাইব তা অবগত হলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই হবেন 'সালেসু সালাসা— তিনজনের তৃতীয় জন। অর্থাৎ রাসূল (সা), আবু বকর ও সুহাইব। কিন্তু কুরাইশদের সচেতন পাহারার কারণে তা হয়নি। কুরাইশরা তাঁর পিছু লেগে ছিল, যাতে তিনি তাঁর বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে সরে যেতে না পারেন।

রাসূলুল্লাহর হিজরাতের পর সুহাইব সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। কুরাইশরাও তাকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। অবশেষে তিনি এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

এক প্রচণ্ড শীতের রাতে বার বার তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাড়ীর বাইরে যেতে লাগলেন। একবার যেয়ে আসতে না আসতে আবার যেতে লাগলেন। কুরাইশ পাহারাদাররা বলা বলি করলো, লাত ও উযযা তার পেট খারাপ করেছে। তারা কিছুটা আত্মতৃপ্তি বোধ করলো এবং বাড়ীতে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এই সুযোগে সুহাইব বাড়ী থেকে বের হয়ে মদীনার পথ ধরলেন।

সুহাইব মক্কা থেকে বেরিয়ে কিছু দূর যেতে না যেতেই পাহারাদাররা বিষয়টি জেনে ফেলে। তারা তাড়াতাড়ি দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করে। সুহাইব তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটি উঁচু টিলার ওপর উঠে তীর ও ধনুক বের করে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'কুরাইশ সম্প্রদায় ! তোমরা জান, আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তীরন্দায ও নিশানবায ব্যক্তি। আল্লাহর কসম, আমার কাছে যতগুলি তীর আছে, তার প্রত্যেকটি দিয়ে তোমাদের এক একজন করে খতম না করা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে পৌছতে পারবে না। তারপর আমার তরবারি তো

আছেই।' কুরাইশদের একজন বললোঃ 'আল্লাহর কসম ! তুমি জীবনও বাঁচাবে এবং অর্থ-সম্পদও নিয়ে যাবে তা আমরা হতে দেব না। তুমি মক্কায় এসেছিলে শূন্য হাতে। এখানে এসেই এসব ধন-সম্পদের মালিক হয়েছো।'

সুহাইব বললেন, 'আমি যদি আমার ধন-সম্পদ তোমাদের হাতে তুলে দিই, তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে দেবে ?'

তারা বললো, 'হাঁ'।

সুহাইব তাদেরকে সংগে করে মক্কায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং সকল ধন-সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিলেন। কুরাইশরাও তাঁর পথ ছেড়ে দিল। এভাবে সুহাইব দ্বীনের খাতিরে সবকিছু ত্যাগ করে মদীনায় চলে এলেন। পেছনে ফেলে আসা কষ্টোপার্জিত ধন-সম্পদের জন্য তিনি একটুও কাতর হননি। পথে যখনই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, রাসূলের (সা) সাথে সাক্ষাতের কথা স্মরণ হতেই সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে আবার যাত্রা শুরু করেন। এভাবে তিনি কুবায় পৌঁছেন। রাসূল (সা) তখন কুবায় কুলসূম ইবন হিদামের বাড়ীতে। রাসূল (সা) তাঁকে আসতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে ওঠেন, 'আবু ইয়াহইয়া, ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।' তিন বার তিনি একথাটি বলেন। সুহাইবের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলে উঠেন, 'আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আগে তো আপনার কাছে আর কেউ আসেনি। নিশ্চয় জিবরীল এ খবর আপনাকে দিয়েছেন।' সত্যিই ব্যবসাটি লাভজনকই হয়েছিল। একথার সমর্থনে জিবরীল (সা) ওহী নিয়ে হাজির হলেন, 'ওয়া মিনান নাসে মান ইয়াশরী নাফসাহু ইবতিগা মারদাতিল্লাহ। ওয়াল্লাহু রাউফুম বিল ইবাদ' কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবনও বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

হযরত সুহাইব মদীনায় সা'দ ইবন খুসাইমার অতিথি হন এবং হারিস ইবনুস সাম্মা আল-আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম হয়।

হযরত সুহাইব ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সহযাত্রী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে জন সমাবেশে তিনি এসব যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য সম্পর্কে তিনি নিজেই বলতেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি ভূমিকায় আমি উপস্থিত থেকেছি। তিনি যখনই কোন বাইয়াত গ্রহণ করেছেন, আমি উপস্থিত থেকেছি। তাঁর ছোট ছোট অভিযান গুলিতে আমি অংশগ্রহণ করেছি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত যুদ্ধ তিনি করেছেন তার প্রত্যেকটিতে আমি তাঁর ডানে অথবা বামে অবস্থান করে যুদ্ধ করেছি। মুসলমানরা যতবার এবং যেখানেই পেছনের অথবা সামনের শত্রুর ভয়ে ভীত হয়েছে, আমি সব সময় তাদের সাথে থেকেছি। রাসূলুল্লাহকে (সা) কক্ষনো আমার নিজের ও শত্রুর মাঝখানে হতে দিইনি। এভাবে রাসূল (সা) তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন।' (রিজালুন হাওলার রাসূল-১৩০)

হযরত সুহাইব সম্পর্কে হযরত 'উমারের (রা) অত্যন্ত সুধারণা ছিল। তিনি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসীয়াত করে যান, সুহাইব তাঁর জানাযার ইমামতি করবেন। শূরার সদস্যবৃন্দ যতক্ষণ নতুন খলীফার নাম ঘোষণা না করবেন, তিনিই খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। হযরত উমারের (রা) মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

হিজরী ৩৮ সনে ৭২ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। মদীনার বাকী' গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত সুহাইব (রা) জীবনের বিরাট এক অংশ রাসূলে পাকের সাহচার্যে কাটানোর সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি বলতেনঃ ওহী নাযিলের পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।' একারণে সকল সৎগুনাবলীর সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। সচ্চরিত্রতা, আত্ম মর্যাদা বোধের সাথে সাথে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, হাস্য কৌতুক ইত্যাদি গুণাবলী তাঁর চরিত্রকে আরও মাধুর্য্য দান করেছিল।

তিনি ছিলেন অতিথি পরায়ণ ও দানশীল। গরীব দুঃখীর প্রতি ছিলেন দরাযহস্ত। মাঝে মাঝে মানুষের ধারণা হতো, তিনি দারুণ অমিতব্যয়ী। একবার হযরত উমার (রা) তাঁকে বলেন, তোমার কথা আমার ভালো লাগে না। কারণ, প্রথমতঃ তোমার কুনিয়াত আবু ইয়াহইয়া। এই নামে একজন নবী ছিলেন। আর এ নামে তোমার কোন সন্তান নেই। দ্বিতীয়তঃ তুমি বড় অমিতব্যয়ী। তৃতীয়তঃ তুমি নিজেকে একজন আরব বলে দাবী কর।' জবাবে তিনি বলেন, 'এই কুনিয়াত আমি নিজে গ্রহণ করিনি। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্বাচিত। দ্বিতীয়তঃ অমিতব্যয়িতা। তা আমার একাজের ভিত্তি হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী— 'যারা মানুষকে অন্নদান করে এবং সালামের জবাব দেয় তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তৃতীয় অভিযোগটির জবাব হলো, প্রকৃতই আমি একজন আরব সন্তান। শৈশবে রোমবাসী আমাকে লুট করে নিয়ে যায়, আমাকে আমার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাসে পরিণত করে, এ-কারণে আমি আমার গোত্র ও খান্দানকে ভুলে যাই।'

হযরত সুহাইবের দৈহিক গঠন ছিল মধ্যমাকৃতির। না লম্বা না খাটো। চেহারা উজ্জ্বল, মাথার চুল ঘন। বার্ধক্যে মেহেন্দীর খিযাব লাগাতেন। জিহবায় কিছুটা জড়তা ও তোৎলামী ছিল। একবার তাঁর চাকর ইয়াহনাসকে ডাকছিলেন। তা যেন শুনা যাচ্ছিল, নাস'। নাস অর্থ মানুষ। হযরত উমার সে ডাক শুনে বলে ওঠেন, 'লোকটি এভাবে 'নাস' 'অর্থাৎ মানুষকে ডাকছে কেন?' হযরত উম্মে সালামা (রা) বললেন, 'সে নাস' দ্বারা মানুষকে নয়, বরং তার চাকর ইয়াহনাসকে ডাকছে। জিহবার জড়তার দরুণ নামটি ভালো মত উচ্চারণ করতে পারে না।

'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)

নাম 'আম্মার, কুনিয়াত 'আবুল ইয়াকজান'। পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা। পিতা কাহতান বংশের সন্তান। আদি বাসস্থান ইয়ামন। তাঁর এক ভাই হারিয়ে যায়। হারানো ভায়ের খোঁজে অন্য দু ভাই হারিস ও মালিককে সংগে করে তিনি মক্কায় পৌছেন। অন্য দু' ভাই ইয়ামন ফিরে গেলেও ইয়াসির একা মক্কায় থেকে যান। মক্কার বনী মাখযুমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আবু হুজাইফা মাখযুমীর 'সুমাইয়্যা' নাম্নী এক দাসীকে বিয়ে করেন। এই সুমাইয়্যার গর্ভেই হযরত আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। আবু হুজাইফা শিশুকালেই আম্মারকে আযাদ করে দেন এবং আমরণ পিতা-পুত্রের মত দু'জনের সম্পর্ক বজায় রাখেন।

হযরত আম্মার ও হযরত সুহাইব ইবন সিনান দু'জন একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আম্মার বলেন ঃ 'আমি সুহাইবকে আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীর দরযায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তোমার উদ্দেশ্য কি ? সে বললো ঃ প্রথমে তোমার উদ্দেশ্যটি কি তাই বল।' বললাম, মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কিছু কথা শুনতে চাই।' সে বললো, 'আমারও সেই একই উদ্দেশ্য।' তারপর দু'জন এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আম্মারের সাথে অথবা কিছু আগে বা পরে তার পিতা ইয়াসিরও ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত 'আম্মার ইসলাম গ্রহণ করে দেখলেন, আবু বকর ছাড়া আর পাঁচজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে এর অর্থ এই যে, তখন মাত্র এ ক'জনই তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যথায় সহীহ বর্ণনা মতে আম্মারের পূর্বে তিরিশেরও বেশী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ কাফিরদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন।

মক্কা হযরত 'আম্মারের জন্মভূমি নয়। আপন বলতে সেখানে তাঁর কেউ ছিল না। পার্থিব আভিজাত্য বা ক্ষমতার দাপটও তাঁর ছিল না। তাছাড়া তখন পর্যন্ত তাঁর মা 'সুমাইয়্যা' বনী মাখযুমের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এমনি এক অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঈমানী জযবায় একদিনও বিষয়টি গোপন রাখতে পারলেন না। সবার কাছে প্রকাশ করে দিলেন। মক্কার মুশরিকরা দুর্বল পেয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের লোকদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করে দিল। দুপুরের প্রচণ্ড গরমের সময় উত্তপ্ত পাথরের ওপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হতো, জ্বলন্ত লোহা দিয়ে শরীর ঝলসে দেওয়া হতো। কিন্তু আম্মারের ঈমানী শক্তির কাছে মুশরিকদের সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন পরাজিত হলো।

হযরত আম্মারের মা হযরত সুমাইয়্যাকে নরাধম আবু জাহল নিজের নিযা দিয়ে নির্মমভাবে শহীদ করে। ইসলামের ইতিহাসে হযরত সুমাইয়্যা প্রথম শহীদ। আম্মারের পিতা ইয়াসির এবং ভাই আবদুল্লাহও মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। একদিন মুশরিকরা আম্মারকে আগুনের অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। এমন সময় রাসূল (সা) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্যথিত চিত্তে আম্মারের মাথায় পবিত্র একটি হাত রেখে বললেন ঃ 'হে আগুন, ইব্রাহিমের মত তুই আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যা।' রাসূল (সা) যখনই আম্মার পরিবারের বাড়ীর ধার দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে নির্যাতিত অবস্থায় দেখতে পেতেন, সান্ত্বনা দিতেন। একদিন তিনি বলেন ঃ 'আম্মার পরিবারের লোকেরা, তোমাদের জন্য সুসংবাদ। জান্নাত তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।' একবার হযরত আম্মার রাসূলুল্লাহর নিকট এই অসহনীয় যুল্ম অত্যাচারের বিরুদ্ধে

শিকায়েত করলো। রাসূল (সা) বললেন, 'সবর কর, সবর কর।' তারপর দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, ইয়াসির খান্দানের লোকদের ক্ষমা করে দাও।'

একদিন মুশরিকরা তাঁকে এত দীর্ঘক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রাখে যে, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁর মুখ দিয়ে তাদের ইচ্ছেমত স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'আম্মার, খবর কি ?' আম্মার জবাব দিলেন ঃ 'আজ আপনার শানে কিছু খারাপ এবং তাদের উপাস্যদের সম্পর্কে কিছু ভালো কথা না বলা পর্যন্ত আমি মুক্তি পাইনি।' রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অন্তর কি বলছে ?' বললেন, 'আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ।' প্রিয় নবী (সা) অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন, 'কোন ক্ষতি নেই। এমন অবস্থার মুখোমুখি হলে আবারও এমনটি করবে।' তারপর তিনি সূরা আন নাহলের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ 'যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, তবে যাদেরকে বাধ্য করা হয় এবং তাদের অন্তর ঈমানের ওপর দৃঢ় (তাদের কোন দোষ নেই)।' (আন নাহল/১৪)

একবার হযরত সাঈদ ইবন যুবাইর (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ কুরাইশরা কি মুসলমানদের ওপর এতই অত্যাচার চালাতো যে, তারা দ্বীন ত্যাগ করতে বাধ্য হতো ? জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, হাঁ। কুরাইশরা তাদেরকে মারতো, অনাহারে রাখতো। এমন কি তারা এতই দুর্বল হয়ে পড়তো যে, উঠতে বসতে অক্ষম হয়ে যেত। এ অবস্থায় তাদের অন্তরের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করে নিত। এসব নির্যাতিত মুসলিমদের একজন আম্মার।"

হযরত আম্মার হাবশায় হিজরাত করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হাবশাগামী দ্বিতীয় কাফিলার সহগামী হয়েছিলেন। মদীনায় হিজরাতের হুকুম হলে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং হযরত মুবাশশির ইবনুল মুনযিরের মেহমান হন। রাসূল (সা) হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান আল আনসারীর সাথে তাঁর ভাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাঁকে একখন্ড ভূমিও দান করেন।

হিজরাতের ছয়-সাত মাস পর মদীনার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। রাসূল (সা) নিজেও মসজিদ তৈরীর কাজে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আম্মারও সক্রিয়ভাবে মসজিদ তৈরীতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মাথায় করে ইট বহন করেছিলেন আর মুখে এই চরণটি আওড়াচ্ছিলেন ঃ 'নাহনুল মুসলিমুন নাবতানিল মাসাজিদ— আমরা মুসলিম, আমরা বানাই মসজিদ।' হযরত আবু সাঈদ বলেন, আমরা একটি করে ইট উঠাচ্ছিলাম, আর আম্মার উঠাচ্ছিলেন দু'টি করে। একবার আম্মার যাচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে। রাসূল (সা) অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাঁর মাথার ধূলো- বালি ঝেড়ে দিয়ে বললেন, 'আফসুস আম্মার ! একটি বিদ্রোহীদল তোমাকে হত্যা করবে। তুমি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবে, আর তারা তোমাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে।' একবার কেউ তাঁর মাথায় এত বোঝা চাপিয়ে দিল যে, লোকেরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আম্মার মারা যাবে, আম্মার মারা যাবে' রাসূল (সা) এগিয়ে গিয়ে আম্মারের মাথা থেকে ইট তুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলেন।

বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, সবগুলিতে আম্মার অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের (রা) যুগে সংঘটিত অধিকাংশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেও তিনি সাহসী যোদ্ধার পরিচয় দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মারের একটি কান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে লাফাতে থাকে। তা সত্বেও তিনি বেপরোয়াভাবে হামলার পর হামলা চালাতে থাকেন। যে দিকে তিনি যাচ্ছিলেন, কাফিরদের ব্যূহ তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। একবার মুসলিম বাহিনী প্রায় ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হলো। আম্মার এক বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে একটি পাথরের কাছে

দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন ঃ 'ওহে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছো আমি আম্মার ইবন ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো।' এই আওয়ায মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যাদুর মত কাজ করে। তারা আবার রুখে দাঁড়ায়। বিজয় ছিনিয়ে আনে। "

হিজরী ২০ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা) তাঁকে কুফার ওয়ালী বা শাসক নিয়োগ করেন। এক বছর নয় মাস অতি দক্ষতার সাথে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় বসরাবাসীরা কিছু নতুন বিজিত এলাকা বসরার সাথে দেওয়ার জন্য খলীফার নিকট দাবী করে। কুফার কিছু নেতৃবৃন্দ তাদের আমীর আম্মারকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন উক্ত এলাকা সমূহ কুফার সাথে দেওয়ার ব্যাপারে খলীফাকে সম্মত করেন। কিন্তু হযরত আম্মার এ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়তে রাজী হলেন না। কুফার নেতারা ক্ষেপে গেলেন। একজনতো তাকে 'কান কাটা' বলে গালিই দিয়ে বসেন। জবাবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আফসুস, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম কানটিকে গালি দিলে, যে কানটি আল্লাহর পথে কাটা গেছে।'

এই বিষয়টি নিয়ে কুফার কিছু নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরুদ্ধে শাসন কার্যে অদক্ষ বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। খলীফা তাঁকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্তের পরের দিন খলীফা ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি আমার এ কাজে অসন্তুষ্ট ?' তিনি জবাব দেন, 'আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন, সত্য কথাটি বলতে হবে। পূর্বে যেমন আমার নিয়োগের সময় খুশী ছিলাম না, তেমনি এখন বরখাস্তের সময় নাখোশও নই।' "

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে চতুর্দিকে যখন বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে, তখন হিজরী ৩৫ সনে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য খলীফা একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। হযরত আম্মারও ছিলেন এই কমিশনের অন্যতম সদস্য। বিক্ষোভের মূল কেন্দ্র মিসরের তদন্তভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। তিনি মিসর যান।

কমিশনের অন্য সদস্যরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজ নিজ এলাকার রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু হযরত আম্মার ফিরতে আশাতিরিক্ত দেরী করলেন। এদিকে দারুল খিলাফত মদীনায় তাঁর সম্পর্কে নানা রকম গুজব ও ধারণা ছাড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি যখন মিসর থেকে ফিরে এলেন তখন বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা তাঁকে প্রভাবিত দেখা গেল। তিনি প্রকাশ্য মিটিং মজলিসে হযরত উসমানের শাসনপদ্ধতি ও প্রাদেশিক ওয়ালীদের নানাবিধ কাজের কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন। ফলে খলীফার লোকদের সাথে বিবাদ শুরু হয়ে গেল। একবার উসমানের (রা) চাকর-বাকরেরা তাঁকে এমন মারাত্মক পিটুনি দেয় যে, তাঁর সমস্ত শরীর ফুলে গেল। তিনি পাঁজরের একটি হাড়ে ভীষণ চোট পেলেন। বনী মাখযুমের সাথে তাঁর জাহিলী যুগে চুক্তি ছিল। তাঁরা খলীফার দরবারে পৌঁছে হুমকি দেয়, যদি আম্মার এই আঘাত থেকে প্রাণে না বাঁচেন তাহলে আমরা অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। (আল-ইসতিয়াব) এমনি ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীরা মদীনায় চড়াও হয়, হযরত 'উসমান (রা) হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে আম্মারের কাছে বলে পাঠান, তিনি যেন তার প্রভাব খাটিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠান। কিন্তু আম্মার অস্বীকার করেন। (তাবারী) "

হযরত 'উসমান (রা) শহীদ হলেন। খিলাফতের দায়িত্ব হযরত আলীর (রা) ওপর ন্যস্ত হলো। হযরত আয়িশা, তালহা, যুবাইর প্রমুখ উসমানের রক্তের বদলা দাবী করে বসরার দিকে চললেন। হযরত আলী কুফাবাসীদেরকে স্বপক্ষে আনার জন্য ইমাম হাসানের সাথে আম্মারকে পাঠালেন কুফায়। হযরত আম্মার যখন কুফা পৌঁছেন, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) তখন কুফার জামে মসজিদে এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে মিম্বর থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রথমে হযরত হাসান, পরে হযরত আম্মার ভাষণ দেন এবং আলীর (রা) প্রতি কুফাবাসীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম

হন। পরদিন সকালে প্রায় সাড়ে নয় হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী আলীর (রা) পক্ষে লড়বার জন্য আম্মারের পাশে সমবেত হয়।

হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউল আখের মাসে বসরার অদূরে 'যিকার' নামক স্থানে হযরত আলী ও আয়িশার বাহিনী মুখোমুখি হলো। হযরত আম্মার কুফার বাহিনী সহ এ যুদ্ধে যোগ দিলেন। যুদ্ধের সূচনাপর্বেই হযরত যুবাইর যখন দেখলেন আম্মার আলীর পক্ষে, তখন তার স্মরণ হলো রাসূলুল্লাহর বাণী, 'সত্য আম্মারের সাথে, বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে।' তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে কেটে পড়লেন। এ যুদ্ধে হযরত আম্মারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি সত্যের ওপর আছেন। তাই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং বিজয়ী হন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

উটের যুদ্ধের পর হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ হয়। হযরত আম্মার এ যুদ্ধেও হযরত আলীর পক্ষে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স একানব্বই, মতান্তরে তিরানব্বই বছর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জিহাদের অনুপ্রেরণায় ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সত্য আলীর (রা) পক্ষে। তাই এই বয়সেও তিনি সিংহের ন্যায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। তিনি যেদিকেই আক্রমণ চালাচ্ছিলেন বিপক্ষ শিবির ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। একবার বিপক্ষ শিবিরের পতাকাবাহী হযরত আমর ইবনুল 'আসের ওপর তাঁর নজর পড়লো। তিনি বললেন, 'আমি এই পতাকাবাহীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর সাথে তিনবার যুদ্ধ করেছি। তার সাথে এ আমার চতুর্থ যুদ্ধ। আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে পরাজিত করে 'হাজার' নামক স্থানেও ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও আমি বিশ্বাস করবো, আমরা সত্য এবং তারা মিথ্যার ওপর।' (তাবাকাত ১/১৮৫)

সিফফীনের যুদ্ধে আলীর (রা) পক্ষে যোগদানের জন্য তিনি মানুষকে আহবান জানিয়ে বলতেন, "ওহে জনমণ্ডলী, আমাদের সাথে এমন লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে বের হও, যারা মনে করে তারা 'উসমানের রক্তের বদলা নিচ্ছে। আল্লাহর কসম, রক্তের বদলা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে তারা দুনিয়ার মজা লাভ করেছে। সে মজা আরো লাভ করতে চায়। · · · · ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের এমন কোন অবদান নেই যার ভিত্তিতে তারা মুসলিম উম্মার আনুগত্য দাবী করতে পারে। মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের কোন হক তাদের নেই। তাদের অন্তরে এমন কিছু আল্লাহর ভীতি নেই যাতে তারা হকের অনুসারী হতে পারে। তারা উসমানের রক্তের বদলার কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। স্বৈরাচারী রাজা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই"। (রিজালুন হাওলার রাসূল/২১৬)

সিফফীনের যুদ্ধ তখন চলছে। একদিন সন্ধ্যায় হযরত আম্মার কয়েক ঢোক দুধ পান করে বললেন, 'রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, দুধই হবে আমার শেষ খাবার। তারপর—'আজ আমি আমার বন্ধুদের সাথে মিলিত হব, আজ আমি মুহম্মাদ (সা) ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হব'—এ কথা বলতে বলতে সৈনিকদের সারিতে যোগ দিলেন। অতঃপর প্রচণ্ডবেগে শত্রু শিবিরের ওপর আক্রমণ চালালেন। উল্লেখ্য যে, বিরোধী শিবিরের লোকেরা হযরত আম্মারকে সব সময় এড়িয়ে চলতো। কারণ, আম্মার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর বিরাট ফজিলাত ও মর্যাদা তাদের জানা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক নও-মুসলিম ছিল যারা আম্মার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতো না। তাদেরই একজন ইবনুল গাবিয়া—তীর নিক্ষেপ করে আম্মারকে প্রথম মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর অন্য একজন শামী ব্যক্তি তরবারি দিয়ে দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

আম্মারকে শহীদ করার পর হত্যাকারী দু'জনই এককভাবে এ কৃতিত্ব দাবী করে ঝগড়া শুরু করে দেয়। ঝগড়া করতে করতে তারা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) কাছে উপস্থিত হয়। ঘটনাক্রমে হযরত

আমর ইবনুল আসও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপার দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, এরা দু'জন জাহান্নামের জন্য ঝগড়া করছে।' একথায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, 'আমর, তুমি এ কি বলছো ? যারা আমাদের জন্য জীবন দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলছো ?' আমর বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটাই সত্য। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি আমার মরণ হতো, কতই না ভালো হতো।'

হযরত আম্মারের (রা) শাহাদাতের পর হযরত 'আমর ইবনুল 'আস দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি এ সংঘাত থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, আম্মারের হত্যাকারী আমরা নই, বরং যারা তাকে ঘর থেকে বের করে এই যুদ্ধের ময়দানে সংগে করে নিয়ে এসেছে প্রকৃতপক্ষে তারাই তাঁর হত্যাকারী। (তাবাকাত)

হযরত আম্মারের (রা) শাহাদাতের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার ফায়সালা হয়ে যায়। হযরত খুযাইমা ইবন সাবিত (রা) উট ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষেই তরবারি কোষমুক্ত করেননি। হযরত আম্মারের শাহাদাতের পর তিনি বুঝলেন, আলীর পক্ষ অবলম্বন করাই উচিৎ। তিনি এবার তরবারি কোষমুক্ত করে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করেন। এমনিভাবে যে সকল সাহাবী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন, তাঁরাও সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন।

হযরত আলী (রা) তাঁর প্রিয় সংগী হযরত আম্মারের (রা) শাহাদাতের খবর শুনে দুঃখের সাথে বলে ওঠেন, "যেদিন আম্মার ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার ওপর আল্লাহ রহম করেছেন, যেদিন সে শাহাদাত বরণ করেছে, তার ওপর আল্লাহ রহম করেছেন এবং যেদিন সে জীবিত হয়ে উঠবে আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন। আমি সেই সময় তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখেছি যখন মাত্র চার-পাঁচ জন সাহাবীর ঈমানের ঘোষণা দানের সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের সাহাবীদের কেউই তাঁর মাগফিরাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। আম্মার এবং সত্য একে অপরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর হত্যাকারী নিশ্চিত জাহান্নামী।"

অতঃপর হযরত আলী (রা) হযরত আম্মারের কাফন দাফনের নির্দেশ দেন। হযরত আলী জানাযার নামায পড়ান এবং আম্মারের রক্ত-ভেজা কাপড়েই দাফনের নির্দেশ দেন। এ হিজরী ৮৭ সনের ঘটনা। হযরত আম্মার (রা) হলেন কুফার মাটিতে সমাহিত রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম সাহাবী।

হযরত আম্মার ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু। তাকওয়া ও খাওফে খোদার কারণে সব সময় চুপচাপ থাকতেন। খুব কম কথা বলতেন। ফিতনা-ফাসাদ থেকে সর্বদা আল্লাহর পানাহ্ চাইতেন। কিন্তু আল্লাহ সবচেয়ে বড় ফিত্না দ্বারা তাঁর পরীক্ষা নেন এবং সার্থকভাবে সত্যের সহায়তাকারী বানিয়ে দেন।

বিনয় ও নম্রতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। মাটিই ছিল তাঁর আরামদায়ক বিছানা। ওয়ালী থাকাকালেও অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। হাট বাজারের কেনাকাটা নিজেই করতেন এবং নিজেই সবকিছু পিঠে করে বহন করতেন। সব কাজ নিজ হাতে করতেন। হযরত আম্মারের এক সমসাময়িক ব্যাক্তি ইবন আবিল হুজাইল বলেন, 'আমি কুফার আমীর আম্মারকে দেখলাম, তিনি কুফায় কিছু শশা খরীদ করলেন। তারপর সেগুলি রশি দিয়ে বেঁধে পিঠে উঠালেন এবং বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২১১)

হযরত আম্মারের (রা) প্রতিটি কাজের মূল প্রেরণা ছিল আল্লাহর রিজামন্দী। সিফ্ফীনের যুদ্ধে যাওয়ার পথে বার বার তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ,আমি যদি জানতাম পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অথবা পানিতে ডুব দিয়ে আমার জীবন বিলিয়ে দিলে তুমি খুশী হবে, আমি তোমাকে সেই ভাবে খুশী করতাম। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তোমার রিজামন্দী।

আমি আশা করি, তুমি আমার এ উদ্দেশ্য বিফল করবে না"। (তাবাকাত) তাঁর চারিত্রিক মহত্ব ও ঈমানী বলিষ্ঠতা সম্পর্কে খোদ রাসূল (সা) বলেছেন, 'আম্মারের শিরা উপশিরায় ঈমান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রাসূল (সা) অন্য সাহাবীদের নিকট আম্মারের ঈমান নিয়ে গর্ব করতেন। একবার প্রখ্যাত সেনা নায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আম্মারের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়। বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) গোচরে এলে তিনি বলেন, 'যে আম্মারের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তার সাথে শত্রুতা করবেন। যে আম্মারকে হিংসা করবে আল্লাহও তাকে হিংসা করবেন। অন্য একটি হাদীসে আছে আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমারের অনুসরণ করবে। তোমরা আম্মারের পথ ও পন্থা থেকে হিদায়াত গ্রহণ করবে।

হযরত আম্মার আল্লাহর ইবাদাতে বিশেষ মজা পেতেন। সারা রাত আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত করতেন। কোন অবস্থাতেই নামায কাযা করতেন না। একবার সফরে ছিলেন। গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। বহু চেষ্টার পরও পানি পেলেন না। তাঁর স্মরণ হলো, মাটিতো পানির বিকল্প। গোসলের পরিবর্তে তিনি সারা দেহে ধূলোবালি মেখে নামায আদায় করলেন। সফর থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'এমন অবস্থায় শুধু তায়াম্মুমই যথেষ্ট।'

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (রা) বলা হয় 'সিররু রাসূলিল্লাহ'— রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় গোপন জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, লোকেরা যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে তখন কার সাথে থাকতে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ? জবাবে বললেন, 'তোমরা ইবন সুমাইয়্যার সাথে থাকবে। তিনি আমরণ সত্য থেকে বিচ্যুৎ হবেন না। মহান সাহাবী হুজাইফার এটাই ছিল জীবনের শেষ কথা (রিজালুন হাওলার রাসূল-২১২)

রাসূল (সা) থেকে তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবু মূসা আশয়ারী, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন জাফর প্রমুখ সাহাবীসহ বহু তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করছেন।

'উসমান ইবন মাজউন (রা)

'নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু সায়িব। পিতা মাজউন, মাতা সুখাইলা বিনতু 'উনাইস। জাহিলী যুগেও তিনি অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। সে যুগের বিপুল সংখ্যক লোক মদ পানে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তিনি তা একবারও স্পর্শ করেননি। যারা মদপান করতো, তাদেরকে তিনি বলতেন, এমন জিনিস পান করে কী লাভ যাতে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায়, নীচ শ্রেণীর লোকের হাসির পাত্রে পরিণত হতে হয় এবং নেশা অবস্থায় মা-বোনের কোন বাছ-বিচার থাকেনা ?

তাঁর অন্তরটিও ছিল দারুণ স্বচ্ছ। রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ওয়াত খুব দ্রুত তাঁকে প্রভাবিত করে। সীরাত লেখকদের মতে তাঁর পূর্বে মাত্র তের ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হলেন চৌদ্দতম মুসলমান। ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) আরকামের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বেই 'উসমান ইবন মাজউন, উবাইদা ইবনুল হারিস, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবু সালামা আবদিল আসাদ এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মদীনায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির এবং মদীনার বাকী' গোরস্তানে দাফনকৃত প্রথম মুসলমান।

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে সর্বপ্রথম মুসলমানদের একটি দল রাসূলুল্লাহর (সা) ইজাযত নিয়ে হাবশায় হিজরাত করেন। 'উসমান ইবন মাজউন ছিলেন এই মুহাজির দলটির আমীর বা নেতা। এই দলটির সাথে তাঁর পুত্র সায়িবও ছিলেন। বেশ কিছুকাল হাবশায় অবস্থানের পর সংবাদ পেলেন যে মক্কার গোটা কুরাইশ খান্দান ইসলাম কবুল করেছে। তিনি আনন্দ সহকারে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে যখন বুঝতে পারলেন খবরটি ভিত্তিহীন, তখন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। কারণ, এত দূর দেশে আবার ফিরে যাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনি মক্কায় প্রবেশ করাও নিরাপদ নয়। এমন দোটানা অবস্থায় যেখানে পৌঁছেছিলেন সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে যখন তাঁর সকল সঙ্গী-সাথী নিজ নিজ মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের সহায়তায় মক্কায় ফিরে গেলেন, তখন তিনিও ওয়ালিদ ইবন মুগীরার নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

ওয়ালিদ ইবন মুগীরার প্রভাবে হযরত উসমান ইবন মাজউন দৈহিক অত্যাচার উৎপীড়নের হাত থেকে তো রেহাই পেলেন, কিন্তু রাসূল (সা) ও অন্যান্য সাহাবীদের ওপর যে যুলুম-অত্যাচার চলছিল তা দেখে মোটেই সুখী হতে পারলেন না। একদিন তিনি নিজেকে তিরস্কার করে বললেন : আফসুস ! আমার আত্মীয়-বন্ধু ও গোত্রের লোকেরা নানা রকম যুলুম-অত্যাচার সহ্য করছে আর আমি এক মুশরিকের সহায়তায় সুখে জীবন যাপন করছি। আল্লাহর কসম ! এটা আমার নিজের সত্তার দারুণ দুর্বলতা।'

এমনই একটা চিন্তায় তিনি ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লেন। একটা অপরাধ বোধে তিনি জর্জরিত হতে লাগলেন। তিনি ওয়ালিদের কাছে গিয়ে বললেন : 'ওহে আবু আবদি শামস, তোমার দায়িত্ব তুমি যথাযথভাবে পালন করছো। এতদিন আমি তোমার আশ্রয়ে কাটিয়েছি, কিন্তু এখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হিফাজতে থাকাই আমি শ্রেয় মনে করি। আমার জন্য আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবীদের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।' ওয়ালিদ বললো : 'কেউ হয়তো তোমাকে কষ্ট দিয়েছে।' তিনি

বললেন, 'না। আসল কথা, আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্য এখন আমার প্রয়োজন নেই। তুমি এখনই আমার সাথে কা'বায় চলো এবং যেভাবে আমাকে আশ্রয় দানের কথা ঘোষণা করেছিলে তেমনিভাবে তা প্রত্যাহারের ঘোষণাটিও দিয়ে দাও।' তার পীড়াপীড়িতে ওয়ালিদ কা'বার চত্বরে সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা দান করলো এবং উসামানও দাঁড়িয়ে ওয়ালিদের কথা সত্যায়িত করে বললে ঃ বন্ধুগন, আমি ওয়ালিদকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও দয়াশীল পেয়েছি। যেহেতু এখন আমার আল্লাহর ও তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো সহায়তা পছন্দীয় নয়, তাই আমি নিজেই ওয়ালীদের ইহসান বা উপকারের বোঝা আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলছি।'

এই ঘোষণার পর 'উসমান ইবন মাজউন গেলেন লাবীদ ইবন রাবীয়ার সাথে কুরাইশদের একটি মজলিসে। লাবীদ ছিলেন তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি। তিনি উপস্থিত হতেই কবিতার আসর শুরু হয়ে গেল। লাবীদ তাঁর কাসীদা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। যখন তিনি এ ছত্রে পৌছলেন-'আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহা বাতিলুন'—'ওহে, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল—অসার' তখন 'উসমান হঠাৎ বলে উঠলেন 'তুমি সত্য কথাই বলেছো'। কিন্তু লাবীদ যখন দ্বিতীয় ছত্রটি পাঠ করলেন—'ওয়া কুল্লু নাঈমিন লামাহালাতা যায়িলুন'—এবং সকল সম্পদই নিশ্চিত ধ্বংস হবে—তখন তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠে বলে উঠেন 'তুমি মিথ্যা বলেছো।' মজলিসে উপস্থিত সকলেই ক্রোধভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। তারা লাবীদকে শ্লোকটি পুনরায় আবৃত্তি করতে অনুরোধ করলো। লাবীদ আবার আবৃত্তি করলো এবং উসমানও প্রথম ছত্রটি সত্য ও দ্বিতীয়টি মিথ্যা বলে মত প্রকাশ করে বললেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলেছো। জান্নাতের নিয়ামত বা সুখ-সম্পদ কখনও ধ্বংস হবে না। একথা শুনে লাবীদ একটু রুষ্ট হয়ে বললো ঃ 'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা, তোমাদের মজলিসের এ অবস্থা তো পূর্বে কখনও ছিলনা।' এই উস্কানিমূলক উক্তিতে সমগ্র মজলিস ক্রোধে ফেটে পড়লো। ইত্যবসরে এক হতভাগা 'উসমানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মুখে সজোরে এক ঘুষি মেরে দেয়। ঘুষি খেয়ে তাঁর একটি চোখ রক্ত জমে কালো হয়ে যায়। লোকেরা বললো, 'উসমান, তুমি তো ওয়ালিদের আশ্রয়ে বেশ ভালোই ছিলে এবং তোমার চোখও এ কষ্ট থেকে নিরাপদে ছিল'। জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহর আশ্রয়ই সবচেয়ে বেশী নিরাপদ ও সম্মানজনক, আমার যে চোখটি এখনো ভালো আছে, সেটাও তার বন্ধুর কষ্টের ভাগী হওয়ার জন্য উদগ্রীব।' ওয়ালিদ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আবার আমার হিফাজতে আসতে চাও ?' তিনি বললেন, 'এখন আমার আল্লাহর হিফাজতই যথেষ্ট।' তাঁর এ সময়ের অনুভূতির চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর স্বরচিত একটি কাসীদায়। হযরত আলীও তাঁর একটি কবিতায় 'উসমানের এ ঘটনা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড)

এভাবে দীর্ঘদিন যাবত হযরত 'উসমান মক্কায় নানা রকম অত্যাচার ও উৎপীড়ন ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সকল সাহাবীকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিলেন। হযরত উসমান ইবন মাজউন তার দুই ভাই কুদামা ইবন মাজউন, আবদুল্লাহ ইবন মাজউন ও পুত্র সায়িব ইবন উসমানসহ পরিবারের অন্য সকলকে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। হযরত উসমান তাঁর খান্দানের একটি লোককেও মক্কায় রেখে যাননি। মদীনা পৌছে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালামা আজলানীর (রা) অতিথি হন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা পৌছে হযরত উসমান ও তাঁর ভাইদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি দান করেন এবং হযরত আবুল হাইসাম ইবন তাইহানের সাথে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করে দেন।

সত্য ও মিথ্যার প্রথম সংঘাত ঘটে বদর প্রান্তরে। তিনি শরিক ছিলেন এ যুদ্ধে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পরই তিনি রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর আনসারী ভাই এবং স্ত্রী পরিজনরা যথেষ্ট সেবা করেও

মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারলেন না। হিজরতের তিরিশ মাস পরে হযরত উসমান ইবনে মাজউন মদীনায় ইনতিকাল করেন।

হযরত উম্মুল আলা আল আনসারিয়্যা- যার বাড়ীতে হযরত উসমান ইনতিকাল করেন, বলেনঃ গোসল ও কাফন দেওয়ার পর জানাযা তৈরী হলে রাসুল (সা) তাশরীফ আনলেন। আমি বলতে লাগলাম, 'আবু সাইব, আল্লাহর রহমত তোমার উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করবেন।' রাসুল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিভাবে জানলে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন?' আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে যদি না হয় তাহলে আর কাকে সম্মানিত করবেন?' রাসুল (সা) বললেন, 'উসমান ছিল দৃঢ় ঈমানের অধিকারী। তার ভালো হবে এমনটিই আমি আশা করি। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসুল হয়েও জানিনে আমার কী পরিণাম হবে?'

হযরত উসমান ইবনে মাজউনের মৃত্যুতে রাসুল (সা) ভীষণ ব্যথিত হন। তিনি তিনবার ঝুঁকে পড়ে তার কপালে চুমু দেন। তখন রাসুলাল্লাহ (সা) চোখের পানিতে উসমানের গণ্ডদ্বয় সিক্ত হয়ে যায়। তারপ মাথা সোজা করে কান্নাভেজা কণ্ঠে তিনি বলেনঃ আবু সাইব, আমি তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! দুনিয়া থেকে তুমি এমনভাবে বিদায় নিলে যে, তার থেকে তুমি কিছু নিলে না এবং দুনিয়াও তোমার থেকে কিছুই নিতে পারেনি।'

হযরত উসমানের (রা) মৃত্যুর পরও রাসুল (সা) তাঁকে ভুলে যাননি। রাসুলাল্লাহর (সা) কন্যা হযরত রুকাইয়্যা মারা গেলে তিনি কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন, 'যাও আমাদের উত্তম অগ্রগামী উসমান ইবনে মাজউনের সাথে গিয়ে মিলিত হও।'

হযরত উসমান ইবনে মজউন যখন মারা যান তখন মদীনায় মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট কোন গোরস্থান ছিল না। উসমানের ওফাতের পর রাসুল (সা) মদীনার 'বাকী' নামক স্থানকে গোরস্থানের জন্য নির্বাচন করেন। রাসুল্লাল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই এখানে সমাহিত হন। রাসুল (সা) নিজেই জানাযার নামায পড়ান এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাফন কাজ তত্ত্বাবধান করেন। তারপর কবরের ওপর কোন একটি জিনিস চিহ্ন হিসেবে পুতে দিয়ে বলেন, 'এখন কেউ মারা গেলে এর আশে পাশেই দাফন কড়া হবে।'

হযরত উসমানের চারিত্রিক মান অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের ছিল। জাহিলী যুগেই তিনি ছিলেন শরাবের প্রতি বিতৃষ্ণ। লজ্জা ছিল তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর গভীর ঝোঁক ছিল। একবার ইচ্ছা করলেন প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ধ্বংস করে মরুচারী রাহিব বা সংসার-ত্যাগী হয়ে যাবেন। কিন্তু রাসুল (সা) জানতে পেয়ে তাঁকে এ উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখেন। তিনি বলেন, 'আমি কি তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নই? আমি আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হই, গোশত খাই, রোযা রাখি এবং ইফতারও করি। রোযাই হলো আমার উম্মাতের খাসি বা নিবীর্য হওয়া। সুতরাং সে খাসি করবে বা খাসি হবে সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

ইবাদাত বা শবগোজারী ছিল তাঁর প্রিয়তম কাজ। সারা রাত তিনি নামায আদায় করতেন। বছরের অধিকাংশ দিনে রোযা রাখতেন। বাড়ীর একটা ঘর ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। রাত দিনে সেখানে ইতিকাফ করতেন। একদিন রসুল (সা) এই ঘরের চৌকাঠ ধরে দুই অথবা তিনবার বলেছিলেন, 'উসমান, আল্লাহ্ আমাকে রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যের জন্য পাঠাননি। সহজ সরল দ্বীনে হানিফ সকল দ্বীন থেকে আল্লাহর প্রিয়তম।

ইবাদাতের প্রবল আগ্রহ স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি তাঁকে উদাসীন করে তোলে। একদিন তাঁর স্ত্রী নবী-গৃহে আসেন। নবীর (সা) সহধর্মিণী তার মলিন বেশ-ভূষা দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ

'তোমার এ অবস্থা কেন ? তোমার স্বামী তো কুরাইশদের মধ্যে একজন ধনী ব্যাক্তি।' জবাবে তিনি বললেনঃ তাঁর সাথে আমার কি সম্পর্ক। তিনি সারা রাত নামায পড়েন, দিনে রোযা রাখেন। 'উম্মুল মুমিনীনগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) গোচরে আনেন। রাসূল (সা) তখনই উসমান ইবন মাজউনের বাড়ীর দিকে ছুটে যান এবং তাকে ডেকে বলেন ঃ 'উসমান, আমার নিজের জীবন কি তোমার জন্য আদর্শ নয় ?' উসমান বললেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক'। রাসূল (সা) বললেন 'তুমি সারা রাত ইবাদাত কর, অধিকাংশ দিন রোযা রাখ।' বললেন হাঁ, এমনটিই করে থাকি। ইরশাদ হলো, এরূপ করবে না। তোমার ওপর তোমার চোখের, তোমার দেহের এবং তোমার পরিবার পরিজনের হক বা অধিকার আছে। নামায পড়, আরাম কর, রোযা ও রাখ এবং ইফতার কর।' এই হিদায়াতের পর তাঁর স্ত্রী একদিন নবী গৃহে আসলেন। তখন কিন্তু তাঁকে নব বধুর সাজে সজ্জিত দেখাচ্ছিল। তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল।

হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকালের পর হযরত 'উসমান ইবন মাজউনের স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতু হাকীম, হযরত আয়িশা ও হযরত সাওদার সাথে বিয়ের প্রস্তাবটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পেশ করেছিলেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় মূলতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'টি বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা—২/৬৫৩)

১৩

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা)

আবদুল্লাহ নাম, কুনিয়াত আবু আবদির রহমান। পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব, মাতা যয়নাব। সঠিক বর্ণনা মতে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। এই হিসাবে নবুওয়াতের দ্বিতীয় বছরে তার জন্ম। নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরে হযরত উমার যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন আবদুল্লাহর বয়স প্রায় পাঁচ।

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই আবদুল্লাহ নিজের বাড়ীটি ইসলামের আলোকে আলোকিত দেখতে পান। ইসলামী পরিবেশেই তিনি বেড়ে ওঠেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনা মতে, পিতার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সঠিক মত এই যে, পিতার ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি অল্প বয়স্ক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হিসাবে তিনিও পিতার ধর্মানুসারী হয়ে যান।

হযরত উমার (রা) কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পরিবার-পরিজনসহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। পিতার সাথে আবদুল্লাহও মদীনায় চলে যান। হিজরাতের পর সত্য-মিথ্যার প্রথম সংঘর্ষ হয় বদর প্রান্তরে। ইবন উমার তখন তের বছরের কিশোর। জিহাদে যোগদানের আবেদন জানালেন। জিহাদের বয়স না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। এক বছর পর আবার সামনে এলো উহুদের যুদ্ধ। এবারও তিনি নাম লেখালেন। একই কারণে এবারও রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি লাভে ব্যর্থ হলেন। এর দুই বছর পর হিঃ পঞ্চম সনে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবদুল্লাহর বয়স তখন পনেরো। এই প্রথম তিনি জিহাদে গমনের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুমতি লাভ করেন।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ঘটনাক্রমে পিতা হযরত উমারের (রা) পূর্বেই তিনি এ গৌরব লাভ করেন। এদিন হযরত 'উমার (রা) এক আনসারীর নিকট থেকে একটি ঘোড়া আনার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পথে বের হতেই শুনতে পেলেন রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে প্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। তারপর ঘোড়াসহ ফিরে এসে খবর দিলে হযরত উমার (রা) বাইয়াত করেন।

খাইবার অভিযানেও তিনি শরীক ছিলেন। এই সফরে রাসূল (সা) হালাল-হারামের যে বিধান ঘোষণা করেন, তিনি তার একজন বর্ণনাকারী। (বুখারী)

মক্কা বিজয়ের সময় ইবন উমার বিশ বছরের নওজোয়ান। এ অভিযানে তিনি অন্য মুজাহিদদের পাশাপাশি ছিলেন। তাঁর হাতিয়ার ছিল একটি দ্রুতগামী ঘোড়া ও একটি ভারি নিযা। গায়ে ছিল এক প্রস্থ চাদর। এ সময় একদিন তিনি নিজ হাতে ঘোড়ার ঘাস কাটছিলেন, এ অবস্থায় রাসূল (সা) তাঁকে দেখে বলে ওঠেন— 'আবদুল্লাহ,আবদুল্লাহ।' মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে পেছনে খানায়ে কাবায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সর্বপ্রথম উসামা বিন যায়িদ, উসমান বিন তালহা ও বিলাল ইবন রিবাহ প্রবেশ করেন। তারপর আমিই প্রথম কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান এবং তায়িফ অবরোধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য মুসলমানের সাথে ইবন উমারও রাসূলাহর (সা) বিদায় হজ্জে সংগী হয়ে এ হজ্জ আদায় করেন।

নবম হিজরীতে পরিচালিত হয় তাবুক অভিযান। তিরিশ হাজার মুজাহিদসহ রাসূল (সা) তাবুক যাত্রা করেন। ইবন উমারও ছিলেন এ বাহিনীর অন্যতম সদস্য। মোটকথা খন্দক থেকে শুরু করে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ও ঘটনায় তিনি শরীক ছিলেন।

প্রথম খলীফার সময়কালে ইবন উমারকে উল্লেখযোগ্য কোন কর্মকাণ্ডে জড়িত দেখা যায় না। অথবা জড়িত থাকলেও ইতিহাসে সে সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

তবে দ্বিতীয় খলীফার যুগে কোন কোন অভিযানে সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁর উপস্থিতি ইতিহাসে দেখা যায়। নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। সিরিয়া ও মিসর অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা ইতিহাসে জানা যায়। তবে এসব অভিযানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কোন অবদানের কথা জানা যায় না। এ সময় রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডেও তাঁকে অনুপস্থিত দেখা যায়। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, খলীফা উমার (রা) তাঁর নিকট আত্মীয়দের খিলাফতের বিশেষ কোন কাজে জড়িত হওয়া পছন্দ করতেন না। এতদসত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর লাভ-ক্ষতির কোন প্রশ্ন দেখা দিলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পিতার সকল কঠোরতা মাথা পেতে নিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, খলীফা উমার (রা) যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ইবন উমার তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) মুখে শুনতে পেলেন, উমার (রা) কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান না। ইবন উমার পিতার অবর্তমানে উম্মাতের ভবিষ্যত সমস্যার কথা চিন্তা করলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিতার সামনে উপস্থিত হয়ে সাহসের সাথে আরজ করলেন, "মানুষের নানা কথা আমার কানে আসছে, আপনাকে তা জানাতে এসেছি। তাদের ধারণা আপনি কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান না। তিনি আরো বলেন, ধরে নিন কোন রাখাল আপনার উট-বকরী চরায়। সে যদি উট-বকরীর পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে আপনার কাছে চলে আসে, তাহলে তার পরিণতি কেমন হয়? মানুষের রাখালী তো আরো কঠিন কাজ।' এ যুক্তিপূর্ণ কথা খলীফা উমারের মনোঃপুত হল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, আল্লাহ নিজেই তার পশু পালের তত্ত্বাবধায়ক। শেষ পর্যন্ত তিনি পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব একদল উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের ওপর ন্যস্ত করে যান।

পিতার ওফাতের পর সর্বপ্রথম ইবন উমারকে খলীফা নির্বাচনের মজলিসে দেখা যায়। হযরত উমার অসীয়াত করে যান যে, পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে আবদুল্লাহ শুধুমাত্র পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবে। তাকে খলীফা বানানো চলবে না।

খলীফা উসমানের যুগে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। তবে অবৈধ কোন ফায়দা লাভের চেষ্টা কখনো করেননি। খলীফা উসমান (রা) তাঁকে কাজীর পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, আমি দুই ব্যক্তির মাঝে না ফয়সালা করে থাকি, না দুই ব্যক্তির ইমামতি করে থাকি। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেন, 'কাজী তিন শ্রেণীর। এক, জাহিল। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। দুই, দুনিয়াদার আলিম। তারাও জাহান্নামী। তিন, যারা ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাদের জন্য নাশাস্তি না পুরস্কার।' খলীফা বললেন, 'তোমার পিতাও তো ফয়সালা করতেন।' বললেনঃ হাঁ, একথা সত্য। তবে কোন সমস্যায় পড়লে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যেতেন। রাসূলও (সা) যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারাগ হতেন তখন জিবরাঈলের শরণাপন্ন হতেন। কিন্তু আমি এখন কার কাছে যাব? আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে অব্যাহতি দিন। খলীফা তাকে অব্যাহিত দিয়েছিলেন। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, একথা তিনি অন্য কারো নিকট প্রকাশ করবেন না। কারণ, খলীফা জানতেন, লোকেরা যদি জানতে পারে ইবন উমার কাজীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাহলে এ পদের জন্য আর কোন সত্যনিষ্ঠ মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকলে ইবন উমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

খিলাফতের প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে দূরে থাকলেও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ থেকে কখনো দূরে থাকেননি। জিহাদের ডাক যখনই এসেছে, সাড়া দিয়েছেন। হিজরী ২৭ সনে আফ্রিকা (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো) অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ৩০ সনে সাঈদ ইবন আসের সাথে খুরাসান ও তিবরিস্তান অভিযানে শরীক হন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা ও ফিতনা-ফাসাদ শুরু হওয়ার পর সম্পূর্ণ নির্জনতা অবলম্বন করেন। খিলাফতের কোন কর্মকাণ্ডে আর অংশগ্রহণ করেননি। হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর লোকেরা তাঁকে খলীফার পদটি গ্রহণের অনুরোধ জানায়। তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। লোকেরা তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

আলী ও মুয়াবিয়া (রা)— এ দু'জনের মধ্যে কার খিলাফত তিনি মেনে নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন হাজার বলেন, 'ইবন উমার মনে করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোকের ব্যাপারে জনগণের ইজমা বা ঐক্যমত না হয় ততক্ষণ তার হাতে বাইয়াত করা উচিত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেননি। কিন্তু মুসতাদরিকের একটি বর্ণনামতে এই শর্তে আলীর (রা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন যে, তিনি আলীর সাথে গৃহযুদ্ধে জড়িত হবেন না। আলী তাঁর এই শর্ত অনুমোদনও করেছিলেন। তবে একথা সত্য যে, তিনি উট ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে কোনপক্ষেই যোগদান করেননি। তাঁর হাতে কোন মুসলমানের এক বিন্দু রক্তও ঝরেনি। তবে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলীর (রা) পক্ষে যোগদান না করায় একটা তীব্র অপরাধ বোধ করেছেন।

সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর আবু মুসা আশয়ারী ও 'আমর ইবনুল আস উভয়পক্ষের বিচারক নিযুক্ত হন। আবু মুসা তাঁর প্রতিপক্ষের নিকট খলীফা হিসাবে আবদুল্লাহ ইবন উমারের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিচারকদ্বয়ের সিদ্ধান্ত শোনার জন্য অন্যান্য মুসলমানের সাথে ইবন উমারও দু'মাতুল জান্দালে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হযরত আলীর শাহাদাতের পর তিনি আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফত মেনে নেন। তাঁর যুগের বিভিন্ন অভিযানে তিনি শরীক হন। কমস্টান্টিনোপল অভিযানে তিনি যোগদান করেছিলেন।

আমীর মুয়াবিয়ার (রা) পর ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক বিভেদজনিত ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ 'যদি তা ভালো হয়, আমরা খুশী থাকবো, আর যদি তা মন্দ হয়, আমরা ধৈর্য ধারণ করবো।' কিছুদিন পর মদীনাবাসীরা ইয়াযিদের প্রতি কৃত তাদের বাইয়াত প্রত্যাহার করলে তিনি তাঁর পরিবারের লোকদের ডেকে বলেন, আমি ইয়াযিদের হাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের বাইয়াত করেছি।....তোমাদের কেউ যেন এ বাইয়াত ভঙ্গ না করে। যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে তরবারিই আমার ও তার মধ্যে ফায়সালা করবে।' তার মতে এ বাইয়াত ফাসখ বা প্রত্যাহারের অর্থ হল এক ধরনের ধোঁকাবাজী। আর শরীয়াতে ধোঁকাবাজীর কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে। কোন লোভের বশবর্তী হয়ে তিনি ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত করেননি।

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া খলীফা হলেন। মাত্র তিন মাসের জন্য তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর একদিকে মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। ইরাক, হিজায ও ইয়ামনের জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত করে। অন্যদিকে মারওয়ান নিজেকে খলীফা দাবী করে সিরিয়াবাসীর বাইয়াত আদায় করেন। তৎকালীন ইসলামী খিলাফতের অধিকাংশ অঞ্চল যদিও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের সমর্থক ছিল, তবুও আবদুল্লাহ ইবন উমার তার দাবীর প্রতি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি। খিলাফতের দাবী নিয়ে যখন দুই বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে, তখন এক ব্যক্তি ইবন উমারকে বললো, আল্লাহ ফিতনা

প্রতিরোধের জন্য জিহাদ করতে বলেছেন। জবাবে তিনি বলেন, যখন ফিতনা ছিল, আমরা জিহাদ করেছি। কাফিররা মুসলমানদের আল্লাহর ইবাদাতের অনুমতি দিত না এই ছিল সে দিনের ফিতনা। আজকের এ গৃহযুদ্ধ জিহাদ নয়, বরং বাদশাহীর জন্য আত্মঘাতী লড়াই। তবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের ওপর আক্রমণ চালায় এবং কা'বার একাংশ ধ্বংস করে ফেলে তখন তিনি ভীষণ বিরক্তি ও নিন্দা প্রকাশ করেন।

আবদুল মালিকের হাতে যখন খিলাফতের বাইয়াত হলো, ইবন উমারও একটা লিখিত বাইয়াত পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর বাইয়াতের বিষয়বস্তু ছিল এমনঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমি ও আমার পুত্র আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের যথাসাধ্য আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি।' আবদুল মালিক ইবন উমারকে খুবই সম্মান করতেন এবং শরীয়াতের নির্দেশ পালনে তাঁকেই অনুসরণ করতেন। হজ্জের সময় আরকানে হজ্জ পালনের ব্যাপারে ইবন উমারকে অনুসরণের নির্দেশ জারি করতেন।

হিজরী ৭৪ সনে ৮৩ অথবা ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। হজ্জের সময় এক ব্যক্তির বিষাক্ত বর্শার ফলা তাঁর পায়ে বিঁধে যায়। এই বিষেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে এমনটি হয়নি, বরং এর পেছনে হাজ্জাজের ইঙ্গিত ছিল। কারণ, কা'বায় আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য ইবন উমার হাজ্জাজের ভীষণ তিরস্কার করেন। এতে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হন। অতঃপর তাঁরই ইঙ্গিতে একজন শামী সৈনিক তাঁকে এভাবে আহত করে। অবশ্য ইবন হাজার বলেছেন, আবদুল মালিক হাজ্জাজকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইবন উমারের সাথে সংঘাতে না যাওয়ার জন্য। হাজ্জাজের কাছে এ নির্দেশ ছিল অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি এই বিকল্প পথে ইবন উমারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেন।

ইবন সা'দ বর্ণনা করেন, একবার হাজ্জাজ খুতবার মধ্যে ইবন যুবাইরের প্রতি দোষারোপ করেন যে, তিনি কালামুল্লাহর বিকৃতি সাধন করেছেন। ইবন উমার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন, 'তুমি মিথ্যা বলেছো। ইবন যুবাইরের এমন ক্ষমতা নেই এবং এমন অভিযোগ উত্থাপনের তোমারও কোন সুযোগ নেই।' সাধারণ সমাবেশে এমন কঠোর প্রতিবাদ হাজ্জাজ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রকাশ্যে ইবন উমারের সাথে কোন রকম অসৌজন্যমূলক আচরণের সাহসও তাঁর ছিল না। তাই তিনি এমন গোপন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, একদিন হাজ্জাজ এত দীর্ঘ খুতবা দিলেন যে, আসর নামাযের সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। ইবন উমার বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন—'সূর্য তোমার প্রতীক্ষা করতে পারে না।' যাইহোক, বিভিন্ন কারণে স্বৈরাচারী হাজ্জাজ সত্যের সৈনিক ইবন উমারকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই এভাবে তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিষের ক্রিয়ায় ইবন উমার যখন শয্যাশায়ী, তখন হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে গেলেন। কুশল বিনিময়ের পর হাজ্জাজ বললেন, অপরাধীকে আমি চিনতে পেলে তার গর্দান নিতাম। ইবন উমার বললেন, সবকিছু তো তুমি করেছো। তারপর বলছো, অপরাধীকে পেলে হত্যা করতে। মুখের ওপর এমন অপ্রিয় সত্য কথা শোনার পর হাজ্জাজ চুপ হয়ে যান।

মদীনা মুনাওয়ারায় জীবনের শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমারের। তাঁর অবস্থা যখন অবনতির দিকে যেতে লাগলো, তিনি দুআ করতে লাগলেন; 'হে আল্লাহ, আমাকে মক্কায় মৃত্যুদান করো না।' পুত্র সালেমকে অসীয়াত করেন, 'মক্কায় আমার মৃত্যু হলে মক্কার হারামের বাইরে কোন এক স্থানে আমাকে দাফন করবে। যে যমীন থেকে আমি হিজরত করেছি, সেখানে সমাহিত হওয়া ভালো মনে হচ্ছে না।' অসীয়াতের অল্প কিছু দিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁর অসীয়াত অনুযায়ী হারামের বাইরে লাশ দাফন করতে চায়। কিন্তু হাজ্জাজ তাতে বাধা দেন। তিনি নিজেই জানাযার নামায পড়ান এবং 'ফাখ' নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন।

সফর ও ইকামাত বা বাড়ী এবং বাড়ীর বাইরে ভ্রমণে থাকা—সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য, হযরত ফারুকে আজমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, সর্বোপরি তাঁর নিজের অনুসন্দিৎসা তাঁকে ইসলামী জ্ঞানের সমুদ্রে পরিণত করেছিল। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। সেকালে মদীনার যে সকল মনিষীকে বলা হতো ইলম ও আমলের 'মাজমাউল বাহরাইন' বা দুই সমুদ্রের সঙ্গম স্থল, ইবন উমার ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর দারুণ আকর্ষণ ছিল। কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের ওপর গবেষণা করে জীবনের বিরাট এক অংশ ব্যয় করেন। কেবল সূরা বাকারার ওপর গবেষণায় চৌদ্দটি বছর অতিবাহিত হয়। এতে অনুমান করা যায় কুরআন বুঝার জন্য তিনি কী পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন। কুরআনের প্রতি এই ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণই তাঁর মধ্যে কুরআনের তাফসীর ও তাবীলের এক অনন্য যোগ্যতা সৃষ্টি করে। কুরআন বুঝার ক্ষমতা যৌবনের সূচনা লগ্নেই তাঁর মধ্যে জন্ম নেয়। এ কারণে বড় বড় সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে তাঁকে শরীক দেখা যায়।

কুরআনের পর হাদীসের স্থান। ইবন উমার ছিলেন প্রথম কাতারের হাফেজে হাদীস। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০ (এক হাজার ছ'শ' তিরিশ)। এর মধ্যে ১৭০টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৮১টি বুখারী ও ৩১টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথাও কাজ জানার প্রবল আকাংখা তাঁর মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য থেকে যে সময়টুকু তিনি দূরে থাকতেন তখন যাঁরা তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকতেন তাঁদের কাছ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সেই সময়ের কথা ও কাজ জেনে নিতেন এবং তা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন। তাঁর অজানা নতুন কোন কথা জানতে পেলে সংগে সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অথবা প্রথম রাবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তার সত্যতা যাচাই করে নিতেন। এই অনুসন্ধিৎসু মন ইবন উমারকে হাদীস শাস্ত্রের এক বিশাল সমুদ্রে পরিণত করে। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতিটি অক্ষর স্মরণ না থাকলে তিনি তা বর্ণনা করতেন না। তাঁর সমসাময়িক লোকেরা বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়া সম্পর্কে ইবন উমার অপেক্ষা অধিক সতর্ক ব্যক্তি সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ নেই।'

হযরত ইবন উমারের মাধ্যমে ইলমে হাদীসের বিস্তর অংশ প্রচারিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর ষাট (৬০) বছরের বেশী সময় জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি একাগ্রচিত্তে ইলমে দ্বীনের চর্চা করেছেন। ইবন শিহাব যুহরী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের কোন বিষয় ইবন উমারের অজানা ছিল না।' জ্ঞানের ঐ চর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কোন সরকারী দায়িত্ব তিনি তখনও গ্রহণ করেননি। তাঁর স্থায়ী 'হালকায়ে দরস' ছিল মদীনায়। হজ্জের মওসুমে তিনি ফাতওয়া দিতেন। মানুষের বাড়ীতে গিয়েও তিনি হাদীস শুনাতেন। বর্ণিত আছে, একদিন তিনি আবদুল্লাহ ইবন মুতী'র বাড়ীতে যান। আবদুল্লাহ তাঁকে বসতে দিলেন। বসার পর ইবন 'উমার বললেন, তোমাকে একটি হাদীস শোনানোর জন্য আমি এ সময় তোমার এখানে এসেছি। রাসূল (সা) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে দূরে থাকবে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে তাঁর কাছে কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করলো সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো।'

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী হওয়াকে ভীষণ ভয় পেতেন। এ কারণে খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম শা'বী বলেন, আমি এক বছর যাবত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের

কাছে বসেছি। এর মধ্যে কোন হাদীসই তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেননি। হাদীস বর্ণনা তিনি খারাপ মনে করতেন বা কম বর্ণনা করতেন এমন নয়, বরং বিনা প্রয়োজনে বর্ণনা করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) উচ্চারিত শব্দেই হাদীস বর্ণনা জরুরী বলে তিনি মনে করতেন। শব্দের হেরফের পছন্দ করতেন না।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের কারণে মুহাদ্দিসদের নিকট তাঁর বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য হয়। ইবন শিহাব যুহরী তো কোন বিষয়ে ইবন উমারের হাদীস পেলে আর কারো হাদীসের প্রয়োজন মনে করতেন না। হাদীস বর্ণনার সনদের ক্ষেত্রে 'মালিক 'আন নাফে' 'আন ইবন 'উমার'—এই সনদটিকে মুহাদ্দিসরা 'সিলসিলাতুজ জাহাব' বা সোনালী চেইন নামে অভিহিত করে থাকেন। কারণ, ইবন 'উমার প্রায় পনেরটি বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবতে কাটিয়েছেন। আবু বকর ও উমারের পুরো সময়টা প্রত্যক্ষ করেছেন। উমারের সাহচর্যে প্রায় তিরিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এই সনদের দ্বিতীয় ব্যক্তি 'নাফে' ইবন উমারের গোলাম। প্রায় তিরিশটি বছর তিনি মনিবের খিদমতে কাটিয়েছেন। সনদের তৃতীয় ব্যক্তি ইমাম মালিক। তিনি তাঁর উস্তাদ নাফে'র হালকায়ে দরসে দশ বারো বছর বসার সুযোগ লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়াও ইবন উমার, আবু বকর, 'উমার', উসমান, আলী, যায়িদ বিন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, বিলাল, সুহাইব, রাফে, আয়িশা ও হাফসার (রা) মত শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের জীবনটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। হযরত আবু হুজায়ফা বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর প্রতিটি মানুষের কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়, কিন্তু 'উমার ও তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইবন উমারের একান্ত খাদেম নাফে' তাঁর তাবেঈ ছাত্রদের বলতেন, এ যুগে যদি ইবন উমার বেঁচে থাকতেন, তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর কঠোরতা দেখে তোমরা বলতে, লোকটি পাগল' তিনি প্রায় পঁচাশি বছর জীবিত ছিলেন এবং শৈশবেই রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি বলেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের পর থেকে আমার আজকের এ দিনটি পর্যন্ত তা ভঙ্গ করিনি বা তাতে কোন পরিবর্তন করিনি।' শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, রাসূলুল্লাহর (সা) মানবসুলভ কাজ ও অভ্যাসসহ প্রতিটি আচরণের তিনি অনুসরণ করতেন। যেমন, হজ্জের সফরে রাসূল (সা) যেখানে যেখানে রাত্রি যাপন করতেন, পরবর্তীকালে তিনিও একই স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। রাসূল (সা) যে সকল স্থানে নামায আদায় করতেন, তিনি সেখানে নামায আদায় করতেন। যে রাস্তা দিয়ে রাসূল (সা) চলতেন তিনিও সেই রাস্তা দিয়ে চলতেন। এমন কি যে সকল স্থানে রাসূল (সা) অজু-গোসল করেছেন তিনিও সেখানে একই কর্ম সম্পাদন করতেন। মোটকথা, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি পদক্ষেপ তিনি হুবহু অনুসরণ করতেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজকে লোকেরা মনে করতো প্রকৃতপক্ষে তা রাসলুল্লাহর (সা) কথা ও কাজ। যেহেতু লোকে তাঁকে অনুসরণ করতো, তাই ব্যক্তিগত কারণে কোন ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে না পারলে স্পষ্ট করে বলে দিতেন, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) কাজ বা আমল নয়। বিশেষ ওজর বশতঃ আমি এমন করেছি। তাতে মানুষের বিভ্রান্তি দূর হয়ে যেত। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর ইত্তেবায়ে সুন্নাত সম্পর্কে বলেছেনঃ 'ইবন 'উমারের মত আর কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) পদাংক অনুসরণ করেন না।'

তাফাক্কুহ্ ফিদ-দ্বীন বা দ্বীন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সারাটি জীবন তাঁর জ্ঞানচর্চা ও ফাতওয়া দিয়েই কাটে। মদীনার প্রখ্যাত মুফতী সাহাবীদের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশেষজ্ঞরাও তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান চাইতেন। সাঈদ ইবন জুবাইরের মত শ্রেষ্ঠ তাবেঈও তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান

নিতেন। পরবর্তীকালে মালেকী মাজহাব মূলতঃ ইবন উমারের এসব ফাতওয়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ইমাম মালিক বলতেন, ইবন উমার দ্বীনের অন্যতম ইমাম। তাঁর ফাতওয়া সংগৃহীত হলে তা বৃহদাকার গ্রন্থে পরিণত হত। ফাতওয়া দেওয়ার ব্যাপারে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাফেজ ইবন আবদিল বার বলেনঃ 'ইবন 'উমার তাঁর ফাতওয়া ও 'আমল— উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। খুব ভাবনা-চিন্তা করে যেমন কথা বলতেন তেমনি কাজও করতেন ভেবে-চিন্তে।

দ্বীনী ইলম ছাড়া তৎকালীন আরবের প্রচলিত জ্ঞান যেমনঃ কবিতা, কুষ্ঠিবিদ্যা, বাগ্মীতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইবন উমারের বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে দ্বীনী ইলম ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের চর্চায় সময় ব্যয় সমীচীন মনে করতেন না।

একথা সত্য যে, সকল সাহাবীর ওপর সার্বিকভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছিল, তবে ইবন উমারের ওপর পড়েছিল একটু গভীরভাবে। তাঁর প্রতিটি কথা ও আচরণে রাসূলুল্লাহর (সা) স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতো।

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে সাহাবীদের প্রশংসায় বলেছেন, 'ইজা জুকেরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম—তাদের কাছে যখন আল্লাহর কথা বলা হয় তখন তাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে। ইবন উমারের মধ্যে এ অবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। একবার তাঁর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হলো—ফাকায়ফা ইজা জি'না মিন কুল্লি উম্মাতিন শাহীদা—তখন কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে সাক্ষী উপস্থিত করবো। ইবন উমার এ আয়াতটি শুনে এত কাঁদলেন যে চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল এবং তাঁর আশেপাশে লোকেরাও তাতে প্রভাবিত হলো।

ইবন উমার ছিলেন একজন বড় ধরনের আবেদ ও শবগুজার ব্যক্তি। রাতের সিংহভাগ ইবাদাতে অতিবাহিত করতেন। তাঁর খাদেম নাফে' বলেন, তিনি সারা রাত নামায আদায় করতেন। সুবহে সাদিকের সময় আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, সকাল কি হলো? আমি যদি হাঁ বলতাম, তাহলে আর একটু ফর্সা হওয়া পর্যন্ত ইসতিগফারে কাটাতেন। আর 'না' বললে আবার নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। কুরআন তিলাওয়াতে তিনি এক অপার্থিব স্বাদ অনুভব করতেন। এক রাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। প্রতি বছর হজ্জ আদায় করতেন। ছোট ছোট ইবাদাতও তিনি ছাড়তেন না। প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন ভাবে অজু করতেন। মসজিদে যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে পা ফেলতেন যাতে কদম সংখ্যা বেড়ে যায় এবং সওয়াবও বেশী অর্জিত হয়।

ইবন উমার ছিলেন যুহদ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অতুলনীয় যাহিদ ও মুত্তাকী। হযরত জাবির (রা) বলতেন, আমাদের মধ্যে ইবন উমার ছাড়া এমন আর কেউ ছিল না যাকে দুনিয়ার চাকচিক্য আকৃষ্ট করেনি। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে তাকওয়ার ভাবটি গালিব ছিল। রাসূল (সা) তাঁর এই তাকওয়া স্বভাব দেখে বলেছিলেন, 'রাজুলুস সালেহ—নেককার বান্দা।'

তিনি ছিলেন খুবই দানশীল। সবসময় প্রিয়তম জিনিসটি আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। যে দাস বা দাসীটি তাঁর কাছে ভালো বলে মনে হতো, তাকে আযাদ করে দিতেন। এক বৈঠকে তিনি হাজার হাজার দিরহাম বিলিয়ে দিতেন। তিনি এত বেশী দাস-দাসী আযাদ করতেন যে, তাঁর আযাদকৃত দাস-দাসীর সংখ্যা-এক হাজারের উর্ধ্বে। একবার খুব সুন্দর একটি উট খরীদ করে তার ওপর সোয়ার হয়ে হজ্জে রওয়ানা হলেন। উটটির চলন তাঁর খুবই ভালো লাগলো। হঠাৎ তিনি নেমে পড়লেন এবং তার পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে ফেলে তাকে কুরবানীর পশুর সাথে মিলিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আইউব ইবন ওয়ায়িল আর-রাসিবী বলেন, একদিন ইবন উমারের হাতে চার হাজার দিরহাম ও একটি মখমলের চাদর এলো। পরদিন তিনি ইবন উমারকে দেখলেন বাজার থেকে তাঁর সোয়ারী পশুর জন্য বাকীতে খাদ্য কিনছেন, ইবন ওয়ায়িল তখনই ইবন উমারের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর

পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, গতকালই কি ইবন উমারের হাতে চারহাজার দিরহাম ও একটি মখমলের চাদর আসেনি? তারা বললো, 'হাঁ'। ইবন ওয়ায়িল বললেন, আজ আমি তাঁকে বাজার থেকে বাকীতে পশু খাদ্য কিনতে দেখলাম। তারা বললো, সেগুলিতো তিনি রাত পোহানোর আগেই বিলিয়ে দিয়েছেন। তারপর সেই চাদরটি কাঁধে করে বাইরে গেলেন, যখন বাড়ী ফিরলেন, দেখলাম সেটিও নেই। জিজ্ঞেস করলে বললেন, ফকীরকে দান করেছি। একথা শুনে ইবন ওয়ায়িল হাতে তালি দিতে দিতে বাজারের দিকে ছুটলেন এবং একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সম্বোধন করলেনঃ ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! তোমরা দুনিয়া দিয়ে কী করবে? এই যে ইবন 'উমার, তাঁর হাতে চার হাজার দিরহাম আসলো, আর তিনি সেগুলি বিলিয়ে দিলেন। তারপর সকাল বেলায় ধারে পশু খাদ্য কিনলেন।'

এভাবে তিনি ছিলেন—'লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বূন'—তোমরা কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় জিনিস ব্যয় করবে—এ আয়াতের বাস্তব তাফসীর। 'প্রতিবেলা দু'একজন গরীব-মিসকীন সংগে না নিয়ে তিনি আহার করতেন না। প্রায়ই তিনি তাঁর ছেলেদের তিরস্কার করতেন যখন তারা খাবারের জন্য ধনীদের আমন্ত্রণ জানাতো এবং তাদের সাথে ফকীর-মিসকীনকে ডাকতো না। তিনি বলতেন, 'তোমরা ভরাপেট লোকদের ডেকে আন এবং ক্ষুধার্তদের ছেড়ে আস।'

তিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। কৃষিযোগ্য ভূমিও ছিল। বাইতুল মাল থেকে ভাতাও পেতেন। তবে নিজে খুব অল্পই ভোগ করতেন। সব বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর এক বন্ধু তাঁকে একটি ভরা পাত্র উপহার দিল। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? বন্ধুটি বললেন, একটা ওষুধ। ইরাক থেকে আমি আপনার জন্য এনেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এর গুণাগুণ কি? বন্ধুটি বললেন, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে। ইবন উমার হেসে ওঠে বলেন, 'হজম শক্তি বৃদ্ধি করে! অথচ আজ চল্লিশ বছর যাবত আমি পেট ভরে আহারই করিনে।' তিনি কি কৃপণ বা অভাবী ছিলেন? না, ইতিহাস তা বলে না। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পিতা উমার ইবনুল খাত্তারের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্যই এমনটি করেছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। প্রিয় নবীব ইনতিকালে তাঁর অন্তরটি ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর তিনি কোন বাড়ী বা উদ্যান তৈরী করেননি। রাসূলুল্লাহর (সা) কথা স্মরণ হলেই ডুকরে কেঁদে উঠতেন। সফর থেকে যখনই মদীনায় ফিরতেন 'রওজা পাকে' গিয়ে সালাম পেশ করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসার কারণে তাঁর পরিবার-পরিজনদেরও গভীর ভাবে ভালো বাসতেন। একবার এক ইরাকী বেদুঈন তাঁর কাছে মশা হত্যার কাফ্ফারা জিজ্ঞেস করে। তিনি সাথীদের বললেন, এই লোকটিকে দেখে নাও। সে মশার রক্তের কাফ্ফারা জিজ্ঞেস করছে, অথচ তারাই প্রিয় নবীর কলিজার টুকরো হুসাইনকে শহীদ করেছে। রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসার কারণে মদীনা শহরকেও তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। শত দুঃখ-কষ্টেও মদীনা ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা কখনও করেননি।

হযরত ইবন উমার (রা) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কাজ থেকে সব সময় বিরত থাকতেন। তিনি ছিলেন সত্য ভাষী। তবে মাঝে মাঝে মুসলিম উম্মাহ্র ক্ষতির সম্ভাবনা দেখলে চুপ থাকতেন। একবার হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) দাবী করলেন খিলাফত লাভের অধিকার আমার থেকে বেশী আর কার আছে? ইবন উমার একথার জবাব দিতে গিয়েও ফিতনা-ফাসাদের ভয়ে দেননি। তিনি চুপ থাকেন। এমনি ভাবে মিনায় খলীফা উসমানের পেছনে চার রাকায়াত নামায আদায় করেন। অথচ তিনি মনে করতেন রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর ও উমারের সুন্নাত অনুযায়ী সেখানে কসর হওয়া উচিত। আবার একাকী পড়লে দু'রাকায়াতই পড়লেন।

বিভেদ সৃষ্টিব আশংকায় উসমানের পেছনে চার রাকায়াত পড়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'বিভেদ সৃষ্টি করা খারাপ কাজ।' তিনি আরো বলতেন, সমগ্র উম্মাতে মুহাম্মদী যদি আমাকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং মাত্র দু'ব্যক্তি মানতে অস্বীকার করে তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো না।

বিভেদ সৃষ্টির ভয়েই তিনি সকল খলীফার হাতে বাইয়াত করেছিলেন। সেই ফিতনা-ফাসাদের যুগে তিনি সব আমীরের পেছনে নামায আদায় করতেন এবং তাদের হাতে যাকাত তুলে দিতেন। তবে এ আনুগত্য দ্বীনের সীমার মধ্যে সীমিত থাকতো। এ কারণে প্রথমে হাজ্জাজের পেছনে নামায আদায় করলেও পরে হাজ্জাজ নামাযে বিলম্ব করতে শুরু করলে তিনি তার পেছনে নামায আদায় ছেড়ে দেন। এমন কি মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান।

সত্য কথা বলতে ইবন 'উমার কখনও ভয় পেতেন না। উমাইয়্যা বংশীয় শাসকদের সামনাসামনি সমালোচনা করতেন। একবার হাজ্জাজ খুতবা দিচ্ছিলেন। ইবন উমার তাঁকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'এই লোকটি আল্লাহর দুশমন। সে মক্কার হারামের অবমাননা করেছে, বাইতুল্লাহ ধ্বংস করেছে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের হত্যা করেছে।'

আরেকবার হাজ্জাজ খুতবা এত দীর্ঘ করলেন যে, আসর নামাযে দেরী হয়ে গেল। ইবন উমার চেঁচিয়ে বললেন, নামাযের সময় চলে যাচ্ছে, কথা শেষ কর। এভাবে তিনবার 'উমার উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি উঠে গেলে, তোমরা কি আমার সাথে যাবে? লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ'। ইবন 'উমার উঠে গেলেন। হাজ্জাজ তড়িঘড়ি মিম্বর থেকে নেমে নামায পড়ালেন। পরে হাজ্জাজ ইবন উমারকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমনটি করলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমরা মসজিদে আসি নামাযের জন্য। নামাযের সময় হয়ে গেলে সাথে সাথে পড়িয়ে দেওয়া উচিত। তারপর যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি বকবক করতে পার। তাঁর এই স্পষ্টবাদিতার কারণেই বনী উমাইয়্যার স্বৈরাচারী শাসকরা তাঁকে ভীষণ ভয় পেত।

কোন মানুষের অসম্মান এবং অহেতুক সম্মান হয়, ইসলাম এমন সব কাজ ও বৈশিষ্ট্যকে খতম করে দিয়েছে। ইবন 'উমার ছিলেন এই ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত। এই সাম্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে এমন সব আচরণ তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। এ কারণে যেখানে লোকেরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াতো সেখানে তিনি বসতেন না। তিনি তাঁর চাকর-বাকর ও দাস-দাসীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে এই সাম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাদের আত্মসম্মান বোধ শিক্ষা-দিতেন। নিজের সাথে বসিয়ে তাদের আহার করাতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দাস-দাসীদের আহার ও পোষাকের প্রতি যত্ন না নেওয়া বড় ধরনের পাপ। সালেম বলেন, ইবন উমার জীবনে একবার ছাড়া আর কখনও কোন দাস-দাসীকে বকাঝকা করেননি। একবার তিনি একটি দাসকে কোন কারণে মেরে বসেন। মারার পর এত অনুতপ্ত হন যে, তাকে আযাদ করে দেন।

বিনয় ও নম্রতা তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজের প্রশংসা শুনতে তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। এক ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করছিল। তিনি তাঁর মুখে মাটি ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীস—প্রশংসাকারীর মুখে মাটি ছুঁড়ে মারো—' শুনিয়ে দিলেন। কোন বাছ-বিচার না করে ছোট বড় সকলকে সালাম করতেন। পথ চলতে কোন ব্যক্তিকে সালাম করতে ভুলে গেলে ফিরে এসে তাকে সালাম করে যেতেন। অত্যন্ত কটু কথা শুনেও হজম করে যেতেন, কোন জবাব দিতেন না। এক ব্যক্তি কটু ভাষায় তাকে গালি দিল। জবাবে তিনি শুধু বললেন, আমি ও আমার ভাই অত্যন্ত উঁচু বংশের। এতটুকু বলে চুপ থাকলেন।

ইবন উমারের জীবনীতে আমরা দেখতে পাই, তাঁর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল ছিল। হাজার হাজার দিরহাম একই বৈঠকে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু তার নিজের ঘরের আসবাবপত্রের মোট মূল্য এক শো দিরহামের বেশী ছিল না। মায়মূন ইবন মাহরান বলছেন, 'আমি

ইবন উমারের ঘরে প্রবেশ করে লেপ, তোষক, বিছানাপত্র ইত্যাদির দাম হিসাব করলাম। সব মিলিয়ে একশো দিরহামের বেশী হলো না।' তিনি এমনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। নিজেরকাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। নিজের কাজে অন্য কারো সাহায্য গ্রহণ তাঁর মনোপূতঃ ছিল না।

হযরত উমারের যুগে যখন সকল সাহাবীর ভাতা নির্ধারিত হয়, তখন ইবন উমারের ভাতা নির্ধারিত হয় আড়াই হাজার দিরহাম। পক্ষান্তরে উসামা ইবন যায়িদের ভাতা নির্ধারিত হয় তিন হাজার দিরহাম। ইবন উমার পিতা উমারের (রা) নিকট এ বৈষম্যের প্রতিবাদ করে বলেন, কোন ক্ষেত্রেই যখন আমি তাঁর থেকে এবং আপনি তাঁর পিতা থেকে পেছনে নেই, তখন এই বৈষম্যের কারণ কি ? উমার (রা) বলেন, সত্যই বলেছো। তবে রাসূল (সা) তাঁর পিতাকে তোমার পিতা থেকে এবং তাঁকে তোমার থেকে বেশী ভালোবাসতেন। জবাব শুনে ইবন উমার (রা) চুপ হয়ে যান।

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে লিখে প্রকাশ করা যাবে না। জনৈক তাবেঈ তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি যদি কোন ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দিতাম যে সে জান্নাতের অধিবাসী, তাহলে অবশ্যই ইবন উমারের জন্য দিতাম।'

আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)

নাম আবদুল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ কুনিয়াত। পিতা জাহাশ, মাতা উমায়মা। বিভিন্ন দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। মা উমায়মা বিনতু আবদিল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। বোন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশ রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী। তাই একাধারে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই ও শ্যালক।

তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে ইতিহাসে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছরের কিছু বেশি। এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) নবুয়াত লাভের চব্বিশ/পঁচিশ বছর পূর্বে তিনি মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে তিনি হারব ইবন উমাইয়্যার হালীফ (মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ) ছিলেন। তবে কেউ কেউ বনু আবদি শামসকে তাঁর হালীফ বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ দু'টি বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, হারব ইবন উমাইয়্যা ছিল বনু আবদি শামসেরই একজন সদস্য।

হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন 'সাবেকীন ইলাল ইসলাম' বা প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (সা) দারুল আরকামে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের যুলুম-অত্যাচারের হাত থেকে তিনি ও তাঁর গোত্র রেহাই পাননি। এই কারণে দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। শেষের হিজরাতে তাঁর পরিবারের সকল সদস্য অর্থাৎ দুই ভাই আবু আহ্‌মদ ও উবায়দুল্লাহ, তিন বোন যয়নাব, উম্মু হাবীবা, হামনা এবং উবায়দুল্লাহর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফইয়ান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁর ভাই উবায়দুল্লাহ হাবশায় পৌঁছে ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) অবস্থায় সেখানে মারা যায়।

ইসলাম ত্যাগ করায় তার স্ত্রী উম্মু হাবীবা তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যান এবং পরবর্তীকালে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। (আল ইসাবা ২/২৭২) হাবশায় কিছুকাল অবস্থানের পর হযরত আবদুল্লাহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় ফিরে এসে দেখেন তাঁর গোত্র বনু গানাম-এর সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁদের সকলকে সঙ্গে করে মদীনায় হিজরাত করেন। তাঁদের পূর্বে কেবল হযরত আবু সালামা মদীনায় হিজরাত করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাঁর গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি গোত্রের অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে করে মদীনায় পৌঁছেন। বনু গানামের একটি লোককেও তিনি মক্কায় ছেড়ে যাননি।

তাঁরা মক্কা থেকে যাত্রা করার কিছুক্ষণ পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যথা ঃ উতবা, আবু জাহল প্রমুখ ঘর থেকে বের হয়ে বনু গানামের মহল্লার দিকে যায়। তাদের উদ্দেশ্য, গানাম গোত্রের কে কে গেল, আর কে কে থাকলো এটাই দেখা। তারা দেখলো, গোটা মহল্লা জন-মানবহীন। কোন বাড়ীর দরজা খোলা, আবার কোনটা তালাবদ্ধ। এ অবস্থা দেখে উতবা মন্তব্য করলো 'বনু জাহাশের বাড়ীগুলি তো খা খা করছে, তাদের অধিবাসীদের জন্য মাতম করছে।' একথা শুনে আবু জাহল বলে উঠলো ঃ 'কেন, তারা কে যে, তাদের জন্য বাড়ীগুলি মাতম করবে?' তারপর আবু জাহল আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের ঘরে হাত লাগালো। জিনিসপত্র ইচ্ছে মত লুটপাট করলো। গোটা মহল্লার মধ্যে আবদুল্লাহর ঘরটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাচুর্যময়। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর নিকট তাঁর বাড়ীতে আবু জাহলের লুটপাটের কথা উল্লেখ করলে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আবদুল্লাহ, তুমি কি খুশী নও

যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতে তোমাকে একটি বাড়ী দান করবেন।' জবাবে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি তাই লাভ করবে।' আবদুল্লাহ খুশী হলেন।

মদীনা পৌঁছার পর আবদুল্লাহর গোটা খান্দানকে হযরত আসিম ইবন সাবিত আল-আনসারী আশ্রয় দান করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দু'জনের মধ্যে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রজব মাসে রাসূল (সা) আটজন সাহাবীর একটি দলকে নির্বাচন করলেন। এই আট জনের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাসও ছিলেন। রাসূল (সা) সকলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যে সর্বাধিক সহনশীল তাঁকেই তোমাদের আমীর বানাবো। অতঃপর আবদুল্লাহকে তিনি আমীর মনোনীত করলেন। এভাবে তিনি মুমিনদের একটি দলের প্রথম আমীর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসূল (সা) তাঁকে যাত্রাপথ নির্দেশ করে তাঁর হাতে একটি সীল মোহর অঙ্কিত চিঠি দিয়ে বললেন, 'দুই দিনের আগে এই চিঠিটি খুলবে না। দুইদিন পথ চলার পর খুলে পড়বে এবং এই চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।'

হযরত আবদুল্লাহ তাঁর সাথীদের নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। দুইদিন পথ চলার পর নির্দেশ মত চিঠিটি খুলে পড়লেন। চিঠিতে নির্দেশ ছিল, মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে কুরাইশদের গতিবিধি ও অন্যান্য অবস্থা অবগত হবে। তিনি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এ হুকুম মাথা পেতে নিলেন। সঙ্গীদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'বন্ধুগণ, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) এ আদেশ কার্যকরী করে ছাড়বো। তোমাদের মধ্যে যে শাহাদাতের অভিলাষী সে আমার সাথে যেতে পার, এবং যে তা পছন্দ না কর ফিরে যেতে পার। আমি কাউকে বাধ্য করবো না।' এ ভাষণ শুনে সকলে তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নাখলা পৌঁছে তাঁরা কুরাইশদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন। একদিন কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফিলা এই পথ দিয়ে অতিক্রম করছিল। এই কাফিলায় ছিল চার ব্যক্তি। 'আমর ইবনুল হাদরামী, হাকাম ইবন কায়সান, উসমান ইবন আবদিল্লাহ এবং উসমানের ভাই মুগীরা। তাদের সাথে ছিল চামড়া, কিসমিস ইত্যাদি পণ্য সামগ্রী।

কাফিলাটি আক্রমণ করা না করা বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তাঁর সঙ্গীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সেই দিনটি ছিল হারাম মাসসমূহের সর্বশেষ দিন। উল্লেখ্য যে, জুল কা'দা, জুল হিজ্জা, মুহাররম ও রজব —এ চারটি মাস হচ্ছে হারাম মাস। প্রাচীন কাল থেকে আরবরা এ মাসগুলিতে যুদ্ধবিগ্রহ ও খুন-খারাবী নিষিদ্ধ বলে মনে করতো। তাঁরা ভেবে দেখলেন, একদিকে আজ কাফিলাটি আক্রমণ করলে হারাম মাসে তা করা হবে। অন্যদিকে আজ আক্রমণ না করে আগামীকাল করলে কাফিলাটি মক্কার হারামের আওতায় পৌঁছে যাবে। মক্কার হারাম সকলের জন্য নিরাপদ স্থান। সেখানে তাদের আক্রমণ করলে হারাম কাজ করা হবে। পরামর্শের পর তারা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে কাফিলার নেতা 'আমর ইবনুল হাদরামীকে হত্যা, উসমান ইবন আবদিল্লাহ ও হাকাম ইবন কায়সানকে বন্দী করেন এবং অন্যজন পালিয়ে যায়। তাঁরা প্রচুর পণ্যসামগ্রী গনীমাত হিসাবে লাভ করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ অর্জিত গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য রেখে দিয়ে অবশিষ্ট চার ভাগ তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। তখনও গনীমাত বন্টনের কোন নিয়ম-নীতি নির্ধারণ হয়নি। তবে আবদুল্লাহর এই ইজতিহাদ সঠিক হয়েছিল। পরে তাঁর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কুরআনে 'খুমুস' (পঞ্চমাংশ)-এর আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ গনীমাতের এক পঞ্চমাংশ নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। রাসূল (সা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে 'হারাম' বা নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাতের নির্দেশ দিইনি।

আবদুল্লাহর এই দুঃসাহস ও বাড়াবাড়ির জন্য অন্য মুসলিমরাও তাঁর নিন্দা করলেন। কুরাইশরাও এই ঘটনাকে খুব ফলাও করে প্রচার করতে লাগলো। তারা বলে বেড়াতে লাগলো, মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীরা হারাম মাসগুলিকে হালাল বানিয়ে নিয়েছে। হত্যা ও রক্ত ঝরিয়ে তারা এই মাসগুলির অবমাননা করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ও তাঁর সাথীরা ভীষণ বিপদে পড়লেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অবাধ্যতা হয়েছে এই ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন ঃ

'হারাম (নিষিদ্ধ) মাস সম্পর্কে তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে মাসে যুদ্ধ করা কি জায়েয ? আপনি বলে দিন, এই মাসে যুদ্ধ করা বড় ধরনের অপরাধ। আর আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া, তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদে হারাম (কা'বা) থেকে বিরত রাখা এবং তার অধিবাসীদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা আল্লাহর কাছে তার থেকেও বড় অপরাধ। আর ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও খারাপ কাজ।' (আল বাকারাহ-২১৭)

কুরআনের এ আয়াত নাযিলের পর তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মুসলমানরা দলে দলে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন এবং তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাসূল (সা) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের নিকট থেকে গনীমাতের অংশ গ্রহণ করলেন এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দী দু'জনকে মুক্তি দিলেন।

প্রকৃতপক্ষে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও তাঁর সঙ্গীদের এ ঘটনাটি ছিল মুসলমানদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁদের এ গনীমাত ইসলামের প্রথম গনীমাত, তাঁদের হাতে নিহত ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে নিহত প্রথম মুশরিক বা অংশীবাদী, তাঁদের হাতে বন্দীদ্বয় মুসলমানদের হাতে প্রথম বন্দী—তাঁদেরকে দেওয়া পতাকা রাসূলুল্লাহর (সা) তুলে দেওয়া প্রথম পতাকা এবং এই দলটির আমীর আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ প্রথম আমীর যাঁকে আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশই প্রথম ব্যক্তি যিনি গনীমাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম খুমুসের প্রবর্তন করেন এবং আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করে তা সমর্থন করেন। (আল-ইসতিয়াব)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস বর্ণনা করছেন, উহুদ যুদ্ধের একদিন আগে আমি ও আবদুল্লাহ দুআ করলাম। আমার ভাষা ছিল, 'হে আল্লাহ, আগামীকাল যে দুশমন আমার সাথে লড়বে সে যেন অত্যন্ত সাহসী ও রাগী হয়। যাতে তোমার রাস্তায় আমি তাঁকে হত্যা করে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিতে পারি।' আমার এ দুআ শুনে আবদুল্লাহ 'আমীন' বলে উঠে। তারপর সে হাত উঠিয়ে দুআ করে ঃ হে আল্লাহ, আমাকে এমন প্রতিদ্বন্দ্বী দান কর যে হবে ভীষণ সাহসী ও দ্রুত উত্তেজিত। আমি তোমার রাস্তায় তার সাথে যুদ্ধ করবো। সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক কান কেটে ফেলবে। যখন আমি তোমার সাথে মিলিত হব এবং তুমি জিজ্ঞেস করবে, 'আবদুল্লাহ, তোমার নাক-কান কিভাবে কাটা গেল ?' তখন, আমি বলবো, তোমার ও তোমার রাসূলের জন্য।' তিনি যেন দৈব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিলেন, তাঁর এ বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। তাই বার বার কসম খেয়ে বলছিলেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমার নামে কসম খেয়ে বলছি, আমি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবো এবং সে আমাকে হত্যা করে আমার নাক-কান কেটে আমাকে বিকৃত করবে।' (উসুদুল গাবা)।

হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে উহুদ প্রান্তরে তুমুল লড়াই শুরু হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ এমন তীব্র আক্রমণ চালালেন যে তাঁর তরবারিটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খেজুর শাখার একটি ছড়ি দান করলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি তা দিয়ে লড়তে থাকেন। এ অবস্থায় আবুল হাকাম ইবন আখনাস সাকাফীর একটি প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ

হয়ে যায়। মুশরিকরা তাঁর দেহের বিকৃতি সাধন করে। নাক-কান কেটে সুতায় মালা গাঁথে। হযরত সা'দ এ দৃশ্য দেখে বলে ওঠেনঃ 'আল্লাহর কসম, আবদুল্লাহর দুআ আমার দুআ অপেক্ষা উত্তম ছিল।'

চল্লিশ বছরের কিছু বেশী সময় তিনি জীবন লাভ করেছিলেন। তাঁর মামা সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযার সাথে একই কবরে তাঁকে দাফন করা হয়।

নাখলা অভিযানে আবদুল্লাহকে আমীর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় রাসূল (সা) তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেনঃ 'যদিও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয় তবে সে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সবচেয়ে বেশী সহ্য করতে পারে।' আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসা তাঁকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে উদাসীন করে তোলে। প্রিয় জীবনটি আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা। তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়েছিল। 'আল-মুজাদ্দা' ফিল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তায় কানকাটা) এ সম্মানজনক উপাধি তিনি লাভ করেছিলেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু বকর, 'উমার ও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

(আল-ইসাবা-২/২৮৭)

আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনিল 'আস (রা)

নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ, আবু আবদির রহমান ও আবু নুসাইর। তবে প্রথমোক্ত কুনিয়াত দু'টি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পিতা প্রখ্যাত সেনানায়ক ও কূটনীতিবিদ হযরত 'আমর ইবনুল' 'আস (রা) ও মাতা রীতা বিনতু মুনাব্বিহ। বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহর ইসলাম-পূর্ব নাম 'আল-আস' (পাপী, অবাধ্য)। আবু যারয়া তাঁর তারীখে উল্লেখ করেছেন, একটি জানাযার অনুষ্ঠানে রাসূল (সা), তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার নাম কি?' তিনি যখন বললেন, 'আল-আস', রাসূল (সা) তখন বললেন, না, আজ থেকে তোমার নাম হবে 'আবদুল্লাহ।' সেই দিন থেকে 'আল-আস' হলেন আবদুল্লাহ।

'ইবন সা'দ বলেন, আবদুল্লাহ তাঁর পিতা আমর ইবনুল আসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, পুত্র আবদুল্লাহ অপেক্ষা পিতা আমরের বয়স মাত্র দশ থেকে বারো বছর বেশী ছিল। তবে ওয়াকিদীর মতে পুত্র অপেক্ষা পিতা বিশ বছরের বড় ছিলেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, আল-ইসাবা, আল-ইসতিয়াব) পিতা-পুত্র উভয়ে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই মদীনায় হিজরাত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর অধিকাংশ সময় আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্র (সা) সুহবত বা সাহচর্যে ব্যয় করতেন। ক্রোধ বা শান্ত উভয় অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে যা কিছু বের হতো, তিনি সব কিছু লিখে রাখতেন। কোন কোন সাহাবী এমনটি না করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, উত্তেজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে যা কিছু বের হয় তা না লেখা উচিত। বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্থাপন করলেন। রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি আমার সব কথা লিখতে পার। সত্য ছাড়া অন্য কিছুই আমি বলতে পারিনে'। (মুসনাদে আহমাদ, আল-ইসতিয়াব) তাঁর পিতা আমর অপেক্ষা রাসূল (সা) তাঁকেই বেশী ভালোবাসতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁর গুরুত্ব ছিল বেশী।

রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্যে কাটানোর পর যে অতিরিক্ত সময়টুকু আবদুল্লাহ পেতেন, তার সবটুকু প্রায় দিনে রোযা রেখে এবং রাতে ইবাদাতে কেটে যেত। ধীরে ধীরে এ কাজে তিনি এত গভীরভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, স্ত্রী-পরিজন ও দুনিয়ার সবকিছুর প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর এই অস্বাভাবিক বৈরাগী জীবনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূল (সা) আবদুল্লাহকে ডেকে পিতার আনুগত্যের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ, রোযা রাখ, ইফতার কর, নামায পড়, বিশ্রাম নেও এবং স্ত্রী-পরিজনের হকও আদায় কর। এই আমার তরীকা বা পন্থা। যে আমার তরীকা প্রত্যাখ্যান করবে সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না।'

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে সংঘটিত সব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় সাধারণত সোয়ারী পশুর ব্যবস্থা ও জিনিসপত্র পরিবহনের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হতো। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু মুহাম্মাদ, আমরা যেখানে বসবাস করি সেখানে দিরহাম ও দীনারের প্রচলন নেই। গৃহপালিত পশু ও জীব-জন্তু আমাদের প্রধান সম্পদ। আমরা ছাগলের বিনিময়ে উট, গরুর বিনিময়ে ঘোড়া এবং ঘোড়ার বিনিময়ে উট ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। এতে কোন আপত্তি নেই তো?' তিনি বললেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন একটি উষ্ট্রারোহী বাহিনী গড়ার। আমার কাছে যতগুলি উট ছিল, এক এক করে সবগুলি বিলি করলাম। তবুও সোয়ারী বিহীন কিছু লোক রয়ে গেল। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে যতগুলি উট ছিল, সবগুলি বন্টন করার পরও সোয়ারী বিহীন অবস্থায় একদল লোক রয়ে গেছে।' রাসূল (সা) নির্দেশ দিলেন, 'একটি উটের বিনিময়ে সদকার দু'টি, তিনটি করে উট দানের অঙ্গীকার করে কিছু উট খরীদ করে নাও।' আমি সেই মত প্রয়োজনীয় উট সংগ্রহ করে নিলাম। (দারু কুতনী)

ইয়ারমুকের যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি লড়াই করেন। এই যুদ্ধে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস তাঁর নেতৃত্বের ঝাণ্ডা আবদুল্লাহর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

সিফ্‌ফীনে হযরত 'আমর ইবনুল 'আস ছিলেন হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে। পুত্র আবদুল্লাহকে তিনি মুয়াবিয়ার বাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে এই গৃহযুদ্ধের প্রতি তিনি ছিলেন ভীষণ বিতৃষ্ণ। এ কারণে মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে যোগ দিলেও বাস্তবে তিনি যুদ্ধে কোন প্রকার অংশগ্রহণ করেননি। বারবার তিনি পিতাকে এই আত্মঘাতী যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ)

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা) সিফ্‌ফীনে হযরত আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করে শহীদ হন। আম্মারের শাহাদাত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণীর কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি পিতা 'আমর ইবনুল 'আসকে (রা) জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেননি, 'আফসুস, ইবন সুমাইয়্যা (আম্মার)-কে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে।' একথা শুনে 'আমর ইবনুল 'আস হযরত মুয়াবিয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আবদুল্লাহ যা বলছে, তা-কি আপনি শুনছেন না?' আবদুল্লাহর কথার ব্যাখ্যা করে মুয়াবিয়া (রা) বলেন, 'সে সবসময় নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে আসে। 'আম্মারকে কি আমরা হত্যা করেছি? প্রকৃতপক্ষে তাঁর হত্যার দায়-দায়িত্ব তাদের যারা তাকে ঘর থেকে বের করে এখানে সংগে নিয়ে এসেছে।' (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আম্মারকে (রা) দুই ব্যক্তি একই সাথে আক্রমণ করে হত্যা করে। তারা এককভাবে এ কৃতিত্ব দাবী করে ঝগড়া করতে করতে হযরত মুয়াবিয়ার নিকট হাজির হয়। ঘটনাক্রমে সেখানে হযরত আবদুল্লাহ (রা) উপস্থিত ছিলেন। তাদের ঝগড়া শুনে তিনি বলেন, 'তোমাদের দু'জনের কোন একজনের উচিত সন্তুষ্ট চিত্তে তার প্রতিপক্ষের দাবী মেনে নেওয়া। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আম্মারকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হযরত মুয়াবিয়াকে বলেন, 'আম্মারের হত্যাকারীকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিন।' একথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা) বিরক্তি সহকারে তাঁর পিতাকে বলেন, 'আমর, তোমার এই পাগল ছেলেটিকে কি আমার সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নেবে না?' তারপর তিনি নিজেই আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন, 'যদি এমনই হয়, তাহলে তুমি আমার সাথে কেন?' হযরত আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, 'এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যতদিন বাঁচবে তোমার পিতার অনুগত থাকবে।'

সিফ্‌ফীনের এই আত্মঘাতী যুদ্ধে যদিও তাঁর হাত কলুষিত হয়নি, তবুও এতে শরীক হওয়ার জন্য আজীবন তিনি অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'হায়, আমি যদি এর দশ বছর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতাম!' হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় এবং তাঁর হাতে ঝাণ্ডা থাকায় সারা জীবন তিনি তাওবাহ ও ইসতিগফার করেছেন। (আল-ইসতিয়াব)

হযরত রাজা' (রা) বলেন ঃ একবার আমি একদল লোকের সাথে মসজিদে নববীতে বসেছিলাম। আবদুল্লাহ ইবন আমর ও আবু সাঈদ খুদরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা) আসতে দেখে আবদুল্লাহ বলে উঠলেন, 'এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি আপনাদের একটি কথা জানাবো?' লোকেরা বললো, 'কেন জানাবে না?' তিনি বললেন, 'সিফফীনের যুদ্ধের পর থেকে তাঁর সাথে আমার কোন কথা হয়নি। অথচ তাঁর সন্তুষ্টি আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।' আবু সাঈদ খুদরী বললেন, 'আপনি কি তাঁর কাছে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান?' তিনি

বললেন, 'হাঁ!' পরদিন আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে সংগে করে হযরত হুসাইনের (রা) বাড়ী গেলেন। হযরত হুসাইন (রা) সাক্ষাৎ দান করতে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেন। পরে আবদুল্লাহর (রা) পীড়াপীড়িতে সম্মত হন। সিফফীনে তাঁর অংশগ্রহণের পটভূমি ব্যাখা করে তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ অনুযায়ী আমি আমার পিতার আনুগত্য করতে বাধ্য ছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! এ যুদ্ধে আমি আমার তরবারি উন্মুক্ত করিনি, নিযা দ্বারা যেমন কাউকে আহত করিনি তেমনি কোন তীরও চালাইনি।' (উসূদুল গাবা)

জ্ঞান ও মান-মর্যাদার দিক দিয়ে সমগ্র সাহাবা সমাজের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহর (রা) বিশেষ স্থান ছিল। মাতৃভাষা আরবী ছাড়াও হিব্রু ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। তাওরাত ও ইনজিল তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার একহাতে মধু, অন্য হাতে চর্বি এবং আমি তা চেটে চেটে খাচ্ছি। স্বপ্নের এ কথা আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললাম। তিনি বললেন, 'তুমি দু'খানা গ্রন্থ তাওরাত ও আল-কুরআন পাঠ করবে'। (আল-ইসাবা)

হাদীসে নববীর যে বিশাল ভাণ্ডার তাঁর কাছে জমা ছিল তার অনুমান করা যায় হযরত আবু হুরাইরার (রা) একটি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমার থেকেও আবদুল্লাহ ইবন আমরের বেশী হাদীস মুখস্থ ছিল। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে তিনি যা কিছু শুনতেন, লিখে রাখতেন; আর আমি লিখতাম না। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, আল-ইসাবা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ নিঃসৃত বাণীর বিরাট একটি অংশ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর সংগ্রহটির নাম রেখেছিলেন 'সাদেকা'। তাঁর কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে এবং সে সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিতে কিছু না থাকলে উক্ত 'সাদেকা' দেখে উত্তর দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ) এই সংগ্রহটি ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। মুজাহিদ বলেনঃ একবার আমি তাঁর বিছানার নীচ থেকে একখানা বই বের করে দেখতে লাগলাম। তিনি নিষেধ করলেন। বললাম, 'আপনি তো আমাকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করেন না। আজ এমন করছেন কেন?' বললেন, 'এ সত্যের সেই গ্রন্থ যা আমি একাই রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনে সংগ্রহ করেছি'। তিনি আরও বলেন, 'এই গ্রন্থখানি এবং পবিত্র কুরআন ও ওয়াহাজের ঐ জায়গীরটি যদি আমাকে দেওয়া হয় তাহলে দুনিয়ায় আমার আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সাত শত। তারমধ্যে সতেরটি মুত্তাফাক আলাইহি, আটটি বুখারী এবং কুড়িটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাহজীব)

হযরত আবদুল্লাহর (রা) হালকায়ে দারসে-হাদীসের সীমা ছিল সুপ্রশস্ত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ হাদীস শোনার জন্য তাঁর দারসে হাজির হতো। তাছাড়া তিনি যেখানেই যেতেন, জ্ঞান পিপাসুদের বিশাল সমাবেশ ঘটতো তাঁর পাশে। একজন নাখয়ী শায়খ বর্ণনা করেন, 'একবার আমি ইলিয়ার মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করছিলাম। এক ব্যক্তি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। নামায শেষে চারদিক থেকে মানুষ তাঁর নিকট গুটিয়ে বসলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম, ইনি আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস।

হযরত আবদুল্লাহ তাঁর ছাত্রদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সমকালীন জ্ঞানীদের প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল। একবার তাঁর সামনে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের (রা) প্রসঙ্গ উঠলো। তিনি বললেন, 'তোমরা এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠিয়েছো যাঁকে আমি সেই দিন থেকে ভালোবাসি যেদিন রাসূল (সা) বলেছিলেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন কর এবং সর্বপ্রথম তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের নামটি উচ্চারণ করেছিলেন।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা) বহু সংখ্যক সাহাবীর নিকট থেকে, যেমনঃ উমার, আবু দারদা, মুয়াজ, আবদুর রহমান বিন আউফ, তাঁর পিতা 'আমর প্রমুখ— হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু

নুয়াঈম বলেন, 'সাহাবীদের মধ্যে ইবন উমার, আবু উমামা, মিসওয়ার, সায়িব ইবন ইয়াযিদ ও আবুত তুফাইল এবং বহু সংখ্যক বিশিষ্ট তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা)

তাকওয়া, পরহিযগারী ও অতিরিক্ত ইবাদাতকারী হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ইতিহাসে তাঁকে প্রার্থনাকারী, তাওবাকারী, ইবাদাত গুজার, ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর পিতা 'আমর ছিলেন যেমন বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও কৌশলীদের গুরু, তেমনি তিনি ছিলেন আবেদ, যাহেদ ও স্পষ্টবাদীদের মধ্যমণি। তাঁর জীবনের সবটুকু সময় ইবাদাতে ব্যয় হয়েছে। যখন যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মুখস্থ করে ফেলেছেন। কুরআনের অবতরণ শেষ হলে তিনিও হলেন সমগ্র কুরআনের হাফেজ। জিহাদের ময়দানে সব সময় তাঁকে প্রথম সারিতে দেখা যেত। আবার সশস্ত্র জিহাদ শেষ হলে তাঁকে দেখা যেত মসজিদে—দিনে রোযাদার এবং রাতে ইবাদাত গুজার। কুরআন ও তাসবীহ তিলাওয়াত অথবা তাওবাহ ইসতিগফারে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। মোটকথা, যখন জিহাদের ডাক না থাকতো, চব্বিশ ঘন্টা তিনি সাওম, সালাত ও তিলাওয়াতে ডুবে থাকতেন।

প্রকৃতিগতভাবেই রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবণতা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একবার তাঁকে ডেকে বললেন 'আবদুল্লাহ, আমি জানতে পেরেছি, তুমি সারাটি জীবন দিনে রোযা রেখে ও রাতে ইবাদাত করে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্প করেছো'। তিনি বললেন, 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) বললেন, 'সে শক্তি তোমার নেই। রোযা রাখ, আবার ইফতারও কর এবং নামায পড়, আবার বিশ্রামও কর। মাসে শুধু তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, প্রতিটি নেকীর দশগুণ বদলা দেওয়া হয়।' তিনি আরজ করলেন, 'আমি এর থেকেও বেশী শক্তি রাখি'। রাসূল (সা) বললেন, 'একদিন রোযা রাখবে এবং দুইদিন ইফতার করবে'। তিনি আবার আরজ করলেন, 'আমি এর থেকেও বেশী শক্তি রাখি। 'রাসূল (সা) বললেন', একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন ইফতার করবে। এটাই হযরত দাউদের (আ) তরীকা এবং এটাই রোযার সর্বোত্তম তরীকা বা পদ্ধতি'। তিনি আবারও আরজ করলেন, 'আমি এর থেকেও উত্তম রোযা রাখতে পারি'। রাসূল (সা) বললেন, 'এর থেকে উত্তম রোযা আর নেই'। অন্য একবার রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে যেয়ে বলেন, 'তোমার দেহের, তোমার চোখের, তোমার পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের তোমার ওপর হক বা অধিকার আছে'।

সারাটি জীবন তিনি রোযার ক্ষেত্রে দাউদের (আ) অনুসরণ করেন এবং রাতের বেশীর ভাগ সময় ইবাদাতে অতিবাহিত করেন। কুরআন তিলাওয়াতের এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, প্রতি তিন দিনে একবার খতম করতেন। তবে শেষ জীবনে এত অধিক ইবাদাত তাঁর জন্য কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে আফসুস করে বলতেন, 'হায়, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত 'রুখসত' বা কম করার অনুমতি গ্রহণ করতাম। (আল-ইসাবা)

দুনিয়ার প্রতি আবদুল্লাহর এই উদাসীনতা দেখে তাঁর পিতা 'আমর ইবনুল 'আস প্রায়ই রাসূলুল্লাহর কাছে অভিযোগ করতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহর হাতটি ধরে তাঁর পিতার হাতের মধ্যে দিয়ে বলেন, 'তোমাকে আমি যা বলি তাই কর, এবং তোমার পিতার ইতায়াত বা আনুগত্য কর'। [রিজালুন হাওলার রাসূল (সা)] আবদুল্লাহ আজীবন তাঁর পিতার আনুগত্য করেছেন। পিতার নির্দেশেই তাই তিনি মুয়াবিয়ার পক্ষে সিফফীনে গিয়েছেন।

হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা) পৈত্রিক মীরাস থেকে বিশাল সম্পত্তি ও বহু দাস-দাসী লাভ করেন। তায়েফে 'ওয়াহাজ' নামক যে জায়গীরটি তিনি লাভ করেন তার মূল্য ছিল প্রায় দশ লাখ দিরহাম। (উসুদুল গাবা) তাঁর পক্ষ থেকে সেখানে চাষাবাদ করা হতো। এই জায়গীর নিয়ে একবার আম্বাসা ইবন আবী সুফইয়ানের সাথে বিবাদ দেখা দেয়। উভয় পক্ষে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাওয়ার

উপক্রম হয়। আবদুল্লাহর ভাই হযরত খালিদ ইবনুল 'আস আসলেন তাঁকে বুঝানোর জন্য। তিনি খালিদকে বললেন, 'যে ব্যক্তি তার সম্পদের হিফাজত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে যেয়ে নিহত হবে সে শহীদ—তোমার কি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী স্মরণ নেই?' (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহর (রা) মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কে সীরাত লেখকদের মতভেদ রয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কেও ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর স্থান সম্পর্কে যেমন শাম, মক্কা, তায়েফ ও মিসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি সন হিসাবে ৬৫, ৬৮ ও ৬৯ হিজরীর কথা বলা হয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি হিজরী ৬৫ সনে 'ফুসতাত' (মিসর) নগরে ৭২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তখন মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই চলছিল, এ কারণে তাঁর লাশ সাধারণ গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁকে তাঁর আবাস স্থলেই দাফন করা হয়। (আল-ইসাবা, তাজকিরাতুল হুফফাজ)

মিকদাদ ইবন 'আমর (রা)

নাম মিকদাদ, কুনিয়াত আবুল আসওয়াদ, আবু 'আমর ও আবু সাঈদ। পিতা 'আমর ইবন সা'লাবা। তাঁর পিতৃ পুরুষের আদি বাসস্থান 'বাহরা'। ইবনুল কালবী বর্ণনা করেন, মিকদাদের পিতা 'আমর তাঁর গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে 'কিসাস' বা প্রতিশোধের ভয়ে 'হাদরামাউত' পালিয়ে যান এবং কিন্দার সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। এ কারণে তাঁকে 'কিন্দী' বলা হয়। তিনি হাদরামাউতের এক নারীকে বিয়ে করেন এবং তার গর্ভেই 'মিকদাদ' জন্মগ্রহণ করেন। এই হাদরামাউতেই মিকদাদ বেড়ে ওঠেন। এখানে আবু শাম্মার ইবন হাজার আল কিন্দী নামক এক ব্যক্তির সাথে তাঁর ঝগড়া হয় এবং তরবারির এক আঘাতে তার একটি পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর পালিয়ে মক্কায় চলে যান। মক্কায় তিনি আল-আসওয়াদ ইবন 'আবদ ইয়াগূসের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। আল আসওয়াদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এত মধুর ও ঘনিষ্ঠ হয় যে, মিকদাদকে তিনি পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (আসওয়াদের পুত্র মিকদাদ) নামে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর পবিত্র কুরআনের 'ওয়াদয়ূহুম লি আবায়িহিম' (তাদেরকে তাদের পিতার নামেই ডাক)— এ আয়াতটি নাযিল হলে তিনি আল-আসওয়াদের পরিবর্তে 'মিকদাদ ইবন আমর' (আমরের পুত্র মিকদাদ)-এ পরিচিতি গ্রহণ করেন। আর এ কারণে ইতিহাসে কোথাও তাঁকে মিকদাদ ইবন আমর আবার কোথাও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (আল-ইসাবা, উসুদুল গাবা)।

মিকদাদ মক্কায় আশ্রয় নেয়ার পর কিছুদিন যেতে না যেতে তাওহীদের আওয়ায তাঁর কানে প্রবেশ করে। হযরত রাসূলে কারীমের দাওয়াত ও তাবলীগ তাঁকে ইসলামের সাথে প্রথম পরিচয় করে দেয়। এ সেই সময়ের কথা যখন ইসলামের কট্টর দুশমনরা মুসলমানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছিল। তাদের ভয়ে অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিল। কিন্তু মিকদাদ ইসলাম গ্রহণ করার পর সত্যকে গোপন করে রাখা সমীচীন মনে করলেন না। তিনি প্রথম পর্যায়ের সাত ব্যক্তির অন্যতম, যারা সেই চরম সন্ত্রাসের মুহূর্তে প্রকাশ্যে নিজেদের ঈমান আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই সাত জনের অন্য ছয়জন হলেন রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, 'আম্মার, তাঁর মা সুমাইয়্যা, সুহাইব ও বিলাল (রা)। (হায়াতুস সাহাবা—১/২১৮)।

রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো বোন 'দুবায়া বিনতু যুবাইর ইবন আবদিল মুত্তালিবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বর্ণিত আছে, একদিন আবদুর রহমান ইবন আউফের সাথে তিনি বসে আছেন। হঠাৎ আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করেন, মিকদাদ তুমি বিয়ে করছো না কেন? মিকদাদ সরলভাবে সাথে সাথে জবাব দেন, তোমার মেয়েকেই আমার সাথে বিয়ে দাও না। এ কথায় আবদুর রহমান অপমান বোধ করেন। তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং মিকদাদকে যথেষ্ট গালমন্দ করেন। মিকদাদ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। রাসূল (সা) বললেন, আমিই তোমার বিয়ে দেব। অতঃপর তিনি চাচাতো বোন 'দুবায়া'-র সাথে মিকদাদের বিয়ে দেন। (আল-ইসাবা)

প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়ার পর মিকদাদের ওপর মুসীবত নেমে আসে। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর আবার মক্কায় ফিরে আসেন। তখন মদীনায় হিজরাতের হিড়িক পড়ে গেছে। বিশেষ কিছু অসুবিধার কারণে তিনি

মদীনায় হিজরাত করতে পারলেন না। এমন কি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পরও তিনি মক্কায় থেকে গেলেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হলে তিনি এবং উতবা ইবন গাযওয়ান কুরাইশদের একটি অগ্রবর্তী অনুসন্ধানী দলের সদস্য হিসাবে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন ইকরিমা ইবন আবী-জাহল। পথিমধ্যে মদীনার মুসলিম মুজাহিদদের একটি দলের সাথে তাদের ছোট খাট একটা সংঘর্ষ হয়। এই মুসলিম মুজাহিদ দলের নেতা বা আমীর ছিলেন হযরত উবাইদা ইবনুল হারিস (রা)। সুযোগ বুঝে এ সময় মিকদাদ ও উতবা ইবন গাযওয়ান মুসলিম মুজাহিদ দলে ভিড়ে যান এবং তাদের সাথে মদীনায় পৌঁছেন। মদীনায় তাঁরা হযরত কুলসুম ইবন হিদামের অতিথি হন। (উসুদুল গাবা) মদীনায় তিনি হযরত উবাই ইবন কা'বের (রা) অনুরোধে বনী আদীল্য (মতান্তরে জাদীলা)-তে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (সা) তাঁকে সেই এলাকায় একখণ্ড জমি দান করেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে শিরক ও তাওহীদের মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়। এ বছরই কুরাইশ বাহিনী বদর প্রান্তরে উপনীত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জন্য এ ছিল প্রথম পরীক্ষা। রাসূল (সা) এ ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ চেয়ে তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে 'আজম প্রমুখ সাহাবা ভাষণ দিয়ে তাঁদের কুরবানী ও আত্মত্যাগের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত মিকদাদও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক আবেগময় ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি রাসূলকে (সা) আশ্বাস দান করে বলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলুন। আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, বনী-ইসরাইলরা তাদের নবী মুসাকে বলেছিলঃ তুমি ও তোমার রব দু'জন যাও এবং যুদ্ধ কর, আর আমরা এখানে বসে থাকি— আমরা আপনাকে তেমন কথা বলবো না। বরং আমরা আপনাকে বলবো: আপনি ও আপনার রব দু'জন যান ও তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনাদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম, আপনি যদি আমাদের 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত নিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে যাব এবং আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করবো— যতক্ষণ না আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন।" (রিজালুন হাওলার রাসূল) তাঁর এই আবেগময় ভাষণ শুনে খুশীতে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বদর যুদ্ধ শুরু হলো। এ যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে মাত্র তিনজন ছিলেন অশ্বারোহী। মিকদাদ ইবন আমর, মুরছেদ ইবন আবী মুরছেদ ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম। এ তিনজন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন পদাতিক ও উষ্ট্রারোহী। তবে একাধিক বর্ণনা মতে এ যুদ্ধে মিকদাদই ছিলেন একমাত্র অশ্বারোহী মুজাহিদ। এ কারণে বলা হয়েছে, 'মিকদাদই সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তাঁর ঘোড়া দৌড়িয়েছেন।'

বদর ছাড়াও উহুদ, খন্দকসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। হিজরী ২০ সনে হযরত 'আমর ইবনুল আস মিসর অভিযান পরিচালনা করেন। রাজধানী মদীনায় তিনি অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য চেয়ে পাঠান। খলীফা উমার (রা) দশ হাজার সিপাহী ও চারজন অফিসার পাঠান। এই চারজনের একজন মিকদাদ ইবন আমর। খলীফা একটি চিঠিতে আমর ইবনুল আসকে লিখে জানান, 'এই চার জনের প্রত্যেকেই শত্রু পক্ষের দশ হাজার সিপাহীর সমান'। এই সিপাহীদের যোগদানের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র মিসরে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।

হযরত খুবাইবকে (রা) মক্কার মুশরিকরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) খুবাইবের লাশ রাতের আঁধারে শূল থেকে নামিয়ে আনার জন্য যুবাইর ও মিকদাদকে পাঠান। তাঁরা খুবাইবের লাশ

শূল থেকে নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে যখন রওয়ানা দেন তখন কুরাইশরা টের পেয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। (হায়াতুস সাহাবা)

হযরত মিকদাদের পেটটি ছিল খুবই মোটা। এ কারণে বার্ধক্যে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতে থাকেন। এ কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে তাঁর এক রোমান দাস তার পেটে অস্ত্রোপচার করে; কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় তিনি মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে হিজরী ৩৩ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত 'উসমান (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। লাশ মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭০ বছর।

হযরত মিকদাদের মধ্যে সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছিল। বদর যুদ্ধের সময় তিনি যে নিষ্ঠা ও সততাপূর্ণ আবেগ প্রকাশ করেন তাতে সমগ্র সাহাবা সমাজ তাঁকে ঈর্ষা করতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলতেন ঃ 'আফসূস! আমি যদি তখন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত হতাম এবং মিকদাদের কথাগুলি আমার মুখ থেকে বের হতো'। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, 'বদর যুদ্ধে আমি মিকদাদের সাথে ছিলাম। এ যুদ্ধে তাঁর সাথে থাকার বিষয়টি আমার কাছে এত প্রিয় যে, তার তুলনায় দুনিয়ার সব কিছু একেবারেই মূল্যহীন'। ইসলামের সূচনালগ্নের চরম দারিদ্র ও অভাব তাঁকে অনেকখানি সহনশীল ও বাস্তববাদী করে তুলেছিল। তিনি বলেন, "হিজরাত করে আমি যখন মদীনায় আসলাম, আমার থাকা-খাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। ক্ষুধায় আমার মরণ-দশা হয়েছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার দু'জন সংগীসহ আমাকে তাঁর আশ্রয়দাতা কুলসুম ইবন হিদামের বাড়ীতে স্থান দেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মাত্র চারটি ছাগী। আমরা এতগুলি মানুষ এই ছাগীগুলির দুধপান করেই জীবন ধারণ করতাম। একদিন রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বাইরে কোথাও বেরিয়ে গেলেন। ফিরতে দেরী হল। আমি মনে করলাম, হয়তো কোন আনসারী তাঁকে দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি খেয়েই ফিরবেন। এই ধারণা আমার মনে উদয় হতেই আমি উঠে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য রাখা দুধটুকু এক চুমুকে পান করে ফেললাম। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা হলো, আমার ধারণা যদি ভুল হয় তাহলে তো ভীষণ লজ্জায় পড়তে হবে। আমার এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রাসূল (সা) ফিরে আসলেন এবং সোজা দুধ যেখানে থাকে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, পেয়ালা শূন্য। আমি আমার ভুলের জন্য লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলাম। বিশেষ করে তিনি যখন কিছু বলার জন্য হাত উঠালেন তখন আমার ভয়ের কোন সীমা থাকলো না। আমার ধারণা হল, রাসূলুল্লাহর (সা) বদ দুআয় এখনই আমার ইহ-পরকাল সব বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁকে আমি বলতে শুনলাম, 'আল্লাহুম্মা আতয়িমহু মান আতয়ামানী ওয়া আসকি মান সাকানী'— হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার করালো তাকে তুমি আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তাঁকে তুমি পান করাও। এই দুআ শুনে আমার মধ্যে সাহস সঞ্চার হলো। আমি উঠে ছাগীগুলির কাছে গেলাম, কোন ছাগীর ওলানে কিছু দুধ পাওয়া যায় কিনা এই আশায়। কিন্তু আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে যে ছাগীর উলানেই হাত দিই না কেন প্রত্যেকটি দুধে পরিপূর্ণ পেলাম। প্রচুর পরিমাণে দুধ দুইয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পেশ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সবাই পান করেছ কি? আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি প্রথমে পান করুন, তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলছি। রাসূল (সা) পেট ভরে পান করলেন। আমার পূর্বের ভুল ও অনুশোচনার কথা মনে হওয়ায় হঠাৎ হেসে উঠলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আবুল আসওয়াদ, হাসছো কেন?' আমি সব কথা খুলে বললাম। সব কিছু শুনে তিনি বললেন, "এ ছিল আল্লাহর রহমত। তুমি তোমার সাথী দু'জনকে ঘুম থেকে জাগালে না কেন, তারাও অনুগৃহীত হতো?"

হযরত মিকদাদ ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় বহু ক্ষেত্রে ও ঘটনায়। তাঁর এক সাথী বর্ণনা করছেন, একদিন আমরা মিকদাদের কাছে বসে

ছিলাম। এমন সময় একজন তাবেয়ী তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন লাভে ধন্য আপনার চোখ দু'টি কতই না সৌভাগ্যের অধিকারী। আল্লাহর কসম, আপনি যা কিছু দেখেছেন, তা দেখার এবং যেসব দৃশ্য ও ঘটনায় আপনি উপস্থিত হয়েছেন তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি খুবই লালায়িত। একথা শুনে মিকদাদ লোকটির উপর খুবই ক্ষেপে গেলেন। লোকেরা বললো, তা এত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে? তিনি বললেন, বর্তমানকে ছেড়ে অতীতকে কামনা করা বৃথা কাজ। কারণ, একথা তার জানা নেই, তখন সে থাকলে তার ভূমিকা কী হতো। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর (সা) সমসাময়িক বহুলোক ঈমান না আনার কারণে তাদের ঠিকানা হয়েছে জাহান্নাম। সে কি জানে সে কোন দলভুক্ত হতো? এমন বিপদ থেকে আল্লাহ যে তাকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমানদান বানিয়েছেন এজন্য কি সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে না?

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁকে একটি দলের আমীর নিযুক্ত করেন। তিনি ফিরে আসলে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, 'ইমারাত বা নেতৃত্ব কেমন লাগলো?' জবাবে তিনি বড় একটি সত্য কথা বলে ফেলেন। বলেন, 'নিজেকে আমার সবার ওপরে এবং অন্যদের আমার নীচে মনে হয়েছে। যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আজকের পর আর কক্ষণো আমি দু'ব্যক্তির ওপর আমীর হবো না'। তিনি নিজের দুর্বলতা ঢাকার বা সত্য গোপন করার চেষ্টা করেননি। তিনি সব সময় রাসূলুল্লাহর এ হাদীসটি আওড়াতেনঃ 'ফিতনা থেকে যে ব্যক্তি পরিত্রাণ পেয়েছে, সে প্রকৃত সৌভাগ্যবান।'

রাসূলুল্লাহকে (সা) তিনি নিজের প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তাঁর মধ্যে ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা) হিফাজত বা নিরাপত্তার চরম দায়িত্বানুভূতি। মদীনায় কোন প্রকার হৈ চৈ দেখা গেলেই রাসূলুল্লাহর (সা) বাসগৃহের দরজায় তাঁকে সশস্ত্র ও অশ্বারোহী অবস্থায় দেখা যেত। ইসলামের বিধি-বিধান যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনদের বিরুদ্ধে যেমন ছিলেন সজাগ, তেমনি ছিলেন নিজের বন্ধুদের ইসলাম সম্পর্কে সামান্য উদাসীনতা ও ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে দারুণ সচেতন। একবার তিনি একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে অভিযানে বের হলেন। শত্রু বাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। বাহিনীর আমীর নির্দেশ দিলেন, বাহিনীর কোন সদস্যই আজ তাঁর সোয়ারী— পশু চড়ানোর জন্য ছাড়বে না। কিন্তু একজন মুজাহিদ বিষয়টি অবহিত ছিলেন না। তিনি আমীরের আদেশের বিপরীত কাজ করেন। এ জন্য তিনি আমীরের নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য শাস্তি থেকেও অধিক শাস্তি লাভ করেন। মুজাহিদটি কাঁদছিল, এমন সময় মিকদাদ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করে বিষয়টি অবগত হলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাতটি ধরে তাঁকে আমীরের কাছে টেনে নিয়ে গেলেন এবং আমীরের সাথে তর্ক করে তাঁর ভুল স্বীকার করতে বাধ্য করেন। আমীরকে তিনি বলেন, লোকটিকে কিসাস গ্রহণের সুযোগ দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করুন। মিকদাদের কথা আমীর মাথা পেতে নিলেন। অবশ্য লোকটি আমীরকে ক্ষমা করে দেন। এভাবে তিনি দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতেন। তিনি প্রায় সব সময় বলতেন, 'ইসলামকে বিজয়ী দেখেই আমি মরতে চাই।' রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে ভালোবাসতে এবং আমাকে এ খবরও দিয়েছেন যে, তিনি তোমাকে ভালোবাসেন।' এভাবে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীকে সাতজন বিশ্বস্ত সাথী ও উযীর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দ জন। তারা হলেনঃ হামযা, জাফর, আবু বকর, উমার, আলী, হাসান, হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সালমান, আম্মার, হুজাইফা, আবু জাফর, মিকদাদ ও বিলাল।

তোষামোদ বা প্রশংসা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার হযরত উসমানের (রা) দরবারে কিছু লোক মিকদাদের সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করে দিল। তিনি এত রুষ্ট হলেন যে, তাদের মুখে মাটি ছুঁড়ে মারলেন। হযরত উসমান (রা) বলে উঠলেন, মিকদাদ, এ কী হচ্ছে? বললেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা প্রশংসাকারীর মুখে মাটি ছুঁড়ে মার।'

ব্যবসা ছিল তাঁর আসল পেশা। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খাইবার অঞ্চলে কিছু ভূমি দান করেন। পরবর্তীকালে মিকদাদের ওয়ারিসদের নিকট থেকে এক লাখ দিরহামের বিনিময়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা) তা খরীদ করে নেন।

হযরত মিকদাদের স্ত্রী দুবায়া বর্ণনা করেন, একবার মিকদাদ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাকী'র একটি নির্জন স্থানে যান। তিনি কর্ম সমাধা করছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি ইঁদুর তার গর্ত থেকে একটি দীনার বের করে আনছে। এভাবে ইঁদুরটি মোট সতেরটি দীনার বের করে আনে। তিনি সেগুলি কুড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে এসে ঘটনা খুলে বলেন। তিনি গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন কিনা রাসূল (সা) তা জানতে চান। তিনি যখন বললেন, না, তিনি হাত ঢুকাননি, তখন রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তোমার এ সম্পদে বরকত দিন। তোমার এ সম্পদের উপর কোন যাকাত নেই। (হায়াতুস সাহবা—৩/৬৪৫)

হযরত মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আলী, আনাস, উবাইদুল্লাহ ইবন আদী, হাম্মাম ইবনুল হারস, আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা প্রমুখ সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

'আমর ইবনুল 'আস (রা)

'আমর নাম, আবু আবদিল্লাহ ও আবু মহাম্মাদ কুনিয়াত। পিতা 'আস ও মাতা নাবিগা। তাঁর বংশের উর্ধপুরুষ কা'ব ইবন লুই-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

জাহিলী যুগেই 'আমর ইবনুল 'আসের খান্দান—'বনু সাহম' সম্ভ্রান্ত খান্দান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। কুরাইশদের ঝগড়া-বিবাদের সালিশ-মিমাংসার দায়িত্ব এই খান্দানের ওপর অর্পিত হত। তাঁর জন্ম ও শৈশবকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন কট্টর ইসলাম-দুশমন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে একাত্ম হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় তাঁর ছিল দারুণ উৎসাহ।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহর (সা) চরম শত্রু কুরাইশদের তিন প্রধান পুরুষের একজন ছিলেন তিনি। যাদের বিরুদ্ধে শেকায়েত করে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন এবং আল্লাহ তার জবাবে এ আয়াত নাযিল করেনঃ "লাইসা লাকা মিনাল আমরে শাইয়্যুন, আও ইয়াতুবা আলাইহিম আও ইউ 'আজ্জিবাহুম, ফাইন্নাহুম যালিমুন।" (আলে 'ইমরান-১২৮)—"কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অধিকার তোমার নেই। আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হয়ে ক্ষমা করে দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। কারণ, তারা যালিম—অত্যাচারী।" রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝতে পারলেন তাদের ওপর বদদু'আ করতে নিষেধ করা হচ্ছে। তিনি বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন। এই তিন জনের একজন হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের মহা সেনা নায়ক, আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধূর্ত কূটনীতিক, মিসরবাসীর মুক্তি দাতা হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা)। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৬১৪)

মুসলমানদের যে প্রথম দলটি হাবশায় হিজরাত করেছিল, তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য কুরাইশদের যে প্রতিনিধি দলটি হাবশায় যায়, তার সবচেয়ে উৎসাহী সদস্য ছিলেন এই আমর ইবনুল আস। তিনি হাবশায় রাজা ও রাজদরবারের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে কথা বলেন এবং মুসলমানদের হাবশা থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে তাদেরকে স্বমতে আনার সব রকম চেষ্টা চালান। বাদশার দরবারে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মত্যাগের অভিযোগ উত্থাপন করে জ্বালাময়ী ভাষণও দেন। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

খন্দকের যুদ্ধে আরব উপদ্বীপের প্রায় সকল গোত্র কুরাইশদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করার জন্য মদীনার উপকণ্ঠে হাজির হয়। এখানেও 'আমর ছিলেন কুরাইশ পক্ষের এক প্রধান পুরুষ। খন্দকের পর কোথা থেকে কি যেন ঘটে গেল। এমন যে গোঁড়া ইসলাম-দুশমন তার মধ্যেও ভাবান্তর সৃষ্টি হল। ইসলামের দাওয়াত ও বাণী সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি নিজেই বলছেন, "এই চিন্তা-ভাবনার ফলে ইসলামের মূলকথা ধীরে ধীরে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আস্তে আস্তে আমি মুসলমানদের বিরোধিতা থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। কুরাইশ নেতারা তা বুঝতে পেরে আমার কাছে একজন লোক পাঠালো। সে আমার সাথে তর্ক শুরু করলো। আমি তাকে বললাম, 'বলতো, সত্যের ওপর আমরা, না পারসিক ও রোমানরা?' সে বললো, 'আমরা', জিজ্ঞেস করলাম, 'সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী তারা, না আমরা?' সে বললো, তারা। আমি বললাম, 'এ জীবনের পরে যদি আর কোন জীবন না থাকে তাহলে আমাদের এ সত্যাশ্রয়ী জীবন কী কাজে আসবে? এ দুনিয়াতেই আমরা মিথ্যাশ্রয়ীদের তুলনায় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আছি,

আর পরলোকেও আমাদের পুরস্কার লাভের কোন সম্ভাবনা নেই। এ কারণে মুহাম্মাদের (সা) এ শিক্ষা— মরনের পর আর একটি জগত হবে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের ফল লাভ করবে— অত্যন্ত সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।" খন্দকের পর তার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাফল্য সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, বিজয়ী হওয়ার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। এ বিশ্বাসই তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে।

তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে আমি আমার নিকটতম আত্মীয় বন্ধুদের ডেকে বললাম, তোমরা জেনে রাখ মুহাম্মাদের কথা সকল কথার ওপর বিজয়ী হবে—এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমার একটি সুচিন্তিত মতামত আছে, বিষয়টি তোমরা কিভাবে নেবে তা আমি জানতে চাই। তিনি বললেন, চলো আমরা নাজাশীর কাছে গিয়ে অবস্থান করতে থাকি। মুহাম্মাদ যদি আমাদের ওপর বিজয়ী হয় আমরা নাজাশীর কাছেই থেকে যাব। আর যদি আমাদের কাওম বিজয়ী হয় তাহলে তো আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। সে ক্ষেত্রে আমাদের সাথে নাজাশীর আচরণ উত্তমই হবে। আমার এ মতামত সকলে মেনে নিল। অতঃপর আমরা নাজাশীর জন্য কি উপহার নিয়ে যাওয়া যায় তা আলোচনা করলাম। উপহার দেওয়ার মত সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ছিল আমাদের এখানকার চামড়া। আমরা বেশ কিছু চামড়া নিয়ে হাবশায় পৌছলাম।

আমরা নাজাশীর দরবারে যাচ্ছি, এমন সময় 'আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামারীও সেখানে পৌছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বিশেষ কোন প্রয়োজনে তাঁকে মদীনা থেকে হযরত জাফর ইবন আবী তালিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। জাফর ইবন আবী তালিব তখনও হাবশায় অবস্থান করছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমর নাজাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা নাজাশীকে অনুরোধ করবো আমরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে যদি তিনি আমরকে আমাদের হাতে তুলে দেন, আমরা তাকে হত্যা করবো। এতে কুরাইশরা বুঝবে আমরা মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করে বদলা নিয়েছি। এ সিদ্ধান্তের পর আমি নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হলাম। নিয়ম মাফিক তাঁকে কুর্ণিশ করে আমাদের উপহার সামগ্রী তাঁর সামনে পেশ করলাম। উপহারগুলি তাঁর খুবই মনোপূত হল।

অতঃপর আমি আরজ করলাম, এখনই যে ব্যক্তি আপনার দরবার থেকে বেরিয়ে গেল সে আমাদের ঘোরতর শত্রুর দূত। আপনি যদি তাকে আমাদের হাতে তুলে দেন, আমরা তাকে হত্যা করবো। আমার এ আবেদনে নাজাশী ক্রোধে ফেটে পড়লেন। অবস্থা বেগতিক দেখে বিনীতভাবে বললাম, আমার এ আবেদন আপনাকে এতখানি উত্তেজিত করবে জানতে পেলে আমি এ আবেদন জানাতাম না। নাজাশী বললেন, তুমি কি চাও, যে ব্যক্তির কাছে আসেন 'নামুসে আকবর' যিনি মূসার (আ) কাছেও এসেছেন, তাঁর দূতকে আমি হত্যার জন্য তোমাদের হাতে তুলে দিই? আমি বললাম, সত্যিই কি তিনি এমন ব্যক্তি? তিনি বললেন, 'আমর, তোমাদের অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। আমার কথা শোন, তোমরা তাঁর আনুগত্য কর। আল্লাহর কসম, তিনিই সত্যপন্থী। তিনি তাঁর বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবেন, যেমন হয়েছিলেন মূসা ফিরআউন ও তার লোক লস্করদের ওপর। আমি বললাম, আপনি তাহলে তার পক্ষে আমার বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নিন। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি প্রথম তাঁর হাতে ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। আমার সাথীদের কাছে আমি ফিরে গেলাম; কিন্তু তখন আমার চিন্তাধারায় একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। আমি তাদের কাছে কিছুই প্রকাশ করলাম না।

আমি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে হাবশা থেকে রওয়ানা হলাম। পথে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সাথে দেখা। তিনিও মক্কা থেকে মদীনার দিকে যাচ্ছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু সুলাইমান, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, মারাত্মক পরীক্ষার

সম্মুখীন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ ব্যক্তি নবী। এখন খুব তাড়াতাড়ি ইসলাম কবুল করা উচিত। এই দ্বিধা-সংশয় আর কত দিন! বললাম, আমিওতো এই উদ্দেশ্যে চলেছি। অতঃপর আমরা দু'জন এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলাম। আমাদের দু'জনকে দেখেই রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'লাকাদ রামাতকুম মাক্কাহু বিফালাজাতি আকবাদিহা—মক্কা তার ক লিজার সুতীক্ষ্ণ বা মূল্যবান অংশসমূহ তোমাদের প্রতি ছুড়ে মেরেছে।' (রিজালুন হাওলার রাসূল)

প্রথমে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হন। তারপর আমি একটু নিকটে এসে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও বাইয়াত হবো। তবে আমার পূর্বের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে। তিনি বললেন, 'আমর, বাইয়াত কর। ইসলাম পূর্বের সকল পাপ মুছে দেয়, হিজরাতও পূর্বের সকল অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আমি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করে ফিরে গেলাম। এটা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে খাইবার বিজয়ের বছর, মতান্তরে অষ্টম হিজরীর সফর মাসে মক্কা বিজয়ের ছয় মাস পূর্বের ঘটনা। (সীরাতু ইবন হিশাম, ২য়, ২৭৬-২৭৮, আল-ফাতহুর রাব্বানী খণ্ড-২২, মুসনাদে ইমাম আহমাদ, হায়াতুস সাহাবা-১/১৫৭-৬০)

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মক্কায় ফিরে যান। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর আবার মদীনায় হিজরাত করেন। আমর ইবনুল আস ছিলেন ইসলাম ও কুফর উভয় অবস্থায় চরমপন্থী। পূর্বে যেমন ইসলামের মূলোৎপাটনে ছিলেন বদ্ধপরিকর তেমনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পর কুফর ও শিরকের ব্যাপারেও। তিনি বলেন, "আমার কাফির অবস্থায় আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বড় দুশমন। তখন মারা গেলে জাহান্নামই হত আমার ঠিকানা। আর মুসলমান হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও আমার চোখের আড়াল হতে পারতেন না।" তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরও একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু তাঁর অংশ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায় না। তবে একাধিক ক্ষুদ্র অভিযান যে তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় সেকথা ইতিহাসে জানা যায়।

ইবন সাদ বলেন, মক্কা বিজয়ের পর বনু কাদা'আর কিছু লোক সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করে। রাসূল (সা) তিন শ' মুজাহিদের একটি বাহিনী আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে তাদের বিরুদ্ধে পাঠান। ইবন আসীর বলেন, 'আমর রাসূলুল্লাহর নিকট আরো সৈন্য চেয়ে পাঠান। রাসূল (সা) মদীনা থেকে তাঁর সাহায্যের জন্য দুশ' মুজাহিদের একটি বাহিনী আবু উবাইদার নেতৃত্বে পাঠান। এই দলে আবু বকর, উমার প্রমুখের মত বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। তাঁরা সকলে 'আমর ইবনুল 'আসের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে শত্রুদের পরাজিত করেন। ইতিহাসে এ অভিযান 'গাযওয়া জাতুস সালাসিল' নামে পরিচিত।

আরব উপদ্বীপের বেশিরভাগ গোত্র মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করে। কোন কোন গোত্র ইসলাম কবুল করলেও যুগ যুগ ধরে লালিত কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। মূর্তি ও মূর্তি উপাসনার কেন্দ্র ভেংগে ফেলতে ভয় পাচ্ছিল। তাই রাসূল (সা) এসব মূর্তি ভাংগার জন্য কয়েকটি বাহিনী বিভিন্ন দিকে পাঠান। যাতে নও মুসলিমদের অন্তর থেকে মূর্তির প্রতি তাদের অমূলক ভয় ও ভক্তি দূর হয়ে যায়। বনু হুজাইলের এমনি একটি মূর্তিপূজার কেন্দ্রের নাম ছিল 'সু'আ'। এই কেন্দ্রটির কাছে পৌছলে স্থানীয় লোকেরা তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে বললো, আপনি এই কেন্দ্র ধ্বংস করতে পারবেন না। তার আত্মরক্ষা সে নিজেই করবে। আমর বললেন, তোমরা এখনও এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারে হাবুডুবু খাচ্ছ? যার দেখা ও শোনার ক্ষমতা নেই সে কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? তারপর তিনি কেন্দ্রটি নিশ্চিহ্ন করে দেন। এ দৃশ্য দেখে স্থানীয় জনসাধারণের ঈমান মজবুত হয়ে যায়।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) আরব উপদ্বীপের আশে-পাশের রাজা-বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করে চিঠি লেখেন। 'আমর ইবনুল 'আস 'উমানের শাসকের নিকট লিখিত রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিটি নিয়ে যান। 'উমানের শাসক চিঠি পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) 'আমরকে 'উমানের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহর ওফাত পর্যন্ত 'আমর উমানেই অবস্থান করেন। (ফুতুহুল বুলদান)

হযরত আবু বকরের (রা) খলীফা হওয়ার পর আরব উপদ্বীপে ভণ্ড নবী ও যাকাত অস্বীকারকারীদের ফিতনা ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 'আমর ইবনুল 'আস তখন 'উমানেই। খলীফার নির্দেশে তিনি 'উমান থেকে বাহরাইনের পথে অগ্রসর হন। পথে বনি আমেরের নেতা 'কুররাহ বিন হুবায়রার অতিথি হন। কুররাহ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করেন। বিদায়ের সময় তিনি 'আমরকে বলেন, যদি যাকাত আদায় করা হয় তাহলে আরববাসী কারও ইমারাত বা নেতৃত্ব মেনে নেবে না। যাকাত আদায় স্থগিত হলে তারা অনুগত ও বাধ্য থাকবে। এ কারণে যাকাত রহিত করা উচিত।

আমর বললেন, কুররাহ, তুমি কি ইসলাম ত্যাগ করেছ? আমাকে আরববাসীর ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম, এমন লোকদের আমি ঘোড়ার পায়ে পিষে ফেলবো। পরবর্তীকালে কুররাহ অন্য বিদ্রোহীদের সাথে বন্দী হয়ে মদীনায় আসেন এবং 'আমর তাঁকে মুক্ত করেন। উমান থেকে আমর মদীনায় পৌঁছলে খালীফা আবুবকর (রা) তাঁকে বনু কাদা'আর বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান। তাঁর চেষ্টায় বনু কাদা'আহ আবার ইসলামে ফিরে আসে। বিদ্রোহ দমিত হলে তিনি আবার উমানে ফিরে যান।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠান। তিনি 'আমরকে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে উমানের ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন, তাই তোমাকে আমি দ্বিতীয়বার সেখানে পাঠিয়েছিলাম। এখন তোমার ওপর আমি এমন দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই যা তোমার ইহ-পরকালের জন্য কল্যাণকর হবে। জবাবে আমর লিখলেন, আমি তো আল্লাহর একটি তীর। আর আপনি একজন দক্ষ তীরন্দায। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে এ তীর নিক্ষেপ করার অধিকার আপনার আছে। খলীফা তাঁকে উমান থেকে সরিয়ে ফিলিস্তীন সেক্টারে নিয়োগ করেন।

মুসলিম বাহিনী চতুর্দিক থেকে সিরিয়ায় অভিযান চালালো। রোমান সম্রাট মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠালো। ভিন্ন ভিন্ন রোমান বাহিনী অবেশেষে আজনাদাইনে সমবেত হয়। আমর ইবনুল আস ফিলিস্তীন থেকে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন। এদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু উবায়দা বসরা অভিযান শেষ করে আমরের সাহায্যের জন্য আজনাদাইনে পৌঁছলেন। হিজরী ১৩ সনে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মধ্যে এই আজনাদাইনে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। রোমান সেনাপতি নিহত হয় এবং তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। আজনাদাইনে রোমান সেনাপতি একজন আরব গুপ্তচরকে মুসলিম বাহিনীর খবর সংগ্রহের জন্য পাঠায়। সে মুসলিম সেনা ছাউনী ঘুরে ফিরে দেখে যাওয়ার পর রোমান সেনাপতি তাকে জিজ্ঞেস করে, কি খবর নিয়ে এলে? সে সত্য কথাটিই প্রকাশ করে দেয়। সে বলেঃ এই লোকগুলি ইবাদাতের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করে এবং দিনে রণক্ষেত্রে ঘোড় সওয়ার। তাদের শাহজাদাও যদি কোন অপরাধ করে, তারও ওপর শরীয়াতের বিধান কার্যকর করা হয়। এ কথা শুনে সেনাপতি মন্তব্য করে, সত্যিই যদি তারা এমন গুণাবলীর অধিকারী হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে মাটিতে পুঁতে যাওয়া অধিক শ্রেয়।

দিমাশ্‌ক অভিযানেও আমর তাঁর দুই সংগী খালিদ ও আবু উবাইদার সাথে অংশ গ্রহণ করেন এবং দিমাশকের 'তুমা' ফটক অবরোধের দায়িত্ব পালন করেন। দিমাশকের পর 'ফাহল' অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানেও তিনি মুসলিম বাহিনীর একটি অংশের সফল নেতৃত্ব দান করেন।

মুসলিম বাহিনীর ধারাবাহিক আক্রমণে রোমান বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে থাকে। অবশেষে রোমান সম্রাটের নির্দেশে বিপর্যস্ত রোমান বাহিনী নতুন ভাবে সংগঠিত হয়ে দু'লাখ সদস্যের এক বিশাল বাহিনীতে পরিণত হয় এবং মুসলিম বাহিনীকে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিরোধের জন্য 'ইয়ারমুক' নামক স্থানে সমবেত হয়। খালিদ, 'আমর ও শুরাহবীল ইবন হাসানার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীও ইয়ারমুকে উপস্থিত হয়। তবে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা চারগুণ বেশী ছিল। ইয়ারমুকের এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে 'আমর ইবনুল 'আস অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। রোমান বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। সমগ্র সিরিয়ায় ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়।

ইয়ারমুকের পূর্বেই 'আমর ইবনুল 'আস ফিলিস্তীনের কিছু অঞ্চলের বিজয় অভিযান শেষ করেছিলেন। এখন ইয়ারমুকের পর তিনি ফিলিস্তীনের সবচেয়ে বড় শহর 'ঈলিয়া' বা বাইতুল মাকদাস অভিযানে মনোযোগী হন। তিনি বাইতুল মাকদাস অবরোধ করেন। আবু উবাইদাও তাঁকে সাহায্য করেন। কোন রকম রক্তক্ষয় ছাড়াই তিনি বাইতুল মাকদাস জয় করেন। ঈলিয়াবাসীদের দাবী অনুযায়ী খালীফা উমার(রা) মদীনা থেকে বাইতুল মাকদাস উপস্থিত হন এবং তাদের সাথে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এভাবে এই প্রথমবারের মত এই গৌরবময় শহরটি মুসলমানদের অধিকারে আসে।

বাইতুল মাকদাস বিজয়ের বছরই সমগ্র সিরিয়া,ইরাক ও মিসরে মহামারি আকারে তাউন বা প্লেগ দেখা দেয়। হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। আমর ইবনুল আস সেনাপতি আবু উবাইদাকে সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাকদীরে গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা সে পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর জীবনও শেষ পর্যন্ত প্লেগ কেড়ে নেয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আমরকে সেনাপতি নিয়োগ করে যান। 'আমর ইবনুল 'আস প্লেগ আক্রান্ত স্থান থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেন।

সিরিয়া বিজয় সমাপ্তির পর 'আমর মিসরে অভিযান পরিচালনার জন্য খলীফা উমারের অনুমতি প্রার্থনা করেন। জাহিলী যুগে ব্যবসা উপলক্ষে আমর মিসরে আসা যাওয়া করতেন। এ কারণে মিসর সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ছিল। খলীফা প্রথমতঃ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে ইতস্ততঃ করলেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি দান করেন। আমর তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মিসর রওয়ানা হলে খালীফা উমার তাঁকে সাহায্যের জন্য যুবাইর ইবনুল আওয়ামের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠান।

হযরত 'আমর ইবনুল আস বাবুল ইউন, 'আরীশ, 'আইনু শামস বা ফুসতাত প্রভৃতি যুদ্ধে একের পর এক জয়লাভ করেন। অতঃপর তিনি ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য খলীফা 'উমারের অনুমতি চেয়ে পাঠান। অনুমতি লাভ করে বিজিত অঞ্চলের দায়িত্ব হযরত খারিজা ইবন হুজাফার ওপর ন্যস্ত করে তিনি ইসকান্দারিয়া অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করলেন। মাকুকাসের বাহিনী এবং শহরবাসী সুরক্ষিত কিল্লায় আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলো। তারা মাঝে মাঝে কিল্লার বাইরে এসে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে আবার কিল্লায় ফিরে যেত। এ অবস্থায় প্রায় দু'বছর কেটে গেল। খলীফা উমার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি 'আমরকে লিখলেন, তোমরা দু'বছর ধরে অবরোধ করে বসে আছ। এখনও কোন ফলাফল প্রকাশ পেল না। মনে হচ্ছে, রোমানদের মত তোরাও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে বসেছো। আমার এ চিঠি তোমার হাতে যখন পৌছবে তখনই লোকদের ডেকে তাদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে ভাষণ

দেবে এবং আমার এ চিঠি তাদের পাঠ করে শুনাবে। তারপর জুম'আর দিনে শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে।

খলীফার নির্দেশমত তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালান এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইস্কান্দারিয়া মুসলিম বাহিনীর অধিকারে আসে। খলীফাকে এ বিজয়ের খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুয়াবিয়া ইবন খাদীজকে মদীনায় পাঠান। মুয়াবিয়া যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন অপরাহ্ন। তিনি সোজা মসজিদে নববীতে চলে যান। খলীফা খবর পেয়ে সাথে সাথে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি আমার বাড়ীতে না এসে সোজা মসজিদে গেলে কেন? মুয়াবিয়া বললেন, আমি ধারণা করেছিলাম, এখন আপনার বিশ্রামের সময়। খলীফা বললেন, আমি দিনে ঘুমিয়ে প্রজাদের ধ্বংস করতে পারি?

ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর তিনি বারকা, যুওয়াইলা, তারাবিলস আল-মাগরিব, সাবরা প্রভৃতি অঞ্চল একের পর এক জয় করেন। তারাবিলস বিজয়ের পর তিনি দূত মারফত খলীফাকে সুসংবাদ পাঠান। তিউনিসিয়া, মরক্কো, আলজিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল সেখান থেকে মাত্র নয় দিনের দূরত্বে। তিনি খলীফার নিকট এ সকল অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার অনুমতি চাইলেন। বিজিত অঞ্চলের শান্তি-শৃংখলার কথা চিন্তা করে খলীফা পশ্চিম আফ্রিকার অভিযান স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। 'আমর ইবনুল 'আসের আফ্রিকা অভিযান এখানেই থেমে গেল।

মিসর বিজয় শেষ হওয়ার পর খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। এর অল্প কিছু দিন পর হযরত উমার শহীদ হন। খলীফা 'উসমানও আমরকে তাঁর পূর্ব পদে বহাল রাখেন। এই সময় রোমের উস্কানীতে ইসকান্দারিয়াবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমর ইবনুল আস অত্যন্ত কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেন এবং ভবিষ্যতে বিদ্রোহের আশংকায় ইসকান্দারিয়া শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন।

হিজরী ২৬ সনে হযরত উসমান (রা) তাঁকে মিসরের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করেন। তাবারী বলেন, কারও বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া খলীফা উসমান কাকেও অপসারণ করতেন না। তাঁর অপসারণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, মিসর অত্যন্ত উর্বর দেশ হওয়া সত্বেও আমরের সময়ে আশানুরূপ রাজস্ব আদায় হতো না। হযরত উমারের যুগ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল। এ বিষয়ে খলীফা উমার (রা) তাঁকে একটি পত্রও লিখেছিলেন। হযরত উসমানের সময়ও তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ ছিল। হযরত উসমান (রা) এ ব্যাপারে তাঁকে একটি পত্র লিখেন। আমর জবাব দেনঃ 'গাভী এর থেকে বেশী দুধ দিতে সক্ষম নয়।' এই জবাবের পর হযরত উসমান (রা) রাজস্বের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে তা 'আবদুল্লাহ ইবনে সা'দের হাতে ন্যস্ত করেন। এই ঘটনার পর থেকে আমর ও আবদুল্লাহর মধ্যে মত বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং মিসরের শাসন ব্যবস্থা অনেকটা অচল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা) আমরকে অপসারণ করে আবদুল্লাহকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। (তাবারী, ইবনুল আসীর) অন্য একটি বর্ণনা মতে ইসকান্দারিয়ার বিদ্রোহের পূর্বেই আমরকে অপসারণ করা হয়। বিদ্রোহ দেখা দিলে খলীফা উসমান তাঁকে বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করেন। বিদ্রোহ নির্মূলের পর খলীফা তাঁকে কেবল প্রতিরক্ষা বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োগ করতে চান। তিনি খলীফার এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন, "আমি শিং ধরবো, আর সে দুধ দুইবে" এমন হতে পারে না। এই বর্ণনা মতে হিজরী ২৫ সনে তাঁকে অপসারণ করা হয়।

হযরত আমর ইবনুল আস মিসর থেকে অপসারিত হয়ে মদীনায় চলে আসেন। হযরত উসমানের ওপর কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। মদীনায় আসার পর খলীফার সাথে তাঁর কথোপকথন হয় এবং তাতে এ অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে ওঠে।খলীফার সাথে যখন তাঁর কথা হয়, তখন মিসর থেকে প্রেরিত রাজস্ব খলীফার নিকট পৌঁছে গেছে। সে রাজস্ব আমর ইবনুল আস প্রেরিত রাজস্ব থেকে বেশী ছিল।

খলীফা বললেন, 'দেখ, গাভী বেশী দুধ দিয়েছে।' আমর সাথে সাথে জবাব দেন, 'হ্যাঁ তবে বাচ্চা অভুক্ত থাকবে।' এ ঘটনার পরও হযরত আমর ইবনুল আস (রা) পূর্বের মতই খলীফা উসমানের হিতাকাঙ্খী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। মিসর থেকে বিদ্রোহীরা যখন মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত ওসমান (রা) তাদেরকে বুঝানোর জন্য আমরকে পাঠান। তিনি তাঁর পূর্বের প্রভাব কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহীদের ফেরত পাঠান। তাছাড়া যখনই হযরত উসমানের (রা) সামনে কোন সমস্যা দেখা দিত, আমর ইবনুল আসের সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি অত্যন্ত সততার সাথে পরামর্শ দিতেন। খলীফা হতযরত উসমানের (রা) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যখন চরম আকার ধারণ করে তিনি তখন মজলিসে শূরার বৈঠক আহবান করেন। হযরত আমর ইবনুল আস ছিলেন এ বৈঠকের অন্যতম সদস্য। শূরার সাথে পরামর্শের পর খলীফা আমরের কাছে বিশেষভাবে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করেন। তিনি খলীফাকে তাঁর পূর্ববর্তী দুই খলীফা—আবু বকর ও উমারের (রা) পদাঙ্ক অনুসরণের পরামর্শ দেন। অর্থাৎ প্রয়োজনে কোমল ও প্রয়োজনে কঠোর হতে বলেন।

মিসরের ওয়ালীর পদ থেকে অপসারিত হয়ে মূলতঃ তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান এবং ফিলিস্তীনে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তবে মাঝে মাঝে মদীনায় আসা-যাওয়া করতেন। বিদ্রোহীদের দ্বারা খলীফা উসমান যখন অবরুদ্ধ হন, আমর ইবনুল আস তখন মদীনায়। তিনি যখন দেখলেন বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন এ কথা বলে মদীনা ত্যাগ করেন যে, উসমানের হত্যায় যার হাত থাকবে আল্লাহ্ তাকে অপমান করবেন এবং যে তাকে সাহায্য করতে পারবে না তার মদীনা ত্যাগ করা উচিত। তিনি মদীনা ছেড়ে সিরিয়া চলে গেলেন। তবে সব সময় লোক মারফত মদীনার খোঁজ-খবর রাখতেন। অতঃপর হযরত উসমানের শাহাদাত এবং উটের যুদ্ধ সংঘটিত হয়; কিন্তু তিনি সিরিয়ার নির্জনবাস থেকে বের হলেন না। কোন কিছুতেই জড়িত হলেন না।

হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধ শুরু হল। হযরত আলী হযরত মুয়াবিয়ার কাছে আনুগত্যের দাবী করলেন। মুয়াবিয়া আমর ইবনুল আসের সাথে পরামর্শ করলেন। বর্ণিত আছে, প্রথমত আমর মুয়াবিয়াকে বলেছিলেন, কোন অবস্থাতেই মুসলিম উম্মাহ্ আপনাকে আলীর পদমর্যাদা দেবে না। কিন্তু পরে দেখা গেল এই ঝগড়ায় আমর ইবনুল আস সম্পূর্ণভাবে মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলেন। সিফ্ফীনে উভয় পক্ষের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে আমর ছিলেন মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর সিপাহসালার। আমরের পরামর্শেই এ যুদ্ধে আসন্ন পরাজয়ের মুহূর্তে বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে মুয়াবিয়া আলীর (রা) কাছে আপোষ-মিমাংসার প্রস্তাব দেন এবং আলীকে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণায় বাধ্য করেন। অতঃপর বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দু'সদস্য বিশিষ্ট যে সালিশী বোর্ড গঠন করা হয়, সে বোর্ডে আমর ইবনুল আস ছিলেন মুয়াবিয়ার মনোনীত, আর আবু মূসা আশয়ারী (রা) ছিলেন আলীর (রা) মনোনীত সদস্য।

আমর ও আবু মূসা আশয়ারী বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর দু'মাতুল জান্দালে উপস্থিত হলেন তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য। কিন্তু ঘোষণার মুহূর্তে আমর পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে কূটনৈতিক প্যাঁচের মাধ্যমে মুয়াবিয়াকে খলীফা বলে ঘোষণা দান করেন এবং সাথে সাথে প্রতিপক্ষ আবু মূসার (রা) মুখ দিয়েও আলীকে (রা) বরখাস্তের কথাটি ঘোষণা করিয়ে নেন।

মুসলিম উম্মার আত্মঘাতী বিরোধ নিষ্পত্তির যে সম্ভাবনা সালিশী বোর্ড গঠনের মাধ্যমে দেখা দিয়েছিল, ঐতিহাসিকদের মতে তা হযরত আমরের (রা) কূটকৌশলের কারণে ব্যর্থ হয়। উভয় পক্ষে আবার বিরোধ ও যুদ্ধ শুরু হয়। আমর মিসর আক্রমণ করে হযরত আলী কর্তৃক নিযুক্ত মিসরের গভর্ণর মুহাম্মাদ বিন আবী বকরকে পরাজিত ও হত্যা করে মিসর দখল করেন।

অতঃপর চরমপন্থী খারেজী সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেহেতু মুসলিম উম্মার বিভেদের কারণ প্রধানতঃ তিন ব্যক্তি ঃ আলী, মুয়াবিয়া ও আমর। সুতরাং তাদেরকে দুনিয়া থেকে

সরিয়ে দিতে হবে। ইবন মুলজিম, বারক বিন আবদিল্লাহ ও আমর ইবন বকর আত-তামীমীর ওপর এ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। সিদ্ধান্ত মুতাবিক নির্ধারিত দিন ও সময়ে তারা তিন জনের ওপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায়। হযরত আলী শহীদ হলেন, মুয়াবিয়া সামান্য আহত হয়ে বেঁচে গেলেন। আর আমর অসুস্থ থাকায় তাঁর পরিবর্তে খারেজা ইবন হুজাফা নামায পড়াতে বেরিয়েছিলেন, আততায়ী তাঁকেই আমর ইবনুল আস মনে করে আঘাত হানে এবং তাকে হত্যা করে। এভাবে আমরও বেঁচে গেলেন।

আমীর মুয়াবিয়া (রা) আমরকে মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন। মিসরের ওয়ালী থাকাকালে তাঁর ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলেও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তিনি মিসরের ওয়ালীর পদে বহাল থাকেন। মিসরের ওয়ালী থাকাকালীন হিজরী ৪৩ মতান্তরে ৪৭ অথবা ৫১ সনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জীবনের আশা ছেড়ে দেন। জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনায় ভীষণ দগ্ধিভূত হন।

তিনি যখন মৃত্যু শয্যায়, ইবন 'আব্বাস তাঁকে দেখতে আসেন। সালাম বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, আবু আবদিল্লাহ, কেমন অবস্থা? 'আমর জবাব দিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছেন? আমার দুনিয়া তৈরী হয়েছে, কিন্তু দ্বীন বিনষ্ট হয়েছে। যদি এমন না হয়ে এর বিপরীত হতো, তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি সফলকাম হতাম। যদি শেষ জীবনের চাওয়া ফলপ্রসূ হতো তাহলে অবশ্যই চাইতাম। যদি পালিয়ে বাঁচার পথ থাকতো, পালাতাম। কিন্তু মিনজিনিকের মত আমি এখন আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় আছি। হাতের সাহায্যে না উপরে উঠতে পারছি, না পায়ের সাহায্যে নীচে নামতে পারছি। ভাতিজা, আমার উপকারে আসে এমন কিছু নসীহত আমাকে কর। ইবন আব্বাস বললেন, আফসুস! সে সময় আর কোথায়! এখন তো ভাতিজা বৃদ্ধ হয়ে আপনার ভাই হয়ে গেছে। এখন যদি আপনি আমাকে কাঁদতে বলেন, কাঁদতে পারি। আমর বললেন, এখন আমার বয়স আশি বছরেরও কিছু বেশী। এখন তুমি আমাকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করছো। হে আল্লাহ, এই ইবন আব্বাস আমাকে তোমার রহমত থেকে নিরাশ করছে। তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এমন শাস্তি তুমি এখনই আমাকে দাও। ইবন আব্বাস বললেন, আবু আবদিল্লাহ, যে জিনিস আপনি নিয়েছিলেন তাতো নতুন আর যা দিচ্ছেন তাতো পুরাতন। আমর বললেন, ইবন আববাস, তোমার কী হয়েছে, আমি যা বলছি, তুমি তার উল্টা বলছো? (আল-ইসতিয়াব)

আবদুর রহমান ইবন শাম্মাসা বলেন, তিনি আমর ইবনুল আসকে মৃত্যু শয্যায় দেখতে যান। আমর দেয়ালের দিকে মুখ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ বললেন, আব্বা, কাঁদছেন কেন? রাসূলুল্লাহ (সা) কি আপনাকে অমুক অমুক বাশারাত বা সুসংবাদ দেননি? তিনি জবাব দিলেন, আমার সর্বোত্তম সম্পদ—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর শাহাদাত বা সাক্ষ্য। আমার জীবনের তিনটি পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি পর্ব এমন গেছে যখন আমি ছিলাম কট্টর দুশমন। আমার চরম বাসনা ছিল, যে কোনভাবেই রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যা করা। তারপর আমার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু। রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করে ইসলাম কবুল করলাম। তখন আমার এমন অবস্থা যে, রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে আর কোন ব্যক্তি আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বা সম্মানী বলে মনে হয়নি। অতিরিক্ত সম্মান ও ভীতির কারণে তাঁর প্রতি আমি ভালো করে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি। কেউ যদি এখন আমাকে তাঁর চেহারা মুবারক কেমন ছিল জিজ্ঞেস করে, আমি তাকে কোন কিছুই বলতে পারিনে। তখন যদি আমার মরণ হতো, জান্নাতের আশা ছিল। এরপর আমার জীবনের তৃতীয় পর্ব। এ সময় আমি নানা রকম কাজ করেছি। আমি জানিনে এখন আমার কি অবস্থা হবে। আমার মৃত্যু হলে বিলাপকারীরা যেন আমার জানাযার সাথে না যায়।

দাফনের সময় ধীরে ধীরে মাটি চাপা দেবে। দাফনের পর একটি জন্তু জবেহ করে তার গোশত ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়া যায়, এতটুকু সময় কবরের কাছে থাকবে। যাতে আমি তোমাদের উপস্থিতিতেই কবরের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি এবং আল্লাহর দূতের প্রশ্নসমূহের জবাব ঠিক করে নিতে পারি। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

তিনি তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে মৃত্যুর পর তাঁকে কিভাবে দাফন করতে হবে সে সম্পর্কে অসীয়াত করলেন। তারপর জিকরে মশগুল হলেন। বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ, তুমি নির্দেশ দিয়েছিলে, আমি তা অমান্য করেছি, তুমি নিষেধ করেছিলে, আমি নাফরমানী করেছি। আমি নির্দোষ নই যে, ওজর পেশ করবো, আমি শক্তিমানও নই যে, বিজয়ী হব।" তারপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে পড়তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হিজরী ৪৩ সনের ১লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামাযের পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ জানাযার নামায পড়ান। মিসরের 'মাকতাম' নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তাঁর নিজ হাতে তৈরী মিসরের প্রথম মসজিদ 'জামে' আমর ইবনুল আস'-এর পাশে তাঁর কবরটি আজও চিহ্নিত রয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই বছর।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আমর ইবনুল আসের জীবনের বেশী অংশ জিহাদের ময়দানেই কেটেছে। এ কারণে জ্ঞান অর্জন ও চর্চার সময় ও সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন। কুরআন তিলাওয়াতে তিনি বিশেষ পুলক ও স্বাদ অনুভব করতেন। অত্যন্ত সুন্দর করে তিলাওয়াত করতেন। জীবনটি জিহাদের ময়দানে কাটলেও যতটুকু সময় পেয়েছেন রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত থেকে ইলম ও আমলের উন্নতি সাধন করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ৩৯টি হাদীস বা বাণী তিনি বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ৩টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। ৩টি এককভাবে মুসলিম বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আমর ইবনুল আস জিহাদের ব্যস্ততা সত্ত্বেও শিক্ষাদান ও ওয়াজ-নসীহতের দায়িত্বও পালন করতেন। 'জাতুস সালাসিল' যুদ্ধে বিজয়ের পর সেখানে অবস্থান করে নও-মুসলিমদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দুনিয়ার প্রতি কিছু মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলে তিনি বক্তৃতা-ভাষণে রাসূলুল্লাহর (সা) আদর্শ অনুসরণের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতেন।

তিনি সাহিত্য রসিকও ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক। অল্পকথায় অধিক ভাব প্রকাশ, সুন্দর উপমা প্রয়োগ এবং বাক্য ও ভাবের অলঙ্করণ তাঁর সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সাহিত্যের বহু নমুনা সংরক্ষিত হয়েছে। বিশেষতঃ 'আমুর রামাদাহ' অর্থাৎ যে বছর আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সে বছর খলীফা উমার মদীনা থেকে মিসরে অবস্থানরত আমরকে খাদ্যশস্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন এবং সে চিঠির জবাবে আমর যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন তা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তাছাড়া তাঁর বক্তৃতা-ভাষণ, পত্রাবলী ও বিভিন্ন ধরনের লেখায় সাহিত্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে।

হযরত আমর ইবনুল আসের সমগ্র জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় তিনি তাঁর জীবনে পরীক্ষার বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করেছেন। সবগুলি পর্বে তিনি সমানভাবে সফলকাম হতে পারেননি। বিশেষতঃ সাহাবী জীবনের শেষ পর্বের কিছু ঘটনার যৌক্তিতা আপাতঃ দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলামী উম্মাহ্ ইমামরা জীবনের শেষ পর্বের এসব ভূমিকাকে তাঁর ইজতিহাদী ভুল বলে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। তবে জীবনের এ পর্বের কতিপয় বিতর্কিত ঘটনা ছাড়া অন্য সকল সাহাবীদের মত তাঁর সামগ্রিক জীবনকে রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্য ফুলের মত শুভ্র ও সুন্দর করে তুলেছিল।

আমর ইবনুল আসের (রা) ঈমানের বলিষ্ঠতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর আমর ইবনুল আস ঈমান এসেছে।' অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আসের দুই পুত্র—হিশাম ও আমর ঈমান এনেছে।' (মুসনাদে ইমাম আহমাদ) এ কথার সত্যতা তাঁর জীবনের একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পাঠালেন, 'আমর যেন পোশাক পরে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এখনই হাজির হয়। নির্দেশ মত আমর সাথে সাথে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অজু করছিলেন, তিনি চোখ তুলে তাকালেন। তারপর চোখ নীচু করে বললেন, তোমাকে আমীর বানিয়ে পাঠাতে চাই। ইন্‌শাআল্লাহ তুমি নিরাপদ থাকবে এবং প্রচুর গনীমাত লাভ করবে। সেই গনীমাত থেকে তুমিও একটা অংশ পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আমর বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করিনি; বরং তা গ্রহণ করেছি অন্তরের টানে। রাসূল (সা) বললেন, 'পবিত্র সম্পদ সত্যনিষ্ঠ মানুষের জন্যই উত্তম।' আরেকবার রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আমর ইবনুল আস কুরাইশদের নেককার ব্যক্তিদের অন্যতম। (মুসনাদে আহমাদ)

একদিন তিনি কা'বার দেয়ালের ছায়ায় বসে লোকদের হাদীস শুনাচ্ছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কোন ইমামের হাতে বাইয়াত করেছে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর সহায়তা করা উচিত। কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করলে তাকে প্রতিহত করাও উচিত।"আবদুর রহমান ইবন আবদে কা'বা (এই হাদীসের বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি হাদীসটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছেন? 'আমর নিজের কান ও অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'আমার এ দু'টি কান শুনেছে ও অন্তর সংরক্ষণ করেছে।' এরপর আবদুর রহমান বললেন, আপনার চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া আমাদেরকে অবৈধভাবে একে অপরের সম্পদ খাওয়ার ও অন্যায়ভাবে প্রাণ নষ্ট করার আদেশ দেয়। এ কথা শুনে 'আমর চুপ হয়ে যান। তারপর বলেন, "আল্লাহর নাফরমানি যাতে না হয় তা মান এবং যাতে নাফরমানি হয় তা মানবে না।" এ দ্বারা বুঝা যায় তিনি প্রকৃতিগত ভাবেই ছিলেন সত্যনিষ্ঠ।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আমর ইবনুল আসকে (রা) তাঁর [illegible] জন্য ভালোবাসতেন। হযরত হাসান (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করেন, এমন ব্যক্তি কি সৎ স্বভাব বিশিষ্ট নয়, যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসতেন? তিনি বললেন, তার সৌভাগ্য সম্পর্কে কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? লোকটি বললেন, 'শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে ভালোবাসতেন।'

জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের কতিপয় ব্যক্তির অন্যতম। ইমাম শা'বী বলতেন, ইসলামী আরবে কূটনীতিক চার জন। তন্মধ্যে আমর ইবনুল আস অন্যতম। (আল-ইসাবা) কূটনীতিতে একমাত্র হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) ছিলেন তাঁর সমকক্ষ। তাঁর দৈহিক গঠন, চাল-চলন, কথা-বার্তা প্রভৃতির মাঝে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠতো যে, তিনি নেতৃত্বের জন্যই জন্ম লাভ করেছেন। বর্ণিত আছে, একদিন আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা) তাঁকে আসতে দেখে প্রথমে একটু হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, 'আমীর বা নেতা হওয়া ছাড়া আবু আবদিল্লাহর পৃথিবীতে হেঁটে বেড়ানো উচিত নয়।' (রিজালুন হাওলার রাসূল—৬১৮)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সুস্থ মতামতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'তুমি ইসলামে সঠিক মতামতের অধিকারী'—এ কথা রাসূল (সা) তাঁকে বলেছেন। (কানযুল উম্মাল) হযরত ফারুকে আজম (রা) যখন কোন মোটা বুদ্ধির লোক দেখতেন, বিস্ময়ের সাথে বলতেন, এই ব্যক্তি ও আমর ইবনুল আসের স্রষ্টা একই সত্তা! (আল-ইসাবা)

হযরত আমরের এই সীমাহীন বুদ্ধিমত্তা ও দুঃসাহসের জন্য হযরত রাসূলে পাক (সা) বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবু বকর, উমার ও আবু উবায়ইদার (রা) মত উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের ওপরও তাঁকে আমীর নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকৃতই তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি দুর্যোগময় মুহূর্তে আমীর বা নেতার মত যোগ্যতা ও মেধার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর যোগ্যতা লক্ষ্য করেই উমারের (রা) মত বিচক্ষণ শাসক তাঁকে ফিলিস্তীন, জর্দান, তারপর মিসরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তিনি তাঁর খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত এ পদে বহাল রেখেছিলেন।

ইতিহাসে তাঁকে 'ফাতেহ মিসর'—মিসর বিজয়ী বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যে অর্থে তাঁকে বিজয়ী বলা হয় সেই অর্থে বিজয়ী নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি মিসরবাসীর মুক্তিদাতা। রোমানদের শত শত বছরের দাসত্ব ও শৃঙ্খল থেকে তিনি মিসরবাসীকে মুক্তি দেন এবং সমগ্র আফ্রিকায় ইসলামী দাওয়াতের পথ সুগম করেন।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হযরত আমরের (রা) জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। সকল যুদ্ধেই তিনি প্রখ্যাত সেনানায়ক হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা) পাশাপাশি থেকেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, সেই প্রথম থেকে যুদ্ধের ময়দানে রাসূল (সা) অন্য কাউকে আমার ও খালিদের সমকক্ষ মনে করেননি। (মুসতাদরিক) মদীনায় যখনই কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত করে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। একবার কোন কারণে মদীনায় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবু হুজায়ফার গোলাম সালেম তলোয়ার হাতে মদীনার মসজিদে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরও অসি কোষমুক্ত করে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরে রাসূলে পাক (সা) খুতবার মধ্যে বললেন, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আশ্রয়ে আস না কেন এবং আমর ও সালেমকে কেন আদর্শ হিসেবে গ্রহণ কর না? (আল-ইসাবা)

হযরত আমর ইবনুল আস ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। আল্লাহর রাস্তায় তিনি প্রশস্ত চিত্তে ব্যয় করেছেন। খোদ রাসূলে খোদা (সা) একাধিকবার সে কথা স্বীকার করেছেন। 'আলকামা ইবন রামসা বালাবী বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক বাহিনী সহ আমরকে পাঠালেন বাহরাইন এবং নিজে বের হলেন অন্য এক অভিযানে। আমিও রাসূলুল্লাহর (সা) এ অভিযানে সহযাত্রী ছিলাম। একদিন রাসূল (সা) একটু তন্দ্রালু হলেন। তন্দ্রা কেটে গেলে বললেন, 'আল্লাহ, আমরের ওপর রহম কর।' আমাদের মধ্যে যারা এ নামের ছিল, আমরা প্রত্যেকেই তাদের কথা চিন্তা করলাম। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তন্দ্রাভিভূত হলেন এবং জেগে উঠে একই কথা বললেন। আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোন্ আমরের কথা বলছেন?' বললেন ঃ আমর ইবনুল আস। আমরা কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ আমার সেই সময়ের কথা স্মরণ হয়ে গেল যখন আমি মানুষের কাছে সাদাকাহ বা দান চেয়েছি, সে প্রচুর সাদাকাহ নিয়ে এসেছে। যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছি, এত সাদাকাহ কোথা থেকে নিয়ে এসেছো? সে বলেছে, আল্লাহ দিয়েছেন। অন্য একবার রাসূল (সা) তিনবার বলেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমর ইবনুল আসকে ক্ষমা করে দাও। যখন আমি তাকে সাদাকাহ দেয়ার জন্য বলেছি, সে সাদাকাহ নিয়ে হাজির হয়েছে।"

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)

নাম আবু সুলাইমান খালিদ, লকব সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি)। পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা এবং মাতা লুবাবা আস-সুগরা, উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনা বিনতুল হারিস ও হযরত আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী লুবাবা আল-কুবরার বোন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আব্বাস (রা) তাঁর খালু। (উসুদুল গাবা-২/৯৩)

তাঁর খান্দান ছিল জাহিলী আরবের কুরাইশদের মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত। কুব্বা ও 'আয়িন্না (সৈন্য ও সেনা ক্যাম্পের পরিচালন দায়িত্ব)—এ দু'টি দায়িত্ব ছিল তাঁর খান্দানের ওপর। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় খালিদ ছিলেন এই পদে অধিষ্ঠিত। (আল-ইসতিয়াব-১/১৫৭) হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য কুরাইশদের যে দলটি মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তার নেতা ছিলেন খালিদ। উহুদ যুদ্ধে বীরত্বের সাথে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েন এবং মক্কার মুশরিক বাহিনীর সুনিশ্চিত পরাজয়কে বিজয়ে রূপদান করেন।

হযরত খালিদের ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। তবে মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি আছে।

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) হাবশা থেকে মদীনায় চলেছেন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। পথে মদীনা অভিমুখী আরেকটি কাফিলার সাথে তাঁর সাক্ষাৎ। তারাও চলেছেন একই উদ্দেশ্যে মদীনায়। দ্বিতীয় এই দলটির সাথে ছিলেন হযরত খালিদ। হযরত 'আমর ইবনুল 'আস খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন দিকে?' খালিদ জবাব দিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এ ব্যক্তি নবী—আর কতদিন এভাবে চলবে? চলো যাই ইসলাম গ্রহণ করি।' (আল-ইসাবা-১/৪১৩, মুসনাদে আহমাদ) তাঁরা মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। প্রথমে খালিদ, তারপর 'আমর ইবনুল 'আস রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। 'আমর মক্কায় ফিরে আসেন; কিন্তু খালিদ মদীনায় থেকে যান।

হযরত খালিদ বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ দেখেছিলাম, আমার আশা ছিল এ বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত তোমাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের কাছেই সমর্পণ করবে।' খালিদ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর হাতে বাইয়াত করার সময় বলেছিলাম, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে যত পাপ আমি করেছি তা ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সা) বলেছিলেন, ইসলাম অতীতের সকল গুনাহ-খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ কথার ওপরই আমি বাইয়াত করলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে যত অপরাধ সে করেছে, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৮৪-৮৫)

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ইসলাম-পূর্ব খান্দানী সামরিক পদে বহাল রেখে তাঁর খিদমত গ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা-২/৯৩) ইসলাম-পূর্ব জীবনে তিনি ছিলেন মুসলমানদের চরম দুশমন, আর ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের জন্য হয়ে দাঁড়ান ভীষণ বিপজ্জনক। অসংখ্য যুদ্ধে তাঁর তরবারি মুশরিকদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ সর্বপ্রথম মূতা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াতী কার্যক্রমের আওতায় হযরত হারিস ইবন 'উমাইর আযদীকে একটি পত্রসহ বসরার শাসকের নিকট পাঠান। শুরাহবীল ইবন 'আমর গাস্সানী মূতা নামক স্থানে হারিসকে হত্যা করে। এ

ঘটনার প্রতিশোধকল্পে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়িদ ইবন হারিসার নেতৃত্বে দু'হাজার সৈন্যের এক বাহিনী পাঠান। প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লাখ। যায়িদ ইবন হারিসার বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উপদেশ দেন, "যুদ্ধে যায়িদ যদি শহীদ হয় তাহলে জা'ফর এবং জা'ফর শহীদ হলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বাহিনীর নেতৃত্ব দেবে। আর যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের কাউকে আমীর বানিয়ে নেবে।"

তাঁরা ছিলেন তিনজন— যায়িদ, জা'ফর ও আবদুল্লাহ! তাঁরা সিরিয়ার মূতা অভিযানের তিন বীর। এ অসম যুদ্ধে তাঁরা নজীরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে একে একে শাহাদাত বরণ করেন। অবশেষে হযরত খালিদ নেতৃত্ব লাভ করেন। একের পর এক তিন সেনাপতির শাহাদাত বরণে মুসলিম বাহিনী সাহস হারিয়ে ফেলে। খালিদ শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে না পারলেও মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেন।

হযরত রাসূলে করীম (সা) উল্লেখিত তিন সেনাপতির শাহাদাত ও খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণের খবর মদীনায় ঘোষণা করেছিলেন এভাবেঃ

"যায়িদ ইবন হারিসা পতাকা হাতে নিয়ে শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করে। তারপর জা'ফর সেই পতাকা তুলে নেয় এবং সেও যুদ্ধ করে শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সেই পতাকা হাতে তুলে নেয় এবং সেও শহীদ হয়। অতঃপর 'সাইফুন মিন সুয়ূফিল্লাহ'— আল্লাহর অন্যতম এক তরবারি সে পতাকা তুলে ধরে এবং তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করেন।" (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৮৬) এইভাবে তিনি লাভ করেন 'সাইফুল্লাহ'— আল্লাহর অসি উপাধি। অবশ্য এই উপাধি লাভের ঘটনা বা সময় সম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কোন এক স্থানে হযরত রাসূলে করীম (সা) অবস্থান করছিলেন। কেউ পাশ দিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন,—কে? জবাবে বলা হচ্ছিল অমুক। এক সময় খালিদ গেলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন,—কে? বলা হলো, খালিদ। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাহ্ খালিদ কত ভালো। সে আল্লাহর অন্যতম এক তরবারি। এটা মূতার পরের ঘটনা। (উসুদুল গাবা-২/৯৪, আল-ইসাবা-১/৪১৩)

যায়িদ, জা'ফর ও আবদুল্লাহ—এ তিন সেনাপতির অধীনে হযরত খালিদ একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে মূতা অভিযানে যোগদান করেছিলেন। উল্লেখিত তিনজনের শেষ ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করলে হযরত সাবিত ইবন আকরাম দৌড়ে পতাকার কাছে যান এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যাতে কোন বিশৃংখলা দেখা না দেয় সে জন্য ডান হাতে পতাকা উঁচু করে ধরেন। পতাকা তুলে ধরে তিনি এক দৌড়ে হযরত খালিদের কাছে এসে বলেন, 'খুজ আল-লিওয়াআ ইয়া আবা সুলাইমান,— 'আবু সুলাইমান, পতাকাটি তুমি ধর'। যে বাহিনীর মধ্যে প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারগণ ছিলেন, সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার কোন অধিকার-যে খালিদের মত নও মুসলিমের থাকতে পারেনা এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে সাবিত ইবন আকরামকে বলেন, 'না, পতাকা আমি গ্রহণ করতে পারিনা; আপনিই এর যোগ্যতম ব্যক্তি। আপনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং বদরী (অর্থাৎ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী)।' সাবিত জবাব দিলেন, 'ধর, যুদ্ধে তুমি আমার থেকে পারদর্শী। এ পতাকা আমি তোমার জন্যই তুলে এনেছি।' তারপর হযরত সাবিত (রা) মুসলিম বাহিনীকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা কি খালিদের নেতৃত্বে রাজি?' তারা সমস্বরে জবাব দিলঃ 'হাঁ, আমরা রাজি'। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৮৬-৮৭) খালিদ বলেন, মূতার যুদ্ধে আমার হাতে সাতখানি তরবারি ভাঙ্গে। অবশেষে একখানি ইয়ামনী তরবারি অক্ষত থাকে। (উসুদুল গাবা-২/৯৪)

মক্কা বিজয়কালে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের দায়িত্ব তাঁকে দেন। বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় হলেও খালিদের হাতে সেদিন কতিপয় মুশরিক প্রাণ হারায়। তিনি 'কুদার' দিক দিয়ে মক্কায় ঢুকছিলেন, পথে মক্কার একটি মুশরিক দলের মুখোমুখি হন। মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ শুরু করে। তিনি তীর ছুঁড়ে তাদের জবাব দেন। তাতে কয়েকজন মুশরিক নিহত হয়। এজন্য তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জবাবদিহি করতে হয়। রাসূল (সা) যখন জানলেন, মুশরিকরাই প্রথম আক্রমণ চালিয়েছে, তখন তিনি এটাকে আল্লাহর ইচ্ছা হিসাবে মেনে নিয়ে চুপ করে যান।

হুনাইন অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বারো হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত হয় মুসলিম বাহিনী। হযরত রাসূলে করীম (সা) গোটা বাহিনীকে গোত্র ভিত্তিক কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন। বনু সুলাইম গোত্র ছিল গোটা বাহিনীর পুরোভাগে। আর এর কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন হযরত খালিদ। এ যুদ্ধে তিনি দারুণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর শরীরের একাধিক স্থান আহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখতে আসেন, তাঁর আহত স্থানসমূহে ফুঁক দেন এবং তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। (উসুদুল গাবা-২/৯৫) তায়িফ অভিযানে খালিদ ছিলেন অগ্রগামী বাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসার। হিজরী নবম সনে তাবুক অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। রাসূল (সা) এ যুদ্ধে দুমাতুল জান্দাল-এর সরদার উকাইদার ইবন আবদিল মালিকের বিরুদ্ধে চার শো সৈনিক সহ পাঠান। খালিদ উকাইদারের ভাইকে হত্যা করেন এবং উকাইদারকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির করেন।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদকে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে বনী জুজাইমা গোত্রে পাঠান। খালিদের দাওয়াতে বনী জুজাইমা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সঠিক ভাষায় তা ব্যক্ত করতে না পারায় খালিদ তাদের ভুল বুঝেন। তিনি আক্রমণের নির্দেশ দেন। ফলে, এই গোত্রের বহু লোক হতাহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টি অবগত হয়ে ভীষণ দুঃখিত হন। তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করেন; 'হে আল্লাহ, আমি খালিদের এই কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত' তারপর হযরত আলীকে পাঠিয়ে তাদের সকল ক্ষতিপূরণ দান করেন। তাদের নিহত কুকুরগুলিরও ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। (বুখারীঃ কিতাবুল মাগাযী, উসুদুল গাবা-২/৯৪)

এই ঘটনার পর খালিদ মদীনায় ফিরে এলে বিষয়টি নিয়ে তাঁর ও আবদুর রহমান ইবন 'আউফের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে খালিদ আবদুর রহমানকে কিছু গালমন্দ করেন। কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছালে তিনি রেগে যান এবং খালিদকে বলেন, "আমার সাহাবীদের গালি দেবে না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও ব্যয় করে তবুও সে তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ ব্যয়ের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।" (উসুদুল গাবা-২/৯৫)

হিজরী দশম সনে হযরত রাসূলে করীম (সা) খালিদকে নাজরানের 'বনু আবদিল মাদ্দান' গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য পাঠান। যেহেতু খালিদ বনু জুজাইমার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে মারাত্মক ভুল করেছিলেন, এ কারণে রাসূল (সা) যাত্রার পূর্বে তাঁকে বিশেষ হিদায়াত দেনঃ 'কেবল ইসলামের দাওয়াতই দেবে, কোন অবস্থাতেই তলোয়ার উঠাবে না'। তিনি এ হিদায়াত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁর দাওয়াতে গোটা আবদুল মাদ্দান গোত্র ইসলাম কবুল করে। এভাবে রণক্ষেত্রের এক সৈনিক প্রথমবারের মত সত্যিকার 'দায়ী-ই ইসলাম' ইসলামের দাওয়াত দানকারী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ সকল নওমুসলিমকে তিনি তালীম ও তারবিয়াত দেন এবং তাদেরকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে নিয়ে আসেন। একই বছর ইয়ামনবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আলী ও খালিদকে (রা) পাঠানো হয়। তাঁদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইয়ামনবাসী ইসলাম কবুল করে।

জাহিলী আরবের কুরাইশদের মূর্তি পূজার কেন্দ্রসমূহের একটি ছিল 'উয্যা'। রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদকে পাঠালেন কেন্দ্রটি ধ্বংসের জন্য। তিনি সেখানে পৌঁছে নিম্নের পংক্তিটি আবৃত্তি করতে করতে কেন্দ্রটি মাটিতে মিশিয়ে দেন ঃ "ওহে উয্যা, তুমি পবিত্র নও, আমরা তোমায় অস্বীকার করি, আমি দেখেছি, আল্লাহ তোমায় অপমানিত করেছেন।" (উসুদুল গাবা-২/৯৪)

হযরত রাসূলে করীমের (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে ইসলাম ত্যাগকারী, নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ও যাকাত অস্বীকারকারীদের মারাত্মক ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই ফিতনাবাজদের শির-দাঁড়া গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য খলীফা আবু বকর (রা) সেনা বাহিনী প্রস্তুত করে নিজেই যাত্রার জন্য ঘোড়ায় চড়লেন। কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবীরা মনে করলেন খলীফার এ সময় দারুল খিলাফা মদীনায় থাকা উচিত। হযরত আলী (রা) খলীফার ঘোড়ার লাগামটি ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর রাসূলের খলীফা, কোন্ দিকে? উহুদের দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে যে-কথা বলেছিলেন, আমি সে কথাই বলছি ঃ ওহে আবু বকর, তোমার তরবারি উন্মত্ত হয়ে গেছে, তুমি তোমার নিজকে দিয়ে আমাদের ব্যথিত করো না।" খলীফা সিদ্ধান্ত বাতিল করে মদীনায় থেকে গেলেন। তিনি গোটা সেনা বাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং একটি ভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন খালিদকে। খালিদকে মদীনা থেকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'খালিদ আল্লাহর একটি তরবারি—যা আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছেন। খালিদ আল্লাহর কতইনা ভালো বান্দা এবং গোত্রের কতই না ভালো ভ্রাতা'। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯১)

হযরত খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। প্রতিটি অভিযানের পূর্বে তিনি তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিতেন ঃ তোমরা কৃষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। তাদের নিরাপদে থাকতে দেবে। তবে তাদের কেউ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

ভণ্ড নবী তুলাইহার বিরুদ্ধে খালিদ অভিযান পরিচালনা করেন। তুমুল লড়াই চলছে। প্রতিটি সংঘর্ষেই তুলাইহার সঙ্গীরা পরাজয় বরণ করছে। একদিন তুলাইহা তার ঘনিষ্ঠজনদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের এমন পরাজয় হচ্ছে কেন? তারা বললো, কারণ, আমাদের প্রত্যেকেই চায় তার সঙ্গীটি তার আগে মারা যাক। অন্যদিকে আমরা যাদের সাথে লড়ছি, তাদের প্রত্যেকেই চায় তার সঙ্গীর পূর্বে সে মৃত্যুবরণ করুক। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৯৩) খালিদ তুলাইহার সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করেন এবং তার তিরিশ জন সঙ্গীকে বন্দী করে মদীনায় পাঠান। তিনি মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত হামযার হন্তা হযরত ওয়াহশীর হাতে ভণ্ড মুসাইলামা নিহত হয়।

ভণ্ড নবীদের ফিতনা নির্মূল করার পর হযরত খালিদ যাকাত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী)-দের দিকে ধাবিত হন। সর্বপ্রথম আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ে আঘাত হানেন। তাদের কিছু মারা যায়, কিছু বন্দী হয়, আর অবশিষ্টরা তাওবাহ করে আবার ইসলামে ফিরে আসে। (তারীখুল খুলাফা ঃ সুয়ূতী-৭২) মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল অভিযানে খালিদ ছিলেন অগ্রভাগে। তাবারী বলেছেন ঃ 'মুরতাদদের বিরুদ্ধে অভিযানে যত বিজয় অর্জিত হয়েছে, তার সবই খালিদ ও অন্যান্যদের কৃতিত্ব।'

আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমনের পর হযরত খালিদ ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। মুজার, কাইসার, আলীম, আমগীশীয়া, হীরা, আমবার, আইনুত তামার, দুমাতুল জান্দাল, হাসীদ, খানাফিস, সানা ও বিশর, ফিরাদ প্রভৃতি যুদ্ধে তিনি অতুলনীয় সাহস ও কৌশল প্রদর্শন করে সমগ্র ইরাক পদানত করেন। হযরত খালিদের সাথে ইরাকীদের সর্বশেষ যুদ্ধ হয় ফিরাদে। ফুরাতের এক তীরে মুসলিম বাহিনী ও অপর তীরে সম্মিলিত ইরাকী-বাহিনী। ইরাকীরা প্রস্তাব দিল ঃ হয় তোমরা এপারে আস, না হয় আমাদের ওপারে যাওয়ার সুযোগ দাও। হযরত খালিদ প্রস্তাবে রাজি হয়ে তাদের এপারে আসার

সুযোগ করে দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হলো। মুসলিম বহিনী শত্রুবাহিনীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললো। পেছনে তাদের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ফুরাত নদী। পেছনে সরে গেলে ডুবে মরা এবং সামনে এগুলে মুসলিম সৈন্যদের তরবারির শিকার হওয়া ছাড়া আর কোন পথ তাদের ছিল না। হযরত খালিদ গোটা শত্রু বাহিনীকে এমন এক যাঁতাকলে আটক করে পিষে ফেলেন। এ যুদ্ধের পর হযরত খালিদ গোপনে হজ্জে চলে যান।

হযরত খালিদ যখন ইরাকে যুদ্ধরত, সিরিয়ায় তখন অন্য একটি মুসলিম বাহিনী সংঘর্ষে লিপ্ত। খালিদের ইরাক অভিযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে খলীফার দরবার থেকে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হলো সিরিয়ায় অবস্থানরত বাহিনীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। খালিদ ইরাক থেকে বসরা উপস্থিত হলেন। পূর্ব থেকেই ইসলামী ফৌজ সেখানে খালিদের প্রতীক্ষায় ছিল। খালিদ পৌঁছেই বসরা আক্রমণ করেন। বসরাবাসীরা সন্ধি চুক্তি করে জীবন রক্ষা করে।

বসরা অভিযান শেষ করে হযরত খালিদ ও আবু উবাইদা আজনাদাইন পৌঁছেন। পূর্ব থেকেই হযরত 'আমর ইবনুল আস সেখানে অবস্থান করছিলেন। হিজরী ১৩ সনে তুমুল লড়াই হয়। আজনাদাইন খালিদের পদানত হয়।

সেনাপতি আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তিন দিক থেকে দিমাশ্‌ক অবরোধ করে বসে আছে। এক দিকের দায়িত্বে হযরত খালিদ নিয়োজিত। তিন মাস অবরোধ করেও কোন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময় দিমাশকের পাদ্রীর এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। নগরবাসী সেই জন্ম উৎসবে মদ পান করে আনন্দে বিভোর হয়ে পড়ে। হযরত খালিদ যুদ্ধের সময় রাতে প্রায় ঘুমাতেন না। রাতে সামরিক ব্যবস্থাপনা ও দুশমনদের তথ্য সন্ধানে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি দিমাশকবাসীর অবস্থা অবগত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, তাকবীর ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তারা যেন নগর-প্রাচীরের ফটকে ছুটে গিয়ে আক্রমণ চালায়। এদিকে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট সৈনিককে নির্বাচন করে রশির সাহায্যে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং অতর্কিতে ফটকের প্রহরীকে হত্যা করে তালা ভেঙ্গে তাকবীর দেওয়া শুরু করেন। তাকবীর শোনার সাথে সাথে বাইরে অপেক্ষমান সৈন্যরা একযোগে ভেতরে প্রবেশ করে। নগরবাসী তখন ঘুমে অচেতন। এমন অতর্কিত হামলায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সেনাপতি আবু উবাইদার নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং নিজেদের হাতে নগর প্রাচীরের অন্য দ্বারগুলি উন্মুক্ত করে দেয়। একদিকে হযরত খালিদ বিজয়ীর বেশে, অন্যদিকে হযরত আবু উবাইদা সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করে নগরে প্রবেশ করেন। নগরের মাঝামাঝি স্থানে খালিদ ও আবু উবাইদা মুখোমুখি হন। যদিও নগরের অর্ধেক যুদ্ধ করে দখল করা হয়, তবুও আবু উবাইদা গোটা নগরবাসীর সাথে সন্ধির শর্তানুযায়ী সমান আচরণ করেন। (তারীখঃ ইবনুল আসীর ৬/৩২৯)।

ফাহলের যুদ্ধেও খালিদ অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী বাহিনীর কম্যাণ্ডার। রোমানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ফাহলের পর খালিদ ও আবু উবাইদা হিমসের দিকে অগ্রসর হন।দিমাশকের প্রশাসনিক দায়িত্বে তখন ইয়াযিদ বিন আবী সুফইয়ান। রোমানরা পুনরায় দিমাশক দখলের পায়তারা চালায়। ইয়াযিদ বাধা দেন। প্রচণ্ড লড়াই চলছে। এমন সময় পেছনের দিক থেকে ধুমকেতুর মত হাজির হলেন হযরত খালিদ। রোমান বাহিনীর মুষ্টিমেয় কিছু সদস্য ছাড়া সকলেই খালিদ-বাহিনীর হাতে নিহত হয়।

সিরিয়ার বিভিন্ন ফ্রন্টে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের খবর শুনে এক পর্যায়ে তথাকার রোমান শাসক মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরিষদবর্গ তাকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়ে বলেঃ আমরা অবশ্যই আবু বকরের অশ্বারোহীদের আমাদের ভূমিতে প্রবেশে বাধা দেব। তারা সেনাপতি মাহানের নেতৃত্বে দু'লাখ চল্লিশ হাজার সদস্যের এক বিরাট বাহিনী ইয়ারমুকে

সমাবেশ করে। তাদের পাদরী পুরোহিতরাও নির্জনবাস থেকে বেরিয়ে ধর্মের নামে জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তোলে। খলীফা আবু বকর (রা) এ খবর শুনে মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কসম, আমি খালিদের দ্বারা তাদের প্রবৃত্তির এ প্ররোচনার নিরাময় করবো।' 'হ্যাঁ, খালিদই ছিলেন সেদিন রোমানদের সেই মহাব্যাধির ধন্বন্তরী প্রতিষেধক।

হযরত খালিদ ময়দানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন কম্যাণ্ডার পৃথকভাবে নিজ নিজ সৈন্য পরিচালনা করছে। তিনি মুসলিম যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণ দেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হামদ-সানার পর বলেনঃ "আজকের এ দিনটি আল্লাহর অন্যতম একটি দিন। এ দিনে গর্ব ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। তোমরা তোমাদের জিহাদে নিষ্ঠাবান হও, তোমাদের কাজের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর। এসো আমরা ইমারাহ বা নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নিই। আমাদের কেউ আজ, কেউ আগামীকাল এবং কেউ পরশু আমীর হোক। এভাবে তোমাদের সকলেই আমীর হবে। তোমরা আজকের দিনটি আমাকে ছেড়ে দাও।" সকলে প্রস্তাবে রাজি হলো। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯৫) তিনি গোটা বাহিনীকে মোট ৩৮/৩৬টি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগে একজন অফিসার নিয়োগ করেন। সেদিন তিনি মুসলিম বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যাস করেন যে, আরবরা পূর্বে তেমন আর কখনো দেখেনি।

ইয়ারমুকে মুসলিম বাহিনী নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণের পর হযরত খালিদ মহিলাদের আহ্বান জানান এবং প্রথম বারের মত তাদের হাতে তরবারি দিয়ে নির্দেশ দেন, তোমরা মুসলিম মুজাহিদদের পেছনে অবস্থান গ্রহণ করবে। কাউকে পালিয়ে পেছনে সরে আসতে দেখলে তাকে এ তরবারি দিয়ে হত্যা করবে। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯৫)

এই তোড়জোড়ের মধ্যে একজন মুসলিম মুজাহিদ হতাশ কণ্ঠে বললোঃ রোমানদের সংখ্যা কত বেশী, আর আমাদের সংখ্যা কত কম। খালিদ তাকে বললেনঃ তোমার কথা ঠিক নয়। বরং একথা বল, রোমানরা কত কম, এবং মুসলমানরা কত বেশী—মানুষের সংখ্যা দ্বারা নয়; বরং বিজয়ের দ্বারা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরাজয়ের দ্বারা হ্রাস পায়। আল্লাহর কসম, যদি আমার ঘোড়ার ক্ষুর ভালো থাকতো আমি তাদের এ আধিক্যের পরোয়া করতাম না। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়াহ ১/১৯৩) উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ ভ্রমণে হযরত খালিদের ঘোড়া 'আসকার'-এর ক্ষুর আহত হয়ে পড়েছিল।

ইয়ারমুকে যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে রোমান সেনাপতি 'মাহান' দূত মারফত জানালো যে, সে খালিদের সাথে সরাসরি কথা বলতে চায়। খালিদ রাজি হলেন। দু'বাহিনীর মধ্যবর্তী ময়দানে দু'সেনাপতি মুখোমুখি হলেন। রোমান সেনাপতি খালিদকে বললোঃ "আমরা জেনেছি, কঠোর শ্রম ও ক্ষুধা তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। তোমরা চাইলে তোমাদের প্রত্যেককে আমরা দশটি দীনার, এক প্রস্থ পোশাক ও কিছু খাদ্য দিতে পারি। বিনিময়ে তোমরা দেশে ফিরে যাবে। আগামী বছরও অনুরূপ জিনিস আমি তোমাদের কাছে পাঠাবো।" রোমান সেনাপতির এ কথায় যে-অপমান প্রচ্ছন্ন ছিল খালিদ তা অনুধাবন করলেন। তিনি রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উপযুক্ত জবাবটা ছুঁড়ে মারলেন। বললেনঃ "—ক্ষুধা আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে এখানে আনেনি— যেমনটি তোমরা বলেছো। তবে আমরা একটি রক্তপায়ী জাতি। আমরা জেনেছি, রোমানদের রক্ত অপেক্ষা অধিক লোভনীয় ও পবিত্র রক্ত নাকি পৃথিবীতে আর নেই। তাই সেই রক্তের লোভে আমরা এসেছি।" কথাগুলি ছুঁড়ে দিয়েই মহাবীর খালিদ ঘোড়ার লাগাম ধরে টান দিলেন এবং সোজা নিজ বাহিনীতে ফিরে এসে 'আল্লাহু আকবর, হুয়্যি রিয়াহাল জান্নাহ্'— ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

রোমান বাহিনী এমন ভয়ংকররূপে অগ্রসর হলো যে, আরবরা এমনটি আর কখনো দেখেনি। মুসলিম বাহিনীর মধ্যভাগের দায়িত্বে ছিলেন ইকরিমা ইবন আবী জাহল ও কা'কা ইবন আমর। খালিদ তাঁদের আক্রমণের নির্দেশ দিলেন! তাঁরা দু'জন গানের পংক্তি আবৃত্তি করতে করতে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলো। খালিদ তাঁর গোটা বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। খালিদ রোমান অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যভাগে ঢুকে পড়লেন। তিনি যেদিকে গেলেন, রোমান বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। একাধারে একদিন ও এক রাত তুমুল লড়াই চললো। পরদিন সকালে খালিদকে দেখা গেল রোমান সেনাপতির মঞ্চের ওপর। তাবারীর মতে, এ যুদ্ধে রণক্ষেত্রে নিহতদের ছাড়াও পশ্চাৎদিকে পলায়নপর সৈনিকদের মধ্যে এক লাখ বিশ হাজার রোমান সৈন্য জর্দান নদীতে ডুবে মারা যায়।

যুদ্ধ শেষ। পরদিন সকালে ইকরিমা ও তাঁর পুত্র 'আমর ইবন ইকরিমাকে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল। খালিদ ইকরিমার মাথা নিজের উরু ও 'আমরের মাথা পায়ের নলার ওপর রেখে, তাঁদের মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন এবং গলায় ফোঁটা ফোঁটা পানি ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলেনঃ 'ইবনুল হানতামা' অর্থাৎ 'উমার মনে করেছিলেন আমরা শাহাদাত বরণ করতে জানিনে। কক্ষণো নয়।' এ যুদ্ধে তিন হাজার মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ—১/১৯৩)

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ব্যক্তিত্ব রোমান বাহিনীকে কতটুকু প্রভাবিত করেছিল বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যায়। ইয়ারমুকের যুদ্ধ তখন চলছে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে রোমান বাহিনীর এক কম্যাণ্ডার, নাম 'জারজাহ্' নিজ ছাউনী থেকে বেরিয়ে এল। তার উদ্দেশ্য খালিদের সাথে সরাসরি কথা বলা। খালিদ তাঁকে সময় ও সুযোগ দিলেন। জারজাহ্ বললোঃ "খালিদ, আমাকে একটি সত্যি কথা বলুন, মিথ্যা বলবেন না। স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিথ্যা বলেন না। আল্লাহ কি আকাশ থেকে আপনাদের নবীকে এমন কোন তরবারি দান করেছেন যা তিনি আপনাকে দিয়েছেন এবং সেই তরবারি যাদেরই বিরুদ্ধে উত্তোলিত হয়েছে, তারা পরাজিত হয়েছে?

খালিদঃ না।

জারজাহঃ তাহলে আপনাকে 'সাইফুল্লাহ'— আল্লাহর তরবারি বলা হয় কেন?

খালিদঃ আল্লাহ আমাদের মাঝে তাঁর রাসূল পাঠালেন। আমাদের কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলো, কেউ করলো না। প্রথমে আমি ছিলাম শেষোক্ত দলে। অতঃপর আল্লাহ আমার অন্তর ঘুরিয়ে দেন। আমি তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনে তাঁর হাতে বাইয়াত করি। রাসূল (সা) আমার জন্য দু'আ করেন। আমাকে তিনি বলেনঃ তুমি আল্লাহর একটি তরবারি। এভাবে আমি হলাম 'সাইফুল্লাহ'।

জারজাহ্ঃ কিসের দিকে আপনারা আহবান জানান?

খালিদঃ আল্লাহর একত্ব ও ইসলামের দিকে।

জারজাহ্ঃ আজ যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করবে সেও কি আপনাদের মতই সওয়াব ও প্রতিদান পাবে?

খালিদঃ হ্যাঁ, বরং তার থেকেও বেশী।

জারজাহঃ কিভাবে? আপনারা তো এগিয়ে আছেন।

খালিদঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উঠেছি, বসেছি। আমরা দেখেছি তাঁর মু'জিযা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ড। যা কিছু আমরা দেখেছি তা কেউ দেখলে, যা শুনেছি তা কেউ শুনলে, অবশ্যই তার উচিত সহজেই ইসলাম গ্রহণ করা। আর আপনারা যাঁরা তাঁকে দেখেননি, তাঁর কথা শুনেননি, তারপরও অদৃশ্যের ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতিদান অধিকতর শ্রেষ্ঠ। যদি আপনারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনেন।"

জারজাহ্ অশ্ব হাঁকিয়ে খালিদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেনঃ খালিদ, আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন।

জারজাহ ইসলাম গ্রহণ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করলেন। এ দু'রাকায়াতই তার জীবনের প্রথম ও শেষ নামায। তারপর এ নও মুসলিম-রোমান শাহাদাতের বাসনা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সাথে চললেন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। আল্লাহ পাক তার বাসনা পূর্ণ করলেন। তিনি শহীদ হলেন (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৯৯-৩০১)।

ইয়ারমুকে রোমান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের খবর শুনে হিরাক্লিয়াস হিমস নগরী পেছনে ফেলে পিছু হটে যান। যাবার সময় তিনি বলেছিলেন— 'সালামুন আলাইকা ইয়া সুরিয়া সালামান লা লিকাআ বা'দাহ'— হে সিরিয়া, তোমাকে বিদায়ী সালাম, যে সালামের পর আর কোন সাক্ষাৎ নেই। ইয়ারমুকের পর হযরত খালিদ 'হাদির' জয় করেন।

হাদির অভিযান শেষ করে খালিদ চললেন 'কিন্নাসরীণ'-এর দিকে। কিন্নাস্‌রীনবাসীরা আগে ভাগেই মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কিল্লায় প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ করে দেয়। হযরত খালিদ তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তোমরা যদি মেঘমালার ওপর আশ্রয় নাও, আল্লাহ সেখানেও আমাদের উঠিয়ে নেবেন আথবা তোমাদের নামিয়ে নিয়ে আসবেন আমাদের কাছে।' (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ-২/৪) কিন্নাসরীণের অধিবাসীরা হিমসবাসীদের পরিণতি চিন্তা করে খালিদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

বাইতুল মাকদাস অবরোধ করা হয়েছে। এ অবরোধে মুসলিম বাহিনীর কম্যাণ্ডিং অফিসারদের মধ্যে খালিদও আছেন। বাইতুল মাকদাসের খৃষ্টান অধিবাসীরা কোন দিশা না পেয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। তবে তারা আবদার রেখেছে স্বয়ং আমীরুল মুমিমীন 'উমার নিজ হাতে সেই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। তাদের আবদার রক্ষার জন্য খলীফা মদীনা থেকে সিরিয়া এসেছেন। তিনি সিরিয়ায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর অফিসারবৃন্দকে 'জাবিয়া' তলব করেছেন। অত্যন্ত জাঁকজমক পোশাক পরে খালিদ এসেছেন। খলীফার দৃষ্টিতে পড়তেই তিনি ঘোড়া থেকে নেমে খালিদের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করে বলেনঃ 'এত শিগগির অভ্যাস পাল্টে ফেলেছো? খালিদ হাতিয়ার উঁচু করে ধরে বললেন, 'তবে সৈনিক সুলভ অভ্যাস যায়নি।' খলীফা বললেন, 'তাহলে কোন দোষ নেই।' হিজরী ১৭ সনে আবু উবাইদা ও খালিদ যৌথভাবে হিমসের বিদ্রোহ দমন করেন। আর সেই সাথে সমগ্র সিরিয়ায় শত শত বছরের রোমান শাসনের অবসান ঘটে।

এতবড় সেনাপতিকেও খলীফা হযরত 'উমার রেহাই দেননি। তিনি খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দেন। বরখাস্তের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। কারো মতে হযরত 'উমারের খিলাফতের পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হিজরী ১৭ সনে তাঁকে অপসারণ করা হয়। আবার কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরই তাঁকে বরখাস্ত করেন, হযরত খালিদ তখন ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

হযরত খালিদের অপসারণের ঘটনা বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইয়ারমুকে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। এমন সময় মদীনা থেকে নতুন খলীফা উমারের (রা) দূত একটি চিঠি নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত হলো। চিঠির বিষয়বস্তু দুইটি— আবু বকরের (রা) মৃত্যু সংবাদ এবং খালিদকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু উবাইদার নিয়োগ। খালিদ চিঠিটি পাঠ করে আবু বকরের জন্য মাগফিরাত ও উমারের সাফল্য কামনা করে দুআ করলেন। তারপর পত্রবাহককে অনুরোধ করলেন সে যেন পত্রের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ না করে। এভাবে খালিদ আবু বকরের (রা) মৃত্যু সংবাদ ও উমারের নির্দেশ গোপন করে তার কমাণ্ড চালিয়ে অবশ্যম্ভাবী বিজয় ছিনিয়ে আনেন। তারপর আবু উবাইদার নিকট উপস্থিত হয়ে একজন সাধারণ সৈনিকের মত তাঁকে সম্মান

প্রদর্শন করলেন। আবু উবাইদা প্রথমে মনে করলেন, এ হয়তো রসিকতা। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলেন এ রসিকতা নয়; বরং বাস্তব ও সত্য। পোশাক খুলে আবু উবাইদার সামনে রাখলেন।

উল্লেখিত ঘটনাটি কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত খালিদের ব্যয় কখনও সীমা অতিক্রম করে যেত। কবি-সাহিত্যিকদের তিনি মোটা অংকের অর্থ দান করতেন। কবি আশয়াস ইবন কায়েসকে দশ হাজার দিরহাম দান করেন। খলীফা উমার এ কথা অবগত হয়ে আবু উবাইদাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন খালিদকে জিজ্ঞেস করেন কোন্ খাত থেকে এ অর্থ তিনি দান করেছেন? মুসলিম উম্মাহর অর্থ থেকে দিয়ে থাকলে খিয়ানাত বা বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছেন, আর নিজের অর্থ থেকে দিয়ে থাকলে অপব্যয় করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু উবাইদা খালীফার এ ফরমান লাভ করেন ইয়ারমুকের রণক্ষেত্রে। তিনি খালিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন নিজের ব্যক্তিগত অর্থ থেকে দান করেছি। অতঃপর আবু উবাইদা তাকে খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনান এবং সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্তের ইঙ্গিত হিসাবে খালিদের মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নেন এবং পাগড়ি ঘাড়ের ওপর নামিয়ে দেন। খালিদ শুধু মন্তব্য করেন, আমি খলীফার ফরমান শুনেছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এখনও আমি আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশ মানতে এবং খিদমাত অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত। খলীফা তাঁকে মদীনায় তলব করেন। তিনি মদীনায় পৌঁছলে তাঁর সম্পদের কঠোর হিসাব গ্রহণ করা হয়; কিন্তু কোন অসঙ্গতি পাওয়া যায়নি। অতঃপর খলীফা উমার (রা) সর্বত্র ঘোষণা করে দেন, আমি খালিদকে আস্থাহীনতা, ক্রোধবশতঃ বা এ জাতীয় কোন কারণে অপসারণ করিনি। (ইবনুল আসীর-২/৪১৮)

উল্লেখিত ঘটনা ছাড়াও খালিদের অপসারণের আরো কারণ ছিল। খালিদের সৈনিক স্বভাবে ছিল রুক্ষতা। প্রতিটি কাজে তিনি নিজের মর্জিমত চলতেন, খলীফার সাথে পরামর্শের প্রয়োজন মনে করতেন না। সেনাবাহিনীর আয়-ব্যয়ের হিসাবও খলীফার দরবারে নিয়ম মত পাঠাতেন না। ইরাক অভিযান শেষ করেই তিনি খলীফা আবু বকরের (রা) অনুমতি ছাড়াই হজ্জের উদ্দেশ্যে মককায় চলে যান। তাঁর এ কাজে হযরত আবু বকর (রা) ভীষণ বিরক্ত হন। খলীফা তাঁকে বার বার সতর্ক করেন। তিনি খলীফাকে জবাব দেন, আমাকে আমার মর্জিমত কাজ করার সুযোগ দিন, অন্যথায় আমি নিজেই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবো। খালিদের এসব কাজে আবু বকরের (রা) সময় থেকেই হযরত উমার (রা) অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বার বার আবু বকরকে (রা) পরামর্শ দান করেন খালিদকে বরখাস্ত করার জন্য। আবু বকর (রা) প্রতিবারই জবাব দেন, আমি এমন তরবারিকে কোষবদ্ধ করতে পারিনা যাকে আল্লাহ কোষমুক্ত করেছেন। উমার খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর খালিদকে সংশোধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু ফলোদয় না হওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করেন।

তাছাড়া তাঁকে অপসারণের পশ্চাতে তৃতীয় যে কারণটির কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে তা হলো, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে এ ধারণা ও বিশ্বাস জন্ম লাভ করে যে, ইসলামের বিজয় মূলতঃ খালিদের বাহুবলের ওপর নির্ভরশীল। এ ধরনের অমূলক ধারণা খলীফা উমারের মোটেই মনোপূত ছিল না। তিনি খালিদকে অপসারণ করে এ বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করেন।

বিষয়টি যেভাবে এবং যেমন করেই ঘটুক না কেন, এ ক্ষেত্রে হযরত খালিদের ভূমিকা লক্ষ্যণীয় বিষয়। তিনি যে আনুগত্য, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন ইতিহাসে তার কোন নজীর পাওয়া যাবে না। এমনটি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন এ কারণে যে, তিনি বিশ্বাস করতেন সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিক— উভয় অবস্থা সমান। সর্ব অবস্থায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং যে দ্বীনের প্রতি তিনি ঈমান এনেছেন, তাদের সকলের প্রতি দায়িত্ব পালন করা নিজের অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। একজন অনুগত সেনাপতি এবং একজন অনুগত সাধারণ সৈনিক— এ দু'য়ের মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল না। তাই তিনি সেনাপতির পদ ছেড়ে সাধারণ সৈনিক হিসেবে

সমানভাবে কাজ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আর একই কারণে আবু উবাইদার হাতে সেনাপতির দায়িত্ব বুঝে দেওয়ার পর সাধারণ সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলতে পেরেছিলেনঃ 'এই উম্মাতের আমীন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদাকে তোমাদের আমীর নিয়োগ করা হয়েছে।'

খলীফা হযরত 'উমার (রা) খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করার পর তাঁকে বিভিন্ন প্রদেশে ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর খালিদ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। হিজরী ২১/২২ সনে কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর মদীনায় ইনতিকাল করেন। অনেকের মতে তিনি হিমসে ইনতিকাল করেন; কিন্তু একথা সঠিক নয় বলে ধারণা হয়। কারণ, খলীফা হযরত উমার (রা) তাঁর জানাযায় শরিক হন বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ আছে। (উসুদুল গাবা ২/৯৬, আল ইসাবা-১/৪১৫)

হযরত খালিদের (রা) মৃত্যুর পর খলীফা হযরত উমার (রা) বলেছিলেনঃ 'নারীরা খালিদের মত সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।' খালিদের মৃত্যুর পর খলীফা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন। মানুষ পরে জেনেছিল, শুধু খালিদের বিয়োগ ব্যথায় তিনি এভাবে কাঁদেননি; বরং খালিদের অপসারণের কারণ দূরীভূত হওয়ায় তিনি তাঁকে আবার সেনাপতির পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু তাঁর সেই ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হওয়ায় তিনি এত কেঁদেছিলেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩০৫)

প্রথম থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত হযরত খালিদের জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছে। এ কারণে হযরত রাসূলে পাকের (সা) সুহবতে থাকার সুযোগ ও সময় খুব কম পেয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেনঃ 'জিহাদের ব্যস্ততা কুরআনের বিরাট একটি অংশ শিক্ষা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে।' (আল ইসাবা-১/৪১৫) তা সত্বেও সুহবতে নববীর ফয়েজ ও ইলমের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, তা নয়। রাসূলে পাকের (সা) ইনতিকালের পর মদীনার আলিম ও মুফতী সাহাবীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তবে সৈনিক স্বভাবের কারণে ইফতা'র মসনদে কখনো তিনি বসেননি। তাঁর ফতোয়ার সংখ্যা দু'চারটির বেশী পাওয়া যায় না। (আ'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন) তিনি মোট ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে দু'টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম এবং একটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

একবার 'আম্মার বিন ইয়াসির (রা) ও তাঁর মধ্যে ঝগড়া হয়। খালিদ তাঁকে ভীষণ গালমন্দ করেন। আম্মারও রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শিকায়েত করেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করেনঃ 'যে 'আম্মারের সাথে হিংসা ও শত্রুতা রাখে সে আল্লাহর সাথে হিংসা ও শত্রুতা রাখে।' খালিদের ওপর রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীর এমন প্রতিক্রিয়া হলো যে, তিনি তক্ষুণি আম্মারের কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে খুশী করেন। খালিদ নিজেই বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে ওঠার পর আম্মারের সন্তুষ্টি অর্জন করা ছাড়া আমার নিকট অধিক প্রিয় আর কোন জিনিস ছিল না।

হযরত খালিদের হৃদয়ে রাসূলে পাকের (সা) প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা এত তীব্র ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) শানে কেউ কোন সামান্য অমার্জিত কথা বললে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু স্বর্ণ এলো। তিনি তা নজদী সরদারদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কুরাইশ ও আনসারদের কেউ কেউ এতে আপত্তি জানায়। এক ব্যক্তি বলে বসে, 'মুহাম্মাদ আল্লাহকে ভয় করুন।' রাসূল (সা) বলেনঃ 'আমি আল্লাহর নাফরমানী করলে আল্লাহর ইতায়াত বা আনুগত্য করে কে?' লোকটির এমন অমার্জিত কথায় খালিদ ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনুমতি দিন, তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করেন। (বুখারী)

হযরত খালিদের জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গৌরবজনক অধ্যায় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' — আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তাঁর রণক্ষেত্রে কেটেছে। তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক কর্মকাণ্ড ও জিহাদের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে হযরত রাসূলে পাকের পক্ষ থেকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ করেন। প্রায় সোয়া শো যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। যেখানেই গেছেন বিজয়ী হয়ে ফিরেছেন। তাঁর ওপর হযরত রাসূলে পাকের এতখানি আস্থা ছিল যে, তাঁর হাতে পতাকা এলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতেন। প্রচুর সমরাস্ত্র তিনি পৈতৃক বিষয় হিসেবে লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দেন। (তাবাকাত) তাঁর বন্ধু ও শত্রুরা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছে ঃ 'তিনি এমন ব্যক্তি যিনি নিজেও ঘুমান না, অন্যকেও ঘুমাতে দেন না।' খালিদ নিজেই বলতেন ঃ "এমন একটি রাত্রি যা আমি নব বধুর সাথে কাটাতে পারি, অথবা যে রাত্রে আমাকে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়— তা অপেক্ষা একটি প্রচণ্ড শীতের রাত্রে একটি মুহাজির দলের সাথে প্রত্যুষে মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালাই, তা আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

মৃত্যুশয্যায় একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমি শতাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তরবারি, তীর অথবা বর্শার দু'একটি আঘাত রয়েছে। আর আজ আমি জ্বরাগ্রস্ত উটের মত বিছানায় পা দাপিয়ে মৃত্যুবরণ করছি।" কথাগুলি তিনি যখন বলছিলেন তখন তাঁর দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩০৫-৩০৬, উসুদুল গাবা-২/৯৫)

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি খলীফা উমারের (রা) অনুকূলে অসীয়াত করে যান। সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাঁর ঘোড়াটি ও কিছু যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে জীবদ্দশায় তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বস্তু-দু'টি মরণের পরও আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে যান।

হযরত রাসূলে করীম (সা) নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার তাঁর প্রশংসা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় একদিন কিছু দূরে খালিদকে দেখা গেল। রাসূল (সা) আবু হুরাইরাকে (রা) বললেন, দেখতো কে? তিনি বললেন, খালিদ। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহর এ বান্দাটি কতই না ভালো। একবার তিনি সাহাবীদের বলেন, খালিদকে তোমরা কষ্ট দেবে না। কারণ, সে কাফিরদের বিরুদ্ধে চালিত আল্লাহর তরবারি।

একবার রাসূল (সা) উমারকে (রা) পাঠালেন যাকাত আদায়ের জন্য। ইবন জামীল, খালিদ ও আব্বাস— এ তিনজন যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। রাসূল (সা) একথা অবগত হয়ে বললেন ঃ ইবন জামীল ছিল দরিদ্র, আল্লাহ তাকে সম্মদশালী করেছেন। এ তার প্রতিদান। তবে খালিদের প্রতি তোমরা বাড়াবাড়ি করেছো। সে তার সকল যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। তার ওপর যাকাত হয় কেমন করে? আর আব্বাস? তার দায়িত্ব আমার ওপর। তোমাদের কি জানা নেই চাচা পিতৃস্থানীয়? (আবু দাউদ-১/১৬৩)

হযরত খালিদ (রা) কেবল একজন সৈনিকই ছিলেন না, তিনি একজন দক্ষ দা'য়ী-ই-ইসলাম— ইসলামের দাওয়াত দানকারীও ছিলেন। বনী জুজাইমা ও মালিক ইবন নুওয়াইরার ব্যাপারে তরিৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে যে ক্ষতি হয় তা লক্ষ্য করে রাসূল (সা) পরবর্তীতে দায়িত্ব দিয়ে কোথাও পাঠানোর সময় তাঁকে উপদেশ দেন— 'শুধু ইসলামের দাওয়াত দেবে, তলোয়ার ওঠাবে না।' তেমনিভাবে ইয়ামনে পাঠানোর সময়ও নির্দেশ দেন, 'যুদ্ধের সূচনা যেন তোমার পক্ষ থেকে না হয়।' এ হিদায়াত লাভের পর যত যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন কোথাও কোন প্রকার বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে জানা যায় না। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পরেও তিনি যথাযথভাবে দা'য়ীর দায়িত্ব পালন করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা) ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য চতুর্দিকে যে বিভিন্ন মিশন পাঠান, তার কয়েকটির দায়িত্ব খালিদ পালন করেন। বনী

জুজাইমা ও বনী আবদিল মাদ্দান তাঁরই চেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করে। ইয়ামনের দাওয়াতী কাজে তিনি হযরত আলীর (রা) সহযোগী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ভণ্ড নবী তুলাইহা আসাদীর সহযোগী বনু হাওয়াযিন, বনু সুলাইম, বনু 'আমের প্রভৃতি গোত্র পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। এছাড়াও অসংখ্য লোক বিভিন্ন সময় তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে। প্রতিটি যুদ্ধ শুরুর আগে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে সব সময় তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। যুদ্ধের ময়দানে প্রচণ্ড যুদ্ধের মাঝেও তিনি সফল দায়ীর ভূমিকা পালন করেছেন। ইয়ারমুকের রোমান সৈনিক 'জারজাহ্' তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে খালিদের জীবনের সব কথা তুলে ধরা যাবে না। আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা) খালিদের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করে যে-কথাগুলি বলেছিলেন, আমরাও সেই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করছি, 'রাহেমাল্লাহ আবা সুলাইমান, মা'ইনদাল্লাহ খায়রুন মিম্মা কানা ফীহিল্লা, লাকাদ 'আশা হামীদান ওয়া মাতা সা'ঈদান— আল্লাহ আবু সুলাইমান খালিদের ওপর রহম করুন। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন আল্লাহর কাছে তার থেকে উত্তম কিছু নেই। তিনি জীবনে প্রশংসিত এবং মরণে সৌভাগ্যবান। '(রিজালুন হাওলার রাসূল-৩০৮)

আবদুল্লাহ্ ইবন হুজাফাহ্ আস-সাহ্মী-(রা)

আবু হুজাফাহ্ আবদুল্লাহ্ নাম। পিতার নাম হুজাফাহ্। কুরাইশ গোত্রের বনী সাহম শাখার সন্তান। ইসলামী দাওয়াতের প্রথম ভাগে মুসলমান হন এবং দীর্ঘদিন যাবত হযরত রাসূলেপাকের (সা) সাহচর্যে অবস্থান করেন। তাঁর ভাই কায়েস ইবন হুজাফাহ্কে সঙ্গে করে হাবশাগামী মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফিলার সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। (আল-ইসতিয়াব)

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে শরিক হন। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) তাঁকে 'বদরী' বা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মুসা বিন 'উকবা, ইবন ইসহাক ও অন্যরা তাঁকে 'বদরী' বলে 'উল্লেখ করেননি। (আল-ইসতিয়াব)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি অভিযানের আমীর বানিয়ে পাঠান। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের রাসূল (সা) নির্দেশ দেন, কক্ষণো তার নির্দেশ অমান্য করবে না। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর হযরত আবদুল্লাহ কোন কারণে ভীষণ রেগে যান। তিনি সৈনিকদের জিজ্ঞেস করেন, রাসূল (সা) কি আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেননি? তারা বললোঃ হ্যাঁ দিয়েছেন। তিনি বললেন, কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়। মুজাহিদরা কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালায়। তারপর সেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তারা একে অপরের দিকে তাকায়। অনেকে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে বলে, আমরা আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্যই রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ করেছি, আর এখন সেই আগুনে জীবন দেব? এই বিতর্ক চলতে থাকে, আর এদিকে আগুন নিভে যায়। আবদুল্লাহ্র রাগও পড়ে যায়। অভিযান থেকে ফিরে এসে তারা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্কে (সা) জানায়। রাসূল (সা) বললেন, যদি তোমরা ঐ আগুনে ঢুকে পড়তে, আর কোনদিন তা থেকে বের হতে পারতে না। আনুগত্য কেবল এমন সব ব্যাপারে ওয়াজিব, যার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। (বুখারীঃ কিতাবুল আহকাম, বাবুস সাময়ে' ওয়াত তায়া'হ, হায়াতুস সাহাবা-১/৬৭)

উল্লেখিত ঘটনাটি কোন কোন বর্ণনায় ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই সব বর্ণনা মতে, হযরত আবদুল্লাহর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশটি প্রকৃত নির্দেশ ছিলনা। তিনি তাঁর সৈনিকদের সাথে একটু রসিকতা করেছিলেন। হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনীকে এক অভিযানে পাঠালেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহকে এ বাহিনীর আমীর নিয়োগ করলেন। আবদুল্লাহ ছিলেন রসিক লোক। কিছুদূর চলার পর তারা এক স্থানে থামলেন। আবদুল্লাহ তাঁর বাহিনীর সদস্যদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি আমার আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি? তারা বললোঃ হাঁ। তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের একটি নির্দেশ দিই তোমরা পালন করবে? তারা বললোঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ আমি আমার অধিকার ও আনুগত্যের দাবীতে নির্দেশ দিচ্ছি, তোমরা এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। নির্দেশ লাভের সাথে সাথে বাহিনীর কোন কোন সদস্য ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তখন তিনি বললেনঃ থাম, আমি তোমাদের সাথে একটু রসিকতা করেছি মাত্র। বাহিনী মদীনায় ফিরে আসার পর বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) কর্ণগোচর হলো। তিনি বললেনঃ কেউ যদি আল্লাহর নাফরমানির নির্দেশ দেয় তোমরা তা মানবে না। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৬৪০)

হিজরী ৬ষ্ঠ মতান্তরে ৭ম সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আশ-পাশের রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সম্রাটদ্বয়ের নিকটও দূত পাঠাবেন বলে স্থির

করলেন। কিন্তু কাজটি খুব সহজ ছিলনা। এর অসুবিধার দিকগুলিও রাসূল (সা) অবহিত ছিলেন। যে সকল দেশে দূতগণ যাবে তথাকার ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষ সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। সেখানে তারা সে দেশের রাজা-বাদশাহ্‌কে তাদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবে। নিঃসন্দেহে এ দৌত্যগিরি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। হয়তো সেখানে যারা যাবে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। হামদ ও সানার পর কালেমা-ই-শাহাদাত পাঠ করলেন। তারপর বললেন ঃ 'আম্মা বাদ! আমি তোমাদের কিছু লোককে আজমী বা অনারব বাদশাহ্‌দের নিকট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করবে না, যেমন করেছিল বনী ইসরাইল ঈসা ইবন মরিয়মের সাথে।

সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করবো। আপনার যেখানে ইচ্ছা আমাদের পাঠান।

হযরত রাসূলেপাক (সা) আরব-আজমের রাজা-বাদশাহদের নিকট দাওয়াতপত্র বহন করার জন্য ছয়জন সাহাবীকে নির্বাচন করলেন। এই ছয়জনের একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ। পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে নির্বাচন করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে স্ত্রী-পুত্রের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বের হলেন। উঁচু-নিচু ভূমির বিচিত্র পথ ধরে তিনি চললেন। সম্পূর্ণ একাকী। এক আল্লাহ ছাড়া সংগে আর কেউ নেই। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পারস্যে পৌঁছলেন। সম্রাটের জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছেন—একথা তাঁর পারিষদবর্গকে জানিয়ে তিনি সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। বিষয়টি সম্রাটের কানে গেল। তিনি দরবার সাজানোর জন্য পারিষদবর্গকে নির্দেশ দিলেন। দরবার সাজানো হলে পারস্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দরবারে ডেকে আনা হলো। তারপর আবদুল্লাহ্ ইবন হুজাফাহকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দূত হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ একটি পাতলা 'শামলাহ্' (শরীরে পেঁচানো হয় যে চাদর) এবং একটি মোটা 'আবা' (লম্বা কোর্তা) গায়ে জড়িয়ে একজন সাধারণ বেদুঈন বেশে কিসরার রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। তিনি ছিলেন লম্বা-চওড়া সুঠাম দেহের অধিকারী। ইসলামের গরিমা ও ঈমানের গর্বে ছিলেন তিনি গর্বিত।

আবদুল্লাহকে ঢুকতে দেখেই কিসরা একজন পারিষদকে তাঁর হাত থেকে পত্রটি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ পত্রটি লোকটির হাতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ 'না, রাসূলুল্লাহ (সা) পত্রটি সরাসরি আপনার হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সে নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারিনে।'

কিসরা তাঁর লোকদের বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে দাও, আমার নিকট আসতে দাও।' তিনি এগিয়ে গিয়ে কিসরার হাতে চিঠিটি দিলেন। হীরার অধিবাসী একজন আরবী ভাষী সেক্রেটারীকে ডেকে পত্রটি খুলে পাঠ করতে বললেন। পত্রটি পাঠ করা শুরু হল ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম—করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি। সালামুন 'আলা মান ইত্তাবায়া' আল-হুদা—যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম।.....।"

পত্রটির এতটুকু শুনেই কিসরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন; তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল, ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) পত্রটির সূচনা করেছেন নিজের নাম দিয়ে, অর্থাৎ কিসরার নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এসেছে। কিসরা পত্রটি পাঠকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। পত্রটির বক্তব্য কি তা আর জানার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি

চিৎকার করে বললেনঃ 'সে আমার দাস, আর সে কিনা আমাকে এভাবে লিখেছে?' তারপর আবদুল্লাহকে মজলিস থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে বের করে নিয়ে যাওয়া হল।

আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ কিসরার দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি জানেন না তাঁর ভাগ্যে আল্লাহ কি নির্ধারণ করেছেন। তাঁকে কি হত্যা করা হবে, না মুক্তি দেওয়া হবে? নানা রকম চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। মুহূর্তেই তিনি সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আপন মনে বললেনঃ 'আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র পৌঁছানোর পর এখন আমার কপালে যা হয় হোক। আমি কোন কিছুর পরোয়া করিনে।' একথা বলে তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে বাহনে সাওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। এদিকে কিসরার ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হলে আদুল্লাহকে আবার হাজির করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না। তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান পেল না। আরব উপদ্বীপ অভিমুখী রাস্তায় খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পেল তিনি স্বদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর আর নাগাল পাওয়া গেল না।

হযরত আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে কিসরার কাণ্ডকারখানা সবিস্তার বর্ণনা করলেন। সব কিছু শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করলেনঃ 'মায্যাকাহুল্লাহু মুলকাহু— আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করে ফেলুন।' (আল-ইসতিয়ার)

এদিকে 'কিসরা' তাঁর প্রতিনিধি, ইয়ামনের শাসক 'বাজান'কে লিখলেন, "তোমার ওখান থেকে দু'জন তাগড়া ও শক্তিশালী লোক পাঠিয়ে হিজাযে যে ব্যক্তি নবী বলে দাবী করেছে তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দাও।" 'বাজান' দু'জন লোক নির্বাচন করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালো। তাদের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লিখিত একটি পত্রও ছিল। তাতে নির্দেশ ছিল, তিনি যেন কাল বিলম্ব না করে পত্র বাহকদের সাথে কিসরার দরবারে হাজির হন। 'বাজান' লোক দু'টিকে আরো নির্দেশ দিল, তারা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে তাকে অবহিত করবে।

লোক দু'টি ইয়ামন থেকে যাত্রা করে রাত-দিন ক্রমাগত চলার পর তায়েফে উপনীত হল। সেখানে তারা একটি কুরাইশ ব্যবসায়ী দলের সাক্ষাৎ লাভ করলো। তাদের কাছে মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করলো। তারা জানালো, মুহাম্মাদ এখন ইয়াসরিব (মদীনা) নগরে। কুরাইশরা লোক দু'টির আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে মহাখুশী হয়ে মক্কায় ফিরলো। তারা মক্কাবাসীদের সুসংবাদ দিলঃ "তোমরা উল্লাস কর। কিসরা এবার মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তার অনিষ্ট থেকে তোমরা এবার মুক্তি পাবে।"

এদিকে লোক দু'টি মদীনায় পৌঁছলো। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে 'বাজান'-এর পত্রটি তাঁর হাতে দিয়ে বললোঃ "শাহানশাহ্ কিসরা আমাদের বাদশাহ 'বাজান'কে লিখেছেন, তিনি যেন আপনাকে নেওয়ার জন্য লোক পাঠান। আমরা তাঁরই নির্দেশে আপনাকে নিতে এসেছি। আমাদের আহবানে সাড়া দিলে আপনার যাতে মঙ্গল হয় এবং তিনি যাতে আপনাকে কোন রকম শাস্তি না দেন সে ব্যাপারে আমরা কিসরার সাথে কথা বলবো। আর আমাদের আহবানে সাড়া না দিলে একটু বুঝে শুনে দেবেন। কারণ আপনাকে এবং আপনার জাতিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাতো আপনার জানা আছে।"

তাদের কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হেসে বললেনঃ 'তোমরা আজ তোমাদের অবস্থানে ফিরে যাও, আগামীকাল আবার একটু এসো।'

পরদিন তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে বললোঃ 'কিসরার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য কি আপনি প্রস্তুতি নিয়েছেন?' রাসূল (সা) বললেন! "তোমরা আর

কক্ষণো কিসরার দেখা পাবে না। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেছেন। অমুক মাসের অমুক তারিখ তার পুত্র 'শীরাওয়াইহ্' তাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেছে।" একথা শুনে বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া করে তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে লাগলো। তারা বললোঃ

"আপনি কি বলছেন তা-কি ভেবে দেখেছেন? আমরা কি 'বাজান'কে একথা লিখে জানাবো?"

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ "হাঁ। আর তোমরা তাকে একথাও লিখবে যে, আমার এ দ্বীন কিসরার সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছবে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমার অধীনে যা কিছু আছে তা-সহ তোমার জাতির কর্তৃত্ব তোমাকে দেওয়া হবে।"

লোক দু'টি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে বের হয়ে সোজা 'বাজান'-এর নিকট পৌঁছলো এবং তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সমস্ত কথা অবহিত করলো। 'বাজান' মন্তব্য করলোঃ "মুহাম্মদ যা বলেছেন তা সত্য হলে তিনি অবশ্যই নবী। আর সত্য না হলে, আমরা তাকে উচিত শিক্ষা দেব।..."

তাদের এ আলোচনা চলছে, এমন সময় 'বাজানের' নিকট শীরাওয়াইহ'র পত্র এসে পৌঁছলো। পত্রের বিষয়বস্তু এরূপঃ "অতঃপর আমি কিসরাকে হত্যা করেছি। আমার জাতির পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছে।..... আমার এ পত্র তোমার নিকট পৌঁছার পর তোমার আশে-পাশের লোকদের নিকট থেকে আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার নেবে।"

'বাজান' শীরাওয়াইহ'র পত্রটি পাঠ করার সাথে সাথে তা ছুঁড়ে ফেলে এবং নিজেকে একজন মুসলমান বলে ঘোষণা দেয়। তার সাথে তার আশে-পাশে ইয়ামনে যত পারসিক ছিল তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে।

এহলো পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহর (রা) ঘটনাটির সংক্ষিপ্তসার। রোমান কাইসারের সাথে তাঁর যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তা আরো চমকপ্রদ। এ ঘটনাটি ঘটে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের খিলাফতকালে।

হিজরী ১৯ সনে খলীফা উমার (রা) রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠালেন। এই বাহিনীতে আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ আস্-সাহমীও ছিলেন। কাইসার মুসলিম মুজাহিদদের ঈমান, বীরত্ব এবং আল্লাহ ও রাসূলের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার বহু কাহিনী শুনতেন। তিনি তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোন মুসলমান সৈনিক বন্দী হলে তাকে জীবিত অবস্থায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবে। আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত আবদুল্লাহ রোমানদের হাতে বন্দী হলেন। রোমানরা তাকে তাদের বাদশার নিকট হাজির করে বললোঃ "এ ব্যক্তি মুহাম্মাদের একজন সহচর, প্রথম ভাগেই সে তাঁর দ্বীন গ্রহণ করেছে। আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে, আমরা আপনার নিকট উপস্থিত করেছি।"

রোমান সম্রাট আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললোঃ

'আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই।' আবদুল্লাহঃ 'বিষয়টি কি?'

সম্রাটঃ "আমি প্রস্তাব করছি তুমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ কর। যদি তা কর, তোমাকে মুক্তি দেব এবং তোমাকে সম্মানিত করবো।"

বন্দী আবদুল্লাহ খুব দ্রুত ও দৃঢ়তার সাথে বললেনঃ

'আফসুস! যেদিকে আপনি আহবান জানাচ্ছেন তার থেকে হাজার বার মৃত্যু আমার অধিক প্রিয়।'

সম্রাটঃ 'আমি মনে করি তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। আমার প্রস্তাব মেনে নিলে আমি তোমাকে আমার ক্ষমতার অংশীদার বানাবো, আমার কন্যা তোমার হাতে সমর্পণ করবো এবং আমার এ সাম্রাজ্য তোমাকে ভাগ করে দেব।'

বেড়ী পরিহিত বন্দী মৃদু হেসে বললেনঃ "আল্লাহর কসম, আপনার গোটা সাম্রাজ্য এবং সেই সাথে আরবদের অধিকারে যা কিছু আছে সবই যদি আমাকে দেওয়া হয়, আর বিনিময়ে আমাকে বলা

হয় এক পলকের জন্য মুহাম্মাদের (সা) দ্বীন আমি পরিত্যাগ করি, আমি তা করবো না।"

সম্রাটঃ 'তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।'

বন্দীঃ 'আপনার যা খুশী করতে পারেন।'

সম্রাটের নির্দেশে বন্দীকে শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে কষে বাঁধা হল। দু'হাতে ঝুলিয়ে বেঁধে খৃষ্টধর্ম পেশ করা হল, তিনি অস্বীকার করলেন। তারপর দু'পায়ে ঝুলিয়ে বেঁধে ইসলাম পরিত্যাগের আহ্বান জানানো হল, তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট তাঁর লোকদের থামতে বলে তাঁকে শূলীকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর বিশাল এক কড়াই আনিয়ে তার মধ্যে তেল ঢালতে বললেন। সেই তেল আগুনে ফুটানো হল। টগবগ করে যখন তেল ফুটতে লাগলো তখন অন্য দু'জন মুসলমান বন্দীকে আনা হল। তাদের একজনকে সেই উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। ফেলার সাথে তার দেহের গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে হাড় থেকে পৃথক হয়ে গেল।

সম্রাট আবদুল্লাহর দিকে ফিরে তাকে আবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানালেন। আবদুল্লাহ এবার পূর্বের চেয়ে আরো বেশী কঠোরতার সাথে প্রত্যাখান করলেন। সম্রাটের নির্দেশে এবার আবদুল্লাহকে সেই উত্তপ্ত তেল ভর্তি কড়াইয়ের কাছে আনা হল। এবার আবদুল্লাহর চোখে অশ্রু দেখা দিল। লোকেরা সম্রাটকে বললো, 'বন্দী এবার কাঁদছে।' সম্রাট মনে করলেন, বন্দী ভীত হয়ে পড়েছে। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'বন্দীকে আমার কাছে নিয়ে এস।' তাঁকে আনা হল। এবারও তিনি ঘৃণাভরে খৃষ্টধর্ম প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্রাট তখন আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক। তাহলে কাঁদছো কেন?' আবদুল্লাহ জবাব দিলেনঃ "আমি একথা চিন্তা করে কাঁদছি যে, এখনই আমাকে এই কড়াইয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং আমি শেষ হয়ে যাব। অথচ আমার বাসনা, আমার দেহের পশমের সমসংখ্যক জীবন যদি আমার হতো এবং সবগুলিই আল্লাহর রাস্তায় এই কড়াই'য়ের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতাম।"

এবার খোদাদ্রোহী সম্রাট বললেনঃ 'অন্ততঃপক্ষে তুমি যদি আমার মাথায় একটা চুম্বন কর, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব।'

আবদুল্লাহ প্রথমে এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন। তবে শর্ত আরোপ করে বললেন, 'যদি আমার সাথে অন্য মুসলিম বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়, আমি রাজি আছি।'

সম্রাট বললেনঃ 'হ্যাঁ, অন্যদেরও ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আবদুল্লাহ বলেনঃ 'আমি মনে মনে বললাম,বিনিময়ে অন্য মুসলিম বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে, এতে কোন দোষ নেই।' তিনি সম্রাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় চুম্বন করলেন। রোমান সম্রাট মুসলিম বন্দীদের একত্র করে আবদুল্লাহর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সর্বমোট বন্দীর সংখ্যা ছিল ৮০ জন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) মদীনায় ফিরে এসে খলীফা উমারের (রা) নিকট ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। আনন্দে খলীফা ফেটে পড়লেন। তিনি উপস্থিত সেই বন্দীদের প্রতি তাকিয়ে বললেনঃ 'প্রতিটি মুসলমানের উচিত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহর মাথায় চুম্বন করা এবং আমিই তার সূচনা করছি।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় চুম্বন করলেন। (দ্রষ্টব্যঃ হায়াতুস সাহাবা—১/৩০২, আল-ইসাবা-২/২৯৬-৯৭, আল-ইসতিয়ার, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা—১/৫১-৫৬, উসুদুল গাবাহ্-৩/১৪৩)

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে বনী জুজাইমা গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য পাঠান। ভুল বুঝাবুঝির কারণে খালিদ তাদের ওপর আক্রমণ চালান এবং তাদের বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। এ ঘটনায় রাসূল (সা) মর্মাহত হন। তিনি নিহত ব্যক্তিদের

ক্ষতিপূরণ দান করেন এবং খালিদকেও ক্ষমা করে দেন। ইবন ইসহাক বলেন, এ ব্যাপারে খালিদকে নিন্দামন্দ করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ আস্-সাহমী আদেশ দিয়েছিলেন বলেই আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ যদি তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ তোমাকে দিয়েছেন।' (সীরাতু ইবন হিশাম—২/৪৩০)

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরের ওপর বসে ঘোষণা করেন, "আমি এখানে বসে থাকাকালীন তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া হবে।" আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আমার পিতা কে?' রাসূলুল্লাহ (সা) 'বললেন, তোমার পিতা হুজাফাহ।' (আল-ইসাবা—২/২৯৬) তাঁর মা একথা শুনে বলেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কী মারাত্মক প্রশ্নই না করেছিলে। আল্লাহ না করুন, তিনি যদি অন্য কিছু বলতেন, আমার অবস্থা কেমন হতো?'

আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, "আমি আমার নসবের সত্যতা যাচাই করছিলাম। তিনি যদি আমাকে কোন হাবশী দাসের সাথে সম্পৃক্ত করতেন, আমি তা মেনে নিতাম।"
(আল-ইসতিয়াব)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ থেকে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেন—আবু ওয়ায়িল, সুলাইমান ও ইবন ইয়াসার।

ইবন ইউনুস বলেন, আবদুল্লাহ মিসর অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং হযরত উসমানের খিলাফতকালে মিসরেই ইনতিকাল করেন। তিনি মিসরেই সমাহিত হন। (আল-ইসাবা—২/২৯৬)

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু সাহায্য চাইলো। তিনি দান করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি চাইলো। তিনি অঙ্গীকার করলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, আমি দিয়েছি। আবার চাওয়া হয়েছে, আবারো দিয়েছি। তারপর আবার চাওয়া হয়েছে, অঙ্গীকার করেছি।" মনে হলো, তাঁর কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) পছন্দ হলোনা। আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ, তখন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি খরচ করুন, 'আরশের অধিকারী যিনি তার কাছে স্বল্পতার আশংকা করবেন না।" রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আমাকে একথারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

(হায়াতুস সাহাবা—২/১৪৫)

ইবন আসাকির যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো, 'তিনি একজন রসিক ও হাস্য-কৌতুকপ্রিয় মানুষ।' তিনি বললেন, "তার কথা ছেড়ে দাও। কারণ, তার একটি বড় পেট আছে। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বড় ভালোবাসে।"

(হায়াতুস সাহাবা—২/৩২১)

খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)

নাম খাব্বাব, কুনিয়াত আবু 'আবদিল্লাহ, পিতার নাম আরাত। তাঁর বংশ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, তিনি বনু তামীম, আবার কেউ বলেছেন, বনু খুযা'য়া গোত্রের সন্তান। তবে সহীহ মতানুযায়ী তিনি বনু তামীম গোত্রের সন্তান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৪) শৈশবে তিনি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁর দাসত্বের কাহিনী ইতিহাসে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

বনু খুযা'য়া গোত্রের উম্মু আনমার নাম্নী এক মহিলা মক্কার দাস কেনা-বেচার বাজারে গেল। তার উদ্দেশ্য, সে সুস্থ ও তাজা-মোটা দেখে এমন একটি দাস কিনবে, যে তার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে। বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে আনীত দাসদের চেহারা সে গভীরভাবে দেখতে লাগলো। অবশেষে সে একটি কিশোর দাস নির্বাচন করলো, যে তখনও যৌবনে পদার্পণ করেনি। তবে দাসটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। চোখে-মুখে তার বুদ্ধিমত্তার ছাপ। আর এটা দেখেই সে তাকে চয়ন করেছে। দাম মিটিয়ে কিশোর দাসটিকে সে সংগে নিয়ে চললো।

কিছুদূর যাওয়ার পর উম্মু আনমার দাসটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলোঃ

—বৎস, তোমার নাম কি?

—খাব্বাব।

—আব্বার নাম?

—আল-আরাত।

—তোমার জন্মভূমি কোথায়?

—নাজ্‌দ।

—তাহলে তুমি আরবের অধিবাসী?

—হাঁ, বনু তামীমের সন্তান।

—তুমি মক্কার এ দাসের আড়তে এলে কিভাবে?

—আরবের কোন এক গোত্র আমাদের গোত্রের উপর আক্রমণ করে গৃহপালিত পশু-পাখি লুট করে নিয়ে যায়, পুরুষদের হত্যা করে এবং নারী-শিশুদের বন্দী করে দাসে পরিণত করে। আমি সেই বন্দী শিশুদের একজন। তারপর হাত বদল হয়ে মক্কায় পৌঁছেছি এবং বর্তমানে আপনার হাতে।

উম্মু আনমার তার দাসটিকে তরবারি নির্মাণের কলা-কৌশল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মক্কার এক কর্মকারের হাতে সোপর্দ করলো। অল্প দিনের মধ্যে এ বুদ্ধিমান দাস তরবারি নির্মাণ শিল্পে দক্ষ হয়ে ওঠে। উম্মু আনমার একটি দোকান ভাড়া নিয়ে কর্মকারের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করে তাকে তরবারি তৈরীর কাজে লাগিয়ে দেয়।

তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারি এবং তরবারি তৈরীর দক্ষতার কথা অল্প দিনের মধ্যে মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ তাঁর নির্মিত তরবারি খরীদের জন্য তাঁর দোকানে ভীড় জমাতে থাকে।

তরুণ হওয়া সত্বেও খাব্বাব লাভ করেছিলেন বয়স্কদের বুদ্ধিমত্তা ও বৃদ্ধদের জ্ঞান। তিনি কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে জাহিলী সমাজ যে বিপর্যয়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত সে সম্পর্কে আপন মনে ভাবতেন। তিনি ভাবতেন, কী মারাত্মক মূর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যেই না গোটা আরব জাতি হাবুডুবু খাচ্ছে এবং যার এক নিকৃষ্ট বলি সে নিজেই। তিনি চিন্তা করতেন, অবচেতন মনে মাঝে মাঝে বলতেন, এই রাত্রির শেষ অবশ্যই আছে। এই শেষ দেখার জন্য মনে মনে তিনি দীর্ঘায়ু কামনা করতেন।

দীর্ঘদিন খাব্বাবকে অপেক্ষা করতে হলো না। তিনি শুনতে পেলেন, বনু হাশিমের এক যুবক মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহর মুখ থেকে নূরের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি ছুটে গেলেন। তাঁর কথা শুনলেন এবং সেই জ্যোতি অবলোকন করলেন। সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে উচ্চারণ করলেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এভাবে তিনি হলেন বিশ্বের ষষ্ঠ মুসলমান। এ কারণে তাঁকে 'সাদেসুল ইসলাম' বলা হয়। অবশ্য মুজাহিদ বলেনঃ সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর যথাক্রমেঃ আবু বকর, খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল, 'আম্মার ও আম্মারের মা সুমাইয়্যা ইসলামের ঘোষণা দেন। এই বর্ণনা মতে খাব্বাব তৃতীয় মুসলমান। (উসুদুল গাবা-২/৯৮, আল-ইসাবা-১/৪১৬) হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, খাব্বাব তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এখন থেকে খাব্বাবের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো। আর তা হলো সত্যের জন্য হাসিমুখে যুলুম-অত্যাচার সহ্য করা ও সত্যের প্রচারে জীবন বাজি রাখার অধ্যায়। খাব্বাব তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কারো কাছে গোপন করলেন না। অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর তাঁর মনিব উম্মু আনমারের কানে পৌঁছলো। ক্রোধে সে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সে তার ভাই সিবা' ইবন 'আবদিল 'উযযাসহ বনী খুযা'য়ার একদল লোক সংগে করে খাব্বাবের কাছে গেল। তিনি তখন গভীর মনোযোগের সাথে কাজে ব্যস্ত। একটু এগিয়ে গিয়ে সিবা' বললোঃ

—তোমার সম্পর্কে আমরা একটি কথা শুনেছি, আমরা তা বিশ্বাস করিনি।

—কি কথা?

—শুনেছি, তুমি নাকি ধর্মত্যাগ করে বনী হাশিমের এক যুবকের অনুসারী হয়েছো?

—আমি ধর্মত্যাগী হইনি, তবে লা শরীক এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। তোমাদের মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

খাব্বাবের কথাগুলি তাদের কানে পৌঁছার সাথে সাথে তারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হাত দিয়ে কিল-ঘুষি ও পা দিয়ে পিষতে শুরু করলো। তাঁর দোকানের সব হাতুড়ি, লোহার পাত ও টুকরা তাঁর ওপর ছুঁড়ে মারলো। খাব্বাব সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, দেহ তাঁর রক্তে রঞ্জিত হলো।

অন্য এক দিনের ঘটনা। কুরাইশদের কতিপয় ব্যক্তি তাদের অর্ডার দেওয়া তরবারি নেওয়ার জন্য খাব্বাবের বাড়ীতে গেল। খাব্বাব তরবারি তৈরী করে মক্কায় বিক্রি করতেন এবং বাইরেও চালান দিতেন। ব্যস্ততার কারণে তিনি খুব কম সময়ই বাড়ী থেকে অনুপস্থিত থাকতেন। কিন্তু তারা খাব্বাবকে বাড়ীতে পেলনা। তারা তাঁর অপেক্ষায় থাকলো। কিছুক্ষণ পর খাব্বাব বাড়ীতে এলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে একটা উজ্জ্বল প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তিনি আগত লোকদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে বসলেন। তারা জিজ্ঞেস করলোঃ খাব্বাব, তরবারিগুলি কি বানানো হয়েছে?

খাব্বাবের চোখে মুখে একটা খুশীর আভা। আপন মনে তিনি কী যেন ভাবছেন। এ সময় অবচেতনভাবে বলে উঠলেনঃ 'তাঁর ব্যাপারটি বড় অভিনব ধরনের।'

সাথে সাথে লোকগুলি প্রশ্ন করলোঃ তুমি কার কথা বলছো? আমরা তো জানতে চাচ্ছি, তরবারিগুলি বানানো হয়েছে কিনা।

তাদের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে খাব্বাব বললেনঃ

—তোমরা কি তাঁকে দেখেছো? তাঁর কোন কথা কি তোমরা শুনেছো?

তারা বিস্ময়ের সাথে একজন আরেকজনের দিকে তাকালো। তাদের একজন একটু রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কি তাকে দেখেছো?

খাব্বাব একটু হেঁয়ালীর মত প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কার কথা বলছো?

উত্তেজিত কণ্ঠে লোকটি জবাব দিলঃ তুমি যার কথা বলছো, আমি তার কথাই বলছি।

সত্য প্রকাশের এ সুযোগটুকু খাব্বাব ছাড়লেন না। তিনি বললেনঃ হাঁ, তাঁকে আমি দেখেছি এবং তাঁর কথাও শুনেছি। আমি দেখেছি, সত্য তাঁর চতুর্দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, নূর তাঁর মুখের মধ্যে দীপ্তিমান হয়ে উঠছে।

আগত লোকেরা এখন বিষয়টি বুঝতে শুরু করলো। তাদের একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ

—ওহে উম্মু আনমারের দাস! তুমি কার কথা বলছো? শান্তভাবে খাব্বাব জবাব দিলেনঃ

—আমার আরব ভায়েরা, তিনি আর কে, তোমাদের কাওমের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কে আছেন যার চতুর্দিক থেকে সত্য প্রবাহিত, যার মুখে নূরের আভা দীপ্তিমান?

—আমাদের ধারণা, তুমি মুহাম্মাদের কথাই বলছো। খাব্বাব মাথাটি একটু দুলিয়ে উৎফুল্লভাবে বললেনঃ

—হাঁ, তিনিই আমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ তাঁকে পাঠিয়েছেন।

এ কথাগুলি উচ্চারণের পর তাঁর মুখ থেকে আর কি বেরিয়েছিল, অথবা তাকে কী বলা হয়েছিল, তিনি তা জানেন না। যতটুকু মনে আছে, কয়েক ঘন্টা পর যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, দেখলেন সেই লোকগুলি নেই। তাঁর শরীর ব্যথা-বেদনায় অসাড় এবং সমস্ত শরীর ও পরনের কাপড়-চোপড় রক্তে একাকার। ঘটনাটি তাঁর বাড়ীর সামনেই ঘটলো। তিনি কোনো মতে উঠে বাড়ীর ভেতরে গেলেন, আহত স্থানে পট্টি লাগিয়ে নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৩০)

এভাবে হযরত খাব্বাব দ্বীনের খাতিরে যুলুম-অত্যাচারের শিকার মানুষদের মধ্যে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী হলেন। দরিদ্র ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা কুরাইশদের অহমিকা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন খাব্বাব তাঁদের এক প্রধান পুরুষ।

শুকনো পাতার আগুনের মত খাব্বাবের নতুন দ্বীন গ্রহণ এবং তাঁর শাস্তি ভোগের কথা মক্কার অলি-গলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। খাব্বাবের দুঃসাহসে মক্কাবাসীরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। ইতোপূর্বে তারা একথা আর কক্ষণো শোনেনি যে, কেউ মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে এভাবে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জের সুরে মানুষের সামনে তা ঘোষণা করেছে।

খাব্বাবের ব্যাপারটি কুরাইশ নেতাদের নাড়া দিল। উম্মু আনমারের নাম-গোত্র ও সহায় সম্বলহীন এ দাস কর্মকারটি-যে এভাবে তাদের ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী ও পিতৃ-পুরুষের ধর্মের নিন্দে-মন্দের আস্পর্ধা ও দুঃসাহস দেখাবে, তা তাদের ধারণায় ছিল না। তারা মনে করলো, এমন পিটুনির পর সে হয়তো শান্ত হয়ে যাবে, কক্ষণো আর এমন বোকামী করবে না।

কুরাইশদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হলো। বরং উল্টো ফল ফললো। খাব্বাবের এই দুঃসাহসে তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সাহস বেড়ে গেল। প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দেওয়ার জন্য তারাও উৎসাহী হয়ে পড়লো। একের পর এক তারা সত্যের কালেমা ঘোষণা করতে শুরু করলো।

আবু সুফইয়ান ইবন হারব, ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, আবু জাহল প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কা'বার চত্বরে সমবেত হলো। তারা মুহাম্মাদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলো। তারা দেখলো, তাঁর বিষয়টি দিন দিন, এমনকি ঘন্টায় ঘন্টায় বৃদ্ধি ও গুরুত্ব লাভ করে চলেছে। তারা বিষয়টি আর বাড়তে না দিয়ে এখনই মূলোৎপাটনের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নিলঃ আজ থেকে প্রতিটি গোত্র, সেই গোত্রের মুহাম্মাদের অনুসারীদের ওপর যুলুম-অত্যাচার চালাতে শুরু করবে। এতে হয় তারা তাদের নতুন দ্বীন ত্যাগ করবে, না হয় মৃত্যুবরণ করবে।

সিবা' ইবন আবদিল 'উয্যা ও তার গোত্রের ওপর খাব্বাবকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব অর্পিত হলো। মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে মাটি যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠতো, তারা খাব্বাবকে মক্কার উপত্যকায় টেনে আনতো। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ উদোম করে লোহার বর্ম পরাতো। প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় তিনি কাতর হয়ে পড়তেন, তবুও এক ফোঁটা পানি দেওয়া হতো না। দারুণ পিপাসায় তিনি যখন ছটফট করতে থাকতেন, তারা তাঁকে বলতোঃ

—মুহাম্মাদ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?

বলতেনঃ তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অন্ধকার থেকে আলোয় নেওয়ার জন্য সত্য ও সঠিক দ্বীন সহকারে তিনি আমাদের নিকট এসেছেন।

তারা আবারো মারপিট করতো ও কিল-ঘুষি মারতো। তারপর জিজ্ঞেস করতোঃ

—লাত ও 'উয্যা সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি? বলতেনঃ ক্ষতি বা কল্যাণের কোন ক্ষমতা এ দু'টি বোবা-বধির মূর্তির নেই।

তারা আবার পাথর আগুনে গরম করে সেই পাথরের ওপর তাঁকে শুইয়ে দিত। খাব্বাব বলেনঃ একদিন তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। তারা আগুন জ্বালিয়ে পাথর গরম করলো এবং সেই পাথরের ওপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে একজন তার একটি পা আমার বুকের ওপর উঠিয়ে ঠেসে ধরে রাখলো। (হায়াতুস, সাহাবা-১/২৯২) এভাবে তিনি শুয়ে থাকতেন, আর তাঁর দু' কাঁধের চর্বি গলে বেয়ে পড়তো। ইমাম শা'বী বলেন, তাঁর পিঠের মাংস উঠে যেত।

তাঁর মনিব উম্মু আনমার তার ভাই সিবা' অপেক্ষা হিংস্রতায় কোন অংশে কম ছিল না। একদিন নবী মুহাম্মাদকে (সা) খাব্বাবের দোকানে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে দেখে সে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে গেল। সে একদিন পর পর খাব্বাবের দোকানে আসতো এবং খাব্বাবের হাপরে লোহার পাত গরম করে তাঁর মাথায় ঠেসে ধরতো। তীব্র যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে করতে চেতনা হারিয়ে ফেলতেন।

একদিন যখন লোহা গরম করে খাব্বাবের মাথায় ঠেসে ধরা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় ঐ পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। খাব্বাবের এ অবস্থা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর কী-ই বা করার ক্ষমতা ছিল? খাব্বাবের জন্য দু'আ ও তাঁকে কিছু সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই করতে পারলেন না। দু'হাত আকাশের দিকে উঠিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেনঃ 'আল্লাহুমা উনসুর খাব্বাবান—হে আল্লাহ্, খাব্বাবকে আপনি সাহায্য করুন।' (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩৩১)

উম্মু আনমারের প্রতি খাব্বাবের বদ-দু'আ আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পূর্বেই তার ফল দেখতে পান। উম্মু আনমারের মাথায় অকস্মাৎ এমন যন্ত্রণা শুরু হয় যে, সে সব সময় কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তার ছেলেরা চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে গেল। সব ডাক্তারই বললোঃ এ যন্ত্রণা নিরাময়ের কোন ঔষধ নেই। তবে লোহা আগুনে গরম করে মাথায় সেক দিলে একটু উপশম হতে পারে। লোহার পাত গরম করে তার মাথায় সেক দেওয়া শুরু হলো।

খলীফা হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে একদিন খাব্বাব গেলেন তাঁর কাছে। খলীফা অত্যধিক সমাদরের সাথে তাঁকে একটা উঁচু গদির ওপর বসিয়ে বললেনঃ একমাত্র বিলাল ছাড়া এই স্থানে বসার জন্য তোমার থেকে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই। খাব্বাব বললেনঃ তিনি আমার সমান হতে পারেন কেমন করে? মুশরিকদের মধ্যেও তাঁর অনেক সাহায্যকারী ছিল; কিন্তু এক আল্লাহ ছাড়া আমার প্রতি সমবেদনা জানানোর আর কেউ ছিল না। কুরাইশদের হাতে তিনি যে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, খলীফা তা জানতে চাইলেন। কিন্তু খাব্বাব তা জানাতে সংকোচ বোধ

করলেন। খলীফার বার বার পীড়াপীড়িতে তিনি চাদর সরিয়ে নিজের পিঠটি আলগা করে দিলেন। খলীফা তাঁর পিঠের বীভৎস রূপ দেখে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করেন; এ কেমন করে হলো?

খাব্বাব বললেনঃ পৌত্তলিকরা আগুন জ্বালালো। যখন তা অঙ্গারে পরিণত হলো, তারা আমার শরীরের কাপড় খুলে ফেললো। তারপর তারা আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিল। আমার পিঠের হাড় থেকে মাংস খসে পড়লো। আমার পিঠের গলিত চর্বিই সেই আগুন নিভিয়ে দেয়। এ ঘটনায় তাঁর পিঠের চামড়া শ্বেতী-রোগীর মত হয়ে গিয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৯২, মুসতাদরিক, সীরাতু ইবন হিশাম, টীকা-১/৩৪৩)

দৈহিক নির্যাতনের সাথে সাথে কুরাইশরা তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও উপহাস করতো। তাঁর পাওনা অর্থও তাঁরা আত্মসাৎ করে ফেলতো। ইবন ইসহাক বলেনঃ 'আস ইবন ওয়ায়িল আস-সাহ্‌মী নামক মক্কার এক কাফির তাঁর নিকট থেকে কিছু তরবারি খরিদ করে এবং এ বাবদ কিছু অর্থ তার কাছে বাকী থাকে। খাব্বাব পাওনা অর্থের তাগাদায় গেলেন। সে বললোঃ ওহে খাব্বাব, তোমাদের বন্ধু মুহাম্মাদ—যার দ্বীনের অনুসারী তুমি—সে কি এমন ধারণা পোষণ করেনা যে, জান্নাতের অধিবাসীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র অথবা চাকর-বাকর যা চাইবে লাভ করবে? খাব্বাব বললেনঃ হাঁ, করেন। সে বললোঃ খাব্বাব কিয়ামত পর্যন্ত একটু সময় দাও, আমি সেখানে গিয়ে তোমার পাওনা পরিশোধ করবো। আল্লাহর কসম, তোমার বন্ধু মুহাম্মাদ ও তুমি আমার থেকে আল্লাহর বেশী প্রিয়পাত্র নও। তোমরা আমার থেকে বেশী সৌভাগ্যও লাভ করতে পারবে না। এ ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেনঃ "তুমি কি লক্ষ্য করেছ সেই ব্যক্তিকে, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, 'আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কক্ষণোই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো। আর সে যে বিষয়ের কথা বলে তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একাকী।" (সূরা মরিয়ামঃ ৭৭-৮০)

একদিন খাব্বাব তাঁর মত আরো কতিপয় নির্যাতিত বন্ধুর সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন। খাব্বাব বলেনঃ আমরা যখন আমাদের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বললাম, তখন তিনি একটি ডোরাকাটা চাদর মাথার নীচে দিয়ে কা'বার ছায়ায় শুয়ে ছিলেন। আমরা বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও ক্ষমা চাইবেন না?

আমাদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তিনি ওঠে বসলেন। তারপর বললেনঃ "তোমাদের পূর্ববর্তী অনেক লোককে ধরে গর্ত খুঁড়ে তার অর্ধাংশ পোতা হয়েছে, তারপর করাত দিয়ে মাথার মাঝখান থেকে ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের হাড় থেকে গোশত ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তবুও তাদের দ্বীন থেকে তারা বিন্দুমাত্র টলেনি। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমন একদিন আসবে যখন একজন পথিক 'সান'আ' থেকে 'হাদরামাউত' পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। এই দীর্ঘ ভ্রমণে সে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় করবে না। তখন নেকড়ে মেষপাল পাহারা দেবে। কিন্তু তোমরা বেশী অস্থির হয়ে পড়ছো' (রিজালুন হাওলার রাসূল-২৩১, উসুদুল গাবা-২/৯৮)

খাব্বাব ও তাঁর বন্ধুরা মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী শুনলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে পরিমাণ সবর ও কুরবাণী—ধৈর্য ও ত্যাগ পছন্দ করেন, তাঁরা তা করবেন। এভাবে তাঁদের ঈমান আরো মজবুত হয়ে যায়।

উম্মু আনমার খাব্বাবকে আযাদ করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চলতে থাকে। ইমাম শা'বী বলেন, 'শত নির্যাতনের মুখেও খাব্বাব ধৈর্য ধারণ করেন। কাফিরদের অত্যাচারে তাঁর শিরদাঁড়া একটুও দুর্বল হয়ে পড়েনি।' মক্কায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর সবটুকু সময় ইবাদাত ও তাবলীগে দ্বীনের কাজে ব্যয় করতেন। মক্কায় তখনও যারা ভয়ে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেনি, তিনি গোপনে তাদের বাড়ীতে যেয়ে যেয়ে কুরআন শিক্ষা দিতেন। হযরত উমারের (রা) বোন-ভগ্নিপতি ফাতিমা ও সা'ঈদকে তিনি গোপনে কুরআন শিক্ষা দিতেন। যেদিন হযরত রাসূলে কারীমকে হত্যার উদ্দেশ্যে 'উমার (রা) বের হলেন এবং পথে নু'য়াইম ইবন আবদিল্লাহর নিকট তাঁর বোন-ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন, সেদিন সেই সময় খাব্বাব (রা) তাদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 'উমারের (রা) উপস্থিতি টের পেয়ে তিনি ফাতিমার বাড়ীর এক কোণে আত্মগোপন করেন। অতঃপর 'উমারের (রা) মধ্যে কুরআন পাঠের পর ভাবান্তর সৃষ্টি হলে তিনি যখন বললেন, তোমরা আমাকে মুহাম্মাদের কাছে নিয়ে চল, তখন খাব্বাব গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি 'উমারকে (রা) বলেনঃ ওহে উমার, আমি আশা করি তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নবীর দু'আ কবুল হয়েছে। গতকাল আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দু'আ করতে শুনেছিঃ 'হে আল্লাহ, তুমি আবুল হাকাম অথবা উমার ইবনুল খাত্তাব—এ দু' ব্যক্তির কোন একজনের দ্বারা ইসলামকে সাহায্য কর।' উমার বললেনঃ খাব্বাব, মুহাম্মাদ এখন কোথায়, আমাকে একটু বল। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। খাব্বাব বললেনঃ তিনি এখন সাফা পাহাড়ের নিকটে একটি বাড়ীতে তাঁর কিছু সংগীর সাথে অবস্থান করছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৪৩, ৩৪৫, হায়াতুস সাহাবা-১/২৯৭)

একদিন কুরাইশদের দুই নেতা আকরা' ইবন হাবিস ও উ'য়াইনা ইবন হাসান আল-ফাযারী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে দেখলো, তিনি 'আম্মার, সুহাইব, বিলাল, খাব্বাব প্রমুখ দাস ও দুর্বল মু'মিনদের সাথে বসে আছেন। নেতৃদ্বয় উপস্থিত সকলকে উপেক্ষা করে হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) একটু দূরে ডেকে নিয়ে যেয়ে বললোঃ আরবের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি আপনার কাছে আসে। এই দাসদের সাথে আমরা এক সংগে বসি, আর আরবের লোকেরা তা দেখে যাক, এটা আমাদের আত্ম সম্মানে বাধে। আমরা যখন আপনার কাছে আসি, তাদের একটু দূরে সরিয়ে দেবেন। রাসূল (সা) তাদের কথায় সায় দিলেন। তারা বললো, বিষয়টি তাহলে এখনই লেখাপড়া হয়ে যাক। রাসূল (সা) আলীকে ডেকে কাগজ-কলম আনালেন। খাব্বাব বলেনঃ আমরা তখন একটু দূরে বসে আছি। এমন সময় জিবরীল (আ) এ আয়াতগুলি নিয়ে হাজির হলেনঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ডাকে তাদের তুমি দূরে সরিয়ে দিওনা। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদের বিতাড়িত করবে। আর তা করলে তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা আল আন্‌আমঃ ৫২-৫৩)

খাব্বাব বলেন, উপরোক্ত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কাগজ-কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে কাছে ডাকলেন। আমরা কাছে গেলে তিনি আমাদের সালাম জানালেন। আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসলাম। আর তক্ষুণি আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেনঃ

"তুমি নিজেকে ধৈর্যশীল রাখবে তাদের সাথে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে আহবান করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা।" (সূরা কাহাফ-২৮)

খাব্বাব বলেন, এর পর থেকে আমরা যখনই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বসতাম, আমরা না ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৭৫)

খাব্বাব দীর্ঘকাল মক্কার কুরাইশদের সীমাহীন নির্যাতন ধৈর্যের সাথে সহ্য করে মক্কার মাটি আঁকড়ে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ পাক হিজরাতের অনুমতি দান করেন এবং তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রিজামন্দী-লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি হিজরাত করেছেন। তিনি বলতেন, আমি কেবল আল্লাহর জন্যই রাসূলুল্লাহর সাথে হিজরাত করেছি। মদীনায় আসার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত খিরাশ ইবন সাম্মার সাথে মতান্তরে জিবর ইবন 'উতাইকের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা দ্বীনী-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। (উসুদুল গাবা-২/৯৯)

মদীনায় আসার পর হযরত খাব্বাবের জীবনে একটু শান্তি ও নিরাপত্তা দেখা দেয়। যে শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে তিনি আজন্ম বঞ্চিত ছিলেন। এখানে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। বদর ও উহুদসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি উম্মু আনমারের ভাই সিবা'র পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এদিন সে হযরত হামযার (রা) হাতে নিহত হয়।

হযরত খাব্বাবের (রা) সারাটি জীবন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছে। ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী কিছুকাল তরবারি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জীবনের শেষ ভাগে তাঁর যথেষ্ট সচ্ছলতা আসে। খলীফা হযরত উমার ও হযরত উসমানের খিলাফতকালে যখন সকল সাহাবীর নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে ভাতা নির্ধারিত হয়, হযরত খাব্বাব তখন থেকে মোটা অংকের ভাতা লাভ করেন। তখন প্রচুর অর্থ তাঁর হাতে জমা হয়ে যায়। তবে সেই অর্থের সাথে তাঁর আচরণ ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি তাঁর দিরহাম ও দীনারসমূহ একটি উন্মুক্ত স্থানে রেখে দেন। অভাবগ্রস্ত ও ফকীর মিসকীনরা সেখান থেকে ইচ্ছামত নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ে যেত। এজন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন হতো না। এতকিছু সত্বেও এ চিন্তা করে তিনি সব সময় ভীত ছিলেন যে, হয়তো আল্লাহ তাঁর এ সম্পদের হিসাব চাইবেন এবং এ জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তাঁর সংগী-সাথীদের একটি দল বলেন ঃ "আমরা খাব্বাবের অন্তিম রোগ শয্যায় তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি তাঁর জরাজীর্ণ ঘরের একদিকে ঈঙ্গিত করে আমাদের বললেন ঃ এই স্থানে আশি হাজার দিরহাম আছে। আল্লাহর কসম, কক্ষণো স্থানটির মুখ বন্ধ করিনি এবং কোন সায়েলকেও তা থেকে গ্রহণ করতে নিষেধ করিনি। একথা বলে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বন্ধুরা তাঁকে বললেন ঃ আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন ঃ আমার সঙ্গীরা দুনিয়াতে তাদের কাজের কোন প্রতিদান না নিয়ে চলে গেছে। আমি বেঁচে আছি এবং এত সম্পদের মালিক হয়েছি। আমার ভয় হয়, এই সম্পদ আমার সৎকাজের প্রতিদান কিনা। আর এজন্যই আমি অস্থির হয়ে কাঁদি। তারপর তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো, যখন তিনি নিজের জন্য ক্রয় করা দামী কাফনের দিকে ইঙ্গিত করে একথাগুলি বললেন ঃ তোমরা দেখ, এই আমার কাফনের কাপড়। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত হামযা উহুদে শাহাদাত বরণ করলে তাঁর কাফনের জন্য একটি চাদর ছাড়া আর কোন কাপড় পাওয়া গেল না। সেই চাদর দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ছিল।"

হিজরী ৩৭ সনে তিনি কূফায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসা সত্বেও রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যদি মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি মৃত্যুর জন্য দু'আ করতাম। (আল-ইসাবা-১/৪১৬, উসুদুল গাবা-২/৯৯) তাঁর মৃত্যুর সন, স্থান ও মৃত্যুকালে বয়স সম্পর্কে সীরাত লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী হিজরী ৩৯ সনে সিফফীন যুদ্ধের পর ৭২ বছর বয়সে কূফায় ইনতিকাল করেন। অসুস্থতার কারণে সিফফীন যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। হযরত আলী (রা) সিফফীন যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পান এবং

তিনিই নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। কূফাবাসীরা সাধারণতঃ শহরের ভেতরেই মৃতদের দাফন করতো। মৃত্যুর পূর্বে হযরত খাব্বাব অসিয়াত করে যান, তাঁকে যেন শহরের বাইরে দাফন করা হয়। তাঁর অসিয়াত মুতাবিক তাঁকে কূফা শহরের বাইরে দাফন করা হয়। কূফা শহরের বাইরে দাফনকৃত প্রথম সাহাবী তিনি। (উসুদুল গাবা-২/১০০)

হযরত খাব্বাবকে দাফন করার পর আমীরুল মুমিনীন আলী (রা) তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেনঃ "আল্লাহ খাব্বাবের ওপর রহম করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ব্যাকুলভাবে, হিজরাত করেন অনুগত হয়ে এবং জীবন অতিবাহিত করেন মুজাহিদ রূপে। যারা সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের ব্যর্থ করেন না।"

হযরত খাব্বাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা ও কাজ জানার প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। কখনও কখনও রাসূলুল্লাহর (সা) অজ্ঞাতসারে রাত জেগে জেগে তাঁর ইবাদাতের কায়দা-কানুন দেখতেন এবং সকাল বেলা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। একবার রাসূল (সা) সারারাত নামায পড়লেন, আর তিনি চুপিসারে তা দেখলেন। সকালে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। গত রাতে আপনি এমন নামায পড়েছেন যা এর আগে আর কখনও পড়েননি। তিনি বললেনঃ হাঁ, এটা ছিল আশা ও ভীতির নামায, আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছিলাম, দু'টি দান করেছেন ; কিন্তু একটি দেননি। একটি ছিল, আল্লাহ যেন আমার উম্মাতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করেন। এটা কবুল করেছেন। আরেকটি ছিল, বিজাতীয় কোন শত্রুকে যেন আমার উম্মাতের উপর বিজয়ী না করেন। এটাও আল্লাহ কবুল করেছেন। তৃতীয়টি ছিল, আমার উম্মাতের একদলের হাতে অন্যদল যেন নিষ্ঠুরতার শিকার না হয়। এটা কবুল হয়নি। (উসুদুল গাবা-২/৯৯)

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) তেত্রিশটি (৩৩) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি, দু'টি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সাহাবা ও তাবেঈদের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁরা হলেনঃ তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ, আবু উমামা বাহিলী, আবু মা'মার, আবদুল্লাহ ইবন শুখাইর, কায়েস ইবন আবী হাযেম, মাসরূক ইবন আজদা, 'আলকামা ইবন কায়েস প্রমুখ।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাতের কন্যা বর্ণনা করেছেন। আমার আব্বা একবার জিহাদে চলে গেলেন। বিদায় বেলা আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি মাত্র ছাগী রেখে বলে গেলেনঃ ছাগীটির দুধ দোহনের প্রয়োজন হলে আহলুস সুফ্ফার লোকদের কাছে নিয়ে যাবে। আমরা ছাগীটি তাদের কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা সেখানে রাসূলকে (সা) বসা দেখলাম। তিনি ছাগীটি বেঁধে দুইলেন। তিনি বললেনঃ তোমাদের ঘরের সবচেয়ে বড় পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এস। আমি আটা মাখার পাত্রটি নিয়ে এলাম। তিনি তাতে দুধ দুইলেন এবং তা ভরে গেল। তিনি দুধ ভরা পাত্রটি আমাদের হাতে দিয়ে বললেনঃ নিয়ে যাও, নিজেরা পান করবে, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও দেবে। আর যখনই প্রয়োজন হয় ছাগীটি আমার কাছে এনে দুইয়ে নিয়ে যাবে। আমরা প্রায়ই ছাগীটি রাসূলুল্লাহর (সা) হাত দ্বারা দুইয়ে নিয়ে আসতাম। আমার আব্বা জিহাদ থেকে ফিরে এলেন। তিনি যখনই ছাগীটি দুইতে গেলেন, দুধ বন্ধ হয়ে গেল। আমার আম্মা বললেনঃ তুমি ছাগীটি নষ্ট করে দিলে। আগে আমরা এই পাত্র ভরে দুধ পেতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কে দুইতো? আম্মা বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা)। তিনি বললেনঃ তুমি কি আমাকে তাঁর সমকক্ষ মনে করলে? তাঁর চেয়ে বেশী বরকত বিশিষ্ট হাত আর কার আছে? (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩৭)

মুগীরা ইবন শু'বা (রা)

নাম আবু 'আবদিল্লাহ মুগীরা, পিতা শু'বা ইবন আবী 'আমের। আবু 'আবদিল্লাহ ছাড়াও আবু মুহাম্মাদ ও আবু 'ঈসা তাঁর কুনিয়াত। বনী সাকীফ গোত্রের সন্তান। তাঁর মা উমামা বিনতু আফকাম বনী নাসর ইবন মুয়াবিয়া গোত্রের কন্যা। হিজরী পঞ্চম সনে খন্দক যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে অবস্থান করতে থাকেন। (আল-ইসাবা-৩/৪৫২, উসুদুল গাবা-৪/৪০৬, আল-ইসতিয়াব)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে মুগীরার সর্বপ্রথম কখন পরিচয় হয় সে সম্পর্কে একটি ঘটনা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। মুগীরা বলেন ঃ আমি প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহর সাথে পরিচিত হই, সেদিন আবু জাহল ও আমি মক্কার এক ছোট্ট গলিপথ দিয়ে হাঁটছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হল। রাসূল (সা) আবু জাহলকে বললেন ঃ ইয়া আবাল হাকাম—ওহে আবুল হাকাম ; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এস। আবু জাহল বললো ঃ ইয়া মুহাম্মাদ ! তুমি কি আমাদের ইলাহ বা মা'বুদদের নিন্দামন্দ থেকে বিরত হবে না ? তুমি কি শুধু চাও আমরা সাক্ষ্য দিই যে, তুমি পৌঁছিয়েছ ? তাহলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহর কসম, আমি যদি জানতাম তুমি যা বলছো তা সত্য, তাহলে আমরা তোমার ইত্তেবা বা অনুসরণ করতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা) চলে গেলেন। আবু জাহল আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো ঃ আল্লাহর কসম ! আমি নিশ্চিতভাবে জানি, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য। কিন্তু আমাকে তা গ্রহণ করতে যে জিনিস বাধা দেয় তা হচ্ছে ঃ বনু কুসাই দাবী করলো, হিজাবাহ্ আমাদের। (অর্থাৎ কা'বার চাবি তাদের কাছে থাকে, তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না) আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারা বললো ঃ সিকায়াহ্ আমাদের। (হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব) আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারা বললো ঃ 'আন-নাদওয়াহ আমাদের।' (পরামর্শ সভার দায়িত্ব) আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারপর তারা বললো ঃ 'আল-লিওয়া' (যুদ্ধের পতাকা) আমাদের।' আমরা বললাম ঃ হাঁ। তারা মানুষকে আহার করায়, আমরাও আহার করালাম। এই ব্যাপারে আমরা যখন তাদের সমকক্ষতা অর্জন করলাম, তখন তারা বললো ঃ আমাদের নবী আছে। আল্লাহর কসম, আমি তা মানতে পারিনে। (হায়াতুস সাহাবা ১/৮৪)

তিনি হুদাইবিয়া অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী হয়ে বাইয়াতে রিদওয়ানে শরিক হন। কুরাইশরা মক্কায় প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। কুরাইশ পক্ষে 'উরওয়া ইবন মাসউদ আস্-সাকাফী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আলোচনার জন্য আসে। আরবের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী সে কথা বলার মধ্যে মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র দাড়ির দিকে হাত বাড়াতে থাকে। মুসলমানদের নিকট এটা ছিল অমার্জিত আচরণ। মুগীরা তখন সশস্ত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে দাঁড়িয়ে। উরওয়ার এরূপ আচরণে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। যখনই 'উরওয়া হাত সম্প্রসারণ করছিল, মুগীরার হাত অবলীলাক্রমে তার তরবারির বাঁটের ওপর চলে যাচ্ছিল। এক সময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিন ধমকের সুরে বললেন ঃ সাবধান ! হাত নিয়ন্ত্রণে রাখ। 'উরওয়া ঘাড় ফিরে তাকালো। তাঁকে চিনতে পেরে বললো ঃ 'ওরে ধোঁকাবাজ ! আমি কি তোর পক্ষে কাজ করিনি ? উল্লেখ্য যে, উরওয়া ছিল মুগীরার চাচা। জাহিলী যুগে মুগীরা কয়েকজন লোককে হত্যা করে। এই উরওয়া ইবন মাসউদ নিহত লোকদের দিয়াত বা রক্তমূল্য আদায় করে। উরওয়া এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত

করেছিল। (বুখারী ঃ কিতাবুশ শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালিহা, উসুদুল গাবা-৪/৪০৬ হায়াতুস সাহাবা-১/১০২)

হুদাইবিয়ার পর তিনি একাধিক অভিযানে অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি বিশেষ বাহিনীর সাথে তাঁকে ও আবু সুফইয়ানকে তায়েফে পাঠান। তাঁরা বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন।

বনী সাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলো। মদীনার উপকণ্ঠে মুগীরা উট চরাচ্ছিলেন, সর্বপ্রথম তাঁর সাথেই সাকীফ গোত্রের লোকদের দেখা হল। মুগীরা তাদের দেখেই রাসূলুল্লাহকে (সা) এ সুসংবাদটি দেওয়ার জন্য দৌড় দিলেন। পথে হযরত আবু বকরের (রা) সাথে দেখা হলে তাঁকে সংবাদটি দিলেন। তিনি মুগীরাকে কসম দিয়ে অনুরোধ করলেন, তুমি আমার আগে রাসূলুল্লাহকে (সা) এ সুসংবাদটি দিওনা। সর্বপ্রথম আমিই রাসূলুল্লাহকে (সা) বিষয়টি অবহিত করতে চাই। মুগীরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। আবু বকরই (রা) সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) কানে সুসংবাদটি পৌঁছালেন। তারপর মুগীরা সাকীফ গোত্রের নিকট পৌঁছে ইসলামী কায়দায় কিভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাম করতে হবে তা তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/১৮৪)

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দাফন-কাফনের সময় হাজির ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মরদেহ লোকেরা কবরে নামিয়ে যখন ওপরে উঠে এসেছে, হঠাৎ তিনি ইচ্ছা করে নিজের আংটিটি কবরের মধ্যে ফেলে দিলেন। হযরত আলী (রা) তাঁকে আংটিটি উঠিয়ে আনতে বললেন। তিনি কবরে নেমে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র পা হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে যখন মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছিল, তিনি কবর থেকে উঠে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সর্বশেষ বিদায়ী ব্যক্তির সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই মানুষের কাছে গর্বের সাথে বলতেন, আমি তোমাদের সকলের শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। (তাবাকাত)

হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর প্রথম দুই খলীফার যুগে অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হযরত আবু বকরের (রা) নির্দেশে সর্বপ্রথম তিনি 'বাহীরা' অভিযানে যান। ইয়ামামার ধর্মত্যাগীদের নির্মূল করার ব্যাপারেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

ভণ্ড নবীদের বিদ্রোহ দমনের পর তিনি ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 'বুয়াইব' বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী কাদেসিয়ার দিকে অগ্রসর হলে পারস্য সেনাপতি বিখ্যাত বীর রুস্তম আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধি পাঠানোর অনুরোধ জানায়। তার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে একাধিক দূতের যাতায়াত চললো। সর্বশেষ এ দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত মুগীরার ওপর।

পারসিকরা মুসলিম দূতকে ভীত ও আতঙ্কিত করে তোলার জন্য সেনাপতি রুস্তমের দরবার খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে সজ্জিত করে। পারস্য বাহিনীর সকল অফিসার রেশমের বহুমূল্য পোশাক পরিধান করে। স্বয়ং রুস্তম স্বর্ণখচিত মুকুট মস্তকে ধারণ করে গর্বভরে মঞ্চের ওপর উপবিষ্ট হয়। দামী কার্পেটে সমগ্র দরবার আচ্ছাদিত হয়। হযরত মুগীরা দরবারে পৌঁছে নিঃসংকোচে সোজা মঞ্চের ওপর উঠে রুস্তমের পাশে বসে পড়েন। এমন সাহসিকতার সাথে তাঁকে বসতে দেখে রুস্তমের পারিষদবর্গ ভীষণ বিরক্ত হয়। তারা মুগীরার হাত ধরে টেনে এনে মঞ্চের নীচে বসিয়ে দেয়। মুগীরা বললেন ঃ

"'আমরা আরববাসী, আমাদের সেখানে এক ব্যক্তি খোদা হবে, আর অন্যরা তার পূজা করবে এমন বিধান নেই। আমরা সকলে সমান। তোমরা আমাদের ডেকে এনেছো, আমরা উপযাচক হয়ে এখানে আসিনি। তোমাদের এমন আচরণ কি যুক্তিসম্মত? তোমাদের অবস্থা যদি এমন

থাকে, খুব শিগ্‌গির তোমরা বিলীন হয়ে যাবে। আমি বুঝলাম, তোমাদের শাসন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। এমন অবস্থায় এবং এমন বুদ্ধির কোন সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে না।"

দরবারের নীচ শ্রেণীর লোকেরা মন্তব্য করলো, এই আরবী লোকটি সত্য কথাই বলেছে। ইরানীরা এমন সাম্যের সাথে পরিচিত ছিল না। মুগীরার কথা শুনে তারা একটু দমে গেল। রুস্তমও একটু লজ্জিত হল। সে বললো, এটা চাকর-বাকরদের ভুল। তারপর মুগীরাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে মুগীরার তুনীর থেকে তীর বের করে রসিকতার সুরে জিজ্ঞেস করে, 'এ দিয়ে কী হবে?' মুগীরা জবাব দিলেনঃ 'স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র হলেও তা আগুন।' রুস্তম এবার মুগীরার তরবারির দিকে ইঙ্গিত করে বলে, 'তোমার এই তলোয়ারটি তো অনেক পুরনো।' মুগীরা বললেন, 'বাঁট পুরনো হলেও ধার আছে।' এরপর মূল বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

রুস্তম স্বজাতির শৌর্য বীর্য, শক্তি ও ক্ষমতা এবং আরবদের তুচ্ছতা ও দারিদ্র্যের উল্লেখ করে বলে, 'তোমরা আমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের সাথে আমরা ভালো ব্যবহার করে থাকি, তোমাদের বিপদ-আপদও আমরা দূর করে থাকি। তোমরা দেশে ফিরে যাও, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা আমাদের দেশে প্রবেশে আমরা বাধা দেব না। আর তোমাদের প্রত্যেক সৈনিককে তাদের মর্যাদা অনুসারে আমরা উপঢৌকন দেব।'

মুগীরা বললেনঃ

"দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আখিরাত। আল্লাহ আমাদের নিকট একজন নবী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছেনঃ যারা আমার দ্বীন গ্রহণ করবে না, আমি তাদের উপর এই দলটিকে বিজয়ী করবো, এদের দ্বারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব। তারা যতদিন এই দ্বীন আঁকড়ে থাকবে, আমি তাদের বিজয়ী রাখবো। অপমানিত ব্যক্তিরা এ দ্বীন প্রত্যাখ্যান করবে এবং সম্মানিত ব্যক্তিরা তা আঁকড়ে থাকবে।"

রুস্তমঃ 'সেই দ্বীন কি?'

মুগীরাঃ 'সেই দ্বীনের ভিত্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এই কথার শাহাদাত বা সাক্ষ্য এবং আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু এসেছে তার স্বীকৃতি দান।'

রুস্তমঃ 'এ তো খুব চমৎকার কথা! আর কি?'

মুগীরাঃ 'মানুষকে মানুষের ইবাদাত বা বন্দেগী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে নিয়ে যাওয়া।'

রুস্তমঃ 'খুবই চমৎকার কথা! আর কি?'

মুগীরাঃ 'প্রতিটি মানুষই আদমের সন্তান, প্রত্যেকেই আমরা ভাই-ভাই।'

রুস্তমঃ 'কী চমৎকার! যদি আমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করি তোমরা কি তোমাদের দেশে ফিরে যাবে?'

মুগীরাঃ 'আল্লাহর কসম, আমরা ফিরে যাব। তারপর ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন প্রয়োজন ছাড়া আমরা তোমাদের দেশের কাছেই ঘেঁষবো না।'

রুস্তমঃ 'খুবই ভালো কথা!'

বর্ণনাকারী বলেন, মুগীরা বের হয়ে গেলে রুস্তম তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করে। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ তাদের অকল্যাণ ও লাঞ্ছিত করেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আলোচনার এক পর্যায়ে রুস্তম বলেঃ 'আমরা তোমাদের হত্যা করবো।'
মুগীরা বলেনঃ 'তোমরা আমাদের হত্যা করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করবো, আর আমরা তোমাদের হত্যা করলে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমরা তখন জিযিয়া দানে বাধ্য হবে।' জিযিয়ার কথা শুনে তারা চিৎকার করে ওঠে।
মুগীরা বলেনঃ 'জিযিয়া' দানে অস্বীকৃত হলে তরবারিই হবে তোমাদের ও আমাদের শেষ ফয়সালা।' এমন কঠোর উত্তরে রুস্তম ক্রোধোন্মত্ত হয়ে পড়ে। সে বলেঃ 'সূর্যের শপথ! আগামীকাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই তোমাদের সেনাবাহিনী নাস্তানাবুদ করে ফেলা হবে।'
মুগীরা বলেনঃ 'নদী পার হয়ে তোমরা আমাদের দিকে যাবে, না আমরা তোমাদের দিকে আসবো?'
রুস্তমঃ 'আমরাই নদী পার হয়ে তোমাদের দিকে যাব।'

এই আলোচনার পর মুগীরা শিবিরে ফিরে আসেন। মুসলিম সৈনিকরা একটু পিছু হটে পারস্য বাহিনীকে নদী পার হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ যুদ্ধে হযরত মুগীরা অংশগ্রহণ করেন এবং পারস্য বাহিনী শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। (হায়াতুস সাহাবা-১/২২০, ২২২-২৩, ৩/৬৮৭-৯২, তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ-১/২০৯)।

হিজরী উনিশ সনে রায়, কাওমাস ও ইসপাহানবাসীরা শাহানশাহ ইয়াযদিগিরদের সাথে যোগাযোগ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষাট হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গড়ে তোলে। হযরত আম্মার বিন ইয়াসির খলীফা উমারকে (রা) বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে অবহিত করেন। বাহিনীসহ খলীফা নিজেই রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করে সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তিনি বসরা ও কূফার আমীরদ্বয়কে নির্দেশ দেন, তারা যেন নিজ নিজ বাহিনীসহ নিহাওয়ান্দের দিকে অগ্রসর হয়। তিনি নু'মান ইবন মুকাররিনকে সেনাপতি নিয়োগ করে হিদায়াত দেন, যদি তুমি শহীদ হও, হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান হবে তোমার স্থলাভিষিক্ত। হুজাইফা শহীদ হলে জারীর ইবন আবদিল্লাহ আল বাজালী তার স্থলাভিষিক্ত হবে, আর সে শহীদ হলে মুগীরা ইবন শু'বা পতাকা তুলে ধরবে।

মুসলিম সৈন্যরা নিহাওয়ান্দের নিকটে ছাউনী ফেলার পর ইরানীরা আবারো আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে একজন দূত পাঠানোর অনুরোধ জানায়। যেহেতু পূর্বেই একবার সাফল্যের সাথে মুগীরা দৌত্যগিরির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এ কারণে দ্বিতীয়বার এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকেই নির্বাচন করা হয়। দূত হিসাবে ইরানীদের দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, অবস্থা আগের মতই। ইরানী সেনাপতি স্বর্ণখচিত মুকুট পরে মঞ্চে বসে আছে। দরবারের অন্যান্য সিপাহী সান্ত্রীরা চকচকে তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ভাব-গম্ভীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সমগ্র দরবার নিস্তব্ধ-নীরব। মুগীরা কারো প্রতি কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা ঢুকে গেলেন। পথে প্রহরীরা বাধা দিতে চাইলো। তিনি তাদের বললেন, 'দূতদের সাথে এমন আচরণ শোভনীয় নয়।' আলোচনা শুরু হল। পারস্য সেনাপতি মারওয়ানশাহ বললো, "তোমরা আরবের অধিবাসী, তোমাদের অপেক্ষা অধিক হতভাগ্য, দারিদ্র্যপীড়িত ও অপবিত্র জাতি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। আমার সৈনিকরা অনেক আগেই তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো; কিন্তু তোমরা এত নীচ যে, তোমাদের নাপাক রক্তে আমরা আমাদের তীর রঞ্জিত করতে চাইনি। এখনও তোমরা ফিরে গেলে আমরা তোমাদের ক্ষমা করে দেব। অন্যথায় রণক্ষেত্রে তোমাদের লাশ তোমরা তড়পাতে দেখবে।"

হযরত মুগীরা হামদ ও নাতের পর বললেনঃ "তোমার ধারণা মত নিশ্চয় আমরা এক সময় তেমনই ছিলাম। কিন্তু আমাদের রাসূল (সা) আমাদের 'আদল বা কায়া পাল্টে দিয়েছেন। এখন চতুর্দিকে আমাদের ক্ষেত্র পরিষ্কার। যতক্ষণ রণক্ষেত্রে আমাদের লাশ তড়পাতে না থাকবে, আমরা

তোমাদের সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারিনে।"

দৌত্যগিরি ব্যর্থ হল। উভয়পক্ষে যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। হযরত মুগীরাকে নিয়োগ করা হল বাম ভাগের দায়িত্বে। নিহাওয়ান্দের এ যুদ্ধে হযরত নু'মান ইবন মুকাররিন মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে লাগলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তায় কোন পরিবর্তন হল না। পারস্য বাহিনী পরাজয় বরণ করলো। যুদ্ধ শেষে হযরত মা'কাল দেখতে গেলেন হযরত নু'মান ইবন মুকাররিনকে। তখনও তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিল, দৃষ্টিশক্তিও কাজ করছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কে?' মা'কাল নিজের পরিচয় দিলেন। নু'মান জিজ্ঞেস করলেনঃ 'যুদ্ধের ফলাফল কী?' মাকাল বললেনঃ 'আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন।' তিনি বললেনঃ 'আল-হামদুলিল্লাহ—সকল প্রশংসা আল্লাহর। উমারকে অবহিত কর।' এ কথাগুলো বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নিহাওয়ান্দের পর বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী পাঠিয়ে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। হামাদান অভিযানের সার্বিক দায়িত্ব হযরত মুগীরার ওপর অর্পিত হয়। অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তিনি হামাদানবাসীদের পরাজিত করে তাদেরকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি যোগ দেন। এ যুদ্ধে তিনি চোখে মারাত্মক রকম আঘাত পান। (আল-ইসাবা-৩/৪৫৩, উসুদুল গাবা-৪/৪০১)

বসরা শহর পত্তনের পর হযরত 'উমার (রা) তাঁকে সেখানকার ওয়ালী নিয়োগ করেন। তিনি বসরার ওয়ালী থাকাকালীন অনেক নিয়ম-পদ্ধতি চালু করেন। সৈনিকদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম বসরায় একটি পৃথক 'দিওয়ান' বা দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। (আল-ইসাবা-৩/৪৫৩) কিছুদিন পর তাঁর চরিত্রের প্রতি মারাত্মক এক দোষারোপের কারণে খলিফা 'উমার (রা) ওয়ালীর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। তদন্তের পরে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। (উসুদুল গাবা-৪/৪০৬) রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী তাঁর প্রতি আরোপিত জঘন্য অভিযোগ থেকে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় হযরত উমার (রা) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেন। এ ঘটনার পর হযরত উমার (রা) তাঁকে 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের (রা) স্থলে কূফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। হযরত উমারের খিলাফতের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করেন। (উসুদুল গাবা—৪/৪০৭)

খলীফা হযরত উসমানকে (রা) তিনি সবসময় সৎ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। ইমাম আহমাদ মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত উসমান যখন গৃহবন্দী তখন মুগীরা একদিন তাঁর কাছে গেলেন। তিনি খলীফাকে বললেন, 'আপনি জনগণের ইমাম বা নেতা। আপনার ওপর যা আপতিত হয়েছে, তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনাকে তিনটি পন্থার কথা বলবো, এর যে কোন একটি গ্রহণ করুন। ১· আপনি ঘর থেকে বের হয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করুন। আপনার সে শক্তি ও ক্ষমতা আছে। আপনি আছেন সত্যের ওপর, আর তারা আছে বাতিলের ওপর। ২· আপনি বাড়ীর পেছন দরজা দিয়ে গোপনে বের হয়ে বাহনে আরোহণ করুন এবং সোজা মক্কায় চলে যান। বিদ্রোহীরা সেখানে আপনার কোন ক্ষতি করবে না। ৩· আপনি সিরিয়া চলে যান। কারণ, সেখানে মুয়াবিয়া আছেন। জবাবে খলীফা উসমান বললেনঃ প্রথমতঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) উম্মাতের মধ্যে প্রথম রক্তপাতকারী হতে চাই না। দ্বিতীয়তঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ একজন কুরাইশ ব্যক্তিকে মক্কায় কবর দেওয়া হবে, তার ওপর বিশ্বের অর্ধেক আযাব বা শাস্তি আপতিত হবে। আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তি হতে চাই না। তৃতীয়তঃ দারুল হিজরাহ্ ও মুজাবিরাতু রাসূলিল্লাহ— হিজরাতস্থল ও রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য (মদীনা) ত্যাগ করে সিরিয়া যেতে আমি ইচ্ছুক নই। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৯৬)

হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে বিরোধ শুরু হল। প্রথম দিকে হযরত মুগীরা (রা) হযরত আলীর (রা) পক্ষে ছিলেন। তিনি আলীর (রা) খিদমতে হাজির হয়ে সরলভাবে পরামর্শ দেন, "যদি আপনি আপনার খিলাফত শক্তিশালী করতে চান তাহলে তালহা ও যুবাইরকে যথাক্রমে কুফা ও বসরার ওয়ালী নিয়োগ করুন। আর আমীর মুয়াবিয়াকে তার পূর্ব পদে আপাততঃ বহাল রাখুন, তারপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যা ইচ্ছা হয় করবেন।" হযরত আলী (রা) তাঁকে জবাব দেন, "তালহা-যুবাইরের ব্যাপারে ভেবে দেখবো; তবে মুয়াবিয়া যতদিন তার বর্তমান কার্যকলাপ বন্ধ না করবে, আমি তাঁকে না কোথাও ওয়ালী নিযুক্ত করবো, না তার কোন সাহায্যগ্রহণ করবো।" এই জবাবে মুগীরা ক্ষুব্ধ হন। (আল-ইসতিয়াব) হযরত উসমানের (রা) হত্যার পর মুসলিম উম্মাহর দু' বিবদমান পক্ষের মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ হয়। তিনি এসব সংঘর্ষ থেকে সযত্নে দূরে থাকেন। সিফ্ফীনের পর দু'মাতুল জান্দালে সালিশী রায় শোনার জন্য তিনিও উপস্থিত ছিলেন। দু'মাতুল জান্দালে সালিশী ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) পক্ষে যোগদান করেন এবং তার হাতে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করেন। এরপর থেকে তিনি প্রকাশ্যে হযরত আলীর (রা) বিরোধিতা শুরু করেন। (আল-ইসাবা ৩/৪৫৩, মুসতাদরিক-৩/৪৫০)।

হযরত মুগীরার (রা) সমর্থন ও সহযোগিতা হযরত মুয়াবিয়ার বিশেষ উপকারে আসে। অনেক বড় বড় সমস্যা তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি সমাধান করে দেন। খিলাফতের ব্যাপারে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সামনে এমনসব কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, তখন যদি মুগীরার বুদ্ধি ও মেধা কাজ না করতো তাহলে হযরত মুয়াবিয়াকে অত্যন্ত মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হতে হতো। যিয়াদ ছিলেন আরবের অতি চালাক ও কৌশলী লোকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ। তিনি ছিলেন হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে পারস্যের ওয়ালী এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রা) চরম বিরোধী। হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের পর হযরত হাসান (রা) খিলাফতের দাবী থেকে সরে দাঁড়ানোর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) যখন সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র খলীফা, তখনও যিয়াদ তাঁকে খলীফা বলে স্বীকার করেননি। হযরত মুগীরা এমন কট্টর দুশমনকেও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) অনুগত বানিয়ে দেন এবং মুয়াবিয়াকে এক মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

হিজরী ৪১ সনে হযরত আমীর মুয়াবিয়া বিশেষ অবদানের পুরস্কার স্বরূপ হযরত মুগীরাকে কূফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। হিজরী ৩৩ সনে কূফার খারেজীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। এভাবে তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফত শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

হযরত মুগীরার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকে বলেছেন, হিজরী ৫০ সনে কূফায় যে প্লেগ দেখা দেয় সেই প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন হিজরী ৪৯/৫১ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ (সত্তর) বছর।

হযরত মুগীরা (রা) যদিও একজন বিজ্ঞ কূটনীতিক ও সৈনিক ছিলেন, তথাপি দ্বীনী বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। সমবয়সীদের মধ্যে অগাধ জ্ঞানের জন্য তাঁর একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত (১৩৩) টি হাদীস দেখা যায়। তারমধ্যে ৯টি মুত্তাফাক আলাইহি, একটি বুখারী ও দু'টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ তাঁর তিন পুত্র—'উরওয়া, হামযা, আক্কার এবং অন্যান্যের মধ্যে যুবাইর ইবন ইয়াহয়িয়া, মিসওয়ার ইবন মাখরামা, কায়েস ইবন আবী হাযেম, মাসরূক ইবন আজদা', নাফে' ইবন হুবায়রা, উরওয়া ইবন যুবাইর, 'আমর ইবন ওয়াহ্হাব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

দ্বীনী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়া সত্বেও তিনি ইলম ও ইফতা'র মসনদের পরিবর্তে রাজনীতি ও কূটনীতির জটিল ময়দানে বিচরণ করেন। এ অঙ্গনেই তাঁর প্রতিভা ও যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

তাঁকে আরবের শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিকদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইমাম শা'বী বলেন, আরবের অতি চালাক ব্যক্তি চারজন—মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, 'আমর ইবনুল 'আস, মুগীরা ইবন শু'বা ও যিয়াদ। (উসুদুল গাবা-৪/৪০৭, আল ইসাবা ৩/৪৫৩) ইবন সা'দ বলেন, তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও মেধার কারণে লোকে তাঁকে 'মুগীরাতুর রায়' মতামত বা সিদ্ধান্তের অধিকারী মুগীরা বলে উল্লেখ করতো। (আল-ইসতিয়াব) এ সকল অসাধারণ গুণের কারণে হযরত উমার (রা) তাঁকে অনেক বড় বড় পদে নিয়োগ করেন। এমন কি ইরানী দরবারে দৌত্যগিরির দুর্লভ সম্মানও অর্জন করেন।

কাবীসা ইবন জাবির বলেন, আমি দীর্ঘদিন মুগীরার সাহচর্যে কাটিয়েছি। তিনি এত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে, যদি কোন শহরের এমন আটটি দরজা থাকে যে, তার কোন একটির ভেতর দিয়েও কৌশল ও চাতুর্য ছাড়া বের হওয়া যায় না, মুগীরা তার প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম ছিলেন। জটিল বিষয়ের জট খোলার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাবারী বলেন, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ব্যক্তকালে তা থেকে সরে আসার পথও বের করে রাখতেন। যখনই কোন দু'টি বিষয় সংশয়পূর্ণ হয়ে পড়তো, অবশ্যই একটির ব্যাপারে তাঁর সঠিক রায় প্রকাশ পেত। (আল-ইসাবা ৩/৪৫৩)

হযরত মুগীরার চাতুর্য ও কূটনীতির বহু কৌতুকপূর্ণ ঘটনা ইতিহাসে দেখা যায়। হযরত উমার (রা) তাঁকে বাহরাইনের ওয়ালী নিয়োগ করেন। বাহরাইনবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করে। হযরত উমার তাঁকে বরখাস্ত করেন। তিনি যাতে দ্বিতীয়বার সেখানে ওয়ালীর পদে নিয়োগ না পান সেজন্য সেখানকার দাহকান বা সরদার এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র করে। সে এক লাখ দিরহাম সংগ্রহ করে খলীফার নিকট জমা দিয়ে বলে, 'মুগীরা বাইতুল মাল থেকে এ অর্থ আত্মসাৎ করে আমার কাছে জমা রেখেছিলেন।' হযরত উমার অত্যন্ত কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। বিষয়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, অন্যদিকে অসংখ্য লোক তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী, আত্মসাৎকৃত অর্থও উপস্থিত। দোষ প্রমাণের জন্য অতিরিক্ত কোন সাক্ষী-সাবুতের প্রয়োজন নেই। এমন পরিস্থিতিতেও মুগীরা বুদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখেন। অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে তিনি বলেন, দাহকান বা সরদার মিথ্যা বলেছে। আমি তো তার নিকট দু'লাখ জমা রেখেছিলাম, একলাখ সে আত্মসাৎ করেছে।' একথা শুনে 'দাহকান' ভয়ে মুষড়ে পড়ে। এখন তো তাকে দু'লাখই বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। সে অকপটে তার কারসাজির কথা স্বীকার করে। বার বার কসম খেয়ে বলতে থাকে, 'মুগীরা আমার কাছে কোন অর্থই জমা রাখেননি।' এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুগীরার দুর্নাম রটানোর জন্য সে মনগড়া কাহিনী তৈরী করেছিল, বিষয়টি মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর হযরত উমার (রা) মুগীরাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি দু'লাখের কথা স্বীকার করলে কেন?' তিনি বললেন, 'সে আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, এভাবে ছাড়া তার বদলা নেওয়ার আমার আর কোন উপায় ছিল না'। (আল-ইসাবা ৩/৪৫৩)

প্রখ্যাত সাহাবী নু'মান ইবন মুকাররিন (রা) একবার মুগীরাকে বলেন, 'ওয়াল্লাহি ইন্নাকা লাজু মানাকিব—অর্থাৎ তুমি বুদ্ধিমত্তা, পরামর্শদান ও সঠিক মতামতের অধিকারী ব্যক্তি।' (হায়াতুস সাহাবা—১/৫১২)

আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা)

তাঁর ইসলাম-পূর্ব যুগের নাম আবদুল কা'বা, মতান্তরে আবদুল 'উয্যা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান। তাঁর ডাক নাম বা কুনিয়াত তিনটিঃ আবু আবদিল্লাহ, তাঁর পুত্র মুহাম্মাদের নামানুসারে আবু মুহাম্মাদ ও আবু 'উসমান। তবে আবু আবদিল্লাহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পিতা প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ও মাতা উম্মু রুমান বা উম্মু রূম্মান। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সহোদর। (উসুদুল গাবা-৩/৩০৪-৩০৫)

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের সন্তানদের সকলে প্রথম ভাগেই ইসলাম গ্রহণ করলেও আবদুর রহমান দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলাম থেকে দূরে থাকেন। বদর যুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্বে তিনি একটু সামনে এগিয়ে এসে মুসলমানদের প্রতি চ্যালেঞ্জের সুরে বললেনঃ 'হাল মিন মুবারিযিন"—আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাহস রাখে এমন কেউ কি আছে? তাঁর এ চ্যালেঞ্জ শুনে পিতা হযরত আবু বকরের (রা) চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। তিনি তাঁর সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে নিবৃত্ত করেন। উহুদের যুদ্ধেও তিনি মক্কার কুরাইশদের সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন কুরাইশদের তীরন্দায বাহিনীর অন্যতম সদস্য। (উসুদুল গাবা-৩/৩০৫) পরবর্তীকালে একদিন আবদুর রহমান পিতা আবু বকরকে (রা) বলেন, উহুদের ময়দানে আমি আপনাকে পেয়েও এড়িয়ে গিয়েছিলাম। জবাবে আবু বকর (রা) বলেন, আমি তোমাকে দেখলে ছেড়ে দিতাম না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৩)

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মদীনায় হিজরাত করে পিতা আবু বকরের (রা) সাথে বসবাস করতে থাকেন। হযরত আবু বকরের (রা) যাবতীয় কাজ কারবার তিনিই দেখাশুনা করতেন। একবার রাত্রিবেলা হযরত আবু বকর (রা) আসহাবে সুফফার কতিপয় লোককে দাওয়াত করলেন। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে যাচ্ছি, আমার ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের খাইয়ে দেবে।' পিতার নির্দেশমত আবদুর রহমান যথাসময়ে মেহমানদের সামনে খাবার হাজির করলেন। কিন্তু তাঁরা মেযবানের অনুপস্থিতিতে খেতে অস্বীকার করলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন হযরত আবু বকর (রা) দেরীতে ফিরলেন। ফিরে এসে যখন জানলেন, মেহমানরা এখনও অভুক্ত রয়েছে, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আবদুর রহমানকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোকে আমি খাবার দেব না।' আবদুর রহমান ভয়ে জড়সড় হয়ে বাড়ীর এক কোণে বসে ছিলেন। একটু সাহস করে তিনি বললেন, 'আপনি মেহমানদের একটু জিজ্ঞেস করুন, আমি তাঁদের খাওয়ার জন্য সেধেছিলাম কিনা।' মেহমানরা আবদুর রহমানের কথা সমর্থন করলেন। তাঁরাও কসম খেয়ে বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আবদুর রহমানকে খেতে না দেবেন, আমরা খাবনা।' এভাবে আবু বকরের রাগ প্রশমিত হয় এবং সকলে এক সাথে বসে আহার করেন। আবদুর রহমান বলেন, "সেদিন আমাদের খাবারে এত বরকত হয়েছিল যে, আমরা খাচ্ছিলাম, কিন্তু তা মোটেই কমছিল না। আমি সেই খাবার থেকে কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বেশ কিছু সাহাবীসহ তা আহার করেন।" (বুখারী)

স্বভাবগত ভাবেই হযরত আবদুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়, তিনি প্রত্যেকটিতে অংশগ্রহণ করে বীরত্ব ও সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। খাইবার অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সহযাত্রী হন এবং খাইবারের গনীমাত থেকে চল্লিশ 'ওয়াসাক' খাদ্যশস্য লাভ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৩৫২) বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে 'তানয়ীমে' পাঠিয়েছিলেন নতুন করে ইহরাম বাঁধার জন্য। উল্লেখ্য যে, হযরত 'আয়িশা (রা) এ সফরে ঋতুবতী হওয়ার কারণে হজ্জের কিছু অবশ্য পালনীয় কাজ স্থগিত রেখে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলেন। সুস্থ হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে 'তানয়ীমে' গিয়ে পুনরায় ইহরাম বেঁধে স্থগিত কাজগুলি সম্পাদন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬০২)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা দমনে তিনি অন্যদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ভণ্ড-নবী মুসাইলামা আল কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তিনি চরম বীরত্বের পরিচয় দেন। এ যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের সাতজন বিখ্যাত বীরকে একাই হত্যা করেন। ইয়ামামার শত্রুপক্ষের দুর্গের এক স্থানে ফেটে ছোট্ট একটি পথ হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম মুজাহিদরা বার বার সেই ছিদ্র পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। কারণ, শত্রুপক্ষের মাহকাম ইবন তুফাইল নামক এক বীর সৈনিক অটলভাবে পথটি পাহারা দিচ্ছিল। হযরত আবদুর রহমান তার সিনা তাক করে একটি তীর নিক্ষেপ করেন এবং সেই তীরের আঘাতে সে মাটিতে ঢলে পড়ে। মুসলিম মুজাহিদরা সাথে সাথে মাহকামের সঙ্গীদের পায়ে পিষতে পিষতে ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা খুলে দেন। এভাবে দুর্গের পতন হয়। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর হযরত আলী ও হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে যে উটের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আবদুর রহমান বোনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। (আল-ইসাবা-২/৪০৮)

•

হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) তাঁর জীবদ্দশাতেই পুত্র ইয়াযিদকে স্থলাভিষিক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে ইয়াযিদের নামে মদীনার জনগণের বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ নেয়ার জন্য মদীনার ওয়ালী মারওয়ানকে নির্দেশ দিলেন। তাঁর এ নির্দেশ মদীনার মসজিদে সমবেত লোকদের পাঠ করে শুনানোর কথাও বললেন। মারওয়ান মুয়াবিয়ার (রা) এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করলেন। তিনি মসজিদে মদীনার জনগণকে সমবেত করে আমীর মুয়াবিয়ার নির্দেশ পাঠ করে শুনালেন। তাঁর পাঠ শেষ হতে না হতেই হযরত আবদুর রহমান ইবন আবী বকর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মজলিসের নীরবতা ভঙ্গ করে গর্জে উঠলেন। "আল্লাহর কসম! তোমরা উম্মাতে মুহাম্মাদীর মতামতের পরোয়া না করে খিলাফতকে হিরাকলী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করছো। এক হিরাকলের মৃত্যু হলে আর এক হিরাকল তার স্থলাভিষিক্ত হবে।" অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, মারওয়ান বলেনঃ এ তো আবু বকর ও উমার প্রবর্তিত পদ্ধতি। আবদুর রহমান প্রতিবাদ করে বলেনঃ না, এটা হিরাকল ও কায়সারের পদ্ধতি। পিতার পর পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর পদ্ধতি। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এবং হুসাইন ইবন আলীও আবদুর রহমানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। (আল-ইসাবা-২/৪০৮, উসুদুল গাবা-৩/৩০৬)

মারওয়ান তখন অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে আবদুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ বন্ধুগণ! এ সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমাদের জন্য আফসুস" অর্থাৎ পিতা-মাতার আনুগত্য না করার জন্য আল্লাহ তার নিন্দা করেছেন, সূরা আহকাফ-১৭। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর হুজরা থেকে তার এ কথা শুনলেন।

তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর কসম ! না, আবদুর রহমানের শানে নয়। যদি তোমরা চাও, কোন ব্যক্তির শানে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল, আমি তা বলতে পারি। (আল-ইসাবা ৪/৪০৮, উসুদুল গাবা-৩/৩০৬)

হযরত আবদুর রহমান সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন, মুয়াবিয়ার (রা) এ ইচ্ছা পূর্ণ হলে মুসলিম উম্মাহ্ এক মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হবে। তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন, এটা ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা উৎখাত করে মুসলিম উম্মাহর ওপর কায়সারিয়্যাহ বা কিসরাবিয়্যাহ্ চাপিয়ে দেয়ার একটি ষড়যন্ত্র।

হযরত আবদুর রহমান হযরত মুয়াবিয়ার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) এবার ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন। তিনি আবদুর রহমানের কণ্ঠরোধ করার জন্য এক লাখ দিরহামসহ একজন দূত তাঁর কাছে পাঠালেন। হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র আবদুর রহমান দিরহামের থলিটি দূরে নিক্ষেপ করে দূতকে বললেন ঃ 'ফিরে যাও। মুয়াবিয়াকে বলবে, আবদুর রহমান দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রী করবে না।' (আল-ইসতিয়াব, উসুদুল গাবা-৩/৩০৬, হায়াতুস সাহাবা-২/২৫৪, রিজালুন হাওলার রাসূল-৫২৮)

এ ঘটনার পর হযরত আবদুর রহমান যখন জানতে পেলেন হযরত মুয়াবিয়া (রা) সিরিয়া থেকে মদীনায় আসছেন, তিনি সাথে সাথে মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানে শহর থেকে দশ মাইল দূরে 'হাবশী' নামক স্থানে বসবাস করতে থাকেন এবং সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী হিজরী ৫৩ সনে ইয়াযিদের বাইয়াতের পূর্বেই ইনতিকাল করেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় প্রতিদিনের মত যথারীতি শুয়ে পড়েন ; কিন্তু সেই ঘুম থেকে আর জাগেননি। হযরত 'আয়িশার মনে একটু সন্দেহ হয়, কেউ হয়তো তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে। এর কিছুদিন পর এক সুস্থ সবল মহিলা হযরত আয়িশার (রা) নিকট আসে এবং নামাযে সিজদারত অবস্থায় মারা যায়। এ ঘটনার পর তাঁর মনের খটকা দূর হয়ে যায়। হযরত আবদুর রহমানের সঙ্গী-সাথীরা তাঁর লাশ মক্কায় এনে দাফন করে।

হযরত 'আয়িশা (রা) ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হজ্জের নিয়তে মক্কায় যান এবং কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কান্নার মধ্যে কবি মুতাম্মিম ইবন নুওয়াইরাহ রচিত একটি শোক গাঁথার শ্লোক বার বার আওড়াচ্ছিলেন। তারপর ভাইয়ের রূহের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "আল্লাহর কসম ! আমি তোমার মরণ সময়ে উপস্থিত থাকলে এখন এভাবে কাঁদতাম না এবং যেখানে তুমি মৃত্যুবরণ করেছিলে সেখানেই তোমাকে দাফন করতাম।" (মুসতাদরিক ৩/৪৭৬, আল-ইসাবা-২/৪০৮)

হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু হুজাইফা ইবন উত্‌বা (রা)

নাম আবু হুজাইফা হাশীম, মতান্তরে হাশেম, পিতা উতবা, মাতা ফাতিমা বিন্‌তু সাফওয়ান এবং ডাকনাম উম্মু সাফওয়ান। কুরাইশ গোত্রের সন্তান।

আবু হুজাইফা সাবেকীনে ইসলাম অর্থাৎ প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ব্যক্তি। তাঁর পিতা 'উতবা ইসলামের চরম দুশমন কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক প্রধান পুরুষ। ইসলামের বিরোধিতায় সে তার জীবন উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মহিমা, তারই প্রিয়তম পুত্র আবু হুজাইফা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে মোটেও বিলম্ব করেননি। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেন এবং আরো অনেকের মত কুরাইশদের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। (উসুদুল গাবা-৫/১৭০) ইবন ইসহাক বলেন, তিনি তেতাল্লিশ (৪৩) জনের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা—৪/৪২)।

আবু হুজাইফা (রা) হাবশার দু'টি হিজরাতেই অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবার হিজরাত করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। পরে আবার হাবশায় চলে যান। হাবশার হিজরাতে তাঁর স্ত্রী হযরত সাহলা বিনতু সুহাইলও সাথী ছিলেন। তাঁদের পুত্র মুহাম্মাদ ইবন আবী-হুজাইফা সেই প্রবাসে হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা—৫/১৭০)।

হাবশা থেকে দ্বিতীয়বারের মত মক্কায় ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের মধ্যে মদীনায় হিজরাতের হিড়িক পড়ে গেছে। তাঁর দাস সালেমকে সংগে করে তিনিও মদীনায় পৌঁছলেন এবং হযরত আব্বাদ ইবন বিশ্‌র আল-আনসারীর অতিথি হলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে 'মুওয়াখাত' বা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। (উসুদুল গাবা—৫/১৭০)।

রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষতঃ বদর যুদ্ধের ঘটনাটি ছিল তাঁর ও সকল মুসলমানের জন্য দারুণ শিক্ষণীয়। এ যুদ্ধে এক পক্ষে তিনি এবং অন্য পক্ষে তাঁর পিতা উতবা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রেম সেদিন মুসলমানদেরকে আপন পর সম্পর্ক বিস্মৃত করে দিয়েছিল। সেদিন আবু হুজাইফা চিৎকার করে আপন পিতা প্রতিপক্ষের দুঃসাহসী বীর উতবাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানন। তাঁর এ আহবান শুনে তাঁর সহোদরা হিন্দা বিনতু উতবা একটি কবিতায় তাঁকে ভীষণ তিরস্কার ও নিন্দা করে। উসুদুল গাবা গ্রন্থে কবিতাটির দু'টি পংক্তি সংকলিত হয়েছে।

বদর যুদ্ধে আবু হুজাইফার পিতা উতবাসহ অধিকাংশ কুরাইশ নেতা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয় এবং তাদের সকলের লাশ বদরের একটি কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেওয়া হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সেই কূপের কাছে দাঁড়িয়ে নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের এক একজন করে নাম ধরে ডেকে বলতে লাগলেন, "ওহে উতবা, ওহে শাইবা, ওহে উমাইয়া ইবনে খালাফ, ওহে আবু জাহল! তোমরা কি আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য পেয়েছ? আমি তো আমার অঙ্গীকার সত্য পেয়েছি।" (বুখারী) ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, সে সময় হযরত আবু হুজাইফাকে খুবই উদাস ও বিমর্ষ মনে হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করেন, "আবু হুজাইফা, সম্ভবতঃ তোমার পিতার জন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে।" আবু হুজাইফা বলেন, "আল্লাহর কসম, না। তাঁর নিহত হওয়ার

জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। তবে আমার ধারণা ছিল, তিনি একজন বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তি। তাই আমার আশা ছিল, তিনি ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। কিন্তু রাসূল (সা) যখন তাঁর 'কুফর' অবস্থায় মৃত্যুবরণের নিশ্চয়তা দান করলেন, তখন আমার দুরাশার জন্য আফসুস হলো।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আবু হুজাইফার জন্য দু'আ করলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৬৩৮-৪১, উসুদুল গাবা—৫/১৭১)

হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে আরব উপদ্বীপে কতিপয় ভণ্ড নবীর ফিতনা ও উৎপাত শুরু হয়। ইয়ামামার মুসাইলামা কাজ্জাবও ছিল সেইসব ভণ্ড নবীর একজন। খলীফা তার বিরুদ্ধে এক বাহিনী পাঠান। এই বাহিনীতে হযরত আবু হুজাইফাও (রা) ছিলেন। ভণ্ড মুসাইলামার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে তিনি ইয়ামামার রণক্ষেত্রে শহীদ হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ অথবা ৫৪ বছর।

হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের সময় একদিন সাহাবীদের বললেন, "আমি জানতে পেরেছি, বনী হাশেম ও অন্য কতিপয় গোত্রের কিছু লোককে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয়েছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। তোমাদের কেউ বনী হাশেমের কোন ব্যক্তির মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। কেউ আবুল বুখতারী ইবন হিশামের দেখা পেলে তাকে হত্যা করবে না। আর কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা "আববাস ইবন আবদিল মুত্তালিবের সামনাসামনি হলে তাকেও হত্যা করবে না। কারণ, তিনি বাধ্য হয়ে এসেছেন।" সংগে সংগে আবু হুজাইফা বলে উঠলেন, "আমরা আমাদের পিতা, পুত্র ও ভ্রাতাদের হত্যা করবো, আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? আল্লাহর কসম, আমি তার সাক্ষাৎ পেলে তরবারি দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবো।" রাসূলুল্লাহ (সা) হুজাইফার এ কথা শুনে বললেন, "ওহে আবু হাফ্স (উমার), আল্লাহর রাসূলের চাচাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হবে?" উমার বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, তরবারি দিয়ে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। আল্লাহর কসম, সে একজন মুনাফিক।" আবু হুজাইফা বলেন, "সেদিন যে কথাটি বলেছিলাম, সে জন্য আমি নিরাপত্তা বোধ করি না এবং শাহাদাতের মাধ্যমে তার কাফফারা আদায় না করা পর্যন্ত সর্বদা আমি ভীত সন্ত্রস্ত।" ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি তাঁর কাফফারা আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা—২/৩৬৪-৬৫)।

সালেম মাওলা আবী হুজাইফা (রা)

হযরত রাসূলে করীম (সা) একদিন সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা কুরআন শেখ চার ব্যক্তির নিকট থেকেঃ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সালেম মাওলা আবী হুজাইফা, উবাই ইবন কা'ব ও মু'য়াজ ইবন জাবাল।" কে এই সালেম মাওলা আবী হুজাইফা—যাকে কুরআন শেখার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন?

তাঁর নাম সালেম, কুনিয়াত আবু 'আবদিল্লাহ। পিতার নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবন মুন্দাহ বলেছেন, 'উবায়েদ ইবন রাবী'য়া। আবার কারো মতে, মা'কাল। ইরানী বংশোদ্ভূত। পারস্যের 'ইসতাখরান' তাঁর পিতৃপুরুষের আবাসভূমি। হযরত সুবাইতা বিনতু ইউ'য়ার আল আনসারিয়্যার দাস হিসেবে মদীনায় পৌঁছেন। হযরত সুবাইতা ছিলেন হযরত আবু হুজাইফার স্ত্রী। সুবাইতা তাকে নিঃশর্ত আযাদ করে দিলে আবু হুজাইফা তাঁকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি সালেম ইবন আবী হুজাইফা হিসেবে পরিচিত হন যেমন হয়েছিলেন যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ। কেউ কেউ তাঁকে আবু হুজাইফার দাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব কারণে তাঁকে মুহাজিরদের মধ্যে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে হযরত সুবাইতার আযাদকৃত দাস হওয়ার কারণে তাঁকে আনসারীও বলা হয়। আবার মূলে পারস্যের সন্তান হওয়ার কারণে কেউ কেউ তাঁকে আজমী বা অনারব বলেও উল্লেখ করেছেন।

হযরত সালেম মক্কায় হযরত আবু হুজাইফার সাথে বসবাস করতেন। এই আবু হুজাইফা ছিলেন মককার কুরাইশ সর্দার ইসলামের চিরদুশমন 'উতবা'র ছেলে। ইসলামী দাওয়াতের সূচনালগ্নেই যারা লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু হুজাইফা ও তাঁর পালিত পুত্র সালেমও ছিলেন। তাঁরা পিতা-পুত্র দু'জন নীরবে ও বিনীতভাবে তাঁদের রবের ইবাদাত করে চললেন এবং কুরাইশদের নির্মম অত্যাচারের মুখে সীমাহীন ধৈর্য্য অবলম্বন করলেন। একদিন পালিতপুত্র গ্রহণের প্রথা বাতিল করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো—'উদয়ূহুম লি আবায়িহিম'—তাদেরকে তাদের পিতার নামে সম্পৃক্ত করে ডাক। প্রত্যেক পালিত পুত্র আপন আপন জন্মদাতা পিতার নামে পরিচিতি গ্রহণ করলো। যেমন যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ হলো যায়িদ ইবন হারিসা। কিন্তু সালেমের পিতৃ পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। তাই তিনি পরিচিত হলেন 'সালেম মাওলা আবী হুজাইফা'—আবু হুজাইফার বন্ধু, সাথী, ভাই বা আযাদকৃত দাস সালেম হিসেবে।

ইসলাম পালিত পুত্রের প্রথা বাতিল ঘোষণা করে। সম্ভবতঃ ইসলাম মুসলিম জাতিকে এ কথা বলতে চায় যে, রক্ত, আত্মীয়তা বা অন্য কোন সম্পর্ককে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া তোমাদের উচিত নয়। বিশ্বাস বা আকীদার ভিত্তিতেই তোমাদের সম্পর্ক নির্মিত হওয়া উচিত। প্রথম পর্যায়ের মুসলমানরা এ ভাবটি খুব ভালো করে বুঝেছিলেন। তাই, তাঁদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পর তাঁদের দ্বীনী ভাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছু ছিল না। এটা আমরা আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দেখেছি। তেমনিভাবে দেখে থাকি সম্ভ্রান্ত কুরাইশ আবু হুজাইফা ও তাঁর পিতৃ পরিচয়হীন অজ্ঞাত-অখ্যাত দাস সালেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

হযরত সালেমের ঈমান ছিল সিদ্দীকীনদের ঈমানের মত এবং আল্লাহর পথে তিনি চলেছিলেন মুত্তাকীনদের মত। সমাজে তাঁর স্থান কি এবং তাঁর জন্ম-পরিচয়ই বা কি সেদিকে তিনি কোন ভ্রূক্ষেপ করেননি। ইসলাম যে নতুন সমাজ বিনির্মাণ করেছিল, সেই সমাজ তাঁর তাকওয়া ও ইখলাসের জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। এই মহান পুণ্যময় নতুন সমাজেই আবু হুজাইফা—

গতকাল যে তাঁর দাস ছিল তাকে ভাই বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করে গৌরব বোধ করেছিলেন। এমনকি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতিমা বিনতুল ওয়ালীদকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে নিজ পরিবারকে সম্মান ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে সমাজ ব্যবস্থা সকল প্রকার যুলুম-অত্যাচার দূর করে সবরকম মিথ্যা আভিজাত্যকে বাতিল ঘোষণা করেছিল, সেখানে সালেমের ঈমান, সততা ও দৃঢ়তা তাঁকে প্রথম সারির ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

হযরত রাসূলে করীমের (সা) হিজরাতের পূর্বেই তিনি তাঁর দ্বীনী বন্ধু আবু হুজাইফার সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় তিনি হযরত আব্বাদ ইবন বিশরের অতিথি হন। মককায় রাসূলুল্লাহ (সা) আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহর সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন। কিন্তু মদীনায় তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় হযরত মুয়াজ ইবন মায়েজ আল-আনসারীর সাথে।

সাহাবীদের যুগে 'কিরআত' শিল্পে যাঁদেরকে ইমাম গণ্য করা হতো, সালেম তাদের একজন। রাসূলুল্লাহ (সা) যে চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সালেম তাঁদের অন্যতম। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতো। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হতে দেরী হলো। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার দেরী হলো কেন?" আয়িশা বললেন, "একজন ক্বারী সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছিল, তাই শুনছিলাম।" তিনি তার তিলাওয়াতের মাধুর্য্য বর্ণনা করলেন। তাঁর বর্ণনা শুনে রাসূলে করীম (সা) চাদরটি টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, সেই ক্বারী আর কেউ নয়, তিনি সালেম মাওলা আবী হুজাইফা। রাসূল (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনে মন্তব্য করলেন, "আলহামদুলিল্লাহ আল্লাজী জা'য়ালা ফী উম্মাতী মিছলাকা" —আমার উম্মাতের মধ্যে যিনি তোমার মত লোককে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। (উসুদুল গাবা-২/২৪৬)

সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং বেশী কুরআন হিফ্জ থাকার কারণে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সালেমকে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে যারা মদীনায় হিজরাত করেছিলেন, মসজিদে কুবায় সালেম তাদের নামাযের ইমামতি করতেন।" (বুখারী) হযরত আবু বকর ও হযরত উমারের মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও তাঁর পেছনে নামায আদায় করতেন।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই তিনি হযরত রাসূলে করীমের (সা) সাথে ছিলেন। (উসুদুল গাবা-২/২৪৬) বদর যুদ্ধে তিনি কাফের উমাইর ইবন আবী উমাইরকে নিজ হাতে হত্যা করেন। (ইবন হিশাম-১/৭০৮)

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার চারদিকের গ্রাম ও গোত্রগুলিতে কতকগুলি দাওয়াতী প্রতিনিধি দল পাঠালেন। তিনি তাদেরকে বলে দিলেন, "যোদ্ধা হিসেবে নয়, বরং দায়ী বা আহবানকারী হিসেবে তোমাদেরকে পাঠানো হচ্ছে।" এমন একটি দলের নেতা ছিলেন হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। খালিদ তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর এমন এক ঘটনা ঘটলো যে, তিনি তরবারি চালালেন এবং তাতে প্রতিপক্ষের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হলো। এ খবর রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছলে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর কাছে এই বলে ওজর পেশ করেছিলেন—"হে আল্লাহ, খালিদ যা করেছে, তার দায়-দায়িত্ব থেকে আমি তোমার কাছে অব্যাহতি চাই।" এ অভিযানে হযরত সালেম হযরত খালিদের সহগামী ছিলেন। খালিদের এ কাজ সালেম নীরবে মেনে নেননি। তিনি খালিদের এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর প্রতিবাদের মুখে মহাবীর খালিদ কখনও লা জওয়াব হয়ে যান, আবার কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। আবার কখনও সালেমের সাথে প্রচণ্ড বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হন। কিন্তু সালেম স্বীয় মতের ওপর অটল থাকেন। খালিদের ভয়ে

সেদিন তিনি সত্য বলা থেকে চুপ থাকেননি।

সালেম ক'দিন আগেও যিনি ছিলেন মককার এক দাস, আজ তিনি খালিদের মত মককার এক সম্ভ্রান্ত কুরাইশ সিপাহসালারের কোন পরোয়াই করলেন না। খালিদও কোন রকম বিরক্তিবোধ করেননি। কারণ, ইসলাম তাঁদের উভয়কে সম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। নেতার প্রতি অহেতুক ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সালেম সেদিন খালিদের ভুল মেনে নেননি। বরং তিনি দায়িত্বের অংশীদার হিসেবে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আত্মতৃপ্তি বা নামের জন্য একাজ করেননি ; বরং বারবার তিনি যে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনেছিলেন, 'আদ-দ্বীন আন-নাসীহা'-দ্বীনের অপর নাম সত্যোপদেশ। এ উপদেশই তিনি সেদিন খালিদকে দান করেছিলেন।

হযরত খালিদের এ বাড়াবাড়ির কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—"কেউ কি তার এ কাজের প্রতিবাদ বা নিন্দে করেনি ?" রাসূলে পাকের ক্রোধ পড়ে গেল যখন তিনি শুনলেনঃ "হ্যাঁ, সালেম প্রতিবাদ করেছিল, তার সাথে ঝগড়া করেছিল।"

হযরত রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। হযরত আবু বকরের খিলাফত মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীদের ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হলো। তাদের সাথে সংঘটিত হয় ভয়াবহ ইয়ামামার যুদ্ধ। এমন ভয়াবহ যুদ্ধ ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসে আর সংঘটিত হয়নি। মুসলিম বাহিনী মদীনা থেকে ইয়ামামার উদ্দেশ্যে বের হলো। সালেম এবং তাঁর দ্বীনী ভাই আবু হুজাইফা অন্যদের সাথে বেরিয়ে পড়লেন। যুদ্ধের প্রথম পর্বে মুসলিম বাহিনী কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে তারা বুঝতে পারে যুদ্ধ যুদ্ধই এবং দায়িত্ব দায়িত্বই। হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ নতুন করে তাদের সংগঠিত করেন এবং অভূতপূর্ব কায়দায় তিনি বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। প্রথমতঃ যখন মুসলিম বাহিনী পিছু হটে যাচ্ছিল, তখন হযরত সালেম চিৎকার করে উঠলেন, "আফসুস, রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে আমাদের অবস্থা তো এমন ছিল না।" তিনি নিজের জন্য একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে যান। (উসুদুল গাবা-২/২৪৬)

ইয়ামামার যুদ্ধে প্রথমে হযরত যায়িদ ইবনুল খাত্তাবের হাতে ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা। তিনি শাহাদাত বরণ করলে পতাকাটি মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সালেম তা তুলে ধরেন। কেউ কেউ তাঁর পতাকা গ্রহণে আপত্তি করে বলে, "আমরা তোমার দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা করছি।" সালেম বলেন, "তাহলে আমি তো হয়ে যাব কুরআনের এক নিকৃষ্ট বাহক।" (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৫)

শত্রু বাহিনীকে আক্রমণের পূর্বে দুই দ্বীনী ভাই—আবু হুজাইফা ও সালেম পরস্পর বুকে বুক মেলালেন এবং দ্বীনে হকের পথে শহীদ হওয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। তারপর উভয়ে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আবু হুজাইফা একদিকে চিৎকার করে বলছেন, "ওহে কুরআনের ধারকরা, তোমরা তোমাদের 'আমল দ্বারা কুরআনকে সুসজ্জিত কর।" আর অন্যদিকে মুসাইলামা কাজ্জাবের বাহিনীর ওপর তরবারির আঘাত হানছেন। আর একদিকে সালেম চিৎকার করে বলছেন—"আমি হব কুরআনের নিকৃষ্ট বাহক—যদি আমার দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণ আসে।" মুখে তিনি একথা বলছেন আর দু'হাতে তরবারি শত্রুসৈন্যের গর্দানে মারছেন।

এক ধর্মত্যাগীর অসির তীব্র আঘাত তাঁর ডান হাতে পড়লো। হাতটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি বাম হাতে পতাকাটি উঁচু করে ধরেন। বাম হাতটিও শত্রুর আঘাতে কেটে পড়ে গেলে পতাকাটি গলার সাথে পেঁচিয়ে ধরেন। এ অবস্থায় তিনি উচ্চারণ করতে থাকেন কুরআনের এ আয়াত, "ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, ওয়াকা আইয়্যিন মিন নাবিয়্যিন কা-তালা মা'য়াহু রিব্বিয়্যুনা কাসীর।"..... "মুহাম্মাদ আল্লাহর এক রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। অতীতে কত নবীর সহযোগী হয়ে কত আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিই না যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যে বিপদ মুসীবত

আপতিত হয়েছে, তাতে তারা দুর্বল হয়ে পড়েনি এবং থেমেও যায়নি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।" এই ছিল তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের শ্লোগান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুরতাদদের একটি দল সালেমকে ঘিরে ফেলে। মহাবীর সালেম লুটিয়ে পড়েন। তখনও তাঁর দেহে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। মুসাইলামা কাজ্জাবের নিহত হওয়ার সাথে মুসলমানদের বিজয় ও মুরতাদদের পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মুসলমানরা আহত-নিহতদের খোঁজ করতে লাগলো। সালেমকে তারা জীবনের শেষ অবস্থায় খুঁজে পেল। এ অবস্থায় সালেম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ

—আবু হুজাইফার অবস্থা কি?

—সে শাহাদাত বরণ করেছে।

—যে ব্যক্তি আমার দিক থেকে শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা করে পতাকা আমার হাতে দিতে আপত্তি জানিয়েছিল, তার অবস্থা কি?

—শহীদ হয়েছে।

—আমাকে তাদের মাঝখানেই শুইয়ে দাও।

—তারা দু'জন তোমার দু'পাশেই শহীদ হয়েছে।

হযরত সালেম শেষ বারের মত শুধু একটু মুচকি হাসি হেসেছিলেন। আর কোন কথা বলেননি। সালেম এবং আবু হুজাইফা উভয়ে যা আন্তরিকভাবে কামনা করেছিলেন, লাভ করেন। তাঁরা এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন, একসাথে জীবন যাপন করেন এবং এক সাথে একস্থানে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত সালেমের কাহিনী বিলাল ও অন্যান্য অসংখ্য অসহায় দাসদের কাহিনীরই মত। ইসলাম তাঁদের সকলের কাঁধ থেকে দাসত্বের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদেরকে সত্য ও কল্যাণময় সমাজে ইমাম, নেতা ও পরিচালকের আসনে বসিয়ে দেয়। তাঁর মধ্যে মহান ইসলামের যাবতীয় গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যা সত্য বলে জানতেন অকপটে তা প্রকাশ করে দিতেন, তা বলা থেকে কক্ষণো বিরত থাকতেন না। তাঁর মুমিন বন্ধুরা তাঁর নাম রেখেছিল—'সালেম মিনাস সালেহীন'—সত্যনিষ্ঠদের দলভুক্ত সালেম।

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সালেমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে বলেছিলেন, "আজ সালেম জীবিত থাকলে শুরার পরামর্শ ছাড়াই আমি তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব দিতাম।" (উসুদুল গাবা-২/২৪৬)

হযরত সালেম ছিলেন নিঃসন্তান। তাই মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যাপারে অসীয়াত করে যান। এক তৃতীয়াংশ দাসমুক্তি ও অন্যান্য ইসলামী কাজের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ পূর্বতন মনিব হযরত সুবাইতার অনুকূলে। হযরত আবু বকর (রা) অসীয়াত মত এক তৃতীয়াংশ সুবাইতার কাছে পাঠালে তিনি এই বলে তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান যে, আমি তো তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়েছি, বিনিময়ে কোন কিছু আশা করিনি। পরে খলীফা উমার (রা) তা বাইতুল মালে জমা দেন। (আল ইসতিয়াব, উসুদুল গাবা-২/২৪৭)

হযরত সালেম থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবার অনেক সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাতিব ইবন আবী বালতা'য়া (রা)

নাম হাতিব, কুনিয়াত আবু মুহাম্মাদ, আবু আবদিল্লাহ। পিতার নাম আবু বালতা'য়া আমর। তাঁর বংশ পরিচয় ও মক্কায় উপস্থিতির ব্যাপারে সীরাত লেখকদের মতভেদ আছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মতে পিতৃ-পুরুষের আদি বাসস্থান ইয়ামান। বনী আসাদ, অতঃপর যুবাইর ইবনুল আওয়ামের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে তারা মক্কায় বসবাস করতো। আবার কেউ বলেছেন, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন হুমাইদের দাস ছিলেন। মুকাতাবা বা চুক্তির ভিত্তিতে অর্থ পরিশোধ করে দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। (উসুদুল গাবা-১/৩৬১)

মারযুবানী তাঁর মু'জামুশ শু'য়ারা গ্রন্থে বলেন, "তিনি জাহিলী যুগে কুরাইশদের অন্যতম খ্যাতিমান ঘোড় সাওয়ার ও কবি ছিলেন"। (আল-ইসাবা-১/৩০০) হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনা ইসলামের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তাঁর দাস সা'দকে সংগে করে তিনি মদীনায় উপস্থিত হন। সেখানে হযরত মুনজির ইবন মুহাম্মাদ আল-আনসারীর অতিথি হন এবং হযরত খালিদ-ইবন রাখবালার (রা) সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসা ইবন 'উকবা ও ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধিতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। (উসুদুল গাবা-১/৩৬১) তাছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা মতে উহুদ, খন্দকসহ রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে সংঘটিত সকল যুদ্ধে যোগদান করেন।

উহুদ থেকে ফিরে হিজরী ষষ্ঠ সনে ইসলামের মুবাল্লিগ বা প্রচারক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মিসর অধিপতি মাকুকাসের দরবারে পাঠান। তিনি মাকুকাসের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) যে পত্রটি বহন করে নিয়ে যান তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ।

"অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামী-দাওয়াতের দিকে আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করলে আপনি নিরাপদ থাকবেন এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করবেন। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সকল কিবতীর পাপ আপনার ওপর বর্তাবে। হে আসমানী কিতাবের অধিকারীরা! আপনারা এমন একটি কালেমা বা কথার দিকে আসুন যা আমাদের ও আপনাদের সকলের জন্য সমান। অর্থাৎ আমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করবো, তার সাথে অন্য কিছু শরীক করবো না এবং আমাদের একজন আর একজনকে খোদার আসনে বসাবো না।"

হযরত হাতিব ইবন আবী বালতা'য়া মিসরে মাকুকাসের দরবারে উপস্থিত হয়ে তার হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) উপরোক্ত পত্রটি পৌঁছে দেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে নিম্নোক্ত আলোচনা হয়ঃ

হাতিবঃ আপনার পূর্বে এখানে এমন একজন শাসক অতীত হয়েছেন যিনি নিজেকে খোদা মনে করতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে নিমজ্জিত করে দৃষ্টান্তমূলক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। অন্যদের থেকে আপনারও উপদেশ হাসিল করা উচিত। আপনি নিজেই উপদেশ লাভের স্থলে পরিণত হন, এমনটি বাঞ্ছনীয় নয়।

মাকুকাসঃ আমরা এক ধর্মের অনুসারী। যতদিন অন্য কোন ধর্ম সে ধর্ম থেকে উন্নততর প্রমাণিত না হয় ততদিন আমরা তা পরিত্যাগ করতে পারিনে।

হাতিবঃ আমরা আপনাকে দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি—যা অন্য সকল দ্বীন থেকে উত্তম ও পরিপূর্ণ। এই নবী যখন মানুষকে এ দ্বীনের দাওয়াত দিলেন, কুরাইশরা তখন তীব্র বিরোধিতা করলো। তাছাড়া ইহুদীরা সর্বাধিক বৈরী ভাব প্রকাশ করে। তবে তুলনামূলকভাবে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীরা

নমনীয় ছিল। আল্লাহর কসম! মূসা (আ) যেমন ঈসার (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন তেমনি ঈসাও (আ) মুহাম্মাদের (সা) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। আপনারা যেমন ইন্‌জীলের দিকে ইহুদীদেরকে আহবান জানান আমরাও তেমনি আপনাদেরকে কুরআনের দাওয়াত দিই। নবীদের আবির্ভাবকালীন সময়ে পৃথিবীতে যত কাওম, বা জাতি থাকে তারা সকলে সেই নবীর উম্মাত এবং তাদের ওপর সেই নবীর আনুগত্য ফরয। যেহেতু আপনি একজন নবীর যুগ লাভ করেছেন, তাই তাঁর ওপর ঈমান আনা আপনার অবশ্য কর্তব্য। আমরা আপনাকে দ্বীনে মসীহ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিনা, বরং সঠিকভাবে সেদিকেই নিয়ে যেতে চাচ্ছি।

মাকুকাসঃ মুহাম্মাদ কি সত্যিই একজন নবী?

হাতিবঃ কেন সত্য নয়?

মাকুকাসঃ কুরাইশরা যখন তাঁকে নিজ শহর থেকে তাড়িয়ে দিল, তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করলেন না কেন?

হাতিবঃ আপনারা কি বিশ্বাস করেন ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল? যদি তাই হয়, তাহলে যখন তাঁকে শূলীতে চড়ানো হয়, তাঁর কাওমের লোকদের জন্য বদদু'য়া করলেন না কেন?

এমন অন্তরভেদী তাৎক্ষণিক জবাবে অবলীলাক্রমে মাকুকাসের মুখ থেকে প্রশংসাসূচক ধ্বনি উচ্চারিত হলো। তিনি আরো বললেন, "নিশ্চয়ই আপনি একজন মহাজ্ঞানী এবং একজন মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকেই এসেছেন।" (উসুদুল গাবা-১/৩৬১) "আমি যতটুকু ভেবে দেখেছি, এই নবী কোন অনর্থক কাজের আদেশ দেন না এবং কোন পছন্দনীয় বিষয় থেকেও বিরত রাখেন না। আমি না তাঁকে ভ্রান্ত যাদুকর বলতে পারি, আর না মিথ্যুক ভবিষ্যদ্বক্তা। তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান। আমি শিগগিরই বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখবো।" কথাগুলি বলে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র পত্রখানি উঠিয়ে হাতির দাঁতের একটি বাক্সে বন্দী করেন এবং সীলযুক্ত করে উপস্থিত এক দাসীর হিফাজতে দিয়ে দেন।

মাকুকাস অত্যন্ত সম্মানের সাথে হযরত হাতিবকে বিদায় দেন এবং তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহর জন্য তিনজন দাসী, দুলদুল নামের একটি খচ্চর এবং বেশ কিছু কাপড়সহ মূল্যবান উপহার পাঠান। (যাদুল মা'য়াদ-২/৫৭) মাকুকাস প্রেরিত দাসীত্রয়ের একজন হযরত মারিয়্যা কিবতিয়্যা, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে নিজের জন্য রাখেন এবং তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহর (সা) পুত্র হযরত ইব্রাহীম। দ্বিতীয় দাসীটি হযরত মারিয়্যার বোন সীরীন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দান করেন প্রখ্যাত কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবিতকে (রা) এবং তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করে হযরত আবদুর রহমান ইবন হাস্‌সান। তৃতীয় দাসীটিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দান করেন আবু জাহম ইবন হুজাইফা আল-আদাবীকে। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৪০-৪১, উসুদুল গাবা-১/৩৬২)

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়। বিষয়টি যাতে প্রতিপক্ষ মক্কার কুরাইশরা জানতে না পারে সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) সকলকে সতর্ক করে দেন। হযরত হাতিব মক্কায় বসবাস না করলেও কুরাইশদের সাথে পুরাতন বন্ধুত্বের কারণে তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি মদীনাবাসীদের এই গোপন প্রস্তুতির খবরসম্বলিত একটি পত্রসহ মুযাইনা গোত্রের এক মহিলাকে মক্কার দিকে পাঠান। এর বিনিময়ে মহিলাটিকে তিনি নির্ধারিত মজুরী দেবেন বলে চুক্তি হয়। পত্রখানি মাথার চুলের বেণীর মধ্যে লুকিয়ে মহিলাটি মক্কার দিকে যাত্রা করে। এদিকে ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সব খবর অবগত হলেন। সাথে সাথে তিনি মহিলাটির পিছু ধাওয়া করে পত্রটি উদ্ধারের জন্য আলী, যুবাইর ও মিকদাদকে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা তিনজন খুব দ্রুত সাওয়ারী দাবড়িয়ে 'খালীকা' মতান্তরে 'রাওদাতু খাক' নামক স্থানে মহিলাকে ধরে ফেলেন। প্রথমে তাঁরা তার বাহনে সন্ধান করে কোন কিছুই পেলেন না। তারপর হযরত আলী (রা) মহিলাকে বললেন, "আমি আল্লাহর

নামে কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহকে (সা) মিথ্যা খবর দেওয়া হয়নি এবং আমাদেরকেও মিথ্যা বলা হয়নি। হয় তুমি নিজেই পত্রটি বের করে দাও, নয়তো আমরা তোমাকে উলংগ করে তালাশ করবো।" তাঁদের এ কঠোরতা দেখে মহিলা বললো, 'তোমরা একটু সরে যাও' তাঁরা সরে দাঁড়ালেন। সে তার মাথার বেণী খুলে তার মধ্য থেকে পত্রটি বের করে দিল। তাঁরা তিনজন পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। পত্রটি পাঠ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন, "ওহে হাতিব, তুমি এমন কাজ করলে কেন?" হাতিব বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। যদিও আমি কুরাইশ বংশের কেউ নই, তবুও জাহিলী যুগে তাদের সাথে আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যেহেতু মুহাজিরদের সকলে তাদের মক্কাস্থ আত্মীয়-বন্ধুদের সাহায্য-সহায়তা করে থাকেন, এ জন্য আমার ইচ্ছে হলো, আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কুরাইশরা যে সদ্ব্যবহার করে থাকে তার কিছু প্রতিদান কমপক্ষে আমি তাদের দান করি। একাজ আমি মুরতাদ হয়ে বা ইসলাম ত্যাগ করে অথবা কুফরকে ইসলামের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণে করিনি।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হাতিব বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পরিবার-পরিজন তাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ক্ষতিকর হবে না—এমনটি মনে করেই আমি চিঠিটি লিখেছি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আল্লাহ সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ দেখা দেয়নি। কিন্তু মক্কায় আমি ছিলাম একজন বহিরাগত এবং সেখানে আমার মা, ভাই ও ছেলেরা রয়েছে।" (আল-ইসাবা-১/৩০০, হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৫)

হাতিবের বক্তব্য শুনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, "সে সত্য কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছে। এ কারণে কেউ যেন তাকে গালমন্দ না করে।" হযরত উমার আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আল্লাহ, রাসূল ও মুসলমানদের প্রতি আস্থাহীনতার কাজ করেছে। অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "সে কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি? আল্লাহ বদরের যোদ্ধাদের অনুমতি দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী কর জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত।" রহমাতুল লিল আলামীন দয়ার নবীর এ অপূর্ব উদারতায় উমারের দু'চোখ সজল হয়ে ওঠে। (সহীহুল বুখারী, ফদলু মান শাহেদা বদরান)

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়,

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের আচরণ কর, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।" (সূরা মুমতাহিনা-১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে দ্বিতীয়বার মাকুকাসের দরবারে পাঠান এবং মাকুকাসের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। হযরত আমর ইবনুল আসের (রা) মিসর জয়ের পূর্ব পর্যন্ত উভয়পক্ষের মধ্যে এ চুক্তি বহাল থাকে। (আল-ইসতিয়াব)

হিজরী ৩০ সনে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত উসমান (রা) জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং বিপুলসংখ্যক লোকের উপস্থিতিতে তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন হয়। (আল-ইসতিয়াব)

প্রতিশ্রুতি পালন, উপকারের প্রতিদান দেওয়া এবং স্পষ্ট ভাষণ তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন দরদ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি যে পত্রটি লেখেন তা ছিল মূলতঃ এ দরদের তাকিদেই। আর রাসূল (সা) তা উপলব্ধি করেই তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

তাঁর স্বভাব ছিল কিছুটা রুক্ষ। দাসদের সাথে কঠোর আচরণ করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ

(সা) ও পরবর্তী খলীফারা মাঝে মাঝে তাঁকে বকাঝকা করে সংশোধন করতেন। একবার তাঁর এক দাস হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয়ই হাতিব জাহান্নামে যাবে।" রাসূল (সা) বললেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। যে ব্যক্তি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশ নিয়েছে সে জাহান্নামে যেতে পারে না।" (ইসতিয়াব)

হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে বহুবার তাঁর দাসেরা তাঁর বিরুদ্ধে খলীফার নিকট কঠোরতার অভিযোগ এনেছে। একবার তাঁর এক দাস মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির একটি উট জবেহ করে দেয়, তার শাস্তি স্বরূপ তিনি সেই দাসের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেন। খলীফা জানতে পেয়ে তাঁকে ডেকে বলেন, "জানতে পেলাম, তুমি তোমার দাসদের অনাহারে রাখ।" খলীফা তাঁকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন।

ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার প্রধান উৎস। খাবারের একটি দোকান থেকে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। মৃত্যুকালে চার হাজার দীনার এবং অনেকগুলি বাড়ী রেখে যান।

কেউ বলেছেন, হাতিব থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) তিনটি হাদীস, আবার কেউ বলেছেন দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে।

'উতবা ইবন গাযওয়ান (রা)

নাম 'উতবা, ডাক নাম আবু আবদিল্লাহ। পিতা গাযওয়ান ইবন জাবির। জাহিলী যুগে তার গোত্র বনী নাওফাল ইবন আবদে মান্নাফের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল।

ইসলামের সূচনালগ্নে তাওহীদের আহবানে সাড়া দানকারীদের মধ্যে উতবা অন্যতম ব্যক্তি। একবার এক ভাষণে তিনি দাবী করেন, তিনি সপ্তম মুসলমান। (উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

মক্কায় কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার দ্বিতীয় হিজরাতে শরিক হন। তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। কিছুদিন হাবশায় থাকার পর আবার মক্কায় ফিরে এসে বসবাস করতে থাকেন। হযরত রাসূলে করীম (সা) তখনও মক্কায়। (আল-ইসতিয়াব, উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরাত করেন এবং কুফর ও ইসলামের মধ্যে সামরিক সংঘাত শুরু হলো, তিনি এবং মিকদাদ একটি কুরাইশ বাহিনীর সাথে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। ইকরামা ইবন আবী জাহল ছিল এই বাহিনীর নেতা। পথে মদীনার মুসলিম মুজাহিদদের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে এই বাহিনীর ছোট-খাট একটি সংঘর্ষ হয়। এই মুজাহিদ দলটির নেতা ছিলেন হযরত 'উবাইদা ইবনুল হারিস। 'উতবা এবং মিকদাদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা সুযোগমত মুজাহিদ দলটির সাথে যোগ দেন। মদীনায় পৌঁছে উতবা হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালামা 'আজলানীর অতিথি হন এবং হযরত আবু দুজানা আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ-৩/৬৯)

হযরত 'উতবা ইবন গাযওয়ান ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। বদর, উহুদ, খন্দক ছাড়াও যে সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন তার সবগুলোতে তিনি অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ (সা) যে অনুসন্ধানী দলটি নাখলার দিকে পাঠান, তিনি সেই দলেরও সদস্য ছিলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫০)

হিজরী ১৪ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) ইরাকের সামুদ্রিক বন্দর উবুল্লা, মায়সান ও তার আশ-পাশের এলাকায় অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করে একটি বাহিনীসহ মদীনা থেকে পাঠান। ঘটনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "আমীরুল মুমিনীন হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ই'শার নামাযের পর একটু বিশ্রামের জন্য বিছানায় গেলেন, যাতে একটু পরে রাতে নগর ভ্রমণে বের হতে পারেন। কিন্তু তাঁর দু'চোখে ঘুম নেই। দূত খবর নিয়ে এসেছে, পরাজিত পারস্য বাহিনী পাল্টা আক্রমণের জন্য বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে সুসংগঠিত হয়েছে। খলীফাকে আরো জানানো হয়েছে, বসরার নিকটবর্তী 'উবুল্লা' নগরী পরাজিত পারস্য বাহিনীর অর্থ ও লোক সরবরাহের প্রধান উৎস। খলীফা পারস্য বাহিনীর এই উৎস বন্ধ করার জন্য 'উবুল্লায়' অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত সামরিক শক্তি তাঁর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কারণ, মদীনায় তখন অল্প কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকলে বিভিন্ন ফ্রন্টে অভিযানে লিপ্ত। খলীফা 'উমার (রা) তখন তাঁর চিরাচরিত পদ্ধতি কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। আর তা হলো, সৈন্যের স্বল্পতা শক্তিশালী ও যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা দূরীকরণ। তিনি সেনা কমাণ্ডারদের সম্পর্কে ভাবলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আপন মনে বলে উঠলেনঃ "পেয়েছি। হ্যাঁ, আমি পেয়েছি।" তারপর একথা বলতে বলতে তিনি বিছানায় গেলেন, "তিনি সেই মুজাহিদ যাঁকে বদর, উহুদ ও খন্দকের মত যুদ্ধসমূহ চিনেছে। ইয়ামামাও তাঁর যোগ্যতা ও ভূমিকার সাক্ষী। কোন যুদ্ধেই তাঁর তরবারি ভোতা হয়নি, তাঁর একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তদুপরি তিনি দুইটি হিজরাতের অধিকারী, ধরাপৃষ্ঠে তিনি সপ্তম মুসলমান।"

সকাল বেলা তিনি বললেনঃ "তোমরা কেউ 'উতবা ইবন গাযওয়ানকে ডেকে দাও।"

খলীফা তাঁকে তিনশো'র কিছু বেশী সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন এবং পশ্চাৎগামী আরো কিছু সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার অঙ্গীকারও করেন।

মদীনা থেকে উতবা তাঁর বাহিনীসহ রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে খলীফা উমার বাহিনী প্রধান 'উতবাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেনঃ

"আল্লাহর রহমত ও বরকতের ওপর নির্ভর করে আরবের শেষ সীমা ও অনারব সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী অংশের দিকে আপনার সঙ্গীদের নিয়ে আপনি রওয়ানা হয়ে যান। যতদূর সম্ভব তাকওয়া অবলম্বন করবেন এবং স্মরণ রাখবেন, আপনারা শত্রু-ভূমিতে যাচ্ছেন। আমি আশা করি আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন। আমি 'আলা ইবনুল হাদরামীকে লিখেছি, 'আরফাজা ইবন হারসামাকে পাঠিয়ে আপনাকে সাহায্য করার জন্য। শত্রুর মুকাবিলায় তিনি এক করিৎকর্মা মুজাহিদ। তিনি আপনার উপদেষ্টা হিসেবে থাকবেন। অনারবদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাবেন। যারা সে আহবান মেনে নেবে, তাদেরকে নিরাপত্তা দেবেন। আর যারা তা অস্বীকার করবে, জিযিয়া দিয়ে শাসিত জীবন যাপনে বাধ্য করবেন। অন্যথায় তলোয়ারের সাহায্যে ফায়সালা করবেন। চলার পথে যে সকল আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যাবেন তাদেরকে শত্রুর সাথে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করবেন এবং সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবেন।" (উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

উতবা ইবন গাযওয়ান তাঁর বাহিনী নিয়ে রওয়ানা দিলেন। সেই বাহিনীর সাথে তাঁর স্ত্রীসহ অন্য সৈনিকদের আরো পনেরো জন মহিলাও চললেন। তাঁরা 'উবুল্লা' শহরের অদূরে 'কাসবা' নামক এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ বিশিষ্ট ভূমিতে পৌঁছলেন। তাঁদের কাছে তখন খেয়ে বেঁচে থাকার মত কোন কিছু নেই। যখন তারা মারাত্মক ক্ষুধার সম্মুখীন হলেন, উতবা তাঁর বাহিনীর কতিপয় সদস্যকে খাওয়ার কোন কিছু তালাশ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁদের এই খাদ্য তালাশের সাথে একটি চমকপ্রদ কাহিনী জড়িত আছে। তাদেরই একজন বর্ণনা করছেনঃ

"আমরা খাদ্যের সন্ধানে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। সেখানে দু'টো বস্তা পড়ে থাকতে দেখলাম। তার একটিতে খেজুর ভর্তি এবং অন্যটিতে এক প্রকার সাদা শস্যদানা যার উপরিভাগ সোনালী আবরণে আবৃত। আমরা বস্তা দুটো টেনে আমাদের সেনা ছাওনীর কাছাকাছি নিয়ে এলাম। আমাদের একজন শস্যদানাভরা বস্তাটির দিকে তাকিয়ে বললো, "এটা বিষ, শত্রুরা রেখে দিয়েছে। কেউ এর ধারে কাছে যাবে না।" আমরা খেজুর খেতে লাগলাম। এর মধ্যে আমাদের একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে শস্যদানার বস্তায় মুখ দিয়ে খেতে শুরু করলো। আমরা তো প্রায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, ঘোড়াটি মারা যাবার পূর্বেই জবেহ করে দেওয়ার যাতে তার গোশত আমরা খেতে পারি।

অতঃপর ঘোড়ার মালিক আমাদের বললোঃ একটু অপেক্ষা করা যাক, আজ রাত আমরা ঘোড়াটি পাহারা দিই। যদি দেখা যায়, সত্যি সত্যিই ঘোড়াটি মারা যাচ্ছে তাহলে জবেহ করা যাবে। কিন্তু সকালে দেখা গেল ঘোড়াটি সম্পূর্ণ সুস্থ্য। তখন আমার বোন আমাকে বললোঃ ভাই, আমার আব্বাকে আমি বলতে শুনেছি, বিষ আগুনে জ্বালিয়ে সিদ্ধ করা হলে তার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। তারপর সে কিছু শস্যদানা নিয়ে হাঁড়িতে ফেলে সিদ্ধ করা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সে আমাদের ডেকে বললো, দেখুন, কেমন লাল হয়ে গেছে। সে দানাগুলির খোসা ছড়িয়ে সাদা দানা বের করলো। আমরা সেগুলি একটি পাত্রে রাখলাম। উতবা বললেনঃ তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে ফেল। আমরা খেয়ে দেখলাম চমৎকার স্বাদ। পরে আমরা জেনেছিলাম এই শস্যদানার নাম "ধান"।

এই 'উবুল্লা' ছিল দিজলার তীরে, শত্রু বাহিনীর একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি। উতবা মাত্র ছ'শো যোদ্ধা ও কতিপয় মহিলাকে সাথে নিয়ে এ ঘাঁটি জয় করেন। তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল অতি মামুলী ধরনের।

যথা ঃ তীর, তরবারি, বর্শা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাহায্যে এ অসাধ্য সাধন করেন।

উতবা মহিলাদের জন্য অনেকগুলি পতাকা বানিয়ে বর্শার মাথায় বেঁধে দেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন মুসলিম মুজাহিদদের পেছনে সেগুলি উঁচু করে ধরে রাখে। তিনি তাদের আরো বলেন, আমরা যখন 'উবুল্লা' শহরের কাছাকাছি পৌঁছে যাব তখন তোমরা খুব বেশী করে ধুলো উড়াবে, যাতে চারিদিক ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যায়।

মুসলিম বাহিনী যখন উবুল্লার নিকটবর্তী হলো, পারস্য বাহিনী শহর থেকে বেরিয়ে এসে দিগন্তব্যাপী ধুলোর মেঘ ও অসংখ্য পতাকার ওঠানামা দেখতে পেল। তারা পরস্পর বলাবলি করলো ঃ এতো অগ্রবর্তী বাহিনী। এদের পেছনে অসংখ্য সৈন্য রয়েছে, তারাই এ ধুলো উড়াচ্ছে।

তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হলো, আতঙ্কে তারা অস্থির হয়ে পড়লো। তারা হাতের কাছে যা পেল তাই নিয়ে দিজলা নদীতে নোঙ্গর করা নৌকায় উঠে পালিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে গেল। উতবা তাঁর বাহিনীর একজন সদস্যকেও না হারিয়ে উবুল্লায় প্রবেশ করেন। অতঃপর দিজলা উপকূলবর্তী নগর ও গ্রামসমূহ পদানত করে ইসলামী ঝাণ্ডা সমুন্নত করেন।

'উবুল্লায় মুসলিম বাহিনী অগণিত গণিমত লাভ করে। মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক মদীনায় এলে মদীনাবাসীরা তাকে প্রশ্ন করে 'উবুল্লায় মুসলমানরা কেমন আছে?' তিনি বলেন, "তোমরা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছো? আল্লাহর কসম, আমি যখন তাদেরকে রেখে এসেছি তখন তারা সোনা রূপো পাল্লায় করে ওজন দিচ্ছে।" একথা শুনে মদীনাবাসীরা উবুল্লার দিকে সওয়ারী হাঁকালো।

উবুল্লা জয়ের পর হযরত 'উতবা ভেবে দেখলেন, যদি তাঁর সৈন্যরা এই বিজাতীয় ভূমিতে শহরের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সহ-অবস্থান করে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি বিজাতীয় আচার-আচরণে অভ্যস্ত হয়ে তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে। বিষয়টি তিনি খলীফা উমারকে (রা) জানান এবং বসরা নামক স্থানে একটি সামরিক শহর নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। এই বসরা ছিল উবুল্লা বন্দরের নিকটবর্তী একটি স্থান যেখানে পারস্য উপসাগরে চলাচলরত ভারতবর্ষ ও পারস্যের জাহাজসমূহ নোঙ্গর করতো। হযরত 'উতবা (রা) আটশো লোক সঙ্গে করে সর্বপ্রথম উক্ত স্থানে যান এবং বসরা নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রত্যেক গোত্রের জন্য তিনি পৃথক মহল্লা নির্ধারণ করে দেন। জামে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেন হযরত মিহজান ইবনুল আদরা-এর ওপর। নগরীর বাড়ী-ঘর প্রথমতঃ গাছ-পাথর দিয়ে তৈরী হয়। এ কারণে জামে মসজিদও গাছপালা দিয়ে নির্মিত হয়। তবে তিনি নিজের জন্য কোন প্রাসাদ নির্মাণ করেননি। কাপড়ের তৈরী তাঁবুতে তিনি বসবাস করতেন। (উসুদুল গাবা-৩/৩৬৪)

হযরত 'উতবা (রা) এই নতুন শহরের প্রথম শাসক নিযুক্ত হন এবং ছয় মাস যাবত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি তাঁর যুহদ ও নির্মোহ স্বভাব তাঁকে পদ থেকে সরে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া তিনি বসরার মুসলমানদের বিলাসী জীবন যাপন লক্ষ্য করে আঁতকে ওঠেন। যারা কিছুদিন পূর্বেও সিদ্ধ ধানের চেয়ে উত্তম খাবার চিনতো না, এখন তারা পারস্যের অভিজাত খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই সময় তিনি মসজিদে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তার কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ

"বন্ধুগণ! দুনিয়া গতিশীল ও বিলীয়মান। তার বেশী অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে। তোমরা নিশ্চিতভাবে এই দুনিয়া থেকে এমন এক স্থানে স্থানান্তরিত হবে যার কোন ধ্বংস নেই। তাহলে সর্বোত্তম পাথেয় সংগে নিয়ে যাচ্ছ না কেন? আমাকে বলা হয়েছে, যদি কোন প্রস্তর খণ্ড জাহান্নামের

কিনারা থেকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সত্তর বছরেও তার তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহর কসম! তোমরা তা পূর্ণ করে ফেলবে। কি, তোমরা অবাক হচ্ছো? আল্লাহর কসম, আমাকে বলা হয়েছে, জান্নাতের দরযা এত প্রশস্ত হবে যে, সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর লাগবে। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন সেখানে প্রচণ্ড ভীড় জমে যাবে। আমি যখন ঈমান আনি, তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে মাত্র ছয় ব্যক্তি। অভাব ও দারিদ্র্যের এমন চরম অবস্থা ছিল যে, গাছের পাতাই ছিল আমাদের জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন। সেই পাতা খেতে খেতে আমাদের ঠোঁটে ঘা হয়ে যেত। একদিন আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পাই। সেটা ফেঁড়ে আমি ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস পরনের তহবন্দ বানিয়ে নিই। কিন্তু আজ এমন দিন এসেছে যখন আমাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের আমীর হয়েছে। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট হওয়া সত্বেও নিজেকে বড় মনে করি— এমন অবস্থা থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। নবুওয়াত শেষ হয়েছে। অবশেষে রাজতন্ত্র কায়েম হবে এবং খুব শিগগিরই তোমরা অন্যান্য আমীরদের পরীক্ষা করবে।" (মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বল-৪/১৭৪)

অতঃপর হযরত 'উতবা (রা) হযরত মাজাশি' ইবন মাসউদকে ফুরাতের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন এবং হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ যান। সেখানে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি খলীফার নিকট দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চান; কিন্তু খলীফা তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বার বার আবেদন করেন, আর খলীফাও বার বার তা প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা তাঁকে বসরায় ফিরে গিয়ে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ দেন। অনিচ্ছা সত্বেও তিনি খলীফার নির্দেশ মেনে নেন। মক্কা থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রাকালে উটের পিঠে আরোহণের পূর্ব মুহূর্তে অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দু'আ করেন—'আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানী ইলাইহা, আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানী ইলাইহা—' ওহে আল্লাহ, তুমি আমাকে বসরায় ফিরিয়ে নিও না, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিও না। আল্লাহ পাক তাঁর দু'আ কবুল করেন। পথিমধ্যে হঠাৎ উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মা'দানে সালীম নামক স্থানে পঁচাত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ১৭ মতান্তরে ২০। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থসমূহে 'উতবা ইবন গাযওয়ান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

'আমের ইবন ফুহাইরা (রা)

নাম 'আমের, ডাক নাম আবু 'আমর। পিতা ফুহাইরা, মতান্তরে ফুহাইরা তাঁর মাতার নাম। ইবন হিশাম বলেন, 'আমের ইবন ফুহাইরা বনী আসাদের এক অনারব নিগ্রো দাস। হযরত আবু বকর সিদ্দীক তাঁকে খরীদ করে আযাদ করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৯) অন্য একটি বর্ণনা মতে, 'আমের ছিলেন হযরত 'আয়িশার বৈপিত্রীয় ভাই ইযদ গোত্রের তুফাইল ইবন আবদিল্লাহর দাস। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হিজরাতের পূর্বে যাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন 'আমের ইবন ফুহাইরা তাদের মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩১৮)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় হযরত আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে 'আমের ইবন ফুহাইরা তাওহীদের দাওয়াত কবুল করেন। একে তো অসহায় দাস, তার ওপর ইসলাম গ্রহণ, ফলে মুসীবতের পাহাড় তাঁর ওপর নেমে আসে। নির্যাতনের নানা রকম কৌশল তার ওপর প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি সকল অত্যাচারের মুখেও পাহাড়ের মত অটল থাকেন। অবশেষে হযরত সিদ্দিকে আকবরের (রা) বদান্যতায় তিনি দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি পান। (উসুদুল গাবা-৩/১৯১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন আবু বকর সিদ্দিককে (রা) সংগে করে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে 'সাওর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন, তখন 'আমের ইবন ফুহাইরা সারাদিন 'সাওর' পর্বতের আশেপাশের চারণক্ষেত্রে আবু বকরের (রা) বকরী চরাতেন এবং যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) অবস্থান করছিলেন, সন্ধ্যায় সেই গুহার নিকট ছাগলের পাল নিয়ে আসতেন। তারপর বকরীর দুধ দুইয়ে তাঁদের পানের ব্যবস্থা করতেন। আর এদিকে হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ প্রতিদিন রাতে গোপনে সাওর পর্বতের গুহায় আসতেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও সিদ্দীকে আকবরকে মক্কার অবস্থা জানাতে। সকালে তিনি যখন বাড়ীতে ফিরতেন 'আমের বকরীর পাল নিয়ে তার পিছে পিছে চলতেন, যাতে তাঁর পায়ের নিশানা মুছে যায় এবং কারো মনে কোন রকম সন্দেহ না দেখা দেয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৮৬, বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) সাওর পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন এবং আবু বকর (রা) স্বীয় বাহনের পেছনে 'আমেরকে উঠিয়ে নেন। এভাবে 'আমের মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবন খুসাইমার (রা) অতিথি হন এবং হযরত হারিস ইবন আউসের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ-৩/১৬৪)

মক্কা থেকে মদীনায় আগত যে সকল লোকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রথম প্রথম মদীনার আবও-হাওয়া উপযোগী হচ্ছিল না 'আমের তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মদীনা আল্লাহর যমীনের মধ্যে সর্বাধিক জ্বরের এলাকা। সেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী সাথীরা ব্যাপকভাবে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আবু বকর তাঁর দুই আযাদকৃত দাস—'আমের ইবন ফুহাইরা ও বিলালের সাথে একই ঘরে থাকতেন। তাঁরা সবাই জ্বরে পড়লেন। আমি তাঁদের দেখতে গেলাম। এটা পর্দার হুকুমের আগের কথা। প্রচণ্ড জ্বরে তখন তাঁদের অচেতন অবস্থা। প্রথমে আবু বকরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর আমি 'আমের ইবন ফুহাইরার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, " 'আমের, কেমন অনুভব করছেন?" তিনি দু'লাইন কবিতা আউড়িয়ে জবাব দিলেন,

"মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের পূর্বেই আমি তাকে পেয়েছি, নিশ্চয় কাপুরুষের মৃত্যু ওপর থেকে হঠাৎ আসে। প্রতিটি মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী বাঁচার চেষ্টা করে, যেমন গরু তার শিং দিয়ে চামড়া বাঁচিয়ে থাকে।"

'আয়িশা বলেন, "আল্লাহর কসম, 'আমের নিজেই জানেনা সে কী বলছে।" তারপর হযরত 'আয়িশা (রা) বিলালের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে যান এবং তাঁদের অবস্থা রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন দু'আ করেন, "হে আল্লাহ, মদীনাকে তুমি আমাদের নিকট মক্কার মত বা তার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় ও প্রিয় বানিয়ে দাও, তার খাদ্যদ্রব্যে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং তার রোগ-ব্যাধি 'মাহইয়া' নামক স্থানে সরিয়ে নাও।" [সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৮৮-৮৯, সহীহুল বুখারী—বাবু হিজরাতিন নাবী ওয়া আসহাবিহি] রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ কবুল হয় এবং তাঁরা সকলে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরা বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরিক ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের পর আবু বারা 'আমের ইবন মালিক নামক এক ব্যক্তি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন; কিন্তু সে না করলো কবুল এবং না করলো প্রত্যাখ্যান। সে বললো, "হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আপনার সাথীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে নাজদবাসীদের নিকট পাঠাতেন এবং তারা যদি নাজদীদের কাছে আপনার দাওয়াত পেশ করতেন তাহলে আমার বিশ্বাস তারা আপনার দাওয়াত কবুল করতো।" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আমি নাজদীদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর আক্রমণের ভয় করছি।" আবু বারা বললো, "তাদের ব্যাপারে আমি জিম্মাদার। আপনি লোক পাঠান এবং তারা আপনার দ্বীনের দাওয়াত দিক।"

তার কথার উপর আস্থা রেখে হযরত রাসূলে কারীম (সা) চল্লিশ মতান্তরে সত্তর জন লোককে বাছাই করে একটি দল গঠন করেন। এই দলের মধ্যে হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরাও ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে এই দলটি উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার চতুর্থ মাসে ৪ হিজরী সনে মদীনা থেকে যাত্রা করে এবং বনী 'আমের ও হাররা বনী সুলাইমের মধ্যবর্তী 'বি'রে মা'উনা' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে।

অতঃপর তাঁরা হারাম ইবন মিলহানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চিঠি 'আমের ইবন তুফাইলের কাছে পাঠান। চিঠিটি পাঠ না করেই 'আমের ইবন তুফাইল দূত হারাম ইবন মিলহানকে হত্যা করে। তারপর বনী সুলাইম, রি'ল ও যাকওয়ানের সহায়তায় দলটির ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে একমাত্র কা'ব ইবন যায়িদ মতান্তরে 'আমর ইবন উমাইয়া দামারী (রা) ছাড়া সকলকে হত্যা করে। হযরত কা'ব মারাত্মক আহত অবস্থায় কোন রকম বেঁচে যান। পরে তিনি খন্দক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৩-৮৬

গাদ্দার জাব্বার ইবন সালমার বর্শা যখন হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরার (রা) বক্ষ বিদীর্ণ করে গেল, তখন অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল- 'ফুযতু ওয়াল্লাহ—আল্লাহর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।' লাশ লাফিয়ে আসমানের দিকে উঠে গেল। ফিরিশতারা তাঁর দাফন কাফন করে। তাঁর পবিত্র রূহের জন্য 'আলা 'ইল্লীয়্যীনের দরযা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকনে ঘাতক জাব্বার ইবন সালমা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং এত প্রভাবিত হয় যে, সে ইসলাম গ্রহণ করে। বি'রে মা'উনা'র এই হৃদয়বিদারক ঘটনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) একাধারে চল্লিশ দিন ফজরের নামাযে 'কুনূতে নাযিলা' পাঠ করেন এবং এই ঘাতকদের জন্য বদ দু'আ করেন।

এই ঘটনার পর 'আমের ইবন তুফাইল মদীনায় আসে এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করে, "হে মুহাম্মাদ, ঐ ব্যক্তি কে যাকে তীরবিদ্ধ করার পরই আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়?" রাসূলুল্লাহ

(সা) বললেন, "সে 'আমের ইবন ফুহাইরা।" (টীকা সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৬, তাবাকাত ইবন সা'দ—মাগাযী)

হযরত 'আমের ইবন ফুহাইরার দেহের বাহ্যিক রং ছিল হাবশী নিগ্রোদের মত কালো এবং তাঁর ৩৪ (চৌত্রিশ) বছর জীবনের বেশীর ভাগ অত্যাচারী মনিবদের দাসত্ব ও গোলামীতে অতিবাহিত হয়েছে। তবে চারিত্রিক সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন মহীয়ান। তিনি বিভিন্ন বিপদ মুসীবতে যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তাতেই তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য অতি চমৎকার রূপে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। তিনি এমন বিশ্বাসী ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বহু সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে তাঁর ওপর আস্থা রেখেছেন। শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন করে তুলেছিল। তাই 'বি'রে মাউনা'র সংঘর্ষে যখন তাঁর বুকে বর্শা বিধিয়ে দেওয়া হলো, অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল 'ফুযতু ওয়াল্লাহ—আল্লাহর কসম, আমি সফলকাম হয়েছি।'

আবদুল্লাহ ইবন সুহাইল (রা)

নাম 'আবদুল্লাহ, ডাক নাম বা কুনিয়াত আবু সুহাইল। পিতা সুহাইল এবং মাতা ফাখ্‌তা বিন্‌তু 'আমের।

ইসলামের প্রথম পর্বে ঈমান আনেন এবং হাবশা অভিমুখী দ্বিতীয় কাফিলার সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। কিছুদিন হাবশায় অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এলে পিতা তাঁকে বন্দী করে এবং তাঁর ওপর নির্দয় অত্যাচার চালায়। 'আবদুল্লাহ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় মুশরিকী জীবনে বা পৌত্তলিকতায় ফিরে যাওয়ার ভান করেন। মাতা-পিতা ও মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাহ্যিক আচরণ দেখে ইসলাম পরিত্যাগ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

এদিকে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান। মক্কা ও মদীনার মাঝে সামরিক সংঘর্ষ শুরু হয়। মক্কাবাসীরা 'আবদুল্লাহকে তাদের সহযোদ্ধা হিসেবে বদরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু যে হৃদয়ে একবার ঈমানের নূর প্রবেশ করে সেখানে যে কক্ষণো শিরকের অন্ধকার প্রবেশ করতে পারেনা—একথাটি তাদের জানা ছিল না। মূলতঃ 'আবদুল্লাহ কোনদিন ইসলাম ত্যাগ করেননি। তিনি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। বদরে মুসলিম ও কুরাইশ বাহিনী মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমনি সময় সুযোগ বুঝে 'আবদুল্লাহ মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন।

এ আকস্মিক ঘটনায় 'আবদুল্লাহর পিতা ক্রোধে ফেটে পড়ে। সে এর প্রতিশোধকল্পে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হলোনা। 'আবদুল্লাহ তখন স্বাধীন, তাঁর দ্বীনী ভাইদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পিতার বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়ছেন। অবশেষে বিজয় হলো মুসলমানদের। বদরের পর সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধেই হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থেকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি শরিক ছিলেন। (আল-ইসাবা-২/৩২৩)

মক্কা বিজয়ের সময়ও হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর পিতা সুহাইল তখনও মক্কায় কাফির অবস্থায় জীবিত। হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) পিতার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমান বা নিরাপত্তা চাইলেন। এ সম্পর্কে তাঁর পিতা সুহাইল বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আমি আমার ঘরে প্রবেশ করে দরযা বন্ধ করে দিলাম। তারপর আমার ছেলে আবদুল্লাহকে আমার নিরাপত্তার আবেদন জানানোর জন্য মুহাম্মাদের (সা) নিকট পাঠালাম। কারণ, আমি যে নিহত হবোনা, এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতাকে কি আমান বা নিরাপত্তা দান করছেন?" রাসূলুল্লাহ বললেন, "হাঁ। তাকে আল্লাহর আমানে আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া গেল। সে আত্মপ্রকাশ করুক।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আশে পাশের লোকদের বললেন, "সুহাইল ইবন 'আমরকে কেউ যেন হেয় চোখে না দেখে। আল্লাহর কসম, সে একজন সম্মানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি কক্ষণো ইসলামের সৌন্দর্য থেকে অজ্ঞ থাকতে পারেনা। এখন তো সে দেখতে পেয়েছে, সে যার সাহায্যকারী ছিল তাতে কোন কল্যাণ নেই।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ শুনিয়ে সুসংবাদ দিলেন। পিতা পুত্রের সৌভাগ্যে আনন্দে বিগলিত হয়ে বলে ওঠেন, "আল্লাহর কসম, তুমি ছোটবেলা

ও বড় হয়ে—উভয় জীবনে সৎকর্মশীল।" রাসূলুল্লাহর (সা) এ আশ্বাসের পর সুহাইল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান অবস্থায় তাঁর দরবারে হাজির হন। হুনাইন যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মক্কা থেকে রওয়ানা হন। পথে মক্কার অনতিদূরে 'জি'রানা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) হুনাইনের গণীমত থেকে তাঁকে ১০০ (একশো) উট দান করেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/১৭৩-১৭৪)

খলীফা আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে 'আরব উপদ্বীপে যাকাত অস্বীকারকারী ও ভণ্ড নবীদের যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, হযরত আবদুল্লাহ (রা) সেই বিদ্রোহ দমনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হিজরী ১২ সনে ইয়ামামার প্রান্তরে ভণ্ড নবী মুসাইলামার সাথে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়, আবদুল্লাহ সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতানুসারে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আটত্রিশ বছর।

আবদুল্লাহর (রা) পিতা সুহাইল তখনও মক্কায় জীবিত। এ ঘটনার পর খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। তিনি আবদুল্লাহর পিতার সাথে দেখা করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহর পিতা খলীফাকে বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'একজন শহীদ ব্যক্তি তার পরিবারের সত্তর (৭০) জনের শাফায়াত বা শুফারিশ করবে।' আমার আশা আছে, সে সময় আমার ছেলে আমাকে ভুলবে না।"

যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা)

নাম যায়িদ, ডাক নাম আবু আবদির রহমান। পিতা খাত্তাব ইবন নুফাইল, মাতা আসমা বিনতু ওয়াহাব। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের বৈমাত্রীয় ভাই এবং বয়সে হযরত 'উমার থেকে বড়। (উসুদুল গাবা-২/২২৮)

ইসলামের সূচনা পর্বে উমারের বাড়াবাড়ির কারণে যদিও খাত্তাবের বাড়ী সন্ত্রস্ত ছিল; তথাপি যায়িদ উমারের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেন এবং মুহাজিরদের প্রথম কাফিলার সাথে মদীনায় হিজরাতও করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় আসার পর মা'ন ইবন 'আদী আল 'আজলানীর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম 'বদর' যুদ্ধে শরিক হন। তারপর উহুদেও অংশগ্রহণ করেন। দারুণ সাহসী ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধে তিনি যতটা না বিজয় কামনা করতেন তারচেয়ে বেশী কামনা করতেন শাহাদাত। উহুদে তিনি অসীম সাহসের সাথে লড়ছেন। এমন সময় তাঁর ভাই উমার লক্ষ্য করলেন যায়িদের বর্মটি খুলে পড়ে গেছে এবং সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি নাঙ্গা শরীরে শত্রু বাহিনীর মাঝখানে ঢুকে পড়ছেন। উমার ভাইকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি চিৎকার করে ভাইকে ডেকে বললেন, "খুজ দিরয়ী' ইয়া যায়িদ, ফা কাতিল বিহা'—যায়িদ, এই নাও আমার বর্মটি। এটি পরে যুদ্ধ কর।"

যায়িদ উত্তর দিলেন, "ইন্নী উরীদু মিনাশ শাহাদাতি মা তুরীদুহু ইয়া উমার'—ওহে উমার, তোমার মত আমারও তো শাহাদাতের সুমধুর পানীয় পান করার আকাঙ্ক্ষা আছে।" তারপর দু'জনেই বর্ম ছাড়াই যুদ্ধ করেন। (তাবাকাত ইবন সা'দ-৩/২৭৫, হায়াতুস সাহাবা-১/৫১৫, রিজালুন হাওলার রাসূল-৩৪৪)

তিনি হুদাইবিয়ার ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন এবং হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাতে বাইয়াত করেন। তাছাড়া খন্দক, হুনাইন, আওতাস প্রভৃতি যুদ্ধেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। এ সফরেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী শোনেন, "তোমরা যা নিজেরা খাও, পর, তাই তোমাদের দাস-দাসীদের খাওয়াও, পরাও। যদি তারা কোন অপরাধ করে, আর তোমরা তা ক্ষমা করতে না পার, তাহলে তাকে বিক্রী করে দাও।" (তাবাকাত-৩/২৭৪)

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে ধর্মদ্রোহীদের যে ফিত্না বা অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা নির্মূলের জন্য হযরত যায়িদ অন্যদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেক মুরতাদকে তিনি স্বহস্তে হত্যা করেন। বিখ্যাত মুরতাদ 'নাহার ইবন 'উনফূহ—যার ইসলাম ত্যাগ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) তার মুসলমান থাকাকালেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাকে হযরত যায়িদ নিজ হাতে খতম করেন। মুসাইলামা কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে ইসলামী ঝাণ্ডা বহনের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। যুদ্ধ চলাকালে বনু হানীফা একবার এমন মারাত্মক আক্রমণ চালায় যে, মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। কিছু সৈনিক তো যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায়। এতে যায়িদের সাহস আরও বেড়ে যায়। তিনি চিৎকার করে সাথীদের আহবান জানিয়ে বলতে লাগলেন, "ওহে জনমণ্ডলী, তোমরা দাঁত কামড়ে ধরে শত্রু নিধন কার্য চালিয়ে যাও। তোমরা সুদৃঢ় থাক। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাদের পরাজিত না করা অথবা আমি আল্লাহর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা আমি বলবো না। আল্লাহর সাথে মিলিত হলে সেখানেই আমি আত্মপক্ষ সমর্থন

করে কথা বলবো।" (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩৪৫) তারপর তিনি সংগী-সাথীদের ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলতে থাকেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'তাজিরু ইলাইকা মিন মিরারে আসহাবী'—হে আল্লাহ, আমার সংগী-সাথীদের ভেগে যাওয়ায় আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।" (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৪-৩৫) এ অবস্থায় তিনি পতাকা দুলিয়ে শত্রু বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে চলে যান এবং তরবারি চালাতে চালাতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর হযরত সালেম (রা) পতাকা তুলে নেন। হযরত যায়িদের মৃত্যুসন হিজরী ১২। (আল-ইসাবা-১/৫৬৫)

হযরত যায়িদ ছিলেন হযরত উমারের (রা) অতি প্রিয়জন। তাঁর মৃত্যুতে হযরত উমার অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে কোন মুসীবত উপস্থিত হলেই তিনি বলতেন, 'যায়িদের মৃত্যুশোক আমি পেয়েছি এবং সবর করেছি।' যায়িদের হত্যাকারীকে দেখে উমার (রা) বলেন, "তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছো। প্রভাতের পূবালী বায়ু তারই স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে।" (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯২) এত প্রিয় ভায়ের মৃত্যুশোকে তিনি কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়েননি। মদীনায় খলীফা আবু বকরের (রা) সাথে তিনি ইয়ামামা প্রত্যাগত সৈনিকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। তাদের কাছে ভায়ের শাহাদাতের খবর শুনে তিনি বলে ওঠেন, "সাবাকানী ইলাল হুসনাইন আসলামা কাবলী ওয়া ইসতাশহাদা কাবলী'—দু'টি নেক কাজে তিনি আমার থেকে অগ্রগামী রয়ে গেলেন—আমার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমার আগে শাহাদাতও বরণ করলেন।" (আল-ইসাবা-১/৫৬৫)

ঠিক এই সময় আরবের তৎকালীন এক বিখ্যাত কবি মুতাম্মিম ইবন নুওয়াইরার এক ভাইও একটি যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের হাতে নিহত হয়। কবি মুতাম্মিম তাঁর ভাইকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি মৃত ভায়ের স্মরণে এমন এক করুণ মরসিয়া রচনা করেন যে, তা শুনে শ্রোতাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। ঘটনাক্রমে হযরত উমারের (রা) সাথে কবির সাক্ষাত হয়। উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার ভায়ের মৃত্যুতে কতখানি শোক পেয়েছো?' কবি বললেন, "কোন এক রোগে আমার একটি চোখ থেকে অশ্রু বের হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভায়ের শোকে যেদিন থেকে সেই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে আজ পর্যন্ত তা আর বন্ধ হয়নি।" তার কথা শুনে হযরত উমার মন্তব্য করেন, "শোক-দুঃখের এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়। যে চলে যায় তার জন্য কেউ এতখানি ব্যথাতুর হয় না।" তারপর তিনি বলেন, "আল্লাহ্ যায়িদকে ক্ষমা করুন। যদি আমি কবি হতাম, তার জন্য আমি মরসিয়া রচনা করতাম।" একথা শুনে কবি মুতাম্মিম বলে ওঠেন, "আমীরুল মু'মিনীন, যদি আপনার ভায়ের মত আমার ভাই শহীদ হতো, আমি কক্ষণো অশ্রু বিসর্জন করতাম না।" কবির এ কথায় হযরত উমার (রা) অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করেন। তারপর তিনি বলেন, 'এর থেকে উত্তম সান্ত্বনা বাণী আর কেউ আমাকে শুনায়নি।'

বিভিন্ন ব্যক্তি হযরত যায়িদ ইবনুল খাত্তাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শুরাহবীল ইবন হাসানা (রা)

নাম শুরাহবীল, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু আবদিল্লাহ বা আবু 'আবদির রহমান। পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল মুতা', মাতা হাসানা। তবে আবু 'আমরের মতে হাসানা তাঁর মেয়ের নাম। যাই হোক, শুরাহবীলের পিতা মারা যাওয়ার পর তাঁর মা হাসানা দ্বিতীয়বার সুফইয়ান আনসারীকে বিয়ে করেন। এ কারণে তিনি পিতার পরিবর্তে মাতার নামের সাথে পরিচিত হন। এই হাসানার বংশ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন কিন্দা গোত্রের, কেউ বলেছেন বনী তামীম গোত্রের, আবার অনেকের মতে বনী জুমাহ গোত্রের। তিনি মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরিবারের অন্যদের সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর সেখান থেকে মদীনায় চলে যান। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৬৪, ৩৬৯)।

শুরাহবীল ইসলামের সূচনা পর্বেই মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং মক্কা থেকে হাবশাগামী প্রথম কাফিলার সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। তারপর হাবশা থেকে সরাসরি মীদনায় আসেন এবং মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্কিত বনী খুরাইক গোত্রে বসবাস করতে থাকেন। মদীনায় আসার পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত পর্যন্ত তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে তিনি মদীনায় আসেন। ইসলামের খিদমতে তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মজীবন শুরু হয় খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত কালে।

হিজরী ১২ সনে খলীফা আবু বকর (রা) মুসলিম বাহিনীর শ্রেষ্ঠ চার সৈনিককে কমাণ্ডার হিসেবে নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেনঃ ১· আমর ইবনুল 'আস, ২· ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান, ৩· আবু 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ এবং ৪· শুরাহবীল ইবন হাসানা। প্রত্যেকের জন্য সৈনিক বাছাই করলেন এবং কে কোন্ পথে অগ্রসর হবেন তাও বলে দিলেন। বিজয়ের পর কে কোথাকার ওয়ালী হবেন সেটাও নির্ধারণ করে দিলেন। যথাঃ 'আমর ফিলিস্তীনের, ইয়াযীদ দিমাশ্‌কের এবং শুরাহবীল জর্দানের। (তারীখুল উম্মাহ আল ইসলামিয়্যাহ-১/১৯০-৯১) অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় পাঁচ জন সেনা কমাণ্ডারের নাম এসেছে। উপরে উল্লেখিত চারজনের মধ্যে তিনজন এবং আবু 'উবাইদার স্থলে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও ইয়াজ ইবন গান্‌ম আল ফিহ্‌র এর নাম বর্ণিত হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৮৪, ১/২১৩) ইবনুল বারকী বলেন, খলীফা 'উমার (রা) শুরাহবীলকে শামের এক চতুর্থাংশের শাসক নিযুক্ত করেন। (আল ইসাবা ২/১৪৩)।

সিরিয়া অভিযানে বসরার যুদ্ধে শুরাহবীল ছিলেন একজন কমাণ্ডিং অফিসার। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তাঁর ও প্রতিপক্ষের নেতা 'রোমানাস'-এর মধ্যে মত বিনিময় হয়। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি সৈন্য সুসংগঠিত করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন এমন সময় হযরত খালিদ এসে উপস্থিত হলেন। খালিদ প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিপক্ষ জিযিয়া দানে সম্মত হয় (ফুতূহুল বুলদান—১১৯)।

বসরার পর রোমানরা আজনা দাইনে সমবেত হয়। খালিদ তাদের প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হন। কিছুদূর যাওয়ার পর শুরাহবীলও তাঁর সাথে যোগ দেন। উভয়ে সম্মিলিতভাবে রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। দিমাশ্‌ক অভিযানে তিনি পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার এবং অবরোধের সময় একটি ফটক প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। বিজয়ের সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

দিমাশ্‌ক বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী 'ফাহল'-এর পথে 'বীসান'-এর দিকে অগ্রসর হয়। প্লাবনের কারণে পথিমধ্যে 'ফাহল'-এ তাদের যাত্রাবিরতি করতে হয়। এ বাহিনীর সাথেও শুরাহবীল ছিলেন। তারই সতর্কতায় মুসলিম বাহিনী এক মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা পায়। মূলতঃ রোমানরা সমুদ্রের একটি বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে 'ফাহল' ও 'বীসান'-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্লাবনের সৃষ্টি করে। মুসলিম বাহিনী যাত্রাবিরতি করে ফাহল-এ শিবির স্থাপন করে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে শুরাহবীল সারা রাত জেগে শিবির পাহারা দিতেন যাতে রোমানরা অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। সত্যি সত্যিই রোমানরা একদিন হঠাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসে কিন্তু শুরাহবীলের দূরদর্শিতা ও সতর্কতার ফলে রোমানরা পরাজিত হয়।

ফাহল-এর পর শুরাহবীল ও 'আমর ইবনুল 'আস 'বীসান'-এর দিকে অগ্রসর হন। বীসান-এর অধিবাসীরা ফাহল-এর পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে কিল্লার দরজা বন্ধ করে দেয়। শুরাহবীল বীসান পৌঁছেই কিল্লা অবরোধ করেন। দীর্ঘদিন এ অবরোধ চলতে থাকে। একদিন কতিপয় লোক কিল্লা থেকে বের হয়ে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করলে তাদের হত্যা করা হয়। অবশেষে তারা দিমাশ্‌কের শর্তাবলীতে সন্ধি করে। এরপর 'তিবরিয়া'-এর অধিবাসীরা শুরাহবীলের নিকট প্রতিনিধি পাঠিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর হযরত শুরাহবীল জর্দান এলাকা ও এর আশেপাশের সকল শহর প্রায় বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে ইসলামী শাসনের অধীনে আনেন।

ইয়ারমুক অভিযানে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার সকল অঞ্চল থেকে গুটিয়ে ইয়ারমুকে সমবেত হয়। হযরত শুরাহবীলও আসেন। তিনি ও ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান একই স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। খালিদ ছিলেন এ অভিযানের সিপাহসালার বা প্রধান সেনাপতি। তিনি গোটা সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে ছত্রিশটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ভাগকে একজন অফিসারের অধীনে ন্যস্ত করেন। ডান ও বাম ভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত 'আমর ইবনুল 'আস ও শুরাহবীল ইবন হাসানার ওপর। এ যুদ্ধে রোমানদের প্রথম আঘাতেই মুসলিম বাহিনীর অবস্থা যখন টলটলায়মান এবং অনেকে ময়দান থেকে ভেগে যায় তখনও শুরাহবীল অটল। এ যুদ্ধে তিনি জীবন বাজি রেখে লড়েন।

হিজরী ১৮ সনে মুসলিম বাহিনী সিরিয়া অভিযানে লিপ্ত। এ সময় ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে মহামারি আকারে প্লেগ দেখা দেয়। 'আমর ইবনুল 'আস বললেন, 'এই প্লেগ হচ্ছে আল্লাহর আযাব। সুতরাং তোমরা বিভিন্ন উপত্যকা ও গিরিপথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়।' একথা শুনে শুরাহবীল ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমর ঠিক কথা বলেনি। আমি যখন রাসূলুল্লাহর সংগী তখনও 'আমর তার পরিবারের উটের চেয়েও পথভ্রষ্ট। নিশ্চয় এ প্লেগ তোমাদের নবীদের দু'আ রবের রহমত এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বহু সত্যনিষ্ঠ লোক এতে মৃত্যুবরণ করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮১) তিনি ছিলেন একান্তভাবে আল্লাহ-নির্ভর ব্যক্তি। তাই রোগের ভয়ে স্থান ত্যাগ করা সমীচীন মনে করেননি। তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না। বর্ণিত আছে হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল, আবু উবাইদাহ, শুরাহবীল ইবন হাসানা ও আবু মালিক আল-আশয়ারী (রা) একই দিন প্লেগে আক্রান্ত হন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮২) 'আমওয়াসের এই প্লেগে অনেকের সাথে হযরত শুরাহবীল ইবন হাসানা ৬৭ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। অবশ্য ইবন ইউনূস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শুরাহবীলকে মিসর পাঠান এবং সেখানেই তিনি মারা যান। (আল ইসাবা-২/১৪৩) ইবন ইউনূসের মতটি বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে হয়।

হযরত শুরাহবীলের সারাটি জীবন হাবশা প্রবাসে এবং পরবর্তীতে জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হলেও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন অংশে পিছিয়ে নন। তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শিফা বিনতু 'আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম কিছু সাদকা চাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি সাদকা দানে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন, আর আমিও চাপাচাপি করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে এলো। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বের হয়ে আমার মেয়ের ঘরে গেলাম। শুরাহবীল ইবন হাসানার স্ত্রী আমার মেয়ে। আমি শুরাহবীলকে ঘরেই পেলাম। আমি তাকে বললাম, নামাযের সময় হয়েছে, আর তুমি ঘরে বসে আছ? আমি তিরস্কার করতে লাগলাম। তখন সে বললো, আমাকে তিরস্কার করবেন না। আমার একখানা মাত্র কাপড়, সেটাও রাসূলুল্লাহ (সা) ধার নিয়েছেন। আমি বললাম, আমার মা-বাবা কুরবান হোক! আজ সারাদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ঝগড়া করছি, অথচ তাঁর এ করুণ অবস্থা আমি মোটেও বুঝতে পারিনি। শুরাহবীল বলেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) একখানা মাত্র কাপড়, আমরা তাতে তালি লাগিয়ে দিয়েছি।' (হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৬)।

আবুল 'আস ইবন রাবী' (রা)

আবুল 'আসের প্রকৃত নামের ব্যাপারে ইতিহাসে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। যেমনঃ লাকীত, হাশীম, মিহশাম, ইয়াসির, ইয়াসিম ইত্যাদি। তবে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম আবুল 'আস'। এ নামেই তিনি ইতিহাসে খ্যাত। তাঁর পিতা 'রাবী' ইবনে 'আবদিল 'উয্যা, মাতা হযরত খাদীজার (রা) সহোদরা হালা বিন্‌তু খুওয়াইলিদ। তিনি কুরাইশ গোত্রের 'আবদু শামস' শাখার সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে সংক্ষেপে 'আবশামী' বলা হয়। খালা হযরত খাদীজা (রা) ও খালু রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে আবুল 'আসের অবাধ যাতায়াত ছিল। তিনি ছিলেন খালা-খালুর অতি স্নেহের পাত্র।

আবুল 'আস ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁর আকর্ষণীয় চেহারা সকলের মন কেড়ে নেয়। বংশ গৌরব এবং আরবীয় বীরত্ব, প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি গুণের জন্য তৎকালীন মক্কার যুবকদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। তদুপরি কুরাইশদের যে বিশেষ গুণের কথা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে—'রিহ্‌লাতাশ শিতায়ি ওয়াস সাঈফ—শীতকালে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের দিকে তাদের বাণিজ্য কাফিলা চলাচল করে'—আবুল 'আসের মধ্যেও এ গুণটির পুরোপুরি বিকাশ ঘটে। মক্কা ও শামের মধ্যে সব সময় তার বাণিজ্য কাফিলা যাতায়াত করে। সেই কাফিলায় থাকে কমপক্ষে একশো উটসহ দু'শো লোক। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি, সততা ও আমানতদারীর জন্য মানুষ তাঁর কাছে নিজেদের পণ্যসম্ভার নিশ্চিন্তে সমর্পণ করে। ইবন ইসহাক বলেন, 'অর্থসম্পদ, আমানতদারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি তখন মক্কার গণ্যমান্য মুষ্টিমেয় লোকদের অন্যতম।' (আল-ইসাবা-৪/১২২)

সময় আপন গতিতে বয়ে চললো। এদিকে মুহাম্মাদের (সা) বড় মেয়ে যয়নাব বেড়ে ওঠেন। মক্কার সম্ভ্রান্ত যুবকরা তাঁকে জীবন সঙ্গীনী হিসেবে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর ব্যাকুল হবেই বা না কেন? যয়নাব হলেন, মক্কার কুরাইশ গোত্রের সর্বোত্তম শাখার কন্যা। পিতা-মাতার দিক দিয়ে যেমন সর্বাধিক সম্মানিত, তেমনি চরিত্র ও আদব-আখলাকের দিক দিয়েও সবচেয়ে বেশী পূতঃপবিত্র। এমন পাত্রীর আশা করলেই কি সবার ভাগ্যে জোটে? অবশেষে মক্কার যুবক তাঁরই খালাতো ভাই আবুল 'আস ইবন রাবী' এ গৌরব লাভে ধন্য হন।

আবুল 'আসের সাথে যয়নাবের (রা) বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। সত্য দ্বীন ও হিদায়াত সহকারে তিনি প্রেরিত হন। নিজের নিকট আত্মীয়দের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর নির্দেশ লাভ করেন। হযরত খাদীজা (রা) ও তাঁর কন্যারা যথাঃ যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর ঈমান আনেন। অবশ্য ফাতিমা তখন খুব ছোট।

রাসূলুল্লাহর (সা) জামাই আবুল 'আস স্ত্রী যয়নাবকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সম্মানও করতেন। কিন্তু তিনি পূর্ব পুরুষের ধর্মত্যাগ করে প্রিয়তমা স্ত্রীর নতুন দ্বীন কবুল করতে রাজী হলেন না। এ অবস্থা চলতে লাগলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো,

"তোমাদের সর্বনাশ হোক! তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদের বিয়ে করে তার দুশ্চিন্তা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিচ্ছ। তোমরা যদি এসকল মেয়েকে তার কাছে ফেরৎ পাঠাতে তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকতো।" তাদের মধ্যে অনেকে এ কথা সমর্থন করে বললো, "এ তো

অতি চমৎকার যুক্তি!" তারা সবাই আবুল 'আসের কাছে যেয়ে বললো, "আবুল 'আস, তুমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার পরিবর্তে তুমি যে কুরাইশ সুন্দরীকে চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।" আবুল 'আস বললেন, "আল্লাহর কসম! না, তা হয় না। আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে। তার পরিবর্তে সকল নারী আমাকে দিলেও আমার তা পছন্দনীয় নয়।"

রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মু কলসুমকে তাদের স্বামীগৃহ থেকে বিদায় দিয়ে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিল। কন্যাদের স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে ফিরে আসায় হযরত রাসূলে কারীম (সা) খুব খুশী হলেন। তিনি মনে মনে কামনা করলেন, অন্য দু' জামাইর মত আবুল 'আসও যদি যয়নাবকে বিদায় দিত! যেহেতু আবুল 'আসের হাত থেকে যয়নাবকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহর (সা) ছিল না এবং মুশরিকদের (পৌত্তলিক) সাথে মুমিন নারীদের বিয়ে তখনও হারাম ঘোষিত হয়নি, একারণে তিনি চুপ থাকলেন।

সময় দ্রুত বয়ে চললো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন। কুরাইশদের সাথে সামরিক সংঘাত শুরু হলো। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরে সমবেত হল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও আবুল 'আস কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন। কারণ কুরাইশদের মধ্যে তাঁর যে স্থান তাতে না যেয়ে উপায় ছিলনা। বদরে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের বেশ কিছু নেতা নিহত হয় এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা বন্দী হয়। আর অবশিষ্টরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এই বন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) জামাই আবুল 'আসও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেন, বদরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ইবন নু'মান (রা) তাঁকে বন্দী করেন। তবে ওয়াকীদীর মতে হযরত খিরাশ ইবন সাম্মাহর (রা) হাতে তিনি বন্দী হন। (আল-ইসাবা-৪/১২২)

বদরের বন্দীদের ব্যাপারে মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হল, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা এবং ধনী-দরিদ্র প্রভেদ অনুযায়ী এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হল। বন্দীদের প্রতিনিধিরা ধার্যকৃত মুক্তিপণ নিয়ে মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি শুরু করে দিল। নবী দুহিতা হযরত যয়নাব স্বামী আবুল 'আসের মুক্তিপণ দিয়ে মদীনায় দূত পাঠালেন। ওয়াকীদীর মতে আবুল 'আসের মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায় এসেছিল তাঁর ভাই 'আমর ইবন রাবী'। হযরত যয়নাব মুক্তিপণ দিরহামের পরিবর্তে একটি হার পাঠালেন। এই হারটি তাঁর জননী হযরত খাদীজা (রা) বিয়ের সময় তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) হারটি দেখেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং স্বীয় বিষণ্ণ মুখ একটা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন। প্রিয়তমা স্ত্রী ও কন্যার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো।

কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, "যয়নাব তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে এই হার পাঠিয়েছে। তোমরা ইচ্ছা করলে তার বন্দীকে ছেড়ে দিতে পার এবং এ হারটিও তাকে ফেরত দিতে পার।" সাহাবীরা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাই করবো।" সাহাবীরা রাজী হয়ে গেলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল 'আসকে মুক্তি দেওয়ার আগে তার নিকট থেকে এই অঙ্গীকার নেন যে, সে মক্কায় ফিরে গিয়ে অনতিবিলম্বে যয়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।

আবুল 'আস মক্কা ফিরে গিয়েই প্রতিশ্রুতি পালনের তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। তিনি স্ত্রী যয়নাবকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তিনি যয়নাবকে একথাও বললেন যে, মক্কার অনতিদূরে তোমার পিতার প্রতিনিধিরা তোমাকে নেওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আবুল আস স্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তাঁর ভাই আমর মতান্তরে কিনানকে ডেকে যয়নাবের সাথে যেতে বললেন এবং তাকে অপেক্ষমান দূতদের হাতে তুলে দিতে বললেন।

ইবন ইসহাক বলেন, সফরের প্রস্তুতি শেষ হলে যয়নাবের দেবর কিনানা ইবন রাবী' একটি উট এনে দাঁড় করালো। যয়নাব উটের পিঠের হাওদায় উঠে বসলেন। আর কিনানা স্বীয় ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি হাতে নিয়ে দিনে দুপুরে মক্কা থেকে বের হলো। কুরাইশদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা ধাওয়া করে একটু দূরেই 'যী-তুওয়া' উপত্যকায় তাদের দু'জনকে ধরে ফেললো।

আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থসমূহে নানারকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। কিনানা ইবন রাবী' কুরাইশদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁধের ধনুকটি নামিয়ে হাতে নিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, "তোমাদের কেউ যয়নাবের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করলে তার বক্ষ হবে আমার তীরের লক্ষ্যস্থল।" কিনানা ছিল একজন দক্ষ তীরন্দায়, তার নিক্ষিপ্ত কোন তীর সচরাচর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না, কিনানার এ কথা শুনে আবু সুফইয়ান ইবন হারব তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো,

"ভাতীজা, তুমি যে তীরটি আমাদের দিকে তাক করে রেখেছো তা একটু ফিরাও, আমরা তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।" আবু সুফইয়ান বললো,

"তোমার কাজটি ঠিক হয়নি, তুমি প্রকাশ্যে মানুষের সামনে দিয়ে যয়নাবকে নিয়ে বের হয়েছো, আর আমরা বসে বসে তা দেখছি। সমগ্র আরবের অধিবাসী জানে, বদরে আমাদের কী দুর্দশা ঘটেছে এবং এই যয়নাবের বাপ আমাদের কী সর্বনাশটাই না করেছে। তুমি যদি এভাবে প্রকাশ্যে তার মেয়েকে আমাদের নাকের ওপর দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সবাই আমাদেরকে কাপুরুষ ভাববে এবং এ কাজটি সবাই আমাদের জন্য অপমান বলে বিবেচনা করবে। তুমি যয়নাবকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কিছুদিন সে তার স্বামীর ঘরে থাকুক। এদিকে যখন লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করবে যে, আমরা যয়নাবকে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধা দিয়েছি, তখন তুমি তাঁকে গোপনে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিও।"

একথায় কিনানা/আমর রাজী হয়ে গেল, যয়নাব মক্কায় ফিরে এল। কিছুদিন পর রাতের অন্ধকারে সে আবার যয়নাবকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো এবং ভায়ের নির্দেশমত তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিনিধিদের হাতে নির্দিষ্ট স্থানে সমর্পণ করলো।

তাবারানী উরওয়াহ ইবন যুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যয়নাব বিনতু রাসূলুল্লাহকে সাথে নিয়ে বের হলো, কুরাইশদের দু'ব্যক্তি পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে। তারা যয়নাবের সংগী লোকটিকে কাবু করে তাঁকে উটের পিঠ থেকে ফেলে দেয়। যয়নাব একটি পাথরের ওপর ছিটকে পড়েন। তার শরীর কেটে গিয়ে রক্ত বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় তারা যয়নাবকে আবু সুফইয়ানের নিকট নিয়ে যায়। আবু সুফইয়ান তাঁকে বনী হাশিমের মেয়েদের কাছে সোপর্দ করে। পরে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন, উটের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় যয়নাব যে ব্যথা পান, আমরণ তিনি সে ব্যথা অনুভব করতেন এবং সেই ব্যথায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য লোকে তাঁকে শহীদ মনে করতো। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭১)।

হযরত আয়িশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর কন্যা যয়নাব কিনানার সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলো। মক্কাবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম যয়নাবকে ধরে ফেললো। সে যয়নাবের উটটি তীরবিদ্ধ করলে যয়নাব পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। সে ছিল সন্তানসম্ভবা। এই আঘাতে তাঁর গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বনু হাশিম ও বনু উমাইয়্যা যয়নাবকে নিয়ে বিবাদ শুরু করে দিল। অবশেষে সে হিন্দা বিনতু 'উতবার নিকট অবস্থান করতে লাগলো। হিন্দা প্রায়ই তাকে বলতো, 'তোমার এ বিপদ তোমার পিতার জন্যই হয়েছে।'

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ ইবন হারিসাকে বললেন, 'তুমি কি যয়নাবকে আনতে পারবে?' যায়িদ রাজী হলো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যায়িদকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে

যাও। এটা যয়নাবের কাছে পৌঁছাবে।" আংটি নিয়ে যায়িদ মক্কার দিকে চললো। মক্কার উপকণ্ঠে সে এক রাখালকে ছাগল চরাতে দেখলো। সে রাখালকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কার রাখাল?' রাখাল বললো, 'আবুল আসের।' আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ছাগলগুলি কার?' বললো, 'যয়নাব বিনতু মুহাম্মাদের।' যায়িদ কিছুদূর রাখালের সাথে চললো। তারপর তাকে বললো, "আমি যদি একটি জিনিস তোমাকে দিই, তাকি তুমি যয়নাবের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?" সে রাজী হলো। যায়িদ তাকে আংটিটি দিল, আর রাখাল সেটি যয়নাবের হাতে পৌঁছে দিল।

যয়নাব রাখালকে জিজ্ঞাস করলো, 'এটি তোমাকে কে দিয়েছে?' বললো, 'একটি লোক।' আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তাকে কোথায় ছেড়ে এসেছো?' বললো, 'অমুক স্থানে।' যয়নাব চুপ থাকলো। রাতের আঁধারে যয়নাব চুপে চুপে সেখানে গেল। যায়িদ তাকে বললো, 'তুমি আমার উটের পিঠে উঠে আমার সামনে বস।' যয়নাব অস্বীকৃতি জানিয়ে বললো, 'না আপনিই আমার সামনে বসুন।' এভাবে যয়নাব যায়িদের পেছনে বসে মদীনায় পৌঁছলো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই বলতেন, 'আমার সর্বোত্তম মেয়েটি আমার জন্যই কষ্ট ভোগ করেছে।' (হায়াতুস সাহাবা—১/৩৭১-৭২)।

স্ত্রী যয়নাব থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল 'আস কয়েক বছর মক্কায় কাটালেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগে একটা বাণিজ্য কাফিলা নিয়ে তিনি সিরিয়া গেলেন। বাণিজ্য শেষে তিনি মক্কায় ফিরছেন। একশো উট ও প্রায় এক শো সত্তর জন লোকের কাফিলা। যখন তারা মদীনার কাছাকাছি স্থানে তখন মদীনা থেকে যায়িদ বিন হারিসার নেতৃত্বে প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র টহলদানকারী বাহিনী তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং উটসহ সকল লোক বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যায়। তবে আবুল 'আস পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

অবশ্য মূসা ইবন 'উকবার মতে, আবু বাসীর ও তাঁর বাহিনী আবুল 'আসের কাফিলার ওপর আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, এই আবু বাসীর ও আরো কিছু লোক হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করে। তবে সন্দির শর্তানুযায়ী মদীনাবাসীরা তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ফলে তারা মক্কা থেকে পালিয়ে গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলীয় এলাকায় বসবাস করতে থাকে। তারা মক্কার বাণিজ্য কাফিলায় অতর্কিত হামলা চালাতে থাকে। তাদের ভয়ে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। মক্কার কুরাইশরা বাধ্য হয়ে তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করে। (আল-ইসাবা—৪/১২২)।

যাই হোক আবুল 'আস পালিয়ে মক্কায় না গিয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে রাতের অন্ধকারে গোপনে মদীনায় প্রবেশ করেন এবং সোজা যয়নাবের কাছে পৌঁছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। যয়নাব তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেন।

রাত কেটে গেল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর তাহরীমা বেঁধেছেন। পেছনের মুক্তাদীরাও তাকবীর তাহরীমা শেষ করেছে। এমন সময় পেছনে মেয়েদের কাতার থেকে যয়নাবের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "জনমণ্ডলী, আমি মুহাম্মাদের কন্যা যয়নাব। আমি 'আবুল আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি, আপনারাও তাকে নিরাপত্তা দিন।"

সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) লোকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যা শুনেছি, তোমরাও কি তা শুনেছো?"

লোকেরা জবাব দিল, "হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!" রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ, আমি এ ঘটনার কিছুই জানিনে। সে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে তাকে

নিরাপত্তা দান করেছে।" অতঃপর তিনি বাড়ীতে যেয়ে মেয়েকে বললেন, "আবুল আসের থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করবে। তবে জেনে রেখ তুমি আর তাঁর জন্য হালাল নও।"

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই বাহিনীর লোকদের ডাকলেন, যারা আবুল 'আসের কাফিলার উট ও লোকদের বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের বললেন, "আমাদের মধ্যে এই লোকটির (আবুল 'আস) মর্যাদা সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত আছ। তোমরা তার বাণিজ্য সম্ভার কেড়ে নিয়ে এসেছো। তোমরা তার প্রতি সদয় হয়ে তার মালামাল ফেরত দিলে আমি খুশী হব। আর তোমরা রাজী না হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে তোমরা সেই মাল ভোগ করতে পার। তোমরাই সেই মালের অধিক হকদার।"

তারা সকলে বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তার সমুদয় মাল ফেরত দেব।'

আবুল 'আস চললেন তাদের সাথে মালামাল বুঝে নিতে। তারা আবুল 'আসকে বললো, "শোন আবুল 'আস, কুরাইশদের মধ্যে তুমি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাই। তুমি এক কাজ কর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাবাসীদের এই মালামালসহ মদীনায় থেকে যাও। বেশ আরামে থাকবে।" আবুল 'আস বললেন, "তোমরা যা বলছো তা খুবই খারাপ কথা। আমি কি আমার নতুন দ্বীনের জীবন শুরু করবো শঠতার মাধ্যমে?"

আবুল 'আস তাঁর কাফিলা ছাড়িয়ে নিয়ে মক্কায় পৌছলেন। মক্কায় যার যার মাল তাকে বুঝে দিয়ে তিনি বললেন, "ওহে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! আমার কাছে তোমাদের আর কোন কিছু পাওনা আছে কি?" তারা বললো, "না, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমরা তোমাকে চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারীরূপে পেয়েছি।"

আবুল 'আস আরো বললেন, "আমি তোমাদের হক পরিপূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা করছি—আশহাদু আনলাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

মদীনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম। কিন্তু তা দিইনি এ জন্য যে, তোমরা ধারণা করতে আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছি। আল্লাহ যখন তোমাদের যার যার মাল ফেরত দেওয়ার তাওফীক আমাকে দিয়েছেন এবং আমি আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।

অতঃপর হযরত আবুল 'আস মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহর খিদমতে হাজির হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সম্মানের সাথে তাঁকে গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্ত্রী যয়নাবকেও তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই বলতেন, "সে আমাকে যা বলেছে, সত্য বলেছে। আমার সাথে ওয়াদা করেছে এবং তা পালনও করেছে।"

হযরত আবুল 'আস (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ পাননি। হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে হিজরী ১২ সনের জিলহজ্জ মাসে তিনি ইনতিকাল করেন। তবে ইবন মুন্দাহর মতে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসাবা—৪/১২৩, আল-ইসতিয়াব)

হযরত যয়নাব ও আবুল 'আসের মেয়ে উমামাকে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই স্নেহ করতেন। নামাযের মধ্যে তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন বলে বর্ণিত আছে।

উমাইর ইবন ওয়াহাব (রা)

নাম 'উমাইর, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু উমাইয়্যা। পিতা ওয়াহাব, মাতা উম্মু সাখীলা। কুরাইশদের অন্যতম বীর নেতা। ইসলাম-পূর্ব জীবনে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমন। তীক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন প্রখর অনুধাবন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিত্ব।

তিনি বদর যুদ্ধে মককার কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দেন এবং যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে কুরাইশ বাহিনী তাকে মুসলিম বাহিনীর শক্তি নিরূপণের দায়িত্ব দেয়। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে মুসলিম বাহিনীর আশে পাশে চক্কর মেরে কুরাইশ ছাউনীতে ফিরে গিয়ে জানান, "তারা তিনশো'র মত হবে। এর কিছু কম বা বেশীও হতে পারে।" তাঁর অনুমান যথাযথ ছিল। কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, "পেছনে তাদের কোন সাহায্য আসার সম্ভাবনা আছে কি?" তিনি জবাব দেন, "তেমন কিছু আমি পাইনি। তবে হে কুরাইশ গণ! আমি তাদের উটগুলিকে কঠিন মৃত্যুকে বহন করতে দেখেছি। তরবারিগুলি ছাড়া তাদের আত্মরক্ষার আর কিছু নেই, আশ্রয় নেওয়ারও কোন স্থান নেই। আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়েছে, তোমরা তাদের একজনকে হত্যা করলে তোমাদেরও একজন নিহত হবে। যদি তাদেরই সমসংখ্যক তোমাদের নিহত হতে হয় তাহলে আর লাভ কি? এখন তোমরা ভেবে দেখ কি করবে।" যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি কুরাইশদের একথাও বলেন, "মদীনার লোকদের চেহারা সাপের মত, চরম পিপাসায়ও তারা কাতর হয় না। আমাদের সাথে যুদ্ধ করে প্রতিশোধ নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব। তোমাদের মত উজ্জ্বল চেহারার লোকদের তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত নয়।"

কুরাইশ নেতৃবর্গের অনেকেই তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়। তারা প্রায় মককায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বসে। কিন্তু আবু জাহল তাদের সিদ্ধান্তে বাধ সাধে। হিংসা ও যুদ্ধের আগুনে তার অন্তর জ্বলছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন হয় আবু জাহল। আর অনেকের সাথে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় উমাইরের পুত্র ওয়াহাব।

উমাইর ইবন ওয়াহাব স্বীয় পুত্র ওয়াহাবকে মুসলমানদের হাতে বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখে বদর থেকে নিজে প্রাণ বাঁচিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল, মক্কায় তিনি রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদের ওপর যে অত্যাচার করেছেন হয়তো তাঁর বদলা নেওয়া হবে বন্দী পুত্রের ওপর।

মক্কায় ফিরে এসে একদিন সকাল বেলা ঘর থেকে বেরিয়ে কাবার দিকে গেলেন তাওয়াফ ও মূর্তিকে সিজদার উদ্দেশ্যে। সেখানে তিনি সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে কাবার চত্বরে বসা দেখতে পেলেন। তিনি সাফওয়ানের কাছে গিয়ে বললেনঃ

—ওহে কুরাইশদের সরদার, সুপ্রভাত।

—আবু ওয়াহাব, সুপ্রভাত। বস, একটু কথা বলি। কথা বললে সময় একটু কাটবে।

উমাইর সাফওয়ানের পাশে বসলেন। তারা বদরের অবস্থা, বদরে আপতিত মুসীবতের কথা আলোচনা করলেন এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর সংগীদের হাতে বদরে কে কে বন্দী হয়েছে তা গুণলেন। বদরে যেসব কুরাইশ নেতাকে হত্যা করে 'কালীব' কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আবেগ-উত্তেজনায় এক পর্যায়ে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা বললোঃ আল্লাহর কসম, এভাবে তাদের নিহত হওয়ার পর কোন কিছুই আর ভালো লাগছে না। উমাইর বললেনঃ

—তুমি সত্য বলেছ। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেনঃ কা'বার প্রভুর নামে শপথ করে বলছি, যদি আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা এবং পরিবার পরিজনের দায়-দায়িত্ব না থাকতো, আমি এক্ষুণি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদের একটা দফা-রফা করে তার সকল অপকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতাম। তারপর গলাটি একটু নিচু করে বললেন, "আমার ছেলে ওয়াহাব তো সেখানে তাদের হাতে বন্দী। আমি সেখানে গেলে কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না।"

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা সুযোগটি হাতছাড়া করলো না। উমাইরের দিকে তাকিয়ে সে বললোঃ

—উমাইর, তোমার সকল ঋণ, তা যতই হোকনা কেন, তার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে তুলে নিলাম। আর আমি যতদিন বেঁচে থাকি এবং তোমার পরিবার পরিজনও যতদিন বেঁচে থাকে, তারা আমার সাথেই থাকবে। আমার অর্থ-সম্পদের কোন অভাব নেই। তারা সুখেই থাকবে।

উমাইর বললেনঃ

—আমাদের এ আলোচনা গোপন থাকুক, কেউ যেন না জানে।

সাফওয়ান বললোঃ

—তাই হবে।

উমাইর কা'বার চত্বর থেকে উঠে বাড়ী গেলেন। মুহাম্মাদের প্রতি প্রতিহিংসার আগুনে তাঁর অন্তর জ্বলছে। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন। তাঁর সফর প্রস্তুতির ব্যাপারে কেউ কোন রকম সন্দেহ করলো না। কারণ, বদর-বন্দীদের ছাড়ানোর জন্য মুক্তিপণ নিয়ে প্রতিনিধিদল তখন মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি করছে।

উমাইর তরবারিতে ধার দিয়ে তীব্র বিষের মধ্যে চুবিয়ে রাখলেন। সোয়ারী প্রস্তুত করা হলো। তিনি সোয়ার হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। হিংসা-বিদ্বেষে তখন তাঁর অন্তরটি জ্বলে কয়লা হয়ে যাচ্ছে।

উমাইর মদীনায় পৌঁছে সোজা মসজিদের দিকে চললেন। মসজিদের দরযার কাছে সোয়ারী থেকে নেমে পড়লেন।

এদিকে মসজিদের দরযার কাছে তখন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব ও কয়েকজন সাহাবী বসে বসে বদরের ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। কুরাইশদের কে কিভাবে নিহত হলো, কে কেমন করে বন্দী হলো এবং মুহাজির ও আনসারদের কে কেমন বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করলো ইত্যাদি বিষয়ে তারা আলাপ জমিয়েছিলেন।

হঠাৎ হযরত উমারের চোখ পড়ে উমাইরের দিকে। তিনি সোয়ারী থেকে নেমে সোজা মসজিদের দিকে আসছেন। কাঁধে তাঁর তরবারি ঝোলানো। উমার সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেনঃ

—"এ তো সেই কুত্তা, আল্লাহর দুশমন উমাইর ইবন ওয়াহাব। আল্লাহর কসম, তার উদ্দেশ্য ভালো নয়। মক্কায় সে আমাদের বিরুদ্ধে সবসময় কাফিরদের উত্তেজিত করতো। বদর যুদ্ধের পূর্বে সে ছিল মক্কার গুপ্তচর।" তিনি সংগীদের দিকে ফিরে বললেনঃ

—তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে যাও, তাঁর আশেপাশে থাক। এই পাপাত্মা যেন কোন রকম ধোঁকা দিতে না পারে।

উমার দৌড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে বললেনঃ

—ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই আল্লাহর দুশমন উমাইর এসেছে তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে। আমার মনে হয়, কোন রকম অসৎ উদ্দেশ্য ছাড়া সে আসেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ

—তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

হযরত উমার (রা) উমাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে একহাতে তার গলার কাছে জামা ধরেন এবং

অন্য হাতে তার তরবারির বাঁটের সাথে ঘাড়টি ঠেসে ধরে তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির করেন। তার এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) উমারকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। উমার ছেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ'র (সা) নির্দেশে উমার তার নিকট থেকেও সরে দাঁড়ালেন। রাসূল (সা) উমাইরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

—উমাইর একটু কাছে এস।

উমাইর একটু কাছে গিয়ে বলেনঃ সুপ্রভাত!

জাহিলী আরবে লোকেরা এভাবে সম্ভাষণ জানাতো।

রাসূল (সা) বললেন, "উমাইর, তোমার সম্ভাষণ অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণ শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। সালামের মাধ্যমে আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। এ সালাম হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসীদের সম্ভাষণ।"

উমাইর বললেন, "আমাদের সম্ভাষণও আপনার কাছে অপরিচিত নয়।"

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "কি উদ্দেশ্যে এসেছ?"

—আপনাদের হাতে আমার যে বন্দীটি আছে তাকে ছাড়াতে এসেছি। আর যাই হোক আপনিও তো আমাদের একই খান্দানের একই গোত্রের লোক। তার ব্যাপারে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

—তাহলে ঘাড়ে এ ঝুলন্ত তরবারি কেন?

—আল্লাহ এই তরবারির অকল্যাণ করুন। বদরে এই তরবারি আমাদের কোন্ কাজে এসেছে? সোয়ারী থেকে নামার সময় ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে ভুলে গেছি। ঐ অবস্থায় রয়ে গেছে।

—"উমাইর, আমার কাছে সত্য কথাটি বল, তুমি কেন এসেছ?"

—আমি শুধু বন্দী-মুক্তির উদ্দেশ্যেই এসেছি। রাসূল (সা) বললেন, "তুমি সাফওয়ানের সাথে কী শর্ত করেছ?"

এই প্রশ্নে উমাইর ভীষণ ভয় পেয়ে যান। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, "কী শর্ত করেছি?"

রাসূল (সা) বললেন, "তুমি ও সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা কা'বার চত্বরে বসে কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে আলোচনা করেছ। তুমি বলেছ, যদি আমার ঘাড়ে ঋণের বোঝা এবং পরিবার পরিজনের দায়িত্ব না থাকতো, আমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। তুমি আমাকে হত্যা করবে—এই শর্তে সাফওয়ান তোমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তোমার ও তোমার উদ্দেশ্যের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে আছেন।"

উমাইর কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলেন। তারপর একটু সচেতন হয়ে বলে উঠলেনঃ আশহাদু আন্নাকা রাসূলুল্লাহ—আমি ঘোষণা করছি, আপনি নিশ্চিত আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আসমানের যেসব খবর আমাদের কাছে নিয়ে আসতেন, আপনার ওপর যে ওহী নাযিল হতো, আমরা তা অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু সাফওয়ানের সাথে আমার যে আলোচনা, তাতো আমি আর সে ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহর কসম, আমার বিশ্বাস জন্মেছে এ খবর একমাত্র আল্লাহই আপনাকে দিয়েছেন। আল-হামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে হিদায়াত দানের জন্য আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন। একথা বলে তিনি আবারো উচ্চারণ করেন, "আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্ মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ।"

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের নির্দেশ দেন, "তোমরা তোমাদের ভাই উমাইরকে দ্বীন শিক্ষা দাও, তাকে কুরআনের তালীম দাও এবং তার বন্দীকে মুক্তি দাও।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমাইর ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম 'শয়তান' বা নেতা। মুসলমান হওয়ার পর তিনি হলেন ইসলামের এক বিশিষ্ট হাওয়ারী বা সাথী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, "যে সত্তার হাতে আমার জীবন তার শপথ, উমাইর যখন মদীনায়

আবির্ভূত হয় তখন একটি শূকরও আমার নিকট তার চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। আর আজ সে আমার কোন একটি সন্তানের চেয়েও আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।" (রিজালুন হাওলার রাসূল-৩২৫)

ইসলাম গ্রহণের পর উমাইর ইসলামী শিক্ষা দ্বারা নিজেকে পবিত্র করা এবং কুরআনের নূরের দ্বারা স্বীয় হৃদয়কে পূর্ণ করে তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি মক্কা এবং মক্কায় যাদের রেখে এসেছেন তাদের কথা প্রায় ভুলে গেলেন।

এদিকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা প্রতিদিন মনে মনে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে। সে মক্কায় কুরাইশদের বিভিন্ন আড্ডায় গিয়ে বলতে থাকে, শিগগির, একটা মহাসুখবর তোমাদের কাছে এসে পৌঁছবে। তোমরা তাতে বদরের সান্ত্বনা পাবে।

সাফওয়ানের প্রতীক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চললো। প্রথমে সে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো, পরে অস্থির হয়ে পড়লো। মদীনার দিক থেকে আগত প্রতিটি কাফিলা বা আরোহীকে ধরে ধরে সে উমাইর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো। কিন্তু কেউ সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলো না। এমন সময় মদীনা থেকে আগত এক আরোহীকে সে পেল। ঔৎসুক্যের আতিশয্যে সাফওয়ান তাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, "মদীনায় কি নতুন কোন ঘটনা ঘটেনি?" লোকটি জবাব দিল, "হা, বিরাট এক ঘটনা ঘটে গেছে।" সাফওয়ানের মুখমণ্ডল দীপ্তিমান হয়ে ওঠে এবং আনন্দ উল্লাসে তার হৃদয়-মন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। সাথে সাথে সে আবার প্রশ্ন করে, "কী ঘটেছে আমাকে একটু খুলে বল তো।" লোকটি বললো, "উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেখানে সে নতুন দ্বীনের দীক্ষা নিচ্ছে এবং কুরআন শিখছে।" সাফওয়ানের দুনিয়াটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। তার মাথায় যেন বাজ পড়লো। তার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও উমাইর কক্ষণো ইসলাম গ্রহণ করবে না।

ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এই দ্বীনের প্রতি যে দায়িত্ব তা হযরত উমাইর যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি অনুধাবন করেন, এ দ্বীনের বিরোধিতায় তিনি যে শক্তি ব্যয় করেছেন ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি এর খিদমতে ব্যয় করতে হবে। এ দ্বীনের বিরুদ্ধে যতখানি অপপ্রচার তিনি চালিয়েছেন ঠিক ততখানি এর দিকে আহবান জানাতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে তিনি যে কতখানি মুহাব্বত করেন তা সততা, জিহাদ ও ইতায়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।

কিছুদিন মদীনায় ইসলামের তালীম ও তারবিয়াত নেওয়ার পর একদিন হযরত উমাইর রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার জীবনের বিরাট এক অংশ আল্লাহর নূর নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ইসলামের অনুসারীদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়নে কাটিয়ে দিয়েছি। আমার ইচ্ছা—আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি মক্কায় যাই এবং কুরাইশদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান জানাই। তারা যদি আমার দাওয়াত কবুল করে তাহলে তা হবে অতি উত্তম কাজ। আর যদি প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদের এমন কষ্ট দেব যেমন ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহর সংগী-সাথীদের দিয়েছি।"

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি দিলেন। একদিন উমাইর তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে মক্কায় ফিরলেন। মক্কায় সর্বপ্রথম সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার সাথে দেখা করে বললেন, —"ওহে সাফওয়ান, তুমি মককার একজন নেতা, কুরাইশদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এই যে তোমরা পাথরের পূজা কর, মূর্তির নামে জীবজন্তু জবেহ কর—এটা কি কোন দ্বীন বা ধর্ম তুমি মনে কর? তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

সাফওয়ান উমাইরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। কিন্তু উমাইরের তরবারি তাকে সঠিকভাবে থামিয়ে দিল। ক্ষোভে দুঃখে সাফওয়ান অশ্রাব্য কিছু গালি উমাইরের কানে ছুড়ে দিয়ে পথ ছেড়ে চলে গেল।

এভাবে উমাইর মুসলমান হয়ে মক্কায় ফিরলেন। ক'দিন আগে যিনি মুশরিক অবস্থায় মক্কা ছেড়ে যান, তিনি যখন আবার মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর রূপটি ছিল ঠিক তেমন যেমন রূপ ধারণ করেছিলেন হযরত উমার (রা) ইসলাম গ্রহণের দিন। ইসলাম গ্রহণের পর উমার চিৎকার করে বলেছিলেন, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, কুফর অবস্থায় যে যে স্থানে আমি বসেছি, ঈমান অবস্থায় সে সে স্থানে আমি বসবো।"

উমাইর যেন এ ক্ষেত্রে উমারকে (রা) নেতা হিসাবে মানলেন। তিনি রাত-দিন মক্কার অলি-গলিতে দাওয়াত দিয়ে চললেন। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উমাইরের হাতে বিপুল সংখ্যক লোক ঈমান আনলেন। উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মুমিনদের এই দলটি সংগে করে তিনি আবার মদীনায় চলে যান। উহুদ, খন্দক ও মক্কা বিজয়সহ সকল অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের আনন্দের দিন উমাইর তাঁর বন্ধু ও সাথী সাফওয়ানকে ভুলে যাননি। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা পৌছার পর সাফওয়ান প্রাণভয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়ামনের পথে জিদ্দা পৌছে। উমাইর (রা) এ খবর পেয়ে ভীষণ ব্যথিত হন। সাফওয়ানকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হন। দৌড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে বলেন,

"হে আল্লাহর নবী! সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা তার সম্প্রদায়ের একজন নেতা। সে আপনার ভয়ে মক্কা থেকে পালিয়েছে। নিজেকে সে সাগরে নিক্ষেপ করবে। আপনি তাকে আমান বা নিরাপত্তা দিন।" রাসূল (সা) বললেন, "সে নিরাপদ।" উমাইর বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন একটি নিদর্শন দিন যা দ্বারা বুঝা যায় আপনি তাকে আমান দিয়েছেন।" রাসূল (সা) যে চাদরটি মাথায় দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন সেটি তাঁকে দান করেন।

উমাইর ইবন যুবাইর বর্ণনা করেনঃ

"চাদরটি নিয়ে উমাইর বের হলেন। তিনি যখন সাফওয়ানের কাছে পৌছলেন তখন সে সাগর পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বললেনঃ "সাফওয়ান, আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক! এভাবে তুমি নিজেকে ধ্বংস করো না। এই তোমার জন্য রাসূলুল্লাহর আমান নিয়ে এসেছি।"

সাফওয়ান বললোঃ

—"তোমার ধ্বংস হোক। আমার কাছ থেকে সরে যাও। আমার সাথে কথা বলো না।" উমাইর বললেনঃ

"সাফওয়ান! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বোত্তম মানুষ। সর্বাধিক নেক্কার ও ধৈর্যশীল মানুষও তিনিই। তাঁর ইজ্জত তোমারই মর্যাদা।" সাফওয়ান বললোঃ

—'আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।' উমাইর বললেনঃ "তিনি তার থেকেও সহনশীল ও সম্মানিত।"

উমাইর (রা) সাফওয়ানকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। সাফওয়ান বললোঃ

—এ ব্যক্তির ধারণা আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ সে সত্যই বলেছে।

সাফওয়ান বললোঃ আমাকে দু'মাসের সময় দিন।

রাসূল (সা) বললেনঃ তোমাকে চার মাসের সময় দেওয়া হলো।

অল্প দিনের মধ্যেই হযরত সাফওয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল ৩২৫, হায়াতুস সাহাবা-১)

হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে হযরত উমাইর (রা) সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে খলীফাকে সহযোগিতা করেন। হযরত উমারের খিলাফতকালে আমর ইবনুল 'আস (রা) মিসর অভিযান পরিচালনা করেন। ইস্‌কান্দারিয়া বিজয়ে যখন তাঁর বিলম্ব ঘটছিল তখন হযরত 'উমার (রা) তাঁর সাহায্যার্থে মদীনা থেকে চারজন জাঁদরেল সেনা কমাণ্ডারের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য পাঠান। এই চার কমাণ্ডারের একজন ছিলেন হযরত 'উমাইর ইবন ওয়াহাব।

হযরত উমার এ চার কমাণ্ডার সম্পর্কে 'আমর ইবনুল 'আসকে হিদায়াত দেন যে, আক্রমণের সময় তাদেরকে অগ্রভাগে রাখবে। তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসকান্দারিয়া অভিযান সফল হয়। ইসকান্দারিয়া বিজয়ের পর আমরের নির্দেশে তিনি মিসরের বহু এলাকা পদানত করেন। হযরত উমারের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে তিনি ইনতিকাল করেন।

সালামা ইবনুল আকও'য়া (রা)

নাম সিনান, পিতা 'আম'র ইবনুল আকও'য়া। কুনিয়াত বা ডাকনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা ঃ আবু মুসলিম, আবু ইয়াস, আবু 'আমের ইত্যাদি। তবে পুত্র ইয়াসের নাম অনুসারে 'আবু ইয়াস' ডাকনামটি অধিক প্রসিদ্ধ। (আল-ইসতিয়াব)

সীরাত বিশেষজ্ঞরা সালামার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে নীরব। তবে এতটুকু ঐতিহাসিক সত্য যে, হিজরী ৬ষ্ঠ সনের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায়ও হিজরত করেন। অধিকাংশ মুহাজির পরিবার-পরিজনসহ হিজরাত করেন ; কিন্তু হযরত সালামা আল্লাহর রাস্তায় স্ত্রী ও সন্তানদের ত্যাগ করেই হিজরাত করেন।

মদীনায় আসার পর তিনি প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' বা 'বাইয়াতে শাজারা'-এর ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার ঘটনাকালে হযরত রাসূলে পাক (সা) যখন মক্কার কাফিরদের হাতে হযরত 'উসমানের শাহাদাতের খবর শুনেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হুদাইবিয়ায় আগত মুসলমানদের নিকট থেকে মৃত্যুর বাইয়াত বা শপথ নেন, তখন হযরত সালামা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তিনবার বাইয়াত করেন। তিনি বলছেন ঃ "হুদাইবিয়ার গাছের নীচে আমি রাসূলুল্লাহর হাতে (সা) মৃত্যুর বাইয়াত করলাম। তারপর একপাশে চলে গেলাম। লোকের ভিড় কিছুটা কমে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে দেখে বললেন ঃ সালামা তোমার কী হল, তুমি যে বাইয়াত করলে না ? বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো বাইয়াত করেছি। বললেন ঃ তাতে কি হয়েছে, আর একবার কর। আমি আবারো বাইয়াত করলাম।" এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি ঢাল উপহার দেন। এরপর আবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নজরে পড়েন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ সালামা, বাইয়াত করবে না ? সালামা আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তো দু'বার বাইয়াত করেছি। বললেন ঃ আবারো একবার কর। সালামা তৃতীয়বার বাইয়াত করেন। এবার রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন ঃ সালামা, ঢালটি কি করেছ ? তিনি বললেন ঃ আমার চাচা একেবারে খালি হাতে ছিলেন, আমি সেটা তাঁকে দিয়েছি। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) হেসে উঠে বলেন ঃ তোমার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে দু'আ করে, হে আল্লাহ আমাকে তুমি এমন বন্ধু দান কর যে আমার নিজের জীবন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে।

হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত চলছে, এর মধ্যে মক্কাবাসীদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হয়ে গেল। মুসলমানরা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করতে লাগলো। হযরত সালামা নিশ্চিন্তে একটি গাছের তলায় শুয়েছিলেন। এমন সময় চারজন মুশরিক (অংশীবাদী) তার পাশে এসে বসে। তারা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এমনসব আলাপ-আলোচনা করতে শুরু করে যা তাঁর শুনতে ইচ্ছা হলো না। তিনি উঠে অন্য একটি গাছের নীচে গিয়ে বসলেন। তাঁর সরে যাওয়ার পর এই চার মুশরিক নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র পাশে রেখে শুয়ে পড়ে। এমন সময় কেউ একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠে ঃ 'মুহাজিরগণ, ছুটে এস, ইবন যানীমকে হত্যা করা হয়েছে।' এ আওয়ায কানে যেতেই সালামা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে ঐ চার মুশরিকের দিকে ছুটে যান। তারা তখনও শুয়ে ছিল। সালামা তাদের অস্ত্র নিজ দখলে নিয়ে বলেন, 'যদি ভালো চাও সোজা আমার সাথে চলো। আল্লাহর কসম, কেউ মাথা উঁচু করলে তাঁর চোখ ফুটো করে ফেলবো!' তিনি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। সালামার চাচাও প্রায় ৭০/৭১ জন

মুশরিককে বন্দী করে নিয়ে আসেন। হযরত নবী কারীম (সা) তাদের সকলকে ছেড়ে দেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষাপটে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

"আর সেই আল্লাহ, তিনিই তো মক্কার মাটিতে কাফিরদের ওপর তোমাদেরকে বিজয় দানের পর তাদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে তাদের থেকে বিরত রেখেছেন।" (সূরা আল-ফাতহ/৩)

মুসলমানদের কাফিলা মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে একটি পাহাড়ের নিকট তাঁবু স্থাপন করে। মুশরিকদের মনে কিছু অসৎ উদ্দেশ্য কাজ করে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তা অবগত হন। তিনি তাঁবু পাহারার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি সেই ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন যে সেই পাহাড়ের ওপর বসে পাহারা দেবে। এই সৌভাগ্য হযরত সালামা অর্জন করেন। তিনি রাতভর বার বার পাহাড়ের ওপর উঠে শত্রুর পদধ্বনি শোনার চেষ্টা করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের কিছু উট 'জী-কারাদ' বা 'জী-কারওয়া'-র চারণক্ষেত্রে চরতো। একদিন বনু গাতফান মতান্তরে বনু ফাযারার লোকেরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে রাখালকে হত্যা করে উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। হযরত সালামা ইবন আকওয়া ঘটনাস্থলের পাশেই ছিলেন। শেষরাতে তিনি বের হয়েছেন, আবদুর রহমান ইবন আউফের দাস তাঁকে খবর দিল, রাসূলুল্লাহর উটগুলি লুট হয়ে গেছে। সালামা আবদুর রহমানের দাসকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহকে (সা) খবর দেওয়ার জন্য। আর তিনি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে "ইয়া সাবাহাহ্" (শত্রুর আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি) বলে এমন জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন যে, সে আওয়ায মদীনার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি একাকী ডাকাত দলের পিছু ধাওয়া করেন। ডাকাতরা পানি তালাশ করছিল, এমন সময় তিনি সেখানে পৌঁছে যান। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দায। নির্ভুল তাক করে তীর ছাড়ছিলেন, আর মুখে গুণগুণ করে আওড়াচ্ছিলেনঃ

"আনা ইবনুল আকও'য়া
আল-য়াউম য়াউমুর রুদ্দায়ি।"

অর্থাৎ আমি আকও'য়ার ছেলে—আজকের দিনটি নীচ প্রকৃতির লোকদের ধ্বংস সাধনের দিন।

তিনি এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, ডাকাতরা উট ফেলে পালিয়ে যায়। তারা দিশেহারা হয়ে তাদের চাদরও ফেলে যায়। এর মধ্যে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আরও লোকজন সংগে করে সেখানে উপস্থিত হন। সালামা আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাদের পানি পান করতে দিইনি। এখনই পিছু ধাওয়া করলে তাদের ধরা যাবে।' রাসূল (সা) বলেন, 'পরাজিত করার পর ক্ষমা কর।' (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতু জী-কারওয়াহ, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৮১-৮২, হায়াতুস সাহাবা ১/৫৫৯-৬১) ঘটনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খাইবার যুদ্ধে তিনি চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। খাইবার বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীমের হাতে হাত দিয়ে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

খাইবারের পর তিনি সাকীফ ও হাওয়াযিনের যুদ্ধে যোগদান করেন। এই অভিযানের সময় এক ব্যক্তি উটে আরোহণ করে মুসলিম সেনা ছাউনীতে আসে এবং উটটি বেঁধে আস্তে করে মুসলিম সৈনিকদের সাথে নাশতায় শরীক হয়ে যায়। তারপর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে মুসলমানদের শক্তি আঁচ করে আবার উটে চড়ে দ্রুত কেটে পড়ে। এভাবে এসে আবার চলে যাওয়ায় গুপ্তচর বলে মুসলমানদের বিশ্বাস হয়। এক ব্যক্তি তার পিছু ধাওয়া করে। সালামাও তাঁকে অনুসরণ করেন এবং দৌড়ে আগে গিয়ে লোকটিকে পাকড়াও করার পর তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। তারপর নিহত ব্যক্তিটির বাহনটি নিয়ে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বললোঃ সালামা। রাসূল (সা) ঘোষণা করেনঃ নিহত ব্যক্তির যাবতীয় জিনিস সে-ই পাবে।

হিজরী ৭ম সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু বকরের নেতৃত্বে বনী কিলাবের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠালেন। সেই বাহিনীতে সালামাও ছিলেন। তিনি এই অভিযানে একাই সাত জনকে হত্যা করেন। যারা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের অনেক নারীকে তিনি বন্দী করে নিয়ে আসেন। এই বন্দীদের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়েও ছিল। হযরত আবু বকর মেয়েটিকে হযরত সালামার দায়িত্বে অর্পণ করেন। হযরত সালামা মেয়েটিকে মদীনায় নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ মেয়েটিকে আমার জিম্মায় ছেড়ে দাও। সালামা মেয়েটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) জিম্মায় দিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ মেয়েটির বিনিময়ে কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করেন।

হযরত সালামা ইবনুল আকও'য়া (রা) ইসলাম গ্রহণের পর কাফিরদের সাথে সংঘটিত প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি মোট চৌদ্দটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সাতটি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথী হিসাবে, আর অবশিষ্ট সাতটি রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত বিভিন্ন অভিযান। মুসতাদরিকের একটি বর্ণনা মতে তাঁর অংশগ্রহণ করা যুদ্ধের সংখ্যা মোট ষোল। একবার তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর সাথে সাতটি এবং যায়িদ ইবন হারিসার সাথে নয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।' (রিজালুন হাওলার রাসূল-৫৫৫)

পদাতিক বাহিনীর যারা তীর-বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতো, তাদের মধ্যে সালামা ছিলেন অন্যতম দক্ষ ব্যক্তি। শত্রু সৈন্যরা যখন আক্রমণ চালাতো তিনি পিছু হটে যেতেন। আবার শত্রুরা যখন পিছু হটে যেত বা বিশ্রাম নিত, তিনি অতর্কিত আক্রমণ চালাতেন। এই ছিল তাঁর যুদ্ধ কৌশল। এই কৌশল অবলম্বন করে তিনি একাই মদীনার উপকণ্ঠে 'জী কারাদ' যুদ্ধে 'উয়াইনা ইবন হিসন আল-ফিযারীর' নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেন। তিনি একাই তাদের পিছু ধাওয়া করেন, তাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। এভাবে মদীনা থেকে বহু দূর পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যান।

বীরত্ব ও সাহসিকতায় বিশেষতঃ দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষেত্রে সাহাবা সমাজের মধ্যে সালামা ছিলেন বিশেষ স্থানের অধিকারী। আল-ইসাবা গ্রন্থকার লিখছেনঃ তিনি ছিলেন অন্যতম বীর এবং অশ্বের চেয়ে দ্রুতগামী। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মতান্তরে 'জী কারাদ' অভিযানের সময় রাসূলে কারীম (সা) তাঁর প্রশংসায় মন্তব্য করেনঃ "খায়রু রাজ্জালীনা সালামা ইবনুল আকও'য়া—সালামা ইবন আকও'য়া আমাদের পদাতিকদের মধ্যে সর্বোত্তম।" (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৫)

হযরত সালামা ছিলেন অত্যন্ত শক্ত মানুষ। দুঃখ-বেদনা কি জিনিস তা যেন তিনি জানতেন না। তবে খাইবার যুদ্ধে তাঁর ভাই মতান্তরে চাচা হযরত 'আমের ইবন আকও'য়ার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে একটি বিষাদ ভরা গান গুণগুণ করে গেয়েছিলেন। যার শেষ চরণটি ছিল এমনঃ "(হে আল্লাহ) আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করুন, শত্রুর মুখোমুখি আমাদের পদসমূহ দৃঢ়মূল করুন।"

এই খাইবার যুদ্ধে তাঁর ভাই 'আমের তরবারি দিয়ে সজোরে একজন মুশরিককে আঘাত হানেন। কিন্তু আঘাতটি ফসকে গিয়ে নিজের দেহে লাগে এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এ ঘটনার পর মুসলমানদের কেউ কেউ মন্তব্য করলোঃ "হতভাগা 'আমের—শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলো।" শুধু এই দিন, যখন অন্যদের মত সালামার মনেও এই ধারণা জন্মালো যে, তাঁর ভাই জিহাদ ও শাহাদাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন ভীষণ ব্যথিত ও বিমর্ষ হলেন। তিনি দৌড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেনঃ

—ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আমেরের সকল নেক 'আমল ব্যর্থ হয়ে গেছে—একথা কি ঠিক?

রাসূল (সা) বলেলেনঃ

—সে মুজাহিদ হিসেবে নিহত হয়েছে। তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে। এখন সে জান্নাতের নদীসমূহে সাঁতার কাটছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৫-৫৫৬)

হযরত সালামা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর থেকে হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাত পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। হযরত 'উসমানের (রা) হত্যার পর এই বীর মুজাহিদ বুঝতে পারলেন, মুসলিম জাতির মধ্যে ফিতনা বা আত্মকলহের দ্বার খুলে গেছে। যে ব্যক্তি তার ভাইদের সঙ্গে করে সারাটি জীবন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, এখন তার পক্ষে সেই ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা শোভন নয়। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে দক্ষতার জন্য তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা কুড়িয়েছেন, একজন মুমিনের বিরুদ্ধে সেই দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করা অথবা সেই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে একজন মুসলমানকে হত্যা করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়।

এ উপলব্ধির পর তিনি নিজের জিনিসপত্র উটের পিঠে চাপিয়ে মদীনা ছেড়ে সোজা 'রাবজা' চলে যান। সেখানেই আমরণ বসবাস করতে থাকেন। এই রাবজাতেই ইতিপূর্বে হযরত আবুযার আল-গিফারী (রা) চলে এসেছিলেন মদীনা ছেড়ে এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

হযরত সালামা (রা) বাকী জীবনটা এই রাবজায় কাটিয়ে দেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হঠাৎ তাঁর মনে মদীনায় যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগে। তিনি মদীনা যান। সেখানে দুই দিন কাটানোর পর তৃতীয় দিন আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে তাঁর হাবীবের পবিত্র ভূমিতে শহীদ ও সত্যনিষ্ঠ বন্ধুদের পাশেই তিনি সমাহিত হন। (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৬-৫৭)

তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য আছে। সঠিক মত অনুযায়ী তিনি হিজরী ৭৪ সনে মৃত্যুবরণ করেন। অন্য একটি মতে তাঁর মৃত্যু সন হিঃ ৬৪। ওয়াকিদী ও তাঁর অনুসারীদের ধারণা তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। ইবন হাজার বলেন, মৃত্যুসন সম্পর্কে প্রথম মতানুযায়ী ওয়াকিদীর এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, তাতে হুদাইবিয়ার বাইয়াতের সময় তাঁর বয়স দাঁড়ায় দশের কাছাকাছি। আর এ বয়সে কেউ মৃত্যুর বাইয়াত করতে পারে না। তাছাড়া আমি ইবন সা'দে দেখেছি, তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে ইনতিকাল করেন। বালাযুরীও এমনটি উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবা-২/৬৭)

হযরত সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। বহু অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার গৌরবও অর্জন করেছিলেন। এই সুযোগ তিনি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তাছাড়া আবু বকর, 'উমার, 'উসমান ও তালহা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সাতাত্তর (৭৭)। তার মধ্যে ষোলটি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত। পাঁচটি বুখারী ও নয়টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুল কামাল-১৪৮) আর তাঁর নিকট থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন—ইয়াস ইবন সালামা, ইয়াযীদ ইবন উবাইদ, আবদুর রহমান ইবন আবদিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন হানাফিয়্যাহ প্রমুখ।

আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে হযরত সালামা ছিলেন দরাযহস্ত। কেউ কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে চাইলে তিনি খালি হাতে ফিরাতেন না। তিনি বলতেন, যে আল্লাহর ওয়াস্তে দেয় না সে কোথায় দেবে? তবে আল্লাহর ওয়াস্তে চাওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না।

তিনি নিজের জন্য সাদাকার মাল হারাম মনে করতেন। যদি কোন জিনিস সাদাকার বলে সন্দেহ হত, তিনি তা থেকে হাত গুটিয়ে নিতেন। এ কারণে নিজের সাদাকা করা কোন জিনিস দ্বিতীয়বার অর্থের বিনিময়ে খরিদ করাও পছন্দ করতেন না।

তিনি হারাম ও হালালের ব্যাপারে এতই সতর্ক ছিলেন যে, জুয়ার সাথে সাদৃশ্য দেখায় এমন কোন খেলাও তিনি বাচ্চাদের খেলতে দিতেন না।

মদীনায় যে সকল সাহাবী ফাতওয়া দান করতেন সালামা (রা) ছিলেন তাঁদেরই একজন। ইবন সা'দ যিয়াদ ইবন মীনা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন ঃ ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, আবু সাঈদ

আল-খুদরী, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, রাফে' ইবন খাদীজ, সালামা ইবন আকও'য়া প্রমুখ সাহাবী মদীনায় ফাতওয়া দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা—৩/২৫৪-৫৫),

ইমাম বুখারী 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (পৃঃ ১৪৪) গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবন রাযীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা রাবজা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদের বলা হলো, এখানে সালামা ইবন আকও'য়া আছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে সালাম জানালাম। তিনি নিজের দু'টি হাত বের করে আমাদেরকে দেখিয়ে বললেনঃ আমি এই দু'টি হাত দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেছি। তিনি তাঁর একটি পাঞ্জা বের করলেন। পাঞ্জাটি যেন উটের পাঞ্জার মত বৃহাদাকৃতির। (হায়াতুস সাহাবা—২/৪৯৮-৯৯)

হযরত সালামাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুদাইবিয়ার দিনে আপনারা কোন্ কথার ওপর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেছিলেন? বলেছিলেনঃ মাওত অর্থাৎ মৃত্যুর ওপর। (আল-ইসতিয়াব, হায়াতুস সাহাবা-১/২৪৯)

হযরত সালামার (রা) পুত্র 'ইয়াস' একটিমাত্র কথায় পিতার ফজীলাত ও বৈশিষ্ট্য চমৎকার রূপে তুলে ধরেছেন। তিনি বলছেনঃ 'মা কাজাবা আবী কাত্তু—আমার আববা কক্ষণো মিথ্যা বলেননি।' (রিজালুন হাওলার রাসূল—৫৫৪)

সত্যনিষ্ঠ মানুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান লাভের জন্য একজন মানুষের জীবনে এই একটিমাত্র গুণই যথেষ্ট। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এই সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

"আল-ইলতিয়াব ফী আসমায়িল আসহাব" গ্রন্থের লেখক আবু 'উমার ইউসুফ আল কুরতুবী ইবন ইসহাকের সূত্রে হযরত সালামা সম্পর্কে একটি অভিনব কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ইবন ইসহাক বলেন, 'আমি শুনেছি নেকড়ে বাঘ যার সংগে কথা বলেছে, সালামা সেই ব্যক্তি। সালামা বলেছেন, আমি একটি নেকড়েকে একটি হরিণ শিকার করতে দেখলাম। আমি তাকে তাড়া করে তার মুখ থেকে হরিণটি বের করে আনলাম। তখন নেকড়েটি বললো, 'তোমার কি হল, আল্লাহ আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন আমি তো তা-ই খেতে চাচ্ছি। আর তা তোমারও সম্পদ নয় যে, তুমি আমার মুখ থেকে কেড়ে নেবে।' সালামা বলেন, আমি বললাম, 'ওহে আল্লাহর বান্দারা, এই দেখ অভিনব ঘটনা। নেকড়ে কথা বলছে, আমার কথা শুনে নেকড়েটি বললো, 'এর থেকেও আশ্চর্য ঘটনা হল, আল্লাহর রাসূল তোমাদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আহবান জানাচ্ছেন, আর তোমরা তা অস্বীকার করে মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হচ্ছো।' সালামা বলেন, 'অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করি। আল্লাহই ভালো জানেন, কে এই নেকড়ে।' (আল-ইসতিয়াব)

আবু সালামা ইবন আবদিল আসাদ (রা)

নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু সালামা। পিতা আবদুল আসাদ, মাতা বার্‌রাহ বিনতু 'আবদিল মুত্তালিব। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই। তাছাড়া সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) দুধভাই। আবু লাহাবের দাসী 'সুওয়াইবা' রাসূলুল্লাহ (সা), হামযা ও আবু সালামাকে দুধ পান করান। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৬)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে অবস্থান নেওয়ার পূর্বে তিনি মুমিনদের দলে শামিল হন। হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সর্বপ্রথম উসমান ইবন 'আফফান, তালহা ইবন 'উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদের সকলকে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে নিয়ে আসেন। তারা সকলে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের দিন তিনি উসমান ইবন মাজউন, আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবু সালামা ও আল আরকাম ইবন আবিল আরকামকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান। তাঁরাও একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-বিদায়াহ-৩/২৯) তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মু সালামাও তাঁকে অনুসরণ করেন। (উসুদুল গাবা-৫/২৮১)

হাবশায় হিজরাতকারী প্রথম দলটির সাথে তিনি ও স্ত্রী উম্মু সালামা হিজরাত করেন। এই হাবশার মাটিতে তাদের কন্যা যায়নাব বিনতু আবী সালামা জন্মগ্রহণ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২২, ৩২৬) কিছুদিন পর তিনি হাবশা থেকে চলে আসেন এবং আবু তালিব ইবন আবদিল মুত্তালিবের নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন। বনু মাখযূমের কিছু লোক আবু তালিবের নিকট এসে অভিযোগের সুরে বলেঃ ওহে আবু তালিব, আপনি আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদকে আমাদের হাত থেকে হিফাজতে রেখেছেন। এখন আবার আমাদেরই এক লোককে নিরাপত্তা দিচ্ছেন? আবু তালিব বললেনঃ 'সে আমার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছে। তাছাড়া সে আমার বোনের ছেলে। যদি বোনের ছেলেকে নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে ভায়ের ছেলেকেও আমি নিরাপত্তা দিতে পারিনে।' এক পর্যায়ে আবু লাহাব উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা এই বৃদ্ধের সাথে বেশী বাড়াবাড়ি করছো। যদি এটা বন্ধ না কর, আমরা এই বৃদ্ধের পাশে এসে দাঁড়াবো।' আবু লাহাবের এ কথায় বনী মাখযূমের লোকেরা সরে পড়ে। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৬৯, ৩৭১) দ্বিতীয়বারও তিনি সস্ত্রীক হাবশায় হিজরাত করেন। শেষবার হাবশা থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে কিছুদিন পর আবার মদীনায় চলে যান।

আবু সালামার স্ত্রী হযরত উম্মু সালামা তাঁদের মদীনায় হিজরাত সম্পর্কে বলেনঃ আবু সালামা মদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাঁর উটটি প্রস্তুত করলেন। আমাকে উটের পিঠে বসিয়ে আমার ছেলে সালামাকে আমার কোলে দিলেন। তারপর উটের লাগাম ধরে তিনি টেনে নিয়ে চললেন। আমার পিতৃ-গোত্র বনু মুগীরার লোকেরা তাঁর পথ আগলে ধরে বললোঃ তোমার নিজের ব্যাপারে তুমি যা খুশী করতে পার। কিন্তু আমাদের এ মেয়েকে তোমার সাথে বিদেশ যেতে দেবনা। তারা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এতে আবু সালামার গোত্র বনু আবদিল আসাদ ক্ষেপে গেল। তারা বললোঃ তোমরা যখন তোমাদের মেয়েকে কেড়ে নিয়ে গেছ, তখন আমরা আমাদের সন্তানকে অর্থাৎ সালামাকে তার মায়ের কাছে থাকতে দেব না। তারা আমার ছেলেটি নিয়ে গেল। আমি বন্দী আমার পিতৃগোত্র বনু মুগীরার হাতে, আমার কোলের বাচ্চা সালামা তার পিতৃগোত্র বনু

আবদিল আসাদে, আর আমার স্বামী আবু সালামা মদীনায়। এভাবে তারা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল।

আমি প্রতিদিন মক্কার 'আবতাহ' উপত্যকায় গিয়ে বসে বসে শুধু কাঁদতাম। প্রায় এক বছর আমি চোখের পানি ফেললাম। অবশেষে একদিন আমার পিতৃগোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে এ অবস্থায় দেখে তার অন্তরে দয়া হলো। সে বনু মুগীরাকে বললোঃ তোমরা কি এ হতভাগিনীকে মক্কা ছাড়তে দেবে না? এভাবে স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? তখন বনু মুগীরা আমাকে বললোঃ তুমি ইচ্ছা করলে তোমার স্বামীর কাছে যেতে পার। বনু 'আবদিল আসাদও আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিল। আমি উটে চড়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে মদীনার পথ ধরলাম। আমার সাথে আল্লাহর আর কোন বান্দা ছিল না। আমি যখন তানয়ীমে পৌঁছলাম তখন উসমান ইবন তালহার সাথে আমার দেখা। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলোঃ আবু উমাইয়্যার মেয়ে, কোথায় যাবে? বললামঃ মদীনায় আমার স্বামীর কাছে। জিজ্ঞেস করলোঃ সাথে আর কেউ নেই? বললামঃ এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। সে আমার উটের লাগাম ধরে হাঁটতে লাগলো এবং আমাকে মদীনার উপকণ্ঠে কুবার বনী 'আমর ইবন আউফের পল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললোঃ তোমার স্বামী এখানেই থাকে। এ কথা বলে সে আবার মক্কার পথ ধরলো। এখানে আমার স্বামীর সাথে মিলিত হলাম। এই উসমান ইবন তালহা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করে। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৫৮-৫৯)

হযরত আবু সালামা ইয়াসরিববাসীদের আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে শপথের এক বছর পূর্বে মদীনায় হিজরাত করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৮) বুখারীর একটি বর্ণনা মতে তিনিই মদীনায় গমনকারী প্রথম মুহাজির। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনায় মুসয়াব ইবন উমাইরকে মদীনার প্রথম মুহাজির বলা হয়েছে। আল্লামা ইবন হাজার (রহ) এই দুই বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে বলেনঃ 'আবু সালামা হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে এলে মক্কার মুশরিকরা তাঁর ওপর পুনরায় অত্যাচার শুরু করে। তিনি তখন মদীনা যান—কুরাইশদের ভয়ে, সেখানে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে নয়। অপরদিকে মুসয়াব ইবন উমাইর মদীনায় যান হিজরাতের নির্দেশ আসার পর। এই হিসাবে দুই বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। (ফাতহুল বারী-৭/২০৩) আবু সালামার মদীনায় উপস্থিতির দিনটি ছিল মুহাররম মাসের ১০ তারিখ। 'আমর ইবন আউফের খান্দান পুরো দুই মাস তাকে আতিথ্য দান করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে হযরত খুসাইমা আনসারী ও তাঁর মাঝে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং পৃথক বসবাসের জন্য একখণ্ড জমিও দান করেন।

বদর ও উহুদ যুদ্ধে তিনি সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উহুদ যুদ্ধে আবু উসামা জাশামীর একটি তীর তাঁর বাহুতে বিদ্ধ হয়। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসা গ্রহণের পর বাহ্যিকভাবে সেরে উঠলেও ভেতরে ভেতরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় তাঁর ওপর 'কাতান' অভিযানের দায়িত্ব অর্পিত হয়।

'কাতান' একটি পাহাড়ের নাম। এখানে বনু আসাদের বসতি ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পেলেন, তুলাইহা ও আসাদ ইবন খুওয়াইলিদ নিজ গোত্র এবং তাদের প্রভাবিত অন্যান্য গোত্রকে মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলছে। রাসূলে কারীম (সা) এমন কার্যকলাপ বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি মুহাজির ও আনসারদের সম্মিলিত দেড়শো মুজাহিদীনের একটি বাহিনী গঠন করে আবু সালামার নেতৃত্বে হিজরী ৪ সনের মুহাররাম/সফর মাসে 'কাতান' অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবু সালামার হাতে ঝাণ্ডা দিতে গিয়ে বলেনঃ 'রওয়ানা হয়ে যাও। বনু আসাদ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগেই তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দাও।'

হযরত আবু সালামা অপ্রসিদ্ধ পথ ধরে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ বনু আসাদের জনপদে গিয়ে হাজির হন। তারা এই আকস্মিক আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাতে শুরু করে। আবু সালামা তাঁর বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তাদের পিছু ধাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা বহু দূর পর্যন্ত তাদেরকে

তাড়িয়ে নিয়ে যান এবং প্রচুর পরিমাণে উট ও ছাগল-বকরী গানীমাত হিসাবে লাভ করেন। সকল গানীমাতই মদীনায় রাসূলুল্লাহর খেদমতে হাজির করেন।

হযরত আবু সালামা 'কাতান' অভিযান থেকে মদীনায় ফিরলেন। এদিকে ওহুদ যুদ্ধে তীরবিদ্ধ ক্ষতস্থানে আবার বিষক্রিয়া শুরু হল। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর হিজরী ৪ সনের মতান্তরে ৩ সনের জামাদিউল আখার মাসের ৩ তারিখ ইনতিকাল করেন। ঘটনাক্রমে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। তাঁর রূহটি বেরিয়ে যাওয়ার পর রাসূল (সা) নিজের পবিত্র হাতে তাঁর খোলা চোখ দু'টি বন্ধ করে দিয়ে বলেনঃ মানুষের রূহ যখন উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন তার দু'টি চোখ তাকে দেখার জন্য খোলা থাকে।" (তাবাকাতু ইবন সা'দ-৩/১৭২)

একদিকে পর্দার অন্তরালে মহিলারা মাতম শুরু করে দেয়। রাসূল (সা) তাদের নিবৃত্ত করে বলেনঃ এখন দু'আর সময়। কারণ, যে সকল ফিরিশতা আসমান থেকে মৃতের কাছে আসে তারাও এই দু'আকারীদের দু'আর সাথে 'আমীন' বলে। তারপর রাসূল (সা) তাঁর জন্য এভাবে দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ, তাঁর কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দাও। তাঁর গুনাহ-খাতা মাফ করে দাও এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত জামায়াতের মধ্যে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও।" (ইবন সা'দ ৩/১৭২)

হযরত আবু সালামা মদীনার উপকণ্ঠে 'আলীয়াহ' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কুবা থেকে এসে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। বনী উমাইয়্যা ইবন যায়িদের কূপ 'ইয়াসীরা'-র পানি দিয়ে তাঁকে গোসল দেওয়া হয় এবং মদীনার পবিত্র মাটিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু সালামা (রা) বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই তাঁকে দেখতে যেতেন।

হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেনঃ একদিন আবু সালামা খুব উৎফুল্লভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে ঘরে ফেরেন। তারপর বলতে থাকেন, "আজ রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী আমাকে খুবই খুশী করেছে। তিনি বলেছেনঃ কোন বিপদগ্রস্ত মুসলমান তার বিপদের মধ্যে যদি আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে বলেঃ 'হে আল্লাহ, আমাকে এই বিপদে সাহায্য কর এবং আমাকে এর উত্তম প্রতিদান দাও'—তাহলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন।" সুতরাং আবু সালামার মৃত্যুতে আমি যখন ভীষণ দুঃখ পেলাম, তখন আমিও ঐ দু'আ করলাম। কিন্তু তক্ষুণি আমার মনে হল, আবু সালামার উত্তম বিনিময় আর কে হতে পারে? আমার ইদ্দৎ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন খোদ রাসূল (সা) বিয়ের পয়গাম পাঠান তখন আমি বুঝলাম আল্লাহ উত্তম বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ ইবন হাম্বল-৪/১২৭) এভাবে উম্মু সালামা হলেন উম্মুল মুমিনীন।

হযরত আবু সালামা দুই ছেলে সালামা ও উমার এবং দুই মেয়ে যয়নাব ও দুররাহ্ রেখে যান।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে যখন প্রত্যেকের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন তখন মুহাজির ও আনসার যাঁরা বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সন্তানদের জন্য দু'হাজার করার নির্দেশ দেন। যখন আবু সালামার ছেলে 'উমারের ব্যাপারটি এলো, তখন বললেন, তাকে এক হাজার বেশী দাও। মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ—যাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, যিনি উহুদে শহীদ হন, প্রতিবাদ করে বলেনঃ তার পিতার আমাদের পিতাদের অপেক্ষা বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। খলীফা বললেনঃ তার পিতা আবু সালামার জন্য তাকে দু'হাজার, আর তার মা উম্মু সালামার জন্য অতিরিক্ত এক হাজার। তার মার মত তোমার একজন মা থাকলে তোমাকেও এক হাজার বেশী দিতাম। (হায়াতুস সাহাবা—১/২১৬-১৭)

'আকীল ইবন আবী তালিব (রা)

নাম 'আকীল, ডাকনাম আবু ইয়াযীদ। পিতা আবু তালিব ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, মাতা ফাতিমা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। চতুর্থ খলীফা হযরত আলীর সৎভাই এবং আলী অপেক্ষা বিশ বছর বড়।

'আকীল পিতা আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে একবার মক্কায় দারুণ অভাব দেখা দেয়। কুরাইশদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আব্বাসের অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটু ভালো ছিল। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আব্বাসকে বললেনঃ 'চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের অবস্থা তো আপনার জানা। তাঁর সন্তান-সংখ্যা বেশী। চলুন না আমরা তাঁর কিছু সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে নিই।' তাঁরা দু'জন আবু তালিবের কাছে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আবু তালিব বললেন, 'আকীল ছাড়া আর যাকে খুশী তোমরা নিয়ে যেতে পার।' রাসূলুল্লাহ (সা) আলীকে এবং আব্বাস জাফরকে নিয়ে গেলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৩০)।

'আকীলের অন্তর প্রথম থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি দুর্বল ছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করতে পারেননি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরদার-মুশরিকদের সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আরও অনেকের সাথে তিনিও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় খান্দানের কে কে বন্দী হয়েছে তা দেখার জন্য আলীকে নির্দেশ দেন। আলী খোঁজ-খবর নিয়ে বলেনঃ নাওফিল, আব্বাস ও 'আকীল বন্দী হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁদের দেখতে যান এবং 'আকীলের পাশে দাঁড়িয়ে বলেনঃ আবু জাহল নিহত হয়েছে। আকীল বললেনঃ এখন তিহামা অঞ্চলে মুসলমানদের আর কোন প্রতিপক্ষ নেই। 'আকীল ছিলেন রিক্তহস্ত। আব্বাস তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাঁকে ছাড়িয়ে নেন। বদরে তিনি হযরত উবাইদ ইবন আউসের হাতে বন্দী হন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৮৭)

বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় ফিরে যান। মক্কা বিজয়ের বছর মতান্তরে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করে অষ্টম হিজরী সনের প্রথম দিকে মদীনায় হিজরাত করেন। (আল-ইসাবা-২/৪৯৪) মূতা অভিযানে অংশগ্রহণের পর আবার মক্কায় ফিরে যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ কারণে মক্কা বিজয়, তায়েফ ও হুনাইন অভিযানে শরিক হতে পারেননি। (উসুদুল গাবা-৩/৪২২) তবে কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে প্রথমদিকে যখন মুসলিম বাহিনীর পরাজয় হতে চলেছিল, এমনকি মুহাজির ও আনসাররাও পালাতে শুরু করেছিল, তখন যাঁরা দৃঢ়পদ ছিলেন তাঁদের একজন তিনি (আল ইসাবা-২/৪৯৪)।

ইবন হিশাম বলেনঃ 'আকীল ইবন আবী তালিব হুনাইন যুদ্ধের দিন রক্তমাখা তরবারি হাতে স্ত্রী ফাতিমা বিনতু শাইবা ইবন রাবীয়ার তাঁবুতে প্রবেশ করেন। স্ত্রী বলেনঃ আমি বুঝেছি তুমি যুদ্ধ করেছ। তবে কী গনীমত (যুদ্ধলব্ধ জিনিস) আমার জন্য নিয়ে এসেছ? 'আকীল বললেনঃ এই নাও একটি সূঁচ, কাপড় সেলাই করবে। তিনি সূঁচটি স্ত্রীর হাতে দিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল। তিনি ঘোষণা করছেনঃ কেউ কোন জিনিস নিয়ে থাকলে ফেরত দিয়ে যাও। এমনকি কেউ একটি সূঁচ-সূতো নিয়ে থাকলে তাও ফেরত দিয়ে যাও। আকীল স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেনঃ তোমার সূঁচটিও চলে গেল। এই বলে তিনি স্ত্রীর হাত থেকে সূঁচটি নিয়ে গনীমতের সম্পদের স্তূপে ফেলে দিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯২)।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল তথা হুনাইন যুদ্ধের পর থেকে খলীফা উসমানের খিলাফতের শেষ পর্যন্ত হযরত আকীলের ভূমিকা ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তবে হযরত উমারের খিলাফতকালে বাইতুলমালে যখন প্রচুর অর্থ জমা হতে থাকে তখন তিনি এই অর্থের ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আলী (রা) সকল অর্থ জনগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। হযরত উসমান বললেন ঃ প্রচুর অর্থ, সকলে পাবে। তবে কে পেল, আর কে পেল না তা হিসেব না রাখলে বিষয়টি বিশৃংখলার রূপ নেবে। তখন ওয়ালীদ ইবন হিশাম ইবন মুগীরা বললেন ঃ আমীরুল মুমিমীন! আমি শামে গিয়েছি। সেখানে রাজাদের দেখেছি, তাঁরা দিওয়ান তৈরী করে সবকিছু পৃথকভাবে লিখে রাখেন। তাঁর পরামর্শটি খলীফার পছন্দ হলো। তিনি আকীল, মাখরামা ও জুবাইর ইবন মুতয়িমকে নির্দেশ দিলেন মর্যাদা অনুযায়ী নাগরিকদের তালিকা তৈরীর জন্য। এ তিনজন ছিলেন কুরাইশদের বিশিষ্ট বংশবিদ্যা বিশারদ। তাঁরা তালিকা তৈরী করে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/২২০)।

হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বিরোধের সময় হযরত আকীলকে আবার ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। যদিও তিনি আলীর (রা) ভাই, তথাপি নিজের প্রয়োজনে আমীর মুয়াবিয়ার (রা) সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আলী-মুয়াবিয়া বিরোধের সময় তিনি মদীনা ছেড়ে শামে মুয়াবিয়ার কাছে চলে যান। এর কারণ ইতিহাসে এভাবে উল্লেখ হয়েছে যে, আকীল ছিলেন ঋণগ্রস্ত অভাবী মানুষ, তাঁর ছিল অর্থের প্রয়োজন। আর আমীর মুয়াবিয়ার (রা) খাযানা ছিল উন্মুক্ত। দারিদ্র ও অভাব তাঁকে হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষাবলম্বনে বাধ্য করে।

হযরত মুয়াবিয়ার (রা) সাথে হযরত আলীর (রা) বিরোধ যখন তুঙ্গে তখন আকীল একবার ঋণ পরিশোধের আশায় হযরত আলীর (রা) কাছে যান। আলী তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করেন। তিনি পুত্র হাসানকে তাঁর সেবার দায়িত্ব দেন। হাসান অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। রাতে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবারের জন্য ডাকা হলো। আকীল এসে দেখলেন, দস্তরখানে কিছু শুকনো রুটি, লবণ ও সামান্য কিছু তরকারি সাজানো। আকীল বললেন ঃ খাবার শুধু এই? আলী বললেন ঃ হ্যাঁ। এবার আকীল নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন ঃ আমার ঋণসমূহ তুমি পরিশোধ করে দাও। আলী জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি পরিমাণ হবে? বললেন ঃ চল্লিশ হাজার দিরহাম। আলী বললেন ঃ এত অর্থ আমি কোথায় পাব? একটু অপেক্ষা করুন, আমার ভাতা চার হাজার হলে আপনাকে দিতে পারবো। আকীল বললেন ঃ তোমার অসুবিধা কোথায়? বাইতুল মাল তো তোমার হাতে। তোমার ভাতা বৃদ্ধির অপেক্ষায় আমাকে কতদিন ঝুলিয়ে রাখবে? আলী বললেন ঃ আমি তো মুসলমানদের অর্থের একজন আমানতদার মাত্র। আপনি কি চান, আমি সেই অর্থ আপনাকে দিয়ে খিয়ানত করি? এ উত্তর শুনে আকীল সোজা শামে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে চলে যান। মুয়াবিয়া (রা) আকীলকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি আলী ও তাঁর সাথীদের কেমন দেখলে? আকীল বললেন ঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঠিক সাহাবী। শুধু এতটুকু অভাব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের মাঝে নেই। আর তুমি ও তোমার সংগী-সাথীরা ঠিক আবু সুফইয়ানের সংগী সাথীদের মত। এমন তুলনা দেওয়ার পরও আমীর মুয়াবিয়া (রা) পরের দিন আকীলকে ডেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম তাঁর হাতে তুলে দেন। (উসুদুল গাবা-৩/৪২৩)।

হযরত আকীলের শামে উপস্থিতির পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলতেন ঃ আমি যদি সত্যের ওপর না হতাম তাহলে আকীল তাঁর ভাই আলীকে ছেড়ে আমার পক্ষাবলম্বন করলেন কিভাবে? একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা) হযরত আকীলের (রা) উপস্থিতিতে মানুষের সামনে এমন যুক্তি উপস্থাপন করলে আকীল প্রতিবাদ করে বললেন ঃ আমার ভাই দ্বীনের জন্য ভাল, আর তুমি দুনিয়ার জন্য। এটা ভিন্ন কথা যে, আমি দুনিয়াকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য

দিয়েছি। আর আখিরাতের ব্যাপার—তা তার উত্তম সমাপ্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করি (উসুদুল গাবা-৩/৪২৩)।

হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে অথবা ইয়াযীদের শাসনকালের প্রথম দিকে হযরত আকীল ইনতিকাল করেন। (আল ইসাবা-২/৪৯৪)।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দীর্ঘ সাহচর্য লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত আপন ও প্রিয়জন হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর যে পারদর্শিতা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তথাপি হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত দু'চারটি হাদীস পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ, হাসান বসরী, 'আতা প্রমুখ তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও তিনি জাহিলী যুগের বিভিন্ন জ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। ইলমুল আনসাব, আইয়্যামুল আরব—বংশবিদ্যা, প্রাচীন আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন সুবিজ্ঞ। এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষ তাঁর নিকট আসতো। তিনি মসজিদে নববীতে নামাযের পর এসব বিষয়ের আলোচনা করতেন এবং লোকেরা তা বসে বসে শুনতো।

হিশাম আল কালবী বলেনঃ আকীল, মাখরামা, হুয়াইতিব ও আবু জাহম—কুরাইশদের এ চার ব্যক্তির নিকট মানুষ তাদের ঝগড়া-বিবাদ ফায়সালার জন্য যেত। (আল ইসাবা-২/৪৯৪)।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেনঃ আবু যায়িদ, তোমার প্রতি আমার দ্বিগুণ ভালোবাসা। একটা আত্মীয়তা এবং অন্যটা আমার চাচা তোমাকে ভালোবাসতেন—এই দুই কারণে।

সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় হযরত আকীল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের যথাযথ অনুসারী ছিলেন। একবার তিনি নতুন বিয়ে করেছেন। সকাল বেলা পাড়া প্রতিবেশীরা তাঁকে স্বাগতম জানাতে এলো। তারা জাহিলী যুগে প্রচলিত দু'টি শব্দ উচ্চারণ করে স্বাগতম জানালো। শব্দ দু'টিতে ইসলাম বিরোধী কোন ভাবও ছিল না। তবে যেহেতু স্বাগতমের ইসলামী ভাষা বিদ্যমান ছিল তাই তিনি তাদের ভুল শুধরে দিয়ে বললেনঃ এমনটি নয় বরং একথা বলোঃ 'বারাকাল্লাহু লাকুম ওয়া বারাকাল্লাহু আলাইকুম।' আমাদেরকে এভাবে বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জীবিকার জন্য খাইবরের উৎপন্ন শস্য থেকে বাৎসরিক ১৪০ ওয়াসক নির্ধারণ করে দিয়ে যান। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫০)।

হাকীম ইবন হাযাম (রা)

নাম হাকীম, ডাক নাম আবু খালিদ। পিতা হাযাম ইবনে খুওয়াইলিদ, মাতা যয়নাব মতান্তরে সাফিয়্যা। হাকীম নিজেই বলছেনঃ আমি 'আমুল ফীল' (হস্তী বৎসর) অর্থাৎ আবরাহার কা'বা আক্রমণের তের বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করি।' ওয়াকিদী বলেনঃ হাকীমের জন্ম রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মের পাঁচ বছর পূর্বে। তাঁর পিতা হাযাম ফিজার যুদ্ধে মারা যায়। তিনি নিজেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুবাইর ইবন বাক্কার বলেনঃ হাকীম কা'বার অভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা-১/৩৪৯)।

ইতিহাস বলছে, তিনি আরবের একমাত্র সন্তান যে কা'বার অভ্যন্তরে ভূমিষ্ট হয়েছে। তাঁর মা কয়েকজন বান্ধবীসহ কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সেদিন কোন এক বিশেষ উপলক্ষে কা'বার দরযা খোলা ছিল। সে সময় তাঁর মা ছিলেন গর্ভবতী। আল্লাহর ইচ্ছায় সেখানে তাঁর প্রসব বেদনা ওঠে, তিনি বের হওয়ার সময় পেলেন না। একটি চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হলো। তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তার নাম রাখা হয় হাকীম ইবন হাযাম। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ তাঁর ফুফু।

হাকীম মক্কার এক সম্পদশালী অভিজাত পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র ও বুদ্ধিমান। কুরাইশরা তাঁকে নেতা হিসাবে বরণ করে নেয়। জাহিলী আরবে যারা মক্কায় আগত হাজীদের দেখা-শুনা করতো, আহার করাতো, তাদের বলা হতো 'মুতয়িম' অর্থাৎ যে আহার করায়— হাকীমও ছিলেন মক্কার এক অন্যতম 'মুতয়িম'। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৬৪-৬৫) জাহিলী যুগে যারা আল্লাহর ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে দুর্দশায় পড়তো তিনি নিজের অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরঙ্গ বন্ধু। বয়সে রাসূলুল্লাহর (সা) বড় হওয়া সত্বেও রাসূলুল্লাহকে ভালোবাসতেন, তাঁর সাহচর্যকে মূল্যবান মনে করতেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহও তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে সঙ্গ দিতেন।

অতঃপর হযরত খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হাকীমের আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে তাঁদের পুরাতন সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। তবে খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, দু'জনের মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক থাকা সত্বেও মককা বিজয়ের পূর্ব দিন পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহর(সা) ওপর ঈমান আনেননি। তিনি যখন ঈমান আনেন তখন রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াতের বিশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'লা হাকীমকে যে জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়তা দান করেন তাতে এটাই সঙ্গত ছিল যে, তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ঈমান আনবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তা হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা যেমন বিস্মিত হই, তেমনি তিনি নিজেও নিজের আচরণে বিস্মিত হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর আমরণ তিনি তাঁর বিগত জীবনের কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পুত্র একদিন তাঁকে দেখলেন, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ

—আব্বা, কাঁদছেন কেন?

—বেটা আমার কান্নার কারণ অনেকগুলি।

প্রথমতঃ আমি বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি। ফলে বহু বড় বড় নেক কাজ থেকে পিছিয়ে পড়েছি। এখন যদি সমগ্র পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণও আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করি তবুও আমি

তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবো না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ আমাকে বদর ও উহুদে প্রাণে বাঁচান। তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, আমি আর কক্ষণও রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে কুরাইশদের সাহায্য করবো না এবং মক্কা থেকেও আর বের হব না। কিন্তু তার পরই আবার কুরাইশদের সাহায্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছি।

তৃতীয়তঃ যখনই আমি ইসলাম গ্রহণের কথা ভেবেছি তখনই বয়স্ক সম্মানিত কুরাইশ নেতাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি। তারা তাদের জাহেলী আচার-আচরণ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। আমিও তাদের অনুসরণ করেছি। আফসুস! আমি যদি তাদের অনুসরণ না করতাম! বাপ-দাদা ও নেতৃবৃন্দের অনুসরণই আমাকে ধ্বংস করেছে। বেটা, এখন আমি কেন কাঁদবো না?

হাকীমের এত বিলম্বে ইসলাম গ্রহণে যেমন আমরা এবং তিনি নিজেও বিস্মিত হয়েছেন, তেমনি খোদ রাসূলুল্লাহও (সা) কম বিস্মিত হননি। তাঁর মত অন্যান্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দ্রুত ইসলামে শামিল হোক রাসূল (সা) এটাই কামনা করতেন।

মক্কা বিজয়ের পূর্বরাত্রি রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেন, মক্কার চার ব্যক্তির মুশরিক থাকা আমি পছন্দ করিনি। তারা ইসলাম গ্রহণ করুক এটাই আমি কামনা করেছি।

প্রশ্ন করা হলো, তারা কে কে? বললেন, আত্তাব ইবন উসাইদ, জুবাইর ইবন মুতয়িম, হাকীম ইবন হাযাম ও সুহাইল ইবন আমর। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাঁর সংগী-সাথীসহ মক্কার শিয়াবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ তখন মুশরিক বা পৌত্তলিক থাকা সত্বেও হাকীম তাঁর ফুফু খাদীজাকে গোপনে খাদ্য সামগ্রী পাঠাতেন। একদিন গম নিয়ে যেতে নরাধম আবু জাহলের নজরে পড়ে যান। আবু জাহল বাধা দেয়। আবুল বাখতারী ইবন হিশাম কাছেই ছিল। সে এগিয়ে এসে আবু জাহলকে বলেঃ সে তার ফুফুর জন্য সামান্য কিছু খাদ্য পাঠাচ্ছে। তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ? শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে বেশ মারপিট হয়। (সীরাতু ইবন হিশাম ১/৩৫৩-৫৪)।

কুরাইশদের প্রতিরোধ সত্বেও যখন মক্কার ভেতরে ও বাইরে রাসূলের (সা) সাহায্যকারীর সংখ্যা বেড়ে গেল তখন কুরাইশরা বেশী বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মক্কার 'দারুন্ নাদওয়া' গৃহে সমবেত হলো। এ বৈঠকে অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে হাকীমও উপস্থিত ছিলেন। একজন নাজদী বৃদ্ধের বেশে ইবলিসও এ বৈঠকে উপস্থিত ছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৮০-৮১)।

কুরাইশরা বদরে অবতরণের পর তাদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) কূপ থেকে পানি পান করার জন্য এগিয়ে এলো। তাদের মধ্যে হাকীমও ছিলেন। রাসূল (সা) তাদের পানি পানে বাধা দিতে নিষেধ করলেন। যারা সেই পানি পান করেছে, একমাত্র হাকীম ছাড়া তাদের সকলে বদরে নিহত হয়েছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২২)।

কুরাইশরা বদরে শিবির স্থাপনের পর উমাইর ইবন ওয়াহাবকে পাঠালো মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিরুপনের জন্য। উমাইর মুসলিম শিবিরের আশেপাশে ঘুরে এসে বললেনঃ তারা তিনশো বা তার কিছু কম-বেশী হতে পারে। উমাইর কুরাইশদের যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথা শুনে হাকীম ইবন হাযাম জনতার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'উতবা ইবন রাবী'য়ার কাছে এসে বললেনঃ আবুল ওয়ালীদ! তুমি কুরাইশদের নেতা ও সরদার। তুমি কুরাইশদের মান্যগণ্য ব্যক্তি। চিরদিন তাদের মধ্যে তোমার সুকীর্তি স্মরণ করা হোক তা কি তুমি চাও না? উতবা বললোঃ হাকীম, একথা কেন? হাকীম বললেনঃ তুমি লোকদের মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। উতবা হাকীমের সাথে একমত হয়। লোকদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণও দেয়। উতবা হাকীমকে আবু জাহলের নিকট পাঠায়। হাকীম বলেন, আমি আবু জাহলের

কাছে গিয়ে দেখলাম সে তার ঢালে তেল লাগাচ্ছে। আমি বললাম ঃ আবুল হাকাম! আমাকে উতবা তোমার নিকট এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে। আবু জাহল বললো ঃ আল্লাহর কসম! সে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দেখে কাপুরুষ হয়ে গেছে।

মুহাম্মাদ ও আমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরবো না। আর উতবা তো এমন কথা বলবেই। তার ছেলে তো রয়েছে তাদের সাথে। এজন্য সে তোমাদের ভয় দিচ্ছে। এভাবে হাকীম ও উতবা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন, আবু জাহলের গোয়ার্তুমীতে তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় বদরের প্রথম শিকার সেই আবু জাহল। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২২-২৪)।

বদরের পরাজয় সম্পর্কে হাকীম পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা একটি শব্দ শুনলাম, যেন আকাশ থেকে মাটিতে এসে পড়লো। শব্দটি ছিল একটি থালার ওপর পাথর পড়ার মত। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই পাথরটি নিক্ষেপ করেছিলেন। আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৫০)।

মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) 'মাররাজ জাহরানে' পৌঁছে শিবির স্থাপন করেছেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে গোপনে খবর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আবু সুফইয়ান ইবন হারব, হাকীম ইবন হাযাম ও বুদাইল ইবন ওয়ারকা মক্কা থেকে বের হন। মক্কার অদূরে 'আরাক' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা উট, ঘোড়া ও মানুষের শোরগোল শুনতে পান। তাঁরা আরও এগিয়ে রাতের অন্ধকারে এক সময় মুসলিম এলাকায় ঢুকে পড়েন। মুসলিম প্রহরীরা তাঁদের ধরে ফেলে। আবু সুফইয়ানের ঘাড়ে উমার (রা) কয়েকটি ঘুষি বসিয়ে দেন। আবু সুফইয়ান ভয়ে চেঁচিয়ে আব্বাসের সাহায্য কামনা করেন। আব্বাস ছুটে এসে তাঁকে উমারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। এদিকে হাকীম ও বুদাইলকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত করা হলে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু সুফইয়ানও ইসলাম গ্রহণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৬৩, ১৭০-৭২, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০)

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করছেন। তিনি হাকীম ইবন হাযামকে সম্মান প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন। তিনি এক ঘোষণা দানের নির্দেশ দেন ঃ

১· আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল— যারা এ সাক্ষ্য দিবে তারা নিরাপদ।

২· যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলে কা'বার চত্বরে বসে পড়বে সে নিরাপদ।

৩· যারা নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তারা নিরাপদ।

৪· যে আবু সুফইয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ।

৫· যে হাকীম ইবন হাযামের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ।

হাকীম ইবন হাযামের বাড়ীটি ছিল মক্কার নিম্নভূমিতে এবং আবু সুফইয়ানের বাড়ীটি উচ্চ ভূমিতে।

হাকীম ইবন হাযাম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন যে, ইসলাম-পূর্ব জীবনে ইসলাম ও রাসূলের (সা) শত্রুতায় যে ভূমিকা ও যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন ঠিক তেমন ভূমিকা ও সেই পরিমাণ অর্থ তিনি ইসলামী জীবনে পালন ও ব্যয় করবেন।

মক্কার 'দারুন্ নাদওয়া' ছিল একটি বাড়ী। কুরাইশরা সেখানে সমবেত হয়ে পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। কুরাইশ বংশের ঊর্ধতন পুরুষ কুসাঈ এ বাড়ীটি নির্মাণ করে। হাত বদল হয়ে ইসলাম-পূর্ব যুগে হাকীম বাড়ীটির মালিক হন। ইসলাম গ্রহণের পর মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে তিনি বাড়ীটি এক লাখ দিরহামে বিক্রি করেন। মুয়াবিয়া তাঁকে তিরস্কার করে বলেন ঃ তুমি বাপ-দাদার

মর্যাদা ও কৌলিন্য বিক্রি করে দিলে? হাকীম বললেনঃ এক তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি ছাড়া সব সম্মান, সব কৌলিন্য বিলীন হয়ে গেছে। জাহিলী যুগে একপাত্র মদের বিনিময়ে বাড়ীটি আমি কিনেছিলাম। আর আজ এক লাখ দিরহামে বিক্রি করলাম। তোমাকে আরও জানাচ্ছি, এ অর্থের সবই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হবে। সুতরাং ক্ষতিটি কোথায়? (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১২৫)

ইসলাম গ্রহণের পর হাকীম ইবন হাযাম একবার হজ্জ আদায় করলেন। মূল্যবান কাপড়ে সজ্জিত উত্তম জাতের একশো উট তাঁর আগে আগে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন। সবগুলিই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কুরবানী করলেন।

আর একবার তিনি হজ্জ করলেন। যখন তিনি আরাফাতে অবস্থান করছেন তখন তাঁর সাথে একশো দাস। প্রত্যেকের কণ্ঠে একটি করে রূপোর প্লেট ঝুলছে, আর তাতে লেখা আছেঃ 'হাকীম ইবন হাযামের পক্ষ থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস।' তাদের সকলকে তিনি মুক্তি দেন।

অন্য একটি হজ্জে তিনি এক হাজার ছাগল-বকরী সংগে নিয়ে যান। সবগুলি মিনায় কুরবানী করেন এবং সেই গোশত দিয়ে মুসলমান গরীব-মিসকিনদের আহার করান।

হুনাইন যুদ্ধের পর হাকীম ইবন হাযাম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গনীমতের সম্পদ থেকে চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁকে কিছু দান করলেন। তিনি আবার চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁকে আবারও দান করলেন। এভাবে সেদিন তিনি একাই একশো উট লাভ করলেন। তখন তিনি নওমুসলিম। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯৩)। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে লক্ষ্য করেন বলেনঃ

'ওহে হাকীম, এই সম্পদ অতি মিষ্টি ও অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মতৃপ্তির সাথে গ্রহণ করে, তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে তা লোভাতুর অবস্থায় গ্রহণ করে তাতে বরকত দেওয়া হয় না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে আহার করে; কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাতটি নীচের হাত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অর্থাৎ দাতা হাতটি গ্রহীতা হাত অপেক্ষা উত্তম।'

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে এ বাণী শুনে হাকীম বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার নামে শপথ, আজকের পর জীবনে আর কোন দিন কারও কাছে কিছুই চাইব না। কারও কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না।' হাকীম তাঁর শপথ যথাযথভাবে পালন করেন।

হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে 'বাইতুল মাল' থেকে হাকীমের ভাতা গ্রহণের জন্য খলীফা তাঁকে একাধিকবার আহবান জানান। হাকীম বার বার তা প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত 'উমার (রা) খলীফা হলেন। তিনিও বার বার হাকীমকে আহবান জানাতে লাগলেন তাঁর অংশ গ্রহণের জন্য। শেষ পর্যন্ত হযরত উমার (রা) জনগণকে সাক্ষী রেখে বললেনঃ 'ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! তোমরা শুনে রাখ, আমি হাকীমকে তার অংশ গ্রহণের আহবান জানিয়েছি, আর সে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে।' এভাবে হাকীম আমরণ আর কারও কাছে হাত পেতে আর কিছুই গ্রহণ করেননি। উমার (রা) প্রায়ই বলতেন,

'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি হাকীমকে তার অংশ গ্রহণের জন্য ডেকেছি, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছে।' (হায়াতুস সাহাবা-২/২৫০-৫১)।

একবার হাকীম ইবন হাযাম মুশরিক অর্থাৎ পৌত্তলিক অবস্থায় ইয়ামনে যান। সেখান থেকে ইয়ামনের 'যু-ইয়াযন' রাজার একটি চাদর খরীদ করে মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি মুশরিকের কোন হাদিয়া গ্রহণ করিনে।' হাকীম চাদরটি বিক্রি করলে রাসূল (সা) ক্রয় করেন এবং গায়ে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন। হাকীম বলেন, এই পোশাকে এত সুন্দর আর কাউকে আমি আর কক্ষণও দেখিনি। রাসূলুল্লাহকে (সা) যেন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত দেখাচ্ছিল। অচেতনভাবে তখন আমার মুখ থেকে

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় একটি কবিতা বেরিয়ে আসে। (হায়াতুস সাহাবা-২/২৪৩-৪৪)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর ছাগল ক্রয়ের জন্য একটি দীনার দিয়ে হাকীমকে বাজারে পাঠালেন। তিনি বাজারে এক দীনারে একটি ছাগল ক্রয় করে আবার তা দুই দীনারে বিক্রি করেন। অতঃপর এক দীনার দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করে অন্য দীনারটিসহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর রিযিকের বরকতের জন্য দু'আ করলেন এবং লাভের দীনারটি সাদকা করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৫)।

হযরত হাকীমের মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারী তাঁর 'তারিখে' উল্লেখ করেছেন, তিনি হিজরী ৬০ (ষাট) সনে একশো বিশ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তবে উরওয়ার মতে, তিনি খলীফা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতের দশম বছরে মৃত্যুবরণ করেন।

নাওফিল ইবন হারেস (রা)

নাম নাওফিল, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু হারেস। পিতা হারেস ইবন আবদিল মুত্তালিব, মাতা গাঁযিয়্যা। কুরাইশ বংশের হাশেমী শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াতী কাজ শুরু করতেই নিকটতম আত্মীয়রাও তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। তবে নাওফিলের অন্তরে সব সময় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। এ কারণে পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বিরোধিতা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। মক্কার মুশরিকদের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বদরে যান। কিন্তু তখন তাঁর মুখে এই পংক্তিটি বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

"আহমাদের সাথে যুদ্ধ করা আমার জন্য হারাম, আহামাদকে আমি আমার নিকট আত্মীয় মনে করি।"

বদরে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পরাজয় হলে অন্যদের সাথে তিনিও বন্দী হন। এই বন্দী অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেনঃ নাওফিল, ফিদিয়া বা মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে যাও। নাওফিল বললেনঃ মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ আমার নেই। রাসূল (সা) বললেনঃ তাহলে জিদ্দায় রেখে আসা তোমার তীরগুলি মুক্তিপণ হিসেবে দান কর। নাওফিল বলে উঠলেনঃ আল্লাহর কসম, এক আল্লাহ ছাড়া জিদ্দার তীরগুলির কথা আর কেউ জানে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। জিদ্দায় তাঁর এক হাজার তীর ছিল। অবশ্য অন্য একটি মতে তিনি খন্দক যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় চলে যান। (টীকাঃ সীরাতু ইবন হিশাম ২/৩, আল-ইসাবা-৩/৫৭৭)

নাওফিল ছিলেন একজন ভালো কবি। ইসলাম গ্রহণের পর স্বীয় অনুভূতি অনেক কবিতায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপঃ

"দূরে যাও, দূরে যাও, আমি আর তোমাদের নই।
কুরাইশ নেতাদের দ্বীনের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
আমি সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই নবী।
তিনি তাঁর প্রভুর কাছ থেকে হিদায়াত ও দিব্যজ্ঞান নিয়ে এসেছেন।
তিনি আল্লাহর রাসূল—তাকওয়ার দিকে আহবান জানান,
আল্লাহর রাসূল কোন কবি নন।
এই বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো।
কবরেও আমি এই বিশ্বাসের ওপর শুয়ে থাকবো।
আবার কিয়ামতের দিন এই বিশ্বাস নিয়ে ওঠবো।"

খন্দক অথবা মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হযরত আব্বাসের (রা) সাথে আবার তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবওয়া পৌঁছে রাবীয়া ইবন হারেস ইবন আবদিল মুত্তালিব আবার মক্কায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। নাওফিল তাঁকে বলেনঃ যে স্থানের মানুষ আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে, যেখানের অধিবাসীরা তাঁকে অস্বীকার করে— সেই পৌত্তলিক ভূমিতে তুমি কোথায় ফিরে যাবে? এখন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্মান দান করেছেন, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তুমি আমাদের সাথেই চলো। অতঃপর কাফিলাটি হিজরাত করে মদীনায় পৌঁছে।

ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই নাওফিল ও আব্বাসের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। এ কারণে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং দু'জনের বসবাসের জন্য দু'টি বাড়ীও বরাদ্দ করেন। বাড়ী দু'টির একটি ছিল মসজিদে নববী সংলগ্ন 'রাহবাতুল কাদা' নামক স্থানে এবং অন্যটি ছিল বাজারে— 'সানিয়্যাতুল বিদা'র রাস্তায়।

মদীনায় আসার পর সর্বপ্রথম মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। তায়েফ ও হুনাইনসহ বিভিন্ন অভিযানে যোগ দিয়ে বিশেষ যোগ্যতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বিশেষতঃ হুনাইনে তিনি চরম সাহসিকতা দেখান। মুসলিম বাহিনী যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখনও তিনি শত্রুর মুকাবিলায় পাহাড়ের মত অটল থাকেন। এই যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীকে প্রভূত সাহায্য করেন। যাত্রার প্রাক্কালে তিন হাজার নিযা তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। রাসূল (সা) মন্তব্য করেনঃ 'আমি যেন দেখছি, তোমার তীরগুলি মুশরিকদের পিঠসমূহ বিদ্ধ করছে।' (টিকাঃ সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩)

হযরত নাওফিল (রা) হিজরী ১৫ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন এবং খলীফা হযরত উমার তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। মদীনার 'বাকী' গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সব সময় নাওফিলের খোঁজ খবর নিতেন, মদীনার এক মহিলার সাথে রাসূল (সা) তাঁর বিয়ে দেন। তখন তাঁর ঘরে কোন খাবার নেই। রাসূল (সা) স্বীয় বর্মটি আবু রাফে' ও আবু আইউবের হাতে দিয়ে এক ইয়াহুদীর নিকট পাঠান। তারা বর্মটি সেই ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখে বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ত্রিশ সা' যব খরীদ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তা নাওফিলকে দান করেন।

আবু রাফে' (রা)

হযরত আবু রাফে'র (রা) প্রকৃত নামের ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। যেমনঃ ইবরাহীম, আসলাম, সিনান, ইয়াসার, সালেহ, আবদুর রহমান, কারমান, ইয়াযীদ, সাবেত, হুরমুয ইত্যাদি। এর মধ্যে আসলাম নামটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (আল ইসাবা-৪/৬৭) আবু রাফে' তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম। বংশ কৌলিন্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমত করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে স্বীয় পরিবারের মধ্যে শামিল করে নেন। এর বেশী খান্দানী শরাফত কোন মানুষের জন্য আর হতে পারে না। আসলে তিনি ছিলেন একজন হাবশী দাস।

হযরত আবু রাফে' প্রথম হযরত 'আব্বাসের (রা) দাস ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) হিবা বা দান করেন। পরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত 'আব্বাসের (রা) ইসলাম গ্রহণের খুশীতে আবু রাফে'কে আযাদ করে দেন।

তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, হযরত রাসূলে পাকের (সা) পবিত্র মুখমণ্ডলের দীপ্তি দেখে যাঁরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন, আবু রাফে' তাদের অন্যতম। এ সম্পর্কে আবু রাফে' নিজেই বলছেনঃ একবার কুরাইশরা আমাকে তাদের কোন একটি কাজে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠায়। রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখামাত্র আমার অন্তর ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আর ফিরে যাব না। তিনি বললেন, 'আমি কাসেদ বা দূতকে ঠেকিয়ে রাখি না এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। এখন তুমি ফিরে যাও। এভাবে যদি কিছু দিন তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আবেগ বিদ্যমান থাকে তাহলে চলে এসো।' তখনকার মত তো তিনি ফিরে গেলেন এবং কিছুদিন পর আবার ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আবু রাফে' অত্যাচারী কুরাইশ শক্তির ভয়ে বদর যুদ্ধ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। বদর যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। এমন সময় একদিন তিনি কাবার পাশে যমযম কুয়োর ঘরে বসে তীর তৈরী করছেন। হযরত আব্বাসের স্ত্রী তাঁর পাশেই বসা। এ সময় নরাধম আবু লাহাব সেখানে এসে বসে। কিছুক্ষণ পর আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবও এসে বসে। আবু লাহাব তার কাছে বদর যুদ্ধের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। উল্লেখ্য যে, আবু লাহাব বদর যুদ্ধে নিজে যোগদান না করে প্রতিনিধি হিসাবে 'আস ইবন হিশামকে পাঠায়। আবু লাহাবের জিজ্ঞাসার জবাবে আবু সুফইয়ান বললোঃ তুমি কী জিজ্ঞেস করছো, মুসলমানরা আমাদের সকল শক্তি চুরমার করে দিয়েছে, অনেককে হত্যা ও বহু লোককে বন্দী করেছে। এ প্রসঙ্গে এক অভিনব কাহিনী বলা হয় যে, ভূমি থেকে আকাশ পর্যন্ত সাদা-কালো পোশাকের অশ্বারোহীতে পরিপূর্ণ ছিল। তার একথা শুনে আবু রাফে' অকস্মাৎ বলে ওঠেন, তারা ফিরিশতা। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফইয়ান আবু রাফে'র গালে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আবু রাফে' আঘাতটা সামলে নিয়ে রুখে দাঁড়ান; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল। আবু লাহাব তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং বুকের উপর উঠে বসে আচ্ছা মত মার দেয়। হযরত আব্বাসের স্ত্রী এ অত্যাচার দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একটি খুঁটি তুলে নিয়ে নরপশু আবু লাহাবের মাথায় কষে মারলেন এক বাড়ি। পাপাচারী আবু লাহাবের মাথা কেটে গেল। হযরত আব্বাসের স্ত্রী তখন বলতে লাগলেন, আবু রাফে'র মনিবের অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে দুর্বল মনে করে মারছো? এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর 'আদাসী' (বসন্ত) নামক রোগে আবু লাহারের মৃত্যু হয়। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩০-৩১)

তাবারানী ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পঞ্চম বছরে আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হই। সেটা ছিল আহযাব যুদ্ধের সময়। আমি ছিলাম আমার ভাই ফদল ইবন আব্বাসের সাথে। আমাদের সাথে আমাদের গোলাম আবু রাফে'ও ছিল। মদীনায় পৌছে আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) খন্দকের মধ্যে পেলাম। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আবু রাফে হিজরী ৫ম সনে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। (হায়াতুস সাহাবা ১/৩৭৩) তবে ইবন হিশাম হযরত আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাতের কিছুদিন পর একটু স্থির হয়ে আমাদেরকে নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন হারিসা ও আবু রাফেকে মদীনা থেকে মক্কায় পাঠান। (সীরাতু ইবন হিশাম)

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবু রাফে' ৫ম হিজরীর পূর্বেই মদীনায় পৌছেন। মদীনায় তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে বসবাস করতে থাকেন।

একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। খাইবারের যুদ্ধ সম্পর্কে আবু রাফে' বর্ণনা করেনঃ আমরা 'আলীর নেতৃত্বে খাইবারে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় পতাকা 'আলীর হাতে দিয়ে খাইবারে পাঠান। আমরা দুর্গের কাছাকাছি গেলে দুর্গবাসীরা বের হয়ে এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলো। আলী দুর্গের একটি দরযা ছিঁড়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সেটা তাঁর হাতে ছিল। তারপর ফেলে দেন। আমরা আট জন প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা উল্টাতে সক্ষম হইনি। (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪৬)

হিজরী সপ্তম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) হুদাইবিয়ার সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী মক্কায় গিয়ে 'উমরাতুল কাদা' আদায় করেন। আবু রাফে' এই সফরেও রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। এই সফরে মক্কায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত মায়মুনার শাদী মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। মক্কায় অবস্থানের মিয়াদ শেষ হলে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু রাফেকে মক্কায় রেখে 'সারফে' চলে যান। পরে আবু রাফে' হযরত মায়মুনাকে (রা) নিয়ে 'সারফে' পৌছেন এবং সেখানেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। তারপর সকলে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আলীর (রা) নেতৃত্বে যে বাহিনীটি ইয়ামনে পাঠান তাতে আবু রাফে'ও ছিলেন। হযরত আলী (রা) নিজের অনুপস্থিতিতে আবু রাফে'কে বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।

ইসলাম দাস তথা দুর্বল শ্রেণীর লোকদের উন্নতির যে সুযোগ দান করেছে, আবু রাফে' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দাস ছিলেন, তবে মর্যাদা ও যোগ্যতায় ছিলেন আযাদ লোকদের সমকক্ষ। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত ৬৮টি হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি ইমাম বুখারী ও তিনটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

দাসত্ব থেকে মুক্তির পরও তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমতের গৌরব হাতছাড়া করেননি। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ ও অভ্যাস সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল অনেক। বিশিষ্ট সাহাবীরা এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানার জন্য ভিড় করতেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) একজন সেক্রেটারী সংগে করে তাঁর কাছে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক অমুক দিন কি কি কাজ করতেন? আবু রাফে' বলতেন আর সেক্রেটারী তা লিখে নিতেন। (আল-ইসাবা-৪/৯২)

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আযাদ করে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে আবদ্ধ থাকেন। রাসূল (সা) যখন তাঁকে মুক্তি দেন, তখন আবু রাফের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। লোকেরা তাঁকে বলে, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছ, এতে কান্নার কি আছে! তিনি

বললেন, আজ একটি সোয়াব আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এরপর থেকে যদিও তিনি আইনগত ভাবে মুক্ত বা স্বাধীন হয়ে যান, তবে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতের মর্যাদা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন। সফরের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবু তিনিই তৈরী করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর এই গোলামীর সম্পর্কটা এত মধুর ও প্রিয় ছিল যে, আমরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) গোলাম বা দাস বলে নিজের পরিচয় দিতেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এক সাহাবী নাওফিল ইবন হারিসকে এক মহিলার সাথে বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর খাওয়ার মত কোন কিছু তার কাছে চাইলেন; কিন্তু পেলেন না। তখন রাসূল (সা) স্বীয় বর্মটি আবু রাফে' ও আবু আইউবের হাতে দিয়ে বিক্রীর জন্য পাঠালেন। তাঁরা বর্মটি এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখে তিরিশ সা' যব নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলেন। রাসূল (সা) যবগুলি নাওফিলের হাতে তুলে দিলেন। নাওফিল বলেন, আমরা সেই যবগুলি অর্ধ বছর খেয়েছিলাম। তারপর ওজন করে দেখলাম তা মোটেই কমেনি, পূর্বের মতই আছে। একথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললে তিনি মন্তব্য করলেন, যদি ওজন না করতে তাহলে সারা জীবন খেতে পারতে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩০)

হযরত আবু রাফে' জীবনের এক পর্যায়ে দারুণ অভাব ও অর্থকষ্টে পড়েন। এমনকি মানুষের কাছে হাত পেতে সাদকা ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে কক্ষনো প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করেননি। তাঁর জীবনের এ পর্যায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আবু রাফে' বলছেন, একদিন রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে আবু রাফে', যখন তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে তখন কেমন হবে?" আবু রাফে' বললেন, 'আমি কি সে অবস্থায় সাদকা গ্রহণ করবো?' রাসূল (সা) বললেন, 'হাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার দারিদ্র্য কখন আসবে?' বললেন, 'আমার মৃত্যুর পরে।' বর্ণনাকারী আবু সুলাইম বলেন, আমি তাঁকে দরিদ্র অবস্থায় দেখেছি। পথের ধারে বসে তিনি বলতেন, এই অন্ধ বৃদ্ধকে কে সাদকা করতে চায়, কে সেই ব্যক্তিকে দান করতে চায় যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন যে, সে ভবিষ্যতে দরিদ্র হবে? তিনি আরও বলে গেছেন, ধনী ব্যক্তির জন্য সাদকা গ্রহণ বৈধ নয় এবং বৈধ নয় সুস্থ্য ব্যক্তির জন্যও। আবু সুলাইম বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে আবু রাফে'কে চারটি দিরহাম দান করলো; কিন্তু তিনি একটি দিরহাম ফেরত দিলেন। লোকটি বললো, আবদুল্লাহ, আমার দান আপনি ফেরত দেবেন না। আবু রাফে' বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অতিরিক্ত সম্পদ জমা করতে নিষেধ করেছেন। আবু সুলাইম আরও বলেন, আমি শেষ পর্যন্ত আবু রাফে'কে ধনী ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি, আফসুস, আবু রাফে' যদি দরিদ্র অবস্থায় মারা যেত! (হায়াতুস সাহাবা-২/২৫৩-৫৪)

ওয়াকিদীর মতে হযরত আবু রাফে' খলীফা 'উসমানের (রা) মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে বা পরে, আর ইবন হিব্বানের মতে হযরত আলীর খিলাফত কালে মদীনায় ইনতিকাল করেন। (আল ইসাবা-৪/৬৭)

উবাইদাহ ইবনুল হারিস (রা)

নাম 'উবাইদাহ, কুনিয়াত আবুল হারিস বা আবু মু'য়াবিয়া। পিতা আল হারিস এবং মাতা সুখাইলা। দাদা আবদুল মুত্তালিব ইবন আবদে মান্নাফ। কুরাইশ গোত্রের সন্তান।

'উবাইদাহ ইবনুল হারিস, আবু সালামা ইবনে আবদিল আসাদ, আল-আরকাম ইবন আবিল আরকাম এবং উসমান ইবন মাজউন হযরত আবু বকরের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে একসাথে ঈমান আনেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখন আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নেননি। হযরত উবাইদাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি বনী 'আবদে মান্নাফের একজন নেতা। মক্কায় হযরত বিলালকে তিনি দ্বীনী ভাই হিসাবে গ্রহণ করেন।

মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ হলো। হযরত উবাইদাহ তাঁর দুই ভাই তুফাইল, হুসাইন এবং মিসতাহ ইবন উসাসাহ্‌কে সাথে করে মদীনায় রওয়ানা হলেন। পথে মিসতাহকে অকস্মাৎ বিচ্ছুতে দংশন করে। তিনি কাফিলা থেকে পেছনে পড়ে গেলেন। মিসতাহ হাঁটা-চলা করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়লেন। অগ্রগামী কাফিলার লোকেরা খবর পেয়ে ফিরে এসে তাঁকে উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে যান। মদীনায় হযরত আবদুর রহমান 'আজলানী (রা) তাদের স্বাগত জানান এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে তাঁদের আতিথেয়তা করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পর পর হযরত 'উমাইর ইবন হুমাম আল আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথকভাবে বসবাসের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে একখণ্ড জমিও দান করেন। তাঁর পুরো খান্দান সেখানে বসতি স্থাপন করে।

মক্কার মুশরিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য হিজরাতের আট মাস পরে ৬০ জন মুহাজিরের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে রাসূল (সা) তাঁকে রাবেগের দিকে পাঠান। ইসলামের ইতিহাসে এটা ছিল দ্বিতীয় অভিযান। রাসূলুল্লাহ (সা) এ বাহিনীর ঝাণ্ডা উবাইদার হাতে অর্পণ করেন। তাঁরা রাবেগের নিকটে পৌঁছলে আবু সুফইয়ানের নেতৃত্বে দু'শো মুশরিকের একটি বাহিনীর সাথে তাঁদের সামান্য সংঘর্ষ হয়। ব্যাপারটি যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্যন্ত না গড়িয়ে কিছু তীর ও বর্শা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

এ ঘটনার পর তিনি হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কাতারবন্দী হওয়ার পর মুশরিকদের পক্ষ থেকে উতবা, শাইবা ও ওয়ালীদ বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে— আমাদের সাথে লড়বার কেউ আছে কি? ইসলামী ফৌজ থেকে কয়েকজন নওজোয়ান আনসারী এগিয়ে গেলেন। তখন তারা চেঁচিয়ে বললো, "মুহাম্মাদ, আমরা অসম লোকদের সাথে লড়তে পারিনে। আমাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাঠাও।" রাসূল (সা) আলী, হামযা ও উবাইদাহকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা এ আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। এ তিন বীর আদেশ পাওয়া মাত্র আপন আপন নিযা দোলাতে দোলাতে তিন প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত উবাইদাহ ও ওয়ালীদের মধ্যে দীর্ঘ সময় লড়াই চললো। তাঁরা দু'জনই মারাত্মক যখম হলেন। তবে আলী ও হামযা উভয়েই প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলেছিলেন। তারা একসাথে ওয়ালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন এবং হযরত উবাইদাহকে রণাঙ্গন থেকে আহত অবস্থায় তুলে নিয়ে আসেন।

হযরত উবাইদাহর একটি পা হাঁটুর নীচ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তাঁর হাঁটুর ওপর স্বীয় মাথাটি রেখে দেন।

এ অবস্থায় উবাইদাহ বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ সময় আবু তালিব জীবিত থেকে আমার এ অবস্থা দেখলে তাঁর প্রত্যয় হতো যে, তাঁর একথা বলার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি আমি। এই বলে তিনি আবু তালিবের একটি কবিতার এই পংক্তি আবৃত্তি করেন, "আমরা মুহাম্মাদের হিফাজত করবো। এমনকি তার চারপাশে মরে পড়ে থাকবো এবং আমাদের সন্তান ও স্ত্রীদের আমরা ভুলে যাব।" (সীরাতু ইবন হিশাম-২)

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সাথে করে মদীনার দিকে রওয়ানা হন। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। পথে 'সাফরা' নামক স্থানে ৬৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। সাফরার বালুর মধ্যে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত রাসূলে কারীমের কাছে তাঁর উঁচু মর্যাদা ছিল। রাসূল (সা) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান দেখাতেন। একবার রাসূল (সা) 'সাফরায়' তাঁর কবরের কাছে তাঁবু স্থাপন করেন। সাহাবীরা 'আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ এখান থেকে মিশকের ঘ্রাণ আসছে। তিনি বললেন, "এখানে তো আবু মুয়াবিয়ার কবর ছিল। সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।"

হযরত উবাইদার (রা) মৃত্যুতে হিন্দা বিনতু উসাসা ও কা'বসহ বহু কবি শোকগাথা রচনা করেছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৪, ২৫, ৪১)

'উকাশা ইবন মিহসান (রা)

নাম 'উকাশা বা 'উক্‌কাশা, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু মিহসান। পিতা মিহসান ইবন হুরসান। জাহিলী যুগে বনী আবদে শামসের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।

হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যদের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যান। (উসুদুল গাবা-৪/২)।

বদর যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য দারুণ নাম করেন। এ যুদ্ধে তাঁর হাতের তরবারিটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি খেজুরের ছড়ি দান করেন এবং তা দিয়েই তিনি সূচালো ছুরির মত শত্রুর ওপর আক্রমণ চালান। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি এ ছড়ি দিয়েই লড়ে যান। (ইসতীয়াব) ইবন সাদ যায়িদ ইবন আসলাম ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করছেন ঃ বদরের দিন 'উকাশা ইবন মিহসানের অসিটি ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে একটি কাঠের লাঠি দেন। সেটি তাঁর হাতে স্বচ্ছ ঝকমকে কঠিন লোহার তীক্ষ্ণ অসিতে পরিণত হয়। (হায়াতুস সাহাবা—৩/৬৫৮)

উহুদ, খন্দকসহ সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি চরম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। হিজরী সপ্তম সনের রাবীউল আউয়াল মাসে বনী আসাদের মূলোৎপাটনের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মদীনার পথে 'গামার' কূপের আশেপাশে ছিল এই বনী আসাদের বসতি। তিনি চল্লিশ জনের একটি বাহিনী নিয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে হাজির হন। কিন্তু বনী আসাদের লোকেরা ভয়ে আগেভাগেই সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যায়। 'উকাশা কাউকে না পেয়ে তাদের পরিত্যাক্ত দু'শো উট ও কিছু ছাগল-বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

হিজরী ১২ সনে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ভণ্ডনবী তুলাইহা আসাদীর বিদ্রোহ নির্মূলের নির্দেশ দেন। হযরত 'উকাশা ও হযরত সাবিত ইবন আকরাম ছিলেন হযরত খালিদের বাহিনীর দু'জন অগ্রসৈনিক। তাঁরা বাহিনীর আগে আগে চলছিলেন। হঠাৎ শত্রু সৈন্যের সাথে তাঁদের সংঘর্ষ ঘটে। এই শত্রু সৈনিকদের মধ্যে তুলাইহা নিজে ও তাঁর ভাই সালামাও ছিল। তুলাইহা আক্রমণ করে 'উকাশাকে, আর সালামা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাবিতের ওপর। সাবিত শাহাদত বরণ করেন। এমন সময় তুলাইহা চেঁচিয়ে ওঠে "সালামা শিগগির আমাকে সাহায্য কর। আমাকে মেরে ফেললো।" সালামার কাজ তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তুলাইহার সাহায্যে এগিয়ে যায় এবং দুই ভাই একসাথে 'উকাশাকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলে। এভাবে 'উকাশা শহীদ হন।

ইসলামী ফৌজ এই দুই শহীদের লাশের কাছে পৌঁছে ভীষণ শোকাতুর হয়ে পড়ে। হযরত 'উকাশার দেহে মারাত্মক যখমের চিহ্ন ছিল। তাঁর সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। বাহিনী প্রধান হযরত খালিদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাহিনীর যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। অতঃপর শহীদ দু'য়ের রক্তভেজা কাপড়েই কাফন দিয়ে সেই মরুভূমির বালুতে দাফন করেন।

মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। (উসুদুল গাবা-৪/৩) হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার বলেন, সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'উকাশা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ? বললেন, তুমিও তাদের মধ্যে। অতঃপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'উকাশা তোমার থেকে এগিয়ে গেছে। এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাক্যটি একটি প্রবাদে পরিণত হয়। কেউ কোন ব্যাপারে কাউকে ছাড়িয়ে গেলে বলা হয়, অমুক 'উকাশার মত এগিয়ে গেছে।

শাম্মাস ইবন 'উসমান (রা)

নাম শাম্মাস, পিতার নাম 'উসমান এবং মাতার নাম সাফিয়্যাহ্। কুরাইশ গোত্রের বনু মাখযুম শাখার সন্তান।

হিশাম কালবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল 'উসমান। শাম্মাস নামকরণের কারণ এই যে, একবার জাহিলী যুগে পরম সুন্দর এক খৃষ্টান পুরুষ মক্কায় আসে। তার চেহারা থেকে যেন সূর্যের কিরণ চমকাচ্ছিল। তার এ অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য দেখে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। হযরত শাম্মাসের মামা 'উতবা ইবন রাবী'য়া এ সময় দাবী করলো যে, তার কাছে এর থেকেও বেশী সূর্যের কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন মানুষ আছে। আর সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হযরত শাম্মাসকে উপস্থাপন করে। সেদিন থেকে 'উসমান শাম্মাসে পরিণত হন। শাম্মাস অর্থ অতিরিক্ত সূর্য কিরণ বিচ্ছুরণকারী। (উসুদুল গাবা-৩/৩৭৫) যুবাইর ইবন বাক্কার বলেনঃ তিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম সুদর্শন ব্যক্তি। (আল-ইসাবা১/১৫৫)

হযরত শাম্মাস ও তাঁর মা হযরত সাফিয়্যা বিনতু রাবী'য়া প্রথম পর্বেই রাসূলুল্লাহর (সা) দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুশরিকদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। সংগে মা সাফিয়্যাকেও নিয়ে যান। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় হযরত মুবাশ্শির ইবন আল-মুনজিরের অতিথি হন। হযরত হানজালা ইবন আবী 'আমের আল-আনসারীর সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদর ও উহুদ যুদ্ধে হযরত শাম্মাস বীরত্বের সাথে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন। উহুদের যুদ্ধে হঠাৎ করে যখন মুসলমানদের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয় এবং মাত্র গুটি কয়েক জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ ছাড়া আর সকলে ময়দান ছেড়ে দেয়, সেই চরম মুহূর্তে যে ক'জন রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে থেকে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করেন তাঁদের মধ্যে শাম্মাস একজন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেনঃ এক ঢাল ছাড়া আমি শাম্মাসের আর কোন উপমা পাইনা। রাসূল (সা) সেদিন ডানে-বাঁয়ে যেদিকে তাকান কেবল শাম্মাসই দৃষ্টিতে পড়েন। তিনি নিজেকে সেদিন রাসূলুল্লাহর ঢালে পরিণত করেন। তাঁর সারাটি দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল প্রাণ স্পন্দন কোন রকম অবশিষ্ট আছে। এ অবস্থায় মদীনায় আনা হলো। হযরত উম্মু সালামাকে তাঁর সেবার দায়িত্ব দেওয়া হলো। কিন্তু তখন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়। একদিন পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর রক্তমাখা জামা-কাপড়েই জানাযার নামায ছাড়াই উহুদের শহীদদের কবরস্থানে দাফন করার নির্দেশ দেন। তাঁকে আবার উহুদে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়। তবে ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেনঃ তাঁকে মদীনার বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়। তিনি ছাড়া উহুদে শাহাদাত প্রাপ্ত আর কেউ বাকী' গোরস্তানে সমাহিত হননি। (আল ইসাবা-২/১৫৫) হযরত হাস্সান (রা) তাঁর মৃত্যুতে শোক গাঁথা রচনা করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র চৌত্রিশ বছর।

শুজা' ইবন ওয়াহাব (রা)

নাম শুজা', কুনিয়াত আবু ওয়াহাব এবং পিতা ওয়াহাব। জাহিলী যুগে তাঁর খান্দান বনী 'আবদে শামস-এর হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিল। (উসুদুলগাবা-২/৩৮৬)

যাঁরা ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন, হযরত শুজা' তাঁদেরই একজন। মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে হাবশা হিজরাতকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশা যান। (আল-ইসাবা-৩/১৩৮) তাঁদের হাবশা অবস্থান কালে যখন সেখানে এ গুজব রটে যে মক্কার সকল বাসিন্দা রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তখন স্বদেশের ভালোবাসা অনেকের মত তাঁকেও মক্কায় টেনে নিয়ে আসে। মক্কায় এসে দেখেন খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর নিরাপদে মদীনায় হিজরাত করেন। এখানে হযরত আউসের সাথে তার দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বদর, উহুদ সহ সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। হিজরী ৮ম সনের রবীউল আউয়াল মাসে বনী হাওয়াযিনের একটি দলকে নির্মূলের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। এই বনী হাওয়াযিন মদীনা থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে 'রস্‌সী' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেছিল। হযরত শুজা' চব্বিশ জন দুঃসাহসী মুজাহিদকে সংগে করে দিনের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে এবং রাতের বেলা সদম্ভে ভ্রমণ করতে করতে একদিন হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের বিপুল সংখ্যক উট, ভেড়া-বকরী ছিনিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। গানীমতের মালের পরিমাণ এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, প্রত্যেক মুজাহিদের ভাগে অন্যান্য জিনিসপত্র ছাড়াও পনরটি উট পড়েছিল।

হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সা) তৎকালীন বিশ্বের অধিকাংশ রাজা-বাদশাদের নিকট পত্রসহ দূত পাঠান। রাসূল (সা) হযরত শুজা'কে একটি পত্র সহ হারেস ইবন আবী শিম্‌র আল-গাস্‌সানী মতান্তরে মুনজির ইবন হারেস ইবন আবী শিম্‌র আল-গাস্‌সানীর নিকট পাঠান। হায়াতুসসাহাবা—১/১২৭) এই হারেস ছিল দিমাশকের নিকটবর্তী 'গুতা' স্থানের শাসক। রাসূল (সা) তাঁকে যে পত্রটি লেখেন তার প্রথম কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারেস ইবন আবী শিমরের প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, ঈমান আনে এবং সত্য বলে জানে তাদের উপর সালাম। আমি আপনাকে সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি যিনি এক, যার কোন শরিক নেই। এমতাবস্থায় আপনার রাজত্ব বহাল থাকবে।"

হারেস এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তবে তার উযীর 'মুরাই' ইসলাম গ্রহণ করেন এবং গোপনে হযরত শুজা'র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে সালাম পেশ করেন।

ইমাম যুহরী বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, শুজা' ইবন ওয়াহাব ছিলেন পারস্যের কিসরার দরবারে প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) দূত। রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিটি তিনিই কিসরার হাতে অর্পন করেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/১৩৬)

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ইয়ামামার প্রান্তরে হযরত শুজা' শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসাবা-২/১৩৮) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছরের কিছু বেশী।

মিহরায ইবন নাদলা (রা)

নাম মিহরায, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু ফাদলাহ। তবে প্রধানতঃ 'আখরাম আল-আসাদী' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি কখন কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তিনি প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন বলে সীরাত বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করার পর আবদুল আশহাল গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং হযরত 'আম্মার ইবন হাযামের (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মূসা ইবন 'উকবা, ইবন ইসহাক ও অন্যরা তাঁকে বদরী সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী আয়্যুব ইবন নু'মান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ বদরে মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের ভাই আবু 'আযীয ইবন 'উমাইর বন্দী হয়। তাকে মিহরায ইবন নাদলার হিফাজতে দেওয়া হয়। মুসয়াব মুহরিযকে বলেনঃ 'ওর হাতটি একটু কষে বাঁধ। মক্কায় ওর একজন সম্পদশালী মা আছে।' আবু আযীয বলেঃ ভাই, আমার প্রতি আপনার এমন নির্দেশ? মুসয়াব বললেনঃ তোমার স্থলে মুহরিয আমার ভাই।' আবু আযীযের মুক্তির জন্য তার মা চার হাজার দিরহাম পাঠায়। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৫)

উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধেও তিনি জীবন বাজি রেখে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো 'জী কারাদের' যুদ্ধ। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে বনু ফাযারাহ মদীনার উপকণ্ঠে একটি চারণক্ষেত্রে হামলা চালায় এবং রাখালদের হত্যা করে রাসূলুল্লাহর (সা) উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া ঘটনাস্থলের নিকটেই ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দাস রাবাহকে, মতান্তরে আবদুর রহমান ইবন 'আউফের একটি দাসকে মদীনায় পাঠান খবর দেওয়ার জন্য। আর এ দিকে তিনি নিজে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে 'ইয়া সাবাহাহ' (বিপদের সর্তক ধ্বনি) বলে এমন জোরে ধ্বনি দেন যে, মদীনার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি দীর্ঘক্ষণ একাকী তীর ও পাথরের সাহায্যে এই ডাকাত দলের মুকাবিলা করতে থাকেন। এর মধ্যে গাছের ফাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহিনী ছুটে আসতে দেখা গেল। সেই বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন হযরত মুহরিয ইবন নাদলা। আর তাঁর পেছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ আল-আনসারী ও মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)। হযরত সালামা ইবন আকওয়া হযরত আখরাম বা মিহরাযের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেনঃ "আখরাম, আগে অগ্রসর হবে না। আমার ভয় হচ্ছে, ডাকাতরা তোমাকে ঘিরে ফেলবে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে তোমাকে মিলিত হতে দেবে না।" তিনি জবাব দিলেনঃ 'সালামা, তুমি যদি আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক, আর তোমার যদি একথা জানা থাকে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তাহলে আমার শাহাদাত লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ো না। কথাটি তিনি এমন আবেগের সাথে উচ্চারণ করেন যে, হযরত সালামা (রা) তাঁর ঘোড়ার লাগামটি ছেড়ে দেন। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে আবদুর রহমান ইবন ফাযারীর সামনে গিয়ে পথ রুখে দাঁড়ান। তিনি আবদুর রহমানের উপর তরবারির এমন শক্ত আঘাত হানেন যে, তার ঘোড়াটি কেটে দু'টুকরো হয়ে যায়। এদিকে আবদুর রহমানের নিক্ষিপ্ত বর্শাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। হযরত মিহরাযের শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর আবদুর রহমান লাফিয়ে মিহরাযের ঘোড়ার উপর চড়ে বসে। পেছনেই ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ। তিনি সাথে সাথে আব্দুর

রহমানের উপর তীব্র আঘাত হানেন। এভাবে আবু কাতাদাহ (রা) আবদুর রহমানকে জাহান্নামে পাঠিয়ে বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেন। শাহাদাতের সময় হযরত মিহরাযের বয়স হয়েছিল ৩৭ অথবা ৩৮ বছর।

উপরে উল্লেখিত ঘটনা তাঁর ঈমানী দৃঢ়তা ও শাহাদাতের তীব্র আকাংখার স্পষ্ট প্রমাণ। শাহাদাতের কয়েকদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, আকাশের দরযাসমূহ তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি সর্বোচ্চ জগতে ভ্রমণ করতে করতে সিদরাতুল মুন্‌তাহা পৌঁছে গেছেন। সেখানে তাঁকে বলা হয়, এটাই তোমার আবাসস্থল।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন স্বপ্নের তাবীর বা তাৎপর্য ব্যাখার ক্ষেত্রে সুবিজ্ঞ। হযরত মিহরায পরের দিন তাঁর নিকট স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ 'আখরাম, তোমার শাহাদাতের সুসংবাদ।' এ ঘটনার কিছুদিন পর 'জী কারাদ' অভিযানে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় এবং তিনি তাঁর স্থায়ী আবাসস্থল 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা' পৌঁছে যান।

শুকরান সালেহ (রা)

নাম সালেহ, লকব বা উপাধি 'শুকরান'। পিতার নাম আদী। হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফের (রা) হাবশী বংশজাত দাস। তবে এই দাসত্বের মধ্যেও নেতৃত্বদান তাঁর ভাগ্যে ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজের কাজের জন্য তাঁকে নির্বাচন করেন। অর্থের বিনিময়ে তাঁকে আবদুর রহমানের নিকট থেকে খরীদ করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আবদুর রহমান কোন রকম অর্থ বিনিময় ছাড়াই তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকূলে হিবা করেন।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। তিনি কখন কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কেও তেমন কোন তথ্য সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

অধিকাংশ যুদ্ধে হযরত শুকরান যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও কয়েদীদের হিফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। এ কারণে যুদ্ধে তিনি একদিকে গানীমতের অংশ পেতেন, আবার অন্যদিকে যাঁদের কয়েদীদের দেখা-শুনার দায়িত্ব পালন করতেন তাদের নিকট থেকে পারিশ্রমিক পেতেন। আবু মা'শার বলেন, তিনি দাস হিসাবে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কারণে বদরের গানীমতের অংশ তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবে বদরে বন্দীদের দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থ তাঁকে দান করে। এতে যাঁরা গানীমতের অংশ পেয়েছিলেন তাঁদের থেকেও তিনি বেশী পেয়ে যান। বদর যুদ্ধে তাঁর দায়িত্ব পালনে সতর্কতা ও দক্ষতা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করেন।

'মাররে ইয়া'সী' যুদ্ধে পরাজিত শত্রু বাহিনীর পরিত্যাক্ত অর্থ সম্পদ অস্ত্র-শস্ত্র, ছাগল-বকরী ও তাদের অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী জমা করার দায়িত্বে তাঁকে নিয়োজিত করা হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর প্রতি এত প্রসন্ন ছিলেন যে, ইনতিকালের সময় তাঁর প্রতি সদাচরণের জন্য অসীয়াত করে যান। হযরত শুকরান (রা) আহলে বাইত বা রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবার-পরিজনদের সাথে তাঁর দাফন-কাফনে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইবন ইসহাক আলী ইবনুল হুসাইনের সূত্রে বর্ণনা করেন, আলী ইবন আবু তালিব, ফাদল ইবন আব্বাস, কুসাম ইবন আব্বাস, শুকরান মাওলা রাসূলিল্লাহ ও আউস ইবন খাওলা কবরে নেমে রাসূলুল্লাহকে কবরে শায়িত করেন। (আল-ইসাবা ২/১৫৩, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬৪)।

হযরত রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত শুকরান (রা) মদীনায় থাকেন না বসরায় বসতি স্থাপন করেন—এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারণ, বসরায় তাঁর একটি বাড়ী ছিল। তাঁর মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কেও সঠিকভাবে জানা যায় না। ইতিহাসে তিনি শুকরান মাওলা রাসূলিল্লাহ—রাসূলুল্লাহর আযাদকৃত দাস শুকরান নামে প্রসিদ্ধ।

উমাইর ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা)

নাম 'উমাইর, পিতা আবু ওয়াককাস, মাতা হামনা বিনতু সুফইয়ান। ইরান বিজয়ী হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাসের সহোদর।

হযরত 'উমাইরের বড় ভাই হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াককাস ইসলামের সূচনা পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন হযরত 'উমাইরের বয়স যদিও কম তথাপি তিনি বড় ভাই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে হিজরাত করে মদীনায় পৌছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার 'আবদুল আশহাল গোত্রের সরদার হযরত সা'দ ইবন মুয়াজের ছোট ভাই হযরত 'আমর ইবন মু'য়াজের সাথে তাঁর দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁরা দু'জনই প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

হিজরী ২য় সনে বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সৈনিক নির্বাচন করছেন। হযরত 'উমাইরও সমাবেশে হাজির হয়েছেন। তাঁর ভাই সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস দেখলেন, 'উমাইর তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে অস্থির হয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। তিনি ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ উমাইর, কি হয়েছে তোমার ? তিনি জবাব দিলেন ঃ ভাই, আমিও যুদ্ধে শরিক হতে চাই। হতে পারে, আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করবেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে ছোট মনে করে রাসূলুল্লাহ (সা) ফিরিয়ে না দেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখন সকলে একের পর এক হাজির হলেন তখন 'উমাইরের আশংকা সত্যে পরিণত হলো। তিনি 'উমাইরের বয়সের দিক লক্ষ্য করে বললেনঃ 'তুমি ফিরে যাও। একথা শুনে হযরত 'উমাইর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর এ কান্না, জিহাদের আগ্রহ ও শাহাদাতের তীব্র বাসনা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) মুগ্ধ হন। 'উমাইর যুদ্ধে শরিক হওয়ার অনুমতি লাভ করেন। রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁর তরবারিটি ঝুলিয়ে দেন।

হযরত 'উমাইর (রা) তখন ষোল বছরের এক কিশোর। 'ভালোমত অস্ত্র-শস্ত্রও ধরতে জানেন না। তাঁর বড় ভাই তরবারি ধরা শিখিয়ে দিলেন। শাহাদাতের প্রবল আবেগ উৎসাহে তিনি কাফিরদের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ চরম বীরত্বের সাথে লড়লেন। এ অবস্থায় আমর ইবন আবদে উদ্দের অসির প্রচণ্ড আঘাত তাঁর শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ করে দেয়। ইন্নালিল্লহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/৫৯৯) খন্দকের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) ঘাতক 'আমরইবন 'আবদে উদ্দকে হত্যা করেন। (আল ইসাবা—৩/৭০)

আবু সুফইয়ান ইবন হারেস (রা)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু সুফইয়ান ইবন হারেসের মধ্যে যতখানি গভীর ও শক্ত সম্পর্ক ছিল তা খুব কম লোকের সাথেই ছিল। তাঁরা দু'জন একই পরিবারে একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জন পরস্পর চাচাতো ভাই। আবু সুফইয়ানের পিতা হারেস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বড় চাচা। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগে মারা যান। (টীকাঃ সীরাতু ইবন হিশাম- ১/১৬৩) রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু সুফইয়ান পরস্পর দুধ-ভাই! হযরত হালীমা আস-সা'দিয়্যাহ তাঁদের দু'জনকে দুধ পান করান! রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। দু'জনের চেহারার মধ্যেও যথেষ্ট মিল ছিল। ইবনুল মুবারক, ইবরাহীম ইবন মুনজির প্রমুখের মতে আবু সুফইয়ানের নাম মুগীরা এবং কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু সুফইয়ান। (আল-ইসাবা- ৪/৯০, সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৭)

নানাদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে এত গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনালগ্নেই আবু সুফইয়ান তাঁর ওপর ঈমান আনবেন ও তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেবেন। কিন্তু যা স্বাভাবিক ছিল তা না হয়ে ঘটলো তার বিপরীত। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করতেই আবু সুফইয়ানের সব বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও অবাধ্যতার রূপ নিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দাওয়াত দিতে শুরু করেন আবু সুফইয়ান তখন কুরাইশদের একজন নামযাদা অশ্বারোহী বীর এবং একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তাঁর জিহবা ও তীর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতায় নিয়োজিত করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় তিনি তাঁর সকল শক্তি একীভূত করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে কুরাইশরা যত যুদ্ধের পরিকল্পনা করে আবু সুফইয়ান তাতে ইন্ধন যোগায়। কুরাইশদের হাতে মুসলমানরা যত রকমের কষ্টভোগ করে তাতে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। তিনি তাঁর কাব্য শক্তি রাসূলুল্লাহর হিজা বা নিন্দায় নিয়োজিত করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে তিনি একটি অশালীন কবিতাও রচনা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কবি হযরত হাস্সান ইবন সাবিত (রা) তাঁর একটি বিখ্যাত কাসীদার একটি লাইনে বলেনঃ "তুমি নিন্দা করেছ মুহাম্মাদের, আমি জবাব দিয়েছি, এর প্রতিদান আল্লাহর কাছে।" মূলতঃ এ লাইনটি আবু সুফইয়ানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। (আল-ইসাবা- ৪/৯০)

হযরত রাসূলে কারীমের সাথে আবু সুফইয়ানের এ শত্রুতা দীর্ঘ বিশ বছর চলে। এ দীর্ঘ সময়ে আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যতরকম ষড়যন্ত্র করা যেতে পারে সবই তিনি করেন। বদর যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বর্ণনা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। হযরত আবু রা'ফে বর্ণনা করেন। আমি বদর যুদ্ধের পর মক্কায় যমযম কূপের নিকট বসে তীর বানাচ্ছি, এমন সময় আবু লাহাব এসে আমার পাশে বসলো। সে কোন কারণবশতঃ বদরে অংশগ্রহণ না করে অন্য একজনকে নিজের পরিবর্তে পাঠিয়েছিল। তারপর আবু সুফইয়ান ইবন হারেস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব এলো। আবু লাহাব তাকে কাছে বসিয়ে তার কাছে বদরের ঘটনা বিস্তারিত জানতে চায়। আবু সুফইয়ান বলেঃ আল্লাহর কসম, তারা ছিল এমন একটি দল যাদের কাছে আমরা আমাদের কাঁধ সমর্পণ করেছিলাম। তারা তাদের ইচ্ছা মত আমাদের পরিচালিত করে, ইচ্ছামত আমাদের বন্দী করে। আল্লাহর কসম, এত কিছু সত্ত্বেও আমি আমাদের লোকদের তিরস্কার করিনা। কারণ, আমরা

আসমান ও যমীনের মাঝে সাদা-কালো উড়ন্ত অশ্বের ওপর কিছু সাদা ধবধবে আরোহী দেখতে পেয়েছি। আল্লাহর কসম, কোন কিছুই তাদের মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। আবু রাফে সাথে সাথে বলে ওঠেন ; আল্লাহর কসম, তারা ফিরিশতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আবু লাহাব আবু রা'ফের গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়।

(সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৬-৪৭, হায়াতুস সাহাবা-৩ /৫৩০)

অবশেষে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে ইসলামের সাথে আবু সুফইয়ানের শত্রুতার সমাপ্তি ঘটে। ইতিহাসে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবু সুফইয়ান বলেন, ইসলাম যখন সবল হয়ে উঠলো এবং এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূল (সা) মক্কা জয়ের জন্য এগিয়ে আসছেন, তখন আমি চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। আমি আপন মনে বলতে লাগলাম, এখন কোথায় যাব, কার সাথে যাব এবং কোথায় কার সাথে থাকবো?

এসব চিন্তা-ভাবনার পর আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের কাছে গিয়ে বললাম, মক্কা থেকে বের হওয়ার জন্য তৈরী হও। মুহাম্মাদের মক্কায় প্রবেশের সময় ঘনিয়ে এসেছে। মুসলমানরা আমাকে হাতে পেলেই হত্যা করবে।

তারা আমাকে বললো, 'আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আরব-অনারব সকলেই মুহাম্মাদের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর দ্বীন কবুল করছে। আর আপনি এখনও তার শত্রুতার জেদ ধরে বসে আছেন? অথচ আপনারই সর্বপ্রথম তাঁর সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এভাবে তারা আমাকে মুহাম্মাদের দ্বীনের প্রতি উৎসাহী ও আকৃষ্ট করে তুলতে লাগলো। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলেন।

আমি তক্ষুণি উঠে আমার দাস মাজকূরকে একটি উট ও একটি ঘোড়া প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলাম। আমার পুত্র জাফরকেও আমি সংগে নিলাম। আমরা খুব দ্রুত মক্কা-মদীনার মাঝখানে "আবওয়া"র দিকে চললাম। আমি আগেই জেনেছিলাম মুহাম্মাদ সেখানে পৌঁচেছেন।

আমি 'আবওয়া'র কাছাকাছি পৌঁছে ছদ্মবেশ ধারণ করলাম, যাতে কেউ আমাকে চিনে ফেলে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হয়ে ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে মেরে না ফেলে। আমি প্রায় এক মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে এগুতে লাগলাম। আর দেখতে লাগলাম মুসলমানদের অগ্রগামী দলগুলি একটির পর একটি মক্কার দিকে চলছে। কেউ আমাকে চিনতে পারে এই ভয় ও আশংকায় আমি তাদের পথ থেকে একটু দূর দিয়ে এগুতে লাগলাম। এই জনস্রোতের মধ্যে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নজরে পড়লেন। আমি খুব ত্বরিৎ গতিতে তাঁর সামনে হাজির হয়ে আমার মুখাবরণ খুলে ফেললাম। তিনি আমাকে চিনতে পেরেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি ঘুরে আবার তাঁর সামনে গেলাম। তিনি আবারও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করলেন।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুশী হবেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ (সা) আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন তারাও মুখ কালো করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আবু বকর আমাকে দেখে অত্যন্ত কঠিনভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি অত্যন্ত অসহায়ভাবে উমার ইবনুল খাত্তাবের দিকে তাকালাম। তিনিও তাঁর সাথী অপেক্ষা অধিক কঠোরতার সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি বরং একজন আনসারীকে আমার বিরুদ্ধে উসকে দিলেন। সেই আনসারী আমাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ 'ওরে আল্লাহর দুশমন! তুই আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের কষ্ট দিয়েছিস। রাসূলের সাথে দুশমনির ক্ষেত্রে তুই পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিস। উক্ত আনসারী উচ্চ কণ্ঠে আমাকে ভর্ৎসনা ও গালি-গালাজ করছে, আর মুসলমানরা আমার পাশে ভিড় করে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তা শুনে উপভোগ করছে।

এমন সময় আমি আমার চাচা আব্বাসকে দেখলাম। আমি তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে

বললাম, চাচা, আমার আশা ছিল, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার আত্মীয়তা এবং আমার কাওমের মধ্যে আমার মর্যাদার কারণে তিনি আমার ইসলাম গ্রহণে খুশী হবেন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার ব্যাপারে কথা বলে তাঁকে একটু রাজী করান। তিনি বললেন; তোমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন এ দৃশ্য দেখার পর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তোমার প্রসঙ্গে একটি কথাও বলতে পারবো না। তবে, যদি কখনও সুযোগ আসে বলবো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে যেমন সম্মান করি তেমন ভয়ও করি।

আমি বললাম, চাচা, আমাকে তাহলে কার দায়িত্বে ছেড়ে দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, এইমাত্র তুমি যা শুনলে তাঁর অতিরিক্ত আমি কিছুই করতে পারবো না।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় আমার অন্তর ভরে গেল। হঠাৎ আমি আমার চাচাতো ভাই আলী ইবন আবু তালিবকে দেখলাম। বিষয়টি আমি তাঁকে বললাম। তিনিও চাচা আব্বাসের মত জবাব দিলেন, আমি আবার চাচা আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, চাচা, যদি আপনি আমার প্রতি রাসূলুল্লাহর অন্তর নরম করতে না পারেন, তাহলে এতটুকু অন্ততঃ করুন, যে লোকটি আমাকে নিন্দা করছে ও গালি দিচ্ছে এবং মানুষকে আমার প্রতি ক্ষেপিয়ে তুলছে, তাকে একটু ঠেকান। তিনি বললেন, লোকটি কেমন— একটু বর্ণনা দাওতো। আমি বর্ণনা দিলাম। তিনি বললেন, সে তো নুয়াইমান ইবনুল হারেস আন নাজ্জারী। তিনি নুয়াইমানের কাছে গিয়ে বললেন, শোন নুয়াইমান! আবু সুফইয়ান হচ্ছে রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই এবং আমার ভাতিজা। যদিও আজ রাসূলুল্লাহ তাঁর প্রতি নারাজ, তবে একদিন তিনি রাজী হয়ে যাবেন। সুতরাং তাকে এভাবে লাঞ্ছিত করো না। এভাবে বার বার তাঁকে বুঝালেন। অবশেষে, নুয়াইমান রাজী হয়ে গেলেন এবং বললেন, এই মুহূর্তের পর থেকে আমি আর তাঁকে কটু কথা বলবো না।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা-মদীনার পথে 'জাহফাহ্' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবুর দরযায় গিয়ে বসলাম, আর আমার ছেলে জা'ফর আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। রাসূলুল্লাহ (সা) বের হওয়ার সময় আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি কিন্তু এতেও হতাশ হলাম না। এভাবে তিনি যখন যেখানে অবতরণ করতে লাগলেন আমি আমার ছেলেকে নিয়ে তাঁর তাঁবুর দরযায় গিয়ে বসতে লাগলাম। আর রাসূলুল্লাহও (সা) একই আচরণ করে যেতে লাগলেন। এভাবে কিছুকাল চললো। আমি খুব কষ্ট পেতে লাগলাম। দুনিয়াটা আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়লো।

ইবন ইসহাক বলেনঃ আবু সুফইয়ান হারেস ও আবদুল্লাহ ইবন আবী উমাইয়্যা 'নীকুল উকাব' নামক স্থানে (মক্কা মদীনার পথে) আবার রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আবেদন জানালেন। হযরত উম্মু সালামা তাদের সম্পর্কে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চাচাতো ভাই ও ফুফাতো ভাই দু'জন এসেছে সাক্ষাত করতে। রাসূল (সা) বললেনঃ তাদের আর কোন প্রয়োজন আমার নেই। আমার চাচাতো ভাই আমার সম্মান নষ্ট করেছে, আর ফুফাতো ভাই— সে আমাকে মক্কায় যা বলার বলেছে। আবু সুফইয়ানের সাথে তার পুত্র জা'ফরও ছিল। যখন রাসূলুল্লাহর (সা) একথা তার কানে পৌঁছলো, আবু সুফইয়ান বললেনঃ আল্লাহর কসম, হয় তিনি আমাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন, নয়তো আমি আমার এ ছেলের হাত ধরে যমীনের যে দিকে ইচ্ছা চলে যাব এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করবো। একথা যখন রাসূলুল্লাহ শুনলেন, তিনি একটু নরম হলেন এবং তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে ইসলামের ঘোষণা দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০-৪০১)

আবু সুফইয়ান বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন এবং আমি ও তাঁর কাফিলার সাথে মক্কায় প্রবেশ করলাম। তিনি মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হলেন, আমি তাঁর সাথে সাথে চললাম। মুহূর্তের জন্যও তাঁর কিছু ছাড়লাম না।

অতঃপর হুনাইন অভিযানের সময় ঘনিয়ে এলো। সমগ্র আরববাসী ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। এবার তারা ইসলাম ও মুসলমানদের একটা কিছু করেই ছাড়বে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য বের হলেন। আমিও চললাম। আমি কাফিরদের বিশাল বাহিনী দেখে মনে মনে বললামঃ আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহর প্রতি অতীতের সকল শত্রুতার প্রতিদান আজ আমি দেবঃ আজ আমি আমার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলকে (সা) খুশী করবো।

দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো। কাফিরদের তীব্র আক্রমণে মুসলমানরা টিকতে না পেরে ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। আমি তখন দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা) ময়দানের মাঝখানে তাঁর 'শাহবা' খচ্চরের উপর পাহাড়ের মত অটল আছেন। তিনি প্রচণ্ড বেগে তরবারি চালিয়ে নিজেকে ও আশে-পাশের সংগীদের রক্ষা করছেন। তখন তাঁকে সিংহের মত সাহসী মনে হচ্ছিল।

এ দৃশ্য দেখে আমি আমার ঘোড়ার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে ছুটলাম। আল্লাহই জানেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে মৃত্যুর আশা করছিলাম। আমার চাচা আব্বাস রাসূলুল্লাহর (সা) খচ্চরের লাগাম ধরে তাঁর এক পাশে, আর আমি অন্য পাশে দাঁড়ালাম। আমি বাঁ হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহন এবং ডান হাতে তরবারি ধরে তীব্র আক্রমণ চালালাম। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) চাচা আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেনঃ এ কে? চাচা বললেনঃ আপনার ভাই, আপনার চাচার ছেলে— আবু সুফইয়ান ইবন হারেস। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ বললেনঃ আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার প্রতি তাঁর সকল শত্রুতা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পায়ে চুমু খেলাম। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেনঃ আমার ভাই, সামনে এগিয়ে যাও, আক্রমণ কর। রাসূলুল্লাহর (সা) এই কথায় আমার সাহস বেড়ে গেল। আমি তীব্র আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষ বাহিনীকে তাদের স্থান থেকে হটিয়ে দিলাম। আমার সাথে অন্য মুসলিমরাও আক্রমণ চালালো। আমরা তাদের ছত্রভঙ্গ করে প্রায় এক ফারসাখ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম।"

আবু সুফইয়ান ইবন হারেস এই হুনাইনের ময়দান থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি ও সাহচর্য লাভে ধন্য হন। তবে জীবনে আর কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি চোখ উঁচু করে তাকিয়ে দেখেননি। অতীত আচরণের কথা মনে করে লজ্জা ও অনুশোচনায় রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সাহস পাননি।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু সুফইয়ান তাঁর অতীত জাহিলী জীবনের কাজ ও আচরণ এবং আল্লাহর কিতাব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা চিন্তা করে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়েছেন। পরবর্তী জীবনে রাত-দিন শুধু কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের বিধি-বিধান ও উপদেশাবলী অনুধাবনে অতিবাহিত করতেন। তিনি দুনিয়ার সকল সুখ সম্পদ হতে দূরে থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একীভূত করে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে পড়েন। একদিন তিনি মসজিদে ঢুকছেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখে হযরত আয়িশাকে ডেকে বলেনঃ আয়িশা, এ লোকটি কে, তুমি চেন? আয়িশা বললেনঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ এ হচ্ছে আমার চাচাতো ভাই আবু সুফইয়ান ইবন হারেস। দেখ, সে সবার আগে মসজিদে ঢোকে, আর সবার পরে মসজিদ থেকে বের হয়। তার জুতোর ফিতে থেকে তাঁর দৃষ্টি কখনও অন্যদিকে যায় না।

হযরত রাসূলে কারীমের ইনতিকালের পর আবু সুফইয়ান সন্তান হারা মায়ের মত ভীষণ কান্নাকাটি করেন। একটি কাসীদায় তাঁর সেই বিয়োগ ব্যথা অতি চমৎকার রূপে ফুটিয়ে তোলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু সুফইয়ান তখনকার স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত ও ক্ষমা প্রার্থনা করে একটি

স্বরচিত কাসীদা রাসূলুল্লাহকে (সা) পাঠকরে শোনান। কাসীদার একটি লাইনে তিনি যখন বলেনঃ "তিনি আমাকে সত্যের পথ দেখিয়েছেন যাঁকে আমি বিতাড়িত করেছিলাম" তখন রাসূল (সা) তাঁর বুকে থাপ্পড় মেরে বলে ওঠেনঃ 'তুমিই আমাকে বিতাড়িত করেছিলেন।"
(সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০—৪০১)

হযরত উমারের খিলাফতকালে আবু সুফইয়ান অনুভব করেন, তাঁর জীবন— সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তিনি একদিন নিজ হাতে একটি কবর খোঁড়েন। এর তিনদিন পর তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। মৃত্যুর সাথে তাঁর যেন একটি চুক্তি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের লোকদের বলেনঃ 'তোমরা আমার জন্য কেঁদোনা। আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের পর আমি কোন পাপ কাজ করিনি।' এতটুকু বলার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খলীফা উমার তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ১৫, মতান্তরে হিঃ ২০।

হিশাম ইবন উরওয়াহ্-পিতা 'উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) বলেন, 'আবু সুফইয়ান জান্নাতের অধিবাসী যুবকদের নেতা।' (আল-ইসাবা—৪/৯০)।

বুরাইদাহ্ ইবনুল হুসাইব (রা)

নাম বুরাইদাহ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু আবদিল্লাহ। পিতার নাম হুসাইব ইবন আবদিল্লাহ। বনু আসলাম গোত্রের সরদার। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের সময় বুরাইদাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'গামীম' নামক স্থানে পৌঁছলে বুরাইদাহ্ রাসূলুল্লাহর খিদমতে হাজির হন। রাসূল (সা) তাঁর সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে তা কবুল করেন। উল্লেখ্য যে, এই 'গামীম' মক্কা থেকে দুই মনযিল দূরে অবস্থিত। এখানে তাঁর সাথে বনু আসলামের আরও আশি ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) সেখানে 'ইশার নামায আদায় করেন এবং বুরাইদাহ ও তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহর (সা) পেছনে ইকতিদা করে নামায আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা- ১/৩) ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজ গোত্রে অবস্থান করতে থাকেন এবং বদর ও উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় আসেন। অবশ্য তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মদীনায় আসার সময়কাল সম্পর্কে ইতিহাসে ভিন্নমতও লক্ষ্য করা যায়।

হিজরী ষষ্ঠ সনের পূর্বে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং সর্বপ্রথম হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ করে 'বাই'য়াতে রিদওয়ানের' সৌভাগ্য অর্জন করেন। হিজরী ৭ম সনে খাইবার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন ঃ আমরা খাইবার অবরোধ করলাম। প্রথম দিন ঝাণ্ডা নিলেন আবু বকর ; কিন্তু জয় হলো না। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থা। লোকেরা হতাশ হয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন ঃ আগামী দিন আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব—যে কিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অতি প্রিয়। আগামী কালই বিষয়টির ফায়সালা হবে একথা চিন্তা করে লোকেরা খুব খুশী হলো। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর ঝাণ্ডা আনার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা ছিল কাতারবন্দী। তিনি আলীকে ডাকলেন এবং তাঁর হাতে ঝাণ্ডাটি তুলে দিলেন। এইদিন আলীর হাতে খাইবার জয় হয়।

হিজরী ৮ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা অভিযানে বুরাইদাহ সংগী ছিলেন এবং একটি বাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। (হায়াতুস সাহাবা- ১/১৬৭) এ প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি এক ওজুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের যুদ্ধে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের নিকট লোক পাঠান। এ সময় তিনি বুরাইদাকে আসলাম গোত্রের নিকট পাঠান এবং তাঁকে নির্দেশ দেন তিনি যেন মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থান 'ফুরআ' নামক স্থানে উপস্থিত হন। (তারীখে ইবন আসাকির- ১/১১০)

মক্কা বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইয়ামনে পাঠান। বুরাইদাহ্ও এ বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। পরে হযরত 'আলীর নেতৃত্বে অন্য একটি বাহিনী সেখানে পাঠানো হয় এবং গোটা বাহিনীর নেতৃত্ব 'আলীর (রা) হাতে অর্পণ করা হয়। যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা) গণীমতের মাল থেকে একটি দাসী নিজে গ্রহণ করেন। বুরাইদাহ্ এটা মেনে নিতে পারেননি। মদীনায় ফিরে বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্থাপন করেন। সবকিছু শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বুরাইদাহ, তোমার কি আলীর প্রতি কোন বিদ্বেষ আছে ? বুরাইদাহ্ অস্বীকার করেন। তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন ঃ আলীর প্রতি মনে কোন রকম হিংসা রেখ না। গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে সে এরচেয়েও বেশী পায়। (সহীহুল বুখারী—বাবু বা'সু 'আলী ইলাল ইয়ামন)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, বুরাইদাহর বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকের রং পাল্টে যায়। তিনি বলেন ঃ বুরাইদাহ, মুমিনদের ওপর তাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও কি আমার অধিকার বেশী নয় ? বুরাইদাহ জবাব দিলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রাসূল (স) বললেন ঃ আমি যার

মাওলা (মনিব/দাস) আলীও তার মাওলা। বুরাইদাহ্ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র যবান থেকে এ বাণী শোনার পর আলীর প্রতি আমার সকল অভিযোগ দূর হয়ে যায়। আর সেইদিন থেকে তার প্রতি আমার অন্তরে যে গভীর মুহাব্বতের সৃষ্টি হয় তা আর কারও প্রতি কখনো হয়নি।

(মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের শেষ অধ্যায়ে উসামাকে সিরিয়ায় একটি অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন বুরাইদাহ। উসামা মদীনা থেকে বের হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে যাত্রার তোড়জোড় করছেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তিম অবস্থার খবর পেলেন। তিন যাত্রা স্থগিত করে ছুটে এলেন রাসূলুল্লাহর (সা) শয্যা পাশে। অন্যদের সাথে বুরাইদাহ্ও ঝাণ্ডা হাতে মদীনায় ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের দরজার সামনে তা গেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) তিরোধানের পর হযরত আবুবকর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। বুরাইদাহ্ খলীফার নির্দেশে আবার ঝাণ্ডা তুলে নিয়ে সিরিয়া যান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষে ঝাণ্ডা হাতে আবার মদীনায় ফিরে এলেন এবং উসামার বাড়ীর সামনে ঝাণ্ডাটি গেড়ে দিলেন। উসামার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঝাণ্ডাটি সেখানে ছিল।

(হায়াতুস সাহাবা- ১/৪২৫-২৬)

হযরত বুরাইদাহ ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে সবগুলিতে অংশগ্রহণ করেন। সহীহাইনে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মোট ১৬টি (ষোল) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা-১/১৪৬, তাবাকাতে ইবন সা'দ—মাগাযী অধ্যায়- ১৩৬)

হযরত রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায় বুরাইদাহ মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে বসরা শহরের পত্তন হলে তিনি সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

হযরত বুরাইদাহর শিরা-উপশিরায় জিহাদের খুন টগবগ করতো। লোকদের তিনি বলতেন ঃ 'জীবনের মজা তো ঘোড়া দাবড়ানোর মধ্যেই'। এই আবেগ ও উচ্ছ্বাসের কারণে খলীফাদের যুগেও তিনি বিভিন্ন অভিযানে সৈনিক হিসাবে ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন। হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে খুরাসান অভিযানে অংশ নিয়ে মারভে চলে যান এবং সেখানেই থেকে যান।

হযরত বুরাইদাহ একজন বীর মুজাহিদ হওয়া সত্ত্বেও খলীফাদের যুগে মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়ায় তাঁর তরবারি সবসময় কোষবদ্ধ থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফার যুগে যত গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার একটিতেও তিনি অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি অত্যধিক সতর্কতার কারণে দু'পক্ষের যাঁরা সেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন তাদের সম্পর্কেও কোন মতামত ব্যক্ত করতেন না। এ প্রসঙ্গে বনী বকর ইবন ওয়ায়িলের এক ব্যক্তি বলেন ঃ একবার আমি বুরাইদাহ্ আল-আসলামীর সাথে সিজিস্তানে ছিলাম। একদিন আমি তাঁর কাছে আলী, উসমান, তালহা ও যুবাইর সম্পর্কে তাঁর মতামত জানার জন্য তাঁদের প্রসঙ্গ উঠালাম। বুরাইদাহ্ সংগে সংগে কিবলার দিকে মুখ করে বসে দু'হাত তুলে দু'আ করতে শুরু করেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি 'উসমানকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আলী, তালহা এবং যুবাইরকেও মাফ করে দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, তুমি কি আমার হত্যাকারী হতে চাও ? আমি বললাম ঃ আমি আপনার হত্যাকারী হতে যাব কেন ? তবে আপনার কাছে এমনটি চেয়েছি। বুরাইদাহ্ বললেন ঃ তাঁরা ছিলেন এমন একদল লোক যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্বেই স্থির হয়ে আছে। তিনি চাইলে তাঁদের ক্ষমা করে দিতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। তাঁদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহর।

(ইবন সা'দ-৪/১৭৬, হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৮৮)

একবার তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়ার (রা) কাছে যান। মুয়াবিয়া (রা) তখন একজন লোকের সাথে বসে কথা বলছিলেন। বুরাইদাহ্ বললেন ঃ 'মুয়াবিয়া, আমাকেও একটু কথা বলার সুযোগ

দেবেন?' মুয়াবিয়া বললেনঃ 'হাঁ, তিনি মনে করেছিলেন বুরাইদাহ্ হয়ত অন্যদের মতই কিছু বলবেন। কিন্তু বুরাইদাহ বললেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ 'আমি আশা করি, আমি কিয়ামতের দিন জগতের সকল গাছ, পাথর ও বালুর সমপরিমাণ মানুষের জন্য সুফারিশ করবো। মুয়াবিয়া, আপনি এ সুফারিশের আশা করেন, আর আলী তার আশা করতে পারে না? (মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৪/৩৪৭, হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৯) সম্ভবতঃ প্রথম ব্যক্তি হযরত আলীর সমালোচনা করছিল এবং মুয়াবিয়া (রা) বুরাইদাহ্র মুখ থেকে তাই শোনার আশা করছিলেন। সত্য বলা ছিল তাঁর বিশেষ গুণ। এ ব্যাপারে তিনি বিরাট ব্যক্তিত্বকেও ভয় করতেন না।

সাহাবা সমাজের মধ্যে বুরাইদাহ্র ছিল বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীস স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১৬৪। তারমধ্যে একটি মুত্তাফাক আলাইহি, দু'টি বুখারী ও ১১টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলির সবই সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) যবানীতে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পুত্র আবদুল্লাহ ও সুলাইমান, এবং অন্যদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন খাযায়ী, শা'বী ও মালীহ ইবন উসামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সাথে অত্যন্ত সহজ ও সাধারণভাবে মিশতেন। একবার বুরাইদাহ কোথাও যাচ্ছেন, পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা। রাসূলুল্লাহ (সা) বুরাইদাহ্র হাতে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করেন।

বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় কুরাইশ বংশের এক ব্যক্তি আসলো। রাসূল (সা) তাকে ডেকে কাছে বসালেন। লোকটি যখন যাওয়ার জন্য উঠলো, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেনঃ 'বুরাইদাহ, তুমি কি এ লোকটিকে চেন? বললামঃ হাঁ, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সে কুরাইশদের মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর। তবে সে সর্বাধিক অর্থ-সম্পদের অধিকারী। কথাটি আমি তিনবার বললাম। তারপর আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার সম্পর্কে আমার যা জানা আছে তাই আপনাকে জানালাম। তবে আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। রাসূল (সা) বললেনঃ কিয়ামতের দিন তার এই বৈশিষ্ট আল্লাহর কাছে কোন গুরুত্ববহ হবে না।

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে তিনি একবার যা শুনতেন তা হুবহু পালন করার চেষ্টা করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসে ছিলেন। রাসূল (সা) বললেনঃ আমার উম্মাতকে ঢালের ন্যায় চওড়া ও ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট জাতির লোকেরা তিনবার তাড়াবে। এমনকি তাদেরকে তাড়াতে তাড়াতে 'জাযীরাতুল আরবের' মধ্যে ঘিরে ফেলবে। তাদের প্রথম আক্রমণে যারা পালাবে তারা বেঁচে যাবে। দ্বিতীয় আক্রমণে কিছু বাঁচবে, কিছু মারা পড়বে। কিন্তু তৃতীয় আক্রমণে সবাই মারা পড়বে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? বললেনঃ তুর্কী। তিনি আরও বললেনঃ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সেই লোকেরা তাদের ঘোড়াসমূহ মুসলমানদের মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধবে।

এই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর পর বুরাইদাহ সর্বদা দুই তিনটি উট, সফরের পাথেয় ও পানি পান করার একটি পাত্র প্রস্তুত রাখতেন। যাতে যখনই এ সময় আসুক, এ আযাব থেকে পালাতে পারেন। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৫/৩৪৭)

হযরত বুরাইদাহ্ ছিলেন আসলাম গোত্রের সরদার। হযরত রাবী'য়া আল-আসলামী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) এক সহায় সম্বলহীন খাদেম। তিনি বিয়ে করলে, রাসূলুল্লাহ (সা) বুরাইদাহকে নির্দেশ দিলেন তার মোহর আদায়ের ব্যবস্থা করতে। বুরাইদাহ চাঁদা উঠিয়ে সে নির্দেশ পালন করেন।

তিনি ইয়াযীদ ইবন মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে হিজরী ৬৩ সনে পারস্যের মারভে ইনতিকাল করেন। তিনি আবদুল্লাহ ও সুলাইমান নামে দু'ছেলে রেখে যান।

'উকবা ইবন 'আমের আল-জুহানী (রা)

নাম 'উকবা, ডাকনাম আবু 'আমর, পিতা 'আমের। বনু জুহানা গোত্রের লোক। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মদীনায় আসেন, 'উকবা তখন মদীনা থেকে বহু দূরে ছাগলের রাখালী করছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন সংবাদ মদীনার অলি-গলি ও তাঁর আশ-পাশের মরু ভূমি ও মরুদ্যানে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহর সাথে 'উকবার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে ঘটে তা 'উকবার মুখেই শোনা যাক ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এলেন আমি তখন মদীনার বাইরে আমার ছাগল চরাচ্ছিলাম। খবরটি আমার কাছে পৌঁছার পর আমি সব কিছু ছেড়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য চলে আসি। রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করাবেন কি? তিনি আমার পরিচয় জানতে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কে? বললাম ঃ 'উকবা ইবন 'আমের আল-জুহানী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ মরুবাসী বেদুঈনদের বাইয়াত অথবা হিজরাতের বাইয়াত-এর কোনটি তোমার অধিক প্রিয়? আমি বললামঃ হিজরাতের বাই'য়াত। অতঃপর তিনি আমাকে সেই বিষয়ের উপর বাইয়াত করালেন যার উপর মুহাজিরদের বাই'য়াত করাতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের পর আমি এক রাত তাঁর সাথে কাটিয়ে আবার মরুভূমিতে আমার ছাগলের কাছে ফিরে গেলাম।

আমরা ছিলাম বারো জন মুসলমান। আমরা মদীনা থেকে দূরে ছাগল চরাতাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো ঃ একদিন পরপর আমরা যদি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে হাজির হয়ে দ্বীনের কথা না শিখি এবং তাঁর উপর যা নাযিল হয় তা না জানি তাহলে আমাদের জীবনে কোন কল্যাণ নেই। প্রতিদিন আমাদের মধ্য থেকে একজন পালাক্রমে মদীনায় যাবে এবং তাঁর ছাগল অন্যরা চরাবে। আমি বললাম ঃ তোমরা পালা করে একজন যাও এবং তার ছাগলগুলির জিম্মাদারি আমি নিলাম। কারও কাছে আমার ছাগলগুলি রেখে মদীনায় যেতে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না।

আমার সঙ্গীরা পালা করে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে যেতে লাগলো, আর আমি তাদের ছাগলের পাল চরাতে লাগলাম। তারা ফিরে এলে তারা যা কিছু শুনে বা শিখে আসতো আমি তাদের কাছে শুনে তা শিখে নিতাম। এভাবে কিছুদিন চললো। এর মধ্যে আমার মনে এ অনুভূতি জাগলো ঃ 'তোমার সর্বনাশ হোক! ছাগলের জন্য তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্য এবং সরাসরি তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছো!' এই অনুভূতির পর আমি আমার ছাগল ফেলে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে মসজিদে নববীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশে মদীনার দিকে চললাম।

আমি মদীনায় পৌঁছলাম। মসজিদে নব্বীতে হাজির হয়ে সর্ব প্রথম শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি বলছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ওজু করবে সে তার সকল গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হবে যেমনটি সে ছিল তার মা তাকে যেদিন জন্ম দিয়েছিল।' কথাটি আমার খুবই ভালো লাগলো। 'উমার ইবনুল খাত্তাব তখন বললেন ঃ তুমি যদি প্রথম কথাটি শুনতে আরও খুশী হতে। আমি তাঁকে কথাটি পুনরায় বলার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরিক না করে কেউ যদি মারা যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের সবগুলি দরযা খুলে দেন। জান্নাতের আটটি দরযা। সে এর যে কোনটি দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ

করবে।' এমন সময় রাসূল (সা) আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর সামনাসামনি বসলাম। তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কয়েকবার এমনটি করলেন। চতুর্থবার আমি আরজ করলাম ঃ হে আল্লাহর নবী, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমার দিক থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? এবার তিনি আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন ঃ একজন তোমার সর্বাধিক প্রিয় না বারোজন? (হায়াতুস সাহাবা—৩/২১৪-১৫, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা—৪/১৪৪)

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'উকবা সর্বপ্রথম উহুদে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েন। এরপর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। দিমাশ্‌ক জয়ের দিনে তিনি তীর নিক্ষেপে অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। দিমাশক বিজয়ের পর সেনাপতি আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) তাঁকে মদীনায় পাঠান খলীফাকে এ সংবাদ দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তিনি মাত্র আট দিনে— এক জুম'আ থেকে অন্য জুম'আর মধ্যে রাত দিন বিরামহীন চলার পর মদীনায় খলীফার কাছে সংবাদটি পৌঁছান। সিফ্‌ফীন যুদ্ধে তিনি হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। মিসর জয়ের পর হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে এক সময় তথাকার ওয়ালী বা শাসক নিয়োগ করেন। আবু 'আমর আল-কিন্দী বলেনঃ মু'য়াবিয়া তাঁকে মিসরের খারাজ (রাজস্ব) আদায় ও নামাযের ইমামতির দায়িত্ব অর্পন করেন। পরে যখন তাঁকে অপসারণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি 'উকবাকে রোড্‌স্ আক্রমণের নির্দেশ দেন। উকবা যখন 'রোড্‌সের পথে অগ্রসর হচ্ছেন তখনই তিনি নিজের স্থলে মাসলামার নিযুক্তির কথা শুনতে পেলেন। তখন তিনি মন্তব্য করেনঃ 'দূরে পাঠিয়ে তারপর অপসারণ?' এটা হিজরী ৪৭ সনের কথা। বরখাস্তের পর তিনি অভিযান থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

হযরত 'উকবার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ আছে। সঠিক বর্ণনা মতে হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৫৮ সনে মিসরে ইনতিকাল করেন। তাঁকে বর্তমান কায়রোর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত 'মুকাত্তাম' পাহাড়ের পাদদেশে দাফন করা হয়। (আল-ইসাবা—৩/৪৮৯, তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ১/৪৩)

জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত 'উকবা ছিলেন এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ফারায়েজ ও কাব্য ক্ষেত্রে ছিল তাঁর এক বিশেষ স্থান। আল্লামা জাহাবী বলেন, 'তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, আল্লামাহ, আল্লাহর কিতাবের ক্বারী, ফারায়েজ শাস্ত্রের তত্বজ্ঞানী, প্রাঞ্জল ভাষী ও উঁচুদরের এক কবি।' (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ ১/৪৩)।

পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শিক্ষার প্রতিছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। দারুন আবেগ ও আগ্রহের সাথে তিনি কুরআন পাকের তিলাওয়াত শিক্ষা করতেন। কোন কোন সূরা তিনি খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটেই শিখেছেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পায়ের ওপর পড়ে নিবেদন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে সূরাহুদ ও সূরা ইউসূফ একটু শিখিয়ে দিন। এ প্রবল আগ্রহই তাঁকে একজন বিখ্যাত ক্বারী বানিয়ে দেয়।

তিনি ছিলেন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। গভীর রাতে যখন নিরবতা নেমে আসতো, তিনি হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা কান লাগিয়ে সে তিলাওয়াত শুনতেন। আল্লাহর ভয়ে তাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়ে পড়তো, এবং চোখ সজল হয়ে উঠতো। খলীফা হযরত 'উমার (রা) একবার তাঁকে বলেন ঃ

'উকবা, আমাদের কিছু কুরআন শুনাও। 'উকবা তিলাওয়াত শুরু করলেন। সে তিলাওয়াত শুনে 'উমার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল।

হযরত 'উকবা নিজ হাতে পবিত্র কুরআনের একটি সংকলন তৈরী করেন। হিজরী নবম শতক পর্যন্ত মিসরের 'জামে উকবা ইবন আমের' নামক মসজিদে এ কপিটি সংরক্ষিত ছিল। কপিটির শেষে

লেখা ছিল 'এটি 'উকবা ইবন 'আমের আল জুহানী লিখেছেন।' এটা ছিল পৃথিবীতে প্রাপ্ত কুরআনের প্রাচীনতম কপি। কিন্তু হতভাগা মুসলিম জাতি আরও অনেক কিছুর মত এই মূল্যবান সম্পদটিও হারিয়েছে। (তাহজীবুত তাহজীব-৭/২৪৩, সুওয়ারুম মিস হায়াতিস সাহাবা-৪/১৪৮-৪৮, মুহাজিরীন—২/২৩৬)।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রেও তিনি একেবারে পিছিয়ে নন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা পঞ্চান্ন। তার মধ্যে সাতটি মুত্তাফাক আলাইহি এবং একটি বুখারী ও সাতটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বহু বড় বড় সাহাবী দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে তাঁর কাছে হাদীস শুনার জন্য আসতেন। হযরত আবু আইউব কেবল একটিমাত্র হাদীস শুনার জন্য মদীনা থেকে মিসরে যান এবং হাদীসটি শুনেই আবার মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হিবরুল উম্মাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসও (রা) তাঁর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেন। তাছাড়া বহু বিখ্যাত তাবেয়ী তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। ইবন 'আসাকির ইবরাহীম ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আউফ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, মৃত্যুর পূর্বে উমার ইবনুল খাত্তাব লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী—আবদুল্লাহ ইবন হুজাফা, আবুদ দারদা, আবু যার ও উকবা ইবন আমেরকে বিভিন্ন স্থান থেকে ডেকে এনে বলেন ঃ তোমরা রাসূলুল্লাহ থেকে এত যে হাদীস বর্ণনা কর—এগুলি কী? তাঁরা বললেন ঃ আপনি কি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন? তিনি বললেন ঃ না। তবে তোমরা আমার কাছে থাকবে। যতদিন আমি জীবিত আছি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। 'উমার যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁকে ছেড়ে তাঁরা দূরে কোথাও যাননি। (হায়াতুস সাহাবা—৩/২৪০-৪১)

ফিকাহ শাস্ত্রেও হযরত 'উকবার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। দ্বীনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত জ্ঞান যথা ঃ খিতাবাহ (বক্তৃতা-ভাষণ), কবিতা ইত্যাদিতে তাঁর ছিল বিরাট দখল।

'উকবা (রা) যদিও একজন উঁচু দরের সাহাবী ছিলেন, তথাপি দ্বীনী দায়িত্ব পালনে ভীষণ ভয় পেতেন। তিনি এক সময় মিসরে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন, তবে পরে ইমামতি এড়িয়ে চলতেন। আবু 'আলী হামাদানী বলেন ঃ একবার এক সফরে লোকেরা তাঁকে বলে, যেহেতু আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, আপনি নামায পড়াবেন। বললেন ঃ না।আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি ইমামতি করে এবং সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নামায পড়ায়, ইমাম ও মুকতাদী উভয়ের জন্য সওয়াব আছে। আর যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে ইমামকে জবাবদিহি করতে হবে এবং মুকতাদীর কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব নেই।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সেবা করা ছিল তাঁর একমাত্র হবি। সফরে, তিনি প্রায়ই রাসূলুল্লাহর (সা) খচ্চর 'আশ্-শুহ্বা'-র লাগাম ধরে টেনে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। এই সেবা ও সাহচর্যকালে তিনি দ্বীনী-জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ একবার আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) বাহন টেনে নিয়ে চলছি এমন সময় তিনি বললেন ঃ 'উকবা, আমি কি তোমাকে পাঠযোগ্য দু'টি উত্তম সূরার কথা বলবো? আমি আরজ করলাম ঃ বলুন। তিনি বললেন ঃ সূরা দু'টি হলো ঃ কুল আ'উজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আ'উজু বিরাব্বিন নাস।

তিনি রাসূলকে (সা) এতই সম্মান করতেন যে, তাঁর বাহনের ওপর বসাও বে-আদবী বলে মনে করতেন। একবার তিনি সফরে নির্ধারিত খিদমতের দায়িত্ব পালন করছেন, এমন সময় রাসূল (সা) সওয়ারী পশুটি থামিয়ে বসিয়ে দেন। সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে এসে তিনি বলেন ঃ 'উকবা, তুমি বাহনের পিঠে সওয়ার হও। 'উকবা বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার বাহনে সওয়ার হব? রাসূল (সা) আবারও নির্দেশ দিলেন। 'উকবা একই উত্তর দিলেন। অবশেষে বারবার পীড়াপীড়ির পর আদেশ পালনার্থে 'উকবা বাহনের পিঠে উঠে বসেন, আর রাসূল (সা) পশুর লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রায়ই তাঁকে নিজের বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে চলতেন। এ কারণে তাঁকে 'রাদীফু রাসূলিল্লাহ'—(রাসূলিল্লাহর বাহনের পেছনে আরোহণকারী বলে ডাকা হতো।

মানুষের দোষ গোপন করা ছিল হযরত 'উকবার বিশেষ গুণ। কারও কোন দোষ প্রচার করাকে তিনি খুবই নিন্দনীয় মনে করতেন। একবার তাঁর সেক্রেটারী এসে বললো, আমাদের প্রতিবেশী

লোকগুলি মদ পান করছে। তিনি বললেনঃ করতে দাও, কাউকে বলোনা। সেক্রেটারী বললো, আমি পুলিশকে খবর দিই। তিনি বললেনঃ খুবই পরিতাপের বিষয়! এড়িয়ে যাও। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারও কোন দোষ গোপন করলো সে যেন একটি মৃতকে জীবিত করলো। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৩)

সামরিক বিদ্যা বিশেষতঃ তীরান্দাযীর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। এ বিদ্যা অর্জনের জন্য তিনি অন্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন। একবার খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ডেকে তিনি বলেনঃ 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহ একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাত দান করবেন—তীরটির প্রস্তুতকারী, আল্লাহর রাস্তায় তীরটি বহনকারী ও তীরটির নিক্ষেপকারী। তিনি একথাও বলেছেনঃ সকল প্রকার খেলা-ধুলার মধ্যে মাত্র তিনটি খেলা জায়েয—তীরান্দাযী, অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ এবং নিজ স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা। যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ বিদ্যা অর্জন করে ভুলে গেছে সে মূলতঃ একটি বিরাট সম্পদ হারিয়েছে।' (মুসনাদু ইমাম আহমাদ-৪/১৪৮)

তিনি যুদ্ধের বহু অস্ত্র-শস্ত্র জমা করেন। মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির খোঁজ নিয়েদেখা গেল তাঁর ঘরে সত্তরের চেয়ে কিছু বেশী ধনুক রয়েছে। আর সেই ধনুকগুলির সাথে আছে বেশ কিছু তীর ও ফলা। সবগুলিই তিনি আল্লাহর রাস্তায় দান করে যান। (সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১৫০-৫১)

হযরত উকবা (রা) ছিলেন সচ্ছল ব্যক্তি। তাঁর চাকর-বাকরও ছিল। তাসত্ত্বেও নিজের সব কাজ নিজ হাতে করতেন।

হযরত 'উকবা (রা) মিসরে অন্তিম রোগ শয্যায়। এ অবস্থায় সন্তানদের ডেকে এই উপদেশটি দান করেনঃ 'আমার সন্তানেরা! আমি তোমাদের তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করছি, ভালো করে স্মরণ রেখ। (১) নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর হাদীস গ্রহণ করো না। (২) 'আবা (সামনে খোলা ঢিলে-ঢালা মোটা জুব্বা) পরলেও কখনও ঋণগ্রস্ত হয়ো না। (৩) তোমরা কবিতা লিখবে না। কারণ তাতে তোমাদের অন্তর কুরআন ছেড়ে সেই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।' (হায়াতুস সাহাবা- ৩/২০১)

মোট কথা ছাগলের রাখাল হযরত 'উকবার মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) স্বল্পকালীন সাহচর্যে তার সেই প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে। উত্তরকালে তিনি সাহাবাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম, শ্রেষ্ঠ কারী, শ্রেষ্ঠ বিজয়ী সেনাপতি ও শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন। যখন তিনি ছাগলের রাখালী ছেড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন তখন তিনি ঘুনাক্ষরেও একথা জানতেন না যে, একদিন তিনি দিমাশ্‌ক বিজয়ী বাহিনীর অগ্রসৈনিক হবেন এবং দিমাশকের 'বাবে তূমা'য় তাঁর একটি বাড়ী হবে। যেদিন তিনি মদীনায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেন সেদিন তাঁর মনে একবারও একথা উদয় হয়নি যে, একদিন তিনি মিসর বিজয়ের অন্যতম নেতা, তথাকার ওয়ালী হবেন এবং কায়রোর 'মুকাত্তাম' পাহাড়ে তাঁর একটি বাড়ী হবে। ইসলাম তাঁর সুপ্ত প্রতিভার এমন বিকাশ ঘটায় যে তিনি ছাগলের রাখালী থেকে এত কিছু হন।

আবু বারযাহ্ আল-আসলামী (রা)

আবু বারযাহ্র আসল নামের ব্যাপারে রিজাল শাস্ত্রবিদদের যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মতানুসারে নাদলা ইবন 'উবাইদ তাঁর নাম এবং আবু বারযাহ্ কুনিয়াত বা উপনাম। (আল-ইসাবা- ৪/১৯)

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পর কাফিরদের সাথে যত সংঘর্ষ হয়েছে তার সবগুলিতে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সঃ) সাথে ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলে কারীম (সা) তাঁর চরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দেন। তবে শত্রুতা ও বিদ্রোহের সীমা লংঘনকারী কতিপয় দুষ্কৃতিকারীকে সেদিন হত্যা করা হয়েছিল। আবদুর রহমান ইবন খাতাল ছিল এমনি একজন। এ ব্যক্তি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার এক মুসলমান দাসকে হত্যা করে ইসলামী দণ্ড 'কিসাস' থেকে বাঁচার জন্য 'মুরতাদ' (ইসলাম ত্যাগ) হয়ে মক্কায় পালিয়ে যায়। তার ছিল দু'টি দাসী। তারা মক্কার বাজারে মুহাম্মাদের (সা) নিন্দাসূচক গীত গেয়ে বেড়াতো। মক্কা বিজয়ের দিন কোন উপায় না দেখে নরাধম ইবন খাতাল নিরাপত্তার আশায় কা'বার গিলাফ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকলো। সাহাবীরা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, ইবন খাতাল কা'বার গিলাফের আশ্রয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ লাভের সাথে সাথে আবু বারযাহ ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে সাঈদ ইবন হুয়াইরিস আল-মাখযূমী ও আবু বারযাহ্ আল-আসলামী একযোগে আবদুর রহমান ইবন খাতালকে হত্যা করেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ; সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪১০)

হযরত রাসূলে পাকের (সা) জীবদ্দশা পর্যন্ত আবু বারযাহ্ মদীনায় বসবাসরত ছিলেন। হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি বসরার বাসিন্দা হন। সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) পক্ষে এবং নাহরাওয়ানে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। খুরাসান অভিযানে তিনি ছিলেন একজন মুজাহিদ।

হযরত আবু বারযাহ্র (রা) মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কারও মতে হিঃ ৬০, আবার কারও মতে হিঃ ৬৫ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, মারওয়ান ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) সংঘর্ষের সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং তিনি বলতেন, তারা সব দুনিয়ার জন্য ঝগড়া-বিবাদ করছে। (হায়াতুস সাহাবা- ২/৪০৭) তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র ছেলে মুগীরাকে রেখে যান।

হযরত আবু বারযাহ (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দীর্ঘ সাহচর্যের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্র (সা) হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য সংখ্যা তিনি স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৬৪। তারমধ্যে ২৭টি মুত্তাফাক আলাইহি। দু'টি বুখারী ও চারটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু বারযাহ্র (রা) স্বভাবে যুহ্দের একটা ভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি দামী কাপড় পরতেন না এবং ঘোড়ায়ও সওয়ার হতেন না। গেরুয়া রঙ্গের দু'খানি কাপড় দিয়ে সতর ঢেকে চলতেন। তাঁরই এক সমসাময়িক সাহাবী 'আয়িজ ইবন উমার। তিনি যেমন মূল্যবান কাপড় পরতেন তেমনি ঘোড়ায়ও সওয়ার হতেন। এক ব্যক্তি তাঁদের দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত আয়িজের

নিকট এসে বললো ঃ আপনি আবু বারযাহ্‌কে দেখুন, তিনি পোশাক-আশাকে আপনার বিরোধিতা করেন। আপনি দামী 'খুয' কাপড় পরেন, ঘোড়ায় চড়েন। আর তিনি এ দু'টি জিনিসই পরিহার করেন।' কিন্তু সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব ছিল বাহ্যিক পোশাক-আশাক ও চাল-চলন থেকেও অতি গভীর ও দৃঢ়। হযরত আয়িজ লোকটিকে জবাব দেন ঃ আল্লাহ্ আবু বারযাহ্‌র ওপর রহম করুন! আজ আমাদের মধ্যে তার সমপর্যায়ের আর কে আছে? লোকটি হতাশ হয়ে সেখান থেকে আবু বারযাহ্‌র নিকট গেল এবং তাঁকে বললো ঃ 'আপনি আয়িজকে একটু দেখুন। আপনার চাল-চলন তাঁর পসন্দ নয়। তিনি ঘোড়ায় সোয়ার হয়ে ঘুরে বেড়ান, মূল্যবান 'খুয' কাপড় তাঁর দেহে শোভা পায়।' কিন্তু লোকটি এখানেও একই জবাব পেল। আবু বারযাহ্ লোকটিকে বললেন ঃ 'আল্লাহ্ আয়িজের ওপর রহম করুন। আমাদের মধ্যে তাঁর সম-মর্যাদার আর কে আছে?'

একবার এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) একটা শক্ত কথা বলে ফেলে। সংগে সংগে আবু বারযাহ বলে উঠলেন ঃ 'আমি কি তার গর্দান উড়িয়ে দেব?' আবু বকর তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) পর আর কারও ক্ষেত্রে এতটুকু অপরাধের এ শাস্তি বৈধ নয়।' (কানযুল 'উম্মাল- ২/১৬১, হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৩৮)

গরীব-দুঃখীর সেবা করা ছিল আবু বারযাহ্‌র বিশেষ বৈশিষ্ট। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ফকীর মিসকীনকে আহার করাতেন। হাসান ইবন হাকীম তাঁর মার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু বারযাহ্ বিধবা, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সকালে এবং সন্ধ্যায় 'সারীদ' (আরবদের এক প্রকার প্রিয় খাদ্য) আহার করাতেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৪-৯৫)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সম্পর্কে কোন প্রকার বিদ্রূপ বা হাসি-কৌতুক তিনি বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের 'হাউজে কাওসার' সম্পর্কে কিছু জানার বাসনা হলো। তিনি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন 'হাউজে কাওসার' সম্পর্কে কে বলতে পারবে? লোকেরা আবু বারযাহর (রা) কথা বললো। উবাইদুল্লাহ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গেলেন। তাঁকে আসতে দেখে উবাইদুল্লাহ বিদ্রূপের সুরে বললো ঃ 'এই সেই তোমাদের মুহাম্মাদী?' অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে আবু বারযাহ্ জবাব দিলেন, 'আল্লাহর শুকরিয়া! আমি এমন এক যুগে বেঁচে আছি যখন সাহাবিয়্যাতের (সাহচর্যের) মর্যাদাকে হেয় চোখে দেখা হয়।' একথা বলতে বলতে অত্যন্ত রুষ্টভাবে তিনি আসন গ্রহণ করেন। উবাইদুল্লাহ প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন, জবাবে আবু বারযাহ্ বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি হাউজে কাওসার অস্বীকার করবে সে তার ধারে-কাছেও যেতে পারবে না এবং আল্লাহ্ তাকে তার থেকে পানও করাবেন না।' একথা বলে তিনি উঠে চলে আসেন।

হযরত আবু বারযাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক যুদ্ধে (মতান্তরে খাইবার) আমরা মুশরিক বাহিনীকে হামলা করে তাদের রুটি তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম থেকে দূরে তাড়িয়ে দিই। তারপর আমরা সেগুলি দখল করে খেতে শুরু করি। জাহিলী যুগে আমরা শুনতাম, যারা সাদা রুটি খায় তারা মোটা হয়ে যায়। তাদের পরিত্যক্ত রুটি খাওয়ার পর আমাদের কেউ কেউ তার নিজের কাঁধের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে যে সে মোটা হয়েছে কিনা। (হায়াতুস সাহাবা- ১/৩২৩) এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় সাহাবায়ে কিরাম সাদা মিহি আটা সাধারণত ব্যবহার করতেন না।

ফাদল ইবন 'আব্বাস (রা)

নাম ফাদল, ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ। পিতা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) এবং মাতা লুবাবা বিনতুল হারেস আল হিলালিয়্যাহ। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। একারণে পিতা আব্বাসকে ডাকা হতো আবুল ফাদল বা ফাদলের পিতা বলে এবং মাতা লুবাবাকে বলা হতো উম্মুল ফাদল বা ফাদলের মা।

বদর যুদ্ধের পূর্বেই পরিবারের অন্যদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন ; কিন্তু মক্কার কাফিরদের ভয়ে প্রকাশ করেননি। মক্কা বিজয়ের অল্প কিছু দিন পূর্বে পিতা হযরত আব্বাস ও ছোট ভাই আবদুল্লাহর (রা) সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ছিল তের বছর এবং আবদুল্লাহর বয়স আট বছর। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭৩) তিনি মদীনায় হিজরাতের পর সর্ব প্রথম মক্কা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর হুনাইন অভিযানেও যোগদান করেন। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়ে পালাতে শুরু করে তখনও তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে ময়দানে অটল থাকেন।

বিদায় হজ্জে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনে বসা ছিলেন। এ কারণে সেই দিন থেকে তিনি 'রাদিফুর রাসূল' উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময় খাইসাম গোত্রের এক যুবক ও এক সুন্দর যুবতী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হজ্জের বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে আসে। হজ্জের সময় মহিলাদের মুখে নেকাব দেওয়া যেহেতু জায়েয নয়, এ কারণে মহিলাটির মুখ খোলা ছিল। ফাদল ছিলেন সুদর্শন নওজোয়ান। মহিলাটি তার দিকে আড় চোখে তাকাতে থাকে এবং ফাদলও তাকে দেখতে থাকেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) কয়েকবার ফাদলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। রাসূল (সা) বললেনঃ 'আজ যে ব্যক্তি স্বীয় চোখ, কান ও জিহ্বা সংযত রাখতে পারবে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (ইবন সা'দ-৪/৩৭, আল-ইসাবা-৩/২০৮ এবং বুখারী শরীফে বাবু হজ্জিল মারয়াতে অধ্যায়ে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।) মিনায় পাথর নিক্ষেপের সময় চাদর উঁচু করে ধরে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) ছায়াদান করেন। মদীনায় রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে দেন এবং নিজেই তাঁর দায়ন মোহর পরিশোধ করেন।

হযরত ফাদল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের সর্বশেষ খিদমাতের সুযোগ লাভে ধন্য হন। অন্তিম রোগশয্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশেষ ভাষণ দান করেন। এ ভাষণ দেওয়ার জন্য যে দু'জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে তিনি ঘর থেকে বের হন তাঁদের একজন ফাদল। আর রাসূল (সা) যে ভাষণ দেবেন—একথাটিও ফাদল জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেন। (আল-ইসাবা-৩/২০৮) রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর যে ক'জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পবিত্র দেহ গোসল দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন ফাদল (রা) তাঁদের অন্যতম। হযরত আলী (রা) গোসল করান, ফাদল পানি ঢেলে দেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কাপড় ধরে রাখেন এবং আউস ইবন খাওলী নামক এক আনসারী পানি এগিয়ে দেন। (আল-ইসতীয়াব, হায়াতুস সাহাবা-২/৩৪১)।

ওয়াকিদী বলেনঃ হযরত ফাদল হযরত উমারের খিলাফতকালে আমওয়াসের প্লেগের মহামারিতে মারা যান। আবার অনেকে বলেছেন, হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে আজনাদাইন অথবা ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী ১৫ সনে

ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে বিস্তর মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী আজনাদাইনের মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/২০৯)।

হযরত ফাদল (রা) হতে ২৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস ও আবু হুরাইরার মত বিশিষ্ট সাহাবীরাও তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া কুরাইব, কুসাম ইবন আব্বাস, আব্বাস ইবন উবাইদিল্লাহ, রাবীয়া ইবন হারেস, উমাইর, আবু সাঈদ, সুলাইমান ইবন ইয়াসার, শাবী, আতা ইবন আবী রিবাহ প্রমুখ তাবেয়ী' তাঁর নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/২০৯)।

তুলাইব ইবন 'উমাইর (রা)

নাম তুলাইব, ডাকনাম আবূ 'আদী। পিতা 'উমাইর ইবন ওয়াহাব, মাতা রাসূলুল্লাহর (মা) ফুফু আরওয়া বিনতু 'আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশ বংশের বনী-'আবদী শাখার সন্তান। (আনসাবুল আশরাফ-১/৮৮)

হযরত তুলাইবের জন্ম ও ইসলাম পূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইসলামের সূচনা পর্বেই যে তিনি এ কাফিলায় শরিক হন সে কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে বর্ণিত কিছু কিছু ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, তাঁর মামাতো ভাই মুহাম্মাদ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভক্তি ও ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি কুরাইশদের বৈরী আচরণে তুলাইব ছিলেন সব সময় ক্রুদ্ধ। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি কুরাইশদের রূঢ় আচরণের কঠিন জবাবও তিনি মাঝে মাঝে দিতেন। আর এসব কাজে তাঁর নেক্‌কার মা তাঁকে সবসময় সমর্থন জানাতেন।

আল-হারেস আত-তাঈমী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার দারুল আরকাম বা আরকামের গৃহে অবস্থান কালে 'তুলাইব' ইবন উমাইর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর সেখান থেকে বের হয়ে সোজা মা আরওয়া বিনতু 'আবদুল মুত্তালিবের নিকট উপস্থিত হন। মাকে বলেনঃ 'মা, আমি মুহাম্মাদের অনুসরণ করেছি, আল্লাহর নিকট নিজেকে সমর্পন করেছি।' মা বললেনঃ 'তোমার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন তোমার মামার ছেলে। পুরুষদের যে শক্তি ও ক্ষমতা আছে আমার তা থাকলে আমি অবশ্যই মানুষের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতাম।' তুলাইব বললেনঃ 'মা, ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর অনুসারী হতে আপনার সামনে কিসের বাধা? আপনার ভাই হামযা, তিনি তো ইসলাম গ্রহণ করেছেন। 'মা বললেনঃ 'আমার অন্য বোনেরা কি করে, আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি। আমি তাদের সাথেই থাকবো।'

তুলাইব বললেনঃ 'যতক্ষণ আপনি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সাক্ষ্য না দেবেন, আমি ততক্ষণ আল্লাহর কাছে আপনার জন্য দু'আ করতে থাকবো।' সন্তানের এই অনুরোধ ভাগ্যবতী মা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত বান্দা'। এই দিন থেকে তিনি তাঁর যবান দ্বারা রাসূলুল্লাহকে (সা) সব রকম সহায়তা করতে শুরু করেন এবং পুত্র তুলাইবকে সর্ব অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। (তাবাকাত—৩/১২৩, আল-ইসাবা—২/২৩৩-২৩৪)।

মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁরা নানাভাবে কুরাইশদের হাতে নির্যাতিত হন। একদিন তুলাইব ও হাতেব ইবন 'আমর মক্কার 'আজইয়াদে আসগার' এলাকায় নামায আদায় করছেন। মক্কার তৎকালীন চরম দুই সন্ত্রাসী ইবনুল আসদা ও ইবনুল গায়তালা তা দেখে ফেলে। তারা তুলাইব ও হাতেবের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে আক্রমণ চালায়। হাতেব ও তুলাইব প্রায় এক ঘন্টা যাবত সে আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং প্রাণ বাঁচিয়ে কোন রকমে পালিয়ে যান। (আনসাবুল আশরাফ—১/১১৭)

মক্কার 'উকবা ইবন আবী মু'য়াইত ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমন। তাছাড়া সে ছিল অত্যন্ত নীচ প্রকৃতির। নানাভাবে সে রাসূলুল্লাহকে (সা) কষ্ট দিত। একদিন সে এক ঝুড়ি ময়লা নিয়ে এসে

রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীর দরযায় ফেলতে শুরু করে। ব্যাপারটি তুলাইবের নজরে পড়ে। তিনি ছুটে গিয়ে 'উকবার হাত থেকে ঝুড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর দু'টি কান মলে দেন। 'উকবা খুব ক্ষেপে গিয়ে তুলাইবের পিছু পিছু তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ জানায় এই বলেঃ 'তুমি কি দেখনা, তোমার ছেলে মুহাম্মাদের পক্ষ নিয়েছে?' আবদুল মুত্তালিবের ভাগ্যবতী মেয়ে জবাব দিলেনঃ আচ্ছা তুমিই বল, তাঁর পক্ষ নেওয়ার জন্য তুলাইবের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি আর কে আছে? মুহাম্মদ তো তার মামাতো ভাই। আমাদের অর্থ কড়ি, জীবন সবই তো মুহাম্মাদের জন্য নিবেদিত।" তারপর তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। যার অর্থঃ "তুলাইব তাঁর মামাতো ভাইকে সাহায্য করেছে, সে তাঁর রক্ত ও অর্থের ব্যাপারে সমবেদনা জানিয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, এই 'উকবা বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। (আনসাবুল আশরাফ ১/১৪৭)

হযরত তুলাইব (রা) ইসলাম গ্রহণের পর বেশ কিছু দিন কুরাইশদের সকল অত্যাচার নিপীড়ন প্রতিরোধ করে মক্কায় অবস্থান করেন। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন চরম রূপ ধারণ করে এবং মক্কায় টিকে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর মক্কাবাসীদের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমন একটি গুজব শুনে যাঁরা হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন তাদের মধ্যে তুলাইবও ছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ১/৩২৪, ৩৬৬)

হাবশা থেকে ফিরে কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সালামা আল-'আজলানীর অতিথি হন। রাসূলুল্লাহ (সা) মুনজির ইবন 'আমর আস-সা'য়েদীর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ইসলামী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

মুহাম্মাদ ইবন 'উমারের বর্ণনা মতে হযরত তুলাইব বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। তাবারী বলেনঃ বদর যুদ্ধে তাঁর যোগদানের ব্যাপারটি প্রমানিত সত্য। অবশ্য মূসা ইবন 'উকবা, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ও আবূ মা'শার বদর যুদ্ধে যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের নামের তালিকায় তুলাইবের নামটি উল্লেখ করেননি। (তাবাকাত—৩/১২৩)

বদর যুদ্ধের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কর্মকাণ্ডের আর কোন তথ্য সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যায়, তাঁর মত এমন তেজোদ্দীপ্ত পুরুষ কখনও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। আমরণ সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

হিজরী ১৩ সনে জামাদিউল উলা মাসে আজনাদাইন যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তবে মুস'য়াব ইবন 'আবদিল্লাহ বলেনঃ তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি কোন সন্তানাদি রেখে যাননি। (তাবাকাত-৩/১২৪, আল-ইসতী'য়াব)

সাওবান ইবন নাজদাহ্ (রা)

নাম সাওবান, পিতার নাম নাজদাহ্, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ। ইয়ামনের প্রসিদ্ধ হিময়ার গোত্রের সন্তান। (আসাহ্হুস্ সিয়ার—৫৯৯) কোন কারণে তিনি দাসে পরিণত হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে খরীদ করেন এবং পরে আযাদ করে দেন। আযাদ করার সময় তিনি সাওবানকে বলেন, ইচ্ছা করলে তুমি স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে চলে যেতে পার অথবা আমার সাথে থাকতে পার। আমার সাথে থাকলে আমার পরিবারের সদস্য বলে গণ্য হবে। সাওবান নিজ গোত্রে ফিরে যাওয়ার চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে থাকাকেই শ্রেয় মনে করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর অল্প কিছু দিন তিনি মদীনায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া মদীনা তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তিনি মদীনা ছেড়ে শামের 'রামলা' নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। মিসর অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং 'রামলা' ছেড়ে 'হিমসে' বসতি স্থাপন করেন। এই হিমসে হিজরী ৫৪ মনে তিনি ইনতিকাল করেন।

হযরত সাওবান ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ খাদেম। ভেতর বাহির সর্ব অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গ লাভের সুযোগ পান। এ কারণে স্বাভাবিকভাবে 'উলুমে নববী' বা নবীর জ্ঞানসমূহে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ১২৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি হাদীস হিফ্জ বা মুখস্থ করার সাথে সাথে প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বও পালন করতেন। আল্লামাহ্ ইবন 'আবদিল বার বলেছেন, সাওবান সেই সব লোকদের একজন যাঁরা হাদীস মুখস্থ করণের সাথে সাথে তার প্রচারের কাজও করেছেন।

হযরত সাওবানের প্রচুর হাদীস মুখস্থ থাকায় অসংখ্য লোক তা শোনার জন্য তাঁর নিকট আসতো। একবার লোকেরা তাঁর নিকট হাদীস শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি বলেনঃ কোন মুসলমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদাহ্ করলে আল্লাহ তাঁর একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তাঁর গোনাহসমূহও মাফ করে দেন। (মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল—৫/২৭৬)

হযরত সাওবানের যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ অন্যদের নিকট থেকে শ্রুত তাঁদের হাদীসসমূহের সত্যাসত্য তাঁর নিকট থেকে যাচাই করতেন। সা'দান ইবন তালহার মত উঁচু স্তরের একজন হাদীস বিশারদ হযরত আবূদ দারদার (রা) নিকট থেকে একটি হাদীস শোনেন এবং তাঁর সত্যাসত্য যাচাই করেন হযরত সাওবানের নিকট থেকে। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর তিনি মদীনার অন্যতম মুজতাহিদ সাহাবী হিসাবে পরিগলিত হন। ('আলামুল মুওয়াক্কিরীন ১/১৫)

হযরত সাওবানের ছাত্রদের গণ্ডিও সুপ্রশস্ত। সা'দান ইবন তালহা, রাশেদ ইবন সা'দ, জুবাইর ইবন নুদাইর, আব্দুর রহমান ইবন গানাম, আবু ইদরীস প্রমুখ ছিলেন তাঁর উল্লেখ যোগ্য ছাত্র।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর এত বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল যে, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায় এমন কোন একটি শব্দও তিনি কোন অমুসলিমের মুখ থেকে শুনে সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললোঃ আস্সালামু 'আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ। সাথে সাথে সাওবান ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি সেই ইয়াহুদীকে এমন জোরে এক ধাক্কা দিলেন যে বেচারা পড়তে পড়তে কোন রকম টাল সামলাল। লোকটি একটু স্থির হয়ে তাঁর এত রাগের কারণ কি তা জানতে চাইলো। সাওবান বললেনঃ তুমি কেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' না বলে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বললে? লোকটি বললো, এতে এমন কি অপরাধ

হয়েছে? আমি তাঁর খান্দানী নামই উচ্চারণ করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, হাঁ, আমার খান্দানী নাম মুহাম্মাদ।

নবুওয়াতের সম্মান তো বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর যে গোলামী বা দাসত্বের সম্পর্ক ছিল তাও যদি কেউ উপেক্ষা বা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতো, তিনি তাকে সর্তক করে দিতেন। হিমসে অবস্থান কালে একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হিমসের তৎকালীন ওয়ালী 'আবদুল্লাহ ইবন কারাত ইযদী যখন তাঁকে দেখতে এলেন না, তখন তিনি একটি চিঠিতে লিখলেনঃ যদি মূসা ও 'ঈসার দাস তোমার এখানে থাকতো, তুমি তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বা দেখতে যেতে। এই চিঠি পেয়ে ওয়ালী এমন ব্যস্ততার সাথে বাড়ী থেকে বের হন যে, লোকেরা মনে করে নিশ্চয় বিরাট কোন কিছু ঘটেছে। এ অবস্থায় তিনি হযরত সাওবানের বাড়ী পৌঁছেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর পাশে বসে থাকেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তিনি এত বেশী সচেতন ছিলেন যে, একবার যে নির্দেশ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে লাভ করেছেন আজীবন তা পালন করেছেন এবং কোন নির্দেশ অমান্য করার বিন্দুমাত্র আশংকা থাকে এমন কাজ তিনি কখনও করেননি। তাবারানী আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ কে বাই'য়াত করবে? সাওবান বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো বাই'য়াত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ কারও কাছে কোন কিছু চাইবে না— এ কথার উপর বাই'য়াত। সাওবান বললেনঃ কিসের জন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ! বললেনঃ জান্নাতের জন্য। সাওবান এ কথার উপর বাই'য়াত করলেন। আবু উমামা বলেনঃ আমি তাঁকে মক্কায় মানুষের ভিড়ের মধ্যে সওয়ারী অবস্থায় দেখেছি। এ অবস্থায় তাঁর হাত থেকে চাবুকটি পড়ে যায়। সম্ভবতঃ তা এক ব্যক্তির ঘাড়ের উপর পড়ে এবং সে চাবুকটি ধরে ফেলে। অতঃপর সে তা সাওবানের হাতে তুলে দিতে চায়; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে বাহন থেকে নেমে এসে নিজ হাতে তুলে নেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/২৪২)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ মানুষের কাছে সাওয়াল করবে না, এ নিশ্চয়তা যে আমাকে দেবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। একথা শুনে সাওবান বলে উঠলেনঃ আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এরপর তিনি কারও কাছে কিছু চাইতেন না। (আল-ইসাবা—১/২০৪)

ইউসূফ ইবন 'আবদিল হামীদ বর্ণনা করেছেন। সাওবান আমাকে বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আহল বা পরিবারবর্গের জন্য দুআ করলেন। আমি বললাম, আমিও তো আহলি বাইতের (আপনার পরিবার বর্গের) অন্তর্গত। তৃতীয়বার তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি আমার পরিবারের অন্তর্গত। তবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তুমি কোন বন্ধ দরযায় না দাঁড়াবে অথবা কোন আমীরের কাছে কিছু চাইতে না যাবে। (আল-ইসাবা—১/২০৪)

এই সব নির্দেশের পর তিনি জীবনে আর কখনও কারও নিকট কোন কিছু চাননি বলে ইতিহাসে জানা যায়।

'আমর ইবন 'আবাসা (রা)

তাঁর নাম 'আমর, আবু নাজীহ কুনিয়াত বা ডাকনাম। পিতা 'আবাসা ইবন 'আমের এবং মাতা রামলা বিনতুল ওয়াকী'য়া। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যার আল-গিফারীর (রা) বৈপিত্রীয় ভাই। (আল-ইসাবা-৩/৫)

জীবনের প্রথম থেকেই আমর ছিলেন সৎ প্রকৃতির লোক। জাহিলী যুগে যখন গোটা আরব মূর্তি পূজায় লিপ্ত তখনও তিনি এ কাজকে ঘৃণা এবং মূর্তি পূজারীদের পথভ্রষ্ট বলে মনে করতেন। তিনি নিজেকে ইসলামের চতুর্থ ব্যক্তি অথবা ইসলামের এক-চতুর্থাংশ বলে দাবী করতেন। তাঁর কাছে যখন জানতে চাওয়া হলো, আপনি কিসের ভিত্তিতে এ দাবী করেন? তিনি বললেনঃ জাহিলী যুগে আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করতাম। মূর্তির কোন গুরুত্ব আমার কাছে ছিল না। আমি জানতাম, এগুলি যেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না, তেমনি কোন উপকারও করতে পারে না। কারণ, তারা পাথরের মূর্তির পূজা করতো। এ সময় আমিএকজন আহলি কিতাব বা ঐশী ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট সর্বোত্তম দ্বীন সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ মক্কায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। তিনি নিজ কাওমের ইলাহ্ বা উপাস্য পরিত্যাগ করে অন্য ইলাহর দিকে মানুষকে আহবান জানাবেন। তিনিই সর্বোত্তম দ্বীন নিয়ে আসবেন। তুমি তাঁর আবির্ভাবের কথা শুনতে পেলে তাঁকে অনুসরণ করবে।

'আমর বলেন, এমন সময় আমি মক্কা থেকে একটি সংবাদ পেলাম। মক্কায় নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা—একথা আমি কারও কাছে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলাম না। অবশেষে পশুর পিঠে সওয়ার হয়ে আমি মক্কায় পৌছলাম। সেখানে এক আরোহীকে প্রশ্ন করলে সে বললোঃ এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যে তার কাওম বা স্বজাতীয় ইলাহকে ঘৃণা করে। আমি গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করলাম। কারণ, তখন তাঁর স্বজাতীয় লোকেরা চরমভাবে তাঁর বিরোধিতা করছে। অন্য একটি বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'আমরের এ সাক্ষাৎ হয় 'উকাজ মেলায়। প্রথম সাক্ষাতে তাঁদের কথোপকথন ছিল নিম্নরূপঃ

'আমর প্রশ্ন করেনঃ আপনি কে?

—আমি আল্লাহর নবী।

—আল্লাহ কি আপনাকে পাঠিয়েছেন?

—হাঁ।

—কি কি জিনিস সহকারে পাঠিয়েছেন?

—আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করবে, তার সাথে কোন কিছু শরিক করবে না, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে।

—কেউকি এ দাওয়াত কবুল করেছে?

—হাঁ, একজন আযাদ ও একজন দাস।

'আমর বলেন, সে দু'জন হলেন আবু বকর ও বিলাল। অতঃপর 'আমর আরজ করেন, আমাকেও আল্লাহর উপাসকদের মধ্যে শরিক করে নিন। আমি আপনারই সাথে থাকবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যখন চারদিক থেকে আমার বিরোধিতা চলছে তখন কিভাবে তুমি আমার সাথে থাকবে? এখন তোমার স্বদেশ ভূমিতে তুমি ফিরে যাও। যখন আমি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে শুরু করি তখন আমার নিকট চলে এসো। 'আমর বলেন, এভাবে আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং নিজেকে ইসলামের

এক চতুর্থ হিসেবে দেখতে পাই। (আল-ইসাবা-৩/৬, হায়াতুস সাহাবা-১/৭১-৭২)

রাসূলুল্লাহর নির্দেশমত 'আমর ইসলাম গ্রহণ করে স্বগোত্রে ফিরে যান। তবে মক্কায় যাতায়াতকারীদের মাধ্যমে সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) খোঁজ-খবর রাখতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর ইয়াসরিব বা মদীনার কিছু লোক 'আমরের গোত্রে আসে। তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, মক্কা থেকে যে লোকটি মদীনায় এসেছেন, তাঁর অবস্থা কি? তারা বললো, দলে দলে লোক তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তাঁর স্বজাতি তো তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল; কিন্তু পারেনি। এখন তিনি মদীনায়।

তাদের কাছে এই খবর পেয়ে 'আমর মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলে তিনি বললেনঃ হাঁ, তোমাকে আমি চিনেছি, মক্কায় তুমি আমার সাথে দেখা করেছিলে। তখন থেকে 'আমর মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

হয়রত 'আমরের মদীনায় আগমনের সময় সম্পর্কে মতভেদ আছে। একটি মতে তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় আসেন এবং বদরে অংশগ্রহণ করেন। তবে প্রসিদ্ধ মতে তিনি খাইবার যুদ্ধের পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় আসেন। (আল-ইসাবা-৩/৫)

বদর, উহুদ, হুদাইবিয়া, খাইবরসহ বিভিন্ন যুদ্ধ তাঁর স্বদেশ থাকাকালেই শেষ হয়ে যায়। মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি সর্বপ্রথম অংশগ্রহণ করেন। তায়িফ অভিযানেও যে তিনি শরিক ছিলেন, এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। তায়িফ অবরোধকালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বললেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করবে, তার জন্য জান্নাতের একটি দরযা খুলে যাবে। এই সুসংবাদ শুনে আমি ১৬টি তীর নিক্ষেপ করি। তায়িফ অভিযানের পর আর কোন যুদ্ধে তার যোগদানের কথা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে তিনি আরও কিছু যুদ্ধে যোগদান করেন।

হযরত 'আমর ইবন 'আবাসার (রা) মৃত্যুর সময়কাল সঠিকভাবে জানা যায় না। সীরাত বিশেষজ্ঞরা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন, তিনি খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং 'আল-ইসাবা ফী-তাময়ী যিস্ সাহাবা' গ্রন্থকার 'আল্লামা ইবন হাজার আল-'আসকালানী' শুধু এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে—যেহেতু 'আলী-মুয়াবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব এবং আমীর মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে কোথাও তাঁকে দেখা যায় না—'উসমানী খিলাফতের শেষদিকে তাঁর মৃত্যুকাল উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/৬) কিন্তু মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের এক বর্ণনায় জানা যায়, আমীর মু'য়াবিয়া (রা) ও রোমানদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তির কারণে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) রোমানদের ওপর আক্রমণ চালাতে পারতেন না। কিন্তু হযরত মু'য়াবিয়া (রা) পরিকল্পনা করেন, তাঁর বাহিনী রোমান সীমান্তে পৌঁছে যাবে, আর এদিকে চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁর বাহিনী সাথে সাথে হামলা চালিয়ে দেবে। এ সময় 'আমর ইবন আবাসা চিৎকার করে বলে বেড়াতেন, অঙ্গিকার পূর্ণ কর, ধোকা দিও না।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি আমীর মু'য়াবিয়ার খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু যদি 'আল-ইসাবা' গ্রন্থকারের মতটি সত্য ধরা হয়, তাহলে এই ঘটনাটি ছিল 'উসমানী খিলাফতকালের, যখন হযরত মু'য়াবিয়া (রা) শামের গভর্নর ছিলেন। তখনও রোমানদের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল।

হযরত 'আমর ইবন 'আবাসা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মুহবত বা সাহচর্যের খুব বেশী সুযোগ পাননি। তবে যতটুকু পেয়েছেন তা পুরাপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন। আমরা তার প্রমাণ পাই মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাতে। তিনি 'আরজ করেন—'আল্লিমনী মা

'আল্লামাকাল্লাহু—আল্লাহ্ আপনাকে যা শিখিয়েছেন তারকিছু আমাকেও শিখিয়ে দিন। এ কারণে এত কম সময়ের সাহচর্য সত্তেও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বর্ণিত মোট ৪৮টি হাদীস দেখা যায়।

সাহাবীদের মধ্যে ইবন মাস'উদ, আবু উমামা আল-বাহিলী, সাহ্ল ইবন সা'দ ; এবং তাবেঈদের মধ্যে শুরাহ্বীল ইবন সামাত, সা'দান ইবন আবী তালহা, সুলাইম ইবন 'আমের, আবদুর রহমন ইবন 'আমের, জুবাইর ইবন নাফীর, আবু সালাম ও অন্যরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা-৩/৫)

আবু নু'ঈম কা'বের মাওলা বা আযাদকৃত দাস থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ একদিন 'আমর ইবন 'আবাসা পশু চরাতে গেলেন। আমি তাঁর খোঁজে দুপুরে বের হলাম। আমি দেখতে পেলাম, 'আমর একস্থানে ঘুমিয়ে আছেন এবং একখানি মেঘ তাঁর ওপর ছায়া দিচ্ছে। আমি তাঁকে জাগালাম। তিনি জেগে আমাকে বললেন, এই ব্যাপারটি আমার ও তোমার মধ্যে গোপন থাকুক। অন্য কারও নিকট প্রকাশ করলে তোমার ভালো হবে না। আমি তাঁর জীবদ্দশায় একথা কারও নিকট বলিনি। (আল-ইসাবা-৩/৬)

ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা (রা)

নাম ওয়ালীদ, পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা। কুরাইশ গোত্রের বনী মাখযুম শাখার সন্তান। প্রখ্যাত সাহাবী ও সেনানায়ক হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও হিশাম ইবনুল ওয়ালীদের ভাই। একটি বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হিশামের সহোদর ও খালিদের বৈমাত্রীয় ভাই।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মক্কী জীবনে ওয়ালীদ ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ সময় মুসলমানদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, সীরাত গ্রন্থাবলীতে সে সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। তবে দেখা যায়, মক্কার কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং পরাজিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ মতান্তরে সুলাইত ইবন কায়েসের (রা) হাতে বন্দী হন।

(আনসাবুল আশরাফ—১/৩০২)

ওয়ালীদের অন্য দুই ভাই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও হিশাম ইবনুল ওয়ালীদ তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে আসেন। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ দাবী করেন। এত মোটা অংকের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে খালিদ দ্বিধার ভাব প্রকাশ করেন। এতে হিশাম খুব রেগে গিয়ে খালিদকে বলেনঃ তোমার কি, তুমি তো আর তার ভাই নও? আবদুল্লাহ যদি এরচেয়ে বেশীও দাবী করে তবুও তাকে মুক্ত করতে হবে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেনঃ ওয়ালীদ তার কাওমের ধর্মের ওপর থাকা অবস্থায় বন্দী হন এবং চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওয়ালীদের মুক্তির বিনিময়ে তার পিতার ঢাল, বর্ম ও তরবারি দাবী করেন। তার ভাইয়েরা সেই দাবী পূরণ করে তাঁকে মুক্ত করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/২১০)

ওয়ালিদ মুক্তি পেয়ে ভাইদের সাথে মক্কার পথে যাত্রা করলেন। যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌছার পর ভাইদের নিকট থেকে পালিয়ে আবার মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ভাইয়েরা ফিরে এসে আবার তাঁর সাথে দেখা করে বলেন, যদি তোমার মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাহলে মুক্তিপণ দেওয়ার পূর্বে হলে না কেন? শুধু শুধু পিতার স্মৃতিচিহ্নগুলি নষ্ট করলে। ওয়ালীদ তাদেরকে বলেন, অন্য কুরাইদের মত আমিও মুক্তিপণ প্রদান করে মুক্ত হতে চেয়েছিলাম। মুক্তির পূর্বে আমি ইসলামের ঘোষণা এজন্য দিইনি যে, যাতে কুরাইশরা এমন কথা বলতে না পারে, আমি ফিদিয়া বা মুক্তিপণ দেওয়ার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ভাইদের সাথে আবার মক্কার পথে যাত্রা করেন। পথে তাঁর ভাইয়েরা তো তেমন কিছু বললো না। কিন্তু মক্কায় পৌছে অন্যান্য অত্যাচারিত মুসলমানদের মত তাঁকেও বন্দী করলো এবং তাঁর মত অন্য বন্দী—আইয়াশ ইবন রাবী'য়া, হিশাম ইবনুল আস, সালামা ইবন হিশাম প্রমুখের সাথে একঘরে আটক করলো।

ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এসব বন্দীদের ওপর কুরাইশরা অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। তাদের হত্যারও হুমকি দেয়া হতো।

কালবী বলেনঃ যাদের কোন গোত্রীয় শক্তি বা জনবল ছিল না এমন একটি দুর্বল সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের অনেকে দ্বীন ত্যাগ করেছে, অনেকে ইসলামে অটল থেকেছে, আবার অনেকে ঈমান না হারিয়ে তাদের আদেশ পালন করেছে। অভিজাত

ঘরের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। যেমনঃ সালামা ইবন হিশাম ইবনুল মুগীরা, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া প্রমুখ। (আনসাবুল আশরাফ—১/১৯৭)

ইবন ইসহাক বলেন, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, বনু মাখযুমের একদল লোক তাঁর ভাই হিশাম ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরার নিকট যায় এবং ওয়ালীদকে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়ার আবদার জানায়। তাদের যুক্তি ছিল, তাঁকে হত্যা করলে অন্যদের ব্যাপারে তারা নিরাপদ হতে পারবে। হিশাম তাদের সেই আবদার অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি আরও হুমকি দেন, কেউ তাঁর ভাই ওয়ালীদকে হত্যা করলে তিনি তাদের সর্বাধিক মর্যাদাবান এক ব্যক্তিকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন। এই চরম হুমকির মুখে তারা ওয়ালীদকে হত্যার আশা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

(সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২১)

বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আইয়াশ ইবন রাবী'য়া, সালামা ইবন হিশাম, হিশাম ইবন 'আস প্রমুখের মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন। বদর যুদ্ধের পর ওয়ালীদ বন্দী হয়ে তাঁদের সাথে যুক্ত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম ধরেও দু'আ করতে লাগলেন। বায্যার আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সালাম ফিরানোর পর মাথা উঁচু করলেন এবং কিবলামুখী অবস্থায় বললেনঃ হে আল্লাহ, তুমি সালামা ইবন হিশাম, 'আইয়াশ ইবনে রাবী'য়া, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ এবং ঐ সকল দুর্বল মুসলমানকে মুক্তি দাও যারা কোন কৌশল অবলম্বনে অক্ষম এবং যাদের কোন পন্থা জানা নেই।' অন্য একটি বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতুল ফজরে এই দু'আ করতেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৮)

বেশ কিছু দিন তাঁর বন্দী দশায় কাটে। একদিন সুযোগ বুঝে তিনি মদীনায় পালিয়ে আসেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর কাছে 'আইয়াশ ও সালামার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। ওয়ালীদ বলেন, তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। একটি বেড়ী দু'জনের পায়ে লাগানো হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বললেনঃ তুমি আবার মক্কায় যাও। সেখানকার এক কর্মকার ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রথমে তার ওখানে গিয়ে ওঠো। তারপর গোপনে 'আইয়াশ ও সালামার সাথে দেখা করে বল, তুমি আমার প্রতিনিধি, আমার সাথে চলো।

রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত ওয়ালীদ মক্কায় পৌঁছলেন এবং 'আইয়াশ ও সালামার সাথে দেখা করে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী তাঁদের কাছে পৌঁছে দিলেন। পরিকল্পনা মত তাঁরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তাঁদের পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ধরতে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় ফিরে যান।

এদিকে ওয়ালীদ তাঁর সঙ্গীদ্বয়সহ একটানা ভ্রমণ ও অজানা শঙ্কায় ক্লান্তিতে অসাড় হয়ে পড়ছিলেন। এই সময় কবিতার একটি শ্লোক বারবার তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

"ওহে আমার চরন যুগল! আমাকে আমার কাওমের নিকট পৌঁছে দাও।
আজকের এ দিনটির পর আর কখনও তুমি অলস দেখতে পাবে না।"

আজবাস নামক স্থানে তিনি পড়ে গেলে একটি অঙ্গুলি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তিনি আহত অঙ্গুলিটিকে উদ্দেশ্য করে একটি শ্লোক আওড়াতে থাকেনঃ "ওহে, তুমি একটি অঙ্গুলি ছাড়া আর কিছু নও, যা থেকে রক্ত ঝরেছে।
যা কিছু তুমি লাভ করেছ, তা সবই আল্লাহর রাস্তায়'। (আনসাবুল আশরাফ— ১/২০৯—২১০,

হুদাইবিয়ার চুক্তি অনুযায়ী হযরত রাসূলে কারীম (সা) হিজরী সপ্তম সনে বিগত বছরের কাজা উমরা আদায় করতে মক্কায় যান। ওয়ালীদ এ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। তখনও

তাঁর ভাই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ সম্পর্কে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বলেনঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আমি যখন দারুণ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি, তখন হিজরী ৭ম সনে যুল-কাদাহ্ মাসে হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'উমরাতুল কাজা' আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁদের কারও সামনে পড়তে হয় এই আশঙ্কায় আমি আত্মগোপন করে থাকলাম। তাঁদের কারও সাথে আমার দেখা হলো না। আমার ভাই ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ এই সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। তিনি আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমাকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠির বিষয়বস্তু নিম্নরূপঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। অতঃপর ইসলামের ব্যাপারে আপনার এমন বিরূপ মনোভাব পোষণের কারণে আপনাকে আমার খুব আশ্চর্য মানুষ বলে মনে হয়েছে। অথচ আপনি একজন বড় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি। আপনার মত কোন ব্যক্তি কি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেনঃ খালিদ কোথায়? আমি বলেছিঃ শিগগিরই আল্লাহ তাঁকে নিয়ে আসবেন। তিনি তখন বললেনঃ তার মত ব্যক্তি কি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে? তার বুদ্ধি ও চেষ্টা যদি মুসলমানদের পক্ষে হতো, তাহলে তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতো এবং আমি তাকে অন্যদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিতাম। ভাই, যে ভালো কাজ আপনার হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখনই আপনি এসে তাতে শরিক হউন।" মূলতঃ এই চিঠি পেয়ে হযরত খালিদ ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে মদীনার দিকে যাত্রা করেন।

(হায়াতুস সাহাবা-১/১৬০, উসুদুল গাবা-৫/৯৩)

হযরত ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদের মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে, তিনি আইয়াশ ও সালামাকে মুক্ত করে মদীনায় ফিরে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। এই বর্ণনা মতে, মদীনায় পৌঁছে তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হয়ে বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মৃত, আপনার পরিত্যক্ত একটু কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিন। অতঃপর তিনি মারা যান এবং রাসূল (সা) স্বীয় কাপড় দিয়ে তাঁকে কাফন দেন।

(আল-ইসাবা-৩/৬৪০, আনসাবুল আশরাফ—১/২১০-২১১)

কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, একাধিক বর্ণনায় জানা যায়, তিনি হিজরী ৭ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'উমরাতুল কাজা' আদায়ে শরিক ছিলেন। আল্লামা ইবন 'আবদিল বার লিখেছেনঃ "আর একথা সঠিক যে, তিনি 'উমরাতুল কাজায়' রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।" আর 'উমরাতুল কাজা হিজরী ৭ম সনের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে প্রথম বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় 'উমরাতুল কাজার দুই বছর পূর্বে হিজরী ৫ম সনে তাঁর ওফাত হয়।

তাছাড়া ওয়াকিদী বলেছেনঃ কেউ কেউ মনে করেন, ওয়ালীদ মক্কা থেকে পালিয়ে আবু বাসীরের দলের সাথে যোগ দেন। উল্লেখ্য যে, এই আবুবাসীর হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মদীনায় আসেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাঁকে মক্কায় ফেরত পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর এক সঙ্গীকে হত্যা করে আবার মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে আসেন। তিনি আবু বাসীরকে মদীনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। আবু বাসীর মদীনা ত্যাগ করে লোহিত সাগরের উপকূল এলাকায় চলে যান। এরপর মক্কার আরও কিছু নও মুসলিম যুবক তাঁর সাথে যোগ দেন। তাঁরা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা আক্রমণ করে লুটপাট করতেন। ফলে কুরাইশদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অতঃপর কুরাইশরা অনন্যোপায় হয়ে এই দলটিকে মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ জানায়। রাসূল (সা) তাঁদেরকে মদীনায় ডেকে পাঠান। (আনসাবুল আশরাফ—১/২১০-২১১) তবে বালাযুরী এই বর্ণনাকে সঠিক বলে মনে করেননি। যাই

হউক হিজরী অষ্টম সনের পরে যে তিনি জীবিত ছিলেন এমন কোন প্রমাণ সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা ছিলেন ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদের চাচাতো বোন। ওয়ালীদের মৃত্যুর পর তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বিদেশ-বিভূঁয়ে মারা গেছে। তার জন্য শোক প্রকাশের কেউ এখানে নেই। রাসূল (সা) তাঁকে শোক প্রকাশের অনুমতি দান করেন। উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে খাবার তৈরী করেন এবং পাড়ার অন্য মহিলাদের ডেকে আনেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) একটি মরসিয়া বা শোকগাঁথা আবৃত্তি করতে শুরু করেন। তার দু'টি শ্লোক নিম্নরূপঃ

"ওহে চোখ, তুমি ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ ইবন মুগীরার জন্য কাঁদ। আমাদের মধ্যে সে ছিল খরার সময় বৃষ্টি ও রহমত স্বরূপ। নামকাম ও গৌরবে সে ছিল তাঁর পিতার মত। সে তাঁর গোত্রের জন্য একাই যথেষ্ট।"

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মরসিয়াটি শোনার সাথে সাথে বলে উঠলেনঃ উম্মু সালামা, একথা না বলে বরং বলঃ "মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসবে। আর এ থেকেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে এসেছো। (সূরা কাফ—১৯) (আনসাবুল আশরাফ—১/২১০-২১১, আল-ইসাবা—৩/৬৪০)

ইবন হিশাম বলেনঃ মুজাহিদের সূত্রে আমার নিকট পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন সূরা ফাত্হ-এর নিম্নের আয়াতটি ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম, 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া, আবু জান্দাল ইবন সুহাইল ও তাঁদের মত আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ

"তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হতো, যদি না এমন কিছু মুমিন নর ও নারী থাকতো, যাদেরকে তোমরা জাননা। তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করতে। ফলে, তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে।"

(সূরা আল-ফাত্হ-২৫, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩২১)

সালামা ইবন হিশাম (রা)

নাম সালামা, ডাকনাম আবূ হাশেম। পিতা হিশাম ইবন মুগীরা এবং মাতা দাবা'য়া বিন্তু আমের। ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবূ জাহলের ভাই।

ডঃ মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ সালামার মা দাবা'য়া বিনতু আমেরের জাহিলী জীবনের এক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। হাইসাম ও ইবনুল কালবী বর্ণনা করেছেনঃ মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদা'য়া ইবন আব্বাসকে বলেছেনঃ দাবায়া বিনতু আমের ছিলেন হাওজা ইবন আলীর স্ত্রী। হাওজা মারা গেলে দাবা'য়া উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি পিতৃ গোত্রে ফিরে আসেন। সেখানে 'আবদুল্লাহ ইবন জুর্দ'য়ান আত তাইমী দাবা'য়ার পিতার নিকট তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। তাঁর পিতা রাজী হন এবং আবদুল্লাহর সাথে তাঁকে বিয়ে দেন।

এদিকে দাবা'য়ার চাচাতো ভাই হুযন ইবন 'আবদুল্লাহ দাবায়ার পিতার নিকট তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দাবায়ার পিতা বলেন, আমি তো তাকে ইবন জুর্দ'য়ানের সাথে বিয়ে দিয়েছি। হুযন তখন শপথ করে বলে, দাবায়া যদি ইবন জুদয়ানের কাছে যায় তাহলে আমি তার স্বামীর সামনেই তাকে হত্যা করবো।

দাবা'য়ার পিতা ঘটনাটি ইবন জুর্দ'য়ানকে জানালেন। ইবন জুর্দ'য়ানও পাল্টা জানিয়ে দিলেন, যদি তিনি দাবায়ার চাচাতো ভাইয়ের দাবী অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে 'উকাজ মেলায় তার বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে। দাবায়ার পিতা তার চাচাতো ভাইয়ের নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলে সে নমনীয় হয়ে যায় এবং তার দাবী প্রত্যাহার করে নেয়।

দাবা'য়াকে ইবন জুর্দ'য়ানের নিকট পাঠানো হলো। আল্লাহর মর্জি যতদিন ছিল, তিনি সেখানে থাকলেন। দাবায়া ছিলেন অতি সুন্দরী যুবতী। ইবন জুর্দ'য়ানের সাথে দাম্পত্য জীবন চলাকালে একদিন মক্কায় কা'বার তাওয়াফ করছিলেন, এ সময় হিশাম ইবন মুগীরার নজরে পড়লেন। দাবা'য়ার রূপে হিশাম মুগ্ধ হলেন। কা'বার চত্বরে তারা কিছুক্ষণ কথা বললেন, এক পর্যায়ে হিশাম বললেনঃ দাবায়া! এই রূপ ও যৌবন নিয়ে তুমি একজন বৃদ্ধের ঘর করছো? তার নিকট থেকে তালাক নিতে পারলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

ঘরে ফিরে দাবা'য়া স্বামী ইবন জুর্দ'য়ানকে বললেনঃ আমি একজন যুবতী নারী, আর তুমি এক বৃদ্ধ। ইবন জুর্দ'য়ান বললেনঃ একথা কেন? আমি জানতে পেরেছি, তাওয়াফের সময় হিশাম তোমার সাথে কথা বলেছে। তুমি হিশামকে বিয়ে করবে না—যতক্ষণ তুমি আমার কাছে এ অঙ্গিকার না করছো, আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি না। তোমাকে আরও অঙ্গিকার করতে হবে, যদি তাকে বিয়ে কর তাহলে তুমি আমার এই শর্তগুলি পূরণ করবেঃ ১· উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করবে, ২· এতগুলি উট কুরবানী করবে, ৩· এত পরিমাণ পশমের সূতা কাটবে।

দাবায়া এই শর্তের কথা হিশামকে জানালেন। হিশাম বললেনঃ প্রথম শর্তটির ব্যাপারে আমি কুরাইশদের সাথে আলোচনা করে কা'বার চত্বর সম্পূর্ণ ফাঁকা করে দেব। তুমি শেষ রাতে অন্ধকারে একাকী উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ সেরে নেবে। কেউ দেখার সুযোগ পাবে না। আর তোমার পক্ষ থেকে উট আমি কুরবানী করে দেব। আর সূতা কাটার ব্যাপারটি, তা এটা কোন ধর্ম নয়। কুরাইশরা এটা তৈরী করেছে। আমার প্রতিবেশী মহিলারা তোমার পক্ষ থেকে এ কাজটি করে দেবে।

হিশামের প্রতিশ্রুতি পেয়ে দাবা'য়া স্বামী ইবন জুর্দ'য়ানকে বলেন, আমি তোমার শর্তে রাজী।

হিশামকে বিয়ে করলে তোমার এ শর্তসমূহ পূরণ করবো। এভাবে ইবন জুদ'য়ানের নিকট থেকে তালাক নিয়ে দাবা'য়া হিশামকে বিয়ে করেন। হিশাম কুরাইশদের সাথে কথা বলে কা'বার চত্বর খালি করে দিলে দাবা'য়া উলঙ্গ হয়ে কা'বা তাওয়াফ করেন। কালবী বলেনঃ মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদা'য়া বলেছেনঃ আমি তখন এক বালক। মসজিদের একটি দরযা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিলাম। দেখলাম, দাবা'য়া কাপড় খুলে ফেললো। এভাবে এক সপ্তাহ ধরে সে একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তাওয়াফ করলো। অন্য শর্ত দু'টিও হিশাম পূরণ করেন। এই হিশামের ঔরসে দাবায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন সালামা ইবন হিশাম। উত্তরকালে এই সালামা হলেন একজন পরীক্ষিত উত্তম মুসলমান।

হিশামের সাথে দাম্পত্য জীবন চলাকালে দাবা'য়ার পূর্ব স্বামী আবদুল্লাহ ইবন জুদয়ান মারা যান। তার মৃত্যুর খবর শুনে দাবা'য়া মন্তব্য করেনঃ তিনি ছিলেন একজন আরব রমনীর এক চমৎকার স্বামী। এর কিছু দিন পর হিশাম মারা গেলে দাবা'য়া বিধবা হন।

পরবর্তীকালে দাবা'য়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এদিকে পুত্র সালামাও বড় হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সালামার নিকট তাঁর মাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সালামা তাঁর মায়ের সাথে পরামর্শ করে তাঁর মধ্যে অনীহার ভাব লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহকে (সা) জানান। রাসূল (সা) প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন। (ডঃ হামীদুল্লাহ সম্পাদিত আনসাবুল আশরাফ'—১, টীকা নং ৩, পৃঃ ৪৬০—৪৬১)

মক্কায় ইসলামী দাও'য়াতের সূচনা পর্বেই সালামা ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশায় হিজরাত করেন। কিছু দিন সেখানে থাকার পর আরও অনেক মুহাজিরদের সাথে তিনিও মক্কায় ফিরে আসেন। সকল মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে— এমন একটি গুজব শুনে তারা মক্কায় আসেন। অনেকেই আবার হাবশায় ফিরে যান। সালামাও যেতে চান, কিন্তু আবু জাহল তাঁকে বাধা দেয়। তাঁর উপর অত্যাচার শুরু হয়। তাঁকে অনাহারে রাখা হয় এবং মারপিটও চলতে থাকে। তবে তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তখন পর্যন্ত ইসলাম তেমন শক্তি অর্জন করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহও (সা) কোন রকম সাহায্য করতে সক্ষম ছিলেন না। তবে নামাযের পর সালামা ও তাঁর মত নির্যাতিতদের জন্য এই বলে দু'আ করতেনঃ 'হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম ও 'আয়্যাশ ইবন রাবীয়াকে মক্কার মুশরিকদের কঠোরতা থেকে মুক্তি দাও। 'ওয়ালীদের জীবনীতে সালামার মুক্তি ও মদীনা হিজরাতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি মক্কায় কাফিরদের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় বদর যুদ্ধ শেষ হয়। বদর যুদ্ধের পর, মতান্তরে খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আসেন। মদীনায় আসার পর সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধে শত্রু বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে যারা ময়দান থেকে পালিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন। এই লজ্জা ও অনুশোচনায় পরবর্তী জীবনে তিনি ঘর থেকে বের হওয়া প্রায় ছেড়ে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা থেকে ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। তিনি সালামা ইবন হিশামের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, সালামার হয়েছে কি, আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের সাথে নামাযের জামায়াতে শামিল হতে দেখিনে কেন? সালামার স্ত্রী বললেনঃ আল্লাহর কসম, তিনি বের হতেই পারেন না। বের হলেই মানুষ তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলতে থাকে— 'ইয়া ফুররার, ফারারতুম ফী সাবীলিল্লাহ, ওহে পলাতক, আল্লাহর রাস্তা থেকে তোমরা পালিয়েছ।" এ কারণে তিনি বাড়ীতেই থাকেন, বাইরে কোথাও যান না। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮২-৮৩) তবে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাকে "কাররার" বা প্রচণ্ড আক্রমণকারী বলে সম্বোধন করতেন। (আল-ইসাবা—২/৬৯)

হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে তিনি শাম বা সিরিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই অভিযানের এক পর্যায়ে হযরত 'উমারের খিলাফতকালে হিজরী ১৪ সনের মুহাররম মাসে সংঘটিত 'মারজে সফর' বা মারজে রোম' নামক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তবে 'উরওয়া, মূসা ইবন 'উকবা, আবু যার'য়া আদ দিমাশ্‌কীর মতে তিনি আজনাদাইন যুদ্ধে শহীদ হন। (আল-ইসাবা-২/৬৯)

সালামার মা দাবা'য়া একটি কবিতায় বলেছেনঃ "হে সম্মানিত কা'বার প্রভুঃ কোন দুশ্চিন্তা নেই। সালামাকে প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী কর।

অনিশ্চিত কর্মকাণ্ডে তার দু'টি হাত,
যার একটি প্রকাশ পায় এবং অন্যটি দানশীল। (আনসাবুল আশরাফ—১/২০৮)

'আমের ইবন রাবী'য়া (রা)

নাম 'আমের, কুনিয়াত আবু আবদিল্লাহ এবং পিতা রাবী'য়া। তাঁর খান্দান হযরত 'উমারের (রা) পিতা খাত্তাব-এর হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিল। খাত্তাব তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তাঁকে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। এ কারণে প্রথম জীবনে 'আমের ইবনুল খাত্তাব (খাত্তাবের পুত্র 'আমের) নামে পরিচিত হন। কিন্তু কুরআন যখন এ প্রথা বাতিল করে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর জন্মদাতা পিতার নামে পরিচয় গ্রহণের নির্দেশ দেয়, তখন হযরত 'আমেরও খাত্তাবের পরিবর্তে নিজের জন্মদাতা পিতা রাবী'য়ার নামে পরিচিত হন।

উল্লেখিত সম্পর্কের কারণে হযরত 'আমের ও হযরত উমারের মধ্যে শেষ জীবন পর্যন্ত অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। হযরত উমারের 'বাইতুল মাকদাস' সফরের সময় হযরত আমের তার সফরসঙ্গী ছিলেন। যে বছর হযরত উসমানকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে হযরত উমার হজ্জে যান, সঙ্গে আমেরও ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়ার পূর্বে ইসলামের সেই সূচনাপর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) আহবানে সাড়া দিয়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, হযরত 'আমের সেই সৌভাগ্যবানদেরই একজন।

শিরক ও তাওহীদের সংঘাত-সংঘর্ষ এবং কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনে তিনিও শান্তিতে মক্কায় বসবাস করতে পারেননি। তিনি স্ত্রী হযরত লায়লাকে সংগে করে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। 'আমেরের স্ত্রী বলেনঃ আমরা হাবশায় হিজরাতের প্রস্তুতি নিচ্ছি। 'আমের কোন প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে যান। এমন সময় 'উমার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। তখনও সে শিরকের ওপর। আমরা তার হাতে নিগৃহিত হতাম। উমার আমাকে বললোঃ আবদুল্লাহর মা, এ কি! তোমাদের চলে যাওয়ার প্রস্তুতি? বললামঃ হাঁ, আমরা আল্লাহর এক যমীন হতে অন্য যমীনের দিকে যাব। তোমরা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছ, আমাদের ওপর যুলুম করেছ। দেখা যাক, আল্লাহ কোন উপায় বের করে দেন কিনা। উমার বললোঃ আল্লাহ তোমাদের দিনটি মঙ্গলময় করুন। আমেরের স্ত্রী বলেনঃ আমি সেদিন উমারকে এত নরম দেখলাম যা আর কখনও দেখিনি। উমার চলে গেল। আমাদের দেশত্যাগে সে অত্যন্ত কষ্ট পায়। আমের বাড়ী ফিরলে আমি তাঁকে বললামঃ আবদুল্লাহর বাপ, এইমাত্র তুমি যদি উমারের বিষণ্ণতা ও আমাদের প্রতি তার দরদ দেখতে! আমের বললেনঃ তুমি তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছো? বললামঃ হাঁ। তিনি বললেনঃ খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে, তবে তুমি যাকে দেখেছো সে ইসলাম গ্রহণ করবে না। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৫৬)

হযরত আমের (রা) হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে এসে সস্ত্রীক আবার মদীনায় হিজরাত করেন। ইবন ইসহাক বলেনঃ মুহাজিরদের মধ্যে সাবু সালামার পর সর্বপ্রথম মদীনায় আসেন আমের ইবন রাবী'য়া ও আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৬৩) অনেকের মতে এটা সঠিক নয়। তাঁর পূর্বে আরও কতিপয় ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছেন। তবে একথা সত্য যে, তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতকারী প্রথম মহিলা।

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। তাছাড়া ছোট ছোট অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবন বাজি রেখে আল্লাহর বাণী বা কালেমা প্রচারের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেন। স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবন আমেরের কাছে প্রায়ই নিজের

গৌরবজনক কর্মকাণ্ডের কথা গর্বের সাথে বর্ণনা করতেন। একবার কথা প্রসঙ্গে বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অভিযানে পাঠাতেন। দারিদ্রের কারণে পাথেয় হিসেবে সামান্য কিছু খেজুর দিতেন। প্রথম প্রথম আমরা এক এক মুট করে পেতাম, তারপর কমতে কমতে একটি মাত্র খেজুরে এসে ঠেকতো।' হযরত আবদুল্লাহ বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেনঃ একটা খেজুরে কিভাবে চলতো? জবাবে তিনি বললেনঃ প্রিয় বৎস! এমনটি বলো না। যখন খেজুর শেষ হয়ে যেত, তখন আমরা এই একটি খেজুরের জন্যও কাতর হয়ে পড়তাম।

হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে যখন ফিতনা ও আত্মকলহ চরম রূপ ধারণ করে তখন হযরত আমের (রা) নির্জন-বাস গ্রহণ করেন। রাত-দিন সব সময় রোযা, নামায ও ইবাদাতে মাশগুল থাকতেন। একদা গভীর রাত পর্যন্ত ইবাদাতে মগ্ন ছিলেন, এ অবস্থায় একটু তন্দ্রাভাব আসে। তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ যেন তাকে বলছেন, "উঠো, আল্লাহর কাছে দু'আ কর, তিনি যেন তোমাকে এই ফিত্না থেকে বাঁচান—যিনি তাঁর অন্য নেক বান্দাদের রক্ষা করেছেন।" হযরত আমের সংগে সংগে উঠে বসেন। এই ঘটনার পর তাঁর নির্জনতা অবলম্বন ও ইবাদাতের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এরপর থেকে কেউ আর তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেখেনি। এ অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হযরত উসমানের শাহাদাতের কয়েকদিন পর ইনতিকাল করেন। অতিরিক্ত নির্জনতা অবলম্বনের জন্য কেউ জানতে পারেনি তিনি কবে অসুস্থ হন এবং কবেই বা মৃত্যুবরণ করেন। হঠাৎ তাঁর জানাযা দেখে লোকেরা অবাক হয়ে যায়।

মুসয়াব ইবন যুবাইর বলেনঃ 'আমের হিজরী ৩২ সনে মারা যান। আবু উবাইদার মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৩৭ সন। ওয়াকিদী বলেন, হযরত উসমানের শাহাদাতের অল্প কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (আল-ইসাবা-২/২৪৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, আবু উমামা ইবন সাহল প্রমুখের সূত্রে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যা বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আমের ইবন রাবী'য়া থেকে বর্ণিত। আরবের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসে। আমের তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। লোকটি সে কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বর্ণনা করে। সে আবার ফিরে এসে আমেরকে বলে, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এমন একটি উপত্যকার মালিকানা চেয়েছি, যার থেকে উত্তম উপত্যকা আরবে দ্বিতীয়টি নেই। আমি ইচ্ছা করেছি তার কিছু অংশ আপনাকে দান করবো। যা আপনার ও আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাজে আসবে। আমের বললেনঃ তোমার ঐ জমির কোন প্রয়োজন আমার নেই। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ "মানুষের হিসাব-নিকাশ নিকটবর্তী হয়েছে অথচ এখনও তারা অমনোযোগী হয়ে প্রত্যাখ্যান করে চলেছে।" (সূরা আল-আম্বিয়া-১) আমের বলেন, এ আয়াত আমাদেরকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ করে তোলে। (আল-ইসাবা-২/২৫১-৫২)

উসমান ইবন তালহা (রা)

নাম উসমান, পিতার নাম তালহা ইবন আবী তালহা এবং মাতার নাম উম্মু সাঈদ সালামা। মক্কার কুরাইশ বংশের বনু আমর শাখার সন্তান। জাহিলী যুগে পবিত্র কা'বার হাজেব বা তত্ত্বাবধায়ক ও চাবির রক্ষক ছিলেন। ইসলামী যুগেও এ দায়িত্ব পালন করেন। (উসুদুল গাবা ৩/৩৭২) উসমান ইবন তালহার পিতা তালহা, তিন ভাই মুসাফি', কিলাব ও হারেস এবং তাঁর চাচা 'উসমান ইবন আবী তালহা উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তাঁর পিতা তালহা হযরত আলীর (রা) সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আলী (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ১ম খণ্ড, টীকা নং ৩, পৃঃ ৪৭০)

'উসমান ইবন তালহার ইসলামপূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কায় মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়নে শরীক হতেন কি-না সে সম্পর্কেও ইতিহাসে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। একটি ঘটনা জানা যায়, হযরত মুসয়াব ইবন 'উমাইর (রা) মক্কায় দারুল আরকামে গোপনে ইসলাম গ্রহণের পর চুপে চুপে নামায আদায় করতেন। একদিন 'উসমান ইবনে তালহা তা দেখে ফেলেন এবং তাঁর মা ও গোত্রের কানে পৌঁছে দেন। ফলে তারা মুসয়াবকে বন্দী করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩০১)

হযরত উম্মু সালামার (রা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞরা উসমান ইবন তালহার নামটি বারবার উচ্চারণ করেছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই রকম ঃ হযরত উম্মু সালামা (রা) যখন মক্কার কুরাইশদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে স্বামী আবু সালামার (রা) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য একাকী মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে মক্কার অদূরে তানয়ীমে পৌঁছেন, তখন এই 'উসমান ইবন তালহা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ আবু উমাইয়্যার মেয়ে, কোন দিকে যাবে ? তিনি বললেন ঃ মদীনায় স্বামীর কাছে। উসমান বললেন ঃ তোমার সাথে আর কেউ নেই ? উম্মু সালামা বললেন, আমার এই ছোট্ট শিশু সালামা ছাড়া আর কেউ নেই। অতঃপর উসমান উম্মু সালামার উটের রশি ধরে টেনে চলতে লাগলেন এবং মদীনার উপকণ্ঠে কুবার বনী আমর ইবন 'আউফের পল্লীতে পৌঁছে উম্মু সালামাকে বললেন ঃ আল্লাহর নামে প্রবেশ কর, তোমার স্বামী এখানে আছে। একথা বলে 'উসমান আবার মক্কার পথ ধরেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৯-৭০) হযরত উম্মু সালামা (রা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, 'উসমান তখনও অমুসলিম।

উসমান ইবন তালহার ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কোন মতে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়, কোন মতে হিজরী ৮ম সনে, আবার কোন মতে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরী অষ্টম সনে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও হযরত 'আমর ইবনুল আসের সাথে মদীনায় গিয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ বলেন ঃ আমি যখন মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম তখন মনে মনে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাব কার সাথে ? বিষয়টি নিয়ে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার সাথে আলোচনা করলাম। সে আমার প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বললো, কেউ আমার সাথে না থাকলেও আমি কক্ষণও তার অনুসারী হবো না। এরপর আমি ইকরামা ইবন আবী জাহলের নিকট গিয়ে একই কথা বললাম। সেও সাফওয়ানের মত জবাব দিল। তারপর আমি উসমান ইবন তালহার সাথে দেখা করে বললাম ঃ আমাদের অবস্থা তো এখন সেই খেঁকশিয়ালের মত যে একটি গর্তের মধ্যে আছে, আর সেই গর্তে পানি ঢালা হচ্ছে। এক

সময় অবশ্যই তাকে বের হয়ে আসতে হবে। উসমান আমার কথা বুঝতে পেরে সায় দিল এবং আমার মত একই ইচ্ছা প্রকাশ করলো। আমি বললামঃ আগামী কাল ভোরেই আমি মদীনার পথে রওয়ানা হচ্ছি। অতঃপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, আগামীকাল ভোরে আমরা পৃথক ভাবে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে ইয়াজুজ' নামক স্থানে পৌঁছবো এবং সেখান থেকে এক সাথে যাত্রা করবো। কেউ আগে পৌঁছলে অন্যের জন্য অপেক্ষা করবো। প্রভাত হওয়ার পূর্বেই আমরা 'ইয়াজুজ' পৌঁছে যাত্রা শুরু করলাম। 'হাদ্দা' নামক স্থানে পৌঁছে আমর ইবনুল আসের সাথে আমাদের দেখা হলো। আলাপ করে জানা গেল তিনিও একই উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। তারপর আমরা তিনজন এক সাথে মদীনায় পৌঁছে, রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হই। প্রথমে আমি, তারপর 'উসমান ও আমর রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করি। সে ছিল অষ্টম হিজরীর সফর মাস। (হায়াতুস সাহাবা -১/১৬১-৬২, কবি আবদুল্লাহ ইবন যাব'য়ারী তালহার ইসলাম গ্রহণকে স্বাগতঃ জানিয়ে সে সময় একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন। তার কিছু অংশ ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন (সীরাত-২/২৭৮)। অন্য একটি বর্ননা মতে, উসমান হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খালিদ ও আমরের সাথে মদীনায় যান। (আল-ইসাবা ৩/৪৬০)। অপর দিকে মক্কা বিজয় সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ননা দ্বারা বুঝা যায় মক্কা-বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে 'উসমান কা'বার চাবি লাভ করার পর সেই দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে বাহ্যতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, মক্কা বিজয়ের পর একজন অমুসলিমের হাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বার চাবি তুলে দিতে পারেন কি? চাবি দেওয়ার ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের পূর্বেও কা'বার চাবি ছিল উসমানের নিকট। মক্কা বিজয়ের পূর্বে একজন মুসলমানের হাতে কা'বার চাবি থাকবে, আর কুরাইশরা তা মেনে নেবে, এ কি সম্ভব? এ সব প্রশ্নের সমাধান এ ভাবে হতে পারে, তিনি খালিদ ও 'আমরের সাথে পূর্বেই মদীনায় গিয়ে ইসলামের ঘোষণা দিয়ে মক্কায় চলে আসেন? কিন্তু মক্কার লোকেরা তা হয়তো জানতোনা। (আসাহ্হুস সিয়ার-৩০৪-৩০৬)

জাহিলী যুগ থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কা'বার তত্ত্বাবধান ও চাবি রক্ষকের দায়িত্ব উসমানের ওপর ন্যস্ত ছিলো। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য তাঁর নিকট চাবি চাইলেন। তিনি বাড়ীতে গিয়ে তাঁর মায়ের নিকট চাবি চাইলে তিনি দিতে অস্বীকার করেন। সম্ভবতঃ তখনও উসমানের মা ইসলাম গ্রহণ করেননি। 'উসমান কোষমুক্ত তরবারি উঁচু করে ধরে মাকে বললেন, চাবি দিন অন্যথায় এই তরবারি পিঠে বসিয়ে দেব। এ ভাবে 'উসমান মার নিকট থেকে জবরদস্তি চাবি এনে নিয়ে হযরত রাসূলে কারীমের হাতে অর্পন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দরজা খুলে কা'বার ভেতরে প্রবেশ করেন। উসমানও সংগে ছিলেন। দরযা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর কা'বা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বের হয়ে আসেন। অতঃপর রাসূল (সা) মসজিদে বসলেন। 'আলী (রা) কা'বার চাবিটি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আরজ করলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, চাবিটি আমাদের দায়িত্বে অর্পন করুন। সিকায়াহ্ ও হিজাবাহ্ (হাজীদের পানি পান ও কা'বার রক্ষণাবেক্ষন) উভয় দায়িত্ব এখন থেকে বনু হাশিমের হাতে দান করুন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন, সে দিন 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব কা'বার চাবিটি হস্তগত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁকে সমর্থন করেছিল বনু হাশিমের আরও কিছু লোক। সিকায়াহ্ বা পানি পান করানোর দায়িত্ব পূর্ব থেকেই আব্বাসের ওপর ন্যস্ত ছিল।

বনু হাশিমের এ দাবীর মুখে হযরত রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ উসমান ইবন তালহা কোথায়? উসমানকে ডাকা হলে রাসূল (সা) তাঁর হাতে মতান্তরে উসমান ও তাঁর চাচাতো ভাই শাইবার হাতে চাবিটি দিয়ে বললেনঃ এই তোমার চাবি। এখন থেকে এই চাবি চিরদিনের জন্য তোমাদের হাতে

থাকবে। কেউ তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে সে হবে অত্যাচারী। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৪১১-১২)

ইবন সা'দ লিখেছেনঃ কাবার চাবি পূর্ব থেকেই উসমান ইবন তালহার দায়িত্বে ছিল। তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার কা'বার দরজা খুলতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ভিন্ন এক দিন দরজা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত শক্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সে দিন তাঁকে বলেছিলেন, ওহে উসমান, এমন একদিন আসবে যখন এ চাবি আমারই আয়ত্বে থাকবে এবং আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই অর্পন করবো। উসমান বলেছিলেনঃ সম্ভবতঃ সেদিন গোটা কুরাইশ বংশের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। রাসূল (সা) তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করে বলেনঃ না, বরং সেই দিনটি হবে কুরাইশদের প্রকৃত ইয্যত ও সম্মানের দিন। তাই মক্কা বিজয়ের দিন উসমান যখন রাসূলুল্লাহর (সা) হাত থেকে চাবিটি নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি উসমানকে পুনরায় ডেকে অতীতের সেই ঘটনার কথা স্মরন করিয়ে দেন। উসমান তখন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।'

আজও কা'বার চাবি মক্কার শাইবী গোত্রের লোকের হাতে বিদ্যমান। এই শাইবী গোত্র হযরত উসমান ইবন তালহার (রা) চাচাতো ভাই শাইবা ইবন উসমান ইবন আবী তালহার বংশধর। এই শাইবা ইবন উসমান হুনাইন যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা উসমান ইবন আবী তালহা উহুদ যুদ্ধে কাফির অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। আর তাঁর মা উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুসয়াব ইবন উমাইরের বোন উম্মু জামীল হিন্দা বিনতু 'উমাইর। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর একটি বর্ণনা মতে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার চাবিটি শাইবা ও উসমান উভয়ের হাতে এক সাথে অর্পন করেন। চাবিটি তখন উসমান ইবন তালহা ইবন আবী-তালহার হাতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর উসমানের চাচাতো ভাই শাইবা ইবন 'উসমান ইবন আবী তালহা গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর অধঃস্তন পুরুষদের হাতে কা'বার চাবি বিদ্যমান। (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃঃ ৩০৫)

মক্কা বিজয়ের পর হযরত উসমান ইবন তালহা মদীনায় চলে যান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর কা'বার চাবি রক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য আবার মক্কায় ফিরে যান এবং এখানে হিজরী ৪২ সনে ইনতিকাল করেন। অবশ্য অন্য একটি বর্ননা মতে তিনি খলীফা হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১ টীকা-৩, পৃঃ ৪৭০)

হযরত উসমান ইবন তালহার শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও উন্নত নৈতিকতার প্রমান পাওয়া যায় হযরত উম্মু সালামার হিজরাতের ঘটনার মধ্যে। হযরত উম্মু সালামা তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে অধিকতর কোন ভদ্র লোক আমি আরবে আর কখনও দেখিনি। যখন তিনি আমাকে সংগে নিয়ে কোন মানযিলে পৌছতেন, আমার নামার জন্য উট বসিয়ে দূরে সরে যেতেন। আমি উটের হাওদা থেকে নেমে একটু দূরে সরে গেলে তিনি আবার ফিরে এসে উটটি গাছের সাথে বাঁধতেন এবং আমার নিকট থেকে একটু দূরে কোন গাছের তলায় শুয়ে পড়তেন। আবার যাত্রার সময় হলে উট প্রস্তুত করে আমার কাছাকাছি নিয়ে এসে তিনি সরে যেতেন এবং বলতেন; উটে আরোহন কর। আমি উটের পিঠে ঠিকমত বসার পর তিনি ফিরে আসতেন এবং লাগামটি ধরে নিয়ে চলা শুরু করতেন। এভাবে তিনি আমাকে মদীনায় পৌছে দেন"। (সীবাতু ইবন হিশাম—১/৪৬৯-৭০) হোয়াতুস সাহাবা-১/৩৫৮-৩৫৯) এই ছিল হযরত উসমান ইবন তালহার (রা) ইসলাম পূর্ব জীবনের নৈতিকতার বাস্তব রূপ।

হাজ্জাজ ইবন ইলাত (রা)

নাম হাজ্জাজ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু কিলাব, মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ ও আবু আবদুল্লাহ। পিতা ইলাত ইবন খালিদ। বনী সুলাইম গোত্রের সন্তান।

ইবন সা'দ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খাইবারে তখন তিনি তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর মদীনায় বসতি স্থাপন করেন। ইবন শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত সত্য বলে স্বীকার করে তাঁর কাছে লোক পাঠান। (আল-ইসাবা-১/৩১৩) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ কাহিনী ইতিহাসে দেখা যায়। ইবন আব আদ-দুনিয়া 'হাওয়াতিফুল জিন' গ্রন্থে এবং ইবন আসাকির ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হাজ্জাজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল এমন। তিনি একটি কাফিলার সাথে মক্কায় যাচ্ছেন। একটি নির্জন ভীতিজনক উপত্যকায় রাত হলে তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হাজ্জাজের সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে অনুরোধ করে বলে! আবু কিলাব, তুমি রাত জেগে বসে বসে তোমার নিজের ও সঙ্গীদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করতে থাক। হাজ্জাজ পাহারাদারির দায়িত্ব নিয়ে জেগে জেগে নিম্নোক্ত কথাগুলি জপতে থাকেনঃ

'উ'য়িজু নাফসী ওয়া উ'য়িজু সাহবী,
মিন কুল্লি জিন্নিয়্যিন বিহাজান নাকবি,
হাত্তা আউবা সালেমান ওয়া রাকবী।'

"আমি আমার নিজের ও আমার সঙ্গীদের জন্য পানাহ চাই, এই গিরিপথের সকল জিন থেকে, যাতে আমি ও আমার কাফিলা নিরাপদে ফিরে যেতে পারি।"

তিনি উপরোক্ত কথাগুলি জপছেন। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কারও কণ্ঠে কুরআনের নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনতে পানঃ

'ওহে জিন ও মানব জাতি! আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর! কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ছাড়া।' (সূরা আর রাহমান-৩৩)

তাঁরা মক্কায় পৌঁছে কুরাইশদের মজলিসে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। কুরাইশরা বলেঃ আবু কিলাব, তুমিও তো দেখছি বে-দ্বীন হয়ে গিয়েছ। এতো সেই বাণী যা মুহাম্মাদের ধারণা মতে তার ওপর নাযিল হয়। জবাবে হাজ্জাজ বলেনঃ আল্লাহর কসম, আমি ও আমার সঙ্গীরা এ বাণীই শুনতে পেয়েছি। তাদের এ আলোচনার মাঝখানে 'আসী ইবন ওয়ায়িল উপস্থিত হয়। লোকেরা তাকে বলেঃ আবু হিশাম, এই আবু কিলাব কি বলছে, শুনেছ? বিষয়টি সে জানতে চাইলে লোকেরা তাকে অবহিত করে। সবকিছু শুনে সে বলেঃ এতে অবাক হওয়ার কি আছে? তারা যার কাছ থেকে শুনেছে, সে-ই মুহাম্মাদের ওপর ভর করে তার মুখ দিয়ে বলে থাকে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৭৬-৭৭, আল-ইসতিয়াব) এই ঘটনার পর তিনি খাইবার, মতান্তরে মদীনায় গিয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন।

হাজ্জাজের সহধর্মীণী তখনও মক্কায় বসবাস করেন। তাঁর সকল সম্পদও সেখানে। ইসলাম গ্রহণের পর এসব সহায়-সম্পদ মদীনায় সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। অন্যথায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা কুরাইশরা জানতে পেলে সব হাতিয়ে নেবে। তাঁর সম্পর্কে মক্কাবাসী পৌত্তলিকরাও সন্দিহান ছিল। তাঁর অর্থ-সম্পদ সহজে মক্কা থেকে সরিয়ে নেওয়া সম্ভবও ছিল না। এ কারণে হাজ্জাজ মক্কা গিয়ে গুজব ছড়িয়ে দেন যে, খাইবারে মুহাম্মাদ (সা) পরাজিত হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে খবরটি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কার মুশরিকদের এভাবে খুশী করে তিনি বললেনঃ মুহাম্মাদের (সা) সকল আসবাবপত্র বিক্রি হচ্ছে। আমার বাসনা, অন্য ব্যবসায়ীদের পৌঁছার পূর্বেই আমি সেগুলি খরীদ করি। মক্কার বিভিন্ন লোকের নিকট আমার বহু অর্থ-কড়ি পাওনা আছে। তোমরা একটু চেষ্টা করলে সহজে আদায় হতে পারে। মক্কাবাসীরা এই ভাল কাজটির জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেল। তারা চেষ্টা তদবীর করে তাঁর পাওনা অর্থ আদায় করে দিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত চাচা হযরত 'আব্বাস (রা) তখন মক্কায়। তিনি নিজের বাড়ীতে বসে সবকিছু শুনছেন। তিনি এত ব্যথা পেলেন যে, খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য ঘর থেকেও বের হলেন না। তিনি একটি ছেলের মাধ্যমে হাজ্জাজকে ডেকে পাঠালেন। হাজ্জাজ গেলেন এবং 'আব্বাসকে (রা) আসল কথা খুলে বললেন। তিনি বললেনঃ আমার বকেয়া আদায়ের জন্য আমি একথা ছড়িয়েছি। আমি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। মক্কাবাসীরা জানতে পেলে আমার প্রাপ্য এক কপর্দকও দেবে না। আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদেই আছেন। খাইবারে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) খাইবারের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যাকে বিয়ে করে তাঁর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন। আমি কুরাইশদের ক্ষমতার আওতা থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই গোপন তথ্য কারও নিকট প্রকাশ করবেন না।

অঙ্গিকার অনুযায়ী হযরত 'আব্বাস (রা) তিনদিন সম্পূর্ণ চুপ থাকলেন। চতুর্থ দিন যখন নিশ্চিত হলেন যে, হাজ্জাজ মক্কাবাসীদের নাগালের বাইরে চলে গেছে, তখন তিনি পোশাক পাল্টে হাজ্জাজের বাড়ী গেলেন এবং তার স্ত্রীর নিকট আসল ঘটনা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি কা'বার চত্বরে আসলেন। সেখানে আগে থেকে এই বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তিনি লোকদের বললেনঃ মুহাম্মাদ (সা) খাইবার জয় করেছেন এবং হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা এখন তাঁর স্ত্রী। বনী আবী হাকীক তথা ইয়াসরিবের নেতৃবৃন্দের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাজ্জাজ তোমাদের ধোকা দিয়ে তার অর্থ-সম্পদ নিয়ে চম্পট দিয়েছে। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আপনি কার কাছে এসব কথা শুনলেন? বললোঃ হাজ্জাজের কাছে। লোকেরা হাজ্জাজের স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনিও সমর্থন করলেন। পঞ্চম দিনে মদীনা থেকেও খবর এসে গেল। কিন্তু এখন তাদের করণীয় কিছুই নেই। শিকার তাদের নাগালের বাইরে। তারা চুপ হয়ে গেল। (ইবন সাদ ৪/২, পৃঃ ১৪-১৫)

খাইবার যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পূর্বে হাজ্জাজ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেই তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মদীনার বাইরে ছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে বনী সুলাইমের পথে মক্কায় প্রবেশ করেন। এই বাহিনীতে 'আব্বাস ইবন মিরদাস, খুফাফ ইবন নুদবাহ ও হাজ্জাজ ইবন 'ইলাত— এ তিনজন তিনটি পতাকা বহন করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৬৭)

হাজ্জাজ ছিলেন ধনী ব্যক্তি। তিনি মক্কা থেকে তাঁর সকল সম্পদ সরিয়ে আনতেও সক্ষম হয়েছিলেন। মদীনায় তিনি নিজের জন্য একটি বাড়ী ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। (আল ইসাবা—১/৩২৭)

তাঁর মৃত্যুকাল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা আছে। একটি মতে তিনি হযরত 'উমার ফারুকের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করেন। আর অন্য একটি মতে তিনি হযরত 'আলী (রা) ও 'আয়িশার (রা) মধ্যে সংঘটিত উটের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। প্রথম বর্ণনাটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। উটের যুদ্ধে হাজ্জাজ নন বরং তাঁর ছেলে শহীদ হন।

কুদামাহ্ ইবন মাজ'উন (রা)

নাম কুদামাহ্, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু 'উমার। পিতা মাজ'উন ইবন হাবীব এবং মা সুখাইলা বিনতুল আনবাস। (টীকা ঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৩) কুরাইশ বংশের বনী জুমাহ শাখার সন্তান। হযরত 'উমারের বোন সাফিয়্যা বিনতুল খাত্তাব তাঁর স্ত্রী।

হযরত কুদামাহ্ ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) আহবানে যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন 'উসমান ইবন মাজ'উন ও তাঁর অন্য দুই ভাই কুদামাহ্ ও আবদুল্লাহ্ অন্যতম। তিনি দুই হিজরাতের অধিকারী। ইসলাম গ্রহণের পর অন্য দুই ভায়ের সাথে প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন। অতঃপর মক্কাবাসীরা সকলে ইসলামের দীক্ষা নিয়েছে এমন একটি মিথ্যা গুজব শুনে অনেকে হাবশা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে কুদামাহ্ও ছিলেন। সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৬৭)

হযরত কুদামাহ্ হাবশা থেকে ফিরে মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে আবার মদীনায় হিজরাত করেন এবং বদরে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) কুদামাহ্কে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালেই তিনি মদ পানের অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং তাঁর ওপর মদ পানের নির্ধারিত শাস্তি বা 'হদ' জারি করা হয়। তিনি হযরত 'উমারের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করেননি এবং একজন বদরী সাহাবী হিসাবে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন বিশ্বাসযোগ্য হলেও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত 'উমারের নিকট তাঁর অপরাধ প্রমাণ হয়ে যায়। এজন্য খলীফা তাঁর ওপর 'হদ' জারি করেন। ঘটনার বর্ণনায় জানা যায়, একবার বনু আবদি কায়সের সরদার 'জারূদ' খলীফা 'উমারের নিকট উপস্থিত হয়ে কুদামাহ্র বিরুদ্ধে মদ পানের অভিযোগ দায়ির করেন। খলীফা জারূদকে বললেন, তুমি ছাড়া এ ঘটনার আর কোন সাক্ষী আছে কি ? জারূদ হযরত আবু হুরাইরাকে (রা) সাক্ষী মানলেন। উমার (রা) আবু হুরাইরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। আবু হুরাইরা বললেন, তিনি কুদামাহ্কে কখনও মদ পান করতে দেখেননি, তবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বমি করতে দেখেছেন। উমার (রা) বললেন, শুধু এ সাক্ষ্যে অপরাধ প্রমাণ হয় না। আরও অনুসন্ধানের জন্য তিনি কুদামাহ্কে বাহরাইন থেকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। কুদামাহ্ মদীনায় পৌঁছলেন। জারূদ আবারও খলীফার নিকট তাঁর ওপর 'হদ' জারি করার দাবী জানালো। উমার (রা) তাঁকে বললেন, তুমি সাক্ষী না বাদী ? জারূদ বললো, সাক্ষী। খলীফা বললেন, তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ, এখন চুপ থাক। অতঃপর জারূদ আবারও খলীফার নিকট 'হদ' জারির তাকিদ দিল। তার এই বাড়াবাড়ির কারণে হযরত উমারের মনে সন্দেহ দেখা দিল। তিনি জারূদকে বললেন ঃ তোমার জিহবা সংযত রাখ, অন্যথায় তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যুত্তরে জারূদ খলীফাকে বললো, 'উমার, আপনার চাচাতো ভাই মদ পান করেছে আর আপনি উল্টো আমাকে শাসাচ্ছেন—এ তো কোন ইনসাফের কথা নয়।

এ পর্যায়ে হযরত আবু হুরাইরা (রা) খলীফাকে বললেন, ইয়া আমীরাল মু'মিনীন, আমাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে আপনি সংশয় পোষণ করলে কুদামাহ্র স্ত্রী তথা ওয়ালীদের মেয়ে হিন্দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। 'উমার (রা) তাকে ডেকে পাঠান। তিনিও স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। (আল-ইসাবা-৩/২২৮)

এবার 'উমারের (রা) 'আদল ও ইনসাফ বা সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা উথলে উঠলো। তিনি কুদামাহকে বললেন, কুদামাহ্, শাস্তি গ্রহণের জন্য তৈরী হয়ে যাও। জবাবে কুদামাহ্ বললেন, তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী যদি ধরেও নেওয়া যায় আমি মদ পান করেছি, তবুও আমার ওপর 'হদ' জারি করার কোন অধিকার আপনার নেই। 'উমার (রা) প্রশ্ন করলেন, কেন? কুদামাহ্ পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদাহর ১১ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে শুনান। আল্লাহ বলছেন ঃ 'যারা ঈমান এনেছে এবং 'আমলে সালেহ বা সৎকাজ করেছে, তারা যা খেয়েছে তার জন্য তাদের কোন পাপ নেই। যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ করেছে।'

(সূরা মায়িদাহ্- ১১)

উমার (রা) বললেন, কুদামাহ্, তুমি আয়াতটির অর্থ বিকৃত করছো। তুমি আল্লাহকে ভয় করলে অবশ্যই হারাম জিনিস থেকে বিরত থাকতে। হযরত কুদামাহ্ তখন অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে খলীফা অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে কিছুদিনের জন্য 'হদ' জারি বা শাস্তিদান মুলতবী রাখেন। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর 'হদ' মুলতবী রাখা উমারের জন্য ছিল অসহনীয়। তিনি দ্বিতীয়বার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এবারও সকলে 'হদ' মুলতবী রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু খলীফা উমার (রা) বললেন ঃ আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হই, আর তার বোঝা আমার কাঁধে চাপুক, এ অবস্থার চেয়ে সে চাবুকের নীচে মৃত্যুবরণ করুক—এটাই আমার অধিক কাম্য। তিনি আর দেরী করলেন না। কুদামাহ্র অসুস্থতার মধ্যেই তার ওপর হদ জারি করেন এবং তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর দু'জন আবার একসাথে হজ্জ আদায় করেন। মদীনায় ফেরার পথে উমার (রা) এক স্থানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে কুদামাহ্র সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার নির্দেশ লাভ করেন। ঘুম থেকে জেগেই তিনি কুদামাহ্কে ডেকে পাঠান। কিন্তু কুদামাহ্ আসতে অস্বীকৃতি জানান। উমার (রা) দ্বিতীয়বার লোক পাঠিয়ে বলেন, স্বেচ্ছায় না এলে জোর করে ধরে আনা হবে। কুদামাহ্ আসলেন। খলীফাই প্রথম আলোচনার সূচনা করলেন। অতঃপর দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর একমাত্র কুদামাহ্ ছাড়া আর কোন বদরী সাহাবী মদ পানের অভিযোগে সাজা প্রাপ্ত হননি। (আল-ইসাবা-৩/২২৯)

হযরত কুদামাহ্র (রা) মৃত্যুসন সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। প্রসিদ্ধ মতে তিনি হযরত আলীর (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৩৬ সনে ৬৮ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। অন্য একটি মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫৬।

হিশাম ইবনুল 'আস (রা)

নাম হিশাম, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবুল 'আস ও আবু মুতী'। ইবন হিব্বান বলেনঃ জাহিলী যুগে হিশামের কুনিয়াত ছিল আবুল 'আস অর্থাৎ অবাধ্যের পিতা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিবর্তন করে রাখেন আবু মুতী'—অনুগতের পিতা। (আল-ইসাবা-২/৬০৪) তাঁর পিতা আল-'আস ইবন ওয়ায়িল। কুরাইশ গোত্রের বনী সাহ্‌ম শাখার সন্তান। মিসর বিজয়ী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আমর ইবনুল 'আসের ছোট ভাই।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বয়সের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে না। হিশাম 'আমর অপেক্ষা ছোট হলেও বড় ভাইয়ের চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন। 'আমর যখন পৌত্তলিকতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছেন, হিশামের ললাটে তখন ইসলামের নূর ঝলক দিচ্ছে। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনাপর্বেই তিনি তা কবুল করেন এবং মক্কাবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাজিরদের একটি কাফিলার সাথে হাবশায় চলে যান। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর এই মিথ্যা গুজব শুনেন যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম কবুল করেছে, তখন অনেকের সাথে তিনিও মক্কায় ফিরে আসেন। এখান থেকে আবার মদীনায় হিজরাতের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু তাঁর পিতা ও খান্দানের লোকদের হাতে বন্দী হন। এ সম্পর্কে 'উমার ইবনুল খাত্তাবের বর্ণনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ

"আমরা মদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি, 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া ও হিশাম ইবনুল 'আস—এ তিনজন মক্কা থেকে ছয় মাইল দূরে 'তানদুব' উপত্যকায় বনী গিফারের 'উদাত' নামক কূপের নিকট এই অঙ্গীকার করলাম আমাদের প্রত্যেকেই আগামীকাল সকালে এখানে উপস্থিত হবে। কেউ ব্যর্থ হলে অবশ্যই সে বন্দী হবে। আমি ও 'আইয়াশ সময়মত হাজির হলাম; কিন্তু হিশাম বন্দী হয়ে অত্যাচারিত হলো। আমরা মদীনায় পৌঁছে কুবার বনী 'আমর ইবন 'আওফের অতিথি হলাম। এদিকে 'আইয়াশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আবু জাহল ইবন হিশাম ও হারিস ইবন হিশাম মদীনায় এলো। তারা দু'জন ছিল 'আইয়াশের চাচাতো ভাই এবং সকলেই একই মায়ের সন্তান। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মক্কায়।

তারা 'আইয়াশকে বললো, তোমার মা শপথ করেছে, তোমাকে না দেখে চুলে চিরুণী দেবে না, রোদ থেকে ছায়াতেও যাবে না। তুমি ফিরে চল। 'আইয়াশের অন্তর মায়ের জন্য নরম হয়ে গেল। 'উমার' বলেনঃ আমি তাকে বার বার অনুরোধ করলাম তাদের সাথে ফিরে না যাওয়ার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'আইয়াশ তাদের সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলো। কিছু দূর যাওয়ার পর তারা 'আইয়াশকে বেঁধে ফেলে এবং অত্যাচার করতে করতে মক্কায় নিয়ে যায়। সেখানে তাকে বন্দী করে রাখা হয়।

'উমার বলেন, আমরা তখন মদীনায় বলাবলি করতাম যারা এভাবে নিজেদেরকে বিপদের সম্মুখীন করেছে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসলেন এবং কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলোঃ

বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

'উমার বলেনঃ আমি আয়াতটি লিখে গোপনে মক্কায় হিশামের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। হিশাম বলেন, আমি সে আয়াতটি মক্কার 'যী-তুওয়া' নামক স্থানে বসে পাঠ করতাম; কিন্তু কিছুই বুঝতাম

না। অবশেষে তা বুঝার তাওফীক দানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম। তারপর আমি বুঝলাম, এ আয়াত আমাদের শানে নাযিল হয়েছে। অতঃপর আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলাম।

(হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৫-৩৪৬, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৪—৪৭৬, আল-ইসাবা-৩/৬০৪)

ইবন হিশাম বলেন। আমার বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মদীনায় একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ 'আইয়াশ ইবন রাবী'য়া ও হিশাম ইবনুল 'আসের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সাহায্য করতে পারে? ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাদের ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। অতঃপর তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। গোপনে মক্কায় প্রবেশ করে তিনি এক মহিলাকে দেখলেন, খাবার নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহর বান্দী, কোথায় যাচ্ছ? সে বললোঃ আমি যাচ্ছি এই দুই বন্দীর কাছে। অর্থাৎ 'আইয়াশ ও হিশামের কাছে। ওয়ালীদ মহিলাকে অনুসরণ করে বন্দীশালাটি চিনে নিলেন। তাদেরকে একটি ছাদবিহীন ঘরে বেঁধে রাখা হয়েছিল। যখন রাত হলো, ওয়ালীদ দেওয়াল টপকে তাঁদের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং একটি পাথরের সাহায্যে তাঁদের বাঁধন কেটে দিলেন। তারপর তিনজন একসাথে বেরিয়ে ওয়ালীদের উটে সওয়ার হয়ে মদীনায় পালিয়ে আসেন। তাঁদের একমাত্র বাহন উটটি হোঁচট খেলে ওয়ালীদের একটি আংগুল আহত হয়ে রক্ত-রঞ্জিত হয়। তিনি স্বীয় অঙ্গুলিকে উদ্দেশ্য করে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেনঃ

"হাল আন্‌তি ইল্লা উসবুয়িন দামাইতি
ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি মা লাকীতি।"

"ওহে, তুমি একটি অঙ্গুলি ছাড়া আর তো কিছু নও, যা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। তোমার যা কিছু হয়েছে, তাতো আল্লাহর রাস্তায়।"

(সীরাতু ইবন হিশাম—১/৪৭৬)

বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ মক্কায় হিশামের বন্দী দশায় শেষ হয়। খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আসেন। খন্দকের পর কাফিরদের সাথে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ওয়াকিদী বলেনঃ মক্কা বিজয়ের পূর্বে রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) হিশামকে এক অভিযানে পাঠান।

(আল-ইসাবা-৩/৬০৪)

সেনা পরিচালনা, বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন—এসব ছিল হিশামের খান্দানের বিশেষ বৈশিষ্ট। এ পরিবারের সন্তানেরা তরবারির ছায়াতলেই বেড়ে ওঠতো। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে তাঁর এ বৈশিষ্টের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে নুঈম ইবন 'আবদুল্লাহ ও অন্য কতিপয় ব্যক্তির সাথে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের দা'ওয়াত দানের জন্য তার দরবারে পাঠান। এ প্রসঙ্গে হিশাম বলেনঃ কয়েক ব্যক্তির সাথে আমাকে হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠানো হয়। আমরা 'গুতা' বা দিমাশকে পৌঁছে জাবালা ইবন আয়হাম আল-গাস্‌সানীর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। আমাদের সাথে কথা বলার জন্য তিনি একজন দূত পাঠালেন। আমরা বললামঃ আমাদেরকে সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়েছে, আমরা কোন দূতের সাথে কথা বলবো না। অনুমতি দিলে আমরা তাঁরই সাথে কথা বলবো। অবশেষে জাবালা আমাদেরকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

জাবালা আমাদেরকে বললেনঃ আপনাদের বক্তব্য কী? হিশাম বলেন, আমি তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত তুলে ধরি। তখন তাঁর ও সভাষদবৃন্দের পরিধানে ছিল কালো পোশাক। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের পরিধানে এ পোশাক কেন? তিনি বললেনঃ আমরা এ পোশাক

পরেছি এবং শপথ করেছি, শাম থেকে তোমাদের তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এগুলি খুলবো না। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম! আপনার এই সিংহাসন এবং আপনাদের সম্রাটের সাম্রাজ্য ইন্‌শাআল্লাহ আমরা ছিনিয়ে নেব। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা) এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। জাবালা বললেন ঃ আপনারা নন; বরং তাঁরাই এর উপযুক্ত যাঁরা দিনে সিয়াম সাধনা করে এবং রাতে 'ইবাদাতে দণ্ডায়মান থাকে। আপনাদের সিয়াম কেমন?' আমি আমাদের সিয়ামের পরিচিতি তুলে ধরলাম। তখন জাবালার চেহারা কালো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি একজন দূতসহ আমাদেরকে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

হিশাম বলেন ঃ আমরা দূতের সাথে চলতে লাগলাম। যখন আমরা নগরের নিকটবর্তী হলাম, আমাদের সাথের দূতটি বললো ঃ আপনাদের এই সওয়ারী পশু সম্রাটের নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। আপনারা চাইলে আমি আপনাদের জন্য তুর্কী ঘোড়া ও খচ্চরের ব্যবস্থা করতে পারবো। আমরা বললাম ঃ আমাদের এই পশুর ওপর সওয়ার হওয়া ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় আমরা শহরে প্রবেশ করবো না। আমাদের অনমনীয়তার কথা সম্রাটকে জানানো হলে তিনি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে সম্রাটের কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম।

এভাবে হিশাম ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গীরা যখন রাজ দরবারের বাইরে নিজ নিজ পশুর পিঠ থেকে নামছিলেন তখন সম্রাট তাদেরকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তারা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করছিলেন, বাতাসে আন্দোলিত খেজুর গাছের পাতার মত তারা কাঁপছিল। সম্রাট লোক মারফত তাদের জানিয়ে দেন যে, এভাবে জোরে জোরে দ্বীন প্রচারের অধিকার তাঁদের নেই। তাঁরা সম্রাটের কাছে গেলেন।

সম্রাট সিংহাসনে এবং রোমান সমরবিশারদরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। সম্রাট হাসিমুখে তাদের বললেন ঃ আপনারা নিজেদের মধ্যে যেভাবে সালাম ও সম্ভাষণ বিনিময় করেন, সেইভাবে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন না কেন? সম্রাটের পাশেই বসা ছিল একজন প্রাঞ্জল আরবী ভাষী। তাঁরা বললেন ঃ আমাদের সম্ভাষণ আপনার জন্য বৈধ নয়; আর আপনাদের সম্ভাষণও আমাদের মুখে উচ্চারণ আমাদের জন্য উচিত নয়। সম্রাট প্রশ্ন করলেন ঃ আপনারা নিজেদের মধ্যে এবং আপনাদের বাদশাহ্‌কে কিভাবে সম্ভাষণ জানান? তাঁরা বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকা। সম্রাট আবার প্রশ্ন করেন ঃ আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য কি? তাঁরা বলেন ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর—আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাঁরা সম্রাটের নিকট দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় যথা—সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির পচিয় তুলে ধরেন।

এই প্রতিনিধিদল সম্রাটের অতিথি হিসাবে তিন দিন তাঁর নিকট অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এই দাওয়াতী মিশনের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। (আল-ইসাবা—২/৪৭১, হায়াতুস সাহাবা-১/২০৪, ৪০৫, ৩/৫৫৭—৫৬২) অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে তাবলীগী মিশন নিয়ে যিনি গিয়েছিলেন তিনি এ হিশাম নন, তিনি অন্য আর এক হিশাম।

(আল-ইসাবা—৩/৭০৪)

খলীফা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে দু'একটি সংঘর্ষের পর রোমানরা আজনাদাইনে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। হিজরী ১৩ সনের জুমাদা আল-উলা মাসে সংঘর্ষ শুরু হয়। ওয়াকিদী উম্মু বকর বিনতুল মিসওয়ারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ এ যুদ্ধে হিশাম যখন কিছু মুসলিম সৈনিকের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করলেন, স্বীয় মুখাবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শত্রু ব্যূহের মাঝ বরাবর এগিয়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকলেন ঃ ওহে মুসলিম সৈনিকবৃন্দ, আমি হিশাম ইবনুল 'আস। তোমরা আমার সাথে এস। তোমরা জান্নাত থেকে পালাচ্ছ?

এই খাত্‌নাবিহীন লোকেরা তোমাদের তরবারির সামনে টিকে থাকতে পারে না।' হিশামের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। রোমান বাহিনী একটি সংকীর্ণ পথের মুখে জমা হয়। পথের বিপরীত দিক থেকে হিশাম আক্রমণ চালান। রোমানরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর লাশের ওপর দিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যরা সেখানে পৌঁছে তাঁর পেষা লাশটি পদদলিত হওয়ার ভয়ে শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করতে ইতস্ততঃ করতে লাগলো। তখন তাঁর বড় ভাই 'আমর (রা) এসে বললেনঃ ওহে লোক সকল, আল্লাহ্ তাকে শাহাদাত দান করেছেন, তার রূহটি উঠিয়ে নিয়েছেন এবং তার দেহটি এখানে পড়ে আছে। অতঃপর মুসলিম সৈন্যরা তাঁর লাশের ওপর দিয়ে সংকীর্ণ পথটি অতিক্রম করে শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) সেই ছড়ানো-ছিটানো লাশ একত্রিত করে দাফন করেন। (আল-ইসাবা—৩/৬০৪) তবে ইবনুল মুবারকের মতে, তিনি খলীফা উমারের যুগে ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

(আল-ইসতীয়াব, টীকা-আল-ইসাবা-৩/৫৯৩-৫৯৫)

হিশাম ইবনুল 'আস তাঁর ভাই 'আমর ইবনুল' আস অপেক্ষা বয়সে ছোট হলেও বড় ভাইয়ের চেয়ে বেশী নেক্‌কার ছিলেন। হিশামের শাহাদাতের পর একবার কতিপয় কুরাইশ ব্যক্তি খানায়ে কা'বার পেছনে বসে তাদের দুই ভাইয়ের সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এমন সময় তাঁরা 'আমরকে তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলোঃ আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে উত্তম—আপনি না আপনার ভাই হিশাম? তিনি বললেনঃ আমার ও তার পক্ষ থেকে আমি বলছি। তার মা হাশেম ইবনুল মুগীরার মেয়ে, আর আমার মা একজন দাসী। আমাদের পিতা আমার চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসতেন। আর প্রত্যেক পিতার তার সন্তানের ব্যাপারে দূরদৃষ্টির কথা তো তোমাদের জানা আছে। আমরা দু'জন ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করেছি, সব সময় সে আমাকে পরাজিত করেছে। আমি ও সে—দু'জনই যুদ্ধে যোগদান করি এবং সারারাত দু'জনই শাহাদাত লাভের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করি। আল্লাহ্ তার দু'আ কবুল করলেন এবং আমার দু'আ ব্যর্থ হলো। (আল-ইসাবা—১/৬০৪)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের দু'ভাইয়ের ঈমানী দৃঢ়তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেনঃ "আসের দুই পুত্র হিশাম ও 'আমর মু'মিন।'

হিশামের শাহাদাতের খবর শুনে হযরত 'উমার ফারূক (রা) মন্তব্য করেছিলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর ওপর রহমত নাযিল করুন। তিনি ইসলামের একজন উত্তম সেবক ছিলেন।

যূ-শিমালাইন 'উমাইর ইবন 'আবদি 'আমর (রা)

আসল নাম 'উমাইর, ডাকনাম আবূ মুহাম্মাদ, লকব বা উপাধি যূ-শিমালাইন। পিতার নাম 'আবদু 'আমর। খুযা'য়া গোত্রের সন্তান। তিনি সকল কাজ দু'হাত দিয়ে করতেন বলে "যূ-শিমালাইন" দু'খানি দক্ষিণ হস্তের অধিকারী তাঁর উপাধিতে পরিণত হয়।

তাঁর পিতা 'আবদু 'আমর ইবন নাদলা মক্কায় এসে 'আবদ ইবন হারেস ইবন নাদলা ইবন যাহ্বার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে থেকে যান। 'আবদ নিজ কন্যা নু'ম বিনতু 'আবদকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। তারই গর্ভে পুত্র যূ-শিমালাইন ও কন্যা রায়তা জন্ম গ্রহণ করেন। (তাবাকাত ইবন সা'দ—৩/১৬৭)

উল্লেখ্য যে, সীরাত গ্রন্থ সমূহে যূ-শিমালাইন অর্থাৎ দু'খানি ডান হাতের অধিকারী এবং যুল ইয়াদাইন বা দু'খানি হাতের অধিকারী এ দু'টি লকব বা উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদ্বয়ের কথা পাওয়া যায়। এ দু'টি উপাধি কি একই ব্যক্তির না ভিন্ন দু'ব্যক্তির এ সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতের অমিল দেখা যায়। অধিকাংশের মতে উপাধি দু'টি একই ব্যক্তির যেমনঃ ইবন সা'দ তার তাবাকাতে শিরোনাম দিয়েছেন "যুল ইয়াদাইন ওয়া ইউকালু যূ-আশ-শিমালাইন" অর্থাৎ যুল-ইয়াদাইন এবং তাঁকেই যূ-আশ্-শিমালাইন বলা হয়। (তাবাকাত—৩/১৬৭)

কিন্তু তাঁদের এ মত অনেকের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে মূলতঃ তাঁরা ভিন্ন দু'ব্যক্তি। হাদীসের দ্বারাও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যুল-ইয়াদাইন নামক ব্যক্তির একটি ঘটনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) চার রাক'য়াতের স্থলে দুই রাক'য়াত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। সাহাবীরা তো সবাই হতভম্ব। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না। যুল-ইয়াদাইন ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি কম করে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট তাঁর কথার সত্যতা যাচাই করলেন। সবাই যুল-ইয়াদাইনকে সমর্থন করে বললেনঃ আপনি দুই রাক'য়াতই আদায় করেছেন। সত্যতা যাচাইর পর তিনি বাকী দু'রাক'য়াত আদায়ের শেষে সহু সিজদাহ করেন। (বুখারীঃ আযান অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সন্দেহ হলে তিনি কি মুকতাদিদের কথা গ্রহণ করবেন?)

উপরোক্ত হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ হুরাইরা (রা)। তিনি হিজরী সপ্তম সনে খাইবার যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে যূ-শিমালাইন তাঁর পাঁচ বছর পূর্বে বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। সুতরাং যুল-ইয়াদাইন ও যূ-শিমালাইন একই ব্যক্তি হতে পারেন না। তাছাড়া দু'জনের নামেও পার্থক্য আছে। একজনের নাম 'খিরবাক ও অন্যজনের নাম 'উমাইর। (সিয়ারুস সাহাবা, মুহাজিরীন—২/৩২৭) আবূ 'উমার বলেনঃ বদরে যে যূ-শিমালাইন শহীদ হন তিনি যুল-ইয়াদাইন নন। (আল-ইসাবা—৩/৩৩)

হযরত যূ-শিমালাইন কখন এবং কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় হিজরাত করে হযরত সা'দ ইবন খাইসামার অতিথি হন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াযীদ ইবন হারেসের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

ইসলাম গ্রহণের পর খুব বেশী দিন তিনি বাঁচেননি। মদীনায় আসার পর তিনি ও তাঁর দ্বীনি ভাই ইযায়ীদ মহান বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি কাফির আবূ উসামা যুহাইর ইবন মু'য়াবিয়া আল-জুশামীর হাতে শহীদ হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। তাঁর দ্বীনি ভাই ইয়াযীদও এ যুদ্ধে শহীদ হন।

(তাবাকাতঃ ৩/১৬৮ আনসাবুল আশরাফ—১/২৯৫)

মু'য়াইকিব ইবন আবী ফাতিমা (রা)

মু'য়াইকিব ছিলেন দাওস গোত্রের সন্তান। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি দাসে পরিণত হয়ে মক্কার সাঈদ ইবনুল আসের নিকট উপনীত হন। (আনসাবুল আশরাফ—১/২০০) অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি আয্দ গোত্রের সন্তান এবং মক্কার বনী আবদি শামসের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন।

ইসলামী দাও'য়াতের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। হাবশা থেকে খাইবার যুদ্ধের সময় মদীনায় আসেন। একটি বর্ণনামতে তিনি আবু মূসা আল আশ'য়ারীর সাথে মক্কা থেকে মদীনায় আসেন এবং খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় তাঁর বদর যুদ্ধ ও বাই'য়াতে রিদওয়ানে যোগদানের কথা পাওয়া যায় এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি খাইবার যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় আসেন। তাঁদের মতে তিনি হাবশায় হিজরাত করেননি। তবে ওয়াকিদী বলেন ঃ 'যারা বলে তিনি হাবশায় হিজরাত করেছিলেন, আমি তাদের কাছে শুনেছি, মু'য়াইকিব হাবশা থেকে জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে সরাসরি মদীনায় চলে যান। (আনসাবুল আশরাফ-১/২০০)

তবে একথা সঠিক যে তিনি খাইবার যুদ্ধের পর মদীনায় আসেন। বদর ও খাইবারে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ইবন সা'দও তাঁকে ঐ সকল সাহাবীর তালিকায় স্থান দিয়েছেন যাঁরা সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করলেও বদরে যোগদানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

হযরত রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায় নবুওয়াতের 'খাতাম' বা মোহর তাঁরই দায়িত্বে থাকতো। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর ও হযরত উমার (রা) তাঁকে বিশেষ সম্মান দেখাতেন। উপরোক্ত দু'জনের খিলাফতকালে অর্থবিষয়ক সকল কর্মকাণ্ড দেখাশুনা ও বাইতুল মালের রক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। শেষ বয়সে তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। খলীফা তাঁর চিকিৎসার সব রকম চেষ্টা করেন। কোথাও কোন ভালো চিকিৎসকের সন্ধান পেলে তাঁদেরকে ডেকে তিনি তাঁর চিকিৎসা করাতেন। কিন্তু কোন উপকার হয়নি। তবে ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাওয়ার আশংকা দূর হয়। মানুষ সাধারণতঃ কুষ্ঠ রোগীদের সাথে ওঠা-বসা ও পানাহার পরিহার করে চলে ; কিন্তু হযরত 'উমার তাঁকে সংগে নিয়ে একই দস্তরখানে খেতে বসতেন।

একবার খলীফা 'উমার (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের রাতের খাবার দেওয়া হলো। খলীফা ঘর থেকে বেরিয়ে মু'য়াইকিব ইবন আবী ফাতিমাকে তাঁদের সাথে খাবারের জন্য ডাকলেন। উপস্থিত লোকেরা ভীত হয়ে পড়লো। 'উমার (রা) মু'য়াইকিবকে বললেন ঃ 'তুমি আমার কাছে বস। আল্লাহর কসম, তোমার ছাড়া এ রোগ অন্য কারও হলে আমি তার সাথে এক থালায় খেতাম না। তুমি তোমার দিক থেকে খুশীমত খাও। মু'য়াইকিব তাঁদের সাথে বসে এক থালায় আহার করেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৫৮) অন্য একটি বর্ণনামতে 'উমার বলেন ঃ 'সে যদি রাসূলুল্লাহর সাহাবী না হতো, আমি তার সাথে খেতাম না।' (আনসাবুল আশরাফ-১/২০০)

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) পর খলীফা হযরত 'উসমান (রা) তাঁর প্রতি একই রকম আচরণ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মোহর শেষ পর্যন্ত তাঁরই জিম্মায় ছিল। এ মোহরটি তাঁরই হাত থেকে 'বীরে মা'উনা'— বা মা'উনা নামক কূপে পড়ে যায়। যে বছর মোহরটি পড়ে যায় সেই বছরের শেষ দিকে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। বালাজুরী বলেন ঃ খলীফা উসমানের যুগে যে বছর

আফ্রিকা অভিযান চালানো হয় সেই বছর তিনি ইনতিকাল করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/২০০) ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইবন মু'য়াইকিব নামে তাঁর এক পুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি তাঁর পিতা মু'য়াইকিব থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি এমন কোন বিশেষ ব্যক্তি ছিলেন না। তবে লেখা-পড়ায় তাঁর দক্ষতা ছিল। হযরত 'উমার (রা) যখন নিজের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করেন তখন সেই ওয়াক্‌ফনামাটি মু'য়াইকিব রচনা করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। হাদীস গ্রন্থসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে দু'টি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং একটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আবান ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা)

হযরত আবানের পিতার নাম আবু উহায়হা সা'ঈদ ইবনুল 'আস এবং মাতার নাম হিন্দা বিন্‌তু মুগীরা। তাঁর বংশের উপরের দিকের পঞ্চম পুরুষ আব্‌দ মান্নাফে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা-১/৩৫)

তাঁর পিতা সাঈদ ছিল কুরাইশদের এক মর্যাদাবান ব্যক্তি। সে হিজরী ২য় অথবা ৩য় সনে কাফির অবস্থায় তায়িফে মারা যায় এবং তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। (আনসাবুল আশরাফ-১/১৪২, ৩৬৮) তার কয়েকজন সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইসলামের সূচনা পর্বেই তাঁদের মধ্যে খালিদ ও 'আমর ইসলাম গ্রহণ করে হাবশায় হিজরাত করেন। আল-ইসাবা—১/১৩) আবান তাঁর অন্য দুই ভাই 'উবাইদা ও আল-আসের সাথে পৌত্তলিক থেকে গেলেন। তাঁর দুই ভাই খালিদ ও 'আমরের ইসলাম গ্রহণে দারুন ব্যথা পান। সে ব্যথার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত একটি কাসীদায়। তার একটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ

'হায়! দ্বীনের ক্ষেত্রে 'আমর ও খালিদ যে মিথ্যারোপ করেছে, জারীবার মৃত লোকগুলি যদি তা দেখতো।' (আল-ইসাবা—১/১৩, উসুদুল গাবা-১/৩৫)

আবান তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের সাথে মিলে রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরোধিতা করতে থাকেন। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে লড়বার জন্য 'উবাইদা ও আল-'আসের সাথে মক্কা থেকে বের হলেন। 'উবাইদা ও আল-'আস মুসলমানদের হাতে শোচনীয়ভাবে নিহত হলো। আবান কোন রকমে প্রাণ নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

আবানের ইসলাম পূর্ব জীবন সম্পর্কিত একটি ঘটনার কথা ইবন হিশাম উল্লেখ করেছেন। ইসলাম পূর্ব যুগে রাসূল (সা) তাঁর কয়েকজন কন্যাকে মক্কার কুরাইশ যুবকদের সাথে বিয়ে দেন। কুরাইশদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সংঘাত শুরু হলে কুরাইশ নেতারা রাসূলুল্লাহর (সা) জামাতাদের নিকট তাঁর কন্যাদের তালাক দেওয়ার আবেদন জানায়। রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা রুকাইয়্যা ছিলেন 'উতবা ইবন আবী লাহাবের স্ত্রী। কুরাইশরা 'উতবাকে বললো ঃ তুমি মুহাম্মাদের কন্যাকে তালাক দাও। সে এই শর্তে রাজী হলো যে, যদি তারা আবান ইবন সা'ঈদের মেয়ে অথবা সা'ঈদ ইবন আসের মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দিতে পারে তাহলে সে রুকাইয়্যাকে তালাক দেবে। তারা 'উতবার দাবী মেনে নিয়ে সা'ঈদ ইবন আসের মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে রুকাইয়্যাকে তার নিকট থেকে ছাড়িয়ে দেয়। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৬২৫)

হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্‌কালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর পয়গামসহ হযরত উসমানকে (রা) মক্কার কুরাইশদের নিকট পাঠালেন। উসমান (রা) 'বালদাহ' উপত্যকা দিয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছেন। কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোথায় যাও? 'উসমান তাঁদেরকে সেই কথাই বললেন যা তাঁকে রাসূল (সা) বলে দিয়েছিলেন। এমন সময় আবান ইবন সা'ঈদ কুরাইশদের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে 'উসমানকে স্বাগতম জানালেন। উসমানের সাথে তাঁর আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আবান নিজের ঘোড়াটিকে প্রস্তুত করে তার পিঠে 'উসমানকে উঠালেন এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলেন। অতঃপর আবান 'উসমানকে মক্কায় নিয়ে আসেন। (হায়াতুস সাহাবা—১/১৫৬)

'উসমান আবানের বাড়ীতে আসার পর আবান তাঁকে বলেন ঃ আপনার পোশাকের এ অবস্থা কেন? 'উসমানের জামা ছিল হাঁটু ও গোঁড়ালির মাঝামাঝি পর্যন্ত। আবান আরও বলেন ঃ আপনার

কাওমের লোকদের মত জামা লম্বা করেন না কেন ? 'উসমান বললেন : আমাদের নবী এভাবে জামা পরেন। আবান বলেন : আপনি কা'বা তাওয়াফ করুন। 'উসমান বললেন : আমাদের নবী কোন কাজ না করা পর্যন্ত আমরা তা করতে পারিনা। আমরা শুধু তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকি। (হুয়াতুস সাহাবা—২/৩৫৮-৫৯, আল-ইসতীয়াব-৩৫, সীরাতু ইবন হিশাম—২/৩১৫)

আবান যদিও দীর্ঘকাল যাবত ইসলাম ও ইসলামের নবীর প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন, তবুও এ সময় সত্যের সন্ধান থেকে মোটেও বিরত থাকেননি। এ সময় তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তখনকার দিনে শাম বা সিরিয়া ছিল জ্ঞানী-গুনী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কেন্দ্র। ব্যবসার কাজে আবানের সেখানে যাতায়াত ছিল। একবার তিনি সেখানকার এক খৃষ্টান 'রাহিব'কে কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমি হিজাযের কুরাইশ গোত্রের সন্তান। এই গোত্রের এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি বলে দাবী করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ আমাকেও ঈসা ও মূসার মত নবী করে পাঠিয়েছেন। রাহিব লোকটির নাম জিজ্ঞেস করলেন। আবান বললেন : লোকটির নাম মুহাম্মাদ। রাহিব আসমানী কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী একজন নবীর আত্মপ্রকাশের বয়স, বংশ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আবান বললেন : এগুলির সবই তো সেই লোকটির মধ্যে বিদ্যমান। রাহিব তখন বললেন : আল্লাহর কসম, তাহলে সেই ব্যক্তি সমগ্র আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পর সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করবেন। তুমি যখন ফিরে যাবে, আল্লাহর এই নেক বান্দার নিকট আমার সালাম পৌঁছে দেবে। শামের এই রাহিব বা পাদ্রীর নাম 'ইয়াকা'। এবার যখন আবান শাম থেকে ফিরলেন তখন তাঁর পূর্বের রূপ আর নেই। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতার শক্তি তাঁর শেষ হয়ে গেছে। (উসুদুল গাবা ১/৩৫, আল-ইসাবা—১/১৩)

পিতৃ-পুরুষের ধর্মের কথা চিন্তা করে এবং সমবয়সীদের নিন্দা ও বিদ্রূপের কথা ভেবে আবান কিছুদিন সম্পূর্ণ চুপ থাকলেন। কিন্তু সত্যের প্রতি যে আবেগ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলে, তা তিনি দীর্ঘদিন দমন করে রাখতে সক্ষম হলেন না। এদিকে তাঁর ভাই 'আমর ও খালিদ হাবশা থেকে ফিরে আবানের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন। অতঃপর তিনি খাইবার যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করেন। তাঁরা তিন ভাই একত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খাইবার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা—১/১৩)

অন্য একটি বর্ণনা মতে আবান মদীনায় পৌঁছার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর আমীর বানিয়ে তাঁকে নাজদের দিকে পাঠিয়ে দেন। এঅভিযানে সফল হয়ে যখন তিনি মদীনায় ফিরে আসেন তখন খাইবার বিজয় শেষ হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় হাবশার অন্যান্য মুহাজিরদের সংগে করে হযরত আবু হুরাইরা মদীনায় আসেন। তাঁরা দু'জন এক সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) খাইবারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ তাঁদেরকে দেন। নাজদ অভিযান ছাড়াও আরও কিছু ছোট ছোট অভিযানে ইমারাত বা নেতৃত্ব তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে লাভ করেন।

হযরত আবান হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তায়িফ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তায়িফে আবানের পিতার কবরটি দেখে বলে ওঠেন : এই কবরের অধিবাসীর প্রতি আল্লাহর লানাত বা অভিসম্পাৎ। সে ছিল আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরনকারী। 'আবান ও তাঁর ভাই আমর সাথে সাথে আবু বকরের কথার প্রতিবাদ করে তাঁর পিতা আবু কুহাফার কিছু নিন্দা করেন। তখন রাসূল (সা) বললেন : 'তোমরা মৃতদের গালি দিও না। মৃতদের গালি দিলে জীবিতদের কষ্ট দেওয়া হয়।' (আনসাবুল আশরাফ—১/১৪২, ৩৬৮)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবানকে হযরত 'আলা ইবনুল হাদরামীর স্থলে বাহরাইনের শাসক

নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের খবর শুনে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। (ইসতী'য়াব—১/৩৫) হযরত আবান রাসূলুল্লাহর (সাকাতিব বা লেখকের দায়িত্বও পালন করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/৫৩২)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। তাঁর হাতে গণ বাই'য়াত শেষ হওয়ার পরও যে ক'জন কুরাইশ ব্যক্তি কিছু দিন যাবত বাই'য়াত থেকে বিরত থাকেন, আবান তাঁদের একজন। বনী হাশেমের লোকেরা বাই'য়াত গ্রহণ করলে তাঁর আপত্তি দূর হয় এবং তিনি বাই'য়াত করেন।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর নিয়োগকৃত কোন শাসক বা কর্মচারীকে অপসারণ করেননি। আবানও ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসক। আবানকে তাঁর দায়িত্বে ফিরে যাওয়ার জন্য আবু বকর (রা) অনুরোধ করেন। কিন্তু আবান খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কোন কোন বর্ননায় জানা যায়, খলীফার বার বার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত ইয়ামনের শাসন কর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইবন সাদ বর্ননা করেন ; আবান যখন খলীফার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন তখন হযরত উমার একদিন আবানকে বললেন, ইমাম বা নেতার অনুমতি ছাড়া এভাবে কর্মস্থল ত্যাগ করা তো তাঁর উচিত হয়নি। এখন আবার তাঁর নির্দেশে সেখানে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে ? আবান বললেন; আল্লাহর কসম। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আমি আর কারও জন্য কাজ করবো না। যদি করতাম তাহলে আবু বকরের মর্যাদা, তাঁর ইসলামে অগ্রগামিতা ইত্যাদি কারণে তাঁর 'আমেল' বা কর্মচারী হতাম। অগত্যা আবু বকর (রা) বাহরাইনে আর কাকে পাঠানো যায় সে বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। 'উসমান (রা) বললেন; যেহেতু তাঁর পূর্বে 'আলা ইবনুল হাদরামী সেখানে ছিলেন, তাই তাঁকেই সেখানে পাঠানো হোক। 'উমার বললেন ; আবানকেই সেখানে আবার যেতে বাধ্য করা হোক। কিন্তু আবু বকর (রা) তা করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন; যে ব্যক্তি বলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আর কারও জন্য কাজ করবো না তাঁকে আমি বাধ্য করতে পারিনে। অতপর 'আলা ইবনুল হাদরামীকে বাহরাইনের শাসক নিয়োগ করেন। (হায়াতুস সাহাবা— ২/৫৯)

হযরত আবানের মৃত্যুর সময় কাল সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা মত দেখা যায়। মূসা ইবন 'উকবা ও অধিকাংশ বংশবিদ্যা বিশারদদের মতে হযরত আবু বকরের খিলাফতকালের শেষ দিকে হিজরী ১৩ সনে আজনাদাইনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইবন ইসহাকের মতে তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে এবং অন্য কিছু লোকের মতে 'মারজুস সাফারের দিন শাহাদাত লাভ করেন। আবার অন্য একটি বর্ননায় জানা যায়, তিনি খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে হিঃ ২৭ সনে মারা যান এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে হযরত যায়িদ ইবন সাবিত 'মাসহাফে উসমানী সংকলন করেন। তবে প্রথমোক্ত মতটি সঠিক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

'আমর ইবন উমাইয়া (রা)

নাম 'আমর, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু উমাইয়া। পিতার নাম উমাইয়া। বনী কিনানা গোত্রের সন্তান। ইবন হিশাম তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির কাছাকাছি সময়ের জাহিলী 'আরবের একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২০৪, ২০৭) তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। উহুদের পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরাত করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর সর্ব প্রথম বীরে মাউনা-এর ঘটনায় অংশ গ্রহণ করেন। ঘটনাটি ছিল এই রকম ঃ উহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ মাসে নাজদের বনী—কিলাব গোত্রের সরদার আবু বারা' 'আমের ইবন মালেক ইবন জা'ফর মুলায়িবুল আসিন্নাহ্ মদীনায় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন। সে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে বললো ঃ আপনি যদি নাজদবাসী কিলাব গোত্রের নিকট আপনার কিছু সংগী পাঠাতেন তাহলে তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতো। রাসূল (সা) বললেন ঃ নাজদীদের ব্যাপারে আমার শঙ্কা হয়। কিন্তু আবূ বারা' প্রেরিত দলটির নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় রাসূল (সা) মুনজির ইবন 'আমেরের নেতৃত্বে চল্লিশ মতান্তরে সত্তর জনের একটি দল পাঠিয়ে দেন। তাঁরা 'বীরে মা'উনা' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁবু ফেলে অবস্থান করতে থাকেন এবং ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রটি হারাম ইবন মালজানের মাধ্যমে 'আমের ইবন তুফাইলের নিকট পৌঁছে দেন।

'আমের ইবন তুফাইল দূত হারামকে হত্যা করে এবং 'আসিয়্যা, রা'ল, জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রে মুসলিম দলটির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দ্রুত বেরিয়ে পড়ার ঘোষণা দেয়। তারা সমবেত হয়। এদিকে হারামের ফিরতে দেরী দেখে মুসলমানরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। কিছু দূর যেতেই তাঁরা রা'ল, জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রের মুখোমুখি হয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম দলটির ওপর আক্রমণ চালিয়ে সকলকে হত্যা করে। একমাত্র 'আমর ইবন উমাইয়্যা প্রাণে রক্ষা পান। তিনি শত্রু বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাঁকে 'আমের ইবন তুফাইলের সামনে আনা হলো। যখন সে জানতে পেল 'আমর ইবন উমাইয়্যা মুদার গোত্রের লোক তখন তাঁকে এই কথা বলে ছেড়ে দিল যে, 'আমার মার একটি দাস মুক্ত করার মান্নত ছিল।' তবে অপমানের চিহ্ন স্বরূপ তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল কেটে দেয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৮৪, ১৮৫)।

এই বীরে মা'উনা'র ঘটনায় প্রখ্যাত সাহাবী 'আমের ইবন ফুহাইরাও শাহাদাত বরণ করেছিলেন।। 'আমর ইবন উমাইয়্যাকে বন্দী করে যখন 'আমের ইবন তুফাইলের সামনে আনা হলো তখন সে 'আমের ইবন ফুহাইরার লাশের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ এই লোকটি কে ? 'আমর ইবন উমাইয়া বল্লেন ঃ 'আমের ইবন ফুহাইরা। তখন 'আমের ইবন তুফাইল বলেছিল ঃ আমি দেখলাম, সে নিহত হওয়ার পর তার লাশ শূন্যে আকাশের দিকে বহুদূর উঠে গেল, তারপর আবার তা নেমে এল। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৫)।

'আমর ইবন উমাইয়া 'বীরে মা'উনার শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মদীনার দিকে চলার পথে যখন 'কারকারা' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বিপরীত দিক থেকে আগত দু'জন লোকের সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি যে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন লোক দু'টিও সেখানে এসে বসলো। তাদের

সাথে আলাপ-পরিচয়ে 'আমর ইবন উমাইয়্যা যখন জানতে পেলেন তারা বনী 'আমের গোত্রের লোক তখন তিনি চুপ থাকলেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে 'আমর তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দু'জনকেই হত্যা করেন। তিনি মনে করেছিলেন, বনী 'আমের রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সাথে যে আচরণ করেছে, এটা তার একটা বদলা হবে। 'আমর মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বলেছিলেনঃ 'আমর, তুমি এমন দু'টি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছ যে, আমাকে অবশ্যই তাদের দিয়াত বা রক্তমূল্য আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনার পূর্বেই বনী 'আমেরের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) চুক্তি হয়েছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৮৬) অতঃপর রাসূল (সা) তাদের দিয়াত আদায় করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৬৪)

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আমর ইবন উমাইয়াকে ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত একটি পত্রসহকারে হাবশা যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই পত্রে রাসূল (সা) নাজ্জাশীকে হাবশায় অবস্থিত মুহাজিরদের আতিথেয়তার সুফারিশ করেন এবং হযরত উম্মু হাবীবা বিনতু আবী সুফইয়ান, যিনি তখনও পর্যন্ত হাবশার মুহাজিরদের সাথে সেখানে অবস্থান করছিলেন—তাঁর সাথে নিজের বিয়ের পয়গাম পাঠান। উল্লেখ্য যে, উম্মু হাবীবা ছিলেন উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশের স্ত্রী। প্রথম ভাগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে স্বামী উবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই দাওয়াত পত্র পেয়ে নাজ্জাশী হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রের জবাবে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তাঁর ইসলাম গ্রহণ, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম, মুহাজিরদের প্রতি আতিথেয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে নাজ্জাশী নিজেই উম্মু হাবীবাকে বিয়ের পয়গাম দেন। তিনি নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) উকিল হন এবং বিয়ের পর রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে চারশো দীনার মোহর আদায় করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২২৪, ৩২৪ হায়াতুস সাহাবা-১/১৫৮, ৩/৫৯৬-৯৭)

এই 'আমর ইবন উমাইয়া যখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দূত হিসেবে নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছেন তখন সেখানে তৎকালীন ইসলামের চরম দুশমন 'আমর ইবনুল 'আস ও উপস্থিত ছিল। সে 'আমর ইবন উমাইয়াকে তার হাতে অর্পনের জন্য নাজ্জাশীর নিকট আবদার জানায় যাতে সে তাঁকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে পারে এবং কুরাইশদের নিকট নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৭৬-৭৭)

হাবশায় যে সকল মুহাজির অবস্থান করছিলেন, দু'টো জাহাজে করে 'আমর ইবন উমাইয়্যা তাঁদেরকে নিয়ে খাইবার যুদ্ধের সময় মদীনায় পৌঁছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫৯)

হাবশার এই দৌত্যগিরি শেষে মদীনায় ফেরার পর আবু সুফইয়ানের এক দুক্ষর্মের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব অর্পন করা হয় তাঁর ওপর। ঘটনাটি এই ঃ আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার জন্য কিছু লোককে উৎসাহিত করে। একব্যক্তি এই দায়িত্ব কাঁধে নেয় এবং আবু সুফইয়ান তাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে। সে মদীনায় আসে এবং সরাসরি মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে। রাসূল (সা) তাঁর উদ্দেশ্য জেনে ফেলেন। তিনি লোকটিকে দেখিয়ে বলেন, সে কোন ধান্ধায় এসেছে। লোকটি রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর প্রায় আক্রমণ করতে বসেছিল, ঠিক সে সময় হঠাৎ হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) তাঁকে পাঁজা করে ধরে ফেলেন। লোকটির কাপড়ের নীচ থেকে একটি খঞ্জর বেরিয়ে পড়ে। অপরাধ প্রকাশ্য ছিল, কোন সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রাহমাতুল লিল 'আলামীন তাঁকে মা'ফ করে দেন। সে আবু সুফইয়ানের পুরো ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়।

যেহেতু এই ঘটনার মূল নায়ক আবু সুফইয়ান এবং তারই জন্য মক্কার কুরাইশ ও মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বক্ষণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকে একারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আমর ইবন উমাইয়া ও

সালামা ইবন আসলাম মতান্তরে জাব্বার ইবন সাখার আল-আনসারীকে এক গোপন অভিযানে মক্কায় পাঠান। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন, যদি সুযোগ হয় তাহলে এই অশান্তির মূল নায়ককে চির দিনের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে।

'আমর ও সালামা গোপনে মক্কায় পৌঁছলেন, কিন্তু মুয়াবিয়া কা'বার তাওয়াফ করা অবস্থায় তাদেরকে দেখে ফেলেন। কুরাইশদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। তারা বলাবলি করলো, তাদের আগমন নিঃসন্দেহে বিনা কারণে নয়। নিশ্চয় তারা কিছু একটা অঘটন ঘটাবে। এদিকে 'আমর ও সালামা যখন দেখলেন, তাদের আগমণের বিষয়টি কুরাইশদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেছে, তখন তাঁরা মক্কার বাইরে চলে যান। পথে উবাইদুল্লাহ ইবন মালিক এবং বনী হুজাইলের এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। 'আমর 'উবাইদুল্লাহকে এবং সালামা দ্বিতীয় লোকটিকে হত্যা করেন।

এদিকে কুরাইশরা তাঁদের সন্ধানে মক্কার চারদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেয়। 'আমর ও সালামা এমন দুই গোয়েন্দার দেখা পেলেন। তাঁরা গোয়েন্দা দু'জনের একজনকে হত্যা করেন এবং অন্যজনকে বন্দী করে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে আসেন। (সীরাতু ইবন হিশাম২/৬৩৩-৩৪)

আহমাদ ও তাবারানীর এক বর্ণনায় জানা যায়, খুবাইব বিন 'আদী মক্কার কাফিরদের হাতে শহীদ হন এবং তাঁর লাশ একটি কাঠের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খুবাইবের লাশ আনার জন্য গোপন মিশন মক্কায় পাঠান। তিনি গোপনে মক্কায় পৌঁছে কাঠ বেয়ে উঠে রশি কেটে দেন এবং খুবাইবের লাশ মাটিতে পড়ে যায়। এমন সময় কুরাইশরা টের পেয়ে তাঁকে ধাওয়া করে এবং তিনি লাশ ফেলে পালিয়ে যান। অবশ্য অন্য বর্ণনায় জানা যায়, মিকদাদ ইবন আসওয়াদ ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম এ দায়িত্বে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাঁরাই এ অভিযান চালান। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৬-৯৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত 'আমর ইবন উমাইয়া দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর পরবর্তী জীবনের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) শাসনকালে হিজরী ৬০ সনের পূর্বে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।

হাদীসের গ্রন্থ সমূহে 'আমর ইবন উমাইয়া থেকে বর্ণিত বিশটি হাদীস পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ, জা'ফর, ফাদল, যাবারকান, শা'বী, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমন, আবূ কিলাবা, জুরমী এবং আবুল মুহাজির তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র।

তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম বীর ও সাহসী ব্যক্তি। এ কারণে রাসূল (সা) দুঃসাহসিক অভিযানগুলির দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করতেন। মৃত্যুকালে জা'ফর, আবদুল্লাহ ও ফাদল নামে তিন ছেলে রেখে যান।

মিসতাহ ইবন উসাসা (রা)

প্রকৃত নাম 'আউফ, ডাকনাম আবু 'আববাদ, এবং লকব বা উপাধি মিসতাহ। পিতা উসাসা ইবন 'আববাদ এবং মা হযরত আবু বকরের খালা মতান্তরে খালাতো বোন। মাতা-পিতা দু'জনেই ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা—৩/৪০৮)

মিসতাহ ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ও যায়েদ ইবন মুযায়্যিনের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তাঁর হিজরাতের সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বেই হিজরাত করে মদীনায় চলে যান এবং বদর যুদ্ধে তাঁর যোগদানের কথা ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সমূহে পাওয়া যায়। বনী মুসতালিক যুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে, 'ইফ্ক' বা উম্মুল মু'মিনীর 'আয়িশার (রা) প্রতি অপবাদের ঘটনাটি ঘটে। মুনাফিকরা যখন অপবাদটি ছড়িয়ে দেয় তখন তাতে কিছু নিষ্ঠাবান মুমিন সাহাবী ও জড়িয়ে পড়েন। মিসতাহ এই দলেরই একজন।

'ওয়াকিয়া'-ই-ইফ্ক' নামে প্রসিদ্ধ ঘটনাটির প্রতি পবিত্র কুরআনের সূরা নূর-এর ১১নং আয়াত সহ কয়েকটি আয়াতে ইংগিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই ঃ উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) বনু মুসতালিকের যুদ্ধে (৬ হিজরী) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁরা এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। 'আয়িশা (রা) শিবির হতে কিছু দূরে বাহ্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যান। তখন তাঁর গলার হারটি সেখানে পড়ে গেলে তিনি তা খুঁজতে থাকেন। এ দিকে তাঁর হাওদা পর্দায় ঘেরা থাকায় তিনি ভেতরে আছেন মনে করে কাফিলা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যায়। পশ্চাৎবর্তী রক্ষী সাফওয়ান (রা) তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজের উটের পিঠে উঠিয়ে নেন এবং উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে কাফিলার সাথে মিলিত হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই নানা অপবাদ ছড়াতে থাকে। সূরা নূরের আয়াত গুলিতে 'আয়িশার (রা) পবিত্রতার ঘোষণা করা হয় এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা ব্যক্ত করা হয়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মিসতাহ ঘটনাটি তাঁর মায়ের কাছে বর্ণনা করেন। মিসতাহর মা আবার একদিন রাতে কোন কাজে 'আয়িশার (রা) বাড়ীতে যান। 'আয়িশা তখন পিতৃগৃহে মায়ের কাছে। তৎকালীন আরবে বাড়ীতে পেশাব-পায়খানার স্থায়ী কোন জায়গা নির্দিষ্ট থাকতো না। মেয়েরা সাধারণত ঃ রাতে বাড়ীর বাইরে মরু ভূমিতে গিয়ে বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করতো। 'আয়িশা (রা) মিসতাহর মাকে সংগে করে বাড়ীর বাইরে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করতে যান। পথে মিসতাহর মা নিজের আঁচলে জড়িয়ে হোঁচট খান। হোচট খাওয়ার পর আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে যায় 'মিসতাহর ধ্বংস হোক।' এতে 'আয়িশা আপত্তি জানিয়ে বলেন, একজন মুহাজির মুসলমান, যিনি বদরে যুদ্ধ করেছেন তাঁকে এভাবে বদ-দু'আ করছেন ? মিসতাহর মা তখন বললেন ঃ 'আবু বকরের মেয়ে, তুমি কি কিছু শোননি ?' তখন মিসতাহর মা তাঁকে পুরো ঘটনা বলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/২৯৯-৩০০, হায়াতুস সাহাবা—১/৫৮৭)

দরিদ্র মিসতাহ ছিলেন হযরত আবুবকরের (রা) খালাতো ভাই। আবু বকর (রা) সব সময় তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার ও আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন তিনি 'ইফ্ক' এর ঘটনার সাথে মিসতাহর জড়িত থাকার কথা জানতে পারলেন এবং কুরআন তাঁদের প্রচারনাকে মিথ্যা অপবাদ হিসেবে ঘোষণা করলো তখন আবু বকর মিসতাহকে সাহায্য দান বন্ধ করে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এখন থেকে আমি মিসতাহর জন্য এক কর্পদকও ব্যয় করবো না। তখন সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয় স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা নূর—২২)

আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) আবার আগের মত সাহায্য দিতে শুরু করেন। বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। (আল-ইসাবা—৩/৪০৮)

তবে যেহেতু একজন সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং কুরআনও তাদের জন্য নিম্নোক্ত শাস্তির বিধান ঘোষণা করেছিল ঃ যারা সতী-সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে।' (সূরা-নূর-৪) এ কারণে অন্যদের সাথে তাঁকেও এ শাস্তি দান করা হয়। মিসতাহর সাথে আর যে ক'জন নিষ্ঠাবান বিখ্যাত সাহাবী শাস্তি ভোগ করেন তাঁরা হলেন— হযরত হাস্সান বিন সাবিত ও উম্মুল মু'মিনীর হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশের বোন হামনা বিনতু জাহাশ (রা)। (সীরাতু ইবন হিশাম ১/৩০২, হায়াতুস সাহাবা—১/৫৯০)

আমাদের স্বরণ রাখতে হবে, হযরত মিসতাহর (রা) মত যে সকল নিষ্ঠাবান সাহাবী 'ইফ্ক' এর ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা নিতান্তই মুনাফিকদের প্রচারনার শিকার হয়েছিলেন। অন্যথায় হযরত মিসতাহর (রা) মত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এতে জড়িয়ে পড়তে পারেন না। তাছাড়া তাঁরা তাওবাহ করেছেন এবং এর শাস্তিও মাথা পেতে নিয়েছেন। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, উম্মুল মু'মিনীর 'আয়িশা (রা), আবূ বকর (রা) তথা গোটা মুসলিম উম্মাহ তাঁদের ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তাঁদের প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী কাজ হবে। হযরত মিসতাহর (রা) সব চেয়ে বড় পরিচয় হযরত 'আয়িশার (রা) মন্তব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী, গৃহত্যাগী মুহাজির এবং বদর যুদ্ধের একজন মুজাহিদ। আর এদের প্রশংসায় পবিত্র কুরআনের কত আয়াতই না নাযিল হয়েছে।

হযরত মিসতাহ কখন ইনতিকাল করেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একটি মতে হিজরী ৩৪ সনে হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। অপর একটি মতে হিজরী ৩৭ সনে সিফ্ফীনে হযরত আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করার পর সেই বছর মারা যান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। (উসুদুল গাবা—৪/৩৫৫, আল-ইসাবা—৩/৪০৮ তাবাকাত—৩/৫২(

মারসাদ ইবন আবী মারসাদ আল-গানাবী (রা)

মারসাদের পিতার নাম আবূ মারসাদ কান্নায ইবন হুসাইন। মক্কায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই পিতা-পুত্র উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধের পূর্বেই হিজরাত করে মদীনায় চলে যান। মারসাদ মক্কায় হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন এবং মদীনায় হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী 'উবাদা ইবন সামিতের ভাই আউস ইবন সামিতের সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্কে স্থাপন করে দেন। (তাবাকাত— ৩/৪৮, আল-ইসাবা— ৩/৩৯৮)

হযরত মারসাদ ও পিতা আবূ মারসাদ কান্নায বদর সুদ্ধের বীর যোদ্ধা। এ যুদ্ধে মারসাদ 'সাবাল' নামক একটি ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশাপাশি অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন। উহুদ যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। (তাবাকাত— ৩/৪৮, সীরাতু ইবন ছিশাম— ১/৬৬৬)

জাহিলী যুগে মক্কার 'ইনাক' নাম্নী এক পতিতার সাথে মারসাদের সম্পর্ক ছিল। ইসলামে ব্যভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার পর তিনি সেই পতিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী, সে জন্য যে সকল মুসলমান মক্কায় কাফিরদের হাতে বন্দী অবস্থায় নির্যাতন ভোগ করতো রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে মক্কা থেকে গোপনে মদীনায় নিয়ে আসার দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন। এ উদ্দেশ্যে একবার তিনি মক্কায় যান। রাতটিও ছিল চন্দ্রালোকিত। তিনি চুপি সারে মক্কার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর সেই পুরাতন প্রেয়সী 'ইনাক' তাঁকে দেখে ফেলে এবং ডাক দেয়। তিনি থেমে যান। সে অত্যন্ত মিষ্টি মধুর ভঙ্গিতে তাঁকে স্বাগতম জানায় এবং সেই রাতটি তার সাথে কাটাবার প্রলোভন দেয়। মারসাদ বলেন, 'ইনাক, আল্লাহ এখন ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর এমন নিরস উত্তরে 'ইনাক দারুণ চোট পায়। সে তখন প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মানুষকে মারসাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়। আটজন লোক তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি একটি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পড়েন। শত্রুরা তাঁকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেলে তিনি গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে সোজা মদীনার পথ ধরেন। মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'ইনাকের সাথে আমার বিয়েটা দিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। এর পরই সূরা নূরের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে এবং ব্যভিচারী নারী ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এগুলি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।' (সূরা নূর— ২)

'উদাল ও কা-রা গোত্রের কতিপয় লোক উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় আসে। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হয়ে 'আরজ করে, আমাদের গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে, আপনি আমাদের সাথে এমন কিছু লোক পাঠান যাঁরা তাদেরকে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষা দিতে পারে। ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে, রাসূলে কারীম (সা) মারসাদ ইবন আবী মারসাদের (রা) নেতৃত্বে ছয় ব্যক্তিকে পাঠান। তবে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে 'আসিম ইবন সাবিতের নেতৃত্বে রাসূল (সা) দশ ব্যক্তিকে পাঠান। তাঁদের মধ্যে মারসাদও একজন।

দলটি যখন বনু হুজাইলের জলাশয় 'রাজী' নামক স্থানে পৌঁছে তখন 'উদাল ও কা-রার লোকগুলি ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে চিৎকার শুরু করে দেয়। নবু হুজাইলের লোকেরা কোষমুক্ত তরবারি হাতে ছুটে

এসে দলটিকে ঘিরে ফেলে। সাহাবায়ে কিরাম ঘোড়ার ওপর সাওয়ার ছিলেন। তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বনু হুজাইল বললো, আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাইনে। তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের নিকট থেকে শুধু কিছু অর্থ আদায় করা আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা নিজেরাই আমাদের কাছে চলে এস, আমরা অঙ্গিকার করছি।

মারসাদ, খালিদ ও আসিম বললেন, আমরা মুশরিকদের অঙ্গিকারে বিশ্বাস করিনা। একথা বলে তারা যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। অন্য দিকে তাঁদের অপর তিন সাথী খুবাইব, যায়িদ ও 'আবদুল্লাহ ইবন তারিক একটু বিনয়ী ভাব দেখিয়ে তাদের হাতে ধরা দেন। যখন শত্রু পক্ষ তাঁদের হাত-পা বাঁধতে শুরু করে তখন আবদুল্লাহ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এটা হলো তোমাদের প্রথম বিশ্বাস ঘাতকতা। তারা 'আবদুল্লাহকে 'জাহরান' নামক স্থানে পাথর মেরে শহীদ করে।

অতঃপর তারা খুবাইব ও যায়িদকে নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হয়। কুরাইশদের হাতে বনু হুজাইলের দুই ব্যাক্তি বন্দী ছিল। তারা এদের দু'জনের বিনিময়ে তাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে নেয়। উকবা ইবন হারিস ইবন আমির তার পিতা হারিসের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খুবাইবকে গ্রহণ করে। হযরত খুবাইব (রা) বদর যুদ্ধে এই হারিসকে হত্যা করেন। অন্যদিকে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া তার পিতা উমাইয়া ইবন খালাফের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায়িদকে হাতে নেয়। এ ভাবে কুরাইশদের প্রতিশোধ স্পৃহার শিকার হয়ে তাঁরা দু'জনই অত্যন্ত অসহায় ও নির্মম ভাবে মক্কায় শাহাদাত বরণ করেন। ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'ওয়াকিয়াতু ইউম আল-রাজী', নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইবন সাদ বলেন, 'রাজী'-এর এই ঘটনাটি ঘটে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের ছত্রিশ মাসের মাথায় সফর মাসে। (তারাকাত—৩/৪৮, আসাহহুস্ সীয়ার— ১৬০, সীরাতু ইবন হিশাম— ১৬৯-১৭৪)।

হযরত মারসাদের (রা) যোগ্যতা ও মর্যাদার জন্য এই ঘটনাই যথেষ্ট যে, খোদ রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে দ্বীনের মু'য়াল্লিম বা শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। যেহেতু হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন সেহেতু তাঁর ইলমী যোগ্যতা প্রকাশের সুযোগ হয়নি। তবুও হাদীসের গ্রন্থ সমূহ তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে একেবারে শূন্য নয়। আহমাদ ইবন সিনান আল-কাত্তান তাঁর মুসনাদে, ইমাম বাগাবী ও হাকেম তাঁদের মুসতাদরিকে এবং তাবারানী তাঁর 'আওসাতে' মারসাদ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ৩/৩৯৮)

আবু আহমাদ ইবন জাহাশ (রা)

আসল নাম 'আবদ, মতান্তরে আবদুল্লাহ, ডাকনাম আবু আহমাদ। পিতা জাহাশ ইবন রিয়াব এবং মাতা উমাইমা বিনতু, আবদিল মুত্তালিব। একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই, অন্য দিকে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশের আপন ভাই। (আনসাবুল আশরাফ—১/৮৮, আলইসাবা- ৪/৩

মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বে আবু আহমাদ তাঁর অন্য দুই ভাই— আবদুল্লাহ ও উবায়দুলাহর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পূর্বেই তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন হয়। বালাযুরী বলেছেন, তাঁর অন্য দুই ভাই আবদুল্লাহ ও 'উবায়দুল্লাহ হাবশায় হিজরাত করলেও তিনি হাবশায় হিজরাত করেননি। তিনি আরও বলেছেন, যে সব বর্ণনায় তাঁর হাবশায় হিজবাতের কথা পাওয়া যায় তা সবই ভিত্তিহীন। (আনসাবুল আশরাফ—১/১৯৯)

ইবন ইসহাক আবু আহমাদের পরিচয় ও মদীনায় হিজরাত সম্পর্কে বলেন ঃ 'আবু সালামার পর সর্ব প্রথম যাঁরা মদীনায় আসেন, 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজ পরিবার এবং অন্য এক ভাই— আবু আহমাদকেও সংগে নিয়ে আসেন। এই আবু আহমাদ এক অন্ধ ব্যক্তি। তিনি মককার উঁচু-নীচু ভূমিতে কারও সাহায্য ছাড়া ঘুরে বেড়াতেন। আবু, সুফইয়ানের কন্যা 'ফারয়া' তাঁর স্ত্রী। আর তাঁর মা আবদুল মুত্তালিবের কন্যা উমাইমা।

তাঁরা ঘর-বাড়ী ছেড়ে মদীনায় চলে এলে একদিন উতবা ইবন রাবীয়া, 'আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব ও আবু জাহল ইবন হিশাম তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়ীর পাশ দিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিকে যাচ্ছিল। 'উতবা খালি বাড়ীটির দিকে ইঙ্গিত করে কবি আবু দুওয়াদ আল-ইয়াদীর একটি কবিতার শ্লোক আওড়িয়ে আফসুসের সুরে বলে ঃ বনী জাহাশের বাড়ীটি একেবারেই খালি হয়ে গেল। আবু জাহল তার জবাবে বললে ঃ এতো আমাদের ভায়ের ছেলের কাজেরই পরিণাম। সে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, আমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আমাদের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে।.....' মদীনায় কুবার বনী 'আমর ইবন আওফের পল্লীতে আবু সালামা ইবন 'আবদিল আসাদ, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও আবু আহমাদ বসবাস করতেন।" (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৪৭০-৪৭২) মদীনায় পৌঁছে প্রথমত ঃ তিনি হযরত মুবাশশির ইবন আবদিল মুনজিরের অতিথি হন।

মক্কায় একদল লোকের সার্বক্ষণিক কাজ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া। এই দলটির প্রধান ছিল দুই ব্যক্তি ঃ আবু সুফইয়ান ও আবু জাহল। আবু আহমাদ আগে ভাগে হিজরাত করে তাদের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায় সরাসরি তাদের অত্যাচার থেকে বেঁচে যান। তবে আবু সুফইয়ান তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়িটি অন্যায় ভাবে 'আমর ইবন 'আলকামার নিকট বিক্রী করে দেয়। (সীরাতু ইবন হিশম০—১/৪৯৯) সম্ভবতঃ আবু সুফইয়ানের মেয়ে 'ফারয়া' ছিল এই বাড়ীর পুত্র বধু, সেই অধিকারে সে বাড়ীটি বিক্রী করে। (সীরাতু ইবন হিশাম—১/৫০০

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয়ের পর আবু আহমাদ তাদের বাড়ীর প্রসঙ্গটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উত্থাপন করেন। লোকেরা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে ঃ আবু আহমাদ, আল্লাহর পথে যা তোমরা হারিয়েছ, এখন তা আবার দাবী কর— রাসূলুল্লাহ (সা) তা পসন্দ করেন না। অন্য একটি বর্ণনা

মতে, আবূ আহমাদের দাবীর পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত উসমানের (রা) মাধ্যমে তাঁকে কিছু বলে পাঠান। হযরত উসমান (রা) সে কথা তাঁকে কানে কানে বলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বাড়ী সম্পর্কে আর একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি। পরে তাঁর সন্তানদের কাছে জানা গেছে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বাড়ীর দাবী ত্যাগ করতে বলেন এবং বিনিময়ে তাঁকে জান্নাতে একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দান করেন।

তবে তিনি আবূ সুফইয়ানের উদ্দেশ্যে একটি জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করেন। তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

তোমরা আবূ সুফইয়ানকে বলে দাও, সে যা করেছে তার পরিণাম লজ্জা ও অনুশোচনা।

তুমি চাচাতো ভাইদের বাড়ী বিক্রী করে নিজের ঋণ পরিশোধ করেছ।

মানুষের রব আল্লাহর নামে আমি শক্ত কসম করেছি। যাও, নিয়ে যাও, যাও, আমি সেই অর্থ তোমার গলায় কবুতরের গলার মালার মতো মালা বানিয়ে দিলাম, (যা আর কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না বা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।) (সীরাতু ইবন হিশাম—২/৬৪৪)

রাসূলুল্লাহর (সা) আযাদকৃত দাস যায়িদ ইবন হারিসার সাথে হযরত যয়নাব বিনতু জাহাশের বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে আবূ আহমাদই তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। (সীরাত—২/৬৪৪)

হযরত আবূ আহমাদ মদীনায় ইনতিকাল করেন। (আনসাবুল আশরাফ—১/১৯৯ তবে তাঁর মৃত্যুর সময় সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ আছে। ইবনুল আসীর দৃঢ় ভাবে বলেছেন ঃ তিনি বোন যয়নাব বিনতু জাহাশের পরে মারা গেছেন। অর্থাৎ হিজরী ২০ সনের পরে। কারণ হযরত যয়নাব মারা যান হিঃ ২০ সনে। ইবন হাজার এ মত সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, এমন বর্ণনাও তো আছে যে, আবূ আহমাদের মৃত্যুর পর তাঁর বোন যয়নাব কিছু খোশবু আনিয়ে তাঁর গায়ে লাগিয়ে দেন। বুখারী ও মুসলিমে যয়নাব বিনতু উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি যয়নাব বিনতু জাহাশের এক ভায়ের মৃত্যুর সময় যয়নাবের ঘরে যাই। তিনি কিছু খোশবু আনিয়ে তাঁর গায়ে লাগিয়ে দেন। ইবন হাজার বলেন, এটা আবূ আহমাদের মৃত্যুর সময়ের ঘটনা হবে। কারণ, যয়নাবের অন্য দুই ভাই আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় উহুদে শহীদ হন এবং উবায়দুল্লাহ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী অবস্থায় হাবশায় মৃত্যুবরণ করে। তাঁর স্ত্রী উম্মু হাবীবাকে রাসূল (সা) বিয়ে করেন। (আল-ইসাবা—৪/৪)

আমর ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা)

আমরের ডাকনাম আবু 'উকবা। পিতা সাঈদ ইবনুল 'আস। কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান। মা বনী মাখযূমের কন্যা। আমর হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ফুফাতো ভাই। (উসুদুল গাবা-৪/১০৬, আল-ইসাবা-২/৫৩৯)

সা'ঈদ ইবনুল 'আসের পাঁচ ছেলে-খালিদ, আবান, সা'ঈদ, আবদুল্লাহ ও আমর। আগে পরে তাঁরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। যুবাইর ইবন বাক্কার বলেনঃ সাঈদ ইবনুল আসের ছেলে আবু উহায়হা সা'ঈদ ইবন সা'ঈদ তায়িফ অবরোধের সময় শাহাদাত বরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদের পূর্ব নাম ছিল হাকাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিবর্তন করে 'আবদুল্লাহ রাখেন। 'আমর ইবন সা'ঈদ আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ অতঃপর 'আমর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, 'আমরের কোন সন্তানাদি ছিল না। সাঈদ ইবনুল আসের অন্য ছেলে আবান সব শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। ভাইদের বিশেষতঃ খালিদ ও 'আমরের ইসলাম গ্রহণে আবান দারুন ক্ষুব্ধ হন। খালিদ, 'আমর ও আবান তিন জনই কবি ছিলেন। আবান তাঁর দুইভাই-খালিদ ও 'আমর ইসলাম গ্রহণ করার পর তিরস্কার করে একটি কবিতা লিখেন। খালিদ ও 'আমর কবিতায় তার জবাবও দেন। আল-ইসাবা, সীরাতু ইবন হিশাব, উসুদুল গাবা প্রভৃতি গ্রন্থে সেই কবিতার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। আবান তাঁর ভাইদের তিরস্কার করে যে কবিতাটি রচনা করেন তার একটি পংক্তি এই রকম ঃ

'হায়! 'আমর ও খালিদ দ্বীনের (ধর্ম) ব্যাপারে যে কেমন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তা যদি 'জাবীরা'র মৃত ব্যক্তি দেখতো!

তাঁদের পিতা সা'ঈদ ইবনুল 'আস জাবীরা' নামকস্থানে সমাহিত ছিল। এখানে সেই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। 'আমর কবিতায় জবাব দেন। তার একটি পংক্তি এমন ঃ 'এখন ঐ মৃতদের কথা ছেড়ে দাও যাঁরা তাঁদের পথে চলে গেছেন। এখন সেই সত্যের দিকে এস যার সত্য হওয়াটা একেবারেই সুস্পষ্ট।'

(আল-ইসাবা— ২/৫৩৯, সীরাতুইবন হিশাম—২/৩৬০)

খালিদ ইবন সা'ঈদের হাবশায় হিজরাতের দুই বছর পর হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে আমর ইবন সা'ঈদ স্ত্রী ফাতিমা বিনতু সাফওয়ান সহ হাবশায় হিজরাত করেন। ফাতিমা বিনতু সাফওয়ান হাবশায় ইনতিকাল করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম ২/৩৬০) আর 'আমর হাবশা থেকে মুসলিম কাফিলার সাথে জাহাজ যোগে খাইবার যুদ্ধের সময় মদীনায় পৌছেন।

মদীনায় আসার পর মক্কা বিজয় সহ হুনাইন, তায়িফ, তাবুক প্রভৃতি অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। হযরত রাসূল কারীম (সা) সা'ঈদের তিন ছেলে আবান, খালিদ ও আমরকে তিন অঞ্চলের, শাসক নিয়োগ করেন। খালিদ ইয়ামন, আবান বাহরাইন এবং 'আমর মদীনার পশ্চিম অঞ্চল তথা তাবুক, খাইবার, ফিদাক ইত্যাদির শাসক ছিলেন। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত অতি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত রাসূলে কারীমের ওফাতের পর তাঁরা মদীনায় চলে আসেন। অযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সকলকে তাঁদের পূর্ব পদে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন ঃ 'শাসন কাজ পরিচালনার জন্য আপনাদের থেকে অধিকতর হকদার ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনা।' (আল-ইসাবা ২/৫৩৯) কিন্তু সা'ঈদ

ইবনুল 'আসের ছেলেরা খলীফার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে ঃ আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আর কারও 'আমিন বা শাসক হবনা।

হযরত আবূবকর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সিরিয়ার বোমানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বিশিষ্ট সাহাবীদের একটি বৈঠকে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করা হয়। একে একে সবাই মত প্রকাশ করছেন, আবার অনেকে নীরব রয়েছেন। এক সময় হযরত 'উমার (রা) সকলকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলেন ঃ যদি আশু ফল লাভের সম্ভাবনা দেখা যেত অথবা সফর নিকটবর্তী হতো, শুধু তাহলেই কি আপনারা বেরুতেন ? 'উমারের (রা) এ বক্তব্যে 'আমর ইবন সা'ঈদ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আপনি মুনাফিকদের সম্পর্কে প্রয়োগকৃত দৃষ্টান্ত আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন ? আপনি নিজে চুপ করে বসে আছেন কেন ? আপনিই প্রথম শুরু করুন না। এ পর্যায়ে 'উমারের সাথে তাঁর বেশ কথা কাটাকাটি হয়। অতঃপর খলীফা আবু বকর (রা) বলেন, আসলে উমারের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা। সাথে সাথে 'আমরের ভাই খালিদ উঠে দাঁড়ান এবং খলীফার বক্তব্য সমর্থন করে এক ভাষণ দেন। এ ভাবে বিষয়টির মীমাংসা হয়। (হায়াতুস সাহাবা—১৪৪০

শাসনকর্তার পদ প্রত্যাখ্যান করে 'আমর একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসাবে সিরিয়া অভিযানে যোগদেন। হিজরী ১৩ সনে আজনাদাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। মুসলিম বাহিনীর একটু দুর্বলতা দেখলেই তিনি চিৎকার করে নানাভাবে তাদের মনোবল দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। একবার অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে আমি আমার সাথীদের দুর্বলতা মোটেই দেখতে পারিনে। এখন অমি নিজেই ঢুকে পড়বো।' একথা বলে তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যভাগের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে চলে যান এবং অত্যন্ত দুঃসাহসের সাথে লড়তে লড়তে শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধের শেষে তাঁর লাশ কুড়িয়ে দেখা গেল অসংখ্য আঘাতে সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। গুণে দেখা গেল মোট ত্রিশটি ক্ষত চিহ্ন। অবশ্য ইবন ইসহাক ও মূসা ইবন উকবার মতে আমর 'মারজ আস সাফার' যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (আল ইসাবা—২/৫৩৯)

ওয়াকিদ ইবন 'আবদিল্লাহ (রা)

নাম ওয়াকিদ, পিতা 'আবদুল্লাহ। বনী তামীম গোত্রের হানজালী ইয়ারবু'য়ী শাখার সন্তান। জাহিলী যুগে খাভাব ইবন নুফাইলের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। (তাবাকাত-৩/৩১০, আল-ইসাবা-৩/৬২৮)

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনালগ্নে হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আরকাম ইবন আবিল আরকামের (রা) বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই ওয়াকিদ ইসলাম গ্রহণ করেন'। হিজরাতের নির্দেশ আসার পর তিনি মদীনায় হিজরাত করেন এবং হযরত রিফা'য়া ইবন 'আবদিল মুনজিরের অতিথি হন। মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) বিশর ইবন বারা' ইবন মা'রূর এর সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দেন। (তাবাকাত— ৩/৩১০)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় হিজরাতের সতেরোতম মাসটি ছিল রজব মাস। এ মাসে তিনি কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে ১২ মতান্তরে ৯ সদস্যের একটি বাহিনীকে 'নাখলায়' পাঠান। এতে ওয়াকিদ ইবন 'আবদিল্লাহও ছিলেন। তাঁরা নাখলায় পৌঁছে ওৎ পেতে আছেন। এমন সময় কুরাইশদের একটি ছোট্ট বানিজ্য কাফিলা দৃষ্টি গোচর হয়। দিনটি ছিল রজবের একেবারে শেষ দিন। আর রজব মাসটি আরবে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ চার মাসের একটি। সুতরাং এ সময় আক্রমণ করা যাবে কিনা, এ বিষয়ে মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা পরামর্শ করেন। অবশেষে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ওয়াকিদ ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) তীর নিক্ষেপ করেন। সেই নিক্ষিপ্ত তীরে শত্রুপক্ষের 'আমর ইবনুল হাদরামী নিহত হয় এবং উসমান ও হাকাম নামে দুই ব্যক্তি বন্দী হয়।

যেহেতু রক্তপাতের ঘটনাটি সংঘটিত হয় হারাম মাসে এ কারণে কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রচারনা চালাতে থাকে। তারা বলে, মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর অনুসারীরা কি আবহমান কাল ধরে মেনে আসা হারাম মাসগুলির পবিত্রতা মানে না? এমন কি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও ঘটনাটি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি বাহিনীর লোকদের ডেকে বললেন, 'আমি তো তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি দিইনি, তবে কেন তোমরা যুদ্ধ করলে?' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা, আল বাকারাহ্‌র নীচের আয়াতটি নাযিল হয়:

'হে মুহাম্মাদ, মুশরিকরা তোমার নিকট 'হারাম' মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্ক জিজ্ঞেস করে। তুমি তাদের বলে দাও এ মাসে যুদ্ধ করা বড় পাপের কাজ। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর কুফেরী করা, মানুষকে মসজিদে হারামে 'ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখা এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদের বের করে দেওয়া আল্লাহর নিকট এ মাসে যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর বড় পাপ কাজ। আর অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ।' (সূরা বাকারাহ—২১৭) আল ইসাবা ৩/৬২৮, আসাহহুস সীয়ার—১২৮)

যাই হোক, 'আমর ইবনুল হাদরামী একজন মুসলমানের হাতে নিহত প্রথম কাফির, উসমান ও হাকাম ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দুই কয়েদী এবং কুরাইশ কাফিলার নিকট থেকে প্রাপ্ত জিনিস ইসলামের প্রথম গনীমাত।
(আসাহহুস সীয়ার—১২৮)

এই ঘটনার পর বনী ইয়ারবু গর্ব করে বলে বেড়াতো আমাদেরই একজন ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম একজন মুশরিককে হত্যা করেছে। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব কাব্য করে বলতেন : 'নাখলায় আমরা আমাদের তীরগুলিকে ইবনুল হাদরামীর রক্ত পান করিয়েছি, যখন ওয়াকিদ যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। (আল-ইসাবা-৩/৬২৮) নাখলার পর বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমারের খিলাফত কালের প্রথম দিকে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর কোনো সন্তানাদি ছিলো না। হাদীসের গ্রন্থ সমূহে তাঁর থেকে বর্নিত দুই/একটি হাদীস দেখা যায়।

আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা)

পুরো নাম আবু মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ, পিতা মাখরামা ইবন 'আবদিল 'উয্যা এবং মাতা বাহসানা বিনতু সাফওয়ান। কুরাইশ বংশের 'আমেরী শাখার সন্তান। (আল-ইসাবা-২/৩৬৫)

ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা লগ্নে মক্কায় ইসলাম গ্রহন করেন। জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) সাথে হাবশাগামী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখান থেকে সরাসরি মদীনায় চলে যান এবং হযরত কুলসুম ইবন হিদামের বাড়িতে অতিথি হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ফারওয়া ইবন 'আমর আল-বায়াদীর (রা) সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। মদীনায় আসার পর সর্ব প্রথম বদর যুদ্ধে যোগদান করে বদরী সাহাবী হওয়ার মহা সম্মান অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর। বদরের পর, উহুদসহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন।

হযরত আবদুল্লাহর (রা) শাহাদাত লাভের এত তীব্র বাসনা ছিলো যে, দেহের প্রতিটি লোম রক্তরঞ্জিত করার জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকতেন'। তিনি দু'আ করতেনঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিও না, যতক্ষন না আমার দেহের প্রতিটি জোড়া আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়।' তাঁর এ দু'আ কবুল হয় এবং অনতিবিলম্বে সে সুযোগও এসে যায়।

হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে রিদ্দা বা ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি একজন মুজাহিদ হিসেবে যোগদেন। মুরতাদদের বিরুদ্ধে তিনি এত নির্মম ভাবে যুদ্ধ করেন যে, তাঁর সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। পবিত্র রমজান মাস। তিনি সাওম পালন করছিলেন। সূর্যাস্তের সময় যখন তাঁরও জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা) খোঁজ নিতে এসেছেন। আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইবন উমার, আপনি কি ইফতার করেছেন ? তিনি বললেন হাঁ'। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমার জন্যও একটু পানি আনুন না।' পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন তাঁর প্রাণহীন দেহটি পড়ে আছে'। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র একচল্লিশ বছর। (আল-ইসাবা ২/৩৬৫)

ইলম, আমল, তাকওয়া ও পরহিযগারীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। উসুদুল গাবা গ্রন্থকার লিখেছেন, তিনি ছিলেন মাহাত্বের অধিকারী একজন আবেদ ব্যক্তি।

তথ্যসূত্র

১· ইবন সা'দ ঃ তাবাকাত
২· ইবন হাজার আসকিলানী ঃ আল-ইসাবা
৩· ইবন হাজার আসকিলানী ঃ তাহজীব আত-তাহজীব
৪· ইবন আসীর ঃ উসুদুল গাবা
৫· ইবন আসীর ঃ তাজরীদ আসমা আস-সাহাবা
৬· আল-বালাজুরী ঃ আনসবুল আশরাফ
৭· আজ-জাহাবী ঃ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ
৮· আজ-জাহাবী ঃ তারীখুল ইসলাম
৯· ইবন কাসীর ঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া
১০· ইবন আসাকির ঃ আত-তারীখুল কাবীর
১১· আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম
১২· আল-কুরতুবী ঃ আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)
১৩· ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্
১৪· তারাবী ঃ তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক
১৫· মাওলানা ইউসুফ কান্ধালূবী ঃ হায়াতুস সাহাবা
১৬· মু'ঈনুদ্দীন আহমাদ নাদবী ঃ মুহাজিরীন
১৭· ডঃ আবদুর রহমান রাফত আল-বাশা ঃ- সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা
১৮· খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওলার রাসূল
১৯· মুহাম্মাদ খিদরী বেক ঃ তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা
২০· দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই ইসলামিয়্যা (উর্দু)
২১· হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

৩

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

তৃতীয় খন্ড

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৯
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০২
চতুর্থ প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৫

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য : একশত পনের টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. III) Written by Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition April 1994 Forth Edition November 2005 Price Taka 115.00 only.

সূচীপত্র

ভূমিকা ৪
মদীনার আনসারদের পরিচয় ৫
১. হযরত আস'য়াদ ইবন যুরারা (রা) ১৩
২. হযরত আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান (রা) ১৮
৩. হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) ২২
৪. হযরত 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ৩২
৫. হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) ৩৯
৬. হযরত আবু আইউব আল-আনসারী (রা) ৫৪
৭. হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) ৬৭
৮. হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) ৭৮
৯. হযরত সা'দ ইবনুর রাবী (রা) ৯৫
১০. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ৯৯
১১. হযরত আবু তালহা আল-আনসারী ১১০
১২. হযরত আবু মাস'উদ আল-বদরী (রা) ১২১
১৩. হযরত আবু কাতাদাহ্ আল-আনসারী (রা) ১২৪
১৪. হযরত আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) ১৩২
১৫. হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল (রা) ১৪০
১৬. হযরত হানজালা ইবন আবী 'আমির (রা) ১৬১
১৭. হযরত উবাই ইবন কা'ব আল-আনসারী (রা) ১৬৪
১৮. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) ১৮২
১৯. হযরত আবু দারদা (রা) ২০২
২০. হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ২২১
তথ্যসূত্র ২৩৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ। 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (তৃতীয় খন্ড)' প্রকাশিত হচ্ছে। ইচ্ছা ছিলো আরো আগে প্রকাশ করার; কিন্তু তা হয়নি। নানা কারণে বিলম্ব ঘটে গেছে। এ খন্ডে বিশজন আনসারী সাহাবীর জীবনকথা এসেছে। আগের দু'টি খন্ডের মত এখানেও অল্প কথায় এই মহান সাহাবীগণের পরিচয় ও কর্মকান্ড তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথম থেকেই পাঠকদের কাছে আমাদের অঙ্গীকার ছিল, অল্প কথায় সাহাবায়ে কিরামের (রা) পরিচয় তুলে ধরার। আমরা তা রক্ষার চেষ্টা করেছি। তবে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার একটিও আমাদের নিজের নয়। সবই নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে গৃহীত হয়েছে।

'জীবনকথা (১ম খন্ড ও ২য় খন্ড)' পাঠকদের হাতে পৌঁছার পর অনেকেই তাকীদ দিয়েছেন, আরো একটু বিস্তারিতভাবে লেখার জন্য। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কারো পরামর্শই গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি, তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করবেন অন্যরা। সাহাবায়ে কিরামের কর্মকান্ড নিয়ে লেখার অনেক কিছুই আছে।

যাঁরা আমার এ লেখার ধারা অব্যাহত রাখার পেছনে নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমাদ, যিনি সর্বক্ষণ আমাকে লেখার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছেন, তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। দু'আ করি, আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাঁকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করেন।

পরিশেষে, বিনীতভাবে স্বীকার করছি, এ বই-এ যদি কোন ভুল ও অসংগতি থেকে থাকে অথবা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি কোথাও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা সবই আমার নিজের ত্রুটি। সেগুলি আমার দৃষ্টিতে আনার জন্য সহৃদয় পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ পাক আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে দীনের ন্যূনতম খিদমাত হিসাবে কবুল করুন। আমীন।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
১৩ই রবী'উল আওয়াল, ১৪১৪

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
সহকারী অধ্যাপক,
আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা - ১০০০।

মদীনার আনসারদের পরিচয়

আরবী 'আল-আনসার' শব্দটি বহুবচন। একবচনে 'নাসের' অর্থ ঃ সাহায্যকারী। রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কা হতে মদীনায় হিজরাতের পর সেখানকার যে সকল মুসলমান তাঁকে খোশ আমদেদ জানান ও সাহায্য করেন, তাঁদেরকে বলা হয় 'আনসার'। মূলতঃ তাঁরা ছিলেন মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের জনগণ।

প্রাচীনকালের আরবের অধিবাসীদেরকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ (১) আল-'আরাব আল-বায়িদা, (২) আল-'আরাব আল-'আরিবা, (৩) আল-'আরাব আল-মুসতা'রাবা। হযরত নূহের (আ) প্লাবনের পর যেসব গোত্র আরবে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং শেষে বিলীন হয়ে যায়, তাঁদের বলা হয় 'বায়িদা'। 'আদ, সামুদ, 'আমালিকা, ত্বাসাম, জাদীস প্রভৃতি জাতি এর অন্তর্ভুক্ত। আর বায়িদার সমসাময়িক অন্যসব গোত্র, যারা তাদের পরে আরবের কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের বলা হয় 'আরিবা। কাহত্বান, সাবা, হিমইয়ার, মুঈন প্রভৃতি তাদেরই শাখাসমূহ। আর মুসতা'রাবা বলা হয় ঐ সব গোত্রকে যারা ছিল নবী হযরত ইসমা'ঈলের (আ) বংশধর এবং মূলতঃ তারা ছিল আরবের উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী।

মদীনার আনসারদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, তারা আল-আরাব আল-'আরেবার বংশধর। এরই ভিত্তিতে আরবের নসববিদগণ তাদের নসবনামা কাহ্ত্বান ইবন 'আবের পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন, যিনি আল-আরাব 'আরিবার উত্তরাধিকারী। তবে কাহত্বান থেকে নসববিদগণ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যান। একদল বলেন, কাহ্ত্বান নিজেই এক স্বতন্ত্র খান্দানের প্রতিষ্ঠাতা। পক্ষান্তরে অন্যদল তাঁকে পৃথক কোন শাখা খান্দান মনে করেন না। তাঁরা কাহ্ত্বানকে নাবিত ইবন ইসমা'ঈলের সন্তান বলে মনে করেন। কালবী ও কতিপয় ইয়ামনবাসী এ মত পোষণ করেছেন। তাঁরা হযরত ইসমা'ঈলকে (আ) সমগ্র আরবের পিতৃ-পুরুষ বলে মনে করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭) তবে মাস'উদী বলেন, ইয়ামনবাসীরা যে কাহত্বানকে নাবিতের সন্তান মনে করে, একথা ঠিক নয়। বরং তারা কাহত্বানকে 'আবিরের সন্তান বলে থাকে। (কিতাবুত তানবীহ ওয়াল-আশরাফ-৮১)

যাই হোক, কাহ্ত্বান একটি স্বতন্ত্র খান্দান এবং একটি স্বতন্ত্র রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ইয়ামনে তাদের বংশধরগণ বহুকাল ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

আরব ঐতিহাসিকরা আনসারদেরকে কাহত্বানের বংশধর বলে মনে করেন। এ কারণে তারা আনসারদের ইতিহাস কাহত্বানের সময় থেকে শুরু করেন। এই বংশে 'আবদি শামস নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'সাবা'। তাঁকেই ইয়ামনের 'সাবা' রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। হিমইয়ার ও কাহ্লান নামে তাঁর দুই ছেলে ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুই ছেলে, রাজবংশের সদস্যবৃন্দ ও রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ডেকে অসীয়াত করে যান যে, 'আমার বড় ছেলে হিমইয়ারকে রাজ্যের ডান ভাগ এবং ছোট ছেলে কাহ্লানকে বাম ভাগ দেবে।' যেহেতু ডান হাতের জন্য তরবারি, চাবুক, কলম এবং বাম হাতের জন্য লাগাম, ঢাল ইত্যাদির প্রয়োজন। এজন্য সবাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হিমইয়ার রাজা হবেন এবং রাজ্যের

প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন কাহ্‌লান। এভাবে হিমাইয়ার রাজা হলেন। তারপর বংশ পরম্পরায় তারা সিংহাসনের অধিকারী হলেন। এবং কাহ্‌লানের বংশধরগণ রাজ্যের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে চললেন।

রাজা আল-হারেস আর-রায়িশ-এর সময় 'আমের ইবন হারিসা, যার উপাধি ছিল 'মাউস সামা' এবং তাঁর পরে তাঁর ছেলে 'আমর আল-মুযাইকিয়া এই একই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এই আমরের স্ত্রী তুরাইফা বিন্‌তু জাবর ছিল একজন 'কাহেনা' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। এক রাতে সে স্বপ্ন দেখে যে, একটি ঘন, কালো মেঘ গোটা ইয়ামনকে ঘিরে ফেলেছে। বিদ্যুতের ঝলকানি এবং বজ্রপাতের দুর্বিসহ গর্জনে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। যেখানেই বজ্রপাত হচ্ছে, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। সে ভীত-শংকিত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে আমরের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে বলে, এখন আর কোন উপায় নেই। আমর জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমাদের করণীয় কি? সে বললো ঃ খুব তাড়াতাড়ি ইয়ামন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। খুব শিগগির 'আরাম বাঁধ ভেঙ্গে গোটা ইয়ামন তলিয়ে যাবে।

'আমর ছিলেন প্রচুর ধন-দৌলত, জীব-জন্তু ইত্যাদির অধিকারী। ইচ্ছা করলেই হঠাৎ কোথাও চলে যেতে পারেন না। তাছাড়া মানুষকে কী বলে যাবেন? এ জন্য এক বুদ্ধি আঁটলেন। বড় ছেলে সা'লাবাকে বললেন, আমি তোমাকে মানুষের সামনে একটা কাজের নির্দেশ দেব, আর তুমি তা পালন না করার ভান করবে। আমি ধমক দিলে তুমি আমার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেবে। সা'লাবা বললো, এমন কাজ আমার দ্বারা কেমন করে সম্ভব? 'আমর বললেন, 'কল্যাণ এতেই রয়েছে।' পরিকল্পনা অনুযায়ী 'আমর নেতৃস্থানীয় লোকদের খাবারের দা'ওয়াত দিলেন। সবাই উপস্থিত হলে তিনি সা'লাবাকে একটি কাজের নির্দেশ দিলেন এবং সে তা পালনে অস্বীকৃতি জানালো। 'আমর তাকে মারার জন্য নিযা হাতে উঠিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে সা'লাবা পিতার গালে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। 'আমর বলে উঠলেন, 'এমন অপমান!' সা'লাবার ভাই তাকে মারার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। 'আমর তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী করে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। এ ধৃষ্টতার জন্য আমি তাকে এক কপর্দক ও দেবনা। এভাবে 'আমর তাঁর বিষয়-সম্পদ উচ্চমূল্যে বিক্রী করে নিজের পরিবার-পরিজনসহ ইয়ামন থেকে বেরিয়ে পড়েন। এরপর 'আরাম বাঁধ ভেঙ্গে গোটা ইয়ামন তলিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

'আমর 'মারিব' থেকে বের হয়ে প্রথমে আক্‌কায় আশ্রয় নেন এবং তাঁর তিন ছেলে— হারেস, মালিক ও হারেসাকে সামনে এগিয়ে যেতে বলেন। তারা ফিরে আসার পূর্বেই 'আমর মারা যান এবং তার বড় ছেলে 'সা'লাবাতুল 'আনকা' তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীকালে তারা এ আক্‌কা থেকেও হিজরাত করে এবং আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং হিজাযের মক্কায় খুযা'য়া, শামে গাস্‌সান এবং ইয়াসরিবে (মদীনা) আউস ও খাযরাজ বসতি স্থাপন করে। এভাবে 'সাবায়ে উলা' বা প্রথম সাবা রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর তখন থেকেই আরবী প্রবাদ 'তাফাররাকূ আইদী সাবা'—সাবাদের ক্ষমতার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে— প্রচলিত হয়।

কেউ কেউ এটাকে একটি বানোয়াট কাহিনী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আবার অনেকে আনসারদেরকে নাবিতের বংশধর বলেছেন। তারা মনে করেন, নাবিতের সময় থেকে আনসারদের ইতিহাসের সূচনা। তাহলে আনসাররা 'আল-আরাব আল-

মুস্‌তা'রাবার অন্তর্ভুক্ত হবেন।

আরবীতে নাবিত, হিব্রুতে নায়াবুত। তাওরাতে তাঁকে হযরত ইসমা'ঈলের (আ) সন্তানদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে হযরত ইসমা'ঈলের (আ) জ্যেষ্ঠ পুত্র বলা হয়েছে। আরব ঐতিহাসিকরা খুব সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দিয়েছেন। তাবারী বলেছেন ঃ আল্লাহ নাবিত ও কাইদার-এর দ্বারা আরবদের বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। (তাবারী-১/৩৫২) ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে লিখেছেন ঃ হযরত ইসমা'ঈলের (আ) পরে কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব তাঁর ছেলে নাবিতের হাতে পৌঁছে।' (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৩) এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় নাবিত মক্কার অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমা'ঈল নির্মিত কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব লাভ করেন। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

মক্কা ছিল শুষ্ক পাহাড়ী ভূমি। এ কারণে নাবিতের মৃত্যুর পর তাঁর নিজের ও তাঁর ভাইদের সন্তানরা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। নাবিতের সন্তানরা আরবের উত্তর-পশ্চিম অংশে আবাসন গড়ে তোলে। তবে কাইদার-এর সন্তানরা তখনও মক্কায় থেকে যায়। পরবর্তীকালে মুদাদ বিন হামী মক্কার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিলে তারা মক্কা ছেড়ে কাজেমা, গুমার জীকুন্দাহ, শা'ছামীম প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নাবিতের সন্তানরা হিজাযের উত্তর এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল। এখানে তারা হযরত 'ঈসার জন্মের চার শো বছর পূর্বে 'আনবাত' নামে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এই নাবাতী সাম্রাজ্য খুবই প্রতাপশালী হয় এবং উত্তর আরব থেকে সাবা সাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন করে। খ্রীঃ পূঃ ৬২ সনে হারেস সিংহাসন লাভ করেন। তিনি এ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। মোটকথা, খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই নাবাতীরা অত্যন্ত প্রতাপের সাথে রাজত্ব করেন।

এই আনবাতের বংশধরদের অন্য একটি শাখা আছে। তারা কোন এক অজ্ঞাত যুগে ইয়ামনে বসতি স্থাপন করে। তারা আয্‌দ অথবা আসাদ গোত্র। তারা নাবিত ইবন মালিকের বংশধর। সম্ভবতঃ ইসমা'ঈলীদের ইয়ামনে বসতি স্থাপনের সময় বা তার পরে এই লোকেরা সেখানে যায়। তারা মা'রিব-এ বসবাস করতো। কালক্রমে তাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অভাব ও অন্যসব অসুবিধার কারণে তারা মা'রিব ছাড়তে বাধ্য হয়। যখন তারা মারিব ত্যাগ করে তখন তাদের নেতা ছিলেন 'আমর ইবন 'আমের। তিনি ইতিহাসে 'মুযাইকিয়া' নামে খ্যাত। মূলতঃ তিনিই গোটা আনসার সম্প্রদায় ও গাস্‌সানীদের আদিপুরুষ। আনসারদের ইতিহাস তাঁর সময় থেকেই পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

'আমর প্রথমতঃ মালিক ইবন ইয়ামন ও আয্‌দ গোত্রকে সংগে করে মা'রিব থেকে বের হন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু যুগ ধরে তাঁর বংশধরগণ বসবাস করতে থাকে। ইতিহাসের এক পর্যায়ে এই 'আমরের অধস্তন পুরুষরা ইয়াসরিব ও তার আশে-পাশে বসতি স্থাপন করে। তারাই মদীনার বিখ্যাত আউস ও খাযরাজ গোত্রের পূর্বপুরুষ।

আনসারদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যত কথাই প্রচলিত থাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মদীনার আনসারদের সবগুলি গোত্র আউস ও খাযরাজ নামের দু'ব্যক্তি থেকে উৎসারিত। তাদের পিতার নাম হারেসা এবং মাতার নাম কাইলা বিনতু 'আমর ইবন জাফনা। 'আদী

নামে তাঁদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁর বংশধরগণও মদীনায় বিদ্যমান ছিল। খাযরাজ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে আউস সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি একজন খতীব (বক্তা) ও শা'য়িব (কবি) ছিলেন। তাঁর নামে বর্ণিত কিছু জ্ঞানগর্ভ কথা সংরক্ষিত আছে। এই আউস, খাযরাজ ও 'আদীর বংশধরগণ ইয়াসরিবে বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন উপগোত্রে বিভক্ত হয়। যথা ঃ

'আদী ঃ তাঁর নামে পৃথক কোন শাখা গোত্র নেই। অনেকের ধারণা তাঁর সন্তানরা আউস ও খাযরাজের সাথে মিলে এক হয়ে গেছে। কারণ, আরবে ভাতিজারা চাচার খ্যাতির কারণে তাঁর সন্তান রূপে প্রসিদ্ধি পায়। (উসুদুল গাবা-৫/২০৪)

আউস ঃ মালিক নামে তাঁর ছিল এক ছেলে। আর এই মালিকের ছিল পাঁচ ছেলে, যারা প্রত্যেকেই পৃথক শাখা গোত্রের উর্ধতন পুরুষ। যথা ঃ 'আমর ইবন মালিক, 'আওফ ইবন মালিক, মুররা ইবন মালিক, ইমরাউল কায়েস ইবন মালিক ও জাশাম ইবন মালিক।

খাযরাজ ঃ খাযরাজের ছিল পাঁচ ছেলে ঃ 'আমর আওফ, জাশাম, কা'ব ও হারেস। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতুল গোত্র বনু নাজ্জারের সকল শাখাই ছিল 'আমর ইবন খাযরাজের বংশধর।

আনসারদের পূর্ব-পুরুষের মদীনায় আগমনের পূর্বেই সেখানে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করেছিল। অনেকের মতে তারা হযরত সুলাইমানের (আ) সময়ে, আবার অনেকের মতে বখ্‌তে নাসরের বায়তুল মাকদাস ধ্বংসের পরে তারা আরবে আসে এবং ইয়াসরিব ও তার আশে-পাশের এলাকায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে আউস ও খাযরাজের পূবপুরুষরা এসে দুর্গ ও বাড়ীঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করে। তারা ইহুদীদের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি করে; কিন্তু কালক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে ইহুদীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং পরে তা শত্রুতায় পরিণত হয়।

আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা প্রথমে ইয়াসরিবের একই এলাকায় বসবাস করতো। পরে ইহুদীদের শক্তি কিছুটা খর্ব হলে তারা সেখানকার গোটা নিচু ও উঁচু এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পৃথক বসতি অঞ্চল গড়ে তোলে।

আউস ও খাযরাজ গোত্র দু'টি দীর্ঘকাল পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং তারা একের পর এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইসলামের আবির্ভাব না হলে তারা হয়তো পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে যেত। 'খুলাসাতুল ওয়াফা' গ্রন্থের লেখক বলেন ঃ 'অতঃপর তাদের মধ্যে এত বেশী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশী ও দীর্ঘ যুদ্ধের কথা আর শোনা যায় না।' সামীর' যুদ্ধ থেকে যার শুরু 'বুয়াস' যুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি। 'বুয়াস' যুদ্ধটি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে। এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে কত যুদ্ধ যে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। ইতিহাসে শুধু বড় যুদ্ধগুলির কথা বর্ণিত হয়েছে। (আল কামিল ফিত তারীখ-১/৫০৩)

আনসারদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস

আনসারগণ যদি নাবিত ইবন ইসমা'ঈলের বংশধর হন তাহলে আদিতে তাদের ধর্মবিশ্বাসও তাই ছিল, যা ইসমা'ঈল (আ) ও তাঁর সন্তানদের ছিল। পরবর্তীকালে 'আমর ইবন লুহাই যখন আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন করে তখন অন্য ইসমা'ঈলীদের মত তারাও

মূর্তিপূজা শুরু করে। আনসারদের পূর্বপুরুষের ইয়ামান অবস্থানকালের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইয়াসরিবে বসবাসের পর থেকে তাদের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জানা যায়। খাযরাজ বংশের আদিপুরুষ থেকে চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ হলেন নাজ্জার। তিনিই বনু নাজ্জারের আদি পুরুষ। ইতিহাসে তার আসল নাম 'তাইমুল লাত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (তারাবী-১/১০৮৫) কিন্তু পরে পরিবর্তন করে 'তাইমুল্লাহ' রাখা হয়। ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে এ নামটি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ আনসারদের ইসলাম গ্রহণের পর এ পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের এমন নজীর আরো আছে। জাহিলী যুগের 'বনু সাম্মা' ইসলামী যুগে 'বনু সুমাই'য়া নাম ধারণ করে। এ নাম রাখেন খোদ রাসূল (সা)। (উসুদুল গাবা-৫/১৭৯) গোত্রের মত বহু ব্যক্তিরও নামের পরিবর্তন ঘটেছে।

যাই হোক, 'তাইমুল লাত' দ্বারা বুঝা যায়, আনসারদের মধ্যে 'লাত' দেবীর পূজা হতো। আনসারদের কোন কোন গোত্র 'আউসুল্লাহ' বলে পরিচয় দিত। হতে পারে পূর্বে তা 'আউসুল লাত' ছিল। আরব ঐতিহাসিকরা 'মানাত'কে আনসারদের দেবী বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'মানাত' ছিল নাবাতীদের দেবী। কুরআনের সূরা 'নাজম'-এ এর কথা এসেছে। 'মু'জামুল বুলদান'-এ বলা হয়েছে, ইসমা'ঈলের বংশধরদের সবচেয়ে পুরাতন দেবী হচ্ছে 'মানাত'। (৮/১৬৭) তারপর 'লাত'-এর পূজা শুরু হয়। (৭/৩১০) আউস, খাযরাজ ও গাস্সানের লোকেরাও মানাত-এর পূজা করতো। (তাবাকাত-১/১০৬) তাছাড়া আরবের অন্যান্য গোত্র, যেমন ঃ হুজাইল, খুযা'য়া, আয্দ শানওয়া, বনী কা'বও এর পূজারী ছিল।

একথা ঠিক নয় যে, ইয়াসরিববাসী শুধু লাত ও মানাত-এর পূজা করতেন, অথবা আরবের আর কোন গোত্র এ দু'দেবীর পূজা করতো না। বরং লাত ও মানাত ছাড়া অন্যান্য ছোট-বড় আরো অনেক দেব-দেবীর পূজা ইয়াসরিববাসী যেমন করতেন, তেমনি আরবের অন্যান্য গোত্রও লাত-মানাত-এর পূজা করতো।

ঐতিহাসিক তাবারী রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একবার হযরত আলীকে (রা) মদীনার কুবায় একজন মুসলিম মহিলার গৃহে কয়েক রাত অবস্থান করতে হয়। এ সময় তিনি প্রতিদিন রাতে দরযা খোলার শব্দ শুনতে পেতেন। মহিলাটি দরযা খুলে বাহির থেকে কিছু জিনিস ঘরে উঠিয়ে রাখতেন। তিনি ছিলেন বিধবা। একদিন আলী (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিদিন রাতে এভাবে দরযা খোলা হয় কেন? তিনি বললেন, আমি এক অনাথ মহিলা। এ কারণে সাহ্ল ইবন হুনাইফ রাতের বেলা তার গোত্রের মূর্তি ভেঙ্গে গোপনে তার কাঠগুলি আমার জ্বালানীর জন্য দিয়ে যায়। (তাবারী-৩/১২৪৪) এতে বুঝা যায় ইয়াসরিববাসীদের গৃহে কাঠের তৈরী বহু মূর্তি ছিল।

আমর ইবন জামূহ ছিলেন বনী সুলামার একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল (রা) মুসলমান হওয়ার পর 'আমরের মানাত' নামক কাঠের বিগ্রহটি রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে আসতেন। আমর আবার তা কুড়িয়ে আনতেন। এমনিভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে নিজস্ব বিগ্রহ ছিল। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক গোত্রের মূর্তি উপাসনার জন্য মন্দির ছিল। ইয়াকূত আল-হামাবী বলেছেন ঃ আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মত মানাত দেবীর এত বেশী সম্মান আর কোন গোত্র করতো না। (মু'জামুল বুলদান-৮/১৬৮)

আউস ও খাযরাজ গোত্রে এমন কিছু লোক ছিলেন যাঁরা মূর্তিপূজা করতেন না। তাঁরা ছিলেন এক আল্লাহতে বিশ্বাসী। তাঁদের অনেকে মদীনা ও খাইবারের ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অনেকে আবার 'হানীফী' ধর্মেরও অনুসারী ছিলেন। আনসারদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ইবন হিশাম বলেছেন ঃ 'আউস ও খাযরাজরা ছিলেন মুশরিক। তাঁরা মূর্তিপূজা করতেন। তাঁরা জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, নশর, কিতাব, হালাল ও হারাম কিছুই জানতেন না (সীরাত-১/৩০৪)' সামগ্রিক অবস্থা ছিলো এটাই।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা

জাহিলী যুগে মক্কার সাথে আনসারদের যোগাযোগ ছিল। হজ্জ, 'উমরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁরা মক্কায় আসতেন। নিজেদের গৃহযুদ্ধ এবং ইহুদীদের শত্রুতার কারণে তাঁরা মক্কার সমর্থন ও সাহায্য লাভের আশায় সেখানে আসতেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মক্কাবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মক্কা ও মদীনার লোকদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও মৈত্রী চুক্তিও ছিল।

বর্ণিত আছে, মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুওয়ায়িদ ইবন সামিত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে ইসলামের দা'ওয়াত লাভ করেন এবং তাঁর মুখ থেকে পবিত্র কুরআন শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন মদীনার 'আমর ইবন 'আওফ গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সেই জাহিলী যুগেই তিনি আরববাসীর নিকট থেকে 'কামিল' উপাধি লাভ করেন। মক্কায় গেলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইসলামের দাওয়াত শুনে তিনি বলেন ঃ 'আপনার নিকট যা আছে, আমারও নিকট প্রায় একই জিনিস আছে।' রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ আপনার কী আছে? তিনি বললেন ঃ 'সাহীফা-ই-লুকমান'। রাসূল (সা) কিছু শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি কিছু শোনালেন। রাসূল (সা) সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন ঃ আমার কাছে এর চেয়ে ভালো জিনিস আছে। আর তা হচ্ছে 'কুরআন'। তিনি কুরআন শুনে মুগ্ধ হলেন। ফল এই দাঁড়ালো যে, ইবন হিশামের মতে, 'তিনি ইসলাম থেকে দূরে থাকলেন না।' তিনি মদীনায় ফিরে গেলে খাযরাজীদের হাতে নিহত হন। 'আমর ইবন 'আওফ গোত্রের ধারণা, তিনি মুসলমান অবস্থায় মারা গেছেন। এটা বু'য়াস যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬)

এরপর 'আবদুল আশহাল গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে সংগে করে আবুল মাইসার আনাস ইবন রাফে 'আসেন মক্কায়। উদ্দেশ্য, কুরাইশদের সাথে মৈত্রী চুক্তি করা। এই দলে ছিলেন ইয়াস ইবন মু'য়াজ। মক্কায় তাঁদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা) তাঁদের সাথে দেখা করে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। ইয়াস ছিলেন তরুণ। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে কুরআন শুনে তিনি সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'তোমরা যে কাজের জন্য এসেছো এটা তার চেয়ে ভালো। মদীনায় ফিরে তিনি মারা যান। রাসূলুল্লাহর (সা) এই স্বল্প সুহবতে তিনি ইসলামকে এতটুকু বুঝেছিলেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে শুধু তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন এবং মানুষকে আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা শুনিয়েছিলেন। তাঁর গোত্রের লোকদের ধারণা, তিনি মুসলমান ছিলেন। (মুসনাদ-৫/৪২৭)

মদীনাবাসীদের মধ্যে প্রথম মুসলমান কে, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। এ ব্যাপারে যাঁদের নাম বিভিন্ন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন ঃ রাফে 'ইবন মালেক

যারকী, মু'য়াজ ইবন 'আফরা', আস'য়াদ ইবন যুরারাহ্, জাকওয়ান ইবন 'আদী, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) প্রমুখ। (দ্রঃ তাবাকাত-১/১৪৬; যারকানী-১/৩৬১)

প্রকৃতপক্ষে মদীনার আনসারদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসারের সূচনা 'আকাবার প্রথম বাই'য়াত থেকে। 'আকাবা বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে 'আকাবা বলতে বুঝায় 'মিনার জমরায়ে 'আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। এ স্থানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বাই'য়াত নেয়া হয়। প্রথম দফায় নেয়া হয় নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয়, মতান্তরে আটজন লোক ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত নিয়ে মদীনায় ফিরে যান। এটা 'আকাবার প্রথম বাই'য়াত। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী কারীমের (সা) চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে বারো জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এঁদের পাঁচজন ছিলেন আগের এবং সাতজন নতুন। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। এটা 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াত। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদের কুরআনের তা'লীম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে পাঠানো হোক। তিনি হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমারকে (রা) পাঠালেন। তিনি মদীনার মুসলমানদের কুরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদীনায় ইসলামের দ্রুত ও ব্যাপক প্রসার ঘটে।

অতঃপর নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর, মতান্তরে তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুই জন মহিলা হজ্জ মওসুমে আবার 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন এবং বাই'য়াত করেন। এ হলো 'আকাবার তৃতীয় বা সর্বশেষ বাই'য়াত। সাধারণতঃ বাই'য়াতে 'আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এ বাই'যাতটি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও কাজ, কাফিরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী হিজরাত করে মদীনায় গেলে তাঁর হিফাজত ও সাহায্য সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) তাঁদের মধ্য থেকে বারো জন নাকীব বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। তাঁরা সবাই ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পথ ও পরিবেশ তৈরী করেন।

এই তৃতীয় বা সর্বশেষ আকাবায় যে ৭২/৭৫ জন লোক অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ১১ জন আউস গোত্রের এবং দু'জন মহিলাসহ মোট ৬৪ জন খাযরাজ গোত্রের (সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৪৯-২৫৫)

আনসারগণ ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতায় কোনরূপ ত্রুটি করেননি। নিজেদের নজীরবিহীন কুরবানী ও সাহায্য দ্বারা ইসলামের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁদের বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। বদর যুদ্ধে দু'শো তিরিশ জন আনসার শরীক হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭০ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বাকী আনসার আউস গোত্রের। এ যুদ্ধে ব্যবহৃত সর্বমোট ৭০টি উটের মধ্যে হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা আল-খাযরাজী একাই ২০টি উট দান করেছিলেন। এ বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী চৌদ্দ জনের আটজনই ছিলেন আনসার। উহুদের যুদ্ধে বহু সংখ্যক আনসার অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সত্তর জন (৭০) শহীদের মধ্যে ছেষট্টিজনই (৬৬) ছিলেন আনসার। কারো কারো শরীরে ৭০টি আঘাত লেগেছিল। বি'রে মা'উনার শহীদদের মধ্যেও উল্লেযোগ্য সংখ্যক ছিলেন আনসার। (ইসলামী বিশ্বকোষ-১ম খন্ড, আনসার)

ইসলামের জন্য আনসারদের ত্যাগ তিতিক্ষার বিবরণ অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা তাঁদের জান-মালসহ সবকিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। মদীনা আগত মুহাজিরদের জন্য তাঁরা নিজেদের অর্থ সম্পদ ও বাড়ী-ঘর ভাগ করে দেন। তাঁরা যে সততা ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মানব ইতিহাসে তা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। এ কারণে তাদের প্রতি রাসূলের (সা) গভীর মুহাব্বত ছিল। তিনি তাদের অবদান, ত্যাগ ও কুরবানী যথার্থ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি কথা ও কাজের দ্বারা তাঁদের এ অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আনসারদের প্রতি ভালোবাসাকে তিনি ঈমানের অংশ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাসী কোন ব্যক্তিই আনসারদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করতে পারেনা। আনসারদের প্রতি বিদ্বেষকে তিনি মুনাফিকের স্বভাব-প্রকৃতি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনসার ও তাঁদের সন্তান-সন্তুতির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষণের জন্য দু'আ করেছেন। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি থেকে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের একাদিক স্থানে আনসার শব্দটি এসেছে। তার মধ্যে সূরা তাওবার ১০০ ও ১১৭ নং আয়াতের একাংশ মদীনার আনসার মুসলমানদের প্রতি সরাসরি প্রযুক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

১. 'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরাতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো মহান কৃতকার্যতা।' (আত-তাওবা-১০০)

২. 'আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সংগে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি, নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।' (আত-তাওবা-১১৭)

এছাড়া কুরআনের আরো বহু আয়াতে, কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে আনসারদের সাহসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-হাশর-এর ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

'যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করেনা এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।'

আস'য়াদ ইবন যুরারা (রা)

আবূ উমামা আস'য়াদ, যিনি আস'য়াদ আল-খায়র নামেও পরিচিত, মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। তাঁর পিতা যুরারা ইবন 'আদাস। (আল-ইসাবা-১/৩৪) উসুদুল গাবা-১/৭১) তাঁর জন্মের সন-তারিখ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র আরব উপদ্বীপ কুফর ও গুমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তবে এর মধ্যেও কিছু লোক বিশুদ্ধ স্বভাব বা ফিতরাতের দাবী অনুসারে তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রবক্তা ছিলেন। আস'য়াদ ইবন যুরারা তাঁদেরই একজন। (তাবাকাত-১/১৪৬)

ইসলাম-পূর্ব যুগেও ইয়াসরিবের (মদীনা) লোকেরা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে কুরাইশদের সমর্থন লাভ এবং তা ফায়সালার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাতায়াত করতো। তাছাড়া হজ্জ ও 'উমরা আদায়ের জন্যও তারা সেখানে যেত। অতঃপর মক্কায় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটলো। এরমধ্যে হয়রত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াতী জীবনের বেশ ক'টি বছর অতিবাহিতও করেছেন। মক্কার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দানের সাথে সাথে বিভিন্ন মেলা ও হাটে-বাজারে উপস্থিত হয়ে ব্যাপকভাবে তিনি মানুষকে সত্যের দা'ওয়াত দিচ্ছেন। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মক্কায় আগত বহিরাগত লোকদের নিকটও গোপনে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও পালন করে চলেছেন। ইবনুল আসীর ওয়াকিদীর সূত্রে বলেন ঃ এমনি এক সময়ে আস'য়াদ ইবন যুরারা ও জাকওয়ান ইবন 'আবদিল কায়স নিজেদের একটি ঝগড়া নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মক্কার কুরাইশ নেতা 'উতবা ইবন রাবী'য়ার নিকট যান। এই 'উতবার নিকট তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কিছু কথা শুনতে পান। গোপনে তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে কিছু তিলা'ওয়াত করে শোনান। এই সাক্ষাতেই তাঁরা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে 'উতবার কাছে আর না গিয়ে সোজা মদীনায় ফিরে যান। এভাবে তাঁরা দু'জনই হলেন মদীনায় আগমনকারী প্রথম মুসলমান। এটা নবুওয়াতের দশম বছরে 'আকাবার প্রথম বাই'য়াতের পূর্বের ঘটনা। (উসুদুল গাবা-১/৭১, আল-ইসাবা-১/৩৪, হায়াতুস সাহাবা-১/৮৬)

অবশ্য ইবন ইসহাকের বরাতে ইবনুল আসীর বলেছেন, আস'য়াদ ইবন যুরারা সেই লোকগুলির একজন যাঁরা নবুওয়াতের দশম বছরে অনুষ্ঠিত 'আকাবার ১ম বাইয়াতে শরিক হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি নবুওয়াতের একাদশ ও দ্বাদশ বছরে অনুষ্ঠিত ২য় ও ৩য় বাইয়াতেও উপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ 'আকাবী ব্যক্তি। (উসুদুল গাবা-১/৭১)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মদীনার প্রথম মুসলমান কে- এ বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিস্তর মতবিরোধ আছে। ইবন হিশাম বলেছেন, সুওয়াইদ ইবন সামিত হজ্জ অথবা 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইয়াসরিববাসীরা তাঁকে 'কামিল' উপাধি দান করে। বীরত্ব, সাহসিকতা, কাব্য প্রতিভা, বংশ মর্যাদা, সম্মান-

প্রতিপত্তি, মোটকথা সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে সে যুগের আরবরা 'কামিল' উপাধি দান করতো। মদীনাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) দাও'য়াত লাভ ও কুরআন শোনার সৌভাগ্য সর্বপ্রথম তাঁরই হয়। ইবন হিশাম বলেন, এ দাওয়াতের পর তিনি ইসলাম থেকে দূরে ছিলেন না। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪২৬-২৭) কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই তিনি নিহত হন। যাই হোক সুওয়াইদ সর্ব প্রথম মুসলমান হলেও মদীনায় ফিরে ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সুযোগ পাননি। সম্ভবতঃ আস'য়াদ ও জাকওয়ানই প্রথম দুই ব্যক্তি যাঁরা সর্বপ্রথম মদীনায় ইসলামের তাবলীগের কাজ শুরু করেন।

মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম তিনি আবুল হায়সামের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে নিজের নতুন বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেন। আবুল হায়সাম সাথে সাথে বলে ওঠেন, "তোমার সাথে আমিও তাঁর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনলাম।" (তাবাকাত-১/১৪৬) অনেকে এই আবুল হায়সামকে মদীনার প্রথম মুসলমান বলে মনে করেছেন।

নবুওয়াতের দশম বছরে প্রতিবছরের মত ইয়াসরিববাসীরা হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আসে। তাদের মধ্য থেকে ছয় ব্যক্তি হজ্জ শেষে গোপনে মিনার আকা'বা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এ ছয়জনের মধ্যে আস'য়াদও ছিলেন। পরের বছর হজ্জের মওসুমে ইয়াসরিববাসীরা আবার মক্কায় আসে। তাদের মধ্য থেকে বারোজন লোক গোপনে, আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হয়ে বাই'য়াত করেন। এই বারো জনের মধ্যে আসয়াদও ছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪২৯, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭) এই 'আকাবার পর মদীনায় যখন ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের সম্ভাবনা অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একজন শিক্ষক দাবী করেন, যিনি তাদেরকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দেবেন। তাঁদের দাবী অনুসারে রাসূল (সা) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে (রা) ইয়াসরিবে দা'য়ী বা আহবায়ক হিসাবে পাঠালেন। মুসয়াবের মদীনায় যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে আসয়াদ ইবন যুরারা নামাযের ইমাম ছিলেন। তার পর মুস'য়াব ইমাম হন। তবে অনেকের মতে সালেম মাওলা আবী হুজাইফার মদীনা পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আস'য়াদই সেখানে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মুস'য়াব শুধুমাত্র তাদের কুরআনের তা'লীম দিতেন। মদীনায় তাঁরা বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৯, ২৬৬) আস'য়াদ হযরত মুস'য়াবকে মদীনায় নিজ গৃহে অতিথির মর্যাদায় আশ্রয় দেন। (তাবাকাত-৩/৪৮৩)

হযরত মুস'য়াবের মদীনায় যাওয়ার পর আস'য়াদ ইবন যুরারা তাঁকে সংগে করে ব্যাপকভাবে দা'ওয়াতী তৎপরতা শুরু করেন। তাঁরা মদীনার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ একদিন আস'য়াদ ইবন যুরারা মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে সাথে করে বনী 'আবদিল আশহাল ও বনী যাফারের দিকে বের হলেন। তাঁরা বনী যাফারের একটি বাগিচায় প্রবেশ করে 'মা'রাক' নামক একটি কূপের ধারে প্রাচীরের ওপর বসলেন। তাঁদের চারপাশে লোকজন জড় হল। সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর ছিলেন বনী 'আবদিল আশহালের নেতা। তখনও তারা পৌত্তলিক ছিলেন। সা'দ ছিলেন আস'য়াদের খালাতো ভাই। আস'য়াদ ও মুস'য়াবের আগমনের কথা জানতে পেয়ে সা'দ উসাইদকে বললেন ঃ 'উসাইদ, তুমি এ দু'ব্যক্তির কাছে যাওতো। তারা আমাদের বাড়ীর উপর এসে আমাদের দুর্বল লোকগুলিকে বোকা বানিয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদেরকে নিষেধ করে এস। যদি আমার খালাতো ভাই আস'য়াদ না থাকতো তাহলে তোমার প্রয়োজন হতো না। আমিই তাদের তাড়িয়ে দিতাম' উসাইদ

বল্লম হাতে নিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল। আস'য়াদ তাকেদেখে মুস'য়াবকে বললেন, 'এ ব্যক্তি তার গোত্রের একজন নেতা, আপনার কাছে এসেছেন।' হযরত মুস'য়াব তার সাথে কথা বললেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই বৈঠকেই উসাইদ মুসলমান হয়ে গেলেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১৮৭/১৯০)

আস'য়াদ ও মুস'য়াবের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মদীনায় ইসলামের এত ব্যাপক প্রসার হল, যে, মাত্র এক বছর পর নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের মওসুমে তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জন নারী-পুরুষের একটি দল আবার মিনার 'আকাবায় গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হয়। এই তৃতীয় তথা সর্বশেষ 'আকাবায় আস'য়াদও তাঁর দ্বীনী শিক্ষক মুস'য়াবের সাথে উপস্থিত ছিলেন। এই 'আকাবায় কে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাইয়াত বা শপথ করেন সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। একটি মতে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি আস'য়াদ। (আল-ইসাবা-১/৩৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪, উসুদুল গাবা-১/৭১)

আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর থেকে বর্ণিত। বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে বারোজন 'নাকীব' নির্বাচন কর, যাঁরা হবে ঈসার হাওয়ায়ীদের (সাথী) মত আপন আপন গোত্রের কাফীল বা দায়িত্বশীল।' আস'য়াদ সায় দিয়ে বললেন ঃ 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' রাসূল (সা) বললেনঃ তুমি হবে তোমার গোত্রের 'নাকীব'। তারপর তিনি অন্য 'নাকীব'-দের নাম ঘোষণা করেন। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮২) এভাবে তিনি হলেন রাসূল (সা) মনোনীত বনী নাজ্জারের 'নাকীব'। তবে ইবন মুন্দাহ ও আবূ নু'ঈমের মতে তিনি ছিলেন বনী সায়িদার 'নাকীব'। ইবনুল আসীর বলেন, এটা তাঁদের ধারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন নিজ গোত্র বনী নাজ্জারের 'নাকীব'। তাই তিনি যখন মারা যান তখন বনী নাজ্জারের লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবেদন করে-'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আস'য়াদ মারা গেছেন, তিনি ছিলেন আমাদের নাকীব। এখন আপনি অন্য একজন নতুন 'নাকীব' নির্বাচন করে দিন। জবাবে রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা আমার মাতুল গোত্র। আমিই তোমাদের 'নাকীব'। এটা ছিল বনী নাজ্জারের জন্য বিরাট মর্যাদা। (উসুদুল গাবা-১/৭১-৭২) রাসূল (সা) তাঁকে শুধু নাকীবই মনোনীত করেননি, বরং 'নাকীব আল-নুকাবা বা প্রধান দায়িত্বশীল বলেও ঘোষণা দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪) ইবনুল আসীর বলেন, একমাত্র জাবির ইবন আবদিল্লাহ ছাড়া আস'য়াদ ছিলেন এই আকাবীদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। (উসুদুল গাবা-১/৭১, আল-ইসাবা-১/৩৪)

আকাবার তৃতীয় বাই'য়াতের পর এক বিরাট দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি মদীনায় ফিরে যান। বয়স অল্প হলে কি হবে। তাঁর ঈমানী জযবা বা আবেগ ছিল অতি তীব্র। তিনি মদীনায় জামা'য়াতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেন এবং চল্লিশজন মুসল্লী নিয়ে সর্বপ্রথম মদীনায় জুম'আর নামাযও আদায় করা শুরু করেন। আবদুর রহমান ইবন কা'ব ইবন মালিক বলেন, আমার আব্বা কা'ব শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে গেলে আমি তাঁকে নিয়ে বেড়াতাম। আমি তাঁকে নিয়ে জুম'আর নামাযের জন্য বের হলে যখনই আযান শুনতে পেতেন, তিনি আবু উমামা আস'য়াদ ইবন যুরারার জন্য ইসতিগফার ও দু'আ করতেন। একদিন আমি বললাম ঃ 'আব্বা, আপনি আযান শুনলে এভাবে সব সময় তাঁর জন্য দু'আ করেন কেন?' বললেন ঃ 'বেটা! রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগে তিনিই সর্বপ্রথম আমাদেরকে বনী বায়দা'র 'হাযমুন নাবীত' নামক পাহাড়ের কাছে 'নাকী আল-খাদিমাত' নামক স্থানে একত্র করে জুম'আর নামায আদায় করতেন। আমাদের সংখ্যা হত ৪০ জন।' (উসুদুল গাবা-১/৭১,

আল-ইসাবা-১/৩৪, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৫, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৭) মদীনায় সর্বপ্রথম কে জুম'আর নামায কায়েম করেন সে ব্যাপারে মতভেদ আছে।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় পৌঁছার পর যদিও আবু আইউব আল-আনসারীর (রা) বাড়ীতে ওঠেন, তবে তাঁর বাহন উটনীটি আস'য়াদের মেহমান হয়। (তাবাকাত-১/১৬০) রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় পৌঁছার প্রথম ক্ষণটিতে উটনীটি সর্ব প্রথম বসে পড়ে এবং পরে যে স্থানটি রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদ ও বাসস্থানের জন্য নির্বাচিত হয়, সেই ভূমির মালিক ছিল সাহল ও সুহাইল নামক দুই ইয়াতীম বালক। আর তাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আস'য়াদ ইবন যুরারা। (বুখারী, হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৩) রাসূল (সা) বালক দু'টির মুরব্বী আস'য়াদের নিকট ভূমির মূল্য জানতে চান। বালক দু'টি সাথে সাথে বলে ওঠে, 'আমরা আল্লাহর কাছেই এর মূল্য চাই।' যেহেতু বিনা মূল্যে রাসূল (সা) ভূমি গ্রহণে রাজী হলেন না তাই হযরত আবু বকর (রা) তার মূল্য পরিশোধ করেন। তবে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায়, আস'য়াদ ইবন যুরারা তাঁর বনী বায়দায় অবস্থিত একটি বাগিচা মসজিদের এই ভূমির বিনিময়ে ইয়াতীমদ্বয়কে দান করেন। (যারকানী-১/৪২২)

বালাজুরী বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমনের পর আবু আইউবের বাড়ীতে অবস্থানকালে আস'য়াদ ইবন যুরারা এক রাত পর পর পালাক্রমে তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন। আস'য়াদের বাড়ী থেকে খাবার আসার পালার রাতে তিনি জিজ্ঞেস করতেনঃ 'আস'য়াদের পিয়ালাটি কি এসেছে?' বলা হত, 'হাঁ।' তিনি বলতেনঃ 'তা হলে সেইটি নিয়ে এস।' বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, তাতে আমরা বুঝে নিতাম তাঁর খাবারটি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৭) ওয়াকিদী হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) মদীনায় আবু আইউবের বাড়ীতে ওঠার পর একদিন জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আবু আইউব, তোমার কি কোন খাট (পালঙ্ক) আছে?' উল্লেখ্য যে, মক্কায় কুরাইশরা খাটে ঘুমাতে অভ্যস্ত ছিল। আবু আইউব বললেন ঃ 'না।' একথা আসা'য়াদ ইবন যুরারার কানে গেল। তিনি একটি স্তম্ভ ও কারুকার্য করা পায়া বিশিষ্ট একটি খাট পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) তাঁর ওপর ঘুমাতেন। অতঃপর রাসূল (সা) যখন আমার ঘরে চলে আসেন এবং আমার মা আমাকে যে খাটটি দেন তাতেই তিনি ঘুমাতেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৫২৫)

হযরত তালহা ইবন 'উবায়দিল্লাহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের পর আস'য়াদের বাড়ীতে ওঠেন। হযরত হামযাও তাঁর বাড়ীতে ওঠেন বলে বর্ণিত আছে। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৭-৪৭৮)

মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ তখন চলছে। এমন সময় প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁর পরকালের ডাক এসে যায়। তিনি 'জাবহা' নামক কণ্ঠনালীর এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজ হাতে তাঁর আক্রান্ত স্থানে সেক দেন, তাঁর মাথায় হাত দেন; কিন্তু কোন উপকার দেখা গেল না। তিনি মারা যান। ওয়াকিদীর মতে হিজরতের পর ৯ম মাসে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যথিত হন। তিনি বলেন, "এখন তো ইয়াহুদীরা বলে বেড়াবে 'যদি তিনি নবী হতেন তাহলে তাঁর সাথী মরতো না, অথচ আমি কি মৃত্যুর চিকিৎসা করতে পারি?" হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৭, উসুদুল গাবা-১/৭১, আল-ইসাবা-১/৩৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩)

বলা হয়ে থাকে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর এটাই প্রথম মৃত্যু। আর এটাও ধারণা করা হয় যে, এবারই সর্বপ্রথম রাসূল (সা) জানাযার নামায আদায় করেন। আনসারদের ধারণা মতে বাকী'তে দাফনকৃত প্রথম মুসলমান আস'য়াদ আর মুহাজিরদের মতে 'উসমান ইবন মাজ'উন। (আল-ইসাবা-১/৩৪)

মৃত্যুকালে হযরত আস'য়াদ দু'টি কন্যা সন্তান রাসূলুল্লাহর (সা) জিম্মায় ছেড়ে যান। রাসূল (সা) আজীবন তাদের দেখাশুনা করেন। মোতির দানা মিশ্রিত সোনার বালা তিনি তাদের হাতে পরান। এক মেয়েকে তিনি সাহল ইবন হুনাইফের সাথে বিয়ে দেন এবং সেখানে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে আবু উমামা বিন সাহল। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, আল-ইসাবা-১/৩৪)

আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান (রা)

আবুল হায়সাম উপনামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম এবং কোন্ গোত্রের সন্তান সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। একটি মতে 'আবদুল্লাহ' তাঁর আসল নাম। তবে অন্য একটি মতে 'মালিক' তাঁর নাম। আর এ মতের ওপরই মূসা ইবন 'উকবা, ইবন সা'দ, মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, আবূ মা'শার ও মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তেমনিভাবে তাঁর গোত্র ও পিতার নামের ব্যাপারেও মতভেদ আছে। এক মতে পিতা বালী ইবন আমর ইবন আল-হাফ ইবন কুদা'য়া। এই হিসাবে তাঁকে আল-বালাবী বলা হয়। এটাই ইবন সা'দের মত। এ মতের বিরোধিতা করেছেন ইবন ইসহাক ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আম্মারা আল-আনসারী। ইবন ইসহাক বলেছেন, আবুল হায়সাম, যিনি বদরে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁর নাম মালিক এবং তাঁর ভাইয়ের নাম আতীক। তাঁরা উভয়ে তায়্যিহানের ছেলে। আর আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-আনসারী বলেন, আবুল হায়সাম আউস গোত্রের সন্তান। তাঁর মা লায়লা বিনতু আতীক। এটাই অধিকাংশের মত। (তাবাকাত-৩৪৪৭, আল-ইসাবা ৪/২১২, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৩) তাঁর জন্মের সঠিক সময় জানা যায় না।

আবুল হায়সাম তাঁর বন্ধু আস'য়াদ ইবন যুরারার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। একটি বর্ণনা মতে আস'য়াদ ইবন যুরারা ও জাকওয়ান ইবন 'আবদি কায়েস মক্কায় 'উতবা ইবন রাবী'য়ার নিকট যান। সেখানে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ওয়াতের কথা শুনতে পেয়ে গোপনে তাঁর সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। আস'য়াদ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে আবুল হায়সামের সাথে দেখা করেন এবং নিজে ইসলাম গ্রহণের কাহিনী, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দা'ওয়াতের কথা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন। ইবন সা'দ বলেন, ইয়াসরিবে পূর্ব থেকে- সেই জাহিলী যুগে আস'য়াদ ও আবুল হায়সাম ছিলেন তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রবক্তা। আবুল হায়সাম বন্ধু যুরারার মুখে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর দা'ওয়াতের কথা শুনে কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ না করে সাথে সাথে বলে ওঠেন ঃ 'আনা আশহাদু মা'য়াকা আন্নাহু রাসূলুল্লাহ- আমিও তোমার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল।' এভাবে তিনি তাঁর বন্ধু যুরারার হাতে মুসলমান হন।

পরের হজ্জ মওসুমে যেবার আটজন মতান্তরে ছয়জন ইয়াসরিববাসী মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গোপনে দেখা করে বাই'য়াত বা শপথ করেন তাঁদের মধ্যে আবুল হায়সামও ছিলেন। ইতিহাসে এ বাই'য়াতকে আকাবার প্রথম বাই'য়াতও বলা হয়। তবে একটি বর্ণনা মতে, উক্ত বাই'য়াত বা শপথে আবুল হায়সাম ছিলেন না। (তাবাকাত-১/২১৮-২১৯) উক্ত মতে, আস'য়াদ প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ফিরে এসে আবুল হায়সামকে ইসলামের দাও'য়াত দেন। এ দাওয়াতেই আবুল হায়সাম ইসলাম গ্রহণ করেন। এর এক বছর পর বারো জনের সাথে এবং তারও পরের বছর তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জনের সাথে তিনি 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবার মিলিত হন। এভাবে তিনি

'আকাবার সব ক'টি বাই'য়াতে শরিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। (তাবাকাত-১/২২, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৩)

একটি বর্ণনা মতে, শেষ 'আকাবায় আবুল হায়সাম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের জন্য সর্ব প্রথম নিজের হাতটি বাড়িয়ে দেন। মুসা ইবন 'উকবা ইমাম যুহরী থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৭, আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪)

তৃতীয় আকাবার শপথের সময় মদীনাবাসীরা যখন রাসূলুল্লাহকে (সা) মদীনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো তখন মক্কা ও মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে যে কয়েকজন লোক ভাষণ দেন, আবুল হায়সাম তদের অন্যতম। তাবারানী 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল হায়সাম ইবন তায়্যিহান রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করার সময় বললেন ঃ ইয়া রাসূলল্লাহ! আমাদের সাথে অন্য লোকদের চুক্তি আছে। এমনও কি হতে পারে, আমরা সেই চুক্তি বাতিল করলাম, তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, আর এ দিকে আপনি স্বগোত্রে ফিরে এলেন? তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) একটু হাসি দিয়ে বললেন ঃ তোমাদের রক্তের দাবীর অর্থ হবে আমারই রক্তের দাবী, তোমাদের রক্তপাত মানে আমারই রক্তপাত। অর্থাৎ আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আবুল হায়সাম সাথীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমার স্বগোত্রীয় লোকেরা! এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী। আজ তিনি মক্কার হারামে আত্মীয়দের মধ্যে নিরাপদেই আছেন। জেনে রাখ, যদি তোমরা এখান থেকে বের করে তাঁকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও তাহলে সমগ্র আরববাসী একই ধনুক থেকে তোমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ সকলের সাধারণ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি বিলিয়ে দিতে রাজী থাক তাহলেই তাঁকে তোমাদের ভূমিতে আমন্ত্রণ জানাও। কারণ, তিনি সত্যি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। তোমরা যদি পরে অনুশোচনার ভয় কর তাহলে ভেবে দেখ।" আবুল হায়সামের এ বক্তব্যের পর তাঁর সাথীরা বললো ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু আমাদের দিয়েছেন, আমরা তা কবুল করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের নিকট যা কিছু দাবী করেছেন আমরা তা আপনাকে দান করলাম। আবুল হায়সাম, আপনি একটু সরে দাঁড়ান, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করি।' আবুল হায়সাম বললেন ঃ আমিই প্রথম বাই'য়াত করি। তাঁর বাই'য়াতের পর অন্যরা একের পর এক বাই'য়াত করে। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৪৭, ২৪৮, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪২) এ বাই'য়াতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) বারোজন নাকীব বা দায়িত্বশীলের নাম ঘোষণা করেন। আউস গোত্র থেকে আবুল হায়সাম, উসাইদ ইবন হুদাইর ও সা'দ ইবন খায়সামা- এই তিনজন নাকীব মনোনীত হন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় হিজরাত করে প্রখ্যাত মুহাজির হযরত উসমান ইবন মাজ'উনের সাথে আবুল হায়সামের মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৭১, আল-ইসাবা-৪/২১২)

বদর, উহুদ, খন্দকসহ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। উহুদে তাঁর ভাই আতীক ইবন তায়্যিহান ইকরিমা উবন আবী জাহলের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। (আনসাব-১/৩২৯) ইবন সা'দ বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা মূতায়

শহীদ হওয়ার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবুল হায়সামকে খেজুরের পরিমাপকারী হিসাবে খাইবারে পাঠান। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকরও তাঁকে এ পদে বহাল রাখার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। (তাবাকাত-৩/৪৪৮)

খলীফা হযরত 'উমারের খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। একটি বর্ণনা মতে হিজরী ৩৭ সনে সিফ্ফীন যুদ্ধের পূর্বে তাঁর মৃত্যুর কথা জানা যায়। ইমাম আসমা'ঈ একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবুল হায়সামের গোত্রের লোকদের নিকট তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন। হিজরী ২১ সনেও তাঁর মৃত্যুর কথা যেমন অনেকে বলেছেন তেমনি কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, তিনি সিফ্ফীনে হযরত আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। অনেকে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, তিনি সিফ্ফীনে 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। (আনসাব-১/২৪০, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৩) ঐতিহাসিক ওয়াকিদী স্পষ্ট করে বলেছেন, সিফ্ফীনে তাঁর যোগদানের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর বিপরীতে হিজরী ২০ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা ইমাম যুহরী, সালেহ ইবন কায়সান এবং হাকেমের মত উঁচু স্তরের মুহাদ্দিসীন থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর বিপরীতে একটি সন্দেহযুক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (সীয়ারে আনসার-২)

হাদীসের গ্রন্থসমূহে আবুল হায়সাম থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস দেখা যায় তবে সেগুলির বিশুদ্ধতা সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। ইবন হাজার 'আসকালানী বলেছেন ঃ আবুল হায়সাম থেকে বর্ণিত যত হাদীস দেখা যায় তার সবই সন্দেহযুক্ত। এমন কোন একটি বর্ণনা শৃঙ্খল পাওয়া যায় না যার দ্বারা সেগুলির কোন একটির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এর কারণ হল, বহু আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। (আল-ইসাবা-৪/২১৩)

আল-হায়সাম ইবন নাসর আল-আসলামী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছি। আবুল হায়সাম ইবন তায়্যিহানের 'জাসিম' নামক একটি কূয়ো ছিল। এই কূয়োর পানি ছিল সুমিষ্ট। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এই কূয়ো থেকে পানি আনতাম। একবার গরমের দিনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু বকরকে (রা) সংগে করে আবুল হায়সামের বাড়ীতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ ঠান্ডা পানি আছে কি? আবুল হায়সাম এক বালতি বরফের মত ঠান্ডা পানি নিয়ে আসেন। ছাগলের দুধের সাথে সেই ঠান্ডা পানি মিশিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) পান করান। তারপর আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলল্লাহ! আমাদের একটি ঠান্ডা ছাউনী ('আরীশ) আছে। এই দুপুরে আপনি সেখানে একটু বিশ্রাম নিন। আবুল হায়সাম ছাউনীর ওপর পানি ছিটিয়ে দেন। রাসূল (সা) আবু বকরকে সংগে করে সেখানে প্রবেশ করেন। আবুল হায়সাম বিভিন্ন ধরনের খেজুর এবং ডিশ ভর্তি 'সারীদ' (এক প্রকার উপাদেয় পানীয়) তাঁদের সামনে হাজির করেন। বর্ণনাকারী হায়সাম ইবন নাসর বলেন, রাসূল (সা), আবু বকর এবং আমরা সবাই তা আহার ও পান করলাম। তারপর নামাযের সময় হলে তিনি আবুল হায়সামের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে জামা'য়াতে নামায আদায় করেন। জামা'য়াতে আবুল হায়সামের স্ত্রী ছিলেন আমার পেছনে। নামায শেষে তিনি আবার ছাউনীতে ফিরে যান এবং সেখানে জুহরের ফরজের পরের দু'রাকা'য়াত নামায আদায় করেন। (আনসাবুল আশরাফ- ১/৫৩৫)

একদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) অভ্যাসের বিপরীত,যখন তিনি ঘর থেকে বের হন

না এমন এক সময়ে বের হলেন। কিছুক্ষণ পর আবু বকরও আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, এমন অসময়ে বের হলে যে? বললেন, আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে 'উমারও উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকেও ঠিক একই প্রশ্ন করলেন। 'উমার জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ক্ষুধাই আমাকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমিও ক্ষুধার্ত। তিনজন একসাথে আবুল হায়সামের বাড়ীতে গেলেন। তাঁর ছিল খেজুরের বাগান এবং বকরীর পাল। কিন্তু কোন চাকর-বাকর ছিল না। সব কাজ নিজে করতেন। আর তখন তিনি বাড়ীতেও ছিলেন না। আওয়ায দিলে তাঁর স্ত্রী বললেন, পানি আনতে গেছেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি মশক ভর্তি পানি নিয়ে ফিরছেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখে মশক মাটিতে রেখে দেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলতে থাকেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! তারপর সবাইকে বাগানে নিয়ে যান। সেখানে বসার জন্য কোন জিনিস বিছিয়ে দেন। সবাইকে বসিয়ে রেখে খেজুরের একটি কাঁধি কেটে নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ যদি পাকা খেজুর নিয়ে আসতে। বললেন ঃ এতে কাঁচা-পাকা সব রকমের আছে, আপনার খুশীমত গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) সেই খেজুর থেকে কিছু খেলেন। তারপর পানি পান করলেন। সেই পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ ও সুস্বাদু। রাসূল (সা) পানাহারের পর বললেন, দেখ, আল্লাহর কত নি'য়ামত। ছায়া, উৎকৃষ্ট খেজুর, ঠান্ডা পানি- আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিন এর সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আবুল হায়সাম সম্মানিত মেহমানদের বাগানে বসিয়ে রেখে বাড়ীতে আসেন এবং খাবারের আয়োজন করেন। তিনি ছোট একটি ছাগল জবেহ করেন এবং তা ভুনা করে মেহমানদের সামনে পেশ করেন। আহার পর্ব শেষ করে রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি কোন চাকর নেই। বললেন ঃ না। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার হাতে কোন যুদ্ধবন্দী এলে তুমি আমার কাছে এস। সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে দু'জন যুদ্ধবন্দী আসে। তিনি আবুল হায়সামকে তাদের যে কোন একজনকে গ্রহণ করতে বলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেন। রাসূল (সা) তাদের একজনকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলেন ঃ এর সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তিনি দাসটিসহ বাড়ীতে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশের কথা স্ত্রীর নিকটবলেন।

স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-পালন করতে চাও, তাহলে তাকে আযাদ করে দাও। তিনি স্ত্রীর পরামর্শ মত দাসটি আযাদ করে দেন। তাঁদের এ কাজের কথা রাসূল(সা) জানতে পেরে খুব খুশী হলেন এবং তাদের দু'জনেরই প্রশংসা করেন। (তিরমিজী-৩৯১) তাছাড়া কানসুল 'উম্মাল গ্রন্থেও ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও ইমাম মালিক ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ আল-মুনজিরী বলেন, এই ঘটনাটি আবুল হায়সাম ও আবু আইউব আল-আনসারী উভয়ের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩১০)

আবুল হায়সামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা 'আকাবায় কিসের ওপর বাই'য়াত করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, বনী ইসরাঈলরা মূসার (আ) হাতে যে বিষয়ের বাই'য়াত করেছিল আমরাও রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ঠিক সেই বাই'য়াত করেছিলাম। (আনসাবুল আশরাফ ১/২৪০)

উসাইদ ইবন হুদাইর (রা)

প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী উসাইদ মদীনার ঐতিহ্যবাহী আউস গোত্রের বনী 'আবদুল আশহাল শাখার সন্তান। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৪০) সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর একাধিক কুনিয়াত বা ডাকনাম দেখতে পাওয়া যায়। যেমনঃ পুত্র ইয়াহইয়ার নাম অনুসারে আবু ইয়াহইয়া, আবু ঈসা– এ নামে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ডেকেছেন বলে বর্ণিত আছে। (উসুদুল গাবা–১/৯২) তাছাড়া আবু 'আতীক, আবু হুদাইর, আবু 'আমর ইত্যাদি নামের কথাও জানা যায়। (দ্রঃ সীয়ারে আনসার–১/২২৮), উসুদুল গাবা–১/৯২, আনসাবুল আশরাফ–১/২৪০, আল–আলাম–১/৩৩০)

তাঁর পিতার নাম হুদাইর ইবন সিমাক এবং মাতার নাম উম্মু উসাইদ বিনতু উসকুন। হুদাইর ছিলেন আউস গোত্রের একজন রয়িস বা নেতা। ইসলামপূর্ব যুগে মদীনার চির বৈরী আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যতগুলি যুদ্ধ হয়েছে তার সবগুলির নেতৃত্ব দেন হুদাইর। তিনি ছিলেন আউস গোত্রের প্রধান ঘোড় সাওয়ার। তাঁর নিজস্ব একটি মজবুত দুর্গও ছিল। (উসুদুল গাবা–১/৯২) আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধটি ছিল 'বু'য়াসের' যুদ্ধ। এ যুদ্ধেরও সিপাহসালার ছিলেন হুদাইর, আর প্রতিপক্ষ খাযরাজ গোত্রের সেনাপতি ছিলেন 'আমর ইবন নু'মান রুজাইলা। উভয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সৈন্য পরিচালনা করেন। এক পর্যায়ে আউস গোত্র পরাজয়ের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় হুদাইর নিজেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। খাযরাজ সেনাপতি 'আমর নিহত হন এবং আউস গোত্র বিজয়ী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (সীয়ারেআনসার–১/২২৮)

উপরোক্ত 'বুয়াস' যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন বছর পর মক্কায় 'আকাবার বাই'য়াত অনুষ্ঠিত হয় এবং মদীনাবাসী নওমুসলিমদের অনুরোধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুসয়াব ইবন 'উমাইরকে তাবলীগে ইসলামের উদ্দেশ্যে মদীনায় পাঠান। উসাইদ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মদীনায় হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের হাতে এবং হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালের পূর্বে। কারো কারো মতে তিনি শেষ আকাবার পরে অর্থাৎ যে বার ৭৩/৭৫ জন মদীনাবাসী মক্কার আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন, তারও পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে একথা সঠিক নয়। কারণ, তিনি যে এই শেষ আকাবায় শরীক হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বনী আবদুল আশহালের 'নাকীব' বা দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন তা সীরাত গ্রন্থসমূহে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা–১/৯২, তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম–১/১৮১, আল–আ'লাম–১/৩১০ আল–ইসাবা–১/৪৯)

হযরত উসাইদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থসমূহে চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর মদীনায় হযরত আস'য়াদ ইবন যুরারার গৃহে অতিথি হন এবং বনী জাফার গোত্রে বসে মানুষকে কুরআনের তা'লীম দিতে থাকেন। বনী জাফারের

বসতি ছিল 'আবদুল আশহাল গোত্রের কাছাকাছি। একদিন মুস'য়াব (রা) একটি বাগানে বসে মুসলমানদের কুরআনের তা'লীম দিচ্ছেন, একথা সা'দ ইবনে মু'য়াজ এবং উসাইদ ইবন হুদাইর জেনে ফেলেন। সা'দ উসাইদকে বললেন, তুমি সেখানে যাও এবং তাকে বল, সে যেন ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের এ মহল্লার চৌহদ্দিতে না আসে। যদি আস'য়াদ ইবন যুরারা এর মধ্যে না থাকত, আমি নিজেই যেতাম। উল্লেখ্য যে, আস'য়াদ ছিলেন সা'দের খালাতো বা মামাতো ভাই। সা'দের কথামত উসাইদ নিজ হাতে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য বাগিচার দিকে চললেন। আস'য়াদ তাঁকে আসতে দেখে মুস'য়াবকে বললেন, 'দেখুন একটি লোক আপনার কাছে আসছে। সে তার গোত্রের সরদার, আপনি তাঁকে মুসলমান বানিয়েদিন।'

উসাইদ অত্যন্ত গরম মেজাজে বললেন, 'এভাবে তোমরা আমাদের দুর্বল লোকগুলিকে বোকা বানিয়ে যাচ্ছ কেন? যদি ভালো চাও, এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।' রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দা'ঈ (আহবানকারী) মুস'য়াব হাসিমুখে অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বললেন, 'আপনি বসুন, আমার কথা একটু শুনুন। পছন্দ হলে কবুল করবেন, আর না হলে আমি বন্ধ করে চলে যাব।' উসাইদ বললেন, এ তো বড় বুদ্ধিমত্তা ও ইনসাফের কথা।'

হযরত মুস'য়াবের এমন বিনীত আচরণে উসাইদের রাগ পড়ে গেল। তিনি বসে পড়লেন। মুস'য়াব তাঁর সামনে ইসলামের মর্মকথা তুলে ধরে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। মুস'য়াব কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন, আর এ দিকে উসাইদের চেহারাও একটু একটু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'এই দ্বীনে দাখিল হওয়া যায় কিভাবে? মুস'য়াব বললেন, প্রথমে গোসল ও পাক-সাফ কাপড় পরে কালিমা উচ্চারণ করতে হবে। তারপর সালাত আদায় করতে হবে।' মুস'য়াবের কথা শেষ না হতে উসাইদ স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পর আবার যখন ফিরে আসলেন তখন তাঁর মাথার চুল ভিজা এবং পরনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়। তারপর মুস'য়াবের হাতে হাত রেখে উচ্চারণ করলেন, 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু- আমি সাক্ষ দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তারপর তিনি মজলিস থেকে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'আমি যাচ্ছি এবং অন্য নেতাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাদেরকেও মুসলমান বানিয়ে ছাড়বেন।' (হায়াতুস সাহাবা-১/১৮৮-১৮৯, সীয়ারেআনসার-১/২২৯)

উসাইদ উঠে সোজা সা'দ ইবন মুয়াজের দিকে চলে গেলেন। তাঁকে যেতে দেখে সা'দের কাছে বসা লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, সে আসছে, কিন্তু যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো তাতে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যাওয়ার সময় ছিল দারুণ উত্তেজিত আর এখন দেখা যাচ্ছে শান্ত-শিষ্ট ও হাসিখুশি।

এ ক্ষেত্রে উসাইদ তাঁর বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, মুস'য়াবের মুখ থেকে তিনি যা শুনেছেন, সা'দও তা শুনুক। কিন্তু তিনি যদি সরাসরি ঘোষণা দেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমিও আমার অনুসরণ কর, তাহলে সে হয়তো উসাইদের

ওপর ঝাপিয়ে পড়তো। তিনি তা না করে সা'দকেও মুস'য়াবের সামনে হাজির করতে চাইলেন।

মুস'য়াব ছিলেন আস'য়াদ ইবন যুরারার অতিথি। তাই সা'দকে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে উসাইদ বললেন, 'আমি শুনেছি, বনী হারেসার লোকেরা আস'য়াদ ইবন যুরারাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারা তো একথা ভালো করেই জানে সে তোমার মামাতো ভাই।'

সা'দ রাগে ফুঁসে উঠলেন। সাথে সাথে তিনি তীর হাতে নিয়ে মুস'য়াব ও আস'য়াদের কাছে পৌছলেন। সেখানে কোন শোরগোল বা ঝগড়া–বিবাদের চিহ্ন দেখতে পেলেন না; বরং তার বিপরীত এক শান্ত পরিবেশে মুস'য়াব মানুষকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছেন আর লোকেরা মনোযোগ সহকারে তা শুনছে। সা'দ তার বন্ধু উসাইদের ধোঁকা বুঝতে পারলেন। তিনিও মুসয়াবের কথা মন দিয়ে শুনলেন এবং সেখানেই ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৩৬–৪৩৭, রিজালুন হাওলার রাসূল–৪৬০–৪৬১)

হযরত উসাইদের ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় হিজরাত করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাজির সাহাবী হযরত যায়িদ ইবন হারিসার (রা) সাথে উসাইদের 'মুওয়াখাত' বা দ্বীনি ভ্রাতৃ–সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। (উসুদুল গাবা–১/৯২· আল ইসাবা–১/৪৯)

উহুদ থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। (আল–আ'লাম–১/৩৩০) বদর যুদ্ধে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ওয়াকিদী, ইবন ইসহাক ও ইবনুল কালবীর মতে তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেননি। তবে কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত পোষণ করেছেন। (উসুদুল গাবা–১/৯২, আনসাবুল আশরাফ–১/২৪০,তাবাকাত–৩/৬০৫) ইবন সা'দ বলেন, উসাইদের মত আরও কয়েকজন নাকীব সাহাবীসহ কিছু বিশিষ্ট সাহাবী বদর যুদ্ধে যোগদান করেননি। বালাজুরী বলেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) বদরের দিকে যাত্রা করলেন; কিন্তু তাঁর কিছু সাহাবী পিছনে থেকে গেলেন। তাঁরা ধারণা করতে পারেননি যে, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হবে। এই পিছনে থেকে যাওয়া সাহাবীদের একজন হলেন উসাইদ। রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধ শেষ করে যখন মদীনায় ফিরলেন, উসাইদ দ্রুত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ বিজয় দান করায় তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। নিজে যোগদান করতে না পারার জন্য দুঃখ ও অনুশোচনা প্রকাশ করলেন। কৈফিয়াত হিসাবে বললেন ঃ আমি ধারণা করেছিলাম, ওটা কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলা। তাঁদের সাথে আপনি যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। আমি যদি বুঝতাম, তারা শত্রু এবং তাদের সাথে আপনার সংঘর্ষ হবে তাহলে কক্ষণো পিছনে পড়ে থাকতাম না। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর কথা বিশ্বাস করেন। ইবন সা'দ ও একই কথা বর্ণনা করেছেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৮৮, তাবাকাত–৩/৬০৫)

তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় সা'দ ইবন মু'য়াজ', উসাইদ ইবন হুদাইর ও সা'দ ইবন উবাদার নেতৃত্বে একদল লোক রাসূলুল্লাহর (সা) পাহারায় নিয়োজিত থাকেন। তাঁরা সারারাত রাসূলুল্লাহর (সা) দরজায় পাহারা দিতেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩১৪)। যুদ্ধের চরম মুহূর্তে এক পর্যায়ে যখন প্রায় সকল সাহাবী বিক্ষিপ্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়েন, তখনও তিনি মুষ্টিমেয় কিছু সাহাবীর সাথে অটল

থাকেন। এই যুদ্ধে তাঁর দেহের সাতটি স্থান দারুণভাবে আহত হয়। (আল ইসাবা-১/৪৯), আল-আ'লাম-১/৩৩০) উহুদ যুদ্ধে শহীদদের জন্য তাঁদের আত্মীয়-পরিজন কান্নাকাটি করতে থাকে। তা দেখে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন, আজ হামযার জন্য কাঁদার কেউ নেই। সা'দ ও উসাইদ একথা শুনে নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাঁদের নারীদের হামযার স্মরণে বিলাপের নির্দেশ দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৯) উহুদের দিনে বনী আউসের পতাকা ছিল উসাইদের হাতে। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈনিকদের কেউ কেউ ভুলবশতঃ নিজেদের সৈনিকদের কাফির সৈনিক মনে করে আঘাত করে বসেন। উসাইদ ভুলক্রমে আবু বারদাহ ইবন নায়ারের হাতে আহত হন। তেমনিভাবে আবু যা'না না চিনতে পেরে আবু বারদাহকে তরবারির দুটি আঘাত করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের সম্পর্কে বলেন, সে তোমাদের কেউ এভাবে নিহত হলেও শহীদ হবে। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮, ৩২২)

তিনি খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও দশ দিন পর্যন্ত মুসলমানরা মদীনায় ঘেরাও অবস্থায় ছিল। মক্কার পৌত্তলিক বাহিনী মুসলিম নেতৃবৃন্দের খোঁজে রাতে ঘুরা-ফিরা করতো। উসাইদ তখন দুই শো লোক নিয়ে খন্দক রক্ষা করেন। খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাতফান গোত্রের লোকেরা খুব লুটতরাজ শুরু করে দিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের নেতা আমের ইবন তুফাইল ও যায়িদকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তারা মদীনায় উপস্থিত হয়ে সম্মিলিতভাবে বলল, যদি মদীনায় উৎপাদিত ফলের একটি অংশ তাঁদের দেওয়া হয় তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উসাইদ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাতের নিযা দিয়ে দুইজনের মাথায় টোকা দিয়ে বলে উঠলেন ঃ খেঁকশিয়াল, দূর হ এখান থেকে। একথায় আমের দারুণ ক্ষুব্ধ হয়। সে জিজ্ঞেস করে- তুমি কে?

-উসাইদ ইবন হুদাইর।

-কাতাইবের পুত্র? (উল্লেখ্য যে, কাতাইব উসাইদের পিতা হুদাইরের উপাধি)

-হ্যাঁ

-তোমার পিতা তোমার চেয়ে ভালো।

সংগে সংগে উসাইদ গর্জে উঠে বললেন, 'কক্ষণও না। আমি তোমাদের সকলের চেয়ে এবং আমার পিতার চেয়ে ঢের ভালো। কারণ তিনি কাফির ছিলেন।' (সীয়ারে আনসার-১/২৩০)

সম্ভবতঃ উপরোক্ত ঘটনাটিই ইবন আব্বাস থেকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আমির ইবন তুফাইল ও আরবাদ ইবন কায়েস নামক দুই ব্যক্তি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলো। আমির রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করে বলল, 'মুহাম্মাদ, আমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমাকে কী দেবেন?' রাসূল (সা) বললেন ঃ সকল মুসলমানের জন্য যা হবে তোমার জন্যও তাই হবে। তাদের মত তোমার ওপরও একই দায়িত্ব বর্তাবে। আমির বলল, 'আমি মুসলমান হলে আপনার পরে কি আমাকে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন? রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি বা তোমার গোত্রের কেউ তা পাবে না। তবে তুমি অশ্বারোহী বাহিনীর একজন নেতা হতে পারবে।' এভাবে তাদের সাথে আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর তারা উঠে গেলো। তারপর তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার ষড়যন্ত্র আটলো। রাসূলুল্লাহর (সা)

নিকট তাদের সে পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। তারা পালিয়ে গেল। মু'য়াজ ও উসাইদ তাদের ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে উসাইদ তাদের লক্ষ্য করে বলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমনরা তোদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' পথিমধ্যে দুইজনেরই অপঘাতে মৃত্যু হয়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৪৮–৪৯)

হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠায়। সে ছোট্ট একটি খঞ্জর কোমরে লুকিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা জিজ্ঞেস করতে করতে বনী আবদিল আশহালের মসজিদে উপস্থিত হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তার চেহারা দেখেই বলে ওঠেন, 'এ ব্যক্তি ধোঁকা দিতে এসেছে।' সে হত্যার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে এগুতেই উসাইদ তার লুঙ্গি ধরে টান দেন। সাথে সাথে তার কোমর থেকে খঞ্জরটি ছিটকে পড়ে। সে বুঝতে পারে এখন আর রেহাই নেই। সে যাতে পালানোর চেষ্টা করতে না পারে, সেই জন্য উসাইদ তার গলার কাছে জামা খুব শক্ত করে ধরে রাখেন। (সীয়ারে আনসার–১/২৩০)

হিজরী ষষ্ঠ সনে বনী মুসতালিকের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ শেষে সেখানে একটি কূপে উট–ঘোড়ার পানি পান করানোর তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন মুহাজির ও আনসারের মধ্যে সামান্য ঝগড়া হয়। এই সামান্য ঝগড়া মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই আরও উসকে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে। সে আনসারদের লক্ষ্য করে বলে ফেলে ঃ 'তোমরা তাদেরকে নিজ দেশে থাকার অনুমতি দিয়েছ, তোমাদের ধন–সম্পদ তাদের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা করে দিয়েছ। আল্লাহর কসম, তোমরা যদি তা না করতে তাহলে তারা অন্য কোথাও চলে যেত। যদি মদীনায় ফিরতে পারি তাহলে আমরা অভিজাতরা (মদীনাবাসীরা) এই নীচদের তাড়িয়ে ছাড়বো।' তার এসব কথা হযরত যায়িদ ইবন আরকাম শুনে ফেলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। হযরত রাসূলে কারীম খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন।

এই ঘটনার পর হযরত উসাইদ আসলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করতে। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ

–তোমাদের বন্ধু যা বলেছে, তা কি তুমি শুনেছ?

–ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন্ বন্ধু?

–আবদুল্লাহ ইবন উবাই।

–কী বলেছে?

–সে বলেছে, মদীনায় ফিরতে পারলে তারা অভিজাতরা নীচদেরকে বের করে দেবে।

উসাইদ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আল্লাহর কসম, ইনশাআল্লাহ আপনিই তাকে তাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহর কসম সে–ই নীচ, আর আপনি অতি সম্মানিত ও বিজয়ী। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/১২৯২)

উসাইদ আরও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ আপনি তার প্রতি একটু সদয় হোন। আল্লাহ তা'য়ালা আপনার সাথে আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন। আর তার স্বগোত্রীয় লোকেরা তার জন্য মুকুট তৈরী করছিল, তাকে মদীনার বাদশাহ বানিয়ে তার মাথায় পরাবে বলে। সে স্বচক্ষে দেখতে পারবে তার সে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল–৪৬৩)

একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাইর উপরোক্ত মন্তব্যের কথা অবগত হয়ে উসাইদ বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে লোকটি মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাকে

হত্যার অনুমতি আমাকে দিন। রাসূল (সা) বললেন, আমি নির্দেশ দিলে তুমি তাকে হত্যা করবে? উসাইদ বললেনঃ হ্যাঁ, আপনার অনুমতি পেলে তরবারি দিয়ে তার গর্দানটি উড়িয়ে দেব। রাসূল (সা) তাকে বসিয়ে শান্ত করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৭৪)

এই বনী মুসতালিক যুদ্ধের সফরে হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গিনী ছিলেন। সফর থেকে মদীনায় ফেরার পথে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা হযরত 'আয়িশার (রা) চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে। সীরাত গ্রন্থ সমূহে যা 'ইফ্‌ক' বা বানোয়াট কাহিনী বলে পরিচিত। কিছু সরলপ্রাণ মুসলমানও মুনাফিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। পরিশেষে আল্লাহ পাক কুরআনের আয়াত নাযিল করে আসল রহস্য ফাঁস করে দেন। বিষয়টি যখন তুঙ্গে তখন একদিন উসাইদ রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ আউস গোত্রের লোকেরা আপনাকে কষ্ট দিলে আমরা তা বন্ধ করে দেব। আর আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোকেরা যদি কষ্ট দেয়, আমাদের নির্দেশ দিন। আল্লাহর কসম, তারা হত্যার উপযুক্ত।' 'খাযরাজ নেতা সা'দ ইবন 'উবাদা সংগে সংগে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন, 'খাযরাজ গোত্রের লোক বলে তুমি এমন কথা বলতে পারছো, তোমার নিজের গোত্রের লোক হলে এমন কথা বলতে পারতে না।' 'উসাইদও সংগে সংগে গর্জে উঠে বলেন, 'আল্লাহর কসম, তুমি মিথ্যা বলেছ।' তুমি এক মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করছো।' (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৩০০)

খাইবার যুদ্ধে সালামা ইবন আকও'য়ার চাচা 'আমির এক ইয়াহুদীর ওপর আক্রমণ চালান; কিন্তু তাঁর তরবারির আঘাত ফসকে গিয়ে নিজেই আহত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উসাইদসহ অনেকে ধারণা করলেন, যেহেতু তিনি নিজের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছেন, যা এক ধরনের আত্মহত্যা– এ কারণে তাঁর সকল নেক 'আমল ব্যর্থ হয়ে গেছে। সালামা বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে দিলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ যারা এমন কথা বলেছে তাদের কথা ঠিক নয়। সে দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবে। (মুসলিম–২/৯৬)

মক্কা বিজয় অভিযানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুহাজির ও আনসারদের সাথে ছিলেন। তাঁর দলটি ছিল সকলের পিছনে। তিনি ছিলেন আবু বকর (রা) ও উসাইদের মাঝখানে। হুনাইন ও তাবুক অভিযানের সময় আউস গোত্রের ঝান্ডাটি ছিল উসাইদের হাতে।

সাকীফা-ই-বনী সা'য়িদার দিনটি– যেদিন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর আনসারদের একটি দল, যার পুরোভাগে ছিলেন হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা– দাবী করলেন, খিলাফতের অগ্রাধিকার আনসারদের। একথা মদীনায় ছড়িয়ে পড়লো। তর্ক–বিতর্ক শুরু হল। উসাইদ ছিলেন আনসার গোত্র আউসের অন্যতম নেতা। সেই জটিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (উসুদুল গাবা–১/৯২) তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেন, "তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মুহাজিরদের একজন। তাঁর খলীফাও মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) আনসার বা সাহায্যকারী।" সা'দ ইবন মু'য়াজকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন ঃ "আজও আমাদের উচিত রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফার আনসার হিসাবে থাকা।" (রিজালুন হাওলার রাসূল–৪৬২)। এক পর্যায়ে তিনি নিজ গোত্র আউসের লোকদের লক্ষ্য করে বলেন, 'খাযরাজ গোত্র সা'দ ইবন

'উবাদাকে খলীফা বানিয়ে নেতৃত্ব কুক্ষিগত করতে চায়। আজ যদি তারা সফল হয় তাহলে চিরদিনের জন্য তারা তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ফেলবে এবং খিলাফতে তোমাদের কোন অংশ তারা আর কোন দিন দেবে না। আমার মতে আবু বকরের হাতে বাইয়াত করা উচিত।' এরপর তিনি সকলকে আবু বকরের হাতে বাই'য়াত করার নির্দেশ দেন। এভাবে আউস গোত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে হযরত সা'দ ইবন উবাদার সমর্থকদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। (সীয়ারে আনসার।-২৩১)

হযরত আবু বকরের (রা) মরণ সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত করে যাবেন- এ বিষয়ে মুহাজির-আনসার নির্বিশেষে যে সকল বিশিষ্ট সাহাবীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উসাইদও (রা) ছিলেন। আবু বকর (রা) যখন উমার (রা) সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন, তিনি বললেন ঃ 'আপনার পরে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের ব্যাপারে আমি তাঁকে ভালোই দেখতে পাই। . . . . . তাঁর ভেতরটা বাইরের থেকে উত্তম। এই দায়িত্ব লাভের জন্য তাঁর চেয়ে অধিকতর সক্ষম ব্যক্তি আর কেউ নেই। (হায়াতুস সাহাবা-২/২৬) হিজরী ১৬ সনে তিনি খলীফা 'উমারের (রা) সাথে মদীনা থেকে বায়তুল মাকদাসে যান। (উসুদুল গাবা-১/৯২)

হিজরী ২০ সনের শা'বান মাসে, মতান্তরে হিজরী ২১ সনে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন। খলীফা হযরত উমার (রা) কাঁধে করে তাঁর লাশ বহন করেন, জানাযার নামায পড়ান এবং বাকী গোরস্থানে দাফন করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪০), তাবাকাত-৩/৫০৬, শাজারাতুজ জাহাব ফী আখবারি মান জাহাব-১/৩১)

মৃত্যুর পূর্বে তিনি খলীফা 'উমারকে অসীয়াত করে যান, তিনি যেন তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজ হাতে নিয়ে তাঁর সকল দায়-দেনা পরিশোধ করে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত 'উমার (রা) পাওনাদারদের ডেকে তাদেরকে এই শর্তে রাজী করান যে, তারা বছরে এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করবেন। এভাবে চার বছরে বাগানের ফল বিক্রী করে সকল দেনা পরিশোধ করা হয়। এভাবে তাঁর সকল সম্পত্তি রক্ষা পায়। 'উমার (রা) বলতেন, 'আমার ভাইয়ের সন্তানদের আমি অভাবী দেখতে চাই না।' (তাবাকাত-৩/৬০৬, উসুদুল গাবা-১/৯৩)

হযরত উসাইদের স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। (সীয়ারে আনসার-১/২৩১) হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'একবার আমরা হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে মদীনায় ফিরলাম। আমাদেরকে জুল হুলায়ফায় অভ্যর্থনা জনানো হল। আনসারদের পরিবারবর্গের লোকেরা আপন আপন পরিবারের লোকদের সাথে মিলিত হল। এখানে উসাইদকে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর খবর দেওয়া হল। তিনি মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী, আর আপনি কিনা একজন মহিলার জন্য এভাবে কাঁদছেন? আয়িশা (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি মাথা থেকে কাপড় ফেলে দিলেন। এবং বললেন ঃ আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। 'সা'দ ইবন মু'য়াজের পর আর কারও জন্য আমাদের কাঁদা উচিত নয়।' (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯৫, মুসনাদে আহমদ-২/৩৫২)

সম্ভবতঃ ইয়াহইয়া নামে উসাইদের একটি মাত্র ছেলে ছিল। সহীহ বুখারীর 'বাবু

নুযুলিস সাকীনা ওয়াল মালায়িকা ইনদা কিরায়াতিল কুরআন" (কুরআন পাঠের সময় প্রশান্তি ও ফিরিশতার অবতরণ) অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা এসেছে।

কুরআন ও হাদীসের প্রচার-প্রসারে তাঁর বিরাট অবদান আছে। তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত 'আয়িশা, আবু সা'ঈদ আল খুদরী, আনাস বিন মালিক, আবু লাইল আনসারী, ও কা'ব ইবন মালিকের মত অতি সম্মানিত সাহাবায়ে কিরাম তাঁর নিকট থেকে শ্রুত হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর সর্বমোট ১৮ (আঠারো) টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (আল-আলাম-১/৩৩০, আল-ইসাবা-১/৪৯)

হযরত উসাইদের পিতা ছিলেন তাঁর গোত্রের অতি সম্মানিত ব্যক্তি। ইবন সা'দ বলেন ঃ "তাঁর পিতার পর ইসলাম ও জাহিলী উভয় যুগে তিনিও অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। গোত্রের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে গণ্য হন। সেই জাহিলী যুগে যখন আরবে লেখার প্রচলন খুব কম ছিল- তিনি আরবীতে লিখতেন। এই গুণগুলির সমন্বয় ঘটেছিল উসাইদের মধ্যে।" তাছাড়া তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ ও দৌড়বিদ। আর সে যুগে আরবে এই তিনটি গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করা হত। (তাবাকাত-৩/৬০৪, আল আলাম-১/৩৩০, উসুদুল গাবা- ১/৯২)

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আধ্যাত্ম সাধনায় এত উন্নতি সাধন করেন যে, তাঁর চোখের সকল পর্দা দূর হয়ে যায়। আর তিলাওয়াতও করতে পারতেন সুমধুর কণ্ঠে। (উসুদুল গাবা-১/৯২) একদিন রাতে তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন। নিকটেই বাঁধা একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি লাফাতে থাকে। তিলাওয়াত বন্ধ করলে ঘোড়াটিও থেমে যায়। আবার তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করে। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া নিকটেই শুয়ে ছিল। তিনি ভীত হয়ে পড়লেন এই কথা চিন্তা করে যে, এমনটি চলতে থাকলে ছেলেটি ঘোড়ার পায়ে পিষে যাবে। তৃতীয়বারের মাথায় তিনি বাইরে এসে দেখেন, আকাশে একটি ছায়ার মত আচ্ছাদন এবং মধ্যে যেন বাতির আলো জ্বলছে। তিলাওয়াত শেষ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতেই আলোটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সকালে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, ফিরিশতারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তাহলে লোকেরা তাদেরকে দিনের আলোতে দেখতে পেত। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪৩, উসুদুল গাবা-১/৯৩, বুখারী শরীফ-২/৭৫০)

তিনি দিব্য চোখে 'সাকীনা' বা প্রশান্তির বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যার চলার সময় আগে আগে একটি 'নূর' বা জ্যোতি চলতো। বুখারী বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধকার রাতে আববাদ ইবন বিশর ও উসাইদ ইবন হুদাইর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে বের হলেন। তাঁদের হাতের লাঠি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে তাদের চলার পথ আলোকিত করে তুলেছিল। তাঁরা যখন দু'জন দুই দিকে চলে গেলেন, জ্যোতিও তাঁদের সাথে ভাগ হয়ে গেল। (শাজারাতুজ জাহাব-১/৩১, হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১১)

হযরত উসাইদ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে একটি দুস্থ আনসার পরিবারের কথা তুলে ধরলাম। তারা অত্যন্ত অভাবী এবং পরিবারের অধিকাংশ সদস্য মহিলা। আমার কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, 'তুমি এমন এক সময় এসেছ যখন আমার হাতে যা

কিছু ছিল সবই মানুষকে দেওয়া হয়ে গেছে। তুমি যখন শুনবে আমার হাতে আবার কিছু এসেছে এই পরিবারটির কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।' কিছুদিনের মধ্যে খাইবার থেকে কিছু জিনিস আসলো। তিনি আনসারদেরকে বেশী করে দিলেন। বিশেষ করে সেই পরিবারটিকে দিলেন প্রচুর পরিমাণে। আমি বললাম, 'হে আল্লার নবী, আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।' রাসূল (সা) বললেন, 'ওহে আনসারগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। তোমাদের সম্পর্কে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তোমরা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যধারণকারী। আমার মৃত্যুর পর লোকেরা তোমাদের উপেক্ষা করে নিজেদেরকে অগ্রাধিকার দেবে। আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা 'সবর' (ধৈর্য) অবলম্বন করবে। আমাদের সেই মিলন স্থল হবে 'হাউজ'।'

উসাইদ বলেন, 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করলেন, আবু বকরের পর 'উমার (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। একবার তিনি মদীনাবাসীদের মধ্যে কিছু গনীমতের মাল বন্টন করলেন। আমার জন্য তিনি একটি জামা পাঠালেন। কিন্তু তা ছোট হয়ে গেল। আমি মসজিদে বসে আছি, এমন সময় এক কুরাইশ যুবককে দেখলাম ঠিক আমার জামার মত একটি লম্বা জামা সে পরে আছে। সেটা এত লম্বা যে, মাটি দিয়ে টেনে যাচ্ছে। তখন আমি আমার সংগের লোকটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) উপরোক্ত বাণী শুনিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যই বলেছেন। লোকটি দৌড়ে 'উমারের কাছে গেল এবং আমি যা বলেছি তাই তাঁকে গিয়ে বলল। 'উমার ছুটে আসলেন। আমি তখন নামাযে। 'উমার বললেন, উসাইদ নামায শেষ কর। নামায শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কী বলেছেন?

আমি যা দেখেছি এবং যা বলেছি, তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন। সেই জামাটি আমি অমুকের জন্য পাঠিয়েছিলাম। আর সে তো একজন আনসারী, আকাবায় শপথ গ্রহণকারী এবং বদর ও উহুদের মুজাহিদ। তাঁর কাছ থেকেই এই কুরাইশ যুবক জামাটি খরীদ করেছে। আপনি কি মনে করেন আনসারদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) সেই বাণী আমার যুগেই সত্যে পরিণত হবে? উসাইদ বললেন, আল্লাহর কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার বিশ্বাস আপনার যুগে তা হতে পারবে না।' (হায়াতুস সাহাবা-১/৪০২-৪০৩, সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৩/৩৬-৩৯)

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, উসাইদ একজন উত্তম মানুষ। তিনি বলতেন, যদি আমি এই তিনটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় সর্বদা থাকতে পারতাম তাহলে নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী হতাম। এব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ থাকতো না। সেই অবস্থা তিনটি হলঃ (১) আমি নিজে যখন কুরআন পাঠ করি অথবা অন্যকে পাঠ করতে শুনি। (২) যখন রাসূলুল্লাহর (সা) ভাষণ শুনি (৩) যখন কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করি। আমি যখন জানাযায় যোগদান করি, আমার নাফ্সকে প্রশ্ন করি ঃ আমি তাকে দিয়ে কী করিয়েছি এবং তার শেষ পরিণতি কী হবে? (আল-ইসাবা-১/৪৯, হায়াতুস সাহাবা-৩/৪১-৪২)

হাকেম আবু লায়লার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, উসাইদ ছিলেন একজন নেককার, হাসি-খুশী মেজাজের ও রসিক প্রকৃতির মানুষ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে নানা রকম কথা বলে লোকদের হাসাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একটু কৌতুক করে তাঁর কোমরে একটু আঘাত করেন। সাথে সাথে উসাইদ বলে উঠেন ঃ আপনি আমাকে ব্যথা

দিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও। উসাইদ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গায়ে জামা ছিল না; কিন্তু আপনার গায়ে তো জামা। রাসূল (সা) জামা খুলে ফেললেন, আর সাথে সাথে উসাইদ রাসূলুল্লাহকে (সা) জড়িয়ে ধরে তাঁর পাজরে চুমুর পর চুমু দিতে লাগলেন। পরে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আমি এই ইচ্ছা করেছিলাম। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৩০-৩১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন, আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ, মু'য়াজ ইবন জাবাল, উসাইদ ইবন হুদাইর ও মু'য়াজ ইবন 'আমর- এরা কতই না উত্তম মানুষ। (আল-ইসাবা-১/৯২) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) বলেছেন, নি'মার রাজুলু উসাইদ- উসাইদ কত ভালো মানুষ। (তাবাকাত-৩/৬০৩) হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ আনসারদের তিন ব্যক্তিকে কেউ মর্যাদার দিক দিয়ে নাগাল পায়নি। তাঁরা সবাই বনী আবদিল আশহালের লোক। তাঁরা হলেনঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, উসাইদ ইবন হুদাইর ও আব্বাদ ইবন বিশর। (আল-ইসাবা-১/৪৯) এই সব কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। তাঁর ওপর অন্য কাউকে তিনি প্রাধান্য দিতেন না। (উসুদুল গাবা-১/৯২)

'উবাদা ইবনুস সামিত (রা)

আবুল ওয়ালীদ 'উবাদা মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনী সালীম শাখার সন্তান। হিজরতের ৩৮ বছর পূর্বে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আ'লাম-৪/৩০) পিতা সামিত ইবন কায়স এবং মাতা কুররাতুল আইন। মা ছিলেন 'উবাদা ইবন নাদলা ইবন মালিক ইবন আজলানের কন্যা। তিনি নিজের পিতার নামে ছেলের নাম রাখেন 'উবাদা' (উসুদুল গাবা-৩/১০৬) 'উবাদার ভাই আউস ইবন সামিতের স্ত্রী খুওয়াইলা বিনতু সা'লাবা। তিনি সেই মহিলা যাঁর শানে সূ'রা মুজাদিলার জিহারের আয়াত নাযিল হয়। (আনসাবুসলআশরাফ-১/২৫১)।

মদীনার পশ্চিম দিকে কুবা সংলগ্ন প্রস্তরময় অঞ্চলে ছিল বনী সালীমের বসতি। 'উতুম কাওয়াকিল' নামে সেখানে তাদের কয়েকটি কিল্লা ছিল। এরই ভিত্তিতে বলা চলে 'উবাদার বাড়ীটি মদীনার কেন্দ্রস্থলের বাইরে ছিল।

'উবাদা সবে যৌবনে পা দিয়েছেন, এমন সময় মক্কায় ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন যাঁরা ইসলামের প্রথম আহবান কানে আসতেই সাড়া দেন। 'আকাবার প্রথম শপথে যেবার ছয়জন মদীনাবাসী রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাই'য়াত করেন, তিনি তাঁদের একজন। অবশ্য ঐতিহাসিকদের অনেকে এই বাই'য়াতকে আকাবা নামে অভিহিত করেননি। তাঁদের মতে আকাবা মাত্র দু'টি। যাই হোক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আকাবায়ও শরিক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন তিনি। অনেকের মতে তিনি দ্বিতীয় আকাবায় বারোজনের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তৃতীয় তথা শেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহ (সা) মনোনীত বারো নাকীবের (দায়িত্বশীল) অন্যতম নাকীব। তিনি হন বনী কাওয়াকিল এর নাকীব। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬, বুলুগুল আমানী- শরহ মুসনাদে আহমাদ-২২/২৭৫, ফাতহুল বারী-৭/১৭২, তাবাকাত-৩/৫৪৬) উল্লেখ্য যে, বনী 'আমর ইবন আওফ ইবন খাযরাজ সেই প্রাচীন কাল থেকে 'কাওয়াকিল' নামে পরিচিত। 'কাওকালা' শব্দটির অর্থ এক বিশেষ ধরনের চলন।' এ নামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হল, যখন কোন ব্যক্তি তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতো তখন তারা লোকটির হাতে একটি তীর দিয়ে বলতো, যাও, এখন ইয়াসরিবের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াও। (ইবন হিশাম ১/৪৩১)

'উবাদার জীবনটি ছিল প্রাণরসে ভরপুর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে ফিরে এসেই সর্বপ্রথম মা-কে ইসলামে দীক্ষিত করেন। মদীনায় কা'ব ইবন আজরা নামে তাঁর ছিল এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। তখনও সে অমুসলিম এবং তার বাড়ীতে ছিল বিরাট এক মূর্তি। 'উবাদার সব সময়ের চিন্তা হল কিভাবে এ বাড়ীটি শিরক থেকে মুক্ত করা যায়। একদিন সুযোগমত বাড়ীর মধ্যে ঢুকে মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলেন। অবশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় কা'ব মুসলমান হয়ে যান।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় পৌঁছে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। আবু মারসাদ আল গানাবী হলেন তাঁর দ্বীনি ভাই। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬, আল ইসাবা-২/২৬৮, আনসাবুল আশরাফ-১/২৭০) আবু মারসাদ ছিলেন

ইসলামের সূচনা লগ্নের একজন মুসলমান এবং হযরত হামযার (রা) হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ।

বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে 'উবাদা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। (উসুদুল গাবা-৩/১০৬) বদর যুদ্ধের পর গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এর ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে মুজাহিদদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তখন সূরা আনফালের প্রথম থেকে কতগুলি আয়াত নাযিল হয় এবং এ ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে। ইবন হিশাম বলেন, সুরা আনফালের উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে 'উবাদাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন, আয়াতগুলি আমাদের বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। বদরের দিন আমরা আনফাল এর ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করি এবং তা নিয়ে যখন আমাদের আখলাকের অবনতি ঘটে তখন আল্লাহ আমাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। তিনি আমাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৬)

এই বদর যুদ্ধের সময়ই মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ইঙ্গিতে মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কায়নুকা রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের সাথে উবাদার গোত্র বনী আউফের বহু আগে থেকেই মৈত্রী চুক্তি ছিল। তেমনিভাবে চুক্তি ছিল মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূলেরও। তাদের বিদ্রোহের কারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন তখন উবাদা ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এবং তাদের সাথে চুক্তি বাতিলের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে বললেনঃ আমি তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন ও দায়মুক্তির ঘোষণা করছি। আর আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মুমিনদেরকে আমার বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছি। অন্যদিকে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূল তার পূর্ব অবস্থায় অটল থাকে। বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বহিষ্কারের এই কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব উবাদার ওপর অর্পণ করেন। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা মায়িদার ৫১নং আয়াত থেকে ৫৮ নং পর্যন্ত আয়াতগুলি নাযিল হয়। আয়াতগুলিতে স্পষ্টতঃ উবাদার প্রশংসা ও মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইযের নিন্দা করা হয়েছে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯) ষষ্ঠ হিজরীর বাইয়াতুর রিদওয়ানে তিনি শরিক ছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ-৫/৩১৯) ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনী মুসতালিক বা মুরাইসী এর যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তাঁরই দলের একটি লোক ভুলক্রমে শত্রু ভেবে অন্য একজন মুসলিম মুজাহিদকে হত্যা করে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯০)

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে শামে যে সকল অভিযান পরিচালিত হয় তার বেশ ক'টিতে 'উবাদা অংশগ্রহণ করেন। হযরত ফারুকে আজমের খিলাফতকালে 'আমর ইবন 'আস মিসরে অভিযান পরিচালনা করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভে সক্ষম না হয়ে মদীনায় খলীফার নিকট অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পাঠান। খলীফা উমার (রা) চার হাজার মতান্তরে দশহাজার সৈন্যের একটি অতিরিক্ত বাহিনী পাঠান। 'উবাদা ছিলেন সেই বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্যের কমান্ডিং অফিসার। (আল-ইসাবা-২/২৬৮) খলীফা 'আমর ইবনুল 'অসকে একটি চিঠিতে আরও লেখেন এই অফিসারদের প্রত্যেকেই একহাজার সৈন্যের সমান। এই অতিরিক্ত বাহিনী মিসর পৌছার পর 'আমর ইবনুল আস সকল সৈন্য একত্র করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। ভাষণ শেষ করে তিনি উবাদাকে ডেকে বলেন, আপনার নিযাটি আমার হাতে দিন। তিনি নিযাটি নিয়ে নিজের মাথার পাগড়ীটি খুলে নিযার মাথায় বাঁধেন। তারপর সেটি উবাদার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেন, এই হচ্ছে সেনাপতির আলাম বা পতাকা। আজ আপনিই সেনাপতি। আল্লাহর ইচ্ছায়

প্রথম খলীফার শাসনের পতন ঘটে।

হযরত 'উবাদা বিভিন্ন সময়ে ইসলামী খিলাফতের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১· সালাত বিষয়ক অফিসার ২· ফিলিস্তীনের কাজী ৩· হিমসের আমীর।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের শেষ দিকে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে 'আমিলে সাদাকা' বা যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। উবাদাকেও কোন একটি অঞ্চলে নিয়োগ দান করেন। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উপদেশ দেন ঃ আল্লাহকে ভয় করবে। এমন যেন না হয়, কিয়ামতের দিন চতুষ্পদ জন্তুও তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬)

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে এক সময় তাঁকে ফিলিস্তীনের কাজী নিয়োগ করা হয়। সেই সময় উক্ত অঞ্চলটি ছিল হযরত মুয়াবিয়ার (রা) ইমারাতের অধীনে। এক সময় কোন একটি বিষয়ে দু'জনের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) তাঁর প্রতি কিছু কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। তিনিও প্রত্যুত্তরে মুয়াবিয়াকে বলেন, আগামীতে আপনি যেখানে থাকবেন আমি সেখানে থাকবো না। তিনি মদীনায় চলে আসেন, খলীফা উমার (রা) এভাবে তাঁর চলে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি পুরো ঘটনা খুলে বলেন। সবকিছু শোনার পর 'উমার (রা) বললেন ঃ আপনার স্থানে আবার আপনি ফিরে যান। এ যমীন আপনার মত লোকদের জন্য ঠিক আছে। আপনিও আপনার মত লোকেরা যেখানে নেই আল্লাহ সেই স্থানের মঙ্গল করুন। অতঃপর তিনি আমীর মু'য়াবিয়াকে (রা) একটি চিঠি লিখে জানিয়ে দেন ঃ আমি উবাদাকে তোমার কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন করে দিলাম। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬) ফিলিস্তীনের বিচার বিভাগের এই পদটি সর্বপ্রথম 'উবাদার হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ উবাদা ফিলিস্তীনের প্রথম কাজী। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬)

হযরত আবু 'উবায়দাহ (রা) যখন শামের আমীর তখন তিনি 'উবাদা ইবনুস সামিতকে হিমসে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করেন। এই হিমসে অবস্থানকালে তিনি লাজিকিয়্যা জয় করেন। এই অভিযানে তিনি এক নতুন সামরিক টেকনিক প্রয়োগ করেন। তিনি এমন সব বড় বড় গর্ত খনন করেন যে, তার মধ্যে একজন অশ্বারোহী তার অশ্বসহ অতি সহজে লুকিয়ে থাকতে পারতো। (ফুতুহুল বুলদান–১৩৯)

হযরত 'উবাদা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শামে (বৃহত্তর সিরিয়া) বসবাসরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিজরী ৩৪/৬৫৪ সনে রামলা মতান্তরে বায়তুল মাকদাসে ৭২ (বাহাত্তর) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইবন 'আসাকির 'উবাদার জীবনীতে মুয়াবিয়ার (রা) সাথে তাঁর এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে ধারণা হয় তিনি হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালেও জীবিত ছিলেন। এ কারণে অনেকে মনে করেছেন তিনি হিজরী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ইবনুল আসীর বলেন, পূর্বের মতটিই সঠিক। (তাবাকাত–৩/৫৪৬, আল ইসাবা–২/২৬৯, উসুদুল গাবা–৩/১০৭, আনসাবুল আশরাফ–১/২৫১)

তিনি মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে শেষ বারের মত একটু দেখার জন্য অনেকে আসা যাওয়া করছে। হযরত শাদ্দাদ ইবন আউসও এসেছেন কিছু লোক সংগে করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন আছেন? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর অনুগ্রহে ভালো আছি।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ছেলে এসে কিছু অসীয়াত করার অনুরোধ করলো। বললেন, আমাকে একটু উঠিয়ে বসাও। তারপর বললেন ঃ বেটা, তাকদীরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, অন্যথায় ঈমানে কোন কল্যাণ নেই। (মুসনাদে আহমাদ–৫/৩১৭, বুলুগুল আমানী ঃ শরহ মুসনাদে আহমাদ–২২/২৭৬)

এই সময়ে তাঁর ছাত্র 'সানাবিহী' আসলেন। প্রিয় শিক্ষকের এই অন্তিম অবস্থা দেখে কাঁদতে শুরু করলে। উবাদা তাকে কাঁদতে নিষেধ করে বললেন ঃ সর্ব অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট। তুমি কাঁদছো কেন? যদি সাক্ষ্য দিতে বল, দিব। যদি কারও জন্য শুপারিশ করি, তোমার জন্য করবো। তারপর বললেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) যত হাদীস সংরক্ষিত ছিল সবই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তবে একটি হাদীস অবশিষ্ট ছিল তা এখন বর্ণনা করছি। হাদীসটি কারও কাছে এ পর্যন্ত বর্ণনা করিনি। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন। (বুলুগুল আমানী–২২/২৭৬) হাদীসটি বর্ণনার পর পরই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন হযরত উসমানের খিলাফতকাল চলছে।

তাঁকে কোথায় দাফন করা হয় সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন সা'দ লিখেছেন, তাঁকে রামলায় দাফন করা হয়। অন্য একটি বর্ণনা মতে বায়তুল মাকদাসের পবিত্র মাটিই হচ্ছে তাঁর শেষ শয্যা এবং সেখানে তাঁর কবরটি এখনও প্রসিদ্ধ। ইমাম বুখারী তাঁর দাফন স্থল ফিলিস্তিন বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ সে সময় ফিলিস্তীন ছিল একটি প্রদেশ এবং উল্লেখিত স্থল দু'টি ছিল তার ভিন্ন দু'টি জেলা। আল–আ'লাম' গ্রন্থকার যিরিকলী বলেন, তিনি শামের কিবরিসে মৃত্যুবরণ করেন। অদ্যাবধি সেখানে তাঁর কবর মানুষের যিয়ারতগাহ হিসাবে বিদ্যমান। খলীফা 'উমারের (রা) পক্ষ থেকে তিনি সেখানকার ওয়ালী ছিলেন। (আ'লাম–৪/৩০)

হযরত 'উবাদার মরণ সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে তিনি চাকর–বাকর, পাড়া–প্রতিবেশী, আত্মীয়–স্বজন সকলকে হাজির করার নির্দেশ দেন। সবাই উপস্থিত হলে বলেন ঃ আজকের এ দিনটিই দুনিয়ায় আমার শেষ দিন, আর আগত রাতটি আমার আখিরাতের প্রথম রাত। আমার হাত বা জিহবা দিয়ে যদি তোমাদেরকে কোন রকম কষ্ট দিয়ে থাকি তোমরা এখনই তার 'কিসাস' বা প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আমি নিজেকে তোমাদের সামনে পেশ করছি। তারা বললো, আপনি আমাদের পিতা, আমাদের শিক্ষক। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তিনি কখনও কোন খাদেমকে খারাপ কথা বলেননি। তারপর তিনি তাদের অসীয়াত করেন ঃ আমি মারা গেলে কেউ কাঁদবে না। তোমরা ভালো করে অজু করে মসজিদে গিয়ে নামায পড়বে। নামায শেষে উবাদা ও তোমাদের নিজেদের জন্য দু'য়া করবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা ছবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর (সূরা বাকারাহ–৪৫, ১৫৩)। আমাকে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি কবর দেবে। (হায়াতুস সাহাবা– ৩/৪৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যে পাঁচজন আনসারী ব্যক্তি সমগ্র কুরআন হিফ্জ (মুখস্থ) করেন 'উবাদা তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও সম্মানিত সাহাবীদের একজন, ইলমুল কিরয়াতে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় মদীনায় আসহাবে সুফ্ফার জন্য ইসলামের প্রথম যে মাদ্রাসাতুল কিরায়াহ প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার দায়িত্বে। অতি সম্মানিত ও মর্যাদাবান আসহাবে সুফ্ফার সাহাবীরা তাঁর কাছে

শিক্ষা লাভ করেন। এই মাদ্রাসায় কুরআনের তালীমের সাথে সাথে লেখাও শিখানো হত। বহু লোক এই মাদ্রাসা থেকে কিরায়াত ও লেখার তা'লীম নিয়ে বের হন। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৫)

এই মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত কোন কোন ছাত্রের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করতেন। এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীতে থাকতেন এবং রাতের খাবার তাঁরই সাথে খেতেন। লোকটি ফিরে যাওয়ার সময় একটি উৎকৃষ্ট ধনুক তাঁকে দান করেন। তিনি একথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালেন। রাসূল (সা) তাঁকে ধনুকটি নিতে নিষেধ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২৪, হায়াতুস সাহাবা–৩/২৩০) হযরত উমার তাঁকে এক সময় শামের মুসলমানদের বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাদানের জন্য পাঠান।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি বিশেষ টেকনিক প্রচলন করেন। তাঁর সমসাময়িক যে সকল সাহাবী হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁরা বলতেন ঃ আমি একথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি। অনেকে কিছু অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করতেন, যা পরবর্তীকালে হাদীস বর্ণনার একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। উবাদাও এমন কিছু শব্দ প্রচলন করেন। যেমন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সামনাসামনি বলেন। আমি একথা বলছিনে যে, অমুক অমুক আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।'

এমনিভাবে এক সমাবেশে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। ভাষণে একটি হাদীস বর্ণনা করলে শ্রোতাদের মধ্য থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রা) হাদীসটির সত্যতা সম্পর্কে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেন। উবাদা তখন বলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে আমি একথা শুনেছি।'

তিনি সর্ব অবস্থায় সকল স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন। ওয়াজমাহফিল, জ্ঞান চর্চার বৈঠক, এমনকি কখনও গীর্জায় গেলে সেখানেও রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র বাণী ঈসায়ীদের কানে পৌঁছিয়ে দিতেন।

হযরত 'উবাদা থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রায় ১৮১ (একশো একাশি)। তাঁর মধ্যে ছয়টি মুত্তাফাক আলাইহি। (আল–আ'লাম ৪/৩০) অনেক বড় বড় সাহাবী এবং তাবে'ঈ তাঁর নিকট থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, আবু উমামা, ছালামা ইবন মাহবাক, মাহমূদ ইবন রাবী মিকদাম ইবন মা'দিকারব, রাফায়া ইবন রাফে, আউস ইবন আবদিল্লাহ আস–সাকাফী, শুরাহবীল ইবন হাসানা প্রমুখ এবং তাবে'ঈদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন উসায়লা সানালজী, হিত্তান ইবন আবদিল্লাহ রাক্কাশী, আবুল আশ'য়াস সাগানী, জুবাইর ইবন নাদীর, জুনাদাহ্ ইবন আবী উমাইয়্যা, আসওয়াদ ইবন সা'লাবা, আতা ইবন আবী ইয়াসার, আবু মুসলিম খাওলানী, আবু ইদরীস খাওলানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (উসুদুল গাবা–৩/১০৬) ফিকাহ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন সুপন্ডিত। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর এ পান্ডিত্যের সম্মান করতেন। খালিদ ইবন মা'দান বলেন ঃ শামে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে উবাদা ও শাদ্দাদ ইবন আউস অপেক্ষা অধিকতর বড় কোন ফকীহ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৬২)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) একটি ভাষণে আমওয়াসের প্লেগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার উবাদার সাথে আলোচনা হয়েছে। তবে তিনি যা বলেছেন তাই সঠিক। তোমরা তাঁর থেকে ফায়দা হাসিল কর। কারণ, তিনি আমার চেয়েও বড় ফকীহ।

জুনাদাহ যান উবাদার সাথে সাক্ষাৎ করতে, তারপর তিনি বর্ণনা করেন, উবাদা আল্লাহর দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান হাসিল করেছেন। (আল-ইসাবা-২/২৬৮, সীয়ারে আনসার ২/৫৬)

শাসকের মুখোমুখী হক কথা বলা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি অতি উৎসাহের সাথে এ দায়িত্ব পালন করতেন। শামে গিয়ে দেখেন, সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ে শরীয়াতের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি এমন এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন যে, গোটা সমাবেশে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই সমাবেশে হযরত মুয়াবিয়াও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠেন, হযরত রাসূলে কারীম (সা) উবাদাকে একথা বলেননি। তখন 'উবাদার ঈমানী জোশ তীব্র আকার ধারণ করেন। তিনি বলেন, মুয়াবিয়ার সাথে থাকার কোন ইচ্ছা আমার নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) একথা আমাকে বলেছিলেন। (উসুদুল গাবা-৩/১০৭, (মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩১৯)

উপরোক্ত ঘটনাটি ছিল হযরত উমারের (রা) খিলাফত কালের। তবে খলীফা উসমানের (রা) যুগে আমীর মুয়াবিয়া (রা) খলীফার দরবারে লেখেন ঃ উবাদা গোটা শামের অবস্থা বিপর্যস্ত করে তুলেছে। হয় আপনি তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠান, নয়তো আমিই শাম ছেড়ে চলে আসবো। জবাবে আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে মদীনায় পাঠিয়ে দিতে বলেন। খলীফার নির্দেশের পর উবাদা শাম থেকে সোজা মদীনায় চলে যান। তিনি যখন খলীফার নিকট পৌছেন তখন তিনি একজন মুহাজির ব্যক্তির সাথে কথা বলছিলেন। খলীফার ঘরের বাইরে তখন বহু লোক সমবেত ছিল। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি এক কোণায় চুপ করে বসে পড়েন। খলীফা দৃষ্টি উঠাতেই তাঁকে দেখতে পান। তিনি প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার? সাথে সাথে তিনি দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমার পরে শাসকরা ভালোকে মন্দে এবং মন্দকে ভালোতে পরিণত করবে। কিন্তু অন্যায় কাজে আনুগত্য সিদ্ধ নয়। তোমরা কখনও পাপ কাজে লিপ্ত হবে না। (মুসনাদে আহমাদ-৫/৩১৯) তাঁর কথার মাঝখানে হযরত আবু হুরাইরা (রা) কিছু বলার চেষ্টা করেন। উবাদা গর্জে উঠে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে আমরা যখন বাই'য়াত করি তোমরা তখন ছিলে না। (সুতরাং অযথা নাক গলাবে না) আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে এই শর্তাবলীর ওপর বাই'য়াত করি যে, সর্ব অবস্থায় আমরা তাঁর কথা মানবো, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আর্থিক সাহায্য দান করবো। মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দেব এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবো। সত্যকথা বলতে কারও ভয় করবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াসরিবে আসলে তাঁকে সাহায্য করবো। আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মত তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করবো। আর আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করবো না। আমাদেরকে জান্নাতের আকারে এ সকল কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে। পরিপূর্ণ রূপে এ সব অঙ্গীকার পালন করা আমাদের কর্তব্য। আর কেউ পালন না করলে সেজন্য সেই জিম্মাদার। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৩, মুসনাদে আহমাদ-৫/৩২৫, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

হযরত 'উবাদা আমর বিল মা'রূফের দায়িত্ব সর্বক্ষণ, এমনকি পথ চলতে চলতেও পালন করতেন। একবার কোথাও যাচ্ছেন। দেখলেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাদ যারকী পাখী শিকার করছেন। তাঁর হাত থেকে পাখী ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দেন। তাঁকে বলেন এ স্থানটি হারামের অন্তর্ভুক্ত, এখানে শিকার নিষিদ্ধ। (মুসনাদে আহমাদ-৫/৩১৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি উবাদার ছিল তীব্র ভালোবাসা। প্রথম দফা সাক্ষাতের

পর আরও দু'বার মক্কায় গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বাইয়াত করে আসেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আসার পর এমন কোন ঘটনা বা যুদ্ধ পাওয়া যায়না যাতে যোগদানের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। এ কারণে তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। একবার তিনি রোগাক্রান্ত হলে রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে আসেন। আনসারদের কিছু লোকও সংগে ছিল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান শহীদ কে? সবাই চুপ করে রইল। উবাদা স্ত্রীকে বলেন, আমাকে একটু বালিশে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দাও। বসার পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশ্নের জবাব দিলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর হিজরাত করে, অতঃপর যুদ্ধে নিহত হয়। রাসূল (সা) বললেন, না। এমনটি হলে তো শহীদদের সংখ্যা খুবই কম হবে। নিহত হওয়া, কলেরা বা পানিতে ডুবে মারা যাওয়া এবং মেয়েদের সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যুবরণ– এ সবই শাহাদাতের মধ্যে গণ্য হবে। (মুসনাদে আহমাদ–৫/৩১৭) তিনি যতদিন অসুস্থ ছিলেন রাসূল (সাঃ সকাল–সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে যেতেন। এ অবস্থায় তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়ে বলেন, এটা জিবরাঈল আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ–৫/৩২৩)

হযরত উবাদার স্ত্রী সম্পর্কে হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে একটি বর্ণনা দেখা যায়। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মিলহানের মেয়ের কাছে গিয়ে কিছুতে ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর হেসে উঠলেন। সে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার উম্মাতের কিছু লোক আল্লাহর রাস্তায় সাগর পাড়ি দেবে। সে আরজ করলো, ইয়া রাসূলল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন আমিও যেন তাদেরই একজন হতে পারি। রাসূল (সা) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, তুমি তাকে তাদেরই একজন করে দাও। তারপর আবার তিনি হেসে উঠলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে একই জবাব দিলেন। এবারও সে পূর্বের মত দু'আর আবেদন করলো। এবার তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দিকের লোক হবে, তবে শেষ দিকের নও। আনাস বলেন, এই মহিলাকে উবাদা বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানের স্ত্রী কারাজার সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেন। তারপর বাহনের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৫৯২)

উসমান ইবন সাওদা বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিতকে দেখলাম, ওয়াদী জাহান্নামের মসজিদের দেওয়ালে বুক ঠেকিয়ে কাঁদছেন। আমি বললাম, আবুল ওয়ালীদ, আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, এটা সেই স্থান, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) জাহান্নাম দেখতে পেয়েছেন বলে আমাদেরকে বলেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬২৬)

হযরত সুফইয়ান ইবন উয়াইনা অতি অল্প কথায় হযরত উবাদার (রা) পরিচয় ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

উবাদা আকাবী, উহুদী, বদরী, শাজারী, উপরন্তু তিনি নাকীব।" (বুলুগুল আমানীঃ শরহ মুসনাদে আহমাদ–২২/২৭৫) হ্যাঁ, প্রকৃতই তিনি ছিলেন, বাইয়াতুল আকাবার একজন সদস্য, বদর–উহুদের যোদ্ধা। বায়য়াতুশ শাজারা তথা বাইয়াতুর রিদওয়ান– যা হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় অনুষ্ঠিত হয়– এরও অন্যতম সদস্য। উপরন্তু তিনি ছিলেন মদীনার দ্বাদশ নাকীবের একজন।

জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা)

নাম জাবির, কুনিয়াত বা ডাকনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা ঃ আবু 'আবদিল্লাহ, আবু 'আবদির রহমান, ও আবু মুহাম্মাদ। ইবনুল আসীর প্রথমটি অধিকতর সঠিক বলে মনে করেছেন। (উসুদুল গাবা ১/২৫৭, আল-ইসাবা-১/২১৩, তাহজীবুল আসমা ওয়া আল-লুগাত-১/১৪৪) পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর এবং মাতা নাসীবা বিনতু উকবা। তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ হারাম ইবন কা'ব-এর মাধ্যমে পিতা-মাতা উভয়ের বংশ একত্রে মিলিত হয়েছে। জাবিরের পিতৃবংশের উর্ধ্বতন পুরুষ সালামা-র বংশধরগণ মদীনার হাররা ও মসজিদে কিবলাতাইন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে তাঁর নিজ গোত্র বনু হারামের বসতি ছিল কবরস্তান ও ছোট্ট একটি মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে। তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন আমর ছিলেন শেষ 'আকাবায় মনোনীত অন্যতম 'নাকীব'। (তাবাকাত-৩/৬২০, ৬৬১, উসুদুল গাবা-১/২৫৬)

জাবিরের দাদা 'আমর ছিলেন তাঁর খান্দানের রয়িস বা নেতা। 'আয়নুল আরযাক' নামক যে কূয়োটি মারওয়ান ইবন হাকাম হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে সংস্কার করেন, সেটা ছিল তাঁরই মালিকানায়। বনু সালামার কয়েকটি দুর্গ ছাড়াও জাবির ইবন 'আতীকের নিকটবর্তী আরও কয়েকটি দুর্গ তারই অধীনে ছিল। 'আমরের মৃত্যুর পর এ সকল সম্পদের মালিক হন তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ। এই 'আবদুল্লাহর পুত্র জাবির চৌত্রিশ (৩৪) 'আমুল ফীল (হাতীর বছর) মুতাবিক ৬১১ মতান্তরে ৬০৭ খৃষ্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-২/৯২, সীয়ারে আনসার-১/২৯৪)

সর্বশেষ 'আকাবার বাই'য়াতে পিতা 'আবদুল্লাহর সাথে জাবিরও অংশগ্রহণ করেন। হতে পারে, তিনি এই বাই'য়াতের সময় অথবা এর পূর্বেই মদীনায় মুসয়াব ইবন 'উমাইরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) তাঁর পিতাকে বনু সালামা-র নাকীব বা দায়িত্বশীল মনোনীত করেন। জাবির বলেন, আমি ছিলাম এই 'আকাবার কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। ইবন সা'দের বর্ণনামতে এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ অথবা উনিশ বছর। ইবনুল আসীর বলেন, জাবির তখন একজন বালকমাত্র। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮, ২৪৯,২৫২, তাবাকাত-৩/৫৬১, উসুদুল গাবা-১/২৫৭, তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়া আল-আ'লাম-১/১৮১)

জাবির বদর ও উহুদ যুদ্ধ ছাড়া আর সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগদান করেন। বদর ও উহুদে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। ইবন 'আসাকির তাঁর তারীখে একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। জাবির বলতেন, আমি বদরের দিন আমার পিতার জন্য অঞ্জলি ভরে পানি নিয়েছিলাম। মুহাম্মাদ ইবন সা'দ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবন উমারকে এই বর্ণনাটি শুনালাম। তিনি বললেন, এটা ইরাকীদের একটি ভিত্তিহীন ধারণা

মাত্র। তিনি বদরে জাবিরের অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করলেন। তাছাড়া জাবির নিজেই বলতেন, আমি বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করিনি। আমার পিতা আমাকে বিরত রেখেছেন। এই দুইটি ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে কক্ষণও আমি পেছনে থাকিনি। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৮৬, উসুদুল গাবা-১/২৫৭, তাহজীবুল আসমা ওয়া আল-লুগাত-১/১৪৩, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১৪৩)

জাবির উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেননি। তিনি কেন যোগদান করেননি তাঁর কারণ এই বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়। ইবন হিশাম বললেন ঃ 'হামরা-উল-আসাদ' মদীনা থেকে ৮/৯ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। কুরাইশরা উহুদ থেকে সরে গিয়ে সেখানে সমবেত হয়। এটা ছিল হিজরী ৩ সালের আট অথবা নয় শাওয়ালের ঘটনা। রাসূল (সা) এ খবর পেয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ উহুদে যারা অংশগ্রহণ করেছিলে তারা ছাড়া আর সবাই শত্রুদের খোঁজে বের হয়ে পড়। লোকেরা, এমনকি উহুদের আহতরাও বের হয়ে পড়লো। সংখ্যায় তারা অনেক হয়ে গেল। জাবির রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে 'আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! গতকাল আমি জিহাদে যোগদান থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমার পিতা আমাকে বিরত রেখেছিলেন। তিনি আমাকে আমার সাতটি বোনের তদারকিতে রেখে যান। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'বেটা, কোন পুরুষ লোক তাদের কাছে থাকবে না, এমন অবস্থায় তাদের রেখে যাওয়া তোমার ও আমার উচিত হবে না। আর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে আমার নিজের ওপর তোমাকে অগ্রাধিকার দিতে পারিনে।' জাবির বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) আমাকে যুদ্ধে বের হওয়ার অনুমতি দান করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৮, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২০৭) বদর ও উহুদ ছাড়া তিনি কতগুলি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। কোন বর্ণনায় উনিশটি, কোন বর্ণনায় আঠারোটি, আবার কোন বর্ণনায় সতেরোটি যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন বলে জানা যায়। (আল-আ'লাম-২/৯২, উসুদুল গাবা-১/২৫৭, আল-ইসাবা-১/৩১৩, তাহজীবুল আসমা-১/১৪৩)

জাবিরের পিতা 'আবদুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে যোগ দেন এবং শহীদ হন। জাবির বলেন, উহুদ যুদ্ধের আগের রাতে আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথম দিকে শহীদ হবে, আমি নিজেকে তাঁদের কাতারেই দেখতে চাই। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে একমাত্র তুমি ছাড়া অধিকতর প্রিয় আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছিনে। আমার কিছু দেনা আছে, তুমি তা পরিশোধ করে দেবে। আর তোমার বোনদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ দিচ্ছি। জাবির বলেন, সকাল হলো, আমার পিতা হলেন প্রথম শহীদ। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৩) সুফইয়ান ইবন 'আবদি শাম্স আস-সুলামী নামক এক কাফির জাবিরের পিতা আবদুল্লাহকে হত্যা করে। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩)

কাফিররা জাবিরের পিতা 'আবদুল্লাহকে হত্যা করে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করে ফেলে। এই কারণে দেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ একটি কাপড়ে সংগ্রহ করা হয়। জাবির লাশ দেখতে চাইলে লোকেরা তাঁকে নিষেধ করে; কিন্তু রাসূল (সা) অনুমতি দান করেন। তাঁর ফুফু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভাইয়ের এ দৃশ্য দেখে তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন, কে? লোকেরা বললো, 'আবদুল্লাহর বোন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কাঁদ বা

না কাঁদ, যতক্ষণ লাশ না উঠাবে ফিরিশতারা ডানা দিয়ে ছায়া দিতে থাকবে। (মুসলিম-২/৩৪৬, বুখারী-২/৫৮৪, তাবাকাত-৩/৫৬১)

জাবিরের বোনেরা তাদের পিতার লাশ উহুদ থেকে নেওয়ার জন্য একটি উট পাঠায়। তারা ইচ্ছা করেছিল, বনু সালামার গোরস্তানে তাদের পিতাকে দাফন করবে। জাবির পিতার লাশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।- এ কথা রাসূল (সা) জানতে পেয়ে বললেন ঃ তাঁর অন্য সব শহীদ ভাইকে যেখানে দাফন করা হয়েছে তাকেও সেখানে দাফন করা হবে। এভাবে উহুদের অন্যান্য শহীদের সাথে তাঁকেও উহুদের প্রান্তরে দাফন করা হয়। (তাবাকাত-৩/৫৬২)

একটি বর্ণনায় এসেছে, জাবির বললেন ঃ আমার পিতা উহুদে শহীদ হওয়ার খবর পেয়ে আমি আসলাম। লাশটি কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি কাপড় সরিয়ে তাঁর মুখে চুমু দিতে লাগলাম। রাসূল (সা) দেখেছিলেন কিন্তু নিষেধ করেননি। (তাবাকাত-৩/৫৬১) তিনি আরও বলেন ঃ আমি কাঁদছিলাম। রাসূল (সা) আমাকে বললেন, তুমি কাঁদছো কেন? আয়িশা তোমার মা ও আমি বাবা হই, তাতে কি তুমি খুশী নও? এ কথা বলে তিনি আমার মাথায় হাত ঘষে দেন। আজ মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেলেও যেখানে রাসূলের (সা) হাতের স্পর্শ লেগেছিল সেখানে কালো আছে। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৮৬)

জাবির তাঁর পিতার লাশ দাফনের ব্যাপারে বললেন ঃ আমি অন্য একজন শহীদের সাথে এক কবরে তাঁকে দাফন করলাম। কিন্তু তাতে আমার মন তুষ্ট হলো না। ছয় মাস পর কবর খুড়ে লাশটি বের করলাম। দেখা গেল একমাত্র কান ছাড়া মাটি লাশ মোটেই স্পর্শ করেনি। লাশটি এমন অবিকৃত অবস্থায় আছে যেন আজই দাফন করা হয়েছে। (তাবাকাত-৩/৫৬২, তাহজীবুল আসমা-১/১৪৩, হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯২)

জাবির বললেন ঃ এর চল্লিশ বছর পর মু'য়াবিয়া যখন উহুদে কূপ খনন করায় তখন সেখানে সমাহিত কতিপয় শহীদের সাথে আমার পিতার লাশটিও উঠে আসে এবং তা সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ছিল। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৩) একটি বর্ণনায় এসেছে, উহুদে জাবিরের পিতা শহীদ হলে আল্লাহ তাঁকে জীবিত করে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আবদুল্লাহ, তুমি কি চাও?' তিনি বললেন, আমি দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাই এবং আবার শহীদ হতে চাই। (তাহজীবুল আসমা-১/১৪৩)

জাবিরের পিতা ছিলেন একজন ঋণগ্রস্ত মানুষ। তাঁর মৃত্যুর পর জাবির এই সব ঋণ নিয়ে বিপাকে পড়লেন। কিভাবে তা পরিশোধ করবেন, এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন। সম্পদের মধ্যে মাত্র দুইটি বাগিচা। তার সব ফলও ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট নয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলেন এবং পাওনাদার ইহুদীদের ডেকে কিছু মওকুফ করিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন। রাসূল (সা) পাওনাদারদের ডেকে জাবিরের বক্তব্য পেশ করলেন। যেহেতু তারা ছিল ইহুদী, তাই তারা রাসূলুল্লাহর (সা) আবেদনে সাড়া দিলনা। তিনি তাদেরকে অর্ধেক করে দুই বছরে দুইটি কিস্তিতে গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। তারা তাতেও রাজী হলো না। তখন তিনি জাবিরকে বললেন, আমি অমুক দিন তোমার বাড়ীতে যাব। তিনি নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হলেন এবং অজু করে দুই রাকায়াত নামায আদায় করলেন। তারপর তাবুতে এসে স্থির হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবু বকর ও উমার উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) খেজুর স্তূপ করে ভাগ করার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি একটি স্তূপের ওপর উঠে বসলেন। জাবির

ভাগ শুরু করলেন, আর রাসূল (সা) বসলেন দু'আ করতে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঋণ পরিশোধের পরেও অনেক অবশিষ্ট থেকে গেল। জাবির খুব খুশী হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন, ঋণ পরিশোধ হয়েছে এবং এত পরিমাণ অবশিষ্ট আছে। রাসূল (সা) আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। আবু বকর ও উমার (রা) দুইজনই খুব খুশী হলেন। (বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী-২২/২০৮, ২০৯, তাবাকাত-৩/৫৬৪, হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩১)

হিজরী পঞ্চম সনে 'জাতুর রুকা' যুদ্ধে জাবির যোগ দেন। তিনি একটি উৎকৃষ্ট উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন। চলতে চলতে উটটি হঠাৎ থেমে যায়। জাবির তাকে উঠিয়ে চালাবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় পেছন থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ জাবির কী হয়েছে? বললেন, উট চলছে না। রাসূল (সা) নিকটে এসে উটের গায়ে চাবুকের একটি ঘা মারেন। সাথে সাথে উটটি দ্রুত চলতে থাকে এবং সবার আগে চলে যায়। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, এই সফরে এক অন্ধকার রাতে জাবিরের উটটি হারিয়ে যায়। জাবির রাসূলাল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে উটের খোঁজে যাচ্ছেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? বললেন, উট হারিয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই যে, এই দিকে তোমার উট, যাও নিয়ে এস। জাবির দৌড়ালেন সেই দিকে; কিন্তু বহু খোঁজাখুজির পরও না পেয়ে ফিরে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) পেলাম না। রাসূল (সা) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার একই কথা বললেন এবং জাবিরও প্রত্যেক বারই ফিরে আসলেন। অবশেষে রাসূল (সা) জাবিরকে হাত ধরে উটের কাছে নিয়ে গেলেন এবং উটটি ধরে জাবিরকে বললেন, এই ধর তোমার উট। ইত্যবসরে কাফিলার লোকেরা অনেক দূর চলে গিয়েছিল। জাবির তাঁর উটের ওপর সাওয়ার হতেই উটটি এত দ্রুত গতিতে চললো যে, সবার আগে পৌঁছে গেল। রাসূল (সা) জাবিরের নিকট থেকে উটটি খরীদ করার প্রস্তাব করেন। জাবির মূল্য ছাড়াই বিক্রি করতে রাজী হন। রাসূল (সা) বললেন, না তা হবে না, মূল্য তোমাকে নিতে হবে এবং মদীনা পর্যন্ত এর ওপর সাওয়ার হয়ে যাবে। এ ভাবে পথে উট কেনা বেচা হয়ে গেল। মদীনা পৌঁছে জাবির উট নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দরযায় হাজির হলেন। রাসূল (সা) উটটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন আর বললেনঃ খুব সুন্দর। তারপর বিলালকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, এক উকিয়া সোনা ওজন করে দাও এবং একটু বেশী দাও। অতঃপর রাসূল (সা) জাবিরকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উটের দাম পেয়েছেন কিনা। জাবির বললেন, হাঁ, পেয়েছি। তখন রাসূল (সা) জাবিরের হাতে উটটি তুলে দিয়ে বললেনঃ এই উট ও মূল্য দুইটিই নিয়ে যাও, সবই তোমার। জাবির খুব খুশী মনে উটসহ বাড়ী ফেরেন এবং ফুফুকে বলেন, দেখুন রাসূল (সা) আমাকে এক উকিয়া সোনা এবং উটটিও দান করেছেন। (বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী-২২/২০৯,২১০)

উপরোক্ত উটের ঘটনাটি বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন রকম বর্ণিত হয়েছে। ইবন 'আসাকির তাঁর তারীখে উট কেনা বেচার ঘটনাটি জাবির থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূল (সা) বললেন, "জাবির এই উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে?

-হাঁ,করবো।

-কত দামে?

–এক দিরহামে।

–এক দিরহামে একটি উট কেনা যায়?

–তাহলে দুই দিরহামে।

–না, আমি চল্লিশ দিরহামে তোমার উটটি কিনলাম এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাকে আমি ওর পিঠে চড়াবো। তারপর পূর্বে উল্লেখিতভাবে মদীনায় পৌঁছে উট কেনা–বেচার বাকী কাজ সম্পন্ন হয়। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৩/৩৮৭)।

মূল্যের অতিরিক্ত যে অর্থ জাবিরকে দেওয়া হয় তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) দান। এ কারণে জাবির সেই অর্থ ভিন্ন একটি থলিতে ভরে ঘরে হিফাজতে রেখে দেন। হাররা–র ঘটনার দিন শামবাসীরা তাঁর বাড়ীতে হামলা চালিয়ে অন্যান্য জিনিসের সাথে সেই থলিটিও লুট করে নিয়ে যায়। (মুসনাদ–৩/৩০৮, সীরাতু ইবন হিশাম–২/২০৬, ২০৭)

উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার শাসন আমলে একবার মদীনায় ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ হয়। এই চরম সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের নায়ক ছিল মুসলিম ইবন 'উকবা আল–মুররী, মদীনাবাসীরা তাকে বলতো মুসরিফ ইবন 'উকবা। এর কারণ হলো, মদীনাবাসীরা ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়াকে খলীফা বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর নিয়োগকৃত গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং তাঁর স্থলে 'আবদুল্লাহ ইবন হানজালাকে নিজেদের আমীর মনোনীত করে। অবশ্য এ কাজের সাথে সে সময়ে জীবিত কোন বিশিষ্ট সাহাবী একমত ছিলেন না।

হযরত জাবির তখন অন্ধ। তিনি মদীনার রাস্তাঘাটে বেড়াতেন, তাঁরই সামনে বাড়ী–ঘর লুট হতো ও সন্ত্রাসী কাজ চলতো। তিনি মৃতদেহের সাথে হোঁচট খেতেন, আর বলতেন যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) ভয় দেখাচ্ছে, তাদের জন্য ধ্বংস। মূলতঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করতেন ঃ 'যে মদীনাকে ভয় দেখাবে প্রকৃতপক্ষে সে আমার দুই পার্শ্বদেশের মধ্যে যা আছে তাকেই ভয় দেখাবে।' সন্ত্রাসীরা তাঁকে হত্যার জন্য ধরে নিয়ে যায়। তবে মারওয়ান নিজে তাঁকে নিরাপত্তা দান করে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২০৭, টীকা নং ৫)

জাবির বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) দানকৃত উটটি আমার নিকট খলীফা 'উমারের খিলাফতকাল পর্যন্ত ছিল। তিনি সেটা আমার নিকট থেকে নিয়ে সাদাকার উটের সাথে দিয়ে তাকে ভালো খাবার ও সুস্বাদু পানি দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। (তারীখু ইবন আসাকির–৩/৩৮৭)

'জাতুর রুকা' যুদ্ধের পর হিজরী পঞ্চম সনেই খন্দকের যুদ্ধ হয়। জাবির বলেন, আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এক সময় একটা কঠিন পাথর আমাদের সামনে পড়লো যা কোন ভাবেই আমরা কাটতে পারছিলাম না। বিষয়টি রাসূলল্লাহ (সা)কে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, আমি নেমে দেখছি। রাসূল (সা) একটি বড় কুড়াল নিয়ে আঘাত করলে পাথরটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। (হায়াতুস সাহাবা–১/৩২০, ২/১৯১)

রাসূল (সা) কুড়াল নিয়ে পাথর সরানোর জন্য যখন আসেন, জাবির তখন দেখেন ক্ষুধার জ্বালায় তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। (বুখারী–২/৫৮৮, ৭৮৯) এ দৃশ্য দেখে তিনি

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে যান এবং স্ত্রীকে বলেন, আজ আমি এমন এক দৃশ্য দেখেছি, যাতে ধৈর্য ধারণ করা যায় না। ঘরে কিছু থাকলে রান্না কর। তিনি ছাগলের একটি বাচ্চা জবেহ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার বাড়ীতে একটু আসুন এবং যা কিছু আছে তাই একটু খেয়ে নিন। রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে তিনদিন যাবত কোন খাবার ছিল না। তিনি দাওয়াত কবুল করলেন। শুধু কবুল নয় তিনি খন্দকে কর্মরত সকলের মাঝে সাধারণ ঘোষণাও দিয়ে দিলেন যে, জাবির তোমাদের সকলকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে। জাবির তো শুধু রাসূল (সা) ও সেই সাথে অতিরিক্ত দুই তিন জনের খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এই ঘোষণা শুনে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন; কিন্তু আদব ও ভদ্রতার খাতিরে চুপ থাকলেন। রাসূল (সা) খন্দকবাসীদের সংগে করে জাবিরের বাড়ীতে পৌছালেন এবং সেই প্রস্তুত খাবার সকলে পেট ভরে খাবার পরেও কিছু বেঁচে গেল। (বুখারী–২/৭৮৯) রাসূল (সা) জাবিরের স্ত্রীকে বললেন, বেঁচে যাওয়া খাবার তোমরা খাও এবং অন্য লোকদের কাছেও কিছু পাঠিয়ে দাও। কারণ, তারা অভুক্ত আছে। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২১৮, ২১৯, হায়াতুস সাহাবা–২/১৯১, ১৯২, ১৯৩)

হিজরী ষষ্ঠ সনে বনু মুসতালিকের যুদ্ধ হয়। রাসূল (সা) যাত্রার উদ্দেশ্যে বের হয়ে নামায পড়তে লাগলেন। এর পূর্বেই তিনি জাবিরকে কোন কাজে কোথাও পাঠিয়েছিলেন। জাবির ফিরে এলে রাসূল (সা) রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দান করেন। বনু মুসতালিকের পর আনমারের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধেও জাবির শরীক ছিলেন। (বুখারী, গুযওয়াতু আনমার)

এই বছরই হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'উমরাহ 'আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হলেন। জাবির বলেন, এই সফরে আমরা মোট চৌদ্দশত লোক ছিলাম। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩০৯) বাই'য়াতুর রিদওয়ানের প্রসিদ্ধ ঘটনা এই সফরেই ঘটে। হযরত জাবিরও বাই'য়াতের (শপথ) সৌভাগ্য অর্জন করেন। বাই'য়াতের সময় 'উমার রাসূলুল্লাহর (সা) হাত এবং জাবির 'উমারের হাত ধরে রেখেছিলেন। (মুসনাদ–৩/৩৬৯) জাবির বলেন, একমাত্র আল–জাদ্দু ইবন কায়স ছাড়া আর সকলেই বাই'য়াত করেছিল। আল্লাহর কসম, আমি যেন আজও দেখতে পাচ্ছি, সে তার উটের বগলের সাথে মিশে লুকিয়ে আছে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩১৬)

জাবির যখন রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করছিলেন তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ তোমরা সারা দুনিয়ার মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। (বুখারী, গুযওয়াতু হুদাইবিয়া) এই বাই'য়াত সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবীরা পরবর্তীকালে বলতেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বাই'য়াত করেছিলাম। কিন্তু জাবির বলতেন, আমরা মৃত্যুর ওপর বাই'য়াত করিনি। আমরা বাই'য়াত করেছি এই কথার ওপর যে, আমরা পালিয়ে যাব না। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩১৫)

সাহাবীরা হুদাইবিয়া থেকে চলা শুরু করেন। পথে 'সুকইয়া' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি হয়। সেখানে পানি ছিল না। হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালের (রা) মুখ দিয়ে ঘোষণা হলো– কেউ যদি পানি পান করাতো। ঘোষণা শুনে জাবির (রা) কয়েকজন আনসারকে সংগে করে পানির সন্ধানে বের হলেন। তেইশ মাইল দূরে 'কুরসায়া' নামক স্থানে পানির সন্ধান পান। সেখানে থেকে মশকে ভরে পানি আনেন। 'ঈশার নামাযের পর দেখেন, এক ব্যক্তি উটে

সাওয়ার হয়ে হাউজের দিকে যাচ্ছে। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলে কারীম (সা)। জাবির (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) উটের লাগাম টেনে ধরে উট বসিয়ে দেন। রাসূল (সা) নেমে নামায আদায় করেন। জাবির নিজেও রাসূলের (সা) পাশে দাঁড়িয়ে নামাযে শরীক হন। (মুসনাদ–৩/৩৮০)

হিজরী অষ্টম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে একটি বাহিনী পাঠান। এই বাহিনীর আমীর ছিলেন আবু 'উবাইদা। ইসলামের ইতিহাসে এই অভিযান ছিল একটি আশ্চর্যজনক পরীক্ষা। মুসলমানরা এ পরীক্ষায় পূর্ণরূপে কামিয়াব হয়। জাবিরও ছিলেন এই বাহিনীর একজন সদস্য। বাহিনীর লোকদের খাদ্য খাবার সব শেষ হয়ে গেল। তারা গাছের পাতা খাওয়া শুরু করলো। হঠাৎ একদিন তারা সাগর তীরে বিশাল এক মরা মাছ দেখতে পেল। লোকেরা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে করে মাছটি খাওয়া শুরু করলো।

মাছটি এত বড় ছিল যে, বাহিনীর আমীর মাছটির পাঁজরের একটি কাটা সোজা করে ধরেন এবং তার নীচ দিয়ে সবচেয়ে উঁচু উটটি পার হয়ে গেল। জাবির পাঁচজন লোকের সাথে মাছটির একটি চোখের গর্তের মধ্যে বসে পড়েন; কিন্তু তাতে তাঁদের কোন কষ্ট হলো না। তিন শো লোক পনেরো দিন পর্যন্ত মাছটি খেয়েছিল। মাছটির নাম ছিল 'আম্বর। (মুসনাদ আহমাদ–৩/৩০৮) হায়াতুস সাহাবা–২/২০৮, ২০৯, ৩/৩৬৯, ৬৪০)

সীরাত লেখকরা হুনাইন ও তাবুক অভিযানে জাবিরের যোগদানের কথা উল্লেখ করেছেন। হিজরী দশম সনে বিদায় হজ্জেও তিনি শরীক ছিলেন। (মুসনাদ–৩/৩৪৯, ২৯২) তবে তিনি খাইবার অভিযানে অনুপস্থিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা) তাঁকে অংশগ্রহণকারী লোকদের সমান গনীমাতের অংশ দান করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩৪৯) হিজরী ৩৭ সনে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে জাবির আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করেন। (উসুদুল গাবা–১/২৫৭)

হিজরী ৪০ সনে আমীর মু'য়াবিয়ার গভর্নর (আমিল) বুসর ইবন আরতাত হিজায ও ইয়ামনে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসেন এবং মদীনায় এক ভাষণ দান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যতক্ষণ জাবির আমার সামনে হাজির না হবে ততক্ষণ বনু সালামাকে আমান বা নিরাপত্তা দেওয়া হবে না। জাবির জীবনের আশংকা করছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট গিয়ে পরামর্শ করেন। উম্মু সালামা তাঁকে বলেন, আমি আমার ছেলেদেরকেও বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করতে বলেছি, তুমিও বাই'য়াত করে নাও। জাবির বলেন, এটা তো হবে গোমরাহীর ওপর বাই'য়াত। উম্মু সালামা বলেন, না, এটা হবে মজবুরী বা বাধ্য অবস্থার বাই'য়াত। আমার মত এটাই। তাঁর পরামর্শ মত জাবির বুসরের সামনে হাজির হন এবং হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার খিলাফতের সপক্ষে বাই'য়াত করেন।

হিজরী ৭৪ সনে হাজ্জাজ ছিলেন মদীনার গভর্নর। তাঁর যুলুম অত্যাচার থেকে সাহাবীরাও নিরাপদ ছিলেন না। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীর ওপর এতটুকু করুণা করেন যে, তাঁদের ঘাড়ে, আর জাবিরের হাতে সীল মোহর মেরে দেন। (উসুদুল গাবা–২/৩৬৬) শেষ জীবনে জাবির বলতেন, আমি আকাবায় উপস্থিত ছিলাম। হাজ্জাজ ও তার কর্মকান্ডও প্রত্যক্ষ করেছি। আমার চোখের মত কান দু'টিও যদি নষ্ট হয়ে যেত, কতই না ভালো হতো। তাহলে অনেক কিছুই আমাকে শুনতে হতো না। হাজ্জাজ বলতেন, জাবিরের এই কথা যখন আমার কানে গেল তখন তাঁকে হত্যা না করার যে অনুশোচনা অনুরূপ অনুশোচনা অন্য কোন

ব্যাপারে আমার হয়নি। এ কথা শুনে 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাকে বলেন, তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৪৯)

হযরত জাবির শেষ জীবনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। চোখেও দেখতেন না। তার ওপর সরকারের জুলুম অত্যাচার তাঁকে আরও কাহিল করে দেয়। তাঁর মৃত্যুসন ও মৃত্যুর সময় বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। মৃত্যুসন হিজরী ৭৮, ৭৭, ৭৪ অথবা ৭৩ বলা হয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ৭৮ সনে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন তৃতীয় আকাবায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশেষ দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী। (শাজারাতুজ জাহাব ফীমান জাহাব–১/৮৪, তারীখু ইবন আসাকির–৩/৩৮৬, আল–ইসাবা–১/২৪৮)

ওয়াকিদী বলেন, জাবির ছিলেন মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। কাতাদাহও এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম বাগাবী বলেন, এটা একটা ভিত্তিহীন ধারণামাত্র। প্রকৃত পক্ষে সাহল ইবন সা'দই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী মদীনার সর্বশেষ সাহাবী। তিনি হিজরী ৯১ সনে মারা যান। (আল–ইসাবা–১/২১৩), শাজারাতুজ জাহাব–১/৪, আনসাবুল আশরাফ–১/২৪৮)

তৃতীয় আকাবায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এ সময় পর্যন্ত একমাত্র জাবিরই জীবিত ছিলেন। আর সাহাবীদের যুগও তখন শেষ হতে চলেছিল, অল্প সংখ্যক সাহাবী জীবিত ছিলেন। এই কারণে তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর অস্তিত্ব ছিল রহমত ও বরকত স্বরূপ।

হাজ্জাজের যুলুম অত্যাচার তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিজেও সহ্য করেছিলেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করে যান যে, হাজ্জাজ যেন তাঁর জানাযার নামায না পড়ায়। এ কারণে হযরত 'উসমানের ছেলে আবান ইবন 'উসমান জানাযার নামায পড়ান। ইমাম বুখারী ও তাবারী তাদের তারীখে উল্লেখ করেছেন যে, হাজ্জাজ তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাহজীবুত তাহজীব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হাজ্জাজই জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। (আল–ইসাবা–১/২১৩, তারীখু ইবন আসাকির–৩/৩৯১)

হযরত জাবির পিতার শাহাদাতের পর এক সতীচ্ছদা (সায়িবা) মহিলাকে বিয়ে করেন। এ সম্পর্কে মুসনাদে আহমাদ ও বুখারীতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জাবির এক সফর থেকে ফিরছিলেন। মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি নতুন বিয়ে করেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু তাড়াতাড়ি পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারি। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি বিয়ে করেছো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কুমারী না (সাইয়্যিবা) সতীচ্ছদা মহিলা? বললেন ঃ সতীচ্ছদা। রাসূল (সা) তখন বললেন ঃ তুমি একটি কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তোমরা পরস্পর খেল তামাশা করতে পারতে। জাবির বললেন, আমার পিতা উহুদে শহীদ হন এবং আমার ওপর কতকগুলি ছোট মেয়ের দায়িত্ব দিয়ে যান। আমি তাদেরই মত কাউকে বিয়ে করতে চাইনি। আমার প্রয়োজন ছিল কোন বয়স্কা মহিলার যে তাদের চিরুনী করে দিতে পারে, বেনী বাঁধতে পারে এবং কাপড় সেলাই করে পরিয়ে দিতে পারে। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি ঠিক

কাজটি করেছ। (বুলুগুল আমানী মিন আসরারি ফাতহির রাব্বানী-৬/১৪৬, ২২/২০৯, বুখারী-২/৫৮০, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২০৭)। বনু সালামা গোত্রে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ইসলামে পাত্রী দেখে বিয়ের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তিনি বিয়ের পয়গামের পর লুকিয়ে পাত্রী দেখে নেন। প্রথম স্ত্রীর নাম সুহাইলা বিনতু মাসউদ। তিনি বনু জুফার গোত্রের কন্যা ও সাহাবিয়্যা ছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম উম্মুল হারিস। তিনি আউস গোত্রের সম্মানিত সাহাবী মুহাম্মাদ ইবন মাসলামার কন্যা। তাঁর সন্তানদের মধ্যে 'আবদুর রহমান, 'আকীল, মুহাম্মাদ, হামীদা, মায়মুনা ও উম্মু হাবীব এই কয়জনের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত জাবিরের জ্ঞান অর্জনের সূচনা হয় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দারসগাহ বা শিক্ষা নিকেতনে। তাছাড়া মাদ্রাসা-ই-নববীর কৃতি ছাত্রদের হালকা-ই-দারস থেকেও ইলম হাসিল করেন। আবু বকর সিদ্দীক, 'উমার, আলী, আবু 'উবাইদা, তালহা, মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবু বারদাহ ইবন নাযার, আবু কাতাদাহ, আবু হুরাইরা, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, আবু হুমাইদ সা'ঈদী, 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস উম্মু, শুরাইক, উম্মু মালিক, উম্মু মুবাশশির, উম্মু কুলসুম বিনতু আবী বকর (রা)- এই মহান ব্যক্তিবর্গের সকলেই ছিলেন তাঁর সম্মানিত শিক্ষক। (তাহজীবু আসমা ওয়াল লুগাত-১/১৪২)

হাদীস শোনা ও সংগ্রহের প্রতি তাঁর আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, একটি মাত্র হাদীস শোনার জন্য মাসের পর মাস ভ্রমণ করতেন। জাবির বলেন ঃ খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছিল এমন এক ব্যক্তির বর্ণিত একটি হাদীস আমি পেলাম। অতঃপর আমি একটি উট খরীদ করে প্রস্তুত করলাম এবং তার ওপর সাওয়ার হয়ে এক মাস পর শামে (সিরিয়া) পৌছলাম। সেখানে পৌছে দেখি তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন উনাইস। আমি তাঁর দারোয়ানকে বললাম ঃ বল, জাবির দরযায় দাঁড়িয়ে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আবদুল্লাহর ছেলে জাবির? বললাম ঃ হাঁ। তিনি কাপড় টানতে টানতে ছুটে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। বললাম ঃ কিসাস-এর ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে একটি হাদীস শুনেছেন বলে আমি জেনেছি। হাদীসটি আপনার মুখ থেকে শোনার আগেই আমি অথবা আপনি মারা যান কিনা, এই ভয়ে ছুটে এসেছি। তারপর আবদুল্লাহ ইবন উনাইস তাঁর কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৬)

এমনিভাবে একটি মাত্র হাদীস শোনার জন্য তিনি মিসর সফর করেন। মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রা) থেকে তাবারানী তাঁর 'আল-আসওয়াত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি যখন মিসরে তখন একদিন দারোয়ান এসে বললো, একজন বেদুঈন উটের পিঠে দরযায় অপেক্ষমান, আপনার সাথে দেখা করতে চায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে আপনি? বললেন ঃ জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী। আমি বললাম ঃ আমি নিচে আসবো না আপনি উপরে উঠে আসবেন। বললেন ঃ আপনার নেমে আসার দরকার নেই, আর আমিও উঠবো না। শুনেছি আপনি 'সাতরুল মুমিন' সম্পর্কিত একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করে থাকেন, আমি সেই হাদীসটি আপনার মুখ থেকে শোনার জন্যই এসেছি। আমি হাদীসটি বর্ণনা করলাম। হাদীসটি শুনেই তিনি উটকে চাবুক মেরে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। (হায়াতুস

সাহাবা-৩/১৯৭, তারীখু ইবন 'আসাকির-৩/৩৮৬, সীয়ারে আনসার-১/৩০১)

ইল্ম হাসিলের পর্ব শেষ করে তিনি তাদরীসের (শিক্ষা দান) আসনে বসেন। মসজিদে নববীতে তাঁর একটি হালকা-ই-দারস ছিল। (আল-আ'লাম-২/৯২) মক্কা, মদীনা, ইয়ামন, কুফা, বসরা, মিসর প্রভৃতি স্থানের ছাত্ররা তাঁর দারসে শরীক হতো। হাদীসের প্রচার ও প্রসার ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা-১৫৪০ (এক হাজার পাঁচ শো চল্লিশ)। তার মধ্যে ৬০টি (ষাট) মুত্তাফাক 'আলাইহি, ২৬টি (ছাব্বিশ) বুখারী ও ১২৬টি (একশো ছাব্বিশ) মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১৪২, আল-আ'লাম-২/৯২) তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন ঃ একটি হাদীস বর্ণনাকালে 'সামি'তু' (আমি শুনেছি) শব্দটি বলতে গিয়ে থেমে যান। পরে নিজের পক্ষ থেকে হাদীসটি 'মাওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেন। কারণ, হাদীসটির সবগুলি শব্দ তিনি নিজ কানে রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শোনার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেননি। (মুসনাদ-৩/৩৩৩)

তাঁর ছাত্রদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাবে'ঈদের সব ক'টি স্তরের বিশিষ্ট মুহাদ্দিসীন তাঁর ছাত্র ছিলেন। বিশেষ খ্যাতিমান কয়েকজন তাবে'ঈর নামঃ সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবু সালামা, সা'ঈদ ইবন মীনা, সা'ঈদ ইবন আবী বিলাল, আসিম ইবন উমার ইবন কাতাদাহ, আবু আয-যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, আশ-শা'বী, আবু সুফইয়ান তালহা ইবন নাফি, আল-হাসান আল-বাসরী, মুহাম্মাদ আল-বাকি, 'আতা', সালিম ইবন আবীল জু'দ, 'আমর ইবন দীনার, মুজাহিদ, মুহাম্মাদ আল-বাকির, আল-হাসান ইবন মুহাম্মাদ আল-হানাফিয়্যা প্রমুখ। (তাজকির'তুল হুফ্ফাজ-১/৪৪, তাহজীবুল আসমা' ওয়ালগাত-১/১৪৪) তাবে'ঈরা ছাড়াও সাহাবীদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-আ'লাম-২/৯২) আল্লামা জাহ্বী তাঁর 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে প্রথম তবকার (শ্রেণী) মুহাদ্দিসীনের মধ্যে জাবিরের নামটি উল্লেখ করেছেন।

হাদীস ছাড়া তাফসীর ও ফিকাহ শাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর বর্ণনা কম পাওয়া গেলেও যা আছে তা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। সব মানুষের জাহান্নামে অবতরণের ব্যাপারে লোকদের মতভেদ ছিল। কেউ মনে করতো, কোন মুসলমান জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অনেকের ধারণা ছিল, সব মানুষই একবার জাহান্নামে যাবে, তবে মুসলমানরা মুক্তি পাবে। এ ব্যাপারে জাবিরকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, নেককার ও বদকার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। তবে নেককারদের গায়ে আগুনের ছোঁয়া লাগবে না। তারপর মুত্তাকীরা (খোদাভীরু) মুক্তি পাবে এবং যালিমরা জাহান্নামেই থেকে যাবে। (মুসনাদ-৩/৩২৯)

তালাক ইবন হাবীব 'শাফা'য়াত' (শুফারিশ) অস্বীকার করতেন। এ ব্যাপারে তিনি 'খুলুদ ফিন্নার' (অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান) সম্পর্কিত যাবতীয় আয়াত তিলাওয়াত করে জাবিরের সাথে মুনাজিরা ও তর্ক-বাহাছ করেন। হযরত জাবির তাঁর সব কথা শোনার পর বললেন ঃ সম্ভবতঃ তুমি নিজেকে কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী মনে করছো। তালাক ইবন হাবীব বললেন ঃ আসতাগফিরুল্লাহ। এমনটি কল্পনাও করতে পারিনে। তখন জাবির বলেন, শোন। এ সব আয়াতের উদ্দেশ্য মুশরিকগণ। যাদেরকে শাস্তি দেওয়ার

পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে তাদের উল্লেখ এ সব আয়াতে নেই। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। (মুসনাদ–৩/৩৩০, হায়াতুস সাহাবা–৩/৪৯)

জাবির বললেন ঃ সূরা আল মুয্যাম্মিলের প্রথম দুইটি আয়াত দ্বারা আমাদের ওপর 'কিয়ামুল লাইল' ফরয করা হয়। রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাদের পা ফুলে যেত। পরে আল্লাহ একই সূরার ২০ নং আয়াত নাযিল করে পূর্বোক্ত আদেশ রহিত করেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৪১) জাবিরের মতে কুরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নাযিল হয় তা সূরা আল মুদ্দাস্সিরের কয়েকটি আয়াত (আনসাবুল আশরাফ–১/১০৭)

ফিকাহ শাস্ত্রেও তাঁর প্রভূত দখল ছিল। যে সব মাসয়ালা সমূহে বিভিন্ন সময়ে তিনি ফাতওয়া দিয়েছেন তা সংকলিত হলে ছোটখাট একটা গ্রন্থে পরিণত হবে। তিনি ছিলেন মদীনার অন্যতম মুফতী। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৫৫) ইসলামী আখলাক বা নৈতিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে ইকামাতে হুদুদিল্লাহ (আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন), ঈমানী আবেগ, সত্য প্রকাশের সৎ সাহস, আমর বিল মা'রূফ (সৎ কাজের আদেশ), রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসা, ইত্তেবা–ই–সুন্নাত (সুন্নাতের অনুসরণ), অন্য মুসলমানের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি ইত্যাদি। হযরত জাবিরের মধ্যে এই সব গুণের প্রত্যেকটির কিছু না কিছু বিকাশ ঘটেছিল।

ইকামাতে হুদুদিল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। এ ক্ষেত্রে জাবিরের নিকট আপন–পর কোন প্রভেদ ছিল না। হযরত মা'য়িয আল–আসলামী (রা) ছিলেন মদীনার বাসিন্দা ও রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম সাহাবী। তাঁকে 'রজম' (যিনার শাস্তি) করার সময় জাবির উপস্থিত থেকে নিজ হাতে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করেন। (মুসনাদ–৩/৩৮১)

সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কারও প্রভাব–প্রতিপত্তি তাঁকে কক্ষণও বিরত রাখতে অথবা বিপথগামী করতে সক্ষম হয়নি। হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) ছিলেন আউস গোত্রের নেতা। তাছাড়া একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী। তিনি ইনতিকাল করলে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বললেন ঃ আজ আরশ কেঁপে উঠেছে। এ হাদীসটি সাহাবী হযরত বারা' ইবন 'আযিবের (রা) জানা ছিল। কিন্তু তিনি 'আরশ' শব্দটির পরিবর্তে 'সারীর' (খাটিয়া) শব্দ বলতেন। যার অর্থ শববাহী খাটিয়া দুলে ওঠা। বারা' ইবন 'আযিবের (রা) এমন কথা জাবিরকে বলা হলে তিনি বললেন ঃ প্রকৃত হাদীস তো হচ্ছে তাই যা আমি বর্ণনা করেছি। আর বারা'–এর কথা হিংসা–বিদ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত। কারণে, ইসলাম পূর্ব যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ ছিল। উল্লেখ্য যে, হযরত জাবির (রা) ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। তাস ত্ত্বেও বারা ইবন 'আযিবকে সমর্থন না করে যা সত্য তাই প্রকাশ করে দেন।

হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ মদীনার গভর্নর হয়ে আসার পর নামাযের সময়ে কিছু আগে–পিছে করেন। লোকেরা জাবিরের কাছে ছুটে আসে। তিনি ঘোষণা করেন, রাসূল (সা) জুহরের নামায দুপুরের পরে, 'আসর সূর্য স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত, সূর্যাস্তের সময় মাগরিব ও ফজরের নামায অন্ধকারে আদায় করতেন। আর 'ঈশার সময় লোকদের জন্য অপেক্ষা করতেন। তাড়াতাড়ি লোক সমাগম হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। অন্যথায় দেরী করতেন। (মুসনাদ–৩/৩৬৯)

একবার 'আবদুল্লাহ ইবন জাবির তাঁর বাগানের ফল তিন বছরের জন্য বিক্রি করেন।

জাবির (রা) এ কথা জানতে পেয়ে কিছু লোক সংগে করে মসজিদে আসেন এবং সকলের সামনে ঘোষণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ধরনের বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন। ফল যতক্ষণ খাওয়ার উপযোগী না হয় ততক্ষণ তা বেচা-কেনা জায়েয নয়। (সুতরাং ফল হওয়ার পূর্বেই তা কিভাবে জায়েয হতে পারে?) মুসনাদ-৩/৩৯৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইত্তেবা 'বা অনুসরণের আবেগ-উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে, যে সকল বিষয়ে অনুসরণ আদৌ প্রয়োজনীয় নয় সে ক্ষেত্রেও অনুসরণ করতেন। একবার রাসূলুল্লাহকে (সা) মাত্র একখানা কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেন। এ কারণে তিনিও সেই ভাবে নামায আদায় করলেন। লোকেরা যখন বললো আপনি এভাবে নামায আদায় করলেন, অথচ আপনার নিকট অতিরিক্ত কাপড় আছে। তিনি বললেন, এটা এই জন্য করলাম যে, তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) এই অনুমতিকে দেখে বুঝতে পার।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে ফাত্হ-এ তিন দিন দু'আ করেছিলেন। তৃতীয় দিন নামাযের মধ্যে দু'আ কবুল হলে চেহারা মুবারকে এক প্রকার নূরের চমক খেলে যায়। হযরত জাবির এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই যখনই তিনি কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতেন, একটা নির্দষ্ট সময়ে সেখানে গিয়ে দু'আ করতেন। (মুসনাদ-৩/৩৩২)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা এবং তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রবল আগ্রহ। আর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তৃতীয় 'আকাবার বাই'য়াতে। তাছাড়া আরও বহু ঘটনায় দেখা যায় রাসূলকে (সা) খুশী করার কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না তিনি করছেন।

একবার কিছু উৎকৃষ্টমানের খেজুর রাসূলের (সা) খিদমতে পেশ করেন। তিনি দেখে বলেন, আমি মনে করেছিলাম গোশত। জাবির বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে কথাটি বলেন। তারপর তক্ষুণি বকরী জবেহ করে গোশত রান্না করে দেন।

একবার রাসূল (সা) জাবিরের বাড়ীতে আসলেন। জাবির একটি বকরী জবেহ করে দেন। জবেহের সময় বকরীটি কিছু ডাকাডাকি করছিল। তাই শুনে তিনি বললেন, বংশ ও দুধ শেষ করে দিচ্ছ কেন? জাবির বললেন ঃ এটা এখনও বাচ্চা, খেজুর খেয়ে এমন মোটা হয়েছে।

একবার তিনি ঢালে করে খেজুর নিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় রাসূলকে (সা) সামনে দিয়ে যেতে দেখে খাওয়ার আহ্বান জানালেন। রাসূল (সা) আহবানে সাড়া দিলেন। আর একবার জাবির রাসূলকে (সা) বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গোশ্ত, খুরমা ও পানি উপস্থাপন করেন। রাসূল (সা) বলেন, তোমরা হয়তো জান আমি গোশ্ত খুব পসন্দ করি। বিদায় বেলা অন্দর মহল থেকে জাবিরের স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। তক্ষুণি তিনি বললেন ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহিম- হে আল্লাহ, তাদের সকলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। (মুসনাদ-৩/২৯৭, ৩০৩, বুখারী-২/৫৮০)

একবার কোন এক বিশেষ ঘটনায় রাসূল (সা) তাঁর জন্য পঁচিশবার মাগফিরাত কামনা করেন। একবার জাবিরের অসুখ হলো। রাসূল (সা) দেখতে আসলেন। জাবির বেঁহুশ ছিলেন। রাসূল (সা) অযু করে পানির ছিটা দিলে তাঁর হুঁশ হলো। তখন পর্যন্ত জাবিরের কোন সন্তানাদি ছিল না। পিতাও মারা গিয়েছিলেন। শরী'য়াতের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকে 'কালালাহ' বলে। যেহেতু জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাই রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, আমি

মারা গেলে আমার মীরাস বা উত্তারাধিকার কিভাবে বন্টিত হবে? আমি কি $\frac{২}{৩}$ (দুই তৃতীয়াংশ) বোনদের দেব? বললেন; বেশ, দাও। আবার আরজ করলেন ঃ $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক) দিই? বললেন; হাঁ, তাও দিতে পার। একথা বলে রাসূল (সা) বাইরে বেরিয়ে আসেন। তারপর আবার ফিরে গিয়ে বললেন ঃ জাবির, তুমি এ অসুখে মরবে না। তোমার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে। এই বলে তিনি সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতুল কালালাহ পাঠ করেন ঃ 'হে নবী, লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন · · · ·।' (তারীখু ইবন আসাকির-৩/৩৯০, হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৯, মুসনাদ-৩/২৯৮, ৩৭২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) কোথাও খাবারের দাও'য়াত পেলে জাবিরকে মাঝে মাঝে সংগে নিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েও আহার করাতেন। একদিন জাবির তাঁর বাড়ীর পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় সামনে দিয়ে রাসূলকে (সা) যেতে দেখলেন। দৌড়ে কাছে গেলেন এবং আদব রক্ষার্থে পেছনে চলতে লাগলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ পাশে এস। তারপর জাবিরের হাত ধরে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান এবং পর্দা সরিয়ে ভেতরে বসতে দেন। ভেতর থেকে তিন টুকরো রুটি ও একটু সিরকা আসলো। রাসূল (সা) রুটি তিনটি সমান দুই ভাগে ভাগ করলেন এবং বললেন ঃ সিরকা খুব উপাদেয় তরকারি। জাবির বলেন ঃ আমি সেই দিন থেকে সিরকা খুব ভালোবাসি। (মুসনাদ-৩/৩৭৯, ৪০, হায়াতুস সাহাবা-২/১৮৩)

একবার রাসূল (সা) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান। জাবির তাঁকে দেখতে যান (মুসনাদ-৩/৩০০) রাসূলুল্লাহর (সা) কখনও ঋণের প্রয়োজন হলে জাবিরের নিকট থেকে গ্রহণ করতেন। একবার ঋণ নিয়ে পরিশোধের সময় সন্তুষ্ট চিত্তে আসলের ওপর কিছু বেশী দান করেন। (মুসনাদ-৩/৩০২)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ পর্যায়ে একবার বাহরাইন থেকে মাল আসছিল। তিনি সেই মাল থেকে জাবিরকে কিছু দেওয়ার অঙ্গিকার করেন। ইত্যবসরে রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হয়ে ঘোষণা দেন যে, রাসূল (সা) যদি কাউকে কিছু দেওয়ার অঙ্গিকার করে থাকেন অথবা কারও নিকট ঋণী থাকেন, সে যেন আমার নিকট থেকে তা গ্রহণ করেন। হযরত জাবির রাসূলুল্লাহর (সা) অঙ্গিকারের কথা বললে আবু বকর (রা) তা পূরণ করেন।

মুসলিম উম্মার প্রতি হযরত জাবিরের ছিল গভীর মমতা ও ভালোবাসা। তিনি ছিলেন 'রুহামাউ বাইনাহুম'- (পরস্পর পরস্পরের প্রতি দয়ালু)-এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। একবার তাঁর এক প্রতিবেশী কোথাও সফরে যায়। সফর থেকে ফিরে আসলে জাবির তার সাথে দেখা করতে যান। লোকটি মানুষের মধ্যে বিভেদ, দলাদলি, বিদ'য়াতের প্রচলন ইত্যাদি যা সে দেখেছিল, বর্ণনা করলো। যে সাহাবায়ে কিরাম রক্তের বিনিময়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা এমন কথা সহ্য করবেন কেমন করে। তাঁর চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, রাসূল (সা) সত্যই বলেছেন, মানুষ যেমন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তেমনি বের হয়েও যাবে। (মুসনাদ-৩/৩৪৩)

তাঁর বাসস্থান ছিল মসজিদে নববী থেকে এক মাইল দূরে। এত দূর থেকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে মসজিদে নববীতে আসতেন। একবার মসজিদে নববীর পাশে কিছু বাড়ী-ঘর খালি হয়। জাবির ও বনু সালামার অন্য এক ব্যক্তি এই সব শূন্য বাড়ী-ঘরে চলে আসার ইচ্ছা করলেন। তাহলে নামায আদায় করা সহজ হবে। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা যে সেখান থেকে আস, তাতে তোমাদের প্রতি কদমে সাওয়াব লেখা হয়। চিন্তা করে দেখ তো কত সাওয়াব হয়েছে? তাঁরা দু'জন মনে প্রাণে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা মেনে নেন। শেষ জীবনে বাড়ীর পাশে একটি মসজিদ তৈরী করেন।

জাবির বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আবু 'উবাইদার নেতৃত্বে আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠান। একটি থলিতে কিছু খেজুর ছাড়া আমাদের সাথে আর কিছুই ছিল না। আবু 'উবাইদা আমাদেরকে প্রতিদিন মাত্র একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা সেটি বাচ্চাদের মত চুষতাম আর পানি পান করতাম। এভাবে একটি খেজুর দিয়ে রাত্রি পর্যন্ত চালাতাম (হায়াতুস সাহাবা-১/৩২১)

ইবন হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে আবুল মুসাববিহ আল-মুকরায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মালিক ইবন 'আবদিল্লাহ আল-খাস'য়ামীর নেতৃত্বে আমরা একবার রোমের মাটিতে চলছিলাম। একদিন মালিক জাবিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তিনি তাঁর বাহন খচ্চরটিকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলছেন। মালিক বললেন ঃ আবু আবদিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে বাহন দিয়েছেন, তার পিঠে আরোহণ করুন। জাবির বললেন ঃ আমি তাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় যে দু'টি পা ধুলি-মলিন হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৬, ৪৭৭)

হযরত জাবির হজ্জ আদায় করেছেন কয়েকবার। হাদীসে তাঁর দু'টি হজ্জের আলোচনা দেখা যায়। একটি বিদায় হজ্জ ও অন্য আর একটি।

সরলতা মুসলমানদের উন্নতির মূল রহস্য। হযরত জাবির ছিলেন অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর। একবার সাহাবায়ে কিরামের একটি দল তাঁর বাড়ীতে আসলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে রুটি ও সিরকা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি বললেন ঃ বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিন। সিরকার খুব মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। মানুষের কাছে তার আত্মীয় বন্ধুদের কেউ আসলে উপস্থিত খাবার যা কিছু থাকে সামনে দিতে হবে, কোন রকম ইতস্ততা করা উচিত নয়। তেমনি ভাবে উপস্থিত লোকদের সামনে যা কিছু খাবার হাজির করা হয় সন্তুষ্ট চিত্তে আহার করা উচিত। হেয় দৃষ্টিতে তা দেখা উচিত নয়। কারণ, ভনিতার মধ্যে উভয়ের ধ্বংসের উপকরণ বিদ্যমান। (হায়াতুস সাহাবা-২/১৮১, মুসনাদ-৩/৩৭১) মানুষের সাথে মেলামেশায় তিনি ছিলেন আন্তরিক ও উদার।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতিটি অভ্যাস ও আচরণ তাঁর মন-মগযে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছিল। হুদাইবিয়ায় 'বাই'য়াতে রিদওয়ান' একটি গাছের নীচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লোকেরা স্থানটিকে বরকত ও কল্যাণময় মনে করে সেখানে নামায আদায় করতে শুরু করে। এ অবস্থা দেখে হযরত উমার (রা) গাছটি কেটে ফেলেন। মুসায়্যাব ইবন দুখন বলেন, পরের বছরই

আমরা সেই গাছটি ও স্থানের কথা ভুলে যাই। (বুখারী–২/৫৯৯) কিন্তু বহু বছর পর্যন্ত জাবিরের তা মনে ছিল। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। হুদাইবিয়ার প্রসঙ্গ উঠলে একবার বললেন ঃ আজ যদি চোখ থাকতো, সেই স্থানটি আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম। (বুখারী–২/৫৯৮)

হযরত জাবির বলতেন, হুদাইবিয়ার সন্ধিই হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত প্রকৃত ফাত্হ বা বিজয়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৮) জাবির আরও বলতেন, রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির খবর সর্বপ্রথম মদীনায় আসে এক জিনের মাধ্যমে। মদীনার এক মহিলার অনুগত একটি জিন ছিল। একদিন জিনটি একটি সাদা পাখীর রূপ ধরে মহিলার বাড়ীর দেওয়ালে এসে বসে। মহিলা তাকে বললো ঃ নীচে নেমে এসো আমরা কথা বলি, খবর আদান–প্রদান করি। জিন বললো ঃ মক্কায় এক নবীর আবির্ভাব হয়েছে। তিনি যিনা (ব্যভিচার) হারাম করেছেন এবং আমাদেরকে যমীনে থাকতে নিষেধ করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৭৩)

জাবির (রা) বলেন ঃ আমি একবার এক দিরহামের গোশত কিনলাম। 'উমার একথা শুনে আমার কাছে এসে বললেন ঃ জাবির, এটা কি? বললাম ঃ আমার পরিবারের লোকদের গোশ্ত খেতে খুব ইচ্ছা করেছে তাই এক দিরহামের গোশত কিনেছি। 'উমার কয়েকবার আমার কথাটি আওড়ালেন, 'আমার পরিবারের লোকদের গোশ্ত খেতে খুব ইচ্ছা করেছে।' তখন আমার ইচ্ছা হলো, যদি আমার দিরহামটি হারিয়ে যেত অথবা 'উমারের সাথে দেখা না হতো। অন্য একটি বর্ণনা মতে 'উমার বলেন, তোমাদের কোন ইচ্ছা হলেই এভাবে কিনে থাক? (হায়াতুস সাহাবা–২/৩০২,৩০৩)

এভাবে হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে হযরত জাবিরের (রা) জীবনের বিভিন্ন দিকের অনেক টুকরো টুকরো কথা পাওয়া যায়, যার মধ্যে মুসলমানদের শিক্ষার অনেক কিছুই লুকিয়ে আছে।

আবু আইউব আল-আনসারী (রা)

নাম খালিদ, ডাক নাম আবু আইউব। পিতা যায়িদ ইবন কুলাইব আল-নাজ্জারী আল-খাযরাজী। কেউ কেউ মালিক ইবন নাজ্জারের সাথে সম্পর্কের কারণে 'আল-মালিকী' এবং আনসারদের 'আযদী' হওয়ার কারণে তাঁকে 'আল-আযদী' বলেও উল্লেখ করে থাকেন। (দায়িরা-ই মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা, উর্দু ১/৭৪২), মাতা হিন্দা বিনতু সা'দ। (উসুদুল গাবা-২/৮০) তবে ইবন সা'দের মতে যাহরা বিনতু সা'দ। (তাবাকাত-৩/৪৮৪) 'যাহরা' আবু আইউবের পিতার মামাতো বোন। আবু আইউব চল্লিশ 'আমুল ফীল' (হস্তী বৎসর) অর্থাৎ হিজরাতের একত্রিশ বছর পূর্বে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি 'আবু আইউব' ডাক নামে পরিচিত। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা, (উর্দু)-১/৭৪২) নাজ্জার খান্দানটি ইয়াসরিবের অন্যতম অভিজাত খান্দান। আর সেই আভিজাত্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) মাতুল গোত্র হওয়ার কারণে। আবু আইউব এই অভিজাত নাজ্জার গোত্রের রয়িস বা নেতা।

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চলেছেন। ইসলামী দাওয়াতের জন্য মক্কার প্রতিকূল অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই ধাবিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইয়াসরিবেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। নবুয়াতের দশম বছরে ছয় জন, একাদশ বছরে বারোজন এবং দ্বাদশ বছরে তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জন ইয়াসরিববাসী (মদীনা বাসী) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একটি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন। ইতিহাসে যা 'আকাবার ১ম, ২য় ও ৩য় শপথ' নামে পরিচিত। এই শেষ শপথে আবু আইউব উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত হয়ে ইয়াসরিবে ফিরে যান। (উসুদুল গাবা-২/৮০, তাবাকাত ৩/৪৮৪) তিনি যে মহাসত্যের সন্ধান নিয়ে ফিরে এলেন তা অন্যদেরকে না জানানো পর্যন্ত স্থির হতে পারলেন না। নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের আপনজনদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। শিগগিরই স্ত্রীকে স্বধর্মে টেনে আনলেন।

আকাবার শপথগুলিতে মদীনার বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করায় এবং মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি মুসয়াব ইবন 'উমাইরের (রা) প্রচেষ্টায় সেখানে ইসলামী দাওয়াত খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে অনেক নির্যাতিত মুসলমান মক্কা থেকে চুপে চুপে হিজরাত করে মদীনায় চলে আসতে শুরু করলেন। কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখনও কুরাইশদের বৈরী পরিবেশের মধ্যে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। অবশেষে নবুওয়াতের এয়োদশ বছরে আল্লাহর নির্দেশে তিনিও মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লেন।

মদীনাবাসীরা অধীর আগ্রহে মহানবীর আগমন অপেক্ষায় ছিল। আনসারদের একটি

দল- আবু আইউব তাদের একজন- নিয়মিত প্রতিদিন সকালে মদীনার ৪/৫ মাইল দূরে 'হাররা' নামক স্থানে চলে যেত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সম্ভাব্য আগমন পথের দিকে তাকিয়ে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। তারপর এক সময় তারা ফিরে যেত। এমনিভাবে একদিন তাঁরা ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় জনৈক ইয়াহুদী বহু দূর থেকে রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে পেয়ে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়। আনসাররা অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে মহানবীকে স্বাগতম জানানোর জন্য দ্রুত ছুটে যায়। বনু নাজ্জার ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী।

মদীনার উপকণ্ঠে 'কুবা' পল্লীতে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কয়েক দিন অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি মদীনার মূল শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কুবা থেকে মদীনার দিকে তাঁর যাত্রার সেই দিনটি ছিল মদীনার ইতিহাসের সর্বাধিক গৌরব ও কল্যাণময় দিন। বনী নাজ্জারসহ মদীনার সকল আনসার গোত্রের লোক মহানবীর চলার পথের দু'ধারে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে, আর গোত্র-পতিরা নিজ নিজ ঘরের দরযায় অপেক্ষমান। পর্দানশীন মেয়েরা ঘর থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে এবং হাবশী গোলামরা আনন্দ-ফুর্তিতে সামরিক কলা-কৌশল প্রদর্শনে মেতে উঠেছে। আর বনী নাজ্জারের ছোট ছেলে-মেয়েরা-'তালায়াল বাদরু আলাইনা'- স্বাগতম সঙ্গীতটি সমবেত কণ্ঠে গেয়ে চলেছে। এমনি এক জাঁকালো ও পবিত্র অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে মহানবী মদীনায় প্রবেশ করলেন।

মহানবীর আতিথেয়তার সৌভাগ্য কার হয় তা দেখার জন্য মদীনার প্রতিটি লোক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। তিনি পথ অতিক্রম করছেন, আর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা- আহলান, সাহলান ওয়া মারহাবান- স্বাগতম শুভাগমন ইত্যাদি বলে এগিয়ে এসে নিজ নিজ বাড়ীতে মেহমান হওয়ার আহবান জানাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ পাক তো মহানবীর আতিথেয়তার জন্য আবু আইউবের বাড়ীটি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহন উটনীটির পথ রোধকারীদের বার বার বলছিলেন ঃ 'তোমরা তার পথটি ছেড়ে দাও, সে (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্দেশ প্রাপ্ত।' (উসুদুল গাবা-২/৮০) ইমাম মালিক বলেন, সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মধ্যে ওহীর অবস্থা বিরাজমান ছিল। তিনি অবতরণ স্থল নির্ণয়ের ব্যাপারে ওহীর প্রতীক্ষায় ছিলেন [সীয়ারে আনসার (উর্দু)-১/১১০]

উটনী চলতে চলতে এক সময় বনী মালিক ইবন নাজ্জারের মধ্যে এক স্থানে (পরবর্তীকালে মসজিদে নববীর দরযায়) বসে পড়ে। তারপর একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার উঠে পড়ে এবং একটু এদিক সেদিক ঘুরে আবার পূর্ব স্থানে ফিরে এসে বসে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) নেমে পড়েন। নিকটেই ছিল আবু আইউবের বাড়ী। (উসুদুল গাবা-২/৮১) আবু আইউব এগিয়ে এসে আরজ করেন নিকটেই আমার বাড়ী, অনুমতি পেলে বাহনের পিঠ থেকে জিনিস পত্র নামাতে পারি। নিজের বাড়ীতে মেহমানদারি করার অভিলাষীদের ভিড় কিন্তু তখনও কমেনি। সবারই একান্ত ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ (সা) তারই মেহমান হউন। শেষমেষ লোকেরা নিজেদের মধ্যে কারয়া বা লটারী করে এবং তাতে আবু আইউবের নামটি ওঠে। এভাবে আবু আইউব মহানবীর

মেহমানদারির মহাগৌরব অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। (সীয়ারে আনসার-১/১১১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন তাঁর বাসস্থান তৈরী না হওয়া পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস আবূ আইউবের গৃহে অবস্থান করেন। অত্যন্ত প্রীতি ও বিনয়ের সাথে তিনি মেহমানদারির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ঘরটি ছিল দুইতলা। তবে ছাদটি ছিল সাদামাটা ধরনের। আবূ আইউব ওপরতলা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্ধারণ করেন। কিন্তু রাসূল (সা) নিজের ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নীচতলাই পছন্দ করেন। এভাবে দিন কেটে যেতে লাগলো। ঘটনাক্রমে একদিন ওপর তলায় পানির একটি কলস ভেঙ্গে পানি গড়িয়ে পড়লো। ছাদ ছিল অতি সাধারণ। পানি নীচে গড়িয়ে পড়বে এবং তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) কষ্ট হবে, এমন একটা ভীতি ও শঙ্কায় আবূ আইউব ও তাঁর স্ত্রী উম্মু আইউব অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁদের ছিল একটি মাত্র লেপ। পানি চুষে নেওয়ার জন্য তাঁরা সেটি পানির ওপর ফেলে দেন। সাথে সাথে তাঁরা নীচে নেমে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) ওপরে যাওয়ার অনুরোধ করে নিজেরা নীচে নেমে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। (উসুদুল গাবা-২/৮১)

এতটুকু কষ্ট অবশ্য তাঁদের জন্য তেমন কিছু ছিল না। তাঁরা অন্য একটি ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। 'আমরা ওপরে আর ওহীর বাহক, আমাদের নীচে' এমন একটা তীব্র অনুভূতি তাদেরকে অস্থির করে তুললো। একটি রাত তো তাঁরা ঘুমাতেই পারলেন না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ঘরের এক কোণে গুটি-গুটি মেরে কোন মতে জেগে কাটিয়ে দিলেন। সকালে আবূ আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে গতরাতের ঘটনা ও তাঁদের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন। তিনি ওপরে চলে যান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৮, হায়াতুস সাহাবা-২/৩২৮-৩২৯)

হয়রত আবূ আইউবের মৃত্যুর পর এই বাড়ীটি তাঁর আযাদকৃত দাস আফলাহ-এর হাতে চলে যায়। ঘরটির দেওয়াল ধসে গিয়ে বিরান হওয়ার উপক্রম হলে তাঁর নিকট থেকে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে মুগীরা ইবন 'আবদির রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম খরীদ করে সংস্কার করেন। আর আফলাহ সেই অর্থ মদীনার গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৮, টীকা নং-৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবূ আইউবের গৃহে অবস্থানকালে সাধারণতঃ আনসারগণ পালাক্রমে অথবা আবূ আইউব নিজে তাঁর জন্য খাবার পাঠাতেন। খাওয়ার পর যা বেঁচে যেত তিনি আবূ আইউবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আবূ আইউব খাবারের থালায় রাসূলুল্লাহর (সা) আঙ্গুলের ছাপ দেখে দেখে যে দিক থেকে তিনি খেয়েছেন সেখান থেকেই খেতেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাসূল (সা) খাবার স্পর্শ না করে, সবই ফেরত পাঠান। দ্বিধা ও সংকোচের সাথে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে খাবার গ্রহণ না করার কারণ জানতে চান। তিনি বলেন, খাবারে রসুন ছিল। আমি রসুন পছন্দ করিনে। তবে তোমরা খাবে। আবূ আইউব বললেন, 'আপনার যা পছন্দ নয়, আমিও তা পছন্দ করবো না।' (মুসলিম-২/১৯৮, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৯, উসুদুল গাবা-২/৮১)

হিজরাতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আনাসের বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের সমবেত করেন এবং রুচি, সামাজিক মর্যাদা, ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুসারে একজন মুহাজির ও একজন আনসারের মধ্যে মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন। ইয়াসরিবে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ (প্রচারক) মুস'য়াব ইবন 'উমাইর আল-কুরাইশীর সাথে আবূ আইউবের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। (তাবাকাত ৩/৪৮৪) মুস'য়াব প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা এক উৎসাহী সাহাবী। ইসলামী দা'ওয়াতের পথে তিনি বহু কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে সর্বপ্রথম দায়ী (প্রচারক) হিসাবে তাঁকে মদীনায় পাঠান। তাঁর সাথে আবূ আইউবের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য হল, তাঁর মধ্যেও মুসয়াবের মত উৎসাহ উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী একথার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

বদর, উহুদ, খন্দক, বাইয়াতুর রিদওয়ান সহ সকল যুদ্ধ ও অভিযানে আবূ আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা-২/৮০, আল-ইসাবা-১/৪০৫) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তিনি সত্যিকারেই জীবন ও ধন-সম্পদ বিক্রী করে দিয়েছিলেন। রাসূলে পাকের (সা) ওফাতের পর খলীফাদের যুগে যত যুদ্ধ হয়েছে, হাজারো দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাঁর একটি থেকেও পিছিয়ে থাকেননি। রাত-দিন, প্রকাশ্যে ও নিরিবিলিতে সর্বক্ষণ তাঁর শ্লোগান ছিল আল্লাহর এই বাণী- 'ইনফিরূ খিফাফান ওয়াসিকালান'- তোমরা হালকা এবং ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বেরিয়ে পড়! (তাওবা-৪১) অর্থাৎ একাকী ও দলবদ্ধভাবে, উদ্যমী ও হতোদ্যম অবস্থায়, যৌবনে ও বার্ধক্যে, প্রাচুর্য ও দারিদ্রের মধ্যে- মোটকথা সর্ব অবস্থায়। (ফাতহুল কাদীর-২/২৬৩) তিনি বলতেন ঃ আমি নিজেকে সব সময় 'খাফীফ ও সাকীল'-ই পেয়েছি। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৫৭-৪৫৮; তাবাকাত-৩/৪৮৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মাত্র একটি বার তিনি ঘর থেকে বের হননি। সেই যুদ্ধে খলীফা একজন কম বয়স্ক যুবককে সেনাপতি নিয়োগ করেন। যার নেতৃত্বের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে সেই সেনাপতি হলেন ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়া (রা)। তবে বেশী দিন ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খেতে থাকেন, অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হন। অল্প দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। আপন মনে বলে ওঠেন ঃ কে আমার আমীর, তাতে আমার কী আসে যায়? এমন চিন্তার পর একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। ইসলামী সেনা দলের একজন সৈনিক হিসাবে বেঁচে থাকা, তার পতাকাতলে যুদ্ধ করে ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখা- তিনি জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪০৬, হায়াতুস সাহাবা ১/৪৫৮) তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশেই গমন করেন। (দায়িরা-ই মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা-১/৭৪৩)

হিজরী ৩৫ সনে হযরত 'উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন তখন আবূ আইউব মদীনায়। সেই দুর্যোগময় সময়ে মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে নববীতে

নামাযের ইমাম হতেন। আলী ও মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকালীন সেই সংকটময় সময়ে তিনি বিনা দ্বিধায় আলীর (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। কারণ, তাঁর মতে, তিনিই ইমাম, মুসলমানরা তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪০৭) ইবনুল আসীরের মতে আলীর (রা) সাথে তিনি সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা-২/৮১) মাস'উদী 'মুরূজ আজ-জাহব' গ্রন্থে হিঃ ৩৬ সনে আলীর (রা) সাথে উটের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। ইবন আবদিল বার 'আল-ইসতী'য়াব' গ্রন্থে মাস'উদীর কথা সমর্থন করেছেন। তবে হিঃ ৪র্থ শতকের ঐতিহাসিক মাস'উদীর পূর্বের কোন ঐতিহাসিক আবূ আইউবের উটের যুদ্ধে যেগদানের কথা বলেছেন বলে জানা যায় না। খারেজীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'নাহরাওয়ানের' যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। যুদ্ধের পূর্বে যাঁরা খারেজীদের সাথে আপোষরফার চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে আবূ আইউবও একজন। তিনি আলীর (রা) সাথে 'মাদায়িন' গমন করেন। তাঁর প্রতি আলীর (রা) ছিল গভীর বিশ্বাস ও আস্থা। মদীনা থেকে 'দারুল খিলাফা' (রাজধানী) কূফায় স্থনান্তরিত হলে আলী (রা) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। আবূ আইউব সেই সময় মদীনায় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। [সীয়ারে আনসার-১/১১১; দায়িরা-ই মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা-(উর্দু) ১/৭৪৩]

হযরত আলীর (রা) শাহাদাতের সময় আবু আইউব মদীনায়। তারপর হযরত মুয়াবিয়া (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। আবূ আইউব চাওয়া-পাওয়ার লোক ছিলেন না। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল জিহাদের ময়দানে ও মুজাহিদদের সারিতে একটুখানি স্থান। হিজরী ৪২ সনে বাইজেন্টাইন রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান বৃদ্ধি পায়। তিনি এ সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পুত্র আবদুর রহমানের নেতৃত্বে জিহাদে শরিক হন। তখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর। হিঃ ৪২ সনে সামুদ্রিক যুদ্ধে যোগদানের জন্য মিসর গমন করেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বাইজেন্টাইন রোমানদের ঘাঁটি কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে যান। কার হাতে এ বিজয়-কর্ম সমাধা হয় তা দেখার জন্য মুসলিম আমীরগণ সব সময় উৎসুক ছিলেন। হিঃ ৫২ মতান্তরে ৪৯ সনে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তিনি স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধের নির্দেশ দেন। এই বাহিনীতে ইবন 'উমার, ইবন 'আব্বাস ও ইবন যুবাইরের মত মর্যাদাবান সাহাবীদের সাথে আবূ আইউবও একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে যোগ দেন।

মিসর, সিরিয়াসহ মুসলিম খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন সেনা ইউনিট এ যুদ্ধে যোগ দেয়। মিসরীয় সেনা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন তথাকার গভর্ণর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'উকবা ইবন 'আমির আল-জুহানী। তাছাড়া ফুদালা ইবন 'উবাইদ ও আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বেও দু'টি সেনা ইউনিট যোগদেয়।

রোমানরা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য এগিয়ে আসে। মুসলমানদের প্রস্তুতিও কম ছিল না। তাদের সংখ্যাও প্রায় শত্রুসংখ্যার সমান। মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে আবেগ উৎসাহ এত তীব্র ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মাত্র মুসলিম সৈনিক রোমানদের একটি পুরো সারির বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। একজন মুসলিম সৈনিক একবার একাই রোমানদের ব্যূহ ভেদ করে তাদের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তার এই দুঃসাহস দেখে অন্যান্য মুসলমানদের মুখ থেকে সমস্বরে এ কুরআনের আয়াতটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে ঃ লা তুলকূ আয়দীকুম ইলাত তাহলুকাহ'- তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা। (আল-বাকারা-১৯৫) তাদের একথা শুনে আবু আইউব এগিয়ে গিয়ে বললেন ঃ তোমরা আয়াতটির এই অর্থ বুঝলে? এ আয়াতটি তো নাযিল হয়েছিল ব্যবসায় ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে আনসারদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। একবার আনসাররা বলল, গত বছর জিহাদে যোগদানের জন্য ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হয়েছে এবছর তা পুষিয়ে নিতে হবে। সেই প্রেক্ষাপটে এ আয়াতের অবতরণ। আয়াতটির তাৎপর্য হল, ধ্বংস জিহাদে নয়, জিহাদ ত্যাগ করা ও অতিরিক্ত ধন-সম্পদ আহরণে ব্যস্ত থাকার মধ্যেই ধ্বংস। (সীয়ারে আনসার-১/১১২; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭০-৪৭১, ৪৫৮-৪৫৯; তাবাকাত-৩/৪৮৪-৪৮৫) ।

এই কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযানের সফরে এক মহামারি দেখা দেয়। বহু মুজাহিদ সেই মহামারিতে মারা যান। আবু আইউবও আক্রান্ত হলেন। তিনি অন্তিম রোগ শয্যায়। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ইয়াযীদ ইবন মুয়াবিয়া শেষ বারের মত তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি জানতে চাইলেন,

'আবু আইউব, আপনার কিছু চাওয়ার আছে কি? আমি আপনার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করবো।'

কিন্তু যে ব্যক্তি জান্নাতের বিনিময়ে নিজের সবকিছু বিক্রী করে দিয়েছেন, এ নশ্বর পৃথিবীতে তাঁর চাওয়ার কী থাকতে পারে? তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ইয়াযীদের কাছে যা আশা করলেন তা কোন মানুষের কল্পনায়ও আসতে পারে না। তিনি ধীর-স্থিরভাবে বললেন, আমি মারা গেলে তোমরা আমার মৃতদেহটি ঘোড়ার ওপর উঠিয়ে শত্রু-ভূমির অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব নিয়ে যাবে এবং শেষ প্রান্তে দাফন করবে। মুসলিম বাহিনীকে এই পথে দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে যাতে তাদের অশ্বের পদাঘাত আমার কবরের ওপর পড়ে এবং আমি বুঝতে পারি, তারা যে সাহায্য ও কামিয়াবী চায় তা তারা লাভ করতে পেরেছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪০৭, আল-ইসাবা-১/৪০৫)

আবু আইউবের মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা হয়। একদিন রাতে মুসলিম বাহিনী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে লাশটি উঠিয়ে নেয় এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের (আধুনিক ইস্তাম্বুল) নগর প্রাচীরের গা ঘেঁষে তাঁকে দাফন করে। মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্য তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করে। বিধর্মীরা তাঁর মাযারের অবমাননা করতে পারে, এই চিন্তায় ইয়াযীদ কবরটি মাটির সাথে সমান করে দেন। পরদিন সকালে

রোমানরা মুসলিম মুজাহিদদের কাছে জানতে চাইলো, কাল রাতে আপনাদের একটু ব্যস্ত দেখা গেল, কী হয়েছিল? তাঁরা জবাব দিলেন, আমাদের নবীর একজন অতি সম্মানিত সংগীর মৃত্যু হয়েছে, তাঁরই দাফন কাজে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। যেখানে দাফন করা হয়েছে তোমরা তা জান। যদি তাঁর মাযারের অবমাননা করা হয় তাহলে জেনে রাখ, বিশাল ইসলামী খিলাফতের কোথাও তোমাদের 'নাকুস' আর বাজবে না। (সীয়ারে আনসার-১/১১৩) ইস্তাম্বুলের সন্নিকটে হযরত আবু আইউবের কবরটি আজও বর্ণ ও ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষের এক তীর্থ-স্থান। রোমানরা তাদের দুর্ভিক্ষ ও খরার সময় তাঁর কবরের নিকট সমবেত হয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করতো এবং পানি চাইতো। (দায়িরা-ই মায়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা-১/৭৪৫, উসুদুল গাবা-২/৮২)

হযরত আবু আইউবের মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনুল আসীর উসুদুল গাবা (২/৮১) গ্রন্থে তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন। যথা হিজরী ৫০, ৫১ ও ৫২ সন। তবে হিজরী ৫২ সন অধিকাংশের মত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। ইবন আসাকির তাঁর একটি মতে হিজরী ৫৫ সন বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় আশিবছর।

হযরত আবু আইউবের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে বহু কথা হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনা জানা যায় যা খুবই শিক্ষণীয়। এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সেসব বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন, 'একদা প্রচন্ড গরমের দিনে ঠিক দুপুরের সময় আবু বকর ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে আসলেন। 'উমার তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন,

-এমন অসময়ে বের হলেন যে?

-কী করবো, দুঃসহ ক্ষুধা তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

-আল্লাহর কসম, আমারও একই দশা। তাঁদের দু'জনের কথা শেষ না হতেই হযরত রাসূলে কারীম (সা) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে দেখে বললেন ঃ

-কি ব্যাপার, এ অসময়ে তোমরা এখানে?

-ক্ষুধার জ্বালায় আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি।

রাসূল (সা) বললেন ঃ যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, আমিও ক্ষুধার জ্বালায় ঘরে থাকতে পারিনি। এসো তোমরা আমার সাথে।

তাঁরা তিন জন হাঁটতে হাঁটতে আবু আইউবের বাড়ীর দরজায় পৌছলেন। আবু আইউবের অভ্যাস ছিল, প্রতিদিন রাসূলে কারীমের (সা) জন্য খাবার তৈরী রাখা। তিনি দেরি করলে বা না খেলে তাঁর পরিবারের লোকেরা তা ভাগ করে খেয়ে ফেলতো; তাঁদের তিনজনের সাড়া পেয়ে উম্মু আইউব (আবু আইউবের স্ত্রী) বেরিয়ে এসে বললেন,

-আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়, আহলান ওয়াসাহলান।

-আবু আইউব কোথায়?

আবু আইউব নিকটেই তাঁর খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) গলার আওয়ায শুনে এই কথা বলতে বলতে ছুটে আসলেন ঃ

–ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমন সময় তো আপনার শুভাগমন হয় না।

–তোমার কথাই ঠিক।

আবু আইউব দৌড়ে বাগানে গেলেন এবং এক কাঁধি শুকনো ও পাকা–কাঁচা খেজুর কেটে নিয়ে আসলেন।

রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি এটা কেটে আন তা কিন্তু আমি চাইনি।

–আপনি এর থেকে কিছু শুকনো, পাকা ও কাঁচা খেজুর খান– এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি আপনাদের জন্য এক্ষুণি বকরী জবেহ করব। রাসূল (সা) বললেন ঃ জবেহ করলে দুধালো বকরী জবেহ করবে না।

আবু আইউব দুধ দেয় না এমন একটি বকরী জবেহ করলেন। স্ত্রীকে বললেন ঃ গোশত ভুনা কর এবং রুটি বানাও। তুমি তো রুটি বানাতে দক্ষ। আবু আইউব লেগে গেলেন বকরীর অর্ধেকটা রান্না করতে। রান্নার কাজ শেষ করে তা রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের সামনে হাজির করলেন।

রাসূল (সা) এক টুকরো গোশত উঠিয়ে একটি রুটির ওপর রেখে বললেন ঃ

–আবু আইউব, শিগগির তুমি এই টুকরোটি ফাতিমাকে দিয়ে এস। বহু দিন সে এমন খাবার দেখে না।

তাঁরা সকলে পেট ভরে খেলেন। তারপর রাসূল (সা) বললেন, 'রুটি, গোশত, খুরমা, পাকা ও আধাপাকা খেজুর।' চোখ দু'টি তাঁর পানিতে ভরে গেল। তারপর বললেন ঃ "যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! এই নি'য়ামত (দান, অনুগ্রহ) সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা এই নিয়ামত লাভ করলে 'বিসমিল্লাহ' বলে তাতে হাত দেবে এবং পেট ভরে খাওয়ার পর বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ আল্লাজী আশবা'য়ানা ওয়া আন'য়ামা আলাইনা ফা আফদালা।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় নেওয়ার সময় আবু আইউবকে বললেন ঃ

–আগামী কাল আমার সাথে দেখা করবে।

পরদিন আবু আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছোট একটি দাসীকে আবু আইউবের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন ঃ আবু আইউব, তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। আমার কাছে যতদিন ছিল, আমরা তাঁর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু দেখিনি।

দাসীটি সংগে করে আবু আইউব বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রী প্রশ্ন করলেন ঃ আইউবের বাপ, এটা আবার কার?

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে দান করেছেন। 'দাতা অতি মহান, দানটিও অতি সম্মানিত'—স্ত্রী মন্তব্য করলেন।

–রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি ভালো আচরণের উপদেশ দিয়েছেন।

–উপদেশ কিভাবে বাস্তবায়ন করবে?

–তাকে আযাদ করে দেওয়া ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশ বাস্তবায়নের আর কোন উত্তম পন্থা নেই।

–তুমি সঠিক হিদায়াত পেয়েছ। তুমি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

অতঃপর তাঁরা দাসীটি আযাদ করে দিলেন। (সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা–১/১২৪–১৩০; হায়াতুস সাহাবা–১/৩০৮–৩১০)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়া বিনতু হুয়াই–এর সাথে যে রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম বাসর হয়, সে রাতে সকলের অজ্ঞাতসারে আবু আইউব রাসূলুল্লাহর (সা) দরযায় কোষমুক্ত তরবারি হাতে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যুষে রাসূল (সা) বের হয়ে আবু আইউবকে দেখতে পান। আবু আইউব বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তাঁর বাপ, ভাই ও স্বামীকে হত্যা করেছেন– এজন্য আমি আপনাকে নিরাপদ মনে করিনি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) হেসে দেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৪৩, হায়াতুস সাহাবা–২/৬৬৩)

সাহাবা সমাজের মধ্যে তাঁর মর্যাদা এত উঁচুতে ছিল যে, অন্যান্য সাহাবীরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমর, বারা' ইবন আযিব, আনাস ইবন মালিক, আবু উমামা, যায়িদ ইবন খালিদ আল–জুহানী, মিকদাম ইবন মা'দিকারাব, জাবির ইবন সুমরা, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল–খাতামী প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীরা তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আতা ইবন ইয়াসার, 'আতা ইবন ইয়াযীদ, লায়সী, আবু সালামা, আবদুর রহমান ইবন আবী–লায়লার মত বিশিষ্ট তাবে'ঈগণও ছিলেন তাঁর শাগরিদ। তাঁরা সকলে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (উসুদুল গাবা–২/৮১; আল–ইসাবা–১/৪০৫)

আবু আইউব ছিলেন সাহাবাদের কেন্দ্রবিন্দু। কোন মাসয়ালায় সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সবাই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। একবার ইহরাম অবস্থায় জানাবাতের গোসলের সময় হাত দিয়ে মাথা ঘষা যায় কিনা– এ ব্যাপারে ইবন 'আব্বাস ও মিসওয়ার ইবন মাখরামার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাঁরা বিষয়টি জানার জন্য আবদুল্লাহ ইবন হুসাইনকে পাঠালেন আবু আইউবের নিকট। আবদুল্লাহ যখন পৌছলেন তখন ঘটনাক্রমে আবু আইউব গোসল করছিলেন। আবদুল্লাহর উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি মাথাটি বাইরে বের করে দিয়ে তা ঘষতে ঘষতে বলেন, দেখ, এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) গোসল করতেন। (বুখারী–১/২৪৮)

হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে 'উকবা ইবন 'আমির আল–জুহানী যখন মিসরের গভর্ণর তখন আবু আইউব দুইবার মিসর ভ্রমণ করেন। প্রথম সফরটি হাদীসের অন্বেষণে। তিনি শুনেছিলেন, 'উকবা রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। 'উকবার মুখ থেকে সেই একটিমাত্র হাদীস শোনার জন্য মদীনা থেকে মিসর পর্যন্ত এত দীর্ঘপথ পাড়ি দেন। মিসর পৌছে তিনি মাসলামা ইবন মাখলাদের বাড়ীতে যান। মাসলামা তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে বুকে বুক মিলান। আবু আইউব তাঁকে বলেন, 'আমাকে একটু 'উকবার বাড়ীটি দেখিয়ে দাও।' সেখানে পৌছে তিনি 'উকবাকে বলেন, 'একটি কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, আমি ও আপনি ছাড়া তাঁদের আর

কেউ এখন বেঁচে নেই। আচ্ছা, 'সতরুল মুসলিম'– মুসলমানের সতর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা) আপনি কী বলতে শুনেছেন?' 'উকবা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কোন গোপন বিষয় গোপন রাখবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।' এতটুকু শুনেই আবু আইউব মদীনার দিকে যাত্রা করেন। বাহনটিকে ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রামও নিলেন না। অতঃপর হাদীসটি তিনি এভাবে বর্ণনা করতেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৯৮; মুসনাদে ইমাম আহমাদ–৪/১৫৪)

হযরত আবু আইউবের জ্ঞান আহরণ ও তার প্রচার প্রসারের প্রতি এত তীব্র আকর্ষণ ছিল যে, মৃত্যু শয্যায়ও তা থেকে বিরত থাকেননি। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এমন দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন যা আগে কখনও করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে হাদীস দু'টি মানুষের মধ্যে প্রচার করা হয় (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪১৪)

হযরত আবু আইউব কুরআনের হাফেজ ছিলেন। ইবন সাদ বর্ণনা করেনঃ

রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে আনসারদের মধ্যে পাঁচ জন কুরআন সংগ্রহ করেন। মা'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদাহ্ ইবন সামিত, উবাই ইবন কা'ব, আবু আইউব ও আবু দারদা। দ্বিতীয় খলীফা 'উমারের খিলাফতকালে ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান (রা) খলীফাকে লিখলেন ঃ শামের অধিবাসীরা নানা পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করছে। তাদেরকে সঠিকভাবে কুরআন শিক্ষা দিতে পারে এমন কিছু বিজ্ঞ শিক্ষক সেখানে পাঠান। এই চিঠি পেয়ে 'উমার উপরোক্ত পাঁচ জনকে ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে বলেন ঃ 'তোমাদের শামবাসী ভাইয়েরা কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে আমার সাহায্য চেয়েছে। তোমাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিনজন এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। আর ইচ্ছা করলে তোমরা সবাই অংশগ্রহণ করতে পার।' তাঁরা খলীফার আবেদনে সাড়া দিলেন। তাঁরা বললেন ঃ 'আবু আইউব বয়সের ভারে দুর্বল, আর উবাই ইবন কা'ব রোগগ্রস্ত।' অতঃপর বাকী তিনজন যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৯৫)

হযরত আবু আইউব থেকে দেড়শো হাদীস বর্ণিত হয়েছে বলে সীরাত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে।। তবে 'জালা' আল-কুলূব'–এর গ্রন্থকার তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২১০টি বলে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে পাঁচটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি। ইমাম আহমাদ তাঁর 'মুসনাদ'–এর ৫ম খন্ডে ৪১২ থেকে ৪২৩ পৃষ্ঠায় ১১২টি এবং ১১৩–১১৪ পৃষ্ঠায় তাঁর বর্ণিত আরও কিছু হাদীস সংকলন করেছেন। [দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা (উর্দু)–১/৭৪৫]

হযরত আবু আইউবের চরিত্রে তিনটি বৈশিষ্ট বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। ১. রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর ভালোবাসা, ২. ঈমানী তেজ ও উদ্দীপনা, ৩. সত্য ভাষণ। রাসূলুল্লাহকে (সা) এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন যে, তাঁর ওফাতের পর রওজা পাকের কাছে গিয়ে পড়ে থাকতেন।

তাঁর ঈমানী তেজ ও দৃঢ়তার প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে সংঘটিত কোন

একটি যুদ্ধেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। আর জীবনের শেষ প্রান্তে আশি বছর বয়সেও মিসরের পথে রোম সাগর পাড়ি দিয়ে ইস্তাম্বুলের নগর প্রাচীরের সন্নিকটে ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য গমন করেন।

আর ব্যক্তি বা রাষ্ট্র– কারও ভয়েই তিনি সত্য কথা বলা থেকে কখনও বিরত থাকেননি। একবার মিসরের গভর্ণর 'উকবা ইবন 'আমির আল–জুহানী–যিনি একজন সাহাবী, কোন কারণবশতঃ মাগরিবের নামায পড়াতে একটু বিলম্ব করলেন। আবু আইউব উঠে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন 'মা হাজিহিস সালাতু ইয়া উকবা'– উকবা এটা কেমন নামায? উকবা বললেন, একটি কাজে আটকে গিয়ে দেরী হয়ে গেছে। আবু আইউব বললেন ঃ 'আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, আপনার এই কাজের দ্বারা মানুষের ধারণা হবে রাসূলুল্লাহ (সা) এই সময় নামায় আদায় করতেন। অথচ মাগরিবের নামায তাড়তাড়ি আদায়ের জন্য তিনি কত তাকীদ দিয়েছেন।' (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪১৭)

ইসলামী বিধি–বিধান তিনি নিজে যেমন পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করতেন তেমনি অন্যদের নিকট থেকেও অনুরূপ অনুসরণ আশা করতেন। কারও মধ্যে সামান্য বিচ্যুতি লক্ষ্য করলেও তা সংশোধন করে দিতেন। একবার হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ছেলে আবদুর রহমান কোন এক যুদ্ধে চারজন বন্দীকে হাত–পা বেঁধে হত্যা করেন। এ কথা আবু আইউব জানতে পেরে তাঁকে বলেন, 'পশুর মত এভাবে হত্যা করা থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। আমি তো এভাবে একটি মুরগীও জবেহ করা পছন্দ করিনে।' (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪২২)

রোমানদের সাথে যুদ্ধের সময় জাহাজে একজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে বহু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী ছিল। একদিন আবু আইউব দেখতে পেলো একজন মহিলা কয়েদী বড় ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। তিনি মহিলাটির এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, 'তার সন্তান থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।' আবু আইউব ছেলেটির হাত ধরে মহিলার হাতে তুলে দেন। অফিসার আবু আইউবের বিরুদ্ধে কমান্ডারের নিকট অভিযোগ করেন। কমান্ডারের প্রশ্নের জবাবে আবু আইউব বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।' (মুসানাদে আহমাদ–৫/৪১২)

তিনি সিরিয়া ও মিসরে গেলেন। দেখলেন, সেখানকার পায়খানাসমূহ কিবলামুখী করে তৈরী করা। তিনি বার বার শুধু বলতে লাগলেন, 'কী বলবো? এখানে পায়খানা কিবলামুখী করে তৈরী করা, অথচ রাসূল (সা) এমনটি করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসনাদে আহমাদ–৫/৪১২)

সালিম ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উমার বলেন ঃ 'আমার পিতার (আবদুল্লাহ ইবন 'উমার) জীবদ্দশায় একবার আমাদের বাড়ীতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হল। আমার পিতা অন্যদের সাথে আবু আইউবকেও দাওয়াত দিলেন। সুন্দর সুন্দর সবুজ চাদর দিয়ে আমাদের বাড়ীর দেওয়াল ঢেকে দেওয়া হল। আবু আইউব এসেই মাথা উঁচু করে একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ, তোমরা

দেওয়াল ঢেকে দিয়েছ?' সালেম বলেন ঃ আমার পিতা লজ্জিত হয়ে জবাব দিলেন, 'আবু আইউব, মহিলারা আমাদেরকে কাবু করে ফেলেছে।' আবু আইউব বললেন ঃ 'সবার ব্যাপারে এ আশংকা আমার আছে। তবে তোমার ব্যাপারে এমন আশংকা ছিলনা। আমি তোমার বাড়ীতে ঢুকবো না, আহারও করবো না।' (হায়াতুস সাহাবা-২/৩০৫)

হযরত আবু আইউব যে কত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইফ্‌ক-এর ঘটনায়। এই ইফ্‌ক বা হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি অপবাদ আরোপের ঘটনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সুষ্ঠু। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন ঃ আবু আইউব, 'আয়িশার সম্পর্কে লোকেরা যা বলাবলি করছে, তা কি তুমি শুনেছ?' বললেন ঃ 'হাঁ, শুনেছি। তাহা মিথ্যে কথা।, উম্মু আইউব, তুমি কি এমন কাজ করতে পার?' বললেন ঃ আল্লাহর কসম। এমন কাজ আমি কক্ষণও করতে পারিনে।' আবু আইউব বললেন ঃ 'তাহলে 'আয়িশা- যিনি তোমার চেয়েও উত্তম, তিনি কিভাবে করতে পারেন?' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩০২)

কনস্ট্যান্টিনোপল যুদ্ধের সময় একদিন একদল মুসলিম সৈনিক তাদের জাহাজে আবু আইউবকে খাবারের দা'ওয়াত দিল। তিনি হাজির হলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছ; অথচ আজ আমি রোযা রেখেছি। তোমাদের দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ একজন মুসলমানের ওপর তার অন্য এক মুসলিম ভাইয়ের ছয়টি অধিকার আছে। তার কোন একটি ছেড়ে দিলে একটি অধিকার ছেড়ে দেওয়া হবে। ১. দেখা হলে তাকে সালাম দিতে হবে। ২. দাওয়াত দিলে সাড়া দিতে হবে। ৩. হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে জবাব দিতে হবে। ৪. অসুস্থ হলে দেখতে যেতে হবে। ৫. মারা গেলে তার জানাযায় শরিক হতে হবে। ৬. কোন ব্যাপারে উপদেশ চাইলে উপদেশ দিতে হবে।' (হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৫)

হযরত আবু আইউব ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। কুয়োর ধারে গোসলের সময়েও চারিদিকে কাপড় টানিয়ে ঘিরে নিতেন। (বুখারী-১/২৪৮)

কাফির মুনাফিকদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। এ কঠোরতা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সে সময় মদীনার মুনাফিকরা (কপট) মসজিদে আসতো, মুসলমানদের নানা কথা কান পেতে শুনতো। বাইরে গিয়ে তারা মুসলমানদের দ্বীন নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। একদিন কতিপয় মুনাফিক মসজিদে নববীতে একত্রিত হল। তারা যখন পরস্পর গায়ে গা মিশিয়ে নিচুস্বরে নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করছে, ঠিক সেই সময় রাসূল (সা) তাদেরকে দেখে ফেলেন। তিনি তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে আবু আইউব ছুটে গিয়ে 'আমর ইবন কায়েসের একটি ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে মসজিদের বাইরে নিয়ে গেলেন। তিনি তার ঠ্যাং ধরে টানছেন আর সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে ঃ আবু আইউব, তুমি এভাবে আমাকে বনী-সা'লাবের মিরবাদ (খোঁয়াড়) থেকে বের করে দিচ্ছ? (মসজিদের স্থানে পূর্বে উট-বকরীর খোঁয়াড় ছিল) তারপর আবু আইউব রাফে ইবন ওয়াদীয়ার দিকে

ধেয়ে যান এবং তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে টানতে টানতে ও লাথি-চড় মারতে মারতে মসজিদ থেকে বের করে দেন। আবু আইউব টানছেন আর মুখে বলছেন ঃ 'পাপাত্মা মুনাফিক দূর হ। যে পথে এসেছিস সেই পথে চলে যা।' (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫২৮)

হযরত আবু আইউব ও তাঁর স্ত্রী যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) আশ্রয় দেন এবং প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করেন তাতে নবী-খান্দানের লোকদের নিকট বিশেষভাবে, আর সাধারণভাবে সকল মুসলমানের নিকট তাঁরা এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন, হযরত আলীর খিলাফতকালে হযরত ইবন 'আববাস (রা) যখন বসরার গভর্ণর তখন একবার আবু আইউব গেলেন সেখানে। ইবন 'আববাস তাঁকে বললেন, 'আমার ইচ্ছা, যেভাবে আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য ঘর খালি করে দিয়েছিলেন, আজ আমিও তেমনিভাবে আপনার জন্য ঘর খালি করে দিই।' একথা বলে তিনি পরিবারের সকল সদস্যকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে সকল সাজ সরঞ্জামসহ বাড়ীটি তাঁর থাকার জন্য ছেড়ে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪০৫)

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর সাহাবা-ই-কিরামের পূর্ববর্তী সেবা ও আত্মত্যাগ অনুযায়ী প্রত্যেকের ভাতা নির্ধারিত হয়। আবু আইউবের ভাতা প্রথমে ৪০০০ (চার হাজার) দিরহাম নির্ধারিত হয়। হযরত আলী তা বাড়িয়ে বিশ হাজার করেন। তাঁর ভূমি চাষাবাদের জন্য প্রথমে ৮ (আট) টি দাস নিযুক্ত ছিল, হযরত আলী (রা) তা চল্লিশ জনে উন্নীত করেন।

হযরত আবু আইউবের ভাগ্যবতী স্ত্রীর নাম উম্মু হাসান বিনতু যায়িদ। অভিজাত আনসারী মহিলা। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে, তাঁর গর্ভে একমাত্র ছেলে 'আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

যদিও হযরত আবু আইউবের (রা) জীবন যুদ্ধের ময়দানে কেটেছে এবং তরবারি কাঁধ থেকে নামিয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাননি, তথাপি সে জীবন ছিল প্রভাতের মৃন্দমন্দ শীতল বায়ুর ন্যায় প্রশান্ত। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছিলেন ঃ

"তুমি যখন নামায আদায় করবে, তা যে শেষবারের মত আদায় করছো, এমনভাবে করবে। এমন কথা কক্ষণও বলবে না যার জন্য পরে কৈফিয়াত দিতে হয়। মানুষের হাতে যা আছে তা পাওয়ার আশা কক্ষণও করবে না।"

কোন ঝগড়া-বিবাদে কক্ষণও তাঁর জিহবা অসংযত হয়নি। কোন লালসা তাঁর অন্তরকে কক্ষণও কাবু করতে পারেনি। একজন 'আবেদের মত, দুনিয়া থেকে এই মুহূর্তে একজন বিদায় গ্রহণকারীর মত সারাটি জীবন তিনি অতিবাহিত করে গেছেন। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪০৮)

সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা)

আসল নাম সা'দ, ডাকনাম আবু 'আমর, লকব বা উপাধি সায়্যিদুল আউস। মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের আবদুল আশহাল শাখার সন্তান। পিতার নাম মু'য়াজ ইবন নু'মান, মাতা কাবশা মতান্তরে কুবাইশা 'বিনতু রাফি'। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সা'ঈদ আল খুদরীর চাচাতো বোন। জাহিলী যুগেই পিতা মু'য়াজের মৃত্যু হয়। তবে মাতা কাবশা হিজরাতের পরে ঈমান আনেন এবং সা'দের ইনতিকালের পরেও বহু দিন জীবিত ছিলেন। গোটা আউস গোত্রের মধ্যে আবদুল আশহাল শাখাটি ছিল সর্বাধিক অভিজাত এবং বংশানুক্রমে নেতৃত্ব ছিল তাদেরই হাতে। সা'দ ছিলেন তাঁর সময়ে একজন বড় মাপের নেতা। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৫২, উসুদুল গাবা–২/২৯৬, তাবাকাত–৩/৪২০, তাহজীবুত তাহজীর–৩/৪৮১) তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

আকাবার প্রথম বাইয়াতের পর থেকে যদিও মদীনায় ইসলামের প্রভাব পড়তে থাকে তবে তা প্রকৃতপক্ষে হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িত ছিল। আকাবার শপথের পর মদীনাবাসীদের অনুরোধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুস'য়াবকে দা'ঈ–ই–ইসলামের (আহবানকারী) দায়িত্ব দিয়ে মদীনায় পাঠান। ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন সফল দা'ঈ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি নিরলস চেষ্টার মাধ্যমে মদীনার প্রতিটি লোকের কানে ইসলামের দা'ওয়াত পৌছে দেন। হযরত মুস'য়াব মদীনায় এসে যখন ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন তখন সা'দ ইবন মু'য়াজ একজন চরম অস্বীকারকারী। তাঁর এ অবস্থা বেশী দিন থাকেনি। অনতিবিলম্বে তিনিও মুস'য়াবের দা'ওয়াতে সাড়া দেন। ইবন ইসহাক তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

একদিন আস'য়াদ ইবন যুরারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রেরিত দা'ঈ (আহবানকারী) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে সংগে করে দা' ওয়াতী কাজে বনী আবদুল আশহাল ও বনী জাফার গোত্রে গেলেন। তাঁরা ' মারাক' নামক একটি কুয়োর ধারে দেওয়ালের ওপর বসলেন। আর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এমন কিছু লোক তাঁদের পাশে জড় হলেন। সা'দ ইবন মুয়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর উভয়ই তখন বনী আবদুল আশহাল গোত্রের নেতা। তখনও তাঁরা মুশ্‌রিক বা পৌত্তলিক। উল্লেখ্য যে, সা'দ ছিলেন আস'য়াদ ইবন যুরারার খালাতো ভাই। যাই হোক, খবরটি সা'দ ও উসাইদের কানে গেল। সাথে সাথে সা'দ উসাইদকে বললেনঃ 'তোমার বাপের সর্বনাশ হোক! তুমি এখনই এ দু'জন লোকের কাছে যাও। তারা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে আমাদের বাড়ীর ওপর চড়াও হয়েছে। তাদের তাড়িয়ে দাও, এপথ মাড়াতে নিষেধ কর। যদি ঐ দ্বিতীয় লোকটির সাথে আমার খালাতো ভাই আস'য়াদ ইবন যুরারা না থাকতো তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না, আমি নিজেই যেতাম। তার সামনে আমার যাওয়া শোভন হবে না। 'উসাইদ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁদের নিকট গেলেন। উল্টো ফল ফললো। তাড়াতে গিয়ে নিজেই তাঁদের কথায় প্রভাবিত হলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। তিনি

মুস'য়াব ও আস'য়াদকে বললেন ঃ 'আমি পিছনে এমন এক ব্যক্তিকে রেখে এসেছি, যদি তিনি তোমাদের কথা শোনেন তাহলে গোত্রের একটি লোকও তোমাদের থেকে দূরে থাকবে না। আমি এখনই সা'দ ইবন মু'য়াজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি নিজ গোত্রের দিকে ফিরে চললেন। সা'দ তখন গোত্রীয় এক আড্ডায় বসা। উসাইদকে ফিরে আসতে দেখে তিনি মন্তব্য করলেনঃ 'আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, উসাইদ যে চেহারায় গিয়েছিল তার থেকে ভিন্ন এক চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছে ফিরছে।' উসাইদ কাছাকাছি এসে পৌঁছালে সা'দ জিজ্ঞেস করলেনঃ কী করেছ? উসাইদ জবাব দিলেনঃ

আমি তাদের দু'জনের সাথে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে তেমন খারাপ কিছু দেখিনি। তবুও তাদেরকে এখানে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। তারাও বলেছে, তোমরা যা ভালো মনে কর, তাই হবে। তবে আমি শুনেছি, বনী হারিছার লোকেরা আস'য়াদ ইবন যুরারাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। তারা তো একথা জানে, আস'য়াদ তোমার খালাতো ভাই।'

সা'দ সাথে সাথে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং বর্শাটি হাতে তুলে নিয়ে তাঁদের দুজনের দিকে ছুটলেন। নিকটে পৌঁছে যখন তিনি দেখলেন, তাঁরা অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে বসে আছেন তখন তিনি বুঝলেন, উসাইদ তাঁকে ধোকা দিয়ে তাঁদের কথা শুনাতে চেয়েছে। তিনি তাঁদের দু'জনকে গালাগালি করতে করতে আস'য়াদকে বললেনঃ 'শোন আবূ উসামা। তোমার ও আমার মধ্যে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকতো তাহলে আমি এত কথা বলতাম না। আমরা যা পছন্দ করিনে তাই তুমি আমাদের বাড়ীর ওপর এসে করে যাচ্ছ।' এ দিকে সা'দকে আসতে দেখে আস'য়াদ, মুসয়াবকে বলেছিলেনঃ 'মুস'য়াব। আপনার নিকট একজন গোত্র নেতা আসছেন। এব্যক্তি যদি আপনার কথা মেনে নেন তাহলে গোত্রের দু'ব্যক্তিও আপনার থেকে দূরে থাকতে পারবে না।'

মুস'য়াব অত্যন্ত নরম মিযাজে সা'দকে বললেনঃ 'আপনি কি একটু বসে আমার কথা শুনবেন? আমার কথা পসন্দ হলে, ভালো লাগলে, মানবেন। আর পসন্দ না হলে, খারাপ লাগলে আমরা চলে যাব।' সা'দ বললেনঃ ' এ তো খুব ইনসাফের কথা।' তিনি মাটিতে বর্শাটি গেঁড়ে বসে পড়লেন। মুস'য়াব অত্যন্ত ধীর- স্থিরভাবে তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন, তাঁকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন। মুস'য়াব ও আস'য়াদ দু'জনেই বর্ণনা করেছেনঃ ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর সা'দ কোন কথা বলার পূর্বেই আমরা তাঁর চেহারায় ইসলামের দীপ্তি লক্ষ্য করেছিলাম। ইসলামের দা'ওয়াত শোনার পর সা'দ তাঁদের কাছে জানতে চান? 'তোমাদের এই ইসলাম, এই দ্বীনে প্রবেশ করতে হলে কি কি কাজ করতে হয়?' তাঁরা বললেন, 'গোসল করে পবিত্র হতে হয়, পোশাক পরিচ্ছন্ন করতে হয়, তারপর কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে দু'রাকা'য়াত সালাত আদায় করতে হয়।' সা'দ তাই করলেন। তারপর বর্শাটি হাতে তুলে নিয়ে উসাইদের সাথে গোত্রীয় আড্ডার দিকে রওয়ানা দিলেন।

তাঁদেরকে ফিরতে দেখে গোত্রীয় লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো ঃ 'সা'দ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলেন এখন তাঁর সেই চেহারা নেই। তাঁকে ভিন্ন এক চেহারায় দেখা যাচ্ছে।' সা'দ নিকটে এসে গোত্রীয় লোকদের বললেনঃ 'ওহে আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা! বিভিন্ন ব্যাপারে তোমরা আমার কাজ-কর্ম কেমন দেখে থাক?' তাঁরা সমস্বরে জবাব দিলঃ 'আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মতামতের অধিকারী ব্যক্তি এবং আমাদের বিশ্বস্ত

নাকীব বা দায়িত্বশীল।' সা'দ বললেনঃ তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান আনবে তোমাদের কোন নারী-পুরুষের সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম।'

আস'য়াদ ও মুস'য়াব বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! সা'দের এই ঘোষণার পর সন্ধ্যা হতে না হতে বনী আবদুল আশহালের সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। সা'দের ইসলাম গ্রহণের পর আস'য়াদ ও মুস'য়াব তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে থাকেন। ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে সেখানে এমন কোন বাড়ী বা গোত্র ছিল না যেখানে দুই/একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরপর সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর দুইজন মিলে বনী আবদুল আশহালের মূর্তিগুলি ভাংতে শুরু করেন। (দ্রঃ তাবাকাত-৩/৪২০, ৪২১; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩৫, ৪৩৭,৪৭৯; আল-বিদায়া-৩/১৫২; উসূদুল গাবা-৩/২৯৬; হায়াতুস সাহাবা-১/১৮৭-১৯০)

মদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে হযরত সা'দের অবদান ছিল অনন্য। এই গৌরবে অন্য কোন সাহাবী তাঁর জুড়ি নেই। কারণ, একজন মানুষের ইসলাম গ্রহণের প্রভাবে গোটা গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুধু তাঁর ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই কারণে রাসূল (সা) বলেছেনঃ'আনসারদের সর্বোত্তম গৃহ বনু নাজ্জার। তারপর আবদুল আশহালের স্থান।' হযরত সা'দ ও তাঁর গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার মধ্যবর্তী সময়ে।

ইবন 'আসাকির বুখারী ও কালবী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করার পর কুরাইশরা তাঁর কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছে না। তাঁরা কা'বার পাশে তাদের পরামর্শ গৃহে বসে আছে। এমন সময় তারা জাবালে আবূ কুবায়সের দিক থেকে একটি কবিতা আবৃত্তির কণ্ঠ শুনতে পেল। তার কিয়দাংশ নিম্নরূপঃ

'দুই সা'দ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে বিরুদ্ধবাদীদের ভয় থেকে মুহাম্মাদ নিরাপদ হয়ে যাবে। ওহে আউসের সা'দ, ওহে খাযরাজের সা'দ! তোমরা মুহাম্মাদের রক্ষক হয়ে যাও।' -এরূপ আরো কয়েকটি পংক্তি।

এই কবিতা শুনে কুরাইশরা বুঝতে পারে, আউস ও খাযরাজ গোত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহায্যকারী দু'সা'দ হলেন- সা'দ ইবন মু'য়াজ ও সা'দ ইবন 'উবাদা। (তাহজীবে ইবন 'আসাকির-৬/৮৯)

ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর সা'দ 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। মক্কার বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা উমায়্যা ইবন খালাফ ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সা'দ তার বাড়ীতে উঠলেন। উমায়্যাও মদীনায় এলে সা'দের বাড়ীতে উঠতো। তিনি উমায়্যাকে বললেন, হারাম শরীফ (কা'বার আশপাশ) যখন জনশূন্য হয় তখন আমাকে বলবে। দুপুর বেলা উমায়্যা তাঁকে সংগে করে হারামের উদ্দেশ্যে বের হলো। পথে আবূ জাহলের সাথে দেখা। সে উমায়্যাকে জিজ্ঞেস করলোঃ এ ব্যক্তি কে?

উমায়্যাঃ সা'দ ইবন মু'য়াজ।

আবূ জাহলঃ এ তো খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, তুমি একজন ধর্মত্যাগীকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে মক্কায় দিব্বি ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি তাঁর সাথে না থাকলে তাঁর বাড়ী ফেরা কঠিন হতো।

উল্লেখ্য যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করতো কাফিররা তাদের ধর্মত্যাগী বলতো। হযরত সা'দ সাথে সাথে আবূ জাহলের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। বললেনঃ তুমি আমাকে বাধা দিয়েই দেখনা কেমন হয়। আমি তোমার মদীনার রাস্তা বন্ধ করে দেব।

উমায়্যা বললোঃ সা'দ! আবুল হাকাম (আবূ জাহল) মক্কার একজন বিশিষ্ট নেতা। তার সামনে নিচু স্বরে কথা বল।

সা'দ বললেনঃ চলো যাই। আমি রাসূলের (সা) নিকট শুনেছি, মুসলমানরা তোমাদেরকে হত্যা করবে। আবূ জাহল প্রশ্ন করলোঃ তারা কি মক্কায় এসে হত্যা করবে? সা'দ বললেনঃ তা আমার জানা নেই।

হিজরী ২য় সনের রাবীউল আওয়াল মাসে রাসূল (সা) কুরাইশ নেতা উমায়্যা ইবন খালাফের নেতৃত্বাধীন এক'শ লোকের একটি কাফিলার সন্ধানে বের হন। ইতিহাসে এটা 'বাওয়াত' অভিযান নামে খ্যাত। একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে সা'দ ইবন মু'য়াজকে মদীনায় রেখে যান। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৮৭)

হযরত রাসূলে কারীম (সা), আবূ 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ মতান্তরে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। (তাবাকাত–৩/৪২১; সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫০৫)

হিজরী ২য় সনে 'বাওয়াত' অভিযানের পর ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ আসন্ন। হযরত সা'দের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার সময় সমাগত। মক্কার কুরাইশরা মদীনা আক্রমণের জন্য তোড়জোড় শুরু করলো। খবর পেয়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বদরের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে কুরাইশ বাহিনীর সর্বশেষ গতিবিধি অবগত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শে বসেন। মুহাজিরদের মধ্য থেকে আবূ বকর, 'উমার, মিকদাদ (রা) প্রমুখ সাহাবী নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। অতঃপর রাসূল (সা) আনসারদের লক্ষ্য করে বলেনঃ 'ওহে লোকেরা, আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন।' সাথে সাথে সা'দ ইবন মু'য়াজ উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবতঃ আপনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন?' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হা। 'সা'দ বললেনঃ 'আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যবাদী বলে জেনেছি, আর আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, যা কিছু আপনি নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। আপনার কথা শোনার ও আপনার আনুগত্য করার আমরা অঙ্গিকার করেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যা ইচ্ছা আপনি করুন, আমরা আপনার সাথে আছি। সেই সত্তার নামে শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। যদি আপনি আমাদেরকে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে থাকবে না। আগামী কালই আপনি আমাদেরকে নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হোন, আমরা তাতে ক্ষুণ্ন হবো না। যুদ্ধে আমরা দারুন ধৈর্যশীল, শত্রুর মুকাবিলায় পরম সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন আচরণ প্রত্যক্ষ করাবেন যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে আমাদের সাথে নিয়ে আপনি অগ্রসর হোন।' তিনি আরও বলেনঃ 'আমরা তাদের মত হবো না যারা মূসাকে (আ) বলেছিল, আপনিও আপনার রব যান এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করুন। আর আমরা এখানে বসে থাকি। বরং আমরা বলি, আপনি ও আপনার রব যান, আমরা আপনাদের অনুসরণ করবো। হতে পারে এক উদ্দেশ্যে আপনি বেরিয়েছেন; কিন্তু আল্লাহ আর একটি করলেন। দেখুন, আল্লাহ আপনার দ্বারা কি করান।' ঐতিহাসিকরা বলেছেন, আল্লাহ

সা'দের এই কথার সমর্থনে সূরা আনফালের ৫ নং আয়াতটি নাযিল করেন। সা'দের উপরোক্ত ভাষণে রাসূল (সা) ভীষণ খুশী হন। সৈন্য মোতায়েনের সময় তিনি আউস গোত্রের ঝান্ডাটি সা'দের হাতে তুলে দেন। অন্যএকটি বর্ণনা মতে এ যুদ্ধে গোটা আনসার সম্প্রদায়ের পতাকা ছিল সা'দের হাতে। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬১৩, ৬১৫; উসুদুল গাবা-২/২৯৯; তাবাকাত-৩/৪২১; আল-বিদায়া-৩/২৬২; হায়াতুস সাহাবা-১/৪১৫)

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে সা'দ ইবন মু'য়াজ বললেনঃ'ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আমরা আপনার জন্য একটি 'আরীশ' বা তাঁবু স্থাপন করে একটি বাহিনী মোতায়েন রাখিনা কেন? আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব। তাতে যদি আল্লাহ আমাদের সম্মান দান করেন, আমরা বিজয়ী হই, তাহলে তো আমাদের আশা পূর্ণ হলো। আর যদি এর বিপরীত কিছু ঘটে তাহলে আপনি এই বাহিনী সহ আমাদের পিছনে ছেড়ে আসা লোকদের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। হে আল্লাহর নবী! আমাদের যে সব লোক মদীনায় পিছনে রয়ে গেছে, আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা তাদের থেকে একটুও বেশী নয়। যদি তারা বুঝতে পারতো আপনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন, তবে তারা এভাবে পিছনে পড়ে থাকতো না। আল্লাহ তাদের দ্বারা আপনার হিফাজত করবেন। তারা আপনাকে সৎ উপদেশ দান করবে এবং আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করবে।' এই বক্তব্যের জন্য রাসূল (সা) সা'দের প্রশংসা করে তাঁর জন্য দু'আ করলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য রনক্ষেত্রের অদূরে একটি 'আরীশ' নির্মিত হয় এবং তিনি সেখান থেকে বদর যুদ্ধ পরিচালনা করেন। (আল-বিদায়া-৩/২৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২০)

এই বদর যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী যখন পরাজিত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে তখন মুসলিম মুজাহিদরা তাদের ধাওয়া করে ধরে ধরে বন্দী করতে শুরু করে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখন 'আরীশে' অবস্থান করছেন। তাঁর ওপর অকস্মাৎ পাল্টা আক্রমণ হতে পারে, এমন এক আশঙ্কায় সা'দ ইবন মু'য়াজ আরো কিছু আনসারী মুজাহিদকে সংগে নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে 'আরীশের' দরযায় পাহারায় নিয়োজিত হন। রাসূল (সা) সা'দের চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করে বলেনঃ সা'দ! মনে হচ্ছে লোকদের কাজ তোমার পছন্দ হচ্ছে না। সা'দ বললেনঃ হাঁ। পৌত্তলিকদের সাথে এটা আমাদের প্রথম সংঘাত। তাদের পুরুষদের জীবিত রাখার চেয়ে হত্যা করাই আমার পছন্দ। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬২৮) একটি বর্ণনা মতে, এ যুদ্ধে তিনি 'আমর ইবন 'উবাইদুল্লাহকে হত্যা করেন। এতে তাঁর একটি দাসও যোগদান করে। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৭, ৪৭৯)

উহুদ যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। এ যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান স্থলের পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন। সূচনাতেই রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছা ছিল মদীনার ভেতর থেকেই কাফিরদের প্রতিরোধ করার। মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূলেরও ছিল একই ইচ্ছা। কিন্তু কিছু নওজোয়ান মুজাহিদ যাঁরা ছিলেন শাহাদাত লাভের চরম অভিলাষী, তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য জিদ ধরে বসেন। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই রাসূল (সা) তাঁদের মতামত মেনে নেন এবং যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হওয়ার জন্য অন্দর মহলে প্রবেশ করেন। সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর তখন বললেনঃ তোমরা রাসূলকে (সা) মদীনার বাইরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেছ; অথচ তাঁর ওপর আসমান থেকে ওহী নাযিল হয়। তোমাদের উচিত, তোমাদের মতামত প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং বিষয়টি

সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর ছেড়ে দেওয়া। এদিকে রাসূল (সা) যখন তরবারি, ঢাল, বর্ম ইত্যাদি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন সবাই অনুতপ্ত হলেন। একযোগে তাঁরা বললেন, আপনার বিরুদ্ধাচারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আপনার নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। রাসূল (সা) বললেনঃ এখন আমার করার কিছুই নেই। কারণ একজন নবী অস্ত্র সজ্জিত হলে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসার কোন অবকাশ থাকে না। (তাবাকাত–২/২৬)

উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা পিছু হটে গেল। দারুন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। এ সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) অটল ও দৃঢ় থাকেন। অন্য যে পনেরো ব্যক্তি রাসূলের (সা) পাশে অটল থাকেন তাঁদের একজন সা'দ ইবন মু'য়াজ। এই উহুদে তাঁর ভাই 'আমর ইবন মু'য়াজ শাহাদাত বরণ করেন। (তাবাকাত–২/৩০; আনসাবুল আশরাফ–১/৩১৮, ৩২৯)।

উহুদ যুদ্ধের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিন আনসারদের বনী আবদুল আশহাল ও জুফার গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, ঐ গোত্রদ্বয়ের মেয়েরা উহুদে শাহাদাত প্রাপ্ত তাদের লোকদের জন্য কান্নাকাটি ও মাতম করছে। দয়ার নবীর দু'টি চোখ পানিতে ভরে গেল। তিনিও কাঁদলেন। তারপর বললেন ঃ 'কিন্তু 'হামযার' জন্য কাঁদার তো কেউ নেই।' সা'দ ইবন মু'য়াজ ও উসাইদ ইবন হুদাইর নিজ গোত্র বনী আবদুল আশহালে ফিরে যখন একথা শুনলেন তখন তাঁরা তাঁদের গোত্রের মহিলাদের নির্দেশ দিলেনঃ 'তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতে যাও এবং তাঁর চাচা হামযার জন্য শোক ও মাতম কর।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৯৯)

মদীনার ইহুদী গোত্র বনী কুরায়জার নেতা কা'ব ইবন আসাদ তার গোত্রের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। খন্দক যুদ্ধের সময় সে বনী নাদার গোত্রের নেতা হুয়ায় ইবন আখতাবের কুপরামর্শ ও উস্কানিতে সেই চুক্তি ভেঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। একথা রাসূলুল্লাহ (সা) সহ মুসলমানদের কানে গেল। রাসূল (সা) ঘটনার যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য আউস গোত্রের পক্ষ থেকে সা'দ ইবন মু'য়াজ ও খাযরাজ গোত্রের পক্ষ থেকে সা'দ ইবন 'উবাদাকে পাঠান। তাদের সাথে আরও যান আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও খাওয়াত ইবন জুবায়র। তাঁরা বনী কুরায়জায় যান এবং তাদের সাথে আলোচনা ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, বিষয়টি সত্য। তাঁরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাঁদের তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট পেশ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২২১)

হযরত সা'দের দৃঢ়তার বহু কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এমন একটি ঘটনা বালাজুরী ও ইবনুল আসীর বর্ণনা করেছেন। গাতফান গোত্রের নেতা আল–হারেস ইবন আউফ ও 'উয়ায়না ইবন হিসনের সাথে রাসূল (সা) এ শর্তে সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করলেন যে, তাদের পক্ষ থেকে মদীনার প্রতি কোন প্রকার হুমকী থাকবে না এবং বিনিময়ে তারা মদীনায় উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ লাভ করবে। এর মধ্যে হিঃ ৫ম সনে খন্দক যুদ্ধের ডামাডোলে মদীনায় দারুণ অভাব দেখা দিল। রাসূলে কারীম (সা) এ সন্ধির ব্যাপারে সা'দ ইবন মু'য়াজ ও

সা'দ ইবন 'উবাদার সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁরা দু'জন বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! এ যদি আপনার পসন্দ হয়, আমরা তা পালন করবো। যদি আল্লাহর নির্দেশ হয় তা হলে তো অবশ্যই পালনীয়। তবে কি এটা আমাদের কথা চিন্তা করে করছেন?' তিনি বললেন ঃ 'হ্যা, তোমাদের কথা চিন্তা করেই করছি। আমি দেখেছি, গোটা আরব এখন তোমাদের বিরুদ্ধে। আমি চেয়েছি, অন্ততঃ এর বিনিময়ে তাদের শত্রুতা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকুক।' একথা শুনে সা'দ ইবন মু'য়াজ বললেন ঃ 'ইয়া রাসূলল্লাহ! তারা ও আমরা ছিলাম এক সাথে পৌত্তলিক।

আমরা কেউ আল্লাহর ইবাদাত করতাম না, তাঁকে জানতামও না। তখনও তারা ব্যবসা উপলক্ষে এবং অতিথি হিসেবে ছাড়া আমাদের একটি খেজুরও খাওয়ার আশা করেনি। আজ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, আল্লাহ ইসলাম ও আপনার দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। আর এখন কিনা আমাদের সম্পদের একটি অংশ তাদেরকে দিতে হবে? এমন সন্ধির প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ আমাদের ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা না করা পর্যন্ত শুধু তরবারি ছাড়া আর কিছুই আমরা তাদেরকে দিব না।' রাসূল (সা) তাঁর কথা মেনে নিলেন। (আল-বিদায়া-৪/১০৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৬,৩৪৭)

যুদ্ধ শুরুর সময় প্রায় কাছাকাছি। সা'দ বর্ম পরে হাতে বর্শা নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছেন। পথে বনী হারেছার দুর্গে তাঁর মা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) পাশে বসে ছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর ছেলে একটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করতে করতে চলেছে। তার একটি পংক্তি এমন ঃ 'যখন আজল এসে যায় তখন আর মৃত্যুর জন্য আপত্তি কিসের।'

মা চেঁচিয়ে বললেন ঃ 'ছেলে! তুমি তো পিছনে পড়ে গেছ, তাড়াতাড়ি যাও।' সা'দের যে হাতে বর্শা ছিল সেই হাতটি বর্মের বাইরে বেরিয়ে ছিল। সে দিকে ইঙ্গিত করে হযরত আয়িশা বললেন ঃ 'সা'দের মা! দেখ, তার বর্মটি কত ছোট।' যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌছার সাথে সাথে তাঁকে লক্ষ্য করে হিববান ইবন 'আবদি মান্নাফ একটি তীর ছোঁড়ে। কোন কোন বর্ণনায় হিববানের পরিবর্তে আবু উসামা অথবা খাফাজা ইবন 'আসিমের নাম এসেছে। তীরটি তাঁর হাতে লেগে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে। খুশীর চোটে হিব্বান বলে ওঠে 'আমি 'আরিকার পুত্র।' একথা শুনে রাসূল (সা), মতান্তরে সা'দ বলে ওঠেন ঃ 'দোযখের মধ্যে আল্লাহ তোমার মুখমন্ডল ঘামে নিমজ্জিত করুন।' উল্লেখ্য যে, 'আরাকার অর্থ ঘাম। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম ঃ ২/২২৬-২২৮; উসুদুল গাবা-২/২৯৬)

সেকালে মসজিদে নববীতে যুদ্ধে আহতদের সেবা ও চিকিৎসার জন্য একটি শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই শিবিরের প্রতিষ্ঠা হয় উহুদ যুদ্ধের পর এবং তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হুজরার নিকটে। আসলাম গোত্রের 'রুফাইদা' নাম্নী এক সেবা পরায়না সৎকর্মশীলা মহিলা ছিলেন এই শিবিরের একজন সেবিকা। তিনি আহতদের সেবা ও চিকিৎসা করতেন। রোগীর সেবা ও ক্ষত চিকিৎসায় তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। খন্দক যুদ্ধে সা'দ ইবন মু'য়াজ আহত হলে রাসূল (সা) নির্দেশ দেন ঃ 'তোমরা সা'দকে রুফাইদার তাঁবুতে রাখ। তাহলে আমি নিকট থেকেই তার দেখাশুনা করতে পারবো।' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৩৯; উসুদুল গাবা-২/২৯৭; দায়িরা-ই-মা'রিফ-ইসলামিয়্যা, উর্দু-১১/৩৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রতিদিন এই শিবিরে এসে অসুস্থ সা'দের দেখাশুনা করতেন। তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েন, তাই আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন ঃ 'হে

আল্লাহ! কুরাইশদের সাথে এ সংঘাত যদি এখনও অবশিষ্ট থাকে তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। তাদের সাথে লড়াই করার আমার খুব সাধ। কারণ, আপনার রাসূলকে তারা কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে অস্বীকার করেছে এবং মাতৃভূমি মক্কা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর যদি সংঘাত শেষ হওয়ার সময় হয়ে থাকে তাহলে এই ক্ষতের দ্বারাই আমাকে শাহাদাত দান করুন। আর বনী কুরায়জার ব্যাপারে আমার চোখে প্রশান্তি না আসা পর্যন্ত আমার মরণ দিও না।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২২৭; উসুদুল গাবা–২/২৯৬; বুখারী–২/৫৯১) আল্লাহ পাক তাঁর দু'আর শেষ কথাটি কবুল করেন।

খন্দক যুদ্ধে কুরাইশ ও তাদের মিত্র বাহিনীর পশ্চাদাপসরণের পর রাসূল (সা) মদীনার যাবতীয় ফাসাদের উৎস ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জাকে শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তারা চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই বনী কুরায়জার সাথে প্রাচীনকাল থেকে মদীনার আউস গোত্রের মৈত্রী চুক্তি ছিল। রাসূল (সা) যখন তাদেরকে শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত নিলেন তখন আউস গোত্রের লোকেরা বললো ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিপক্ষ খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে তারা ছিল আমাদের মিত্র। এর আগে আপনি আমাদের ভাই খাযরাজীদের মিত্র গোত্র বনী কায়নুকা'র বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা তো আপনার জানা আছে।' মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুলও একই রকম কথা বললো। আসলে তারা রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে বনী কুরায়জার ব্যাপারে কোন কঠিন দন্ডের আশংকা করছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'ওহে আউস গোত্রের লোকেরা! তোমাদের গোত্রের কেউ একজন তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দিলে তোমরা কি তাতে খুশী হবে?' তারা বললো ঃ হ্যাঁ, খুশী হবো।' রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তাদের ব্যাপারে সা'দ ইবন মু'য়াজ রায় দেবে।'

বনী কুরায়জার ভাগ্য নির্ধারণের জন্য রাসূল (সা) এভাবে সা'দ ইবন মু'য়াজকে বিচারক নিয়োগ করলেন। সা'দ তো তখন আহত অবস্থায় দারুণ অসুস্থ। আউস গোত্রের লোকেরা উটের পিঠে গদি বসিয়ে তার ওপর সা'দকে উঠিয়ে রাসূলের (সা) নিকট নিয়ে গেল। তারা সা'দকে বললো ঃ 'আবু 'আমর! আপনার মিত্রদের সাথে একটু ভালো আচরণ করবেন। সম্ভবতঃ এ জন্যই রাসূল (সা) আপনাকে বিচারক মনোনীত করেছেন।' তারা বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করলে সা'দ বললেন ঃ 'আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন নিন্দুকের নিন্দার বিন্দুমাত্র পরোয়া সা'দের নেই।' সা'দ যখন রাসূলের (সা) নিকট পৌঁছুলেন তখন রাসূল (সা) আশেপাশে বসা আনসার ও মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'কু মু ইলা সায়্যিদিকুম– তোমাদের নেতার সম্মানার্থে তোমরা উঠে দাঁড়াও।' সা'দের গোত্রের লোকেরা বিচারের ক্ষেত্রে একটু নমনীয় হওয়ার জন্য যখন আবারও পীড়াপীড়ি শুরু করলো তখন তিনি বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি অনুসরণ করা উচিত।' তারপর রাসূল (সা) সা'দকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'এই লোকেরা তোমার রায়ের অপেক্ষায় আছে।' সা'দ বললেন, 'আমি আমার রায় ঘোষণা করছি ঃ তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার উপযুক্ত তাদেরকে হত্যা করা, তাদের নারী ও শিশুদেরকে দাস–দাসীতে পরিণত করা এবং তাদের ধন–সম্পদ বন্টন করে দেওয়া হোক।' তাঁর এই রায় শুনে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ যে ফায়সালা দিয়েছেন তুমিও ঠিক একই ফায়সালা দিয়েছ।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৩৯, ২৪০; উসুদুল গাবা–২/২৯৭; আল–ইসাবা–২/৩৮)

বনী কুরায়জার ব্যাপারে সা'দের রায় বাস্তবায়িত হওয়ার পর অল্প কিছু দিন তিনি জীবিত ছিলেন। একদিন রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁর ক্ষতে সেঁক দেন। তাতে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে ফুলে যায়। হঠাৎ একদিন ক্ষতটি ফেটে তীব্র বেগে রক্ত ঝরতে থাকে। ইবন 'আব্বাস বলেনঃ যখন সা'দের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহ শুরু হয় তখন রাসূল (সা) দৌড়ে এসে তাঁর মাথাটি কোলের ওপর উঠিয়ে নেন। সা'দের রক্তে রাসূলের (সা) চেহারা ও দাড়ি ভিজে যায়। রাসূল (সা) একটি সাদা চাদর দিয়ে তাঁর দেহটি ঢেকে দেন। চাদরটি এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। সা'দ ছিলেন ফর্সা মোটা মানুষ। রাসূল (সা) তখন সা'দের জন্য দু'আ করেন এই বলে ঃ 'হে আল্লাহ! সা'দ তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছে, তোমার নবীকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর পথে চলেছে। তুমি তাঁর রূহকে সর্বোত্তমভাবে কবুল কর।' রাসূলের (সা) এই দু'আ শুনে সা'দ চোখ খোলেন এবং বলেন ঃ 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। (তাবাকাত–৩/৪২৬; হায়াতুস সাহাবা–২/৪৫৭)

হযরত সা'দ ইনতিকাল করলেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ 'সা'দ ইবন মু'য়াজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর রাতের বেলা একটি রেশমী পাগড়ী মাথায় বেঁধে জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ 'ইয়া মুহাম্মদ! এ মৃত ব্যক্তিটি কে, যার জন্য আসমানের সবগুলি দরযা খুলে গেছে এবং 'আরশ কেঁপে উঠেছে?' রাসূল (সা) কাপড় টানতে টানতে খুব দ্রুত সা'দের নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি ইনতিকাল করেছেন। (তাবাকাত–৩/৪৩২; সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৫০, ২৫১)

রাসূল (সা) সা'দের মাথাটি কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকলেন। তখনও তাঁর হাত থেকে রক্ত ঝরছিল। চতুর্দিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে লাগলো। আবু বকর (রা) দৌড়ে এসে লাশ দেখে চিৎকার দিয়ে উঠলেন। রাসূল (সা) তাঁকে এমনটি করতে নিষেধ করলেন। 'উমার (রা) কাঁদতে কাঁদতে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। গোটা তাঁবুতে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল। সা'দের দুখিনী মা কাঁদতে কাঁদতে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। 'উমার (রা) তাঁকে কবিতা পড়তে নিষেধ করলেন; কিন্তু রাসূল (সা) বললেনঃ থাক, তাকে পড়তে দাও। অন্য বিলাপ কারিনীরা মিথ্যা বলে থাকে; কিন্তু সা'দের মা সত্য বলছে।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৫২; তাবাকাত–৩/২২৮, ২২৯)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সা'দের মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ীতে যাচ্ছিলেন। সাহাবীরাও সংগে ছিলেন। তিনি এত দ্রুত চলছিলেন যে, সাহাবীরা তাঁর অনুসরণ করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে পড়ছিলেন। একজন তো বলেই বসলেন; 'আপনি এত দ্রুত চলছেন কেন? আমরা তো রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়ছি?' রাসূল (সা) বললেনঃ 'আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের আগেই ফিরিশ্‌তারা তাকে গোসল না দিয়ে ফেলে, যেমন দিয়েছিল হানজালাকে।' (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৪৫)

রাসূল (সা) সা'দের জানাযার সাথে গোরস্তানে গিয়েছিলেন। মুনাফিকরাও গিয়েছিল। তাঁর লাশ হালকা বোধ হচ্ছিলো। এজন্য মুনাফিকরা বলাবলি করছিল, এমন হালকা লাশ তো আমরা আর কখনও দেখিনি। সম্ভবতঃ বনী কুরায়জার ব্যাপারে সে যে রায় দিয়েছিল, এটা তারই কুফল। কথাটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে তিনি বললেন; 'যাঁর হাতে আমার জীবন

তাঁর নামের শপথ! ফিরিশতাকুল তাঁর খাটিয়া বহন করছে।' ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আরও বললেনঃ 'নিশ্চয় এই সা'দ অতি নেক্কার বান্দা। তার জন্য আল্লাহর 'আরশ দুলে উঠেছে, আসমানের দরযাসমূহ খুলে গেছে এবং তাঁর জানাযায় এমন ৭০ হাজার ফিরিশতা যোগদান করেছে যারা এর আগে আর কখনও পৃথিবীতে আসেনি।' (তাবাকাত-৩/৪৩০; উসুদুল গাবা-২/২৯৭, সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫১)

ইবন ইসহাক জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ 'সা'দকে দাফনের সময় আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলাম। তিনি প্রথমে, একবার জোরে 'সুবহানাল্লাহ' উচ্চারণ করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে 'সুবহানাল্লাহ' পড়লেন। তারপর তিনি 'তাকবীর' ধ্বনি দিলেন, লোকেরাও 'তাকবীর' দিল। লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এভাবে 'তাসবীহ' পড়লেন কেন? বললেনঃ এ নেক্কার লোকটির কবর বড় সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ পাক প্রশস্ত করে দিয়েছেন।' (তাবাকাত-৩/৪৩২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫১, ২৫২)

হযরত সা'দকে দাফনের পর রাসূলে কারীমকে (সা) দারুণ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। চোখ দিয়ে ক্রমাগতভাবে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। আল-ইস্তীয়াব গ্রন্থকার বলেছেনঃ 'খন্দক যুদ্ধের একমাস এবং বনী কুরায়জার ঘটনার কয়েক রাত্রি পর হিজরী পঞ্চম সনে সা'দের ওফাত হয়।' (টীকাঃ আল-ইসাবা-২/২৮)

মদীনার বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। (আল-আ'লাম-৩/১৩৯) ইবন ইসহাক তাঁকে খন্দক যুদ্ধে বনী 'আবদিল আশহালের শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫২)

হযরত সা'দের ওফাতের ঘটনাটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক অসাধারণ ঘটনা। তিনি ইসলামের খিদমতে যে অবদান রাখেন এবং তাঁর মধ্যে যে ঈমানী চেতনা বিদ্যমান ছিল, তার জন্য তাঁকে আনসারদের 'আবু বকর' বলে গণ্য করা হতো। 'ইফক' বা হযরত আয়িশার প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন রাসূল (সা) ক্ষোভের সাথে বললেনঃ 'এ আল্লাহর দুশমন (আবদুল্লাহ ইবন উবাই, মুনাফিক সর্দার) আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে এর প্রতিবিধান করতে পারে? 'সাথে সাথে সা'দ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেনঃ 'আউস গোত্রের কেউ থাকলে আমাকে বলুন, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দিচ্ছি। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজীদের কেউ হয়, আমাদেরকে নির্দেশ দিন, আমরা আপনার নির্দেশ বাস্তবায়ন করবো।' (শাহীরাতুন নিসা ফিল 'আলম আল-ইসলামী-৫৯) তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বুঝা যায় তাঁর জানাযায় ফিরিশতাদের অংশগ্রহণ এবং আল্লাহর 'আরশ কেঁপে উঠার মাধ্যমে। তাই একজন আনসারী কবি গর্ব করে বলেছিলেনঃ 'একমাত্র সা'দ আবু 'আমরের মৃত্যু ছাড়া আর কোন মরণশীলের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে, এমন কথা আমরা কখনও শুনিনি।' এমনিভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারী কবি হাস্সান ইবন সাবিতও তাঁর অনেক কবিতায় সা'দের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জ্ঞাপন করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৫২, ২৬৯, ২৭০, ২৭২)

হযরত সা'দ ছিলেন ফর্সা, দীর্ঘদেহী, সুদর্শন পুরুষ। মৃত্যুকালে 'আমর ও আবদুল্লাহ নামে দুই ছেলে রেখে যান। তাঁরা দু'জনই বাই'য়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

তাঁদের মা হিন্দা বিনতু সাম্মাকও ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিতা সাহাবিয়্যা। (তাবাকাত–৪২০, ৪৩৩)

মদীনায় ইসলামের প্রথম ভাগেই হযরত সা'দের ওফাত হয়। জীবনের মাত্র পাঁচটি বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ অল্প সময়ে তিনি হয়তো বহু হাদীস শুনে থাকবেন; কিন্তু হাদীস বর্ণনার সিলসিলা যেহেতু রাসূলুল্লাহর (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর শুরু হয়, এ কারণে তাঁর বর্ণনা প্রচারিত হয়নি। তবে সহীহ বুখারীতে 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের একটি বর্ণনা এসেছে যাতে সা'দের 'উমরার কথা আছে এবং উহুদে সা'দ ইবন রাবী'র শাহাদাতের ঘটনা প্রসঙ্গে আনাস (রা) তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটাও বুখারীতে এসেছে। (তাহজীব আত–তাহজীব–৩/৪৮২)

নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ ছিলেন অতি উঁচুমানের লোক। 'আয়িশা (রা) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) পরে বনী 'আবদুল আশহালে তিন ব্যক্তি থেকে উত্তম আর কেউ নেই। তাঁরা হলেনঃ সা'দ ইবন মু'য়াজ, উসাইদ ইবন হুদাইর ও 'আব্বাদ ইবন বিশর।' (আল–ইসাবা–২/৯৭) সা'দ নিজেই বলতেনঃ আমি একজন সাধারণ মানুষ, তবে তিনটি বিষয়ে যে পর্যন্ত পৌছানো উচিত, আমি সেখানে পৌচেছি। ১· রাসূলুলাহর (সা) মুখ থেকে যে বাণী আমি শুনি তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস করি। ২· নামাযের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা আমার মনে জাগে না। ৩· মৃত ব্যক্তির জানাযার কাছে থাকলে মুনকির–নাকীরের প্রশ্নের চিন্তা ছাড়া আমার মধ্যে আর কিছু থাকে না। টীকাঃ আল ইসতীয়াব; আল ইসাবা–২/৩৩; তাহজীব আত তাহজীব–৩/৪৮২)

হযরত সা'দের 'আমলের ওপর হযরত রাসূলে কারীমের (সা) যে দারুণ আস্থা ছিল সে কথা একটি হাদীসে জানা যায়। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেনঃ 'কবরের একটি চাপ অবশ্যই আছে। যদি কেউ এই চাপ থেকে রেহাই পেয়ে থাকে, তাহলে সে সা'দ ইবন মু'য়াজ।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৫২; তাবাকাত–৩/৪৩২। তাছাড়া ইমাম আহমাদ ও বায়হাকীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

কিন্দার রাজা উকাযদারকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এলেন। তার মূল্যবান পোশাক দেখে, মতান্তরে রাসূলকে (সা) উপহার দেওয়া একখানা কাপড় দেখে সাহাবীরা অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁদের এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) বললেনঃ 'তোমরা এই দেখে অবাক হচ্ছো? জান্নাতে সা'দ ইবন মু'য়াজের রুমালগুলিও এর থেকে সুন্দর হবে।' (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৮৩; তাবাকাত–৩/৪৩৬; উসুদুল গাবা–২/২৯৭, ইবন হিশাম–২/৫২৬; সহীহ বুখারী–১/৫৩৬)

আবু সা'ঈদ আল–খুদরী (রা) বলেনঃ 'যাঁরা বাকী গোরস্তানে সা'দের কবর খুঁড়েছিল আমি তাঁদের একজন। আমরা কবরের মাটি খোঁড়ার সময় মিশকের ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। শুরাহবীল ইবন হাসানা বলেনঃ এক ব্যক্তি সা'দের কবরের মাটি থেকে এক মুঠ মাটি নিয়ে ঘরে রেখে দেয়। কিছুদিন পরে সে দেখে, তা মাটি নয়; বরং মিশ্‌ক। (তাবাকাত–৩/৪৩১; হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৯৫) ■

সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)

আসল নাম সা'দ, ডাকনাম আবু কায়স ও আবু সাবিত। প্রথমটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। (উসুদুল গাবা–২/২৮৩) লকব বা উপাধি সায়্যিদুল খাযরাজ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'সায়িদাহ' শাখার সন্তান। পিতার নাম 'উবাদা ইবন দুলাইম এবং মাতার নাম 'উমরা বিন্‌তু মাস'উদ। 'উমরা সাহাবিয়্যা (মহিলা সাহাবী) ছিলেন এবং হিজরী ৫ম সনে ইন্তিকাল করেন। সা'দ তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'দুমাতুল জান্দাল' যুদ্ধে যোগদানের জন্য মদীনার বাইরে। মদীনায় ফিরে রাসূল (সা) তাঁর মার কবরে যান এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন। (তাবাকাত–৩/৬১৪; আল–ইসাবা–২/৩০)

হযরত সা'দের সম্মানিত দাদা 'দুলাইম' ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সবচেয়ে বড় নেতা। তাছাড়া মদীনার জনকল্যাণমূলক কাজেও তাঁর খ্যাতি ছিল। সায়িদাহ খান্দানের সম্মান ও গৌরব মূলতঃ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। দেবী 'মানাত'–এর পূজা করতেন। এ দেবীর মূর্তি ছিল মক্কার নিকটে 'মুসালাল্' নামক স্থানে। তিনি প্রতি বছর সেখানে দশটি উট বলি দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'উবাদা, তারপর সা'দ ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রাখেন। ইসলামী যুগে সা'দের ছেলে কায়স পূর্ব পুরুষের ধারা বজায় রেখে উটগুলি কা'বার চত্বরে কুরবানী করতেন। একবার হযরত আবু 'উবাইদা ও হযরত 'উমার (রা) কায়সকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু কায়স তাঁদের কথার প্রতি মোটেও কর্ণপাত করেননি। তাঁরা কায়সের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অভিযোগ করেন। তখন রাসূল (সা) বলেনঃ কায়স তো দানশীল পরিবারের সন্তান। (আল–ইসতী'য়াবঃ টীকা আল–ইসাবা–২/৩৭)

সা'দের পিতা 'উবাদা ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী। পিতার মত একইভাবে জীবন কাটিয়ে ছেলে সা'দের জন্য ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান। ছেলেকে তিনি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলেন। 'সা'দ' সেই জাহিলী আরবেই 'কামিল' উপাধি লাভ করেন। কারণ, তৎকালীন আরবে হাতে গোনা যে ক'জন লোক আরবী লিখতে জানতো, তিনি ছিলেন তাদের একজন। তাঁর আরবী লেখা ছিল চমৎকার। তাছাড়া তিনি ছিলেন সে সময়ের আরবের একজন শ্রেষ্ঠ সাঁতারু ও দক্ষ তীরন্দাজ। আর এ বিদ্যাগুলি যারা বিশেষভাবে রফ্‌ত করতো আরববাসী শুধু তাদেরকেই 'কামিল' উপাধি দিত। (দ্রঃ তাহজীব আত–তাহজীব–৩/৪৭৫; আল ইসাবা–২/৩০; তাবাকাত–৩/৬১৩)

শেষ 'আকাবার বাই'য়াতের সময় সা'দ ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বনী সায়িদার 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) নিয়োগ করেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৫০; উসুদুল গাবা–২/২৮৩) তাঁকে উঁচু স্তরের সাহাবী গণ্য করা হতো। বুখারী শরীফে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'ওয়া কানা জা কিদামিন ফিল ইসলাম'– ইসলামে তিনি ছিলেন প্রথম স্তরের মানুষ।

'আকাবার শেষ বাই'য়াত যেভাবে সম্পন্ন হয়, আনসারদের যে সংখ্যক মানুষ তাতে

অংশগ্রহণ করেন এবং যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শর্তের ওপর তা অনুষ্ঠিত হয় তাতে তা গোপন থাকা সম্ভব ছিল না। যদিও তা রাতের অন্ধকারে গোপনে হয়েছিল। কারণ, রাসূলকে (সা) নিয়ে কুরাইশদের চিন্তার অন্ত ছিল না। তারা সর্বক্ষণ তাঁর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। সুতরাং রাতের যে লগ্নে রাসূল (সা) 'আকাবায় মদীনা থেকে আগত লোকদের নিকট থেকে বাই'য়াত গ্রহণ করেন, ঠিক সেই সময়ে; কেউ একজন মক্কার 'জাবালে আবু কুরাইসের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল; 'দেখ সা'দ যদি মুসলমান হয়ে যায় তালে মুহাম্মাদ একেবারেই নির্ভিক হয়ে যাবে।' (দ্রঃ উসুদুল গাবা–২/২৮৪; আল ইসতী'য়াব; আল ইসাবা–২/৩৭)

এ আওয়ায কুরাইশদের কানে পৌঁছালেও প্রথমে তারা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। তারা সা'দ বলতে 'কাদায়া' ও তামীম গোত্রের সা'দ নামের লোকগুলিকে বুঝেছিল। পরের রাতে ঐ পাহাড় থেকে আবার একটি কবিতার কিছু চরণ আবৃত্তি করতে শোনা গেল। তাতে পরিষ্কার ভাবে সা'দের নাম ও পরিচয় ছিল। কুরাইশরা দারুণ বিস্ময়ের মধ্যে পড়ে গেল। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তারা 'দারুন নাদওয়া' বা পরামর্শ গৃহে সমবেত হলো। তারা মদীনার আউস গোত্রের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন 'উবাই ইবন সুলুলের সাথে কথা বললো, কিন্তু সে বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কুরাইশরা চারিদিকে গোয়েন্দা নিয়োগ করে যার যার মত বাড়ীতে ফিরে গেল। আর মদীনাবাসী মুসলমানরা 'ইয়াজজ'–এর পথে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলো।

ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ 'নাকীবগণ 'আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত শেষ করে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কেউ কেউ মক্কা ছেড়ে স্বদেশের পথ ধরলো। এদিকে বাই'য়াতের কথা লোকমুখে প্রচার হয়ে গেল। খোঁজ–খবর নিয়ে কুরাইশরা বুঝতে পারলো, ব্যাপারটি সত্য। তারা বাই'য়াতকারীদের ধরার জন্য বেরিয়ে পড়লো এবং সা'দ ইবন 'উবাদা ও আল মুনজির ইবন 'উমারকে পেয়ে গেল। তবে সা'দকে ধরতে পারলেও আল মুনজির ইবন 'উমার পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। সা'দের মাথার চুল ছিল লম্বা। তারা সেই চুল ধরে টেনে–হেঁচড়ে নিয়ে চললো। সা'দ বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তাদের হাতে বন্দী। কুরাইশদের কয়েকজন লোক আমার কাছে আসলো। তাদের মধ্যে একজন উজ্জল সুদর্শন যুবককে দেখে আমি ভাবলাম, যদি এ সম্প্রদায়ের কারও মধ্যে ভালো কিছু থাকে তাহলে হয়তো এর মধ্যেই আছে। সে ছিল সুহাইল ইবন 'আমর। কিন্তু সে আমার আশার মুখে ছাই দিয়ে কাছে এগিয়ে এসে আমার গায়ে জোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিল। আমি তখন মনে মনে বললাম; আল্লাহর কসম! এরপর এ সম্প্রদায়ের অন্য কারও কাছে ভালো কিছু আশা করা বৃথা। একজন প্রশ্ন করলো; তুমি কি মুহাম্মাদের দীন কবুল করেছ? আমি বললাম; হাঁ, কবুল করেছি। তখন তাঁরা আমাকে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধলো। এসময় একজন আমার উরুতে টোকা মেরে বললোঃ কুরাইশদের কারও সাথে তোমার কি কোন চুক্তি আছে? বললামঃ হাঁ আছে। মুতয়িম ইবন 'আদী ও আল–হারিস ইবন উমায়্যা যখন আমাদের আবাসভূমিতে যায়, আমি তাদের নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। সে বললোঃ তোমার বাপ নিপাত যাক! শিগগিরই তাদের নাম ধরে জোরে জোরে সাহায্য চাও। আমি তাই করলাম। লোকটি ছুটে তাদের দু'জনের কাছে গিয়ে বললোঃ কুরাইশদের কয়েক ব্যক্তি যে লোকটিকে বন্দী করে মারধোর ও অপমান করছে সে তোমাদের দু'জনের নাম ধরে ডাকছে। সে বলছে, তোমাদের সাথে নাকি তার মৈত্রী চুক্তি আছে। তারা জিজ্ঞেস করলোঃ লোকটি কে? সে বললোঃ সা'দ ইবন 'উবাদা। তারা

বললোঃ সে সত্য বলেছে। তারপর মুতয়িম ইবন 'আদী ও আল হারিস ইবন উমায়্যা ছুটে এসে তাদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে মদীনার পথ ধরিয়ে দেয়।'

এই মুতয়িম ইবন আদী ছিলেন মক্কার এক অতি ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি। ইসলামের সূচনা পর্বে মক্কায় তিনি রাসূলকে (সা) নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আর যে ব্যক্তি তাকে খবর দিয়েছিল, সে ছিল আবুল বাখতারী ইবন হিশাম।

যাইহোক, সা'দ এভাবে বন্দী হওয়ায় মদীনা অভিমুখী আনসারদের কাফেলায় দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা পরামর্শ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়, জীবনের ঝুঁকি থাকলেও মক্কায় ফিরে সা'দের সন্ধান নিতে হবে। এর মধ্যে সা'দকে ফিরে আসতে দেখা গেল। তারা তাঁকে সংগে করে সোজা মদীনার পথ ধরলো। (দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৮৫,৮৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৪, ২৫৫; সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৫০, ১৫১; তাবাকাত-১/১৫০)

সা'দের বন্দীর বিষয়টি নিয়ে কুরাইশ পক্ষের কবি দাররার ইবনুল খাত্তাব ইবন মিরদাস একটি কবিতা রচনা করে। কবি হাস্সান ইবন সাবিত তার জবাবে বড় একটি কবিতা লেখেন। তাতে সা'দের প্রশংসা ও কুরাইশদের নিন্দা করা হয়েছে। আনসাবুল আশরাফ ও সীরাতু ইবন হিশামসহ বিভিন্ন গ্রন্থে তার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। (দ্রঃ আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৫ ; সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৫০, ১৫১)

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পর রাসূল (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। এ উপলক্ষে মদীনার প্রতিটি অলি-গলিতে আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। তিনি আবু আইউবের বাড়ীতে পৌছতেই সেখানে হাদিয়া তোহফা আসা শুরু হয়ে যায়। হযরত সা'দ তাঁর বাড়ী থেকে বড় এক পাত্র সারীদ ও 'উরাক পাঠিয়ে দেন। (তাবাকাত-১/১৬১)

হিজরাতের কয়েক মাস পর থেকে ইসলামী আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করতে থাকে। হিজরাতের দ্বাদশ মাস সফরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ছোট্ট একটি বাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে 'আবওয়া' নামক স্থানে যান। এটাকে 'ওয়াদ্দান' অভিযানও বলা হয়। এ বাহিনীতে কোন আনসার মুজাহিদ ছিল না। এ সময় পনেরোটি রাত রাসূল (সা) মদীনার বাইরে ছিলেন। তিনি সা'দ ইবন 'উবাদাকে স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় রেখে যান। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৭; তাবাকাত-১/৩)

হিজরী দ্বিতীয় সনে ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে হযরত সা'দের অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের দারুণ মতভেদ আছে। ইয়াকুব ইবন সুফইয়ান, মূসা ইবন 'উকবা, খলীফা ইবন খায়্যাত, আল ওয়াকিদী, আল মাদায়িনী, ইবনুল কালবী প্রমুখ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁকে বদরী যোদ্ধা বলে উল্লেখ করেছেন। আবু আহমাদ তাঁর 'আল কুনা' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদরে অংশগ্রহণ করেন।(দ্রঃ উসুদুল গাবা-২/২৮৩; আল ইসতীয়াব ; আল ইসাবা-২/৩৬; তারীখ ইবন 'আসাকির-৬/৮৪, ৮৫) পক্ষান্তরে ইবন ইসহাক তাঁকে বদরী যোদ্ধাদের মধ্যে উল্লেখ করেননি। ইবন সা'দ ও বালাজুরী বলেনঃ সা'দ বদরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে কুকুরে কামড়ায়। এ কারণে তিনি যেতে পারেননি। রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ যদিও সা'দ বদরে হাজির হয়নি, তবে সে যাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে রাসূল (সা) তাঁকে বদরের গনীমতের অংশ দিয়েছিলেন। ইবন আসাকির বলেন, এটা সর্বসম্মত ও প্রমাণিত

নয়। (দ্রঃ তাকরীবুত তাহজীব-১/২৮৮; উসুদুল গাবা ২/২৮৩, আল ইসবা ২/৩০; তারীখ ইবন 'আসাকির ৬৮৪, ৮৫) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সা'দের বদরে অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে এটাই সঠিক যে, তিনি বদরে শরীক হননি। আল্লামা ইবন হাজার 'আসকিলানীর মতও এটাই। তিনি ইমাম মুসলিমের ভাষা দ্বারা নিজ মতের স্বপক্ষে খুব সুক্ষ্মভাবে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। (দ্রঃ ফাতহুল বারী-৫/২২৪)

বদর যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের যুদ্ধগুলির মধ্যে প্রথম এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এর পূর্বে যদিও চারটি গাযওয়া ও চারটি সারিয়্যা সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন আনসারী সৈনিক অংশগ্রহণ করেনি। এর নানা কারণ থাকতে পারে। একটি এই হতে পারে যে, 'আকাবার বাই'য়াতের সময় আনসারদের পক্ষ থেকে শুধু এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, যারা মদীনা আক্রমণ করবে শুধু তাদেরকেই তারা প্রতিরোধ করবে। মদীনার বাইরে কোন সংঘাত হলে সে বিষয়ে তাদের ভূমিকা কী হবে তার কোন উল্লেখ তাতে ছিল না। আরেকটি কারণ এই হতে পারে যে, রাসূল (সা) প্রথমতঃ মদীনার মূল বাসিন্দাদেরকে কুরাইশদের শত্রু হিসেবে দাঁড় করাতে চাননি।

অতএব রাসূল (সা) যখন বদরে যাত্রার মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন তখন আনসারদের সাথে পরামর্শ করা ও তাদের মতামত গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেন। মদীনার সকল গোত্রের লোকদের একটি বৈঠকে ডাকা হলো। সেখানে যুদ্ধের বিষয়টি উঠলো। হযরত আবু বকর (রা) উঠে তাঁর মতামত পেশ করলেন। হযরত 'উমার (রা) কিছু বলার জন্য উঠলেন, কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। সেই বৈঠকে হযরত সা'দ ইবন 'উবাদাও ছিলেন। তিনি বুঝলেন, রাসূল (সা) তাঁদের মতামত চাচ্ছেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল। যার হাতে আমার জীবন, তাঁর জাতের কসম, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্র অভিযানের নির্দেশ দেন, আমরা তা দলিত মথিত করে ছাড়বো। আর যদি শুকনো মাটিতে অভিযানের আদেশ দেন তাহলে ইয়ামনের 'বারকে গিমাদ' পর্যন্ত উট ছুটিয়ে নিয়ে যাব। (সহীহ মুসলিম-২/৮৪; আল-বিদায়া-৩/২৬৩; কানযুল 'উম্মাল-৫/২৭৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৪২৪)

উল্লেখিত বর্ণনার ভিত্তিতে সীরাত লেখকদের অনেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, তিনি বদরে যোগদান করেছিলেন। অথচ সহীহ মুসলিমের এ বর্ণনাতেই উল্লেখ আছে সিরিয়া থেকে আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফিলা আসার খবর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) পেলেন তখন তিনি পরামর্শ করেন। মূলতঃ এ বাণিজ্য কাফেলা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) মদীনা থেকে বের হন; যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়। (মুসলিম-২/৮৪) কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন, মক্কা থেকে কুরাইশ বাহিনী বদরের দিকে এগিয়ে আসছে। আর তখনই রাসূল (সা) যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কারণে মদীনাবাসীদের অনেকেই বুঝতে পারেননি যে, রাসূল (সা) বদরে একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন। তাই তাদের অনেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মদীনা থেকে বের হননি। আর তাদেরই একজন সা'দ ইবন 'উবাদা। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮)

বদরের পর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার পৌত্তলিক শক্তি এমন তোড়জোড় সহকারে ধেয়ে আসে যে মদীনায় একটা ভীতির সঞ্চার হয়। গোটা মদীনায় সারা রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। মদীনার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তান যথা সা'দ ইবন মু'য়াজ, 'উসাইদ ইবন হুদাইর

প্রমুখের সাথে তিনিও অস্ত্র হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহের হিফাজতে দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা সারা রাত মদীনা পাহারা দেন। শাওয়ালের ৬ তারিখ জুম'আর দিন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) আনসার গোত্র খাযরাজের পতাকাটি সা'দ ইবন 'উবাদার হাতে তুলে দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৪, ৩১৭) প্রস্তুতি শেষ হলে রাসূল (সা) ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে বের হন। আউস ও খাযরাজ গোত্রের দুই নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ ও সা'দ ইবন 'উবাদা নিজ নিজ গোত্রের ঝান্ডা হাতে নিয়ে আগে আগে চললেন। মধ্যে রাসূল (সা) এবং ডানে বাঁয়ে অন্যান্য আনসার-মুহাজির মুজাহিদগণ। এমন শান শওকাতে হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) বের হতে দেখে কাফির ও মুনাফিকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

শনিবার উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধ শুরু হলো। সংঘর্ষ এমন তীব্র ছিল যে, এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। তবে রাসূল (সা) ময়দানে অটল থাকলেন। এ সময় মাত্র ১৪ ব্যক্তি নিজেদের জীবন বাজি রেখে লড়াই করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে থেকে কাফিরদের হটিয়ে দেন। অনেকের মতে ঐ ১৪ জনের একজন সা'দ ইবন 'উবাদা। (যারকানী-২/৪০)

হিজরী ৫ম সনে সংঘটিত হয় বনী মুসতালিক বা মুরাইসী'র যুদ্ধ। এতে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের ঝান্ডা তাঁরই হাতে অর্পণ করা হয়। (তাবাকাত, মাগাযী অধ্যায়-৪৫) এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাকে (রা) কেন্দ্র করে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে যায়। তারা হযরত 'আয়িশার (রা) চরিত্র সম্পর্কে কিছু অশোভন উক্তি করে এবং তাতে কিছু সরল মুসলমানও জড়িয়ে পড়ে। এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় রাসূল (সা) ভীষণ কষ্ট পান এবং একটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাটি 'ইফ্‌ক' বা বানোয়াট কাহিনী নামে পরিচিত হয়েছে।

এই 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনার এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলুল আমার পরিবারের প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছে। এতে আমি দারুণ কষ্ট পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে এর প্রতিবিধান করতে পারে? সাথে সাথে আউস গোত্রের নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ বলে ওঠেন; আমি প্রস্তুত। আপনি যে হুকুম দেবেন তা পালন করবো। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় এখনই তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর খাযরাজ গোত্রের হলে আপনার নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত আছি। উল্লেখ্য যে প্রাচীন কাল থেকে আউস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে শত্রুতা ও রেষারেষি চলে আসছিল। প্রাক-ইসলামী যুগে তাদের মধ্যে বড় ধরনের অনেক যুদ্ধও হয়েছিল। ইসলাম তাদের সেই বৈরিতা দূর করে দেয়। তা সত্ত্বেও তাদের অন্তরে পূর্ব শত্রুতার কিছুটা রেশ বিদ্যমান ছিল। এ কারণে সা'দ ইবন মু'য়াজের কথায় খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ ইবন 'উবাদা অপমান বোধ করেন। কথাটি তিনি সহজভাবে নিতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে সা'দ ইবন মু'য়াজ! তুমি ঠিক বলোনি। তোমরা কক্ষনো খাযরাজকে হত্যা করতে পারবে না, তাদেরকে পরাভূত করতেও সক্ষম হবে না। যদি তোমার নিজ গোত্র আবদুল আশহালের ব্যাপার হতো তাহলে তোমার মুখ থেকে এমন কথা বের হতো না। উসাইদ ইবন হুদাইর ছিলেন সা'দ ইবন মু'য়াজের খালাতো বা মামাতো ভাই। তিনি সা'দ ইবন 'উবাদাকে লক্ষ্য করে বললেন; আপনি এসব কী বলছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ পেলে

আমরা অবশ্যই তা পালন করবো। তারপর দুই গোত্র উত্তেজিতভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। রাসূল (সা) মিম্বরে ছিলেন। তিনি উত্তেজনা দূর করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। (ফাতহুল বারী–৮/৩২; সহীহুল বুখারী–৭/৩৩৫; সীয়ারে আনসার–২/৩৩)

হিজরী ৫ম সনে খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার মুসলমানদের অবস্থা যখন অতি সঙ্কটজনক তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) গাত্‌ফান গোত্রের দুই নেতা 'উয়াইনা ইবন হিস্‌ন ও আল হারিস ইবন 'আউফের সাথে একটি চুক্তি করার ইচ্ছা করলেন। তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করতে চাইলেন যে, মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়ংশের বিনিময়ে তারা কুরাইশদের সাথে যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে। রাসূল (সা) পরামর্শের জন্য সা'দ ইবন মু'য়াজ ও সা'দ ইবন 'উবাদাকে ডাকলেন। তাঁরা উপস্থিত হলে রাসূল (সা) বললেন; আমি 'উয়াইনা ও আল হারিসকে মদীনায় উৎপাদিত ফলের এক তৃতীয়াংশ এই শর্তে দিতে চাই যে, তারা কুরাইশদের পক্ষ ত্যাগ করে ফিরে যাবে; কিন্তু তারা অর্ধেক দাবী করছে। এ ব্যাপারে তোমাদের মত কী?

সা'দ ইবন 'উবাদা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যদি ওহীর নির্দেশ হয় তাহলে তো দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। আর তা যদি না হয় তাহলে তাদের দাবীর জবাব তো শুধু তরবারি। আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে ফলের পরিবর্তে তরবারির ধার উপহার দেব।

রাসূল (সা) বললেন ঃ 'ওহী নয়। ওহী হলে তো তোমাদের সাথে পরামর্শের কোন প্রশ্নই উঠতো না। সা'দ বললেন ঃ 'তাহলে তরবারির মাধ্যমে তাদেরকে জবাব দিতে হবে। জাহিলী যুগেও এমন অপমান আমরা চিন্তা করিনি। আর এখন তো আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মাধ্যমে হিদায়াত দান করে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এখন দেব আমরা আমাদের ফসলের একাংশ তাদেরকে?' রাসূল (সা) তাঁদের দুই জনের সাথে আলোচনা করে খুব খুশী হলেন এবং তাঁদের জন্য দু'আ করলেন। তারপর সা'দ ইবন উবাদা খসড়া চুক্তি পত্রটি হাতে নিয়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম– ২/২২১–২২৩; উসুদুল গাবা– ২/২৮৪; আনসাবুল আশরাফ– ১/৩৪৬, ৩৪৭, হায়াতুস সাহাবা– ২/৪৪,৪৫) এই খন্দক যুদ্ধেও আনসারদের ঝান্ডা সা'দ 'উবাদার হাতে ছিল।

মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের অবরোধের সময় সা'দ ইবন উবাদা নিজ খরচে মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে খেজুর বন্টন করেন। তেমনিভাবে বনু কুরাইজার অবরোধের সময় তিনি মুসলিম সৈনিকদের রসদপত্র সরবরাহ করেন। (দায়িরা–ই–মা'খারিফ ইসলামিয়্যা– ১১/৩২)

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রাসূল (সা) 'গাবা' অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি সা'দকে ৩০০ সদস্যের একটি বাহিনীর অফিসার বানিয়ে মদীনার নিরাপত্তার দায়িত্বে রেখে যান। ওয়াকিদী বর্ণনা করেন ঃ গাবা অভিযানের সময় সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁর গোত্রের তিন শো লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) না ফেরা পর্যন্ত পাঁচ রাত্রি মদীনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাছাড়া রাসূল (সা) যখন 'জ্বিকারাদ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তখন সাহায্যের জন্য মদীনায় খবর পাঠান। হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা দশটি উট বোঝাই করে খেজুর পাঠান। রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাহিনীতে সা'দের ছেলে কায়সও ছিলেন একজন অশ্বারোহী সৈনিক। তিনি পিতা প্রেরিত উট ও খেজুর যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পেশ করলেন তখন তিনি বললেন ঃ হে কায়স! তোমার পিতা তোমাকে ঘোড় সওয়ার করে পাঠিয়েছেন, মুজাহিদদের শক্তিশালী করেছেন

এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মদীনা পাহারা দিয়েছেন। তারপর তিনি দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! সা'দ ও তার পরিবার–পরিজনের ওপর রহম করুন! সা'দ ইবন 'উবাদা কতই না ভালো মানুষ। তখন খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলে ওঠে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাদের খান্দানের লোক, আমাদের নেতা এবং নেতার ছেলে। (তারীখে ইবন আসাকির– ৬/৮৮; তাবাকাত ঃ মাগাযী–৫৮)

হিজরী ৭ম সনে খাইবার যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীতে তিনটি ঝান্ডা ছিল। তার একটি ছিল সা'দ ইবন 'উবাদার হাতে। (তাবাকাত ঃ মাগাযী– ৭৭) তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) সাহাবায়ে কিরামের নিকট বস্তুগত সাহায্যের আবেদন জানালে অন্যদের মত সা'দ ইবন 'উবাদাও তাঁর হাতে বিপুল অর্থ তুলে দেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪২১; দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা–১১/৩২)

মক্কা বিজয়ের দিন খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) ঝান্ডাটি হযরত সা'দের হাতে ছিল। মুসলিম সৈনিকদের একটি দল 'কাদায়া'র দিক দিয়ে শহরে প্রবেশ করছিল। আবু সুফইয়ান হযরত 'আব্বাসের সাথে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আনসারদের একটি দলের পুরোভাগে ছিলেন সা'দ ইবন 'উবাদা। তাদের দৃপ্ত ভঙ্গিতে চলা দেখে আবু সুফইয়ানের দু' চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। তিনি 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কারা? আব্বাস জবাব দিলেন ঃ আনসার। এদের কমান্ডার সা'দ ইবন 'উবাদা। ঝান্ডা তাঁরই হাতে।

সা'দ আবু সুফইয়ানের কাছাকাছি এসে তাঁকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'দেখবে আজ কেমন তুমুল যুদ্ধ হয়। আজ কা'বা হালাল (রক্তপাত বৈধ) হয়ে যাবে।' একথা শুনে আবু সুফইয়ানের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি 'আব্বাসকে বলেন, 'আজ তো তুমুল লড়াই হবে।' সা'দের বাহিনী অতিক্রমের পরই রাসূলুল্লাহর (সা) দলটি উপস্থিত হয়। তাঁকে দেখে আবু সুফইয়ান চেঁচিয়ে বলে ওঠেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার সম্প্রদায়ের প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ আপনাকে দয়ালু ও সৎকর্মশীল করে সৃষ্টি করেছেন। সা'দ আমাকে ভয় দেখিয়ে গেছে। আজ নাকি ঘোরতর যুদ্ধ হবে, কুরাইশদের বিনাশ ঘটবে। আবু সুফইয়ানের কথা সমর্থন করে আরও কয়েকজন একই কথা বললেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে হযরত 'উমার সা'দের কথা শুনে তা রাসূলকে (সা) অবহিত করেন। হযরত 'উসমান ও হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ বললেন ঃ 'আমাদের ভয় হচ্ছে, সা'দের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে না ওঠে।' দার্‌রার ইবন খাত্তাব আল–ফিহ্‌রী একটি কবিতা আবৃত্তিও করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গিয়ে কবিতার মাধ্যমে ফরিয়াদ কর। দার্‌রারের সেই সব কবিতার অংশবিশেষ 'আল–ইসতী'য়াব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট কুরাইশরা এমন সময় আশ্রয় নিয়েছে যখন তাদের আর কোন আশ্রয় স্থল নেই, আর দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং আসমানের আল্লাহ তাদের শত্রু হয়ে গেছে। সা'দ মক্কাবাসীদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছে।'

কবিতা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সা'দ ঠিক বলেনি। আজ কা'বার সম্মান আরও বৃদ্ধি

পাবে। তার গায়ে গিলাফ চড়ানো হবে।' তিনি আলীকে (রা) বললেন, 'তুমি ছুটে যাও। সা'দের হাত থেকে ঝান্ডাটি নিয়ে তার ছেলে কায়সের হাতে দাও। আলী ছুটে গিয়ে ঝান্ডাটি চাইলেন। সা'দ তা দিতে অস্বীকার করে বললেন, সত্যিই যে রাসূল (সা) তোমাকে পাঠিয়েছেন তার প্রমাণ কি? রাসূল (সা) তাঁর পাগড়ীটি পাঠালেন। তখন সা'দ ঝান্ডাটি নিজের ছেলের হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু যে আশঙ্কা সা'দকে নিয়ে ছিল, একই আশঙ্কা তাঁর ছেলেকে নিয়েও দেখা দিল। আবেদন জানানো হলো ঃ সা'দের ছেলে কায়সের হাত থেকে ঝান্ডাটি অন্য কারও হাতে দেওয়া হোক। তখন রাসূল (সা) ঝান্ডাটি নিয়ে যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের হাতে তুলে দেন। সহীহ বুখারীতে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) ঝান্ডা হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের হাতে ছিল, তার তাৎপর্য এটাই। (দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪০৬, ৪০৭; উসুদুল গাবা- ২/২৮৪; হায়াতুস সাহাবা- ১/১৬৯; আল-ইসতীয়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-২/৩৯; বুখারী- ২/৬১৩; ফাতহুল বারী- ৮/৭)

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান পরিচালিত হয়। এতে খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডা সা'দের হাতে ছিল। (তাবাকাত ঃ মাগাযী- ১০৮) উল্লেখিত যুদ্ধগুলি ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় উপস্থিতির পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছোট-বড় যত যুদ্ধ হয়েছে তার সবগুলিতে সা'দ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, প্রতিটি অভিযানেই তিনি ছিলেন আনসারদের পতাকাবাহী।

হিজরী ১১ সনে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাত হয়। প্রাচীন কাল থেকে মদীনার মালিকানা ছিল আনসারদের। ইসলামের সূচনা পর্ব থেকেই তারা রাসূলকে (সা) সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল। যে সময় ইসলামের কোন আবাসভূমি ছিল না, রাসূল (সা) ব্যাকুল হয়ে একটি আশ্রয় খুঁজছিলেন, কুরাইশদের ভয়ে যখন আরবের কোন একটি গোত্র তাঁকে আশ্রয় দিতে দুঃসাহস করেনি তখন আনসারদের ৭২/৭৫ জনের একটি দল মক্কায় এসে আরব-আজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শর্তে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (শপথ) করেন এবং সকল ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে রাসূলকে (সা) মদীনায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে জীবন ও সম্পদ কুরবানীর দিক দিয়ে আনসাররা ছিল সকলের অগ্রগামী। হযরত কাতাদা বলতেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোন একটি গোত্র আনসারদের সমসংখ্যক শহীদ উপস্থাপন করতে পারবে না। আমি আনাসের নিকট শুনেছি, উহুদে সত্তর জন, বীরে মা'উনায় সত্তর জন এবং ইয়ামামায় সত্তর জন আনসার শাহাদাত বরণ করেন। (বুখারী- ২/৫৮৪; সীয়ারে আনসার- ২/২৭) তাছাড়া কুরআনের বহু আয়াত এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীসে আনসারদের অনেক ফজীলাত ও মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। এসব কারণে তাদের অন্তরে খিলাফতের নেতৃত্বলাভ করার আকাঙ্খা সৃষ্টি হওয়া ছিল অতি স্বাভাবিক।

মদীনার আনসারগণ সেই প্রাচীনকাল থেকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। গোত্র দু'টি আউস ও খাযরাজ। লোকসংখ্যা ও নেতৃত্বের দিক দিয়ে খাযরাজ গোত্রটি ছিল তুলনামূলকভাবে একটু বেশী বরেণ্য। এর নেতা সা'দ ইবন 'উবাদা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) মনোনীত দ্বাদশ নাকীবের অন্যতম। অপর দিকে সা'দ ইবন মু'য়াজ ছিলেন আউস গোত্রের নেতা। তবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে উহুদ যুদ্ধের পর মদীনায় ইনতিকাল করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় সা'দ ইবন 'উবাদা মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।

সা'দ ইবন 'উবাদার বাড়ীটি ছিল মদীনার বাজার সংলগ্ন। তাঁর ঘরের সাথেই ছিল একটি ছাউনী। এর মালিকানা ছিল খাযরাজ গোত্রের বনী সায়িদা শাখার লোকদের। এ জন্য তা 'সাকীফা বনী সায়িদা' নামে প্রসিদ্ধ। এটাকে আনসাররা মক্কার 'দারুন নাদওয়ার' মত পরামর্শ গৃহ হিসাবে ব্যবহার করতো।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিশিষ্ট আনসারগণ উক্ত সাকীফায় সমবেত হলেন। সা'দ ইবন 'উবাদা তখন ভীষণ অসুস্থ। লোকেরা তাঁকেও ধরাধরি করে মঞ্চে এনে বসিয়ে দিল। তিনি বালিশে হেলান ও কাপড় মুড়ি দিয়ে বসলেন। তাদের এই সমাবেশের উদ্দেশ্য, আনসারদের মধ্য থেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) একজন খলীফা নির্বাচন। সা'দ ইবন 'উবাদা সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিতে চাইলেন। তিনি নিকটতম লোকদের বললেন, আমার আওয়াজ হয়তো সবার কানে পৌঁছবে না। আমি যা বলবো তোমরা তা জোর গলায় সবার কানে পৌঁছে দেবে। তারপর তিনি আনসারদের মর্যাদা, কার্যাবলী, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহায্য–সহযোগিতা ইত্যাদি দিক তুলে ধরে একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সারকথা ছিল এরূপঃ

'আনসারদের যে সম্মান এবং দীনের ক্ষেত্রে যে অগ্রগামিতা তা আরবের আর কোন গোত্রের নেই। রাসূল (সা) দশ বছরের বেশী সময় ধরে নিজ গোত্রে ছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি। যাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। তাঁদের না ছিল রাসূলকে (সা) নিরাপত্তা দানের শক্তি, আর না ছিল তাঁদের দীনের আওয়াজ বুলন্দ করার ক্ষমতা। তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তা বিধানেই ছিল অক্ষম।

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সম্মানিত করতে চাইলেন। তাই তিনি তোমাদেরকে এক সাথে দু'টি উপাদান সরবরাহ করলেন। তোমরা ঈমান আনলে, রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবাদের আশ্রয় দিলে এবং নিজেদের থেকেও আল্লাহর রাসূলকে (সা) প্রিয় মনে করলেও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে জিহাদ করলে। শেষ পর্যন্ত গোটা আরব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং নিকট ও দূরের সকলেই মস্তক অবনত করে দেয়। সুতরাং এই বিজিত অঞ্চলের সবটুকু তোমাদের তলোয়ারের নিকট দায়বদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (সা) আজীবন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং ওফাতের সময় সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিয়েছেন। এ সকল কারণে এ খিলাফতের একমাত্র হকদার তোমরা এবং এ ব্যাপারে আর কেউ তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেনা।'

তাঁর ভাষণ শেষ হলে উপস্থিত আনসারমন্ডলী সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলো, আপনার কথা খুবই যুক্তিসম্মত। আমাদের মতে এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিকতর যোগ্য আর কেউ নেই। আমরা আপনাকেই খলীফা বানাতে চাই। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা চললো। একজন বললো, যদি মুহাজিররা মানতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের কি জবাব দেওয়া যাবে? অন্য একজন তাকে বললো, আমরা তখন তাদেরকে বলবো, তাহলে আমীর দু'জন হবে– একজন আমাদের আর একজন তোমাদের। এছাড়া আর কিছুতেই আমরা রাজী হবো না। তার একথা শুনে সা'দ মন্তব্য করেনঃ এ হলো প্রথম দুর্বলতা। এদিকে আনসারদের এ সমাবেশের কথা হযরত 'উমারের (রা) কানে পৌঁছে গেল। তিনি হযরত আবু বকরকে (রা)

সংগে নিয়ে সাকীফা বনী সায়িদার সমাবেশে উপস্থিত হলেন। হযরত 'উমারের (রা) কঠোর প্রকৃতি আনসারদের উত্তেজিত করে তুললো। আনসারী বক্তারাও বারবার উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করছিল। হযরত 'উমার (রা) এবং তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, এমন কি তরবারির ভয়-ভীতি দেখানো পর্যন্ত পৌঁছে। অবস্থা বেগতিক দেখে ধীর ও স্থির প্রকৃতির মানুষ হযরত আবু বকর (রা) 'উমারকে (রা) নিবৃত করেন এবং নিজেই এক আবেগময় ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেই বিখ্যাত বাণী- 'আল আয়িমম্মাতু মিন কুরাইশ'- ইমাম হবে কুরাইশদের ভিতর থেকে- উল্লেখ করেন। ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সমাবেশের রূপ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। তারপর হযরত 'উমার (রা) দাঁড়িয়ে আবু বকরের (রা) ফজীলাত ও মর্যাদা বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনা শুনে আনসাররা চেঁচিয়ে বলতে থাকে- 'না'উযুবিল্লাহ আন নাতাকাদ্দামা আবা বকর' - আবু বকরের আগে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা আল্লাহর পানাহ চাই।

'উমারের ভাষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুহাজিরদের মধ্য থেকে যথাক্রমে 'উমার, আবু 'উবাইদা এবং আনসারদের মধ্য থেকে খাযরাজ গোত্রের বাশীর ইবন সা'দ সর্ব প্রথম আবু বকরের হাত স্পর্শ করে বা'ইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করেন। তারপর সমবেত জনতা বা'ইয়াতের উদ্দেশ্যে একযোগে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরা এই বলে চেঁচাতে শুরু করে যে, সাবধান! সা'দ যেন পায়ে পিষে না যায়। একথা শুনে 'উমার (রা) বললেনঃ আল্লাহ তাকে পিষে ফেলুক। এমনিতেই সা'দ নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছিলেন। 'উমারের একথায় তিনি দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে লোকদের বললেন ঃ তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। (দ্রঃ মুসনাদ-১/২১; তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যা-১/১৬৮, ১৬৯; তাবারীঃ হিজরী ১১ সনের ঘটনাবলী-১৮৪৩; বুখারী-২/১০১০; হায়াতুস সাহাবা-২/১২-১৮)

আল্লামা যিরিক্লী 'ফিল বুদয়ি ওয়াত তারীখ' (৫/১৩২) গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানরা যখন আবু বকর (রা) উদ্ধৃত হাদীস 'আল-আয়িম্মাতু মিন কুরাইশ' মেনে নিয়ে তাঁকেই খলীফা নির্বাচন করে তখন সা'দ বলেন ঃ 'লা ওয়াল্লাহ্। লা উবায়ি'উ কুরাশিয়্যাম আবাদা'- আল্লাহর কসম, না। আমি কক্ষণো কোন কুরাইশীর হাতে বা'ইয়াত করবো না। (আল-আ'লাম-৩/১৩৫)

বেশ কিছু দিন খলীফা হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে কোন রকম ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না। শেষে একদিন এক ব্যক্তিকে বলে পাঠালেন যে, সা'দ যেন এসে বাই'য়াত করে যান। সা'দ বাই'য়াত করতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। হযরত 'উমার (রা) খলীফাকে বললেন, তাঁর থেকে আপনি অবশ্যই বাই'য়াত নিন। সেখানে হযরত বাশীর ইবন সা'দ আল-আনসারীও ছিলেন। তিনি বললেন, একবার যখন তিনি বাই'য়াত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তখন আর কোন ভাবেই তাঁর থেকে বাই'য়াত নেওয়া যাবেনা। চাপাচাপি করলে রক্তারক্তির পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। তিনি রুখে দাঁড়ালে তাঁর পরিবার ও বংশের লোকেরাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত গোটা খাযরাজ গোত্রই তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে একটি ঘুমন্ত ফিত্না জাগিয়ে তোলা উচিত হবে না। আমার মতে তাঁকে থাকতে দিন, একটি লোক কী আর করবে? বাশীরের এ মত সবাই পছন্দ করলেন। হযরত সা'দ (রা) খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতের শেষ পর্যন্ত মদীনায় ছিলেন। অবশেষে মদীনা ছেড়ে শামে চলে যান এবং দিমাশ্কের নিকটবর্তী- 'হাওরান' নামক একটি উর্বর ও সবুজ স্থান বসবাসের জন্য নির্বাচন

করেন। আমরণ সেখানেই বসবাস করেন। (উসুদুল গাবা–২/৮৪; আনসাবুল আশরাফ–১/৫৮৯; তারীখু ইবন আসাকির–৬/৯০)

হযরত সা'দের মদীনা ত্যাগের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) খলীফা হওয়ার পর বাই'য়াত থেকে দূরে থাকার জন্য একবার তাঁকে তিরস্কার করেন। জবাবে সা'দ বলেনঃ আপনার বন্ধু আবু বকর আমার কাছে আপনার চেয়ে বেশী পছন্দনীয় ছিলেন। আল্লাহর কসম! আপনার প্রতিবেশীত্ব আমাকে অতিষ্ট করে তুলেছে। 'উমার বলেনঃ কেউ তার প্রতিবেশীকে পছন্দ না করলে দূরে সরে যেতে পারে। এরপর সা'দ কালবিলম্ব না করে শামে চলে যান। (আল–আ'লাম–৩/১৩৫; তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮৪)

হযরত সা'দ ইবন 'উবাদার মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে হিজরী ১১, ১৪ ও ১৫ সনের কথা উল্লেখ আছে। ইবন আসাকির হিজরী ১৪ সনটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। (তারীখ–৬/৯১) আবু 'উবাইদ কাসেম ইবন সাল্লামের মতে তিনি 'হাওরানে' মারা যান। এবং সেখানেই দাফন করা হয়। আর দিমাশ্‌কের 'আল–মুনীহা' নামক স্থানে তাঁর যে কবরের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ইবন আসাকির তা সঠিক বলে মনে করেননি। (তারীখু ইবন আসাকির–৬/৯১; আল–ইসতী'য়াব; টীকা আল–ইসাবা–২/৪০; উসুদুল গাবা–২/২৮৪)

হযরত সা'দ ইবন 'উবাদার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। এ হত্যা সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। বালাজুরী বলেনঃ সা'দ ইবন 'উবাদা শামে হিজরাত করেন এবং সেখানে নিহত হন। তিনি আবু বকরের হাতে বাই'য়াত করেননি। 'উমার (রা) তাঁর কাছে একজন লোক পাঠান। তাঁকে বলে দেন তাঁকে বাই'য়াত করতে বলবে। যদি অস্বীকার করে তাহলে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। লোকটি শামে গেল এবং সা'দকে 'হাওরানের' একটি প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানে পেল। সে তাঁকে বাই'য়াত করতে বললো। তিনি বললেনঃ আমি কোন কুরাইশের হাতে বাই'য়াত করবো না। লোকটি বললোঃ তাহলে আমি আপনাকে হত্যা করবো। তিনি বললেনঃ আমাকে হত্যা করলেও আমি বাই'য়াত করবো না। লোকটি তখন বললোঃ তাহলে গোটা উম্মাত যাতে ঢুকেছে আপনি কি তার বাইরে? বললেন; বাই'য়াতের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তাদের বাইরে।

লোকটি তখন তীর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে। (আনসাবুল আশরাফ–১/৫৮৯) ডঃ হামীদুল্লাহ বলেন, এটা চরমপন্থী শিয়াদের একটি মনগড়া কথা। (আনসাবুল আশরাফঃ টীকা–১/২৫০) অন্য একটি বর্ণনা মতে, কেউ তাঁকে হত্যা করে গোসল খানায় ফেলে রাখে। বাড়ীর লোকেরা যখন দেখতে পায় তখন তাঁর প্রাণ স্পন্দন থেমে গেছে। তাঁর সারা দেহ নীল হয়ে যায়। ঘাতকের সন্ধান করেও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শুধু দূর থেকে ভেসে আসা কবিতার একটি চরণ আবৃত্তির শব্দ শোনা যায়, যার অর্থ এরূপঃ 'আমরা খাযরাজ নেতা সা'দ ইবন 'উবাদাকে হত্যা করেছি। আমরা দুইটি তীর নিক্ষেপ করেছি এবং তাঁর কলিজা ভেদ করতে ভুল করিনি।' যেহেতু ঘাতকের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এবং শব্দ শোনা গেছে, এজন্য অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁকে জ্বীনে হত্যা করেছে। (দ্রঃ উসুদুল–গাবা–২/২৮৫; আল–ইসতী'য়াবঃ আল–ইসাবার পার্শ্ব টীকা–২/৪০; আনসাবুল আশরাফ–১/২৫০)

হযরত সা'দের দুই স্ত্রী ছিল–গাযিয়্যা বিনতু সা'দ ইবন খলীফা ও ফুকাইহা বিনতু 'উবায়েদ ইবন দুলাইম। ফুকাইহা ছিলেন সা'দের চাচাতো বোন। তিনি সাহাবিয়্যাও ছিলেন। গাযিয়্যার গর্ভে সা'দের তিন ছেলে সা'ঈদ, মুহাম্মাদ ও আবদুর রহমান এবং ফুকাইহার গর্ভে দুই ছেলে কায়স, সাদুস ও এক মেয়ে উমামা জন্মগ্রহণ করেন। (তাবাকাত–৩/৬১৩; আল–ইসতীয়াবঃ আল–ইসাবার পার্শ্ব টীকা–২/৫৩৮)

হযরত সা'দের প্রচুর বিষয় সম্পত্তি ছিল, মদীনা ত্যাগের পর সবই ছেলে মেয়েদের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা করে দেন। এক ছেলে তখন পেটে। তিনি তার অংশ দিয়ে যাননি। সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর 'উমার (রা) কায়সকে ডেকে বলেন, তুমি তোমার পিতার ভাগ বাতিল করে দাও। কারণ, মৃত্যুর পর তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। কায়স বললেন, আমার পিতার ভাগ ঠিক থাকবে। তবে ইচ্ছা করলে সে আমার অংশটি নিতে পারে। (আল–ইসতীয়াব–২/৫৩৯)

হযরত সা'দের বাড়ীটি ছিল মদীনার বাজারের শেষ প্রান্তে। সেখানে একটি মসজিদ ও কয়েকটি দুর্গও ছিল। বনু হারিস পল্লীতে তাঁর আর একটি বাড়ী ছিল। (খুলাসাতুল ওফা'–৮৮)

হযরত রাসূলে কারীমের (রা) হাদীসের প্রতি সা'দ অসাধারণ গুরুত্ব দিতেন। সাহাবীদের যুগে ব্যাপকভাবে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। কুরআন ও লেখা হয়েছিল। তাসত্ত্বেও হাদীস লেখার ব্যাপক প্রচলন তখন হয়নি। তবে সা'দ হাদীস লিখেছিলেন। মুসনাদে ইমাম আহমাদে এ রকম একটি বর্ণনা এসেছেঃ 'কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁর পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা এ হাদীসটি সা'দ ইবন 'উবাদার পুস্তক বা পুস্তকসমূহে পেয়েছেন।' (মুসনাদ–৫/২৮৫) হযরত সা'দ হাদীস লেখার সাথে সাথে তা শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রচারও করেন। একারণে তাঁর ছেলে কায়স ও সাঈদ, পৌত্র শুরাহবীল, প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আবু 'উমামা ইবন সাহ্ল, তাবে'ঈ ইবন মুসায়্যিব প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮৪)

হযরত সা'দের চরিত্রে দানশীলতার গুণটির চরম বিকাশ ঘটেছিল। 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্রকারদের প্রায় প্রত্যেকে তাঁর চরিত্র রূপায়ণ করতে গিয়ে বলেছেনঃ 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল'। শুধু তিনি নন, পুরুষানুক্রমে তাঁরা ছিলেন আরবের বিখ্যাত দানশীল। তাঁর চার পুরুষ বদান্যতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। এমন গৌরব সে যুগে খুব কম লোকেরই ছিল। তার দাদা দুলাইম, পিতা 'উবাদা, পুত্র কায়স এবং তিনি নিজে–প্রত্যেকেই ছিলেন আপন আপন সময়ের বিখ্যাত জনহিতৈষী ও অতিথি সেবক। (আল–ইসতীয়াবঃ টীকা আল–ইসাবা–২/৩৬)

তাঁর দাদার সময় আতিথেয়তা এত ব্যাপক ছিল যে, একজন ঘোষক দুর্গের চূড়ায় উঠে চিৎকার করে আহবান জানাতো, যারা গোশ্ত, চর্বি ও উপাদেয় খাবার খেতে চায় তারা যেন আমাদের অতিথি হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) একবার সা'দের দুর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নাফে'কে ডেকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলেন, এ হচ্ছে সা'দের দাদার দুর্গ। একজন ঘোষক এ দুর্গের চূড়ায় উঠে ঘোষণা করতোঃ কেউ চর্বি–গোশ্ত খেতে চাইলে দুলাইমের বাড়ীতে এসো। দুলাইম মারা গেলে তাঁর ছেলে 'উবাদার সময়েও একই রকম ঘোষণা দেওয়া হতো। সা'দের সময়ও এ ধারা অব্যাহত থাকে। আমি সা'দের ছেলে কায়সকেও একই রকম করতে দেখেছি। কায়স ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। (আল–ইসতী'য়াবঃ টীকা আল–ইসাবা–২/৩৬–৩৭)

প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত 'উরওয়া ইবন যুবাইর বলেনঃ আমি সা'দ ইবন 'উবাদাকে তাঁর দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা দিতে দেখেছিঃ কেউ চর্বি ও গোশ্‌ত পছন্দ করলে সা'দ ইবন 'উবাদার বাড়ীতে এসো। তারপর তাঁর ছেলেকেও আমি একই রকম করতে দেখেছি। যৌবনে একদিন আমি মদীনার রাস্তায় হাঁটছি। এমন সময় 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার আমার পাশ দিয়ে 'আওয়ালীতে তাঁর ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে বললেনঃ বালক, দেখতো সা'দ ইবন 'উবাদার দুর্গের ওপর থেকে কেউ আহবান জানাচ্ছে কিনা। আমি তাকিয়ে দেখে বললামঃ না। তিনি বললেনঃ তুমি ঠিকই বলেছ। (তাবাকাত–৩/৬১৩; হায়াতুস সাহাবা–২/১৮৯) এমন ব্যাপক আতিথেয়তা ও দানশীলতা বনী সা'য়িদাকে মদীনার 'হাতেম' বানিয়ে দিয়েছিল।

ইসলাম ও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি সা'দের বদান্যতার অনেক মুখরোচক কাহিনী বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে দু'একটি সত্য কাহিনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

হযরত রাসূলে কারীম (রা) যখন হিজরাত করে মদীনায় আসলেন তখন সা'দের বাড়ী থেকে রাসূল (রা) ও তাঁর পরিবারের জন্য প্রতিদিন নিয়মিত খাবার আসতো। প্রতিদিন বড় এক গামলা গোশ্‌ত অথবা দুধের সারীদ অথবা সিরকা ও তেল বা ঘিয়ের সারীদ আসতো, এই পাত্রটি রাসূল (রা) ও তাঁর সহধর্মিনীদের গৃহে চক্কর দিত। (আল–ইসাবা–২/৩০; তাবাকাত–৩/৬১৪; হায়াতুস সাহাবা–২/৭০০)

একবার সা'দ ইবন 'উবাদা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জন্য বরতন ভর্তি রান্না করা মগজ নিয়ে আসলেন। রাসূল (রা) বললেনঃ এটা কি? সা'দ বললেনঃ যিনি সত্য সহকারে আপনাকে পাঠিয়েছেন সে সত্তার নামে শপথ, আমি আজ ৪০টি তাজা–মোটা উট নহর (জবেহ) করেছি। আমার ইচ্ছা হলো আপনাকে একটু পেট ভরে মগজ খাওয়াই। রাসূল (সা) খেলেন এবং তাঁর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। (কানযুল 'উম্মাল–৭/৪০; হায়াতুস সাহাবা–২/১৮৯)

সাহাবীদের 'আসহাবে সুফ্‌ফা' নামে একটি দল ছিল। যাঁরা বহু দূর–দূরান্ত থেকে ঘর–বাড়ী ছেড়ে মদীনায় এসেছিলেন। তাদের এখানে আসা ও অবস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 'ইলম হাসিল এবং দীনের প্রশিক্ষণ লাভ করা। রাসূল (সা) তাদেরকে সচ্ছল সাহাবীদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিতেন। অন্যরা যেখানে দুই একজন করে সাথে নিয়ে যেতেন, সেখানে হযরত সা'দ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৮০ জনকে আহার করানোর জন্য নিয়ে যেতেন। (আল–ইসাবা–২/৩০; কানযুল 'উম্মাল–৫/১৯০; হায়াতুস সাহাবা–২/১৯৬)

ইয়াহইয়া ইবন 'আবদুল 'আযীয থেকে বর্ণিত আছে। সা'দ ইবন 'উবাদা ও তাঁর ছেলে কায়স ইবন সা'দ পালাক্রমে জিহাদে যেতেন। একবার সা'দ লোকদের সাথে জিহাদে গেলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাইরের অনেক অতিথি এলো। সেনা শিবিরে বসে সা'দ একথা জানতে পেয়ে বললেনঃ কায়স যদি আমার ছেলে হয় তাহলে আমার দাস নিস্‌তাসকে ডেকে বলবে, চাবি দাও, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজন মেটানোর জন্য খাবার বের করে নিই। তখন হয়তো নিস্‌তাস বলবেঃ তোমার আব্বার চিঠি নিয়ে এসো। এতে কায়স হয়তো ক্ষেপে গিয়ে তার নাকে ঘুষি মেরে চাবিটি ছিনিয়ে নেবে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজন মত খাদ্য বের করে নেবে। আসলে ব্যাপারটিও তাই হয়েছিল। সেবার কায়স রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এক শো ওয়াসক খাদ্য নিয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা–২/২০০)

ওয়াকিদী বলেনঃ বিদায় হজ্জের সময় একদিন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ভারবাহী পশুটি হারিয়ে গেল। সা'দ ও কায়স সাথে সাথে একটি পশু নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে। আল্লাহ তাঁর পশুটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। সা'দ আরজ করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জেনেছি, আপনার পশুটি হারিয়ে গেছে। তাই এ পশুটি নিয়ে এসেছি। রাসূল (সা) বললেনঃ আল্লাহ আমার বাহনটি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এটি নিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাদের বরকত দিন। ওহে আবু সাবিত! আমি মদীনায় আসার পর থেকে তোমরা যে সমাদর করেছ তাকি যথেষ্ট নয়? সা'দ বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সম্পদ থেকে যা আপনি গ্রহণ করেন না তার চেয়ে যা কিছু আপনি গ্রহণ করেন তাই আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়। রাসূল (সা) তাঁর কথা সমর্থন করে বলেনঃ আবু সাবিত! সত্য বলেছ। সুসংবাদ লও। তুমি সফলকাম হয়েছ। (তারীখু ইবন আসাকির–৬/৮৮)

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। সা'দ ইবন 'উবাদা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জানতে চান যে, তাঁর মা একটি মান্নত মেনেছিলেন; কিন্তু তা পূরণ না করেই মারা গেছেন। এখন তিনি কি তা পূরণ করে দেবেন? রাসূল (সা) তাঁকে পূরণ করে দিতে বলেন। এমনি ভাবে তাঁর মা'র পক্ষ থেকে সাদাকা করার কথা জিজ্ঞেস করলে রাসূল (সা) তাঁকে বলেনঃ হাঁ তুমি তা করতে পার। তখন সা'দ রাসূলকে (সা) সাক্ষী রেখে তাঁর 'আল–মিখরাফ' বাগিচাটি দান করার কথা ঘোষণা করেন। সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত হয়েছে। সা'দ তাঁর মা'র মৃত্যুর পর একবার রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ কোন সাদাকা সবচেয়ে ভালো? তিনি বলেনঃ তুমি মানুষকে পানি পান করাও।

সা'দ মদীনার মসজিদে তাঁর মায়ের নামে পানি পানের ব্যবস্থা করেন। যা বহু দিন যাবত 'সিকায়া আলে সা'দ' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসানের (রা) নিকট জানতে চায় যে, সা'দের মায়ের নামে যে পানির ব্যবস্থা তাতো সাদাকা। সে পানি কি আমি পান করতে পারি? হাসান (রা) জবাব দিলেনঃ আবু বকর ও 'উমার যখন পান করেছেন তখন তোমার আপত্তি কিসে? (তাবাকাত–৩/৬১৪, ৬১৫; মুসনাদে ইমাম আহমাদ–৫/২৮৫)

'জাতুল ফুদুল' নামে সা'দ ইবন 'উবাদার একটি বর্ম ছিল। রাসূল (সা) যে দিন বদরের উদ্দেশ্যে বের হন, সা'দ বর্মটি তাঁকে দান করেন। সেই সাথে 'আল–আদব' নামে একখানি তরবারিও দান করেন। এ দু'টি যুদ্ধাস্ত্র রাসূল (সা) বদরে ব্যবহার করেন। এই বদরে রাসূল (সা) 'জুল–ফিকার' তরবারিটি গনীমাত হিসাবে লাভ করেন। ওয়াকিদীর মতে ঐ তরবারিটি ছিল কাফির সৈনিক মুনাব্বিহ অথবা নাবীহ্ ইবন হাজ্জাজের। কালবীর মতে আল–আ'স ইবন মুনাব্বিহ্ ইবন হাজ্জাজের। (আনসাবুল আশরাফ–১/৫২১)

ইবন 'আসাকির হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার সা'দ ইবন 'উবাদা নবী কারীমকে (সা) আহারের দাও'য়াত দিলেন। তিনি উপস্থিত হলে সা'দ খেজুর ও হাড়সহ গোশ্ত হাজির করলেন। রাসূল (সা) তা খেলেন এবং এক পেয়ালা দুধও পান করলেন। শেষে বললেন ঃ নেক্কার লোকেরা তোমার খাবার খেয়েছে, রোযাদাররা ইফ্তার করেছে এবং ফিরিশ্তারা তোমাদের জন্য দু'আ করেছে। হে আল্লাহ! সা'দ ইবন 'উবাদার পরিবার–পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। (কানযুল 'উম্মাল–৫/৬৬; হায়াতুস সাহাবা–২/১৮৯, ৩৬৪)

এভাবে হযরত সা'দের আতিথেয়তা, দানশীলতা, উদারতা ও বদান্যতার বহু কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি হযরত সা'দের ভালোবাসার রূপ এমন ছিল যে, রাসূল (সা) সম্পর্কে তাঁর গোত্রের অতি গোপন কথাটিও তিনি তাঁর নিকট পৌঁছে দিতেন। হাওয়াযিন যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) 'তালীফে কুলুবের' জন্য কুরাইশ বংশের নও মুসলিমদেরকে গনীমতের বড় বড় অংশ দিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে অনেক আনসার যুবক ক্ষুব্ধ হয়ে বললোঃ রাসূল (সা) স্বগোত্রীয় লোকদের দিলেন এবং আমাদেরকে মাহরূম করলেন। অথচঃ আমাদের তরবারি হতে এখনো কুরাইশদের রক্ত ঝরছে। সা'দ ইবন 'উবাদা সাথে সাথে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। তিনি সা'দকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার মত কি? বললেনঃ আমিও আমার সম্প্রদায়ের একজন। তবে এমন কথা বলিনা। রাসূল (সা) তাঁকে বললেনঃ যাও, লোকদের অমুক তাঁবুতে সমবেত কর। ঘোষণা শুনে মুহাজির ও আনসার উভয় সম্প্রদায়ের লোক উপস্থিত হলো। সা'দ শুধু আনসারদের থাকতে বলে মুহাজিরদের চলে যেতে বললেন। তারপর রাসূল (সা) এসে এক আবেগময় ভাষণ দান করলেন। সে ভাষণের কিছু অংশ ছিল এরূপঃ তোমরা কি এতে খুশী নও যে, অন্যরা ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাক, আর তোমরা আমাকে নিয়ে ফিরবে? রাসূলুল্লাহর (সা) এমন প্রশ্নে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সমস্বরে তারা জবাব দেয়, আপনার পরিবর্তে গোটা দুনিয়া কিছুই না। (বুখারী-২/৬২০; মুসনাদ-৩/৭২০; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৯৮, ৪৯৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৮)

উহুদ যুদ্ধের সময় গোটা মদীনা একটা মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়ে। এ সময় সা'দ ইবন 'উবাদা নিজের বাড়ী ছেড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ী পাহারা দিয়েছিলেন। হযরত রাসূলে কারীমও (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যেতেন। সা'দের ছেলে কায়স বলেনঃ একবার রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে আসলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি সালাম দিলেন। সা'দ সালাম শুনে খুব নিচু স্বরে জবাব দিলেন। কায়স বললেনঃ আপনি কি রাসূলকে (সা) ভিতরে আসার অনুমতি দেবেন না? সা'দ বললেনঃ দেরী কর। তাঁকে আমাদের ওপর একটু বেশী করে সালাম দেওয়ার সুযোগ দাও। রাসূল (সা) তিনবার সালাম দিয়ে কোন জবাব না পেয়ে ফিরে চললেন। সা'দ তখন দৌড়ে গিয়ে পিছন থেকে ডাক দিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি আপনার সালাম শুনেছি। জবাবও দিয়েছি একটু আস্তে আস্তে। আমি চেয়েছি, আপনি আমাদের ওপর একটু বেশী সালাম দিন। রাসূল (সা) সা'দের সাথে আবার ফিরে আসলেন। সেদিন তিনি সা'দের বাড়ীতে আহার করে তাঁর পরিবারের সকলের জন্য দু'আ করেন। (উসুদুল গাবা-২/২৮৩ হায়াতুস সাহাবা-২/৪৯১, ৫১৫; ৩/৩১৪)

একবার রাসূল (সা) এক দু'আয় বলেনঃ হে আল্লাহ! আনসারদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। বিশেষ করে 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম ও সা'দ ইবন 'উবাদাকে।

একবার হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ী গেলেন। তিনি সোজা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইশারায় দূরে সরে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার দরজার সামনে গিয়ে অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূল (সা) বললেনঃ যখন দরজার সামনেই থাকবে, অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫১৬)

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাত আদায়কারী হিসাবে সা'দকে নিয়োগ করলেন। একদিন রাসূল (সা) তাঁর কাছে গিয়ে বললেনঃ কিয়ামতের দিন যাতে তোমাকে উট কাঁধে করে উঠতে

না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। সা'দ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তেমন কিছু করি তাহলে সত্যি এমন হবে? তিনি বললেনঃ হাঁ। সা'দ আরজ করলেনঃ আমাকে অব্যাহতি দিন। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে অব্যাহতি দান করেন। (তারীখু ইবন আসাকির–৬/৮৯; মুসনাদ–৫/২৮৫)

একবার হযরত সা'দ অসুস্থ হলে রাসূল (সা) সাহাবীদের সংগে করে তাঁকে দেখতে যান। সা'দ অচেতন ছিলেন। সাহাবীদের মধ্য থেকে নানাজনে নানারকম মন্তব্য করলেন। কেউ বললেন, শেষ হয়ে গেছে। কেউ বললেন, না এখনো দম আছে। একথা শুনে রাসূল (সা) কেঁদে ফেলেন। সাথে সাথে গোটা মজলিসে কান্না শুরু হয়ে যায়। (বুখারী–২/১৭৪)

আর একবার রাসূল (সা) যায়িদ ইবন সাবিতকে বাহনের পিছনে বসিয়ে অসুস্থ সা'দকে দেখতে তাঁর বাড়ী গিয়েছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৬৯)

একবার রাসূল (সা) সা'দকে দেখতে যাচ্ছেন। পথে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সুলূল বসে ছিল। সে রাসূলকে (সা) কিছু কটু কথা বললো। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয় হয় অবস্থা। রাসূল (সা) সকলকে নিবৃত্ত করলেন এবং সা'দের বাড়ী উপস্থিত হলেন। তিনি বললেনঃ সা'দ! আজ আমাকে আবু হুবাব (ইবন উবাই) যে সব কথা বলেছে তাকি শুনেছ? সা'দ আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আসল কথা হলো, ইসলাম আসার পূর্বে মানুষ ধারণা করেছিল সে মদীনার বাদশাহ হবে। কিন্তু যখন আল্লাহ আপনাকে সত্য সহকারে পাঠালেন তখন তাদের সে ধারণা চুরমার হয়ে গেল। এটা হলো সেই বেদনার বহিঃপ্রকাশ। এবার রাসূল (সা) তাঁর অনুরোধে ইবন উবাইকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী–২/৬৫৬; হায়াতুস সাহাবা–২/৫০৯) হযরত সা'দ যে নরম প্রকৃতির ও শান্তিপ্রিয় স্বভাবের ছিলেন উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা তা বুঝা যায়।

ইবন 'আসাকির হযরত যায়িদ ইবন সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁর ছেলেকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলেন। সালাম বিনিময়ের পর রাসূল (সা) তাঁকে বললেনঃ এখানে, এখানে। এই বলে তাঁকে ডান পাশে বসালেন। তারপর বললেনঃ মারহাবান বিল আনসার, মারহাবান বিল আনসার– আনসারদের প্রতি স্বাগতম, আনসারদের প্রতি স্বাগতম। ছেলেটি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাসূল (সা) বসতে বললেন। সে বসে পড়লো। একটু পরে তিনি তাকে কাছে আসতে বললেন। সে এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ও পায়ে চুমু দিল। রাসূল (সা) বললেনঃ আমিও আনসারদের একজন। সা'দ তখন বললেনঃ আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করুন যেমন আপনি আমাদের সম্মান দেখিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন, আমার সম্মান দেখানোর আগেই আল্লাহ তোমাদের সম্মানিত করেছেন। আমার পরে তোমরা অনেক কষ্ট ভোগ করবে। তখন সবর করবে। অবশেষে হাউজে কাওসারের নিকট আমার সাথে তোমাদের আবার সাক্ষাত হবে। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪০৪)

হযরত সা'দের একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা মজলিস ছিল। একদিন রাসূল (সা) সেখানে গিয়ে কিভাবে রাসূলের (সা) ওপর দরূদ ও সালাম পেশ করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৩১৪)

হযরত সালমান আল–ফারেসী (রা) ইসলাম গ্রহণের পর মনিবের হাত থেকে মুক্তি লাভের

উদ্দেশ্যে তার সাথে একটি চুক্তি করেন। তার একটি শর্ত ছিল, তিনি মনিবকে ৩০০ (তিন শো) খেজুরের চারা লাগিয়ে দেবেন। হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা তাঁকে ষাটটি (৬০) চারা দিয়ে সাহায্য করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৮৭)

এক সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দশটি গর্ভবতী উট ছিল।তার তিনটিই স'াদ তাঁকে দান করেন। তার একটির নাম ছিল 'মুহরাহ্'। (আনসাবুল আশরাফ-১/৫১২)

সাফওয়ান ইবন মু'য়াত্তাল বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সা'দ ইবন 'উবাদা পরার জন্য তাঁকে কাপড় দান করেন। সেই কাপড় পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গেলে তিনি বলেনঃ যে তাকে কাপড় পরিয়েছে আল্লাহ তাকে জান্নাতের কাপড় পরাবেন। সাফওয়ান তখন বলেঃ আমাকে সা'দ ইবন 'উবাদা কাপড় দান করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৮৯)

হযরত ইবন 'আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। যখন সূরা আন-নূরের ৪ নং আয়াত- 'যারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি দুর্‌রা লাগাবে এবং কখনো তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না। তারাই ফাসিক'- নাযিল হয় তখন সা'দ ইবন 'উবাদা বলে ওঠেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এভাবে নাযিল হয়েছে? তাঁর মধ্যে বিস্ময়ের ভাব দেখে রাসূল (সা) বলেনঃ ওহে আনসারগণ। শোন, তোমাদের নেতার কথা শোন। তারা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ তিনি একজন প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি। আল্লাহর কসম। তিনি কুমারী ছাড়া কোন মেয়ে বিয়ে করেননি। তেমনিভাবে তাঁর তালাক দেওয়া কোন মহিলাকেও কেউ কখনো বিয়ে করতে সাহস করেনি। এর একমাত্র কারণ, তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ। সা'দ বললেনঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি জানি এটি সত্য এবং আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, একজন দুরাচারীকে আমার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে দেখেও তাকে কিছুই না বলে চারজন সাক্ষীর তালাশে বেরিয়ে যাব এবং তাকে নির্বিঘ্নে তার কুকর্ম শেষ করার সুযোগ করে দেব। আল্লাহর কসম! আমি যখন সাক্ষী নিয়ে ফিরে আসবো তখন তো তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, সা'দ বলেনঃ কক্ষণো না। সেই সত্তার নামে শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্যই তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করবো। তখন রাসূল (সা) আনসারদের ডেকে বলেন, শোন, তোমাদের নেতার কথা শোন। সে অবশ্যই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক। তবে তার থেকেও আমি এবং আমার থেকেও আল্লাহ বেশী মর্যাদাবোধের অধিকারী। (দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৮৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩৮, ৬৩৯)

মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। যখন আবু 'উবাইদাহ, মু'য়াজ, বিলাল ও সা'দ ইবন 'উবাদার মত প্রথম শ্রেণীর সাহাবীরা শামে গেলেন তখন সেখানের একজন খৃষ্টান রাহিব (সাধক) তাদেরকে দেখে মন্তব্য করেনঃ হযরত 'ঈসার যে সকল হাওয়ারীকে (সাথী) শূলীতে চড়ানো হয়েছিল এবং করাত দিয়ে দু'ফালি করে ফেলা হয়েছিল তারাও সংগ্রামে মুহাম্মাদের (সা) এ সকল সাহাবীদের সমকক্ষ ছিলেন না। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৯১) ■

সা'দ ইবনুর রাবী' (রা)

সা'দ ইবনুর রাবী আল-আনসারী মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু আল-হারিস শাখার সন্তান। হায়সাম উল্লেখ করেছেন, 'আবুর রাবী' তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম। পিতা আর-রাবী ও মাতা হুযাইলা বিন্‌তু ইন্‌বা। সীরাত বিশেষজ্ঞরা তাঁর জন্মসন সম্পর্কে নীরব। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪, তাবাকাত-৩/৫২২, উসূদুল গাবা- ২/২৭৭)

সা'দ ইবনুর রাবী'র ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। আবূ নু'য়াইম তাঁর 'দালায়িল' গ্রন্থে 'আকীল ইবন আবী তালিব ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রথম 'আকাবায়, যে বার ছয়জন ইয়াসরিববাসী মক্কায় রাসূলুল্লাহর হাতে (সা) ইসলাম গ্রহণ করে বায়'য়াত করেন তাঁদের একজন ছিলেন সা'দ। সেই ছয় ব্যক্তি হলেন ঃ ১· আস'য়াদ ইবন যুরারা ২· আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান ৩· আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ৪· সা'দ ইবনুর রাবী' ৫· আন-নু'মান ইবন হারিসা ও ৬· 'উবাদা ইবনুস সামিত। (হায়াতুস সাহাবা-১/১০৫) পক্ষান্তরে কোন কোন বর্ণনায় বুঝা যায়, তিনি দ্বিতীয় আকাবার বারো সদস্যের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি এই দ্বিতীয় 'আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তৃতীয় আকাবায় তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জন লোকের সংগে তিনি যোগ দেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে তাঁদের গোত্র বনু আল-হারিস ইবনুল খাযরাজের যুগ্ম 'নাকীব' বা দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮১, তাবাকাত-৩/৫২২, উসূদুল গাবা-২/২২৭)

ইবন হিশাম বর্ণনা করেন ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সা) কুবা থেকে যে দিন মদীনায় উপস্থিত হন, মদীনার সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁকে স্বাগতঃ জানায়। তিনি বিভিন্ন গোত্রের ভিতর দিয়ে চলছিলেন, আর সেই গোত্রের লোকেরা তাঁর বাহনের পথ রোধ করে তাদের ওখানে অবতরণের আবেদন জানাচ্ছিল। যখন তিনি বনু আল-হারিস ইবনুল খাযরাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সা'দ ইবনুর রাবী খারিজা ইবন যায়িদ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বনী হারিসার আরও কিছু লোক সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাওয়ারীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে 'আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাদের সংখ্যা, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রতিরক্ষার দিকে আসুন। (অর্থাৎ আপনাকে সম্মানের সাথে আশ্রয় দানের মত ক্ষমতা আমাদের আছে) রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা আমার বাহনের পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত। তাঁরা সবাই পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৫)

যুহরী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সাদ ইবনুর রাবী ও আবদুর রহমান ইবন 'আউফের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। হযরত সা'দ তাঁর এই মুহাজির ভাইয়ের প্রতি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখান দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। অন্যান্য আনসারগণ নিজ নিজ অর্থ-সম্পদ, জায়গা-জমি সবই অর্ধেক তাঁর দ্বীনী মুহাজির ভাইকে ভাগ করে দেন; কিন্তু হযরত সা'দ অর্থ-সম্পদ ছাড়াও একজন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার দ্বীনী ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। আর আব্দুর রহমান

যদিও সে সময় রিক্ত ও নিঃস্ব, তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি সা'দের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এ সম্পর্কে আনাস ইবন 'আউফ থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ সা'দ তাঁর দ্বীনী ভাইকে সংগে করে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং এক সাথে আহার করেন। তারপর বলেন ঃ আল্লাহর নামে আপনি আমার ভাই। আপনার স্ত্রী নেই; কিন্তু আমার দুই স্ত্রী। একজনকে আমি তালাক দেব, আপনি তাঁকে বিয়ে করবেন। আব্দুর রহমান বলেন ঃ আল্লাহর কসম! কক্ষনো না। সা'দ বললেন ঃ আমার বাগানে চলুন, আধা-আধি ভাগ করে নিই। আব্দুর রহমান বললেন ঃ না। আল্লাহ আপনার ছেলে-মেয়ে ও মাল-দৌলতে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করুন। এসবের কোন কিছুর প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে শুধু বাজারের পথটি একটু দেখিয়ে দিন। (আল-ইসাবা-৩/২৬, উসুদুল গাবা-২/২৭৮, তাবাকাত-৩/৫২৩)

হযরত সা'দ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি বনী মাখযুমের রিফা'য়া ইবন রিফা'য়াকে হত্যা করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১১, তাবাকাত-৩/৫২৩)

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশরা ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করলো। তাদের সেই সমর প্রস্তুতির খবর দিয়ে একটি চিঠি মক্কা থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিব গোপনে মদিনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালেন। চিঠিতে তিনি তাদের প্রস্তুতির বিবরণ দিয়ে এ কথাও লিখেন যে, 'তারা তোমাদের ওপর আপতিত হলে, তোমরা যা ভালো মনে কর তাই করবে এবং সেই জন্য প্রস্তুতি নাও।' বনী গিফারের একটি লোক অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কুবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে চিঠিটি পৌঁছে দেয়। রাসূল (সা) সর্বপ্রথম তা উবাই ইবন কা'বকে পড়তে দেন এবং গোপন রাখতে বলেন। তারপর সা'দ ইবনুর রাবী'র নিকট আসেন এবং তাঁকেও বিষয়টি অবহিত করেন। তাঁকেও কথাটি কারও নিকট ফাঁস না করার নির্দেশ দেন। রাসূল (সা) চলে যাওয়ার পর সা'দের স্ত্রী সা'দকে জিজ্ঞেস করলো ঃ রাসূল (সা) তোমাকে কি বললেন ?

সা'দ ঃ তোমার মা নিপাত যাক। তোমার তা শোনার কি প্রয়োজন?

স্ত্রী ঃ আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। এই বলে তিনি সব কথা সা'দকে শোনান। সা'দ ইন্নালিল্লাহ পাঠ করে বললেন ঃ দেখছি, তুমি আমাদের কথা আঁড়ি পেতে শুনে থাক। সা'দ তাঁর স্ত্রীকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হলেন এবং সব ঘটনা খুলে বলার পর আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহঃ আমার ভয় হচ্ছে, খবরটি হয়ত ছড়িয়ে পড়বে, আর আপনি ধারণা করবেন আমিই তা ছড়িয়েছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ বিষয়টি ছেড়ে দাও। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৩-৩১৪)

হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন। তাঁকে একদল প্রতিপক্ষ যোদ্ধা পরাস্ত করে হত্যা করে। (আল-আ'লাম-৩/১৩৪, উসুদুল গাবা-২/২৭৭, আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩০) তাঁর দেহে তীর-বর্শার মোট বারোটি আঘাত লাগে। তিনি যখন মুমূর্ষু অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছেন তখন মালিক ইবন দুখশান তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ মুহাম্মাদ (সা) নাকি নিহত হয়েছেন, তুমি জান ? সা'দ জবাব দেন, তিনি নিহত হলেও আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তুমি তোমার দ্বীনের পক্ষে জিহাদ কর। মুহাম্মাদ (সা) তো তাঁর রবের বাণী ও দ্বীনের বিধি-বিধান পৌঁছানোর দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করে গেছেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৭, তাবাকাত-৩/৫২৩)

উহুদের যুদ্ধ শেষে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বললেন ঃ কেউ সা'দ ইবনুর রাবী'র খোঁজ নিয়ে আসতো। এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমি যাচ্ছি। যারকানী বলেন, লোকটি পড়ে থাকা লাশগুলির চারপাশে চক্কর দিয়ে সা'দের নাম ধরে জোরে ডাক দিলেন। কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। কিন্তু যখন তিনি এই কথা বলে চিৎকার করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার খোঁজে আমাকে পাঠিয়েছেন। তখন ক্ষীণকণ্ঠের একটা আওয়াজ ভেসে এল; আমি মৃতদের মধ্যে। তখন তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, জিহ্বাও আয়ত্তে নেই। অন্য একটি বর্ণনা মতে, লোকটি যখন তাঁর খোঁজে ঘুরাঘুরি করছে, তখন সা'দই তাঁকে ডাক দেন। যাই হোক, সেই অবস্থায় সা'দ তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) আমার সালাম পৌঁছিয়ে বলবেন, আমাকে বারোটি আঘাত করা হয়েছে। আমিও আমার হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। আর আনসারদের বলবেন, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ রাসূল (সা) নিহত হন, আর তোমাদের একজনও জীবিত ফিরে যাও, আল্লাহকে মুখ দেখানোর যোগ্য তোমরা থাকবে না। কারণ, 'লাইলাতুল আকাবায়' (আকাবার রাত্রি) তোমরা রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়েছিলে। কোন কোন বর্ণনায় এই ব্যক্তির নাম উবাই ইবন কা'ব বলা হয়েছে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সা'দের পবিত্র রূহ তাঁর নশ্বর দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। (তাবাকাত-৩/৫২৩-২৪, আল-ইসতীয়াব-২/৩৪, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২১০, আল-ইসাবা-২/২৭)

হযরত উবাই ইবন কা'ব ফিরে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) সা'দের অন্তিম কথাগুলি পৌঁছালে তিনি বলেন, আল্লাহ তার ওপর করুণা বর্ষণ করুন। জীবন-মরণ উভয় অবস্থায় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে উপদেশ দিয়েছে। (উসুদুল গাবা-২৭৭) উহুদের অন্য এক শহীদ খারিজা ইবন যায়িদ ও সা'দকে উহুদের প্রান্তরে একই কবরে দাফন করা হয়। খারিজা ছিলেন সম্পর্কে সা'দের চাচা।

সা'দের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জাহিলী প্রথা অনুসারে তাঁর সকল সম্পত্তি দখল করে নেয়। সা'দ গর্ভবতী স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে যান। তখনও মীরাসের (উত্তরাধিকার) আয়াত নাযিল হয়নি। জাবির ইবন আবদিল্লাহ বর্ণনা করেন। সা'দের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী একদিন তাঁর দুই কন্যাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এরা সা'দের কন্যা। ওদের পিতা উহুদে শাহাদত বরণ করেছে। আর ওদের চাচা সকল সহায়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে বসেছে, ওদেরকে কিছুই দেয়নি। অর্থ-সম্পদ ছাড়া ওদের বিয়ে শাদী হবে কেমন করে? রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তা'য়ালা ওদের ব্যাপারে ফায়সালা দেবেন। এর পরই সূরা নিসার ১১ নং আয়াতের এই অংশটুকু নাযিল হয় ঃ 'যদি কন্যা কেবল দুই-এর অধিক হয় তাহলে তাদের জন্য পরিত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ।'

উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) মেয়ে দু'টির চাচাকে ডেকে নির্দেশ দেন ঃ সা'দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তার দুই মেয়েকে, এক-অষ্টমাংশ তাদের মাকে দেওয়ার পর বাকীটা তুমি গ্রহণ কর। (আল-ইসাবা-২/২৭, তাবাকাত-৩/৫২৪, উসুদুল গাবা-২/২৭৮, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২১০, তাছাড়া ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবন মাজা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন সা'দের কন্যা ও স্ত্রীদের জন্য এই ফায়সালা দান করেন

তখনও মাতৃগর্ভের সন্তানের কোন মীরাস বা উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়নি। এই ঘটনার অনেক পরে গর্ভের সন্তানের মীরাস দেওয়ার বিধান হয়। সা'দের স্ত্রীগর্ভের সেই সন্তানটি ভূমিষ্ট হয়। তাঁর নাম রাখা হয় উম্মু সা'দ বিনতু সা'দ এবং পরবর্তীকালে তিনি যায়িদ ইবন সাবিতের স্ত্রী হন। খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে যায়িদ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তোমার পিতার মীরাসের ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীনের সাথে কথা বলতে পার। বর্তমানে তিনি গর্ভের সন্তানদের মীরাসের অংশ দান করছেন। উম্মু সা'দ বললেন ঃ আমি আমার বোনদের কাছে কিছুই দাবী করবো না। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩৮)

সেই জাহিলী আরবে যখন লেখার খুব কম প্রচলন ছিল, হযরত সা'দ লেখা জানতেন। (তাবাকাত–৩/৫২২, তাহজীবুল আসমা–১/২১০) যেহেতু তিনি গোত্রীয় নেতার সন্তান ছিলেন, তাই শিক্ষার বিশেষ সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং লেখাও শিখেছিলেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মুখ থেকে শোনা কিছু হাদীসও মুখস্থ করেছিলেন। (উসুদুল গাবা–২/২৭৮)

তাঁর 'ঈমানী জোশ ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছিল আকাবার বাই'য়াত, উহুদের যুদ্ধ এবং মৃত্যুর পূর্বে করে যাওয়া অসীয়াতের মধ্যে।

এই সব কারণে সাহাবাযে কিরামের নিকট হযরত সা'দের একটা বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তাঁর এক কন্যা একবার হযরত আবু বকরের (রা) নিকট আসলে তিনি তাঁর বসার জন্য নিজের কাপড় বিছিয়ে দেন। তা দেখে হযরত উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ মেয়েটি কার? খলীফা বললেন ঃ এ সেই ব্যক্তির মেয়ে– যিনি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এমন মর্যাদা কি জন্য? বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় জান্নাতে পৌঁছে গেছেন আর তুমি–আমি এখনও এখানে পড়ে আছি। (আল–ইসাবা–২/২৭)

আবু বকর আয–যুবায়রী বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি খলীফা আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি সা'দ ইবনুর রাবীর ছোট্ট একটি মেয়েকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার লালা মুছে দিচ্ছেন ও চুমু খাচ্ছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল, মেয়েটি কে? তিনি জবাব দিলেন, এ এমন এক ব্যক্তির মেয়ে যিনি তোমার ও আমার চেয়ে উত্তম। এ সা'দ ইবনুর রাবীর মেয়ে। তিনি ছিলেন 'আকাবার নাকীব, বদরের যোদ্ধা ও উহুদের শহীদ। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৯৫)

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)

'আবদুল্লাহ নাম। কুনিয়াত বা উপনামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা ঃ আবু মুহাম্মদ, আবু রাওয়াহা অথবা আবু 'আমর। 'শা'য়িরু রাসূলিল্লাহ'- 'রাসূলুল্লাহর (সা) কবি' তাঁর উপাধি। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনী আল-হারিস শাখার সন্তান। পিতা রাওয়াহা ইবন সা'লাবা এবং মাতা কাবশা বিনতু ওয়াকিদ। সাহাবিয়্যা 'আমরাহ বিনতু রাওয়াহা তাঁর বোন এবং কবি সাহাবী নু'মান ইবন বাশীর তাঁর ভাগ্নে। ইতিহাসে তাঁর জন্মের সময়কাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় জীবনে অতি মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। (তাবাকাত-৩/৫২৫, আল-আ'লাম-৪/২১৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াললুগাত-১/২৬৫

তিনি তৃতীয় আকাবায় সত্তর জন (৭০) মদীনাবাসীর সাথে অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন এবং সা'দ ইবনুর রাবী'র সাথে তিনিও বনু আল-হারিসার 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) মনোনীত হন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৩, ৪৫৮, তাবাকাত-৩/৫২৬, আনসাবুল আশরাফ-১/২৫২, তারীখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর-১/১৮১) তবে সম্ভবতঃ তিনি এই তৃতীয় 'আকাবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় তিনি প্রথম আকাবায় ছয়জনের সাথে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/১০৫)

ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় ইসলামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে কুবায় উপস্থিত হলেন। তিনি যে দিন কুবা থেকে সর্বপ্রথম মদীনায় পদার্পণ করেন, সেদিন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, সা'দ ইবনুর রাবী ও খারিজা ইবন যায়িদ তাদের গোত্র বনু আল-হারিসার লোকদের সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীর পথরোধ করে দাঁড়ান এবং তাঁকে তাদের গোত্রে অবতরণের বিনীত আবেদন জানান। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদের বলেন, উটনীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর নির্দেশমত চলছে, আল্লাহর যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থামবে। তাঁরা পথ ছেড়ে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৫) হযরত রাসূলে কারীম (সা) মিকদাদ ইবন আসওয়াদ আল-কিন্দীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার, 'উমরাতুল কাদা- প্রত্যেকটি অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কেবল হিজরী চতুর্থ সনে সংঘটিত 'বদর আস-সুগরা' অভিযানে যোগদান করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে যান। (তাবাকাত-৩/৫২৬, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৮) উল্লেখ্য যে, উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় কুরাইশ নেতা আবু সুফইয়ান ইবন হারব ঘোষণা দেয় যে, এখন থেকে ঠিক এক বছরের মাথায় 'বদর আস-সুগরা' তে আবার তোমাদের মুখোমুখি হব। রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানরা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কিন্তু কুরাইশরা অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হয়। এই বদর আস-সুগরা-তে রাসূল (সা) বাহিনীসহ আট দিন

অপেক্ষা করেন। এটা হিজরী চতুর্থ সনের জ্বিলকা'দ মাসের ঘটনা। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩৯–৩৪০)

বদর যুদ্ধের সূচনা পর্বে কুরাইশ পক্ষের বাহাদুর 'উতবা ইবন রাবীয়া' তার ভাই শাইবা ইবন রাবীয়া ও ছেলে আল–ওয়ালীদ ইবন উতবাকে সংগে করে প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। তার আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে 'আউফ, মুয়াওয়াজ ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সর্বপ্রথম এগিয়ে যান। 'উতবা তাঁদের জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা কারা? তাঁরা জবাব দেন ঃ আনসারদের একটি দল। 'উতবা বলল, তোমাদের সাথে আমরা লড়তে চাইনা। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৬২৫)

বদরের বিজয় বার্তা দিয়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার চতুর্দিকে লোক পাঠান। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে পাঠান মদীনার উঁচু অঞ্চলের দিকে। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৬৪২)

রাসূলুল্লাহ (সা) বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের হাতে বন্দী কুরাইশদের সম্পর্কে সাহাবীদের মতামত জানতে চান। তাঁদের সম্পর্কে নানাজন নানা মত প্রকাশ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ প্রচুর জ্বালানী কাঠে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকায় তাদেরকে জড় করে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক। তারপর আমিই সেই কাঠে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলবো। (হায়াতুস সাহাবা–২/৪২)

খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার রচিত কবিতা বার বার আবৃত্তি করেছিলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্য না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না,
আমরা যাকাত দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না
তুমি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল কর,
যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখ।
যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে,
তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করলে, আমরা অস্বীকার করবো।"
(সীয়ারেআনসার–২/৫৯)

এই খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজার নেতা কাব ইবন আসাদ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সম্পাদিত তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। খবরটি রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছে। তিনি খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন লোককে কা'বের নিকট পাঠান। তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২২১, আসাহ আস–সীয়ার–১৯০)

খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মকান্ডের কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর তার সাথে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার নামটি উচ্চারিত হয়েছে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার ভাগ্নী তথা নু'মান ইবন বাশীরের বোন বলেন ঃ একদিন আমার মা 'উমরাহ বিনতু রাওয়াহা আমাকে ডেকে আমার কাপড়ে কিছু খেজুর বেঁধে দিয়ে বললেন ঃ এগুলি তোমার বাবা বাশীর ও মামা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে দিয়ে এস, তাঁরা দুপুরে খাবেন। আমি সেগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছি, আর আমার বাবা ও মামাকে

খোঁজ করছি। রাসূলে (সা) আমাকে দেখে ডাক দিলেন ঃ এই মেয়ে, এদিকে এস। তোমার কাছে কি? বললাম ঃ খেজুর। আমার মা আমার বাবা বাশীর ইবন সা'দ ও মামা 'আবদুল্লাহর দুপুরের খাবারের জন্য পাঠিয়েছেন। বললেন ঃ আমার কাছে দাও। আমি খেজুরগুলি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই হাতে ঢেলে দিলাম, কিন্তু হাত ভরলো না। তিনি কাপড় বিছাতে বললেন এবং খেজুরগুলি কাপড়ের ওপর ছড়িয়ে দিলেন; তারপর পাশের লোকটিকে বললেন ঃ যাও, খন্দকবাসীদের দুপুরের খাবার খেয়ে যেতে বল। ঘোষণার পর, সবাই চলে এল এবং খাবার খেতে শুরু করল। তাঁরা খাচ্ছে, আর খেজুরও বাড়ছে। তাঁরা পেট ভরে খেয়ে চলে গেল, আর তখনও কাপড়ের ওপর কিছু খেজুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকলো। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/১১৮, হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩১)

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বাই'য়াতে রিদওয়ানেও 'আবদুল্লাহ যোগদান করেন।

আবু রাফে'র পরে উসাইর ইবন রাযিম ইহুদীকে খাইবারের শাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। ইসলামের শত্রুতায় সে ছিল উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। সে গাতফান গোত্রে ঘুরাঘুরি করে তাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) খবর পেয়ে ষষ্ঠ হিজরীর রমাদান মাসে তিরিশ সদস্যের একটি দলের সাথে 'আবদুল্লাহকে খাইবারে পাঠান। তিনি গোপনে উসাইর ইবন রাযিমের সকল তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। রাসূল (সা) তিরিশ সদস্যের একটি বাহিনী 'আবদুল্লাহর অধীনে ন্যস্ত করে উসাইরকে হত্যার নির্দেশ দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৮)

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উসাইরের সাথে দেখা করে বলেন, যদি আপনি নিরাপত্তার আশ্বাস দেন তাহলে একটি কথা বলি। সে আশ্বাস দিল। 'আবদুল্লাহ বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। আপনাকে খাইবারের নেতা বানানো তাঁর ইচ্ছা। তবে আপনাকে একবার মদীনায় যেতে হবে। সে প্রলোভনে পড়ে এবং তিরিশজন ইহুদীকে সংগে করে 'আবদুল্লাহর বাহিনীর সাথে চলতে শুরু করলো। পথে 'আবদুল্লাহ প্রত্যেক ইহুদীর প্রতি নজর রাখার জন্য একজন করে মুসলমান নির্দিষ্ট করে দিলেন। এতে উসাইরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল এবং ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলো। ধোঁকা ও প্রতারণার অপরাধে মুসলিম মুজাহিদরা খুব দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে তাদের সকলকে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর খাইবারের মাথাচাড়া দেওয়া বিদ্রোহ দমিত হয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১৮, সীয়ারে আনসার-২/৬০)

পরে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) 'আবদুল্লাহকে খাইবারে উৎপাদিত খেজুর পরিমাপকারী হিসাবে আবারও সেখানে পাঠান। কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'আবদুল্লাহর কঠোরতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো। এক পর্যায়ে তারা ঘুষও দিতে চাইল। ইবন রাওয়াহা তাদেরকে বললেন ঃ ওহে আল্লাহর দুশমনরা। তোমরা আমাকে হারাম খাওয়াতে চাও? আমার প্রিয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার নিকট তোমরা বানর ও শুকর থেকেও ঘৃণিত। তোমাদের প্রতি ঘৃণা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা তোমাদের ওপর কোন রকম জুলুমের দিকে নিয়ে যাবে না। একথা শুনে তারা বলল ঃ এমন ন্যায়পরায়ণতার ওপরই আসমান ও যমীন প্রতিষ্ঠিত। (হায়াতুস সাহাবা-২/১০৮, আল বিদায়া-৪/১৯৯)

হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী সে বছরের মূলতবী 'উমরাহ রাসূল (সা) পরের বছর হিজরী

সপ্তম সনে আদায় করেন। একে 'উমরাতুল কাদা' বা কাজা 'উমরা বলে। এই সফরে রাসূলে কারীম (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন এবং উটের পিঠে বসে 'হাজারে আসাওয়াদ' চুম্বন করেন তখন আবদুল্লাহ তার বাহনের লাগাম ধরে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির কিছু অংশের মর্ম নিম্নরূপ ঃ

ওরে কাফিরের সন্তানরা! তোরা তাঁর পথ থেকে সরে যা, তোরা পথ ছেড়ে দে। কারণ, সকল সৎকাজ তো তাঁরই সাথে। আমরা তোদের মেরেছি কুরআনের ব্যখ্যার ওপর, যেমন মেরেছি তার নাযিলের ওপর। এমন মার দিয়েছি যে, তোদের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বন্ধু ভুলে ফেলে গেছে তাঁর বন্ধুকে। প্রভু আমি তাঁর কথার ওপর ঈমান এনেছি। (তাবাকাত–৩/৫২৬–৫২৭,আলইসাবা–২/৩০৭)

এক সময় হযরত উমার (রা) ধমক দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহর হারামে ও রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এভাবে কবিতা পাঠ? রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করে বলেন ঃ 'উমার! আমি তার কথা শুনছি। আল্লাহর কসম! কাফিরদের ওপর তার কথা তীর বর্শার চেয়েও বেশী ক্রিয়াশীল। (আল–ইসাবা–২/৩০৭) তিনি আবদুল্লাহকে বলেন ঃ তুমি এভাবে বল ঃ 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ, নাসারা 'আবদাহ ওয়া আ'য়াযযা জুনদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ'– এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেছেন এবং একাই প্রতিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিতকরেছেন।

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা উপরোক্ত বাক্যগুলি আবৃত্তি করছিলেন, আর তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলেন সমবেত মুসলিম জনমন্ডলী। তখন মক্কার উপত্যকা সমূহে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছিল।(সীয়ারে আনসার–২/৬১)

হিজরী অষ্টম সনের জামাদি–উল–আওয়াল মাসে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বসরার শাসকের নিকট দূত মারফত একটি চিঠি পাঠান। পথে মূতা নামক স্থানে এক গাসসানী ব্যক্তির হাতে দূত নিহত হয়। দূতের হত্যা মূলতঃ যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত। রাসূল (সা) খবর পেয়ে যায়িদ ইবন হারিসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী মূতায় পাঠান। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন ঃ যায়িদ হবে এ বাহিনীর প্রধান। সে নিহত হলে জা'ফর ইবন আবী তালিব তার স্থলাভিষিক্ত হবে। জা'ফরের পর হবে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আর সেও যদি নিহত হয় তাহলে মুসলমানরা আলোচনার মাধ্যমে নিজেদেরআমীরবানিয়েনেবে।

বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রার সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'সানিয়্যাতুল বিদা' পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদের বিদায় জানান। বিদায় বেলা মদীনাবাসীরা তাদেরকে বলল ঃ তোমরা নিরাপদে থাক এবং কামিয়াব হয়ে ফিরে এসো। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা বলল ঃ কাঁদার কী আছে? তিনি বললেন, দুনিয়ার মুহাব্বতে আমি কাঁদছিনা। তিনি সূরা মারইয়াম এর ৭১ নং আয়াত– 'তোমাদের প্রত্যেককেই তা (পুলসিরাত) অতিক্রম করতে হবে। এটা তোমার রব–এর অনিবার্য সিদ্ধান্ত'– পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি কি সেই পুলিসিরাত পার হতে পারবো? লোকরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল ঃ আল্লাহ তোমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবার মিলিত করবেন। তখন তিনি স্বরচিত একটি কবিতা

আবৃত্তি করেন। কবিতাটির অর্থ নিম্নরূপ। 'তবে আমি রহমানের কাছে মাগফিরাত কামনা করি, আর কামনা করি অসির অন্তরভেদী একটি আঘাত, অথবা কলিজা ও নাড়িতে পৌঁছে যায় নিযার এমন একটি খোঁচা, আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী যেন বলে– হায় আল্লাহ, সে কত ভালো যোদ্ধা ও গাজী ছিল।' (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৭৪, ৩৭৩ হায়াতুস সাহাবা–১/৫২৯,৫৩০)

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যায়িদ ও জা'ফর বাহিনীসহ সকালে মদীনা ত্যাগ করলেন। ঘটনাক্রমে সেটা ছিল জুময়ার দিন। 'আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জুময়ার নামায আদায় করে রওয়ানা হব। তিনি নামায আদায় করলেন। রাসূল (সা) নামায শেষে তাঁকে দেখে বললেন ঃ সকালে তোমার সংগীদের সাথে যাওনি কেন? 'আবদুল্লাহ বললেন, আমি ইচ্ছা করেছি, আপনার সাথে জুম'য়া আদায় করে তাদের সাথে মিলিত হব। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যদি দুনিয়ার সবকিছু খরচ কর তবুও তাদের সকালে যাত্রার সাওয়াবের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না।(হায়াতুস সাহাবা–১/৪৬৩)

মদীনা থেকে শামের 'মা'য়ান' নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন যে, রোমান সম্রাট হিরাকল এক লাখ রোমান সৈন্যসহ 'বালকা'–র 'মাব' নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছে। আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে লাখম, জুজাম, কায়ন, বাহরা, বালী–সহ বিভিন্ন গোত্রের আরও এক লাখ লোক। এ খবর পেয়ে তাঁরা মায়ানে দুই দিন ধরে চিন্তা–ভাবনা ও পরামর্শ করেন। মুসলিম সৈনিকদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করে যে, আমরা শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও প্রস্তুতির সব খবর রাসূলকে (সা) অবহিত করি। তারপর তিনি আমাদেরকে অতিরিক্ত সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন এবং আমরা সেই মোতাবিক কাজ করব।

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তখন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ওহে জনমন্ডলী, এখন তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হতে পসন্দ করছো না; অথচ তোমার সবাই শাহাদাত লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়েছো। আমরা তো শত্রুর সাথে সংখ্যা, শক্তি ও আধিক্যের দ্বারা লড়বো না। আমরা লড়বো দ্বীনের বলে বলীয়ান হয়ে– যে দ্বীনের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তোমরা সামনে ঝাঁপিয়ে পড়। তোমাদের সামনে আছে দুইটি কল্যাণের যে কোন একটি– হয় বিজয়ী হবে নতুবা শাহাদাত লাভ করবে। সৈনিকরা তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলল ঃ আল্লাহর কসম! ইবন রাওয়াহা ঠিক কথাই বলেছেন। তারা তাদের সকল দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তাদের সাথে চলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩৭৫, আসাহ আস–সীয়ার–২৮০)

তাঁরা 'মা'য়ান' ত্যাগ করে মূতায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। এখানে অমুসলিমদের সাথে এক রক্তক্ষয়ী অসম যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'মূতার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা মাত্র তিনহাজার আর শত্রুবাহিনীর সংখ্যা অগণিত। (সীয়ারে আনসার–২/৬২)

প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হল। সেনাপতি যায়িদ ইবন হারিসা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হলেন। জা'ফর তাঁর পতাকাটি তুলে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন। এবার আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে তুলে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি ছিলেন ঘোড়ার পিঠে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার মুহূর্তে তাঁর মনে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দিল। তিনি সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

'হে আমার প্রাণ! আমি কসম করেছি, তুমি অবশ্যই নামবে, তুমি স্বেচ্ছায় নামবে অথবা নামতে বাধ্য করা হবে। মানুষের চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে, তোমার কী হয়েছে যে, এখনও জান্নাতকে অবজ্ঞা করছো? সেই কত দিন থেকে না এই জান্নাতের প্রত্যাশা করে আসছো, পুরানো ফুটো মশকের এক বিন্দু পানি ছাড়া তো তুমি আর কিছু নও। হে আমার প্রাণ, আজ তুমি নিহত না হলেও একদিন তুমি মরবে, এই মৃত্যুর হাম্মাম এখানে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তুমি যা কামনা করতে এখন তোমাকে তাই দেওয়া হয়েছে, তুমি তোমার সঙ্গীদ্বয়ের কর্মপন্থা অনুসরণ করলে হিদায়াত পাবে।'

উপরোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। তখন তাঁর এক চাচাতো ভাই গোশতসহ একটুকরো হাড় নিয়ে এসে তার হাতে দেন। তিনি সেটা হাতে নিয়ে যেই না একটু চাটা দিয়েছেন, ঠিক তখনই প্রচন্ড যুদ্ধের শোরগোল ভেসে এলো। 'তুমি এখনও বেঁচে আছ'- এ কথা বলে হাতের হাড়টি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে তুলে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শত্রুপক্ষের এক সৈনিক এমন জোরে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একটি তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি রক্তরঞ্জিত অবস্থায় সাথীদের আহবান জানান। সাথীরা ছুটে এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। (তাবাকাত-৩/৫২৯, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭৯, হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৩, সীয়ারে আনসার-২/৬৩, আনসাবুল আশরাফ-১/৩৮০, ২৪৪)

মূতায় অবস্থানকালে শাহাদাতের পূর্বে একদিন রাতে তিনি একটি মর্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আবৃত্তি শুনে যায়িদ ইবন আরকাম কাঁদতে শুরু করেন। তিনি যায়িদের মাথার ওপর দুররা উঁচু করে ধরে বলেন ঃ তোমার কী হয়েছে? আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করলে তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাবে। (আল-ইসাবা-২/৩০৭)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওহীর মাধ্যমে মূতার প্রতি মুহূর্তের খবর লাভ করে মদীনায় উপস্থিত লোকদের সামনে বর্ণনা করছিলেন। সহীহ বুখারীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মূতার খবর আসার পূর্বেই রাসূল (সা) মদীনায় যায়িদ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহর শাহাদাতের খবর দান করেন। তিনি বলেন ঃ যায়িদ ঝান্ডা হাতে নেয় এবং শহীদ হয়। তারপর জা'ফর তুলে নেয়, সেও শহীদ হয়। অতঃপর আবদুল্লাহ তুলে নেয় এবং সেও শহীদ হয়। তিনি একথা বলছিলেন আর তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (আসাহ আস-সীয়ার-২৮১) কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, যায়িদ ও জা'ফরের শাহাদাতের খবর দেওয়ার পর রাসূল (সা) একটু চুপ থাকেন। এতে আনসারদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তারা ধারণা করে যে, 'আবদুল্লাহর এমন কিছু ঘটেছে যা তাদের মনঃপূত নয়। তারপর রাসূল (সা) বলেন ঃ অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা উঠিয়ে নেয় এবং যুদ্ধ করে শহীদ হয়। তিনি আরও বলেন, তাদের সকলকে জান্নাতে আমার কাছে আনা হয়েছে। আমি দেখলাম, তারা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। তবে 'আবদুল্লাহর পালঙ্কটি তার অন্য দুই সঙ্গীর থেকে

একটু বাঁকা। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ এটা এমন কেন? বলা হল ঃ তারা দুইজন দ্বিধাহীন চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু আবদুল্লাহর চিত্ত দ্বিধা-সংকোচে একটি দোল খায়। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮০)

মূতার তিন সেনাপতির মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁদের কর্মকান্ড বর্ণনা করে এই বলে দুআ করেন ঃ আল্লাহ তুমি যায়িদকে ক্ষমা করে দাও। একথা তিনবার বলেন, তারপর বলেন ঃ আল্লাহ তুমি জাফর ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে ক্ষমা করে দাও। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৪)

মূতায় যাওয়ার পূর্বে একবার মদীনায় অসুস্থ অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েন। তখন তাঁর বোন 'উমরাহ নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে আরবদের প্রথা অনুযায়ী বিলাপ শুরু করেন। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি বোনকে বলেন, তুমি আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জন করে যা কিছু বলছিলে, তার সবই আমার কাছ থেকে সত্যায়িত করা হচ্ছিল। এই কারণে তাঁর মৃত্যুর সময় তারই উপদেশ মত সকলে 'সবর'(ধৈর্য্য) অবলম্বন করে। সহীহ বুখারীতে এসেছে- তিনি যখন মারা যান তাঁর জন্য কান্নাকাটি বা বিলাপ করা হয়নি। (উসূদুল গাবা-৩/১৫৭-১৫৯, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৮০)

মূতা রওয়ানা হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান ছিল। কিন্তু উসূদুল গাবা গ্রন্থকার বলেছেন, তিনি নিহত হন এবং কোন সন্তান রেখে যাননি। (উসূদুল গাবা-৩/১৫৯, সীয়ারে আনসার-২/২৬৫)

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার স্ত্রী সম্পর্কে আল-ইসতীয়াব গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, তুমি যদি পাক অবস্থায় থাক তাহলে একটু কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাও। তখন 'আবদুল্লাহ চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ওয়াদা সত্য,
কাফিরদের ঠিকানা দোযখ,
'আরশ ছিল পানির ওপর,
'আরশের ওপর ছিলেন বিশ্বের প্রতিপালক,
আর সেই আরশ বহন করে তাঁরই শক্তিশালী ফিরিশতারা।"

তাঁর স্ত্রী কুরআনে পারদর্শী ছিলেন না। এই কারণে তিনি বিশ্বাস করেন যে, আবদুল্লাহ কুরআন থেকেই তিলাওয়াত করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ সত্যবাদী, আমার চোখ দেখতে ভুল করেছে। আমি অহেতুক তোমাকে দোষারোপ করছি। দাসীর সাথে উপগত হওয়ার পর স্ত্রীর ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য হযরত আবদুল্লাহ এমন বাহানার আশ্রয় নেন। তিনি পরদিন সকালে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনি হেসে দেন। (আল-ইসতীয়াব-১/৩৬২, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৫)

সামরিক দক্ষতা ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার আরও অনেক যোগ্যতা ছিল। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সমাদর করতেন। সেই জাহিলী আরবে যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক আরবীতে লেখা জানতো, 'আবদুল্লাহ তাদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় 'কাতিব' (লেখক) হিসাবে নিয়োগ করেন। তবে কখন কিভাবে তিনি লেখা শিখেছিলেন, সে সম্পর্কে ইতিহাস কিছু বলে না।

তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত কবি। ডক্টর 'উমার ফাররুখ বলেন, 'মদীনায় ইসলাম রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করলে আরবের মুশরিকগণ আরও শংকিত হয়ে পড়ে। মক্কার পৌত্তলিক কবিগণ বিশেষতঃ 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবা'রী, কা'ব ইবন যুহাইর ও আবু সুফইয়ান ইবন আল-হারিস রাসূলুল্লাহ (সা) ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা রটনা করে কবিতা লিখতো। তখন মদীনায় হাসসান ইবন সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়ে সমুচিত জবাব দেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরেন। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দু'পক্ষের এ কবিতার যুদ্ধ চলতে থাকে। 'আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁর যুগের ভালো কবিদের একজন। তিনি হাস্সান ও কা'বের সমপর্যায়ের কবি। জাহিলী যুগে তিনি কবি কায়েস ইবনুল খুতাইম-এর সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ মূলক কবিতা লিখে প্রতিযোগিতা করতেন। আর ইসলামী যুগে রাসূলের (সা) প্রশংসা এবং মুশরিক কবিদের প্রতিবাদ ও নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন। (তারীখুল আদাব আল-আরাবী-১/২৫৮, ২৬১,২৬২)

জুরযী যায়দান বলেন ঃ 'মক্কার পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে যারা মুসলমানদের নিন্দা করে কবিতা বলতো তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন আয-যিবারী, আবু সুফইয়ান ইবন আল-হারিস ও 'আমর ইবন আল-'আস ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। একদিন নবী (সা) বললেন ঃ যারা তাদের অস্ত্রের দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে সাহায্য করেছে, জিহ্বা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে তাদেরকে কিসে বিরত রেখেছে? এই কথার পর যে তিন কবি উপরোক্ত কবিদের প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে যান তাঁরা হলেন, হাস্সান, কা'ব ও আবদুল্লাহ। রাসূল (সা) মনে করতেন, এই তিন কবির কবিতা শত্রুদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন ঃ এই তিন কবি কুরাইশদের কাছে তীরের ফলার চেয়েও বেশী শক্তিশালী। (তারীখু আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ-১/১৯১)

কবি হাস্সান কুরাইশদের বংশ ও রক্তের ওপর আঘাত হানতেন, কবি কা'ব কুরাইশদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে তাদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতেন। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাদের কুফরীর জন্য নিন্দা ও ধিক্কার দিতেন। (উসুদুল গাবা-৪/২৪৮) আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী বলেন ঃ হাস্সান ও কা'ব প্রতিপক্ষ কুরাইশ কবিদের মত যুদ্ধ বিগ্রহ ও গৌরবমূলক কাজ-কর্ম নিয়ে কবিতা রচনা করতেন এবং তার মধ্যে কুরাইশদের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতেন। আর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহ তাদের কুফরীর জন্য ধিক্কার ও নিন্দা জানাতেন। কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বোক্ত দু'জনের কবিতা ছিল তাদের নিকট 'আবদুল্লাহর কবিতা অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক। কিন্তু যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্মবাণী উপলব্ধি করলো তখন 'আবদুল্লাহর কবিতা সর্বাধিক প্রভাবশালী ও পীড়াদায়ক বলে তাদের নিকট প্রতিভাত হলো। (কিতাবুল আগানী-৪/১৩৬)

আবদুল্লাহ ছিলেন স্বভাব কবি। উপস্থিত কবিতা রচনায় দক্ষ ছিলেন। হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন ঃ তাৎক্ষণিক কবিতা বলার ক্ষেত্রে আমি 'আবদুল্লাহ অপেক্ষা অধিকতর সক্ষম আর কাউকে দেখিনি। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২৬৫) একদিন তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। পূর্বেই সেখানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদল সাহাবীর সাথে বসে ছিলেন। তিনি 'আবদুল্লাহকে কাছে ডেকে বলেন, তুমি এখন মুশরিকদের সম্পর্কে কিছু কবিতা শোনাও।' আবদুল্লাহ কিছু কবিতা শোনালেন। কবিতা শুনে রাসূল (সা) একটু

হাসি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাকে অটল রাখুন। (আল-ইসতীয়াব-১/৩৬২, তাবাকাত-৩/৫২৮,আল-ইসাবা-২/৩০৭)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) ওয়াজ নসীহাতের সময় বলতেন, তোমাদের এক ভাই আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা অশ্লীল কথা বলতেন। তারপর তিনি 'আবদুল্লাহর একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে কবিতাটি সংকলন করেছেন। (আল-ফাতহুর রাব্বানী, শরহু মুসনাদ আহমাদ-২২/২৮৭)

'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সব কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে এখনও পঞ্চাশটি শ্লোক (verse) সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। সীরাতু ইবন হিশামে তার অধিকাংশ পাওয়া যায়। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)-১২/৭৮০)

যখন সূরা শু'য়ারা-এর ২২৪-২২৬ নং আয়াতগুলি- 'কবিদেরকে তারাই অনুসরণ করে যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না তাই বলে বেড়ায়'- নাযিল হয় তখন হাস্সান, আবদুল্লাহ ও কাব এত ভীত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে যান। তাঁরা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই আয়াত নাযিলের সময় আল্লাহ তো জানতেন আমরা কবি। তখন রাসূল (সা) আয়াতের পরবর্তী অংশ- 'কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহকে বার বার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে'- পাঠ করেন এবং বলেন এই হচ্ছো তোমরা। (আল-ইসাবা-২/৩০৭, তাবাকাত-৩/৫২৮, হায়াতুস সাহাবা-৩/৭৭, ১৭২)

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি হাদীসগুলি খোদ রাসূল (সা) ও বিলাল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন ইবন 'আব্বাস, উসামা ইবন যায়িদ, আনাস ইবন মালিক, নু'মান ইবন বাশীর ও আবু হুরাইরা। (আল-ইসাবা-২/৩০৬)

আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন একজন দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ ও সব সময় আল্লাহকে স্মরণকারী (জাকির) ব্যক্তি। আবুদ দারদা বলেন ঃ এমন কোন দিন যায়না যেদিন আমি তাঁকে স্মরণ করিনা। আমার সঙ্গে একত্র হলেই তিনি বলতেন, এস, কিছুক্ষণের জন্য আমরা মুসলমান হয়ে যাই। তারপর বসে 'জিকর' শুরু করতেন। 'জিকর' শেষ হলে বলতেন, এটা ছিল ঈমানের মজলিস। (উসুদুল গাবা-৩/১৫৭)

আনাস ইবন মালিক বলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন সাহাবীর দেখা হলে বলতেন, এস, আমরা কিছু সময়ের জন্য ঈমান আনি। একদিন এক ব্যক্তি তাঁর এমন কথায় খুব রেগে গেল। সে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অভিযোগ করে বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি দেখেন না, ইবন রাওয়াহা আপনার ঈমান ত্যাগ করে কিছুক্ষণের ঈমানকে পসন্দ করছে? তিনি বললেন, আল্লাহ ইবন রাওয়াহার ওপর রহম করুন। সে এমন সব মজলিস পসন্দ করে যার জন্য ফিরিশতারাও ফখর করে থাকে।

একবার তো তাঁর এমনি ধরনের আহবানে এক ব্যক্তি প্রতিবাদ করে বলে বসলো, কেন আমরা কি মুমিন নই? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমরা মুমিন। তবে আমরা জিকর করবো, তাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে। (আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/২৮৬, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৫)

তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন, যখন তিনি ঘর থেকে বের হতেন, দুই রাকায়াত নামায আদায় করতেন। আবার ঘরে ফিরে এসে ঠিক একই রকম করতেন। এ ব্যাপারে কক্ষণও অলসতা করতেন না। (আল-ইসাবা-২/৩০৭, হায়াতুস সাহাবা-৩/১৪৮)

একবার এক সফরে এত প্রচন্ড গরম ছিল যে, মানুষ সূর্যের তেজ থেকে বাঁচার জন্য নিজ নিজ মাথার ওপর হাত দিয়ে রেখেছিল। এমন গরমে কে রোযা রাখে? কিন্তু তার মধ্যেও কেবল হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা 'সাওম' পালন করেন। (সহীহ বুখারী-১/২৬১, মুসলিম-১/৩৫৭, হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৯, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/২৬৫)

জিহাদের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। বদর থেকে নিয়ে মূতা পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে তার একটিতেও তিনি অনুপস্থিত থাকেননি। রিজাল শাস্ত্রবিদরা (চরিত অভিধান) বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ সবার আগে যুদ্ধে বের হতেন এবং সবার শেষে ঘরে ফিরতেন। (আল-ইসাবা-২/৩০৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আদেশ-নিষেধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। একটি ঘটনায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছেন। আর ইবন রাওয়াহা যাচ্ছেন মসজিদের দিকে। তিনি যখন মসজিদের বাইরের রাস্তায় এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন রাসূল (সা) বলছেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে বসে পড়। এই নির্দেশ ইবন রাওয়াহার কানে যেতেই সেখানে বসে পড়েন। রাসূল (সা) খুতবা শেষ করার পর কোন এক ব্যক্তি ইবন রাওয়াহার ব্যাপারটি তাঁকে শোনান। শুনে তিনি মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লালসা আল্লাহ তার মধ্যে আরও বৃদ্ধি করে দিন। (আল-ইসাবা-২/৩০৬, হায়াতুস সাহাবা-২/৩৫৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা যেমন রাসূলকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি রাসূল (সা)ও তাঁকে ভালোবাসতেন। একবার আবদুল্লাহ অসুখে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। তিনি দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ, যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসে থাকে তাহলে সহজে তার মরণ দাও অন্যথায় তাকে ভালো করে দাও। (আল-ইসাবা-২/৩০৬)

উসামা ইবন যায়িদ বলেন ঃ সা'দ ইবন 'উবাদা অসুস্থ হলে রাসূল (সা) তাঁকে দেখার জন্য বের হলেন। আমাকেও বাহনের পিছনে বসিয়ে নিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই তার মুযাহিম দুর্গের ছায়ায় নিজ গোত্রের আরও কিছু লোকের সাথে বসে ছিল। রাসূল (সা) মনে করলেন, কোন কথা না বলে তাদের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া শিষ্টাচারের পরিপন্থী। তাই তিনি বাহনের পিঠ থেকে নামলেন এবং সালাম দিয়ে কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাদের সকলকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এতক্ষণ 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই চুপ করে ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) কথা শেষ হলে সে বলল ঃ দেখুন, আপনার কথা সত্য হলে বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকুন। কেউ আপনার কাছে গেলে তাকে যত পারেন শুনাবেন। এমন অবাঞ্ছিতভাবে কোন মজলিসে উপস্থিত হয়ে কাউকে বিরক্ত করবেন না। সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ঃ তার কথা কক্ষণও মানবেন না। আপনি আসবেন! আপনি আমাদের মজলিসে, ঘরে ঘরে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে আসবেন। আমরা সেটাই পসন্দ করি। আপনার

আগমনের দ্বারা আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫৮৭, হায়াতুস সাহাবা–২/৫০৯)

একদিন আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাঁদা শুরু করলেন। তাই দেখে স্ত্রীও কাঁদতে লাগলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কাঁদছো কেন? স্ত্রী বললেন ঃ তোমাকে কাঁদতে দেখে আমি কাঁদছি। তখন তিনি সূরা মরিয়াম–এর ৭১ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন, আমি এই আয়াতটি স্মরণ করে কাঁদছি। জানিনে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব কিনা। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৪৫)

বিখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু দারদা–র ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আবদুল্লাহর ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।জাহিলী যুগে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। 'আবদুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের পরও আবু দারদা মূর্তি উপাসক থেকে যান। তাঁর বাড়ীতে ছিল বিরাট এক মূর্তি। একদিন আবু দারদা বাড়ী থেকে বের হলেন, আর ঠিক সেই সময় ভিন্ন পথ দিয়ে আবদুল্লাহ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি আবু দারদা–র স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু দারদা কোথায়? স্ত্রী জবাব দিলেন ঃ এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ মূর্তির ঘরে প্রবেশ করে সেখানে রক্ষিত একটি হাতুড়ী দিয়ে মূর্তিটি ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললেন। শব্দ শুনে আবু দারদার–র স্ত্রী ছুটে গেলেন। আবদুল্লাহ কাজ শেষ করে চলে গেলেন। এ দিকে আবু দারদা–র স্ত্রী ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আবু দারদা ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট সব কিছু শুনে প্রথমে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা করলেন, যদি মূর্তির কোন ক্ষমতা থাকতো তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতো। এই উপলব্ধির পর তিনি আবদুল্লাহকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ইসলামের ঘোষণা দেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৩২, ৩৩৩)

একবার কবি হাস্সান ইবন সাবিত, একটি কবিতায় সাফওয়ান ইবন আল–মুয়াত্তাল ও তাঁর গোত্রের নিন্দা করেন। সাফওয়ান ক্ষেপে গিয়ে কবিকে মারপিট করে এবং তাঁকে দু'হাত গলার সাথে বেঁধে বনু আল–হারিসের পল্লীতে নিয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা তাকে ছাড়িয়ে দেন এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। তাদের দু'জনকেও রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে নিয়ে আসেন। তিনি তাদের ঝগড়া মিটমাট করে দেন (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩০৫)

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্টসমূহের কারণে রাসূল (সা) তাঁর প্রশংসায় বলেছেন ঃ 'নি'মার রাজুলু আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা' – আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কতই না ভালো মানুষ। (আল–ইসাবা–২/৩০৬)

আবু তালহা আল–আনসারী (রা)

নাম যায়িদ, ডাকনাম আবু তালহা। এ নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হিজরাতের ৩৬ বছর পূর্বে ৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আল–আ'লাম–৩/৯৮) পিতা সাহল ইবন আল–আসওয়াদ ইবন হারাম। বনু জাজীলার সন্তান। মাতা 'উবাদাহ্ বিনতু মালিক। প্রাচীন জাহিলী যুগে ইয়াসরিবে আবু তালহার খান্দান বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাঁর পিতৃ ও মাতৃ বংশের মধ্যেও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। বর্তমান মসজিদে নববী সংলগ্ন পশ্চিম দিকে তাঁর খান্দানের বসতি ছিল। তিনি তাঁর সময়ে খান্দানের রয়িস বা নেতা ছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪২, আল–ইসতীয়াব–৪/১১৩, তাহজীবুল আসমা–১/৪৪৫)

ইসলাম–পূর্ব জীবনে সাধারণ আরববাসীর মত মূর্তি পূজারী ছিলেন। তাঁর মদ পানের আসরটিও ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। পানের আসরে নিয়মিত আড্ডা জমতো। সেই জাহিলী যুগে তিনি ইয়াসরিবের হাতেগোনা গুটি কয়েক সাহসী তীরন্দাযদের মধ্যে গণ্য হতেন। (বুখারী–২/৬৬৪, আল–আ'লাম–৩/৯৮)

আবু তালহা যখন কুড়ি/বাইশ বছরের যুবক তখন মক্কায় হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। প্রথম কয়েক বছর ইয়াসরিবে এর কোন প্রভাব তেমন একটা না পড়লেও পরের বছরগুলিতে ধীরে ধীরে পড়তে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কা থেকে হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে সেখানে পাঠান ইসলাম প্রচারের জন্য। তাঁরই নিকট মদীনার এক মহিয়সী মহিলা উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন। এই মহিলার প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে আবু তালহা মূর্তি পূজা ত্যাগ করে মুসলিম হন এবং তাঁকে বিয়ে করেন।

আবু তালহা কখন ইসলাম গ্রহণ করেন, বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে সে সম্পর্কে দুইটি ধারণা পাওয়া যায়। একটি এই যে, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে সর্বশেষ 'আকাবায় তিহাত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জনের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করেন। এই বাই'য়াতে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে রাসূল (সা) যে বারো জন নাকীব বা দায়িত্বশীল মনোনীত করেন তাঁদের একজন ছিলেন আবু তালহা। অন্যটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে প্রথম ধারণাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ একথাই বর্ণনা করেছেন। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম–২/১১৯, শাজারাতুজ জাহাব–১/৪০, উসূদুল গাবা–৫/২৩৪)

আবু তালহার ইসলাম গ্রহণ এবং উম্মু সুলাইমের সাথে বিয়ের ঘটনার মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের সম্মানিতা মা হলেন হযরত উম্মু সুলাইম। আনাসের পিতা মালিক ছিল তাঁর ইসলাম–পূর্ব জীবনের স্বামী। উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করলে দুঃখ ও ক্ষোভে মালিক স্ত্রী–পুত্র ফেলে

শামে চলে যায় এবং সেখানে মারা যায়। তারপর আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এই বিয়ে সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা এখানে আমরা তুলে ধরছি।

আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। উম্মু সুলাইম বললেন ঃ 'কোন মুশরিককে বিয়ে করা আমার উচিত হবে না। আচ্ছা আবু তালহা, তুমি কি দেখনা তোমাদের এইসব ইলাহ, যার তোমরা 'ইবাদাত করে থাক, তা তো অমুকের ওখানে তৈরী। আগুন লাগালে তা জ্বলে যায়।' কথাগুলি শুনে আবু তালহা উঠে চলে গেলেন। তবে অন্তরে একটা ভাবনা দেখা দিল। কিছুতেই ঘুম এলো না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে। উম্মু সুলাইম বলেছিলেন ঃ 'তোমার এই প্রস্তাবে তো আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সমস্যা হলো, তুমি যে একজন কাফির ব্যক্তি, আর আমি একজন মুসলিম নারী। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে তো কোন সমস্যাই নেই। তখন তোমার ইসলামই হবে আমার মোহর। তাছাড়া অন্য কিছুই আমি চাইনা।' আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মু সুলাইমকে বিয়ে করেন। সাবিত বলতেন ঃ উম্মু সুলাইমের মোহরের চেয়ে উত্তম মোহরের কথা আমরা আর শুনিনি। তাঁর সেই মোহর ছিল ইসলাম। ইবন 'আসাকির বলেন, তাবারানী, আবু নু'ঈম ও ইবন দুরাসতাওয়াইহ উপরোক্ত কথা বর্ণনা করেছেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৫) 'উরওয়া, মূসা ইবন 'উকবা, আল্লামা জাহবী, ইবনুল 'ইমাদ আল–হাম্বলী, ইবনুল আসীর প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেন, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। কারণ, আবু তালহা আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন ও নাকীব মনোনীত হন।

ইবন 'আসাকির বলেন ঃ উম্মুসুলাইমের সাথে আবু তালহার বিয়ের যেসব বর্ণনা এসেছে তাতে ধারণা জন্মে যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নাদর ইবন আনাস থেকে বর্ণিত হাফেজ ও বায়হাকীর একটি বর্ণনা উদ্ধার করেছেন। নাদর বলেন ঃ আনাসের পিতা মালিক একদিন তাঁর স্ত্রী উম্মু সুলাইমকে বললো ঃ এ ব্যক্তি [রাসূল (সা)] তো দেখছি মদ হারাম করেছেন। তারপর সে স্ত্রী ও সন্তান ফেলে শামে চলে যায় এবং সেখানে মারা যায়।

অতঃপর আবু তালহা উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন উম্মু সুলাইম বললেন ঃ 'শোন আবু তালহা, তোমার মত ব্যক্তিকে ফেরানো যায় না। তবে তুমি কাফির, আর আমি মুসলিম। সমস্যাটি এখানেই। এ বিয়ে হতে পারে না।' আবু তালহা বললেন ঃ 'তুমি সোনা–রূপো চাও?' উম্মু সুলাইম বললেন ঃ 'না, আমি তা চাইনা। আমি শুধু তোমার ইসলাম চাই।' আবু তালহা বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমাকে কে সাহায্য করবে?' বললেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা)।'

আবু তালহা চললেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। তিনি তখন সাহাবীদের নিয়ে বসে ছিলেন। আবু তালহাকে আসতে দেখে বললেন ঃ আবু তালহা আসছে। ইসলামের দীপ্তি তার কপালে দেখা যাচ্ছে। আবু তালহা এসে উম্মু সুলাইম যা বলেছিলেন সেই কথাগুলি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। এভাবে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উম্মু সুলাইমকে বিয়ে করেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৫, হায়াতুস সাহাবা–১/১৯৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে মককার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্কের প্রচলন করেন। আবু তালহার দ্বীনী ভাই কে হয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও নানা জনের নানা কথা আছে। প্রখ্যাত কুরাইশ মুহাজির আবু 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহর (রা) সাথে তাঁর

ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ সীরাত লেখকের মত। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এই আবু 'উবায়দাহ্ 'আমীনুল উম্মাহ' খিতাবসহ জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। ইবন 'আসাকির বলেন ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু তালহা ও বিলালের হাত ধরে তাঁদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৯) ইবন সা'দ এ সম্পর্কে 'আসিম ইবন 'উমারের একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। রাসূল (সা) আবু তালহা ও আরকাম ইবন আল–আরকাম আল–মাখযূমীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করেন। (তাবাকাত–৩/৫০৫)

বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধ ও অভিযানে আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি প্রায়ই এই চরণটি আওড়াতেন ঃ 'আমি আবু তালহা, আমার নাম যায়িদ। প্রতিদিন আমার অস্ত্রে থাকে একটি শিকার।' (তাহজীবুল আসমা–১/৪৪৫, তারীখে ইবন আসাকির–৫/৪)

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদর। আবু তালহা অতি উৎসাহের সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে বদরী সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নামটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ বদরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গিয়েছিল। একবার নয়, তিনবার। আর এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ হতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন।' (সূরা আল–আনফাল–১১) (তারীখে ইবন আসাকির–৬/৬) উল্লেখ্য যে, বদর যুদ্ধের ময়দানে এক সময় ক্ষণিকের জন্য মুসলিম বাহিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। এতে তাঁদের ক্লান্তি ও ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়।

উহুদ যুদ্ধে তিনি আল্লাহর নবীর জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন তীরন্দায বাহিনীর সদস্য। (আনসাবুল আশরাফ–১/১২৫) প্রচন্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। তখন আবু তালহাসহ মুষ্টিমেয় কিছু সৈনিক নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে শত্রু বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। এদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিজের পেছনে আড়াল করে রেখে শত্রুদের দিকে তীর ছুড়ছিলেন। একটি তীর ছুড়লে রাসূল (সা) একটু মাথা উঁচু করে দেখছিলেন, তা কোথায় গিয়ে পড়ছে। আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) বুকে হাত দিয়ে বসিয়ে দিয়ে বলছিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বসুন! এভাবে থাকুন। তাহলে আপনার গায়ে কোন তীর লাগবে না। তিনি একটু মাথা উঁচু করলেই আবু তালহা খুব দ্রুত তাঁকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছিলেন। সেদিন তিনি রাসূলকে (সা) আরও বলেছিলেন, আমার এ বুক আপনার বুকের সামনেই থাকবে। এক পর্যায়ে তিনি রাসূলকে (সা) বলেন ঃ আমি শক্তিশালী সাহসী মানুষ। আপনার যা প্রয়োজন আমাকেই বলুন। তিনি শত্রুদের বুক লক্ষ্য করে তীর ছুড়ছিলেন আর গুন গুন করে কবিতার একটি পংক্তি আওড়াচ্ছিলেন ঃ

'আমার জীবন হোক আপনার জীবনের প্রতি উৎসর্গ, আমার মুখমন্ডল হোক আপনার মুখমন্ডলের ঢাল।' আবু তালহা ছিলেন বলবান বীর পুরুষ। এই উহুদ যুদ্ধে তিনি দুই অথবা তিনখানি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন।

আক্রমণের প্রচন্ডতায় তাঁর হাত দুইখানি অবশ হয়ে পড়ছিল। তবুও তিনি একবারও একটু উহ্ শব্দ উচ্চারণ করেননি। কারণ, তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হিফাজত

ও নিরাপত্তা। (উসুদুল গাবা-৫/২৩৪, তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৭, তাবাকাত-৩/৫০৭, বুখারী-কিতাবুল মাগাযী)

হযরত আবু তালহা খাইবার যুদ্ধে যোগদান করেন। এই যুদ্ধের সময় তাঁর ও রাসূলুল্লাহ (সা) উভয়ের উট খুবই নিকটে পাশাপাশি ছিল এবং রাসূল (সা) গাধার গোশত হারাম ঘোষণা করার জন্য ঘোষক হিসেবে তাঁকেই মনোনীত করেন। (মুসনাদে আহমাদ-৩/১২১)

এই অভিযান থেকে ফেরার সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও হযরত সাফিয়্যা ছিলেন এক উটের ওপর। মদীনার কাছাকাছি এসে উটটি হোঁচট খায় এবং আরোহীদ্বয় ছিটকে মাটিতে পড়ে যান। আবু তালহা দ্রুত নিজের উট থেকে লাফিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আল্লাহ আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন! আপনি কি কষ্ট পেয়েছেন? বললেন ঃ না। তবে মহিলার খবর লও। আবু তালহা রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে হযরত সাফিয়্যার নিকটে যান এবং উটের হাওদা ঠিক করে আবার তাঁকে বসিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমাদ-৩/১৮০)

হুনাইন যুদ্ধেও তিনি দারুণ বাহাদুরী দেখান। এই যুদ্ধে তিনি একাই বিশ মতান্তরে একুশজন কাফিরকে হত্যা করেন। রাসূল (সা) ঘোষণা করেছিলেন কেউ কোন কাফিরকে হত্যা করলে সে হবে নিহত ব্যক্তির সকল জিনিসের মালিক। এ দিন আবু তালহা একুশ ব্যক্তির সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী হন। হিজরী অষ্টম সনে সংঘটিত এই যুদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ। (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/১১৯, তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৭, উসুদুল গাবা-৫/২৩৫)

এই যুদ্ধের সময় তিনি হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মু সুলাইমের হাতে একটি খঞ্জর, আপনি কি তা দেখেছেন? রাসূল (সা) বললেন, উম্মু সুলাইম, এই খঞ্জর দিয়ে কি করবে? বললেন ঃ মুশরিকরা কেউ আমার নিকটে এলে এটা দিয়ে তাঁর পেট ফেঁড়ে ফেলবো। একথা শুনে রাসূল (সা) হাসতে লাগলেন। সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৬, ৪৪৭, হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭)

বিদায় হজ্জে আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। মিনায় রাসূল (সা) মাথা 'হলক' (চুল ছেঁচে ফেলা) করছিলেন। তিনি মাথার ডান দিকের কর্তিত চুল একটি/দুইটি করে পাশে বসা সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। কিন্তু মাথার বাম পাশের চুলগুলির সবই আবু তালহাকে দান করেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৭) ইমাম মুসলিমও একথা বর্ণনা করেছেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের কাছাকাছি সময় মদীনায় সাধারণতঃ দুই ব্যক্তি কবর খুঁড়তেন। মুহাজিরদের মধ্যে আবু 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ। তিনি খুঁড়তেন মককাবাসীদের মত। আর আনসারদের মধ্যে আবু তালহা। তিনি খুঁড়তেন মদীনাবাসীদের মত। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম মসজিদে নববীতে বসে দাফন-কাফনের বিষয় পরামর্শ শুরু করলেন। প্রশ্ন দেখা দিল, কে এবং কোন পদ্ধতিতে কবর তৈরী করবে? উপরোক্ত দুই ব্যক্তি তখন এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন না। হযরত 'আববাস (রা) একই সময়ে দুইজনের নিকট লোক পাঠালেন, তাঁদেরকে ডেকে আনার জন্য। সিদ্ধান্ত হলো, এই দুইজনের মধ্যে যিনি আগে পৌঁছবেন তিনিই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন। তাঁদের

ডাকার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়ে হযরত 'আববাস (রা) সহ উপস্থিত সাহাবীরা দু'আ করতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ, আপনার নবীর জন্য এই দুই জনের একজনকে নির্বাচন করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ব্যক্তি আবু তালহার খোঁজে গিয়েছিল, তাঁকে সংগে করে ফিরে আসে। অতঃপর আবু তালহা মদীনাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) কবর তৈরী করেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৫৭৩, ৫৭৪, আসাহ আস–সীয়ার–৫৮৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর বহু সাহাবী মদীনা ছেড়ে শামে আবাসন গড়ে তোলেন। আবু তালহাও তথাকার অধিবাসীদের একজন। তবে যখনই কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পিষ্ট হতেন, তখনই এই মাসাধিক কালের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মাযারে হাজির হতেন এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন। (তারীখে ইবন আসাকির–৬/৪)

হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত কাল আবু তালহা মোটামুটি শামে (সিরিয়া) কাটান। হযরত ফারূকে 'আজমের খিলাফত কালের বেশীর ভাগ সময় সেখানেই ছিলেন। হযরত উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরের সময় তিনি শামে ছিলেন। আনাস থেকে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব শাম সফরে গেছেন। আবু তালহা ও আবু 'উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসে বললেন ঃ আপনার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বাছা বাছা সাহাবীরা আছেন। অথচ আমরা পিছনে রেখে এসেছি এক প্রজ্জ্বলিত আগুন। (তাঁরা মহামারি আকারে প্লেগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।) আপনি এ যাত্রা শামে প্রবেশ না করে মদীনায় ফিরে যান। 'উমার ফিরে গেলেন। পরের বছর তিনি এই স্থগিত সফর শেষ করেন।' (তারীখে ইবন 'আসাকির–৬/৪)

হযরত 'উমারের (রা) অন্তিম সময়ে আবু তালহা মদীনায় ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার প্রতি খলীফা 'উমারের (রা) প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি যখন জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে পড়লেন, তখন পরবর্তী খলীফা পদের জন্য ছয়জন সর্বজনমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করলেন। তারপর আবু তালহাকে ডেকে বললেন ঃ আপনাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার মৃত্যুর পর আপনি ৫০ জন আনসারকে সংগে নিয়ে এই ছয় ব্যক্তির কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। যদি তাঁদের চারজন এক দিকে যায় আর দুই জন বিরোধিতা করে তাহলে ঐ দুইজনের গর্দান উড়িয়ে দিবেন। আর তাঁরা সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে যে দলে 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ থাকবে না সে দলকে হত্যা করবেন। তিন দিনের মধ্যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে তাদের সকলের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। আমার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত আপনিই হবেন অন্তরবর্তীকালীন খলীফা। (কানযুল 'উম্মাল–৩/১৫৬, ১৫৭, হায়াতুস সাহাবা–২/৩৪)

হযরত মিসওয়ার ইবন মাখরামার গৃহে ঐ ছয় ব্যক্তির বৈঠক বসলো। আবু তালহা সঙ্গীদের নিয়ে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে বাড়ীর দরযায় দাঁড়িয়ে গেলেন। বনু 'হাশিম প্রথম থেকেই এই পরামর্শের বিরোধী ছিল। কারণ, তারা ছিল 'আলীকে (রা) খলীফা বানানোর অভিলাষী। হযরত 'আববাস (রা) সেই সময় চুপে চুপে 'আলীকে (রা) বলেছিলেন, আপনি নিজের বিষয়টি ঐ লোকদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। আপনি নিজেই ফায়সালা করুন। 'আলী (রা) কিছু একটা জবাব দিয়েছিলেন। আবু তালহা পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের এ সংলাপ শুনেছিলেন। হঠাৎ তাঁর প্রতি

'আলীর দৃষ্টি পড়তেই তিনি কিছু একটা যেন চিন্তা করলেন। আবু তালহা তা বুঝতে পেরে বলেছিলেন ঃ আবুল হাসান, ভয়ের কিছু নেই।

একদিন এই ছয় ব্যক্তির গোপন বৈঠক চলছে। আবু তালহাও তাঁর বাহিনী নিয়ে দরযায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় 'আমর ইবনুল 'আস ও মুগীরা ইবন শু'বা এসে দরযায় বসে পড়েন। আবু তালহা তাঁদেরকে তেমন কিছু বললেন না; তবে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ। তিনি ওঁদের দুইজনের ভাব-ভঙ্গিমায় স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কঙ্কর উঠিয়ে তাঁদের প্রতি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এরা এসেছে মদীনায় একথা প্রচার করতে যে, আমরাও শূরার সদস্য ছিলাম। কঙ্কর নিক্ষেপ করায় 'আমর ও মুগীরা ক্ষুব্ধ হন এবং ঝগড়া শুরু করেন। আবু তালহা বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ আমার আশংকা হচ্ছে, আপনারা এমন অহেতুক ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে আসল বিষয়টি ছেড়ে না দেন। সেই সত্তার নামে শপথ, যিনি 'উমারকে মৃত্যু দান করেছেন, আমি তিনদিনের বেশী একটুও সময় দেব না। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারটি শেষ হওয়ার পর আবু তালহা মন্তব্য করেন ঃ খিলাফতের দায়িত্ব লাভের জন্য এই ছয় ব্যক্তি প্রতিযোগিতা করবে, এমন আশংকার চেয়ে আমার বেশী ভয় ছিল তাঁরা এই দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকে কিনা। কারণ, 'উমারের মৃত্যুর পর প্রতিটি গৃহে দ্বীন ও দুনিয়ার ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৭৩)

খলিফা নির্বাচনের পর আবু তালহা সম্পূর্ণ নির্জনে চলে যান এবং বাকী জীবন একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদাতে কাটিয়ে দেন।

হযরত উম্মু সুলাইমের (রা) গর্ভে আবু তালহার একাধিক সন্তান হয়; কিন্তু তাদের কেউই বেশী দিন বাঁচেনি। তাঁর এক ছেলের নাম ছিল আবু 'উমাইর। ছোট বেলায় তার ছিল একটি ছোট পাখী। পাখীটি মারা গেল। একদিন রাসূল (সা) তাদের বাড়ীতে গিয়ে তাকে খুবই বিমর্ষ দেখতে পেলেন। তার এমন অবস্থার কারণ জানতে চাইলে লোকেরা রাসূলকে (সা) প্রকৃত ঘটনা খুলে বললে। রাসূল (সা) তাকে হাসানোর জন্য একটু কাব্য করে বললেন ঃ 'ইয়া আবা 'উমাইর, মা ফা'য়ালান নুগাইর'- ওহে আবু উমাইর তোমার ছোট পাখীটি কী করলো? (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৭০, আল-ইসতী'য়াব)

আবু তালহার অন্য একটি ছেলে কিছু দিন রোগ ভোগের পর মারা যায়। ছেলেটির অসুস্থতার মধ্যে আবু তালহা একদিন মসজিদে নববীতে যান এবং তখন সে মারা যায়। উম্মু সুলাইম ছেলের বাবার জন্য অপেক্ষা না করে তাকে দাফন করে দেন এবং বাড়ীতে লোকদের বলেন, তারা যেন ছেলের দাফন-কাফনের কথা আবু তালহাকে না বলে। এদিকে আবু তালহা মসজিদ থেকে আরও কয়েকজন মেহমানসহ বাড়ী ফিরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে? ছেলের মা বললেন ঃ আগের চেয়ে ভালো। আবু তালহা মেহমানদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। খাবার এলো এবং সবাই এক সাথে বসে খেয়ে নিলেন। মেহমান বিদায় নিলে আবু তালহা ভিতর বাড়ীতে আসলেন। রাতে স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় কাটালেন এবং মিলিত হলেন। শেষ রাতে উম্মু সুলাইম ছেলের মৃত্যুর খবর সহ কাফন-দাফনের কথা প্রকাশ করে বললেন ঃ সে ছিল আমাদের কাছে আল্লাহর এক আমানত। তিনি সেই আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন। এতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? আবু তালহা 'ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' উচ্চারণ করলেন তবে এভাবে খবরটি গোপন করাতে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হলেন। পরদিন সকালে

আবু তালহা বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করলে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের গত রাতের বরকত দান করুন। সেই রাতেই উম্মু সুলাইম গর্ভবতী হন। গর্ভের এই সন্তান প্রসব করার পর উম্মু সুলাইম তাকে আনাসের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। রাসূল (সা) একটু খেজুর চিবিয়ে শিশুর গালে দেন এবং সে মুখ নেড়ে একটু চুষতে থাকে। তাই দেখে তিনি বললেন ঃ দেখ, আনসারদের খেজুরের প্রতি স্বভাবগত টান রয়েছে। তিনি এই শিশুর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহর (সা) এই পবিত্র লালার বদৌলতে উত্তরকালে এই ছেলে অন্যান্য আনসার নওজোয়ানদের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। এই 'আবদুল্লার মাধ্যমে আবু তালহার বংশধারা চলেছে। ইসহাক ও 'উবাইদুল্লাহ নামে তাঁর ছিল দুই ছেলে, আর ইয়াহইয়া নামে ইসহাকের এক ছেলে। এঁরা সবাই ছিলেন তাঁদের যুগের অন্যতম হাদীস বিশারদ। (মুসনাদে আহমাদ–৩/২৫৭, তারীখ ইবন 'আসাকির–৬/৬, বুখারী ও মুসলিমেও বিভিন্নভাবে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)

হযরত আবু তালহার মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম নাওয়াবী বলেন ঃ 'তিনি হিজরী ৩২ অথবা ৩৪ সনে ৭০ বছর বয়সে মদীনায় মারা যান। তাঁর মদীনায় মৃত্যুর কথা অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেছেন। তবে আবু যুর'য়া আদ–দিমাশ্‌কী বলেছেন, তিনি শামে মারা গেছেন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি সমুদ্র পথে অভিযানে বেরিয়ে মারা যান। আবু যুর'য়া আদ–দিমাশকী থেকে বর্ণিত হয়েছে, আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর চল্লিশ বছর একাধারে রোযা রেখে জীবন কাটান। এই বর্ণনা উপরে উল্লেখিত মৃত্যুসনের পরিপন্থী। কারণ, তিনি যদি হিজরী ৩২ অথবা ৩৪ সনে মারা যান তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর ৪০ বছর রোযা রেখে বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না। যাঁরা বলেছেন তিনি মদীনায় মারা গেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, খলীফা হযরত 'উসমান (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত–১/৪৪৫, ৪৪৬)

বসরাবাসীরা বলেন, তিনি শেষ জীবনে সমুদ্র পথে অভিযানে বেরিয়ে পথিমধ্যে মারা যান। এই মতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫১। বিভিন্ন গ্রন্থে আবু তালহার এই জিহাদে যাওয়ার চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। একদিন সূরা 'তাওবাহ' তিলাওয়াত করছেন। যখন 'ইনফিরূ খিফাফান ওয়া সিকালান'– অভিযানে বের হয়ে পড়, ভারি অবস্থায় হোক অথবা হালকা অবস্থায় (আয়াত ৪১) – এ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন তাঁর মধ্যে জিহাদের প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তিনি পরিবারের লোকদের বললেন ঃ আল্লাহ যুবক–বৃদ্ধ সকলের ওপর জিহাদ ফরয করেছেন। আমি জিহাদে যেতে চাই, তোমরা আমার সফরের ব্যবস্থা কর। একথা দুইবার উচ্চারণ করেন। একেতো বার্দ্ধক্য, তাছাড়া ক্রমাগত সিয়াম পালন করতে করতে তিনি শীর্ণকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের লোকেরা বললো ঃ আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আবু বকর ও 'উমারের যুগেও ধারাবাহিকভাবে জিহাদে লিপ্ত থেকেছেন। এখনও আপনার জিহাদের লোভ আছে? আপনি বাড়ীতে থাকুন, আমরা আপনার পক্ষ থেকে জিহাদে বেরিয়ে পড়ছি। শাহাদাতের অদম্য আবেগ যাঁকে ধাক্‌কাচ্ছে তাঁকে ঠেকাচ্ছে কে? বললেন ঃ আমি যা বলছি তাই কর। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সফরের ব্যবস্থা করা হয়। সত্তুর বছরের এই বৃদ্ধ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত ছিল। অভিযানটি ছিল সাগর পথে। আবু তালহা

জাহাজে চড়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। তীব্র প্রতীক্ষা, কখন শত্রুসেনার মুখোমুখি হবেন। এমন সময় তাঁর ডাক এসে যায়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সাগর পথে কোথাও একটু ভূমির চিহ্ন দেখা গেল না। প্রবল বায়ু ও বিক্ষুব্ধ সাগর জাহাজটি অজানা লক্ষ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এই মুমিন মুজাহিদের লাশ সাত দিন জাহাজের ডেকে পড়ে রইল। অবশেষে একটি অজানা দ্বীপ পাওয়া গেল এবং সেখানেই দাফন করা হলো। এত দিনেও লাশে পচন ধরেনি বা সামান্য বিকৃতি ঘটেনি। (তাবাকাত-৩/৫০৭, তারীখু ইবন 'আসাকির-৬/৭, তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/১২০, উসূদুল গাবা-৫/২৩৫, আনসাবুল আশরাফ-১/২৪২)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু তালহা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সমূহে বিভিন্ন মাসয়ালা অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা থাকতো। দীর্ঘ দিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন, অথচ 'আমলের ফজীলাত বিষয়ক কোন বর্ণনা তাঁর থেকে পাওয়া যায় না। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা ৯২ টি (বিরানব্বই)। তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম প্রত্যেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আববাস ও আনাস ইবন মালিকসহ সাহাবীদের একটি দল এবং বিশিষ্ট তাবে'ঈদের একটি দলও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনাও করেছেন। (তাহজীবুল আসমা-১/৪৪৫, তারিখে ইবন 'আসাকির-৬/৪)

হযরত আবু তালহার এক দল ছাত্র ও ভক্ত একবার তাঁর অসুস্থ অবস্থায় দেখতে আসলো। তারা দেখলো, দরযায় একটি ছবিযুক্ত পর্দা টাঙ্গানো। তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। একটু সাহস করে যায়িদ ইবন খালিদ বলেই ফেললেন ঃ গতকাল তো আপনি ছবি নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি 'উবাইদুল্লাহ খাওলানীকে বললেন ঃ হাঁ, তা করেছিলাম। তবে এ কথাও তো বলেছিলাম, কাপড়ে যে ছবি থাকে তা এর আওতায় পড়বে না। (মুসনাদ-৪/২৮)

একদিন আবু তালহা আহার করছেন। সাথে উবাই ইবন কা'ব এবং আনাস ইবন মালিকও আছেন। আহার শেষে আনাস অজুর জন্য পানি চাইলেন। আবু তালহা ও 'উবাই দুই জনই বললেন ঃ গোশত খাওয়ার কারণে হয়তো অজুর কথা মনে হয়েছে? আনাস বললেন ঃ জী হাঁ! আবু তালহা বললেন ঃ তোমরা 'তায়্যিবাত'- পবিত্র বস্তুসমূহ খেয়ে অজু করছো অথচ রাসূল (সা) এমনটি করতেন না। (মুসনাদ-৪/৩)

আবু তালহা একদিন নফল রোযা রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই বরফ পড়েছিল। তিনি কয়েকটি তুষার খন্ড হাতে নিয়ে খেয়ে ফেলেন। 'আপনি তো রোযার মধ্যে খাচ্ছেন'- লোকেরা এ কথা বললে তিনি মন্তব্য করেন ঃ এ একটা রবকত, এর কিছু অর্জন করা উচিত। এ কোন খাদ্যও নয়, পানীয়ও নয়।' (মুসনাদ-৩/২৭৯, তারিখু ইবন 'আসাকির-৬/১০)

হযরত আবু তালহার মধ্যে কাব্য-প্রীতি ও প্রতিভা ছিল। তিনি কবিতা রচনা করতেন, আবৃত্তিও করতেন। প্রচন্ড যুদ্ধের সময় তিনি গুন গুন করে কবিতার পংক্তি আওড়াতেন। সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কিছু পংক্তি সংকলিত হয়েছে। (দ্রঃ আল-ইসাবা-৪/১১৩, তারিখু ইবন 'আসাকির-৬/৭ আল-ইসতীয়াব)

হযরত আবু তালহার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হব্বে রাসূল-বা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি

গভীর প্রেম ও ভালোবাসা। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু পক্ষের প্রচন্ড আক্রমণে যখন সাথীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তখনও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নিজের জীবনকে বাজি রেখে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নিজের গোটাদেহ আঁড় করে দিয়ে তাঁকে হিফাজত করেছেন। প্রিয় নবীর গায়ে যেন আঁচড় লাগতে না পারে– এই আশায় তীর–বর্শার আঘাত নিজের বুকে ধারণ করেছেন। তাঁর প্রেমের গভীরতা এর দ্বারাই কিছুটা মাপা যায়। তিনি সাধারণতঃ সকল অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে থাকতেন এবং দুই জনের উটও প্রায় পাশাপাশি চলতো।

একবার মদীনায় শত্রুর আক্রমণের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু তালহার 'মানদূর' নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিলেন এবং যে দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সেই দিকেই যাত্রা করলেন। আবু তালহাও রাসূলুল্লাহর (সা) নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পিছনে পিছনে চললেন। কিন্তু তাঁর পৌঁছতে না পৌঁছতেই রাসূল (সা) আবার ফিরে আসলেন এবং পথে আবু তালহার সাথে দেখা হয়ে গেল। তিনি আবু তালহাকে বললেন ঃ সেখানে কিছু না। তোমার ঘোড়াটি খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি যে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল, খুব ছোট ছোট ব্যাপারেও তা প্রকাশ পেত। তাঁর বাড়ীতে কোন জিনিস এলে তার কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীতেও পাঠিয়ে দিতেন। একবার হযরত আনাস একটি খরগোশ ধরে আনলেন। আবু তালহা খরগোশটি জবেহ করে তার একটি রান নবীগৃহে পাঠিয়ে দিলেন। একবার আবু তালহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম এক থালা খেজুর পাঠালেন। রাসূল (সা) খেজুরগুলি আযওয়াজে মুতাহ্হারাত ও অন্যান্য সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। (মুসনাদ–৩/১২৫, ১৭১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) শেষ রোগ যন্ত্রণায়– যাতে তিনি ইন্তিকাল করেন, একদিন আবু তালহা গেলেন তাঁকে দেখতে। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ তোমার কাওমকে (আনসার) আমার সালাম বলবে। কারণ, তারা যা বৈধ ও উচিত নয় তা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে এবং ধৈর্য ধারণ করে। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪০১)

আবু তালহা বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে গেলাম। তখন তাঁর চামড়া ও চেহারায় এমন এক অবস্থা দেখলাম যা এর পূর্বে আর কখনও দেখিনি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন অবস্থায় আমি আপনাকে আর কক্ষণও দেখিনি। বললেন ঃ আবু তালহা ঃ এমন অবস্থা হবে না কেন। এইমাত্র জিবরীল বেরিয়ে গেলেন। তিনি আমার রবের পক্ষ থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন ঃ আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে এই সুসংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আপনার উম্মাতের কেউ আপনার ওপর একবার দরুদ ও সালাম পেশ করলে আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ তার ওপর দশবার দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন। (উসুদুল গাবা–৫/২৩৫) আহমাদ ও নাসাঈ অন্যভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন! তাতে আছে, জিবরীল বললেন, আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করবে আল্লাহ তার জন্য ১০টি নেকী লিখবেন, তার ১০টি গুনাহ মাফ করবেন এবং তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৩১৩)

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে একদিন তিনি খেজুর থেকে তৈরী 'ফাদীখ' নামক এক প্রকার মদ পান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে খবর দিল, মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। সাথে সাথে তিনি আনাসকে বললেন ঃ মদের এই কলসটি ভেঙ্গে ফেল। আনাস নির্দেশ পালন করলেন।(বুখারী–২/১০৭)

যখন সূরা আলে 'ইমরানের এই আয়াত–'তোমরা কোন কল্যাণই লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন সব জিনিস (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর যা তোমাদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়' – নাযিল হলো তখন আনসারদের যার কাছে যে সব মূল্যবান জিনিস ছিল সবই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেল এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিল। আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর 'বীরাহ' নামক বিশাল ভূ–সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। এখানে তাঁর একটি কুয়ো ছিল। কুয়োটির পানি ছিল সুস্বাদু এবং রাসূল (সা) এর পানি খুব পছন্দ করতেন। আবু তালহার এই দানে রাসূল (সা) খুব খুশী হয়েছিলেন। (শাজারাতুজ জাহাব–১/৪০, তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮, হায়াতুস সাহাবা–২/১৫৭)

আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর থেকে বর্ণিত। একদিন আবু তালহা তাঁর একটি বাগিচার দেয়ালের পাশে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় একটি ছোট্ট পাখী– এদিক ওদিক উড়ে বেরোনোর পথ খুঁজতে থাকে; কিন্তু ঘন খেজুর গাছের জন্য বেরোনোর পথ পেল না। আবু তালহা নামাযে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এই তামাশা দেখলেন। এদিকে নামায কত রাকায়াত পড়েছেন তা আর স্মরণ করতে পারলেন না। ভাবলেন, এই সম্পদই আমাকে ফিতনায় (বিপর্যয়ে) ফেলেছে। নামায শেষ করে তিনি ছুটে গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সবই আমি সাদাকা (দান) করে দিলাম। এই সম্পদ আপনি আল্লাহর পথে কাজে লাগান। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ এই সম্পদ তোমার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। নির্দেশমত তিনি যাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেন তাঁদের মধ্যে হাসসান ইবন সাবিত ও উবাই ইবন কা'বও ছিলেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৮, হায়াতুস সাহাবা–৩/৯৭, মুসনাদে আহমাদ–৩/১৪১)

একবার এক ব্যক্তি মদীনায় এলো, সেখানে থাকা–খাওয়ার কোন সংস্থান তার ছিল না। রাসূল (সা) ঘোষণা করলেন, যে এই লোকটিকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবে আল্লাহ তার ওপর সদয় হবেন। আবু তালহা সাথে সাথে বললেন ঃ আমিই নিয়ে যাচ্ছি। বাড়ীতে ছোট ছেলে–মেয়েদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত কোন খাবার ছিল না। আবু তালহা স্ত্রীকে বললেন ঃ এক কাজ কর, তুমি ভুলিয়ে–ভালিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াও। তারপর মেহমানের সামনে খাবার হাজির করে কোন এক ছুতোয় আলো নিভিয়ে দাও। অন্ধকারে আমরা খাওয়ার ভান করে শুধু মুখ নাড়াচাড়া করবো, আর মেহমান একাই পেট ভরে খেয়ে নেবে। যেই কথা সেই কাজ। স্বামী–স্ত্রী মেহমানকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করালেন; কিন্তু ছেলে–মেয়ে সহ নিজেরা উপোস থাকলেন। সকালে আবু তালহা আসলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। তিনি 'তাদের তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দান করে' (সূরা হাশর–৯)

–এই আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শোনান। তারপর আবু তালহাকে বলেন, অতিথির সাথে তোমাদের রাতের আচরণ আল্লাহর খুব পছন্দ হয়েছে। (মুসলিম–২/১৯৮, হায়াতুস সাহাবা–২/১৬০, ১৬১)

নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল আবু তালহার বিশেষ গুণ। খ্যাতি ও প্রদর্শনী থেকে তিনি সব সময় দূরে থাকতেন। 'বীরাহা' সম্পত্তি দান করার সময় তিনি কসম খেয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, একথা যদি গোপন রাখতে সক্ষম হতাম তাহলে কক্ষণও প্রকাশ করতাম না। (মুসনাদ–৩/১১৫)

আবু-তালহা ছিলেন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলতেন, সৈন্যদের মধ্যে আবু তালহার একটি জোর আওয়ায একদল সৈনিক থেকেও উত্তম। অন্য বর্ণনা মতে 'এক হাজার মানুষের চেয়েও উত্তম।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ 'মুশরিকদের জন্য আবু তালহার একটি হুংকার একদল সৈন্যের চেয়েও ভয়ংকর।' (তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর–২/১১৯, তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৭, উসুদুল গাবা–৫/২৩৫)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু তালহার পরিবারের জন্য দু'আ করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–৬/৯) হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর সারা বছরই আবু তালহা রোযা পালন করতেন। শুধু দুই 'ঈদ ছাড়া কখনও রোযা ত্যাগ করতেন না। কারণ, রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় সব সময় জিহাদে ব্যস্ত থাকায় তখন রোযা রাখতে পারতেন না। (তাহজীবুল আসমা–১/২৪৬)

ইবন হাজার 'আল–ইসাবা' গ্রন্থে আবু তালহার সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এই বলে, তিনি ছিলেন উঁচু স্তরের মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্যতম।

আবু মাস'উদ আল–বদরী (রা)

আবু মাস'উদ ডাক নাম, আর এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম 'উকবা এবং পিতার নাম 'আমর ইবন সা'লাবা। সর্বশেষ বাই'য়াতে 'আকাবায় যোগ দিয়ে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ওয়াকিদী বলেন ঃ আবু মাস'উদ 'আকাবায় অংশগ্রহণ করেন, তবে বদরে অনুপস্থিত ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন ঃ 'আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৪৫; সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৫৯; উসুদুল গাবা–৫/২৯৬) সীরাতের কোন কোন গ্রন্থে আবু মাস'উদ আল–আনসারী নামে উল্লেখিত ব্যক্তি, আর এই আবু মাস'উদ আল-বদরী মূলতঃ একই ব্যক্তি। ইবনুল আসীর তাঁর 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থে (৫/২৯৬) এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

উহুদ এবং উহুদ পরবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। তবে তাঁর বদর যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের অনেক মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে, তিনি বদরে যোগ দেন এবং এ কারণেই তাঁকে বদরী বলা হয়। ইমাম বুখারী খুব দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, তিনি বদরে যোগ দিয়েছেন। আর এর স্বপক্ষে তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে দলীল হিসেবে একাধিক হাদীস উপস্থাপন করেছেন। যেমন, বাশীর ইবন আবী মাস'উদ বর্ণিত একটি হাদীস। তাতে এসেছে ঃ মুগীরা আসরের নামায দেরী করে পড়লে আবু মাস'উদ 'উকবা ইবন 'আমর তার প্রতিবাদ করেন। এ আবু মাস'উদ হচ্ছে যায়িদ ইবন হাসানের নানা এবং তিনি বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু 'উতবা ইবন সালাম এবং মুসলিম 'আল–কুনা' গ্রন্থে তাঁর বদরে যোগদানের কথা বলেছেন। ইবনুল বারকী বলেন ঃ ইবন ইসহাক তাঁকে বদরীদের মধ্যে উল্লেখ করেননি। তাবারানী বলেন ঃ কূফাবাসীরা দাবী করেন, তিনি বদরে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু মদীনাবাসীরা তাঁকে বদরীদের মধ্যে উল্লেখ করেন না। ইবন সা'দ আল–ওয়াকিদী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবু মাস'উদ যে বদরে যোগ দেননি, এ ব্যাপারে আমাদের সংগী–সাথীদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তিনি বদরে বসবাস করেছিলেন, এ কারণে তাঁকে বদরী বলা হয়। (আল–ইসাবা–২/৪৯০, ৪৯১; সীরাতু ইবন হিশাম–১/৪৫৯; উসুদুল গাবা–৫/২৯৬)

নবুওয়াতের যুগ ও প্রথম তিন খলীফার সময় পর্যন্ত আবু মাস'উদ মদীনায় ছিলেন। জীবনের কোন এক পর্যায়ে কিছু দিনের জন্য বদরের পানির ধারে বসবাস করেছিলেন। হযরত 'আলীর খিলাফতকালে মদীনা ছেড়ে কূফায় চলে যান এবং সেখানে বাড়ী তৈরী করে বসবাস করেন। (আল–ইসাবা–৪/২৫২; আনসাবুল আশরাফ–১/২৪৫)

হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে বিরোধের সময় আবু মাস'উদের ভূমিকার বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা দেখা যায়। একটি বর্ণনা মতে, তিনি ছিলেন হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) ঘনিষ্ঠজনদের একজন। হযরত মু'য়াবিয়া (রা) যখন সিফ্ফীন যুদ্ধে যান তখন তাঁকে কূফায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। তাঁর না ফেরা পর্যন্ত আবু মাস'উদ কূফার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। (আল–ইসাবা–২/৪৯১) পক্ষান্তরে অন্য একটি বর্ণনা মতে,

তিনি ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) সহচর। 'আলীর (রা) সময়ে তিনি কূফায় যান এবং 'আলী (রা) সিফ্‌ফীনে যাওয়ার সময় তাঁকে কূফার আমীরের দায়িত্ব দিয়ে যান। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৫; আল-আ'লাম-৪/২৪১) শেষের বর্ণনাটিই সঠিক। কারণ সিফ্‌ফীন যুদ্ধের সময় কূফা ছিল হযরত 'আলীর (রা) অধীনে, মু'য়াবিয়ার (রা) অধীনে নয়।

হযরত আবু মাস'উদের মৃত্যুর সন ও স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পর তিনি কূফা থেকে জন্মভূমি মদীনায় ফিরে আসেন এবং সেখানে মারা যান। আবার অনেকে বলেছেন, তাঁর মৃত্যু হয় কূফায়। (আল-ইসাবা-২/৪৯১; আল-আ'লাম-৪/২৪১)

তাঁর মৃত্যুর সন সম্পর্কেও মতভেদ আছে। হিজরী ৪১ ও ৪২ দু'টি তাঁর মৃত্যু সন বলে কথিত হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন, হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতের শেষ দিকে হিজরী ৬০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। (উসূদুল গাবা-৫/২৯৬) তবে এটা ঠিক যে হযরত মুগীরা ইবন শু'বার (রা) কূফার শাসন কর্তৃত্বের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। নিশ্চিতভাবে তা ছিল হিজরী ৪০ সনের পরে। (আল-ইসাবা-২/৪৯১)

হযরত আবু মাস'উদের এক পুত্র ও এক কন্যার পরিচয় জানা যায়। পুত্রের নাম বাশীর এবং কন্যা ছিলেন হযরত ইমাম হাসানের (রা) সহধর্মিনী। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত যায়িদ ইবন হাসান। বাশীরের জন্ম হয় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বা তার কিছু পরে।

হযরত আবু মাস'উদ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করেন। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের তৃতীয় তবকা বা স্তরে তাঁকে গণ্য করা হয়। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত ১০২ (একশো দুইটি) হাদীস পাওয়া যায়। (আল-'আলাম-৪/২৪১) তাবে'ঈদের মধ্যে যাঁরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ঃ

বাশীর, আবদুল্লা ইবন ইয়াযীদ খুতামী, আবু ওয়ায়িল, 'আলকামা, কায়স ইবন আবী হাতেম, 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ নাখ'ঈ, ইয়াযীদ ইবন শুরাইক, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন যায়িদ ইবন 'আবদি রাব্বিহি-আনসারী প্রমুখ।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনাচারের অনুসরণ এবং 'আমর বিল মা'রূফ ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-নিষেধকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে পালন করতেন। একবার তিনি তাঁর এক দাসকে মারছেন। এমন সময় পিছন থেকে আওয়ায ভেসে এলা ঃ 'আবু মাস'উদ! একটু ভেবে দেখ। যে আল্লাহ তোমাকে তার ওপর ক্ষমতাবান করেছেন, তিনি তাকেও তোমার ওপর ক্ষমতাবান করতে পারতেন।' আওয়াযটি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা)। আবু মাস'উদ ভীষণ প্রভাবিত হন। সেই মুহূর্তে তিনি শপথ করেন, আগামীতে কোন দিন আর কোন দাসের গায়ে হাত তুলবেন না। আর সেই দাসটিকে তিনি আযাদ (মুক্ত) করে দেন। (মুসনাদ-৫/২৭৩,২৭৪)

আমর বিল মা'রূফের দায়িত্ব পালন থেকেও তিনি কক্ষণো উদাসীন ছিলেন না। আর এ ব্যাপারে ছোট-বড় কারো পরোয়া করতেন না। হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) তখন কূফার আমীর। একদিন তিনি একটু দেরীতে আসরের নামায পড়ালেন। সাথে সাথে আবু মাস'উদ প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন ঃ আপনার জানা আছে,রাসূল (সা) পাঁচ ওয়াক্‌ত নামায জিবরীলের বর্ণনা মত সময়ে আদায় করতেন, আর বলতেনঃ এভাবেই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারী-২/৫৭১)

তিনি নিজে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করতেন। একদিন তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান রাসূলুল্লাহ (সা) কিভাবে নামায আদায় করতেন? তারপর তিনি নামায আদায় করে তাদেরকে দেখিয়ে দেন। (মুসনাদ–৫/১২২)

নামাযের জামা'য়াতে গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়ানো রাসূলের (সা) সুন্নাত। তিনি যখন দেখলেন, লোকেরা তা পুরোপুরি পালন করছে না, তখন বলতেনঃ এমনভাবে দাঁড়ানোর ফায়দা এ ছিলো যে, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। এখন তোমরা দূরে দূরে দাঁড়াও, এ জন্যেই তো বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত আবু মাস'উদকে (রা) মুফতী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তবে তিনি মাঝে মধ্যে ফাতওয়া দিতেন। ইবন 'আবদিল বার তাঁর 'জামি'উল 'ইলম' গ্রন্থে (২/১৬৬) ইবন সীরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ খলীফা 'উমার একবার আবু মাস'উদকে বলেন ঃ আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি ফাতওয়া দান করে থাক? ফাতওয়ার উষ্ণতা তার জন্য ছেড়ে দাও যে তার শৈত্যের স্পর্শ লাভ করেছে। অর্থাৎ আমীরের জন্য। আর তুমি তো আমীর নও। (হায়াতুস সাহাবা–২/২৫৩) ■

আবু কাতাদাহ্ আল–আনসারী (রা)

হযরত আবু কাতাদাহ মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনী সুলামা শাখার সন্তান। তাঁর আসল নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন 'আল হারিস'; আবার কেউ বলেছেন 'আমর'। আল–কালবী ও ইবন ইসহাকের মতে 'আন–নু'মান'। তবে 'আল–হারিস' অধিকতর প্রসিদ্ধ। ইতিহাসে তিনি 'আবু কাতাদাহ্' এ ডাক নামেই খ্যাত। পিতা রাব'য়ী ইবন বালদামা এবং মাতা কাবশা বিনতু মুতাহ্হির। তিনিও খাযরাজ গোত্রের বনী সুলামার সাওয়াদ ইবন গানাম শাখার মেয়ে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের ১৮ বছর পূর্বে ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। (উসুদুল গাবা–৫/২৭৪, আল ইসাবা–৪/১৫৮; আল–আ'লাম–২/১৫৪) তাবুক যুদ্ধে যোগদান না-করার কারণে যে কা'ব ইবন মালিক আল–আনসারীর শাস্তি হয় এবং পরে আল্লাহ পাক যাঁকে ক্ষমা করেন, তিনি আবু কাতাদাহ্র চাচাতো ভাই। সে সময় তিনিও অন্য সকলের মত কা'বকে বয়কট করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৬৭)

শেষ 'আকাবার পরে কোন এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে তাঁর অংশ গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ আছে। অনেকে তাঁকে বদরী সাহাবী বলেছেন। তবে মুসা ইবন 'উকবা বা ইবন ইসহাক, এঁদের কেউই বদরী সাহাবীদের তালিকার মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করেননি। উহুদসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। (আল–ইসাবা–৪/১৫৮; উসুদুল গাবা–৫/২৭৪)

৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে জীকারাদ বা গাবা অভিযান পরিচালিত হয়। সেই অভিযানে তিনি দারুন দুঃসাহসের পরিচয় দান করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উটগুলি জীকারাদ নামক একটি পল্লীতে চরতো। রাসূলুল্লাহর (সা) দাস রাবাহ ছিলেন সেই উটগুলির দায়িত্বে। গাতফান গোত্রের কিছু লোক রাখালদের হত্যা করে উটগুলি লুট করে নিয়ে যায়। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালামা ইবন আকওয়া এ সংবাদ পেয়ে আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মদীনার দিকে মুখ করে শত্রুর আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি 'ইয়া সাবাহাহ্!' বলে তিনবার চিৎকার দেন। অন্যদিকে রাবাহকে দ্রুত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গাতফানী লুটেরাদের পিছে ধাওয়া করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে সাহায্যের জন্য দ্রুত তিনজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের পিছনে তিনি নিজেও বেরিয়ে পড়েন। সালামা ইবন আকওয়া মদীনার সাহায্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, আবু কাতাদাহ আল–আনসারী, আল–আখরাম আল–আসাদী এবং তাঁদের পিছনে মিকদাদ আল–কিন্দী বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন। এই অশ্বারোহীদের দেখে গাতফানীরা উট ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আল–আখরাম আল–আসাদীর মধ্যে তখন শাহাদাতের তীব্র বাসনা কাজ করছে। তিনি সালামার নিষেধ অমান্য করে গাতফানীদের পিছে ধাওয়া করেন। এক পর্যায়ে তাঁর ও 'আবদুর রহমান গাতফারীর মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হয় এবং আল–আখরাম শাহাদাত বরণ করেন। আবদুর রহমান আল–আখরামের ঘোড়াটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় আবু কাতাদাহ্ এসে উপস্থিত হন এবং তিনি বর্শার এক খোঁচায় আবদুর রহমানকে হত্যা করেন। (আল–কামিল ফী আত–

তারীখ–২/১৮৯–১৯১; আল–ইসাবা–৪/১৫৮; হায়াতুস সাহাবা–১/৫৬১; সাহীহ মুসলিম–২/১০১)

অন্য একটি বর্ণনা মতে এই জীকারাদ যুদ্ধে আবু কাতাদাহ্ যাকে হত্যা করেন তার নাম হাবীব ইবন 'উয়াইনা ইবন হিস্ন। তিনি হাবীবকে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে শত্রুর পিছনে আরও এগিয়ে যান। পিছনের লোকেরা যখন দেখতে পেল, আবু কাতাদাহ্র চাদর দিয়ে একটি লাশ ঢাকা তখন তারা মনে করলো, নিশ্চয় এ আবু কাতাদাহ্র লাশ। সাথে সাথে তারা 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারণ করলো। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো; আবু কাতাদাহ্ নিহত হয়েছে। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন; আবু কাতাদাহ্ নয়; বরং আবু কাতাদাহ্র হাতে নিহত ব্যক্তির লাশ। সে একে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে, যাতে তোমরা বুঝতে পার, এর ঘাতক সেই। এ যুদ্ধে আবু কাতাদাহ্র ঘোড়াটির নাম ছিল 'হাযওয়া'। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/২৮৪)

আবু কাতাদাহ বলেন, জীকারাদের দিন অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার কেশ ও ত্বকে বরকত দাও। তার চেহারাকে কামিয়াব কর। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ আপনার চেহারাও কামিয়াব করুন! (উসুদুল গাবা–৫/২৭৫) এ দিন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা শুনে রাসূল (সা) মন্তব্য করেনঃ 'আবু কাতাদাহ্ আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী।' (আল–কামিল ফী আত–তারীখ–২/১৯১; আল–ইসাবা–৪/১৫৮)

হুদাইবিয়া সন্ধির সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবু কাতাদাহ্ও ছিলেন। এ সফরে ফেরার পথে একদিন রাসূলসহ (সা) তাঁর সফর সঙ্গীদের ফজরের নামায কাজা হয়ে যায়। সে কাজা নামায কখন কিভাবে রাসূল (সা) আদায় করেছিলেন তার একটা বিবরণ আবু কাতাদাহ্ বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৯)

হিজরী সপ্তম অথবা অষ্টম সনে রাসূল (সা) আবু কাতাদাহ্র নেতৃত্বে একটি বাহিনী 'ইদাম' –এর দিকে পাঠান। এই 'ইদাম' একটি স্থান বা একটি পাহাড়ের নাম এবং মদীনা থেকে শামের রাস্তায়। তাঁরা 'ইদাম' উপত্যকায় পৌঁছানোর পর তাঁদের পাশ দিয়ে 'আমের ইবন আল–আদবাত আল–আশজা'য়ী যাচ্ছিলেন। তিনি আবু কাতাদাহ্ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যদের সালাম দিলেন। তা সত্ত্বেও পূর্ব শত্রুতার কারণে এ বাহিনীর সদস্য মুহাল্লিম ইবন জাসসামা ইবন কায়েস তাঁকে হত্যা করেন এবং তাঁর উট ও অন্যান্য জিনিস ছিনিয়ে নেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে যখন তাঁকে এ ঘটনা অবহিত করেন তখন সূরা আন নিসার ৯৪ নং আয়াতটি নাযিল হয়। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৮১; হায়াতুস সাহাবা–২/৩৮৯)

'হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নেবে কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে ইহ–জীবনের সম্পদের আকাঙ্খায় তাকে বলো না, 'তুমি মুমিন নও'। কারণ, আল্লাহর নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর আছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।' (সূরা আন নিসা–৯৪)

হিজরী ৮ম সনের শা'বান মাসে রাসূল (সা) নাজ্দের 'খাদরাহ্' নামক স্থানের দিকে পনেরো সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। আবু কাতাদাহ্ ছিলেন এই বাহিনীর আমীর। সেখানে

গাতফান গোত্রের বসতি ছিল। তারা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রু এক লুটেরা গোত্র। তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। একারণে সারা রাত চলতেন এবং দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে হঠাৎ তাঁরা গাতফান গোত্রে পৌঁছে যান। তারাও ছিল ভীষণ সাহসী। সাথে সাথে বহুলোক উপস্থিত হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু হলো। আবু কাতাদাহ্ সঙ্গীদের বললেন, যারা তোমাদের সাথে লড়বে শুধু তাদেরকেই হত্যা করবে। সবাইকে ধাওয়া করার কোন প্রয়োজন নেই। এমন নীতি গ্রহণের ফলে দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। মাত্র ১৫ দিন পর প্রচুর গণীমতের মাল সংগে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসলেন। গণীমতের মালের মধ্যে ছিল দু'শো উট, দু' হাজার ছাগল এবং বহু বন্দী। এই মালের এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকী সবই তাঁদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার কিছু দিন পর আল্লাহর রাসূল (সা) রমজান মাসে ৮ জন লোকের একটি দল 'বাতানে আখাম'-এর দিকে পাঠান। এঁদেরও নেতা ছিলেন আবু কাতাদাহ্। 'বাতানে আখাম'-এর অবস্থান হচ্ছে জী-খাশাব ও জী-মারওয়ার মাঝামাঝি মদীনা থেকে মক্কার দিকে তিন মানযিল দূরে। রাসূল (সা) মক্কায় সেনা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মানুষ যাতে একথা মোটেই বুঝতে না পারে এ জন্য এই দলটিকে পাঠান। মূলতঃ মানুষের চিন্তা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই একাজ করেন। জী-খাশাব পৌঁছার পর এ দলটি জানতে পেল যে, রাসূল (সা) মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁরা 'সুকাইয়্যা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) বাহিনীর সাথে মিলিত হন। (তাবাকাতঃ মাগাযী অধ্যায়-৯১)

মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে লড়াই এত তীব্র ছিল যে, মুসলমানদের অনেক বড় বড় বীরও পিছু হঠতে বাধ্য হন। আবু কাতাদাহ্ এ যুদ্ধে দারুন বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এক স্থানে একজন মুসলমান ও একজন মুশরিক সৈনিকের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হচ্ছে। দ্বিতীয় একজন পিছন দিক থেকে মুসলিম সৈনিককে আক্রমণের পায়তারা করছে। ব্যাপারটি আবু কাতাদাহ্র নজরে পড়লো। তিনি চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে লোকটির কাঁধে তরবারির ঘা বসিয়ে দিলেন। লোকটির একটি হাত কেটে পড়ে গেল; কিন্তু অতর্কিতে সে দ্বিতীয় হাতটি দিয়ে আবু কাতাদাহ্র গলা পেঁচিয়ে ধরলো। লোকটি ছিল অতি শক্তিশালী। সে এত জোরে আবু কাতাদাহ্কে চাপ দিল যে, তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে, এর মধ্যে লোকটির দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় সে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে আবু কাতাদাহ্ লোকটির দেহে আরেকটি ঘা বসিয়ে দেন। লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

আবু কাতাদাহ্ যখন তার হত্যা কর্মে ব্যস্ত তখন মক্কার এক মুসলিম সৈনিক সেই পথে যাচ্ছিল। সে নিহত ব্যক্তির সকল সাজ-সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেল। এরপর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দারুন ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। তারা ময়দান থেকে যে যেদিকে পারে, পালিয়ে যাচ্ছিল। আবু কাতাদাহ্ও এক দিকে যাচ্ছেন। পথে এক স্থানে হযরত 'উমারের (রা) সাথে দেখা। আবু কাতাদাহ্ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কী ব্যপার? 'উমার (রা) বললেনঃ আল্লাহর যা ইচ্ছা। এর মধ্যে মুসলমানরা দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং রণক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে।

আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ যুদ্ধ থেমে গেল। আমরাও বিশ্রাম নিচ্ছি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা)

ঘোষণা করলেনঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিস লাভ করবে। আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন সাজ-সরঞ্জামবিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। আমি যখন তার হত্যা কর্মে ব্যস্ত তখন কে একজন তাঁর জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি তাকে চিনিনে। তখন মক্কার সেই ব্যক্তি বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সত্য বলেছে। নিহত ব্যক্তির জিনিস আমার কাছে আছে। সেগুলি আমাকে দেওয়ার জন্য তাঁকে একটু রাজী করিয়ে দিন।

সাথে সাথে আবু বকর (রা) বলে উঠলেন ঃ আল্লাহর কসম! রাসূল (সা) তাকে রাজী করাবেন না। একজন শেরে খোদা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে, আর তুমি তার প্রাপ্য জিনিস হাতানোর মতলবে আছ? নিহত ব্যক্তির জিনিস তাকে দিয়ে দাও। তখন রাসূল (সা) বললেনঃ আবু বকর সত্য বলেছে। তুমি তার লুণ্ঠিত দ্রব্য ফিরিয়ে দাও। আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ আমি সেই জিনিসগুলি নিয়ে বিক্রী করি এবং সে অর্থ দিয়ে দশটির মত খেজুর গাছ ক্রয় করি। ইসলাম গ্রহণের পর এই ছিল আমার প্রথম কোন সম্পদ ক্রয়। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৮, ৪৪৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৯০, ৯১; মুসনাদ-৫/৩০৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর খলীফাদের সময়ে আবু কাতাদাহ্র কর্মকান্ডের বিস্তারিত তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। হযরত 'উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা মদীনায় নিজ গৃহে ঘেরাও অবস্থায়, তখন হজ্জ মওসুম। সে সময় একদিন আবু কাতাদাহ্ অন্য একজন লোককে সংগে করে খলীফা 'উসমানের (রা) নিকট গিয়ে হজ্জে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন। তখন তারা খলীফার নিকট জানতে চানঃ যদি এই বিদ্রোহীরা বিজয়ী হয় তাহলে তাঁরা কার সাথে থাকবেন? খলীফা বললেনঃ সংখ্যা গরিষ্ঠ জামা'য়াতের সাথে। তাঁরা আবার প্রশ্ন করেন ঃ যদি এই সংখ্যা গরিষ্ঠ জামা'য়াতই আপনার ওপর বিজয়ী হয় তখন কার সাথে থাকবো? সংখ্যা গরিষ্ঠ দল যারাই হোক না কেন তাদের সাথে থাকবে। (হায়াতুস সাহাবা-২/১২৬)

হযরত আলী (রা) তাঁকে একবার মক্কার আমীর নিয়োগ করেন। পরে তাঁর স্থলে কুছাম ইবন 'আব্বাসকে নিয়োগ করেন। হিজরী ৩৬ সনে উটের যুদ্ধ এবং এর পরের বছর সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) দু'টি যুদ্ধেই হযরত আলীর (রা) পক্ষে যোগ দেন। (আল-আ'লাম-২/১৫৪; আল-ইসাবা-৪/১৫৮) হিজরী ৩৮ সনে খারেজীরা বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে। হযরত আলী (রা) যে বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন, আবু কাতাদাহ্ ছিলেন তার পদাতিক দলের অফিসার।

হযরত আবু কাতাদাহ্র (রা) মৃত্যু সন নিয়ে দারুন মতভেদ আছে। কুফাবাসীদের মতে হিজরী ৩৮ সনে তিনি কুফায় মারা যান এবং হযরত আলী (রা) সাত তাকবীরের সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইমাম শা'বী বলেন, সাত নয়, বরং ছয় তাকবীরের সাথে। হাসান ইবন 'উসমান বলেন, তিনি হিজরী-৪০ সনে মারা যান। ওয়াকিদী বলেন, হিজরী ৫৪ সনে ৭২ বছর বয়সে মদীনায় মারা যান। আবার কেউ বলেছেন, ৭২ নয়; বরং ৭০ বছর বয়সে। ইমাম বুখারী 'আল-আওসাত' গ্রন্থে যারা হিজরী ৫০ থেকে ৬০ সনের মধ্যে মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে আবু কাতাদাহ্র নামটি উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মারওয়ান যখন মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে মদীনার ওয়ালী তখন তিনি আবু কাতাদাহ্কে একবার দেখা করার জন্য ডেকে পাঠান

এবং তিনি মারওয়ানের সাথে দেখা করেন। এর সমর্থনে আর একটি বর্ণনা দেখা যায়। মু'য়াবিয়া (রা) যখন মদীনায় আসেন তখন সবশ্রেণীর মানুষ তাঁর সাথে দেখা করে। তখন তিনি আবু কাতাদাহ্‌কে ডেকে বলেনঃ শুধু আপনারা–আনসাররা ছাড়া সব মানুষই আমার সাথে দেখা করেছে। এসব বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় তিনি হিজরী ৪০ সনের পরে মারা গেছেন। (দ্রঃ আল–ইসাবা৪/১৫৯; আল–আ'লাম–২/১৫৪; উসুদুল গাবা–৫/২৭৫)

হযরত আবু কাতাদাহ্‌র (রা) দৈহিক আকার–আকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ঘাড় পর্যন্ত চুল রাখতেন যাকে 'হামিয়্যা' বলা হয়। চুলে মাঝে মাঝে চিরুনী করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার তাঁর চুলের অযত্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেখে বলেন, এগুলি একটু ঠিক কর। মানুষের উচিত চুল রাখলে তার যত্ন নেওয়া। অন্যথায় সে রাখায় ফায়দা কি?

তাঁর ছিল চার ছেলে ঃ আবদুল্লাহ, মা'বাদ, আবদুর রহমান ও সাবিত। শেষের জন ছিলেন দাসীর গর্ভজাত। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সালাফা বিনতু বারা' ইবন মা'রূর ইবন সাখার। সুলামা খান্দানের এক অভিজাত ঘরের মেয়ে। তিনি নিজেও একজন 'সাহাবিয়্যা' (মহিলা সাহাবী) এবং তাঁর পিতা বারা' ইবন মা'রূর ইবন সাখারও ছিলেন একজন খ্যাতিমান সাহাবী।

হযরত আবু কাতদাহ্ কুরআন–হাদীসের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ছিলেন দারুন সতর্ক। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে 'কিজব 'আলার রাসূলে'– বা রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপের হাদীস শোনার পর থেকে হাদীসের ব্যাপারে দারুন সতর্কতা আবলম্বন করেন। (মুসনাদ–৫/২৯২)

একদিন তাবেঈদের একটি মজলিসে হাদীসের চর্চা হচ্ছিল। প্রত্যেকেই বলছিলেন, 'রাসূল (সা) এমন বলেছেন, রাসূল (সা) এমন বলেছেন'। আবু কাতাদাহ্ তাঁদের এসব আলোচনা শুনে বললেন; হতভাগার দল, তোমাদের মুখ থেকে এসব কী বের হচ্ছে? রাসূল (সা) মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের জাহান্নামের শাস্তির কথা বলেছেন। (মুসনাদ–৫/৩১০)

এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭০ (একশত সত্তর)। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ সাহাবাগণ আছেন, তেমনি আছেন শ্রেষ্ঠ তাবে'ঈগণও। যেমন ঃ আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবু মুহাম্মাদ নাফে, (তাঁর আযাদকৃতদাস), সা'ঈদ ইবন কা'ব ইবন মালিক, কাবশা বিনতু কা'ব ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ, 'আতা ইবন ইয়াসার, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ইবন 'আউফ, 'উমার ইবন সুলাইম যারকী, 'আবদুল্লাহ ইবন মা'বাদ, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব প্রমুখ। উল্লেখিত ব্যক্তিগণের সকলেই হাদীস শাস্ত্রের এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।

হযরত আবু কাতাদাহ্‌র মধ্যে ইসলামী উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্বের চরম বিকাশ ঘটেছিল। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এক আনসারী ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলো জানাযার জন্য। রাসূল (সা) প্রথমে জানতে চাইলেন, তর ওপর কোন ঋণ আছে কিনা। লোকেরা বললো তার দু'দীনার ঋণ আছে। তিনি আবার জানতে চাইলেন, সে কোন সম্পদ রেখে গেছে কিনা। লোকেরা বললো, না, সে কিছুই রেখে যায়নি। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা তার নামায পড়। হযরত আবু কাতাদাহ্ আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি যদি তার ঋণ পরিশোধ

করে দেই, আপনি কি নামায পড়াবেন? বললেনঃ হাঁ। আবু কাতাদাহ্ লোকটির ঋণ পরিশোধ করে রাসূলকে (সা) খবর দিলেন। রাসূল (সা) এসে জানাযার নামায পড়ান। (মুসনাদ-৫/২৯,২০৩)

একজন মুসলমান তাঁর কাছে কিছু ঋণী ছিল। যখন তিনি তাগাদায় যেতেন তখন সে লুকিয়ে থাকতো। একদিন তিনি লোকটির বাড়ীতে গেলেন এবং তার ছেলের কাছে খবর পেলেন, সে খাবার খাচ্ছে। তিনি চেঁচিয়ে বললেন ঃ তুমি বেরিয়ে এসো, আজ আমি জেনে ফেলেছি। আজ লুকিয়ে কাজ হবে না। সে বেরিয়ে এলে আবু কাতাদাহ্ তার এভাবে লুকানোর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বললোঃ আসল কথা হলো, আমি খুবই গরীব। আমার কাছে কিছুই নেই। তার ওপর আছে পরিবার-পরিজনের বোঝা। আবু কাতাদাহ্ বললেন ঃ সত্যিই কি তোমার এমন দুরবস্থা? সে বললোঃ হাঁ। আবু কাতাদাহ্র চোখ পানিতে ভরে গেল। তিনি তার ঋণ মাফ করে দিলেন। (মুসনাদ-৫/৩০৮)

হযরত আবু বকরের (সা) খিলাফতকালে রিদ্দার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে খলীফা খালিদ ইবন ওয়ালীদকে পাঠালেন মালিক ইবন নুওয়াইরা ইয়ারবু'য়ীর বিরুদ্ধে। মালিক ইবন নুওয়াইরা ইসলাম কুবল করেন। তা সত্ত্বেও যে কোন কারণেই হোক খালিদ তাঁকে হত্যা করেন। খালিদের একাজে আবু কাতাদাহ্ এতই ক্ষুব্ধ হন যে, খলীফার নিকট আবেদন করেন; আমি খালিদের অধীনে থাকতে রাজী নই। সে একজন মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছে।

অতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি মানুষকে সঠিক আকীদা বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। একবার তিনি ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় একটা উল্কা ছুটে আসতে থাকে। মানুষ সে দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ এটা বেশী দেখা নিষেধ (মুসনাদ-৫/২৯৯)

হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক সাহচর্য ও খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেন, পানি কোথায় আছে তা খুঁজে বের কর অন্যথায় সকালে ঘুম থেকে পিপাসিত অবস্থায় উঠতে হবে। লোকেরা পানির তালাশে বেরিয়ে গেল। কিন্তু হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থেকে গেলেন। রাসূল (সা) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। ঘুম কাতর অবস্থায় তিনি যখন এক দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন তখন আবু কাতাদাহ্ এগিয়ে গিয়ে নিজের হাত দিয়ে সে দিকে ঠেস দিচ্ছিলেন। একবার তো রাসূল (সা) পড়ে যাবারই উপক্রম হলেন। আবু কাতাদাহ্ দ্রুত হাত দিয়ে ঠেকালেন। রাসূল (সা) চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেনঃ কে? বললেনঃ আবু কাতাদাহ্। রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ কখন থেকে আমার সাথে আছ? বললেনঃ সন্ধ্যা থেকে। তখন রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন এই বলে ঃ হে আল্লাহ! আপনি আবু কাতাদাহ্কে হিফাজত করুন যেমন সে সারা রাত আমার হিফাজত করেছে। (মুসনাদ-৫/২৯৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৭; আল-ইসাবা-৪/১৫৯)

একবার হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেন। আবু নু'য়ায়িম 'আদ-দালায়িল' গ্রন্থে (১৪৪) ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলাম। এক সময় যাত্রা বিরতিকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের সাথে কি পানি আছে? বললামঃ হাঁ। আমার কাছে একটি পাত্রে

কিছু পানি আছে। বললেনঃ নিয়ে এসো। আমি পানির পাত্রটি নিয়ে এলাম। তিনি বললেনঃ এর থেকে কিছু পানি নিয়ে তোমরা সবাই অজু কর। অজুর পর সেই পাত্রে এক ঢোক মত পানি থাকলো। রাসূল (সা) বললেনঃ আবু কাতাদাহ্, তুমি এ পানিটুকু হিফাজতে রেখে দাও। খুব শিগগিরই এর একটি খবর হবে। আস্তে আস্তে দুপুরের প্রচন্ড গরম শুরু হলো। রাসূল (সা) সঙ্গীদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারা সবাই বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিপাসায় তো আমাদের জীবন যায় যায় অবস্থা। তিনি বললেনঃ না, তোমরা মরবে না। এই বলে তিনি আবু কাতাদাহ্‌কে ডেকে পানির পাত্রটি নিয়ে আসতে বললেন। আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ আমি পাত্রটি নিয়ে এলাম। রাসূল (সা) বললেনঃ আমার পিয়ালাটি নিয়ে এসো। পিয়ালা আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে একটু করে পানি পিয়ালায় ঢেলে মানুষকে পান করাতে লাগলেন। পানি পানের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) চারপাশে ভীড় জমে গেল। দারুন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। রাসূল (সা) বললেনঃ তোমরা ভদ্রভাবে শান্ত থাক, সবাই পান করতে পারবে। আবু কাতাদাহ্ বলেনঃ একমাত্র রাসূল (সা) ও আমি ছাড়া সকলের পান শেষ হলে তিনি বললেনঃ আবু কাতদাহ্, এবার তুমি পান কর। আমি বললাম! আপনি আগে পান করুন। তিনি বললেনঃ সম্প্রদায়ের যিনি সাকী বা পানি পান করান, তিনি সবার শেষে পান করেন। অতঃপর আমি পান করলাম এবং সবার শেষে রাসূল (সা) পান করলেন। সবার পান করার পরেও পাত্রে ঠিক যতটুকু পানি ছিল তাই থেকে গেল। বর্ণনাকারী বলেন ঃ সে দিন তিন শো লোক ছিল। অন্য একটি বর্ণনা মতে, লোক সংখ্যা ছিল সাতশো। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬২০, ৬২১)

তিনি স্বভাবগতভাবেই ছিলেন কোমল। জীবের প্রতি ছিল তাঁর দারুন দয়া। একবার ছেলের বাড়ী গেলেন। ছেলের বউ অজুর জন্য পানি রেখেছিল। একটি বিড়াল তাতে মুখ দিয়ে পান করতে শুরু করলো। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রা) বিড়ালটি না তাড়িয়ে পাত্রটি তার দিকে আরো একটু কাত করে দিলেন, যাতে সে ভালো করে পান করতে পারে। পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের বউ এ দৃশ্য দেখছিল। তিনি ছেলে-বউকে বললেন ঃ এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ বিড়ালের এঁটে না পাক নয়। কারণ, এরা ঘরের মধ্যে বিচরণকারী জীব। (মুসনাদ-৫/৩০৩)

শিকার করা ছিল তাঁর বিশেষ শখ। একবার হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে যাচ্ছিলেন। পথে যাত্রা বিরতিকালে কয়েকজন সংগী নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। স্থানটি ছিল পাহাড়ী এলাকা। খুব দ্রুত পাহাড়ে উঠার অভ্যাস ছিল তাঁর। তিনি সংগীদের নিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলেন। সেখানে একটি জন্তু দেখতে পেলেন। আবু কাতাদাহ্ একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে সংগীদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা বলতো এটা কি জন্তু? তাঁরা বললেনঃ আমরা তো ঠিক বলতে পারছিনা। তিনি বললেনঃ এটা একটা বন্য গাধা। আবু কাতাদাহ্ পাহাড়ে উঠার সময় তাঁর চাবুকটি ভুলে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি সংগীদের চাবুকটি নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা ছিলেন ইহরাম অবস্থায়। একারণে তাঁরা শিকারে কোন রকম সহযোগিতা করলেন না। শেষে তিনি নিজেই বর্শা নিয়ে জন্তুটির পিছু ধাওয়া করে হত্যা করেন। তারপর সেটি ওঠানোর জন্য সংগীদের সাহায্য চান; কেউ তাঁকে সাহায্য করলেন না। অবশেষে তিনি একাই সেটা উঠিয়ে আনেন এবং গোশত তৈরী করে রান্না করেন। কিন্তু সংগীরা খেতে দ্বিধাবোধ করেন।

কেউ কেউ সেই গোশ্‌ত খেলেন, আবার অনেকে খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবু কাতাদাহ্‌ বললেন, আচ্ছা আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে বলছি। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করে ঘটনাটি খুলে বললেন। রাসূল (সা) শুনে বললেনঃ ওটা খেতে অসুবিধা কি? ওটা তো আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমার জন্য কিছু নিয়ে এসো। গোশত সামনে আনা হলে রাসূল (সা) সাহাবীদের বললেনঃ তোমরা খাও। (ফাতহুল বারী-৯/৫২৮)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। একারণে তাঁর বন্ধুদের একটা দল ছিল। হুদাইবিয়ার সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগী ছিলেন। তিনি ইয়ার-বন্ধুদের সাথে হাসি-তামাশা ও কৌতুক করতে করতে পথ চলছিলেন। আবু মুহাম্মাদও ছিলেন তাঁর বান্ধব মজলিসের একজন সদস্য।(মুসনাদ-৫/২৯৫;৩০১)

হযরত আবু কাতাদাহ্‌ (রা) একবার একটি 'আদনী' (আদনে তৈরী) চাদর গায়ে জড়িয়ে হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) দরবারে যান। তখন সেখানে আবদুল্লাহ ইবন মাস'য়াদাহ্‌ বসা ছিলেন। ঘটনাক্রমে আবু কাতাদাহ্‌র গায়ের চাদরটি আবুদুল্লাহর গায়ে খসে পড়ে। অত্যন্ত রাগের সাথে আবদুল্লাহ সেটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। আবু কাতাদাহ্‌ প্রশ্ন করেনঃ আমীরুল মুমিনীন। লোকটি কে? বললেনঃ আবদুল্লাহ ইবন মাস'য়াদাহ্‌। আবু কাতাদাহ্‌ বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি তার পিতার বুক বর্শা দিয়ে প্রতিরোধ করেছি- যে দিন সে মদীনার উপকণ্ঠে আক্রমণ করেছিল। একথা শুনে 'আবদুল্লাহ চুপ থাকে। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৯) উল্লেখ্য যে, আবু কাতাদাহ্‌ জীকারাদ অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। সেই গাতফানী লুটেরাদের মধ্যে এই 'আবদুল্লাহর পিতাও ছিল। ■

আবূ সা'ঈদ আল-খুদারী (রা)

নাম সা'দ, ডাক নাম আবূ সা'ঈদ। খুদরাহ বংশের সন্তান হওয়ার কারণে খুদারী বা খুদরী বলা হয়। তাঁর পিতা মালিক ইবন সিনান উহুদের অন্যতম শহীদ। এ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আহত হলে তিনি রাসূলের (সা) পবিত্র খুন চুষে গিলে ফেলেন। রাসূল (সা) তখন মন্তব্য করেন ঃ 'আমার রক্ত যার রক্তে মিশেছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।' (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮০, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪) তাঁর মা উনায়সা বিনতু আবী হারিসা বনু 'আদী ইবন নাজ্জারের কন্যা। দাদা সিনান ছিলেন মহল্লার রয়িস। তিনি ছিলেন একটি কিল্লার অধিপতি ও ইসলাম পূর্ব যুগের একজন বিচারক।

তাঁর মার প্রথম স্বামী ছিল আউস গোত্রের 'আম্মান নামক এক ব্যক্তি। সে মারা যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বে তিনি মালিক ইবন সিনানকে দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁদেরই সন্তান আবূ সা'ঈদ হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসরিবে জন্মগ্রহণ করেন। (আল-ইসাবা-৪/৮৮, আল-আ'লাম-৩/১৩৮) প্রখ্যাত বদরী সাহাবী কাতাদাহ ইবন নু'মান (রা)- উহুদ যুদ্ধে যাঁর চোখ আহত হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আর বরকতে আবার ভালো হয়ে যায়- আবূ সা'ঈদের বৈপিত্রীয় ভাই। হিজরী ২৩ সনে এই কাতাদাহ মারা গেলে আবূ সা'ঈদ তাঁকে কবরে নামিয়ে দাফন করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪২, উসূদুল গাবা- ৫/২১১)

বাই'য়াতে আকাবা থেকেই মোটামুটি মদীনায় ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। মদীনাবাসীদের অনেকেই তখন ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় মালিক ইবন সিনান ইসলাম কবুল করেন। স্বামীর সাথে স্ত্রীও মুসলমান হন। সুতরাং আবূ সা'ঈদ মুসলিম মা-বাবার কোলেই বেড়ে ওঠেন।

হিজরাতের প্রথম বছরেই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আবূ সা'ঈদ এই নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে মোট বারোটি যুদ্ধে যোগ দেন। (তাহজীবুল আসমা-২/২৩৭, আল-আ'লাম-৩/১৩৮) অল্প বয়সের কারণে বদর যুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি। উহুদ যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। যুদ্ধের পূর্বে পিতার সাথে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করেন এবং এখনও যুদ্ধের বয়স হয়নি- এই বলে ফিরিয়ে দেন। পিতা মালিক তখন রাসূলুল্লাহর (সা) হাত ধরে বলেন, ছেলের বয়স কম হলে কি হবে, তার হাত দু'টি পুরুষের মত সবল। তবুও রাসূল (সা) তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। (আল-ইসাবা-২/৩৫; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩০)

এই উহুদ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র মুখমন্ডল আহত হয়ে রক্ত রঞ্জিত হয়। মালিক ইবন সিনান সেই রক্ত পান করেন। রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ 'যদি কারও এমন ব্যক্তিকে দেখার ইচ্ছা হয় যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশেছে, সে যেন মালিক ইবন সিনানকে দেখে। এরপর বীরের মত যুদ্ধ করে মালিক শাহাদাত বরণ করেন।

আবূ সা'ঈদের পিতা কোন সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন না। এ কারণে পিতার মৃত্যুতে তিনি পর্বত পরিমাণ বিপদের সম্মুখীন হলেন। দারিদ্র ও অনাহারে সময় সময় পেটে পাথর বেঁধে কাটাতেন। একদিন তিনি প্রচন্ড ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে আছেন। তখন তাঁর স্ত্রী (মতান্তরে মা অথবা দাসী) তাঁকে বললেন ঃ নবীর (সা) কাছে যাও, তাঁর কাছে কিছু চাও। অমুক এসে সাহায্য চেয়েছিল, তাকে তিনি দিয়েছেন। আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম তিনি তখন ভাষণ দিচ্ছেন এবং বলছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহও তাকে চাওয়া থেকে বিরত রাখবেন। আর যে নিজেকে গনী বা ধনী মনে করে আল্লাহও তাকে ধনবান করে দেন। আর যে আমার কাছে কোন কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে সে ঐ ব্যক্তির থেকেও আমার বেশী প্রিয় যে আমার কাছে চায়।' একথা শুনে আমি আর কিছু চাইলাম না। আমি বাড়ী ফিরে এলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের রিযকে বরকত বা সমৃদ্ধি দান করতে লাগলো। অবশেষে, আনসারদের মধ্যে কোন বাড়ী আমাদের চেয়ে বেশী বিত্তশালী ছিল বলে আমি জানতাম না। (মুসনাদ–৩/৪৪৯; হায়াতুস সাহাবা–২/২৫৭)

খন্দক ও বনী মুসতালিকের যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। তবে 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থের একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ 'আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ খন্দকের দিন আমার পিতা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে নিয়ে বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর হাড় খুব শক্ত।' এরপরও তিনি আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে ফিরিয়ে দেন। তিনি আরও বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বনী মুসতালিক যুদ্ধে যোগ দিই।' ওয়াকিদী বলেন ঃ 'তখন আবূ সা'ঈদের বয়স পনেরো বছর।' (উসুদুল গাবা–৫/২১১, আনসাবুল আশরাফ–১/৩৪৪)

ইমাম আহমাদ আবূ সা'ঈদ খুদারী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের দিন বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো গলায় এসে ঠেকেছে। এমন কোন দু'আ কি আছে যা আমরা পাঠ করতে পারি? বললেন ঃ হাঁ। বল ঃ আল্লাহুম্মা উসতুর 'আওরাতিনা ওয়া আমিন রাও'য়াতিনা– হে আল্লাহ আমাদের গোপন বিষয় গোপন রাখ এবং আমাদের ভীতিকে নিরাপত্তা দান কর।' (হায়াতুস সাহাবা– ১/৪৮৮)

তিনি 'বাই'য়াতুশ শাজারা' বা 'বাই'য়াতুর রিদওয়ানে' অংশগ্রহণ করেন। (শাজারাতুজ জাহাব–১/৮১; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৪৪) হিজরী ৮ম সনের সফর মাসে 'আবদুল্লাহ ইবন গালিব লায়সীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য ফিদাক যায়। তিনিও এই বাহিনীতে ছিলেন। আবদুল্লাহ সৈন্যদের তাকীদ দেন, তারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাহিনীর সদস্যদের পরস্পরের সাথে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁকেও একজন বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন।

হিজরী ৯ম সনের রাবী'উস সানী মাসে 'আরকামা ইবন মুখাররকে ছোট একটি বাহিনীসহ একটি অভিযানে পাঠানো হয়। আবূ সা'ঈদ ছিলেন এ বাহিনীর অন্যতম সদস্য। (মুসনাদ–৩/২৭০; হায়াতুস সাহাবা–২/৬৭)

উপরোক্ত যুদ্ধগুলি ছাড়াও মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক, আওতাস প্রভৃতি অভিযানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে সংঘটিত মোট ১২টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। তিনি তাবুক যুদ্ধে মুসলমানদের চরম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হুনাইন যুদ্ধে লব্ধ

গনীমাতের বেশীর ভাগ যখন রাসূল (সা) মক্কাবাসী নওমুসলিমদের খুশী (তালীফে কুলুব) করার জন্য দান করেন তখন মদীনার আনসারদের অনেকে একটু ক্ষুণ্ন হন। এ সম্পর্কিত ঘটনা আবূ সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৭-৩৯৮; ৩/৬২৫) তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে গিয়েছি রমজান মাসে। আমাদের কেউ সাওম পালন করতো, আবার কেউ করতো না। তবে একে অপরকে কোন রকম হিংসা করতো না। তারা প্রত্যেকেই জানতো যে, যে ব্যক্তি নিজেকে সক্ষম মনে করবে সে সাওম পালন করবে, আর এটাই তার জন্য উত্তম। আর যে নিজেকে দুর্বল ও অক্ষম মনে করবে সে সাওম পালন করবে না। আর এটাই তার জন্য উত্তম।' (হায়াতুস সাহাবা- ১/৪৭৯)

একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁদেরকে একটি ছোটখাট অভিযানে পাঠালেন। বাহিনীর সর্বমোট সদস্য তিরিশজন এবং নেতা আবূ সা'ঈদ। যাত্রা পথে তাঁরা একটি স্থানে তাঁবু স্থাপন করে যাত্রা বিরতি করেন। নিকটেই ছিল একটি জনপদ। তাঁরা সেই জনপদের লোকদের বললেন, আমরা আপনাদের অতিথি। কিন্তু তারা অতিথিদের সেবা করতে পরিষ্কার অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে সেইদিন উক্ত জনপদের প্রধানকে বিচ্ছুতে কামড়ায়। নানা জনে নানা রকম চিকিৎসা চালালো; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাদেরকে কেউ পরামর্শ দিল, তোমরা এই অতিথিদের কাছে যাও, তাদের মধ্যে কারও হয়তো কোন চিকিৎসা জানা থাকতে পারে। পরামর্শমত তারা এসে বিষয়টি জানালো। আবূ সা'ঈদ বললেন, 'আমি ঝাড়-ফুঁক জানি, তবে পারিশ্রমিক হিসেবে তিরিশটি ছাগল দিতে হবে। তারা রাজি হয়ে গেল। আবূ সা'ঈদ তাদের সাথে গেলেন এবং সূরা মুহাম্মাদ পাঠ করে দংশিত স্থানে একটু থু থু লাগিয়ে দিলেন। তাতেই লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরাম তিরিশটি ছাগল নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁদের মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল, এভাবে ছাগলগুলি নেওয়া ঠিক কিনা। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) জানানো হবে। মদীনায় পৌঁছেই তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘটনাটি খুলে বলেন। সবকিছু শুনে তিনি একটু মুচকি হাসি দেন। তারপর বলেন, তোমরা কিভাবে জানলে যে, এই সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজ দেয়? তোমরা ঠিকই করেছ। বকরীগুলি তোমরা ভাগ করে নেবে এবং আমাকেও একটি অংশ দিতে ভুল করবে না। (সহীহুল বুখারী- ১/২৫১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। খলীফা হযরত 'উমার ও হযরত 'উসমানের (রা) যুগে ফাতওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। যিয়াদ ইবন মীনা'র সূত্রে ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন ঃ ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, আবূ সা'ঈদ খুদারী, আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ প্রমুখ আসহাবে রাসূল 'উসমানের মৃত্যুর সময় থেকে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত মদীনায় ফাতওয়া দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৫)

হযরত আলীর (রা) যুগে খারেজীদের বিরুদ্ধে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তিনি যোগ দেন। তখন তিনি বলতেন, তর্কীদের চেয়ে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আমি বেশী প্রয়োজন মনে করি। (মুসনাদ-৩/৩৩, ৫৬) হযরত ইমাম হুসাইন যখন মদীনা ছেড়ে কুফায় যাওয়া স্থির করেন, তখন আরও অনেক সাহাবীর মত আবূ সা'ঈদও তাঁকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। (সুয়ূতী ঃ তারীখুল খুলাফা)

হিজরী ৫৯ সনে হযরত উম্মু সালামা (রা) ইনতিকাল করলে আবূ সা'ঈদ তাঁর জানাযায়

শরীক ছিলেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৩২) হিজরী ৬১ সনে হিজাযবাসীরা ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের ইবনুল 'আওয়ামের (রা) হাতে বাই'য়াত করে। এই বাই'য়াতকারীদের মধ্যে হযরত আবূ সা'ঈদও ছিলেন।

হিজরী ৬৩ সনে দারুল হিজরাহ্ মদীনার অধিবাসীরা ইয়াযীদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করে গাসীলুল মালায়িকা হযরত হানজালার ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহর হাতে বাই'য়াত করে তাঁকে নিজেদের আমীর বলে ঘোষণা দেয়। ইয়াযীদের বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে মদীনাবাসীদের পরাভূত করে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইয়াযীদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। বিজয়ী ইয়াযীদ বাহিনী সেই সময় মদীনায় হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও ধ্বংসের তান্ডবলীলা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহর (সা) হারাম বা সম্মানিত শহর মদীনার এমন অসম্মান ও অবমাননা সেই সময় জীবিত সাহাবীরা দেখে দারুন মর্মাহত হন। আবূ সা'ঈদও এমন দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর খোঁজে একজন পৌঁছে যায় এবং তাঁকে হত্যার জন্য তরবারি উঠায়। তিনি প্রথমতঃ তাকে ভয় দেখানোর জন্য তরবারি তুলে ধরেন। কিন্তু সৈন্যটি আরও এগিয়ে এলে তিনি তরবারি মাটিতে রেখে দিয়ে সূরা আল–মায়িদার ২৮ নং আয়াতটি পাঠ করেনঃ

'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তোমার হাত বাড়াও তবুও আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার হাত বাড়াবো না। কারণ, আমি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে ভয় করি।'

সৈনিকটি থেমে যায়। সে প্রশ্ন করে, আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন তো আপনি কে? বললেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ আল খুদারী। আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী? বললেন! হাঁ। সৈনিকটি গুহা ছেড়ে চলে গেল। (আল–ইসাবা–৩/৫৫) আবূ সা'ঈদ গুহা থেকে বাড়ী আসলেন। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ চললো এবং বন্দী করা হলো। অবশেষে প্রচন্ড চাপের মুখে ইয়াযীদের প্রতি বাই'য়াত করতে বাধ্য হলেন।

একথা হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) অবগত হয়ে তাঁর কাছে যান এবং বলেন ঃ শুনেছি আপনি নাকি দুই আমীরের বাই'য়াত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছেন? বললেন ঃ হাঁ। প্রথমে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের এবং বন্দী হওয়ার পরে ইয়াযীদের প্রতি বাই'য়াত করেছি। ইবন 'উমার বললেন ঃ আমি এমনই আশংকা করেছিলাম। আবূ সা'ঈদ বললেন ঃ কিন্তু আমার করার কি ছিল? কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, মানুষের প্রতিটি সকাল ও সন্ধ্যা কোন না কোন আমীরের অধীনে অতিবাহিত হওয়া উচিত। একথা শুনে ইবন 'উমার বললেন, যাই হোক না কেন, আমি দুই আমীরের প্রতি বাই'য়াত পছন্দ করিনে। (মুসনাদ–৩/২৯, ৩০)

বেশী সংখ্যক বর্ণনা মতে তিনি হিজরী ৭৪ সনে (খ্রীঃ ৬৯৩) শুক্রবার মদীনায় মারা যান এবং তাঁকে মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। অপর একটি বর্ণনা মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৬৪। মৃত্যুকালে অনেক বয়স হয়েছিল। বার্দ্ধক্যের দরুন হাত–পা কাঁপতো। অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞের ধারণা, তিনি ৭৪ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। তবে আল্লামা জাহাবী লিখেছেন, তিনি ৮৬ বছর বয়সে মারা যান এবং এটাই সঠিক। (দ্রঃ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/৩৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত–২/২৩৭, আল–আ'লাম–৩/১৩৮, শাজারাতুজ জাহাব–১/৮১, উসুদুল গাবা–৫/২১১)

হযরত আবূ সা'ঈদের ছিল দুই স্ত্রী। একজনের নাম যয়নাব বিনতু কা'ব ইবন আজযাহ্।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। দ্বিতীয়জন উম্মু 'আবদিল্লাহ বিনতু 'আবদিল্লাহ নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর সন্তানদের নাম ঃ আবদুর রহমান, হামযাহ্ ও সা'ঈদ।

হযরত আবূ সা'ঈদ ছিলেন আহলুস্ সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ। কোন ক্বারীর নিকট কুরআন তিলাওয়াত শিখেছিলেন। তাঁর শিক্ষা জীবনে আনসারদের কয়েকটি হালকায়ে দারস ছিল। সেখানে আনসারদের 'আলিম ব্যক্তিরা দারস দিতেন। আবূ সা'ঈদের ছাত্র জীবনের যুগটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগ। সেই সময় মানুষ ঠিক মত শরীর ঢাকার মত কাপড়ও সংগ্রহ করতে পারতো না। হালকায়ে দারসে একজন আর একজনের আড়ালে আবডালে চুপে চুপে বসে যেত। একদিন এমন একটি হালকায়ে দারসে হযরত রাসূলে কারীম (সা) উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে ক্বারীর কিরাত থেমে গেল। তিনি সবাইকে গোল হয়ে বসতে বলে নিজেও তাদের সাথে বসে গেলেন। সেই হালকায় সে দিন যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র আবূ সা'ঈদকে রাসূল (সা) চিনতেন। (মুসনাদ-৩/৬৩, হায়াতুস সাহাবা-৩/২০৪)

হাদীস ও ফিকাহর জ্ঞান তিনি সরাসরি রাসূল (সা) ও অন্য সাহাবীদের নিকট থেকে অর্জন করেন। চার খলীফা ও যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট থেকে তিনি হাদীস শোনেন। অসংখ্য হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১১৭০টি। যাঁরা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি এমন একজন হাফেজে হাদীস। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ৪৩টি মতান্তরে ৪৬টি মুত্তাফিক 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন।)এবং বুখারী ও মুসলিম প্রত্যেকেই এককভাবে যথাক্রমে ১৬টি ও ৫২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সকল বিখ্যাত সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শোনেন ও বর্ণনা করেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

যায়িদ ইবন সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, আনাস ইবন মালিক, ইবন 'উমার, ইবন যুবাইর, জাবির, আবূ কাতাদাহ, ইবন 'আমর, মাহমূদ ইবন লাবীদ, আবুত তুফায়েল, আবূ উমামা ইবন সাহল, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, তারিক ইবন শিহাব, 'আতা, মুজাহিদ, আবূ 'উসমান আন-নাহদী, 'উবায়দ ইবন 'উমায়র, 'আয়্যাদ ইবন আবী সারাহ, বুসর ইবন সা'ঈদ, আবূ নুদবাহ্, ইবন সীরীন প্রমুখ। (দ্রঃ আল-ইসাবা-২/৩৫, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/২৩৭, আল-আ'লাম-৩/১৩৮)

তাঁর হালকায়ে দারস সব সময় ছাত্রে পরিপূর্ণ থাকতো। কেউ কোন প্রশ্ন করতে চাইলে অনেক প্রতীক্ষার পর সুযোগ পেত। (মুসনাদ-৩/৩৫) দারসের সময় ছাড়াও যে কোন সময় লোকে তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা জানতে পারতো। প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিতেন। একবার ইবন 'আব্বাস ছেলে 'আলী ও দাস 'আকরামাকে বললেন, যাও তো আবূ সা'ঈদের নিকট থেকে হাদীস শুনে এস। তারা যখন পৌঁছলেন, আবূ সা'ঈদ তখন বাগিচায়, তিনি তাদের সাথে বসেন এবং হাদীস শোনান। (মুসনাদ-৩/৯০, ৯১)

হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে কিভাবে তিনি সে হাদীস শুনেছিলেন সে অবস্থারও বর্ণনা দিতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি হাদীস শোনেন। এই লোকটি আবূ সা'ঈদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে। ইবন 'উমার ঐ লোকটিকে সংগে করে আবূ সা'ঈদের নিকট যান এবং প্রশ্ন করেনঃ এই ব্যক্তি কি অমুক হাদীসটি আপনার নিকট থেকে শুনেছে? আর আপনি কি তা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন?

তিনি বললেন ঃ আমার দু'চোখ দেখেছে এবং দু'কান শুনেছে। (মুসনাদ–৩/৪)

একবার কুয'য়া নামক একজন ছাত্রের নিকট একটি হাদীস খুব ভালো লাগে। তিনি জিজ্ঞেস করে বসলেন, হাদীসটি কি আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন? এমন প্রশ্নে তিনি একটু ক্ষুব্ধ হলেন। বললেন ঃ তাহলে কি না শুনেই আমি বর্ণনা করছি? হাঁ, আমি শুনেছি। (মুসনাদ–৩/৯১)

যে সকল হাদীস রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শোনা শব্দাবলীর ওপর আস্থা না হতো সেগুলি বর্ণনার ব্যাপারে দারুন সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যেমন একবার একটি হাদীস বর্ণনা করলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) নামটি উচ্চারণ করলেন না। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে বসলো, এটা কি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত? বললেন ঃ আমিও জানি।

আবূ সা'ঈদ হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উপদেশ মত তাঁর ছাত্রদের আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানাতেন। ইমাম তিরমিযী আবূ হারূন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমরা আবূ সা'ঈদের কাছে গেলে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অসীয়াতের (উপদেশ) প্রতি স্বাগতম। নবী (সা) বলেছেন ঃ মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে। কিছু লোক নানা স্থান থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তোমরা তাদের ভালো উপদেশ দেবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'তাদেরকে শিক্ষা দেবে এবং বলবে মারহাবা, মারহাবা, নিকটে এস।' (হায়াতুস সাহাবা–৩/২০২, কানযুল 'উম্মাল–৫/২৪৩)

আবূ সা'ঈদ আরও বর্ণনা করেন। 'রাসূল (সা) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন তাদের (ছাত্রদের) মজলিসে বসার স্থান করে দিই, তাদের হাদীস শিখাই।' কারণ, তোমরাই তো আমাদের পরবর্তী প্রতিনিধি, আমাদের পরবর্তী মুহাদ্দিস। তিনি তাঁর ছাত্রদের আরও বলতেন ঃ তুমি কোন বিষয় না বুঝলে তা বুঝার জন্য বার বার প্রশ্ন করবে। কারণ, তুমি বুঝে আমার মজলিস থেকে উঠে যাও– এটা তোমার না বুঝে উঠে যাওয়া থেকে আমার নিকট অধিক প্রিয়। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২০৩, কানযুল 'উম্মাল–৫/২৪৩)

তিনি ছাত্রদের হাদীস লিখে দিতেন না। তাবরানী আবূ নাদরাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদকে বললাম, আপনি আমাদেরকে হাদীস লিখে দিন। তিনি বললেন ঃ আমরা কক্ষণও লিখে দেবনা এবং কক্ষণও হাদীসকে কুরআন বানাবো না। তোমরা বরং আমাদের নিকট থেকে এমনভাবে গ্রহণ কর যেমন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে গ্রহণ করেছি। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২১৭)

হানজালা ইবন আবী সুফইয়ান আল–জুমাহী তাঁর শায়খদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন! আবূ সা'ঈদ আল–খুদারী অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) ঘটনাবলীর অধিকতর সমঝদার ব্যক্তি আর কেউ নেই। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত–২/২৩৭)

অত্যন্ত সত্যভাষী ছিলেন তিনি। বলতেন ঃ আমি রাসূলকে (সা) সত্য ভাষণের প্রতি জোর তাকীদ দিতে শুনেছি। হায়, যদি তা না শুনতাম! (মুসনাদ–৩/৫) একবার সত্য ভাষণের হাদীসটির আলোচনা উঠলে তিনি কেঁদে ফেলেন। তারপর বলেন ঃ হাদীসটি তো অবশ্যই শুনেছি; কিন্তু তার ওপর 'আমল মোটেও হচ্ছেনা। (মুসনাদ–৩/৬১, ৭১)

হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) শাসনকালে অনেক বিদ'য়াতের প্রচলন হতে থাকে। তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মু'য়াবিয়ার (রা) কাছে যান এবং এক এক করে সকল বিদ'য়াতের কথা

তাঁর কর্ণগোচর করেন। (মুসনাদ–৩/৮৪) একবার আমীর মু'য়াবিয়ার সাথে তাঁর আনসারদের সম্পর্কে কথা হয়। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের কষ্টে ধৈর্য ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আমীর মু'য়াবিয়া বললেন ঃ তাহলে তোমরা ধৈর্য ধর। (মুসনাদ–৩/৮৯)

একবার উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ানের দরবারে বসে সাহাবীদের ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শোনালেন। মারওয়ান বিশ্বাস করতে চাইলেন না। উক্ত বৈঠকে হযরত যায়িদ ইবন সাবিত ও রাফে 'ইবন খাদীজও উপস্থিত ছিলেন। আবূ সা'ঈদ প্রথমে তাদের দুইজনকে স্বাক্ষী মানলেন। তারপর বললেন ঃ তাঁরাই বা কেন বলবে? একজনের তো সাদাকার দায়িত্ব থেকে অপসারণের ভয় আছে, আর অন্যজনের আপনার একটু ইশারাতেই গোত্রের নেতৃত্ব চলে যাওয়ার ভয়। এমন স্পষ্ট কথা শুনে মারওয়ান তাঁকে কোড়া দিয়ে মারার জন্য উদ্যত হয়। তখন ঐ ব্যক্তিদ্বয় তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করেন। (মুসনাদ–৩/২৩)

এমনিভাবে এক 'ঈদের দিনে মারওয়ান মিম্বার বের করেন এবং নামাযের পূর্বে খুতবা দেন। এক ব্যক্তি উঠে প্রতিবাদ করে বলে, এ দু'টি কাজই সুন্নাতের পরিপন্থী বিদ'য়াত। মারওয়ান বললেন ঃ পূর্বের পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে। সেখানে আবূ সা'ঈদ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, যা কিছুই হোক না কেন, লোকটি তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি হযরত রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করতে দেখে তাহলে তার উচিত শক্তি প্রয়োগে তা প্রতিরোধ করা। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে উচিত মুখে প্রতিবাদ করা, আর তাও সম্ভব না হলে কমপক্ষে অন্তরে তা ঘৃণা করা উচিত। (মুসনাদ–৩/১০)

আমর বিল মারূফের(সৎকাজের আদেশ) আবেগ এত তীব্র ছিল যে, একবার মারওয়ান হযরত আবূ হুরাইরার (রা) সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁদের সামনে দিয়ে একটি লাশ অতিক্রম করলো। এই লাশের সাথে আবূ সা'ঈদও ছিলেন। মারওয়ান লাশ দেখেও উঠলেন না। তখন আবূ সা'ঈদ তাঁকে বললেন ঃ আমীর, জানাযার জন্য ওঠো। কারণ, রাসূল (সা) উঠতেন। একথা শুনে মারওয়ান দাঁড়িয়ে যান। (মুসনাদ–৩/৪৭, ৯৭) ইবন সা'দের মতে এই জানাযাটি ছিল উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা)। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪২৮)

হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর যখন মদীনার গভর্ণর তখন একবার 'ঈদুল ফিতরের দিন জিজ্ঞেস করলেন, নামায এবং খুতবার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) কর্মপন্থা কি ছিল? আবূ সা'ঈদ বললেন ঃ রাসূল (সা) খুতবার আগে নামায পড়াতেন। মুস'য়াব তাঁর কথামত কাজ করেন। (মুসনাদ–৩/৪)

একবার শাহর ইবন হাওশাব 'তূর' পাহাড় ভ্রমণের ইচ্ছা করেন। তিনি আবূ সা'ঈদের সাথে দেখা করতে আসেন। আবূ সা'ঈদ তাঁকে বলেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন পবিত্র ভূমির প্রতি সফর নিষেধ করা হয়েছে।

ইবন আবী সা'সার জঙ্গল খুব পছন্দ ছিল। আবূ সা'ঈদ তাঁকে বললেন ঃ তুমি সেখানে এমন জোরে আযান দেবে যেন গোটা জঙ্গলে তাকবীরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। (মুসনাদ–৩/৯৫, ৪/৯৩)

তাঁর বোন কোন কিছু পানাহার ছাড়াই ধারাবাহিকভাবে সাওম পালন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের সাওম পালনে নিষেধ করতেন। আবূ সা'ঈদও সব সময় তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতেন।

তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের অনুসারী। হযরত আবূ হুরাইরাহ এক মসজিদে নামায পড়াতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা কোন কারণে আসতে পারলেন না। তাঁর পরিবর্তে আবূ সা'ঈদ নামায পড়ালেন। তাঁর নামাযের পদ্ধতির সাথে লোকেরা কিছুটা দ্বিমত পোষণ করলো। তিনি মিম্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) নামায আদায় করতে দেখেছি ঠিক সেইভাবে পড়িয়েছি। এখন তোমরা আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করলে তাতে আমার কিছু যায় আসেনা।

তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। একবার তাঁর পায়ে ব্যথা হলো। তিনি পায়ের ওপর পা রেখে শুয়ে ছিলেন। তাঁর ভাই এসে হঠাৎ সেই পায়ে হাত দিয়ে একটি থাবা মারেন। তাতে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। তিনি অত্যন্ত নরমভাবে বললেন, আমাকে ব্যথা দিলে? তুমি তো জানতে আমার পায়ে ব্যথা। ভাই বললেন ঃ হাঁ, জানতাম। তবে এভাবে শুতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

সরলতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট। একবার একটি জানাযার নামাযের জন্য তাঁকে ডাকা হয়। সবার শেষে একটু দেরীতে তিনি পৌছলেন। লোকেরা তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিল। তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য স্থান খালি করে দেয়। তিনি বললেন ঃ এ উচিত নয়। মানুষের উচিত ফাঁকা জায়গায় বসা। একথা বলে তিনি একটি ফাঁকা স্থানে বসে পড়েন।

আবূ সালামা নামে তার এক ছাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন তাবে'ঈ। তাঁর সাথে ছিল চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একবার আবূ সালামা তাঁকে ডাক দিলেন। তিনি গায়ে চাদর জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আবূ সালামা বললেন, একটু বাগিচা পর্যন্ত চলুন। আপনার সাথে কিছু কথা আছে। তিনি আবূ সালামার সাথে চললেন।

তিনি ইয়াতীমদের প্রতিপালন করতেন। লায়স ও সুলায়মান ইবন 'আমর তাঁরই পালিত। তিনি হাতে একটি ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। হালকা-পাতলা ছড়ি তাঁর পছন্দ ছিল। খেজুরের ডাল সোজা করে তিনি ছড়ি বানাতেন। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসারী। (মুসনাদ-৩/৬৫)

আনাস বলেন ঃ আনসারদের ২০ জন যুবক সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সেবায় নিয়োজিত থাকতো। যে কোন প্রয়োজনে রাসূল (সা) তাদের কাউকে পাঠাতেন। আবদুর রহমান ইবন 'আউফ বলেন, চার অথবা পাঁচজন সাহাবী তো কক্ষণও রাসূলুল্লাহর (সা) বাড়ীর দরযা থেকে উঠতো না। আবূ সা'ঈদ বলেন, আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে থাকতাম। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮৭)

একবার এক ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে তাঁকে দা'ওয়াত করা হয়। তিনি উপস্থিত হয়ে দেখেন, নানা পদের খাবার প্রস্তুত। বাড়ীর লোকদের বললেন, তোমরা কি জাননা, রাসূল (সা) যে দিন দুপুরে খেতেন সে দিন রাতে উপোস যেতেন এবং সকালে নাস্তা করলে দুপুরে খেতেন না? (হায়াতুস সাহাবা-২/৩০৮)

সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস পিতা 'আমর ইবনুল 'আসের সাথে হযরত 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে রনাঙ্গণে যান। এ কারণে হযরত হাসান ইবন 'আলী বহুদিন যাবত তাঁর সাথে কথা বলা বন্ধ রাখেন। হযরত আবূ সা'ঈদ (রা) এ কথা জানতে পেরে 'আবদুল্লাহকে সংগে নিয়ে হাসানের নিকট যান এবং তাঁদের দু'জনের মনোমালিন্য দূর করে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৩৪)

মু'য়াজ ইবন জাবাল (রা)

নাম মু'য়াজ, ডাকনাম আবু আবদির রহমান এবং লকব বা উপাধি 'ইমামুল ফুকাহা, কানযুল 'উলামা ও রাব্বানিয়্যুল কুলূব।' মদীনার খাযরাজ গোত্রের উদায় ইবন সা'দ শাখার সন্তান। অনেকে তাঁকে সালামা ইবন সা'দ শাখার সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেছেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন বনু কুদা'য়া গোত্রের সন্তান, উদায় ইবন সা'দ গোত্রের নন। এ গোত্রের লোকেরা তাঁকে নিজেদের গোত্রের লোক বলে দাবী করতো। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৭, আল-ইসাবা-৪/৪২৭, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৪), উসুদুল গাবা-৪/৩৭৬) হিজরাতের ২০ বছর পূর্বে ৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াসরিবে (মদীনায়) জন্মগ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-৮/১৬৬)

তাঁর বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ সা'দ ইবন আলীর ছিল দুই ছেলে। তাদের নাম সালামা ও উদায়। সালামার বংশকে বলা হয় বনু সালামা। এই বংশে আবু কাতাদাহ, জাবির ইবন আবদিল্লাহ, কা'ব ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম-এর মত বিখ্যাত সাহাবী জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দ ছাড়াও আরও বহু বিশিষ্ট বক্তির এই বংশের সাথে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সালামার ভাই উদায়-এর বংশে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের সময় শুধু এক মু'য়াজ-ই জীবিত ছিলেন এবং হিজরী ১৮ অথবা ১৯ সনে তাঁর মৃত্যুর সাথে এই বংশধারা চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যায়।

ইমাম সাম'য়ানী 'কিতাবুল আনসাব' গ্রন্থে হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ ইবন তাহিরকে এই উদায়-এর বংশের লোক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, ইসলামের প্রাথমিক পর্বে এই খান্দানের দুই ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের একজন মু'য়াজ ইবন জাবাল এবং দ্বিতীয় জন তাঁরই ছেলে 'আবদুর রহমান। আর তাঁরা উভয়ে শামের 'আমওয়াসের মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৬)

বনু উদায়-এর বাসস্থান তাদের চাচাতো গোষ্ঠী বনু সালামের পাশে মসজিদুল কিবলাতাইন-এর ধারে কাছেই ছিল। হযরত মু'য়াজের বাড়ীটিও ছিল এখানে।

হযরত মু'য়াজের পিতা জাবাল ইবন আমর এবং মাতা হিন্দা বিনতু সাহল আল-জুহাইনিয়্যা। বদরী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল জাদ্দ (রা) তাঁর বৈপিত্রীয় ভাই। (তাবাকাত-৩/৫৭১, ৫৮৩) মু'য়াজের ছেলের নাম ছিল আবদুর রহমান। এ জন্য তাঁকে আবু 'আবদির রহমান বলে ডাকা হতো। (তাবাকাত-৩/৫৮৩)

মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ঈ-ই-ইসলাম হযরত মুস'য়াব ইবন উমাইরের (রা) হাতে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মু'য়াজ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ১৮ বছর। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৬) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর পরবর্তী হজ্জ মওসুমে মুস'য়াব ইবন 'উমাইর মক্কায় চললেন। মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমান ও মুশরিকদের একটি দলও হজ্বের উদ্দেশ্যে তাঁর সংগী হলো। হযরত মুয়াজও ছিলেন এই কাফিলার একজন সদস্য। মক্কার আকাবায় তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) দীদার লাভ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন।

এটা ছিল আকাবার তৃতীয় বা শেষ বাইয়াত। এই দলটি মক্কা থেকে ফিরে আসার পর মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।

অল্প বয়স্ক মু'য়াজ যখন মক্কা থেকে ফিরলেন, ঈমানী আবেগে তাঁর অন্তর তখন ভরপুর। এখন কারও বাড়ী মূর্তি থাকাটা তাঁর নিকট অসহনীয়। মদীনায় ফিরে তিনি এবং তাঁর মত আরও কিছু যুবক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই হোক মদীনাকে প্রতীমামুক্ত করবেন। তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে হযরত 'আমর ইবনুল জামূহ প্রতীমা পূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

'আমর ইবনুল জামূহ ছিলেন মদীনার বনু সালামা গোত্রের অতি সম্মানিত সরদার। অন্য নেতাদের মত তাঁরও ছিল একটি অতি প্রিয় কাঠের প্রতীমা। প্রতীমাটির নাম ছিল মানাত। এই প্রতীমাটির প্রতি ছিল 'আমরের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি অতি যত্নসহকারে সুগন্ধি মাখিয়ে রেশমী কাপড় দিয়ে সেটি সব সময় ঢেকে রাখতেন।

মক্কা থেকে ফেরা এই তরুণরা রাতের অন্ধকারে একদিন চুপে চুপে মূর্তিটি তুলে নিয়ে বনু সালামা গোত্রের ময়লা-আবর্জনা ফেলার গর্তে ফেলে দেয়। ইবন ইসহাক এই উৎসাহী তরুণদের তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ও সালামা ইবন গানামা। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯৯)

সকালে ঘুম থেকে উঠে 'আমর ইবন জামূহ যথাস্থানে প্রতীমাটি না পেয়ে খোঁজা-খুঁজি শুরু করলেন। এক সময় ময়লা-আবর্জনার স্তূপে প্রতীমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে বলেন ঃ তোমাদের সর্বনাশ হোক! গত রাতে আমাদের ইলাহ'র সাথে কারা এমন আচরণ করলো? তিনি প্রতীমাটি সেখান থেকে তুলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। প্রতীমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ওহে মানাত, আমি যদি জানতাম, কারা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে।

পরদিন রাতে আবার একই ঘটনা ঘটলো। সকালে 'আমর খুঁজতে খুঁজতে অন্য একটি গর্ত থেকে প্রতীমাটি উদ্ধার করে ধুয়ে মুছে আগের মত রেখে দেন। পরের রাতে একই ঘটনা ঘটলো। তিনিও আগের মত সেটি কুড়িয়ে এনে একই স্থানে রেখে দিলেন। তবে এ দিন তিনি প্রতীমাটির কাঁধে একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

"আল্লাহর কসম! তোমার সাথে কে বা কারা এমন আচরণ করছে, আমি জানিনে। তবে তুমি তাদের দেখেছো। হে মানাত, তোমার মধ্যে যদি কোন ক্ষমতা থাকে তুমি তাদের থেকে আত্মরক্ষা কর। এই থাকলো তোমার সাথে তরবারি।"

রাত হলো। তরুণরা আজও এলো। তারা প্রতীমার কাঁধ থেকে তরবারি তুলে নিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে সেটি বাঁধলো। তারপর প্রতীমাসহ কুকুরটি একটি নোংরা গর্তে ফেলে চলে গেল। 'আমর সকালে খুঁজতে বেরিয়ে মূর্তিটির এমন দশা দেখে তাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার প্রথম লাইনটি এমন ঃ

'আল্লাহর কসম! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ হতে তাহলে এমনভাবে কুকুর ও তুমি এক সাথে গর্তে পড়ে থাকতে না।' (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৩-৫৪)

এভাবে 'আমর ইবন জামূহ মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। (দ্রঃ সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-৭/১২২-১২৬, হায়াতুস সাহাবা-১/২৩০, সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫২, ৪৫৩, ৬৯৯)

হযরত মু'য়াজের ইসলাম গ্রহণের অল্পকাল পরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায়

হিজরাত করেন। ইবন সা'দ বলেন ঃ রাসূলে কারীম (সা) মু'য়াজ ও আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। তবে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক থেকে একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সা) জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে মু'য়াজের দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার ইবন ইসহাকের এ বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন ঃ এটা কেমন করে হতে পারে? দ্বীনী মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ-সম্পর্কের বিষয়টি ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর বদর যুদ্ধের পূর্বে। বদর যুদ্ধের পর মীরাসের আয়াত নাযিল হলে মুওয়াখাতের রীতি রহিত হয়ে যায়। আর জা'ফর ইবন আবী তালিব এর অনেক আগে মক্কা থেকে হাবশায় হিজরাত করেন। রাসূল (সা) যখন মদীনায় এ মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃত্বের রীতি চালু করেন জা'ফর তখন হাবশায় এবং এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর তিনি মদীনায় আসেন। সুতরাং জা'ফর ইবন আবী তালিবের সাথে হযরত মু'য়াজের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—মুহাম্মাদ ইবন ইসহাকের এমন ধারণা একটি মারাত্মক ভ্রান্তি। (দ্রঃ তাবাকাত-৩/৫৮৪, আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৭, তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৯৮, আল-আলাম-৮/১৬৬, সীরাতু ইবন হিশাত-১/৫০৫)

ইবন সা'দ বলেন ঃ মু'য়াজ বিশ অথবা একুশ বছর বয়সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এরপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। (তাবাকাত-৩/৫৮৪, আল-আলাম-৮/১৬৬)

হযরত মু'য়াজ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ হিফজ করেন। রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে যে ছয় ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। (আল-আ'লাম-৮/১৬৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বনু সালামার মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মিত হলে হযরত মু'য়াজ এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন। একদিন তিনি 'ঈশার নামাযে সূরা বাকারাহ পাঠ করেন। পিছনে মুকতাদীদের মধ্যে ছিলেন কর্মক্লান্ত এক ক্ষেত মজুর। হযরত মু'য়াজের নামায শেষ করার আগেই তিনি নামায ছেড়ে চলে যান। নামায শেষে মু'য়াজ বিষয়টি জানতে পেরে মন্তব্য করেন ঃ সে একজন মুনাফিক (কপট মুসলমান)। লোকটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মু'য়াজের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো। রাসূলুল্লাহ (সা) মু'য়াজকে ডেকে বললেন ঃ মুয়াজ! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তারপর তিনি বলেন ঃ ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে। কারণ, তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও ব্যস্ত লোকও থাকে। তাদের সবার কথা তোমার স্মরণে থাকা উচিত। (বুখারী-১/৯৮)

হিজরী নবম সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাবুক অভিযান শেষ করে সবে মাত্র মদীনায় ফিরেছেন। এমন সময় রমজান মাসে ইয়ামনের হিময়ার গোত্রের শাসকের দূত মদীনায় খবর নিয়ে আসে যে, ইয়ামনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ খবর পেয়ে রাসূল (সা) সেখানকার আমীর হিসাবে মু'য়াজ ইবন জাবালকে মনোনীত করেন।

আমীর মনোনীত হওয়ার পূর্বে হযরত মু'য়াজের সকল সহায় সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন ঃ চেহারা-সুরৎ, স্বভাব-চরিত্র ও দানশীলতার দিক দিয়ে মু'য়াজ ছিলেন সর্বোত্তম লোকদের অন্যতম। দরায হস্তের কারণে তিনি প্রচুর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাওনাদাররা তাগাদা দিতে শুরু করলে কিছুদিন তিনি বাড়ীতে লুকিয়ে থাকেন। তারা তাদের পাওনা আদায় করে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করলো। রাসূল (সা) মু'য়াজকে ডাকলেন। পাওনাদার হাজির হলো। তাঁরা বললোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ,

মু'য়াজের নিকট থেকে আমাদের পাওনা আদায় করে দিন। রাসূল (সা) মু'য়াজের দুর্দশা দেখে পাওনাদারদের বললেন ঃ যে তার পাওনা মাফ করে দেবে আল্লাহ তার ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথার পর কিছু পাওনাদার তাদের দাবী ছেড়ে দেয়। তবে অনেকে দাবী ছাড়তে নারাজি প্রকাশ করে। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ মু'য়াজ, তুমি ধৈর্য ধর। তারপর তিনি মু'য়াজের সকল সম্পদ পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। তাতেও তার সব ঋণ পরিশোধ হলো না। তখন তিনি পাওনাদারদের বললেন ঃ এর অতিরিক্ত তোমরা পাবেনা, এই গুলিই নিয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে হযরত মু'য়াজ রিক্ত হস্তে বনু সালামার দিকে ফিরে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি বললো ঃ আবু আবদির রহমান, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু সাহায্য চাইলে না কেন? আজ তো তুমি একেবারে কপর্দকহীন হয়ে পড়েছ। মু'য়াজ বললেন ঃ চাওয়া আমার স্বভাব নয়। মু'য়াজের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) স্মরণ ছিল। একদিন পর তিনি মু'য়াজকে ডাকলেন এবং তাঁকে ইয়ামনে আমীর হিসাবে নিযুক্তির কথা জানিয়ে বললেন ঃ আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২১, তাবাকাত–৩/৫৮৪)

যদিও হযরত মু'য়াজের আমীর হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ণ আস্থা ছিল, তবুও তাঁকে ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে একটি পরীক্ষা নেওয়া উচিত মনে করলেন। তিনি মু'য়াজকে ডেকে প্রশ্ন করলেন ঃ

– আচ্ছা, তুমি ফায়সালা করবে কিভাবে?

– কুরআনের দ্বারা।

– যদি এমন কোন বিষয় আসে যার সমাধান কুরআনে না পাও, তখন কি করবে?

– আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের দ্বারা ফায়সালা করবো।

– যদি এমন কোন বিষয়ের সম্মুখিন হও যার সমাধান কুরআন অথবা সুন্নাতে পাচ্ছ না, তখন কি করবে?

– আমি নিজেই ইজতিহাদ করে ফায়সালা করবো।

হযরত মু'য়াজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর জবাবে রাসূল (সা) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের রাসূলকে (দূত) এমন জিনিসের তাওফীক বা ক্ষমতা দান করেছেন যা তাঁর রাসূলের পছন্দ। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবার পার্শ্বটীকা–৪/৪৫৮, তাবাকাত–২/১৪৭–১৪৮)

মু'য়াজের পরীক্ষা শেষ করে রাসূল (সা) ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখেন। তাতে হযরত মু'য়াজের স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। (আল–আ'লাম–৮/১৬৬) তিনি লেখেন ঃ 'ইন্নি বা'য়াস্তু লাকুম খায়রা আহলী–'– আমি আমার সর্বোত্তম আহল বা পরিজনকে তোমাদের নিকট পাঠালাম। তিনি আরও লিখলেন, তোমরা মু'য়াজ ও অন্য লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাদাকা ও জিযিয়ার অর্থ তার নিকট জমা করবে। আমি মু'য়াজ ইবন জাবালকে ইয়ামনে বসবাসরত সকলের ওপর আমীর নিয়োগ করছি। তাকে সন্তুষ্ট রাখবে এবং এমন যেন না হয় যে সে তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

সফরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে হযরত মু'য়াজ গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে। সেখানে আরও লোক ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে বিদায় নেন। মু'য়াজ উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন, আর তাঁর পাশে রাসূল (সা) পায়ে হেঁটে চলছিলেন।

দুই জনের মধ্যে কিছু কথাবার্তাও হচ্ছিল। রাসূল (সা) বললেন ঃ মু'য়াজ তোমার দায়িত্ব অনেক। কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে। আমি তোমাকে তা গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছি। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। এরপর তুমি মদীনায় ফিরে আমার স্থলে আমার কবর ও মসজিদ যিয়ারত করবে।' সাথে সাথে মু'য়াজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'কেঁদো না। কান্না শয়তানী কাজ। যাও আল্লাহ তোমাকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে হিফাজত করুন।' একথা বলে রাসূল (সা) মু'য়াজকে ছেড়ে দেন। মু'য়াজ অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মদীনার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ মুত্তাকীরাই (খোদাভীরু) আমার নিকটতম মানুষ- তা তারা যে কেউ হোক না কেন এবং যেখানেই থাকুক না কেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৩৩৬)

হযরত মু'য়াজ ইয়ামনে মাত্র দুই বছর ছিলেন। হিজরী নবম সনে 'আমীরের দায়িত্ব নিয়ে ইয়ামনে যান এবং হিজরী একাদশ সনে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত মু'য়াজ ইয়ামন যাওয়ার কিছুদিন পর রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন এবং হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হন। তিনি আমীরে হজ্জের দায়িত্ব দিয়ে 'উমারকে মক্কায় পাঠালেন। এদিকে হযরত মু'য়াজও হজ্জের উদ্দেশ্যে ইয়ামন থেকে সরাসরি তাঁর লাটবহর সহ মক্কায় পৌছলেন। মিনায় দুইজনের সাক্ষাৎ, কুশল বিনিময় ও কোলাকুলি হলো। মু'য়াজের সাথে তাঁর অনেকগুলি দাস ও লাটবহর দেখে 'উমার জিজ্ঞেস করলেন ঃ

- আবু 'আবদির রহমান, এসব কি?
- এগুলি আমার। আমি অর্জন করেছি।
- কিভাবে অর্জন করলে?
- লোকেরা আমাকে হাদিয়া দিয়েছে।
- তুমি আবু বকরকে এসব কথা জানাবে এবং সবকিছুই তাঁর হাতে তুলে দেবে। যদি তিনি তোমাকে কিছু দান করেন, তুমি তা গ্রহণ করবে।
- আমি তোমার কথা মানবো না। মানুষ আমাকে দান করেছে, আর আমি তা আবু বকরের হাতে তুলে দেব?

হযরত 'উমার (রা) মদীনায় ফিরে খলীফাকে পরামর্শ দিলেন, মু'য়াজের জীবন ধারণের মত কিছু অর্থ তাঁকে দিয়ে অবশিষ্ট সবকিছু বাইতুল মালে জমা করা হোক। আবু বকর জবাব দিলেন ঃ তাঁকে 'আমীর নিয়োগ করেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। সে যদি নিজেই জমা দিতে ইচ্ছা করে এবং আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি গ্রহণ করবো। অন্যথায় এক কপর্দকও গ্রহণ করবো না। হযরত 'উমার খলীফার জবাব পেয়ে আবার মু'য়াজের কাছে যান এবং পুনরায় তাঁকে জমা দেওয়ার তাকিদ দেন। এবার মু'য়াজ বলেন ঃ আমাকে রাসূল (সা) ইয়ামনে শুধু এই জন্য পাঠান যে, আমি যেন সেখানে থেকে নিজের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারি। আমি কিছুই দেব না। হযরত 'উমার নীরবে উঠে চলে আসলেন। তবে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

হযরত মু'য়াজ তো 'উমারকে ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য সাহায্যে তিনি 'উমারের সাথে একমত পোষণ করেন। মু'য়াজ রাতে ঘুমিয়ে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সোজা 'উমারের নিকট গিয়ে বললেন ঃ আপনার কথা মানা ছাড়া আমার আর উপায় নেই। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর আপনি আমাকে টেনে ধরে রেখেছেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে মু'য়াজ পানিতে ডুবে যাচ্ছেন এবং 'উমার তাঁকে উদ্ধার করছেন। তারপর মু'য়াজ সকল দাস-দাসী সংগে করে খলীফা আবু বকরের

নিকট হাজির হন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনার পর বলেন, আমার কাছে যা কিছু আছে সবই এনে হাজির করছি। আবুবকর (রা) বললেন ঃ আমি তোমার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করবো না, সবই তোমাকে হিবা বা দান করলাম। কারণ, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছিঃ 'আশা করা যায় আল্লাহ তোমার ক্ষতি পূরণ করে দেবেন।' অন্য একটি বর্ণনা মতে আবু বকর তাঁর নিকট থেকে কিছু সম্পদ গ্রহণ করে তাঁর অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করেন এবং বাকী সম্পদ সবই তাঁকে দান করেন। হযরত 'উমার তখন মু'য়াজকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ এখন সবই তোমার কাছে রাখ। এখন তুমি অনুমতি প্রাপ্ত।

হযরত মু'য়াজ দাসদের সংগে করে বাড়ী ফিরলেন। তাদের সাথে জামায়াতে নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কার জন্য নামায আদায় করলে? তারা বললো ঃ আল্লাহর জন্য। মু'য়াজ বললেন ঃ তাহলে তোমরা মুক্ত, তোমরা তাঁরই জন্য। (তাবাকাত–৩/৫৮৬–৫৮৮, হায়াতুস সাহাবা–১৫২–১৫৪,)

রাসূলুল্লাহ (সা) মু'য়াজকে ইয়ামনে পাঠালেন। একদিকে তিনি ইয়ামনের গভর্ণর, অন্যদিকে সেখানকার তাবলীগ ও দ্বীনী তা'লীমের দায়িত্বশীলও। বিচারের দায়িত্ব ছাড়াও দ্বীনী দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি লোকদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, ইসলামী বিধি–বিধানের প্রশিক্ষণ দিতেন।

তিনি ইয়ামনে থাকাকালীন একবার হাওলান গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এলো। তার ছিল বারোটি ছেলে। তবে সবচেয়ে ছোট ছেলেটিও তখন শ্মশ্রু মন্ডিত। এর দ্বারাই অনুমান করা যায় মহিলার বয়স কত হতে পারে। স্বামীকে একা বাড়ীতে রেখে বারোটি ছেলের সকলকে সংগে করে সে এসেছে। দুই ছেলে তার দুইটি বাহু ধরে চলতে সাহায্য করেছে। মহিলা মু'য়াজকে প্রশ্ন করলো ঃ

- আপনাকে কে পাঠিয়েছে?
- রাসূলুল্লাহ(সা)।
- আপনি তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্বাচিত প্রতিনিধি? আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।
- করুন।
- স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক বা অধিকার কতটুকু?
- যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে তার আনুগত্য করবে।
- আল্লাহর কসম, আপনি একটু ঠিক ঠিক বলবেন।
- আপনি এতটুকুতে সন্তুষ্ট নন?
- ছেলেদের বাবা বৃদ্ধ হয়েছে, আমি তাঁর হক কিভাবে আদায় করবো?
- আপনি তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। যদি কুষ্ঠ রোগে তার দেহ পঁচে ফেটে যায়, রক্ত ও পুঁজ ঝরতে থাকে, আর আপনি তাতে মুখ লাগিয়ে চুষে নেন, তবুও তার হক পুরোপুরি আদায় হবে না। (মুসনাদ–৫/২৩৯, সীরাতু ইবন হিশাম–২/৫৯০–৯১, সীয়ারে আনসার–২/১৬৬)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) গোটা ইয়ামনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন; সান'য়া, কিন্দাহ, হাদরামাউত, জানাদ, খুবাইদ। ইয়ামনের রাজধানী ছিল জানাদ, আর এখানেই থাকতেন হযরত মু'য়াজ। তিনিই জানাদের জামে' মসজিদটির নির্মাতা। (শাজারাতুজ জাহাব–১/৩০) অবশিষ্ট চারটি স্থানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ শাসক নিযুক্ত হন ঃ

সান'য়া– হযরত খালিদ ইবন সা'ঈদ, কিন্দাহ– হযরত মুহাজির ইবন আবী উমাইয়্যা, হাদরামাউত– হযরত যিয়াদ ইবন লাবীদ এবং খুবাইদ ও উপকূলীয় এলাকায়– হযরত আবু মূসা আল–আশয়ারী (রা)। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ এলাকায় সাদাকা, জিযিয়া ইত্যাদি আদায় করে হযরত মু'য়াজের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। রাজকোষের পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন হযরত মু'য়াজ। (শাজারাতুজ জাহাব–১/৩০)

হযরত মু'য়াজ বিভিন্ন সময়ে তাঁর অধীনস্থ শাসকদের এলাকাসমূহ ঘুরে ঘুরে তাঁদের বিচার ও সিদ্ধান্তসমূহ দেখাশুনা করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেও মুকাদ্দামার শুনানী করতেন। একবার হযরত আবু মূসার অঞ্চলে গিয়ে এভাবে একটি মুকাদ্দামার ফায়সালা করেন। এসব সফরে তিনি তাঁবুতে অবস্থান করতেন। আবু মূসার এখানেও তাঁর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। তিনি ও আবু মূসা দুই জনই পাশাপাশি তাঁবুতে অবস্থান করেন। (বুখারী–২/৬৩৩)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মু'য়াজকে ইয়ামনে পাঠান তখন তাঁকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দান করেন। তাতে গনীমাত, খুমুস, সাদাকাত, জিযিয়াসহ বিভিন্ন বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হযরত মু'য়াজ সব সময় তারই আলোকে কাজ করতেন।

একবার এক ব্যক্তি একপাল গরু নিয়ে এলো। গরুগুলি সংখ্যায় ছিল তিরিশটি। রাসূল (সা) তাঁকে তিরিশটি গরুতে একটি বাছুর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ কারণে হযরত মু'য়াজ বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে না জেনে কিছুই গ্রহণ করবো না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (সা) আমাকে কিছুই বলেননি। এ দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়ালীগণ দুনিয়ার অন্যান্য শাসকদের মত অত্যাচারী ছিলেন না। রক্ষক ও রক্ষিতের মাঝে যে সম্পর্ক ইসলাম ঘোষণা করেছিল, তারা সব সময় তা স্মরণে রাখতেন। আর রক্ষকের ওপর শরীয়াত যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছে তারা তা কঠোর ভাবে অনুসরণ করতেন।

বিচার ও সিদ্ধান্তের সময়ও জনগণের অধিকার যাতে খর্ব না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের আদালত সমূহে সর্বদা সত্য ও সততার বিজয় ছিল। এক ইয়াহুদী মারা গেল। একমাত্র ভাই রেখে গেল উত্তরাধিকারী। সেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বিষয়টি হযরত মু'য়াজের 'আদালতে উত্থাপিত হলো। তিনি ভাইকে উত্তরাধিকার দান করেন। (মুসনাদ–৫/২৩০)

হযরত মু'য়াজ ছিলেন জীবনের প্রথম থেকে অতি বুদ্ধিমান। রাসূল (সা) মদীনায় আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে ফায়েজে নববীর বরকতে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ মডেলের রূপ লাভ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে এত মুহাব্বত করতেন যে, অধিকাংশ সময় তাঁকে নিজের বাহনের পিছনে বসার সুযোগ দিয়ে নানা রকম ইলম ও মা'রেফাত শিক্ষা দিতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বাহনের পিছনে বসেছিলেন। রাসূল (সা) ডাকলেন ঃ মু'য়াজ। তিনি জবাব দিলেন ঃ লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ ও সা'দাইকা– হাজির ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূল (সা) আবার ডাকলেন ঃ মু'য়াজ। তিনিও অত্যন্ত আদব ও শ্রদ্ধার সাথে জবাব দিলেন। এভাবে রাসূল (সা) তিনবার ডাকলেন, আর মু'য়াজও প্রতিবার সাড়া দিলেন। তারপর রাসূল (সা) বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কালিমা–ই–তাওহীদ পাঠ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।' মু'য়াজ আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি মানুষের কাছে এই সুসংবাদ কি পৌঁছে দেব? তিনি বললেন ঃ না। কারণ, মানুষ আমল ছেড়ে দেবে। (বুখারী–১/২৪)

হযরত মু'য়াজের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহের এত আধিক্য ছিল যে, তিনি নিজে কোন প্রশ্ন না করলে রাসূল (সা) বলতেন, তুমি একাকী পেয়েও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?

একবার মু'য়াজ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে খচ্চরের ওপর সাওয়ার ছিলেন। রাসূল (সা) চাবুক দিয়ে খচ্চরের পিঠে মৃদু আঘাত করে বলেন ঃ 'তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর হক কি?' মু'য়াজ বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং শিরক থেকে বিরত থাকবে।' কিছুদূর যাওয়ার পর আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলতে পার, আল্লাহর নিকট বান্দার হক বা অধিকার কি? মু'য়াজ বললেন ঃ এ ব্যাপারে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী জানেন। বললেন ঃ 'তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (মুসনাদ–৫/২৩৮)

এভাবে হযরত মু'য়াজ সর্বদা রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ ও আদর লাভে ধন্য হয়েছেন। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ রাসূলাল্লাহর (সা) নিকট শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছেন। একবার তো দরযায় অপেক্ষমান দেখতে পেয়ে রাসূল (সা) তাঁকে একটি জিনিস শিখিয়ে দিলেন। আর একবার বললেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের দরযার কথা বলে দেব? বললেন ঃ হাঁ। ইরশাদ হল ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করবে। (মুসনাদ–৫/২৩৮)

একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। একদিন সকালে যখন সৈন্যরা লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে বসা। তিনি আবদার জানালেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি একটা কঠিন বিষয় জানতে চেয়েছ। তবে আল্লাহ যাকে তাওফীক বা সামর্থ দান করেন তার জন্য সহজ। শিরক করবে না, ইবাদাত করবে, নামায আদায় করবে, যাকাত দান করবে, রমজান মাসে সিয়াম পালন করবে এবং হজ্জ আদায় করবে।' তিনি আরও বলেন ঃ 'কল্যাণের কয়েকটি দ্বার আছে। আমি তোমাকে বলছি, শোন ঃ সাওম– যা ঢালের কাজ করে, সাদাকা– যা পাপের আগুনকে পানির মত নিবিয়ে দেয় এবং যে নামায রাতের বিভিন্ন অংশে আদায় করা হয়। এরপর তিনি নীচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

'তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।' (সূরা সাজদা–১৬)

তিনি আরও বলেন ঃ 'ইসলামের মাথা, খুঁটি ও চূড়ার কথা বলছি। মাথা ও খুঁটি হচ্ছে নামায এবং চূড়া হচ্ছে জিহাদ।' তারপর বললেন ঃ 'এইসব জিনিসের মূল হচ্ছে একটি মাত্র জিনিস। আর তা হলো 'জিহবা'। তিনি নিজের 'জিহবা' বের করে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলেন, একে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।' মু'য়াজ প্রশ্ন করলেন ঃ এই যে আমরা যা কিছু বলি, তার সব কিছুরই কি জবাবদিহি করতে হবে? বললেন ঃ 'মু'য়াজ! তোমার মার সর্বনাশ হোক! অনেকে শুধু এর জন্যই জাহান্নামে যাবে।' (মুসনাদ–৫/২৩১)

একবার তো রাসূল (সা) মু'য়াজকে দশটি বিষয়ের অসীয়াত করলেন। ১· শিরক করবে না। তার জন্য কেউ যদি তোমাকে হত্যা করে অথবা আগুনে পুড়িয়েও মারে, তবুও না। ২· মাতা–পিতাকে কষ্ট দেবে না। তারা যদি তোমাকে তোমার সন্তান–সন্ততি ও বিষয়–সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তবুও। ৩· ফরজ নামায ইচ্ছাকৃতভাবে কক্ষণও তরক করবে না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে আল্লাহ তার জিম্মাদারী থেকে অব্যাহতি নিয়ে নেন। ৪· মদ

পান করবে না। কারণ, এ কাজটি সকল অশ্লীলতার মূল। ৫· পাপ কর্মে লিপ্ত হবে না। পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আল্লাহর ক্রোধ বৈধ হয়ে যায়। ৬· জিহাদের ময়দান থেকে পালাবে না। যদি সকল সৈন্য রক্ত রঞ্জিত ও ধুলিমলিন হয়ে যায় এবং ব্যাপকভাবে মৃত্যুবরণ করে, তবুও না। ৭· মহামারি আকারে কোন রোগ–ব্যাধি দেখা দিলে অটল থাকবে। ৮· নিজের সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ৯· তাদেরকে সর্বদা আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে। ১০· তাদেরকে খাওফে খোদা (আল্লাহর ভয়) শিক্ষা দেবে।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার মু'য়াজকে পাঁচটি জিনিসের তাকিদ দিয়ে বলেছিলেন ঃ যে এই 'আমলগুলি করে আল্লাহ তার জামিন হয়ে যান। ১· অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, ২· জানাযার সাথে চলা, ৩. জিহাদে বের হওয়া, ৪. শাসককে ভীতি প্রদর্শন অথবা সম্মান দেখানোর জন্য যাওয়া, ৫. ঘরে চুপচাপ বসে থাকা– যেখানে সে নিরাপদ থাকে এবং মানুষও তার থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

রাসূল (সা) তাঁকে নৈতিক শিক্ষা দেন এভাবে ঃ 'মু'য়াজ! একটি মন্দ কাজ করার পর একটি নেক কাজ কর। নেক কাজ মন্দ কাজটি বিলীন করে দেয়। আর মানুষের সামনে সর্বোত্তম নৈতিকতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর।' (মুসনাদ–৫/২৩৮)

তিনি মু'য়াজকে এ কথাও শিক্ষা দেন ঃ মাজলুম বা অত্যাচারিতের বদ দু'আ থেকে দূরে থাকবে। কারণ, সেই বদ দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। (বুখারী)

রাসূল (সা) যখন তাঁকে ইয়ামানের আমীর করে পাঠান তখন বলেছিলেন ঃ 'মু'য়াজ! ভোগ–বিলাসিতা থেকে দূরে থাকবে। কারণ, আল্লাহর বান্দা কক্ষণও আরামপ্রিয় ও বিলাসী হতে পারে না।' (মুসনাদ–৫/২৪৩) রাসূল (সা) তাঁকে সামাজিক জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে ঃ 'মানুষের নেকড়ে হচ্ছে শয়তান। নেকড়ে যেমন দলছুট বকরীকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তানও এমন মানুষের ওপর প্রভুত্ব লাভ করে যে জামা'য়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সাবধান! সাবধান! কক্ষণও বিচ্ছিন্ন থাকবে না। সর্বদা জামা'য়াতের সাথে থাকবে। (মুসনাদ–৫/২৪৩)

ইসলামের তাবলীগ ও দা'ওয়াত সম্পর্কে রাসূল (সা) তাকে বলেন ঃ'মু'য়াজ! তুমি যদি কেবলমাত্র একজন মুশরিককেও মুসলমান বানাতে পার তাহলে সেটা হবে তোমার জন্য দুনিয়ার সবকিছু থেকে উত্তম কাজ।' (মুসনাদ–৫/২৩৮)

এমন পবিত্র চিন্তা ও মহোত্তম শিক্ষা লাভ করেছিলেন হযরত মু'য়াজ। একারণে মহান সাহাবী হযরত ইবন মাসউদ তাঁকে শুধু একজন ব্যক্তি নয় বরং একটি উম্মাতই মনে করতেন। তিনি বলেন ঃ 'মু'য়াজ ছিলেন সরল–সোজা একটি আল্লাহ অনুগত উম্মাত। তিনি কখনও মুশরিকদের কেউ ছিলেননা।' ফারওয়া আল–আশজা'ঈ তাঁকে বললেন ঃ 'এমন কথা তো আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ) সম্পর্কেই বলেছেন।' ইবন মাস'উদ আবারও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফারওয়া আল–আশজা'ঈ বলেন ঃ 'আমি ইবন মাস'উদকে তাঁর কথার ওপর অটল থাকতে দেখে চুপ থাকলাম। তারপর তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি জান 'উম্মাত' মানে কি, বা 'কানিত' কাকে বলে? বললাম ঃ আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি বললেন, 'উম্মাত' হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মঙ্গলকে জানেন এবং যার ইকতিদা ও অনুসরণ করা যায়।' আর 'কানিত' বলে আল্লাহর অনুগত ব্যক্তিকে। এই অর্থে মু'য়াজ ছিলো যথার্থই মঙ্গল বা কল্যাণের শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সা) অনুগত ব্যক্তি। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবা–৪/৩৬১, তাহজীবুল আসমা–২/১০০)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালেই মজলিসে শূরা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণরূপ লাভ করে। তবে প্রথম খলীফার যুগেই তার একটি কাঠামো তৈরী হয়ে গিয়েছিল। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে মু'য়াজও ছিলেন। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে যখন মজলিসে শূরার নিয়মিত অধিবেশন বসতো তখনও মু'য়াজ সদস্য ছিলেন। (কানযুল 'উম্মাল–১৩৪)

হযরত 'উমারের খিলাফতকালে শামের ওয়ালী ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান খলীফাকে লিখলেন কিছু কুরআনের মু'য়াল্লিম পাঠানোর জন্য। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে যাঁরা কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন এমন পাঁচ ব্যক্তিকে খলিফা ডাকলেন। তাঁরা হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদা ইবনুস সামিত, আবু আইউব আল–আনসারী, উবাই ইবন কা'ব ও আবুদ দারদা। খলীফা তাঁদেরকে বললেন ঃ শামবাসী ভাইয়েরা এমন কিছু লোক পাঠানোর অনুরোধ করেছে যাঁরা তাদেরকে কুরআনের তা'লীম ও দ্বীনের তারবিয়াত দান করবেন। এ ব্যাপারে আপনাদের পাঁচ জনের যে কোন তিনজন আমাকে সাহায্য করুন। আপনারা ইচ্ছা করলে লটারীর মাধ্যমেও তিন জনের নাম নির্বাচন করতে পারেন। অন্যথায় আমিই তিন জনকে বেছে নিব। তাঁরা বললেন ঃ লটারী কেন? আবু আইউব একজন বৃদ্ধ মানুষ, আর উবাইতো অসুস্থ। বাকী থাকলাম আমরা তিন জন। 'উমার (রা) তাদেরকে হিমস, দিমাশ্‌কও ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। মু'য়াজ গেলেন ফিলিস্তিনে। (সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা–৭/১৩২–১৩৪)

বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রথম খলীফা আবু বকরের (রা) যুগেই হযরত মু'য়াজ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য শামে চলে যান। হযরত 'উমার (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি সিরিয়ার এক ফ্রন্টে যুদ্ধরত। সেখান থেকে তিনি ও আবু 'উবাইদা সমতা ও ন্যায় বিচারের উপদেশ দান করে খলীফাকে একটি পত্র লেখেন। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৩১) খলীফা 'উমারের খিলাফতকালে ইসলামী বিজয়ের প্রবল প্লাবন শামের ওপর দিয়েই বয়ে চলে। হযরত মু'য়াজও একজন সৈনিক হিসাবে রণক্ষেত্রে চরম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রকাশ করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে হযরত মু'য়াজের মধ্যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তাঁর মধ্যে দেখা দেয় বহুবিধ যোগ্যতা। তিনি হন একাধারে শরী'য়াতের মুফতী, মজলিসে শূরার সদস্য, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষক, প্রদেশের ওয়ালী, দূত, সাহসী সেনাপতি, বিজয়ী যোদ্ধা ও যাকাত উসূলকারী ইত্যাদি।

দৌত্যগিরির দায়িত্ব যখন তাঁর ওপর অর্পিত হলো তিনি অতি দক্ষতার সাথে তা পালন করলেন। শামের 'ফাহল' নামক স্থানে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছিল, এমন সময় প্রতিপক্ষ রোমান বাহিনী সন্ধির প্রস্তাব দিল। সেনাপতি আবু 'উবাইদা আলোচনার জন্য মু'য়াজকে নির্বাচন করলেন। মু'য়াজ চললেন রোমান সেনা ছাউনীতে। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, দরবার অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজানো হয়েছে। একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে যার অভ্যন্তরে সোনালী কারুকাজ করা গালিচা বিছানো। হযরত মু'য়াজ ভিতরে না ঢুকে থমকে বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন। একজন খৃষ্টান সৈনিক এগিয়ে এসে বললো ঃ আমি ঘোড়াটি ধরছি, আপনি ভিতরে যান। মু'য়াজ বললেন ঃ আমি এমন শয্যায় বসিনা যা দরিদ্র লোকদের বঞ্চিত করে তৈরী করা হয়েছে। একথা বলে তিনি মাটির ওপর বসে পড়লেন। খৃষ্টানরা দুঃখ প্রকাশ করে বললো ঃ আমরা আপনাকে সম্মান করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আপনি তা অবহেলা করলেন। হযরত মু'য়াজ হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ আমার এমন সম্মানের প্রয়োজন নেই। যদি মাটিতে বসা দাসদের অভ্যাস হয় তা হলে আমার চেয়ে আল্লাহর বড় দাস আর কে আছে? রোমানরা

হযরত মু'য়াজের এমন স্বাধীন ও বেপরোয়া আচরণে হতবাক হয়ে গেল। এমনকি তাদের একজন জিজ্ঞেস করেই বসলো, মুসলমানদের মধ্যে আপনার চেয়েও বড় কেউ কি আছে? তিনি জবাব দিলেনঃ 'মায়াজ'আল্লাহ! (আল্লাহর পানাহ্ চাই) আমি হচ্ছি তাদের এক নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।' লোকটি চুপ হয়ে গেল।

হযরত মু'য়াজ কিছুক্ষণ পর দোভাষীকে বললেন; রোমানদের বল, তারা কোন বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে আমরা বসবো, নইলে চলে যাব। আলোচনা শুরু হলো। রোমানরা বলল ঃ

– আমাদের দেশ আক্রমণ করা হয়েছে কেন? অথচ হাবশা আরবের অতি নিকটে, পারস্যের সম্রাট মারা গেছেন এবং সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব এক মহিলার হাতে। আপনারা ঐ সকল দেশ ছেড়ে আমাদের দিকে ধাবিত হলেন কেন? অন্যদিকে আমাদের সম্রাট দুনিয়ার সকল সম্রাটদের সম্রাট এবং সংখ্যায় আমরা আসমানের তারকারাজি ও দুনিয়ার বালুকারাশির সমান।

মু'য়াজ বললেন ঃ আমরা তোমাদেরকে যা বলতে চাই তার সারকথা হলো, তোমরা ইসলাম কবুল করে আমাদের কিবলার দিকে নামায আদায় কর, মদ পান ছেড়ে দাও, শুকরের মাংস পরিহার কর। তোমরা যদি এইসব কাজ কর তাহলে আমরা তোমাদের ভাই। আর যদি একান্তই ইসলাম গ্রহণ করতে না চাও তাহলে জিযিয়া দাও। তাও যদি না মান তাহলে যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি। যদি আসমানের তারকারাজি ও যমীনের বালুকারাশির পরিমাণ তোমাদের সংখ্যা হয় তাতেও আমাদের বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই।

আর হ্যাঁ, তোমাদের এ জন্য গর্ব যে, তোমাদের শাহানশাহ্ তোমাদের জান–মালের মালিক মুখতার। কিন্তু আমরা যাঁকে বাদশাহ বানিয়েছি কোন ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিতে পারেন না। তিনি ব্যভিচার করলে তাঁকে দুররা লাগানো হবে, চুরি করলে হাত কাটা হবে। তিনি গোপনে বসেন না, নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করেন না। ধন–সম্পদেও আমাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

রোমানরা মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনলো। তাঁর মুখে ইসলামী শিক্ষা ও সাম্যের কথা শুনে তারা হতবাক হয়ে গেল। তারা প্রস্তাব দিল ঃ 'আমরা আপনাদেরকে 'বালকা'–এর সম্পূর্ণ এলাকা এবং 'দূন'– এর যে অংশ আপনাদের অঞ্চলের সাথে মিশেছে, ছেড়ে দিচ্ছি। আপনারা আমাদের এই দেশ ছেড়ে পারস্যের দিকে চলে যান।'

এটা কোন কেনা–বেচার বিষয় ছিল না। তাই হযরত মু'য়াজ নেতিবাচক জবাব দিয়ে সেখান থেকে উঠে আসেন। (সীয়ারে আনসার–২/১৬৯ –১৭১) যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হলো। এ যুদ্ধে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। হযরত আবু 'উবাইদা তাঁকে 'মায়মানা' (দক্ষিণ ভাগ)–এর কমান্ডিং অফিসার নিয়োগ করেন।

হিজরী ১৫ সনে ইয়ারমুকের যুদ্ধ হয়। খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধেও তাঁকে 'মায়মানা'–র দায়িত্ব দেওয়া হয়। শত্রুপক্ষের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে মুসলমানদের 'মায়মানা' মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় হযরত মু'য়াজ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থির চিত্ততার পরিচয় দেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে হুংকার দিয়ে বলেন ঃ আমি পায়ে হেঁটে লড়বো। কোন সাহসী বীর যদি ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে, সে এই ঘোড়া নিতে পারে। রণক্ষেত্রে তাঁর পুত্রও ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, আমিই এ ঘোড়ার হক আদায় করবো। তারপর বাপ–বেটা দু'জন রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যান এবং এমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন যে, বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনী আবার দৃঢ় অবস্থান ফিরে পায়।

হযরত ফারুকে আ'জমের খিলাফতকালে সিরিয়ায় যুদ্ধরত গোটা মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু 'উবাইদা। হিজরী ১৮ সনে সিরিয়ায় মহামারি আকারে প্লেগ বা 'তা'উন' দেখা দেয়। ইতিহাসে এই মহামারি 'আমওয়াসের 'তা'উন' নামে প্রসিদ্ধ। 'আমওয়াস হচ্ছে রামলা ও বাইতুল মাকদাসের মধ্যবর্তী একটি গ্রামের নাম। সেনাপতি হযরত আবু 'উবাইদা সহ বহু মুসলিম সৈনিক এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হযরত আবু 'উবাইদা মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'য়াজকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত মু'য়াজ আবু 'উবাইদার জানাযার নামায পড়ান এবং অন্যদের সাথে কবরে নেমে তাঁকে কবরে শায়িত করেন। এ সময় তিনি সকলের উদ্দেশ্যে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। আবু 'উবাইদার ইনতিকালের পর তিনি কিছু দিনের জন্য সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৮, আল–ইসতীয়াব; আল ইসাবা–৪/৩৫৭,৩৫৯)

মহামারি মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। হযরত 'আমর ইবনুল আস বললেন ঃ আমাদের উচিত এ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া। এ রোগ নয়, এ যেন আগুন। তাঁর এ কথায় হযরত মু'য়াজ দারুণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে একটি ভাষণ দেন। ভাষণের মধ্যে তিনি 'আমরের নিন্দাও করেন। তারপর বলেন, এই মহামারি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বালা–মুসীবত নয়; বরং তাঁর রহমত ও নবীর দু'আ। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিলাম, মুসলমানরা শামে হিজরাত করবে। শাম ইসলামী পতাকাতলে আসবে। সেখানে একটি রোগ দেখা দেবে যা ফোঁড়ার মত হয়ে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করবে। কেউ তাতে মারা গেলে শহীদ হবে। তাঁর সকল 'আমল পাক হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, যদি আমি একথা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনে থাকি তাহলে এই রহমত আমার ঘরেও পাঠাও এবং আমাকেও তার যথেষ্ট অংশ দান কর।' (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭, হায়াতুস সাহাবা–২/৫৮১, ৫৮২)

ভাষণ শেষ করে তিনি পুত্র আবদুর রহমানের নিকট গেলেন। তখন তাঁর দু'আ কবুল হয়ে গেছে। দেখেন, পুত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। পুত্র পিতাকে দেখে কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ 'আল–হাক্কু মির রাব্বিকা ফালা তাকূনান্না মিনাল মুমতারীন–' এই মৃত্যু যা সত্য, আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। সুতরাং কক্ষণও আপনি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে হবেন না। যেমন পুত্র তেমনই পিতা। পিতা জবাব দিলেন ঃ 'সাতাজিদুনী ইনশা আল্লাহু মিনাস সাবিরীন'– ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবে। হযরত আবদুর রহমান মারা গেলেন। পুত্রের মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দুই স্ত্রীও একই রোগে মারা যান। এখন হযরত মু'য়াজ একাকী। নির্দিষ্ট সময়ে তিনিও আল্লাহর এই রহমাতের অংশীদার হন। তাঁর ডান হাতের শাহাদাত আংগুলে একটি ফোঁড়া বের হয়। তিনি অত্যন্ত খুশী ছিলেন। বলছিলেন, দুনিয়ার সকল সম্পদ এর তুলনায় মূল্যহীন। প্রচন্ড ব্যথায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলেন। যখনই চেতনা ফিরে পাচ্ছিলেন, বলছিলেন, 'হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে আমার ব্যথায় ব্যথিত কর। আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি তা তুমি ভালোই জান।'

হযরত মু'য়াজ যে রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খুব অস্থিরভাবে সেই রাতটি কাটান। বার বার শুধু জিজ্ঞেস করেন ঃ দেখতো সকাল হলো কিনা? লোকেরা জবাব দেন ঃ এখনও হয়নি। যখন বলা হলো, হ্যাঁ, সকাল হয়েছে, তিনি বললেন ঃ এমন রাত থেকে আল্লাহর পানাহ চাই যার প্রভাত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। স্বাগতম মৃত্যু, স্বাগতম। তুমি সেই বন্ধুর কাছে এসেছ যে একেবারে রিক্ত ও নিঃস্ব। ইয়া ইলাহী, আমি তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তা তুমি জান। আজ তোমার কাছে আমার বড় আশা। আমি কখনও দুনিয়া এবং দীর্ঘ জীবন এই জন্য

কামনা করিনি যে তা বৃক্ষ রোপণ ও নদী খননে ব্যয় করবো; বরং যদি কামনা করে থাকি তবে তা এ জন্য যাতে প্রচন্ড গরমে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি, উদারতা ও দানশীলতার প্রসার ঘটাতে এবং জিকিরের মজলিসসমূহে আলেমদের সাথে বসতে পারি। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৬২, তাহজীব আল আসমা–১/৩০) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। লোকেরা সান্ত্বনা দিয়ে বলে ঃ আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী, উঁচু মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার না আছে মরণ ভয়, আর না আছে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ। তবে তার দুইটি মুষ্টি আছে আমার জানা নেই আমি তার কোন মুষ্টিতে থাকবো। এই ভয়েই আমি কাঁদছি। এই অবস্থায় তাঁর পবিত্র রূহ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৮, সীয়ারে আনসার–২/১৭৪, ১৭৫)

হযরত মু'য়াজের মৃত্যুসন এবং মৃত্যুর সময় বয়স সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ১৮ অথবা ১৯ সনে ৩৮ বছর বয়সে বাইতুল মাকদাস ও দিমাশকের মধ্যবর্তী এবং জর্দান নদীর তীরবর্তী 'বীসান' নামক স্থানে মারা যান। এরই নিকটবর্তী একটি স্থান যেখান থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত 'ঈসাকে (আ) আসমানে উঠিয়ে নেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। (আল–আ'লাম–৮/১৬৬, উসুদুল গাবা–৪/৩৭৮ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১)

হযরত মু'য়াজের গায়ের রং ছিল সাদা, চেহারা উজ্জ্বল, দৈহিক কাঠামো দীর্ঘাকৃতির, চোখ কালো ও বড়, চুল খুব ঘন এবং সামনের দাঁত ধবধবে সাদা। কথা বলার সময় যেন মুক্তা ঝরতো। কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মিষ্টি–মধুর। দৈহিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছিলেন সাহাবা সমাজের মধ্যমনি। জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) বলেন ঃ মু'য়াজ ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর, সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ব্যক্তি। আবু নু'ঈম বলেন ঃ বিচক্ষণতা, লজ্জাশীলতা, ও বদান্যতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আনসারদের সর্বোত্তম যুবক। ওয়াকিদী বলেন ঃ তিনি ছিলেন সুন্দরতম পুরুষ। (আল–ইসাবা–৪/৪২৭, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৯, উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭)

হযরত মু'য়াজ ৩৮ বছর বয়সে মারা যান। আল–মাদায়িনী, ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেছেন, তাঁর কোন সন্তানাদি হয়নি। তবে বিশ্বস্ত বর্ণনা সমূহে জানা যায় তাঁর এক পুত্র, মতান্তরে দুই পুত্র ছিল। তাদের একজনের নাম আবদুর রহমান এবং অন্যজনের নাম জানা যায় না। এই আবদুর রহমান ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিজরী ১৮ সনে 'আমওয়াসের' মহামারিতে পিতার আগে মারা যান। (আল–ইসতী'য়াব; আল–ইসাবা–৪/৩৫৬)

কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হযরত মু'য়াজ ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে জানা যায়, সাহাবাদের মধ্যে যে চারজনের নিকট থেকে কুরআন গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন, মু'য়াজ তাঁদের অন্যতম। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা আছে। এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তিনি কুরআন হিফ্জ করেছিলেন। খাযরাজীরা বলতো ঃ আমাদের চার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে কুরআন সংগ্রহ করেছে যা অন্যরা করেনি। তাঁদের একজন মু'য়াজ। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৬৪, হায়াতুস সাহাবা–১/৩৯৫)

হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ থেকে আমরণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য সব সময় মদীনা থেকে দূরে ছিলেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। তবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাদীস

বর্ণনার ধারবাহিকতা তিনি চালু রাখেন। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায়ও এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন। (মুসনাদ–৫/২৩৩)

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) ও আরও কিছু লোক তাঁর পাশে ছিলেন। অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে তিনি বললেন, আমি এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবো যা আজ পর্যন্ত এই জন্য গোপন রেখেছিলাম যে তা শুনলে মানুষ হয়তো 'আমল ছেড়ে দিবে। তারপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। (মুসনাদ–৫/৩৩৬)

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত মু'য়াজের নামটি তৃতীয় তবকায় গণনা করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ১৫৭ টি। তার মধ্যে দুইটি মুত্তাফাক আলাইহি, তিনটি বুখারী ও একটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। (আল–আ'লাম–৮/১৬৬, তাহজীবুল আসমা–২/৯৮)

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের সংখ্যা অনেক। উঁচু মর্যাদার সাহাবীদের বড় একটি দল তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ 'উমার, আবু কাতাদাহ আল–আনসারী, আবু মূসা আল–আশ'য়ারী, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, আনাস ইবন মালিক, আবু উমামা আল–বাহিলী, আবু লায়লা আল–আনসারী, আবু তুফাইল ও আরও অনেকে। (আল–ইসাবা–৪/৪২৭, তাহজীবুল আসমা–২/৯৮)

বিশিষ্ট তাবে'ঈ ছাত্রদের মধ্যে ইবন 'আদী, ইবন আবী–আউফা আল–আশয়ারী, আবদুর রহমান ইবন সুমরা লা'বাসী, জাবির ইবন আনাস, আবু সা'লাবা খুশানী, জাবির ইবন সুমরা, মালিক ইবন নীহামীর, আবদুর রহমান ইবন গানাম, আবু মুসলিম খাওলানী, আবদুল্লাহ ইবন সানাবিহী, আবু ওয়ায়িল মাসরূক, জুনাদাহ ইবন আবী উমাইয়্যা, আবু ইদরীস খাওলানী, আসলাম মাওলা 'উমার, আসওয়াদ ইবন হিলাল, আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ প্রমুখ সর্বাধিক খ্যাতি সম্পন্ন। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৮, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৯)

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন কালেই হযরত মু'য়াজ শ্রেষ্ঠ ফকীহদের মধ্যে পরিগণিত হন। খোদ রাসূলে কারীম (সা) তাঁর ফকীহ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? তিনি বলেছেন ঃ 'আ'লামুহুম বিল হালালি ওয়াল হারামি মু'য়াজ ইবন জাবাল– তাদের মধ্যে মু'য়াজ ইবন জাবাল হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় 'আলিম।' (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৯) কা'ব ইবন মালিক বলেন ঃ রাসূল (সা) ও আবু বকরের (রা) যুগে তিনি মদীনায় ফাতওয়া দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৪৫২) ইবনুল আসীর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মুহাজিরদের মধ্যে 'উমার, 'উসমান, আলী এবং আনসারদের মধ্যে মু'য়াজ, 'উবাই ইবন কা'ব ও যায়িদ ইবন সাবিত ফাতওয়া দিতেন। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৭, তাবাকাত–২/৩৫০)

হযরত 'উমার (রা) একবার মু'য়াজ সম্পর্কে বলেন ঃ 'লাওলা মু'য়াজ লাহালাকা 'উমার– মু'য়াজ না থাকলে 'উমার বিনাশ হতো।' এই মন্তব্য দ্বারা তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা ও গবেষণা শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সময় হযরত 'উমার তাঁর ফকীহ ও মুজতাহিদ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জাবিয়ায় প্রদত্ত খুতবায় বলেন ঃ কেউ ফিকাহ শিখতে চাইলে সে যেন মু'য়াজের কাছে যায়। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২০)

প্রশ্ন হতে পারে এই বিশাল জ্ঞান তিনি কিভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে বলা যায় তাঁর স্বভাবগত আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে তিনি এ যোগ্যতা অর্জন করেন। তাছাড়া এমন

প্রতিভাবান ছাত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ দানও এর কারণ। হযরত মু'য়াজ অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আশেপাশে হাজির থাকতেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) প্রত্যেকটি মজলিস ছিল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এক একটি বৈঠক। তিনি সব সময় এই মজলিসের সুযোগ গ্রহণ করতেন।

হযরত মু'য়াজ সুযোগ পেলেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একাকী থাকতেন। রাসূল (সা) এই একাকীত্বের সুযোগে তাঁকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন। কখনও কোন মাসয়ালা জানার প্রয়োজন হলে তখনই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হতেন। তখন রাসূলকে (সা) না পেলে বহু দূর পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করতেন। একবার তিনি গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে। যেয়ে শুনলেন তিনি কোথাও বেরিয়ে গেছেন। তিনি মানুষের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা জিজ্ঞেস করতে করতে এগুতে লাগলেন। এক সময় দেখলেন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। মু'য়াজও রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ নামায আদায় করলেন। নামায শেষে মু'য়াজ বললেন ঃ আপনি আজ দীর্ঘ নামায আদায় করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এটা ছিল আশা ও ভীতির নামায। আমি আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছিলাম। দুইটি দেওয়া হয়েছে এবং একটি দেওয়া হয়নি। তারপর তিনি সেই তিনটি প্রার্থনার কথা মু'য়াজকে বলেন। (মুসনাদ–৫/২৪০)

হযরত মু'য়াজ সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকতেন। সুযোগ পেলেই তিনি জানার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রশ্ন করতেন। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) মেযাজ ও মর্জির প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাবূক যুদ্ধের পূর্বে লোকেরা সূর্যোদয়ের সময় বাহনের পিঠে ঘুমাচ্ছিল এবং উটগুলি এদিক সেদিক চরছিল। হযরত মু'য়াজ এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। তিনি তখন ঘুমিয়ে এবং উটটিও চরছে। মু'য়াজের উটটি হোঁচট খেলো এবং তিনি লাগাম ধরে টান দিলেন। উটটি আরও ক্ষেপে গিয়ে লাফালাফি করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহর (সা) ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি পিছনের দিকে তাকিয়ে মু'য়াজকে দেখে ডাক দিলেন। মু'য়াজ! মু'য়াজ সাড়া দিলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ কাছে এস। মু'য়াজ এত নিকটে গেলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর উট একদম পাশাপাশি এসে গেল। তিনি বললেন, দেখ তো মানুষ কত দূরে? মু'য়াজ বললেন ঃ সবাই ঘুমিয়ে আছে আর পশুগুলি চরছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমিও ঘুমাচ্ছিলাম। মু'য়াজ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অনুমতি দিলে আমি আপনাকে এমন একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম যা আমাকে ভীষণ চিন্তিত ও পীড়িত করে তুলেছে। রাসূল (সা) বললেন, তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার।

হযরত মু'য়াজের স্বভাবেই ছিল জানার আগ্রহ। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একটি বিশেষ মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলো। রাসূল (সা) যে জবাব দিলেন তা একজন সাধারণ লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হযরত মু'য়াজ ততটুকু যথেষ্ট মনে করতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হুকুম কি বিশেষ এই ব্যক্তির জন্য, না সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য? রাসূল (সা) বললেন, না, এটা একটি সাধারণ হুকুম। (মুসনাদ–৫/২৪৪)

জ্ঞান ও বিভিন্ন বিষয়ে ইজতিহাদ ও গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করে তিনি ফকীহ, মুজতাহিদ ও মু'য়াল্লিমের আসনে সমাসীন হন। রাসূলে কারীমের (সা) জীবনেই তিনি শিক্ষকের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। হিজরী অষ্টম সনে মক্কা বিজয়ের পর মক্কাবাসীদের ফিকাহ ও সুন্নাতের তা'লীম দানের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে সেখানে রেখে আসেন। (আনসাবুল আশরাফ–১/৩৬৫, সীরাতু ইবন হিশাম–২/৫০০, তাবাকাত–১/৯৯) তাছাড়া–হিজরী নবম সনে রাসূল (সা)

তাঁকে ইয়ামনে পাঠান। ইয়ামনের অন্যান্য দায়িত্বের সাথে সেখানকার লোকদের শিক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করেন।

মু'য়াজ যখন ফিলিস্তিনে তখন তাঁর শিক্ষাদানের গন্ডি ফিলিস্তিনের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। দিমাশ্‌ক, হিমস প্রভৃতি স্থানেও তাঁর হালকা-ই-দারস ছিল। এ সকল স্থানে তিনি ঘুরে ঘুরে দারস দিতেন। তাঁর দারসের পদ্ধতি ছিল, একটি বৈঠকে কিছু সাহাবী কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, আর হযরত মু'য়াজ চুপ করে বসে শুনতেন। আলোচকরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে তিনি সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতেন।

আবু ইদরীস আল-খাওলানী একবার জামে' দিমাশ্‌ক-এ গিয়ে দেখলেন, এক সুদর্শন যুবককে ঘিরে লোকেরা গোল হয়ে বসে আছে। কোন বিষয়ে তাদের মতভেদ হলে সেই যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আর তিনি সন্তোষজনক জবাব দিচ্ছেন। তিনি যখন জিজ্ঞেস করলেন, যুবকটি কে? বলা হলো- মু'য়াজ ইবন জাবাল।

আবু মুসলিম আল-খাওলানী একবার জামে' হিম্‌স-এ গিয়ে দেখলেন, বত্রিশ জন প্রবীণ সাহাবী গোল হয়ে বসে আছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই বার্দ্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন যুবকও আছেন। কোন মাসয়ালায় তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে এই যুবক মিমাংসা করে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। পরে তিনি জানতে পারেন এই যুবক মু'য়াজ ইবন জাবাল। (তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/২০, হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩১, ৬৩৮) শাহর ইবন হাওশাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাঁদের মধ্যে মু'য়াজ ইবন জাবাল উপস্থিত থাকলে সকলে তাঁর প্রতি সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলতেন, দুনিয়ায় 'আলিম মাত্র তিনজন। তাঁদের একজন শামে বসবাসরত। একথা দ্বারা তিনি মু'য়াজের দিকেই ইঙ্গিত করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করতেন, তোমরা কি জান 'আলিম মতান্তরে 'আকিল কারা? লোকেরা অজ্ঞতা প্রকাশ করলে বলতেন, 'আলিম হলেন মু'য়াজ ইবন জাবাল ও আবুদ দারদা।(তাবাকাত-২/৩৫০)

একজন মুজতাহিদের সবচেয়ে বড় গুণ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। হযরত মু'য়াজ এমন সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন যে খোদ রাসূল (সা) কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইয়ামনে পাঠানোর পূর্বে যে পরীক্ষা গ্রহণ করেন সে সময় তিনি যে জবাব দেন তাতে রাসূল (সা) দারুণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মূলতঃ তাঁর এই জবাবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ইসলামী শরী'য়াতের মৌলিক উৎস তিনটি ঃ ১. কিতাবুল্লাহ, ২. সুন্নাহ ও ৩. কিয়াস।

ইসলামের প্রথম যুগে যারা একটু দেরীতে নামাযের জামা'য়াতে হাজির হতো এবং দুই এক রাকা'য়াত ছুটে যেত,তারা নামাযে দাঁড়ানো লোকদের কাছে ইশারায় জিজ্ঞেস করে জেনে নিত কত রাকা'য়াত হয়েছে। নামাযীরাও ইশারায় তা জানিয়ে দিত। দেরীতে আসা লোকটি প্রথমে তার ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে জামা'য়াতে শরীক হতো। এভাবে একদিন নামায হচ্ছে এবং প্রথম বৈঠক চলছে, এমন সময় মু'য়াজ আসলেন এবং প্রচলিত নিয়মের খিলাফ প্রথমে জামা'য়াতে শরীক হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) সালাম ফিরানোর পর মু'য়াজ উঠে ছুটে যাওয়া রাকা'য়াতগুলি আদায় করলেন। তাঁর এ কাজ দেখে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'কাদ সান্না লাকুম ফা হাকাজা ফাসনা'য়' - মু'য়াজ তোমাদের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি বের করেছে, তোমরাও এমনটি করবে। (মুসনাদ-৫/২৩৩, ২৪৬) হযরত মু'য়াজের জন্য এটা অতি সম্মান ও

গৌরবের বিষয় যে, তাঁরই একটা 'আমল গোটা মুসলিম জাতির জন্য ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা জারী থাকবে।

একবার এক গর্ভবতী মহিলার স্বামী দুই বছর নিরুদ্দেশ থাকে। এর মধ্যে মহিলা গর্ভবতী হয়, মানুষের মনে সন্দেহ হলে তারা বিষয়টি খলীফা 'উমারের নিকট উত্থাপন করে। 'উমার (রা) মহিলাকে রজম করার (যিনার শাস্তি) নির্দেশ দেন। মু'য়াজ বললেন ঃ মহিলাকে রজম করার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু পেটের সন্তানের রজম করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? 'উমার মহিলাকে তখনকার মত ছেড়ে দিয়ে সন্তান প্রসবের পর রজমের নির্দেশ দেন।

মহিলা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। সন্তানটি ছিল অবিকল তাঁর পিতার 'আদলের। তখন পিতা সন্তান দেখে শপথ করে দাবী করে এ তো আমারই সন্তান। এ কথা শুনে 'উমার (রা) মন্তব্য করেন ঃ 'মু'য়াজের মত সন্তান মহিলারা আর জন্ম দিতে পারবে না। মু'য়াজ না থাকলে 'উমার ধ্বংস হয়ে যেত।' তিনি আরও বলতেন ঃ 'মু'য়াজের মত সন্তান জন্ম দিতে মহিলারা অক্ষম হয়ে গেছে।' সাহাবী সমাজের মধ্যে তাঁর বিশাল মর্যাদা সম্পর্কে এমনই একটা ধারণা বিদ্যমান ছিল।

খলীফা 'উমারের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে লোকেরা তাঁর নিকট পরবর্তী খলীফা মনোনয়নের জন্য 'আরজ করলো। তখন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তার মধ্যে এ কথাটিও বলেন যে, 'আজ মু'য়াজ ইবন জাবাল বেঁচে থাকলে তাঁকেই খলীফা বানিয়ে যেতাম। আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আমি এমন এক ব্যক্তিকে খলীফা বানিয়ে এসেছি যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'কিয়ামতের দিন মু'য়াজ সব 'আলিমদের থেকে এক অথবা দুই তীর নিক্ষেপের দূরত্ব আগে থাকবে। (উসুদুল গাবা–৪/৩৭৮, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৯)

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানকে একবার অসীয়াত করেন ঃ 'মু'য়াজ ইবন জাবালের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমি তাঁর সকল অভিযান প্রত্যক্ষ করেছি। রাসূল (সা) একদিন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ কিয়ামতের দিন মু'য়াজ 'আলিমদের থেকে এক তীর নিক্ষেপের দূরত্ব আগে থাকবে। সে এবং আবু 'উবাইদার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। তাতে তোমার মঙ্গল হবে না। (হায়াতুস সাহাবা–২/১১৮) অপর একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ কিয়ামতের দিন সকল 'আলিম মু'য়াজের পতাকাতলে উঠবে। (শাজারাত–১/৩০)

একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) মু'য়াজকে পাঠালেন বনু কিলাব গোত্রে যাকাত আদায় করে গরীবদের মধ্যে বন্টনের জন্য। মু'য়াজ সেখানে গিয়ে দায়িত্ব পালন করে স্ত্রীর নিকট ফিরে আসলেন। যাওয়ার সময় হাতে করে যে জিনিসগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন ফেরার সময় শুধু সেইগুলিই হাতে করে ফিরলেন। স্ত্রী কাছে এসে বললেন ঃ অন্যান্য শাসকরা ঘরে ফেরার সময় তাঁদের পরিবারের লোকদের জন্য নানা রকম উপঢৌকন নিয়ে আসে, দেখি তুমি আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? মু'য়াজ বললেন ঃ আমার সাথে সবসময় একজন পাহারাদার ছিল। সে সতর্কভাবে আমাকে পাহারা দিয়েছে। স্ত্রী বললেন ঃ তুমি ছিলে রাসূলুল্লাহর (সা) ও আবু বকরের পরম বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আর 'উমার কিনা তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছে?

স্বামী–স্ত্রীর এ আলোচনা 'উমারের (রা) মেয়ে মহলের মাধ্যমে তাঁর কানে গেল। তিনি মু'য়াজকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি তোমার পিছনে পাহারাদার নিয়োগ করেছি? মু'য়াজ

বললেন ঃ না, আপনি তা করবেন কেন? তবে আমার স্ত্রীকে বুঝ দেওয়ার জন্য এমন কথা না বলে উপায় ছিলনা। 'উমার একটু হেসে দিলেন। তারপর মু'য়াজের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বলেন, যাও, এইগুলি দিয়ে তোমার স্ত্রীকে খুশী কর। (সুওয়ারুম মিন্ হায়াতিস সাহাবা-৭/১৩১-১৩২)

তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। একারণে তাঁর সকল বিষয়-সম্পত্তি একবার নিলামে উঠে বিক্রী হয়েছিল। তাঁর এই দানশীলতায় ইসলামের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়েছে।

খলীফা 'উমার (রা) একদিন সংগীদের বললেন ঃ আচ্ছা বলতো তোমরা কে কি নেক আশা কর। একজন বললো, আমার বাসনা হলো, আমি যদি এই ঘর ভর্তি দিরহাম পেতাম এবং সবই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারতাম। আরেকজন বললো ঃ আমি যদি এই ঘর ভর্তি সোনাদানা পেতাম এবং আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। এভাবে একেক জন একেক রকম সৎ বাসনা প্রকাশ করলো। সবশেষে 'উমার (রা) বললেন ঃ আমার বাসনা কি জান? আমি যদি এই ঘর ভর্তি পরিমাণ আবু 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মু'য়াজ ইবন জাবাল ও হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামানের মত লোক পেতাম এবং তাদের সকলকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগাতে পারতাম। তারপর তিনি বলেন, এখনই আমি পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দিচ্ছি।

তিনি চাকরকে ডেকে চারশত দীনার ভর্তি একটি থলি তার হাতে দিয়ে বলেন, এগুলি আবু 'উবাইদাকে দিয়ে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতে বলে এস। আবু 'উবাইদা থলিটি হাতে নিয়ে খলীফার চাকর স্থান ত্যাগের পূর্বেই দীনারগুলি বিভিন্ন থলিতে ভরলেন এবং অভাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। অনুরূপভাবে খলীফা আর একটি দীনার ভর্তি থলি পাঠালেন মু'য়াজ ইবন জাবালের কাছে। মু'য়াজও তক্ষুণি দাসীকে ডেকে দীনারগুলি বিভিন্ন লোকের মধ্যে বন্টন শুরু করলেন। থলিতে যখন মাত্র দুইটি দীনার বাকী তখন তাঁর স্ত্রী খবর পেলেন এবং দৌড়ে এসে বললেন, আমিও তো একজন মিসকীন, আমাকেও কিছু দাওনা। মু'য়াজ দীনার দুইটি সহ থলিটি স্ত্রীর দিকে ছুড়ে মেরে বলেন ঃ এই নাও। খলীফা চাকরের মুখে আবু 'উবাইদা ও মু'য়াজের এই আচরণের কথা শুনে দারুণ পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন ঃ তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের ভাই। (হায়াতুস সাহাবা-২/২৩১-২৩৩)

আল্লাহর প্রতি গভীর মুহাব্বত ও ভালোবাসা, তাঁর ইতা'য়াত ও আনুগত্য, 'ইবাদাত ও বন্দেগী এবং তাঁর ওপর তাওয়াককুল ও নির্ভরতা হচ্ছে একজন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট ও পরিচয়। হযরত মু'য়াজের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণরূপ লাভ করে। গভীর রাতে তিনি আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়ে যেতেন। কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন ঃ 'হে আল্লাহ! এখন সকল চক্ষু নিদ্রিত। কিন্তু তুমি চিরজাগ্রত, চিরঞ্জীব। হে আল্লাহ! জান্নাতের দিকে আমার যাত্রা বড় মন্থর এবং জাহান্নাম থেকে পলায়ন বড় দুর্বল। তুমি আমার জন্য তোমার কাছে একটি হিদায়াত নির্দিষ্ট রাখ যা কিয়ামতের দিন আমি লাভ করতে পারি।' (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৭) তিনি যে কত বড় আল্লাহনির্ভর লোক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আমওয়াসের মহামারির সময়। হযরত 'আমার ইবনুল 'আস যখন সৈন্যদের স্থান ত্যাগের পরামর্শ দেন তখন তাঁর পরামর্শকে তাওক্কুলের পরিপন্থী মনে করে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান। শেষ পর্যন্ত তাওয়াক্কুলের ওপর অটল থেকেই সেই মহামারিতে মৃত্যুবরণ করেন।

একদিন হযরত 'উমার (রা) দেখলেন, মু'য়াজ কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তুমি কাঁদছো কেন? মু'য়াজ বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ বিন্দুমাত্র 'রিয়া'ও এক ধরনের শিরক। আর আত্মগোপনকারী-মুত্তাকীরাই হচ্ছে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা।

তাঁরা অদৃশ্য হলে হারায় না এবং দৃশ্যমান হলে চেনা যায়না। তাঁরাই হলেন হিদায়াতের ইমাম ও ইলমের মশাল বা প্রদীপ। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬২৪)

তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার মু'য়াজ ইবন জাবাল আমাদের অঞ্চলে আসেন। আমাদের নেতারা বললো ঃ আপনার অনুমতি পেলে আমরা পাথর ও ইঁট দিয়ে আপনার জন্য একটি মসজিদ বানিয়ে দিতাম। মু'য়াজ বললেন ঃ কিয়ামতের দিন এই মসজিদ আমার পিঠে বহন করতে বলা হয় কিনা সে ব্যাপারে আমি শঙ্কিত। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬২১)

ইসলামী সাম্য ও ন্যায় বিচারে তিনি ছিলেন এক বাস্তব নমুনা। ছোট খাট ব্যাপারেও তিনি ইনসাফ থেকে বিচ্যুৎ হতেন না। ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। মু'য়াজের দুই স্ত্রী ছিল। তিনি তাদের মধ্যে সমতা বিধানের প্রতি ছিলেন দারুণ সতর্ক। যেদিন তিনি এক স্ত্রীর ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন অন্যের ঘরে অজু করা বা এক গ্লাস পানিও পান করতেন না। দুই স্ত্রীই 'আমওয়াসের মহামারিতে এক সাথে মারা যান। দুইজনকে একই কবরে দাফন করা হয়। কবর খোড়া হলে কাকে আগে কবরে রাখা হবে সে ব্যাপারেও লটারী করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬১২)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি মু'য়াজের যে কত গভীর ভালোবাসা ছিল তার কিছু পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনায় পরিসফুট হয়েছে। কখনও তাঁকে না পেলে তিনি অস্থির হয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিয়ম ছিল সফরে রাত্রি যাপনের সময় মুহাজির সঙ্গীদের নিজের কাছেই রাখা। একবার তিনি কোন এক সফরে গেলেন। সাহাবীরাও সংগে ছিলেন। এক স্থানে রাত্রি যাপনের জন্য থামলেন। রাসূল (সা) মু'য়াজ সহ কতিপয় সাহাবীর একটি বৈঠক থেকে কিছু না বলে কোথাও চলে গেলেন। মু'য়াজ অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর আবু মূসাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পথে রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর শুনে এগিয়ে গেলেন। রাসূল (সা) তাঁদের দেখে প্রশ্ন করেন ঃ তোমাদের কি অবস্থা? তাঁরা বললেন ঃ আপনাকে না পেয়ে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।(মুসনাদ–৫/২৩২)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভক্তি ও শ্রদ্ধা। একবার তিনি সফর থেকে ফিরে এসে রাসূলকে (সা) বললেন ঃ আমরা ইয়ামানে একজন অন্যজনকে সিজদাহ করতে দেখেছি। আমরা কি আপনাকে সিজদাহ করতে পারিনে? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি যদি কোন মানুষের জন্য সিজদাহর বিধানই রাখতাম তাহলে মহিলাদেরকে বলতাম তাদের নিজ নিজ স্বামীদেরকে সিজদাহ করতে। (মুসনাদ–৫/২২৭)

একবার মুনাফিক কায়েস ইবন মুতাতিয়্যা একটি মজলিসে উপস্থিত হলো। সেই মজলিসে হযরত সালমান আল–ফারেসী, সুহাইব আর রূমী ও বিলাল আল–হাবশী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করে কায়েস বললো, এই আউস ও খাযরাজ না হয় এই ব্যক্তিকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য করলো; কিন্তু এই সব লোক সাহায্য করছে কেন? একথা বলার সাথে সাথে মু'য়াজ ইবন জাবাল লাফ দিয়ে উঠে তার বুকের ও গলার কাপড় মুট করে ধরে টানতে টানতে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি লোকদের মসজিদে সমবেত হওয়ার আহবান জানাতে বললেন। জনগণ মসজিদে সমবেত হলে তিনি ঐক্য ও সংহতির ওপর এক ভাষণ দান করেন। ভাষণ শেষ হলে মু'য়াজ বলেন, কিন্তু এই মুনাফিকের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ তাঁকে জাহান্নামের জন্য ছেড়ে দাও। মু'য়াজ ছেড়ে দিলেন। পরবর্তীকালে এই কায়েস মুরতাদ হয়ে

ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় এবং এ অবস্থায় মুসলিম মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৭৬, ৪৭৭)

একবার হযরত মু'য়াজ রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর একখানি হাত ধরে বললেন ঃ মু'য়াজ, তোমার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা। উত্তরে মু'য়াজ বললেন ঃ আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আমিও অন্তর দিয়ে আপনাকে ভালোবাসি। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি কক্ষণও তা অবহেলা করবে না। তারপর তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিলেন। হযরত মু'য়াজ আমরণ সেই দু'আটি পাঠ করতেন। (মুসনাদ-৫/২৪৫)

হিজরী ১৬ সনে খলীফা হযরত 'উমার যখন বাইতুল মাকদাস সফর করেন তখন সেখানে হযরত বিলাল ও মু'য়াজও ছিলেন। 'উমার আযান দেওয়ার জন্য বিলালকে অনুরোধ করলেন। বিলাল বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর কারও অনুরোধে কক্ষণও আযান দেবনা। কিন্তু আজ আপনার অনুরোধ রক্ষা করবো। তিনি আযান দিতে শুরু করলেন। আযানের ধ্বনিতে সাহাবীদের মনে রাসূলে পাকের (সা) জীবনকালের স্মৃতি ভেসে ওঠে। তাঁদের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়। হযরত মু'য়াজ তো কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন।

হয়রত মু'য়াবিয়া (রা) যখন শামের গভর্ণর তখন মু'য়াজ একবার সেখানে গিয়ে দেখলেন, লোকেরা 'বিতর' নামায আদায় করে না। তিনি মুয়াবিয়ার কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। বিষয়টি তাঁরও জানা ছিল না। তাই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ বিতর কি ওয়াজিব? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। এভাবে আমর বিল মা'রূপের ব্যাপারে তিনি কারও পরোয়া করতেন না। (মুসনাদ-৫/২৪২)

তিনি ছিলেন সত্যবাদী। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একবার হযরত মু'য়াজ হযরত আনাসের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মু'য়াজকে একথা বলেছেন? জবাবে রাসূল (সা) তিনবার বললেন ঃ মু'য়াজ সত্য বলেছে। (উসুদুল গাবা-৪/৩৭৭)

তাঁর মরণ-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে লোকেরা এই বলে বিলাপ শুরু করে দিল যে, ইল্ম উঠে যাচ্ছে। তারা মু'য়াজকে বললো, আপনি আমাদের বলে যান, আপনার মৃত্যুর পর আমরা কার নিকট যাব। তিনি বললেন ঃ আমাকে একটু উঠিয়ে বসাও। বসানো হলে বললেন ঃ শোন, ইলম ও ঈমান- এ দুইটি উঠার জিনিস নয়। যারা তালাশ করবে তারা লাভ করবে। কথাটি তিনবার বললেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা আবুদ দারদা, সালমান আল-ফারেসী, ইবন মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবন সালাম- এই চার জনের নিকট থেকে ইলম হাসিল করবে। (মুসনাদ-৫/২৪৩)

সীরাত গ্রন্থসমূহে দেখা যায় পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত নাযিলের ঘটনার সাথে হযরত মু'য়াজও প্রতক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। একবার হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালসহ আউস ও খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহুদীদের কয়েকজন আহবারের নিকট তাওরাতের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করেন। কিন্তু তারা সত্যকে গোপন করার উদ্দেশ্যে তা জানাতে অস্বীকার করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক সূরা বাকারার ১৫৯ নং আয়াতটি নাযিল করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৫১)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার ইহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করার পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। তা সত্ত্বেও তারা রাসূলুল্লাহর (সা) কথা মানতে অস্বীকার করতে থাকে। তাদের এ অবস্থা দেখে হযরত মু'য়াজ সহ কতিপয় সাহাবী ইহুদীদেরকে বললেন ঃ ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহর কসম ! তোমরা অবশ্যই জান যে তিনি আল্লাহর রাসূল। আর একথা তো তোমরা তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই আমাদেরকে বলতে এবং তাঁর পরিচয়ও আমাদের কাছে তুলে ধরতে। একথার উত্তরে রাফে ইবন হুরায়মালা ও ওয়াহাব ইবন ইহুজা বললো ঃ না, আমরা কক্ষণও তোমাদেরকে এমন কথা বলিনি। মূসার কিতাবের পর আর কোন কিতাব আল্লাহ নাযিল করেননি এবং আর কোন সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীও আল্লাহ পাঠাননি। তখন আল্লাহ পাক সূরা আল-মায়িদার ১৯ নং আয়াতটি নাযিল করে ইহুদীদের কথার প্রতিবাদ করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫৬৪)

হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে হযরত মু'য়াজ ইবন জাবাল সম্পর্কে এ ধরনের বহু খন্ড খন্ড তথ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা মুসলিম সমাজ চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

হানজালা ইবন আবী 'আমির (রা)

নাম হানজালা, লকব বা উপাধি 'গাসীলুল মালায়িকা' ও তাকী। মদীনার আউস গোত্রের 'আমর ইবন' আউফ শাখার সন্তান। পিতার নাম আবু 'আমির 'আমর, মতান্তরে 'আবদু 'আমর, মাতার নাম জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি খাযরাজ নেতা মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাইয়ের বোন ছিলেন। হানজালার জন্ম ও কৈশোর সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

হানজালার পিতা আবূ 'আমির ছিলেন আউস গোত্রের একজন সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। সেই জাহিলী আরবে দ্বীনে হানীফের একজন বিশ্বাসী হিসেবে তিনি নবুওয়াত, রিসালাত, কিয়ামাত ইত্যাদি বিশ্বাস করতেন। এই ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁকে 'রুহবানিয়্যাত' (বৈরাগ্য)–এর দিকে নিয়ে যায় এবং সব রকম পার্থিব নেতৃত্ব ছেড়ে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জন করেন। জীবনের এক পর্যায়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। একারণে তিনি 'রাহিব' (বৈরাগী) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। (আল–ইসাবা–১/৩৬১)

এদিকে রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন এবং মককা থেকে মদীনায় হিজরাত করে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করেন। এতে আবূ 'আমির ও 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই উভয়ের নেতৃত্বে ভাটা পড়ে। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাই মুনাফিকী (দ্বিমুখী) নীতি অবলম্বন করে মদীনাতেই বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু আবূ 'আমির ততখানি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। তিনি মদীনা ছেড়ে মককায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি কুরাইশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে মদীনা আক্রমণে আসেন। একারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে 'ফাসিক' নামে অভিহিত করেন।

যুদ্ধ শেষে তিনি মককায় ফিরে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। হিজরী অষ্টম সনে মুসলমানদের দ্বারা মককা বিজিত হলে আল্লাহর যমীন তাঁর জন্য আবার সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি মককা ছেড়ে রোমান সম্রাট হিরাকলের দরবারে পৌঁছেন এবং সেখানেই হিজরী দশম সনে মারা যান।

এই তো ছিল আবূ 'আমিরের কুফরী বা অবিশ্বাসের চরম অবস্থা। অপর দিকে তাঁর ছেলে হযরত হানজালার ঈমানী মজবুতীর চরম অবস্থাও লক্ষ্যণীয়। তিনি ইসলাম কবুল করে আবেদন জানান ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নির্দেশ দিলে আমি আমার পিতা আবূ 'আমিরকে হত্যা করতাম। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেননি। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইবন 'উবাইর ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতার ব্যাপারেও অনুরূপ আবেদন জানিয়েছিলেন এবং রাসূল (সা) তাঁকেও একইভাবে নিবৃত্ত করেছিলেন।

হযরত হানজালা বদর যুদ্ধে যোগ দেন নি। এর কারণ জানা যায় না। তবে উহুদ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল তাঁর ইসলামী জীবনের প্রথম ও শেষ যুদ্ধ।

তিনি স্ত্রী উপগত হয়ে ঘরে শুয়ে আছেন। এমন সময় ঘোষকের কণ্ঠ কানে গেল ঃ 'এক্ষুনি জিহাদে বের হতে হবে।' জিহাদের ডাক শুনে 'তাহারাতের' (পবিত্রতা) গোসলের

কথা ভুলে গেলেন। সেই অশুচি অবস্থায় কোষমুক্ত তরবারি হাতে উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হলেন। যুদ্ধ শুরু হলো। তিনি কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ান ইবন হারবের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাকে কাবু করে তরবারির আঘাত করবেন, ঠিক সেই সময় নিকট থেকে শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ আল-লায়সী দেখে ফেলে এবং দ্রুত হানজালার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির এক আঘাতে তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। অনেকে বলেছেন, আবূ সুফইয়ান ও শাদ্দাদ দু'জনে একযোগে তাঁকে হত্যা করেন। তবে 'রাওদুল আন্‌ফ' গ্রন্থকার নাফে' ইবন আবী নু'ঈম- মাওলা জা'উনা ইবন শা'উবকে হানজালার ঘাতক বলে উল্লেখ করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৭৫,১২৩)

বদর যুদ্ধে আবূ সুফইয়ানের পুত্র 'হানজালা' মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তাই উহুদে এই হানজালাকে হত্যার পর সে মন্তব্য করে ঃ 'হানজালার পরিবর্তে হানজালা।'

হযরত হানজালা (রা) নাপাক অবস্থায় শহীদ হন। শাহাদাতের পর ফিরিশতারা তাঁকে গোসল দেয়। তাই দেখে হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের বললেন, তোমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস কর তো ব্যাপার কি? হিশাম ইবন 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) হানজালার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হানজালার ব্যাপারটি কি? স্ত্রী বললেন ঃ হানজালা নাপাক ছিল। আমি তাঁর মাথার একাংশ মাত্র ধুইয়েছি, এমন সময় জিহাদের ডাক তাঁর কানে গেল। গোসল অসম্পূর্ণ রেখেই সেই অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ এই জন্য আমি ফিরিশতাদেরকে তাঁকে গোসল দিতে দেখেছি। (আল-ইসতীয়াবঃ আল-ইসাবার টীকা-১/২৮১; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৪৪) আর এখান থেকেই 'গাসীলুল মালায়িকা' (ফিরিশতাকুল কর্তৃক গোসলকৃত) লকব বা উপাধিতে ভূষিত হন।

হযরত হানজালা মৃত্যুর সময় 'আবদুল্লাহ নামে এক ছেলে রেখে যান। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পর এই 'আবদুল্লাহর জন্ম হয় এবং রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয় মাত্র সাত/আট বছর। পরিণত বয়সে তিনি পিতার সুযোগ্য উত্তরসুরী বলে নিজেকে প্রমাণ করেন। উমাইয়্যা শাসক ইয়াযিদ ইবন মু'য়াবিয়ার কলঙ্কজনক কর্মকান্ডের প্রতিবাদে তাঁর প্রতি কৃত 'বাই'য়াত' (আনুগত্যের অঙ্গীকার) প্রত্যাখ্যান করে তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ইয়াযীদের বাহিনী মদীনা আক্রমণ করে। হযরত 'আবদুল্লাহ অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মদীনাবাসীদের সাথে নিয়ে নিজেই সেনাপতি হিসেবে আক্রমণকারীদের বাধা দেন। অসংখ্য মদীনাবাসী শাহাদাত বরণ করেন। একের পর এক হযরত 'আবদুল্লাহর আট পুত্র ইয়াযীদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য হযরত 'আবদুল্লাহ স্বচক্ষে অবলোকন করেন। অবশেষে তিনি নিজেই অগ্রসর হন। উহুদে শাহাদাতপ্রাপ্ত পিতার রক্তরঞ্জিত পোশাক পরে তিনি শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন। এ ছিল হিজরী ৬৩ সনের জ্বিলহজ্জ মাসের ঘটনা।

হযরত হানজালার পিতা 'ফাসিক' ছিলেন। আর এই 'ফাসিক' পিতার সন্তান হানজালা 'তাকী' (আল্লাহ ভীরু) উপাধি লাভ করেন। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি কত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইবন 'আসাকির বর্ণনা করেছেন, খলীফা 'উমার যখন লোকদের ভাতার ব্যবস্থা করেন তখন হানজালার ছেলে 'আবদুল্লাহর জন্য দুই হাজার দিরহাম নির্ধারণ

করেন। হযরত তালহা তাঁর ভাইয়ের ছেলের হাত ধরে খলীফার নিকট নিয়ে গেলেন। খলীফা তাঁর জন্য কিছু কম অংক নির্ধারণ করলেন। তালহা বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আপনি এই আনসারীকে আমার ভাতীজার চেয়ে বেশি দিলেন? খলীফা বললেন ঃ হাঁ। কারণ, তাঁর পিতা হানজালাকে আমি উহুদে অসির নীচে এমনভাবে হারিয়ে যেতে দেখেছি যেমন একটি উট হারিয়ে যায়। (হায়াতুস সাহাবা–২/২১৮)

একবার আনসারদের দুই গোত্র– আউস ও খাযরাজ নিজেদের গৌরব ও সম্মানের কথা বর্ণনা করছিল। তারা নিজ নিজ গোত্রের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নাম উচ্চারণ করল। আউস গোত্র সর্বপ্রথম উচ্চারণ করল হানজালা ইবন আবী আমিরের পুন্যময় নামটি। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার আউস গোত্রের লোকেরা গর্ব করে বলল ঃ আমাদের আছে হানজালা– যাঁকে ফিরিশতারা গোসল দিয়েছেন; আসিম ইবন সাবিত– আল্লাহ যাঁর দেহ মৌমাছি ও ভীমরুলের দ্বারা মুশরিকদের হাত থেকে হিফাজত করেছিলেন; খুযায়মা ইবন সাবিত– যাঁর একার সাক্ষ্য দুইজনের সাক্ষ্যের সমান; আর আছে সা'দ ইবন 'উবাদা– যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর 'আরশ কেঁপে উঠেছিল।

(দ্রঃ আল–ইসাবা–১/৩৬১, আল–ইসতী'য়াব ঃ আল–ইসাবার টীকা– ১/২৮০–২৮২, সীরাতু ইবন হিশাম–২/৭৫,১২৩) ■

উবাই ইবন কা'ব আল–আনসারী (রা)

নাম উবাই, ডাকনাম আবুল মুনজির ও আবুত তুফাইল। (আল–আ'লাম–১/৭৮; আল–ইসাবা–১/১৯) সায়্যিদুল কুররা, সায়্যিদুল আনসার প্রভৃতি তাঁর লকব বা উপাধি। মদীনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতার নাম কা'ব ইবন কাইস, মাতার নাম সুহাইলা। তিনি বনী 'আদী ইবন নাজ্জারের কন্যা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ তালহা আল–আনসারীর ফুফু। সুতরাং উবাই, আবূ তালহার ফুফাতো ভাই। উবাইর আবুল মুনজির কুনিয়াতটি খোদ রাসূল (সা) দান করেন এবং দ্বিতীয় কুনিয়াতটি হযরত 'উমার (রা) তাঁর ছেলে তুফাইলের নাম অনুসারে আবুত তুফাইল রাখেন। তাঁর জন্মের সঠিক সন–তারিখ জানা যায় না।

হযরত উবাইয়ের প্রথম জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে হযরত আনাস ইবন মালিকের বর্ণনায় এতটুকু জানা যায় যে, ইসলাম–পূর্ব জীবনে তিনি মদ পানে আসক্ত ছিলেন। হযরত আবূ তালহার মদ পানের আড্ডার তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। তাঁকে মদীনার অন্যতম ইয়াহুদী ধর্মগুরু বলে গণ্য করা হতো। প্রাচীন আসমানী কিতাব সমূহেও তাঁর জ্ঞান ছিল। সে যুগে লেখা–পড়ার তেমন প্রচলন ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি লিখতে পড়তে জানতেন। এ কারণে ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহর (সা) সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন এবং কুরআনের অন্যতম লেখকে পরিণত হন। (আল–আ'লাম–১/৭৮)

মদীনায় ইয়াহুদীদের যথেষ্ট ধর্মীয় প্রভাব ছিল। ইসলাম–পূর্ব জীবনে তিনি তাওরাতসহ অন্যান্য যে সকল ধর্মীয় গ্রন্থ পড়েছিলেন, মূলতঃ সেই জ্ঞানই তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনে। যে সকল মদীনাবাসী মক্কায় গিয়ে সর্বশেষ আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন তিনিও তাঁদের একজন। আর এখান থেকেই তাঁর ইসলামী জীবনের সূচনা। (আল–ইসাবা–১/১৯)

হিজরাতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আশারা মুবাশ্শারার অন্যতম সদস্য হযরত সা'ঈদ ইবন যায়িদের সাথে উবাইয়ের মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৫০৫) বালাজুরীর মতে, তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৭১) রাসূল (সা) মদীনায় আগমনের পর হযরত আবু আইউব আল–আনসারীর বাড়ীতে অতিথি হন। তবে একটি বর্ণনা মতে, তাঁর বাহন উটনীটি উবাই ইবন কা'বের বাড়ীতে থাকে। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৬৭)

হযরত উবাই বদর থেকে নিয়ে তায়িফ অভিযান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যোগদান করেন। (আল–ইসাবা–১/১৯; আল–আ'লাম–১/৭৮) কুরাইশরা বদরে পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে প্রতিশোধ নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কায় অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত 'আব্বাস ইবন 'আবদুল মুত্তালিব গোপনে বনী গিফার গোত্রের এক লোকের মাধ্যমে একটি পত্র রাসূলুল্লাহর(সা)

নিকট পাঠান। সেই পত্রে তিনি কুরাইশদের সকল গতিবিধি রাসূলকে (সা) অবহিত করেন। লোকটি মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় পত্রখানি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হস্তান্তর করেন। রাসূল (সা) পত্রখানা সেখানে উবাই ইবন কা'বের দ্বারা পাঠ করিয়ে শোনেন এবং পত্রের বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৪) এই উহুদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। হযরত রাসূল (সা) তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক পাঠান। চিকিৎসক তাঁর রগ কেটে সেই স্থানে সেঁক দেয়।

উহুদ যুদ্ধের শেষে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আহত-নিহতদের খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ একজন সা'দ ইবন রাবী'র খোঁজ নাও তো। একজন আনসারী সাহাবী তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থায় শহীদদের লাশের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করেন। কোন কোন বর্ণনা মতে এই আনসারী সাহাবী হলেন উবাই ইবন কা'ব। (হায়াতুস সাহাবা-২/৯৫)

খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে মককার কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ান, আবূ উসামা আল-জাশামীর মারফত একটি চিঠি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। সেই চিঠিও রাসূল (সা) উবাইয়ের দ্বারা পাঠ করান। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭০) তেমনিভাবে হিজরী ২য় সনের রজব মাসে রাসূল (সা) 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী নাখলা অভিমুখে পাঠান। যাত্রাকালে তিনি 'আবদুল্লাহর হাতে একটি সীলকৃত চিঠি দিয়ে বলেন ঃ 'দুই রাত একাধারে চলার পর চিঠিটি খুলে পাঠ করবে এবং এর নির্দেশ মত কাজ করবে।' রাসূল (সা) এই চিঠিটি উবাইয়ের দ্বারা লেখান। (আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭১)

হিজরী ৯ম সনে যাকাত ফরজ হলে রাসূল (সা) আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। তিনি উবাইকে বালী, 'আজরা এবং বনী সা'দ গোত্রে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠান। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদারী ও সততার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। একবার এক জনবসতিতে গেলেন যাকাত আদায় করতে। নিয়ম অনুযায়ী এক ব্যক্তি তার সকল গবাদিপশু উবাইয়ের সামনে হাজির করে, যাতে তিনি যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। উবাই উটের পাল থেকে দুই বছরের একটি বাচ্চা গ্রহণ করেন। যাকাত দানকারী বললেন ঃ এতটুকু বাচ্চা নিয়ে কি হবে? এতো দুধও দেয় না, আরোহণেরও উপযোগী নয়। আপনি যদি নিতে চান এই মোটা তাজা উটনীটি নিন। উবাই বললেন ঃ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের বিপরীত আমি কিছুই করতে পারি না। মদীনা তো এখান থেকে খুব বেশী দূর না, তুমি আমার সাথে চলো, বিষয়টি আমরা রাসূলকে (সা) জানাই। তিনি যা বলবেন, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবো। লোকটি রাজী হলো। সে তার উটনী নিয়ে উবাইয়ের সাথে মদীনায় উপস্থিত হলো। তাদের কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে উটনী দাও, গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন। লোকটি সন্তুষ্টচিত্তে উটনীটি দান করে বাড়ী ফিরে গেল। (মুসনাদ-৫/১৪২, কানযুল 'উম্মাল-৩/৩০৯, হায়াতুস সাহাবা-১/১৫১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবুবকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়। সাহাবা-ই-কিরামের যে দলটির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়, উবাই ছিলেন তাঁদের নেতা।

তিনি কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন, আর অন্যরা লিখতেন। এই দলটির সকলেই ছিলেন উঁচু স্তরের 'আলিম। এই কারণে মাঝে মধ্যে কোন কোন আয়াত সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হতো। যখন সূরা আত-তাওবার ১২৭ নং আয়াতটি লেখা হয় তখন দলের অন্য সদস্যরা বললেন, এই আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে। হযরত উবাই বললেন ঃ না। রাসূল (সা) এর পরে আরও দু'টি আয়াত আমাকে শিখিয়েছিলেন। সূরা আল্-তাওবার ১২৮ নং আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে। (মুসনাদ-৫/১৩৪)

হযরত আবুবকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত 'উমার (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে অসংখ্য জনকল্যাণ ও সংস্কারমূলক কাজের প্রবর্তন করেন। মজলিসে শূরা তার মধ্যে একটি। বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে এই মজলিস গঠিত হয়। খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে উবাই এই মজলিসের সদস্য ছিলেন। (কানযুল উম্মাল-৩/১৩)

হযরত 'উমারের খিলাফতকালের গোটা সময়টা তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে কাটান। বেশীর ভাগ সময় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। যখন মজলিসে শূরার অধিবেশন বসতো বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো খলীফা 'উমার (রা) তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালের পুরো সময়টা তিনি 'ইফতার' পদে আসীন ছিলেন। এছাড়া অন্য কোন পদ তিনি লাভ করেননি। একবার 'উমারকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে কোন এক স্থানের ওয়ালী (শাসক) নিযুক্ত করেন না কেন? 'উমার (রা) বললেন ঃ আমি আপনার দ্বীনকে দুনিয়ার দ্বারা কলুষিত হতে দেখতে চাই না। (কানযুল 'উম্মাল-৩/১২৩) হযরত 'উমার (রা) যখন তারাবীহর নামায জামা'য়াতের সাথে আদায়ের প্রচলন করেন তখন উবাইকে ইমাম মনোনীত করেন। (বুখারী ঃ কিতাবু সালাতিত তারাবীহ) 'উমার যেমন তাঁকে সম্মান করতেন তেমনি ভয়ও করতেন। তাঁর কাছে ফাতওয়া চাইতেন।

খলীফা 'উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরে উবাই তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। খলীফার ঐতিহাসিক জাবিয়া ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন। বাইতুল মাকদাসের অধিবাসীদের সাথে হযরত 'উমার (রা) যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন তার লেখক ছিলেন হযরত উবাই। (আল-আ'লাম-১/৭৮; সিফাতুস সাফওয়া-১/১৮৮)

'উমারের পর হযরত 'উসমানের (রা) সময় খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও উচ্চারণে বিভিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা 'উসমান (রা) শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি এই বিভিন্নতা দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ক্বারীদের ডেকে পৃথকভাবে তাঁদের তিলাওয়াত শুনলেন। 'উবাই ইবন কা'ব, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস এবং মু'য়াজ ইবন জাবাল- প্রত্যেকেরই উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সকল মুসলমানকে একই উচ্চারণের কুরআনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে চাই।

সেই সময় কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে ১২ ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনে দক্ষ ছিলেন। খলীফা 'উসমান এই ১২ জনের ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। আর এই পরিষদের সভাপতির

দায়িত্ব দান করেন উবাই ইবন কা'বকে। তিনি শব্দাবলী উচ্চারণ করতেন, যায়িদ ইবন সাবিত লিখতেন। আজ পৃথিবীতে যে কুরআন বিদ্যমান তা মূলতঃ হযরত উবাইয়ের পাঠের অনুলিপি। (কানযুল উম্মাল–১/২৮২, ২৮৩)

হযরত উবাইয়ের মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৩৯ সনের এক জুম'আর দিনে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত 'উসমান তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনায় দাফন করা হয়। হাইসাম ইবন 'আদী ও অন্যদের মতে তিনি হিজরী ১৯ সনে মদীনায় মারা যান। আর ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদুল্লাহ প্রমুখের মতে তাঁর মৃত্যু হয় হিজরী ২২ সনে। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৭; শাজারাতুজ জাহাব–১/৩১) তবে বিভিন্ন বর্ণনা মাধ্যমে খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে বিভিন্ন কর্মকান্ডে তাঁর শরীক হওয়ার কথা জানা যায়। অতএব হিজরী ৩৯ সনে তাঁর মৃত্যুর মতটি সঠিক বলে মনে হয়।

হযরত সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে যে সকল সন্তানদের নাম জানা যায় তারা হলেন ঃ ১. তুফাইল, ২. মুহাম্মাদ, ৩. রাবী', ৪. উম্মু 'উমার। প্রথমোক্ত দুইজন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রীর ডাকনাম উম্মু তুফাইল। তিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নামটিও দেখা যায়।

হযরত উবাইয়ের দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির হালকা–পাতলা ধরনের। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌর বর্ণের। বার্দ্ধক্যে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু খিযাব লাগাতেন না। (আল–ইসাবা–১/১৯; আল–আ'লাম–১/৭৮; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৭) স্বভাব ছিল একটু সৌখিন প্রকৃতির। বাড়ীতে গদীর ওপর বসতেন। ঘরের দেওয়ালে আয়না লাগিয়েছিলেন এবং সেইদিকে মুখ করে নিয়মিত চিরুনী করতেন। একটু রুক্ষ প্রকৃতির ছিলেন। সাধারণতঃ স্বভাববিরোধী কোন কথা শুনলেই রেগে যেতেন। হযরত 'উমারের স্বভাবও ছিল একই রকম। এই কারণে মাঝে মাঝে তাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যেত। বিভিন্ন বর্ণনায় এমন বহু ঝগড়ার কথা জানা যায়।

একবার হযরত উবাই একব্যক্তিকে একটি আয়াত শেখালেন। হযরত 'উমার (রা) লোকটির মুখে আয়াতটির পাঠ শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এ পাঠ কার কাছে শিখেছ? লোকটি উবাইয়ের নাম বললো। হযরত 'উমার লোকটিকে সংগে করে উবাইয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং আয়াতটি সম্পর্কে জানতে চান। 'উবাই বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে এভাবেই শিখেছি। হযরত 'উমার আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শিখেছেন? উবাই বললেন ঃ হাঁ। হযরত 'উমার (রা) প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করেন। এবার উবাই ক্ষেপে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'য়ালা এই আয়াতটি জিবরীলের (আ) মাধ্যমে মুহাম্মাদের (সা) অন্তকরণে নাযিল করেন। এই ব্যাপারে খাত্তাব ও তাঁর ছেলের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ কথা শুনে হযরত 'উমার (রা) কানে হাত দিয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যান। (কানযুল 'উম্মাল–১/২৮৭)

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত! উবাই ইবন কা'বের একটি আয়াতের তিলাওয়াতের সাথে

'উমার ইবন খাত্তাব দ্বিমত পোষণ করলেন। উবাই তাঁকে বললেন ঃ আপনি যখন বাকী'র বাজারে কেনা-বেচা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন আমি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে আয়াতটি শুনেছি। 'উমার বললেন ঃ সত্যি কথা বলেছেন। কে সত্য বলে আমি শুধু তাই পরীক্ষা করতে চেয়েছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ উবাই সূরা আল-মায়িদার ১০৭ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলে 'উমার বললেন ঃ মিথ্যা বলছেন। উবাই বললেন ঃ আপনি অধিকতর মিথ্যাবাদী। এক ব্যক্তি বললো ঃ আপনি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদী বললেন? উবাই বললেন ঃ আমি আমীরুল মুমিনীনকে তোমার থেকে বেশী সম্মান করি; কিন্তু তাঁকে আমি কিতাবুল্লাহর তাসদীক বা প্রত্যায়নের ব্যাপারে মিথ্যাবাদী বলেছি। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে আমি তাঁকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করিনি। (কানযুল 'উম্মাল-১/২৮৫; হায়াতুস সাহাবা-১/৭৪)

হযরত আবূ দারদা (রা) একবার শামের অধিবাসীদের বিরাট একটি দলকে কুরআন শিখানোর জন্য মদীনায় নিয়ে আসেন। তারা হযরত উবাইয়ের নিকট কুরআন শিখেন। একদিন তাদেরই একজন হযরত 'উমারের সামনে কুরআন পাঠ করেন। 'উমার তার ভুল ধরেন। লোকটি বলে, আমাকে তো উবাই এভাবে শিখিয়েছেন। 'উমার তার সংগে একজন লোক দিয়ে বলেন ঃ যাও, উবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। তারা উবাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন তিনি উটকে খাবার দিচ্ছেন। তারা বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজে? তারা ঘটনাটি খুলে বললো। তিনি তাদের ওপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বললেন ঃ তোমরা কি ক্ষ্যান্ত দিবে না? রাগের চোটে সেই উটের খাবার হাতে নিয়েই 'উমারের কাছে ছুটে যান। উমার তাঁর ও যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট থেকে আয়াতটি শোনেন। দুইজনের পাঠে কিছু তারতম্য ছিল। হযরত 'উমার যায়িদের পাঠ সমর্থন করেন। এতে উবাই ক্ষেপে গিয়ে বলেন ঃ আল্লাহর কসম! 'উমার! আপনার ভালো জানা আছে, আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অন্দরে থাকতাম আর আপনারা তখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আজ আমার সাথে এমন আচরণ করছেন। আল্লাহর কসম! আপনি যদি বলেন, আমি ঘরেই বসে থাকবো। আমরণ কারও সাথে কথা বলবো না, কাউকে কুরআনও শিখাবো না। 'উমার বললেন ঃ না, এমন করবেন না। আল্লাহ আপনাকে যে ইলম দান করেছেন, আপনি অতি আগ্রহের সাথে তা শিখাতে থাকুন। (কানযুল 'উম্মাল-১/২৮৫)

স্বভাবগতভাবেই হযরত উবাই ছিলেন একটু স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) মদীনার একটি গলি দিয়ে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, পিছন থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, 'উমার। কাছে এসে ইবন 'আব্বাসকে বললেন ঃ তুমি আমার দাসকে সংগে নিয়ে উবাই ইবন কা'বের নিকট যাবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কি অমুক আয়াতটি এভাবে পড়েছেন? ইবন আববাস উবাইয়ের গৃহে পৌছুলেন এবং পরপরই 'উমারও সেখানে হাজির হলেন। অনুমতি নিয়ে তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করলেন। উবাই তখন দেওয়ালের দিকে মুখ করে মাথার চুল ঠিক করছিলেন। 'উমারকে গদীর ওপর বসানো হলো। উবাইয়ের পিঠ ছিল 'উমারের দিকে এবং সেই অবস্থায়ই বসে থাকলেন, পিছনে তাকালেন না। কিছুক্ষণ পর বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, স্বাগত! আমার সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে না অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছেন? 'উমার বললেন ঃ একটি কাজে এসেছি। অতঃপর

একটি আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন– এর উচ্চারণ তো খুব কঠিন। উবাই বললেন ঃ আমি কুরআন তাঁর নিকট থেকেই শিখেছি, যিনি জিবরীলের নিকট থেকে শিখেছিলেন। এ তো খুব সহজ ও কোমল। 'উমার বললেন ঃ আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে একবার একটি বাগিচা নিয়ে খলীফা ও উবাইয়ের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলো। উবাই কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করলেন, আপনার খিলাফতকালে এমন কর্ম? 'উমার বললেন ঃ আমি তো এমনটি চাইনি। মুসলমানদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, আপনি বিচার চাইতে পারেন। তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। উবাই বিচারক মানলেন যায়িদ ইবন সাবিতকে (রা)। 'উমার রাজী হলেন। হযরত যায়িদের এজলাসে মুকাদ্দামার শুনানীর দিন ধার্য হলো। নির্ধারিত দিনে খলীফাতুল মুসলিমীন এজলাসে হাজির হলেন। তিনি উবাইয়ের দাবী অস্বীকার করলেন এবং উবাইকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনি ভুলে গেছেন, একটু চিন্তা করে মনে করার চেষ্টা করুন। উবাই বললেন ঃ এখন আমার কিছুই স্মরণে আসছেনা। তখন হযরত 'উমার ঘটনাটির পূর্ণ চিত্র উবাইয়ের সামনে তুলে ধরেন। বিচারক যায়িদ উবাইকে বললেন, আপনার কোন প্রমাণ আছে কি? তিনি বললেন, না। যায়িদ বললেন ঃ তাহলে আপনি আমীরুল মুমিনীনকে কসম দিতে বাধ্য করবেন না। তখন হযরত 'উমার বললেন ঃ আমার ওপর কসম অপরিহার্য হলে কসম দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। (কানযুল 'উম্মাল– ৩/১৮১–১৮৪; হায়াতুস সাহাবা–১/৯৪)

একবার একব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললো, অমুক তার পিতার স্ত্রীর (সৎমা) সাথে সহবাস করে। উবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলে উঠলেন ঃ আমি এমন ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দিতাম। একথা শুনে রাসূল (সা) একটু মৃদু হেসে বললেন ঃ উবাই কতই না আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তবে আমি তাঁর চেয়েও বেশী আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। আর আল্লাহ আমার চেয়েও বেশী আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। (হায়াতুস সাহাবা–১/৬৩৮)

হযরত উবাই ইবন কা'বের পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জ্ঞান চর্চার জন্য নিবেদিত ছিল। মদীনার আনসার–মুহাজিরগণ যখন ব্যবসা–বাণিজ্য ও কৃষিকাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকতো, হযরত উবাই তখন মসজিদে নববীতে কুরআন–হাদীসের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন–পাঠনে সময় অতিবাহিত করতেন। আনসারদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোন 'আলিম' কেউ ছিলেন না। আর কুরআন বুঝার দক্ষতা এবং হিফ্জ ও কিরআতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত। খোদ রাসূলে কারীম (সা) মাঝে মাঝে তাঁর নিকট থেকে কুরআন তিলওয়াত শুনতেন।

ইসলামী জ্ঞান ছাড়া প্রাচীন আসমানী কিতাবের জ্ঞানেও ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তাওরাত ও ইন্জীলের আলিম ছিলেন। অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূল (সা) সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ ছিল সে বিষয়ে তিনি ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর এই পান্ডিত্যের কারণে হযরত ফারুকে আজম তাঁকে খুবই সমীহ ও সম্মান করতেন। এমন কি তিনি নিজেই বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান জানার জন্য সময়–অসময়ে তাঁর গৃহে যেতেন।

ইসলামের ইতিহাসে গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ মনীষার জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আববাস (রা) 'হিবরুল উম্মাত' নামে খ্যাত। তিনিও হযরত উবাইয়ের হালকা–ই–দারসে উপস্থিত হওয়াকে গৌরবজনক বলে মনে করতেন। তাঁর এই ফজীলাত ও মর্যাদা ছিল নবীর

(সা) নিকট থেকে অর্জিত জ্ঞানের কারণেই। তিনি নবীর (সা) নিকট থেকে এত বেশী পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যে, অন্য কারও নিকট জ্ঞানের জন্য যাওয়ার প্রয়োজন তাঁর ছিল না। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একমাত্র আবুবকর (রা) ছাড়া তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না।

হযরত উবাই (রা) বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তবে বিশেষভাবে কুরআন, তাফসীর, শানে নুযুল, নাসিখ-মানসুখ, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে ছিলেন ইমাম ও মুজতাহিদ। একজন মুজতাহিদ বা গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন। একদিন রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলতো কুরআনের শ্রেষ্ঠতম আয়াত কোনটি? বললেন ঃ আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা) দারুণ খুশী হলেন এবং বললেন ঃ উবাই, এই ইল্ম তোমাকে খুশী করুক।

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি কুরআনের আয়াত নিয়ে কতখানি চিন্তা-ভাবনা করতেন। একবার এক ব্যক্তি উবাইকে বললো, আমাকে কিছু নসীহত বা উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন ঃ কুরআনকে পথের দিশারী মানবে, তার বিধি-নিষেধ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ওপর রাজী থাকবে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তোমাদের জন্য এই জিনিসটিই রেখে গেছেন। তাতে আছে তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের কথা এবং যা কিছু তোমাদের পরে হবে, সব কিছুই। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৮)

উল্লেখিত মতামত দ্বারা উবাই মূলতঃ এই কথাগুলিই প্রকাশ করেছেন ঃ

১. কুরআন ইসলামের পূর্ণ জীবন বিধান।
২. কুরআন মুসলমানদের সর্বোত্তম জীবন বিধান।
৩. কুরআনের সকল কাহিনী ও বর্ণনা শিক্ষা ও উপদেশমূলক।
৪. এতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মোটামুটি আলোচনা এসেছে।

কোন ব্যক্তি যদি এইভাবে কুরআনকে দেখে তাহলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি যে কত বিস্তৃত, গভীর ও সূক্ষ্ম হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই হযরত উবাই কুরআনের সাথে অস্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলেন। রাসূল (সা) মদীনায় আগমনের পর অহী লেখার সর্বপ্রথম গৌরব তিনিই অর্জন করেন। (আল-ইসাবা-১/১৭) তখন থেকেই তাঁর মধ্যে কুরআন হিফ্জ করার প্রবণতা দেখা দেয়। যতটুকু কুরআন অবতীর্ণ হতো তিনি হিফ্জ করে ফেলতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন হিফ্জ শেষ করেন। আনসারদের যে পাঁচ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ কুরআন হিফ্জ করেন তাদের মধ্যে উবাইয়ের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৫) মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা গর্ব করে বলতো ঃ আমাদের গোত্রের চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেনি। তাদের অন্যতম হলেন উবাই ইবন কা'ব। (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৫)

হযরত উবাই পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখ থেকে শুনে হিফ্জ করেন। রাসূলও (সা) অত্যাধিক আগ্রহ দেখে তাঁর শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভীতির কারণে অনেক বিশিষ্ট সাহাবী অনেক সময় তাঁর কাছে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন; কিন্তু উবাই নিঃসংকোচে যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন করতেন। তাঁর এই আগ্রহের কারণে রাসূলও (সা) মাঝে মাঝে প্রশ্ন করার আগেই তাঁকে

অনেক কথা বলে দিতেন। একবার তাঁকে বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন একটি সূরার কথা বলছি, তাওরাত ও ইনজীলে যার সমকক্ষ কোন কিছু নেই। এমন কি কুরআনেও এর মত দ্বিতীয়টি নেই। এতটুকু বলে তিনি অন্য কথায় চলে গেলেন। উবাই বলেন, আমার ধারণা ছিল তিনি বলে দিবেন; কিন্তু তা না বলে বাড়ী যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। আমিও পিছনে পিছনে চললাম। এক সময় তিনি আমার হাত মুট করে ধরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছলেন। তখন আমি সেই সূরাটির নাম বলার জন্য 'আরজ করলাম। তিনি সূরাটির নাম আমাকে বলে দিলেন। (মুসনাদ-৫/১১৪)

একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) ফজরের নামায পড়ালেন এবং একটি আয়াত ভুলে বাদ পড়ে গেল। হযরত উবাই মাঝখানে নামাযে শরীক হন। নামায শেষে রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি আমার কিরআতের প্রতি মনোযোগী ছিলে? লোকেরা কেউ কোন জবাব দিল না। তিনি আবার জানতে চাইলেন, উবাই ইবন কা'ব আছ কি? হযরত উবাই ততোক্ষণে বাকী নামায শেষ করেছেন। তিনি বলে উঠলেন, আপনি অমুক আয়াতটি পাঠ করেননি। আয়াতটি কি 'মানসুখ' (রহিত) হয়েছে নাকি আপনি পড়তে ভুলে গেছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ মানসুখ হয়নি, আমি পড়তে ভুলে গেছি। আমি জানতাম তুমি ছাড়া আর কেউ হয়তো এইদিকে মনোযোগী হবে না। (মুসনাদ-৫/১২৩,১৪৪)

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোন বিষয় হযরত উবাইয়ের বোধগম্য না হলে অন্য সাহবীদের মত চুপ থাকতেন না; বরং বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আলোচনা করতেন এবং বুঝে আসার পরই উঠতেন। একবার মসজিদে নববীতে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) একটি আয়াত পাঠ করলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন হুজায়ল গোত্রের লোক, এ কারণে তাঁর উচ্চারণে একটু ভিন্নতা ছিল। হযরত উবাই তাঁর পাঠ শুনে প্রশ্ন করেন ঃ আপনি এই আয়াত কার কাছে শিখেছেন? আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আয়াতটির পাঠ এভাবে শিখেছি। 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বললেন ঃ আমাকেও তো রাসূল (সা) শিখিয়েছেন। উবাই বলেন, সেই সময় আমার অন্তরে ভ্রান্ত ধারণার প্রবাহ বয়ে যেতে লাগলো। আমি ইবন মাস'উদকে সংগে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে 'আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ও তাঁর কুরআন পাঠে তারতম্য দেখা দিয়েছে। রাসূল (সা) আমার পাঠ শুনলেন এবং বললেন ঃ তুমি ঠিক পড়েছ। তারপর ইবন মাস'উদের পাঠ শুনে বললেন ঃ তুমিও ঠিক পড়েছ। আমি হাত দিয়ে ইশারা করে বললাম ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুইজনের পাঠই সঠিক হয় কি করে?' এতক্ষণে হযরত উবাই ঘেমে একাকার হয়ে গেছেন। রাসূল (সা) এ অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ওপর হাত রেখে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! উবায়ের সংশয় দূর করে দাও।' পবিত্র হাতের স্পর্শে তাঁর হৃদয়ে পূর্ণ প্রত্যয় নেমে আসে।

কিরায়াত শাস্ত্রে হযরত উবাই ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। এই বিষয়ে তিনি এত পারদর্শী ছিলেন যে, স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁর প্রশংসা করেছেন। সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির বিশেষত্ব রাসূল (সা) নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেইসব মহান ব্যক্তির একজন হযরত উবাই। তাঁর সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আকরাহুম উবাই'- তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী উবাই। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৬) মাসরূক থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ইবন মাসউদ, উবাই ইবন কা'ব, মু'য়াজ ইবন জাবাল ও সালিম

মাওলা আবী হুজায়ফা– এই চারজনের নিকট থেকে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে। (আনসাবুল আশরাফ–১/২৬৪)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত 'উমার (রা), উবাই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এসব বাণী অনেকবার মানুষকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেন। একবার মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ উবাই সবচেয়ে বড় ক্বারী। সিরিয়া সফরের সময় 'জাবিয়া' নামক স্থানের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি আর একবার বলেন ঃ তোমাদের কেউ কুরআন শিখতে চাইলে সে যেন উবাইয়ের কাছে আসে। (মুসনাদ–৫/১২৩; হায়াতুস সাহাবা–৩/২০১) হযরত 'উমার তাঁকে সায়্যিদুল মুসলিমীন নামে আখ্যায়িত করেছেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৯; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/১৭; আল–ইসাবা–১/১৯)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজে উবাইকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন। যে বছর তিনি ইনতিকাল করেন সে বছরও উবাইকে কুরআন শোনান। আর একথাও বলেন যে, জিবরীল আমাকে বলেছেন, আমি যেন উবাইকে কুরআন শুনাই।

যখনই কুরআনের যে আয়াতটি বা সূরাটি নাযিল হতো রাসূল (সা) উবাইকে পাঠ করে শোনাতেন। শুধু তাই নয়, মুখস্ত করিয়ে দিতেন। যখন সূরা 'আল–বায়্যিনাহ' নাযিল হয় তখন তিনি উবাইকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তোমাকে কুরআন শিখানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই জিজ্ঞেস করেনঃ আল্লাহ কি আমার নাম বলেছেন? রাসূল (সা) বলেনঃ হাঁ। উবাই তখন খুশীর আতিশয্যে কেঁদে ফেলেন। (আল–ইসাবা–১/১৯) 'আবদুর রহমান ইবন আবী আবযা নামক উবাইয়ের এক ছাত্র উস্তাদের এই ঘটনা অবগত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবুল মুনজির! সম্ভবতঃ সেই সময় আপনি বিশেষ পুলক ও আনন্দ অনুভব করেছিলেন? উবাই বললেনঃ কেন করবো না? একথা বলে তিনি সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতটি পাঠ করেন। (মুসনাদ–৪/১১৩) কিরায়াত শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার কারণে বিশেষ এক ধরনের কিরায়াত সেকালে তাঁর নামে চালু হয় এবং 'কিরায়াতে উবাই' নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশেষতঃ দিমাশ্কবাসীদের মধ্যে তা বেশী প্রচলিত ছিল।

হযরত উবাইয়ের জীবদ্দশায় তাঁর কিরায়াত সারা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। কারণ অনেক মানসূখ (রহিত) আয়াত তাঁর পাঠে বিদ্যমান ছিল। আর এ জন্য হযরত 'উমার (রা) তাঁর মর্যাদা উচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করা সত্ত্বেও বহুবার বহু ক্ষেত্রে উবাইয়ের সাথে কুরআন পাঠের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন, উবাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুরআন জানেন। তা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে হয়েছে। তিনি দাবী করে থাকেন, সবকিছুই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শিখেছেন। তাঁর দাবী অবশ্য সত্য। কিন্তু যখন দেখা যায় বহু আয়াত মানসূখ (রহিত) হয়েছে অথচ তিনি তা জানেন না, তখন তাঁর কিরায়াতের ওপর আমরা কেমন করে অটল থাকতে পারি? (মুসনাদ–৫/১১৩)

তবে পরবর্তীকালে তিনি সংশোধন হয়ে যান। হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে যখন কুরআন সংকলন করা হয় তখন মানসূখ আয়াতের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তখন উবাইয়ের কিরায়াত সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করে এবং সমগ্র মুসলিম খিলাফতে চালু হয়। (দ্রঃ সীয়ারে আনসার–১/১৬২–৬৩)

হযরত উবাই (রা) মৃত্যুর সময় তাঁর কিরায়াত শাস্ত্রে দুইজন যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যান যাঁরা বিশ্ব মুসলিমের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁরা হলেনঃ হযরত আবূ হুরাইরা ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)। পরবর্তীকালে বিখ্যাত সাত ক্বারীর মধ্যে নাফে 'ইবন আবদুর রহমান ও আবূ রূওয়াম মাদানী'র সনদ আবূ হুরাইরার মাধ্যমে এবং 'আবদুল্লাহ ইবন কাসীর মাক্কীর সনদ আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের মাধ্যমে হযরত উবাই ইবন কা'বে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

সেকালে হযরত উবাইয়ের 'মাদরাসাতুল কিরায়াহ' (কিরায়াত শাস্ত্রের শিক্ষালয়) একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। আরব, রোম, শাম এবং ইসলামী খিলাফতের নানা অঞ্চলের ছাত্ররা মদীনায় এসে তাঁর শিক্ষালয়ে কিরায়াত শিখতো। বহু বড় বড় সাহাবী দূর-দূরান্ত থেকে উৎসাহী লোকদের সাথে করে মদীনায় নিয়ে আসতেন এবং উবাইয়ের মাদরাসায় ভর্তি করে দিতেন। হযরত 'উমার তাঁর খিলাফতকালে হযরত আবূ দারদা আল-আনসারীকে (রা) লোকদের কুরআন শিক্ষাদানের জন্য শামে পাঠান। তিনি ছিলেন সেই পাঁচ রত্নের অন্যতম যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় গোটা কুরআন হিফ্জ করেন। তাসত্ত্বেও তিনি উবাইয়ের কিরায়াতের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। একবার হযরত 'উমারের খিলাফতকালে শামবাসীদের একটি দল সংগে নিয়ে তিনি মদীনায় উবাইয়ের নিকট আসেন। তাঁর নিকট তাঁদের সাথে তিনি নিজেও কুরআন পড়েন।

ছাত্রদের শিক্ষা দানের ব্যাপারে হযরত উবাইয়ের যদিও বিশেষ আগ্রহ ছিল, তবে মেযাজ ছিল একটু উগ্র। এই কারণে তাঁর ধৈর্য খুব শিগগিরই ক্রোধে পরিণত হত। তিনি ক্ষেপে যান এই ভয়ে ছাত্ররা প্রশ্ন করতে ভয় পেত। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের ছাত্র যার ইবন জা'য়শ, যিনি হযরত উবাইয়ের ছাত্র হওয়ার গৌরবও অর্জন করেন- একদিন তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সাহস পাননি। একদিন এভাবে ভূমিকা দিয়ে একটি প্রশ্ন করেনঃ 'আমার প্রতি একটু অনুগ্রহের দৃষ্টি দিন। আমি আপনার নিকট থেকে ইলম হাসিল করতে চাই।' উবাই বললেন ঃ হুঁ, সম্ভবতঃ তোমার ইচ্ছা, কুরআনের কোন আয়াত যেন জিজ্ঞাসা থেকে বাকী না থাকে।

এই কারণে তাঁর মজলিস অর্থহীন প্রশ্ন থেকে মুক্ত থাকতো। তিনি সম্ভাব্য কোন সমস্যার উত্তর দিতেন না; বরং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। একদিন তাঁর ছাত্র প্রখ্যাত তাবে'ঈ মাসরূক এমন একটি প্রশ্ন করলে বললেনঃ এমনও কি আছে? মাসরূক বললেনঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে অপেক্ষা কর। যখন তেমন অবস্থা হয় তখন তোমার জন্য ইজতিহাদের কষ্ট স্বীকার করা যাবে। তবে যুক্তি সঙ্গত প্রশ্ন করা হলে তিনি খুশী হতেন।

জুনদুব ইবন 'আবদুল্লাহ আল-বাজালী বলেনঃ আমি ইলম হাসিলের উদ্দেশ্যে মদীনায় গেলাম, রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে উপস্থিত হয়ে দেখলাম লোকেরা বিভিন্ন স্থানে হালকা করে বসে আলোচনা করছে। আমি একটি হালকার কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম তার মধ্যস্থলে একজন বিমর্ষ লোক, পরনে তার দুই প্রস্থ কাপড়। তিনি যেন এই মাত্র সফর থেকে এসেছেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলামঃ 'ক্ষমতাসীন শাসকরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের প্রতি আমার কোন সমবেদনা নেই।' আমি বসলাম। তিনি কিছু কথা বলার পর চলে গেলেন। আমি মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে? তারা বললোঃ ইনি সায়্যিদুল মুসলিমীন উবাই ইবন কা'ব। আমি পিছনে পিছনে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীটি অতি সাধারণ ভাঙ্গাচোরা। তিনি যেন

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসীন এক সাধক। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে প্রশ্ন করলেনঃ কোথা থেকে আসা হয়েছে? বললামঃ ইরাক থেকে। তিনি বললেনঃ লোকেরা আমাকে খুব বেশী প্রশ্ন করে। একথা শুনে আমি একটু ক্ষুণ্ন হলাম। আর কথা না বাড়িয়ে সোজা আমার বাহনের দিকে যেতে যেতে হাত উচিয়ে বলতে লাগলামঃ হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ পেশ করছি। আমরা অর্থ-কড়ি খরচ করে, দৈহিক ক্লেশ-ভোগ করে, বাহন ছুটিয়ে ইলম হাসিলের উদ্দেশে আলিমদের নিকট যাই, আর তাঁরা কিনা আমাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করেন। আমার একথা শুনে উবাই কেঁদে ফেলেন এবং আমাকে খুশী করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেনঃ 'যদি তুমি আমাকে জুম'আর দিন পর্যন্ত সময় দাও তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমি যা শুনেছি তার কিছু তোমাদের শোনাবো। এ ব্যাপারে কারো কোন সমালোচনার পরোয়া আমি করবো না।' আমি ফিরে এসে জুম'আ বারের অপেক্ষা করতে লাগলাম। বৃহস্পতিবারে কোন প্রয়োজনে আমি বের হয়ে দেখি মদীনার সব অলি-গলি লোকে লোকারন্য। আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করলামঃ কী ব্যাপার? লোকেরা অবাক হয়ে বললোঃ মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী। বললামঃ হাঁ। তখন তারা বললো! সায়্যিদুল মুসলিমীন উবাই ইবন কা'বের ইনতিকাল হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২০৬)

হযরত উবাইয়ের জীবনধারা ছিল অতি সাধারণ, তবে গাম্ভীর্যপূর্ণ। বাড়ীর ভিতরে এবং বাইরে উভয় স্থানে গদীর ওপর বসতেন, আর ছাত্ররা বসতেন সাধারণ সারিতে। মজলিসে আসা এবং মজলিস থেকে যাওয়ার সময় তাঁর সম্মানে ছাত্ররা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যেত। সে যুগে এই নিয়ম ছিল সম্পূর্ণ নতুন। একবার সুলায়ম ইবন হানজালা কোন একটি মাসয়ালা জানার জন্য উবাইয়ের নিকট আসলেন। যখন উবাই উঠলেন তখন ছাত্ররা তাঁর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলো। হযরত 'উমার এ অবস্থা দেখে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেনঃ এটা আপনার জন্য ফিত্না এবং তাদের জন্য অপমান। (কানযুল 'উম্মাল-৮/৬১; হায়াতুস সাহাবা-১/৬৯৮)

প্রথম জীবনে তিনি ছাত্রদের নিকট থেকে হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালে একবার তুফাইল ইবন 'আমর আদ-দাওসীকে কুরআন শিখিয়েছিলেন। তিনি একটি ধনুক হাদীয়া দেন। উবাই ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কোথায় পেয়েছ? বললেনঃ একজন ছাত্রের হাদীয়া। রাসূল (সা) বললেনঃ তাকে ফিরিয়ে দাও। ভবিষ্যতে এমন হাদীয়া থেকে দূরে থাকবে।

আর একবার একজন ছাত্র কাপড় হাদীয়া দেয়। সেবারও একই অবস্থা দেখা দেয়। এই কারণে পরবর্তীকালে কোন রকম হাদীয়া তোহফা গ্রহণ করতেন না। শামের লোকেরা যখন তাঁর নিকট কুরআন শিখতে আসে, তখন তারা মদীনার কাতিবদের (লেখক) দ্বারা কুরআন লিখিয়েও নিত। বিনিময়ে তারা লেখকদের আহার করিয়ে পরিতুষ্ট করতো। কিন্তু হযরত উবাই কোন দিন তাদের কোন খাবারে হাত দেননি। হযরত 'উমার (রা) একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেন, শামীদের খাবার কেমন? তিনি বলেনঃ আমি তাদের খাবার খাইনা। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৪১)

কিরায়াত শিক্ষাদানের সময় হরফের যথাযথ উচ্চারণের প্রতি জোর দিতেন। এতে মদীনা

ও তার আশে-পাশের লোকদের তেমন অসুবিধা হতো না। তবে মরু-বেদুঈন ও অন্য দেশের অধিবাসী, যারা আরবী বর্ণ-ধ্বনির বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানতো না তাদের নিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়তেন। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এই সমস্যার সমাধান করতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় এক ইরানীকে তিনি কুরআন শিখাতেন। যখন আদ-দুখানের ৪৩ নং আয়াত 'ইন্না শাজারাতুজ যাকুম, তা'য়ামুল আছীম' পর্যন্ত পৌছেন তখন লোকটির 'আছীম' শব্দের উচ্চারণে বিভ্রাট দেখা দেয়। হযরত উবাই উচ্চারণ করেন 'আছীম' আর লোকটি উচ্চারণ করে 'ইয়াতীম'। একদিন উবাই তাকে শব্দটির উচ্চারণ মশ্‌ক করাচ্ছেন, এমন সময় রাসূল (সা) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উবাইয়ের অস্থিরতা ও দুঃশ্চিন্তা দেখে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি ইরানী লোকটিকে প্রথমে বলেনঃ বল, 'তা'য়ামুজ জালিম'। লোকটি পরিষ্কারভাবে তা উচ্চারণ করলো। তখন তিনি উবাইকে বললেনঃ প্রথমে তার জিহবা ঠিক কর এবং তাকে বর্ণ-ধ্বনির উচ্চারণ শিখাও। আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন।

হযরত উবাই (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যতটুকু কুরআন পড়তেন, ঘরে ফিরে তা লিখে রাখতেন। কিরায়াত শাস্ত্রের ইতিহাসে এই কুরআনই 'মাসহাফে উবাই' নামে প্রসিদ্ধ। এই মাসহাফ হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই মাসহাফের খ্যাতি ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। হযরত উবাইয়ের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মদীনায় বসবাস করতেন। একবার ইরাক থেকে কিছু লোক তাঁর নিকট এসে বললো, আমরা আপনার পিতার মাসহাফ শরীফ দেখার জন্য এসেছি। তিনি বললেনঃ তা তো আমাদের নিকট নেই, খলীফা উসমান তা নিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত উবাই ছিলেন কুরআনের মুফাস্‌সির (ভাষ্যকার) সাহাবীদের অন্যতম। এই শাস্ত্রের বড় একটি অংশ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর আর রাযী তার বর্ণনাকারী। মাত্র তিনটি মাধ্যমে এই সনদ হযরত উবাই পর্যন্ত পৌছেছে। এই শাস্ত্রে হযরত উবাইয়ের বহু ছাত্র ছিল। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের বর্ণনা ছড়িয়ে রয়েছে। তবে তার সিংহভাগ আবুল আলীয়্যার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছেছে। এই আবুল আলীয়্যার ছাত্র রাবী ইবন আনাস। ইমাম তিরমিযীর সনদের ধারাবাহিকতা এই রাবী পর্যন্ত পৌছেছে। উবাইয়ের তাফসীরের বর্ণনাসমূহ ইবন জারীর ও ইবন আবী হাতেম প্রচুর পরিমাণে নকল করেছেন। হাকেম তাঁর মুসতাদরাকে এবং ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে কিছু বর্ণনা সংকলন করেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রে হযরত উবাই থেকে দুই রকম রিওয়ায়াত (বর্ণনা) আছে। ১· তিনি রাসূলুল্লাহকে(সা) যে সকল প্রশ্ন করেন এবং রাসূল (সা) তার যে সকল জবাব দেন, তাই। ২· এমন সব তাফসীর যা খোদ উবাইয়ের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের তাফসীর, যেহেতু তা রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হয়েছে এ কারণে তা ঈমান ও ইয়াকীনের স্তরে উন্নীত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকারের তাফসীর হচ্ছে হযরত উবাইয়ের মতামত ও সিদ্ধান্তের সমষ্টি। তার কোনটিতে তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন (কুরআনের দ্বারা কুরআনের তাফসীর)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, কোনটিতে সমকালীন চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে, আবার কোনটিতে ইহুদী বর্ণনার প্রভাব পড়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ সবের উর্ধে উঠে একজন মুজতাহিদের মত নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। মূলতঃ এটাই তাঁর তাফসীর শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। শানে নুযূল বিষয়ে তাঁর থেকে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। তাফসীরের বিভিন্ন গ্রন্থে তা ছড়িয়ে রয়েছে।

সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে যাঁদেরকে হাদীসের বিশেষজ্ঞ বলা হয় উবাই ইবন কা'ব তাঁদের অন্যতম। আল্লামা জাহাবী বলেছেনঃ উবাই ছিলেন সেই সকল ব্যক্তির একজন যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে হাদীসের বিরাট এক অংশ শুনেছিলেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৬) এই কারণে আলিম সাহাবীদের মধ্যে যাঁদের নিজস্ব হালকা-ই-দারস ছিল তাঁরাও উবাইয়ের হালকা-ই-দারসে শরীক হওয়াকে গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। আর এই কারণে তাঁর হালকা-ই-দারসে তাবে'ঈদের চেয়ে সাহাবীদের সমাবেশ ঘটতো বেশী। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব, আবূ আইউব আল-আনসারী, উবাদাহ ইবন সামিত, আবূ হুরাইরা , আবূ মূসা আল-আশ'য়ারী, আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, সাহল ইবন সা'দ, সুলায়মান ইবন সুরাদ (রা) প্রমুখের মত উঁচু স্তরের সাহাবীরা উবাইয়ের দারসে বসাকে গৌরবের বিষয় মনে করতেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/১৭) তাঁর দারসের নির্দিষ্ট সময় ছিল। তবে তাঁর জ্ঞান ভান্ডার সবার জন্য সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। যখন তিনি নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে আসতেন তখন কেউ কিছু জানতে চাইলে মাহরূম করতেন না।

কায়স ইবন 'আববাদ সাহাবীদের দীদার লাভে ধন্য হওয়ার জন্য একবার মদীনায় আসেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ 'আমি মদীনায় উবাই ইবন কা'ব অপেক্ষা অধিকতর বড় কোন 'আলিম পাইনি। নামাযের সময় হলে মানুষ সমবেত হলো। জনগণের মধ্যে হযরত 'উমারও ছিলেন। হযরত উবাই কোন একটি বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দানের প্রয়োজন অনুভব করলেন। নামায শেষে তিনি দাঁড়ালেন এবং সমবেত জনমন্ডলীর নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস পৌছালেন। জনতা অত্যন্ত আগ্রহ ও আবেগের সাথে নীরবে তাঁর কথা শুনছিল।' হযরত উবাইয়ের এমন সম্মান ও মর্যাদা দেখে কায়স আজীবন মুগ্ধ ছিলেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত উবাই ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও সতর্ক। এ কারণে জীবনে বিরাট এক অংশ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যে কাটালেও খুব বেশী হাদীস তিনি বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর বর্ণিত ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-আ'লাম-১/৭৮)

সাহাবা-ই-কিরামের মধ্যে যাঁদের ইজতিহাদ ও ইসতিম্বাতের যোগ্যতা ছিল, উবাই তাঁদের অন্যতম। হয়রত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালেই তিনি ফাতওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। হযরত আবূ বকরের (রা) খিলাফত কালেও সিদ্ধান্তদানকারী ফকীহদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইবন সা'দ বর্ণনা করেনঃ আবূ বকর (রা) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল ও সিদ্ধান্তদানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। এই সকল ব্যক্তির একজন ছিলেন উবাই ইবন কা'ব। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৫) হযরত 'উমার ও হযরত 'উসমানের খিলাফতকালেও তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবন সা'দ, সাহল ইবন আবী খায়সামা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) যুগে তিনজন মুহাজির ও তিনজন আনসার ফাতওয়া দিতেন। তাঁরা হলেনঃ 'উমার, 'উসমান, আলী, উবাই, মু'য়াজ ও যায়িদ ইবন সাবিত। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪)

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা বিষয়ে তাঁর নিকট ফাতওয়া চাওয়া হতো। এই ফাতওয়া তলবকারীদের মধ্যে সম্মানিত সাহাবা-ই-কিরামও থাকতেন। সুমরাহ্ ইবন জুনদুব ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। তিনি নামাযে তাকবীর ও সূরা পাঠের পর একটু দেরী করতেন। লোকেরা আপত্তি জানালো। তিনি হযরত উবাইকে লিখলেন, এ ব্যাপারে প্রকৃত

তথ্য আমাকে অবহিত করুন, আমি ভুলে গেছি। হযরত উবাই সংক্ষিপ্ত জবাব লিখে পাঠান। তাতে তিনি বলেনঃ আপনার পদ্ধতি শরীয়াত অনুসারী। আপত্তি উত্থাপনকারীরা ভুল করছে। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫১)

তাঁর ইজতিহাদের পদ্ধতি ছিল, প্রথমে কুরআনের আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করা, তারপর সেই বিষয়ে হাদীসের সন্ধান করা। আর যখন কোন বিষয়ে কুরআন হাদীস সম্পর্কে কিছু না পেতেন তখন কিয়াস বা অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

হয়রত 'উমারের নিকট এক মহিলা এসে দাবী করলো যে, সে যখন গর্ভবতী তখন তার স্বামী মারা গেছে। এখন সে সন্তান প্রসব করেছে; কিন্তু 'ইদ্দতের সময় সীমা পূর্ণ হয়নি, এ বিষয়ে সে খলীফার মতামত চাইলো। খলীফা 'উমার বললেনঃ 'ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মহিলা উঠে উবাই ইবন কা'বের নিকট গেল এবং 'উমারের নিকট তার যাওয়া, ফাতওয়া জিজ্ঞেস করা ইত্যাদি তাঁকে অবহিত করলো। উবাই বললেনঃ তুমি 'উমারের কাছে আবার যাও এবং তাঁকে বল, উবাই বলেছেনঃ মহিলার 'ইদ্দত পূর্ণ হয়ে হালাল হয়ে গেছে। যদি তিনি আমার কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবে, আমি এখানে বসে আছি, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাবে। মহিলা 'উমারের নিকট ফিরে গেল। 'উমার (রা) উবাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি হাজির হলে 'উমার জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি একথা কিভাবে বললেন এবং কোথায় পেলেন? তিনি বললেনঃ কুরআনে পেয়েছি। এই বলে তিনি সূরা আত–তালাকের ৪ নং আয়াত– 'ওয়া উলাতিল আহমালি আজালুহুন্না আন ইয়াদা'না হামলাহুন্না–' পাঠ করেন। তারপর বলেন, যে গর্ভবতী মহিলা বিধবা হবে সেও এই বিধানের অন্তর্গত। তাছাড়া রাসূল (সা) থেকে এ সম্পর্কে একটি হাদীসও শুনেছি। হযরত 'উমার মহিলাকে বললেনঃ উবাইয়ের কথা শোন। (কানযুল 'উম্মাল–৫/১৬৬)

রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত 'আব্বাসের (রা) বাড়ীটি ছিল মসজিদে নববীর সংলগ্ন। হযরত 'উমার (রা) যখন মসজিদ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তিনি 'আব্বাসকে (রা) বলেন, মসজিদ বানাতে হবে, বাড়ীটি বিক্রী করে দিন। 'আব্বাস বললেন, না, আমি বিক্রী করবো না। 'উমার বললেন, তাহলে বাড়ীটি মসজিদের অনুকূলে হিবা (দান) করে দিন। এ প্রস্তাবেও তিনি রাজী হলেন না। 'উমার তখন বললেনঃ তাহলে আপনি নিজে মসজিদটি সম্প্রসারণ করে দিন এবং আপনার বাড়ীটিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। 'আব্বাস রাজী হলেন না। 'উমার (রা) বললেনঃ এই তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি আপনাকে মানতে হবে। অবশেষে দু'জনই উবাই ইবন কা'বকে শালিস মানলেন। তিনি 'উমারকে (রা) প্রশ্ন করলেনঃ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও জিনিস কেড়ে নেওয়ার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? 'উমার জানতে চাইলেন, এ বিধান কুরআন না হাদীসে পেয়েছেন? বললেনঃ হাদীসে। তারপর বলেনঃ হযরত সুলাইমান বাইতুল মাকদাসের প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীরের একাংশ অন্যের জমিতে নির্মিত হয় এবং তা ধ্বসে পড়ে। অতঃপর হযরত সুলাইমানের নিকট ওহী আসে যে, জমির মালিকের অনুমতি নিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করবে। একথা শুনে হযরত 'উমার চুপ হয়ে যান। এই ঘটনার পর হযরত 'আব্বাস স্বেচ্ছায় মসজিদের জন্য বাড়ীটি দান করেন। (হায়াতুস সাহাবা–১/৯৪,৯৫)

সুওয়ায়দ ইবন গাফলা, যায়িদ ইবন সুজান ও সুলাইমান ইবন রাবী'য়ার সাথে কোন এক

অভিযানে যান। পথে 'উজায়ব' নামক স্থানে একটি চাবুক পড়ে থাকতে দেখে উঠিয়ে নেন। তাঁর অপর সঙ্গীদ্বয় বললেন, আপনি ওটা ফেলে দিন। তিনি ফেললেন না। এই ঘটনার কিছু দিন পর সুওয়ায়দ হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে মদীনায় যাত্রা বিরতি করে হযরত উবাইয়ের নিকট যান এবং চাবুকের ঘটনা বর্ণনা করেন। উবাই বললেন; আমার জীবনেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় একবার আমি একশো দীনার পথে পাই। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, এক বছর পর্যন্ত মানুষকে জানাতে থাকবে। একবছর পূর্ণ হলে বললেন, দীনারের পরিমাণ, থলির অবস্থা সব ভালোভাবে মনে রেখে আরও এক বছর অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে প্রমাণসহ কেউ উপস্থিত হলে তাকে দেবে। অন্যথায় তুমি মালিক হবে।

হযরত 'উমার (রা) একবার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তিনি মানুষকে 'তামাত্তু' হজ্জ আদায় করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন। উবাই তাঁকে বললেন, এমন নিষেধাজ্ঞা জারির কোন ইখতিয়ার আপনার নেই।

হযরত উবাই 'কিরায়াত খালফাল ইমাম' (ইমামের পিছনে কিরায়াত পাঠ)–এর প্রবক্তা ছিলেন। তবে তার রূপ ছিল এমনঃ যুহর ও 'আসরের ফরয নামাযে ইমামের পিছনে কিরায়াত পাঠ করতেন। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন হুজায়ল তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ইমামের পিছনে কিরায়াত পড়েন? বললেনঃ হাঁ। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫৪) তিনি সূরা আল–আ'রাফের ২০৪ নং আয়াত 'ওয়া ইজা কুরিয়াল কুরআন ফাসতামি'উ লাহু ওয়া আনসিতূ–' যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক– এর বাহ্যিক অর্থের ওপর 'আমল করতেন। যুহর ও 'আসরে ইমাম যখন চুপে চুপে কিরায়াত পড়েন তখন তো শোনার প্রশ্ন আসেনা। সুতরাং তাঁর মতে যে নামাযে ইমাম জোরে কিরায়াত পাঠ করবেন সেখানে মুক্তাদী চুপ করে শুনবেন। আর যেখানে ইমাম চুপে চুপে পাঠ করবেন সেখানে মুক্তাদীও কিরায়াত পাঠ করবেন।

একবার এক ব্যক্তি মসজিদে একটি হারানো জিনিসের ব্যাপারে হৈ চৈ করছিল। হযরত উবাই রেগে গেলেন। লোকটি বললো, আমি তো অশ্লীল কিছু বলছিনে। উবাই বললেন, অশ্লীল না হলেও এটা মসজিদের আদবের খেলাফ। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫০)

আর একবার রাসূল (সা) জুম'আর খুতবা দিলেন এবং সূরা বারায়াত থেকে পাঠ করলেন। এই সূরাটি হযরত আবূ দারদা ও আবূ জারের (রা) জানা ছিল না। তাঁরা খুতবার মধ্যেই ইশারায় উবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এই সূরাটি কবে নাযিল হয়েছে, আমাদের তো জানা নেই? উবাইও ইশারা য় তাদেরকে চুপ থাকতে বললেন। নামায শেষে তিনজনই নিজ নিজ বাড়ীতে ফেরার জন্য রওয়ানা হচ্ছেন, তখন অন্য দু'জন উবাইকে বললেন, আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন? উবাই বললেনঃ আজ আপনাদের নামায নষ্ট হয়ে গেছে, আর তাও একটি অহেতুক কারণে। এমন কথা শুনে তাঁরা হযরত রাসূল্ল কারীমের (সা) নিকট হাজির হলেন এবং বললেনঃ উবাই আমাদেরকে এমন কথা বলেছেন। তিনি বললেনঃ সে ঠিক কথাই বলেছে। (কানযুল 'উম্মাল–৪/২৫৫)

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে হযরত উবাই বলতেন, তিন রকম লোকের জন্য তিন রকম হুকুম আছে। কিছু লোক দুররা ও রজম উভয় প্রকার শাস্তির যোগ্য। কিছু লোক শুধু রজম এবং কিছু শুধু দুররার শাস্তি লাভের উপযুক্ত। যে বৃদ্ধ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচার করে তাকে

উভয় শাস্তি দিতে হবে। আর যে যুবক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচার করে তাকে শুধু রজম করতে হবে। যে যুবকের স্ত্রী নেই সে ব্যভিচার করলে তাকে শুধু দুররা লাগাতে হবে।

নাবীজ (খেজুরের শরবত) হালাল হওয়া সম্পর্কে সকল 'আলিম প্রায় একমত। তবে উবাই থেকে এ সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমধর্মী মত বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট নাবীজ পান করা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, নাবীজের মধ্যে এমন কী দেখেছ? পানি, ছাতুর শরবত, দুধ ইত্যাদি পান কর। প্রশ্নকারী বললো, মনে হচ্ছে আপনি নাবীজ পানের সমর্থক নন। তিনি বললেন, মদ পান আমি কিভাবে সমর্থন করতে পারি?

এভাবে বিভিন্ন মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত উবাইয়ের মতামত গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে ফকীহ সাহাবীদের মধ্যে তাঁর যে উঁচু মর্যাদা ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

হযরত উবাই লিখতে-পড়তে জানতেন। এ কারণে ওহীর বেশীর ভাগ আয়াত তিনিই লিখতেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনা আগমনের পর ওহী লেখার প্রথম গৌরব তিনিই লাভ করেন। (আন সাবুল আশরাফ-১/৫৩১) সেযুগে কোন লেখা বা কুরআনের শেষে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিল না। হযরত উবাই সর্ব প্রথম নাম লেখার প্রচলন করেন। পরে অন্যরা তাঁর অনুসরণ করে।

সকল প্রকার বিদ'য়াত থেকে দূরে থাকা, সত্য প্রকাশের সৎ সাহস- এ জাতীয় গুণাবলী হযরত উবাইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি প্রবল উৎসাহ-আবেগ তাঁর মধ্যে রূহানিয়্যাতের চরম বিকাশ সাধন করেছিল। গভীর রাতে মানুষ যখন আরাম -আয়েশে বিছানায় গা এলিয়ে দিত, তিনি তখন ঘরের এক কোণে বিনীতভাবে আল্লাহর ইবাদাতে মাশগুল থাকতেন, মুখে আল্লাহর কালাম জারী থাকতো এবং চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতো। তিন রাতে কুরআন খতম করতেন। রাতের এক অংশ দরূদ ও সালাম পেশের মাধ্যমে অতিবাহিত হতো।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত প্রবল ছিল যে 'উস্তুনে হান্নানা'র একাংশ তাবারুক হিসেবে বাড়ীতে রেখে দেন এবং উইপোকায় খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতেই ছিল।

সব ধরনের বিদ'য়াত থেকে এত দূরে থাকতেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র সময়ে যে কথা বা কাজ হয়নি তা বলা বা করাকে তিনি খুব খারাপ মনে করতেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে একদিন মসজিদে নববীতে এসে দেখলেন লোকেরা পৃথকভাবে যার যার মত তারাবীহর নামায পড়ছে। 'উমার জামায়াতবদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি উবাইকে বললেনঃ আমি আপনাকে ইমাম নিযুক্ত করতে চাই, আপনি তারাবীহর নামায পড়াবেন। উবাই বললেনঃ যে কাজ আগে করিনি এখন তা কিভাবে করি? 'উমার (রা) বললেন, আমি তা জানি। তবে এ কোন খারাপ কাজ নয়। (কানযুল 'উম্মাল-৪/২৮৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৪৯)

একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) প্রশ্ন করলোঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমরা মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ি বা নানাবিধ কষ্ট ভোগ করি, কি কোন সাওয়াব আছে? রাসূল (সা) বললেনঃ এতে গুণাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়। সেখানে হযরত উবাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, ছোট ছোট বিপদ- মুসীবতও কি গুণাহর কাফ্ফারা হয়? বললেনঃ একটি কাঁটা ফুটলেও তা কাফ্ফারা হয়। তখন ঈমানী আবেগে তাঁর মুখ

থেকে বেরিয়ে যায়; হায়! সব সময় যদি আমার দেহে জ্বর লেগে থাকতো, আর তা সত্ত্বেও আমি হজ্জ 'উমরা আদায়ে সক্ষম হতাম এবং জিহাদে গমন ও জামায়াতে নামায আদায়ের যোগ্য থাকতাম। আল্লাহ পাক তাঁর এই দু'আ কবুল করেন। তারপর থেকে যত দিন জীবিত ছিলেন, শরীরে সব সময় জ্বর থাকতো। (কানযুল 'উম্মাল-২/১৫৩; আল-ইসাবা-১/২০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫০২-৩)

আল্লাহর ভয়ে, শেষ বিচার দিনের ভয়ে, সব সময় তিনি কাঁদতেন। কুরআন পাঠের সময় ভীষণ ভীত হয়ে পড়তেন। বিশেষতঃ সূরা আল-আনয়ামের ৬৫ নং আয়াত ও পরবর্তী আযাবের আয়াতগুলি যখন পাঠ করতেন তখন তাঁর শঙ্কা ও ভয়ের সীমা থাকতো না। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪৯৮)

ইসলামী খিলাফতের সীমা যখন বিস্তার লাভ করে এবং সাধারণ মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী বা শাসকদের অহেতুক তোয়াজ খাতির করে চলতে থাকে তখন তিনি বলতেনঃ কা'বার প্রভুর নামে শপথ! তারা ধ্বংস হয়েছে। তারা ধ্বংস হয়েছে। অন্যদেরকে তারা ধ্বংস করেছে। তাদের জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমার দুঃখ তাদের জন্য, যাদের তারা সর্বনাশ করেছে। (রিজালুন হাওলার রাসূল-৪৯৮)

হযরত উবাই বলতেনঃ মুমিনের চারটি বৈশিষ্টঃ ১. বিপদে ধৈর্যধারণ করে, ২. কোন কিছু পেলে আল্লাহর শোকর করে, ৩. যখন কথা বলে, সত্য বলে, ৪. যখন বিচার করে, ন্যায়-নীতির সাথে বিচার করে। তিনি আরও বলতেন, মুমিনের জীবন পাঁচটি নূর বা জ্যোতির মধ্যে বিবর্তিত হয়। ১. তার কথা নূর, ২. তার ইলম বা জ্ঞান নূর, ৩. কবরে সে নূরের মধ্যে অবস্থান করবে, ৪. কবর থেকে সে নূরের মধ্যে উঠবে এবং ৫. কিয়ামতের দিন নূরের দিকেই তার শেষ যাত্রা হবে। অপর দিকে একজন কাফিরের জীবন পাঁচটি অন্ধকারের মধ্যে বিবর্তিত হয়। ১. তার কথা অন্ধকার, ২. তার আমল অন্ধকার, ৩. তার কবর অন্ধকার, ৪. কবর থেকে উঠবে অন্ধকারে এবং ৫. কিয়ামতের দিন তার শেষ যাত্রা হবে অন্ধকারের দিকে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৮)

জীনের সাথে হযরত উবাইয়ের একটি ঘটনার কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। খেজুর শুকানোর জন্য হযরত উবাইয়ের একটি উঠোন ছিল। সেখানে খেজুর নেড়ে দেওয়া ছিল। তিনি মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। একদিন খেজুরে ঘাটতি লক্ষ্য করে রাতে পাহারা দিলেন। হঠাৎ অন্ধকারে একজন যুবকের মত একটি প্রাণী দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন। সে সালামের জবাব দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে তুমি? সে বললোঃ জীন। তিনি বললেনঃ তোমার একটি হাত দাও তো। সে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি হাত ধরলেন এবং তাঁর মনে হলো, সেটা যেন কুকুরের হাত এবং তার লোম কুকুরের লোমের মত। তিনি বললেনঃ জীনদের সৃষ্টি কি এমনই? আমার তো ধারণা ছিল তারা আরও শক্তিশালী। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি যা করেছ, তার কারণ কি? সে জবাব দিলঃ আমরা জেনেছি, আপনি সাদাকা (দান) করতে ভালোবাসেন। তাই আমরা এই খেজুর থেকে কিছু গ্রহণ করতে চেয়েছি। তিনি জীনকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের হাত থেকে আমাদের নিরাপত্তা কিসে? সে বললোঃ সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসীতে। কেউ সন্ধ্যায় পড়ে ঘুমালে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে; আর কেউ সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। পরদিন সকালে হযরত উবাই

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে রাতের ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল (সা) সবকিছু শুনে বললেনঃএই খবীসটি (পাপাত্মাটি) সত্যি কথা বলেছে। নাসাঈ, হাকেম, তাবারানী প্রভৃতি গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৯০)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উবাই ইবন কা'ব প্রতিজ্ঞা করলেনঃ আজ আমি মসজিদে এমন নামায আদায় করবো এবং আল্লাহর এমন প্রশংসা করবো যা আর কেউ কোন দিন করেনি। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করে যেই না আল্লাহর প্রশংসার জন্য বসেছেন অমনি পিছন দিকে জোরে জোরে কাউকে হামদ পাঠ করতে শুনতে পেলেন। তিনি ঘটনাটি রাসূলকে (সা) জানালেন। রাসূল (সা) বললেন, এই হামদের পাঠক ছিলেন জিবরীল (আ)। (দ্রঃ হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৪১)

ইবন 'আব্বাস বর্ণনা করেন। একবার 'উমার ইবন আল–খাত্তাব আমাদেরকে কোথাও বের হতে বললেন। আমরা পথ চলছি। আমি ও উবাই এক সময় কাফিলার একটু পিছনে পড়ে গেলাম। এমন সময় আকাশে একটু মেঘ দেখা গেল। উবাই দু'আ করলেনঃ হে আল্লাহ! এই মেঘের কষ্ট আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আমরা মেঘের কষ্ট থেকে বেঁচে গেলাম। আমরা কাফিলার সাথে মিলিত হলে 'উমার জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরাও কি আমাদের মত কষ্ট পেয়েছ? আমি বললামঃ আবুল মুনজির (উবাই) মেঘের কষ্ট থেকে আমাদেরকে রেহাই দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিল। 'উমার বললেনঃ আমাদের জন্যও একটু দু'আ করলে না কেন? (হায়াতুস সাহাবা–৩/৬৫৮)। ■

আনাস ইবন মালিক (রা)

আনাস ইবন মালিক ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী, খাদিমে রাসূল, ইমাম, মুফতী, মু'য়াল্লিমে কুরআন, মুহাদ্দিস, খ্যাতিমান রাবী, আনসারী, খাযরাজী ও মাদানী। কুনিয়াত আবু সুমামা ও আবু হামযা। খাদিমু রাসূলিল্লাহ লকব বা উপাধি। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়া-৩/৪০২, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪) আনাস বলতেনঃ আমি 'হামযা' নামক এক প্রকার সবুজী খুটতাম, তাই দেখে রাসূল (সা) আদর করে আমাকে ডাকেনঃ 'ইয়া আবা হামযা'। সে দিন থেকে এটাই আমার কুনিয়াত বা ডাকনাম হয়ে যায়। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১) ইয়াসরিবের (আল-ইসাবা-১/৭১) বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে ৬১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। (আল-আ'লাম-১/৩৬৫ আল ইসাবা-১/৭১) এই গোত্রটি ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। আনাসের পিতা মালিক ইবন নাদর এবং মাতা উম্মু সুলাইম সাহলা বিনতু মিলহান আল-আনসারিয়্যা। উম্মু সুলাইম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু 'আমর-এর নসব 'আমির ইবন গানাম-এ গিয়ে আনাসের মার বংশের সাথে মিলিত হয়েছে। (উসুদুল গাবা-১/১২৭, আসাহহুস সীয়াব-৬০৬)

উম্মু সুলাইমের আসল নামের ব্যাপারে মতভেদ আছে। যেমনঃ সাহলা, রুমাইলা, রুমাইসা, সুলাইকা, আল-ফায়সা ইত্যাদি। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪০)

আনাসের চাচা আনাস ইবন নাদর উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা কেটে কুটে তাঁর দেহ বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর দেহে মোট আশিটি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর এক বোন ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। আনাস বলতেন, আমার এই চাচা আনাসের নামেই আমার নাম রাখা হয়েছিল। (সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮৩, হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৪, ৫০৫) আনাসের মামা হারাম ইবন মিলহান বি'রে মা'উনার দুঃখজনক ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-৩/৪০২)

আনাসের বয়স যখন আট/নয় বছর তখন তাঁর মা ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে তাঁর পিতা ক্ষোভ ও ঘৃণায় শামে চলে যায় এবং সেখানে কুফরী অবস্থায় মারা যায়। মা আবু তালহাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। আবু তালহা ছিলেন খাযরাজ গোত্রের একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। মা বালক আনাসকেও সাথে করে আবু তালহার বাড়ীতে নিয়ে যান। আনাস এখানেই প্রতিপালিত হন।

আবু তালহার সাথে তাঁর মার বিয়ে সম্পর্কে আনাস বর্ণনা করেছেনঃ আবু তালহা যখন উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। উম্মু সুলাইম বললেনঃ আবু তালহা, তুমি কি জাননা, যে ইলাহ-র ইবাদাত তুমি কর তা মাটি দিয়ে তৈরী? বললেনঃ হাঁ, তা জানি। উম্মু সুলাইম আরও বললেনঃ একটি গাছের ইবাদাত করতে তোমার লজ্জা হয় না? তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তোমাকে বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই এবং

তোমার কাছে কোন মোহরের দাবীও আমার থাকবে না। 'আমি ভেবে দেখবো'– এ কথা বলে আবু তালহা উঠে গেলেন। পরে ফিরে এসে তিনি উচ্চারণ করলেনঃ 'আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ– আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তখন উম্মু সুলাইম ছেলে আনাসকে ডেকে বললেনঃ আনাস, তুমি আবু তালহার বিয়ের কাজটি সমাধা কর। আনাস তাঁর মাকে আবু তালহার সাথে বিয়ে দিলেন। (হায়াতুস সাহাবা– ১/১৯৫, ১৯৬)

মদ হারাম হওয়ার পূর্বে আবু তালহার বাড়ীতে মদ পানের আসর বসতো। বালক আনাস সেই আসরে সাকীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং নিজেও মদের অভ্যাস করতেন। এই বালককে মদ পান থেকে বিরত রাখার কেউ ছিল না। (মুসনাদ– ৩/১৮১)

আনাসের বয়স যখন আট/নয় বছর তখন মদীনায় ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায়। ইসলাম কবুলের ব্যাপারে বনু নাজ্জার গোত্র সবার আগে ভাগেই ছিল। এই খান্দানের বেশীর ভাগ সদস্য রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আনাসের মা উম্মু সুলাইম ও তৃতীয় আকাবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পূর্বেই বলা হয়েছে উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর স্বামী অর্থাৎ আনাসের পিতা স্ত্রী ও সন্তান ত্যাগ করে শামে চলে যায়। স্বামী পরিত্যক্তা উম্মু সুলাইম আবু তালহাকে বিয়ে করতে রাজী হন এই শর্তে যে, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করবেন। এভাবে উম্মে সুলাইমের চেষ্টায় আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় যান এবং তৃতীয় 'আকাবায় শরীক হয়ে রাসূলুল্লাহর হাতে (সা) বাইয়াতের গৌরব অর্জন করেন। এভাবে আনাসের বাড়ী ঈমানের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। তাঁর জান্নাতী মা উম্মু সুলাইম ইসলামের এক আলোক বর্তিকা, আর তাঁর স্বামী দ্বীনের এক নিবেদিত প্রাণ কর্মী। এমনই এক আশ্রয়ে আনাস বেড়ে ওঠেন।

আনাস যখন দশ বছরের বালক তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় আসেন। আনাসের বয়স অল্প হলেও তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। রাসূল (সা) যখন কুবা থেকে মদীনার দিকে আসছিলেন, সমবয়সী ছোট ছেলে–মেয়েদের সাথে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আনাসও স্বাগত সংগীত গেয়েছিলেন, তাঁরা ছুটে ছুটে 'রাসূলুল্লাহ এসেছেন, মুহাম্মাদ এসেছেন'– বলে মদীনাবাসীদের ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। এক সময় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ থেকে ভীড় একটু কম হলে আনাস তাঁর চেহারামুবারকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মদীনায় আসেন প্রসিদ্ধ মতে আনাসের বয়স তখন দশ বছর। রাসূল (সা) একটু স্থির হওয়ার পর আনাসের মা একদিন তাঁর হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে আনাস বলেনঃ আমার মা আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে গিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারদের প্রত্যেক নারী–পুরুষ আপনাকে কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি তো তেমন কিছু দিতে পারছিনে। আমার এই ছেলেটি আছে, সে লিখতে জানে। এখনও সে বালেগ হয়নি। আপনি একেই গ্রহণ করুন। সে আপনার খিদমাত করবে। সেই দিন থেকে আমি একাধারে দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছি। এর মধ্যে কখনও তিনি আমাকে মারেননি, গালি দেননি, বকাঝকা করেননি এবং মুখও কালো করেননি। তিনি সর্ব প্রথম আমাকে এই অসীয়াতটি করেনঃছেলে, তুমি আমার গোপন কথা

গোপন রাখবে। তা হলেই তুমি ঈমানদার হবে। আমার মা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনীগণ কখনও আমার কাছে রাসূলের (সা) গোপন কথা জিজ্ঞেস করলে, বলিনি। আমি তাঁর কোন গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করিনি। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু তালহা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যান। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৩/১৪১, আনসাবুল আশরাফ–১/৫০৬, আল–ইসাবা–১/৭১)

হযরত আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় দশ বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাঁর খিদমাতের দায়িত্ব পালন করেন। এ জন্য তাঁর গর্বের শেষ ছিল না। ফজর নামাযের পূর্বেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাতে হাজির হয়ে দুপুরে বাড়ী ফিরতেন। কিছুক্ষণ পর আবার আসতেন এবং আসরের নামায আদায় করে বাড়ী ফিরতেন। আনাসের মহল্লায় একটি মসজিদ ছিল, সেখানে মুসল্লীরা তাঁর অপেক্ষায় থাকতো। তাঁকে দেখে তারা আসরের নামাযে দাঁড়াতো। (মুসনাদে আহমাদ–৩/২২২)

উপরোক্ত সময় ছাড়াও তিনি সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। যখনই প্রয়োজন পড়তো রাসূলুল্লাহর (সা) ডাকে সাড়া দিতেন। এক দিনের ঘটনা, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজনীয় কাজ সেরে দুপুরে বাড়ীর দিকে চলেছেন। পথে দেখলেন, তাঁরই সমবয়সী ছেলেরা খেলছে। তাঁর কাছে খেলাটি ভালো লাগলো। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন তাদের খেলা দেখতে। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, রাসূল (সা) তাদের দিকে আসছেন। তিনি এসে প্রথমে ছেলেদের সালাম দিলেন, তারপর আনাসের হাতটি ধরে তাঁকে কোন কাজে পাঠালেন। আর রাসূল (সা) তাঁর অপেক্ষায় একটি দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। আনাস কাজ সেরে ফিরে এলে রাসূল (সা) বাড়ীর দিকে ফিরলেন, আর তিনি চললেন বাড়ীর দিকে। ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁর মা জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরী হলো কেন? তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন কাজে গিয়েছিলাম। এই জন্য ফিরতে দেরী হয়েছে। মা মনে করলেন, ছেলে হয়তো সত্য গোপন করছে, এই জন্য জানতে চাইলেনঃ কী কাজ? আনাস জবাব দিলেন একটি গোপন কথা, কাউকে বলা যাবেনা। মা বললেনঃ তাহলে গোপনই রাখ কারও কাছে প্রকাশ করোনা। আনাস আজীবন এ সত্য গোপন রেখেছেন। একবার তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র সাবিত যখন সেই কথাটি জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন, কথাটি কাউকে জানালে তোমাকেই জানাতাম। কিন্তু আমি তা কাউকে বলবো না। (আল–ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগুল আমানী–২২/২০৪, হায়াতুস সাহাবা–১/৩৪৩, ২/৫০৩)

হযরত আনাস সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকতেন। আবাসে–প্রবাসে, ভিতরে–বাহিরে কোন বিশেষ স্থান বা সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিলনা। হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি স্বাধীনভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে যাতায়াত করতেন। আনাস বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে আসতাম এবং অন্দর মহলে আযওয়াজে মুতাহ্হারাতদের কাছেও যেতাম। একদিন আমি অন্দরে প্রবেশ করতে যাব, এমন সময় রাসূল (সা) ডাকলেনঃ আনাস, পিছিয়ে এস। হিজাবের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৬৪) আনাস আরও বলেনঃ আমি যে দিন বালেগ হলাম, রাসূলকে (সা) সে কথা জানালাম। তিনি বললেনঃ এখন থেকে অনুমতি ছাড়া মেয়েদের কাছে যাবেনা। আনাস বলেনঃ সেই দিনটির মত কঠিন দিন আমার জীবনে আর আসেনি। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৩/১৪৪)

একদিন ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূল (সা) বললেন, আজ রোযা রাখার ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু খাবার দাও। আনাস খুব তাড়াতাড়ি কিছু খুরমা ও পানি হাজির করেন। রাসূল (সা) তাই দিয়ে সেহরী সেরে ফজরের নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। (মুসনাদ–৩/১৯৭) ওয়াকিদী বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) খাদিমদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দরজা থেকে দূরে যেত না তাঁদের মধ্যে আনাস একজন। আবু হুরাইরা (রা) বলতেনঃ আমি তো মনে করতাম আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) দাস। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৮৫)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে আবু আইউব আল আনাসারীর (রা) অতিথি হন। সেই সময় তিনি আনাসের পিতা মালিক ইবন নাদরের কুয়োর পানি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি সহকারে পান করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) আবু আইউবের বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে চলে গেলে আনাস সেই কুয়োর পানি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য বয়ে নিয়ে আসতেন। (আনসাবুলআশরাফ–১/৫৩৫)

হযরত আনাস অত্যন্ত নিপুণতার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সকল কাজ সম্পাদন করতেন। আনুগত্যের মাধ্যমে সর্বক্ষণ তাঁকে খুশী রাখতেন। তিনি নিজেই বলেনঃ আমি দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কক্ষণও আমার ওপর নারাজ হননি। আমার কোন কাজের জন্য কক্ষণও বলেননিঃ এ কাজটি তুমি কেন করলে? আর আমি কোন কাজ করিনি সে জন্যও তিনি প্রশ্ন করেননিঃ কাজটি তুমি কেন করনি? অথবা তুমি ভুল করেছ বা যা করেছ, খুবই খারাপ করেছ– এমন কথাও আমার কোন ভুলের জন্য তিনি বলেননি। (আনসাবুল আশরাফ–১/৪৬৪, ৫০৬) এভাবে আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তরে এক বিশেষ স্থান দখল করেন। রাসূল (সা) স্নেহভরে কখনও 'ছেলে' আবার কখনও 'উনাইস' বলে ডাকতেন। তিনি মাঝে মধ্যে আনাসদের বাড়ীতে যেতেন, আহার করতেন, দুপুরের সময় হলে বিশ্রাম নিতেন, নামায আদায় করতেন এবং আনাসের জন্য দু'আও করতেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। (আল–ফাতহুর রাব্বানী–২২/২০৩)

আনাস বলেনঃ একদিন আবু তালহা আমার মা উম্মু সুলাইমকে বললেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল শুনতে পেলাম। মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? মা বললেনঃ আছে। তিনি কয়েকটুকরো রুটি আমার কাপড়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালেন। আমাকে দেখেই রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু তালহা পাঠিয়েছে? বললামঃ হাঁ। বললেনঃ খাবার? বললামঃ হাঁ। রাসূল (সা) সাথের লোকদের বললেনঃ তোমরা ওঠো। তাঁরা চললেন, আমিও তাদের আগে আগে চললাম। আবু তালহা সকলকে দেখে স্ত্রীকে ডেকে বললেনঃ উম্মু সুলাইম, দেখ, রাসূল (সা) লোকজন সংগে করে চলে এসেছেন। সবাইকে খেতে দেওয়ার মত খাবার তো নেই। উম্মু সুলাইম বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সে কথা ভালোই জানেন। আবু তালহা অতিথিদের নিয়ে বসালেন। রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে বললেনঃ যা আছে নিয়ে এসো। সামান্য খাবার ছিল, তাই হাজির করা হলো। তিনি বললেনঃ প্রথম দশজনকে আসতে বল। দশ জন ঢুকে পেট ভরে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর দশ জন। এ ভাবে মোট সত্তুর জন লোক পেট ভরে সেই খাবার খেয়েছিল। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৯৪)

আনাস আরও বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইমের আবু তালহার পক্ষের আবু 'উমাইর নামে একটি ছোট ছেলে ছিল। রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এলে তার সাথে একটু রসিকতা করতেন। একদিন দেখলেন আবু 'উমাইর মুখ ভার করে বসে আছে। রাসূল (সা) বললেনঃ আবু 'উমাইর এমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন? মা বললেনঃ তার খেলার সাথী 'নুগাইর' টি মারা গেছে। তখন থেকে রাসূল (সা) তাঁকে দেখলে কাব্যি করে বলতেনঃ 'ইয়া আবা 'উমাইর– মা ফা'য়ালান নুগাইর'– ওহে আবু 'উমাইর, তোমার নুগাইরটি কি করলো? উল্লেখ্য যে, 'নুগাইর' লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই–এর মত এক প্রকার ছোট্ট পাখী। (তারীখে ইবন 'আসাকির– ৩/১৩৯, হায়াতুস সাহাবা–২/৫৭০, ৫৭১)

আনাসদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর কুরআনের বহু আয়াত নাযিল হয়েছে। রাসূল (সা) ওহী নাযিলের সময় ঘেমে যেতেন আর তাঁরা সেই ঘাম সংরক্ষণ করতেন। আনাস বলেনঃ একদিন দুপুরে রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিলেন এবং ঘেমে গেলেন। আমার মা একটি বোতল এনে সেই ঘাম ভরতে লাগলেন। রাসূল (সা) জেগে উঠে বললেনঃ 'উম্মু সুলাইম, একি করছো? মা বললেনঃ আপনার এই ঘাম আমাদের জন্য সুগন্ধি। আনাস বলতেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সুগন্ধি থেকে অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত মিশ্‌ক অথবা আম্বর আমার জীবনে আর শুকিনি। (তারীখে ইবন 'আসাকির– ৩/১৪৪, ১৪৫)

আমরা আগেই বলেছি, আনাসের কল্যাণময়ী মা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা। তিনি অন্তর দিয়ে তাঁকে ভালোবাসতেন, ভক্তি–শ্রদ্ধা করতেন। আর রাসূলও (সা) তাঁর কথা কখনও বিস্মৃত হননি। এই সম্মানিত মাহিলাকে রাসূল (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। (দায়িরা–ই–মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)–৩/৪০২) খাইবার যুদ্ধে হযরত সাফিয়্যা (রা) বন্দী হলেন এবং রাসূল (সা) তাঁকে শাদী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাফিয়্যাকে উম্মু সুলাইমের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনিই বিয়ের সকল ব্যবস্থা সম্পাদন করলেন। এ সম্পর্কে ইবন ইসহাক বলেনঃ খাইবারে অথবা খাইবার থেকে ফেরার পথে হযরত সাফিয়্যার সাথে রাসূলল্লাহর (সা) শাদী মুবারাক অনুষ্ঠিত হয়। আনাসের মা উম্মু সুলাইম তাঁর সাজানো, চুল বাঁধা ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩৩৯, ৩৪০, আন সাবুল আশরাফ–১/৪৪৩)

এমনিভাবে হযরত যয়নাবের সাথে যখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে হয় তখনও উম্মু সুলাইম কিছু খাবার তৈরী করে পাঠান। রাসূল (সা) সাহাবীদের দা'ওয়াত দিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করে সেই খাবার পরিবেশন করেন। (মুসনাদে আহমাদ–৩/১৬৩)

এই সব বৈশিষ্ট্যই আনাসকে নবী খান্দানের একজন সদস্যে পরিণত করে। রাসূল (সা) মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে হালকা মিযাজ হয়ে যেতেন। এই যেমন তাঁকে ডাকলেন 'আবু হামযা' বলে। একবার তো ডাকলেন 'ইয়া জাল উজনাইন'– ওহে দুই কান ওয়ালা বলে। (উসুদুল গাবা–১/১২৭)

আমরা পূর্বেই দেখেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আনাসের কত গভীর সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের কারণেই ঘরে–বাইরে, আবাসে–প্রবাসে সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকতেন। যুদ্ধের ময়দানেও সেই সংগ ত্যাগ করেননি। বদর যুদ্ধের সময় আনাসের বয়স এমন কিছু হয়নি। মাত্র বারো বছর। তাসত্ত্বেও মুসলিম মুজাহিদদের পাশাপাশি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সেবা ও সৈনিকদের সাজ-সরঞ্জাম ও মাল-সামান দেখার দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় বয়স অতি অল্প থাকার কারণে তাঁর এ যুদ্ধে যোগদান সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। একবার তো সংশয়ের সুরে এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেই বসেঃ আপনি কি বদরে হাজির ছিলেন? জবাব দিলেনঃ আমি কিভাবে গায়ের হাজির থাকতে পারি? (আল-ইসাবা-১/৭১, দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-৩/৪০২)

বদরের এক বছর পর উহুদ যুদ্ধ হয়। তখনও আনাস অল্প বয়স্ক। হিজরী ষষ্ঠ সনে হুদাইবিয়ায় বাইয়াতে শাজারার গৌরব অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স ষোল বছর। যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছেন। হিজরী সপ্তম সনে রাসূল (সা) 'উমরাতুল কাদা (কাজা 'উমরাহ) আদায় করেন। আনাস সংগে ছিলেন। এ বছরই খাইবার বিজিত হয়। এই অভিযানে আনাস আবু তালহার সাথে উটের পিঠে সাওয়ার ছিলেন। এক পর্যায়ে বিজয়ীর বেশে হযরত রাসূলে কারীম (সা) খাইবারে প্রবেশ করছিলেন তখন আনাস তাঁর এত নিকটে ছিলেন যে তাঁর পা রাসূলের (সা) পবিত্র পা স্পর্শ করে। এর ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) ইযার হাঁটুর ওপরে উঠে যায় এবং তা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। (মুসনাদ-৩/১০২) এরপর মক্কা বিজয়, তায়িফ ও হুনাইন অভিযানে যোগ দেন। সর্বশেষ হিজরী দশ সনে বিদায় হজ্জে রাসূলল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন।

আনাস বলেনঃ হুনাইন যুদ্ধের দিন আবু তালহা হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখেছেন, উম্মু সুলাইমের হাতে খঞ্জর? রাসূল (সা) বললেনঃ উম্মু সুলাইম খঞ্জর দিয়ে কি করবে? জবাব দিলেনঃ কেউ আমার দিকে এগিয়ে এলে এটা দিয়ে আমি আঘাত করবো। (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অভিযানের সংখ্যা ছিল ২৬ অথবা ২৭টি। তবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এমন অভিযানের সংখ্যা মাত্র ৯টি। যেমনঃ বদর, উহুদ, খন্দক, কুরায়জা, মুসতালিক, খাইবার, হুনাইন ও তায়িফ। আনাস এর সব ক'টিতে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি আনাসের ছেলে মূসাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার সম্মানিত পিতা কতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ আটটি যুদ্ধে। সম্ভবতঃ বদর যুদ্ধটি বাদ দিয়েছিলেন। তার কারণ এই হতে পারে যে, সে সময় জিহাদে যাওয়ার যে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল, আনাস তার চেয়ে ছোট ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর (রা) খলীফা হলেন। এ সময় ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে আনাসের অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। (হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৭) খলীফা আনাসকে বাহরাইনে 'আমিলে সাদাকা'র পদে নিয়োগ দান করতে চান। এ ব্যাপারে 'উমারের পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন ঃ আনাস বুদ্ধিমান ও লেখাপড়া জানা মানুষ। তার জন্য যে খিদমতের প্রস্তাব আপনি করেছেন আমি তা সমর্থন করি। খলীফা আনাসকে ডেকে পাঠান এবং আমিলে সাদাকার দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে বাহরাইনে পাঠিয়ে দেন। (বুখারী, কিতাবুয যাকাত, আল-ইসাবা-১/৭২) তিনি যখন বাহরাইন থেকে ফিরে আসেন তখন আবু বকর (রা) আর নেই। তাঁর স্থলে 'উমার (রা) খলীফা। তিনি বাহরাইন থেকে আনীত অর্থ থেকে চার হাজার দিরহাম আনাসকে দান করেন। আনাস বলেন ঃ আমি

সেই অর্থ পেয়ে মদীনাবাসীদের মধ্যে একজন অধিক অর্থশালী ব্যক্তি হয়ে যাই। (হায়াতুস সাহাবা-২/২২)

আনাস আরও বলেন ঃ আবু বকরের (রা) মৃত্যুর পর 'উমার খিলাফতের দায়িত্বভার হাতে নিলে আমি মদীনায় এসে তাঁকে বললাম ঃ দেখি, আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন। যে কথার ওপর আপনার পূর্ববর্তী বন্ধুর হাতে আপনি বাই'য়াত করেছিলেন সেই কথার ওপর আমি আপনার হাতে বাই'য়াত করবো। এভাবে তিনি 'উমারের (রা) হাতে বাই'য়াত করেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৫৮)

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ইয়ামনবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি পত্রসহ আনাসকে ইয়ামনেও পাঠান। সেই পত্রে তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পড়ার জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান। (হায়াতুস সাহাবা-১/৪৪১, ৪৪২)

হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বসরার গভর্ণর ছিলেন। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হযরত আবু বাকরার (রা) নেতৃত্বে এক মারাত্মক অভিযোগ উত্থাপিত হয়। (দ্রঃ আনসাবুল আশরাফ-১/৪৯০-৪৯২) খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বরখাস্ত করে আবু মূসা আল-আশ'য়ারীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। ঘটনার তদন্তের জন্য তাঁর সহকারী হিসাবে আরও চার ব্যক্তিকে বসরায় পাঠান। তারা হলেন, ১. আনাস ইবন মালিক, ২. আনাসের ভাই আল-বারা' ইবন মালিক, ৩. ইমরান ইবনুল হুসাইন, ৪. আবু নাজীদ আল-খুযা'ঈ। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৯১)

এই বসরা শহরে হযরত আনাস স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। খলীফা 'উমার (রা) যাঁদের ওপর এখানকার ফিকাহ ও ফাতওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁদের মধ্যে আনাস একজন। জীবনের বাকী অংশ তিনি এই বসরা শহরেই কাটিয়ে দেন। এখানে ফিকাহ ও ফাতওয়ার দায়িত্ব পালন ছাড়াও যখন যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে তিনি দক্ষতার সাথে তা পালন করেন। এই সময় পরিচালিত সকল অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। 'তুসতার' অভিযানে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। তুসতার বিজিত হয় এবং পারশ্য সেনাপতি হুরমুযানকে সপরিবারে বন্দী করে মুসলিম সেনাপতি আবু মূসা আল-আশয়ারীর (রা) সামনে হাজির করা হয়। হযরত আবু মূসা (রা) তিনশো সদস্যের একটি বাহিনীর হিফাজতে হুরমুযানকে মদীনায় খলীফার দরবারে পাঠিয়ে দেন। আনাস (রা) ছিলেন এ বাহিনীর আমীর এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। এভাবে দীর্ঘদিন পর প্রিয় জন্মভূমির যিয়ারত লাভের সুযোগ পান। (হায়াতুস সাহাবা-১/৬৬, দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-৩/৪০২)

কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করার পর আনাস আবার বসরায় ফিরে গেলেন। হিজরী ২৩ সনের জ্বিলহজ্জ মাসে হযরত 'উমার (রা) শাহাদাত বরণ করলে হযরত 'উসমান (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম কয়টি বছর খুবই শান্ত ছিল। তবে কিছুকাল পরে নানারকম ফিত্না ও অশান্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। চতুর্দিকে স্বার্থান্বেষী, হাঙ্গামাবাজ লোকেরা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দেয় এবং তারা মদীনা অভিমুখে যাত্রা করে।

তখনও কিন্তু ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা কোন রকম বিদ্রোহ ও হুমকির পরোয়া করতেন না। সুতরাং মাজলুম খলীফার আর্ত চিৎকার সর্ব প্রথম এই সত্যের সৈনিকদের কানে পৌঁছে। তাঁরা তাঁর সাহায্যের জন্য গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান।

ইরাকের রাজধানী বসরাতেও এমন লোকের অভাব ছিলনা। এমন ভয়াবহ অবস্থার খবর যখন সেখানে পৌছলো তখন আনাস ইবন মালিক, 'ইমরান ইবন হুসাইনসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বীনের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁরা বক্তৃতা-ভাষণের দ্বারা গোটা বসরাকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের সাহায্য মদীনায় পৌছার পূর্বেই বিদ্রোহীদের হাতে খলীফা 'উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত 'উসমানের (রা) পর হযরত'আলী (রা) খিলাফতের দায়িত্ব তার গ্রহণ করলেন। ছয় মাস যেতে না যেতেই তাঁরও বিরুদ্ধে এক মস্ত বড় ফিত্না এই বসরাতেই মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর তাতে বিশিষ্ট সাহাবা-ই-কিরামও জড়িয়ে পড়েন। বসরা ছিল আনাসের আবাস স্থল। সেখানে তার বিশেষ প্রভাবও ছিল। কিন্তু তিনি সকল আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে রাখেন। যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত না হয়, তিনি আরও বহু বিশিষ্ট সাহাবীর মত নির্জনতা অবলম্বন করেন। এ কারণে, হযরত আলী ও হযরত 'আয়িশার (রা) উটের যুদ্ধ, যা এই বসরার অনতি দূরে সংঘটিত হয়- তাতে কোন পক্ষে আনাসের (রা) কোন ভূমিকা দেখা যায় না। এসব ঘটনায় তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন।

হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতের পরেও হযরত আনাস বহুদিন জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে নানা রকম দৃশ্য ও অবস্থা অবলোকন করেন; কিন্তু সব সময় নির্জনতাকে প্রাধান্য দান করেন। কোন অবস্থাতেই নিজেকে জাহির করা তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসকদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে পারেননি। খলীফা আবদুল মালিকের সময় উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের পূর্ব অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। অত্যাচারী ও নিপীড়ক হিসেবে ইতিহাসে তিনি খ্যাতিমান। একবার তিনি বসরায় এসে আনাসকে ডেকে শাসান এবং জনগণের মাঝে হেয় করার জন্য তাঁর ঘাড়ে ছাপ মেরে দেন। ওয়াকিদী ইসহাক ইবন ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি এই ছাপ মারা অবস্থায় আনাসকে দেখেছি। (আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-১/৭২)

হাজ্জাজ ধারণা করেছিলেন, আনাস রাজনৈতিক বাতাস বুঝে কাজ করেন। তাই আনাসকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন ঃ ওহে খবীস! এটা একটা চালবাজি। আপনি মুখতার আস-সাকাফীর সাথেও থাকেন, আবার কখনও থাকেন ইবনুল আশ'য়াসের সাথে। আমি আপনাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। এমন কঠিন মুহূর্তেও আনাস নিজেকে আয়ত্বে রাখেন। শান্তভাবে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমীরকে সাহায্য করুন। আপনার শাস্তি কার জন্য? বললেন ঃ আপনার জন্য। হযরত আনাস চুপচাপ বাড়ী ফিরে এলেন এবং খলীফা 'আবদুল মালিকের নিকট হাজ্জাজের আচরণের বিবরণ দিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। চিঠি পড়ে 'আবদুল মালিক রাগে ফেটে পড়লেন। সাথে সাথে তিনি হাজ্জাজকে লিখলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি আনাসের বাড়ীতে গিয়ে ক্ষমা চাও, নইলে তোমার সাথে খুব খারাপ আচরণ করা হবে। খলীফার চিঠি পেয়ে হাজ্জাজ তাঁর পরিষদবর্গসহ আনাসের খিদমতে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি আনাসের নিকট আরও আবেদন জানান, তিনি যে হাজ্জাজকে ক্ষমা করেছেন, সেই কথা যেন খলীফাকে একটু জানিয়ে দেন। আনাস তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন এবং সেই মর্মে একটি চিঠি দিমাশ্কে পাঠিয়ে দেন। মূলতঃ ফিত্না ও বিশৃঙ্খলার ভয়ে আনাস এমন

কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করেন। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৮, আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগিল আমানী-২২/২০৫, হায়াতুস সাহাবা-২/৬৪৭,৬৪৮)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) কর্তৃত্বের সময় হযরত আনাস কিছুদিনের জন্য বসরার ইমাম ছিলেন। খলীফা ওয়ালীদ ইবন 'আবদিল মালিকের সময় তিনি একবার দিমাশকে যান। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৩৯) তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি প্রথমে দিমাশকে যান এবং সেখান থেকে বসরায় পৌঁছেন। (আল-আ'লাম-১/৩৬৫)

হযরত আনাসের মৃত্যু সন ও মৃত্যুর সময় বয়স সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হিজরী ৯৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং তখন তাঁর বয়স হয়েছিল এক শো বছরের উর্দ্ধে। কারণ, হিজরাতের পূর্বে তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। (তাহজীবুল আসমা-১/১২৮, আল-আ'লাম-১/৩৬৫, তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৫, উসুদুল গাবা-১/১২৮) মৃত্যুর পূর্বে তিনি কয়েক মাস অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। দেখার জন্য ভক্ত-অনুরক্তদের ভীড় লেগেই থাকতো। দূর থেকে দলে দলে মানুষ তাঁকে এক নজর দেখার জন্য আসতো। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তাঁর একান্ত শাগরিদ সাবিত নাবানীকে বলেন, আমার জিহবার নীচে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি পবিত্র চুল রেখে দাও। পবিত্র চুল রাখা হলো। এ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং সেই অবস্থায় দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি লাঠি ছিল তাঁর কাছে। মৃত্যুর পূর্বে লাঠিটি কবরে তাঁর সাথে দাফনের নির্দেশ দিয়ে যান। সে নির্দেশ পালন করা হয়। (উসুদুল গাবা-১/১২৮, আল-ইসাবা-১/৭১, আল-ইসতীয়াব-১/৭৩) ইবন কুতায়বা 'আল-মা'য়ারিফ' গ্রন্থে বলেন, বসরার তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই এক শো বছর জীবন পেয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ আনাস ইবন মালিক, আবু বাকরাহ্ ও খীলফা ইবন বদর (রা)। (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৮)

হযরত আনাস ছিলেন দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী বসরার শেষ সাহাবী। সম্ভবতঃ একমাত্র আবুত তুফাইল (রা) ছাড়া তখন পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন সাহাবী জীবিত ছিলেন না। (আল-ইসাবা-১/৭১, আল-আ'লাম-১/৩৬৫, আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবা-১/৭৩) অবশ্য আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে বলেন ঃ 'কানা (আনাস) আখিরাস সাহাবাতি মাওতান'- আনাস মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।' সাহাবীদের মধ্যে দুনিয়া থেকে তিনিই সর্বশেষ বিদায় নেন। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪) হযরত আনাস নিজেও শেষ জীবনে বলতেনঃ কিবলাতাইন বা দুই কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছেন, এমন ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া এখন আর কেউ বেঁচে নেই। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৫)

পরিবারের সদস্য, ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ ছাড়াও আশ-পাশের লোকেরা তাঁর জানাযায় শরীক হন। কুতন ইবন মুদরিক আল-কিলাবী জানাযার নামায পড়ান। বসরার উপকণ্ঠে 'তিফ্' নামক স্থানে তাঁর বাসস্থানের পাশেই কবর দেওয়া হয়। (উসুদুল গাবা-১/১২৯)

হযরত আনাসের মৃত্যুতে গোটা মুসলিম উম্মাহ দারুণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছিল। বাস্তবেও তেমন হওয়ার কথা। কারণ, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা এক এক করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। মাত্র দুই ব্যক্তি যাঁদেরকে দেখে মানুষ প্রশান্তি লাভ করতো, তাঁদের একজন চলে গেলেন।

হযরত আনাসের ইনতিকালের পর 'মাওরিক' নামক এক তাবেঈ ব্যক্তি আফসোস করে বলেন ঃ 'আল-ইউয়াম জাহাবা নিসফুল 'ইলম- আজ অর্ধেক 'ইলম (জ্ঞান) চলে গেল।' লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ তা কেমন করে? বললেন ঃ আমার কাছে একজন প্রবৃত্তির অনুসারী লোক আসতো। সে যখন হাদীসের বিরোধিতা করতো, আমি তাঁকে আনাসের নিকট নিয়ে যেতাম। আনাস তাঁকে হাদীস শুনিয়ে নিশ্চিন্ত করতেন। এখন কার কাছে যাব? (তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৮, তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১)

আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে হযরত আনাসের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছিল সব চেয়ে বেশী। আর এটা হয়েছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দু'আর বরকতে। এ সম্পর্কে আনাস বলেন ঃ একদিন রাসূল (সা) উম্মু সুলাইমের (আনাসের মা) বাড়ীতে এলেন। উম্মু সুলাইম খুরমা ও ঘি খেতে দিলেন। কিন্তু রাসূল (সা) সে দিন সাওম পালন করছিলেন। তিনি বললেন ঃ এগুলি নিয়ে যাও এবং খুরমার পাত্রে খুরমা ও ঘিয়ের পাত্রে ঘি রেখে দাও। তারপর তিনি উঠে ঘরের এক কোণে গিয়ে দুই রাকা'য়াত নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি উম্মু সুলাইম ও তাঁর পরিবারের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন। উম্মু সুলাইম 'আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কিছু বিশেষ নিবেদন আছে। তিনি জানতে চাইলেন ঃ কী? বললেন ঃ এই আপনার খাদিম আনাস। আনাস বলেন ঃ তারপর রাসূল (সা) আমার জন্য এমন দু'আ করলেন যে, দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণই বাদ দিলেন না। শেষের দিকে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দান কর এবং তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।' আনাস বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যে তিনটি জিনিসের জন্য দু'আ করেছিলেন, তার দুইটি আমি পেয়ে গেছি এবং বাকী একটির (জান্নাত) অপেক্ষায় আছি। আনাস আরও বলতেন ঃ 'আজ আনসারদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী সম্পদশালী ব্যক্তি আর কেউ নেই।' ঐতিহাসিকরা বলছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই দু'আর পূর্বে একটি মাত্র আংটি ছাড়া তিনি কোন সোনা বা রূপোর মালিক ছিলেন না। এভাবে রাসূল (সা) আনাস ও তাঁর পরিবারের কল্যাণ চেয়ে বহুবার দু'আ করেছেন। (আল-ফাতহুর রাব্বানী- মা'য়া বুলুগিল আমানী-২২/২০৩, আল-ইসাবা-১/৭২, তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪২, ১৪৩)

মৃত্যুকালে হযরত আনাস মোট ৮২ (বিরাশি) জন ছেলে মেয়ে-রেখে যান। তাদের মধ্যে ৮০ (আশি) জন ছেলে এবং হাফসা ও উম্মু 'আমর নামে দুই মেয়ে। তাছাড়া নাতি-নাতনীর সংখ্যা ছিল আরও অনেক। (উসুদুল গাবা-১/১২৮) খলীফা ইবন খাইয়্যাত বলেন ঃ আনাস যখন মারা যান তখন তাঁর চারটি বাড়ী। একটি বসরার জামে মসজিদের সামনে, একটি ইসতাফানুস গলিতে এবং একটি বসরা থেকে দুই ফারসাখ দূরে। তাছাড়া আরও একটি বাড়ী ছিল। (তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪১)

সন্তানদের প্রতি ছিল হযরত আনাসের দারুণ স্নেহ-মমতা। সব সময় যে তিনি বাড়ীতে থাকতেন- এই স্নেহ-মমতার প্রাবাল্যও তার একটি কারণ। ছেলে-মেয়েদের নিজেই শিক্ষা দিতেন। মেয়েদেরও হালকায়ে দারসে বসার অনুমতি ছিল। তাঁর কয়েকটি ছেলে হাদীস শাস্ত্রের শায়খ ও ইমাম রূপে স্বীকৃত হন। তাবেঈদের তাবকায় (শ্রেণী) তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। হযরত আনাসই তাদেরকে গড়ে তোলেন।

হযরত আনাস ছিলেন একজন দক্ষ তীর-দাজ। সন্তানদেরও এর অনুশীলন করাতেন। ছেলেরা

প্রথমে নিশানা ঠিক করে তীর ছুড়তো। তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তিনি ছুড়তেন এবং সঠিকভাবে তা লক্ষ্যভেদ করতো। তীর ছোড়ার অনুশীলনী সেই প্রাচীন জাহিলিয়্যাতের সময় থেকেই আনসারদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একথা তাবারী উল্লেখ করেছেন। (উসুদুল গাবা–১/১২৮)

হযরত আনাসের পরিপূর্ণ হুলিয়া বা অবয়ব জানা যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি মধ্যম আকৃতির সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। চুল–দাড়িতে মেহেন্দীর খিযাব লাগাতেন। হাতে সব সময় হলুদ বর্ণের 'খালুক' নামক এক রকম সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থকার বলেন ঃ সিংহের ছবি অঙ্কিত একটি আংটি হাতে পরতেন। বার্দ্ধক্যে সোনা দিয়ে দাঁত বেঁধেছিলেন। সুন্দর মিহি কাপড়ের পোশাক পরতেন। ছোট বেলায় মাথায় একটি জটা ছিল। রাসূল (সা) যখন মাথায় হাত দিতেন, সেই জটা স্পর্শ করতেন। পরে সেটি কেটে ফেলার ইচ্ছা করলে মা বললেন ঃ রাসূল (সা) এটি স্পর্শ করেছেন, সুতরাং কেটো না। (উসুদুল গাবা–১/১২৭, ১২৮) মাথায় পাগড়ী বাঁধতেন।

তিনি ছিলেন দারুণ সৌখিন ও পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির একজন মার্জিত রুচির মানুষ। দুনিয়ার বিত্ত–বৈভবও তাঁর অনুকূলে সাড়া দেয়। এ কারণে তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। অতি যত্নে একটি উদ্যান তৈরী করেছিলেন, তাতে বছরে দুইবার ফল আসতো। সেখানে একটি ফুল ছিল যা মিশকের মত সুগন্ধি ছড়াতো। (আল–ইসাবা–১/৭১)

তিনি বসরার দুই ফারসাখ (মাইল) দূরে 'তিফ' নামক স্থানে একটি বাড়ী বানিয়ে বসবাস করতেন। এতে বুঝা যায়, নগর জীবনের চেয়ে পল্লীতে বাস করা বেশী পসন্দ করতেন। ভালো খাবার খেতেন। খাবার তালিকায় সব সময় রুটি ও শুরবা থাকতো। তিনি উদার প্রকৃতির ছিলেন। আহারের সময় ছাত্র বা অন্য কেউ কাছে থাকলে, আহারে শরীক করাতেন। সকালে নাশতা করতেন এবং তিন অথবা পাঁচটি খেজুর খেতেন। কথা খুব কম বলতেন। প্রয়োজন হলে কথা তিনবার করে বলতেন। কারও বাড়ীতে ঢুকবার আগে তিনবার অনুমতি চাইতেন। (মুসনাদ–৩/১২৮, ১৮০, ২২১, ২৩২) আত্মীয়–বন্ধুদের কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে কিছু না কিছু খাবার তাদের সামনে উপস্থিত করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছু লোক তাঁকে দেখতে আসে। তিনি দাসীকে ডেকে বললেন ঃ রুটির সামান্য একটি টুকরো হলেও আমার বন্ধুদের জন্য নিয়ে এসো। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ উত্তম নৈতিকতা জান্নাতের কাজ। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৮২)

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির ছিলেন। মানুষের সাথে উদারভাবে মিশতেন। ছাত্রদের সাথেও ছিলেন ভীষণ আন্তরিক। প্রায়ই বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময় আমরা বসা থাকতাম, তিনি আসতেন; কিন্তু তাঁর সম্মানে আমরা কেউই উঠে দাঁড়াতাম না। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে অধিকতর প্রিয় আমাদের আর কে হতে পারে? এর কারণ, রাসূল (সা) এ সব কৃত্রিমতা একটুও পসন্দ করতেন না।

সবরের গুণটি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। তিনি যে পর্যায়ের লোক ছিলেন, মুসলমানদের অন্তরে তার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর যে মর্যাদার কথা বলেছেন এবং খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) যে নৈকট্য তিনি লাভ করেছিলেন তাতে প্রতিটি মানুষ তাঁকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখতো। তাঁর ছাত্র প্রখ্যাত তাবেঈ সাবিত নাবানী ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্যে হযরত আনাসের দুই চোখের মাঝখানে চুমু দিতেন।

একবার আনাস আবুল 'আলিয়্যাকে একটি সেব দিলেন। সেবটি হাতে নিয়ে তিনি শুকতে, চুমু খেতে ও মুখে ঘষতে লাগলেন। তারপর বললেন ঃ এই সেবে এমন হাতের স্পর্শ লেগেছে যে হাত রাসূলের(সা)পবিত্র হাত স্পর্শ করেছে।(তারীখে ইবন'আসাকির–৩/১৪৪)কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও উমাইয়্যা শাসকদের অনেকের কাছে এর কোন গুরুত্বই ছিল না। এসব স্বেচ্ছাচারী দুষ্টমতিদের নেতা ছিলেন হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ। তাঁর উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত আনাস তখন চরম ধৈর্য অবলম্বন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কারও সাথে এমন আচরণ করা হলে বসরায় আগুন জ্বলে যেত। তিনি কোন্ নীতি অবলম্বন করে এত ধৈর্য ধারণ করতেন? এর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর নিজের কথার মধ্যে। তিনি বলতেন ঃ মুহাম্মাদের (সা) বিশিষ্ট সাহাবীরা আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের আমীরদেরকে গালাগালি করবেনা, তাঁদেরকে ধোকা দেবে না এবং তাঁদের অবাধ্য হবে না। আল্লাহকে ভয় করবে ও ধৈর্য ধারণ করবে। (হায়াতুস সাহাবা–২/৭২)

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভয়–ডর শূন্য দুঃসাহসী। খুব দৌড়াতে পারতেন। একবার 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে একটি খরগোশ তাড়া করে ধরে ফেলেন। অথচ তাঁর সমবয়সী ছেলেরা খরগোশটির পিছনে ধাওয়া করে ফিরে আসে। বড় হয়ে নিপুণ অশ্বারোহী ও দক্ষ তীরন্দাজ হন।

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের সংখ্যা বিপুল। তাঁদের মধ্যে আবার এমন একদল আছেন যাঁরা বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি বলে বিবেচিত। আনাস ছিলেন এই দলেরই একজন। তাঁর বর্ণনা সমূহ বিশ্লেষণ করলে নীচের মূলনীতিগুলি পাওয়া যায় ঃ

১. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে এসেছে ঃ 'আনাস ইবন মালিক হাদীস বর্ণনার সময় ভীত হয়ে পড়তেন। বর্ণনার শেষে বলতেন ঃ এই রকম অথবা এই যেমনটি রাসূল (সা) বলেছেন' মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনার শেষে যে বলে থাকেন– 'আও কামা কালা–অথবা যেমন তিনি বলেছেন'– এবং আজকের যুগ পর্যন্ত যে ধারাটি অব্যাহত রয়েছে, তার প্রচলন হযরত আনাস থেকে। (তারীখে ইবন 'আসাকির–৩/১৪৮)

২. যে হাদীস বুঝতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তিনি তা বর্ণনা করেননি।

৩. যে সকল হাদীস তিনি সাহাবীদের নিকট থেকে এবং যেগুলি খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছিলেন এই দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানের সেবা বা খিদমাত হলো সেই জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটানো, হযরত আনাস এ ক্ষেত্রে কোন সাহাবী থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। সারাটি জীবন তিনি অভিনিবেশ সহকারে ইলমে হাদীসের প্রচার–প্রসারে অতিবাহিত করেন। তিনি হাদীস শিক্ষা দানের আওতা থেকে কক্ষণও বাইরে যাননি। যে যুগে তাঁর সমসাময়িক সাহাবা যুদ্ধ–বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তখনও রাসূলুল্লাহর (সা) এই খাদিম দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে বসরার জামে মসজিদে বসে মানুষকে হাদীস শোনাতেন।

তাঁর জ্ঞানের প্রসারতা তাঁর শাগরিদদের সংখ্যা দ্বারাই অনুমান করা যায়। তাঁর হালকায়ে দারসে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, সিরিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রের সমাবেশ ঘটতো। তাঁর সন্তান সংখ্যার মত ছাত্র সংখ্যাও অগণিত। হযরত আনাস হযরত রাসূলে কারীম (সা) থেকে

এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রায় এক শো রাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২২৮৬ (দুই হাজার দুই শো ছিয়াশি)। মুত্তাফাক আলাইহি-১৮০, বুখারী এককভাবে ৮০ এবং মুসলিম এককভাবে ৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ছেলে এবং নাতীদের থেকেও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বসরার বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু 'উমাইর 'আবদুল কাবীর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাফ্স ইবন হিশাম (২৯১ হিঃ) তাঁরই বংশধর। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-৩/৪০১) অবশ্য তাঁর বর্ণিত মুত্তাফাক আলাইহি হাদীসের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন-১৬৮, আবার কেউ বলেছেন-১২৮। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৫, তাহজীবুল আসমা-১/১২৭)

হযরত আনাস প্রথমতঃ রাসূলে পাকের (সা) সাহচার্যে থেকে ইল্ম হাসিল করেন। রাসূলের (সা) ওফাতের পর যে সকল সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শোনেন তারা হলেন ঃ উবাই ইবন কা'ব, 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবু জার, আবু তালহা, মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা, সাবিত ইবন কায়েস, মালিক ইবন সা'সা', উম্মু সুলাইম (তাঁর মা), উম্মু হারাম (তাঁর খালা), উম্মুল ফাদল (হযরত 'আব্বাসের স্ত্রী), আবু বকর, 'উমার, 'উসমান (রা) প্রমুখ। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৪)

হযরত আনাসের ছাত্র ও শাগরিদদের নামের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে যাঁরা বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন এখানে তাঁদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা গেল ঃ হাসান বসরী, ইবন শিহাব যুহরী, সুলাইমান তায়মী, আবু কিলাবা, ইসহাক ইবন আবী তালহা, আবু বকর ইবন 'আবদিল্লাহ মুযানী, কাতাদাহ, সাবিত নাবানী, হুমাইদ আতত্বাবীল, সুমামাহ্ ইবন 'আবদিল্লাহ, (আনাসের পৌত্র) জা'দ, আবু 'উসমান, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন আনসারী, আনাস ইবন সীরীন আযহারী, ইয়াহইয়া ইবন সা'ঈদ আনসারী, রাবী'য়াতুর রায়, সা'ঈদ ইবন জুবাইর এবং সুলাইমান ওয়ারদান রাহিমাহুমুল্লাহ। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৫)

ইলমে হাদীসের মত ফিকাহ শাস্ত্রেও হযরত আনাসের পান্ডিত্য ছিল। ফকীহ সাহাবীদেরকে তিনটি তাবকা বা স্তরে ভাগ করা হয়। আনাসের স্থান দ্বিতীয় স্তরে। তাঁর ইজতিহাদ ও ফাতওয়াসমূহ সংকলিত হলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের রূপ লাভ করতে পারে। হযরত 'উমার (রা) ফকীহ সাহাবীদের একটি দলের সাথে তাঁকে বসরায় পাঠান। ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

সাহাবীদের যুগে শিক্ষাদান সাধারণতঃ হালকা-ই-দারসের মধ্যেই সীমিত ছিল। হযরত আনাসও এই হালকার পদ্ধতিতেই দারস দিতেন। কোন ছাত্র প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিতেন। তাঁর দারসের এ ধরনের সাওয়াল-জাওয়াবের একটি সংকলন আছে। এখানে কয়েকটি মাসয়ালা উদ্ধৃত হলো যার মাধ্যমে তাঁর ইজতিহাদ পদ্ধতি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, স্বচ্ছ বোধশক্তি, সঠিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদির একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

বিশেষ কয়েকটি বরতনে নাবীজ (আংগুর বা খেজুরের রস) পান করা মাকরূহ। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একমত। হযরত আনাস স্পষ্ট করে তার কারণগুলির প্রতি ঈঙ্গিত করেছেন।

একবার কাতাদাহ জিজ্ঞেস করলেন, ঘড়া বা কলসে কি নাবীজ বানানো যায়? আনাস

বললেন ঃ যদিও রাসূলে কারীম (সা) এ সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করে যাননি, তবুও আমি মাকরূহ মনে করি। কারণ, যে জিনিসের হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ আছে, তাতে হারাম হওয়ার দিকটিই প্রাধান্য পাবে।

একবার মুখতার ইবন ফিলফিল জানতে চাইলেন, কোন্ কোন্ পাত্রে নাবীজ পান করা উচিত নয়? বললেন, যাতে নেশা হয় তা সবই হারাম। মুখতার বললেন, কাঁচ অথবা আলকাতরার পাত্রে কি পান করা যায়? বললেন ঃ হাঁ। আবার প্রশ্ন করা হলো ঃ মানুষ যে মাকরূহ মনে করে? বললেন ঃ যাতে সন্দেহ হয় তা পরিহার কর। তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হলো ঃ নেশা হয় এমন জিনিস তো হারাম; কিন্তু এক দুই ঢোক পানে আপত্তি কি? আনাস বললেন ঃ যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম। দেখ–আংগুর, খুরমা,গম, যব ইত্যাদি থেকে মদ তৈরী হয়। তার মধ্যে যে জিনিসে নেশা সৃষ্টি হয় তা মদ হয়ে যায়।

হযরত আনাস যদিও সুন্দরভাবে এই মাস'য়ালাটি বর্ণনা করেছেন; তবুও এর আরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) পান ও পানীয় সম্পর্কে যে বিধি–বিধান দান করেছেন সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক শরাব বা পানীয় যা নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম। সাহীহাইনে হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই খমর এবং প্রত্যেক খমর (মদ) হারাম। ইবন'উমার (রা) থেকে সাহীহ মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৩. 'যে সব জিনিসের বেশী পান করলে নেশা হয় তার অল্প একটুও হারাম।' (সুনানু ইবন 'উমার)। এর মধ্যে প্রথম হাদীসটির মর্ম হলো, যে সকল পানীয়ের মধ্যে নেশা বা মাদকতা এসে যায় তা হারাম। দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই খমর, আর প্রত্যেক খমরই হারাম। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায়; প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। তৃতীয়টির অর্থ হলো ঃ যে সব জিনিসের বেশী পান করলে নেশা হয় তার অল্প একটুও হারাম। হযরত আনাস (রা) তাঁর উপরোক্ত জবাবে এই কথাটিই বলেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো বিশেষ কয়েকটি পাত্রে নাবীজ পান করতে নিষেধ করা হয়েছে কেন? এর প্রকৃত রহস্য এই যে, আধুনিক বিশ্ব মদ তৈরী ও সংরক্ষণের জন্য সুন্দর কাঁচের যে সব পাত্র আবিষ্কার করেছে, তৎকালীন আরবে তা ছিলনা। সেখানে সাধারণভাবে লাউ–এর খোল ও সুরাহী বোতলের কাজ দিত। অথবা এ জাতীয় আরও কয়েকটি পাত্র ছিল যা প্রাকৃতিক ফল শুকিয়ে ও সাফ করে মদের কাজে ব্যবহার করা হতো। ঐ সব পাত্রে মদ রাখলে স্বাভাবিকভাবেই তাতে মদের ক্রিয়া পড়তো, আর তা ধোয়ার পরেও দূর হতো না। ইসলামের প্রথম যুগে যখন মদ হারাম হয় তখন এইসব পাত্রের ব্যবহার হারাম হওয়ার প্রকৃত রহস্য এটাই। অবশ্য পরবর্তীকালে এ জাতীয় পাত্র যাতে মদ রাখা হয়নি, তার ব্যবহার জায়েয হতে পারে। কিন্তু হিজরী প্রথম শতকের ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত মুসলমানরা ধারণা করে যে, ঐ সব পাত্র ব্যবহার করলে শরাব পানের কথা নতুন করে মানুষের স্মরণ হতে পারে।

একবার এক ব্যক্তি হযরত আনাসকে প্রশ্ন করলো ঃ রাসূল (সা) কি জুতো পরে নামায

আদায় করতেন? বললেন ঃ হাঁ। জুতো পরে নামায আদায় করা যায়। তবে শর্ত হলো, পাক হতে হবে, নাজাসাত থেকে পরিষ্কার হতে হবে। কেউ নতুন জুতো পরে নামায পড়লে ক্ষতি নেই।

একবার ইয়াহইয়া ইবন ইয়াযীদ হান্নায়ী প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযে কখন কসর করা উচিত? বললেন ঃ আমি যখন কুফা যেতাম, তখন কসর করতাম। আর রাসূল (সা) তিন মাইল বা তিন ফারসাখ পথ চলার পর কসর করেছিলেন। হযরত আনাসের কথার অর্থ এই নয় যে, তিন মাইল সফর করলেই কসর করতে হবে। বরং প্রকৃত ঘটনা হলো, রাসূল (সা) মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথে সর্বপ্রথম জুলহুলায়ফা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। সাহীহ বর্ণনা মতে, তা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। আর এ জন্যই তিনি সেখানে কসর আদায় করেন।

মুখতার ইবন ফিলফিল একবার প্রশ্ন করলেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে? আনাস বললেন ঃ বসে বসে।

'আবদুর রহমান ইবন দারদান এবং তাঁর সাথে আরও কিছু লোক মদীনায় আনাসের কাছে আসলেন। আনাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি 'আসরের নামায আদায় করেছ? তাঁরা বললেনঃ হাঁ। তাঁরা পাল্টা প্রশ্ন করলো ঃ রাসূল (সা) 'আসরের নামায পড়তেন কোন সময়? বললেন ঃ সূর্য তখনও উজ্জ্বল ও উপরে থাকতো।

একবার তিনি একটি জানাযার নামায পড়ালেন। জানাযাটি ছিল পুরুষের। এজন্য মাইয়্যেতের মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। একবার এক মহিলার জানাযা আনা হলো। এবার তিনি কোমর সোজা দাঁড়ালেন। 'আলা ইবন যিয়াদ 'আদাদীও সেই নামাযে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুইটি জানাযায় দুই রকম দাঁড়ানোর কারণ জানতে চাইলেন। আনাস বললেন ঃ রাসূল (সা) এমনটিই করতেন। 'আলা' সমবেত লোকদের বললেন ঃ ওহে, তোমরা কথাটি মনে রেখ।

একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ হযরত 'উমার (রা) রুকু'র পরে কুনুত পড়েছিলেন? বললেন ঃ হাঁ। রাসূল (সা) ও পড়েছিলেন। তবে এটা হযরত আনাসের নিজস্ব মতামত। কারণ, সাহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) এবং সাধারণভাবে প্রায় সকল সাহাবা 'বিতর' নামাযে রুকু'র পূর্বে কুনুত পড়তেন। এই মাসয়ালায় ইমাম শাফে'ঈ হযরত আনাসের অনুসারী। তিনি নিজের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীস গ্রহণ করেছেন। হাদীসটি হলো, হযরত 'আলীও রুকু'র পরে কুনুত পড়তেন। কিন্তু হাদীসটি মুনকাতা'ও দুর্বল সনদ বিশিষ্ট।

তাছাড়া ইবন মুনজির 'আল-আশরাফ' গ্রন্থে লিখেছেন, আনাস এবং অমুক অমুক সাহাবী থেকে বর্ণিত যে সকল হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে, তার প্রত্যেকটিতে রুকু'র পূর্বে কুনুত পড়ার কথা এসেছে। আর এটাই সঠিক। কারণ, সাহীহ মুসলিম গ্রন্থে আনাস থেকে যে সকল রিওয়ায়াত এসেছে তাতে এই মাসয়ালার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'আসিম হযরত আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুনুত রুকু'র পূর্বে না পরে পড়া উচিত? বললেন ঃ রুকু'র পূর্বে। 'আসিম বললেন ঃ মানুষের তো ধারণা রাসূল (সা) রুকু'র পরে পড়তেন। আনাস বললেন ঃ সে একটা সাময়িক ঘটনা। কয়েকটি গোত্র মুরতাদ হয়ে যায় এবং বেশ কিছু সাহাবাকে হত্যা করে। এজন্য হযরত রাসূলে কারীম (সা) একমাস রুকু'র পরে কুনুত পড়ে তাদের ওপর বদ দু'আ করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ- ৩/১০০, ১১২, ১১৮,১২৬, ১২৯, ২০৪, ২০৯)

উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম হযরত আনাস কেমন সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ইজতিহাদী মাসয়ালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অন্যান্য সাহাবার ইজতিহাদের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য তা সঠিক। (দ্রঃ সীয়ারে আনসার-১/১৩৭-১৪২)

হযরত আনাসের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যকে আরও শোভা দান করেছিল, হুব্বে রাসূল, ইত্তেবা-ই-সুন্নাত, আমর বিল মা'রূফ ও হক কথা বলা- এগুলিই হলো সেই বৈশিষ্ট্য। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর ভালোবাসার চিত্র তো আমরা তুলে ধরেছি। তিনি যখন মাত্র দশ বছরের এক অবুঝ বালক তখনই রাসূলের (সা) প্রতি এত গভীর মুহাব্বত যে, প্রতিদিন প্রত্যুষে রাসূলের (সা) দীদার লাভে তাঁর চোখ দুটি ধন্য হতো। সেই সুবহে সাদিকের পূর্বে রাতের অন্ধকারে উম্মু সুলাইমের এই ছেলে শয্যা ত্যাগ করে তাঁর হাবীবের অজুর পানির বন্দোবস্ত করার জন্য মসজিদে নববীর পথ ধরতেন। যৌবনে তাঁর এই ভালোবাসার কোন সীমা ছিল না। রাসূলুল্লাহর (সা) একটিমাত্র দৃষ্টি আনাসের জন্য চরম আনন্দ ও প্রশান্তি বয়ে নিয়ে আসতো। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর যদিও তিনি বাহ্যতঃ তাঁর দীদার থেকে বঞ্চিত হন, তবুও প্রায়ই স্বপ্নে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হতেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে কাঁদতে মানুষের কাছে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কথা যখন তিনি স্মরণ করতেন তখন বড় অস্থির ও কাতর হয়ে পড়তেন। একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক ও দৈহিক গঠনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। তখন শুধু উদাস চাহনিতে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশার সেই সৌভাগ্যে ভরা দিনগুলির কথা স্মরণ করতে লাগলেন। তিনি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতের কথা বলতেন, তখন দেখা যেত অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে ভাবান্তর ঘটে গেছে। অবলীলাক্রমে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছেঃ কিয়ামতের দিন আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হবো তখন বলবো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সেই নিকৃষ্ট খাদিম আনাস উপস্থিত।

হযরত আনাসের প্রতিটি মজলিস হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ঘটনাবলী স্মরণে ভরপুর থাকতো। নবুওয়াতের সময়কালের ঘটনাবলী ছাত্র ও ভক্তদের কাছে বর্ণনা করতেন। এই বর্ণনার মধ্যেই অন্তরে একটা প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করতেন এবং তাতে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তিনি বাড়ী ফিরে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) যে সকল জিনিস তাঁর কাছে ছিল তা বের করে বার বার দেখতেন এবং মনকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর ছাত্রদের সকলের মধ্যে এই রাসূল-প্রেমের প্রভাব পড়েছিল। সাবিত ছিলেন হযরত আনাসের অন্যতম ছাত্র। তিনি একেবারেই উস্তাদের রংগে রংগিত ছিলেন। তিনি উস্তাদের নিকট সব সময় নবুওয়াতী যুগ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। একদিন প্রশ্ন করলেন, আপনি কি হযরতের পবিত্র হাত স্পর্শ করেছেন? আনাস বললেন ঃ হাঁ। অথবা তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) হাত অপেক্ষা অধিকতর কোমল হাত আর কক্ষণও স্পর্শ করিনি। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৪) একথা শুনে সাবিতের অন্তরে প্রেমের আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি উস্তাদকে বললেন ঃ আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন, একটু চুমু দিই।

প্রকৃত ভালোবাসার দাবী হলো প্রিয়জনের প্রতিটি জিনিস ও আচরণই পছন্দ করা। হযরত আনাস তা করতেন। তাঁর জীবনের অসংখ্য ঘটনাও একথা প্রমাণ করে। আনাস বলেন ঃ

একবার এক দর্জি রাসূলকে (সা) আহারের দা'ওয়াত দিল। আমিও সাথে গেলাম। যবের রুটি এবং শুকনো গোশত ও লাউ–এর তরকারি উপস্থিত করা হলো। আমি দেখলাম, রাসূল (সা) বেছে বেছে লাউ খাচ্ছেন। সেইদিন থেকে আমি লাউ খেতে ভালোবাসি। (হায়াতুস–সাহাবা–২/১৯০)

আনাস বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলো ঃ কিয়ামত কখন হবে? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বললো ঃ কিছুই না। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করি। রাসূ ল (সা) বললেন ঃ তুমি যাদের ভালোবাস তাদের সাথেই থাকবে। আনাস বলেন ঃ সেদিন রাসূলুল্লাহর (সা) এ কথায় আমরা দারুণ খুশী হয়েছিলাম। আমি—নবী (সা), আবু বকর ও 'উমারকে ভালোবাসি এবং আশা করি এই ভালোবাসার বিনিময়ে আমি তাঁদের সাথেই থাকবো। (হায়াতুস সাহাবা–২/৩১৮)

কালিমা তাওহীদের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন নামায। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যে খুশু'–খুদু' (ভয় ও বিনয়) ও আদবের সাথে নামায আদায় করতেন সাহাবীরাও সেই পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করতেন। বহু সাহাবীর নামায তো ছিল প্রায় রাসূলে পাকের (সা) নামাযের কাছাকাছি। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে আনাসের নামাযের সাদৃশ্য ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। একবার তো হযরত আবু হুরাইরা (রা) আনাসকে (রা) নামায পড়তে দেখে বলেছিলেন, আমি ইবন উম্মে সুলাইমের (আনাস) নামায অপেক্ষা রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ আর কারও নামায দেখিনি।

নামায ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কথা ও কাজ সাহাবায়ে কিরামের সামনে ছিল। হযরত আনাস দশ বছর যাবত রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বক্ষণিক খাদেম ছিলেন। এই সময় কালে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কাজ আনাসের নিকট গোপন থাকতে পারে না। রাসূল (সা) যা কিছু বলতেন অথবা 'আমলের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত করতেন তার সবই আনাস স্মৃতিতে ধরে রাখতেন এবং সেই অনুযায়ী 'আমল করতেন। একবার খলিফার আমন্ত্রণে তিনি দিমাশকে গেলেন। ফেরার পথে 'আইনুত তামার' নামক স্থানে যাত্রা বিরতির ইচ্ছা করলেন। ছাত্র ও ভক্তদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেল। তারা নির্ধারিত দিনে উক্ত স্থানে সমবেত হলো, লোকালয়ের বাইরে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানের মধ্য দিয়ে তাঁর উট এগিয়ে আসছিল। তখন ছিল নামাযের সময়। লোকেরা দেখলো, তিনি উটের পিঠে নামাযরত; কিন্তু উটটি কিবলামুখী নয়। ছাত্ররা বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এ কেমনভাবে নামায আদায় করছিলেন? হযরত আনাস বললেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহকে (সা) এভাবে নামায আদায় করতে না দেখতাম, কক্ষণও আদায় করতাম না।

একবার ইবরাহীম ইবন রাবীয়া' হযরত আনাসের নিকট আসলেন। হযরত আনাস একখানা কাপড়ের একপাশ পরে অন্য পাশ গায়ে জড়িয়ে নামাযে মশগুল ছিলেন। নামায শেষ হলে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি এভাবে এক কাপড়ে নামায পড়েন? আনাস বললেন ঃ হাঁ, আমি এভাবে রাসূলকে (সা) নামায পড়তে দেখেছিলাম। উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের সর্বশেষ নামায– যে নামায হযরত আবু বকরের (রা) পিছনে পড়েছিলেন, তা এক কাপড়েই ছিল। (মুসনাদ – ৩/১৫৯)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পবিত্র জীবনের প্রতিটি আচরণ ও পদক্ষেপ ছিল হযরত আনাসের জীবন পথের দিশারী। ফরজ ছাড়াও ওয়াজিব ও সুন্নাত সমূহেও রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি ছোট-বড় সকলকে সালাম করতেন। সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলতেন, আমাকে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আনাস, তুমি যখন ঘর থেকে বের হবে, তারপর যার সাথে দেখা হবে, সকলকে সালাম করবে। এতে তোমার নেকী বা মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। আর সম্ভব হলে সব সময় অজু অবস্থায় থাকবে। কারণ, তুমি জান না তোমার মৃত্যু কখন আসবে। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৪)

প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তির জন্য কুরবানী প্রয়োজন। হযরত আনাস ছিলেন একজন বিত্তশালী রয়িস বা নেতা। যতগুলি জানোয়ার ইচ্ছা, কুরবানী করতে পারতেন। কিন্তু 'খায়রুল কুরূন'-সর্বোত্তম যুগের লোকদের নিকট নাম-কামের চেয়ে রাসূলের (সা) পায়রুবী ও অনুসরণ ছিল সব কিছুর উর্ধ্বে। সে যুগের লোকেরা খ্যাতির জন্য নয়; বরং সাওয়াবের জন্যই কুরবানী করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) দুইটি পশু কুরবানী করতেন, এই জন্য হযরত আনাসও দুইটিই করতেন।

উমাইয়্যা শাসন আমলে হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (র) যুবরাজ থাকাকালে একবার মদীনার গভর্ণর ছিলেন। যেহেতু শাহী খান্দানের সদস্য ছিলেন, এ কারণে জাতীয় জীবনের অনেক কিছুই তাঁর জানা ছিল না। সে যুগের প্রচলন অনুযায়ী নিজেই নামাযের ইমামতি করতেন এবং মাঝে মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটিও হয়ে যেত। হযরত আনাস প্রায়ই তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতেন। তিনি একবার হযরত আনাসকে বললেন, আপনি এভাবে আমার বিরোধিতা করেন কেন? হযরত আনাস বললেন ঃ আমি যেভাবে রাসূলুল্লাহকে (সা) নামায পড়তে দেখেছি আপনি যদি সেইভাবে নামায পড়ান তাহলে আমি সন্তুষ্ট হবো। অন্যথায় আপনার পিছনে নামায আদায় করবো না। হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয ছিলেন বুদ্ধিমান ও সৎ স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি। হযরত আনাসের কথায় তিনি প্রভাবিত হলেন। তিনি আনাসকে উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করলেন। কিছুদিন তাঁর সাহচর্য ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি এমন সুন্দর নামায পড়াতে লাগলেন যে, খোদ আনাসই বলতে লাগলেন, এই ছেলের নামাযের চেয়ে আর কারও নামায রাসূলুল্লাহর (সা) নামাযের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১৩৩, ১৩৪)

একবার খলীফা 'আবদুল মালিক হযরত আনাসসহ আরও চল্লিশজন আনসারী ব্যক্তিকে দিমাশ্‌কে ডেকে পাঠান। সেখান থেকে ফেরার পথে 'ফাজ্জুন নাকাহ' নামক স্থানে পৌছলে, আসর নামাযের সময় হয়ে যায়। যেহেতু সফর তখনও শেষ হয়নি, এই কারণে হযরত আনাস দুই রাকা'য়াত নামায পড়ান (কসর করেন)। তবে কিছু লোক আরও দুই রাকা'য়াত পড়ে চার রাকা'য়াত পুরো করেন। একথা হযরত আনাস জানতে পেরে দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন, আল্লাহ যখন কসরের অনুমতি দিয়েছেন তখন এ সুবিধা গ্রহণ করবে না কেন? আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি, এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি করবে। আসলে তারা দ্বীনের প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে থাকবে গাফিল।

সত্যকথা বলা এবং সত্যকে পছন্দ করা ছিল হযরত আনাসের চরিত্রের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। খিলাফতে রাশেদার প্রথম দুই খলীফার পর এমন অনেক যুবক সরকারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয় যারা ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। এজন্য তাদের

অনেক কাজই কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী হতো। যে সাহাবায়ে কিরাম জীবনের বিনিময়ে ইসলাম খরীদ করেছিলেন তাঁরা এটা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে সব সময় সত্য কথাটি স্পষ্টভাবে বলে দিতেন। হযরত আনাস রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে বহু স্বৈরাচারী শাসকের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন যারা প্রকাশ্যে শরীয়াতের প্রতি অবহেলা করতো। হযরত আনাস এ অবস্থায় চুপ থাকেননি। তিনি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে তাদের সতর্ক করে দিতেন।

ইয়াযীদের সময়ে আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ ছিলেন ইরাকের গভর্ণর। তাঁর নির্দেশে হযরত ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা সামনে আনা হলে তিনি হাতের ছড়িটি দিয়ে হযরত হুসাইনের চোখে টোকা দিয়ে তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু অশালীন কটাক্ষ করেন। হযরত আনাস নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলেন না। ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ এই চেহারা রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উমাইয়্যা রাজবংশের বিখ্যাত স্বৈরাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আস-সাকাফী নিজের ছেলেকে বসরার কাজী নিয়োগ করতে চায়। হাদীস শরীফে বিচারক অথবা আমীরের পদের আকাঙ্খী হবার নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই হযরত আনাস হাজ্জাজের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে বলেন ঃ এমনটি করতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন।

উমাইয়্যা শাসকদের আর এক আমীর হাকাম ইবন আইউব। তাঁর নৃশংসতা মানুষের সীমা অতিক্রম করে জীব-জন্তু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একবার হযরত আনাস তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন, মুরগীর পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে তীরের নিশানা বানানো হচ্ছে। তীর লাগলে মুরগীটি ছটফট করছে। হযরত আনাস এ দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হলেন এবং মানুষকে তাদের এ কাজের জন্য ধিক্কার দিলেন। (সাহীহ মুসলিম-২/১৫৮)

একবার কিছু লোক জুহরের নামায আদায় করে হযরত আনাসের সাক্ষাতের জন্য আসে। তিনি তখন চাকরের নিকট অজুর পানি চাইলেন। লোকেরা জানতে চাইলো, এ কোন নামাযের প্রস্তুতি? বললেন ঃ 'আসর নামাযের। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমরা তো এখনই 'জুহর' পড়ে এলাম। হযরত আনাস আমীর উমরাহের দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা এবং জনগণের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন ঃ এ তো হবে মুনাফিকদের নামায। মানুষ বেকার বসে থাকবে, তবুও নামাযের জন্য উঠবে না। যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকবে তখন খুব তাড়াতাড়ি মোরগের মত চারটি ঠোকর মেরে দেবে। সেই ঠোকরে আল্লাহর স্মরণ থাকবে অতি অল্পই।

প্রকৃত দ্বীনদারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আমর বিল মা'রূফ'- সৎ কাজের আদেশ দান করা। আর এজন্যই কুরআন মজীদে উম্মাতে মুসলিমাকে সর্বোত্তম উম্মাত হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। হযরত আনাসের মধ্যে এই গুণটির বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল। একবার 'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের একটি মজলিসে হাউজে কাওসার প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। উবাইদুল্লাহ এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। একথা হযরত আনাসের কানে গেল। তিনি সরাসরি উবাইদুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন ঃ তোমার এখানে কি 'হাউজে কাওসার' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছিল? বললেন ঃ হাঁ। কেন, রাসূল (সা) কি এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন? হযরত আনাস (রা) হাউজে কাওসার সম্পর্কে রাসূলের (সা) হাদীস তাঁকে শুনিয়ে

ফিরে আসেন।

হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর (রা) একজন আনসারী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের রিপোর্ট পেলেন। এই অপরাধের জন্য তিনি লোকটিকে পাকড়াও করার চিন্তা করলেন। লোকেরা হযরত আনাসকে কথাটি জানালেন। তিনি সোজা মুস'য়াবের কাছে গিয়ে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের প্রতি ভালো ব্যবহার করার জন্য আমীরদের অসীয়াত করেছেন। তাদের ভালো লোকদের সাথে উত্তম আচরণ এবং খারাপ লোকদের ক্ষমা করতে বলেছেন। এই হাদীস শুনা মাত্র মুস'য়াব ইবন 'উমাইর (রা) খাট থেকে নীচে নেমে এসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশের স্থান আমার চোখের ওপর। আমি লোকটিকে ছেড়ে দিচ্ছি।

সাবিত আন–নাবানী বলেন ঃ একদিন আমি বসরার 'যাবিয়া' নামক স্থানে আনাসের সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় আজান শোনা গেল। সাথে সাথে আনাস মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলেন এবং এভাবে আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি বলতে পার কেন আমি এভাবে হেঁটে মসজিদে এলাম? তারপর নিজেই বললেন ঃ নামাযের জন্য আমার পদক্ষেপ যাতে বেশী হয়, সেই জন্য। (হায়াতুস সাহাবা– ৩/১০৪)

হযরত আনাস 'ইলম হাসিলের চেয়ে অর্জিত 'ইলম অনুযায়ী 'আমলের ওপর বেশী জোর দিতেন। তিনি বলতেন ঃ যত ইচ্ছা 'ইলম বা জ্ঞান হাসিল কর। তবে আল্লাহর কসম, 'আমল না করলে সে সব 'ইলমের প্রতিদান দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলতেন ঃ প্রকৃত 'আলেমের কাজ বুঝা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। আর মূর্খদের কাজ শুধু বর্ণনা করা। (হায়াতুস সাহাবা– ৩/২৪১, ২৪৪)

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন। এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে আমার সুন্নাত ছেড়ে দেবে সে আমার উম্মাতের কেউ নয়। তিনি আরও বলেছেন ঃ যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। (হায়াতুস সাহাবা– ১/৩৫)

হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিস স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করেছিলেন, যেমন ঃ জুতো, একটি চাদর, একটি পিয়ালা, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি ইত্যাদি। আনাস বলতেন ঃ আমার মা উম্মু সুলাইম মৃত্যুকালে আমার জন্য রেখে যান রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চাদর, একটি পিয়ালা যাতে তিনি পানি পান করতেন, তাঁবুর কয়েকটি খুঁটি এবং একটি শীলা যার ওপর আমার মা রাসূলুল্লাহর (সা) ঘাম মিশিয়ে সুগন্ধি পিষতেন। (তারিখে ইবন আসাকির– ৩/১৪৪, ১৪৫)

এভাবে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) সম্পর্কে টুকরো টুকরো তথ্য হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা খুবই চমকপ্রদ এবং মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকরও বটে। ■

আবু দারদা (রা)

ডাক নাম আবু দারদা। কন্যা দারদার নাম অনুসারে এ নাম এবং ইতিহাসে এ নামেই খ্যাত। আসল নামের ব্যাপারে মত পার্থক্য আছে। যথা ঃ 'আমির ও 'উয়াইমির । আল-আসমা'ঈর মতে, 'আমির, তবে লোকে 'উয়াইমির বলতো। আর এটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কেউ বলেছেন, 'উয়াইমির তাঁর লকব বা উপাধি। পিতার নামের ব্যাপারেও বিস্তর মত পার্থক্য আছে। যথাঃ মালিক, 'আমির, সা'লাবা, আবদুল্লাহ, যায়িদ ইত্যাদি। মায়ের নাম মুহাব্বাত বা ওয়াকিদাহ্। (তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১৫৬; আল-ইসাবা-২/৪৫; উসুদুল গাবা-৫/১৮৫; আল-ইসতী'য়াবঃ পার্শ্ব টীকা: আল-ইসাবা-৪/৫৯) মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'বালহারিস' শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) সমবয়সী বা কিছুদিনের ছোট। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দ্দু)-১/৮০০)

তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অশ্বারোহী ও বিচারক। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন মদীনার একজন সফল ব্যবসায়ী। তারপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলতেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আমি ছিলাম ব্যবসায়ী। তারপর যখন ইসলাম এলো, আমি আমার ব্যবসা ও ইবাদাতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা সমন্বিত হলো না। সুতরাং আমি ব্যবসা ছেড়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করলাম।' (আজ-জাহাবীঃ তারীখুল ইসলাম-২/১০৭; আল-আ'লাম-৫/২৮১; হায়াতুস সাহাবা-২/২৯৬) শেষে ব্যবসার প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন। অনেক সময় বলতেন, এখন যদি আমার মসজিদে নববীর সামনে একটি দোকান থাকে, প্রতিদিন তাতে ৪০ দীনার করে লাভ হয় এবং তা সাদাকা করে দিই, আর এ জন্য নামাযের জামা'য়াতও ফাওত না হয়- তবুও এমন ব্যবসা এখন আমার পসন্দ নয়। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেনঃ শেষ বিচার দিনের কঠিন হিসাবের ভয়। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৫; হায়াতুস সাহাবা-২/২৯৬; আল-হুলায়্যা-১/২০৯) ইসলাম গ্রহণের পর বীরত্ব, খোদাভীরুতা ও পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি উদাসীনতার জন্য সাহাবাকুলের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। (আল-আ'লাম-৫/২৮১; আল-ইসাবা-২/৪৫)

আবু দারদার বীরত্ব, অশ্বারোহণ ও বিজ্ঞতার স্বীকৃতি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বাণীতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞতা সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেনঃ 'উয়াইমির হাকীমু উম্মাতি- 'উয়াইমির- আমার উম্মাতের একজন মহাজ্ঞানী হাকীম। তাঁর অশ্বারোহণ সম্পর্কে বলেছেনঃ নি'মাল ফারিসু 'উয়াইমির- 'উয়াইমির একজন চমৎকার অশ্বারোহী। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৮; আল-ইসাবা-২/৪৪; আল-ইসতীয়াবঃ আল-ইসাবার টীকা-৪/৬০) তাঁর বিজ্ঞতাসূচক অনেক বাণী বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তার কিছু অংশ 'আল-ইসতীয়াব' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। (টীকা আল-ইসাবা-২/১৭) এ কারণে ইমাম ইবনুল জাযারী তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ 'কানা মিনাল 'উলামা আল-হুকামা'- তিনি ছিলেন বিজ্ঞ জ্ঞানীদের একজন। (আল-আ'লাম-৫/২৮১)

সা'ঈদ ইবন 'আবদুল আযীয বলেনঃ আবু দারদা বদর যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। (তারীখুল ইসলাম–২/১০৯) আবার অনেকে বলেছেন বদর যুদ্ধের পর। (শাজারাতুজ জাহাব–৫/৩৯) আল–ইসতী'য়াব গ্রন্থকার বলেনঃ তিনি তাঁর পরিবারের সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে একজন ভালো মুসলিমে পরিণত হন। (টীকা–আল–ইসাবা–৪/৫৯) জুবাইর ইবন নুফাইর বলেন, রাসূল (সা) বলেছেনঃ আল্লাহ আমাকে আবু দারদার ইসলামের অঙ্গীকার করেছেন। জুবাইর বলেনঃ অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (তারীখুল ইসলাম–২/১০৯)

এ খুব বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এত বড় বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্য শ্রেষ্ঠ আনসারদের সাথে ইসলাম গ্রহণ না করে হিজরী দ্বিতীয় সন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এর একমাত্র কারণ, তার ইসলাম গ্রহণ অন্যের দেখাদেখি নয়; বরং ভেবে–চিন্তে ও জেনেশুনে ছিল। সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর এক বছর পর্যন্ত তিনি বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং ভালো মত খোঁজখবর নেন। তবে এই একটি বছর পেছনে পড়ার কারণে সারা জীবন অনুশোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে প্রায়ই বলতেনঃ এক মুহূর্তের প্রবৃত্তির দাসত্ব দীর্ঘকালের অনুশোচনার জন্ম দেয়।

জাহিলী যুগে প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) সাথে আবু দারদার গভীর বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃ সম্পর্ক ছিল। আবদুল্লাহ আগে ভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু আবু দারদা পৌত্তলিকতার ওপর অটল থাকেন। তবে আবদুল্লাহর সাথে সম্পর্ক পূর্বের মতই বজায় রাখেন। আবদুল্লাহও বন্ধুকে ইসলামের মধ্যে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকেন। তিনি আবু দারদাকে বারবার ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁরই চেষ্টায় আবু দারদা মুসলমান হন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

'সেদিন আবু দারদা 'উয়াইমির প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে তাঁর প্রতীমাটির কাছে গেলেন। সেটি থাকতো বাড়ীর সবচেয়ে ভালো ঘরটিতে। প্রথমে তার প্রতি আদাব ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। নিজের বিশাল দোকানের সর্বোত্তম সুগন্ধ তেল তার গায়ে ভালো করে মালিশ করলেন। তারপর গতকালই ইয়ামন থেকে আগত একজন ব্যবসায়ী তাঁকে যে একখানি উৎকৃষ্ঠ রেশমী কাপড় উপহার দিয়েছেন তাই দিয়ে খুব সুন্দরভাবে প্রতীমাটি ঢেকে রাখলেন। অতঃপর একটু বেলা হলে তিনি দোকানের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যাওয়ার পথে তিনি দেখলেন, মদীনার রাস্তা–ঘাট, অলি–গলি সর্বত্রই মুহাম্মাদের (সা) সংগী–সাথী গিজ গিজ করছে। তারা দলে দলে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরছেন। আর তাঁদের আগে আগে চলছে কুরাইশ বন্দীরা। তিনি তাঁদের এড়িয়ে পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ খাযরাজ গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে এসে পড়লো। তিনি যুবকের কাছে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কুশল জিজ্ঞেস করলেন। যুবক বললেন, বদরে তিনি দারুণ যুদ্ধ করেছেন এবং গণীমতের মাল নিয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরেছেন। আবু দারদা দোকানে গিয়ে বসলেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বদর থেকে ফিরে তাঁর ভাই আবু দারদার বাড়ীতে গেছেন তার সাথে দেখা করতে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দেখলেন, আবু দারদার স্ত্রী বসে বসে চুলে চিরুনী করছেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু দারদা

কোথায়? স্ত্রী বললেনঃ আপনার ভাই তো এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। এ কথা বলে আবদুল্লাহকে ঘরে বসতে দিয়ে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে আবদুল্লাহ একটি হাতুড়ি হাতে তুলে নিয়ে যে ঘরে প্রতীমাটি ছিল সেখানে ঢুকে গেলেন এবং বিভিন্ন শয়তানের নামের একটি কাসীদা আবৃত্তি করতে করতে হাতুড়ির আঘাতে মূর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলেন। কাসীদাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপঃ

'ওহে সাবধান! আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছুই ডাকা হোক না কেন সবই বাতিল ও অসার।'

আবু দারদার স্ত্রী হাতুড়ির আঘাতের শব্দ শুনে ছুটে এসে ঘটনাটি দেখে চেঁচিয়ে বলে ওঠেনঃ 'ওহে ইবন রাওয়াহা। আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন।' আবদুল্লাহ কোন জবাব না দিয়ে এমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন যেন কিছুই ঘটেনি।

আবু দারদা বাড়ী ফিরে দেখলেন, স্ত্রী বসে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি হয়েছে? বললেনঃ আপনার ভাই আবদুল্লাহ এসে ঐ দেখুন কি কান্ডই না ঘটিয়ে গেছেন। আবু দারদা প্রথমতঃ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারপর গভীরভাবে চিন্তা করার পর আপন মনে বলে ওঠেনঃ যদি এ প্রতীমার মধ্যে সত্যি সত্যিই কোন কল্যাণ থাকতো তাহলে সে নিজেকে রক্ষা করতো। এমন চিন্তার পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ইসলাম কবুল করেন।' (সুওয়ারুন মিন হায়াতুস সাহাবা-৩/৯৫-১০০; হায়াতুস সাহাবা-১/২৩২-২৩৩; ৩/৩৮৪; আল-মুসতাদরিক-৩/৩৩৬) রাসূল (সা) সালমান আল-ফারেসীর সাথে তাঁর দ্বীনি-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/২৭১; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৫; উসুদুল গাবা-৫/১৮৫)

বদর যুদ্ধের সময় আবু দারদা অমুসলিম ছিলেন। এ কারণে সে যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তবে খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে সাহাবাদের যে ভাতার ব্যবস্থা করেন তাতে আবু দারদার ভাতা বদরী সাহাবীদের সমান নির্ধারণ করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-১/৮০০) উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমান। এ যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন এবং একজন অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবেই এতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে প্রতিপক্ষের একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে তাড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি একাই তাদের তাড়িয়ে দেন। রাসূল (সা) সে দিন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে দারুণ পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেনঃ 'নি'মাল ফারিসু 'উয়াইমির'- 'উয়াইমির এক চমৎকার ঘোড় সওয়ার। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৪; তারীখুল ইসলাম-২/১০৭) উহুদ ছাড়াও অন্যান্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তবে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে আবু দারদা মদীনায় ছিলেন। তাঁর এ সময়ের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে মদীনা ছেড়ে শামে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা তাঁর মদীনা ত্যাগের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। ১· মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) স্মৃতি তাঁকে সব সময় কষ্ট দিত। ২· তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামী

শিক্ষার প্রচার-প্রসার নবীর ওয়ারিসদের ওপর ফরজ। এই বোধ তাঁকে মদীনা ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। ৩· তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট একথা শুনেছিলেন যে, ফিত্‌নার অন্ধকারে ঈমানের প্রদীপ শামে নিরাপদ থাকবে। মূলতঃ এসকল কারণে শামের রাজধানী দিমাশ্‌কে তিনি বসতি স্থাপন করেন। (সীয়ারে আনসার-২/১৯০)

হযরত আবু দারদার মদীনা ত্যাগের ব্যাপারে একটি কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। তিনি সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খলীফা হযরত 'উমারের নিকট গেলেন অনুমতি চাইতে। খলীফা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তবে একটি শর্তে অনুমতি দিতে পারেন বলে জানালেন। শর্তটি হলো তাঁকে কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে যেতে হবে। আবু দারদা জানালেন, শাসক হওয়া তাঁর পছন্দ নয়। খলীফা বললেন, তাহলে অনুমতির আশা করবেন না। আবু দারদা অবস্থা বেগতিক দেখে বললেন, আমি কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করবো না ঠিক, তবে মানুষকে কুরআন-হাদীস শিখাবো এবং নামায পড়াবো। তাঁর প্রস্তাবে খলীফা রাজী হলেন এবং তাঁকে মদীনা ত্যাগের অনুমতি দিলেন। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই তিনি শামের প্রবাস জীবন গ্রহণ করেন।

আবু দারদার শামে গমন সম্পর্কে ইবন সা'দ ও হাকেম, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী থেকে একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেন, হযরত নবী কারীমের (সা) জীবনকালে পাঁচজন আনসার সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেন। তাঁরা হলেনঃ মু'য়াজ ইবন জাবাল, 'উবাদা ইবনুস সামিত, উবাই ইবন কা'ব, আবু আইউব ও আবু দারদা (রা)। খলীফা 'উমারের খিলাফতকালে হযরত ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ান শাম থেকে খলীফাকে লিখলেনঃ শামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি শহর-বন্দর লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। এ সকল লোককে কুরআন শিখাতে পারে এমন কিছু ব্যক্তির প্রয়োজন। চিঠি পেয়ে খলীফা 'উমার (রা) উপরোক্ত পাঁচ ব্যক্তিকে ডেকে চিঠির বক্তব্য তাঁদেরকে জানালেন এবং আবেদন রাখলেন, আপনাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিনজন এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন। আর ইচ্ছা করলে সবাই করতে পারেন। ইচ্ছা করলে আপনাদের মধ্য থেকে নিজেরা তিনজনকে নির্বাচন করতে পারেন, অন্যথায় আমিই তিনজনকে বেছে নেব। তাঁরা বললেনঃ ঠিক আছে, আমরা যাব। আবু আইউব ছিলেন বয়োবৃদ্ধ, আবু উবাই পীড়িত, এ জন্য এ দু'জনকে তাঁরা বাদ দিলেন। বাকী তিন জনকে খলীফা বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন। আবু দারদাকে পাঠালেন দিমাশ্‌কে এবং তিনি আমরণ সেখানে অবস্থান করেন। (তাবাকাত-৪/১৭২; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৫-১৯৬)

দিমাশ্‌কে তাঁর অধিকাংশ সময় ছাত্রদের কুরআন হাদীসের তা'লীম, শরীয়াতের আহকামের তারবিয়্যাত (প্রশিক্ষণ দান) এবং ইবাদাতের মধ্যে অতিবাহিত হতো। যখন শামে অবস্থানরত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরামের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের ওপর সেখানকার ঠাঁট ও জৌলুসের কিছু না কিছু ছাপ পড়েছিল তখন আবু দারদা এর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অকৃত্রিম জীবনধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর ঐতিহাসিক শাম সফরের সময় সেখানে অবস্থানরত প্রখ্যাত সাহাবা ইয়াযীদ ইবন আবী সুফ ইয়ান, 'আমর ইবনুল 'আস ও আবু মূসা আল-'আশ'য়ারী (রা) প্রত্যেকের গৃহে অতর্কিতে উপস্থিত হন এবং তাঁদের জীবন যাপনে জৌলুসের ছাপ দেখতে পান। তিনি আবু দারদার আবাসস্থলেও যান; কিন্তু সেখানে ভোগ-বিলাসের চিহ্ন

তো দূরের কথা রাতের অন্ধকারে একটি বাতিও দেখতে পেলেন না। একটি অন্ধকার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন। তাঁর এ চরম দীন-হীন অবস্থা দেখে খলীফার চোখ পানিতে ভরে গেল। তিনি জানতে চাইলেন, জীবনের প্রতি এমন নির্মমতার কারণ কি? আবু দারদা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এ পৃথিবীতে আমাদের এতটুকু জীবন উপকরণ থাকা উচিত যতটুকু একজন মুসাফিরের প্রয়োজন হয়। হায়! রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আমরা কিসের থেকে কি হয়ে গেলাম। তারপর উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাত কাটিয়ে দিলেন। (কানযুল 'উম্মাল-৭/৭৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৮২-৮৪)

খলীফা হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে শামের গভর্ণর হযরত মু'য়াবিয়া (রা) খলীফার নির্দেশে আবু দারদাকে দিমাশ্‌কের কাজী নিয়োগ করেন। হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) কখনও সফরে গেলে তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। এটি ছিল দিমাশ্‌কের প্রথম কাজীর পদ। (শাজারাতুজ জাহাব-৫/৩৯; আল-আ'লাম-৫/২৮১) ইবন হিব্বানের মতে, খলীফা 'উমারের নির্দেশে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে কাজীর পদে নিয়োগ করেন। (লিসানুল মীযান-৭/৪৪) 'আল-ইসতী'য়াব' গ্রন্থকার প্রথম মতটি সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-২/১৭; ৪/৬০)

হযরত আবু দারদার দুই স্ত্রী ছিল। দু'জনই ছিলেন সম্মান ও মর্যাদার উঁচু আসনের অধিকারিনী। প্রথম জনের নাম উম্মু দারদা কুবরা খাযরা বিন্‌তু আবী হাদরাদ আল-আসলামী এবং দ্বিতীয়জনের নাম উম্মু দারদা সুগরা হাজীমা হায়ওয়াস্ সাবিয়্যা। উম্মু দারদা কুবরা ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা, প্রখর বুদ্ধিমতী, উঁচু স্তরের ফকীহা ও শ্রেষ্ঠ 'আবিদাহ্। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সূত্রে বর্ণিত বহু হাদীস পাওয়া যায়। তবে উম্মু দারদা সুগরা সাহাবিয়্যা ছিলেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। হযরত মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত আবু দারদার বিয়ে সম্পর্কিত একটি বর্ণনা সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। সাবিত আল-বুনানী থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু দারদা তাঁর দ্বীনী ভাই সালমান আল-ফারেসীকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে সংগে করে একটি কনের পিতার গৃহে গেলেন। তিনি সালমানকে বাইরে বসিয়ে রেখে ভিতর বাড়ী ঢুকলেন। কনের অভিভাবকদের নিকট সালমানের দ্বীনদারী ও দ্বীনের জন্য তাঁর ত্যাগের কথা উল্লেখ করে তাঁর পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাদের মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। পাত্রীপক্ষ বলেন ঃ আমরা সালমানকে মেয়ে দেব না, তবে তোমাকে দেব। এই বলে তাঁরা আবু দারদার সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের কাজ শেষ হলে আবু দারদা বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত লজ্জার সাথে সালমানকে খবরটি দেন। তবে এটা আবু দারদার কোন বিয়ে সে সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৭৪)

হযরত আবু দারদা ছিলেন একজন সুপুরুষ। বার্ধক্যে দাড়িতে খিজাব লাগাতেন। সব সময় আরবী পোশাক পরতেন। মাথায় 'কালানসুয়া' নামক এক প্রকার উঁচু টুপি ও পাগড়ী পরতেন। আবু দারদার সন্তানদের মধ্যে কয়েকজনের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন ঃ বিলাল, ইয়াযীদ, দারদা ও নুসাইবা। প্রথমজন বিলাল। তিনি ইতিহাসে বিলাল আবু মুহাম্মাদ দিমাশকী নামে খ্যাত। তিনি ইয়াযীদ ও পরবর্তী খলীফাদের সময়ে দিমাশ্‌কের কাজী ছিলেন। খলীফা 'আবদুল মালিক তাঁকে বরখাস্ত করেন। হিজরী ৯২ সনে তাঁর ওফাত হয়।

কন্যা দারদা ছিলেন মক্কার এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও প্রখ্যাত তাবে'ঈ সাফওয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ্ আল কুরাইশীর সহধর্মিনী। এই দারদার বিয়ে সম্পর্কে একটি ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়া দারদাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান। আবু দারদা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে এক অতি সাধারণ দীনদার মুসলমানের সাথে তাঁকে বিয়ে দেন। তখন লোকে বলাবলি করতে লাগলো, আবু দারদা, ইয়াযীদের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন না; অথচ তাঁর চেয়ে নিচু স্তরের একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন। একথা আবু দারদার কানে গেলে তিনি বললেন ঃ আমি দারদার প্রতি লক্ষ্য করেছি। যখন দারদার মাথার ওপর চাকর-বাকর দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ঘরের বিপুল দ্রব্যের প্রতি নজর পড়বে তখন তাঁর দ্বীনের কি অবস্থা হবে? (সিফাতুস সাফওয়াহ্-১/২৬০; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৭৪)

হযরত আবু দারদার মৃত্যুসন সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিস্তর মতভেদ আছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন গ্রন্থে হিজরী ৩১,৩২, ৩৩ ও ৩৪ সনগুলি উল্লেখ করেছেন। আবার কারো কারো মতে তিনি হযরত আলী ও হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফীন যুদ্ধের পর ইনতিকাল করেন। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে তিনি হিজরী ৩২ সন মুতাবিক ৬৫২ খ্রীস্টাব্দে দিমাশ্কে ইনতিকাল করেন। ওয়াকিদী, আবু মাসহার সহ প্রমুখ ইতিহাসবিদ এমত পোষণ করেছেন। দিমাশ্কের 'বাবুস সাগীর'-এর নিকট তাঁকে দাফন করা হয় এবং তাঁরই পাশে তাঁর সহধর্মীনী উম্মু দারদাকেও সমাহিত করা হয় বলে প্রসিদ্ধি আছে। (দ্রঃ আল-ইসতী'য়াব ঃ টীকা আল-ইসাবা-২/৪৬; ৪/৬০; উসূদুল গাবা-৫/১৮৬; 'আল-আ'লাম-৫/২৮১; তারীখুল ইসলাম-২/১১১; দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-১/৮০১; তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৫৬; শাজারাতুজ জাহাব-৫/৩৯)

হযরত আবু দারদার (রা) মৃত্যুর ঘটনাটি ছিল একটু ব্যতিক্রম ধরনের। জীবনের শেষ মুহূর্তে তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদছেন। স্ত্রী উম্মু দারদা বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী হয়ে এত কাঁদছেন? বললেন ঃ কেন কাঁদবো না? কিভাবে মুক্তি পাব আল্লাহই ভালো জানেন। এ অবস্থায় ছেলে বিলালকে ডেকে বললেন, দেখ, একদিন তোমাকেও এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। সে দিনের জন্য কিছু করে রাখ। মৃত্যুর সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো তাঁর হাহুতাশ ও অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেয়ে চললো। ঈমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, ঈমান হচ্ছে ভীতি ও আশার মাঝখানে। আবু দারদার ওপর খোদাভীতির প্রাবল্য ছিল।

স্ত্রী পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তিনি এক সময় বললেন, আপনি তো মৃত্যুকে খুবই ভালোবাসতেন। এখন এত অস্থির কেন? বললেন ঃ তোমার কথা সত্য। কিন্তু যখন মৃত্যু অবধারিত বুঝেছি তখনই এ অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এতটুকু বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর বললেন, এখন আমার শেষ সময়। আমাকে কালিমার তালকীন দাও। লোকেরা কালিমার তালকীন দিল। তিনি তা উচ্চারণ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন

হযরত আবু দারদা যখন অন্তিম রোগ শয্যায় তখন একদিন ইউসুফ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন সালাম আসলেন তাঁর নিকট ইল্ম হাসিলের জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে? তাঁর সেই মুমূর্ষ অবস্থা দেখে ইউসুফ জবাব দিলেন আপনার সাথে আমার আব্বার যে

গভীর সম্পর্ক ছিল সেই সূত্রে আমি আপনার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, মিথ্যা অতি নিকৃষ্ট জিনিস। কিন্তু কেউ মিথ্যা বলে ইসতিগফার করলে তা মাফ হতে পারে। (মুসনাদ–৬/৪৫০)

হযরত আবু দারদার ওফাত পর্যন্ত ইউসুফ অবস্থান করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে ডেকে বললেন, আমার মৃত্যু আসন্ন, একথা মানুষকে জানিয়ে দাও। তিনি খবর ছড়িয়ে দিতেই বন্যার স্রোতের মত মানুষ আসতে শুরু করলো। ঘরে বাইরে শুধু মানুষ আর মানুষ। তাঁকে প্রচুর লোক সমাগমের কথা জানানো হলে তিনি বললেন, আমাকে বাইরে নিয়ে চলো। ধরে বাইরে আনা হলে তিনি উঠে বসলেন এবং জনগণের উদ্দেশ্যে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। (মুসনাদ–৬/৪৪৩) এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস প্রচারের আবেগ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

হযরত আবু দারদাকে আলিম সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে অতি সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বলতেন ঃ তোমরা দু'জন বা–'আমল আলিম–মু'য়াজ ও আবু দারদার কিছু আলোচনা কর। ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়া বলতেন ঃ আবু দারদা এমন আলিম ও ফকীহদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রোগের নিরাময় দান করে থাকেন। (আল–ইসতী'য়াব ঃ আল–ইসাবা–৪/৫০) মৃত্যুর পূর্বে হযরত মু'য়াজ ইবন জাবালও আবু দারদার গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিল। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এত কান্না কেন? লোকটি বললো ঃ আমি আপনার নিকট থেকে ইলম হাসিল করতাম; কিন্তু এখন আপনি চলে যাচ্ছেন। তাই আমার কান্না পাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ কেঁদো না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা ইলম হাসিলের জন্য আবু দারদা, সালমান, ইবন মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবন সালাম– এ চার ব্যক্তির কাছে যাবে। (কানযুল 'উম্মাল–২/৩২৫; হায়াতুস সাহাবা–২/৫৮১, ৫৮২; তারীখুল ইসলাম–২/১০৯) একবার হযরত আবুজার আল–গিফারী (রা) আবু দারদাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ওহে আবু দারদা ঃ যমীনের ওপর এবং আসমানের নীচে আপনার চেয়ে বড় কোন 'আলিম নেই। (তারীখুল ইসলাম–২/১০৯); হযরত মাসরূক, যিনি একজন উঁচু মর্যাদার তাবে'ঈ এবং তাঁর যুগের একজন বিশিষ্ট ইমাম–বলেন ঃ আমি সকল সাহাবীর জ্ঞানরাশি মাত্র ছ' ব্যক্তির মধ্যে একত্রে দেখতে পেয়েছি। তাঁদের একজন আবু দারদা। মিসয়ার থেকে বর্ণিত। কাসেম ইবন 'আবদির রহমান বলেন ঃ যাঁদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, আবু দারদা তাঁদের একজন। (আল–ইসতী'য়াব ঃ আল–ইসাবা–৪/৫০) তাঁর এ বিশাল জ্ঞানের কারণে তাঁর সময়ে মক্কা–মদীনা তথা গোটা হিজাযে বহু বড় বড় সাহাবী ফাতওয়া ও ইমামতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্থান থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা দলে দলে আবু দারদার দারসগাহে ভিড় জমাতেন।

হযরত আবু দারদার দারসগাহে সব সময় ছাত্রদের ভিড় জমে থাকতো। ঘর থেকে বের হলেই দেখতে পেতেন পথের দু'ধারে ছাত্ররা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন মসজিদে যাচ্ছেন। পিছনে এত ভিড় জমে গেল যে, মানুষ মনে করলো হয়তো এটা কোন শাহী মিছিল হবে। তাদের প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু জিজ্ঞেস করছিল। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ–১/২৫)

হযরত আবু দারদা সব সময় মানুষকে ইলম হাসিলের প্রতি উৎসাহ দান করতেন। হযরত

হাসান বলেছেন, আবু দারদা বলতেন : তোমরা 'আলিম, তালিবে ইলম, তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী অথবা তাঁদের অনুসারী– এ চারটির যে কোন একটি হও। এর বাইরে পঞ্চম কিছু হয়ো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাসানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল পঞ্চমটি কি? বললেন ঃ বিদ'য়াতী। (হায়াতুস সাহাবা–২/১৬০) তিনি আরও বলতেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে প্রবেশ করা ও বের হওয়া একজন মানুষের বিজ্ঞতার পরিচায়ক। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৯)

দাহ্হাক থেকে বর্ণিত হয়েছে আবু দারদা শামবাসীদের বলতেন ঃ ওহে দিমাশ্কের অধিবাসীরা! তোমরা আমার দ্বীনী ভাই, বাড়ীর পাশের প্রতিবেশী এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আমার সাথে প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করতে তোমাদের বাঁধা কিসের? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমাদের 'আলিমরা চলে যাচ্ছেন অথচ তোমাদের জাহিলরা শিখছেনা? তোমরা শুধু জীবিকার ধান্দায় ঘুরছো অথচ তোমাদেরকে যা কিছুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা ছেড়ে দিচ্ছ? শুনে রাখ, একটি জাতি বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করেছিল, বিশাল সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিল। এভাবে তারা বড় উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়েছিল। অবশেষে তাদের সেই সুউচ্চ অট্টালিকা তাদের কবরে পরিণত হয়, তাদের উচ্চাভিলাষ তাদেরকে প্রতারিত করে এবং তাদের পুঞ্জিভূত সম্পদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ওহে, তোমরা শেখ এবং অন্যকে শিখাও। কারণ, শিক্ষাদানকারী ও গ্রহণকারীর প্রতিদান সমান সমান। এ দু'শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কারও মধ্যে অধিকতর কল্যাণ নেই।

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি দিমাশ্কবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ ওহে, তোমরা বছরের পর বছর পেট ভরে শুধু গমের রুটি খাবে– এতেই খুশী থাকবে? তোমাদের মজলিশ ও সভা–সমিতিতে কি তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করবে না? তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমাদের 'আলিমগণ চলে যাচ্ছেন আর তোমাদের জাহিলগণ তাঁদের নিকট থেকে কিছুই শিখছে না? (হায়াতুস সাহাবা–৩/১৬০,১৬১)

হযরত আবু দারদা ছিলেন একজন বা–'আমল আলিম। যা শিখেছিলেন তা যথাযথভাবে পালন করতেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম বলতেন ঃ আমাদের মধ্যে আবু দারদা ইলম অনুযায়ী সর্বাধিক আমলকারী। আবু দারদা বলতেন ঃ যে জানেনা তার ধ্বংস একবার, আর যে জেনে 'আমল করেনা তার ধ্বংস সাতবার। সালেম ইবন আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। আবু দারদা বলতেন ঃ তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। আল্লাহর কসম! আমাকে হারালে তোমরা একজন মহান ব্যক্তিকে হারাবে। (তারীখুল ইসলাম–২/১০৯, ২১১)

হযরত আবু দারদার শিক্ষাদানের নিয়ম ছিল ফজরের নামাযের পর জামে' মসজিদে দারসের জন্য বসে যেতেন। ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে বসে প্রশ্ন করতো, আর তিনি জবাব দিতেন। যদিও তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁর মূল বিষয় ছিল কুরআন মজীদের দারস ও তা'লীম। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় যাঁরা সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ ও সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি তাদের একজন। ইমাম বুখারী হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আবু দারদা, মু'য়াজ, যায়িদ ইবন সাবিত ও আবু যায়িদ আল–আনসারী– এ চারজন ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) মৃত্যু পর্যন্ত আর কেউ সম্পূর্ণ কুরআন সংগ্রহ করেননি। ইমাম শা'বী অবশ্য উবাই ইবন কা'ব ও সা'ঈদ ইবন 'উবায়েদ– এ দু'জনের নাম

সংযোগ করে মোট ছয় জনের কথা বলেছেন। ইবন হাজার ফাতহুল বারী (৯/৪৩) গ্রন্থে এমন ২৯ জন হাফেজে কুরআনের নাম উল্লেখ করেছেন। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৮; আল-আ'লাম-৫/২৮১; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৫) যাইহোক, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালের হুফ্ফাজে কুরআনদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আবু দারদা। এ কারণে খলীফা হযরত 'উমার (রা) শামে কুরআনের তা'লীম ও তাবলীগের জন্য তাঁকে নির্বাচন করেন। দিমাশ্কের জামে' 'উমারী'তে তিনি কুরআনের দারস দিতেন। অবশেষে এটা একটি শ্রেষ্ঠ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর অধীনে আরো অনেক শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রসংখ্যাও ছিল কয়েক হাজার। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এসে তাঁর দারসে শরীক হতো।

ফজর নামাযের পর তিনি দশজন করে একটি গ্রুপ করে দিতেন। প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একজন করে ক্বারী থাকতেন। ক্বারী কুরআন পড়াতেন। তিনি টহল দিতেন এবং ছাত্রদের পাঠ কান লাগিয়ে শুনতেন। এভাবে কোন ছাত্রের সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ হয়ে গেলে তাঁকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দানের জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিতেন। গ্রুপ শিক্ষক ছাত্রদের কোন প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হলে তাঁর নিকট থেকেই জেনে নিতেন। দারসে প্রচুর ছাত্র সমাগম হতো। একদিন গুণে দেখা গেল কেন্দ্র থেকে ১৬০০ ছাত্র বের হচ্ছে।

ইবন 'আমির ইয়াহসাবী, উম্মু দারদা সুগরা, খলীফা ইবন সা'দ, রাশেদ ইবন সা'দ, খালিদ ইবন সা'দ প্রমুখ এই কুরআন শিক্ষা কেন্দ্রের খ্যাতিমান ছাত্র-ছাত্রী। ইবন 'আমির ইয়াহসাবী ছিলেন খলীফা ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিকের সময়ে মসজিদ বিষয়ক দফতরের রয়িস বা নেতা। আবু দারদার স্ত্রী উম্মু দারদা সুগরা ছিলেন কিরাত শাস্ত্রের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞ। মূলতঃ স্বামীর নিকট থেকেই তিনি এ জ্ঞান অর্জন করেন। আতীয়্যা ইবন কায়েস কিলাবীকে তিনিই কিরাত শেখান। খলীফা ইবন সা'দের এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লোকে তাঁকে আবু দারদার সার্থক উত্তরাধিকারী বলতো। শামের বিখ্যাত ক্বারীদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হতো।

তাফসীর শাস্ত্রে যে সকল সাহাবী প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে যদিও আবু দারদার নামটি পাওয়া যায় না, তবুও বেশ কিছু আয়াতের তাফসীর তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন, মানুষ যতক্ষণ না কুরআনের নানা দিক বিবেচনায় আনবে ততক্ষণ ফকীহ হতে পারবে না। জটিল আয়াতসমূহের ভাব তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন।

হযরত আবু দারদার নিকট কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি খুব সন্তোষজনক জবাব দিতেন। একবার এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো : ولمن خاف مقام ربه جنتان এর মধ্যে কি ব্যভিচারী ও চোর শামিল হবে? তিনি জবাব দিলেন, তার রব বা প্রভুর ভয় থাকলে সে কিভাবে ব্যভিচার ও চুরি করতে পারে?

সূরা قلم -এ এক কাফির সম্পর্কে এসেছে عتل بعد ذلك زنيم এখানে 'উ'তুল'শব্দটির অর্থের ব্যাপারে 'মুফাস্সিরগণ নানা কথা বলেছেন। আবু দারদা তার ব্যাপক অর্থ বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ বড় পেট ও শক্ত হলক বিশিষ্ট অতিরিক্ত পানাহারকারী, সম্পদ পুঞ্জিভূতকারী ও অতি কৃপণ ব্যক্তিকে 'উতুল' বলে।

এমনিভাবে সূরা তারিক-এ السرائر শব্দটি এসেছে। হযরত আবু দারদা এ শব্দটিরও একটি বিশেষ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদের তা'লীম ও খিদমতের পরে সাহাবায়ে কিরাম সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে। হযরত আবু দারদা অতি সার্থকভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু দারদার এক বিশেষ স্টাইল ছিল। তাবারানী ইদরীস আল-খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবু দারদাকে দেখেছি, রাসূলের (সা) কোন হাদীস বর্ণনা শেষ করে তিনি বলতেনঃ এই অথবা এই রকম অথবা এ ধরনের। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৩৯)

ইবন 'আসাকির ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান ইবন 'আউফ থেকে বর্ণনা করেছেন। খলীফা 'উমার (রা) বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবা—আবদুল্লাহ ইবন হুজাইফা, আবু দারদা, আবু জার ও 'উকবা ইবন 'আমিরকে ডেকে পাঠান। তাঁরা হাজির হলে বলেনঃ এই যে আপনারা রাসূলের (সা) হাদীসের নামে যা কিছু প্রচার করছেন, এসব কী? তাঁরা বললেনঃ আপনি প্রচার করতে নিষেধ করেন? 'উমার বললেনঃ না। তবে আপনারা আমার পাশে থাকবেন। আমি আপনাদের থেকে গ্রহণ অথবা বর্জন করবো। এ ব্যাপারে আমরা বেশী জানি। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৪০,৪৪১)

একবার তিনি হযরত সা'দান ইবন তালহার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। দিমাশ্‌কের মসজিদে তখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আযাদকৃত দাস হযরত সাওবান উপস্থিত ছিলেন। হযরত সা'দান একটু বেশী আশ্বস্ত হওয়ার জন্য হাদীসটি সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। সাওবান বললেন, আবু দারদা সত্য বলেছেন। আমিও সে সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। (মুসনাদ-৬/৪৪২)

হযরত মু'য়াজ (রা) মৃত্যুর পূর্বক্ষণে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেছিলেন, এর জন্য সাক্ষী চাইলে 'উয়াইমির (আবু দারদা) আছেন, তাঁর কাছে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার। লোকেরা তাঁর নিকট গেল। তিনি হাদীসটি শুনে বললেনঃ আমার ভাই (মু'য়াজ) সত্য বলেছেন। (মুসনাদ-৬/৪৫০)

সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল, একে অপরের সাথে মিলিত হলে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতেন। একবার একটি সমাবেশে 'উবাদা ইবনুস সামিত, হারিস আল-কিন্দী ও মিকদাদ ইবন মা'দিকারিবের সাথে আবু দারদাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি 'উবাদাকে প্রশ্ন করলেন, অমুক যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) কি খুমুস সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন? 'উবাদার স্মরণ হলো। তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন।

হযরত আবু দারদার গোটা জীবন কেটেছে আল্লাহর কালাম ও হাদীসে নববীর শিক্ষাদান ও প্রচারে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শহরের নানা শ্রেণীর অধিবাসীদের সমবেত করে তাদেরকে ঠিকমত নামায আদায়ের শেষ অসীয়াত করে যান। তাঁর নিকট হাদীসের যে ভান্ডার ছিল তা তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর কিছু হাদীস তিনি যায়িদ ইবন সাবিত ও 'আয়িশা (রা) থেকেও বর্ণনা করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের গন্ডি ছিল সীমিত। আনাস ইবন মালিক, ফুদালা ইবন 'উবাইদ, আবু উমামা, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, উম্মু দারদা প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবীরা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ খ্যাতিমান 'আলিম তাবে'ঈ তাঁর নিকট ইলমে হাদীস হাসিল করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এখানে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, বিলাল ইবন আবু দারদা, 'আলকামা ইবন কায়স, আবু মুররা

মাওলা উম্মে হানী, আবু ইদরীস খাওলী, জুবাইর ইবন নাদীর, সুওয়ায়িদ ইবন গাফলা, যায়িদ ইবন ওয়াহাব, মা'দান ইবন আবী তালহা, আবু হাবীবা তাঈ, আবুস সাফার হামাদানী, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান, সাফওয়ান ইবন 'আবদিল্লাহ, কুসায়্যিব ইবন কায়স, আবু বাহরিয়্যা 'আবদুল্লাহ ইবন কায়স, কুসায়্যির ইবন মুররা, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুহাম্মাদ ইবন সুওয়াইদ আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী, হিলাল ইবন ইয়াসাফ প্রমুখ। (তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৫৬; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৪; তারীখুল ইসলাম-২/১০৭)

হযরত আবু দারদার সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায় তার মোট সংখ্যা-১৭৯ (এক শো উনাশি)। এর মধ্যে বুখারী শরীফে ১৩টি ও মুসলিম শরীফে ৮টি সংকলিত হয়েছে। (আল-আ'লাম-৫/২৮১; তারীখুল ইসলাম-২/১০৭)

ফিকাহ শাস্ত্রেও তিনি এক বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। মানুষ বহু দূর-দুরান্ত থেকে মাসয়ালা জানার জন্য তাঁর কাছে আসতো। এক ব্যক্তি তো শুধু একটি মাসয়ালা জানার জন্য সুদূর কূফা থেকে দিমাশ্‌কে তাঁর নিকট আসেন। সেই বিশেষ মাসয়ালাটি ছিল এ রকমঃ

উক্ত ব্যক্তি প্রথমে বিয়ে করতে রাজী ছিলনা। কিন্তু পরে মায়ের চাপাচাপিতে বিয়ে করে। বিয়ের পর যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা গড়ে ওঠে তখন মা আবার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দেন। এখন সে তালাক দিতে চায়না। সবকিছু শুনে আবু দারদা বললেন, আমি সুনির্দিষ্টভাবে কারো সাথে- না মায়ের সাথে, না স্ত্রীর সাথে, সম্পর্ক ছেদ করার কথা বলবো না। আমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথাও বলবো না, আবার মায়ের নাফরমানীও জায়েয মনে করবো না। তোমার ইচ্ছা হলে তালাকও দিতে পার, আবার এখন যেমন আছ তেমন থাকতেও পার। তবে একথা যেন স্মরণ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাকে জান্নাতের দরজা বলে অভিহিত করেছেন। (মুসনাদ-৫/৯৮; সীয়ারে অনসার-২/২০০)

আবু হাবীব তাঈ একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই কিছু দীনার 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর রাহে) দান করেন এবং মরণকালে অসীয়াত করে যান, দীনারগুলি যেন দানের খাতসমূহের কোন একটিতে দিয়ে দিই। এখন আপনি বলুন, সবচেয়ে উত্তম খাত কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, আমার নিকট উত্তম খাত 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ)।

হযরত আবু দারদা ছিলেন স্বভাবগতভাবেই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ প্রকৃতির। ইসলামী শিক্ষা তাঁর এ প্রকৃতিকে আরো দীপ্ত ও স্বচ্ছ করে তোলে। গোটা সাহাবাকুলের মধ্যে হযরত আবু জার আল গিফারী ছিলেন সবচেয়ে বড় স্পষ্টভাষী ও স্বাধীনচেতা। প্রথম পর্যায়ে তিনিও শামে থাকতেন। সেখানে খুব কম লোকই তাঁর কঠোরতার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। হযরত আমীর মু'য়াবিয়াকে (রা) তিনি তাঁর দরবারে কঠোর সমালোচনা করেছেন। ইসলামী বিধি-নিষেধের ব্যাপারে এহেন কঠোর ব্যক্তি একদিন আবু দারদাকে বললেনঃ আপনি যদি রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ নাও পেতেন অথবা রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলেও নেককার মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতেন। হযরত আবু দারদার (রা) আখলাকের পবিত্রতার জন্য এর চেয়ে বড় সনদ আর কী হতে পারে?

তিনি ছিলেন নবীর (সা) সহচর। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে তাঁর দেহে কম্পন সৃষ্টি হতো। একবার তো মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবার মধ্যে বলতে লাগলেন, আমি সেই দিনের ব্যাপারে খুবই ভীত যেদিন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার ইল্‌ম অনুযায়ী 'আমল করেছো? যে দিন কুরআনের প্রতিটি আয়াত জীবন্তরূপে আমার

সামনে এসে দাঁড়াবে এবং আমার কাছে জিজ্ঞেস করবে তুমি কুরআনের নির্দেশের কতটুকু অনুসরণ করেছো? নির্দেশসূচক আয়াত তখন আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, কোন কিছুই করেনি। তারপর প্রশ্ন করা হবে নিষেধ থেকে কতটুকু দূরে থেকেছো? নিষেধসূচক আয়াত তখন বলে উঠবে, কিছুই করেনি। ওহে জনমন্ডলী! আমি কি সেদিন মুক্তি পাব? (কানযুল 'উম্মাল-৭/৮৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৮৮, ৪৮৯)

পরকালের ভয়ে সব সময় তিনি ভীত থাকতেন। হিযাম ইবন হাকীম বলেন, আবু দারদা বলতেনঃ মরণের পর যে কী হবে তা যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তাহলে তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে পারতে না এবং রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাদওয়ালা ঘরেও প্রবেশ করতে না। বরং রাস্তায় বেরিয়ে বুক চাপড়াতে আর কাঁদতে। তিনি আরো বলতেনঃ হায়! আমি যদি গাছ হতাম, আর গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলতো। আমি যদি আমার পরিবারের ছাগল হতাম, আর তারা আমাকে জবেহ করে টুকরো টুকরো করে অতিথি-মেহমানদের নিয়ে খেয়ে ফেলতো। অথবা আমি যদি এই খুঁটি হয়ে জন্মাতাম। তাহলে হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকতো না। (কানযুল 'উম্মাল-২/১৪৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৬২০, ৬২১)

ইবাদাতের ক্ষেত্রে পাঞ্জেগানা ও কিয়ামুল লাইল ছাড়াও তিনটি জিনিস অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতেন। ১· প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করতেন। ২· বিতর নামায আদায় করতেন। ৩· আবাসে-প্রবাসে সকল অবস্থায় চাশ্‌তের নামায আদায় করতেন। এগুলি সম্পর্কে রাসূল (সা) তাঁকে অসীয়াত করেছিলেন।

তিনি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর তাসবীহ পাঠ করতেন। তাসবীহ ৩৩ বার, তাহমীদ ৩৩ বার এবং তাকবীর ৩৪ বার। (মুসনাদ-৫/১৯৬) উম্মু দারদা থেকে বর্ণিত। একবার আবু দারদার নিকট একটি লোক এলো। আবু দারদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি থাকবেন না চলে যাবেন? থাকলে বাতি জ্বালাই, নইলে আপনার বাহনের খাদ্য দিই। লোকটি বললোঃ চলে যাব। আবু দারদা বললেনঃ আমি আপনাকে পাথেয় দান করবো। যদি এর চেয়ে উত্তম কোন পাথেয় পেতাম তাহলে তাই আপনাকে দিতাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই লুটে নিল। আমরাও নামায পড়ি, তারাও পড়ে, আমরাও রোযা রাখি, তারাও রাখে। কিন্তু তারা সাদাকা করে, আমরা তা করতে পারিনা। রাসূল (সা) বললেনঃ আমি কি তোমাকে একটি জিনিস বলে দেব না, যদি তুমি তা কর তাহলে তোমার পূর্বের ও পরের কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবেনা? তবে যে তোমার মত করবে, কেবল সেই তোমার সমান হবে। সে জিনিসটি হলোঃ প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার তাসবীহ, ৩৩ বার আল- হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩০৫)

আর একবার আবু দারদা বলেনঃ এক শো দীনার সাদাকা করার চেয়ে এক শো বার তাকবীর পাঠ করা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৭৯) তিনি প্রতি মুহূর্ত তাসবীহ পাঠে নিরত থাকতেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি প্রতিদিন কতবার তাসবীহ পাঠ করেন? বললেনঃ এক লাখ বার। তবে আমার আংগুল যদি ভুল করে তবে তা ভিন্ন কথা। (তারীখুল ইসলাম-২/১১০)

একবার আবু দারদাকে বলা হলোঃ আবু সা'দ ইবন মুনাব্‌বিহ্ এক শো দাস মুক্ত করেছে। তিনি বললেনঃ একজন লোকের সম্পদের জন্য এক শো দাস অনেক। তুমি শুনতে চাইলে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা আমি তোমাকে শোনাতে পারি। আর তা হলোঃ দিবা-রাত্রির অবিচ্ছিন্ন ঈমান, আর সেই সাথে আল্লাহর জিক্‌র (স্মরণ) থেকে তোমার জিহবা বিরত না থাকা। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১২)

একবার এক ব্যক্তি আবু দারদার নিকট এসে বললো, আমাকে কিছু অসীয়াত করুন। বললেনঃ সুখের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার দুঃখের সময় স্মরণ করবেন। দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি যখন তাকাবে তখন তার পরিণতির প্রতি একটু দৃষ্টি দেবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/২৭৬)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে জিকর শিক্ষা দিয়েছেন। একদিন রাসূল (সা) বললেনঃ আবু দারদা, তুমি কী পাঠ কর? বললেনঃ আল্লাহর জিক্‌র করি। রাসূল (সা) বললেনঃ আমি কি রাত-দিনে আল্লাহর যে জিক্‌র করা হয় তার থেকে কিছু শিখিয়ে দেব না? আবু দারদা বললেন হাঁ, শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে একটি জিক্‌র শিখিয়ে দেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩০২)

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শ্রুত বাণীর প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও ইয়াকীন ছিল। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললোঃ আবু দারদা! আপনার বাড়ীটি আগুনে পুড়ে গেছে। তিনি বললেনঃ না পুড়েনি। এরপর দু'ব্যক্তি একের পর এক একই খবর নিয়ে এলো। তিনিও একই জবাব দিলেন। চতুর্থ এক ব্যক্তি এসে বললো, আগুন লেগে ছিল; কিন্তু আপনার ঘর পর্যন্ত এসে তা নিভে যায়। একথা শুনে তিনি বলেন, আমি জেনেছি, আল্লাহ অবশ্যই তা করেন না। তখন লোকটি বললোঃ ওহে আবু দারদা! আপনি যে বললেন, 'আমার ঘর পুড়েনি' এবং 'আমি জেনেছি, আল্লাহ অবশ্যই তা করেন না'- এ দু'টি কথার মধ্যে কোনটি সর্বাধিক বিস্ময়কর? তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখেছি, কেউ সেগুলি সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিপদে পড়েনা। তারপর তিনি সেই বাক্যগুলি উচ্চারণ করেন। (বায়হাকীঃ আসমা ও সিফাত অধ্যায়-১২৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৭০)

হযরত আবু দারদার জীবন ছিল অতি সরল ও অনাড়ম্বর। দুনিয়ার কোন চাকচিক্য, জৌলুষ, ভোগ-বিলাস তাঁর গায়ে কক্ষনো দাগ কাটতে পারেনি। তিনি বলতেন, দুনিয়ায় মানুষের একজন মুসাফিরের মত থাকা উচিত। সূফীরা তাঁকে 'আসহাবে সুফ্‌ফা'র সদস্যদের মধ্যে গণ্য করে থাকেন এবং 'যুহুদ ও তাকওয়া'র বিষয়ের ওপর তাঁর বহু মূল্যবান বাণী- তারা বর্ণনা করেছেন। (দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা-১/৮০০)

একবার হযরত সালমান আল-ফারেসী (রা) সাক্ষাতের জন্য তাঁর গৃহে আসলেন। তাঁরা ছিলেন পরস্পর দ্বীনি ভাই। তিনি আবু দারদার স্ত্রীকে অতি সাধারণ বেশভূষায় দেখতে পেয়ে তাঁর এমন দীন-হীন অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদা দুনিয়ার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছেন। এখন আর তাঁর কোন কিছুর প্রতি কোন রকম আগ্রহ নেই। আবু দারদা ঘরে ফিরলেন। সালাম বিনিময়ের পালা শেষ হলে খাবার এলো। সালমান আবু দারদাকে খাবারের জন্য ডাকলেন। আবু দারদা বললেন, আমি সাওম পালন করছি। সালমান কসম খেয়ে বললেন, আপনাকে অবশ্যই আমার সাথে খেতে হবে, অন্যথায় আমিও খাব না। সালমান আবু দারদার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলেন। রাতে আবু দারদা নামায পড়ার জন্য উঠলেন। সালমান তাঁকে বাধা দিয়ে বললেনঃ ভাই আপনার ওপর আল্লাহর যেমন হক আছে, তেমনি স্ত্রীরও আছে। আপনার দেহেরও আছে। সুতরাং আপনি ইফতার করবেন, নামায পড়বেন, স্ত্রীর কাছে যাবেন এবং সকলের হক আদায় করবেন। শেষ রাতে সালমান তাঁকে ঘুম থেকে জাগালেন, দুইজন এক সাথে নামায পড়লেন এবং এক সাথে মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। সকালে আবু দারদা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সালমানের ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন, সালমান ঠিক বলেছে। সে তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। (তারীখুল ইসলাম-২/১০৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৯২, ৬৯৩)

বিলাল ইবন সা'দ বলেন। আবু দারদা প্রায়ই দু'আ করতেনঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তরের

বিক্ষিপ্ততা থেকে আমি আপনার পানাহ চাই। প্রশ্ন করা হলোঃ অন্তরের বিক্ষিপ্ততা আবার কী? বললেন ঃ প্রতিটি উপত্যকায় আমার সম্পদ ছড়িয়ে থাকাই হচ্ছে অন্তরের বিক্ষিপ্ততা। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৩)

আবু নু'য়াইম 'আল হুলইয়্যা' গ্রন্থে (১/২২২) খালিদ ইবন হুদাইর আল-আসলামী থেকে বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি আবু দারদার ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি চামড়া অথবা পশমের বিছানার ওপর বসে আছেন। তাঁর গায়ে মোটা পশমের কাপড় এবং পায়েও পশমের জুতো। আর তিনি তখন অসুস্থ। এ অবস্থায় তিনি শুধু ঘামছেন। খালিদ বললেনঃ আপনি অনুমতি দিলে আমীরুল মুমিনীদের নিকট থেকে প্রেরিত উত্তম বিছানা ও পোশাক আপনার জন্য আনতে পারি। জবাবে তিনি বললেনঃ আমার তো অন্য একটি বাড়ী আছে। আমি সেখানেই চলে যাব এবং সেখানে যাওয়ার জন্যই কাজ করছি। সুতরাং এতকিছুর প্রয়োজন কি? (হায়াতুস সাহাবা ২/২৯৬)

একবার আবু দারদার গৃহে কয়েকজন মেহমান এলো। সময়টি ছিল শীতকাল। তিনি গরম খাবার তো দিলেন; কিন্তু গরম বিছানা দিলেন না। মেহমানদের একজন তার সঙ্গীদের বললেনঃ আমাদের গরম খাবার তো দিলেন, কিন্তু শীত নিবারনের জন্য কোন কিছু তো দিলেন না। এভাবে থাকা যাবে না। তাঁর কাছে চাইতে হবে। অন্য একজন বললোঃ বাদ দাও। কিন্তু এক ব্যক্তি কারো কথা না শুনে সোজা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। সে দেখলো, আবু দারদার পাশেই তাঁর স্ত্রী বসে আছেন; কিন্তু তাদের গায়েও তেমন কোন শীতের কাপড় নেই। লোকটি ফিরে গেল। পরে সে আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলোঃ আপনি আমাদের মতই শীত বস্ত্র ছাড়াই রাত কাটালেন কেন? জবাব দিলেন, আমাদের অন্য একটি বাড়ী আছে। আর সেখানেই আমরা চলে যাব। আমাদের বিছানাপত্র ও লেপ-তোষক সবই সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার কিছু আমাদের কাছে থাকলে অবশ্য তোমাদের কক্ষে পাঠিয়ে দিতাম। (সিফাতুস সাফওয়া-১/২৬৩; হায়াতুস সাহাবা-২/২৯৭)

মু'য়াবিয়া ইবন কুররা বলেন, আবু দারদা বলতেনঃ আমি তিনটি জিনিস পসন্দ করি, অথচ মানুষ সেগুলি অপসন্দ করে। দারিদ্র, রোগ ও মৃত্যু। মৃত্যুকে আমি পসন্দ করি আমার রব বা প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, দারিদ্রকে পসন্দ করি প্রভুর সামনে বিনীতভাব প্রকাশের জন্য, আর রোগ পসন্দ করি আমার পাপের কাফ্ফারার জন্য। (তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৫; তারীখুল ইসলাম-২/১১০)

রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা সবাই বুঝেছিলেনঃ 'আমর বিল মা'রূফ বা সৎ কাজের আদেশ তাঁদের ওপর ফরজ। হযরত আবু দারদা এ ফরজের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। একবার হযরত মু'য়াবিয়া একটি রূপোর পাত্র খরীদ করলেন। বিনিময়ে তিনি কিছু কম-বেশী রূপোর মুদ্রা বিক্রেতাকে দিলেন। শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটা ছিল অবৈধ। বিষয়টি আবু দারদা অবগত হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলেন, ওহে মু'য়াবিয়া! এমন কেনা-বেচা জায়েয নয়। রাসূল (সা) সোনা-রূপোর বিনিময়ে সমতার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইউসুফ ইবন আবদিল্লাহর ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আবু দারদার কাছে এসেছিলেন এক উদ্দেশ্যে, আর বলেছিলেন ভিন্ন কথা। এ কারণে আবু দারদা সংগে সংগে তাঁকে শুধরে দিয়ে বলেছিলেনঃ মিথ্যা বলা খুবই খারাপ কাজ। (মুসনাদ-৬/৪৫০)

আমীর মু'য়াবিয়া (রা) হযরত আবু জারকে (রা) শাম থেকে বের করে দিলেন। পথ চলা কালে আবু দারদার কানে খবরটি পৌছালে অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারিত হলো। তারপর তিনি বললেনঃ উটের সাথীদের সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (উটের সাথী দ্বারা হযরত সালেহর (আ) সংগী সাথী বুঝিয়েছেন।)

তারপর অত্যন্ত আবেগের সাথে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তারা আবু জারকে মিথ্যাবাদী বলেছে, কিন্তু আমি তা বলি না। লোকে তাঁর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কিন্তু আমি তা করিনা। তারা তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে, কিন্তু আমি এ ব্যাপারে তাদের সাথে নই। কারণ আমি জানি, রাসূল (সা) ধরাপৃষ্ঠে তাঁর মত আর কাউকে সত্যবাদী মনে করতেন না এবং তাঁর মত আর কারো নিকট গোপন কথা বলতেন না। যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, যদি আবু জার আমার হাতও কেটে দেন তবুও আমি তাঁর প্রতি কোন রকম বিদ্বেষ পোষণ করবো না। কারণ, রাসূল (সা) বলেছেনঃ আসমানের নীচে ও যমীনের ওপরে আবু জার অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী আর কেউ নেই।

ইবন 'আসাকির বর্ণনা করেছেন। আবু দারদা একবার মাসলামা ইবন মুখাল্লাদকে লিখলেনঃ বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যখন তাঁকে ভালোবাসেন তখন তার সকল বান্দার প্রিয়পাত্র করে দেন। অপর দিকে বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানির কাজ করে তখন তার ওপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়। যখন সে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হয় তখন সে তার সৃষ্টিরও ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়। (কানযুল 'উম্মাল–৮/২২৭, হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৪)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিন বললেন, যে ব্যক্তি তাওহীদের কালেমা উচ্চারণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আবু দারদা প্রশ্ন করলেন—সে যদি যিনা বা চুরি করে, তবুও? রাসূল (সা) বললেনঃ হাঁ, তবুও। এমন একটা খোশখবর মানুষের কাছে পৌঁছানো উচিত। আবু দারদা তিনবার জিজ্ঞেস করে মানুষের নিকট এ খবর পৌঁছানোর জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পথে 'উমারের সাথে সাক্ষাৎ। তিনি বললেনঃ এমন কাজ করো না। এতে মানুষ 'আমল ছেড়ে দেবে। আবু দারদা ফিরে বিষয়টি রাসূলকে (সা) জানালেন। তিনি বললেন, 'উমার ঠিক বলেছে।(মুসনাদ–৫/৪১)

একদিন তিনি বাহির থেকে ঘরে ফিরলেন। চোখে–মুখে উত্তেজনার ছাপ। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেনঃ কী হয়েছে? বললেনঃ আল্লাহর কসম! শুধুমাত্র জামায়াতে নামায আদায় ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) একটি কাজও আর পালিত হচ্ছে না। মানুষ সব ছেড়ে দিয়েছে। (হায়াতুস সাহাবা–৩/১২৩)

একবার সা'দান ইবন আবী তালহার সাথে তাঁর দেখা হলে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার বাড়ী কোথায়? সা'দান বললেনঃ গ্রামে। তবে শহরের কাছাকাছি। তখন তিনি বললেন ঃ তাহলে আপনি শহরে নামায পড়বেন। যেখানে আযান এবং নামায হয়না সেখানে শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। দেখ, নেকড়ে সেই মেষকে ধরে যে দলছুট হয়ে যায়। (মুসনাদ–৬/৪৫৯)

গোটা মুসলিম সমাজ তাঁকে অত্যন্ত সমীহ ও সম্মান করতো। উত্তেজিত অবস্থায়ও তিনি যা কিছু বলতেন, মানুষ অন্তর দিয়ে তা শুনতো। একবার এক কুরাইশী এক আনসারীর দাঁত ভেঙ্গে দেয়। হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) দরবারে বিচার গেল। তিনি কুরাইশীকে অপরাধী ঘোষণা করলেন। তখন সে বললো, আনসারী লোকটি প্রথমে আমার দাঁতে ব্যথা দেয়। একথা শুনে আমীর মু'য়াবিয়া বললেনঃ একটু থাম, আমি আনসারীকে রাজী করাচ্ছি। কিন্তু আনসারী–কিসাসের দাবীতে অটল রইল। সে রাজী হলো না। আমীর মু'য়াবিয়া বললেন, এই যে আবু দারদা আসছেন, তিনি যে ফয়সালা করেন তাই মেনে নাও। আবু দারদা ঘটনাটি শুনে এই হাদীসটি বর্ণনা করেনঃ কোন ব্যক্তি কাউকে দৈহিক কষ্ট দিলে কষ্টপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তাকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবু দারদার মুখ থেকে এ হাদীসটি শোনার সাথে সাথে আনসারী লোকটি– যে তখন

দারুণ উত্তেজিত ছিল, রাজী হয়ে গেল। সে আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলো, হাদীসটি কি আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন· হাঁ। আনসারী বললেন, তাহলে আমি তাঁকে মাফ করে দিলাম। (মুসনাদ–৬/৪৪৮)

তিনি সব সময় সব রকম ফিত্না ও অশান্তি থেকে দূরে থাকতেন। হিজায অপেক্ষা শাম কোন দিক দিয়েই ভালো ছিল না। তবে ফিত্না ও অশান্তি থেকে দূরে থাকার জন্যই শামে বসবাস করতেন। তিনি বলতেন, যেখানে দু'জন লোকও একহাত পরিমাণ ভূমির জন্য বিবাদ করে সে স্থানও ত্যাগ করা আমি পসন্দ করি।

তিনি নির্জনতা ভালোবাসতেন। তিনি বলতেনঃ একজন মুসলমানের সবচেয়ে ভালো ইবাদাতগাহ্ তার বাড়ী। সেখানে তাঁর নাফ্স, চোখ ও লজ্জাস্থান সর্বাধিক সংযত থাকে। তিনি আরো বলতেন তোমরা বাজারের মজলিস থেকে দূরে থাক। কারণ, এসব মজলিস তোমাদেরকে খেলা ও হাসি–তামাশার দিকে নিয়ে যায়। (কানযুল 'উম্মাল–২/১৫৯; হায়াতুস সাহাবা–২/৬৫০)

তিনি সব সময় চুপচাপ থাকতে এবং চিন্তা–অনুধ্যানে সময় কাটাতে পসন্দ করতেন। 'আউন ইবন 'আবদিল্লাহ একবার উম্মু দারদাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু দারদার সর্বোত্তম আমল ছিল কোনটি? বললেনঃ গভীর চিন্তা ও অনুধ্যান। আবু দারদা আরও বলেতেনঃ এক ঘন্টা চিন্তা করা সারারাত ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম। (সিফাতুস সাফওয়া–১/২৫৮; কানযুল 'উম্মাল–২/১৪২; হায়াতুস সাহাবা–২/৬২৭) তিনি আরও বলতেনঃ তোমরা যেমন কথা বলা শেখ, তেমনি চুপ থাকাও শেখ। কারণ, চুপ থাকা বিরাট সহনশীলতা। বলার চেয়ে শোনার প্রতি আগ্রহী হও। অহেতুক কোন কথা বলো না। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬৩২)

তিনি সব সময় হাসি মুখে থাকতেন এবং মানুষের সাথে খোশ–মেযাজে মিশতেন। কথা বলার সময় ঠোঁটে হাসি ঝরতো। আর এ হাসিকে স্ত্রী উম্মু দারদা মর্যাদার পরিপন্থী মনে করতেন। একদিন তো বলেই বসলেন, এই যে আপনি প্রতি কথায় মুচকি হাসি দেন, এতে লোকে আপনাকে নির্বোধ মনে না করে। আবু দারদা বললেনঃ রাসূল (সা) তো কথা বলার সময় মৃদু হাসতেন। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২০৩)

তাঁর স্বভাব ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। দিমাশ্কের মসজিদ চত্বরে নিজ হাতে গাছ লাগাতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী ও মসজিদের হালকায়ে দারসের ইমাম হয়ে এত ছোট ছোট কাজ নিজ হাতে করাতে লোকে অবাক হয়ে যেত। এক ব্যক্তি তো একবার তাঁকে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে বসে, আপনি নিজেই এমন কাজ করেন? আবু দারদা তাঁর বিস্ময়ের জবাবে বলেন, এতে খুব সওয়াব।

তিনি অত্যন্ত দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অভাব–অনাটন সত্ত্বেও মেহমানের খিদমতের কোন প্রকার ত্রুটি কক্ষণো করতেন না। অধিকাংশ সময় তাঁর বাড়ীতে লোক থাকতেন। কোন মেহমান এলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ থাকবেন না চলে যাবেন? যদি যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করতো, তাহলে তিনি তার পাথেয় দিয়ে দিতেন। কোন কোন লোক কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করতো। হযরত সালমান আল–ফারেসী–দিমাশ্কে গেলে তাঁরই বাড়ীতে অবস্থান করতেন।

তাঁর অন্তরটি ছিল বড় কোমল ও উদার। কাউকে ঘৃণা করা বা গালি দেওয়া পসন্দ করতেন না। একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। দেখলেন, বেশ কিছু লোক এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, সে কোন পাপ কাজ করেছে। হযরত আবু দারদা লোকদের বললেন, কেউ কুয়ায় পড়ে গেলে তাকে টেনে তোলা উচিত। গালি দেওয়াতে কোন কল্যাণ নেই। তোমরা যে এ পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পেরেছ, সেটাই সৌভাগ্য মনে কর। লোকেরা

তখন প্রশ্ন করলো, আপনি কি এ ব্যক্তিকে খারাপ মনে করেন না? বললেনঃ স্বভাবগতভাবে লোকটির মধ্যে কোনরকম খারাবি নেই; তবে তার এ কাজটি খারাপ। যখন সে এ কাজ ছেড়ে দেবে তখন সে আবার আমার ভাই। (উসুদুল গাবা-৪/১৫০; কানযুল 'উম্মাল-২/১৭৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৮)

তাঁর স্বভাবটি ছিল বড় ঐশ্বর্যমন্ডিত। কারো নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা ছিল তাঁর প্রকৃতি বিরোধী। একবার 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমির আসলেন শামে। বহু সাহাবী তাঁর কাছে গিয়ে নিজ নিজ ভাতা গ্রহণ করলেন। কিন্তু আবু দারদা গেলেন না। বাধ্য হয়ে 'আবদুল্লাহ নিজেই ভাতা নিয়ে তাঁর গৃহে হাজির হলেন এবং বললেনঃ আপনি যাননি তাই আমি নিজেই ভাতা নিয়ে হাজির হয়েছি। তিনি বললেনঃ রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, যখন আমীরগণ নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে নেয় তখন তোমরাও নিজেদেরকে পরিবর্তন করে নেবে। (কানযুল 'উম্মাল-২/১৭১)

তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সম্পর্কে অনেক কথা বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আবুল বাখতারী থেকে বর্ণিত। একবার আবু দারদা একটি হাঁড়িতে কিছু জ্বাল দিচ্ছিলেন। পাশেই হযরত সালমান আল-ফারেসী বসেছিলেন। এমন সময় আবু দারদা ছোট বাচ্চাদের আওয়াযের মত হাঁড়ির মধ্যে তাসবীহ পাঠের আওয়ায শুনতে পেলেন। তিনি চিৎকার করে সালমানকে ডেকে বললেনঃ সালমান! দেখ, দারুণ বিস্ময়ের ব্যাপার। তুমি বা তোমার বাপ-দাদা কেউ কক্ষনো এমন ঘটনা দেখনি। সালমান বললেনঃ তুমি যদি চুপ থাকতে তাহলে আল্লাহর এর থেকে বড় নিদর্শন দেখতে পেতে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৮৬)

আবু নু'য়াইম 'আল-হুলইয়্যা' গ্রন্থে (১/২১০) 'আউফ ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন। আউফ স্বপ্নে একটি চামড়ার নির্মিত গম্বুজ ও একটি চারণক্ষেত্র দেখলেন। গম্বুজের পাশে একপাল ছাগল শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলি কার? বলা হলো, আবদুর রহমান ইবন আউফের। কিছুক্ষণ পর আবদুর রহমান ইবন আউফ বের হয়ে আসলেন। বললেন ঃ হে আউফ, কুরআনের বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এ সবকিছু দান করেছেন। যদি তুমি এ রাস্তার দিকে একটু তাকাও তাহলে এমন সব জিনিস দেখতে পাবে যা তোমার চোখ কখনো দেখেনি, তোমার কান কখনো সে সম্পর্কে কিছু শোনেনি এবং তোমার অন্তরে তার কল্পনাও কখনো উদয় হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা তা আবু দারদার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। কারণ, তিনি দু'হাত ও বুক দিয়ে দুনিয়াকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। (উসুদুল গাবা-৫/১৮৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৭২)

তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাঁর দ্বীনী-ভাই হযরত সালমান আল-ফারেসীর সাথে আজীবন গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আশ'য়াস ইবন কায়স ও জারীর ইবন আবদুল্লাহ আল-বাজালী একবার সালমান আল-ফারেসীর নিকট আসলেন। তিনি তখন মাদায়েনের একটি দূর্গে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি সালমান আল-ফারেসী? বললেন ঃ হা। আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী? বললেন ঃ জানিনে। তখন তাঁরা সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেল। তাঁরা মনে করলেন, আমরা যাঁকে খুঁজছি, এ তিনি নন। তাঁদের এ ইতস্তত: ভাব দেখে সালমান বললেন ঃ তোমরা যাঁকে খুঁজছো আমি সেই ব্যক্তি। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছি, তাঁর সাথে উঠা-বসা করেছি। আর সাহাবী তো সেই যে রাসূলের (সা) সাথে জান্নাতে যাবে। যাই হোক, তোমাদের কী প্রয়োজন? তাঁরা বললেন ঃ শামে অবস্থানরত আপনার এক ভাইয়ের নিকট থেকে আমরা এসেছি। তিনি জানতে চাইলেন ঃ কে সে? তারা বললেন ঃ আবু দারদা। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তাহলে তোমাদের সাথে পাঠানো তাঁর

উপহার সামগ্রী কোথায়? তাঁরা বললেন ঃ আমাদের সাথে তো কোন উপহার পাঠাননি। আবু দারদা বললেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং যথাযথভাবে আমানত আদায় কর। তাঁর নিকট থেকে যেই এসেছে, তার সাথে কিছু না কিছু হাদিয়া তিনি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁরা বললেন ঃ এভাবে আমাদেরকে দোষারোপ করবেন না। এই আমাদের অর্থকড়ি থেকে যা খুশী আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের অর্থকড়ি চাইনা। যে হাদিয়া পাঠিয়েছেন শুধু তাই চাই। তখন তাঁরা শপথ করে বললেন, কোন হাদিয়া তিনি পাঠাননি। তবে তিনি আমাদেরকে একথা বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন, রাসূল (সা) যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতেন তখন তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ডাকতেন না। তোমরা যখন তাঁর কাছে যাবে, তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দেবে। আবু দারদা বললেন ঃ এছাড়া আর কি হাদিয়া আমি তোমাদের কাছে চাচ্ছি? সালামের চেয়ে উত্তম হাদিয়া আর কী হতে পারে? (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৯২-৪৯৫)

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ছিলেন তাঁর জাহিলী যুগের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ভাই। তাঁরই দাওয়াত ও চেষ্টায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি সে সম্পর্ক অটুট রেখেছিলেন। তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা লজ্জা পায় আমার এমন কোন 'আমল তাঁর কাছে উপস্থাপনের ব্যাপারে আমি আপনার পানাহ্ চাই। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৪)

এছাড়া হযরত আবু দারদার বহু দ্বীনী ইয়ার-বন্ধু ছিলেন। তিনি নামাযের পর তাঁদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মুল দারদা (রা) বলেন ঃ আবু দারদার ৩৬০ জন আল্লাহর পথের বন্ধু ছিলেন। নামাযে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য দু'আ করতেন। আমি তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কোন মানুষ দূর থেকে যখন তার কোন ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন আল্লাহ তার জন্য দু'জন ফিরিশতা নিয়োগ করেন। তারা বলতে থাকেঃ তোমার ভাইয়ের জন্য তুমি যা কামনা করছো, আল্লাহ তোমাকেও তা দান করুন। ফিরিশতারা আমার জন্য দু'আ করুক, তাকি আমি চাইবো না? (তারীখুল ইসলাম-২/১১১)

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ও 'আশেক। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তাঁকে এত বেশী ভালোবাসতেন যে, রাতে তাঁর ঘরের সামনে শুয়ে থাকতেন, যাতে তিনি প্রয়োজন হলে তাঁকে জাগিয়ে তুলে তাঁকে কাজে লাগাতে পারেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮৮)

পরোক্ষভাবে কুরআনের একটি আয়াতও তাঁর শানে নাযিল হয়েছে। শুরাইহ ইবন 'উবাইয়দ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি একদিন আবু দারদাকে বিদ্রুপ করে বললো ঃ ওহে ক্বারীদের দল! তোমাদের হয়েছে কি যে, তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী ভীরু ও বেশী কৃপণ? কিন্তু খাওয়ার সময় তোমাদের গ্রাসটি তো হয় সবচেয়ে বড়। আবু দারদা তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। বিষয়টি 'উমারের কানে গেল। তিনি আবু দারদাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন। তাদের সব কথাই কি আমরা ধরবো? তখন 'উমার সেই লোকটির নিকট গিয়ে তার গলায় কাপড় পেঁচিয়ে টানতে টানতে রাসূলল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যান। লোকটি বললো ঃ আমরা একটু হাসি-মাশ্কারা করছিলাম। তখন সূরা তাওবার ৬৫ নং আয়াতটি নাযিল হয়। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪৬৩)

মু'য়াবিয়া ইবন কুররা বলেন ঃ একবার আবু দারদা অসুস্থ হলেন। বন্ধুরা দেখতে গেলেন। তাঁরা বললেন ঃ আপনার অভিযোগ কিসের বিরুদ্ধে? বললেন ঃ আমার গুনাহ্র বিরুদ্ধে। আপনার সর্বশেষ কামনা কী? বললেন ঃ জান্নাত। তাঁরা বললেন ঃ আমরা কি একজন ডাক্তার

ডাকবো? বললেন ঃ প্রয়োজন নেই। শ্রেষ্ঠতম ডাক্তারই তো আমাকে এ কষ্ট দিয়েছেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮১)

আবু নু'য়াইম 'আল-হুলইয়্যা' গ্রন্থে (১/২১২) জুবাইর ইবন নুফাইর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ 'কিবরিস' বিজয়ের দিন অনেক মুজাহিদ কেঁদে ফেলেন। আমি দেখলাম, আবু দারদা একাকী বসে বসে কাঁদছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, যে দিন আল্লাহ ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করলেন, সে দিন এভাবে কাঁদার কারণ কি? বললেন ঃ জুবাইর, তোমার ধ্বংস হোক। যে মানুষ আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দেয় সে কতই না নিকৃষ্ট জীব। এই জাতি ছিল শক্তিশালী ও বিজয়ী। তাদের ছিল একটি রাষ্ট্র। তারা আল্লাহর আদেশ ছেড়ে দেয়। তাই তাদের এ পরিণতি। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৮১)

একবার হযরত মুয়াবিয়া আবু দারদাকে লিখলেন ঃ আপনি আমাকে দিমাশ্‌কের ফাসিকদের একটা তালিকা দিন। জবাবে তিনি বললেন ঃ তাদের সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি কিভাবে তাদের চিনবো? কিন্তু তাঁর ছেলে বিলাল বললেন ঃ আমিই তাদের তালিকা পাঠাবো। সত্যিই তিনি তালিকা তৈরী করলেন। তখন আবু দারদা বললেন ঃ কিভাবে তুমি তাদেরকে চিনলে? তুমি তাদের দলের একজন না হলে তাদেরকে চিনতে পার না। তোমার নামটি দিয়েই তালিকা শুরু কর। একথার পর বিলাল আর তালিকা পাঠাননি। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪২৪)

হযরত আবু দারদা মানুষকে বলতেন ঃ তোমরা দুনিয়া থেকে দূরে থাক। কারণ, এ দুনিয়া হারূত ও মারূত অপেক্ষা বড় জাদুকর। (লিসানুল-মীযান-৭/৪৪) তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে পূণ্যবানদের সাথে মরণ দিন এবং পাপাচারীদের সাথে বাঁচিয়ে রাখবেন না। তিনি আরো দু'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আলিমদের অভিশাপ থেকে আপনার পানাহ চাই। যখন জানতে চাওয়া হলো, তারা কিভাবে আপনাকে অভিশাপ দেবে? বললেন ঃ আমাকে ঘৃণা করবে। (হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৮৪)

হযরত আবু দারদা (রা) সম্পর্কে অনেক টুকরো টুকরো কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা খুবই চমকপ্রদ ও শিক্ষনীয়। ইবন হাজারের (রহ) মত আমরাও বলি, তাঁর মাহাত্ম্য ও গুণাবলী অনেক যা ছোটখাট কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাবে না। (তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৫৬)

হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)

আসল নাম হুজাইফা, ডাকনাম আবু 'আবদিল্লাহ, এবং লকব বা উপাধি 'সাহিবুস সির'। গাতফান গোত্রের 'আবস শাখার সন্তান। এজন্য তাঁকে আল-'আবসীও বলা হয়। পিতার নাম হুসাইল মতান্তরে হাসাল ইবন জাবির এবং মাতার নাম রাবাহ বিনতু কা'ব ইবন 'আদী ইবন 'আবদিল আশহাল, মদীনার আনসার গোত্র আউসের আবদুল আশহাল শাখার কন্যা। ইবন হাজার (রহ) বলেন ঃ এ হুজাইফা একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী। (আল-ইসাবা-১/৩১৭; আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-১/২৭৭)

হুজাইফার পিতা হুসাইল ছিলেন মূলতঃ মক্কার বনী 'আবস গোত্রের লোক। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি নিজ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়াসরিবে আশ্রয় নেন। সেখানে বনী 'আবদুল আশহাল গোত্রের সাথে প্রথমে মৈত্রীচুক্তি, পরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। মদীনার আনসার গোত্রসমূহের আদি সম্পর্ক মূলতঃ ইয়ামানের সাথে। হুসাইল তাদের মেয়ে বিয়ে করায় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পরিচয় দিত 'আল-ইয়ামান' বলে। এজন্য হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান বলা হয়। (দ্রঃ শাজারাতুয্ যাহাব-১/৪৪; আল-ইসাবা-১/৩১৭; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩) এ ইয়ামান আবদুল আশহাল গোত্রে যে বিয়ে করেন সেখানে তাঁর নিম্নোল্লেখিত সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করেন ঃ ১· হুজাইফা, ২· সা'দ, ৩· সাফওয়ান; ৪· মুদলিজ, ৫· লাইলা। এঁরা ইতিহাসে ইয়ামানের বংশধর নামে খ্যাত।

আল-ইয়ামানের মক্কায় প্রবেশে যে বাধা ও ভয় ছিল ধীরে ধীরে তা দূর হয়ে যায়। তিনি মাঝে মধ্যে মক্কা-ইয়াসরিবের মধ্যে যাতায়াত করতেন। তবে বেশী থাকতেন ইয়াসরিবে। এদিকে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে হুজাইফার পিতা আল-ইয়ামান বনী 'আবসের এগারো ব্যক্তিকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখনও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেননি। সুতরাং হুজাইফা মূলের দিক থেকে মক্কার তবে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বড় হন। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১২২)

হযরত হুজাইফার পিতা আল-ইয়ামান মুসলমান হন মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে। পিতার সাথে মা-ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে হুজাইফা মুসলিম পিতা-মাতার কোলে বেড়ে ওঠেন। এবং হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) দেখার সৌভাগ্য অর্জনের আগেই মুসলিম হন। ভাই-বোনের মধ্যে শুধু তিনি ও সাফওয়ান এ গৌরবের অধিকারী হন। মুসলিম হওয়ার পর রাসূলকে (সা) একটু দেখার আগ্রহ জন্মে। দিন দিন এ আগ্রহ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তিনি সব সময় যাঁরা রাসূলকে (সা) দেখেছেন, তাঁদের কাছে রাসূলের (সা) চেহারা-সুরত ও গুণ-বৈশিষ্ট কেমন তা জানার জন্য প্রশ্ন করতেন। শেষে একদিন সত্যি সত্যি মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে হাজির হন এবং হিজরাত ও নুসরাতের ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চান। রাসূল (সা) তাঁকে দু' টোর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দান করেন। হুজাইফা বলেন ঃ রাসূল (সা) হিজরাত ও নুসরাত (মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অবস্থান)-এর যে কোন একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দান করেন। আমি নুসরাতকে বেছে নিলাম। (উসুদুল গাবা-১/৩৯৪; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩; আল-ইসাবা-১/৩১৮) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ মক্কার প্রথম সাক্ষাতে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি

মুহাজির না আনসার? রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ তুমি মুহাজির বা আনসার যে কোন একটি বেছে নিতে পার। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আনসারই হবো। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা–৪/১২৩–১২৪)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে মদীনায় আসার পর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ–সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার বিধান চালু করেন। তিনি হুজাইফা ও 'আম্মার ইবন ইয়াসিরকে পরস্পরের দ্বীনী ভাই বলে ঘোষণা করেন। (সীরাতু ইবন হিশাম–১/৫০৬)

হযরত হুজাইফা বদর যুদ্ধে যোগদান করেননি। ইবন সা'দ তাঁকে যে সকল সাহাবী বদরে যোগদান করেননি তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির–১/৯৪) এ যুদ্ধে হুজাইফা ও তাঁর পিতার যোগদান না করার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ আমার বদরে যোগদানে কোন বাধা ছিল না। তবে আমার আব্বার সাথে আমি তখন মদীনার বাইরে। আমাদের মদীনায় ফেরার পথে কুরাইশ কাফিররা পথরোধ করে জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বললাম ঃ মদীনায়। তারা বললো ঃ তাহলে নিশ্চয় তোমরা মুহাম্মাদের কাছেই যাচ্ছো? আমরা বললাম ঃ আমরা শুধু মদীনায় যাচ্ছি। তা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশেষে তারা আমাদের পথ ছেড়ে দিল। তবে এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে যে, আমরা মদীনায় গিয়ে কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুহাম্মাদকে (সা) কোনভাবে সাহায্য করবো না। তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা মদীনায় পৌছলাম এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) কুরাইশদের নিকট কৃত অঙ্গীকারের কথা বলে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এখন আমরা কী করবো? বললেন ঃ তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ কর। আর আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইবো। (তারীখুল ইসলাম ঃ যাহাবী–২/১৫৩; সহীহ মুসলিম–২/৮৯; তাহজীবুত তাহজীব–২/১৯৩; আল–ইসাবা–১/৩১৭)

হযরত হুজাইফা উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতার সাথে যোগদান করেন। তিনি দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করেন এবং নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তবে তাঁর বৃদ্ধ পিতা শাহাদাত বরণ করেন। আর সে শাহাদাত ছিল স্বপক্ষীয় মুসলিম সৈনিকদের হাতে। ঘটনাটি এ রকম ঃ

উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর পিতা আল–ইয়ামান ও সাবিত ইবন ওয়াক্‌শ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। যুদ্ধের আগে নারী ও শিশুদের একটি নিরাপদ দুর্গে রাখা হয়। আর এ দুই বৃদ্ধকে রাখা হয় ঐ দুর্গের তত্ত্বাবধানে। যুদ্ধ যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন আল–ইয়ামান সঙ্গী সাবিতকে বললেন ঃ তোমার বাপ নিপাত যাক! আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? পিপাসিত গাধার স্বল্পায়ুর মত আমাদের সবার আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। আমরা খুব বেশী হলে আজ অথবা কাল পর্যন্ত বেঁচে আছি। আমাদের কি উচিত নয়, তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট চলে যাওয়া? হতে পারে, আল্লাহ তাঁর নবীর (সা) সাথে আমাদের শাহাদাত দান করবেন। তাঁরা দু'জন তরবারি হাতে নিয়ে দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে যুদ্ধের এক পর্যায়ে পৌত্তলিক বাহিনী পরাজয় বরণ করে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছিল। তখন এক দুরাচারী শয়তান চেচিয়ে বলে ওঠে, দেখ, মুসলমানরা এসে পড়েছে। একথা শুনে পৌত্তলিক বাহিনীর একটি দল ফিরে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের একটি দলের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল–ইয়ামান ও সাবিত দু'দলের তুমুল সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে যান। পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে সাবিত শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু হুজাইফার পিতা আল–ইয়ামান শহীদ হন মুসলমানদের হাতে।। না চেনার কারণে এবং যুদ্ধের ঘোরে এমনটি ঘটে যায়। হুজাইফা কিছু দূর থেকে পিতার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠেন ঃ 'আমার আব্বা, আমার আব্বা' বলে। কিন্তু সে চিৎকার কারো কানে পৌছেনি। যুদ্ধের শোরগোলে তা অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নিজ সঙ্গীদের তরবারির আঘাতে ঢলে পড়ে গেছেন। হুজাইফা পিতার মৃত্যু

নিশ্চিত হয়ে শুধু একটি কথা উচ্চারণ করেন ঃ 'আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হুজাইফাকে তাঁর পিতার 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ আমার আব্বা তো শাহাদাতেরই প্রত্যাশী ছিলেন, আর তিনি তা লাভ করেছেন। হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাক, আমি তাঁর দিয়াত বা রক্তমূল্য মুসলমানদের জন্য দান করে দিলাম। রাসূল (সা) দারুণ খুশী হলেন। (দ্রঃ সহীহ বুখারী–২/৫৮১; সীরাতু ইবন হিশাম–২/৮৭; হায়াতুস সাহাবা–১/৫১৯; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা–৪/১২৫–১২৭)

হযরত হুজাইফা খন্দক যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুরাইশরা এমন তোড়জোড় করে ধেয়ে আসে যে, মদীনায় ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। মদীনার চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত কুরাইশ বাহিনীর লোকেরা ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সা) আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, আর সেইসাথে মদীনার প্রতিরক্ষার জন্য খন্দক খনন করেন। একদিন রাতে এক অভিনব ঘটনা ঘটে গেল। আর তা মুসলমানদের জন্য এক অদৃশ্য সাহায্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কুরাইশ মদীনার আশে–পাশের বাগানগুলিতে শিবির সংস্থাপন করে আছে। হঠাৎ এমন প্রচন্ড বাতাস বইতে শুরু করলো যে, রশি ছিড়ে তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, হাঁড়ি–পাতিল উল্টে–পাল্টে গেল এবং হাড় কাঁপানো শীত আরম্ভহলো। আবু সুফইয়ান বললো, আর উপায় নেই, এখনই স্থান ত্যাগ করতে হবে। (তাবাকাত–২/৫০)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) কুরাইশ বাহিনী নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তিনি সেই ভয়াল দুর্যোগময় রাতে হুজাইফার শক্তি ও অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করতে চাইলেন। তিনি কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাতের অন্ধকারে কাউকে কুরাইশ বাহিনীর অভ্যন্তরে পাঠিয়ে তাদের খবর সংগ্রহের ইচ্ছা করলেন। আর এ দুঃসাহসী অভিযানের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত হুজাইফাকে নির্বাচন করেন। এ অভিযান সম্পর্কে সীরাতের গ্রন্থসমূহে নানা রকম বর্ণনা দেখা যায়। একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) সঙ্গীদের বললেন ঃ 'যদি কেউ মুশরিকদের খবর নিয়ে আসতে পারে, তাকে আমি কিয়ামতের দিন আমার সাহচর্যের খোশখবর দিচ্ছি।' একে তো দারুণ শীত, তার উপর প্রবল বাতাস। কেউ সাহস পেল না। রাসূল (সা) তিনবার কথাটি উচ্চারণ করলেন; কিন্তু কোন দিক থেকে কোন রকম সাড়া পেলেন না। চতুর্থবার তিনি হুজাইফার নাম ধরে ডেকে বললেন ঃ 'তুমি যাও, খবর নিয়ে এসো।' যেহেতু নাম ধরে ডেকেছেন, সুতরাং আদেশ পালন ছাড়া উপায় ছিল না।

অন্য একটি বর্ণনা মতে হুজাইফা নিজেই বলেন ঃ 'আমরা সে রাতে কাতারবন্দী হয়ে বসেছিলাম। আবু সুফইয়ান ও মক্কার মুশরিক বাহিনী ছিল আমাদের উপরের দিকে, আর নীচে ছিল বনী কুরাইজার ইহুদী গোত্র। আমাদের নারী ও শিশুদের নিয়ে আমরা ছিলাম শঙ্কিত। আর সেইসাথে ছিল প্রবল ঝড়–ঝন্‌ঝা ও ঘোর অন্ধকার। এমন দুর্যোগপূর্ণ রাত আমাদের জীবনে আর কখনো আসেনি। বাতাসের শব্দ ছিল বাজ পড়ার শব্দের মত। আর এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল যে, আমরা আমাদের নিজের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম না।

এদিকে মুনাফিক শ্রেণীর লোকেরা একজন একজন করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলতে লাগলো ঃ আমাদের ঘর–দোর শত্রুর সামনে একেবারেই খোলা। তাই একটু ঘরে ফেরার অনুমিত চাই। মূলতঃ অবস্থা সে রকম ছিল না। কেউ যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেই তিনি অনুমতি দিচ্ছিলেন। এভাবে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত আমরা তিন শো বা তার কাছাকাছি সংখ্যক লোক থাকলাম।

এমন এক সময় রাসূল (সা) উঠে এক এক করে আমাদের সবার কাছে আসতে লাগলেন।

এক সময় আমার কাছেও আসলেন। শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার গায়ে একটি চাদর ছাড়া আর কিছু ছিল না। চাদরটি ছিল আমার স্ত্রীর, আর তা খুব টেনেটুনে হাঁটু পর্যন্ত পড়ছিল। তিনি আমার একেবারে কাছে আসলেন। আমি মাটিতে বসে ছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই তুমি কে? বললাম ঃ হুজাইফা। হুজাইফা? এই বলে মাটির দিকে একটু ঝুঁকলেন, যাতে আমি তীব্র ক্ষুধা ও শীতের মধ্যে উঠে না দাঁড়াই। আমি বললাম ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ কুরাইশদের মধ্যে একটি খবর হচ্ছে। তুমি তাদের শিবিরে যেয়ে আমাকে তাদের খবর এনে দেবে।

আমি বের হলাম। অথচ আমি ছিলাম সবার চেয়ে ভীতু ও শীতকাতর। রাসূল (সা) দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপর-নীচে, সব দিক থেকে তুমি তাকে হিফাজত কর।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'আ শেষ হতে না হতে আমার সব ভীতি দূর হলো এবং শীতের জড়তাও কেটে গেল।

আমি যখন পিছন ফিরে চলতে শুরু করেছি তখন তিনি আমাকে আবার ডেকে বললেন ঃ হুজাইফা! আমার কাছে ফিরে না এসে আক্রমণ করবে না। বললাম ঃ ঠিক আছে। আমি রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলতে লাগলাম। এক সময় চুপিসারে কুরাইশদের শিবিরে প্রবেশ করে তাদের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যেন আমি তাদেরই একজন।

আমার পৌঁছার কিছুক্ষণ পর আবু সুফইয়ান কুরাইশ বাহিনীর সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলতে চাই। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে তা মুহাম্মাদের কাছে পৌঁছে যায় কিনা। তোমরা প্রত্যেকেই নিজের পাশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখ। একথা শোনার সাথে সাথে আমার পাশের লোকটির হাত মুট করে ধরে জিজ্ঞেস করলাম ঃ কে তুমি? সে জবাব দিল অমুকের ছেলে অমুক।

আবু সুফইয়ান বললেন ঃ 'ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা কোন নিরাপদ গৃহে নও। আমাদের ঘোড়াগুলি মরে গেছে, উটগুলি কমে গেছে এবং মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজাও আমাদের ছেড়ে গেছে। তাদের যে খবর আমাদের কাছে এসেছে তা সুখকর নয়। আর কেমন প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছি, তাও তোমরা দেখছো। আমাদের হাঁড়িও আর নিরাপদ নয়। আগুনও জ্বলছেনা। সুতরাং ফিরে চলো। আমি চলছি।' একথা বলে তিনি উটের রশি খুললেন এবং পিঠে চড়ে বসে তার গায়ে আঘাত করলেন। উট চলতে শুরু করলো। কোন কিছু ঘটাতে রাসূল (সা) যদি নিষেধ না করতেন তাহলে একটি মাত্র তীর মেরে তাকে হত্যা করতে পারতাম।

আমি ফিরে এলাম। এসে দেখলাম রাসূল (সা) তাঁর এক স্ত্রীর চাদর গায়ে জড়িয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। নামায শেষ করে তিনি আমাকে তাঁর দু'পায়ের কাছে টেনে নিয়ে চাদরের এক কোনা আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। আমি সব খবর তাঁকে জানালাম। তিনি দারুণ খুশী হলেন এবং আল্লাহর হামদ ও ছানা পেশ করলেন। হযরত হুজাইফা সে দিন বাকী রাতটুকু রাসূলুল্লাহর (সা) সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে সেখানেই কাটিয়ে দেন। প্রত্যুষে রাসূল (সা) তাঁকে ডাকেন ঃ ইয়া নাওমান-ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি।' (দ্রঃ সহীহ মুসলিম-২/৮৯; তারীখু ইবন আসাকির-১/৯৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৩১; হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৮-৩৩০; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা- ৪/১২৯-১৩৬)

একবার কূফার এক লোক হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে বললো ঃ আবু 'আবুদিল্লাহ! আপনি কি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছেন? তাঁর সুহবত সাহচর্য পেয়েছেন? বললেন ঃ হাঁ, ভাতিজা। লোকটি আবার প্রশ্ন কললো ঃ আপনারা কেমন আচরণ করতেন? বললেন ঃ তাঁর আদেশ পালনের চেষ্টা করতাম। লোকটি বললো ঃ আমরা রাসূলকে (সা)

পেলে মাটিতে হেঁটে চলতে দিতাম না, কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতাম। তিনি বললেন ঃ আমি খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নিজেকে দেখেছি। এই বলে তিনি খন্দকের সেই রাতের ভয়-ভীতি, ঝড়, শৈত্য ইত্যাদির এক চিত্র তুলে ধরলেন। (হায়াতুস সাহাবা-১/২৬৪)

খন্দক পরবর্তী রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় বা তাঁর পরের সকল অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের পর তিনি ইরাকে বসতি স্থাপন করেন। তারপর বিভিন্ন সময় কূফা, নিস্‌সীবীন ও মাদায়েনে বসবাস করেন। নিস্‌সীবীনের 'আল-জাযীরা' শহরে একটি বিয়েও করেন। (উসুদুল গাবা-১/৩৯৪)

হযরত হুজাইফা যে পারস্যের নিহাওয়ান্দ, দাইনাওয়ার, হামজান, মাহ্ রায় প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং গোটা ইরাক ও পারস্যবাসীকে কুরআনের এক পাঠের ওপর সমবেত করেন, একথা খুব কম লোকেই জানে। (আল-ইসতী'য়াব; আল-ইসাবার টীকা-১/২৭৮; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩)

ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর হযরত 'উমার (রা) সেখানকার ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ কাজের জন্য তিনি দু'জন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। ফুরাত নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে হযরত 'উসমান ইবন হুনাইফ এবং দিজলা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে হযরত হুজাইফাকে নিয়োগ করেন। দিজলা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির। তারা হযরত হুজাইফাকে তার কাজে কোন রকম সাহায্য তো দূরের কথা বরং নানা রকম বাধার সৃষ্টি করলো। তা সত্ত্বেও তিনি বন্দোবস্ত দিলেন। এর ফলে সরকারী আয় অনেকটা বেড়ে গেল। এরপর তিনি মদীনায় এসে খলীফা 'উমারের (রা) সাথে সাক্ষাৎ করলেন। খলীফা তাঁকে বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ যমীনের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়েছে।' হুজাইফা বললেন ঃ আমি অনেক বেশী ছেড়ে দিয়েছি। (কিতাবুল খিরাজ-২১)

হযরত হুজাইফা ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমুক যুদ্ধের বিজয়ের খবর সর্বপ্রথম তিনিই মদীনায় খলীফা 'উমারের নিকট নিয়ে আসেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৪/৯৩, ৯৪)

হিজরী ১৮ সনে নিহাওয়ান্দের ওপর সেনা অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। অবশ্য আবু 'উবাইদাহ বলেন, হিজরী ২২ সনে হুজাইফা নিহাওয়ান্দে যান। (তারীখু ইবন আসাকির-১/১০০) এই নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে পারসিক সৈন্যসংখ্যা ছিল দেড় লাখ। খলীফা হযরত 'উমার (রা) মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন হযরত নু'মান ইবন মুকাররিনকে। তারপর তিনি কূফায় অবস্থানরত হযরত হুজাইফাকে একটি চিঠিতে সেখান থেকে একটি বাহিনী নিয়ে নিহাওয়ান্দের দিকে যাত্রা করার জন্য নির্দেশ দেন। এদিকে খলীফা মুসলিম মুজাহিদদের প্রতি জারি করা এক ফরমানে বললেন, চারদিক থেকে মুসলিম সৈন্যরা যখন এক স্থানে সমবেত হবে তখন প্রত্যেক স্থান থেকে আগত বাহিনীর একজন করে আমীর থাকবে। আর গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন, নু'মান ইবন মুকাররিন। নু'মান যদি শাহাদাত বরণ করেন, হুজাইফা হবেন পরবর্তী আমীর। আর তিনি শহীদ হলে আমীর হবেন জারীর ইবন 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী। এভাবে খলীফা সে ফরমানে একের পর এক সাতজন সেনাপতির নাম ঘোষণা করেন। হযরত নু'মান নিহাওয়ান্দের অদূরে শিবির স্থাপন করে বাহিনীর দায়িত্ব বন্টন করেন। সেখানে হযরত হুজাইফাকে দক্ষিণ ভাগের অফিসার নিয়োগ করা হয়।

দু'বাহিনী মুখোমুখি হলো। শত্রুসৈন্য দেড় লাখ, আর মুসলমান সৈন্য মাত্র তিরিশ হাজার। প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। ইতিহাসে এমন যুদ্ধের নজীর খুব কমই আছে। মুসলিম বাহিনীর এক নম্বর অধিনায়ক নু'মান শাহাদাত বরণ করলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনিও হুজাইফাকে

আমীর নিয়োগের অসীয়াত করে যান। তাঁর শাহাদাতের পর আশে পাশের সৈনিকরা যখন নতুন আমীরের সন্ধান করছে তখন হযরত মা'কাল হুজাইফার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ইনিই তোমাদের পরবর্তী আমীর। আশা করা যায়, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের বিজয় দান করবেন।

হযরত হুজাইফা সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুদ্ধ তখন ঘোরতর রূপ ধারণ করেছে। তিনি পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে নু'মানের শাহাদাতের খবর প্রচার করতে নিষেধ করে দিলেন। আর সাথে সাথে নু'মানের স্থলে ভাই নু'য়াঈমকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যাতে নু'মানের শাহাদাতে যুদ্ধের ওপর কোন রকম প্রভাব না পড়ে। এ কাজগুলি তিনি করলেন মুহূর্তের মধ্যে। তারপর তিনি ঝড়ের গতিতে চিরে-ফেঁড়ে পারসিক বাহিনীর সামনে পৌঁছে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন ঃ

'আল্লাহু আকবার ঃ সাদাকা ও'য়াদাহ্

আল্লাহ আকবার ঃ নাসারা জুনদাহ্'

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ- তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ- তিনি তাঁর সিপাহীদের সাহায্য করেছেন।

তারপর তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মেরে শত্রু বাহিনীর দিকে ফিরিয়ে জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেনঃ 'ওহে মুহাম্মাদের (সা) অনুসারীরা! এখানে, এদিকে জান্নাত তোমাদের স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তোমরা আর দেরী করোনা।

ওহে বদরের যোদ্ধারা! ছুটে এসো। ওহে খন্দক, উহুদ ও তাবুকের বীরেরা! সামনে এগিয়ে চলো।' এভাবে তিনি সেদিন নজীরবিহীন সাহস ও বিজ্ঞতার পরিচয় দান করেন। (দ্রঃ তাবারী-৫/২৬০১, ২৬০৫, ২৬৩২; যাহাবী ঃ তারীখ-২/৩৯-৪১; রিজালুন হাওলার রাসূল-১৯৯)

নিহাওয়ান্দে ছিল একটি অগ্নি উপাসনা কেন্দ্র। তার প্রধান ধর্মগুরু একদিন হুজাইফার নিকট এসে বললেন, যদি আমার নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয় তাহলে আমি একটি মহামূল্যবান গুপ্ত সম্পদের সন্ধান দিতে পারি। হযরত হুজাইফা (রা) তাঁকে আশ্বাস দিলেন। লোকটি পারস্য সম্রাটের অতিমূল্যবান মনি-মুক্তা এনে হাজির করলেন। হযরত হুজাইফা (রা) গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশসহ সেই মহামূল্যবান মনি-মুক্তা মদীনায় খলীফা 'উমারের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত 'উমার (রা) মনি-মুক্তা দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। ইবন মুলাইকাকে ডেকে বললেন, এক্ষুণি এগুলি নিয়ে যাও। আর হুজাইফাকে বল, এগুলি বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সৈন্যদের মধ্যে যেন বন্টন করে দেয়। হযরত হুজাইফা তখন নিহাওয়ান্দের 'মাহ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি সেই ধনরত্ন চার কোটি দিরহামে বিক্রী করেন। (তাবারী-৫/২৬২৭, ২৬৩০)

ইবন আসাকির বলেন, নিহাওয়ান্দের শাসক বাৎসরিক আট লাখ দিরহাম জিযিয়া দানের অঙ্গীকার করে হযরত হুজাইফার সাথে সন্ধি করেন। নিহাওয়ান্দের পর তিনি বিনা বাধায় 'দায়নাওয়ার' জয় করেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস পূর্বেই এ দায়নাওয়ার জয় করেছিলেন; কিন্তু অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে। তারপর হযরত হুজাইফা বিনা যুদ্ধে একে একে মাহ্, হামাজান, ও রায় জয় করেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০০)

মাহ্-এর অধিবাসীদের সাথে হযরত হুজাইফা (রা) যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তা নিম্নরূপ ঃ

"হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান মাহবাসীদের জান, মাল ও বিষয়-সম্পত্তির এ নিরাপত্তা দান করছেন যে, তাদের ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হবেনা। এবং ধর্ম ত্যাগের জন্য কোন রূপ জোর-জবরদস্তি করা হবে না। তাদের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যতদিন বাৎসরিক

জিযিয়া আদায় করবে, পথিকদের পথের সন্ধান দেবে, পথ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, এখানে অবস্থানরত মুসলিম সৈনিকদের একদিন এক রাত আহার করাবে এবং মুসলমানদের শুভাকাংখী থাকবে, ততদিন তাদের এ নিরাপত্তা বলবৎ থাকবে। আর যদি তারা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বা তাদের আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাহলে তাদের কোন দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর থাকবে না।" হিজরী ১৯ সনের মুহাররাম মাসে এ চুক্তিপত্রটি লেখা হয় এবং তাতে কা'কা', নু'য়াইম ইবন মুকাররিন ও মুয়ায়িদ ইবন মুকাররিন সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দান করেন। (তাবারী-৫/২৬৩৩)

উল্লেখিত অভিযানসমূহ শেষ করে হযরত হুজাইফা তাঁর পূর্বের ভূমি বন্দোবস্তদানকারী অফিসার পদে ফিরে যান। (তাবারী-৫/২৬৩৮)

বালাজুরীর বর্ণনা মতে হিজরী ২২ সনে আজারবাইজান অভিযানে হযরত হুজাইফা গোটা বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি নিহাওয়ান্দথেকে আজারবাইজানের রাজধানী আরদাবীলে পৌছেন। এখানকার শাসক মাজেরওয়ান, মায়মন্দ, সুরাত, সাবৃজ, মিয়াঞ্চ প্রভৃতি স্থান থেকে একটি বাহিনী সংগ্রহ করে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অতঃপর বাৎসরিক আট লাখ দিরহাম জিযিয়া দানের শর্তে সন্ধি করে। হযরত হুজাইফা সেখান থেকে মুকাম ও রুজাইলার দিকে অগ্রসর হন এবং বিজয় লাভ করেন। ইত্যবসরে মদীনার খলীফার দরবার থেকে তাঁর বরখাস্তের নির্দেশ হাতে পৌছে। তাঁর স্থলে 'উতবা ইবন ফারকাদকে নিয়োগ করা হয়। (তাবারী-৫/২৮০৬; বিস্তারিত বর্ণনা তারীখে বালাজুরীতে এসেছে।)

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মাদায়েন বিজিত হওয়ার পর মুসলিম বাহিনী সেখানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু সেখানকার আবহাওয়া আরব মুসলমানদের স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় খলীফা 'উমার (রা) সা'দকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কূফায় চলে যেতে বলেন এবং সেখানে একটি স্বাস্থ্য উপযোগী স্থান নির্বাচন করে স্থায়ী সেনা ছাওনী তথা শহর পত্তনের নির্দেশ দেন। হযরত সা'দ (রা) শহর পত্তনের জন্য হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান ও সালমান ইবন যিয়াদের ওপর স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা দু'জন গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি স্বাস্থ্যকর স্থান নির্বাচন করেন। আজকের কূফা শহরটি এ দু'ব্যক্তিরই নির্বাচিত স্থানে অবস্থিত। (রিজালুন হাওলার রাসূল-২০০)

উল্লেখিত অভিযান সমূহের পর খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাকে মাদায়েনের ওয়ালী নিয়োগ করেন। (তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৪) একজন নতুন ওয়ালী আসছেন-এ খবর মাদায়েনবাসীদের কাছে পৌছে গেল। নতুন আমীরকে স্বাগত জানানোর জন্য তারা দলে দলে শহরের বাইরে সমবেত হলো। তারা এ মহান সাহাবীর তাকওয়া, খোদাভীতি, সরলতা ও ইরাক বিজয়ের অনেক কথা শুনেছিল। তারা তাঁর একটি জাঁকজমকপূর্ণ কাফিলার সাথে আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। না, কোন কাফিলার সাথে নয়। তারা দেখতে পেল কিছু দূরে গাধার ওপর সাওয়ার হয়ে দীপ্ত চেহারার এক ব্যক্তি তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। গাধার পিঠে অতি পুরনো একটি জিন। তার ওপর বসে বাহনের পিঠের দু'পাশের পা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে রুটি ও অন্য হাতে লবণ ধরে মুখে ঢুকিয়ে চিবোচ্ছেন। আরোহী ধীরে ধীরে জনতার মাঝখানে এসে পড়লেন। তারা ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝলো, ইনিই সেই ওয়ালী যার প্রতীক্ষায় তারা দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথমবারের মত তাদের কল্পনা হোঁচট খেল। পারস্যের কিসরা বা তাঁর পূর্ব থেকে তাদের দেশে এমন ওয়ালীর আগমন আর কক্ষণো ঘটেনি।

তিনি চললেন এবং লোকেরাও তাঁকে ঘিরে পাশপাশি চললো। তিনি আবাস স্থলে পৌছে উপস্থিত জনতাকে তাদের প্রতি লেখা খলীফার ফরমান পাঠ করে শোনালেন। খলীফা হযরত 'উমারের (রা) নিয়ম ছিল, নতুন ওয়ালী বা শাসক নিয়োগের সময় সেই এলাকার

অধিবাসীদের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ও ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। কিন্তু হযরত হুজাইফার (রা) নিয়োগ পত্রে মাদায়েনবাসীর প্রতি শুধু একটি নির্দেশ ছিল ঃ 'তোমরা তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে।' তিনি যখন তাদের সামনে খলীফার এ ফরমান পাঠ করে শোনালেন, তখন চারদিক থেকে আওয়ায উঠলো, বলুন, আপনার কী প্রয়োজন। আমরা সবই দিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী ও খুলাফায়ে রাশেদার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হযরত হুজাইফা বললেন ঃ 'আমার নিজের পেটের জন্য শুধু কিছু খাবার, আর আমার গাধাটির জন্য কিছু ঘাস-খড় প্রয়োজন। যতদিন এখানে থাকবো, আপনাদের কাছে শুধু এতটুকুই চাইবো।' তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে আরো বললেন ঃ 'তোমরা ফিতনার স্থানগুলি থেকে দূরে থাকবে। লোকেরা জানতে চাইলো, ফিত্‌নার স্থানগুলি কি? বললেন ঃ আমীর বা শাসকদের বাড়ীর দরযাসমূহ। তোমাদের কেউ আমীর বা শাসকের কাছে এসে মিথ্যা দ্বারা তার সত্যায়িত করবে এবং তার মধ্যে যা নেই তাই বলে তার প্রশংসা করবে- এটাই মূলতঃ ফিত্‌না।' এ পদে কিছু দিন থাকার পর কোন এক কারণে খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে রাজধানী মদীনায় তলব করেন। খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে হযরত হুজাইফা (রা) যে অবস্থায় একদিন মাদায়েন গিয়েছিলেন ঠিক একই অবস্থায় মদীনার দিকে যাত্রা করেন। হুজাইফা আসছেন, এ খবর পেয়ে খলীফা মদীনার কাছাকাছি পথের পাশে এক স্থানে লুকিয়ে থাকেন। নিকটে আসতেই হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন ঃ 'হুজাইফা, তুমি আমার ভাই, আর আমিও তোমার ভাই।' তারপর সেই পদেই তাঁকে বহাল রাখেন।

(দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০০; আল-আ'লাম-২/১৭১; তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩; উসুদুল গাবা-১/৩৯২; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬৬, ২/৭৩)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহ্‌লবী (রহ) হযরত ইমাম আবু হানীফার (রহ) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হযরত হুজাইফা

ইবনুল ইয়ামান (রা) মাদায়েন থাকাকালে এক ইহুদী নারীকে বিয়ে করেন। খবর পেয়ে আমীরুল মুমিনীন 'উমার (রা) তাঁকে উক্ত মহিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দেন। হুজাইফা (রা) খলীফাকে প্রশ্ন করেন ঃ কিতাবী নারী বিয়ে করা কি হারাম? জবাবে 'উমার (রা) বলেন ঃ হুজাইফা! আমি তোমাকে তাকীদ দিচ্ছি, আমার এ নির্দেশ হাত থেকে রাখার পূর্বেই যেন মহিলাকে বিদায় করে দেয়া হয়। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তোমার দেখাদেখি অন্য মুসলমানরাও জিম্মী নারীর রূপ ও গুণের কারণে মুসলিম মহিলাদের ওপর তাদেরকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে না দেয়। আর এমন হলে তা মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি মারাত্মক ফিত্‌না বলে প্রমাণিত হবে। (ফিক্‌হে 'উমার ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিহলবী, উর্দু অনুবাদ-

মাদায়েনে ওয়ালী থাকাকালে একবার জনতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন ঃ 'হে জনমন্ডলী! তোমরা তোমাদের দাসদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর রাখ। দেখ, তারা কোথা থেকে কিভাবে উপার্জন করে তোমাদের নির্ধারিত মজুরী পরিশোধ করছে। কারণ, হারাম উপার্জন খেয়ে দেহে যে গোশ্‌ত তৈরী হয় তা কক্ষণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর এটাও জেনে রাখ, মদ বিক্রেতা, ক্রেতা ও তাঁর প্রস্তুতকারক, সকলেই তা পানকারীর সমান।' (হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৮২)

হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালের পুরো সময়টা এবং হযরত আলীর (রা) খিলাফতের কিছু দিন, একটানা এ দীর্ঘ সময় তিনি মাদায়েনের ওয়ালী পদে আসীন ছিলেন। (আল-ইসাবা-১/৩১৭) হযরত 'উসমানের খিলাফতকালে হিজরী তিরিশ সনে হযরত সা'ঈদ ইবন 'আসের সাথে কূফা থেকে খুরাসানের উদ্দেশ্যে বের হন। 'তুমাইস নামক বন্দরে

শত্রু বাহিনীর সাথে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। এখানে সা'ঈদ ইবন 'আস সালাতুল খাওফ (ভীতিকালীন নামায) আদায় করেন। তিনি নামায পড়ানোর পূর্বে হযরত হুজাইফার নিকট থেকে তার পদ্ধতি জেনে নেন। (মুসনাদ-৫/৩৮৫; রাবীয়া-৫/৩৮৩৬-৩৭) এরপর তিনি 'রায়'-এ যান এবং সেখান থেকে সালমান ইবন রাবীয়া ও হাবীব ইবন মাসলামার সাথে আরমেনিয়ার দিকে অগ্রসর হন। এ অভিযানে তিনি কূফী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। (তাবারী-৫/২৮৯৩)

হিজরী ৩১ সনে 'খাকানে খাযার'-এর বাহিনীর সাথে বড় ধরনের একটি সংঘর্ষ হয়। এতে সালমানসহ প্রায় চার হাজার মুসলিম শহীদ হন। সালমানের শাহাদাতের পর হযরত হুজাইফা গোটা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর তাঁকে অন্যত্র বদলী করা হয় এবং তাঁর স্থলে হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে নিয়োগ করা হয়।

হযরত হুজাইফা (রা) 'বাব'-এর ওপর তিনবার অভিযান চালান। (তাবারী-৫/২৮৯৪) তৃতীয় হামলাটি ছিল হিজরী ৩৪ সনে। (তাবারী-৫/২৯৩৬) এ অভিযান ছিল হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতের শেষ দিকে। এ সকল অভিযান শেষ করে তিনি মাদায়েনে নিজ পদে ফিরে আসেন।

মাদায়েনে পৌঁছার পর তিনি হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের ঘটনা অবগত হন। খলীফা 'উসমানের (রা) শাহাদাতের মাত্র চল্লিশ দিন পর তিনিও ইনতিকাল করেন। এটা হিজরী ৩৬ সন মুতাবিক ৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। ওয়াকিদী ও আল-হায়সাম ইবন 'আদী এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (দ্রঃ আল-ইসাবা-১/৩১৮; শাজারাতুয্ যাহাব-১/৪৪; আল-আ'রাম-২/১৭১; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৪)

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাঁর সাদাসিধে ভাব আরো বেড়ে যায় এবং দারুণ ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সব সময় কান্নাকাটি করতেন। লোকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে এ কান্না নয়। কারণ, মৃত্যু আমার অতি প্রিয়। তবে এ জন্য কাঁদছি যে, মৃত্যুর পর আমার যে কী অবস্থা হবে এবং আমার পরিণতিই বা কী হবে, তা তো আমার জানা নেই। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তোমার সাক্ষাৎ আমার জন্য কল্যাণময় কর। তুমি তো জান আমি তোমায় কত ভালোবাসি।' (উসুদুল গাবা-১/৩৯২)

তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এলে রাতের বেলা কয়েকজন সাহাবী তাঁকে দেখতে গেলেন। হুজাইফা তাঁদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ এটা কোন্ সময়? তাঁরা বললেন ঃ প্রভাতের কাছাকাছি সময়। তিনি বললেন ঃ আমি সেই সকালের ব্যাপারে আল্লাহর পানাহ্ চাই যা আমাদের জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা কি কাফন এনেছেন? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ, এনেছি। বললেন ঃ কাফনের ব্যাপারে বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না। কারণ, আল্লাহর কাছে যদি আমার কিছু ভালো থেকে থাকে তাহলে এ কাফন পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, আর যদি খারাপ থাকে এ ভালো কাফন ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

তিনি কাফন দেখতে চাইলে তা দেখানো হলো। যখন দেখলেন, তা নতুন ও দামী তখন ঠোঁটে একটু বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে বললেন ঃ এ আমার কাফন নয়। কামিস ছাড়াই দু'প্রস্থ সাদা কাপড়ই আমার জন্য যথেষ্ট। কারণ কবরে আমাকে বেশী সময় বিরতি দেওয়া হবে না। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তার চেয়ে ভালো অথবা মন্দ স্থানে স্থানান্তর করা হবে। তারপর দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি জান আমি ধনের পরিবর্তে দারিদ্রকে, ইয্যতের পরিবর্তে জিল্লতীকে এবং জীবনের পরিবর্তে মৃত্যুকে ভালোবাসতাম।' তার শেষ কথাটি ছিল ঃ 'অতি

আবেগের সাথে বন্ধু এসেছে, যে অনুশোচনা করবে তার সফলতা নেই।' (দ্রঃ উসুদুল গাবা-১/৩৯৩; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০৩; রিজালুন হাওলার রাসূল-২০১; সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১৩৮)

তাঁর জানাযায় বহু লোক উপস্থিত ছিল। এক ব্যক্তি তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, আমি এই খাটিয়ার ওপর শায়িত ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সা) যা কিছু বলেছেন তা বর্ণনা করতে কোন দোষ নেই। আর তোমরা যদি পরস্পর যুদ্ধের দিকে ধাবিত হও তাহলে আমি ঘরে বসে থাকবো। তারপরেও যদি কেউ সেখানে উপস্থিত হয় তাহলে তাকে বলবো, এগিয়ে এসো, আমার ও তোমার পাপের বোঝা কাঁধে তুলে নাও। (মুসনাদ-৫/৩৮৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৪০৪, ৪০৫)

মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আলীর (রা) নিকট বাই'য়াত করার জন্য দুই ছেলেকে অসীয়াত করে যান। তাঁরা দু'জনই 'আলীর (রা) বাই'য়াত করেন এবং সিফ্ফীন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসতীয়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা-১/২৭৮) হযরত হুজাইফা (রা) নিজেও 'আলীর নিকট বাই'য়াত করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

আবু 'উবাইদাহ, বিলাল, সাফওয়ান ও সা'ঈদ নামে তাঁর চার ছেলে ছিল। 'তাবাকাত' গ্রন্থকার ইবন সা'দের সময় মাদায়েনে তাঁর বংশধরগণ জীবিত ছিলেন। (তাবাকাত-৬/৮) হযরত হুজাইফার দুই স্ত্রী ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে।

দৈহিক আকৃতির দিক দিয়ে হযরত হুজাইফাকে (রা) হিজাযী বলে চেনা যেত। মধ্যমাকৃতির একহারা গড়ন এবং সামনের দাঁতগুলি ছিল অতি সুন্দর। দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, ভোরের আবছা অন্ধকারেও তীরের নিশানা (লক্ষ্যস্থল) নির্ভুলভাবে দেখতে পেতেন।

হযরত হুজাইফা (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ 'আলিম সাহাবীদের একজন। ফিকাহ ও হাদীস ছাড়াও কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে যে সকল আবর্তন-বিবর্তন হবে সে সম্পর্কেও একজন শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মুনাফিকদের সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল অনেক। এ কারণে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন জ্ঞানের অধিকারী বা 'সাহিবুস সির' বলা হতো। হুজাইফা বলেন ঃ অতীতে পৃথবীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে তা সবই রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব-২/১৯৩)

একবার তিনি প্রখ্যাত 'আলিম সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের নিকট বসে ছিলেন। আরো অনেকে সেখানে ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে দাজ্জালের কথা উঠলে তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে তোমাদের থেকে অনেক বেশী জানি। (সহীহ মুসলিম-২/৫১৪)

একদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) এক ভাষণে সাহাবীদের সামনে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা দান করেন। হযরত হুজাইফার সেই ভাষণটি স্মরণ ছিল। তবে কিছু কথা ভুলে যান। যখনই কোন ঘটনা ঘটতো তখন সে কথা মনে পড়তো। (সহীহ মুসলিম-৫/৪৯) তিনি নিজেই বলেছেন, রাসূল (সা) তাঁকে সব ঘটনা অবহিত করেন। শুধু একটি কথা বলা বাকী ছিল। তা হলো, মদীনাবাসীদের মদীনা থেকে বের হওয়ার কারণ কী হবে? (সহীহ মুসলিম-৫/৪৯)

'আলকামা বলেন ঃ একবার আমি শামে গেলাম। সেখানে আমি এই বলে দু'আ করলাম ঃ হে আল্লাহ! আমাকে একজন নেক্কার সঙ্গী দাও। এরপর আমি একজন লোকের পাশে বসলাম। ঘটনাক্রমে তিনি ছিলেন আবু দারদা (রা) তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথাকার লোক? বললাম ঃ কূফার। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ওখানে 'সাহিবুস সির' বা গোপন রহস্যের অধিকারী ব্যক্তি, যিনি ছাড়া অন্য কেউ সে রহস্য জানেনা—সেই হুজাইফা কি নেই? (তারীখু ইবন 'আসাকির-৪/৯৬)

হযরত হুজাইফা (রা) সম্পর্কে একবার হযরত 'আলীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে

বললেন, তিনি তো মুনাফিকদের সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে— তিনি তো মুনাফিকদের সম্পর্কে মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। (তারীখু ইবন 'আসাকির-৪/৯৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৭)

আর একবার হুজাইফা সম্পর্কে হযরত আবু যারকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলে বললেন ঃ তিনি যেমন যাবতীয় জটিল ও বিস্তারিত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, তেমনিভাবে মুনাফিকদের নামও জানেন। মুনাফিকদের সম্পর্কে যদি তুমি জানতে চাও তাহলে এ বিষয়ে তাঁকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিই পাবে। (তারীখু ইবন 'আসাকির- ৪/৯৭)

সাহাবায়ে কিরাম সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিভিন্ন 'আমলের ফজীলাত, নামায, রোযা বা এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু হুজাইফা (রা) তা করতেন না। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদের (সা) সাহাবীরা সব সময় ভালো কি, তাই জিজ্ঞেস করতেন। আর আমি জিজ্ঞেস করতাম, খারাপ কি, তা জানার জন্য। প্রশ্ন করা হলো, কেন এমন করতেন? বললেন ঃ যে খারাপকে জানে সে ভালোর মধ্যে থাকে। অন্য একটি বর্ণনা মতে, তিনি বলেন, 'যাতে আমি খারাপের মধ্যে না পড়ি সেই ভয়ে।' (বুখারী-২/১০৪৯; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/১০১; তাজীবুত তাহজীব-২/১৯৩)

একবার হযরত 'উমারের (রা) নিকট বহু সাহাবী বসে ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ ফিত্না সম্পর্কে কারো কি কিছু জানা আছে? হুজাইফা বললেন ঃ ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে মানুষের যা কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, নামায, সাদাকা, আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার দ্বারা তার কাফ্ফারা হয়ে যায়। 'উমার বললেন ঃ আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এ নয়। আমাকে সে ফিত্নার কথা বল যা সাগরের মত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।' হুজাইফা বললেন ঃ আপনার ও সেই ফিত্নার মধ্যে একটি দরযার বাধা আছে। এ জন্য আপনার দ্বিধান্বিত হওয়ার কারণ নেই। 'উমার (রা) জানতে চাইলেন ঃ দরযা খোলা হবে না ভেঙ্গে ফেলা হবে? বললেন ঃ ভেঙ্গে ফেলা হবে। 'উমার (রা) বললেন ঃ তাহলে তো আর কক্ষণো থামবে না। হুজাইফা বললেন ঃ হাঁ, তাই।

হযরত হুজাইফা (রা) উল্লেখিত ঘটনাটি পরবর্তীকালে অন্য একটি মজলিসে বর্ণনা করলেন। তখন সেখানে প্রখ্যাত তাবে'ঈ 'শাকীক' উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'উমার কি দরযা সম্পর্কে জানতেন? বললেন ঃ তোমরা যেমন জান দিনের পর রাত হয়, ঠিক তেমনি তিনিও দরযা সম্পর্কে জানতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ দরযার অর্থ কি? বললেন ঃ 'উমার নিজেই। (বুখারী)

হযরত হুজাইফা (রা) থেকে এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। নবুওয়াতের যেসব গোপন কথা তাঁর জানা ছিল তার বেশীর ভাগ ইসলামী রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছাড়া আরো অনেকে এসব গোপন কথা জানতেন। হুজাইফার (রা) বর্ণনা থেকে সে কথা জানা যায়। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'আমি বর্তমান সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের সকল ফিত্না সম্পর্কে জানি। তবে একথা দ্বারা কেউ যেন না বোঝে যে, আমি ছাড়া আর কেউ বিষয়টি জানতো না। রাসূল (সা) এক মজলিসে কথাগুলি বলেছিলেন। ছোট-বড় সকল ঘটনার সংবাদ দিয়েছিলেন। তবে সেই মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একমাত্র আমি ছাড়া আজ আর কেউ বেঁচে নেই।' (মুসলিম-২/৩৯৭)

হযরত হুজাইফা (রা) মাঝে মাঝে নিজের এ জ্ঞান কাজে লাগাতেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন। একবার 'আমের ইবন হানজালার গৃহে প্রদত্ত এক খুতবায় তিনি বলেন ঃ 'একটি সময়ে কুরাইশরা দুনিয়ার কোন নেক্কার বান্দাহ্কে ছেড়ে দেবে না। তারা সকলকে ফিত্নায় জড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের একটি বাহিনী দিয়ে তাদেরকে একেবারেই নির্মূল করে ফেলবেন।'

লোকেরা বললো ঃ আপনি নিজেও তো একজন কুরাইশী। বললেন ঃ আমার করার কী আছে? আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এমনই শুনেছি। (মুসনাদ–৫/৩৯০; ৩৯৫, ৪০৪)

একবার হযরত হুজাইফা বললেন ঃ রাসূল (সা) আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছিলেন। যার একটি আমি দেখেছি, আর অন্যটির প্রতীক্ষায় আছি। এমন এক সময় ছিল যখন আমি যে আমীরের হাতেই বাই'য়াত করতাম, তার ব্যাপারে আমার মধ্যে কোন রকম দ্বিধা–সংকোচ দেখা দিতনা। আমি বিশ্বাস করতাম, সে মুসলিম হলে ইসলামের দ্বারা, আর খ্রীস্টান হলে মুসলিম কর্মচারী দ্বারা আমাদেরকে শাসন করবে। কিন্তু এখন আমি বাই'য়াতের ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করি। আমার দৃষ্টিতে বাই'য়াতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছে। আমি কেবল তাদের হাতে বাই'য়াত করতে পারি। (বুখারী)

কিয়ামত সম্পর্কে তিনি একটি আগাম কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'যতদিন প্রতিটি গোত্রের মুনাফিকরা তার নেতা না হবে ততদিন কিয়ামত হবে না।' (আল–ইসতী'য়াব, আল–ইসাবা–১/২৭৮) আর একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ফিত্না সবচেয়ে বড়? বললেন ঃ যদি তোমার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টোই পেশ করা হয়, আর তুমি কোন্টি গ্রহণ করবে তা ঠিক করতে না পার, তাহলে সেটাই বড় ফিত্না। (আল–ইসতী'য়াব ঃ আল–ইসাবা–১/২৭৮) আর একবার বললেন ঃ মানবজাতির জন্য এমন একটা সময় বা কাল আসবে যখন কেউ ফিত্না থেকে মুক্তি পাবে না। শুধু তারাই মুক্তি পাবে যারা পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির ডাকার মত আল্লাহকে ডাকবে। (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৭)

তিনি সরাসরি রাসূল (সা) ও 'উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহজীবুত তাহজীব–২/১৯৩) 'খুলাসা' গ্রন্থের লেখক তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক শো'র (১০০) বেশী বলে উল্লেখ করেছেন। যে সকল সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ঃ জাবির ইবন আবদিল্লাহ, জুনদুব ইবন 'আবদিল্লাহ আল–বাজালী, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল–খুতামী, আবুত তুফাইল, 'আলী ইবন আবী তালিব, 'উমার ইবন খাত্তাব প্রমুখ সাহাবী। (উসুদুল গাবা–১/৩৯০; তাহজীবুত তাহজীব–২/১৯৩)

তাবে'ঈদের একটি বিরাট দল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

কায়স ইবন আবী–হাযেম, আবু ওয়ায়িল, যায়িদ ইবন ওয়াহাব, রিব'ঈ ইবন খিরাশ, যার ইবন হুবাইশ, আবু জাবইয়ান, হুসাইন ইবন জুনদুব, সিলা ইবন যুফার, আবু ইদরীস আল–খাওলানী, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উকাইম, সুওয়াইদ ইবন ইয়াযীদ নাখ'ঈ, 'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ, আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা, হাম্মাম ইবন আল–হারেস, ইয়াযীদ ইবন শুরাইত আত–তাঈমী, বিলাল ইবন হুজাইফা প্রমুখ। (আল–ইসাবা–১/৩১৮; আয্–যাহাবী, তারীখ–২/১৫২; তাহজীবুত–তাহজীব–২/১৯৩)

রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব পালনের পর তিনি সময় খুব কম পেতেন। তা সত্ত্বেও যখনই সুযোগ হতো হাদীসের দারস দিতে বসে যেতেন। কূফার মসজিদে দারসের হালকা বসতো এবং তিনি সেখানে হাদীস বর্ণনা করতেন। (মুসনাদ–৫/৪০৩) জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ বলেন ঃ হুজাইফা (রা) আমাদের বলতেন, আমাদের ওপর এই ইলমের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে তা পৌঁছাবো—যদিও তার ওপর আমরা 'আমল না করি। (হায়াতুস সাহাবা–৩/২৬৮; কানযুল 'উম্মাল–৭/২৪)

ছাত্ররা তাঁকে যেমন অতিরিক্ত ভক্তি ও সম্মান দেখাতো তেমনি ভয়ও পেত। 'বাশকারী' একবার মসজিদে এসে দেখেন, গোটা মজলিস সম্পূর্ণ নীরব এবং একই ব্যক্তির দিকে

একাগ্রচিত্তে চেয়ে আছে। যেন সকলের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। (মুসনাদ–৫/৩৮৬) ছাত্ররা যে তাঁকে কী পরিমাণ ভয় ও সম্মানের চোখে দেখতো তা একটি ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়। একবার তিনি হযরত 'উমার (রা) সম্পর্কিত ফিত্‌নার হাদীসটি বর্ণনা করলেন। হাদীসটি ছিল গোপন রহস্য বিষয়ক ও ইশারা–ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার অর্থ জিজ্ঞেস করার হিম্মত কোন ছাত্রের হলো না। অবশেষে তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের যোগ্য ছাত্র 'মাসরূক'কে হাদীসটির অর্থ জিজ্ঞেস করার জন্য রাজী করান। তিনি তা জিজ্ঞেস করেন।

একবার হযরত হুজাইফা (রা) মি'রাজের হাদীস বর্ণনা করছেন। এমন সময় যার বিন হুবাইশ আসলেন। হুজাইফা বললেন ঃ হযরত রাসূলে কারীম (সা) বাইতুল মাকদাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। যার বললেন ঃ রাসূল (সা) ভিতরে ঢুকেছিলেন এবং নামাযও আদায় করেছিলেন। হুজাইফা বললেন ঃ তোমার নাম কি? আমি তোমাকে চিনি তবে নামটি জানিনে। তিনি নাম বললেন। হুজাইফা বললেন ঃ রাসূল (সা) যে নামায আদায় করেছিলেন, সেকথা তুমি কিভাবে জানলে? যার বললেন ঃ কুরআন থেকে। হুজাইফা বললেন ঃ আয়াতটি পাঠ কর তো। যার সূরা আল–ইসরার সেই আয়াতটি পাঠ করলেন যাতে মি'রাজের বর্ণনা এসেছে। হুজাইফা বললেন ঃ এর মধ্যে নামাযের কথা কোথায় আছে? যার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করেন। (মুসনাদ–৫/৩৮৭)

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি দারুণ সতর্ক ও সংরক্ষণবাদী ছিলেন। আবদুর রহমান ইবন আবী লাইলা বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে হাদীস শুনতে চাইলে তিনি বর্ণনা করতেন না। (মুসনাদ–৫/৩৯৭)

এ কারণে মানুষও সুযোগের অপেক্ষায় থাকতো। যখন কোন ঘটনা ঘটতো, আর তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন তখন গোটা সমাবেশকে অতি গুরুত্বের সাথে চুপ করানো হতো। (মুসনাদ–৫/৩৯৭) একবার তিনি ও আবু মাস'উদ একসাথে ছিলেন। একজন অন্যজনের কাছে হাদীস শুনতে চাইলেন। কিন্তু প্রত্যেকেই বলছিলেন, না, আপনি বলুন। (মুসনাদ–৫/৪০৭)

তিনি পার্থিব ভোগ–বিলাসের প্রতি ছিলেন দারুণ উদাসীন। এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, মাদায়েনের ওয়ালী থাকাকালেও তাঁর জীবন যাপনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। অনারব পরিবেশ এবং সেইসাথে ইমারাতের পদে অধিষ্ঠিত থাকা—এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর কোন সাজ–সরঞ্জাম ছিল না। বাহনের জন্য সব সময় একটি গাধা ব্যবহার করতেন। এমন কি জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম খাবার ছাড়া কাছে আর কিছুই রাখতেন না। একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর কাছে কিছু অর্থ পাঠালেন। সাথে সাথে তিনি সবই মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (উসুদুল গাবা–১/৩৯২) তবে তিনি দুনিয়া ও আখিরাত সমানভাবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম নয় যারা আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে, আবার তারাও নয় যারা দুনিয়ার জন্য আখিরাত ছেড়ে দিয়েছে। বরং যারা এখান থেকে কিছু এবং ওখান থেকে কিছু গ্রহণ করে তারাই মূলতঃ সবচেয়ে ভালো। (রিজালুন হাওলার রাসূল–২০০; হায়াতুস সাহাবা–৩/৫১৭)

দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতার সাথে সাথে ইবাদাত–বন্দেগীতে গভীরভাবে মশগুল থাকতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সারা রাত নামায আদায় করেন। এর মধ্যে একবারও 'উহু' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। (মুসনাদ–৫/৪০০) হুজাইফা (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায পড়েছি। তিনি সূরা বাকারাহ দিয়ে শুরু করলেন। ভাবলাম, এক শো আয়াতের মাথায় হয়তো রুকূ' করবেন; কিন্তু তার পরেও পড়ে যেতে লাগলেন। মনে করলাম, সূরা বাকারাহ্ এক রাকা'য়াতে শেষ করবেন। কিন্তু না, সূরা নিসা শুরু করলেন। নিসার পর আলে 'ইমরানও শেষ করলেন। তারপরও রুকু'র কোন লক্ষণ দেখা

গেল না। বিভিন্ন সূরা পড়তে লাগলেন। কোন তাসবীহর আয়াত তিলাওয়াত করছেন, সাথে সাথে সুবহানাল্লাহ পড়ছেন। দু'আর আয়াত এলে দু'আ করছেন, আবার তা'য়াউজের আয়াত এলে আ'উজুবিল্লাহ পড়ছেন। এক সময় রুকু'তে গেলেন এবং সুবহানা রাব্বীয়াল 'আজীম পড়তে লাগলেন। সে রুকু'র যেন শেষ নেই। তা ছিল কিয়ামের মতই দীর্ঘ। এক সময় 'সামি'য়া আল্লাহু লিমান হামিদা' বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং রুকু'র মতই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং তাও ছিল কিয়ামের মত দীর্ঘ। এভাবে নামায শেষ হলে বিষয়টির প্রতি আমি রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি যে আমার পিছনে আছ একথা জানতে পেলে আমি নামায সংক্ষেপ করতাম। (মুসনাদ-৫/৩৮২, ৩৮৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৯১)

সর্ব অবস্থায় সকলকে তিনি আমর বিল মা'রূফ বা ভালো কাজের আদেশ দিতেন। হযরত আবু মূসা আল-আশ'য়ারী (রা) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সম্মানিত সাহাবী। তিনি কাপড়ে প্রস্রাবের ছিটা লাগার ভয়ে সতর্কতা স্বরূপ বোতলে প্রস্রাব করা শুরু করেন। হযরত হুজাইফা এ কথা জানতে পেরে তাঁকে বললেন ঃ এমন কঠোরতা ঠিক নয়। রাসূল (সা) একবার একটি ঘোড়ার ওপর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। আমিও তখন তাঁর সাথে। আমি একটু দূরে সরে যেতে চাইলে বললেন, কাছেই থাক। আমি তাঁর পিঠের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। (মুসনাদে-৫/৩৮২)

একবার কিছু লোক এক স্থানে জটলা করে বসে কথা বলছিল। হুজাইফা তাদের কাছে এসে বললেন, রাসূলের (সা) সময়ে এমন জটলা করে কথা বলা 'নিফাকের' (কপটতা) মধ্যে গণ্য করা হতো। (মুসনাদ-৫/৩৮৪)

একদিন এক ব্যক্তি মসজিদে এসে খুব তাড়াতাড়ি নামায আদায় করছিল। হযরত হুজাইফা (রা) কাছে এসে বললেন, তুমি কতকাল এভাবে নামায আদায় করছো? লোকটি বললো ঃ চল্লিশ বছর। হুজাইফা বললেন, তোমার এ চল্লিশ বছরের নামায একেবারে মিছেমিছি হয়ে গেছে। যদি এভাবে নামায আদায় করতে করতে মারা যাও তাহলে সে মরণ দ্বীনে মুহাম্মদীর ওপর হবে না। তারপর তাকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিয়ে বলেন, ছোট ছোট সূরাহ পড়, তবে রুকু'-সিজদা ঠিকমত কর। (মুসনাদ-৫/৩৮৪; কানযুল 'উম্মাল-৪/২৩০; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৮০)

একবার এক ব্যক্তিকে মজলিসের মাঝখানে এসে বসতে দেখে তিনি বললেন, রাসূল (সা) এমন ব্যক্তির ওপর লা'নত (অভিশাপ) করেছেন। (মুসনাদ-৫/৩৯৮)

হযরত 'উসমান (রা) যখন মদীনায় বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় আছেন তখন একবার রিব'ঈ হযরত হুজাইফার (রা) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মাদায়েন আসলেন। হুজাইফা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, 'উসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে কারা? রিব'ঈ কতিপয় লোকের নাম বললেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি জামা'য়াত (দল) ছেড়ে দিয়েছে এবং ইমারাত বা নেতৃত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, আল্লাহর নিকট সে একেবারেই গুরুত্বহীন। (মুসনাদ-৫/৩৮৭)

সত্যবাদিতা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। তাঁর ছাত্র হযরত রিব'ঈ যখন হযরত হুজাইফার (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন ঃ 'হাদ্দাসানী মান লাম ইউকাজ্জিব্‌নী—আমাকে এমন ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি।' তাঁর এ কথা দ্বারা লোকেরা বুঝে যেত যে তিনি হুজাইফা ছাড়া আর কেউ নন। (মুসনাদ-৫/৩৮৫, ৪০১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তাঁর গভীর নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা ছিল। বহু ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার রাসূল (সা) তাঁর বুকে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। (মুসনাদ-

৫/৩৮৩) আর একবার ইযারের (পাজামা) সীমা বলতে গিয়ে তাঁর পবিত্র হাত হুজাইফার (রা) পায়ের নালা স্পর্শ করেছিল। (মুসনাদ–৫/৩৮২) খন্দকের সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে মুশরিকদের খবর নিয়ে এলে রাসূল (সা) নিজের কম্বলের একাংশ তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন, টেনে নিজের কাছে বসান। একরাত নিজের হুজরায় থাকার ব্যবস্থা করেন। (মুসনাদ–৫/৩৯৩) তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে বসে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে নানা বিষয়ে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করতেন। হযরত আবুদল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) একটি বর্ণনা থেকে একথা জানা যায়। (সীরাতু ইবন হিশাম–২/৬৩১)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে তাঁর কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা আরেকটি ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একবার রমজান মাসে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায় করেন। রাতে রাসূল (সা) গোসল করেন। তখন হুজাইফা (রা) পর্দা করে দাঁড়ান। কিছু পানি বেঁচে গেল এবং তা দিয়ে হুজাইফা গোসল করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূল (সা) অনুমতি দিলেন। তিনি গোসল শুরু করলে রাসূল (সা) পর্দা করে দাঁড়ালেন। এতে তিনি আপত্তি জানালে রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি যেমন আমার পর্দা করেছ, আমিও তেমন তোমার পর্দা করবো (তারীখু ইবন 'আসাকির–১/৯৮); হায়াতুস সাহাবা–২/৬৮৮)

হযরত হুজাইফা ছিলেন ক্ষমা ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর পিতাকে যাঁরা ভুলক্রমে হত্যা করেছিল তিনি তাদের প্রতি উত্তেজিত বা তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেননি; বরং আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তাদের এ ভুলের মাগফিরাত কামনা করেছেন। হযরত 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রহ) বলেন ঃ ক্ষমা ও সহনশীলতার গুণটি হযরত হুজাইফার (রা) মধ্যে আমরণ বিদ্যমান ছিল। (বুখারী–২/৫৮১)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর আনুগত্যের অবস্থা যে কেমন ছিল তা বুঝা যায় খন্দক যুদ্ধের ঘটনাটি দ্বারা। সে সময় একজন সাহাবীও শত্রু শিবিরে যেতে সাহস করেনি। কিন্তু তিনি রাসূলের (সা) আদেশ পালনের জন্য জীবন বাজি রেখে সেখানে যান এবং জান্নাতের সুসংবাদ লাভকরেন।

একবার পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর দেখা হলো। রাসূল (সা) হাত মিলানোর জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, আমি অপবিত্র। রাসূল (সা) বললেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কখনো নাজাস বা অপবিত্র হয়না। (মুসনাদ–৫/৩৮৪) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) বলেন ঃ একজন মুসলিম যখন তার ভাইয়ের সাথে হাত মেলায় তখন তাদের দু'জনের গুনাহ গাছের শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে। (হায়াতুস সাহাবা–২/৪৯৫) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে যখন তাঁর আহার করার সৌভাগ্য হতো, তিনি কখনো আগে শুরু করতেন না। রাসূল (সা) আগে শুরু করতেন। (মুসনাদ–৫/৩৮৩)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যে যে দিন আসতেন সেদিন যুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার নামায তার সাথে আদায় করতেন। মাঝের এ সময়টুকু সুহবতের সৌভাগ্য অর্জন করতেন। (মুসনাদ–৫/৩৯২) যখনই সময় ও সুযোগ পেতেন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করতেন এবং ওযু–গোসলের পানি এগিয়ে দিতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন রাসূল (সা) ময়লা–আবর্জনা ফেলার স্থলে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর আমার কাছে পানি চাইলেন। আমি পানি এগিয়ে দিলে তিনি ওযু করে মোযার ওপর মাসেহ করলেন। (মুসনাদ–৫/৩৮২) তিনি এ খবরও দিয়েছেন যে, রাসূল (সা) রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক করতেন। (মুসনাদ–৫/৩৮২) এ সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি সময় ও সুযোগ পেলে সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) আশে–পাশে থাকতেন।

একদিন হুজাইফার (রা) সম্মানিত মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে যাওনি? ছেলে সময়–সীমা বলার পর তিনি ক্ষেপে গিয়ে তাকে

বকাঝকা করেন। তখন হুজাইফা মাকে বলেন, মা, আপনি থামুন। আমি আজই মাগরিবের নামায রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আদায় করছি এবং তাঁর দ্বারা আমার ও আপনার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করাচ্ছি। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন। নামায শেষ করে রাসূল (সা) বের হলেন। হুজাইফাও পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। এক সময় রাসূল (সা) ঘাড় ফিরিয়ে তাঁকে দেখে বলে উঠলেন ঃ কে, হুজাইফা? আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মাকে ক্ষমা করুন। (মুসনাদ-৫/৩৯১; তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৫)

হযরত হুজাইফা খুব কমই উত্তেজিত হতেন। তবে শরী'য়াতের হুকুম যথাযথভাবে পালিত হতে না দেখলে তাঁর রাগের কোন সীমা থাকতো না। শরী'য়াতের বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হওয়া সহ্য করতেন না। মাদায়েনে থাকাকালে একবার এক রয়িসের (সর্দার) গৃহে পানি চাইলেন। রয়িস রূপোর পাত্রে পানি দিলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান। পাত্রটি রয়িসের হাত থেকে নিয়ে তার গায়ে ছুড়ে মারেন। তারপর বলেন, আমি কি তোমাকে সতর্ক করে দিইনি যে, রাসূল (সা) সোনা-রূপোর পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন?

এমনিভাবে তিনি সুন্নাতের হেরফের হওয়া বিন্দুমাত্র পসন্দ করতেন না। একবার বনী উসাইদের আযাদকৃত দাস আবু সা'ঈদ কিছু খাবার তৈরী করে আবু যার, হুজাইফা ও ইবন মাস'উদকে দা'ওয়াত দিলেন। তিনজন যখন তাঁর বাড়ী পৌছলেন তখন নামাযের সময় হয়েছে। আবু যার ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলে হুজাইফা বলে উঠলেন ঃ আবু যার পিছনে সরে এসো। ইমামতির অগ্রাধিকার গৃহকর্তার। আবু যার বললেন ঃ ইবন মাস'উদ, কথাটি কি সত্যি? ইবন মাস'উদ বললেন ঃ হাঁ। আবু যার পেছনে সরে এলেন। (হায়াতুস সাহাবা-৩/১৩১)

জাহিলী আরবে কারো মৃত্যু হলে তা খুব ঘটা করে প্রচার করা হতো। রাসূল (সা) এমনটি করতে নিষেধ করেন। হযরত হুজাইফা এত কঠোরভাবে তা পালন করতেন যে, কেউ মারা গেলে কাউকে সে খবরটি পর্যন্ত দিতে চাইতেন না। তিনি ভয় করতেন, সেই আগের অবস্থায় আবার ফিরে না আসে। (মুসনাদ-৫/৪০৬)

তিনি নির্জনতা পসন্দ করতেন, কিন্তু সেভাবে থাকতে পারতেন না। তিনি বলতেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, বিষয়-সম্পদ দেখা-শুনার মত কেউ থাকলে আমি ঘরের দরযা বন্ধ করে দিতাম। তাহলে কেউ আমার কাছে ঘেঁষতে পরতো না এবং আমিও মানুষের কাছে যেতাম না। আর এভাবে আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হতাম। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৪৯)

তিনি ঝগড়া-বিবাদ, পরনিন্দা, দোষ অন্বেষণ, রক্তপাত ইত্যাদি ধরনের খারাপ কাজ খুবই ঘৃণা করতেন। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি কি একজন মস্তবড় পাপীকে হত্যা করতে পারলে খুশী হবে? সে বললো ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি হবে তখন তার চেয়েও বড় পাপাচারী। (হায়াতুস সাহাবা-২/৪০৮) এক ব্যক্তি খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) কাছে মানুষের নানা কথা পৌছে দিত। লোকটি একদিন যখন হুজাইফার (রা) সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন লোকেরা বললো ঃ এ ব্যক্তি আমীরের নিকট সকল সংবাদ পৌছে দেয়। তিনি বললেন ঃ এমন লোক জান্নাতে যেতে পারে না। (মুসনাদ-৫/৩৮৯)

যায়িদ ইবন ওয়াহাব বলেন ঃ একবার একটি ব্যাপারে কোন এক আমীরের প্রতি মানুষ ক্ষেপে গেল। হযরত হুজাইফা মসজিদে দারস দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মানুষের ভীড় ঠেলে হুজাইফার (রা) মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললো ঃ 'হে রাসূলুল্লাহর সাহাবী! আপনি কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবেন না? হুজাইফা (রা) লোকটির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি মাথা সোজা করে তাকে বললেন ঃ

'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার অতি ভালো কাজ—এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ জন্য আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সুন্নাত সম্মত নয়। (হায়াতুস সাহাবা–২/৬৬)

তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে মিষ্টি–মধুর আলাপ করতেন। কিন্তু বাড়ীতে স্ত্রীর সাথে কথাবার্তায় ছিলেন একটু কর্কশ। বিষয়টি তিনি নিজেই উপলব্ধি করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, 'আমি নবীর (সা) কাছে এসে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি জিহবা আছে, আমার স্ত্রীর প্রতি তা বড় কঠোর। ভয় হচ্ছে, তা আমাকে জাহান্নামে নিয়ে না যায়। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি আল্লার কাছে ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা চাওয়া) করনা কেন? এই যে আমি, প্রতিদিন শতবার আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করি। (রিজালুন হাওলার রাসূল–১৯৬; হায়াতুস সাহাবা–৩/৩১৬)

একবার লোকেরা বললো, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) এমন একজন সাহাবীর নাম বলুন যিনি চলন–বলন, আকীদা–বিশ্বাস, তথা প্রতিটি বিষয়ে আপনার মত। বললেন ঃ এমন ব্যক্তি শুধু ইবন মাস'উদ। তবে যতক্ষণ তিনি ঘরের বাইরে থাকেন। ঘরের ভিতরের অবস্থা আমার জানা নেই। (মুসনাদ–৫/২৮৯, ৩৯৪)

হযরত 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'আমার পূর্বের নবীদেরকে সাতজন উযীর ও বন্ধু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাকে দেওয়া হয়েছে চৌদ্দজন।' এই বলে তিনি চৌদ্দ জনের নাম উচ্চারণ করেন। তাদের মধ্যে হুজাইফার নামটিও ছিল। (তারীখু ইবন 'আসাকির– ৪/৯৬)

তিনি সব সময় হিংসা–বিদ্বেষের উর্ধে থাকার চেষ্টা করতেন। কারো সাথে কোন রকম তিক্ততার সৃষ্টি হলে তাড়াতাড়ি মিটমাট করে নিতেন। 'আকাবায় অংশগ্রহণকারী কোন এক সাহাবীর সাথে একটি ব্যাপারে তাঁর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। তাদের কথা বলাবলি বন্ধ হয়ে যায়। হযরত হুজাইফা (রা) সবকিছু ভুলে প্রথমে তাঁর সাথে কথা বলেন। তারপর সে সাহাবীও নিজের আচরণে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন। (মুসনাদ–৫/৩৯০)

তিনি ছিলেন খুবই সামাজিক ও উদার। খাওয়ার সময় কেউ উপস্থিত হলে তাকেও ডেকে সংগেবসাতেন।(মুসনাদ–৫/৩৯২)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত। সাহাবীরা তাঁর মৃত্যু–পরবর্তী একজন খলীফা নিয়োগ করে যাওয়ার আবেদন জানান। তিনি তাদের সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যে সব উপদেশ দান করেন তার মধ্যে এ কথাটিও ছিল ঃ 'হুজাইফা তোমাদেরকে যা বলবে তা মেনে নিবে।' (তারীখু ইবন 'আসাকির– ৪/৯৬)

খলীফা হযরত 'উসমান (রা) পবিত্র কুরআনের যে স্ট্যান্ডার্ড কপি তৈরী করেন এবং খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান, তার নেপথ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেন মূলতঃ হযরত হুজাইফা (রা)। ইমাম বুখারী হযরত আনাসের (রা) একটি বর্ণনা নকল করেছেন। আনাস বলেন, 'হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান সিরিয়াবাসীদের সাথে ইরাক, আরমেনিয়া ও আজারবাইজান অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সকল এলাকার নবদীক্ষিত অনারব মুসলিমদের কুরআন পাঠে তারতম্য লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। সেখান থেকে মদীনায় ফিরে খলীফাকে বললেন ঃ 'আমি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের লোকদের দেখেছি, তারা সঠিকভাবে কুরআন পড়তে জানেনা। তাদের কাছে কুরআনের স্ট্যান্ডার্ড কপি পৌছাতে না পারলে ইয়াহুদ ও নাসারার হাতে তাওরাত ও ইনজীলের যে দশা হয়েছে, এ উম্মাতের হাতে কুরআনের দশাও অনুরূপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' খলীফা বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'মাসহাফ' এনে তার হুবহু নকল করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন। এভাবে পবিত্র কুরআনের হিফাজতের ব্যাপারে হযরত

হুজাইফা (রা) পরোক্ষভাবে বিরাট অবদান রাখেন। (দ্রঃ সহীহ্ বুখারী ঃ জাম'উল কুরআন অধ্যায়; আত-তিব ইয়ান ফী উলূমিল কুরআন-৫৭)

উল্লেখিত বৈশিষ্টসমূহ ও গুণাবলীর কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। যেহেতু হুজাইফা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে মুনাফিকদের নাম জেনেছিলেন, তাই সকলে এ ব্যাপারে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। খলীফা 'উমারের (রা) তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল কোন মুসলমান মারা গেলে এ কথা জিজ্ঞেস করা যে, হুজাইফা কি এর জানাযায় শরীক হয়েছে? যদি বলা হতো 'হ্যাঁ' তাহলে তিনিও পড়তেন। আর যদি বলা হতো 'না' তাহলে তাঁর সন্দেহ হতো এবং তিনি তার জানাযা পড়তেন না। (উসুদুল গাবা-১/৩৯১; শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৪)

একবার খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা আমার কর্মকর্তাদের মধ্যে কি কোন মুনাফিক আছে? হুজাইফা বললেন ঃ একজন আছে। খলীফা বললেন ঃ আমাকে তার একটু পরিচয় দাও না। বললেন ঃ আমি তা দেব না। হুজাইফা বলেন ঃ তবে অল্প কিছু দিনের মধ্যে 'উমার তাকে বরখাস্ত করেন। সম্ভবতঃ তিনি সঠিক হিদায়াত পেয়েছিলেন। (সুওয়ারুন মিন হায়াতিস সাহাবা-৪/১৩৬-১৩৭)

হুজাইফা (রা) বলেন ঃ আমি একদিন মসজিদে বসে আছি। 'উমার (রা) আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন ঃ হুজাইফা, অমুক মারা গেছে, তার জানাযায় চলো। একথা বলে তিনি চলে গেলেন। মসজিদ থেকে বের হতে যাবেন, এমন সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন, আমি নিজ স্থানে বসে আছি। তিনি বুঝতে পেরে আমার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ হুজাইফা, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, সত্যি করে বল তো আমিও কি তাদের (মুনাফিকদের) একজন? আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই না। আপনার পরে আর কাউকে কক্ষণো আমি এমন সনদ দেব না। (তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৭; যাহাবী ঃ তারীখ-২/১৫৩)

একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর পাশে বসা সাহাবীদের বললেন, আচ্ছা আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্খার কথা একটু বলুন তো। প্রায় সকলেই বললেন, আমাদের একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমরা যদি ধন-রত্নে ভরা একটি ঘর পেতাম, আর তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতে পারতাম। সবার শেষে 'উমার (রা) বললেন, আমার বাসনা এই যে, আমি যদি আবু 'উবাইদাহ, মুয়াজ ও হুজাইফার (রা) মত মানুষ বেশী বেশী পেতাম, আর তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ করতে পারতাম। একথা বলে তিনি দীনার ভর্তি একটি থলে একজন লোকের হাতে দিয়ে বলেন, এগুলি হুজাইফার নিকট নিয়ে যাও, আর তাকে বল, খলীফা এগুলি আপনার প্রয়োজনে খরচের জন্য পাঠিয়েছেন। তাকে আরো বলে দেন, তুমি একটু অপেক্ষা করে দেখে আসবে, সে দীনারগুলি কি করে। লোকটি থলেটি নিয়ে হুজাইফার নিকট গেল। আর হুজাইফা সাথে সাথে তা গরীব-মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (দ্রঃ তারীখু ইবন 'আসাকির-১/৯৯, ১০০; উসুদুল গাবা-১/৩৯২; হায়াতুস সাহাবা-২/২৩৩)

হযরত হুজাইফার (রা) এমনি ধরনের অনেক ফজীলাত ও মহত্বের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে যা ছোট কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র

১. ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্।
২. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত,
৩. ইবনুল আসীর ঃ উসুদুল গাবা,
ঃ তাজরীদ আসমা আস-সাহাবা,
ঃ আল-কামিল ফিত তারীখ,
৪. ইবন 'আসাকির ঃ আত-তারীখ আল-কাবীর,
৫. ইবন হাজার ঃ আল-ইসাবা,
ঃ তাকরীব আত-তাহজীব,
ঃ লিসানুল মীযান,
৬. বালাজুরী ঃ আনসাবুল আশরাফ,
৭. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী ঃ শাহজারাতুয্ যাহাব ফী-মান য্াহাব,
৮. মুহীউদ্দীন আন-নাওয়াবী ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,
৯. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী,
১০. ইবনুল জাওযী ঃ সিফাতুস সাফওয়া,
১১. আজ-জাহাবী ঃ তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ,
ঃ তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত
আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম,
১২. ইয়াকুত আল-হামাবী ঃ মু'জামুল বুলদান,
১৩. আল-কুরতুবী ঃ আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা),
১৪. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ঃ ফিকহু 'উমার (উর্দু),
১৫. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী ঃ আত-তিবইয়ান ফী 'উলুমিল কুরআন,
১৬. আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম,
১৭. ইউসূফ কান্ধালুবী, মাওলানা ঃ হায়াতুস সাহাবা, (আরবী)
১৮. খালিদ মুহাম্মাদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওলার রাসূল,
১৯. ডঃ রাফাত আল-বাশা ঃ সুওয়ারুন্ মিন হায়াতিস সাহাবা,
২০. আবদুর রউফ, মাওলানা ঃ আসাহ আস্-সীয়ার,
২১. সা'ঈদ আনসারী, মাওলানা ঃ সীয়ারে আনসার,
২২. ডঃ 'উমার ফাররুখ ঃ তারীকুল আদাব আল 'আরাবী,
২৩. জুরযী যায়দান ঃ তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যা,
২৪. ইমাম আহমাদ ঃ আল মুসনাদ
২৫. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দু)
২৬. মুহাম্মাদ খিদ্রী বেক ঃ তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা,
২৭. আবদুর রহমান আল-বান্না ঃ আল-ফাতহুর রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ)
২৮. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

৪

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

[চতুর্থ খণ্ড]

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭১৬৬৭১৪২৪
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : bic@accesstel.net

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৮
চতুর্থ প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৮

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত সত্তর টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. IV) Written by Dr Muhammad Abdul Mabud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition March 1998 Fourth Edition April 2008 Price Taka 170.00 only.

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা' (৪র্থ খণ্ড) প্রকাশিত হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে যখন আমরা এই বিশাল কাজে হাত দিয়েছিলাম তখন এতদূর এগুতে পারবো এমন আশা ছিল না। আমার মত একজন অলস মানুষের জন্য কাজটি যে ভীষণ কঠিন তা আমি পরে উপলব্ধি করেছি। আল্লাহ পাকের সাহায্য এবং বন্ধু-বান্ধব ও পাঠকবর্গের উৎসাহ আমাকে এ কাজ এগিয়ে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে। আর বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমাদ-এর পরামর্শ ও সহযোগিতা না পেলে অনেক আগেই এ কাজ বন্ধ হয়ে যেত। এ কাজে যাঁরা যেভাবে সাহায্য করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের সকলকে প্রতিদান দিন, এই কামনা করি।

চতুর্থ খণ্ডে যে সকল মহান সাহাবীর জীবনের আলোচনা এসেছে তাঁরা সকলেই মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের। তথ্যসমূহ যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। সূত্রের নামও উল্লেখ করেছি। সাহাবায়ে কিরামের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দ ব্যবহারের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও কোথাও যদি কোন প্রকার তথ্য ও ভাষাগত অসংগতি পাঠকবর্গের নিকট ধরা পড়ে তাহলে তা আমাকে জানালে সংশোধনের চেষ্টা করবো। বাংলার ঘরে ঘরে সাহাবায়ে কিরামের বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ পড়বে—এই আশা নিয়ে আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আল্লাহ পাক আমার এই সামান্য শ্রম কবুল করুন! আমীন ॥

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

১ জানুয়ারী ১৯৯৮
১ রমজান ১৪১৮

সূচীপত্র

ঃ	ভূমিকা		
১.	আনাস ইবন নাদার (রা)	-	৭
২.	আল-বারা' ইবন মালিক (রা)	-	৯
৩.	আল-বারা' ইবন মা'রূর (রা)	-	১৪
৪.	আল-বারা' ইবন 'আযিব (রা)	-	২০
৫.	হুবাব ইবনুল মুনজির (রা)	-	২৮
৬.	কাতাদা ইবন নু'মান (রা)	-	৩৩
৭.	খুযায়মা ইবন সাবিত (রা)	-	৩৭
৮.	আবূ দুজানা (রা)	-	৪০
৯.	কুলসূম ইবনুল হিদম (রা)	-	৪৪
১০.	শাদ্দাদ ইবন আউস (রা)	-	৪৭
১১.	মু'য়াজ ইবন 'আফরা' (রা)	-	৫৩
১২.	আবূ লুবাবা (রা)	-	৫৯
১৩.	যায়িদ ইবন আরকাম (রা)	-	৬৪
১৪.	যায়িদ ইবন সাবিত (রা)	-	৭১
১৫.	'আমর ইবন আল-জামূহ (রা)	-	৯৭
১৬.	'আমর ইবন হায্ম (রা)	-	১০৩
১৭.	কা'ব ইবন মালিক (রা)	-	১০৯
১৮.	হাস্সান ইবন সাবিত (রা)	-	১২৪
১৯.	আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)	-	১৪৮
২০.	সাহ্ল ইবন সা'দ (রা)	-	১৫৭
২১.	সাহ্ল ইবন হুনাইফ (রা)	-	১৬১
২২.	নু'মান ইবন বাশীর (রা)	-	১৬৪
২৩.	সামুরা ইবন জুনদুব (রা)	-	১৭৪
২৪.	আবুল ইয়াসার কা'ব ইবন 'আমর (রা)	-	১৮০
২৫.	'আসিম ইবন সাবিত ইবন আবিল আকলাহ (রা)	-	১৮৪
২৬.	আল-হারেসা ইবন সুরাকা (রা)	-	১৯১
২৭.	আল-হারেস ইবন আস-সিম্মাহ্ (রা)	-	১৯৩
২৮.	'উমাইর ইবন সা'দ (রা)	-	১৯৭
২৯.	রাফে' ইবন মালিক ইবন 'আজলান (রা)	-	২০৫

৩০. যায়িদ ইবন দাসিনা (রা) - ২০৮
৩১. কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) - ২১০
৩২. আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম (রা) - ২২০
৩৩. আবদুল্লাহ (রা) ইবন আবদিল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল (রা) - ২২৫
৩৪. রাফে ইবন খাদীজ (রা) - ২৩০
৩৫. আমর ইবন আল ওয়াকশ (রা) - ২৩৬
৩৬. রিফায়া ইবন রাফে' ইবন মালিক আয-যারকী (রা) - ২৩৮
৩৭. আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা) - ২৪১
৩৮. সাবিত ইবন কায়স (রা) - ২৪৬
৩৯. খুবাইব ইবন আদী ইবন আমের (রা) - ২৫৪

আনাস ইবন নাদার (রা)

নাম 'আনাস', পিতা 'নাদর ইবন দামদাম'। রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের সম্মানিত চাচা।[১] হযরত আনাস ইবনে মালিক বলতেন ঃ 'আমার চাচা আনাসের নামে আমার নাম রাখা হয়েছে।'[২] রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু 'আমর ছিলেন এই আনাসের খান্দান বনু নাজ্জারের মেয়ে। সম্পর্কে তিনি আনাস ইবন নাদরের ফুফু। আনাস ইবন নাদর ছিলেন তাঁর খান্দানের রয়িস বা নেতা। মহিলা সাহাবী হযরত রুবাইয়্যা' বিনতু নাদর ছিলেন তাঁর বোন। তাঁদের মাও ছিলেন একজন সাহাবিয়্যা।[৩] তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

হযরত আনাস ইবন নাদর (রা) শেষ 'আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ কোন অজ্ঞাত কারণে আমার চাচা আনাস ইবন নাদর বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফিরে এলে তিনি তাঁর সামনে হাজির হয়ে অনুতাপের সুরে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৌত্তলিক শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত আপনার প্রথম অভিযানে আমি অনুপস্থিত থেকে গেছি। আল্লাহর কসম, আগামীতে আল্লাহ যদি আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ দান করেন তাহলে আমি কি করি তা অবশ্যই আল্লাহ দেখাবেন।

উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী তৃতীয় সনে। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে ময়দান ত্যাগ করছিল তখন তিনি আপন মনে বলে উঠলেন ঃ 'হে আল্লাহ! এই মুসলমানরা যা করছে তার জন্য আমি আপনার নিকট মাগফিরাত কামনা করছি। আর এই পৌত্তলিকরা যা করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।' এই বলে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। পথে সা'দ ইবন মু'য়াজের (রা) সাথে দেখা। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আনাস কোথায় যাচ্ছো?

আনাস ঃ সা'দ জান্নাত তো ঐখানে-উহুদে। আল্লাহর কসম! আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের খোশবু পাচ্ছি।

একথা বলতে বলতে আনাস (রা) উহুদের ময়দানের দিকে ছুটে যান এবং অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। সা'দ বলেন ঃ সেদিন তিনি যা করলেন, আমি তা করতে পারিনি। বালাজুরী বলেন ঃ সুফইয়ান ইবন 'উয়াইফ তাঁকে হত্যা করে।[৪]

উহুদ যুদ্ধে হযরত আনাসের (রা) ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবন ইসহাক বলেন ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব ও তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহ মুহাজির ও আনসারদের সাথে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। আনাস সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আপনারা এভাবে বসে কেন?

তারা বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হয়েছেন।

আনাস বললেন ঃ তিনি যদি মারাই গিয়ে থাকেন, আপনারা বেঁচে থেকে কী করবেন? উঠুন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে পথে জীবন দিয়েছেন আপনারাও সে পথে জীবন দিন। একথা

বলে তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন।[৫]

হযরত আনাস ইবন মালিক বলেছেন ঃ তীর, বর্শা ও তরবারির আঘাতে আনাস ইবন নাদরের সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। গুণে দেখা যায় তাঁর দেহে সত্তর মতান্তরে আশিটির অধিক আঘাত করা হয়েছে। কাফিরেরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁর বোন রুবাইয়্যা বিনতু নাদর ছাড়া আর কেউ সে লাশ সনাক্ত করতে পারেনি। তিনিও তা করতে সক্ষম হন তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে।[৬]

হযরত আনাস ইবন নাদরের (রা) ঈমান যে কত মজবুত ছিল তা তাঁর শাহাদাতের ঘটনা থেকে বুঝা যায়। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে তাঁর মত মহান ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করা হয়েছে। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ সূরা আল আহযাবের ২৩ নম্বর আয়াত– 'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে'– আমার চাচা আনাস ইবন নাদরের শানে নাযিল হয়েছে।[৭]

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। রুবাইয়্যা বিনতু নাদর একবার এক আনসারী মহিলার মুখে চপেটাঘাত করে বসেন। তাতে তার একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। রুবাইয়্যার পক্ষ থেকে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়; কিন্তু তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। তাদেরকে দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ দানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তারা তাও প্রত্যাখ্যান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এখন কিসাস বা বদলা অপরিহার্য'। একথা শুনে আনাস ইবন নাদর বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রুবাইয়্যার দাঁত ভাঙ্গা হবে? যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার নামে শপথ! না, না কক্ষণো তার দাঁত ভাঙ্গা হবে না।

এরপর আকস্মিকভাবে বাদী পক্ষ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছে যারা তাঁর নামে কসম খেলে তিনি নিজেই তাদের কসম পূরণ করে দেন। তাদেরই একজন আনাস ইবন নাদর। সহীহ মুসলিমেও ঘটনাটি ভিন্ন সনদে ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৮]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩৩
২. হায়াতুস সাহাবা– ১/৫০২
৩. আল-ইসাবা– ৪/৩১০
৪. দ্রঃ উসুদুল গাবা–১/১৩২; আনসাবুল আশরাফ–১/৩৩; আল ইসাবা–১/৭৪; আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা–১/৭০
৫. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৮৪; ১২৪; ১২৫; হায়াতুস সাহাবা–১/৫১৬; আল বিদায়া–৪/৩৪;
৬. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৮৩; উসুদুল গাবা–১/৫০৪; আল-ইসতী'য়াব–১/৭১;
৭. উসুদুল গাবা–১/১৩২; হায়াতুস সাহাবা–১/৫০৪; আল-ইসতীয়াব–১/৭০
৮. আল-ইসাবা–৪/৩০১; উসুদুল গাবা–১/১৩২।

আল-বারা' ইবন মালিক (রা)

আল-বারা' ইবন মালিক ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহের খাদেম হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) বৈমাত্রেয় ভাই। একথা বলেছেন আবু হাতেম। সা'দের মতে তিনি আনাসের সহোদর। তাঁদের উভয়ের মা প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা হযরত উম্মু সুলাইম।[১] ইবনুল আছীরের মতও তাই।[২] তবে ইবন হাজার এমত সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, শুরাইক ইবন সামহার জীবনীতে দেখা যায়, তিনি আল-বারা' ইবন মালিকের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের উভয়ের মা সামহা। পক্ষান্তরে আনাস ইবন মালিকের মা যে উম্মু সুলাইম, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।[৩] এছাড়া উম্মু সুলাইমের সন্তানদের যে পরিচয় বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় তার মধ্যে আল-বারা'র নামটি কোথাও নেই।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বেই মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক পড়ে যায়। দলে দলে লোক মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার অনেকে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ দূত হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের (রা) দা'ওয়াতে মুসলমান হন। মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের এধারা রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পরও অব্যাহত থাকে। হযরত বারা' এর কোন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া উহুদ, খন্দকসহ বাকী সকল অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।[৪] হুদায়বিয়ার 'বায়'য়াতে রিদওয়ানে'ও তিনি শরীক ছিলেন।[৫]

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে গোটা আরবে ভণ্ড নবীদের উৎপাত শুরু হয়। এসময় ভণ্ডনবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর যে ভয়াবহ যুদ্ধ হয় তাতে আল-বারা' বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ ছিলেন সেনাপতি। এক পর্যায়ে তিনি সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আপনি উঠে আদেশ করুন।' তারপর নিজে ঘোড়ার ওপর সাওয়ার হয়ে আল্লাহর কিছু গুণগান পাঠ করে মুসলিম বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'ওহে মদীনার অধিবাসীগণ! আজ তোমরা অন্তর থেকে মদীনার চিন্তা মুছে ফেল। আজ তোমাদের অন্তরে শুধু আল্লাহ ও জান্নাতের স্মরণ বিদ্যমান থাকাই বাঞ্ছনীয়।'[৬] তাঁর এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পর গোটা বাহিনীর মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ার আসে। সৈন্যরা নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করে তাঁর সাথে এসে যোগ দেয়।

এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের এক নেতার সাথে হযরত বারা'র হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। লোকটি ছিল তাগড়া জোয়ান। বারা' প্রথমে তার পা লক্ষ্য করে তরবারির এক আঘাত হানেন। আঘাতটি লক্ষ্যভেদী ছিল না। তবুও লোকটি ভয়ে গড়াগড়ি যেতে থাকে। এই সুযোগে হযরত বারা' মুহূর্তের মধ্যে নিজের তরবারি কোষবদ্ধ করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন

এবং তার তরবারিটি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে এমন একটি ঘা বসিয়ে দেন যে তার দেহটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়।[৭]

তারপর বিদ্যুৎ গতিতে ধর্মত্যাগীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে বাগানের প্রাচীর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান। বাগানের মধ্যে মুসায়লামা অবস্থান করছিল। মুসায়লামার অনুসারী সৈন্যরা উদ্যানে ঢুকে পড়ে এবং তার পাশে সমবেত হয়ে উদ্যানের ফটক বন্ধ করে দেয়। বারা' ইবন মালিক তাদের পিছু ধাওয়া করে প্রাচীরের নিকট পৌঁছে রুদ্ধ ফটকের সামনে থমকে দাঁড়ান। মুহূর্তের মধ্যে তিনি সিংহের মত গর্জে ওঠেন এবং হুংকার ছেড়ে বলেন ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী! আমি বারা' ইবন মালিক। তোমরা আমার দিকে এসো, তোমরা আমার দিকে এসো।' সহযোদ্ধারা এগিয়ে এলে তিনি তাদের আরো বলেন ঃ 'ওহে মুসলিম জনমণ্ডলী! তোমরা আমাকে উদ্যানের অভ্যন্তরে তাদের মাঝে ছুড়ে মার।' লোকেরা বললো ঃ 'না, তা কেমন করে হয়।' তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই আমাকে তাদের নিকট ছুড়ে মারবে।' অতঃপর তাঁকে উঁচু করে তুলে ধরা হয়। তিনি প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফটকের মুখেই প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তিনি বাইরে অপেক্ষমান মুসলিম সৈন্যদের জন্য দরজা খুলে দেন। বিদ্যুৎবেগে মুসলিম সৈন্যরা একযোগে ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহত হয়। অভিশপ্ত মুসায়লামা এখানে নিহত হয় এবং তার বাহিনী পরাজয়বরণ করে।[৮]

এই ইয়ামামার উদ্যান-ফটকে হযরত বারা' ইবন মালিকের সাথে অন্য যাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে হযরত 'আব্বাদ ইবন বিশ্‌র শাহাদাত বরণ করে।[৯] আর এখানেই হযরত বারা' একাই দশজন প্রতিপক্ষ সৈনিককে হত্যা করেন।[১০]

এই দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁর সারা দেহ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তীর, বর্শা ও বল্লমের আশিটিরও বেশী আঘাত লাগে। বাহনের পিঠে উঠিয়ে তাঁকে শিবিরে আনা হয় এবং মাসাধিককাল চিকিৎসার পর আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ নিজ হাতে তাঁর ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ লাগান এবং সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা করান।[১১]

হিজরী ১৭ সনে খলীফা হযরত 'উমার (রা) বসরার ওয়ালী হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে (রা) অপসরণ করে সেখানে হযরত আবু মূসা আল আশয়ারীকে (রা) নিয়োগ করেন। মদীনা থেকে যাত্রাকালে আবু মূসা যে ২৯ ব্যক্তিকে সংগে করে নিয়ে যান তাঁদের মধ্যে আল-বারা' ইবন মালিক একজন।[১২]

হযরত আল-বারা' ইবন মালিক 'ইরাকের হীরক' যুদ্ধেও দারুণ সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দেন। নগরের একটি দুর্গ মুসলিম বাহিনী অবরোধ করে রেখেছে। শত্রু বাহিনী ভিতর থেকে আগুনে পোড়ানো প্রচণ্ড গরম কাঁটাওয়ালা শিকল দুর্গ প্রাচীরের ওপর বিছিয়ে রেখেছে যাতে কোন মুসলিম সৈনিক প্রাচীরের কাছেই ঘেঁষতে সাহস না পায়। হযরত আনাস (রা) প্রাচীর টপকানোর জন্য সাহস করে অগ্রসর হলেন। দুর্গবাসীরা কৌশলে

তাঁকে শিকলে জড়িয়ে ওপরের দিকে টেনে তুলতে থাকে। শিকল উপরে উঠছে, এমন সময় হযরত আল-বারা তা দেখে ফেলেন। ত্বরিৎ গতিতে তিনি ছুটে গিয়ে শিকল ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মারেন যে তা ছিঁড়ে আনাস (রা) সহ নীচে পড়ে যায়। শিকল ধরে টানার কারণে তাঁর হাতের মাংস উঠে গিয়ে হাঁড় বেরিয়ে যায়। তবে হযরত আনাস (রা) বেঁচে যান।[১৩]

হিজরী ১৭ থেকে ২০ সনে পারস্যের রামহুরমুয, তুসতার ও সোস বিজিত হয়। পারস্য বাহিনী যখন রামহুরমুযে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আবার সম্মিলিত হয় তখন রণক্ষেত্র থেকে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সা'দ ইবন 'উবাদাকে লেখা হলো প্রচুর সৈন্য পাঠান এবং তাদের মধ্যে যেন সাহল ইবন 'আদী, আল-বারা' ইবন মালিক, মাজ'যা ইবন সাওর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ থাকেন।[১৪]

পারস্যের 'তুসতার' অভিযানে তিনি হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারীর (রা) বাহিনীর দক্ষিণভাগের অধিনায়ক ছিলেন।[১৫] এই যুদ্ধে তিনি একাই এক শো সৈন্য নিধন করেন।[১৬]

'তুসতারে' যুদ্ধ চলছে। শত্রু বাহিনী সুরক্ষিত দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান নিয়েছে। এলোপাথাড়ি হামলা চালিয়ে তারা মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করছে। ইবনুল আছীর বলেন, এ সময় তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর ৮০টি হামলা চালায়।[১৭] এমন অবস্থায় একদিন হযরত আনাস (রা) তাঁর কাছে যেয়ে শোনেন, তিনি সুর করে একটি কবিতা আবৃত্তি করছেন। আনাস (রা) বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস আল-কুরআন দান করেছেন। তাই সুর করে পাঠ করুন। আল-বারা' বললেন, সম্ভবত ঃ আপনার আশঙ্কা হচ্ছে, না জানি আমি কখন মারা যাই। আল্লাহর কাছে আমার কামনা, তিনি যেন এমনটি না করেন। মরলে আমি ময়দানেই মরবো।[১৮] হযরত রাসূলে কারীম (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'বিক্ষিপ্ত ও ধুলিমলিন কেশ বিশিষ্ট এমন অনেক ব্যক্তি, মানুষ হিসেবে যাদের কোন গুরুত্ব নেই; কিন্তু তাঁরা আল্লাহর নামে কসম খায়, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। আল-বারা' ইবন মালিক তাদের অন্যতম।' তুস্তারে যখন মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর দুর্গের পতন ঘটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন তাঁদের হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উপরোক্ত বাণী স্মরণ হয়। তাঁরা হযরত আল-বারা'র (রা) নিকট এসে আবদার করেন, আপনি আল্লাহর নামে একটু কসম খান। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনার নামে কসম খেয়ে বলছি, আজ আপনি মুসলমানদের একটু বিজয় দান করুন এবং আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) দর্শন দান করে সম্মানিত করুন।[১৯]

এ সময় মুসলিম সৈন্যরা দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশের একটি সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান পায়। হযরত আল-বারা' হযরত মাজযা'কে (রা) সংগে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সুড়ঙ্গ থেকে বের হতেই হযরত মাজযা' শত্রুদের নিক্ষিপ্ত একটি বড় পাথরে শাহাদাত বরণ করেন।[২০] হযরত আল-বারা'ও মুরযাবান আযা'রা নামক এক পারসিক সৈনিকের সামনাসামনি পড়ে যান। সে হযরত আল-বারা'র (রা) পথ রোধ

করে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি মুরযাবানকে হত্যা করে বীর বিক্রমে শত্রু বাহিনীর সকল প্রতিরোধ তছনছ করে দুর্গের দ্বার পর্যন্ত পৌছে যান। সেখানে খোদ হরমুযানের মুখোমুখি হন। দুই জনের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়। অবশেষে হরমুযানের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। হরমুযান তাঁকে হত্যা করে তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ হাতিয়ে নেয় এবং তা ত্রিশ হাজারেরও বেশী মুদ্রায় বিক্রি করে। তবে তাঁর এ সাহসিকতায় রণক্ষেত্রে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে এটা হিজরী ২০ সনের ঘটনা। মতান্তরে হিজরী ১৯ অথবা ২৩ সনের ঘটনা।[২১] আল্লামা যিরিক্‌লী বলেন ঃ তিনি তুস্‌তারের পূর্ব ফটকে শাহাদাত বরণ করেন এবং সেখানেই তাঁর কবর।[২২]

হযরত আল-বারা' ইবন মালিক ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্গত। অনেক বছর যাবত তিনি রাসূলে পাকের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ নিঃসৃত অসংখ্য হাদীস নিশ্চয় তিনি শুনে থাকবেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাঁর বর্ণিত হাদীস তেমন দেখা যায়না। সম্ভবতঃ জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ 'আল বারা' ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্গত।'[২৩] আল্লামা জাহাবী বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন মহান নেতাদের একজন। চরম সাহসী বীর, অশ্বারোহণ ও কঠিন বিপদের মুকাবিলায় ছিলেন একজন প্রবাদপুরুষ।'[২৪] এ কারণে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে কখনো কোন বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেননি। অন্য সামরিক অফিসারদের একবার তিনি লেখেন ঃ 'বারা'কে তোমরা কোন মুসলিম বাহিনীর আমীর নিয়োগ করবে না। সে একজন মানুষ, সে একটি বালা বা বিপদ। সামনেই যাবে, পিছনে ফিরতে জানে না। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ'সে একটি ধ্বংস।' তবে বাহ্যতঃ তিনি দেখতে দুর্বল ছিলেন।[২৫] 'রিজালুন হাওলার রাসূল' এর গ্রন্থকার খালিদ মুহাম্মদ বলেন ঃ 'তাঁর ঐকান্তিক বাসনা ছিল শহীদ হয়ে মরার।' আল্লাহ পাক তাঁর সে বাসনা পূরণ করেন।

আল-মুসতাদরিক, ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবন মালিক বলতেন, আল-বারা' ইবন মালিক সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। গান গাওয়ার সখও তাঁর ছিল। হযরত আনাস বলতেন ঃ বারা' পুরুষদেরকে উট চরানোর গান গেয়ে শোনাতেন।[২৬] একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এক সফরে তিনি একটি গান গাচ্ছেন। রাসূল (সা) তা শুনে আল-বারা'কে বলেন ঃ মহিলাদের কথা একটু মনে রেখ। একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যান।[২৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা–১/১৪৩; আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা–১/১৩৭;, দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৪/২৫৪;
২. উসুদুল গাবা–১/১৭২
৩. আল-ইসাবা–১/১৪৩

৪. উসুদুল গাবা–১/১৭২; আল-ইসাবা-১/১৪৭; আল-আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩৪;
৫. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৪/২৫৪;
৬. সীয়ারে আনসার-১/২৭৩
৭. প্রাগুক্ত–১/২৭৪; আল ইসাবা-১/১৪৩
৮. আল-কামিল ফিত তারিখ-২/৩৬৪; আল আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩৬; সিফাতু সাফওয়াহ্-১/২৫৬;
৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩৬; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৭
১০. আল-আ'লাম-২/১৫
১১. হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৭; উসুদুল গাবা-১/১৭২
১২. আল-কামিল ফিত্ তারিখ-২/৫৪০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৯১
১৩. সীয়ারে আনসার-১/২৭৪; হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৭; আল-ইসাবা-১/১৪৩
১৪. আল-কামিল ফিত তারিখ-২/৫৪০
১৫. আল-আ'লাম-২/১৫; মু'জামুল বুলদান-১/২৫৬
১৬. উসুদুল গাবা-১/১৭২; আল-কামিল ফিত্ তারিখ-২/৫৪৬;
১৭. আল-কামিল ফিত তারিখ-২/৫৪৭
১৮. তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩৪
১৯. উসুদুল গাবা-১/১৭২; কানযুল 'উম্মাল-৭/১১; হায়াতুস সাহাবা-১/৫১০-৫১১; আল-কামিল ফিত-তারিখ-২/৫৪৭;
২০. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই- ইসলামিয়্যা (উর্দু)-৪/২৫৫;
২১. উসুদুল গাবা-১/১৭৩;
২২. আল-আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩৪
২৩. আল-ইসতী'য়াব; আল-ইসাবার টীকা-১/১৩৭
২৪. তারিখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩৪
২৫. আল-আ'লাম-২/১৫; তারিখুল ইসলাম-২/৩৪; উসুদুল গাবা-১/১৭২
২৬. আল-ইসাবা-১/১৪৩
২৭. উসুদুল গাবা-১/১৭৩; আল-ইসাবা-১/১৪৩

আল-বারা' ইবন মা'রূর (রা)

নাম আল-বারা' এবং ডাকনাম আবু বিশ্‌র। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার সন্তান। পিতা মা'রূর ইবন সাখার এবং মাতা আর-রুবাব বিনতুন নু'মান। মা আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজের ফুফু।[১] হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর ছিলেন স্বীয় গোত্রের রয়িস বা নেতা। মদীনার বেশ কয়েকটি দুর্গ ও উদ্যান ছিল তাঁর মালিকানাধীন। তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[২]

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর যে 'আকাবার সর্বশেষ বাই'য়াতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। অনেকের মতে তিনি 'আকাবার প্রথম বাই'য়াতে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতও করেন। মুসা ইবন 'উকবা ইমাম যুহ্‌রীর সূত্রে আল-বারা' ইবন মা'রূরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'তিনি ঐ মুষ্টিমেয় লোকদের একজন যাঁরা 'আকাবার প্রথম বাই'য়াতে অংশ নিয়েছিলেন।'[৩] ইবনুল আসীরও বর্ণনাটি নকল করেছেন।[৪] অনেকের মতে এই বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই। একমাত্র মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ব্যতিত আর কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ এটি নকল করেননি।[৫]

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন তখন 'বাইতুল মাকদাস' মুসলমানদের কিবলা। মুসলমানরা সে দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। কিন্তু তিনি মক্কার কা'বাকে পিছনে রেখে শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একারণে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় শুরু করলেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেছেন ঃ আল-বারা' ইবন মা'রূর প্রথম ব্যক্তি, যিনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কা'বার দিকে মুখ করেছেন।[৬] হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন, সে সময়ও তিনি কা'বামুখী হয়ে নামায আদায় করেছেন। রাসূল (সা) একথা জানতে পেরে তাঁকে বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করতে নির্দেশ দেন। তিনি সে নির্দেশ পালন করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, পরিবারের লোকদের তিনি বলেন, আমাকে তোমরা কা'বামুখী করে দাও।[৭]

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর 'আকাবার শেষ বাই'য়াতের একজন সদস্য। এ বাই'য়াতের অন্যতম সদস্য হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ হজ্জের মওসুমে, যে বার আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেছিলাম- আমাদের কাওমের পৌত্তলিকদের সাথে আমরাও মদীনা থেকে বের হলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের বয়োঃজ্যেষ্ঠ নেতা আল-বারা' ইবন মা'রূর। যখন আমরা আল-বায়দা'র উপকণ্ঠে, তিনি আমাদের বললেন ঃ এই, তোমরা শোন! আমি একটি

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। জানিনে তোমরা আমার সাথে একমত হবে কিনা। আমরা বললামঃ আবু বিশ্‌র! বলুন তো আপনার সিদ্ধান্তটি কি? বললেন ঃ আমি এই গৃহের (কা'বা) দিকে মুখ করে নামায আদায় করবো এবং তা আর কক্ষনো আমার পিছনে রাখবো না। আমরা বললাম ঃ আল্লাহর কসম! আপনি এমনটি করবেন না। কারণ, আমরা জানি, রাসূল (সা) কেবল শামের দিকেই মুখ করে নামায আদায় করেন। আমাদের এ অনুরোধের পরও তিনি বললেন ঃ কসম আল্লাহর! আমি ঐদিকেই মুখ করে নামায আদায় করবো! যখন নামাযের সময় হলো, তিনি কা'বা মুখী হয়ে দাঁড়ালেন, আর আমরা দাঁড়ালাম শামের দিকে মুখ করে! এভাবে আমরা মক্কায় পৌঁছলাম।

মক্কায় পৌঁছে তিনি আমাকে বললেনঃ ভাতিজা! আমাকে একটু রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিয়ে চলো। আমি যা করেছি, সে বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাই। কারণ, তোমাদের বিরোধিতা করে আমি অন্তরে একটু অস্বস্তি বোধ করছি। কা'ব বলেন ঃ আমরা রাসূলের (সা) খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। আবতাহ উপত্যকায় এক ব্যক্তির দেখা পেলাম। তাকে বললাম ঃ আমাদেরকে একটু মুহাম্মাদের সন্ধান দিতে পারেন? সে পাল্টা প্রশ্ন করলো ঃ তোমরা তাঁকে দেখে চিনতে পারবে? আমরা বললাম ঃ আল্লাহর কসম! মোটেই না। সে প্রশ্ন করলো ঃ তোমরা কি 'আব্বাসকে চেন? বললাম ঃ হাঁ, তা চিনি। তিনি মাঝে মাঝে তিজারাতের উদ্দেশ্যে আমাদের ওখানে যান তো। সে বললো ঃ মসজিদে ঢুকতেই তোমরা 'আব্বাসকে দেখতে পাবে। তাঁর সাথে যে লোকটি বসা, তিনিই মুহাম্মাদ।

কা'ব বলেন ঃ আমরা মসজিদে ঢুকে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আব্বাস এক কোণে বসে আছেন। আমরা কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বসে পড়লাম। রাসূল (সা) 'আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আবুল ফাদল! এ দু'জনকে আপনি চেনেন? আব্বাস বললেন ঃ হাঁ, চিনি। ইনি আল-বারা' ইবন মারূর- তাঁর গোত্রের নেতা। আর ইনি কা'ব ইবন মালিক। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই কবি কা'ব? আব্বাস বললেন ঃ হাঁ।

এবার আল-বারা' বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মদীনা থেকে আসার পথে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমার ইচ্ছা, সে বিষয়ে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন ঃ তা বিষয়টি একটু পরিষ্কার করে বল। আল-বারা' বললেন ঃ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই গৃহকে (কা'বা) আর কক্ষনো পেছনে রাখবো না। এ দিকে মুখ করেই নামায আদায় করবো। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি যে কিবলার ওপর ছিলে তার ওপর যদি একটু ধৈর্য ধরে থাকতে। এরপর আল-বারা' রাসূলের (সা) কিবলার দিকে ফিরে যান এবং আমাদের সাথে শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা বলতো তিনি তাঁর কিবলার ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।

কা'ব বলেন ঃ আমরা জানি তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কিবলার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং আমাদের সাথে শামের দিকে মুখ করে নামাযও পড়েছিলেন। তারপর আমরা

আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য কথা দিলাম। আমাদের সাথে যে সকল মুশরিক (পৌত্তলিক) ছিল তাদের কাছে বিষয়টি গোপন রাখলাম। আমাদের সাথে জাবিরের বয়োবৃদ্ধ পিতা আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম ছিলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলে জাবির ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই কাফিলায় ছিলেন।

কা'ব বলেন ঃ আমরা সবাই মিলে আবদুল্লাহকে ঘিরে ধরে বললাম ঃ জাবিরের আব্বা, আপনার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আপনি যে বিশ্বাসের ওপর আছেন, তার ওপর যদি মারা যান তাহলে কালই এই আগুনের ইন্ধনে পরিণত হবেন। অথচ আল্লাহ একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত ও 'ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহবান জানাচ্ছেন। আপনার সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়েছে। আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। আমাদের একথার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাই'য়াতে শরীক হন।

অবশেষে মিনার সেই প্রতিশ্রুত রাতটি এসে গেলে। মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন, আমরা মরুভূমির কাতা পাখির ন্যায় শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লাম এবং এক সময় 'আকাবায় সমবেত হলাম। রাসূল (সা) চাচা 'আব্বাসকে সংগে নিয়ে আসলেন। 'আব্বাসই সর্ব প্রথম কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! মুহাম্মাদ আমাদের মধ্যে কেমন আছেন, তা তোমরা জান। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে আছেন। আমরা তাঁকে রক্ষা করেছি। কিন্তু তিনি তোমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে তোমাদের কাছেই যেতে চান। যদি তোমরা প্রতিশ্রুত অঙ্গীকার পালন করতে পারবে বলে মনে কর তাহলে তাঁকে নিয়ে যাও। আর যদি অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কর তাহলে তাঁকে নিজ কাওমে থাকতে দাও। তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে আছেন।

আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এবার আপনি কিছু বলুন। রাসূল (সা) বক্তব্য রাখলেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন এবং কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করলেন। তারপর আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললাম ঃ আপনার নিজের ও আপনার রবের জন্য আমাদের নিকট থেকে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি আপনাদের নিকট থেকে এই কথার ওপর বাই'য়াত গ্রহণ করছি যে, যা থেকে আপনারা আপনাদের সন্তান ও নারীদের রক্ষা করে থাকেন তা থেকে আমাকেও রক্ষা করবেন।

জবাবে আল-বারা' ইবন মা'রূর বললেনঃ হাঁ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, সেই সত্তার নামে শপথ, যা থেকে আমরা আমাদের জীবন ও নারীদের রক্ষা করি তা থেকে আপনাকেও আমরা রক্ষা করবো। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করলাম। আল-বারা' ইবন মা'রূর আবেদন জানালেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন, আমরা বাই'য়াত করি। রাসূল (সা) হাত বাড়িয়ে

দিলে তিনি হাতে হাত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাই'য়াতকারী তিনি। তারপর অন্যরা একের পর এক বাই'য়াত করতে থাকে।[৮]

'আকাবার শেষ বাই'য়াতে কে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাই'য়াত করেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। বনু নাজ্জারের লোকেরা দাবী করেছেন, এ গৌরবের অধিকারী আস'য়াদ ইবন যুরারা, আর বনু আবদিল আশহালের লোকেরা দাবী করেছেন, আবুল হায়সাম ইবন আত-তায়্যিহান। তবে কা'ব ইবন মালিকের সূত্রে ইমাম যুহরী বলেছেন, এ অনন্য গৌরবের অধিকারী আল-বারা' ইবন মা'রূর। এটিই ছিল বনু সালামার লোকদের বিশ্বাস।[৯] ইবন ইসহাকও একথা বলেছেন।[১০] 'আল্লামা যিরিক্‌লী বলেন ঃ যে বার আনসারদের সত্তর জন 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে বাই'য়াত করেন, সেই বার সর্ব প্রথম আল-বারা' ইবন মা'রূর আনসারদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন।[১১] বাই'য়াতের পর রাসূল (সা) তাঁকে ও জাবিরের পিতা আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারামকে বনু সালামার নাকীব ঘোষণা করেন।[১২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই শেষ 'আকাবায় প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইবন আবদিল্লাহর পিতা আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আল-বারা' তাঁকে দুই প্রস্থ পরিচ্ছন্ন কাপড় দেন এবং তিনি তাই পরে কালেমা পাঠ করেন।[১৩]

শেষ 'আকাবার বাই'য়াতে যে সকল নেতার সাথে তাঁদের ছেলেও অংশগ্রহণ করেছিল, আল-বারা' তাঁদের একজন। তাঁর ছেলে বিশ্‌র ইবন আল-বারা'ও সেদিন বাই'য়াত করেছিলেন।[১৪]

নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরের জ্বিলহাজ্জ মাসে 'আকাবায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। এর মাত্র দুই মাস পরে সফর মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর সময় অসীয়াত করে যান, আমাকে কা'বার দিকে মুখ করে কবরে রাখবে, আর আমার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্ধারিত থাকবে। তিনি যেখানে ভালো মনে করেন সেখানে খরচ করবেন। ইবন ইসহাকের মতে এটা রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের একমাস পূর্বের ঘটনা।[১৫] ইবনুল আসীর বলেন ঃ তিনি মদীনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুসলমান।[১৬] ইবনুল আসীরের এই মত সঠিব বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর পূর্বে আরও দুই একজন মুসলমানের মদীনায় মৃত্যুর কথা জানা যায়। তবে নাকীবদের মধ্যে সর্ব প্রথম তিনি ইনতিকাল করেন বলে আল্লামা যিরিকলী যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক।[১৭]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হিজরাত করে মদীনায় আসলেন। সাহাবীদের সংগে নিয়ে তিনি আল-বারা'র কবরে যান এবং চার তাকবীরের সাথে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। আর যে সম্পদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকূলে অসীয়াত করে গিয়েছিলেন, তা তিনি গ্রহণ করে পুনরায় আল-বারা'র ছেলেকে দান করেন।[১৮]

আবদুল্লাহ ইবন আবী কাতাদাহ্ বলেছেন ঃ মদীনায় আসার পর রাসূল (সা) সর্ব প্রথম আল-বারা' ইবন মা'রূরের জানাযার নামায পড়েন। সংগীদের নিয়ে তিনি তাঁর কবরের কাছে যান এবং কাতারবন্দী হয়ে তাঁর জন্য দু'আ করেন ঃ

(হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন, তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হউন।)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁর জন্য এই বলে দু'আ করেন ঃ[১৯]

(হে আল্লাহ, আপনি আল-বারা' ইবন মা'রূরের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। কিয়ামতের দিন আপনার ও তার মাঝে আড়াল না রাখুন এবং তাকে জান্নাতবাসী করুন।)

হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূরের (রা) সন্তানাদির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সীরাতের গ্রন্থসমূহে শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, বিশ্‌র নামে তাঁর এক ছেলে ছিল এবং তিনি 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে শরীক হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেছিলেন।[২০] হযরত আল-বারা'র মৃত্যুর পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বনু সালামার নেতা মনোনীত করেন। খাইবার যুদ্ধের সময় যয়নাব বিনতুল হারিস নাম্নী এক ইয়াহুদী মহিলা ছাগলের গোশ্‌তের সাথে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহকে (সা) খাওয়ায়। হযরত বিশ্‌রও সেই বিষ মিশ্রিত গোশ্‌ত খেয়েছিলেন এবং তারই ক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[২১]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আল-বারা' ইবন মা'রূর (রা) ইসলাম গ্রহণের পরই মক্কার কা'বাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং মরণকালেও সেই দিকে মুখ করে কবর দেওয়ার জন্য অসীয়াত করে যান। তখনও কিন্তু ইসলাম কা'বাকে কিবলা বলে ঘোষণা দেয়নি। কেন তিনি এমনটি করেন? তিনি কি বুঝেছিলেন, ভবিষ্যতে কা'বাই হবে ইসলামের কিবলা? তাঁর কী সৌভাগ্য যে, পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তাঁরই গৃহে রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থানের সময় আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে কা'বাকে কিবলা হিসেবে ঘোষণা করেন এবং রাসূল (সা) তাঁরই গৃহে সর্বপ্রথম মক্কার দিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। ঘটনাটি এই রকম ঃ আল-বারা' ইবন মা'রূরের স্ত্রী হযরত উম্মু বিশ্‌র (রা) আল-বারা'র বাড়ীতে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জন্য একবার খাবার তৈরী করলেন। তিনি সেই খাবার খেয়ে সাহাবীদের নিয়ে জুহরের নামাযে দাঁড়িয়েছেন। দুই রাকা'য়াত শেষ হতেই কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ আসে। বাকী নামায তিনি কা'বার দিকে ফিরে আদায় করেন। এটা দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মতান্তরে রজব মাসের মাঝামাঝি মঙ্গলবারের ঘটনা।[২২]

আনসারী কবি 'আওন ইবন আইউব তাঁর একটি কাসীদায় আনসারদের গৌরবময় কীর্তি-কান্ড তুলে ধরেছেন। তারই একটি পংক্তিতে তিনি আল-বারা' ইবন মা'রূরের সর্বপ্রথম কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের কথা গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। ইবন হিশাম পংক্তিটি তাঁর সীরাত গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[২৩]

সীরাত বিশেষজ্ঞগণ আল-বারা' ইবন মা'রূরের (রা) নিম্নের পাঁচটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ[২৪]

১. সর্ব প্রথম কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়কারী।
২. শেষ 'আকাবায় সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে বাই'য়াত গ্রহণকারী।
৩. সর্ব প্রথম সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অসীয়াতকারী।
৪. রাসূল (সা) মনোনীত বারো নাকীবের একজন।
৫. নাকীবদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুবরণকারী।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার টীকা-১/১৩৬; উসুদুল গাবা-১/১৭৩
২. সীয়ারে আনসার-১/২৮৩
৩. আল-ইসাবা-১/১৪৪
৪. উসুদুল গাবা-১/১৭৩
৫. সীয়ারে আনসার-১/১৮৩
৬. আল-ইসাবা-১/১৪৪; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৭;
৭. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৭
৮. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্ লি-ইবন কাসীর-১/৩৪৩-৩৪৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৩৯-৪৪৩; হায়াতুস সাহাবা-১/২৪৭; উসুদুল গাবা-১/১৭৩
৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৭, ৪৬১
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৫৩
১১. আল-আ'লাম-২/১৫
১২. তারীখুল ইসলাম ওয়াতাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮১
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
১৪. প্রাগুক্ত-১/২৫৪
১৫. আল-ইসাবা-১/১৪৫; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৬; সিফাতুস সাফওয়াহ্-১/২০৩
১৬. উসুদুল গাবা-১/১৭৩
১৭. আল-আ'লাম-২/১৫
১৮. উসুদুল গাবা-১/১৭৩; আল-ইসাবা-১/১৪৫; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৬; সীয়ারে আনসার-১/২৮৭
১৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৬
২০. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৮৩
২১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৮; সীয়ারে আনসার-১/২৮৫
২২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৬, ২৭১
২৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪০
২৪. আল-ইসাবা-১/১৪৪; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩-২৫৪; আল-আ'লাম-২/১৫

আল-বারা' ইবন 'আযিব (রা)

মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের বনু হারেসা শাখার সন্তান আল-বারা'। আনসারী সাহাবী। কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু 'উমার, মতান্তরে আবু 'আমর বা আবুত্ তুফাইল।[১] ইবনুল আসীরের মতে আবু 'আমর সর্বাধিক সঠিক।[২] পিতা 'আযিব ইবনুল হারেস সাহাবী ছিলেন।[৩] মাতা হাবীবা বিন্তু আবী হাবীবা ইবনুল হুবাব, মতান্তরে উম্মুল খালিদ বিন্তু সাবিত। মায়ের নাম যাই হোক না কেন, তিনি বদরী সাহাবী আবু বুরদাহ্ নিয়ার-এর আপন বোন এবং প্রখ্যাত সাহাবী আবু সা'ঈদ আল খুদরীর (রা) চাচাত বোন।[৪]

সাহীহাইন ও বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে আল-বারা'র সম্মানিত পিতা 'আসির সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল-বারা' বলেন ঃ একবার আবু বকর (রা) 'আযিবের নিকট থেকে দশ দিরহাম দিয়ে একটি জিন কেনেন। তারপর তিনি 'আযিবকে বলেন, আপনি আল-বারা'কে একটু বলুন, সে যেন জিনটি আমার বাড়ী পৌছে দিয়ে আসে। 'আযিব বললেন ঃ না, তা আমি বলছিনা, যতক্ষণ না আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আপনার হিজরাতের সফরকাহিনী শুনাচ্ছেন। অগত্যা আবু বকর (রা) বলতে শুরু করলেন।[৫]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মদীনা হিজরাত করেন তখন আল-বারা' নয় দশ বছরের কিশোর। মদীনায় তখন ইসলামের দা'ওয়াত জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর মামা 'আকাবায় বাই'য়াত করেছেন এবং পিতাও তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনই দুইটি পরিবারে আল-বারা বেড়ে ওঠেন। তাই যিরিক্লী বলেছেন ঃ তিনি ছোট্ট বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬]

সেই কৈশোরে তিনি ইসলামের হুকুম-আহকাম ও মাসলা-মাসায়িল শেখার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। মদীনায় তখন হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকতুমের (রা) মজলিস কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মূলতঃ তিনি শৈশবের শিক্ষা সেখানেই লাভ করেন। প্রথমে পবিত্র কুরআন পড়তে শুরু করেন। পরবর্তীকালে আল-বারা' রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মদীনায় আসেন মুস'য়াব ইবন 'উমাইর ও ইবন উম্মে মাকুতম। তাঁরা দু'জন আমাদের কুরআন শেখাতেন। তারপর আসেন 'আম্মার, বিলাল ও সা'দ। তারপর বিশজনকে সংগে নিয়ে আসেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব। তাদের পর আবু বকরকে সংগে নিয়ে আসেন রাসূলুল্লাহ (সা)। রাসূলের (সা) আগমনে আমি মদীনাবাসীদের যতখানি উৎফুল্ল হতে দেখেছি ততখানি উৎফুল হতে আর কোন ব্যাপারে দেখিনি। তিনি যখন আসেন তখন আমি 'সাব্বিহ ইসমা রব্বিকাল আ'লা'-এর মত মুফাস্সাল সূরা মাত্র পড়েছি।[৭]

বদর যুদ্ধ যখন হয় তখন আল-বারা' কৈশোর অতিক্রম করেননি। তবে তাঁর ঈমানী

আবেগ ছিল যৌবনে ভরপুর। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হলেন; কিন্তু যুদ্ধের বয়স না হওয়ায় তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। বদর যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত আল-বারা'র একটি বর্ণনা আছে। তিনি বলেন ঃ আমরা বলাবলি করতাম, বদরের যোদ্ধা ছিল তিন শো দশজনের কিছু বেশী- তালুতের সাথে যারা নদী অতিক্রম করেছিল তাদের সমসংখ্যক। আর তালুতের সাথে নদী অতিক্রম করেছিল কেবল ঈমানদার ব্যক্তিরাই। তিনি আরও বলেন ঃ বদরে আমি ও ইবন 'উমার যুদ্ধের উপযোগী বয়স থেকে ছোট হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। বদরের দিন মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের কিছু বেশী, আর আনসারদের সংখ্যা ছিল দুই শো চল্লিশের কিছু বেশী।[৮]

হযরত আল-বারা' সর্বপ্রথম কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তার যুদ্ধের সংখ্যা মোট কত, সে সম্পর্কে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইবনুল আসীর, ইবন আবদিল বার ইমাম নাবাবী প্রমুখের মতে তিনি সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে ইবন হিশাম, ওয়াকিদী, ইবন সা'দ, আল-'আসকারীর মত সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি সর্ব প্রথম খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) তাঁকে বদরে ফিরিয়ে দেন এবং খন্দকে অনুমতি দান করেন। তখন তাঁর বয়স পনোরো বছর।[৯] ওয়াকিদী বলেন ঃ ইবন 'উমার, আল-বারা 'ইবন 'আযিব, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী ও যায়িদ ইবন আরকাম—এ চারজন সর্ব প্রথম খন্দক যুদ্ধে যোগ দেন। নাফে'র বর্ণনামতে এটাই সর্বাধিক সঠিক।[১০] ইবন সা'দ মুহাম্মদ ইবন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খন্দকের দিনে আল-বারা 'ইবন আযিবকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। তখন তার বয়স পনেরো বছর। এর পূর্বে তিনি অনুমতি দেননি।[১১]

উপরোক্ত মতপার্থক্যের কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তিনি মোট কতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন সে সম্পর্কেও মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। যাঁরা তাঁর উহুদে শরীক হওয়ার কথা বলেছেন, তাঁদের হিসাবে পনেরোটি; আর যাঁরা উহুদ বাদ দিয়েছেন তাঁদের হিসেবে চৌদ্দটি।[১২] আর এই যুদ্ধের সাথে যদি অন্য সফর যোগ করা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সর্বমোট সফরের সংখ্যা হবে আঠারোটি। আল-বারা' নিজেই বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মোট পনেরোটি যুদ্ধ করেছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) আঠারোটি সফরের সঙ্গী হয়েছি।[১৩]

খন্দক থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি যোগদান করেন। ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার বাই'য়াতে অংশ গ্রহণ করেন। এ বছর রাসূল (সা) ১৪০০ সঙ্গী নিয়ে 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছিলেন। এই কাফেলায় আল-বারা'ও ছিলেন। পথিমধ্যে কুরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল (সা) হুদাইবিয়া উপত্যকায় শিবির স্থাপন করেন। সঙ্গীরা বললেন, এখানে তো পানি নেই। তবে সেখানে একটি মরা কূপ ছিল। রাসূল (সা) নিজের বাভিল থেকে একটি তীর বের করে একজনের

হাতে দিয়ে বললেন, যাও ঐ কূপের মধ্যে গেড়ে দিয়ে এসো। সে তীরটি হাতে নিয়ে কূপের মধ্যে নেমে গেঁড়ে দিয়ে আসতেই পানি উথলে উঠতে শুরু করলো।[১৪] ইবন ইসহাক বলেছেন, আল-বারা' দাবী করতেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যে হুদাইবিয়ার কূপে রাসূলের (সা) তীর গেড়ে ছিল।[১৫] তবে ইবন হাজার 'আসকিলানী বলেন, প্রসিদ্ধ মতে তীর গেড়ে ছিলেন নাজিয়াহ্ ইবন জুনদুব।[১৬]

এই হুদাইবিয়ার বাই'য়াত সম্পর্কে ইবন আযিবের একটি মন্তব্য বুখারী সহ সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আল-বারা' বলতেন, লোকেরা মক্কা বিজয়কে আল-ফাত্হ বা মহা বিজয় বলে মনে করে। হাঁ, মককা বিজয়ও একটি বিজয়। তবে হুদাইবিয়ার দিনের বাই'য়াতে রিদওয়ানকে আমরা প্রকৃত বিজয় বলে মনে করি। সে দিন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ১৪০০ লোক ছিলাম।[১৭]

তিনি হুনাইন যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন এবং খুব সাহসের সাথে শত্রুর মুকাবিলা করেছিলেন। বুখারী আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বনু কায়েসের এক ব্যক্তিকে আল-বারা' ইবন 'আযিবের নিকট প্রশ্ন করতে শুনেছেন। প্রশ্নটি এই রকম ঃ আচ্ছা, হুনাইনের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহকে (সা) ছেড়ে পালিয়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ তবে রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু পালাননি। হাওয়াযিন গোত্র তীর চালনায় পারদর্শী। আমরা হামলা চালালে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আমরা গনীমাত সংগ্রহের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি। বনু হাওয়াযিন আবার তীর দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। আমি তখন রাসূলকে (সা) তাঁর সাদা খচ্চরের ওপর বসে থাকতে এবং আবু সুফিয়ানকে তার লাগাম ধরে রাখতে দেখেছি। খচ্চরের ওপর বসে তিনি এই কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন ঃ

'আমি নবী, একথা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। হে আল্লাহ, আপনার সাহায্য পাঠান।'

আল-বারা' বলেন, যখন ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলো তখন আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে আড়াল করে দাঁড়ালাম।[১৮]

তায়িফ যুদ্ধের পর এবং বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইয়ামানবাসীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একদল লোক সেখানে পাঠান। হযরত আল-বারা' ইবন 'আযিবও সেই দলে ছিলেন। বায়হাকী বর্ণনা করেন, আল-বারা' ইবন 'আযিব বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামনবাসীদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে খালিদ ইবন ওয়ালীদকে সেখানে পাঠালেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ছয়মাস ধরে আমরা মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলাম কিন্তু তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূল (সা) 'আলী ইবন আবী তালিবকে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, খালিদের সাথে যারা আছে তাদের কেউ ইচ্ছা করলে আলীর সাথে থেকে যেতে পারে। আল-বারা' বলেন ঃ আমি আলীর সাথে থেকে গেলাম। যখন আমরা হামাদান গোত্রে গেলাম, তারা আমাদের কাছে আসলো। আলী সামনে এগিয়ে

যেয়ে আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে আমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। আলী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ইয়ামনবাসীদের প্রতি লেখা রাসূলুল্লাহর (সা) পত্রখানি পাঠ করে শোনালেন। হামাদান গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। আলী তাদের ইসলাম গ্রহণের খবর জানিয়ে রাসূলকে (সা) পত্র লিখলেন। পত্র পাঠ করে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে দুইবার বললেন ঃ 'আস্‌সালামু 'আলা-হামাদান,'আস্‌সালামু 'আলা-হামাদান।'[১৯]

খলীফা হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে পারস্যের তুসতার বিজয়ে তিনি আবূ মুসা আল-আশ'য়ারীর বাহিনীতে ছিলেন।[২০] আবু আমর আশ্-শায়বানী বলেন, আল-বারা' ইবন 'আযিব হিজরী ২৪ সনে পারস্যের রায় জয় করেন।[২১] ইমাম নাবাবী বলেন ঃ আল-বারা' ইবন আযিব ও তাঁর ভাই 'উবাইদ ইবন 'আযিব উট, সিফ্‌ফীন ও নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধগুলিতে আলীর পক্ষে যুদ্ধ করেন।[২২]

শেষ জীবনে তিনি কুফায় একটি বাড়ী তৈরী করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় অন্ধ হয়ে যান।[২৩]

হিজরী ৭২ মতান্তরে ৭১ সনে হযরত মুসয়া'ব ইবন যুবাইর যখন কুফার আমীর তখন আল-বারা' সেখানে ইনতিকাল করেন।[২৪] ইতিহাসে তাঁর এই সন্তানগুলির নাম পাওয়া যায় ঃ আর-রাবী', 'উবাইদ, লুত, সুওয়াইদ ও ইযায়ীদ। তবে ইমাম নাবাবী বলেছেন ঃ তিনি ইযায়ীদ ও সুওয়াইদ নামে দুই ছেলে রেখে যান।[২৫] ইমাম নাবাবীর এই মত সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ 'তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল'গ্রন্থকার বলেছেন, তাঁর চার ছেলে- আর-রাবী', 'উবাইদ, লুত ও ইযায়ীদ তাঁদের পিতার নিকট থেকে হাদীস শুনেছে এবং বর্ণনাও করেছেন।[২৬] ইযায়ীদ এক সময় আম্মানের আমীরও হয়েছিলেন।[২৭] সুওয়াইদের জীবনীতে ইবন সা'দ লিখেছেন যে, সুওয়াইদ আম্মানের সর্বোত্তম আমীর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন।[২৮] সম্ভবতঃ ইযায়ীদ ও সুওয়াইদ দুই জনই আম্মানের আমীর হয়েছিলেন।

হযরত আল-বারা' ইবন 'আযিব সব সময় হাতে একটি সোনার আংটি পরতেন। লোকে বললো ঃ সোনা তো পুরুষের জন্য হারাম। তিনি বললেন ঃ শোন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমাতের মাল বন্টন করলেন। শুধু একটি আংটি থেকে গেল। তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর আমাকে ডেকে বললেন ঃ ধর, এটা পরো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাকে পরাচ্ছেন। এখন তোমরাই বল, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাকে পরিয়েছেন, আমি তা কেমন করে খুলি?[২৯]

হযরত আল-বারা' ইবন 'আযিব ছিলেন একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীসের প্রচার ও প্রসারে ছিলেন বিশেষ মনোযোগী। তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৩০৫ টি। তারমধ্যে ২২টি মুত্তাফাক আলাইহি। ১৫টি বুখারী এবং ৬টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩০]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন খোদ রাসূলে পাকের (সা) নিকট থেকে। একবার রাসূল (সা) তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন। তিনি আবার তা আল-বারা'র মুখ থেকে শুনতে চান। আল-বারা' 'বিনাবিয়্যিকা'-এর স্থলে 'বিরাসুলিকা' পাঠ করেন। রাসূল (সা) শব্দটি তাঁকে শুধরে দেন।[৩১] এর ফলাফল এই হয় যে, হাদীস বর্ণনার সময় তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

একবার তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীসের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যে সকল হাদীস আমি বর্ণনা করে থাকি তার সব আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনিনি। আমরা উটের রাখালি ও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এ কারণে সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিসে হাজির থাকতে পারতাম না। আমার বর্ণিত হাদীসের অনেকগুলি অন্য সাহাবীদের নিকট থেকে শোনা।[৩২]

আল-বারা' ইবন 'আযিব সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সকল সাহাবীর নিকট থেকে তিনি হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকে আপন আপন স্তরে নেতৃস্থানীয়। যেমন ঃ বিলাল ইবন রাবাহ, সাবিত ইবন ওয়াদীয়া আল-আনসারী, হাস্সান ইবন সাবিত, আবু আইউব আল-আনসারী, আবু বকর ইবন আবী কুহাফা, 'আলী ইবন আবী তালিব ও 'উমার ইবনুল খাত্তাব।[৩৩]

যাঁরা তাঁর ছাত্র হওয়ার এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনার গৌরব লাভ করেন তাঁরা সকলে শ্রেষ্ঠ তাবে'ঈ। 'তাহজীবুল কামাল' গ্রন্থকার তাঁর এমন ৫০ জন তাবে'ঈ ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তারমধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা গেল ঃ ইয়াদ ইবন লাকীত, সাবিত ইবন 'উবাইদ, হারাম ইবন সা'দ, তাঁর ছেলে আর-রাবী' ইবনুল বারা', 'উবাইদ ইবনুল বারা', লুত ইবনুল বারা', ইয়াযীদ ইবনুল বারা', খায়সামা ইবন আবদির রহমান, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, যায়িদ ইবন ওয়াহাব আল-জুহানী, সা'দ ইবন 'উবাইদা, আবু বুরদাহ্ ইবন আবী মুসা আল-আশ'য়ারী প্রমুখ।[৩৪]

তাঁর হাদীসের দারসে কোন কোন সময় সাহাবীরাও হাজির হয়েছেন। এমন কিছু সাহাবীর নাম সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। তাঁরা আল-বারা' সূত্রে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খতামী, আবু জুহাইফা ওয়াহাব ইবন 'আবদিল্লাহ প্রমুখ।[৩৫] তাছাড়া অনেক সাহাবী হঠাৎ করে তাঁর দারসে হাজির হয়ে যেতেন। একদিন কা'ব ইবন হুজর (রা) আরো কয়েকজন সাহাবীর সাথে তার দারসে হাজির হয়েছিলেন।[৩৬]

তাঁর মজলিসে উপস্থিত ছাত্ররা নানা ধরনের প্রশ্ন করতো। কেউ প্রশ্ন করতো কুরআনের আয়াত সম্পর্কে, আবার কেউ বা করতো ফিকাহর কোন মাসয়ালা বিষয়ে।

এক ব্যক্তি একবার সূরা আল-বাকারার ১৯৫ নং আয়াত 'নিজের জীবনকে তোমরা ধ্বংসের সম্মুখীন করো না'– সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলো। বললো ঃ এই নিষেধাজ্ঞার

মধ্যে কি পৌত্তলিকদের ওপর আক্রমণ শামিল হবেনা? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তা কি করে হয়? কারণ, আল্লাহ তো রাসূলকে (সা) জিহাদের হুকুম দিয়ে বলেছেন ঃ 'আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাক, তুমি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে জিম্মাদার নও। তুমি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাক।' (সূরা আন-নিসা ঃ ৮৪) তিনি আরো বললেন ঃ 'তুমি যে আয়াত পেশ করেছো তা হচ্ছে খরচের ব্যাপারে।'[৩৭] অর্থাৎ এমন বিশ্বাস যেন না জন্মে যে, আল্লাহর পথে খরচ করলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন বিশ্বাস হলে ধ্বংস।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, লোকটি জানতে চেয়েছিল ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা কি ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে শত্রুর সাক্ষাৎ পেয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন ঃ না। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে কোন পাপ করে। অতঃপর বলে, আল্লাহ এ পাপ ক্ষমা করবেন না।[৩৮]

একবার আবদুর রহমান ইবন মুতঈমের এক বন্ধু কিছু দিরহাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রী করলেন। আবদুর রহমান তাঁর বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন ঃ এমন বিক্রী কি জায়েয? তিনি বললেন ঃ হাঁ, জায়েয। আমি এর আগেও এভাবে বিক্রী করেছি, কেউ মন্দ বলেনি। আবদুর রহমান আল-বারা' ইবন 'আযিবের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। শুনে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আসেন তখন আমরা এভাবে কেনা-বেচা করতাম। তা দেখে তিনি বললেন ঃ নগদা-নগদি হলে এমন বেচাকেনায় দোষ নেই। তবে বাকী হলে জায়েয হবে না। তারপর তিনি আবদুর রহমানকে বললেন ঃ তুমি আরো নিশ্চিত হতে চাইলে যায়িদ ইবন আরকামের কাছে জিজ্ঞেস করতে পার। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আবদুর রহমান যায়িদ ইবন আরকামের কাছে যান। তিনি আল-বারা'র কথা সমর্থন করেন। ঘটনাটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। আবুল মিনহাল বলেন ঃ একবার আমি যায়িদ ইবন আরকাম ও আল-বারা' ইবন ইবন 'আযিবের কাছে 'সারফ' বা মুদ্রা বিনিময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। আমি যখন তাঁদের একজনের কাছে জিজ্ঞেস করলাম তখন তিনি অন্যজনের কথা বলে বললেন ঃ তাঁর কাছে জিজ্ঞেস কর। কারণ, তিনি আমার চেয়ে ভালো এবং আমার চেয়ে বেশী জানেন।[৩৯]

হযরত রাসূলে কারীমের প্রতি সীমাহীন মুহাব্বত, সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ এবং বিনয় ও ভীতি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট। সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর নামাযের প্রতিটি বিষয় রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ ছিল। একদিন তিনি পরিবারের লোকদের জড় করে বললেন ঃ যেভাবে রাসূল (সা) ওজু করতেন এবং যেভাবে নামায পড়তেন আমি তোমাদের তা দেখাবো। কারণ, আল্লাহই জানেন, আমি আর কতদিন বাঁচবো। তিনি ওজু করে জুহর, 'আসর, মাগরিব ও 'ঈশার নামায সেইভাবে আদায় করেন। আর একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সিজদার অনুসরণ করে দেখান।[৪০]

একবার আবু দাউদ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আল-বারা' প্রথমে সালাম করেন এবং তাঁর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একচোট প্রাণখুলে হাসেন। পরে বলেন ঃ জান, আমি এমনটি কেন করেছি? রাসূল (সা) একবার আমার সাথে এরূপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয় এবং নিজেদের কোন স্বার্থ প্রতিবন্ধক না হয় তখন তাদের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৪১]

হাদীসে নামাযের কাতারে ডান দিকে দাঁড়ানোর অনেক বেশী ফজীলাতের কথা এসেছে। এ কারণে তিনি ডান দিকে দাঁড়ানো পছন্দ করতেন।[৪২]

নিজের জান-মাল থেকেও অনেক বেশী রাসূলকে (সা) ভালোবাসতেন। প্রতিটি কথা ও কাজে তার প্রমাণ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা-সুরাতের বর্ণনা যখন দিতেন তখন তাঁর প্রতিটি শব্দ হতো প্রেম-রসে সিক্ত। বলতেন ঃ রাসূল (সা) ছিলেন জগতের সকল মানুষ থেকে সুন্দর। আমি লাল চাদর গায়ে জড়িয়ে দেখেছি, তা যতখানি রাসূলুল্লাহর (সা) গায়ে সুন্দর দেখাতো অন্যের গায়ে ততখানি নয়।[৪৩]

একবার একজন প্রশ্ন করলো, রাসূলুল্লাহর (সা) মুবারাক চেহারার দীপ্তি কি তরবারির ঔজ্জ্বল্যের মত ছিল? বললেন ঃ না। চাঁদের মত ছিল।[৪৪]

তিনি রাসূলকে (সা) যেমন গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি ভয়ও করতেন। তিনি বলেন ঃ একবার আমি রাসূলের (সা) নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাইলাম; কিন্তু তাঁর প্রতি অত্যধিক ভীতির কারণে দুই বছর দেরী করলাম।[৪৫]

বিনয় ও নম্রতার তিনি ছিলেন বাস্তব প্রতিচ্ছবি। অতি উঁচু মর্যাদার সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও অতি নগণ্য মনে করতেন। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, আপনার কত বড় খোশ কিসমত যে, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য্য লাভ এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেছেন। তাঁর কথা শুনে তিনি বললেন ঃ ভাতিজা, তোমার জানা নেই, রাসূলুল্লাহর (সা) পরে আমরা কি কি করেছি।[৪৬]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-৪/৩৪; তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭২; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১৩২; আল-ইসাবা-১/১৪২,
২. উসুদুল গাবা-১/১৭১; আল-ইসতী'য়াব-১/১৩৯,
৩. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৫; আল-ইসাবা-১/১৪২,
৪. তাহজীবুল আসমা-১/১৩৭; তাহজীবুল কামাল-৪/৩৫; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; তাবাকাত-৪/৩৬৪,
৫ সহীহ বুখারী-১/৫৭৭; তাবাকাত-৪/৩৬৫; আল-বিদায়া-৩/১৮৭, ১৮৮; উসুদুল গাবা-১/৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪০,
৬. আল-আ'লাম-২/১৪,
৭. বুখারী-১/৫৫৮; তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; কানযুল উম্মাল-৮/৩৩১; আল-বিদায়া-৩/১৮৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৪,

৮. আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যা ল-ইবনকাসীর-১/৪৫৫; শাজারাতুজ জাহাব-১/৭৮; তাবাকাত-৪/৩৬৭-৩৬৮; বুখারী-১/৫৬৪; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬; উসুদুল গাবা-১/১৭২,
৯. তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৪; উসুদুল গাবা-১/১৭১; তাহজীবুল-আসমা-১/১৩২,
১০. আল-ইসতীয়াব-১/১৪০,
১১. তাবাকাত-৪/৩৬৮,
১২. আল-ইসাবা-১/১৪২; উসুদুল গাবা-১/১৭১,
১৩. মুসনাদে আহমাদ-৪/২৯২; তাবাকাত-৪/৩৬৮; তাহজীবুল আসমা-১/১৩১
১৪. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগিল আমানী-২১/৯৬,
১৫. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩১১; উসুদুল গাবা-১/১৭২,
১৬. তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭৩,
১৭. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/১৮২; তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৮,
১৮. আল-বিদায়া-৪/৩২৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৬১০; বুখারী-১/৬১৭; মুসনাদ-৪/২৮২,
১৯. বুখারী-১/৬২৬; আল-বিদায়া-৫/১০৫; হায়াতুস-সাহাবা-১/১২১,
২০. তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; উসুদুল গাবা-১/১৭১,
২১. উসুদুল গাবা-১/১৭১; আল-ইসাবা-১/১৪২,
২২. তাহজীবুল আসমা-১/১৩৩; উসুদুল গাবা-১/১৭১,
২৩. তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-৪/৩৫; আল-আ'লাম-২/১৪,
২৪ শাজারাতুজ জাহাব-১/৭৭; তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭২; তাবাকাত-৪/৩৬৮; আল-ইসাবা-১/১৪২,
২৫. তাহজীবুল আস্‌মা-১/১৩৩,
২৬. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৬,
২৭. মুসনাদ-৪/২৮৮,
২৮. তাবাকাত-৬/২০৭,
২৯. প্রাগুক্ত-৬/২৯৪,
৩০. তাবাকাত-৪/৩৬৫; তাহজীবুল আসমা-১/১৩২,
৩১. তাবাকাত-৪/২৯২,
৩২. মুসনাদ-৪/২৯২; তাবাকাত-৪/২৮৩; কানযুল 'উম্মাল-৫/২৩৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৮৯,
৩৩. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৫,
৩৪. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৬, ৩৭; তাহজীবুত তাহজীব-১/৩৭২,
৩৫. তাহজীবুল কামাল-৪/৩৬; তাহজীবুল আসমা-১/১৩২,
৩৬. মুসনাদ-৪/৩০৩,
৩৭. প্রাগুক্ত-৪/২৮১,
৩৮. হায়াতুস-সাহাবা-৩/৩১৮,
৩৯. প্রাগুক্ত-৩/২৫৩,
৪০. মুসনাদ-৪/২৯৮; ৩০৩,
৪১. প্রাগুক্ত-৪/২৮৯,
৪২. প্রাগুক্ত-৪/৩০৪,
৪৩. বুখারী-১/৫০২,
৪৪. প্রাগুক্ত-১/৫০২,
৪৫. হায়াতুস সাহাবা-২/৩২৫,
৪৬. বুখারী-১/৫৯৯,

হুবাব ইবনুল মুনজির (রা)

নাম হুবাব, ডাকনাম আবু 'উমার বা আবু 'আমর। পিতা মুনজির এবং মাতা শামূস বিন্‌তু হাক্ক। মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান।[১] আকাবার অন্যতম নাকীব এবং বিরে মা'উনার অন্যতম শহীদ আল-মুনজির ইবন 'আমর আস-সা'য়িদীর (রা) মামা।[২] মহানবীর মদীনায় হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদর থেকে নিয়ে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডা তাঁরই হাতে ছিল।[৩] ইবন সা'দ বলেন ঃ 'তিনি যে বদর যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, এ ব্যাপারে প্রায় ইজমা হয়ে গেছে। তবে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক তাঁকে বদরীদের মধ্যে গণ্য করেননি। আমাদের মতে এটা তাঁর ভুল। কারণ, বদরে হুবাবের কর্মকান্ড অতি প্রসিদ্ধ।'[৪]

বদরের কাছাকাছি পৌঁছে রাসূল (সা) শিবির স্থাপনের জন্য অবতরণ করলেন। হুবাব আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে শিবির স্থাপনের সিদ্ধান্ত কি আল্লাহর পক্ষ থেকে, না আপনার নিজের? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার নিজের। হুবাব বললেন ঃ তাহলে এখানে নয়। আমাদেরকে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি সর্বশেষ পানির কাছে নিয়ে চলুন। সেখানে আমরা একটি পানির হাউজ তৈরী করবো, পাত্র দিয়ে উঠিয়ে সেই পানি পান করবো, আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবো। এছাড়া অন্যসব কূপের পানি আমরা ঘোলা করে ফেলবো। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হুবাব বললেন ঃ আমরা হচ্ছি যোদ্ধা সম্প্রদায়। আমার মত হচ্ছে, একটিমাত্র কূয়ো ছাড়া বাকি সবগুলি কূয়োর পানি ঘোলা করে ফেলা। যাতে কোন অবস্থাতে আমাদের পানি-কষ্ট না হয়। পক্ষান্তরে শত্রুরা পানির জন্য দিশেহারা হয়ে পড়ে।

হুবাবের পরামর্শ দানের পর জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সা) জানান যে, হুবাবের মতটিই সঠিক। অতঃপর রাসূল (সা) হুবাবকে ডেকে বলেন, তোমার মতটিই সঠিক। একথা বলে তিনি গোটা বাহিনী সরিয়ে নিয়ে বদরের কূয়োর ধারে অবতরণ করেন।[৫]

এই বদর যুদ্ধে রাসূল (সা) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, এ কারণে তিনি 'জু-আর-রায়' বা সিদ্ধান্ত দানকারী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। ইমাম সা'য়ালাবী তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ[৬] 'বদরে তিনি ছিলেন পরামর্শদাতা। রাসূল (সা) পরামর্শ গ্রহণ করেন। জিবরীল (আ) এসে বলেন ঃ হুবাব যে মত পেশ করেছে তাই সঠিক। জাহিলী 'আমলেও তিনি অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রদান করেছেন।'

মক্কায় যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) সবচেয়ে বেশী উৎপীড়িত করেছিল নরাধম আবু কায়স ইবন আল-ফাকিহ তাদের অন্যতম। বদরে সে নিহত হয়। একটি বর্ণনা মতে হযরত হুবাবই তাকে হত্যা করেন।[৭] এ যুদ্ধে তিনি হযরত বিলালের (রা) উৎপীড়ক উমাইয়্যা ইবন খালাফের একটি উরু তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তাছাড়া 'আম্মার

ইবন ইয়াসির ও তিনি একযোগে উমাইয়্যার ছেলে আলীকেও হত্যা করেন।[৮] এ যুদ্ধে তিনি খালিদ ইবন আল-আ'লামকে বন্দী করেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী এমন তোড়জোড় সহকারে মদীনার দিকে ধেয়ে আসে যে, গোটা মদীনায় একটা শোরগোল পড়ে যায়। কুরাইশ বাহিনী মদীনার অনতিদূরে জুল-হুলায়ফায় পৌছালে রাসূল (সা) দু'জন গুপ্তচর পাঠালেন এবং তাদের পিছনে হুবাবকেও পাঠালেন। তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং শত্রু বাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা রাসূলুল্লাহকে (সা) দান করেন।[১০] এ যুদ্ধেও খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডা ছিল তাঁর হাতে। অনেকের ধারণা, ঝান্ডা বাহক তিনি নন, বরং সা'দ ইবন 'উবাদা।[১১]

এই উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দেয় এবং মুসলিম বাহিনী হযরত রাসূলে কারীম (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন যে ১৫ জন মুজাহিদ জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে রাখেন তাঁদের একজন ছিলেন এই হুবাব। এ যুদ্ধে তিনি মৃত্যুর জন্য বাই'য়াত করেছিলেন।[১২]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জা ও বনু নাদীরের বিষয়ে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাইলে হুবাব বলেন ঃ আমরা তাদের বাড়ী-ঘর ঘেরাও করে তাদের যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো। রাসূল (সা) তাঁর মতই গ্রহণ করেন।[১৩]

খাইবার যুদ্ধে খাযরাজ বাহিনীর একাংশের এবং হুনাইন যুদ্ধে গোটা খাযরাজ বাহিনীর ঝান্ডা বাহক ছিলেন তিনি।[১৪] একটি বর্ণনা মতে তাবুক যুদ্ধের সময়ও রাসূল (সা) খাযরাজ বাহিনীর ঝান্ডা তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মদীনার আউস ও খাযরাজ সহ গোটা আনসার সম্প্রদায়ের লোকেরা মসজিদে নববীর অনতিদূরে সাকীফা বনী সা'য়িদা নামক স্থানে সমবেত হয়ে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা শুরু করে। আনসার নেতা সা'দ ইবন 'উবাদার একটি ভাষণের পর তাঁরা প্রায় তাঁকেই খলীফা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এদিকে আনসারদের এ সমাবেশের খবর আবু বকরের (রা) কানে গেল। তিনি 'উমারকে (রা) সাথে নিয়ে সেখানে ছুটে গেলেন। সেখানে খলীফা মুহাজির না আনসারদের মধ্য থেকে হবে, এনিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বাক-বিতন্ডা হয়। এই বিতর্কে হযরত হুবাব ছিলেন হযরত সা'দ ইবন উবাদার (রা) কঠোর সমর্থক। তিনি আনসারদের পক্ষ নিয়ে হযরত 'উমারের (রা) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং দু' পর্যায়ে দু'টি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। হযরত আবু বকরের (রা) ভাষণ শেষ হলে হুবাব উঠে দাঁড়ান এবং আনসারদের সম্বোধন করে বলতে শুরু করেন ঃ[১৬]

'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের এ অধিকার তোমরা হাতছাড়া করো না। জনগণ তোমাদেরই সাথে আছে। তোমাদের চরিত্রের ওপর আঘাত হানতে কেউ দুঃসাহসী

হবেনা। তোমাদের মতামত ছাড়া কেউ কোন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম হবে না। তোমরা হচ্ছো সম্মানী ধনবান, সংখ্যাগুরু, অভিজ্ঞ, সাহসী ও বুদ্ধিমান। তোমরা কি সিদ্ধান্ত নেবে তা দেখার জন্য মানুষ তাকিয়ে আছে। তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করোনা। বিভেদ সৃষ্টি করলে তোমাদের অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিপক্ষ মুহাজিররা তোমাদের দাবী যদি না-ই মানে তাহলে আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং তাদের মধ্য থেকে একজন--মোট দু'জন আমীর হবেন।'

হযরত হুবাবের (রা) এই দুই আমীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হযরত 'উমার (রা) বলে ওঠেন ঃ 'দূর! এক শিং-এর ওপর দু'জনের অবস্থান অসম্ভব।' 'উমারের (রা) বক্তব্য শেষ হলে তিনি আবার বলতে শুরু করেন ঃ 'তোমরা নিজেদের অধিকার শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো। এ ব্যক্তির কথায় কান দিওনা। তাঁর কথা শুনলে তোমাদের এ ক্ষমতার অধিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি আমার সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন ব্যক্তি এবং মানুষ আমার সিদ্ধান্ত দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহর কসম! তোমরা চাইলে এ খিলাফতকে আমরা পাঁচ বছরের একটি উটের বাচ্চায় রূপান্তরিত করে ছাড়বো।' তারপর তিনি মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'ব্যাপারটি আপনাদের হাতে ছেড়ে দিতে আমরা কার্পণ্য করতাম না। যদি না আমাদের আশঙ্কা হতো, যে সম্প্রদায়ের লোকদের পিতা ও ভ্রাতাদের আমরা হত্যা করেছি তারাই এটা হস্তগত করে না নেয়।' 'উমার জবাব দিলেন, 'যদি এমন হয় তাহলে বেঁচে থেকে কোন কল্যাণ নেই। তখন তোমার মরণই শ্রেয়ঃ।' অর্থাৎ 'উমার (রা) আশ্বাস দিলেন, এমনটি কক্ষনো হবেনা। 'আমাদের যাঁরা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদেরই একজনের হাতে আমরা বাই'য়াত করবো যিনি তোমাদের ওপর কোনরকম অন্যায় ও অবিচার করবেন না।'

এত কিছু সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত জনতাকে হযরত আবু বকরের (রা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) থেকে বিরত রাখতে পারলেন না। আনসারদের মধ্য থেকে সর্ব প্রথম হযরত বাশীর ইবন সা'দ (রা) আবু বকরের (রা) হাতে বাই'য়াত করেন। তখন বাশীরকে লক্ষ্য করে হুবাব বলেন ঃ 'তুমি নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারণ করলে? তোমার চাচাতো ভাইয়ের ইমারাত বা নেতৃত্বকে ঈর্ষা করলে?' বাশীর জবাব দিলেন ঃ 'তা নয়; বরং একটি সম্প্রদায়কে আল্লাহ যে অধিকার দিয়েছেন তা নিয়ে বিবাদ করা আমি পছন্দ করিনি।'

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৭] তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছরের মত। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল তেত্রিশ বছর।[১৮]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবুত তুফাইল 'আমের ইবন ওয়াসিলা তাঁর ছাত্র। তিনি হুবাবের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৯]

কবিত্ব ছিল তৎকালীন আরবদের স্বভাবজাত গুণ। হযরত হুবাবের মধ্যেও এ গুণটি ছিল। তিনি কবিতা রচনা করেছেন। ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে তাঁর নামে কিছু

পংক্তি সংকলিত হয়েছে।[২০] তাঁর কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ্ তোমাদের দু'জনের পিতামাতার ভালো করুন! তোমরা কি জাননা যে, মানুষ দু' রকমের—অন্ধ ও চক্ষুষ্মান?

২. আমরা এবং মুহাম্মাদের দুশমনরা-সকলেই সিংহ-পুরুষ। যাদের হুংকার সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

৩. তবে পার্থক্য এই যে, আমরা তাঁকে সাহায্য করেছি এবং আশ্রয় দিয়েছি। আমরা ছাড়া তাঁর আর কোন সাহায্যকারী নেই।

তিনি একজন তুখোড় বক্তা ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ। সাকীফা বনী সা'য়িদায় তিনি যে দু'টি ভাষণ দিয়েছিলেন তা পাঠ করলে তাঁর বাগ্মিতা ও আলঙ্কারিতা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আনসাররা যে খিলাফতের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম, যে কথাটি তিনি একটি অলঙ্কার মন্ডিত বাক্যে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! তোমরা যদি চাও তাহলে অবশ্যই আমরা এ খিলাফতকে পাঁচ বছরের একটি উটের বাচ্চায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।' এখানে তিনি খিলাফতকে উটের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আমরা যুদ্ধকে শক্তিশালী করতে পারি। তেমনিভাবে তিনি আনসারদের মধ্যে স্বীয় মর্যাদা ও স্থান বর্ণনা করেন এভাবে ঃ 'আমি আনসারদের চর্মরোগগ্রস্ত উটের শরীর চুলকাবার খুঁটি এবং তাদের দীর্ঘ ও ফলবান বৃক্ষের ঠেস দানের খুঁটি বা প্রাচীর।'

আরবে চর্মরোগগ্রস্ত উটের জন্য একটি খুঁটি বা কাঠ গেঁড়ে দেওয়া হতো যাতে সে তাতে গা চুলকাতে পারে এবং এর মাধ্যমে সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তেমনিভাবে যে খেজুর গাছটি লম্বা বা ফলবান হওয়ার কারণে উপড়ে পড়ার আশঙ্কা হতো, তাতে ঠেস দিয়ে একটি খুঁটি পুতে দেওয়া হতো অথবা একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হতো। হযরত হুবাব নিজেকে সেই খুঁটি ও প্রাচীরের সাথে তুলনা করেছেন।[২১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-১/৩০২; তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩
২. তাবাকাত-৩/৫৬৭
৩. উসুদুল গাবা-১/৩৬৫; আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৩
৪. তাবাকাত-৩/৫৬৭, ৫৬৮
৫. তাবাকাত-৩/৫৬৭; আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৩; তাজরীদ-১/১২৩
৬. সিমারুল কুলুব-২৩০; আল-ইসাবা-১/৩০২
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/১৩৮; ২৯৯
৮. প্রাগুক্ত-১/১৯১
৯. প্রাগুক্ত-১/৩০৩
১০. উসুদুল গাবা-১/২৫২
১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৭; উসুদুল গাবা-১/২৫২

১২. তাবাকাত-৩/৫৬৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮
১৩. তাবাকাত-৩/৫৬৭
১৪. উসুদুল গাবা-১/১৫২
১৫. হায়াতুস সাহাবা- (আরবী) ১/৪২৩
১৬. ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন ঃ আল-বিদায়া-৫/২৪৫; আনসাবুল আশরাফ-১/৫৮০-৫৮৪; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/৩৩৬-৩৩৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৪০১; তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়া-১/১৬৮-১৬৯; তাবাকাত-৩/৫৬৮; সহীহ বুখারী-২/১০১০
১৭. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩
১৮. তাবাকাত-৩/৫৬৮
১৯. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩
২০. আল-আ'লাম-১/১৬৭; আল-ইসাবা-১/৩০২
২১. তাবাকাত-৩/৫৬৮; তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১/১২৩; হায়াতুস সাহাবা-২/১৬-১৭।

কাতাদা ইবন নু'মান (রা)

নাম কাতাদা। ডাকনাম অনেকগুলি। যেমন ঃ আবু 'উমার, আবু 'উসমান, আবু 'আমর ও আবু 'আবদিল্লাহ।[১] মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের বনু জাফার শাখার সন্তান।[২] মা উনাইসা বিনতু কায়স নাজ্জার গোত্রের কন্যা এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরীও (রা) তাঁর সন্তান। কাতাদা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী বৈপিত্রীয় ভাই।[৩]

তিনি সর্বশেষ 'আকাবার শপথে শরীক হন এবং ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন।[৪] বদর সহ অন্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন।[৫] উহুদ যুদ্ধে তিনি অকল্পনীয় ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। এ যুদ্ধে তিনি ছিলেন মুসলিম তীরন্দায বাহিনীর অন্যতম সদস্য। এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় 'আল-কাতুম' নামক একটি ভাঙ্গা ধনুক দান করেছিলেন।[৬]

উহুদ যুদ্ধের এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) মুশরিক তীরন্দাযরা তাদের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিল। তাঁকেই লক্ষ্য করে তারা তীর ছুড়ছিলো। রাসূলুল্লাহর (সা) আশে পাশে তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজাহিদ মাত্র। অন্যরা এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। এ মুষ্টিমেয় মুজাহিদরা একজনের পর একজন নিজের বুক পেতে দিয়ে প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর থেকে রাসূলকে (সা) আড়াল করে রাখছিলেন। এভাবে দশজন শহীদ হওয়ার পর হযরত কাতাদার পালা আসলো। তিনি ছিলেন একাদশ ব্যক্তি। তিনি রাসূলকে (সা) পিছনে রেখে শত্রুবাহিনীর দিকে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর ছুটে এসে তাঁর একটি চোখে আঘাত হানে। চোখটি কোটর থেকে ছিটকে গন্ডদেশে গড়িয়ে পড়ে। অন্য একটি বর্ণনা মতে চোখটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তিনি তা হাতে ধরে রাখেন। লোকেরা ফেলে দেওয়ার পরামর্শ দিল। তিনি রাজী হলেন না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আরজ করলেন ঃ আমার এক স্ত্রী আছে। আমি তার প্রতি আসক্ত। তাকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসি। আমার এ অবস্থায় সে আমাকে ঘৃণা করতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে আমি যা করেছি তা শুধু শাহাদাত লাভের জন্যই করেছি। রাসূল (সা) নিজ হাতে চোখটি আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ! কাতাদা তার মুখমন্ডল দ্বারা তোমার নবীকে (সা) রক্ষা করেছে। সুতরাং তুমি এখন তার এ চোখটিকে অন্যটি অপেক্ষা সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন করে দাও।' রাসূলুল্লাহর (সা) এ দু'আ কবুল হয়। এ চোখটি অন্যটি অপেক্ষা খুবই সুন্দর হয় এবং দৃষ্টিশক্তিও তীক্ষ্ণ হয়।[৭]

পরবর্তীকালে তাঁর সন্তানদের কেউ একজন উমাইয়্যা খলীফা হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের দরবারে যান। তিনি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দান করেন। এখানে তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ দেয়া হলো ঃ[৮]

'আমি তো সেই ব্যক্তির সন্তান যার একটি চোখ তার গন্ডদেশে গড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর নবী মুস্তাফার হাত তাকে যথাস্থানে বসিয়ে দেয়।

তারপর তা পূর্বের মত হয়ে যায়। সেই চোখটির রূপ কী চমৎকার হয় এবং স্থাপনও হয় কত সুন্দর!'

হযরত কাতাদার চোখটি কোন্ যুদ্ধে আহত হয় সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। বদর, উহুদ ও খন্দক–এ তিনটি যুদ্ধের কথাই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মালিক, দারু কুতনী, বায়হাকী ও হাফেজ ইবন 'আবদিল বার উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা সর্বাধিক সঠিক বলে মনে করেছেন।[৯]

মক্কা বিজয় অভিযানে বনু জাফারের ঝান্ডা হযরত কাতাদার হাতেই ছিল।[১০] হুনাইন যুদ্ধের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে যাঁরা দৃঢ়পদ ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[১১]

হিজরী ১১ সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) উসামা ইবন যায়িদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সিরিয়া সীমান্তের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মুহাজির ও আনসারদের প্রায় সকল উঁচু স্তরের সাহাবী এ বাহিনীতে ছিলেন। হযরত কাতাদাও (রা) ছিলেন এর একজন সদস্য।[১২]

তিনি হিজরী ২৩/ খ্রীস্টাব্দ ৬৪৪, ৬৫ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন খিলাফতের মসনদে আসীন।[১৩] খলীফা 'উমার (রা) জানাযার নামায পড়ান। 'উমার, আবু সাঈদ আল খুদরী ও মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা)- এই তিনজন কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন।[১৪] ইমাম নাওয়াবী বলেন, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ও আল-হারেস ইবন খুযায়মা এদুজন কবরে নামেন।[১৫]

'উমার ও 'উবাইদ নামে তাঁর দুই ছেলের নাম জানা যায়। স্ত্রীর নাম জানা যায় না। তবে স্ত্রীর সাথে তাঁর গভীর প্রেম-প্রীতির সম্পর্কের কথা জানা যায়।[১৬] উহুদ যুদ্ধের পূর্বে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত তাবে'ঈ মুহাদ্দিস হযরত 'আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদার দাদা। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক তাঁর সূত্রে প্রচুর বর্ণনা নকল করেছেন।[১৭] এই 'আসিম হিঃ ১২০ অথবা ১২৯ সনে ইনতিকাল করেন।[১৮]

তিনি ছিলেন মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন। শরীয়াতের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর নিকট জানতে চাইতেন। হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু কাতাদার মত বিশিষ্ট সাহাবীরা যে তাঁর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করতেন তা হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[১৯]

হযরত কাতাদা ইবন নু'মানের (রা) বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা-৭ (সাত)। তারমধ্যে ইমাম বুখারী এককভাবে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২০]

তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আবু সাঈদ আল খুদরী, হুজাইফা, মাহমুদ ইবন লাবীদ, 'উবাইদ ইবন হুনাইন, 'আয়াদ ইবন 'আবদিল্লাহ ও তাঁর ছেলে 'উমার ইবন কাতাদার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আছেন।[২১]

তাঁর চরিত্রে যুহ্দ ও তাকওয়ার প্রাধান্য ছিল। একবার শুধু সূরা ইখলাস পাঠ করতে করতে রাত শেষ করে ফেলেন।[২২]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় হযরত কাতাদার বংশের মধ্যে চুরির একটি ঘটনা ঘটে। চোরটি ছিল একজন মুনাফিক। সে চুরির দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর পায়তারা করে। হযরত কাতাদা তাকেই সন্দেহ করেছিলেন। তিনি তাঁর সন্দেহের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রকাশ করলে তিনি বেশ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এদিকে যাকে সন্দেহ করা হয়েছিল সে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে নিতান্ত ভালো মানুষ সেজে কাতাদার এহেন সন্দেহের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ পাক সূরা আন-নিসার ১০৫ থেকে ১১৩ নং আয়াতগুলি নাযিল করে প্রকৃত ঘটনা রাসূলকে অবহিত করেন এবং একই সাথে কাতাদার সত্যবাদিতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৩]

হযরত কাতাদার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযা প্রকাশের ঘটনা সীরাতের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। একদিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘন অন্ধকার রাত। রাসূল (সা) ঈশার নামাযের জন্য আসলেন। কাতাদাও হাজির হলেন। বিদ্যুৎ চমকালে রাসূল (সা) কাতাদাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাতাদা? তিনি জবাব দিলেন ঃ আজ লোকের উপস্থিতি কম হবে– একথা ভেবে আমি ইচ্ছে করেই হাজির হয়েছি। তখন রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ ঘরে ফেরার সময় আমার কাছে এসো। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করলেন। একটি খেজুরের শাখা তাঁর হাতে দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'ধর। এটা হাতে থাকলে তোমার সামনে দশজন এবং পিছনে দশজন আলোকিত করতে থাকবে। আর বাড়ী পৌঁছে ঘরের আশেপাশে কোথাও অন্ধকার দেখলে কোন কথা না বলেই এটা দ্বারা সেখানে আঘাত করবে। কারণ, সে শয়তান।' তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশমত খেজুর শাখাটি হাতে করে বাড়ী ফিরলেন। সত্যি সত্যিই বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি শক্ত লোম বিশিষ্ট গোলাকৃতির ক্ষুদ্র প্রাণী দেখতে পেলেন এবং সেই শাখাটি দিয়ে আঘাত করলে সেটা পালিয়ে যায়।[২৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৫৮
২. তাকরীবুত তাহজীব-২/১২৩
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; উসুদুল গাবা-৪/১৯৫; আল-আ'লাম ৬/২৭; আল-ইসাবা-৩/২২৫
৪. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; তাহজীবুল আসমা-২/৫৮
৫. সহীহ বুখারী-২/৫৭৪; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৮৭; আল-আ'লাম-৬/২৭
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৩; ৫২৩
৭. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪; হায়াতুস সাহাবা-১/৫০৬, ৫৫৯; ২/৩৩৪; ৩/৫৫৫ আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; আল-ইসাবা-৩/২২৫
৮. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪; তাহজীবুল আসমা-২/৫৮; উসুদুল গাবা-৪/১৯৬
৯. তাহজীবুল আসমা-২/৫৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৫৫, ২/৩৩৪; আল ইসাবা-৩/২২৫; উসুদুল গাবা-৪/১৯৫
১০. আল-আ'লাম-৬/২৭; তাহজীবুল আসমা-২/৫৮

১১. আল-ইসাবা-৩/২২৫
১২. তাবাকাত-২/১৩৬; হায়াতুস সাহাবা-১/৪২৩
১৩. তাকরীবুত তাহজীব-২/১২৩; আল-আ'লাম-৬/২৭; শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪
১৪. উসুদুল গাবা-৪/১৯৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১; আল-ইসাবা-৩/২২৬
১৫. তাহজীবুল আসমা-২/৫৯
১৬. আল ইসতীয়াব-২/৫৪৫
১৭. উসুদুল গাবা-৪/১৯৬
১৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫২৫
১৯. সহীহ বুখারী-২/৫৭০; মুসনাদ-৪/১৫
২০. তাহজীবুল আসমা-২/৫৮; আল-আ'লাম-৬/২৭
২১. আল-ইসাবা-৩/২২৫; তাহজীবুল আসমা-২/৫৯
২২. সীয়ারে আনসার-১/১৩০
২৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৮-২৮০
২৪. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১১; আল-ইসাবা-৩/২২৬; উসুদুল গাবা-৪/১৯৬

খুযায়মা ইবন সাবিত (রা)

আবু 'আম্মারা খুযায়মা নাম এবং জু-আশ্-শাহাদাতাইন উপাধি। পিতা সাবিত ইবনুল ফাকিহ্ মদীনার আউস গোত্রের এবং মাতা কাবশা বিনতু আউস খাযরাজ গোত্রের সন্তান। আউস গোত্রের খাতম শাখার সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে খাতমী বলা হয়। তিনি একজন আনসারী সাহাবী।[১] জাহিলী ও ইসলামী আমলে মদীনার আউস গোত্রের একজন সম্ভ্রান্ত নেতা এবং সাহসী বীর।[২]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে কোন এক সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি 'উমাইর ইবন 'আদী ইবন খারাশাকে সংগে নিয়ে নিজ গোত্রের মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলেন।[৩] ইবন হিশাম বলেন ঃ বনু খাতমার যাঁরা প্রথম পর্বে চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন 'উমাইর ইবন 'আদী, 'আবদুল্লাহ ইবন আউস ও খুযায়মা ইবন সাবিত'।[৪]

ইবন সা'দের মতে তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সিফ্ফীনে মারা যান।[৫] তবে গ্রহণযোগ্য মতে তিনি উহুদ ও তার পরবর্তী যুদ্ধ ও অভিযানগুলিতে অংশগ্রহণ করেন।[৬] ইমাম জাহাবী সিফ্ফীন যুদ্ধের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলেন ঃ যে সকল অবদরী সাহাবী সিফ্ফীনে আলীর পক্ষে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে খুযাইমা অন্যতম।[৭] মক্কা বিজয় অভিযানে স্বীয় গোত্র বনু খাতমার ঝান্ডা ছিল তাঁরই হাতে।[৮] তিনি মূতা অভিযানেও অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি মূতা অভিযানে অংশগ্রহণ করি এবং একদিন এক ব্যক্তির একটি শ্বেত-শুভ্ররত্ন ছিনিয়ে নিই। যুদ্ধের পর আমি সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির হই। তিনি সেটা আমাকে দান করেন এবং আমি তা খলীফা 'উমারের (রা) সময়ে বিক্রী করে খাতমা গোত্রের নিকটবর্তী একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি।[৯] উটের যুদ্ধে তিনি আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করলেও তরবারি কোষমুক্ত করেননি। সিফ্ফীনে আলীর (রা) সাথে রণাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ আম্মার নিহত না হওয়া পর্যন্ত এবং কারা তাঁকে হত্যা করে তা না দেখা পর্যন্ত আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ আম্মারকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। অতঃপর মু'য়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে 'আম্মার নিহত হলে তিনি মন্তব্য করেন ঃ এখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এরপর সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তরবারি কোষমুক্ত করে একটি কবিতার দু'টি চরণ গুন গুন করে আবৃত্তি করতে করতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১০] চরণ দু'টির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আমরা 'আলীর হাতে বাই'য়াত করেছি এবং যে ফিতনার ভয় করেছি তার জন্য আবুল হাসানই যথেষ্ট।
২. 'আলীর মধ্যে শামবাসীদের সকল কল্যাণ বিদ্যমান; কিন্তু তাদের মধ্যে 'আলীর গুণাবলীর কিছুমাত্র নেই।

এভাবে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে সিফ্ফীনের ময়দানে শহীদ হন। এটা হিজরী

৩৭/ খ্রীঃ ৬৫৭ সনের ঘটনা।[১১] মৃত্যুকালে তিনি 'আম্মারা, 'উমার ও উমারা নামে তিনটি ছেলে-মেয়ে রেখে যান।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ৩৮ (আটত্রিশ)[১২] জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, 'আম্মারা ইবন 'উসমান, ইবন হুনাইফ, 'আমর ইবন মায়মূন আউদী, ইবরাহীম ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আবু 'আবদিল্লাহ জাদালী, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'আতা ইবন ইয়াসার প্রমুখের ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ঈমানের দৃঢ়তা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঈমানী মজবুতীর পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা দ্বারা। একবার রাসূল (সা) এক আরব বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া খরিদ করেন। লোকটির নাম সাওয়া ইবন কায়স আল-মুহাযিলী। এ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। এ কারণে বিষয়টি কারো জানা ছিলনা। রাসূল (সা) দর দাম ঠিক ও কথা পাকাপাকি করে লোকটিকে সংগে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে থাকেন। পথিমধ্যে অন্য এক খরিদদার ঘোড়াটির মূল্য বেশী বলায় ঘোড়ার মালিক রাসূলকে (সা) ডেকে বলে ঘোড়া যদি নিতে চান নিয়ে নিন, নইলে আমি এর কাছে বিক্রী করে দিই। কথাটি সে এমনভাবে বলে যেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তার বেচা-কেনা হয়নি। রাসূল (সা) বললেন, ঘোড়াটি তো আগেই আমার কাছে বিক্রী করে ফেলেছো। লোকটি বললো না, আমি বিক্রী করিনি। যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে কোন সাক্ষী হাজির করুন। দু'জনের কথার মাঝখানে মুসলিম জনতা জড় হয়ে গেল। তারা বললো, রাসূল (সা) সত্য বলছেন। লোকটি অস্বীকার করে সাক্ষী হাজির করার দাবী জানাতে লাগলো। ইত্যবসরে হযরত খুযায়মা সেখানে উপস্থিত হলেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ঘোড়াটি বিক্রী করেছো। খুযায়মার এমন কথায় খোদ রাসূল (সা) বিস্মিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কিসের ভিত্তিতে তুমি এমন সাক্ষ্য দিলে? তুমি তো উপস্থিত ছিলে না? খুযায়মা উত্তর দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তা সবই সত্য বলে জেনেছি। আর একথাও জেনেছি, আপনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, খুযায়মা বলেন ঃ আপনি আসমানের যে সব খবর দেন তা আমি বিশ্বাস করি। আর আপনি নিজে যা বলছেন তা আমি বিশ্বাস করবো না? সে দিনই হযরত রাসূলে কারীম (সা), হযরত খুযায়মার একার সাক্ষ্যকে দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দেন এবং সে দিন থেকেই তাঁর লকব বা উপাধি হয় 'জূ-আশ্-শাহাদাতাইন' বা দু'সাক্ষের অধিকারী ব্যক্তি[১৩]। আবু দাউদ ইমাম যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ খুযায়মা একা কারো জন্য সাক্ষ্য দিলে তার একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।[১৪]

কোন কোন সীরাত গ্রন্থে দু'জন 'জূ-আশ্-শাহাদাতাইন' লকবধারী ব্যক্তিকে দেখা যায়। অন্য জন খুযায়মা ইবন সাবিত ইবন শাম্মাস। দু'জন কি একই ব্যক্তি না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তা বলা কঠিন। আল-ইসাবা গ্রন্থের ২২৫১ ও ২২৫২ নং জীবনী দু'টিতে তাঁদের বর্ণনা এসেছে।[১৫]

সহীহ্ বুখারীতে হযরত খুযায়মার উপরোক্ত ঘটনাটি অন্য একটি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত বর্ণনা করেন ঃ আমরা যখন 'মাসহাফ' সংকলন করছিলাম তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত যা আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনতাম, পেলাম না। তবে আয়াতটি শুধু খুযায়মা আনসারীর নিকটই ছিল। আর তাঁর সাক্ষ্যকে রাসূল (সা) দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।[১৬]

তাঁর সম্মান ও মর্যাদার অনেক কথা সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলে পাকের পবিত্র কপালে চুমু দিচ্ছেন। স্বপ্নের কথা রাসূলকে (সা) বলার পর তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পার। অতঃপর খুযায়মা উঠে এগিয়ে গিয়ে রাসূলের (সা) পবিত্র কপালে চুমু দেন।[১৭]

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি স্বপ্ন দেখেন, রাসূলকে (সা) সিজদা করছেন। একথা রাসূলের (সা) নিকট বলার পর রাসূল (সা) স্বীয় কপাল দ্বারা খুযায়মার কপাল স্পর্শ করেন।[১৮]

একবার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলিন্য নিয়ে বাকযুদ্ধ হয়। তখন আউস গোত্রের লোকেরা খুযায়মার নামটিও অতি গর্বের সাথে উল্লেখ করে বলে, আমাদের মধ্যে খুযায়মা আছেন যাঁর সাক্ষ্যকে রাসূল (সা) দু'জনের সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা দিয়েছেন।[১৯]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১৭০; তারীখে ইবন 'আসাকির-৫/১৩২
২. আল-আ'লাম-২/৩৫১
৩. আল-ইসাবা-১/৪২৫,৪২৬,
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৩৮
৫. আল-ইসাবা-১/৪২৬
৬. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১৭০; তারীখে ইবন আসাকির-৫/১২৩
৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/১৭১
৮. আল-ইসাবা-১/৪২৫
৯. তারীখে ইবন 'আসাকির-৫/১৩২
১০. মুসনাদ-৫/২১৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১৭০
১১. তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা-১৭০; আল-ইসাবা-১/৪২৬, তারীখু ইবন 'আসাকির-৫/১৩২; আল-আ'লাম-২/৩৫১
১২. আল-আ'লাম-২/৩৫১
১৩. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ তারীখে ইবন আসাকির-৫/১৩৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৫০৯; তারকাত-৪/৩৭৮; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৬২-৬৩; আল-আজকিয়া-২৭-২৮।
১৪. আল-ইসাবা-১/৪২৫
১৫. আল-আ'লাম-২/৩৫১; আল-ইসাবা-১/৪২৯-৩০
১৬. বুখারী-২/৭০৫; তারীখে ইবন আসাকির-৫/১৩৩; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৭০
১৭. মুসনাদ-৫/২১৪,
১৮. প্রাগুক্ত-৫/২১৫
১৯. তারীখে ইবন আসাকির-৫/১৩৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৫

আবু দুজানা (রা)

আসল নাম সিমাক, ডাকনাম আবু দুজানা। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু সায়িদা শাখার সন্তান। খাযরাজ নেতা বিখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) চাচাতো ভাই। পিতার নাম খারাশা ইবন লাওজান, মতান্তরে আউস ইবন খারাশা এবং মাতার নাম হাযমা বিনতু হারমালা।[১] আবু দুজানা একজন খ্যাতিমান আনসারী সাহাবী এবং একজন সাহসী বীর। ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিরাট আত্মত্যাগ স্বীকৃত।[২]

হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে 'উতবা ইবন গাযওয়ানের (রা) সাথে তাঁর দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[৩] 'আল্লামা ইবন হাজার (রহ) তাঁর বদরে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতের কথা বর্ণনা করেছেন।[৪] ইবন হিশামও তাঁর বদরে শরীক হওয়ার কথা বলেছেন।[৫] বদরের যুদ্ধের দিন তাঁর মাথায় একটি লাল ফেটা বাঁধা ছিল। মুসা ইবন মুহাম্মাদ বলেন ঃ সেদিন জনতার মাঝে এ লাল ফেটার জন্যই তাঁকে স্পষ্টভাবে চেনা যাচ্ছিল।[৬] মক্কায় যারা হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) নির্মমভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, আবুল আসওয়াদ ইবনল মুত্তালিব ছিল তাদের অন্যতম। একটি বর্ণনামতে বদরে আবু দুজানা তার ছেলে আবু হাকীমা যাম'য়া ইবনুল আসওয়াদকে হত্যা করেন। তাছাড়া আবু মুসাফি' আল-আশ'য়ারী ও মা'বাদ ইবন ওয়াহাবকেও হত্যা করেন।[৭]

আবু দুজানা উহুদ যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। এবং চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তেও তার সাথে অটল থাকেন। সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মৃত্যুর জন্য বাই'য়াত করেছিলেন। আনাস ইবন মালিক বলেন ঃ যুদ্ধের পূর্বক্ষণে রাসূল (সা) একখানি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন ঃ এটি কে নিবে? উপস্থিত সকলেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠেঃ আমি, আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কে এর হক আদায় করতে পারবে? তখন সবাই চুপ থাকলো; কিন্তু আবু দুজানা বললেন ঃ আমি পারবো এর হক আদায় করতে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আবু দুজানা রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর হক কি? তিনি জবাব দিলেন; এ দিয়ে কোন মুসলমানকে হত্যা না করা, এটি নিয়ে কাফিরদের ভয়ে পালিয়ে না যাওয়া।[৮]

যুদ্ধের সময় মাথায় একটি লাল ফেটা বাঁধা ছিল তাঁর অভ্যাস। সেটা বাঁধলে বুঝা যেত তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহর (সা) হাত থেকে তরবারিখানি নিয়ে তিনি মাথায় ফেটা বাঁধলেন। তারপর একটা অভিজাত চলনে সৈনিকদের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।[৯] কিছুক্ষণ পর কবিতার কিছু পংক্তি গুন গুন করে গাইতে গাইতে শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবিত হলেন। দু'টি পংক্তির অর্থ নিম্নরূপ ঃ[১০]

১. আমি সেই ব্যক্তি, যাকে আমার বন্ধু পাহাড়ের পাদদেশে খেজুর বাগানের সন্নিকটে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন।

২. আমি যেন সৈনিকদের সারির শেষ প্রান্তে অবস্থান না করি। আর তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) তরবারি দ্বারা শত্রু নিধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উহুদের রণক্ষেত্রের দিকে তিনি অভিজাত ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়েছিলেন, তা দেখে রাসূল (সা) মন্তব্য করেছিলেন ঃ যদিও এভাবে চলা আল্লাহর পসন্দ নয়, তবে এক্ষেত্রে কোন দোষ নেই।[১১]

হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম বলেন, আবু দুজানার আগেই আমি তরবারিখানি চেয়েছিলাম। কিন্তু রাসূল (সা) আমাকে না দিয়ে দিলেন তাঁকে। অথচ আমি হলাম রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিনতু আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। তাই তরবারিখানি তাঁকে দেওয়ার রহস্য জানার জন্য আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রাসূল (সা) প্রদত্ত তরবারি হাতে নিয়ে অগ্রসর হলেন। যে দিকে এগুতে লাগলেন শত্রুদের মাঝে ত্রাস ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। একসময় তিনি পাহাড়ের ঢালে নেমে গেলেন, যেখানে কুরাইশ রমণীরা হিন্দার নেতৃত্বে রণসঙ্গীত গেয়ে তাদের সৈনিকদের উৎসাহিত করছিলো। তারা আবু দুজানাকে দেখে ভীত হয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করে দিল। কিন্তু কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো না। কিন্তু না, আবু দুজানা তাদের কাউকে স্পর্শ করলেন না। ফিরে এলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হিন্দার মাথার ওপর তরবারি রেখে তিনি আবার তা উঠিয়ে নিলেন। যুবাইর তাঁর পিছনেই ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন। আবু দাজানা জবাব দিলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) তরবারি দিয়ে অসহায় কোন নারীকে হত্যা করতে আমার ইচ্ছা হয়নি।[১২]

উহুদের বিপর্যয়ের সময় যে মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলকে (সা) ঘিরে নিজেদের দেহকে ঢাল বানিয়ে অটল হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের মধ্যে আবু দুজানা অন্যতম।[১৩] এদিন তিনি নিজের পিঠ পেতে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পিঠ রক্ষা করেছিলেন। তাই শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর-বর্শার আঘাতেই তাঁর পিঠ ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো।[১৪]

এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে পৌত্তলিক আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ, রাসূলকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। আবু দুজানা তাকে তরবারি দ্বারা প্রচন্ড আঘাত হেনে বলে ওঠেন ঃ নে, আমি ইবন খারাশা। সেই আঘাতে নরাধম আবদুল্লাহ ধরাশায়ী হয়। তখন হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জন্য এই বলে দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি ইবন খারাশার প্রতি সন্তুষ্ট হও, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।[১৫]

রাসূল (সা) উহুদের যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে কন্যা ফাতিমাকে (রা) বললেনঃ লও, আমার তরবারিখানি ধুয়ে ফেল। আজ সে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে। হযরত আলীও (রা) ফাতিমার নিকট একই আবেদন করে বললেন ঃ আজ আমি খুব লড়েছি। রাসূল (সা) তার জবাবে বললেন, হাঁ, তুমি যদি ভালো লড়ে থাক তাহলে সাহল ইবন হুনাইফ ও আবু দুজানা—দু'জনই ভালো লড়েছে।[১৬]

আল্লাহপাক বনু নাদীরের যাবতীয় গনীমতের মালিকানা দান করেন রাসূলকে (সা)। তিনি সেই সম্পদ শুধুমাত্র প্রথম পর্বের মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেন। তবে সাহল ইবন হুনাইফ ও আবু দুজানা– এ দু'জন আনসারীকেও তাঁদের দারিদ্র্যের কারণে কিছু কিছু দান করেন। এ সময় আবু দুজানা কিছু ভূমি লাভ করেন যা বহু দিন পর্যন্ত ইবন খারাশার ভূমি নামে পরিচিত ছিল।[১৭]

একটি বর্ণনা মতে তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত রাসূলে কারীম (সা) খাযরাজ গোত্রের ঝান্ডাটি আবু দুজানার হাতে অর্পণ করেন।[১৮]

মোটকথা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ 'রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালের সকল যুদ্ধে তার প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল।'[১৯]

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত ইয়ামামার ভয়াবহ যুদ্ধে তিনি চরম দুঃসাহসের পরিচয় দেন। যুদ্ধটি ছিল ভন্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে। সে তার একটি সুরক্ষিত উদ্যানের মধ্য থেকে মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল। উদ্যানটি শক্ত প্রাচীর বেষ্টিত থাকার কারণে মুসলিম বাহিনী ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে আবু দুজানা ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ 'আমার মুসলমান ভাইয়েরা! আমাকে ভিতরে ছুড়ে মার।' এভাবে তিনি প্রাচীর তো টপকালেন; কিন্তু পা ভেঙ্গে গেল। তা সত্ত্বেও প্রাচীরের ফটক থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হলেন এবং মুসলিম সৈন্যরা ভিতরে না ঢোকা পর্যন্ত নিজের স্থানে অটল থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ ও ওয়াহশীর সাথে তিনি ভন্ড মুসায়লামার হত্যায় অংশ গ্রহণ করেন। অবশেষে এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইবন সা'দের মতে এটা হিজরী ১২ সনের, আর আল্লামা যিরিক্লীর মতে হিঃ ১১/খ্রীঃ ৬৩২ সনের ঘটনা।[২০]

আবু দুজানার সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত না থাকলেও 'ইবনুল আসীরের' ভাষায় ঃ 'তিনি ছিলেন সম্মানিত সাহাবীদের একজন এবং তাঁদের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি।'[২১]

প্রবল একটা ঈমানী আবেগ তাঁর মধ্যে ছিল। এর প্রমাণ তিনি দিয়েছেন ইয়ামামার যুদ্ধে। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন উহুদ যুদ্ধে। এ যুদ্ধের এক মারাত্মক পর্যায়ে যখন মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়ে তখন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈনিক তাঁর ধারে কাছে ছিলেন তাঁদের মধ্যে মুস'য়াব ইবন 'উমাইর ও আবু দুজানা ঢাল হিসেবে নিজেদের বুক পেতে দেন। মুসয়াব তো জীবনই দান করেন। আর আবু দুজানা নিজের দেহ ঝাঝরা করে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

তাঁর চলার ভঙ্গিটা ছিল এক বিশেষ ধরনের যা তখন রীতিমত একটা দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল। 'আল-মাশহারা' নামে তাঁর একটি বর্ম ছিল। যুদ্ধের সময় তিনি সেটা

পরতেন। এ কারণে তাঁকে 'জুল মাশহারা' (আল-মাশহারার অধিকারী) বলা হতো। তাঁকে 'জু-আস্-সায়ফাইন'ও বলা হতো। কারণ উহুদে তিনি দু'টি তরবারি দিয়ে লড়েছিলেন। একটি নিজের এবং অপরটি রাসূলুল্লাহর (সা)। 'জু-আস্-সায়ফাইন'-অর্থ দুই তরবারির অধিকারী।[২২]

আবু দুজানা একবার রোগশয্যায় শায়িত। এক ব্যক্তি তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি তাঁর চেহারায় নূরের ঝলক দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার চেহেরা এমন উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন ঃ দু'টি অভ্যাস ছাড়া আমার তেমন কোন 'আমল নেই। একটি হচ্ছে, অপ্রয়োজনীয় কোন কথা আমি বলিনে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আমার অন্তরটি সব সময় মুসলমানদের কল্যাণকামী।[২৩] উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাঁর কর্মময় জীবন, চরিত্র ও গুণাবলী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫৫৬; উসুদুল গাবা-৫/১৮৪; আল-ইসাবা-৪/৫৮
২. আল-আ'লাম-৩/২০২
৩. তাবাকাত-৩/৫৫৬; উসুদুল গাবা-৫/১৮৪
৪. আল-ইসাবা-৪/৫৮
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯৫, ৬৯৬
৬. তাবাকাত-৩/৫৫৬
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/১৪৯, ২৯৯, ৩০১
৮. আল-ইসাবা-৪/৫৯
৯. সিরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬, ৬৮
১০. তাবাকাত-৩/৫৫৬; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৬, ৫৫৭; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৮
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৮; আল-আ'লাম-৩/২০২
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৮
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮
১৪. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৯
১৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৯, ৩২০, ৩২৪
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১০০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪২
১৭. তাবাকাত ঃ মাগাযী খন্ড-১৪২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৯২; আনসাবুল আশরাফ-১/৫১৮
১৮. হায়াতুস সাহাবা-১/৪২৩
১৯. সীয়ারে আনসার-১/২৩৬
২০. তাবাকাত-৩/৫৫; আল-আ'লাম-৩/২০২; উসুদুল গাবা-৫/১৮৪
২১. উসুদুল গাবা-৫/১৮৪
২২. আল-আ'লাম-৩/২০২
২৩. তাবাকাত-৩/৫৫৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৩০

কুলসূম ইবনুল হিদ্‌ম (রা)

ইসলামের ইতিহাসে হিজরাত অধ্যায় আলোচনা করতে গেলেই হযরত কুলসূম ইবনুল হিদমের (রা) পবিত্র নামটি বারবার এসে যায়। ইসলামের প্রচার প্রসারে তাঁর অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে তিনি যে আশ্রয় দিয়েছেন তাতেই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বিস্তারিত জীবন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

তাঁর ডাকনাম আবু কায়স এবং আসল নাম কুলসূম। পিতা আল-হিদ্‌ম ইবন ইমরাউল কায়স। আউস গোত্রের বনী 'আমর ইবন 'আওফের সন্তান। মদীনার কুবা পল্লীর অধিবাসী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) একজন আনসার সাহাবী। হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর জীবনে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণের অল্প কিছুদিন পরেই ঐতিহাসিক হিজরাত সংঘটিত হয়।[১]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে হিজরাত করে সর্বপ্রথম মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে 'আমর ইবন আওফ গোত্রে চারদিন অবস্থান করেন।[২] সর্বাধিক সঠিক বর্ণনা মতে এ চারদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও তাঁর সফর সঙ্গীকে আতিথেয়তার দুর্লভ সৌভাগ্য যিনি অর্জন করেন, তিনি এই কুলসূম ইবনুল হিদ্‌ম (রা)। রাসূল (সা) ও আবু বকর (রা) কুবায় এসে তাঁর গৃহেই ওঠেন। এ ব্যাপারে ইবন ইসহাক, মূসা ইবন 'উকবা ও আল-ওয়াকিদী ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৩] ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূল (সা) কুবায় কুলসূমের গৃহে অবতরণ করেন। তবে কেউ কেউ যে বলেছেন, কুলসূমের নয় বরং সা'দ ইবন খায়সামার গৃহে অবস্থান করেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেনঃ রাসূল (সা) কুলসূমের গৃহে অবস্থান করতেন এবং সা'দের গৃহে লোকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। কারণ, সা'দ ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর পরিবার-পরিজন ছিল না। একারণে মক্কা থেকে আগত অবিবাহিত মুহাজিরগণ সা'দের গৃহেই আশ্রয় নিতেন। আর তাই ঐ গৃহটি অবিবাহিতদের আবাসস্থল বলে লোকেরা আখ্যায়িত করতো।[৪] তাঁর গৃহে চারদিন অবস্থানের পর তিনি মদীনার মূল ভূখন্ডে আবু আইউব আল-আনসারীর (রা) গৃহে অবস্থান করেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আগমনে তিনি এত খুশী হন যে বাড়ীর চাকর-বাকরদেরকে চিৎকার করে হাঁক-ডাক শুরু করেন। নাজীহ নামে তাঁর এক চাকর ছিল। রাসূল (সা) তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে তিনি নাজীহ, নাজীহ বলে ডাকাডাকি শুরু করেন। নাজীহ অর্থ সফলকাম। রাসূল (সা) এ নামকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করলেন। তিনি আবু বকরকে (রা) বললেনঃ ওহে আবু বকর! সফলকাম হয়েছ।[৫]

শুধুই কি হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও আবু বকর (রা) তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন? না, তা নয়। আরো অনেকে মক্কা থেকে এসে প্রথমে তাঁর ওখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) কুবায় তাঁর গৃহে অবস্থান কালেই আলী (রা)

ও সুহাইব (রা) মক্কা থেকে এসে সেখানেই রাসূলের (সা) সাথে মিলিত হন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁদের যখন দেখা হয় তখন তাঁর সামনে ছিল কুলসূম ইবনুল হিদমের উপস্থাপিত উম্মু জারজান নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট জাতের খেজুর। সুহাইব তখন ভীষণ ক্ষুধার্ত। তাছাড়া তাঁর ছিল চোখের পীড়া। এ অবস্থায় তিনি সেই খেজুর ভীষণ আগ্রহের সাথে খেতে থাকেন। তাঁকে এভাবে খেতে দেখে রাসূল (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেনঃ কুরাইশরা বন্দী করে আমার ওপর অত্যাচার করেছিল। তারপর আমার সকল ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমার নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবন ক্রয় করে খুব দ্রুত চলে এসেছি। রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ তুমি লাভবান হয়েছো।[৬]

বালাজুরী কুলসূম ইবনুল হিদমের গৃহে আলীর (রা) অবস্থানকালের একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি সেখানে থাকাকালে লক্ষ্য করেন যে, প্রতিদিনই গভীর রাতে পাশের একটি বাড়ীর দরজা খোলা হয় এবং লোকজনের আনাগোনার শব্দ হয়। এতে তাঁর মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। একদিন তিনি পাশের বাড়ীর মহিলাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। মহিলাটি বলেন ঃ জনাব, আমি একজন অনাথ বিধবা। সাইল ইবন হুনাইফ প্রতিদিন রাতে গোপনে মদীনার কাঠের তৈরী বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে তার কাঠগুলি জ্বালানীর জন্য আমাকে দিয়ে যায়।[৭] এর দ্বারা বুঝা যায় কুলসূমের বাড়ীতে তাঁর অবস্থান বেশ দীর্ঘ হয়।

তাছাড়া আবু মা'বাদ আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা)[৮] যায়িদ ইবন হারিসা (রা)[৯] আবু মারসাদ কান্নায ইবন হিসন (রা)[১০] ও আবু কাবশা (রা)[১১] মক্কা থেকে এসে সর্বপ্রথম তাঁরই আশ্রয়ে থাকেন। আল-হায়সাম ইবন 'আদীর মতে আবু 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহও (রা) প্রথমে তাঁর বাড়ীতে ওঠেন।[১২] এভাবে ইতিহাসের পাতা উল্টালে আরো অনেক মুহাজিরের নাম পাওয়া যাবে যাঁদেরকে তিনি সেই চরম দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে হযরত হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের (রা) সাথে কুলসূমের মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১৩]

মদীনায় মসজিদে নাবাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মীনীদের আবাসস্থল নির্মাণের কাজ যখন চলছে তখনই তাঁর পরপারের ডাক এসে যায়। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই হয় বদর যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধ বা অভিযানে অংশ গ্রহণের সুযোগ তিনি পাননি।[১৪] রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পর এটাই ছিল কোন আনসারী সাহাবীর মৃত্যু। এর কিছুদিন পরেই ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগ হযরত আবু উমামা (রা) ইনতিকাল করেন। তাছাড়া অন্য একজন আনসারী সাহাবী হযরত আস'য়াদ ইবন যুরারা তার কিছুদিন পর মারা যান।[১৫] তাবারী ও ইবন কুতায়বা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে মদীনায় সর্বপ্রথম কুলসূম ইবনুল হিদমই মারা

যান। তারপর মারা যান আস'য়াদ ইবন যুরারা (রা)।[১৬]

তথ্যসূত্র ঃ

১. সিয়ারুল আনসার-১/১৫৫; সীরাতু ইবন হিশামঃ টীকা-১/৪৯৩
২. তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৩৭
৩. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবা-৩/৩১৫
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৩; আল-ইসাবা-৩/৩০৫; আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৩
৫. আল ইসাবা-৩/৫৫২
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/১৮২; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৭, কানযুল উম্মাল-৮/৩৩৫
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৫
৮. প্রাগুক্ত-১/২০৫
৯. প্রাগুক্ত-১/২৭২; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৮
১০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭৭
১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৭৮; ইবন হিশাম-১/৪৭৮
১২. আনসাবুল আশরাফ-১/২২৪
১৩. প্রাগুক্ত-১/২৭০
১৪. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-৩/৩১৫
১৫. টীকা সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৩
১৬. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩০৫; ৩১৫।

শাদ্দাদ ইবন আউস (রা)

নাম শাদ্দাদ, কুনিয়াত বা ডাকনাম আবু ইয়া'লা আবু 'আবদির রহমান। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সন্তান। এ গোত্রের বিখ্যাত কবি 'শায়িরুর রাসূল' ও 'শায়িরুল মান্‌জিরা' নামে খ্যাত হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিতের (রা) ভাতিজা। কবি হাস্‌সান ছিলেন শাদ্দাদের পিতা আউস ইবন সাবিতের ভাই।[১] মাতা সুরাইমা বনু নাজ্জারের 'আদী উপগোত্রের কন্যা।[২]

শাদ্দাদের সম্মানিত পিতা হযরত আউস ইবন সাবিত (রা) 'আকাবার শেষ বাইয়াত (শপথ) এবং বদর যুদ্ধে শরীক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৩]

হযরত শাদ্দাদ ছিলেন একজন সাহাবী এবং একজন আমীর। খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাকে হিমসের আমীর নিয়োগ করেন। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করলে তিনি সকল দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধ ভাষী, ধৈর্যশীল ও বিজ্ঞ ব্যক্তি।[৪]

মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বেই তাঁর বাবা-চাচা সহ গোত্রের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁদের সাথে ঈমান আনেন।[৫] যেহেতু যুদ্ধে যাওয়ার বয়স তখনও শাদ্দাদের হয়নি, একারণে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে কোন যুদ্ধে যাননি বলে জানা যায়। ইমাম বুখারীর মতে তিনি বদরে শরীক ছিলেন। আর এটা সঠিক নয় বলে আল্লামা ইবন 'আসাকির ও আরো অনেকে মন্তব্য করেছেন।[৬]

হিজরী ৫৮, খ্রীঃ ৬৭৭ সনে ৭৫ বছর বয়সে তিনি ফিলিস্তীনে ইন্তিকাল করেন এবং তাকে বাইতুল মাকদাসে দাফন করা হয়।[৭] তবে হিজরী ৪১, ৫৪ ও ৬৪ সনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলেও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।[৮]

হাফেজ ও হাকেম বর্ণনা করেছেন, হযরত শাদ্দাদ চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান। ছেলেরা হলেন ঃ ইয়া'লা, মুহাম্মাদ, আবদুল ওয়াহ্‌হাব ও আল-মুনজির। ইয়া'লা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। অন্যদের বংশধারা ছিল। মেয়েটি আয্‌দ গোত্রে বিয়ে করেন এবং হিজরী ১৩০ পর্যন্ত তাঁর বংশধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এ বছর আবু মুসলিম খুরাসানীর উত্থান ও উমাইয়্যা রাজবংশের পতন হয়। আর এ বছরেই শাম ও বাইতুল মাকদাসে দারুণ এক ভূমিকম্প হয়। এ ঘটনায় এখানে বসবাসরত আনসারদের বহু বংশধর নিহত হয়। শাদ্দাদের সন্তানরা বাড়ী ধসে মারা যান। তবে তার ছেলে মুহাম্মাদ কোন রকম বেঁচে যান। তিনি পঙ্গু অবস্থায় খলীফা আল-মাহদীর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এক জোড়া জুতো হযরত শাদ্দাদের হিফাজতে ছিল। তার একখানা তাঁর কন্যার মাধ্যমে তাঁর সন্তানদের হাতে চলে যায়। খলীফা আল-মাহদী

যখন বাইতুল মাকদাস সফর করেন তখন জুতোখানি তাঁদের নিকট থেকে এক হাজার দীনার ও বিপুল উপঢৌকনের বিনিময়ে হাতিয়ে নেন। অবশিষ্ট জুতোখানি সম্পর্কে জানতে পারেন যে, তা মুহাম্মাদ ইবন শাদ্দাদের হিফাজতে আছে। আল-মাহদী তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে তিনি জুতোখানি দাবী করেন। তিনি অনেক অনুনয় ও বিনয় সহকারে বলেন যে, রাসূল (সা) যে সম্মান এ জুতোর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীকে দান করে গেছেন, আপনি তাঁর বংশধরদের নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিবেন না। আল-মাহদী রাজী হন এবং জুতোখানি তাঁদের কাছেই রাখার অনুমতি দান করেন।[৯]

হযরত শাদ্দাদ ছিলেন বিজ্ঞ সাহাবীদের অন্যতম। হযরত 'উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ছিলেন উম্মাতের একজন স্তম্ভস্বরূপ এবং সাহাবা সমাজে জ্ঞানের একটি কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বলতেন, মানুষ হয় দুই ধরনের। কিছু হয় জ্ঞানী, তবে তারা খুব বদমেজাজী। আর কিছু হয় ধৈর্যশীল। কিন্তু তারা হয় মূর্খ ও অজ্ঞ। শাদ্দাদের মধ্যে জ্ঞান ও ধৈর্যের সমন্বয় ঘটেছিল।[১০] হযরত আবুদদারদা (রা) বলতেন ঃ কিছু মানুষকে তো 'ইলম' (জ্ঞান) দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 'হিল্‌ম' (ধৈর্য) দেওয়া হয়নি। তবে আবু ই'য়ালা শাদ্দাদের মধ্যে এ দু'টির সমাবেশ ঘটেছিল।[১১] তিনি আরো বলতেন ঃ প্রত্যেক উম্মাতের থাকে একজন ফকীহ্ (ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ)। আর এ উম্মাতের 'ফকীহ' হচ্ছেন শাদ্দাদ। তাঁকে ইলম ও হিকমাত দান করা হয়েছে।[১২]

একবার মসজিদে জাবিয়ায় বসে কথা বলছেন হযরত ইবন গানাম, আবুদদারদা ও 'উবাদা ইবন সামিত। এমন সময় হযরত শাদ্দাদ এসে বললেন ঃ লোকেরা! আপনাদের নিয়ে আমার ভয় হয়। আর সে ভয়টা হচ্ছে, রাসূল (সা) বলেছেন, আমার 'উম্মাত প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে পড়বে এবং শিরকে লিপ্ত হবে। কথাটির শেষাংশ ছিল বিস্মিত হওয়ার মত। তাই আবুদদারদা ও উবাদা প্রতিবাদ করলেন এবং নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস পেশ করলেন। হাদীসটি হলো, আরব উপদ্বীপে শয়তান তার উপাসনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাহলে আমাদের মুশরিক হওয়ার অর্থ কি? —এ প্রশ্নটি তারা রাখলেন।

শাদ্দাদ বললেন, এক ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে— তার সম্পর্কে আপনারা কি ধারণা পোষণ করেন? তাঁরা জবাব দিলেন, সে মুশরিক (অংশীবাদী)। এরপর তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে রাসূলের (সা) নিকট থেকে শুনেছি, এ সকল কাজ যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করবে, সে হবে মুশরিক। হযরত 'আউফ ইবন মালিকও ছিলেন তাঁদের সাথে। তিনি বললেন, যতটুকু কর্ম রিয়া (লোক দেখানো) থেকে মুক্ত হবে ততটুকুই কবুল হওয়ার আশা আছে। আর অবশিষ্ট কর্ম, যাতে শিরকের মিশ্রণ আছে, তা কবুল হবে না। এ হিসাবে আমাদের নিজেদের কর্মের উপর আস্থাবান হওয়া উচিত। হযরত শাদ্দাদ উত্তরে বললেন ঃ হাদীসে কুদসীতে এসেছে, মুশরিকের যাবতীয় 'আমল তার উপাস্য বা মা'বুদকে দেওয়া হবে। আল্লাহ তার মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন।[১৩] হযরত শাদ্দাদের এ অভিমত হুবহু কুরআনের বাণীর

অনুরূপ। কুরআন বলছে, আল্লাহ কোন অবস্থাতেই শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিচক্ষণতা ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি 'দিরায়াত' ও 'নাকদ'-এর মূলনীতি অনুসরণ করতেন। হযরত আবুজার আল-গিফারী (রা) ছিলেন যুহ্দ কিনা'য়াত (বৈরাগ্য ও অল্পেতুষ্টি)-এর জন্য প্রসিদ্ধ। ভোগবাদী জীবনের বিরুদ্ধে তিনি গোটা শামে এক প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর মত ও আন্দোলনের সপক্ষে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন। এতে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। তাঁর সম্পর্কে হযরত শাদ্দাদ (রা) বলেন ঃ আবুজার রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে কোন হাদীস, যাতে কোন কঠোরতা থাকতো, শুনতেন। তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তা প্রচার করতেন। রাসূল (সা) আবার এই কঠোরতায় কিছুটা শিথিলতা প্রদান করতেন। কিন্তু আবুজার তা জানতেন না। তিনি সেই কঠোরতার ওপর অটল থাকেন।[১৪]

হযরত শাদ্দাদের (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ)। আল্লামা যিরিকলী বলেছেন, এর সবগুলিই সাহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে।[১৫] এ সকল হাদীস তিনি রাসূল (সা) থেকে এবং কিছু কা'ব আল-আহবার (রা) থেকে শুনেছেন।[১৬]

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের অনেকেই ছিলেন শামের অধিবাসী। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলো ঃ মাহমুদ ইবন লাবীদ,তাঁর দুই পুত্র মুহাম্মাদ ও ইয়া'লা, আবুল আশ'য়াস সাফানী, দামরা ইবন হাবীব, আবু ইদরীস খাওলানী, মাহমুদ ইবন রাবী', 'আবদুর রহমান ইবন গানাম, বাশীর ইবন কা'ব, জুবাইর ইবন নুফাইর, আবু আসমা রাহবী, হাস্সান ইবন আতিয়্যা, 'উবাদা ইবন বাসানী হানজালী প্রমুখ।[১৭]

তিনি ছিলেন একজন অতি খোদাভীরু 'আবেদ ব্যক্তি। আল্লাহর ভয়ে সব সময় কম্পিত থাকতেন। অধিকাংশ সময় রাতে আরাম করার জন্য শুয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে বসতেন এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিতেন। কখনো কখনো শোনা যেত, তিনি উচ্চারণ করছেন ঃ 'আল্লাহুম্মা আন্নান নারা কাদ হালাত বায়নী ওয়া বায়নান নাওম' –হে খোদা! জাহান্নামের আগুন আমার এবং ঘুমের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহান্নাম আমার ঘুম দূর করে দিয়েছে। এখানে আসাদ ইবন বিদা'য়ার একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ শাদ্দাদ যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন আল্লাহর ভয়ে অত্যন্ত অশান্ত ও ভীত থাকতেন।[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) ও খিলাফতে রাশেদার পর মুসলমানদের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছিল তা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করতেন। উ'বাদা ইবন নাসী বলেন ঃ একবার শাদ্দাদ ইবন আউস আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার হাতটি ধরে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন। তারপর বসে কাঁদতে শুরু করলেন। তা দেখে আমরাও কাঁদা শুরু করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাঁদছেন কেন? বললাম ঃ আপনার কান্না দেখে আমার কান্না পেয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার রাসূলুল্লাহর একটি হাদীস মনে পড়েছে। তিনি বলেছিলেনঃ আমার সবচেয়ে বেশী ভয় হয় আমার উম্মাতের প্রবৃত্তির গোপন কামনা-

বাসনার পূজারী হওয়া ও শিরকে লিপ্ত হওয়ার। আমি বললাম ঃ আপনার উম্মাত মুশরিক হয়ে যাবে? বললেন ঃ হাঁ। তবে এমন নয় যে তারা চন্দ্র, সূর্য, মূর্তি, পাথরের পূজা করবে। তাদের মধ্যে রিয়া ও প্রবৃত্তি পূজার প্রভাব দেখা দেবে। সকল মানুষ রোযা রাখবে, কিন্তু যখন তার প্রবৃত্তি চাইবে, সে নিঃসংকোচে তা ভেঙ্গে ফেলবে।[২০]

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন রোগগ্রস্ত হলে তাদের দেখতে যাওয়া ও খোঁজ-খবর নেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। আবু আশ'য়াস সাগানী শামের নিকটবর্তী দিমাশক মসজিদে থাকতেন। একবার শাদ্দাদ (রা) ও সানাবিহীর সাথে পথে তাঁর দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন দিকে যাচ্ছেন? শাদ্দাদ জবাব দিলেন, আমাদের এক ভাই অসুস্থ, তাকে দেখতে যাচ্ছি। তিনিও সংগী হলেন। ভিতরে ঢুকে তিনি রোগীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অবস্থা? জবাব এলো ঃ ভালো আছি। হযরত শাদ্দাদ বললেনঃ আমি তোমাকে রোগ-ব্যাধি গুনাহর কাফ্ফারা হওয়ার সুসংবাদ শুনাচ্ছি। হাদীসে এসেছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পরীক্ষায় তাঁর প্রশংসা করে এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া সদ্যজাত শিশুর মত পাক-পবিত্র হয়ে যায়। [২১]

মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন রাসূল (সা) মদীনার বাকী' গোরস্তানে যান। হযরত শাদ্দাদ তখন সঙ্গে ছিলেন এবং রাসূল (সা) তাঁর একটি হাত ধরেছিলেন।[২২] এ ঘটনা দ্বারা রাসূলের (সা) সাথে তাঁর সম্পর্ক অনুমান করা যায়।

একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। তাঁর চেহারায় বিমর্ষতার ছাপ দেখে রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি হয়েছে? বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ। রাসূল (সা) বললেন ঃ পৃথিবী তোমার জন্য সংকীর্ণ হবে না। শাম ও বাইতুল মাকদাস বিজিত হবে। তুমি ও তোমার সন্তানরা তথাকার ইমাম হবে।[২৩] অক্ষরে অক্ষরে এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের সহ বাইতুল মাকদাসে বসতি স্থাপন করেন এবং গোটা শামের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

একবার শাদ্দাদ জিহাদে গমনকারী একদল মুজাহিদকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁকে তাঁদের সাথে আহার করার আমন্ত্রণ জানালে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াতের পর থেকে খাবারটি কোথা থেকে এসেছে তা না জেনে যদি খাওয়ার অভ্যাস থাকতো তাহলে তোমাদের সাথে অবশ্যই খেতাম।[২৪]

ইবন সা'দ খালিদ ইবন মা'দান থেকে বর্ণনা করেছেন, খালিদ বলেছেন ঃ উবাদা ইবন সামিত ও শাদ্দাদ ইবন আউস অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বস্ত, চিন্তাবিদ ও সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ শামে জীবিত নেই।[২৫]

ইল্ম উঠে যাওয়া ও ভুলে যাওয়া সম্পর্কেও একটি হাদীস আওফ ইবন মালিক আল-আশজা'ঈ (রা) রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে এক ব্যক্তি শাদ্দাদকে (রা) প্রশ্ন করলে তিনি বলেন ঃ 'আওফ সত্য বলেছে,তারপর তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম কোন্

'ইলমটি উঠবে তাকি তোমাকে বলবো? সে বললো ঃ হাঁ। বললেন ঃ আল্লাহ্ভীতি। এমন কি একজন আল্লাহ্ভীরু লোকও তুমি দেখবে না।[২৬]

শাদ্দাদ ইবন আওস বলতেন ঃ তোমরা কল্যাণ ও মঙ্গলের 'সবাব' বা কারণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাও না। তেমনিভাবে অকল্যাণ ও অমঙ্গলের কারণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওনা। কল্যাণের সবকিছুই জান্নাতের এবং অকল্যাণের সবকিছুই জাহান্নামের। আর এই দুনিয়া একটি উপস্থিত ভোগের বস্তু। সৎ ও অসৎ সকলেই তা ভোগ করে থাকে। আর আখিরাত হচ্ছে সত্য অঙ্গীকার যেখানে রাজত্ব করেন মহাপরাক্রমশালী রাজা। প্রত্যেকেরই আছে সন্তানাদি। তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়োনা।[২৭]

তিনি ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল ও স্বল্পভাষী। তবে মানুষের সাথে যখন কথা বলতেন, তখন তা হতো খুবই মধুর ও চিত্তাকর্ষক। সা'ঈদ ইবন আবদিল আযীয বলেন ঃ শাদ্দাদ দুইটি অভ্যাসে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। বলার সময় বাগ্মিতায় এবং ক্রোধের সময় ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহানুভবতায়।[২৮]

তিনি যে কত স্বল্পভাষী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর একটি মন্তব্য দ্বারা। একবার তিনি তার এক সঙ্গীকে বললেন, পাথেয়টুকু নিয়ে এসো, একটু খেলি। সঙ্গীটি বললো ঃ এমন কথা তো আপনার মুখে কখনো শুনিনি! তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই মুখে লাগাম পরে নিয়েছি। আজ অকস্মাৎ মুখ থেকে একথাটি বেরিয়ে গেল, তোমরা এটা ভুলে যাও। আর কখনো এমনটি হবে না।[২৯]

একবার হযরত মু'য়াবিয়া (রা) হযরত শাদ্দাদকে জিজ্ঞেস করলেনঃ শাদ্দাদ, বলুন তো আমি ভালো না আলী ইবন আবী তালিব ভালো? আমাদের দু'জনের মধ্যে কে আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? শাদ্দাদ বললেনঃ আলী আগে হিজরাত করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বেশী ভালো কাজ করেছেন, আপনার চেয়ে বেশী সাহসী, আর তিনি আপনার চেয়ে বেশী প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ। আর ভালোবাসার কথা বলছেন? আলী চলে গেছেন। আজ মানুষ আপনার কাছে বেশী আশা করে।[৩০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তারীখু ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮
২. আল-ইসাবা- ২/১৩৯
৩. ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮; আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪৩
৪. আল-আ'লাম- ৩/২৩২; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৯
৫. সিয়ারুস আনসার- ২/৪৫
৬. আল-ইসাবা- ২/১৩৯; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮
৭. শাজারাতুজ জাহাব- ১/৬৪; তারীকুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম- ২/২৬৫; আল-আ'লাম- ৩/২৩২
৮. আল-ইসাবা- ২/১৪০; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮
৯. বিস্তারিত জানার জন্য- তারীখু ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৮, ২৮৯

১০. উসুদুল গাবা- ২/৩৮৭
১১. আল-ইসাবা- ২/১৩৯; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৫২২
১২. আল-আ'লাম- ৩৩/২৩২; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৯
১৩. মুসনাদে ইমাম আহমাদ- ৪/১২৬; সিয়ারে আনসার- ২/৪৬
১৪. মুসনাদ- ৪/১২৫
১৫. আল-আ'লাম- ৩/২৩২
১৬. আল-ইসাবা- ২/১৩৯
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. ইবন 'আসাকির- ৬/২৯১; হায়াতুস সাহাবা- ২/৬২১
১৯. উসুদুল গাবা- ২/৩৮৮
২০. মুসনাদ- ৪/১২৪; ইবন 'আসাকির- ৬/২৯০
২১. মুসনাদ- ৪/১২৩
২২. প্রাগুক্ত- ৪/১২৪
২৩. আল-ইসাবা- ২/১৪০
২৪. ইবন আসাকির- ৬/২৯১
২৫. হায়াতুস সাহাবা- ৩/২৬২; ইবন 'আসাকির- ৬/২৮৯
২৬. হায়াতুস সাহাবা- ৩/২৬৭
২৭. ইবন 'আসাকির- ৬/২৯১; হায়াতুস সাহাবা- ৩/৫২২
২৮. আল-ইসাবা- ২/১৩৯
২৯. হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৩৯
৩০. ইবন আসাকির- ৬/২৯১

মু'য়াজ ইবন আফরা (রা)

হযরত মু'য়াজের পিতার নাম আল-হারিস ইবন রাফা'য়া আন-নাজ্জারী এবং মাতার নাম 'আফরা বিনতু 'উবাইদ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতার নামে তিনি পরিচিত নন। ইবন সা'দ বলেন ঃ তাঁকে মায়ের সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়।[১]

তাঁর মা 'আফরার প্রথম বিয়ে হয় আল-হারিস ইবন রাফা'য়া আল-খাযরাজীর সাথে। সেখানে তাঁর দু'ছেলে- মু'য়াজ ও মু'য়াওবিজ-এর জন্ম হয়। এরপর তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 'আফরা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যান এবং সেখানে আল-বুকাইর ইবন 'আবদি ইয়ালীল আল-লাইসীকে বিয়ে করেন। সেখানে 'আকিল, ইয়াস, 'আমির ও খালিদ নামে চার ছেলের জন্মের পর আবার মদীনায় ফিরে আসেন। পূর্ব স্বামী আল-হারিস আবার তাঁকে ফিরিয়ে নেন। এবার ছেলে 'আওফ-এর জন্ম হয়।[২] এ সবই ইসলাম-পূর্ব জীবনের ঘটনা।

হযরত 'আফরা (রা) ছিলেন একজন ভাগ্যবতী মহিলা। ইসলাম গ্রহণ করে নিজে তো সাহাবিয়্যা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তাছাড়া মু'য়াজ, মু'য়াওবিজ ও 'আওফের মত তিনটি ছেলের মা হওয়ার দুর্লভ সম্মানও অর্জন করেন। এ তিনটি ছেলেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বদরের যোদ্ধা।[৩] শেষোক্ত দু'জন বদরের শহীদ।[৪] শুধু তাই নয়, তাঁরাই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ দুশমন আবু জাহলকে এ বদরেই এক যোগে হামলা করে হত্যা করেন।

'আকাবা উপত্যকায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মদীনাবাসীদের বাই'য়াত বা শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই তিনি মক্কায় গিয়ে মুসলমান হন। আরো পাঁচ ব্যক্তি এ সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। অবশ্য এ ছ'জনের নামের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে। যুহরী ও 'উরওয়ার বর্ণনা মতে মু'য়াজ ইবন 'আফরাও তাদের একজন।[৫]

তাবারানী 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। হজ্জ মওসুমে আনসারদের কয়েক ব্যক্তি মক্কায় গিয়ে হজ্জ করলেন। তাঁরা হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন 'আফরা, আস'য়াদ ইবন যুরারা, রাফে ইবন মালিক, জাকওয়ান ইবন 'আবদিল কায়েস, আবুল হায়সাম ইবন আত্-তায়্যিহান ও 'উওয়ায়িম ইবন সা'য়িদা (রা)। খবর পেয়ে রাসূল (সা) তাঁদের কাছে গেলেন এবং আল্লাহ যে তাঁকে নবী হিসেবে নির্বাচন করেছেন তা তাঁদেরকে জানালেন। তিনি কুরআন থেকে পাঠ করেও শোনালেন। তাঁরা অত্যন্ত ধীর-স্থির ভাবে কান লাগিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনলেন। আহলি কিতাবদের নিকট থেকে শেষ নবীর যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা এবং তাঁর দা'ওয়াতের বিষয় তাঁদের জানা ছিল, তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) দাবীর প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস জন্মালো। তাঁরা ঈমান আনলেন। আগামী হজ্জ মওসুমে তাঁর সাথে আবার মিলিত হবেন-এ অঙ্গীকার করে তাঁরা মদীনায় ফিরে এলেন।

মদীনায় এসে তাঁরা চুপে চুপে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন এবং তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব ও তাঁর মিশন সম্পর্কে অবহিত করতে লাগলেন। মানুষকে কুরআন পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁরা এমন ভাবে কাজ করলেন যে, আনসারদের এমন বাড়ি খুব কমই ছিল যেখানে একজন লোকও মুসলমান হলো না।[৬] ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনাকে কেউ কেউ 'আকাবার প্রথম বাইয়াত বা শপথ বলে উল্লেখ করেছেন। এ হিসেবে 'আকাবার বা'ইয়াত হয় তিনটি।

মদীনায় যখন বেশ কিছু লোক ইসলাম কবুল করলো এবং ঘরে ঘরে ইসলামের পরিচিতি গড়ে উঠলো তখন মদীনাবাসীরা মক্কা থেকে একজন লোক পাঠানোর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অনুরোধ জানালো যিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরকে কুরআন শিখাবেন এবং দ্বীনের সঠিক তা'লীম দেবেন। রাসূল (সা) তাঁদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রখ্যাত দা'ঈ (আহবানকারী) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে (রা) মদীনায় পাঠান। আবু নু'য়াইম 'আল-হুলয়িয়্যা' গ্রন্থে (১/১০৭) যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তাদের এ আবেদন পৌঁছানোর জন্য মু'য়াজ ইবন 'আফরা ও রাফে' ইবন মালিককে মক্কায় পাঠান।[৭]

তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও মক্কায় গমন সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা রকম ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন ইবন সা'দ বলেন, বর্ণিত আছে, মু'য়াজ ইবন আল-হারিস ও রাফে' ইবন মালিক আনসারদের প্রথম দু' ব্যক্তি যাঁরা মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তাঁদের দু'জনকে আনসারদের সেই আট ব্যক্তির মধ্যে গণ্য করা হয় যাঁরা প্রথম পর্বে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার তাঁদেরকে সেই ছয় ব্যক্তির মধ্যেও গণ্য করা হয় যাঁদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরাই আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। যাঁদের আগে আর কেউ এমন করেননি। ওয়াকিদী ও মুহাম্মদ ইবন 'উমার বলেন ঃ ছয় জনের বর্ণনাটি আমাদের নিকট সর্বাধিক সঠিক ও শক্তিশালী বলে মনে হয়।[৮] সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, তিনি 'আকাবার পরবর্তী দু'টি বাই'য়াতেই উপস্থিত ছিলেন।[৯]

হিজরাতের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) মা'মার ইবনুল হারিসের সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১০] হযরত মু'য়াজ তাঁর অন্য দু' ভাই মু'য়াওবিজ ও 'আওফের সাথে বদরে অংশ গ্রহণ করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[১১]

হযরত মু'য়াজ ইবন 'আফরার বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই। তবে এ যুদ্ধে ইসলামের চরম দুশমন আবু জাহলকে তাঁর হত্যা বা এ যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত বরণ সম্পর্কে সীরাত ও হাদীস বিশেষজ্ঞদের দারুণ মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আবু জাহলের হত্যায় অংশগ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধে আহত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি।

বদর যুদ্ধের শুরুতে কুরাইশ পক্ষের তিন বীর - শায়বা, 'উতবা ও ওয়ালীদ ইবন 'উতবা হুঙ্কার ছেড়ে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহবান জানায়। তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্য হতে সর্বপ্রথম হযরত 'আফরার তিন ছেলে মু'য়াজ, মুয়াওবিজ ও আওফ তরবারি হাতে নিয়ে ময়দানের দিকে ধাবিত হন। কিন্তু হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাদেরকে বিরত রাখেন। তিনি হযরত হামযা ও অন্যদেরকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। কিন্তু জিহাদের তীব্র আবেগ কি তাতে দমে থাকতে পারে? হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আওফ একটি সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর ডানে-বামে দু'পাশে তাঁরা দু' ভাই এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুর রহমান তাদেরকে চিনতেন না। এ কারণে নিজের দু' পাশে দু' তরুণকে দেখে একটু হতাশা ও ভীতি অনুভব করলেন। এর মধ্যে একজন ফিস ফিস করে জানতে চাইলেন ঃ চাচা, বলুন তো আবু জাহল কোন দিকে? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন ঃ ভাতিজা, তাকে দিয়ে কি করবে? তরুণটি বললেন ঃ শুনেছি সে রাসূলুল্লাহকে (সা) গালি দেয়, এজন্য আমরা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি যে, তাকে অবশ্যই হত্যা করবো। আর এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে জীবনও বিলিয়ে দেব। দ্বিতীয় তরুণও ঠিক একই কথা বললেন।

হযরত 'আবদুর রহমান দারুণ পুলকিত হলেন। তিনি কিছুটা গর্বও অনুভব করলেন এই ভেবে যে, কত মহান দু' ব্যক্তির মাঝখানেই না দাঁড়িয়ে! তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন ঃ দেখ, ঐ যে আবু জাহল হাঁটছে। এতটুকু বলতেই তাঁরা দু'জন বাজ পাখীর ন্যায় ত্বরিৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। ফিরে এসে তাঁরা রাসূলকে (সা) এ হত্যার সুসংবাদ দান করেন। তখন তাঁদের দু' জনের তরবারিতে আবু জাহলের রক্ত বিদ্যমান।[১২]

সহীহ মুসলিম গ্রন্থে এ দু' তরুণের নাম মু'য়াজ ইবন 'আমর ইবনুল জামূহ এবং মু'য়াজ ইবন 'আফরা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সহীহ বুখারীতে 'আফরা'র ছেলেদের কথা এসেছে। যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মু'য়াজ ইবন 'আফরা' ও তাঁর ভায়েরা নরাধম আবু জাহলকে হত্যা করেছিলেন।

আল হাকেম (৩/৪২৫) ও আল-বায়হাকীর (৬/৩০৫) বর্ণনায় জানা যায়, ঐ দু' তরুণের একজন মু'য়াজ ইবন 'আফরা এবং অন্যজন মু'য়াজ ইবন 'আমর ইবনুল জামূহ। তাঁরা আবু জাহলকে হত্যার পর দৌড়ে রাসূলকে (সা) সুসংবাদ দিতে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের দু'জনের কে তাঁকে হত্যা করেছে? তাঁরা দু'জনই বললেন ঃ আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমরা কি নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছো? তাঁরা বললেন ঃ না। রাসূল (সা) তাদের দু'জনের তরবারির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা দু'জনেই তাঁকে হত্যা করেছো, এরপর তিনি তাঁদের দু'জনকেই রণক্ষেত্রে আবু জাহলের নিকট থেকে প্রাপ্ত জিনিসগুলি দান করেন।[১৩]

ইবন আবী খায়সামা ইবন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মু'য়াজ ইবন 'আফরা বলেছেন ঃ 'আমি সুযোগ পেয়ে আবু জাহলকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত হানলাম

যে, তার পায়ের নলার মাঝামাঝি থেকে কেটে পড়ে গেল। সাথে সাথে 'আকরামা ইবন আবী জাহল আমার এক কাঁধে আঘাত করে বসলো। আমার একটি হাত গোড়া থেকে কেটে ঝুলে থাকলো। আমার সেই ঝোলানো হাতটি পিছনের দিকে টেনে নিয়ে বেড়াতাম। তারপর সেটা যখন বেশী কষ্ট দিতে লাগলো তখন একদিন পা দিয়ে চেপে ধরে ছিঁড়ে ফেলে দেই। অবশ্য ইবন হিশাম ইবন ইসহাকের সূত্রে উপরোক্ত ঘটনা মু'য়াজ ইবন 'আমর ইবনুল জামূহ-এর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁর সহযোগী হিসেবে মু'য়াওবিজ ইবন 'আফরার কথা বলেছেন।[১৪]

'আল-ইসতীয়াব গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন, বদরে তিনি বনু যুরাইক গোত্রের ইবন মায়িদ-এর আঘাতে আহত হন।[১৫] ইবন সা'দ-এর মতে 'আফরার দু'ছেলে মু'য়াওবিজ ও 'আওফ এক কোপে আবু জাহলকে আক্রমণ করেন। আবু জাহল পাল্টা আক্রমণ করে তাদের দু'জনকেই হত্যা করে। এরপর আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ বাকী কাজটুকু শেষ করে তাকে জাহান্নামে পাঠান।[১৬]

একটি বর্ণনা মতে এ বদর যুদ্ধে তিনি ইসলামের অন্য এক চরম দুশমন উমাইয়্যা ইবন খালাফকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেন।[১৭]

আবু জাহলের হত্যার ঘটনার মত হযরত মু'য়াজ ইবন 'আফরার মৃত্যুর সময় সম্পর্কে বেশ মতভেদ আছে। যেমন, বালাজুরী বলেন ঃ মু'য়াজ ও তাঁর ভাই মু'য়াওবিজ বদরে শহীদ হন। তাঁদের ভাই 'আওফ জীবিত থাকেন। ইবনুল কালবী বলেন ঃ বদরে মু'য়াজ ও মু'য়াওবিজ শহীদ হওয়ার পর 'আফরা ছেলে 'আওফকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন। তারপর ছেলে 'আওফের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমার সবচেয়ে খারাপ ছেলেটি রয়ে গেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ না। তার মাধ্যমেই 'আফরা'র বংশধারা চলবে। কিন্তু ওয়াকিদী বলেন ঃ বদরে 'আওফ ও মু'য়াবিজ শহীদ হন এবং মু'য়াজ জীবিত থাকেন। তারপর ফিত্না অর্থাৎ আলী-মু'য়াওবিয়ার (রা) দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় হিজরী ৩৭ সনে ইনতিকাল করেন।[১৯] 'আওফ ও মু'য়াওবিজ যে বদরে শহীদ হন, একথা ইবন হিশামও বলেছেন।[২০]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, মু'য়াজ বদরে বনু যুরাইক গোত্রের ইবন মা'য়িদা-এর হাতে আহত হন এবং তাতেই পরে মদীনায় মারা যান। ইবন ইদরীস, ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মু'য়াজ খলীফা উসমানের (রা) সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। খলীফা ইবন খাইয়্যাত বলেছেন ঃ তিনি আলী ইবন আবী তালিবের (রা) খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[২১]

যাই হোক, তিনি যে বদরে শাহাদাত বরণ বা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেননি তা প্রমাণিত হয় সীরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত তাঁর পরবর্তী জীবনের অনেক ঘটনাবলী দ্বারা। এখানে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হলো ঃ

খলীফা হযরত 'উমার (রা) খাইবার থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়িত করার পর সেখানকার 'ওয়াদি-উল-কুরা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেন। তাঁর একটি অংশ মু'য়াজ ইবন 'আফরাও লাভ করেন।[২২]

হযরত আবু আইউব আল-আনসারীর (রা) আযাদকৃত দাস আফলাহ্ বর্ণনা করেছেন। একবার খলীফা 'উমার (রা) প্রত্যেক বদরী সাহাবীকে দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর চাদর তৈরী করালেন। তার একটি মু'য়াজ ইবন 'আফরাকেও পাঠালেন। তারপর মু'য়াজ আমাকে বললেন ঃ চাদরটি বিক্রী করে দাও। আমি পনেরো শো দিরহামে বিক্রী করলাম। তিনি আবার আমাকে সেই অর্থ দিয়ে কিছু দাস খরীদ করে আনতে বললেন। আমি পাঁচটি দাস খরীদ করে আনলাম। তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলেন। 'উমার (রা) এ খবর শুনে মাত্র এক শো দিরহাম খরচ করে একটি মোটা ও পুরো চাদর তৈরী করে আবার পাঠান। মু'য়াজ চাদরটি হাতে নিয়ে সোজা 'উমারের (রা) নিকট চলে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি এটি পাঠিয়েছেন? 'উমার বললেন ঃ হ্যাঁ। পূর্বে যেটি পাঠিয়েছিলাম, ঠিক সে রকম চাদর আপনার অন্যসব ভাইদের নিকটও পাঠিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি সেটি পরেননি। মু'য়াজ বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! এটা আমি পরবো না। আমি চাই, আপনার নিকট যে সব কল্যাণকর জিনিস আছে তাই আসুক। একথা বলে তিনি চাদরটি ফিরিয়ে দেন।[২৩] দুনিয়ার প্রতি তিনি যে কতখানি নিরাসক্ত ছিলেন তা উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়।

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) তিনি প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় নরাধম আবু জাহলের হত্যার ঘটনায়। এ ক্ষেত্রে জীবনের মায়া ত্যাগ করে যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

মদীনায় মসজিদে নববী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সে ভূ-খন্ডটি ছিল সাহল ও সুহাইল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের। রাসূল (সা) কুবা থেকে যে দিন মদীনার মূল ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেন সে দিন তাঁর বাহন উটটির লাগাম ছেড়ে দেওয়া ছিল। সে আল্লাহর নির্দেশে চলছিল এবং আল্লাহরই নির্দেশে সাহল ও সুহাইলের উক্ত ভূমিতে এসে বসে পড়ে। ইবন হিশামের বর্ণনামতে উক্ত ইয়াতীমদ্বয় তখন এই মু'য়াজ ইবন 'আফরার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছিল।[২৪] এতে বুঝা যায়, তিনি ইয়াতীম ও অসহায়দের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন।

দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি খুব সচেতন ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একবার হজ্জ করেন। এছাড়া আরো হজ্জ করেন। যার একটির বর্ণনা সুনানে নাসাঈ গ্রন্থে এসেছে।[২৫]

ইবন সা'দ তাঁর একাধিক স্ত্রী ও অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এমন কি তাদের নামও বর্ণনা করেছেন।[২৬]

সুনানে নাসাঈ সহ বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত দু'একটি হাদীস পাওয়া যায়।[২৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৪৯১; তাকরীবুত তাহজীব-২/২৫৫,
২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬,
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭০২, ৪২৯, আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪
৪. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬,

৫. ফাতহুল বারী-৭/১৭২
৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭৯
৭. প্রাগুক্ত-১/১১৭
৮. তাবাকাত-৩/৪৯২, আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪
৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩১, ৪৫৭, তাবাকাত-৩/৪৯২
১০. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৬; তাবাকাত-৩/৪৯২, উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৭, আল-ইসাবা-৩/৪২৮, উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
১২. বুখারী; কিতাবুল মাগাযী-২/৫৬৮; মুসলিম-২/৬৮,৬৯, হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৪, ৫৫৫
১৩. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৫৫
১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১০; আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৫
১৫. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪
১৬. তাবাকাত-৩/৪৯২, ৯৩ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩১, ৪৫৭
১৭. আল-ইসাবা-৩/৪২৮; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১৩
১৮. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬
১৯. তাবাকাত-৩/৪৯২; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩, ২৯৬
২০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৩১, ৪৫৭ উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
২১. আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৪, ৩৬৬; তাকরীবুত তাহজীব-২/২৫৬, আল-ইসাবা-৩/২২৮, উসুদুল গাবা-৪/৩৭৯
২২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৫৮
২৩. হায়াতুস সাহাবা-১/২৯৭-২৯৮
২৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৯৫
২৫. সীয়ারে আনসার-২/২০৪
২৬. তাবাকাত/৩/৪৯১
২৭. আল-ইসাবা-৩/২২৮, আল-ইসতী'য়াব-৩/৩৬৫, ৩৬৬।

আবু লুবাবা (রা)

হযরত আবু লুবাবার (রা) আসল নামের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মুসা ইবন 'উকবা ও ইবন হিশাম বলেন, তাঁর নাম বাশীর। আর ইবন ইসহাকের মতে রাফা'য়া। তাফসীরে 'আল-কাশশাফের' রচয়িতা আল্লামা যামাখশারী সূরা আল আনফালের তাফসীরে তাঁর নাম 'মারওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন।[১] বালাজুরীর মতে, রাফা'য়া হচ্ছেন আবু লুবাবার ভাই এবং তিনি 'আকাবার শেষ বা'ইয়াতে অংশ গ্রহণ করেন। বদরেও অংশ গ্রহণ করেন এবং খাইবার যুদ্ধে শহীদ হন। আর আবু লুবাবার নাম বাশীর।[২] তাঁর আসল নাম যাই হোক না কেন, ইতিহাসে তিনি আবু লুবাবা নামেই খ্যাত। তাঁর পিতার নাম 'আবদুল মুনজির ইবন যুবাইর। মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের বনু 'আমর ইবন 'আওফ শাখার সন্তান। তিনি 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে (শপথ) অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজ গোত্রের 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) মনোনীত হন।[৩]

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধের সময় বিশেষ সম্মানও লাভ করেন। এ সফরে প্রতিটি উটের ওপর তিনজন করে আরোহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) উটের ওপর আবু লুবাবা ও আলী ইবন আবী তালিব (রা) ছিলেন। তাঁরা পালাক্রমে উটের পিঠে ওঠানামা করছিলেন। যখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) পালা আসছিলো, তাঁরা আবেদন করছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উটের পিঠেই থাকুন, আমরা হেঁটে চলছি। কিন্তু রাসূল (সা) বলছিলেন, তোমরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী নও। আর এমনও নয় যে, তোমাদের চেয়ে বেশী সাওয়াবের প্রয়োজন আমার নেই।[৪]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ অনেকে বলেছেন, আবু লুবাবা ও আল-হারিস ইবন হাতিব, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদরের দিকে যাত্রা করেন। কিছু দূর যাওয়ার পর পথ থেকে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনকে আবার মদীনায় ফেরত পাঠান। রাসূল (সা) আবু লুবাবাকে মদীনার ইমারাতের দায়িত্বও দান করেন। যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনকেই গনীমাতের অংশ দেন এবং আসহাবে বদরের মতই তাঁদের সাথে আচরণ করেন। মুসা ইবন 'উকবা আবু লুবাবাকে বদরীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৫] ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) 'আর-রাওহা' নামক স্থান থেকে তাঁদের দু'জনকে ফেরত পাঠান।[৬]

হিজরী ২য় সনের শাওয়াল মাসে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকা'র সাথে সংঘটিত যুদ্ধে এবং একই সনের জ্বিলহাজ্জ মাসে সংঘটিত 'সাবীক' যুদ্ধে তিনি যোগদান করেননি। এ সময় রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। রাসূল (সা) পনেরো দিন যাবত বনু কায়নুকা' অবরোধ করে রাখেন। এ সময় আবু লুবাবা মদীনায় ইমারতের দায়িত্ব পালন করেন।[৭]

হিজরী ৫ম সনে খন্দক যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জা কুরাইশ বাহিনীকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) সহ মুসলিম বাহিনী নিজ নিজ ঘরে ফিরে আসার পরই জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? বললেন ঃ হাঁ। জিবরীল (আ) বললেন ঃ কিন্তু ফেরেশতারা অস্ত্র রাখেনি। ইয়া মুহাম্মাদ! আল্লাহ আপনাকে বনু কুরায়জার দিকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি সে দিকেই যাচ্ছি এবং তাদেরকে নাড়া দিচ্ছি। রাসূল (সা) তখন জুহরের নামায শেষ করে মাত্র ঘরে ফিরছেন।

জিবরীলের (আ) এ কথার পর রাসূল (সা) সাথে সাথে ঘোষণা দিলেন ঃ বনু কুরায়জা পৌঁছা ছাড়া কেউই 'আসর নামাজ পড়বে না। ঘোষণা অনুযায়ী সবাই বনু কুরায়জায় পৌঁছে। দীর্ঘ ২৫ রাত তাদের দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয় এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণের আহবান জানানো হয়। অবশেষে আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে দেন। তারা তাদের পুরাতন বন্ধু হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজের (রা) শালিশী মেনে নিতে রাজী হয়।

মদীনার আউস গোত্রের বনু 'আমর ইবন 'আওফ শাখার সাথে বনু কুরায়জার সেই জাহিলী যুগ থেকে মৈত্রী চুক্তি ছিল। আবু লুবাবা ছিলেন এ গোত্রেরই লোক। এ কারণে তারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রাসূলুল্লাহর নিকট আবেদন জানায় ঃ আমাদের কাছে আবু লুবাবাকে পাঠান, আমরা তাঁর সাথে একটু পরামর্শ করতে চাই। রাসূল (সা) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং আবু লুবাবাকে তাদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন।

আবু লুবাবা বনু কুরায়জায় পৌঁছালে ইহুদীরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। তারা আবু লুবাবার নিকট তাদের সমস্যা তুলে ধরে। ইহুদী নারী ও শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে দিশেহারার মত তার সামনে এসে দাঁড়ায়। দৃশ্যটি ছিল সত্যিই হৃদয়বিদারক। আবু লুবাবার অন্তর কোমল হয়ে যায়। তারা আবু লুবাবাকে প্রশ্ন করে ঃ আমরা কি মুহাম্মাদের নির্দেশ মেনে নেব? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তবে সাথে সাথে নিজের গলার দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দেন যে তাদেরকে হত্যা করা হবে।

আবেগের বশে এ ইঙ্গিত তো করে ফেললেন। কিন্তু সাথে সাথে এ উপলব্ধি জন্মালো যে, এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছে। তখন তাঁর পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল। তিনি সেখান থেকে উঠে সোজা মসজিদে নববীতে চলে আসলেন এবং একটি মোটা ও ভারী বেড়ী দিয়ে নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে বললেন ঃ যতক্ষণ আল্লাহ আমার তাওবা কবুল না করেন, এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকবো।

এদিকে আবু লুবাবার ফিরতে দেরী দেখে একদিন রাসূল (সা) বললেন ঃ আবু লুবাবা কি তার মিশন শেষ করেছে? তখন লোকেরা রাসূলকে (সা) বিষয়টি অবগত করে। রাসূল

(সা) বললেন ঃ যা হোক, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। সে যদি সোজা আমার কাছে চলে আসতো, আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করতাম। মোটকথা, বিশ মতান্তরে দশ রাত বেড়ী বাঁধা অবস্থায় আবু লুবাবার অতিক্রান্ত হয়। নামায ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনের সময় তাঁর স্ত্রী বেড়ী খুলে দিতেন এবং প্রয়োজন শেষ হলে আবার বেঁধে দিতেন। পানাহার একেবারেই ছেড়ে দেন। শ্রবণ শক্তি কমে যায়, দৃষ্টি শক্তিও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। একদিন দুর্বলতার কারণে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আর তখনই আল্লাহর রহমত নাযিলের সময় হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সে দিন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে ছিলেন। প্রভাতের পূর্বেই আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (সা) একটু হেসে ওঠেন। তা দেখে হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সব সময় খুশী রাখুন। বলুন তো কি ব্যাপার? বললেন ঃ আবু লুবাবার তাওবা কবুল হয়েছে। উম্মু সালামা (রা) জানতে চাইলেন, আমি কি এ সুসংবাদ মানুষকে জানিয়ে দিতে পারি? রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ। তখনও হিজাবের আয়াত নাযিল হয়নি। উম্মু সালামা (রা) হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে লোকদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। লোকেরা আবু লুবাবাকে মুক্ত করার জন্য ছুটে যায়। কিন্তু তিনি বললেন, যখন রাসূল (সা) নিজে এসে খুলবেন কেবল তখনই আমি এ স্থান থেকে সরবো। রাসূল (সা) যখন ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে আসেন তখন নিজ হাতে তাঁকে বন্ধনমুক্ত করেন।

তাওবা কবুল হওয়ায় হযরত আবু লুবাবা (রা) দারুণ খুশী হন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঐ বাড়ী ত্যাগ করতে চাই যেখানে আমি এ পাপে লিপ্ত হয়েছি। আমি আমার সকল সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দিতে চাই। রাসূল (সা) বললেন ঃ সব নয় বরং এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। তিনি এক-তৃতীয়াংশই দান করেন।

হযরত আবু লুবাবার (রা) এ তাওবার পশ্চাতে কি কারণ ছিল সে সম্পর্কে অবশ্য সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। মা'মার ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু লুবাবা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধে তাওবার এ পন্থা অবলম্বন করেন। হযরত ইবন 'আব্বাসও (রা) একথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সূরা আত্‌তাওবার ১০২ নং আয়াত- 'আর কোন কোন লোক আছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ হয়তো তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়' আবু লুবাবাসহ আরও ৮/৯ জন সম্পর্কে নাযিল হয়। তারা তাবুক যুদ্ধে যোগদান না করে মদীনায় থেকে যায়। তারপর অনুতপ্ত হয়ে সকলে তাওবা করে। তারা তাওবার পদ্ধতি হিসেবে নিজেদেরকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে ফেলে। অতঃপর তাদের তাওবা কবুল হয়। তাদের সবচেয়ে ভালো কাজ এ তাওবা এবং সবচেয়ে মন্দকাজ তাবুকে যোগদান না করা।

আবু 'আমরের মতে তাবুকের ঘটনায় নয়; বরং বনু কুরায়জার ঘটনায় আবু লুবাবা এ তাওবা করেন। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল আনফালের ২৭ নং আয়াত- 'হে

ঈমানদারগণ! খিয়ানত করোনা আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত করোনা নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে' নাযিল হয়। আবু 'আমরসহ অনেকের মতে আবু লুবাবা তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যে সকল মুসলমান বিনা কারণে তাবুকে যোগদান করেননি তাঁদের সংখ্যা মাত্র তিন। তাঁরা হলেন ঃ মুরারা ইবন রাবী', হিলাল ইবন উমাইয়্যা এবং কা'ব ইবন মালিক (রা)। তাঁদের সাথে আবু লুবাবাকে যুক্ত করা ঠিক নয়। কারণ, সূরা আত্ তাওবার ১১৮ নং আয়াতে উপরোক্ত তিনজনের কথাই বলা হয়েছে ঃ 'এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই— অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে।[৮]

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয় অভিযানে বনু 'আমর ইবন 'আওফের ঝান্ডা ছিল হযরত আবু লুবাবার (রা) হাতে। এছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সংঘটিত সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে দারুণ মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে মারা যান। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর তিনি মারা যান। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, হিজরী ৫০ সন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।[৯] মৃত্যুকালে সায়িব ও আবদুর রহমান নামে দু'টি ছেলে রেখে যান।

হযরত আবু লুবাবা ছিলেন একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী। তিনি বহু বছর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যের সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী শুনে থাকবেন। কিন্তু তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড় বড় সাহাবীও আছেন। যেমন ঃ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)। তাছাড়া তাবেঈদের প্রথম তাবকার অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এখানে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

'আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ ইবন জাবির, আবু বকর ইবন 'আমর ইবন হাযাম, সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, 'আবদুর রহমান ইবন কাব ইবন মালিক, সালেম ইবন 'আবদিল্লাহ, 'উবাইদুল্লাহ ইবন আবী ইয়াযিদ, নাফে মাওলা ইবন 'উমার, তাঁর দু'ছেলে- সায়িব ও 'আবদুর রহমান।[১০]

হযরত আবু লুবাবা (রা) ইসলামের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ পূর্ণরূপে মেনে চলতেন। মানবিক দুর্বলতার কারণে কক্ষণো কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা বুঝতে পারার সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করতেন। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আবু লুবাবা (রা) বনু কুরায়জার ব্যাপারে যে ভুল করেছিলেন এবং তাতে তাঁর চরিত্র যতখানি ম্লান হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল করেছিল তাঁর তাওবা। আল্লাহ পাক স্বয়ং তাঁর তাওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা দিয়ে

অহী নাযিল করেছেন, আর আল্লাহর রাসূল (সা) সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ হাতে তাঁর বন্ধন খুলে দিয়েছেন। আবু লুবাবার (রা) এর চেয়ে বড় মর্যাদা এবং পাওয়া আর কি আছে? প্রকৃতপক্ষে অনুতপ্ত তাওবাকারী অপরাধী আল্লাহর অতি প্রিয়। তিনি অতি খুটিনাটি বিষয়েও রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের ওপর আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে সাপ মারার হাদীস শুনেছিলেন। এ কারণে সাপ দেখলই মেরে ফেলতেন। আবু লুবাবার (রা) বাড়ীটি ছিল তাঁরই বাড়ীর একেবারে লাগোয়া। একদিন তিনি ইবন 'উমারকে (রা) বললেন, আপনার বাড়ীর দরজাটি একটু খুলুন, আমি এ পথেই মসজিদে যাব। ইবন 'উমার (রা) উঠে যেইনা দরজা খুলেছেন, অমনি একটি সাপ দেখতে পেলেন। ইবন 'উমার (রা) মারার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবু লুবাবা (রা) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ রাসূল (সা) ঘরের সাপ মারতে নিষেধ করেছে।[১১]

আবু নু'য়াইম তাঁর আদ-দালায়িল' (১৬০) গ্রন্থে আবু লুবাবার একটি বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (সা) এক জুম্মার দিন মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও। আবু লুবাবা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! খেজুর তো শুকানোর জন্য উঠোনে রয়েছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও যতক্ষণ না আবু লুবাবা ল্যাংটা হয়ে ওঠে এবং নিজের পাজামা দিয়ে তার উঠোনের পানির নালা বন্ধ করে। তারপর এত বৃষ্টি হতে থাকে যে, লোকেরা আবু লুবাবাকে বললো ঃ রাসূল (সা) তোমার সম্পর্কে যা বলেছেন তা না করা পর্যন্ত বৃষ্টি থামবে না। আবু লুবাবা তাই করলেন। বৃষ্টিও থেমে গেল।[১২]

এভাবে আবু লুবাবার (রা) জীবনের অনেক টুকরো টুকরো কথা সীরাতের গ্রন্থ সমূহের পাতায় ছড়িয়ে আছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-৪/১৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৮৮; ২/৪৫
২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪১
৩. আল-ইসাবা-৪/১৬৮
৪. আল-বিদায়া-৩/২৬১; হায়াতুস সাহাবা-২/৬০৩
৫. আল-ইসাবা-৪/১৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১২, ৬৮৮; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৯, ২৯৪
৬. আল-ইসতীয়াব-৪/১৬৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬১২, ৬৮৮
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৩০৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৫, ৪৯
৮. আবু লুবাবার (রা) এ ঘটনা বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ 'আল্লামা ইবন কাসীরের সীরাতু নবী' ২/৮-১৮ পৃঃ, সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৪-৩৩৮, ৫৩১ পৃঃ ফাতহুল বারী-৭/২৯১; আল-বিদায়া-৪/১১৯; আল-ইসাবা-৪/১৬৮; আল-ইসতীয়াব-৪/১৬৮; হায়াতুস সাহাবা-২/১৮০, ৩৬৫
৯. আল-ইসাবা-৪/১৬৮
১০. প্রাগুক্ত-৪/১৬৮
১১. মুসনাদ-৩/৪৫২, ৪৫৩
১২. আল-বিদায়া-৬/৯২

যায়িদ ইবন আরকাম (রা)

ভালো নাম যায়িদ। কুনিয়াত বা ডাক নামের ব্যাপারে দারুণ মতভেদ আছে। যেমন ঃ আবু 'উমার, আবু 'আমের, আবু সা'দ, আবু সা'ঈদ, আবু 'উনাইস ইত্যাদি।[১] পিতা আরকাম ইবন যায়িদ। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু হারিস শাখার সন্তান। একজন আনসারী সাহাবী। খুব অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ছিলেন একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবী। সম্পর্কে তিনি যায়িদের চাচা। তিনি পিতৃহারা যায়িদকে তত্ত্বাবধানে নেন এবং লালন পালন করেন।[২] 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) 'আকাবার বাইয়াতে (শপথ) শরীক ছিলেন। মূলতঃ তাঁরই প্রভাবে হযরত যায়িদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত যায়িদ উহুদ যুদ্ধে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ায় হযরত রাসূলে কারীম (রা) তাঁকে বিরত রাখেন। সর্ব প্রথম খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে একথাও বর্ণিত আছে যে, 'আল-মুরাইসী' তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ। এরপর থেকে সকল অভিযান ও যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগদান করেন। সহীহ আল বুখারীতে এভাবে তাঁর বর্ণনা আছে, 'রাসূল (সা) মোট উনিশটি যুদ্ধ করেছেন, তারমধ্যে আমি সতেরটিতে (১৭) শরীক ছিলাম।'[৩]

মূতার যুদ্ধে চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) সংগে গিয়েছিলেন। চাচা-ভাতিজা দু'জনেই ছিলেন একই উটের ওপর আরোহী। চাচা ইবন রাওয়াহা ছিলেন বড় মাপের কবি। তিনি পথ চলতে চলতে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন যাতে তাঁর শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা প্রকাশ পায়। যায়িদ কবিতাটি শুনে কাঁদতে শুরু করেন। ইবন রাওয়াহা ছড়ি ঝাঁকিয়ে বলে ওঠেন, 'ওরে ছোটলোক, আমার শাহাদাতের ভাগ্য হলে তোর ক্ষতি কি?[৪]

খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত 'আলীর (রা) সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সিফ্ফীন যুদ্ধে 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন। তাঁকে 'আলীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়।[৫]

হযরত যায়িদ (রা) শেষ জীবনে কূফার বনু কিন্দা মহল্লায় বাড়ী করে বসতি স্থাপন করেন। এ কূফা শহরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে কিছু মতান্তর আছে। অনেকের মতে, আল-মুখতার আস-সাকাফীর বিদ্রোহের সময় হিজরী ৬৬ সনে মারা যান। তবে আল-হায়সাম ইবন 'আদী এবং আরো অনেকের মতে তাঁর মৃত্যু সন হিজরী ৬৮ সন। অনেকে একথাও বলেছেন যে হযরত আল-হুসাইনের (রা) শাহাদাতের অল্প কিছু দিন পর তাঁর মৃত্যু হয়।[৬]

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন তাঁর সময়ের জ্ঞান, মর্যাদা ও সম্মানের একটি কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে ছুটে আসতো। এক ব্যক্তিতো

'কিসতাস'-এর শেষ প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছিল তাঁর কাছে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে।[৭] তিনি যেখানেই যেতেন, হাদীসের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁর পাশে ভীড় জমাতো। একবার বসরা মতান্তরে মক্কায় গেলে হযরত 'আব্বাস (রা) বললেন, অমুক হাদীসটি যা আপনি বর্ণনা করে থাকেন, আবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।[৮] একবার 'আতিয়্যা আল- 'আওফী এসে বললেন, আপনি অমুক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমার আসার উদ্দেশ্য হলো, আপনার মুখ থেকেই হাদীসটি শোনা। তিনি হাদীসটি বর্ণনা করলে 'আতিয়্যা বললেন, আপনি এ বাক্যটিও তো বলেছিলেন - আমি যেমন শুনেছি, তেমনই তোমাকে বর্ণনা করবো।[৯]

হাদীস ছাড়াও যে সকল দু'আ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনে মুখস্ত করেছিলেন, মানুষকে শিখাতেন। একবার লোকদেরকে বলেছিলেন ঃ এগুলি রাসূল (সা) আমাদেরকে শিখাতেন, তাই আমরা তোমাদেরকে শিখাচ্ছি। তাঁর বর্ণিত বহু দু'আ হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।[১০]

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত যায়িদ (রা) দারুণ সতর্ক ছিলেন। আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা বলেন ঃ আমরা তাঁর কাছে এসে আবেদন জানাতাম, আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করুন। বলতেন ঃ আমি এখন বুড়ো হয়েছি এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করা বড় কঠিন কাজ।[১১]

একবার ইয়াযীদ ইবন হায়্যান, হুসাইন ইবন সাবরা ও 'আমর ইবন মুসলিম হাদীস শোনার জন্য তাঁর কাছে যান। প্রথমে তাঁরা যায়িদের (রা) প্রশংসা করে বলেন, আল্লাহ আপনাকে বড় ফজীলাত দিয়েছেন। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) কামালিয়্যাত (পূর্ণতা) প্রত্যক্ষ করেছেন। হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে যুদ্ধে গেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন। এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে? আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীস শোনান। জবাবে যায়িদ (রা) বললেন ঃ ভাতিজা, আমি এখন বুড়ো হয়েছি, সে সময়ও চলে গেছে। অনেক কথাই আজ স্মৃতি ও স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। হাদীসের একটি বড় ভান্ডার আজ ভুলে গেছি। এখন আমি যা কিছু বর্ণনা করি তাই শোন। যা নেই তার জন্য আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের উচিত হবে না।[১২]

এ কারণে হযরত যায়িদের (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র নব্বই (৯০)টি। তিনি হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও 'আলীর (রা) মুখ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং তাই বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সূত্রে যে সকল সাহাবী ও তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন, এখানে তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস, আবুততুফাইল, আবু 'উসমান আন-নাহদী, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'আবদে খায়র আল-হামাদানী, তাউস, নাদার ইবন আনাস, আবু 'উমার শায়বানী, আবুল মিনহাল, আবদুর রহমান ইবন মুতয়িম, আবু ইসহাক আস-সুবা'ঈ, মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজী, আবু হামযা তালহা ইবন

ইয়াযীদ, আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল-বসরী, কাসেম ইবন 'আওফ, আতিয়্যা আল-আওফ, আবু মুসলিম আল -বাজালী প্রমুখ।[১৩]

হযরত যায়িদের (রা) মধ্যে ইসলামের রূহানী বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় বনু মুসতালিক যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনায়। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরূপ ঃ

বনু আল-মুসতালিক-এর সংরক্ষিত জলাশয়ের নাম আল-মুরাইসী।' ইবন ইসহাকের মতে হিজরী ৬ এবং মূসা ইবন 'উকবার মতে ৪ সনে এ জলাশয়ের পাশে রাসূলুল্লাহর (সা) নেতৃত্বে মুসলিম, বাহিনীর এক যুদ্ধ হয়। যা ইতিহাসে 'আল-মুরাইসী'র যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে বনু মুসতালিফ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[১৪]

রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীসহ এ জলাশয়ের পাশে শিবির স্থাপন করেছিলেন। সৈনিকরা এখান থেকেই পশুকে পানি পান করাতো। হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) ছিল জাহ্জাহ্ ইবন মাস'উদ নামে বনু গিফার গোত্রের এক মজুর। তিনি 'উমারের (রা) ঘোড়াটি চরাতেন। একদিন ঘোড়াটিকে পানি পান করাতে গিয়ে 'আওফ ইবন খাযরাজের হালীফ বা বন্ধু সিনান ইবন ওয়াবার আল-জুহানীর সাথে তাঁর ঝগড়া বাঁধে এবং তা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে। আল-জুহানী আনসারদের সাহায্য চেয়ে চিৎকার জুড়ে দেন। জাহ্জাহ্ও বসে থাকলেন না। তিনিও মুহাজিরদের সাহায্য চেয়ে আওয়াজ দেন। মুনাফিক সরদার 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল এতে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়। তখন তার নিকট তার গোত্রের একদল লোক উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে যায়িদ ইবন আরকামও ছিলেন। তিনি তখন একজন তরুণ ব্যক্তি।

'আবদুল্লাহ ইবন উবাই সুযোগ বুঝে তার গোত্রীয় লোকদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ মুসলিম মুহাজিররা আমাদের সাথে এমন আচরণ করলো? আমাদেরই ভূমিতে তারা আমাদেরকে ঘৃণা করছে এবং আমাদের চেয়ে সংখ্যায় বেড়ে গেছে। মুহাজিরদের ব্যাপারটি যেন, 'খাইয়ে মোটাতাজা করা সেই পালিত কুকুরের মত যে তার প্রভুকে খেয়ে ফেলে।' আল্লাহর কসম, মদীনায় ফিরতে পারলে আমরা তথাকার অভিজাতরা এই ইতরদেরকে বিতাড়িত করে ছাড়বো। মূলতঃ এটা তোমাদেরই কর্মফল। তোমাদের মাতৃভূমির দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিয়েছো। তোমাদের সম্পদ তাদেরকে ভাগ করে দিয়েছো। আল্লাহর কসম, তোমাদের যা আছে তা যদি তোমরা তাদেরকে দেওয়া বন্ধ করে দাও তাহলে তারা (মুহাজিররা) তোমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।' মুনাফিক ইবন উবাই এভাবে তার গোত্রীয় লোকদের সুপ্ত অনুভূতিতে আঘাত করে মুহাজিরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করলো না। যায়িদ ইবন আরকাম (রা) চুপ করে তার সব কথা শুনলেন। তাঁর ঈমানী চেতনা তাঁকে এ মুনাফিকের কথাগুলি চেপে রাখতে দিলোনা। যদিও ইবন উবাই ছিল তাঁর স্বগোত্রীয় লোক।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যুদ্ধের ব্যস্ততা শেষ করে একটু বিশ্রামে আছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন তাঁর কাছে বসা। এ সময় যায়িদ (রা) উপস্থিত হলেন এবং সব কথা খুলে বললেন। 'উমার (রা) রাগে ফেটে পড়লেন এবং রাসূলকে (সা) পরামর্শ দিলেন ঃ আপনি ইবন উবাইকে হত্যা করার জন্য 'আব্বাদ ইবন বিশরকে নির্দেশ দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'উমার, লোকে যখন বলাবলি করবে, মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেন তখন কি হবে? না তা হয়না। তুমি বরং লোকদেরকে এখান থেকে চলার কথা জানিয়ে দাও। সাধারণত রাসূল (সা) এমন সময় যাত্রা শুরু করতেন না। ঘোষণা অনুযায়ী লোকেরা যাত্রা শুরু করলো।

এ দিকে মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই যখন জানলো, যায়িদ ইবন আরকাম তার সব কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছে দিয়েছে তখন সে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে এসে হলফ করে বললো ঃ যায়িদ যা বলেছে তার কিছুই আমি বলিনি। এমন কোন কথাই আমি উচ্চারণ করিনি। সে ছিল তার গোত্রের একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি। তাই যে সকল আনসার সাহাবী তখন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সম্ভবত এ তরুণ ইবন উবাইয়ের কথা বুঝতে ভুল করেছে এবং তার মূল বক্তব্য মনে রাখতে পারেনি। এভাবে তাঁরা আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কথা বিশ্বাস করে তার পক্ষে সাফাই গাইলেন। যায়িদের (রা) চাচা 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও (রা) তাঁকে তিরস্কার করলেন।

ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূল (সা) আল-মুরাইসী থেকে যাত্রা করলেন। উসাইদ ইবন হুদাইর এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি তো এমন অসময়ে বের হন না। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমাদের সাথী যে কথা বলেছে তা কি তোমার কানে পৌঁছেনি? বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন সাথীর কথা বলছেন? বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই। সে কি বলেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সা) যা শুনেছিলেন তাই তাঁকে বললেন। উসাইদ তখন বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি চাইলে তো তাকেই বের করে দিতে পারবেন। সেই ইতর, আর আপনি তো সম্মানিত ও শক্তিশালী। এরপর তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন উবাইর প্রতি করুণা করার জন্য রাসূলকে (সা) অনুরোধ করেন।

এরপর রাসূল (সা) হিজাযের 'বাকয়া' নামক উঁচু ভূমিতে যাত্রা বিরতি করেন। আর সেখানেই সূরা 'আল-মুনাফিকুন' নাযিল হয়। এতে আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও তার মত অন্য মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিল। আর সেই সাথে ঘোষিত হয়েছে হযরত যায়িদের (রা) নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা। সূরাটি যেভাবে শুরু হয়েছে তা বুঝার জন্য এখানে প্রথম দু'টি আয়াতের অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

"মুনাফিকরা তোমার কাছে এসে বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে।

অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।"

সূরা আল-মুনাফিকুন নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) হযরত যায়িদের (রা) কান ধরে বলেন- 'এ সেই ব্যক্তি যার কান আল্লাহর হক পূর্ণরূপে আদায় করেছে।'

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আল মুরাইসী থেকে সফর শুরু করার পর হযরত যায়িদ (রা) বারবার রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কুরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়িদ ইবন আরকাম দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহর (রা) মধ্যে ওহী নাযিলের সময়ের লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তিনি আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়িদ (রা) বলেন ঃ আমার সাওয়ারী রাসূলুল্লাহ (সা) কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সাওয়ারীর ওপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ 'হে বালক, আল্লাহ তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন।'

এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু ইমাম বাগভীর (রহ) বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং যায়িদ ইবন আরকাম (রা) অপমানের ভয়ে ঘরে আত্মগোপন করেন তখন এই সূরা নাযিল হয়।[১৫]

তিনি সুন্নাতে নাবাবীর অনুসরণে বিন্দুমাত্র হেরফের করতেন না। জানাযার নামাযে তিনি চারতাকবীর বলতেন। একবার পাঁচ তাকবীর বললেন। এক ব্যক্তি হাত টেনে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, ভুল করেননি তো? বললেন ঃ এটাও রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাত। আমি একেবারেই ছেড়ে দিই কিভাবে?[১৬]

তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (রা) অতি ঘনিষ্ঠজন। কোন সময় অসুস্থ হলে রাসূল (সা) তাকে দেখতে যেতেন।[১৭] একবার তিনি চোখের রোগে আক্রান্ত হলেন। রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। সেরে ওঠার পর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইবন আরকাম! তোমার রোগ যদি না সারতো, কি করতে? বললেন ঃ সবর করতাম এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় থাকতাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ এমন করলে পাপমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে।[১৮] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ এ রোগে তোমার কোন ক্ষতি হবেনা। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যদি তুমি বেঁচে থাক এবং অন্ধ হয়ে যাও তাহলে কি করবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি তখন সবর করবো এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় থাকবো। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। রাসূলুল্লাহর (সা) মৃত্যুর পর হযরত যায়িদ (রা) অন্ধ হয়ে যান।[১৯]

কারও সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন আচরণ ও মন্তব্য থেকে তিনি সব সময় বিরত থাকতেন। আর কারও মধ্যে এ ত্রুটি দেখতে পেলে তার প্রতিবাদ করতেন। একবার

হযরত আলী (রা) সম্পর্কে হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) একটি অশোভন উক্তি করেন। সাথে সাথে হযরত যায়িদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) মৃতদেরকে খারাপ বলতে নিষেধ করেছেন। 'আলী (রা) মারা গেছেন। এখন তাঁকে খারাপ বলছেন কেন?

মানুষের বিপদ মুসীবতে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ছিল তাঁর স্বভাব। হাররার ঘটনায় হযরত আনাসের এক ছেলে এবং তাঁর কিছু আত্মীয়-বন্ধু মারা যান। হযরত যায়িদ (রা) সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে আনাসের (রা) কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি বলেনঃ আমি আপনাকে আল্লাহর সুসংবাদ শুনাচ্ছি। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ, আনসার, তাদের সন্তান-সন্তুতি, অধঃস্তন পুরুষ, তাদের নাতি-নাতিনী এবং তাদের সকল ছেলে-মেয়েদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।[২০]

তিনি তাঁর সমকালীন ব্যক্তিদের যোগ্যতা ও গুণাবলীকে অত্যন্ত উদার চিত্তে স্বীকৃতি দিতেন। একারণে কেউ কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলে তাঁকে সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন। একবার আবুল মিনহাল আসলেন তাঁর কাছে 'বায় 'সারফ' সম্পর্কে কিছু জানার জন্য। তিনি বললেন ঃ বারা'-এর কাছে যাও। তাঁকে জিজ্ঞেস করো। এ ব্যাপারে তিনি আমার চেয়ে ভালো এবং বড় 'আলিম। আবুল মিনহাল বারা'-এর কাছে গেলেন। তিনি মাসয়ালার জবাব দিয়ে বললেন ঃ আমি যা বলেছি, এর সত্যতা যাচাই করে নিবে যায়িদ ইবন আরকামের নিকট থেকে। তিনি আমার চেয়ে বেশী এবং ভালো জানেন।

আমীর-উমারাদের সাথে তাঁর উঠা-বসা ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন।

হযরত যায়িদ ইবন আরকাম ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিশ্বাস এবং ইবাদাত সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাহল্লাহ' পাঠ করবে, সে জান্নাতে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ নিষ্ঠার সাথে পাঠ করার অর্থ কি? বললেন ঃ আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত থাকা।[২২]

একবার কিছু লোক কুবার মসজিদে চাশতের নামায পড়ছিলো। ঐ পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। লোকদের নামায পড়তে দেখে বললেন, সম্ভবত তাদের জানা নেই যে, এ নামাযের জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৭; উসুদুল গাবা-২/৩১৯
২. আল-ইসাবা-১/৫৬০; উসুদুল গাবা-২/৩১৯
৩. বুখারী-২/৫৬৩; উসুদুল গাবা-২/৩১৯; তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-১০/১০; আল-ইসাবা-১/৫৬০

৪. আল-বিদায়া-৪/২৪৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৩২ আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৮
৫. আল-ইসাবা-১/৫৬০; তাহজীবুল কামাল-১০/১১
৬. উসুদুল গাবা-২/৩২০; তাহজীবুল কামাল-১০/১১-১২, আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৭; তাবাকাত-৬/১৮
৭. তাবাকাত-৪/৩৭২
৮. প্রাগুক্ত-৪/৩৬৭
৯. প্রাগুক্ত-৪-৩৯৮
১০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৫১, ৩৬৭
১১. মুসনাদ-৪/৩৭০; কানযুল 'উম্মাল-৫/২৩৯; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৪১,
১২. মুসনাদ-৪/৩২৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৪৩
১৩. আল-ইসাবা-১/৫৬০; 'তাহজীবুল কামাল' গ্রন্থকার যায়িদ (রা) থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, এমন বিখ্যাত ২৯ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। দ্রঃখ, ১০, পৃঃ ১০-১১
১৪. সহীহ বুখারী ঃ বাবু গাযওয়াতু বনী আল-মুসতালিক।
১৫. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ বুখারী-৬/১৮৯, ১৯০, ১৯১; তিরমিযী-৩৩১৪; মুসলিম-২৭৭২; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯০-২৯২; ইবন কাছীরের আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-২/৪৮-৫০; উসুদুল গাবা-২/৩১৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৭; তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন ঃ সূরা আল-মুনাফিকুন।
১৬. মুসনাদ-৪/৩৬০, ৩৭০
১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৫০৮
১৮. মুসনাদ-৪/৩৭৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮৪; আল-আদাবুল মুফরাদ-৭৮
১৯. কানযুল 'উম্মাল-২/১৫৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৫৮
২০. মুসনাদ-৪৩৭০
২১. কানযুল 'উম্মাল-৫/২৪১; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৩ আল-ইসাবা-১/৫৬০
২২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-৩/৭৪; হায়াতুস সাহাবা/২৯২

যায়িদ ইবন সাবিত (রা)

রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবী হযরত যায়িদ (রা)-এর বেশ কয়েকটি উপনাম বা ডাকনাম সীরাত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যেমন ঃ আবু সাঈদ, আবু খারিজা, আবু 'আবদির রহমান ও আবু সাবিত।[১] মুসলিম উম্মাহ তাঁকে অনেকগুলি উপাধিতে ভূষিত করেছে। যেমনঃ হাবরুল উম্মাহ, কাতিবুল ওহী ইত্যাদি। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতা সাবিত ইবন দাহহাক এবং মাতা নাওয়ার বিনতু মালিক।[২] নাওয়ার ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের (রা) খান্দানের মেয়ে।

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পূর্বে মদীনার অধিবাসীদের পরস্পরের মধ্যে যে সব রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও সংঘর্ষ হয় তার মধ্যে 'বুয়াস' যুদ্ধটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধে যায়িদের পিতা সাবিত নিহত হন। এটা হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন যায়িদের বয়স মাত্র ছয় বছর। তিনি মায়ের তত্ত্বাবধানে বড় হন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিযরতের সময় যায়িদ এগারো বছরের এক বালক মাত্র।[৩]

তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মদীনায় ইসলামের ভিত্তি খুব একটা মজবুত হয়নি। মক্কা থেকে হযরত রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত মুবাল্লিগ হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইর (রা) যখন মদীনায় ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন তখন কোন এক সময়ে অতি অল্প বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বালেগ হওয়ার পূর্বে ঈমান আনা যদি কোন গৌরবের বিষয় হয় তাহলে হযরত যায়িদ সেই গৌরবের অধিকারী। জীবনের সূচনা থেকেই এভাবে তিনি শিরকের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই কুরআন পড়তে শুরু করলেন। মানুষও তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তিনি ছিলেন প্রচন্ড মেধাবী ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসলেন। তখন তিনি কুরআনের সতেরটি সূরার হাফেজ। লোকেরা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে নিয়ে গেল এবং এই বলে পরিচয় করে দিল যে, ছেলেটি নাজ্জার গোত্রের। এরই মধ্যে সে সতেরটি সূরার পাঠ শেষ করেছে। রাসূল (সা) তাঁর মুখ থেকে কুরআন তিলওয়াত শুনে খুব খুশী হলেন।[৫] যায়িদ বলেন ঃ তখন আমার বয়স মাত্র এগার বছর।[৬]

বদর যুদ্ধের সময় তিনি তের (১৩) বছরের এক বালক মাত্র। যুদ্ধে যাওয়ার বয়স তখনো হয়নি। তবুও আনসার ও মুহাজিরগণ যখন বদরের দিকে যাত্রা করলেন তখন এ বালকও যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরই মত ছোটদের একটি দলের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যুদ্ধের বয়স না হওয়ার কারণে রাসূল (সা) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন।[৭]

হযরত যায়িদ সর্ব প্রথম কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। অনেকের ধারণা তিনি উহুদে যোগদান করেন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ। তখন তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার বয়স ষোল পূর্ণ হয়ে গেছে। আবার অনেকে বলেছেন, খন্দক তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ।[৮] আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, যায়িদ ইবন সাবিত বলেন ঃ আমাকে বদর ও উহুদে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি। খন্দকে প্রথম অনুমতি পাই।[৯] ইবন হিশামও বলেন, তাঁর বয়স কম হওয়ায় রাসূল (সা) অন্যদের সাথে তাঁকেও উহুদে ফিরিয়ে দেন।[১০]

হায়াতুস সাহাবা গ্রন্থে যায়িদ ইবন সাবিতের একটি বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। তাদ্বারা বুঝা যায়, তিনি উহুদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন ঃ উহুদের দিন যুদ্ধ শেষে রাসূল (সা) আমাকে সা'দ ইবনুর রাবীকে খুঁজতে পাঠালেন। যাবার সময় বলে দিলেন ঃ যদি তাঁকে পাও, আমার সালাম জানাবে। আর তাকে বলবে- রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে চেয়েছেন, তুমি নিজেকে কেমন দেখতে পাচ্ছো?

যায়িদ বলেন ঃ আমি শহীদদের মাঝে ঘুরে ঘুরে তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। এক সময় পেয়ে গেলাম। তখন তাঁর অন্তিম মুহূর্ত। সারা দেহে তাঁর তীর, বর্শা ও তরবারির সত্তরটি (৭০) আঘাত। বললাম ঃ সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তোমার কেমন মনে হচ্ছে তা জানতে চেয়েছেন।

সা'দ বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি সালাম এবং তোমার প্রতিও। তুমি বলবে, আমি জান্নাতের খোশবু লাভ করছি।[১১]

যাইহোক, খন্দক যুদ্ধে যে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যায়িদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে খন্দকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন এবং এক খন্ড কুবতী (মিসরীয় সূক্ষ্ম ও শুভ্র) বস্ত্রও দান করেন।[১২] খন্দক খনন ও মাটি বহনে অংশ নেন। এ অবস্থায় একবার রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টিতে পড়লে তিনি মন্তব্য করেন ঃ 'বেশ ভালো ছেলে তো।'[১৩] ঘটনাক্রমে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এ অবস্থায় 'আম্মারা ইবন হাযাম একটু রসিকতা করে তাঁর কাঁধ থেকে অস্ত্র সরিয়ে নেন। যায়িদ টের পেলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) কাছেই ছিলেন। তিনিও একটু রস করে ডাক দিলেন ঃ 'ইয়া আবা রুকাদ!' ওহে নিদ্রাকাতর ব্যক্তি, ওঠো। তারপর তিনি লোকদের এ ধরনের মশকারা করতে নিষেধ করে দেন।[১৪] এই খন্দক থেকে নিয়ে পরবর্তীকালের সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১৫]

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত যায়িদের (রা) গোত্র মালিক ইবন নাজ্জারের ঝান্ডা প্রথম ছিল 'আম্মারা ইবন হাযামের হাতে। পরে রাসূল (সা) সেটি যায়িদের হাতে অর্পণ করেন। এতে 'আম্মারা মনে করেন, হয়তো তাঁর কোন ত্রুটি হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোন ত্রুটি হয়েছে কি? তিনি জবাব দেন ঃ না, তেমন কিছু নয়।

আমি কুরআনের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে একাজ করেছি। যায়িদ তোমার চেয়ে বেশী কুরআন পড়েছে। কুরআনই অগ্রাধিকারযোগ্য।[১৬]

খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফাতকালে ভন্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের সাথে ইয়ামামার যুদ্ধ হয়। এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যায়িদও (রা) অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর গায়ে একটি তীর লাগে। কিন্তু তিনি মারাত্মক আঘাত থেকে বেঁচে যান।[১৭] খলীফা 'উমারের (রা) আমলে খাইবার থেকে ইহুদীদের বিতাড়নের পর তথাকার 'ওয়াদি-উল-কুরা' মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়। যায়িদও (রা) একটি অংশ লাভ করেন।[১৮]

খলীফা হযরত 'উসমান (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী তখন মদীনার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্রোহীদের সাথে লড়বার জন্য খলীফার অনুমতি চান। এ সময় যায়িদ ইবন সাবিতও (রা) খলীফার সাথে দেখা করে বলেন ঃ আনসাররা আপনার দরজায় হাজির। আপনি চাইলে তারা আবারও আল্লাহর আনসার হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত। খলীফা বললেন ঃ তোমরা যদি লড়াই করার ইচ্ছা করে থাক তাহলে তাতে আমার সম্মতি নেই।[১৯]

হযরত যায়িদ ইবন সাবিতের (রা) গোটা জীবন সৎকর্মের সমষ্টি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সেক্রেটারী। ওহী লিখতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি-পত্র লিখতেন এবং যে সব চিঠি-পত্র আসতো তা পাঠ করে শোনাতেন। পরবর্তীকালে খলীফা 'উমারেরও (রা) সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

পবিত্র কুরআন ইসলামের মূল ভিত্তি। এর সংগ্রহ ও সংকলন করার মহা গৌরবের অধিকারী হলেন 'কাতিবুল ওহী' যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।[২১] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকাল পর্যন্ত হাড়, চামড়া, খেজুরের পাতা ও মুসলমান হাফেজদের স্মৃতিতে কুরআন সংরক্ষিত ছিলো। বহু সাহাবী কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। এ সকল হাফেজদের মধ্যে যায়িদও (রা) একজন।

হযরত রাসূলের কারীমের (সা) ইনতিকালের পর আরব উপদ্বীপের একদল মানুষ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগ করা) হয়ে মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের দলে ভিড়ে যায়। সে ইয়ামামায় নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করে। হযরত আবু বকর (রা) তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। মুসায়লামা ইয়ামামার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়। তবে এ যুদ্ধে ৭০ (সত্তর) জন হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন।

এ ঘটনার পর হযরত 'উমারের (রা) অন্তরে কুরআন সংগ্রহ করার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তিনি খলীফা আবু বকরকে (রা) বললেন, এভাবে হাফেজদের শাহাদাতের ধারা অব্যাহত থাকলে কুরআনের বিরাট অংশ এক সময় হারিয়ে যাবার আশংকা আছে। সুতরাং বিলম্ব না করে গোটা কুরআন এক স্থানে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নিন। খলীফা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। তিনি যায়িদ ইবন সাবিতকে ডেকে বলেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান নওজোয়ান। তোমার প্রতি সবার আস্থা আছে। তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ওহী লিখেছিলে। সুতরাং তুমিই এ কাজটি সম্পাদন কর।[২২]

হযরত যায়িদ (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তাঁরা আমাকে কুরআন সংগ্রহ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা করার চেয়ে একটি পাহাড় সরানোর দায়িত্ব দিলে তা আমার কাছে অধিকতর সহজ হতো।[২৩] তিনি খলীফাকে বললেন ঃ আপনি এমন কাজ করতে চান যা রাসূল (সা) করেননি। খলীফা বললেন ঃ তা ঠিক। তবে ভালো কাজে অসুবিধা কি? তারপরেও যায়িদ কাজটি করতে ইতস্তত করতে থাকেন। খলীফা বিভিন্নভাবে বুঝানোর পর তিনি রাজী হয়ে গেলেন।[২৪]

এ কাজে যায়িদকে সহযোগিতার জন্য খলীফা আবু বকর (রা) আরও একদল সাহাবাকে দিলেন। দলটির সংখ্যা ৭৫ (পঁচাত্তর) বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে উবাই ইবন কা'ব ও সা'ঈদ ইবনুল 'আসও (রা) ছিলেন। হযরত যায়িদ খেজুরের পাতা, পাতলা পাথর ও হাড়ের ওপর লেখা আল কুরআনের সকল অংশ সংগ্রহ করলেন। হাফেজদের পাঠের সাথে তা মিলিয়ে দেখলেন। তিনি নিজেও আল কুরআনের একজন হাফেজ ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে আল কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন।[২৫]

আয়াতের সত্যতা এবং বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্ক ও ঝগড়ার পর্যায়ে চলে যেত। এক স্থানে পৌছে যায়িদ বললেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'রজমের' আয়াত থেকে শুনেছিলাম। হযরত 'উমার (রা) বললেন ঃ কিন্তু রাসূল (সা) তা লেখার অনুমতি দেননি।[২৬] মোট কথা কঠোর পরিশ্রম করে হযরত যায়িদ (রা) এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাপ্ত করেন। তাঁর দ্বারাই সম্পূর্ণ আল কুরআন সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা হয়।

একটি আয়াতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রমাণের নিয়ম ধরা হয়েছিল প্রতিটি আয়াতের ব্যাপারে কম পক্ষে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য। আয়াতটি ছিল হযরত আবু খুযায়মার (রা) নিকট। ইনি সেই আবু খুযায়মা যাঁর একার সাক্ষ্যকে রাসূল (সা) দু'জনের সাক্ষ্যের সমান বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। একারণে হযরত যায়িদ উক্ত আয়াতটির ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন মনে করেননি। তাছাড়া আয়াতটি তাঁর নিজের জানা ছিল।[২৭]

হযরত যায়িদ (রা) কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত কুরআন মজীদের এ কপিটি খলীফা হযরত আবু বকর (রা) নিজের হিফাজতে রাখেন। তাঁর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) হাত হয়ে তা তাঁরই কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) হাতে পৌছে এবং সেখানে সংরক্ষিত হয়।[২৮]

তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে বিভিন্ন অঞ্চলে যখন আল কুরআনের পাঠে তারতম্য দেখা দেয় তখন হযরত হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) খলীফাকে পরামর্শ দেন যে, ইহুদী ও নাসারাদের ধর্মীয় গ্রন্থের মত আল কুরআনের ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আপনি তা রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। খলীফাও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুধাবন করেন। তিনি হযরত যায়িদের (রা) সংগৃহীত আল কুরআনের কপিটি হযরত হাফসার (রা) নিকট থেকে

চেয়ে নেন। তারপর হযরত যায়িদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনুযযুবাইর, সা'ঈদ ইবনুল 'আস ও 'আবদুর রহমান ইবনুল হারেস ইবন হিশাম (রা) এ চারজন বিশিষ্ট সাহাবীকে তার থেকে কপি করার নির্দেশ দেন। তাঁরা হযরত আবু বকরের (রা) ঐ মূল কপি থেকে পাঁচটি কপি নকল করেন। খলীফা 'উসমান (রা) এই কপিগুলি খিলাফতের পাঁচটি অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন এবং হযরত আবু বকর (রা) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মূল কপিটি- যা 'মাসহাফে সিদ্দীকী' নামে প্রসিদ্ধ - আবার হযরত হাফসার (রা) নিকট ফিরিয়ে দেন।[২৯]

নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ওহী লেখার দায়িত্ব বিভিন্ন সাহাবীর ওপর অর্পণ করেছিলেন। এ সকল ভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।

হযরত যায়িদ কলম, দোয়াত, কাগজ, খেজুরের পাতা, চওড়া ও পাতলা হাড়, পাথর ইত্যাদি নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে যেতেন। যখন ওহী অবতীর্ণ হতো, রাসূল (সা) বলে যেতেন, আর তিনি লিখে চলতেন। লেখা সম্পর্কে বিশেষ কোন নির্দেশ থাকলে রাসূল (সা) তা বলে দিতেন, আর যায়িদ তদানুযায়ী কাজ করতেন।

ইমাম বুখারী (রহ) আল-বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আন-নিসা'র ৯৫ নং আয়াতটি—

لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে -সমান নয়।) নাযিল হলো তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ কাঠ, দোয়াত, হাড় নিয়ে যায়িদকে আমার কাছে আসতে বলো, যায়িদ এলে তিনি আয়াতটি লিখতে বললেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে তখন অন্ধ সাহাবী 'আমর ইবন উম্মে মাকতুম বসা ছিলেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ব্যাপারে কি হুকুম? আমি তো একজন অন্ধ মানুষ। তখন- (যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই) অংশটি নাযিল হয়। তখন রাসূল (সা) যায়িদকে আয়াতটি এভাবে সাজিয়ে লিখতে বলেন ঃ[৩০]

لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - غَيْرُ اُلِىْ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

যায়িদ পরে অবতীর্ণ অংশটুকু হাড়ের ফাটার মধ্যে লিখে নেন। কারণ, যে হাড়টির মধ্যে পূর্বে আয়াতটি লেখা হয়েছিল তা ফাটা ছিল।[৩১]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে আনসারদের মধ্যে খিলাফতের বিষয়টি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা 'সাকীফা বনী সায়িদা'য় সমবেত হন এবং তাঁদের নেতৃত্বের আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)। তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিরা সেখানে বক্তৃতা করছিলেন এবং আনসারদের একটি বড় দল ছিলেন তাঁর সমর্থক। এ মজলিসে যায়িদ ইবন সাবিতও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু জনতার মতের বিরুদ্ধে তখন কথা বলা সহজ ছিল না। এ জন্য তিনি চুপ করে বসে থাকেন।

তারপর হযরত আবু বকর, 'উমার ও আবু 'উবাইদাহ (রা) 'সাকীফা বনী সায়িদা'-য় পৌঁছলেন এবং মুহাজিরদের পক্ষ থেকে 'উমার (রা) খিলাফতের বিষয়টি আলোচনা শুরু করলেন। তখন সর্ব প্রথম যে আনসারী ব্যক্তি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন তিনি যায়িদ ইবন সাবিত।

হযরত হুবাব ইবনুল মুনজির (রা) একজন আনসারী ও বদরী সাহাবী। তিনি যখন তাঁর বক্তৃতায় দুই আমীরের তত্ত্ব পেশ করে মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আপনাদের মধ্য থেকে একজন এবং আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। এছাড়া আর কিছুতেই আপোষ হবেনা।' তখন যায়িদ ইবন সাবিত উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে এক নতুন তত্ত্ব দিলেন। তিনি বললেন ঃ 'রাসূল (সা) ছিলেন একজন মুহাজির। এখন ইমামও হবেন একজন মুহাজির। আর আমরা যেমন ছিলাম রাসূলের (সা) আনসার তেমনিভাবে এখন হবো ইমামের আনসার।' একথা বলে তিনি আবু বকরের (রা) একটি হাত ধরে আনসারদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'এই তোমাদের বন্ধু, তোমরা এর হাতে বাই'য়াত কর।'[৩২]

হযরত যায়িদের (রা) এ বক্তব্য ছিল তারই গোত্রের লোকদের বিপক্ষে। তা সত্ত্বেও স্বীয় অনুভূতি প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে হযরত আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। যদি এর বিপরীত কিছু বলা হতো তাহলে আমরা হয়তো মানতাম না।[৩৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় আসার পর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ ও এলাকার রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা ও গোত্র প্রধানদের চিঠিপত্র বিভিন্ন সময় তাঁর নিকট আসতে থাকে। যার বেশীর ভাগই হতো সুরইয়ানী ও ইবরানী (হিব্রু) ভাষায়। মদীনায় তখন এ দু'টি ভাষা জানতো শুধু ইহুদীরা। তাদের ছিল আবার ইসলামের সাথে চরম দুশমনী। এ কারণে উক্ত ভাষা দু'টি আয়ত্ত করা ছিল মুসলমানদের একান্ত প্রয়োজন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এ প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করলেন। তিনি হযরত যায়িদের (রা) মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকেই এ কাজের জন্য নির্বাচন করলেন। এ প্রসঙ্গে হযরত যায়িদের (রা) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হলো ঃ

রাসূল (সা) মদীনায় এলে আমাকে তাঁর সামনে হাজির করা হয়। তিনি আমাকে বললেন ঃ 'যায়িদ, আমার জন্য তুমি ইহুদীদের লেখা শিখ। আল্লাহর কসম! তারা

আমার পক্ষ থেকে 'ইবরানী ভাষায় যা কিছু লিখে থাকে তার ওপর আমার আস্থা হয় না।' তাই আমি 'ইবরানী ভাষা শিখলাম। মাত্র আধা মাসের মধ্যে এতে দক্ষতা অর্জন করে ফেললাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) ইহুদীদেরকে কিছু লেখার দরকার হলে আমিই লিখতাম এবং রাসূলকে (সা) কিছু লিখলে আমিই তা পাঠ করে শুনাতাম।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) আমাকে বললেন ঃ 'যায়িদ, তুমি কি সুরইয়ানী ভাষা ভালো জান? এ ভাষায় আমার কাছে চিঠি-পত্র আসে। বললাম ঃ না। তিনি বললেনঃ তাহলে এ ভাষাটি শিখে ফেল। এরপর আমি মাত্র সতের দিনে ভাষাটি শিখে ফেললাম।[৩৪]

যায়িদের (রা) এই সীমাহীন মেধা ও জ্ঞানের কারণে হযরত রাসূলে কারীম (সা) যাবতীয় লেখালেখির দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করেন। মুহাম্মাদ ইবন 'উমার বলেন ঃ যায়িদ আরবী ও 'ইবরানী- দু'ভাষাতেই লিখতেন।[৩৫] বালাজুরী বলেন ঃ সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন উবাই ইবন কা'ব আল-আনসারী। উবাই-এর অনুপস্থিতিতে যায়িদ এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা ওহী ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠি-পত্রও লিখতেন।[৩৬] রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা) ও 'উমারের (রা) খিলাফত কালেও এ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। তবে তখন কাজের চাপ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় মু'য়াইকিব আদ-দাওসীকে তাঁর সহকারী নিয়োগ করা হয়।[৩৭]

ইসলামী হুকুমতের একটি অতি মর্যাদাপূর্ণ দফতর হলো বিচার বা কাজা'। প্রসিদ্ধ মতে এ দফতরটি সৃষ্টি হয় হযরত ফারূকে আজমের খিলাফতকালে। রাসূল (সা) ও আবু বকরের (রা) আমলে পৃথকভাবে এ দফতরটি ছিল না। খলীফা হযরত উমার (রা) এর সূচনা করেন এবং হযরত যায়িদ ইবন সাবিতকে (রা) মদীনায় কাজী নিয়োগ করেন। তাবাকাত ইবন সা'দ ও আখবারুল কুজাত গ্রন্থে এসেছে ঃ 'উমার (রা) যায়িদকে কাজী নিয়োগ করেন এবং তাঁর ভাতাও নির্ধারণ করেন।[৩৮]

তখনও বিচারকের জন্য পৃথক 'আদালত ভবন বা বাড়ি নির্মাণ হয়নি। হযরত যায়িদের (রা) বাড়িই ছিল 'দারুল কাজা' বা বিচারালয়। ঘরের মেঝেতে ফরাশ বিছানো থাকতো। তিনি তার ওপর মাঝখানে বসতেন। রাজধানী মদীনা ও তার আশে পাশের যাবতীয় মামলা-মোকদ্দামা হযরত যায়িদের (রা) এজলাসে উপস্থাপিত হতো। এমন কি তৎকালীন খলীফা খোদ 'উমারের (রা) বিরুদ্ধেও এখানে মামলা দায়ের হয়েছে এবং তার বিচারও চলেছে।

ইমাম শা'বী বর্ণনা করেছেন। একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) ও হযরত উবাই ইবন কা'বের (রা) মধ্যে একটি বিবাদ দেখা দিল। হযরত যায়িদের (রা) এজলাসে মুকাদ্দামা পেশ হলো। বিবাদী হিসাবে খলীফা 'উমার (রা) আদালতে হাজির হলেন। আধুনিক যুগে যেমন আদালতে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের বসার জন্য চেয়ার দানের নিয়ম হয়েছে, হযরত যায়িদও তেমনি খলীফাকে নিজের আসনের পাশে বসার স্থান করে দেন। কিন্তু

ইসলাম যে সাম্য ও সমতার বিধান কায়েম করেছিল, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন। বিশেষত হযরত 'উমার (রা) তো এ ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন। তিনি বিচারক হযরত যায়িদের (রা) এ আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'এ হলো আপনার প্রথম অবিচার। আমাকে আমার প্রতিপক্ষের সাথে বসা উচিত।' অতঃপর বাদী-বিবাদী উভয়ে আদালতের সামনে এক সাথে বসেন।

মামলার শুনানী শুরু হলো। হযরত 'উবাই (রা) ছিলেন বাদী। তিনি ছিলেন একটি বিষয়ের দাবীদার; পক্ষান্তরে 'উমার (রা) ছিলেন অস্বীকারকারী। ইসলামী বিচার বিধি অনুযায়ী অস্বীকারকারীর ওপর কসম বা শপথ দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু হযরত যায়িদ (রা) খিলাফতের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাদীকে বললেন, যদিও নিয়ম নয়, তবুও আমি বলছি, আপনি আমীরুল মুমিনীনকে কসম দানের বিষয়টি মাফ করে দিন। একথা শুনে আমীরুল মুমিনীন ক্ষোভের সাথে বললেন ঃ "যায়িদ ন্যায় বিচারক হতে পারবেনা, যতক্ষণ না 'উমার ও সাধারণ একজন মুসলমান তাঁর নিকট সমান হয়।'[৩৯]

তৎকালীন খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে যদিও একাধিক স্থানীয় 'বাইতুলমাল' ছিল, তবুও 'দারুল খিলাফা' মদীনায় ছিল কেন্দ্রীয় 'বাইতুলমাল'। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন এই কেন্দ্রীয় বাইতুলমালের দায়িত্বশীল। হিজরী ৩১ সনে খলীফা হযরত 'উসমান (রা) তাঁকে এ দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এই 'বাইতুলমালের' কর্মচারীদের মধ্যে 'ওহাইব' নামে যায়িদের (রা) একজন দাসও ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান। নানা কাজে যায়িদকে (রা) সাহায্য করতেন।

একদিন তিনি 'বাইতুল মালে' কাজ করছেন। এমন সময় খলীফা 'উসমান (রা) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এ কে? যায়িদ বললেন ঃ আমার দাস। উসমান (রা) বললেন ঃ আমাদের নিকট তার অধিকার আছে। কারণ সে মুসলমানদের সাহায্য করছে। মূলতঃ তিনি 'বাইতুলমালের কাজের' প্রতি ইঙ্গিত করেন। তারপর তিনি দু'হাজার দিরহাম তাঁর বেতন নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত যায়িদ এক হাজার করার প্রস্তাব রাখেন। খলীফা তাতে রাজী হন। এভাবে তাঁর বেতন এক হাজার নির্ধারিত হয়।[৪০]

খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) আমলে মুহাজির ও আনসারদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত মজলিসে শূরার একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন যায়িদ (রা)। খলীফা 'উমার (রা) উক্ত শূরাকে একটি উপদেষ্টা কাউন্সিলের রূপ দান করেন। যায়িদ (রা) তারও সদস্য ছিলেন।

হযরত যায়িদের (রা) মধ্যে 'ইল্‌ম ও দ্বীনের পূর্ণতার সাথে সাথে প্রশাসনিক যোগ্যতাও ছিল। তাঁর ওপর খলীফা 'উমারের (রা) এতখানি আস্থা ছিল যে, যখনই তিনি মদীনার বাইরে সফরে যেতেন, তাঁকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। খলীফা 'উসমানও (রা) একই পন্থা অনুসরণ করেন। ইবন 'উমার থেকে নাফে বর্ণনা করেছেন। 'উমার (রা) যখন হজ্জে যেতেন, যায়িদকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। 'উসমানও তাই করতেন।[৪১]

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে মোট তিনবার তিনি খলীফার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিজরী ১৬ ও ১৭ সনে দু'বার। বালাজুরী বলেন ঃ হিজরী ২৩ সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনীদের সাথে নিয়ে 'উমার হজ্জ করেন। তখনও যায়িদ ইবন সাবিতকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান।[৪২] খলীফা 'উমার (রা) যখন শাম সফর করেন তখনও যায়িদকে (রা) দায়িত্ব দিয়ে যান। শামে পৌঁছে তিনি যায়িদের (রা) নিকট যে পত্র লেখেন তাতে যায়িদের নামটি খলীফার নিজের নামের আগেই উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন ঃ

- যায়িদ ইবন সাবিতের প্রতি 'উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট থেকে।[৪৩]

হযরত যায়িদ (রা) অত্যন্ত সতর্কতা ও যোগ্যতার সাথে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর দায়িত্ব পালনে খুশী হতেন এবং ফিরে এসে তাঁকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু দান করতেন।

হাদীসে এসেছে, ঈমানের সত্তরটিরও বেশী শাখা আছে। তার মধ্যে আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এমন কি রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।' হযরত যায়িদের (রা) মধ্যে এ আমানতদারীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। তাই রাষ্ট্রের অর্থ বিষয়ক অনেক গুরুদায়িত্ব বিভিন্ন সময় তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সময়কালে যে গনীমতের মাল আসতো তার বেশীর ভাগ তিনি নিজ হাতে বন্টন করতেন। এতে একাজটির গুরুত্ব কতখানি তা বুঝা যায়। হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধটি অতি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের বিপুল পরিমাণ সম্পদ বন্টনের ভার খলীফা অর্পণ করেছিলেন যায়িদের ওপর। তাছাড়া খলীফা 'উমার (রা) যখন সাহাবীদের ভাতা নির্ধারণ করেন তখন আনসারদের ভাতা বন্টনের দায়িত্ব তাঁকেই দেন। তিনি 'আওয়ালী থেকে শুরু করেন। তারপর যথাক্রমে আবদুল আশহাল, আউস, খাযরাজ প্রভৃতি গোত্রে বন্টন করে সব শেষে নিজের ভাতা গ্রহণ করেন।[৪৪]

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন খলীফাদের দরবারের অতি ঘনিষ্ঠজন। হযরত 'উমারের (রা) নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল শীর্ষে। খলীফা 'উসমানেরও (রা) তিনি বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে যখন চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও অশান্তি ধূমায়িত হয়ে ওঠে তখনও যায়িদ (রা) ছিলেন খলীফার পক্ষে। সেই হাঙ্গামা ও বিশৃংখলার মধ্যে তিনি একদিন আনসারদের সম্বোধন করে বলেন ঃ 'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা আরো একবার আল্লাহর আনসার হও।' দুঃখের বিষয়, হযরত যায়িদের (রা) মত ব্যক্তিরা সে দিন ইতিহাসের সেই চরম ট্রাজেডী রুখতে পারেননি।

এই ব্যর্থতার কারণও ছিল। কিছু সাহাবায়ে কিরাম (রা) কেন যেন হযরত 'উসমানের (রা) প্রতি সেদিন ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু আইউব আল-

আনসারীর (রা) মত বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। তিনি হযরত যায়িদের (রা) কথার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ 'উসমানের সাহায্যের জন্য তুমি মানুষকে এজন্য উৎসাহিত করেছ যে, তিনি তোমাকে বহু দাস দিয়েছেন। হযরত আবু আইউব (রা) ছিলেন বিশাল মর্যাদার অধিকারী একজন আনসারী সাহাবী। তাঁর সামনে হযরত যায়িদের (রা) চুপ করে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলনা।

'তাহ্জীবুল কামাল' গ্রন্থকার হযরত যায়িদের (রা) একাধিক স্ত্রী ও উনত্রিশজন ছেলে-মেয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত সা'দ ইবন রাবী' আল-আনসারীর কন্যা একজন।[৪৫]

হযরত সা'দ ইবন রাবী' (রা) উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। দু'কন্যা ও স্ত্রী রেখে যান। স্ত্রী তখন গর্ভবতী। গর্ভের এই সন্তানটিই উম্মু সা'দ বা উম্মুল 'আলা। ভালো নাম জামীলা। পরবর্তীকালে তিনিই হযরত যায়িদের (রা) সম্মানিতা স্ত্রী। সা'দ (রা) যখন মারা যান তখন মীরাসের আয়াত নাযিল হয়নি। এ কারণে জাহিলী প্রথা অনুযায়ী সা'দের ভাই গোটা মীরাস আত্মসাৎ করে। তখনই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মীরাসের আয়াত নাযিল হয়। তিনি সা'দের (রা) ভাইকে ডেকে $\frac{২}{৩}$ অংশ দু'কন্যা এবং $\frac{১}{২}$ অংশ স্ত্রীকে দিয়ে বাকী অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখনও গর্ভের সন্তানকে মীরাস দানের বিধান চালু হয়নি। পরবর্তীকালে খলীফা 'উমার (রা) গর্ভের সন্তানকে মীরাস দানের বিধান চালু করলে হযরত যায়িদ স্ত্রীকে বললেন ঃ তুমি যদি চাও তাহলে তোমার পিতার মীরাসের ব্যাপারে তোমার বোনদের সাথে কথা বলতে পার। কারণ, এখন আমীরুল মুমিনীন গর্ভের সন্তানের মীরাস ঘোষণা করেছেন। উম্মু সা'দ বললেন ঃ না, আমি আমার বোনদের কাছে কিছুই চাইবো না।[৪৬]

হযরত যায়িদের (রা) সন্তানদের মধ্যে খারিজা ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিখ্যাত সাতজন ফকীহ্র অন্যতম এবং উম্মু সা'দের গর্ভজাত সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান এবং একজন পৌত্রও নিজেদের যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর আযাদকৃত দাসের সংখ্যাও ছিল অনেক। তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন সাবিত ইবন 'উবাইদ ও ওহাইব।

হযরত যায়িদের (রা) মৃত্যু সন সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে হিজরী ৪৫ সন। 'আলী আল-মাদীনীর মতে হিঃ ৫১, আহমাদ ইবন হাম্বল ও আবু হাফ্স আল-ফাল্লাসের মতে হিঃ ৫১ এবং আল-হায়সাম ইবন 'আদী ও ইয়াহইয়া ইবন মু'ঈনের মতে হিঃ ৫৫ সনে তিনি মারা যান।[৪৭] ইবন হাজার (রহ) বলেন ঃ অধিকাংশের মতে হিজরী ৪৫ সনে তিনি মারা গেছেন।[৪৮] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪/৫৫ বছর। মারওয়ান ইবন হাকাম তখন মদীনার আমীর। তাঁর সাথে যায়িদের (রা) অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। তিনিই জানাযার নামায পড়ান।[৪৯] তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে জনগণ শোকাভিভূত হয়ে পড়েন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) তাঁর মৃত্যুর দিন মন্তব্য করেন ঃ আজ 'হাবরুল উম্মাহ' (উম্মাতের ধর্মীয় নেতা) চলে গেলেন।[৫০] সালেম ইবন 'আবদুল্লাহ বলেন ঃ যায়িদ ইবন সাবিত যে দিন মারা যান সে দিন আমরা 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) সংগে ছিলাম। আমি বললাম ঃ আজ জনগণের শিক্ষক মারা গেলেন। ইবন 'উমার (রা) বললেন ঃ আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ছিলেন জনগণের শিক্ষক ও 'হাবর' (ধর্মীয় নেতা)।[৫১]

প্রখ্যাত তাবে'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন ঃ আমি যায়িদ ইবন সাবিতের (রা) জানাযায় শরীক ছিলাম যখন তাঁকে কবরে নামানো হলো, ইবন 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তোমরা যারা 'ইলম কিভাবে উঠে যায় তা জানতে চাও তারা জেনে নাও, এভাবে 'ইলম উঠে যায়। আজ বহু 'ইলম চলে গেল। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন ঃ আজ অনেক 'ইলম দাফন হয়ে গেল। হাত দিয়ে কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এভাবে 'ইলম চলে যায়। একজন মানুষ মারা যায় এবং সে যা জানে তা যদি অন্যরা না জানে তাহলে সে তার জ্ঞান নিয়েই কবরে চলে যায়।[৫২] কবি হাস্সান ইবন সাবিত (রা) একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তাঁর একটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৫৩]

- হাস্সান ও তার পুত্রের পর কবিতার ছন্দ কে আর রচনা করবে ?

যায়িদ ইবন সাবিতের পর ভাবের সমঝদার আর কে আছে ?

কিরাআত, ফারায়েজ, বিচার ও ফাতওয়া শাস্ত্রে হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। পবিত্র কুরআনের ভাষায় তিনি 'রাসখ ফিল 'ইলম' (জ্ঞানে সুগভীর)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)-যাঁকে সাহাবীদের মধ্যে 'ইলমের সাগর গণ্য করা হতো, তিনিও যায়িদকে 'রাসেখ ফিল 'ইলম' গণ্য করতেন।[৫৪] ইবনুল আসীরের মতে তিনি সাহাবা সমাজের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।[৫৫] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র মাসরূক ইবন আজদা' বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের 'ইলম বা জ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি। তাঁদের সকলের জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ, মু'য়াজ, আবুদ দারদা ও যায়িদ ইবন সাবিত-এই ছয়জনের মধ্যে। তিনি আরো বলেন ঃ আমি মদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, যায়িদ ইবন সা'বিত আর-রাসেখুনা ফিল ইল্ম (জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিবর্গ)-এর অন্যতম ব্যক্তি।[৫৬]

ইসলাম যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেছে 'ইলমে কিরাআত তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ শাস্ত্রে হযরত যায়িদের পান্ডিত্য সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈনের প্রতিটি ব্যক্তি স্বীকার করতেন।

ইমাম শা'বীর মত শ্রেষ্ঠ বিদ্বান তাবে'ঈ বলেন ঃ 'যায়িদ 'ইলমে ফারায়েজের মত 'ইলমে কিরাআতেও সকল সাহাবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন।'[৫৭]

পবিত্র কুরআনের সাথে হযরত যায়িদের (রা) যে গভীর সম্পর্ক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া

যায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময়ের ঘটনা দ্বারা। মাত্র এগারো বছর বয়সে ১৭টি সূরা হিফজ করেন। অবশিষ্ট জীবন কুরআন লেখালেখির মধ্যেই অতিবাহিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যখন যতটুকু ওহী নাযিল হতো তিনি জেনে লিখে নিতেন ও মুখস্থ করে ফেলতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় গোটা কুরআন তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়।[৫৮]

কাতাদাহ্ বলেন ঃ আমি আনাস ইবন মালিককে জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় কারা কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন? বললেন ঃ চারজন। তাঁদের সবাই আনসার। উবাই ইবন কা'ব, মু'য়াজ ইবন জাবাল, যায়িদ ইবন সাবিত ও আবু যায়িদ।[৫৯]

এ কারণে খলীফা আবুবকর (রা) যখন কুরআন সংগ্রহ ও সংকলন করার সিদ্ধান্ত নেন তখন এ দায়িত্ব পালনের জন্য যায়িদকে নির্বাচন করেন। আর খলীফা 'উসমান যখন কুরআনের কপি তৈরী করান তখনও এ কাজে যায়িদের (রা) সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য মনে করেন।

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) ছিলেন কুররা বা কুরআন পাঠকদের নেতা। হযরত 'উমার (রা) যায়িদকে তাঁরও ওপর প্রাধান্য দিতেন। 'আবদুর রহমান আসসুলামী একবার খলীফা 'উসমানকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে চাইলে তিনি বললেন ঃ তাহলে তো তুমি আমাকে মানুষের কাজ থেকে বিরত রাখবে। তুমি বরং যায়িদ ইবন সাবিতের কাছে যাও। এ কাজের জন্য তাঁর হাতে বেশী সময় আছে। তাঁকে শুনাও। তাঁর ও আমার পাঠ একই। দু'জনের পাঠে কোন ভিন্নতা নেই।[৬০]

হযরত যায়িদের কিরাআতের সিলসিলা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেহেতু তিনি কুরাইশদের মত পাঠ করতেন এ কারণে মানুষের ঝোঁক ছিল তাঁরই দিকে। হযরত উবাই ইবন কা'বের জীবদ্দশায় যদিও তিনি এ ক্ষেত্রে সকলের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারেননি, তবে তাঁর মৃত্যুর পর গোটা মুসলিম বিশ্বের একক কেন্দ্রে পরিণত হন। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ মদীনায় তাঁর নিকট ছুটে আসতো।

হযরত যায়িদ (রা) কুরআন মজীদের যে কিরাআত বা পাঠ প্রতিষ্ঠা করেন তা আজও বেঁচে আছে। ইবন 'আব্বাস, আবু 'আবদির রহমান আস-সুলামী, আবুল 'আলিয়া রাইয়্যাহী, আবু জা'ফর প্রমুখ ছিলেন কিরাআত শাস্ত্রে তাঁর ছাত্র।[৬১]

পবিত্র কুরআনের পরেই মহানবীর হাদীসের স্থান। তিনি অন্যদের মত বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। তবে তাঁর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি 'দিরায়াত' বা যুক্তিকে কাজে লাগাতেন। হযরত রাফে' ইবন খাদীজ (রা) বর্ণনা করলেন, রাসূল (সা) ভূমি ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। এ কথা যায়িদের (রা) কানে গেলে বললেন ঃ আল্লাহ রাফে'কে ক্ষমা করুন! তাঁর এত বেশী হাদীস বর্ণনার রহস্য আমার জানা আছে। আসল ঘটনা হলো, দু' ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। রাসূল (সা) তা দেখে বলেন, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে ইজারার ভিত্তিতে ভূমি চাষ করা উচিত নয়। রাফে' শুধু শেষের অংশটুকু শুনেছে।[৬২]

হযরত 'আয়িশা (রা) যুবাইরের (রা) সন্তানদের নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) 'আসরের পরে তাঁর ঘরে দু' রাকা'য়াত নামায আদায় করেছিলেন। তাঁরা এ দু'রাকা'য়াতকে সুন্নাত মনে করে আদায় করা শুরু করেন। এ কথা যায়িদ (রা) জানতে পেরে বললেন ঃ আল্লাহ 'আয়িশাকে ক্ষমা করুন! হাদীসের জ্ঞান তাঁর চেয়ে আমার বেশী আছে। আসরের পরে নামায আদায়ের কারণ হলো, দুপুরে কয়েকজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। তারা প্রশ্ন করছিল, আর রাসূল (সা) উত্তর দিচ্ছিলেন। এভাবে জুহরের নামাযের সময় হলে তিনি শুধু ফরজ নামায আদায় করে আবার তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে বসে যান। এরপর আসরের নামাযের সময় হলে তা আদায় করেন। ঘরে ফেরার পর স্মরণ হয় যে, জুহরের ফরজের পরের দু'রাকা'য়াত সুন্নাত আদায় করেননি। তখন সেখানেই দু'রাকা'য়াত নামায আদায় করেন। আল্লাহ 'আয়িশাকে ক্ষমা করুন। তাঁর চেয়ে আমার বেশী জানা আছে যে, রাসূল (সা) 'আসরের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[৬৩]

কোন হাদীস সহীহ হলে এবং সে সম্পর্কে তাঁর নিকট কেউ জিজ্ঞেস করলে তিনি সমর্থন জানাতেন। একবার হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) স্বৈরাচারী উমাইয়্যা শাসক মারওয়ানের সামনে সাহাবীদের মর্যাদাবিষয়ক একটি হাদীস বর্ণনা করেন। মারওয়ান বললেন ঃ আপনি অসত্য বলছেন। যায়িদ ইবন সাবিত ও রাফে' ইবন খাদীজ (রা) মারওয়ানের পাশে মঞ্চে বসে ছিলেন। আবু সা'ঈদ মারওয়ানকে বললেন, আপনি তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মারওয়ান তা না করে আবু সা'ঈদকে মারার জন্য ছড়ি তুলে ধরেন। তখন এ দুই মহান সাহাবী আবু সা'ঈদের কথা সত্য বলে সমর্থন করেন।[৬৪]

হযরত যায়িদের (রা) অধিকাংশ হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত। তাছাড়া আবুবকর, 'উমার ও 'উসমান (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৫]

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর ছাত্রদের তালিকা অনেক দীর্ঘ। তাঁর কাছে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এমন কয়েকজন বিখ্যাত সাহাবী ও তাবে'ঈর নাম এখানে উল্লেখ করা হলোঃ[৬৬]

ইবন 'আব্বাস, ইবন 'উমার, আনাস ইবন মালিক, আবু হুরাইরা, আবু সা'ঈদ খুদরী, সাহ্ল ইবন হুনাইফ, সাহ্ল ইবন সা'দ, 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-খুতামী। এঁরা সকলে সাহাবী। সা'ঈদ ইবন মুসাইয়্যাব, কাসেম ইবন মুহাম্মদ, আবান ইবন 'উসমান, খারেজা ইবন যায়িদ (যায়িদের ছেলে এবং মদীনার সপ্ত ফুকাহার একজন), সাহ্ল ইবন আবী হাসামা, আবু 'আমর, মারওয়ান ইবন হাজম, 'উবাইদ ইবন সাব্বাক, 'আতা' ইবন ইয়াসার, বুসর ইবন সা'ঈদ, হাজার আল-মুদরী, তাউস, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, সালমান ইবন যায়িদ, সাবিত ইবন 'উবাইদ, উম্মু সা'দ (যায়িদের স্ত্রী)। এছাড়া আরো অনেকে।

হযরত যায়িদের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মাত্র ৯২ (বিরানব্বই)টি। তারমধ্যে পাঁচটি মুত্তাফাক আলাইহি। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে

অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তাঁর হাদীসের সংখ্যা এত কম হয়েছে। অন্যথায় তাঁর অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে থাকা পড়েছে, বহু হাদীস শোনা এবং বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যও হয়েছে। এত কম হাদীস বর্ণনার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) একটি সতর্কবাণী। আর সে বাণীই তাঁর মত আরও অনেককে বেশী হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সংযমী করে তুলেছে। মুহাম্মাদ ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে আনসারদের তৃতীয় তাবকায় তাঁকে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে প্রথম তাবকায় তাঁর আলোচনা এনেছেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রে হযরত যায়িদ (রা) দারুণ পারদর্শী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইফতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। সাহ্ল ইবন আবী খায়সামা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় মুহাজিরদের তিন ব্যক্তি ও আনসারদের তিন ব্যক্তি ফাতওয়া দিতেন। আনসারদের সেই তিনজনের একজন হলেন যায়িদ ইবন সাবিত (রা)।[৬৭] ইমাম শা'বী ও প্রখ্যাত তাবে'ঈ মাসরূক একই ধরনের কথা বর্ণনা করেছেন।[৬৮] হযরত আবুবকর (রা) ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালেও তিনি মদীনার ইফতার মসনদে আসীন ছিলেন। শুধু তাই নয়, হিজরী ৪৫ সন পর্যন্ত আমরণ এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। খলীফা আবুবকর (রা) কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে কতিপয় চিন্তাশীল ও ফিকাহবিদ আনসার ও মুহাজির সাহাবীর সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁদের মধ্যে যায়িদ ইবন সাবিতও একজন। আর তাঁরাই আবুবকর, 'উমার ও 'উসমানের (রা) যুগে ফাতওয়া দিতেন।[৬৯]

কাবীসা ইবন জুওয়াইব বর্ণনা করেছেন যে 'উমার, 'উসমান, 'আলীর (রা) 'আমলে, এমনকি হিজরী ৪০ সনে মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ৪৫ সনে মৃত্যু পর্যন্ত যায়িদ ((রা) মদীনার বিচার, ফাতওয়া, কিরাআত ও ফারায়েজ শাস্ত্রের প্রধান ছিলেন।[৭০] তাঁর যোগ্যতার পূর্ণ স্বীকৃতি খলীফা 'উমার (রা) দিয়েছেন। তিনি যায়িদকে (রা) এত গুরুত্ব দিতেন যে, তাঁকে মদীনার বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। মদীনার বাইরে বিভিন্ন স্থানে অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হতো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন দেখা দিত, আর সেজন্য খলীফার নিকট বিভিন্ন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হতো। তিনি তাঁদের কাউকে মনোনীত করতেন। কিন্তু যায়িদের নামটি প্রস্তাব করা হলেই তিনি বলতেন, যায়িদ আমার হিসাবের বাইরে নেই। কিন্তু আমি কি করবো? মদীনাবাসী তাঁর মুখাপেক্ষী বেশী। কারণ, তাঁর কাছে যা পাবে অন্যের কাছে তা তারা পাবে না।[৭১]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার বলতেন, যায়িদ ছিলেন ফারূকী খিলাফতের একজন বড় 'আলীম। 'উমার (রা) সকল মানুষকে নানা দেশ ও শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফাতওয়া ও সিদ্ধান্ত দানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কিন্তু যায়িদ মদীনায় বসে বসে মদীনাবাসী এবং সেখানে আগত লোকদের নিকট ফাতওয়া দিতেন।[৭২]

সুলায়মান ইবন ইয়াসার বলেন ঃ ফাতওয়া, ফারায়েজ ও কিরাআতে 'উমার ও 'উসমান (রা), যায়িদের (রা) ওপর কাউকে প্রাধান্য দিতেন না।[৭৩] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব একজন মস্তবড় মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও ফাতওয়া ও বিচারে হযরত যায়িদের (রা) অনুসারী ছিলেন। তাঁর সামনে যখন কোন মাসয়ালা বা প্রশ্ন আসতো এবং মানুষ অন্যান্য সাহাবীর ইজতিহাদসমূহ বর্ণনা করতো তখন তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করতেন, এ ব্যাপারে যায়িদ কি বলেছেন? বিচার ফায়সালায় যায়িদ ছিলেন সবার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। আর যে সকল বিষয়ে কোন হাদীস পাওয়া যায় না সে সম্পর্কে মতামত দানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাঁর কোন কথা থাকলে তাই বল।[৭৪]

ইমাম মালিক (রহ) ছিলেন মদীনার ইমাম। আজও তিনি ফিকাহ ও হাদীস শাস্ত্রে অগণিত মানুষের ইমাম। তিনি বলতেন, 'উমারের (রা) পরে যায়িদ ইবন সাবিত ছিলেন মদীনার ইমাম। ইমাম শাফে'ঈও (রহ) ফারায়েজ শাস্ত্রের সকল মাসয়ালা হযরত যায়িদের তাকলীদ করেছেন।[৭৫]

ফকীহ সাহাবীদের তিনটি তাবকা বা স্তর ছিল। এর প্রথম তাবকায় ছিল হযরত যায়িদের (রা) স্থান। তিনি জীবনে বিপুল পরিমাণ ফাতওয়া দিয়েছেন। সবগুলি একত্রে সংগ্রহ করা হলে বিরাট আকারের একটি বই হবে।[৭৬]

হযরত যায়িদের (রা) ফিকাহ্ তাঁর জীবনকালেই জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। হযরত সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব বলতেন, যায়িদ ইবন সাবিতের এমন কোন কথা নেই যার ওপর মানুষ সর্বসম্মতভাবে আমল করেনি। সাহাবীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি এমন ছিলেন যাঁদের কথার ওপর কেউই আমল করেনি। কিন্তু হযরত যায়িদের (রা) ফাতওয়ার ওপর তাঁর জীবনকালেই পূর্ব-পশ্চিমের সকল মানুষ আমল করেছে।

মানুষের ধারণা, ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধি ও প্রসারের নিমিত্ত হচ্ছেন চারজন সাহাবী ব্যক্তিত্ব। যায়িদ ইবন সাবিত, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)। তাঁদেরই শিষ্য-শাগরিদদের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাহানে 'ইলমে দীনের প্রসার ঘটে। কিন্তু মদীনা ছিল ইসলামের উৎস ও নবীর (সা) আবাস স্থল। এ স্থানটি যায়িদ ও তাঁর ছাত্রদের বদৌলতে জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ফকীহ সাহাবীদের দু'টি মজলিস ছিল। একটির সভাপতি ছিলেন হযরত 'উমার (রা), আর অন্যটির হযরত 'আলী (রা)। হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন 'উমারের (রা) মজলিসের সদস্য। এখানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো এবং জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।

যে সকল বিষয় এখনো বাস্তবে ঘটেনি সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতেন না। খারেজা ইবন যায়িদ বর্ণনা করেন, কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে- 'এটা কি ঘটেছে, না

ঘটেনি?' - এ রকম প্রশ্ন না করে তিনি কোন মতামত দিতেন না। বিষয়টি যদি বাস্তবে না ঘটতো তাহলে সে সম্পর্কে কিছুই বলতেন না। আর ঘটলে বলতেন।[৭৭]

হযরত যায়িদ (রা) সাধারণতঃ সব সময় জ্ঞান বিতরণে নিয়োজিত থাকতেন। তা সত্ত্বেও সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে মসজিদে নববীতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফাতওয়া ও মাসয়ালার জবাব দিতে বসতেন।

হযরত যায়িদের (রা) মাসয়ালাসমূহ ফিকাহ্‌র সকল অধ্যায়ে পরিব্যাপ্ত। তার বিস্তারিত আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি মাসয়ালা তুলে ধরছি।

১. তিনি বলেছেন, ফরজ নামায ছাড়া অন্য নামায ঘরে আদায় করা উত্তম।[৭৮] তিনি বলেছেন, বাড়ীতে পুরুষের নামায আদায় একটি নূর বা জ্যোতি বিশেষ। পুরুষ যখন ঘরে নামাযে দাঁড়ায় তখন তার পাপসমূহ মাথার ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। একটি সিজদা দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তার পাপ মুছে দেন।[৭৯]

২. এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো জুহর ও আসরে কি কিরআত আছে? বললেন ঃ হ্যাঁ। রাসূল (সা) দীর্ঘ সময় ধরে এ দু'টি নামাযে কিয়াম (দাঁড়িয়ে থাকা) করতেন এবং এ সময় তাঁর ঠোঁট নড়াচড়া করতো।[৮০]

এর অর্থ এ নয় যে, ইমামের পিছনে মুকতাদিরও কিরাআত করা উচিত। মূলতঃ প্রশ্নটি ছিল ইমাম সম্পর্কে, মুকতাদি সম্পর্কে নয়। প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, জুহর ও আসর নামাযে কি কিছু পড়া হয়? যায়িদ (রা) তারই জবাব দিয়েছেন। অন্যথায় সহীহ বুখারীতে খাব্বাব ইবন আরাত, যায়িদ ইবন সাবিত, আবু কাতাদাহ ও সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে যে সব বর্ণনা এসেছে তার কোনটি দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে কিরাআত করেছেন।

৪. কোন ব্যক্তি যদি নিজের বাসগৃহ নিজের জীবদ্দশা পর্যন্ত কাউকে থাকার জন্য দান করে তাহলে তার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা তার ওয়ারিস হবে। হযরত যায়িদের বর্ণনায় এর বিবরণ এসেছে। তিনি বলেছেন ঃ العمرى للوارث।

৫. হযরত যায়িদের মতে, যতদিন পর্যন্ত বাগানে ফল ভালো মত না আসে অথবা গাছে খেজুর পরিপক্ক না হয় ততদিন তা আন্দাজে বেচাকেনা নাজায়েজ।[৮২]

ইসলাম পূর্ব আমলে মদীনায় গাছে ফল পরিপক্ক হওয়ার আগেই বিক্রির প্রথা ছিল। এতে যখন ক্রেতার লোকসান হতো তখন দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হতো। রাসূল (সা) মদীনায় এসে এ অবস্থা দেখে এ ধরনের কেনাবেচা করতে নিষেধ করেন।

ফিকাহ্‌র অন্য সকল অধ্যায়ের চেয়ে ফারায়েজ-এর অধ্যায়ে ছিল হযরত যায়িদের (রা) বিশেষ পারদর্শিতা। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীসে এসেছে ঃ[৮৩] "আমার উম্মাতের সবচেয়ে বড় ফারায়েজ বিশেষজ্ঞ যায়িদ ইবন সাবিত।" রাসূলুল্লাহর (সা) এ সনদ দ্বারা বুঝা যায় তিনি ফারায়েজ শাস্ত্রে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামও

এ শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য স্বীকার করতেন। খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জাবীয়ার ঐতিহাসিক ভাষণে অগণিত শ্রোতার সামনে ঘোষণা করেন ঃ "ফারায়েজ সম্পর্কে কারো কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে সে যেন যায়িদ ইবন সাবিতের নিকট যায়।'[৮৪] তাঁর সমকালীন লোকেরা বলতো, যায়িদ ফারায়েজ ও কুরআনে অন্যদের অতিক্রম করে গেছেন।[৮৫]

ফারায়েজ শাস্ত্রটি বেশ জটিল। কুরআনে এ শাস্ত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী, কর্ম এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) ফাতওয়া ও বিচার-আচার থেকেই গ্রহণ করা হয়। কুরআনে মীরাস ও অসীয়াত বিষয়ে যা কিছু এসেছে তা অতি চুম্বক কথায়। তাতে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি ইত্যাদি ধরনের উত্তরাধিকারীদের নির্ধারিত অংশ ঘোষণা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ সীমা লংঘন করবে সে হবে মূলতঃ নিজের ওপর অত্যাচারী।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বিচার-ফায়সালার মাধ্যমে এই সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর যায়িদ (রা) এ শাস্ত্রের এত উন্নতি সাধন করেন যে, তাঁর পরেই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হয় এবং বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (সা) মত জ্ঞানী ও উঁচু মর্যাদার সাহাবীরাও যায়িদের (রা) নিকট ফারায়েজ সংক্রান্ত মাসয়ালার সমাধান জানতে চাইতেন।

ইয়ামামার নিহত অধিবাসীদের ব্যাপারে হযরত আবুবকর (রা) হযরত যায়িদের (রা) ফাতওয়া অনুযায়ী ফায়সালা করেন। অর্থাৎ যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদেরই মৃতদের ওয়ারিস নির্ধারণ করেন। মৃতদেরকে পরস্পর ওয়ারিস নির্ধারণ করেননি।[৮৬]

'আমওয়াসের 'তা'উন' মহামারীতে যখন গোত্রের পর গোত্র মৃত্যু বরণ করে তখন 'উমার (রা) যায়িদের (রা) উল্লেখিত মতের ভিত্তিতে সমাধান দেন। এমন কি হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) যাঁকে উম্মাতের তত্ত্বজ্ঞানী ও জ্ঞানের সাগর বলা হয়, তিনিও যায়িদের (রা) সমাধানে নিশ্চিত হতেন।

একদিন তিনি ছাত্র 'আকরামাকে একথা বলে পাঠালেন, তুমি যায়িদকে জিজ্ঞেস করে এসো যে, এক ব্যক্তি স্ত্রী ও মাতা-পিতা রেখে মারা গেছে, তার মীরাস কিভাবে বন্টিত হবে? যায়িদ বললেন, স্ত্রী অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেকের এক-তৃতীয়াংশ মাতা এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে পিতা। ইবন 'আব্বাসের (রা) ধারণা ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন মাতা পাবে মোট মীরাসের এক-তৃতীয়াংশ। এজন্য আবার জানতে চাইলেন, এরকম বন্টন কি কুরআনে আছে, না এটা আপনার নিজের মত? যায়িদ (রা) বললেন, এ আমার ইজতিহাদ। আমি মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দিতে পারিনে।[৮৭]

খিলাফতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জনগণ লিখিত আকারে ফাতওয়া চেয়ে চিঠি লিখতো। তিনিও লিখিত জবাব দিতেন। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) একবার চিঠি মারফত

দাদার অংশ সম্পর্কে যায়িদের (রা) ফাতওয়া জানতে চান। হযরত যায়িদ (রা) জবাবে যে লিখিত ফাতওয়াটি দান করেন তা 'কানযুল 'উম্মাল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সেই চিঠিতে খলীফা 'উমার (রা) ও 'উসমান যেভাবে দাদার অংশ বন্টন করেছিলেন তা উল্লেখ করেন।[৮৮]

হযরত যায়িদ (রা) ফারায়েজের নানা ধরনের জিজ্ঞাসা বা মাসয়ালার সমাধান খলীফা 'উমারের (রা) 'আমলেই বিন্যাস করেন।[৮৯] তাঁর বোধ ও বুদ্ধিতে নতুন নতুন সমস্যার উদয় হতো আর তিনি তার সমাধান বের করতেন। পরবর্তীকালে এ সব সমাধান এ শাস্ত্রের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়।

হযরত যায়িদ (রা) দাদার মীরাসের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দান করেন সাহাবাদের মধ্যে অনেকেই তার বিরোধী ছিলেন। তবে জনতার সমর্থন তার পক্ষেই ছিল। ফারায়েজ শাস্ত্রে দাদার মীরাস একটি দারুণ মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা। এমন কি হযরত যায়িদ (রা) এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম বুখারী 'আল-ফারায়েজ' অধ্যায়ে 'দাদার মীরাস' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ এনেছেন। তাতে তিনি এ মতবিরোধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, 'এ বিষয়ে ইবন 'উমার, আলী, ইবন মাস'উদ ও যায়িদের (রা) বিভিন্ন রকম কথা বর্ণিত হয়েছে।'[৯০] তবে যে মতের ওপর হযরত যায়িদের (রা) শেষ জীবন পর্যন্ত অটল ছিলেন 'উমার ও 'উসমান (রা) সেটাই প্রয়োগযোগ্য মনে করেছেন।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত 'উমার (রা) সর্বপ্রথম দাদার অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর এক পৌত্র মারা গেলে তিনি নিজেকে তার যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী মনে করতে থাকেন। লোকেরা এর বিরোধী মত পোষণ করতে থাকে। একদিন হযরত 'উমার যখন হযরত যায়িদের (রা) বাড়ীতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি চিরুনী করছিলেন এবং দাসী তাঁর চুল পরিপাটি করে দিচ্ছিল। যায়িদ (রা) খলীফাকে বললেন, কষ্ট করে আসার কি প্রয়োজন ছিল, ডেকে পাঠালেই তো পারতেন। খলীফা বললেন, একটি মাসয়ালা সম্পর্কে পরামর্শ করতে এসেছি। যদি আপনার মতের সাথে আমার মতের মিল হয় তাহলে 'আমল করবো। অন্যথায় আপনার ওপর কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই। যায়িদ এ অবস্থায় মতামত দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। 'উমার ফিরে গেলেন। অন্য একদিন আবার গেলেন। যায়িদ (রা) বললেন, আমার সিদ্ধান্ত আমি লিখিতভাবে জানাবো। অতঃপর তিনি শাজারার আকৃতিতে বিন্যাস করে অংশ বন্টন করেন। হযরত 'উমার (রা) জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে বলেন, যায়িদ ইবন সাবিত এটি লিখে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি তা চালু করছি।[৯১]

হযরত যায়িদ (রা) 'ইলমে ফারায়েজ গ্রন্থাবদ্ধ করেন এবং এর বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে গবেষণা করে নতুন নতুন মাসয়ালাও সৃষ্টি করেন। তবে এর মধ্যে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উদ্ভাবন হলো মাসয়ালায়ে 'আওল'। কিছু লোকের ধারণা, 'আওলের' উদ্ভাবক হলেন হযরত 'আব্বাস (রা)। কিন্তু এ ধারণা বর্ণনা ও যুক্তি উভয়ের পরিপন্থী।

প্রথমতঃ এ ধারণার পশ্চাতে তেমন কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্বাসের (রা) ফারায়েজ শাস্ত্রে তেমন বুৎপত্তি ছিলনা। এ কারণে এ জাতীয় উদ্ভাবনা তাঁর প্রতি আরোপ করা যুক্তির পরিপন্থী।

হযরত যায়িদ (রা) ফারায়েজ শাস্ত্রের যতটুকু খিদমাত করেছেন তা উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীমের বাণী- 'আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফারায়েজ বিশেষজ্ঞ হচ্ছে যায়িদ'- অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে। হযরত যায়িদের (রা) অসাধারণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা ও অভিনব চিন্তাশক্তি দেখে সে যুগের উলামা-মাশায়েখ দারুণ বিস্মিত হয়েছেন। 'উলুমে শারা'য়িয়্যা ছাড়াও পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি যে কতখানি পারদর্শী ছিলেন সে সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন। এখানে তার কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

যায়িদ (রা) রাসূলে কারীমের (সা) নির্দেশ মুতাবিক হিব্রু ও সুরইয়ানী ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, মাত্র পনেরো দিনের চেষ্টায় এ ভাষা দু'টিতে এতখানি দক্ষতা অর্জন করেন যে, অনায়াসে চিঠি লিখতে সক্ষম হন। পরে আরো চর্চার ফলে এতখানি উন্নতি হয় যে তাওরাত ও ইনজীলের ভাষাসমূহের একজন আলেমে পরিণত হন। মাস'উদী লিখেছেন, তিনি ফার্সী, রোমান, হাবশী ভাষাগুলোও জানতেন। এগুলি তিনি শিখেছিলেন মদীনায় যারা এ ভাষা জানতো তাদের নিকট থেকে।[৯২]

তৎকালীন আরবে হিসাব বা অংক শাস্ত্রের তেমন প্রচলন ছিলনা। এ কারণে ইসলামের প্রথম পর্বে খারাজের হিসাবপত্র রোমান অথবা ইরানীরা করতো। আরববাসী হাজারের ওপর গণনা করতে জানতো না। আরবীতে হাজারের ওপর সংখ্যার জন্য কোন শব্দও ছিলনা। কিন্তু যায়িদের (রা) অংকে এতখানি পারদর্শিতা ছিল যে, ফারায়েজ শাস্ত্রের অতি জটিল ও সূক্ষ্ম মাসয়ালাসমূহও অংক দ্বারা সমাধান করতেন। তাছাড়া অর্থ সম্পদের বন্টনও করতে পারতেন। হিজরী ৮ম সনে হুনাইন যুদ্ধ হয়। এতে প্রায় বারো হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে। তাঁরই আদমশুমারী ও প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী রাসূল (সা) মালে গানীমাত বন্টন করেন। প্রথমে তিনি মানুষের সংখ্যা অবগত হন। তারপর মালে গানীমাত উক্ত সংখ্যার ওপর বিছিয়ে দেন। এমনিভাবে ইয়ারমুকের যুদ্ধের মালে গনীমাত মদীনায় আসলে যায়িদই (রা) তা বন্টন করেন।[৯৩]

ইসলাম-পূর্ব আরবে লেখার তেমন প্রচলন ছিলনা, সুপ্রাচীনকালের বর্ণনা সমূহ তারা স্মৃতিতে বংশপরম্পরায় ধরে রাখতো। যায়িদ (রা) লিখতে জানতেন এবং তাঁর সমকালে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত লেখক। বিভিন্ন ফরমান, চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র লেখা ছাড়াও সুন্দর অঙ্কনও জানতেন।

খলীফা 'উমারের (রা) সময়ে আরবের বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ 'আমুর রামাদাহ' দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার জন্য তিনি মিসরের গভর্ণর 'আমর ইবনুল 'আসকে (রা) খাদ্যশস্য পাঠাতে বলেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বিশটি জাহাজ বোঝাই করে খাদ্য শস্য

রাজধানী মদীনায় পাঠান। 'উমার (রা) অত্যন্ত বিচলিতভাবে জাহাজের প্রতীক্ষায় থাকেন। যায়িদ সহ আরো কিছু সাহাবীকে সংগে নিয়ে তিনি মদীনার নিকটবর্তী 'জার' নামক বন্দরে চলে যান। খাদ্যশস্য ভর্তি জাহাজ এলে সেখানে দু'টি গুদাম বানিয়ে তাতে সংরক্ষণ করেন। তিনি যায়িদকে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের একটি তালিকা ও তাদের প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দকৃত শস্যের পরিমাণ লেখা থাকে এমন একটি ফর্দ তৈরী করতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের ভিত্তিতে যায়িদ একটি রেজিস্টার তৈরী করেন, প্রত্যেককে একটি কাগজের চাকতি দেন যার নীচে 'উমারের (রা) সীল-মোহর লাগানো ছিল। চাকতি তৈরী ও তাতে মোহর লাগানোর ঘটনা ইসলামে ছিল এটাই প্রথম। আর এর রূপকার ছিলেন যায়িদ (রা)।

ইসলামের আসল উদ্দেশ্য হলো মহোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন। তাঁর চরিত্রে যে সকল গুণ-বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তা হলো, হুব্বে রাসূল, ইত্তেবায়ে রাসূল, আমর বিল মারূফ, শাসকদের প্রতি উপদেশ-নসীহত ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা।

রাসূলের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে অধিকাংশ সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে যেতেন। কোন কোন সময় এত সকালে যেতেন যে, রাসূলের (সা) সাথেই সেহরী খেতেন। রাসূল (সা) তাঁকে স্বীয় কক্ষে ডেকে নিতেন।[৯৪]

একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে দেখতে পান, তিনি খেজুর দিয়ে সেহরী খাচ্ছেন। তাঁকেও আহারে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। যায়িদ বললেন, আমি রোযা রাখার ইরাদা করেছি। রাসূল (সা) বললেন, আমারও তো এটাই ইরাদা। সেদিন হযরত যায়িদ রাসূলের (সা) সঙ্গে সেহরী খান। কিছুক্ষণ পর নামাযের ওয়াকত হলে তিনি রাসূলের (সা) সাথে মসজিদে যান এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করেন।[৯৫]

যায়িদ (রা) অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে যেতেন। রাসূল (সা) তাঁর সাথে এতখানি খোলামেলা ছিলেন যে কখনো কখনো নিজের হাঁটু যায়িদের রানের ওপর রেখে দিতেন। একদিন তো এ অবস্থায় ওহী নাযিল হয়। যায়িদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটু এ সময় এত ভারী মনে হচ্ছিল যে তার ভার সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছিল, আমার রান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু বেয়াদবী হয়, এ ভয়ে তিনি 'উহ' শব্দটিও উচ্চারণ করেননি। চুপ করে বসে থাকেন।[৯৬]

রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র হেরফের বরদাশত করতেন না। একবার শামে গেলেন আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট। তাঁর কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। মু'য়াবিয়া (রা) এক ব্যক্তিকে হাদীসটি লিখে রাখার জন্য বললেন। যায়িদ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি তাঁর লিখিত অংশটুকু মুছে দেন।[৯৭]

আমীর-'উমারাদের সামনেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের প্রচারের ব্যাপারে চুপ থাকতেন না। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তখন মদীনার গভর্ণর। তিনি মাগরিব নামাযে ছোট ছোট সূরা পড়তেন। যায়িদ বললেন, এমনটি করেন কেন? রাসূল (সা) তো বড় বড় সূরাও পড়তেন।[৯৮]

সাহাবা ও তাবেঈনদের কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করে বসলে যায়িদ তাঁকেও সতর্ক করে দিতেন। একবার শুরাহবীল ইবন সা'দ (রা) বাজারে একটি পাখি ধরেন। যায়িদ তা দেখে ফেলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে এক থাপ্পড় মারেন এবং পাখিটি ছিনিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দেন। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, ওরে নিজের শত্রু, তোমার জানা নেই যে, রাসূল (সা) মদীনাকে 'হারাম' ঘোষণা করেছেন![৯৯]

একবার তিনি শুরাহবীলকে বাগানে জাল পাততে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন- 'এখানে শিকার করা নিষিদ্ধ।'[১০০]

শাম থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় এলো যয়তুনের তেল বিক্রী করতে। অনেক ব্যবসায়ী কথাবার্তা বললো। আবদুল্লাহ ইবন উমার কথাবার্তা বলে তেল খরীদ করে নিলেন। মাল সেখানে থাকতেই দ্বিতীয় ক্রেতা পাওয়া গেল। সে আবদুল্লাহ ইবন উমারকে বললেন, আমি আপনাকে এত লাভ দিচ্ছি। আমার কাছে বিক্রী করে দিন। ইবন উমার রাজী হয়ে গেলেন। তিনি কথা পাকাপাকি করার জন্য তার হাতের ওপর স্বীয় হাত রাখবেন, এমন সময় পিছন থেকে একজন তাঁর হাত টেনে ধরেন। তিনি তাকিয়ে দেখেন যায়িদ ইবন সাবিত। তিনি ইবন উমারকে বললেন, এখন বেচো না। প্রথমে মাল এখান থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, রাসূল (সা) এমনভাবে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।[১০১]

একবার তিনি দুপুরের সময় মদীনার গভর্ণর মারওয়ানের বাড়ী থেকে বের হলেন। শিষ্য-শাগরিদরা তা দেখে ফেলে। তারা মনে করলো, হয়তো বিশেষ কোন প্রয়োজনে গিয়েছিলেন। তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো। যায়িদ বললেন, এ সময় তিনি কয়েকটি হাদীস জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি, তিনটি অভ্যাসের ব্যাপারে মুসলমানের অন্তরে বিরূপ ভাব জন্মাবে না। তাহলো আল্লাহর জন্য কাজ করা, শাসকদের নসীহত করা জামায়াতের সাথে থাকা।[১০২]

'উবাদা ইবন সামিত ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। একবার তিনি বায়তুল মাকদাস গেলেন। সেখানে একজন থাবাতী ব্যক্তিকে তাঁর বাহনটি একটু ধরতে বললেন। সে ধরতে অস্বীকৃতি জানালো। 'উবাদা তাকে খুব ধমকালেন এবং মারলেন। কথাটি খলীফা 'উমারের কানে গেল। তিনি 'উবাদাকে বললেন, আপনি এ কেমন কাজ করলেন? 'উবাদা বললেন, আমি তাঁকে ঘোড়াটি একটু ধরতে বললাম, আর সে অস্বীকার করলো। আমার মেজাজটা একটু গরম। আমি তাকে মেরে বসলাম। 'উমার বললেন, আপনি বদলা বা কিসাসের জন্য প্রস্তুত হোন। সেখানে যায়িদ ইবন সাবিত উপস্থিত ছিলেন।

তিনি এভাবে একজন সাহাবীর অপমান সহ্য করতে পারলেন না। 'উমারকে বললেন, আপনি একজন গোলামের বদলায় নিজের ভাইকে মারবেন? তাঁর একথার পর 'উমার কিসাসের পরিবর্তে শুধু দিয়াত ধার্য করেন। 'উবাদাকে (রা) দিয়াত আদায় করতে হয়।[১০৩]

এমনি আর একটি ঘটনা। 'উমার (রা) যখন শামে ছিলেন তখন একদিন খবর পেলেন যে, একজন মুসলমান একজন জিম্মীকে হত্যা করেছে। 'উমার হত্যাকারী মুসলমানকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। যায়িদ অতিকষ্টে খলীফাকে বুঝালেন এবং কিসাসের পরিবর্তে দিয়াতে রাজী করান।[১০৪]

স্বভাবগত ভাবেই তিনি চুপচাপ থাকতে ভালোবাসতেন। খলীফাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। খলীফা 'উমারের অন্যতম সঙ্গী ও পারিষদ ছিলেন। খলীফা 'উসমানের (রা) সাথে তাঁর এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, লোকে তাঁকে 'উসমানী বলতো। 'উসমান শাহাদাত বরণ করলে তিনি খুব কেঁদেছিলেন। 'উসমান (রা) তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। 'আলী-মু'য়াবিয়ার (রা) দ্বন্দ্বে আলীর (রা) পক্ষে কোন যুদ্ধে অংশ নেননি, তা সত্ত্বেও তিনি আলীকে দারুণ ভালোবাসতেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার প্রবক্তা ছিলেন। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) সাথেও সুসম্পর্ক ছিল। শামে গেলে তাঁর গৃহেই উঠতেন।[১০৫]

মারওয়ান ছিলেন তৎকালীন আরব বিশ্বের একজন অতি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ। যায়িদের (রা) ছিল তাঁর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন না। একদিন যায়িদ ইবন সাবিতকে ডেকে রাজনীতি বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করেন। যায়িদ জবাব দিচ্ছেন, এমন সময় তিনি বুঝতে পারলেন কিছু লোক পর্দার আড়াল থেকে তাঁর বক্তব্য লিখে নিচ্ছে। যায়িদ তক্ষুণি বলে উঠলেন, মাফ করবেন, এতক্ষণ আমি যা কিছু বলেছি তা সবই আমার ব্যক্তিগত মতামত।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। একদিন যায়িদ (রা) যখন ঘোড়ায় চড়তে যাবেন, ইবন 'আব্বাস তাঁর জিনটি ধরে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন। যায়িদ (রা) বললেন ঃ আপনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। দয়া করে আপনি সরে যান। তিনি বললেন ঃ আমাদের 'উলামা ও বড়দের সাথে এমন আচরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যায়িদ বললেন ঃ আপনার হাতটি একটু বাড়িয়ে দিন। ইবন 'আব্বাস (রা) হাত বাড়িয়ে দিলে যায়িদ হাতে চুমু দিয়ে বললেন ঃ আমাদেরকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবীর (সা) পরিবার-পরিজনদের সাথে এমন আচরণ করার জন্য।[১০৬]

যে মারওয়ান ইবনুল হাকাম, আবু সা'ঈদ আল-খুদরীর (রা) মত একজন উঁচু মর্যাদার সাহাবীকে মারার জন্য ছড়ি উঠিয়েছিলেন, তিনিও যায়িদকে (রা) অত্যন্ত সম্মান করতেন। দরবারে গেলে মারওয়ান তাঁকে নিজের আসনের পাশেই বসাতেন।

যায়িদ (রা) অন্যান্য সাহাবী ও তাবে'ঈদেরকে মাঝে মধ্যে চিঠির মাধ্যমে উপদেশ দিতেন। প্রখ্যাত সাহাবী উবাই ইবন কা'বকে (রা) তিনি এমনি একটি উপদেশমূলক চিঠি লিখেছিলেন। সীরাত ও হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে।[১০৭]

সত্য কথা বলতে কাকেও পরোয়া করতেন না। তাবারানী বর্ণনা করেছেন। খলীফা 'উমার (রা) একদিন গোপনে খবর পেলেন, আবু মিহ্জান আস-সাকাফী নামক একব্যক্তি তার এক বন্ধুর সাথে ঘরের মধ্যে মদ পান করছে। তিনি তৎক্ষণাত রওয়ানা দিলেন এবং সোজা তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। সেখানে আবু মিহ্জানকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না। আবু মিহ্জান তখন ক্ষুব্ধ হয়ে আমীরুল মুমিনীনকে বললেন ঃ একাজটি আপনি ঠিক করেননি। কারণ, আল্লাহ্ আপনাকে গুপ্তচরগিরি করতে নিষেধ করেছেন। 'উমার (রা) সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন ঃ এ কি বলে? যায়িদ ইবন সাবিত ও আবদুর রহমান ইবন আল-আরকান (রা) বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, সে ঠিক বলেছে। এ এক ধরনের গুপ্তচরবৃত্তি। 'উমার (রা) তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন।[১০৮]

যায়িদ (রা) পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। ঘুমানোর সময় দু'আ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পরিবার-পরিজনের স্বাচ্ছন্দ ও প্রাচুর্য কামনা করি। আর কোন আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে তার বদ দু'আ থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।' পরিবার-পরিজনদের মধ্যে তিনি খুব রসিক হতেন যেমন মজলিসে হতেন অত্যন্ত গম্ভীর।[১০৯]

তাঁকে নিয়ে তাঁর নিজ গোত্র খাযরাজীদের গর্বের অন্ত ছিলনা। মদীনার চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্র আউস ও খাযরাজ। ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা মাঝে মাঝে নানা বিষয় নিয়ে একে অপরের ওপর আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করত। এমনিভাবে একবার খাযরাজীরা বললো, 'আমাদের মধ্যে এমন চার ব্যক্তি আছেন, যাঁদের সমকক্ষ কেউ তোমাদের মধ্যে নেই। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় গোটা কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের একজন যায়িদ ইবন সাবিত।'[১১০]

যায়িদের (রা) জীবন ও কর্ম ছোট কোন প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থ সমূহে তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-১/৫৬১; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/২২৩
২. উসুদুল গাবা-২/৩৩১; তাহজীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল-১০/২৫
৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫১; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৩
৪. প্রাগুক্ত-২/২২৪
৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৮; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯০; উসুদুল গাবা-২/৩৩১
৬. তাহজীবুল কামাল-১০/২৭; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫১

৭. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮; আল-ইসাবা-১/৫৬১
৮. আল-ইসাবা-১/৫৬১
৯. তাহজীবুল কামাল-১০/৩০; আল-ইসাবা-১/৫৬১
১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৬,৩৪৪
১১. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৭
১২. তাহজীবুল কামাল-১০/২৯
১৩. প্রাগুক্ত-১০/৩০
১৪. আল-ইসাবা-১/৫৬১
১৫. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪
১৬. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২; আল-ইসাবা-১/৫৬১
১৭. উসুদুল গাবা-২/৩৩১; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২
১৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫৮;
১৯. তাবাকাত-৩/৪৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৯৭
২০. তারীখুত তামাদ্দুন আল-ইসলামী-১/২৪৪
২১. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩০
২২. আল-ইসাবা-১/৫৬১
২৩. রিজানুল হাওলার রাসূল-৩৯২
২৪. বুখারী ঃ বাবু জাম'য়িল কুরআন; মুসনাদ-৫/১৮৮
২৫. বুখারী ঃ বাবুল কুররা'; মুসনাদ-৫/১৮৫
২৬. মুসনাদ-৫/১৮৩
২৭. বুখারী ঃ বাবু জাম'য়িল কুরআন; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২
২৮. বুখারী ঃ বাবু জাম'য়িল কুরআন
২৯. প্রাগুক্ত ঃ মুসনাদ-৫/১৮৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩
৩০. বুখারী ঃ বাবু কাতিবিল ওহী
৩১. মুসনাদ-৫/১৯১
৩২. কানযুল 'উম্মাল-৩/১৩১; মুসনাদ-৫/১৯১; হায়াতুস সাহাবা-১/৪০৯;
৩৩. মুসনাদ-৫/১৮৬
৩৪. তাবাকাত-২/৩৫৮; তাহজীবুল কামাল-১০/২৮; মুসনাদ-৫/১৮২; উসুদুল গাবা-২/৩৩২; আল-ইসাবা-১/৫৬১; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯০-১৯১
৩৫. তাহজীবুল কামাল-১০/৩০
৩৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৫৩১
৩৭. সীয়ারে আনসার-১/৩৮৬
৩৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩১
৩৯. বুখারী ও মুসলিম; কানযুল 'উম্মাল-৩/১৭৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৯৪
৪০. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩
৪১. তাবাকাত-৪/১৭৪; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯২
৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৬
৪৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫২; উসুদুল গাবা-২/৩৩২
৪৪. কিতাবুল খারাজ-৬৬
৪৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৬,২৭
৪৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৮
৪৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৬; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৪

৪৮. আল-ইসাবা-১/৫৬২
৪৯. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৪
৫০. তারীখুল ইসলাম ও তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৫
৫১. হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯২
৫২. তাবাকাত-২/২৬১, ২৬২; তাহজীবুল কামাল-১০/৩২৫
৫৩. আল-ইসাবা-১/৫৬২
৫৪. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩১; আল-ইসাবা-১/৫৬২
৫৫. উসুদুল গাবা-২/৩৩২
৫৬. তাবাকাত-৪/১৬৭ আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৮, ২৫৯
৫৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৫
৫৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩০
৫৯. বুখারী ঃ বাবুল কুররা মিন্ আসহাবিল নাবী (সা)।
৬০ হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯৩
৬১. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩০; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪
৬২. মুসনাদ-৫/১৮২
৬৩. প্রাগুক্ত-৫/১৮৫
৬৪. প্রাগুক্ত
৬৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৫; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪
৬৬. তাহজীবুল কামাল-১০/২৫,২৬; আল-ইসাবা-১/৫৬১
৬৭. তাবাকাত-৪/১৬০; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪
৬৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩২
৬৯. কানযুল 'উম্মাল-৩/১৩৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৬
৭০. তাবাকাত-৪/১৭৫; আল-ইসাবা-১/৫৬২; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪
৭১. তাবাকাত-৪/১৭৪; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/১৯২
৭২. প্রাগুক্ত
৭৩. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩২
৭৪. তাবাকাত-৪/১৭৫
৭৫. উসুদুল গাবা-২/৩৩২
৭৬. আ'লামুল মওয়াক্কি'ঈন-২/১২
৭৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩২; হায়াতুস সাহাবা-৩/২২৩
৭৮. মুসনাদ-৫/৮৬
৭৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/৮৭
৮০. মুসনাদ-৫/৮৬
৮১. প্রাগুক্ত-৫/১৮২
৮২. প্রাগুক্ত-৫/১৯২
৮৩. মুসনাদ-৩/১৮৪; তাহজীবুল কামাল-১০/২৯; ইবন মাজা এবং তিরমিজিও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
৮৪. হায়াতুস সাহাবা-৩/২০২
৮৫. তাহজীবুল কামাল-১০/২৯; তাহজীব ইবন আসাকির-৫/৪৪৯
৮৬. কানযুল 'উম্মাল-৬/৬
৮৭. প্রাগুক্ত
৮৮. প্রাগুক্ত-৬/১৫

৮৯. প্রাগুক্ত
৯০. বুখারী ঃ বাবু মীরাসুল জাদ্দে,
৯১. কানযুল্ 'উম্মাল-৬/১৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৫১৮; ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১৮৯) গ্রন্থেও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।
৯২. কিতাবুত তানবীহ্ ওয়াল ইশরাফ-১/৪০৩
৯৩. আল-ইসাবা-১/৫৬১; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২৪; তাবাকাত-১/১১০
৯৪. মুসনাদ-৫/১৮২
৯৫. প্রাগুক্ত-৫/১৯২
৯৬. প্রাগুক্ত-৫/১৮২, ১৯২
৯৭. প্রাগুক্ত-৫/১৮২
৯৮. বুখারী ঃ বাবুল কিরামাহ্ ফিল মাগরিব
৯৯. মুসনাদ-৫/১৮১, ১৯২
১০০. প্রাগুক্ত-৫/১৯০
১০১. প্রাগুক্ত-৫/১৯১
১০২. প্রাগুক্ত-৫/১৮৩
১০৩. কানযুল 'উম্মাল-৭/২৯৯; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৩১; হায়াতুস সাহাবা-২/১৯
১০৪. কানযুল 'উম্মাল-৭/৩০৪
১০৫. মুসনাদ-৫/১৮২; আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৪
১০৬. কানযুল 'উম্মাল-৭/৩৭; আল-ইসাবা-১/৫৬১; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৫৪, ৪৫৫
১০৭. কানযুল 'উম্মাল-৮/২২৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫১৯
১০৮. কানযুল 'উম্মাল-২/১৪১; হায়াতুস সাহাবা-২/৪২২
১০৯. আল-ইসতী'য়াব-১/৫৫৩
১১০. আল-আ'লাম-২/৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৯৫

'আমর ইবন আল-জামূহ (রা)

হযরত 'আমর ইবন আল-জামূহের (রা) পিতার নাম আল-জামূহ ইবন যায়িদ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার সন্তান। একজন আনসারী সাহাবী।[১] জন্ম সন ও প্রথম জীবন সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইবন ইসহাক তাঁর মাগাযীতে বলেন ঃ তিনি বনু সালামা তথা গোটা আনসার সম্প্রদায়ের একজন নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।[২] তাছাড়া জাহিলী আমলে তিনি তাদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। তাদের মূর্তি উপাসনা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক বা মুতাওয়াল্লীও ছিলেন।[৩]

তাঁর ঘরে কাঠের নির্মিত একটি বিগ্রহ ছিল তার নাম ছিল 'মানাত'। বিগ্রহটিকে তিনি সীমাহীন তা'জীম করতেন। অন্তরের সবটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা এর পদতলে নিবেদন করতেন।[৪] এর মধ্যে মক্কায় ইসলামের ধ্বনি উত্থিত হলো। কিছু লোক মদীনা থেকে মক্কায় আসলেন এবং 'আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশগ্রহণ করে আবার মদীনায় ফিরে গেলেন। এই দলে 'আমরের ছেলে মু'য়াজও ছিলেন।

মদীনায় ফিরে এসে তাঁরা খুব জোরেশোরে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন এবং অতি দ্রুত তথাকার অলি-গলি তাকবীর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। এরই মধ্যে বনু সালামার কিছু তরুণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে কোন ভাবে তাঁদের সম্মানিত নেতা 'আমরকে ইসলামের সুশীলত ছায়ায় আনতে হবে। তাঁর ছেলে মু'য়াজ চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। এক পর্যায়ে তাঁদের মাথায় নতুন এক খেয়াল চাপলো।

তাঁর ছেলে মু'য়াজ বন্ধু মু'য়াজ ইবন হায়সাম, মতান্তরে মু'য়াজ ইবন জাবাল ও অন্যদের সংগে করে রাতে বাড়ীতে আসতেন এবং সকলের অগোচরে অতি সন্তর্পণে 'আমরের অতিপ্রিয় বিগ্রহটি তুলে নিয়ে দূরে কোন ময়লা-আবর্জনার গর্তে ফেলে আসতে লাগলেন। সকালে 'আমর তাঁর প্রিয় বিগ্রহটির এমন করুণ দশা দেখে দারুণ দুঃখ পেতেন। আবার সেটা কুড়িয়ে এনে ধুয়ে মুছে সুগন্ধি লাগিয়ে পূর্ব স্থানে রেখে দিতেন। এ প্রক্রিয়া কিছু দিন যাবত চলতে লাগলো। অবশেষে একদিন নিরুপায় হয়ে বিগ্রহটির কাঁধে একখানি তরবারি ঝুলিয়ে বললেন, কারা তোমার সাথে এমন অশোভন আচরণ করছে আমার তা জানা নেই। যদি জানতে পারতাম, তাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতাম। এই থাকলো তরবারি। তুমি কিছু করতে পারলে কর।

তরুণরা তখন আর একটি নতুন খেলা খেললেন। তাঁরা রাতের অন্ধকারে বিগ্রহটি উঠিয়ে নিয়ে তরবারিটি সরিয়ে নিলেন এবং তার সাথে একটি মরা কুকুর বেঁধে ময়লার গর্তে ফেলে রাখলেন। সকালে 'আমর তাঁর উপাস্যের এমন অবমাননা দেখে ক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে সঠিক পথের দিশা পেলেন। প্রকৃত সত্য তাঁর চোখে ধরা পড়লো। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁর তখনকার সেই অনুভূতি তিনি একটি কবিতায় ধরে

রেখেছেন। এখানে তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

১. আল্লাহর নামের শপথ! যদি তুমি ইলাহ হতে তাহলে ময়লার গর্তে এভাবে কুকুরের সাথে এক রশিতে বাঁধা থাকতে না।

২. সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি দানশীল, সৃষ্টির রিযিকদাতা ও দ্বীনের বিধান দানকারী।

৩. তিনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন কবরের অন্ধকারে বন্দী হওয়ার পূর্বে।

অন্য একটি কবিতায় তিনি বলেন ঃ

১. আমি পূতঃ পবিত্র আল্লাহর নিকট তাওবা করছি। আমি আল্লাহর আগুন থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

২. প্রকাশ্য ও গোপনে আমি তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসা করছি।[৫]

ইবন ইসহাক 'আমর ইবন আল-জামূহের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ভিন্ন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বনু সালামার তরুণদের সাথে 'আমরের স্ত্রী-পুত্রও ইসলাম গ্রহণ করলেন। একদিন 'আমর স্ত্রীকে বললেন, এ সব যুবক কি করে তার শেষ না দেখা পর্যন্ত তুমি তোমার পরিবারের কাউকে তাদের দলে ভিড়তে দিওনা। স্ত্রী বললেন ঃ আমি না হয় তা করলাম; কিন্তু আপনার ছেলে এই ব্যক্তি[৬] সম্পর্কে কি সব কথাবার্তা বলে তাকি আপনি শোনেন? 'আমর বললেন ঃ সম্ভবত সে ধর্মত্যাগী হয়েছে। স্ত্রী বললেন ঃ না। সে তার গোত্রীয় লোকদের সাথে ছিল। তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। 'আমর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি এই লোকটির কোন কথা শুনেছো? বললেন ঃ হ্যাঁ, শুনেছি। এরপর সূরা আল-ফাতিহার প্রথম থেকে পাঠ করে শোনালেন। 'আমর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এভাবে ঃ 'একি মিষ্টিমধুর বাণী! তার সব বাণীই কি এমন? স্ত্রী বললেন ঃ হায়রে আমার কপাল! এর চেয়েও ভালো। আপনার গোত্রীয় লোকদের মত আপনিও কি বাই'য়াত বা শপথ করতে চান? বললেন ঃ না, আমি তা করছি না। আমি একটু 'মানাত' দেবীর সাথে পরামর্শ করতে চাই। দেখি সে কি বলে। আরবদের প্রথা ছিল, তারা মানাতের কথা শুনতে চাইলে একজন বৃদ্ধা তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার পক্ষে উত্তর দিত। 'আমর মানাতের কাছে আসলে বৃদ্ধাটি অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি মানাতের সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন ঃ শোন মানাত! এই লোকটি (মুস'য়াব) তোমার সম্পর্কে কত কথা বলে বেড়াচ্ছে, আর তুমি নীরব শ্রোতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। এ ব্যক্তি তোমার ইবাদাত করতে নিষেধ করছে, তোমাকে পরিত্যাগ করতে বলছে। আমি তোমার পরামর্শ ব্যতীত তার হাতে বাইয়াত করতে চাইনা। বল, আমি কি করতে পারি। তিনি দীর্ঘক্ষণ পরামর্শ চাইলেন; কিন্তু মানাত কোন সাড়া দিল না। তারপর তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন ঃ সম্ভবত তুমি রাগ করেছো। ঠিক আছে এখন থেকে তোমার সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে মানাতের মূর্তিটি ভেঙ্গে গুঁড়ো করে ফেললেন।[৭]

হযরত 'আমরের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে আরো কিছু অপ্রসিদ্ধ মতামত আছে। ইবনুল আসীর বলেন, একটি বর্ণনা মতে তিনি আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত ও বদরে অংশ গ্রহণ করেন। তবে ইবন ইসহাক তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে তাঁকে 'আকাবা ও বদরের তাবকা বা স্তরে উল্লেখ করেননি।[৮] কালবী বলেছেন, তিনি আনসারদের মধ্যে সর্বশেষ ইসলাম গ্রহণকারী।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে আনসার-মুহাজিরদের মধ্যে যে দ্বীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন, একটি বর্ণনা মতে, তাতে 'উবাইদা ইবনুল হারেস ও 'আমরের মধ্যে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০]

বদর যুদ্ধে হযরত 'আমরের (রা) যোগদানের ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে সঠিক মত এই যে, তিনি বদরে যোগদান করেননি। কোন কারণে তিনি পায়ে আঘাত পান এবং খোঁড়া হয়ে যান। এ অবস্থায়ও তিনি যুদ্ধে যেতে চাইলে ছেলেরা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে বিরত রাখেন। তাঁরা বোঝান যে, এ অবস্থায় তাঁর ওপর জিহাদ ফরজ নয়।

উহুদের রণ-দামামা বেজে উঠলো। 'আমর ছেলেদের ডেকে বললেন, তোমরা আমাকে বদরে যেতে দাওনি। এবার আমি তোমাদের কোন নিষেধ মানবো না। এ যুদ্ধে আমি যাবই। ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমর ইবন আল-জামূহ ছিলেন মারাত্মক ধরনের খোঁড়া। সিংহের মত তাঁর চার ছেলে ছিল। সকল কাজ ও ঘটনায় তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে থাকতেন। উহুদের দিনে তাঁরা তাঁদের পিতাকে যুদ্ধে গমন থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। তাঁরা বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে মা'জুর (অক্ষম) করেছেন। আপনার যুদ্ধে যাওয়ার দরকার নেই। 'আমর (রা) খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন ঃ আমার ছেলেরা আমাকে যুদ্ধে যেতে বারণ করছে। আল্লাহর কসম! এ খোঁড়া পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি জান্নাতে যেতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 'আল্লাহ তো আপনাকে মা'জুর করেছেন। জিহাদ আপনার ওপর ফরজ নয়।' একথার পরও 'আমরকে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল দেখে রাসূল (সা) তাঁর ছেলেদের বললেনঃ তোমরা আর তাঁকে বাধা দিওনা। আল্লাহ পাক হয়তো তাঁকে শাহাদাত দান করবেন।[১১]

ইমাম সুহাইলী বলেন ঃ অন্যরা আরো বলেছেন, 'আমর বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় অন্তরে সবটুকু বিনীত ভাব ঢেলে দিয়ে দু'আ করেন ঃ

'ইলাহী! তুমি আর আমাকে মদীনায় ফিরিয়ে এনো না।' আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর এ আকুল আবেদন কবুল হয়ে যায়। তিনি শহীদ হন।[১২]

উহুদে যুদ্ধ শুরু হলো। 'আমরও প্রাণপণ করে যুদ্ধ করছেন। প্রচন্ড যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। তখন তিনি ছেলে খাল্লাদকে সাথে নিয়ে পৌত্তলিক বাহিনীর ওপর প্রচন্ড আক্রমণ চালান। দারুণ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে পিতা-পুত্র

এক সাথে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত 'আমরের (রা) তীব্র বাসনা ও রাসূলুল্লাহর(সা) ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলো। তিনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে জান্নাতে পৌছে গেলেন। এটা হিজরী ৩য়/খ্রীঃ ৬২৫ সনের ঘটনা।[১৩]

যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত 'আমরের (রা) প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। রাসূল (সা) পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। লাশটি দেখে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন ঃ 'আল্লাহ তাঁর কোন কোন বান্দার কসম পূরণ করেন। 'আমর তাদেরই একজন। আমি তাঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জান্নাতে হাঁটতে দেখতে পাচ্ছি।' 'আমর ও খাল্লাদের (রা) ঘাতক আল-আসওয়াদ ইবন জা'উনা।[১৪]

'আমরের (রা) শাহাদাতের খবর তাঁর স্ত্রীর কাছে পৌছলে তিনি একটি উট নিয়ে আসেন এবং স্বামী ও ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (জাবিরের (রা) পিতা)-এর লাশ দু'টি উটের পিঠে উঠিয়ে বাড়ীতে নিয়ে যান। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হয়, উহুদের রণ-ক্ষেত্রেই সকল শহীদকে দাফন করা হবে। রাসূল (সা) 'আমরের স্ত্রীর নিকট থেকে লাশ দু'টি ফিরিয়ে আনেন এবং উহুদের সকল শহীদের সাথে দাফন করেন[১৫]। ইবন ইসহাক বনু সালামার কতিপয় সম্মানীয় বৃদ্ধ ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) উহুদের শহীদদের দাফনের সময় বলেন ঃ তোমরা 'আমর ইবন জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন হারামের দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। দুনিয়াতে তারা একই সারিতে সারিবদ্ধ ছিল। তাদেরকে একই কবরে দাফন কর।[১৬] তাদেরকে এক কবরে একই সাথে দাফন করা হয়।

তবে ইমাম সুহাইলী বর্ণনা করেন যে, 'আমরের ছেলেরা তাঁর লাশ মদীনায় আনার জন্য একটি উটের ওপর উঠান। উট অবাধ্য হয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও তাঁরা উটটি মদীনার দিকে আনতে পারলেন না। তখন তাদের স্মরণ হলো পিতার অন্তিম দু'আটির কথা ঃ 'প্রভু হে, আমাকে আর মদীনায় ফিরিয়ে এনো না।' তারা আর অহেতুক চেষ্টা করলেন না। পিতাকে তাঁরা তাঁর নিহত হওয়ার স্থলেই দাফন করেন।[১৭]

ইমাম মালিক 'আল-মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উহুদে শাহাদাত প্রাপ্ত 'আমর ইবন জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন 'আমরকে পানির নালার ধারে এক সাথে কবর দেওয়া হয়। বহু বছর পর স্রোতে কবরটি ভেঙ্গে যায় এবং লাশ দু'টি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। যেন তাঁরা গতকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যত্র কবর দেওয়ার জন্য লাশ দু'টি তোলা হলো। আবদুল্লাহ ছিলেন আহত। তাঁর একটি হাত ক্ষত স্থানটির ওপর রাখা ছিল। সেখান থেকে হাতটি সরিয়ে দিলে আবার ক্ষত স্থানটির ওপর গিয়ে পড়ছিল। এভাবেই তাঁদেরকে আবার দাফন করা হয়। উহুদের যুদ্ধ ও এই ঘটনার মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় ৪৬ (ছেচল্লিশ) বছর।

জাবির বলেন ঃ কবর থেকে তোলার পর আমি আমার পিতাকে দেখলাম তিনি যেন কবরে ঘুমিয়ে আছেন। দেহের কোন অংশ বিন্দুমাত্র বিকৃত হয়নি। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, তাঁদের কাফনের অবস্থা কিরূপ দেখেছিলেন? বললেন ঃ এক টুকরো কাপড় দিয়ে

মুখসহ উপর দিক ঢাকা ছিল। আর পায়ের দিকে ছিল 'হারমাল' নামক এক প্রকার ঘাস। এ দু'টি বস্তুও অক্ষত ছিল।[১৮]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমরের (রা) ছিল চার ছেলে। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল যুদ্ধ ও ঘটনায় শরীক ছিলেন। সীরাত গ্রন্থ সমূহে দুইজনের নাম পাওয়া যায়। মু'য়াজ ও খাল্লাদ। মু'য়াজ (রা) পিতার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং 'আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত বা শপথে অংশ গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন। খাল্লাদ (রা) উহুদের অন্যতম শহীদ। এছাড়া 'আমরের (রা) আবু আয়মান নামক এক দাসও এ যুদ্ধে শহীদ হন।[১৯] একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে বড় গৌরব ও সম্মানের আর কি হতে পারে?

'আমরের (রা) গর্বিত স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দা বিনতু 'আমর। বনু সালামার এক নেতা, উহুদের শহীদ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারামের বোন এবং প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইবন 'আবদিল্লাহর (রা) আপন ফুফু।

'আমর (রা) ছিলেন দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বল গৌর বর্ণের। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। পা ছিল খোঁড়া।[২০] অতিথি সেবা ও দানশীলতা হচ্ছে 'আরবদের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাঁর দানশীলতার জন্য রাসূল কারীম (সা) তাঁকে বনু সালামার নেতা ঘোষণা করেন। ঘটনাটি এই রকম। একবার বনু সালামার কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের নেতা কে? তারা বললো ঃ জাদ্দ ইবন কায়স। সে একজন কৃপণ ব্যক্তি। তাদের কথা শুনে রাসূল বললেন ঃ কৃপণতার চেয়ে নিকৃষ্ট রোগ আর নেই। তোমাদের নেতা বরং 'আমর ইবন আল-জামূহ।[২১] অবশ্য ইমাম যুহরীর একটি বর্ণনা বিশর ইবন আল-বারার নামটি এসেছে।[২২] এ ঘটনাকে আনসারদের একজন কবি কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন।[২৩] তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ

১. রাসূল (সা) বললেন- আর তাঁর কথাইতো সত্য-তোমাদের নেতা কে?
২. তারা বললো ঃ জাদ্দ ইবন কায়স। যদিও সে আমাদের নেতৃত্ব দেয়, সে একজন কৃপণ।
৩. সে এমন এক যুবক যে পৃথিবীবাসীর প্রতি কোন পদক্ষেপ নেয়না এবং কারো প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায় না।
৪. অতএব, তিনি 'আমর ইবন জামূহকে নেতা বানালেন তাঁর দানশীলতার জন্য। দানশীলতার কারণে নেতৃত্ব দানের অধিকার 'আমরেরই।
৫. কোন সাহায্যপ্রার্থী তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁর সম্পদ তাকে দেন। আর বলেন, এগুলি লও এবং আগামীকাল আবার এসো।

রাসূল কারীমের প্রতি ছিল তাঁর প্রচন্ড ভক্তি ও ভালোবাসা। রাসূল (সা) যখন কোন শাদী

করতেন তিনি নিজ উদ্যোগে তার ওলীমা করতেন।[২৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম- ৫/৭৫
২. আল-ইসাবা- ২/৫২৯
৩. সীয়ারে আনসার- ২/১১২
৪. সিফাতুস সাফওয়া- ১/২৬৫
৫. উসুদুল গাবা-৪/৯৪; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫২; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-১/১৮৫; আল-ইসাবা-২/৫২৯।
৬. ব্যক্তি দ্বারা এখানে হযরত মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের (রা) প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'আকাবার শপথের পর মদীনাবাসীদের অনুরোধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মুবাল্লিগ হিসাবে তাঁকে মক্কা থেকে মদীনায় পাঠান। তাঁরই আপ্রাণ চেষ্টায় মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।
৭. হায়াতুস সাহাবা-১/২৩১
৮. উসুদুল গাবা-৪/৯৩
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩; আল-আ'লাম-৫/৭৫
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭০
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯০-৯১; উসুদুল গাবা-৪/৯৪
১২. সীরাতু ইবন হিশাম ঃ টীকা-২/৯১
১৩. আল-আ'লাম-৫/৭৫; উসুদুল গাবা-৪/৯৪
১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩
১৫. উসুদুল গাবা-৪/৯৩
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৮
১৭. সীরাতু ইবন হিশাম ঃ টীকা-২/৯১
১৮. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৬৩; তাবাকাত-৩/৫৬২
১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১২৬
২০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৩
২১. আল-আ'লাম-৫/৭৫; আল-ইসাবা-২/৫২৯
২২. উসুদুল গাবা-৪/৯৩
২৩. প্রাগুক্ত-৪/৯৩
২৪. আল-ইসাবা-২/৫২৯; আল-ইসতী'য়াব-২/৫০৩

'আমর ইবন হায্‌ম (রা)

'আমর (রা) এর ডাকনাম আবু আদ-দাহ্‌হাক। মতান্তরে আবু মুহাম্মদ। পিতা হায্‌ম ইবন যায়িদ মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার ছেলে এবং মাতা বনু সায়িদা শাখার মেয়ে।[১] হযরত আম্মারা ইবন হায্‌ম (রা)- যিনি 'আকাবার বাইয়াতে শরীক ছিলেন, 'আমরের বৈমাত্রীয় ভাই।[২]

ইসলামের সূচনাপর্বে ও হিজরাতের সময় পর্যন্ত আমর ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এ কারণে তিনি যে কখন ইসলাম গ্রহণ করেন তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবতঃ নিজের পরিবারের লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ার কারণে বদর ও উহুদ যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। ইবন হিশাম বলেনঃ রাসূল (সা) বয়স কম হওয়ায় উমামা ইবন যায়িদ, 'আবদুল্লাহ্ ইবন 'উমার ইবন আল খাত্তাব, যায়িদ ইবন সাবিত, আল-বারা' ইবন 'আমির, 'আমর ইবন হায্‌ম ও উসাইদ ইবন জুহাইরকে উহুদ যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেননি। তাঁরা যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রাসূল (সা) তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেন। খন্দক যুদ্ধের সময় যোগদানের অনুমতি দেন।[৪] ইবন ইসহাক বলেনঃ 'আমর পনেরো বছর বয়সে খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন।[৫] খন্দক পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধ খন্দক।[৬]

ইবন ইসহাক বলেনঃ রাসূল (সা) হিজরী দশ সনের রাবীউল আওয়াল অথবা জামাদিউল আওয়াল মাসে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে নাজরানের বনু আল হারিস ইবন কা'ব-এর নিকট পাঠান। যাওয়ার সময় তাঁকে নির্দেশ দেন, তাদের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার আগে তিনবার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা সে দাওয়াত গ্রহণ করলে তুমি তা মেনে নেবে। প্রত্যাখ্যান করলে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। খালিদ সেখানে পৌঁছে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা গ্রহণ করে। খালিদের আপ্রাণ চেষ্টায় নাজরানের অধিবাসীরা ইসলাম কবুল করে। খালিদ সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা) সুন্নাত শিক্ষা দিতে থাকেন।

এক পর্যায়ে খালিদ (রা) নাজরানের সঠিক অবস্থা বর্ণনা করে রাসূলকে (সা) পত্র লেখেন। উত্তরে রাসূলও (সা) একটি পত্র খালিদকে (রা) পাঠান। তাতে তিনি বনু আল-হারিসের একটি প্রতিনিধিদল সংগে করে মদীনায় আসার জন্য খালিদকে নির্দেশ দেন। খালিদ একটি প্রতিনিধি দল সাথে নিয়ে মদীনায় আসেন। প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। ইবন হিশাম বলেনঃ এ দলটি শাওয়াল মাসের শেষ অথবা জুল কা'দাহ মাসের প্রথম দিকে স্বদেশ ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার পর রাসূল (সা) মাত্র চার মাস জীবিত ছিলেন।

ইবন হিশাম আরো বলেন, প্রতিনিধিদলটি ফিরে যাওয়ার পর রাসূল (সা) তাদেরকে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানদান, ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা, রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের শিক্ষা দান এবং যাকাত ও সাদাকা আদায়ের জন্য আমর ইবন হায্মকে পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে তাদের কাছে পাঠান। যাত্রার পূর্বে তাঁর দায়িত্বের পরিধি এবং কর্ম পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে রাসূল (সা) তাঁকে একখানি লিখিত অঙ্গীকারপত্র দান করেন।[৭] এখানে পত্রটির ভাবার্থ দেওয়া হলোঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ আল্লাহ ও রাসূলের ঘোষণা, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।' এটা আল্লাহর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে 'আমর ইবন হায্মের প্রতি অঙ্গীকার- যখন তাকে ইয়ামন পাঠানো হচ্ছে। তিনি তাকে সকল ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা, তাঁকে যারা ভয় করে ও মানুষের উপকার করে, তাদের সংগে থাকেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আল্লাহর নির্দেশ মত সত্যসহকারে মানুষের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করার।

তুমি মানুষের কল্যাণের সুসংবাদ দেবে এবং ভালো কাজের আদেশ করবে। কুরআন শিক্ষা দেবে, তাদের সামনে কুরআনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবে এবং তাদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। কেউ পবিত্র অবস্থায় ছাড়া কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। মানুষের অধিকার ও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য তাদেরকে অবহিত করবে। মানুষ হক বা সত্যের ওপর থাকলে তাদের প্রতি কোমল হবে, তারা অত্যাচারী হলে কঠোর হবে। কারণ, আল্লাহ অত্যাচার অপসন্দ করেন এবং অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেনঃ 'সাবধান! অত্যাচারীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' মানুষকে জান্নাত ও জান্নাতের কাজসমূহের সুসংবাদ দেবে। তেমনিভাবে জাহান্নাম ও জাহান্নামের কাজগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

মানুষের সাথে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। যাতে তারা দ্বীন বুঝতে পারে। হজ্জের নিদর্শনসমূহ, সুন্নাত ও ফরজসমূহ এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ যা বর্ণনা করেছেন তা তাদেরকে অবহিত করবে। হজ্জে আকবর সম্পর্কে জানাবে। হজ্জ দুই প্রকার ঃ হজ্জে আকবর ও হজ্জে আসগর। 'উমরা হচ্ছে হজ্জে আসগর। মানুষকে একখানা ছোট কাপড়ে নামায পড়তে নিষেধ করবে। দুই কাঁধের ওপর আর একখানা কাপড় পেঁচানো থাকতে হবে। মানুষকে একখানা কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে পরতে নিষেধ করবে যেন একটি ছিদ্র দিয়ে মাথাটি আকাশের দিকে উঁচু হয়ে আছে। মাথার পেছন দিকে চুলের বেনী বাঁধতে নিষেধ করবে।

উত্তেজিত হয়ে গোত্র ও সম্প্রদায়কে আহবান জানাতে মানুষকে নিষেধ করবে। তাদের আহবান হবে কেবল আল্লাহর দিকে। কেউ আল্লাহর দিকে না ডেকে গোত্র ও সম্প্রদায়ের দিকে আহবান জানালে তরবারি দিয়ে মাথাটি কেটে ফেলবে। যাতে, তাদের আহবান হয় এক আল্লাহর দিকে। মানুষকে পরিপূর্ণরূপে অজু করতে আদেশ করবে। আল্লাহ যেমন মুখমন্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত, গিরা পর্যন্ত দুই পা ধুইতে এবং মাথা মসেহ করতে

বলেছেন, সেইভাবে। সঠিক সময়ে নামায আদায় করতে ও যথাযথভাবে রুকু-সিজদা করতে আদেশ করবে। সকালের নামায অন্ধকারে, জুহরের নামায সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে গেলে, আসরের নামায সূর্য পৃথিবীর দিকে পিছন দিলে এবং মাগরিবের নামায রাতের আগমন ঘটলে আদায় করতে মানুষকে আদেশ করবে। মাগরিবের নামায আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় এমন সময় পর্যন্ত দেরী করবে না। রাতের প্রথম ভাগে ঈশার নামায আদায় করতে বলবে। জুম'আর নামাযের আজান হলে সব কাজ বন্ধ করে জুম'আর নামাযে যেতে বলবে। যাওয়ার আগে গোসল করতে বলবে।

গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর। ভূ-সম্পত্তির উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত আল্লাহ ফরজ করেছেন। বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানিতে সিক্ত ভূমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচযোগ্য ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ। প্রতি দশটি উটে দুইটি বকরী ও প্রতি বিশটিতে চারটি বকরী। প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি গরু এবং প্রতি তিরিশটি গরুতে একটি বাছুর যাকাত দিতে হবে। প্রতি চল্লিশটি ছাগলে একটি বকরী দিতে হবে। এ যাকাত আল্লাহ মুমিনদের ওপর ফরজ করেছেন। যে এর অতিরিক্ত দেবে, তা তার জন্য হবে কল্যাণকর।

যে কোন ইয়াহুদী অথবা নাসারা নিষ্ঠাসহকারে মুসলমান হবে এবং ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলবে সে সত্যিকার মুমিন বলে বিবেচিত হবে। মুমিনদের সমান অধিকার যেমন সে ভোগ করবে, তেমনি সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যও তার ওপর বর্তাবে। আর যে ইয়াহুদী ও নাসারা তার নিজ ধর্মে থেকে যাবে তাকে কোন রকম বাধা দেওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, স্বাধীন ও দাস নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের ওপর পূর্ণ এক দীনার অথবা তার পরিবর্তে কাপড় দিতে হবে। যারা তা ঠিকমত দেবে তাদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। যে তা দিতে অস্বীকার করবে সে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও মুমিন সকলের শত্রু। মুহাম্মাদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। ওয়াস সালামু 'আলাইহি ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।'

নাজরানে সরকার পরিচালনার পাশাপাশি ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি শিক্ষাদান ও তাবলীগের দায়িত্বও পালন করতেন। ইবনুল আসীর বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে নাজরানবাসীদেরকে ফিকাহ ও কুরআন শিক্ষা দান ও তাদের নিকট থেকে যাকাত ও সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেন।[৮]

ইবন হাজার বলেনঃ রাসূল (সা) 'আমরকে যখন নাজরানে পাঠান তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো বছর। ইবন সা'দও এ কথা বলেছেন।[৯] কিন্তু তাঁদের এ কথা সঠিক নয় বলে মনে হয়। কারণ সীরাত ও ইতিহাসের সকল গ্রন্থে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হিজরী দশ সনে নাজরানে যান। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে খন্দক যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল পনেরো বছর। ইবন হাজার তাঁর 'তাহজীবুত তাহজীব' (৮/৯) গ্রন্থেও বলেছেন তিনি পনেরো বছর বয়সেই খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন। আর একথা তো সত্য যে খন্দক যুদ্ধ হয় হিজরী পঞ্চম সনে। অতএব হিজরী দশ সনে কোন অবস্থাতে তাঁর বয়স বিশ বছরের কম হতে পারে না।

হযরত 'আমর (রা) মদীনা থেকে নাজরান যাওয়ার সময় স্ত্রীকেও সংগে নিয়ে যান। স্ত্রীর নাম ছিল 'উমরা। নাজরান পৌছার পর সেই বছরই তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। পিতা-মাতা সন্তানের নাম রাখেন মুহাম্মাদ এবং ডাক নাম আবু সুলায়মান। এ খবর মদীনায় রাসূলের (সা) নিকট পৌছালে তিনি সন্তানের নাম মুহাম্মাদ ও ডাকনাম আবু আবদিল মালিক রাখার জন্য লিখে পাঠান।[১০] ইমাম আল হাযেমী এই মুহাম্মাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ যাদেরকে ইয়ামনের নাজরানের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আবু আবদিল মালিক মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হায্ম তাদের একজন। তাঁকে নাজরানী বলা হয়। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে হিজরী দশ সনে সেখানে জন্ম গ্রহণ করেন। মদীনার আনসাররা 'আল-হাররা'-এর দিনে তাঁকেই ওয়ালী মনোনীত করেন এবং হিজরী ৬৩ সনে তিনি আল হাররা'র ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন।[১১]

হযরত আমরের (রা) দুই স্ত্রী। প্রথমার নাম 'উমরা। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল- গাস্সানীর কন্যা। এই আবদুল্লাহ ছিলেন মদীনায় বহিরাগত এবং মদীনার সায়িদা গোত্রের হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ।[১২] দ্বিতীয়ার নাম সাওদা বিনতু হারিসা।[১৩] 'আমরের (রা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

'আমরের (রা) সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে ছেলে মুহাম্মাদ, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেন, খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তিনি 'উমার (রা)ও অন্যদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতাকে দেওয়া রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিটি তিনি লোকদের দেখিয়ে বলতেন, এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চিঠি। তিনি 'আমর ইবন হায্মকে ইয়ামনে পাঠানোর সময় তাঁকে দিয়েছিলেন।[১৪] প্রখ্যাত মুজতাহিদ ও ফকীহ কাজী আবুবকর ছিলেন এই মুহাম্মাদের পুত্র।[১৫]

গভীর জ্ঞান, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা এবং শরীয়াতের বিধি-বিধানে অপরিসীম দখল ছিল তাঁর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (সা) কর্তৃক তাঁকে নাজরানের ওয়ালী নিয়োগের মাধ্যমে। মাত্র বিশ বছর বয়সে শাসন পরিচালনার মত গুরুদায়িত্ব পালন এবং কুরআন ও হাদীস শিক্ষাদান তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে।

রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত নাজরান যাওয়ার প্রাক্কালে রাসূলে করীম (সা) যে লিখিত পুস্তিকাটি তাঁকে দান করেন তা আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, দারেমী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের কয়েক জনের নাম এখানে দেওয়া হলোঃ

স্ত্রী সাওদা, পৌত্র আবু বকর, পুত্র মুহাম্মদ, নাদার ইবন আবদুল্লাহ সালামী এবং যিয়াদ ইবন নু'য়াইম আল- হাদরামী।[১৬]

'আমরের (রা) চরিত্রের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো সততা ও সত্যবাদিতা। কারও রক্তচক্ষু কখনো তাঁকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। প্রখ্যাত সাহাবী 'আম্মার ইবন

ইয়াসির (রা) সম্পর্কে রাসূলে করীম (সা) ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, একটি বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে। সিফফীন যুদ্ধে 'আম্মার (রা) 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধ করে মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। আম্মারের শাহাদাতের পর আমর যান মু'য়াবিয়ার (রা) পৃষ্ঠপোষক 'আমর ইবনুল আসের (রা) নিকট এবং বলেনঃ 'আম্মার তো নিহত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী আছেঃ 'তাঁকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।' এরপর তিনি যান মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট। বলেনঃ আম্মার তো নিহত হয়েছে। মু'য়াবিয়া (রা) বললেনঃ 'আম্মার নিহত হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? 'আমর বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছিঃ তাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। মু'য়াবিয়া (রা) বললেনঃ তুমি তোমার যুক্তিতে ভুল করছো। আমরা কি তাকে হত্যা করেছি? তাকে হত্যা করেছে আলী ও তাঁর সংগী সাথীরা। তাঁরাই তাঁকে আমাদের বর্শা ও তরবারির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।[১৭]

মু'য়াবিয়া (রা) তখন খলীফা। একবার 'আমর (রা) গেলেন খলীফার দরবারে এবং তাঁর শাসনের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শোনালেন। তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনেছি, কিয়ামতের দিন রাজাকে তার প্রজাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[১৮]

মুসনাদে আবু ই'য়ালা গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'য়াবিয়া (রা) যখন স্বীয় পুত্র ইয়াযিদের জন্য বা'ইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেন তখন একবার তাঁর সাথে 'আমরের (রা) শক্ত বাকযুদ্ধ হয়।[১৯]

'আমরের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে মতবিরোধ আছে। হিজরী ৫১, ৫৩ ও ৫৪ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু নু'য়াইম বলেন, 'আমর ইবন হাযম 'উমারের (রা) খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম ইবন মুনজিরও তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। তবে হিজরী পঞ্চাশ সনের পর মারা গেছেন বলে যে সকল মত বর্ণিত হয়েছে, ইবন হাজার তার কোন একটি সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, মু'য়াবিয়ার (রা) সাথে তাঁর যে ঝগড়া হয় তা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যুর প্রশ্নই ওঠে না। তিনি মদীনায় মারা যান।[২০]

'আমর ইবন হাযম বলেনঃ রাসূল (সা) একদিন আমাকে একটি কবরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেনঃ নেমে এসো। কবরে শায়িত ব্যক্তিকে কষ্ট দিও না।[২১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/১৮; উসুদুল গাবা- ৪/৯৯; অ'ল-আ'লাম -৫/২৪৪, তারীখলিজ জাহাবী- ২/৩০১,
২. আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪২
৩. সীয়ারে আনসার- ২/১১৭
৪. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৬৬; তাজরীদু আসমায়িস সাহাবা- ১/৪৩৫; আল ইসতীয়াব-২/৫১৭; আল-ইসাবা-২/৫৩২
৫. তাহজীবুত তাহজীব ৮/১৯

৬. উসুদুল গাবা-৪/৯৯
৭. আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবন হিব্বান, দারেমীসহ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে রাসূলুল্লাহর (সা) এ অঙ্গীকার পত্র সহ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া দেখুনঃ সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৯২-৫৯৬; ইবন কাসীরের আস সীরাতুন নাবাবিয়া-২/৩৫০-৩৫১; আনসাবুল আশরাফ-১/৫২৯; উসুদুল গাবা-৪/৯৯; তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৪৩৫; ফুতুহুল বুলদান লিল বালাজুরী-৭৭; সুবহুল আ'শা-১০/৯; তারীখুত তাবারী-৩/১৫৭; জামহারাতু রাসায়িল আল-আরাব-১/৬৪; কিতাবুল খিরাজলি আবী ইউসুফ-৮৫
৮. উসুদুল গাবা-৪/৯৯; আল-ইসতীয়াব-২/৫১৭
৯. তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৯; তারীখ লিজ জাহাবী-২/৩০৯,
১০. তাবাকাত-৫/৫০
১১. মু'জামুল বুলদান-৫/২৭০
১২. তাবাকাত -৫/৫০
১৩. তাহজীবুত তাহজীব-৮/২০
১৪. হায়াতুস সাহাবা- ৩/১৯৪
১৫. মু'জামুল বুলদান-৫/২৭০
১৬. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/১৯; উসুদুল গাবা-৪/৯৯, আল ইসতী'য়াব-২/৫১৭; তারীখ লিজ জাহাবী-২/৩০৯.
১৭. সীয়ারু আ'লামিন নুবালা-১/৩০০,৩০৫,
১৮. উসুদুল গাবা- ৪/৯৯
১৯. তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৯; উসুদুল গাবা-৪/৯৯
২০. আল আ'লাম-৫/২৪৪; তাহজীবুত তাহজীব-৮/১৯; আল ইসতীয়াব-২/৫১৭; আল ইসাবা-২/৫৩২
২১. আল ইসাবা-২/৫৩২

কা'ব ইবন মালিক (রা)

কা'ব (রা) ইতিহাসের সেই তিন ব্যক্তির একজন যাঁরা আলস্যবশতঃ তাবুক যুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত থাকেন এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) ও মু'মিনদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁদের তাওবা কবুলের সুসংবাদ দিয়ে আয়াত নাযিল করেন।[১] হিজরাতের ২৫ বছর পূর্বে ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইয়াসরিবে জন্ম গ্রহণ করেন।[২] তাঁর অনেকগুলি কুনিয়াত বা ডাকনাম ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যথাঃ আবু 'আবদিল্লাহ, আবূ আবদির রহমান, আবূ মুহাম্মদ ও আবু বাশীর।[৩] ইবনে হাজারের একটি বর্ণনায় জানা যায়, জন্মের পর তাঁর পিতা মালিক ইবন আবী কা'ব 'আমর ছেলের ডাকনাম রাখেন আবূ বাশীর। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে কারীম (সা) রাখেন আবূ আবদিল্লাহ। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান।[৪] মাতার নাম লায়লা বিনতু যায়িদ। পিতামাতা উভয়ে মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালিমা শাখার সন্তান।[৫] তিনি একজন আকাবী ও উহুদী সাহাবী। ইবন আবী হাতেম বলেনঃ তিনি ছিলেন 'আহলুস সুফ্ফা'রও অন্যতম সদস্য।[৬] পঁচিশ বছর বয়সে গোত্রীয় লোকদের সাথে বাই'য়াতে 'আকাবায় শরীক হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭]

ইবনুল আসীর বলেনঃ প্রায় সকল সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, কা'ব 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে শরীক ছিলেন।[৮] উরওয়া সেই সত্তর জনের মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করেছেন যাঁরা 'আকাবায় অংশ গ্রহণ করে ছিলেন।[৯] বুখারী ও মুসলিমে এসেছে কা'ব বলেছেনঃ আমি বাই'য়াতে আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ইসলামের ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম। তবে অপর একটি বর্ণনায় এসেছে । তিনি বলেন, আমি লায়লাতুল আকাবার বাই'য়াত থেকে বঞ্চিত হই।[১০]

কা'ব ইবন মালিক যে 'আকাবার শেষ বাই'য়াতে শরীক ছিলেন তা ইবন ইসহাকের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে জানা যায়। এ বাই'য়াতের বিস্তারিত বিবরণ কা'ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়েছে। সীরাতু ইবন হিশামে কা'বের জবানীতে তা হুবহু এসেছে। সংক্ষেপে তার কিছু এখানে তুলে ধরছি।

ইবন ইসহাক কা'ব-এর ছেলে আবদুল্লাহ ও মা'বাদ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কা'ব মদীনা থেকে স্বগোত্রীয় পৌত্তলিক হাজীদের একটি কাফেলার সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। এ কাফেলার সাথে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণকারী কিছু মুসলমানও ছিলেন। তারা দ্বীন বুঝেছিলেন এবং নামাযও পড়তেন। এ কাফেলায় তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা আল-বারা' ইবন মা'রূরও ছিলেন। চলার পথে তিনি একদিন বললেন, আমি আর এই কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে নামায পড়তে চাইনে। এখন থেকে কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়বো। কা'ব ও অন্যরা তাঁর এ কথায় আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমাদের নবী (সা) তো শামের বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে থাকেন। তাঁর

বিরোধিতা হয়, আমরা এমনভাবে নামায পড়তে চাইনা। এরপরও আল-বারা' তাঁর মতে অটল থাকলেন।

পথে নামাযের সময় হলে আল-বারা' কা'বার দিকে, কা'ব ও অন্যরা শামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে করতে মক্কায় পৌছলেন। তাঁরা আল-বারা'কে তাঁর এ কাজের জন্য তিরস্কার করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলোনা, তিনি স্বীয় মতে অনড় থাকলেন।

মক্কায় পৌছে আল-বারা' কা'ব কে বললেনঃ তুমি আমাকে একটু রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে চলো। আসার পথে আমি যে কাজ করেছি সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমাদের বিরোধিতা করে আমার মনটা ভালো যাচ্ছে না। কা'ব তাঁকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে চললেন। দুইজনের কেউই এর আগে রাসূলুল্লাহকে (সা) চিনতেন না এবং দেখেননি। পথে মক্কার দুই ব্যক্তির সাথে তাঁদের দেখা হলো। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁরা বললো: আপনারা কি তাঁকে চেনেন? কা'ব ও আল বারা' বললেনঃ না। তারা আবার প্রশ্ন করলোঃ তাঁর চাচা 'আব্বাসকে চেনেন? তাঁরা জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, 'আব্বাসকে চিনি। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি আমাদের ওখানে যাতায়াত করেন। তখন তারা বললোঃ আপনারা মসজিদে ঢুকে দেখবেন আব্বাসের সাথে একটি লোক বসে আছেন। তিনি সেই ব্যক্তি।

কা'ব ও আল-বারা' লোক দুইটির কথামত মসজিদে হারামে ঢুকে 'আব্বাসকে এবং তাঁর পাশে রাসূলুল্লাহকে (সা) বসা দেখতে পেলেন। সালাম দিয়ে তাঁদের পাশে বসে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) 'আব্বাসকে বললেনঃ আবুল ফাদল! আপনি কি এ দুই ব্যক্তিকে চেনেন? আব্বাস বললেনঃ হাঁ। ইনি আল-বারা' ইবন মা'রূফ। তাঁর সম্প্রদায়ের নেতা। আর ইনি কা'ব ইবন মালিক। কা'ব বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সেই প্রশ্নবোধক শব্দটি আজও ভুলিনি- 'কবি?' অর্থাৎ রাসূল (সা) আব্বাসকে প্রশ্ন করেনঃ একি সেই কবি কা'ব ইবন মালিক? আব্বাস জবাব দেনঃ হাঁ, ইনি সেই কবি কা'ব। এরপর কা'ব বর্ণনা করেছেন, কিভাবে কেমন করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো এবং কোন কথার ওপর তাঁরা বাই'য়াত করলেন।[১১] রাসূল (সা) যে বারোজন নাকীব মনোনীত করেন, কা'ব একটি কবিতায় তাঁদের পরিচয়ও ধরে রেখেছেন। ইবন হিশাম সে কবিতাটিও বর্ণনা করেছেন।[১২]

রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে দ্বীনী মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। 'আশারা মুবাশ্‌শারার সদস্য তালহা ইবন উবাইদুল্লাহর (রা) সাথে কা'বের এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একথা ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন।[১৩] তবে উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) যুবাইর ও কা'বের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[১৪] উহুদের দিন কা'ব আহত হলে যুবাইর তাঁকে মুমূর্ষ অবস্থায় কাঁধে বহন করে নিয়ে আসেন। সেদিন কা'ব মারা গেলে যুবাইর হতেন তাঁর উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে সূরা আল আনফালের ৭৫ নং আয়াত -'বস্তুতঃ যারা উলুল আরহাম' বা

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তাঁরা পরস্পর বেশী হকদার- নাযিল করে এ বিধান রহিত করা হয়।[১৫]

একমাত্র বদর ও তাবুক ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলে কারীমের (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ইবনুল কালবীর মতে, তিনি বদরে যোগদান করেন।[১৬] তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের নিকট এ মতটি স্বীকৃত হয়নি। আসল ঘটনা হলো, যে তাড়াহুড়ো ও দ্রুততার সাথে বদর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় তাতে অনেকের মত কা'বও অংশ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকেন। এ কারণে রাসূল (সা) কাউকে কিছুই বলেননি।

কা'ব বলেনঃ তাবুক পর্যন্ত একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেছি। বদরে যাঁরা যাননি, রাসূল (সা) তাঁদেরকে কোন প্রকার তিরস্কার করেননি। মূলতঃ রাসূল (সা) মদীনা থেকে বের হন আবু সুফইয়ানের বাণিজ্য কাফিলার উদ্দেশ্যে। আর এদিকে কুরাইশরা মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে আবূ সুফইয়ানের কাফেলার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মককায় পৌছার সুযোগ করে দিতে। বদরে উভয় পক্ষ মুখোমুখী হয় কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই। কা'ব আরও বলেন, বদর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বলে মানুষের নিকট বিবেচিত। তবে 'লাইলাতুল 'আকাবা'- যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে ইসলামের ওপর বাই'য়াত (অঙ্গীকার) করেছিলাম, তার পরিবর্তে বদর আমার নিকট মোটেই প্রাধান্যযোগ্য নয়। এরপর একমাত্র তাবুক ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকিনি।[১৭]

তবে কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় কা'ব বদরে অংশ গ্রহণ করেছেন। ইবন ইসহাক কা'বের নামটি বদরে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাছাড়া একটি বর্ণনায় এসেছে, কা'ব বলেছেন: আমি মুসলমানদের সাথে বদরে যাই। যুদ্ধ শেষে দেখলাম পৌত্তলিক যোদ্ধাদের বিকৃত লাশ মুসলিম শহীদদের সাথে পড়ে আছে। আমি ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন পৌত্তলিক অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুসলিম শহীদদের অতিক্রম করছে। একজন অস্ত্রসজ্জিত যোদ্ধাও যেন তার অপেক্ষা করছিল। আমি একটু এগিয়ে এ দুইজনের ভাগ্য দেখার জন্য তাদের পিছনে দাঁড়ালাম। পৌত্তলিকটি ছিল বিরাট বপুধারী। আমি তাকিয়ে থাকতেই মুসলিম সৈনিকটি তার কাঁধে তরবারির এমন এক শক্ত কোপ বসিয়ে দেয় যে, তা তার নিতম্ব পর্যন্ত পৌছে তাকে দুইভাগ করে ফেলে। তারপর লোকটি মুখের বর্ম খুলে ফেলে বলেঃ কা'ব কেমন দেখলে? আমি আবূ দুজানা।[১৯] তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁর বদরে অনুপস্থিত থাকার বর্ণনাগুলি সঠিক বলে মনে করেছেন।

উহুদ যুদ্ধে কা'ব তাঁর দ্বীনী ভাই তালহার (রা) সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরেন রাসূলুল্লাহর (সা) বর্ম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) পরেন তাঁর বর্ম। রাসূল (সা) নিজ হাতে তাঁকে বর্ম পরিয়ে দেন। এই উহুদে তাঁর দেহে মোট এগারো স্থানে যখম হয়।[২০] তবে বহু মুহাদ্দিস তাঁর দেহে সতেরোটি আঘাতের কথা বর্ণনা করেছেন।[২১]

এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলে কারীম (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একটা দারুণ হৈ চৈ পড়ে যায়। এ অবস্থায় কা'বই সর্বপ্রথম রাসূলকে (সা) দেখতে পান এবং গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন- রাসূল (সা) এই যে, এখানে। তোমরা এদিকে এসো। কা'ব তখন উপত্যকার মধ্যস্থলে। রাসূল (সা) তখন তাঁর হলুদ বর্ণের বর্ম দ্বারা তাঁকে ইঙ্গিত করে চুপ থাকতে বলেন।[২২]

উহুদের পরে যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে কা'ব (রা) দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহকারে যোগদান করেছেন। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে, নবীর (সা) জীবনের প্রথম যুদ্ধ বদরের মত শেষ যুদ্ধ তাবুকেও তিনি যোগদান করতে ব্যর্থ হন। তাবুক ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ অভিযান। নানা কারণে একে কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) রীতি ছিল, যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে স্পষ্টভাবে কিছু বলতেন না। কিন্তু এবার রীতি বিরুদ্ধ কাজ করলেন। এবার তিনি ঘোষণা করে দিলেন। যাতে দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের জন্য মুসলমানরা যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। কা'ব এই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দুইটি উট প্রস্তুত করেন। তাঁর নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি পূর্বের কোন যুদ্ধেই এতখানি সচ্ছল ও সক্ষম ছিলেন না, যতখানি এবার ছিলেন।

এ যুদ্ধের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) এতখানি গুরুত্বদান ও সতর্কতা অবলম্বনের কারণ এই ছিল যে, মূলতঃ সংঘর্ষটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সুপার পাওয়ার প্রবল পরাক্রমশালী রোমান বাহিনীর সাথে। সাজ-সরঞ্জাম, সংখ্যা, ঐক্য ও অটুট মনোবলের দিক দিয়ে তাদের বাহিনী ছিল বিশ্বের সেরা ও শক্তিশালী বাহিনী।

নবম হিজরীর রজব মাস শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড গরমের মওসুম। রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন এবং সকলকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশও দিলেন।[২৩] সংগত ও অসংগত নানা অজুহাতে মোট তিরাশিজন (৮৩) সক্ষম মুসলমান এ যুদ্ধে গমন থেকে বিরত থাকেন। তাদের কিছু ছিল মুনাফিক (কপট মুসলমান)। কারও বাগানের ফল পাকতে শুরু করেছিল, তা ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা হয়নি। কেউ ভয় পেয়েছিল প্রচণ্ড গরম ও দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার। আবার কেউ ছিল অতি দরিদ্র, যার কোন বাহন ছিল না।[২৪]

ইবন ইসহাক বলেনঃ যাঁরা সন্দেহ সংশয় বশতঃ নয়; বরং আলস্যবশতঃ যোগদানে ব্যর্থ হন তারা মোট চার জন। কা'ব ইবন মালিক, মুরারা ইবন রাবী, হিলাল ইবন উমাইয়্যা ও আবূ খায়সামা। তবে আবূ খায়সামা একেবারে শেষ মুহূর্তে তাবুকে পৌঁছেন ও রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।[২৫] কারও কারও মতে প্রচণ্ড গরমের কারণে তাঁরা তাবুক গমনে বিরত থাকেন।[২৬] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। কা'ব (রা) প্রতিদিনই যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন; কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে তাঁর সময় বয়ে যায়। তিনি প্রতিদিনই মনে মনে বলতেন

আমি যেতে পারবো। পরক্ষণেই সিদ্ধান্ত পাল্টে যেত। যাত্রার উদ্যোগ নিয়ে আবার থেমে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন মদীনায় খবর এলো, রাসূল (সা) তাবুক পৌঁছে গেছেন।

মদীনা ও তার আশ-পাশের সকল সক্ষম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাবুক চলে যান। কা'ব (রা) যখন মদীনা শহরে বের হতেন তখন শুধু শিশু, বৃদ্ধ ও কিছু মুনাফিক ছাড়া আর কোন মানুষের দেখা পেতেন না। লজ্জা ও অনুশোচনায় জর্জরিত হতেন। সুস্থ, সবল ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেন পিছনে থেকে গেলেন, সারাক্ষণ এই অনুশোচনার অনলে দগ্ধিভূত হতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সেনা বাহিনীর কোন দফতর ছিলনা। সুতরাং এত মানুষের মধ্যে কা'বের মত একজন লোক এলো কি এলো না, তা তাঁর জানা থাকার কথা নয়। একমাত্র আল্লাহ পাকের ওহীই ছিল তাঁর জানার মাধ্যম। তাবুক পৌঁছে একদিন তিনি কা'ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কোন এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার এত সময় কোথায় যে সে এখানে আসবে? মু'য়াজ ইবন জাবাল কাছেই ছিলেন। তিনি প্রতিবাদের সুরে বললেন, আমরা তো তাঁর মধ্যে খারাপ কোন কিছু দেখিনি। একথা শুনে রাসূল (সা) চুপ থাকলেন।

রোমানদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন মারাত্মক সংঘর্ষ হলো না। উত্তর আরবের অনেক গোত্র জিযিয়ার বিনিময়ে সন্ধি করলো। রাসূল (সা) মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ফিরে আসার খবর কা'ব পেলেন। তাঁর অন্তরে তখন নানা রকম চিন্তার ঢেউ খেলছে। রাসূলুল্লাহর (সা) অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায় কি, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন পরিবারের লোকদের কাছে। কখনও এমন চিন্তাও তাঁর মনে উদয় হলো যে, সত্য অসত্য মিলিয়ে কিছু কারণ রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু পরক্ষণেই এ চিন্তা যেন কোথায় হাওয়া হয়ে যেত। এ রকম দ্বিধা দ্বন্দ্বের এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, কপালে যা আছে তাই হোক, কোনরকম ছল-চাতুরীর আশ্রয় তিনি নেবেন না। যা সত্য তাই বলবেন।

এর মধ্যে দলে দলে আশি জনের মত লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য রাখলো। রাসূল (সা) তাদের সকলের ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য মনে করলেন। সকলের অপরাধ ক্ষমার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন এবং পুনরায় তাদের বাই'য়াত বা অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

কা'ব (রা) আসলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট। তাঁকে দেখে রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেনঃ এসো। কা'ব সামনে এসে বসার পর প্রশ্ন করলেনঃ যুদ্ধে যাওনি কেন? কা'ব বললেনঃ আপনার কাছে কী আর গোপন করবো? দুনিয়ার কোন রাজা-বাদশাহ হলে নানারকম কথার জাল তৈরী করে তাকে খুশী করতাম। সে শক্তি আমার আছে। আমি তো একজন বাগ্মী ও তর্কবাগিশ। আমি আপনার নিকট সত্য গোপন করবো না। এতে

হতে পারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মিথ্যা বললে এ মুহূর্তে আপনি খুশী হয়ে যাবেন। তবে আল্লাহ আপনাকে আমার ব্যাপারে নাখোশ করে দেবেন। আর তা আমার জন্য মোটেই সুখকর নয়। মূলতঃ আমার না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমি ছিলাম সুস্থ সবল এবং অর্থে-বিত্তেও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে সমর্থ। তবুও আমার দুর্ভাগ্য যে, আমি যেতে পরিনি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেনঃ সত্য বলেছো। তুমি এখন যাও। দেখা যাক আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত দান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে উঠে আসার পর বনু সালেমার কিছু লোক তাঁকে বললো, আপনি এর আগে আর কোন অপরাধ করেননি। এটাই আপনার প্রথমবারের মত একটি অপরাধ। অথচ এর জন্য ভালোমত কোন ওজর ও আপত্তি উপস্থাপন করতে পারলেন না। অন্যদের মত আপনিও কিছু ওজর পেশ করতেন, রাসূল (সা) আপনার গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করতেন, আর আল্লাহ মাফ করে দিতেন। কিন্তু তা আপনি পারলেন না। তাদের কথা শুনে কা'বের ইচ্ছা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে গিয়ে পূর্বের বর্ণনা প্রত্যাহার করেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি প্রশ্ন করলেনঃ আমার মত আর কেউ কি আছে? তিনি জানতে পেলেন, আরও দুইজন আছেন। তাঁরা হলেনঃ মুরারা ইবন রাবী ও হিলাল ইবন উমাইয়্যা। তাঁরা দুইজনই অতি নেক্কার বান্দা ও বদরী সাহাবী। তাঁদের নাম শুনে তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং নতুন করে ওজর পেশ করার ইচ্ছা দমন করলেন।

রাসূলে কারীম (সা) পূর্বে উল্লেখিত তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বলবত থাকে। মানুষ তাঁদের প্রতি আড় চোখে তাকিয়ে দেখতো। কোন কথা বলতো না। মুরারা ও হিলাল নিজেদেরকে আপন আপন গৃহে আবদ্ধ করে রাখেন। দিন রাত তাঁরা শুধু কাঁদতেন। কা'ব ছিলেন যুবক। ঘরে বসে থাকা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল? পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই তিনি মসজিদে আসা যাওয়া করতেন, হাটে-বাজারেও ঘোরাঘুরি করতেন। কিন্তু কোন মুসলামান ভুলেও তাঁর সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না।

কা'ব মসজিদে যেতেন এবং নামাযের পর রাসূলকে (সা) সালাম করতেন। রাসূল (সা) জায়নামাযে বসে থাকতেন। রাসূল (সা) সালামের জবাব দিচ্ছেন কিনা বা তাঁর ঠোঁট নড়ছে কিনা, কা'ব তা গভীরভাবে লক্ষ্য করতেন। তারপর আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। চোখ আড় করে একটু একটু করে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে তাকাতেন এবং রাসূলও (সা) তাকে আড় চোখে দেখতেন। যখন কা'ব নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে ফিরতেন তখন তিনি কা'বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

কা'বের (রা) সাথে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আচরণও ছিল অভিন্ন। আবূ কাতাদাহ (রা) ছিলেন কা'বের চাচাতো ভাই। একদিন কা'ব তাঁর বাড়ীর প্রাচীরের ওপর উঠে তাঁকে সালাম করলেন; কিন্তু কাতাদাহ জবাব দিলেন না। কা'ব তিনবার কসম খেয়ে

বললেন, তুমি তো জান আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কত ভালোবাসি। শেষবার কাতাদাহ্ শুধু মন্তব্য করলেন- বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

কাতাদাহর (রা) এমন জবাবে কা'ব (রা) দারুণ হতাশ হলেন। আপন মনে বললেন, এখন তো আমার ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষী দেওয়ারও কেউ নেই। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বাজারের দিকে বেরিয়ে গেলেন। এদিকে বাজারে তখন শামের এক নাবাতী ব্যক্তি তাঁকে খুঁজছিলেন। কা'বকে দেখে লোকেরা ইঙ্গিত করে বললো, ঐ যে তিনি আসছেন। লোকটি কা'বের নামে লেখা গাস্সানীয় রাজার একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলো। তাঁর নিকট থেকে চিঠিটি নিয়ে কা'ব পড়লেন। তাঁতে লেখা ছিল- 'তোমার বন্ধু (রাসূল (সা) তোমার প্রতি খুব অবিচার করেছেন। তুমি তো কোন সাধারণ ঘরের সন্তান নও। তুমি আমার কাছে চলে এসো।' চিঠিটি পড়ে তিনি মন্তব্য করলেন, এটাও এক পরীক্ষা। চিঠিটি তিনি জ্বলন্ত চুলায় ফেলে দিলেন।

এভাবে চল্লিশ দিন কেটে গেল। চল্লিশ দিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট গিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ হলো, তোমার স্ত্রী থেকে তুমি দূরে থাকবে। কা'ব জানতে চাইলেন, আমি কি তাঁকে তালাক দেব? তিনি বললেনঃ না। শুধু পৃথক থাকবে।

কা'ব (রা) বললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার কাছে চলে যাও। আমার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত সেখানেই থাক। অন্য দুইজন- হিলাল ও মুরারাকেও (রা) একই নির্দেশ দেওয়া হয়। হিলাল ছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বামী সেবার বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসেন। কা'বের পরিবারের লোকেরা তাঁর স্ত্রীকেও বললেন, তুমিও রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেয়ে স্বামী সেবার অনুমতি নিয়ে এসো। কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। বললেনঃ আমি যাব না। না জানি, রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলবেন।'

পঞ্চাশ দিনের মাথায় ফজরের নামায আদায় করে কা'ব (রা) ঘরের ছাদে বসে আছেন। ভাবছেন, এখন তো আমার জীবনটাই বোঝা হয়ে উঠেছে। আসমান-যমীন আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এ ধরনের আকাশ-পাতাল চিন্তা করছেন, এমন সময় সালা' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এলোঃ 'কা'ব শোন! তোমার জন্য সুসংবাদ'! তিনি বুঝলেন, তাঁর দু'আ ও তাওবা কবুল হয়েছে। সাথে সাথে তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। নিজের ভুলের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। কিছুক্ষণ পর দুই ব্যক্তি-যাদের একজন ছিল ঘোড় সাওয়ার, এসে তাঁকে সুসংবাদ দান করেন। কা'ব নিজের গায়ের কাপড় খুলে তাদেরকে দান করেন। অতিরিক্ত কাপড় ছিল না তাই সেই দান করা কাপড় আবার চেয়ে নিয়ে পরেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে যান।

ইতিমধ্যে খবরটি মদীনায় ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে মানুষ তাঁর বাড়ীর দিকে আসতে শুরু করেছে। পথে যার সাথেই দেখা হচ্ছে, তাঁকে মুবারকবাদ দিচ্ছে। তিনি মসজিদে

নববীতে পৌঁছে রাসূলকে (সা) সাহাবীদের মাঝে বসা অবস্থায় পেলেন।। মসজিদে ঢুকতেই তালহা (রা) দৌড়ে এসে হাত মেলালেন। তবে অন্যরা নিজ নিজ স্থানে বসে থাকলেন। কা'ব (রা) এগিয়ে গিয়ে রাসূলে কারীমকে (সা) সালাম করলেন। তাবারানী বর্ণনা করেছেন: তাওবা কবুল হওয়ার পর কা'ব রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে তাঁর দুইখানি পবিত্র হাত ধরে চুমু দিয়েছিলেন।[২৭] তখন রাসূলে কারীমের চেহারা মুবারক চাঁদের মত দীপ্তিমান দেখাচ্ছিল। তিনি কা'বের (রা) উদ্দেশ্যে বললেন: 'তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি। তোমার জন্মের পর থেকে আজকের দিনটির মত এত ভালো দিন তোমার জীবনে আর আসেনি।'

আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন? রাসূল (সা) বললেনঃ 'আমি কেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন।' এ কথা বলে তিনি তাদের সম্পর্কে সদ্য নাযিল হওয়া সূরা তাওবার ১১৭ নং আয়াতটি পাঠ করে শোনান। 'আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি, এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যাঁরা কঠিন মুহূর্তে নবীর সংগে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়।' তিলাওয়াত শেষ হলে আনন্দের আতিশয্যে কা'ব বলে উঠলেন, 'আমি আমার সমস্ত ধন সম্পদ সাদাকা করে দিচ্ছি।' রাসূল (সা) বললেনঃ 'সব নয়, কিছু দান কর।' কা'ব তাঁর খাইবারের সম্পত্তি দান করেন। এরপর তিনি মন্তব্য করেনঃ 'আল্লাহ আমার সততার জন্যই মুক্তি দিয়েছেন। আমি অঙ্গীকার করছি, বাকী জীবনে আমি শুধু সত্যই বলবো।'

সত্য বলার জন্য কা'ব ও তাঁর অপর দুই সঙ্গীকে যে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, ইসলামের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। এত বড় বিপদেও তাঁদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে তাঁদের সেই করুণ অবস্থা অতি চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছেঃ

"এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই- অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা ১১৮-১১৯)

এ আয়াতে-যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল-বলা হয়েছে। এর অর্থ যুদ্ধ থেকে পিছনে থেকে যাওয়া নয়। বরং এর অর্থ যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসার প্রতীক্ষায় ছিলেন।

কা'ব বলেনঃ আমাদের তাওবাহ কবুল সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে। উম্মু সালামা তখন বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা কি কা'বকে সুসংবাদটি জানিয়ে দেব? রাসূল (সা) বললেনঃ 'তাহলেতো মানুষের ঢল নামবে এবং তোমরা আর ঘুমাতে পারবে না।[২৮]

কা'বের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। ইবন হিব্বান বলেন, তিনি আলীর (রা) শাহাদাতের সময়কালে মারা যান। ইবন আবী হাতেম বলেন, মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তিনি অন্ধ হয়ে যান। ইমাম বুখারী তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'উসমানের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেছেন এবং মু'য়াবিয়া ও আলীর (রা) দ্বন্দ্বে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে আমরা কোন তথ্য পাইনি। ইমাম বাগাবী বলেন, আমি জেনেছি, তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফত কালে শামে মারা যান। আবুল ফারাজ আল ইসপাহানী 'কিতাবুল আগানী' গ্রন্থে একটি দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন যে, হাস্সান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আন-নূ'মান ইবন বাশীর (রা) একবার আলীর (রা) কাছে যান এবং উসমানের (রা) হত্যার বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হন। তখন কা'ব (রা) উসমানের (রা) শানে তাঁর রচিত একটি শোকগাথা আবৃত্তি করে আলীকে শোনান। তারপর তাঁরা সেখান থেকে উঠে সোজা মু'য়াবিয়ার কাছে চলে যান। মু'য়াবিয়া (রা) তাঁদেরকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করেন।[২৯]

আল-হায়সাম ও আল-মাদায়িনীর মতে কা'ব হিজরী ৪০ সনে মারা যান। তবে তাঁর থেকে হিজরী ৫১ সনের কথাও বর্ণিত হয়েছে। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, হিজরী ৫০ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণিত আছে। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সঠিক মত এই যে, হিজরী ৫০ থেকে ৫৫ (৬৭০-৬৭৩ খ্রীঃ)-এর মধ্যে প্রায় ৭৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।[৩০]

সীরাত গ্রন্থসমূহে তাঁর পাঁচ ছেলের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন ঃ আবদুল্লাহ, 'উবায়দুল্লাহ, আবদুর রহমান, মা'বাদ ও মুহাম্মাদ। শেষ জীবনে কা'ব (রা) অন্ধ হয়ে যান।[৩১] ছেলেরা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে বেড়াতেন।[৩২] ইবন ইসহাক তাঁর ছেলে আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ শেষ জীবনে আমার পিতা অন্ধ হয়ে গেলে আমি তাঁকে নিয়ে বেড়াতাম। আমি যখন তাঁকে জুম'আর নামাযের জন্য নিয়ে বের হতাম তখন আজান শোনার সাথে সাথে তিনি আবু উমামা আস'য়াদ ইবন খুরারার জন্যে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতেন। জুমআর আজান শুনলেই তাঁকে আমি সব সময় এ কাজটি করতে দেখতাম। বিষয়টি আমার কাছে রহস্যজনক মন হলো। আমি একদিন জুম'আর দিনে তাঁকে নিয়ে বের হয়েছি, পথে আজানের ধ্বনি শোনার সাথে সাথে তিনি আবু উমামার জন্য দু'আ করতে শুরু করেন। আমি বললাম ঃ আব্বা, জুম'আর আজান শুনলেই আপনি এভাবে আবু উমামার জন্য দু'আ করেন কেন? বললেনঃ বাবা, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগে সেই আমাদেরকে সমবেত করে সর্বপ্রথম জুম'আর জামায়াত কায়েম করে। সেটি অনুষ্ঠিত হতো হাররার বনু বায়দার 'হাযমুন নাবীত' পাহাড়ের 'নাকী আল-খাদিমাত' নামক স্থানে। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তখন আপনারা কতজন ছিলেন? বললেন ঃ চল্লিশজন।[৩৩]

হাদীসের গ্রন্থসমূহে কা'বের (রা) বর্ণিত মোট আশিটি (৮০) হাদীস পাওয়া যায়।[৩৪] তবে ইমাম জাহাবী বলেন ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ত্রিশে পৌঁছবে। তারমধ্যে

তিনটি মুত্তাফাক আলাইহি। একটি বুখারী ও দুইটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩৫] তিনি খোদ রাসূল (সা) ও উসাইদ ইবন হুদাইর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

কা'ব (রা) থেকে যে সকল মনীষী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কতিপয় ব্যক্তি হলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ ও আবু ইমামা আল-বাহিলী। উল্লেখিত তিনজনই হলেন সাহাবী। আর তাবেঈদের মধ্যে ইমাম বাকের, 'আমর ইবন হাকাম ইবন সাওবান, 'আলী ইবন আবী তালহা, 'উমার ইবন কাসীর ইবন আফলাহ, 'উমার ইবন আল-হাকাম ইবন রাফে, কা'বের পাঁচ পুত্র ও পৌত্র আবদুর রহমান ইবন আবদিল্লাহ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩৭]

বালাজুরীর বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলে কারীম (সা) আসলাম, গিফারী ও জুহাইনা গোত্রের যাকাত-সাদাকা আদায়ের জন্য কা'বকে নিয়োগ করেন।[৩৮]

'উসমানের (রা) শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনায় কা'ব (রা) একটি মারসিয়া (শোকগাথা) রচনা করেন এবং 'আলীকে (রা) আবৃত্তি করে শোনান। তার কয়েকটি পংক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ[৩৯]

১. 'উসমান তাঁর হাত দু'টি গুটিয়ে নিলেন, তারপর দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তিনি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করলেন, আল্লাহ উদাসীন নন।
২. গৃহে যারা ছিল তাদের বললেন, তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। যারা যুদ্ধ করেনি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।
৩. বন্ধুত্ব সৃষ্টির পর আল্লাহ কেমন করে তাঁদের অন্তরে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিলেন ?
৪. আর কল্যাণ কিভাবে তাঁদের দিকে পশ্চাদ্দেশ ফিরিয়ে উট পাখীর মত দৌড় দিল?

'আলী (রা) কবিতাটি শোনার পর মন্তব্য করলেন ঃ 'উসমান আত্মত্যাগ করেছেন। আর এ ত্যাগ ছিল অতীব দুঃখজনক। আর তোমরা তখন ভীত হয়ে পড়েছিলে। সে ভীতি ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরনের।

আলী ও মু'য়াবিয়ার (রা) মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটেছিল তাতে কা'ব (রা) কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে উভয়ের থেকে দূরে থাকেন।

সততা ও সত্য বলা ছিল কা'বের (রা) চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যকে যেভাবে তিনি ধারণ করেন সেভাবে অনেকেই ধারণ করতে পারেননি। দু'আ কবুল হওয়ার পর জীবনে কোন দিন বিন্দুমাত্র মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আল্লাহর কসম! যে দিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) সেই কথাগুলি বলেছিলাম সেদিন থেকে আজকের দিনটি পর্যন্ত আর কোন প্রকার মিথ্যা বলিনি।[৪০] তাবুক যুদ্ধের পূর্বের জীবনটি ছিল তাঁর অতি পরিচ্ছন্ন। এ কারণে তার জীবনে যখন তাবুকের বিপর্যয় নেমে এলো তখন তাঁর নিজ গোত্র বনু সালেমা তাঁকে বলতে পেরেছিল— 'আল্লাহর কসম! তোমাকে তো আমরা এর পূর্বে আর কোন অপরাধ করতে দেখিনি।[৪১]

কা'ব (রা) ছিলেন তাঁর সময়ের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে যাঁরা বেশী বেশী কবিতা রচনা করেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। জাহিলী আমলেও কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তাঁর কবিতা খুবই উন্নতমানের।[৪২] মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে যে তিনজন কবি কুরাইশ ও তাদের স্বগোত্রীয় কবিদের মুকাবিলায় দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন, কা'ব (রা) সেই ত্রয়ীর অন্যতম। তাঁরা ইসলামবিদ্বেষী কবিদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।[৪৩] ইবন সীরীন বলেন ঃ এ তিন কবি হলেন, হাস্সান ইবন সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন মালিক। তাঁরাই রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৪]

কা'ব ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন। তিনি একটি শ্লোকে বলেছেন ঃ[৪৫]

'আমরা আল-লাত, আল 'উয্যা ও উদ্দাকে ভুলে যাব। তাদের গলার হার ও কানের দুল ছিনিয়ে নেব।'

রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারের প্রধান তিন কবির কবিতার বিষয় ছিল ভিন্ন। কা'বের কবিতার মূল বিষয় ছিল যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে কাফিরদের অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করা এবং মুসলমানদের অন্তর থেকে ভীতি দূর করে তাদেরকে অটল ও দৃঢ় করা। ইবন সীরীন বলেন ঃ[৪৬] কা'ব তো কবিতায় যুদ্ধের কথা বলে কাফিরদের ভয় দেখাতেন। বলতেন ঃ আমরা এমন করেছি, এমন করছি বা করবো। হাস্সান তাঁর কবিতায় কাফিরদের দোষ-ত্রুটি এবং তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বর্ণনা করতেন। আর ইবন রাওয়াহা কুফরী এবং আল্লাহ ও রাসূলের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার উল্লেখ করে তাদেরকে ধিক্কার ও নিন্দা জানাতেন।

কা'বের (রা) ছেলে আবদুর রহমান বলেন, আমার পিতা একদিন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ তো যা নাযিল করার তা করেছেন। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন ঃ একজন প্রকৃত মুজাহিদ তার তরবারি ও জিহবা-উভয়টি দিয়ে জিহাদ করে। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তার নামের শপথ! তোমরা তো শত্রুদের দিকে (জিহবা দিয়ে) তীরের ফলাই ছুড়ে মারছো।

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আশ-শূ'য়ারার ২২৪ থেকে ২২৬ নং আয়াত-বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করেনা—নাযিল হলো তখন তিন কবি-হাস্সান, আবদুল্লাহ ও কা'ব কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ যখন এ আয়াত নাযিল করেছেন তখন তো অবশ্যই জেনেছেন, আমরা কবি। রাসূল (সা) তখন তাঁদেরকে আয়াতের ব্যতিক্রমী অংশ—তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে—পাঠ করে শোনালেন। তারপর বললেন ঃ এ হচ্ছে তোমরা।[৪৮]

কা'ব (রা) ইসলামের প্রতিপক্ষ কুরাইশদের নিন্দায় বহু শ্লোক রচনা করেছেন। আল্লাহর দরবারে অন্ততঃ তার একটি শ্লোক যে গৃহীত হয়েছে, সে কথা খোদ রাসূল (সা) বলেছেন। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একদিন রাসূল (সা) কা'বকে বললেন ঃ তুমি যে শ্লোকটি বলেছো, তাতে তোমার রব তোমাকে ভোলেননি। কা'ব জানতে চাইলেন ঃ কোন শ্লোকটি? রাসূল (সা) তখন আবু বকরকে বললেন ঃ আপনি শ্লোকটি একটু আবৃত্তি করুন তো। আবু বকর তখন শ্লোকটি আবৃত্তি করে শোনান।[৪৯] প্রাচীন আরবী সূত্রসমূহে শ্লোকটি সংকলিত হয়েছে।[৫০] শ্লোকটির অনুবাদ এখানে দেওয়া হলোঃ

'সাখীনা ধারণা করেছে, সে তার রবকে (প্রভু) পরাভূত করবে। সকল বিজয়ীদের ওপর বিজয়ী (আল্লাহ) অবশ্যই জয়ী হবেন।'

এখানে 'সাখীনা' অর্থ আটা ও ঘি অথবা আটা ও খোরমা দিয়ে তৈরী এক প্রকার খাবার। এটি ছিল কুরাইশদের খুবই প্রিয় খাদ্য। তারা খেতও খুব বেশী বেশী। এ কারণে কবি কুরাইশদেরকে 'সাখীনা' বলেছেন। এ দ্বারা মূলতঃ তাদেরকে হেয় ও অপমান করা হয়েছে।[৫১]

কা'ব (রা) কবিতা রচনা করে রাসূলকে (সা) শোনাতেন। মাঝে মাঝে রাসূল (সা) তাতে কিছু শব্দ রদ-বদল করে সংশোধন করে দিতেন। কা'ব তা সবিনয়ে গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন।[৫২]

সমকালীন আরব সমাজে কা'বের (রা) কবিতা এক অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। রাসূলে কারীম (সা) হুনাইন যুদ্ধ শেষ করে যখন তায়েফের দিকে যাত্রা করেন তখন কা'ব দু'টি শ্লোক রচনা করেন। শ্লোক দু'টি দাউস গোত্রের ওপর এত গভীর প্রভাব ফেলে যে, তারা তা শুনেই ইসলাম গ্রহণ করে। শ্লোক দু'টির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'তিহামা ও খায়বার থেকে আমরা সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বিদূরিত করে তরবারি কোষে আবদ্ধ করে ফেলেছি।

এখন আবার আমরা তাকে যে কোন দু'টির মধ্যে একটি স্বাধীনতা দিচ্ছি। যদি তরবারি কথা বলতে পারতো তাহলে বলতো এবার দাউস অথবা সাকীফের পালা।'

ইবনে সীরীন বলেন ঃ দাউস গোত্র যখন উক্ত পংক্তি দু'টি শুনলো তখন তারা ভীত হয়ে পড়লো। তারা বললো, এখন মুসলমান হয়ে যাওয়াই উচিত। তা না হলে আমাদের দশাও হবে অন্যদের মত। এরপর তারা একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে।[৫৩]

কা'ব (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োগ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি যেমন তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন তেমনিভাবে ভাষার যুদ্ধও চালিয়েছেন। তাঁর জীবনকালের ইসলামের ইতিহাসের সকল ঘটনা তিনি তাঁর কবিতায় ধরে রেখেছেন। বদর যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। বদরে 'উবায়দাহ ইবনুল হারেস শহীদ হন। তাঁর স্মরণে রচনা করেন এক শোকগাথা।[৫৪] উহুদ যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধের

শহীদদের সম্পর্কে বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। এ যুদ্ধের অন্যতম শহীদ রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা সায়্যিদুশ্ শুহাদা হামযার (রা) স্মরণে তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। এ সময় মক্কার পৌত্তলিক কবিদের সাথে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সীরাতে ইবন হিশামে তার একটি চিত্র পাওয়া যায়।[৫৫]

হামযার (রা) শানে রচিত একটি মরসিয়াতে তিনি হামযার বোন সাফিয়্যা বিনতু আবদিল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ[৫৬]

১. ওঠো সাফিয়্যা, ভেঙ্গে পড়োনা। হামযার স্মরণে বিলাপের জন্য নারীদের প্রতি আহবান জানাও।

২. মানুষের অন্তর কাঁপানো যে বিপদ আল্লাহর সিংহের ওপর আপতিত হয়েছে, সেজন্য দীর্ঘ ক্রন্দনে ক্লান্ত হয়ো না।

৩. তিনি ছিলেন পিতৃ-মাতৃহীনদের জন্য মর্যাদার প্রতীক। অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ছিলেন সিংহের মত।

৪. তাঁর সকল কর্ম দ্বারা তিনি শুধু আহমাদের সন্তুষ্টি এবং আরশ ও ইজ্জতের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর খুশীই কামনা করতেন।

বীরে মা'উনায় রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে কবি কা'বের যবান সোচ্চার হয়ে ওঠে। তিনি হত্যাকারীদের নিন্দায় অনেক কবিতা রচনা করেন।[৫৭] মদীনার ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের নির্বাসন ও ইহুদী নেতা কা'ব ইবন আশরাফের হত্যার চিত্র তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতায় ধরা পড়েছে। এ ঘটনা লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ কবিদের নিন্দাবাদের জবাবও তিনি দিয়েছেন।[৫৮]

খন্দক যুদ্ধের চিত্রও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। প্রতিপক্ষের বাহিনী ও কবিদের নিন্দায় তিনি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন।[৫৯] বনু লিহইয়ানের যুদ্ধও তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে।[৬০] জ্বি-কারাদের ঘটনায়ও তাঁকে সোচ্চার দেখা যায়।[৬১] খায়বার বিজয়ের চিত্রও তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে।[৬২] মূতার যুদ্ধের শহীদরা তাঁর হৃদয়ে দারুণ ছাপ ফেলেছে। তাঁদের স্মরণে তিনি রচনা করেছেন আবেগ-ভরা এক কাসীদা।[৬৩] এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) এ মহান কবির জিহ্বা ইসলামের প্রথম পর্বের সকল ঘটনা ও যুদ্ধে সোচ্চার থেকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার যথাযথ ব্যবহার করে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর কিছু কিছু পংক্তি আরবী ভাষা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। রাওহ ইবন যান্‌বা বলেন, কা'বের নিজ গোত্রের এক ব্যক্তির প্রশংসায় রচিত তাঁর একটি শ্লোক আরবী কাব্য জগতে সর্বাধিক বীরত্বব্যঞ্জক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[৬৪]

তথ্যসূত্র ঃ

১. শাজারাতুজ জাহাব- ১/৫৬
২. ডঃ উমার ফাররূখ- তারীখ- আল- আদাব আল আরবী- ১/৩২৩
৩. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/৩৯৪; আজ-জাহাবী-তারীখ- ২/২৪৩
৪. আল-ইসাবা- ৩/৩০২

৫. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৩, ৫২৪
৭. 'উমার ফাররূখ: তারীখ আল-আদাব- ১/৩২৩
৮. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/২২২,২২৩; আল-ইসাবা- ৩/৩০২
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৭
১১. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৪৩৯-৪৪৩
১২. প্রাগুক্ত- ১/৪৪৫
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৪, ৫২৭; শাজারাতুজ জাহাব- ১/৫৬; উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
১৪. তাবাকাত- ৩/১০২; আজ-জাহাবী: তারীখ- ২/২৪৩; আনসাবুল আশরাফ- ১/২৭১
১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৪,৫২৬
১৬. সুয়ূতী: আসবাব আন-নুযুল-৩৭৭; তাহজীবুত-তাহজীব- ৮/৩৯৫; উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
১৭. উসুদুল গাবা-৪/২৪৭,২৪৮; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮, ২৮৯; সহীহ বুখারী- ২/৬৩৪
১৮. সীরাতু ইবন হিশাম -১/৪৬২
১৯. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫৫৮
২০. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
২১. জাহাবী তারীখ-২/২৪৩; সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৪; আল মুসতাদরিক- ৩/৪৪১
২২. তাবাকাত: মাগাযী-৩২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২২
২৩. ইবন কাসীর:আস সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-২/২৬৬
২৪. 'উমার ফাররূখ- তারীখ- ১/৩২৩
২৫. আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ- ২/২৭০
২৬. উসুদুল গাবা- ৪/২৪৭
২৭. হায়াতুস সাহাবা- ২/৪৯৭
২৮. হযরত কা'ব ও তাঁর সঙ্গীদের এ ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২য় খণ্ড, পৃ: ৫২৭-৫৩০; সীরাতু ইবন হিশাম- ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৩১; মুসনাদে ইমাম আহমাদ- ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ; ৩৮৭, ৩৯০; হায়াতুস সাহাবা- ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৪-৪৬৮; উসুদুল গাবা- ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৮; ইবন কাসীরের আস-সীরাহ- ২য় খণ্ড পৃ: ২৬৬-২৭০। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এই তিনজনের ঘটনাটি একটি পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।
২৯. আল ইসাবা- ৩/৩০২; তাহজীবুত তাহজীব - ৮/৩৯৯
৩০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: শাজারাতুজ জাহাব-১/৫৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৬- আজ-জাহাবী: তারীখ- ২/২৪৩; ডঃ উমার ফাররূখ: তারীখুল আদাব-১/৩২৪; আনসাবুল আশরাফ- ১/২২৮
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন- নুবালা- ২/৫২৪; শাজারুতুজ জাহাব- ১/৫৬; তাহজীবুত তাহজীব- ৮/৩৯৫.
৩২. বুখারী - ২/৬৩২
৩৩. সীরাতু ইবন হিশাম - ১/৪৩৫; হায়াতুস সাহাবা - ৩/৩৮৭
৩৪. আল- আ'লাম- ৫/২২৮
৩৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৩
৩৬. তাহজীবুত তাহজীব- ৮/৩৯৫
৩৭. আজ-জাহাবী: তারীখ - ২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৩; আল-ইসাবা - ২/১৫৩; তাহজীবুত তাহজীব - ৮/৩৯৫
৩৮. আনসাবুল আশরাফ- ১/৫৩১

৩৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৭
৪০. সহীহ মুসলিম- ২/৪৫৪
৪১. বুখারী - ২/৬৩৫
৪২. ডঃ ফাররূখ - তারীখুল আদাব-১/৩২৪
৪৩. শাজারাতুজ জাহাব-১/৫৬.
৪৪. আজ- জাহাবী তারীখ- ২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; উসুদুল গাবা-৪/২৪৮
৪৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৭৮
৪৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; উসুদুল গাবা -৪/২৪৮
৪৭. আজ-জাহাবী : তারীখ - ২/২৪৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; মুসনাদ- ৬/৩৮৭
৪৮. তাফসীর ইবন কাসীর - ৩/৩৫৪
৪৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; আয-জাহাবী: তারীখ -২/২৪৩
৫০. দেখুন: কানযুল উম্মাল- ১৩/৫৮১; শাজারাতুজ জাহাব- ১/৫৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৬
৫১. দেখুন: টীকা: সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৬; কানযুল উম্মাল- ১৩/৫৮১
৫২. সীরাতু ইবন হিশাম - ২/১৩৬
৫৩. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৪৭৯; উসুদুল গাবা- ৪/২৪৮; আল ইসাবা- ৩/৩০২;সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/৫২৫; আয-জাহাবী: তারীখ - ২/২৪৩
৫৪. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৭১৪; ২/১৪,২৪,২৫,২১০
৫৫. প্রাগুক্ত- ২/১৩২,১৩৮,১৩৯,১৪৪,১৪৭,১৫৬,১৫৮,১৬১,১৬৩
৫৬. ডঃ উমার ফাররূখ- তারীখ: ১/৩২৪-৩২৫; কিতাবুল আগানী- ১৬/২২৬
৫৭. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৮৯
৫৮. প্রাগুক্ত- ২/৫৭; ১৯৮-২০২
৫৯. প্রাগুক্ত - ২/২৫৫-২৫৮; ২৫৯-২৬৬
৬০. প্রাগুক্ত - ২/২৮০;২৮১
৬১. প্রাগুক্ত - ২/২৮৭;২৮৮
৬২. প্রাগুক্ত- ২/৩৩৩; ৩৪৮; কিতাবুল আগানী- ১৬/২২৬
৬৩. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৩৮৫
৬৪. কিতাবুল আগানী- ১৫/২৯; আল-আ'লাম- ৫/২২৮

হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)

সীরাতের গ্রন্থসমূহে হাস্‌সানের (রা) অনেকগুলি ডাকনাম বা কুনিয়াত পাওয়া যায়। আবুল ওয়ালীদ, আবুল মাদরাব, আবুল হুসাম ও আবূ আবদির রহমান। তবে আবুল ওয়ালীদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[১] তাঁর লকব বা উপাধি 'শায়িরু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর (সা) কবি। তাঁর পিতার নাম সাবিত ইবন আল-মুনজির এবং মাতার নাম আল-ফুরাই'য়া বিন্‌তু খালিদা।[২] ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে তাঁর মায়ের নাম আল-ফুরাইয়া বিন্‌ত হুরাইস বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] তাঁরা উভয়ে মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সন্তান। রাসূলুল্লাহর (সা) মাতুল গোত্র বনু নাজ্জারের সন্তান হওয়ার কারণে রাসূলে পাকের (সা) সাথে আত্মীয়তা ও রক্তের সম্পর্ক ছিল।[৪] মা আল-ফুরাইয়া ইসলামের আবির্ভাব কাল পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।[৫] তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বিখ্যাত নেতা সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) চাচাতো বোন।[৬] হযরত হাস্‌সান (রা) তাঁর কবিতার একটি চরণে মা আল-ফুরাইয়া'র নামটি ধরে রেখেছেন।[৭] প্রখ্যাত সাহাবী শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) ছিলেন হাস্‌সানের (রা) ভাতিজা।[৮] হাস্‌সান (রা) একজন সাহাবী, রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারী কবি, দুনিয়ার সকল ঈমানদার কবিদের ইমাম এবং তাঁর কাব্য প্রতিভা রুহুল কুদুস জিবরীল দ্বারা সমর্থিত।[৯]

ইবন সাল্লাম আল-জামহী বলেন : হাস্‌সানের পিতা সাবিত ইবন আল-মুনজির ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের একজন নেতা ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর দাদা আল-মুনজির প্রাক-ইসলামী আমলে 'সুমাইহা' যুদ্ধের সময় মীদনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিচারক হয়ে তাদের মধ্যে ফায়সালা করেছিলেন। কবি হাস্‌সানের কবিতায় তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একবার মুযানিয়্যা গোত্র কবির পিতাকে বন্দী করেছিল। কবির গোত্র তাঁকে ছাড়িয়ে আনার জন্য ফিদিয়ার প্রস্তাব দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করে। দীর্ঘদিন বন্দী থাকার পর তাঁর পিতার প্রস্তাবেই বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে তিনি মুক্ত হন।[১০] হাস্‌সানের দাদা আল-মুনজির ছিলেন খুবই উদার ও শান্তিপ্রিয় মানুষ।

হাস্‌সান হিজরাতের প্রায় ষাট বছর পূর্বে ৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইয়াসরিবে (মদীনা) জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নির্মিত মসজিদে নব্বীর পশ্চিম প্রান্তে বাবে রহমতের বিপরীত দিকে অবস্থিত 'ফারে' কিল্লাটি ছিল তাঁদের পৈত্রিক আবাসস্থল। হাস্‌সানের কবিতায় এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১১] কবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং কবিতাকে জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রাচীন আরবের জিল্লাক ও হীরার রাজপ্রাসাদে যাতায়াত ছিল। তবে গাস্‌সানীয় সম্রাটদের প্রতি একটু বেশী দুর্বল ছিলেন। হাস্‌সানের সাথে তাঁদের একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি তাঁদের প্রশংসায় বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। তার কিছু অংশ সাহিত্য সমালোচকগণ হাস্‌সানের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে

গণ্য করেছেন।[১২] সম্রাটগণও প্রতিদানে তাঁর প্রতি যথেষ্ট বদান্যতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের এ সম্পর্ক ইসলামের পরেও বিদ্যমান ছিল।[১৩]

গাস্‌সানীয় সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট জাবালা ইবন আল-আয়হাম। তাঁর প্রশংসায় কবি হাস্‌সান অনেক কবিতা রচনা করেছেন। খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে গোটা শামে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। পরাজয়ের পর জাবালা ইবন আল-আয়হাম ইসলাম গ্রহণ করে কিছুকাল হিজাযে বসবাস করেন। এ সময় একবার হজ্জ করতে যান। কা'বা তাওয়াফের সময় ঘটনাক্রমে তাঁর কাপড়ের আঁচল এক আরব বেদুঈনের পায়ের তলায় পড়ে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তার গালে থাপ্পড় বসিয়ে দেন। বেদুঈন খলীফা 'উমারের (রা) নিকট বিচার দাবী করে। খলীফা ছিলেন সাম্যের প্রতীক। তিনি বেদুঈনকে একইভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। জাবালা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন ঃ আমি একজন রাজা। একজন বেদুঈন কিভাবে আমাকে থাপ্পড় মারতে পারে? 'উমার (রা) বললেন ঃ ইসলাম আপনাকে ও তাকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। জাবালা বিষয়টি একটু ভেবে দেখার কথা বলে সময় চেয়ে নিলেন। এরপর রাতের আঁধারে রোমান সাম্রাজ্যে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

এই রোমান সাম্রাজ্যে অবস্থানকালে পরবর্তীকালে একবার মু'য়াবিয়া (রা) প্রেরিত এক দূতের সাথে জাবালার সেখানে সাক্ষাৎ হয়। জাবালা তাঁর নিকট হাস্‌সানের কুশল জিজ্ঞেস করেন। দূত বলেন ঃ তিনি এখন বার্দ্ধক্যে জর্জরিত। অন্ধ হয়ে গেছেন। হাস্‌সানকে দেওয়ার জন্য জাবালা তাঁর হাতে এক হাজার দীনার দান করেন। দূত মদীনায় ফিরে আসলেন এবং কবিকে মসজিদে নববীতে পেলেন। তিনি কবিকে বললেন ঃ আপনার বন্ধু জাবালা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। কবি বললেন ঃ তাহলে তুমি যা নিয়ে এসেছো তা দাও। দূত বললেন ঃ আবুল ওয়ালীদ, আমি কিছু নিয়ে এসেছি তা আপনি কি করে জানলেন? বললেন ঃ তাঁর কাছ থেকে যখনই কোন চিঠি আসে, সাথে কিছুনা কিছু থাকেই।[১৫]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন। একবার এক গাস্‌সানীয় সম্রাট দূত মারফত কবি হাস্‌সানের নিকট পাঁচ শো দীনার ও কিছু কাপড় পাঠিয়েছিলেন। দূতকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি যদি জীবিত না থাকেন তাহলে কাপড়গুলি কবরের ওপর বিছিয়ে দেবে এবং দীনারগুলি দ্বারা একটি উট খরীদ করে তার কবরের পাশে জবেহ করবে। দূত মদীনায় এসে কবির সাক্ষাৎ পেলেন এবং কথাগুলি বললেন। কবি বললেন ঃ তুমি আমাকে মৃতই পেয়েছো।[১৬]

গাস্‌সানীয় রাজ দরবারের মত হীরার রাজ দরবারেও কবি হাস্‌সানের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। জুরজী যায়দান বলেন ঃ 'প্রাক-ইসলামী আমলে যে সকল খ্যাতিমান আরব কবির হীরার রাজ দরবারের আসা-যাওয়া ছিল এবং আপন কাব্য-প্রতিভা বলে সেখানে মর্যাদার আসনটি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হাস্‌সান অন্যতম।[১৭]

ইসলাম-পূর্বকালে কবি হাস্‌সান ইয়াসরিবের চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই গোত্র আউস ও খাযরাজের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হতো তাতে নিজ গোত্রের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতেন। আর এখান থেকেই প্রতিপক্ষ আউস গোত্রের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কায়স ইবন খুতাইম ও আবী কায়স ইবন আল-আসলাত-এর সাথে কাব্য-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[১৮]

হাস্‌সানের চার পুরুষ অতি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। প্রত্যেকে একশো বিশ বছর করে বেঁচে ছিলেন। আরবের আর কোন খান্দানের পরপর চার পুরুষ এত দীর্ঘ জীবন লাভ করেনি। হাস্‌সানের প্রপিতামহ হারাম, পিতামহ আল-মুনজির, পিতা সাবিত এবং তিনি নিজে-প্রত্যেকে ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন।[১৯]

হাস্‌সান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর জীবনে বার্দ্ধক্য এসে গেছে। মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে তিনি মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের সময় হাস্‌সানের বয়স হয়েছিল ষাট বছর।[২০] ইবন ইসহাক হাস্‌সানের পৌত্র আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিজরাতের সময় তাঁর বয়স ষাট, এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স তিপ্পান্ন বছর ছিল। ইবন সা'দ আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ষাট বছর জাহিলিয়্যাতের এবং ষাট বছর ইসলামের জীবন লাভ করেন।[২১]

রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব বিষয়ে ইবন ইসহাক হাস্‌সানের একটি বর্ণনা নকল করেছেন। হাস্‌সান বলেন ঃ আমি তখন সাত/আট বছরের এক চালাক-চতুর বালক। যা কিছু শুনতাম, বুঝতাম। একদিন এক ইহুদীকে ইয়াসরিবের একটি কিল্লার ওপর উঠে চিৎকার করে মানুষকে ডাকতে শুনলাম। মানুষ জড় হলে সে বলতে লাগলো ঃ আজ রাতে আহমাদের নক্ষত্র উদিত হয়েছে। আহমাদকে আজ নবী করে দুনিয়ায় পাঠানো হবে।[২২]

ইবনুল কালবী বলেন ঃ হাস্‌সান ছিলেন একজন বাগ্মী ও বীর। কোন এক রোগে তাঁর মধ্যে ভীরুতা এসে যায়। এরপর থেকে তিনি আর যুদ্ধের দিকে তাকাতে পারতেন না এবং কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেননি।[২৩] তবে ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় জানা যায়, তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লামাহ ইবন হাজার 'আসকালানী লিখেছেন ঃ একবার ইবন আববাসকে বলা হলো 'হাস্‌সান আল-লা'ঈন' (অভিশপ্ত হাস্‌সান) এসেছে। তিনি বললেন ঃ হাস্‌সান অভিশপ্ত নন। তিনি জীবন ও জিহবা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদ করেছেন।[২৪] আল্লামাহ্ জাহাবী বলেন, এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।[২৫]

হাস্‌সানের (রা) যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে সবকথা প্রচলিত আছে তা এই বর্ণনার বিপরীত। খন্দক মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) মুসলিম মহিলাদেরকে হাস্‌সানের 'ফারে' দূর্গে নিরাপত্তার জন্য রেখে যান। তাদের সাথে হাস্‌সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিবও ছিলেন। একদিন এক ইহুদীকে তিনি কিল্লার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ

শুণলেন যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় তাহলে ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ রাসূল (সা) তাঁর বাহিনী নিয়ে তখন প্রত্যক্ষ জিহাদে লিপ্ত। তিনি হাস্‌সানকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্‌সান বললেন, আপনার জানা আছে আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহসই থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হাস্‌সানকে বলেন, যাও, এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলি নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ, তাই একাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাস্‌সান বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।[২৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সাফিয়্যা লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্‌সাকে বলেন, ধর, এটা দূর্গের নীচে ইহুদীদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন ঃ এ আমার কাজ নয়। অতঃপর সাফিয়্যা নিজেই মাথাটি ইহুদীদের মধ্যে ছুড়ে মারেন। ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[২৭]

হাস্‌সান (রা) সশরীরে না হলেও জিহবা দিয়ে রাসূলে কারীমের সাথে জিহাদ করেছেন। বনু নাদীরের যুদ্ধে রাসূল (সা) যখন তাদেরকে অবরুদ্ধ করেন এবং তাদের গাছপালা জ্বালিয়ে দেন তখন তার সমর্থনে হাস্‌সান কবিতা রচনা করেন। বনু নাদীর ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য ও সহযোগিতা চুক্তি ছিল। তাই তিনি কবিতায় কুরাইশদের নিন্দা করে বলেন, মুসলমানরা বনু নাদীরের বাগ-বাগিচা জ্বালিয়ে ছিল, তোমরা তো তাদের কোন উপকারে আসনি। এ কবিতা মক্কায় পৌঁছালে কুরাইশ কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস বলেন ঃ আল্লাহ সর্বদা তোমাদের এমন কর্মশক্তি দান করুন, যাতে আশে-পাশের আগুনে খোদ মদীনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর আমরা দূরে বসে তামাশা দেখবো।[২৮]

হিজরী পঞ্চম সনে 'আল-মুরাইসী' যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। সুযোগ সন্ধানী মুনাফিকরা তিলকে তাল করে ফেলে। তারা 'আয়িশার (রা) পূতঃপবিত্র চরিত্রের ওপর অপবাদ দেয়। মুনফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল এ ব্যাপারে সকলের অগ্রগামী। কতিপয় প্রকৃত মুসলমানও তাদের এ ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে পড়েন। যেমন হাস্‌সান, মিসতাহ ইবন উসাসা, হামনা বিন্‌ত জাহাশ প্রমুখ। যখন আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কুরআনের আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূল (সা) অপবাদ দানকারীদের ওপর কুরআনের নির্ধারিত 'হদ' (শাস্তি) আশি দুররা জারি করেন। ইমাম যুহরী থেকে সাহীহাইনে একথা বর্ণিত হয়েছে।[২৯] অবশ্য অনেকে 'হদ' জারির বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।[৩০]

অনেকে অবশ্য হাস্‌সানের জীবন, কর্মকাণ্ড এবং তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করে এ মত পোষণ করেছেন যে, কোনভাবেই তিনি 'ইফ্‌ক' বা অপবাদের ঘটনায় জড়িত ছিলেন

না। যেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়িয়ে মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশদের আভিজাত্যের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছিলেন এবং আরববাসীর নিকট তাদের হঠকারিতার স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন, একারণে পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণকারী কুরাইশরা নানাভাবে তাঁকে নাজেহাল করেছেন। তাঁরা মনে করেন, 'ইফ্ক'-এর ঘটনায় হাস্সানের নামটি জড়ানোর ব্যাপারে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন, তাদের পুরোধা সাফওয়ান ইবন মু'য়াত্তাল। হাস্সান 'আয়িশার (রা) শানে অনেক অনুপম কবিতা রচনা করেছেন। একটি চরণে তিনি 'ইফ্ক'-এর ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্য একটি চরণে যারা তাঁর নামটি জড়ানোর ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছেন, সেই সব কুরাইশ মুহাজিরদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৩১]

'ইফ্ক'-এর ঘটনায় তাঁর জড়িয়ে পড়ার যত বর্ণনা পাওয়া যায়, সীরাত বিশেষজ্ঞরা সেগুলিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। একারণে পরবর্তীকালে বহু সাহাবী ও তাবে'ঈ তাঁকে ভালো চোখে দেখেননি। অনেকে তাঁকে নিন্দা-মন্দ করেছেন। তবে খোদ 'আয়িশা (রা) ও রাসূল (সা) তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। একথা বহু বর্ণনায় জানা যায়। 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাস্সানকে মুমিনরাই ভালোবাসে এবং মুনফিকরাই ঘৃণা করে। তিনি আরো বলেছেন ঃ হাস্সান হচ্ছে মুমিন ও মুনাফিকদের মধ্যে প্রতিবন্ধক।[৩২] কেউ আয়িশার (রা) সামনে হাস্সানকে (রা) খারাপ কিছু বললে তিনি নিষেধ করতেন।

হাস্সান (রা) শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার আয়িশার (রা) গৃহে আসেন। তিনি গদি বিছিয়ে হাস্সানকে (রা) বসতে দেন। এমন সময় 'আয়িশার (রা) ভাই আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত হন। তিনি বোনকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ আপনি তাঁকে গদির ওপর বসিয়েছেন? তিনি কি আপনার চরিত্র নিয়ে এসব কথা বলেননি? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে কাফিরদের জবাব দিতেন শত্রুদের জবাব দিয়ে রাসূলুল্লাহর (রা) অন্তরে শান্তি দিতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ আখিরাতে তাঁকে শাস্তি দেবেন না।[৩৩]

প্রখ্যাত তাবে'ঈ মাসরূক বলেন ঃ একবার আমরা 'আয়িশার (রা) কাছে গিয়ে দেখলাম হাস্সান সেখানে বসে বসে 'আয়িশার (রা) প্রশংসায় রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে এই পংক্তিটিও ছিল ঃ

'হাস্সানুল রাযানুন মা তুযান্নু বিরীবাতিন'- অর্থাৎ তিনি পূতঃপবিত্র, শক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভদ্রমহিলা, তাঁর আচরণে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। পরনিন্দা থেকে মুক্ত অবস্থায় তাঁর দিনের সূচনা হয়।

পংক্তিটি শোনার পর 'আয়িশা (রা) মন্তব্য করলেন ঃ 'কিন্তু আপনি তেমন নন।' আয়িশাকে (রা) বললাম ঃ আপনি তাকে এখানে আসার অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তা'য়ালা তো ঘোষণা করেছেন, ইফ্ক-এ যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে, তার জন্য রয়েছে

বিরাট শাস্তি। (সূরা ঃ আন-নূর-১১) 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর কাজের শাস্তি তো তিনি লাভ করেছেন। অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) পক্ষ থেকে কুরাইশদের প্রতিরোধ করেছেন এবং তাদের কঠোর নিন্দা করেছেন।[৩৪]

'উরওয়া বলেন ঃ একবার আমি ফুরাই'য়ার ছেলে হাস্সানকে 'আয়িশার (রা) সামনে গালি দিই। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভাতিজা, তুমি কি এমন কাজ থেকে বিরত হবে না? তাঁকে গালি দিওনা। কারণ, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে কুরাইশদের জবাব দিতেন।[৩৫]

একবার কতিপয় মহিলা 'আয়িশার (রা) উপস্থিতিতে হাস্সানকে নিন্দামন্দ করে। আয়িশা (রা) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা তাঁকে নিন্দামন্দ করোনা। আল্লাহ তা'য়ালা যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দানের অঙ্গিকার করেছেন, তিনি তা পেয়ে গেছেন। তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। আমি আশা করি তিনি কুরাইশ কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিসের কবিতার জবাবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় যে কবিতা রচনা করেছেন তার বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। একথা বলে তিনি হাস্সানের 'হাজাওতা মুহাম্মাদান ফা আজাবতু আনহু' কবিতাটির কয়েকটি লাইন পাঠ করেন।[৩৬]

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) কবি হাস্সানকে ক্ষমা করেছিলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'আয়িশার (রা) সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হাস্সান (রা) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সময় নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। ইবন ইসহাকের মতে তিনি হিজরী ৫৪ সনে মারা যান। আল হায়সাম ইবন 'আদী বলেন ঃ হিজরী ৪০ সনে মারা যান। ইমাম জাহাবী বলেন ঃ তিনি জাবালা ইবন আল-আয়হাম ও আমীর মু'য়াবিয়ার দরবারে গিয়েছেন। তাই ইবন সা'দ বলেছেন ঃ মু'য়াবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, তিনি হিজরী ৫৪/ খ্রীঃ ৬৭৪ সনে ১২০ বছর বয়সে মারা যান।[৩৭]

আবু 'উবায়েদ আল-কাসেম ইবন সাল্লাম বলেন ঃ হিজরী ৫৪ সনে হাকীম ইবন হিযাম' আবু ইয়াযীদ হুয়াইতিব ইবন 'আব দিল 'উয্যা, সা'ঈদ ইবন ইয়ারবু আল মাখযুমী ও হাস্সান ইবন সাবিত আল-আনসারী মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের প্রত্যেকে ১২০ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।[৩৮]

হাস্সানের (রা) স্ত্রীর নাম ছিল সীরীন। তিনি একজন মিসরীয় কিবতী মহিলা। আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। রাসূলে কারীম (সা) সাহাবী হয়রত হাতিব ইবন বালতা'য়াকে (রা) ইস্কান্দারিয়ার শাসক 'মাকুকাস'-এর নিকট দূত হিসেবে পাঠান। মাকুকাস রাসূলুল্লাহর (রা) দূতকে যথেষ্ট সমাদর করেন। ফেরার সময় তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) জন্য কিছু উপহার পাঠান। এই উপহার সামগ্রীর মধ্যে তিনটি কিবতী দাসীও ছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে ইবরাহীমের মা মারিয়্যা আল কিবতিয়্যা (রা) এই দাসী ক্রয়ের একজন। অন্য দুইজন দাসীর মধ্যে রাসূল (সা) হাস্সান ইবন সাবিত ও মুহাম্মাদ ইবন কায়স আল-আবদীকে একটি করে দান করেন। হাস্সানকে প্রদত্ত দাসীটি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন মারিয়্যা আল-কিবতিয়্যার বোন। নাম ছিল সীরীন। তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হাস্সানের (রা) ছেলে 'আবদুর রহমান। এই আবদুর রহমান এবং রাসূলুল্লাহর (রা) ছেলে ইবরাহীম ছিলেন পরস্পর খালাতো ভাই।[৩৯]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'ফারে' পর্বতের দূর্গ ছিল হাস্সানের (রা) পৈতৃক বাসস্থান। আবু তালহা (রা) যখন 'বীরহা' উদ্যান তাঁর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে সাদাকা হিসেবে বন্টন করে দেন তখন সেখান থেকে একটি অংশ লাভ করেন। এরপর তিনি এখানে বাসস্থান নির্মাণ করেন। স্থানটি আল-বাকী'র নিকটবর্তী। পরে আমীর মু'য়াবিয়া (রা) তাঁর নিকট থেকে সেটি খরীদ করে সেখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা পরে কাসরে বনী হুদায়লা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারো কারো ধারণা যে, রাসূল (সা) এ ভূমি তাঁকে দান করেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। উপরে উল্লেখিত আমাদের বক্তব্য সাহীহ বুখারীর বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত।

হাস্সানের (রা) মাথার সামনের দিকে এক গোছা লম্বা চুল ছিল। তিনি তা দুই চোখের মাঝখানে সব সময় ছেড়ে রাখতেন। ভীষণ বাক্পটু ছিলেন। এ কারণে বলা হতো, তিনি তাঁর জিহবার আগা নাকের আগায় ছোঁয়াতে পারতেন। তিনি বলতেন, আরবের কোন মিষ্টভাষীই আমাকে তুষ্ট করতে পারে না। আমি যদি আমার জিহ্বার আগা কারো মাথার চুলের ওপর রাখি তাহলে সে মাথা ন্যাড়া হয়ে যাবে। আর যদি কোন পাথরের ওপর রাখি তাহলে তা বিদীর্ণ হয়ে যাবে।[৪০]

হাস্সান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ আল-বারা' ইবন 'আযিব, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান, 'উরওয়া ইবন খুরাইর, আবুল হাসান মাওলা বনী নাওফাল, খারিজা ইবন যায়িদ ইবন সাবিত, ইয়াহইয়া ইবন 'আবদির রহমান ইবন হাতিব, আয়িশা, আবু হুরাইরা, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, আবদুর রহমান ইবন হাস্সান প্রমুখ।[৪১] ইবন সা'দ হাস্সানকে (রা) দ্বিতীয় তাবকায় (স্তর) উল্লেখ করেছেন।[৪২]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর প্রথম দুই খলীফা— আবূ বকর ও 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হাস্সানের (রা) কোন রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায় না। 'উসমানের (রা) খিলাফতের সময় তাঁর মধ্যে আবার 'আসাবিয়্যাতের (অন্ধ পক্ষপাতিত্ব) কিছু লক্ষণ দেখা যায়। তিনি খলীফা 'উসমানের (রা) পক্ষ নিয়ে বনু উমাইয়্যাকে 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন। খলীফা 'উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলে তিনি বনু হাশিম, বিশেষতঃ 'আলীকে (রা) ইঙ্গিত করে কিছু কবিতা রচনা করেছেন।[৪৩]

হাস্‌সানের (রা) জীবনে কবিত্ব একটি স্বতন্ত্র শিরোনাম। কাব্য প্রতিভা সর্বকালে সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিকট সমাদৃত। বিশেষ করে প্রাক-ইসলামী আরবে এ গুণটির আবার সবচেয়ে বেশী কদর ছিল। কবিতা চর্চা ছিল সেকালের আরববাসীর এক বিশেষ রুচি। তৎকালীন আরবে কিছু গোত্র ছিল কবির খনি বা উৎস বলে খ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ কায়স, রাবী'য়া, তামীম, মুদার, য়ামন প্রমুখ গোত্রের নাম করা যায়। এ সকল গোত্রে অসংখ্য আরবী কবির জন্ম হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ছিল শেষোক্ত য়ামন গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। হাস্‌সানের (রা) পৈত্রিক বংশধারা উপরের দিকে এদের সাথে মিলিত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত গোত্রসমূহের মধ্যে আবার কিছু খান্দানে কবিত্ব বংশানুক্রমে চলে আসছিল। হাস্‌সানের (রা) খান্দানটি ছিল তেমনই। উপরের দিকে তাঁর পিতামহ ও পিতা, নীচের দিকে তাঁর পুত্র আবদুর রহমান, পৌত্র সা'ঈদ ইবন 'আবদির রহমান এবং তিনি নিজে সকলেই ছিলেন তাঁদের সমকালে একেকজন শ্রেষ্ঠ কবি।[৪৪] হাস্‌সানের (রা) এক মেয়েও একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। হাস্‌সান (রা) তাঁর বার্দ্ধক্যে এক রাতে কবিতা রচনা করতে বসেছেন। কয়েকটি শ্লোক রচনার পর আর ছন্দ মিলাতে পারছেন না। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে মেয়ে বললেন ঃ বাবা, মনে হচ্ছে আপনি আর পারছেন না। বললেন ঃ ঠিকই বলেছো। মেয়ে বললেন ঃ আমি কি কিছু শ্লোক মিলিয়ে দেব? বললেন ঃ পারবে? মেয়ে বললেন ঃ হাঁ, তা পারবো। তখন বৃদ্ধ একটি শ্লোক বললেন, আর তার সাথে মিল রেখে একই ছন্দে মেয়েও একটি শ্লোক রচনা করলেন। তখন হাস্‌সান বললেন ঃ তুমি যতদিন জীবিত আছ আমি আর একটি শ্লোকও রচনা করবো না। মেয়ে বললেন ঃ তা হয় না; বরং আমি আর আপনার জীবদ্দশায় কোন কবিতা রচনা করবো না।[৪৫]

প্রাক-ইসলামী 'আমলের অগণিত আরব কবির অনেকে ছিলেন 'আসহাবে মুজাহ্‌হাবাত' নামে খ্যাত। 'মুজাহ্‌হাবাত' শব্দটি 'জাহাব' থেকে নির্গত। 'জাহাব' অর্থ স্বর্ণ। যেহেতু এ সকল কবিদের কিছু অনুপম কবিতা স্বর্ণের পানি দ্বারা লিখিত হয়েছিল, এজন্য সেই কবিতাগুলিকে 'মুজাহ্‌হাবাত' বলা হতো। আর 'আসহাব' শব্দটি 'সাহেব' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ 'অধিকারী, মালিক।' সুতরাং 'আসহাবে মুজাহ্‌হাবাত' অর্থ স্বর্ণ দ্বারা লিখিত কবিতা সমূহের অধিকারী বা রচয়িতাগণ। পরবর্তীকালে প্রত্যেক কবির সর্বোত্তম কবিতাটিকে 'মুজাহ্‌হাব' বলা হতে থাকে। হাস্‌সানের (রা) 'মুজাহ্‌হাবার' প্রথম পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৪৬]

لَعَمْرُ أَبِيْكَ الْخَيْرُ حَقًّا لِمَا بِنَا عَلَى لِسَانِى فِى

الْخُطُوْبِ وَلاَ يَدِىْ ـ

(লা'আমরু আবীকাল খায়রু হাক্‌কান লিমা বিনা.....)

আরবী কবিদের চারটি তাবকা বা স্তর। ১. জাহিলী বা প্রাক-ইসলামী কালের কবি, ২.

মুখাদরাম— যে সকল কবি জাহিলী ও ইসলামী উভয় কাল পেয়েছেন, ৩. ইসলামী— যারা ইসলামের অভ্যুদয়ের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং কবি হয়েছেন, ৪. মুহদাস— আব্বাসী বা পরবর্তীকালের কবি। এ দিক দিয়ে হযরত হাস্সান দ্বিতীয় স্তরের কবি। তিনি জাহিলী ও ইসলাম— উভয়কালই পেয়েছেন।[৪৭]

কাব্য প্রতিভায় হাস্সান (রা) ছিলেন জাহিলী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন ঃ হাস্সানের জাহিলী আমলের কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্তর্গত।[৪৮]

হাস্সানের (রা) কাব্য জীবনের দুইটি অধ্যায়। একটি জাহিলী ও অন্যটি ইসলামী। যদিও দুইটি ভিন্নধর্মী অধ্যায়, তথাপি একটি অপরটি থেকে কোন অংশে কম নয়। জাহিলী জীবনে তিনি গাস্সান ও হীরার রাজন্যবর্গের স্তুতি ও প্রশংসাগীতি রচনার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ইসলামী জীবনে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা, তাঁর পক্ষে প্রতিরোধ ও কুরাইশদের নিন্দার জন্য। তিনি সমকালীন শহুরে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃত। বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় অতি দক্ষ। আবু উবায়দাহ্ বলেন ঃ 'অন্য কবিদের ওপর হাস্সানের মর্যাদা তিনটি কারণে। জাহিলী আমলে তিনি আনসারদের কবি, রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াতের সময়কালে 'শা'য়িরুর রাসূল' এবং ইসলামী আমলে গোটা য়ামনের কবি।[৪৯]

জাহিলী আরবে উকাজ মেলায় প্রতি বছর সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎসব ও প্রতিযোগিতা হতো। এ প্রতিযোগিতায় হাস্সানও অংশগ্রহণ করতেন। একবার তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা আয্-যুবইয়ানী (মৃতঃ ৬০৪ খ্রীঃ) ছিলেন এ মেলার কাব্য বিচারক। কবি হাস্সান ছিলেন একজন প্রতিযোগী। বিচারক আন-নাবিগা, আল-আ'শাকে হাস্সানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কবি বলে রায় দিলে হাস্সান তার প্রতিবাদ করেন এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে দাবী করেন।[৫০]

আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন ঃ আল-আ'শা আবু বাসীর প্রথমে কবিতা পাঠ করেন। তারপর পাঠ করেন হাস্সান ও অন্যান্য কবিরা। সর্বশেষে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি আল-খান্সা বিন্ত 'আমর তাঁর কবিতা পাঠ করেন। তাঁর পাঠ শেষ হলে বিচারক আন-নাবিগা বলেন ঃ আল্লাহর কসম! একটু আগে পঠিত আবু বাসীর আল-আ'শার কবিতাটি যদি আমি না শুনতাম তাহলে অবশ্যই বলতাম, তুমি জিন ও মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর এ রায় শোনার সাথে সাথে হাস্সান উঠে দাঁড়ান এবং বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি আপনার পিতা ও আপনার চেয়ে বড় কবি। আন-নাবিগা তখন নিজের দুইট চরণ আবৃত্তি করে বলেনঃ ভাতিজা! তুমি এ চরণ দুইটির চেয়ে সুন্দর কোন চরণ বলতে পারবে কি? তখন হাস্সান তাঁর কথার জন্য লজ্জিত হন।[৫১] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আন-নাবিগার কথার জবাবে হাস্সান তাঁর —

لنا الجفنات الغر يلمعن بالدجى الخ'

(লানা আল-জাফানাতুল গুররু ইয়াল মা'না বিদদুজা) পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করেন। আন-নাবিগা তখন পংক্তি দুইটির কঠোর সমালোচনা করে হাস্‌সানের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।[৫২]

হাস্‌সান (রা) জাহিলী জীবনেই কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন। গোটা আরবে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ দরবারসমূহে তিনি খ্যাতিমান কবিদের তালিকায় নিজের নামটি লেখাতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে তাঁর জীবনের ষাটটি বছর পেরিয়ে গেছে। এরপর তিনি ইসলামের দা'ওয়াত লাভ করলেন। রাসূল (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসলেন। হাস্‌সানের কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হলো। তিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভার যথাযথ হক আদায় করে 'শা'য়িরুর রাসূল' খিতাব অর্জন করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর মক্কার কুরাইশরা এ আশ্রয়স্থল থেকে তাঁকে উৎখাতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এক দিকে তারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়, অন্যদিকে তারা তাদের কবিদের লেলিয়ে দেয়। তারা আল্লাহর রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কবিতা রচনা করতো এবং আরববাসীদেরকে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো। এ ব্যাপারে মক্কার কুরাইশ কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস ইবন আবদিল মুত্তালিব, 'আবদুল্লাহ ইবন যাব'য়ারী, 'আমর ইবনুল 'আস ও দাররার ইবনুল খাত্তাব অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও নিন্দাসূচক কবিতা রাসূল (সা) সহ মুসলমানদেরকে অস্থির করে তোলে।

এ সময় মদীনায় মুহাজিরদের মধ্যে আলী (রা) ছিলেন একজন নামকরা কবি। মদীনার মুসলমানরা তাঁকে অনুরোধ করলো মক্কার কবিদের জবাবে একই কায়দায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্য। আলী (রা) বললেন, রাসূল (সা) আমাকে অনুমতি দিলে আমি তাদের জবাব দিতে পারি। একথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে তিনি বললেন, আলী একাজের উপযুক্ত নয়। যারা আমাকে তরবারি দিয়ে সাহায্য করেছে, আমি আলীকে তাদের সাহায্যকারী করবো। হাস্‌সান উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বললেন ঃ আমি সানন্দে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তাঁর জিহ্বাটি ছিল সাপের জিহ্বার মত, এক পাশে কালো দাগ। তিনি সেই জিহ্বা বের করে স্বীয় চিবুক স্পর্শ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, তুমি কুরাইশদের হিজা (নিন্দা) কিভাবে করবে? তাতে আমারও নিন্দা হয়ে যাবে না? আমিও তো তাদেরই একজন। হাস্‌সান বললেন ঃ আমি আমার নিন্দা ও ব্যঙ্গ থেকে আপনাকে এমনভাবে বের করে আনবো যেমন আটা চেলে চুল ও অন্যান্য ময়লা বের করে আনা হয়। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি নসবনামার (কুষ্ঠি বিদ্যা) ব্যাপারে আবু বকরের সাহায্য নেবে। তিনি কুরাইশদের নসব বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি আমার নসব তোমাকে বলে দেবেন।[৫৩]

জাবির (রা) বলেন। আহযাব যুদ্ধের সময় একদিন রাসূল (সা) বললেন ঃ কে মুসলমানদের মান-সম্মান রক্ষা করতে পারে? কা'ব ইবন মালিক বললেন ঃ আমি। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন ঃ আমি। হাস্‌সান বললেন ঃ আমি। রাসূল (সা)

হাস্‌সানকে বললেন ঃ হাঁ, তুমি। তুমি তাদের হিজা (নিন্দা) কর। তাদের বিরুদ্ধে রুহুল কুদুস জিবরীল তোমাকে সাহায্য করবেন।[৫৪]

হাস্‌সান (রা) আবু বকরের (রা) নিকট যেতেন এবং কুরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখা, ব্যক্তির নসব ও সম্পর্ক বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতেন। আবু বকর বলতেন, অমুক অমুক মহিলাকে মুক্ত রাখবেন। তাঁরা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) দাদী। অন্য সকল মহিলাদের সম্পর্কে বলবেন। হাস্‌সান সে সময় কুরাইশদের নিন্দায় একটি কাসীদা রচনা করেন। তাতে তিনি কুরাইশ সন্তান আবদুল্লাহ, যুবাইর, হামযা, সাফিয়্যা, আব্বাস ও দাররার ইবন আবদিল মুত্তালিবকে বাদ দিয়ে একই গোত্রের তৎকালীন মুশরিক নেতা ও কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস-এর মা সুমাইয়্যা ও তার পিতা আল-হারেসের তীব্র নিন্দা ও ব্যঙ্গ করেন।

উল্লেখ্য যে, এই আবু সুফইয়ান ইবনুল হারেস ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ও দুধ ভাই। ইসলামপূর্ব সময়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর খুবই ভাব ছিল। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর তার সাথে দুশমনি শুরু হয়। তিনি ছিলেন একজন কবি। রাসূল (সা) ও মুসলমানদের নিন্দায় কবিতা রচনা করতেন। মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুনাইন যুদ্ধে যোগদান করেন। এই আবু সুফইয়ানের নিন্দায় হাস্‌সান রচনা করেন এক অনবদ্য কাসীদা। তার কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ[৫৫]

১. তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো, আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আর এর প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

২. তুমি নিন্দা করেছো একজন পবিত্র, পুণ্যবান ও সত্যপন্থী ব্যক্তির। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং অঙ্গিকার পালন করা যাঁর স্বভাব।

৩. তুমি তাঁর নিন্দা কর? অথচ তুমি তো তাঁর সমকক্ষ নও। অতএব, তোমাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা তোমাদের উৎকৃষ্টদের জন্য উৎসর্গ হোক।

৪. অতএব, আমার পিতা, তাঁর পুত্র এবং আমার মান-ইজ্জত মুহাম্মাদের মান-সম্মান রক্ষায় নিবেদিত হোক।

হাস্‌সানের (রা) এ কবিতাটি শুনে আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস মন্তব্য করেন ঃ নিশ্চয় এর পিছনে আবু বকরের হাত আছে। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় ও কাফিরদের নিন্দায় ৭০টি বয়েত (শ্লোক) রচনায় জিবরীল (আ) তাঁকে সাহায্য করেন।[৫৬]

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাব্যের প্রতিরোধ ব্যূহ রচনায় হাস্‌সানের (রা) এমন প্রয়াসে রাসূলে কারীম (সা) দারুণ খুশী হতেন। একবার তিনি বলেন ঃ 'হাস্‌সান! আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে তুমি জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে রুহুল কুদুস জিবরীলের দ্বারা সাহায্য কর।'[৫৭]

আর একবার রাসূল (সা) হাস্‌সানকে (রা) বললেন ঃ 'তুমি কুরাইশদের নিন্দা ও বিদ্রূপ করতে থাক, জিবরীল তোমার সাথে আছেন।[৫৮]

একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে কুরাইশ কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রত্যুত্তর করতে বললাম। সে সুন্দর প্রত্যুত্তর করলো। আমি কা'ব ইবন মালিককেও বললাম তাদের জবাব দিতে। সে উত্তম জবাব দিল। এরপর আমি হাস্‌সান ইবন সাবিতকে বললাম। সে যে জবাব দিল তাতে সে নিজে যেমন পরিতৃপ্ত হলো, আমাকেও পরিতৃপ্ত করলো।[৫৯]

হাস্‌সানের (রা) কবিতা মক্কার পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো সে সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'হাস্‌সানের কবিতা তাদের মধ্যে তীরের আঘাতের চেয়েও তীব্র আঘাত করে।'[৬০]

'আয়িশা (রা) থেকে উরওয়া বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) তাঁর মসজিদে হাস্‌সানের জন্য একটি মিম্বর তৈরী করান। তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাফির কবিদের জবাব দিতেন।[৬১] তিনি এ মিম্বরে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা ও পরিচিতিমূলক কবিতা পাঠ করতেন এবং কুরাইশ কবিদের জবাব দিতেন, আর রাসূল (সা) তা শুনে দারুণ তুষ্ট হতেন।[৬২] এ কারণে 'আয়িশা (রা) একবার রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তেমনই ছিলেন যেমন হাস্‌সান বলেছে।[৬৩]

হিজরী নবম সনে (খ্রীঃ ৬৩০) আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু তামীমের ৭০ অথবা ৮০ জনের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এলো। এই দলে বনু তামীমের আয্‌-যিবিরকান ইবন বদরের মত বাঘা কবি ও 'উতারিদ ইবন হাজিবের মত তুখোড় বক্তাও ছিলেন। তখন গোটা আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার আগের বছর মক্কাও বিজিত হয়েছে। জনসংখ্যা, শক্তি ও মর্যাদার দিক দিয়ে গোটা বনু তামীমের তখন ভীষণ দাপট। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে আরবের প্রথা অনুযায়ী বললো ঃ 'মুহাম্মাদ ! আমরা এসেছি আপনার সাথে গর্ব ও গৌরব প্রকাশের প্রতিযোগিতা করতে। আপনি আমাদের কবি ও খতীব (বক্তা)দেরকে বলার অনুমতি দিন।' রাসূল (সা) বললেন ঃ আপনাদের খতীবদের অনুমতি দেওয়া হলো।' তখন বনু তামীমের পক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠ খতীব 'উতারিদ ইবন হাজিব উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তির বর্ণনা দিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষে জবাব দিলেন প্রখ্যাত খতীব সাবিত ইবন কায়স। তারপর বনু তামীমের কবি যিবিরকান ইবন বদর দাঁড়ালেন এবং তাদের গৌরব ও কীর্তি কথায় ভরা স্বরচিত কাসীদা পাঠ করলেন। তাঁর আবৃত্তি শেষ হলে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'হাস্‌সান, ওঠো! লোকটির জবাব দাও।' হাস্‌সান দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষ কবির একই ছন্দ ও অন্তমিলে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত এক দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। তাঁর এ কবিতা পক্ষ-বিপক্ষের সকলকে দারুণ মুগ্ধ করে। বনু তামীমের শ্রোতারা এক বাক্যে সেদিন বলে, মুহাম্মাদের খতীব আমাদের খতীব অপেক্ষা এবং তাঁর কবি আমাদের কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[৬৪]

হাস্‌সানের (রা) জাহিলী কবিতার বিষয়বস্তু ছিল গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত মাদাহ (প্রশংসা) ও হিজা (নিন্দা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ)। তাছাড়া শোকগাঁথা, মদ পানের আড্ডা ও মদের বর্ণনা,

বীরত্ব, গর্ব ও প্রেম সংগীত রচনা করেছেন। ইসলামী জীবনের কবিতায় তিনি অন্তর দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা করেছেন, আর নিন্দা করেছেন পৌত্তলিকদের যারা আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের সাথে দুশমনী করেছে।

ইসলাম তাঁর কবিতায় সততা ও মাধুর্য দান করেছে। কবিতায় তিনি ইসলামের বহু বিষয়ের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। কবিতায় পবিত্র কুরআনের প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। এ কারণে যারা আরবী কবিতায় গতানুগতিকতার বন্ধন ছিন্ন করে অভিনবত্ব আনয়নের চেষ্টা করেছেন, হাস্সানকে তাদের পুরোধা বলা সঙ্গত। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসা গীতি বা না'তে রাসূল রচনার সূচনাকারী তিনিই। আরবী কবিতায় জাহিলী ও ইসলামী আমলে মাদাহ (প্রশংসা গীতি) রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, হাস্সান তাদের অন্যতম।[৬৫]

ইবনুল আসীর বলেন ঃ পৌত্তলিক কবিদের নিন্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অপপ্রচারের জবাব দানের জন্য তৎকালীন আরবের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা হলেন হাস্সান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। হাস্সান ও কা'ব প্রতিপক্ষ কবিদের জবাব দিতেন তাদেরই মত বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহের জয়-পরাজয়, কীর্তি ও গৌরব তুলে ধরে। আর আবদুল্লাহ তাদের কুফরী ও দের দেবীর পূজার কথা উল্লেখ করে ধিক্কার দিতেন। তাঁর কবিতা প্রতিপক্ষের ওপর তেমন বেশী প্রভাব ফেলতো না। তবে অন্য দুইজনের কবিতা তাদেরকে দারুণভাবে আহত করতো[৬৬]

হাস্সান (রা) আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি কুরাইশদের অবাধ্যতা ও তাদের মূর্তিপূজার উল্লেখ করে নিন্দা করতেন না। কারণ, তাতে তেমন ফল না হওয়ারই কথা। তারা তো রাসূলকে (সা) বিশ্বাসই করেনি। আর মূর্তি পূজাকেই তারা সত্য বলে বিশ্বাস করতো। তাই তিনি তাদের বংশগত দোষ-ত্রুটি, নৈতিকতার স্খলন, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে তাদেরকে চরমভাবে আহত করতেন। আর একাজে আবু বকর (রা) তাঁকে জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন।

প্রাচীন আরবী কবিতার যতগুলি বিষয় বৈচিত্র আছে তার সবগুলিতে হাস্সানের (রা) পদচারণা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তাঁর কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো ঃ

১. উপমার অভিনবত্ব ঃ একথা সত্য যে প্রাচীন আরবী কবিতা কোন উন্নত সভ্যতার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বড় সভ্যতা দ্বারা তা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছে। আরব সভ্যতার সত্যিকার সূচনা হয়েছে পবিত্র কুরআনের অবতরণ ও রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের সময় থেকে। কুরআন আরবী বাচনভঙ্গি ও বাক্যালঙ্কারের সবচেয়ে বড় বাস্তব মুজিযা। এই কুরআন অনেক বড় বড় বাগ্মীকে হতবাক করে দিয়েছে। এ কারণে সে সময়ের যে কবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁর

মধ্যে বাক্‌পটুতা ও বাক্যালঙ্কারের এক নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণীর কবিদের মধ্যে হাস্‌সান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শক্তি তাঁর মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— সিজদার চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বিদ্যমান। হাস্‌সান উক্ত আয়াতকে উসমানের (রা) প্রশংসায় রূপক হিসেবে ব্যবহার করে হত্যাকারীদের ধিক্‌কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ[৬৭]

'তারা এই কাঁচা-পাকা কেশধারী, ললাটে সিজদার চিহ্ন বিশিষ্ট লোকটিকে জবাই করে দিল, যিনি তাসবীহ পাঠ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করতেন।'

এই শ্লোকে কবি 'উসমানের চেহারাকে সিজদার চিহ্নধারী বলেছেন। তৎকালীন আরবী কবিতায় এ জাতীয় রূপকের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নতুন।

২. চমৎকার প্রতীকের ব্যবহার ঃ আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে 'তাতবী' বা 'তাজাওয়ায' নামে এক প্রকার প্রতীকের নাম দেখা যায়। তার অর্থ হলো, কবি কোন বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু অকস্মাৎ অতি সচেতনভাবে তা ছেড়ে দিয়ে এমন এক বিষয়ের বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পূর্বের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। হাস্‌সানের কবিতায় এ জাতীয় প্রতীক বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আরবে অসংখ্য গোত্র দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে বসবাস করতো। তারা ছিল যাযাবর। যেখানে পানি ও পশুর চারণভূমি পাওয়া যেত সেখানেই তাঁবু গেড়ে অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তুলতো। পানি ও পশুর খাদ্য শেষ হলে নতুন কোন স্থানের দিকে যাত্রা করতো। এভাবে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। আরব কবিরা তাদের কাব্যে এ জীবনকে নানাভাবে ধরে রেখেছেন। তবে হাস্‌সান বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে বেশ অভিনবত্ব আছে । তিনি বলছেন ঃ 'জাফ্‌নার সন্তানরা তাদের পিতা ইবন মারিয়্যার কবরের পাশেই থাকে, যিনি খুবই উদার ও দানশীল।'

প্রশংসিত ব্যক্তি যেহেতু আরব বংশোদ্ভূত। এ কারণে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে বলে দিলেন, এঁরা আরব হলেও যাযাবর নন, বরং রাজন্যবর্গ। কোন রকম ভীতি ও শঙ্কা ছাড়াই তাঁরা তাঁদের পিতার কবরের আশে-পাশেই বসবাস করেন। তাঁদের বাসস্থান সবুজ-শ্যামল। একারণে তাঁদের স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন পড়েনা।

৩. রূপকের অভিনবত্ব : আরব কবিরা কিছু কথা রূপক অর্থে এবং পরোক্ষে বর্ণনা করতেন। যেমন ঃ যদি উদ্দেশ্য হয় একথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অতি মর্যাদাবান ও দানশীল, তাহলে তাঁরা বলতেন, এই গুণগুলি তার পরিচ্ছেদের মধ্যেই আছে। হাসসানের (রা) কবিতায় রূপকের অভিনবত্ব দেখা যায়। যেমন একটি শ্লোকে তিনি বলতে চান, আমরা খুবই কুলিন ও সম্ভ্রান্ত। কিন্তু কথাটি তিনি বলেছেন এভাবে : 'সম্মান

ও মর্যাদা আমাদের আঙ্গিনায় ঘর বেঁধেছে এবং তার খুঁটি এত মজবুত করে গেঁড়েছে যে, মানুষ তা নাড়াতে চাইলেও নাড়াতে পারে না।' এই শ্লোকে সম্মান ও মর্যাদার ঘর বাঁধা, সুদৃঢ় পিলার স্থাপন করা এবং তা টলাতে মানুষের অক্ষম হওয়া এ সবই আরবী কাব্যে নতুন বর্ণনারীতি।

৪. ছন্দ, অন্তমিল ও স্বর সাদৃশ্যের আশ্চর্য রকমের এক সৌন্দর্য তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শব্দের গাঁথুনি ও বাক্যের গঠন খুবই শক্ত, গতিশীল ও সাবলীল। প্রথম শ্লোকের প্রথম অংশের শেষ পদের শেষ বর্ণটি তাঁর বহু কাসীদার প্রতিটি শ্লোকের শেষ পদের শেষ বর্ণ দেখা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্রে যাকে 'কাফিয়া' বলা হয়। আরবী বাক্যের এ ধরনের শিল্পকারিতা এর আগে কেবল ইমরুল কায়সের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর পরে বহু আরব কবি নানা রকম শিল্পকারিতার সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আব্বাসী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আবুল 'আলা আল-মা'য়াররীর একটি বিখ্যাত কাব্যের নাম 'নুযুমু মালা ইয়ালযাযু'। কবিতা রচনায় এমন কিছু বিষয় তিনি অপরিহার্যরূপে অনুসরণ করেছেন, যা আদৌ কবিতার জন্য প্রয়োজন নয়। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি এ ধরনের কবিতার সমষ্টি। এটা তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

৫. হাস্‌সানের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রায়ই এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি হয়তো একটি ভাব স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং সেজন্য এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন যাতে উদ্দিষ্ট বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় সুন্দরভাবে এসে গেছে।[৬৮]

৬. অতিরঞ্জন ও অতিকথন ঃ হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা যাবতীয় অতিরঞ্জন ও অতিকথন থেকে মুক্ত বলা চলে। একথা সত্য যে কল্পনা ও অতিরঞ্জন ছাড়া কবিতা হয় না। তিনি নিজেই বলতেন, মিথ্যা বলতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ কারণে অতিরঞ্জন ও অতিকথন, যা মূলতঃ মিথ্যারই নামান্তর— আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।[৬৯]

শুধু তাই নয়, তাঁর জাহিলী আমলে লেখা কবিতায়ও এ উপাদান খুব কম ছিল। আর এ কারণে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা কবি হাস্‌সানের একটি শ্লোকের অবমূল্যায়ন করলে দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হয়।[৭০]

হাস্‌সানের ইসলামী কবিতার মূল বিষয় ছিল কাফিরদের প্রতিরোধ ও নিন্দা করা। কাফিরদের হিজা ও নিন্দা করে তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। তবে তাঁর সেই কবিতাকে অশ্লীলতা স্পর্শ করতে পারেনি। তৎকালীন আরব কবিরা 'হিজা' বলতে নিজ গোত্রের প্রশংসা এবং বিরোধী গোত্রের নিন্দা বুঝাতো। এই নিন্দা হতো খুবই তীর্যক ও আক্রমণাত্মক। এ কারণে কবিরা তাদের কবিতায় সঠিক ঘটনাবলী প্রাসঙ্গিক ও মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরতো। জাহিলী কবি যুহাইর ইবন আবী-সুলমার 'হিজা' বা নিন্দার একটি স্টাইল আমরা তার দুইটি শ্লোকে লক্ষ্য করি। তিনি 'হিস্‌ন' গোত্রের নিন্দায় বলেছেন ঃ[৭১]

'আমি জানিনে। তবে মনে হয় খুব শিগ্‌গীর জেনে যাব। 'হিস্‌ন' গোত্রের লোকেরা পুরুষ না নারী?

যদি পর্দানশীল নারী হয় তাহলে তাদের প্রত্যেক কুমারীর প্রাপ্য হচ্ছে উপহার।'

যুহাইরের এ শ্লোকটি ছিল আরবী কবিতার সবচেয়ে কঠোর নিন্দাসূচক। এ কারণে শ্লোকটি উক্ত গোত্রের লোকদের দারুণ পীড়া দিয়েছিল। হাস্‌সানের নিন্দাবাদের মধ্যে শুধু গালিই থাকতো না, তাতে থাকতো প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর। তাঁর স্টাইলটি ছিল অতি চমৎকার। কুরাইশদের নিন্দায় রচিত তাঁর একটি কবিতার শেষের শ্লোকটি সেকালে এতখানি জনপ্রিয়তা পায় যে তা প্রবাদে পরিণত হয়। শ্লোকটি নিম্নরূপ ঃ

'আমি জানি যে তোমার আত্মীয়তা কুরাইশদের সংগে আছে। তবে তা এ রকম যেমন উট শাবকের সাথে উট পাখীর ছানার সাদৃশ্য হয়ে থাকে।'[৭২]

পরবর্তীকালে কবি ইবনুল মুফারিরগ উল্লেখিত শ্লোকটির ১ম পংক্তিটি আমীর মুয়াবিয়ার (রা) নিন্দায় প্রয়োগ করেছেন।[৭৩] আল-হারেস ইবন 'আউফ আল-মুররীর গোত্রের বসতি এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত একজন মুবাল্লিগ নিহত হলে কবি হাস্‌সান তার নিন্দায় একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন ঃ

'যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাক তাহলে তা এমন কিছু নয়। কারণ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তোমাদের স্বভাব। আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মূল থেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অঙ্কুরিত হয়।'

হাস্‌সানের এই বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনে আল-হারেসের দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন নেমে আসে। সে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে ছুটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং হাস্‌সানকে বিরত রাখার আবেদন জানায়।[৭৪]

হাস্‌সান (রা) চমৎকার মাদাহ বা প্রশংসা গীতি রচনা করেছেন। আলে 'ইনানের প্রশংসায় তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার দুইটি শ্লোক এ রকম ঃ

'যারা তাদের নিকট যায় তাদেরকে তারা 'বারদী' নদীর পানি স্বচ্ছ শরাবের সাথে মিশিয়ে পান করায়।'

এই শ্লোকটিরই কাছাকাছি একটি শ্লোক রচনা করেছেন কবি ইবন কায়স মুস'য়াব ইবন যুবাইরের প্রশসংসায়। কিন্তু যে বিষয়টি হাস্‌সানের শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে তা ইবন কায়সের শ্লোকে অনুপস্থিত।[৭৫]

অন্য একটি শ্লোকে তিনি গাসসানীয় রাজন্যবর্গের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন চমৎকার স্টাইলে। 'তাঁদের গৃহে সব সময় অতিথিদের এত ভিড় থাকে যে তাঁদের কুকুরগুলিও তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর তারা নতুন আগন্তুককে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।'

আরবী কাব্য জগতের বিখ্যাত তিন কবির তিনটি শ্লোক প্রশংসা বা মাদাহ কবিতা হিসেবে সর্বোত্তম। এ ব্যাপারে প্রায় সকলে একমত। তবে এ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটি সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কবি হুতাইয়্যা হাস্‌সানের এ শ্লোকটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। কিন্তু অন্যরা আবুত ত্বিহান ও নাবিগার শ্লোক দুইটিকে সর্বোত্তম

বলেছেন।[৭৬] উমাইয়্যা খলীফা আবদুল মালিক ছিলেন একজন বড় জ্ঞানী ও সাহিত্য রসিক মানুষ। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো, 'আরবরা যত প্রশংসাগীতি রচনা করেছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাস্‌সানের শ্লোকটি।'[৭৭] তিনি রাসূলে কারীমের প্রশংসায় যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার স্টাইল ও শিল্পকারিতায় যথেষ্ট নতুনত্ব আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রশংসায় রচিত একটি শ্লোকে তিনি বলেছেন ঃ 'অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র ললাট অন্ধকারে জ্বলন্ত প্রদীপের আলোর মত উজ্জ্বল দেখায়।'

হাস্‌সান (রা) জাহিলী ও ইসলামী জীবনে অনেক মারসিয়া বা শোকগাঁথা রচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল ছিল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় শোক ও ব্যথা। হাস্‌সান রচিত কয়েকটি মারসিয়ায় সে শোক অতি চমৎকাররূপে বিধৃত হয়েছে। ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে মারসিয়াগুলি সংকলন করেছেন।

হাস্‌সান ছিলেন একজন দীর্ঘজীবনের অধিকারী অভিজ্ঞ কবি। তাছাড়া একজন মহান সাহাবীও বটে। এ কারণে তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় প্রচুর উপদেশ ও নীতিকথা। কবিতায় তিনি মানুষকে উন্নত নৈতিকতা অর্জন করতে বলেছেন। সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে দুইটি শ্লোক ঃ

'অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে আমি আমার মান-সম্মান রক্ষা করি। যে অর্থ-সম্পদে সম্মান রক্ষা পায়না আল্লাহ তাতে সমৃদ্ধি দান না করুন!

সম্পদ চলে গেলে তা অর্জন করা যায়; কিন্তু সম্মান বার বার অর্জন করা যায় না।'[৭৯]

মানুষের সব সময় একই রকম থাকা উচিত। প্রাচুর্যের অধিকারী হলে ধরাকে সরা জ্ঞান করা এবং প্রাচুর্য চলে গেলে ভেঙ্গে পড়া যে উচিত নয়, সে কথা বলেছেন একটি শ্লোকে ঃ

'অর্থ-সম্পদ আমার লজ্জা-শরম ও আত্ম-সম্মানবোধকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি। তেমনিভাবে বিপদ-মুসবিত আমার আরাম-আয়েশ বিঘ্নিত করতে পারেনি।'[৮০]

অত্যাচারের পরিণতি যে শুভ হয় না সে সম্পর্কে তাঁর একটি শ্লোক ঃ

'আমি কোন বিষয় সম্পর্কে অহেতুক প্রশ্ন ও অনুসন্ধান পরিহার করি। অধিকাংশ সময় গর্ত খননকারী সেই গর্তের মধ্যে পড়ে।'[৮১]

তিনি একটি শ্লোকে মন্দ কথা শুনে উপেক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন ঃ

'মন্দ কথা শুনে উপেক্ষা কর এবং তার সাথে এমন আচরণ কর যেন তুমি শুনতেই পাওনি।'[৮২]

লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপন সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

'তারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে তাদের চারণভূমি অন্যদের জন্য বৈধ করে দিয়েছি। তাই শত্রুরা সেখানে অপকর্ম সম্পন্ন করেছে।

তোমরা কি মৃত্যু থেকে পালাচ্ছো? দুর্বলতার মৃত্যু তেমন সুন্দর নয়।'[৮৩]

'আবদুল কাহির আল-জুরজানী বলেছেন, হাস্‌সানের রচিত কবিতার সকল পদের মধ্যে

একটা সুদৃঢ় ঐক্য ও বন্ধন দেখা যায়। এমন কি সম্পূর্ণ বাক্যকে একটি শক্তিশালী রশি বলে মনে হয়।[৮৪]

একালের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক বুটরুস আল-বুসতানী বলেন ঃ 'হাস্‌সানের কবিতার বিশেষত্ব কেবল তাঁর মাদাহ ও হিজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তার রয়েছে এক বড় ধরনের বিশেষত্ব। আর তা হচ্ছে তাঁর সময়ের ঘটনাবলীর একজন বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব। কারণ, তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিভিন্ন ঘটনাবলী। এ সকল যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যাঁরা শহীদ হয়েছেন এবং বিরোধী পক্ষে যারা নিহত হয়েছে তাদের অনেকের নাম তিনি কবিতায় ধরে রেখেছেন। আমরা যখন তাঁর কবিতা পাঠ করি তখন মনে হয়, ইসলামের প্রথম পর্বের ইতিহাস পাঠ করছি।"[৮৫]

প্রাচীন আরবের অধিবাসীরা দেহাতী ও শহুরে—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। মক্কা, মদীনা ও তায়েফের অধিবাসীরা ছিল শহরবাসী। অবশিষ্ট সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল দেহাতী বা গ্রাম্য। বেশীর ভাগ খ্যাতিমান কবি ছিলেন গ্রাম অঞ্চলের। এর মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু কবি শহরেও জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে হাস্‌সানের স্থান সর্বোচ্চে।[৮৬]

ইবন সাল্লাম আল-জামহী বলেন ঃ 'মদীনা, মক্কা, তায়িফ, ইয়ামামাহ, বাহরাইন-এর প্রত্যেক গ্রামে অনেক কবি ছিলেন। তবে মদীনার গ্রাম ছিল কবিতার জন্য শীর্ষে। এখানকার শ্রেষ্ঠ কবি পাঁচজন। তিনজন খাযরাজ ও দুইজন আউস গোত্রের। খাযরাজের তিনজন হলেন ঃ হাস্‌সান ইবন সাবিত, কা'ব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। আউসের দুইজন হলেন ঃ কায়স ইবনুল খুতাইম ও আবু কায়স ইবন আসলাত। এঁদের মধ্যে হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ।[৮৭] আবু 'উবায়দাহ বলেন ঃ 'শহুরে কবিদের মধ্যে হাস্‌সান সর্বশ্রেষ্ঠ।'[৮৮] একথা আবু 'আমর ইবনুল 'আলাও বলেছেন। কবি আল-হুতাইয়্যা বলেন ঃ 'তোমরা আনসারদের জানিয়ে দাও, তাদের কবিই আরবের শ্রেষ্ঠ কবি।'[৮৯] আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী বলেন ঃ হাস্‌সান শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইমরাউল কায়স হচ্ছে দোযখী কবিদের পতাকাবাহী এবং হাস্‌সান ইবন সাবিত তাদের সকলকে জান্নাতের দিকে চালিত করবে।[৯০]

ইমাম আল-আসমা'ঈ বলেন ঃ 'অকল্যাণ ও অপকর্মে কবিতা শক্তিশালী ও সাবলীল হয়। আর কল্যাণ ও সৎকর্মে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই যে হাস্‌সান, তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতার মান নেমে যায়। তাঁর জাহিলী কবিতাই শ্রেষ্ঠ কবিতা।'[৯১]

হাস্‌সানের (রা) বার্দ্ধক্যে একবার তাঁকে বলা হলো, আপনার কবিতা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে এবং তার পর বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে। বললেন ঃ ভাতিজা! ইসলাম হচ্ছে মিথ্যার প্রতিবন্ধক। ইবনুল আসীর বলেন, হাস্‌সানের একথার অর্থ হলো কবিতার বিষয়বস্তুতে যদি অতিরঞ্জন থাকে তাহলে কবিতা চমৎকার হয়। আর যে কোন

অতিরঞ্জনই ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যাচার, যা পরিহারযোগ্য। সুতরাং কবিতা ভালো হবে কেমন করে?[৯২]

বুট্রুস আল-বুসতানী হাস্সানের (রা) কবিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন ঃ 'আমরা দেখতে পাই হাস্সান তাঁর জাহিলী কবিতায় ভালো করেছেন। তবে সে কালের শ্রেষ্ঠ কবিদের পর্যায়ে পৌছাতে পারেননি। আর তাঁর ইসলামী কবিতার কিছু অংশে ভালো করেছেন। বিশেষতঃ হিজা ও ফখর (নিন্দা ও গর্ব) বিষয়ক কবিতায়। তবে অধিকাংশ বিষয়ে দুর্বলতা দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ রাসূলের (সা) প্রশংসায় রচিত কবিতায় ও তাঁর প্রতি নিবেদিত শোকগাঁথায়। তবে ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে এ সকল কবিতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ইসলামী কবিতায় এমন সব নতুন স্টাইল দেখা যায় যা জাহিলী কবিতায় ছিল না। ইসলামী আমলে হাস্সান একজন কবি ও ঐতিহাসিক এবং একই সাথে একজন সংস্কারবাদী কবিও বটে। রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক কবিদের পুরোধা।'[৯৩]

একবার কবি কা'ব ইবন যুহাইর একটি শ্লোকে গর্ব করে বলেন ঃ কা'বের মৃত্যুর পর কবিতার ছন্দ ও অন্তমিলের কি দশা হবে? শ্লোকটি শোনার সাথে সাথে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি সাম্মাখের ভাই তোমরূয বলে উঠলেন ঃ আপনি অবশ্যই সাবিতের ছেলে তীক্ষ্ণধী হাস্সানের মত কবি নন।[৯৪] যাই হোক, তিনি যে একজন বড় মাপের কবি ছিলেন তা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য।

হাস্সানের (রা) সকল কবিতা বহুদিন যাবত মানুষের মুখে মুখে ও অন্তরে সংরক্ষিত ছিল। পরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ান আছে যা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। তবে এতে সংকলিত বহু কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ইমাম আল-আসমা'ঈ একবার বললেন ঃ হাস্সান একজন খুব বড় কবি। একথা শুনে আবু হাতেম বললেন ঃ কিন্তু তাঁর অনেক কবিতা খুব দুর্বল। আল-আসমা'ঈ বললেন ঃ তাঁর প্রতি আরোপিত অনেক কবিতাই তাঁর নয়।[৯৫] ইবন সাল্লাম আল-জামহী বলেন ঃ হাস্সানের মানসম্পন্ন কবিতা অনেক। যেহেতু তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, এ কারণে পরবর্তীকালে বহু নিম্নমানের কবিতা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। মূলতঃ তিনি সেসব কবিতার রচয়িতা নন।[৯৬]

হাস্সানের (রা) নামে যাঁরা বানোয়াট কবিতা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন প্রখ্যাত সীরাত বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক। তিনি তাঁর মাগাযীতে হাস্সানের (রা) প্রতি আরোপিত বহু বানোয়াট কবিতা সংকলন করেছেন। পরবর্তীকালে ইবন হিশাম যখন ইবন ইসহাকের মাগাযীর আলোকে তাঁর 'আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ' সংকলন করেন তখন বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। তখন তিনি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রাচীন আরবী কবিতার তৎকালীন পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের, বিশেষতঃ বসরার বিখ্যাত রাবী ও ভাষাবিদ আবু যায়িদ আল-আনসারীর শরণাপন্ন হন। তিনি ইবন ইসহাক বর্ণিত হাস্সানের কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, আর তার কিছু সঠিক বলে

মত দিতেন, আর কিছু তাঁর নয় বলে মত দিতেন। এই পন্ডিতরা যে সকল কবিতা হাস্‌সানের নয় বলে মত দিয়েছেন তাঁরও কিছু কবিতা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। আর তা দিওয়ানেও সংকলিত হয়েছে।[৯৭]

প্রকৃতপক্ষে হাস্‌সানের (রা) ইসলামী কবিতায় যথেষ্ট প্রক্ষেপণ হয়েছে। এ কারণে দেখা যায় তাঁর প্রতি আরোপিত কিছু কবিতা খুবই দুর্বল। মূলতঃ এ সব কবিতা তাঁর নয়। আর এই দুর্বলতা দেখেই আল-আসমা'ঈর মত পণ্ডিতও মন্তব্য করেছেন যে, হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা দারুণ দুর্বল।

হাস্‌সানের (রা) কবিতার একটি দিওয়ান ভারত ও তিউনিসিয়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে সেটি ১৯১০ সনে প্রফেসর গীব মেমোরিয়াল সিরিজ হিসেবে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশ পায়। লন্ডন, বার্লিন, প্যারিস ও সেন্টপিটার্সবুর্গে দিওয়ানটির প্রাচীন হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।[৯৮]

শেষ জীবনে একবার হাস্‌সান (রা) গভীর রাতে একটি অনুপম কবিতা রচনা করেন। সাথে সাথে তিনি ফারে' দুর্গের ওপর উঠে চিৎকার দিয়ে নিজ গোত্র বনু ক্বায়লার লোকদের তাঁর কাছে সমবেত হওয়ার আহবান জানান। লোকেরা সমবেত হলে তিনি তাদের সামনে কবিতাটি পাঠ করে বলেন ঃ আমি এই যে কাসীদাটি রচনা করেছি, এমন কবিতা আরবের কোন কবি কখনও রচনা করেননি। লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ আপনি কি একথা বলার জন্যই আমাদেরকে ডেকেছেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভয় হলো, আমি হয়তো এ রাতেই মারা যেতে পারি। আর সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার এ কবিতাটি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৯৯]

আল-আসমা'ঈ বর্ণনা করেছেন ঃ সেকালে ছোট মঞ্চের ওপর গানের আসর বসতো। সেখানে বর্তমান সময়ের মত অশ্লীল কোন কিছু হতো না। বনী নাবীতে এরকম একটি বিনোদনের আসর বসতো। বার্দ্ধক্যে হাস্‌সান (রা) যখন অন্ধ হয়ে যান তখন তিনি এবং তাঁর ছেলে এ আসরে উপস্থিত হতেন। একদিন দুইজন গায়িকা তাঁর জাহিলী আমলে রচিত একটি গানে কণ্ঠ দিয়ে গাইতে থাকলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তখন তাঁর ছেলে গায়িকাদ্বয়কে বলতে থাকেন ঃ আরো গাও, আরো গাও।[১০০] তাঁর মানসপটে তখন অতীত জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠেছিল।

হাস্‌সানের (রা) মধ্যে স্বভাবগত ভীরুতা থাকলেও নৈতিক সাহস ছিল অপরিসীম। একবার খলীফা 'উমার (রা) মসজিদে নব্বীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখলেন, হাস্‌সান মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করছেন। 'উমার বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মসজিদে কবিতা পাঠ? হাস্‌সান গর্জে উঠলেন ঃ 'উমার! আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তির উপস্থিতিতে এখানে কবিতা আবৃত্তি করেছি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'উমার (রা) বললেন ঃ সত্য বলেছো।[১০১]

হাস্‌সান (রা) ইসলাম-পূর্ব জীবনে মদ পান করতেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মদ চিরদিনের জন্য পরিহার করেন। একবার তিনি তাঁর গোত্রের কতিপয় তরুণকে মদপান করতে দেখে ভীষণ ক্ষেপে যান। তখন তরুণরা তাঁর একটি চরণ আবৃত্তি করে বলে, আমরা তো আপনাকেই অনুসরণ করছি। তিনি বললেন, এটা আমার ইসলাম-পূর্ব জীবনের কবিতা। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণের পর আমি মদ স্পর্শ করিনি।[১০২]

হাস্‌সানের মধ্যে আমরা খোদাভীতির চরম রূপ প্রত্যক্ষ করি। কুরাইশ কবিদের সংগে যখন তাঁর প্রচন্ড বাক্‌যুদ্ধ চলছে, তখন কবিদের নিন্দায় নাযিল হলো সূরা আশ-শু'য়ারার ২২৪ নং আয়াত। রাসূলুল্লাহর (সা) তিন কবি হাস্‌সান, কা'ব ও আবদুল্লাহ কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াতের আওতায় তো আমরাও পড়েছি। আমরাও তো কাব্য চর্চা করি। আমাদের কি দশা হবে?' তখন রাসূল (সা) তাঁদেরকে আয়াতটির শেষাংশ অর্থাৎ ব্যতিক্রমী অংশটুকু পাঠ করে বলেন, এ হচ্ছো তোমরা।[১০৩]

হাস্‌সানের (রা) সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারের কবি ছিলেন। তিনি মসজিদে নববীতে রাসূলকে (সা) স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। এ ছিল এক বড় গৌরবের বিষয়। তাঁকে যথার্থই 'শা'য়িরুল ইসলাম' ও 'শা'য়িরুর রাসূল' উপাধি দান করা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর পাশে থেকে কুরাইশ, ইহুদী ও আরব পৌত্তলিকদের প্রতি বিষাক্ত তীরের ফলার ন্যায় কথামালা ছুড়ে মেরে আল্লাহর রাসূলের (সা) মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করেছেন।

রাসূলে কারীম (সা) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁর সহধর্মীগণকে হাস্‌সান (রা) তাঁর সুরক্ষিত 'ফারে' দুর্গের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে রাসূল (সা) তাঁকে গণীমতের অংশ দিতেন। এমন কি উম্মুল মুমিনীন মারিয়্যা আল-কিবতিয়্যার বোন সীরীনকেও (রা) তুলে দেন হাস্‌সানের হাতে। খুলাফায়ে রাশেদীনের দরবারেও ছিল তাঁর বিশেষ মর্যাদা। খলীফাগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলতেন এবং তাঁর জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। এভাবে একটি একটি করে হাস্‌সানের (রা) সম্মান ও মর্যাদার বিষয়গুলি গণনা করলে দীর্ঘ তালিকা তৈরী হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইসাবা-১/৩২৬, তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৬
২. উসুদুল গাবা-২/৪
৩. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২
৪. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী-২/৭৭
৫. আল-ইসাবা-১/৩২৭; তাবাকাত-৮/২৭১
৬. সহীহ আল-বুখারী-২/৫৫৫
৭. আল-ইসাবা-১/৩২৬

৮. তাহজীবুল কামাল-৬/১৭; তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৬/২৮৮
৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২
১০. তাবাকাতুশ শু'য়ারা-৮৪
১১. খুলাসাতুল ওয়াফা-২৯১
১২. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯; তাবাকাতুশ শু'য়ারা-৮৫
১৩. 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৩২৫
১৪. প্রাগুক্ত-১/৩২৭
১৫. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. তারীখু আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যাহ-১/১০৩
১৮. কিতাবুল আগানী (দারুল কুতুব)-৩/১২
১৯. তাহজীবুল কামাল-৬/১৮; উসুদুল গাবা-২/৭; জাহাবী; তারীখুল ইসলাম-২/২৭৭
২০. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯; তাহজীবুল কামাল-৬/১৮
২১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৩; উসুদুল গাবা-২/৭
২২. তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৭; কিতাবুল আগানী-৪/১৩৫; তাহজীবুল কামাল-৬/১৯
২৩. তাহজীবু ইবন আসাকির-৪/১৪৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২১
২৪. তাহজীবুত তাহজীব-১/২৪৮; তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৪/১৩১; আল-আগানী-৪/১৪৫, ১৪৬
২৫. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবাল-২/৫১৮
২৬. উসুদুল গাবা-২/৬; কানযুল 'উম্মাল-৭/৯৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২২৮; আল-আগানী-৪/১৬৪
২৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২; তাহজীবুল কামাল-৬/২৪
২৮. সাহীহ আল-বুখারী-২/১১৩
২৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯০
৩০. উসুদুল গাবা-২/৬
৩১. দেখুন ঃ ড. শাওকী-দায়ফঃ তারীখুল আদাব-২/৭৮
৩২. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৮
৩৩. তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৪/১২৯
৩৪. সাহীহ বুখারী-৭/৩৩৮; ৮/৩৭৪; মুসলিম (২৪৮৮); সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৮
৩৫. বুখারী-৭/৩৩৮; মুসলিম (২৪৮৭; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪
৩৬. মুসলিম- (২৪৯০); তাহজীবুল কামাল-৬/২০; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫
৩৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫২২; আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯
৩৮. তাহজীবুল কামাল-৬/২৪
৩৯. উসুদুল গাবা-২/৬; আল-বিদায়া-৪/২৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/১৪০
৪০. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা'-১৩৯
৪১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১২; তাহজীবুল কামাল-৬/১৭; তারীখুল ইসলাম-২/২৭৭
৪২. তাহজীবুত তাহজীব-২/২১৬; তাহজীবুল কামাল-৬/১৭
৪৩. ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-'আরাবী-১/৩২৫
৪৪. কিতাবুল 'উমদাহ-২/২৩৫
৪৫. আশ-শি'র ওয়াশ-শু'য়ারা'-১৪০
৪৬. কিতাবুল 'উমদাহ-১/৬১; জুরজী যায়দান; তারীখুল আদাব-১/১৫০
৪৭. কিতাবুল 'উমদাহ্-১/২১
৪৮. দিওয়ানে হাস্সান-২৮
৪৯. জুরজী যায়দান ঃ তারীখুল আদাব-১/১৪৮; আল-ইসাবা-১/৩২৬

৫০. কিতাবুল আগানী-৯/৩৪০; জুরজী যায়দান-১/১০৩
৫১. আল-আগানী-১১/৬
৫২. প্রাগুক্ত-৯/৩৪০; নাকদুশ শি'র-৬২
৫৩. বুখারী-২/৯০৯; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪, ৫১৫; তাহজীবু ইবন 'আসাকির-৪/১৩০
৫৪. আল-আগানী-১৬/২৩২; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৪
৫৫. আল-আগানী-৪/১৬৩; উসুদুল গাবা-২/৫; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫, ৫১৬
৫৬. তাহজীবুল কামাল-৬/২১৪
৫৭. সাহীহ বুখারী-৬/১২২; মুসলিম- (২৪৮৫); আহমাদ-৫/২২২, ২২৩
৫৮. বুখারী-৬/২২২, ৭/৩২১; মুসলিম- (২৪৮৬); মুসনাদ-৪/২৯৯; আল-আগানী-৪/১৩৭
৫৯. ডঃ শাওকী দায়ফ ঃ তারীখুল আদাব-২/৭৮
৬০. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০
৬১. আবু দাউদ- (৫০১৫); তিরমিজী- (২৮৪৬); তাহজীবুল কামাল-৬/২০
৬২. উসুদুল গাবা-২/৪; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৫
৬৩. উসুদুল গাবা-২/৪
৬৪. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩১; জুরজী যায়দান; তারীখ-১/১৪৯; ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-১/২২৯
৬৫. ড. 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখ-১/৩২৬
৬৬. উসুদুল গাবা-২/৫
৬৭. কিতাবুল 'উমদাহ-১/১৮৬
৬৮. কুদামা ইবন জা'ফার ঃ নাকদুশ শি'র-৫০
৬৯. উসুদুল গাবা-২/৫
৭০. নাকদুশ শি'র-৬২
৭১. কিতাবুল 'উমদাহ-২/১৩৯
৭২. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-২/৮২
৭৩. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-
৭৪. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-২/৭৮-৭৯
৭৫. কিতাবুল 'উমদাহ-২/১০২
৭৬. প্রাগুক্ত-২/১১০
৭৭. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩০
৭৮. তাবাকাত-২/৯০, ৯১, ৯২; ড.'উমার ফাররূখ-১/৩৩০
৭৯. আবু তাম্মাম ঃ হামাসা-২/৫৮-৫৯
৮০. হামাসাতুল বুহতুরী-১১৯
৮১. প্রাগুক্ত-১১৩
৮২. প্রাগুক্ত-১৭২
৮৩. প্রাগুক্ত-২৬
৮৪. দালায়িলুল 'উজায-৭৪
৮৫. উদাবাউল 'আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম-২৭৮
৮৬. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৭০
৮৭. তাবাকাতুশ শু'য়ারা- ৮৩-৯৪
৮৮. উসুদুল গাবা-২/৫
৮৯. তাহ্জীবুত তাহ্জীব-২/২১৭
৯০. উদাবাউল 'আরাব-২৮১
৯১. আশ-শি'র ওয়াশ শু'য়ারা-১৩৯; ড. 'উমার ফাররূখ-১/৩৩৬

৯২. উসুদুল গাবা-২/৫
৯৩. উদাবাউল আরাব-২৭৮
৯৪. টীকা ঃ দিওয়ানু হাস্সান-২৮
৯৫. আল-ইসতী'য়াব-১/১৩০
৯৬. তাবাকাতুশ শু'য়ারা- ৮৩-৯৪
৯৭. ড. শাওকী দায়ফ ঃ তারীখ-২/৭৯-৮০
৯৮. জুরজী যায়দান ঃ তারীখ- ১/১৫০
৯৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫১৯
১০০. প্রাগুক্ত-২/৫২০; দিওয়ান-৬৬
১০১. বুখারী-৬/২২১; মুসলিম- (২৪৮৫); আবু দাউদ- (৫০১৩), আন-নাসাঈ-২/৪৮; মুসনাদ-৫/২২২, ২২৩
১০২. আল-ইসতী'য়াব-১/১২৯
১০৩. হায়াতুস সাহাবা-৩/৭৭, ১৭২; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৩৫৪।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)

আবদুল্লাহ (রা) মদীনার বিখ্যাত ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকার সন্তান। তাঁর বংশধারা উপরের দিকে ইউসুফ আলাইহিস সালামে গিয়ে মিলিত হয়েছে।[১] তাঁর উপনাম দুইটি ঃ আবু ইউসুফ ও আবুল হারেস। পিতার নাম সালাম ইবন হারেস। মদীনার খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা বনু 'আউফ। এই বনু 'আউফের একটি উপ-শাখার নাম 'কাওয়াকিল'। আবদুল্লাহ ইবন সালাম প্রাচীন জাহিলী আরবের রেওয়াজ অনুযায়ী এই কাওয়াকিল গোত্রের 'হানীফ' বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিতে পরিণত হন।[২] ইসলামপূর্ব জাহিলী আমলে তাঁর নাম ছিল 'হুসাইন'। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা) নামটি পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রাখেন।[৩]

আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনায় যে কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি একজন বড় ইহুদী ধর্মগুরু হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাওরাতে রাসূলুল্লাহর (সা) আগমন কাল ও তাঁর পরিচয় সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর জানা ছিল। অনেকের মত তিনিও শেষ নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে সর্বপ্রথম কুবার বনু 'আমর ইবন 'আউফ গোত্রে যখন ওঠেন তখন তিনি একটি খেজুর গাছের মাথায়। এক ব্যক্তি তাঁকে রাসূলের (সা) আগমন খবর দিলে তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারেন তিনি নবী। তারপর রাসূল (সা) যখন মদীনার মূল ভূখণ্ডে এসে আবু আইউব আল-আনসারীর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন তখন আবদুল্লাহ আবার আসেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। এই সাক্ষাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর অনেক কথা হয়। বিভিন্ন বর্ণনায় নানা ভাবে এ সব কথা এসেছে।[৪] এখানে আমরা কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরছি।

আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলতেন ঃ আমার পিতার নিকট আমি তাওরাতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শিখেছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচয়, নিদর্শন, গুণাবলী ও তাঁর কর্মকাণ্ডসম্পর্কিত একটি আয়াত তিনি পড়ালেন। তারপর বললেন ঃ তিনি যদি হারূনের বংশধর হন তাহলে তাঁর অনুসরণ করবে, অন্যথায় নয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পূর্বে মারা যান।

অতঃপর একদিন রাসূল (সা) মদীনায় আসলেন। আমি তখন বাগানে খেজুর পাড়ছিলাম আর আমার ফুফু খালেদা বিনতুল হারেস খেজুর কুড়াচ্ছিলেন। এই সময় ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ আরবের অধিকারী ব্যক্তি আজ এসে গেছেন। একথা শুনে আমি কাঁপতে শুরু করলাম এবং জোরে তাকবীর দিলাম।

আমার বৃদ্ধা ফুফু আমার এ অবস্থা দেখে বললেন ঃ ওরে খবীছ, তোমার যা হাল হয়েছে, মুসা ইবন ইমরানও যদি আসতেন তাহলেও এর চেয়ে বেশী হতোনা। আমি বললাম ঃ ফুফু! তিনি মুসারই ভাই এবং তাঁরই দ্বীনের ওপর আছেন। তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন ইনিও তাই নিয়ে এসেছেন।

আমি গাছ থেকে নেমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম। তাঁর অবয়ব প্রত্যক্ষ করলাম এবং তাঁকে চিনলাম। আমি তাঁকে আমার পিতার কথা বললাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। পরে আমার ফুফুও ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫]

আবদুল্লাহ ইবন সালাম আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় পদার্পণ করলে মানুষ তাঁর কাছে ভীড় করলো। আমিও গেলাম। আমি দেখেই বুঝলাম এই চেহারা কোন ভণ্ড-মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। আমি তাঁর মুখ থেকে সর্বপ্রথম এই কথাগুলি শুনলাম ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, মানুষকে আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখ এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড় - তাহলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে কুবা পৌঁছার পর আবদুল্লাহ ইবন সালামের প্রথম যে সাক্ষাৎ হয় উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সম্ভবত সেই সাক্ষাতের কথা বলেছেন। রাসূল (সা) তিনদিন কুবায় বিশ্রাম নেওয়ার পর মদীনার মূল ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করেন। পথে সকলের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে আবু আইউব আল-আনসারীর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম এ সময় আবার রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন। আর এ সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন আনাস (রা)।

আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পর আবদুল্লাহ ইবন সালাম সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি আপনাকে এমন তিনটি প্রশ্ন করতে চাই যার উত্তর কেবল নবীরাই জানেন।

১. কিয়ামতের প্রথম আলামত বা নিদর্শন কি?

২. জান্নাতের অধিবাসীদের প্রথম খাবার কি?

৩. সন্তান পিতা অথবা মাতার সদৃশ হয় কেন?

রাসূল (সা) বললেন ঃ এই মাত্র জিবরীল কথাগুলি আমাকে বলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন ঃ ফিরিশতাদের মধ্যে এই জিবরীলই তো ইহুদীদের দুশমন। রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো, পূর্ব থেকে একটি আগুন বের হবে এবং মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে পশ্চিমে সমবেত করবে। জান্নাতের অধিবাসীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তানের পিতা-মাতার সাদৃশ্যের কারণ হলো, পুরুষের পানি আগে বের হলে সন্তান তার দিকে ঝুঁকবে, আর স্ত্রীর পানি আগে বের হলে সন্তান ঝুঁকবে তাঁর দিকে। এ জবাব শুনে আবদুল্লাহ বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।

এরপর আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদীরা একটি মিথ্যাবাদী সম্প্রদায়। আমি একজন 'আলিম (জ্ঞানী) পিতার 'আলিম সন্তান। তেমনিভাবে একজন রয়িস (নেতা) পিতার রয়িস সন্তান। আপনি ইহুদীদের ডেকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তবে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তাদের কাছে গোপন রাখবেন। তাঁর কথা মত রাসূল (সা) ইহুদীদের ডেকে তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন। এক পর্যায়ে তাদেরকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কে? তারা বললো ঃ তিনি তো আমাদের প্রাক্তন রয়িসের ছেলে বর্তমান রয়িস। 'আলিম পিতার 'আলিম সন্তান। রাসূল (সা) বললেন ঃ আচ্ছা, তিনি কি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন? তারা বললো ঃ কক্ষণো না।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবন সালাম তখন ঘরের এক কোণে লুকিয়ে আছেন। রাসূল (সা) তাঁকে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত করলেন। তিনি কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে এসে ইহুদী সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহকে একটু ভয় কর। তোমরা ভালো করেই জান এ ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর দ্বীন সত্য।

তাঁর আবেদন সত্ত্বেও ইহুদীরা ঈমান আনলো না। বরং এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তারা যে অপমানিত হলো তাতে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো ঃ তুমি একজন ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক। তুমি আমাদের সম্প্রদায়ের একজন নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। তোমার বাবাও ছিল একজন ইতর।

আবদুল্লাহ তখন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দেখলেন তো। আমি এরই ভয় পাচ্ছিলাম।[৮] যখন ইহুদীরা রাসূলুল্লাহর (সা) দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল তখন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহক্বাফের দশম আয়াতটি নাযিল হলো।[৯]

আবদুল্লাহ ইবন সালামের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ভিন্নমতও আছে। ইমাম শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহর ওফাতের দুই বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০] ইমাম জাহাবী বলেন, এ একটি ব্যতিক্রমী ও প্রত্যাখ্যাত বর্ণনা। কারণ, সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত ও মদীনায় আগমনের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১১] ইবন সা'দ বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর প্রথমভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইহুদীদের একজন 'হাব্‌র' বা ধর্মগুরু।[১২]

বদর ও উহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন সালামের যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মত পার্থক্য আছে। ইবন সা'দের মতে তিনি সর্বপ্রথম খন্দক যুদ্ধে যোগদান করেন। এ কারণে তাঁকে সাহাবীদের তৃতীয় তাবকা (স্তর) খন্দকের যোদ্ধাদের সাথে উল্লেখ করেছেন। খন্দকের পর থেকে সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন।

খলীফা 'উমারের (রা) বাইতুল মাকদাস সফরকালে তিনি সফরসঙ্গী ছিলেন। আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, বায়তুল মাকদাস ও জাবিয়া বিজয়ের তিনি অন্যতম অংশীদার ছিলেন।[১৩]

বিদ্রোহীরা যখন খলীফা 'উসমানকে (রা) গৃহে অবরুদ্ধ করে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে তখন সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে তিনি একদিন সাক্ষাৎ করে বলেন ঃ আমরা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এখন এভাবে আপনার ঘরে বসে থাকা ঠিক হবে না। বাইরে যেয়ে সমবেত জনতাকে বিক্ষিপ্ত করে দিন। এ কথা বলে আবদুল্লাহ নিজেই জনতার সামনে এসে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। ভাষণটি বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

"ওহে জনমণ্ডলী! জাহিলী 'আমলে আমার নাম ছিল হুসাইন। রাসূলুল্লাহ আমার নাম দেন আবদুল্লাহ। কুরআন পাকের এ আয়াতগুলি আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ

১. আর বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তোমরা অহঙ্কার করছো। (সূরা আল-আহক্বাফ-১০)
২. কাফেররা বলে ঃ আপনি রাসূল নন। বলে দিনঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে (আসমানী) গ্রন্থের জ্ঞান আছে। (সূরা রা'দ-৪৩)

আল্লাহর তরবারি এখন পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে এবং আপনাদের এই শহর-রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাত স্থলকে ফিরিশতারা তাদের আবাসভূমি বানিয়ে রেখেছেন। অতএব আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁকে (উসমানকে) হত্যা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহর কসম! যদি আপনারা তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন তাহলে আপনাদের প্রতিবেশী ফিরিশতাগণ মদীনা ত্যাগ করবেন। আর এখন পর্যন্ত যে তরবারি কোষবদ্ধ আছে তা বেরিয়ে পড়বে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা আর কোষবদ্ধ হবে না।"

তাঁর এ ভাষণ কঠোর হৃদয় বিদ্রোহীদের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারলো না। বরং এর উল্টো ফল দেখা দিল। তাদের দুর্ভাগ্য ও হঠকারিতা আরো বেড়ে গেল। তারা বললো ঃ "এই ইহুদী ও উসমান-দুই জনকেই হত্যা কর।"[১৪]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন ঃ 'উসমান যখন গৃহবন্দী তখন আমি একদিন তাঁকে সালাম জানাতে গেলাম। আমি তাঁর গৃহে প্রবেশ করতেই তিনি বললেন ঃ আমার ভাই স্বাগতম! গত রাতে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এই জানালা দিয়ে দেখেছি। তিনি বললেন ঃ 'উসমান! তোমাকে তারা অবরুদ্ধ করেছে? বললাম ঃ হাঁ। বললেন ঃ তোমাকে তারা তৃষ্ণার্ত রেখেছে? বললাম ঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে একটি পানিভর্তি বালতি দিলেন। আমি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি চাইলে তাঁদের বিরুদ্ধে তোমাকে বিজয়ী করবো। আর ইচ্ছা করলে আজ আমার সাথে ইফতার করতে পার। আমি তাঁর সাথে ইফতার করাকে বেছে নিয়েছি। তিনি সেই দিন নিহত হন।[১৫]

খলীফা আলী (রা) মদীনার পরিবর্তে কুফাকে রাজধানী করার সিদ্ধান্ত নিলে আবদুল্লাহ তাঁকে বলেন, "আপনি মদীনার মসজিদে রাসূলুল্লাহর (সা) মিম্বর ত্যাগ করবেন না। এটা ত্যাগ করলে আর কখনও তা যিয়ারত করতে পারবেন না।" আলী (রা) তখন মন্তব্য করেন "বেচারা বড় সরল ও সৎ মানুষ।"[১৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আলী (রা) বলেন ঃ আমি ঘোড়ার পিঠে উঠার জন্য যখন জিনে পা রাখছি ঠিক সেই সময় আবদুল্লাহ ইবন সালাম আমার কাছে এসে বলেন ঃ কোথায় যাচ্ছেন? বললাম ঃ ইরাক। বললেন ঃ সেখানে গেলে আপনি তরবারির ধার লাভ করবেন। বললাম ঃ আমি আগেই একথাটি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি।[১৭]

খলীফা আলী ও আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) ঝগড়া ও বিবাদে তিনি জড়াননি। একটি কাঠের তৈরী তরবারি সঙ্গে নিয়ে এ বিবাদ থেকে সযত্নে দূরে থাকেন।[১৮]

সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ একমত যে, তিনি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৪৩ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন।[১৯] তিনি দুই ছেলে রেখে যান। তাঁদের নাম ইউসুফ ও মুহাম্মাদ। উভয়ের জন্ম হয় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায়। ইউসুফ ছিলেন বড়। তাঁর জন্মের পর রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে কোলে নেন, মাথায় হাত রাখেন এবং ইউসুফ নাম রাখেন।[২০]

আবদুল্লাহর দৈহিক গঠনের তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে একথা জানা যায় যে, বার্দ্ধক্যে দুর্বলতার দরুন লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতেন এবং প্রয়োজনে তাতে ঠেস দিতেন।[২১] মুখমণ্ডলে খোদাভীতির ছাপ সর্বদা প্রতিভাত হতো।[২২]

আবদুল্লাহর (রা) বুকটি ভরা ছিল তাওরাত, ইনজীল, কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীর জ্ঞানে। তাওরাতে তাঁর সীমাহীন পারদর্শিতা সম্পর্কে আল্লামাহ জাহাবী লিখেছেন ঃ[২৩]

"আবদুল্লাহ ইবন সালাম তাঁর সময়ে মদীনায় আহলি কিতাবদের সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন।"

ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন ও হাদীসের প্রতি মনোযোগ দেন এবং এর জ্ঞানে সকলের আস্থা ভাজনে পরিণত হন। এর চেয়ে মর্যাদার বিষয় আর কি হতে পারে যে, আবু হুরাইরাহ— যিনি সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী ছিলেন, তিনিও আবদুল্লাহর নিকট হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। একবার আবু হুরাইরাহ গেছেন শামে। সেখানে তিনি কা'ব ইবন আহ্‌বারের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ 'জুম'আর দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে তখন যদি কোন বান্দাহ আল্লাহর নিকট কিছু চায় তাহলে তিনি অবশ্যই তা তাকে দান করেন।' হাদীসটি শোনার পর কা'ব কিছুটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকেন। তারপর অবশ্য আবু হুরাইরার বর্ণনার সাথে একমত পোষণ করেন।

এদিকে তিনি (আবু হুরাইরাহ) মদীনায় ফিরে এসে আবদুল্লাহ ইবন সালামের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি শুনে মন্তব্য করেন ঃ কা'ব মিথ্যা বলেছে। তখন আবু হুরাইরাহ বললেন ঃ শেষে তিনি আমার কথা মেনে নিয়েছেন। আবদুল্লাহ বললেন ঃ আপনি কি জানেন সেটা কোন সময়? এ প্রশ্ন শুনে আবু হুরাইরাহ তাঁর পিছু নিলেন এবং সময়টি বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন ঃ আসর ও মাগরিবের মাঝখানের সময়। আবু হুরাইরাহ বললেন ঃ আসর ও মাগরিবের

মাঝখানে তো কোন নামায নেই। এ কেমন করে হয়? আবদুল্লাহ বললেন ঃ আপনার হয়তো জানা নেই যে, রাসূল (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতীক্ষায় বসে থাকে সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে।[২৪]

হাদীসে এত পারদর্শিতা সত্ত্বেও তাঁর থেকে মাত্র পঁচিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৫] তাঁর মুখ থেকে হাদীস শুনে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেক সাহাবী আছেন। যেমন ঃ আনাস ইবন মালিক, যুরারাহ ইবন আওফা, আবু হুরাইরাহ, আবদুল্লাহ ইবন মা'কিল, আবদুল্লাহ ইবন হান্‌জালা প্রমুখ। এছাড়া তাঁর বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের নাম ঃ খারাশা ইবন আল-হুর, কায়স ইবন 'উবাদ, আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান, হামযাহ ইবন ইউসুফ (পৌত্র), 'উমার ইবন মুহাম্মদ (পৌত্র), 'আওফ ইবন মালিক, আবু বুরাদাহ্ ইবন আবী মুসা, আবু সা'ঈদ আল-মুকরী, 'উবাদাহ্ আয-যারকী, 'আতা ইবন ইয়াসার, 'উবাইদুল্লাহ ইবন জায়শ আল-গিফারী, যুররাহ্ ইবন আওফা, ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (দুই পুত্র)।[২৬]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালামের সম্মান ও মর্যাদা ছিল অতি উঁচুতে। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট 'আলিম সাহাবীদের অন্যতম। বিখ্যাত সাহাবী মু'য়াজ ইবন জাবালের অন্তিম সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন তাঁকে বলা হলো, আমাদেরকে কিছু উপদেশ দিন। বললেন ঃ আমি দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। তবে আমার সাথে ইলম বা জ্ঞান উঠে যাচ্ছে না। যে ব্যক্তি তা তালাশ করবে, সে লাভ করবে। তোমরা আবুদ দারদা, সালমান আল-ফারেসী, আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ ও আবদুল্লাহ ইবন সালামের নিকট ইলম (জ্ঞান) তালাশ করবে। আবদুল্লাহ ছিলেন ইহুদী। পরে মুসলমান হন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ সে দশম জান্নাতী ব্যক্তি।[২৭]

সা'দ ইবন 'আবী ওয়াক্‌কাস (রা) বলেছেন। আমি একমাত্র আবদুল্লাহ ইবন সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনিনি ঃ সে একজন জান্নাতের অধিকারী ব্যক্তি। তাঁরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে সূরা আল-আহক্বাফের ১০নং আয়াতটি।[২৮]

মুস'য়াব ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্‌কাস তাঁর পিতা সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এক পেয়ালা 'সারীদ' আনা হলো। তিনি খাওয়ার পর কিছু অবশিষ্ট থাকলো। রাসূল (সা) বললেন ঃ এই ফাঁক দিয়ে একজন জান্নাতী ব্যক্তি প্রবেশ করবে এবং এই এঁটেটুকু খেয়ে ফেলবে। সা'দ বলেন ঃ আমি আমার ভাই 'উমাইরকে ওজু করতে পাঠিয়েছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম,সে এসে এঁটেটুকু খেয়ে ফেলুক। কিন্তু তাঁর আগেই আবদুল্লাহ ইবন সালাম এসে তা খেয়ে ফেলে।[২৯]

আবদুল্লাহ এত বড় মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী ছিলেন। কেউ তাঁর সামান্য প্রশংসা করলে ক্ষেপে যেতেন। কায়স ইবন 'উবাদ বলেন ঃ আমি মদীনার মসজিদে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলেন, যাঁর চেহারায় খোদাভীতির ছাপ বিদ্যমান ছিল। লোকেরা বললো ঃ ইনি একজন জান্নাতী ব্যক্তি। এরপর তিনি দুই

রাকা'য়াত সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করলেন। তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর ঘরে ঢুকলেন, আমিও পিছনে পিছনে ঢুকলাম। আমি তাঁর সাথে কথা বলে পরিচিত হওয়ার পর বললাম ঃ আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন লোকেরা এমন এমন কথা বলাবলি করছিল। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! কোন মানুষের এমন কথা বলা উচিত নয় যা সে জানেনা। আমি তোমাকে বলছি ঃ আমি একটি স্বপ্ন দেখে রাসূলুল্লাহকে (সা) বললাম। স্বপ্নটি এরূপ ঃ আমি যেন একটি সবুজ উদ্যান দেখতে পেলাম। যার মাঝখানে রয়েছে একটি লোহার খুঁটি। খুঁটির গোড়া মাটিতে এবং আগা আকাশে। আগায় একটি রশি বাঁধা। আমাকে বলা হলো ঃ খুঁটি বেয়ে উপরে ওঠো। আমি উঠে রশি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হলো ঃ শক্তভাবে আঁকড়ে থাক। রশিটি আমার হাতে থাকা অবস্থায় আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। সকালে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে স্বপ্নটি বর্ণনা করলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ উদ্যানটি হলো ইসলামের উদ্যান, আর খুঁটি হলো ইসলামের খুঁটি। আর রশি হলো ইসলামের রশি। তুমি আমরণ ইসলামের ওপর থাকবে। বর্ণনাকারী কায়স বলেন ঃ সেই লোকটি হলেন আবদুল্লাহ ইবন সালাম।[৩০]

খারাশা ইবনুল হুর স্বপ্নটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩১] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্বপ্নের বিবরণ শুনে বলেন ঃ ইসলামের শক্ত রশি আঁকড়ে থাকা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে।[৩২]

আবদুল্লাহর (রা) বিনয়ের আরো বহু ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। একবার তিনি লাকড়ীর একটি বোঝা মাথায় করে চলেছেন। তা দেখে লোকেরা তাঁকে বললো ঃ এমন কাজ করা থেকে আল্লাহ আপনাকে রেহাই দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ, ঠিক। তবে আমি এ কাজের মাধ্যমে আমার অহঙ্কার ও আভিজাত্য চুরমার করতে চাই। কারণ আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ যার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ 'কিবর' বা অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৩৩]

আবদুল্লাহর (রা) মধ্যে সত্য ও সততার সীমাহীন আবেগ ও শক্তি ছিল। শেষ জীবনে তিনি বলতেন, তোমাদের যদি আর একবার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, আর সে সময় যদি আমার মধ্যে শক্তি না থাকে তাহলে একটি চৌকির ওপর আমাকে বসিয়ে দুই পক্ষের মাঝখানে রেখে দেবে।[৩৪]

আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একবার সালমান আল-ফারেসী (রা) তাঁকে বললেন ঃ ভাই! আমাদের দুইজনের মধ্যে যে আগে মারা যাব তাকে স্বপ্নে দেখার চেষ্টা করবো যে জীবিত থাকবো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বললেন ঃ এটা কি সম্ভব? সালমান বললেন ঃ হাঁ, সম্ভব। ঈমানদার ব্যক্তির রূহ মুক্ত থাকে। পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। আর কাফির ব্যক্তির রূহ থাকে বন্দী। সালমান মারা গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালাম বলেন ঃ একদিন আমি মধ্যরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। সালমান এসে আমাকে সালাম দিলেন। আমি সালামের জবাব দিয়ে বললাম ঃ আবু

আবদিল্লাহ! আপনি আপনার বাসস্থান কেমন পেয়েছেন? বললেন ঃ ভালো। আপনি তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা) আঁকড়ে থাকবেন। তাওয়াক্কুল খুব ভালো জিনিস। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। আবদুল্লাহ প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কোন আমলটি সবচেয়ে ভালো পেয়েছেন? বললেন ঃ তাওয়াক্কুলকে আমি বিস্ময়কর জিনিস হিসেবে পেয়েছি।[৩৫]

আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ একবার আমি মদীনায় গিয়ে আবদুল্লাহ ইবন সালামের সংগে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমার বাড়ীতে যাবে না? চল, তোমাকে ছাতু ও খোরমা খাওয়াবো। আমি গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ দেখ, তোমরা এমন এক অঞ্চলে বাস কর যেখানে সুদ প্রচলিত। তোমার যদি কোন ব্যক্তির কাছে কিছু পাওনা থাকে, আর সে তোমাকে পশুর খাদ্য কিছু ভূষিও উপহার দেয়, তুমি তা নিবে না। কারণ তা সুদ হয়ে যাবে।[৩৬] অন্য একটি বর্ণনায় ঘটনাটি একটু ভিন্নভাবে এসেছে।[৩৭]

আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) শানে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহক্বাফ ও সূরা আর-রাদ-এর যথাক্রমে ১০নং ও ৪৩ নং আয়াত দুইটি ছাড়াও আরো দুইটি আয়াত নাযিল হয়েছে বলে কোন কোন মুফাস্সির মত প্রকাশ করেছেন। ইবন ইসহাক ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সূরা আলে ইমরানের ১১৩ ও ১১৪ নং আয়াত দুইটি আবদুল্লাহ ইবন সালাম ও সা'লাবা ইবন সা'ইয়ার প্রশংসায় নাযিল হয়েছে।[৩৮] আল্লাহ তাঁদের প্রশংসায় বলেন ঃ

তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সিজদা করে। তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়, অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হলো সৎকর্মশীল।

এভাবে স্বয়ং আল্লাহ পাক আবদুল্লাহ ইবন সালামের (রা) মর্যাদার সনদ দান করেছেন। তিনি কত মহান ব্যক্তি ছিলেন তা আল্লাহ তা'য়ালার এ ঘোষণায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম-৪/২৪৩
২. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৩; আল-ইসাবা-২/৩২০; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০
৩. ইবন হিশাম-১/৫১৫; আল-মুসতাদরিক-৩/৪১৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৪
৪. দেখুন ঃ ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৩৯৪-৩৯৭.
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৬; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫১৬
৬. ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-১/৪৯৫; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৪. ইমাম তিরমিজী ও ইবন মাজাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৫

৮. বুখারী-৫/৪৬; জাহাবী ঃ তারীখ-১/২০৪; ইবন হিশাম-১/৫১৭; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৫, ৪১৬, ৪২০
৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪২১; জামি'উল বায়ান-২৬/১১
১০. আল-ইসাবা-২/৩২০
১১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৪
১২. প্রাগুক্ত-২/৪১৫
১৩. বুলুগুল আমানী-২২/৩৮৮; আল-আ'লাম-৪/২২৩; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০
১৪. তিরমিজী-৬২৮;
১৫. আল-বিদায়া-৭/১৮২; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৪৪, ৬৪৫
১৬. আল-ইসাবাহ্-২/৩২১
১৭. হায়াতুস-সাহাবা-৩/৬৫
১৮. আল-আ'লাম-২/২২৩
১৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২০
২০. মুসনাদ-৪/৩৫
২১. মুসনাদ-৫/৪৫২
২২. আল-ইসাবা-৪/৩২১
২৩. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২২; ইবন হিশাম-১/৫১৫
২৪. মুসনাদ-৫/৪৫১, ৪৫৩
২৫. আল-আ'লাম-২/২২৩
২৬. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৬; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৩; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০
২৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৬; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪১৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৮২; তাবাকাত-২/৩৫২; তিরমিজী-৩৮০৪। ইমাম তিরমিজী এ হাদীসটিকে 'হাসান সাহীহ্ গারীব' বলেছেন। আল-হাকেম-৩/৪১৬
২৮. বুখারী-৭/৯৭; মুসলিম -(২৪৮৩); বুলুগুল আমানী-২২/৩৮৯; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৬
২৯. মুসনাদ-১/১৬৯, ১৮৩; সীয়ারু আ'লাম-২/৪১৭; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২৩০; বুলুগুল আমানী-২২/৩৯০
৩০. বুখারী-৫/৪৬; মুসলিম-(২৪৮৪); মুসনাদ-৫/৪৫২; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৭.
৩১. ইবন মাজাহ-(৩৯২০); মুসনাদ-৫/৪৫৩; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪২২
৩২. সীয়ারু আ'লাম-২/৪১৮
৩৩. তিরমিজী-(১৯৯৯); সীয়ারু আ'লাম-২/৪১৯; আল-মুসতাদরিক-৩/৪১৬; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৩
৩৪. আল-ইসতী'য়াব-১/৩৯৬; সীয়ারু আ'লাম-২/৪২৩
৩৫. তাবাকাত-৪/৯৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১৭
৩৬. বুখারী-৫/৪৬
৩৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৪২৩
৩৮. প্রাগুক্ত-২/৪১৬; তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন ঃ সূরা আলে ইমরানের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

সাহল ইবন সা'দ (রা)

তাঁর ভালো নাম সাহ্‌ল। ডাকনাম কয়েকটি। যেমন ঃ আবুল 'আব্বাস, আবু মালিক ও আবু ইয়াহইয়া। পিতার নাম সা'দ ইবন মালিক। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সায়িদার সন্তান। একজন বিখ্যাত আনসারী সাহাবী। পিতা সা'দও সাহাবী ছিলেন।[১]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পাঁচ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর পিতা নাম রাখেন 'হুয্‌ন'। রাসূল (সা) মদীনায় আসার পর পরিবর্তন করে তাঁর নাম রাখেন 'সাহল'। একথা ইবন হিব্‌বান বর্ণনা করেছেন।[২] হিজরাতের পূর্বেই তাঁর পিতা সা'দ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি মুসলমান হিসেবেই বেড়ে ওঠেন।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনা আগমনের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের সময় তিনি সাত বছরের এক বালক মাত্র। যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে, এমন সময় তার পিতা হযরত সা'দ ইনতিকাল করেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। বদর যুদ্ধের পর রাসূল (সা) গনীমতের একটি অংশ তাঁর মরহুম পিতাকেও দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বদর যুদ্ধে যোগদানের সংকল্প করেছিলেন।

হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর সম বয়সী ছেলেদের সাথে মিলে মদীনার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) আহত হয়ে রক্তরঞ্জিত হয়েছিলেন। যখন তাঁর সেই রক্ত সাফ করা হয়েছিল, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৩]

হিজরী পঞ্চম সনে যখন খন্দক যুদ্ধ হয় তখন তিনি দশ বছরের বালক মাত্র। তা সত্ত্বেও তীব্র আবেগ ও উৎসাহ ভরে খন্দক খননে অংশ নেন এবং কাঁধে করে মাটি বহন করেন।[৪] মোট কথা হিজরী এগারো সনে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। তখনও তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি।

খিলাফতে রাশেদার সময় কালের তাঁর জীবনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। হিজরী ৭৪ সনে স্বৈরাচারী ও উৎপীড়ক উমাইয়্যা শাসক হাজ্জাজ ইবন ইউসুফের রোষানলে পড়েন। হাজ্জাজ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি খলীফা উসমানকে সাহায্য করেননি কেন? তিনি বলেন ঃ করেছি। হাজ্জাজ বলেন ঃ সত্য বলছেন না। এরপর তিনি অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতীক স্বরূপ তাঁর ঘাড়ে ছাপ মেরে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হাজ্জাজের এ অপকর্মের হাত থেকে হযরত আনাস ও জাবির ইবন আবদিল্লাহর মত মর্যাদাবান সাহাবীদ্বয়ও রেহাই পাননি। হাজ্জাজের এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল যাতে মানুষ তাঁদের থেকে দূরে থাকে এবং তাঁদের কথায় কান না দেয়।[৫]

ইমাম যুহরী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর ইনতিকালের সময় সাহল ইবন সা'দের বয়স হয়েছিল ১৫ বছর। আর তিনি হিজরী ৯১ সনে মদীনায় মারা যান। ওয়াকিদীর মতে তিনি এক

শো বছর জীবন লাভ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন ছিয়ানব্বই বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী।[৬] ইবন হাজারের মতে হিজরী ৮৮ সনে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ১০০ বছরের উর্দ্ধে।[৭] ইবন আবী দাউদের ধারণা, তিনি ইসকান্দারিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মিসরে মারা যান। ইবন হাজার বলেন, এ সব ধারণা মাত্র।[৮] ওয়াকিদী বলেন ঃ একথা বর্ণিত আছে যে, মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ। তবে সঠিক এই যে, হিজরী ৯১ সনে সাহল ইবন সা'দ আস-সা'য়িদী মদীনায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী।[৯] তাঁর জীবনের শেষ ভাগে মদীনায় আর কোন সাহাবী ছিলেন না। ইসলামী খিলাফতের অন্যান্য অঞ্চলও তখন সাহাবীদের বরকত থেকে প্রায় মাহরূম হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেই বলতেন আমি মারা গেলে 'কালার রাসূল'(রাসূল বলেছেন) বলার কেউ থাকবে না।

হযরত সাহল ইবন সা'দ ছিলেন খ্যাতিমান সাহাবীদের একজন। বিশিষ্ট সাহাবীদের মৃত্যুর পর তিনি জনগণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। অতি আবেগ ও উৎসাহের সাথে অগণিত মানুষ হাদীস শোনার জন্য তাঁর কাছে ভীড় জমাতো।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যদিও তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন, তবুও বহু হাদীস শুনেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত উবাই ইবন কা'ব 'আসিম ইবন 'আদী, 'আমর ইবন 'আবাসা প্রমুখ খ্যাতিমান সাহাবীর নিকট থেকে এ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। মারওয়ান যদিও সাহাবী ছিলেন না, তবুও তাঁর নিকট থেকে কিছু হাদীস তিনি গ্রহণ করেছেন।[১০]

সাহাবী ও তাবে'ঈদের অনেকেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের বিশেষ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আবু হুরাইরা, ইবন 'আব্বাস, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবু হাযিম ইবন দীনায, যুহরী, আবু সুহাইল সুবহী, 'আব্বাস ইবন সাহল (ছেলে), ওয়াফা ইবন শুরাইহ হাদরামী, ইয়াহইয়া ইবন মায়মুন হাদরামী, আবদুল্লাহ ইবন 'আবদির রহমান ইবন আবী জুবাব, 'আমর ইবন জাবির হাদরামী প্রমুখ।[১১]

হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সর্বমোট ১৮৮টি। তার মধ্যে ২৮টি মুত্তাফাক আলাইহি।[১২]

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিটি কাজ ও আচার-আচরণ অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। রাসূল (সা) একটি কাঠের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। একবার তিনি একটি মিম্বরের কথা বললেন। হযরত সাহল সাথে সাথে জঙ্গলে চলে যান এবং মিম্বরের জন্য কাঠ কেটে নিয়ে আসেন।[১৩] একবার তিনি নিজ হাতে রাসূলকে (সা) 'বুদা'য়া' কূপের পানি পান করিয়েছিলেন। একথা তিনি বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা মদীনার একটি কূপ। মদীনাবাসীরা তাতে ময়লা-আবর্জনা ফেলতো। তবে কূপটি বড় ছিল এবং তাতে অনেক ঝর্ণা ছিল।[১৪]

সত্য বলা ছিল হযরত সাহলের (রা) চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবদ্দশায় একবার মারওয়ান বংশের এক ব্যক্তি মদীনার আমীর হয়ে আসেন। তিনি হযরত সাহলকে (রা) ডেকে হযরত 'আলীকে (রা) গালি দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সেই স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশ পালন করতে কঠোরভাবে অস্বীকার করেন। তখন সেই আমীর আবদার করেন, অন্ততঃ এতটুকুই বলুন যে,'আবু তুরাবের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' জবাবে হযরত সাহল বলেন ঃ আবু তুরাব ছিল 'আলীর প্রিয়তম নাম। রাসূল (সা) তাঁকে এ নামে ডেকে খুশী হতেন। এরপর তিনি 'আলীর (রা) আবু তুরাব নাম করণের ব্যাখ্যা করে শোনালে আমীর চুপ হয়ে যান।[১৫]

একবার সাহল ইবন সা'দ, আবু জার, 'উবাদা ইবনুস সামিত, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা ও ষষ্ঠ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে একথার ওপর বাই'য়াত করেন যে, আল্লাহর ব্যাপারে তাঁরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবেন না।[১৬] তাঁর জীবন-ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, আমরণ তিনি এ বাই'য়াতের ওপর অটল ছিলেন।

তাঁর হাদীসের দারসের মজলিসে কেউ উদাসীন বা অমনোযোগী থাকলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যেতেন। এ ধরনের একটি ঘটনা তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবু হাসেম বলেন, একবার এক মজলিসে তিনি হাদীস শোনাচ্ছেন। শ্রোতাদের কেউ কেউ তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল। তিনি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বললেন ঃ এদেরকে দেখে রাখ। আমার দু'চোখ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যা কিছু দেখেছে, দু'কান যা কিছু শুনেছে, আমি তাই এদের নিকট বর্ণনা করছি, আর এরা তা না শুনে নিজেরা কথা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মাঝ থেকে চলে যাব, আর কক্ষনো ফিরে আসবো না। আমি জানতে চাইলাম ঃ কোথায় যাবেন? বললেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে যাব। বললাম ঃ আপনার ওপর এখন তো আর জিহাদ ফরজ নয়। আপনি এখন ঘোড়ার ওপর বসতে পারেন না, তরবারি দিয়ে আঘাত করার শক্তি রাখেন না এবং তীর-বর্শাও ছুড়তে পারেন না।

বললেন ঃ আবু হাসেম! আমি ময়দানে গিয়ে সারিতে দাঁড়িয়ে থাকবো। একটা অজানা তীর বা পাথর উড়ে এসে আমাকে আঘাত করবে এবং আল্লাহ তাতেই আমাকে শাহাদাত দান করবেন।[১৭]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬; উসুদুল গাবা-২/৩৬৬; আল-ইসাবা-২/৮৮; আল-আ'লাম-৩/২১০
২. উসুদুল গাবা-২/৩৬৬; আল-ইসাবা-২৮৮
৩. মুসনাদ-৫/৩৩৪
৪. প্রাগুক্ত-৫/৩৩২
৫. উসুদুল গাবা-২/৩৬৬
৬. শাজারাতুজ জাহাব-১/৯৯; উসুদুল গাবা-২/৩৬৬

৭. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬
৮. আল-ইসাবা-২/৮৮
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
১০. আল-ইসাবা-২/৮৮
১১. প্রাগুক্ত-২/৮৮; উসুদুল গাবা-২/৩৬৬
১২. আল-আ'লাম-৩/২১০; সীয়ারে আনসার-২৬
১৩. মুসনাদ-৫/৩৩৭
১৪. মুসনাদ-৫/৩৩৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৫৩৭
১৫. মুসলিম-১/৩২৬
১৬. হায়াতুস সাহাবা (আরবী)-১/২৪৩
১৭. প্রাগুক্ত-৩/২০৭-২০৮

সাহল ইবন হুনাইফ (রা)

নাম সাহল, ডাকনাম আবু সা'দ, আবু 'আবদিল্লাহ, আবুল ওয়ালীদ ও আবু সাবেত। পিতা হুনাইফ ইবন ওয়াহিব এবং মাতা হিন্দা বিন্‌তু রাফে'। মদীনার আউস গোত্রের সন্তান। বিখ্যাত আনসারী বদরী সাহাবী।[১] তাঁর ভাই 'আব্বাদ ইবন হুনাইফ ছিল মদীনার অন্যতম মুনাফিক। মসজিদে 'দিরার' যারা নির্মাণ করেছিল, সে তাদের একজন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর ও তিনি রাতের অন্ধকারে সকলের অগোচরে ঘুরে ঘুরে মদীনার বিভিন্ন স্থানের বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে ফেলতেন। কাঠের বিগ্রহগুলি ভেঙ্গে তাঁরা সেই কাঠ দরিদ্র মুসলমানদের গৃহে জ্বালানীর জন্য পৌঁছে দিতেন। হযরত 'আলী (রা) মদীনায় হিজরাতের পর কুবায় কুলছুম ইবন হাদামের গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। তার পাশেই ছিল এক মহিলার বাড়ী। প্রতিদিন গভীর রাতে সেই বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ তিনি শুনতে পেতেন। তারপর একজন লোকের ভিতরে প্রবেশ ও বেরিয়ে যাওয়ার সাড়া পেতেন। একদিন তিনি বিষয়টি জানার জন্য মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলাটি বললেন ঃ আমি একজন বিধবা মুসলিম নারী। প্রতিদিন রাতে যিনি এখানে আসেন, তিনি সাহল ইবন হুনাইফ। তিনি রাতে ঘুরে ঘুরে মূর্তি ভাঙ্গেন এবং তার কাঠগুলি আমার জ্বালানীর জন্য দিয়ে যান।[৩]

হযরত রাসূলে কারীম(সা) মদীনায় আসার পর আলীর (সা) সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রীতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।[৪]

বদর, উহুদ, খন্দক সহ সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।[৫] উহুদ যুদ্ধের বিপর্যয়ের সময় যে ১৫ জন সাহাবী জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ময়দানে অটল থাকেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[৬] সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মরণের শপথ করেছিলেন। রাসূলকে (সা) লক্ষ্য করে কাফিররা যে সব তীর ছুড়েছিলো, তিনি তার জবাব দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) সংগের লোকদের তখন বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে তীর দাও, এ হচ্ছে সাহল।' হযরত 'উমার (রা) পরবর্তী কালে কোন সংকট মুহূর্তে সাহল উপস্থিত থাকলে তাঁকে সৌভাগ্যের প্রতীক ধরে নিয়ে বলতেন, সাহল আছে, কোন ভাবনা নেই।[৭] উহুদ যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা) ফাতিমার নিকট এসে তরবারি এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এই লও তরবারি যা মোটেই নিন্দিত নয়।' একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি ভালো যুদ্ধ করেছো। তবে সাহল ও আবু দুজানা–উভয়ে ভালো যুদ্ধ করেছে।'[৮]

হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর পক্ষে ছিলেন। আলী (রা) যখন ইরাকে যান তখন তাঁকে মদীনার আমীর নিয়োগ করেন।[৯] এক সময় খলীফা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি মদীনা ছেড়ে কূফায় চলে যান।[১০] উটের যুদ্ধের পর হযরত আলী

(রা) তাঁকে বসরার ওয়ালী নিয়োগ করেন।[১১] সিফ্‌ফীন যুদ্ধে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন।[১২] যুদ্ধ শেষে তিনি কূফায় চলে যান। এসময় তাঁকে 'ফারেস'-এর আমীর নিয়োগ করা হয়।[১৩] কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। হযরত 'আলী (রা) তাঁর স্থলে যিয়াদ ইবন আবীহকে তথাকার আমীর নিয়োগ করেন।[১৪]

মদীনা থেকে ইহুদী গোত্র বনু নাদীর বিতাড়িত হওয়ার পর তাদের থেকে আটককৃত ধন-সম্পদ রাসূল (সা) মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। আনসারদের মধ্যে সাহল ইবন হুনাইফ ও আবু দুজানা সিমাক ইবন খারাশা নিজেদের চরম দারিদ্রের কথা প্রকাশ করলে রাসূল (সা) তাদেরকেও কিছু দেন।[১৫] আল্লামা সুহাইলীর মতে মোট তিনজন আনসারকে বনু নাদীরের সম্পদ থেকে অংশ দেওয়া হয়েছিল।[১৬]

ওয়াকিদী ও আল-মাদায়িনী বলেন, সাহল ইবন হুনাইফ হিজরী ৩৮ সনে কূফায় ইনতিকাল করেন। হযরত আলী (রা) তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন মা'কাল বলেন ঃ আমি 'আলীর সাথে সাহল ইবন হুনাইফের জানাযার নামায পড়েছি। এ নামাযে তিনি ছয় তাকবীর বললেন। কেউ একজন এর প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, হুনাইফ ছিলেন বদরী সাহাবী। আমি ছয় তাকবীরের দ্বারা অন্যদের ওপর বদরীদের ফজীলাতের কথা তোমাদের জানাতে চেয়েছি।[১৭]

মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে রেখে যান। তাঁরা হলেন ঃ আবু উমামা আস'য়াদ ও 'আবদুল্লাহ। প্রথমজন রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১৮]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আসার নয় মাসের মাথায় তাঁর একজন অতি প্রিয় আনসারী সাহাবী আস'য়াদ ইবন যুরারা ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন 'বাই'য়াতে 'আকাবার' সময় মনোনীত ১২ নাকীবের 'নাকীবুন নুকাবা' বা প্রধান নাকীব। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁর একটি মেয়েকে নিজ দায়িত্বে লালন-পালন করেন এবং তাঁকে এই সাহল ইবন হুনাইফের সাথে বিয়ে দেন। তাঁরই পেটে জন্মগ্রহণ করেন আবু উমামা ইবন সাহল।[১৯]

তিনি ছিলেন খুবই সুদর্শন ব্যক্তি। চেহারায় একটা পবিত্রতার ছাপ বিরাজমান ছিল। দৈহিক গঠন ছিল অতি সুন্দর। একবার এক যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একই বাহনের পিঠে আরোহী ছিলেন। সেখানে ছিল একটি ঝর্ণা। সেই ঝর্ণায় তিনি গোসল করতে যান। এক আনসারী তাঁর দেহের অতুলনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেন ঃ 'এ কেমন অপরূপ দেহ তার? আমি তো এমনটি আর কখনো দেখিনি।' এতে হযরত সাহলের কুনজর লাগে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীরে ভীষণ জ্বর এসে যায়। রাসূল (সা) এর কারণ জানতে চাইলেন। লোকেরা ঘটনাটি বর্ণনা করলো। তিনি তাদের কথা শুনে বললেন, মানুষ তার ভাইয়ের শরীর অথবা ধন-সম্পদ দেখে এবং তার জন্য দু'আ করে না। এ জন্য নজর লেগে যায়। নজর সত্য।[২০]

আল্লামা যিরিকলী সাহীহাইনে তাঁর থেকে বর্ণিত চল্লিশটি হাদীস সংকলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও যায়িদ ইবন সাবিত থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু তাবে'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

আবু ওয়ায়িল, 'উবাইদ ইবন সাববাক, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, সীরীন ইবন 'আমর, রাবাব প্রমুখ।[২২]

তিনি সব সময় সকল প্রকার মতভেদ থেকে দূরে থাকতেন। সিফ্ফীন থেকে ফিরে আসার পর ছাত্র আবু ওয়ায়িল বললেনঃ আমাদের কাছে কিছু ঘটনা বর্ণনা করুন। বললেনঃ কী বর্ণনা করবো? কঠিন সমস্যা। একটি ছিদ্র বন্ধ করলে আরেকটি খুলে যায়।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও উদ্যমী। কিন্তু মানুষ তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতো। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, এ তাঁদের মতের দোষ। আমি কাপুরুষ নই। যে কাজের জন্যই আমি তলোয়ার উঠিয়েছি, তা চিরকালের জন্য সহজ করে দিয়েছি। হুদাইবিয়ার দিন লড়াই করা যদি রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছার বিরোধী না হতো, আমি সে দিনও লড়তে প্রস্তুত ছিলাম।[২৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬; আল-ইসাবা-২/৮৭; তাবাকাত-৩/৪৭০; উসুদুল গাবা-২/৩৬৪।
২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৭; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৩০
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৫
৪. আল-ইসাবা-২/৮৭; আনসাবুল আশরাফ-১/২৭০; তাহজীবুত তাহজীব-৪/২৫১; আল-আ'লাম-৩/২০৯; তাবাকাত-৩/৪৭১
৫. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮; আল-আ'লাম-৩/২০৯
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮; আল-আ'লাম-৩/২০৯
৭. তাবাকাত-৩/৪৭১; আল-ইসাবা-২/৮৭; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১০০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৪২
৯. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮
১০. উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
১১. তাকরীবুত তাহজীব-১/৩৩৬
১২. বুখারী-২/৬০২; আল-ইসাবা-২/৮৭; আল-আ'লাম-৩/২০৯
১৩. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
১৪. সীয়ারে আনসার-২/৭
১৫. তাবাকাত-৩/৪৭২; আনসাবুল আশরাফ-১/৫১৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৯২
১৬. টীকা সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৯২
১৭. তাবাকাত-৩/৪৭২; শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৮; আল-আ'লাম-৩/২০৯; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
১৮. সীয়ারে আনসার-২/৮
১৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৩
২০. উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
২১. আল-আ'লাম-২/৩৬৫
২২. তাবাকাত-৬/৮; আল-ইসাবা-২/৮৭; উসুদুল গাবা-২/৩৬৫
২৩. সাহীহ বুখারী-২/৬০২

নু'মান ইবন বাশীর (রা)

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে হযরত নু'মানের (রা) দুইটি কুনিয়াত বা ডাকনাম পাওয়া যায় ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ ও আবূ মুহাম্মদ। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের সন্তান। তিনি একজন আমীর, খতীব, শা'রিয়, আলিম ও অন্যতম আনসারী সাহাবী।[১] তাঁর পিতা বাশীর ইবন সা'দও একজন বড় মাপের সাহাবী।[২] তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।[৩]

বাশীর ইবন সা'দ (রা) শেষ 'আকাবায় সত্তর, মতান্তরে পঁচাত্তর জন আনসারের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। বদর, উহুদসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর মদীনার সাকীফা বনী সা'য়েদাহ্তে খলীফা নির্বাচনের যে সমাবেশ হয় তাতে সর্ব প্রথম এই বাশীর ইবন সা'দ আবূ বকরের (রা) হাতে বাই'য়াত করেন।[৪] হিজরী ১২ সনে সেনাপতি খালিদ ইবন ওয়ালীদের (রা) নেতৃত্বাধীনে তিনি ভণ্ডনবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে 'আয়নুত তামার'-এর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৫]

নু'মানের (রা) মায়ের নাম 'উমরাহ বিন্ত রাওয়াহা। তিনি বিখ্যাত কবি সাহাবী ও শহীদ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) বোন।[৬] তিনিও রাসূলুল্লাহ্র (সা) সাহাবীয়্যাত বা সাহচর্য্যের গৌরব অর্জন করেন।

এমনই এক পবিত্র ও মহান পরিবারে নুমানের (রা) জন্ম । ইবন সা'দ বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের চৌদ্দ মাসের মাথায় রবিউল আখের মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এটা মদীনাবাসীদের বর্ণনা। কুফাবাসীরা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা নু'মান থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তিনি- 'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি'- বলেছেন। তারা বলেন, মদীনাবাসীরা তাঁর জন্ম সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তার থেকে তিনি বয়সে যে বড়, তার এ বর্ণনাসমূহ দ্বারা তা বুঝা যায়। বালাজুরী বলেন ঃ হিজরী দ্বিতীয় সনে আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আর এ সনেই জন্মগ্রহণ করেন আন-নু'মান ইবন বাশীর। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর আনসারদের ঘরে জন্ম গ্রহণকারী প্রথম শিশু নু'মান। রাসূল (সা) তাঁর 'তাহনীক' করেন।[৮] (খেজুর বা অন্য কিছু চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে। তাঁর জন্মের ছয় মাস পরে জন্মলাভ করেন আবদুল্লাহ ইবন জুবাইর (রা)। পরবর্তীকালে তাই তিনি বলতেন, আন-নু'মান ইবন বাশীর আমার চেয়ে ছয় মাসের বড়।[৯] ইমাম বুখারীর মতে, তাঁর জন্ম হিজরাতের বছরে।[১০]

ইমাম জাহাবী হযরত নু'মানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'তিনি হিজরী দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে হাদীস শুনেছেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা

সর্বসম্মতভাবে তাঁকে শিশু সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।'[১১]

ইসলামের ইতিহাসে হিজরী দ্বিতীয় সনের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ বছরের শুরুতেই মক্কার কুরাইশ ও তার আশে পাশের অন্যান্য গোত্রের সাথে মদীনার মুসলমানদের সংঘাত–সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে বদর যুদ্ধের মাধ্যমে। এ বছর যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের ওপর এই বিপ্লবী সময় ও ঘটনার একটা প্রভাব হয়তো পড়ে থাকবে। এ কারণে আন নু'মান ও আবদুল্লাহ– প্রত্যেকেই পরবর্তী জীবনে বড় বড় বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করেছেন।

নু'মানের পিতা-মাতা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) নিকট নিয়ে গিয়ে তাঁর জন্য দু'আ চাইতেন। মা তাঁকে এত বেশী ভালোবাসতেন যে, অন্য সন্তানদের বঞ্চিত করে সকল ধন-সম্পদ তাঁর নামে লিখে দিতে চাইতেন। একবার তিনি এ ব্যাপারে স্বামীকে রাজী করেন এবং সাক্ষী হিসেবে রাসূলুল্লাহকে (সা) মনোনীত করেন। বাশীর (রা) ছেলে নু'মানকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন আমি আমার অমুক অমুক ভূমি এই ছেলেকে দান করছি। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি তোমার অন্য সন্তানদের অংশও এভাবে দিয়েছো? বললেন ঃ না, দিইনি। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তাহলে আমি তো এমন অবিচারের সাক্ষী হতে পারিনে। একথা শোনার পর বাশীর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।[১২]

হেঁটে বেড়ানোর বয়স হলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতেন। একবার তায়েফ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু আঙ্গুর এলো। তিনি নু'মানের হাতে দুইটি ছড়া দিয়ে বললেন, একটি তোমার এবং একটি তোমার মায়ের। নু'মান বাড়ী ফেরার পথে দুইটি ছড়াই খেয়ে ফেলেন। বাড়ী এসে আঙ্গুরের ব্যাপারে কাউকে কিছু বললেন না। কয়েক দিন পর রাসূল (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ মাকে আঙ্গুর দিয়েছিলে? জবাব দিলেন ঃ না। রাসূল (সা) তখন তাঁর কানমলা দিয়ে বললেন ঃ ওরে ঠক্‌বাজ![১৩]

সেই শৈশবকালেই নু'মান নামায ও অন্যান্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হন। রাসূলুল্লাহর (সা) বিভিন্ন আচরণ মনোযোগ সহকারে দেখতেন এবং স্মরণ রাখার চেষ্টা করতেন। মসজিদে মিম্বরের কাছাকাছি বসে রাসূলুল্লাহর (সা) ওয়াজ-নসীহত ও বক্তৃতা–ভাষণ শুনতেন।[১৪] একবার তিনি দাবী করে বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে আমি অধিকাংশ সাহাবীদের থেকে বেশী জানি।[১৫] শবে কদরে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জেগে নামায পড়তেন।[১৬]

হিজরী ১১ সনের রাবী'উল আওয়াল মাসে রাসূলে কারীম (সা) ইনতিকাল করেন। তখন নু'মানের বয়স মাত্র আট বছর সাত মাস। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফার সময়ে নু'মানের বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা দেখা যায় না। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী নায়িলা (রা) স্বামীর রক্তমাখা জামাসহ নু'মানকে (রা) শামে পাঠান।[১৭] এ ঘটনার পর থেকে তাঁকে তৎকালীন ইতিহাসের অন্যতম এক চরিত্র হিসেবে দেখা যায়।

আলীর (রা) খিলাফতকালে মু'য়াবিয়ার (রা) সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। এই বিরোধে তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ অবলম্বন করেন। এটা অবাক হওয়ার মত ব্যাপার যে, গোটা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুটিকয়েক লোক তখন মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ নেন, তিনি তাঁদের একজন। বিভিন্ন গ্রন্থে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আমীর মু'য়াবিয়া (রা) ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ 'তাঁর ভালোবাসা ছিল মু'য়াবিয়ার প্রতি। এ কারণে মু'য়াবিয়া ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদের প্রতি তাঁর টান ছিল।[১৮] বিনিময়ে মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে বড় বড় পদ দান করেন। 'আলীর (রা) পক্ষ থেকে 'আয়নুত তামার'–এর শাসক ছিলেন মালিক ইবন কা'ব আল-আবহাবী। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নির্দেশে নু'মান (রা) তথাকার অস্ত্র গুদামে আক্রমণ চালান।[১৯]

নু'মান সিফ্ফীন যুদ্ধে মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষে যোগদান করেন।[২০] ফুদালা ইবন 'উবাইদের পরে হিঃ ৫৩ সনে মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে দিমাশকের কাজী নিয়োগ করেন।[২১] ইয়ামন মু'য়াবিয়ার (রা) অধীনে এলে 'উসমান ইবন আস্ সাকাফীর পরে তিনি নু'মানকে (রা) তথাকার ওয়ালী নিয়োগ করেন। এ হিসাবে উমাইয়্যা রাজ বংশের পক্ষ থেকে তিনি ছিলেন ইয়ামনের তৃতীয় ওয়ালী।[২২]

হিজরী ৫৯ সনে মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে কূফার ওয়ালী নিয়োগ করেন। প্রায় সাত মাস এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মু'য়াবিয়া (রা) ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ খলীফার পদে আসীন হন। তিনি ইমাম হুসাইন (রা), আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) তাঁর আনুগত্যের জন্য চাপ দিলেন। ইমাম হুসাইন (রা) ইয়াযীদের আনুগত্য মেনে নিতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানালেন। একদিকে কূফা থেকে 'আলীর (রা) অনুসারীদের চিঠি ইমাম হুসাইনের (রা) নিকট পৌঁছতে লাগলো। এ সকল চিঠিতে তারা ইমাম হুসাইনকে (রা) খলীফা হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছিল। এ কারণে ইমাম হুসাইন (রা) অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মুসলিম ইবন আকীলকে কূফায় পাঠালেন। মুসলিম কূফায় পৌঁছলে শহরের অধিকাংশ অধিবাসী ইমামের প্রতি আস্থার ঘোষণা দিল। প্রায় বারো হাজার মানুষ মুসলিমের হাতে বাই'য়াত গ্রহণ করে। নু'মান (রা) তখন কূফার ওয়ালী। সব খবরই তিনি পাচ্ছিলেন; কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

কিন্তু যখন মুখতার ইবন 'উবাইদের গৃহে 'আলীর (রা) অনুসারীদের বৈঠক হলো এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, ইয়াযীদের প্রতি কৃত বা'ইয়াত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করা হবে তখন নু'মান (রা) কূফার মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সারকথা নিম্নরূপ ঃ

'ওহে জনমণ্ডলী! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন। অশান্তি ও মতভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। কারণ, তাতে প্রাণহানি ঘটে, রক্তপাত হয় এবং সম্পদ লুটপাট হয়। কেউ আগ বাড়িয়ে আমার সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হলে আমি তার সাথে সংঘাতে জড়াবো না। কোন খারাপ কথা বলবো না, গালিগালাজ করবো না। কারো চরিত্রে

অপবাদ দান অথবা খারাপ ধারণা পোষণের কারণে কাউকে পাকড়াও করবো না। কিন্তু আপনারা যদি বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) ভঙ্গ করে প্রকাশ্যে আমার ও ইমামের বিরুদ্ধাচরণে নামেন, তাহলে সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, যতক্ষণ তরবারির হাতল আমার হাতের মুঠোয় থাকবে, আমি আপনাদের মারতে থাকবো। এতে একটি লোকও যদি আমার পাশে না থাকে, তবুও আমি বিরত হবো না। তবে আমি আশা করি, আপনাদের মধ্যে বাতিলের অনুসারীদের অপেক্ষা সত্যকে জানে এমন লোকের সংখ্যাই অধিক হবে।"

উক্ত সমাবেশে বনী উমাইয়্যার নিষ্ঠাবান সমর্থক ও বন্ধু আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন। শত্রুর প্রতি সরকারের ওয়ালীর এমন দুর্বল অবস্থান দেখে তিনি মর্মাহত হন। ক্ষোভের সাথে তিনি নু'মানকে বলেন ঃ 'এ ব্যাপারে আপনার অবস্থান অতি দুর্বল। এখন কোমল হওয়ার সময় নয়; শত্রুর বিরুদ্ধে এখন আপনার কঠোর হওয়া উচিত।' জবাবে নু'মান বললেন ঃ

'আমি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে শক্ত হওয়ার চেয়ে তাঁর আনুগত্যে দুর্বল থাকা বেশী পসন্দ করি। আর আল্লাহ যে পর্দাটি টেনে দিয়েছেন তা আমি ছিন্ন করা সমীচীন মনে করিনা।' আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম সমাবেশ থেকে ফিরে ইয়াযীদকে লিখলেন ঃ 'মুসলিম ইবন আকীল কূফার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। যদি আপনার এখানকার শাসন কর্তৃত্বের প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনার আদেশ-নিষেধ কার্যকর করতে সক্ষম হবেন। নু'মান একজন ভীরু লোক, অথবা তিনি ইচ্ছা করেই ভীরু ও দুর্বল সেজেছেন।' ঠিক একই সময় একই রকম চিঠি ইয়াযীদকে লেখেন আম্মারা ইবন 'উকবা ও 'উমার ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস। এ সকল চিঠি পাওয়ার পর ইয়াযীদ কূফার ওয়ালীর পদ থেকে নু'মান ইবন বাশীরকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে 'উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে নিয়োগ করেন। আর নু'মান চলে যান শামে।[২৩] এটা হিজরী ৬০ (ষাট) সনের ঘটনা।[২৪]

অতঃপর ইয়াযীদ তাঁকে হিম্স-এর ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং ইয়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মু'য়াবিয়া (রা) তাঁকে কূফা থেকে সরিয়ে হিম্স-এ নিয়োগ করেন।[২৫]

হিজরী ৬৪ সনে ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার মৃত্যুর পর নু'মান শামের অধিবাসীদেরকে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) প্রতি আনুগত্যের আহবান জানান এবং তাঁর পক্ষ থেকে তিনি হিম্স-এর ওয়ালী নিযুক্ত হন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে প্রথমে তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে নিজেই খিলাফতের দাবীদার হিসেবে মানুষের বাই'য়াত গ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ, যদি এমন ঘটনা আদৌ ঘটতো তাহলে ইতিহাস ও সীরাতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে তা বর্ণিত হতো। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব।

নু'মানের (রা) মত আরো অনেকে শামে ইবন যুবাইরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এ অবস্থা দেখে মারওয়ান শামে যান এবং একটি বাহিনী প্রস্তুত করে দাহহাক ইবন কায়সের বিরুদ্ধে পাঠান। দাহহাক ছিলেন ইবন যুবাইরের পক্ষ থেকে শামের কয়েকটি অঞ্চলের শাসক। নু'মান এ সংবাদ পেয়ে শুরাহবীল ইবন জুল-কিলাবার নেতৃত্বে কিছু সৈন্য দাহহাকের সাহায্যে পাঠান। 'মারজে রাহিত' নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং দাহহাক পরাজিত ও নিহত হন। এ সংবাদ পেয়ে নু'মান রাতের অন্ধকারে হিম্‌স থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করেন। মারওয়ান তাঁকে ধাওয়া করে ধরার জন্য খালিদ ইবন 'আদী আল-কিলা'ঈর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান।

হিম্‌স-এর অদূরে 'বীরীন' নামক এক পল্লীতে তিনি খালিদের মুখোমুখি হন। খালিদ তাঁকে হত্যা করে মাথাটি কেটে এবং পরিবার-পরিজনকে বন্দী করে মারওয়ানের সামনে হাজির করে। নু'মানের স্ত্রী তাঁর স্বামীর এমন নির্মম পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি স্বামীর ছিন্ন মস্তকটি তাঁর কোলে দেওয়ার জন্য মারওয়ানের নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন ঃ এ মস্তকের হকদার আমি। আমাকেই দেওয়া হোক।

মারওয়ানের নির্দেশে লোকেরা নু'মানের (রা) মাথাটি তাঁর স্ত্রীর কোলে ছুড়ে মারে। এটা হিজরী-৬৫ সনের প্রথম দিকের, মতান্তরে ৬৪ সনের শেষ দিকের ঘটনা। তখন নু'মানের (রা) বয়স ছিল ৬৪ বছর।[২৬] ইবন হাযাম বলেন ঃ মারওয়ান নু'মানকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতায় আরোহনকে উদ্বোধন করেন।

'আব্বাসী আমলের প্রখ্যাত কবি আবুল 'আলা আল-মা'য়াররীর জন্মস্থান 'মায়'য়াররাতুন নু'মান'। স্থানটির পূর্ব নাম ছিল শুধু 'মা'য়াররা'। নু'মান একবার সেখানে ভ্রমণে যান। তখন তাঁর একটি ছেলে মারা যায় এবং তাকে সেখানে দাফন করা হয়। সেখান থেকে স্থানটি আন-নু'মানের প্রতি আরোপ করে 'মা'য়ারাতুন নু'মান' হিসাবে প্রসিদ্ধি পায়।[২৭]

নু'মানের (রা) স্ত্রী ছিলেন আরবের 'কাল্‌ব' গোত্রের মেয়ে। তাঁর সম্পর্কে একটি আজব কথা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এক সময় মু'য়াবিয়ার (রা) অন্দর মহলে ছিলেন। মু'য়াবিয়া একদিন ইয়াযীদের মা মাবসূনকে বললেন, তুমি যেয়ে একবার এই মহিলাকে দেখে এসো তো। মাব্‌সূন তাঁকে দেখে এসে বললেন, রূপ ও সৌন্দর্য্যে এ মহিলা অনন্যা। কিন্তু তাঁর নাভীর নীচে একটি তিল আছে। এ কারণে সে তার স্বামীর ছিন্ন মস্তক নিজের কোলে ধারণ করবে।

এই মহিলাকে প্রথমে হাবীব ইবন মাসলামা বিয়ে করেন। তাঁর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে নু'মান তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি নিহত হলে স্ত্রী হিসাবে তাঁর কর্তিত মাথা কোলে ধারণ করেন। এভাবে মাবসূনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।[২৮]

নু'মানের (রা) সন্তানদের মধ্যে তিনটি ছেলে মুহাম্মাদ, বাশীর ও ইয়াযীদ খ্যাতিমান হন। বহুদিন যাবত মদীনা ও বাগদাদে তাঁর বংশধারা বিদ্যমান ছিল।[২৯]

হাদীস ও ফিকাহ্‌-তে নু'মানের (রা) গভীর জ্ঞান ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ও

অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন যদিও তিনি জ্ঞান বিতরণের মহান দায়িত্ব পালন করতে পারেননি, তবে তিনি যেখানেই শাসকের দায়িত্ব নিয়ে গেছেন, সেই স্থানটি ফিকাহ ও হাদীস চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাঁর সামনে অসংখ্য মামলা আসতো, তিনি স্বীয় জ্ঞান ও মেধা দ্বারা তা ফয়সালা করতেন।

রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের সময় যদিও তিনি আট বছরের বালক মাত্র, তবুও অনেক হাদীস তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীকালে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) ও 'উমারের (রা) সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। তাঁদের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। তাছাড়া তাঁর মামা আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) নিকট থেকেও বহু হাদীস শুনেছেন।[৩৩]

হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দারুণ সর্তক ও রক্ষণশীল। তা সত্ত্বেও তাঁর সনদে মোট ১২৪ (একশত চব্বিশ)টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারমধ্যে পাঁচটি হাদীস বুখারী ও মুসলিম মুত্তাফাক আলাইহি এবং বুখারী অন্য একটি ও মুসলিম অন্য চারটি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৩১] তিনি বিচার-ফায়সালার সময় হাদীসের উদ্ধৃতি দিতেন। একবার একটি মামলার বিচারের সময় বললেন, আমি এ মামলার ফায়সালা এমনভাবে করবো যেমন ফায়সালা করেছিলেন রাসূল (সা) এক ব্যক্তির মামলার।[৩২]

তিনি শরী'য়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। অধিকাংশ সময় এ জবাব দিতেন খুতবা বা বক্তৃতা-ভাষণের মধ্যে। তাঁর খুতবা বা ভাষণ হতো দুই প্রকার ঃ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বাগ্মী ব্যক্তি। তাঁর ভাষণ হতো অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায়। বাচন ও প্রকাশ ভঙ্গিতে তাঁর যে নৈপুণ্য ছিল তার স্বীকৃতি দিয়েছেন সিমাক ইবন হারব এভাবে ঃ 'আমি যে সকল মানুষের ভাষণ শুনেছি, তাঁদের মধ্যে নু'মান ইবন বাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলে মনে হয়েছে।'[৩৩]

খুতবার মধ্যে স্থান-কাল অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতেন। যেমন, একবার তিনি খুতবার মধ্যে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। 'শুনেছি' বলার সাথে সাথে আঙ্গুল দিয়ে দুই কানের দিকে ইঙ্গিত করলেন।[৩৪] একবার ভাষণে তিনি রাসূলুল্লাহর (রা) অবস্থা বর্ণনা করেন এভাবে ঃ 'ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নিম্নমানের খোরমাও রাসূলুল্লাহর (রা) জুটতো না। আর এখন নানা জাতের উৎকৃষ্ট খোরমা ও মাখন ছাড়া তোমাদের রুচি হয় না।'[৩৫]

একবার তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। ভাষণে জামা'য়াতবদ্ধ জীবনকে আল্লাহর রহমত এবং বিচ্ছিন্নতাকে আল্লাহর আযাব ও অভিশাপ হিসেবে চিত্রিত করলেন। সমাবেশে প্রখ্যাত ইমাম আল-বাহিলীও উপস্থিত ছিলেন। ভাষণ শেষে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমাদের ওপর 'আস্-সাওয়াদ আল-আ'জাম'-এর অনুসরণ ফরজ।[৩৬]

বক্তৃতা-ভাষণের সময় তাঁর মুখ থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের সংখ্যা অগণিত। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হলো ঃ শা'বী, হুমাইদ ইবন

'আবদির রহমান, খায়সামা ইবন' আবদির রহমান, সালেম ইবন আবিল জু'দ, আবু ইসহাক সুবাঈ', আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর, ইয়াসী' আল-কিন্দী, হাবীব ইবন সালেম (নু'মানের সেক্রেটারী), আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'উতবা, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু কিলাবা আল-জুরমী, আবু সালাম আল-আসওয়াদ, গায়রায আবী সুফরাহ, আযহার ইবন 'আবদিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবন নু'মান, আবু সাল্লাম মামতূর প্রমুখ।[৩৭]

নু'মান (রা) ছিলেন একজন সাহিত্য ও কাব্যরসিক মানুষ। গদ্য সাহিত্যে যেমন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তেমনিভাবে কাব্য সাহিত্যেও তাঁর পদচারণা দেখা যায়। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সীরাতের গ্রন্থসমূহে কিছু কবিতা তাঁর নামে সংকলিত হয়েছে। আল-কুরতুবী 'আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থে তাঁর কিছু শ্লোক সংকলন করেছেন। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ানও আছে।[৩৮]

নু'মান (রা) বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-হাঙ্গামা, নানা ধরনের ওলট-পালট ও বিপ্লবের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও যুলুম-অত্যাচার একেবারেই পসন্দ করতেন না। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং কোমল মনের মানুষ ছিলেন। ঝগড়া-বিবাদে কঠোরতা ও শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে মমতা ও ভালোবাসা দ্বারা মানুষের মন জয় করতেন। ঐতিহাসিক তাবারী বলেছেন ঃ 'তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ ধৈর্যশীল এবং 'আবেদ ব্যক্তি। যিনি মানুষকে ক্ষমা করতে ভালোবাসতেন।'

মুসলিম ইবন 'আকীলের ঘটনা এবং এ সম্পর্কে নু'মানের (রা) ভাষণ, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তাঁর সহনশীল ও উদার নীতির রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একবার তিনি কায়স ইবন আল-হায়সামকে একটি চিঠিতে লেখেন ঃ 'তুমি একজন দারুণ হতভাগ্য ব্যক্তি। আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেছি এবং তাঁর হাদীস (বাণী) শুনেছি। আর তোমরা না তাঁকে দেখেছো, না তাঁর মুখ থেকে হাদীস শুনেছো। তিনি বলেছেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ধারাবাহিক ফেতনা-ফাসাদ দেখা দেবে। তখন মানুষ সকালে মুসলমান হলে সন্ধ্যা হতে না হতে আবার কাফির হয়ে যাবে। মানুষ সামান্য পার্থিব সুযোগ-সুবিধার লোভে নিজের দ্বীন বিক্রি করবে।[৩৯] তবে তাঁর এ কোমল ও নম্র স্বভাব ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণে ছিল না। তিনি যেমন ধৈর্য ও সহনশীলতার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য, তেমনি ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতায় অতুলনীয়।

তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের দানশীল ব্যক্তি। বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি যখন হিম্‌স-এর ওয়ালী তখন একবার কবি আল-আ'শা আল-হামাদানী তাঁর নিকট এসে বললেন, আমি ইয়াযীদের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছি, কিন্তু তিনি কোন সাড়া দিলেন না। এখন এসেছি আপনার কাছে। আত্মীয়তার হক কিছু আদায় করুন। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করুন। নু'মানের (রা) হাতে তখন কোন অর্থ ছিল না। তিনি শপথ করে বললেন, আমার কাছে কিছুই নেই। তারপর কিছু চিন্তা করে বললেন ঃ 'হুঁ!' এরপর মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রায় বিশ হাজার

লোকের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। যার সারকথা নিম্নরূপ ঃ[৪০]

ওহে জনমণ্ডলী! আল-আ'শা আল-হামাদীনী আপনাদের এক চাচার ছেলে। অভিজাত বংশের একজন মুসলিম। তার কিছু অর্থের প্রয়োজন। আর এ উদ্দেশ্যেই সে আপনাদের নিকট এসেছে। এখন আপনাদের ইচ্ছা কি? জনতা সমস্বরে বলে উঠলো ঃ আপনি যা বলবেন আমরা তা শুনবো। তিনি বললেন ঃ আমার কোন নির্দেশ নেই। জনতা বললো ঃ তাহলে আমরা এখানে উপস্থিত প্রত্যেকে এক দীনার করে দান করবো। তিনি বললেন ঃ না। দুইজনে এক দীনার করে দিন। সকলে সম্মত হলে তিনি বললেন ঃ আমি বাইতুলমাল থেকে তাঁকে এ অর্থ দিয়ে দিচ্ছি। যখন বেতন/ভাতার অর্থ আসবে তখন সকলের কাছ থেকে উসূল করা হবে। নু'মান (রা) এভাবে ঋণগ্রস্ত আল-আ'শাকে দশ হাজার দীনার দানের ব্যবস্থা করেন। এটা আল-ইসতীয়াব গ্রন্থকারের বর্ণনা। উসুদুল গাবা গ্রন্থকার ইবনুল আসীর বলেন, চল্লিশ হাজার। কবি আল-আ'শা আল-হামাদানী এ জন্য নু'মানের (রা) প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। নু'মানের (রা) প্রশংসায় তিনি একটি কবিতাও রচনা করেছেন। কবিতাটির কয়েকটি শ্লোকের অর্থ নিম্নরূপ ঃ[৪১]

১. প্রয়োজনের সময় দানশীল নু'মান ইবন বাশীরের মত আর কাউকে পাইনি।

২. তিনি যখন কোন কথা বলেন তখন সে কথা পূর্ণ করেন। তিনি সেই ব্যক্তির মত নন যে জনগণের প্রতি ধোঁকাবাজির রশি ঝুলিয়ে দেয়।

৩. যদি তিনি একজন আনসারী না হতেন তাহলে আমি সেই ব্যক্তির মত হতাম, যে কোথাও যেয়ে কিছু না পেয়েই ফিরে আসে।

৪. আমি যখন নু'মানের অকৃতজ্ঞ হবো তখন আমার মধ্য থেকে কৃতজ্ঞতার স্বভাব বিলীন হয়ে যাবে। আর অকৃতজ্ঞ মানুষের মধ্যে ভালো কিছু থাকে না।

শৈশবে নু'মান (রা) যেহেতু রাসূলে কারীমের (সা) অতি সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, এ কারণে তাঁর খুঁটিনাটি অনেক আচার-আচরণের বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁর এ ধরনের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) রাতের ইবাদাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুইখানি পা ফুলে যেত।[৪২] তেমনিভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূল (সা) কিভাবে নামাযের কাতার সোজা করতেন এবং কাতার সোজা করার প্রতি কতখানি গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূল (সা) দেখেন এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে চলে গেছে। তখন তিনি বলেন ঃ ওহে আল্লাহর বান্দারা! হয় তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন।[৪৩]

'উম্মুল মুমিনীন আ'য়িশা (রা) ছিলেন আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কন্যা। নু'মান (রা) বলেন ঃ একদিন আবু বকর গেলেন মেয়ে-জামাই-এর সাথে দেখা করতে। ভিতরে

ঢোকার অনুমতি চেয়ে শুনতে পেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) কথার উপরে মেয়ে আ'য়িশার চড়া গলার কথা। তিনি ঢুকেই রাসূলুল্লাহর (সা) কথার উপরে কথা বলছো— এই বলে মেয়েকে থাপ্পড় মারতে উদ্যত হলেন। রাসূল (সা) দ্রুত মাঝখানে দাঁড়িয়ে আ'য়িশাকে মার থেকে বাঁচালেন। আবু বকর রাগান্বিত অবস্থায় মেয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন রাসূল (সা) আ'য়িশাকে বললেন ঃ দেখলে তো, তোমাকে আমি মার থেকে বাঁচালাম? কিছুদিন পর আবু বকর আবার মেয়ে-জামাইর বাড়ী গেলেন। দেখলেন, তাঁদের সম্পর্ক স্বাভাবিক। তখন তিনি বললেন ঃ তোমাদের শান্তির সময় তোমরা আমাকে প্রবেশের অনুমতি দাও, আবার যুদ্ধের সময়ও অনুমতি দিয়ে থাক। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ আমরা এই করেছি, আমরা এই করেছি।[৪৪]

একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, সে বেশীরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করাই হচ্ছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আর স্বীকার না করা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা।

এভাবে আল্লাহর রাসূলের (সা) জীবনের নানা দিক তাঁর বিভিন্ন বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

নু'মান (রা) ইতিহাসের এক বিভ্রান্তির অধ্যায়ে মু'য়াবিয়া (রা) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদের পক্ষ অবলম্বন করলেও কোথাও কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেছেন, এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সত্যের ওপর যে তিনি অটল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আবদুল্লাহ ইবন জুবাইরের (রা) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জীবন দানের মধ্যে। কূফার মসনদ ত্যাগ করেছেন তবুও ইমাম হুসাইনের প্রতিনিধি মুসলিম ইবন 'আকীলের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়াতে রাজী হননি। রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যের কল্যাণে এমন উন্নত নৈতিকতার অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম-৯/৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/৪১১
২. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৮
৪. আল-ইসাবা-১/১৫৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৪১০
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪, ৫৮০; আল-ইসাবা-১/১৫৮; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৯
৬. তাবাকাত-৬/৫৩; আল-ইসতীয়াব-৩/৫৫১
৭. তাবাকাত-৬/৫৩
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪, ২৭২
৯. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৩/৪১২
১১. প্রাগুক্ত-৩/৪১০

১২. মুসনাদ-৪/২৪৮; আল-ইসাবা-১/১৫৮, সহীহ মুসলিমেও ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।
১৩. আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫২
১৪. মুসনাদ-৪/৭১, ২৬৯
১৫. প্রাগুক্ত-৪/২৭০
১৬. প্রাগুক্ত-৪/২৭২
১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৪/৯
১৮. উসুদুল গাবা-৫/২৩
১৮. ইয়া'কূবী তারীখ-২/২২৫
২০. আল-আ'লাম-৪/৯
২১. তারীখুল কুজাত-৩/২০১; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯ ইয়াকূবী-২/২২৮
২২. ইয়া'কূবী- ২/২৭৮
২৩. তাবারী-৭/৩৮, ৩৯, ২২৮
২৪. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
২৫. আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫২; আল-আ'লাম-৯/৪; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
২৬. তাবাকাত-৬/৫৩; আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫৪; সিয়ারু আ'লাম, আন-নু'বালা-৩/৪১২; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪
২৭. আল-আ'লাম; টীকা-৯/৪; মু'জামুল বুলদান-৫/১৫৬
২৮. ইয়া'কূবী-২/৩০৫; আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫৫
২৯. আল-আ'লাম-৯/৪
৩০. আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৩/৪১১; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-১/১২৯
৩২. মুসনাদ- ৪/২৭২
৩৩. তাবাকাত-৬/৫৪; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯; তাহজীবুত তাহজীব-১০/৪৪৮
৩৪. মুসনাদ-৪/২৬৯
৩৫. প্রাগুক্ত-৪/২৬৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩০৪
৩৬. মুসনাদ-৪/১৭৮
৩৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-৩/৪১২; আল-ইসাবা-৩/৫৫৯
৩৮. আল-আ'লাম-৯/৪
৩৯. মুসনাদ-৪/২৭৭
৪০. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা- ৩/৪১২; আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫২
৪১. আল-ইসতী'য়াব-৩/৫৫৩
৪২. হায়াতুস সাহাবা-৩/৯
৪৩. প্রাগুক্ত-৩/১২৪-১২৫
৪৪. প্রাগুক্ত-২/৫৭২।

সামুরা ইবন জুনদুব আল ফাযারী (রা)

সামুরা আল ফাযারীর (রা) অনেকগুলি কুনিয়াত বা ডাকনাম সীরাতের গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। যথা: আবূ সাঈদ, আবূ আবদির রহমান, আবূ আবদিল্লাহ, আবূ সুলায়মান ও আবূ মুহাম্মদ।[১] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) একজন সাহাবী। ইতিহাসে তিনি একজন সাহসী নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধ।[২] ইমাম জাহাবী বলেন: তিনি ছিলেন আলিম (জ্ঞানী) সাহাবীদের একজন।[৩]

সামুরা (রা) মদীনার আনসার সম্প্রদায়ের সন্তান নন। মূলত তিনি বনু ফাযারার সন্তান। ইবন ইসহাক বলেন ঃ তিনি মদীনার আনসারদের একজন হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ বন্ধু ছিলেন।[৪] তাঁর পিতা জুনদুব ইবন হিলাল আল ফাযারী ছিলেন বসরার অধিবাসী। সামুরা বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সেই সামুরা পিতৃহারা হন। তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মদীনায় আসেন এবং আনসারদের কাউকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তবে শর্ত দেন, যে তাঁকে বিয়ে করবেন, সন্তান সামুরাসহ তাঁর সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী থাকতে হবে। মুররী ইবন শায়বান ইবন সা'লাবা তাঁর এ শর্ত মেনে নিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। সামুরা (রা) তাঁর এই সৎ পিতা মুররী ইবন শায়বানের তত্ত্বাবধান ও স্নেহছায়ায় বেড়ে ওঠেন।[৫]

সামুরা (রা) হিজরাতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। যুদ্ধে যাওয়ার বয়স না হওয়ায় তিনি হিজরী দ্বিতীয় সনের বদর যুদ্ধে যোগদানের অনুমতি পাননি। উহুদ যুদ্ধের সময় আরো কিছু আনসার কিশোরের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার আশায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হন। রাসূল (সা) সামুরার একজন সাথীকে নির্বাচন করেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে দেন। তখন সামুরা বলেন ঃ আপনি তাকে নির্বাচন করলেন এবং আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। অথচ আমি তার চেয়েও শক্তিশালী। বিশ্বাস না হলে আমাদের কুস্তি লাগিয়ে দেখতে পারেন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) তাঁদের দুজনের কুস্তি লাগার নির্দেশ দেন। কুস্তিতে সামুরা তাঁর প্রতিপক্ষ কিশোরকে উঁচু করে ফেলে দেন। তাই দেখে রাসূল (সা) তাঁকেও রণক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি দান করেন।[৬] ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) সামুরা ইবন জুনদুব ও রাফে' ইবন খাদীজকে উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন তাঁদের দুইজনেরই বয়স পনেরো বছর।[৭] উহুদের পর থেকে সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন।

রাসূলে করীমের (সা) জীবনকালে তিনি মদীনায় বসবাস করেন। পরে তিনি বসরায় বসতি স্থাপন করে।[৮] হিজরী ৫০ সনে কূফার ওয়ালী মুগীরা ইবন শু'বার (রা) মৃত্যুর পর মু'য়াবিয়া (রা) কূফার সাথে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে বসরার ইমারাতের দায়িত্বও যিয়াদ ইবন সুমাইয়্যার ওপর অর্পণ করেন। যিয়াদ সামুরাকে (রা) স্বীয় প্রতিনিধি ও সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। যিয়াদ ছয় মাস করে বসরা ও কূফায় অবস্থান

করতেন। সামুরাও উভয় স্থানে তাঁর অনুপস্থিতির সময় দায়িত্ব পালন করতেন। যিয়াদ বসরায় থাকলে তিনি কূফায় এবং তিনি কূফায় থাকলে সামুরা বসরায়–এভাবে।[৯]

যিয়াদের শাসনকাল নানা দিক দিয়ে স্মরণযোগ্য। তাঁর সময়ে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো যে, কোনপ্রকার বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ তাঁর সময়ে বসরা ও কূফায় দেখা দিতে পারেনি। খারেজী বিপ্লবপন্থীদের একটি দল, যারা পূর্ব থেকেই সেখানে বিদ্যমান ছিল, একবার মাথা উঁচু করলে ভালোমত তাদের দমন করা হয়।

চতুর্থ খলীফা আলীর (রা) জীবদ্দশায় খারেজীদের উদ্ভব হয়। এক সময় তারা আলীরই (রা) অনুসারী ছিল। পরে তারা অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী দল হিসাবে নিজেদেরকে পরিচিত করে তোলে। 'নাহরাওয়ান'–এর যুদ্ধে তারা আলীর (রা) বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় এবং তাদের অনেক সাহসী যোদ্ধা মারা যায়। তবে তাদেরকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। সুযোগ পেলেই তারা মাথা উঁচু করে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করতো। এই উগ্রপন্থীদের হাতে বহু সাহাবীসহ অসংখ্য নিরপরাধ মুসলমানের রক্ত ঝরেছে। খলীফা আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন এই পথভ্রষ্ট চরমপন্থীদের হাতে।[১০] বসরা ও কূফা ছিল তাদের মূল কেন্দ্র। যিয়াদ তাদের নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সিদ্ধান্ত সামুরার (রা) সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যায়।[১১] ইবন হাজার বলেন ঃ সামুরা ছিলেন খারেজীদের প্রতি ভীষণ কঠোর।[১২] ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়, যিয়াদ ও তাঁর ছেলে 'উবায়দুল্লাহ বসরায় প্রায় সত্তর হাজার লোক হত্যা করেন। আর এর সাথে সামুরাও জড়িত ছিলেন।[১৩] ইমাম জাহাবী বলেছেন ঃ সামুরা (রা) বহু মানুষ হত্যা করেছেন।[১৪]

আমের ইবন আবী 'আমের বলেন ঃ আমরা ইউনুস ইবন হাবীবের মজলিসে বসা ছিলাম। উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ এই যমীন যে পরিমাণ রক্ত চুষেছে পৃথিবীর আর কোন ভূ-খণ্ড তেমন চোষেনি। এখানে সত্তর হাজার মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আমি ইউনুসকে কথাটি হত্যা কিনা তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ হাঁ। প্রশ্ন করা হলোঃ এ কাজ কারা করেছে? বললেন ঃ যিয়াদ, তাঁর ছেলে উবায়দুল্লাহ ও সামুরা।[১৫] ইমাম আল কুরতুবী বলেন ঃ "সামুরার নিকট কোন খারেজীকে আনা হলে তিনি তাকে হত্যা করতেন এবং বলতেন ঃ আকাশের নীচে এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম নিহত ব্যক্তি। কারণ, তারা মুসলমানদের কাফির বলে এবং মানুষের রক্ত ঝরায়"।[১৬]

সামুরার এমন কঠোরতার কারণে খারেজীরা ছিল তাঁর প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ। তারা সামুরাকে খারাপ জানতো। তাঁর এরূপ আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাতো। পক্ষান্তরে বসরার তৎকালীন জ্ঞানী-গুনীরা যাঁদের মধ্যে ইবন সীরীন ও হযরত হাসান আল বসরীর মত খ্যাতিমান লোকও আছেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। তাঁরা সামুরার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতেন।[১৭]

ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত এ সকল তথ্য দেখে আজ আমাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, সামুরার (রা) মত একজন সাহাবীর হাত মানুষের রক্তে রঞ্জিত

হতে পারে কিভাবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ইতিহাসের সকল তথ্য হাদীসের মত সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। হতে পারে তৎকালীন গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। এমন নজীর ইতিহাসে বিরল নয়।

তাছাড়া ইতিহাসের এ অধ্যায়টি বুঝার জন্য খারেজীদের উদ্ভব, বিকাশ, তাদের দর্শন, সর্বোপরি বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তাদের নির্মম আচরণ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা থাকা দরকার। তারা একটি চরমপন্থী ভ্রান্ত দল হিসেবে চিহ্নিত। ইতিহাসের একটি অধ্যায়ে তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ। নির্বিচারে তারা হত্যা করেছে বিরুদ্ধবাদীদের। রাসূলুল্লাহর (সা) বিপুলসংখ্যক সাহাবী তাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। সামুরার (রা) মন্তব্যেও এই সত্য ফুটে উঠেছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একজন শাসক হিসেবে তাদের প্রতি নির্মম হওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আর এ কারণে, ইবন সীরীন ও হযরত হাসান আল বসরীর মত শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহর (সা) একজন মহান সাহাবী অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত ঝরাতে পারেন না।

হিজরী ৫৩ সনে যিয়াদের মৃত্যু হলে রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হয়। বসরা এবং কূফা দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা লাভ করে এবং দুই প্রদেশে দুইজন ওয়ালী নিয়োগ লাভ করেন। সামুরা বসরার ওয়ালী হন এবং প্রায় একবছর এ পদে বহাল থাকেন।[১৮] হিজরী ৫৪ সনে আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নির্দেশে এ পদ থেকে তিনি অপসারিত হন।

সামুরা ইবন জুনদুবের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে মত পার্থক্য আছে। হিজরী ৫৮, ৫৯ ও ৬০ সনের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৯] ইবনু ইমাদ আল হাম্বলী হিজরী ৬০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।[২০] তিনি বসরা না কূফায় মারা যান, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।[২১] কেউ কেউ বলেছেন, তিনি বসরার ওয়ালী ছিলেন এবং কূফায় মারা যান। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কূফায় মৃত্যুবরণকারী রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বশেষ সাহাবী।[২২]

সামুরার (রা) মৃত্যু হয় অস্বাভাবিক ভাবে। শেষ জীবনে তিনি ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভব করতেন। চিকিৎসা স্বরূপ দীর্ঘদিন গরম পানিতে বসে শরীর গরম করতেন। অবশেষে এটা কালব্যাধিতে রূপ নেয়। একদিন ভীষণ ঠাণ্ডা অনুভব করতে থাকেন। তাঁর চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হলো; কিন্তু কোন কাজ হলো না। তিনি বললেন, আমার পেটে যে কি অবস্থা হচ্ছে, তা বুঝাবো কি করে। এমন এক অস্থিরতার মধ্যে হাঁড়ির গরম পানিতে বসতে গিয়ে টগবগ করে ফুটন্ত পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।[২৩] হিলাল ইবন উমাইয়া বলেন, তিনি সেঁক দিতে গিয়ে অসতর্ক অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারা যান। যদি এ বর্ণনা সত্য হয় তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ছিল দুনিয়ার আগুন। আখেরাতের আগুন নয়।[২৪] ইবন আবদিল বার বলেন, সামুরার এভাবে মৃত্যু হওয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।

হযরত সামুরার (রা) মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলে কারীমের (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণী 'রিজাল ও সীরাত' শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে দেখা যায়। আনাস ইবন হাকীম আদ-দাব্বী বলেন, আমি মদীনায় ঘোরাফেরা করছিলাম। হঠাৎ আবূ হুরাইরার সাথে দেখা হলো। অন্য কোন কথা বলার আগেই তিনি সামুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি সামুরা বেঁচে থাকার খবর দিলে খুব খুশী হলেন। তারপর বললেন ঃ আমরা দশজন এক বাড়ীতে একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলাম। এক সময় তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। তারপর দরজার দুইটি বাজু ধরে বললেনঃ 'আখেরুকুম মাওতান ফিন্ নার।'– তোমাদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী আগুনে যাবে অথবা আগুনে পুড়ে মৃত্যু হবে। আমাদের সেই দশজনের আটজন মারা গেছে। বেঁচে আছি আমি ও সামুরা। এখন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের চেয়ে আর কোন কিছু প্রিয়তর আমার কাছে নেই।[২৫] কোন কোন বর্ণনায় দশজনের স্থলে তিনজনের কথা এসেছে। তারা হলেনঃ সামুরা, আবূ মাহজুরা ও আবূ হুরাইরা।[২৬]

উল্লেখিত দলটির মধ্য থেকে হযরত সামুরা যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করেছেন, সে ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে আবূ মাহজুরা ও আবূ হুরাইরার (রা) মধ্যে কে আগে মারা গেছেন সে ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবূ হুরাইরা (রা) আগে মারা গেছেন। বালাজুরী বলেন ঃ সামুরা বসরায় এবং আবূ মাহজুরা মক্কায় জীবিত ছিলেন। তাই হিজায থেকে কেউ বসরায় গেলে সামুরা জিজ্ঞেস করতেন আবূ মাহজুরা সম্পর্কে, আবার কেউ বসরা থেকে মক্কায় গেলে আবূ মাহজুরা জিজ্ঞেস করতেন সামুরা সম্পর্কে। এভাবে একদিন আবূ মাহজুরা মারা যান সামূরার আগে।[২৭]

আউস ইবন খালিদ বলেন ঃ আমি আবূ মাহজুরার কাছে গেলে তিনি সামূরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আবার সামুরার কাছে গেলে তিনি আবূ মাহজুরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।[২৮] কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত আনাস ইবন হাকীমের বর্ণনা এবং তাউসের একটি বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবূ হুরাইরার আগেই আবূ মাহজুরা মারা যান। যেমন তাউস বলেনঃ কেউ আবূ হুরাইরাকে ভয় দেখাতে চাইলে বলতোঃ সামুরা মারা গেছেন একথা শুনেই তিনি হঠাৎ চিৎকার দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে যেতেন।[২৯]

সামুরার (রা) সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে সুলায়মান ও সা'দ নামে তাঁর যে দুই ছেলে ছিল, একথা জানা যায়। তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও অতি মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন। রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায় যদিও তিনি ছিলেন একজন তরুণ, তবুও রাসূলুল্লাহর (সা) অসংখ্য হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেন। ইমাম আল-কুরতুবী বলেন ঃ তিনি ছিলেন বেশী পরিমাণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনাকারী-হাদীসের হাফেজদের একজন।[৩০] 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের লিখিত একটি কপি তাঁর ছেলের কাছে ছিল।[৩১] ইবন সীরীন বলেন, এই পুস্তিকাটি ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার।[৩২]

সামুরা (রা) হাদীস স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ যা কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইতেন, পারতেন। রাসূলে করীম (সা) নামাযের মধ্যে দুইটি স্থানে চুপ থাকতেন। একটি 'তাকবীর তাহরীমার পরে যখন 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' পড়তেন। অন্যটি সূরা ফাতিহা পাঠের পর যখন 'আমীন' বলতেন। এ বিষয়টি সামুরার স্মরণ ছিল এবং তিনি তা আমলও করতেন। কিন্তু 'ইমরান ইবন হুসাইনের (রা) বিষয়টি মনে ছিলনা। একবার সামুরা (রা) নামাযে রাসূলুল্লাহর (সা) আমলের অনুসরণ করলে ইমরান (রা) প্রতিবাদ করলেন। বিষয়টি উল্লেখ করে সঠিক তথ্য জানার জন্য মদীনায় উবাই ইবন কা'বকে (রা) চিঠি লেখা হলো। জবাবে তিনি লিখলেন, সামুরা সত্য বলেছে। তাঁর ঠিকই স্মরণ আছে।[৩৩]

একবার ভাষণ দানকালে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে সা'লাবা ইবন 'আব্বাদ আল-আবদী ছিলেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয়বার যখন সামুরা হাদীসটি বর্ণনা করেন, তখন শব্দের মধ্যে কোন তারতম্য দেখা গেলনা।[৩৪] প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনায় দারুণ সতর্ক ও রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে বহু কিছু শুনেছি। কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের প্রতি আমার আদব তার সব বর্ণনা থেকে আমাকে বিরত রাখে। তাঁরা আমার চেয়ে বয়সে বড়। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে আমি ছিলাম একজন তরুণ। তা সত্ত্বেও যা কিছু শুনতাম, স্মৃতিতে ধারণ করতাম।[৩৫]

কখনো কখনো তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তাতে কারো মনে কোনপ্রকার সন্দেহ দেখা দিলে তিনি জবাব দিয়ে তা দূর করতেন। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযার বর্ণনা শুনে প্রশ্ন করলো ঃ খাবার কি বেড়ে গিয়েছিল? তিনি বললেন ঃ বিস্ময়ের কি আছে? তবে আসমান ছাড়া আর কোথা থেকে এ বৃদ্ধি ঘটেছিল?[৩৬]

সামুরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ 'উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ থেকে শোনা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর সনদে মোট ১২৩টি (একশত তেইশ) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলোঃ

'ইমরান ইবন হুসাইন, শা'বী, ইবন আবী লায়লা, 'আলী ইবন রাবী'য়া, 'আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদা, হাসান আল-বসরী, মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, মুতরিফ ইবন শুখাইর, আবুল 'আলা' আল- আতারাদী, কুদামা ইবন ওয়াবরা, যায়িদ ইবন 'উকবা, রাবী 'ইবন 'উমাইলা, হিলাল ইবন লিয়াফ, আবূ নাদরা আল-'আবদী, সা'লাবা ইবন আব্বাদ, আবূ কিলাবা আল-জারমী, সুলায়মান ইবন সামুরা।[৩৭]

সামুরার (রা) মধ্যে বহুবিধ চারিত্রিক সৌন্দর্য্য বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ ইবন সীরীন বলেনঃ 'তিনি ছিলেন একজন পরম আমানতদার ও সত্যভাষী ব্যক্তি। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন।'[৩৮] রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।[৩৯]

আরবে 'আহনাফ' নামক এক ব্যক্তি বিশেষ একধরনের তরবারি তৈরী করেন, যা 'হানাফিয়্যা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটও একখানি এই তরবারি ছিল। সামুরা (রা) তার একটি নকল তৈরী করেন। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন সীরীনও তার নকল তৈরী করেন।[৪০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. উসুদুল গাবা–২/৩৫৪;তাহজীবুত তাহজীব–৪/২৩৬
২. আল–আ'লাম– ৩/২০৩
৩. সিয়ারু আ'লাম আন–নুবালা– ৩/১৮৩
৪. তাহজীবুত তাহজীব– ৪/২৩৬; আল–ইসাবা–২/৭৮
৫. আল–ইসতী'য়াব– ২/৭৯;আল-ইসাবা–২/৭৮; তাবাকাত–৬/৩৪
৬. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৬৬; আল–ইসাবা–২/৭৯; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
৭. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৬৬
৮. আল–আ'লাম–৩/২০৩
৯. আল–ইসতী'য়াব–২/৭৭; তাবাকাত–৬/৩৪; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
১০. তারিখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ–২/৮০
১১. তারীখু তাবারী–৭/৯১
১২. আল–ইসাবা–২/৭৯; তাহজীবুত তাহজীব–৪/২৩৬; আল–আ'লাম–৩/২০৪
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন–নুবালা–৩/১৮৫; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯১
১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৩
১৫. প্রাগুক্ত–১৮৫; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯১
১৬. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৭
১৭. আল-ইসাবা–২/৭৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৬; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯০
১৮. আনসাবুল আশরাফ–১/৪৯৬
১৯. উসুদুল গাবা–২/৫৫৫; তাহজীবুত তাহজীব–৪/২৩৭
২০. শাজারাতুজ জাহাব–১/৬৫
২১. আল-আ'লাম–৩/২০৪
২২. আনসাবুল আশরাফ–১/২৪৯
২৩. তাবাকাত–৬/৩৪; উসুদুল গাবা–২/৫৫৫
২৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৫
২৫. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৪
২৬. রাসূলুল্লাহর (সা) এই ভবিষ্যদ্বাণীটি দেখুন ঃ তাবাকাত–৬/২২; উসুদুল গাবা–২/৩৫৫; আল-ইসতী'য়াব–২/৫৮০; আল-ইসাবা–২/৭৯
২৭. আনসাবুল আশরাফ–১/৫২৭
২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৫; জাহাবী ঃ তারীখ–২/২৯১
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৮
৩১. তাহজীবুত তাহজীব–৪/১৯৮
৩২. আল-আ'লাম–৩/২০৪; আল-ইসাবা–২/৭৯; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
৩৩. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৭; উসুদুল গাবা–২/৩৫৫; মুসনাদ–৫/১৬
৩৪. মুসনাদ–৪/১৬
৩৫. মুসনাদ–৫/১৯; আল-ইসতী'য়াব–২/৭৯; উসুদুল গাবা–২/৩৫৪
৩৬. মুসনাদ–৫/১৮; হায়াতুস সাহাবা–৩/৬২৬
৩৭. আজ-জাহাবীঃ তারীখ–২/২৯০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৩; উসুদুল গাবা–২/৩৫৫
৩৮. আল-ইসতী'য়াব–২/৭৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–৩/১৮৫
৩৯. মুসনাদ–৫/১৮
৪০. প্রাগুক্ত–৫/২০

আবুল ইয়াসার কা'ব ইবন 'আমর (রা)

মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালেমা শাখার সন্তান আবুল ইয়াসার কা'ব (রা)। ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে তাঁকে শুধু আবুল ইয়াসার অথবা কা'ব অথবা উভয় নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। পিতা 'আমর ইবন আব্বাদ এবং মাতা নুসাইবা বিন্‌ত আযহার আল-মুর্‌রী। তিনিও বনু সালেমা গোত্রের কন্যা।[১] ইমাম জাহাবী তাঁর পিতার নাম 'উমার এবং আবুল ইয়াসারকে আনসারদের অন্যতম স্তম্ভ বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

আল-'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতে (শপথ) তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং ইসলামের ঘোষণা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করেন। অনেকে তখন তাঁর বয়স বিশ বছর বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরসহ পরবর্তীকালের সকল যুদ্ধে রাসূলে কারীমের (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন।[৪] বদর যুদ্ধে তিনি দারুণ সাহস ও বাহাদুরী দেখান। মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর ঝাণ্ডা ছিল প্রখ্যাত মুহাজির সাহাবী মুসয়াব ইবন 'উমাইরের আপন ভাই আবু 'আযীয ইবন 'উমাইরের হাতে। তিনি ঝটিকা বেগে অগ্রসর হয়ে তার হাত থেকে ঝাণ্ডা ছিনিয়ে নেন এবং তাকে বন্দী করেন।[৫] এ যুদ্ধে তিনি মুনাব্‌বিহ্ ইবন হাজ্জাজ নামক এক পৌত্তলিক সৈনিককে হত্যা করেন।[৬] তাছাড়া হযরত আব্বাসকে বন্দী করে রাসূলে কারীমের (সা) সামনে হাজির করেন। রাসূল (সা) আবুল ইয়াসারের ছোট-খাট দেহ এবং আব্বাসের বিশাল দেহের প্রতি তাকিয়ে অবাক হয়ে যান। তিনি আবুল ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আব্বাসকে কেমন করে বন্দী করলে? আবুল ইয়াসার বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁকে বন্দী করার ব্যাপারে আমাকে এমন এক ব্যক্তি সাহায্য করেছে যাকে এর আগে বা পরে আর কখনো আমি দেখিনি। লোকটি দেখতে এমন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ তাঁকে বন্দী করার ব্যাপারে কোন মহান ফিরিশতা তোমাকে সাহায্য করেছে।[৭] ইমাম আহমাদ আল-বারার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুল ইয়াসার আব্বাসকে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করলে আব্বাস বললেন ঃ এ ব্যক্তি আমাকে বন্দী করেনি। আমাকে বন্দী করেছে অন্য এক ব্যক্তি, যে দেখতে এমন। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ কোন ফিরিশতা তাকে সাহায্য করেছে।[৮]

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। বদরের কুরাইশ বন্দীদেরকে মদীনায় স্থানান্তরের জন্য রাসূল (সা) তাদেরকে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের আপন ভাই আবু 'আযীয ইবন উমাইর ছিলেন বন্দীদের একজন। তিনি পড়েন মুস'য়াব ও আবুল ইয়াসারের দায়িত্বে। আবুল ইয়াসারই তাকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বন্দী করেছিলেন। মদীনার দিকে চলার পথে মুস'য়াব তাঁর ভাই আবু আযীযের দুই হাত শক্ত করে বাঁধার জন্য আবুল ইয়াসারকে বলেন। একথা শুনে আবূ আযীয দুঃখের সাথে

বলেন ঃ ভাই, আমার ব্যাপারে তুমি এ কথাও বলতে পারলে? মুস'য়াব বললেন ঃ তুমি নও, এখন এই আবুল ইয়াসার আমার ভাই।[৯] ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে আবুল ইয়াসারের বদরে যোগদানের কথা বলেছেন। ইবন হিশাম তাঁকে বদরীদের মধ্যে গণনা করেছেন।[১০] বালাজুরী বলেছেন, বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স বত্রিশ বছর ছিল।[১১] কিন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ বছর বয়সে তিনি 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতে অংশ গ্রহণ করেন। তাহলে বদরের সময় বয়স বত্রিশ বছর হয় কি করে?

আবুল ইয়াসার খায়বার যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর সাথে জড়িত খায়বারের একটি ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী শত্রু বাহিনীর দুর্গ অবরোধ করে আছেন। এ সময় এক রাতে প্রতিপক্ষ জনৈক ইহুদীর এক পাল ছাগল অবরুদ্ধ দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল। রাসূল (সা) বললেনঃ কে আমাকে এই বকরীর গোশত খাওয়াতে পারবে? আবুল ইয়াসার সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ আমি পারবো। একথা বলেই তিনি বকরীর পালের দিকে ছুটে গেলেন। বকরীগুলি তখন দুর্গের আভ্যন্তরে প্রবেশ করছিল। তিনি পিছন দিকের দুইটি ধরে ফেললেন এবং তাদেরকে দুই বগলে চেপে ধরে নিয়ে এলেন। সঙ্গীরা বকরী দুইটি জবেহ করে রান্না করেছিল।[১২]

সিফ্ফীন ও পরবর্তী অন্যান্য ঘটনায় তিনি আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেছিলেন।[১৩] বদরী সাহাবীদের মধ্যে তখন তিনি একাই বেঁচে।[১৪]

হিজরী ৫৫ সনে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। কেউ কেউ বলেছেন, বদরী সাহাবীদের মধ্যে তিনি সর্বশেষে মারা যান।[১৫] শেষ জীবনে তিনি খায়বারের ঘটনাটি বর্ণনা করতেন, আর রসিকতা করে বলতেন, আমার কাছ থেকে তোমরা গ্রহণ কর। সাহাবীদের মধ্যে এখন আমিই শুধু বেঁচে আছি।[১৬] একথা দ্বারা তিনি শুধু বদরী সাহাবীদের কথা বুঝাতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সত্তর বছরের উর্দ্ধে। অনেকে এক শো বিশ বছরের কথা বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়।

আবুল ইয়াসারের দেহটি ছিল স্থূল ও বেঁটে। তবে পেশী ছিল পাকানো রশির মত শক্ত। পেটটি ছিল মোটা।[১৭]

তিনি খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে যা করতেন তাতে সীমাহীন সতর্কতা থাকতো। একবার উবাদাহ্ ইবন ওয়ালীদের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) দুইটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন তিনি নিজের চোখ ও কানের ওপর আঙ্গুল রেখে বলেন, আমার এ চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং এ কান রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছে।[১৮] ইমাম মুসলিম তাঁর দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস দুইটির ক্রমিক সংখ্যা হলো ৩০০৬ ও ৩০০৭। তবে ইমাম বুখারী তাঁর কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।[১৯]

তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 'উবাদাহ্ ইবন আল-ওয়ালীদ, মূসা ইবন তালহা, 'উমার ইবন হাকাম ইবন রাফে, হানজালা ইবন কায়স যারকী, সায়ফী-মাওলা আবূ আইউব আল-আনসারী এবং রিবা'ঈ ইবন খারাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২০]

তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু ও নরম দিলের মানুষ। বনু হারামের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু ঋণী ছিলেন। একদিন তাগাদা দিতে তার বাড়ীর দরজায় গিয়ে নাম ধরে ডাক দিলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। মনে করলেন, লোকটি বাড়ী নেই। তিনি ফিরে আসলেন এমন সময় একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আব্বা কোথায়? ছেলেটি বললো, তিনি তো আমার মায়ের চৌকির নীচে লুকিয়ে আছেন। তখন তিনি চিৎকার করে বললেন, এখন বেরিয়ে এসো। তুমি কোথায় আছ তা আমার জানা হয়ে গেছে। লোকটি বেরিয়ে এলো এবং তার অভাবের কাহিনী বর্ণনা করলো। আবুল ইয়াসারের অন্তর কোমল হয়ে গেল। লোকটির নিকট থেকে ঋণের দলিলটি চেয়ে নিয়ে লেখাগুলি কেটে দিলেন। তারপর বললেন, সম্ভব হলে পরিশোধ করবে। অন্যথায় সকল ঋণ মাফ করে দিলাম।[২১]

দাস-দাসীদের সাথে তিনি সাম্য ও সমতার আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজেও তা কাজে পরিণত করতেন। একদিন উবাদাহ্ ইবন ওয়ালীদ হাদীস শোনার জন্য তাঁর নিকট এসে দেখলেন, তাঁর দাসের সামনে এক গাদা বই। তিনি নিজে এক প্রস্থ চাদর ও একটি লুঙ্গি পরে আছেন। দাসের শরীরেও একই পোশাক। উবাদাহ্ বললেন, চাচা, ভালো হয় পোশাক একই জাতীয় এক জোড়া করে হলে। আপনি তার লুঙ্গিটি নিয়ে নিন এবং আপনার চাদরটি তাকে দিয়ে দিন। অথবা আপনার লুঙ্গিটি তাঁকে দিয়ে তার চাদরটি আপনি নিন। আবুল ইয়াসার তাঁর কথা শুনে তাঁর মাথার ওপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা যা পরবে দাসদেরও তাই পরতে দেবে, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে।[২২]

ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ আবুল ইয়াসারের সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি দু'আ বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি ধ্বংস থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই পতন থেকে। পানিতে ডোবা, আগুনে পুড়ে যাওয়া ও বার্দ্ধক্য থেকেও তোমার আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং তোমার রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পলায়নপর অবস্থায় ও বিষাক্ত জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের দংশনে মৃত্যু থেকে।[২৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল- ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা) ৪/২১৯.
২. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম- ২/৩৩৯
৩. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা - ২/৫৩৭; তারীখুল ইসলাম - ২/৩৩৯
৪. আল-ইসাবা- ৪/২২১
৫. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৫; আল-ইসতী'য়াব-৪/২২০
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭১৩
৭. তাবাকাত-৪/১২; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩৪;
৮. কানযুল উম্মাল-৫/২৬৬; হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩৩
৯. হায়াতুস সাহাবা- ২/৩১৫
১০. আস-সীরাহ-১/৬৬২, ১/৬৯৯

১১. আনসাবুল আশরাফ- ১/২৪৭
১২. মুসনাদ-৩/৪২৭; ইবন হিশাম-২/৩৩৬-৩৩৭
১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৭
১৪. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৭
১৫. তারীখুল ইসলাম-২/৩৩৯; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৭
১৬. মুসনাদ -৩/৪২৭; ইবন হিশাম-২/৩৩৭
১৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৭; আনসাবুল আশরাফ-২/২৪৭
১৮. মুসলিম -২/৪৫০
১৯. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৩৮
২০. প্রাগুক্ত - ২/৫৩৭
২১. মুসলিম-২/৪৫০
২২. মুসলিম- ২/৪৫১
২৩. হায়াতুস সাহাবা- ৩/৩৬৭

আসিম ইবন সাবিত ইবন আবিল আকলাহ (রা)

ভালো নাম 'আসিম, ডাকনাম আবু সুলাইমান। পিতা সাবিত ইবন আবিল আকলাহ কায়েস এবং মাতা আশ-শামুস বিন্‌তু আবী 'আমীর।[১] এই 'আসিম ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাবের পুত্র প্রখ্যাত তাবেঈ 'আসিমের নানা।[২] মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের সন্তান।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে আগে-ভাগেই ইসলাম গ্রহণকারী আনসারদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের সাথে তাঁর মুয়াখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক গড়ে দেন।[৪]

হযরত 'আসিম বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫] বদর যুদ্ধের পূর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) সকল যোদ্ধাকে একত্র করে যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে মতবিনিময় করলেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা, বলতো তোমরা কিভাবে লড়বে? সাথে সাথে হযরত 'আসিম তীর-ধনুক হাতে করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ দু'শো হাতের ব্যবধানে হলে তীর ছুড়বো। তার চেয়ে নিকটে হলে নিযা এবং তার চেয়ে আরো নিকটে হলে তরবারি দিয়ে আঘাত করবো। তাঁর একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ যুদ্ধের নিয়ম এটাই। 'আসিম যেভাবে লড়ে, তোমরা সেভাবেই লড়বে।[৬]

বদর যুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পতাকা প্রথমে তালহা ইবন আবীতালহার হাতে ছিল। হযরত আলীর হাতে সে নিহত হলে তার ভাই আবু সা'দ ইবন আবী তালহা তা তুলে নেয়। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের হাতে সে নিহত হলে 'উসমান বা 'উসাম ইবন তালহা তা উঠিয়ে নেয়। হযরত হামযার হাতে সে নিহত হয় এবং মুসাফি ইবন তালহা সেটি তুলে নেয়। হযরত 'আসিম ইবন সাবিত তাকে হত্যা করেন। তারপর তার ভাই আল-জুলাস ইবন তালহা, মতান্তরে কিলাব ইবন তালহা পতাকাটি তুলে ধরে। হযরত 'আসিম তীর মেরে তাকেও হত্যা করেন।[৭]

হযরত 'আসিম এই বদরে কুরাইশদের আর একজন অতি সম্মানিত ব্যক্তি 'উকবা ইবন আবী মু'য়াইতকে হত্যা করেন। এই 'উকবা ছিল একজন অতি নীচ প্রকৃতির লোক। সে ছিল মককায় রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমনদের একজন। নানাভাবে রাসূলকে (সা) কষ্ট দিত। ঝুড়ি ভরে ময়লা-আবর্জনা এনে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের দরজায় ফেলে রাখতো। একদিন তো রাসূল (সা) সিজদাবনত আছেন, কোথা থেকে এই নরাধম ছুটে এসে তাঁর মাথার ওপর এমনভাবে চেপে বসে যে, নবীজীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। আর একদিনের ঘটনা, নবীজী সিজদায় আছেন। এই পাষন্ড কোথা থেকে মরা ছাগলের নাড়িভুঁড়ি কাঁধে করে এনে রাসূলুল্লাহর (সা) মাথায় ঢেলে দেয়। এহেন পাপিষ্ঠ বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। হযরত রাসূলে কারীমের নির্দেশে হযরত 'আসিম তাঁকে

হত্যা করেন।[৮] অবশ্য ইবন হিশাম বলেন ঃ যুহ্‌রী ও আরো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, 'উকবাকে হত্যা করেন হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)।[৯]

তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলামের জন্য কিভাবে জীবনকে বাজি রাখতে হয় তার একটি নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত তিনি এ যুদ্ধে রেখে গেছেন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়। কিন্তু একটি গিরিপথে রাসূল (সা) কর্তৃক মোতায়েনকৃত তীরন্দায বাহিনী রাসূলের (সা) নির্দেশ ভুলে তাদের স্থান ছেড়ে দেয় এবং গনিমাত কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে একদল পৌত্তলিক সৈনিক সেই গিরিপথ দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই আকস্মিক হামলায় বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর ওপর দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে। মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তারা তাদের অধিনায়ক রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়ে। এমন দুর্যোগময় মুহূর্তে পনেরো জন মুজাহিদ পাহাড়ের মত অটল হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন। তাঁদেরই একজন হযরত 'আসিম ইবন সাবিত। এই উহুদের দিন আট ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত করেন। তাঁরা হলেন ঃ আলী, যুবাইর, তালহা, আবু দুজানা, আল-হারিস ইবনুস সাম্মাহ, হুবাব ইবনুল মুনজির, আসিম ইবন সাবিত ও সাহল ইবন হুনাইফ। কিন্তু সেদিন তাঁদের কেউই মারা যাননি।[১০] ইবন সা'দ বলেন ঃ উহুদে যখন সবাই পালিয়ে যায় তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে মৃত্যুর জন্য বাইয়াত করেন।[১১] তিনি ছিলেন এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর দক্ষ তীরন্দাযদের অন্যতম।[১২]

এই উহুদে তিনি পৌত্তলিক বহিনীর সদস্য তালহা ইবন আবী তালহার দুই পুত্র মুসাফি' ও আল-হারিস মতান্তরে আল-জুলাসকে হত্যা করেন। তাদের দুইজনের দেহেই তিনি অতি সার্থকভাবে তীর বিদ্ধ করেন। মারাত্মক আহত অবস্থায় উভয়কে তাদের মা সুলাফা বিন্‌তু সা'দের কাছে আনা হয়। মা ছেলে মুসাফি'র মাথা কোলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করে ঃ বাছাধন! তোমার দেহে এমনভাবে তীর বিদ্ধ করেছে কে? সে বলেঃ আমি শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি আমার প্রতি তীর ছুড়ে বলে উঠলো! এই লও, আমি ইবন আবিল আকলাহ। তখন সুলাফা কসম খায়, যদি সে কোন দিন 'আসিমের মাথা হাতে পায় তাহলে সে তাঁর খুলিতে মদ পান করবে।[১৩] আল্লাহ পাক তার এ কসম পূর্ণ করেননি।

এই উহুদে হযরত 'আসিম মককার আর এক অকৃতজ্ঞ দুরাচারীকে হত্যা করেন। তার নাম আবু ইজ্জাহ্ 'আমর ইবন 'আবদিল্লাহ। এই লোকটি বদরে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তখন সে এই বলে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকম্পা ভিক্ষা করে যে, একটি বড় পরিবারের ভরন-পোষণের দায়িত্ব তার কাঁধে এবং সেই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা) তারপ্রতি উদারতা দেখান। জীবনে সে আর কোনদিন রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের হবে না—এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তিনি তাকে মুক্তি দেন।

এই আবু ইজ্জাহ্ কিন্তু উহুদ যুদ্ধের সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কুরাইশদের সাথে মককা থেকে বের হবেনা। সে তাদের বলেছিল, মুহাম্মদ আমার সাথে ভালো ব্যবহার এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি তার প্রতিদান এভাবে দিতে পারি না। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারেনি। মককার সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা ও উবাই ইবন খালাফের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত সে তাদের সাথে উহুদে আসে যুদ্ধ করতে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এবারও সে মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। আগের মত এবারও সে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুকম্পা ভিক্ষা করে। উত্তরে রাসূল (সা) তাকে একটি চমৎকার কথা বলেন ঃ একজন মুমিন (বিশ্বাসী) একই গর্তের সাপ বা বিচ্ছু দ্বারা দুইবার দংশিত হতে পারে না। তুমি কি ভেবেছো, মককায় ফিরে গিয়ে তোমার লোকদের বলবে, আমি মুহাম্মদকে দুইবার ধোঁকা দিয়েছি?

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বুকাইর ইবন মিসমারের সূত্রে আবু ইজ্জাহ্র উহুদে বন্দী হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুশরিকরা উহুদ থেকে পিছনে সরে গিয়ে দিনের প্রথম ভাগে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণ পর তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে। কিন্তু আবু ইজ্জাহ্ তখনও ঘুমিয়ে। এদিকে বেলা বেড়ে গেল। কুরাইশ বাহিনীর অনুসরণকারী মুসলিম বাহিনীর লোকেরা সেখানে এসে উপস্থিত হলো। হযরত 'আসিম ইবন সাবিত আবু ইজ্জাহ্কে সেখানে পেয়ে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাজির করেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রাণ ভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়ে তাঁকে হত্যার নির্দেশ দেন। হযরত 'আসিম তার ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।'[১৪] অবশ্য অন্য একটি বর্ণনামতে আবু ইজ্জাহর হত্যাকারী হযরত যুবাইর।[১৫]

হযরত 'আসিম (রা) হিজরী ৪র্থ সনে 'আর-রাজী'-এর ঘটনায় হুজাইল গোত্রের লোকদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। এই ঘটনার বর্ণনায় ইমাম বুখারী ও অন্যান্য সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা অমিল দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

'আর-রাজী' ছিলো হুজাইল গোত্রের একটি পানির কুপের নাম। এর পাশেই ঘটনাটি ঘটেছিল। তাই ইতিহাসে তা 'ইওমুর রাজী'-এর ঘটনা নামে পরিচিত। ইমাম বুখারী আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) 'আসিম ইবন সাবিতের নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি গোয়েন্দা দল পাঠালেন। তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করে 'উসফান ও মককার মাঝামাঝি স্থানে পৌছালে হুজাইল গোত্রের 'বনু লিহইয়ান' শাখা তা টের পায়। তারা এক শো তীরান্দায লোক নিয়ে দলটির অনুসরণ শুরু করে। এক পর্যায়ে দলটি যেখানে অবস্থান করেছিলো সেখানে পৌছে তারা খেজুরের আঁটি কুড়িয়ে পায় এবং তা দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে দলটি মদীনা থেকে এসেছে। আঁটি পেয়ে তারা বলাবলি করেছিলো, এতো ইয়াসরিবের খেজুর। তারা দ্রুত অনুসরণ করে দলটি ঘিরে ফেলে। শত্রুর উপস্থিতি টের পেয়ে হযরত 'আসিম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটি উঁচু শক্ত টিলার ওপর আশ্রয় নেন।[১৬]

ইমাম বুখারীর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একটু ভিন্নতা দেখা যায় মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, মুসা ইবন 'উকবা ও 'উরওয়া ইবন যুবাইরের বর্ণনায়। তবে মাগাযী শাস্ত্রে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, কেউ মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী) জানতে চাইলে তাকে মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।[১৭]

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক 'আসিম ইবন 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধের পর আল-'আদল ও আল-কারাহ্ গোত্রদ্বয়ের কিছু লোক মদীনায় এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কিছু লোক মুসলমান হয়েছে। আমাদের সাথে আপনার কিছু সঙ্গী পাঠান, যারা আমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করবেন, কুরআন পড়াবেন এবং ইসলামী শরীয়াত শেখাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে ছয় ব্যক্তিকে পাঠালেন। তাঁরা হলেনঃ (১) মারসাদ ইবন আবী মারসাদ আল-গানাবী, (২) খালিদ ইবনুল বুকাইর আল-লাইসী, (৩) 'আসিম ইবন সাবিত, (৪) খুবাইব 'আদী, (৫) যায়িদ ইবনুদ দাস্নাহ্, (৬) 'আবদুল্লাহ ইবন তারিক। দলনেতা ছিলেন মারসাদ ইবন আবী মারসাদ। মুসা ইবন 'উকবাও ইবন ইসহাকের মত বর্ণনা করেছেন।[১৮]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ তাঁরা ঐ লোকগুলির সাথে যাত্রা করলেন। হিজাযের দিকে 'আল-হাদয়ার' কাছাকাছি হুজাইল গোত্রের 'আর-রাজী' কূপের নিকট পৌঁছালে সাথের লোকগুলি বিশ্বাস ভঙ্গ করে দলটির ওপর আক্রমণের জন্য হুজাইল গোত্রের সাহায্য চেয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। সাথে সাথে হুজাইল গোত্রের লোকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং চারদিক থেকে দলটিকে ঘিরে ফেললো। এই মুষ্টিমেয় লোক তাদের সাথে লড়বার জন্য হাতিয়ার তুলে নিলো। তখন হুজাইল গোত্রের লোকেরা বললো ঃ আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে হত্যার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তবে মককাবাসীদের হাতে তোমাদেরকে তুলে দিয়ে বিনিময়ে কিছু লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।[১৯] আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি এবং তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমরা তোমাদেরকে হত্যা করবো না। তোমরা আত্মসমর্পণ কর। প্রত্যুত্তরে মারসাদ, খালিদ ও 'আসিম বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা কোন মুশরিকের অঙ্গীকার ও চুক্তি কক্ষণো গ্রহণ করবো না। ইমাম বুখারী বলেন ঃ এই সময় 'আসিম বলেছিলেন ঃ আমি কাফিরের জিম্মায় যাব না। হে আল্লাহ! আপনার নবীকে আমাদের খবর পৌঁছে দিন।[২০] ইবন ইসহাক বলেন, এই সময় 'আসিম একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন, তার কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[২১]

'আমার কী যুক্তি থাকতে পারে, যখন আমি একজন শক্তিমান, দক্ষ তীরান্দায?

একটি ধনুকও আছে, আর তাতে আছে শক্ত ছিলা।

তার পিঠ থেকে উড়ে যায় লম্বা-চওড়া তীরের ফলা।

আর মৃত্যু? তাই তো সত্য, আর জীবন-তাতো মিথ্যা।

আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতো আসবে,

আর মানুষ, সে তো তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।
আমার মা হবেন নাককাটা–
যদিনা আমি তাদের সাথে লড়াই করি।'

এমনি ধরনের আরো কিছু পংক্তি সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।[২২]

'আসিম কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করতে করতে কাফিরদের প্রতি তীর ছুড়ছিলেন। তীর শেষ হয়ে গেলে বর্শা চালাতে লাগলেন। এক সময় তাও ভেঙ্গে গেলে এবার থাকলো তরবারি। তাই চালালেন। শাহাদাতের ক্ষণিক পূর্বে তিনি দু'আ করলেন ঃ

'হে আল্লাহ! দিনের প্রথম ভাগে আমি তোমার দ্বীন রক্ষা করেছি। এখন দিনের শেষ ভাগে তুমি আমার দেহ রক্ষা কর।' তিনি তরবারি চালাচ্ছিলেন, আর কবিতার দুইটি পংক্তি গুন গুন করে আওড়াচ্ছিলেন। তার অর্থ এ রকম ঃ

'আমি আবু সুলাইমান! আমার মত লোকেরাই তীর নিক্ষেপ করে। এ গৌরব লাভ করেছি সম্মানিত লোকদের থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে। শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মারসাদ ও খালিদ শহীদ হয়েছে।'[২৩]

ইমাম বুখারী বলেন ঃ অতপর 'আসিম সহ তাঁর সঙ্গীরা যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। শত্রুদের তীরে বিদ্ধ হয়ে 'আসিম তাঁর ছয়জন সঙ্গীসহ শাহাদাত বরণ করেন। বেঁচে থাকেন খুবাইব, যায়িদ ও অন্য একজন। কাফিরদের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা আত্মসমর্পণ করলেন। হাতের মধ্যে পেয়েই কাফিররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তাঁদেরই ধনুকের সূতা খুলে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এ দেখে তাঁদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠলেন, এ হলো প্রথম ধোঁকা। একথা বলে তিনি তাদের সাথে চলতে একেবারেই অস্বীকার করলেন। তারা অনেক টানাহেঁচড়া করলো; কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিতে পারলো না। শেষে কাফিররা তাঁকেও হত্যা করে। অবশিষ্ট দুইজনকেও মককায় নিয়ে হত্যা করা হয়।[২৪]

হযরত 'আসিমকে (রা) হত্যার পর বনু হুজাইল তাঁর মাথা মককার এক মহিলা 'সুলাফা বিন্‌তু সা'দ'-এর কাছে বিক্রীর সিদ্ধান্ত নিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আসিম উহুদ যুদ্ধে এই মহিলার দুই ছেলেকে হত্যা করেন। তাই সে কসম খেয়েছিল, যদি কখনো 'আসিমকে হাতের মুঠোয় পায় তাহলে তাঁর মাথার খুলিতে মদ পান করবে।[২৫] সে আরো ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি তাঁর মাথা এনে দেবে তাকে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে।[২৬] তাছাড়া তিনি বদরে পৌত্তলিক কুরাইশদের এক বড় নেতা 'উকবা ইবন আবী মু'য়াইতকে হত্যা করেছিলেন। এজন্য তারাও 'আসিমের মৃত্যুর খবর পেয়ে দারুণ খুশী হয়েছিল। তারা এই বলে উল্লাস প্রকাশ করেছিল যে, যাক, শেষ পর্যন্ত 'উকবার হত্যাকারীর পার্থিব জীবনের অবসান হয়েছে। তারা তাঁর দেহ আগুনে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ করতে চেয়েছিল।[২৭] কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের কারও বাসনা পূরণ করেননি।

এদিকে হযরত 'আসিম মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর দরবারে এই বলে দু'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! কোন মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ না করে এবং আমিও যেন তাদের কাউকে স্পর্শ না করি। আল্লাহ পাক তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। তিনি মৌমাছি বা বোল্‌তা পাঠিয়ে কাফিরদের স্পর্শ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উরওয়া বলেন ঃ মুশরিকরা তাঁর লাশের দিকে যাওয়ার উদ্যোগী হতেই কোথা থেকে এক ঝাঁক মৌমাছি এসে তাদেরকে এমনভাবে কামড়াতে শুরু করে যে, তারা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। দিনের আলোতে তারা অকৃতকার্য হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, রাতের আঁধারে লাশের কাছে যাবে। কিন্তু রাতের আঁধার নামতে না নামতে মুষলধারে বৃষ্টি নামে এবং গোটা উপত্যকায় প্লাবনের সৃষ্টি হয়। সে প্লাবনের প্রবল স্রোতে হযরত 'আসিমের লাশটি যে কোথায় ভেসে যায় মুশরিকরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার কোন হদিস পায়নি। ইবন সা'দ বলেন ঃ হিজরাতের ছত্রিশ মাসের মাথায় সফর মাসে 'আর-রাজী'র এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। হযরত উমার যখন শুনলেন, মৌমাছি তাঁর দেহ রক্ষা করেছে, তখন মন্তব্য করলেন ঃ একজন বিশ্বাসী বান্দাহ্‌কে আল্লাহ হিফাজত করেছেন। জীবন ও মরণ উভয় অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে মুশরিকের স্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন। যেহেতু মৌমাছি তাঁকে রক্ষা করেছেন, এ কারণে ইতিহাসে তিনি 'হামিউদ দাবার' নামে পরিচিত।[২৮]

'আর-রাজী'র এই বিষাদময় ঘটনার পর হুজাইলীদের নিন্দায় মদীনার ইসলামী কবিরা সরব হয়ে ওঠেন। হাস্‌সান ইবন সাবিত, আবু যায়িদ আল-আনসারী প্রমুখ কবি তাদের এ অপকর্মের নিন্দা এবং শহীদদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। সীরাতু ইবন হিশাম সহ বিভিন্ন গ্রন্থে তার কিছু সংকলিত হয়েছে।[২৯] হাস্‌সান ইবন সাবিতের একটি মরছিয়া বা শোকগাঁথার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

'আমার জীবনের শপথ! হুজাইল ই. মুদরিক দারুণ অপরাধ করেছে, খুবাইব ও 'আসিমের ব্যাপারে তারা দুর্নাম কুড়িয়েছে।'[৩০]

হযরত ইবন 'আব্বাস বলেন ঃ 'আর-রাজী'র খবর মদীনায় পৌছালে মুনাফিকরা মন্তব্য করলো, এই হতভাগ্য লোকগুলো তাদের ঘরেও থাকলো না, তাদের নেতার বাণীও পৌছাতে পারলো না অথবা তারা জীবনের বিনিময়ে কোন কল্যাণও লাভ করলো না। তখন আল্লাহ পাক সূরা আল-বাকারার ২০৪ নং আয়াতটি নাযিল করেন ঃ[৩১]

'আর এমন কিছু লোক আছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।'

হযরত 'আসিমের এক ছেলের নাম মুহাম্মাদ। তৎকালীন 'আরবের বিখ্যাত কবি আল-আহওয়াস এই মুহাম্মাদের পৌত্র।[৩২]

শক্ত ঈমান, রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর মুহাব্বত, পরিচ্ছন্ন মন, অতুলনীয় সাহস ইত্যাদি গুণ হযরত 'আসিমের চরিত্রের উজ্জলতম দিক।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মদীনার চির বৈরী দুই গোত্র– আউস ও খাযরাজ নিজ নিজ গোত্রের কৃতি সন্তানদের নাম নিয়ে গর্ব করতো। আউস বলতো, হানজালা– যাঁকে ফিরিশ্‌তারা গোসল দিয়েছিল, সা'দ ইবন মু'য়াজ– যাঁর মৃত্যুতে 'আরশ কেঁপে উঠেছিলো, 'আসিম ইবন সাবিত– যাঁর দেহ আল্লাহ মৌমাছি দ্বারা রক্ষা করেছিলেন, খুযাইমা ইবন সাবিত– যাঁর একার সাক্ষ্য দুইজনের সমান– এঁরা সবাই আউস গোত্রের সন্তান।[৩৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত- ৩/৪৬২; আল-আ'লাম- ৪/১২
২. উসুদুল গাবা- ৩/৭৩; আল-ইসাবা- ২/২৪৪
৩. আল-ইসাবা- ২/২৪৪; আল-আ'লাম- ৪/১২
৪. তাবাকাত- ৩/৪৬২
৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৮৮; আল-আ'লাম- ৪/১২
৬. আল-ইসাবা- ২/২৪৫
৭. আনসাবুল আশরাফ- ১/৫৪; উসুদুলগাবা- ৩/৭৩
৮. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৪, ৭০৮; আনসাবুল আশরাফ- ১/১৪৭, ১৪৮, ২১৭, উসুদুল গাবা-৩/৭৩
৯. সীরাতু ইবন হিশাম- ১/৬৪৪, ৭০৮, ২/১২৭
১০. আনসাবুল আশরাফ- ১/৩১৮
১১. তাবাকাত- ৩/৪৬২
১২. আনসাবুল আশরাফ- ১/৩২৩
১৩. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৭৪; তাবাকাত- ৩/৪৬২; আনসাবুল আশরাফ- ১/৩৩৪
১৪. আনসাবুল আশরাফ- ১/৩৩৫, ৩৩৬
১৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১০৪
১৬. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০; আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৮-৯৯; আল-আ'লাম-৪/১২
১৭. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৮
১৮. প্রাগুক্ত- ১/৫৯৮
১৯. তাবাকাত- ৩/৪৬৩
২০. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্-১/৫৯৮
২১. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৬৯, ১৭০, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৯
২২. আল-ইসাবা- ২/২৪৫
২৩. তাবাকাত- ৩/৪৬৩
২৪. হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- /৫৯৮, ৫৯৯
২৫. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৯; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩
২৬. তাবাকাত- ৩/৪৬২
২৭. আল-ইসতী'য়াব- ২/৫১৩; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩; আনসাবুল আশরাফ- ১/৩৭৫; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৯
২৮. ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য দেখুন ঃ আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্- ১/৫৯৮-৬০১; বুখারী- ২/৫৬৮, ৫৮৫; তাবাকাত- ৩/৪৬২, ৪৬৩; হায়াতুস সাহাবা- ১/৫২০-৫২৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৬৯-১৭১; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩; আনসাবুল আশরাফ- /৩৭৫; আল-ইসাবা-২/২৪৫
২৯. দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৭৪; ১৮০-১৮৩
৩০. আল-ইসাবা- ২/২৪৫; উসুদুল গাবা- ৩/৭৩
৩১. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/১৭৪
৩২. তাবাকাত- ৩/৪৬৩
৩৩. হায়াতুস সাহাবা- ১/৩৯৫।

আল হারেসা ইবন সুরাকা (রা)

আল হারেসা ইবন সুরাকা মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান। পিতা সুরাকা ইবন হারেস এবং মাতা রাবী বিনতু নাদার। তাঁর ডাক নাম উম্মুল হারেসা। মা রাবী ছিলেন একজন উঁচুস্তরের সাহাবী এবং প্রখ্যাত সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম আনাস ইবন মালিকের আপন ফুফু।[১]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বেই পিতার মৃত্যু হয়। মা জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদা লাভের গৌরব অর্জন করেন। মায়ের সাথে ছেলেও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) আস-সায়িব ইবন 'উসমান ইবন মাজ'উনের (রা) সাথে তাঁর দ্বীনি ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করেছেন।[২]

বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। বদরে যাত্রার নির্দেশ লাভের পর তিনিই সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে চলতে শুরু করেন।[৩] রাসূল (সা) তাঁকে পর্যবেক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিজের সংগে রাখেন।[৪] তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তিনি যখন একটি ঝরনায় পানি পান করছিলেন তখন হিব্বান ইবন 'আরাফার নিক্ষিপ্ত একটি তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৫] বর্ণিত আছে, আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ তিনি। তবে কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[৬]

রাসূলুল্লাহ (সা) বদর থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। আল হারেসার মা ছুটে এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল হারেসাকে আমি কতখানি ভালোবাসি তা আপনি জানেন। যদি সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে থাকে তাহলে তো সবর করলাম। অন্যথায় আপনি দেখবেন আমি কি করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এসব তুমি বলছো কি? জান্নাতের সংখ্যা তো একটি বা দু'টি নয়। জান্নাত অনেক। আল হারেসা সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত আল ফিরদাউসের অধিকারী হয়েছে।[৭] এই খোশখবর শুনে মা রাবী' আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। মৃদু হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগেন ঃ নাজ, নাজ ইয়া আল হারেসা- সাবাশ, সাবাশ, ওহে আল-হারেসা![৮]

আল হারেসা ছিলেন দারুণ মাতৃভক্ত। 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থকার লিখেছেন! তিনি ছিলেন মায়ের ভীষণ অনুগত ও বাধ্য।[৯]

একবার রাসূলে কারীম (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে আল হারেসার সাথে দেখা। বললেন ঃ হারেসা! আজ তোমার সকাল হলো কি অবস্থায়? হারেসা বললেন ঃ এমন অবস্থায় যে আমি একজন খাঁটি মুসলমান। রাসূল (সা) বললেন ঃ একটু ভেবে বল। প্রত্যেকটি কথার একটি গূঢ় তত্ত্ব থাকে। আল হারেসা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। রাত কাটে ইবাদাত-বন্দেগীতে এবং দিন কাটে রোযা রেখে। বর্তমান মুহূর্তে আমি যেন নিজেকে আরশের দিকে যেতে দেখতে

পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে জান্নাতীরা জান্নাতের দিকে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের দিকে চলছে। তাঁর কথা শোনার পর রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ যে বান্দার অন্তরকে আলোকিত করেন, সে অন্তর আর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না। আল হারেসা আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার শাহাদাতের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু'আ করলেন। সে দু'আ কবুল হয়। বদর যুদ্ধের সময় তার বাস্তবায়ন হয়। তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫১০; আল-ইসাবা-১/২৯৭;
২. তাবাকাত-৩/৫১০.
৩. উসুদুল গাবা-১/২৮৬
৪. সহীহ বুখারী-২/৫৭৪
৫. তাবাকাত-৩/৫১০,
৬. আল-ইসাবা-১/২৯৭
৭. বুখারী-২/৫৬৪; তাবাকাত-৩/৫১০; আল-ইসাবা-১/২৯৭.
৮. উসুদুল গাবা-১/৩৫৬; আল-ইসাবা-১/২৯৭
৯. উসুদুল গাবা-১/৩৫৫.
১০. সীয়ারে আনসার-১/৩৪৪

আল-হারেস ইবন আস্-সিম্মাহ্ (রা)

আল-হারেস (রা)-এর ডাকনাম আবু সা'ঈদ। পিতা আস্-সিম্মাহ ইবন 'আমর এবং মাতা তুমাদুর বিনতু 'আমর। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান।[১]

রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় আগমনের পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সবর ও ইসতিকলাল, ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রতীক সুহাইব আর-রূমীর (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

মূসা ইবন 'উকবা, ইবন ইসহাক ও অন্যরা তাঁকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] রাসূলে কারীমের (সা) সাথে বদরে যাত্রা করেন এবং 'রাওহা' নামক স্থানে যাওয়ার পর কোন কারণে দেহের কোন হাড় ভেঙ্গে গেলে রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় ফেরত পাঠান। তবে যুদ্ধের শেষে তাঁকে বদরের গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও সওয়াবের অংশীদার ঘোষণা করেন।[৪]

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন আল-হারেস দারুণ সাহসের পরিচয় দেন। তিনি কুরাইশ বাহিনীর সদস্য 'উসমান ইবন আবদিল্লাহ ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর বর্ম, ঢাল, তরবারি ইত্যাদি কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করেন। এ খবর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে এ সুযোগ দান করেছেন।[৫] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এই 'উসমানকে ইতিপূর্বে নাখলায় টহলদানের সময় বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন। এরপর সে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়ে আবার কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়। উহুদে আল-হারেস যখন তাকে হত্যা করছিলেন তখন 'উবাইদ ইবন হাজেয আল-'আমেরীর দৃষ্টিগোচর হয়। সে অতর্কিত আল-হারেসের কাঁধে তরবারির প্রচণ্ড আঘাত হানে। আল-হারেস মারাত্মকভাবে আহত হন। দূর থেকে আবু দুজানা ছুটে এসে 'উবাইদ ইবন হাজেযকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এরপর তাকে হত্যা করে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেন।[৬] রাসূল (সা) আল-হারেসকে নিহত 'উসমানের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম দান করেন।

উহুদে যখন মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল (সা) থেকে ছিটকে পড়ে তখনও যে কয়েক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে অটল থাকেন, আল-হারেস ইবন আস-সিম্মাহ্ তাঁদের অন্যতম।[৭] ইবন ইসহাক বলেন, উহুদের বিপর্যয়ের সময় মুসলমানরা যখন জানলো যে, রাসূল (সা) জীবিত আছেন এবং তাঁকে চিনতে পারলো তখন সবাই সেদিকে ছুটলো। এরপর আবু বকর, উমার, আলী, তালহা, যুবাইর, আল-হারেস ইবন আস্-সিম্মাহ সহ আরো কিছু মুসলমান রাসূলকে (সা) নিয়ে উপত্যকার দিকে যান।[৮]

উহুদের উপত্যকায় রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের বেষ্টনীর মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা আছেন। এমন সময় মক্কার পৌত্তলিক নেতা উবাই ইবন খালাফ একেবারে কাছাকাছি

এসে রাসূলকে (সা) সম্বোধন করে বললো ঃ ওহে মুহাম্মদ! তুমি বেঁচে গেলে আমি বাঁচবো না। সাহাবীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ একজন কি তাকে রুখবে? বললেন ঃ না। তার দরকার নেই। যখন সে আরো কাছাকাছি এলো, রাসূল (সা) আল-হারেস ইবন আস-সিম্মাহর হাত থেকে তাঁর নিযাটি নিলেন। তারপর উবাই ইবন খালাফের মুখোমুখি হয়ে তার গলায় সামান্য খোঁচা দিলেন। আর তাতেই সে তার অতি প্রিয় ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালালো।

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় থাকতে উবাই ইবন খালাফের সাথে দেখা হলে সে বলতো ঃ মুহাম্মাদ! আমার একটা তাগড়া ঘোড়া আছে। প্রতিদিন আমি তাকে বারো রতল দানা খাওয়াই। আমার বিশ্বাস, ওর ওপর সোয়ার হয়েই আমি তোমাকে হত্যা করবো। রাসূল (সা) বলতেন ঃ না, তা পারবেনা। বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ। রাসূল (সা) তার গলায় যে খোঁচাটি দিয়েছিলেন, তা ছিল অতি সামান্য। খোঁচা খেয়ে সে অস্থিরভাবে স্বপক্ষীয় লোকদের নিকট দৌড়ে গিয়ে বলতে থাকে ঃ আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ আমাকে মেরে ফেলেছে। তার সাথীরা বললো ঃ তোমার তো কিছুই হয়নি। তুমি মনে হয় পাগল হয়ে গেছো। সে বললো ঃ 'মুহাম্মাদ মক্কায় থাকতে আমাকে বলতো ঃ আমি তোমাকে হত্যা করবো। আল্লাহর কসম! আমার প্রতি সে যদি কেবল থুথু নিক্ষেপ করতো তাতেই আমার মৃত্যু হতো।' আল্লাহর এই দুশমন কুরাইশ কাফেলার সাথে মক্কায় ফেরার পথে 'সারাফ' নামক স্থানে মারা যায়।[৯] আসলে সে বুঝেছিল, আঘাত যত সামান্যই হোক, মুহাম্মাদের মুখ থেকে যে কথা উচ্চারিত হয়েছে তা সত্যে পরিণত হবেই।

উহুদ যুদ্ধে এক পর্যায়ে রাসূলে কারীম (সা) আল-হারেসকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আবদুর রহমান ইবন 'আওফকে দেখেছো? বললেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো পাহাড়ের পাদদেশে পৌত্তলিকদের ভীড়ের মধ্যে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে যাওয়ার জন্য মনস্থির করছিলাম, এমন সময় আপনার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লো। আমি এ দিকে চলে এলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ ফিরিশতারা তাঁর পক্ষে লড়ছে। একথা শোনার সাথে সাথে আল-হারেস ছুটে গেলেন 'আবদুর রহমানের দিকে। দেখলেন, তাঁর সামনে কাফিরদের সাতটি লাশ পড়ে আছে। তিনি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এদের সকলকে কি আপনি একাই হত্যা করেছেন? আবদুর রহমান বললেন ঃ এই আরতাত ইবন 'আবদি শুরাহবীল এবং ওকে—এ দু'জনকে তো আমি হত্যা করেছি। কিন্তু অন্যদের হত্যাকারী আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আল-হারেস তখন বললেন ঃ রাসূল (সা) ঠিক কথাই বলেছেন। তাবারানী এ বর্ণনাটি সংকলন করেছেন।[১০]

উহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রাসূল (সা) হামযা (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আল-হারেস সংগে সংগে তাঁর খোঁজে বের হলেন। তাঁর ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে 'আলী

(রা) তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। আলী তখন একটি কবিতার দু'টি চরণ গুন্ গুন্ করে আবৃত্তি করছিলেন। তার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'প্রভু হে, আল-হারেস ইবন আস্-সিম্মাহ্ একজন বন্ধুবৎসল এবং আমাদের মধ্যে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গিয়ে সে হারিয়ে গেছে। আর সে যেখানেই যায় জান্নাত তালাশ করে।'[১১]

ইবন হিশাম চরণ দু'টি একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, চরণ দু'টি আলীর নয়।[১২]

এরপর আলী (রা) আল হারেসের দেখা পেলেন। তাঁরা উভয়ে হামযাকে (রা) মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন এবং ফিরে এসে রাসূলকে (সা) খবর দিলেন।

আল-হারেস ছিলেন 'বীরে মাউনা'র ঘটনার অন্যতম সদস্য। এক পর্যায়ে তিনি অন্য সঙ্গীদের থেকে একটু দূরে ছিলেন। এদিকে কাফিররা তাঁর অন্য সঙ্গীদের হত্যা করে; কিন্তু তিনি তা জানতেন না। তিনি আমর ইবন উমাইয়্যার সাথে একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন। হঠাৎ আকাশে শকুন জাতীয় পাখী দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বুঝতে পারলেন কিছু একটা ঘটেছে। 'আমরকে সংগে করে সেই দিকে চললেন। দেখলেন, এক স্থানে বেশ কিছু মুসলমানের রক্তাক্ত ও ধুলিমলিন লাশ বিগলিত অবস্থায় পড়ে আছে। এদৃশ্য দেখে তিনি সঙ্গী 'আমরকে বললেন, এখন বল তোমার ইচ্ছা কি? 'আমর বললেন ঃ এটা তো স্পষ্ট যে, রাসূল (সা) সত্যের ওপর আছেন। এখন আমাদের উচিত মদীনায় ফিরে গিয়ে বিষয়টি তাঁকে জানানো। এখন বল তোমার ইচ্ছা কি? আল-হারেস বললেন ঃ যেখানে আল-মুনজির ইবন 'আমর নিহত হয়েছেন, আমি কিভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি? লোকে বলবে, আল-মুনজির নিহত হয়েছেন, আর আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এরপর তিনি 'আমরকে সংগে করে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন। প্রতিপক্ষ ছিল সুসজ্জিত এবং সংখ্যায় অনেক। তারা বৃষ্টির মত তীর নিক্ষেপ করে আল-হারেসের সারা দেহ ঝাঝরা করে ফেলে। তিনি ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সংগী 'আমর শত্রু পক্ষের হাতে বন্দী হন। 'আমের ইবন আততুফাইল যখন জানতে পারে যে বন্দী 'আমর মুদার গোত্রের লোক তখন সে তাঁর মাথার সামনের দিকের চুল মুড়ে দিয়ে মুক্ত করে দেয়। কারণ, তার মা মান্নত করেছিল যে, সে একটি বন্দী মুক্ত করবে। এভাবে 'আমের তার মায়ের মান্নত পূরণ করে। এটা হিজরাতের ৩৬ মাসের মাথায় সফর মাসে সংঘটিত হয়।[১৩]

আল-হারেসের এক ছেলে সা'দ সিফ্ফীনে 'আলীর (রা) পক্ষে যুদ্ধে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। সা'দের মায়ের নাম ছিল উম্মুল হাকাম খাওলা বিনতু 'উকবা। তাঁর অন্য একটি ছেলের নাম আবুল জুহাইম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য লাভে ধন্য হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন। তাঁর মায়ের নাম 'উতাইলা বিনতু কা'ব। ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে বলেছেন, মদীনা ও বাগদাদে এখনও আল-হারেসের

বংশধর বিদ্যমান আছে।[১৪] আল-হারেসের মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর কিছু শ্লোক সংকলিত হয়েছে।[১৫]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত- ৩/৫০৮; আল-ইসাবা-১/২৮১
২. আনসাবুল-আশরাফ-১/২৭১; তাবাকাত-৩/৫০৯
৩. আল-ইসাবা-১/২৮১
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৭০৩; তাবাকাত-৩/৫০৯; আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৯
৫. তাবাকাত-৩/৫০৯
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৫
৭. প্রাগুক্ত-১/৩১৮
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮৩
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৮৪
১০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩৬
১১. তাবাকাত-৩/৫০৯; আনসাব-১/৩২৫
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৬৬
১৩. তাবাকাত-৩/৫০৯; আল-ইসাবা-১/২৮১; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৭
১৪. তাবাকাত-৩/৫০৯
১৫. আল-ইসাবা-১/২৮১; সীয়ারে আনসার-১/৩৪১;

'উমাইর ইবন সা'দ (রা)

'উমাইর ইবন সা'দ মদীনার বিখ্যাত আউস গোত্রের ভোগ-বিমুখ একজন আনসারী সাহাবী। চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি 'নাসীজু ওয়াহ্‌দিহ্' উপাধি লাভ করেন। তাঁকে এ উপাধি দান করেন খলীফা 'উমার (রা)।[১]

'উমাইরের শৈশব কালেই পিতা সা'দ ইবন 'উবাইদ মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর মা জুলাস ইবন সুওয়ায়িদকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। মায়ের সাথে 'উমাইরও চলে যান জুলাসের তত্ত্বাবধানে। জুলাস তাঁকে নিজের সন্তানদের মত অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে প্রতিপালন করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ এই জুলাস ও তাঁর ভাই আল-হারেস, দুইজনই ছিলেন মুনাফিক (কপট মুসলমান)।[২]

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আবু যায়িদ ছিলেন মদীনার আনসারদের বিখ্যাত চার ক্বারীর অন্যতম। তাঁর আসল নাম সা'দ ইবন 'উবাইদ। আর আমাদের আলোচ্য এই মহান সাহাবীর সম্মানিত পিতার নামও ছিল সা'দ ইবন 'উবাইদ। এ কারণে অনেক ঐতিহাসিক, বিশেষতঃ ইবন সা'দ ভুল করেছেন। তাঁরা 'উমাইরকে ক্বারী আবু যায়িদ সা'দ ইবন 'উবাইদের পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তাঁদের এক মারাত্মক ভুল। যেমন ইবনুল কালবী বলেছেন ঃ তাঁর পিতা সা'দ ইবন 'উবাইদ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৩] অথচ উভয় সা'দের মৃত্যু সনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া 'উমাইরের পিতা সা'দ ছিলেন আউস গোত্রের এবং আবু যায়িদ সা'দ ছিলেন খাযরাজ গোত্রের সন্তান। প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবন মালিক বলেছেন, আবু যায়িদ সম্পর্কে তাঁর চাচা। আর এটা তো স্বীকৃত যে, আনাস খাযরাজ গোত্রের লোক। তাছাড়া আবু যায়িদ কোন বংশধর রেখে যাননি।[৪]

'উমাইরের পালক পিতা জুলাসের তত্ত্বাবধানে থাকা কালেই সম্ভবত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সাহাবিয়্যাতের (রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য) গৌরব তো তিনি অর্জন করেছেন, তবে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধে যাওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারেননি।[৫] এর কারণ হলো রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় যুদ্ধে যাওয়ার বয়স তাঁর হয়নি। কোন কোন গ্রন্থকার বলেছেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও জিহাদে তিনি জুলাসের সহগামী হতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা তাবুক যুদ্ধের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন।[৬]

খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সেনাপতি আবু 'উবায়দার সাথে তিনি শাম অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। 'উমার তাঁকে শামের একটি বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। কিছুদিন পর তাঁকে 'হিম্‌স ও দিমাশ্‌ক'-এর ওয়ালী নিয়োগ করেন। 'উমারের (রা) ওফাত পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। ইমাম যুহ্‌রী বলেন ঃ সা'ঈদ ইবন 'আমির ইবন হিজিম মৃত্যুবরণ করলে 'উমাইর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। 'উমারের নিহত হওয়া পর্যন্ত মু'য়াবিয়া ও তিনি এক সাথে শামে ছিলেন। অতঃপর খলীফা 'উসমান 'উমাইরকে অপসরণ করে গোটা শাম মু'য়াবিয়ার অধীনে ন্যস্ত করেন।[৭]

সাফওয়ান ইবন 'আমর বলেন ঃ মু'য়াবিয়া গোটা শামের আমীর হিসেবে নিয়োগ লাভের পর হিমসের মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তাতে বলেন ঃ ওহে হিমসবাসী! আল্লাহ তা'য়ালা সৎ ও যোগ্য আমীরদের দ্বারা আপনাদেরকে ধন্য করেছেন। আপনাদের প্রথম আমীর 'ইয়াদ ইবন গান্‌ম। তিনি আমার চেয়ে ভালো লোক ছিলেন। আপনাদের দ্বিতীয় আমীর সা'ঈদ ইবন 'আমির। তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তারপর আপনাদের আমীর হলেন 'উমাইর। 'উমাইর অতি ভালো মানুষ। এখন আমি আপনাদের আমীর। আপনারা আমাকে জানবেন।[৮]

'উমাইরের (রা) শামে থাকাকালের বেশ কিছু ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু তুলে ধরা হলো ঃ

একবার খলীফা 'উমার (রা) একটি বাহিনীর অধিনায়ক করে তাঁকে শামে পাঠান। কিছু দিন পর খলীফার নিকট এসে বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন! আমাদের অবস্থান এবং আমাদের শত্রুদের অবস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে 'আরাবসোস' নামে একটি শহর আছে। এর অধিবাসীরা আমাদের গোপন তথ্য আমাদের শত্রুদের নিকট সরবরাহ করে থাকে। তার ওপর ভিত্তি করে শত্রুরা আমাদের সাথে এমন এমন আচরণ করে থাকে।

খলীফা বললেন ঃ তুমি শহরের অধিবাসীদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার প্রস্তাব দেবে। বিনিময়ে তাদেরকে একটি ছাগলের পরিবর্তে দুইটি ছাগল, একটি গরুর পরিবর্তে দুইটি গরু এবং এভাবে তাদের প্রত্যেকটি জিনিসের পরিবর্তে দুইটি জিনিস দান করবে। এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা তাদরকে দ্বিগুণ জিনিস দান করবো। আর এ প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের সাথে আমাদের যে চুক্তি আছে তা বাতিলের ঘোষণা দিয়ে এক বছর অপেক্ষা করবে।

'উমাইর আরজ করলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার এ অঙ্গিকারটি আমাকে একটু লিখিতভাবে দান করুন।

খলীফার অঙ্গিকার পত্রটি নিয়ে 'উমাইর শামে ফিরে গেলেন এবং 'আরাবসোসের' অধিবাসীদের নিকট প্রস্তাবটি পেশ করলেন। তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। 'উমাইর তাদের সাথে কৃত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে এক বছর সময় দিলেন।

এদিকে মদীনায় খলীফা 'উমারের (রা) কানে এলো, 'উমাইর 'আরাবসোস' শহরটি ধ্বংস করে ফেলেছে। আরো নানা কথা তিনি শুনতে পেলেন। খলীফা তাঁর ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। সাথে সাথে 'উমাইরকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। 'উমাইর মদীনায় খলীফার দরবারে হাজির হলেন। ক্ষুব্ধ খলীফা তাঁর মাথার ওপর ছড়ি ঝাঁকিয়ে বললেন ঃ তুমি 'আরাবসোস' ধ্বংস করে ফেলেছ! 'উমাইর কোন উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খলীফা দরবার থেকে উঠে ঘরে ফিরলেন। 'উমাইর সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে প্রদত্ত খলীফার অঙ্গিকার পত্রটি পাঠ করে শোনালেন। 'উমার মন্তব্য করলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন![৯]

খলীফা 'উমার (রা) তাঁকে হিমসের ওয়ালী করে পাঠালেন। এক বছরের মধ্যে তাঁর কোন খবর পেলেন না। অবশেষে তিনি কাতিবকে (সেক্রেটারী) বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে সে আমাদের আস্থা নষ্ট করেছে। তুমি তাঁকে লেখ ঃ 'আমার এ পত্র পৌছা এবং পাঠমাত্র মুসলমানদের নিকট থেকে খাজনা, যাকাত যা কিছু আদায় করেছো তা নিয়ে মদীনায় চলে আসবে।' চিঠি পেয়ে 'উমাইর বিলম্ব না করে একটি চামড়ার থলিতে সামান্য কিছু পাথেয় ও পানির একটি পিয়ালা ভরে কাঁধে ঝোলালেন এবং লাঠিটি হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করলেন।

মদীনা থেকে হিমসের দূরত্ব কয়েক শো মাইল। মদীনায় যখন পৌছলেন তখন তাঁর মাথার চুল লম্বা হয়ে গেছে। রোদ, ধুলোবালি ও দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তিতে চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সরাসরি খলীফার দরবারে পৌছে বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মুমিনীন! - আমিরুল মুমিনীন, আপনার প্রতি সালাম! খলীফা তাঁর দিকে চোখ তুলে দেখে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন ঃ এ তোমার কী হাল হয়েছে? 'উমাইর বললেন ঃ আপনি আমার আবার কি হাল দেখলেন? আমি কি সুস্থ নই? আমার ওপর কি দুনিয়াদারির ছোঁয়া লেগেছে? আমি কি দুনিয়ার শিং দুইটি ধরে টানাটানি করছি?

খলীফা ধারণা করেছিলেন, 'উমাইর হয়তো প্রচুর অর্থ-সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছেন। তাই প্রশ্ন করলেন ঃ হেঁটে এসেছো?

বললেন ঃ হাঁ, হেঁটেই এসেছি।

- কেউ কি তোমাকে একটি বাহন দিয়ে সাহায্য করলো না?

- আমি কারো কাছে বাহন চাইনি, আর কেউ দেয়ওনি।

- তারা খুব খারাপ মুসলমান হয়ে গেছে।

- 'উমার! আল্লাহ আপনাকে মানুষের গীবত করতে নিষেধ করেছেন। আমি তো তাদেরকে ফজরের নামায জামায়াতে আদায় করতে দেখেছি।

- তুমি অর্থ-সম্পদ কি করেছো?

- যা কিছু আদায় করেছি, সেখানেই জায়গামত খরচ করেছি। কিছু থাকলে তা অবশ্যই আপনার সামনে উপস্থিত করতাম।

খলীফা নির্দেশ দিলেন ঃ 'উমাইরের নিয়োগ নবায়ন করা হোক। 'উমাইর বললেন ঃ আমি আপনার অধীনে বা ভবিষ্যতে আর কারো অধীনে আর কোন দায়িত্ব পালন করবো না। কারণ, অপরাধ থেকে আমি মুক্ত থাকতে পারিনি। সেখানে খ্রীস্টান জিম্মীকে আমি বলেছি, আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন। ওহে 'উমার, আপনি কি আমাকে এমন কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন? অন্য সাহাবীদের মত মৃত্যুবরণ না করে বেঁচে থাকলাম এবং যেদিন থেকে আপনার সাথে কাজ করছি সেটি আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিন।

এরপর তিনি খলীফার অনুমতি নিয়ে মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি নিরিবিলি স্থানে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। একদিন খলীফার কেন যেন মনে হলো, 'উমাইর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তাই তাঁকে পরীক্ষার জন্য এক শো দীনারসহ আল-হারেস নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠালেন। যাওয়ার সময় লোকটিকে বললেন ঃ তুমি 'উমাইরের কাছে একজন অতিথির ছদ্মবেশে যাবে। যদি তাঁর ওখানে পার্থিব ভোগ-বিলাসের কোন চিহ্ন দেখতে পাও তাহলে সাথে সাথে ফিরে আসবে। আর তাঁকে খুব করুণ অবস্থায় দেখলে এই এক শো দীনার তাঁকে দান করবে।

লোকটি চলে গেল। 'উমাইরের বাসস্থানে পৌঁছে দেখলো, তিনি দেওয়ালের পাশে বসে বসে জামার ময়লা খুটে খুটে তাতে তালি লাগাচ্ছেন। লোকটি সালাম দিল। 'উমাইর সালামের জবাব দিলে তাকে থাকার অনুরোধ করলেন। লোকটি থেকে গেল।

'উমাইর ঃ কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

- মদীনা থেকে।

- আমীরুল মুমিনীনকে কেমন ছেড়ে এসেছেন?

- একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি হিসেবে।

- আমীরুল মুমেনীন কি এখন আর 'হদ' (শরী'য়াত নির্ধারিত শাস্তি) কায়েম করেন না?

- তিনি তাঁর এক ছেলেকে সম্প্রতি ব্যভিচারের শাস্তি দান করেছেন। ছেলেটি মারা গেছে।

- আল্লাহ, তুমি 'উমারকে সাহায্য কর। তোমার ভালোবাসা ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কিছু আছে বলে আমার জানা নেই।

লোকটি 'উমাইরের গৃহে তিন দিন অতিথি হিসেবে থাকলো। এ তিনটি দিন শুধু যবের রুটির কিছু টুকরো চিবিয়েই তাকে কাটাতে হলো। এ অবস্থা দেখে লোকটি বললো ঃ এ কয়টি দিন তো আপনি আমাকে প্রায় অভুক্তই রেখেছেন। এরপর সে দীনারগুলি বের করে 'উমাইরের দিকে এগিয়ে দিল। দীনার দেখামাত্র তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ 'আমার প্রয়োজন নেই।' একথা বলে দীনারের থলিটি তিনি লোকটির দিকে ঠেলে দিলেন। এ সময় 'উমাইরের সহধর্মিনী বললেন ঃ 'আপনার প্রয়োজন না থাকলে যাদের প্রয়োজন আছে তাদের মধ্যে বিলি করুন।' 'উমাইর বললেন ঃ 'এগুলির ব্যাপারে কোন কিছু করার কোন অধিকার আমার নেই।' তখন স্ত্রী তাঁর ওড়না ছিঁড়ে কয়েকটি টুকরো করেন। তারপর দীনারগুলি ভাগ করে সেই টুকরোগুলিতে বেঁধে আশেপাশের শহীদদের সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

এদিকে লোকটি খলীফা 'উমারের নিকট ফিরে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'উমাইর দীনারগুলি কি করেছ? 'আমি তো জানিনে'-লোকটি জবাব দিল। এরপর খলীফা 'উমার (রা) দীনারগুলিসহ 'উমাইরকে আসার জন্য লিখলেন। 'উমাইর খলীফার দরবারে হাজির

হলেন। 'দীনারগুলি কি করেছো?' - খলীফা জানতে চাইলেন। বললেন ঃ 'আমার যা ইচ্ছা হয়েছে করেছি। তার সাথে আপনার সম্পর্ক কি?' 'না তোমাকে বলতেই হবে'- খলীফা জোর দিয়ে বললেন। 'উমাইর বললেন ঃ 'আমি সেগুলি আমার আখিরাতের প্রয়োজনে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি।' খলীফা তখন কিছু খাদ্যদ্রব্য ও দুইখানা কাপড় তাঁকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। 'উমাইর তখন বললেন ঃ খাদ্যের প্রয়োজন আমার নেই। বাড়ীতে আমি দুই সা' পরিমাণ যব রেখে এসেছি। সেগুলি খেতে খেতেই আল্লাহ পাক হয়তো অন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। তবে কাপড় দুইখানি নেওয়া যেতে পারে। কারণ, আসার সময় আমি দেখে এসেছি, অমুকের মায়ের কাপড় নেই। সে ন্যাংটা প্রায়। একথা বলে কাপড় দুইখানি বগলদাবা করে বাড়ীতে ফিরে আসেন। এর অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান।[১০]

'উমাইরের (রা) মৃত্যু সন নিয়ে সীরাত শাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেছেন, হিমসে তিনি স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে, মতান্তরে খলীফা 'উমার অথবা 'উসমানের (রা) সময়ে সেখানেই মারা যান।[১১] একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি মদীনায় মারা যান এবং খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছেন।[১২] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'উমাইরের মৃত্যুর খবর পেয়ে খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ ও মাগফিরাত কামনা করেন। তারপর তিনি মদীনার 'বাকী' আল-গারকাদ' গোরস্থানে যান। তাঁকে অনুসরণ করে আরো অনেকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসনা প্রকাশ করুন তো।' তখন একজন বললো, 'আমার যদি প্রচুর ধন-সম্পদ থাকতো, তাহলে তা দিয়ে আমি এত পরিমাণ দাস মুক্ত করতাম।' আর একজন বললো ঃ 'আমার দেহে যদি অদমনীয় শক্তি হতো তাহলে আমি যমযম কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে হাজীদের পান করাতাম।' এভাবে আরো অনেকে নিজ নিজ মনোবাসনা ব্যক্ত করলো। সবশেষে 'উমার (রা) বললেন ঃ 'আমি যদি 'উমাইর ইবন সা'দের মত আরো যোগ্য লোক পেতাম তাহলে মুসলমানদের কাজে আমি তাদের সাহায্য নিতাম।[১৩]

হিমসের ওয়ালী থাকাকালে একদিন তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বলেন ঃ 'আপনারা জেনে রাখুন, ইসলাম একটি সুরক্ষা প্রাচীর ও একটি সুদৃঢ় দ্বার বিশেষ। ইসলামের প্রাচীর হলো ন্যায় বিচার এবং তার দ্বার হলো সত্য ও ন্যায়। প্রাচীর ফেটে গেলে এবং দ্বার ভেঙ্গে গেলে ইসলাম পরাভূত হবে। তবে শাসক যতদিন কঠোর থাকবে ইসলাম ততদিন রক্ষক থাকবে। শাসকের কঠোরতার অর্থ এই নয় যে, সে তরবারি দ্বারা হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তার অর্থ হলো, সত্যের সাথে ফায়সালা করবে এবং ন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে।[১৪] 'আবদুর রহমান ও মাহমুদ নামে দুই ছেলে তিনি রেখে যান।

'উমাইর (রা) ছিলেন মর্যাদাবান ও যুহ্হাদ (পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীন) সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম।[১৫] সাহাবীদের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি

ছিলেন অতি উঁচু স্তরের। মুফাদ্দাল আল-গাল্লাবী বলেন ঃ আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক যাহিদ (দুনিয়াবিরাগী) ব্যক্তি তিনজন ঃ আবুদ দারদা, শাদ্দাদ ইবন আউস ও 'উমাইর ইবন সা'দ।[১৬] ইবন সীরীন বলেন ঃ খলীফা 'উমার (রা) তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর উপাধি দেন 'নাসীজু ওয়াহদিহ'-সৃষ্টি ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যে একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।[১৭]

'উমাইরের ছেলে আবদুর রহমান বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার আমাকে বলেছেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে তোমার পিতার চেয়ে ভালো মানুষ ছিল না।[১৮] ইবন সুমাই' হিমসে যে সকল সাহাবী গমন করেন তাঁদের প্রথম তাবকা বা শ্রেণীতে 'উমাইরের নামটি উল্লেখ করেছেন।[১৯]

স্বভাব ও নৈতিক চরিত্রে 'উমাইর (রা) ছিলেন আদর্শ মানের। তাকওয়া-পরহিযগারীতে তাঁর সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাঁর মধ্যে ছিল তীব্র ঈমানী আবেগ। শৈশব থেকেই তাঁর অন্তরে ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ঈমান ও ভালোবাসার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কপটতার লেশমাত্র ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাবুক যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনায়। এ সময় তাঁর পালক পিতা আল-জুলাস রাসূলুল্লাহর (সা) শানে একটি আপত্তিকর মন্তব্য করে। 'উমাইর সাথে সাথে বিষয়টি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। অথচ আল-জুলাসের আশ্রয়েই তিনি লালিত-পালিত এবং তখনও তাঁরই আশ্রিত।[২০] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি দৃঢ় ঈমান ও গভীর ভালোবাসা ছিল তাঁর নিকট সব কিছুর উর্দ্ধে।

আল-জুলাসের সাথে 'উমাইরের ঘটনাটি ইবন হিশামসহ বিভিন্ন গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন। তাবুক যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি আল-জুলাস তাদের একজন। এ সময় আল-জুলাস একদিন 'উমাইরের উপস্থিতিতে মন্তব্য করেন ঃ 'এই বক্তি (মুহাম্মাদ (সা) সত্যবাদী হলে আমরা হবো গাধার চেয়েও অধম।' 'উমাইর কথাটি শুনে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আল-জুলাস! আপনি সকলের চেয়ে আমার বেশী প্রিয় ব্যক্তি। আপনার অনুগ্রহ আমার ওপর সবচেয়ে বেশী। আপনার ওপর কোন বিপদ-মুসীবত আপতিত হলে আমি কষ্ট পাই সবচেয়ে বেশী। আপনি একটি মন্তব্য করেছেন। আমি যদি বলি আপনারা গাধার চেয়েও অধম তাহলে আপনাকে লজ্জা দেওয়া হবে। আর যদি চুপ থাকি তাহলে তাতে আমার দ্বীন ধ্বংস হবে। দ্বিতীয়টি অপেক্ষা প্রথমটি আমার নিকট অধিকতর সহজ।

'উমাইরের এ প্রতিবাদ আল-জুলাসকে দারুণ ক্ষুব্ধ করে। সাথে সাথে 'উমাইরের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার অঙ্গীকার করেন। এদিকে 'উমাইর সাথে সাথে বিষয়টি রাসূলকে (সা) অবহিত করলেন। রাসূল (সা) তাদের দুইজনকে এক সাথে ডেকে ব্যাপারটি সম্পর্কে জুলাসকে জিজ্ঞেস করলেন। আল-জুলাস হলফ করে বললেন ঃ 'উমাইর আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। সে যেমন বলেছে, আমি তেমন কিছু বলিনি। এভাবে আল-জুলাস ঘটনাটি একেবারেই অস্বীকার করলেন। কিন্তু নবী-রাসূলদের নিকট কোন সত্য গোপন থাকে না। ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে তাঁরা সব কিছু জেনে যান।

আল-জুলাসের ক্ষেত্রেও তাই হলো। আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করে তাঁর নবীকে সব কিছু জানিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) তখন সূরা আত-তাওবার ৭৪ নং আয়াতটি পাঠ করলেন।

"তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা পায়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে।"

রাসূলে কারীম (সা) যখন আয়াতটির শেষাংশ-'বস্তুত এরা যদি তাওবা করে নেয়, তা হবে তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তা না মানে, তাহলে তাদেরকে আজাব দেবেন আল্লাহ তা'য়ালা, বেদনাদায়ক আজাব দুনিয়া ও আখিরাতে।'- পাঠ করেন তখন আল-জুলাস বলে উঠলেন, আমি তাওবা করছি। ইবন ইসহাক বলেনঃ এ ঘটনার পর আল-জুলাস সত্যিকারভাবে মুসলমান হন। তাঁর বাকী জীবনে আর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়নি। তাওবা কবুল হওয়ার খুশীতে আল-জুলাস 'উমাইরকে আবার নিজ তত্ত্বাবধানে ফিরিয়ে নেন। আজীবন তাঁকে প্রতিপালন করেন। আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) 'উমাইরের কান ধরে বলেন ঃ ছেলে, তোমার এ কান ঠিক শুনেছিল। 'উরওয়া বলেন ঃ এ ঘটনার পর 'উমাইরের মর্যাদা সবার উর্দ্ধে উঠে যায়।[২১]

'উমাইর (রা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার রাবী হলেন, ছেলে মাহমুদ, আবূ তালহা আল-খাওলানী, আবু ইদরীস আল-খাওলানী, রাশেদ ইবন সা'দ, হাবীব ইবন 'উবায়েদ, যুহাইর ইবন সালেম প্রমুখ।[২২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১০৩-১০৪, ৫৫৭; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮; উসুদুল গাবা-৪/১৪৪,
২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫১৯
৩. উসুদুল গাবা-৪/১৪৪
৪. তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৯; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/১৪; উসুদুল গাবা-৪/১৪৫
৫. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৪; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮
৬. সীয়ারে আনসার-২/১১৯
৭. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫, ৫৫৯; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮; আল-আ'লাম-৫/৮৮
৮. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৫৫৯
৯. প্রাগুক্ত-২/৫৬০
১০. প্রাগুক্ত-২/৫৬০-৫৬২
১১. আল-আ'লাম-৫/৮৮; তাহজীবুত তাহজীব-৮/১২৯
১২. আল-ইসাবা-৩/৩২
১৩. কানযুল 'উম্মাল-৭/৭৯; হায়াতুস সাহাবা-২/১৩৫-১৩৮; আল-আ'লাম-৫/৮৮
১৪. তাবাকাত-৪/৩৭৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৪৮৮

১৫. তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮
১৬. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫, ৫৬২
১৭. তাহজীব আত-তাজীব-৮/১২৯; আল-ইসাবা-৩/৩২; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫
১৮. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৫, ৫৫৯; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৯
১৯. আল-ইসাবা-৩/৩২
২০. সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৪; তাহজীব আত-তাহজীব-৮/১২৮
২১. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫১১-৫২০; উসুদুল গাবা-৪/১৪৪;
২২. তাহজীব আত-তাহজীব-৮১২৮; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৪, ৫৫৭; উসুদুল গাবা-৪/১৪৪; আল-ইসাবা-৩/৩২

রাফে' ইবন মালিক ইবন 'আজলান (রা)

আবু মালিক ও আবু রিফা'য়া ডাকনাম। আসল নাম রাফে'। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের সন্তান। পিতা মালিক ইবন 'আজলান।[১]

মদীনার আনসার সম্প্রদায় একটি অতি সৌভাগ্যবান গোষ্ঠী বা দল। বিশেষতঃ সত্তর মতান্তরে পচাত্তর জনের একটি দল। তাঁদের মধ্যে আবার আগে ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে মর্যাদার তারতম্য আছে। আনসারদের মধ্যে বনু নাজ্জার ও খাযরাজ গোত্র আগে ভাগে ইসলামের আহবানে সাড়া দানের ক্ষেত্রে প্রায় সমান সমান। তবে এ ব্যাপারে তাঁদের সকল সম্মান, মর্যাদা ও কৌলিন্য কিন্তু তাঁদেরই দুই মহান ব্যক্তির জন্য। সেই দুই মহান ব্যক্তি হলেন ঃ মু'য়াজ ইবন 'আফরা' ও রাফে' ইবন মালিক ইবন 'আজলান।

রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন। বিশেষতঃ হজ্জ মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত লোকদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াতী যিন্দেগীর এমনই এক পর্যায়ে মদীনার খাযরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি 'উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। এই ছয় সদস্যের দলটির সাথে মু'য়াজ ও রাফে' ছিলেন। তাঁদের মক্কায় উপস্থিতির খবর পেয়ে হযরত রাসূল (সা) তাঁদের অবস্থান স্থলে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করলেন। তাঁরা ধীরস্থির ভাবে মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহর (সা) বক্তব্য শোনেন। তারপর তাঁদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মু'য়াজ ও রাফে' রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত (আনুগত্যের শপথ) করে মুসলমান হন।[২]

তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ বর্ণিত হয়েছে, সেইবার মদীনা থেকে মু'য়াজ ও রাফে'- কেবল এই দুই জনই গিয়েছিলেন। তাঁরা মক্কায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মপ্রকাশের কথা শুনতে পেলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কথা শুনলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।[৩] সা'দ ইবন আবদুল হামীদের বর্ণনা অনুযায়ী দুইজনের মধ্যে এই রাফে' প্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। তিনি আরো বলেন, খাযরাজ গোত্রের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪] বালাজুরী বলেন ঃ রাফে' আনসারদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।[৫]

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন এবং খুব জোরেশোরে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ

'যখন তাঁরা মদীনায় ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন তখন গোটা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) চর্চা হতো না।'[৬]

এর পরের বছর রাফে' বারো ব্যক্তি এবং তার পরের বছর ৭০/৭৫ ব্যক্তির সাথে পর পর দুই বার মক্কায় যান এবং ঐতিহাসিক বাই'য়াতে আকাবায় অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত করেন। সর্বশেষ বাই'য়াতের সময় তিনি বনু যুরাইক-এর 'নাকীব' বা দায়িত্বশীল মনোনীত হন।[৭]

একটি বর্ণনায় এসেছে, মদীনায় কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁরা সর্বসম্মতভাবে মু'য়াজ ও রাফে'কে মক্কায় পাঠান। উদ্দেশ্য, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করবেন, তিনি যেন মদীনায় একজন প্রচারক পাঠান, যিনি মদীনায় আল কুরআন শিক্ষা দেবেন। তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাসূল (সা) মুস'য়াব ইবন 'উমাইরকে মদীনায় পাঠান।[৮]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর সা'ঈদ ইবন যায়িদ ইবন 'আমর ইবন নুফাইলের সাথে রাফে'র দ্বীনী ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[৯]

রাফে'র ইসলামী জীবনের সময়কাল খুবই স্বল্প। এ স্বল্পসময়ে মাত্র দুইটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়–বদর ও উহুদ। বদরে তাঁর যোগদানের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে। ইবন ইসহাক তাঁকে বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেননি। মূসা ইবন 'উকবা ইমাম ইবন শিহাব আয-যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাফে' বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১০] এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য হলো খোদ রাফে'র মন্তব্য যা ইমাম বুখারী সংকলন করেছেন। রাফে' বলেছেন ঃ 'এতে আমি খুশী নই যে, আকাবার পরিবর্তে বদরে অংশগ্রহণ করি।'[১১] যদিও তিনি এ মন্তব্য দ্বারা বদরের চেয়ে 'আকাবা'র অধিক গুরত্বের কথা বুঝাতে চেয়েছেন, তবে এ দ্বারা তাঁর বদরে যোগদান না করার কথাও বুঝা যায়। ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন মদীনা থেকে বদরের দিকে যাত্রা করেন তখন মদীনার অনেকের মত রাফে'ও মনে করেন, রাসূল (সা) কোন যুদ্ধে যাচ্ছেন না। আর এ কারণেই তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী হননি।[১২]

রাফে'(রা) হিজরী তৃতীয় সনের উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী যিন্দেগীর এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১৩]

রাফে' (রা) ইসলামী জীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ে বিভিন্ন প্রকার দ্বীনী সেবা প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুবাল্লিগ (প্রচারক)। সেই প্রথম পর্যায়ে মদীনায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে তাঁর বিরাট অবদান আছে। ইসলাম গ্রহণের পর গোটা মদীনায় কিভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটানো যায়– এটাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা ও ফিকর। তাই তিনি প্রতিবছর ছুটে গেছেন মদীনা থেকে মক্কায় এবং গোপনে 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হয়েছেন এবং জরুরী হিদায়াত ও নির্দেশ নিয়ে মদীনায় ফিরে এসেছেন। আকাবার সর্বশেষ বাই'য়াতের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নির্বাচিত দ্বাদশ নাকীবের অন্যতম নাকীব হিসাবে অর্পিত মহাদায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেছেন।

বর্ণিত আছে রাফে' সবার আগে সূরা ইউসুফ মদীনায় নিয়ে আসেন। মদীনার সকল মসজিদের পূর্বে মসজিদে বনু যুরাইকে সর্বপ্রথম আল কুরআন পঠিত হয়েছিল। আর সে

পাঠক ছিলেন তিনি। মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াতের সময় যতটুকু আল কুরআন তাঁর ওপর নাযিল হয়েছিল, তিনি তা লিখে সাথে করে মদীনায় নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজ খান্দানের সকলকে সমবেত করে তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।[১৪]

এমন একটি বর্ণনাও আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় থেকে যান। সূরা ত্বাহা নাযিল হওয়ার পর তা লিখে মদীনায় নিয়ে আসেন। মোটকথা, এমনি ধরনের আরো বহু সেবা তিনি দান করেন।

হাকেম তাঁর আল-মুসতাদরিক গ্রন্থে রাফে' ইবন মালিকের একটি হাদীস সংকলন করেছেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী তাঁর পৌত্র মু'য়াজ ইবন রিফা'য়া ইবন রাফে'।[১৫]

তথ্য সূত্র ঃ

১. আল-ইসতী'য়াব ঃ ১/৪৯৪
২. ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ-১/৩৩৪; উসুদুল গাবা- ২/১৫৭; আনসাবুল আশরাফ- ১/২৩৯
৩. তাবাকাত-১/১৪৬
৪. আল-ইসাবা-১/৪৯৯
৫. উসুদুল গাবা-২/১৫৭
৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২২৯, ৪৩১, ৪৪৩, ৪৬০; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৪
৮. হায়াতুস সাহাবা-১/১১৭
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২৭১
১০. আল-ইসাবা-১/৪৯৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৪
১১. আল-ইসাবা-১/৪৯৯
১২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮
১৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৪
১৪. আল-ইসাবা-১/৪৯৯
১৫. প্রাগুক্ত-১/৪৯৯

যায়িদ ইবনে দাসিনা (রা)

হযরত যায়িদের (রা) পিতার নাম দাসিনা ইবনে মু'য়াবিয়া। মদীনার খাযরাজ গোত্রের 'বনু বায়্যাদা' শাখার সন্তান।[১] তিনি যে কখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলী দ্বারা বুঝা যায়, মদীনায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর বেশী দিন এ পার্থিব জীবন ভোগ করার সুযোগ পাননি। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

উহুদ যুদ্ধের পরে, ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে 'আদাল ও কারা গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে আবেদন জানায়, কুরআন ও শরীয়াতের তা'লীম ও তারবিয়াত দিতে পারে এমন কিছু লোক আমাদের ওখানে পাঠান সেখানে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। তাদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূলে কারীম (সা), খুবাইব ইবনে আদী ও যায়িদ ইবনে দাসিনাসহ মোট ছয়জনকে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁরা হুজাইল গোত্রের আর-রাজী' নামক জলাশয়ের পাশে মুশরিকদের (পৌত্তলিক) দ্বারা আক্রান্ত হন। হযরত খুবাইব ও যায়িদ (রা) তাদের হাতে বন্দী এবং অন্যরা শহীদ হন। তাঁদের দু'জনকে হাত বেঁধে মক্কায় নিয়ে যায় এবং হুজাইল গোত্রের দু'বন্দীর বিনিময়ে তাদেরকে কুরাইশদের নিকট অর্পণ করে। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা মুসলমানদের হাতে নিহত তার পিতা উমাইয়্যা ইবন খালাফের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন দাসিনাকে গ্রহণ করে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে ভেবে সে দারুণ পুলকিত হয়ে ওঠে।

মক্কার পৌত্তলিকরা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিল যে, যায়িদকে 'তানঈম' নামক স্থানে হত্যা করা হবে। সাফওয়ানের ছিল 'নিস্‌তাস' নামে একটি দাস। সাফওয়ান তাঁদের দু'জনকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিল। সেখানে পৌছার পর তাঁরা এক আজব পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। আবু সুফইয়ান যায়িদকে (রা) লক্ষ্য করে বললেনঃ যায়িদ, তোমাকে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি। তুমি সত্য কথা বলবে। যদি তোমার স্থলে মুহাম্মাদকে আনা হয়, তাঁকে হত্যা করা হয়, আর তুমি তোমার ঘরে নিরাপদে ফিরে যাও-তুমি কি তা পসন্দ করবে? যায়িদ (রা) ধীর-স্থির ভাবে জবাব দিলেনঃ মুহাম্মদের গায়ে কাঁটার একটি আঁচড় লাগুক আর আমি আমার পরিবারের লোকদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি- এ আমার মোটেই পসন্দ নয়।

আবু সুফইয়ান তার এ জবাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল- মুহাম্মাদের সঙ্গী-সাথীরা তাকে যে পরিমাণ ভালবাসে, দুনিয়ায় কারো কোন বন্ধু তাকে এতখানি ভালোবাসেনা। এর পর তাদের নির্দেশে নিসতাস তাঁকে হত্যা

করে। এটা হিযরী তৃতীয় মতান্তরে চতুর্থ সনের একটি মর্মান্তিক ঘটনা। কোন কোন বর্ণনায় 'বীরে মাউনার' ঘটনায় হযরত যায়িদ (রা) বন্দী ও শহীদ হন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'গাযওয়াতুর রাজী ও বীরে মাউনা'- অধ্যায়ে ইবন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এটা উহুদের পরের ঘটনা। তাঁর বর্ণনায় আরো বুঝা যায়, 'আর-রাজী ও বীরে মাউনা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। আর আর-রাজী'র ঘটনায় খুবাইবের সাথে যায়িদ মক্কায় নিহত হন।

মূসা ইবন 'উকরা তাঁর মাগাযীতে বর্ণনা করেছেন, খুবাইব ও যায়িদকে একই দিনে হত্যা করা হয়। আর সেদিন মদীনায় রাসূলকে (সা) বলতে শুনা যায় "ওয়া আলাইকুমা আও ওয়া আলাইকাস্ সালামু।"

'উরওয়া ও মূসা ইবন 'উকবা বলেনঃ কুরাইশরা যায়িদকে ফাঁসিতে ঝুলানোর পূর্বে তার দেহ তীর মেরে ঝাঝরা করে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করে। কিন্তু এতে তাঁর ঈমান ও আত্মসমর্পণের ইচ্ছার বৃদ্ধিই ঘটে।[২]

ইবন ইসহাক ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 'আর-রাজী'র' নায়করা এমন অসহায়ভাবে নিহত হলে মদীনার মুনাফিকরা বলতে লাগলোঃ এই হতভাগাদের জন্য দুঃখ হয়, যারা এমন অসহায়ভাবে শেষ হয়ে গেল। তারা না তাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে থাকলো, আর না তারা তাদের বন্ধুর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারলো। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-বাকারার ২০৪ নং আয়াতটি নাযিল করেনঃ[৩]

"-আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্যস্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃত পক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক।"

'আর-রাজী'র শহীদদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা আল-বাকারার ২০৭ নং আয়াতটি নাযিল করেনঃ

"-আর মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. উদুসুল গাবা-২/২৩০

২. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ আল্লামাহ ইবনকাসীরেরর আস-সীরাতু আন-নাবাবীয়্যা-১/৫৯৮-৬০৪; সীরাতু ইবন হিশাম ২/১৬৯-১৭২; আল বিদায়া- ৪/৬৩; উদুসুল গাবা-২/২৩০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২০-৫২৫; আল ইসাবা-১/৫৬৫

৩. আস-সীরাতু আন নাবাবিয়্যা-১/৬০৩

কায়স ইবন সা'দ ইবন 'উবাদা (রা)

হযরত কায়সের (রা) একাধিক ডাকনাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমনঃ 'আবুল ফাদল, আবু 'আবদিল্লাহ ও আবু আবদিল মালিক। ইবন হিব্বান 'আবুল কাসেম নামটি উল্লেখ করেছেন।[১] মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের সায়িদা শাখার সম্মানিত সদস্য। একজন আনসারী সাহাবী খাযরাজ গোত্রের বিখ্যাত নেতা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'দ ইবন উবাদা তাঁর পিতা এবং ফুকাইহা বিনতু 'উবাইদ ইবন দুলাইম মাতা। পিতা-মাতা ছিলেন পরস্পর চাচাতো ভাই-বোন।[২] তাঁর পূর্ব পুরুষের লোকেরা ছিলেন মদীনার বিখ্যাত জনসেবক ও শ্রেষ্ঠ নেতা। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিযরতের পূর্বে হযরত কায়স ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে হযরত কায়স অংশ গ্রহণ করেন।[৩] ইমাম যুহরী বলেন, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাবাহীদের অন্যতম।[৪] হিজরী ৮ম সনের 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধটি ছিল মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা। ৩০০ (তিনশো) সদস্যের এক বাহিনী নিয়ে, যার মধ্যে হযরত আবু বকর ও 'উমারও ছিলেন— আবু 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ সমুদ্র উপকূলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে ১৫ (পনেরো) দিন অবস্থান করেন। সংগে নেওয়া খাদ্য-খাবার ফুরিয়ে যায়। গোটা বাহিনী প্রচন্ড খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হন। সৈনিকরা ক্ষুধার জ্বালায় গাছের ঝরা পাতা খেতে থাকেন। 'খাবাত' অর্থ ঝরা পাতা। যেহেতু এ বাহিনীর সৈনিকরা গাছের ঝরা পাতা খেয়েছিলেন, একারণে এই বাহিনী 'জায়শুল খাবাত' বা ঝরা পাতার বাহিনী নামে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। হযরত কায়স এ দুঃসময়ে তিনটি করে উট ধার নিয়ে জবেহ করেন। তিনবার মোট নয়টি উট ধার নিয়ে জবেহ করে গোটা বাহিনীর বেঁচে থাকার মত খাবারের ব্যবস্থা করেন। অতিরিক্ত ধার দেনা হয়ে যাচ্ছে দেখে অধিনায়ক আবু 'উবায়দাহ (রা) তাঁকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন।[৫] একটি বর্ণনায় এসেছে, 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত আবু বকর ও হযরত 'উমার (রা) তাঁর এমন বেপরোয়া উট জবেহ করা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, যদি এ যুবককে বিরত না রাখা হয় তাহলে সে তার পিতার সকল সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলবে। তারপর তাঁরা দু'জন বাহিনীর অন্য সদস্যদের বুঝিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে এনে কায়সকে উট জবেহ থেকে নিবৃত করেন।[৬] যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে লোকেরা তাঁর এ আচরণের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেনঃ দানশীলতা অবশ্যই এ বাড়ীর এক বৈশিষ্ট্য।[৭]

মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কায় প্রবেশকালে আনসারদের ঝান্ডা প্রথমতঃ সা'দ ইবন উবাদার হাতে ছিল। এক পর্যায়ে রাসূল (সা) সেটি তার হাত থেকে নিয়ে কায়সের হাতে তুলে দেন।[৮]

বিভিন্ন যুদ্ধে ঝান্ডা বহনকারী ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশাতে খিলাফতের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। এ সময় শাসন-শৃংখলার দায়িত্ব যে সকল ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়, কায়স তাদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে কায়সের মর্যাদা ছিল কোন আমীরের দরবারে পুলিশের একজন সর্বাধিনায়কের মর্যাদার মত।[৯]

হযরত আলীর দরবারেও তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। ইবন ইউনুস বলেনঃ তিনি মিসর বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন এবং সেখানে বাড়ী তৈরী করেন। তারপর আলী (রা) তাঁকে মিসরের আমীর নিয়োগ করেন।[১০] হযরত মুয়াবিয়া (রা) নানাভাবে বিরুদ্ধাচরণ করেও মিসরে কোন রকম হাঙ্গামা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে কুফাবাসীদের ক্ষেপিয়ে তুলে আলী (রা) দ্বারা তাঁকে বরখাস্ত করাতে সক্ষম হন। তাঁর স্থলে আলী (রা) মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে ওয়ালী নিয়োগ করেন। এ সম্পর্কে ইবন সীরীন বলেনঃ আলী (রা) কায়স ইবন সা'দকে হিজরী ৩৬ সনে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন এবং হিজরী ৩৭ সনে বরখাস্ত করেন। কারণ, আলীর (রা) বন্ধুরা তাঁকে এ কথা বুঝায় যে, কায়স মুয়াবিয়ার (রা) সাথে গোপন আঁতাত করেছে। যখন তাঁকে অপসারণ করে তার স্থলে মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে নিয়োগ করা হয় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, আলীকে (রা) বিভ্রান্ত করা হয়েছে। এরপরেও আলীর (রা) সাথে তাঁর সদ্ভাব বজায় থাকে এবং সকল ব্যাপারে আলী (রা) তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।[১১] মিসর শাসন করা মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর বিরুদ্ধে পরিচালিত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) ও আমর ইবনুল 'আসের (রা) কর্ম-কৌশল অশান্তির এক প্রবাহ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে যা খিলাফতের বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।[১২]

হযরত কায়স (রা) মিসর থেকে সোজা মদীনায় চলে আসেন। মারওয়ান তখন মদীনায়। তিনি কায়সকে ভয় দেখালে তিনি মদীনা ছেড়ে কুফায় চলে যান এবং সেখানে হযরত আলীর (রা) সাথে বসবাস করতে থাকেন।[১৩]

আলীর (রা) সাথে সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সিফ্‌ফীন যুদ্ধের দিনগুলিতে তিনি আলীর (রা) বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন। এ যুদ্ধের দিনগুলিতে তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন। তার দু'টি পংক্তি নিম্নরূপঃ[১৪]

এ সেই ঝান্ডা যা আমরা নবীর সাথে বহন
করেছি। তখন জিব্‌রাইল ছিলেন আমাদের সাহায্যকারী।
আমরা সেই জাতি, যখন তারা যুদ্ধ করে
তখন দেশ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত
তাদের তরবারি ধরা হাতটি প্রলম্বিত হতে থাকে।

এর পূর্বে তিনি উটের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। নাহরাওয়ানের যুদ্ধে তিনি নিজের গোত্রের সকল লোকের সাথে যোগদান করেন। এ যুদ্ধের শুরুতে হযরত আলী (রা) নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি আহবান জানানোর জন্য আবু আইউব

আল-আনসারী ও কায়সকে (রা) খারেজী সম্প্রদায়ের নিকট পাঠান। আবদুল্লাহ্ ইবন সানজার খারেজীর সাথে তাঁদের আলোচনা হয়। তিনি বলেন, আলীর আনুগত্য ও অনুসরণ আমাদের মনপূত নয়। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) মত কেউ হলে আমরা তাঁকে খলীফা বলে মানতে রাজী হতাম। জবাবে কায়স (রা) বললেন, আমাদের মধ্যে আলী ইবন আবী তালিব (রা) আছেন। আপনাদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ থাকলে তাঁর নাম পেশ করুন। তিনি বললেন, না, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই। কায়স বললেন, তাহলে আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত। অশান্তি ও বিশৃংখলা আপনাদের অন্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে।

হযরত কায়স (রা) সর্ব অবস্থায় আলীর (রা) একজন বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন। হিঃ ৪০ সনে আলী (রা) শাহাদাত বরণ করেন। খিলাফতের দায়িত্ব ইমাম হাসানের (রা) ওপর অর্পিত হয়। হযরত কায়স (রা) ইমাম হাসানকে সমর্থন জানান। এদিকে আলীর (রা) শাহাদাতের খবর পেয়ে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) এক বাহিনী পাঠান। হযরত কায়স (রা) পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী, যাঁদের প্রত্যেকের মাথা ছিল মুড়ানো এবং যাঁরা মৃত্যুর জন্য শপথ করেছিল— নিয়ে মু'য়াবিয়ার (রা) সিরীয় সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য 'আনবার' পৌঁছেন। আমীর মু'য়াবিয়ার বাহিনী 'আনবার' অবরোধ করেন। এর মধ্যে ইমাম হাসান (রা) ও মু'য়াবিয়ার মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। ইমাম হাসান (রা) 'আনবার' শহরটি মু'য়াবিয়া (রা) বাহিনীর হাতে অর্পণ করে মাদায়েনে তাঁর কাছে চলে যাওয়ার জন্য কায়সকে (রা) লেখেন।

ইমামের চিঠি পেয়ে হযরত কায়স দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি তাঁর বাহিনীর সকল সদস্যকে একত্র করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেনঃ তোমরা কী চাও? তোমাদের ইচ্ছা হলে আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমরণ লড়বো। আর তোমরা যদি চাও তাহালে আমি আমীর মু'য়াবিয়ার নিকট থেকে তোমাদের জন্য আমান বা নিরাপত্তার অঙ্গীকার নিতে পারি। সৈনিকেরা বললো, আপনি আমাদের জন্য নিরাপত্তার অঙ্গীকার নিন। তিনি তাই করেন এবং সহযোদ্ধাদের নিয়ে মাদায়েন চলে যান।

মাদায়েন থেকে হযরত কায়স (রা) মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথে মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত প্রতিদিন সঙ্গীদের জন্য একটি করে নিজের উট জবেহ্ করতেন। মদীনায় এসে তিনি সম্পূর্ণ নির্জন বাস অবলম্বন করেন এবং আমরণ একাগ্রচিত্তে আল্লাহর জিকর ও ইবাদাতে মশগুল থাকেন।[১৫]

খলীফা ইবন খাইয়্যাত, ওয়াকিদী ও আরো অনেকের মতে হযরত কায়স হিজরী ৬০ সনে হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) ফিলাফতকালের শেষ দিকে মদীনায় ইনতিকাল করেন। ইবন হিব্বানের মতে তিনি মু'য়াবিয়ার ভয়ে মদীনা থেকে সরে অন্যত্র পালিয়ে থাকেন এবং হিজরী ৮৫ সনে খলীফা আবদুল মালিকের সময় মারা যান। ইবন হাজার আসকালানীর মতে প্রথমোক্ত মতটি সর্বাধিক সঠিক।[১৬]

মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। মদীনার বহু অধিবাসী তাঁর কাছে আর্থিকভাবে ঋণী ছিল। এ কারণে ঋণগ্রস্তরা তাঁকে দেখতে আসতে লজ্জিত হচ্ছিলো। একথা বুঝতে পেরে তিনি ঘোষণা দেন, আমি আমার সকল পাওনা মাফ করে দিলাম। এ ঘোষণা ছড়িয়ে পড়তেই তাঁকে এক নজর দেখার জন্য জনতার মিছিল শুরু হয়ে যায়। লোকের প্রচন্ড ভিড়ে তার বাড়ীর সিঁড়িটি এক সময় ভেঙে পড়ে।

হযরত কায়সের (রা) এক ছেলের নাম ছিল 'আমের।[১৭] তিনি পিতা কায়সের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কায়স ছিলেন স্থূলকায় ও দীর্ঘ দেহী। 'আমর ইবন দীনার বলেন ঃ তাঁর ছিল বিশাল একটি দেহ ও ছোট্ট একটি মাথা। এত লম্বা ছিলেন যে, গাধার পিঠে সওয়ার হলে পা মাটিতে গিয়ে ঠেকতো।[১৮] মুখে তাঁর কখনও দাড়ি গজায়নি। আনসাররা রসিকতা করে বলতো, নিজেদের পয়সায় আমরা কায়সের জন্য কিছু পশম কিনতে চাই।[১৯]

তিনি ছিলেন 'আলিম সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীসের প্রচার ও প্রসার। জীবনের কোন পর্যায়ে তিনি এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। মিসরের আমীর থাকা কালেও সেখানের মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন।[২০] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। এ সকল হাদীস তিনি সরাসরি রাসূল (সা), পিতা সা'দ ইবন 'উবাদা, 'আবদুল্লাহ ইবন হানজালা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বয়সে কায়সের চেয়ে ছোট।[২১] তিনি মোট ১৬ (ষোল)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একথা বলেছেন 'আল্লামা যিরিক্‌লী।[২২]

হযরত কায়সের নিকট থেকে বহু লোক হাদীস শুনেছেন এবং তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনাও করেছেন। এখানে তাঁর বিখ্যাত কয়েকজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ আনাস ইবন মালিক, সা'লাবা ইবন আবী মালিক, আবু মায়সারা, 'আবদুর রহমান ইবন আবীলায়লা, আবু 'আম্মার আজ-জাহাবী, শুরাইব ইবন হুমাইদ হামাদানী, আশ-শা'বী, 'আমর ইবন শুরাহবীল, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, মায়মূন ইবন আবী শায়ব, মুহাম্মাদ ইবন আবদির রহমান ও আবু তামীম আল-জায্‌শানী।[২৩]

হযরত কায়স ছিলেন একজন বড় মাপের চিন্তাশীল মানুষ। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে গেলে অনেক ভেবে-চিন্তে দিতেন। ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারেও তাঁর মধ্যে ছিল একটা পরিচ্ছন্ন মুক্ত চিন্তার ছাপ। যেমন একবার এক ব্যক্তি তাঁকে সাদাকায়ে ফিতরার ব্যাপারে প্রশ্ন করে বসলো। তিনি বললেন, যাকাতের হুকুমের পূর্বে রাসূল (সা) সাদাকায়ে ফিতরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু যাকাত ফরজ হওয়ার পর সাদাকায়ে ফিতরের নির্দেশও দেননি, আবার নিষেধও করেননি। পূর্ববর্তী নির্দেশের ভিত্তিতেই আমরা এখনও আদায় করছি।[২৪]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আখলাক ও স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দারুণ প্রভাব পড়েছিল তাঁর ওপর। রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত, পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি অনীহা, তাকওয়া, দানশীলতা, চিন্তা ও অনুধ্যান, বীরত্ব ও সাহসিকতা, উদারতা, সকলকে সমানভাবে ভালোবাসা ইত্যাদি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ মাধুর্য।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খিদমাত ও সেবার সুযোগ পাওয়া ছিল দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য। সকল সাহাবী এই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করতেন। হযরত কায়সও (রা) এ গৌরব ও সৌভাগ্যের একজন অধিকারী। মুসনাদে ইমাম আহমাদে এসেছে ঃ

"তাঁর পিতা তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সেবায় নিয়োগ করেন।[২৫] ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে মারয়াম ইবন আ'সয়াদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কায়স ইবন সা'দকে দেখেছি। তিনি দশ বছর রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করেছেন।[২৬]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর অপরিমিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। একদিন রাসূল (সা) গেলেন সা'দ ইবন 'উবাদার গৃহে। ফেরার সময় হলে সা'দ নিজের একটি গাধা আনালেন এবং পিঠে একটি চাদর বিছালেন। রাসূল (সা) গাধাটির পিঠে চড়ে বসলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যাওয়ার জন্য সা'দ কায়সকে বললেন। রাসূল (সা) গাধার ওপরে, আর কায়স তার পাশে হাঁটতে শুরু করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে পিছনে উঠে বসতে বললেন। কিন্তু তিনি ইতস্তত ভাব প্রকাশ করলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ হয় আমার বাহনের পিঠে উঠে বস, নয়তো ফিরে যাও। রাসূলুল্লাহর (সা) পাশাপাশি বসা আদবের খিলাফ মনে করলেন। তাই ফিরে গেলেন।[২৭]

উদারতা ও দানশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। আসমাউর রিজাল শাস্ত্রকারগণ তাঁর চিত্তের প্রশস্ততার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ[২৮]

"তিনি ছিলেন অন্যতম জ্ঞানী ও মর্যাদাবান সাহাবী এবং আরবের অন্যতম চালাক ও দানশীল ব্যক্তি।" এ উদারতা ও দানশীলতা ছিল একান্তই তাঁর স্বভাবগত। কিন্তু এ স্বভাব গঠনে দেশের পরিবেশ-প্রকৃতি, মাতা-পিতা ও খান্দানের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের যে বড় প্রভাব ছিল তা অনস্বীকার্য। 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে পিতার কাছে যখন সৈনিকদের অনাহার ও খাদ্যাভাবের কথা বর্ণনা করছিলেন তখন পিতা তাঁকে বললেন, তুমি উট জবেহ করে আহার করাতে পারতে। তিনি বললেন, আমি তো তাই করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদ্যাভাবের কথা বর্ণনা করলে পিতা একই কথা বললেন এবং পুত্রও একই উত্তর দিলেন। এভাবে তৃতীয় পর্যায়ের অনাহারের কথা বর্ণনা করা হলে পিতা তাঁকে একই কথা বললেন। তখন তিনি অভিযোগের সুরে বললেন, আমি তো তাই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে বিরত রাখা হয়েছে।[২৯] জাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ যুদ্ধে তিনি মোট নয়টি উট জবেহ করেছিলেন।[৩০]

এই 'জায়শুল খাবাত' যুদ্ধে হযরত আবুবকর ও হযরত 'উমার (রা) কায়সের (রা) উট জবেহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা সা'দ ইবন 'উবাদার (রা) কানে পৌঁছুলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে যান এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে বলেন, ইবন আবু কুহাফা ও ইবন খাত্তাব (আবু বকর ও উ'মার) কেন আমার ছেলেকে কৃপণ বানাতে চেয়েছে— একথার জবাব আপনি দিন।[৩১]

যে পিতা এমন দরিয়া দিল, তাঁর পুত্র কেমন দানশীল হতে পারেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। উসুদুল গাবা গ্রন্থকার বলেন ঃ তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই উল্লেখ করলাম না।[৩২] রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দানশীলতা এ বাড়ীর এক বৈশিষ্ট্য।[৩৩] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ সে দানশীল পরিবারের সন্তান।[৩৪]

দারুকুতনী ইয়াহইয়া ইবন আবদিল আযীয হতে বর্ণনা করেছেন। সা'দ ইবন 'উবাদা ও তাঁর ছেলে কায়স এক বছর এক বছর করে পালাক্রমে যুদ্ধে যেতেন। একবার সা'দ যুদ্ধে গেলেন, কায়স থাকলেন বাড়ীতে। সা'দ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে খবর পেলেন, মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বহু অতিথি এসেছে। তিনি সাথীদের বললেন ঃ কায়স যদি আমার ছেলে হয় তাহলে সে আমার খাদিম 'নিসতাস'কে বলবে ঃ নিসতাস, ভান্ডারের চাবি দাও। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য খাদ্যদ্রব্য নেব। তখন নিসতাস বলবে ঃ তোমার পিতার অনুমতিপত্র দেখাও। কায়স তখন তার নাকে ঘুষি মেরে চাবি ছিনিয়ে নেবে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজন মত জিনিস বের করে নেবে। বর্ণনাকারী বলেন, বাস্তবেই এমনটি ঘটেছিল। সেবার কায়স রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য এক শো ওয়াসাক খাদ্য নিয়েছিলেন।[৩৫]

হযরত কায়সের দানশীলতার আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা অসংগত হবে না। কুসাইর ইবন সাল্‌ত নামে এক ব্যক্তি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট ঋণী ছিলেন। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) মারওয়ানকে লিখলেন, আপনি কুসাইরের বাড়ীটি খরিদ করুন। যদি সে বিক্রী করতে না চায় তাহলে আমার পাওনা টাকার তাগাদা দিন। টাকা দিয়ে দিলে ভালো, অন্যথায় তার বাড়ীটি বিক্রী করে দিন। কুসাইরকে ডেকে মারওয়ান বিষয়টি জানালেন এবং তাকে তিন দিন সময় দিলেন। বাড়ীটি বিক্রীর ইচ্ছা কুসাইরের ছিলনা। তিনি টাকা দিয়ে দেওয়ারই চিন্তা করলেন। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকার ঘাটতি দেখা দিল। এ অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করবেন তা নিয়ে দারুণ ভাবনায় পড়লেন। হঠাৎ তাঁর কায়সের (রা) কথা স্মরণ হলো। তিনি কায়সের বাড়ী গিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা ধার চাইলেন। কায়স টাকা ধার দিলেন। কুসাইর টাকা নিয়ে মারওয়ানের নিকট উপস্থিত হলে সব কথা শুনে তাঁর অন্তরে দয়া হলো। তিনি বাড়ী ও টাকা সবই তাঁকে ফেরত দিলেন। কুসাইর সেখান থেকে উঠে কায়সের নিকট গেলেন এবং তাঁকে ত্রিশ হাজার টাকা ফেরত দিলেন। কায়স- যা আমি একবার কাউকে দিই তা আর ফেরত নিইনা— একথা বলে টাকার বান্ডিল গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।[৩৬]

একবার এক বৃদ্ধা কায়সের (রা) নিকট এসে তার চরম দারিদ্র ও অভাবের কথা জানিয়ে বললো, এখন আমার ঘরে কোন খাদ্য-খাবার নেই। কায়স বললেন, আপনি বাড়ী ফিরে যান। এখনই আপনার ঘরে শুধু খাবার বস্তু দেখতে পাবেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধার বাড়ীটি তেল, আটা, ঘি, গোশ্‌ত, খেজুর ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ভরে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৭] জুয়াইরিয়া ইবন আসমা বলেন, কায়স তাদেরকে ঋণ দিতেন ও আহার করাতেন।[৩৮]

তাঁর পিতা হযরত সা'দের (রা) ছিল বিপুল বিষয়-সম্পত্তি। সা'দ (রা) সিরিয়া চলে যাওয়ার সময় যাবতীয় সম্পদ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আর একটি ছেলের জন্ম হয়। তার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। আবু বকর ও 'উমার (রা) উভয়ে কায়সকে তাঁর পিতার বন্টন বাতিল করে নতুন করে সকল সম্পদ বন্টন করার পরামর্শ দিলেন। কায়স বললেন, আমার পিতা যেভাবে বন্টন করে গেছেন সেভাবেই থাকবে। তবে আমার অংশটি আমি তাকে দিলাম।[৩৯]

হযরত কায়স (রা) আল্লাহর কাছে সম্পদের প্রাচুর্য চাইতেন। তিনি একথা বিশ্বাস করতেন, ভালো কিছু করতে হলে সম্পদের প্রয়োজন হয়। সম্পদ ছাড়া কিছুই হয় না। তাই তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন ঃ 'হে আল্লাহ, আমাকে সম্পদ দান করুন। কারণ, সম্পদ ছাড়া কোন কাজ হয় না।[৪০]

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও রাজনৈতিক কূট-কৌশলে তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম সেরা ব্যক্তি। ইবন শিহাব বলেন ঃ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সময়ে গোটা আরবে কূটচাল ও কৌশলী হিসেবে খ্যাত ছিলেন পাঁচ ব্যক্তি। তারা হলেন ঃ মু'য়াবিয়া, 'আমর ইবনুল 'আস, কায়স, মুগীরা ও 'আবদুল্লাহ ইবন বুদাইল। তাঁদের মধ্যে কায়স ও বুদাইল ছিলেন আলীর (রা) সাথে।[৪১]

তাঁর বুদ্ধি ও চাতুর্য এমন ছিল যে, যতদিন তিনি মিসরের ওয়ালী ছিলেন ততদিন সেখানে আমীর মু'য়াবিয়া ও 'আমর ইবনুল 'আসের (রা) যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল সফল হতে দেননি। তিনি বলতেন ঃ যদি ইসলাম না আসতো তাহলে আমি এমন ধোঁকাবাজি করতাম যে সমগ্র আরববাসীকে অক্ষম করে ছাড়তাম।[৪২] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'প্রতারক ও ধোঁকাবাজ দোযখী'— রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী যদি আমি না শুনতাম তা হলে আমি হতাম এ উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধোঁকাবাজ।[৪৩] ইমাম যুহরী বলেছেন, তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধূর্ত লোকদের একজন।[৪৪] তাঁর সমকালীন লোকেরা বলেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, অব্যর্থ কৌশল অবলম্বনকারী, সাহসী ও বিচক্ষণ যোদ্ধা।[৪৫]

হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের সময়কালে খিলাফতের চতুর্দিকে যখন চরম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজমান তখন একদিন হাবীব ইবন মাসলামা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি এই ঘোড়ার পিঠে চড়ুন। এই বলে তিনি নিজের আসন থেকে একটু সরে তাঁকে সামনে বসার স্থান করে দেন। 'রাসূল

(সা) বলেছেন, বাহনের পিঠে সামনের দিকে মালিকের বসা উচিত'— একথা বলে তিনি সামনে বসতে অস্বীকার করেন। হাবীব বললেন, একথা আমিও জানি। তবে আপনাকে পিছনে বসিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারিনে।[৪৬]

হযরত কায়স (রা) ছিলেন একজন উদার ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি। এটা তাঁর জীবনের বিভিন্ন আচরণে ফুটে উঠেছে। একবার কাদেসিয়ায় সাহ্ল ইবন হুনাইফের সাথে বসে আছেন। এমন সময় সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যেতে দেখলেন। মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী তক্ষুণি মৃত ব্যক্তির সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা বললো, আপনি অহেতুক দাঁড়িয়ে গেছেন। মৃত ব্যক্তিটি তো একজন জিম্মী। কায়স (রা) বললেন, রাসূলও (সা) এক ইহুদীর লাশ দেখে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃত ব্যক্তিটি একজন ইহুদী— একথা বলা হলে তিনি বলেছিলেন, কোন ক্ষতি নেই। সেও তো একটি প্রাণী।[৪৭]

হযরত কায়স (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম। রাসূল (সা) তাঁকে খুবই আদর ও স্নেহ করতেন। আদর করে তাঁকে অনেক কিছু শিখাতেন। কায়স বলেন, একদিন আমি দু'রাকা'য়াত নামায শেষ করেছি। এমন সময় রাসূল (সা) আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় পা দিয়ে আমাকে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি প্রবেশ পথ বলে দেব না? বললাম ঃ জ্বী, বলে দিন। বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ"।[৪৮]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) বহুবার কায়সের পিতা সা'দ ইবন 'উবাদা (রা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। একবার বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সা'দ ইবন 'উবাদা ও তার পরিবার-পরিজনদের ওপর দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন।[৪৯]

হযরত কায়সের (রা) মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি এমন রূপ ধারণ করে যে, হযরত হাসানের (রা) খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর একেবারেই নির্জনবাস অবলম্বন করেন। এরপর বেশীর ভাগ সময় ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন। তিনি সব সময় ফরজ ইবাদাত সমূহ যথাযথভাবে আদায়ের পর নফল ইবাদাত সমূহও অতি নিয়মানুবর্তিতার সাথে আদায় করতেন। 'আশূরা দিনের রোযা নফল। রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পূর্বে সকল সাহাবী এ রোযা রাখতেন। রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পর এর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও হযরত কায়স সব সময় আশূরার রোযা রাখতেন।[৫০]

হযরত কায়স (রা) ছিলেন হযরত আলীর (রা) সমর্থক। আলী (রা) এবং তাঁর পরে হাসানকে (রা) তিনি খিলাফতের ব্যাপারে সত্যপন্থী মনে করতেন। তাই হাসান যখন মু'য়াবিয়ার (রা) সাথে চুক্তি করে খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ান তখন তিনি দারুণ মনঃক্ষুণ্ন হন। এরপর তিনি রাজনীতির ময়দান থেকে সরে গিয়ে নির্জনবাস অবলম্বন করেন। তা সত্ত্বেও তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছেন বলে

মনে হয় না। তাঁর বিভিন্ন কথা ও কাজ একথা প্রমাণ করে। এখানে একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করছি যা বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

একবার রোমান সম্রাট আমীর মু'য়াবিয়াকে আরব দেশের দীর্ঘতম ব্যক্তির একটি পায়জামা পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে দূত পাঠান। মু'য়াবিয়া (রা) কায়সকে (রা) ডাকিয়ে বলেন, আমার শুধু আপনার একটা পায়জামার প্রয়োজন। তিনি সাথে সাথে উঠে এক কোণে নির্জনে গিয়ে পরনের পায়জামাটা খুলে হাতে করে নিয়ে এসে মু'য়াবিয়ার দিকে ছুড়ে মারেন। মু'য়াবিয়া বলেন আপনি ঘরে ফিরে গিয়েও তো পাঠিয়ে দিতে পারতেন। হযরত কায়স (রা) তখন কবিতায় মু'য়াবিয়ার (রা) কথার জবাব দেন। তাতে তাঁর প্রবল আবেগ, আকুতি ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে সেই কবিতার কয়েকটি চরণ সংকলিত হয়েছে। তার কয়েকটি চরণের অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আমি এখনি পায়জামা এ জন্য দিয়েছি যে, লোকে জানুক এটা কায়সের পায়জামা, আর কায়জারের প্রতিনিধিরা সাক্ষী থাকুক।

২. তারা যাতে বলতে না পারে যে, কায়স রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং এ একটি সাধারণ পায়জামা।

৩. আমি তো ইয়ামনী গোত্রের একজন নেতা। আর মানুষ তো দু'প্রকারেরই হয়— নেতা ও অনুসারী।

৪. আমার মত মানুষ তাদের জন্য ভীতিকর। তবে আমার স্বভাব ও চরিত্র মানুষের মধ্যে প্রসারিত।

অতঃপর মু'য়াবিয়া (রা) তাঁর বাহিনীর দীর্ঘতম ব্যক্তিকে বলেন সেটি পরতে। সে পায়জামাটি তার নাকের ওপর ধরলে তা মাটিতে গিয়ে পড়ে।[৫১] ইবনুল আসীর, আবু 'আমরের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মু'য়াবিয়ার দরবারে কায়সের পায়জামা বিষয়ক যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই।[৫২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৩; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
২. উসুদুল গাবা-৪/২১৫; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/৩১১
৩. আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৪. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৫. বুখারী-২/৬২৫, ৬২৬; আল-বিদায়া-৪/২৭৬; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৪০
৬. উসুদুল গাবা-৪/২১৫; তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
৭. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯
৮. আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৯. সহীহ বুখারী-২/১০৫৯; তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৩ আল-আ'লাম-৫/২০৬
১০. আল-ইসাবা-৩/২৪৯
১১. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫

১২. আল-ইসাবা-৩/২৪৯; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
১৫. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/৩১২
১৬. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-ইসাবা-৩/২৪৯; আল-আ'লাম-৫/২০৬
১৭. মুসনাদ-৩/৪২২
১৮. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
১৯. উসুদুল গাবা-৪/২১৫; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
২০. মুসনাদ-২/৪২২
২১. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪
২২. আল-আ'লাম-৫/২০১
২৩. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-ইসাবা-৩/২৪৯; তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
২৪. মুসনাদ-৬/৬
২৫. মুসনাদ-৩/৪২২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-৩/১০৪
২৬. আল-ইসাবা-৩/২২৯
২৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৫১৫
২৮. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
২৯. সহীহ বুখারী-৩/৬২৬
৩০. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; আল-বিদায়া-৪/২৭৬
৩১. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৩২. উসুদুল গাবা-৪/৩১৬
৩৩. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪; হায়াতুস সাহাবা-২/২০৮
৩৪. হায়াতুস সাহাবা-২/২০৯
৩৫. আল-ইসাবা-৩/৫৫৩; হায়াতুস সাহাবা-২/২০০
৩৬. আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯; আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৩৭. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২
৩৮. প্রাগুক্ত-২/৩১৩
৩৯. আল-ইসতী'য়াব-২/৫৩৯
৪০. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪
৪১. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৪২. আল-ইসাবা-৩/২৪৯
৪৩. তারীখুল ইসলাম-২/৩১২; উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৪৪. তাহজীবুত তাহজীব-৮/৩৫৪
৪৫. উসুদুল গাবা-৪/২১৫
৪৬. মুসনাদ-৩/৪২২
৪৭. প্রাগুক্ত-৬/৬
৪৮. আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব-৩/১০৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৯৮
৪৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৬
৫০. মুসনাদ-৩/৪২২
৫১. তারীখুল ইসলাম-২/৩১৩
৫২. উসুদুল গাবা—৪/২১৫

'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন হারাম (রা)

নাম আবু জাবির 'আবদুল্লাহ। পিতা 'আমর ইবন হারাম এবং মাতা আর-রাবাব বিনতু কায়স। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সুলামা শাখার সন্তান।[১] রাসূলুল্লাহর (সা) বহু হাদীস বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাবিরের (রা) গর্বিত পিতা। বনু সুলামার একজন সম্মানিত নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি একজন 'আকাবী, বদরী ও উহুদের শহীদ।[২] বালাজুরী বলেন ঃ তিনি একজন আকাবী, বদরী ও নাকীব।[৩]

ইসলাম-পূর্ব সময়ের আরবের লোকেরা মক্কার কা'বায় গিয়ে হজ্জ ও 'উমরা আদায় করতো। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরিববাসীদের পাঁচ শো সদস্যের একটি বিরাট কাফিলা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যায়। তখন পর্যন্ত ইয়াসরিবে মুস'য়াব ইবন 'উমাইরের (রা) হাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারীরা ছাড়াও অনেক পৌত্তলিক এ কাফেলায় ছিল। আবদুল্লাহও ছিলেন এ কাফিলার একজন সদস্য। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।[৪] এ সফরে তাঁর ছেলে জাবিরও মুসলমান অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আনসারী সাহাবী কা'ব ইবন মালিক বলেন ঃ[৫] "আমরা ইয়াসরিব থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মক্কায় পৌঁছে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আকাবা উপত্যকায় মিলিত হওয়ার কথা পাকাপাকি করলাম। হজ্জ শেষ করলাম এবং সাক্ষাতের নির্ধারিত রাতটিও এসে গেল। আমাদের সংগে ছিলেন আবু জাবির আবদুল্লাহ ইবন আমর। তিনি একজন নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁকেও আমরা সফরসঙ্গী করেছিলাম। পৌত্তলিক সফরসঙ্গীদের কাছে আমরা আমাদের প্লান-পরিকল্পনা গোপন রাখতাম। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কিছু আগে আমরা তাঁকে বললাম ঃ 'আবু জাবির! আপনি আমাদের একজন নেতা। আপনি একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি আছেন, তার ওপর মারা গেলে কালই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবেন। এভাবে এক পর্যায়ে আমরা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আকাবায় নির্ধারিত সাক্ষাতের সময়ের কথাও জানালাম। তিনি তক্ষুণি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমাদের সাথে 'আকাবার বা'ইয়াতে শরীক হন। রাসূল (সা) তাঁকে বনু সুলামার নাকীব বা দায়িত্বশীল মনোনীত করেন।"

বালাজুরী বলেন ঃ[৬] তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের পরনের অপবিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে আল-বারা' ইবন মা'রূরের দেওয়া দু'খানি কাপড় পরেন। আকাবার এই শেষ শপথে তাঁরা পিতা-পুত্র অংশগ্রহণের গৌরব অর্জন করেন। 'আবদুল্লাহ বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। হিজরী তৃতীয় সনের উহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং শাহাদাতের অনন্ত গৌরবের অধিকারী হন। এটা হিজরাতের বত্রিশ মাসের মাথায় শাওয়াল মাসের ঘটনা।[৭]

উহুদ যুদ্ধে মুনাফিকদের (কপট মুসলমান) সরদার আবদুল্লাহ ইবন উবাই মদীনার বাইরে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। রাসূল (সা) উহুদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সে তার সমর্থকদের নিকট এসে বলে ঃ 'তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করে তাঁর ছোকরাদের কথা শুনলেন। আমরা জানিনে, কিসের জন্য আমাদের জীবন বিপন্ন করবো।'— এই বলে সে তার তিন শো সঙ্গীসহ ফিরে চললো।

এ সময় আবদুল্লাহ ইবন 'আমর কিছু মুসলমান সঙ্গীকে নিয়ে তার সাথে দেখা করে বলেন ঃ 'তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের লজ্জা করে না? তোমাদের নারীদের এবং তোমাদের আবাসভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।' বিশেষতঃ মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাইকে ভীষণ তিরস্কার ও গালমন্দ করে বলেন ঃ 'আল্লাহর নামে আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায় ও নবীকে এভাবে শত্রুর সামনে ছেড়ে দিয়ে অপমান করোনা।' উত্তরে তারা বলে ঃ 'আমরা যদি যুদ্ধে পারদর্শী হতাম, তোমাদের সাথে যেতাম। এভাবে তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করতাম না।' যখন তারা রণক্ষেত্রে ফিরে যেতে কোনভাবেই রাজী হলো না তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ তার শত্রুদের দূর করে দিন। তোমাদের হাত থেকে আল্লাহ তাঁর নবীকে রক্ষার জন্য একাই যথেষ্ট।' এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াতটি নাযিল করেন [৮]

উহুদ যুদ্ধের আগের দিন রাতে তিনি ছেলে জাবিরকে ডেকে বললেন ঃ বাবা, আগামীকালের প্রথম শহীদ আমি হতে চাই। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে তুমিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আমি তোমাকে বাড়িতে রেখে যাচ্ছি। তোমার বোনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আমার যে ঋণ আছে তা পরিশোধ করবে।[৯]

দিনের বেলা তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ দারুণ সাহসের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। তিনিই হলেন দিনের প্রথম শহীদ।[১০] উসামা ইবন 'উনাইদ তাঁকে হত্যা করে।[১১] বালাজুরী হত্যাকারী হিসেবে সুফইয়ান ইবন 'আবদি শাম্‌স আস-সুলামীর নাম উল্লেখ করেছেন।[১২] পৌত্তলিকরা তাঁর লাশ কেটেকুটে একেবারে বিকৃত করে ফেলে।

ছেলে জাবির বলেন ঃ আমার পিতার শাহাদাতের খবর শুনে ছুটে এসে দেখলাম, লাশ একটি চাদর দিয়ে ঢাকা। আমি মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে মুখে চুমু দিতে লাগলাম। রাসূল (সা) দেখলেন কিন্তু নিষেধ করলেন না। আমি কাঁদতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীরা নিষেধ করতে লাগলেন; কিন্তু রাসূল (সা) নিষেধ করলেন না। আমার ফুফু ফাতিমা বিনতু 'আমর কাঁদতে লাগলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কাঁদ বা না কাঁদ লাশটি তোমরা উঠিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতারা ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া দিতে থাকবে। ফাতিমা এক চিৎকার দিয়ে ওঠেন। 'এটা কার চিৎকার'— রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন। উপস্থিত লোকেরা বললো ঃ আবদুল্লাহর বোনের।[১৩]

তাঁকে উহুদে দাফন করা হয়। উহুদের শহীদদেরকে দু'জন অথবা তিনজন করে এক

কবরে দাফন করা হয়।[১৪] জাবির বলেনঃ উহুদের শহীদ আমার পিতা ও মামার লাশ মদীনায় আনা হচ্ছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘোষণা— শহীদদেরকে শাহাদাতের স্থলেই দাফন করা হবে— শুনে তাঁদেরকে আবার উহুদে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়। মালিক ইবন আনাস বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ও 'আমর ইবন আল–জামূহকে একই কাফনে ও একই কবরে দাফন করা হয়।[১৫] বুখারীর বর্ণনায় মামার স্থলে চাচা বর্ণিত হয়েছে।[১৬] আসলে 'আমর ইবন আল-জামূহ আবদুল্লাহর ভাই নন; বরং ভগ্নিপতি।[১৭] বনু সুলামার এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সূত্রে ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন ঃ উহুদের লাশ দাফনের সময় রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা 'আমর ইবন আল-জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবন হারামের দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। তারা দু'জন দুনিয়াতে ছিল অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁদেরকে একই কবরে দাফন করবে।[১৮]

দাফনের ছয় মাস পর হযরত জাবির পিতার লাশটি কবর থেকে তুলে অন্য একটি কবরে দাফন করেন। তখন কেবল কান ছাড়া গোটা দেহ এমন অক্ষত ছিল যে, মনে হচ্ছিলো কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে।[১৯] এর ৪৬ বছর পর লাশটি আবার কবর থেকে তোলা হয়। জাবির বর্ণনা করেছেন। কবরটি ছিল একটি পানির নালার ধারে। একবার প্লাবনের সময় তাতে পানি প্রবেশ করে। কবরটি খোড়া হয়। দেখা গেল, আবদুল্লাহর মুখে, যেখানে আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর একটি হাত সেই ক্ষতের ওপর। হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। হাতটি আবার সেখানে রেখে দিলে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। জাবির বলেন ঃ 'আমি দেখলাম আমার পিতা যেন কবরে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর দেহে কম-বেশী কোন রকম পরিবর্তন হয়নি। জাবিরকে প্রশ্ন করা হলো ঃ তাঁর কাফনটি কেমন ছিল? বললেন ঃ কাফনেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। একই অবস্থায় ছিল। অথচ এর মধ্যে ৪৬টি (ছেচল্লিশ) বছর চলে গেছে।

জাবির (রা) পিতার মৃত দেহে কিছু সুগন্ধি লাগানোর পরামর্শ চাইলে সাহাবীরা অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ তাঁদের ব্যাপারে নতুন করে আর কিছুই করবে না। তারপর অন্য এক স্থানে দাফন করা হয়।[২০]

হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) মৃত্যুকালে ছেলে হযরত জাবির (রা) ছাড়া আরো নয়জন মেয়ে রেখে যান। তাদের মধ্যে ছয়জন ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক।[২১] তিনি অনেক ঋণের বোঝা রেখে যান। সহীহ বুখারীতে এর বিবরণ এসেছে। এসব ঋণ হযরত জাবির (রা) পরিশোধ করেন। হযরত জাবিরের (রা) জীবনীতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[২২] জাবির বলেন ঃ আমার পিতা অনেক দেনা রেখে যান। মৃত্যুর পর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললাম ঃ আমার বাবা অনেক দেনা করে গেছেন। কিছু খেজুর আছে। আপনি চলুন যাতে পাওনাদাররা সব নিয়ে না যায়। রাসূল (সা) গেলেন এবং খেজুরের স্তূপের ওপর বসে পাওনাদারদেরকে ডেকে ডেকে তাদের পাওনা পরিশোধ করেন। তার পরেও সমপরিমাণ খেজুর থেকে যায়।[২৩]

হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন অতি সম্মানিত ও অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের একজন। বনু সুলামা গোত্রে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি যে চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর রাহে যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেন, খোদ রাসূলে কারীম (সা) তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুনানু নাসাঈ গ্রন্থে এসেছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ গোটা আনসার সম্প্রদায়কে আমাদের পক্ষ থেকে ভালো প্রতিদান দিন, বিশেষ করে 'আমর ইবন হারামের বংশধর (আবদুল্লাহ ও তাঁর সন্তান) ও সা'দ ইবন 'উবাদাকে।[২৪]

জামে' তিরমিজী গ্রন্থে এসেছে। উহুদের ঘটনার পর একবার রাসূল (সা) জাবিরকে মলিন ও বিমর্ষ দেখে প্রশ্ন করলেনঃ কি হয়েছে?

জবাব দিলেন ঃ আব্বা শহীদ হয়েছেন এবং অনেকগুলি সন্তান রেখে গেছেন। তাদেরই চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ অস্থির করে রেখেছে। রাসূল (সা) বললেন ঃ একটি সুসংবাদ শোন,আল্লাহ আড়াল ছাড়া কারো সাথে সামনা-সামনি কথা বলেন না। কিন্তু তিনি তোমার আব্বার সাথে সামনা-সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন 'আমর! তুমি কি পছন্দ কর? জবাবে তোমার আব্বা বলেছেন, আমার পছন্দ এই যে, আমি আবার পৃথিবীতে ফিরে যাই এবং আপনার রাস্তায় জিহাদ করে আবার শহীদ হই।[২৫] আল্লাহ বলেছেন, এ হয়না। পৃথিবী থেকে যে একবার আসে সে আর ফিরে যেতে পারে না। তখন তিনি বলেছেন, তাহলে আমার সম্পর্কে কিছু ওহী পাঠান। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

—যারা আল্লাহর পথে জীবন দেয় তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা আল্লাহর নিকট জীবিত। যাদেরকে আহার দেওয়া হয়।[২৬]

হযরত আবদুল্লাহর (রা) এর চেয়ে বড় গৌরব অহঙ্কারের আর কি আছে যে, আজ চৌদ্দ শো বছর পরেও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। হয়তো আরো হাজার হাজার বছর পরেও এভাবে মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত ঃ ৩/৫৬১
২. আল-ইসাবা-২/৩৫০; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৪, ৬৬৩, ৬৯৭
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
৪. প্রাগুক্ত-১/২৪৯
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪১
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৮
৭. তাবাকাত-৩/৫৬১
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৫; ইবন হিশাম-২/৬৪
৯. বুখারী-১/১৮০; তাবাকাত-৩/৫৬৪
১০. বুখারী-১/১৮০
১১. উসুদুল গাবা-৩/২৩৩

১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৩৩
১৩. বুখারী-১/১৬৬; ১৭২; মুসলিম-২/২৪৭; তাবাকাত-৩/৫৬১; আল-ইসাবা-২/৩৫০.
১৪. ইবন হিশাম-২/৯৮
১৫. তাবাকাত-৩/৫৬২
১৬. বুখারী-১/১৭৯
১৭. উসুদুল গাবা-৩/২৩২
১৮. ইবন হিশাম-২/৯৮,১২৬
১৯. বুখারী-১/১৮০
২০. তাবাকাত-৩/৫৬২, ৫৬৩; আল-ইসাবা-২/৩৫০
২১. বুখারী-১/১৮০
২২. দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, ৩য় খন্ড।
২৩. তাবাকাত-৩/৫৭৪
২৪. আল-ইসাবা-২/৩৫০; সীয়ারুল আনসার-২/৭২
২৫. ইবন হিশাম-২/১২০
২৬. আল-ইসাবা-২/৩৫০

'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল (রা)

'আবদুল্লাহ (রা) মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের 'হুবলা' শাখার সন্তান। খান্দানটি খুবই সম্মানিত। এই খান্দানের উর্ধতন এক ব্যক্তি ছিলেন সালেম। তাঁর উপাধি ছিল 'হুবলা'। আর সেখান থেকেই এই খান্দানের নাম হয়েছে 'হুবলা'। সালেমের পেটটি ছিল খুব মোটা। এই কারণে লোকে তাঁকে 'হুবলা' বলতো। পরবর্তীকালে তাই তাঁর খান্দানের নামে পরিণত হয়।[১] 'আবদুল্লাহর (রা) মাতার নাম খাওলা বিন্‌ত আল-মুনজির। তিনি বনু নাজ্জার খান্দানের বনু মাগালা শাখার সন্তান।[২]

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহর (রা) পিতা 'রয়িসুল মুনাফিকীন' (মুনাফিকদের নেতা) 'আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূল। এই মুনাফিক নেতা ইতিহাসে ইবন উবাই ইবন সালূল নামে প্রসিদ্ধ। জাহিলী মদীনার খাযরাজ গোত্রের সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থের প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, ইসলাম-পূর্ব মদীনার অধিবাসীরা তাকেই তাদের রাজা বানানোর চিন্তা-ভাবনা করছিল। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান ছিল। তা সত্ত্বেও তাকে রাজা করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত ছিল না। এমন পিতারই ছেলে আবদুল্লাহ (রা)।[৩]

আবদুল্লাহর (রা) পিতা এই ইবন উবাই ইবন সালূল। সে বড় জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী ছিল। তাসত্ত্বেও ঈমানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। রাসূলেকারীম (সা) মদীনায় এসে ইসলামী খিলাফতের ভিত্তি স্থাপন করলে ঈর্ষা ও শত্রুতার এক বিস্ময়কর দৃশ্য তার মধ্যে দেখা যায়। ইবন উবাই ও তার অনুসারী মদীনার কিছু লোক ইসলামের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিকে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে মদীনার মাটি থেকে উৎখাতের জন্য একের পর এক নানা রকম ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে।

অবশেষে মুসলমানদের বিজয় ও শক্তির কাছে ইবন উবাই ও তার অনুসারীদেরকে বাহ্যতঃ মাথা নত করতে হয়। তারা কপটতার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের দলে ভিড়ে যায়। তার এই দলটির সদস্যরা মুনাফিক (কপট মুসলমান) এবং সে মুনাফিকদের নেতা হিসাবে ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত মুনাফিক জন্মাবে তাদের নেতা এই ইবন উবাই ইবন সালূল। হিজরাতের পর মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের (রা) ওপর যত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই ইবন উবাই ও তার দলবল কোন না কোনভাবে জড়িত ছিল। তার ও তার দলের কীর্তি-কলাপের বর্ণনায় কুরআনের বহু

আয়াত নাযিল হয়েছে। সূরা 'আল-মুনাফিকুন' তো তাদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ।[৪]

কথায় বলে ফির'আউনের ঘরে মূসা বা যেখানে ফির'আউন সেখানে মূসা। এক্ষেত্রেও তাই; এহেন কট্টর ইসলামের দুশমন ও চরম মুনাফিকের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন মহান সাহাবী 'আবদুল্লাহ (রা)। পিতার নাপাক আছর থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। এতবড় বুদ্ধিমান পিতা নিজের ছেলের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।

এই মুনাফিক ইবন উবাই তৎকালীন আরবের একজন বিখ্যাত সাধু আবু 'আমের আর-রাহিব-এর খালাতো ভাই। রাসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরবের যে সকল সাধু পুরুষ তাঁর শীঘ্র আগমনের কথা বলতেন এবং তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন, এই আবু 'আমের তাঁদের একজন। জাহিলী আমলে তিনি পার্থিব ভোগ-বিমুখ সন্যাস ও বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন রাসূল (সা) নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন তখন তিনি স্বীয় বিশ্বাস থেকে সরে গেলেন। বদরে তিনি মুশরিকদের সাথে একাত্ম হয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এ কারণে রাসূল (সা) তাঁকে 'আল-ফাসেক' (পাপাচারী) অভিধায় চিহ্নিত করলেন।[৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার আগেই আবদুল্লাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম-পূর্ব নাম ছিল আ-হুবাব। 'উরওয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল কারো খারাপ নাম শুনলে তা পরিবর্তন করে দেওয়া। একদিন তিনি আল-হুবাবকে বললেন ঃ এখন থেকে তোমার নাম হবে আবদুল্লাহ। কারণ, আল-হুবাব হচ্ছে শয়তানের নাম।[৬] এভাবে পিতা-পুত্রের নাম এক হয়ে যায়।

'আবদুল্লাহ (রা) একজন বদরী সাহাবী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বদরে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তাঁর যোগদানের কথা জানা যায়।[৭] তিনি উহুদেও যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর সামনের দুটি দাঁত শহীদ হয়। যুদ্ধের পর রাসূল (সা) তাঁকে বলেন, তুমি দুটি সোনার দাঁত বানিয়ে লও। একথা 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবন মুন্দাহ উল্লেখ করেছেন যে, দাঁত নয়, বরং তাঁর নাক বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি সোনার একটি নাক প্রতিস্থাপন করেন। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়।[৮]

আবু সুফইয়ান উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে একটি পাহাড়ের ওপর উঠে চিৎকার করে বলে ঃ আগামী বছর বদরে আবার তোমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি রইলো। এ ঘোষণা শুনে রাসূল (সা) একজন সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি বল, হাঁ, সেখানেই তোমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলাম।[৯] ইবন ইসহাক বলেন ঃ আবু সুফইয়ানের সাথে এ অঙ্গীকার রক্ষার জন্য রাসূল (সা) হিজরী চতুর্থ সনের শা'বান মাসে দ্বিতীয়বার বদরে উপস্থিত হন। ইতিহাসে যা 'বদর আল-আখেরাহ' নামে পরিচিত। ইবন হিশাম বলেন ঃ এ যাত্রায় রাসূল (সা) তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধি হিসেবে 'আবদুল্লাহকে (রা) মদীনায় রেখে যান।[১০]

বনু আল-মুসতালিক মতান্তরে তাবুক যুদ্ধের এক পর্যায়ে উট-ঘোড়ার পানি পান

করানোকে কেন্দ্র করে একজন আনসার ও একজন মুহাজির ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়। এ ঝগড়ার এক পর্যায়ে মুনাফিক ইবন উবাই রাসূল (সা) ও মুহাজিরদের প্রতি ইঙ্গিত করে মন্তব্য করে— 'মদীনায় পৌঁছাতে পারলে আমরা অভিজাতরা এই ইতরদেরকে বের করে দেব।'[১১] একথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। 'উমার (রা) তো রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বলেই ফেললেন ঃ যদি অনুমতি দান করেন তো এই মুনাফিকের 'মাথাটা ধর থেকে আলাদা করে ফেলি।' রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ 'বাদ দাও। তা করলে লোকে বলবে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে।'[১২]

আল্লাহর রাসূল (সা) ও তাঁর বহু পরীক্ষিত মুহাজির সঙ্গী-সহচরদের সম্পর্কে উচ্চারিত ইবন উবাইর মহাআপত্তিকর মন্তব্যটি এক সময় ছেলে আবদুল্লাহর (রা) কানে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হয়ে বললেন, আমার পিতা আপনাকে 'ইতর' বলে গালি দিয়েছেন। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আপনি নন, তিনিই ইতর। তারপর যে কথাটি তিনি বললেন তা অতি চমকপ্রদ ও বড় বিস্ময়কর। বললেন, গোটা খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী পিতার বাধ্য ও অনুগত ছেলে দ্বিতীয়টি নেই। তবুও আপনি যদি তাঁকে হত্যা করাতে চান তো আমাকে হুকুম দিন। আমি তার মাথাটি আপনার নিকট হাজির করছি। কিন্তু অন্য কোন মুসলমান যদি আমার পিতাকে হত্যা করে তাহলে আমার পিতার ঘাতক হবে আমার চোখের কাঁটা। আমি তাকে সহ্য করতে পারবো না। তখন হয়তো তাকে হত্যা করবো এবং একজন মুসলমান হত্যার দায়ে জাহান্নাম হবে আমার ঠিকানা। তাঁর কথা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তাকে হত্যা করানোর কোন উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা আমার নেই।[১৩]

'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা শেষ করে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। পিতাকে আসতে দেখে উটের পিঠ থেকে নেমে অসি উঁচু করে ধরে বললেন ঃ যতক্ষণ আপনি মুখ দিয়ে একথা উচ্চারণ না করবেন— 'আমি ইতর এবং মুহাম্মাদ অতি সম্মানীয়'—ততক্ষণ এ অসি কোষবদ্ধ হবে না। আপনি এক পাও এগুতে পারবেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে সে উচ্চারণ করলো- 'তোর ধ্বংস হোক! মুহাম্মাদ সম্মানীয় এবং আমি ইতর।' একটু পিছনে রাসূলে কারীম (সা) আসছিলেন। পিতা-পুত্রের সংলাপ কানে গেল। তিনি আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! যতদিন সে আমাদের মধ্যে আছে আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো।[১৪] 'উরওয়া বলেন ঃ হানজালা ইবন আবী 'আমের ও 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ— এ দুইজনের প্রত্যেকে নিজ নিজ পিতাকে হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে বিরত রাখেন।[১৫]

তাবুক যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ফেরার পর মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই মারা যায়।[১৬]

সাহীহ হাদীস সমূহের মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মাদী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, পবিত্র

কুরআনের সূরা তাওবার আশি ও চুরাশিতম আয়াত দুটি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আশিতম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর (উভয়ই সমান)। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তথাপি কখনোই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তা এজন্য যে তারা আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে।' সাহীহাইন (অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তার জানাযায় রাসূল (সা) নামায পড়েন, তার কবরের পাশে দাঁড়ান এবং তার ছেলে আবদুল্লাহকে (রা) সান্ত্বনা দেন। নামায পড়ার পরই চুরাশিতম আয়াতটি নাযিল হয়। এ আয়াতে বলা হয় ঃ 'আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেনা এবং তার কবরে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।' এ আয়াত নাযিলের পর রাসূলে কারীম (সা) আর কোন মুনাফিকের জানাযায় নামায পড়েননি।

সাহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)-এর বর্ণনায় এ আয়াত নাযিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা হলো এই যে, মুনাফিক ইবন উবাই যখন মারা যায়, তখন তার ছেলে নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে আরজ করলেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার একটি জামা দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরিণত করতে পারি। তারপর নিবেদন করলেন, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। তিনি তাও কবুল করলেন।

রাসূলে কারীমের (সা) গায়ে তখন দুইটি জামা ছিল। আবদুল্লাহ (রা) নীচের জামাটি পসন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দেহের পবিত্র ঘাম তাতে লাগা ছিল। রাসূল (সা) আবদুল্লাহকে (রা) জামাটি দিয়ে বললেন, কাফন পরানো হলে আমাকে খবর দেবে, আমি জানাযায় নামায পড়াবো। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। লাশ কবরে নামানোর পর রাসূল (সা) আসেন। কবরে নেমে লাশ হাঁটুর ওপর রেখে তাকে জামা পরান এবং পবিত্র মুখের লালা লাগান। তারপর জানাযার নামাযের জন্য দাঁড়ান।

জানাযার নামাযে দাঁড়ালে 'উমার ইবন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কাপড় টেনে ধরে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে নামায পড়তে বারণ করেছেন। রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেন ঃ যাও, নিজের স্থানে গিয়ে দাঁড়াও। এরপরেও 'উমার (রা) যখন একটু বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন— মাগফিরাতের দু'আ করবো অথবা করবো না। যদি সত্তর বারের বেশীও মাগফিরাত চাইলে সে ক্ষমা পায় তাহলে আমি তার জন্যও প্রস্তুত আছি।

অতঃপর রাসূল (সা) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই চুরাশিতম আয়াতটি নাযিল হয়। এ অহীর মাধ্যমে 'উমার (রা) স্বীয় কর্ম ও আচরণের সমর্থন লাভ করেন। তিনি নিজের এমন দুঃসাহসের জন্য দারুণ বিস্ময়বোধ করেন।[১৭]

খলীফা আবু বকরের (রা) খিলাফতকালে আবদুল্লাহ (রা) ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এটা হিজরী ১২ সনের রবীউল আওয়াল মাসের ঘটনা।[১৮]

আবদুল্লাহ ছিলেন অতি মর্যাদাবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। 'আয়িশা (রা) তাঁর সম্বন্ধে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখতে জানতেন। মাঝে মাঝে অহী লেখার দায়িত্বও পালন করেছেন।[১৯]

আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন মুনাফিক পিতার একজন সুসন্তান। পিতার কপটতাপূর্ণ জীবন সর্বদা তাঁকে পীড়া দিত। তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন।[২০] বিপথগামী পিতাকে সত্য ও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। পিতার এ বিপথগামিতা সত্ত্বেও সন্তান হিসেবে তার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কখনও শৈথিল্য দেখাননি। ইসলামী বিধানের আওতায় থেকে সব সময় পিতার আনুগত্য করেছেন। তার মৃত্যুর পরেও মুক্তির আশায় সন্তান হিসেবে যা কিছু করার সবই করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫৪০; আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৫,
২. তাবাকাত-৩/৫৪০
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৮৪-৫৮৫, আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৮
৪. আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫২৬, ৫৮৪-৫৮৫,
৫. তাবাকাত-৩/৫৪১
৬. প্রাগুক্ত-৩/৫৪১; আজ-জাহাবী-১/৩৭১; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৮.
৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৯৩: আল-ইসাবা-২/৩৩৬; তাবাকাত-৩/৫৪১.
৮. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : উসুদুল গাবা-৩/১৯৭, আজ-জাহাবী; তারীখ-১/৩৭১; আল-ইসাবা-২/৩৩৬
৯. আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৫৭৩
১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২০৯
১১.
১২. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/৩৭০; তায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৩-৪৭৪; আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৬.
১৩. উসুদুল গাবা-৩/১৯৭; হায়াতুস সাহাবা -২/৩১২; আল-বিদায়া-৪/১৫৮.
১৪. তাবাকাত-১/৪৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৩১২
১৫. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/৩৭২; হায়াতুস সাহাবা-২/৩১৩; আল-ইসাবা-১/৩১৬.
১৬. তাবাকাত-৩/৫৪১
১৭. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ বুখারী-১/১৬৯, ১৮০, ১৮৬; তাফসীরে ইবন কাসীর-২/৩৭৬-৩৮০; তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর। আল-ইসতী'য়াব-২/৩৩৬.
১৮. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৩৭১; তাবাকাত-৩/৫৪১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৯৮.
১৯. আল-ইসাবা-২/৩৩৬.
২০. তাবাকাত-৩/৫৪১.

রাফে' ইবন খাদীজ (রা)

রাফে' (রা) হিজরাতের বারো বছর পূর্বে ৬১১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তিনি মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ, মতান্তরে আউস গোত্রের বনু আল-হারেসার সন্তান। পিতা খাদীজ ইবন রাফে' এবং মাতা হালীমা বিন্‌ত মাস'উদ। দাদার নামে তাঁর নাম রাখা হয়।[২] রাফে'-এর ডাকনাম আবূ 'আবদিল্লাহ। ইমাম বুখারী বলেছেন আবূ খাদীজ।[৩] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দুইজন নামকরা সাহাবী জহীর ও মুজহির ইবন রাফে'-এর ভাতিজা।[৪]

প্রাচীন মদীনার আবদুল্লাহ আশহাল ও আল-হারেসা গোত্র দুইটি শক্তি ও সামর্থের দিক দিয়ে সমপর্যায়ের ছিল। তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ এবং পরিণতিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সবসময় লেগেই থাকতো। উসাইদ ইবন হুদাইরের (রা) দাদা সিমাক ইবন রাফে'কে এই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা একটি যুদ্ধে হত্যা করে এবং তার বংশের লোকদের মদীনা থেকে বিতাড়িত করে। উসাইদের পিতা হুদাইর আল-হারেসা গোত্র অবরোধ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেন এবং তাদেরকে পরাভূত করে খায়বারে তাড়িয়ে দেন। বনু আল-হারেসা খায়বারে বসবাস করতে থাকে। এর মধ্যে হুদাইরের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি বনু আল-হারেসাকে আবার মদীনায় ফিরে এসে বসবাসের অনুমতি দান করেন।

রাফে' ইবন খাদীজের (রা) পূর্বপুরুষ এই বনু আল-হারেসার রয়িস বা নেতা ছিলেন। বাবা-চাচার মৃত্যুর পর এ নেতৃত্ব লাভ করেন রাফে' এবং আজীবন তা হাতছাড়া হয়নি।

রাসূলে কারীমের (সা) হিজরাতের সময় রাফে' অল্পবয়স্ক এক বালকমাত্র। তা সত্ত্বেও ইসলাম তাঁর অন্তরে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাঁর দুই চাচা জহীর ও মুজহির তখন মুসলমান।

বদর যুদ্ধের সময় রাফে'র বয়স চৌদ্দ বছর। যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির হলেন। যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি দেখে অন্যদের সাথে তাঁকেও ফেরত দিলেন। এভাবে হযরত রাফে' বদরের যোদ্ধা হতে পারলেন না।[৫]

মদীনার ছোট ছেলেদের প্রতিবছর রাসূলে কারীমের (সা) সামনে হাজির করা হতো।[৬] তিনি তাদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে যাওয়ার যোগ্য মনে করতেন, তাদেরকে বাছাই করতেন। হিজরী ৩য় সনে উহুদ যুদ্ধে যাত্রার সময় রাফে'কে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আনা হয়। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং তিনি যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। এ সময় তাঁরই সমবয়সী সামুরা ইবন জুন্দুবের সাথে তাঁর একটি মজার ঘটনা ঘটে। 'রিজাল' শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে রাফে' বলেন ঃ "আমি সারিতে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে নিজেকে উঁচু করে দেখাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহকে (সা) পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, আমি একজন দক্ষ

তীরন্দায। অতঃপর রাসূল (সা) আমাকে অনুমতি দান করেন। তখন আমারই সমবয়সী সামুরা ইবন জুন্দুব তাঁর সৎ পিতা মুররী ইবন সাবিতকে বললো ঃ রাসূল (সা) রাফে' ইবন খাদিজকে অনুমতি দিলেন; কিন্তু আমাকে ফেরত দিলেন। মুররী তখন বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাফে'কে অনুমতি দিয়েছেন, আর আমার ছেলে সামুরাকে ফেরত দিয়েছেন। সে কিন্তু কুস্তিতে রাফে'কে হারিয়ে দিতে পারে। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ'তোমরা দুইজন কুস্তি লাগো।'[৭] এভাবে তাঁরা দুইজন কুস্তি লাগেন এবং সামুরা রাফে'কে হারিয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি লাভ করেন। ইবন হিশাম বলেন ঃ দুই জনেরই বয়স তখন পনেরো বছর।[৮]

এই উহুদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর রাফে'র বুকে লাগে। তীরটি হাড় ভেদ করে ভিতরে ঢুকে যায়। এ সম্পর্কে ইমাম আল-বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। উহুদ অথবা হুনাইনের দিন রাফে' ইবন খাদীজের বুকে তীর বিদ্ধ হয়। তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আনা হলে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার বুক থেকে তীরটি বের করে দিন। রাসূল (সা) বললেন ঃ'তুমি চাইলে আমি ফলাসহ তীরটি বের করে দিতে পারবো। আর তুমি চাইলে আমি শুধু তীরটি বের করে আনবো এবং ফলাটি থেকে যাবে। সে ক্ষেত্রে আমি কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেব যে তুমি একজন শহীদ।' তখন রাফে' বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাহলে তীরটিই বের করে আনুন, ফলাটি থাক। কিয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সাক্ষ্য দিন যে, আমি একজন শহীদ। এ অবস্থায় হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। অবশেষে ক্ষতস্থানে পচন ধরে মৃত্যুবরণ করেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধে কিভাবে মুসলমানদের পরাজয় হয় রাফে' পরবর্তীকালে তা বর্ণনা করতেন। সেই বর্ণনার মধ্যে এ যুদ্ধের একটা চিত্র ফুটে ওঠে।[১০]

খন্দকসহ পরবর্তীকালে সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[১১] সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি 'আলীর (রা) পক্ষে যোগদান করেন।[১২]

তীরের যে আগাটি রাফে'র শরীরের ভিতরে ছিল, দীর্ঘদিন পর তা ক্ষতের সৃষ্টি করে, এবং সেই যন্ত্রণায় তিনি মারা যান। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে রিজাল শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে একটি ব্যাপারে সকলে একমত যে, আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইমাম আল-বুখারী তাঁর তারীখে বলেছেন যে, তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে মারা যান। তিনি 'তারীখুল 'আওসাত' গ্রন্থে 'হিজরী ৫০-৬০ সনের মধ্যে যাঁরা মারা গেছেন' শিরোনামের অনুচ্ছেদে রাফে'র নামটি উল্লেখ করেছেন। আর ইবন কানে' নির্দিষ্ট করে হিজরী ৫৯ সনের কথা বলেছেন।[১৩] পক্ষান্তরে আল-ওয়াকিদী রাফে' ইবন খাদীজের কোন কোন সন্তানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হিজরী ৭৪ সনের প্রথম দিকে ৮৬

বছর বয়সে মদীনায় মারা যান।[১৪] আর তখন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান খিলাফতের মসনদে আসীন।

একথা প্রমাণিত যে, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার তাঁর জানাযার নামায পড়ান। আর এটাও স্বীকৃত যে, তিনি হিজরী ৭৪ সনের প্রথম দিকে মক্কায় ছিলেন। তাই অনেকে বলেছেন, রাফে' ইবন খাদীজের ক্ষতে পঁচন ধরে আগেই এবং তিনি মারা যান হিজরী ৭৪ সনে ইবন 'উমার মক্কা থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর। অথবা হিজরী ৭৩ সনে মারা যান ইবন 'উমারের (রা) মক্কা যাওয়ার আগে। ইবন 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ে মক্কায় যান। ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর বলেন ঃ তিনি হিজরী ৭৩ সনে মারা যান। আর এটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।[১৫]

মুসনাদে ইমাম আহমাদে এসেছে, 'তাঁকে কাফন পরিয়ে বাইরে আনা হয়েছিল এবং তাঁর ওপর একটি লাল চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।'[১৬] লাশের সাথে বিপুল সংখ্যক লোক চলেছিল। ঘর থেকে মহিলারা কাঁদতে ও মাতম করতে করতে বের হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু ও জানাযা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা 'সীরাত ও রিজাল' শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়। এখানে তার কয়েকটি হুবহু নকল করা হলো ঃ

আবূ নুসরা বলেন ঃ আমি রাফে' ইবন খাদীজের জানাযায় যোগ দিয়েছিলাম। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবন 'উমারও ছিলেন। মহিলারা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে তিনি বললেন ঃ চুপ কর। এই বৃদ্ধের আল্লাহর আযাব (শাস্তি) সহ্য করার শক্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের লোকদের মাতম ও কান্নার জন্য আযাব দেওয়া হয়।[১৭]

শু'বা ইউসুফ ইবন মাহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ বলেছেন ঃ আমি দেখেছি যে, ইবন 'উমার রাফে' ইবন খাদীজের লাশবাহী খাটিয়ার সামনের দুইটি পায়া ধরে স্বীয় কাঁধে রাখেন এবং আগে আগে হেঁটে কবর পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় তিনি বলেন ঃ মৃতকে জীবিত লোকদের কাঁদার জন্য 'আযাব দেওয়া হয়।[১৮]

বিশর ইবন হারব থেকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাফে' ইবন খাদীজ মারা গেলে ইবন 'উমারকে বলা হলো, রাত পোহানো পর্যন্ত দাফন দেরী করা হোক। তাহলে শহরবাসীদেরকে জানিয়ে দেওয়া যাবে। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এ সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার। হিশাম ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন 'উসমান ইবন 'উবাইদুল্লাহ থেকে। তিনি বলেছেন ঃ রাফে' মারা গেলে সূর্যোদয়ের পূর্বে লাশ আনা হলো জানাযার জন্য। ইবন 'উমার বললেন ঃ সূর্যোদয়ের আগে তার জানাযা পড়োনা।[১৯]

রাফে' ইবন খাদীজের (রা) দৈহিক গঠন ও আকৃতির তেমন বিবরণ পাওয়া যায় না। এতটুকু জানা যায় যে, তিনি চিকন করে মোঁচ রাখতেন এবং চুলে খিজাব লাগাতেন। মৃত্যুকালে তিনি দাস-দাসী, উট ও ভূ-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান।[২০]

'আবদুল্লাহ, রিফায়া' 'আবদুর রহমান, 'উবাইদুল্লাহ, সাহল ও 'উবাইদ— তাঁর এই ছয়

ছেলের নাম জানা যায়। 'আবদুল্লাহ পিতার মসজিদের ইমাম ছিলেন। 'উবাইদ ছিলেন দাসীর পেটের সন্তান। আর অন্য ছেলেরা ছিলেন তাঁর লুবনা ও আসমা নাম্নী দুই স্ত্রীর পেটের সন্তান। তাঁর এই সন্তানদের বংশধারা বহুকাল যাবত মদীনা ও বাগদাদে বিদ্যমান ছিল।[২১]

রাফে' (রা) রাসূল (সা) ও চাচা জহীর ইবন রাফে' (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সনদে সর্বমোট ৭৮ (আটাত্তর)টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৩] তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেই সকল রাবীর মধ্যে সাহাবী ও তাবেঈ— উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা আছেন। এখানে তাঁদের কয়েকজনের নাম দেওয়া হলোঃ

ইবন 'উমার, মাহমুদ ইবন লাবীদ, সায়িব ইবন ইয়াযীদ, উসাইদ ইবন জহীর, মুজাহিদ, আতা', শা'বী, 'আবাইয়া ইবন রিফায়া', 'উমরা বিন্ত আবদির রহমান, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, নাফে' ইবন জুবাইর, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান, আবু আন-নাজ্জাশী, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, 'ঈসা, 'উসমান ইবন সাহ্ল, হারীর ইবন 'আবদির রহমান, ইয়াহইয়া ইবন ইসহাক, সাবিত ইবন আনাস ইবন জহীর, হানজালা ইবন কায়স, নাফে' আল-'উমারী, ওয়াসি' ইবন হিব্বান, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হিববান, 'উবাইদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'উসমান প্রমুখ।[২৪]

রাফে' ইবন খাদীজ (রা) ছিলেন মদীনার মুফতী সাহাবীদের অন্যতম। যিয়াদ ইবন মীনা বলেন ঃ ইবন 'আব্বাস,ইবন 'উমার, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী, আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ, রাফে' ইবন খাদীজ, সালামা ইবন আকওয়া', আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী, আবদুল্লাহ ইবন বুহাইনা এবং এঁদের মত রাসূলুল্লাহর (সা) আরো অনেক সাহাবী মদীনায় ফাতওয়া দিতেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন। এ কাজ তাঁরা করতেন 'উসমানের (রা) মৃত্যু থেকে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত।[২৫] ইমাম জাহাবী বলেন ঃ তিনি মু'য়াবিয়ার (রা) সময় ও তার পরে মদীনায় যাঁরা ফাতওয়া দিতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[২৬] ইবন আব্বাস (রা) মারা গেলে রাফে' ইবন খাদীজ মন্তব্য করেছিলেন ঃ আজ এমন এক ব্যক্তি মারা গেলেন যাঁর প্রতি মাশরিক ও মাগরিবের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মুখাপেক্ষী ছিলেন।[২৭] তিনি ছিলেন একজন মরুচারী মানুষ। কৃষি ও সেচকাজে ছিলেন দক্ষ।[২৮]

ইতা'য়াতে রাসূল ও আমর বিল মা'রূফ— রাসূলের (সা) আনুগত্য ও সৎ কাজের আদেশ করা ছিল তাঁর চরিত্র ও স্বভাবের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট। একবার নু'মান আল-আনসারীর একজন দাস জনৈক ব্যক্তির বাগান থেকে খেজুরের ছোট গাছ উপড়ে ফেলে। বিষয়টি মারওয়ানের আদালতে উত্থাপিত হয়। তিনি চুরির অপরাধ আরোপ করে হাত কাটার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন। তখন রাফে' বললেন ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ ফলের জন্য হাত কাটা যাবেনা।[২৯]

একবার মারওয়ান ভাষণের মধ্যে বললেন ঃ মক্কা হারাম। সমাবেশে রাফে' উপস্থিত ছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, মক্কা হারাম, তা ঠিক আছে। তবে মদীনাও হারাম। মদীনাকে রাসূল (সা) হারাম ঘোষণা করেছেন। আমার কাছে হাদীসটি লেখা আছে। তুমি চাইলে দেখাতে পারি। মারওয়ান বললেন, হাঁ, হাদীসটি আমিও শুনেছি।[৩০]

রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাঁর জীবনের বহু কথা, কাজ ও আচরণে তা ফুটে উঠেছে। একবার তাঁর চাচা জহীর (রা) এসে বললেন, আজ রাসূল (সা) একটি জিনিসের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অথচ এতে আমাদের কিছু সহজ হতো। রাফে' (রা) সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ চাচা! রাসূল (সা) যা কিছু বলেছেন তাই সত্য।[৩১]

একদিন তিনি স্ত্রী সম্ভোগে মগ্ন আছেন। আর ঠিক সেই সময় রাসূলে কারীম (সা) এসে ডাক দিলেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) কণ্ঠস্বর কানে পৌছার সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে যান এবং পাকসাফ হয়ে বেরিয়ে আসেন।[৩২]

রাফে' (রা) একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে দেখলেন, সেখানে হাঁড়িতে টগবগ করে গোশত সিদ্ধ হচ্ছে। তাঁর খেতে খুব ইচ্ছে হলো। তিনি এক টুকরো মুখে দিয়ে গিলে ফেললেন। এরপর থেকে তাঁর পেটের পীড়া দেখা দিল। এক বছর পর্যন্ত ভুগতে লাগলেন। তারপর একদিন পেটের পীড়ার কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। তিনি রাফে'র (রা) পেটে হাত বুলিয়ে দেন। এতে তাঁর সবুজ বর্ণের বমি হয়। এরপর থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।[৩৩]

রাফে' (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় যে সকল দু'আ পাঠ করতেন তার কিছু কিছু বর্ণনা করেছেন। যেমন নতুন চাঁদ দেখা গেলে রাসূল (সা) যে দু'আ পড়তেন রাফে' তা বর্ণনায় করেছেন।[৩৪]

হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে সন্ধান করলে রাফে'র (রা) জীবনের বহু ছোট ছোট কথা জানা যাবে। যা হবে একজন মুসলমানের জীবনে পথচলার জন্য আলোক বর্তিকাস্বরূপ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-আ'লাম-৩/৩৫
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮১; আল-ইসাবা-১/৪৯৬
৩. তাহজীবুত তাহজীব-৩/২৩০; আল-ইসাবা-১/৪৯৬
৪. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৫.
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৮; আল-ইসাবা-১/৪৯৬
৬. উসুদুল গাবা-২/৩৫৪
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৬; তাবারী-১/১৩৯৪
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৬
৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৩২; ৫০৭; আল-ইসাবা-/৪৯৬
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১৮

১১. আল-ইসাবা-১/৪৯৬
১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮২
১৩. তাহজীবুত তাহজীব-৩/২৩০
১৪. প্রাগুক্ত-৩/২২৯; শাজারাতুজ জাহাব-১/৮২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮৩.
১৫. আল-ইসাবা-১/৪৯৬; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৫
১৬. মুসনাদ-৪/১৪১
১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮৩
১৮. প্রাগুক্ত-৩/১৮২; আল-মুসতাদরিক-৩/৫৬২
১৯. প্রাগুক্ত-৩/১৮২-১৮৩
২০. মুসনাদ-৪/১৪১
২১. সিয়ারে আনসার-২/৩৬৬
২২. আল-ইসাবা-১/৪৯৬
২৩. আল-আ'লাম-৩/৩৫
২৪. আল-ইসাবা-১/৪৯৬; আল-ইসতী'য়াব-১/৪৯৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮২
২৫. তাবাকাত-৪/১৮৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৫৪-২৫৫
২৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৮২
২৭. তাবাকাত-৪/১৮৭; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬১
২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/২৬১
২৯. মুসনাদ-৩/৪৭৪
৩০. প্রাগুক্ত-৪/১৪১
৩১. মুসলিম-১/৬১২
৩২. মুসনাদ-৪/১৪৩
৩৩. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৪৯-৬৫০
৩৪. প্রাগুক্ত-৩/৩৬১।

'আমর ইবন সাবিত ইবন ওয়াক্‌শ (রা)

'আমর (রা)-এর উপাধি 'উসাইরাম'। আর এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি মদীনার আউস গোত্রের আবদুল আশহাল শাখার সন্তান। পিতার নাম সাবিত ইবন ওয়াক্‌শ এবং মাতার নাম লায়লা মতান্তরে লুবাবা বিন্‌ত ইয়ামান। প্রখ্যাত সাহাবী হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের (রা) বোন। উহুদের শহীদ সালাম ইবন সাবিত (রা) 'আমরের ভাই।[১]

'আমর (রা) প্রথম দিকে ইসলামের প্রতি ভীষণ বিরূপ ছিলেন। তাঁর গোত্রের প্রায় সকল নারী-পুরুষ সা'দ ইবন মু'য়াজের (রা) চেষ্টায় মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তখনও তিনি নিজের পুরাতন বিশ্বাস ও ধর্মের ওপর অটল থাকেন। বালাজুরী বলেন ঃ 'তিনি ইসলামের ব্যাপারে দারুণ সংশয়ের মধ্যে ছিলেন। উহুদের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং শহীদ হন। জীবনে কখনও নামায না পড়েও জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।'[২]

রাসূলে কারীম (সা) যখন উহুদ যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন তখন হঠাৎ করে 'আমরের (রা) অন্তরে সত্যের প্রতি প্রবল আবেগ সৃষ্টি হলো। সুনানে আবী দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। জাহিলী আমলে তাঁর সূদী কারবার ছিল। অনেকের নিকট তাঁর বকেয়া অর্থ পাওনা ছিল। তিনি এই বকেয়া অর্থ উসূল করে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, ইসলাম সূদী লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উহুদ যুদ্ধের সময় সম্ভবতঃ তাঁর বকেয়া পাওনা আদায় হয়ে গিয়েছিল। আর তখনই তিনি মুসলমান হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন।[৩]

উহুদে যাত্রার সময় 'উসাইরামের' খান্দান আবদুল আশহালের লোকেরা সহ সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। উহুদের যোদ্ধারা চলে যাওয়ার পর মদীনার প্রতিটি মহল্লায় একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা নেমে আসে। উসাইরাম চারদিকে এমন নীরব ও নির্জন অবস্থা দেখে ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের খান্দানের লোকেরা কোথায় গেছে? উত্তর পেলেন ঃ উহুদে।

যদিও তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাসত্ত্বেও যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হলেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে উহুদের দিকে চললেন। সোজা উহুদে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি আগে যুদ্ধ করবো, না মুসলমান হবো? রাসূল (সা) বললেন ঃ দুইটিই করবে। আগে মুসলমান হও, পরে যুদ্ধে যাও। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জীবনে এক রাকা'য়াত নামাযও আমার পড়া হয়নি। এ অবস্থায় যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার জন্য কি ভালো হবে?' বললেন ঃ 'হাঁ, ভালো হবে।' অতঃপর তিনি কালেমা পাঠ করে মুসলমান হলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তরবারি হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রের দিকে চললেন। তিনি যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, মুসলিম যোদ্ধাদের তা জানা ছিল না। তাই তাঁরা তাঁকে বললেন

ঃ 'তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ 'আমিও মুসলমান হয়েছি।'

যুদ্ধ শুরু হলো। দারুণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়লেন। শত্রুবাহিনীর ভিতরে ঢুকে পড়লে বহু আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলেন। আঘাত এত মারাত্মক ছিল যে, রণক্ষেত্রে নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিলেন, উঠারও শক্তি ছিল না। যুদ্ধ শেষে আবদুল আশহাল গোত্রের লোকেরা শহীদদের খোঁজে বের হয়ে, দেখলেন তাঁদের উসাইরাম মৃতদের মধ্যে পড়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও চালু আছে। তারা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তুমি এখানে এভাবে কেন? সম্ভবতঃ গোত্রীয় টানে এখানে এসেছো? তিনি বললেন ঃ 'না। আমি ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছি।'

রণক্ষেত্র থেকে উঠিয়ে তাঁকে বাড়ীতে আনা হলো। গোটা খান্দানে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়লো। আবদুল আশহাল খান্দানের নেতা সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) খবর পেয়ে তাঁর বাড়ীতে ছুটে গেলেন এবং তাঁর বোনের কাছে কি ঘটেছে তা জানতে চাইলেন। মানুষের এ যাতায়াতের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে রাসূলে কারীম (সা) মন্তব্য করলেন ঃ 'অল্প শ্রমে প্রচুর বিনিময় লাভ করেছে।' কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ 'নিশ্চিত সে জান্নাতীদের অন্তর্গত।'

যেহেতু 'আমরের (রা) এ ঘটনাটি ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক ধরনের। এ কারণে লোকেরা তাঁকে স্মরণ রাখার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। আবু হুরাইরা (রা) তাঁর শিষ্য-শাগরিদদেরকে প্রশ্ন করতেন ঃ 'সে আচ্ছা, তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তির নাম জান যিনি জীবনে কখনও নামায আদায় করেননি, অথচ সোজা জান্নাতে চলে গেছেন?' যখন কেউ উত্তর দিতে পারতো না তখন তিনি বলতেন ঃ 'তিনি আবদুল আশহালের উসাইরাম।'[৪]

উহুদে তাঁর ভাই সালামা ইবন সাবিত শাহাদাত বরণ করেন আবু সুফইয়ান ইবন হারবের হাতে এবং তিনি নিজে আঘাতপ্রাপ্ত ও পরে শাহাদাত বরণ করেন দাররার ইবনুল খাত্তাবের হাতে।[৫]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল-ইস্তী'য়াব-২/৫০৬; আল-ইসাবা-২/৫২৬
২. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৫
৩. আল-ইসাবা-২/৫২৬
৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৯০; আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৫; আল ইসাবা-২/৫২৬; কানযুল 'উম্মাল-৭/৮; আল-বায়হাকী-৯/১৬৭; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৯৫। তাছাড়া বুখারী, আবু দাউদ, মুসলিম, নাসাঈ ও হাকেম তাঁর জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।
৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২৮; ইবন হিশাম-১/১২২।

রিফা'য়া ইবন রাফে' ইবন মলিক আয-যারকী (রা)

রিফায়া (রা)-এর ডাকনাম আবূ মু'য়াজ।[১] তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের 'হুবলা' শাখার সন্তান। পিতা রাফে' ইবন মালিক (রা) এবং মাতা উম্মু মালিক বিন্‌ত উবাই ইবন সালূল। মাতা মুনাফিক (কপট মুসলমান) নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর বোন।[২]

রিফায়া'র (রা) সম্মানিত পিতা রাফে' (রা) ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রথম মুসলমান। বাই'য়াতে আকাবার দুই বছর আগে পাঁচ/ছয়জন ইয়াসরিববাসীর সংগে মক্কায় যান এবং ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) হতে বাই'য়াত হন। তাঁর সম্মানিতা মাও মুসলমান হয়েছিলেন। এই মহিলার ভাই আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল মদীনার কুফর ও নিফাকের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু তারই সহোদরা ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ। রিফায়া (রা) এমনি এক মহান পারিবারে বেড়ে ওঠেন। পিতার সাথে মক্কায় যেয়ে 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতে অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র হাতে বাই'য়াত করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন।[৩]

সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যোগ দেন। তাঁর বদরে যোগদানের কথা সাহীহ আল বুখারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।[৪] এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর চোখে আঘাত করে। রাসূল (সা) একটু থুথু দিয়ে দু'আ করলে তিনি সুস্থ হয়ে যান।[৫] এই যুদ্ধে তাঁর অন্য দুই ভাই খাল্লাদ ও মালিক অংশগ্রহণ করেন।[৬] 'উমাইর ইবন ওয়াহাব ছিল মক্কার কুরাইশদের এক নেতা। মক্কায় যারা রাসূলুল্লাহকে (সা) নানাভাবে কষ্ট দিত সে তাদের অন্যতম। রিফায়া বদরে তার ছেলে ওয়াহাবকে বন্দী করেন।[৭]

জামাল ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে তিনি হযরত 'আলীর (রা) পক্ষে ছিলেন।[৮] জামালের যুদ্ধে 'আয়িশা (রা), তালহা (রা) ও যুবাইরের (রা) যোগদান বিষয়টি ভীষণ জটিল করে তোলে। রাসূলুল্লাহর (সা) চাচী আব্বাসের (রা) স্ত্রী উম্মুল ফাদল বিনত আল-হারেস মক্কা থেকে আলীকে চিঠি মারফত জানান যে, তালহা ও যুবাইর বসরায় গেছেন। এ খবর পেয়ে আলী দারুণ দুঃখ পেলেন। আক্ষেপের সুরে বললেন ঃ তাঁদের আচরণে বিস্মিত হই। কারণ রাসূলে কারীমের ইনতিকালের পর আমরা নবী খান্দানের লোকেরা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করতে থাকি। আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যদেরকে খলীফা বানালো। ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তির কথা-বিবেচনা করে আমরা সব কিছু মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ করি। আল্লাহর শুকরিয়া যে, তার ফলাফল অতীব শুভ হয়েছে। এরপর লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে খলীফা 'উসমানকে হত্যা করলো এবং কোন প্রকার জোর-জবরদস্তী ছাড়াই জনগণ আমাকে খলীফা নির্বাচন করলো। আমার

হাতে বাই'য়াতকারীদের মধ্যে তালহা ও যুবাইরও ছিলেন। এক মাসও যেতে পারলো না, এখন তাদের সসৈন্য বসরায় যাওয়ার খবর আসছে। হে আল্লাহ! আপনি এই ঝগড়া ও বিশৃংখলাকে দেখুন।

রিফায়া' ইবন রাফে' (রা) খলীফা 'আলীর (রা) ভাষণ শুনে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকালের পর আমাদের মান-মর্যাদা ও দ্বীনের সাহায্য-সহায়তার প্রতি লক্ষ্য করে আমরা নিজেদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করেছিলাম। তখন আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নিকট সম্পর্ক, ঈমানের অগ্রগামিতা এবং হিজরাত ইত্যাদির মত দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদার দাবী করে আমাদের নিকট থেকে এই অধিকার চেয়ে নেন। আমরাও বিশ্বাস করলাম যে, সত্য ও ন্যায়ের বাস্তবায়ন হচ্ছে, কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। আপনাদের দাবী আমরা মেনে নিলাম এবং খিলাফত কুরাইশদের হাতে অর্পণ করলাম। মূলতঃ আমাদের তাই করা সঙ্গত ছিল। এখন আপনার হাতে বাই'য়াত হওয়ার পর কিছু লোক বিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, আপনি তাদের থেকে উত্তম এবং আমাদের দৃষ্টিতে আপনিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। এখন বলুন, আপনি কি চান? আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।"

রিফায়া'র (রা) ভাষণ শেষ হলে হাজ্জাজ ইবন গায়িয়্যা আল-আনসারী এগিয়ে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এই বিষয়টির এখন ফয়সালা করে নিন। এই পথে আমি জীবন দানের জন্য প্রস্তুত। তারপর তিনি আনসারদের সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা পূর্বে যেমন রাসূলুল্লাহকে (সা) সাহায্য করেছিলে, এখন তেমনি আমীরুল মুমিনীনকে সাহায্য কর। এই শেষের সাহায্য হুবহু প্রথম সাহায্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও প্রথম সাহায্য ছিল অধিকতর ভালো ও সম্মানীয়।[৯]

আলী (রা) এই বক্তৃতা-ভাষণের পর একটি বাহিনী নিয়ে ইরাক যান। রিফায়া' (রা)ও সঙ্গী ছিলেন।

রিফায়া'র (রা) মৃত্যু সন নিয়ে সামান্য মতপার্থক্য আছে। ইবন কানে' বলেন ঃ তিনি হিজরী ৪১, ৪২ অথবা ৪৩ সনে মারা যান। আর সেটা মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে।[১০] মৃত্যুকালে মু'য়াজ ও উবাইদ নামে দুই ছেলে রেখে যান।

রিফায়া' থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ আল-বুখারী ও মুসলিমে তাঁর কয়েকটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। বুখারী তিনটি হাদীস এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

রিফায়া' (রা) রাসূলে কারীম (সা) ছাড়াও আবু বকর ও উবাদা ইবন সামিত থেকে হাদীস শুনেছেন, আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবন খালিদ, আলী ইবন ইয়াহইয়া এবং ছেলে মু'য়াজ ও উবাইদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১১]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৫
২. আল-ইসাবা-১/৫১৭; আল-ইসতী'য়াব-৫০১
৩. আল-ইসাবা-১/৫১৭
৪. বুখারী-২/৫৬৯; ইবন হিশাম-১/৭০০; আল-ইসাবা-১/৫১৭
৫. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৫৬
৬. আল-ইসতী'য়াব-১/৫০১
৭. ইবন হিশাম-১/৬৬১
৮. আল-ইসতী'য়াব-১/৫০১; আল-ইসাবা-১/৫১৭
৯. আল-ইসতী'য়াব-১/৫০১-৫০২; সিয়ারে আনসার-১/৩৬৬
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৫; আল-ইসাবা-১/৫১৭
১১. আল-ইসাবা-১/৫১৭।

'আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা)

'আবদুল্লাহর (রা) ডাকনাম আবূ মুহাম্মাদ এবং উপাধি 'সাহিবুল আযান'। তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান। তাঁর পিতা-পিতামহের নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে 'রিজাল' শাস্ত্রবিদরা বেশ এলোমেলো করে ফেলেছেন। ইবন সা'দ তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। ইবন হাজার ও ইমাম আল-কুরতুবীও এই ওলট-পালটের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১] ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি একজন বদরী সাহাবী এবং যাঁকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল।[২] তিনি 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'য়াতের (শপথ) একজন সদস্য। ইবন হিশাম 'আকাবায় বাই'য়াতকারীদের মধ্যে তাঁর নামটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি বদরে যোগদান করেছেন এবং তাঁকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল। ইমাম জাহাবীও একথা বলেছেন।[৩]

প্রথম হিজরী সনের আগ পর্যন্ত মানুষকে নামাযে সমবেত করার জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি চালু ছিল না। রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসে মসজিদে নববী তৈরী করার পর নামাযের ঘোষণা দানের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ পেলেন। কেউ বললেন, নামাযের সময় হলে মসজিদের ওপরে একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হোক। কেউ প্রস্তাব করলেন, ঘন্টা বাজানো হোক। এভাবে শিঙ্গা ফুঁকানো, আগুন জ্বালানো ইত্যাদি প্রস্তাবও দেওয়া হলো। কিন্তু কোন প্রস্তাবই রাসূলুল্লাহর (সা) মনপূত হলো না। কারণ সেগুলো ইহুদী-নাসারাসহ কোন না কোন ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তখন এই ঘন্টা বাজানোর প্রস্তাবটির ওপর সকলে একমত হলেন। রাসূল (সা) এই প্রস্তাব অনুযায়ী ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে নামাযে ডাকার জন্য অনুমতি দিয়ে বৈঠক শেষ করলেন।

সেদিন রাতেই 'আবদুল্লাহ (রা) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি একটি ঘন্টা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিক্রী করবে? লোকটি প্রশ্ন করলো ঃ কি করবে? তিনি বললেন ঃ নামাযের সময় বাজাবো। লোকটি বললো ঃ এর চেয়ে ভালো পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। এই বলে 'আবদুল্লাহকে আযানের পদ ও বাক্যগুলি উচ্চারণ করে শিখিয়ে দিল। ঘুম থেকে জেগেই 'আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন। তুমি যাও, বিলালকে শিখিয়ে দাও। সে আযান দিক। আবদুল্লাহ বিলালকে স্বপ্নে প্রাপ্ত আযান শেখালেন এবং বিলাল আযান দিলেন। এটাই ছিল ইসলামের প্রথম আযান এবং এভাবে আযানের সূচনা হয়।

বিলালের (রা) কণ্ঠে আযানের ধ্বনি শুনে 'উমার (রা) গায়ের চাদর টানতে টানতে দ্রুত

ঘর থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমিও স্বপ্নে এই বাক্যগুলি শুনেছিলাম। রাসূলে কারীম (সা) দুইজন মুসলমানের স্বপ্নের মিলের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।[৪] আযানের পর লোকেরা নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হলো। বিলাল (রা) ইকামাত দিতে যাবেন, এমন সময় 'আবদুল্লাহ বললেন, ইকামাত আমি বলবো।

আযানের জন্য বিলালকে (রা) নির্বাচন করার কারণ হলো, 'আবদুল্লাহর চেয়ে তাঁর গলার আওয়ায ছিল বেশী বড়। সুতরাং সহীহ তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) যখন আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি বিলালকে তোমার স্বপ্নে পাওয়া বাক্যগুলি শিখিয়ে দাও তখন একথাও বলেন যে, তোমার গলার আওয়ায অপেক্ষা তার গলার আওয়ায বড়।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, আযান যা মূলতঃ নামাযের ভূমিকা স্বরূপ এবং ইসলামের একটি বড় প্রতীক, তা 'আবদুল্লাহর (রা) মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বপ্নে অদৃশ্য থেকে আযানের শব্দ ও বাক্য লাভ, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তা সত্যায়ন এবং সর্ব সম্মতভাবে মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হওয়া— এ সবকিছুই আবদুল্লাহর (রা) জন্য এক ঈর্ষণীয় সম্মান ও মর্যাদা ছিল। আযানের প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন সম্পর্কে এখানে আরো কিছু কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমরা মনে করি।

কিছু লোকের ধারণা 'উমার (রা) সর্বপ্রথম রাসূলকে (সা) আযানের প্রস্তাব দান করেন। সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনা দ্বারা এমনটিই বোঝা যায়। কিন্তু আসল ঘটনা হলো সেখানে আযানের বাক্যগুলির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। শুধু এতটুকু আছে যে, 'উমার বললেন ঃ আপনাদের মধ্য থেকে একজন লোক পাঠান যে নামাযের ঘোষণা দেবে। অতঃপর রাসূল (সা) বললেন ঃ বিলাল ওঠো, নামাযের ঘোষণা দাও।[৫]

আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে 'উমার (রা) বিশ দিন পর্যন্ত স্বীয় স্বপ্নের কথা গোপন রাখেন। যখন বিলাল আযান দেন তখন তিনি নিজের স্বপ্নের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রকাশ করেন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি আগে কেন বলনি? 'উমার (রা) বললেন ঃ আবদুল্লাহ আমার আগেই প্রকাশ করে দিয়েছে। এ কারণে আমার লজ্জা হচ্ছিল।[৬]

উপরোক্ত বর্ণনাটি যে 'উমারের (রা) স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী, সে কথা বাদ দিলেও ঘটনাটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে মিল খায় না। কারণ, আযান সম্পর্কে যতগুলি বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে যে বিষয়টি সকল বর্ণনায় এসেছে তা হলো, রাসূল (সা) দিনের বেলা পরামর্শ করেন। সেখানে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 'আবদুল্লাহর (রা) হাদীস দ্বারা জানা যায়, ঘন্টা বাজানোর ব্যাপারে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মজলিস থেকে বাড়ী যান, রাতে স্বপ্ন দেখেন এবং ফজরে আযান দেওয়া হয়। এই হিসাবে 'আবদুল্লাহর (রা)

হাদীসটি বুখারী বর্ণিত ইবন 'উমারের (রা) হাদীসটির ব্যাখ্যা ও ভাষ্য। আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের (র) হাদীসটি ইমাম বুখারীর জানা ছিল। কিন্তু তাঁর নির্ধারিত শর্তের নিরীখে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেননি।[৭]

প্রকৃতপক্ষে এইসব বর্ণনা দ্বারা কারো আগে-পিছের ফয়সালা করা যায় না। সম্ভবতঃ ইমাম বুখারী এ কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তা না হলে তাবারানীর বর্ণনামতে আবু বকরও (রা) আযানের স্বপ্ন দেখেন। ইমাম আল-গাজালী 'আল-ওয়াসীত' গ্রন্থে লিখেছেন, দশজনেরও অধিক ব্যক্তি স্বপ্নে আযান দেখেছিলেন। 'শরহে তানবীহ' গ্রন্থে চৌদ্দ ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে। তবে মুহাদ্দিসীনের নিকট এ সকল বর্ণনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত নয়। শুধুমাত্র আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ এবং কোন কোন সনদে ইবন 'উমারের (রা) বর্ণনাটি সঠিক ও প্রমাণের পর্যায়ে পৌঁছে। তার মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের বর্ণনাটি একাধিক সনদে এসেছে এবং সাহাবীদের একটি দল এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক আযানের স্বপ্ন যে কেউ প্রথমে দেখুন না কেন, স্বপ্নটি ও তার ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবন যায়িদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এ কারণে তিনি 'সাহিবুল আযান' লকবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।[৮]

এত বড় গৌরবের অধিকারী হওয়ার পরেও আরো বহু সৌভাগ্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধ হয়। এতে তিনি এবং তাঁর ভাই হুয়াইরিস ইবন যায়িদ অংশগ্রহণ করেন।[৯] এর পরে খন্দক, উহুদসহ যত যুদ্ধ হয়েছে সবগুলিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। মক্কা বিজয় অভিযানে তিনি শরীক ছিলেন এবং বনু আল-হারেস ইবন খাযরাজের পতাকাটি ছিল তাঁর হাতে। বিদায় হজ্জেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় রাসূলে কারীম (সা) যখন ছাগল-উট বন্টন করছিলেন তখন তিনি নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে কিছুই দেননি। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে ছিল অন্য জিনিস। রাসূল (সা) মাথা ন্যাড়া ও নখ কাটার সময় তাঁকে কিছু কেশ ও নখ দান করেন। অবশিষ্ট কেশ ও নখগুলি অন্যদের মধ্যে বন্টন করেন। এই কেশ ছিল মেহেন্দী রঞ্জিত। আবদুল্লাহর বংশধরদের মধ্যে এ কেশ ও নখ বরকতের প্রতীক হিসেবে বহুকাল রক্ষিত ছিল।[১০]

তাবুক অভিযান থেকে মদীনায় ফেরার পর রাসূলে কারীমের (সা) নিকট হিমইয়ার রাজন্যবর্গের পত্রসহ দূত আসে। পত্রে তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কথা জানান। রাসূল (সা) তাঁদের পত্রের জবাব এবং তাঁদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান শেখানো ও যাকাত-সাদকা আদায়ের জন্য মু'য়াজ ইবন জাবালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এই দলটির মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন যায়িদও ছিলেন।[১১]

'আবদুল্লাহর (রা) ছেলে মুহাম্মাদ বলেন, আমার পিতা হিজরী ৩২ (বত্রিশ) সনে ৬৪ (চৌষট্টি) বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। জানাযার নামায পড়ান খলীফা 'উসমান (রা)।[১২] তবে আল-হাকেমসহ অনেকের ধারণা, তিনি উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা এই ঘটনা উপস্থাপন করেন যে, একবার আবদুল্লাহর (রা) এক কন্যা 'উমারের (রা) নিকট এসে বলেন, আমার পিতা একজন বদরী সাহাবী এবং উহুদে শাহাদাত বরণকারী। 'উমার (রা) বললেন, এখন তোমার দাবী কি? তারপর তিনি কিছু সাহায্য প্রাপ্তির আবেদন জানালে তিনি তা দান করেন। এটা আল-হুলইয়ার বর্ণনা। তবে মুসনাদসহ রিজাল শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে হিজরী ৩২ সনের বর্ণনা এসেছে। তাছাড়া উহুদে শহীদ হওয়ার কথা হাকেম বললেও তিনি আবার 'আল-মুসতাদরিক' গ্রন্থে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।[১৩]

তাঁর সন্তানাদির মধ্যে এক ছেলে ও এক মেয়ের কথা জানা যায়। ছেলের নাম ছিল মুহাম্মাদ। তাঁর জন্ম হয় রাসূলে কারীমের (সা) জীবদ্দশায়। তিনি বলেছেন, আমার পিতা না খাটো ছিলেন না লম্বা। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল মধ্যমাকৃতির।[১৪] তিনি আরবীতে লিখতে জানতেন।[১৫]

আবদুল্লাহর (রা) এক পৌত্র বিশর ইবন মুহাম্মাদ একবার 'উমার ইবন 'আবদিল আযীযের দরবারে যান এবং নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি একজন 'আকাবী বদরী ব্যক্তির পৌত্র-যাঁকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল। তখন 'উমার পাশে উপস্থিত শামবাসীদেরকে কবিতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনান।[১৬]

ইমাম বুখারী লিখেছেন, আযান বিষয়ে তাঁর সূত্রে একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযীও এ কথা সমর্থন করেছেন। কিন্তু হাফেজ ইবন হাজার আল-আসকালানী তাঁর সূত্রে বর্ণিত ছয়টি হাদীস পেয়েছেন এবং তা তিনি একটি পৃথক অংশে সংকলন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭] আল্লামাহ্ জাহাবী বলেছেন, তাঁর সনদে অল্প কয়েকটি হাদীস পাওয়া যায়।[১৮]

'আবদুল্লাহর (রা) মুখ থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ, পৌত্র 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, আবূ বকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আমর ইবন হাযাম প্রমুখ।[১৯]

অভাব ও দারিদ্রের মধ্যেও আল্লাহর রাস্তায় সবকিছু দান করা আখলাকের এক উন্নততর বৈশিষ্ট। আবদুল্লাহর (রা) বিষয়-সম্পদ ছিল অতি সামান্য। যা দিয়ে তিনি পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। বর্ণিত হয়েছে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই বাগিচাটি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা)

উদ্দেশ্যে সাদাকা করে দিলাম। এর পরেই তাঁর পিতা-মাতা রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাগিচাটির আয় দিয়েই আমরা জীবন ধারণ করি। রাসূল (সা) তখন তাঁদেরকে বাগিচাটি ফেরত দেন। কিছু দিন পর তাঁরা মারা গেলে তাঁদের দুই ছেলে এই বাগিচাটির উত্তরাধিকারী হন।[২০]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাবাকাত-৩/৫৩৬; তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪; আল-ইসতী'য়াব-২/৩১১
২. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৯
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৫৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬; আনসাবুল আশরাফ-১/২৪৪
৪. তাঁর স্বপ্নে আযান দেখার হাদীসটি আবু দাউদ (৪৯৯), তিরমিযী (৩৭), আহমাদ-৪/৪৩, ইবন মাজাহ (৭০৮) ও আল বায়হাকী-১/৩৯০-৩৯১ সংকলন করেছেন।
৫. বুখারী-১/১৫৭; আনসাবুল আশরাফ-১/২৭৩
৬. ফাতহুল বারী-২/৬৬
৭. প্রাগুক্ত-২/৬৩
৮. আযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৪১৭-৪১৯; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৮-৫০৯; হায়াতুস সাহাবা-৩/১১৫; কান্যুল 'উম্মাল-৪/২৬৩; ফাতহুল বারী-২/৬৩-৬৬
৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯২
১০. তাবাকাত-৩/৫৩৬-৫৩৭ ; আল-ইসতী'য়াব-২/৩১২; মুসনাদ-৪/৪২
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৯২
১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬; তাবাকাত-৩/৫৩৭; আল-ইসতী'য়াব-২/৩১২
১৩. তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪; আল-ইসাবা-২/৩১২
১৪. তাবাকাত-৩/৫৩৬
১৫. প্রাগুক্ত
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬
১৭. তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬; আল-ইসাবা-২/৩১২
১৯. তাহজীবুত তাহজীব-৫/২২৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৭৬
২০. আল-মুসতাদরিক-৩/৩৩৬; হায়াতুস সাহাবা-২/১৬০; উসুদুল গাবা-২/২৩৩।

সাবিত ইবন কায়স (রা)

সাবিতের (রা) ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ বা আবু 'আবদির রহমান। 'খতীবু রাসূলিল্লাহ' (রাসূলুল্লাহর বক্তা) তাঁর উপাধি।[১] মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান। পিতা কায়স ইবন শাম্মাস। মাতা তাঈ গোত্রের কন্যা হিন্দা, মতান্তরে কাবশা বিন্‌ত ওয়াকিদ। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও 'উমরা বিন্‌ত রাওয়াহা তাঁর বৈপিত্রীয় ভাই-বোন।[২]

সাবিত (রা) ছিলেন অতি মর্যাদাবান সাহাবীদের একজন। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ একটি বর্ণনা মতে রাসূল (সা) 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।[৩]

রাসূলে কারীম (সা) মক্কা থেকে ইয়াসরিবে পদার্পণ করলে গোটা শহরবাসী তাঁকে বরণ করার জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আনাস (রা) বলেন ঃ এই উপলক্ষে সাবিত একটি ভাষণ দান করেন। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ 'আমরা আপনাকে সেই সব জিনিস থেকে রক্ষা করবো যা থেকে আমরা নিজেদের জীবন ও সন্তানদের রক্ষা করে থাকি। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কী পাব? জবাবে রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমরা জান্নাত পাবে। তখন সমবেত জনতা সমস্বরে বলে ওঠে ঃ আমরা এ বিনিময়ে রাজি।[৪]

মাগাযী শাস্ত্রবিদরা সাবিতকে (রা) বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেননি। তবে ইবন হাজার আল-আসকিলানী 'তাহজীবুত তাহজীব' গ্রন্থে তাঁকে বদরী সাহাবী বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৫] মাগাযী শাস্ত্রবিদরা বলেছেন ঃ তাঁর সর্বপ্রথম যুদ্ধ হলো উহুদ। তারপর সকল যুদ্ধ ও অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।[৬] বাই'য়াতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৭]

হিজরী ৫ম সনে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জার অবরোধ ও বিতাড়ন অভিযানে সাবিত (রা) অংশগ্রহণ করেন। বনু কুরায়জা অবশেষে তাদের পুরাতন বন্ধু সা'দ ইবন মু'য়াজের হাতে তাদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে। সা'দ ইবন মু'য়াজের বিচারে তাদের অপরাধী পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। ইবন ইসহাক ইবন শিহাব আয-যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সময় সাবিত ইবন কায়স যান যাবীর ইবন বাতা আল-কুরাজীর সাথে দেখা করতে। এ যাবীর ছিল বনু কুরায়জার এক বৃদ্ধ ইহুদী। জাহিলী আমলের বু'য়াস যুদ্ধে সাবিত বন্দী হলে এই যাবীর তাঁকে ছেড়ে দেয়। এই ঋণ পরিশোধের আশায় এ বিপদের সময় সাবিত তার সামনে যান। যাবীর তখন এক বৃদ্ধ। সে সাবিতকে বললো ঃ আবু আবদির রহমান, তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছো? সাবিত বললেন ঃ আমার মত মানুষ কি আপনার মত মানুষকে ভুলতে পারে? আমি আজ এসেছি আপনার ঋণ পরিশোধের আশায়। যাবীর বললো ঃ মহৎ ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তিদের প্রতিদান দেয়।

এরপর সাবিত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওপর যাবীরের একটি বড় অনুগ্রহ আছে। আমি তার প্রতিদান দিতে চাই। তার রক্ত আমাকে দান করুন। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে বলেন ঃ হাঁ, তাই হোক। সাবিত যাবীরের নিকট যেয়ে বলেন ঃ রাসূল (সা) তোমার রক্ত আমাকে দান করেছেন। আর আমি তা তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। যাবীর বললো ঃ এখন আমি একজন পরিবার-পরিজনহীন বৃদ্ধ, জীবন দিয়ে আমার কি হবে? সাবিত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে গিয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যাবীরের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাকে দান করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, তারা তোমার। সাবিত যাবীরের নিকট ফিরে গিয়ে বললেনঃ রাসূল(সা)তোমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদেরকে আমাকে দান করেছেন। আমি তাদের সকলকে তোমাকে দিলাম। তখন বৃদ্ধ যাবীর বললো ঃ হিজাযের একটি পরিবার-যাদের কোন অর্থ-সম্পদ নেই, তারা বাঁচবে কেমন করে? সাবিত আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে তাদের অর্থ, সম্পদ চেয়ে নিলেন এবং যাবীরের নিকট ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) যে তার সকল সম্পদ ফেরত দিয়েছেন, সে কথা তাকে জানালেন।

এরপর বৃদ্ধ বললা ঃ ওহে সাবিত! চীনা আয়নার মত যে যুবকের চেহারা, সেখানে গোত্রের সকল কুমারী মেয়ের চেহারা দেখা যেত, সেই কা'ব ইবন আসাদের পরিণতি কি হয়েছে? সাবিত বললো ঃ সে তো নিহত হয়েছে। যাবীর বললো ঃ আমাদের আনন্দ-বিপদে যে ব্যক্তি আগে আগে থাকতো, আমরা পালালে যে আমাদের রক্ষা করতো, সেই 'আযযাল ইবন সামায়াল-এর কি দশা হয়েছে? সাবিত বললেন ঃ সেও নিহত হয়েছে। যাবীর আবার জানতে চাইলো ঃ মজলিস দুইটি— অর্থাৎ বনু কা'ব ইবন কুরায়জা ও বনু 'আমর ইবন কুরায়জার পরিণতি কি হয়েছে? সাবিত বললো ঃ তাদেরকে হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাবীর বললো ঃ ওহে সাবিত! তোমার ওপর আমার যে অনুগ্রহ আছে, তার বিনিময়ে তুমি আমাকে আমার কাওমের পরিণতি বরণ করার সুযোগ করে দাও। আল্লাহর কসম! তাদের অবর্তমানে আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। তাদের ছাড়া শুধু জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার ধৈর্য আমার নেই।[৮]

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে বনু আল-মুসতালিক যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নেতার কন্যা জুওয়াইরিয়্যা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) তাঁর চুক্তিকৃত সোনা পরিশোধ করে চিরদিনের জন্য তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর তাঁর সম্মতিক্রমে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা দান করেন।[৯]

এই বনু আল-মুসতালিকের যুদ্ধের সময় 'ইফ্ক' বা মিথ্যা ও বানোয়াট কলঙ্ক আরোপের ঘটনা ঘটে। যা মূলতঃ উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) ও সাফওয়ান ইবনুল মু'য়াত্তালকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা রটনা করে। এই ঘটনা রাসূলে কারীম (সা) সহ গোটা মুসলিম

সমাজকে কিছুদিনের জন্য ভীষণ বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। কিছু সরলপ্রাণ মুসলমানও এ মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়। ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে দেখা যায় শা'য়িরুর রাসূল হাস্‌সান ইবন সাবিতও এর সাথে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তিনি সাফওয়ান ও তাঁর মুদার গোত্রের সমালোচনায় একটি কবিতাও রচনা করেন। যখন এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন করে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো তখন সাফওয়ান একদিন তরবারি হাতে নিয়ে হাস্‌সানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ সময় সাবিত ইবন কায়স পাশেই ছিলেন। তিনি দ্রুত সাফওয়ানকে ধরে তাঁর হাত দুইটি গলার সাথে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলেন। এ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে বনু আল-হারেস ইবনুল খাযরাজের মহল্লায় নিয়ে যান। সেখানে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সাথে দেখা হয়। তিনি বলেন ঃ এ কি? সাবিত বলেন ঃ হাস্‌সানকে সে তরবারি দিয়ে মেরে ফেলুক তাতে কি তুমি খুশী হবে? আল্লাহর কসম! এই সাফওয়ান তো তাঁকে হত্যা করেই ফেলেছিল। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা বললেন ঃ তুমি যা করেছো তাকি রাসূল (সা) জেনেছেন? সাবিত বললেন ঃ না। আবদুল্লাহ বললেন ঃ তাহলে তুমি খুব দুঃসাহসের কাজ করেছো। তাকে ছেড়ে দাও। সাবিত তাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর সবাই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলেন এবং পুরো ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। রাসূল (সা) তাঁদের মধ্যে একটা আপোষ করে দেন।[১০]

হিজরী নবম সনে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বনু তামীম গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল আসে। বেদুঈন কালচার অনুযায়ী তারা সোজা রাসূলুল্লাহর (ষা) ঘরের দরজায় এসে হাঁক দেয় ঃ 'মুহাম্মদ! বাইরে আসুন।' রাসূল (সা) বাইরে এসে তাদের সাথে আলোচনায় বসেন। এক পর্যায়ে আরবের প্রথা অনুযায়ী তারা তাদের তুখোড় বক্তা 'উতারিদ ইবন হাজিরকে দাঁড় করিয়ে দেয় তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তুলে ধরার জন্য। 'উতারিদ এক দীর্ঘ ভাষণে তার গোত্রের গৌরব ও কীর্তির কথা বর্ণনা করে। তার ভাষণ শেষ হলে রাসূল (সা) তার জবাব দানের জন্য সাবিত ইবন কায়সকে নির্দেশ দেন। সাবিত অতি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। তার ভাষণ শেষে বনু তামীমের প্রতিনিধিদল মন্তব্য করে ঃ আমাদের বাবার শপথ! তাঁর খতীব (বক্তা) আমাদের খতীব অপেক্ষা উত্তম। রাসূল (সা) ও মুসলমানরাও তাঁর ভাষণ শুনে দারুণ খুশী হন।[১১]

এ প্রসঙ্গে ইবন হিশাম বলেন ঃ সাবিত দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন ঃ[১২] 'আকাশ ও পৃথিবী যে আল্লাহর সৃষ্টি, সকল প্রশংসা তাঁর। যিনি আকাশ-পৃথিবীর সবকিছু নির্ধারণ করেছেন। যাঁর কুরসী তাঁর জ্ঞানের সমান প্রশস্ত। তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। এ তাঁরই কুদরাত যে, তিনি আমাদেরকে বাদশাহ বানিয়েছেন, তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টিকে রাসূল মনোনীত করেছেন। বংশের দিক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত এবং সত্যবাদী করেছেন। তাঁর নিকট কিতাব নাযিল করে সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ

পরিপূর্ণ করেছেন। সুতরাং তিনি সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম সত্তায় পরিণত হয়েছেন। তিনি মানুষকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানান। সে আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাওমের মুহাজিরগণ তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। তাঁরা বংশগতভাবে সর্বাধিক সম্মানিত, চেহারার দিক দিয়ে সর্বাধিক সুদর্শন ও কর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম মানুষ। তাঁদের পরে রাসূলের আহবানে সাড়া দানকারী জনগণ আমরা। আমরা আল্লাহর আনসার এবং তাঁর রাসূলের উযীর। আমরা মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে, সে আমাদের হাত থেকে তাঁর জীবন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। আর যে অস্বীকার করবে তার বিরুদ্ধে আমরা চিরকাল জিহাদ করবো। তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ। আমার বক্তব্য এতটুকু। আমি আল্লাহর নিকট আমার নিজের এবং সকল মুসলিম নর-নারীর জন্য ক্ষমা ও ইসতিগফার কামনা করি। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম।'

এই হিজরী নবম সনেই মুসায়লামা আল-কাজ্জাব বনু হানীফার একদল লোক সংগে করে মদীনায় আসে। খবর পেয়ে রাসূলে কারীম (সা) সাবিত ইবন কায়সকে সংগে করে মুসায়লামার অবস্থান স্থল আল-হারিস ইবন কুরায়েজের গৃহে যান। রাসূলে কারীমের (সা) হাতে ছিল একটি ছড়ি। আলোচনার এক পর্যায়ে মুসায়লামা বললো ঃ আপনি যদি আপনার পরে আমাকে খলীফা বানানোর প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমি আপনার অনুসারী হতে পারি। রাসূল (সা) বললেন ঃ খিলাফাত দূরে থাক, আমি আমার হাতের এই ছড়িটিও তোমাকে দেওয়ার উপযুক্ত মনে করিনে। আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হবেই। আমি তোমার পরিণতি স্বপ্নে দেখেছি। তোমার আর কোন কথা থাকলে এই সাবিত আছে, তাকেই বলো। আমি যাচ্ছি।[১৩]

রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর মদীনার আনসারগণ তাদের নেতা সা'দ ইবন 'উবাদাকে খলীফা নির্বাচিত করার উদ্দেশ্যে সকীফা বনী সা'য়েদায় সমবেত হয়। এ খবর আবু বকরের (রা) কানে পৌছলে তিনি 'উমার (রা) ও অন্যদের সংগে নিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হন। সেখানে অনেকের মত সাবিত ইবন কায়সও জনগণকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ 'আম্মা বা'দ! আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী আনসার এবং ইসলামের সৈনিক। আর আপনারা মুহাজিরগণ, একটি ছোট্ট সম্প্রদায়। এরপও কিছু লোক আমাদেরকে খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এটাই আশ্চর্য বিষয়।' জবাবে আবু বকর (রা) বলেন ঃ তুমি যা বলেছো, তা ঠিক। তবে খলীফা কুরাইশদের মধ্য থেকেই হতে হবে।

আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পরেই ভণ্ড নবী তুলাইহার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)। আনসার মুজাহিদরা ছিলেন সাবিতের পরিচালনাধীন।[১৪]

হিজরী বারো সনে ভণ্ড নবী মুসায়লামা আল-কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালিত

হয়। সাবিত (রা)ও অভিযানে শরীক ছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানদের পরাজয় হয় এবং মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এ সময় আনাস (রা) তাঁকে বলেন ঃ চাচা, যা হয়েছে আপনি দেখলেন তো। সাবিত তখন সুগন্ধি মাখছিলেন। তিনি বললেন ঃ এটা যুদ্ধের কোন পদ্ধতি নয়। রাসূলুল্লাহর (সা) সময় মানুষ এভাবে যুদ্ধ করতো না। হে আল্লাহ! এই লোকেরা যা করেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১৫] তিনি আরও বলেন ঃ এই সকল লোক ও তারা যার পূজারী এবং তারা যা করেছে, সব কিছুর জন্য দুঃখ হয়। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং মুসায়লামার দূর্গের ফটকে দাঁড়ানো এক সৈনিককে হত্যা করেন এবং নিজেও শাহাদাত বরণ করেন।[১৬]

তাঁর দেহের বর্মটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। একজন মুসলিম সৈনিক সেটি খুলে নেয়। এক রাতে অন্য একজন মুসলিম সৈনিক স্বপ্নে দেখেন যে, সাবিত (রা) তাকে বলছেন, অমুক মুসলমান আমার দেহ থেকে বর্মটি খুলে নিয়েছে। তুমি খালিদকে বল, তিনি যেন তার কাছ থেকে বর্মটি নিয়ে নেন এবং মদীনায় পৌছে আবু বকরকে বলেন ঃ সাবিত এত পরিমাণ ঋণী আছে। এই বর্মটি বিক্রী করে তা যেন পরিশোধ করে দেন। আর আমার অমুক দাসটিও যেন মুক্ত করে দেন। খালিদ (রা) সেই লোকটির নিকট থেকে বর্মটি নিয়ে নেন এবং আবু বকর (রা) সাবিতের অসীয়াত মত কাজ করেন। এ ঘটনা সহীহ বুখারীতে সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। তবে তাবারানী আনাসের (রা) সনদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[১৭]

সাবিত (রা) বেশ কয়েকজন বংশধর রেখে যান। তাঁর এক মেয়ে ছিল; কিন্তু তার নাম জানা যায় না। ছেলেদের নাম ঃ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, কায়স আবদুল্লাহ, ইসমা'ঈল আবান মুহাম্মাদ, ইয়াহইয়াহ ও আবদুল্লাহ আল-হাররার দিন শাহাদাত বরণ করেন।[১৮] তাঁর এক পৌত্র আদী ইবন আবান কূফার একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিস ছিলেন।[১৯]

সাবিতের স্ত্রীর নাম ছিল জামীলা। তিনি ছিলেন মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলের কন্যা।[২০] জীবনের এক পর্যায়ে সাবিতের (রা) সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইমাম জাহাবী বলেন, সাবিত সেই ব্যক্তি যাঁর স্ত্রী জামীলা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে অভিযোগ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর সাবিতের সঙ্গে নেই। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিতে চাও? বললেন ঃ হাঁ। এরপর জামীলা সাবিতের নিকট থেকে খুলা' তালাক নেন।[২১] বর্ণিত হয়েছে, এ সময় জামীলা সন্তান সম্ভাবা ছিলেন। তালাক গ্রহণের কিছু দিন পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সন্তানটি কাপড়ে পেঁচিয়ে পিতা সাবিতের নিকট পাঠানো হয়। সাবিত শিশুটিকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে গেলে তিনি তাহনীক করে মুহাম্মাদ নাম রাখেন। পিতা তার লালন-পালনের জন্য একজন ধাত্রী নিয়োগ করেন।[২২]

সাবিত (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর সন্তানরা। যেমন ঃ মুহাম্মদ, কায়স ও ইসমা'ঈল। তাছাড়া আনাস ইবন মালিক, আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা প্রমুখ

ব্যক্তিবর্গ। সহীহ গ্রন্থে তাঁর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২৩]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ সাবিত (রা) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ও বিশুদ্ধভাষী, বাগ্মী পুরুষ।[২৪] মদীনার আনসার সম্প্রদায় তাঁকে তাদের খতীব (বক্তা) নির্বাচন করেন। রাসূলে কারীমও (সা) তাঁকে স্বীয় দরবারের খতীবের মর্যাদা দান করেন।[২৫] ইমাম আল-কুরতুবী বলেন ঃ তিনি ছিলেন আনসারদের খতীব। পরবর্তীকালে 'খতীবু রাসূলিল্লাহ' (রাসূলুল্লাহর খতীব) উপাধি লাভ করেন, যেমন হাস্সান ইবন সাবিত (রা) লাভ করেন 'শা'য়িরু রাসূলুল্লাহ' (রাসূলুল্লাহর (সা) কবি) উপাধি।[২৬]

সাবিতের (রা) চরিত্রের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য হলো রাসূলে পাকের (সা) প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে না-জানি কোন বেয়াদবী হয়ে যায়, সব সময় তিনি এ ভয়ে থাকতেন। ইমাম মুসলিম আনাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যখন সূরা আল-হুজুরাত-এর দ্বিতীয় আয়াত— 'মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলোনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।' —নাযিল হলো তখন হযরত সাবিত ঘরের দরযা বন্ধ করে বসে থাকলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমি একজন জাহান্নামের মানুষ। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যাওয়া আসাও ছেড়ে দিলেন। একদিন রাসূল (সা) সা'দ ইবন মু'য়াজকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু 'আমর! সাবিতের কি হয়েছে? সে কি অসুস্থ? সা'দ বললেন ঃ না, সে ভালো আছে। কোন অসুবিধের কথা তো আমি জানিনে। এরপর সা'দ সাবিতের নিকট এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কথা তাঁকে বললেন। তখন সাবিত বললেন ঃ সূরা আল-হুজুরাতের এ আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তোমরা তো জান আমি তোমাদের সকলের চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হয়ে গেছি। সা'দ তাঁর একথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনি বললেন ঃ না, সে জাহান্নামী নয়, সে জান্নাতের অধিকারী।[২৭] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, সাবিত (রা) বলেন ঃ আমি একজন উঁচু কণ্ঠস্বরের মানুষ। আমার ভয় হচ্ছে, আমার সব 'আমল বরবাদ হয়ে গেছে কিনা। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ সাবিত, তুমি তাদের কেউ নও! শুভ ও কল্যাণের সাথে এ পৃথিবীতে তুমি বাঁচবে এবং শুভ ও কল্যাণের উপর মৃত্যু হবে।[২৮]

যখন সূরা আন-নিসার ৩৬তম আয়াতের এই অংশ—'নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে'—নাযিল হলো তখন সাবিত (রা) ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে না দেখে খোঁজে লোক পাঠালেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সুন্দরকে ভালোবাসি। আমি পছন্দ করি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব। আমার ভয় হচ্ছে, আমি এ আয়াতের আওতায় পড়ে গিয়েছি কিনা। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। তোমার পার্থিব জীবন হবে প্রশংসিত। আর তোমার এ জীবনের সমাপ্তি হবে শাহাদাতের মাধ্যমে এবং আখেরাতে তুমি হবে জান্নাতের অধিবাসী।[২৯]

সাবিতের (রা) ছেলে মুহাম্মাদ বলেন ঃ একবার তার পিতা সাবিত রাসূলকে (সা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভয় হয়, আমি ধ্বংস হয়ে না যাই। রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ কেন? সাবিত বললেন ঃ আমরা যে কাজ করিনি তার জন্য আমাদের প্রশংসা করা হোক, এমন ইচ্ছা পোষণ করতে আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। অথচ আমার মনে হয়েছে আমি প্রশংসা পছন্দ করি। আল্লাহ আমাদেরকে গর্ব ও অহঙ্কার করতে বারণ করেছেন। অথচ আমি সুন্দরকে ভালোবাসি। আপনার কণ্ঠস্বরের উপর আমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করতে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু আমি একজন উচ্চকণ্ঠের মানুষ। তাঁর কথা শেষ হলে রাসূল (সা) বললেন ঃ সাবিত! তুমি কি প্রশংসিত অবস্থায় জীবন যাপন, শহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ এবং আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশ করা পছন্দ কর না? সাবিত বললেন ঃ হাঁ, করি ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যি, দুনিয়াতে তাঁর জীবনটি হয়েছে প্রশংসিত এবং মুসায়লামা আল-কাজ্জারের সাথে যুদ্ধে তিনি শহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[৩০] হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ সাবিত কতই না ভালো মানুষ।[৩১]

রাসূলে কারীম (সা) যে তাঁকে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে। একবার সাবিত (রা) অসুখে পড়লে রাসূল (সা) তাঁকে দেখতে যান এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করে দু'আ করেন এই বলে ঃ 'হে মানুষের প্রভু! আপনি সাবিত ইবন কায়সের কষ্ট দূর করে দিন।[৩২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. আল ইতসী'য়াব ১/১৯২; আল-ইসাবা-১/১৯৫
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯; তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৫০৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
৪. আল-ইসাবা-১/১৯৫; আল-হাকেম-৩/২৩৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
৫. তাহজীবুত তাহজীব-২/২২
৬. আল ইসাবা-১/১৯৫; আল ইসতী'য়াব-১/১৯৩
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৪২, ২৪৩
৯. আনসাবুল আশরাফ–১/৪৪১; ইবন হিশাম–২/২৯৪, ৬৪৫
১০. সীরাতু ইবন হিশাম–২/৩০৪-৩০৫
১১. তাবারী ৪/১৭১৬; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১২
১২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৫৬২
১৩. বুখারী–৫/২১৬
১৪. তাবারী–৪/১৮৮৭
১৫. আল-ইসাবা-১/১৯৫
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১০; আল-আ'লাম-২/৮২; আল হাকেম-৩/২৩৫; আল-বায়হাকী-৯/৪৪

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–১/৩১১-৩১৩; তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮; আল-ইসতী'য়াব-১/১৯৩
১৮. তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮; আল ইসতী'য়াব ১/১৯২
১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১৩-৩১৪
২০. তাবাকাত–৫/৫৯
২১. বুখারী : খুলা' তালাক অধ্যায়, হাদীস নং ৫২৭৩, ৫২৭৭; ইবন মাজাহ–২০৫৬; নাসাঈ–৬/১৬৯; আবূ দাউদ–২২২৭; মুসনাদ-৪/৩
২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯, ৩১৩,
২৩. তাহজীবুত তাহজীব–২/১২-১৩
২৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩০৯
২৫. বুখারী–৫/২১৬
২৬. আল-ইসতী'য়াব–১/১৯২
২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা (টীকা)-১/৩১০; তাফসীরে ইবন কাসীর–৪/২০৬-২০৭; বুখারী-৬/১৭১, তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা-১/৬৮
২৮. আল-ইসতী'য়াব-১/১৯৭
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. সিয়ারু আ'লাম-আন-নুবালা-১/৩০৯; আল-হাকেম-৩/২৩৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৬৭
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩১২; আল-আ'লাম ২/৮২; তিরমিযী–৩৭৯৭
৩২. তাহজীবুত তাহজীব–২/১২; আল-আলাম-২/৮২।

খুবাইব ইবন 'আদী ইবন 'আমের (রা)

খুবাইব ইবন 'আদী মদীনার আউস খান্দানের সন্তান। একজন আনসারী সাহাবী।[১] হিজরাতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলিম মুজাহিদদের জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২] এ যুদ্ধে তিনি মক্কার পৌত্তলিক আল-হারেস ইবন নাওফালকে হত্যা করেন।[৩] ইবন সা'দ বলেন, তিনি উহুদ যুদ্ধেও যোগদান করেন।[৪]

আল-ওয়াকিদী ও বালাজুরীর মতে হিজরী চতুর্থ সনের সফর মাসে 'আর-রাজী'র দুঃখজনক ঘটনাটি ঘটে।[৫] এতে রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। হযরত খুবাইব (রা) সেই মহান শহীদদের অন্যতম। ঘটনাটির যেভাবে সূত্রপাত হয় সে সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।

ইবন শিহাবের সূত্রে আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলে কারীম (সা) দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাহিনীকে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিয়োগ করেন আসেম ইবন সাবেত আল-আনসারীকে, তাঁরা যখন 'হাদয়া' (উসফান ও মক্কার মাঝামাঝি) নামক স্থানে পৌছেন তখন সেখানে বসবাসরত হুজাইল গোত্রের 'বনু লিহইয়ান' শাখা টের পায়। তাদের প্রায় একশো দক্ষ তীরন্দায ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে। এক স্থানে তারা এই বাহিনীর খাওয়া খেজুরের বীচি কুড়িয়ে পেয়ে বুঝতে পারে, এটা ইয়াসরিবের খেজুর এবং যারা এই খেজুর খেয়েছে তারা ইয়াসরিবের অধিবাসী। আসেম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একটি নিরাপদ টিলায় আশ্রয় নেন। বনু লিহইয়ান খুঁজতে খুঁজতে তাঁদের অবস্থান জেনে যায়। তারা চারদিক থেকে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে এবং জীবনের নিরাপত্তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্মসমর্পণের আহবান জানায়।

ইবন ইসহাক, আসিম ইবন 'উমার ইবন কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধের পর 'আদাল ও আল-কারা গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসে। তারা বলে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গোত্রে ইসলামের প্রসার ঘটেছে। আপনার কিছু সাহাবীকে আমাদের সংগে পাঠান যাঁরা আমাদেরকে কুরআন পড়াবেন, দ্বীনের তা'লীম ও শরীয়াতের বিধিবিধান শিক্ষা দেবেন। রাসূল (সা) তাদের কথা বিশ্বাস করে ছয়জন সাহাবীকে তাদের সংগে দিলেন। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে তাঁরা যখন 'উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হুজাইল গোত্রের 'আর-রাজী' নামক জলাশয়ের নিকট পৌছেন তখন 'আদাল ও আল-কারা গোত্রের উক্ত লোকগুলি অহেতুক গলা ফাটিয়ে চিৎকার জানায়। ভাবখানা এমন দেখায় যে তারা আক্রান্ত হয়েছে। মূলতঃ তাদেরকে কোন রকম ভয়-ভীতি দেখানো হয়নি। হুজাইল গোত্রের লোকেরা তরবারি হাতে নিয়ে

বেরিয়ে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) এই গুটিকতক অসহায় সাহাবীকে ঘিরে ফেলে। তাঁরাও তরবারি কোষমুক্ত করে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেন। শত্রুরা তখন তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলে ঃ 'তোমাদের হত্যার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা তোমাদের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের নিকট থেকে শুধু কিছু সুবিধা লুটে নিতে চাই। আল্লাহর নামে আমরা অঙ্গীকার করছি, তোমাদের আমরা হত্যা করবো না।' তখন দলটির তিনজন সদস্য—মারসাদ, খালিদ ইবন বুকাইর ও আসিম ইবন সাবিত (রা) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা কোন পৌত্তলিকের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারিনে। তারপর তাঁরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং উপরিউক্ত তিনজনই শাহাদাত বরণ করেন।

দলটির অপর তিনজন সদস্য খুবাইব ইবন 'আদী, যায়িদ ইবন আদ-দাসিনা ও আবদুল্লাহ ইবন তারেক (রা) জীবনের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁরা রণেভঙ্গ দিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। কাফিররা আত্মসমর্পণকারীদেরই ধনুকের সূতা খুলে তাঁদের হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলে। তখন আবদুল্লাহ ইবন তারেক তাদের এ কাজের প্রতিবাদ করে বলেন, 'এটা হলো তোমাদের প্রথম অঙ্গীকার ভঙ্গ। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সংগে যাবনা।' অপর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলেন, এই কাফিরদের ব্যাপারে আমার কাছে আদর্শ আছে। শত্রুরা তখন তাঁকে টানাহেঁচড়া করে নিতে থাকে। তিনি তাদের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁরা যখন মক্কার অদূরে 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে পৌছেন আবদুল্লাহ ইবন তারেক এক সুযোগে হাতের বন্ধন খুলে মুক্ত হয়ে যান এবং সাথে সাথে তরবারি উঁচিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। শত্রুরা তাঁর থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে তীর মেরে তাঁকে হত্যা করে। 'মাররুজ জাহরানে' তাঁর কবর আছে।

খুবাইব ইবন 'আদী ও যায়িদ ইবন আদ-দাসিনাকে নিয়ে তারা মক্কায় পৌছে। হুজাইল গোত্রের দুই ব্যক্তি মককার কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিল। তারা এই দুই জনের বিনিময়ে তাদের দুই বন্দীকে মুক্ত করে।[৬] তবে বিভিন্ন বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, বন্দী বিনিময় নয়, বরং অতি উচ্চমূল্যে তারা এই দুই জনকে মক্কার কুরাইশদের নিকট বিক্রয় করে।

খুবাইকে কে বা কারা খরীদ করেছিল সে সম্পর্কে সামান্য মতভেদ আছে। একটি মতে 'উকবা ইবনুল হারেস তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে খরীদ করে। অন্য একটি বর্ণনামতে, আবু ইহাব, 'আকরামা ইবন আবী জাহল, আল-আখনাস ইবন শুরাইক, 'উবাইদা ইবন হাকীম ইবনুল আওকাস, উমাইয়্যা ইবন আবী আসমাহ, বনুল খাদারামী সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা প্রমুখ সম্মিলিতভাবে তাঁকে খরীদ করে বদরে নিহত তাদের প্রত্যেকের পিতার হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য।[৭] ইবন ইসহাক বলেন, হারেস ইবন আমেরের বৈপিত্রীয় ভাই হুজাইর ইবন আবী ইহাব আত-তামীমী খুবাইবকে খরীদ করে 'উকবা ইবন আল-হারেসের হাতে তুলে দেয়। যাতে সে বদরে নিহত পিতৃহত্যার বদলা হিসেবে তাঁকে হত্যা করতে পারে।[৮]

উল্লেখ্য যে, মদীনা থেকে রাসূল (সা) যে দলটি পাঠান তার সদস্য সংখ্যা কত ছিল এবং দলনেতাই বা কে ছিলেন, সে সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় দলটির সদস্য সংখ্যা ছয়, সাত ও দশ জনের কথা এসেছে। ইবন হিশাম পূর্বে উল্লেখিত ছয় জনের নাম বর্ণনা করে মারসাদকে দলনেতা (আমীর) বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় আসিম ইবন সাবিতকে দলনেতা বলা হয়েছে।[৯]
খুবাইবকে (রা) হাতকড়া পরিয়ে উকবা ইবন হারেসের গৃহে বন্দী করে রাখা হয়।[১০] 'মাওহাব' নামক এক ব্যক্তিকে পাহারায় বসানো হয়। উকবার স্ত্রী আহারের সময় তাঁর হাতকড়াটি খুলে দিত।[১১] বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে এই মহিলার নাম শাবিয়্যা বলে প্রতীয়মান হয়। কোন কোন বর্ণনায় যাকে হুজাইর ইবন আবী ইহাবের দাসীর বা কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন ইসহাক তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে এই মহিলা মুসলমান হন।
কয়েকমাস তারা খুবাইবকে বন্দী করে রাখে। পবিত্র হারাম মাসগুলি অতিবাহিত হওয়ার পর তারা তাঁকে হত্যার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। খুবাইব তাঁকে হত্যা করা হবে একথা বুঝতে পেরে পাহারায় নিযুক্ত 'মাওহাবের' নিকট তিনটি অনুরোধ করেন ঃ[১২]

১. তাকে মিষ্টি পানি পান করাবে।
২. তাদের দেব-দেবীর নামে জবেহকৃত জীবের গোশত খেতে দেবে না।
৩. হত্যার পূর্বে যেন তাঁকে অবহিত করে।

শেষের অনুরোধটি তিনি 'উকবার স্ত্রীকেও করেন। হত্যার সিদ্ধান্ত হলে সে অবহিত করে।[১৩] তিনি পাক-সাফ হওয়ার জন্য তার নিকট থেকে একটি ক্ষুর চেয়ে নেন। খুবাইব (রা) যখন ক্ষৌরকার্য্য করছেন তখন, 'উকবার একটি শিশু সন্তান খেলতে খেলতে তাঁর নিকটে চলে যায়। তিনি শিশুটিকে আদর করে কোলে তুলে নেন। খুব শিগগির যাকে শূলী কাষ্ঠে চড়ানো হবে এমন বন্দীর হাতে ধারালো ক্ষুর এবং তার কোলে নিজের সন্তান— এ দৃশ্য দেখে শিশুর মায়ের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে। তার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বন্দী খুবাইব বললেন, তোমার ধারণা, এই শিশুকে হত্যা করে আমি আমার রক্তের বদলা নিব। এমন কাজ কক্ষণও আমি করবো না। এমন চরিত্র আমাদের নয়।[১৪] তারপর তিনি একটু রসিকতা করে বলেন, আল্লাহ এখন আমাকে তোমাদের উপর বিজয়ী করেছেন। শিশুটির মা বললো, তোমার কাছে আমি এমন আশা করিনি। একথার পর খুবাইব ক্ষুরটি মহিলার সামনে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও, একটু মশ্‌কারা করলাম।[১৫]
এই মহিলার উপর খুবাইবের (রা) কথা ও কর্মের ভীষণ প্রভাব পড়ে। খুবাইবের হত্যার পর তিনি মুসলমান হন। ইবন ইসহাক খুবাইব (রা) সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি এই খুবাইবের চেয়ে ভালো কোন কয়েদী আর দেখিনি। আমি কয়েদখানার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতাম তাঁর হাতে মানুষের মাথার আকৃতির বড় বড় আঙ্গুর। তিনি সেই আঙ্গুর খাচ্ছেন। এমন আঙ্গুর পৃথিবীর কোথাও খাওয়া হয় তা আমার জানা নেই। মক্কায় তখন আঙ্গুরের বাগানও ছিলনা। তাছাড়া তিনি

তো লোহার হাতকড়া অবস্থায় বন্দী ছিলেন। এ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট থেকে আসা রিযক (খাদ্য)।[১৬]

মক্কার পৌত্তলিক শক্তি খুবাইবের হত্যার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। হারাম শরীফের অদূরে 'তান'ঈম' নামক স্থানে একটি গাছে শূলী কাঠ ঝোলানো হয়। ঢোল-শুহরত করে মক্কার নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাবেশ ঘটানো হয়। ব্যাপারটি ছিল তাদের নিকট এক মস্তবড় আনন্দ ও তামাশার। লোকেরা যখন তাঁকে উকবার গৃহ থেকে নেওয়ার জন্য এলো, তিনি তাদেরকে অনুরোধ করলেন, তোমরা একটু সময় দাও, আমি সংক্ষিপ্ত দুই রাকা'য়াত নামায আদায় করে নিই। নামায দীর্ঘ করলে তোমরা বলবে, আমি মরণ ভয়ে দীর্ঘ করছি। সংক্ষিপ্ত দুই রাকা'য়াত নামায শেষ করে তিনি বধ্যভূমির দিকে যাত্রা করেন। তিনি মৃত্যুর দিকে চলছেন, আর তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে ঃ[১৭]

اللّٰهُمَّ احْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بِدَدًا وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

—হে আল্লাহ! তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখ, এক এক করে তাদেরকে হত্যা কর এবং তাদের কাউকে তুমি ছেড়ে দিও না।

তান'ঈমের সেই গাছের নীচে যখন পৌছলেন তখন তাঁর মুখে একটি কবিতার আবৃত্তি শোনা গেল, যার দুইটি শ্লোকের অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আমি যদি মুসলমান অবস্থায় নিহত হই তাহলে আমার মৃতদেহ কোন পার্শ্বে পড়ে থাকবে সে ব্যাপারে আমার কোন পরোয়া নেই।

২. এ যা কিছু হচ্ছে, সবই আল্লাহর পবিত্র সত্তার প্রেমের পথে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার খণ্ড-বিখণ্ড দেহের উপরেও করুণা বর্ষণ করতে পারেন।

এছাড়া তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উচ্চারিত আরও কিছু শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

শূলী কাঠে ঝোলানোর পূর্বে তিনি এই দু'আও করেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার রাসূলের বাণী পৌছে দিয়েছি। আপনি আমাদের সংবাদ আপনার রাসূলকে পৌছে দিন।'[১৯]

'উকবা ইবন হারেস ও আবু হুরাইরা আল-'আবদারী সম্মিলিতভাবে তাঁকে শূলীতে চড়ায়।[২০] পরবর্তীকালে 'উকবা ইবন হারেস খুবাইবের হত্যায় তার অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করে বলতেন, আমি মূলতঃ খুবাইবকে হত্যা করিনি। কারণ তখন কাউকে হত্যা করার মত বয়স আমার হয়নি। তাই আবু মায়সারা আমার হাতে একটি বল্লম ধরিয়ে দেয়। তারপর বল্লমটিসহ আমার হাতটি ধরে খুবাইবের দেহে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে। এই 'উকবা মুসলমান হন এবং দুধপান বিষয়ে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২১]

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, খুবাইবকে শূলীতে ঝুলিয়ে বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করা হয়েছিল।

মূসা ইবন 'উকবার মাগাযীতে বর্ণিত হয়েছে। খুবাইব ও যায়িদ ইবন আদ-দাসিনাকে একই দিন হত্যা করা হয়। আর যে দিন তাঁদেরকে হত্যা করা হয়, সেই দিন মদীনায় রাসূলকে (সা) বলতে শোনা যায় ঃ 'তোমাদের দুইজনের প্রতি সালাম।' তিনি তাঁদের হত্যার কথাটিও ঘোষণা করেন। ওহীর মাধ্যমে তিনি সবকিছু অবগত হন।[২২]

রাসূলে কারীম (সা) খুবাইব ও যায়িদের লাশ কাফিরদের হাত থেকে কৌশলে উদ্ধারের জন্য মদীনা থেকে কয়েকজন সাহসী ও দক্ষ লোক পাঠান। তাঁরা হলেন, 'আমর ইবন 'উমাইয়্যা, আল-মিকদাদ ও যুবাইর। 'আমর বলেন, আমি খুবাইবের শূলী কাঠের কাছে গিয়ে তাকে মুক্ত করে একটু দূরে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর নেমে এসে বহু খোঁজাখুঁজির পরও তার কোন চিহ্ন পেলাম না। যমীন যেন তাকে গিলে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে আবু ইউসুফ 'কিতাবুল লাতায়িফ' গ্রন্থে দাহ্হাক থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী কারীম (সা) শূলী কাঠ থেকে খুবাইবের লাশটি নামিয়ে আনার জন্য আল-মিকদাদ ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামকে মদীনা থেকে পাঠান। তান'ঈমে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, লাশের আশেপাশে ৪০ জন নেশাগ্রস্ত মানুষ। তারা লাশ পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাঁরা লাশটি নামান এবং যুবাইর ঘোড়ার পিঠে উঠান। এতক্ষণে পাহারাদাররা টের পেয়ে যায় এবং তাঁদের পিছু ধাওয়া করে। যুবাইর লাশটি ফেলে দেন এবং যমীন তা গিলে ফেলে। এ কারণে খুবাইবকে 'বালী'উল আরদি' বলা হয়।[২৩] খুবাইবের কবরটি কোথায় দুনিয়ার মানুষ কোন দিন জানতে পারেনি। মূসা ইবন উকবা বলেছেন ঃ অনেকের ধারণা, 'আমর ইবন উমাইয়্যা তাঁকে কোথাও দাফন করেছেন।

হত্যার পূর্বে পৌত্তলিকরা তাঁর মুখটি কিবলার দিকে ফেরাতে চায়নি। কিন্তু যে মুখ একবার কিবলার দিকে ফিরে যায় তাকে অন্য দিকে ফেরায় কার সাধ্য। পৌত্তলিকরা বার বার মুখটি অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।[২৪]

সা'ঈদ ইবন 'আমের আল-জামহী (রা) খুবাইবের হত্যা-অনুষ্ঠানে একজন দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেটা ছিল তাঁর ইসলাম-পূর্ব জীবন। পরবর্তীকালে তিনি মুসলমান হন। খলীফা উমার (রা) তাঁকে হিমসের গভর্ণর নিয়োগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে হিম্সবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করে। তার মধ্যে একটি ছিল এই রকম ঃ সা'ঈদ ইবন 'আমের মাঝে মাঝে এমনভাবে অচেতন হয়ে পড়েন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা হয়। সা'ঈদের নিকট খলীফা 'উমার এর কারণ জানতে চান। সা'ঈদ বলেন ঃ আমি মক্কায় খুবাইব আল-আনসারীর শূলীতে ঝোলানোর দৃশ্য দেখেছিলাম। কুরাইশরা তাঁর দেহ থেকে গোশত কেটে কেটে ফেলেছিল। তারপর তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে জানতে চেয়েছিল! তুমি কি এটা পসন্দ করবে যে, তোমার এই স্থানে মুহাম্মদকে আনা হোক? তিনি বলেছিলেন ঃ আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করি এবং তার বিনিময়ে মুহাম্মাদের গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক, আল্লাহর কসম, আমি তা কক্ষণো পসন্দ করিনে।' আমার যখনই সেই দিনটির কথা মনে পড়ে তখন আমার মধ্যে একটা অপরাধবোধ জেগে ওঠে।

আমি কেন সেদিন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যাইনি। যদিও আমি সেদিন পৌত্তলিক ছিলাম, তবুও আমার মনে হয় আল্লাহ আমার এ অপরাধ কক্ষণো ক্ষমা করবেন না। আর তখনই আমার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। একথা বলার পর তিনি মুহাম্মাদ বলে জোরে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েন।[২৫]

মু'য়াবিয়া (রা) পরবর্তীকালে বলতেন ঃ খুবাইবের হত্যার অনুষ্ঠানে অন্যদের মত আমি আমার পিতা আবু সুফইয়ানের সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুবাইবের বদ-দু'আর ভয়ে আমাকে প্রায় মাটির সাথে ঠেসে ধরে রাখেন। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, কেউ যদি কোন ব্যক্তির উপর বদ-দু'আ করে, আর সে ভয়ে জড়সড় হয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ে তাহলে সে বদদু'আ তার উপর না পড়ে অন্যত্র পড়ে।[২৬] আল-হারেস বলেন ঃ আমি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহর কসম! আমাদের কেউ বেঁচে থাকবে এমন ধারণা আমার ছিল না।[২৭]

খুবাইবের (রা) দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। যে সকল নরাধম তাঁর হত্যায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, এক বছরের মধ্যে তাদের সবাই অতি নির্দয়ভাবে নিহত হয়।[২৮]

ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এ ঘটনার পর মদীনার মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগলো, এই হতভাগ্যরা তাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যেও থাকলো না, আবার তাদের বন্ধুর (নবী) অর্পিত দায়িত্বও পালন করতে পারলো না। তখন আল্লাহ পাক এই মুনাফিকদের স্বরূপ তুলে ধরে সূরা আল-বাকারার ২০৪-২০৬ নং আয়াত এবং খুবাইব ইবন 'আদী ও তাঁর সঙ্গীদের প্রশংসায় ২০৭ নং আয়াত নাযিল করেন ঃ[২৯]

"আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৪)

যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ধ্বংস ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পসন্দ করেন না। (২০৫)

আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৬)

আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে— যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জান বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান (২০৭)। (সূরা আল-বাকারা)

আর-রাজী'র এই হৃদয় বিদারক ঘটনা তৎকালীন আরবের মুসলিম কবিদের বোধ ও বিবেককে ভীষণ নাড়া দেয়। কবি হাস্‌সান সহ আরও অনেকে এই সকল শহীদের স্মরণে অনেক মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন। তাতে একদিকে যেমন শহীদদের প্রশংসা করা হয়েছে অন্যদিকে পৌত্তলিকদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। সীরাতে ইবনে

হিশাম পাঠ করলে তার কিছু চিত্র পাওয়া যায়।[৩০]

ইবন ইসহাক আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ খুবাইবই সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য নিহত হওয়ার পূর্বে দুই রাক'য়াত নামায আদায়ের প্রথা চালু করেন। এটা তাঁরই সুন্নাত।[৩১]

ইমাম আস-সুহাইলী বলেছেন ঃ খুবাইব ইবন 'আদীর আদায়কৃত দুই রাকা'য়াত নামাযকে যে তাঁরই প্রবর্তিত সুন্নাত নামায বলা হয়েছে তা এই জন্য যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় আদায় করেছেন এবং রাসূল (সা) কাজটির প্রশংসা করেছেন। তাঁর পূর্বে যায়িদের জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনাটিও ঘটে রাসূলে কারীমের জীবদ্দশায়। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই রকম ঃ

যায়িদ ইবন হারেসা তায়েফ থেকে এই শর্তে এক ব্যক্তির একটি খচ্চর ভাড়া করেন যে, সে তাঁকে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং তাঁর ইচ্ছামত জায়গায় নামিয়ে দেবে। লোকটি তাঁকে খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে একটি বিরান বধ্যভূমিতে নিয়ে পৌঁছে এবং হত্যা করতে উদ্যত হয়। যায়িদ তখন তাকে বলেন ঃ আমাকে একটু সময় দিন, আমি দুই রাকা'য়াত নামায আদায় করে নিই। লোকটি বললো, ঠিক আছে, দুই রাকা'য়াত নামায আদায় কর। আর এই যে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা লাশগুলো দেখছো, তারাও তোমার মত নামায পড়েছিল। কিন্তু তাদের নামায কোন কাজে আসেনি। যায়িদ নামায আদায় করলেন। তারপর লোকটি তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে এলো। যায়িদ উচ্চারণ করলেনঃ ইয়া আরহামার রাহেমীন—হে পরম করুণাময়! সাথে সাথে— 'তাকে হত্যা কর না'—এই ধ্বনিটি শোনা গেল। ধ্বনিটি কোথা থেকে এলো তা দেখার জন্য লোকটি এদিক ওদিক তাকালো, কিন্তু কাউকে না পেয়ে আবার ফিরে এলো। যায়িদ আবারও ঃ 'ইয়া আরহামার রাহেমীন' উচ্চারণ করলেন। আবারও ঠিক একই ধ্বনি শোনা গেল এবং লোকটি একই কাজ করলো। এভাবে তিনবার একই ঘটনা ঘটে। তবে তৃতীয়বার যায়িদ একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পেলেন, যার হাতে একটি বর্শা এবং মাথায় আগুনের শিখা। সে লোকটির দেহে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়ে হত্যা করলো। তারপর যায়িদের দিকে ফিরে বললো ঃ তুমি প্রথমবার যখন আল্লাহকে ডাক তখন আমি ছিলাম সপ্তম আকাশে, দ্বিতীয়বার ডাকার সময় ছিলাম পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে এবং তৃতীয়বার ডাকার সময় তোমার কাছে এসে হাজির হয়েছি।[৩২]

তথ্যসূত্র ঃ

১. তাজরীদু আসমা' আস-সাহাবা-১/১৬৭
২. বুখারী- ২/৫৭৪
৩. বুখারী- ২/৫৬৮; আল-ইসাবা- ১/৪১৮
৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৬
৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ৪/৬২
৬. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ মুসনাদে ইমাম আহমাদ- ২/২৯৭, ৩১০; বুখারী-জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৪৫; মাগাযী অধ্যায়- হাদীস নং ৩৯৮৯, ৪০৮৬, ৭৪০২; ইবন হিশাম-

২/১৬৯-১৭১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৬, ২৪৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৬২-৬৩; ইবন কাসীর ঃ আস্-সীরাহ ০-১/৫৯৮-৬০০.

৭. আল-ইসাবা-১/৪১৯; আল-ইসতী'য়াব-১/৪২৯
৮. আল-ইসতী'য়াব-১/৪২৯, হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৩
৯. ইবন হিশাম-২/১৬৯; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-১/৫১৯
১০. বুখারী-৩/৫৮৫
১১. আল-ইসতী'য়াব-১/৪২৯
১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৯
১৩. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩০
১৪. বুখারী-২/১৮৫;
১৫. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩০
১৬. ইব হিশাম-২/১৭২; আল-ইসাবা-১/৪১৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৪, ৩/৬৪৪; বুখারী-২/৫৮৫.
১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৭
১৮. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩১; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-১/৬০৩; ইবন হিশাম-২/১৭২; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২২-৫২৫
১৯. ইবন হিশাম-২/১৭৩
২০. আল-ইসতী'য়াব-১/৪৩১-৪৩২
২১. ইবন কাসী-১/৫৯৯, ৬০২; ইবন হিশাম-২/১৭৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৮
২২. আল-বিদায়া-৪/৬৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৫, ফাতহুল বারী-৭/২৯৫
২৩. ইবন কাসীর-১/৬০৭; আল-বিদায়া-৪/৬৭; আল-ইসাবা-১/৪১৯; আল-ইসতীয়াব-১/৪৩২, হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৯৬-৫৯৭.
২৪. আল-ইসাবা-১/৪১৯
২৫. ইবন হিশাম-২/১৭২; আল-বিদায়া-৪/৬৭; ইবন কাসীর-১/৬০২; হায়াতুস সাহাবা-২/১৪০, ৩২২.
২৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৫২৫; ইবন কাসীর-১/৬০২; ইবন হিশাম-২/১৭২
২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৪৭
২৮. ফাতহুল বারী-৭/২৯৫
২৯. ইবন হিশাম-২/১৭৫
৩০. প্রাগুক্ত-২/১৭৬-১৮৩; আল-বিদায়া-১/৬৮-৬৯
৩১. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৫; ইবন কাসীর-১/৬০২
৩২. ইবন কাসীর-১/৬০২; আল-বিদায়া-৪/৬৫

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. আল-ইমাম আজ-জাহাবী ঃ (ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (বৈরুত, আল-মুওয়াস্সাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০।)
(খ) তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-ইসলামী।)
(গ) তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হিঃ।)

২. ইবন হাজার ঃ
(ক) তাহজীবুত তাহজীব, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হিঃ।)
(খ) তাকরীবুত তাহজীব, (লাখ্নৌ,)
(গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, (বৈরুত, দার আল-ফিক্র, ১৯৭৮)।
(ঘ) লিসানুল মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হিঃ।)
(ঙ) ফাতহুল বারী, (মিসর, ১৩১৯ হিঃ।)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী ঃ শাজারাতুজ জাহাব, (বৈরুত, আল-মাকতাব আত-তিজারী)।

৪. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মুযী ঃ তাহজীব আল-কামাল ফী আসমা আর-রিজাল, (বৈরুত, মুওয়াসসাসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮।)

৫. আবু ইউসুফ ঃ কিতাবুল খিরাজ, (বৈরুত, দার আল-মা'রিফা, ১৯৭৯।)

৬. ইবন কাসীর ঃ
(ক) আত-তাফসীর, (মিসর, দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা।)
(খ) আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা।)
(গ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত, মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ।)

৭. ইবনুল জাওযী ঃ
(ক) আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, (দিল্লী, আশরাফুল মাতাবি', ১৩১৩ হিঃ।)
(খ) কিতাবুত তানবীহ ওয়াল ইশরাফ, (মিসর, মাতবা'য়াতুল হাসানিয়্যা, ১৩২৩ হিঃ।)
(গ) কিতাবুল আজকিয়া, (সম্পাদনা ঃ আবদুর রহমান ইবন আলী, ১৩০৪ হিঃ।)
(ঘ) সিফাতুস্ সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হিঃ।)।

৮. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরুত, দারু সাদির)।

৯. ইবন আসাকির ঃ আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম, মাতবায়াতুশ শাম, ১৩২৯ হিঃ)।

১০. ইয়াকূত আল-হামাবী ঃ মু'জামুল বুলদান, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)।

১১. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী, (মিসর, ১৯২৯)।

১২. ইবন হাযাম ঃ জামহারাতু আনসাবুল 'আরাব, (মক্কা, দারুল মা'য়ারফ, ১৯৬২)।

১৩. ইবন খাল্লিকান ঃ ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর, মাকতাবাতু আন-নাহদাতুল মিসরিয়্যা, ১৯৪৮।)

১৪. মুহাম্মাদ আল-আলুসী ঃ বুলুগুল আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব, (১৩১৪ হিঃ)।
১৫. ইবনুল আসীর ঃ (ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)।
(খ) আল-কামিল ফিত তারীখ, (বৈরুত)।
(গ) তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩১৫)।
১৬. আল-বালাজুরী ঃ
(ক) আনসাবুল আশরাফ, (মিসর, দারুল মা'য়ারিফ)।
(খ) ফুতুহুল বুলদান, (মিসর, মাতবায়াতুল মাওসূয়াত, ১৯০১)।
১৭. আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম, (বৈরুত, দারুল 'ইল্ম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৯)।
১৮. ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্ (বৈরুত)।
১৯. ইউসুফ আল-কান্ধালূবী ঃ হায়াতুস সাহাবা, (দিমাশ্ক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩)।
২০. সা'ঈদ আনসারী' মাওলানা ঃ সিয়ারে আনসার, (ভারত, ১৯৪৮)
২১. ইবন আবদিল বার ঃ আল-ইসতী'য়াব, ('আল-ইসাবা' গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা)।
২২. ইবন সাল্লাম আল-জামহী ঃ তাবাকাত আশ শু'য়ারা, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮০)।
২৩. ইবন কুতায়বা ঃ আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারাউ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)।
২৪. ডঃ আবদুর রহমান আল-বাশা ঃ সুওয়ারুন মিন হায়াতুস সাহাবা, (সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ)।
২৫. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওলার রাসূল, (বৈরুত, দারুল ফিক্র)।
২৬. ডঃ শাওকী দাঈফ ঃ তারীখুল আদাব আরাবী, (কায়রো, দারুল মা'য়ারিফ, ৭ম সংস্করণ)।
২৭. ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)।
২৮. জুরযী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, (বৈরুত, দারু মাকতাবাতুল হায়াত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮)।
২৯. আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না ঃ বুলূগুল আমানী মিন আসরার আল-ফাতহির রাব্বানী, (কায়রো, দারুশ শিহাব)।
৩০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী ঃ কানযুল 'উম্মাল, (বৈরুত, মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৫)।
৩১. ডঃ মুস্তাফা আস্-সিবা'ঈ ঃ আস্-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' আল-ইসলামী, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬)।
৩২. হাজী-খলীফা ঃ কাশফুজ জুনূন 'আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরুত, দারুল ফিক্র, ১৯৯০)।

৩৩. মুহাম্মদ আল-খাদারী বেক ঃ তারীখুল উমাম আল-ইসলামিয়া, (মিসর, আল-মাকতাবাতু তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)।
৩৪. মুহাম্মদ আলী আ-সাবুনী ঃ (ক) রাওয়ায়ি 'উল কুরআন, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন, (বৈরুত, মুওয়াস্‌সাসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১)। (খ) আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন, (বৈরুত)।
৩৫. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, (মিসর, আত-তিবায়া' 'আল-মুগীরিয়্যা)।
৩৬. ইমাম আহমাদ ঃ আল-মুসনাদ
৩৭. R.A. Nicholson : A Literary History of the Arabs, (Cambridge, University Press, 1969.)
৩৮. পবিত্র কোরআনুল করীম ঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
৩৯. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।
৪০. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়্যা (উর্দ্দূ)।
৪১. কুদামাহ ইবন জা'ফর ঃ নাকদুশ শি'র (বৈরুত)।
৪২. ইবন রাশীক ঃ কিতাবুল 'উমদাহ, (কায়রো- ১৯৩৪)।
৪৩. আবু তাম্মাম ঃ আল-হামাসা, (বৈরুত)।
৪৪. আল-বাকিল্লানী ঃ ই'জাযুল কুরআন, (বৈরুত-১৯৯১)।
৪৫. আল-জুরজানী ঃ দালায়িলুল ই'জায, (কায়রো-১৯৭৬)।
৪৬. বুটরুস আল-বুসতানী ঃ উদাবাউল আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম (বৈরুত-১৯৮৯)।
৪৭. 'আবদুর রউফ দানাপুরী ঃ আসাহ আস-সীরাহ (করাচী)।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

৫

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

[পঞ্চম খণ্ড]

[উম্মাহাতুল মু'মিনীন]

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯
দ্বিতীয় প্রকাশ : অকটোবর ২০০৩
তৃতীয় প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪২৭
বৈশাখ ১৪১৩
এপ্রিল ২০০৬

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. V) Written by Muhammad Abdul Mabud Published by AKM Nazir Ahmalld Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 1999 Third Edition April 2006 Price Taka 150.00 only.

সূচীপত্র

- ভূমিকা ॥ ৫

১. হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ (রা) ॥ ১১

২. হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা) ॥ ৪০

৩. হযরত 'আয়িশা বিন্‌ত আবী বকর (রা) ॥ ৫৩

৪. হযরত হাফসা বিন্‌ত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ॥ ১৯৬

৫. হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) ॥ ২১০

৬. হযরত উম্মু সালামা (রা) ॥ ২১৩

৭. হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) ॥ ২৩৪

৮. হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস (রা) ॥ ২৫২

৯. হযরত উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফইয়ান (রা) ॥ ২৫৯

১০. হযরত মায়মুনা বিন্‌ত হারিস (রা) ॥ ২৬৭

১১. হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইবন আখতাব (রা) ॥ ২৭২

- গ্রন্থপঞ্জি ॥ ২৮১

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ মেহেরবানীতে 'আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৫ম খণ্ড' প্রকাশিত হচ্ছে। অল্প কথায় বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট সাহাবায়ে কিরামের (রা) পরিচয় তুলে ধরাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ইতিপূর্বে প্রকাশিত চারটি খণ্ডে পুরুষ সাহাবীদের জীবনকথা আমরা আলোচনা করেছি। ৫ম খণ্ডে এগারোজন 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' এর জীবনকথা আলোচনা করা হয়েছে। এ এগারো জন ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' বা পুতঃপবিত্র সহধর্মিণী।

ইসলামে পুরুষ ও নারীকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। উভয়ের সমান দায়িত্ব ও সমান অধিকার ঘোষিত হয়েছে। এ বিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় পুরুষের যেমন ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অবদান রয়েছে, তেমনি আছে নারীরও। পুরুষরা যেমন জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, নারীরাও তেমনি জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছেন, দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীরা ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মোটকথা, এ বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী করতে মহিলা সাহাবীরা কোন অংশে পুরুষ সাহাবীদের থেকে পিছিয়ে থাকেননি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত ও রিসালাতের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন একজন নারী, সর্বপ্রথম সালাত আদায় করেছেন একজন নারী। ইসলামের জন্য নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই আমরা পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীদের জীবন ও কর্মের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত 'আসমা আর-রিজাল' (চরিত-অভিধান) শাস্ত্রের প্রায় সকল গ্রন্থে মহিলা সাহাবীদের পরিচয় ও জীবনকথা আলোচিত হয়েছে। ইবন মুন্দাহ্ (হিঃ ৩৯৫), আবু নু'আইম, ইবন 'আবদিল বার (হিঃ ৪৬৩), আবু মূসা ইসফাহানী (হিঃ ৫৮১) প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রন্থে মহিলা সাহাবীদের জীবনী আলোচনা করেছেন। ইবন 'আবদিল বার তাঁর *'আল ইসতী'আব'* গ্রন্থে মোট ৩৯৮ জন মহিলা সাহাবীর জীবনী আলোচনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন সা'দের (হিঃ ২৩৩) *'আত-তাবাকাত আল-কুবরা'* গ্রন্থে মোট ৬২৭ জন মহিলার জীবনী এসেছে। তার মধ্যে ৯৩ জন সাহাবী নন এমন মহিলাও আছেন। তাঁর গ্রন্থের ৮ম খণ্ডে মহিলাদের জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল আসীর *'তারিখ আন-নিসা'* শিরোনামে মহিলাদের জীবনীর উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এ নামটি পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য। ইবনুল আসীরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *'উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা'*। এর একটি খণ্ডে শুধু মহিলাদের জীবনকথা এসেছে। এ গ্রন্থে মোট ১০২২ জন মহিলা সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। হিজরী নবম শতকের আরেকজন

বিখ্যাত লেখক আল্লামা ইবন হাজার আল-আসকিলানী (হিঃ ৮৫২)। তিনি *'তাহজীবুত তাহজীব'* ও *'আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা'* নামে দুইখানি বৃহদাকৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। *'তাহজীবুত তাহজীব'*-এর ১২তম খণ্ডে ৩২২ জন মহিলার জীবনী আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মহিলা তাবে'ঈর জীবনীও আছে। তবে *'আল-ইসাবা'* গ্রন্থে ১৫৪৫ জন মহিলা সাহাবীর জীবনকথা স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মহিলা সাহাবীর নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উপরে বিভিন্ন গ্রন্থের মহিলা সাহাবীদের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অনেক নামের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ইমাম আজ-জাহাবীর (হিঃ ৭৪৮) *'সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'* ও *'তাজকিরাতুল হুফফাজ'*– দুইখানি বড় আকারের গ্রন্থ। তাতে তিনি বহু মহিলা সাহাবীর জীবনী সন্নিবেশ করেছেন। উল্লেখিত গ্রন্থগুলিই মূলতঃ সাহাবীদের উপর রচিত মৌলিক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থগুলির সবই আমাদের সামনে রয়েছে।

হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) যাঁরা ঘরের জীবনে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) পারিবারিক জীবনের আদর্শের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা হলেন—'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত'। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' (ঈমানদারদের মা) বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরা মুসলিম নারীদের মডেল বা আদর্শ। ৫ম খণ্ডে আমরা তাঁদের কথাই আলোচনা করেছি। তাঁদের সংখ্যা মোট এগারো জন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল নয়।

বর্তমান সময়ে আমরা মুসলমানরা যখন পাশ্চাত্য জীবন দর্শন দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত এবং ইসলামের 'আকীদা-বিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার, আইন-কানুন ইত্যাদি সবই তাদের দৃষ্টি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করছি, বিশেষতঃ নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির নামে ইসলাম বিরোধী যে কর্মতৎপরতা প্রবল বেগে বয়ে চলেছে তখন রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি একজন ঈমানদারের মনেও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আমরা সে প্রশ্নের জবাব দানের চেষ্টা এখানে করবোনা। কারণ, এ প্রশ্ন নতুন নয়, বরং খ্রীস্টান-ইহুদীরা তা বহুকাল আগেই উত্থাপন করেছে এবং মুসলিম মনীষীরা যুগে যুগে নানাভাবে তাদের জবাব দিয়ে এসেছেন। আমরা আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে।

আমরা আমাদের পাঠকদেরকে যে কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তা হলো, একজন সত্যিকার মুমিনের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) গোটা জীবন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিল। নিজের ইচ্ছায় তিনি কিছুই করতেন না বা বলতেন না। সুতরাং তিনি যে বিয়েগুলি করেছেন তা সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশে করেছেন। দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টান-ইহুদীদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় যে প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দেয়, সেই রকম কোন প্রশ্ন কি কোন পুরুষ বা মহিলা সাহাবীর মনে কখনও দেখা দিয়েছিল? ইতিহাস অন্তত সে কথা বলে না। তাহলে আমরা আজ কেন বিভ্রান্ত হবো? আসলে এ জগতের সকল সৃষ্টির মালিক একমাত্র আল্লাহ। একজন মালিকের অধিকার আছে তার মালিকানাধীন বস্তু যাকে এবং যত পরিমাণ খুশী দান করার। সে

ক্ষেত্রে যেমন কারও কোন প্রশ্ন করার অধিকার থাকে না, এ ক্ষেত্রেও তাই। আল্লাহ্ তাঁর নবীকে (সা) এগারো জন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেছেন, যেমন একজন মুমিন পুরুষকে শর্তসাপেক্ষে চার স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ রেখেছেন। এটাই ছিল আল্লাহর হিকমাত। মূলত এ সবই ঈমানের ব্যাপার। আমাদের ঈমান হতে হবে সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের মত। আল্লাহর রাসূলের (সা) যাবতীয় কর্ম ও আচরণ আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিতে হয়েছে—এ বিশ্বাস শক্ত হলে কোন সংশয়, কোন অবান্তর প্রশ্ন অন্তর মাঝে উঁকি দিতে পারে না। যেমন পারেনি সাহাবায়ে কিরামের (রা) মনে।

রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ যেদিন থেকে তাঁর সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন এবং আল্লাহ্ তাঁদেরকে মুমিন বা বিশ্বাসীদের মা বলে ঘোষণা দেন সেদিন থেকেই জগতের সকল মুসলমানের অন্তরে এক বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের আসন তাঁরা লাভ করেছেন। প্রতিটি মুসলিম নর-নারী নিজের মায়ের থেকেও বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাঁদেরকে দেখে এসেছেন। মুসলিম উম্মার নিকট থেকে তাঁরা যে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন, বিশ্বের নারী জাতির ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই।

রাসূলুল্লাহর (সা) এক বেগমের ইনতিকাল হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আপনি এ সময় সিজদা করছেন কেন? বললেন ঃ 'যখন কিয়ামতের কোন নিদর্শন দেখ তখন তোমরা সিজদা করে থাক। তাহলে আযওয়াজে মুতাহ্হারাত-এর মৃত্যুর চেয়ে কিয়ামতের বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে?' (আবু দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত, বাবুস সুজূদ ইনদাল আয়াত।)

মক্কার অদূরে 'সারাফ' নামক স্থানে হযরত মায়মূনার (রা) ইনতিকালের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) উপস্থিত ছিলেন। লাশ খাটিয়ায় উঠানোর সময় তিনি লোকদের বলেন ঃ 'ইনি মায়মূনা, তাঁর লাশ আদবের সাথে উঠাবে, বেশী নাড়াচাড়া করবে না।' (নাসাঈ ঃ কিতাবুন নিকাহ, জিকরু আমরি রাসূলিল্লাহ সা. ফিন-নিকাহ ওয়া আযওয়াজিহি)

কোন কোন সাহাবী আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে এত বেশী পরিমাণ ভালোবাসতেন যে, তাঁদের জন্য নিজের অনেক বিষয় সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফ (রা) তাঁদের জন্য একটি বড় বাগিচা ওয়াক্ফ করেন, যা চার হাজার দিরহামে বিক্রি করা হয়েছিল। (তিরমিযী ঃ মানাকিবু আবদির রহমান ইবন আউফ)

খুলাফায়ে রাশেদুন-এর প্রত্যেক খলীফা 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত'-এর খুবই সমাদর ও সম্মান করতেন। হযরত 'উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁদের সংখ্যা অনুযায়ী নয়টি পিয়ালা বানিয়েছিলেন। কোন ফল বা কোন খাবার জিনিস যখন তাঁর নিকট আসতো তখন নয়টি পিয়ালা করে তাঁদের প্রত্যেকের নিকট পাঠাতেন। (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ কিতাবুয যাকাত)

উটের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা) সহ অন্যান্য সাহাবী জনতা উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, ইতিহাসের কোথাও কি তার তুলনা পাওয়া যায়?

হযরত যায়িদ ইবন হারিসার (রা) সাথে বিয়ে হয় হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের (রা)। প্রায় বছর খানেক তাঁরা একসাথে ঘর করেন। বনিবনা না হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পর রাসূল (সা) সেই যায়িদকেই পাঠালেন যায়নাবের (রা) কাছে বিয়ের পয়গাম দিয়ে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাবকে (রা) বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন, তাই যায়িদের অন্তরে যায়নাবের (রা) প্রতি এত বেশী ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হয় যে, তিনি যায়নাবের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পারেননি। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাঁর সাথে কথা বলেন। এসব অলীক কোন কিস্‌সা-কাহিনী নয়, সবই বাস্তব সত্য।

হিজরী ২৩ সনে যখন খলীফা 'উমার (রা) 'আমীরুল হাজ্জ' হিসেবে হজ্জে যান তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত'কেও সফরসঙ্গী করেন। হযরত 'উসমান (রা) ও হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আউফের (রা) উপর তাঁদের নিরাপত্তা ও দেখাশুনার সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁরা দুইজন 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতে'র বাহনের আগে পিছে চলতেন, কাউকে তাঁদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। যখন কোথাও যাত্রাবিরতি করতেন, কাউকে তাঁদের তাঁবুর ধারে কাছে আসতে দিতেন না। (তাবাকাত ঃ আবদুর রহমান ইবন আউফের জীবনী)

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীনের অনেকে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। মুসলিম উম্মাহ যে তাঁদেরকে কী পরিমাণ সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছে তা আমরা তাঁদের জীবনীতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মোটকথা, তাঁদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। মুসলিম উম্মাহ কোনকালেই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়নি। আমরাও যখন তাঁদের জীবনী পাঠ করবো, তখন আমাদের অন্তরেও তাঁদের সম্পর্কে একটা পবিত্র চিন্তা ও ভাব বজায় রাখবো।

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা বাংলাভাষী পাঠকদের নিকট তুলে ধরার চিন্তা ও পরিকল্পনা মূলতঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর পরিচালক অধ্যাপক নাজির আহমদ সাহেবের। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ এ কাজ এতদূর এগিয়ে আনতে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। নানাভাবে তিনি আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলেছেন। এ জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং দু'আ করি আল্লাহ যেন তাঁকে এর ভালো প্রতিদান দেন।

সাহাবীদের জীবনকথা লেখার ব্যাপারে পাঠকদের নিকট থেকেও অনেক মূল্যবান উপদেশ ও পরামর্শ পাওয়া গেছে। অনেক পরামর্শ আমরা গ্রহণ করতে পারিনি বলে দুঃখিত। এ গ্রন্থের তথ্যসমূহ আরবী-উর্দূর নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহ থেকে গ্রহণ করার

চেষ্টা করেছি। উম্মাহাতুল মুমিনীন-এর সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে যথাযথ ভাষা ব্যবহারেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি তথ্য ও ভাষাগত কোন অসংগতি পাঠকদের নিকট ধরা পড়ে তাহলে তা আমার দৃষ্টিগোচর করার জন্য অনুরোধ করছি। বাংলার মুসলিম মা-বোনদের উপর 'উম্মাহাতুল মুমিনীন'-এর বিশ্বাস ও কর্মের ছাপ পড়বে—এই আশা নিয়ে আমরা কাজ করে যাব।

আল্লাহ পাক আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করুন। আমীন ॥

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
২১ ভাদ্র ১৪০৬

মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)। তাঁর ডাকনাম 'উম্মু হিন্দা' ও 'উম্মুল কাসিম'[১] এবং উপাধি বা লকব 'তাহিরা'। পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ মক্কার কুরাইশ খান্দানের বনু আসাদ শাখার সন্তান। পিতৃ-বংশের উর্ধপুরুষ 'কুসাঈ'-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।[২] অর্থাৎ খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবন 'আবদুল 'উয্‌যা ইবন কুসাঈ। এই 'কুসাঈ' রাসূলুল্লাহরও (সা) ৪র্থ উর্ধতন পুরুষ। হযরত খাদীজার (রা) মাতা ফাতিমা বিন্‌ত যায়িদও ছিলেন কুরাইশ বংশীয়া।[৩] যুবাইর ইবন বাক্‌কার বলেন ঃ জাহিলী যুগেই খাদীজার লকব ছিল 'আত-তাহিরা'। বয়স ও বুদ্ধি হওয়ার পর পুতঃপবিত্র চরিত্রের জন্য এ লকব পান।[৪] রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত খাদীজার (রা) মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর-সম্পর্ক ছিল। এ কারণে, নুবুওয়াত লাভের পর হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। সম্ভবত বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছিলেন।

হযরত খাদীজার (রা) পরিবারটি ছিল মক্কার এক অভিজাত ও বিত্তবান পরিবার। তাঁর জন্ম হয় 'আমুল ফীল' (হাতীর বছর)-এর ১৫ বছর পূর্বে, মুতাবেক হিঃ পূঃ ৬৮/ খ্রীঃ ৫৫৬ সনে মক্কা নগরীতে।[৫] হাকীম ইবন হিযাম বলেন, আমার ফুফু খাদীজা আমার চেয়ে দুই বছরের বড়। আমার জন্ম হাতীর বছরের তেরো বছর আগে।[৬]

হযরত খাদীজার (রা) পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ নিজ খান্দানের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কায় এসে চাচাতো ভাই আবদুদ দার ইবন কুসাঈ-এর হালীফ বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। এখানেই মক্কার মেয়ে ফাতিমা বিন্‌ত যায়িদকে বিয়ে করেন।[৭] এই ফাতিমা উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার জননী। খুওয়াইলিদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গোত্রের কমাণ্ডার। তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জনক। প্রথম পুত্র হিযাম, এই হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী হাকীম জাহিলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়া'র পরিচালনভার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান খাদীজা (রা)। তৃতীয় সন্তান 'আওয়াম' প্রখ্যাত সাহাবী হযরত যুবাইরের (রা) পিতা। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু এবং হযরত হামযার (রা) আপন বোন হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিব ছিলেন

---

১ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৯
২ আজ-জাহাবী ঃ তারীখুল ইসলাম-১/৪১; তাবাকাত-৮/৫২
৩ আল-ইসাবা ৪/২৮১; তাবাকাত-১/১৩৩
৪ সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১১১
৫ আল-আ'লাম ২/৩৪২; তাবাকাত-১/১৩২
৬ আনসাবুল আশরাফ-১/৯৯; আল ইসাবা-৪/২৮২
৭ সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১; তাবাকাত-৮/১

আওয়ামের স্ত্রী তথা যুবাইরের (রা) মা। অর্থাৎ খাদীজার (রা) ছোট ভাই-বউ। চতুর্থ সন্তান হালা। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে হযরত যায়নাবের (রা) শ্বাশুড়ী, তথা আবুল 'আস ইবন রাবী'র মা। আবুল 'আস রাসূলুল্লাহর (সা) বড় জামাই। পঞ্চম সন্তান রুকাইয়া। তাছাড়া, বালাজুরী খালিদা ও রাকীকা নাম্নী তাঁর আরও দুই মেয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। খালিদার বিয়ে হয় 'ইলাজ ইবন আবী সালামার সাথে, আর রাকীকার বিয়ে হয় আবদুল্লাহ ইবন বিজাদের সাথে।[৮] হযরত খাদীজার ভাই–বোনদের মধ্যে একমাত্র হালা (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত খাদীজার (রা) বাল্য ও কৈশোর জীবনের তেমন কোন তথ্য সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। তবে সেই জাহিলী সমাজে তিনি যে অতি পুতঃপবিত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন সে কথা বিভিন্নভাবে জানা যায়। পিতা খুওয়াইলিদ মেয়ের এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তৎকালীন আরবের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নাওফিলকে তাঁর বর নির্বাচন করেছিলেন,[৯] কিন্তু কেন যে সে বিয়ে হয়নি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব। শেষ পর্যন্ত আবু হালা হিন্দা ইবন যুরারা আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর 'আতীক ইবন আবিদ, মতান্তরে 'আয়িজ-এর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ কথা বলেছেন ইবন আবদিল বারসহ অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ।[১০] তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায়, তাঁর প্রথম স্বামী 'আতীক, অতঃপর আবু হালা। ইবন ইসহাকও এ মত পোষণ করেছেন বলে ইউনুস ইবন বুকাইর বর্ণনা করেছেন।[১১] বালাজুরী বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামী 'আতীকের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর রাসূলুল্লাহকে (সা) বিয়ে করেন।[১২]

হযরত খাদীজার (রা) পিতা কখন মারা যান, সে সম্পর্কে সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা মতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর বিয়ের সময় পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং বিয়ের পর কোন এক সময় মারা যান।[১৩] কেউ কেউ বলেছেন ফিজার[১৪] যুদ্ধে তিনি মারা যান।[১৫] ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন, খাদীজার (রা) পিতা ফিজার যুদ্ধের পূর্বে মারা যান এবং তাঁর চাচা আমর ইবন আসাদ

---

৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৬

৯. প্রাগুক্ত-১/৪০৭; আল-ইসাবা-৪/২৮২

১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/১১১; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০

১১. আল-ইসাবা-৪/২৮১

১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭

১৩. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২; আজ-জাহাবী; তারীখ-১/৪২

১৪. ফিজার যুদ্ধটি হয় 'আমুল ফীল' বা হাতীর বছরের বিশ বছর পর। পবিত্র হারাম মাসে এ যুদ্ধ হয় বলে একে 'ফিজার' বলা হয়। যুদ্ধটি হয় কুরাইশ ও তার মিত্র গোত্রসমূহ এবং কায়স 'আসলানের মধ্যে। (তাবাকাত-১/৮১, ১২৬-১২৮)

১৫. তাবাকাত-৮/৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৪৬

তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। তিনি আরও বলেছেন, ফিজারের পূর্বে যে তাঁর পিতা মারা যান সে ব্যাপারে আমাদের সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে ইজমা হয়েছে। কোন দ্বিমত নেই।[১৬] ইমাম সুহায়লীও একথা বলেছেন।

পিতার মৃত্যু বা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্নতা বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, কুরাইশ বংশের অনেকের মত হযরত খাদীজাও (রা) ছিলেন একজন মস্তবড় ব্যবসায়ী। ইবন সা'দ তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।' ইবন সাদের এ মন্তব্য দ্বারা হযরত খাদীজার (রা) ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায়। অংশীদারী বা মজুরীর বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ-বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।[১৭]

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন 'আল-আমীন'। তাঁর সুনামের কথা খাদীজার (রা) কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তার ছোট ভাই-বউ সাফিয়্যার কাছে 'আল আমীন' মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন।

এ সময় হযরত খাদীজা (রা) সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। এ জন্য যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন। অবশেষে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহকে নিয়োগ দান করেন। যেভাবে তিনি নিয়োগ লাভ করেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আমরা এখানে তুলে ধরছি।

হযরত ইয়া'লার বোন নাফীসা বিন্‌ত মুনইয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পঁচিশ বছরে পদার্পণ করেছেন তখন আবু তালিব একদিন তাঁকে ডেকে বললেন ঃ 'ভাতিজা! আমি একজন বিত্তহীন মানুষ, সময়টাও আমাদের জন্য খুব সঙ্কটজনক। মারাত্মক অভাবের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন উপায় উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তার পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি যদি তার কাছে যেতে, হয়তো তোমাকে সে নির্বাচন করতো, তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তার জানা আছে। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করিনে এবং ইহুদীদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশঙ্কা করি।[১৮] তবুও এমনটি না করে উপায় নেই। জবাবে রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবতঃ সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবু তালিব বললেন ঃ হয়তো অন্য কাউকে সে

---

১৬. তাবাকাত-১/১৩২-১৩৩; আল-ইসাবা-৪/২৮২

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩৪২

১৮. কিশোর বয়সে একবার রাসূল (সা) চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন পাদরী 'বাহীরা' তাঁর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ বর্ণনায় আবু তালিব সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

নিয়োগ দিয়ে ফেলবে। চাচা- ভাতিজার এ সংলাপের কথা খাদীজার কানে গেল। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ অন্য লোকে আপনাকে যে পারিশ্রমিক দিবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব।[১৯]

বালাজুরী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স যখন বিশ বছর তখন আবু তালিব একদিন বললেন ঃ ভাতিজা! খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ একজন ধনবতী ব্যবসায়ী মহিলা। তার এখন প্রয়োজন তোমার মত একজন সৎ, বিশ্বস্ত ও চরিত্রবান লোকের। আমি যদি তোমার ব্যাপারে কথা বলি, হয়তো সে তার কোন ব্যবসায়ে তোমাকে দায়িত্ব দিতে পারে। রাসূল (সা) বললেন ঃ চাচা! আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন।

আবু তালিব খাদীজার নিকট গেলেন এবং তাঁর কোন ব্যবসায় মুহাম্মাদকে (সা) নিয়োগের ব্যাপারে কথা বললেন। খাদীজা প্রস্তাব শুনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিলেন।[২০]

'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল বলেছেন ঃ আবু তালিব মুহাম্মাদকে (সা) বলেন ঃ ভাতিজা! শুনেছি খাদীজা অমুককে দুইটি জওয়ান উটের বিনিময়ে মজুর হিসেবে নিয়োগ করেছে। তোমার ব্যাপারে আমরা এতে রাজি হবো না। তুমি তার সাথে কথা বলতে চাও? বললেন ঃ চাচা! আপনি যা ভালো মনে করেন। এরপর আবু তালিব খাদীজার নিকট যেয়ে বলেন ঃ খাদীজা! তুমি কি মুহাম্মাদকে মজুরীর বিনিময়ে নিয়োগ করতে চাও? শুনেছি তুমি অমুককে দুইটি জওয়ান উটের বিনিময়ে নিয়োগ করেছো। মুহাম্মাদের ব্যাপারে চার উটের কমে আমরা রাজি হবোনা।[২১]

উল্লেখিত বর্ণনাগুলি দ্বারা বুঝা যায়, হযরত খাদীজা একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি বহু শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁর বুদ্ধিও ছিল প্রখর। তাই তিনি যথাসময়ে মুহাম্মাদকে (সা) নির্বাচনে এবং তাঁর উপর ব্যবসার দায়িত্ব প্রদানে মোটেই ভুল করেননি। আর এই নিয়োগ লাভের ব্যাপারে জনাব আবু তালিব মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। নিয়োগ লাভের পর জনাব আবু তালিব রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেন, এ তোমার প্রতি আল্লাহর একটি অনুগ্রহ।

খাদীজার (রা) পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সংগে করে মুহাম্মাদ (সা) সিরিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রাকালে চাচারা তাঁর সহযাত্রীদের সতর্ক করে দিলেন তাঁর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য। কাফিলা সিরিয়া পৌছলো। পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি। মায়সারা গেছেন একটু দূরে কোন কাজে। গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?'

---

১৯. তাবাকাত-১/১২৯; সীরাতু ইবন হিশাম. (পাদটীকা)-১/১৮৮

২০. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭

২১. তাবাকাত-১/১৩০

মায়সারা বললেন ঃ 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি লোক।' পাদ্রী বললেন ঃ 'এখন এ গাছের নিচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' পাদ্রী আরও জানতে চান ঃ 'তাঁর চোখ দুইটি কি লালচে?' মায়সারা বললেন ঃ হাঁ। এই লাল আভা কখনও দূর হয় না। পাদ্রী বললেন ঃ তিনি নবী। তিনিই আখিরুল আম্বিয়া—শেষ নবী।[২২]

রাসূল (সা) মায়সারাকে সংগে নিয়ে বাজারে পণ্য বিক্রি করেন। এক পর্যায়ে সেখানে এক ব্যক্তির সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু বিবাদ হয়। লোকটি রাসূলকে (সা) বলে ঃ আপনি লাত ও উয্যার নামে শপথ করে বলুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আমি তো কক্ষণও তাদের নামে শপথ করিনে। আমি তাদের প্রত্যাখ্যান করি। লোকটি বললো ঃ আপনার কথাই ঠিক। অতঃপর সে মায়সারাকে বলে ঃ আল্লাহর কসম! তিনি একজন নবী।

রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার (রা) বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে কোন্ বাজারে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে সামান্য মতবিরোধ আছে। একটি মতে, তিনি সিরিয়ার 'বুসরা' বাজার গিয়েছিলেন।[২৩] আল্লামা আয-যিরিকলী 'হাওরান' বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪] তাবারী ইবন শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়া নয়, বরং ইয়ামনের একটি হাবশী বাজারে গিয়েছিলেন। তবে সিরিয়া যাওয়ার বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল (সা) তাঁর উটের উপর সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দুইজন ফিরিশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজার (রা) পণ্য সামগ্রী বিক্রী করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো।[২৬] এই সফরে আল্লাহ তা'আলা মায়সারার অন্তরে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। তিনি যেন রাসূলুল্লাহর (সা) দাসে পরিণত হন। যখন তাঁরা মক্কার অদূরে 'মাররুজ জাহরান' নামক স্থানে তখন মায়সারা বলেন ঃ মুহাম্মাদ (সা), আপনি খাদীজার কাছে যান এবং আল্লাহ আপনার সাথে যে আচরণ করেছেন তা তাঁকে অবহিত করুন।[২৭]

---

২২. ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। (সীরাতু ইবন হিশাম (টীকা)-১/১৮৮)। ইবন হাজার আল-আসকিলানী এই পাদ্রীর নাম 'বাহীরা' বলেছেন। (আল-ইসাবা-৪/২৮১)

২৩. তাবাকাত-১/১৩০; আল-ইসাবা-৪/২৮১

২৪. আল-আ'লাম-২/৩৪২

২৫. তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা-১/৬৪,

২৬. তাবাকাত-১/৮৩

২৭. প্রাগুক্ত-১/১৩১

তাঁরা ব্যবসা থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন। দাস মায়সারা অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় কর্মকাণ্ড, পাদ্রীর মন্তব্য, ফিরিশতার ছায়াদান, দ্বিগুণ মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ের একটি বিস্তারিত রিপোর্ট মনিব খাদীজার (রা) নিকট পেশ করেন। মায়সারা একথাও বলেন ঃ 'আমি তাঁর সাথে খেতে বসতাম। আমাদের পেট ভরে যেত, অথচ অধিকাংশ খাবার পড়ে থাকতো।'[২৮] এ সফরের ঘটনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে সব বর্ণনার বিষয়বস্তু একই আছে।[২৯]

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী ও দৃঢ়চেতা ভদ্রমহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন বংশত কৌলিন্যের দিক দিয়ে কুরাইশদের মধ্যমণি। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিণী হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশী ছিল। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল এবং সেজন্য প্রচুর অর্থও ব্যয় করেছিল।[৩০] তিনি তাঁদের সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান।[৩১]

হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বিয়ে করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে যে কথাটি বলা হয় তা হলো, বিশ্বস্ত দাস মায়সারার মুখে রাসূলুল্লাহর (সা) নৈতিক গুণাবলী ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। হয়তো এটাই মূল কারণ। তবে এর পশ্চাতে হযরত খাদীজার (রা) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও কাজ করে থাকতে পারে। যেমন ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। সিরিয়া থেকে ফেরার সময় রাসূল (সা) চলতে চলতে এক সময় মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন ছিল দুপুর বেলা। খাদীজা (রা) তখন তাঁর ঘরের ছাদে। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলেন, মুহাম্মাদ উটের উপর বসে আছেন এবং দুইজন ফিরিশতা তাঁকে ছায়া দান করে আছে। তিনি সঙ্গের অন্য মহিলাদেরকে এ দৃশ্য দেখান।[৩২] এছাড়া আর একটি ঘটনার কথা আল মাদায়িনী ইবন আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। জাহিলী যুগে মেয়েদের কোন এক উৎসব উপলক্ষে মক্কার মেয়েরা এক স্থানে সমবেত হয়। তখন দূরে এক অপরিচিত ব্যক্তি দেখা যায়। লোকটি আরও নিকটে এসে উঁচু গলায় ঘোষণা করে ঃ ওহে মক্কার মহিলারা! তোমরা শুনে রাখ। খুব শিগ্‌গির তোমাদের এ মক্কা নগরীতে একজন নবীর আবির্ভাব হবে। তাঁর নাম হবে আহমাদ। তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব সে যেন তাঁর স্ত্রী হয়।[৩৩] ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন ঃ খাদীজা (রা) দাস মায়সারার মুখে পাদ্রীর মন্তব্য ও দুইজন ফিরিশতা কর্তৃক মুহাম্মাদকে (সা)

---

২৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭; ইবন হিশাম-১/১৮৯

২৯. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আজ-জাহাবী; তারীখ-১/৪১-৪২; তাবাকাত-১/১২৯-১৩১; আনসাবুল আশরাফ-১/৯৬-৯৭

৩০. আল-ইসাবা-৪/২৮৩; তাবাকাত-১/১৩২; ইবন হিশাম-১/১৮৯

৩১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯

৩২. তাবাকাত-১/১৩০

৩৩. আল-ইসাবা-৪/২৮২

ছায়াদানের কথা শুনে ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট যেয়ে তাঁকে এসব কথা বলেন। খাদীজার কথা শুনে তিনি বলেন ঃ খাদীজা! তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে মুহাম্মাদ এই উম্মাতের নবী। আমি জেনেছি, খুব শিগগির এই উম্মাতের একজন নবী আসবেন। এ তাঁরই সময়। এরপর ওয়ারাকা প্রতীক্ষা করতে থাকেন।[৩৪] সম্ভবতঃ উল্লেখিত সকল ঘটনা হযরত খাদীজার (রা) সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

এখানে ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। কারণ হযরত খাদীজার (রা) জীবনকে সঠিক ধারায় চলমান রাখতে তাঁকে আমরা বারবার দৃশ্যপটে দেখতে পাই। ইসলামের সূচনা পর্বের ইতিহাসে সকাল বেলার সূর্যের সোনালী আভার মত তিনি দীপ্তিমান। তিনি ওয়ারাকা ইবন নাওফিল ইবন আসাদ ইবন আবদুল 'উয্যা। তাঁর মায়ের নাম হিন্দা বিন্‌ত আবী কাবীর। তিনি আসমানী কিতাবের ও মানুষের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বেই যাঁরা তাঁর উপর ঈমান আনেন এবং মারা যান তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৩৫]

বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে। তবে খাদীজাই (রা) যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সে ব্যাপারে প্রায় সব বর্ণনা একমত।

একটি বর্ণনায় এসেছে, নাফীসা[৩৬] বিন্‌তু মুন্‌ইয়া বলেন, মুহাম্মাদ সিরিয়া থেকে ফেরার পর তাঁর মনোভাব জানার জন্য খাদীজা (রা) আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ মুহাম্মাদ! আপনি বিয়ে করছেন না কেন? বললেন, বিয়ে করার মতো অর্থ তো আমার হাতে নেই। বললাম ঃ যদি আপনাকে একটা সুন্দরের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, অর্থ-বিত্ত, মর্যাদা ও অভিজাত বংশের প্রস্তাব দেওয়া হয়, রাজি হবেন? বললেন ঃ কে তিনি? বললাম ঃ খাদীজা। বললেন ঃ এ আমার জন্য কিভাবে সম্ভব হতে পারে? বললাম ঃ সে দায়িত্ব আমার। তিনি রাজি হয়ে গেলেন।[৩৭]

ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খাদীজা ছিলেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। তিনি দূতের মাধ্যমে মুহাম্মাদকে (সা) একথা বলেন ঃ 'হে আমার চাচাতো ভাই! আপনার সাথে আমার আত্মীয়তা, নিজের কাওমের মধ্যে আপনার স্থান ও মর্যাদা, আপনার বিশ্বস্ততা, সততা ও উন্নত নৈতিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।'[৩৮] সম্ভবতঃ এই দূত নাফীসা বিন্‌ত মুন্‌ইয়া।

---

৩৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯১

৩৫. তাফসীর আল-কাশ্‌শাফ ঃ সূরা ইয়াসীন

৩৬. নাফীসা বিন্‌ত মুনইয়া 'ইয়া'লা ইবন মুনইয়া আত-তামীমীর বোন। এ মহিলা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৯৮)

৩৭. তাবাকাত-১/১৩২; আল ইসাবা-৪/২৮২

৩৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, খাদীজা (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন এবং তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য রাসূলুল্লাহকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, দারিদ্রের কারণে হয়তো খাদীজার পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশেষে খাদীজা নিজেই বিষয়টি তাঁর পিতার কাছে উত্থাপন করেন এবং তাঁর সম্মতি আদায় করেন।[৩৯]

অনেকে এমন কথা বলেছেন যে, প্রথমে খাদীজা (রা) নাফীসাকে পাঠান বিয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) মনোভাব জানার জন্য। তিনি ইতিবাচক সাড়া পেয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন।[৪০] আর এটা সম্ভবত এ কারণে যে, তৎকালীন আরবে মেয়েদের, বিশেষত অভিজাত বংশের মেয়েদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ছিল। তাই পিতা অথবা চাচা জীবিত থাকতেও খাদীজা নিজেই নিজের বিয়ের সকল পর্যায় অতিক্রম করেন।[৪১]

আল-কালবী বলেন ঃ খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর চাচা 'আমর ইবন আসাদের নিকট আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দান করেন। 'আমর তখন থুত্থুড়ে বুড়ো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার প্রস্তাবের কথা চাচাদের বললেন। তিনি তাঁর দুই চাচা আবু তালিব ও হামযাকে সংগে করে একটি নির্দিষ্ট দিনে খাদীজার গৃহে যান। খাদীজা ছাগল জবাই করে আপ্যায়নের আয়োজন করেন। চাচা 'আমর ও খান্দানের লোকদেরও ডাকেন। চাচাকে পানীয় পান করান। পানাহারের পর্ব শেষ হলে খাদীজা রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেন ঃ আপনি আবু তালিবকে আমার চাচা 'আমরের নিকট আমার বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পেশ করতে বলুন। অতঃপর আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করে খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের কাজ সমাধা করেন। এই বিয়ের অল্প কিছুদিন পর খাদীজার (রা) চাচা মারা যান।[৪২]

এ প্রসঙ্গে হযরত খাদীজার (রা) পিতা সম্পর্কিত কয়েকটি বর্ণনা ও দেখতে পাওয়া যায়। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। খাদীজার (রা) পিতা এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না। একদিন খাদীজা (রা) তাঁর গৃহে পিতার সাথে আরও কিছু কুরাইশ ব্যক্তিবর্গকে পানাহারের আমন্ত্রণ জানালেন। তারা পরিতৃপ্তি সহকারে পানাহার করে মাতাল হয়ে পড়লে খাদীজা (রা) পিতাকে বললেন ঃ মুহাম্মাদ আমাকে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন। আপনি এ বিয়েতে সম্মতি দিন। পিতা সম্মতি দান করেন। খাদীজা (রা) প্রথা অনুযায়ী পিতাকে নতুন পোশাক পরান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেন ঃ আমার এ নতুন পোশাক কেন? খাদীজা (রা) বলেন ঃ মুহাম্মাদের সাথে আমার বিয়েতে আপনি সম্মতি দান করেছেন, তাই। পিতা বললেন ঃ তোমাকে আমি আবু

---

৩৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২
৪০. সীরাতু ইবন হিশাম, (টীকা)-১/১৮৯
৪১. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৩
৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭,৯৮

তালিবের এই ইয়াতীমের সাথে বিয়ে দিব? আমার জীবনের শপথ! কক্ষণও তা হয় না। খাদীজা (রা) প্রতিবাদের সুরে বলেন ঃ আপনি আমার ব্যাপারটি নিয়ে নিজেকে কুরাইশদের নিকট নির্বোধ প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছেন? আপনি তাদের জানাতে চাচ্ছেন যে, আপনি মাতাল ছিলেন। খাদীজার (রা) এ কথায় তিনি সম্মতি দান করেন। আল-আ'মাশ জাবির ইবন সামুরা থেকেও এ রকম কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরীও এরকম কথা উল্লেখ করেছেন।[৪৩]

আবু মিহলায বর্ণনা করেছেন। খাদীজার (রা) পিতাকে মদপান করিয়ে মাতাল করা হয়। তারপর মুহাম্মাদকে (সা) ডাকা হয় এবং তাঁর দ্বারা বিয়ের কাজ সমাধা করা হয়। অতঃপর প্রথা অনুযায়ী বৃদ্ধকে নুতন পোশাক পরানো হয়। সুস্থ হয়ে বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ঃ আমার গায়ে এ নতুন পোশাক কেন? লোকেরা বললো ঃ এ পোশাক আপনার মেয়ের স্বামী মুহাম্মাদ আপনাকে পরিয়েছেন। তিনি রাগে ফেটে পড়েন এবং হাতে অস্ত্র তুলে নেন। বনু হাশিমও প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে যায়। শেষমেষ একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায়।

অন্য একটি সনদে এ রকম বর্ণিত হয়েছে যে, খাদীজা (রা) তার পিতাকে অতিরিক্ত মদপান করিয়ে অচেতন করে ফেলেন। গরু জবেহ করেন, পিতার গায়ে রং লাগান এবং নতুন পোশাক পরান। তিনি সুস্থ হয়ে জানতে চান ঃ এ গরু জবেহ কেন, এসব রং কেন এবং এ পোশাকই বা কেন? খাদীজা (রা) বলেন ঃ কেন, আপনি আমাকে মুহাম্মাদের সাথে বিয়ে দিয়েছেন, তাকি মনে নেই? তিনি বললেন ঃ না, আমি তা করিনি। কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেখানে আমি মত দিইনি। আর মুহাম্মাদের সাথে আমি তোমাকে বিয়ে দিয়েছি?[৪৪]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় খাদীজার পিতা বেঁচে ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ আছে। সুতরাং এ ব্যাপারেও মতপার্থক্য আছে যে, এ বিয়েতে খাদীজার (রা) অভিভাবক (ওয়ালী) কে হয়েছিলেন। কেউ কেউ চাচা 'আমর ইবন আসাদের কথা বলেছেন, আবার অনেকে ভাই 'আমর ইবন খুওয়াইলিদের নাম উল্লেখ করেছেন।[৪৫] হযরত আয়িশা (রা) ও ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ খাদীজার চাচা আমর ইবন আসাদ তাকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। কারণ ফিজার যুদ্ধের পূর্বে তাঁর পিতা মারা যান। ইবন আব্বাস আরও বলেন ঃ 'আমর সে সময় থুথুড়ে বুড়ো। তিনি ছাড়া আসাদের আর কোন সন্তান তখন জীবিত ছিলেন না। আর আমরেরও কোন সন্তান ছিল না।[৪৬] মুহাম্মাদ ইবন উমারও বলেছেন ফিজারের পূর্বে খাদীজার পিতা মারা যান। আর খাদীজার (রা) বিয়ের ব্যাপারে

---

৪৩. আল-জাহবী ঃ তারীখ-১/৪২

৪৪. তাবাকাত-১/১৩৩

৪৫. সীরাতু ইবন হিশাম-(টীকা)-১/১৯০; আনসাবুল আশরাফ-১/৯৮

৪৬. তাবাকাত-১/১৩২

তাঁর পিতাকে জড়িয়ে যেসব বর্ণনা এসেছে সবই অসত্য ও অমূলক। তাঁর চাচাই তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন।[৪৭]

যাই হোক, পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের লোকদের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা আবু তালিব আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের খুতবা পাঠ করেন। সংক্ষিপ্ত হলেও খুতবাটি সাহিত্য-উৎকর্ষের দিক দিয়ে জাহিলী যুগের আরবী গদ্য সাহিত্যের একটি মডেল হিসেবে চিহ্নিত। আরব ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-রসিকরা খুতবাটি সংরক্ষণ করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা তা এখানে তুলে ধরছি।[৪৮]

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحجام على الناس ، وإن محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش الا رجح به بركة وفضلا وعضلا، وان كان فى المال مقلا، فان المال عارية مسترجعة وظل زائل، وله فى خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أردتم من الصداق فهو على -

–'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে ইবরাহীমের বংশধর ও ইসমাঈলের ফসলের অন্তর্গত করেছেন। মানুষের উপর আমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহকে যে কোন কুরাইশ যুবকের সাথে পাল্লায় ওজন দেওয়া হোক না কেন, কল্যাণ, মাহাত্ম্য ও ন্যায়নিষ্ঠায় তার পাল্লা অবশ্যই ভারী হবে–যদিও বিত্ত-বৈভবে সে সর্বনিম্নে। তবে অর্থ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও অপসৃয়মান ছায়াস্বরূপ। খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদের প্রতি তাঁর আগ্রহ আছে এবং তার প্রতিও খাদীজার একই রকম ঝোঁক আছে। আপনারা যে পরিমাণ মোহর চান, তা আদায় করার দায়িত্ব আমার।'

রাসূলুল্লাহ (সা) ও খাদীজার (রা) বিয়েতে দেন-মোহর কত ধার্য হয় সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য আছে। একটি বর্ণনায় এসেছে, চাচা 'আমরের পরামর্শে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা ধার্য হয়।[৪৯] আল-কালবী বলেন ঃ মোহর নির্ধারিত হয় বারো উকিয়া স্বর্ণ। এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান।[৫০] ইমাম জাহাবী ইবন ইসহাকের সূত্রে বলেছেন, রাসূল (সা)

---

৪৭. প্রাগুক্ত-১/১৩৩

৪৮. আবু আলী আল-কালী ঃ কিতাবুল আমালী-২/২৮৪; ঈলীয়া হাবী ঃ ফানুস খিতাবা-৫২

৪৯. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-পৃ.৩

৫০. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৭

খাদীজাকে (রা) 'বিশ বাক্‌রাহ' দেন-মোহর দান করেন।[৫১]

হযরত খাদীজা (রা) নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রূপো রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে বলেন।[৫২]

এভাবে খাদীজা (রা) হলেন 'উম্মুল মুমিনীন'। এ রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রকাশের পনেরো বছর পূর্বের ঘটনা। অবশ্য তখন তাঁদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে।

আল-কালবী ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) যখন খাদীজাকে (রা) বিয়ে করেন তখন খাদীজার (রা) বয়স আটাশ (২৮) বছর।[৫৩] তবে বিশেষজ্ঞরা এ বর্ণনাটির সনদ দুর্বল বলে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। যুরকানী 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে বিয়ের সময় খাদীজার (রা) বয়স চল্লিশ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম জাহাবী বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স তখন পঁচিশ এবং খাদীজা (রা) তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বড়।[৫৪] হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকীম ইবন হিযামও এ রকম কথা বলেছেন।[৫৫] আল-ওয়াকিদী নাফীসা বিন্‌ত মুনইয়ার সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স চব্বিশ বছর বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৬] কোন কোন বর্ণনায় রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স পঁচিশ ও খাদীজার বয়স ছেচল্লিশ। তেমনিভাবে তেইশ ও আঠাশ বছরের কথাও এসেছে।[৫৭] সর্বাধিক সঠিক মতটি হলো পঁচিশ ও চল্লিশ।

বিয়ের পনেরো বছর পর হযরত নবী করীম (সা) নুবুওয়াত লাভ করেন। পূর্ব থেকেই খাদীজা (রা) স্বামী মুহাম্মাদের (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন। সহীহ বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। হযরত আয়িশা (রা) অতি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

'রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন। খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হিরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে কয়েকদিন ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন ঃ আপনি পড়ুন। তিনি বললেন ঃ আমি তো পড়া-লেখার লোক নই। ফিরিশতা তাঁকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে,

---

৫১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৪; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২। 'বাক্‌রাহ' অর্থ জওয়ান মাদী উট।
৫২. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২
৫৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১১
৫৪. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২
৫৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৯
৫৬. আল-ইসাবা-৪/২৮২
৫৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৮

তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ পড়ুন। তিনি আবারও বললেন ঃ আমি পড়া-লেখার লোক নই। ফিরিশতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও তাঁর সাথে প্রথম বারের মত আচরণ করলেন। অবশেষে বললেন ঃ[৫৮]

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

–'পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'

রাসূল (সা) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেন ঃ 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি ঢেকে দিলেন। তাঁর ভীতি কেটে গেল। তিনি খাদীজার নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। খাদীজা বললেন ঃ

كلّا والله مايخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق -

–'না, তা কক্ষণো হতে পারে না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) সঙ্গে করে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহিলী যুগে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিব্রু ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজা বললেন ঃ 'শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ভাতিজা তোমার বিষয়টি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব কথা শুনে ওয়ারাকা বললেন ঃ এতো সেই 'নামূস'–আল্লাহ যাকে মূসার (আ) নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! সেদিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে।' রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এরা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমার শক্তি থাকে এবং আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো।[৫৯]

ইমাম যুহরী বলেন ঃ খাদীজা (রা) প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন।

---

৫৮. সূরা আল 'আলাক-৫

৫৯. সহীহ আল-বুখারী-বাবু বুদুয়িল ওহী। আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৬৭-৬৮

তারপর রাসূল (সা) রিসালাত লাভ করেন। রিসালাত লাভ করে ঘরে ফেরার পথে প্রতিটি পাথর, প্রতিটি গাছ, তাঁকে সালাম জানাতে থাকে। ঘরে এসে খাদীজাকে (রা) বলেন, যে সত্তাকে আমি স্বপ্নে দেখি বলে তোমাকে বলতাম, তিনি জিবরীল। প্রকাশ্যে আমাকে দেখা দিয়েছেন। আমার প্রতিপালক তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি খাদীজাকে (রা) ওহীর সকল ঘটনা খুলে বলেন। তাঁর কথা শুনে খাদীজা (রা) বলেন ঃ 'সুসংবাদ, আল্লাহ আপনার কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ করবেন না। আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তা গ্রহণ করুন। তা অবশ্যই সত্য।'[৬০]

এরপর খাদীজা (রা) ছুটে যান উতবা ইবন রাবী'আর দাস 'আদ্দাসের নিকট। তিনি ছিলেন 'নিনাওয়ার' অধিবাসী একজন নাসারা। খাদীজা (রা) আল্লাহর নামে কসম খেয়ে 'আদ্দাসের নিকট জানতে চান ঃ জিবরীল সম্পর্কে তোমার কি কিছু জানা আছে? আদ্দাস বললেন ঃ কুদ্দুস, কুদ্দুস— পবিত্র, পবিত্র! খাদীজা বলেন ঃ তুমি তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জান আমাকে একটু বল। 'আদ্দাস বললেন ঃ জিবরীল হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর নবীদের মধ্যের আমীন বা পরম বিশ্বাসী সত্তা। তিনি মূসা (আ) ও ঈসার (আ) নিকট এসেছেন। 'আদ্দাসের নিকট থেকে উঠে খাদীজা (রা) যান ওয়ারাকার নিকট। দুইজনের কথা শুনে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফিরে আসেন।[৬১]

ইবন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ওহী লাভের পর আমি গুহা থেকে বের হলাম। আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি তখন আকাশের দিকে একটি ধ্বনি শুনতে পেলাম। কেউ যেন আমাকে বলছে ঃ মুহাম্মাদ আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি মাথা উঁচু করতেই দেখলাম, একজন ধবধবে পরিষ্কার লোকের আকৃতিতে জিবরীল দাঁড়িয়ে। তাঁর দুই খানি পা মহাশূন্যের দুই দিগন্তে। তিনি আমাকে বলছেন ঃ মুহাম্মাদ, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি জিবরীল। আমি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আকাশের যে দিকেই তাকালাম একই দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। এদিকে আমার ফিরতে দেরী দেখে খাদীজা আমার খোঁজে লোক পাঠালেন। তাঁরা মক্কার উঁচু ভূমিতে আমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথায়ও না পেয়ে খাদীজার নিকট ফিরে আসলো। আমি কিন্তু তখন একই স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে।

এক সময় জিবরীল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ঘরে ফিরে খাদীজার রান ঘেঁষে বসলাম। খাদীজা বললো ঃ আবুল কাসিম! আপনি কোথায় ছিলেন? আমি আপনার খোঁজে লোক পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা মক্কার উঁচু ভূমিতে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও না পেয়ে ফিরে এসেছে। আমি তখন সকল ঘটনা খুলে বললাম। আমার কথা শুনে খাদীজা বললো ঃ আমার চাচাতো ভাই, আপনি অটল থাকুন। খাদীজার জীবন যাঁর হাতে, সেই সত্তার শপথ! আমি আশা করি, আপনি এই উম্মাতের নবী হবেন।' তারপর তিনি রাসূলকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে ওয়ারাকার নিকট চলে যান।[৬২]

---

৬০. আল-ইসাবা-৪/২৮১

৬১. আজ-জাহাবী ঃ তারিখ-১/৭৩; আনসাবুল আশরাফ-১/১১১

৬২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৩৮-২৩৯

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার 'আজইয়াদ' এলাকায় একাকী আছেন। তিনি দেখেন যে, একটি ফিরিশতা এক পায়ের উপর আরেকটি পা উঠিয়ে আকাশের দিগন্তে বসে আছেন। তিনি চেঁচিয়ে বলছেন–'ইয়া মুহাম্মাদ! আমি জিবরীল।' রাসূল (সা) ভয় পেয়ে দ্রুত খাদীজার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি কাহিন'[৬৩] হয়ে না যাই। খাদীজা বললেন ঃ আমার চাচাতো ভাই! আপনি এমন কথা বলবেন না। তা হতে পারে না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন, সত্য বলেন, আমানত ফেরত দেন। আপনার চরিত্র তো অতি মহৎ।[৬৪]

আবূ মায়সারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ওহী লাভের প্রথম পর্বে একাকী নির্জনে কোথাও গেলে–'ইয়া মুহাম্মাদ' ডাক শুনতে পেতেন। তিনি ভয় পেয়ে যেতেন। একথা খাদীজাকে (রা) জানালেন। খাদীজা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ আপনার কোন অকল্যাণ করবেন না। তারপর তিনি আবু বকরের (রা) সাথে রাসূলকে (সা) ওয়ারাকার নিকট পাঠিয়ে দেন।[৬৫]

ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রথম ওহী আসার পর বেশ কিছু দিন যাবত ওহী আসা বন্ধ থাকে। ইসলামের পরিভাষায় এ সময়কে 'ফাতরাতুল ওহী' বলে। রাসূল (সা) দারুণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি হেরা গুহায় যেতে থাকেন। এ সময় একদিন জিবরীলকে উপরে দেখতে পান এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে খাদীজার কাছে দ্রুত ফিরে এসে বলেন ঃ আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। খাদীজা কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন। এ অবস্থায় নাযিল হয় সূরা আল-মুদ্দাস্সির। জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা) থেকে একই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি সূরা আল-মুয্যাম্মিল নাযিলের কথা বলেছেন।[৬৬]

খাদীজা (রা) এ সময় একদিন পরীক্ষা করতে চাইলেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। খাদীজা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আমার চাচাতো ভাই! আপনার সাথী (জিবরীল আ.) যখন আপনার নিকট আসেন তখন কি আপনি আমাকে একটু জানাতে পারেন? এরপর জিবরীল যখন আসলেন, রাসূল (সা খাদীজাকে বললেন, এই জিবরীল এসেছেন। খাদীজা (রা) রাসূল্লাহকে (সা) নিজের ডান উরুর উপর বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? বললেন ঃ হাঁ, দেখতে পাচ্ছি। খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বাম উরুর উপর বসিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ

---

৬৩. 'কাহিন' অর্থ ভবিষ্যদ্বক্তা। প্রাচীন আরবে অনেক কাহিনের নাম পাওয়া যায়, যারা ভবিষ্যৎ জানার দাবী করতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে আগাম খবর দিত। তারা বিশ্বাস করতো যে, তাঁদের নিকট অনুগত জ্বিন আছে এবং তারাই এসব গায়েবী খবর তাদেরকে সরবরাহ করে থাকে। (আল-আলুসী ঃ বুলূগুল আরিব-১/১৮৮)

৬৪. আনসাবুল আশরাফ-১/১০৪; আল-ইসাবা-৪/২৮১

৬৫. আনসাবুল আশরাফ-১/১০৪-১০৫

৬৬. প্রাগুক্ত-১/১০৮-১০৯

এখন কি তাঁকে দেখা যায়? বললেন ঃ হাঁ, দেখা যায়। অতঃপর খাদীজা (রা) নিজের ওড়না ফেলে দিয়ে বুক উন্মুক্ত করে ফেললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ এখনও কি তাঁকে দেখা যায়? বললেন ঃ না, এখন দেখা যায় না। তখন খাদীজা (রা) বললেন ঃ সুসংবাদ! আল্লাহর শপথ, তিনি অবশ্যই ফিরিশতা। কোন শয়তান নয়। কারণ, এ অবস্থায় ফিরিশতা নিশ্চয় লজ্জা পাবে।[৬৭]

একদিন হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য আহার-সামগ্রী নিয়ে তাঁর খোঁজে মক্কার উঁচু ভূমির দিকে চলেছেন। পথে জিবরীল (আ) এক অপরিচিত ব্যক্তির রূপ ধরে আবির্ভূত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। খাদীজা (রা) ভীত হয়ে পড়েন। তিনি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, না জানি লোকটি তাঁকে অপহরণ করে কিনা। পরে খাদীজা (রা) কথাটি রাসূলুল্লাহকে জানালে তিনি বললেন, লোকটি ছিল জিবরীল (আ)। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি যেন তোমাকে সালাম জানাই এবং জান্নাতে মণি-মুক্তোর তৈরী একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করি।[৬৮]

পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাবলীর সবই ইসলামের অব্যবহিত পূর্ব সময়ের ও সূচনা পর্বের। এ ধরনের আরও বহু ঘটনার কথা জানা যায় যাতে হযরত খাদীজার (রা) ধৈর্য, বিচক্ষণতা, স্বামীর প্রতি প্রবল আবেগ ও বিশ্বাস এবং সর্ব অবস্থায় স্বামীর পাশে দাঁড়ানোর দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এ সকল ঘটনা পর্যালোচনা করলে আর যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিবরীলের (আ) আগমনের পূর্বেই তিনি যেন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁর স্বামী একজন অসাধারণ মানুষ হবেন। তিনি হবেন একজন নবী। আর তাই রাসূল (সা) যখন তাঁর কাছে এসে সর্বপ্রথম দাবী করলেন, তাঁর নিকট জিবরীল এসেছেন, তিনি ওহী লাভ করেছেন, তখন ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মনে কোন দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়নি। তিনি যেন আগে থেকেই এমন একটি সংবাদ পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন, মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর সে সময়ের বিভিন্ন কর্ম ও আচরণ দ্বারা এ কথাগুলি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা (রা) তাঁর সকল ধন-সম্পদ-বিত্ত-বৈভব তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইসাথে বাড়তে থাকে খাদীজার (রা) দুশ্চিন্তা। তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে সব প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলা করেন। ইবন ইসহাক বলেন ঃ[৬৯]

فكان لا يسمع من المشركين شيئا يكرهه من ردعليه وتكذيب له إلا فرج الله بها تتثبته وتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه مالقى من قومه -

---

৬৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৬; সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৩৮-২৩২; আল-ইসাবা-২/২৮১

৬৮. আল-ইসাবা-৪/২৮৩

৬৯. আল-ইসতীয়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-৪/২৮৩

–'মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের কারণে রাসূল (সা) যে ব্যথা অনুভব করতেন, খাদীজার (রা) দ্বারা আল্লাহ তা দূর করে দিতেন। কারণ, তিনি রাসূলকে (সা) সান্ত্বনা দিতেন, সাহস ও উৎসাহ যোগাতেন। তাঁর সব কথাই তিনি বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন। মুশরিকদের সকল অমার্জিত আচরণ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে অত্যন্ত হালকা ও তুচ্ছভাবে তুলে ধরতেন।'

ইবন ইসহাক আরও বলেন ঃ[৭০]

وكان له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها -

–রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য খাদীজা (রা) ছিলেন ইসলামের ব্যাপারে সত্য ও সঠিক উযীর। রাসূল (সা) সকল বিপদ-আপদে তাঁর কাছে মনের কথা বলতেন, অভিযোগ করতেন। নুবুওয়াতের সপ্তম বছর মুহাররম মাসে কুরাইশরা মুসলমানদের বয়কট করে। তাঁরা 'শিয়াবে আবু তালিবে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত খাদীজাও (রা) সেখানে অন্তরীণ হন।[৭১] প্রায় তিনটি বছর বনু হাশিম দারুণ অভাব ও দুর্ভিক্ষের মাঝে অতিবাহিত করে। গাছের পাতা ছাড়া জীবন ধারণের আর কোন ব্যবস্থা প্রায় তাদের ছিল না। স্বামীর সাথে হযরত খাদীজাও (রা) হাসিমুখে সে কষ্ট সহ্য করেন। এমন দুর্দিনে তিনি নিজের প্রভাব খাটিয়ে নানা উপায়ে কিছু খাদ্য খাবারের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করতেন। তাঁর তিন ভাতিজা–হাকীম ইবন হিযাম, আবুল বুখতারী ও যুম'আ ইবনুল আসওয়াদ–সকলে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের অন্যতম। অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিভিন্নভাবে একঘরে করা মুসলমানদের কাছে খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

একদিন হাকীম ইবন হিযাম চাকরের মাথায় কিছু গম উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন ফুফু খাদীজার (রা) কাছে। তিনি তখন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'শিয়াবে আবী তালিবে' অন্তরীণ। পথে নরাধম আবু জাহলের সাথে দেখা। সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো ঃ খাদ্য নিয়ে তুমি বনু হাশিমের কাছে যাচ্ছ? আল্লাহর কসম, এ খাদ্যসহ তুমি সেখানে যেতে পারবে না। যদি যাও, তোমাকে আমি মক্কায় লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবো। এমন সময় আবুল বুখতারী ইবন হাশিম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ঝগড়া করছো কেন? আবু জাহ্ল বললো ঃ সে বনু হাশিমের কাছে খাদ্য নিয়ে যাচ্ছে। আবুল বুখতারী বললেন ঃ এ খাদ্য তো তার ফুফুর, হাকীমের কাছে ছিল। ফুফুর সে খাদ্য সে দিতে যাচ্ছে, আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছো? পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু আবু জাহ্ল তাঁর কথায় কান দিল না। তখন দুই জনের মধ্যে ভালোরকম একটা মারপিট হয়। এভাবে হাকীম প্রায়ই খাদ্য পাঠাতেন।[৭২]

---

৭০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪১৬; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/২৪০

৭১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯২

৭২. প্রাগুক্ত-১/৩৮৪; আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৫

আর একদিন হযরত 'আব্বাস (রা) কিছু খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'শিয়াব' থেকে বের হলেন। আবু জাহ্‌ল তাঁর উপর হামলা করার ফন্দি আঁটে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন। এ কথা খাদীজা (রা) জানতে পেয়ে চাচা যুমআ ইবন আল-আসাদকে লোক মারফত বলে পাঠান ঃ আবু জাহ্‌ল খাদ্য ক্রয়ে বাধা দিচ্ছে। তাঁকে কিছু কথা শুনিয়ে দিন। যুমআ খাদীজার (রা) কথামত কাজ করেন। এরপর সে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়।[৭৩]

নামায ফরযের হুকুম নাযিল হওয়ার আগেই হযরত খাদীজা (রা) ঘরের মধ্যে গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একত্রে নামায আদায় করতেন।[৭৪] ইবন ইসহাক বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কার উঁচু ভূমিতে তখন জিবরীল (আ) আসেন এবং উপত্যকার এক প্রান্তে একটি স্থানে আঘাত করে একটি ঝর্ণার সৃষ্টি করেন। প্রথমে জিবরীল (আ) সেই পানি দিয়ে ওজু করেন, তারপর রাসূল (সা) তাঁর মত ওজু করেন। জিবরীল (আ) নামায পড়েন এবং রাসূল (সা)ও তাঁর মত নামায পড়েন। তারপর রাসূল (সা) ঘরে এসে খাদীজাকে (রা) ওজু শিখান এবং তাঁকে নিয়ে নামায পড়ে বাস্তব শিক্ষা দেন।[৭৫]

ইবন ইসহাক আরও উল্লেখ করেছেন, একদিন আলী (রা) দেখতে পেলেন, তাঁরা দুইজন অর্থাৎ নবী (সা) ও খাদীজা (রা) নামায আদায় করছেন। আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মুহাম্মাদ, এ কি? রাসূল (সা) তখন নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলীর (রা) কাছে পেশ করলেন এবং একথা অন্য কাউকে বলতে বারণ করলেন।[৭৬] এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উম্মাতে মুহাম্মাদীর (সা) মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায়ের গৌরব অর্জন করেন।[৭৭]

'আফীফ আল-কিন্দী নামক এক ব্যক্তি সে সময় কিছু কেনাকাটার জন্য মক্কায় এসেছিলেন। তিনি হযরত 'আব্বাসের (রা) গৃহে অবস্থান করছিলেন। একদিন সকালে লক্ষ্য করলেন, এক যুবক কা'বার কাছে এসে আসমানের দিকে তাকালো। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালো। একজন কিশোর এসে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এলো এক মহিলা। সেও তাদের দুই জনের পিছনে দাঁড়ালো। তারা নামায শেষ করে চলে গেল। 'আফীফ আল কিন্দী দৃশ্যটি দেখলেন। 'আব্বাসকে (রা) তিনি বললেন ঃ 'বড় রকমের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ হাঁ। এ জওয়ান আমার ভাতিজা মুহাম্মাদ। কিশোরটি আমার আরেক ভাতিজা আলী এবং মহিলাটি মুহাম্মাদের স্ত্রী। আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম বিশ্বপ্রতিপালকের ধর্ম। আর সে যা

---

৭৩. আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৫
৭৪. তাবাকাত-৮/১০
৭৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৪৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১১২
৭৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৭০
৭৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১০৯

কিছু করে, তাঁরই হুকুমে করে। আমার জানা মতে দুনিয়ায় তারা তিনজনই মাত্র এই নতুন ধর্মের অনুসারী।[৭৮]

হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকালের সঠিক সন সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য আছে। হিজরতের তিন, চার অথবা পাঁচ বছর পূর্বে তিনি মক্কায় মারা যান বলে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নব্বী বলেন, তিন বছর পূর্বের কথাটি সঠিক। তাঁর মৃত্যু হয় আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর।[৭৯]

বালাজুরী বলেন ঃ শি'য়াবে আবু তালিব থেকে বনু হাশিম বের হয় নুবুওয়াতের দশম বছরে। এখান থেকে বের হওয়ার পর সেই বছর জিলকাদ মাসের প্রথম দিকে অথবা শাওয়ালের মাঝামাঝি আবু তালিব মারা যান। আবু তালিব ও খাদীজার (রা) মৃত্যুর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে মতভেদ আছে। যথা ৩৫, ২৫, ৫ ও ৩ দিন। খাদীজার মৃত্যু হয় আগে। তাঁকে মক্কার 'হাজূন' গোরস্তানে দাফন করা হয়। তখন জানাযার নামাযের প্রচলন হয়নি।[৮০] হযরত খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকীম ইবন হিযাম বলেন ঃ আমরা তাঁকে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে 'হাজূন'-এ দাফন করি। নবী (সা) তাঁর কবরে নামেন। তাঁর মৃত্যু হয় নুবুওয়াতের দশম বছর রমজান মাসে। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর।[৮১] ইবনুল জাওযীও একথা বলেছেন।[৮২]

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। খাদীজা (রা) নামায ফরজ হওয়ার পূর্বে ইনতিকাল করেন। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু হয় রমজান মাসে, তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর। মক্কার উঁচু ভূমিতে অবস্থিত 'হাজূন' গোরস্তানে দাফন করা হয়।[৮৩] কাতাদা ও উরওয়া বলেছেন, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মারা যান। আল-ওয়াকিদী বলেছেন ঃ 'বনু হাশিমের' উপত্যকা থেকে তাঁরা মুক্ত হন হিজরাতের তিন বছর পূর্বে। তারপর আবু তালিব মারা যান। দুই জনের মৃত্যু হয় একই বছর। তবে আবু তালিবের মৃত্যুর তিনদিন পর খাদীজার (রা) মৃত্যু হয়।[৮৪] ইমাম আজ-জাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় খাদীজার (রা) বয়স ছিল ৪০ বছর। তাঁর সাথে জীবন কাটান ২৪ বছর।[৮৫] এই হিসাবে তিনি ৬৪ বছর জীবন লাভ করেন।

---

৭৮. তাবাকাত-৮/১০-১১। আল্লামা 'উকায়লী এ বর্ণনাটিকে দা'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন। কিন্তু অনেকের মতে, এতে দুর্বল হওয়ার মত কোন কারণ বিদ্যমান নেই। তাছাড়া এই মর্মের আরও বর্ণনা ভিন্ন সনদেও এসেছে। ইমাম বাগাবী, আবু ইয়ালা, নাসাঈ নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাকেম, ইবন খায়সামা, ইবন মুন্দাহ বর্ণনাটি 'মাকবূল' (গ্রহণযোগ্য) বলে মনে করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারীর মত মুহাদ্দিস তাঁর তারীখে বর্ণনাটি স্থান দিয়েছেন এবং 'সহীহ' বলেছেন। (সিয়ারুস সাহাবিয়াত-পৃ.৭)

৭৯. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১

৮০. আনসাবুল আশরাফ-১/২৩৬-২৩৭

৮১. প্রাগুক্ত-১/৪০৬

৮২. সিফাতুস সাফওয়া-২/৩

৮৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১২, ১১৭; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০

৮৪. প্রাগুক্ত

৮৫. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০

পরম শ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালিব ও প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার (রা) ওফাতের পর রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আর তা ছিল সর্বাধিক কঠিন অধ্যায়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নিজেই তাঁদের ওফাতের বছরকে 'আমুল হুয্ন'–দুঃখ ও শোকের বছর নামে অভিহিত করতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অতিপ্রিয় এ দুই ব্যক্তির মৃত্যুতে কুরাইশ পাষণ্ডরা একেবারে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা অতি নির্দয়ভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকে। এ সময়ই তিনি মক্কাবাসীদের প্রতি হতাশ হয়ে তায়েফ গমন করেন। খাদীজা (রা) জীবিত থাকলে তিনি অন্তত নিজের দুঃখের কথা তাঁকে বলতে পারতেন।[৮৬] ইবন ইসহাক বলেছেন ঃ খাদীজার (রা) তিরোধানের পর রাসূলুল্লাহর (সা) উপর একের পর এক মুসীবত আসতেই থাকে।[৮৭] কারণ, পৌত্তলিক শক্তিকে রুখতে পারে, আবু তালিব ও খাদীজার (রা) মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তখন আর ছিলেন না।

ইবনুল আসীর বলেন ঃ[৮৮]

خديجة أول خلق الله أسلم، بإجماع المسلمين -

–'এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মার ইজমা' হয়েছে যে, হযরত খাদীজা (রা) আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন।

যুহরী, কাতাদা, মূসা ইবন 'উকবা, ইবন ইসহাক, আল-ওয়াকিদী ও সাঈদ ইবন ইয়াহইয়া বলেছেন ঃ[৮৯]

أول من آمن بالله ورسوله خديجة وأبوبكر وعلى رضى الله عنهم -

–'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন খাদীজা, আবু বকর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

হযরত হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ[৯০]

خَدِيْجَةُ سَابِقَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ إِلى الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَبِمُحَمَّدٍ -

'আল্লাহ ও মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে খাদীজা বিশ্বের সকল নারীর অগ্রবর্তিনী।'

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেছেন ঃ[৯১]

أول النساء إسلاما خديجة -

---

৮৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪১৬
৮৭. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪০
৮৮. উসুদুল গাবা-৫/৭৮
৮৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/১১৫
৯০. আল-মুসতাদরিক-৩/১৮৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৬
৯১. আনসাবুল আশরাফ-১/১১২

–'নারীদের মধ্যে খাদীজা (রা) প্রথম মুসলমান।'

ইমাম নব্বী বলেন ঃ যুহরী ও 'আলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দল উল্লেখ করেছেন যে, খাদীজা (রা) আল্লাহ ও রাসূলের (সা) প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। আর এ কথার উপর ইজমা হয়েছে বলে ইমাম সা'লাবী বর্ণনা করেছেন।[৯২] ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত খাদীজার (রা) বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর। তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব তাঁর পিতৃকূলের লোকদের উপরও পড়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের সময় পিতৃকূল বনু আসাদ ইবন আবদিল 'উযযার পনেরো জন বিখ্যাত ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তাঁদের দশজনই ইসলাম গ্রহণ করেন। অন্য পাঁচজন কাফির অবস্থায় বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বহু সন্তানের জননী। প্রথম স্বামী আবু হালার ঔরসে হালা ও হিন্দ নামে দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। হিন্দ বদর, মতান্তরে উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তবে বালাজুরীর বর্ণনায় বুঝা যায়, প্রথম স্বামীর ঘরে একটি মাত্র ছেলে ছিল, তাঁর নাম হিন্দ। পিতার নামে নাম রাখা হয়। তিনি ছিলেন একজন প্রাঞ্জলভাষী বাগ্মী পুরুষ। উটের যুদ্ধে তিনি আলীর (রা) পক্ষে শাহাদাত বরণ করেন। দ্বিতীয় স্বামী আতীকের ঔরসে হিন্দা নাম্নী এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[৯৩] অবশ্য অন্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম পক্ষে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। দুই ছেলে হিন্দ ও হারিস। হারিসকে এক কাফির কা'বার রুকনে ইয়ামানীর নিকট শহীদ করে ফেলে। এক কন্যা যায়নাব। আর দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটির ডাকনাম ছিল উম্মু মুহাম্মাদ।[৯৪] তার বিয়ে হয় সায়ফী ইবন উমাইয়্যার সাথে। মুহাম্মাদ নামে তাঁর এক ছেলে হয়। এ কারণে তাঁকে উম্মু মুহাম্মাদ নামে ডাকা হতো।[৯৫]

ইবন ইসহাক বলেন, একমাত্র ইবরাহীম (আ) ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সকল সন্তান হযরত খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন ঃ আল-কাসিম, আত-তাহির, আত-তায়্যিব, যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা)।[৯৬] ইবন হিশাম বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) বড় ছেলে আল-কাসিম। তারপর আত-তায়্যিব ও আত-তাহির। বড় মেয়ে রুকাইয়া, তারপর যায়নাব, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা (রা)।[৯৭]

ইবন ইসহাক আরও বলেন, আল-কাসিম, আত-তায়্যিব ও আত-তাহির জাহিলী যুগেই মারা যান। আর মেয়েদের সকলে ইসলামী যুগ লাভ করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে

---

৯২. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১
৯৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭; সীরাতু ইবন হিশাম (টীকা)-১/১৮৭
৯৪. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসলামী (উর্দু)-'খাদীজা' অংশ।
৯৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭
৯৬. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/৪২; সীরাতু ইবন হিশাম-১/২১০
৯৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯০

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[৯৮]

ইবন ইসহাক ও ইবন হিশামের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, আত-তাহির ও আত-তায়্যিব ভিন্ন দুই ছেলে। অথচ এ দুইটি নাম রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে হযরত আবদুল্লাহর দুইটি লবক বা উপাধি।[৯৯] আল ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে হযরত খাদীজার (রা) আল-কাসিম ও আবদুল্লাহ নামের দুই ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। নুবুওয়াত লাভের পর আবদুল্লাহর জন্ম হয় বলে তাঁকে আত-তায়্যিব বা আত-তাহির বলা হতো। এছাড়া চার মেয়েও জন্মগ্রহণ করেন। মোট ছয় সন্তানের মা হন।[১০০] প্রথম সন্তান আল-কাসিম। রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে দুগ্ধপোষ্য বয়সে মক্কায় মারা যান। তাঁর নাম অনুসারে রাসূলুল্লাহর (সা) কুনিয়াত বা উপনাম হয় আবুল কাসিম। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পা পা করে হাঁটা শিখেছিলেন। বালাজুরীর মতে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র দুই বছর।[১০১]

ইমাম আস-সুহাইলী বর্ণনা করেছেন, আল-কাসিম মারা যাওয়ার পর রাসূল (সা) খাদীজার (রা) কাছে যান। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুধের টুকরো মারা গেছে। যদি সে দুধ পান শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতো তাহলে আমার দুঃখ ছিল না। রাসূল (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ তুমি চাইলে জান্নাতের মধ্য থেকে তার কণ্ঠস্বর তোমাকে শোনাতে পারবো। খাদীজা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশী ভালো জানেন। এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আল-কাসিমের মৃত্যু জাহিলী যুগে নয়, বরং ইসলামী যুগে হয়েছে।[১০২]

দ্বিতীয় সন্তান হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) বড় মেয়ে। খালাতো ভাই আবুল আস ইবন রাবী'র সাথে বিয়ে হয়। আবুল আসের মা হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ।

তৃতীয় সন্তান হযরত আবদুল্লাহ। তাঁকেই আত-তায়্যিব ও আত-তাহির বলা হয়। যেহেতু নুবুওয়াত লাভের পর তাঁর জন্ম হয়, তাই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। শিশু বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কাফিররা, বিশেষতঃ 'আস ইবন ওয়ায়িল রাসূলুল্লাহকে (সা) 'আবতার' বা নির্বংশ বলে উপহাস করতে থাকে। তখন নাযিল হয় সূরা আল কাওসার-এর এ আয়াত ঃ

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ -

–যে আপনার শত্রু, সে-ই লেজকাটা, নির্বংশ।[১০৩]

অবশ্য এ ব্যাপারে প্রথম সন্তানের মৃত্যুর কথাও বর্ণিত হয়েছে।

---

৯৮. প্রাগুক্ত-১/১৯১
৯৯. প্রাগুক্ত (টীকা)।
১০০. আল-ইসাবা-৪/৮২
১০১. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৬
১০২. সীরাতু ইবন হিশাম-(টীকা)-১/১৯০
১০৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৫; তাবাকাত-১/১৩৩

চতুর্থ সন্তান হযরত রুকাইয়া (রা)। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় 'উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে। ইসলামের সাথে চরম দুশমনীর কারণে সে হযরত রুকাইয়াকে তালাক দেয়। তারপর হযরত 'উসমানের (রা) সাথে বিয়ে হয়। হিজরাতের পর মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।

পঞ্চম সন্তান হযরত উম্মু কুলসুম (রা)। তাঁর প্রথম বিয়ে হয় মু'আত্তাব, মতান্তরে 'উতাইবা ইবন আবী লাহাবের সাথে। সেও প্রবল ইসলাম বিদ্বেষের কারণে স্ত্রী উম্মু কুলসুমকে তালাক দেয়। তারপর বোন রুকাইয়ার মৃত্যুর পর হযরত উসমানের (রা) সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ কারণে হযরত উসমানের (রা) উপাধি হয় 'জিন-নূরাইন'।
ষষ্ঠ সন্তান হযরত ফাতিমা (রা) চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলীর (রা) স্ত্রী এবং হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইনের মা।[১০৪]

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দাসী হযরত মারিয়া আল-কিবতিয়ার (রা) গর্ভজাত সন্তান। এই মারিয়াকে মিসরের শাসক 'মাকাওকাস' উপহার হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান।[১০৫] মোটকথা, একমাত্র ইবরাহীম ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) সকল সন্তানের জননী হলেন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)।[১০৬]

হযরত খাদীজা সন্তানদের খুব আদর যত্ন করতেন। আর্থিক সচ্ছলতাও ছিল। সন্তানদের প্রতিপালন ও দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী নিয়োগ করতেন। সন্তান প্রসবের আগেই সব ব্যবস্থা করে রাখতেন।[১০৭] সাফিয়্যার দাসী সালামাকে মজুরীর বিনিময়ে সন্তানদের দেখাশুনার জন্য নিয়োগ করেন। সালামা তাদেরকে দুধপান ও আহার করাতেন।[১০৮]

হযরত খাদীজা (রা) যে তাঁর সকল সন্তানকে কী পরিমাণ ভালোবাসতেন এবং তাদের মঙ্গল কামনায় কেমন অস্থির থাকতেন, একটি বর্ণনায় তা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ঔরসে আমার যে সকল সন্তান হয়েছে এবং শিশু অবস্থায় মারা গেছে পরকালে তাদের অবস্থান কোথায় হবে? বললেন ঃ জান্নাতে। তিনি আবার জানতে চাইলেন ঃ আমার পৌত্তলিক স্বামীদের ঔরসে যে সন্তান হয়েছে এবং মারা গেছে, তারা কোথায় যাবে? বললেন ঃ জাহান্নামে। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কোন রকম কর্ম ছাড়াই? বললেন ঃ আল্লাহ জানেন বেঁচে থাকলে কেমন কর্ম তারা করতো।[১০৯] বর্ণনায় সন্তানদের জন্য তাঁর যে আকুলতা তা প্রকাশ পেয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) ফজীলাত, মহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করে শেষ করা

---

১০৪. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৬-৪০৩; আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪২ তাবাকাত-১/১৩৩
১০৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৯১
১০৬. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪০
১০৭. আল-আলাম আন-নুবালা-২/৩৪৬
১০৮. আল-ইসাবা-৪/২৮২
১০৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৩

যাবে না। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আরবের সেই ঘোর অন্ধকার দিনে কিভাবে এক মহিলা সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয় নেই। সেই ওহী লাভের প্রথম দিনটি, ওয়ারাকার নিকট গমন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা সবকিছুই গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে খাদীজা (রা) যেন দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন–তিনি নবী হবেন। তাই জিবরীলের (আ) আগমনের পর ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মনে একটুও ইতস্ততঃ ভাব দেখা দেয়নি। এতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নুবুওয়াত লাভের আগে ও পরে সর্বদাই তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্মান করেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা প্রশ্নহীনভাবে বিশ্বাস করেছেন। পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে কোন প্রকার সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি। সেই জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন পুতঃপবিত্র। কখনও মূর্তিপূজা করেননি। নবী করীম (সা) একদিন তাঁকে বললেন ঃ 'আমি কখনও লাত-উয্যার ইবাদাত করবো না।' খাদীজা (রা) বললেন ঃ লাত-উয্যার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন। তাদের কথাই উঠাবেন না।[১১০]

নুবুওয়াতে মুহাম্মাদীর (সা) উপর প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারিণী এবং তাঁর সাথে প্রথম সালাত আদায়কারিণীই শুধু তিনি নন। সেই ঘোর দুর্দিনে ইসলামের জন্য তিনি যে শক্তি যুগিয়েছেন চিরদিন তা অম্লান হয়ে থাকবে। ইসলামের সেই সূচনা লগ্নে প্রকৃতপক্ষেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পরামর্শদাত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর নিজের সমস্ত সম্পদ তিনি স্বামীর হাতে তুলে দেন। যায়িদ ইবন হারিসা (রা) ছিলেন খাদিজার (রা) প্রিয় দাস। তাঁকেও তিনি স্বামীকে উপহার দেন।

ইবন হিশাম বলেন ঃ খাদীজার (রা) ভাতিজা হাকীম ইবন হিযাম সিরিয়ার বাজার থেকে অনেকগুলো দাস কিনে আনেন। তাদের মধ্যে যায়িদ ইবন হারিসাও একজন। ফুফু খাদীজা গেলেন ভাতিজা হাকীমের সাথে দেখা করতে। ভাতিজা বললেন ঃ ফুফু, এ দাসগুলির মধ্যে যেটি পছন্দ হয়, আপনি বেছে নিন। খাদীজা যায়িদকে পছন্দ করে নিয়ে আসেন। রাসূল (সা) যায়িদকে দেখে পছন্দ করেন। খাদীজা (রা) তা বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহকে (সা) উপহার দেন। রাসূল (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পালিত পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।[১১১]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে; হাকীম তাঁর ফুফু খাদীজার (রা) জন্য যায়িদকে (রা) আরবের 'উকাজ মেলা থেকে কিনে আনেন। আর এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) যখন খাদীজার (রা) পণ্য নিয়ে মায়সারার সাথে সিরিয়া যান, সেই সফরে যায়িদকে খাদীজার (রা) জন্য কিনে আনেন। বিয়ের পর খাদীজা (রা) যায়িদকে উপহার হিসেবে

---

১১০. মুসনাদ-৪/২২২

১১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৪৮

রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন।[১১২]

হযরত খাদীজা (রা) স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকেও সম্মান করতেন, খোঁজ-খবর নিতেন এবং তাঁদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াতেন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) দুধমাতা হালীমা আসলেন দেখা করতে। খাদীজা (রা) আপন শাশুড়ীর মত মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে তার সেবা-যত্ন করলেন। হালীমা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, তাঁদের অঞ্চলে খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে পশু-পাখী মারা গেছে এবং অভাব দেখা দিয়েছে। রাসূল (সা) তাঁদের সমস্যা নিয়ে হযরত খাদীজার (রা) সাথে কথা বললেন। খাদীজা (রা) হালীমাকে চল্লিশটি ছাগল ও উট দান করলেন তাঁর খান্দানের মধ্যে বন্টনের জন্য।[১১৩]

আবু লাহাবের দাসী সুওয়ায়বা ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (রা) আর এক দুধমাতা। তিনি মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসতেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রতি সম্মান দেখাতেন, এবং তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। খাদীজাও (রা) তাঁকে খুবই সম্মান ও সমাদর করতেন। তিনি সুওয়ায়বাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে আবু লাহাবের নিকট তাঁকে কেনার প্রস্তাব করেন; কিন্তু সে বিক্রী করতে রাজি হয়নি।[১১৪]

মক্কার একজন বিত্তশালী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে স্বামীর সেবা করতেন। সন্তানদের প্রতিপালনসহ গৃহকর্মের যাবতীয় দায়িত্ব নিজে পালন করতেন। স্বামীর আহার, বিশ্রাম ইত্যাদির তদারক নিজে করতেন। হযরত আবু হুরায়রার (রা) একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন ঃ

أتى جبريل النبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله هذه خديجة قد اتت معها إناء فيه إدام أوطعام أوشراب فاذا هى اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة من قصب -

–একদিন জিবরীল (আ) নবীর (সা) নিকট এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে খাদীজা আসছেন পাত্রে করে আপনার জন্য তরকারি, খাদ্যসামগ্রী অথবা পানীয় কিছু নিয়ে। আপনি তাঁর রব ও আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরী একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করবেন।[১১৫]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব অন্যের উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজেই সম্পন্ন করতেন।

---

১১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৬৭, ৪৭৬.

১১৩. প্রাগুক্ত-১/৯৫

১১৪. প্রাগুক্ত-১/৯৬

১১৫. বুখারী ঃ কিতাবুল মানাকিব ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১; আল-ইসাবা-৪/২৮৩

হযরত রাসূলে কারীম (সা)ও খাদীজাকে (রা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। খাদীজার (রা) মৃত্যুর পরও আজীবন তাঁর স্মৃতি ও তার অবদান মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। রাসূলুল্লাহর (সা) বহু আচরণ এবং বহু মন্তব্যে তা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ

ما غرت على أحد من نساء النبى صلعم ماغرت على خديجة وما رأيتها - ولكن كان النبى صلي الله عليه وسلم يكثر ذكرها ، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها فى صدايق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن فى الدنيا إمرأة إلا خديجة ، فيقول إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد -

–আমি খাদীজাকে (রা) দেখিনি। তাসত্ত্বেও তাকে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য কোন স্ত্রীকে সে পরিমাণ ঈর্ষা করিনি। কারণ রাসূল (সা) খুব বেশী বেশী তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি যখনই কোন ছাগল জবেহ করতেন, তার কিছু অংশ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। আমি যদি বলতাম, দুনিয়াতে যেন খাদীজা ছাড়া আর কোন নারী নেই। তিনি বলতেন, খাদীজা এমন ছিল, এমন ছিল। তাঁর থেকেই আমি সন্তান লাভ করেছি।[১১৬]

'আয়িশা (রা) আরও বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার খাদীজার কথা আলোচনা করলেন। আমি একটু কটূক্তি করে বললাম ঃ তিনি তো একজন বৃদ্ধা। তাছাড়া এমন, এমন। আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে উত্তম নারী আপনাকে দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেননি। মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে তার সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তার সন্তান আমাকে দান করেছেন এবং অন্যদের সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি বললাম ঃ আমি আর কক্ষণও তাঁকে নিয়ে আপনাকে তিরস্কার করবো না।[১১৭]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে। আয়িশা (রা) বলেন ঃ খাদীজার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে কোন ছাগল জবেহ হলেই বলতেন ঃ কিছু গোশ্ত তোমরা খাদীজার বান্ধবীদের বাড়ীতে পাঠাও। একদিন তিনি খাদীজার আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ আমি খাদীজার বান্ধবীদের ভালোবাসি।[১১৮] আয়িশা (রা) আরও বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার কথা

---

১১৬. বুখারী ঃ আল-মানাকিব ঃ ফাদলু খাদীজা ; মুসলিম (২৪৩৫), সিফাতুস সাফওয়া-২/৩

১১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৭; মুসনাদ ৬/১১৭-১১৮; আল-ইসাবা-৪/২৮৩

১১৮. সিফাতুস সাফওয়া-২/৩; আল-ইসাবা-৪/২৮৩

উঠলেই তাঁর কিছু প্রশংসা না করে বিরত হতেন না।[১১৯] তিনি খাদীজার কিছু আলোচনা না করে প্রতিদিন ঘর থেকে বের হতেন না।[১২০] আর একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে খাদীজার (রা) আলোচনা শুনে আয়িশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তো এই বৃদ্ধার পরিবর্তে আপনাকে অন্য নারী দান করেছেন। একথার পর রাসূল (সা) ভীষণ রেগে যান। 'আয়িশা (রা) অনুতপ্ত হয়ে মনে মনে বলেন ঃ হে আল্লাহ, যদি তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) রাগ দূর করে দাও, তাহলে আর কক্ষণও তার সম্পর্কে কোন মন্দ কথা উচ্চারণ করবো না। রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন ঃ তুমি এমন কথা কি করে বলতে পার? মানুষ যখন আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে তখন সে আমার উপর ঈমান এনেছে। মানুষ যখন আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সে আশ্রয় দিয়েছে।[১২১] আরেকবার রাসূল (সা) আয়িশাকে (রা) বলেন ঃ 'আল্লাহ আমার অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

আবুল 'আস ইবনুর রাবী' মক্কার একজন সৎ, বিশ্বস্ত ও বিত্তবান ব্যবসায়ী যুবক। খাদীজার (রা) বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদের ছেলে। খালা খাদীজা (রা) তাঁকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। তিনি নিজের মেয়ে হযরত যায়নাবের (রা) সাথে আবুল আসের বিয়ে দিতে চাইলেন। রাসূল (সা) অমত করলেন না। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় হযরত খাদীজা (রা) মেয়ে যায়নাবকে (রা) যে সকল জিনিস উপহার দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি সোনার হার ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) নুবুওয়াত লাভ করলেন। খাদীজার (রা) কন্যারা মুসলমান হলেন। কিন্তু আবুল 'আস অমুসলিমই থেকে গেলেন। খাদীজা (রা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করলেন। মেয়ে যায়নাব (রা) মক্কায় স্বামীর কাছে থেকে গেলেন। আবুল 'আস মক্কার কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। বন্দী হয়ে তিনি মদীনায় শ্বশুর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌছলেন। মুক্তিপণের বিনিময়ে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত হলো। বন্দীদের আপনজনেরা মক্কা থেকে মুক্তিপণের অর্থ পাঠালো। যায়নাব (রা) স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ যে অর্থ সম্পদ পাঠালেন তার মধ্যে একটি সোনার হার ছিল। মূলতঃ সেটি ছিল মা খাদীজার (রা) দেওয়া বিয়ের সময়ের সেই হারটি। হারটি দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) মনটি ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লো। তাঁর মানসপটে ভেসে উঠলো খাদীজার (রা) স্মৃতি। তিনি সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা পারলে যায়নাবের বন্দীকে ছেড়ে দাও এবং অর্থও ফেরত দাও। সাহাবীরা রাজি হলেন। তাঁরা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন।[১২২]

---

১১৯. আজ-জাহাবী; তারীখ-১/১৪১; আল-মুসনাদ-৬/১১৭, ১১৮; সিয়ারু আলাম আন-নুবালা-২/১১২
১২০. আল-ইসাবা-৪/২৮৩; তাহজীবুল আসমা-২/৩৪১
১২১. সিয়ারু আলাম আন-নুবালা-২/১১২
১২২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৫১-৬৫৩

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ

استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أستيذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت فى الدهر قد أبدلك الله خيرا منها -

–খাদীজার (রা) বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দুই বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) রাসূল (সা) খাদীজার (রা) অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে ওঠেন। তারপর (স্বাভাবিক হয়ে) তিনি বলে উঠলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! এ তো দেখছি হালা। আয়িশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম ঃ কুরাইশ বুড়ীদের এক লাল গালের বুড়ী, যে শেষ হয়ে গেছে কতকাল আগে, তার আবার কি স্মরণ করেন। আল্লাহ তো তার চাইতেও উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।[১২৩]

মুহাম্মাদ ইবন সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত খাদীজার (রা) ইনতিকালের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) এত শোকাতুর হয়ে পড়েন যে তাঁর জীবন-আশঙ্কা দেখা দেয়। অবশেষে তিনি আয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন।[১২৪]

হযরত খাদীজার (রা) ফজীলাত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) বহু বাণী ও মন্তব্য হাদীসে ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। আমাদের পূর্বের আলোচনায় তার কিছু পেশ করেছি। এখানে আরও কয়েকটি বাণী তুলে ধরছি।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

حسبك من نساء العالمين أربع -

–বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমার জন্য চারজনই যথেষ্ট।[১২৫]

আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

خَيْرَ نِسَاء العالمين مَرْيَمَ، وأَسِيَةُ، وخَدِيْجَةُ بنت خُوَيْلِدْ، وفَاطِمَةُ -

–বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম হলেন ঃ মারইয়াম, আসিয়া, খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা (রা)।[১২৬]

---

১২৩. বুখারী ঃ আল-মানাকিব ঃ ফাদলু খাদীজা।

১২৪. সিয়ারু আলাম আন-নুবালা-২/১১৬; শারহুল মাওয়াহিব-৩/২২৭

১২৫. তিরমিজী ঃ আল-মানাকিব (৩৮৭৮); আল-হাকেম-৩/১৫৭; মুসনাদ-৩/১৩৫

১২৬. সিয়ারু আলাম আন-নুবালা- ২/১১৭

আলী (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি ঃ

خَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ -

–খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ তাঁর সময়ের সর্বোত্তম নারী। মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান তাঁর সময়ের সর্বোত্তম নারী।[১২৭]

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

سيدة نساء اهل الجنة بعد مريم فاطمة وخديجة وامرأة فرعون آسية.

–মারইয়াম বিন্‌ত ইমরানের পরে ফাতিমা, খাদীজা ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতের অধিবাসী মহিলাদের নেত্রী।[১২৮]

ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে ঃ জান্নাতের অধিকারী নারীদের মধ্যে খাদীজা, ফাতিমা, মারইয়াম ও আসিয়া সর্বোত্তম। ইমাম নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১২৯]

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বহুবার বলতে শুনেছি ঃ

كَنَتْ خَدِيْجَةُ خَيْرِ نِسَاء العالمين -

–খাদীজা (রা) জগতের সর্বোত্তম নারী।[১৩০]

ইমাম আজ-জাহাবী হযরত খাদীজার স্থান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তাঁর ফজীলাত অনেক। তাঁর সময়ের বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী (বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায়) পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, অতি সম্মানিতা, ধর্মপরায়ণা, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী এক ভদ্রমহিলা। তিনি জান্নাতের অধিকারিণী। রাসূল (সা) তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং অন্য বিবিগণের উপর তাঁর প্রাধ্যান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক সন্তানের জননী। রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বোত্তম জীবন সঙ্গিনী। তাঁকে হারিয়ে রাসূল (সা) ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন। নিজের ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য ব্যয় করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মাধ্যমে তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরীর একটি বাড়ীর সুসংবাদ দান করেছেন।[১৩১]

---

১২৭. আজ-জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৪১; তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১; মুসনাদ-১/৩১৬, ৩২২,
১২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৭
১২৯. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪১; হাকেম-৩/১৮৫
১৩০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১২
১৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/১০৯-১১০

অনেকগুলি সূত্রে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'হে খাদীজা, জিবরীল তোমাকে সালাম জানিয়েছেন।' তাঁর মধ্যে কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল বলেন, 'হে মুহাম্মাদ আপনি আপনার রব ও আমার পক্ষ থেকে খাদীজাকে সালাম বলুন।' জবাবে খাদীজা বলেন ঃ১৩২

اَللّٰه السلام ، وَمنهُ السلام ، وَعلى جِبريل السلام -

হযরত আনাসের (রা) একটি বর্ণনায় হযরত খাদীজার (রা) জবাবটি এসেছে এ রকম ঃ১৩৩

إنَّ الله هو السلام وعلى جبريل السلام و عليك السلام ورَحمة الله .

হযরত খাদীজা (রা) নবী মুহাম্মাদকে (সা) স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে, অটল হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এবং নিজের সবকিছু তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মানব জাতির অপার কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে আমরা শেষ করতে পারবোনা। আল্লাহ পাক ও জিবরীলের (আ) মত আমরাও তাঁর প্রতি অগণিত বার সালাম পেশ করে আমাদের কথার সমাপ্তি টানছি।

---

১৩২. প্রাগুক্ত-২/১১৬; ইবন হিশাম-১/২৪১;
১৩৩. আল-ইসাবা-৪/২৮৩

সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা)

হযরত সাওদা (রা) সেই ভাগ্যবতী মহিলা যাঁকে হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) মৃত্যুর পর বিয়ে করেন। শুধু তাঁকে নিয়েই তিনি প্রায় তিন বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। তারপর উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশাকে (রা) ঘরে তুলে আনেন।[১]

হযরত সাওদা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি শাখা গোত্র বনু 'আমের ইবন লুই-এর সন্তান। পিতা যাম'আ ইবন কায়স কুরাইশ বংশীয় এবং মাতা শামুস বিন্‌ত কায়স মদীনার বিখ্যাত নাজ্জার গোত্রীয়।[২] রাসূলুল্লাহর (রা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমাও ছিলেন এই নাজ্জার খান্দানের মেয়ে। সাওদার নানা কায়স ইবন 'আমর এবং সালমা বিন্‌ত 'আমর ছিলেন ভাই-বোন।[৩] হযরত সাওদার ডাকনাম ছিল 'উম্মুল আসওয়াদ'।[৪]

জাহিলী যুগে হযরত সাওদার প্রথম বিয়ে হয় সাকরান ইবন 'আমরের সাথে।[৫] সাকরান ছিলেন সাওদার চাচাতো ভাই।[৬] বিখ্যাত চার-সাহাবা সুহাইল ইবন 'আমর, সাহ্‌ল ইবন 'আমর, সালীত ইবন 'আমর ও হাতেব ইবন 'আমর—এঁরা ছিলেন সাকরানের ভাই।[৭]

হযরত রাসূলে কারীমের নুবুওয়াত লাভের প্রথম পর্বে হযরত সাওদা ও তাঁর স্বামী সাকরান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়ে প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নর-নারীদের অন্তর্গত। তাঁদের উভয়ের ইসলাম গ্রহণের সময়কাল একই।[৮]

কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মক্কার অসহায় মুসলমানদের প্রথম দলটি যখন হাবশায় হিজরাত করে তখনও এই মুসলিম পরিবারটি মক্কার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তাদের অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা অতিক্রম করতে লাগলো তখন মক্কার মুসলমানদের দ্বিতীয় একটি দল হাবশায় হিজরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সাওদা তাঁর স্বামীসহ এই দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। কয়েক বছর সেখানে অবস্থানের পর আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের কিছুকাল

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/২৬৫
২. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত- ২/৩৪৮; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫
৩. আসাহ আস-সিয়ার- ৬১২
৪ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত- ২/৩৪৮
৫. সীরাতু ইবন হিশাম- ২/৬৪৪; উসুদুলগাবা-৫/৪১২;
৬. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪; আল-ইসতী'য়াব-৪/৩২৩
৭. আসাহ আস-সিয়ার- ৬১৩
৮. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাতুন নবী- ২/৪০৪; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৩

পূর্বে সাকরান মুসলমান অবস্থায় মক্কায় মারা যান। রাসূল (সা) তাঁকে মক্কায় দাফন করেন।[৯]

একথাও বর্ণিত হয়েছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় দলটির সাথে স্বামীসহ তিনি হাবশা হিজরাত করেন। আবু 'উবাইদাহ্ ও মা'মারসহ একদল সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সাকরান হাবশা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর মুরতাদ হয়ে অথবা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে আবার হাবশায় ফিরে যান এবং সেখানেই মারা যান। বালাজুরী বলেন, প্রথম বর্ণনাটি সঠিক।[১০]

রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের প্রায় তিন বছর পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার ইনতিকালের পর তিনি হযরত সাওদাকে (রা) বিয়ে করেন।[১১]

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (রা) প্রথমা এবং প্রিয়তমা স্ত্রী। একাকীত্বের অস্থিরতায়, বিপদ-আপদের ভয়াবহতায়, এবং অত্যাচারী-উৎপীড়কের নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় তিনি ছিলেন প্রিয় স্বামীর একান্ত সংগিনী। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে সান্ত্বনা দিতেন, সমবেদনা প্রকাশ এবং পাশে থেকে সকল বাধা অতিক্রমে সাহায্য করতেন। এমন একজন অন্তরঙ্গ স্ত্রী ও বান্ধবীর তিরোধানে রাসূল (সা) দারুণ বিমর্ষ ও বেদনাহত হয়ে পড়েন। তাঁর বিচ্ছেদ ব্যথায় এত কাতর হয়ে পড়েন যে জীবনও সংকটজনক হয়ে দাঁড়ায়।[১২] তাছাড়া খাদীজা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের জননী এবং গৃহকর্ত্রী। তাঁর অনুপস্থিতিতে মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন ও ঘর সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু পৌত্তলিকদের জ্বালাতন ও উৎপাতের মাত্রাও বেড়ে যায়।[১৩] রাসূলুল্লাহর (সা) এমন অবস্থা তাঁর সাহাবীদেরকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

'উসমান ইবন মাজ'উন (মৃ. হিঃ ২) একজন বড় মাপের সাহাবী। তাঁর স্ত্রী খাওলা বিন্ত হাকীম একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। নানা কথার ফাঁকে এক সময় তিনি বলে ফেললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবার বিয়ে করুন! প্রশ্ন করলেন ঃ পাত্রী কে? খাওলা বললেন ঃ বিধবা এবং কুমারী—দুই রকম পাত্রীই আছে। এখন আপনি যাকে পসন্দ করেন তার ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে। তিনি আবার জানতে চাইলেন ঃ পাত্রী কে ? খাওলা বললেন ঃ বিধবা পাত্রী সাওদা বিন্ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রী আবু বকরের মেয়ে আয়িশা।[১৪] রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য মেয়েরা অধিকতর যোগ্য। এভাবে তিনি সম্মতি দান করেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে খাওলা গেলেন সাওদার গৃহে। সাওদার পিতা তখন

---

৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২৯; ৩৬৮; আল-আ'লাম-৩/২১৪ তাবাকাত-৮/৫৪.
১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২১৯
১১. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪
১২. তাবাকাত-৮৫৪; সুলায়মান নাদবী; সীরাতে 'আয়িশা-২৪
১৩. ডঃ আহমাদ শালবা : আত-তারীখ আল-ইসলামী-১/৩২৭
১৪. সীরাতে 'আয়িশা-২৪

জীবনের প্রান্ত সীমায়। পার্থিব সকল কর্মতৎপরতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। খাওলা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে 'আনঈম সাবাহান!' (সুপ্রভাত) বলে জাহিলী রীতিতে সম্ভাষণ জানান।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন ঃ কে তুমি ? খাওলা উত্তর দেন ঃ আমি খাওলা বিন্‌ত হাকীম। বৃদ্ধ খাওলাকে স্বাগতম জানিয়ে কাছে বসান। খাওলা বিয়ের পয়গাম পেশ করেন এভাবে ঃ মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। বৃদ্ধ বলেন ঃ এতো অভিজাত কুফু। তোমার বান্ধবী সাওদা কি বলে? খাওলা বলেন ঃ তার মত আছে। বৃদ্ধ সাওদাকে ডাকতে বলেন। সাওদা উপস্থিত হলে বলেন ঃ আমার মেয়ে! এই মেয়ে (খাওলা) বলছে, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছে। অভিজাত পাত্র। আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই, তুমি কি রাজি? সাওদা বলেন ঃ হাঁ, রাজি। তখন বৃদ্ধ খাওলাকে বলেন ঃ তুমি যাও, মুহাম্মাদকে ডেকে আন। রাসূল (সা) বরবেশে উপস্থিত হন এবং সাওদার পিতা সাওদাকে তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৫]

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, বিয়ের পূর্বে রাসূল (সা) স্বয়ং সাওদার সাথে সরাসরি আলোচনা করেন। হতে পারে খাওলা এ আলোচনার ব্যবস্থা করেন। ইমাম আহমাদ আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাসূল (সা) তাঁর গোত্রের সাওদা নামের একটি মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি ছিলেন মুসীবতের বাস্তব রূপ। পাঁচ অথবা ছয়টি ছেলে-মেয়ে রেখে স্বামী মারা গেছেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ আমার প্রস্তাবে রাজি হতে তোমার বাধা কিসের? সাওদা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর নবী! সৃষ্টি জগতের মধ্যে আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমার কোন বাধা নেই কিন্তু আমার ভয়, আমার এই সন্তানগুলি সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করবে, আপনার সেবা থেকে আমাকে বিরত রাখবে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এছাড়া আর কোন বাধা আছে? সাওদা বললেন ঃ না, আর কোন বাধা নেই। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে করুণা করুন। সর্বোত্তম নারী তারা যারা উটের পিঠে পিছন দিকে চড়ে। কুরাইশদের সৎকর্মশীলা নারী তারা যারা তাদের শিশুসন্তানদের প্রতি মমতাময়ী এবং স্বামীদের প্রতি যত্নশীলা।[১৬]

বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ থেকে বর্ণিত হয়েছে। সাকরান সাওদাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে মারা যান। 'ইদ্দত পালনের পর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। সাওদা বলেন ঃ আমার বিষয়টি আপনার উপর ছেড়ে দিলাম। রাসূল (সা) বলেন ঃ তুমি তোমার গোত্রের কাউকে বিয়ের কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দাও। অতঃপর সাওদা হাতেব ইবন

১৫. ইবন কাসীর ঃ সীরাতুননাবী-১/৩১৭-৩১৮; তাবাকাত-৮/৫৩; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/১৬৬

১৬. ইবন কাসীর-১/৩১৮

'আমর আল-'আমেরীকে দায়িত্ব দেন। তিনিই সাওদাকে রাসূল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে দেন। এই হাতেব একজন মুহাজির ও বদরী ব্যক্তি।[১৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়েতে সাওদার ওলী কে হয়েছিলেন সে সম্পর্কে দুই রকম ধারণা পাওয়া যায়। ১. সাওদার পিতা নিজেই ওলী হয়ে মেয়ের বিয়ে দেন। ২. সালীত ইবন 'আমর অথবা হাতেব মতান্তরে আবু হাতেব ইবন 'আমর আল-আমেরী। কেউ কেউ বলেছেন, সাওদার পিতা সম্ভবত বার্ধক্যের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে হাতেব অথবা সালীতকে ওলী নিয়োগ করেছিলেন।[১৮] ইবন ইসহাক বলেন ঃ সালীত ও আবু হাতেব উভয়ে এই বিয়ের সময় মক্কায় ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন হাবশায়।[১৯] সুতরাং তাঁদের ওলী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাসূল (সা) সাওদাকে চার শো দিরহাম মোহর দান করেন।[২০]

আল-ওয়াকিদী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাওদার বিয়ে হয় নুবুওয়াতের দশম বছরে রমজান মাসে।[২১] যেহেতু সাওদা ও আয়িশার (রা) বিয়ে কাছাকাছি সময়ে হয়েছিল, এ কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায় যে, কার বিয়েটি আগে সম্পন্ন হয়েছিল। এ সম্পর্কে যত বর্ণনা আছে, তা পর্যালোচনা করলে দুই রকমের ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ খাওলা একই সাথে 'আয়িশা ও সাওদার বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (সা) দুইটি প্রস্তাবেই সম্মতি দিয়ে খাওলাকে পাত্রী পক্ষের সাথে কথা বলার অনুমতি দান করেন। খাওলা প্রথমে 'আয়িশার পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং বিয়ের ব্যবস্থা করেন। এরপর সাওদার বিয়ের ব্যবস্থা হয়। ইমাম আহমাদ 'আয়িশার (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ সাওদা প্রথম মহিলা যাঁকে রাসূল (সা) আমার পরে বিয়ে করেন। আর এটাই আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আকীলের মত।[২২]

পক্ষান্তরে বুকাইর ইবনুল আশাজ্জের বর্ণনা মতে, খাদীজার পরে রাসূল (সা) সাওদাকে বিয়ে করেন।[২৩] ইবন হিব্বানও একথা বলেছেন।[২৪] আবদুল্লাহ ইবন মুসলিম বলেন ঃ খাদীজার মৃত্যুর পর এবং 'আয়িশাকে বিয়ের আগে রাসূল (সা) নুবুওয়াতের দশম বছরে রমজান মাসে সাওদাকে বিয়ে করেন। মক্কায় তাঁকে নিয়ে ঘর করেন এবং তাঁকে নিয়ে মদীনায় হিজরাত করেন।[২৫]

---

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৭; তাবাকাত-৮/৫৩
১৮. নিয়ায ফতেহপুরী : সাহাবিয়াত-৩৩
১৯. ইবন হিশাম-২/৬৪৪
২০. যারকানী: শারহুল মাওয়াহির-৩/২৬০; শিবলী নু'মানী-২/৪০৪; ইবন হিশাম-২/৬৪৪
২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৭; জাহাবী : তারীখ-১/১৬৬
২২. ইবন কাসীর-১/৩১৮, যারকানী-৩/২৬০
২৩. তাবাকাত-৮/৫৩
২৪. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫
২৫. তাবাকাত-৮/৫৩

আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ও ইয়াহইয়া ইবন 'আবদির রহমান—উভয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে খাওলা যথাক্রমে সাওদা ও আয়িশার নিকট প্রস্তাব নিয়ে যান এবং তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রাসূল (সা) সাওদাকে নিয়ে মক্কায় ঘর-সংসার করেন। আর 'আয়িশার বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। মদীনায় হিজরাতের পর তাঁকে ঘরে তুলে নেন।[২৬] খাদীজার পরে এবং 'আয়িশার পূর্বে রাসূল (সা) সাওদাকে বিয়ে করেন– একথা বলেছেন ইবন ইসহাক, কাতাদাহ, আবু 'উবাইদাহ্, ইবন কুতায়বাহ্ ও আরো অনেকে।[২৭]

ইবন ইসহাক রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের ক্রমধারা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ১. খাদীজা, ২. সাওদা, ৩, 'আয়িশা, ৪. হাফসা, ৫. যয়নাব বিন্ত খুযায়মা, ৬. উম্মু হাবীবা, ৭. উম্মু সালামা, ৮. যয়নাব বিন্ত জাহাশ, ৯. জুওয়াইরিয়্যা, ১০. সাফিয়্যা, ১১. মায়মূনা।[২৮]

হযরত সাওদার ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ এই বিয়ের সময় পর্যন্ত অমুসলিম ছিলেন। বিয়ের সময় তিনি গৃহে ছিলেন না। বিয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর জানতে পেরে ক্রোধে উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। দুঃখ ও ক্ষোভে মাথা কুটতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন আদর্শ মুসলমান হন। তিনি আমরণ তাঁর সেইদিনের আচরণের জন্য সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করতেন।[২৯]

হযরত সাওদার বিয়ের সময়কাল নিয়েও সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটু মতবিরোধ দেখা যায়। তাবাকাতসহ বিভিন্ন গ্রন্থে নুবুওয়াতের দশম সনের কথা বর্ণিত হয়েছে। আর যারকানী (৩/৪৬০) অষ্টম সনের কথা লিখেছেন। মূলতঃ এই বিরোধের কারণ হলো হযরত খাদীজার (রা) মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে মতবিরোধ।[৩০]

কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাওদা (রা) তাঁর প্রথম স্বামীর জীবদ্দশায় দুইটি স্বপ্ন দেখেন এবং স্বামীর নিকট বর্ণনা করলে তিনি যে তা'বীর বা ব্যাখ্যা করেন তা সত্যে পরিণত হয়। হিশাম ইবন মুহাম্মাদের সূত্রে ইবন সা'দ লিখেছেন, সাওদা তাঁর প্রথম স্বামী সাকরানের জীবদ্দশায় একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল (সা) কাছে এসে একখানি পা তাঁর কাঁধে রাখলেন। সাওদা স্বপ্নের কথা স্বামীকে জানালে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি এ স্বপ্ন দেখে থাক তাহলে আমার মৃত্যু হবে এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তোমার বিয়ে হবে।[৩১]

আর একবার স্বপ্নে দেখেন, তিনি বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। হঠাৎ আকাশ

---

২৬. প্রাগুক্ত-৮/৫৭
২৭. তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত-২/৩৪৮
২৮. প্রাগুক্ত-৩/৩৪৯
২৯. যারকানী-৩/৪৬০; জাহাবী : তারীখ-১/১৬৬
৩০. শিবলী নু'মানী-২/৪০৪
৩১. তাবাকাত-৮/৫৭; আল-ইসাবা-৪/৩৩৮

থেকে চাঁদ ভেঙ্গে তাঁর ওপর এসে পড়ে। স্বামী স্বপ্নের কথা শুনে বলেন, খুব শিগ্‌গির আমি মারা যাচ্ছি। আর আমার মৃত্যুর পর তোমার দ্বিতীয় বিয়ে হবে। সেই দিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্প কিছুদিন পর মারা যান।[৩২]

অধ্যাপক আহমাদ 'আতিয়্যা তাঁর আল-কামুস আল-ইসলামী (৩/৫৫৭) গ্রন্থে কোন সূত্রের উল্লেখ ছাড়াই রাসূলুল্লাহর (সা) সাওদাকে বিয়ে করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'সাওদা ছিলেন বয়স্কা বিধবা মহিলা। স্থূলকায় ও চলনে ছিলেন ভারী। রাসূল (সা) তাঁর দয়ার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁর বার্ধক্যে সাহায্য এবং জীবনে তিনি যে দুর্ভোগ লাভ করেছেন, তার কিছুটা লাঘবের জন্য।[৩৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় পৌঁছে একটু স্থির হওয়ার পর যায়িদ ইবন হারিসাকে আবার মক্কায় পাঠান সাওদাসহ অন্যদের নেওয়ার জন্য। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) মদীনায় পৌঁছে যায়িদ ইবন হারিসা ও আবু রাফে'কে দুইটি উট ও পাঁচ শো দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠান। অতঃপর আমরা সকলে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়ি। যায়িদ ও আবু রাফে' মদীনায় ফিরে যান ফাতিমা, উম্মু কুলসুম, সাওদা, উম্মু আয়মান ও উসামাকে নিয়ে।[৩৪]

দশম হিজরীর বিদায় হজ্জে হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে অন্য লোকদের মুযদালাফা থেকে যাত্রার আগেই মীনায় চলে যাবার অনুমতি দান করেন। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ মুযদালাফার রাতে সাওদা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মানুষের ভীড়ের আগে মীনায় চলে যাওয়ার অনুমতি চান। সাওদা ছিলেন ভারী মহিলা। তিনি দ্রুত চলাফেরা করতে পারতেন না। রাসূল (সা) তাঁকে অনুমতি দান করেন।[৩৫]

একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণ সকলে তাঁর পাশে বসা আছেন। এমন সময় একজন প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কার মৃত্যু হবে? বললেন ঃ যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ। উপস্থিত সকলে এই উক্তির সরল অর্থ বুঝলেন। তাঁরা নিজেদের হাত মেপে দেখলেন, সাওদার হাত সবার চেয়ে দীর্ঘ। তাঁরা বিশ্বাস করলেন, সাওদার মৃত্যু হবে সবার আগে। কিন্তু যখন হযরত যয়নাব বিন্‌ত খুযায়মা সবার আগে মারা গেলেন তখন বুঝা গেল, হাত দীর্ঘ হওয়া অর্থ দানশীলতা। দান করা ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত (পবিত্র স্ত্রীগণ)-এর মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম মারা যান। সাওদা তখন জীবিত।[৩৬]

---

৩২. যারকানী-৩/৪৬০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৭
৩৩. আহমাদ শালবা-১/৩২৮
৩৪. তাবাকাত-১/২৩৭-২৩৮; আল-ইসতীয়াব-৪/৪৫০; আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৯
৩৫. বুখারী-৩/৪২৩; মুসলিম-১২৯০; আহমাদ-৬/১৬৪; নাসাঈ-৫/২৬৬; তাবাকাত-৮/৫৬
৩৬. তাবাকাত-৮/৫৫; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬

হযরত সাওদার (রা) মৃত্যুর সময়কাল সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের দারুণ মতভেদ রয়েছে। আল-ওয়াকিদী বলেন, আমাদের নিকট এটাই সঠিক যে, হিজরী ৫৪ সনের শাওয়াল মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।[৩৭] ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী খলীফা হযরত মুয়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৫৫ সনের মতটি সর্বাধিক সঠিক বলে মনে করেছেন।[৩৮] ইবন হাজার বলেন, বুখারী তাঁর তারীখে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তাঁর ইনতিকাল হয়। ইমাম জাহাবী জোর দিয়ে বলেছেন যে, খলীফা 'উমারের খিলাফতকালের শেষ দিকে তাঁর ইনতিকাল হয়। 'উমার শাহাদাত লাভ করেন হিজরী ২৩ সনের জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে। এ কারণে সাওদার ইনতিকাল তারও আগে হয়ে থাকবে।[৩৯] বালাজুরী বলেন, হিজরী ২৩ সনে তিনি মারা যান। খলীফা 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৪০] ইবন হিব্বান বলেন, হিজরী ৬৫ সনে তিনি মারা যান।[৪১] আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, খলীফা 'উসমানের খিলাফতকালে প্রায় আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪২]

হযরত সাওদার (রা) সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থকার কোন আলোচনা করেননি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, হযরত রাসূলে পাকের সাথে বৈবাহিক জীবনে তাঁর কোন সন্তান হয়নি।[৪৩] প্রথম স্বামী সাকরানের পক্ষের একটি ছেলে, যার নাম আবদুর রহমান, পারস্যের জালুলার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৪]

রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের মধ্যে সাওদার চেয়ে দীর্ঘদেহী আর কেউ ছিলেন না। হযরত আয়িশা (রা) বলেছেন, যে একবার তাঁকে দেখেছে তার চোখ থেকে তিনি গোপন হতে পারতেন না।[৪৫] যারকানী বর্ণনা করেছেন, তাঁর কাঠামো ছিল লম্বা।[৪৬] আল্লামাহ শিবলী নু'মানী বলেছেন, তিনি ছিলেন স্থূলকায়।[৪৭] একথা ইমাম জাহাবাও বলেছেন।[৪৮] এ কারণে বিদায় হজ্জের সময় মানুষের ভীড়ের আগে তিনি মুযদালাফা থেকে মীনায় চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি লাভ করেছিলেন।

হযরত সাওদার (রা) সূত্রে মাত্র পাঁচটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ইমাম বুখারী মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে ইবন আব্বাস, ইবন যুবাইর এবং

---

৩৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৭; তাবাকাত-৮/৫৭
৩৮. শাজারাতুজ জাহাব-১/৩৪
৩৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৫; জাহাবী : তারীখ-২/৬৭, ২৯০
৪০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৮
৪১. তাহজীবুত তাহজীব-১/৪৫৪
৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৮
৪৩. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৫
৪৪. যারকানী-৩/২৬০; শিবলী নু'মানী : সীরাত-২/৪০৪
৪৫. বুখারী-২/৭০৭
৪৬. যারকানী-৩/২৫৯
৪৭. সীরাতুন নাবী-২/৪০৫
৪৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৬৫

ইয়াহইয়া ইবন আবদিল্লাহ আল-আনসারী তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন।[৪৯]

হিজরাতের প্রায় তিন বছর পূর্বে হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে আসেন। নুবুওয়াতের দশম বছরের রমজান মাস থেকে ত্রয়োদশ হিজরীর রবীউল আওয়াল মাস পর্যন্ত প্রায় তেরো বছর স্ত্রী হিসাবে রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাওদা ও 'আয়িশার বিয়ে হয়। বিয়ের পর আয়িশা প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। এ সময় সাওদাই ছিলেন মূলতঃ একক গৃহিণী।[৫০] এ সময় তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থালীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। মাতৃহারা কন্যা ফাতিমাসহ অন্য কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্বও নিজের কাঁধে তুলে নেন। সম্ভবতঃ তখন পর্যন্ত নবী পরিবারের সদস্য হযরত 'আলীরও তত্ত্বাবধান করেন।[৫১] মোটকথা, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের এক কঠিন ও সংকটময় পর্বে হযরত সাওদা (রা) জীবন সংগিনী হিসাবে কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে খাদীজার শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করেন।

প্রথম হিজরী সনে 'আয়িশা (রা) যখন স্বামীগৃহে আসেন তখন সতীন সাওদা বিদ্যমান। এ অবস্থায় একে অপরের অধিকারে ভাগ বসানোর কল্পনা করতে পারতেন। কিন্তু এই স্বাভাবিক অনুমানের একেবারে বিপরীত ছিল এই দুইজনের অবস্থা। তাঁদের সংসার জীবনের সবকিছু ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের। গার্হস্থ্য জীবনের অধিকাংশ বিষয়ে সাওদা ছিলেন আয়িশার বান্ধবী।[৫২] 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'সাওদা ছাড়া অন্য কোন মহিলাকে দেখে আমার এমন ইচ্ছা হয়নি যে, তার দেহে যদি আমার প্রাণটি হোত।'[৫৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে তিনি সকল 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাত' (পবিত্র স্ত্রীগণ) অপেক্ষা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। বিদায় হজ্জে রাসূল (সা) 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' এর (ঈমানদারদের মাতাগণ) উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।'[৫৪] হযরত সাওদা ও যয়নাব (রা) এই নির্দেশের উপর এত কঠোরভাবে আমল করেন যে, হজ্জের উদ্দেশ্যেও আর কখনও ঘর থেকে বের হননি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর ওফাতের পর তাঁর অন্য সহধর্মিণীগণ হজ্জ করতেন; কিন্তু সাওদা ও যয়নাব বিন্ত জাহাশ রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ কঠোরভাবে পালন করতেন। ঘরে থেকে বের হতেন না।[৫৫] সাওদা (রা) বলতেন, আমি হজ্জ ও

---

৪৯. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৬, ২৬৯
৫০. জাহাবী : তারীখ-২/৬৭
৫১. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়া (উর্দু)-১১/৪৪২
৫২. সীরাতে আয়িশা- ৬৮-৬৯; বুখারী-৩/৩০৮
৫৩. মুসলিম : হিবা অধ্যায়; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫; আল-ইসতীয়াব-৪/৩২৪
৫৪. তাবাকাত-৮/৫৫; মুসনাদ-২/৪৪৬, ৬/৩২৪, ৫/২১৮; আনসাব-১/৪০৮
৫৫. তাবাকাত-৮/৫৫

'উমরা—দুটোই আদায় করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মত ঘরে বসে থাকবো।[৫৬]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আখলাক ও স্বভাব-চরিত্রের এক অনুপম দিক ছিল দানশীলতা। সাহাবীদের মধ্যে যিনি যত বেশী তাঁর নিকটে থাকার সুযোগ পেয়েছেন তাঁর মধ্যে এই বিশেষ গুণটির ছাপ পড়েছে অধিক। রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য থেকে তাঁর সহধর্মিণীগণই সর্বাধিক মাত্রায় গ্রহণের সুযোগে পেয়েছেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) এই বিশেষ গুণটি তাঁদের সকলের মধ্যে সাধারণভাবে পাওয়া গেলেও একমাত্র 'আয়িশা ছাড়া সাওদার মধ্যেই সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।[৫৭] ইবন সীরীন বর্ণনা করেছেন, একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) হযরত সাওদার (রা) নিকট একটি থলি পাঠান। তিনি বহনকারীকে প্রশ্ন করেন ঃ থলিতে কি? বললো ঃ দিরহাম। 'থলিতে খেজুরের মত দিরহাম পাঠানো হয়'– একথা বলে তক্ষুণি সবগুলি দিরহাম মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেন।[৫৮]

ইছার বা নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করাও ছিল তাঁর চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। তিনি এবং 'আয়িশা (রা) কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বৈবাহিক জীবন শুরু করেন। তবে 'আয়িশা অপেক্ষা তাঁর বয়স ছিল বেশী। এ কারণে তাঁর জীবনে বার্ধক্য এসে যায় এবং তাঁর মধ্যে পুরুষের প্রতি আকর্ষণে ভাটা পড়ে। তাই তিনি স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ভাগের রাতটি সতীন 'আয়িশাকে দান করেন।[৫৯] এ সম্পর্কে একবার হযরত আয়িশা (রা) 'উরওয়াকে বললেন ঃ ভাতিজা! রাসূল (সা) স্ত্রীদের জন্য তাঁর বণ্টিত রাতে অবস্থানের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। অনেক দিন এমন গেছে তিনি আমাদের সকলের নিকট এসে ঘুরে গেছেন, কোন স্ত্রীকেই স্পর্শ করেননি। শেষে সেই স্ত্রীর নিকট রাত কাটিয়েছেন যার জন্য রাতটি নির্ধারিত ছিল। সাওদা বিন্‌ত যাম'আর যখন বার্ধক্য এসে যায় এবং এই ভয় পেয়ে যান যে না জানি রাসূল (সা) তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেন, তখন তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগের রাতটি আমি 'আয়িশাকে দিলাম। রাসূল (সা) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করেন।[৬০]

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার। হযরত সাওদার (রা) স্বামী সান্নিধ্যের সময়টুকু 'আয়িশাকে (রা) দান করার বিষয়টি হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে এসেছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি সীরাতের গ্রন্থসমূহে এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যাতে দেখা যায়, সাওদার (রা) জীবনে বার্ধক্য এসে যাওয়ায় রাসূল (সা) তাঁকে এক তালাক দান করেছিলেন।

---

৫৬. আনসাব-১/৪৬৫; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৭

৫৭. শিবলী নু'মানী-২/৪০৬

৫৮. তাবাকাত-৮/৫৬; আল-ইসাবা-৪/৩৩৮;

৫৯. বুখারী-হিবা অধ্যায়-৩/৩০৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৬; আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/১০৯

৬০. এই বর্ণনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। দেখুন ঃ সাহীহ বুখারী-নিকাহ অধ্যায়-৫/১৬১, ৯/২৭৪; মুসলিম-(১৪৬৩); আবু দাউদ (২১৩৫); তিবমিজী- (৩০৪০); ইবন সা'দ-৮/৫৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৬

তারপর তাঁর বিনীত অনুরোধে রাসূল (সা) তালাক প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু মুহাদ্দিসদের নিকট বর্ণনাগুলি অতি দুর্বল বিধায় গুরুত্বহীন। আর এটাই সঠিক যে রাসূল (সা) তাঁর কোন স্ত্রীকে তালাক দান করেননি।[৬১]

রাসূলুল্লাহ (সা) জীবনের এক বিশেষ সময়ে যাঁকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন এবং যিনি অতি দক্ষতার সাথে খাদীজার (রা) দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর বার্ধক্যে রাসূল (সা) তাঁকে দূরে ঠেলে দেবেন, এমন কথা কেমন করে ভাবা যায়? তাই মুহাদ্দিসগণ এসব বর্ণনায় বিশ্বাস করেননি। কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থেও এসব বর্ণনা স্থান পায়নি। কিন্তু তা না পেলে কি হবে? আধুনিক ইতিহাস লেখকদের অনেকে সাওদা (রা) সম্পর্কে অনেক অশালীন মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আদর্শ গৃহিণী হতে পারেননি।[৬২]

এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা করলে যে তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, সাওদার জীবনে বার্ধক্য এসে যায়। স্বামীকে তুষ্ট করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। আর তিনি ছিলেন 'আদল ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। সকল স্ত্রীকে সমান মর্যাদা দান করতেন। স্ত্রীদের জন্য যতটুকু সময় ব্যয় করতেন, তা সকলের জন্য সমানভাবে ভাগ করতেন। এভাবে সাওদাসহ আরো কয়েকজন স্ত্রী সমানভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) আরাম ও প্রশান্তি লাভের সময়ের ভাগ পেতেন। কিন্তু মূলতঃ তাঁদের বয়সের কারণে তাঁরা রাসূলকে (সা) প্রশান্তি দিতে অক্ষম ছিলেন। স্বেচ্ছায় নিজের অধিকার সতীন 'আয়িশার (রা) অনুকূলে ছেড়ে দিয়ে রাসূলকে (সা) দায়মুক্ত করেন। 'আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ সাওদা বৃদ্ধা হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বেশী কাছে পেতে চাইতেন না। আর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমার স্থান কি এবং তিনি যে আমাকে বেশী কাছে পেতে চান, তা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি ভয় পেয়ে যান, না জানি রাসূল (সা) তাঁকে পৃথক করে দেন। তাই তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বারির দিনটি 'আয়িশাকে দান করলাম। আপনি এ ব্যাপারে দায়মুক্ত। রাসূল (সা) তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৬৩] হযরত সাওদা ছিলেন একটু রুক্ষ প্রকৃতির মহিলা। হযরত 'আয়িশার (রা) সীমাহীন শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, সাওদা খুব দ্রুত রেগে যেতেন। পর্দার হুকুম নাযিলের পূর্ব থেকে হযরত 'উমার (রা) এ বিষয়ে নির্দেশ দানের জন্য প্রায়ই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দাবী জানাতেন। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ আসেনি তাই তিনি চুপ থাকতেন। সে সময় মক্কার কোন গৃহের অভ্যন্তরে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। পায়খানা থাকাটা তারা শোভন মনে করতো না। সে সময় মেয়েরাও প্রাকৃতিক কর্ম সমাধার জন্য রাতের বেলা বাড়ীর বাইরে খোলা ময়দানে চলে যেত।

---

৬১. টীকা ঃ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৮

৬২. ড. আহমাদ শালবা ঃ আত-তারীখ-১/৩২৮

৬৩. তাবাকাত-৮/৫৩; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৫

হযরত সাওদা ছিলেন স্থূলকায় ও দীর্ঘদেহী। বহু মানুষের মধ্যেও তাঁকে চেনা যেত। একদিন রাতে তিনি বাইরে যাচ্ছেন। পথে 'উমারের দৃষ্টিতে পড়েন। তিনি চেঁচিয়ে বলে ওঠেন ঃ 'আপনাকে আমি চিনে ফেলেছি।' 'উমারের এমন আচরণে সাওদা যেমন লজ্জা পেলেন, তেমনি রেগেও গেলেন। ফিরে এসে 'উমারের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর নিকট অভিযোগ করেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।[৬৪]

হিজাবের আয়াত নাযিলের কারণ সম্পর্কে দারুণ মতভেদ আছে। একটি বর্ণনা তো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় একটি বর্ণনা এই যে, হযরত 'উমার (রা) রাসূলকে (সা) বললেন, আপনার নিকট ভালো-মন্দ সকল ধরনের লোকের সমাগম হয়। আপনি যদি তাদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেন, ভালো হতো। ইবন জারীর তাঁর তাফসীরে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) সাহাবীদের সাথে আহার করছিলেন। হযরত 'আয়িশাও ভোজনে অংশীদার ছিলেন। তাঁর হাতে এক ব্যক্তির হাতের ছোঁয়া লাগে। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে খুব খারাপ লাগে। এই ঘটনার পর হিজাবের আয়াত নাযিল হয়। তবে সাধারণভাবে একথা প্রসিদ্ধ যে, হযরত যয়নাবের (রা) ওলীমার আহার পর্ব উপলক্ষে 'আয়াতে হিজাব' নাযিল হয়। ইবন হাজার এই বর্ণনাগুলির সমন্বয় করেছেন এভাবে ঃ হিজাবের আয়াত নাযিলের একাধিক কারণ ছিল। তার মধ্যে যয়নাবের ঘটনাটি ছিল সর্বশেষ। আর সেটাই আয়াতের শানে নুযুল। কারণ উক্ত আয়াতের মধ্যেই ঘটনাটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[৬৫]

রুক্ষ স্বভাবের হলেও সাওদার (রা) মধ্যে সারল্য ভাবও ছিল। তাঁর কোন কোন কথায় রাসূল (সা) হেসে দিতেন। একদিন তিনি রাসূলকে (সা) বললেন, কাল রাতে আমি আপনার সাথে নামায পড়েছি। আপনি এত দীর্ঘ সময় রুকুতে ছিলেন যে, আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু হয়েছে বলে মনে হয়েছিল। এ কারণে আমি দীর্ঘক্ষণ নাক চেপে ধরে রেখেছিলাম। রাসূল (সা) তাঁর কথায় মৃদু হেসে দেন।[৬৬]

তিনি একবার 'আয়িশা ও হাফসার (রা) সাথে যাচ্ছেন। তাঁরা একটু কৌতুক করে বললেন, আপনি কি কিছু শুনেছেন? তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ কোন বিষয়ে? তাঁরা বললেন ঃ দাজ্জাল বের হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। পাশেই একটি তাঁবুতে কিছু লোক আগুন পোহাচ্ছিল। তিনি হঠাৎ সেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েন। হযরত হাফসা ও হযরত আয়িশা তাঁর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছেন এবং তাঁদের কৌতুকের কথা বলেন। রাসূল (সা) এসে তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, এখনো দাজ্জাল বের হয়নি। তখন সাওদা বেরিয়ে আসেন। গায়ে তাঁর মাকড়সার জাল লেগে ছিল, বাইরে এসে তা সাফ করেন। অনেকের নিকট এ বর্ণনাটির সূত্র দুর্বল

---

৬৪. বুখারী ঃ বাবুল হাদায়া; বাবুত তাহরীম।
৬৫. ফাতহুল বারী-১/২১৯; শিবলী নু'মানী-২/৪০৫
৬৬. তাবাকাত-৮/৫৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৮, আল-ইসাবা-৪/৩৩৯

এবং বর্ণনাটি সন্দেহযুক্ত।[৬৭]

হযরত সাওদার (রা) সরলতার আরো বহু ঘটনা আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্য যে মধু পান হারাম করে নেন তার পিছনে ছিল দাম্পত্য জীবনের একটি মধুর ঘটনা। আর সেই ঘটনার সাথে সরলভাবে সাওদাও জড়িয়ে পড়েন বলে অনেকের ধারণা। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই রকম ঃ

রাসূল (সা) মিষ্টি পছন্দ করতেন। তিনি স্ত্রী যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ, মতান্তরে হাফসার ঘরে গেলে মধুর শরবত পান করতেন। এতে 'আয়িশার মনে কিছুটা ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। তিনি চাইলেন, রাসূল (সা) যাতে সেখানে আর মধু পান না করেন। তাই সাওদার সাথে ফন্দি আঁটলেন। রাসূল (সা) মধু পানের পর যখন তাঁদের নিকট আসবেন তখন তাঁরা প্রত্যেকেই বলবেন, আপনার পবিত্র মুখ থেকে 'মুগফুর'-এর গন্ধ বের হচ্ছে। এতে হয়তো রাসূল (সা) মধু পান ছেড়ে দিবেন। কারণ, তিনি কোন রকম দুর্গন্ধ পছন্দ করেন না। রাসূল (সা) মধু পান করে যখনই তাঁদের কাছে গেলেন, তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে একই কথা বললেন। দ্রুত ফল হলো। রাসূল (সা) নিজের জন্য মধু হারাম করে বসলেন। তখন সূরা আত-তাহরীম-এর ১-৩ নং আয়াত নাযিল হয়।[৬৮]

হযরত সাওদার (রা) অন্তরটি ছিল অতি কোমল। আপনজনদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ইবন আমরের ভাই সুহাইল ইবন 'আমরকে বদরে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এ সম্পর্কে ইবন ইসহাক বলেন ঃ বদরের বন্দীদের যখন মদীনায় আনা হয় তখন সাওদা ছিলেন 'আফরার ছেলে 'আউফ ও মু'য়াওবিজের গৃহে। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে। এমন সময় বদরের বন্দীদের আগমনের কথা ঘোষণা করা হলো। সাওদা বাড়ী ফিরে এসে রাসূলকে (সা) ঘরেই পেলেন। হঠাৎ কক্ষের এক কোণে বন্দী আবু ইয়াযীদ সুহাইল ইবন আমরকে দেখতে পেলেন। গলার সাথে তার হাত দুইটি রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। এ দৃশ্য দেখে তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। বলে উঠলেন ঃ আবু ইয়াযীদ! তোমরা এভাবে ধরা দিলে? সম্মানের সাথে মরতে পারলে না? সাওদা বলেন ঃ ঘরের মধ্য থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ কণ্ঠস্বরে আমি সম্বিত ফিরে পাই ঃ সাওদা! তুমি কি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছো? সাওদা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আবু ইয়াযীদ সুহাইলকে এ অবস্থায় দেখে নিজেকে সামলাতে পারিনি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।[৬৯]

---

৬৭. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৮

৬৮. তাফসীরে ইবন কাসীর-৪/৩৮৭; তাবাকাত-৮/৮৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮০-৬৮১

৬৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৩০৩; ইবন হিশাম-/৬৪৫

হিজরী ৮ম সনে যয়নাব বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাঁকে গোসল দেন সাওদা, উম্মু আয়মান ও উম্মু সালামা।[৭০]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) খায়বারে সাওদার (রা) জীবিকার ব্যবস্থা করে যান। আবদুর রহমান আল-আ'রাজ মদীনায় বিভিন্ন মজলিসে বলতেন ঃ রাসূল (সা) সাওদাকে ৮০ ওয়াসাক খেজুর ও ২০ ওয়াসাক গম বা যবের দ্বারা তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করেন।[৭১]

---

৭০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০

৭১. তাবাকাত-৮/৫৬; দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ ইসলামিয়া-১১/৪৪৩

'আয়িশা সিদ্দীকা (রা)

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর ডাকনাম বা কুনিয়াত উম্মু 'আবদিল্লাহ' এবং উপাধি 'সিদ্দীকা'। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাঁর অন্য একটি উপাধি 'আল-হুমায়রা'। তিনি ফরসা সুন্দরী ছিলেন। এ কারণে 'আল-হুমায়রা' বলা হতো।[১] 'উরওয়া বলেন ঃ একবার হিজাবের হুকুম নাযিলের পূর্বে উয়ায়না ইবন হিস্ন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তখন আয়িশা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'উয়ায়না 'আয়িশার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ 'আল-হুমায়রা' (সুন্দরীটি) কে? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন ঃ এ হচ্ছে আবু বকরের মেয়ে আয়িশা।[২] অনেকে এই বর্ণনাটিকে ভিত্তিহীন মনে করেছেন।[৩]

আবদুল্লাহ ছিলেন 'আয়িশার (রা) বোন আসমার (রা) ছেলে। ইতিহাসে তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর নামে প্রসিদ্ধ। 'কুনিয়াত' হয় কোন সন্তানের নামের সাথে। আয়িশা (রা) ছিলেন নিঃসন্তান। তাই তাঁর কোন 'কুনিয়াত'ও ছিল না। সেকালের আরবে 'কুনিয়াত' ছিল শরাফত ও আভিজাত্যের প্রতীক। অভিজাত শ্রেণীর লোকদের নাম ধরে ডাকার নিয়ম ছিল না। কুনিয়াত বা উপনামেই তাদেরকে সম্বোধন করা হতো। একদিন 'আয়িশা (রা) স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আপনার অন্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্বের স্বামীদের সন্তানদের নামে নিজেদের কুনিয়াত ধারণ করেছেন, আমি কার নামে কুনিয়াত ধারণ করি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমার বোনের ছেলে আবদুল্লাহর নামে। সেই দিন থেকে তাঁর কুনিয়াত বা ডাকনাম হয় 'উম্মু আবদিল্লাহ'– আবদুল্লাহর মা।[৪]

একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আয়িশা (রা) একটি পুত্র সন্তানের মা হন এবং শিশুকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ।[৫] সেই সন্তানের নামেই তাঁর কুনিয়াত হয়। ইবন হাজার আসকিলানী– বলেন, এ বর্ণনা সঠিক নয়।[৬] তাছাড়া বিভিন্ন সহীহ হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।[৭]

আয়িশার (রা) পিতা খলীফাতু রাসূলিল্লাহ, আস্-সিদ্দীকুল আকবর আবু বকর (রা) এবং মাতা উম্মু রূমান যয়নাব বিন্ত আমের, মতান্তরে 'উমাইর আল-কিনানী। পিতার দিক দিয়ে তিনি কুরাইশ গোত্রের বনু তাইম শাখার এবং মাতার দিক দিয়ে বনু কিনানার

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০
২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৪
৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬৭
৪. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব; মুসনাদ-৬/৯,১০৭ তাবাকাত-৮/৬৪
৫. যারকানী ঃ শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৬৯
৬. আল-ইসাবা-৪/৩৬০
৭. মুসনাদ-৬/১৫১

সন্তান। মা গানাম ইবন মালিক ইবন কিনানার মেয়ে।[৮] রাসূলুল্লাহ (সা) ও আয়িশার (রা) বংশধারা পিতৃকূলের দিক দিয়ে উপরের দিকে সপ্তম/অষ্টম পুরুষে এবং মাতৃকূলের দিক দিয়ে একাদশ/দ্বাদশ পুরুষে মিলিত হয়েছে।[৯]

আয়িশার (রা) পিতা আবু বকর (রা) হিজরী ১৩ সনে ইনতিকাল করেন। মা উম্মু রূমান সম্পর্কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি পাঁচ অথবা ছয় হিজরীতে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কবরে নেমে তাঁকে দাফন করেন এবং জানাযার নামায পড়েন।[১০] কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ, নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি 'উসমানের খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ সনের 'ইফক (আয়িশার রা. চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ)-এর ঘটনা সংক্রান্ত সকল হাদীসে তাঁর নাম এসেছে। হিজরী নবম সনের 'তাখঈর' (যে কোন একটি জিনিস বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার)-এর ঘটনার সময়ও তিনি জীবিত ছিলেন। এ কথা তাবাকাত, বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাসমূহে জানা যায়। ইমাম বুখারী 'তারীখে সাগীর' গ্রন্থে তাঁর নামটি ঐসকল লোকদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যাঁরা হযরত আবু বকরের খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। তিনি প্রথম বর্ণনাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাফেজ ইবন হাজার 'আত-তাহজীব' গ্রন্থে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম বুখারীর বর্ণনা সঠিক।[১১]

'আশিয়ার (রা) মা উম্মু রূমানের (রা) প্রথম বিয়ে হয় আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিস আল-আযদীর সাথে। 'আবদুল্লাহ স্ত্রী উম্মু রূমানকে নিয়ে মক্কায় আসেন এবং আবু বকরের সাথে মৈত্রী চুক্তি করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। এটা ইসলাম-পূর্ব কালের কথা। আত-তুফাইল নামে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। আবদুল্লাহ মারা যান এবং আবু বকর (রা) উম্মু রূমানকে বিয়ে করেন।[১২] এখানে তাঁর দুইটি সন্তান হয়– আবদুল্লাহ ও আয়িশা। হযরত 'আয়িশার জন্মের সঠিক সময়কাল সম্পর্কে তারিখ ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। এ কারণে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী বলেন ঃ 'ঐতিহাসিক ইবন সা'দ লিখেছেন এবং কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁকে অনুসরণ করে বলেছেন নুবুওয়াতের চতুর্থ বছরের সূচনায় আয়িশা জন্মগ্রহণ করেন এবং দশম বছরে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু এ কথা কোনভাবেই সঠিক হতে পারে না। কারণ নুবুওয়াতের চতুর্থ বছরের সূচনায় তাঁর জন্ম হলে দশম বছরে তাঁর বয়স ছয় বছর নয়, বরং সাত বছর হবে। মূলত আয়িশার (রা) বয়স সম্পর্কে কয়েকটি কথা সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তা

---

৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৬১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৫

৯. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৩

১০. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬০

১১. সীরাতে 'আয়িশা-২০

১২. আল-ইসাবা-৪/৪৫০; আনসাবুল আশরাফ-১/১৯৪, ২৪০

হলো, হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে যান এবং এগারো হিজরীর রাবীউল আওয়াল মাসে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন। এই হিসাবে তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল হবে নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষের দিক। অর্থাৎ হিজরাত পূর্ব নবম সনের শাওয়াল মাস, মুতাবিক জুলাই, ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দ।'[১৩]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) তেইশ বছরের নুবুওয়াতী জীবনের প্রায় তেরো বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত হয়। নাদবী সাহেবের বর্ণনা মতে 'আয়িশার (রা) যখন জন্ম হয় তখন নুবুওয়াতের চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে পঞ্চম বছর চলছে। ইমাম জাহাবী বলেন ঃ আয়িশা (রা), ফাতিমার চেয়ে আট বছরের ছোট। আয়িশা বলেছেন, তিনি মক্কায় একজন বৃদ্ধ অন্ধ হাতী চালকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন।[১৪]

'আয়িশা (রা) কখন কিভাবে মুসলমান হন সে সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে হযরত সিদ্দীকে আক্‌বরের (রা) বড় সৌভাগ্য যে, তাঁরই গৃহে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো প্রবেশ করে। এই কারণে হযরত আয়িশা ঐ সকল ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নর-নারীদের একজন যাঁদের কর্ণকুহরে মুহূর্তের জন্যও কুফর ও শিরকের আওয়ায পৌঁছেনি। আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'যখন থেকে আমি আমার বাবা-মাকে চিনেছি তখন থেকেই তাঁদেরকে মুসলমান পেয়েছি।'[১৫] ইমাম জাহাবী শুধু বলেছেন ঃ আয়িশা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৬] কিন্তু কখন কিভাবে, তা বলেননি। ইবন হিশাম, যাঁরা আবু বকরের (রা) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে একটা স্বতন্ত্র শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। সেখানে আয়িশার (রা) নামটিও এসেছে।[১৭]

আয়িশাকে (রা) ওয়ায়িল-এর স্ত্রী দুধপান করান। এই ওয়ায়িল-এর ডাকনাম ছিল আবুল ফুকায়'য়াস। তাঁর ভাই আফলাহ– যিনি আয়িশার দুধচাচা– পরবর্তীকালে মাঝে মাঝে আয়িশার (রা) সাথে দেখা করতে আসতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে আয়িশা (রা) তাঁর সামনে যেতেন। তাঁর দুধ-ভাইও মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন।[১৮]

আয়িশার (রা) বাল্যজীবন অন্যসব শিশুদের মতই কেটেছে। তবে একটু ভিন্নতর ছিল। বাল্যকালেই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যসব শিশুদের মত খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সমবয়সী প্রতিবেশী মেয়েরা তাঁর কাছে আসতো এবং তিনি অধিকাংশ সময় তাদের সাথে খেলতেন। কিন্তু সেই বয়সে খেলার মধ্যেও রাসূলুল্লাহর (রা) সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সজাগ থাকতেন। অনেক সময় এমন হতো যে,

---

১৩. সীরাতে 'আয়িশা-২১; সাহাবিয়াত-৩৭
১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৯
১৫. বুখারী-১/৫৫২; হায়াতুস সাহাবা-১/২৮২
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৯
১৭. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫২, ২৫৪
১৮. বুখারী-১/৩৬০-৩৬১

তিনি অন্যদের সাথে পুতুল নিয়ে খেলছেন, এমন সময় রাসূল (সা) তাঁদের গৃহে এসেছেন এবং হঠাৎ তাঁদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। আয়িশা (রা) পুতুলগুলি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলতেন এবং অন্য সাথীরা রাসূলকে (সা) দেখামাত্র ছুটে পালাতো। রাসূল (সা) শিশুদের ভালোবাসতেন। তাঁদের খেলাধুলাকেও খারাপ মনে করতেন না। তিনি পালিয়ে যাওয়া শিশুদের ডেকে ডেকে আয়িশার সাথে খেলতে বলতেন।[১৯] শিশুদের খেলাগুলির মধ্যে দুইটি খেলা ছিল তাঁর সর্বাধিক প্রিয়। পুতুল খেলা ও দোল খাওয়া।[২০]

একদিন আয়িশা (রা) পুতুল নিয়ে খেলছেন, এমন সময় রাসূল (সা) এসে পড়লেন। পুতুলগুলির মধ্যে একটি দুই ডানাওয়ালা ঘোড়াও ছিল। রাসূল (সা) সেই ঘোড়াটির প্রতি ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করলেন, আয়িশা! এটা কি? জবাব দিলেন ঃ ঘোড়া। রাসূল (সা) বললেন ঃ ঘোড়ার তো কোন ডানা হয় না। আয়িশা সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ কেন? সুলায়মান আলাইহিস সালামের ঘোড়াগুলির তো ডানা ছিল– একথা কি আপনি শোনেননি? আয়িশার (রা) এমন উপস্থিত জবাব শুনে রাসূল (সা) এমনভাবে একটু হেসে দেন যে, তাঁর দাঁত দেখা যায়।[২১]

এই ঘটনা দ্বারা আয়িশার (রা) স্বভাবগত উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, ইতিহাস-ঐতিহ্যের জ্ঞান, এবং তীক্ষ্ণ মেধার অনুমান করা যায়।

সাধারণত শৈশবকালের কথা মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যায়। কিন্তু 'আয়িশার (রা) ছোটবেলার সব কথাই স্মৃতিতে ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন তখন আয়িশার (রা) বয়স আট/নয় বছরের বেশী হবে না। কিন্তু হিজরাতের ঘটনার যত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা আর কোন সাহাবী দিতে পারেননি।[২২]

ইমাম বুখারী সূরা আল-কামার-এর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, যখন এই আয়াত :

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

(سورة القمر- ٢٤)

মক্কায় নাযিল হয় তখন আমি এক ছোট্ট মেয়ে, খেলছিলাম।[২৩]

ছোটবেলায় হযরত আয়িশা (রা) মাঝে মাঝে মাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। তিনিও মেয়েকে শাস্তি দিতেন। রাসূল (সা) এতে কষ্ট অনুভব করতেন। একবার তিনি উম্মু রুমানকে বলেন, আমার খাতিরে তাকে আর শাস্তি দিবেন না। একবার রাসূল (সা)

---

১৯. বুখারী ঃ কিতাবুল আদাব; বাবুল ইনবিসাত ইলান্নাস; মুসলিম ঃ ফাদায়িলুস সাহাবা; তাবাকাত-৮/৫৯, ৬৫, ৬৬।

২০. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব

২১. মিশকাত ঃ আশরাতুন নিসা-১/৭৫; তাবাকাত-৮/৬২; আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব ঃ বাবুল লা'ব বিল-বানাত

২২. বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ

২৩. বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর ঃ আল-কামার

আয়িশার পিতৃগৃহে এসে দেখেন, দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে আয়িশা কাঁদছেন। তিনি উম্মু রূমানকে বলেন, আপনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। উম্মু রূমান বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মেয়ে আমার বিরুদ্ধে তার বাপের কাছে লাগায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যা কিছুই করুক না কেন, তাকে কষ্ট দিবেন না। আল্লামাহ সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী 'মুসতাদরিকে হাকেম'-এর বরাত দিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

রাসূলে কারীমের (সা) প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়াইলিদ। তাঁকে বিয়ে করার সময় রাসূলে পাকের বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পঁচিশ বছর ঘর করার পর নুবুওয়াতের দশম বছর রমজান মাসে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে খাদীজা (রা) ইনতিকাল করেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স পঞ্চাশ এবং খাদীজার পঁয়ষট্টি।

সাওদার (রা) জীবনীতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, খাদীজার (রা) ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহকে (সা) বিমর্ষ দেখে 'উসমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন ঃ কাকে? খাওলা বললেন ঃ বিধবা ও কুমারী দুই রকম পাত্রীই আছে। যাকে আপনার পছন্দ হয় তাঁর বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। রাসূল (সা) আবার জানতে চাইলেন ঃ তারা কারা? খাওলা বললেন ঃ বিধবা পাত্রীটি সাওদা বিনত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রীটি আবু বকরের মেয়ে 'আয়িশা। রাসূল (সা) বললেন ঃ ভালো। তুমি তার সম্পর্কে কথা বলো।[২৪]

হযরত খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে প্রথমে আবু বকরের (রা) বাড়ী এসে প্রস্তাব দেন। জাহিলী আরবের রীতি ছিল, তারা আপন ভাইয়ের সন্তানদের যেমন বিয়ে করতো না, তেমনি সৎ ভাই, জ্ঞাতি ভাই বা পাতানো ভাইয়ের সন্তানদেরকেও বিয়ে করা বৈধ মনে করতো না। এ কারণে প্রস্তাবটি শুনে আবু বকর বললেন ঃ খাওলা! আয়িশা তো রাসূলুল্লাহর (সা) ভাতিজী। তার সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে হয় কেমন করে? খাওলা (রা) ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আবু বকর আমার দ্বীনী ভাই। আর এ ধরনের ভাইদের সন্তানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। আবু বকর (রা) প্রস্তাব মেনে নেন এবং খাওলাকে বলেন রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসতে।[২৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'আয়িশার (রা) বিয়ের প্রস্তাব আসার আগে জুবাইর ইবন মুত'ইম ইবন আদীর সাথে তাঁর বিয়ের কথা হয়েছিল। এ কারণে তার কাছেও জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন ছিল। হযরত আবু বকর মুত'ইম ইবন 'আদীর কাছে যেয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার ছেলের সাথে আয়িশার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত

---

২৪. ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-১/৩১৭

২৫. বুখারী ঃ বাবু তাযবীজুস সিগার মিনাল কিবার; ইবন কাসীর-১/৩১৬, তাবাকাত-৮/৫৭,৫৯; জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৬৫-১৬৬, আল-মুসনাদ-৬/২১০-২১১

কী, বল। মুত'ইম তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। মুত'ইমের পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে তাঁর স্ত্রী বললেন এ মেয়ে আমাদের ঘরে এলে আমাদের ছেলে ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। আমার এ প্রস্তাবে মত নেই। তখন আবু বকর (রা) মুত'ইমের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমার স্ত্রী কী বলে? মুত'ইম বললেন ঃ সে যা বলেছে, আমারও মত তাই। তারপর ফিরে এসে খাওলাকে বললেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসুন। রাসূল (সা) এলেন এবং আবু বকর বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।[২৬] বালাজুরী অবশ্য অন্য কারো সাথে আয়িশার বিয়ের প্রস্তাবের কথা সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭]

আয়িশা (রা) ও সাওদার (রা) বিয়ে একই সময় হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সাওদাকে বিয়ের পরই ঘরে তুলে নেন এবং শুধু তাঁকে নিয়ে তিন বছর ঘর করার পর আয়িশাকে (রা) ঘরে নিয়ে আসেন।[২৮]

এই বিয়ে অতি সাদামাটা ও আড়ম্বরহীনভাবে সম্পন্ন হয়। আতিয়্যা (রা) এই বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– আয়িশা অন্য মেয়েদের সাথে খেলছিলেন। তাঁর সেবিকা এসে তাঁকে নিয়ে যায় এবং আবু বকর (রা) এসে বিয়ে পড়িয়ে দেন।'

এই বিয়ে যে কত অনাড়ম্বর ও অনুষ্ঠানহীন অবস্থায় শেষ হয়েছিল তা অনুমান করা যায় খোদ আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলছেন ঃ যখন আমার বিয়ে হয়, আমি কিছুই জানতাম না। আমার বিয়ে হয়ে গেল। যখন মা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করতে লাগলেন তখন বুঝলাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর মা আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন।[২৯]

আয়িশা (রা) বলেন ঃ বিয়ের সময় আমি এক ছোট্ট মেয়ে। 'হাওফ' নামক এক প্রকার পোশাক পরি। বিয়ের পর ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও আমার মধ্যে লজ্জা এসে যায়। উল্লেখ্য যে, 'হাওফ' হলো চামড়ার তৈরী পায়জামার মত এক ধরণের পোশাক, যা শিশুদের মাঝদেহ বরাবর পরা থাকে।

আয়িশাকে (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কত দেন মোহর দান করেছিলেন, সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। ইবন সা'দের বর্ণনাসমূহের মাধ্যমে জানা যায়, রাসূল (সা) দেন মোহর হিসাবে আয়িশাকে (রা) একটি ঘর দান করেন যার মূল্য ছিল পঞ্চাশ দিরহাম।[৩০] ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন চার শো দিরহামের কথা। ইবন সা'দের অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, যা খোদ আয়িশা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ মোহর ছিল বারো উকিয়া

---

২৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/২১০-২১১; জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৬৫, ১৬৬ তাবাকাত-৮/৫৮; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১৪৯

২৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০৯

২৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪১

২৯. তাবাকাত-৮/৫৯-৬০

৩০. প্রাগুক্ত : ৮/৬০

ও এক নশ– যা পাঁচশো দিরহামের সমান।[৩১] সহীহ্ মুসলিমে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীগণের মোহর সাধারণত পাঁচশো দিরহাম হতো।[৩২] মুসনাদে আহমাদে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর মোহর ছিল পাঁচশো।

আয়িশাকে (রা) বিয়ে করার পূর্বেই রাসূলে কারীম (সা) এর সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস এক টুকরো রেশমে জড়িয়ে তাঁকে দেখিয়ে বলছেন, এটি আপনার। তিনি খুলে দেখেন তার মধ্যে আয়িশা (রা)।[৩৩]

আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তিন রাত আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম। একজন ফিরিশতা রেশমের একটি খণ্ডে কিছু একটা মুড়ে এনে বললো, এ আপনার স্ত্রী। মাথার দিক থেকে আমি খুলে দেখলাম, তার মধ্যে তুমি। আমি বললাম, এ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে হোক।[৩৪]

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আয়িশা (রা) বলেন ঃ জিবরীল তাঁর একটি প্রতিকৃতি সবুজ রেশমের একটি টুকরোয় জড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে এসে বলেন ঃ ইনি হবেন দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।[৩৫]

আয়িশার (রা) বিয়ের সঠিক সময়কাল নিয়ে একটু মতভেদ আছে। আল্লামাহ বদরুদ্দীন আয়নী সহীহ্ আল-বুখারীর ভাষ্যে লিখেছেন ঃ আয়িশার (রা) বিয়ে হিজরাতের দুই বছর পূর্বে, আবার বলা হয়ে থাকে তিন বছর পূর্বে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, দেড় বছর পূর্বে হয়েছিল'[৩৬] কিছু কিছু বর্ণনায় জানা যায়, খাদীজার (রা) ইনতিকালের তিন বছর পর রাসূললুল্লাহ (সা) আঁয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন। কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞ বলেন, যে বছর খাদীজার (রা) মৃত্যু হয় সেই বছর আয়িশার (রা) বিয়ে হয়।[৩৭]

সুলায়মান নাদবী বলেন ঃ খাদীজার (রা) ওফাতের তারিখ দ্বারা আয়িশার (রা) বিয়ের সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু খাদীজার (রা) ওফাতের তারিখও সর্বসম্মত নয়। সেখানেও মতভেদ আছে। এ ক্ষেত্রে খোদ আয়িশার (রা) বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু বুখারী ও মুসনাদে তাঁর থেকেও ভিন্ন দুইটি বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি বর্ণনায় এসেছে খাদীজার (রা) ওফাতের তিন বছর পর তাঁর বিয়ে হয়।[৩৮] অপর

---

৩১. প্রাগুক্ত-৮/৬৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৪ এক 'নশ' হলো অর্ধ 'উকিয়া'। এক 'উকিয়া' = ৪০ দিরহাম। সুতরাং বারো 'উকিয়া' ও এক নশ = ৫০০ দিরহাম। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৪)

৩২. সহীহ্ মুসলিম ঃ কিতাবুন নিকাহ

৩৩. তাবাকাত-৮/৬০

৩৪. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪১, ১২৮, ১৬১; ইমাম বুখারী বিভিন্ন অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিম-(২৪২৮) ফাদায়িলুস সাহাবা; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-১/৩১৫। সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০

৩৫. আত-তিরমিযী-(৩৮৮০) ঃ বাবু ফাদলি 'আয়িশা; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ-১/৩১৫

৩৬. 'উমদাতুল কারী-১/৪৫

৩৭. ইবন কাসীর-১/৩১৬

৩৮. বুখারী ঃ ফাদলু খাদীজা; মুসনাদ-৬/২৫৮; জাহাবী ঃ তারীখ-১/১৬৫

বর্ণনাটিতে খাদীজার (রা) ওফাতের বছরে বিয়ের কথা এসেছে।[৩৯]

অধিকাংশ গবেষকের সিদ্ধান্ত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহের গরিষ্ঠ অংশ যা সমর্থন করে তা হলো, খাদীজা (রা) নুবুওয়াতের দশম বছরে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে রমজান মাসে ইনতিকাল করেন এবং তার একমাস পরে শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) আয়িশাকে (রা) বিয়ে করেন। তখন আয়িশার (রা) বয়স ছয় বছর। এই হিসাবে হিজরাত-পূর্ব তিন সনের শাওয়াল, মুতাবিক ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আয়িশার (রা) বিয়ে হয়। আল-ইসতী'য়াব গ্রন্থকার ইবন আবদিল বার এই মত সমর্থন করেছেন। মূলত বিয়ে হয়েছিল খাদীজার (রা) ওফাতের বছরেই এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তিন বছর পরে যখন নয় বছর বয়সে তাঁকে ঘরে তুলে নেন। আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা যা ইবন সা'দ নকল করেছেন, তাতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৪০]

বিয়ের পর আয়িশা (রা) প্রায় তিন বছর পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। দুই বছর তিন মাস মক্কায় এবং সাত/আট মাস হিজরাতের পর মদীনায়।

মক্কার পৌত্তলিকদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা ছেড়ে গেল, রাসূল (সা) তখন মদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত নিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আবু বকরের গৃহে আসতেন। একদিন অভ্যাসের বিপরীত চাদর দিয়ে মাথা-মুখ ঢেকে দুপুরের সময় উপস্থিত হন। আবু বকরের কাছে তখন তাঁর দুই মেয়ে আয়িশা ও আসমা বসা। রাসূল (সা) বললেন, আবু বকর! আপনার কাছে বসা লোকগুলিকে একটু সরিয়ে দিন, আমি কিছু কথা বলতে চাই। আবু বকর বললেন ঃ

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে অন্য কেউ নেই। আপনারই ঘরের লোক। রাসূল (সা) আসেন এবং হিজরাতের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন। 'আয়িশা ও আসমা–দুই বোন মিলে সফরের জিনিসপত্র গোছগাছ করেন। তারপর দুইজন মদীনার পথ ধরেন। তাঁরা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে মক্কায় শত্রুদের মধ্যে ছেড়ে যান।[৪১]

মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে পরিবার-পরিজনকে মদীনায় নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন হারিসা (রা) ও আবু রাফে'কে (রা) মক্কায় পাঠান। তাঁদেরকে দুইটি উট ও পাঁচশো দিরহাম দেন–যা আবু বকর (রা) রাসূলকে (সা) তাঁর প্রয়োজন পূরণের জন্য দিয়েছিলেন। আবু বকরও (রা) তাঁদের সাথে আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতকে দুই অথবা তিনটি উট দিয়ে পাঠান। তিনি মক্কায় অবস্থানরত পুত্র আবদুল্লাহকে বলে পাঠান যে, সে যেন আয়িশা, আসমা এবং তাঁদের মা উম্মু রুমানকে নিয়ে মদীনায় চলে আসে।

---

৩৯. বুখারী তাযবীজু 'আয়িশা; মুসনাদ-৬/১১৮; ইবন কাসীর-১/৩১৭; জাহাবী ঃ তারিখ-১/১৬৫

৪০. তাবাকাত-৮/৫৮,৫৯

৪১. হিজরাতের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ-১/৫৫২; কানযুল 'উম্মাল-৮৩৩৫ হায়াতুস সাহাব-১/৩৩৭

এই সকল লোক যখন মক্কা থেকে যাত্রা করেন তখন তালহা ইবন আবদিল্লাহ হিজরাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযাত্রী হন। আবু রাফে' ও যায়িদ ইবন হারিসার সংগে ফাতিমা, উম্মু কুলসুম, সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, উম্মু আয়মান ও উসামা ইবন যায়িদ এবং আবদুল্লাহ ইবন আবী বকরের সংগে উম্মু রূমান, আবদুল্লাহর দুই বোন–'আয়িশা ও আসমা ছিলেন।[৪২]

এই কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা করে যখন হিজাযের বনু কিনানার আবাসস্থল 'আল-বায়দ' পৌঁছে তখন আয়িশা (রা) ও তাঁর মা উম্মু রূমান (রা) যে উটের উপর আরোহী ছিলেন সেই উটটি তাঁদেকে নিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে পালালো। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন, এই বুঝি হাওদাসহ ছিটকে পড়ছেন। মেয়েদের যেমন স্বভাব, মার নিজের জানের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কলিজার টুকরা আয়িশার (রা) জন্য অস্থির হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। অনেক দূর যাওয়ার পর উটটি ধরে বশে আনা হয়। সবাই নিরাপদে ছিলেন এবং নিরাপদেই মদীনায় পৌঁছেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তখন মসজিদে নববী ও তার আশে-পাশের ঘর-বাড়ী নির্মাণ করছিলেন। তারই একটি ঘরে সাওদা (রা) এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যাদের থাকার ব্যবস্থা হয়।[৪৩]

আয়িশা (রা) আপনজনদের সাথে মদীনার বনু হারেস ইবন খাযরাজের মহল্লায় অবতরণ করেন এবং সাত-আট মাস সেখানে মায়ের সাথে বসবাস করেন। মক্কা থেকে মদীনায় আগত অধিকাংশ মুহাজিরের নিকট মদীনার আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। বহু নারী-পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবু বকর (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। অল্প বয়সী মেয়ে আয়িশা (রা) পিতার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে পিতার অবস্থা জানালে তিনি আবু বকরের (রা) জন্য দু'আ করেন। আবু বকর (রা) সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পিতাকে সুস্থ করে তোলার পর আয়িশা (রা) নিজেই শয্যা নিলেন। এবার পিতা মেয়ের সেবায় মনোযোগী হলেন। আবু বকর অসুস্থ মেয়ের শয্যার কাছে যেতেন এবং অত্যন্ত দরদের সাথে তাঁর মুখে মুখ ঘঁষতেন। অসুস্থতা এত মারাত্মক ছিল যে, আয়িশার (রা) মাথার প্রায় সব চুল পড়ে যায়।[৪৪]

বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর আবু বকর (রা), মতান্তরে উম্মু রূমান (রা) একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন? বললেন ঃ এখন আমার হাতে মোহর আদায় করার মত অর্থ নেই। আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার অর্থ গ্রহণ করুন। আমি ধার দিচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বারো উকিয়া ও এক নশ (=পাঁচশো দিরহাম) আবু বকরের (রা) নিকট থেকে ধার নিয়ে আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন।

---

৪২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৯, ২৭০

৪৩. তাবাকাত-৮/৬২; বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৫২; আল-ইসাবা-৪/৪৫০; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭০

৪৪. বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ; তাবাকাত-৮/৬৩

মদীনা ছিল যেন আয়িশার (রা) শ্বশুর বাড়ী। আনসারী মহিলারা নববধূকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আবু বকরের গৃহে আসলেন। আয়িশা (রা) তখন বাড়ীর আঙ্গিনায় খেজুর গাছের তলায় অন্য মেয়েদের সাথে খেলছেন। মা উম্মু রূমান (রা) তাকে ডাক দিলেন। মায়ের ডাক কানে যেতেই হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসেন। মা মেয়ের হাত ধরে দরজা পর্যন্ত এনে হাত-মুখ ধুইয়ে কেশ বিন্যাস করে দেন। তারপর সেই কক্ষে নিয়ে যান যেখানে অতিথি মহিলারা তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলেন। নববধূ কক্ষে প্রবেশ করতে২ মহিলারা বলে উঠলেন ঃ তোমার আগমন শুভ ও কল্যাণময় হোক। তাঁরা নববধূকে সাজালেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত হলেন।[৪৫]

এক পেয়ালা দুধ ছাড়া সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আর কিছুই উপস্থাপন করা হয়নি। আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ ছিলেন আয়িশার (রা) একজন খেলার সাথী। তিনি বলছেন, আমি ছিলাম আয়িশার বান্ধবী। আমি তাকে সাজিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থাপন করেছিলাম। আমার সাথে অন্যরাও ছিল। আমরা এক পেয়ালা দুধ ছাড়া সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে দেওয়ার মত আর কিছুই পাইনি। রাসূলুল্লাহ (সা) পেয়ালা থেকে সামান্য একটু দুধ মুখে দিয়ে আয়িশার দিকে এগিয়ে দেন। আয়িশা নিতে লজ্জা পাচ্ছে দেখে আমি তাকে বললাম ঃ 'রাসূলুল্লাহর দান ফিরিয়ে দিও না।' তখন সে অত্যন্ত লাজুক অবস্থায় গ্রহণ করে এবং সামান্য পান করে রেখে দিতে যায়। রাসূল (সা) তাকে বললেন ঃ তোমার সাথীদের দাও। আমরা বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সময় আমাদের পান করার ইচ্ছা নেই। তিনি বললেন ঃ মিথ্যা বলবে না। মানুষের প্রতিটি মিথ্যা লেখা হয়। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ ক্ষুধা ও মিথ্যা একত্র করো না। মিথ্যা লেখা হয়। এমন কি ছোট ছোট মিথ্যাও।[৪৬]

সহীহ বর্ণনা সমূহের ভিত্তিতে একথা জানা যায় যে, আয়িশার (রা) স্বামীগৃহে গমন হয় প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে। আল্লামাহ আয়নী লিখেছেন, হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর তিনি স্বামীগৃহে যান।[৪৭] এ ধরনের একটি কথা আয়িশা (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হিজরাতের তিন বছর পূর্বে বিয়ে করেন এবং হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাওয়াল মাসে আমার সাথে বাসর করেন। বিয়ের সময় আমি ছয় বছরের এবং বাসরের সময় নয় বছরের এক মেয়ে।[৪৮]

কিন্তু এ বর্ণনাসঠিক হতে পারে না। কারণ, এই বর্ণনার ভিত্তিতে আয়িশার (রা) তখন বয়স হবে দশ বছর। অথচ হাদীস ও ইতিহাসের সকল গ্রন্থ এ ব্যাপারে একমত যে, সেই সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।[৪৯]

---

৪৫. বুখারী ঃ বাবু তাযবীযু 'আয়িশা; মুসলিম ঃ কিতাবুন নিকাহ; তাবাকাত-৮/৬২; আনসাবুল আশরাফ-১/৪১০

৪৬. মুসনাদ-৬/৪৩৮,৪৫২-৪৫৩,৪৫৮; ইবন মাজা-(৩২৯৮); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৩

৪৭. 'উমদাতুল কারী-১/৫৪

৪৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১০

৪৯. আবু দাউদ-(৯৪৩৫) ঃ কিতাবুল আদাব; বুখারী ঃ ৭/২৭ বাবু তাযবীজুন নাবী আয়িশা; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১৪৮, ১৪৯

আয়িশার (রা) বিয়ে ও স্বামীগৃহে গমন উভয় কাজই সম্পন্ন হয় শাওয়াল মাসে। এ কারণে তিনি আজীবন এ ধরনের অনুষ্ঠান শাওয়াল মাসে করতে পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন ঃ আমার বিয়ে ও স্বামীগৃহে গমন– দুইটাই হয় শাওয়ালে। আর এ কারণে স্বামীর নিকট আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী আর কে ছিল?[৫০]

রাসূলে কারীম (সা) মসজিদে নববীর পাশে নির্মিত ছোট্ট একটি ঘরে আয়িশাকে এনে উঠান। আজ যেখানে রাসূল (সা) শুয়ে আছেন সেটাই আয়িশার (রা) ঘর। পরবর্তীকালে আয়িশা (রা) বলতেন ঃ এখন আমি যে ঘরে আছি, আমার এই ঘরে রাসূল (সা) আমাকে প্রথম এনে উঠান। তিনি এখানেই ওফাত পেয়েছেন। রাসূল (সা) ঘরের দরজা সোজাসুজি মসজিদের একটি দরজা বানিয়ে নেন।[৫১]

পূর্বের বর্ণনাসমূহ থেকে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, আয়িশার (রা) বিয়ে, স্বামীগৃহে গমন, তথা প্রতিটি অনুষ্ঠান কত আড়ম্বরহীন ও সাদামাটা ছিল। তাতে অতিরঞ্জিত প্রদর্শনী বা বাহুল্য ভাবের কিছু ছিল না।

আয়িশার (রা) বিয়ের মাধ্যমে তৎকালীন আরবের বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিলোপ ঘটে। তারা সকল প্রকার ভাই, এমনকি মুখে বলা ভাইয়ের মেয়েকেও বিয়ে করা বৈধ মনে করতো না। এ কারণে খাওলার (রা) প্রস্তাব শুনে আবু বকর (রা) বলে ওঠেন ঃ এটা কি বৈধ? আয়িশা তো রাসূলুল্লাহর (সা) ভাতিজী। একথা রাসূলুল্লাহর (সা) কানে গেলে তিনি বললেন ঃ আবু বকর আমার ইসলামী ভাই। তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে বৈধ।

আর একটি কুপ্রথা হলো, শাওয়াল মাসে তারা বিয়ে-শাদী করতো না। অতীতে কোন এক শাওয়াল মাসে আরবে প্লেগ দেখা দেয়। এ কারণে তারা এ মাসটিকে অশুভ বলে বিশ্বাস করতো এবং এ মাসে তারা কোন বিয়ের অনুষ্ঠান করতো না।[৫২]

তৎকালীন আরবের কিছু লোকের এ বিশ্বাসও ছিল যে, এ মাসে নববধূকে ঘরে আনলে তাদের সম্পর্ক টেকে না। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এমন বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আয়িশার (রা) এ বিয়ে কুঠারাঘাত করে। নববধূকে ঘরে আনার অনুষ্ঠানটি হয় দিনের বেলায়। এটাও ছিল প্রচলিত প্রথার বিপরীত।[৫৩]

আরেকটি প্রথা ছিল, দুলহানের আগে আগে তারা আগুন জ্বালাতো। নব দম্পতির প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হতো কোন মঞ্চে অথবা তাঁবুর অভ্যন্তরে। এই সকল কুপ্রথার মূলোৎপাটন ঘটে এই বিয়ের মাধ্যমে।

---

৫০. বুখারী ও মুসলিম ঃ কিতাবুন নিকাহ; ইবন মাজাহ-(১৯৯০) কিতাবুন নিকাহ; তাবাকাত-৮/৫৯; সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা-২/১৬৪

৫১. তাবাকাত-৮/৬৩

৫২. প্রাগুক্ত-৮/৬১

৫৩. ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ-১/৪১৬

শিক্ষা-দীক্ষা

প্রাচীন আরবে যেখানে পুরুষদেরই লেখা-পড়ার কোন প্রচলন ছিল না সেখানে মেয়েদের তো কোন প্রশ্নই আসেনা। ইসলামের সূচনাকালে মক্কার গোটা কুরাইশ খান্দানে মাত্র ১৭ (সতেরো) ব্যক্তি লিখতে-পড়তে জানতো। তাদের মধ্যে একজন মাত্র মহিলা ছিলেন– শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহ।[৫৪] ইসলাম পড়া-লেখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় খুব দ্রুত এর প্রসার ঘটে।

রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণের মধ্যে হাফসা (রা) ও উম্মু সালামা (রা) কিছু লেখাপড়া জানতেন। হযরত হাফসা (রা) খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহর (রা) নিকট লিখতে ও পড়তে শেখেন।[৫৫] সে সময় আরো কিছু মহিলা সাহাবী লেখাপড়া শেখেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, বিশেষত 'আয়িশাকে (রা) অপরিণত বয়সে গ্রহণের মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্যের বরকত যদিও অগণিত পুরুষকে সৌভাগ্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দিচ্ছিল, তথাপি স্বাভাবিক কারণে সাধারণ মহিলারা এ সৌভাগ্য লাভে সক্ষম ছিল না। রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের মাধ্যমেই তাঁর সাহচর্যের ফয়েজ ও বরকতের রহস্য গোটা বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে প্রচারিত ও প্রসারিত হওয়া সম্ভব ছিল।

একমাত্র 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া অন্য সকল আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন। এদিক দিয়ে একমাত্র 'আয়িশা (রা) শুধুমাত্র নুবুওয়াতের ফয়েজ ও বরকত লাভে ধন্য হন। শৈশব ও কৈশোর বয়স হলো মানুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সময়। সৌভাগ্য বশত এ বয়সের পুরোটা সময় তাঁর নবীর (সা) একান্ত সান্নিধ্যে কাটে। ফলে তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেন যাতে বিশ্বের মানব জাতির অর্ধেক অংশের জন্য আলোক বর্তিকা হয়ে যান।

গোটা কুরাইশ খান্দানের মধ্যে কৃষ্টি বিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে আবু বকর (রা) ছিলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। 'আয়িশা (রা) এমন পিতার তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। ফলে বংশগতভাবে তাঁর মধ্যে এ দুইটি শাস্ত্রের প্রীতি ও পারদর্শিতা সৃষ্টি হয়।

হযরত আবু বকর (রা) নিজের সন্তানদের সুশিক্ষা ও আদব-আখলাক শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষে কঠোরতাও করতেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। একবার ছেলে আবদুর রহমানকে মারতে উদ্যত হন শুধু এই কারণে যে, মেহমানদের খাবার দিতে দেরী করেছিলেন। বিয়ের পরেও

---

৫৪. বালাজুরী ঃ ফুতুহুল বুলদান ঃ 'ফাসলুল খত' অধ্যায়

৫৫. সুনানু আবী দাউদ ঃ কিতাবুত তিব্ব

'আয়িশা (রা) নিজের কোন ভুল-ত্রুটির জন্য পিতাকে দারুণ ভয় করতেন।[৫৬] অনেক ক্ষেত্রে পিতা তাঁকে ভীষণ বকাঝকা করতেন। মাঝে মধ্যে গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করতেন না।[৫৭] একবার রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) সামনে তাঁকে মারতে উদ্যত হন। রাসূল (সা) তাকে বাঁচিয়ে নেন।[৫৮] আর একবার রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) উপস্থিতিতে 'আয়িশার (রা) পাঁজরে জোরে থাপ্‌পড় মারেন। রাসূল (সা) তখন বলে ওঠেন ঃ আবু বকর! আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন! আমরা এমনটি চাইনি।[৫৯]

হযরত 'আয়িশার (রা) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সূচনা হয় স্বামীর ঘরে যাওয়ার পর। এ সময়ে তিনি পড়তে শেখেন। তিনি দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি লিখতে জানতেন না।[৬০] হাদীসে এসেছে, তাঁর জন্য কুরআন লেখালেখির কাজ করতেন তাঁর দাস জাকওয়ান।[৬১] তবে কিছু বর্ণনায় এসেছে– 'অমুক চিঠির জবাবে তিনি একথা লেখেন।' সম্ভবত বর্ণনাকারীরা 'লিখিয়েছেন' কথাটির স্থলে 'লেখেন' বলে দিয়েছেন। সাধারণত এমনই হয়ে থাকে।

যাহোক, লেখা ও পড়া মানুষের জ্ঞানের বাহ্যিক মাপকাঠি। প্রকৃত জ্ঞানের মাপকাঠি তার থেকে অনেক উঁচু স্তরে। মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার পূর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জন, দীনের আবশ্যকীয় বিষয় ও শরীয়াতের গূঢ় রহস্য জানা এবং আল্লাহর কালাম ও আহকামে নববীর জ্ঞান লাভই হচ্ছে সর্বোত্তম শিক্ষা। হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন এই সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাছাড়া ইতিহাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান।

ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন পিতার নিকট থেকে।[৬২] চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থান থেকে যে সকল লোকজন ও প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে আসতো তাদের নিকট থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতে অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতেন। আরবের চিকিৎসকরা যেখানে যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিতেন, 'আয়িশা (রা) স্মৃতিতে তা ধরে রাখতেন।

একদিন 'উরওয়া 'আয়িশাকে (রা) বললেন ঃ আমি আপনার ফিকাহ্, কাব্য ও প্রাচীন আরবের ইতিহাসের জ্ঞান দেখে বিস্মিত হইনি। কারণ, এ জ্ঞান অর্জন আপনার জন্য সম্ভব। কিন্তু আপনার 'তিব্ব' বা চিকিৎসা বিদ্যার জ্ঞান দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনা। এ জ্ঞান আপনি কিভাবে ও কোথা থেকে অর্জন করেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ 'উরওয়া! রাসূল (সা) তাঁর শেষ জীবনে অসুস্থ থাকতেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর

---

৫৬. সহীহ্ মুসলিম ঃ বাবুল কাসামে বায়নায যাওজাত
৫৭. বুখারী ঃ কিতাবুন নিকাহ্; আল-মুওয়াত্তা-১/৭৪
৫৮. আবূ দাউদ ঃ আল-আদাব ঃ বাবুল মাযাহ (৪৯৯৯)
৫৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৭
৬০. মুসনাদ ৬/৭৩
৬১. প্রাগুক্ত ৬/৭৪; তিরমিজী-১/৩৯৭
৬২. প্রাগুক্ত ৬/৬৭

কাছে লোক আসতো। তারা নানা রকম ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিত। আর আমি সেইভাবে চিকিৎসা করতাম। সেখান থেকেই এই জ্ঞান অর্জন করেছি। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উরওয়া প্রশ্ন করেন ঃ এই তিব্বের জ্ঞান আপনি কোথা থেকে অর্জন করেছেন? 'আয়িশা (রা) জবাব দেন ঃ আমি অথবা অন্য কোন লোক অসুস্থ হলে যে ওষুধ ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়, সেখান থেকে শিখেছি। তাছাড়া একজন আরেকজনকে যেসব রোগ ও ওষুধের কথা বলে আমি তাও মনে রাখি।[৬৩]

দীনী জ্ঞান অর্জনের তো কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। শরীয়াতের মহান শিক্ষক ঘরেই ছিলেন। রাত-দিন তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হতেন। প্রতিদিন মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহর (সা) তা'লীম ও ইরশাদের মজলিস বসতো। মসজিদের গাঁ ঘেঁষেই ছিল হযরত 'আয়িশার (রা) হুজরা। এ কারণে রাসূল (সা) বাইরে লোকদের যে শিক্ষা দিতেন, 'আয়িশা (রা) ঘরে বসেই তাতে শরিক থাকতেন। কখনো কোন কথা দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে বুঝতে না পারলে রাসূল (সা) ঘরে এলে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতেন।[৬৪] কখনো কখনো তিনি মসজিদের কাছাকাছি চলে যেতেন।[৬৫] তাছাড়া রাসূল (সা) মহিলাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সপ্তাহে একটি দিন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন।[৬৬]

দিবা-রাত্র ইল্‌ম ও হিকমাত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা তাঁর কানে আসতো। তাঁর নিজেরও অভ্যাস ছিল, প্রতিটি বিষয় দ্বিধাহীন চিত্তে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থাপন করা। তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্ত হতেন না। একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّبَ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো বলেছেন–

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا - (الانشقاق)

অর্থাৎ, তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে। রাসূল (সা) বললেন ঃ এ হলো আমলের উপস্থাপন। কিন্তু যার আমলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য।[৬৭]

একবার ওয়াজ-নসীহতের সময় রাসূল (সা) বললেন ঃ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ নগ্ন অবস্থায় উঠবে। 'আয়িশার (রা) মনে খট্‌কা লাগলো। তিনি বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী-পুরুষ এক সংগে উঠবে। তাহলে একে অন্যের প্রতি কি দৃষ্টি পড়বে না? রাসূল (সা) বললেন ঃ সময়টা হবে অতি ভয়ংকর। অর্থাৎ একজনের অন্যজনের

---

৬৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮২-১৮৩
৬৪. মুসনাদ-৬/৭৭
৬৫. প্রাগুক্ত ৬/১৫৯
৬৬. বুখারী ঃ কিতাবুল ইল্‌ম
৬৭. প্রাগুক্ত

ব্যাপারে কোন খবরই থাকবে না।[৬৮]

একদিন 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কাফির-মুশরিকরা যে ভালো কাজ করে তার সাওয়াব তারা পাবে কিনা? আবদুল্লাহ ইবন জাদ'আন নামে মক্কায় একজন সৎ স্বভাব ও কোমল অন্তরের মুশরিক ছিল। সে ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-ফাসাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে একটি বৈঠকে সমবেত করে। তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন। 'আয়িশা (রা) প্রশ্ন করেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবন জাদ'আন জাহিলী যুগে মানুষের সাথে সদয় ব্যবহার করতো। দরিদ্র ও অনাহারক্লিষ্টদেরকে আহার করাতো। তার এ কাজ কি উপকারে আসবে না?" তিনি জবাব দিলেন ঃ না, 'আয়িশা। সে কোনদিন একথা বলেনি যে, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

জিহাদ ইসলামের একটি অন্যতম ফরজ। 'আয়িশার (রা) ধারণা ছিল, অন্য ফরজের ক্ষেত্রে যেমন নারী-পুরুষের কোন প্রভেদ নেই, তেমনি এ ক্ষেত্রেও তাই হবে। একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করেই বসলেন । উত্তর পেলেন ঃ হজ্জ হলো নারীদের জিহাদ।[৬৯]

আর একদিন প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদ হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। আমরা নারীরা কি জিহাদ করবো না? বললেন ঃ না। তবে সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্জে মাবরূর।[৭০]

বিয়েতে বর-কনে উভয়ের সম্মতি থাকা শর্ত। কুমারী মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে লজ্জায় মুখে সম্মতি প্রকাশ করে না। এ কারণে 'আয়িশা (রা) একদিন প্রশ্ন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিয়েতে তো মেয়ের সম্মতি প্রয়োজন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হ্যাঁ, প্রয়োজন। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ মেয়েরা তো লজ্জায় চুপ থাকে। রাসূল (সা) বললেন, তার চুপ থাকাই সম্মতি।[৭১]

একদিন রাসূল (সা) তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর বিতর না পড়েই বিশ্রামের জন্য একটু শোয়ার ইচ্ছা করলেন। 'আয়িশা (রা) বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিতর না পড়েই শুয়ে যাচ্ছেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায়না।[৭২] বাহ্যত 'আয়িশার (রা) এ ধরনের প্রশ্ন বেয়াদবী বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি সাহসিকতা না দেখালে উম্মাতে মুহাম্মাদী নুবুওয়াতের গূঢ় রহস্য থেকে অজ্ঞ থেকে যেত।

ইসলামে প্রতিবেশীর বহু অধিকারের কথা এসেছে। আর এই অধিকার দানের সুযোগ

---

৬৮. প্রাগুক্ত ঃ বাবু কায়ফাল হাশার

৬৯. প্রাগুক্ত ঃ বাবু জিহাদিন নিসা; তাবাকাত-৮/৭২

৭০. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ফাদলিল হাজ্জ আল মাবরূর

৭১. মুসলিম ঃ বাবুন নিকাহ,

৭২. বুখারী ঃ বাবু ফাদলু মান কামা রামাদান

আসে বেশীর ভাগ মেয়েদেরই। কিন্তু প্রতিবেশী একাধিক হলে কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে? তাই 'আয়িশা (রা) একদিন প্রশ্ন করলেন। রাসূল (সা) জবাব দিলেন ঃ যে প্রতিবেশীর দরজা তোমার ঘরের অধিক নিকটবর্তী, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৭৩]

একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ তো মৃত্যুকে পছন্দ করে না? রাসূল (সা) বললেন ঃ আমার কথার এই অর্থ নয়। তার অর্থ হলো, মুমিন ব্যক্তি যখন আল্লাহর রহমত, রিজামন্দী এবং জান্নাতের অবস্থার কথা শোনে তখন তার অন্তর আল্লাহর জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহও তার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকেন। আর কাফির ব্যক্তি যখন আল্লাহর আজাব ও অসন্তুষ্টির কথা শোনে তখন সে আল্লাহর সামনে যেতে অপছন্দ করে। আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।[৭৪]

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ 'তাকে আসতে দাও। সে তার গোত্রের খুব খারাপ লোক।' লোকটি এসে বসলো। রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্য, মনযোগ ও আন্তরিকতা সহকারে তার সাথে কথা বললেন। 'আয়িশা (রা) খুব অবাক হলেন। লোকটি চলে গেলে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো লোকটিকে ভালো জানতেন না। কিন্তু সে যখন এলো, তার সাথে এমন আন্তরিকতা ও নম্রভাবে কথা বললেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! সবচেয়ে খারাপ মানুষ ঐ ব্যক্তি যার ভয়ে মানুষ তার সাথে মেলামেশা ছেড়ে দেয়।

একবার এক ব্যক্তি এসে কিছু সাহায্য চাইলো। হযরত 'আয়িশার (রা) ইঙ্গিতে দাসী কিছু জিনিস নিয়ে দিতে চললেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! গুনে গুনে দিবে না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দিবেন।[৭৫] আর একবার রাসূল (সা) বলেন ঃ 'আয়িশা! খোরমার ছোট্ট একটি টুকরাও যদি হয়, ভিক্ষুককে তাই দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচ। সেটি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ খেলে তো কিছু হবে এবং তার পেট ভরবে। এর থেকে আর ভালো কি হতে পারে।

আর একবার রাসূল (সা) দু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে দরিদ্র অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ, দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং কিয়ামতের দিন দরিদ্রদের সাথেই উঠাও। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল (সা) বললেন ঃ সম্পদহীনরা সম্পদশালীদের চেয়ে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। 'আয়িশা! কোন ভিক্ষুককে কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিবে না। তা সে খোরমার একটি টুকরাই হোক না কেন। দরিদ্রদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে নিজের পাশে বসাবে।[৭৬]

---

৭৩. মুসনাদ-৬/১৭৫
৭৪. জামে 'তিরমিজী ঃ কিতাবুল জানায়িজ
৭৫. আবূ দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব
৭৬. তিরমিজী ঃ আবওয়াবুয যুহ্দ

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) এ জাতীয় অসংখ্য জিজ্ঞাসা ও তার জবাব বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ এগুলিই ছিল তাঁর নিত্যদিনের পাঠ। বিভিন্ন নৈতিক উপদেশ ছাড়াও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তথা দ্বীন ও দুনিয়ার অসংখ্য কথা রাসূলে পাক (সা) হযরত 'আয়িশাকে (রা) অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শেখাতেন। 'আয়িশাও (রা) অতি আগ্রহ সহকারে শিখতেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা আমল করতেন।

হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে জানার আগ্রহ ছিল অতি তীব্র। যে সকল মুহূর্তে রাসূলুল্লাহর (সা) অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করা থেকে বিরত থাকতেন না। মূলতঃ তিনি স্বামী হযরত রাসূলে পাকের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তাঁর কাছে এত খোলামেলা ও দুঃসাহসী হতে পারতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কারণে স্ত্রীদের উপর বিরক্ত হয়ে অঙ্গীকার করেন যে, আগামী একমাস কোন স্ত্রীর কাছেই যাবেন না। উনত্রিশ দিন এই অঙ্গীকারের উপর অটল থাকেন। ঘটনাক্রমে সেই চন্দ্র মাসটি ছিল উনত্রিশ দিনের। রাসূল (সা) পরের মাসের প্রথম তারিখ অর্থাৎ ৩০তম দিনে 'আয়িশার (রা) নিকট যান। আপতঃদৃষ্টিতে 'আয়িশার (রা) উল্লসিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, তিনি প্রশ্ন করেছেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বলেছেন, একমাস আমাদের কাছে আসবেন না। একদিন আগে কিভাবে আসলেন? রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

সংসার জীবন

হযরত 'আয়িশা (রা) পিতৃগৃহ থেকে বউ হয়ে যে ঘরে এসে ওঠেন তা কোন আলিশান অট্টালিকা ছিল না। মদীনার বনু নাজ্জার মহল্লার মসজিদে নববীর চারপাশে ছোট্ট ছোট্ট কিছু কাঁচা ঘর ছিল, তারই একটিতে তিনি এসে ওঠেন। ঘরটি ছিল মসজিদের পূর্ব দিকে। তার একটি দরজা ছিল পশ্চিম দিকে– মসজিদের ভিতরে। ফলে মসজিদ ঘরের আঙ্গিনায় পরিণত হয়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সেই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তিনি যখন মসজিদে ই'তিকাফ করতেন, মাথাটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন, আর 'আয়িশা (রা) চুলে চিরুনী করে দিতেন।[৭৭] কখনো মসজিদে বসেই ঘরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কোন কিছু 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে চেয়ে নিতেন।[৭৮]

ঘরটির প্রশস্ততা ছিল ছয় হাতেরও বেশী। দেয়াল ছিল মাটির। খেজুর পাতা ও ডালের ছাদ ছিল। তার উপরে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কম্বল দেওয়া ছিল। এতটুকু উঁচু ছিল যে, একজন মানুষ দাঁড়ালে তার হাতে ছাদের নাগাল পাওয়া যেত। এক পাল্লার একটি দরজা ছিল; কিন্তু তা কখনো বন্ধ করার প্রয়োজন পড়েনি।[৭৯] পর্দার জন্য দরজায় একটি কম্বল

---

৭৭. বুখারী ঃ আল-ইতিকাফ; মুসনাদ-৬/২৩১

৭৮. বুখারী ঃ কিতাবুল হায়জ

৭৯. বুখারী ঃ বাবুল নিসা; তাবাকাত -৮/৭১

ঝুলানো থাকতো। এই ঘরের লাগোয়া আর একটি ঘর ছিল– যাকে 'মাশরাবা' বলা হতো। একবার রাসূল (সা) স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাকা কালে এক মাস এখানেই কাটান।

ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল– একটি খাট, একটি চাটাই, একটি বিছানা, একটি বালিশ, খোরমা-খেজুর রাখার দুইটি মটকা, পানির একটি পাত্র এবং পান করার একটি পেয়ালা। এর বেশী কিছু নয়। বিভিন্ন হাদীসে একাধিক স্থানে এইসব জিনিসের নাম এসেছে। যে ঘরটি ছিল দুনিয়া ও আখিরাতের সকল আলোর উৎস, সেই ঘরের বাসিন্দাদের রাতের বেলা একটি বাতি জ্বালানোর সামর্থ ছিল না। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ একাধারে প্রায় চল্লিশ রাত চলে যেত ঘরে কোন বাতি জ্বলতো না।

ঘরে সর্বসাকুল্যে দুইটি মানুষ– রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশা (রা)। কিছুদিন পর 'বুরায়রা' (রা) নাম্নী একজন দাসী যুক্ত হন।[৮০] যতদিন 'আয়িশা ও সাওদা– মাত্র দুই স্ত্রীই ছিলেন, রাসূল (সা) একদিন পর পর 'আয়িশার (রা) ঘরে রাত কাটাতেন। পরে আরো কয়েকজনকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করলে এবং হযরত সাওদা (রা) স্বেচ্ছায় স্বীয় বারির দিনটি 'আয়িশাকে দান করলে প্রতি নয় দিনে দুই দিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটাতেন।[৮১]

ঘর-গৃহস্থালীর গোছগাছ ও পরিপাটির বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়তো না। খাদ্য খাবার তৈরী ও রান্নাবান্নার সুযোগ খুব কমই আসতো। হযরত 'আয়িশা (রা) নিজেই বলতেন ঃ কখনো একাধারে তিন দিন এমন যায়নি যখন নবী পরিবারের লোকেরা পেট ভরে খেয়েছেন।[৮২] তিনি আরো বলতেন ঃ মাসের পর মাস ঘরে আগুন জ্বলতো না।[৮৩] এ সময় খেজুর ও পানির উপরই কাটতো।[৮৪] খায়বার বিজয়ের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের (পবিত্র সহধর্মিণীগণ) প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করে দেন।[৮৫] আবদুর রহমান আল-আ'রাজ মদীনায় তাঁর মজলিসে বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশার (রা) জীবিকার জন্য খায়বারের ফসল থেকে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ ওয়াসাক যব মতান্তরে গম দিতেন।[৮৬] কিন্তু তাঁর দানশীলতার কারণে এই পরিমাণ খাদ্য সারা বছরের জন্য কখনো যথেষ্ট ছিল না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) সব সময় নবী-পরিবারে উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। বিশেষ করে যেদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে অবস্থান করতেন, লোকেরা ইচ্ছা করেই

---

৮০. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ইসতিয়ানুল সুকাতির; বাবুস সাদাকা; ও আল-ইফ্ক
৮১. তাবাকাত ঃ ৮/৬৫
৮২. বুখারী ঃ মায়ীশাতুন নাবী
৮৩. মুসনাদ ৬/২১৭, ২৩৭, বুখারীতে 'আল-আত'য়িমা' অধ্যায়ে এক মাসের বর্ণনা এসেছে
৮৪. বুখারী ঃ বাবু কায়ফাকানা 'আয়তন নাবী
৮৫. আবূ দাউদ ঃ হুকমু আরদি খায়বার
৮৬. তাবাকাত-৮/৬৯

সেই দিন বেশী করে হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন।[৮৭]

অনেক সময় এমন হতো যে, রাসূল (সা) বাইরে থেকে এসে জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'আয়িশা! কিছু আছে কি? তিনি জবাব দিতেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছুই নেই। তারপর সবাই মিলে রোযা রাখতেন।[৮৮] অনেক সময় কোন কোন আনসার পরিবার দুধ পাঠাতো। তাই পান করেই পরিতৃপ্ত থাকতেন।[৮৯] উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময় আমাদের অধিকাংশ দিনের খাবার ছিল দুধ।[৯০]

রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থলীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল হযরত বিলালের (রা) উপর। তিনি সারা বছরের খাদ্যশস্য বন্টন করতেন। প্রয়োজন পড়লে ধার-কর্জ করতেন।[৯১]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যখন ওফাত পান তখন গোটা আরব ইসলামের ছায়াতলে এসে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ এসে বায়তুল মালে জমা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও রাসূল (সা) যেদিন ওফাত পান সেদিন হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরে একদিন চলার মতও খাবার ছিল না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালেও হযরত 'আয়িশার (রা) খায়বারে উৎপাদিত ফসল থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য পেতেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) সবার জন্য নগদ ভাতার প্রচলন করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক দশহাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন। কিন্তু 'আয়িশার (রা) জন্য নির্ধারণ করেন বারো হাজার। এর কারণ স্বরূপ তিনি বলতেন ঃ 'আয়িশা ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী।[৯২] একটি বর্ণনায় এসেছে, খলীফা 'উমার (রা) তাঁর সময়ে খায়বারে উৎপন্ন ফসলের অংশ অথবা ভূমি গ্রহণের এখতিয়ার দান করেন। হযরত 'আয়িশা (রা) তখন ভূমি গ্রহণ করেন।[৯৩]

অর্থ-সম্পদ যা কিছু তাঁর হাতে আসতো– গরীব-মিসকীনদের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। খলীফা হযরত 'উসমান (রা) থেকে নিয়ে আমীর মু'য়াবিয়া (রা) পর্যন্ত উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) ছিলেন হযরত 'আয়িশার (রা) ভাগ্নে– যিনি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) পরে হিজাযের খলীফা হন। তিনি খালার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। কিন্তু যেদিন বায়তুল মাল থেকে ভাতা না আসতো সেদিন তাঁর গৃহে অভুক্ত থাকার উপক্রম হতো।[৯৪]

স্বভাবগতভাবে হযরত 'আয়িশার (রা) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বোধ থাকা সত্ত্বেও বয়স কম হওয়ার

---

৮৭. বুখারী ঃ ফাদলু 'আয়িশা
৮৮. মুসনাদ-৬/৪৯
৮৯. প্রাগুক্ত-৬/২৪৪
৯০. আনসাবুল আশরাফ-১/৫১৩
৯১. আবূ দাউদ ঃ কবূলু হাদা ইয়াল মুশরিকীন
৯২. তাবাকাত-৮/৭৪; আল-মুসতাদরিক ঃ জিকরু 'আয়িশা।
৯৩. বুখারী ঃ বাবুল মুযারিয়া বিশ-শাতরে।
৯৪. প্রাগুক্ত বাবু মানাকিবি কুরাইশ।

কারণে মাঝে মধ্যে ভুল-ত্রুটি হয়ে যেত। ঘরে গম পিষে আটা বানিয়ে ঘুমিয়ে যেতেন, ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলতো।[৯৫] একদিন তিনি নিজ হাতে আটা পিষে রুটি তৈরী করেন। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) আসার প্রতীক্ষায় থাকেন। সময়টি ছিল রাতের বেলা। এক সময় রাসূল (সা) আসলেন এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘুমে হযরত 'আয়িশার (রা) চোখ দুইটি বন্ধ হয়ে এলো। এই ফাঁকে প্রতিবেশীর একটি ছাগল ঘরে ঢুকে সবকিছু খেয়ে ফেললো। রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স্কা স্ত্রীদের তুলনায় তিনি খাদ্য-খাবার ভালো পাকাতে পারতেন না।[৯৬]

দাম্পত্য জীবন

রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) যুগল জীবন এবং তাঁদের মধ্যের মধুর সম্পর্কের একটি চিত্র আমাদের সামনে থাকা দরকার। ইসলাম নারীকে না অতি পবিত্র মনে করে দেবীর আসনে বসিয়েছে, আর না তাকে কেবল পুরুষের ভোগের বস্তু বলে মনে করেছে। নারী সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক কালের পৃথিবীর মানুষের ধারণা মূলত এমনই। তাই কোন কালেই কোন সমাজে নারী সঠিক মর্যাদা লাভ করেনি। একমাত্র ইসলামই সঠিক মর্যাদা দিয়েছে। ইসলাম নারীর সর্বোত্তম যে পরিচিতি তুলে ধরেছে তা হচ্ছে, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বিশ্বে নারী হলো পুরুষের প্রশান্তি ও সান্ত্বনার উৎস। কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً - (الروم-٢١)

–আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর্ রূম-২১)

আল্লাহ পাকের এই ঘোষণার বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) দাম্পত্য জীবনের মধ্যে। রাসূল (সা) বলেছেন।[৯৭]

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُم لاِهْلِهِ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لاَهْلِىْ -

–তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের সকলের চেয়ে উত্তম।

তাঁদের নয় বছরের দাম্পত্য জীবনে ছিল গভীর ভালোবাসা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সীমাহীন আবেগ ও নিষ্ঠা। কঠিন দারিদ্র, অনাহার, তথা সকল প্রতিকূল পরিবেশেও

---

৯৫. প্রাগুক্ত-আল-ইফ্ক।

৯৬. আবূ দাউদ ঃ বাবু মান আফসাদা শায়য়ান।

৯৭. বুখারী ঃ বাবু হুসনুল মুয়াশারা।

তাঁদের এ মধুর সম্পর্কে একদিনের জন্যও ফাটল দেখা যায়নি। কোন রকম তিক্ততা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়নি।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'আয়িশাকে (রা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একথা গোটা সাহাবী সমাজের জানা ছিল। এ কারণে রাসূল (সা) যেদিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটাতেন সেদিন তাঁরা বেশী বেশী হাদিয়া তোহফা পাঠাতেন। এতে অন্যান্য স্ত্রীরা ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁরা চাইতেন রাসূল (সা) যেন লোকদের নির্দেশ দেন, তিনি যেদিন যেখানে থাকেন লোকেরা যেন সেখানেই যা কিছু পাঠাবার, পাঠায়। কিন্তু সে কথা বলার হিম্মত কারো হতো না। এই জন্য তাঁরা সবাই মিলে তাঁদের মনের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূলে পাকের কলিজার টুকরো ফাতিমাকে (রা) বেছে নেন। রাসূল (সা) ফাতিমার (রা) বক্তব্য শুনে বললেন, 'মা, আমি যা চাই, তুমি কি তা চাও না? ফাতিমা পিতার ইচ্ছা বুঝতে পারলেন। তিনি ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীরা আবার তাঁকে পাঠাতে চাইলেন; কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে তাঁরা হযরত উম্মু সালামাকে (রা) পাঠালেন। তিনি ছিলেন একজন বয়স্কা, বুদ্ধিমতী ও রসিক মহিলা। তিনি বেশ কায়দা করে তাঁদের মনের কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ উম্মু সালামা! 'আয়িশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে বিরক্ত করবেনা। কারণ 'আয়িশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর লেপের নীচে আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি।[৯৮] ইমাম জাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই জবাব দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অন্যদের তুলনায় 'আয়িশাকে (রা) সর্বাধিক ভালোবাসার অন্যতম কারণ হলো, আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহর নির্দেশেই তিনি 'আয়িশাকে (রা) এত ভালোবাসতেন।[৯৯]

হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা) 'জাতুস সালাসিল' যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ পৃথিবীতে আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? বললেন ঃ 'আয়িশা। তিনি আবার বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার জিজ্ঞাসা পুরুষ সম্পর্কে। বললেন ঃ 'আয়িশার পিতা।[১০০]

একদিন 'উমার (রা) মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হাফসাকে (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ তুমি 'আয়িশার সাথে পাল্লা দিতে যেও না। কারণ, সে তো রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা।[১০১]

একবার এক সফরে চলার পথে 'আয়িশার (রা) উটনীটি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তাঁকে নিয়ে দৌড় দেয়। এতে রাসূলে পাক এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে, তাঁর মুখ দিয়ে তখন উচ্চারিত হতে শোনা যায় ঃ 'ওয়া আরূসাহ!' হায়! আমার বধূ![১০২]

---

৯৮. বুখারী ঃ ফা'দলু 'আয়িশা; আল-হিবা; মুসলিম ঃ ফাদায়িল আস-সাহাবা (২৪৪১)।

৯৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪৩

১০০. বুখারী ঃ ফাদায়িল আসহাবিল নাবী, গাযওয়াতু জাতিস সালাসিল; মুসলিম ঃ ফাদায়িলু আবী বকর (২৩৮৪); তাবাকাত-৮/৬৭; তিরমিজী (৩৮৮৫)।

১০১. বুখারী ঃ হুব্বুর রাজুলে বা'দা নিসায়িহি।

১০২. মুসনাদ-৬/২৩৮

হযরত রাসূলে কারীম (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ঃ আজ কি বার? সবাই বুঝলো, তিনি 'আয়িশার বারির দিনটির অপেক্ষা করছেন। সুতরাং তাঁকে 'আয়িশার (রা) ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। 'আয়িশার (রা) রানের উপর মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[১০৩] তেরো দিন রাসূল (সা) অসুস্থ ছিলেন। তার মধ্যে পাঁচ দিন অন্য স্ত্রীদের ঘরে এবং আট দিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটান।

পরবর্তীকালে 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ রাসূল (সা) আমার ঘরে আমার বারির দিনে এবং আমারই বুকে ইনতিকাল করেন। জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা) একটি কাঁচা মিসওয়াক হাতে করে রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখতে আসেন। রাসূল (সা) সেই মিসওয়াকটির দিকে বার বার তাকাতে লাগলেন। বুঝলাম, তিনি সেটা চাচ্ছেন। আমি সেটা নিয়ে ধুয়ে নিজে চিবিয়ে নরম করে রাসূলুল্লাহকে (সা) দিলাম। তিনি সেটা দিয়ে সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন। তারপর আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাতটি পড়ে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাঁর রাসূলের পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে তাঁর ও আমার থুথু মিলিত করেছেন।[১০৪]

অনেকে মনে করে থাকে 'আয়িশার (রা) প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) এমন আবেগ ও মুগ্ধতার কারণ তাঁর রূপ-লাবণ্য। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। রাসূলে পাকের সহধর্মিণীদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া, যায়নাব ও সাফিয়্যা (রা) ছিলেন সর্বাধিক সুন্দরী। তাঁদের সৌন্দর্য্যের কথা হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান। কিন্তু 'আয়িশার (রা) রূপ-লাবণ্যের কথা দুই একটি স্থান ব্যতিত তেমন কিছু উল্লেখ নেই। যেমন একবার 'উমার (রা) হাফসাকে (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেন। আর তা শুনে রাসূল (সা) একটু হেসে দেন।[১০৫] মূলতঃ 'উমারের এ মন্তব্য দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, 'আয়িশা (রা) হাফসার (রা) চেয়ে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

আসল কথা রাসূল (সা) যা বলেছেন, তাই। তিনি বলেছেন ঃ বিয়ের জন্য কনের নির্বাচন চারটি গুণের ভিত্তিতে হতে পারে। ১. ধন-সম্পদ ২. রূপ-সৌন্দর্য্য, ৩. বংশ মর্যাদা ৪. দ্বীনদারী। তোমরা দীনদারীর সন্ধান করবে।[১০৬] এ কারণে যাঁর দ্বারা দ্বীনের বেশী খিদমাত হওয়া সম্ভব ছিল স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক ভালোবাসার পাত্রী ছিলেন। 'আয়িশার (রা) সমঝ-বুঝ, চিন্তা-অনুধ্যান, হুকুম-আহকাম স্মৃতিতে ধারণ ক্ষমতা অন্য স্ত্রীদের তুলনায় অতিমাত্রায় বেশী ছিল। মূলতঃ এসব গুণই তাঁকে

---

১০৩. বুখারী ঃ বাবু মারদিন নাবী

১০৪. মুসনাদ ঃ ৬/৪৮, ২৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/১৮৯

১০৫. বুখারী ঃ বাবু মাওয়িজাতুর রাজুলে ইবনাতাহু

১০৬. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুন নিকাহ ঃ আল-আকফা ফিদ-দ্বীন। মুসলিম ও আবু দাউদ ঃ কিতাবুন নিকাহ।

স্বামীর প্রিয়তমা করে তুলেছিল। আল্লামাহ ইবন হাযাম *'আল-মিলাল ওয়ান নিহাল'* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে একথা প্রমাণ করেছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ[১০৭]

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةَ امْرَاَةِ فِرْعَوْنَ وَاِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

–পুরুষদের মধ্যে কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জন করেছেন অনেকে, কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান এবং ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। তবে গোটা নারী জাতির উপর 'আয়িশার মর্যাদা যাবতীয় খাদ্য সমগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদার মত।

'আয়িশাকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) এত বেশী ভালোবাসার তাৎপর্য এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। তাঁর মুগ্ধতা 'আয়িশার (রা) রূপ-যৌবন ও সৌন্দর্য্যে ছিল না; বরং তা ছিল তাঁর অন্তর্গত গুণাবলী ও পূর্ণতায়। আর এই অন্তর্গত গুণাবলীতে 'আয়িশার (রা) পরে স্থান ছিল উম্মু সালামার (রা)। এ কারণে বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও তিনিও রাসূলুল্লাহর (সা) গভীর ভালোবাসার পাত্রী ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) ষাট বছর বয়স লাভ করে ওফাত পান, অথচ তাঁর ভালোবাসা রাসূলুল্লাহর (সা) হৃদয়ের এত গভীরে ছিল যে, তাতে 'আয়িশাও (রা) ঈর্ষা পোষণ করতেন।[১০৮]

স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ছিল 'আয়িশার (রা) বুকভরা পবিত্র ভালোবাসা। সেই ভালোবাসায় অন্য কেউ ভাগের দাবীদার হলে তিনি কষ্ট পেতেন। কখনো রাতে 'আয়িশার (রা) ঘুম ভেঙ্গে গেলে পাশে স্বামীকে না পেলে অস্থির হয়ে পড়তেন। একদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশে স্বামীকে পেলেন না। রাতে ঘরে বাতিও জ্বলতো না। অন্ধকারে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলেন। অবশেষে এক স্থানে স্বামীর কদম মুবারাক খুঁজে পেলেন। তিনি সিজদায় পড়ে আছেন।[১০৯]

আরো একবার একই অবস্থার অবতারণা হলো। 'আয়িশা (রা) মনে করলেন, তিনি হয়তো অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে গেছেন। তিনি এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। দেখলেন, স্বামী এক কোণে নীরবে তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন আছেন। 'আয়িশা (রা) নিজের অমূলক ধারণার জন্য লজ্জিত হলেন। তিনি আপন মনে বলে উঠলেন ঃ 'আমার মা-বাবা উৎসর্গীত হোক! আমি কোন্ ধারণায় আছি, আর তিনি আছেন কোন্ অবস্থায়।'[১১০]

---

১০৭. বুখারী ঃ ফাদলু 'আয়িশা; মুসলিম ঃ ফাদায়িলু খাদীজা; তিরমিজী-(৩৮৮৭); আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৩, তাবাকাত-৮/৭৯

১০৮. মুসলিম : বাবু ফাদায়িলু খাদীজা

১০৯. নাসাঈ ঃ বাবুল গায়রা; বাবুদ-দু'আ ফিস সুজুদ; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ বাব মা জা' ফিদ-দু'আ

১১০. নাসাঈ ঃ আল-গায়রা; আদ-দু'আ ফিস্-সুজুদ

অন্য এক রাতের ঘটনা। 'আয়িশা (রা) মধ্যরাতে জেগে উঠলেন। পাশে স্বামীকে না পেয়ে এখানে সেখানে খোঁজাখোঁজি করতে করতে কবরস্থানে পৌঁছে দেখলেন, তিনি দু'আ ও ইসতিগফারে নিমগ্ন। তিনি আবার নীরবে ফিরে আসলেন। সকালে একথা স্বামীকে জানালে তিনি বললেন ঃ হাঁ, রাতে আমার সামনে দিয়ে কোন একটা জিনিস যাচ্ছিল মনে হয়েছিল। তাহলে সে তুমিই হবে।'

একবার এক সফরে 'আয়িশা (রা) ও হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গিনী ছিলেন। রাতে চলার পথে রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) বাহনের পিঠে বসে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে চলতেন। একদিন 'আয়িশা ও হাফসা (রা) পরামর্শ করে উট বদল করে নিলেন। রাতে রাসূল (সা) যথারীতি 'আয়িশার (রা) উঠের পিঠে উঠে এলেন এবং হাফসার (রা) সাথে কথা বলতে বলতে পথ চললেন। এদিকে 'আয়িশা (রা) স্বামী সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে কাতর হয়ে পড়েন। পরবর্তী মানযিলে কাফেলা থামলে তিনি বাহনের পিঠ থেকে নেমে পড়েন এবং ঘাসের মধ্যে নিজের চরণ দুইখানি ডুবিয়ে দিয়ে আপন মনে বলতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহ! আমি তো আর তাঁকে কিছু বলতে পারিনে। আপনি একটা বিচ্ছু অথবা সাপ পাঠিয়ে দিন, আমাকে দংশন করুক!'[১১১]

রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীগণের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলা ছিলেন। কেউ কেউ ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ অভিজাত পরিবারের মেয়ে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে এমন দীন-হীন অবস্থায় জীবন যাপন করতে গিয়ে তাঁদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এ জন্য তাঁরা সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির আবদার করতে থাকেন। এরই প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। যাতে তাঁদেরকে এ চূড়ান্ত কথা বলে দেওয়া হয় যে, যাঁর ইচ্ছা স্বেচ্ছায় সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যেতে পারেন অথবা এই দীন-হীন অবস্থা মেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জীবন যাপন করতে পারেন। 'আয়িশা (রা) ছিলেন যেহেতু কম বয়স্কা, তাই রাসূল (সা) তাঁকে মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত জানাতে বলেন। কিন্তু তিনি কারো সাথে পরামর্শ ছাড়াই সাথে সাথে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। বলেন ঃ 'আমি আল্লাহর রাসূলকেই চাই।' সবার আগেই তিনি এ সিদ্ধান্ত দেন এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করে বলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ সিদ্ধান্তের কথা আপনি অন্য কাউকে বলবেন না।'[১১২]

রাসূলে কারীম (সা) অনেক সময় 'আয়িশার (রা) রানের উপর মাথা রেখে শুয়ে যেতেন। একদিন রাসূল (সা) সেই অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় আবু বকর (রা) কোন এক কারণে মেয়ের উপর উত্তেজিত হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েন এবং তাঁর পার্শ্বদেশে ধাক্কা দেন। কিন্তু 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আরামের ব্যাঘাত হতে পারে, তাই মোটেই নড়াচড়া করলেন না।[১১৩]

---

১১১. মুসলিম ঃ ফাদলু 'আয়িশা; বুখারী ঃ আল-কার'আ বাইনা আন-নিসা

১১২. বুখারী ঃ আল-ঈলা; তাবাকাত-৮/৭৯

১১৩. প্রাগুক্ত ঃ আত-তায়াম্মুস

রাসূলে কারীম (সা) যে সকল বস্ত্রে ইনতিকাল করেন, 'আয়িশা (রা) অতি যত্নের সাথে তা সংরক্ষণ করেন। একবার এক সাহাবীকে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) একটি চাদর ও কম্বল দেখিয়ে বলেন, এই কাপড়েই তিনি ইনতিকাল করেন।[১১৪]

রাসূলে পাকের গোটা জিন্দেগী মানবজাতির জন্য আদর্শস্বরূপ। এ কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে খুশী করার জন্য কেমন আচরণ করবে, আমরা তাও 'আয়িশা (রা) ও রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে দেখতে পাই। আমরা কখনো কখনো রাসূলুল্লাহকে (সা) 'আয়িশার (রা) সাথে দারুণ উদার ও খোলামেলা দেখতে পাই। 'আয়িশার (রা) অতি তুচ্ছ কোন তামাশা বা খেলাধুলা দেখেও তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) একজন আনসারী মেয়েকে প্রতিপালন করেন। খুব সাদামাটা ও অনুষ্ঠানবিহীনভাবে তার বিয়ে হচ্ছিল। রাসূল (সা) ঘরে এসে বললেন ঃ 'আয়িশা! কোন গান-গীত তো নেই।[১১৫]

একবার ঈদের দিন কিছু হাবশী লোক নিযা হেলিয়ে দুলিয়ে পালোয়ানীর কসরত দেখাচ্ছিল। 'আয়িশা (রা) স্বামীর নিকট এই খেলা দেখার আবদার করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং 'আয়িশা (রা) সেই খেলা উপভোগ করলেন। যতক্ষণ 'আয়িশা (রা) ক্লান্ত হয়ে নিজেই সরে না গেলেন, রাসূল (সা) ততক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।[১১৬]

একবার 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে একটু উঁচু গলায় কথা বলছিলেন। এমন সময় পিতা আবু বকর (রা) এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মেয়ের এমন বেয়াদবী দেখে রেগে গেলেন এবং মারার জন্য হাত উঁচু করলেন। রাসূল (সা) দ্রুত মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে 'আয়িশাকে রক্ষা করলেন। আবু বকর (রা) চলে গেলে রাসূল (সা) 'আয়িশাকে বললেন ঃ বলতো, আমি তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম?[১১৭]

একবার একটি মেয়েকে সংগে করে রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) নিকট এসে বললেন, তুমি এই মেয়েটিকে চেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ না। রাসূল (সা) বললেন ঃ সে অমুকের দাসী। তুমি কি তার গান শুনতে চাও? 'আয়িশা (রা) শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। দাসীটি দীর্ঘক্ষণ গান গাইলো। এক সময় রাসূল (সা) তার সম্পর্কে মন্তব্য করলেন ঃ শয়তান তার নাকের ছিদ্রে বাদ্য বাজায়। অর্থাৎ এ ধরনের গান রাসূলুল্লাহ (সা) অপছন্দ করেন।

'আয়িশাকে (রা) খুশী করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মধ্যে তাঁকে গল্পও শোনাতেন।[১১৮] আবার কখনো কখনো ধৈর্যসহকারে 'আয়িশার (রা) গল্পও শুনতেন।

---

১১৪. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল লিবাস
১১৫. মুসনাদ-৬/২৬৯; বুখারী ঃ আন-নিকাহ অধ্যায়
১১৬. বুখারী ঃ বাবু হুসনুল মু'য়াশারা
১১৭. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব ঃ মা জাআ' ফিল মিযাজ
১১৮. শামায়িলি তিরমিজী ঃ হাদীসু খুরাফা; মুসনাদ-৬/১৫৭

কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ ও আনন্দঘন মুহূর্তেও যদি আজানের ধ্বনি কানে আসতো, তিনি তক্ষুনি সোজা বেরিয়ে যেতেন, যেন কাকেও চেনেন না।[১১৯]

একবার এক সফরে 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গিনী ছিলেন। চলার পথে এক পর্যায়ে রাসূল (সা) সকল সঙ্গীকে আগে চলার নির্দেশ দিলেন। তারপর 'আয়িশাকে বললেন ঃ এসো, আমরা দৌড়াই। দেখি কে আগে যেতে পারে। 'আয়িশা (রা) ছিলেন হালকা পাতলা। তাই তিনি আগে চলে যান। তার কিছুকাল পরে এমন দৌড় প্রতিযোগিতার সুযোগ আরেকবার আসে। 'আয়িশা (রা) বলেন, তখন আমি মোটা হয়ে গিয়েছিলাম। তাই রাসূল (সা) আমার আগে চলে যান। তখন তিনি বলেন ঃ এ হচ্ছে ঐ দিনের বদলা।[১২০]

রাসূলে কারীমের (সা) 'আয়িশার (রা) সাথে যখন পানাহারের সুযোগ হতো তখন একই দস্তরখানে এক থালায় আহার করতেন। একবার পর্দার হুকুমের আগে তাঁরা এক সাথে আহার করছেন, এমন সময় 'উমার (রা) এসে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে খেতে ডাকলেন এবং তিনজন একসাথে খেলেন।[১২১] পানাহারের মধ্যে প্রেম-প্রীতির অবস্থা এমন ছিল যে, 'আয়িশার (রা) চোষা হাঁড় রাসূল (সা) চুষতেন, গ্লাসে 'আয়িশা (রা) যেখানে মুখ লাগাতেন, রাসূল (সা) ঠিক সেখানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন।[১২২] রাতে যেহেতু ঘরে বাতি জ্বলতো না, তাই অন্ধকারে খেতে বসে মাঝে মাঝে উভয়ের হাত একই টুকরোর উপর গিয়ে পড়তো।[১২৩]

সীরাত ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশার (রা) প্রেম-প্রীতি ও মান-অভিমানের এক চমৎকার দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইসলাম যে মানুষের স্বভাবগত নির্মল আবেগ-অনুভূতিকে অস্বীকার করেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁদের আচরণের মধ্যে। কখনো কখনো তাঁদেরকে দেখা যায় সাধারণ মানুষের মত আবেগপ্রবণ। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, 'আয়িশা (রা) যেমন একজন নবীর স্ত্রী, তেমনি একজন নারীও বটে। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন একজন নবী ও রাসূল তেমনি একজন স্বামীও বটে। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাঁদের এমন বহু আচরণ ও মান-অভিমানের কথা ও ঘটনা বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যা অতি চমকপ্রদ ও শিক্ষণীয়।

রাসূলে কারীম (সা) তাঁর পরলোকগত প্রথমা স্ত্রী খাদীজাকে (রা) প্রায়ই স্মরণ করতেন। একবার তিনি খাদীজার কথা আলোচনা করছেন, 'আয়িশা (রা) বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই বৃদ্ধার কথা এত স্মরণ করেন কেন। আল্লাহ তো আপনাকে তাঁর চেয়ে ভালো স্ত্রী দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে তাঁর থেকে

---

১১৯. বুখারী ঃ কায়ফা ইয়াকূনুর রাজুলু ফী আহলিহি।
১২০. আবু দাউদ ঃ বাবুস সাবাক
১২১. বুখারী ঃ আদাবুল মুফরাদ ঃ আকলুর রাজুলি মা'য়া ইমরাতিহি;
১২২. আবু দাউদ ঃ মুওয়াকালাতুল হায়েজে; মুসনাদ-৬/৬৪
১২৩. মুসনাদ-৬/২১৭

সন্তান দান করেছেন।[১২৪]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) একদিন খাদীজার (রা) প্রশংসা শুরু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ প্রশংসা করতে থাকলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার অন্তর্দাহ হলো। বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি একজন কুরাইশ বৃদ্ধা, যার ঠোঁট লাল এবং যার মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, এত দীর্ঘ সময় তার প্রশংসা করছেন। আল্লাহ তো তাঁর চেয়ে ভালো স্ত্রী দান করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারার রং পাল্টে গেল। তিনি বললেন ঃ খাদীজা আমার এমন স্ত্রী ছিল যে, মানুষ যখন আমাকে নবী বলে মানতে অস্বীকার করে তখন সে আমার প্রতি ঈমান আনে, মানুষ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে চেয়েছে তখন সে সত্যবাদী বলেছে এবং মানুষ যখন আমাকে সাহায্য করতে চায়নি তখন সে তার অর্থ-বিত্ত সহকারে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তার মাধ্যমেই আমাকে সন্তান দিয়েছেন। যখন অন্য স্ত্রীরা আমাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছে।[১২৫]

একবার 'আয়িশার (রা) মাথায় ব্যথা হলো। রাসূলুল্লাহর (সা) তখন অন্তিম রোগ লক্ষণ শুরু হতে চলেছে। তিনি 'আয়িশাকে (রা) বললেন ঃ তুমি যদি আমার সামনে মারা যেতে, আমি নিজ হাতে তোমাকে গোসল দিয়ে কাফন পরাতাম এবং তোমার জন্য দু'আ করতাম। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার মরণ কামনা করছেন। যদি এমন হয় তাহলে আপনি তো এই ঘরে নতুন একজন স্ত্রীকে এনে উঠাবেন। রাসূল (সা) এ কথা শুনে মৃদু হেসে দেন।[১২৬]

'ইফ্ক' বা-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের ঘটনার পর যখন ওহী দ্বারা 'আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষিত হয় তখন তাঁর মা বললেন ঃ যাও, স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। 'আয়িশা (রা) ত্বরিৎ অভিমানের সুরে জবাব দিলেন ঃ আমি এক আল্লাহ ছাড়া– যিনি আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন, আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞ নই।

একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা! তুমি আমার প্রতি কখন খুশী বা অখুশী থাক, আমি তা বুঝতে পারি। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ কিভাবে? বললেন ঃ অখুশী থাকলে কসম খাও 'ইবরাহীমের আল্লাহর কসম' বলে, আর খুশী থাকলে বল ঃ 'মুহাম্মাদের আল্লাহর কসম।'[১২৭]

স্বামীর সেবা

হাদীসের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন স্থানে 'আয়িশার (রা) স্বামী–সেবার কথা ছড়িয়ে আছে। এখানে আমরা তার থেকে কিছু তুলে ধরছি।

---

১২৪. বুখারী ঃ ফাদলু খাদীজা
১২৫. মুসনাদ-৬/১১৮, ১৫০
১২৬. বুখারী ঃ বাবুল মারদ; মুসনাদ-৬/২২৮
১২৭. বুখারী ঃ বাবু মা ইয়াজুযু মিনাল হিজরান; জাহাবী ঃ আত-তারীখ-২/২৯৮

ঘরে খাদেম থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ হাতে সব কাজ করতেন। নিজ হাতে আটা পিষতেন, খাবার তৈরী করতেন, বিছানা পাততেন, ওজুর পানি এনে রাখতেন, স্বামীর কুরবানীর পশুর গলার রশি পাকাতেন, স্বামীর মাথায় চিরুনী করে দিতেন, দেহে আতর লাগিয়ে দিতেন, কাপড় ধুতেন, রাতে শোয়ার সময় মিসওয়াক ও পানি মাথার কাছে এনে রাখতেন, মিসওয়াক ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে মসজিদে যান। একজন সাহাবী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কম্বলে তো কোন ময়লার দাগ দেখা যাচ্ছে। সাথে সাথে তিনি কম্বলটি খুলে একজন খাদেমের হাতে 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন। 'আয়িশা (রা) পানি আনিয়ে নিজ হাতে কম্বলটি ধুয়ে, শুকিয়ে আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠিয়ে দেন।[১২৮]

কায়স আল-গিফারী (রা) ছিলেন আসহাবে সুফ্ফার' অন্যতম সদস্য। তিনি বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই আজ 'আয়িশার ঘরে চলো। তিনি আমাদেরকে সংগে করে ঘরে গিয়ে বললেন ঃ 'আয়িশা! আমাদের সকলকে আহার করাও। 'আয়িশা (রা) আমাদের সকলকে পাকানো খাবার খাওয়ালেন এবং দুধ ও পানি পান করালেন।[১২৯] সম্ভবত এটা হিজাবের হুকুম নাযিলের আগের ঘটনা।

'আয়িশা (রা) স্বামীর প্রিয়তমা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও অতি আগ্রহভরে অন্যদের চেয়ে বেশী মাত্রায় স্বামীর সেবা করতেন। স্বামীর আরাম-আয়েশ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সর্বদা সজাগ থাকতেন। বার বার স্বামীর মিসওয়াকটি ধোয়ার প্রয়োজন পড়তো। এই কাজটির সুযোগ এককভাবে 'আয়িশাই (রা) লাভ করতেন।[১৩০]

স্বামীর আনুগত্য ও অনুসরণ

ইসলামে স্ত্রীর অন্যতম গুণ হলো স্বামীর আনুগত্য ও অনুসরণ করা। 'আয়িশা (রা) স্বামী সাহচর্যের দীর্ঘ নয় বছরে তাঁর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ বা অমান্য করা তো দূরের কথা, ইশারা-ইঙ্গিতেও যদি তিনি কোন অপছন্দের কথা বুঝিয়েছেন, তাও 'আয়িশা (রা) সাথে সাথে পরিহার করেছেন। একবার তিনি অতি যত্ন সহকারে দরজায় একটি ছবিওয়ালা পর্দা টানালেন। রাসূল (সা) ঘরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় পর্দার প্রতি দৃষ্টি পড়লো। সাথে সাথে তাঁর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে 'আয়িশা (রা) সব কিছু বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ আমায় ক্ষমা করুন! আমার অপরাধ কোথায় বলবেন কি? রাসূল (সা) বললেন ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। একথা শোনার পর 'আয়িশা (রা) পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন।[১৩১]

---

১২৮. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল বাররা মিনান নাজাসাহ্
১২৯. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল আদাব
১৩০. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুত তাহারাহ্
১৩১. বুখারী ঃ বাবুত তাসবীর

স্বামীর জীবদ্দশায় বহু স্ত্রীই স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর আয়িশা (রা) যে পরিমাণ স্বামীর আনুগত্য এবং হুকুম তামীল করেছেন, তার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে স্বামীর প্রতিটি আদেশ ও ইচ্ছা তেমনিভাবে পালন ও পূরণ করেছেন যেমন তাঁর জীবনকালে করতেন।

রাসূলে কারীম (সা) 'আয়িশাকে (রা) দানশীলতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমরণ তিনি এ গুণটি অতি নিষ্ঠার সাথে ধারণ করে থাকেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ নারীদের জিহাদ হলো হজ্জ। এই বাণী শোনার পর থেকে এমন কঠোরতার সাথে আমল করতে থাকেন যে, তাঁর জীবনের খুব কম বছরই হজ্জ ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে।[১৩২]

একবার এক ব্যক্তি কিছু কাপড় ও কিছু নগদ অর্থ 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠালো। তিনি প্রথমে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ফেরত পাঠালেন। তারপর আবার লোকটিকে ডেকে এনে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন ঃ আমার একটি কথা মনে এসে গেল।[১৩৩]

একবার 'আরাফাতের দিন 'আয়িশা (রা) রোযা রাখলেন। প্রচণ্ড গরমের কারণে মাথায় পানির ছিটা দিচ্ছিলেন। একজন রোযা ভেঙ্গে ফেলার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শুনেছি যে, আরাফাতের দিন রোযা রাখলে সারা বছরের পাপ মোচন হয়ে যায়, তখন তা কিভাবে ভাংতে পারি?[১৩৪]

রাসূলুল্লাহকে (সা) চাশতের নামায পড়তে দেখে সারা জীবন তিনি এই নামায পড়েছেন। তিনি বলতেন ঃ আমার পিতাও যদি কবর থেকে উঠে এসে আমাকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেন, আমি তাঁর কথা মানবো না।[১৩৫] একবার এক মহিলা 'আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলো ঃ মেহেন্দী লাগানো কেমন? জবাব দিলেন ঃ আমার প্রিয়তমের মেহেন্দীর রং খুব পছন্দ ছিল, তবে গন্ধ পছন্দ ছিল না। হারাম নয়। ইচ্ছা হলে তুমি লাগাতে পার।

গৃহ অভ্যন্তরে স্বামী-স্ত্রীর দ্বীনি জীবন

'আয়িশার (রা) ঘরটি ছিল একজন নবীর আবাসস্থল। সেখানে বিত্ত-বৈভবের কোন ছোঁয়া ছিল না। পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁদের কোন পরোয়াও ছিল না। 'আয়িশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহর (সা) অভ্যাস ছিল, যখন ঘরে আসতেন, একটু উঁচু গলায় নিম্নের কথাগুলি বার বার উচ্চারণ করতেন।[১৩৬]

لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى وَادِيًا ثَالِثًا

১৩২. প্রাগুক্ত ঃ বাবু হজ্জিন নিসা
১৩৩. মুসনাদ-৬/২৫৯
১৩৪. প্রাগুক্ত-৬/১২৮
১৩৫. প্রাগুক্ত-৬/১৩৮
১৩৬. প্রাগুক্ত-৬/৫৫

وَلَا يَمْلأُ فَمَهُ اِلاَّ التُّرَابُ جَعَلْنَا الْمَالَ اِلاَّ لِاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ .

'আদম সন্তানদের মালিকানায় যদি ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দুইটি উপত্যকা হয়, তাহলে সে তৃতীয়টির লোভ করবে। তার লোভের মুখ শুধুমাত্র মাটিই ভরতে পারে। আল্লাহ বলেন, ধন-সম্পদ তো আমি নামায কায়েম এবং যাকাত দানের জন্য সৃষ্টি করেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহও তার দিকে ফিরে আসেন।'

মানুষের লোভের যে কোন শেষ নেই, এবং ধন-সম্পদ দানের মূল উদ্দেশ্য কি, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই ছিল এর আসল লক্ষ্য।

রাসূলে কারীম (সা) 'ঈশার নামায আদায়ের পর ঘরে আসতেন। মিসওয়াক করে সাথে সাথে শয্যা নিতেন। মাঝ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। রাতের শেষভাগে 'আয়িশাকে (রা) জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে স্বামীর সাথে নামাযে অংশগ্রহণ করতেন। সবশেষে বিতর নামায আদায় করতেন। সুবহে সাদিক হওয়ার পর রাসূলে পাক (সা) ফজরের সুন্নাত আদায় করে কাত হয়ে একটু শুয়ে যেতেন এবং 'আয়িশার (রা) সাথে কিছু কথা-বার্তা বলতেন।[১৩৭] তারপর ফজরের ফরজ আদায়ের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতেন। কখনো কখনো সারা রাত রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আয়িশা (রা) আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিতেন। রাসূল (সা) ইমাম হতেন, 'আয়িশা (রা) হতেন মুক্তাদী। কুসূফ ও খুসূফ (সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ)-এর অবস্থায় রাসূল (সা) নামাযে দাঁড়ালে তিনিও দাঁড়িয়ে যেতেন। রাসূল (সা) মসজিদে জামা'য়াতের ইমামতি করতেন, আর তিনি ঘরে ইকতিদা করতেন।[১৩৮]

পাঞ্জেগানা নামায ও তাহাজ্জুদ ছাড়াও রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখে তিনি চাশতের নামাযও নিয়মিত পড়তেন। প্রায়ই রোযা রাখতেন। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে রোযা পালন করতেন। রমজানের শেষ দশদিন রাসূল (সা) মসজিদে ই'তিকাফ করতেন। 'আয়িশাও (রা) এতে শরিক হতেন। মসজিদের আঙ্গিনায় তাঁবু টানিয়ে ঘিরে নিতেন। ফজর নামাযের পর রাসূল (সা) কিছু সময়ের জন্য সেখানে আসতেন।[১৩৯]

হিজরী ১১ সনে রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের সফরসঙ্গী হন। হজ্জ ও 'উমরার নিয়েত করেন। কিন্তু স্বাভাবিক নারী প্রকৃতির কারণে যথাসময়ে তাওয়াফ করতে পারলেন না। দারুণ কষ্ট পেলেন। কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূল (সা) বাহির থেকে এসে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং তাঁকে করণীয় মাসয়ালা বাতলে দিলেন। তিনি ভাই

---

১৩৭. বুখারী ঃ মান তাহাদ্দাসা বা'য়াদার রাক'য়াতাইনে; মুসলিম ঃ সালাতুল লাইলে।

১৩৮. বুখারী ঃ সালাতুল কুসূফ

১৩৯. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ই'তিকাফ আন-নিসা

আবদুর রহমান ইবন আবী বকরকে (রা) সাথে নিয়ে অসমাপ্ত আবশ্যকীয় কাজ সমাপন করলেন।[১৪০]

আমাদের মত সাধারণ মানুষের মনে এমন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রাসূলে কারীম (সা) কি গৃহ অভ্যন্তরে আরাম ও বিশ্রামের সময় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে একটু শিথিলতা (নাউজুবিল্লাহ) দেখাতেন? এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। পূর্বেই আমরা 'আয়িশার (রা) মন্তব্য উল্লেখ করেছি– 'রাসূল (সা) আমাদের সাথে কথা বলতেন। আজানের ধ্বনি কানে যেতেই উঠে দাঁড়াতেন। তখন মনে হতো তিনি যেন আমাদের চেনেনই না।' 'আয়িশা (রা) খুব সাধ করে রাসূলুল্লাহকে (সা) খুশী করার জন্য ছবিওয়ালা পর্দা টানালেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তুষ্টির পরিবর্তে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

একবার 'আয়িশা (রা) এক ইহুদীকে– যে তাঁকে মৃত্যুর অভিশাপ দিয়েছিল, কঠোর ভাষায় প্রত্যুত্তর করেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে বলেন ঃ 'আয়িশা! আল্লাহ অতি দয়াবান। তিনি দয়া ও কোমলতা পছন্দ করেন। আর একবার 'আয়িশা (রা) নিজ হাতে আটা পিষে রুটি বানিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। এই সুযোগে প্রতিবেশীর একটি ছাগল ঘরে ঢুকে সব খেয়ে ফেলে। 'আয়িশা (রা) দৌড়ে ছাগলটি ধরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতে গেলেন। রাসূল (সা) বাধা দিয়ে বললেন ঃ 'আয়িশা! প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না।

সতীন ও তাদের সন্তানদের সাথে সম্পর্ক

আমাদের জানা মতে এ পৃথিবীতে একজন নারীর সবচেয়ে অসহনীয় বিষয় হলো সতীনের অস্তিত্ব। 'আয়িশার (রা) এক সাথে সতীন ছিল একজন থেকে নিয়ে আটজন পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহর (সা) মহান সাহচর্যের দৌলতে তাঁদের সকলের হৃদয়ের যাবতীয় আবিলতা দূর হয়ে তা স্বচ্ছ আয়নায় পরিণত হয়। সতীন ও তাঁদের সন্তান-সন্তুতিদের সাথে 'আয়িশার (রা) জীবন যাপনের যে চিত্র আমরা পাই তা বিশ্বের নারী জাতির জন্য এক অতুলনীয় আদর্শ হয়ে আছে।

খাদীজা (রা) যদিও 'আয়িশার (রা) সময়ে বেঁচে ছিলেন না, তবে রাসূলে পাকের হৃদয় মাঝে তিনি সর্বদা জীবিত ছিলেন। তিনি 'আয়িশার (রা) কাছে সবসময় খাদীজার (রা) স্মৃতিচারণ করতেন। এ কারণে 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'আমি যে পরিমাণ খাদীজাকে ঈর্ষা করতাম, রাসূলুল্লাহর (সা) আর কোন স্ত্রীকে তেমন করতাম না। আর তা এই জন্য যে, রাসূল (সা) তাঁকে খুব বেশী স্মরণ করতেন।' অথচ খাদীজার (রা) ফজীলাত ও মর্যাদার কথা তিনি যত বেশী বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ তা করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক খাদীজার (রা) নামে কুরবানী করা, খাদীজার বান্ধবীদের নিকট হাদীয়া-তোহফা পাঠানো, ইসলামের প্রথম পর্বে তাঁর যাবতীয় অবদান, যথা ঃ স্বামীকে সান্ত্বনা ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান, যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কথা কিন্তু 'আয়িশাই (রা) এই উম্মাতকে জানিয়েছেন। আল্লাহ পাক

---

১৪০. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল হজ্জ

যে, খাদীজাকে (রা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, সে কথাটিও তিনি জানিয়েছেন।[১৪১] এতেই তাঁর হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও প্রশস্ততার কথা অনুমান করা যায়।

সাওদার (রা) প্রশংসায় 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'একমাত্র সাওদা ছাড়া অন্য কোন নারীকে দেখে আমার মধ্যে এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি যে, তাঁর দেহে যদি আমার প্রাণটি হতো।' মায়মূনার (রা) মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ 'তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার ছিলেন।'[১৪২] সাফিয়্যা (রা) চমৎকার খাবার তৈরী করতে পারতেন। তাঁর এই পারদর্শিতা তিনি স্বীকার করেন এইভাবে 'আমি তাঁর চেয়ে ভালো খাবার তৈরী করতে পারে এমন কাউকে দেখিনি।' সতীনদের সাথে তাঁর উঠা-বসা ও আচার-আচরণের অনেক কথা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান আছে– যাতে তাঁর উদারতা, মহানুভবতা ও উন্নত নৈতিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

'আয়িশার (রা) মধুর ব্যবহার ও আচরণ সকলকে খুশী করেছিল। আর তাই 'ইফ্ক (কলঙ্ক আরোপ)-এর ঘটনার সময়—যখন তাঁর দিশেহারা অবস্থা, তখন তাঁর অন্যতম সতীন যয়নাবকে (রা) রাসূল (সা) তাঁর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে জবাব দিয়েছিলেন ঃ 'আমি তো তাঁর মধ্যে শুধু ভালো ছাড়া কিছু জানিনে।'[১৪৩]

'আয়িশা (রা) নিঃসন্তান ছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য স্ত্রীদের বেশ কয়েকজন সন্তান ছিলেন। তাঁদের সাথে 'আয়িশার (রা) সম্পর্ক ছিল আদর্শ মানের। যয়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মু কুলসুম ও ফাতিমা— এই চার কন্যা ছিলেন খাদীজার (রা) সন্তান। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে আসার পূর্বে একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া অন্যদের বিয়ে হয়ে যায় এবং সবাই নিজ নিজ স্বামীর ঘরে চলে যান। হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রুকাইয়্যা এবং হিঃ ৮ম ও ৯ম সনে যথাক্রমে যয়নাব ও উম্মু কুলসুম ইনতিকাল করেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের সাথে 'আয়িশার (রা) তিক্ত সম্পর্কের একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না। বরং এ সকল কন্যা সম্পর্কে 'আয়িশার (রা) যেসব মন্তব্য ও আচরণের কথা পাওয়া যায় তাতে তাঁদের সাথে তাঁর গভীর হৃদ্যতার কথা জানা যায়। যয়নাব, যিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন, তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এই বাণীটি 'আয়িশা বর্ণনা করেছেন ঃ 'সে আমার অতি ভালো মেয়ে ছিল, আমাকে ভালোবাসার কারণে যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে।' এই যয়নাবের মেয়ে উমামাকে রাসূল (সা) কী পরিমাণ স্নেহ ও আদর করতেন তা 'আয়িশাই (রা) বর্ণনা করেছেন।

'আয়িশা (রা) যখন স্বামীগৃহে আসেন তখন কুমারী মেয়ে ফাতিমা (রা) পিতার ঘরে। কিন্তু তিনি বয়সে 'আয়িশার চেয়ে পাঁচ অথবা ছয় বছরের বড়। এক বছর বা তার চেয়ে কিছু কম সময়ের জন্য এই মা-মেয়ে এক সাথে কাটান। হিজরী ২য় সনের মধ্যে আলীর (রা) সাথে এই মেয়ের বিয়ে হয়। এই বিয়ের উদ্যোগ আয়োজনে অন্য মা-দের

---

১৪১. প্রাগুক্ত ঃ ফাদায়িলু খাদীজা

১৪২. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৫৩

১৪৩. বুখারী ঃ আল-ইফ্ক

সাথে 'আয়িশাও শরিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে তিনি বিশেষ গুরুত্বও প্রদান করেন। ঘর লেপেন, বিছানা তৈরী করেন, নিজের হাতে খেজুরের ছাল ধুনে বালিশ বানান, খেজুর ও মানাক্কা অতিথিদের সামনে পেশ করেন এবং কাঠের একটি আলনার মত তৈরী করেন পানির মশক ও কাপড় চোপড় টানানোর জন্য। 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ 'ফাতিমার বিয়ের মত এত চমৎকার বিয়ে আর দেখিনি।'[১৪৪]

ফাতিমার (রা) প্রশংসায় 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি ফাতিমার চেয়ে একমাত্র তার পিতা ছাড়া আর কোন ভালো মানুষ কক্ষণো দেখিনি। একবার এক তাবে'ঈ 'আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে প্রিয় কে ছিলেন? উত্তর দিলেন ঃ ফাতিমা। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) মত চাল-চলন, উঠা-বসায় মিলে যায় একমাত্র ফাতিমা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। ফাতিমা যখন তাঁর পিতার সাথে দেখা করতে আসতেন পিতা সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। মেয়ের কপালে চুমু খেতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আবার পিতা তার ঘরে গেলে মেয়ে উঠে দাঁড়াতেন, পিতাকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে নিয়ে বসাতেন।[১৪৫]

স্বামীগৃহে ফাতিমা (রা) নিজ হাতে যাবতীয় কাজ করতে করতে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন পিতার কাছে এসেছিলেন একটি দাসী প্রাপ্তির আবেদন নিয়ে। ঘটনাক্রমে পিতার দেখা পেলেন না। মা 'আয়িশাকে এ ব্যাপারে কথা বলার দায়িত্ব দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।[১৪৬]

'আয়িশা বর্ণনা করেন। "একদিন আমরা সকল স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে আছি। এমন সময় ফাতিমা সামনের দিক থেকে আসলো। তার চলন ছিল অবিকল রাসূলুল্লাহর (সা) মত, একটুও পার্থক্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত আবেগের সাথে তাকে ডেকে পাশে বসালেন। তারপর চুপে চুপে তার কানে কিছু কথা বললেন। ফাতিমা কাঁদতে লাগলো। তার অস্থিরতা দেখে রাসূল (সা) কানে কানে আবার কিছু বললেন। এবার ফাতিমা হাসতে লাগলো। 'আয়িশা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ ফাতিমা! রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদের বাদ দিয়ে তোমার কাছে গোপন কথা বলেন, আর তুমি কাঁদছো? রাসূল (সা) উঠে গেলে আমি ফাতিমার নিকট বিষয়টি জানতে চাইলাম। সে বললো ঃ আমি আমার আব্বার গোপন কথা ফাঁস করবো না।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর 'আয়িশা আবার একদিন বিষয়টি জানতে চান। ফাতিমা বলেন, আমার কান্নার কারণ হলো, তিনি আমাকে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। হাসির কারণ হলো, তিনি আমাকে বলেন ঃ ফাতিমা! এ কি তোমার পছন্দ

---

১৪৪. ইবন মাজা-বাবুল ওলীমা

১৪৫. তিরমিজী-বাবুল মানাকিব

১৪৬. বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ; বাবু 'আমলিল মারয়াতি ফী বায়তি যাওজিহা

নয় যে, তুমি সারা পৃথিবীর নারীদের নেত্রী হও?"[১৪৭]

উপরে উল্লেখিত এ সকল ঘটনা দ্বারা 'আয়িশার (রা) সাথে তাঁর সতীন-কন্যাদের কেমন মধুর সম্পর্ক ছিল তা বুঝা যায়। এ ধরনের আরো বহু ঘটনা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান।

যুদ্ধ-বিগ্রহ

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি 'আয়িশা ও উম্মু সুলাইমকে (রা) দেখলাম, তাঁরা কাঁধে করে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে ঢালছেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আবার ভরে এনে ঢালছেন।[১৪৮] উহুদ যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স দশ এগারো বছরের বেশী হবে না। এই যুদ্ধে তিনি যোগদান করে আহতদের সেবা করেছেন।

ইমাম বুখারী বলেন, বনু মুসতালিক যুদ্ধই হলো আল-মুরাইসী' যুদ্ধ। এই যুদ্ধটি কোন সনে হয় সে সম্পর্কে অবশ্য সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন, এটি হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। মূসা ইবন 'উকবা বলেন, চতুর্থ হিজরীতে। আর 'উরওয়া বলেন, এটা পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসের ঘটনা।[১৪৯] আল-মুরাইসী হলো বনু মুসতালিক গোত্রের একটি ঝর্ণা। তাদের নেতা ছিল আল-হারেস ইবন আবী দাররার। সে তার নিজ গোত্র ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকদের রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সংগঠিত করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ খবর অবগত হয়ে তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এই বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক মুনাফিক (কপট মুসলমান) অংশগ্রহণ করে– যা অন্য কোন যুদ্ধে কখনো করেনি।[১৫০] অবশেষে আল-মুরাইসী-এর পাশে দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। এই অভিযানে মুনাফিকরা হযরত 'আয়িশাকে (রা) নিয়ে একটি কুৎসিত ষড়যন্ত্র পাকায়। ঘটনাটি আরো একটু বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি।

হিজরী ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ সনের শা'বান মাসে নবী কারীম (সা) জানতে পারলেন যে, 'মুরাইসী'-এর পাশে বসবাসকারী লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এ কথা জানার পরপরই রাসূল (সা) এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই লোকদের দিকে যাত্রা করলেন। মুনাফিক-শ্রেষ্ঠ আবদুল্লাহ ইবন উবাই বিপুল সংখ্যক মুনাফিক সংগে নিয়ে এই যাত্রায় নবী কারীমের (সা) সংগে শরিক হলো। ইবন সা'দ বলেন, ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধেই এত সংখ্যক মুনাফিক যোগদান করেনি। অভিযান শেষে এই মুনাফিকরা নানাভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আল্লাহ পাকের রহমত ও রাসূলুল্লাহর (সা) দূরদৃষ্টি ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের সকল

---

১৪৭. মুসলিম ঃ বাবুল ফাদায়িল; বুখারী ঃ মান না-জা বায়না ইয়াদাই আন-নাস।

১৪৮. সহীহ বুখারী ঃ গাযওয়াতু উহুদ, ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাতু আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৫৬২

১৪৯. ইবন কাসীর-২/৪৭

১৫০. ইবন সা'দ তাবাকাত-২/৬৩; ইবন কাসীর-২/৪৭

চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়।

এই সফরেই তারা উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাকে (রা) কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা হযরত 'আয়িশার (রা) পবিত্র চরিত্রের উপর এক চরম অপমানকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসে। মূল কাহিনীটি হযরত আয়িশার (রা) ভাষায় সহীহ বুখারীসহ বিভিন্ন হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ

'রাসূলে কারীমের (সা) নিয়ম ছিল যখন দূরে কোথাও বের হতেন, 'কুর'আ'র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবেন। বনী আল-মুসতালিক যুদ্ধের সময় কুর'আ'য় আমার নামটি আসে। ফলে আমি তাঁর সফরসঙ্গী হই। ফিরে আসার সময় যখন আমরা মদীনার কাছাকাছি পৌঁছি, রাতের বেলা রাসূল (সা) এক মানযিলে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেন। রাতের শেষভাগে সেখান থেকে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করা হয়। আমি ঘুম থেকে জেগে স্বাভাবিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে গেলাম। ফিরে আসার সময় অবস্থানের কাছাকাছি স্থানে আসতেই মনে হলো যে, আমার গলার হারটি কোথাও পড়ে গেছে। আমি তা খুঁজতে লেগে গেলাম। ইতিমধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। নিয়ম ছিল যে, রওয়ানা হওয়ার সময় আমি আমার 'হাওদাজে' (উটের পিঠের পালকি) বসে যেতাম, তারপর চারজন লোক তা তুলে উটের পিঠের উপর বেঁধে দিত। এই সময় অভাব অনটনের কারণে আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হাল্‌কা-পাতলা। আমার 'হাওদাজ' উঠানোর সময় লোকেরা টেরই পেলনা যে, আমি ওর মধ্যে নেই। অজ্ঞাতসারে তারা 'হাওদাজ' উটের পিঠে বসিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

এদিকে আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। ফলে আমি আমার গায়ের চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে সেখানেই পড়ে থাকলাম। চিন্তা করলাম, সামনে গিয়ে যখন আমাকে দেখতে পাবে না, তখন তারা আমার তালাশে ফিরে আসবে। এই অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা সাফওয়ান ইবন মু'য়াত্তাল আস-সুলামী যেখানে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, সেখানে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখেই তিনি চিনতে পারলেন। কারণ, পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে কয়েকবার দেখেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি উট থামালেন এবং বিস্ময়ের সাথে তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো– ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন! রাসূলুল্লাহর (সা) বেগম সাহেবা এখানে রয়ে গেছেন!

তাঁর কণ্ঠস্বর কানে যেতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম এবং চাদর দ্বারা মুখ ঢেকে ফেললাম। তিনি আমার সংগে কোন কথাই বললেন না। নিজের উটটি এনে আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালেন। আমি উটের পিঠে উঠে বসলাম, আর তিনি লাগাম ধরে হেঁটে চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম– যখন তারা এক স্থানে সবেমাত্র থেমেছে। আর আমি যে পিছনে রয়ে গেছি, সে কথা তাদের কেউ জানতেও পারেনি। এই ঘটনার উপর মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হলো। যারা এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তাদের মধ্যে

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিল সবার চেয়ে অগ্রসর। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে কি কি কথা বলা হচ্ছে, আমি তার কিছুই জানতে পারিনি।'

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, সাফওয়ানের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হযরত 'আয়িশা (রা) যে সময় সৈনিকদের তাঁবুতে উপস্থিত হলেন এবং তিনি পিছনে পড়ে ছিলেন বলে জানা গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ 'খোদার কসম! এই মহিলাটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সংগে রাত কাটিয়েছে, আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সংগে নিয়ে চলে এসেছে।'

'আয়িশা (রা) বলেন ঃ "মদীনায় ফিরে আসার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রায় এক মাসকাল আমি শয্যাশায়ী হয়ে থাকলাম। শহরের সর্বত্র এই মিথ্যা দোষারোপের খবর উড়ে বেড়াতে লাগলো। নবী কারীমের (সা) কান পর্যন্ত পৌঁছাতে দেরী হলো না। কিন্তু আমি কিছুই জানতে পারলাম না। একটি খট্‌কা অবশ্য আমার মনে লাগছিলো। তা হলো, অসুস্থ অবস্থায় রাসূলে কারীম (সা) যে রকম লক্ষ্য দিতেন, এবার তিনি তেমন দিচ্ছেন না। তিনি ঘরে এসে ঘরের লোকদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করতেন ঃ 'ও কেমন আছে'? আমার সংগে কোন কথা বলতেন না। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়তো। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে মা আমার সেবা-শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

একদিন রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘরের বাইরে গেলাম। তখনও পর্যন্ত আমাদের সব বাড়ীতে পায়খানা নির্মিত হয়নি। আমরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্য বনে-জঙ্গলেই যেতাম। আমার সংগে মিসতাহ ইবন উসাসা'র মাও ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার পিতার খালাতো বোন। তিনি পথ চলতে গিয়ে হোঁটচ খান। তখন অকস্মাৎ তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়! 'ধ্বংস হোক মিসতাহ'। আমি বললাম ঃ আপনি কেমন মা? নিজের ছেলের ধ্বংস কামনা করেন! আর ছেলেও এমন, যে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তিনি বললেন ঃ মেয়ে! তুমি কি কোন খবরই রাখো না? তারপর তিনি আমাকে সকল কাহিনী বললেন। মিথ্যাবাদীরা আমার সম্পর্কে কি কি বলে বেড়াচ্ছিল, তা সবই শোনালেন।"

উল্লেখ্য যে, মুনাফিকীন ছাড়াও মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান এই মিথ্যার অভিযানে শরিক হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিস্‌তাহ ইবন উসাসা, ইসলামের প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান বিন সাবিত ও হযরত যয়নাব (রা) এর বোন হামনা বিন্‌ত জাহাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ এই কাহিনী শুনে আমার রক্ত যেন পানি হয়ে গেল। যে জন্য এসেছিলাম, সেই প্রয়োজনের কথাও ভুলে গেলাম। সোজা ঘরে ফিরে গেলাম এবং সারা রাত কেঁদে কাটালাম।

এদিকে আমার অনুপস্থিতিকালে রাসূলে কারীম (সা) আলী ও উসামা ইবন যায়িদকে

(রা) ডাকলেন এবং তাদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। উসামা (রা) আমার পক্ষে ভালো কথাই বললেন। বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু কখনো দেখতে পাইনি। যা কিছু বলে বেড়ানো হচ্ছে, তা সবই মিথ্যা কথা, রচিত অভিযোগ মাত্র। আর আলী বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সমাজে মেয়ে লোকের কোন অভাব নেই। আপনি এর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। আর আসল ব্যাপার যদি জানতে চান, তাহলে দাসীকে ডেকে অবস্থা জেনে নিতে পারেন।

দাসীকে ডাকা হলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। সে বললো : 'আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে খারাপ কিছুই দেখিনি– যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, আমি আটা মেখে রেখে যেতাম, আর বলতাম, একটু দেখবেন। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, আর তৈরী আটা ছাগল এসে খেয়ে যেত।'

সেইদিন নবী কারীম (সা) তাঁর এক ভাষণে বললেন ঃ 'হে মুসলমানরা, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে– আমার স্ত্রীর উপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে– তার আক্রমণ হতে আমাকে বাঁচাতে পারে? আল্লাহর শপথ, আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি, না সেই লোকটির মধ্যে যার সম্পর্কে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতির সময় সে তো কখনই আমার ঘরে আসেনি।' এই কথা শুনে হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর, কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন, তাই করবো।' এই কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র-প্রধান সা'দ ইবন 'উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি কিছুতেই তাকে মারতে পারবে না। তুমি তাকে হত্যা করার কথা শুধু এইজন্য বলছো যে, সে খাযরাজ গোত্রের লোক। সে তোমাদের লোক হলে তুমি কখনই তাকে হত্যা করার কথা বলতে পারতে না।' জবাবে তাকে বলা হয়েছিল ঃ তুমি তো মুনাফিক, এই জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছো।'

এই বাকবিতণ্ডায় মসজিদে নববীতে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের লোকেরা মসজিদেই লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু নবী কারীম (সা) তাদেরকে ঠাণ্ডা করেন এবং পরে মিম্বরের উপর হতে নেমে আসেন।

অন্তত একমাস কাল এই মিথ্যা দোষারোপের বানোয়াট কথা সমাজে উড়ে বেড়াতে লাগলো। নবী কারীম (সা) কঠিন মানসিক কষ্ট আবুব করতে থাকলেন। আমি কান্নাকাটি করতে লাগলাম। আমার পিতা-মাতা সীমাহীন দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত নবী কারীম (সা) একদিন আসলেন এবং আমার পাশে বসলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি একবারও আমার কাছে বসেননি। আবু বকর ও

উম্মু রূমান ('আয়িশার পিতা-মাতা) মনে করলেন, আজ হয়তো কোন সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এই কারণে তাঁরাও নিকটে এসে বসলেন। নবী কারীম (সা) বললেন ঃ 'আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এইসব কথা আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন প্রকার গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, ক্ষমা চাও। বান্দাহ যখন গুনাহ স্বীকার করে, তাওবা করে, তখন আল্লাহ মা'ফ করে দেন।

এই কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমি পিতাকে বললাম, 'আপনি রাসূলে কারীমের (সা) কথার জবাব দিন। তিনি বললেন ঃ 'মেয়ে! আমি কি বলবো তা বুঝতে পারছিনে।' আমি আমার মাকে বললাম, 'আপনিই কিছু বলুন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি কি বলবো তা আমার বুঝে আসে না।' তখন আমি বললাম ঃ 'আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে, অমনি তা মনের মধ্যে বসে গেছে। এখন আমি যদি বলি, আমি নির্দোষ– আল্লাহ সাক্ষী, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ– তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা স্বীকার করে নিই যা আমি আদৌ করিনি– আল্লাহ জানেন যে, আমি কোন দোষের কাজ করিনি– তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নিবেন। আমি তখন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নামটি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মরণে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এমন অবস্থায় আমি সেই কথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না, যা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলেছেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

(يوسف ١٨)

এই কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত ব্যাপার লোকদের সামনে উন্মোচিত করে দিবেন। তবে আমার সপক্ষে 'ওহী' নাযিল হবে, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত পড়া হবে, এমন ধারণা আমার মনে কখনো আসেনি। আমি মনে করেছিলাম, রাসূল (সা) কোন স্বপ্ন দেখবেন, আর তাতে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দিবেন। এরই মধ্যে নবী কারীমের (সা) উপর 'ওহী' নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সৃষ্টি হলো। এমনকি তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা মুবারক হতে ঘামের ফোটা টপ টপ করে পড়তে লাগলো। এমন অবস্থা দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে পূর্ণমাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা-মাতার অবস্থা ছিল বড়ই মর্মান্তিক। আল্লাহ কোন্ মহাসত্য উদঘাটন করেন, সেই চিন্তায় তাঁরা ছিলেন অস্থির, উদ্বিগ্ন। 'ওহী' কালীন অবস্থা শেষ হয়ে গেলে রাসূলে কারীমকে (সা) খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। তিনি হাসি সহকারে প্রথম যে কথাটি বললেন তা ছিল এই ঃ 'আয়িশা, তোমাকে সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি

সূরা আন-নূর-এর ১১ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন। আমার মা তখন আমাকে বললেন ঃ 'ওঠো, রাসূলুল্লাহর (সা) শুকরিয়া আদায় কর।' আমি বললাম ঃ 'আমি না উনার শুকরিয়া আদায় করবো, আর না আপনাদের দুইজনের। আমিতো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এই মিথ্যা অভিযোগকে অসত্য বলেও ঘোষণা করেননি।'[১৫১]

হযরত 'আয়িশার (রা) বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, আল-কুরআনের ভাষায় তাকে 'আল-ইফ্‌ক' বলা হয়েছে। এই শব্দ দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে এই অভিযোগের পরিপূর্ণ প্রতিবাদ করা হয়েছে। 'ইফ্‌ক' শব্দের অর্থ মূল কথাকে উল্টিয়ে দেওয়া, প্রকৃত সত্যের বিপরীত যা ইচ্ছা বলে দেওয়া। এই অর্থের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া কথা– অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন অভিযোগ সম্পর্কে শব্দটি প্রয়োগ হলে তার অর্থ হয়, সুস্পষ্ট মিথ্যা অভিযোগ, মিথ্যা দোষারোপ।[১৫২]

হযরত 'আয়িশার (রা) নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা দোষারোপ করার অভিযোগে দুইজন পুরুষ ও একজন নারীর উপর 'হদ' (নির্ধারিত শাস্তি) জারি করা হয়। তাঁরা হলেন ঃ মিসতাহ ইবন উসাসা, কবি হাস্‌সান ইবন সাবিত ও হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা)।[১৫৩]

তায়াম্মুমের আয়াত নাযিলের ঘটনা

আল্লাহ পাক হযরত আয়িশাকে (রা) উপলক্ষ করে মানবজাতিকে বহুবিধ কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। 'ইফ্‌ক'কে কেন্দ্র করে মানব সমাজকে যৌনাচার ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য অনেকগুলি বিধি-নিষেধ ও দণ্ডবিধি ঘোষণা করেছেন। তেমনি পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য পানির বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুমের সুযোগও তাঁকেই কেন্দ্র করে দান করেছেন। এখানে সে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি।

একবার আর এক সফরে 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। ইবন সা'দের মতে, এটাও ছিল 'আল-মুরাইসী' যুদ্ধ-সফরের ঘটনা।[১৫৪] সেই একই হার এবারও তাঁর গলায় ছিল। কাফেলা যখন 'জাতুল জাইশ' অথবা আল-বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন হারটি গলা থেকে আবার ছিঁড়ে কোথায় পড়ে যায়।[১৫৫] পূর্বের ঘটনায় তাঁর যথেষ্ট

---

১৫১. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুশ শাহাদাত-৫/১৯৮,২০১; কিতাবুল জিহাদ-৭/৩৩৩,৩৩৫;কিতাবুত তাফসীর-৮/৩৪৩, ৩৬৭; সহীহ মুসলিম-(২৭৭০) কিতাবুত তাওবাহ্; ইবন হিশাম-২/২৯৭, ৩০৭; আনসাবুল আশরাফ-১ম খণ্ড; তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আন-নূর; তিরমিযী-(৩১৭৯); আল-বিদায়া-৩/১৬০; তাফসীর ইবন কাসীর-৩/২৬৮, ২৭২, আস-সীরাহ-২/৫১-৫৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৫৩-১৫৯

১৫২. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আন-নূর, টীকা-৮

১৫৩. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল হুদূদ (৪৪৭৪); ইবন মাজাহ ঃ আল-হুদূদ (২৫৬৭); আত-তিরমিযী) আত-তাফসীর (৩১৮১); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬১; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৩

১৫৪. তাবাকাত-২/৬৩,৬৫

১৫৫. কোন কোন বর্ণনায় 'আস-সুলসুল' নামক স্থানের কথা এসেছে। আল-বিকরী বলেন ঃ 'আস-সুলসুল হলো জুলহুলায়ফার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। (সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬৯, ১৭০

জ্ঞান হয়েছিল। তাই এবার সাথে সাথে ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করেন। সময়টি ছিল প্রভাত হওয়ার কাছাকাছি। রাসূল (সা) যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন এবং এক ব্যক্তিকে হারটি খোঁজার জন্য দ্রুত পাঠিয়ে দিলেন! ঘটনাক্রমে সৈন্যরা যেখানে তাঁবু গেঁড়েছিল সেখানে বিন্দুমাত্র পানি ছিল না। এ দিকে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেল। লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) নিকট ছুটে গিয়ে বললো, 'আয়িশা (রা) সৈন্য বাহিনীকে কী বিপদের মধ্যে ফেলে দিল। আবু বকর (রা) তখন সোজা 'আয়িশার (রা) কাছে দৌড়ে গেলেন। দেখলেন, রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) হাঁটুর উপর মাথা রেখে একটু আরাম করছেন। আবু বকর (রা) উত্তেজিত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, তুমি সব সময় মানুষের জন্য নতুন নতুন মুসীবত ডেকে আন। এ কথা বলে তিনি রাগে-ক্ষোভে মেয়ের পাঁজরে কয়েকটি খোঁচা মারেন। কিন্তু 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আরামের ব্যাঘাত হবে ভেবে একটুও নড়লেন না।

এদিকে সকাল হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুম থেকে জেগে সবকিছু অবগত হলেন। ইসলামী বিধি-বিধানের এ এক বৈশিষ্ট্য যে, সর্বদা তা উপযুক্ত সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামে এর আগে নামাযের জন্য ওজু ফরয ছিল। কিন্তু এই ঘটনার সময় পানি না পাওয়া গেলে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে করণীয় কর্তব্য বলে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا - (سورة النساء-٤٣)

"আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী-গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানি না পায়, তবে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তা'য়াম্মুম করে নাও। তাতে তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল।" (আন-নিসা ঃ ৪৩)

মূলত তা'য়াম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার বিশেষ– যা এ উম্মাতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি ওজু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। আর এ সহজ ব্যবস্থাটি পূর্ববর্তী কোন উম্মাতকে দান করা হয়নি, একমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীকেই দান করা হয়েছে।

যা হোক, মুসলিম মুজাহিদদের আবেগ-উত্তেজনায় টগবগে দলটি—যারা তখন পানি না পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত মনে করছিল, আল্লাহর এ রহমত লাভে ভীষণ

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। হযরত উসাইদ ইবন হুদাইর– যিনি একজন বড় মাপের সাহাবী ছিলেন, আবেগ ভরে বলে উঠলেন ঃ 'ওহে আবু বকর সিদ্দীকের পরিবারবর্গ! ইসলামের এটাই আপনাদের প্রথম কল্যাণ নয়।'[১৫৬]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উসাইদ ইবন হুদাইর 'আয়িশাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন! আপনার উপর যখনই কোন বিপদ এসেছে– যা আপনি পছন্দ করেন না, তখনই আল্লাহ তার মাধ্যমে আপনার ও মুসলমানদের জন্য কোন না কোন কল্যাণ দান করেছেন।'[১৫৭]

হযরত সিদ্দীকে আকবর-যিনি কিছুক্ষণ আগেই প্রিয়তমা কন্যাকে শিক্ষাদানের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, গর্বের সাথে এখন তিনি সেই কন্যাকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ 'আমার কলিজার টুকরা! আমার জানা ছিল না যে, তুমি এতখানি কল্যাণময়ী। তোমার অসীলায় আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে এতখানি বরকত ও আসানী দান করেছেন।'[১৫৮]

উল্লেখ্য যে, 'আয়িশা (রা) এই হারটি বোন আসমার (রা) নিকট থেকে পরার জন্য ধার নিয়েছিলেন।[১৫৯] এরপর কাফেলা চলার জন্য যখন 'আয়িশার (রা) উটটি উঠানো হয় তখন সেই উটের নীচে হারটি পাওয়া যায়।[১৬০]

ঈলা বা তাখঈর-এর ঘটনা

রাসূলে কারীম (সা) ও 'আয়িশার (রা) যুগল জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অনেক। তারমধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি হলো ঃ তাহরীম ও ঈলা বা তাখঈর-এর ঘটনা। তাহরীম হলো মধু সংক্রান্ত সেই ঘটনা যা হযরত হাফসার (রা) জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর ঘটনাটির প্রতি পূর্বে কোথাও কোথাও ইঙ্গিত করা হলেও বিশদ আলোচনা হয়নি তাই এখানে বর্ণনা করা হলো।

এটা হিজরী ৯ম সন, মতান্তরে আহযাব ও বনু কুরাইজার সমসাময়িক কালের ঘটনা।[১৬১] তখন আরবের দূর-দূরান্তরে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের বাইতুল মালে প্রতিনিয়ত সম্পদ জমা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত রাসূলে পাকের (সা) পরিবারের লোকেরা যে অভাব-অনটন ও মিতব্যয়িতার ভিতর দিয়ে চলছিলেন, তার কিছু ইঙ্গিত পূর্বেই এসে গেছে। খাইবার বিজয়ের পর যে পরিমাণ শস্যদানা ও খোরমা-খেজুর আযওয়াজে মুতাহহারাতের সারা বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা ছিল খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের ছিল অতিথি সেবার অভ্যাস ও দান-খায়রাতের

---

১৫৬. বুখারী ঃ কিতাবুত তায়াম্মম; তাফসীর ইবন কাসীর-১/৫০৬; তাবাকাত-২/৬৫

১৫৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭০

১৫৮. মুসনাদ-৬/২৭২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭১

১৫৯. তাফসীর ইবন কাসীর-১/৫০৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬৯

১৬০. বুখারী ঃ আত-তায়াম্মম, আত-তাহারাহ্, আত-তাফসীর; ইবন মাজাহ-(৫৬৮): মুসলিম-(৩৬৭, ১০৮); তাফসীর ইবন কাসীর-১/৫০৬

১৬১. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আল-আহযাব, টীকা-৪১

হাত। এ কারণে তাঁদের জীবন-যাপনের মান ছিল অতি নিম্ন পর্যায়ের। তাঁদের প্রতিটি দিন কাটতো অনাহার-অর্ধাহারে। রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের মধ্যে আরবের অনেক বড় বড় গোত্র-প্রধানের মেয়েরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন শাহযাদীও। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের আগে তাঁরা নিজের পিতৃগৃহে অথবা পূর্বের স্বামীর ঘরে অত্যন্ত বিলাসী জীবন যাপন করতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে অর্থ-সম্পদের আধিক্য দেখে তাঁরা একযোগে তাঁদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানান।

এ কথা 'উমারের (রা) কানে গেলে প্রথমে তিনি নিজের মেয়ে হাফসাকে (রা) এই বলে বুঝালেন যে, তুমি তোমার জীবিকার পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানাচ্ছো। তোমার যা প্রয়োজন হয় আমার কাছেই চাইতে পার। তারপর হযরত 'উমার (রা) এক এক করে উম্মুল মুমিনীনদের প্রত্যেকের দরজায় যেয়ে তাদেরকে বুঝান। হযরত উম্মু সালামা বলেন ঃ 'উমার! আপনি তো প্রতিটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেই থাকেন, এখন রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করা আরম্ভ করলেন।' একথা শুনে 'উমার (রা) অপমাণিত হয়ে চুপ হয়ে গেলেন।'

একদিন আবু বকর ও 'উমার দুজন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) ঘিরে তাঁর স্ত্রীরা বসে আছেন এবং তাঁদের জীবিকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তাঁকে চাপাচাপি করছেন। উভয়ে নিজ নিজ মেয়ে– 'আয়িশা ও হাফসাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন তাঁরা এই অঙ্গীকার করে আপন আপন পিতার হাত থেকে রক্ষা পেলেন যে, আগামীতে তাঁরা আর জীবিকা বৃদ্ধির দাবী জানিয়ে রাসূলকে (সা) কষ্ট দেবেন না।

অন্য স্ত্রীরা তাঁদের দাবীর উপর অটল থাকলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় রাসূল (সা) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং পাঁজরে গাছের একটি মূলের সাথে ধাক্কা লেগে আহত হন।[১৬২]

হযরত 'আয়িশার (রা) হুজরা সংলগ্ন আর একটি ঘর ছিল যাকে 'আল-মাশরাবা বলা হতো। রাসূল (সা) সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আগামী এক মাস কোন স্ত্রীর কাছেই যাবেন না। এই ঘটনাটি মুনাফিকরা প্রচার করে দেয় যে, রাসূল (সা) তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দান করেছেন। একথা শুনে সাহাবা-ই-কিরাম মসজিদে সমবেত হন। ঘরে ঘরে একটা অস্থিরতার ভাব বিরাজ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীরা কান্নাকাটি শুরু করে দেন। সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে ঘটনাটির সত্যতা যাচাইয়ের সাহস করলেন না।

হযরত 'উমার (রা) খবর পেয়ে মসজিদে নববীতে এসে দেখলেন, সাহাবায়ে কিরাম বিমর্ষ অবস্থায় চুপচাপ বসে আছেন। তিনি রাসূলে পাকের (সা) সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দুইবার কোন সাড়া পেলেন না। তৃতীয় বারের মাথায় অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন, রাসূল (সা) একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন, তাঁর পবিত্র দেহে মোটা

---

১৬২. আবু দাউদ ঃ ইমামাতু মান সাল্লা কা'য়েদান

কম্বলের দাগ পড়ে গেছে। উমার (রা) ঘরের চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলেন, সেখানে কয়েকটি মাটির পাত্র ও শুকনো মশক ছাড়া আর কোন জিনিস নেই। এ অবস্থা দেখে 'উমারের (রা) চোখে অশ্রু নেমে এলো। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? জবাব দিলেন ঃ না। 'উমার বললেন ঃ আমি কি এ সুসংবাদ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে দিব? রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে 'উমার (রা) গলা ফাটিয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন।

এই মাসটি ছিল ২৯ দিনের। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'আমি একটি একটি করে দিন গুনতাম। ২৯ দিন পূর্ণ হলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।' রাসূলে কারীম (সা) সর্বপ্রথম 'আয়িশার (রা) ঘরে যান। তিনি আরজ করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ তো উনত্রিশ হলো। তিনি বললেন ঃ কোন মাস ২৯ দিনেও হয়।[১৬৩]

যেহেতু আযওয়াজে মুতাহ্হারাত জীবন-যাপনের মান বৃদ্ধির দাবীদার ছিলেন, অন্যদিকে নবী কারীম (সা) সহধর্মিণীদের সন্তুষ্টির জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস দ্বারা নিজেকে কলুষিত করতে পারেন না। এই জন্য আল্লাহ তা'য়ালা 'তাখঈর' এর আয়াত নাযিল করেন। 'তাখঈর' অর্থ এখতিয়ার ও স্বাধীনতা দান করা। অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে যাঁর ইচ্ছা দারিদ্র ও অভাব-অনটন মেনে নিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেন। আর যাঁর ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন। আয়াতটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً - وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الاخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا -

(الأَحْزَابُ-٢٩)

"হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বল ঃ তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও পরকালের ঘর পেতে চাও, তবে জেনে রাখ তোমাদের মধ্যে যারা নেক্কার, তাদের জন্য আল্লাহ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (আল-আহযাব-২৯)

মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীসে হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ সেই সময়কার ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, একদিন হযরত আবু বকর ও হযরত 'উমার (রা) নবী কারীমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন যে, হযরতের পত্নীগণ তাঁর চারপাশে বসে

---

১৬৩. সহীহ মুসলিম ঃ বাবুল ঈলা

আছেন, আর রাসূলও (সা) চুপচাপ বসে আছেন। তিনি হযরত 'উমারকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা দেখছো, এরা আমার চারপাশে বসে আছে; আসলে এরা আমার নিকট খরচের টাকা চাচ্ছে।' এই কথা শুনে উভয় সাহাবী নিজ নিজ কন্যাকে খুব করে শাসিয়ে দিলেন এবং তাঁদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা রাসূলে কারীমকে কষ্ট দিচ্ছ এবং তাঁর নিকট এমন জিনিস চাচ্ছো যা তাঁর নিকট নেই।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, মারতে উদ্যত হলেন। রাসূল (সা) তাঁদেরকে থামালেন।[১৬৪] বস্তুত তখন নবী কারীম (সা) যে কতদূর আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলেন, তা উপরোক্ত ঘটনা হতে স্পষ্ট জানা যায়।

এই আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন নবী কারীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে কথা বললেন ঃ 'তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে জবাব দিও না। তোমার পিতা-মাতার মতামত জেনে নাও।' তারপর নবী কারীম (সা) তাঁকে উল্লেখিত আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন এবং বললেন, আল্লাহর নিকট থেকে এই হুকুম এসেছে। সাথে সাথে হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ এই বিষয়ে আমার বাবা-মার নিকট কি জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকালের সাফল্যই চাই। 'আয়িশার (রা) এমন জবাবে রাসূলে কারীম (সা) দারুণ খুশী হলেন। তিনি বললেন ঃ বিষয়টি যেভাবে তোমার নিকট উপস্থাপন করেছি সেভাবে তোমার অন্য সতীনদের নিকটও করবো। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ অনুগ্রহ করে আপনি আমার সিদ্ধান্তের কথাটি অন্য কাউকে জানাবেন না। কিন্তু রাসূল (সা) তাঁর সে অনুরোধ রাখেননি। তিনি যেভাবে 'আয়িশাকে কথাটি বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবে তাঁর সতীনদেরকেও বলেন। সাথে সাথে এ কথাটিও বলে দেন যে, 'আয়িশা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) ও আখেরাতকে গ্রহণ করেছে।[১৬৫] তাঁদের প্রত্যেকেই 'আয়িশার মত (রা) একই জবাব দেন। সীরাতের গ্রন্থসমূহে এই ঘটনা 'তাখঈর' নামে অভিহিত হয়েছে। 'তাখঈর' অর্থ ইখতিয়ার দান করা। স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকবে, নাকি তাঁর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে– এই দুইটির কোন একটি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করার ইখতিয়ার স্ত্রীকে অর্পণ করা।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রহ) ইবনুল 'আরাবীর' আহকামুল কুরআনের সূত্রে বলেছেন ঃ 'তাখঈর'-এর আয়াত নাযিল হওয়ার সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চারজন বেগম বর্তমান ছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ হযরত সাওদা (রা), হযরত 'আয়িশা (রা), হযরত হাফসা (রা) ও হযরত উম্মু সালামা (রা)।'[১৬৬] তবে আল্লামাহ ইবন কাসীর হযরত আকরামার (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মোট নয়জন বেগম ছিলেন। পাঁচজন কুরাইশ খান্দানের– 'আয়িশা, হাফসা, উম্মু হাবীবা,

---

১৬৪. তাফসীর ইবন কাসীর-৩/৪৮১

১৬৫. তাবাকাত-৮/৬৯; সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুত তাফসীর-সূরা আল-আহযাব; মুসলিম ঃ আল-ঈলা

১৬৬. তাফহীমুল কুরআন ঃ সূরা আল আহযাব, টীকা-৪১

সাওদা ও উম্মু সালামা (রা) এবং অন্যরা হলেন– সাফিয়্যা, মাইমুনা, জুওয়াইরিয়া ও যয়নাব বিনত জাহাশ আল-আসাদিয়্যা (রা)।[১৬৭] ঘটনার সময়কাল নিয়ে মতভেদের কারণে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বামীর ইনতিকাল

হযরত 'আয়িশার (রা) বয়স যখন আঠারো বছর তখন স্বামী রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন। হিজরী ১১ সনের সফর মাসের পূর্বে কোন একদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে এসে দেখেন, তিনি মাথার যন্ত্রণায় আহ্ উহ্ করছেন। রাসূল (সা) তাঁর এ অবস্থা দেখে বললেন ঃ তুমি যদি আমার সামনে মারা যেতে, আমি তোমাকে নিজ হাতে গোসল দিয়ে কাফন-দাফন করতাম। 'আয়িশা (রা) সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানালেন এভাবে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো একথা বলছেন এ জন্য যে, যাতে এই ঘরে অন্য একজন স্ত্রীকে এনে উঠাতে পারেন। একথা শুনে রাসূল (সা) নিজের মাথায় হাত রেখে বলে ওঠেন ঃ হায় আমার মাথা! বলা হয়েছে, মূলত তখন থেকেই রাসূলুল্লাহর (সা) মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়।[১৬৮] এরপর তিনি হযরত মায়মূনার (রা) ঘরে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এ অবস্থায়ও তিনি নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট স্ত্রীর ঘরে রাত কাটাতেন। কিন্তু প্রত্যেক দিনই জানতে চাইতেন, আগামী কাল তিনি কোথায় থাকবেন? স্ত্রীগণ বুঝতে পারলেন তিনি 'আয়িশার (রা) কাছেই থাকতে চাচ্ছেন। তাই তাঁরা সবাই অনুমতি দিলেন। সেই দিন থেকে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি 'আয়িশার (রা) ঘরে অবস্থান করেন।[১৬৯]

এখন কারো মনে এ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত 'আয়িশার (রা) কাছে যাওয়ার জন্য এত ব্যাকুল ছিলেন কেন? তাঁকে অতিমাত্রায় ভালোবাসার কারণে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তা নয়। মূলত আল্লাহ 'আয়িশাকে (রা) যে পরিমাণ বুদ্ধি, মেধা, স্মরণশক্তি, স্বভাবগত পূর্ণতা এবং চিন্তাশক্তি দান করেছিলেন তা অন্য কোন স্ত্রীর মধ্যে ছিল না। সুতরাং এমন ধারণা অমূলক নয় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলির যাবতীয় কথা, কাজ ও আচরণ যেন পূর্ণরূপে সংরক্ষিত থাকে। বাস্তবে তাই হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত সংক্রান্ত অধিকাংশ সহীহ বর্ণনা 'আয়িশার (রা) মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছেছে।

রাসূলুল্লাহর (সা) রোগের তীব্রতা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক পর্যায়ে তিনি ইমামতির জন্য মসজিদে যেতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। সহধর্মিণীগণ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে শেখা কিছু দু'আ পড়ে তাঁরা ফুঁক দিচ্ছিলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) কিছু দু'আ পড়ে ফুঁক দিয়েছিলেন।[১৭০]

---

১৬৭. তাফসীর ইবন কাসীর-৩/৪৮১
১৬৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৫৪১-৫৪৫
১৬৯. প্রাগুক্ত-১/৫৪৫; বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয।
১৭০. আনসাবুল আশরাফ-১/৫৫১

ফজরের নামাযে সমবেত মুসল্লীরা রাসূলুল্লাহর (সা) অপেক্ষায় বসে ছিলেন। তিনি কয়েকবার ওঠার চেষ্টা করতেই অচেতন হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তিনি আবু বকরকে (রা) ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। 'আয়িশা (রা) বলেন, আমার ধারণা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) স্থলে যিনিই দাঁড়াবেন মানুষ তাঁকে অপাংক্তেয় ও অশুভ বলে মনে করবে। এজন্য আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আবু বকর একজন নরম দিলের মানুষ। তাঁর দ্বারা এ কাজ হবে না। তিনি কেঁদে ফেলবেন। অন্য কাউকে নির্দেশ দিন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার একই নির্দেশ দিলেন। তখন 'আয়িশা (রা) হাফসাকে (রা) অনুরোধ করলেন কথাটি আবার রাসূলুল্লাহকে (সা) বলার জন্য। হাফসা (রা) একই কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করলেন ঃ 'তোমরা সবাই ইউসুফের সঙ্গিনীদের মত। বলে দাও, আবু বকর ইমামতি করবেন।'[১৭১]

রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়ার পূর্বে কিছু নগদ অর্থ 'আয়িশার (রা) নিকট রেখে খরচ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন এই প্রবল রোগের মধ্যে সে কথা স্মরণ হলো। 'আয়িশাকে (রা) বললেন ঃ সেই দিরহামগুলি কোথায়? ওগুলি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে ফেল। মুহাম্মাদ কি বিরূপ ধারণা নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে? তখনই সেই অর্থ দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।[১৭২]

এখন রাসূলুল্লাহর (সা) শেষ সময়। 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার কাছে বসা এবং তিনিও 'আয়িশার (রা) সিনার সাথে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সুস্থতার জন্য দু'আ করে চলেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাত তাঁর হাতের মধ্যেই। হঠাৎ তিনি টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ وَالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى (আল্লাহুম্মা ওয়ার রাফীকিল আ'লা)

অর্থাৎ, আল্লাহ! আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুকেই গ্রহণ করছি।[১৭৩]

'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সুস্থ অবস্থায় তিনি বলতেন, প্রত্যেক নবীর মরণকালে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের যে কোন একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) এই শব্দগুলি উচ্চারণের পর আমি বুঝে গেলাম যে, তিনি আমাদের থেকে দূরে থাকাকেই কবুল করেছেন।[১৭৪] তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আপনার তো বড় কষ্ট হচ্ছে। বললেন ঃ কষ্ট অনুপাতে প্রতিদানও আছে।

'আয়িশা (রা) হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) সামলে নিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর দেহের ভার আবুব করলেন। চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তিনি আর নেই। আস্তে করে পবিত্র মাথাটি বালিশের উপর রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।[১৭৫]

---

১৭১. প্রাগুক্ত-১/৫৫৬-৫৫৭; বুখারী : বাবুল হিজরাহ্

১৭২. মুসনাদ-৬/৪৯

১৭৩. প্রাগুক্ত-৬/১২৬

১৭৪. ইবন কাসীর : আস্-সীরাহ-২/৪৭২; আনসাব-১/৫৪৭, ৫৪৯,

১৭৫. মুসনাদ-৬/২৭৪

হযরত 'আয়িশার (রা) সবচেয়ে বড় সম্মান ও মর্যাদা এই যে, তাঁরই ঘরের মধ্যে, এক পাশে রাসূলে পাকের পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।[১৭৬]

একবার হযরত 'আয়িশা (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর ঘরে একের পর এক তিনটি চাঁদ ছুটে এসে পড়ছে। তিনি এই স্বপ্নের কথা পিতা আবু বকর সিদ্দীককে (রা) বলেন। যখন রাসূলে কারীমকে (সা) তাঁর ঘরে দাফন করা হলো তখন আবু বকর (রা) মেয়েকে বললেন, সেই তিন চাঁদের একটি এই এবং সবচেয়ে ভালোটি।[১৭৭] পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, তাঁর স্বপ্নের দ্বিতীয় ও তৃতীয় চাঁদ ছিলেন আবু বকর (রা) ও উমার (রা)।

হযরত 'আয়িশা (রা) আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন এবং এ অবস্থায় জীবনের আরো আটচল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, কবর পাকের পাশেই ছিলেন। প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশেই ঘুমোতেন। একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নে দেখার পর সেখানে ঘুমোনো ছেড়ে দেন। হযরত 'উমারকে (রা) 'আয়িশার (রা) ঘরে দাফন করার পূর্ব পর্যন্ত হিজাব ছাড়া আসা-যাওয়া করতেন। কারণ, তখন সেখানে যে দুইজন শায়িত ছিলেন, তাঁদের একজন স্বামী এবং অপরজন পিতা। তাঁদের পাশে 'উমারকে (রা) দাফন করার পর বলতেন, এখন ওখানে যেতে গেলে হিজাবের প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ পাক আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের (পবিত্র-সহধর্মিণীগণ) জন্য দ্বিতীয় বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলো যে, রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর কোন এক স্ত্রীকে বিয়ে করবে। এই হাদীসের বর্ণনা সূত্রের একজন বর্ণনাকারী সুফইয়ানকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো ঃ তিনি কি 'আয়িশা (রা)? সুফইয়ান বললেন ঃ বর্ণনাকারীরা তাই উল্লেখ করেছেন। সুদী বলেন ঃ যে ব্যক্তি এমন ইচ্ছা করেছিলেন, তিনি হলেন তালহা ইবন 'উবাইদিল্লাহ। এরই প্রেক্ষিতে নিম্নের এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ[১৭৮]

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا - اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا -

(الاحزاب ٥٣)

'আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ।'[১৭৯]

---

১৭৬. বুখারী ঃ বাবু ওফাত আন-নাবিয়্যি।

১৭৭. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ্-২/৪৯৫, আনসাব-১/৫৭১

১৭৮. তাফসীর ইবন কাসীর-৩/২৬৮

১৭৯. সূরা আল-আহযাব-৫৪

অপর আয়াতে আল্লাহ্ পাক আযওয়াজে মুতাহ্হারাতকে মুসলমানদের জননী বলে ঘোষণা দেন ঃ[১৮০]

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ -

'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।'

মূলকথা হলো, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত– যাঁরা তাঁদের জীবনের একটি অংশে মহানবীর (সা) জীবন সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁদের বাকী জীবনটাও স্বামীর শিক্ষা ও কর্মের অনুশীলন এবং প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করবেন। তাঁরা মুসলমানদের মা। তাঁদের দায়িত্ব হবে সন্তানদের তালীম ও তারবিয়্যাত (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) দান করা। তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বয়ং আল্লাহ বলে দিয়েছেন এভাবে ঃ[১৮১]

'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– প্রথম জাহিলী যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন।'

হযরত 'আয়িশার (রা) বাকী জীবন ছিল উপরে উদ্ধৃত আল্লাহর বাণীর বাস্তব ব্যাখ্যাস্বরূপ।

হযরত রাসূলে কারীমের ইনতিকালের পর উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কাফন-দাফন ও খলীফা নির্বাচনের ঝুট-ঝামেলা থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ চাইলেন, হযরত উসমানকে (রা) তাঁদের পক্ষ থেকে খলীফার নিকট পাঠাবেন উত্তরাধিকারের বিষয়টি চূড়ান্ত করার জন্য। তখন 'আয়িশা (রা) তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, রাসূলে কারীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় বলেছিলেন, 'আমার কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না। আমার পরিত্যক্ত সবকিছু সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।'[১৮২] এ কথা শুনে সবাই চুপ হয়ে যান।

আসলে রাসূলে পাক (সা) বিষয়-সম্পত্তি এমন কী-ইবা রেখে গিয়েছিলেন, যা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হতে পারতো? হাদীসে এসেছে, তিনি দিরহাম ও দীনার,

---

১৮০. প্রাগুক্ত-৬

১৮১. প্রাগুক্ত-৩০-৩৪

১৮২. বুখারী ঃ কিতাবুল ফারায়েজ; ইবন কাসীর ঃ আস-সীরাহ-২/৫০৮

চতুষ্পদ জন্তু, দাস-দাসী কিছুই মীরাস হিসেবে রেখে যাননি।[১৮৩]

তবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হিসেবে কয়েকটি বাগ-বাগিচা তিনি নিজের অধীনে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তার আয় যে যে খাতে ব্যয় করতেন, খিলাফতে রাশেদাও তা একই অবস্থায় বহাল রাখেন। রাসূল (সা) বেগমগণের ব্যয় নির্বাহ করতেন এরই আয় থেকে, আবু বকরও তা বহাল রাখেন।[১৮৪]

পিতৃবিয়োগ

হযরত আবু বকর মাত্র দুই বছর খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পান। হিজরী তেরো সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর যখন অন্তিম দশা তখন মেয়ে 'আয়িশা পিতার শিয়রে বসা ছিলেন। এর আগে সুস্থ অবস্থায় তিনি মেয়েকে কিছু বিষয়-সম্পত্তি ভোগ-দখলের জন্য দিয়েছিলেন। এখন অন্য সন্তানদেরও বিষয়-সম্পত্তির প্রয়োজনের কথা মনে করে বললেন ঃ আমার কলিজার টুকরো মেয়ে! তুমি কি ঐ বিষয়-সম্পত্তি তোমার অন্য ভাইদের দিয়ে দিবে? মেয়ে বললেন ঃ অবশ্যই দিব। তারপর তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) কাফনে মোট কতখানা কাপড় ছিল? মেয়ে বললেন ঃ তিনখানা সাদা কাপড়। আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি কোন দিন ওফাত পান? বললেন ঃ সোমবার। আবার জিজ্ঞেস করলেন; আজ কি বার? বললেন ঃ সোমবার। বললেন ঃ তাহলে আজ রাতে আমাকেও যেতে হবে। তারপর তিনি নিজের চাদরটি দেখলেন। তাতে জাফরানের দাগ ছিল। বললেন ঃ এই কাপড়খানি ধুয়ে তার উপর আরো দুইখানি কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিবে। মেয়ে বললেন ঃ এই কাপড় তো পুরানো। বললেন ঃ মৃতদের চেয়ে জীবিতদেরই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশী।[১৮৫] সেই দিন রাতেই তিনি ওফাত পান। হযরত 'আয়িশার হুজরার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে, একটু পায়ের দিকে সরিয়ে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত 'আয়িশার হুজরায় পতিত এটা হলো দ্বিতীয় চাঁদ। এত অল্প বয়সে স্বামী হারানোর মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি পিতাকে হারালেন।

খিলাফতে ফারুকী

হযরত ফারুকে আজমের (রা) খিলাফত কালটি ছিল সর্বদিক দিয়ে উৎকর্ষমণ্ডিত। তিনি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য নগদ ভাতা নির্ধারণ করে দেন। একটি বর্ণনা মতে, তিনি 'আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক বারো হাজার করে দিতেন।[১৮৬] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, অন্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের প্রত্যেককে দশ হাজার এবং 'আয়িশাকে (রা) বারো হাজার দিতেন। এমন প্রাধান্য দানের কারণ উমার (রা) নিজেই বলে দিয়েছেন। 'আমি তাঁকে দুই হাজার এই জন্য বেশী দিই যে, তিনি ছিলেন

---

১৮৩. বুখারী ঃ কিতাবুল ওয়াসাইয়া

১৮৪. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল ফারায়েজ

১৮৫. প্রাগুক্ত ঃ আবওয়াবুল জানায়েয

১৮৬. কিতাবুল খারাজ-২৫

রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী।'

আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের সংখ্যা অনুযায়ী খলীফা উমার (রা) নয়টি পিয়ালা তৈরী করান। যখন কোন জিনিস তাঁর হাতে আসতো, নয়টি ভিন্ন ভিন্ন পিয়ালায় সকলের নিকট পাঠাতেন। হাদিয়া-তোহফা বণ্টনের সময় এতখানি খেয়াল রাখতেন যে, কোন জন্তু জবেহ্ হলে তার মাথা থেকে পায়া পর্যন্ত তাঁদের নিকট পাঠাতেন।

ইরাক বিজয়ের এক পর্যায়ে মূল্যবান মোতি ভর্তি একটি কৌটা মুসলমানদের হাতে আসে। অন্যান্য মালে গনীমতের সাথে সেটিও খলীফার দরবারে পাঠানো হয়। এই মোতির বণ্টন সকলের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। খলীফা 'উমার (রা) বললেন ঃ আপনারা সকলে অনুমতি দিলে এই মোতিগুলি আমি 'উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দিতে পারি। কারণ, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী। সকলে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিলেন। পাত্রটি 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠানো হলো। তিনি সেটা খুলে দেখে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) পরে ইবন খাত্তাব আমার প্রতি অনেক বড় বড় অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। হে আল্লাহ! আগামীতে তাঁর এমনসব অনুগ্রহ লাভের জন্য আমাকে জীবিত রেখো না।

খলীফা হযরত 'উমারের (রা) বাসনা ছিল, 'আয়িশার (রা) হুজরায় রাসূলুল্লাহর (সা) কদম মুবারকের কাছে দাফন হওয়ার। কিন্তু একথা বলতে পারছিলেন না। তাঁর কারণ, যদিও মাটির নীচে চলে গেলে শরীয়াতের দৃষ্টিতে পুরুষদের থেকে পর্দা করা জরুরী নয়, তবুও আদব ও শিষ্টাচারের দৃষ্টিতে দাফনের পরেও তিনি আয়িশার নিকট গায়ের মাহরামই মনে করতেন। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে এসব চিন্তায় তিনি বড় পেরেশান ছিলেন। শেষমেষ ছেলেকে পাঠালেন এই বলে যে, 'উম্মুল মুমিনীনকে আমার সালাম পেশ করে বলবে, 'উমারের বাসনা হলো তাঁর দুই বন্ধুর পাশে দাফন হওয়ার।' 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ 'যদিও আমি ঐ স্থানটি নিজের জন্য রেখেছিলাম, তবে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) এই অনুমতি পাওয়ার পরেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে 'উমার (রা) অসীয়াত করে গেলেন, আমার লাশবাহী খাটিয়া তাঁর দরজায় নিয়ে গিয়ে আবার অনুমতি চাইবে। যদি তিনি অনুমতি দান করেন তাহলে ভিতরে দাফন করবে। অন্যথায় দাফন করবে সাধারণ মুসলমানদের গোরস্তানে। খলীফার ইনতিকালের পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হয়। 'আয়িশা (রা) দ্বিতীয়বার অনুমতি দান করেন এবং লাশ ভিতরে নিয়ে দাফন করা হয়।[১৮৭]

আর এভাবে তিনি হলেন হযরত 'আয়িশার (রা) স্বপ্নের তৃতীয় চাঁদ—যাঁর মাধ্যমে তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

বিদ্রোহীদের হাতে খলীফা হযরত উসমানের (রা) শাহাদাত বরণ ইসলামের ইতিহাসের

---

১৮৭. বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়েয

এক মর্মান্তিক ঘটনা। এরই প্রেক্ষিতে উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সরাসরি তৎকালীন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আর তাঁরই প্রেক্ষাপটে ঘটে আর এক হৃদয়বিদারক ঘটনা— উটের যুদ্ধ। হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাত পরবর্তী ঘটনাবলীতে তাঁর এভাবে জড়িয়ে পড়া কতটুকু ঠিক বা বেঠিক ছিল, সে বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তে যাবনা। আমরা শুধু বিশ্বাস করবো, তাঁর সকল কর্ম-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল দ্বীন ও 'উম্মাহর কল্যাণের জন্য। ঐতিহাসিক এ সকল ঘটনা বুঝার জন্য একটু বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন।

হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকাল প্রায় বারো বছর। এ সময়ের প্রথম অর্ধাংশে সকল প্রকার ঝামেলা ও হৈ-হাঙ্গামা মুক্ত শান্ত পরিবেশ বিরাজমান ছিল। তারপর ধীরে ধীরে জনগণের পক্ষ থেকে নানা রকম অভিযোগ উঠতে থাকে। হযরত 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) 'উসমানকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কখনও খিলাফতের জামা পরান তাহলে স্বেচ্ছায় তা যেন খুলে না ফেলেন।[১৮৮]

মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে হযরত 'আয়িশার (রা) খুবই গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী তিনি ছিলেন মুসলমানদের মা। হিজায, ইরাক, মিসর তথা খিলাফতের প্রতিটি অঞ্চলে তাঁকে মায়ের মত মানা হতো। লোকেরা তাঁর নিকট এসে নিজেদের নানা অভিযোগ ও অসুবিধার কথা বলতো, আর তিনি উপদেশ ও সান্ত্বনা দিতেন।

হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতের প্রথম পর্ব পর্যন্ত বড় মাপের প্রজ্ঞাবান সাহাবীরা জীবিত ছিলেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদেরকে নিয়োগ দান করা হতো। পূর্ববর্তী দুই খলীফার সময়ে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। সে সময় যাঁরা উচ্চাভিলাষী যুবক ছিলেন– যেমন আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর, মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর, মারওয়ান ইবন হাকাম, মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা, সাঈদ ইবন আল-আ'স প্রমুখ, তাঁরা বড়দের সাহায্য করতেন। খিলাফত এবং ইমারাতের কোন উঁচু পদ ছিল তাঁদের জন্য দুরাশা মাত্র।

আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবরের নাতী এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই ও হাওয়ারী যুবাইয়ের (রা) ছেলে। তিনি নিজেকে খিলাফতের একজন হকদার মনে করতেন।

মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ছিলেন প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের ছোট ছেলে এবং উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) বৈমাত্রেয় ভাই। এই মুহাম্মাদের মাকে আবু বকরের মৃত্যুর পর আলী (রা) বিয়ে করেন। এ কারণে আলীর (রা) নিকট লালিত-পালিত হন।[১৮৯] আর আলীও তাঁকে ছেলের মত দেখতেন।

---

১৮৮. মুসনাদ-৬/২৬৩

১৮৯. আল-ইসাবা-৩/২৭২

মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা বেড়ে ওঠেন হযরত উসমানের (রা) তত্ত্বাবধানে। বয়স হলে খলীফা উসমানের নিকট কোন একটি বড় পদের আশা করেন। খলীফা তাঁকে যোগ্য মনে না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে মদীনা ছেড়ে মিসর চলে যান।

মারওয়ান ও সা'ঈদ ইবন আ'স উভয়ে উমাইয়্যা বংশের দুই নব্য যুবক ছিলেন। উঁচু মর্যাদার অধিকারী মুহাজিরদের ইনতিকালের পর তাঁদের সন্তানরাও খিলাফতের নিকট বহু কিছু প্রাপ্তির আশা নিয়ে এগিয়ে আসেন। হযরত 'উসমান (রা) উমাইয়্যা খান্দানের লোক ছিলেন। তাই তিনি যখনই মারওয়ান ও সা'ঈদ ইবন আসের মত লোকদের উঁচুপদ দান করলেন, তখন কুরাইশ-খান্দানের অন্যসব উচ্চাভিলাষী যুবকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ কারণে মুহাম্মাদ ইবন-আবী বকর ও মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা 'উসমান বিরোধী বিক্ষোভে সবচেয়ে বেশী অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া এই সকল নওজোয়ানের মধ্যে উঁচু স্তরের সাহাবায়ে কিরামের মত সাম্য ও ন্যায়পরায়ণতা, সততা, আমানাতদারি, তাকওয়া ও খোদাভীতি ছিল না। এ কারণে, জনসাধারণ ও সৈনিকদের মধ্যে যাঁরা প্রথম স্তরের সাহাবীদেরকে দেখেছিলেন, তারা এই লোকদের নেতৃত্ব ও শাসনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, আরবরা ছিল চির স্বাধীন। মরু প্রকৃতিতে তারা স্বাধীন আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের আনুগত্য করতো এবং নিজের গোত্রকে অন্য গোত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। ইসলামী সাম্যের আদর্শ তাদের সকল অভিজাত্য ভুলিয়ে দেয় এবং তাদেরকে একই স্তরে নামিয়ে আনে। প্রথম স্তরের সাহাবায়ে কিরাম ইসলামী সাম্যের শিক্ষা সমুন্নত রাখলেও তাঁদের পরবর্তী নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তা ও পদাধিকারী ব্যক্তিরা যেমন তা ভুলে বসেন, তেমনি অন্যদেরকেও ভুলিয়ে দেন। তাঁরা প্রকাশ্যে নিজেদের মজলিস ও দরবারে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা ও গোত্রীয় আভিজাত্য প্রকাশ করতে শুরু করেন। অন্যান্য আরব গোত্রসমূহ তাঁদের এমন মনোভাব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তারা ছিল সম অধিকারের দাবীদার। অন্যদিকে নওমুসলিম অনারব গোষ্ঠী কুরাইশ বা বনু উমাইয়্যা কোন আরব গোত্রেরই শাসন সহ্য করতে পারছিল না। এই জন্য খিলাফতের অভ্যন্তরে যে কোন ধরনের হৈ-হাঙ্গামায় অতি উৎসাহের সাথে তারা অংশগ্রহণ করতো।

আরব-আজমের মিলনস্থলরূপে যে কয়টি শহর চিহ্নিত ছিল তার মধ্যে কুফা অন্যতম। ইসলামী খিলাফতের ফিত্‌নার সূচনা এই শহর থেকেই হয়। এটি ছিল আরব গোত্রসমূহের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সা'ঈদ ইবনুল আ'স ছিলেন এই কূফার ওয়ালী। রাতের বেলা তাঁর দরবারে সকল গোত্রের সর্দারদের মাজমা বসতো। সাধারণত আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও আরব গোত্রসমূহের খান্দানী মর্যাদার তারতম্য বিষয়ে আলোচনা হতো। আর বিষয়টি এমন ছিল যে, কোন গোত্রই অন্য গোত্র থেকে মর্যাদায় খাটো মনে করতো না। অনেক সময় আলোচনা তর্ক-বিতর্ক ঝগড়া-ঝাটি ও মারামারিতে রূপ নিত। এ ক্ষেত্রে সা'ঈদ ইবন 'আসের মুখে নিজেকে কুরাইশ বংশজাত বলে গর্বের

সাথে প্রকাশ করা আগুনে তেল ঢালার মত কাজ করতো। তাঁর এমন কর্মপন্থায় গোত্রীয় নেতাদের অভিযোগ সৃষ্টি হয়। মূলত তা একটি ফিতনার রূপ ধারণ করে।

ঠিক এই সময়ে ইবন সাবা নামক এক ইহুদী মুসলমান হয়। ইহুদীদের নিয়ম হলো, শত্রু হিসেবে যদি শত্রুর ক্ষতি না করতে পারে তাহলে রূপ পাল্টে বন্ধু হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শত্রুর সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ে। অতীতে খৃস্টধর্মের সাথে তারা এমন আচরণই করেছিল।

এই ইহুদীর সন্তান ইবন সাবা জনগণের মধ্যে এই কথা প্রচার করতে থাকে যে, হযরত আলী (রা) প্রকৃত পক্ষে খিলাফতের হকদার। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর খলীফা হওয়ার ব্যাপারে অসীয়াত করে গিয়েছিলেন। সর্বশক্তি দিয়ে সে তাঁর এই ভ্রান্তবিশ্বাস প্রচার করতে থাকে। খিলাফতের বিভিন্ন ছোটখাট রাজনৈতিক হৈ-চৈকে বাহানা বানিয়ে সে তার ষড়যন্ত্রের জালকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। সে গোটা খিলাফত চষে ফেলে। কূফা, বসরা, মিসর তথা যেখানে বড় বড় সৈন্য ছাউনী ছিল সেখানে কিছু না কিছু বিপ্লবপন্থী সে তৈরী করে। সে মিসরকে এই বিপ্লবপন্থীদের কেন্দ্র বানিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। ইতিহাসে এটাকে 'সাবায়ী' আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

খলীফা 'উসমানের (রা) সময়ে আফ্রিকাতেই অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। একারণে সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ সেখানেই থাকতো। যুদ্ধে অংশগ্রহণের বাহানায় মুহম্মাদ ইবন আবী বকর ও মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা স্বাধীনভাবে সৈন্যদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেতেন এবং তাদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ রোপণ করতেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে মিসর উসমান (রা) বিরোধী বিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে ওঠে। আর সেই সময় আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহ মিসরের ওয়ালী ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর, মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা ও অন্যরা আবদুল্লাহ ইবন আবী সারাহ ও খলীফা উসমানের (রা) বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করে দিলেন। এভাবে তাঁরা মিসরে নতুন রাজনৈতিক দলের নেতা পরিণত হলেন।

হজ্জের মওসুম এসে গেল। পারস্পরিক যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত মুতাবিক কূফা, বসরা ও মিসর থেকে এক হাজার মানুষের একটি দল হজ্জের বাহানায় হিজাযের দিকে যাত্রা করলো এবং মদীনার কাছাকাছি এসে শিবির স্থাপন করলো। হযরত আলী (রা) ও অন্য বড় বড় সাহাবীরা তাদেরকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। তারা কিছুদূর যেয়ে আবার ফিরে আসে এবং মিসরের গভর্ণরের নিকট লেখা একটি চিঠি দেখায়। তাতে মিসরের গভর্নরের প্রতি খলীফার নির্দেশ ছিল, মিসরী বিদ্রোহীদের নেতৃবৃন্দকে মিসর প্রত্যাবর্তনের পরপরই হত্যা অথবা বন্দী করার। বিদ্রোহীদের ধারণা মতে, এই পত্রখানি ছিল খলীফার সেক্রেটারী মারওয়ানের হাতের লেখা। এ কারণে তারা সমবেতভাবে খলীফা উসমানের (রা) বাড়ী ঘেরাও করে এবং খলীফার নিকট দুইটি প্রস্তাব পেশ করে। হয় তিনি মারওয়ানকে বিদ্রোহীদের হাতে অর্পণ করবেন অথবা তিনি নিজেই পদত্যাগ

করবেন। হযরত উসমান দুইটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন।

হযরত আয়িশা তখন মদীনায়। তিনি বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকে ডেকে বুঝালেন এবং খলীফার বিরুদ্ধে এমন চরম সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকতে বললেন। কিন্তু তিনি বোনের কথায় কান দিলেন না।

মদীনায় যখন এমন একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান, তখন হযরত 'আয়িশা (রা) প্রতিবছরের মত হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে গেলেন। অবশ্য তিনি মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরকেও সংগে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে রাজি করাতে পারেননি। তারপর কিছুদিন হযরত উসমান (রা) নিজ গৃহে অবরুদ্ধ থাকেন এবং অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত 'উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করলেন। এখন একজন নতুন খলীফা নির্বাচনের পালা। স্বাভাবিক ভাবেই সকলের দৃষ্টি সেই চারজন জীবিত বিশিষ্ট সাহাবীর প্রতি পড়ার কথা, যাঁরা খলীফা হযরত উমারের (রা) মনোনীত ছয় সদস্যের খলীফা প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তারা হলেন ঃ তালহা, যুবাইর, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ও আলী (রা)। এ সময় সা'দ (রা) একেবারেই নিজেকে দূরে সরিয়ে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে যান। বসরার অধিবাসীরা তালহার (রা) পক্ষ অবলম্বনকারী ছিল। মিসরবাসীদের একাংশ ছিল যুবাইরের (রা) পক্ষে; কিন্তু অপর অংশ এবং বিপ্লবীদের গরিষ্ঠ অংশ ছিল আলীর (রা) পক্ষে। আলীর (রা) সমর্থকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছিলেন আশতার নাখঈ, আম্মার ইবন ইয়াসির ও মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা)। এমনিভাবে প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠী নিজেদের পছন্দনীয় ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে থাকে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) ছেলে আবদুল্লাহ ইবন উমার, তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের (রা) ছেলে আবান ও প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) ছেলে আবদুর রহমানের নামটিও প্রস্তাবে আসে। দীর্ঘ আলোচনা, পর্যালোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর বিদ্রোহীদের চাপ ও মদীনাবাসীদের ইচ্ছায় হযরত আলীকে (রা) খলীফা নির্বাচন করা হয়।[১৯০]

মদীনায় যখন এ সকল ঘটনা ঘটছে তখন সিরিয়ায় হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন এবং মুহাম্মাদ ইবন আবী হুজায়ফা মিসরে স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে বসে আছেন। মদীনার পবিত্র ভূমিতে পবিত্র মাসে রাসূলুল্লাহর (সা) খলীফা এবং মুসলিম জাহানের ইমামের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে দারুণ ছাপ ফেলে। পূর্বে যাঁরা হযরত উসমানের (রা) কর্মপদ্ধতির সমালোচক ছিলেন, তারাও এহেন ঘৃণিত কাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। হযরত 'আয়িশাও (রা) এই শ্রেণীর লোকদের অন্যতম। এমন বাড়াবাড়ি তাঁদের কেউই চাননি। এই ঘটনার পূর্বে আশতার নাখঈ একদিন আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, উসমানকে (রা) হত্যার ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর পানাহ্! আমি ইমামদের

---

১৯০. ইবনুল আসীর; আল-কামিল ফিত তারীখ-৩/১৯২

ইমামকে হত্যার কথা বলতে পারি? এতেই ফিতনাবাজ লোকেরা রটিয়ে দেয় যে, উসমান (রা) হত্যাকাণ্ডে 'আয়িশারও (রা) সমর্থন ছিল। তাছাড়া, মানুষের এমন ধারণার আরেকটি কারণ ছিল। তা হলো তাঁর ছোট সৎ ভাই মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) ছিলেন বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর ভাইকে উসমান (রা) বিরোধী হঠকারী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হযরত আয়িশা (রা) পরবর্তীকালে একবার হযরত 'উসমানের (রা) আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনও চাইনি যে 'উসমানের (রা) কোন রকম অসম্মান হোক। আমি যদি তা চেয়ে থাকি তাহলে আমারও যেন তেমন হয়। আমি কখনো চাইনি যে, তিনি নিহত হোন। যদি তা চেয়ে থাকি তাহলে আমারও যেন তাঁর মত পরিণতি হয়। হে 'উবাইদুল্লাহ ইবন আদী! (আদী ছিলেন আলীর রা. পক্ষে) একথা জানার পর কেউ যেন তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের কর্মকাণ্ডকে কেউ ততদিন অসম্মান করতে পারেনি যতদিন তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়নি। যে উসমানের সমালোচনা করেছে, সে এমন সব কথা বলেছে যা বলা উচিত ছিল না। তারা এমন সব কথা পাঠ করেছে, যা পাঠ করা উচিত ছিল না। এমনভাবে নামায পড়েছে, যা সঙ্গত ছিল না। আমরা তাদের কর্মকাণ্ডকে গভীরভাবে দেখেছি, তাতে বুঝেছি তা সাহাবীদের কর্মকাণ্ডের ধারে কাছেও ছিল না।' ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থে হযরত আয়িশার (রা) এ জাতীয় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যা দ্বারা বুঝা যায় উসমান (রা) হত্যার ব্যাপারে তার কোন রকম ভূমিকা ছিল না। তাঁর প্রতি যে দোষারোপ করা হয়েছিল তা ছিল বিদ্রোহীদের একটি অপপ্রচার মাত্র।

মদীনার এই মর্মবিদারী ঘটনায় তৎকালীন গোটা মুসলিম উম্মাহ শোকে কাতর হয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কিরামের ছোট্ট একটি দল, যাঁরা নিজেদের দেহের রক্ত দিয়ে গড়া উদ্যান তছনছ হতে দেখছিলেন—স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা এর একটা দফারফা করার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন তিনজন মহান সাহাবী ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা, হযরত যুবাইর ও হযরত তালহা (রা)। হযরত তালহা (রা) ছিলেন কুরাইশ খান্দানের লোক এবং প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) কন্যার স্বামী, ইসলামের আদি পর্বের একজন মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) আমলে সংঘটিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ। যুবাইর ইসলামের একজন বীর সৈনিক। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো ভাই এবং প্রথম খলীফার কন্যা হযরত আসমার (রা) স্বামী। উভয়ে ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের (রা) মনোনীত খলীফা প্যানেলের অন্যতম সদস্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় যখন খলীফা 'উসমান (রা) বহিরাগত বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ তখন হযরত 'আয়িশা (রা) প্রতি বছরের অভ্যাসমত হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলে যান। হজ্জ শেষ করে মদীনায় ফিরছিলেন, এমন সময় খলীফা

'উসমানের (রা) শাহাদাতের খবর পেলেন। সামনে কিছুদূর অগ্রসর হতেই হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরা খলীফা হযরত আলীর (রা) অনুমতি নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছেন। তাঁরা তখন হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট মদীনার আইন-শৃঙ্খলার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাবারী সহ বিভিন্ন প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ[১৯১]

'আমরা মদীনা থেকে বেদুইন ও সাধারণ মানুষের হাত থেকে কোন রকম পালিয়ে এসেছি। আমরা জনগণকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা যেমন সত্যকে চিনতে পারছে না, তেমনি মিথ্যাকেও অস্বীকার করতে সক্ষম হচ্ছে না। নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারছেনা।'

হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, এখন আমাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করা উচিত। এ সময় তিনি নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ قَوْمِىْ طَاوَعَتْنِىْ سُرَاتُهُمْ + لاَنْقَذْتُهُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَوِالْخَبَلِ -

–যদি আমার কাওমের নেতারা আমার আনুগত্য করতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারতাম।

তিনি আবার মক্কায় ফিরে গেলেন। খলীফার শাহাদাতের খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে চতুর্দিক থেকে মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসতে লাগলো। 'উমরা বিন্‌ত 'আবদির রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে। সে সময় উম্মুল মুমিনীন বলেন ঃ[১৯২] সেই কাওমের (সম্প্রদায়) মত অন্য কোন কাওম নেই যারা নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করে ঃ[১৯৩]

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْئَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ، فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا -

–যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অত ঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কববে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে।

হজ্জের মওসুম ছিল। ঘোষণার সাথে সাথে হারাম শরীফ থেকেই কয়েকশো মানুষ সাড়া

---

১৯১. প্রাগুক্ত-৩/২০৮

১৯২. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ বাবুত তাফসীর।

১৯৩. সূরা আল-হুজুরাত-৯

দিল। আবদুল্লাহ ইবন 'আমের বসরা থেকে প্রচুর নগদ অর্থ নিয়ে এসে 'আয়িশার (রা) সাথে যোগ দিল। ই'য়ালা ইবন মুনাইয়্যা ইয়ামন থেকে সাত শো উট ও ছয় লাখ দিরহাম এনে 'আয়িশার (রা) হাতে দিল।[১৯৪] এই বাহিনী কোন্ দিকে যাত্রা করবে তা ঠিক করার জন্য হযরত 'আয়িশার (রা) আবাস গৃহে পরামর্শ বৈঠক বসলো। আয়িশার (রা) মত ছিল মদীনার দিকে যাত্রা করার। কারণ সাবায়ী ও বিদ্রোহীরা সেখানেই অবস্থান করছিল। সেদিন তাঁর এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ইসলামী উম্মার ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, উসমানের (রা) রক্তের বদলা গ্রহণের জন্য বসরা ও কূফা থেকে— যেখানে হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) প্রচুর সমর্থক ছিল, সামরিক সাহায্য নেওয়া হবে। অত ঃপর এই কাফেলা মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তখন মক্কায়। তাঁকেও বসরার দিকে যাওয়ার অনুরোধ করা হলো। 'আমি মদীনার মানুষ, মদীনাবাসীরা যা করে, আমি তাই করবো'— একথা বলে তিনি এই কাফেলার সাথে বসরার দিকে চলতে অস্বীকৃতি জানালেন। অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন— যাঁরা 'আয়িশার (রা) সাথে মদীনায় ফেরার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, কেউ এই কাফেলার সাথে বসরার দিকে গেলেন না। একমাত্র হাফসা (রা) যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) বারণ করায় তিনিও আর গেলেন না। তবে অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন ও মক্কার সাধারণ মানুষ 'জাতুল ইরাক' পর্যন্ত বসরাগামী কাফেলাকে এগিয়ে দেন। তাঁরা সেদিন ইসলামের এমন দুর্দিন দেখে এমন কান্নাকাটি ও মাতম করেছিলেন যে আর কোনদিন তেমন দেখা যায়নি। এ কারণে ইতিহাসে এ দিনটিকে 'ইয়াউমুন নাহীব' বা কান্নার দিন বলা হয়।[১৯৫]

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) একটি উটের উপর সওয়ার হয়ে কাফেলার সাথে বসরার দিকে চললেন। ইতিহাসের এক মস্তবড় ট্রাজেডির সাক্ষী এই উটের একটু পরিচয় দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে করি। এই উটটি উম্মুল মুমিনীনকে কে দিয়েছিল, সে সম্পর্কে দুই ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। ই'য়ালা ইবন মুনাইয়্যা আশি দীনার দিয়ে খরিদ করে তাঁকে দেন। উটটির নাম ছিল 'আল-আসকার'। মতান্তরে উটটি ছিল 'উরাইনা' গোত্রের এক ব্যক্তির। উরায়নী গোত্রের সেই লোকটি বর্ণনা করেছে ঃ[১৯৬]

'আমি একটি উটে চড়ে চলছি। এমন সময় এক অশ্বারোহী এসে আমাকে বললো ঃ তুমি কি তোমার এ উটটি বেচবে? বললাম ঃ হ্যাঁ, বেচতে পারি। লোকটি বললো ঃ কত দাম? বললাম ঃ এক হাজার দিরহাম। বললো ঃ তুমি কি পাগল? বললাম ঃ কেন? আল্লাহর কসম! এর উপর সোয়ার হয়ে আমি যাকেই ধরতে চেয়েছি, সফল হয়েছি। আর এর পিঠে থাকা অবস্থায় কেউ আমাকে ধরতে পারেনি। সে বললো ঃ তুমি যদি জানতে, উটটি আমি কার জন্য কিনতে চাই। এটা আমি কিনতে চাই উম্মুল মুমিনীন

---

১৯৪. আল-কামিল ৩/২০৭

১৯৫. প্রাগুক্ত-২০৮,২০৯

১৯৬. প্রাগুক্ত-২১০

'আয়িশার (রা) জন্য। বললাম ঃ তাহলে আমি বিনা মূল্যেই দিলাম। সে বললো ঃ তা হয় না, তুমি বরং আমার সাথে কাফেলার কাছে চলো, আমরা তোমাকে একটি মাদী উট ও অনেক দিরহাম দিব। আমি তার সাথে কাফেলার কাছে গেলাম। তারা আমাকে বিনিময়ে একটি মাদী উট ও চার মতান্তরে ছয় শো দিরহাম দিল।' এই উরানী লোকটিকে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাফেলার সাথে নেওয়া হয়।

কাফেলার যাত্রাপথে মানুষ যখন শুনতে পেল, এই বাহিনীর পুরোধা উম্মুল মুমিনীন, তখন বহু লোক অত্যন্ত আবেগ ও উৎসাহের সাথে যোগদান করলো। এভাবে এক মানযিল পথ অতিক্রম করতে না করতে তিন হাজারের একটি বাহিনী তৈরী হয়ে গেল। হযরত উসমানের (রা) গোত্র বনু উমাইয়্যার যুবকদের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কি হতে পারতো? সে সময়ের পরিস্থিতি তাদের এত প্রতিকূল ছিল যে, চতুর্দিক থেকে তাড়া খেয়ে তারা পালিয়ে মক্কার হারামে এসে জড় হচ্ছিল। হযরত আয়িশার (রা) ঘোষণা ছিল তাদের জন্য এক মহা সুযোগ। তাঁরা সকলে তাঁর বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেল।

বনু উমাইয়্যার সাঈদ ইবনুল 'আস ও মারওয়ান ইবনুল হাকামও কাফেলার সাথে বের হলেন। 'মাররুজ জাহ্‌রান' মতান্তরে 'জাতু ইরাক' পৌঁছে সাঈদ ইবনুল 'আস তাঁর দলীয় লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা যদি উসমান (রা) হত্যার বদলা নিতে চাও তাহলে আগে এই লোকদের হত্যা কর। তাঁর ইঙ্গিত ছিল তালহা, যুবাইর, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি। কারণ বনু উমাইয়্যাদের মধ্যে সাধারণভাবে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, 'উসমানের (রা) হত্যাকারী কেবল তারাই নয় যারা তাকে হত্যা করেছে অথবা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বাইরে থেকে এসেছে, বরং ঐ সকল ব্যক্তির সকলে তাঁর হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত যাঁরা বিভিন্ন সময়ে হযরত উসমানের (রা) কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছেন এবং তারাও যাঁরা হাঙ্গামার সময় মদীনায় ছিলেন, কিন্তু তাঁকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেননি। মারওয়ান বললেন ঃ 'আমরা তাঁদের (তালহা , যুবাইর ও আলী রা.) একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়াবো। যাঁর পরাজয় হবে, তিনি এমনিই শেষ হয়ে যাবেন। আর যিনি জয়ী হবেন, এত দুর্বল হয়ে পড়বেন যে, অতি সহজেই আমরা তাঁকে কাবু করে ফেলতে পারবো।'[১৯৭]

আসলে বনু উমাইয়্যাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল হযরত আয়িশার (রা) আপোষ-মীমাংসার আহ্বান ও আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, আয়িশার নেতৃত্বে তৃতীয় আরেকটি শক্তির উত্থান হচ্ছে দেখে তাদের অনেকে এই বাহিনীর মধ্যে নানাভাবে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তারা প্রশ্ন তোলে আলীকে (রা) পরাভূত করার পর তালহা ও যুবাইরের মধ্যে কে খলীফা হবেন? হযরত 'আয়িশা (রা) জানতে পেরে এ প্রপাগাণ্ডা থামিয়ে দেন। তারপর আরেকটি প্রশ্ন তোলা হয়— খিলাফতের ফায়সালা না হয় পরে হবে, কিন্তু এ মুহূর্তে নামাযের ইমাম হবেন কে? হযরত আয়িশা (রা) তালহা ও

১৯৭. তাবাকাত-৫/৩৪-৩৫; তারীখে ইবন খালদুন-২/১৫৫; আল-কামিল-৩/২০৯,

যুবাইরের (রা) ছেলেদের নামাযের ইমামতির জন্য একদিন করে নির্ধারণ করে দিয়ে এ ফিতনাও থামিয়ে দেন।

চলার পথে 'হাওয়াব'[১৯৮] নামক জলাশয়ের নিকট পৌছলে এই বিশাল কাফেলা দেখে সেখানকার কুকুর হাঁকডাক আরম্ভ করে দেয়। আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করেন স্থানটির নাম কি? বলা হলো, 'হাওয়াব'। তখন তাঁর স্মরণ হয় রাসূলুল্লাহর (সা) একটি বাণী, একবার তিনি বেগমদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কাকে দেখে 'হাওয়াবের' কুকুরগুলি ডাকবে।' এই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হতেই হযরত আয়িশা (রা) ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একদিন একরাত কাফেলা এখানে থেমে থাকে।[১৯৯] অবশেষে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা হাওয়াব নয়। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হন। তাছাড়া হযরত যুবাইর তখন বলেন ঃ আপনি ফিরে যাবেন। কিন্তু হতে পারে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার দ্বারা এই বিবাদ মীমাংসা করে দেবেন।[২০০] কোন কোন বর্ণনায় কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'তাঁর (আয়িশার রা.) সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, পিছনে না ফিরে সামনে অগ্রসর হোন। লোকেরা যখন আপনাকে দেখতে পাবে তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করে দেবেন। সামনে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আছেন, তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি দ্রুত চলুন, পিছন থেকে আলীর (রা) বাহিনী আসছে। এই সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত আয়িশার (রা) বসরার দিকে চলার উদ্দেশ্য ছিল কেবল ইসলাহ ও মীমাংসা।

কূফা

মক্কা মু'য়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা ও বসরার পরে আরবের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল কূফা। হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী (রা) ছিলেন তথাকার ওয়ালী। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে নিজেদের দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরে তার সমর্থন কামনা করছিল। মহান সাহাবী হযরত আবু মূসা (রা) এই বিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজের প্রভাবের দ্বারা ও খুতবার মাধ্যমে এর থেকে দূরে থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন। হযরত আয়িশা (রা) কূফার নেতৃবৃন্দের নামে পৃথক পৃথক চিঠি পাঠালেন। এদিকে হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির ও ইমাম আল-হাসান (রা) কূফায় পৌঁছলেন। হযরত 'আম্মার (রা) কূফার জামে মসজিদে প্রদত্ত এক ভাষণে তৎকালীন ঘটনাবলী স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। সেই ভাষণে তিনি হযরত আয়িশার (রা) সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনার পরে বলেন, এ সব কিছু সঠিক। কিন্তু আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁর পরীক্ষা নিচ্ছেন। 'আম্মারের (রা) এ ভাষণ কূফাবাসীদের উপর দারুণ

---

১৯৮. 'আল-হাওয়াব' বসরাগামী পথে আরবের একটি জলাশয়। ইয়াকূত, আল-হামাবী তাঁর 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে একথা বলেছেন। আর 'উবাইদ আল-বিক্‌রী তাঁর 'মু'জামু মা ইসতা'জামা' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'আল-হাওয়াব হলো মক্কাগামী পথে বসরার অদূরে অবস্থিত একটি জলাশয়। কুদায়া গোত্রের কালব ইবন ওয়াবরীর কন্যা আল-হাওয়াব-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে

১৯৯. আল-কামিল-৩/২১০

২০০. মুসনাদে আহমাদ-৬/৯৭

প্রভাব ফেলে। কয়েক হাজার মুসলমান তাঁর আবেদনে সাড়া দেন। তা সত্ত্বেও কূফাবাসীর মনে এই দ্বিধা ও সংকোচ কাজ করতে থাকে যে, একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেগম উম্মুল মুমিনীন, আর অন্যদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যার স্বামী এবং চাচাতো ভাই—এই দুই জনের কার সাথে যাওয়া যেতে পারে।

এ দিকে হযরত 'আয়িশা (রা) বসরার সন্নিকটে পৌঁছে লোক মারফত শহরের আরব নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকের নিকট চিঠি পাঠালেন। পরে বসরা পৌঁছে কোন কোন নেতার গৃহেও গেলেন। শহরের একজন নেতা তাঁর আহবানে সাড়া দিচ্ছিলেন না। তিনি নিজে তার গৃহে যেয়ে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। সে বললো ঃ 'আমার মায়ের কথা না মানতে পেরে আমার লজ্জা হচ্ছে।'[২০১]

হযরত আলীর (রা) পক্ষ থেকে তখন বসরার ওয়ালী ছিলেন 'উসমান ইবন হুনাইফ। তিনি প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য ইমরান ইবন হুসাইন ও আবুল আসওয়াদকে পাঠালেন। তাঁরা হযরত আয়িশার (রা) নিকট উপস্থিত হয়ে ওয়ালীর পক্ষ থেকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চান। 'আয়িশা (রা) তাঁদেরকে বলেন, 'আল্লাহর কসম' আমার মত ব্যক্তিরা কোন কথা গোপন রেখে ঘর থেকে বের হতে পারে না। আর না কোন মা প্রকৃত ঘটনা তার সন্তানদের কাছে লুকাতে পারে।' তারপর তিনি তাদের সামনে মদীনার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন এবং উসমান (রা) হত্যাকারীদের শাস্তিদান ও উম্মাতের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিয়েছে তা মিটিয়ে ফেলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সব শেষে তিনি বলেন ঃ[২০২] 'তোমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা আমার কাজ।' তারপর তিনি পাঠ করেন ঃ[২০৩]

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَا هُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَ قَةٍأَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْاِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ -

–তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভালো নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো, তা স্বতন্ত্র।

এই দুই ব্যক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট থেকে উঠে হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) কাছে যান। তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে আবার হযরত আয়িশার (রা) নিকট যান। তখন তিনি বলেন ঃ আবুল আসওয়াদ, তোমার প্রবৃত্তি যেন তোমাকে দোযখের দিকে নিয়ে না যায়। তারপর তাদেরকে এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান ঃ[২০৪]

كُوْنُوْا قَوَّا مِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ -

–তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে।

---

২০১. আল-বিদায়া-৬/২১২; আল-হাকেম-৩/১২০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা–২/১৭৭
২০২. আল কামিল-৩/২১১
২০৩. সূরা আন-নিসা-১১৪
২০৪. সূরা আল মায়িদা–৮

'আয়িশার (রা) বক্তব্যের প্রভাব এই হলো যে, প্রতিনিধিদ্বয়ের একজন সদস্য— 'ইমরান নিজেকে এই বিবাদ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন এবং বসরার ওয়ালীকেও তাঁর মত করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি বিরত হলেন না; বরং বসরায় হযরত আলীর (রা) পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এদিকে তালহা, যুবাইর ও 'আয়িশা (রা) বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে বসরার জনগণকে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে থাকলেন। একদিন এক সমাবেশে তালহা ও যুবাইর (রা) বক্তৃতা করার পর শ্রোতাদের মধ্যে দ্বিধা-সংশয় লক্ষ্য করে হযরত আয়িশা (রা) অত্যন্ত ধীর-স্থীর ও গম্ভীর গলায় হামদ ও না'ত পেশ করার পর নিম্নোক্ত ভাষণটি দান করেন ঃ[২০৫]

'জনগণ উসমানের (রা) কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করতো, তাঁর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দোষ-ত্রুটি প্রচার করতো। মানুষ মদীনায় এসে আমাদের কাছে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতো। আমরা তাদেরকে সন্ধি ও আপোষ-মীমাংসার যে উপদেশ দিতাম তারা তা মেনে নিত। উসমানের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল, আমরা সে বিষয়ে গভীরভাবে খতিয়ে দেখে তাঁকে একজন নিষ্পাপ পরহেযগার ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসেবে পেতাম। আর শোরগোলকারীদেরকে দেখতাম তারা পাপাচারী ও ধোঁকাবাজ। তাদের অন্তরে ছিল এক কথা, আর মুখে ভিন্ন কথা। তাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল তখন তারা বিনা কারণে এবং বিনা দোষে উসমানের (রা) গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অত ঃপর যে রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ ছিল না, তা তারা করেছে, যে ধন-সম্পদ লুটপাট করা সঙ্গত ছিল না, তা করেছে, আর যে পবিত্র ভূমির মর্যাদা রক্ষা করা তাদের উপর ফরজ ছিল, তারা তার অমর্যাদা ও অসম্মান করেছে। সাবধান! এখন যে কাজ করতে হবে এবং যার বিরোধিতা করা উচিত হবে না, তাহলো 'উসমানের (রা) হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা এবং শক্তভাবে আল্লাহর হুকুম ও বিধান বলবৎ করা। আল্লাহ বলেছেন ঃ[২০৬]

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ -

–আপনি কি তাদের দেখেছেন, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে— আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিলো যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অত ঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ইবন 'আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসী হযরত 'আয়িশার (রা) এ সময়ের একটি ভাষণ তাঁর গ্রন্থে সংকলন করেছেন, যা ভাষা ও বাকশৈলীর দিক দিয়ে অতি চমৎকার। এখানে

---

২০৫. আল-কামিল ৩/২১৩

২০৬. সূরা আলে ইমরান-২৩

তাঁর অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ২০৭

'ওহে জনমণ্ডলী! চুপ করুন! চুপ করুন! আপনাদের উপর আমার মায়ের দাবী আছে। আপনাদেরকে উপদেশ দানেরও অধিকার আমার আছে। একমাত্র খোদা-দ্রোহী মানুষ ছাড়া কেউ আমার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বুকে মাথা রেখে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমি তাঁর প্রিয়তমা বেগমদের অন্যতম। আল্লাহ পাক অন্য মানুষ থেকে আমাকে সর্বভাবে সংরক্ষণ করেছেন। আমার সত্তা দ্বারা মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয় নির্ণিত হয়েছে এবং আমাকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহ আপনাদের জন্য তায়াম্মুমের বিধান দান করেছেন।

আমার পিতা এ পৃথিবীর তৃতীয় মুসলমান এবং ছাওর পর্বতের গুহায় দুইজনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় এবং তাঁর গলায় খিলাফতের মালা পরিয়ে ইনতিকাল করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর যখন ইসলামের রশি দুলতে থাকে তখন আমার পিতাই তা শক্ত হাতে মুট করে ধরেন। তিনিই নিফাক (কপটতা)-এর লাগাম টেনে ধরেন, ধর্মত্যাগের ঝর্ণা শুকিয়ে ফেলেন এবং ইহুদীদের আগুনে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করে দেন। আমরা সেই সময় চোখ বন্ধ করে ধোঁকাবাজি, বিশ্বাসহীনতা ও ফিতনা-ফাসাদের প্রতীক্ষায় ছিলাম।... হাঁ, এখন আমি মানুষের প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছি। কারণ, আমি বাহিনী নিয়ে বের হয়েছি। আমার এ বের হওয়ার উদ্দেশ্য পাপ ও ফিত্‌নার অনুসন্ধান নয়— যা আমি নিশ্চিহ্ন করতে চাই, যা কিছু আমি বলছি সত্য ও ন্যায়ের সাথে বলছি। আমার ওজর-আপত্তি তুলে ধরা এবং আপনাদেরকে জ্ঞাত করানোর জন্য বলছি। আল্লাহ পাক নবী মুহাম্মাদের (সা) উপর দরূদ ও সালাম নাযিল করুন।'

জনগণ নীরবে মনোযোগ সহকারে তাঁর ভাষণ শুনছিল। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ প্রতিপক্ষের লোকদের অন্তরেও তীরের ফলার মত গেঁথে যাচ্ছিল। তাদের অনেকে স্বপক্ষ ত্যাগ করে আয়িশার (রা) সেনাক্যাম্পে এসে যোগ দেয়।

বসরায় পৌঁছে হযরত আয়িশা (রা) কূফার ওয়ালী এবং কূফা ও বসরার আশে পাশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট তাঁর এভাবে আগমনের উদ্দেশ্য ও তাদের করণীয় কর্তব্য বর্ণনা করে চিঠি লেখেন। উল্লেখ্য যে, আলী (রা) ও আয়িশা (রা) চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখোমুখি— যাকে 'উটের যুদ্ধ' বলা হয়— হওয়ার আগে উভয় পক্ষের লোকদের মধ্যে ছোটখাট অনেক সংঘর্ষ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়। অবশেষে বসরায় আয়িশার (রা) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ দিকে হযরত আলী (রা) হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মদীনা থেকে সিরিয়া যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বসরার এই সমাবেশের কথা অবগত হয়ে

---

২০৭. আল-'ইকদুল ফারীদ-৪/১২৮-১২৯, ৩১৪-৩১৫; আহমাদ আবূ তাহির ঃ বালাগাতুন নিসা-৭

এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করার জন্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বহু সংখ্যক সাহাবী এবং তাদের অনুগামী লোকেরা যারা মুসলমানদের এই গৃহযুদ্ধকে একটি ফিত্না বা পরীক্ষা বলে মনে করছিলেন, এ যাত্রায় আলীর (রা) সহগামী হতে রাজি হলেন না।[২০৮] হিজরী ৩৬ সনের রবীউস সানী মাসে হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন।[২০৯] সেদিন বহু সাহাবীর আলীর (রা) পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করার ফল এই হলো যে, সেই 'উসমান (রা) হত্যাকারীরা— যাদেরকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য আলী (রা) সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীর মধ্যে ঢুকে গেল। যা একদিকে যেমন তাঁর দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়ালো, তেমনি নানা সমস্যারও।

বসরা শহরের অদূরে যেদিন উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) এবং আমীরুল মুমিনীন আলীর বাহিনীদ্বয় পরস্পর মুখোমুখি হয়, সেদিন মুসলিম উম্মাহর প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষের বিরাট একটি দল আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালালেন ঈমানদার লোকদের এই দুইটি দলকে সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখার জন্য। তাঁদের চেষ্টায় আপোষ মীমাংসার কথাবার্তা পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিকে আলীর (রা) বাহিনীতে উসমান (রা) হত্যাকরীরা বিদ্যমান ছিল— যারা বুঝেছিল, যদি আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে তাদের রক্ষা নেই, অন্যদিকে উম্মুল মুমিনীনের বাহিনীতে সেই লোকেরা ছিল, যারা দুইটি দলকে লড়িয়ে উভয়কে দুর্বল করে ফেলতে চাচ্ছিল। এ কারণে সৎ লোকেরা যে যুদ্ধটিকে ঠেকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, উভয় পক্ষের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা অপশক্তি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে শেষ পর্যন্ত তা বাধিয়ে দিল এবং উটের যুদ্ধ হয়েই গেল।[২১০]

উটের যুদ্ধ

হযরত আলী (রা) মদীনা থেকে মাত্র সাত শো লোক সংগে করে যাত্রা করেছিলেন। কূফা থেকে আরো সাতহাজার লোক যোগ দেয়। একটি ছোট্ট বাহিনী নিয়ে তিনি বসরায় পৌঁছেন। উভয় বাহিনী রণক্ষেত্রে মুখোমুখি হলো। আরবের প্রতিটি গোত্রের লোক সেদিন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মুদার গোত্রের এক ভাগ অন্য ভাগের সামনে দাঁড়ায়। এমনিভাবে আয্দ সহ অন্য সকল গোত্রও—একাংশ আরেক অংশের বিপক্ষে দাঁড়ায়। সত্যিই সে এক মর্মবিদারী দৃশ্য। সে দিন উভয় দলের, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রতিটি সদস্য ছিলেন সত্যের সিপাহী। প্রত্যেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে তারা সত্যের উপর আছেন। কেউই নিজের অবস্থান থেকে বিন্দু মাত্র সরতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কূফার কোন কোন গোত্রের নেতারা তাদের স্বগোত্রীয় বসরী নেতাদের মসজিদে যান এবং তাঁদেরকে এই ঝগড়া থেকে দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁরা জবাব

---

২০৮. অল-বিদায়া–৭/২৩৩
২০৯. আল-কামিল-৩/২১৩
২১০. আল বিদায়া-৭/২৩৭

দেয় ঃ 'আমরা কি উম্মুল মুমিনীনকে একাকী ছেড়ে দেব?'

তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ব্যাপারটি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াবে না। একটা নিষ্পত্তি শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবে। একজন গোত্রীয় নেতা হযরত আলীর (রা) নিকট যেয়ে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছার জন্য তাকিদ দিলেন। তিনি তো প্রথম থেকেই রাজি ছিলেন। আলীর (রা) নিকট থেকে উঠে উক্ত নেতা তালহা, যুবাইর ও আয়িশার (রা) নিকট গেলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'উম্মুল মুমিনীন! এই কর্মকাণ্ডে আপনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? বললেন ঃ উসমানের (রা) হত্যাকারীদের শাস্তি দান এবং আপোষ-মীমাংসার আহ্বান। গোত্রীয় নেতা বললেন ঃ উম্মুল মুমিনীন! একটু ভেবে দেখুন তো, পাঁচ শো মানুষের শাস্তির জন্য পাঁচ হাজার মানুষের রক্ত ঝরিয়েছেন এবং পাঁচ হাজারের জন্য আপনাকে হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরাতে হবে। এ কেমন ইসলাহ্ ও সংশোধন হলো?' লোকটির বক্তব্য এত স্পষ্ট ও শক্তিশালী ছিল যে, উম্মুল মুমিনীন নিরুত্তর হয়ে গেলেন। তিনি আপোষ করতে রাজি হলেন এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্তে এসে গেলেন।[২১১]

এখন উভয় পক্ষ নিশ্চিন্ত। যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তা তাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। সবকিছু ঠিকঠাক মত নিষ্পত্তির ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকলো না। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান দুষ্কৃতিকারীরা দেখলো, যদি আপোষ-মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে তাদের বিপদের অন্ত নেই। তাছাড়া তাদের বহু বছরের পরিকল্পনা ও চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা তখন সক্রিয় হয়ে উঠলো। সাবায়ী দলের বিরাট একটি সংখ্যা আলীর (রা) পক্ষে ছিল। আলাপ-আলোচনার পর উভয় দলের লোকেরা যখন রাতের শেষ প্রহরে ঘুমিয়ে ছিল তখন এই সাবায়ীরা আক্রমণ করে বসলো। এই কিছু সংখ্যক পাপাত্মা হঠাৎ করে চতুর্দিকে আগুন জ্বালিয়ে দিল। ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে প্রত্যেকে নিজের অস্ত্রটি হাতে তুলে নিল। প্রত্যেক গ্রুপ ও দলের নেতারা বিশ্বাস করলো, প্রতিপক্ষ তাদের নিদ্রার সুযোগে চুক্তি ভঙ্গ করে আক্রমণ করে বসেছে। হযরত আলী (রা) লোকদের থামাতে প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন।

সকাল পর্যন্ত এ হৈ হাঙ্গামা চলতে থাকে। হৈ চৈ শুনে হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করেন ঃ কি হয়েছে? জানতে পারলেন, লোকেরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। বসরার কাজী কা'ব ইবন সুওয়ার হযরত আয়িশার (রা) নিকট এসে বললেন, আপনি উটের পিঠে চড়ে চলুন। হতে পারে লোকেরা আপনার মাধ্যমে সন্ধি করে নেবে।[২১২] তিনি লোহার তৈরী হাওদা উটের পিঠে বেঁধে তাঁর মধ্যে বসে সৈন্যবাহিনীর মাঝ বরাবর চলে আসেন। এদিকে হযরত আলী (রা) তাঁর প্রতিপক্ষ হযরত তালহা ও হযরত যুবাইরকে ডেকে আনেন। এই তিন মহান সাহাবী ঘোড়ার উপর বসা অবস্থায় কিছুক্ষণ এক স্থানে অবস্থান করেন। বদর-উহুদের সহযোদ্ধাত্রয়ীর আজ এমন অবস্থান! সত্যি সে এক পীড়াদায়ক

---

২১১. তাবারী-৬/৩১৮২

২১২. প্রাগুক্ত-৬/৩১৮৮

দৃশ্য। আলী (রা) তাঁদের দুইজনকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁদেরও স্মরণ হলো। সাথে সাথে যুবাইর (রা) যুদ্ধের ইচ্ছা অন্তর থেকে মুছে ফেলেন। ছেলে আবদুল্লাহ পাশেই ছিলেন। তিনি পিতাকে ভীরু, কাপুরুষ বলে তিরস্কার করেন। যুবাইর জবাব দেন, লোকে জানে আমি ভীরু নই। তবে আলী (রা) আমাকে একটি কথা স্মরণ করে দিয়েছে, যা আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি। আমি শপথ করছি, তাঁর বিরুদ্ধে আমি আর লড়বো না।[২১৩]

তিনি ঘোড়ার লাগামে টান দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। ইবন জুরমূয নামক এক সাবায়ী তাকে অনুসরণ করে এবং পথিমধ্যে সে নামাযে সিজদারত অবস্থায় তরবারির এক আঘাতে তাঁর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

হযরত তালহাও (রা) রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি উমাইয়্যা গোত্রের মারওয়ানের দৃষ্টিতে পড়ে যান। সে বুঝেছিল, যদি তালহা জীবিত ফেরে তাহলে উমাইয়্যা খান্দানের প্রতিষ্ঠা কঠিন হবে। সে তাঁকে তাক করে একটি বিষাক্ত তীর ছোড়ে। তীরটি তাঁর পায়ে বেধে। কোনভাবেই রক্ত পড়া বন্ধ করা গেল না। এই আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এদিকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কা'ব ইবন সুওয়ারকে ডেকে তাঁর হাতে নিজের কুরআনের কপিটি দিয়ে বলেন, যাও এটি দেখিয়ে মানুষকে আপোষ-মীমাংসার আহ্বান জানাও। তিনি কুরআন খুলে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুষ্কৃতিকারীরা দূর থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়ে। ফলে তিনিও শাহাদাত বরণ করেন।

দুপুর হয়ে গেল। আক্রমণ ছিল অতর্কিত। হযরত আয়িশার (রা) বাহিনীর অধিনায়করা শেষ পর্যন্ত এই ফিতনা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিলেন। একারণে তাঁর বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়লো। এই যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, উভয় পক্ষের গরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাস ছিল, প্রতিপক্ষ আমাদের মুসলিম ভাই। এ কারণে, প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষের হাত পা বা অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত করার চেষ্টা করছিল। সবাই চেষ্টা করছিল যাতে মাথা ও বুকে আঘাত না লাগে। উদ্দেশ্য; হাত-পা কাটা গেলেও যাতে জীবনে বেঁচে থাকে। তারা আন্তরিকভাবে কামনা করছিল, যুদ্ধ বন্ধ হোক। রণক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে সৈনিকদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত-পায়ের স্তূপ হয়ে গিয়েছিল।

সাবায়ীদের বাসনা ছিল, 'আয়িশাকে (রা) হাতের মুঠোয় পেলে চরমভাবে অবমাননা করা হবে। সুতরাং হযরত তালহা ও যুবাইরের (রা) শাহাদাতের পর কূফাবাসীরা তাঁর উপর আক্রমণের লক্ষ্যে এগিয়ে আসে।[২১৪] হযরত আয়িশার (রা) বাহিনীর লোকেরাও চতুর্দিক থেকে গুটিয়ে এসে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বেষ্টনী রচনা করে ফেলে। মুসলিম উম্মার মায়ের সম্মান ও মর্যাদার হিফাজতের জন্য আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও

---

২১৩. আজ-জাহাবী ঃ তারীখুল ইসলাম-২/১৫০

২১৪. তারাবী–৬/৩১৯৩

গোত্রের হাজার হাজার সন্তান সেদিন প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত অগণিত তীর-বর্শার সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে যায়। উম্মুল মুমিনীনের উটটি একই স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল। চতুর্দিক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর-বর্শা এসে আঘাত করছিল তাঁর বর্ম আচ্ছাদিত হাওদায়। সন্তানেরা ডানে-বামে, সামনে-পিছন থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে চলছিল। তখন তাদের অনেকের মুখে এ দুইটি চরণ উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ[২১৫]

يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمُ + أَمَا تَرَيْنَ كَمْ شُجَاعٍ يُكْلَمُ

وَتَخْتَلِىْ هَامَتُهُ وَالْمِعْصَمُ -

–হে আমাদের মা, হে আমাদের সেই মা— যাঁকে আমরা সর্বোত্তম বলে জানি! আপনি কি দেখছেন না, কত বীর সন্তানকে আহত করা হচ্ছে এবং তাদের হাত ও মাথা কাটা যাচ্ছে ?

এখন চতুর্দিক থেকে এ আওয়ায উঠতে লাগলো যে, যতক্ষণ না উম্মুল মুমিনীনের উটটি আঘাত করে বসিয়ে দেওয়া যাবে, এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হবে না। বনু দাব্বা উটের চতুর্দিকে একটা বেষ্টনী করে রেখেছিল। কেউ উটের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলেই তাকে তারা জীবিত ছেড়ে দিচ্ছিল না। তারা তখন একটা আবেগ ও উত্তেজনাপূর্ণ সংগীত গেয়ে চলছিল। তার তিনটি শ্লোক নিম্নরূপ ঃ[২১৬]

نَحْنُ بَنُو ضَبَّةَ أَصْحَابُ الْجَمَلِ + اَلْمَوْتُ اَحْلٰى عِنْدَنَا مِنَ الْعَسَلِ

نَحْنُ بَنُوالْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلْ + نَنْعِى ابْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الْاَسَلْ

رُدُّوْ عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَلْ -

–'আমরা দাব্বার সন্তান, এই উটের রক্ষক। মৃত্যু আমাদের নিকট মধুর চেয়ে মিষ্টি।

–আমরা মৃত্যুর সন্তান–মৃত্যু যখন আসে। আমরা 'আফফানের ছেলে 'উসমানের মৃত্যুর ঘোষণা নিযার ফলার সাহায্যে করি।

–তোমরা আমাদের নেতাকে ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই।'

আবেগ ও উত্তেজনা এমন প্রবল ছিল যে, বনু দাব্বার একজন একজন করে এগিয়ে গিয়ে উটের লাগাম ধরছিল, প্রতিপক্ষের আঘাতে তার হাত বিচ্ছিন্ন হলে অন্য একজন ছুটে এসে লাগামটি মুঠ করে ধরছিল। এ ভাবে একই স্থানে উটের লাগাম ধরা অবস্থায় '৭০ (সত্তর) ব্যক্তির হাত বিচ্ছিন্ন হয়।[২১৭] এমনিভাবে উম্মুল মুমিনীনের প্রতিপক্ষের যে কোন হাত সে দিন উটের লাগামের প্রতি বাড়ানো হয়েছিল, তা আর আস্ত ফিরিয়ে নিতে পারেনি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) নিকটেই দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি বলেন ঃ

---

২১৫. আল-কামিল-৩/২৫০

২১৬. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল ফিত-তারীখ-৩/২৪৯

২১৭. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৩

কর্তিত হাত যেন তখন বাতাসে উড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে হযরত 'আলী (রা) ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসেন। আশতার আন-নাখঈ, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের কাছে পৌঁছে গেলেন। দুইজনই ছিলেন সাহসী বীর পুরুষ। উভয়ের মধ্যে অসির যুদ্ধ শুরু হলো। দুইজন আহত হলেন। এ অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। ইবন যুবাইর (রা) চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ[২১৮]

اُقْتُلُوْنِىْ وَمَالِكًا، اُقْتُلُوْا مَالِكًا مَعِىْ -

অর্থাৎ, মালিক ও আমাকে মেরে ফেল। আমার সাথে মালিককেও হত্যা কর।

পরবর্তীকালে আশতার নাখ'ঈ বলতেন ঃ লোকেরা আমাকে মালিক নামে জানতো না, তাই সে দিন রক্ষা পেয়েছিলাম। অন্যথায় আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।

বনু দাব্বার কিছু লোক আলীর (রা) পক্ষেও ছিলেন। তাঁরা দেখলেন উট যদি তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে না আনা যায় তাহলে যেভাবে লোক মারা যাচ্ছে তাতে তাঁদের গোত্র নির্মূল হয়ে যাবে। এমন চিন্তা মাথায় আসার পর দাব্বা গোত্রের 'বুজাইর ইবন দালজা' নামক এক ব্যক্তি পিছন দিক থেকে এসে উটের পায়ে তরবারির এমন আঘাত হানেন যে, উট হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে। আর সাথে সাথে উটকে কেন্দ্র করে 'আয়িশার (রা) পক্ষে যাঁরা লড়ছিলেন, তারা সরে গেলেন। আলীর (রা) নির্দেশে 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ও মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর ছুটে গিয়ে হাওদাটি ধরে ফেলেন। হাওদা সোজা করে মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা) হাওদার অভ্যন্তরে হাত ঢুকিয়ে দেখতে যান যে, বোন 'আয়িশা (রা) কোন রকম আঘাত পেয়েছেন কিনা। হাত দেখেই 'আয়িশা (রা) গর্জে ওঠেন ঃ এ কোন মাল'উনের (অভিশপ্ত) হাত? মুহাম্মাদ জবাব দেন ঃ বোন! আপনার ভাই মুহাম্মাদ। আপনি কোন আঘাত পাননি তো? 'আয়িশা বলেন ঃ না, তুমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) নও, তুমি মুজাম্মাম (নিন্দিত)। অন্য একটি বর্ণনা মতে 'আয়িশা প্রশ্ন করেন ঃ কে? মুহাম্মাদ বলেন ঃ আপনার অনুগত ভাই। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তুমি অনুগত নও, বরং অবাধ্য। মুহাম্মাদ প্রশ্ন করেন ঃ বোন! আপনি কি কোন আঘাত পেয়েছেন? আয়িশা (রা) জবাব দেন ঃ তাতে তোমার কি ?

এরই মধ্যে হযরত আলী (রা) উটের কাছে এসে হাজির হলেন। তিনি জানতে চাইলেন ঃ আম্মা, আপনি কেমন আছেন? আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভালো আছি। আলী (রা) বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। 'আয়িশা বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন।[২১৯]

হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) কাছেই ছিলেন। তিনি বললেন ঃ মা, আপনার সন্তানদের এ লড়াই কেমন দেখলেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ আমি তোমার মা নই। 'আম্মার (রা) বললেন ঃ আপনার পছন্দ না হলেও আপনি আমার মা। 'আয়িশা (রা)

---

২১৮. আল-কামিল-৩/২৫১

২১৯. প্রাগুক্ত-৩/২৫৪

বললেন ঃ বিজয়ী হয়েছো বলে গর্ব করছো। যেভাবে বদলা নিয়েছো তাই সংগে নিয়ে এসেছো। জেনে রাখ, যাদের আচরণ এমন হয় তারা কখনও বিজয়ী হতে পারে না।

'আউন ইবন দুরাইয়া আল-মাজাশি' নামক এক ব্যক্তি এসে হাওদার মধ্যে উঁকি মারতে থাকে। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সরে যাও। তোমার উপর আল্লাহর অভিশাপ। লোকটি বলে ঃ আমি শুধু হুমায়রাকে এক নজর দেখতে চাই। হযরত আয়িশা (রা) তখন লোকটির প্রতি অভিশাপ দিয়ে বলেন ঃ 'আল্লাহ তোমার আবরু-ইজ্জত উন্মুক্ত করুন, তোমার হাত বিচ্ছিন্ন করুন এবং তোমার লজ্জাস্থান প্রকাশ করুন।' পরে লোকটি বসরায় নিহত হয়। তার সকল জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয়। হাত-পা কর্তিত ও উলঙ্গ অবস্থায় আয্দ গোত্রের একটি বিরান ভূমিতে তার লাশটি পাওয়া যায়।[২২০]

হযরত আলী (রা) মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের নেতৃত্বে উম্মুল মুমিনীনকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তাঁরই পক্ষাবলম্বনকারী বসরার এক নেতা— আবদুল্লাহ ইবন খালাফ আল-খুযা'ঈ-এর গৃহে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। হযরত 'আয়িশার (রা) বাহিনীর আহত সৈনিকরা সেই বাড়ীর ঘর ও বাইরের প্রতিটি স্থানে আশ্রয় নিয়েছিল। অত ঃপর হযরত আলী (রা), হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) ও আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীনের সাথে সাক্ষাৎ করতে সেখানে যান। হযরত আলী (রা) উম্মুল মুমিনীনকে সালাম করেন এবং কিছুক্ষণ তাঁর পাশে অবস্থান করেন। হযরত আলী (রা) জানতেন যে, এই বাড়ীতে প্রতিপক্ষের আহত সৈনিকরা আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে কোন কথা উচ্চারণ করলেন না।[২২১]

উম্মুল মুমিনীন কয়েকদিন বসরায় অবস্থান করেন। তারপর হযরত আলী (রা) যথাযোগ্য মর্যাদায় ও সম্মানের সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকরের (রা) তত্ত্বাবধানে চল্লিশজন সম্ভ্রান্ত বসরী মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁর হিজাযে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বারো হাজার দিরহামও সাথে দিয়ে দেন।[২২২] হযরত আলী (রা) সহ অসংখ্য সাধারণ মুসলমান বহুদূর পর্যন্ত তাঁদেরকে এগিয়ে দেন। ইমাম হাসান (রা) বহু মাইল পথ সেই কাফেলার সাথে চলেন। হিজরী ৩৬ সনের ১লা রজব শনিবার উম্মুল মুমিনীন বসরা থেকে যাত্রা করেন।[২২৩] যাত্রাকালে জনগণকে তিনি বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম, একজন নারীর তার জামাইদের সাথে যে রকম সম্পর্ক থাকে, তাছাড়া অন্য কোন বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক তাঁর (আলী) ও আমার মধ্যে অতীতে ছিল না। আমার জানা মতে তিনি সৎলোকদের একজন।' জবাবে আলী (রা) বলেন ঃ 'ওহে জনমণ্ডলী! তিনি সত্য বলেছেন। আমার ও তাঁর মাঝে কোন রেষারেষি নেই। তিনি আপনাদের নবীর স্ত্রী—দুনিয়া ও আখিরাতে।'[২২৪]

---

২২০. প্রাগুক্ত-৩/২৫৫
২২১. প্রাগুক্ত
২২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৮
২২৩. আল-কামিল-৩/২৫৮
২২৪. প্রাগুক্ত-৩/২৫৯; তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যা-২/৫৭-৫৮

হযরত 'আয়িশা (রা) বসরা থেকে সোজা মক্কা মুকাররামায় চলে যান। পরবর্তী হজ্জ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তারপর মদীনায় ফিরে যান এবং আজীবন সেখানেই বসবাস করেন। পরিশুদ্ধির যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেন, সারা জীবন তার জন্য আফসোস করেছেন।[২২৫] ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন, হযরত 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ হায়, যদি আমি বৃক্ষ হতাম, হায়, যদি আমি পাথর হতাম, হায়, যদি আমি কিছুই না হতাম।[২২৬] এই কথা দ্বারা তাঁর আফসোসের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

একবার বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি 'আয়িশার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। 'আয়িশা (রা) তাকে প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কি আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে? লোকটি জবাব দিল ঃ হাঁ। 'আয়িশা (রা) প্রশ্ন করেন ঃ তুমি কি সেই ব্যক্তিকে চেন, যে সেদিন এই চরণটি আবৃত্তি করেছিল ঃ يَا أُمَّنَا يَا خَيْرَ أُمٍّ نَعْلَمُ -

লোকটি বললো ঃ সে তো আমার ভাই। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, এরপর হযরত 'আয়িশা (রা) এত কাঁদলেন যে, আমার মনে হলো এ কান্না যেন আর থামবে না। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর সময় তিনি অসীয়াত করেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরের পাশে দাফন করবে না। বাকী' গোরস্তানে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে।[২২৭] ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) মৃত্যুর সময় বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পরে একটি নতুন কাজ করেছি। সুতরাং তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে।[২২৮] একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন আয়াত[২২৯] وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ -

(তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে) তিলাওয়াত করতেন তখন এত কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে আঁচল ভিজে যেত।[২৩০] উটের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হযরত 'আয়িশা (রা) আল-কা'কা' ইবন 'আমরকে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! আমি যদি আজকের এদিনটির আরো বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম, তাহলে কতনা ভালো হতো।' আর সে কথা শুনে আলীও (রা) ঠিক একই রকম মন্তব্য করেছিলেন।[২৩১]

হিজরী ৩৬ সনের ১০ই জামাদি-উস-সানী বৃহস্পতিবার ভোর থেকে আসর পর্যন্ত উটের যুদ্ধ হয়।[২৩২] এ যুদ্ধে আহতের সংখ্যা অগণিত। নিহতের সংখ্যা কত, সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। ইবনুল ইমাদ-আল-হাম্বলী তাঁর 'শাজারাতুজ জাহাব' গ্রন্থে তেত্রিশ হাজার, মতান্তরে সতেরো হাজার উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনুল

২২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৭
২২৬. তাবাকাত-৮/৭৪, ৭৫, ৭৬; আজ-জাহাবী; তারীখ-২/২৯৮
২২৭. বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়িয,
২২৮. তাবাকাত-৮/৭৪
২২৯. সূরা আল-আহযাব-৩৩
২৩০. তাবাকাত-৮/৮১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৭
২৩১. আল-কামিল-৩/২৫৪
২৩২. শাজারাতুজ জাহাব-১/৪৩

আসীরসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিক দশহাজার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অর্ধেক আলীর (রা) ও অর্ধেক 'আয়িশার (রা) পক্ষের। ইবনুল আসীর আরো উল্লেখ করেছেন একমাত্র বনু দাব্বার এক হাজার লোক নিহত হয় এবং উটের পাশেই শুধু বনী 'আদীর সত্তর (৭০) ব্যক্তির লাশ পাওয়া যায়।[২৩৩] এই যুদ্ধে ইসলামের এমন অনেক বীর পুরুষ শাহাদাত বরণ করেন, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে গড়ে তোলেন এবং যারা ছিলেন ইসলামের অতি পরীক্ষিত সন্তান। তালহা (রা), যুবাইর (রা) প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। তাঁদের মৃত্যুতে মুসলিম উম্মার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

রণক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশার (রা) উট বসে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা) একজন ঘোষককে এই ঘোষণা দানের নির্দেশ দেন ঃ 'কেউ কোন পলায়নকারীকে ধাওয়া করবে না, কোন আহত সৈনিকের মালামাল লুট করবে না এবং কোন সৈনিক কোন গৃহে প্রবেশ করবে না। বিশেষতঃ নারীদের ব্যাপারে তিনি নির্দেশ দেন এভাবে ঃ[২৩৪]

ولا تهتكنّ سترا ولا تدخلن داراولا تهيجن إمرأة بآذى وإن شتمن أعراضكم سفهن أمراءكم وصلحاءكم، فان النساء ضعيفات، ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات، فكيف إذهن مسلمات؟

–'তোমরা অবশ্যই কারো ইজ্জত-আবরু উন্মুক্ত করবে না, কোন গৃহে প্রবেশ করবে না, কোন নারীর উপর চড়াও হবে না–যদিও সে তোমাদের মান-মর্যাদা, তোমাদের নেতা ও সৎ লোকদের নিয়ে উপহাস ও গালিগালাজ করে। নারীদের উপর হাত তুলতে (রাসূলুল্লাহর সা. সময়) আমাদেরকে নিষেধ করা হতো— যখন সেই নারীরা ছিল মুশরিক। তাহলে এখন এই মুসলিম নারীদের উপর হাত তোলা যায় কিভাবে?'

যুদ্ধ শেষে আলী (রা) ময়দানে পড়ে থাকা লাশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন এবং পরিচিত লাশের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর পক্ষের হোক বা 'আয়িশার (রা) পক্ষের—দু ঃখ প্রকাশ করছিলেন। তারপর উভয় পক্ষের সকল লাশ একস্থানে জমা করার নির্দেশ দিলেন। তিনি ইমাম হয়ে সকলের জানাযার নামায পড়ালেন এবং বড় বড় কবর খুঁড়ে এক সাথে অনেকের দাফনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি হযরত তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহর (রা) লাশের কাছে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

তারপর বলেন ঃ 'আল্লাহর কসম! কোন কুরাইশকে এভাবে পড়ে থাকা আমি পছন্দ করতাম না।' তারপর তিনি সৈনিকদের পরিত্যক্ত জিনিস সংগ্রহ করে বসরার মসজিদে জমা করার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, 'শুধু অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া প্রত্যেকেই নিজ

২৩৩. আল-কামিল-৩/২৫৫, ২৫৬
২৩৪. প্রাগুক্ত-৩/২৫৭

নিজ জিনিস সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। অস্ত্র-শস্ত্র কোষাগারে জমা হবে।'[২৩৫]

যুদ্ধের পরে হযরত আয়িশা (রা) উভয় দলের কে কে নিহত হয়েছে তা জানতে চাইতেন। যখন বলা হতো অমুক নিহত হয়েছে, বলতেন— يَرْحَمُهُ اللّٰهُ - (আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন!)। এই যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে হযরত আলী বলতেন ঃ[২৩৬]

إِنِّىْ لَأَرْجُوْ أَنْ لاَ يَكُوْنَ أَحَدٌ نَقِىٌّ قَلْبُهُ لِلّٰهِ مِنْ هٰؤُلاَءِ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ -

–'আমি অবশ্যই আশা করি এই লোকদের মধ্যে যার অন্তর আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ছিল তারা সবাই জান্নাতে যাবে।'

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, কিছু বিকৃতমনা মানুষের ধারণা, উটের যুদ্ধের মূল কারণ হলো, আলীর (রা) প্রতি হযরত 'আয়িশার (রা) একটি পুরানো ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। ইফ্কের ঘটনায় আলী (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেছিলেন, 'আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন'। মূলত ঃ তখন থেকেই হযরত 'আয়িশা (রা) আলীর (রা) প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। আর তারই পরিণতি এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। কিন্তু আমাদের সামনে হাদীস ও ইতিহাসের যে সকল তথ্য রয়েছে, তাতে এমন ধারণা পোষণের কোন অবকাশ নেই। এটা সম্পূর্ণ অমূলক ধারণা। ইতিহাসে এমন বহু তথ্য রয়েছে যাতে বিপরীত চিত্রটিই ফুটে ওঠে। দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় এখানে আমরা তা উল্লেখ করলাম না। ইতিহাসের সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে এই প্রত্যয় জন্মে যে, উটের যুদ্ধটি একটি আকস্মিক ঘটনা। মুষ্টিমেয় ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া উভয় পক্ষের সকলেই ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সংঘাত ও সংঘর্ষের উদ্দেশ্যে 'আয়িশা (রা) যেমন বসরায় যাননি, তেমনি 'আলীও (রা) এমনটি আশা করেননি।এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র পূর্ণমাত্রায় সফল হয়েছে।

হযরত আলীর (রা) খিলাফতের সময়কাল ছিল মাত্র চার বছর। তারপর হযরত আমীর মু'য়াবিয়া খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী বিশ বছর যাবত গোটা ইসলামী দুনিয়ার একক শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর খিলাফতকাল শেষ হওয়ার দুই বছর পূর্বে হযরত 'আয়িশা (রা) ইনতিকাল করেন। হযরত মুয়াবিয়ার (রা) শাসনকালে তিনি জীবনের আঠারোটি বছর অতিবাহিত করেন। দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এই দীর্ঘ সময় সম্পূর্ণ নীরবে অতিবাহিত করেন।

একবার হযরত মু'য়াবিয়া (রা) মদীনায় আসেন এবং হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। 'আয়িশা (রা) তাঁকে বলেন, তুমি এমন নিশ্চিন্ত মনে একাকী আমার ঘরে এসে গেলে? এও তো সম্ভব ছিল যে, আমি কোন ঘাতককে দাঁড় করিয়ে রাখতাম এবং

২৩৫. প্রাগুক্ত-৩/২৫৫
২৩৬. প্রাগুক্ত-৩/২৫৭-২৫৮

তুমি ঢোকার সাথে সাথে তোমার কল্লা কেটে ফেলতো। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) বললেন, এটা দারুল আমান (নিরাপত্তার গৃহ), এখানে আপনি এমন কাজ করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ঈমান অতর্কিত হত্যার শিকল। তারপর হযরত মু'য়াবিয়া (রা) প্রশ্ন করেন, আপনার সাথে আমার আচরণ কেমন হচ্ছে? বললেন ঃ ভালো। তারপর মু'য়াবিয়া (রা) বলেন, তাহলে আমার ও বনু হাশিমের ব্যাপারটি ছেড়ে দিন, আল্লাহর দরবারে বুঝাপড়া হবে।[২৩৭]

হুজর ইবনে 'আদী (রা) একজন উঁচুস্তরের সাহাবী, কূফায় 'আলীর (রা) পক্ষাবলম্বন-কারীদের একজন অন্যতম নেতা। কিছু লোকের সাক্ষের ভিত্তিতে কূফার গভর্ণর আরো কিছু লোকের সাথে তাঁকে গ্রেফতার করে দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেন। হুজর ছিলেন কিন্দা গোত্রের লোক। তৎকালীন কূফা ছিল আরবের বড় বড় গোত্রের কেন্দ্রস্থল। সেখানে কিন্দা গোত্রের লোকদেরও বসবাস ছিল। কিন্তু কোন ব্যক্তিই হুজরকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলো না। অথচ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সেই সময় হুজরের (রা) যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তবে তাঁর গ্রেফতারির খবরটি খিলাফতের প্রত্যেকটি অঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। আরবের বিভিন্ন গোত্রের বহু নেতা তাঁর মুক্তির জন্য সুপারিশ করে, কিন্তু তা সবই প্রত্যাখ্যাত হয়। এ খবর মদীনায় 'আয়িশার (রা) নিকট পৌঁছালে তিনি সুপারিশের উদ্দেশ্যে একজন দূত পাঠান। দু ঃখের বিষয় দূত পৌঁছার পূর্বেই হুজরের (রা) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যায়।[২৩৮]

পরে হযরত মু'য়াবিয়া (রা) যখন মদীনায় এসে হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে সাক্ষাত করেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম হুজরের (রা) বিষয়টি উঠান। তিনি বলেন ঃ 'মু'য়াবিয়া! হুজরের ব্যাপারে তোমার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা কোথায় ছিল। তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় করনি।' মু'য়াবিয়া জবাব দিলেন ঃ 'তার ব্যাপারে আমার কোন অপরাধ নেই। অপরাধ তাদের যারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।' অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, 'উম্মুল মুমিনীন! কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দানকারী ব্যক্তি আমার কাছে ছিল না।'[২৩৯] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত মাসরূক (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া যদি বুঝতো কূফায় সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধের কিছু অবশিষ্ট আছে তাহলে কখনও তাদের সামনে থেকে হুজরকে ধরে নিয়ে গিয়ে এভাবে শামে হত্যা করতো না। কিন্তু কলিজা চিবানো হিন্দার[২৪০] এই ছেলে ভালো করেই বুঝে গেছে, এখন সেই সব লোক চলে গেছেন। আল্লাহর কসম!

---

২৩৭. মুসনাদে আহমাদ-৪/৯২

২৩৮. তাবারী-৭/১৪৫

২৩৯. প্রাগুক্ত-৭/১১৬, ১৪৫

২৪০. হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) মা হিন্দা। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত হামযা (রা) শাহাদাত বরণ করলে এই হিন্দা তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন

কূফা ছিল সাহসী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন আরব নেতাদের আবাসভূমি। লাবীদ (রা) যথার্থই বলেছেন ঃ[২৪১]

ذَهَبَ الذين يعاش فى أكنافهم + وبقيت فى خلف كجلد الاجرب

لا ينفعون ولا يرجى خيرهم + ويعاب قائلهم وإن لم يتغب -

–সেই সব লোক চলে গেছেন— যাদের ছায়াতলে জীবন যাপন করা যায়। এখন এমন উত্তরাধিকারীদের আশ্রয়ে আছি যারা চর্মরোগগ্রস্ত উটের চর্মের মত।

–তারা না কারো উপকারে আসে, আর না তাদের কাছে ভালো কিছু আশা করা যায়। তাদের সাথে যারা কথা বলে তাদের কেবল দোষ খোঁজা হয়।

ইরাক ও মিসরের কিছু লোক হযরত উসমানের (রা) নিন্দা মন্দ করতো, তেমনিভাবে শামের অধিবাসীরা হযরত আলীর (রা) শানে অশোভন কথা বলতো। আবার খারেজীরা উভয়কে খারাপ বলে জানতো। এ সকল দল ও উপদলের অবস্থা হযরত 'আয়িশা (রা) জানতে পেরে বলেন, কুরআনে আল্লাহ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের জন্য রহমত ও মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে বলেছেন, আর এই লোকেরা তাঁদেরকে গালি দেয়।[২৪২]

খারেজীরা হযরত আলীর (রা) দল থেকে পৃথক হয়ে সর্বপ্রথম 'হারূর' নামক স্থানে সমবেত হয়। একারণে তাদেরকে 'হারূরিয়্যা' বলা হয়। একবার এক মহিলা হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট এসে প্রশ্ন করলো ঃ আচ্ছা, মেয়েদের বিশেষ কিছু দিনের রোযার মত নামায কেন কাজা করতে হবে না? 'আয়িশা (রা) অত্যন্ত রাগের সাথে বললেন ঃ 'তুমি কি হারূরিয়্যা'![২৪৩] একথা দ্বারা হারূরিয়্যাদের প্রতি তাঁর ঘৃণার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

একবার হযরত মু'য়াবিয়া (রা) হযরত আয়িশাকে (রা) একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে অনুরোধ করলেন তাঁকে কিছু উপদেশ দানের জন্যে। হযরত আয়িশা (রা) জবাবে লিখলেন ঃ 'সালামুন আলাইকুম! অত ঃপর আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির পরোয়া না করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, আল্লাহ তাকে মানুষের অসন্তুষ্টির পরিণতি থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি চাইবে, আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেবেন। ওয়াস্ সালামু আলাইকা।'[২৪৪]

হযরত মু'য়াবিয়া (রা) জীবনের শেষ পর্যায়ে ছেলে ইয়াযিদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যেতে চান। তাঁর পক্ষ থেকে মারওয়ান তখন মদীনার গভর্ণর। মসজিদে জনসমাবেশে

---

২৪১. তাবারী-৭/১৪৬

২৪২. সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুত তাফসীর

২৪৩. সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুল হায়জ

২৪৪. তিরমিজী-আবওয়াবুয যুহ্দ।

তিনি ইয়াযিদের নাম উত্থাপন করেন। হযরত 'আয়িশার (রা) ভাই আবদুর রহমান ইবন আবী বকর (রা) উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন। সাথে সাথে মারওয়ান তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলেন। আবদুর রহমান দৌড়ে বোন 'আয়িশার (রা) ঘরে ঢুকে যান। মারওয়ান ভিতরে ঢোকার সাহস করলেন না। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, এতো সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কুরআনের এ আয়াতঃ

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا -

–'আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে ধিক্ তোমাদেরকে।'

পর্দার অন্তরাল থেকে হযরত 'আয়িশা (রা) বলে ওঠেন, আমার নির্দোষিতা ঘোষণার আয়াত ছাড়া আমাদের সম্পর্কে আল্লাহ আর কোন আয়াত নাযিল করেননি।[২৪৫] এই প্রতিবাদ দ্বারা বুঝা যায়, তাঁরা ভাই-বোন ইয়াযিদের মনোনয়ন সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেননি।

হিজরী ৪৯ সনে হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হযরত ইমাম হাসান (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত 'আয়িশার (রা) হুজরায় ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর (রা) ও 'উমার ফারুককে (রা) দাফন করা হয়েছে। সেখানে এক কোণে একটি কবর হতে পারে এমন কিছু স্থান খালি ছিল। মৃত্যুর পূর্বে হযরত হাসান (রা) ছোট ভাই হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা) অসীয়াত করে যান যে, ঐ শূন্য স্থানে তাঁকে দাফন করবে। তাতে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে সংঘাত-সংঘর্ষে যাবে না। সাধারণ মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন করবে। হযরত ইমাম হুসাইন যখন বড় ভাইয়ের অসীয়াত বাস্তবায়ন করতে চাইলেন, হযরত 'আয়িশা (রা) খুশী মনে অনুমতি দিলেন। হযরত মু'য়াবিয়ার (রা) পক্ষ থেকে সে সময় সা'ঈদ ইবনুল আসী মদীনার গভর্ণর ছিলেন, তিনিও কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু মারওয়ান ইবন হাকাম তাঁর কিছু সহযোগীকে নিয়ে শক্তভাবে বাধা দিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, যখন হযরত উসমানকে (রা) বিদ্রোহীরা এখানে দাফন করতে দেয়নি তখন আর কেউ অনুমতি পেতে পারেনা। হযরত ইমাম হুসাইনের (রা) পক্ষে বনু হাশিম এবং মারওয়ানের পক্ষে বনু উমাইয়্যা অস্ত্রহাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয় এলো। আরেকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের উপক্রম হলো। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা চালালেন। তিনি মারওয়ানকে বললেন, নাতি যদি তার নানার পাশে দাফন হওয়ার ইচ্ছে করে তাতে তুমি নাক গলাতে যাবে কেন। অন্যদিকে ইমাম হুসাইনকে (রা) বললেন, মরহুম ইমামের এটাও অসীয়াত ছিল, যদি বাধা আসে তাহলে সংঘাত-সংঘর্ষে যাবে না। যাই হোক, হযরত ইমাম হুসাইন (রা) ধৈর্য ধারণ করেন এবং ভাইয়ের লাশ 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁদের মা হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (রা) কবরের পাশে দাফন করেন।[২৪৬] এ সম্পর্কে ইবন আবদিল বার তাঁর 'আল-ইসতি'য়াব' গ্রন্থে,ইবনুল আসীর 'উসুদুল গাবা' গ্রন্থে এবং আল্লামা সুয়ুতী 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থে একই ভাষায় একটি

২৪৫. বুখারী-তাফসীর, সূরা আহকাফ

২৪৬. আল-কামিল-৩/৩৮৩

বর্ণনা নকল করেছেন। এই বর্ণনাটি এমন এক ব্যক্তির যিনি ইমামের ওফাতের সময় তাঁর কাছে ছিলেন। বর্ণনাটি এখানে উপস্থাপন করা হলো ঃ[২৪৭]

–ইমাম হাসান (রা) বলছেন, 'আমি আয়িশার (রা) কাছে আবেদন করেছিলাম, আমাকে আপনার ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দাফন হওয়ার সুযোগ দিবেন। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি জানিনে, এ অনুমতি তিনি লজ্জায় পড়ে দিয়েছিলেন কিনা। আমার মৃত্যুর পর তাঁর কাছে আবার অনুমতি চাইবে। যদি তিনি হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দেন তাহলে দাফন করবে। আমার মনে হচ্ছে, লোকেরা তোমাকে বাধা দেবে। যদি তারা সত্যিই এমন করে তাহলে এই ব্যাপার নিয়ে তাদের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষে যাবেনা। আমাকে বাকী' গোরস্তানে দাফন করবে। হযরত হাসান (রা) ইনতিকাল করার পর হযরত হুসাইন (রা) হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, হাঁ, আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি। ব্যাপারটি মারওয়ানের কানে গেলে বললেন ঃ হুসাইন ও আয়িশা দুইজনই মিথ্যা বলছে। হাসানকে কখনো সেখানে দাফন করা যেতে পারে না। উসমানকে তারা গোরস্তানে পর্যন্ত দাফন করতে দেয়নি। আর এখন তারা হাসানকে 'আয়িশার ঘরে দাফন করতে চায়।'

ওফাত

হযরত 'আয়িশা (রা) হিজরী ৫৮ সনের ১৭ রমজান মুতাবিক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৬ বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন হযরত আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালের শেষ পর্যায়। মৃত্যুর পূর্বে কিছুকাল রোগগ্রস্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। অসংখ্য মানুষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দরজায় ভিড় করতো। কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ভালো আছি।[২৪৮] এ সময় একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) সাক্ষাতের অনুমতি চান। হযরত 'আয়িশা (রা) এ কথা চিন্তা করে তাঁকে সাক্ষাৎ দানে ইতস্তত ঃ করতে থাকেন যে, তিনি হয়তো এসেই তাঁর প্রশংসা শুরু করে দেবেন। কিন্তু বোনের ছেলেরা তাঁকে বুঝান যে, আপনি হচ্ছেন উম্মুল মুমিনীন, আর তিনি হচ্ছেন ইবন আব্বাস। আপনাকে সালাম এবং বিদায় জানাতে এসেছেন। তখন বললেন, তোমরা যদি চাও, ডেকে আন। হযরত ইবন আব্বাসকে (রা) ডাকা হলো। উম্মুল মুমিনীনের ধারণা সত্য হলো। ইবন আব্বাস (রা) বসার সাথে সাথে বলতে শুরু করলেন, 'সেই আদিকাল থেকেই আপনার নাম উম্মুল মুমিনীন ছিল। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা স্ত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আপনার দেহ থেকে প্রাণটি বের হয়ে যাওয়ার সময়টুকু শুধু অপেক্ষা। যে রাতে আপনার হারটি হারিয়ে যায়, রাসূল (সা) পানি তালাশ করেন এবং লোকেরা পানি পেলনা, তখন আপনারই কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনার নির্দোষিতা ও দোষ মুক্তির কথা জিবরীল আমীন (আ) আসমান থেকে নিয়ে এসেছেন। এসব আয়াত কিয়ামত

---

২৪৭. আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-১/৩৭৭

২৪৮. তাবাকাত-৮/৭১

পর্যন্ত প্রতিটি মসজিদে পাঠ করা হবে। এতটুকু শোনার পর তিনি বলেন ঃ ইবন আব্বাস, আমাকে আপনি এই প্রশংসা থেকে মাফ করুন। আমার তো এটাই পছন্দ ছিল যে, আমার যদি অস্তিত্বই না হতো।[২৪৯]

মৃত্যুর পূর্বে অসীয়াত করে যান যে, আমাকে জান্নাতুল বাকীতে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে। মৃত্যু যদি রাতের বেলায় হয় তাহলে রাতেই দাফন করে দিবে। তাঁর ওফাত হয় রাতে বিতর নামাযের পরে। সুতরাং তখনই তাঁকে অসীয়াত মত জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। তাঁর ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে মদীনায় কান্নার রোল পড়ে যায়। আনসাররা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। জানাযায় এত লোকের সমাগম হয় যে, রাতের বেলা এত জনসমাগম পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি বলে লোকেরা বর্ণনা করেছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মহিলাদের ভিড় দেখে ঈদের দিন বলে মনে হচ্ছিল। হযরত উম্মু সালামা কান্নার আওয়ায শুনে বলেন ঃ 'আয়িশার (রা) জন্য জান্নাত অপরিহার্য। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) ছিলেন তখন মদীনার গভর্ণর। তিনি জানাযার নামায পড়ান। কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা), আবদুল্লাহ ইবন আবদির রহমান ইবন আবী বকর, আবদুল্লাহ ইবন আতীক, 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা)— ভাই ও বোনের এই ছেলেরা তাঁকে কবরে নামান। তাঁর অন্তিম অসীয়াত অনুযায়ী জান্নাতুল বাকী, গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৫০]

উম্মুল মুমিনীনের ইনতিকালে প্রতিটি মুসলমান গভীরভাবে শোকাভিভূত হন। প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত মাসরূক (রহ) বলেন, আমার যদি একটি কথা স্মরণ না হতো, আমি উম্মুল মুমিনীনের জন্য মাতমের মাজমা বসাতাম। উবাইদ ইবন 'উমাইর এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, হযরত আয়িশার (রা) মৃত্যুতে কারা দু ঃখ পান? লোকটি জবাব দেয়, তিনি যাদের মা ছিলেন তারা সবাই দু ঃখ পায়। এ সকল কথা ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত 'আয়িশা (রা) কোন সন্তান জন্মদান করেননি। বোন হযরত আসমার (রা) ছেলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) নিজের ছেলের মত লালন-পালন করেন। আবদুল্লাহও মায়ের মত খালাকে ভালোবাসতেন। হিজরাতের পরে মদীনায় মুহাজিরদের ঘরে সর্বপ্রথম এই আবদুল্লাহর জন্ম। মদীনার কাফির-মুনাফিকরা বলাবলি করতো যে, মুসলিম নারীরা মদীনায় এসে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। এমনি এক সময়ে তাঁর জন্ম হলে মুসলমানদের মধ্যে খুশীর জোয়ার বয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) খেজুর চিবিয়ে নিজ হাতে তার গালে দিয়ে 'তাহনীক' করেন। এই আবদুল্লাহকে হযরত আয়িশা (রা) ছেলে হিসেবে মানুষ করেন। এক আনসারী মেয়েকে লালন-পালন করে তিনি বিয়ে দেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।[২৫১] তাছাড়া মাসরূক ইবনে আজদা',

---

২৪৯. প্রাগুক্ত-৮/৫২

২৫০. প্রাগুক্ত-৮/৫৪

২৫১. মুসনাদ-৬/২৬৯

'উমরা বিন্‌ত আয়িশা বিন্‌ত তালহা, 'উমরা বিন্‌ত 'আবদির রহমান আনসারিয়্যা, আসমা বিন্‌ত আবদির রহমান ইবন আবী বকর, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ও তাঁর ভাই, আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযিদ ও আরো অনেক ছেলে-মেয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়। মুহাম্মাদ ইবন আবী বকরের (রা) মেয়েদেরকে তিনিই লালন-পালন করে বিয়ে-শাদী দেন।[২৫২]

দৈহিক আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদ

হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন খুব দ্রুত বেড়ে ওঠা মেয়েদের একজন। নয়-দশ বছর বয়সে তিনি বেশ বেড়ে উঠেছিলেন।[২৫৩] ছোটবেলায় একেবারেই হালকা-পাতলা ছিলেন। কিছু বয়স হলে শরীর কিছুটা ভারী হয়ে যায়।[২৫৪] গায়ের বর্ণ ছিল সাদা-লালের মিশ্রণ। উজ্জ্বল চেহারা ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিলেন। এ কারণে আল-হুমায়রা বলা হতো।[২৫৫]

মিতব্যয়িতা ও অল্পেতুষ্টির কারণে মাত্র এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র রাখতেন। তাই একখানা ধুয়ে অন্যখানা পরতেন।[২৫৬] একটি জামা ছিল, যার মূল্য পাঁচ দিরহামের মত হবে। কিন্তু তা সেই আমলে এত মূল্যবান ছিল যে, বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে কনেকে সাজানোর জন্যে চেয়ে নেওয়া হতো।[২৫৭] কখনো কখনো জাফরান দিয়ে রং করা কাপড় পরতেন, আবার মাঝে মধ্যে অলঙ্কারও পরতেন। ইয়ামনের তৈরী সাদা-কালো মোতির একটি বিশেষ ধরনের হার গলায় পরতেন। আঙ্গুলে সোনার আংটি পরতেন।[২৫৮] কাসিম ইবন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, 'আমি হযরত 'আয়িশাকে (রা) ইহ্‌রাম অবস্থায় সোনার আংটি এবং হলুদ বর্ণের পোশাক পরতে দেখেছি।' মাঝে মাঝে একটি রেশমী চাদরও ব্যবহার করতেন। পরে সেটি আবদুল্লাহ্ ইবন যুবাইরকে দান করেন।[২৫৯]

পোশাকের ব্যাপারে শরীয়াতের বিধিবিধানের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। একবার ভাতিজী হাফসা বিন্‌ত আবদির রহমান মাথায় একটি পাতলা ওড়না দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি সেটা নিয়ে ফেঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, তুমি জাননা, আল্লাহ্ তা'য়ালা সূরা নূর-এ কি বলেছেন। তারপর একটা পুরু ওড়না আনিয়ে তাকে দেন।[২৬০] একবার তিনি এক বাড়ীতে মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। গৃহকর্তার বাড়ন্ত বয়সের দুইটি মেয়ে ছিল। তিনি দেখলেন, চাদর ছাড়াই তারা নামায পড়ছে।

---

২৫২. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-যাকাতুল হুলা; কিতাবুত তালাক
২৫৩. বুখারী ঃ বাবু তাযবীজু আয়িশা (রা)
২৫৪. প্রাগুক্ত ঃ আল-ইফক; আবু দাউদ-বাবুস সাবাক
২৫৫. দেখুন ঃ মুসনাদ-৬/১৩৮; বুখারী ঃ ইফক, ঈলা
২৫৬. বুখারী ঃ বাবু হাল তুসাল্লি আল-মারয়াতু ফী সাওবিন হাদাত ফীহে
২৫৭. প্রাগুক্ত ঃ বাবুল ইসতি'য়ারা লিল আরূস
২৫৮. প্রাগুক্ত ঃ বাবু মা ইয়ালবাসুল মুহ্‌রিম সিলাস সিয়ার; বাবুত তায়াম্মুম, ইফক, বাবু খাতামিন নিসা
২৫৯. তাবাকাত-৮/৪৮
২৬০. প্রাগুক্ত-৮/৫০

তিনি তাকিদ দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে আর কোন মেয়ে যেন চাদর ছাড়া নামায না পড়ে।[২৬১]

অভ্যাস ও চারিত্রিক গুণাবলী

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশার (রা) শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সময়কাল এমন এক পবিত্র ব্যক্তি-সত্তার সাহচর্যে কাটে, এই ধরাধামে যাঁর আগমন ঘটেছিল মহোত্তম নৈতিকতার পূর্ণতা বিধানের জন্য। এই সাহচর্য তাঁকে নৈতিকতার এমন আদর্শ স্তরে পৌঁছে দেয় যা আধ্যাত্মিক উন্নতির চূড়ান্ত পর্যায় বলে বিবেচিত। সুতরাং তাঁর নৈতিকতার মান ছিল অতি উঁচুতে। তাঁর হৃদয় ছিল অতি প্রশস্ত। তাছাড়া তিনি ছিলেন দানশীল, মিতব্যয়ী, ইবাদাতকারিণী এবং দয়াময়ী।

নারী ও অল্পেতুষ্টি— এ যেন পরস্পরবিরোধী দুইটি বিষয়। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি দোযখে সবচেয়ে বেশী মহিলাদেরকে দেখেছি। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলো। বললেন, স্বামীদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা এর কারণ। তবে হযরত আয়িশার (রা) সত্তায় এই দুইটি গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর বৈবাহিক জীবন প্রচণ্ড অভাব ও দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন, কিন্তু কখনো অভিযোগের একটি বর্ণও জিহ্বায় আনেননি। সুন্দর সুন্দর পোশাক, মূল্যবান অলঙ্কার, আলীশান ইমারাত, মুখরোচক খাদ্য সামগ্রী—এর কোন কিছুই তিনি স্বামীর ঘরে পাননি। অথচ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, গণীমাতের অর্থ-সম্পদ প্লাবনের মত একদিকে আসছে আর অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তা থেকে কিছু পাওয়ার বিন্দুমাত্র লোভ ও ইচ্ছা কখনো তাঁকে পেয়ে বসেনি। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরে একবার তিনি খাবার আনতে বলেন। তারপর বলেন, কখনো আমি পেট ভরে খাইনে। যাতে আমার কান্না না পায়। তাঁর এক শাগরিদ জিজ্ঞেস করলো, কেন? বললেন, আমার সেই অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান। আল্লাহর কসম! দিনে দুইবার কখনো তিনি পেট ভরে রুটি ও গোশত খাননি!

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সন্তান থেকে মাহরুম করেছিলেন। তবে তিনি সাধারণ মুসলমানদের সন্তানদেরকে, বিশেষত ঃ ইয়াতীমদেরকে এনে প্রতিপালন করতেন। তাদেরকে শিক্ষা দিতেন এবং তাদের বিয়ে-শাদী দেওয়ার দায়িত্বও পালন করতেন।

স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাই ছিল হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি মহূর্তের চিন্তা ও কাজ। তাঁর চেহারা সামান্য মলিন ও বিমর্ষ দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি এত যত্নবান ছিলেন যে তাঁদের কোন কথা উপেক্ষা করতেন না। একবার বোনের ছেলে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর খালার সীমাহীন দানশীলতা দেখে শংকিত হয়ে পড়েন এবং

---

২৬১. মুসনাদ-৬/৭৯৬

বলেন, এখন তাঁর হাত থামানো দরকার। এ কথায় হযরত 'আয়িশা (রা) এতই রেগে যান যে, আবদুল্লাহর সাথে কথা না বলার কসম করে বসেন। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহর (সা) মাতুল গোত্রের লোকেরা সুপারিশ করলো তখন তিনি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না।[২৬২] রাসূলুল্লাহর (সা) বন্ধুদেরকেও তিনি অতি সমাদর ও সম্মান করতেন এবং তাঁদের কোন কথাও উপেক্ষা করতেন না। যথাসম্ভব কারো কোন হাদিয়া-তোহফা ফিরিয়ে দিতেন না।

মুহাম্মাদ ইবন আশ'য়াস (রা) ছিলেন একজন সাহাবী।একবার তিনি হযরত 'আয়িশাকে (রা) একটি পোস্তীন (চামড়ার তৈরী জামা) হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং বলেন, এটি গরম, আপনি পরবেন। হযরত 'আয়িশা (রা) গ্রহণ করতে রাজি হন এবং প্রায়ই সেটি পরতেন।[২৬৩]

আয়াতে হিজাব নাযিলের পর থেকে কঠোরভাবে পর্দা পালন করতেন। ইসহাক নামে একজন অন্ধ তাবেঈ ছিলেন। একবার তিনি এলেন দেখা করতে। হযরত 'আয়িশা (রা) পর্দা করলেন। ইসহাক বললেন, আপনি আমার থেকে পর্দা করছেন! আমি তো আপনাকে দেখতে পাইনে। তিনি বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাওনা তাতে কি হয়েছে, আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।[২৬৪] একবার হজ্জের সময় অন্য মহিলারা বললেন, উম্মুল মুমিনীন! চলুন, হাজারে আসওয়াদে চুমু দেবেন। বললেন ঃ তোমরা যেতে পার। আমি পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে যেতে পারিনে।[২৬৫] কখনও দিনের বেলায় তাওয়াফের প্রয়োজন হলে কা'বার চত্বর থেকে পুরুষদের সরিয়ে দেওয়া হতো।[২৬৬] শরীয়াতে মৃতদের থেকে পর্দার হুকুম নেই। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারেও অতিমাত্রায় সতর্ক ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে 'উমারকে (রা) দাফন করার পর, সেখানে পর্দা ছাড়া যেতেন না।

হযরত 'আয়িশা (রা) কক্ষণো কারো গীবত করতেন না বা কারো সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তিও না। তাঁর বহু কথা হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার একটিতেও কোন মানুষের প্রতি খারাপ উক্তি বা কারো সম্মানহানি ঘটে এমন একটি কথাও পাওয়া যায় না। সতীনের নিন্দামন্দ করা নারীদের অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু তিনি সতীনদের কেমন উদারচিত্তে প্রশংসা করতেন তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কবি হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা), যিনি ইফ্‌ক-এর ঘটনায় জড়িয়ে হযরত 'আয়িশার (রা) দু ঃখকে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনিও হযরত 'আয়িশার (রা) মজলিসে আসতেন এবং তিনি খুব হৃষ্টচিত্তে তাঁকে বসার অনুমতি দিতেন। একদিন হযরত হাস্‌সান (রা) এসে তাঁর শানে রচিত একটি কাসীদা শুনাতে শুরু করেন। যার একটি

---

২৬২. বুখারী ঃ মানকিচু কুরাইশ
২৬৩. তাবাকাত-৮/৪৯
২৬৪. প্রাগুক্ত
২৬৫. বুখারী ঃ কিতাবুল হাজ্জ, তাওয়াফুন নিসা
২৬৬. মুসনাদ-৬/১১৭

শ্লোকের অর্থ ছিল এরূপ ঃ

'তিনি পূত ঃপবিত্র নারীদের প্রতি কোন দোষারোপ করেন না'।

শ্লোকটি শুনতেই হযরত 'আয়িশার (রা) বহু পূর্বের সেই ইফ্ক-এর ঘটনা স্মরণ হলো। তারপর তিনি শুধু এতটুকু মন্তব্য করলেন যে, 'কিন্তু আপনি এমন নন।'[২৬৭] হযরত 'আয়িশার (রা) প্রিয়জনদের অনেকে তাঁর দরবারে হযরত হাস্সানের (রা) এভাবে উপস্থিতি সহজে মেনে নিতে পারতেন না। তাঁরা অনেক সময় হাস্সানকে (রা) কটু কথা শুনাতে চাইতেন কিন্তু হযরত 'আয়িশা (রা) অত্যন্ত শক্তভাবে নিষেধ করতেন। হযরত মাসরূক (রহ) বলেন, 'একবার আমি উম্মুল মুমিনীনকে বললাম, আপনি এভাবে তাঁকে আপনার কাছে আসার অনুমতি দেন কেন? বললেন, এখন সে অন্ধ হয়ে গেছে। আর অন্ধত্বের চেয়ে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে। তাছাড়া সে রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে মককার পৌত্তলিক কবিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জবাব দিত।'[২৬৮]

একবার এক ব্যক্তির আলোচনা চলছিল। প্রসঙ্গক্রমে হযরত আয়িশা (রা) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো ধারণা প্রকাশ করলেন না। লোকেরা বললো ঃ উম্মুল মুমিনীন! সেই ব্যক্তি তো মারা গেছে। একথা শুনতেই তিনি তার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে শুরু করলেন। লোকেরা তখন বললো, আপনি তো এইমাত্র তাকে ভালো বলেন নি, আর এখন তার মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করছেন! জবাবে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা মৃতদের সম্পর্কে শুধু ভালো কথাই বলবে।[২৬৯]

অহংকারের লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। নিজেকে অতি সাধারণ ও তুচ্ছ মনে করতেন। কেউ তাঁর মুখের উপর প্রশংসা করুক তা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। এ প্রসঙ্গে অন্তিম শয্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাসের (রা) সাথে তাঁর আচরণটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয়ী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল পূর্ণমাত্রায়। তাই স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর কোন কোন আচরণ প্রেয়সীর মান-অভিমানের রূপ নিত। যেমন, ইফ্ক-এর ঘটনায় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নির্দোষ বিষয়ক আয়াত পাঠ করে শোনান এবং মা বলেন, মেয়ে, স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তখন তিনি যে জবাব দেন, তাতে একদিকে যেমন প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রিয়তমের নিকট অভিমানের এক চমৎকার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'আমি শুধু আমার পরোয়ারদিগারের শুকরিয়া আদায় করবো, অন্য কারো নয়— যিনি আমাকে আমার নির্দোষিতা ও পবিত্রতার ঘোষণা দিয়ে সম্মানিত করেছেন।[২৭০] তাছাড়া আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যখন তিনি স্বামীর প্রতি ক্ষুব্ধ হতেন তখন তাঁর নাম নিয়ে কসম খাওয়া ছেড়ে দিতেন। এ সবই ছিল প্রেয়সীর

---

২৬৭. সহীহ বুখারী ঃ বাবু হাদীসিল ইফ্ক; তাফসীর সূরা নূর

২৬৮. প্রাগুক্ত। আল-ইফ্ক; মানকিবু হাস্সান, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৬১

২৬৯. মুসনাদে তায়ালীসী; মুসনাদে 'আয়িশা

২৭০. সহীহ বুখারী ঃ আল-ইফক

মান-অভিমানের এক অনুপম দৃশ্য।

আমরা তাঁর আত্মমর্যাদাবোধের চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই অপর একটি ঘটনায়। যে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরকে (রা) তিনি মাতৃস্নেহে লালন পালন করেন, আর তিনিও খালা 'আয়িশাকে (রা) মায়ের মত সম্মান ও সেবা করতেন। তিনি খালার সীমাহীন দানের হাত দেখে একবার মন্তব্য করে বসেন, এখন তাঁর হাতে বাঁধা দেওয়া উচিত। তাঁর এমন মন্তব্যে হযরত আয়িশার (রা) আত্মসম্মান বোধ আহত হয়। তিনি কসম খেয়ে বসেন, ভাগ্নের কোন জিনিসই আর স্পর্শ করবেন না। ভাগ্নে আবদুল্লাহ (রা) পড়ে গেলেন মহা বিপদে। অবশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সুপারিশ ও মধ্যস্থতায় তিনি সদয় হন।[২৭১]

হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ ও ব্যক্তিত্বের সাথে সাথে তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধও ছিল। একবার মিসরের এক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তিনি লোকটির নিকট জানতে চাইলেন, যুদ্ধের ময়দানে তথাকার তৎকালীন শাসকদের আচরণ তাদের সাথে কেমন হয়ে থাকে। লোকটি জবাবে বললেন, প্রতিবাদ করার মত তেমন কোন আচরণ তাঁদের দৃষ্টিতে পড়েনা। কারো উট মারা গেলে তিনি তাকে অন্য একটি উট দেন, কারো চাকর না থাকলে চাকর দেন, কারো খরচের অর্থের প্রয়োজন হলে তার সে প্রয়োজন পূরণ করেন। তাঁর এ জবাব শুনে হযরত আয়িশা (রা) বলেন, মিসরবাসীরা আমার ভাই মুহাম্মদ ইবন আবী বকরের সাথে যত খারাপ আচরণ করুক না কেন, তাদের সেই খারাপ আচরণ তোমাদের কাছে আমাকে এ সত্য কথাটি বলতে বিরত রাখতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার এই ঘরের মধ্যেই দু'আ করেছিলেন– 'হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের উপর কঠোরতা করে তুমিও তার উপর কঠোরতা কর, আর যে সদয় হবে, তুমিও তার প্রতি সদয় হও।'[২৭২]

হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন দানের ক্ষেত্রে খুবই দরাজহস্ত। অন্তরটাও ছিল অতি উদার ও প্রশস্ত। বোন হযরত আসমাও (রা) ছিলেন খুবই দানশীল। দুই বোনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল দানশীলতা। আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বলেন, তাঁদের দুইজনের চেয়ে বড় দানশীল ব্যক্তি আর কাকেও দেখিনি। তবে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, হযরত আয়িশা (রা) অল্প অল্প করে জমা করতেন। যখন কিছু জমা হয়ে যেত, তখন সব এক সাথে বিলিয়ে দিতেন। আর হযরত আসমার (রা) অবস্থা ছিল, হাতে কিছু এলে জমা করে রাখতেন না, সাথে সাথে বিলিয়ে দিতেন।[২৭৩] অধিকাংশ সময় তিনি ঋণগ্রস্ত থাকতেন। বিভিন্ন জনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন। লোকেরা যখন বলতো, আপনার এত ঋণ করার প্রয়োজন কি? তিনি বলতেন, ঋণ পরিশোধের যার ইচ্ছা থাকে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আমি আল্লাহর এই সাহায্য তালাশ করি।[২৭৪]

তিনি দান-খয়রাতের ব্যাপারে কম-বেশীর চিন্তা করতেন না। হাতে যা কিছুই থাকতো

---

২৭১. প্রাগুক্ত ঃ মানাকিবু কুরাইশ

২৭২. সহীহ মুসলিম ঃ বাবু ফাদীলাতিল আল-আদিশ

২৭৩. বুখারী আদাবুল মুফরাদ-বাবু সাখাওয়াতুন নাফ্‌স

২৭৪. মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৬/৯৯

তাই দিয়ে দিতেন। একবার এক মহিলা ছোট ছোট দুই বাচ্চা কোলে করে এসে কিছু সাহায্য চায়। ঘটনাক্রমে সেই সময় তাদেরকে দেওয়ার মত ঘরে কিছুই ছিল না। খুঁজে-খুঁজে একটি মাত্র খেজুর পেলেন। সেটি দুই ভাগ করে বাচ্চা দুইটির হাতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এলে তাঁকে ঘটনাটি শুনালেন।[২৭৫] আর একবার এক ভিক্ষুক এসে সাহায্য চাইলো। হযরত আয়িশার (রা) সামনেই ছিল কিছু আঙ্গুরের দানা। সেখান থেকে তিনি একটি দানা নিয়ে ভিক্ষুকের হাতে তুলে দেন। ভিক্ষুক দানাটির দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখতে থাকে যে, একটি দানা কি কেউ কারো হাতে দেয়! তখন তিনি ভিক্ষুককে লক্ষ্য করে বলেন, দেখ, এই একটি দানার মধ্যে কত দানা রয়েছে।[২৭৬] মূলত তিনি সূরা যিলযাল- এর এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

হযরত 'উরওয়া (রা) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আয়িশা (রা) তাঁর সামনে পুরো সত্তর হাজার দিরহাম এক সাথে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়ে চাদরের কোণা ঝেড়ে ফেলেন।[২৭৭] হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) একবার এক লাখ দিরহাম হযরত আয়িশার (রা) নিকট পাঠালেন। সন্ধ্যা হতে হতে একটি পয়সাও থাকলো না। সবই গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। দাসী বললো, ইফতারীর খাদ্য-সামগ্রী কেনার জন্য কিছু রেখে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বললেন ঃ একথা যদি আগে স্মরণ করিয়ে দিতে। এ রকম ঘটনা আরো আছে। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) বড় বড় দুইটি থলিতে ভরে এক লাখ দিরহাম পাঠালেন। তিনি সবগুলি একটি খাঞ্চায় ঢেলে বিলাতে শুরু করেন। সেদিনও তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যার সময় দাসীকে ইফতারী আনতে বলেন। দাসী বলেন, উম্মুল মুমিনীন! এই অর্থ দিয়ে কিছু গোশত ইফতারের জন্য আনাতে পারতেন না? বললেন, এখন তিরস্কার করো না। তখন কেন স্মরণ করে দাওনি?[২৭৮] একদিন তিনি রোযা আছেন। ঘরে একটি রুটি ছাড়া কিছুই নেই। এমন সময় এক মহিলা ভিক্ষুক এসে কিছু খাবার চায়। তিনি দাসীকে বলেন রুটিটি তাকে দিয়ে দিতে। দাসী বলেন, রুটি দিয়ে দিলে সন্ধ্যায় ইফতার করবেন কি দিয়ে? বললেন, এখন রুটিটি দিয়ে দাও তো, তারপর দেখা যাবে। সন্ধ্যার সময় কেউ একজন খাসীর গোশ্‌ত পাঠালো। তিনি দাসীকে বললেন, এই দেখ, তোমার রুটির চেয়েও ভালো জিনিস আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন।[২৭৯] নিজের থাকার ঘরটি তিনি আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) নিকট বিক্রি করে যে অর্থ পান তা

---

২৭৫. আদাবুল মুফরাদ ঃ বাবু মান ই'উলা ইয়াতীমান

২৭৬. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ বাবুত তারগীব ফিস-সাদাকা

২৭৭. তাবাকাত-৮/৬৭

২৭৮. প্রাগুক্ত-৮/৬৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৭

২৭৯. মুওয়াত্তা ঃ বাবুত তারগীব ফিস-সাদাকা

সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন।[২৮০]

স্বভাবগতভাবেই হযরত আয়িশা (রা) ছিলেন নির্ভীক ও সাহসী। তাঁর জীবনের বহু ঘটনায় এ সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাতে ঘুম থেকে জেগে একা একাই কবরস্তানে চলে যেতেন।[২৮১] যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়িয়ে যেতেন। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীতে অস্থিরতা বিরাজমান তখন তিনি পিঠে করে মশকভর্তি পানি নিয়ে আহত সৈনিকদের পান করিয়েছেন।[২৮২] খন্দক যুদ্ধের সময় যখন পৌত্তলিক বাহিনী চতুর্দিক থেকে মদীনা ঘিরে রেখেছিল এবং নগরীর ভিতর থেকে ইহুদীদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল তখনও তিনি নির্ভীক চিত্তে কিল্লা থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম মুজাহিদদের যুদ্ধ কৌশল প্রত্যক্ষ করতেন।[২৮৩] একবার তো তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিহাদে গমনের অনুমতি চেয়েই বসেন; কিন্তু অনুমতি পাননি।[২৮৪] উটের যুদ্ধে তিনি যে দক্ষতার সাথে সৈন্য পরিচালনা করেন, তাতে তার স্বভাবগত সাহসিকতার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত 'আয়িশার (রা) অন্তরে ছিল তীব্র আল্লাহ-ভীতি। অন্তরটিও ছিল অতি কোমল। খুব তাড়াতাড়ি কাঁদতে শুরু করতেন। বিদায় হজ্জের সময় যখন নারী প্রকৃতির কারণে হজ্জের কিছু আনুষ্ঠানিতা পালন করতে পারলেন না তখন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করে আকুলভাবে কান্না শুরু করেন। পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সান্ত্বনায় স্থির হন।[২৮৫] একবার তো দাজ্জালের ভয়ে অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকেন।[২৮৬] পরবর্তী জীবনে যখনই উটের যুদ্ধের কথা স্মরণ হতো, অস্থির হয়ে কাঁদতেন।

একবার কোন একটি কথার উপর কসম করে বসেন। পরে মানুষের পীড়াপীড়িতে কসম ভাংতে বাধ্য হন এবং কাফ্ফারা হিসেবে ৪০টি দাস মুক্ত করেন। কিন্তু বিষয়টি তাঁর হৃদয়ে এত গভীর ছাপ ফেলে যে, যখনই স্মরণ হতো চোখের পানি মুছতে মুছতে আঁচল ভিজে যেত।[২৮৭] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইফ্কের ঘটনায় তিনি মুনাফিকদের দোষারোপের কথা জানতে পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পিতামাতার সান্ত্বনা দান সত্ত্বেও চোখের পানি বন্ধ হচ্ছিল না।

একবার এক দরিদ্র মহিলা তার দুইটি ছোট্ট শিশু সন্তান নিয়ে কিছু সাহায্যের আশায় হযরত আয়িশার (রা) নিকট আসে। তখন ঘরে তেমন কিছু ছিল না। তিনি তিনটি খেজুর মহিলার হাতে দেন। মহিলা একটি করে খেজুর তার দুই সন্তানের হাতে এবং

---

২৮০. তাবাকাত ঃ জিকরু হুজুরাত উম্মাহাতিল মুমিনীন
২৮১. বুখারী ঃ বাবু যিয়ারাতুল কুবুর
২৮২. প্রাগুক্ত ঃ বাবু জিকরু উহুদ।
২৮৩. মুসনাদ ঃ ৬/৯৯
২৮৪. বুখারী ঃ বাবু হাজ্জিন নিসা,
২৮৫. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল হাজ্জ,
২৮৬. মুসনাদ ঃ ৬/৭৫
২৮৭. বুখারী ঃ বাবুল হিজরাতু

একটি নিজের মুখে দেয়। সন্তান দুইটি নিজেদের খেজুর খেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। তখন মহিলা নিজের মুখ থেকে খেজুরটি বের করে দুই ভাগ করে দুই সন্তানের মুখে দেয়। নিজে কিছুই খেল না। তিনি মাতৃস্নেহের এমন দু ঃখজনক দৃশ্য এবং তার অসহায় অবস্থা দেখে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।[২৮৮]

রাত-দিনের বেশীর ভাগ সময় ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। চাশতের নামায নিয়মিত পড়তেন। বলতেন, আমার আব্বাও যদি কবর থেকে উঠে এসে এ নামায পড়তে বারণ করেন তবুও আমি ছাড়বো না।[২৮৯] রাতে ঘুম থেকে জেগে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরও এই নামাযের এত পাবন্দ ছিলেন যে, সকাল সকাল উঠে ফজরের নামাযের পূর্বে পড়ে নিতেন। একদিন তিনি এ নামায আদায় করছেন, এমন সময় ভাতিজা কাসেম এসে উপস্থিত হন। তিনি প্রশ্ন করেন ঃ ফুফু এ আপনি কোন নামায পড়ছেন? বললেন ঃ রাতে আমি পড়তে পারিনি; কিন্তু এখন আমি ছেড়ে দিতে পারিনে।[২৯০]

তিনি বছরের অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি সর্বদা রোযা অবস্থায় থাকতেন।[২৯১] একবার গরমকালে আরাফাতের দিনে রোযা রাখেন। গরম ও সূর্যের তাপ এত তীব্র ছিল যে, মাথায় পানির ছিটে দেওয়া হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে তাঁর ভাই আবদুর রহমান (রা) বলেন, এই প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখার এত কি দরকার। ইফতার করে ফেলুন। বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে শুনেছি যে, আরাফাতের দিনে রোযা রাখলে সারা বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপরেও আমি রোযা ভেঙ্গে ফেলবো?[২৯২]

অত্যন্ত কঠোরভাবে হজ্জের পাবন্দ ছিলেন। এমন বছর খুব কমই যেত, যাতে তিনি হজ্জ আদায় করতেন না। খলীফা হযরত উমার (রা) তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত উসমান (রা) ও আবদুর রহমান ইবন আওফকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিণীদের সাথে হজ্জে পাঠান।[২৯৩] হজ্জের সময় তাঁদের অবস্থানের স্থানসমূহ নির্দিষ্ট ছিল। প্রথমে ওয়াদিনামির-এর শেষ প্রান্তে অবস্থান করতেন। সেখানে যখন মানুষের ভিড় হতে লাগলো তখন তার থেকে একটু দূরে আরাফ নামক স্থানে তাবু স্থাপন করাতেন। কোনবার 'জাবালে সাবীর'-এর পাদদেশে অবস্থান নিতেন। আরাফাতের দিন রোযা

---

২৮৮. মুসতাদারিকে হাকেম-২০৬
২৮৯. মুসনাদ-৬/১৩৮
২৯০. দারুকুতনী ঃ কিতাবুস সালাত
২৯১. তাবাকাত-৩/৭৭
২৯২. মুসনাদ-৬/১২৮,
২৯৩. বুখারী ঃ বাবু হাজ্জিন নিসা

রাখতেন। মানুষ যখন আরাফা ছেড়ে চলতে শুরু করতো, তখন তিনি ইফতার করতেন।[২৯৪]

দাস-দাসীদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। তিনি সুযোগ পেলেই নানা অজুহাতে দাস মুক্ত করতেন। একবার তো একটি মাত্র কসমের কাফ্ফারায় চল্লিশজন দাস মুক্ত করে দেন। তাঁর মুক্ত করা দাস-দাসীর সংখ্যা সর্বমোট ৬৭ (সাতষট্টি) জন।[২৯৫] তামীম গোত্রের একটি দাসী ছিল তাঁর। রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে তিনি শুনতে পান যে, এই গোত্রটি হযরত ইসমাঈলের (আ) বংশধর। রাসূলুল্লাহর (সা) ইঙ্গিতে তিনি দাসীটিকে মুক্ত করে দেন। মদীনায় বুরায়রা নাম্নী এক দাসী ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের ব্যাপারে তাঁর মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। তারপর তিনি মানুষের কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। সেকথা হযরত আয়িশার (রা) কানে গেলে তিনি একাই সব অর্থ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্ত করে দেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। লোকেরা বলতে লাগলো, কেউ হয়তো জাদু-টোনা করেছে। তিনি এক দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জাদু করেছো? সে স্বীকার করলো। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ কেন? দাসীটি বললো ঃ যাতে আপনি তাড়াতাড়ি মারা যান, আর আমি মুক্ত হই। হযরত আয়িশা (রা) নির্দেশ দেন ঃ তাকে একটি মন্দ লোকের নিকট বিক্রী করে সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দাও। তাঁর এ নির্দেশ কার্যকরী করা হয়।[২৯৬] মুসতাদরিকে হাকেম-এর আত-তিব্ব অধ্যায়ে এসেছে যে, দাসীকে এ শাস্তি তিনি দিয়েছিলেন তার শরীয়াতবিরোধী কাজের জন্য।

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য তাদের মর্যাদা অনুযায়ী করা উচিত। হযরত আয়িশা (রা) সর্বদা এদিকে দৃষ্টি রাখতেন। একবার একজন সাধারণ ভিক্ষুক তাঁর নিকট আসলো। তিনি তাকে এক টুকরো রুটি দিয়ে বিদায় করলেন। তারপর একটু ভালো কাপড় চোপড় পরা একজন ভিক্ষুক আসলো। তাকে দেখে একজন মর্যাদাবান মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে বসিয়ে আহার করিয়ে বিদায় দেন। উপস্থিত লোকেরা দুইজন ভিক্ষুকের সাথে দুই রকম আচরণের কারণ জানতে চাইলো। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করা উচিত।[২৯৭]

শরীয়াতের অতি সাধারণ আদেশ-নিষেধের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন। ছোট ছোট নিষিদ্ধ কাজও এড়িয়ে চলতেন। পথ চলতে যদি ঘন্টাধ্বনি শোনা যেত, সাথে সাথে থেমে যেতেন, যাতে কানে না যায়।[২৯৮] তাঁর একটি বাড়ীতে একজন ভাড়াটিয়া ছিল। সে দাবা খেলতো। তিনি তাকে বলে দেন, যদি এ কাজ থেকে বিরত না হও, ঘর থেকে

---

২৯৪. মুওয়াত্তা ঃ সিয়ারু ইওমি 'আরাফা
২৯৫. আমীর ইসমাঈল ঃ শারহু বুলুগিল মুরাম-কিতাবুল 'ইতক
২৯৬. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ঃ বাবুল ইত্ক
২৯৭. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল আদাব
২৯৮. মুসনাদ-৬/১৫২

বের করে দেব।[২৯৯]

আয়িশা বিন্‌ত তালহা বলেন ঃ একটি জিন বার বার হযরত আয়িশার (রা) ঘরে প্রবেশ করতো। তিনি তাকে এভাবে ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে থাকেন। এমন কি তাকে হত্যার হুমকি দেন। তবুও সে আসতে থাকে। একদিন তিনি লোহার একটি দণ্ড দিয়ে জিনটিকে আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর তিনি স্বপ্নে দেখেন, কেউ একজন তাঁকে বলছেন, আপনি অমুককে হত্যা করেছেন, অথচ তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনি যখন পর্দা অবস্থায় থাকতেন তখন ছাড়া তিনি তো আপনার ঘরে ঢুকতেন না। তিনি যেতেন আপনার নিকট থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস শোনার জন্য। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর এই স্বপ্নের কথা পিতাকে বললেন।' তিনি তাঁকে দিয়াত (রক্তপণ) হিসেবে বারো হাজার দিরহাম সাদাকা করে দেওয়ার জন্য বলেন। ইমাম জাহাবী এ ঘটনা তাঁর *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, জিনটি সাপের রূপ ধরে আসতো এবং তার দিয়াত হিসেবে হযরত আয়িশা (রা) একটি দাস মুক্ত করেন।

হযরত 'আয়িশার (রা) স্থান ও মর্যাদা

সহীহ মুসলিমের 'আল-ফাদায়িল অধ্যায়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বিরাট জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ আল্লাহর কিতাব এবং আহলি বায়ত (আমার পরিবার-পরিজন)। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীর তাৎপর্য হলো, যদিও কিতাবুল্লাহ তার সহজ-সরল ভাষা ও বর্ণনার জন্য সহজেই বোধগম্য এবং বাস্তবায়নযোগ্য তবুও সর্বদাই দুনিয়াতে এমন সব মানুষের প্রয়োজন থাকবে যারা তার রহস্যসমূহ উদঘাটন করতে পারেন এবং তার ইলমী ও আমলী ব্যাখ্যা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পরে এমন ব্যক্তিদের আহলে বায়তের মধ্যে তালাশ করা উচিত।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত আয়িশা (রা) সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য ও বাণী রেখে গেছেন, আয়িশাও (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচার্য ও শিক্ষায় যে ভাবে নিজেকে যোগ্য করে তুলেছেন, সর্বোপরি তিনি স্বীয় স্বভাবগত তীক্ষ্ণ মেধা ও যোগ্যতা দ্বারা নিজেকে যেভাবে শানিত করেছেন, তাতে আহলি বায়তের মধ্যে তাঁর যে এক বিশেষ মর্যাদার আসন ছিল, সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এরই ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং ইসলামী হুকুম-আহকামের শিক্ষাদান তাঁর চেয়ে ভালো আর কে করতে পারতেন? লোকেরা তো কেবল বাইরের নবীকে প্রত্যক্ষ করতেন, অভ্যন্তরের নবী থাকতেন তাদের দৃষ্টির আড়ালে। পক্ষান্তরে হযরত আয়িশা (রা) বাহির ও গৃহাভ্যন্তর—সর্ব অবস্থার নবীকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করতেন। আর একারণেই আল্লাহর নবী বলেছেন ঃ[৩০০]

---

২৯৯. আদাবুল মুফরাদ,-২৩২

৩০০. বুখারী, তিরমিযী ঃ মানাকিবু আয়িশা (রা)

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

–নারী জাতির উপর 'আয়িশার (রা) মর্যাদা তেমন, যেমন সকল খাদ্য-সামগ্রীর উপর সারীদের মর্যাদা।

রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আয়িশাকে (রা) স্ত্রী হিসেবে লাভের সুসংবাদ পান। তাঁর বিছানা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বিছানায় রাসূল (সা) ওহী লাভ করেননি। মহান ফিরিশতা জিবরীল আমীন তাঁকে সালাম পেশ করেছেন। তিনি দুইবার জিবরীলকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন। আর তিনিই যে আখিরাতের জীবনে রাসূলে পাকের স্ত্রী হবেন, সেকথাও রাসূল (সা) জানিয়ে গেছেন। এ সকল কথা সহীহ বুখারীর আয়িশার সম্মান ও মর্যাদা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) বলতেন, আমি গর্বের জন্য নয়, বরং বাস্তব কথাই বলছি। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা আর কাকেও দান করেননি। (১) ফিরিশতা রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বপ্নের মধ্যে আমার ছবি দেখিয়েছেন, (২) আমার সাত বছর বয়সে রাসূল (সা) আমাকে বিয়ে করেছেন, (৩) নয় বছর বয়সে আমি স্বামীগৃহে গমন করেছি, (৪) আমিই ছিলাম রাসূলুল্লাহর (সা) একমাত্র কুমারী স্ত্রী, (৫) যখন তিনি আমার বিছানায় থাকতেন তখনও তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, (৬) আমি ছিলাম রাসূলুল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী, (৭) আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, (৮) জিবরীলকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি, (৯) রাসূল (সা) আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছেন, (১০) আমি তাঁর খলীফা ও তাঁর সিদ্দীকের কন্যা, (১১) আমাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে, (১২) আমার মাগফিরাত এবং জান্নাতে আমাকে উত্তম জীবিকা দানের অঙ্গিকার করা হয়েছে, (১৩) রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের সর্বশেষ মুহূর্তে আমার মুখের লালা তাঁর লালার সাথে মিলেছে, (১৪) আমারই ঘরে তাঁর কবর দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের আরো গৌরব ও মর্যাদার কথা তিনি নিজেও যেমন বলেছেন, তেমনি আরো বহু সাহাবী বর্ণনা করেছেন। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে যা ছড়িয়ে আছে।[৩০১]

হযরত 'আয়িশার (রা) এত সব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দেখে কোন কোন আলিম মনে করেছেন, তিনি তাঁর পিতা আবু বকর (রা) থেকেও উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ইমাম জাহাবী বলেন, 'তাঁদের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকটি জিনিসের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আমরা বরং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী। এর চেয়ে বড় গর্বের বিষয় তাঁর জন্য আর কিছু কি আছে? তা সত্ত্বেও হযরত খাদীজার এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা কেউ অর্জন

---

৩০১. দেখুন ঃ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ঃ ৩/১৪০-১৪১, ১৪৬-১৪৭/১৯১; তাবাকাত ঃ ৩/৬৮

করতে পারেনি। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, অনেকগুলি কারণে তাঁর চেয়ে খাদীজার মর্যাদা অনেক বেশী।'[৩০২]

হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকার (রা) সীরাতে মুবারাকার প্রতি যখন আমরা একটা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করি তখন কেবল সকল মহিলা সাহাবী নয়, বরং অনেক বড় বড় পুরুষ সাহাবীদেরও তুলনায় তাঁর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণরূপে পাই তা হলো, তিনি জন্ম ও স্বভাবগতভাবে চিন্তা ও অনুধ্যানশীল মেধা ও মস্তিষ্ক লাভ করেছিলেন। দ্বীনের তাৎপর্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান, ইজতিহাদের ক্ষমতা ও শক্তি, সমালোচনা ও পর্যালোচনার রীতি-পদ্ধতি, ঘটনাবলীর যথাযথ উপলব্ধি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শুদ্ধ ও সঠিক সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে।

তিনি যে সব কথা বলতেন, যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতেন, তা হতো বিলকুল প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির অনুকূলে। তাঁর এমন কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হবে যা সমর্থনের জন্য মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে নানা রকম তাবীল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। একথা অবশ্য সত্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) অতি নিকটের মানুষ হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর যাবতীয় কথা ও কাজ অধ্যয়নের খুব চমৎকার সুযোগ লাভ করেছিলেন। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, তিনি ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তি এমন ছিলেন যাঁদের নৈকট্য তাঁর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না তখন আমাদের সামনে হযরত 'আয়িশার (রা) মেধা ও মননের শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘুরে ফিরে সেই একই কথা আসে, রাসূলুল্লাহর (সা) মুখনিঃসৃত বাণী 'আয়িশা (রা) ছাড়া আরো অনেকে শুনতেন, কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন এবং তার প্রকৃত প্রাণসত্তা তাঁর মেধা ও মস্তিষ্ক যতটুকু অনুধাবন করতে সক্ষম হতো, অন্যরা তা পারতো না।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাবী শিক্ষার্থী। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা ছিল অতুলনীয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তৎকালীন সকল নারী অথবা সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন (রাসূলুল্লাহর সহধর্মিণীগণ, যাঁরা বিশ্বের সকল বিশ্বাসীদের মাতা), অথবা সাহাবীদের একটি অংশের উপরই ছিল না, বরং কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবী ছাড়া সকল সাহাবীর উপরই ছিল। হযরত আবু মূসা আল-আশ'য়ারী (রা) বলেন ঃ[৩০৩]

مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلاَّوَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا -

–আমরা মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীরা কক্ষণো এমন কোন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হইনি, যে বিষয়ে আমরা 'আয়িশার (রা) নিকট জানতে চেয়েছি এবং সে সম্পর্কে কোন

---

৩০২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৪০

৩০৩. জামে তিরমিজী মানাকিবু 'আয়িশা (রা); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৯; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮; আল-ইসাবা-৪/৩৬০

জ্ঞান আমরা তাঁর কাছে পাইনি।

হযরত আবু মূসা আল-আশ'য়ারী (রা) একজন অতি উঁচু মর্যাদার সাহাবী। তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা হযরত 'আয়িশার (রা) জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত 'আতা ইবন আবী রাবাহ—যিনি বহু সাহাবীর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, বলেন ঃ৩০৪

كَانَتْ عَائِشَةُ أَفْقَهُ النَّاسِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ وَأَحْسَنُ النَّاسِ رَأْيًا فِى الْعَامَّةِ؛

–হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে বেশী জানা ব্যক্তি এবং আম জনতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মতামতের অধিকারিনী।

তাবে'ঈদের ইমাম বলে খ্যাত হযরত ইমাম যুহ্‌রী—যিনি একাধিক অতি মর্যাদাবান সাহাবীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন, বলেন ঃ৩০৫

"كانت عائشة أعلم الناس يسئلها الأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه رسلم "

–হযরত 'আয়িশা (রা) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক বড় বড় সাহাবী তাঁর কাছে জানতে চাইতেন।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফের (রা) সুযোগ্য পুত্র আবু সালামা যিনি একজন অতি উঁচু স্তরের তাবে'ঈ ছিলেন, বলেন ঃ৩০৬

مارأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا أفقه فى رأى ان احتيج ألى رأيه ولا اعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة -

–রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের জ্ঞান, প্রয়োজনে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দান, আয়াতের শানে নুযুল এবং ফরজ বিষয়সমূহে আমি 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী ও সুচিন্তিত মতামতের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।

হযরত আমীর মু'য়াবিয়া (রা) একদিন দরবারের এক ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন, আচ্ছা, আপনি বলুন তো, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় 'আলিম কে? লোকটি বললো ঃ আমীরুল মমিনীন! আপনি। আমীর মু'য়াবিয়া (রা) বললেন ঃ না। আমি কসম দিচ্ছি, আপনি সত্য কথাটি বলুন। তখন লোকটি বললো ঃ যদি তাই হয়, তাহলে 'আয়িশা (রা)।

---

৩০৪. আল-মুসতাদরিক-৪/১১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৫

৩০৫. মুসনাদ-৬/৪৫০

৩০৬. আল-মুসতাদরিক-৪/১১

হযরত 'উরওয়া ইবন যুবাইর (রা) বলেন ঃ[৩০৭]

مارأيت أحدا اعلم بالحلال والحرام، والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين"

–আমি হালাল-হারাম, জ্ঞান, কবিত্ব ও চিকিৎসা বিদ্যায় উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী অন্য কাউকে দেখিনি।

অপর একটি বর্ণনায় হযরত 'উরওয়ার কথাগুলি এভাবে এসেছে ঃ[৩০৮]

مارأيت أحدا اعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا بفقه ولا بشعرولا بطب ولا بحديث العرب ولا نسب من عائشة"

–কুরআন, ফারায়েজ, হালাল-হারাম, ফিকাহ, কাব্য, চিকিৎসা, আরবের ইতিহাস ও নসব বিদ্যায় আমি 'আয়িশার (রা) চেয়ে বড় আলিম আর কাউকে দেখিনি।

প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত মাসরূক (র)—যিনি হযরত 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন, একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো ঃ উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) কি ফারায়েজ শাস্ত্র জানতেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ[৩০৯]

أى والذى نفسى بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئلونها عن الفرائض" -

–সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি বড় বড় সাহাবীদেরকে তাঁর নিকট ফারায়েজ বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস ও সুন্নাতের হিফাজত ও প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বেগমগণও করেছেন। তবে তাঁদের কেউই হযরত 'আয়িশার (রা) স্তরে পৌঁছতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে মাহমূদ ইবন লাবীদ মন্তব্য করেছেন ঃ[৩১০]

"كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة" -

–রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ বহু হাদীস স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু কেউ 'আয়িশা (রা) ও উম্মু সালামার (রা) সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

এ ব্যাপারে ইমাম যুহরী (র) সাক্ষ্য দিচ্ছেন ঃ[৩১১]

---

৩০৭. যারকানী-৩/২২৭; তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮

৩০৮. তাবাকাত-৮/৭৭

৩০৯. আল-মুসতাদরিক-৪/১১; আল-ইসাবা-৪/৩৬০

৩১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৫; তাবাকাত-৮/৭৬

৩১১. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৮৫

لو جمع علم الناس كلهم وعلم أزواج النبى صلى الله عليه وسلم فكانت عائشة أوسعهم علما -

–যদি সকল মানুষ ও রাসূলুল্লাহর (রা) বেগমদের ইল্‌ম (জ্ঞান) একত্র করা যেত তাহলে তাদের মধ্যে 'আয়িশার (রা) ইল্‌ম বা জ্ঞান অধিকতর প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতো।

অপর একটি বর্ণনা মতে ইমাম যুহরী বলেন ঃ[৩১২] গোটা নারী জাতির ইল্‌ম (জ্ঞান) এবং 'আয়িশার (রা) ইল্‌ম যদি একত্র করা যেত তাহলে 'আয়িশার (রা) ইল্‌মই শ্রেষ্ঠ হতো।'

উপরের বর্ণনাসমূহের প্রেক্ষিতে 'আল্লামা জাহাবী বলেন ঃ[৩১৩] 'তিনি ছিলেন বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার।' তিনি আরো বলেন ঃ[৩১৪] 'উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে, সার্বিকভাবে মহিলাদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তি নেই।'

কোন কোন মুহাদ্দিস 'আয়িশার (রা) ফজীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন ঃ[৩১৫]

خُذُوْا شَطْرَ دِيْنِكُمْ عَنْ حُمَيْرَاءَ -

–তোমাদের দ্বীনের একটি অংশ তোমরা হুমায়রা হতে গ্রহণ কর।

ইল্‌ম ও ইজতিহাদ বা জ্ঞান ও গবেষণায় হযরত 'আয়িশা (রা) কেবল মহিলাদের মধ্যেই নন, বরং পুরুষদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হন। কুরআন, সুন্নাহ, ফিকাহ ও আহকাম বিষয়ক জ্ঞানে তাঁর স্থান ও মর্যাদা এত উর্ধে যে 'উমার (রা), আলী (রা), আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা), আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখের সাথে তাঁর নামটি নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করা যায়। এখানে সংক্ষেপে আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা সম্পর্কে একটি আলোচনা উপস্থাপন করছি।

আল-কুরআন

আমরা জানি পবিত্র কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে নাযিল হয়। হযরত 'আয়িশা (রা) নুযূলে কুরআনের চতুর্দশ বছরে মাত্র নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহর ঘরে আসেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর সহ-অবস্থানের সময়কাল দশ বছরের উর্ধে নয়। নুযূলে কুরআনের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত হয় তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বয়োপ্রাপ্তির পূর্বে। কিন্তু এমন অসাধারণ মেধা ও মননের অধিকারী সত্তা তাঁর শৈশবকালকেও বৃথা যেতে দেয়নি। মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় হযরত সিদ্দীকে আকবরের (রা) গৃহে

---

৩১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০

৩১৩. তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/২৮

৩১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৪০

৩১৫. এই হাদীসটি ইবনুল আসীর 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী বলেছেন, হাদীসটির সনদ প্রমাণিত নয় এবং এটি 'মাওজু' (বানোয়াট) হাদীসের মধ্যে পরিগণিত। তা সত্ত্বেও অর্থগত দিক দিয়ে এটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কার সন্দেহ থাকতে পারে? (সীরাতে 'আয়িশা (রা)-১৭৩)

আসতেন। সিদ্দীকে আকবরও (রা) নিজ গৃহে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন। সেখানে বসে তিনি অত্যন্ত বিনয় ও ভয়-বিহ্বল চিত্তে কুরআন পাক তিলাওয়াত করতেন।[৩১৬]

হযরত 'আয়িশার (রা) অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তির জন্য এ সকল পরিবেশ ও অবস্থা থেকে কোন ফায়দা লাভ না করাটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই আমরা তাঁকে সূরা 'আল-কামার'-এর ৩য় আয়াত–

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ -

সম্পর্কে বলতে শুনি ঃ

لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلْعَمَ بِمَكَّةَ وَإِنِّى لَجَارِيَةٌ الْعَبُ

–আয়াতটি মক্কায় মুহাম্মাদের (সা) উপর নাযিল হয়। আমি তখন একটি ছোট্ট মেয়ে, খেলা করি।[৩১৭]

ইফ্‌ক (বানোয়াট দোষারোপ)-এর ঘটনা যখন ঘটে তখন হযরত 'আয়িশার (রা) বয়স ১৩/১৪ বছর হবে। তখন পর্যন্ত কুরআনের খুব বেশী অংশ হিফ্‌জ করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ[৩১৮]

أَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَثِيْرًا -

–সেই সময় আমি একটি কম বয়সী মেয়ে, খুব বেশী কুরআন পড়িনি।' কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনই কুরআনের উদ্ধৃতি পেশ করতেন।

আবূ ইউনুস নামে হযরত 'আয়িশার (রা) একটি দাস ছিল। সে লেখাপড়া জানতো। তিনি এই আবু ইউনুসকে দিয়ে নিজের জন্য কুরআন লিখিয়েছিলেন।[৩১৯]

অনারবদের সাথে মেলামেশার কারণে কুরআন পাঠে তারতম্য সবচেয়ে বেশী দেখা দেয় ইরাকে।

একবার ইরাক থেকে এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা করতে আসে। সে বলে, উম্মুল মুমিনীন! আমাকে আপনার কুরআনটি একটু দেখান। হযরত 'আয়িশা (রা) কারণ জানতে চাইলে সে বললো, আমাদের ওখানে লোকেরা এখনো পর্যন্ত কুরআন পাঠে কোন ক্রমধারা অনুসরণ করেনা। আমি চাই, আমার কুরআনটি আপনার কুরআনের অনুরূপ সাজিয়ে নিই। তিনি বললেন, সূরাসমূহের বিন্যাস আগে-পিছে হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তারপর নিজের কুরআনটি বের করে প্রত্যেক সূরার আয়াতসমূহ প্রথম থেকে পাঠ করে লিখিয়ে দেন।[৩২০]

---

৩১৬. সহীহ আল-বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ
৩১৭. প্রাগুক্ত ঃ তাফসীর সূরা আল-কামার; বাবু তা'লীফ আল-কুরআন
৩১৮. প্রাগুক্ত ঃ আল-ইফ্‌ক
৩১৯. মুসনাদ ঃ ৬/৭৩
৩২০. সহীহ আল-বুখারী ঃ বাবু জাম'ইল কুরআন; বাবু তা'লীফ আল-কুরআন

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বৈবাহিক জীবনে হযরত 'আয়িশার অভ্যাস ছিল, যদি কোন আয়াতের অর্থ বোধগম্য না হতো, স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহর (রা) নিকট বহু আয়াত সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নির্দেশ ছিল ঃ[৩২১]

"وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ" -

–হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে।

তাঁরা এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ যোগ্যতা ও সাধ্যমত 'আমল করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাজ্জুদের নামাযে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে এবং বিনয় ও বিনম্র চিত্তে কুরআনের বড় বড় সূরা তিলাওয়াত করতেন। সেইসব নামাযে হযরত 'আয়িশাও (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পিছনে ইকতাদা করতেন।[৩২২] একমাত্র হযরত 'আয়িশা (রা) ছাড়া আর কোন বেগমের বিছানায় কুরআনের নুযূল হয়নি। এমতাস্থায় নাযিলকৃত আয়াতের প্রথম ধ্বনিটি তাঁর কানেই যেত। তিনি বলছেন ঃ 'সূরা আল-বাকারা ও সূরা আন-নিসা যখন নাযিল হয় তখন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছেই ছিলাম।'[৩২৩]

মোটকথা, এ সকল পরিবেশ ও অবস্থার কারণে হযরত 'আয়িশা (রা) কুরআনের প্রতিটি আয়াতের পাঠ পদ্ধতি, ভাব ও তাৎপর্য এবং হুকুম-আহকাম বের করার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। এ কারণে, কোন বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে সর্বপ্রথম তিনি কুরআন পাকের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। আকায়েদ, ফিকাহ, আহকাম ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সা) সীরাত ও আখলাক– যা মূলত ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত, সবকিছুই তিনি কুরআন পাক দ্বারা বুঝার চেষ্টা করতেন। একবার কিছু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলো। তারা বললো ঃ উম্মুল মুমিনীন! আপনি আমাদের কাছে রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু আখলাকের কথা বর্ণনা করুন! তিনি বললেন ঃ তোমরা কি কুরআন পড় না? তাঁর আখলাক হলো আল-কুরআন। তারা আবার প্রশ্ন করলো ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) রাত্রিকালীন ইবাদাতের পদ্ধতি কেমন ছিল? বললেন ঃ তোমরা কি সূরা 'মুয্যাম্মিল' পড়নি?[৩২৪]

সহীহ সনদে সাহাবায়ে কিরাম থেকে কুরআন কারীমের তাফসীর খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে হযরত 'আয়িশার (রা) তাফসীরমূলক বর্ণনা একেবারে কম নয়। এখানে তার কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

---

৩২১. সূরা আল-আহযাব-৩৪
৩২২. মুসনাদ-৬/৯২
৩২৩. সহীহ আল-বুখারী ঃ বাবু তা'লীফ আল-কুরআন
৩২৪. আবূ দাউদ ঃ কিয়ামুল লাইল; মুসনাদ-৬/৫৪

সাফা ও মারওয়ার পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো হজ্জের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে নিম্নের আয়াতটি এসেছে ঃ[৩২৫]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ - فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا"

–নি ঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ তা'য়ালার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বাঘরে হজ্জ বা উমরা করে, তাদের পক্ষে এ দুইটির তাওয়াফ করাতে কোন দোষ নেই।

একদিন 'উরওয়া বললেন ঃ খালাআম্মা! এই আয়াতের অর্থ তো এটাই যে, কেউ যদি সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ না করে তা হলেও কোন দোষ নেই। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ ভাগ্নে! তুমি ঠিক বলোনি। যদি আয়াতটির অর্থ তাই হতো যা তুমি বুঝেছো, তাহলে আল্লাহ এভাবে বলতেন ঃ

لَا جُنَاحَ أَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا -

–অর্থাৎ ওদের তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই। মূলত আয়াতটি আনসারদের শানে নাযিল হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলাম-পূর্ব জীবনে 'মানাত' দেবীর উপাসনা করতো। মানাতের মূর্তি ছিল কুদাইদ-এর কাছে 'মুশাল্লাল' পাহাড়ে। এ কারণে তারা সাফা-মারওয়ার তাওয়াফকে খারাপ মনে করতো। ইসলাম গ্রহণের পর তারা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করে, ইসলামের পূর্বে আমরা এমন করতাম, এখন এর বিধান কি? এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ কর, এতে দোষের কিছু নেই। এরপর তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করেছেন। এখন তা ত্যাগ করার অধিকার কারো নেই।[৩২৬]

হযরত 'আয়িশার (রা) এই তাফসীর দ্বারা যে মূলনীতিটা বেরিয়ে আসে তা হলো, কুরআন বুঝতে হলে আরবদের বাকবিধি ও ব্যবহৃত শব্দের অর্থের ভিত্তিতে বুঝতে হবে।

সূরা ইউসূফের ১১০তম আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا"

–অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং লোকে ভাবলো যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসলো।

হযরত 'উরওয়া হযরত 'আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করলেন– كُذِبُوْا

---

৩২৫. সূরা আল-বাকারা-১৫৮

৩২৬. সহীহ আল-বুখারী ঃ তাফসীর সূরা আল-বাকারা; বাবু উজুর আস-সাফা ওয়া আল-মারওয়া

(অর্থাৎ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) হবে, না كُذِّبُوْا (অর্থাৎ তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে) হবে? 'আয়িশা (রা) বললেন– كُذِّبُوْا (মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে) হবে। 'উরওয়া বললেন ঃ রাসূলগণের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং তাঁদের স্বজাতির লোকেরা তাঁদেরকে নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা বলেছে তখন ظَنُّوْا অর্থাৎ তাঁরা ধারণা বা অনুমান করলো– কথাটির তাৎপর্য কি? একারণে كُذِبُوْا (তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে) হওয়াই শুদ্ধ হবে।[৩২৭] হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ মা'য়াজ আলাহ! আল্লাহর নবী-রাসূলগণ কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করতে পারেন যে, তাদেরকে সাহায্যের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে? হযরত 'উরওয়া তখন জানতে চাইলেন ঃ তাহলে আয়াতটির অর্থ কি হবে? বললেন ঃ কথাটি বলা হয়েছে রাসূলদের অনুসারীদের সম্পর্কে। যখন তারা ঈমান আনলো, তাঁদের নবুওয়াতকে সত্য বলে স্বীকার করলো তখন স্বজাতির লোকেরা তাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালালো। সেই সময় আল্লাহর সাহায্য আসতে বিলম্ব হচ্ছে বলে তারা এরূপ মনে করলো। এমন কি রাসূলগণ স্বজাতির অস্বীকারকারীদের ঈমানের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেলেন। তাঁদের ধারণা হলো আল্লাহর সাহায্যের এই বিলম্বের কারণে ঈমানদারগণ আমাদের মিথ্যাবাদী বলে না দেয়। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহর সাহায্য এসে যায়।[৩২৮]

স্ত্রীর যদি স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে সে ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ[৩২৯]

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْإِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ -

–কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে কোন দোষ নেই, এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই শ্রেয়।

অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য আপোষ-মীমাংসা করে নেওয়া তো একটি সাধারণ ব্যাপার। এর জন্য আল্লাহ পাকের এক বিশেষ হুকুম নাযিলের কি প্রয়োজন ছিল? হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, এ আয়াত সেই স্ত্রীর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যার স্বামী তার কাছে তেমন আসে না। অথবা স্ত্রীর বয়স বেশী হওয়ার কারণে স্বামীকে তৃপ্ত করতে সক্ষম নয়। এমন বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী যদি তালাক নিতে না চায় এবং স্ত্রী অবস্থায় থেকে স্বামীর নিকট প্রাপ্য নিজের অধিকার ছেড়ে দেয়, তাহলে এমন আপোষ-নিষ্পত্তি খারাপ নয়। বরং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে তা উত্তম।[৩৩০]

---

৩২৭. প্রসিদ্ধ কিরআত (পাঠ) كُذِبُوْا , হযরত ইবন আব্বাস ও (রা) এই কিরআত বর্ণনা করেছেন

৩২৮. সহীহ বুখারী ঃ তাফসীর সূরা ইউসুফ

৩২৯. সূরা আন-নিসা-১২৮

৩৩০. মুসনাদ-৫/২০৬

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-বাকারার ২৩৮তম আয়াতে বলেছেন ঃ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -

–তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে।

'মধ্যবর্তী নামায' বলতে কি বুঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) ও হযরত 'উসামার (রা) মতে, মধ্যবর্তী নামায হলো জুহরের নামায। কোন কোন সাহাবীর মতে ফজরের নামায। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামায বুঝানো হয়েছে। তিনি নিজের এই তাফসীরের উপর এতখানি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, নিজের মাসহাফখানির পার্শ্বটীকায় وصلوة العصر কথাটি লিখিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত 'আয়িশার (রা) দাস আবু ইউনুস বলেন, তিনি আমাকে একখানি কুরআন লেখার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছবে, আমাকে জানাবে। আমি যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম, তখন তিনি والصلوة الوسطى -এর পরে وصلوة العصر কথাটি লেখান।

তারপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে এমনই শুনেছি।[৩৩১]

মূলত صلوة العصر কুরআনের আয়াত নয়, বরং والصلوة الوسطى -এর তাফসীর।

সূরা আল-বাকারার ২৮৪তম আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَإِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ"

–তোমরা তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মানুষের অন্তরে মুহূর্তের জন্য যে সকল ভাব ও কল্পনার উদয় হয়, আল্লাহ তার সবকিছুরই হিসাব নিবেন। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যে সকল ওস্‌ওসা এবং কল্পনার উদয় হয় তারও পাকড়াও যদি আল্লাহ করেন তাহলে মানুষের পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব হবে। হযরত আলী (রা) ও ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতের হুকুম একই সূরার ২৮৬তম আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে।[৩৩২] আয়াতটির অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে।'

---

৩৩১. তিরমিজী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর; সহীহ বুখারী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর

৩৩২. তিরমিজী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমারও (রা) উপরোক্ত মত পোষণ করেন।[৩৩৩] কোন এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট উপরোক্ত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করে। সাথে সাথে সে সূরা আন-নিসার ১২৩তম আয়াতটি পেশ করে। আয়াতটির অর্থ ঃ 'যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে'।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য ছিল, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত বান্দা কিভাবে লাভ করবে এবং সে মুক্তির আশাই বা কেমন করে করবে? হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করার পর সর্বপ্রথম তুমিই আমার কাছে প্রশ্ন করেছো। আল্লাহর বাণী সত্য। তবে আল্লাহ তা'য়ালা তার বান্দাদের ছোট ছোট ভুল-ত্রুটি নানা রকম মুসীবত ও বিপদের বিনিময়ে ক্ষমা করে দেন। একজন মুমিন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় অথবা তার উপর কোন বিপদ আসে, এমন কি পকেটে কোন জিনিস রেখে ভুলে যায় এবং তা তালাশ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ে– এর সবকিছুই তার মাগফিরাত ও রহমত লাভের কারণ ও বাহানা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সোনা আগুনে পুড়ে যেমন নিখাঁদ হয়ে যায় তেমনি মুমিন ব্যক্তিও পাক-সাফ হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।[৩৩৪]

সূরা আন্-নিসার ষষ্ঠ আয়াতে ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ - وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

–যারা সচ্ছল তারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে।

এ আয়াতের নির্দেশ ইয়াতীমের ওলীদের সম্পর্কে। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, উল্লেখিত আয়াতের হুকুম নিম্নোক্ত সূরা নিসার ১০ম আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে ঃ[৩৩৫]

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا -

–যারা ইয়াতীমের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে।

কিন্তু পরবর্তী আয়াতে তো তাদের জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খায়। এ কারণে হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, যে আয়াতে খাওয়ার অনুমতি আছে সেটি সেইসব লোকদের জন্য যারা ইয়াতীমের বিষয়-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখা-শোনা করে। এমন ওলী যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার বিনিময় গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি দরিদ্র হয় তাহলে তার মর্যাদা অনুযায়ী কিছু গ্রহণ করতে পারে।[৩৩৬] মূলত হযরত 'আয়িশার (রা) এ তাফসীরের ভিত্তিতে দুইটি আয়াতের অর্থে

৩৩৩. সহীহ বুখারী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর; তাফসীর অধ্যায়
৩৩৪. তিরমিজী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর
৩৩৫. ইমাম আন-নাওয়াবী ঃ শারহু মুসলিম; কিতাবুত তাফসীর
৩৩৬. সহীহ বুখারী ঃ উক্ত আয়াতের তাফসীর; তাফসীর অধ্যায়

কোন বিরোধ থাকে না।

উপরে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মত আরো বহু আয়াতের তাফসীর হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

আল-হাদীস

রাসূলুল্লাহর (সা) বাস্তব সত্তাই হচ্ছে মূলত ইল্‌মে হাদীসের বিষয়বস্তু। এই কারণে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানও সবচেয়ে বেশী। ভাগ্যগুণে হযরত 'আয়িশা (রা) আবার এ সুযোগটি পেয়েছিলেন। হিজরাতের তিন বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিদিন তাঁর পিতার গৃহে আসতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পরে অবশ্য ছয় মাসের জন্য স্বামীর দীদার থেকে মাহরূম থাকেন। মদীনায় আসার অল্প কিছুদিন পর স্বামীর ঘরে চলে যান, তারপর থেকে আর বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁর শৈশব জীবনেই ইসলামের প্রথম পর্বটি অতিবাহিত হয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, তাঁর স্বভাবগত মেধা ও স্মৃতিশক্তি সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের মধ্যে একমাত্র হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সহঅবস্থানের ব্যাপারে হযরত 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা কয়েক মাস বেশী সময় লাভ করেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একদিকে যেমন বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অনুধাবন ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য ছিল, অন্যদিকে তেমনি সাওদা (রা) ছিলেন বয়োবৃদ্ধা। তাঁর দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়িষ্ণু হতে চলেছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের কয়েক বছর পূর্বেই তিনি স্বামী সেবায় অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। অপর দিকে হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন উঠতি বয়সের এক নারী। সেই বয়সে দিন দিন তাঁর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার উন্নতি ঘটছিল। রাসূলুল্লাহর (সা) পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেবার সুযোগ লাভ করেন। এই কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) সার্বিক অবস্থা এবং শরীয়াতের যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তাঁর অবগতি ছিল সবার চেয়ে বেশী।

হযরত সাওদা (রা) ছাড়া অন্য বেগমগণ হযরত 'আয়িশার (রা) পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ হন। যেহেতু হযরত সাওদা (রা) বার্ধক্যের কারণে নিজের বারির দিনটি হযরত 'আয়িশাকে (রা) দান করেন, তাই অন্যরা যখন প্রতি আট দিনে একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেতেন তখন হযরত 'আয়িশা (রা) পেতেন দুইদিন। আর যে মসজিদ ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা) গণশিক্ষাকেন্দ্র, সৌভাগ্যক্রমে হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরটি ছিল তারই সাথে। এই সকল কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস ও জীবনধারা সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে বেগমগণের কেউই হযরত 'আয়িশার (রা) সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেননি।

হয়রত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত বেশী যে, রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমগণ তথা সকল মহিলা সাহাবীদের শুধু নন, হাতেগোণা চার-পাঁচজন পুরুষ সাহাবী ছাড়া আর কেউই তাঁর সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত 'উমার (রা), হযরত 'উসমান (রা), হযরত আলী (রা) প্রমুখের মত বড় বড়

সাহাবীরা তাঁদের দীর্ঘ সুহবত বা সাহচর্য, তীক্ষ্ণ বোধ ও মেধা শক্তি ইত্যাদি কারণে 'আয়িশা (রা) থেকে মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক উর্ধে ছিলেন। তবে একজন স্ত্রী স্বাভাবিকভাবে স্বামী সম্পর্কে এক মাসে যতটুকু জ্ঞান লাভ করতে পারে, আত্মীয়-বন্ধুরা বহু বছরেও তা পারে না। অন্যদিকে উল্লেখিত উঁচু স্তরের সাহাবীরা রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর পরই খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীস বর্ণনার সময় ও সুযোগ খুব কমই পেয়েছেন। তারপরেও তাঁদের বর্ণিত হাদীস যা সংরক্ষিত আছে তা বিচার ও বিধি-বিধান সংক্রান্ত। সেগুলিই আমাদের ফিকাহ শাস্ত্রের ভিত্তি। মূলত হাদীস বর্ণনার মূল দায়িত্ব পালন করেছেন যাঁরা খিলাফত পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাছাড়া ঐসকল উঁচু মর্যাদার সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত কম হওয়ার আরো একটি কারণ আছে। তাঁদের যুগ ছিল পূর্ণভাবে সাহাবীদের যুগ। সে সময় একজনের অন্যজনের নিকট রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী বা কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করার খুব কমই প্রয়োজন পড়তো। সুতরাং হাদীস বর্ণনার সুযোগও হতো অতি অল্প। যাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখেননি বা রাসূলুল্লাহর (সা) যুগ লাভ করেননি সেই পরবর্তী প্রজন্ম হলেন তাবে'ঈন। মূলত তাঁদের যুগ শুরু হয় রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের বিশ-পঁচিশ বছর পরে। তাঁরাই রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। কিন্তু তখন ঐসব উঁচু স্তরের সাহাবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। অন্যদিকে অল্পবয়সী সাহাবীরা তখন জীবনের মধ্য অথবা শেষ স্তরে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরাই রাসূলুল্লাহর (সা) জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তাবে'ঈদের জানার তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। এ কারণে অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে যে সকল সাহাবীর নাম হাদীসের গ্রন্থসমূহে দেখা যায় তাঁরা প্রায় সকলে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময়ের কম বয়সী সাহাবী।

যে সকল সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এক হাজারের উর্ধে তাঁরা হলেন মাত্র সাতজন। নিম্নে তাঁদের নাম ও বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ করা হলো ঃ

১.	হযরত আবু হুরাইরাহ (রা)	৫৩৬৪
২.	হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)	২৬৬০
৩.	হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা)	২৬৩০
৪.	হযরত জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা)	২৫৪০
৫.	হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)	২৬৮৬
৬.	হযরত 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা)	২২১০
৭.	হযরত আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)	২২৭০

উপরে উল্লেখিত নামের পাশের সংখ্যা অনুযায়ী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত 'আয়িশার (রা) স্থান সপ্তম। অবশ্য এই তালিকাটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। অনেকের মতে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ছাড়া আর কেউ হযরত 'আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। তাঁদের মতে অধিক হাদীস

বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত 'আয়িশার (রা) স্থান তৃতীয়।[৩৩৭]

অধিক হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের অধিকাংশ উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) ইনতিকালের পরেও জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা আরো কিছুকাল অব্যাহত ছিল। পুরুষদের তুলনায় হযরত 'আয়িশার (রা) অতিরিক্ত কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল। যেমন তিনি ছিলেন একজন পর্দানশীন নারী। পুরুষ বর্ণনাকারীদের মত প্রতিটি মজলিসে উপস্থিত থাকতে পারতেন না এবং শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলেই যখন তখন তাঁর কাছে যেতে পারতো না। অন্যদের মত তিনি তৎকালীন ইসলামী খিলাফতের বড় বড় শহরসমূহে যাওয়ার সুযোগও পাননি। পুরুষ বর্ণনাকারীদের মত তিনি যদি সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সমর্থ হতেন তাহলে তাঁরই স্থান হতো সবার উপরে।

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা গেছে, হযরত 'আয়িশার (রা) সর্বমোট বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দুই হাজার দুইশো দশ (২২১০)। তার মধ্যে সহীহাইন-বুখারী ও মুসলিমে ২৮৬টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ১৭৪টি মুত্তাফাক আলাইহি, ৫৪টি শুধু বুখারীতে এবং ৬৯টি মুসলিমে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হিসেবে বুখারীতে সর্বমোট ২২৮টি এবং মুসলিমে ২৪৩টি হাদীস এসেছে।[৩৩৮] এছাড়া হযরত 'আয়িশার (রা) অন্য হাদীসগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সনদ সহকারে সংকলিত হয়েছে। ইমাম আহমাদের (রা) মুসনাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (মিসর) হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত সকল হাদীস সংকলিত হয়েছে।

ইসলামী উম্মার নিকট হযরত 'আয়িশার (রা) যে উঁচু মর্যাদা ও বিরাট সম্মান তা তাঁর অধিক হাদীস বর্ণনার জন্য নয়, বরং হাদীসের গভীর ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য এবং মূল ভাবধারা অনুধাবনই প্রধান কারণ। সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু তাঁরা উঁচু স্তরের ফকীহ সাহাবীদের অন্তর্গত। যাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) বাণীর মূল তাৎপর্য অনুধাবন না করে যা কিছু শুনেছেন তাই বর্ণনা করে দিয়েছেন, তাঁদের বর্ণনার সংখ্যাই বেশী। আমরা দেখতে পাই যে সকল সাহাবী বেশী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও হযরত 'আয়িশা (রা) ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কথিত আছে শরীয়াতের যাবতীয় আহকামের এক চতুর্থাংশ তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই আল্লামা জাহাবী বলেছেন ঃ[৩৩৯]

كَانَ فُقَهَاءُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلْعَمَ يَرْجِعُوْنَ اِلَيْهَا تَفْقَهُ بِهَا جَمَاعَةٌ -

–রাসূলুল্লাহর (সা) ফকীহ (গভীর জ্ঞানসম্পন্ন) সাহাবীরা তাঁর কাছ থেকে জানতেন।

---

৩৩৭. ইমাম আস-সাখাবী ঃ ফাতহুল মুগীস শারহু আলফিয়াতিল হাদীস, পৃ. ৩৭১। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলায়মান নাদবী তাঁর 'সীরাতে 'আয়িশা (রা)' গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় তালিকাটি উল্লেখ করেছেন

৩৩৮. নিয়াম ফতেহপুরী ঃ সাহারিয়াত, পৃ. ৬৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৩৯

৩৩৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৭

একদল লোক তাঁর নিকট থেকেই দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

বর্ণনার আধিক্যের সাথে সাথে দ্বীনের তাৎপর্যের গভীর উপলব্ধি এবং হুকুম-আহকাম বের করার প্রবল এক ক্ষমতা হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যে ছিল। তাঁর বর্ণনাসমূহের এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, আহকাম ও ঘটনাবলী বর্ণনার সাথে সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কারণও বলে দিয়েছেন। সেই বিশেষ হুকুমটি যে কারণে দান করা হয়েছে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এখানে অন্যান্য রাবীর (বর্ণনাকারী) বর্ণনার সাথে একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

জুম'আর দিন গোসল করা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে[৩৪০] হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা), হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) ও হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা এসেছে। এখানে তিনজনের বর্ণনার নমুনা দেয়া হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন ঃ

سمعت رسول الله صلعم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل -

–আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, তোমাদের যে ব্যক্তি জুম'আয় আসে, সে যেন অবশ্যই গোসল করে আসে।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

ان رسول الله صلعم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -

–রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তির উপর জুম'আর দিনের গোসল ওয়াজিব।

একই বিষয়ে হযরত আয়িশার (রা) বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

قالت كان الناس ينتابون من منازلهم والعو الى فيأتون فى الغبار تصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندى فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا-

–মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে এবং মদীনার বাইরের বসতি থেকে আসতো। তারা ধুলো-বালির মধ্য দিয়ে আসতো। এতে তারা ঘামে ও ধুলো-বালিতে একাকার হয়ে যেত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট অবস্থান করছেন, এমন সময় তাদেরই এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তখন নবী (সা) বলেন ঃ তোমরা যদি এই দিনটিতে গোসল করতে তাহলে ভালো হতো।

---

৩৪০. সহীহ আল-বুখারী ঃ কিতাবুল জুম'আ

হযরত আয়িশার (রা) অন্য একটি বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

كان الناس مهنة انفسهم كانوا اذاراحوا الى الجمعة راحوا فى هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم -

–লোকেরা নিজ হাতে কাজ করতো। যখন তারা জুম'আর নামাযে যেত তখন সেই অবস্থায় চলে যেত। তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যদি গোসল করতে তাহলে ভালো হতো।

আমরা উপরের একই বিষয়ের তিনটি বর্ণনা লক্ষ্য করলাম। কি কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) জুম'আর দিনে গোসলের নির্দেশ দেন, তা হযরত আয়িশার (রা) স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন– যা অন্য দুইটি বর্ণনায় নেই।

একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) নির্দেশ দিলেন, কুরবানীর গোশ্‌ত তিন দিনের মধ্যে খেয়ে শেষ করতে হবে। তিন দিনের বেশী রাখা যাবেনা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) ও হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) সহ আরো অনেক সাহাবী এই নির্দেশকে চিরস্থায়ী বলে মনে করতেন।[৩৪১] তাঁদের অনেকে এ ধরনের কথাই লোকদের বলতেন। কিন্তু হযরত 'আয়িশা (রা) এটাকে চিরস্থায়ী বা অকাট্য নির্দেশ বলে মনে করতেন না। তিনি এটাকে একটা সাময়িক নির্দেশ বলে বিশ্বাস করতেন। বিষয়টি তিনি বর্ণনা করছেন এভাবে ঃ [৩৪২]

الضحية كنا نملح منها فتقدم به الى النبى صلعم بالمدينة فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم -

–আমরা কুরবানীর গোশত লবণ দিয়ে রেখে দিতাম। মদীনায় আমরা ঐ গোশত রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে খাওয়ার জন্য উপস্থাপন করতাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা এই গোশত তিনদিন ছাড়া খাবে না। এটা কোন চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বরং তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন এই গোশত থেকে কিছু অন্যদেরকেও খেতে দেয়।

হযরত 'আয়িশার (রা) অন্য একটি হাদীস যা ইমাম তিরমিজী বর্ণনা করেছেন, তাতে তিনি এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত কারণ বলে দিয়েছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ উম্মুল মুমিনীন! কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খাওয়া কি নিষেধ? তিনি বললেন ঃ

لاولكن قل من كان يضحى من الناس فاحب ان يطعم من لم يكن يضحى -

---

৩৪১. বুখারী ও তিরমিজী ঃ কিতাবুল আদাহী

৩৪২. বুখারী ঃ কিতাবুল আদাহী

–না। তবে সেই সময় কুরবানী করার লোক কম ছিল। এজন্য তিনি চান, যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদেরকেও যেন ঐ গোশত খেতে দেয়।

ইমাম আহমাদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ ৩৪৩

لا ولكن لم يكن يضحى منهم الا قليل ففعل ذالك ليطعم من ضحى من لم يضح -

–এটা সঠিক নয় যে, কুরবানীর গোশত তিন দিন পর খাওয়া যাবে না। বরং সেই সময় খুব কম লোক কুরবানী করতে পারতো। এ কারণে তিনি এই নির্দেশ দেন যে, যারা কুরবানী করবে তারা যেন তাদেরকে গোশত খেতে দেয় যারা কুরবানী করতে পারেনি।

ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি একটি তথ্যের আকারে বর্ণনা করেছেন। যেমন, একবছর মদীনার আশে-পাশে এবং গ্রাম এলাকায় অভাব দেখা দেয়। সেবার তিনি এই হুকুম দেন। পরের বছর যখন অভাব থাকলো না তখন ঐ হুকুম রহিত করেন। হযরত সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা আছে।৩৪৪

কা'বা ঘরের এক দিকের দেওয়ালের পরে কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া আছে, যাকে 'হাতীম' বলে। তাওয়াফের সময় 'হাতীমকে' বেষ্টনীর মধ্যে নিয়েই তাওয়াফ করতে হয়। মানুষের অন্তরে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, যেটি কা'বার অংশ নয়, সেটিও তাওয়াফ করতে হবে কেন? হয়তো অনেক সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চেয়ে থাকবেন। কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁদের থেকে তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমরা হযরত আয়িশার (রা) বর্ণনা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাই। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দেওয়ালও কি কা'বা ঘরের অন্তর্গত? বললেন ঃ হাঁ! বললাম! তাহলে নির্মাণের সময় লোকেরা এটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলনা কেন? বললেন ঃ তোমার স্বজাতির হাতে পুঁজি ছিল না। তাই এটুকু বাদ দেয়। আবার প্রশ্ন করলাম! তা কা'বার দরজা এত উঁচুতে কেন? বললেন ঃ এজন্য যে, সে যাকে ইচ্ছা ভিতরে যেতে দেবে, আর যাকে ইচ্ছা বাধা দেবে।

হযরত ইবন 'উমার (রা) বলেন, 'আয়িশার (রা) বর্ণনা সঠিক হলে বুঝা যায় রাসূল (সা) সেদিকের স্তম্ভ দুইটি এই কারণে চুমো দেননি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাসূল (সা) যখন জানতেন যে, কা'বা ঘর তার মূলভিত্তির উপর সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নেই, তখন হযরত ইবরাহীমের (আ) শরীয়াতের পুনরুজ্জীবনকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ছিলো এটাকে ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণ করা। বিষয়টি ইবরাহীমের (আ) উত্তরাধিকারী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) জানা থাকার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাই তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন ঃ আয়িশা! তোমার কাওম যদি তাদের কুফরীর সময়কালের

---

৩৪৩. মুসনাদ ঃ ৬/১০২

৩৪৪. সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুজ জাবায়িহ,

নিকটবর্তী না হতো তাহলে আমি কা'বাকে ভেঙ্গে আবার ইবরাহীমের মূল ভিত্তির উপর নির্মাণ করাতাম।[৩৪৫] যেহেতু সাধারণ আরববাসী সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে, এমতাবস্থায় নতুন করে কা'বা গৃহ নির্মাণ করলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারতো, এই আশংকায় তা করা হয়নি। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, অধিকতর কোন কল্যাণের ভিত্তিতে যদি শরীয়াতের কোন কাজের বাস্তবায়নে বিলম্ব করা হয় তাহলে তা তিরস্কারযোগ্য হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে সেই কাজটির বাস্তবায়ন যদি শরীয়াত তাৎক্ষণিকভাবে দাবী না করে।

হযরত 'আয়িশার (রা) এই বর্ণনার ভিত্তিতে তাঁর ভাগ্নে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) স্বীয় খিলাফতকালে কা'বা ঘর বাড়িয়ে ইবরাহীমের (আ) মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ইবন যুবাইরের শাহাদাতের পর খলীফা আবদুল মালিক যখন পুনরায় মক্কার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি এ ধারণার ভিত্তিতে যে, আবদুল্লাহ (রা) একাজ তাঁর নিজের ইজতিহাদ থেকে করেছেন, ভেঙ্গে ফেলেন এবং পূর্বের মত তৈরী করেন। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন 'আবদুল্লাহ (রা) নিজের ইজতিহাদ থেকে নয়; বরং উম্মুল মুমিনীনের এ বর্ণনার ভিত্তিতে করেছেন, তখন তিনি নিজের এই কাজের জন্য ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন।[৩৪৬]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে তা নিয়ে বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু বকর (রা) তখন বলেন, নবীরা যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেখানেই দাফন করা হয়। এ কারণে রাসূলে কারীমকে (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে, যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, দাফন করা হয়। কিন্তু এর আসল কারণ হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ[৩৪৭]

قال رسول الله صلعم فى مرضه الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد، لو لا ذلك ابرز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدا،

–রাসূলুল্লাহ (সা) অন্তিম রোগশয্যায় বলেন, আল্লাহ ইহুদী ও নাসারাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে উপাসনালয় বানিয়ে নিয়েছে। আয়িশা (রা) বলেন, যদি এমন আশঙ্কা না থাকতো তাহলে রাসূলুল্লাহর (সা) কবরখানা মাঠেই হতো। কিন্তু তিনি কবরকে মসজিদ বানানোর ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করেন।

মূলত ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) এই শঙ্কা প্রকাশের কারণেই তাঁকে শেষ নি ঃশ্বাস ত্যাগের স্থলেই দাফন করা হয়।

---

৩৪৫. প্রাগুক্ত ঃ বাবু নাকদ আল-কা'বা। বিভিন্ন গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে

৩৪৬. প্রাগুক্ত ঃ নাকদ আল-কাবা; মুসনাদ ৬/২৪৭, ২৫৩

৩৪৭. বুখারী ঃ কিতাবুল জানায়িয; মুসনাদ ৬/১২১

এমনি ভাবে হিজরাতের একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যাও বুখারী বর্ণিত 'আয়িশার (রা) একটি হাদীস থেকে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে হিজরাত বলতে মানুষ বুঝতো নিজের জন্মস্থান ত্যাগ করে মদীনায় এসে বসবাস করা। কিন্তু তিনি বলেন, এখন আর হিজরাত নেই। হিজরাত তো তখন ছিল যখন মানুষ নিজেদের দ্বীন-ধর্মকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট ছুটে আসতো। এখন তো আর সে অবস্থা নেই। সুতরাং প্রকৃত হিজরাতও হবে না। একারণে ইবন উমার (রা) বলতেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই।

মুহাদ্দিসীন ও জারাহ ও তা'দীল (সমালোচনা ও মূল্যায়ন) শাস্ত্রবিদদের মতে হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি তুলনামূলকভাবে খুব কম। এর বিশেষ কারণও আছে। সাধারণ সাহাবীরা হয়তো একবার রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কথা শুনতেন বা কোন কাজ করতে দেখতেন, তারপর হুবহু সেই কথা বা কাজের বর্ণনা অন্যদের নিকট দিতেন। এক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশার (রা) রীতি ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন কথা বা ঘটনা ভালোমত বুঝতে পারতেন, অন্যের নিকট বর্ণনা করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন কথা বা আচরণ বুঝতে অক্ষম হলে তিনি বারবার প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর এ ধরনের বহু জিজ্ঞাসা বর্ণিত হয়েছে।[৩৪৮] কিন্তু অন্যরা এ সুযোগ খুব কমই পেতেন।

যে সকল হাদীস তিনি সরাসরি শোনেননি, বরং অন্যদের মাধ্যমে শুনেছেন, সেগুলির বর্ণনার ক্ষেত্রে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। চূড়ান্ত রকমের যাচাই-বাছাই, বিচার-বিশ্লেষণ ও খোঁজ-খবর নেওয়ার পর পূর্ণ আস্থা হলে তখন বর্ণনা করতেন। একবার প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল আ'স (রা) তাঁকে একটি হাদীস শোনালেন। একবছর পর তিনি যখন আসলেন তখন হযরত 'আয়িশা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট পাঠালেন সেই হাদীসটি আবার শুনে আসার জন্য। আবদুল্লাহ (রা) কোন রকম কম-বেশী ছাড়াই পূর্বের মত হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। লোকটি ফিরে এসে হাদীসটি আয়িশাকে (রা) শোনান। তিনি তখন মন্তব্য করেন, আল্লাহর কসম, ইবন 'আমরের কথা স্মরণ আছে।[৩৪৯]

এই মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি যদি কারও নিকট থেকে কোন বর্ণনা গ্রহণ করতেন, আর কেউ যদি সেটি শোনার ইচ্ছা নিয়ে তাঁর কাছে আসতো, তাঁকে মূল বর্ণনাকারীর নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আসল উদ্দেশ্য হতো হাদীসটির বর্ণনা সূত্রের মাঝখানের মাধ্যম যতখানি সম্ভব কমিয়ে দেওয়া এবং 'আলী সনদে রূপান্তরিত করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আসরের নামায আদায়ের পর ঘরে এসে সুন্নাত নামায আদায় করতেন। অথচ চূড়ান্ত নির্দেশ ছিল আসরের পরে আর কোন নামায নেই। কিছু লোক হযরত

---

৩৪৮. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল ইলম

৩৪৯. প্রাগুক্ত ঃ ওয়াফদু বনী তামীম

'আয়িশার (রা) নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠালো একথা জানার জন্য যে, তাঁর সূত্রে যে এই হাদীস বর্ণিত হচ্ছে, এর বাস্তবতা কতটুকু? তিনি বললেন, তোমরা উম্মু সালামার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। হাদীসটির আসল রাবী বা বর্ণনাকারী তিনিই।[৩৫০] আর একবার এক ব্যক্তি তাঁকে মোযার উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলেন ঃ আলীর (রা) কাছে যাও। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরে সংগে থাকতেন।[৩৫১]

হযরত 'আয়িশা (রা) নিজের বর্ণনাসমূহকে যে কোন রকমের ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেমন মুক্ত রেখেছেন, তেমনিভাবে বহুক্ষেত্রে অন্যদের বর্ণনাসমূহও সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমকালীনদের বর্ণনাসমূহের অতি তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতিও অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করতেন এবং সংশোধন করে দিতেন। মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় যা 'ইদরাক' নামে পরিচিত।

হযরত 'আয়িশা (রা) বিশ্বাস করতেন, কোন বর্ণনা আল্লাহর কালামের বিরোধী হলে তা সঠিক নয়। পরবর্তীকালে হাদীস শাস্ত্র বিশারদরা এটাকে হাদীস যাচাই-বাছায়ের একটি অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে হযরত 'আয়িশার (রা) অন্যদের অনেক বর্ণনা সঠিক বলে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আর নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সেই সব বর্ণনার প্রকৃত রহস্য ও ভাব বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এবং আরও কতিপয় সাহাবী বর্ণনা করেছেন ঃ

ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه -

অর্থাৎ, পরিবারের লোকদের কান্নার জন্য মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।'

হযরত আয়িশাকে (রা) যখন এই বর্ণনাটি শোনানো হলো তখন তিনি তা মানতে অস্বীকার করলেন। বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এমন কথা কক্ষনো বলেননি। ঘটনা হলো, একদিন রাসূল (সা) এক ইহুদীর লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন তার আত্মীয় স্বজনরা চিল্লাপাল্লা ও মাতম করতে আরম্ভ করেছে। তখন তিনি বলেন ঃ এরা কান্নাকাটি করছে আর তার উপর শাস্তি হচ্ছে। আয়িশার (রা) বক্তব্যের মর্ম হলো, শাস্তির কারণ কান্নাকাটি করা নয়। অর্থাৎ এরা মাতম করছে, আর ওদিকে মৃতব্যক্তির উপর অতীত কৃতকর্মের জন্য শাস্তি হচ্ছে। কারণ, কান্নাকাটি করা তো অন্যের কর্ম। আর অন্যের কর্মফল মৃত ব্যক্তি কেন ভোগ করবে? তাই তিনি বলেন, তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেছেন ঃ[৩৫২] وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।

---

৩৫০. প্রাগুক্ত ঃ বাবু মাইউজকারু মিন জাম্মির রায়

৩৫১. প্রাগুক্ত ঃ আল-মাসহ 'আলাল খুফফাইন

৩৫২. সূরা আল-আন'আম-১৬৪; সূরা বনী ইসরাইল-১৫

বর্ণনাকারী ইবন আবী মুলাইকা বলেন, হযরত ইবন উমার (রা) হযরত 'আয়িশার (রা) এমন বর্ণনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা যখন শুনলেন তখন কোন উত্তর দিতে পারেননি।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থের 'আল-জানায়িয' অধ্যায়ে পৃথক একটি অনুচ্ছেদে হযরত 'আয়িশার (রা) ও ইবন উমারের (রা) বর্ণনা দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, কান্নাকাটি ও মাতম করা যদি মৃত ব্যক্তির জীবিত অবস্থার অভ্যাস থেকে থাকে, আর সে যদি জীবদ্দশায় আপনজনদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকার কথা না বলে থাকে তাহলে তাদের মাতমের আযাব তার উপর হবে। কারণ, তাদের শিক্ষা–দীক্ষার দায়িত্ব সে তাঁর জীবদ্দশায় পালন করেনি।[৩৫৩] আল্লাহ বলেন ঃ[৩৫৪]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْ اَنْفُسِكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا -

–হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

আর জীবদ্দশায় পরিবার-পরিজনকে যথাযথ শিক্ষাদান সত্ত্বেও যদি তারা মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করতে থাকে তা হলে সে ক্ষেত্রে 'আয়িশার (রা) মতই সঠিক। কারণ আল্লাহ তো বলেছেন, 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।' তিনি আরো বলেছেন ঃ[৩৫৫]

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -

–কেউ যদি তার গুরুভার বহন করতে অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না– যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়।

প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুবারাকও ইমাম বুখারীর মত বলেছেন।[৩৫৬] তবে কেউ কেউ ইমাম বুখারীর সামঞ্জস্য চেষ্টার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন এ ভাবে– কেউ যদি জীবদ্দশায় পরিবার-পরিজনের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব পালন না করে থাকে, তাহলে মৃত্যুর পর সে দায়িত্ব পালন না করার অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে। জীবিতদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে কেন? মুজতাহিদদের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু হানীফা (র) এই মাসয়ালায় হযরত 'আয়িশার (রা) মতের অনুসারী।[৩৫৭]

---

৩৫৩. সহীহ বুখারী ও মুসলিম ঃ কিতাবুল জানায়িয

৩৫৪. সূরা আত-তাহরীম-১০

৩৫৫. সূরা ফাতির-১৮

৩৫৬. জামে তিরমিজী-কিতাবুল জানায়িয

৩৫৭. উল্লেখ থাকে যে, প্রিয়জনদের মৃত্যুতে স্বাভাবিক কান্না পেলে, চোখ থেকে পানি ঝরলে তাতে কোন পাপ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও পুত্র হযরত কাসিমের মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন। মূলতঃ চিল্লাচিল্লি করা, মাতম করা, দেহের পোশাক-পরিচ্ছদ টেনে ছিঁড়ে ফেলা, বুকে-মুখে কিল-থাপ্পড় মারা, মুখে শরীয়াত বিরোধী কথা উচ্চারণ করা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কান্নারও নানা প্রকার আছে। যে কান্নায় শরীয়াত বিরোধী আচরণ প্রকাশ পায়, তা নিষিদ্ধ। অন্যথায় স্বাভাবিক কান্না অথবা চোখ থেকে পানি পড়াতে কোন নিষেধ নেই এবং তাতে কোন পাপও নেই

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে দেখেছেন। হযরত মাসরূক (র) হযরত 'আয়িশাকে (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ আম্মা! মুহাম্মাদ (সা) কি আল্লাহকে দেখেছেন? 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তুমি এমন একটি কথা বলেছো যা শুনে আমার দেহের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহকে দেখেছেন সে মিথ্যা বলে। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ[৩৫৮]

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَاللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ-

–দৃষ্টিসমূহ তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে বেষ্টন করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ।

তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ[৩৫৯]

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلًا -

–কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ঃ কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত পাঠাবেন।

আরো কিছু হাদীসে হযরত 'আয়িশার (রা) বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমে সংকলিত একটি হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (সা) বলেছেন, তিনি তো নূর বা জ্যোতি। তাঁকে আমি কিভাবে দেখতে পারি।

মুত'আ যা একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত বিয়ে জাহিলী যুগ এবং ইসলামের সূচনাকাল থেকে ৭ম হিজরী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। খায়বার বিজয়ের সময় এ জাতীয় বিয়ে হারাম ঘোষিত হয়। এরপর হযরত ইবন আব্বাস (রা) সহ আরো কিছু লোক এই বিয়ে জায়েয আছে বলে মনে করতেন। কিন্তু সাহাবীদের গরিষ্ঠ অংশ হারাম বলে বিশ্বাস করতেন। হযরত আয়িশার (রা) এক ছাত্র একদিন এই মুত'আ বিয়ের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। হযরত আয়িশা (রা) তার জবাব হাদীস দ্বারা দেননি। তিনি বলেন, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব আছে। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ[৩৬০]

وَالَّذِيْنَ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ -

–এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত

---

৩৫৮. সূরা আল-আন'আম-১০৩

৩৫৯. সূরা আশ-শুরা-৫১। ইমাম বুখারী সূরা আন নাজমের তাফসীরে হযরত আয়িশার (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ঃ কিতাবুত তাফসীর

৩৬০. সূরা আল-মুমিনূন-৫-৬

দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।

এ কারণে এই দুই পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতি জায়েয নেই। উল্লেখ্য যে, মুত'আর মাধ্যমে লাভ করা নারী স্ত্রী বা দাসী কোনটিই নয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, অবৈধ ছেলে তিনজনের মধ্যে (পিতা-মাতা ও সন্তান) নিকৃষ্টতর।

একথা হযরত 'আয়িশার (রা) কানে গেলে বলেন, এ সঠিক নয়। ঘটনা হলো, একজন মুনাফিক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দামন্দ করতো। লোকেরা একদিন বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি জারজ সন্তানও। তখন রাসূল (সা) মন্তব্য করেন ঃ সে তিনজনের মধ্যে অধিকতর নিকৃষ্ট। অর্থাৎ তার মা-বাবা তো শুধু অপকর্ম করেছে ঃ কিন্তু তারা আল্লাহর রাসূলের নিন্দামন্দ করেনি। আর তাদের সেই অপকর্মের ফসল এই সন্তান আল্লাহর রাসূলের নিন্দামন্দ করে। সুতরাং সে তাদের থেকেও খারাপ। 'আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এই মন্তব্য ছিল এক বিশেষ ঘটনার জন্য, সবার জন্য নয়। কারণ আল্লাহ তো বলেছেন ঃ 'কেউ অপরের বোঝা বহন করবেনা।' অর্থাৎ অপরাধ মা-বাবার। সন্তান তার জন্য দায়ী হবে কেন?

বদর যুদ্ধে যে সকল কাফির নিহত হয়, তাদেরকে বদরেই একত্রে মাটি চাপা দেওয়া হয়। রাসূল (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ[৩৬১]

فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا -

–তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছো? সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন? ইবন উমার পিতা 'উমার (রা) থেকে এবং আনাস ইবন মালিক আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করে[illegible]বাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لَا يُجِيْبُوْنَ -

তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা। তবে তারা জবাব দিতে পারে না।

হযরত আয়িশাকে (রা) যখন এই বর্ণনার কথা বলা হলো, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একথা নয়, বরং এই বলেছেন ঃ

إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْآنَ أَنْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ -

–এখন তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছে যে, আমি তাদেরকে যা কিছু বলতাম তা সবই সত্য।

---

৩৬১. সূরা আল-আ'রাফ-৪৪

তারপর হযরত আয়িশা (রা) কুরআনের এই আয়াত দুইটি পাঠ করেন ঃ৩৬২

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ - وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

–'আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে'

'আপনি কবরে, শায়িতদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।'

পরবর্তীকালে মুহাদ্দিসগণ হযরত 'আয়িশার (রা) যুক্তি-প্রমাণ মেনে নিয়ে দুইটি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (র) বলেন ঃ বদরে নিহতদের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মুজিযা হিসেবে তাদেরকে সেই সময়ের জন্য শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কোন কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে বর্ণনা পার্থক্য দেখা যায়, তার ভিত্তি অনেকটা তাদের বুঝার পার্থক্য।

আল্লাহ প্রদত্ত এই বুঝ শক্তি ও মেধা আবার হযরত আয়িশা (রা) অনেকের চেয়ে বেশী পরিমাণে লাভ করেছিলেন। তাঁর এই অতুলনীয় বোধশক্তি ও অনুধাবন ক্ষমতা তিনি কাজে লাগান হাদীস বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। এখানে আমরা এমন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ বোধ ও বুদ্ধির ছাপ ফুটে উঠেছে।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরীর (রা) জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে নতুন কাপড় চেয়ে নিয়ে পরেন। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'একজন মুসলমান যে লিবাসে (পোশাকে) মারা যায় তাকে সেই লিবাসেই উঠানো হয়।' একথা হযরত আয়িশা (রা) জানতে পেরে বলেন, আল্লাহ আবু সা'ঈদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। 'লিবাস' বলতে রাসূলুল্লাহ (সা) বুঝাতে চেয়েছেন মানুষের 'আমল বা কর্ম। অন্যথায় রাসূল (সা) তো স্পষ্টভাবে বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ খালি গা, খালি পা ও খালি মাথায় উঠবে।৩৬৩

ইসলামের নির্দেশ হলো, তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর ঘরেই ইদ্দত পালন করবে। এই নির্দেশের বিরোধী ফাতিমা নাম্নী একজন মহিলা সাহাবী তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ইদ্দত পালনকালীন সময়ে স্বামীর ঘর থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বহু সাহাবীর সামনে প্রমাণ হিসেবে নিজের এই ঘটনা উপস্থাপন করেন। অনেকে তাঁর এ বর্ণনা গ্রহণ করেন, তবে বেশীর ভাগ সাহাবী তা মানতে অস্বীকার করেন। ঘটনাক্রমে মারওয়ান যখন মদীনার গভর্ণর তখন এই ধরনের একটি মোকদ্দমা দায়ের হয়। এক পক্ষ ফাতিমার বর্ণনাকে প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করায়। এ কথা হযরত আয়িশা (রা) জানতে

---

৩৬২. সূরা আন-নামল-৮০; সূরা ফাতির–২২

৩৬৩. আবূ দাউদ কিতাবুল জানায়িয। খালি গায়ে উঠার হাদীসটি হযরত আয়িশার (রা) থেকে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে

পেরে ফাতিমাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, ফাতিমার এই ঘটনা বর্ণনাতে কোন কল্যাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইদ্দত পালনকালীন সময়ে তাকে স্বামীর গৃহ থেকে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি অবশ্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু তা এই কারণে যে, তার স্বামীর বাড়ীটি ছিল একটি অনিরাপদ ও ভীতিকর স্থানে।[৩৬৪]

একাধিক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, ছাগলের বাহুর গোশত রাসূলুল্লাহর (সা) অধিক পছন্দ ছিল। হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, নবীর (সা) কাছে বাহুর গোশ্তই বেশী পসন্দনীয় ছিল। বাহুর গোশ্তেই বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

আবূ উবায়েদও বলেন ঃ নবী (সা) বাহুর গোশতই বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ[৩৬৫]

ما كان الذراع احب اللحم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم الا غبا وكان يعجل اليها لانها اعجلها نضجا ـ

–রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাহুর গোশ্তই অধিক প্রিয় ছিল তা নয়, বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অনেক দিন পর পর তিনি গোশ্ত খাওয়ার সুযোগ পেতেন। তাই তাঁকে বাহুর গোশ্ত পরিবেশন করা হতো। কেননা বাহুর গোশ্ত দ্রুত সিদ্ধ হয় এবং গলে যায়।

কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের কোন অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু যত বেশীই জানুক না কেন, একজন স্ত্রী তার চেয়ে অনেক বেশীই জেনে থাকে। রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত গোটা দেহ ছিল প্রতিটি মুহূর্তের জন্য একটি দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্বরূপ। এ কারণে তাঁর জীবনের প্রতিটি সময়ের প্রতিটি কর্ম আইন ও বিধানের মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং বলা চলে, তাঁর বেগমগণ তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জানার যে সুযোগ লাভ করেন তা অন্যদের জন্য ছিল অসম্ভব। কিছু কিছু মাসয়ালা এমন আছে, দেখা যায় অন্য সাহাবায়ে কিরাম সেখানে নিজ নিজ ইজতিহাদ অথবা কোন বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, কিন্তু হযরত আয়িশার (রা) নিজের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আজ পর্যন্ত ঐ সব মাসয়ালায় তাঁরই কথা প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে সে রকম কয়েকটি মাসয়ালা উল্লেখ করা হলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) ফাতওয়া দিতেন, গোসলের সময় মেয়েদের চুলের খোপা খুলে চুল ভিজানো জরুরী। হযরত আয়িশা (রা) একথা শুনে বললেন, তিনি মহিলাদেরকে একথা কেন বলে দেন না যে, তারা যেন তাদের খোপা কেটে ফেলে। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গোসল করতাম এবং চুল খুলতাম না।[৩৬৬]

---

৩৬৪. সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিজী ঃ কিতাবুত তালাক

৩৬৫. শামায়েলে তিরমিজী-১৬১, ১৬২, ১৬৩

৩৬৬. সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসাঈ

হযরত ইবন 'উমার (রা) বলতেন, অজু অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিলে অজু ভেঙ্গে যায়। একথা আয়িশা (রা) শুনে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চুমু খাওয়ার পর অজু করতেন না। একথা বলে তিনি মৃদু হেসে দেন।[৩৬৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করতেন, নামায আদায়কারী পুরুষের সামনে দিয়ে যদি নারী, গাধা অথবা কুকুর যায়, তাহলে পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়। হযরত 'আয়িশা (রা) একথা শুনে রেগে যান। তিনি বলেন, আমরা, নারীদেরকে তোমরা গাধা ও কুকুরের সমান করে দিয়েছো। আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকতাম, আর তিনি নামাযে দাঁড়ানো থাকতেন। যখন সিজদায় যেতেন, হাত দিয়ে টোকা দিতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।[৩৬৮] আবার কখনো প্রয়োজন হলে নিজেকে গুটিয়ে সামনে দিয়ে চলে যেতাম।[৩৬৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রা) একদিন ওয়াজ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন, রোযার দিনে কারো যদি সকালে গোসল করার প্রয়োজন দেখা দেয় সে যেন সেদিন রোযা না রাখে। লোকেরা হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট গিয়ে একথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলো। আয়িশা (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) কর্ম পদ্ধতি এর বিপরীত ছিল। লোকেরা আবার আবু হুরাইরার (রা) নিকট গিয়ে সতর্ক করলো। অবশেষে তিনি তাঁর পূর্বের ফাতওয়া প্রত্যাহার করেন।[৩৭০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ফাতওয়া দিতেন যে, কেউ যদি হজ্জ না করে, শুধু মাত্র কুরবানীর পশু মক্কার হারামে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পশু সেখানে জবেহ হবে তার উপর সেই সকল শর্ত আপতিত হবে যা একজন হাজীর উপর হয়। একথা শুনে হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি নিজের হাতে রাসূলুল্লাহর (সা) কুরবানীর পশুর রশি পাকিয়েছি, তিনি নিজ হাতে সেই রশি কুরবানীর পশুর গলায় পরিয়েছেন। তারপর আমার পিতা সেগুলি নিয়ে মক্কায় গেছেন। তা সত্ত্বেও সব কিছু হালাল ছিল। কোন হালাল জিনিসই কুরবানী পর্যন্ত হারাম হয়নি।[৩৭১]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হযরত আয়িশা (রা) অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারিনী ছিলেন। মূলত ঃ স্মৃতিশক্তি আল্লাহ পাকের এক অনুগ্রহ। তিনি পূর্ণমাত্রায় এ অনুগ্রহ লাভে ধন্য হন। ছোট বেলায় খেলতে খেলতে কুরআনের যে সব আয়াত কানে এসেছে, সারা জীবন তা স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। হাদীস শাস্ত্রের নির্ভরতা তো এই স্মৃতি ও মুখস্থ শক্তির উপরে। নুবুওয়াতী সময়কালের প্রতিদিনের ঘটনা মনে রাখা, প্রতিনিয়ত তা হুবহু বর্ণনা করা, রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে যে শব্দাবলী যে ভাবে শুনেছেন তা

---

৩৬৭. সহীহ বুখারী

৩৬৮. ঘর অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে এমন করতেন

৩৬৯. সহীহ বুখারীঃ বাবুত তাতাও'উ খালফাল মারয়াতি; বাবু মান লা ইয়াকতা'উস সালাতা শাইউন; বাবুস সারীর

৩৭০. সহীহ মুসলিম ও মুওয়াত্তা। কিতাবুস সাওম

৩৭১. সহীহ বুখারী ঃ কিতাবুল হাজ্জ

সেই ভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানো একজন সফল মুহাদ্দিসের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। হযরত আয়িশা (রা) তাঁর সমকালীনদের যে ভুলত্রুটি ধরেছেন এবং তাঁদের যে সমালোচনা করেছেন, তাতে তাঁদের মধ্যের মুখস্থ শক্তির পার্থক্য ও বিভিন্নতা বিশেষভাবে কাজ করেছে। এখানে এমন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো যা দ্বারা তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ইনতিকাল করলেন। হযরত আয়িশা (রা) চাইলেন, লাশ মসজিদে আনা হোক, তাহলে তিনিও জানাযায় শরীক হতে পারবেন। লোকেরা প্রতিবাদ করলো। হযরত 'আয়িশা (রা) বললেন, লোকেরা কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) সুহাইল ইবন বায়দার (রা) জানাযার নামায মসজিদেই পড়েছিলেন।৩৭২

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) লোকেরা জিজ্ঞেস করলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কতবার 'উমরা আদায় করেছেন? জবাব দিলেন ঃ চারবার। তারমধ্যে একটি ছিল রজব মাসে। হযরত 'উরওয়া (রা) চেঁচিয়ে বলে উঠলেন ঃ খালা আম্মা! এ কি বলছে আপনি কি শুনছেন না? তিনি জানতে চাইলেন ঃ সে কি বলে? উরওয়া বললেন ঃ তিনি বলেন, রাসূল (সা) চারটি 'উমরা করেছেন, যার একটি রজব মাসে। তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আবু আবদির রহমানের (ইবন উমারের উপনাম) উপর রহম করুন। রাসূল (সা) এমন কোন উমরা করেননি যাতে আমি শরীক থাকিনি। রজবে তিনি কোন উমরা করেননি।৩৭৩

মুহাদ্দিসীন কিরাম, হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে সাহাবা-ই কিরামকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করেছেন এবং প্রায় প্রতিটি স্তরে পুরুষ সাহাবীদের সাথে মহিলা সাহাবীরাও আছেন। ১ম স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা একহাজার অথবা তার উর্ধে। হযরত আয়িশা (রা) এই স্তরের অন্তর্গত। ২য় স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনা পাঁচ শো অথবা তাঁর উর্ধে, কিন্তু এক হাজারের কম। এই স্তরে কোন মহিলা সাহাবী নেই। ৩য় স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনা এক শো অথবা তার উর্ধে; কিন্তু পাঁচ শো'র কম। হযরত উম্মু সালামা (রা) এই স্তরের অন্তর্গত। ৪র্থ স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনা সংখ্যা চল্লিশ থেকে একশো' পর্যন্ত। এই স্তরে বেশীর ভাগ মহিলা সাহাবী। যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা), উম্মে আতিয়্যা (রা), উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা), আসমা বিন্ত আবী বকর (রা), উম্মু হানী (রা), প্রমুখ। ৫ম স্তর ঃ যে সকল সাহাবীর বর্ণনাসংখ্যা চল্লিশ অথবা তার কম। এই স্তরের সদস্যরা অধিকাংশ মহিলা। যেমন ঃ হযরত উম্মে কায়স (রা), হযরত ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা), হযরত রাবী বিন্ত মাসউদ (রা), হযরত সুবরা বিনত সাফওয়ান (রা), হযরত কুলসুম বিন্ত হুসাইন গিফারী (রা), হযরত জাদা বিন্ত ওয়াহাব (রা) প্রমুখ।

---

৩৭২. সহীহ মুসলিম ঃ কিতাবুস জানায়িয

৩৭৩. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল 'উমরা,

উপরে এই স্তরগুলির আলোচনা দ্বারা আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীস শাস্ত্রে হযরত আশিয়ার (রা) মর্যাদা বা স্থান কোথায়। আমরা দেখতে পেলাম তাঁর স্থান সর্বোচ্চ স্তরে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া পিতা হযরত আবু বকর (রা), 'উমার (রা), ফাতিমা (রা), সা'দ (রা), হামযা ইবন আমর আল-আসলামী (রা) এবং জুজামা বিন্ত ওয়াহাব (রা)-এর সূত্রেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে হযরত আয়িশা (রা) থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে সাহাবী ও তাবেঈ উভয় শ্রেণীর লোক আছেন। আল্লামা জাহাবী প্রায় দুই শো লোকের নাম উল্লেখ করার পর বলেছেন, এছাড়া আরো অনেকে।[৩৭৪]

সাহাবীদের বর্ণনা ও হাদীসের লেখা-লেখি ও গ্রন্থাবদ্ধের কাজ হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি শুরু হয়ে যায়। এ শতকের প্রান্তসীমায় উমাইয়্যা খলীফা হযরত 'উমার ইবন আবদিল আযীয (র) খিলাফতের মসনদে আসীন হন। তাঁর সময়ে মদীনার কাজী ছিলেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আবু বকর ইবন 'আমর ইবন হাযাম আল আনসারী। কুরআন-হাদীসে তিনি এক বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্যের পিছনে তাঁর খালা হযরত 'উমরার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। এই 'উমরা ছিলেন হযরত 'আয়িশার (রা) ছাত্রী ও তাঁর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত। খলীফা 'উমার ইবন আবদিল আযীয, আবু বকর-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন 'উমরার বর্ণনাসমূহ লিখে তাঁর কাছে পাঠান।

ইল্‌মে ফিকাহ্ ও কিয়াস

আল-কুরআন ও আল-হাদীস বা আস-সুন্নাহ হলো দলিল ও প্রমাণ, আর ফিকাহ হলো তার সিদ্ধান্ত ও ফলাফল। কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তাই হলো ফিকাহ ও কিয়াস। এই ইলমে ফিকাহ্ ও কিয়াসে হযরত 'আয়িশা (রা) যে কি পরিমাণ পারদর্শী ছিলেন তা পূর্বের আল-কুরআন ও আল-হাদীসে তাঁর পারদর্শিতার আলোচনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখানে ফিকাহ ও কিয়াসে তাঁর উসূল বা নীতিমালা কি ছিলো সে সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকালে তিনি নিজেই ছিলেন যাবতীয় ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তের কেন্দ্রবিন্দু। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনিই তার সমাধান বলে দিতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর উঁচু স্তরের সাহাবীগণ, যাঁরা শরীয়াত ও আহকামে ইসলামীর গভীর তাৎপর্য বিষয়ে দক্ষ ছিলেন, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত 'উমারের (রা) সামনে যখন কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতো তখন তিনি 'আলিম সাহাবীদেরকে একত্র করে তাঁদের নিকট সিদ্ধান্ত চাইতেন। তাঁদের মধ্যে

---

৩৭৪ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৭৭

কারো কাছে যদি বিশেষ কোন হাদীস থাকতো তিনি তা বর্ণনা করতেন। অন্যথায় কুরআন ও হাদীসের অন্য কোন হুকুমের উপর কিয়াস বা অনুমান করে সিদ্ধান্ত দিতেন। খিলাফতে রাশেদার তৃতীয় খলীফা পর্যন্ত এই ফিকাহ একাডেমী ছিল মদীনাকেন্দ্রিক। হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে অরাজকতা ও অশান্তি মাথাচাড়া দেয় এবং বহু মানুষ মদীনা ছেড়ে মক্কা, তায়িফ, দিমাশক, বসরা প্রভৃতি স্থানে আবাসন গড়ে তোলে। অতপর হযরত আলী (রা) খলীফা হলেন। তিনি কুফাকে বানালেন 'দারুল খিলাফা'। এসব কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) দারসগাহের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকেই মদীনা ছেড়ে অন্য শহরে চলে যান। তবে এর ফলে জ্ঞানচর্চার বেষ্টনী ও পরিধি আরো বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তার সম্মিলিত রূপ বা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। যা কিছু বিদ্যমান ছিল তা কেবল মদীনাতেই।

উঁচু স্তরের সাহাবীদের পরে মদীনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'উমার, হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত 'আয়িশা (রা)– এ চারজন বেশীর ভাগ সময় ফিকাহ ও ফাতওয়ার কাজ করেন। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান যেখানে নেই সেখানে এ চারজনের নীতিও ছিল ভিন্ন। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও আবু হুরায়রার (রা) রীতি ছিল যে, উপস্থিত মাসয়লা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর কোন হুকুম বা পূর্ববর্তী খলীফাদের কোন আমল যদি থাকতো, তারা তা বলে দিতেন। আর যদি তা না থাকতো তাঁরা নীরব থাকতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফাদের সময়ে সমাধানকৃত মাসয়ালার উপর কিয়াস করে নিজের বোধ ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেন। এ ক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশার (রা) উসুল ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। সেখানে না পেলে সুন্নাহর দিকে দৃষ্টি দিতেন। সেখানে ব্যর্থ হলে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কিয়াস করতেন। হযরত 'আয়িশার (রা) ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের (গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ) রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা আমরা করেছি। এখানে আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

কুরআনে এসেছে–৩৭৫

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ -

–"তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন 'কু'রূ' পর্যন্ত।" অর্থাৎ তার ইদ্দতের সময়সীমা তিন 'কুরূ'। এই 'কুরূ'-এর অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। হযরত 'আয়িশার (রা) এক ভাতিজীকে তার স্বামী তালাক দেয়। তিন 'তুহূর' অর্থাৎ পবিত্রতার তিনটি মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর যখন নতুন মাস শুরু হয় তখন তিনি তাকে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসতে বলেন। কিছু লোক তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ করে

---

৩৭৫. সূরা আল-বাকারা-২২৮

বলেন, এটা কুরআনের হুকুমের পরিপন্থী। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে কুরআনের উপরে উল্লেখিত আয়াতটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। জবাবে উম্মুল মুমিনীন বলেন, 'তিন কুরূ'– তা ঠিক আছে। তবে তোমরা কি জান 'কুরূ'-এর অর্থ কি? 'কুরূ' অর্থ 'তুহুর' (পবিত্রতা)। মদীনার সকল ফকীহ এ মাসয়ালায় হযরত 'আয়িশার (রা) অনুসরণ করেছেন। তবে ইরাকীরা 'কুরূ' অর্থ হায়েজ (মাসিকের বিশেষ দিনগুলি) বুঝেছেন।[৩৭৬]

হযরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা) এক মহিলার নিকট থেকে বাকীতে আট শো দিরহামে একটি দাসী খরীদ করেন। শর্ত করেন যে ভাতা পেলে মূল্য পরিশেধ করবেন। মূল্য পরিশোধের পূর্বেই তিনি উক্ত দাসীটি নগদ ছয়শো দিরহামে আবার সেই মহিলার নিকট বিক্রী করেন। মহিলা ক্রয়-বিক্রয়ের এ বিষয়টি হযরত 'আয়িশাকে (রা) অবহিত করেন। হযরত আয়িশা (রা) মহিলাকে বলেন, তুমিও খারাপ কাজ করেছো এবং যায়িদ ইবন আরকামও। তুমি তাঁকে বলে দিবে, তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদ করে যে সাওয়াব অর্জন করেছিলেন তা বরবাদ হয়ে গেছে। তবে তিনি যদি তাওবা করে নেন।

এই বিশেষ অবস্থায় হযরত আয়িশা (রা) অতিরিক্ত দুই শো দিরহামকে সুদ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়িশা (রা) সূরা আল-বাকারার ২৭৫তম আয়াতের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আল-কুরআনুল কারীমের পরে হাদীসের স্থান। এ হাদীসের হুকুমের উপর কিয়াস করে কিভাবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হলো।

স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করে এবং স্ত্রী সে ক্ষমতা স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়ে উক্ত স্বামীকে মেনে নেয় তাহলেও কি সেই স্ত্রীর উপর কোন তালাক পড়বে? এ প্রশ্নে হযরত আলী (রা) ও হযরত যায়িদের (রা) মতে এক তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা) বলেন, এক তালাকও হবে না। তিনি তাঁর মতের সপক্ষে রাসূলুল্লাহর (সা) সেই 'তাখঈর'-এর ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাঁর স্ত্রীদেরকে এই ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে ছেড়ে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্য গ্রহণ করতে পারেন অথবা তাঁর সাথে থেকে এই দারিদ্র্য ও অনাহারকে বরণ করতে পারেন। সবাই দ্বিতীয় অবস্থাটি গ্রহণ করেন। এতে কি তাদের উপর এক তালাক পতিত হয়েছে?[৩৭৭]

কেউ যদি কোন দাস মুক্ত করে তাহলে সেই মনিব ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের মধ্যে ইসলামী বিধান মতে এক প্রকার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আল-ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব) বলে। যার ফলে মুক্তিদানকারী মনিব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং আইনগতভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত দাস পূর্বের মনিবের বংশের

---

৩৭৬. দেখুন ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ কিতাবুল তালাক

৩৭৭. সহীহ বুখারী ঃ বাবু মান খায়্যারা নিসায়াহু

লোক বলে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। এ কারণে এ 'আল-ওয়ালা' সম্পর্কের গুরুত্ব অত্যধিক। একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস একবার হযরত আয়িশার (রা) নিকট এসে বললো, আমি উতবা ইবন আবী লাহাবের দাস ছিলাম। তারা স্বামী-স্ত্রী আমাকে এই শর্তে বিক্রী করে দেয় যে, আমি মুক্ত হলে আমার 'আল-ওয়ালা'-এর অধিকারী হবে সে। এখন আমি মুক্ত। আমার এই 'আল-ওয়ালা'-এর সম্পর্ক হবে কার সাথে? উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে না, যে মুক্ত করেছে তার সাথে? হযরত আয়িশা (রা) বললেন, 'বারীরা' নাম্নী দাসীর অবস্থাও ছিল এমন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন যে, বারীরাকে খরীদ করে আযাদ করে দাও। তুমিই তার 'আল-ওয়ালা'-এর অধিকারিণী হবে– বিক্রয়কারী আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী যত শর্তই আরোপ করুক না কেন।[৩৭৮]

হযরত বারীরা (রা) ছিলেন একজন দাসী। তাঁর মনিব তাঁকে এ শর্তে বিক্রী করতে চায় যে, তিনি মুক্ত হলে তাঁর আল-ওয়ালা-এর অধিকারী সে হবে। হযরত বারীরা (রা) হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট এসে নিজের অবস্থার কথা তাঁকে বলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁকে ক্রয় করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁর মনিবের আল-ওয়ালার শর্তটি মানতে রাজি হলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এলে তিনি বিষয়টি অবহিত করেন। রাসূল (রা) 'আয়িশাকে (রা) বলেন– তুমি নির্দ্বিধায় তাঁকে ক্রয় করে মুক্তি দিতে পার। আল্লাহর কিতাবের বিরোধী শর্ত স্বাভাবিকভাবেই রহিত হয়ে যাবে। বারীরা (রা) দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। দাসী অবস্থায় যার সাথে বিয়ে হয়েছিল, মুক্ত হয়ে তাঁকে আর স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলেন না। লোকেরা তাঁকে সাদাকা দিত। তিনি সেই সাদাকা থেকে কিছু খাদ্য বস্তু রাসূলকে (সা) হাদিয়া (উপঢৌকন) হিসেবে দিতেন এবং রাসূল (সা) তা গ্রহণ করতেন।

হযরত বারীরার (রা) এ ঘটনা থেকে হযরত 'আয়িশা (রা) শরীয়াতের একাধিক হুকুম বের করেছেন। তিনি বলতেন ঃ বারীরার মাধ্যমে ইসলামের তিনটি বিধান জানা যায়।[৩৭৯] যথা ঃ

১. মুক্তিদানকারী ব্যক্তিই হবে আল-ওয়ালার অধিকারী।
২. দাসত্ব অবস্থায় যদি একটি দাস ও একটি দাসীর বিয়ে হয় এবং পরে স্ত্রী দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, কিন্তু স্বামী দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, তাহলে দাস স্বামীকে গ্রহণ করা বা না করার ইখতিয়ার স্ত্রী লাভ করে।
৩. যদি দান-সাদকা পাওয়ার উপযুক্ত কোন ব্যক্তি কোন কিছু দান-সাদকা হিসেবে পায় এবং সে তা থেকে কিছু এমন ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে দেয় যে সাদকা পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

বিদায় হজ্জে কিছু কম-বেশী প্রায় এক লাখ মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন। উঁচু স্তরের সকল সাহাবী এ সফরে রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। এ সফরের যাবতীয় ঘটনা

---

৩৭৮. বায়হাকী ঃ কিতাবুল বুয়; আল ফাতহুর রাব্বানী মায়া বুলুগিল আমানী-১৩/১৬২-১৬৩
৩৭৯. বুখারী ঃ বাবুল হুররাহ তাকুনু তাহতাল 'আবদি

সকলের জানা থাকার কথা। হযরত 'আয়িশার ও (রা) ঘটনাবলী তিনি স্মৃতিতে ধরে রাখেন। বিভিন্ন হাদীসে তা হুবহু বর্ণিতও হয়েছে। তবে হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণনাসমূহ ফকীহ ও মুজতাহিদদের মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। হযরত 'আয়িশা (রা) ঠিক হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি আদায়কালীন সময়ের মধ্যে নারী প্রকৃতির বিশেষ অবস্থা দেখা দেওয়ায় হজ্জের কিছু অনুষ্ঠান আদায়ে অপারগ হয়ে পড়েন। এতে তিনি ভীষণ কষ্ট পান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি 'তানঈম'-এ নতুন করে 'ইহরাম' বেঁধে কা'বার তাওয়াফ করেন।[৩৮০] হাফেজ ইবন কায়্যিম (র) হযরত 'আয়িশার (রা) এ বর্ণনাটি নকল করার পর বলেছেন :[৩৮১]

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من اصول المناسك -

–হযরত 'আয়িশার (রা) এ হাদীস থেকে হজ্জের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি গৃহীত হয়েছে। যেমন ঃ

১. যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে উমরার নিয়্যেত অর্থাৎ 'কিরান' হজ্জের নিয়্যেত করবে তার জন্য একটি তাওয়াফ ও সাঈ করলে হয়ে যাবে।
২. নারীদের ক্ষেত্রে শারীরিক বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে 'তাওয়াফুল কুদুম' রহিত হয়ে যাবে।
৩. নারীদের বিশেষ অবস্থা দেখা দিলে হজ্জের পরে 'উমরার নিয়্যেত করা জায়িয।
৪. নারীরা বিশেষ অবস্থায় শুধু কা'বার তাওয়াফ ছাড়া হজ্জের অন্য সব কাজ আদায় করতে পারবে।
৫. 'তানঈম' 'হারাম'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হারাম-এর বাইরে।
৬. 'উমরা এক বছরে, বরং এক মাসেও দুইবার আদায় করা যায়।
৭. কেবলমাত্র হযরত আয়িশার (রা) এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, মক্কার বাইরের লোকেরা মক্কা থেকেই (তানঈম) ইহরাম বেঁধে 'উমরা আদায় করতে পারে।

এখানে কিয়াসে 'আকলী বা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিনির্ভর অনুমান সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। কিয়াসে আকলী অর্থ এই নয় যে, যে কেউ নিজের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে শরীয়াতের কোন হুকুম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান করবে। বরং তার অর্থ হলো, আলিমগণ, যাঁরা শরীয়াতের গূঢ় রহস্য এবং দ্বীনী ইলমসমূহে অভিজ্ঞ, কিতাব ও সুন্নাতের অধ্যয়ন, গবেষণা এবং নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়নের কারণে তাঁদের মধ্যে এমন এক যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যখন তাঁদের সামনে কোন নতুন মাসয়ালা আসে তখন তাঁরা তাঁদের সেই যোগ্যতা বলে বুঝতে সক্ষম হন যে, যদি শারে (আ) (বিধানদাতা) অর্থাৎ রাসূল (সা) জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি এই জবাব দিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন অভিজ্ঞ আইনজীবী, কোন বিশেষ আদালতের বহু মামলার রায় যিনি

---

৩৮০. মুওয়াত্তা ইমাম মলিক ঃ ইফাদাতুল হায়িদ
৩৮১. যাদুল মা'য়াদ-১/২০৭

দেখেছেন। তারপর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ জাতীয় কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে সেই সকল রায়ের উপর অনুমান করে যদি একথা বলে দেন যে, মোকদ্দমাটি এই আদালতে উঠলে তার রায় এমন হবে। তখন তাকে কিয়াসে আকলী বলা হবে। ইসলামী শরীয়াতে নজীর ও ফয়সালা (দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত) সমূহ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) যে কতখানি অবহিত ছিলেন তা আমাদের পূর্বের আলোচনায় মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণে তাঁর কিয়াসে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুব কম থাকাই স্বাভাবিক। এখানে আমরা হযরত আয়িশার (রা) কিয়াসে আকলীর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় সাধারণভাবে মহিলারা মসজিদে আসতো এবং নামাযের জামায়াতে শরীক হতো। পুরুষদের পিছনে শিশু-কিশোররা এবং তাদের পিছনে মহিলারা সারিবদ্ধ হতো, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اَمَاءَ اللّٰهِ مِنْ مَسَاجِدِاللّٰهِ -

–"আল্লাহর বান্দীদের আল্লাহর মসজিদে আসতে তোমরা বারণ করোনা।"

রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের সাথে আরবদের উঠা-বসা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও আর্থিক প্রাচুর্যের কারণে মহিলাদের চাল-চলন, সাজ-সজ্জা ও বেশ-ভূষায় পরিবর্তন আসে। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ 'আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকতেন তাহলে মহিলাদের মসজিদে আসতে বারণ করতেন।' তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ[৩৮২]

عن عمرة عن عائشة قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائل -

আমারাহ থেকে বর্ণিত। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, "আজকাল মহিলারা যে সব নতুন কথা ও কাজের জন্ম দিচ্ছে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এ সময় জীবিত থাকতেন তাহলে, তাদের মসজিদে আসা বন্ধ করে দিতেন, যেমন ইহুদী মহিলাদের বন্ধ করা হয়েছিল।"

হযরত 'আয়িশার (রা) এ সিদ্ধান্ত যদিও সে সময় বাস্তবায়িত হয়নি, তবে তার ভিত্তি ছিল ঐ কিয়াসে আকলী। তিনি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝেছিলেন, এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কেমন হতে পারতো।

হযরত আবু হুরাইয়া (রা) ফাতওয়া দিতেন, কোন ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলে তাকেও গোসল করতে হবে। আর যদি কেউ মৃতের খাটিয়া বহন করে তাকে দ্বিতীয়বার ওজু

---

৩৮২. সহীহ বুখারী ঃ বাবু খুরূজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ

করতে হবে। একথা হযরত 'আয়িশার (রা) কানে গেলে বলেন ঃ

أو ينجس موتى المسلمين وما على رجل لو حمل عودا -

"মুসলমান মোর্দাও কি নাপাক হয়ে যায়? আর কেউ যদি কাঠ বহন করে তাতে তার কি হয়?"

গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য ধাতু নির্গত হওয়া প্রয়োজন কিনা, সে সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। হযরত জাবির (রা) বলতেন ঃ - الماء من الماء 'পানির জন্য পানি'। –অর্থাৎ ধাতু নির্গত হলেই কেবল পানি ব্যবহার প্রয়োজন, অন্যথায় নয়। হযরত আয়িশা (রা) এ মতের বিপরীত একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেন, "কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পানি বের না হলেও তো তোমরা তাকে রজম করে থাক, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে না কেন?"

সাহবায়ে কিরামের (রা) মধ্যে হযরত ইবন 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) যাবতীয় কর্মকে সুন্নাত বলে মনে করতেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতেন। ফকীহগণ সুন্নাতকে যে ইবাদী ও 'আদী[৩৮৩] দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, তিনি তা করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কাজ যে কারণেই করুন না কেন, তা সুন্নাত। তা অনুসরণ করা জরুরী। এ কারণে তিনি সফরের মানযিল-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ রাসূল (সা) কোন সফরে যেখানে যেখানে অবস্থান করেছেন, ইবন উমার (রা) পরবর্তী কালে ঠিক সেখানেই অবস্থান করতেন। যদি কোন মানযিলে রাসূল (সা) ঘটনাক্রমে পাক-পবিত্র হয়ে থাকেন, তিনিও সেখানে বিনা প্রয়োজনে পাক-পবিত্র হতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সুন্নাতের উপরোক্ত পার্থক্যের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁরা ইবন 'উমারের (রা) মতকে সমর্থন করেননি। হজ্জের সময় রাসূল (সা) 'আবতাহ' উপত্যকায় তাবু গেড়ে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু 'আয়িশা (রা) এটাকে সুন্নাত মনে করেননি। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان اسمح لخروجه إذا خرج -

"আল-আবতাহ উপত্যকায় অবস্থান করা সুন্নাত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এ জন্য অবস্থান করেছিলেন যে, সেখান থেকে বের হওয়া তাঁর জন্য সহজ ছিল।"

হযরত 'আয়িশা (রা) বহু ফিকহী মাসয়ালায় তাঁর সমকালীনদের থেকে দ্বিমত পোষণ করেছেন। পরবর্তী কালে হিজাযের ফকীহরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরই মতের উপর আমল করেছেন। হযরত 'আয়িশার (রা) এসব মতামত ও আমলের বিরাট একটি অংশ

৩৮৩. রাসূল (সা) যে কাজ সাওয়াবের নিয়্যেতে ইবাদাতের পদ্ধতিতে করেছেন, তা হলো 'ইবাদী। এই ইবাদী কর্ম আবার দুই প্রকার-মুওয়াক্কাদা ও গায়ের মুওয়াক্কাদা। আর যে কাজ তিনি স্বভাব ও অভ্যাসবশত অথবা কোন সাময়িক প্রয়োজনে করেছেন, তা হলো 'আদী। উম্মাতের জন্য তা অনুসরণ জরুরী নয়

ইমাম মালিক (র) তাঁর 'আল-মুওয়াত্তা'গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

তা'লীম ও ইফ্‌তা (শিক্ষাদান ও ফাতওয়ার দায়িত্ব পালন)

ইলম বা জ্ঞান অন্যের নিকট পৌঁছানো ইলমের অন্যতম খিদমাত বলে ইসলাম বিশ্বাস করে। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন–

فليبلغ الشاهد الغائب -

উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট অবশ্যই পৌঁছাবে। হযরত 'আয়িশা (রা) এ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছিলেন তা আমাদের পূর্বের আলোচনা সমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখানে আমরা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইসলামী দাওয়াত ও ইলমের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশে ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। মক্কা মুয়াজ্জামা, তায়িফ, বাহরাইন, ইয়ামান, দিমাশক, মিসর, কুফা, বসরা প্রভৃতি বড় বড় শহর ও নগরে এই সকল মহান শিক্ষকবৃন্দের এক একটি ছোট দল অবস্থান করতেন। খিলাফত ও সরকারের কেন্দ্র ২৭ বছর পর মদীনা থেকে প্রথমে কুফায় এবং পরবর্তীকালে দিমাশকে স্থানান্তরিত হয়। তা সত্ত্বেও মদীনার রূহানী ও ইল্‌মী (আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানগত) শ্রেষ্ঠত্বের কোন অংশে ভাটা পড়েনি। তখনও মদীনায় হযরত ইবন 'উমর (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) প্রমুখের পৃথক পৃথক দারসগাহ চালু ছিল। তবে সবচেয়ে বড় দারসগাহটি ছিল হযরত আয়িশার (রা) হুজরাকেন্দ্রিক মসজিদে নববীর সেই বিশেষ স্থানে।

মদীনা ছিল ইসলামী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র। যিযারত ও বরকত হাসিলের উদ্দেশে চতুর্দিক থেকে মানুষ সেখানে ছুটে আসতো। যারা আসতো তারা অবশ্যই একবার না একবার উম্মুল মুমিনীনের হুজরার দরজায় হাজিরা দিত। তারা সালাম পেশ করতো। তিনি আগন্তুকদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেন। কথাবার্তা, সালাম-কালাম, মাসয়ালা জিজ্ঞাসা ও জবাব দান সবই হতো পর্দার অন্তরাল থেকে। ইরাক, মিসর, শাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে তাঁর খিদমতে হাজির হতো এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও ফাতওয়া চাইতো। যে সব শিক্ষার্থী সর্বক্ষণ উম্মুল মুমিনীনের খিদমতে থাকতো, এসকল আগন্তুক তাদেরকেও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো। এ ধরনের একজন শিক্ষার্থী 'আয়িশা বিন্‌ত তালহা বর্ণনা করেছেন ঃ

كان الناس يأتونها من كل مصر فكان الشيوخ ينتابونى لمكانى منها وكان الشباب يتاخونى فيهدون الى ويكتبون الى من الامصار فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته تقول لى عائشة أى بنية فاجيبه واثبيه.(أدب

المفرد للبخارى: باب الكتابة الى النساء)

"প্রতিটি শহর থেকে মানুষ হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট আসতো। তাঁর সাথে আমার সম্পর্কের কারণে বৃদ্ধরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতো। যুবকরা আমার সাথে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতো। লোকেরা আমার কাছে হাদিয়া-তোহাফা পাঠাতো এবং বিভিন্ন শহর থেকে চিঠি-পত্র লিখতো। আমি তা হযরত 'আয়িশার (রা) সামনে উপস্থাপন করে বলতাম, খালা আম্মা! এ অমুকের চিঠি ও হাদিয়া। তিনি বলতেন, বেটি! তুমি এর জবাব দাও এবং বিনিময়ে তুমিও কিছু পাঠিয়ে দাও।'

স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষের চেয়ে মহিলাদেরই ভীড় হতো বেশী। মহিলা বিষয়ক মাসয়ালার সমাধান দানের সাথে সাথে বলে দিতেন, তোমরা পুরুষদেরকেও অবহিত করবে। একবার বসরা থেকে কিছু মহিলা আসে। তিনি তাদের কিছু নসীহত করে বলেন, তোমরা পুরুষদেরকে অবহিত করবে। তাদেরকে অনেক কথা বলতে আমার শরম হয়। তাদের বলবে তারা যেন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করে।

নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং যে সকল পুরুষদের থেকে হযরত 'আয়িশার (রা) পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁরা সকলে হুজরার ভিতরের মজলিসে বসতেন, আর অন্যরা বসতেন হুজরার বাইরে মসজিদে নববীর মধ্যে। দরজায় পর্দা টানানো থাকতো। পর্দার আড়ালে তিনি নিজে বসে যেতেন।[৩৮৪] লোকেরা প্রশ্ন করতো, তিনি জবাব দিতেন। কোন কোন মাসয়ালায় শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে তর্ক-বাহাছ হতো।[৩৮৫] কখনও কোন মাসয়ালা নিজেই বিস্তারিত বর্ণনা করতেন, লোকেরা নীরবে কান লাগিয়ে শুনতো। তিনি শিক্ষার্থীদের ভাষা, প্রকাশভঙ্গি এবং সঠিক উচ্চারণের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একবার তাঁর দুই ভাতিজা আসেন। তাঁরা দুইজন ছিলেন দুই মায়ের সন্তান। একজনের ভাষা তেমন শুদ্ধ ছিল না। তার ভাষায় যথেষ্ট ভুল-ত্রুটি ছিল। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর ভুল ধরে দিয়ে বলেন, তুমি তেমন ভাষায় কথা বল না কেন যেমন আমার এই ভাতিজা কথা বলে? হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি, তাকে তার মা এবং তোমাকে তোমার মা শিক্ষা দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, যাঁর ভাষা শুদ্ধ ছিল না, তার মা ছিলেন দাসী।

উপরে উল্লেখিত এ ধরনের অস্থায়ী শিক্ষার্থীরা ছাড়া তিনি বিভিন্ন খান্দানের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এবং ইয়াতীম শিশুদেরকে নিজের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করতেন ও শিক্ষা দিতেন। কখনও এমন হয়েছে যে, শিশু নয়, বরং যারা বড় হয়ে গেছে এমন ছেলেদেরকে তাঁদের দুধ-খালা বা দুধ-নানী হওয়ার কারণে নিজের ঘরের মধ্যে ঢোকার অনুমতি দিতেন।[৩৮৬] আর যাদের ঘরের ঢোকার অনুমতি ছিল না, এমন গায়ের মুহাররম ব্যক্তিরা আফসোস করে বলতো, ইলম হাসিলের ভালো সুযোগ থেকে আমরা

---

৩৮৪. মুসনাদ-৬/৭২; তাবাকাত-২/২৯

৩৮৫. মুসনদা-৬/৭৫

৩৮৬. হযরত আয়িশা (রা) এমত পোষণ করতেন যে, যদি কোন মহিলা কোন বালেগ ছেলেকেও দুধ পান করায় তাহলে তাতে রাদা'ঈ হুরমত বা দুধপানগত কারণে মুহাররম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহর

বঞ্চিত। কুবায়সা বলতেন, 'উরওয়া আমার চেয়ে জ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, সে আয়িশার (রা) গৃহাভ্যন্তরে যেতে পারতো। ইরাকের সর্বজন মান্য ইমাম নাখঈ ছোটবেলায় হযরত 'আয়িশার (রা) সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন। এজন্য তার সমকালীনরা তাঁকে ঈর্ষা করতেন।[৩৮৭]

হযরত 'আয়িশা (রা) প্রতিবছর হজ্জে যেতেন। হিরা ও সাবীর পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর তাঁবু স্থাপন করা হতো। দূর-দূরান্তের জ্ঞান পিপাসুরা সেই তাঁবুর পাশে ভীড় জমাতো। কখনো কখনো কা'বার চত্বরে যমযমের ছাদের নীচে বসে যেতেন, জ্ঞান পিপাসুরা সামনে জমায়েত হতো। তিনি যখন চলতেন মহিলারা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখতো। ইমামের মত তিনি চলতেন আগে আগে, আর অন্যরা পিছনে। লোকেরা বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান চাইতো এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করতে চাইতো, তিনি তাদের সমাধান বলে দিয়ে সন্দেহ দূর করে দিতেন। তিনি লোকদের যে কোন ধরনের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ দিতেন। বলতেন, তোমরা তোমাদের মার কাছে যে প্রশ্ন করতে পার, তা আমার কাছেও করতে পার। একবার তিনি হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারীকেও (রা) এ রকম কথা বলেছিলেন।[৩৮৮] তিনি বলতেন, আমি তোমাদের মা। আসলেই তিনি শিক্ষার্থীদের মায়ের মতই শিক্ষা দিতেন। 'উরওয়া, কাসেম, আবু সালামা, মাসরূক ও সাফিয়্যাক মাতৃস্নেহে শিক্ষাদীক্ষা দেন। ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং তাদের যাবতীয় খরচও নিজে বহন করতেন। কোন কোন শিক্ষার্থীর সাথে তিনি এমন মাতৃসুলভ আচরণ করতেন যে, তা দেখে তাঁর আপন জনেরাও ঈর্ষা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা) ছিলেন হযরত আয়িশার (রা) অতি স্নেহের ভাগ্নে। তিনি একবার খালার এক শাগরিদ আসওয়াদকে বলেন, 'উম্মুল মুমিনীন তোমার কাছে যে সব গোপন কথা বলতেন, তা কিছু আমাকেও বলো।

হযরত 'আয়িশার (রা) শাগরিদরা তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। হযরত 'আমারাহ্ ছিলেন আনসার-কন্যা। তিনি হযরত 'আয়িশাকে (রা) খালা বলে ডাকতেন। ইমাম আশ-শা'বী বলেন ঃ 'আয়িশা (রা) মাসরূক ইবন আজদা'কে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩৮৯] হযরত আয়িশার (রা) জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অসংখ্য মানুষ গ্রহণ করেছেন। তবে যাঁরা

(সা) অন্য বিবিগণ হযরত 'আয়িশার (রা) এমত গ্রহণ করেননি। ইমামদের মধ্যে একমাত্র দাউদ জাহিরী ছাড়া সকল ইমাম ও ফকীহ রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণের সাথে আছেন। কেবল দাউদ জাহিরী হযরত আবু হুজায়ফা ও তাঁর মাওলা সালেমের (রা) ঘটনার ভিত্তিতে হযরত আয়িশার মতটি গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া অন্য সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, কেবল শিশু অবস্থায় দুধপান করলেই হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে দুধপানের সময়কাল জন্মের পর থেকে দুই বছর নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। একারণে অধিকাংশ ফকীহ এ ক্ষেত্রে হযরত আয়িশার (রা) মতটি গ্রহণ করেননি। তাঁরা আবু হুজায়ফার স্ত্রী ও সালেমের ঘটনাটি ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে করেছেন। (ইমাম নাওয়াবী ঃ শরহু মুসলিম ঃ বাবু রাদীয়াতুল কাবীর; মুসনাদে আহমাদ-৬/২৭১)

৩৮৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৭৪

৩৮৮. মুসনাদ-৬/৯০; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ঃ বাবুল গুসল

৩৮৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/৪৯

শৈশব থেকে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে আয়িশার (রা) জ্ঞানের সত্যিকার বাহকরূপে মুহাদ্দিসদের নিকট সমাদৃত হন নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো ঃ

১. 'উরওয়া ঃ তাঁর পিতা যুবাইর (রা), মাতা আসমা বিন্‌ত আবী বকর (রা)। নানা হযরত আবু বকর (রা) এবং খালা হযরত আয়িশা (রা)। খালা অতি আদরে তাঁকে লালন-পালন করেন। মদীনার জ্ঞান ও মহত্বের শিরোমণিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইমাম যুহরী ও আরো অনেকে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁকে সীরাত ও মাগাযীশাস্ত্রের ইমাম গণ্য করা হয়। ইমাম যুহরী বলেন, আমি তাঁকে অফুরন্ত সাগররূপে দেখেছি। হযরত 'আয়িশার (রা) বর্ণনা, ফিকাহ ও ফাতওয়ার জ্ঞানে তাঁর চেয়ে বড় কোন আলিম সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। হিজরী ৯৪ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯০]

২. কাসিম ইবন মুহাম্মাদ ঃ তাঁর দাদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং ফুফু হযরত আয়িশা (রা)। ছোটবেলা থেকেই ফুফুর স্নেহে বেড়ে ওঠেন এবং তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। বড় হয়ে মদীনার ফিকাহর একজন ইমাম হন। মদীনায় সাত সদস্যবিশিষ্ট ফকীহদের যে মজলিস ছিল, তিনি ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। আবুয যিয়াদ বলেন ঃ 'আমি কাসিমের চেয়ে বড় ফকীহ যেমন দেখিনি, তেমনি সুন্নাতের জ্ঞানে তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কাউকে দেখেনি।' ইবন 'উয়ায়না বলেন ঃ 'কাসিম ছিলেন তাঁর সময়ের সবচেয়ে বড় আলিম।' হিজরী ১০৬, মতান্তরে ১০৭ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯১]

৩. আবু সালামা ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুর রহমান ইবন আউফের (রা) ছেলে। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি হযরত আয়িশার (রা) স্নেহে বড় হন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের মদীনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'আলিম। ইমাম যুহরী বলেন ঃ 'আমি চারজনকে সাগরের মত পেয়েছি। তাঁরা হলেন ঃ 'উরওয়া ইবন যুবাইর, ইবনুল মুসায়্যাব, আবু সালামা ও উবাইদুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ।' হিজরী ৯৪, মতান্তরে ১০৪ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯২]

৪. মাসরূক ইবনুল আজদা ঃ তাঁর পিতা ছিলেন ইয়ামনের একজন বিখ্যাত অশ্বারোহী। আরবের বিখ্যাত বীর 'আমর ইবন মা'দিকারিব ছিলেন তাঁর মামা। ইমাম জাহাবী শা'বীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত 'আয়িশা (রা) মাসরূককে ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেন। ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা করতে এলে তিনি মাসরূকের জন্য শরবত তৈরী করতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, আমার ছেলের জন্য শরবত বানাও। তিনি আয়িশা (রা) থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশ ইমাম আহমাদ মুসনাদে এবং ইমাম বুখারী তাঁর আল-জামে' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাঁকে ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ গণ্য করা হতো। ইমাম

---

৩৯০. প্রাগুক্ত-১/৬২

৩৯১. প্রাগুক্ত-১/৯৬-৯৭

৩৯২. প্রাগুক্ত-১/৬৩

শা'বী বলেন ঃ 'আমি তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানপিপাসু আর কাকেও জানিনে। তিনি কাজী শুরাইহ থেকেও বড় মুফতী ছিলেন। কাজী শুরাইহ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাসরূকের কাজী শুরাইহ এর কোন প্রয়োজন হতো না। তিনি কুফার বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। তবে কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। উঁচুস্তরের আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। আবু ইসহাক বলেন ঃ 'একবার তিনি হজ্জে যান। বাড়ী থেকে বের হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত সিজদারত অবস্থায় ছাড়া ঘুমাননি।' তাঁর স্ত্রী বলেছেন ঃ 'নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেত।' হিজরী ৬৩ সনে ইনতিকাল করেন।[৩৯৩]

৫. আমারাহ বিনত আবদির রহমান ঃ তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আস'য়াদ ইবন যুরারার (রা) পৌত্রী। মহিলাদের মধ্যে হযরত 'আয়িশার (রা) তা'লীম-তারবিয়্যাত বা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম নমুনা হলেন তিনি। মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নামটি উচ্চারণ করে থাকেন। 'আয়িশার (রা) হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন তিনি'–একথা বলেছেন ইবন হিব্বান। সুফইয়ান সাওরী বলেন ঃ 'আমারাহ, কাসিম ও 'উরওয়ার হাদীসই হচ্ছে 'আয়িশার (রা) সর্বাধিক শক্তিশালী ও প্রমাণিত হাদীস।' উম্মুল মুমিনীন তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। একারণে লোকেরা তাঁকে অতিরিক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। ইমাম বুখারীর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীনের সেক্রেটারী। লোকেরা তাঁরই মাধ্যমে হাদিয়া-তোহফা ও চিঠি-পত্র হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠাতো।[৩৯৪]

৬. সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা ঃ কা'বার চাবি রক্ষক শায়বার কন্যা, সাফিয়্যা। হাদীসের প্রায় সকল গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হাদীসের সনদে তাঁকে– 'শায়বার কন্যা সাফিয়্যা, আয়িশার (রা) বিশেষ শাগরিদ' অথবা 'আয়িশার (রা) সাহচর্যপ্রাপ্তা'– এভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[৩৯৫] মানুষ তাঁর কাছে বিভিন্ন মাসয়ালা এবং হযরত 'আয়িশার (রা) হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আসতো। আবু দাউদ বলেন ঃ[৩৯৬]

خرجت مع عدى بن عدى الكندى حتى قدمنا مكة فبعثنى إلى صفية بنت شيبة وكانت حفظت من عائشة -

–আমি 'আদী ইবন আদী আল-কিন্দীর সাথে হজ্জের উদ্দেশে বের হলাম। মক্কায় পৌছার পর তিনি আমাকে সাফিয়্যা বিন্ত শায়বার নিকট পাঠালেন। তিনি হযরত আয়িশা (রা) থেকে হাদীস শুনে মুখস্থ করেছিলেন।

৭. 'আয়িশা বিন্ত তালহা (রা) ঃ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তালহার কন্যা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর নানা এবং হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর খালা। খালার তত্ত্বাবধানে

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত-১/৪৯

৩৯৪. বুখারী ঃ আদাবুল মুফরাদ-বাবুল মুরাসালা ইলান নিসা

৩৯৫. মুসনাদ-৬/২৭৬; তাবাকাত-৮/২৮৪

৩৯৬. বাবুত তালাক আলাল গালাত

লালিত-পালিত হন। আবু যার'আ দিমাশকী বলেন, লোকেরা তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও শিষ্টাচারিতা দেখে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮. মুয়াজা বিন্‌ত আবদিল্লাহ আল-'আদাবিয়্যা ঃ একজন বসরী মেয়ে। হযরত 'আয়িশার (রা) শাগরিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তিনি বহু হাদীস হযরত 'আয়িশার (রা) ভাষায়ই বর্ণনা করেছেন। একজন উঁচু স্তরের আবেদা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি আর কোন দিন বিছানায় ঘুমাননি।

এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা হলো। এছাড়া আরো অনেকে আছেন।

চিকিৎসা বিদ্যা, ইতিহাস, সাহিত্য, কবিতা ও বক্তৃতা-ভাষণে হযরত 'আয়িশার (রা) আগ্রহ ও পারদর্শিতা সম্পর্কে যদিও আগে কিছু কিছু আলোচনা এসে গেছে, তা সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে আরো কিছু আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। হযরত আয়িশার (রা) ছাত্র-শিষ্যরা বর্ণনা করেছেন যে, ইতিহাস, বক্তৃতা-ভাষণ, সাহিত্য ও কবিতায় তার বেশ ভালোই দখল ছিল। আর চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল মোটামুটি জ্ঞান। হিশাম ইবন উরওয়ার বর্ণনা ঃ[৩৯৭]

ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقران ولا بفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة -

'আমি (উরওয়া) কুরআন, ফারায়েজ, হালাল-হারাম (ফিকাহ্) কবিতা, আরবের ইতিহাস ও নসব (বংশ) বিদ্যায় 'আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি।'

'উরওয়া আরো বলেন ঃ 'আমি চিকিৎসা বিদ্যায় আয়িশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ আর কাউকে পাইনি।[৩৯৮] তৎকালীন আরবে চিকিৎসা বিদ্যার যথাযথ চর্চা ও প্রচলন ছিলনা। সেকালের আরবের সবচেয়ে বড় চিকিৎসাবিদ ছিলেন হারিস ইবন কালদা। তাছাড়া সারা আরবে ছোট ছোট আরো অনেক চিকিৎসক ছিলেন। একটা নিরক্ষর সমাজে চিকিৎসার যতটুকু প্রচলন হয়ে থাকে, সেকালের আরব সমাজে চিকিৎসাবিদ্যা বলতে তাই বুঝায়। গাছ-গাছড়ার কিছু গুণাগুণ জানা, অসুস্থ ব্যক্তিদের পরীক্ষিত কিছু ওষুধ সম্পর্কে জানা ইত্যাদি। এক ব্যক্তি হযরত আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করে, আপনি কবিতা বলেন, তা মানলাম যে, আপনি আবু বকরের (রা) মেয়ে, বলতে পারেন; কিন্তু আপনি এ চিকিৎসাবিদ্যা কিভাবে আয়ত্ব করেন? তিনি জবাব দেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ জীবনে অসুস্থ থাকতেন। আরবের চিকিৎসকরা আসতো। তারা যে ওষুধের কথা বলতো, আমি মনে রাখতাম।[৩৯৯] আমরা বুঝতে পারি যে, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর

---

৩৯৭. তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ-১/২৮

৩৯৮. প্রাগুক্ত

৩৯৯. মুসনাদে আহমাদ-৬/৬৭

লোকেরা যে ভাবে গাছ-গাছড়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকে, তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা ছিল সেই পর্যায়ের। তাছাড়া আরো কিছু রোগীর ব্যবস্থাপত্র তিনি মনে রেখেছিলেন। সেই সময় মুসলিম মহিলারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে যেতেন, তাঁরা আহত সৈনিকদের ব্যাণ্ডেজ লাগাতেন[৪০০] ও সেবা করতেন। আয়িশা (রা) নিজেও উহুদ যুদ্ধের আহত সৈনিকদের সেবা করেছিলেন। এতে ধারণা হয় যে সে যুগের মুসলিম মহিলাদের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর মত এই শাস্ত্রের জ্ঞান থাকতো।

প্রাচীন আরবের ইতিহাস, জাহিলিয়াতের রীতি-প্রথা এবং আরবের বিভিন্ন গোত্র- গোষ্ঠীর বংশ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। হযরত আয়িশা (রা) তাঁরই মেয়ে। বলা চলে পিতার জ্ঞান তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। এ কারণে আমরা হযরত উরওয়াকে বলতে শুনি– 'আমি আরবের ইতিহাস ও কুষ্ঠিবিদ্যায় আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী জানা কাউকে দেখিনি।' জাহিলী আরবের রীতি-প্রথা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ তিনি দিয়েছেন, যা হাদীসের গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে। যেমন, আরবে কত রকমের বিয়ে চালু ছিল, তালাকের পদ্ধতি কেমন ছিল, বিয়ের সময় কি গাওয়া হতো, তারা কোন কোন দিন রোযা রাখতো, হজ্জের সময় কুরাইশরা কোথায় অবস্থান করতো, মৃত ব্যক্তির লাশ দেখে তারা কি কথা উচ্চারণ করতো ইত্যাদি। সহীহ বুখারী, তিরমিজী, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে তার এসব বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইসলাম–পূর্ব আমলে মদীনার আনসারদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ 'বুয়াস'-এর বর্ণনা[৪০১] যেমন আয়িশা (রা) দিয়েছেন, তেমনি তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কথা, দেব-দেবীর কথাও বলেছেন। যেমন তারা 'মুশাল্লাল' পর্বতের মূর্তির পূজা করতো।[৪০২] ইসলামের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যেমন ওহীর সূচনা পর্ব, ওহী কেমন করে হতো, ওহীর সময় রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থা কিরূপ দাঁড়াতো, নবুওয়াতের সূচনা পর্বের নানা ঘটনা, হিজরতের ঘটনা, নিজের জীবনের ইফকের ঘটনা ইত্যাদির তিনি আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়েছেন।[৪০৩] মজার ব্যাপার হলো, এ সব ঘটনার সাথে যারা জড়িত ছিলেন অথবা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই সব পরিণত বয়সের লোকেরা যেখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে হযরত আয়িশার (রা) বর্ণনা হাদীসের গ্রন্থসমূহে কয়েক পৃষ্ঠা ছড়িয়ে গেছে। অথচ অনেক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি ছিলেন একটি শিশু অথবা বড়জোর একজন কিশোরীমাত্র। কুরআন কিভাবে, কি তারতীবে নাযিল হয়েছে এবং নামাযের পদ্ধতির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন।[৪০৪] তাছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতকালীন অবস্থা, কাফন-দাফনের ব্যবস্থা, কাফনের কাপড়ের সংখ্যা, মাপ

---

৪০০. আবু দাউদ ঃ কিতাবুল জিহাদ
৪০১. সহীহ বুখারী ঃ বাবু আয়্যাম আল-জাহিলিয়্যা,
৪০২. প্রাগুক্ত ঃ কিতাবুল হাজ্জ।
৪০৩. দেখুন ঃ সহীহ বুখারী ঃ বাবু বুদয়ুল ওয়াহ্য়ি, বাবুল হিজরাহ্, বাবুল ইফ্ক
৪০৪. প্রাগুক্ত ঃ বাবু তা'লীফ আল-কুরআন

ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা তো বিশ্ববাসী তাঁর মাধ্যমেই জেনেছে।[৪০৫]

শুধু কি তাই, তিনি যুদ্ধের ময়দানের অবস্থাও আমাদের শুনিয়েছেন। বদরের ঘটনা,[৪০৬] উহুদের অবস্থা, খন্দক ও বনী কুরায়জার কিছু কথা [৪০৭], জাতুর রুকা 'যুদ্ধে সালাতুল খাওফ' (ভীতিকালীন নামায) এর অবস্থা, মক্কা বিজয়কালীন মহিলাদের বাইয়াত, বিদায় হজ্জের ঘটনাবলীর একাংশ ইত্যাদির কথা আমরা তাঁর মুখে শুনতে পাই। রাসূলুল্লাহর (সা) নৈশকালীন ইবাদতের কথা, ঘর-গৃহস্থলীর কথা, তাঁর আদব-আখলাক, স্বভাব-আচরণের কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। এমন কি রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে সবচেয়ে কঠিন দিন কোনটি গেছে সেকথাও তিনি বলেছেন।[৪০৮] মোটকথা, নবীজীবনের একটি স্বচ্ছ ও সঠিক চিত্র তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হযরত আবু বকরের (রা) খিলাফত, হযরত ফাতিমা (রা) ও রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণের দাবী-দাওয়া, বাইয়াত, ইত্যাদির কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন।[৪০৯]

একথা ঠিক যে, ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞান, তা ছিল তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ। অনেক কিছুই তাঁর সামনে ঘটেছিল। কিন্তু জাহেলী আরবের অবস্থার কথা তিনি কার কাছে জেনেছিলেন? নিশ্চয়ই তা পিতা আবু বকরের (রা) মুখে শুনেছেন।

সাহিত্য

অসংখ্য বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত 'আয়িশা (রা) ছিলেন একজন সুভাষিণী। তাঁর কথা ছিল অতি স্পষ্ট, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। মূসা ইবন তালহা তাঁর একজন ছাত্র। ইমাম তিরমিজী 'মানাকিব' পরিচ্ছেদে তার এ মন্তব্য–

ما رأيت أفصح من عائشة -

বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ– 'আমি আয়িশার (রা) অপেক্ষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।' মুসতাদরিকে হাকেমে আহনাফ ইবন কায়সের একটি মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি আয়িশার (রা) মুখের চমৎকার বর্ণনা ও শক্তিশালী কথার চেয়ে ভালো কথা আর শুনিনি। হযরত 'আয়িশার (রা) থেকে যে শত শত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর নিজের ভাষার অনেক বর্ণনাও সংরক্ষিত হয়েছে। সেগুলি পাঠ করলে তার মধ্যে চমৎকার এক শিল্পরূপ পরিলক্ষিত হয়। তাতে রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা)

---

৪০৫. প্রাগুক্ত ঃ বাবু ওফাতুন নাবিয়্যি (সা)

৪০৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/১৫০, ২৭২

৪০৭. বুখারী ঃ জিকরু বনী কুরায়জা.

৪০৮. প্রাগুক্ত ঃ বাবু আশাদ্দু মা বাকিয়ান নাবিয়্যি (সা)

৪০৯. দেখুন ঃ প্রাগুক্ত ঃ বাবু ওফাতুন নাবিয়্যি; কিতাবুল ফারায়িজ, গাযওয়াতুন খায়বার; সহীহ মুসলিম ঃ বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (সা)-মা তারাকনা ফাওয়া সাদাকাতুন

উপর ওহী নাযিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ ৪১০

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم، فكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح -

অর্থাৎ "প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহী লাভ করতেন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন না কেন, তা প্রভাতের দীপ্তির মত উদ্ভাসিত হতো।" হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সত্য স্বপ্নসমূহকে প্রভাতের দীপ্তি ও কিরণের সাথে তুলনা করেছেন। ওহী লাভের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকে ঘাম জমতো। এই ঘামের ফোঁটাকে তিনি উজ্জ্বল মোতির দানার সাথে তুলনা করেছেন। মুনাফিকরা যখন তাঁকে নিয়ে কুৎসা রটনা করেছিলো, তাঁর চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করেছিলো, তখন সেই দিনগুলি যে কেমন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তার একটা সুন্দর চিত্র আমরা পাই তাঁর বর্ণনার মধ্যে। সেই সময়ে তাঁর জীবনের একটি রাতের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ৪১১

فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا اكتحل بنوم -

অর্থাৎ "সারারাত আমি কাঁদলাম। সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও শুকায়নি এবং আমি চোখে ঘুমের সুরমাও লাগাইনি।" তিনি সে রাতটি বিনিদ্র অবস্থায় এবং চোখের পানি ঝরিয়ে কাটিয়েছেন, সে কথাটি সরাসরি না বলে একটি সুন্দর চিত্রকল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। চোখে ঘুম আসাকে তিনি চোখে সুরমা লাগানোর সাথে তুলনা করেছেন। ভাষায় প্রচণ্ড অধিকার থাকলেই কেবল এমনভাবে বলা যায়। একবার তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এমন দুইটি চারণভূমি থাকে– যার একটিতে পশু চারিত হয়েছে, আর অন্যটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে। তখন আপনি কোনটিতে উট চরানো পছন্দ করবেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যেটি সুরক্ষিত আছে, সেটিতে। মূলত ঃ তিনি জানতে চেয়েছেন, যে নারী স্বামীসঙ্গ লাভ করেছে, আর যে লাভ করেনি, এর কোনটিকে আপনি পছন্দ করেন? আসলে তিনি নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছার কথা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরাসরি সে কথাটি না বলে একটি উপমার মাধ্যমে চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে একমাত্র 'আয়িশা (রা) ছিলেন কুমারী। অন্যরা সকলেই ছিলেন হয় বিধবা, নয়তো স্বামী পরিত্যক্তা।

হযরত 'আয়িশা (রা) প্রাচীন আরবের অনেক লোক কাহিনীও জানতেন এবং সুন্দরভাবে তা বর্ণনাও করতে পারতেন। হাদীসের কোন কোন গ্রন্থে তাঁর বলা দুই একটি গল্প বর্ণিত

---

৪১০. প্রাগুক্ত ঃ কায়ফা কানা বুদউল ওহয়ি

৪১১. প্রাগুক্ত ঃ বাবু হাদীসুল ইফ্ক

হয়েছে। আরবের এগারো সহদরার একটি দীর্ঘ কাহিনী তিনি একদিন স্বামী রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনিয়েছিলেন। রাসূল (সা) অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাঁর গল্প শোনেন।[৪১২] এ গল্পে তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি এবং শিল্পকারিতা লক্ষ্য করা যায়। শব্দ ও বাক্যালংকারের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

বক্তৃতা ভাষণ

বাগ্মী ও বাকপটু ব্যক্তিরাই বক্তৃতা-ভাষণ দিতে পারে। এ এক খোদাপ্রদত্ত গুণ। মানুষকে স্বমতে আনার জন্য, প্রভাবিত করার জন্য এ এক অসাধারণ শিল্প। সেই আদিকাল থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে সকল জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে এ শিল্পের চর্চা দেখা যায়। সেই প্রাচীন আরবদের মধ্যে এর ব্যাপক চর্চা ছিল। জাহিলী আরবের বড় বড় খতীব এবং তাদের খুতবা বা ভাষণের কথা ইতিহাসে দেখা যায়। নানা কারণ ও প্রয়োজনে ইসলামী আমলে এই খুতবা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতি ও বিকাশ ঘটে। পুরুষদের গণ্ডি অতিক্রম করে নারীদের মধ্যেও এর বিস্তার ঘটে। হযরত 'আয়িশা (রা) একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা খতিব বা বক্তা ছিলেন। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) বহু খুতবা বা বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। উটের যুদ্ধের ডামাডোলের সময় তিনি যে সকল খুতবা দিয়েছিলেন তাবারীর ইতিহাসে তা সংকলিত হয়েছে। ইবন আবদি রাব্বিহি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'আল-ইকদুল ফারীদ'* এ তার কিছু নকল করেছেন।[৪১৩]

বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা যেমন একজন সুবক্তার অন্যতম গুণ, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ, উচ্চকণ্ঠ এবং ভাব-গাম্ভীর্যের অধিকারী হওয়াও তার জন্য জরুরী। হযরত আয়িশার (রা) কণ্ঠধ্বনি এমনই ছিল। তাবারী বর্ণনা করেছেন ঃ[৪১৪]

فتكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كثيرة كأنه صوت إمرأة جليلة -

"হযরত 'আয়িশা (রা) ভাষণ দিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তাঁর গলার আওয়ায অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করতো। যেন তা কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার গলার আওয়ায।"

আহনাফ ইবন কায়স একজন বিখ্যাত তাবেঈ। সম্ভবত ঃ তিনি বসরায় হযরত আয়িশার (রা) একটি ভাষণ শোনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'আমি হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমার (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) এবং এই সময় পর্যন্ত সকল খলীফার ভাষণ শুনেছি; কিন্তু আয়িশার (রা) মুখ থেকে বের

---

৪১২. সীরাতে আয়িশা (রা)-৫৪-৫৫

৪১৩. দেখুন ঃ কালকাশান্দীর 'সুবহুল আ'শা-১/২৪৮; ইবন আবদি রাব্বিহির-আল ইকসুল ফারীদ-২/১৫৬, ২০৬, ২২৬; মাহমুদ শুকরী আল-আলুসীর-নিহায়াতুল আরিব-৭/২৩০; ইবনুল আসীরের আল-কামিল-৩/১০৫; তাবারীর তারিখ-৫/১৭৫ ও শারহু ইবন আবী আল হাদীদ-২/৮১

৪১৪. তাবারী ঃ তারীখ-৫/১৭৫; জামহারাতু খুতাবিল আরাব-১/২৮৬

হওয়া কথায় যে কলামণ্ডিত সৌন্দর্য ও জোর থাকতো তা আর কারও কথায় পাওয়া যেত না।' আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী আহনাফ ইবন কায়সের মন্তব্যের উদ্ধৃতি টেনে বলছেন, 'আমার মতে, আহনাফ ইবন কায়সের এ কথা অতিরঞ্জিত থেকে মুক্ত নয়, তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আয়িশা (রা) একজন স্বচ্ছন্দ ও শুদ্ধভাষী বক্তা ছিলেন।'[৪১৫]

আহনাফের মত ঠিক একই রকম মন্তব্য করেছেন হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা) ও মূসা ইবন তালহা। উটের যুদ্ধের সময়ে তিনি যে সকল বক্তৃতা ভাষণ দান করেছিলেন, তাতে যে আবেগ, শক্তি ও উত্তাপ দেখা যায় তা অনেকটা তুলনাহীন। পূর্বেই আমরা উটের যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর একটি ভাষণের অনুবাদ উপস্থাপন করেছি। এখানে আমরা তাঁর ঐ সময়ের আর একটি ভাষণের ছোট্ট উদ্ধৃতি টেনে এ আলোচনার সমাপ্তি টানবো।

হযরত 'আয়িশা (রা) যখন হযরত তালহা ও যুবাইরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে বসরায় পৌঁছলেন তখন বসরাবাসীরা 'আল মিরবাদ'-এ সমবেত হলো। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে প্রথমে তালহা (রা) তারপরে যুবাইর (রা) ভাষণ দিলেন। সবশেষে হযরত 'আয়িশা (রা) বক্তৃতা করলেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর হাম্‌দ এবং রাসূলের (সা) প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করলেন। তারপর বললেন ঃ[৪১৬]

كان الناس يتجنون على عثمان رضى الله عنه، ويزرون على عماله، ويأتوننا بالمدينة، فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم ، فننظر فى ذلك فنجده بريا، تقيا وفيا، ونجدهم فجرة غدرة كذبة ، يحاولون غير ما يظهرون، فلما قووا على المكاثرة كاثروه، واقتحموا عليه داره، واستحلوا الدم الحرام، والمال الحرام ، والبلد الحرام، بلاترة ولا عذر، ألا إن مما ينبغى، لا ينبغى لكم غيره، أخذ قتلة عثمان رضى الله عنه، وإقامة كتاب الله عزوجل: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، الاية -

"মানুষ ওসমানের (রা) অপরাধের কথা বলতো, তাঁর কর্মচারী-কর্মকর্তাদের প্রতি দোষারোপ করতো। তারা মদীনায় আসতো এবং তাঁদের সম্পর্কে নানা রকম তথ্য

---

৪১৫. সীরাতে আয়িশা-২৫০

৪১৬. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল ঃ ৩/১০৫; তাবারী ঃ আত-তারীখ-৫/১৭৫; জামাহারাতু খুতাবিল আরাব-১/২৮৬-২৮৭

আমাদেরকে জানিয়ে পরামর্শ চাইতো। আমরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতাম। আমরা উসমানকে (রা) পবিত্র, খোদাভীরু অঙ্গীকার পালনকারী হিসেবে দেখতে পেতাম। আর অভিযোগকারীরা আমাদের কাছে পাপাচারী, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদী বলে প্রতীয়মান হতো। তারা মুখে যা বলতো, তার বিপরীত কাজ করার চেষ্টা করতো। যখন তারা মুকাবিলা করার মত শক্তিশালী হলো সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তারা তাঁর উপর তাঁর বাড়ীতেই হামলা চালালো। যে রক্ত ঝরানো হারাম ছিল তা তারা হালাল করলো, আর যে মাল লুট করা, যে শহরের অবমাননা করা অবৈধ ছিল তা তারা বিনা দ্বিধায় ও বিনা কারণে বৈধ করে নিল। শোন! এখন যা করণীয় এবং যা ব্যতীত অন্য কিছু করা তোমাদের উচিত হবে না, তা হলো 'উসমানের (রা) হত্যাকারীদের ধরা এবং তাদের উপর কিতাবুল্লাহর হুকুম কার্যকরী করা। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরানের ২৩ নং আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে– আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অত ঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'

বসরায় তিনি আরেকটি আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তার কিছু অংশের অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেন একটা প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনা ঢেলে দিয়ে শ্রোতাদের সম্মোহিত করে তুলেছে। এখানে তাঁর মূল ভাষায় কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো ঃ[৪১৭]

أيهاالناس: صه صه، إن لى عليكم حق الأمومة وحرمةالموعظة، لا يتهمنى إلامن عصى ربه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرى ونحرى، فأنا إحدى نسائه فى الجنة، له ادخرنى ربى وخلصنى من كل بضاعة، وبي ميزمنافقكم من مؤمنكم ، وبى أرخص الله لكم فى صعيد الأبواء، ثم أبى ثانى اثنين الله ثالثهما وأول من سمى صديقا، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا عنه،... وأنا نصب المسألة عن مسيرى هذا، لم ألتمس أثما ولم أونس فتنة أوطئكموها...

'ওহে জনমণ্ডলী! চুপ করুন, চুপ করুন। নিশ্চয় আপনাদের উপর আমার মায়ের দাবী আছে, উপদেশ দানের অধিকার আছে। আমার প্রতি কেউ কলঙ্ক আরোপ করতে

৪১৭. আল-ইকদুল ফারীদ ৪/৩১৪-৩১৬

পারেনা– একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আমারই বুকে মাথা রেখে ইনতিকাল করেছেন। জান্নাতে আমি হবো তাঁর অন্যতম স্ত্রী। আমার রব আমাকে তাঁর জন্যই সংরক্ষিত রেখেছেন এবং অন্যদের থেকে পবিত্র রেখেছেন। আমার সত্তা দ্বারাই তোমাদের মুনাফিকদের তোমাদের মুমিনদের থেকে পৃথক করেছেন। আমার দ্বারাই আল্লাহ তোমাদেরকে আবওয়ার মাটিতে তায়াম্মুমের সুযোগ দিয়েছেন। অত ঃপর আমার পিতা সেই সাওর পর্বতের গুহায় দুই জনের মধ্যে দ্বিতীয়, আর আল্লাহ ছিলেন তৃতীয়। তিনিই সর্বপ্রথম সিদ্দীক উপাধি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি খুশী থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন.... হাঁ, এখন আমি মানুষের এই প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছি যে, আমি কিভাবে বাহিনী নিয়ে বের হলাম? এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য কোন পাপের বাসনা ও ফিত্না ফাসাদের অন্বেষণ করা নয়....।"

চিঠি-পত্র

আরবী সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য প্রাচীন সংকলনসমূহে হযরত 'আয়িশার (রা) বহু গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দেখতে পাওয়া যায়। সে সব চিঠি তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিকট লিখেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এ সব চিঠি কি তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন না তার পক্ষ থেকে কোন সেক্রেটারি এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন? যিনিই লিখুন না কেন, তার ভাব ও ভাষা যে হযরত আয়িশার (রা) ছিলনা, এমন কোন প্রমাণ নেই। তাই আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কালের পণ্ডিতরা হযরত আয়িশার এ সব চিঠির সাহিত্য-মূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিয়ে গেছেন। ইবন আবদি রাব্বিহি আল-আন্দালুসীর বিখ্যাত সংকলন– 'আল-ইকদুল ফরীদ'–এর ৪র্থ খণ্ডে তার অনেকগুলি চিঠি সংকলিত হয়েছে। যেমন, তিনি বসরায় পৌঁছে তথাকার এক নেতা যায়িদ ইবন সুহানকে লিখেছেন ঃ[৪১৮]

من عائشة أم المؤمنين إلى إبنها الخالص زيد بن صوحان، سلام عليك ، أما بعد، فإن أباك كان رأسا فى الجاهلية وسيدا فى الاسلام ، وإنك من ابيك بمنزلة المصلى من السابق يقال كاد آولحق وقد بلغك الذى كان فى الاسلام من مصاب عثمان بن عفان، ونحن قادمون عليك، والعيان أشفى لك من الخبر. فإذا أتاك كتابى هذا فثبط الناس عن على بن أبى طالب، وكن مكانك حتى يأتيك أمرى، والسلام -

৪১৮. প্রাগুক্ত ঃ ৪/৩১৬-৩২০

"উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) পক্ষ থেকে তার নিষ্ঠাবান ছেলে যায়িদ ইবন সুহানের প্রতি। সালামুন আলাইকা। অত ঃপর তোমার পিতা জাহিলী আমলে নেতা ছিলেন, ইসলামী আমলেও। তুমি তোমার পক্ষ থেকে মাসবূক মুসল্লীর অবস্থানে আছ যাকে বলা যায় প্রায় অথবা নিশ্চিতভাবে লাহেক হয়েছে। তুমি জেনেছো যে, উসমান ইবন আফ্ফান হত্যার মাধ্যমে ইসলামে কী বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। চাক্ষুস দেখা সংবাদের চেয়ে অধিক স্বস্তিদায়ক। তোমার কাছে আমার এ চিঠি পৌঁছার পর মানুষকে আলী ইবন আবী তালিবের পক্ষাবলম্বন থেকে ঠেকিয়ে রাখবে। তুমি তোমার গৃহে অবস্থান করতে থাক, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ তোমার কাছে যায়। ওয়াস্ সালাম্।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) উপরোক্ত চিঠির যে জবাব যায়িদ ইবন সুহান দিয়েছিলেন তা একটু দেখার বিষয়। আমরা সেই চিঠিটি তুলে দিয়ে এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানছি। যায়িদ ইবন সুহান লিখলেন ঃ[৪১৯]

من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين سلام عليك، أما بعد، فإنك أمرت بأمر و أمرنا بغيره، أمرت أن تقر فى بيتك، وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة، فتركت ما أمرت به وكتبت تنهينا عما أمرنا به والسلام -

"যায়িদ ইবন সুহানের পক্ষ থেকে উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশার (রা) প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অত ঃপর, আপনাকে কিছু কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভিন্ন কিছু কাজের। আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঘরে অবস্থান করার জন্য, আর আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য– যতক্ষণ ফিত্না দূরীভূত না হয়। আপনি ছেড়ে দিয়েছেন যা আপনাকে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আপনি লিখেছেন। ওয়াস সালাম।"

হযরত 'আয়িশার (রা) কাব্যপ্রীতি

ইসলাম-পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি কাব্যরসিক জাতি। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাদের নিকট কবির স্থান ছিল সবার উপরে। তারা কবি ও নবীকে একই কাতারের মানুষ বলে মনে করতো। তাইতো তারা রাসূলুল্লাহকেও (সা) কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল। ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী জাহিলী আরবে কবির স্থান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ[৪২০]

---

৪১৯. প্রাগুক্ত ঃ ৪/৩১৭-৩১৮

৪২০. কিতাবুল 'উমদাহ-১/৭৮

كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعين بالمزاهر، كما يصنعون فى الأعراس، ويتباشر الرجال والولدان، لأنه (اى الشاعر)حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وإشادة بذكرهم...

"আরবের কোন গোত্রে যখন কোন কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে অভিনন্দন জানাতো। নানা রকম খাদ্যদ্রব্য তৈরী করা হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের মত মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো। পুরুষ ও শিশু-কিশোররা এসে আনন্দ প্রকাশ করতো। এর কারণ, কবি তাদের মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক।"

প্রাচীন আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন কাব্যচর্চার প্লাবন বয়ে চলেছে। অসংখ্য কবির নাম পাওয়া যায় যা গুণেও শেষ করা যাবে না। ইবন কুতায়বা বলেছেন ঃ[৪২১]

والشعراء المعوفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فى الجاهلية والاسلام أكثر من أن تحيط بهم محيط -

"কবিরা– যাঁরা কবিতার জন্যে তাদের সমাজে ও গোত্রে জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন তাঁদের সংখ্যা এত বেশী যে কেউ তা শুমার করতে পারবে না।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ[৪২২]

ولو قصدنا لذكر من لم يقل من الشعر الا الشذ اليسير لذكرنا أكثر الناس -

"যারা কবিতা বলেনি– তাদের সংখ্যা খুবই কম– তাদের নাম যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই তাহলে অধিকাংশ লোকের নাম উল্লেখ করতে পারবো।"

রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন ঃ[৪২৩]

قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فى الانصار بيت إلا وهو يقول الشعر -

---

৪২১. আশ-শি'রু ওয়াশ্ শু'য়ারাউ-পৃ. ৩

৪২২. প্রাগুক্ত-পৃ. ৩

৪২৩. আল-ইকদুল ফারীদ-৫/২৮৩

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আমাদের এখানে আসেন তখন আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা হতো।"

মোটকথা একজন আরব কবি তার কবিতার মাধ্যমে কোথাও যেমন আগুন জ্বালিয়ে দিত তেমনিভাবে কোথাও জীবনের বারি বর্ষণও করতো। এ গুণটি কেবল পুরুষদের সাথে সংযুক্ত ছিল না; বরং নারীরাও এর সাথে প্রযুক্ত ছিল। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরেও শতবর্ষ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে আরবীয় এ গুণ-বৈশিষ্টটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সে আমলের এমন অসংখ্য নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁরা কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় এমন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে, তাঁদের কথা আরবী কাব্যজগতের একেকটি সৌন্দর্যে পরিণত হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) আরবের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমন একটি পর্বে জন্মলাভ করেন। তাঁর নিজের পরিবারেও কবিতার চর্চা ছিল। পিতা আবু বকর (রা) একজন কবি ছিলেন।[৪২৪] প্রখ্যাত তাবে'ঈ হযরত সা'ঈদ ইবন আল-মুসয়্যিব বলেন ঃ[৪২৫]

كان ابوبكر شاعرا، وعمر شاعرا وعلى أشعر الثلاثة ـ

"আবু বকর (রা) কবি ছিলেন। 'উমার (রা) কবি ছিলেন। আর আলী (রা) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।"

তাই বলা চলে পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্যশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। কবিতার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, চিত্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যেসব মন্তব্য ও মতামত রেখেছেন তাতে এ শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণিত হয়। তাঁর এক গুণমুগ্ধ শাগরিদ আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বলেছেন ঃ[৪২৬]

ما كنت أعلم أحدا من أصحاب رسول صلعم أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة رضى الله عنها ـ

"রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীদের মধ্যে কাব্য ও ফারায়েজ শাস্ত্রে আয়িশার (রা) চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে এমন কাউকে আমি জানিনে।"

হযরত উরওয়া ইবন যুবাইর ঠিক একই রকম কথা বলেছেন।[৪২৭] তাঁর অন্য একজন শাগরিদ বলেছেন, "আমি আয়িশার (রা) কাব্য-জ্ঞান দেখে বিস্মিত হইনে। কারণ তিনি আবু বকরের (রা) মেয়ে।"

হযরত 'আয়িশা (রা) নিজেও একজন কবি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি যে

---

৪২৪. মুসনাদ -৬/৬৭
৪২৫. আল-ইকদুল ফারীদ-৫/২৮৩
৪২৬. প্রাগুক্ত -৫/২৭৪
৪২৭. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ-১/২৮

শোকগাঁথাটি রচনা করেন, তার কিছু অংশ আল্লামা আলুসী তাঁর *'বুলুগুল আরিব'* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে সংকলন করেছেন।

ইমাম বুখারী *'আদাবুল মুফরাদ'* গ্রন্থে হযরত 'উরওয়ার একটি বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত কা'ব ইবন মালিকের (রা) একটি পূর্ণ কাসীদা হযরত 'আয়িশার (রা) মুখস্থ ছিল। একটি কাসীদায় কম-বেশী চল্লিশটি শ্লোক ছিল![৪২৮] হযরত 'আয়িশা (রা) বলতেন ঃ[৪২৯]

رَوُّوْا أَوْلَادَكُمْ الشِّعْرَ تَعْذُبُ أَلْسِنَتُهُمْ -

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও। তাতে তাদের ভাষা মাধুরীময় হবে।"

জাহিলী ও ইসলামী যুগের কবিদের বহু কবিতা হযরত 'আয়িশার (রা) মুখস্থ ছিল। সেই সকল কবিতা বা তার কিছু অংশ সময় ও সুযোগমত উদ্ধৃতির আকারে উপস্থাপন করতেন। তার বর্ণিত বহু কবিতা বা পংক্তি হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত 'আয়িশাকে (রা) জিজ্ঞেস করে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি কখনও কবিতা আবৃত্তি করেছেন? বললেন ঃ হাঁ, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার কিছু শ্লোক তিনি আবৃত্তি করতেন। যেমন ঃ[৪৩০]

ويأتيك بالأخبار من لم تزود -

"তমি যাকে পাথেয় দিয়ে পাঠাওনি সে অনেক খবর নিয়ে তোমার কাছে আসবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন শুনলেন, 'আয়িশা (রা) কবি যুহাইর ইবন জানাবের নিম্নোক্ত পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করছেন ঃ[৪৩১]

ارفع ضعيفك لا يحربك ضعفه + يوما فتدركه عواقب ماجنى

يخزيك أويثنى عليك فاءن من + أثنى عليك بما فعلت كمن جزى -

"তুমি উঠাও তোমার দুর্বলকে। যার দুর্বলতা তোমার বিরুদ্ধে কোন দিন যুদ্ধ করবে না। অত ঃপর সে যা অর্জন করেছে তার পরিণতি সে লাভ করবে।

সে তোমাকে প্রতিদান দিবে, অথবা তোমার প্রশংসা করবে। তোমার কর্মের যে প্রশংসা করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে প্রতিদান দিয়েছেন।"

পংক্তি দুইটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'আয়িশা! সে সত্য বলেছে। যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

আবু কাবীর আল-হুজালী একজন জাহিলী কবি। তিনি তাঁর সৎ ছেলে কবি তায়াব্বাতা শাররান–এর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। যার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ[৪৩২]

---

৪২৮. বাবু ঃ আশ-শি'রু হাসানুন কা হাসানিল কালাম

৪২৯. আল-ইকদুল ফারীদ–৫/২৭৪

৪৩০. আদাবুল মুফরাদ-বাব ঃ আশ-শি'রু হাসানুন কা হাসানিল কালাম

৪৩১. আল-ইকদুল ফারীদ-৫/২৭৫

৪৩২. হাফেজ ইবন কায়্যিম তাঁর মাদারিজুস সালিকীন গ্রন্থে পংক্তি দুইটি বর্ণনা করেছেন। পৃ. ২৭৭ (মিসর)

ومبرء من كل غير حيفة + وفساد مرضعة وداء مغيل

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه + برقت كبرق العارض المتهلل

"সে তার মায়ের গর্ভের সকল অশুচিতা এবং
দুধদানকারী ধাত্রীর যাবতীয় রোগ-থেকে মুক্ত।
যখন তুমি তার মুখমণ্ডলের মজবুত শিরা উপশিরার দিকে
দৃষ্টিপাত করবে, তখন তা প্রবল বর্ষণের সাথে
বিদ্যুতের চমকের মত চমকাতে দেখবে।"

হযরত 'আয়িশা (রা) একদিন উপরোক্ত শ্লোক দুইটি রাসূলুল্লাহকে (সা) শুনিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই তো এ দুইটি শ্লোকের বেশী হকদার। তাঁর এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) উৎফুল্ল হন।

'আয়িশা (রা) নিম্নের দুইটি বয়েত দিয়ে প্রায়ই মিছাল দিতেন ঃ[৪৩৩]

إذا ما الدهر جرى على أناس + حوادثه أناخ بآخرينا

فقل للشامتين بنا أفيقوا + سيلقى الشامتون كما لقينا ـ

"কালচক্র যখন তার বিপদ মুসীবত সহ কোন জনমণ্ডলীর উপর দিয়ে ধাবিত হয় তখন তা আমাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে থামে। আমাদের এ বিপদ দেখে যারা উৎফুল্ল হয় তাদের বলে দাও– তোমরা সতর্ক হও। খুব শিগগিরই তোমরাও মুখোমুখি হবে, যেমন আমরা হয়েছি।"

হযরত 'আয়িশার (রা) ভাই আবদুর রহমান ইবন আবী বকরের (রা) ইনতিকাল হয় মক্কার পাশে এবং মক্কায় দাফন করা হয়। পরে যখন হযরত 'আয়িশা (রা) মক্কায় যান তখন ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করেন ঃ[৪৩৪]

وكنا كندمانى جذيمة حقبة + من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقا كأنى ومالكا + لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ـ

"আমরা দুইজন বাদশাহ জাজীমার দুইজন সহচরের মত একটা দীর্ঘ সময় একসাথে থেকেছি। এমনকি লোকে আমাদের সম্পর্কে বলাবলি করতো যে, আমরা আর কখনও পৃথক হবোনা।

অত ঃপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি ও মালিক যেন দীর্ঘকাল

---

৪৩৩. আল-ইদুল ফারীদ-২/৩২২। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী এই বয়েত দুইটি কবি আল-ফারাযদাকের মামা কবি আল-আলা' ইবন কারাজা-এর বলে উল্লেখ করেছেন। (আল-আগানী, মাতবায়াতু বুলাক, মিসর,খণ্ড ১৯,পৃ. ৪৯)

৪৩৪. তিরমিজী ঃ যিয়ারাতুল কুবুর লিন্-নিসা

সহঅবস্থান সত্ত্বেও একটি রাতও এক সাথে কাটাইনি।"

মক্কার মুহাজিরদের শরীরে প্রথম প্রথম মদীনার আবহাওয়া খাপ খাচ্ছিল না। হযরত আবু বকর (রা), হযরত 'আমির ইবন ফুহায়রা (রা), হযরত বিলাল (রা) এবং আরো অনেকে, এমনকি খোদ 'আয়িশা (রা) মদীনায় আসার পর প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বরের ঘোরে তাঁদের অনেকের মুখ থেকে তখন কবিতার পংক্তি উচ্চারিত হতো। এমন কিছু পংক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) স্মৃতিতে ছিল এবং তিনি বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবু বকরের (রা) জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আওড়াতেন ঃ[৪৩৫]

كل إمرئ مصبح فى أهله

والموت أدنى من شراك نعله -

"প্রতিটি মানুষ তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে দিনের সূচনা করে।
অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও বেশী নিকটবর্তী।"

হযরত বিলাল (রা) জ্বরের ঘোরে নিম্নের পংক্তি দুইটি জোরে জোরে আওড়াতেন ঃ

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة + بوالى حولى ذخر وجليل

وهل أردن يوما مياه مجنة + وهل يبدون لى شامة وطفيل

"হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, কোন একটি রাত আমি মক্কার উপত্যকায় কাটাবো এবং আমার চারপাশে ইজখীর ও জলী ঘাস থাকবে। অথবা মাজান্নার সরোবরে কোন একদিন আমার বিচরণ ঘটবে, অথবা শামা ও তুফায়েল পর্বতদ্বয় কোনদিন আমার দৃষ্টিগোচর হবে!"

হযরত 'আমির ইবন ফুহাইরাকে (রা) তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে এই পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন ঃ[৪৩৬]

إنى وجدت الموت قبل ذوقه + إن الجبان حتفه من فوقه -

"আমি স্বাদ চাখার আগেই সত্যকে পেয়ে গেছি। ভীরু-কাপুরুষের মৃত্যু তার উপর দিক থেকেই আসে।"

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের অনেক বড় বড় নেতা নিহত হয় এবং তাদেরকে বদরের কুয়োয় নিক্ষেপ করা হয়। কুরাইশ কবিরা তাঁদের স্মরণে অনেক আবেগজড়িত মরসিয়া রচনা করেছিল। সেই সকল কবিতার অনেক পংক্তি হযরত 'আয়িশার (রা) স্মৃতিতে ছিল এবং তিনি তা বর্ণনাও করেছেন। নিম্নের বয়েত দুইটিও তিনি বর্ণনা করেছেন।[৪৩৭]

---

৪৩৫. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ্

৪৩৬. মুসনাদ-৬/৬৫

৪৩৭. সহীহ বুখারী ঃ বাবুল হিজরাহ

وماذا بالقليب بدر + من القينات والشرب الكرام

تحى بالسلامة أم بكر + وهل لى بعد قومى من سلام -

"বদরের কূপের মধ্যে কতনা নর্তকী ও অভিজাত শরাবখোর পড়ে আছে, তাদের অবস্থা কি? উম্মে বকর তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছে। আমার স্বগোত্রের লোকদের মৃত্যুর পরে আমার জন্য কোন শান্তি আসতে পারে কি?"

হযরত সা'দ ইবন মু'য়াজ (রা) খন্দক যুদ্ধের সময় আরবী রজয ছন্দের একটি গানের একটি কলি আওড়াতেন, তাও হযরত 'আয়িশা (রা) মনে রেখেছিলেন। সেটি তিনি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ليت قليلا يدرك الهيجا جمل + ما أحسن الموت إذا حان الأجل -

"হায়! যদি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে উট যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যেত। মরণের সময় যখন ঘনিয়ে এসেছে তখন সে মরণ কতনা প্রিয়।"

মক্কার কুরাইশ কবিরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দায় কবিতা বলতো তখন মদীনার মুসলমান কবিরা কিভাবে তার জবাব দিতেন, সে কথাও আমরা হযরত 'আয়িশার (রা) মাধ্যমে জানতে পারি। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কুরাইশদের নিন্দা করে কবিতা রচনা কর। এ কবিতা তাদের উপর তরবারির আঘাতের চেয়েও বেশী কার্যকর হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) একজন কবি ছিলেন। তিনি একটি কবিতা রচনা করলেন; কিন্তু তা রাসূলুল্লাহর (সা) তেমন পছন্দ হলো না। তিনি কবি কা'ব ইবন মালিককে (রা) নির্দেশ দিলেন কুরাইশদের জবাবে একটি কবিতা লিখতে। অবশেষে হযরত হাসসান ইবন সাবিতের পালা এলো। তিনি এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমি তাদের এমন বিধ্বস্ত করে ছাড়বো, যেমন লোকেরা চামড়াকে করে থাকে।' রাসূল (সা) বললেন ঃ তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। আবু বকর গোটা কুরাইশ খান্দানের মধ্যে কুরাইশদের নসবনামা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ। আমারও তাঁর সাথে নিকট সম্পর্ক। আমার বংশসূত্র তাঁর কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নাও। অত ঃপর তিনি আবু বকরের (রা) নিকট যান এবং বংশসূত্রের নানা রকম প্যাঁচ ও জটিলতা সম্পর্কে জেনে আবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই জাতের কসম! যিনি আপনাকে সত্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাকে তাদের থেকে এমনভাবে বের করে আনবো, যেমন লোকেরা আটার দলা থেকে চুল টেনে বের করে আনে। তারপর হাস্সান (রা) একটি কাসীদা পাঠ করেন যার একটি বয়েত এই ঃ

إن سنام المجد من ال هاشم + بنو بنت مخزوم ووالدك

"আলে হাশিমের সম্মান ও মর্যাদার শিখর হচ্ছেন মাখযূমের নাতি। আর তোমার বাপ ছিল দাস।"

হযরত 'আয়িশা (রা) বলছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, 'হাস্সান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, রুহুল কুদুসের সাহায্য তুমি লাভ করবে।' তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথাও বলতে শুনেছি, 'হাস্সান তাদের জবাব দিয়ে দু ঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করেছে।' এসব কথা বর্ণনার পর উম্মুল মুমিনীন আমাদেরকে হাসসানের এ কাসীদাটিও শুনিয়েছেন ঃ[৪৩৮]

هجوت محمدا فاجبت عنه + عند الله فى ذلك الجزاء

هجوت محمدا براً حنيفا + رسول الله شيمته الوفاء

فان أبى ووالده وعرضى + لعرض محمد منكم وقاء

فمن يهجورسول الله منكم + ويمدحه وينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا + وروح القدس ليس له كفاء.

"তুমি করেছো মুহাম্মাদের নিন্দা, আর আমি তার জবাব দিয়েছি। আমার এ কাজের প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর কাছে।

তুমি মুহাম্মাদের নিন্দা করেছো, যিনি সৎকর্মশীল, ধার্মিক ও আল্লাহর রাসূল। প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা পালন যার স্বভাব-বৈশিষ্ট।

আমার বাপ-দাদা আমার ইজ্জত-আবরু সবই তোমাদের আক্রমণ থেকে মুহাম্মাদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য ঢাল স্বরূপ।

তোমাদের মধ্য থেকে কেউ রাসূলুল্লাহর নিন্দা, প্রশংসা বা সাহায্য করুক না কেন, সবই তাঁর জন্য সমান।

জিবরীল আমাদের মধ্যে আছেন। যিনি আল্লাহর বার্তাবাহক ও পবিত্র রূহ–যার সমকক্ষ কেউ নেই।"

হযরত 'উসমানের (রা) শাহাদাতের পর মদীনার বিশৃঙ্খল অবস্থার কথা যখন জানলেন তখন তাঁর মুখে নিম্নোক্ত পংক্তিটি উচ্চারিত হলো ঃ[৪৩৯]

ولو أن قومى طاوعتنى سراتهم +لا نقذتهم من الحبال والخبل

"যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতারা আমার কথা মানতো তাহলে আমি তাদের এই ফাঁদ ও ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারতাম।"

বসরা পৌঁছার পর তাঁর মুখে নিম্নের দুইটি বয়েত শোনা যেত ঃ

دعى بلاد جموع الظلم اذ صلحت + فيها المياه وسيرى سير مذعور

---

৪৩৮. এই ঘটনা ও কাসীদাটি সহীহ মুসলিমে 'মানাকিবে হাস্সান' পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে

৪৩৯. দেখুন ঃ তাবারী ব্রীলি সংস্করণ, পৃ. ৩০৯৯, ৩১০৫, ৩২০১

تخيرى النبت فارعى ثم ظاهرة + وبطن واد من الضماد ممطور -

"অত্যাচারীদের আবাসভূমি ছেড়ে দাও– যদিও সেখানে পানি বিশুদ্ধ থাকে এবং ভীতিগ্রস্তদের চলার মত চল।

ঘাস নির্বাচন কর। অতঃপর দামাদের সবুজ উপত্যকায় রোদের মধ্যে চরতে থাক।"

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উটের যুদ্ধে কোন কোন বীর সৈনিক রজয ছন্দের যে চরণ দুইটি আবৃত্তি করেছিলেন, তা হযরত আয়িশার (রা) স্মরণে ছিল। একবার তিনি চরণ দুইটি আবৃত্তি করে খুব কেঁদেছিলেন। সেই চরণ দুইটি এই ঃ

يا أمنا يا خير ام نعلم + أما ترين كم شجاع يكلم

وتختلى هامته والمعصم -

"হে আমাদের মা! যাঁকে আমরা সর্বোত্তম মা বলে জানি, আপনি কি দেখছেন না, কত বীর আহত হয়েছে, কত মাথা ও হাত ঘাসের মত কাটা গেছে।"

হিশাম ইবন 'উরওয়া তাঁর পিতা 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। 'আয়িশা (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কবি লাবীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন! তিনি বলতেন ঃ[৪৪০]

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم + وبقيت فى خلف كجلد الأجرب

"যাঁদের পাশে বসবাস করা যেত, তাঁরা সব চলে গেছেন। এখন আমি বেঁচে আছি চর্মরোগগ্রস্ত উটের মত উত্তরসূরীদের মাঝে।"

তারপর হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ

"তিনি যদি আমাদের এ কালের অবস্থা দেখতেন, তাহলে কী বলতেন! আমি কবি লাবীদের এ রকম হাজারটি বয়েত বলতে পারি। অবশ্য অন্য কবিদের যে পরিমাণ বয়েত আমি বলতে পারি তার তুলনায় এ অতি নগণ্য।"

হযরত 'আয়িশার (রা) এ মন্তব্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, তিনি কি পরিমাণ কাব্যরসিক ছিলেন, এ শাস্ত্রে তাঁর কি পরিমাণ দখল ছিল এবং কত শত আরবী বয়েত তাঁর মুখস্থ ছিল। আমরা হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি, কী অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি সেখানে রেখেছেন! আরবী কবিতার ক্ষেত্রে একই দৃশ্য দেখা যায়।

হযরত 'আয়িশার (রা) এমন কাব্যরুচি এবং শিল্পরস আস্বাদন ক্ষমতা দেখে অনেক কবি তাঁকে নিজের কবিতা শোনাতেন। হযরত হাস্সান ইবন সাবিত (রা) আনসারদের মধ্যে কবিত্বের স্বীকৃত উসতাদ ছিলেন। ইফ্কের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে হযরত

---

৪৪০. আল-ইকদুল ফারীদ–২/৩৩৯; ৫/২/৭৫

'আয়িশার (রা) তাঁর প্রতি অসন্তোষ থাকা স্বাভাবিক ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হযরত 'আয়িশার (রা) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে নিজের কবিতা শোনাতেন।[৪৪১] হযরত 'আয়িশা (রা) তার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করতেন। তাছাড়া প্রসঙ্গক্রমে নবীর (সা) জলসার অপর দুইজন শ্রেষ্ঠ কবি হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) নামও উল্লেখ করতেন।[৪৪২]

মূলগতভাবে কাব্যচর্চা করা না ভালো, না মন্দ। কবিতাও কথার একটি প্রকার। কথার ভালো মন্দ কবিতার ছন্দের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তু যদি খারাপ না হয় তাহলে সেই কবিতায় কোন দোষ নেই। গদ্যেরও ঠিক একই অবস্থা। ভালোমন্দ নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপর।

কবিতার ভালোমন্দ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) ঠিক এ রকম কথাই বলেছেন ঃ[৪৪৩]

الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القابح -

"কিছু কবিতা ভালো হয়, কিছু কবিতা খারাপ হয়। ভালোটি গ্রহণ কর, খারাপটি পরিত্যাগ কর।"

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার ঐ কবি, যে গোটা গোত্রের নিন্দা করে। অর্থাৎ এক দুই জনের খারাপ কাজের জন্য গোটা গোত্রের নিন্দা করা নৈতিকতার পদস্খলন এবং কবিত্ব শক্তির অপব্যবহার মাত্র।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, হযরত 'আয়িশা (রা) এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা যার বর্ণনা ও মূল্যায়ন কোন সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁর জীবন ও বিচিত্রমুখী প্রতিভার বিবরণের জন্য প্রয়োজন একখানি বৃহদাকৃতির গ্রন্থের। আমাদের আলোচনায় আমরা তাঁর কিছু পরিচয় পাঠকবর্গের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

---

৪৪১. সহীহ বুখারী ঃ মানকিবু হাস্সান

৪৪২. প্রাগুক্ত

৪৪৩. আদাবুল মুফরাদ ঃ বাবুশ শি'রু

হাফসা বিন্‌ত 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) কন্যা। মা খুযা'আ গোত্রের মেয়ে যয়নাব বিন্‌ত মাজ'উন প্রখ্যাত সাহাবী উসমান ইবন মাজ'উনের আপন বোন। তিনি নিজেও একজন সাহাবী। 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার ও হাফসা আপন ভাই-বোন।[১] হাফসা আবদুল্লাহর চেয়ে ছয় বছরের বড়।[২] রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উমার (রা) বলেন ঃ মক্কার কুরাইশরা তখন কা'বা ঘরের পুন ঃনির্মাণের কাজে ব্যস্ত।[৩]

বিয়ের বয়স হলে পিতা 'উমার ইবনুল খাত্তাব বনু সাহ্‌ম গোত্রের সন্তান খুনাইস ইবন হুজাফার সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে দেন। এই খুনাইস মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হাবশায় হিজরাতকারী দ্বিতীয় দলটির সাথে হাবশায় হিজরাত করেন।[৪] অবশ্য মূসা ইবন 'উকবা ও আবু মা'শার তাঁর হাবশায় হিজরাতের কথা উল্লেখ করেননি।[৫] সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে আবার মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় পৌঁছে কুবার বনু 'আমর ইবন আওফ গোত্রের রিফা'য়া ইবন আবদুল মুনজিরের গৃহে আশ্রয় নেন।[৬]

হাফসার (রা) ইসলাম গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়না। তবে এতটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, উমার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁর নিজ গোত্র ও খান্দানের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। সম্ভবত ঃ হাফসাও সেই সময় পরিবারের লোকদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭]

স্বামীর সাথে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় আসার অল্পকাল পরেই বিধবা হন। তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও হয়নি।[৮] খুনাইসের মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে তিনি বদর ও উহুদ উভয় যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদে তাঁর দেহে একাধিক স্থানে জখম হয় এবং মদীনায় ফিরে এসে তাতেই মারা যান।[৯] ভিন্ন মতে তিনি বদরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন বা জখম হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বদর থেকে মদীনায় ফেরার পর হিজরী দ্বিতীয়

---

১. উসুদুল গাবা- ৫/৪২৫; আল-ইসতী'য়াব-৪/২৬৮,
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭.
৩. তাবাকাত- ৮/৫৬; তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-২/২২১
৪. তাবাকাত-৮/৫৬; উসুদাল গাবা-৫/৪২৫
৫ আনসাবুল আশরাফ- ১/২১৪
৬. ইবন হিশাম-১/৪৭৭
৭. সাহাবিয়াত-৬৫
৮. ডঃ আহমাদ শালবা-আত-তারীখ আল-ইসলামী ১/৩৩১;
৯. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাতুল মাশাহীর-২/২২১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, টীকা-২/২২৭

সনে তিনি মারা যান।[১০]

মেয়ে বিধবা হওয়ার পর পিতা উমার (রা) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ও হযরত উসমানের স্ত্রী রুকাইয়্যা (রা) ইনতিকাল করেন। উমার (রা) সর্বপ্রথম উসমানের সাথে দেখা করে তাঁর সাথে হাফসার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 'উসমান বিষয়টি ভেবে দেখবো বলে সময় নেন। কয়েক দিন পর, 'আমি এ সময় বিয়ে করতে চাচ্ছি না'– বলে জবাব দেন। তারপর উমার গেলেন আবু বকরের (রা) কাছে। বললেন ঃ আপনার সাথে আমি হাফসাকে বিয়ে দিতে চাই। আবু বকর চুপ থাকলেন, কোন জবাব দিলেন না। উসমানের জবাবে উমার যতখানি আহত হন তার চেয়ে বেশী হন আবু বকরের আচরণে। 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে মনের দু ঃখ প্রকাশ করেন।[১১] ইবনুল আসীর বলেন, 'উমার প্রথমে আবু বকরকে প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দেওয়ায় উসমানকে প্রস্তাব করেন।[১২]

'আয়িশার (রা) সাথে বিয়ের মাধ্যমে আবু বকরের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। কিন্তু উমারের সাথে কোন আত্মীয়তা ছিলনা। হাফসার সাথে বিয়ের মাধ্যমে এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর মর্জি ছিল। উমারের (রা) দু:খের কথা শুনে রাসূল (সা) বলেন ঃ হাফসাকে বিয়ে করবে উসমানের চেয়েও ভালো এক ব্যক্তি এবং 'উসমান বিয়ে করবে হাফসার চেয়েও ভালো এক মহিলাকে।[১৩] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি কি তোমাকে 'উসমানের চেয়ে ভালো জামাই এবং 'উসমানকে তোমার চেয়ে ভালো শ্বশুরের সন্ধান দেব না? 'উমার বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই দেবেন। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমার মেয়ে হাফসাকে আমার সাথে বিয়ে দাও, আর আমার মেয়ে উম্মু কুলসুমকে বিয়ে দিই 'উসমানের সাথে।[১৪] এভাবে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যায়। হাফসার পিতা উমার নিজেই ওলি হয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন। রাসূল (সা) হাফসাকে চার শো দিরহাম দেন মোহর দান করেন।[১৫]

উমারের (রা) প্রস্তাবে 'উসমান ও আবু বকরের (রা) সাড়া না দেওয়ার কারণ হলো, তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) হাফসার কথা আলোচনা করতে শুনেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, তিনি উমারের সম্মানার্থে হাফসাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু তাঁরা এ কথাটি উমারকে বলতে সাহস করেননি এই ভয়ে যে, তাঁদের বুঝার ভুলও হতে পারে।[১৬] এ কারণে

---

১০. আনসাবুল আশরাফ-১/২১৪, ৪২২
১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৩; হায়াতুস সাহাবা-২/৫০২, ৬৫৬
১২. উসুদুল গাবা- ৫/৪২৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮
১৩. উসুদুল গাবা-৫/৪২৫
১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৩
১৫. ইবন হিশাম-২/৬৪৫
১৬. ড. আহমাদ শালবা ঃ তারীখুল ইসলাম-১/৩৩১

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হাফসার বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবার পর আবু বকর একদিন উমারের সাথে দেখা করে বলেন ঃ রাসূল (সা) একদিন হাফসার কথা বলেছিলেন, আমি তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইনি। এছাড়া আপনার প্রস্তাবের জবাব না দেওয়ার আর কোন কারণ ছিল না।[১৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হাফসার বিয়ে কখন হয় সে বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতভেদ আছে। এ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে মূলত ঃ তাঁর প্রথম স্বামীর মৃত্যুর সময় নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে। ইবনুল আসীর বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে হিজরী তৃতীয় সনে এ বিয়ে হয়।[১৮] ইমাম জাহাবী বলেন, তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ঘরে তুলে নেন। তখন হাফসার বয়স প্রায় বিশ বছর।[১৯] আবু উবায়দার মতে, এ বিয়ে হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। আর এটাই ইবন আবদিল বার-এর মত। ইবন হাজার আল-ইসাবা গ্রন্থে তৃতীয় সনের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তাঁর প্রথম স্বামী উহুদে শাহাদাত বরণ করেন। অনেকে বলেন, হিজরাতের ২৫ মতান্তরে ৩০ মাস পরে এ বিয়ে হয়। কোন কোন বর্ণনায় ২০ মাস পরের কথাও এসেছে। অথচ উহুদ যুদ্ধ হয় হিজরাতের ৩০ মাসেরও পরে। ইবন সা'দ জোর দিয়ে বলেন, তাঁর প্রথম স্বামী বদর থেকে ফেরার পর মারা যান। ইবন সায়্যিদিন নাস বলেন, হিজরাতের ৩০ মাসের মাথায় শা'বান মাসে এ বিয়ে হয়।[২০]

হাফসার (রা) মৃত্যুসন নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের একটু মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, তিনি ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন। আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকাল এবং মদীনার গভর্ণর তখন মারওয়ান। তিনি জানাযার নামায পড়ান, লাশের সাথে বাকী গোরস্তান পর্যন্ত যান এবং দাফন কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকেন। আলে হাযামের বাড়ী থেকে মুগীরার বাড়ী পর্যন্ত লাশবাহী খাটিয়ায় তিনি কাঁধ দেন এবং সেখান থেকে তাঁর স্থলে আবু হুরাইরা কাঁধ দিয়ে কবর পর্যন্ত নিয়ে যান। হাফসার (রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) এবং তাঁর ছেলেরা– আসেম, সালেম, আবদুল্লাহ ও হামযা লাশ কবরে নামান। এভাবে তিনি বাকী গোরস্তানে সমাহিত হন। উল্লেখিত মতটি মা'মার, যুহরী ও সালেমের সূত্রে আল-ওয়াকিদী বর্ণনা করেছেন।[২১] তবে ইবনুল আসীরের ঝোঁক এই দিকে যে, যে সময় হাসান ইবন আলী (রা) আমীর মু'য়াবিয়ার (রা) হাতে বাই'য়াত করেন সেই সময় হাফসার ওফাত হয়। আর সেটা ৪১ হিজরীর জামাদিউল আওয়াল মাস। আর এই সনকে 'আমুল জামা'য়াহ' বলা হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হিজরী ২৭ সনে 'উসমানের (রা) খিলাফতকালে মারা

---

১৭. বুখারী- ৯/১৫২-১৫৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৩; ইমাম আহমাদ, ইবন সাদ, বুখারী, নাসাঈ, বায়হাকী প্রমুখ মুহাম্মদ্দিসীন হাফসার বিয়ে সংক্রান্ত বর্ণনা সংকলন করেছেন।

১৮. উসুদুল গাবা- ৫/৪২৫

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭, ২৩০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২২

২০. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'য়া বুলুগুল আমানী-২২/১৩০

২১. তাবাকাত-৮/৬০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা- ২/২২৯, ২৩০; আনসাবুল আশরাফ ১/৪২৭,৪২৮

যান। এ মতটির ভিত্তি হলো, ওয়াহাব ইবন মালিক বলেছেন, যে বছর আফ্রিকা বিজয় হয় সেই বছর তিনি মারা যান। আর আফ্রিকা বিজয় হয় হিজরী ২৭ সনে। কিন্তু এ এক মারাত্মক ভুল। কারণ আফ্রিকা বিজয় হয় দুইবার। প্রথম বিজয় হয় হিজরী ২৭ সনে, আর দ্বিতীয় বিজয় হয় মু'য়াবিয়ার (রা) খিলাফতকালে। এ বিজয়ের গৌরবের অধিকারী ছিলেন মু'য়াবিয়া ইবন খাদিজা (রা)[২২] মৃত্যুকালে হাফসার বয়স হয়েছিল ৬৩ অথবা ৫৯ বছর।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমারকে (রা) একই উপদেশ দান করেন যা তাঁর পিতা উমার (রা) তাঁকে মৃত্যুর সময় দান করেছিলেন। পিতা তাঁকে গাবা'তে যে ভূ-সম্পত্তি দিয়ে যান তা তিনি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দেন।[২৩] হাফসা কোন সন্তান রেখে যাননি।[২৪]

হাফসার (রা) সন্তানাদি না থাকলেও তিনি অনেক স্নেহভাজন নারী ও পুরুষ রেখে যান যারা তাঁর নিকট হাদীস শুনেছিলেন এবং তা বর্ণনাও করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন উমার, হামযা ইবন আবদিল্লাহ, সাফিয়্যা বিন্‌ত আবী উবায়দা (আবদুল্লাহর স্ত্রী), মুত্তালিব ইবন আবী ওয়াদায়া, উম্মু মুবাশ্‌শির আল আনসারিয়্যা, আবদুর রহমান ইবন হারেস ইবন হিশাম, আবদুল্লাহ ইবন সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, শুতাইর ইবন শাকাল, সাওয়া আল-খুযাঈ, আল-মুসায়্যিব ইবন রাফে, আল-মাজলায ও আরো অনেকে।[২৫]

হাফসা (রা) থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলি তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) ও পিতা উমার (রা) থেকে শুনেছিলেন।[২৬] তাঁর বর্ণিত চারটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি এবং ছয়টি হাদীস বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৭]

হযরত হাফসার (রা) তৎকালীন আরবের অন্য সকল নারী-পুরুষের মতই কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। তবে পিতা 'উমার (রা) ও স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে বড় শিক্ষক আর কে হতে পারতেন? তাঁদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জন ও দ্বীনকে বুঝার প্রবল আগ্রহ জন্ম নেয়। দ্বীনী বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিভিন্ন ঘটনায় তা জানা যায়। একবার রাসূল (সা) বললেন ঃ 'আমি আশা করি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ জাহান্নামে যাবে না'। হযরত হাফসা (রা) বলে উঠলেন, আল্লাহ তো বলেছেন ঃ

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا - (سورة مريم - ٧١)

---

২২. উসুদাল গাবা-৫/৪২৬; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৩৯ আল-ইসাবা-৪/২৭৩
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. যারকানী ঃ শারহুল মাওয়াহিব-৩/২১
২৫. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৩৯; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২২১; সীয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮
২৬. যারকানী-৩/২২১; তাহজীবুত তাহজীব-১২/৪৩৯
২৭. বুলুগুল আমানী-২২/১৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩০

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (জাহান্নামে) পৌছবে না।

রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, তা ঠিক, তবে একথাও তো আল্লাহ বলেছেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

(سورة مريم-٧٢)

অত ঃপর আমি খোদাভীরু লোকদের উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (সূরা মারইয়াম-৭১-৭২)[২৮]

হাফসার (রা) মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রাসূলে কারীমও (সা) সব সময় তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানোর চিন্তা করতেন। হযরত শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহ ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। হযরত হাফসা তাঁর নিকট লেখা শেখেন। এই শিফা 'নামলা'[২৯] নামক এক প্রকার ক্ষত-রোগ নিরাময়ের ঝাঁড়-ফুক জানতেন। জাহিলী জীবনে এই ঝাঁড়-ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলে কারীমের (সা) নিকট এসে বললেন ঃ আমি জাহিলী জীবনে ঝাঁড়-ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে তা আমি আপনাকে শুনাই। রাসূল (সা) শুনে বললেন, এই ঝাঁড়–ফুঁকটি তুমি হাফসাকেও শিখিয়ে দাও। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে রাসূল (সা) শিফাকে বলেন, তুমি কি হাফসাকে এই 'নামলা'র দু'আটি শিখিয়ে দেবে না যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছো?[৩০]

রাসূলে পাকের (সা) জীবদ্দশায় এবং পরবর্তী জীবনে হাফসা (রা) প্রচুর ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। সব সময় রোযা রাখতেন এবং অতিমাত্রায় রাত জেগে নামায আদায় করতেন। জিবরীল (আ) তাঁর সম্পর্কে রাসূলকে (সা) বলেছেন ঃ তিনি অতিমাত্রায় সিয়াম পালনকারিণী এবং রাতের বেলায় খুব বেশী ইবাদাতকারিণী।[৩১] অন্য একটি বর্ণনা এসেছে, জিবরীল (আ) বলেন ঃ তিনি একজন সৎকর্মশীলা নারী।[৩২] তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, রোযা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।[৩৩]

তিনি সব রকমের মতবিরোধকে অপছন্দ করতেন। সিফ্‌ফীন যুদ্ধের পর যখন 'দুমাতুল জান্দালে' শালিশ-ফয়সালার বিষয়টি এলো তখন তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) তা একটি ফিতনা-ফাসাদ মনে করে ঘর থেকে বের হতে চাইলেন না। কিন্তু হাফসা তাঁকে বললেন, এতে অংশগ্রহণে তোমার কোন লাভ নেই, তবে তোমার অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ, মানুষ তোমার মতামতের অপেক্ষায় থাকবে। এমনও হতে পারে,

---

২৮. মুসনাদ-৬/২৮৫

২৯. নামলা' মানুষের দেহের পার্শ্বদেশে নির্গত একপ্রকার ক্ষত, (সহীহ মুসলিম বিশারহিন নাওয়াবী-১৪/১৮২)

৩০. 'আওনুল মা'বুদ, শারহু সুনানে আবী দাউদ-১০/৩৭৪; আল মুফাস্‌সাল ফী আহকামিল মারয়াতি ওয়াল বায়ত-৩/২৬২

৩১. তাবাকাত-৮/৮৫

৩২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৬

৩৩. তাবাকাত-৮/৮৫

তোমার এই দূরে থাকা তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে।[৩৪] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা হতে পারে এমন কোন বিষয় থেকে দূরে থাকা সমীচীন নয়। তুমি হচ্ছো রাসূলুল্লাহর (সা) শ্যালক এবং 'উমার ইবনুল খাত্তাবের ছেলে।[৩৫]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হাফসা (রা) জনগণের পক্ষে বিভিন্ন দাবী নিয়ে খলীফাদের সাথে, বিশেষত তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলীফা 'উমারের (রা) সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলীফাও তাঁর মেয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ রকম কিছু ঘটনা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায়।

'উমার (রা) খলীফা হওয়ার পরও প্রথম খলীফা আবু বকরের (রা) সময় তাঁর জন্য নির্ধারিত ভাতার উপর নির্ভর করে সংসার চালাতেন। কিন্তু তাতে তার সংসার ভালো মত চলে না দেখে উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী একত্র হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে খলীফা উমারের (রা) সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবেন কে? বিষয়টি নিয়ে খলীফার সাথে কথা বলতে তাঁরা কেউ সাহস পেলেননা। শেষমেষ তাঁরা হাফসার দ্বারস্থ হলেন এবং তাঁকেই খলীফার সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন। হাফসা (রা) কথা বললেন, কিন্তু খলীফা রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের আড়ম্বরহীনতা ও সরলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে বিদায় দেন।[৩৬]

আর একবার তিনি তাঁর পিতা খলীফা উমারকে তাঁর পোশাক ও খাদ্যের মান বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এখন তো মুসলমানদের জীবিকায় আগের চেয়ে প্রশস্ততা দান করেছেন। তাদেরকে আগের তুলনায় অঢেল কল্যাণও দান করেছেন। উমার (রা) তাঁর মেয়েকে তখন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে খুব কাঁদলেন।[৩৭]

একবার খলীফা 'উমারের (রা) নিকট কিছু অর্থ-সম্পদ এলো। হাফসা এসে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা নিকট-আত্মীয়দের ব্যাপারে অসীয়াত করেছেন। এই সম্পদে আপনার নিকট-আত্মীয়দের অধিকার আছে। মেয়ের কথা শুনে খলীফা বললেন ঃ আমার নিকট-আত্মীয়দের অধিকার আছে আমার সম্পদে। আর এই সম্পদ তো মুসলমানদের। মেয়ে. তুমি তোমার পিতাকে ধোঁকায় ফেলেছো। ওঠো, এখান থেকে যাও। এরপর হাফসা চাদরের আঁচল টানতে টানতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।[৩৮]

ইবন জুরাইজ থেকে বর্ণিত হয়েছে খলীফা উমার (রা) একদিন রাতের বেলা কা'বা

---

৩৪. বুখারী- ২/৫৮৯; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৩৮
৩৫. হায়াতুস সাহাবা-২/৬১
৩৬. তাবারী-৪/১৬৪; হায়াতুস সাহাবা-২/২৭৭
৩৭. তাবাকাত-৩/১৯৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৩৭১
৩৮. মুন্তাখাবুল কান্‌য-৪/৪১২; হায়াতুস সাহাবা-২/২৩৮

তাওয়াফ করা অবস্থায় এক মাহিলাকে করুণ সুরে একটি বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন। যার দুইটি পংক্তি এই রকম ঃ

تطاول هذا الليل واسود جانبه -

وارقنى أن لا حبيب ألاعبه

فلولا حذار الله لا شئ مثله

لزعزع من هذا السرير جوانبه

– এই রাত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়েছে, চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে। একাকী আমি জেগে আছি, পাশে কোন প্রিয়জন নেই যার সাথে প্রেমালাপ করতে পারি।

– আল্লাহ-যিনি অতুলনীয়, যদি তাঁর ভয় না থাকতো তাহলে এই শয্যাধারের চারপাশ অবশ্যই কম্পিত হতো।

খলীফা 'উমার (রা) মহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? মহিলা বললো ঃ কয়েক মাস যাবত আমার স্বামী আমার থেকে দূরে আছে। তাঁকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি আমার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে। তারপর উমার (রা) মেয়ে হাফসার কাছে গিয়ে বলেন, আমি তোমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে চাই, আমাকে তুমি সাহায্য কর। মেয়েরা স্বামী থেকে দূরে থাকলে কতদিন পর স্বামীকে কাছে পাওয়ার অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে? হাফসা লজ্জায় মাথানত করে ফেলেন। 'উমার বললেন ঃ আল্লাহ সত্য প্রকাশের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। তখন হাফসা হাত দিয়ে ইশারা করে তিন অথবা চার মাস বুঝিয়ে দেন। তখন 'উমার (রা) নির্দেশ দেন, কোন সৈনিককে যেন চার মাসের অধিক আটকে রাখা না হয়।[৩৯]

আল-বায়হাকী (৯/২৯) ইবন উমার থেকে বর্ণনা করেছেন। একদিন 'উমার রাতের বেলা নগর পরিভ্রমণে বেরিয়ে এক মহিলাকে উপরোক্ত পংক্তি দুইটি গাইতে শোনেন। তারপর তিনি হাফসাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ মেয়েরা সর্বাধিক কতদিন স্বামী ছাড়া থাকতে পারে? হাফসা বলেন ঃ ছয় অথবা চার মাস। উমার বলেন ঃ আমি এর চেয়ে বেশীদিন কোন সৈনিককে আটকে রাখবো না।[৪০]

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) কুরআনের যে কপি তৈরী করান, তাঁর ইনতিকালের পর তা উসমানের (রা) কাছে ছিল। তারপর তা হাফসার কাছে রাখা হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কপিটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল।[৪১]

হাফসা (রা) ছিলেন 'উমারের কন্যা। পিতার মত তাঁর মেজাজেও ছিল কিছুটা তীক্ষ্ণতা। কখনো কখনো রাসূলুল্লাহর (সা) কথার পিঠে কথা বলতেন। তাতে দাম্পত্য জীবনে

---

৩৯. কান্‌যুল 'উম্মাল-৮/৩০৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৫

৪০. হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৬

৪১. কান্‌যুল উম্মাল-১/২৭৯

মনোমালিন্যের উপক্রম হতো। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বুখারীসহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। উমার (রা) একবার ইবন আব্বাসকে (রা) বললেন ঃ জাহিলী আমলে কুরাইশ নারীরা পুরুষের অনুগত ও বাধ্য থাকতো। আমরা তাদের বিন্দুমাত্র মূল্য দিতাম না। ইসলাম তাদেরকে মর্যাদা দান করে। তাদের সম্পর্কে বহু আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমরা তাদের স্থান ও মর্যাদা অবগত হই। আমরা মদীনায় এসে দেখলাম, মদীনায় নারীরা পুরুষদের বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরা তাদের কাছে শিক্ষা পেতে লাগলো। আমার বাড়ীটি ছিল 'আওয়ালীর বনু উমাইয়্যা ইবন যায়িদ পল্লীতে। আমি একদিন স্ত্রীর উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলাম। সেও ছেড়ে দিল না, কথার পিঠে কথা শুনিয়ে দিল। তার এমন প্রত্যুত্তর আমার মোটেই ভালো লাগলো না। তখন সে বললো, আমার এরূপ উত্তর করা আপনার পছন্দ নয়, অথচ রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীরাও তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করে থাকেন। কোন কোন স্ত্রী আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর থেকে দূরে আছেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন ঃ আপনার মেয়ে হাফসা রাসূলুল্লাহর (সা) মুখের উপর জবাব ছুড়ে দেয়। তাতে এমন হয় যে রাসূলুল্লাহ (সা) সারাদিন বিমর্ষ থাকেন।

'উমার (রা) বলেন ঃ একথা শুনে আমি হাফসার কাছে ছুটে গেলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমরা কি রাসূলুল্লাহর (সা) কথার প্রত্যুত্তর করে থাক? হাফসা বললো ঃ হাঁ। আমরা এমন করে থাকি। আমি প্রশ্ন করলাম ঃ তোমাদের কেউ কি রাত পর্যন্ত তাঁর থেকে দূরে থাক? হাফসা বললো ঃ হাঁ। বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে যে এমন করে সে সফল হবে না। সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমাদের কেউ কি আল্লাহর রাসূলের ক্রুদ্ধ হওয়ার পরেও আল্লাহর ক্রোধ থেকে নিরাপদ মনে করেছে? মেয়ে, তোমার চেয়ে যে বেশী সুন্দরী ও রাসূলুল্লাহর (সা) অধিক প্রিয় সে যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।[৪২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, উমার (রা) হাফসাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ সাবধান! এমন করোনা। আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। তুমি তার অহমিকার ফাঁদে পড়োনা যার সৌন্দর্য রাসূলুল্লাহকে (সা) বিমোহিত করেছে। (অর্থাৎ আয়িশা রা)[৪৩] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি হাফসাকে বলেন ঃ তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) কথার উত্তর করবে না। তোমার না আছে যয়নাবের সৌন্দর্য ও আয়িশার সৌভাগ্য।[৪৪]

তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। একদিন উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা বসে বসে কাঁদছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে এভাবে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। সাফিয়্যা বললেন ঃ হাফসা আমাকে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হাফসাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর।' তারপর সাফিয়্যাকে বললেন ঃ তুমি তো একজন নবীর মেয়ে, তোমার চাচাও একজন নবী। তারপর একজন

---

৪২. বুখারী-৬/১৯৫-১৯৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮২-৬৮৩

৪৩. মুসনাদ-৬/২৮৩; বুখারী-৬/১৯৬; শিবলী নু'মানী ঃ সীরাত-২/৪১০

৪৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৭

নবীর স্ত্রী। কোন্ ব্যাপারে হাফসা তোমার উপর গর্ব করতে পারে?[৪৫]

আর একবার হাফসা ও আয়িশা (রা) সাফিয়্যাকে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমরা দুইজন তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। আমরা তাঁর স্ত্রী, তদুপরি তাঁর চাচাতো বোন। কথাগুলো হযরত সাফিয়্যাকে ভীষণ আহত করে। তিনি তাঁদের দুইজনের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অভিযোগ করলেন। রাসূল (সা) তাঁকে বললেন ঃ তুমি তাদেরকে কেন একথা বললে না যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হতে পার না। কারণ, আমার স্বামী মুহাম্মাদ, আমার পিতা হারূন এবং চাচা মূসা।[৪৬]

'আয়িশা ও হাফসা (রা) পরস্পর সতীন হলেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল বোনের মত। অধিকাংশ ব্যাপারে তাঁরা একে অপরের সহযোগী ছিলেন। আয়িশা (রা) হাফসা সম্পর্কে বলেছেন ঃ হাফসা বাপের বেটি। তাঁর বাপ যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ়সংকল্প, হাফসাও তেমন।[৪৭] রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র হাফসাই আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন।[৪৮] আমরা দুইজন ছিলাম যেন একটি হাত।[৪৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) অন্তিম রোগ শয্যায়। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছেন। নামাযের সময় হলো। তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আয়িশা বললেন ঃ আবু বকর একজন কোমল মনের মানুষ। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) স্থানে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতে গেলে কান্নায় তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে, লোকেরা কিছুই শুনতে পাবে না– একথাগুলি তিনি হাফসাকে বললেন এবং তাঁর স্থলে 'উমারকে নির্দেশ দানের জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। আয়িশার (রা) কথামত হাফসা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতেই তিনি মন্তব্য করলেন ঃ 'তোমরা সবাই ইউসুফের সঙ্গী-সাথীদের মত।'[৫০]

আয়িশা ও হাফসা, দুইজনের মনের এমন চমৎকার মিল এবং উভয়ের মধ্যে এত ভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে নারীর স্বাভাবিক প্রবণতা মাথাচাড়া দিত। স্বামীসঙ্গ ও সোহাগ প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁরা ঈর্ষার শিকার হতেন। একবার এক সফরে তাঁরা দুইজন রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশার উটের উপর সওয়ার হয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। একদিন হাফসা আয়িশাকে বললেন, আজ রাতে তুমি যদি আমার উটের উপর, আর আমি তোমার উটের উপর সওয়ার হই তাহলে অন্য একটা দৃশ্য দেখা যাবে। 'আয়িশা রাজি হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) হাফসার সাথে তাঁর বাহনে পথ চললেন। মনযিলে

---

৪৫. তিরমিযী (কিতাবুল মানাকিব)-৫/৩৬৮; শিবলী-২/৪১০
৪৬. প্রাগুক্ত
৪৭. সুনানে আবী দাউদ, (হাফসার আলোচনা অধ্যায়)
৪৮. জাহাবী ঃ তারীখ-২/২২১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭
৪৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩১
৫০. প্রাগুক্ত-১/৫৫৪, ৫৫৬-৫৫৭

পৌঁছে আয়িশা যখন রাসূলকে (সা) পেলেন না তখন নিজের চরণ দুইখানি ইযখীর ঘাসের মধ্যে ঝুলিয়ে বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ! কোন সাপ অথবা বিচ্ছু যদি আমাকে দংশন করতো।[৫১]

আয়িশা ও হাফসা ছিলেন যথাক্রমে আবু বকর (রা) ও উমারের (রা) কন্যা। এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাসূলেকারীমের (সা) অতি কাছের মানুষ। এ কারণে, আয়িশা ও হাফসা দুইজন ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পারিবারিক জীবনে অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের বিপরীতে একজোট। তাঁদের এই জোটবদ্ধতা নবীপাকের পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনার পশ্চাতে কাজ করেছে।

আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের সকল ছোট-বড় ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনের মত নিছক কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে রয়েছে মানবজাতির জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা এসব ঘটনার মাধ্যমে মানব জাতিকে বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আচরণের বাস্তব শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তা না হলে তাঁর নবীর জীবনে এসব ঘটনা না ঘটালেও পারতেন। আমাদের প্রিয় নবীজীর জীবনের প্রতিটি ঘটনা এভাবেই দেখতে হবে।

হিজরী ৯ম সনে সূরা আত-তাহরীম অবতীর্ণ হয়। এই অবতরণের পশ্চাতে রয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনা। মিষ্টি ও মধু ছিল রাসূলে কারীমের (সা) অতি প্রিয় খাবার। তিনি সাধারণত আসরের নামাজের পর সকল সহধর্মিণীদের ঘরে গিয়ে দেখা করতেন। একদিন যয়নাবের (রা) নিকট স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে একটু দেরী হয়ে যায়। এতে আয়িশা মনক্ষুণ্ন হন। তিনি অবগত হন যে, কোন এক মহিলা যয়নাবকে কিছু মধু উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছে। রাসূল (সা) সেই মধু যয়নাবের নিকট পান করেছেন। আর সেই কারণে তাঁর ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান দীর্ঘ হয়েছে। আয়িশা ও হাফসা জোটবদ্ধ হন। আয়িশা হাফসাকে বলেন, রাসূল (সা) যখন আমার অথবা তোমার ঘরে আসবেন তখন আমরা তাঁকে বলবো, আপনার মুখ থেকে মাগাফীর-এর দুর্গন্ধ আসছে। (মাগাফীর, মাগফুর-এর বহুবচন। একপ্রকার উদ্ভিদের ফুল যা থেকে মৌমাছি মধু আহরণ করে) আয়িশা একই কথা সাফিয়্যাকেও শিখিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) যখন তাঁদের ঘরে আসলেন তখন তাঁরা পূর্ব সিদ্ধান্ত মত একই কথা বললেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দুর্গন্ধ ছিল খুবই অপ্রিয়। এরপর তিনি যখন আবার যয়নাবের নিকট যান তিনি রাসূলকে (সা) আবার মধু পান করাতে চান। তখন রাসূল (সা) বলেন, প্রয়োজন নেই। তারপর তিনি নিজের জন্য মধু পান হারাম করে নেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে আয়িশা আফসোসের সুরে হাফসাকে বলেন ঃ আমরা একটি মারাত্মক কাজ করে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর একটি প্রিয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় সূরা আত-তাহরীমের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ[৫২]

---

৫১. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাত-২/৪১১; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৪২

৫২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮০ বুখারী -৬/১৯৫

– হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? (আত-তাহরীম-১)

রাসূলুল্লাহকে (সা) মধু পরিবেশনকারিণী হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন জনের নাম এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় হাফসার নামটি এসেছে। সে ক্ষেত্রে আয়িশা সাওদা ও সাফিয়্যার সাথে দল বাঁধেন। ইবন সাদের একটি বর্ণনায় তেমনি বুঝা যায়।[৫৩] কোন কোন বর্ণনায় উম্মু সালামার নামও এসেছে।[৫৪]

রাসূলে কারীম (সা) স্ত্রীদের খুশী করার জন্য মধু পান না করার যে সিদ্ধান্ত নেন তা তিনি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীদের গোপন রাখতে বলেন। যাতে মধু পরিবেশনকারিণী মনে কষ্ট না পান। অধিকাংশ বর্ণনা মতে, রাসূল (সা) হাফসার (রা) কাছে এই গোপন কথাটি বলেছিলেন। কিন্তু হাফসা কথাটি গোপন রাখতে পারলেন না। তিনি তা আয়িশার কাছে প্রকাশ করে দেন। একথাই আল্লাহ সূরা আত-তাহরীমের তৃতীয় আয়াতে বলেছেন এভাবে ঃ যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অত ঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল আর আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন না এবং কিছু বললেন। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন ঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো? নবী বললেন ঃ যিনি সর্বজ্ঞ ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।

সূরা আত-তাহরীমের নাযিলের কারণ সম্পর্কে আল-ওয়াকিদীসহ আরো অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞ ভিন্ন একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। একদিন হাফসা (রা) ঘরে ছিলেন না। এ সময় রাসূল (সা) তাঁর ঘরে আসেন এবং দাসী মারিয়া কিবতিয়্যাকে ডেকে সঙ্গ দেন। এর মধ্যে হাফসা ফিরে আসেন এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তখন রাসূল (সা) হাফসার সন্তুষ্টির জন্য উক্ত দাসীর সাহচর্যকে নিজের জন্য হারাম করে নেন। আর একথা তিনি হাফসাকে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি তা গোপন রাখতে পারলেন না। আয়িশার কাছে প্রকাশ করে দেন। তখন সূরা আত-তাহরীম নাযিল হয়। নাফে বলেছেন ঃ একথা কি ঠিক নয় যে, রাসূল (সা) নিজের জন্য তার দাসীকে হারাম করেছিলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?[৫৫]

যে দুইজন নারী এসব ঘটনা সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে (সা) বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছিলেন, তাঁদেরই সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেন আত-তাহরীমের চতুর্থ আয়াতটি।– 'তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভালো কথা। আর যদি তোমরা নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য

---

৫৩. তাবাকাত-৮/৮৫

৫৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৫; ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ তাফসীর ইবন কাসীর (সূরা আত-তাহরীম) ৩/৫১৯-৫২১

৫৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৪; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৫২০

কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়।'[৫৬]

এই দুই নারী হলেন আয়িশা (রা) ও হাফসা (রা)। এই দুইজন নারী কে, সে সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে ইবন আব্বাস (রা) এর একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। এতে তিনি বলেন ঃ যে দুইজন নারী সম্পর্কে কুরআনে 'যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর'– বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে উমারকে (রা) প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বুঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি অজু করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম ঃ কুরআনে যে দুইজন নারী সম্পর্কে 'যদি তোমরা তওবা কর'– বলা হয়েছে তাঁরা কে? উমার বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জানেন না, এঁরা দুইজন হলেন হাফসা ও আয়িশা (রা)।[৫৭]

নবী পরিবারের মধ্যে এই তুচ্ছ কলহ কোন সাধারণ ব্যাপার ছিল না। মুনাফিকরা সব সময় ধান্দায় থাকতো খোদ নবী পরিবার ও তাঁর বিশেষ আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যে কোন ধরনের ফাটল ধরানোর। তারা আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের এই মামুলি বিরোধের কথা জানতে পেরে হয়তো আরো একটু উস্কে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল আয়িশা ও হাফসার পিতা আবু বকর ও উমারকে এবার রাসূলুল্লাহর (সা) বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যাবে। কিন্তু তারা জানতো না, রাসূলুল্লাহর (সা) পদতলে তাঁরা কন্যা কেন, নিজেদের জীবনও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই উমার (রা) হাফসার সাথে দেখা করার অনুমতি না পেয়ে চিৎকার করে বলে ওঠেন ঃ অনুমতি পেলে হাফসার মাথা কেটে নিয়ে আসি।[৫৮] সূরা আত-তাহরীমের ৪র্থ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আয়িশা ও হাফসা যদি ষড়যন্ত্র করে, আর মুনাফিকরা তা কাজে লাগায় তাহলেও আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহর সাথে আছেন জিবরীল, ফিরিশতামণ্ডলী ও সমস্ত বিশ্বের মুমিন নর-নারী।[৫৯]

বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত ঘটনার পর রাসূলে কারীম (সা) হাফসাকে তালাক দেন। তারপর আবার ফিরিয়ে নেন। একথা আসেম ইবনে উমার বলেছেন।[৬০] তালাক দেওয়ার পর জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সা) বলেন ঃ হাফসা খুব বেশী রোযা পালনকারিণী এবং রাতে বেশী বেশী নামায আদায়কারিণী। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন। জিবরীলের এ কথায় রাসূল (সা) আবার তাঁকে ফিরিয়ে নেন।[৬১]

ইবন সা'দ, কায়স ইবন ইয়াযীদ এবং ইবন সীরীনের একটি বর্ণনা নকল করেছেন। নবী

---

৫৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৯

৫৭. বুখারী-৬/১৯৫-১৯৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮১; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৫২১

৫৮. সীয়ারুস সাহাবিয়াত-৪১

৫৯. প্রাগুক্ত-৪২

৬০. আল-ফাতহুর রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ) ১৭/৩; ইবন মাজা-(২০১৬); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮; নাসাঈ-৬/২১৩; আল মুসতাদরিক-৪/১৫

৬১. উসুদুল গাবা-৫/৪২৫; আবু দাউদ-(২২৮৩); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৮

(সা) হাফসাকে এক তালাক দেন। তারপর হাফসার দুই মামা– কুদামা ও উসমান ইবন মাজউন হাফসার সাথে দেখা করেন। হাফসা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কোন মন্দ কাজের জন্য তালাক দেননি। এমন সময় নবী (সা) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন ঃ 'জিবরীল আমাকে বলেছেন, আপনি হাফসাকে ফিরিয়ে নিন। কারণ, তিনি খুব বেশী রোযা পালন করেন এবং বেশী নামায আদায় করেন। জান্নাতে তিনি আপনার স্ত্রী হবেন।"[৬২]

'উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতে লাগলেন। লোকমুখে প্রচার হলো, তিনি তাঁর সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এটা হিজাবের হুকুমের আগের ঘটনা। আমি আয়িশার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আবু বকরের মেয়ে! তুমি রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দিয়ে থাক– লোকেরা যে একথা বলাবলি করছে, তাকি তুমি শুনেছো? আয়িশা বললেন ঃ ওহে খাত্তাবের পুত্র, আমার সাথে আপনার সম্পর্ক কি? আপনি অন্যত্র যেতে পারেন।

এরপর আমি হাফসার কাছে গিয়ে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, আমি জেনেছি তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না। আমি না থাকলে তিনি অবশ্যই তোমাকে তালাক দিতেন। একথা শুনে হাফসা খুব কাঁদলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায়? বললো ঃ পাশেই একটি ঘরে আছেন। আমি সেখানে রাসূলুল্লাহকে বসা দেখতে পেলাম। দরজায় দাঁড়ানো তাঁর চাকর রাবাহ। তার মাধ্যমে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। তিনবারের মাথায় অনুমতি পেলাম। আমি রাসূলুল্লাহকে বললাম ঃ আপনার অনুমতি পেলে আমি হাফসার কল্লা কেটে ফেলবো। রাসূল (সা) আমাকে নরম হওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমি শান্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে তালাক দিয়েছেন? বললেন ঃ না। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর স্ত্রীদের তালাক দেননি। তখন নাযিল হয় সূরা আন-নিসার ৮৩তম আয়াতটি।[৬৩] বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

নবী পরিবারের মনোমালিন্য ও তালাক সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মাধ্যমে হাফসার (রা) অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা এবং শরীয়াতের কিছু বিধান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ

১. তালাক দান একটি বৈধ কাজ। যদি সে তালাক হয় কোন প্রয়োজন বা কল্যাণের নিমিত্তে, তবে তা কামালিয়াত বা পূর্ণতার পরিপন্থী নয়।[৬৪]
২. খোদ আল্লাহপাক হাফসার বেশী রোযা রাখা ও বেশী নামায পড়ার সনদ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন।

---

৬২. তাবাকাত-৮/৮৪- আল হাকেম-৪/১৫; জাহাবী ঃ তারীখ-২/২২১
৬৩. কানযুল উম্মাল-১/২৬৯; তাফসীরে ইবন কাসীর-৩/৫২১; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৮৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৬
৬৪. আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/১৩১

৩. জান্নাতেও তিনি নবীর (সা) স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন।

৪. তাকে খুশী করার জন্য নবী (সা) দুইটি হালাল বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেন।

৫. আয়িশার (রা) বক্তব্যে জানা গেছে, 'তিনি ছিলেন তাঁর পিতার মত।'

৬. দাম্পত্য জীবনে ছোট-খাট মনোমালিন্য স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে নবীর (সা) আদর্শ আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

হাফসার (রা) মধ্যে প্রবল দাজ্জাল-ভীতি ছিল। মদীনায় ইবন সাইয়্যাদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দাজ্জালের যতগুলো চিহ্ন বা আলামত বর্ণনা করেছিলেন, এই লোকটির মধ্যে তার অনেকগুলি ছিল। এমনকি তার সম্পর্কে খোদ রাসূলুল্লাহরও (সা) সন্দেহ ছিল। একদিন হাফসা ও আবদুল্লাহ ইবন উমারের সাথে পথে সেই লোকটির দেখা হয়ে গেল। ইবন উমার তাঁকে কিছু বলতেই সে রেগে এত ফুলে উঠে যে পথই বন্ধ হয়ে যায়। তখন ইবন উমার তাকে মারতে উদ্যত হন। হাফসা ভীত হয়ে পড়েন। তিনি ইবন 'উমারকে বলেন, তার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? তুমি কি জাননা রাসূল (সা) বলেছেন ঃ দাজ্জালের ক্রোধই তার বের হবার কারণ হবে?[৬৫]

উম্মুল মুমিনীন হাফসার (রা) সম্মান ও মর্যাদা ছোট একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এ পৃথিবীতে তিনি সীরাতে রাসূলের সাথে যেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি আখিরাতের জীবনেও একাত্ম থাকবেন বলে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৬৫. মুসনাদ-৬/২৮৩

যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা)

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা ইবন আল হারিস আল-হিলালিয়্যা ছিলেন বনু বাক্‌র ইবন হাওয়াযিনের কন্যা। তাঁর উপাধি বা লকব ছিল 'উম্মুল মাসাকীন'। উহুদ যুদ্ধে তাঁর স্বামী শাহাদাত বরণ করলে ঐ বছরই হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তিনি উম্মুল মুমিনীন-এর অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারিণী হন।

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার (রা) প্রথম বিয়ে কার সাথে হয় সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। বালাজুরী, ইবনুল কালবী এবং নসববিদ আবুল হাসান আলী আল-জুরজানীর মতে, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের আগে তার প্রথম স্বামী ছিলেন তুফাইল ইবন আল হারিস। তুফাইল তালাক দিলে তাঁর ভাই উবায়দা ইবন আল-হারিস তাঁকে বিয়ে করেন। বদরে তিনি আহত হয়ে আস-সাফরাতে মারা যান। তখন 'উবায়দার বয়স ৬৪ বছর। তারপর রাসূল (সা) তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসে তাঁকে বিয়ে করেন। একথা বালাজুরী ও ইবন সা'দও বলেছেন।[১]

ইউনুস ইবন মুহাম্মাদ, ইবন ইসহাকের সূত্রে বলেছেন, পূর্বে তিনি আল-হুসাইন ইবনুল হারিস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন, অথবা তাঁর ভাই আত-তুফাইল ইবন আল-হারিসের।[২] ইবন হিশাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পূর্বে তিনি 'উবায়দা ইবনুল হারিসের স্ত্রী ছিলেন। আর 'উবায়দার পূর্বে তিনি স্ত্রী ছিলেন জাহ্‌ম ইবন 'আমর ইবনুল হারিসের। এই জাহ্‌ম ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই।[৩]

তবে ইবন আবদিল বার ও ইবনুল আসীরের মতে, রাসূলুল্লাহের সাথে বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের স্ত্রী ছিলেন।[৪] হিজরী তৃতীয় সনে এই আবদুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু উমাইমা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিবের ছেলে। স্বামীর এমন মৃত্যুতে হযরত যায়নাব (রা) দারুণ ব্যথা পান। ইমাম যুহরীও একথা বলেছেন।[৫]

তৃতীয় হিজরীর রমজান মাসের প্রথম দিকে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং দেনমোহর বাবদ বারো উকিয়া সোনা দান করেন। ইবন হিশাম বলেন, চার শো দিরহাম দেনমোহরের বিনিময়ে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।[৬] এ বিয়ের মধ্যস্থতা করেন

---

১. আনসাবুল আশরাফ–১/৪২৯; আল-ইসাবা-৪/৩১৬, তাবাকাত-৮/৮২
২. ইবন কাসীর : আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা–২/৫১৮
৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭
৪. উসূদুল গাবা-৫/৪৬৬
৫. আসাহ আস-সিয়ার-৬১৯; আল-ইসতীয়াব-৪/৩১৩
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭

কুবায়সা ইবন 'আমর আল-হিলালী (রা)।[৭] রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর, কোন কোন বর্ণনা মতে, দুই অথবা তিন মাস জীবিত ছিলেন।[৮] বালাজুরী বলেন, আট মাস রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর করার পর ৪র্থ হিজরীর রবী'উস সানী মাসের শেষ দিকে মারা যান।[৯] এ মতটিই সঠিক বলে মনে হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর।[১০] রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই তাঁর জীবদ্দশায় হযরত খাদীজার পর প্রথম জান্নাতবাসিনী হন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার বাকী গোরস্তানে দাফন করেন।[১১]

ইবন হাজার (র) বলেন, হযরত হাফসার (রা) পরে রাসূল (সা) যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মাকে (রা) ঘরে আনেন। হযরত উম্মু সালামার (রা) একটি বর্ণনায় এসেছে, যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার মৃত্যুর পর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করে তাঁরই ঘরে এনে উঠান।[১২]

কেউ কেউ বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী

أَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقاً بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا -

(তোমাদের মধ্যে যার হাত দীর্ঘ সেই খুব তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যুর পর আমার সাথে মিলিত হবে।) —দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'দীর্ঘ হাত' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ দানশীলতা। যেহেতু হযরত যায়নাব, খুব বেশী দান-খায়রাত করতেন, তাই 'লম্বা হাত' বলে তাঁকে বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মূলত এ হাদীস দ্বারা যায়নাব বিন্‌ত জাহাশকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয় রাসূলুল্লাহর (স) ওফাতের পরে সকল আযওয়াজে মুতাহারাতের আগে। আর মুহাদ্দিসগণ তো এ ব্যাপারে একমত যে, যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।[১৩]

ইবন হিশাম বলেন ঃ[১৪]

وكانت تسمىٰ أُمُّ المساكين ، لرحمتها إيَّاهم ورقَّتها عليهم -

–'গরীব-মিসকীনদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতা ও সহমর্মিতার কারণে, তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বা 'মিসকীনদের মা' বলা হতো।'

---

৭. প্রাগুক্ত
৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮
৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯
১০. তাবাকাত-৮/৮২; আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১১. তাবাকাত-৮/৮২
১২. আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১৩. তাবাকাত-৮/৮২; আল-ইসাবা-৪/৩১৬
১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৬৪৭

হাফেজ ইবন হাজার (র) বলেন ঃ[১৫]

وكنت يقال له أمُّ المساكين لأنها كانت تطعمهم و تصدق عليهم -

–'তিনি গরীব-মিসকীনদের আহার করাতেন এবং তাদেরকে দান-খায়রাত করতেন, এ কারণে তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বলা হতো।'

ইবন আবদিল বার ও বালাজুরী বলেন, জাহিলী যুগেই তাঁকে এ নামে ডাকা হতো।[১৬]

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) সম্পর্কে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায়না। সম্ভবত এর কারণ তাঁর অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ।

---

১৫. আল-ইসাবা-৪/৩১৫

১৬. আল-ইসতী'য়াব–৪/৩১৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯

উম্মু সালামা বিন্‌ত আবী উমাইয়্যা (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) আসল নাম 'হিন্দা'। 'উম্মু সালামা' ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।[১] অনেকে তাঁর নাম 'রামলা' বলেছেন, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ একে ভিত্তিহীন মনে করেছেন।[২] মূলত 'রামলা' উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবার (রা) নাম। উম্মু সালামার (রা) পিতা আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা ইবন আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন আল-মাখযুম। আবু উমাইয়্যার আসল নাম 'হুজাইফা'। তবে তিনি 'আবু উমাইয়্যা' নামেই খ্যাত।[৩] তাঁর উপাধি ছিল 'যাদুর রাকব'। 'যাদুর রাকব' অর্থ কাফেলার পাথেয়। মক্কার দানশীল ও অতিথি সেবকদের মধ্যে তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিল। তিনি যখন কোন কাফেলার সাথে কোথাও বের হতেন তখন গোটা কাফেলার খাওয়া-দাওয়াসহ যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতেন। তাঁর এমন উদারতা ও মহানুভবতায় তুষ্ট হয়ে সমকালীন আরববাসী তাঁকে এ উপাধি দান করে।[৪] উল্লেখ্য যে, সেকালে কুরাইশদের মধ্যে 'যাদুর রাক্‌ব' উপাধি ধারণকারী ব্যক্তি ছিলেন মোট তিনজন। আবু উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা, আল-আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব, মুসাফির ইবন আবী আমর।[৫]

মক্কার আবু জাহলের পিতা হিশাম, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) নানা হাশিম, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের (রা) পিতা ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, আবু হুজাইফা মাখযুমী, 'আয়্যাশ ইবন রাবী'আর পিতা আবু রাবী'আ, ফাকিহ্‌, হিন্দা বিন্‌ত উতবার প্রথম স্বামী, হাফস, আবদু শাম্‌স– এঁরা সবাই ছিলেন মুগীরা আল-মাখযুমীর ছেলে, আবু উমাইয়্যার ভাই এবং হযরত উম্মু সালামার (রা) চাচা। আর 'আমর ইবনুল 'আসের (রা) মা উম্মু হারমালা বিন্‌ত হিশাম, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) মা খানতামা বিন্‌ত হাশিম– উভয়ে ছিলেন উম্মু সালামার (রা) চাচাতো বোন।খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, 'আয়্যাশ ইবন আবী রাবী'আ, সালামা ইবন হিশাম, আবু জাহল ইবন হিশাম, খালিদ ইবন হিশাম, হারিস ইবন হিশাম– এঁরা সবাই ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই।[৬]

হযরত উম্মু সালামার (রা) মাতার নাম 'আতিকা বিন্‌ত 'আমির ইবন রাবী'আ ইবন মালিক আল-কিনানিয়্যা।[৭] কোন কোন গ্রন্থকার মনে করেছেন উম্মু সালামার (রা) মা 'আতিকা' ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। সুতরাং উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা)

---

১. আনসাবুল আশরাফ–১/২০৭, ৪২৯,
২. আল-ইসাবা-৪/৪৫৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৪/২০২,
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯
৪. আল-ইসাবা-৪/৪৫৮
৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, টীকা নং-২, ২/২০২,
৬. আসাহ আস-সিয়ার-৬২০,৬২১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২
৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৯

ফুফাতো বোন।[৮] আসলে উম্মু সালামার (রা) পিতার সাথে এই আতিকার বিয়ে হয়েছিল এবং তাঁর গর্ভে আবদুল্লাহ, উম্মু যুহাইর ও কারীবা নামের তিনটি সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু এ 'আতিকা উম্মু সালামার (রা) মা নন। তাঁর মা আমির ইবন রাবী'আর কন্যা আতিকা।[৯]

প্রথম বিয়ে

হযরত উম্মু সালামার (রা) প্রথম বিয়ে হয় আবদুল্লাহ ইবন আবদিল আসাদ আল-মাখযুমীর সাথে। যার ডাকনাম আবু সালামা এবং এ নামেই প্রসিদ্ধ। আবু সালামার (রা) পিতামহ হিলাল এবং উম্মু সালামার (রা) পিতামহ মুগীরা দুই ভাই। আবু সালামার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফা। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু বুর্‌রাকে তিনি বিয়ে করেন। তাঁরই ছেলে আবু সালামা (রা)। হযরত আবু তালিব হযরত হামযা (রা) ও হযরত 'আব্বাস (রা) আবু সালামার সম্মানিত মামা।[১০] অন্য দিকে আবু সালামা ছিলেন রাসূলুল্লাহর দুধভাই।[১১]

তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ঐ সকল লোকদের অন্তর্গত যাঁদেরকে বলা হয় 'কাদীমুল ইসলাম' বা প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলামের সূচনা পর্বে যখন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে কি করবে না– এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং যখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল একটি দুরুহ কাজ তখন এই দম্পতি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[১২] ইবনুল আসীর লিখেছেন, আবু সালামা ইবন আবদুল আসাদ, আবু উবাইদা ইবনুল হারিস, আরকাম ইবন আবী আরকাম, উসমান ইবন মাজউন– এঁরা সকলে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এঁদের পরে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সা'ঈদ ইবন যায়িদ ও অন্যরা মুসলিম হন।[১৩]

ইসলাম গ্রহণের পর বনু মাখযুম হযরত আবু সালামার (রা) উপর নির্দয়ভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকলে এক পর্যায়ে তিনি পালিয়ে হযরত আবু তালিবের আশ্রয়ে চলে আসেন। বনু মাখযুমের লোকেরা বললো ঃ আবু তালিব! এতদিন আপনি আপনার ভাতিজার সাহায্য সমর্থন করছিলেন, এখন আপনার আশ্রয়ে থাকা আমাদের ভাইয়ের ছেলেকেও আমাদের হাতে সমর্পণ করছেন না। আবু তালিব বললেন ঃ যে বিপদ থেকে আমার ভাইয়ের ছেলেকে রক্ষা করছি, সেই একই বিপদ থেকে আমার বোনের ছেলেকেও রক্ষা করছি। হিজরাতের হুকুম হলে তিনি হাবশায় হিজরাত করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তিনিই সর্বপ্রথম সস্ত্রীক হাবশায় হিজরাত করেন।[১৪]

---

৮. প্রাগুক্ত-১/৮৮
৯. আসাহ আস-সিয়ার-৬২১; প্রাগুক্ত-১/৪২৯
১০. প্রাগুক্ত,
১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২; আল-ইসাবা-৪/৪৫৮
১২. আল-ইসাবা-৪/৪৫৮
১৩. আসাহ আস-সিয়ার-৬২১
১৪. প্রাগুক্ত-৬২২

হিজরাত

ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যেমন দু'জন একসাথে সিদ্ধান্ত নেন তেমনি হিজরাতের ব্যাপারেও তাঁরা একসাথে ও একমতে ছিলেন। পর পর দুইবার তাঁরা হাবশায় হিজরাত করেন।[১৫] সেখানে কিছু দিন অবস্থান করার পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর আবার মদীনার দিকে যাত্রা করেন। মদীনায় হিজরাতের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) যে হৃদয় বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হন তা তাঁরই ভাষায় ইবনুল আসীর তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

'আবু সালামা যখন মদীনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তাঁর কাছে মাত্র একটি উট ছিল। তিনি সেই উটের উপর আমাকে ও তাঁর ছেলে সালামাকে উঠান এবং নিজে উটের লাগাম ধরে চলতে আরম্ভ করেন। আমার পিতৃকূল বনু মুগীরার লোকেরা আবু সালামাকে বাধা দিয়ে বললো, আমরা আমাদের মেয়েকে এমন খারাপ অবস্থায় যেতে দেব না। আবু সালামার হাত থেকে তারা উটের লাগাম ছিনিয়ে নিল এবং আমাকে তারা সংগে করে নিয়ে চললো। ইতোমধ্যে আমার স্বামীর খান্দান বনু 'আবদিল আসাদের লোকেরা এসে পড়ে এবং তারা আমার সন্তান সালামাকে তাদের দখলে নিয়ে নেয়। তারা বনু মুগীরাকে বললো, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে তার স্বামীর সাথে যেতে না দাও তাহলে আমরা আমাদের সন্তানকে তোমাদের মেয়ের কাছে থাকতে দেব না। এভাবে আমি, আমার স্বামী ও আমার সন্তান–তিনজন তিনদিকে ছিটকে পড়লাম। স্বামী-সন্তানের বিচ্ছেদ ব্যথায় আমার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়লো। যেহেতু হিজরাতের নির্দেশ এসে গিয়েছিল, তাই আবু সালামা মদীনায় পৌঁছে যান। আর এদিকে মক্কায় আমি একাকিনী। প্রতিদিন সকালে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম এবং আবতাহ উপত্যকায় একটি টিলার উপর বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতাম। এভাবে প্রায় সাত/ আটদিন চলে যায়।

একদিন আমাদের হিতাকাঙ্খী বনু মুগীরার এক ব্যক্তি আমার এ দুরবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট পেলেন। তিনি বনু মুগীরার লোকদের একত্র করে তাদের সম্বোধন করে বললেন ঃ 'আপনারা এ অসহায় মেয়েটিকে মুক্তি দিচ্ছেন না কেন? তাকে কেন তার স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন? তাকে মুক্তি দিন এবং স্বামী-সন্তানের সাথে মিলিত হতে দিন।' তিনি কথাগুলি এমন আবেগভরা শব্দে প্রকাশ করেন যে, তাতে আমার পিতৃগোত্রের লোকদের অন্তরে দয়া ও করুণার সঞ্চার হয়। তাঁরা আমাকে আমার স্বামীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন।

এ খবর শুনে বনু আবদুল আসাদও আমার সন্তানটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখন আমি উটের উপর হাওদায় বসলাম এবং সালামাকে কোলে করে সওয়ার হয়ে গেলাম। মক্কা থেকে একাকিনী বের হয়ে তান'ঈম পৌঁছলাম। সেখানে কা'বার চাবি রক্ষক

---

১৬. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৮; সিফাতুস সাফওয়া-২/২১

'উসমান ইবন তালহা ইবন আবী তালহার সাথে দেখা হলো। তিনি আমার ইচ্ছার কথা জেনে, আমার সাথে আর কেউ আছে কিনা তা জানতে চাইলেন। বললাম, না, আর কেউ নেই। শুধু আমি ও আমার এ শিশু সন্তান। একথা শুনে তিনি আমার উটের লাগাম মুট করে ধরে টানতে টানতে উটের আগে আগে চলতে লাগলেন।

আল্লাহ জানেন, আমি তালহার চেয়ে বেশী ভালো ও ভদ্র মানুষ আরবে আর কাউকে পাইনি। যখন আমরা কোন মানযিলে পৌঁছতাম, এবং আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়তো, তিনি উট বসিয়ে দিয়ে দূরে কোন গাছের আড়ালে চলে যেতেন। আবার চলার সময় হলে, তিনি উট প্রস্তুত করে আমার কাছে এসে বলতেন, 'উঠে বস।' আমি উটের পিঠে আরাম করে বসার পর তিনি লাগাম ধরে আগে আগে চলতে থাকতেন। গোটা ভ্রমণটাই এই নিয়মে হয়েছিল। যখন আমরা মদীনার বনু আমর ইবন আওফের পল্লী কুবায় পৌঁছলাম, উসমান ইবন তালহা আমাকে বললেন, তোমার স্বামী এই পল্লীতে আছেন। আবু সালামা সেখানে অবস্থান করছিলেন। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে মহল্লার মধ্যে ঢুকে গেলাম এবং আবু সালামার দেখা পেয়ে গেলাম। এভাবে উসমান ইবন তালহা আমাকে আবু সালামার সন্ধান দিয়ে আবার মক্কার দিকে যাত্রা করেন।[১৬]

'উসমান ইবন তালহার এই সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কথা হযরত উম্মু সালামা সারা জীবন মনে রেখেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ

مَارَأَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ اَكْرَمُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ -

– 'আমি 'উসমান ইবন তালহার চেয়ে বেশী ভদ্র সঙ্গী আর কখনও দেখিনি।'

এই পরীক্ষাপর্বে চারিদিক থেকে মুসলমানরা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল এবং তাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কোন অন্ত ছিল না। হিজরাতের সময় উম্মু সালামাকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয় এ তারই কিছু অংশমাত্র। তাঁর নিজের অন্তরেও এ উপলব্ধি ছিল। তাই পরবর্তীকালে হিজরাতের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি একটু গর্বের সঙ্গে বলতেন ঃ 'ইসলামের জন্যে আবু সালামার পরিবারকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, আহলে বাইতের আর কেউ তেমন পোহায়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।'[১৭]

অন্যান্য গুণে হযরত উম্মু সালামা যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণের উপর প্রাধান্যযোগ্য ছিলেন, তেমনিভাবে এ বৈশিষ্ট্যও লাভ করেন যে, তিনিই প্রথম পর্দানশীল মহিলা যিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন।[১৮]

হযরত উম্মু সালামা (রা) প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না মহিলা ছিলেন। তাঁর পিতা আবু উমাইয়্যা ছিলেন কুরাইশদের একজন খ্যাতিমান ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। উম্মু সালামা (রা)

---

১৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/১৬৯; উসুদুল গাবা-৫/৫৮৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৫৮,৩৫৯

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৯

যখন কুবায় পৌঁছেন তখন লোকেরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইতো। তিনি পিতার নাম বললে কেউ বিশ্বাস করতে চাইতো না। কারণ, সে যুগেও তাঁর মত কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা একাকী এভাবে ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতো। উম্মু সালামার ছিল ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড দরদ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন তিনি অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করতেন। এ কারণে তিনি কারও কোন কথায় কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন না। সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতেন। হজ্জের মওসুম এসে গেল। যখন কিছু লোক কুবা থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল, তিনি তাদেরকে মক্কায় পিতার ঠিকানা দিলেন। তখন সবাই তাঁর শরাফতী ও খান্দানী আভিজাত্য বিশ্বাস করলো। সবার অন্তরে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করলেন।[১৯]

হিজরাতের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার দগদগে স্মৃতি তখনও তাঁদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানসহ এক সাথে বসবাসের সুযোগও বেশী দিন হয়নি, এরই মধ্যে উহুদ যুদ্ধের ডাক এসে যায় এবং হযরত আবু সালামা (রা) সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধে একই নামের প্রতিপক্ষের অপর এক ব্যক্তি আবু সালামা হাশমীর নিক্ষিপ্ত একটি তীরে তাঁর বাহু আহত হয় এবং একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যান।[২০] এর কিছুদিন পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে 'কাতান' অভিযানে পাঠান এবং ২৯ দিন সেখানে অতিবাহিত হয়। হিজরী ৪র্থ সনের সফর মাসের আট অথবা নয় তারিখ মদীনায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর সেই পুরানো ক্ষত আবার তাজা হয়ে জীবন আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই বছর জামাদিউস সানী মাসের নয় তারিখ তিনি ইনতিকাল করেন।[২১] হযরত উম্মু সালামা (রা) স্বামীর মৃত্যুর খবর রাসূলুল্লাহকে (সা) দিতে আসেন। রাসূল (সা) উম্মু সালামার গৃহে যান। উম্মু সালামা তখন শোকে বিহ্বল। তিনি বারবার শুধু বলছিলেন ঃ 'হায়, বিদেশ-বিভূঁয়ে এ তাঁর কেমন মৃত্যু হলো!' রাসূল (সা) তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিয়ে বলেন, তোমরা তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ কর। আর বল–

اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ خَيْرًا مِنْهَا -

'হে আল্লাহ, আমাকে তাঁর চেয়ে ভালো কোন বিকল্প দান করুন।'

তারপর রাসূল (সা) আবু সালামার লাশের কাছে যান এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। সেই নামাযে তিনি নয়টি তাকবীর বলেন। লোকেরা মনে করেছিলেন হয়তো ভুল হয়েছে। তাই তাঁরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার ভুল হয়নি তো? বললেন ঃ এ ব্যক্তি হাজার তাকবীর লাভের যোগ ছিলেন। মৃত্যুর সময় আবু সালামার চোখ দুইটি খোলা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের দুইটি পবিত্র হাত দিয়ে চোখ দুইটি বন্ধ করে দেন এবং তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করেন।[২২]

---

১৯. মুসনাদে ইমাম আহমাদ-৬/৩০৭; আল-ইসাবা-৪/৪৫৯; তাবাকাত-৮/৯৩

২০. তাবাকাত-৮/৮৮

২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৩; আল-ইসাবা-৪/৪৫৮ তাবাকাত-৮/৮৭

২২. মুসনাদে আহমাদ-৬/২৮৯; ২৯১, ৩০৬; মুসলিম : কিতাবুল জানায়িয (৯১৯); আবু দাউদ : আল-জানায়িয (৩১১৫); তিরমিযী : আল-জানায়িয (৯৭৭)

দ্বিতীয় বিয়ে

হযরত আবু সালামার (রা) যখন ইনতিকাল হয় তখন হযরত উম্মু সালামা সন্তানসম্ভবা। সন্তান প্রসবের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর একাকীত্ব ও দুঃখ-বেদনার কথা চিন্তা করে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[২৩]

একটি বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, হযরত 'উমারও (রা) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু 'আল-ইসাবা' গ্রন্থকারের ধারণা যে, 'উমারের (রা) মাধ্যমে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত আবু সালামার আত্মত্যাগ এবং হযরত উম্মু সালামার (রা) অসহায় অবস্থা ও একাকীত্ব হযরত রাসূলে কারীমের অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে থাকবে। তাই হযরত আবু বকরের (রা) প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আল্লাহ পাকের নির্দেশে রাসূল (সা) হযরত 'উমারের (রা) মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান। হযরত উম্মু সালামা (রা) কতকগুলি কারণ উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু সালামার (রা) সকল শর্ত মেনে নেন। তখন উম্মু সালামা (রা) রাজি হয়ে যান। উম্মু সালামা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রস্তাব কবুল করতে অপারগতার যে কারণগুলি দেখান তা এরকম ঃ (ক) আমি ভীষণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মহিলা, (খ) আমার কয়েকটি সন্তান রয়েছে, (গ) আমি একজন বয়স্ক মহিলা, (ঘ) আমার কোন ওলী নেই। জবাবে রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমার সন্তানদের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। তোমার প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ দূর করে দেবেন। ওলী, তা তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে রাজি হবেনা, আর তুমি বয়স্কা, তা তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী।

তারপর তিনি ছেলে 'উমারকে বলেন ঃ 'যাও, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর।'[২৪]

হিজরী ৪র্থ সনের শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত রাসূলে পাকের (সা) সাথে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। স্বামী আবু সালামার (রা) মৃত্যুতে তিনি যে দুঃখ-বেদনার শিকার হন, এভাবে তা দূর হয় এবং তাঁর চেয়ে ভালো বিকল্প লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দুঃখকে অনন্তকালের জন্য আনন্দে রূপান্তর করে দেন।

আহমাদ ইবন ইসহাক হাদরামী, যিয়াদ ইবন মারইয়ামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একবার উম্মু সালামা স্বামী আবু সালামাকে বলেন ঃ আমি জেনেছি, যদি কোন মহিলার স্বামী মৃত্যুর পর জান্নাতে যায়, আর তার স্ত্রী-দ্বিতীয় বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ সে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে জান্নাতে স্থান দান করবেন। এই অবস্থা পুরুষের জন্যেও যদি হয়, তাহলে আসুন আমরা অঙ্গীকার করি, আপনি আমার পরে আর বিয়ে করবেন না, আর আমিও

---

২৩. তাবাকাত-৮/৯০

২৪. প্রাগুক্ত-৮/৯০, ৯১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৪, ২০৫; আল-ইসাবা-৪/৪৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/২১

আপনার পরে আর বিয়ে করবো না। আবু সালামা বলেন ঃ তুমি কি আমার কথা মানবে? উম্মু সালামা বললেন, আপনার কথা মানা ছাড়া আমার আনন্দ আর কোথায়? আবু সালামা বললেন ঃ আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তুমি আবার বিয়ে করবে। তারপর আবু সালামা দু'আ করেন ঃ 'হে আল্লাহ, আমার পরে উম্মু সালামাকে আমার চেয়েও ভালো পাত্র দান করুন।' হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন ঃ যখন আবু সালামা মারা গেলেন, তখন আমি মনে মনে বলতাম, আবু সালামার চেয়ে ভালো আর কে হবে? এর কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায়।[২৫]

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা এই দম্পতির মধ্যে এক মধুর সম্পর্কের কথা যেমন জানা যায়, তেমনি একথাও জানা যায় যে, সেকালে ইসলামের সঠিক ও পরিচ্ছন্ন শিক্ষার প্রভাব কত গভীর ছিল। যার ফলে একজন স্বামী-তাঁর সকল আবেগ দমন করে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে তার অবর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ের উপদেশ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একজোড়া যাঁতা, দুইটি মশক, এবং চামড়ার কভার ও খোরমার ছালে ভরা একটি বালিশ উম্মু সালামাকে দেন। এ সকল জিনিসই তিনি অন্য বিগিণকেও দিয়েছিলেন।[২৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মু সালামাকে বিয়ে করার পর তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের কথা হযরত আয়িশার (রা) কানে গেলে তাঁর মনের মধ্যে একটু ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। তিনি উম্মু সালামাকে দেখতে আসেন। গভীরভাবে দেখার পর তিনি বুঝতে পারলেন, উম্মু সালামার রূপের কথা যতটুকু বলা হয়, তিনি তার চেয়েও বেশী সুন্দরী। তিনি তাঁর রূপের কথা হযরত হাফসাকে (রা) বললেন। হাফসা (রা) 'আয়িশাকে (রা) বুঝালেন যে, লোকে একটু বাড়িয়ে বলছে। তারপর হযরত হাফসা (রা) তাঁকে দেখেন এবং একই কথা বলেন। হযরত আয়িশা (রা) আবার তীক্ষ্ণভাবে উম্মু সালামাকে দেখেন এবং হাফসার কথাই ঠিক বলে বিশ্বাস করেন।[২৭] যাই-হোক, এ বর্ণনা এবং এ ধরনের আরও বহু বর্ণনা দ্বারা হযরত উম্মু সালামার (রা) সুদর্শন চেহারার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত উম্মু সালামা ছিলেন একজন লজ্জাবতী ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না মহিলা। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের পর প্রথম দিকে তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই রাসূল (সা) কাছে আসতেন, তিনি দুগ্ধপোষ্য মেয়ে যায়নাবকে দুধ পান করাতে শুরু করতেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) ফিরে যেতেন। হযরত 'আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) ছিলেন তাঁর দুধভাই। তিনি একথা শুনে ক্ষেপে যান এবং মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এরপর রাসূল (সা) উম্মু সালামার ঘরে আসেন এবং এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন। শিশু মেয়েকে না দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ যায়নাব কোথায়? তাকে কি করেছো? তিনি

---

২৫. তাবাকাত-৮/৮৮; মুসনাদ-৬/২৯৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৩
২৬. তাবাকাত-৮/৯০; আন-নাসাঈ : কিতাবুন নিকাহ : মুসনাদ-৬/২৯৫, ৩১৩-৩১৭; সিফাতুস সাফয়া-২/২১
২৭. তাবাকাত-৮/৯৪; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩৯

জবাব দিলেন ঃ আম্মার এসে নিয়ে গেছে। সেদিন থেকে রাসূল (সা) অবস্থান করতে থাকেন।[২৮]

ধীরে ধীরে এ অবস্থা দূর হয়ে যায় এবং অন্য বিবিগণ যেভাবে ছিলেন সেভাবে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পরে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সম্পর্ক এত গভীর হয় যে, হযরত 'আয়িশার (রা) পরেই তাঁর স্থান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে হযরত উম্মু সালামার (রা) বিয়ের ঘটনাসমূহের মধ্যে এ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যেদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে আসেন সেদিনই নিজহাতে খাবার তৈরী করেন। হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) অল্প কিছুদিন আগে ইনতিকাল করেছিলেন। উম্মু সালামাকে তাঁরই ঘরে এনে উঠানো হয়। ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। হযরত উম্মু সালামা (রা) একটি কলস থেকে কিছু যব বের করেন এবং অন্য একটি পাত্র থেকে কিছু চর্বি বের করে একটি হাঁড়িতে চড়িয়ে দেন। তারপর যবগুলি যাঁতায় পিষে চর্বিতে মিশিয়ে এক প্রকার খাবার তৈরী করেন। তাই ছিল হযরত রাসূলে কারীম (সা) ও তাঁর জীবন সঙ্গিনীর বাসর রাতের খাদ্য।[২৯]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বিবিগণের দুইটি দল ছিল। একদলে ছিলেন হযরত আয়িশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাফিয়্যা (রা) ও হযরত সাওদা (রা)। আর অন্য দলে ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা) ও অন্যরা। আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী। লোকেরা তা জানতো। এ কারণে রাসূল (সা) যে দিন 'আয়িশার (রা) ঘরে থাকতেন, সেদিন তাঁরা হাদিয়া তোহফা পাঠাতো। উম্মু সালামার (রা) দলের বিবিগণ বললেন, আমরাও আয়িশার মত হাদিয়া তোহফা পেতে চাই। সুতরাং রাসূল (সা) যার ঘরেই থাকুন না কেন, লোকদের সেখানেই যা কিছু পাঠাবার পাঠানো উচিত। তাঁরা তাঁদের দাবীর কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানানোর জন্য উম্মু সালামাকে মুখপাত্র মনোনীত করেন।

হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) কথাটি পর পর দুইবার বললেন। তিনি উপেক্ষা করলেন। তৃতীয়বারের মাথায় বললেন ঃ আয়িশার ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না। কারণ, সে ছাড়া তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার লেপের মধ্যে আমার নিকট ওহী এসেছে।

উম্মু সালামা (রা) তখন বললেন ঃ

أَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ أَذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ -

–ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনাকে কষ্টদানের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।

রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের অভাব ও দারিদ্র্যকে মেনে নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর সাথে জীবন

---

২৮. মুসনাদ-৬/৩১৩, ৩১৪; তাবাকাত-৮/৯০

২৯. তাবাকাত-৮/৯৩; কানযুল উম্মাল-৭/১১৭

কাটিয়েছেন। একবার হযরত আল-ইরবাদ, জু'আল ইবন সুরাকা ও আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্‌ফিল (রা) কোন এক সফর থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসলেন। তাঁরা ছিলেন অভুক্ত। রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু আহার করানোর ইচ্ছায় উম্মু সালামার (রা) নিকট গেলেন এবং কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু তাঁর ঘরে খাবার মত কিছুই পেলেন না।[৩০]

আল-মুত্তালিব ইবন আবদুল্লাহ বলেন ঃ আরবের বিধবা উম্মু সালামা সন্ধ্যার প্রথম পর্বে সাইয়্যেদুল মুসলিমীনের ঘরে বউ হিসেবে আসেন এবং রাতের শেষ পর্বে যব পিষতে লেগে যান।[৩১]

হিজরী ৫ম সনে মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কুরায়জার অবরোধের এক পর্যায়ে তাদের সাথে আলোচনার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আবু লুবাবাকে (রা) পাঠান। তাদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি হাতের ইঙ্গিতে তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেন যে, তোমাদের হত্যা করা হবে। কিন্তু এটাকে রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে মনে করে ভীষণ অনুতপ্ত হন। তারপর তিনি মসজিদের একটি খুঁটিতে নিজেকে বেঁধে ফেলেন। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে এ অবস্থায় রাখেন, অতঃপর তাঁর তাওবা কবুল হয়। সেদিন রাসূল (সা) উম্মু সালামার (রা) ঘরে ছিলেন।

সকালে রাসূল (সা) উম্মু সালামার (রা) ঘরে ঘুম থেকে জেগে মৃদু হাসতে থাকেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) তা দেখে বলেন ঃ 'আল্লাহ আপনাকে সর্বদা হাসিতে রাখুন। এ সময় হাসির কারণ কি?' বললেন ঃ আবু লুবাবার তাওবা কবুল হয়েছে। হযরত উম্মু সালামা তাঁকে এ খোশখবরটি শোনাবার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হাঁ, চাইলে শোনাতে পার। উম্মু সালামার ঘরটি ছিল মসজিদে নববীর এত নিকটে যে, ঘর থেকে আওয়ায দিলে মসজিদ থেকে শোনা যেত। অনুমতি পেয়ে তিনি হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন ঃ আবু লুবাবা! তোমাকে মুবারকবাদ। তোমার তাওবা কবুল হয়েছে। এ আওয়ায মানুষের কানে যেতেই গোটা মদীনা যেন আনন্দ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।[৩২]

এটা হিজাবের হুকুম নাযিলের আগের ঘটনা।

সেই বছর হিজাবের (পর্দা) আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত নাযিলের আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণ কিছু কিছু দূরের আত্মীয়-স্বজনদের সামনে যেতেন। এখন কিছু বিশেষ আত্মীয় ও আপনজন ছাড়া সবার থেকে পর্দা করার নির্দেশ হলো। হযরত ইবন উম্মে মাকতুম ছিলেন কুরাইশ বংশের একজন অতিমর্যাদাবান অন্ধ সাহাবী। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মু'য়াজ্জিনও ছিলেন। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন, এ কারণে রাসূলুল্লাহর (সা) অন্দর মহলেও তাঁর যাতায়াত ছিল। হিজাবের আয়াত নাযিলের পর পূর্বের অভ্যাস

---

৩০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৬৩২

৩১. প্রাগুক্ত-২/৫৬৬; তাবাকাত-৮/৮৪

৩২. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৩৭

মত একদিন তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। রাসূল (সা) হযরত উম্মু সালামা (রা) ও হযরত মায়মূনাকে (রা) বললেন ঃ 'তার থেকে তোমরা পর্দা কর।' তাঁরা বললেন ঃ তিনি তো একজন অন্ধ মানুষ। রাসূল (সা) বললেন ঃ তোমরা তো আর অন্ধ নও। তোমরা তো তাকে দেখছো।[৩৩]

খন্দক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) এত নিকটে ছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি কথা ভালোমত শুনতে পেতেন। তিনি বলতেন, আমার সেই সময়ের কথা খুব ভালো মনে আছে, যখন রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র বুকে ধূলোবালি লেগে ছিল। তিনি লোকদের মাথায় ইট উঠিয়ে দিচ্ছিলেন, আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। হঠাৎ আম্মার ইবন ইয়াসিরের প্রতি দৃষ্টি পড়লে তিনি বললেন ঃ হে ইবন সুমাইয়্যা, তোমাকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে।[৩৪]

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) একটি সঠিক পরামর্শ দান করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে, সন্ধি চুক্তির পর রাসূল (সা) বলেন, লোকেরা যেন হুদায়বিয়ায় নিজ নিজ পশু কুরবানী করে। যেহেতু সন্ধির শর্তাবলী দৃশ্যত মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী ছিল। এ কারণে, সাধারণভাবে মুসলমানরা মনঃক্ষুণ্ন ও বিমর্ষ ছিল। রাসূল (সা) তিনবার নির্দেশ দানের পরেও কারও মধ্যে নির্দেশ পালনের তোড়জোড় দেখা গেলনা। রাসূল (সা) তাঁবুতে ফিরে এসে উম্মু সালামার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন উম্মু সালামা বলেন ঃ 'আপনি কাকেও কিছু বলবেন না। বাইরে যেয়ে নিজের কুরবানী করুন এবং ইহরাম ভাঙ্গার জন্য মাথার চুল ফেলে দিন।' রাসূল (সা) তাঁর পরামর্শ মত কাজ করেন। লোকেরা যখন দেখলো রাসূল (সা) তাঁর নির্দেশ মত নিজেই আমল করছেন তখন সবাই কুরবানী করে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলে। তখন কুরবানী করা ও ইহরাম ভাঙ্গার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।[৩৫]

হযরত উম্মু সালামার (রা) এ পরামর্শ ছিল খুবই সময় উপযোগী ও বাস্তব সম্মত। যা এক কঠিন সমস্যাকে নিমেষেই সমাধান করে দেয়।

হিজরী ৯ম সনের ঈলা ও তাখঈর-এর ঘটনার সময় হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত 'উমার (রা) নিজ নিজ মেয়েকে উপদেশ দেন। হযরত 'উমার (রা) উম্মু সালামার কাছে এসে কথা বলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা) একটু কর্কশ কণ্ঠে তাঁকে বলেন ঃ

عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت فى كل شيئ حتى تبغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه -

–ইবন খাত্তাব! এ আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে নাক গলান।

---

৩৩. মুসনাদ-৬/২৯৬
৩৪. প্রাগুক্ত-৬/৩১৯
৩৫. হায়াতুস সাহাবা-১/১৫৪; বুখারী-১/৩৮০

এমনকি আপনি রাসূল (সা) ও তাঁর বিবিগণের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও নাক গলাতে শুরু করেছেন।[৩৬]

হযররত আয়িশার (রা) জীবনকথা'য় আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হযরত উম্মু সালামার (রা) জবাবটি ছিল বড় শক্ত। তাই হযরত 'উমার (রা) নীরবে উঠে চলে যান। এদিকে রাতের মধ্যে খবর রটে যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম তাঁর বিবিগণকে তালাক দান করেছেন। সকালে হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাঁকে বলেন। উম্মু সালামার (রা) শক্ত জবাবের কথা শুনে তিনি মৃদু হেসে দেন।[৩৭]

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) ও রাসূলুল্লাহর (সা) সফর সঙ্গিনী ছিলেন। কাফেলা যখন মক্কার অদূরে মাররুজ জাহরান মতান্তরে নীকুল ওকাব নামক স্থানে তখন রাতের অন্ধকারে মক্কার আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন আবী উমাইয়্যা ইবনুল মুগীরা মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। এ সময় উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) পরামর্শ দেন এভাবে ঃ

يارسول الله إبن عمك ، وابن عمتك وصهرك -

–ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন আপনার চাচার ছেলে, আর একজন আপনার ফুফুর ছেলে ও আপনার শালা।' উল্লেখ্য যে, আবু সুফইয়ান রাসূলুল্লাহর (সা) বড় চাচা আল-হারিসের ছেলে, আর আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহর ফুফু আতিকার ছেলে এবং উম্মু সালামার (রা) ভাই।[৩৮]

তায়িফ অভিযানের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন।[৩৯] হিজরী ১০ম সনে বিদায় হজ্জের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু একটি দ্বীনী ফরজ কাজ আদায়ে কোন রকম শিথিলতা তাঁর পছন্দ হয়নি, তাই সঠিক ওজর বা কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গিনী হন। তাওয়াফের ব্যাপারে রাসূল (সা) তাঁকে বলেন ঃ উম্মু সালামা! যখন ফজর নামাযের সময় হতে থাকবে তুমি উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করে নিবে। তিনি তাই করেছিলেন।[৪০]

হিজরী একাদশ সনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) জীবনের শেষ দিনগুলিতে যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হযরত আয়িশার (রা) ঘরে অবস্থান করতে থাকেন তখন হযরত উম্মু সালামা (রা) প্রায়ই রাসূলকে (সা) দেখতে আসতেন। একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। হঠাৎ চিৎকার

---

৩৬. মুসলিম : বাবুল ঈলা; বুখারী-২/৭২০
৩৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৪
৩৮. হায়াতুস সাহাবা-১/১৬৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬১; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪০০
৩৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৮২
৪০. বুখারী-১/২১৯, ২২০

দিয়ে উঠলেন। রাসূল (সা) নিষেধ করে বললেন ঃ এটা মুসলমানদের আদর্শ নয়।

এ সময় একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) অসুখ বেড়ে যায়। বিবিগণ তাঁকে দুধ পান করাতে চান। পান করার ইচ্ছে না থাকায় অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু যখন তিনি একটু অচেতন হয়ে পড়েন তখন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) জোর করে মুখ হা করে সামান্য পান করিয়ে দেন।

এ সময় একদিন উম্মু সালামা (রা) ও উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হাবশার খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে মানুষের মূর্তির ছবি রাখার আলোচনা করলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তাদের মধ্যে কোন নেক্‌কার লোক মারা গেলে তারা তার কবরকে উপাসনালয় বানিয়ে নেয় এবং তাদের মূর্তি তৈরী করে তার মধ্যে স্থাপন করে। কিয়ামতের দিন এই লোকেরা হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

হযরত হুসাইনের (রা) শাহাদাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মু সালামার নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হযরত হুসাইন (রা) যে সময় ইয়াযীদের বাহিনীর সাথে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে চলেছেন, ঠিক সেই সময় হযরত উম্মু সালামা (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলূল্লাহ (সা) এসেছেন। তিনি ভীষণ অস্থির। মাথা ও দাড়ি মুবারক ধুলিমলিন। উম্মু সালামা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ। এ অবস্থা কেন? বললেন ঃ 'হুসাইনের শাহাদাত স্থল থেকে ফিরে আসছি।' ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, ইরাকীরা হুসাইনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! হুসাইনকে তারা অপমান করেছে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক।[৪১]

সন্তান

হযরত উম্মু সালামার সকল ছেলে-মেয়ে প্রথম স্বামীর। রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরে তাঁর কোন সন্তান হয়নি। আল-ইসাবা, উসুদুল গাবা ও তাবাকাতে সালামা ও 'উমার-দুই ছেলে এবং যায়নাব নামের এক মেয়ের বর্ণনা এসেছে। সহীহ বুখারীতে 'দুররা' নামে একটি মেয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই হিসেবে হযরত উম্মু সালামার (রা) সন্তান সংখ্যা চারজন হয়। নিম্নে সংক্ষেপে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

সালামা ঃ হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪২] উম্মু সালামার মদীনায় হিজরাতের সময় তিনি কোলে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযার (রা) মেয়ে উমামাকে এ সালামার সাথে বিয়ে দেন।[৪৩]

'উমার ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের সময় তার বয়স ছিল নয় বছর। ডাকনাম ছিল আবু হাফ্‌স। রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময় মদীনায় মারা যান। এই 'উমারের তত্ত্বাবধানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে তাঁর মা উম্মু

---

৪১. মুসনাদ-৬/২৯৮

৪২. ইবন হিশাম-২/৩৬৮

৪৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩০

সালামার বিয়ে সম্পন্ন হয়। হযরত 'আলীর (রা) খিলাফতকালে তিনি ফারেস ও বাহরাইনের শাসক নিযুক্ত হন। মা তাঁকে উটের যুদ্ধে আলীর (রা) সাথে পাঠান। তিনি আলীকে (রা) বলেন, আমার জানের চেয়েও প্রিয় সন্তানকে আপনার সাথে পাঠালাম। আপনার সাথে থাকবে, তারপর আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে। যদি রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের খেলাফ না হতো তাহলে আমিও আপনার সাথে বের হতাম। যেমন বের হয়েছেন আয়িশা (রা), তালহা ও যুবাইরের সাথে।[৪৪]

দুররা ঃ সহীহ বুখারীতে তার উল্লেখ এসেছে। একদিন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, আমি শুনেছি আপনি নাকি দুররাকে বিয়ে করতে চান? রাসূল (সা) বললেন ঃ তা কি করে হয়? আমি তাকে লালন-পালন না করলেও সে আমার জন্য কোনভাবেই হালাল ছিল না, কারণ, সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে।[৪৫]

যায়নাব ঃ তাঁর প্রথম নাম ছিল 'বাররা'। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) রাখেন যায়নাব। তাঁর এই সন্তানগণের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবিয়্যাতের মর্যাদার অধিকারী হন।[৪৬]

আখলাক

হযরত উম্মু সালামার (রা) গোটা জীবনই ছিল যুহ্দ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও চাকচিক্যের প্রতি খুব কমই দৃষ্টি দিতেন। একবার তিনি একটি হার গলায় পরেন। হারটিতে সামান্য সোনা ছিল। রাসূল (সা) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করায় তা খুলে ফেলেন।[৪৭]

তিনি প্রতিমাসের প্রতি সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার মোট তিনদিন রোযা রাখতেন।[৪৮]

প্রথম স্বামীর ছেলে-মেয়েরা সঙ্গে ছিল। অতি যত্নের সাথে তাদের লালন-পালন করতেন। একবার রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি এর কোন সওয়াব পাব? তিনি বলেন ঃ 'হাঁ, পাবে।'[৪৯] শরীয়াতের আদেশ-নিষেধের প্রতি অত্যধিক সতর্ক থাকতেন। কিছু লোক একবার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ছেড়ে দেয়। উম্মু সালামা তাদের সতর্ক করে দেন এবং বলেন ঃ রাসূল (সা) জুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, আর তোমরা আসরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করে থাক?[৫০]

হযরত উম্মু সালামার (রা) এক ভাতীজা একদিন তাঁর সামনে দুই রাকায়াত নামায পড়লেন। সিজদার স্থানটিতে ধুলোবালি থাকায় তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কপাল থেকে মাটি ঝাড়েন। উম্মু সালামা তাঁকে নিষেধ করেন এবং বলেন, এটা রাসূলুল্লাহর

---

৪৪. প্রাগুক্ত
৪৫. বুখারী-২/৭৬৪
৪৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২
৪৭. মুসনাদ-৬/৩১৫, ৩২২
৪৮. প্রাগুক্ত-৬/২৮৯
৪৯. বুখারী-১/১৯৮
৫০. মুসনাদ-৬/২৮৯

(সা) আচরণের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি দাস একবার এমন করেছিল। তিনি তাঁকে বলেন ঃ

تَرِبَ وَجْهُكَ لِلّٰهِ -

আল্লাহর জন্য তোমার চেহারা ধুলিমলিন হোক।

তিনি নিজেও যেমন দানশীল ছিলেন তেমনি অন্যকেও দানশীলতার প্রতি উৎসাহ দিতেন। একবার কয়েকজন অভাবী মানুষ তাঁর গৃহে এসে সাহায্য প্রার্থনা করে। উম্মুল হুসাইন তাঁর কাছে বসা ছিলেন, তিনি তাদের ধমক দিলেন। কিন্তু উম্মু সালামা তাঁকে থামান এবং বলেন, আমাদের এমন করার আদেশ নেই। তারপর তিনি দাসীকে নির্দেশ দেন, তাদেরকে কিছু দিয়ে বিদেয় করো। যদি কিছু না থাকে তাহলে একটি খোরমা তাদের হাতে দাও।

একবার হযরত আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) তাঁকে বললেন ঃ আম্মা! আমার কাছে এত বেশী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জমা হয়ে গেছে যে, আমি আমার ধ্বংসের আশঙ্কা করছি। তিনি বললেন ঃ ছেলে! খরচ করে ফেল! রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, অনেক সাহাবী এমন আছে যে আমাকে আমার মৃত্যুর পর আর কখনও দেখবে না।[৫১]

তিনি অন্যের আরাম-আয়েশের প্রতি খুবই সতর্ক থাকতেন। যতদূর সম্ভব ভালো কাজে কার্পণ্য করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি ভালোবাসার স্মৃতি হিসেবে তাঁর দেহের একটি পশম তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। সহীহ বুখারীতে এসেছে, তার কাছে রূপোর একটি পাত্র ছিল, তাতে তিনি পশম মুবারক সংরক্ষণ করেছিলেন। সাহাবীদের কেউ কোন দুঃখ-বেদনা পেলে একপেয়ালা পানি এনে তাঁর সামনে রাখতেন, তিনি পশম মুবারকটি সেই পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন। সেই পানির বরকতে তাঁর সকল দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত। আবদুল্লাহ ইবন মাওহাব বলেন, আমি উম্মু সালামার (রা) নিকট গেলাম। তিনি 'হিন্না ও কাতাম'-এ রক্ষিত রাসূলুল্লাহর (সা) একটি পশম বের করেন।[৫২]

যেদিন হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে রাত কাটাতেন, জায়নামাজের সামনে বিছানা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নামাজ আদায় করতেন, আর তিনি সেই বিছানায় শুয়ে থাকতেন।[৫৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) আরাম-আয়েশের প্রতি এতই সতর্ক ছিলেন যে, নিজের দাস সাফীনাকে এই শর্তে মুক্ত করে দেন যে, যতদিন রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিত থাকেন তাঁর সেবা করতে হবে।[৫৪]

---

৫১. প্রাগুক্ত-৬/২৯০; হায়াতুস সাহাবা-২/২৬৫

৫২. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৫; সাহাবিয়াত-৮০

৫৩. মুসনাদ-৬/৩২২

৫৪. প্রাগুক্ত-৬/৩১৯; হায়াতুস সাহাবা-১/৪৭৮

একবার হযরত উম্মু সালামা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) এর কী কারণ যে, কুরআনে আমাদের (মেয়েদের) উল্লেখ নেই? এ প্রশ্নের পর রাসূল (সা) মসজিদের মিম্বারে উঠে দাঁড়ান এবং সূরা আল-আহযাবের ৩৫তম আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدالله لهم مغفرة وأجرا عظيما ـ

–নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী আল্লাহর অধিক জিকরকারী পুরুষ ও জিকরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকার কারণেই হযরত উম্মু সালামা (রা) এমন প্রশ্ন করতে সাহস পান।

হযরত উম্মু সালামার (রা) মহত্ব ও মর্যাদা

রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে মহত্ব ও মর্যাদায় হযরত আয়িশার (রা) পরেই হযরত উম্মু সালামার স্থান। ইবন হাজার বলেন ঃ

كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب ـ

–উম্মু সালামা অনুপম সৌন্দর্য, পূর্ণ প্রজ্ঞা ও সঠিক সিদ্ধান্তের গুণে গুণান্বিতা ছিলেন।

তিনি আবু সালামা, ফাতিমাতুয যাহরা এবং খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাঁরা উম্মু সালামার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ 'উমার, যায়নাব (ছেলে-মেয়ে), তাঁর ভাই 'আমির, ভাইয়ের ছেলে মুস'আব ইবন আবদিল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবন রাফে, 'নাফে', ইবন সাফীনা, আবু কাসীর, খাযরা, সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা, হিন্দা বিন্‌ত হারিস, কাবীসা বিন্‌ত জুরাইব, আবু 'উসমান নাহদী', আবু ওয়ায়িল, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, হুমাইদ, 'উরওয়া, আবু বকর ইবন

আবদির রহমান, সুলায়মান ইবন ইয়াসার প্রমুখ সাহাবী ও তাবে'ঈ।[৫৫] হাদীসের গ্রন্থসমূহে তাঁর ৩৭৮টি হাদীস পাওয়া যায়। তার মধ্যে তেরটি মুত্তাফাক আলাইহি। ইমাম বুখারী তিনটি ও ইমাম মুসলিম তেরটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এ হিসেবে তিনি মুহাদ্দিস সাহাবীদের তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস বর্ণনাকারী মহিলাদের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়িশা (রা) ছাড়া তাঁর উপরে আর কেউ নেই।[৫৬]

হযরত উম্মু সালামার (রা) হাদীস শোনার প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবা দানের জন্যে মসজিদের মিম্বারে উঠলেন। তিনি কেবল 'ওহে জনমণ্ডলী!' বলেছেন, আর অমনি উম্মু সালামা চুল বিন্যস্তকারিণীকে বললেন, 'চুল বেঁধে দাও'। সে বললো! এত তাড়া কিসের। সবে তো 'ওহে জনমণ্ডলী!' বলেছেন। উম্মু সালামা বললেন! খুব ভালো কথা, আমরা কি জনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নই? তারপর তিনি নিজেই চুল বেঁধে দ্রুত উঠে যান এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্ণ ভাষণটি শোনেন।[৫৭]
এ ঘটনা দ্বারা তাঁর জ্ঞান অর্জনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রমাণিত হয়।

হযরত উম্মু সালামার (রা) হাদীসগুলি মুসনাদে ইমাম আহমাদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৮৯ হতে ৩২৪ পৃষ্ঠাগুলিতে সংকলিত হয়েছে।

হযরত উম্মু সালামার (রা) স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে মাহমুদ ইবন লাবীদ বলেন ঃ

كان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يحفظن من حديث النبى صلى الله عليه وسلم كثيرا ولا مثلا لعائشة وأم سلمة (طبقات ٧/١٧٦)

– রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের বহু হাদীস মুখস্থ ছিল। তবে হযরত আয়িশা ও হযরত উম্মু সালামার (রা) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।[৫৮]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন ঃ যদি তাঁর ফাতওয়া সংগ্রহ করা হয়, তাহলে ছোটখাট একটি পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে।[৫৯]
ইমামুল হারামাইন বলেন ঃ 'হযরত উম্মু সালামার (রা) চেয়ে বেশী সঠিক সিদ্ধান্ত দানের অধিকারী কোন মেয়ে আমার নজরে পড়েনা।'

---

৫৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০২; আল-ইসাবা-৪/৪৫৯
৫৬. প্রাগুক্ত-২/২১০
৫৭. মুসনাদ-৬/৬৯৭
৫৮. তাবাকাত-২/১২৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/২৬৩
৫৯. আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন-১/১৩

মারওয়ান ইবন হাকাম হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন ঃ ৬০

كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبى صلى الله عليه وسلم -

–আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণ থাকতে কিভাবে আমরা অন্যদের নিকট জিজ্ঞেস করি?

হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা)– যাঁদেররকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, তাঁরাও জানার জন্য হযরত উম্মু সালামার (রা) দরজায় ধর্না দিতেন। তাবে'ঈদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।৬১

হযরত উম্মু সালামা (রা) খুব সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) কায়দা ও রীতিতে পড়তে পারতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চায় ঃ রাসূল (সা) কিরায়াত পড়তেন কেমন করে? বললেন ঃ এক একটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পড়তেন। তারপর তিনি নিজেই কিছু আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দেন।৬২

তাঁর মধ্যে দারুণ বিচক্ষণতা ছিল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইনতিকালের পূর্বে কন্যা ফাতিমাকে গোপনে একটি কথা বলেন। হযরত আয়িশার (রা) মত সর্বগুণে গুণান্বিতা স্ত্রীও তখনই ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করে তা জানতে চান। কিন্তু ফাতিমা (রা) তা বলতে অস্বীকৃতি জানান এবং আয়িশা (রা) লজ্জিত হন। কিন্তু উম্মু সালামা (রা) সেই গোপন কথা জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েননি। তিনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর জিজ্ঞেস করেন।

সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নং আয়াত, যাকে 'আয়াতে তাতহীর' বলা হয়, হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে নাযিল হয়। রাসূল (সা) তখন তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। আয়াতটি এই ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

–হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।

এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে (রা) ডেকে আনেন এবং বলেন, এরা আমার আহলে বায়ত বা আমার পরিবারের সদস্য। হযরত উম্মু সালামা (রা) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও

---

৬০. মুসনাদ-৬/৩১৭
৬১. প্রাগুক্ত-৬/৩১৩
৬২. প্রাগুক্ত-৬/৩০০, ৩০২

কি আহলে বায়তের অন্তর্গত? বললেন ঃ بَلٰى اِنْشَاءَ اللّٰهُ হাঁ, ইনশাআল্লাহ।[৬৩]

জামে আত-তিরমিযীতে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে ডেকে এনে তাঁদের মাথার উপর কম্বল উড়িয়ে দেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বায়ত। এদেরকে আপনি পবিত্র করুন। এ দু'আ শুনে হযরত উম্মু সালামা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমিও কি ওদের অন্তর্গত? বললেন ঃ তুমি তোমার স্থানেই আছ এবং ভালো আছ।[৬৪]

একদিন হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে বসে আছেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) আসেন এবং কথা বলতে থাকেন। তাঁর চলে যাওয়ার পর রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করেন ঃ তাঁকে চেন? উম্মু সালামা বললেন ঃ দাহইয়া আল-কালবী। কিন্তু উম্মু সালামা (রা) যখন ঘটনাটি অন্য লোকদের নিকট বললেন তখন জানলেন, লোকটি দাহইয়া নন, বরং জিবরাঈল (আ)। মুহাদ্দিসদের ধারণা, এটা হিজাবের হুকুম নাযিলের আগের ঘটনা।[৬৫]

তিনি যে ইসলামী শরী'আতের তত্ত্বজ্ঞানে কতখানি পারদর্শী ছিলেন তা তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, রমজান মাসে কেউ অপবিত্র হলে সুবহে সাদিকের পূর্বে তাড়াতাড়ি গোসল করে নিতে হবে। অন্যথায় তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। এক ব্যক্তি হযরত আয়িশা ও হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট আবু হুরায়রার কথার সত্যতা জানতে চান। তাঁরা দুইজনই তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, অপবিত্র অবস্থায় খোদ রাসূলকে (সা) রোযা রাখতে দেখা গেছে। আবু হুরায়রা একথা জানতে পেরে খুব অনুতপ্ত হন। তিনি বলেন, আমি কি করবো। ফাদল ইবন আব্বাস আমাকে এমনই বলেছিলেন ঃ কিন্তু একথা স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে উম্মু সালামা ও আয়িশার (রা) জ্ঞান বেশী।[৬৬]

একবার কতিপয় সাহাবী হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট আবদার করেন যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। বললেন ঃ তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন—উভয় জীবনই এক রকম। একথা বলার পর হযরত উম্মু সালামার (রা) অনুভূতি হলো যে, রাসূলুল্লাহর (সা) কোন গোপন কথা ফাঁস করে দেওয়া হলো না তো! অনুতপ্ত হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘরে এলে সবকথা বললেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি খুব ভালো করেছো।[৬৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর আসরের পর দুই রাকায়াত নামায আদায় করতেন।

---

৬৩. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৯
৬৪. তিরমিযী-৫২০
৬৫. মুসলিম-২/৩৪
৬৬. মুসনাদ-৬/৩০৬, ৩০৮
৬৭. প্রাগুক্ত-৬/৩০৯

একদিন মারওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ নামায কেন পড়েন? তিনি জবাব দিলেন, রাসূল (সা) পড়তেন। যেহেতু হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর এ হাদীস হযরত আয়িশার সূত্রে জেনেছিলেন, তাই মারওয়ান তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য 'আয়িশার (রা) নিকট লোক পাঠান। আয়িশা (রা) বললেন, হাদীসটি আমি উম্মু সালামা (রা) থেকে পেয়েছি। হযরত উম্মু সালামার (রা) নিকট লোক গেল এবং তাঁকে 'আয়িশার (রা) কথা বলা হলো। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ 'আয়িশাকে (রা) মাফ করুন! তিনি আমার কথার ভুল অর্থ করেছেন। আমি তাঁকে কি একথা বলিনি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ নামায পড়তে বারণ করেছেন।[৬৮]

একবার তিনি এক ব্যক্তিকে একটি মাসয়ালার সমাধান বললেন! লোকটি তাতে তৃপ্ত হলো না। সে তাঁর নিকট থেকে উঠে অন্য বিবিগণের নিকট গেল। সবাই একই জবাব দিলেন। লোকটি ফিরে এসে উম্মু সালামাকে কথাটি জানালো। তিনি তাকে বললেন ঃ হাঁ, দাঁড়াও। আমি তোমাকে তৃপ্ত করতে চাই। আমি ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে একটি হাদীস শুনেছি।[৬৯]

হযরত উম্মু সালামা (রা) যে খুবই লজ্জাবতী মহিলা ছিলেন হাদীসে বর্ণিত অনেক ঘটনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। একবার হযরত উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন, কোন মহিলা যদি স্বপ্নে দেখে যে তার স্বামী তার সাথে যৌনক্রিয়া করছে, তাহলে তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হবে? পাশেই বসা ছিলেন হযরত উম্মু সালামা (রা)। তিনি বলে উঠলেন, উম্মু সুলাইম! তোমার হাত ধুলিমলিন হোক! রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গোটা নারী জাতিকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছো। জবাবে যখন রাসূল (সা) বললেন, পানি দেখা গেলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে, তখন উম্মু সালামা (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! মেয়েদেরও কি পানি আছে?[৭০]

খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়্যা খান্দানের শাসক ও তাদের উগ্র সমর্থকরা নবী খান্দানের বিরুদ্ধে, বিশেষত হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নানা রকম অশালীন মন্তব্য করতো। অনেকে তাঁকে গালি দিত। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) সে সময় জীবিত। তিনি তাদেরকে ঘৃণা করতেন। অনেক সময় প্রতিবাদও করতেন। হযরত আবু আবদুল্লাহ আল-জাদালী (রা) বলেন, একদিন আমি হযরত উম্মু সালামার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহকে (সা) গালি দেওয়া হয়? বললাম ঃ মা 'আজাল্লাহ (আল্লাহর পানাহ্)। তখন তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আলীকে গালি দিয়েছে সে যেন আমাকে গালি দিয়েছে।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মু সালামা (রা) বলেন, আলী এবং তাকে যারা

---

৬৮. প্রাগুক্ত-৬/২৯৯, ৩০৩ ঘটনাটি সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে।

৬৯. প্রাগুক্ত-৬/২৯৭

৭০. হায়াতুস সাহাবা-৩/২২২

ভালোবাসে তাদেরকে কি গালি দেওয়া হয় না? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ভালোবাসতেন।

এ বর্ণনা দ্বারা নবী পরিবারের সদস্যদের প্রতি কত গভীর ভালোবাসা ও দরদ ছিল তা জানা যায়।[৭১]

হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) দিন-রাতের অনেক দু'আ ও ওজীফা বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) সালাতুল ফাজ্‌রের পর এই দু'আ করতেন ঃ[৭২]

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ـ

–হে আল্লাহ ঃ আমি আপনার কাছে চাই পবিত্র রিযক, কল্যাণকর জ্ঞান ও কবুলকৃত কর্ম।

তিনি আরও বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ[৭৩]

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا ـ

–বিস্‌মিল্লাহ, তাওয়াক্‌কালতু আলাল্লাহি। হে আল্লাহ্ : আমরা পদস্খলন, পথভ্রষ্টতা, অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া, কারও উপর বাড়াবাড়ি করা অথবা আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।

তিনি আরও বলেছেন, রাসূল (সা) প্রায়ই বলতেন ঃ[৭৪]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ ـ

–হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় করে দিন।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলতেন ঃ[৭৫]

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِىْ السَّبِيْلَ الْأَقْوَمَ ـ

–প্রভু হে! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমার প্রতি সদয় হোন এবং আমাকে সোজা পথ দেখান।

---

৭১. প্রাগুক্ত-২/৪৫১
৭২. প্রাগুক্ত-৩/৩৫০
৭৩. প্রাগুক্ত-৩/২৫৭
৭৪. প্রাগুক্ত-৩/৩৬৩
৭৫. প্রাগুক্ত-৩/৩৬৪

মৃত্যু

তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে মতভেদ আছে। আল-ওয়াকিদীর ধারণা, হিজরী ৫৯ সনের শাওয়াল মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। ইবন হিব্বান বলেন, হিজরী-৬১ সনের শেষ দিকে হুসাইন ইবন আলীর (রা) শাহাদাতের পরে তিনি ইনতিকাল করেন। আবু খায়সামার মতে, ৬০ হিজরীর শেষের দিকে ইয়াযীদ ইবন মু'য়াবিয়ার খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু হিজরী ৬৩ সনের মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এ বছরই হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ইয়াযীদ-এর বাহিনী হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) বাহিনীকে মক্কায় অবরোধ করে এবং মক্কার উপর আক্রমণ চালায়।[৭৬]

মৃত্যুর সময় হযরত উম্মু সালামার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৭৭] নিয়ম অনুযায়ী তৎকালীন মদীনার গভর্নর জানাযার নামায পড়াতেন। ওয়ালীদ ইবন 'উতবা ছিলেন তখন মদীনার গভর্নর। এই ওয়ালীদ আবু সুফইয়ানের (রা) পৌত্র। মৃত্যুর পূর্বে হযরত উম্মু সালামা (রা) অসীয়াত করে যান যে, 'ওয়ালীদ যেন আমার জানাযার নামায না পড়ায়'। এ কারণে তাঁর ইনতিকালের পর ওয়ালীদ মদীনার বাইরে জঙ্গলের দিকে চলে যান এবং জানাযার নামায পড়ানোর জন্য হযরত আবু হুরায়য়াকে (রা) পাঠিয়ে দেন। তবে ইমাম আযযাহাবী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আবু হুরায়রার (রা) নামায পড়ানোর কথাটি প্রমাণিত নয়। কারণ তিনি উম্মু সালামার আগেই মারা যান। হযরত উম্মু সালামাকে (রা) মদীনার আল-বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়।[৭৮]

---

৭৬. মুসলিম-২/৪৯৩; আল-ইসাবা-৪/৪৬০

৭৭. তাবাকাত-৮/৯৬

৭৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২০৮, ২১০; তাবারী-১৩/২২০৩, সিফাতুস সাফওয়া-২/২১; তাবাকাত-৮/৯৬

যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব-এর ডাকনাম ছিল উম্মু হাকাম। তাঁর পিতা ছিলেন বনু আসাদ ইবন খুযায়মা গোত্রের জাহাশ ইবন রাবাব আল-আসাদী এবং মাতা রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু উমায়মা বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিব। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আপন ফুফাতো বোন।[১] হযরত যায়নাবের (রা) দুই ভাই– 'উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ ও আবু আহমাদ ইবন জাহাশ হযরত আবু সুফইয়ানের (রা) দুই মেয়ে যথাক্রমে উম্মু হাবীবা ও ফারি'আকে বিয়ে করেন। তাঁর আর এক ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর পেট ফেঁড়ে লাশ বিকৃত করে ফেলে। তাঁকে তাঁর মামা হযরত হামযার (রা) সাথে উহুদ প্রান্তরে একই কবরে দাফন করা হয়। হামনা বিন্‌ত জাহাশ ও উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহাশ হযরত যায়নাবের দুই বোন।[২] দুই জনেরই মেয়েলী রোগ 'ইসতিহাজা' ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রায়ই এ সম্পর্কিত নানা মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। এ কারণে হাদীসে তাঁদের উল্লেখ দেখা যায়।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ এবং তাঁর অন্য সকল ভাই-বোন প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দারুল আরকামে যাওয়ার আগেই মুসলমান হন। তারপর তাঁরা সবাই হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁদের ভাই 'উবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যান এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মু হাবীবা (রা) ইসলামের উপর অটল থাকেন। পরে নাজ্জাশীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ে করেন। অতঃপর তাঁরা সকলে মক্কায় ফিরে আসেন। কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও আবু আহমাদ ইবন জাহাশ আপন পরিবারবর্গ ও বোনদের নিয়ে মদীনায় হিজরাত করেন।[৪]

হযরত যায়নাব (রা) ইসলামের আদি-পর্বেই মুসলমান হন। ইবনুল আসীর বলেন ঃ

كَانَتْ قَدِيْمَةَ الْاِسْلَامِ

তিনি ছিলেন আদিপর্বের মুসলমান।[৫]

বিয়ে

হযরত রাসূলে কারীম (সা) স্বীয় আযাদকৃত দাস ও পালিত পুত্র যায়িদ ইবন হারিসার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। পৃথিবীতে ইসলাম যেভাবে সাম্য ও সমতার শিক্ষার বাস্তবায়ন

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৩

২. আনসাবুল আশরাফ-১/৮৮, ১০৯-১১০

৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৬; আসাহ আস-সিয়ার-৬২৭; দেখুন হাদীস ঃ আবু দাউদ (২৮৭), মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৩৯; তিরমিযী-১২৮); ইবন মাজাহ্ (৬২৭); আল-বায়হাকী-১/৩৩৮-৩৩৯, মুসলিম (৩৩৪), নাসাঈ ১/৮৩।

৪. আসাহ আস-সিয়ার-৬২৭,

৫. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৩,

ঘটিয়েছে এবং যেভাবে সকল স্তরের মানুষকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে ইতিহাসে তার অগণিত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। তবে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের ঘটনাটি ছিল সাম্য ও সমতার বাস্তব শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। এ কারণে তা এ জাতীয় সকল দৃষ্টান্তের উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব লাভ করেছে।

পবিত্র কা'বার খাদিম হিসেবে গোটা আরবে কুরাইশ খান্দান, বিশেষত বনু হাশিমের যে উঁচু মর্যাদা ও সম্মানের আসন ছিল, তৎকালীন ইয়ামেনের কোন বাদশাহও তার সমকক্ষতার দাবী করতে দুঃসাহসী হতো না।

কিন্তু ইসলাম সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি ঘোষণা করে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতিকে এবং ঘোষণা করে যে, যে কোন ধরনের গর্ব, আভিজাত্য ও কৌলিন্য জাহিলিয়াতের প্রতীক। এই ভিত্তিতে হযরত যায়িদ যদিও দৃশ্যত একজন দাস ছিলেন, তবুও যেহেতু ইসলাম তাঁর দ্বারা সীমাহীন শক্তি লাভ করে, এ কারণে হাজার হাজার স্বাধীন ব্যক্তি থেকেও তাঁকে শ্রেষ্ঠতর গণ্য করা হতো। ইসলামী সাম্যের বাস্তব শিক্ষাদান ছাড়া এই বিয়ের আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইবনুল আসীর তা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

زَوَّجَهَا لِيُعَلِّمَهَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ -

–রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদের সাথে তাঁর বিয়ে এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে যায়িদ তাঁকে কিতাবুল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের তা'লীম ও তারবিয়াত দান করেন।[৬]

কুরাইশরা বংশের বড়াই করতো। বংশ নিয়ে তাদের গৌরবের অন্ত ছিলনা। কিন্তু রাসূল (সা) যায়নাব বিনতু জাহাশের বিয়ে দিলেন যায়িদ ইবন হারিসার সাথে। যায়িদ ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রীতিভাজন ব্যক্তি। হযরত খাদীজা (রা) ও হযরত আবু বকর (রা) যে সময়ে মুসলমান হন, যায়িদও সে সময় মুসলমান হন।

অধিকাংশ অভিযানে রাসূল (সা) কুরাইশ নেতাদের উপর তাঁকে পরিচালক নিয়োগ করতেন। যায়িদ রাসূলুল্লাহর (সা) এত কাছের মানুষ হয়ে যান যে, তিনি যায়িদ ইবন মুহাম্মাদ হিসেবে প্রসিদ্ধি পান। তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। এতসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দাস। আর যায়নাবের ছিল বংশ কৌলিন্য। প্রথম থেকেই এ বিয়েতে হযরত যায়নাবের মত ছিলনা। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) সরাসরি বলে দিয়েছিলেন–

"لَا اَرْضَاهُ لِنَفْسِىْ"

তাকে নিজের জন্য পছন্দ করিনে।[৭] কিন্তু সবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে রাজী হন। কারণ, তখন সূরা আল আহযাবের এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

---

৬. প্রাগুক্ত

৭. তাবাকাত-৮/১০৮

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান করেন তখন কোন মুমিন নারী পুরুষের কোন প্রকার ইখতিয়ার থাকে না।[৮]

বিয়ের পর এক বছর দুইজন একসাথে থাকেন কিন্তু প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলো না। দিন দিন সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠলো। হযরত যায়িদ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে অভিযোগ করলেন এবং তালাক দানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।[৯]

جَاءَ زَيْدُبْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَيْنَبَ اَشْتَدَّ عَلَىَّ لِسَانُهَا وَاَنَا اُرِيْدُ أَنْ اُطَلِّقَهَا -

–যায়িদ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যায়নাব তাঁর কঠোর বাক্যবানে আমাকে বিদ্ধ করে। আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়িদকে তালাক দান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কুরআন পাকে সে চেষ্টা এভাবে বিধৃত হয়েছে।[১০]

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ أَنْعَمَ اللّٰه عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ -

–যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে যার প্রতি আল্লাহ ও আপনি অনুগ্রহ করেছেন, বলছিলেন যে, তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।

রাসূলুল্লাহর (সা) শত চেষ্টা সত্ত্বেও হযরত যায়নাব ও হযরত যায়িদের (রা) বিয়ে টিকলো না। হযরত যায়িদ (রা) তাঁকে তালাক দিয়েই ছাড়লেন।[১১]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি হযরত যায়িদের (রা) সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়েটি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) ইচ্ছায়। এ বিয়েতে যায়নাবের মোটেই মত ছিলনা। যায়নাব ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বোন। বোধ-বুদ্ধি হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে লালন পালন করেন। তাই যখন তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তখন রাসূল (সা) তাঁকে খুশী করার জন্য নিজেই বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু তখনও পর্যন্ত মুসলিমদের মন-মানসে জাহিলী যুগের প্রথা ও সংস্কারের প্রভাব কিছুটা বিদ্যমান ছিল, এ

---

৮. সূরা আল-আহযাব-৩৬

৯. ফাতহুল বারী ঃ তাফসীর সূরা আল-আহযাব; তাবাকাত-৮/১০৯

১০. সূরা আল-আহযাব-৩৭

১১. আল-ইসতীয়াব-২/৭৫৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৪

কারণে তিনি নিজের মনের ইচ্ছা চেপে রাখেন। কারণ, যায়িদ ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র। আর জাহিলী সমাজ আপন ঔরসজাত পুত্র ও পালিত পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করতো না। যায়নাব ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) পালিত পুত্র যায়িদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। তাঁকে বিয়ে করলে মুনাফিক ও কাফিররা হৈচৈ বাধিয়ে দিতে পারে এমন আশঙ্কা রাসূলুল্লাহ (সা) করছিলেন।[১২] কিন্তু যেহেতু পালিত পুত্রের বিচ্ছেদপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে না করার প্রথাটি ছিল একটি জাহিলী সংস্কার মাত্র, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) ইচ্ছা ছিল তার মূলোৎপাটন করা, এ কারণে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহর (সা) সে সময়ের মনের ইচ্ছাটি প্রকাশ করে দেন এভাবে ঃ[১৩]

وَتُخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَااللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ـ

–'আপনি আপনার অন্তরে এমন কথা গোপন করে রাখছেন যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আর আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সঙ্গত।'

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যদি ওহীর কোন কিছু গোপন করতেন তাহলে এ আয়াতটিই করতেন।'[১৪] কারণ আল্লাহ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত যায়নাবের (রা) 'ইদ্দাত' কাল শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়িদকেই তাঁর কাছে এই বলে পাঠালেন যে, তুমি তার কাছে আমার বিয়ের পয়গাম নিয়ে যাও। যায়িদ (রা) যেয়ে দেখেন যায়নাব (রা) আটা চটকাচ্ছেন। যায়িদ বলছেন, তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই আমার অন্তরে তাঁর সম্পর্কে এক বড় ধরনের সম্ভ্রম বোধ সৃষ্টি হয়। আমি তাঁর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর হিম্মত হারিয়ে ফেলি। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন। আমি একটু পেছনে সরে আসি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়িদ (রা) যায়নাবের (রা) ঘরের দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, যায়নাব! আমি রাসূলুল্লাহর (সা) পয়গাম নিয়ে এসেছি। হযরত যায়নাব জবাব দিলেন, 'এখন আমি কাজ করছি। আল্লাহর কাছে ইসতিখারা ব্যতীত কিছু বলতে পারিনে।' এ কথা বলে তিনি মাসজিদের দিকে যেতে শুরু করেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াত নাযিল করেন ঃ[১৫]

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى

---

১২. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৪

১৩. সূরা আল-আহযাব-৩৫

১৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১১, টীকা-১,

১৫. প্রাগুক্ত-২/২১৭; সহীহ মুসলিম-(১৪২৮)-কিতাবুন নিকাহ; নাসাঈ-৬/৭৯, কিতাবুন নিকাহ।

الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُاللّٰهِ مَفْعُوْلاً -

–পরে যায়িদ যখন তার নিকট হতে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল তখন আমরা তাকে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। যেন নিজেদের মুখ-ডাকা পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিন লোকদের কোন অসুবিধে না থাকে– যখন তারা তাদের নিকট হতে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে নেয়। আল্লাহর আদেশ তো বাস্তবায়ন হতেই হবে। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, যায়নাবের সাথে তোমার বিয়ের কাজটি আমিই সমাধা করে দিলাম। এ কারণে যায়নাব রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী হয়ে যান। এ ব্যাপারে যায়নাবের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইবন ইসহাক বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের কাজটি আঞ্জাম দেন হযরত আবু আহমাদ ইবন জাহাশ (রা)।[১৭] হতে পারে পরে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল এবং সেই কাজটি করেন আবু আহমাদ ইবন জাহাশ। কিন্তু সহীহ মুসলিমে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (সা) কোন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই যায়নাবের (রা) নিকট উপস্থিত হন।[১৮] সাহীহাইনের একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যায়নাব (রা) তাঁর সতীনদের নিকট এই বলে গর্ব করতেন যে, আপনাদের বিয়ে আপনাদের অভিভাবকরা দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে দিয়েছেন খোদ আল্লাহ তা'আলা। রাসূলুল্লাহর (সা) এ বিয়ের কাজটি সম্পন্ন হয় ৫ম হিজরীর জিলকা'দ মাসে।[১৯]

সূরা আল আহযাবের ৩৭তম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আমরা তাকে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যায়নাবকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।' এই কথাগুলি ও ব্যবহৃত শব্দগুলি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী কারীম (সা) এ বিয়ে নিজের ইচ্ছা ও কামনার ভিত্তিতে নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই করেন।[২০]

উক্ত আয়াত হতে একথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দ্বারা এ কাজটি করিয়েছেন একটি বিশেষ প্রয়োজন পূরণ ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। যা এ পন্থা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। আরবে মুখ-ডাকা আত্মীয়দের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক ধরনের ভুল প্রথা প্রচলিত হয়েছিল এবং যুগ যুগ ধরে অব্যাহতভাবে তা চলে আসছিল পূর্ণ দাপটের সাথে। তা উৎখাত করার একটি মাত্র উপায় কার্যকর ও সফল হতে পারতো। আর তা হলো আল্লাহর রাসূল (সা) নিজেই

---

১৬. আল-আহযাব-৩৭

১৭. আসাহ আস-সিয়ার-৬২৮

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭; মুসলিম-(১৪২৮), কিতাবুন নিকাহ।

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭

২০. তাফহীমুল কুরআন, তাফসীর সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৩৭

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তা শিকড়সহ উপড়ে ফেলবেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, নবী কারীমের (সা) ঘরে তাঁর স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই বিয়ে করাননি। একটি অত্যন্ত বড় ও অতিশয় প্রয়োজনীয় কাজের লক্ষ্যেই তিনি তা করিয়েছিলেন।[২১]

হযরত যায়নাবের (রা) সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ে তো হয়ে গেল। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা বড় হৈ চৈ করে বাজার গরম করে তুললো এই বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর পুত্র-বধূকে বিয়ে করেছেন, অথচ তাঁর নিজের উপস্থাপিত শরীয়াতের আইনেও পুত্র-বধূকে বিয়ে করা পিতার জন্য হারাম করা হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ পাক নাযিল করেন সূরা আল-আহযাবের ৪০তম আয়াত ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ - وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا -

–(হে জনগণ) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়, বরং আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী মাত্র। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী।

'মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নয়।' অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্ত্রীকে মুহাম্মাদ (সা) বিয়ে করেছেন সে তো রাসূলের (সা) পুত্রই ছিল না। কাজেই তার পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা রাসূলের (সা) জন্য কখনও হারাম ছিল না। তোমরা নিজেরাই জান যে, নবী কারীমের (সা) আদপেই কোন পুত্র সন্তান বর্তমান নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই ছিল যে, মুখ-ডাকা পুত্র যদি প্রকৃত ঔরসজাত পুত্র না-ও হয়, তবুও তার পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা খুব বেশী হলেও জায়েয হতে পারে। কিন্তু তাকে বিয়ে করতেই হবে এমন কোন প্রয়োজন তো ছিল না। এর জবাবে বলা হয়েছে ঃ 'সর্বোপরি তিনি আল্লাহর রাসূল।' অর্থাৎ যে হালাল ও জায়েয কাজ তোমাদের ভুল প্রথার কারণে শুধু শুধুই হারাম বিবেচিত হয়ে আসছে, সে বিষয়ে সকল ভুল-ভ্রান্তির মূলোৎপাটন করে দেওয়া রাসূল হওয়ার কারণেই হযরত মুহাম্মাদের (সা) কর্তব্য। তাছাড়া তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন রাসূল আসা তো দূরের কথা, কোন নবী পর্যন্তও আসবেন না। কাজেই তাঁর জীবনকালে কোন আইন ও সমাজের কোন সংশোধনী যদি অকার্যকর ও অবাস্তবায়িত থেকে যায়, তবে তা পরবর্তী কোন নবীর দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কাজেই এই জাহিলী কু-প্রথা বিলুপ্ত করা তাঁর নিজের পক্ষেই একান্ত কর্তব্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তারপর আলোচ্য বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের জন্য বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞানী।' অর্থাৎ আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, এখনই শেষ নবীর দ্বারা এ কু-প্রথা বিলোপ করে দেওয়া একান্ত জরুরী। তা না হলে তার পরে এমন কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় থাকবে না যার দ্বারা

---

২১. প্রাগুক্ত

এহেন মজবুত কু-প্রথা দূর করা সম্ভব হবে।[২২]

ওলীমার অনুষ্ঠান

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাবকে (রা) স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার পর ওলীমার আয়োজন করেন। আয়োজন অর্থ এই নয় যে, তিনি রাজকীয় ভোজের আয়োজন করেন। তবে হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমা তুলনামূলকভাবে একটু জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল দুপুর বেলা মতান্তরে রাতের বেলা। হযরত আনাস (রা) বলেন, 'রাসূল (সা) আমাদের সকলকে রুটি ও গোশ্‌ত খাওয়ান।' আমাদের রাসূলে পাকের (সা) জন্য এটা রাজকীয় আয়োজনই বটে। কারণ, দিনের পর দিন যে পরিবারের লোকদের শুধু দুধপান করে কাটাতে হতো, তাঁদের পক্ষে তিন শো লোকের জন্য গোশ্‌ত-রুটির ব্যবস্থা করা জাঁকজমকপূর্ণই বলা চলে। এ কারণে পরবর্তীকালে হযরত যায়নাব (রা) তাঁর সতীনদের সামনে গর্ব করে বলতেন, কেবল আমার বিয়েতেই হযরত রাসূলে কারীম (সা) গোশ্‌ত-রুটি দিয়ে ওলীমা করেন। ইবন সা'দ এই ওলীমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ[২৩]

مَا أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَائِهِ مَاأَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ -

–'রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমা সেভাবে করেননি যেভাবে যায়নাবের (রা) ওলীমা করেছিলেন। তিনি যায়নাবের (রা) ওলীমা করেন ছাগলের গোশত দিয়ে।' হযরত আনাস (রা) বলেন, এতো ভালো ও এত বেশী খাবারের আয়োজন তিনি অন্য কোন স্ত্রীর ওলীমাতে করেননি।[২৪]

হযরত আনাসের (রা) সম্মানীত মা হযরত উম্মু সুলাইম (রা), যিনি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন, হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমায় নবীগৃহে কিছু খাবার পাঠিয়েছিলেন। খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়ে গেলে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মানুষকে ডাকার জন্য খাদেম আনাসকে (রা) পাঠান। তিন শো মেহমান সমবেত হন। রাসূল (সা) দশজন দশজন করে খাবারের ব্যবস্থা করেন। লোকেরা দলে দলে এসে খেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। দাওয়াতী মেহমানরা পেট ভরে আহার করেন।

আবু হাতেম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন এক স্ত্রীর সাথে প্রথম মিলন উপলক্ষে উম্মু সুলাইম 'হাইস' নামক (খেজুর, আকিত ও চর্বি দ্বারা তৈরী) এক প্রকার খাবার তৈরী করে পিতল বা কাঠের পাত্রে ঢালেন। তারপর ছেলে আনাসকে ডেকে বলেন ঃ এটা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বলবে, আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য

---

২২. প্রাগুক্ত, আয়াত নং ৪০

২৩. তাবাকাত-৮/১০৯

২৪. আসাহ আস-সিয়ার-৬২২

হাদিয়া। আনাস বলেন ঃ মানুষ সে সময় দারুণ অন্নকষ্টে ছিল। আমি পাত্রটি নিয়ে যেয়ে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা উম্মু সুলাইম আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালামও পেশ করেছেন এবং বলেছেন, এ হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া। রাসূল (সা) পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ওটা ঘরের এক কোণে রাখ এবং অমুক অমুককে ডেকে আন। তিনি অনেক লোকের নাম বললেন। তাছাড়া আরও বললেন ঃ পথে যে মুসলমানের সাথে দেখা হবে, সাথে নিয়ে আসবে। আনাস বলেন ঃ যাদের নাম তিনি বললেন তাদেরকে তো দাওয়াত দিলাম। আর পথে আমার সাথে যে মুসলমানের দেখা হলো তাদের সকলকেও দাওয়াত দিলাম। আমি ফিরে এসে দেখি রাসূলুল্লাহর (সা) গোটা বাড়ী, সুফ্ফা ও হুজরা— সবই লোকে লোকারণ্য। বর্ণনাকারী আনাসকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তা কত লোক হবে? বললেন ঃ প্রায় তিন শো। আনাস বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাকে খাবার পাত্রটি আনতে বললেন। আমি কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তার ওপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ তোমরা দশজন দশজন করে বসবে, বিসমিল্লাহ বলবে এবং প্রত্যেকে নিজের পাশ থেকে খাবে। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত সবাই পেট ভরে খেলো। তারপর তিনি আমাকে বললেন ঃ পাত্রটি উঠাও। আনাস বলেন ঃ আমি এগিয়ে এসে পাত্রটি উঠালাম। তারমধ্যে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি বলতে পারবো না, যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল, না যখন উঠালাম।[২৫] এ ছিল হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমার সময়ের ঘটনা।

আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে চান। তাই তিনি জাহিলী যুগের মানুষের মধ্যে যে বর্বর ও অসভ্য রীতি-নীতি চালু ছিল তার কিছু বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমার একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।[২৬]

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنٰهُ، وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلاَ مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰه لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ -

–হে ঈমানদার লোকেরা তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ো না; আর না এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকবে। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয় তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে সংগে সংগে সরে পড়। কথায় মশগুল হয়ে বসে থেকোনা। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট

---

২৫. হায়াতুস সাহাবা-২/২৬০-২৬১

২৬. সূরা আল-আহযাব-৫৩

দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।'

উপরোক্ত আয়াতে আরবদের কয়েকটি বদ-অভ্যাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

১. প্রাচীনকালে আরববাসীরা অকুণ্ঠচিত্তে একজন আরেকজনের ঘরে প্রবেশ করতো। কারো সাথে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন হলে তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়ায দেওয়া এবং অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার কোন বাধ্য বাধকতা কারও ছিল না। বরং ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে নারী ও শিশুদের নিকট জিজ্ঞেস করতো যে, গৃহস্বামী ঘরে আছে কি না। এই জাহিলী রীতি নানা প্রকারের দোষ-ত্রুটির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। অনেক সময় এর দরুন বিভিন্ন রকমের নৈতিক বিপর্যয়কারী অবাঞ্ছনীয় ঘটনাবলীর সূচনা হয়ে যেত। এ কারণে সর্বপ্রথম নবী কারীমের (সা) বাসগৃহে নিকটবর্তী কোন বন্ধু বা দূরবর্তী কোন আত্মীয় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে না বলে নিয়ম ঘোষণা করা হয়। পরে সূরা আন-নূর-এর মাধ্যমে এ নিয়ম সকল মুসলমানের ঘরের জন্য সাধারণভাবে চালু করা হয়।

২. আরবদের মধ্যে আরেকটি বদ-অভ্যাস ও কু-প্রথা চালু ছিল। তারা কোন বন্ধু বা সাক্ষাতের লোকের ঘরে আহারের সময় দেখে উপস্থিত হতো, অথবা এ ধরনের লোকের ঘরে এসে আহারের সময় পর্যন্ত বসে থাকতো। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ অবস্থায় গৃহস্বামী দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এই বদ অভ্যাস পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আদেশ দিয়েছেন যে, কারও ঘরে খাওয়ার উদ্দেশ্যে কেবল তখনই যাবে যখন গৃহস্বামী খাওয়ার দাওয়াত দিবে। এই আদেশ কেবলমাত্র নবী কারীমের (সা) ঘরের জন্য ছিল না। বরং এই নিয়ম সাধারণভাবে সব মুসলমানের ঘরের সাধারণ প্রচলিত রীতিতে পরিণত হবে। এ উদ্দেশ্যে নমুনাস্বরূপ রাসূলের (সা) ঘরের কথা বলা হয়েছে মাত্র।

৩. এ আয়াতে আরেকটি বদ-অভ্যাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সমাজে এমন লোকও দেখা যায়, যারা কারও বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে খাওয়ার জন্য যায় এবং খাওয়া শেষ হওয়ার পরও অহেতুক ধর্ণা দিয়ে বসে থাকে। আর পরস্পরে কথাবার্তার এমন এক ধারাবাহিকতা শুরু করে দেয় যে, তা আর শেষ হতেই চায় না। এর দরুন বাড়ীর মালিক ও ঘরের লোকদের কি অসুবিধা হয়, তা তারা মোটেই চিন্তা করে দেখে না। অনেকে রাসূলে কারীমকে (সা) পর্যন্ত অসুবিধায় ফেলতো। তিনি তাঁর সীমাহীন ভদ্রতা ও বিনম্র স্বভাবের কারণে এসব যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে যেতেন। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়নাবের (রা) ওলীমার দিন এরূপ একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহর (সা) যন্ত্রণার চূড়ান্ত করে ছাড়ে। মূলত আয়াতটি নাযিলের কারণ সেই ঘটনা।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বিশেষ খাদিম হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাত্রিকালে ছিল এই ওলীমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা দাওয়াত খেয়ে বিদায় হয়ে চলে গেল। কিন্তু দুই তিনজন লোক ঠায় বসে নানা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে রইল।

রাসূলে কারীম (সা) অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় উঠে পড়লেন এবং অন্দর মহলে বেগমদের নিকট হতে একবার ঘুরে আসলেন। ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন, লোকগুলি অবিচলভাবে বসে আছে। তিনি আবার ভেতরে গেলেন ও 'আয়িশার (রা) ঘরে গিয়ে বসলেন, অনেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তিনি জানতে পারলেন যে, লোকগুলি চলে গেছে, তখন তিনি যায়নাবের (রা) ঘরে গমন করেন। এ ঘটনার পর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলারই লোকদের এই বদ-অভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার আবশ্যক হয়ে পড়লো। হযরত আনাসের বর্ণনামতে আলোচ্য আয়াত ঠিক এই ঘটনা সম্পর্কেই নাযিল হয়।[২৭]

উপরে উল্লেখিত ঘটনার পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দেন এবং মানুষকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এটা পঞ্চম হিজরীর জিলকাদ মাসের ঘটনা।[২৮]

হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. পালিত ও ধর্মপুত্রকে যে ঔরসজাত পুত্রের সমান জ্ঞান করা হতো, সেই ভ্রান্তি দূর হয়।
২. দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার যে পর্বত পরিমাণ ব্যবধান ছিল তা দূর করে ইসলামী সাম্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত এ বিয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাস যায়িদকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক অভিজাত খান্দান বনু হাশিমের সম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।
৩. এ বিয়েকে কেন্দ্র করে হিজাবের হুকুম নাযিল হয় অথবা বলা চলে এ বিয়ে ছিল হিজাবের হুকুম নাযিলের পটভূমি।
৪. এ বিয়ের জন্য ওহী নাযিল হয়।
৫. এ বিয়ের ওলীমা হয় জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে।

এসবের কারণেই হযরত যায়নাব (রা) তাঁর অন্য সতীনদের সামনে গর্ব করতেন। একদিন তো তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলেই বসলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি আপনার অন্য কোন বিবির মত নই। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাঁর বিয়ে তাঁর পিতা, ভাই, অথবা খান্দানের কোন অভিভাবক দেননি। একমাত্র আমি- যার বিয়ে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে আপনার সাথে সম্পন্ন করেছেন। আপনার ও আমার দাদা একই ব্যক্তি, আর আমার ব্যাপারে জিবরীল হলেন দূত।[২৯]

ইমাম জাহাবী বলেনঃ[৩০] فَزَوَّجَهَا اللّٰهُ بِنَبِيِّهِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شَاهِدٍ -

২৭. তাফহীম, আল-আহযাব-৫৩; মা'য়ারিফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীর। তাবাকাত-৮/১০৪; আল-বিদায়া-৪/১৪৬
২৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৩; সিয়ারুস সাহাবা-৬৪
২৯. তাবাকাত-৮/১০৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫;
৩০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১১

– 'আল্লাহ যায়নাবকে তাঁর নবীর (সা) সাথে কোন অভিভাবক ও সাক্ষী ছাড়াই বিয়ে দেন।'

রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে যাঁরা হযরত 'আয়িশার (রা) সমকক্ষতা দাবী করতে পারতেন তাঁদের মধ্যে হযরত যায়নাব (রা) অন্যতম। এ ব্যাপারে খোদ 'আয়িশার (রা) মন্তব্য ছিল এ রকমঃ[৩১]

هى التى تساومنى من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم -

– রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন।

হযরত যায়নাবের (রা) এ দাবীর যৌক্তিকতাও ছিল। কারণ, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো বোন এবং রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী। রাসূলুল্লাহও (সা) সব সময় তাঁকে খুশী রাখতে চাইতেন। হযরত যায়নাবের (রা) চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম নারীর মধ্যেই পাওয়া যেত। রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্য লাভের ব্যাপারে হযরত আয়িশা (রা)ও তাঁর মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করতো। যা নারী স্বভাবের দাবী অনুযায়ী এক প্রকার পবিত্র ঈর্ষার রূপ লাভ করে। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'গিবতা' বলে। পবিত্র ঈর্ষা কথাটি এজন্য বলেছি যে, হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে তাঁদের একজনের অন্যজন সম্পর্কে যে সকল ধারণা, মতামত ও মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনভাবেই অপবিত্র ঈর্ষার ভাব ফুটে উঠে না। কারণ প্রকৃত ঈর্ষা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। প্রতিপক্ষের ভালো কোন কিছুই সে দেখতে পারে না এবং সহ্যও করতে পারে না। কিন্তু তাঁরা কেউই এমন ছিলেন না। রাসূলে পাকের (সা) পবিত্র সুহবতের বরকতে তাঁরা এত উদার ও মহানুভব হয়ে গিয়েছিলেন যে, একজন অপরজনের ভালো গুণগুলি অকপটে স্বীকার করেছেন। আমরণ মানুষের কাছে তা প্রচার করে গেছেন। এ কাজ কেবল বড় মাপের মানুষেরাই করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসেবে 'ইফ্‌ক-এর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত 'আয়িশার (রা) প্রতি কলঙ্ক আরোপের ঘটনা হলো 'ইফক'। এই ষড়যন্ত্রের সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বোন হযরত হামনা বিনত জাহাশও জড়িয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এই সুযোগে বোন যায়নাবের (রা) সতীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী 'আয়িশাকে (রা) কাবু করতে পারলে বোন যায়নাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যাবেন। বোনের শুভ চিন্তায় তিনি এই নোংরা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন।

আমাদের দেখার বিষয় হলো, এ সময় হযরত যায়নাবের (রা) ভূমিকা কি ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী সতীনকে ঘায়েল করার, পথের কাঁটা দূর করার চমৎকার একটা সুযোগ। এমন মোক্ষম সুযোগ জগতের কোন সতীন হাতছাড়া করেছে বলে জানা যায়না। কিন্তু হযরত যায়নাব (রা) নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার যে স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তাতে তাঁর মত লোকের

---

৩১. মুসলিম (২৪২২), ফাদায়িমুস সাহাবা; প্রাগুক্ত-২/২১৩,

পক্ষে এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন এমন কল্পনা করা যায় কেমন করে! তাই হযরত 'আয়িশার (রা) সে দুর্যোগের দিনে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশা (রা) সম্পর্কে হযরত যায়নাবের (রা) মতামত জানতে চাইলেন। হযরত যায়নাব (রা) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন,

مَا عَلِمْتُ اِلاَّ خَيْرًا -

আমি তাঁর মধ্যে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানিনে। পরে হযরত আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল-কুরআনের দশটি আয়াত নাযিল হয়। আর সেইসাথে হযরত যায়নাবের (রা) সত্যবাদিতা ও উন্নত নৈতিকতাও প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত 'আয়িশা (রা) আজীবন হযরত যায়নাবের (রা) এ ঋণ মনে রেখেছেন। সারা জীবন তিনি মানুষের কাছে সে কথা বলেছেন। যায়নাবের (রা) মধ্যে যত গুণাবলী তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, অকপটে তা মানুষকে জানিয়েছেন। ইবন হাজার আল-আসকিলানী (রহ) লিখেছেনঃ[৩২]

وَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةَ زَيْنَبَ بِالْوَصْفِ الْجَمِيْلِ فِىْ قِصَّةِ الْاِفْكِ -

–হযরত 'আয়িশা (রা) 'ইফক'-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত যায়নাবের (রা) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হযরত 'আয়িশার (রা) মত প্রখর বুদ্ধিমতী, বিদূষী ও মহিয়সী নারী যখন হযরত যায়নাবের (রা) প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন তাঁর মর্যাদা ও স্থান যে কোন স্তরে তা অনুমান করতে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর খোদাপ্রদত্ত ও তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে গভীরভাবে অতি নিকট থেকে হযরত যায়নাবকে (রা) পর্যবেক্ষণ অধ্যয়ন করেছিলেন। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে হযরত 'আয়িশার (রা) যেসব উক্তি ছড়িয়ে আছে তাতেই হযরত যায়নাবের (রা) প্রকৃত মর্যাদা ফুটে উঠেছে। হযরত আয়িশা বলেন ঃ[৩৩]

لَمْ أَرَقَطُّ خَيْرًا فِىْ الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ وَاَتْقٰى لِلّٰهِ وَأَصْدَقُ حَدِيْثًا وَأَوْصَلُ لِلرَّحْمِ وَاَعْظَمُ صَدَقَةً وَأَشَدُّ اِبْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِى الْعَمَلِ الَّذِىْ تُصَدَّقُ بِهِ وَتُقَرِّبُ بِهِ إِلَى اللّٰهِ مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيْهَا تَسْرَعُ مِنْهَا الْفَيْئَةُ -

–'আমি যায়নাবের (রা) চেয়ে কোন মহিলাকে বেশী দ্বীনদার, বেশী পরহেযগার, বেশী

৩২. আল-ইসাবা-৪/৩১৩

৩৩. মুসলিম (২৪২২), ফাদায়িলু যায়নাব; আহমাদ-৬/১৫১

সত্যভাষী, বেশী উদার, দানশীল, সৎকর্মশীল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেশী তৎপর দেখিনি। শুধু তাঁর মেজাজে একটু তীক্ষ্ণতা ছিল। তবে তার জন্য তিনি খুব তাড়াতাড়ি লজ্জিত হতেন।'

আল্লামা ইবন 'আবদিল বার হযরত যায়নাব (রা) সম্পর্কে হযরত 'আয়িশার (রা) নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বর্ণনা করেছেন ঃ[৩৪]

مَارَأَيْتُ اِمْرَأَةً قَطُّ فِى الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ -

–দ্বীনের ব্যাপারে আমি যায়নাবের (রা) চেয়ে ভালো কোন মহিলা কক্ষণো দেখিনি।

ইবন সা'দ হযরত আয়িশার (রা) নিম্নোক্ত মন্তব্যটি সংকলন করেছেন ঃ[৩৫]

يَرْحَمُ اللّٰهُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ لَقَدْ نَالَتْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا الشَّرَفَ لَا يَبْلُغُهُ شَرَفٌ إِنَّ اللّٰهَ زَوَّجَهَا بِنَبِيِّهِ فِى الدُّنْيَا وَنَطَقَ بِهِ الْقُرْاٰنُ -

–আল্লাহ যায়নাব বিন্‌ত জাহশের প্রতি সদয় হোন! সত্যিই তিনি দুনিয়াতে অতুলনীয় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর উপলক্ষে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রা) আরও বলেছেনঃ 'রাসূল (সা) পরকালে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম মিলিত হওয়ার এবং জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হওয়ার সুসংবাদ দান করে গেছেন।'[৩৬]

হযরত উম্মু সালামা (রা) তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ[৩৭]

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً -

অর্থাৎ তিনি ছিলেন খুব বেশী সৎকর্মশীলা, বেশী সাওম পালনকারিনী ও বেশী বেশী সালাত আদায়কারিনী।

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হযরত যায়নাবের (রা) যে একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল সেকথা বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। একবার একটি ব্যাপারে 'আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাত' (পবিত্র সহধর্মিণীগণ) রাসূলুল্লাহকে (সা) রাজী করানোর জন্য হযরত ফাতিমাকে (রা) দূত হিসেবে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। কিন্তু তিনি দূতিয়ালীতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। তখন সকলে একমত হয়ে এই দূতিয়ালীর জন্য নির্বাচন করেন হযরত যায়নাবকে (রা)। কারণ তাঁদের সকলের দৃষ্টিতে তিনিই এ কাজের যোগ্য ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে

---

৩৪. আল-ইসতীয়াব-২/৭৫৪

৩৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৫; তাবাকাত-৮/১০৩

৩৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫

৩৭. আল-ইসাবা-৪/৩১৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭

অত্যন্ত প্রবলভাবে একথা প্রমাণ করতে চান যে, হযরত 'আয়িশা (রা) এই মর্যাদার যোগ্য নন। হযরত আয়িশা (রা) পাশে বসেই চুপ করে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন, আর রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারকের প্রতি আড় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। হযরত যায়নাবের (রা) বক্তব্য শেষ হলে হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং এমন শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, যায়নাব (রা) নিরুত্তর হয়ে যান। তখন রাসূল (সা) বলেন ঃ এমন কেন হবেনা, আবু বকরের মেয়ে তো।[৩৮]

হযরত যায়নাব (রা) ছিলেন খুবই দানশীল, দরাজহস্ত, আল্লাহ-নির্ভর ও স্বল্পে তুষ্ট মহিলা। ইয়াতিম, দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচিত হতেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাঁর দয়া-মমতার শেষ ছিল না। ইবন সা'দ বর্ণনা করেছেন ঃ[৩৯]

مَا تَرَكَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا كَانَتْ تُصَدِّقُ لِكُلِّ مَا وَفَدَتْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مأوى المساكين ـ

–'যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ দিরহাম-দীনার কিছুই রেখে যাননি। যা কিছুই তাঁর হাতে আসতো দান করে দিতেন। তিনি ছিলেন গরীব-মিসকীনদের আশ্রয়স্থল।

হযরত যায়নাব (রা) একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। তিনি নিজহাতে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় চামড়া দাবাগাত করে পাকা করতেন এবং তার থেকে যে আয় হতো তা সবই অভাবী মানুষদের দান করতেন।[৪০]

হযরত আয়িশা (রা) থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে। যায়নাব (রা) হাতে সূতা কেটে রাসূলুল্লাহর (সা) যুদ্ধবন্দীদেরকে দিতেন। আর তারা কাপড় বুনতো। রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের কাজে তা ব্যবহার করতেন।[৪১] তাঁর দানের হাত এমন ছিল যে, খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর জন্য বাৎসরিক বারো হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করে দেন; কিন্তু তিনি কখনও তা গ্রহণ করেননি। একবার উমার (রা) তাঁর এক বছরের ভাতা পাঠালেন। হযরত যায়নাব দিরহামগুলি একখানা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। তারপর বাযরাহ ইবন রাফে'কে নির্দেশ দেন দিরহামগুলো আত্মীয়-স্বজন ও গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করার জন্য। বাযরাহ বললেন, এতে আমাদেরও কি কিছু অধিকার আছে? তিনি বললেন কাপড়ের নীচে যেগুলি আছে সেগুলি তোমার। সেগুলি কুড়িয়ে গুণে দেখা গেল পঞ্চাশ মতান্তরে পঁচাশি দিরহাম। সব দিরহাম বন্টন করার পর তিনি দু'আ করেন এই বলে ঃ[৪২] اَللّٰهُمَّ لَا يُدْرِكْنِى هٰذَا الْمَالَ قَابِلٌ فَإِنَّهُ فِتْنَةٌ ـ

---

৩৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৪১৫

৩৯. তাবাকাত-৮/১০৪

৪০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭; আল-হাকেম-৪/২৫; আল- ইসাবা-৪/৩১৪

৪১. হায়াতুস সাহাবা-২/১৬৯ .

৪২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১২

'হে আল্লাহ! আগামীতে এই অর্থ যেন আমাকে আর না পায়। কারণ, এ এক পরীক্ষা।' এ খবর হযরত উমারের (রা) কানে গেল। তিনি মন্তব্য করলেন ঃ

هَذِهِ امْرَأَةٌ يُرَادُ بِهَا خَيْرٌ -

'এ এমন মহিলা যার থেকে শুধু ভালো আশা করা যায়। তারপর হযরত উমার (রা) কিছুক্ষণ তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন এবং সালাম বলে পাঠান। তিনি যায়নাবকে (রা) বলেন, আপনি যা কিছু করেছেন সবই আমি জেনে গেছি। ফিরে গিয়ে তিনি আরও এক হাজার দিরহাম তাঁর খরচের জন্য পাঠান। তিনি সেগুলিও আগের মত খরচ করে ফেলেন। ঐতিহাসিকরা বলছেন, হযরত যায়নাবের (রা) উপরোক্ত দু'আ কবুল হয় এবং তিনি সে বছরই ইনতিকাল করেন।[৪৩]

হযরত যায়নাব যে চূড়ান্ত পর্যায়ের খোদাভীরু, বিনয়ী ও 'আবিদা মহিলা ছিলেন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)। একবার রাসূল (সা) মুহাজিরদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। মাঝখানে হযরত যায়নাব তাঁকে কিছু বলে ওঠেন। সাথে সাথে হযরত 'উমার (রা) তাঁকে এক ধমক লাগান। রাসূল (সা) 'উমারকে (রা) বলেন, তাকে কিছু বলো না। সে একজন বড় আবিদ ও যাহিদ মহিলা।[৪৪]

মৃত্যু

খলীফা হযরত উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে হযরত যায়নাব (রা) ইনতিকাল করেন। সে বছরই মিসর বিজয় হয়। হাফেজ ইবন হাজারের মতে তিনি তিপ্পান্ন বছর জীবন পেয়েছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত এটাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মতে হযরত যায়নাবের (রা) মোট জীবনকাল পঞ্চাশ বছর। আর যা অধিকাংশের মতের পরিপন্থী। আল-ওয়াকিদী আরও বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর; পক্ষান্তরে অন্যদের মতে আটত্রিশ বছর।[৪৫]

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দানের স্বভাব বিদ্যমান ছিল। নিজের কাফনের ব্যবস্থা নিজেই করে যান। তবে তিনি আপনজনদের বলে যান, আমার মৃত্যুর পর 'উমার (রা) কাফনের কাপড় পাঠাতে পারেন, যদি তেমন হয় তাহলে দুইটির যে কোন একটি কাফন গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিবে।[৪৬] হযরত উমার (রা) পাঁচখানা কাপড় পাঠান এবং তাই দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। আর হযরত যায়নাব (রা) যে কাপড় রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বোন হাফসা তা দান করে দেন।[৪৭] তিনি আরও অসীয়াত করে যান যে,

---

৪৩. তাবাকাত-৮/১০৯; আল-ইসাবা-৪/১১৪
৪৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৭
৪৫. আল-ইসাবা-৪/৩১৫
৪৬. তাবাকাত-৮/১০৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১১
৪৭. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫

রাসূলুল্লাহকে (সা) যে খাটিয়াতে করে কবরের কাছে নেওয়া হয়েছিল, তাঁকেও যেন সেই খাটিয়াতে উঠানো হয়। তিনিই প্রথম মহিলা যাঁকে হযরত আবু বকরের (রা) পরে এই খাটিয়ায় ওঠানো হয়।[৪৮] তাঁর দুইটি অসীয়াতই পালিত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বিবিগণ তাঁকে গোসল দেন।[৪৯]

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং আল-বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়।

রাবী'আ ইবন আবদিল্লাহ বলেন ঃ 'আমি 'উমারকে দেখলাম, তাঁর এক কাঁধে দুররা ঝোলানো। সেই অবস্থায় সামনে গেলেন এবং চার তাকবীরের সাথে যায়নাবের (রা) জানাযার নামায পড়ালেন, কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি কবরের পাশে ছিলেন।[৫০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবী সুলাইত (রা) বলেন ঃ আমি আবু আহমাদ ইবন জাহাশকে (যায়নাবের (রা) ভাই) দেখলাম কাঁদতে কাঁদতে যায়নাবের (রা) লাশবাহী খাটিয়া বহন করছেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। আমি শুনলাম, উমার (রা) তাঁকে বলছেন, আবু আহমাদ, তুমি খাটিয়া থেকে সরে এসো, যাতে মানুষের চাপে কষ্ট না পাও। আবু আহমাদ বললেন ঃ 'উমার, তাঁরই অসীলায় আমরা সব কল্যাণ লাভ করেছি। আমার এই কান্না আমার ভিতরের তীব্র জ্বালাকে প্রশমিত করছে। উমার বললেন ঃ ঠিক আছে, থাক, থাক।[৫১]

হযরত যায়নাবকে (রা) যখন দাফন করা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় একজন কুরাইশ যুবক দুইখানা মিসরীয় রঙ্গিন কাপড়ে সেজে, চুলে চিরুনী করে উপস্থিত হয়। 'উমার, (রা) তাঁর মাথার উপর ছড়ি তুলে ধরে বলেন, তুমি যেভাবে এসেছো তাতে মনে হচ্ছে আমরা খেলা করছি। এখানে প্রবীণরা তাঁদের মাকে দাফন করছে।[৫২] তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন। যেখানে কবর খোঁড়া হচ্ছিল হযরত 'উমার (রা) সেখানে তাঁবু টানিয়ে দেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ছিল প্রথম তাঁবু যা বাকী'র কোন কবরের উপর টানানো হয়েছিল।[৫৩] লাশ কবরে নামানোর সময় হযরত উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য

---

৪৮. প্রাগুক্ত ১/৪৩৬; তাবাকাত-৮/১০৭; হযরত রাসূলে কারীমকে (সা) যে খাটিয়ায় উঠানো হয়েছিল সেই খাটিয়ায় হযরত আবু বকরের (রা) পরে হযরত যায়নাবকে (রা) উঠানো হয়। তারপর থেকে মদীনার লোকদেরকে সেই খাটিয়ায় বহন করা হতো। মারওয়ান মদীনার গভর্নর হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। মারওয়ান কেবল সম্মানীয় ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য ঐ খাটিয়ার ব্যবহার বন্ধ করে দেন। বিকল্প হিসেবে তনি বহু খাটিয়া তৈরী করে মদীনায় বিতরণ করেন। (আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬)

৪৯. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. তাবাকাত-৮/১০৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯৬

৫২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৭

৫৩. তাবাকাত-৮/১০৯; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৬,

বিবিগণের নিকট জানতে চান যে, তাঁর কবরে কে কে নামবে? তাঁরা বলেন, জীবদ্দশায় যারা তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতো তারা নামবে। অতঃপর হযরত 'উমারের (রা) নির্দেশে মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন জাহাশ, উসামা ইবন যায়িদ, আবদুল্লাহ ইবন আবী আহমাদ ইবন জাহাশ ও মুহাম্মাদ ইবন তালহা (রা) কবরে নামেন। তাঁরা সকলে ছিলেন হযরত যায়নাবের (রা) আত্মীয় স্বজন।[৫৪]

হযরত যায়নাবের (রা) মৃত্যুতে হযরত 'আয়িশা (রা) দারুণ শোকাভিভূত হন। তিনি তাঁর সেই সময়ের অনুভূতি প্রকাশ করেন এভাবে ঃ[৫৫]

لقد ذهبت حميدة فقيدة مفزعا للارامل واليتامى

–তিনি প্রশংসিত ও অতুলনীয় অবস্থায় চলে গেলেন। ইয়াতীম ও বিধবাদের অস্থির করে রেখে গেলেন। হযরত যায়নাব (রা) যেদিন মারা যান সেদিন মদীনায় গরীব-মিসকীন ও অভাবী মানুষরা শোকে আহাজারি শুরু করে দেয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) খায়বারে উৎপন্ন ফসল থেকে হযরত যায়নাবের (রা) জন্য এক শো ওয়াসাক শস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[৫৬]

হযরত যায়নাব (রা) উত্তরাধিকার হিসেবে শুধু একটি বাড়ী রেখে যান। উমাইয়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক তাঁর খিলাফতকালে পঞ্চাশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর নিকট-আত্মীয়দের থেকে বাড়ীটি খরীদ করে মসজিদে নববীর সাথে মিলিয়ে দেন।[৫৭]

হযরত যায়নাব (রা) খুব কম হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে তাঁর বর্ণিত মাত্র এগারোটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি মুত্তাফাক আলাইহি।[৫৮] তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে হযরত উম্মু হাবীবা (রা), যায়নাব বিন্‌ত আবী সালামা, মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ ইবন জাহাশ, কুলসুম বিন্‌ত তালাক এবং দাস মাজকুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫৯]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ওফাতের পূর্বে একবার তাঁর বিবিগণের কাছে বলেন ঃ[৬০]

أَسْرَعُكُنَّ لِحَاقًا بِىْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا -

–তোমাদের মধ্যে খুব দ্রুত সেই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত সবচেয়ে বেশী লম্বা। তিনি হাত লম্বা দ্বারা রূপক অর্থে দানশীলতা বুঝিয়েছেন। কিন্তু সম্মানিত বিবিগণ

---

৫৪. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৫; তাবাকাত-৮/১০৯
৫৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫
৫৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৫
৫৭. তাবারী-১৩/২৪৪৯; তাবাকাত-৮/১০৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮
৫৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৮
৫৯. প্রাগুক্ত।
৬০. প্রাগুক্ত।

শব্দগত অর্থ বুঝেছিলেন। এ কারণে তাঁরা একত্র হলে পরস্পর পরস্পরের হাত মেপে দেখতেন যে, কার হাত বেশী লম্বা। যায়নাব (রা) ছিলেন ছোট খাট মানুষ। যায়নাব বিনত জাহাশের (রা) ইনতিকাল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা এমন করতেন। কিন্তু তিনি যখন সবার আগে মারা গেলেন তখন গভীরভাবে চিন্তা করে তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) কথার তাৎপর্য বুঝতে পারেন। তাই হযরত আয়িশা (রা) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ[৬১]

كَانَتْ اَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدٍ وَتَتَصَدَّقُ

–আমাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা হাতের অধিকারিণী ছিলেন যায়নাব। কারণ, তিনি নিজের হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং তা দান করতেন।

অনেকে মনে করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ মন্তব্য দ্বারা হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মাকে (রা) বুঝিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আগেই ইনতিকাল করেন।

হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে যেসব বর্ণনা এসেছে তাদ্বারা একথা বুঝা যায় যে, হযরত যায়নাব (রা) খুবই রূপবতী মহিলা ছিলেন। একবার হযরত 'উমার (রা) তার মেয়ে হযরত হাফসাকে (রা) উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ[৬২]

لَا تُرَاجِعِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِنَّهُ لَيْسَ لَكِ جَمَالُ زَيْنَبَ وَلَا حَظَّةَ عَائِشَةَ -

–তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) কথার প্রত্যুত্তর করবে না। কারণ তোমার না আছে যায়নাবের রূপ-সৌন্দর্য, আর না আছে আয়িশার স্বামী সোহাগ।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর অন্য বিবিগণ হজ্জ আদায় করলেও হযরত সাওদা (রা) ও হযরত যায়নাব (রা) আর হজ্জ করেননি। তাঁরা আর ঘর থেকে বের হননি।[৬৩] তাঁরা দুইজন আল্লাহ ও রাসূলের (রা) নির্দেশ সেভাবেই বুঝেছিলেন।

---

৬১. মুসলিম (২৪৫৩)-ফাদায়িলু যায়নাব; বুখারী-৩/২২৬; আল-ইসাবা-৪/৩১৪

৬২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২৭

৬৩. প্রাগুক্ত-১/৪৬৫।

জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) আরবের বিখ্যাত খুযা'আ গোত্রের 'মুসতালিক' শাখার কন্যা। পিতা হারিস ইবন দিরার ছিলেন বনু মুসতালিকের নেতা।[১]

হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) প্রথম বিয়ে হয় তাঁরই গোত্রের 'মুসাফি' ইবন সাফওয়ান' (জী শুফার) নামের এক ব্যক্তির সাথে। তিনি ছিলেন হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) চাচাতো ভাই এবং 'জী আশ-শুফার' নামে প্রসিদ্ধ।[২] পিতা হারিস ও স্বামী মুসাফি' উভয়ে ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু। পরে তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

বনু আল-মুসতালিক-এর যুদ্ধ

'মুসতালিক' হলো বনু খুযা'আ গোত্রের জুজায়মা ইবন সা'দ নামের এক ব্যক্তির উপাধি। আর বনু খুযা'আ গোত্রের একটি পানির কূপের নাম হলো 'আল-মুরাইসী'। বনু মুসতালিক অভিযানে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বাহিনীসহ এই কূপের ধারে অবস্থান করেন, তাই ইতিহাসে এই অভিযান 'বনু মুসতালিক' অথবা 'আল-মুরাইসী'র যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ অভিযান পরিচালিত হয় হিজরী পঞ্চম সনের শা'বান মাসে। অবশ্য অনেকে ষষ্ঠ সনের কথাও বলেছেন।[৪] কিন্তু তা সঠিক বলে মনে হয় না।

হিজরী পঞ্চম সনে রাসূলুল্লাহ (সা) খবর পেলেন যে, বনু আল-মুসতালিক-এর নেতা হারিস ইবন দিরার মক্কার কুরাইশদের প্ররোচনায় নিজের ও অন্য আরব গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বুরাইদা ইবন আল-হুসাইব আল-আসলামীকে (রা) পাঠালেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সরাসরি হারিসের সাথে কথা বলে বুঝলেন, ঘটনা সত্য। তিনি সাথে সাথে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রকৃত অবস্থা জানালেন। কাল বিলম্ব না করে রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন।

বাহিনী প্রস্তুত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ ইবন হারিসা (রা), মতান্তরে আবু জার আল-গিফারীকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে নিজেই বাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। কোন কোন বর্ণনায় নুমাইলা ইবন আবদিল্লাহ আল-লাইসীকে মদীনায় খীলফা হিসেবে রেখে যাওয়ার কথা এসেছে। যাই হোক, তিনি পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসের ২ তারিখ

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬১
২. তাবাকাত-৮/১১৬; আল-ইসাবা-৪/২৬৬,
৩. উসুদুল গাবা-১/৪০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩
৪. আল-ইসাবা-৪/২৬৫

মদীনা থেকে বের হন এবং মদীনা থেকে নয় মানযিল দূরে 'মুরাইসী' পৌঁছে যাত্রাবিরতি করেন।

হারিসের নেতৃত্বে গঠিত কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর নিকট সব খবর পৌঁছে গেল। তারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লো। অন্যান্য আরব গোত্র প্রতিরোধের ইচ্ছা ত্যাগ করে যার যার মত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হারিসের সংগে থাকলো শুধু তার গোত্রের লোকেরা। তারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো এবং দীর্ঘক্ষণ তীর-বর্শা ছুড়ে ছুড়ে মুসলিম বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখলো। অবশেষে মুসলিম বাহিনী হঠাৎ করে একসাথে আক্রমণ করে বসে এবং শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে। নেতা আল-হারিস পালিয়ে যায়।

এগারোজন কাফির সৈন্য মারা যায় এবং অন্যরা সকলে বন্দী হয়। মুসলিম বাহিনীর কোন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেনি। তবে ভুলক্রমে হযরত 'উবাদা ইবন সামিতের (রা) হাতে হিশাম ইবন সাবাবা নামে এক ব্যক্তি শহীদ হন। শত্রুপক্ষের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে প্রায় ৬০০ জন বন্দী হয় এবং তাদের দুই হাজার উট পাঁচ হাজার ছাগল-ভেড়া গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হিসেবে মুসলিম বাহিনী লাভ করে।[৫]

এই যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে হযরত জুওয়াইরিয়াও (রা) ছিলেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের কোন কোন গ্রন্থেও তাঁর বর্ণনাটি সংকলিত হয়েছে। সকল যুদ্ধবন্দীকে দাস-দাসী ঘোষণা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) পড়েন হযরত সাবিত ইবন কায়সের (রা) মতান্তরে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের ভাগে। তিনি ছিলেন গোত্রীয় নেতার কন্যা। তদুপরি তাঁর ছিল প্রবল আত্মসম্মানবোধ, কোমল স্বভাব, রূপ ও সৌন্দর্য। দাসীর জীবন মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হযরত সাবিত ইবন কায়সের (রা) নিকট 'মুকাতাবা'-এর আবেদন জানালেন। সাবিত (রা) নয় উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের 'মুকাতাবা' বা চুক্তি করলেন। কিন্তু হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) এ পরিমাণ অর্থ কোথায় পাবেন? তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মানুষের কাছে সাহায্যের হাত পেতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করবেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) গনীমাতের মাল বন্টন শেষ করার পর হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) তাঁর সামনে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি। আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা রাসূলুহু।' আমি আমার গোত্রপতি হারিস ইবন দিরারের কন্যা। মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে এসেছি এবং সাবিত ইবন কায়সের ভাগে পড়েছি। সাবিত আমার সাথে 'মুকাতাবা' করেছেন। কিন্তু আমি অর্থ পরিশোধ করতে পারছিনে। আমি আপনার নিকট এই প্রত্যাশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি আমার চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা কর না? বললেন, তা কী? রাসূল

৫. আসাহ আস-সিয়ার-১৭২

(সা) বললেন, আমি তোমার চুক্তিকৃত সকল অর্থ পরিশোধ করে দিই এবং তোমাকে বিয়ে করি। এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) দারুণ খুশী হন এবং সম্মতি প্রকাশ করেন। অতঃপর হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাবিতকে ডেকে পাঠান এবং চুক্তিকৃত অর্থ তাঁকে দান করে জুওয়াইরিয়াকে (রা) দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। তারপর তাঁকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন। ইবন ইসহাক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।[৬]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) পিতা হারিস ছিলেন আরবের একজন অন্যতম নেতা। মুসলিম বাহিনীর হাতে তাঁর কন্যা বন্দী হলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলেন, 'আমার কন্যা দাসী হতে পারে না। আমার মর্যাদা দাসত্বের অনেক উর্ধে। আপনি তাঁকে মুক্ত করে দিন।' রাসূল (সা) বললেন, বিষয়টি জুওয়াইরিয়ার মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হোক– সেটাই কি ভালো হবে না? হারিস কন্যা জুওয়াইরিয়ার নিকট যেয়ে বললেন, মুহাম্মাদ তোমার মর্জির উপর তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। দেখ, তুমি যেন আমাকে লজ্জায় ফেলো না। জুওয়াইরিয়া পিতাকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে থাকতে পছন্দ করছি।' অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।[৭]

ইবন সা'দ তাবাকাতে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতাই তাঁর মুক্তিপণ পরিশোধ করেন। যখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যান তখন তাঁর সম্মতিতে রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ে করেন।

বিয়ের খবর যখন মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন তাঁরা বললেন, বনু আল-মুসতালিক তো এখন রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত শ্বশুরকুল। যে খান্দানে রাসূলুল্লাহ (সা) বিয়ে করেছেন, তাঁরা কক্ষণো দাস-দাসী হতে পারে না। এরপর তাঁরা পরামর্শ করলেন এবং একজোট হয়ে একসাথে সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন।[৮]

ইবনুল আসীর লিখেছেন, এই উপলক্ষে বনু মুসতালিকের এক শো বাড়ীর সকল বন্দী মুক্তি পায়। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমাদ হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ[৯]

مَا رَأَيْتُ اِمْرَأَةً أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا ـ

'আমি কোন নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া থেকে অধিকতর কল্যাণময়ী দেখিনি।'

ইবন ইসহাক বলেছেন, এক শো বাড়ী অর্থ এক শো মানুষ নয়। কেন না, তাদের সংখ্যা

---

৬. তাবাকাত-৮/১১৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯৪, ২৯৫; আল-ইসাবা-৪/২৬৫

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩; তাবাকাত-৮/১১৮

৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯৪, ২৯৫; আল-ইসতী'য়াব-৪/২৬০; আবু দাউদ : কিতাবুল 'ইতাক-২/১০৫; তাবাকাত-৮/১১৬

৯. উসুদুল গাবা-৫/৪২০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/১৫৯

সাত শো'রও অধিক ছিল। এক শো বাড়ী অর্থ এক শো বাড়ীর মানুষ।[১০]

ইবনুল আসীরসহ অনেকে ঘটনাটি এভাবেও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী হিসেবে ঘর করা শুরু করেছেন। পিতা হারিস তা জানতেন না। তিনি কন্যাকে মুক্ত করার জন্য অনেকগুলি উটের উপর মুক্তিপণের অর্থ-সম্পদ বোঝাই করে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথে আকীক উপত্যকায় পৌঁছে উটগুলি চরানোর জন্য লাগামমুক্ত করে দেন। সেই উটগুলির মধ্যে দুইটি উট ছিল তাঁর অতি প্রিয়। এ কারণে তিনি উট দুইটি একটি গোপন স্থানে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে পৌঁছে আরজ করেন ঃ

'আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন। এই নিন তার মুক্তিপণ এবং তাকে আমার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিন।'

তারপর তিনি যে অর্থ-সম্পদ, উট ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন, এক এক করে সবই উপস্থাপন করতে লাগলেন। তখন রাসূল (সা) তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, 'সেই উট দুইটি কোথায়, যাদেরকে আকীক উপত্যায় লুকিয়ে রেখে এসেছো?'

রাসূলুল্লাহর (সা) এই অবগতিতে হারিস দারুণ বিস্মিত হলেন। তিনি সাথে সাথে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে যান। তারপর তিনি জানতে পারলেন যে, যাঁকে মুক্ত করতে তিনি ছুটে এসেছেন, তিনি এত দিনে নবীগৃহের শোভায় পরিণত হয়েছেন। তিনি কন্যার এমন সৌভাগ্যে দারুণ পুলকিত হলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সাথে কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর খুশী মনে তাঁকে সাথে নিয়ে নিজ গোত্রের আবাসভূমির দিকে যাত্রা করলেন।[১১]

আল-ওয়াকিদী হযরত 'উরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) বলেছেন, নবীর (সা) আগমনের তিনদিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন ইয়াসরিবের দিক থেকে চাঁদ ছুটে এসে আমার কোলে পড়লো। কোন মানুষকে একথা বলা আমি ভালো মনে করিনি। অতঃপর নবী (সা) এসে গেলেন। যখন আমি বন্দী হলাম, তখন আমার দেখা স্বপ্নের বাস্তবে রূপ লাভের আশা করলাম। তারপর রাসূল (সা) আমাকে মুক্ত করে বিয়ে করলেন। আমি এ স্বপ্নের কথা আমার গোত্রের কাউকে বলিনি। রাসূল (সা)-এর যে আগমন ঘটেছে সেকথা আমার এক চাচাতো বোন আমাকে না বলা পর্যন্ত আমার কিছুই জানা ছিল না। অতঃপর আমি আল্লাহ তা'আলার হামদ পেশ করলাম।[১২]

ইমাম মুসলিম হযরত ইবন আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন ঃ[১৩]

---

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/২৯৪, ২৯৫

১১. উসুদুল গাবা-৫/৪২০

১২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/১৫৯; আল-হাকেম-৪/২৭ হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৫

১৩. মুসলিম (২১২০); আল-মুসনাদ-৬/৪২৯, ৪৩০; তাবাকাত-৮/১১৮

كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى جويرية -

–হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) প্রথম নাম ছিল 'বাররা'। বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া রাখেন। কারণ, প্রথম নামটির মধ্যে কিছুটা আত্ম-প্রশস্তির ভাব বিদ্যমান থাকায় রাসূল (সা) তাতে অশুভ ও অকল্যাণের ইঙ্গিত দেখতে পান। এ কারণে তিনি তা পছন্দ করেননি। হযরত ইবন আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় এসেছে ঃ[১৪]

كره أن يقال خرج من عند برة -

–'তিনি তাঁকে 'বাররা' বলা অপছন্দ করলেন। তাই তাঁর নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

لَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ -

–তোমরা নিজেদেরকে পূতঃপবিত্র মনে করো না। মূলতঃ এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাসূল (সা) তাঁর নামটি পরিবর্তন করেন।

ইবন সা'দ হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) দেন-মোহর সম্পর্কে বলেছেন ঃ[১৫]

وجعل صداقها عتق كل مملوك من بنى المصطلق -

–বনু আল-মুসতালিক-এর প্রতিটি বন্দীর মুক্তি তাঁর মোহর হিসেবে ধার্য হয়।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) যে সময় বিয়ে হয় তখন তিনি মাত্র বিশ বছর বয়সের এক মহিলা। হযরত 'আয়িশা (রা) প্রথম দর্শনেই তাঁকে যথেষ্ট রূপবতী এবং তাঁর চাল-চলন খুবই মিষ্টি-মধুর বলে মনে করেছেন। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ[১৬]

كانت جويرية إمرأة حلوة وملاحة لا يكاد يراها أحد الا وقعت فى نفسه -

–জুওয়াইরিয়ার মধ্যে মধুরতা ও ছলাকলা উভয় রকমের গুণ বিদ্যমান ছিল। কেউ তাঁকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন।

---

১৪. আল-ইসাবা-৪/২৬৬

১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬২, ২৬৩; তাবাকাত-৮/১১৭

১৬. ইবন হিশাম-২/২৯৪; মুসনাদ-৬/২৭৭; উসুদুল গাবা-৫/২২০

ইমাম আজ-জাহাবী বলেন ঃ[১৭]

وكانت من أجمل النساء -

'তিনি ছিলেন সেরা রূপবতী মহিলাদের একজন।'

তিনি ছিলেন খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। তাঁর মধ্যে ছিল সীমাহীন আত্মসম্মান বোধ। তার প্রমাণ হলো, দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য তাঁর অস্থিরতা ও চেষ্টা সাধনা। পার্থিব ভোগ-বিলাসিতার প্রতি ছিলেন নির্মোহ এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন একাগ্রচিত্ত। হাদীসের একাধিক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাসবীহ ও তাহলীলে মশগুল দেখতে পেয়েছেন।

খলীফা 'উমার (রা) যখন ভাতা প্রচলন করলেন তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিবিগণের মধ্যে সাফিয়্যা (রা) ও জুওয়াইরিয়া (রা) ব্যতীত অন্য সকলের জন্য বারো হাজার করে নির্ধারণ করলেন। তাঁদের দুইজনের জন্য করলেন ছয় হাজার করে। তাঁদের দুইজনের জীবনের এক পর্যায়ে দাসত্ব থাকার কারণে তিনি এমন করেন। কিন্তু তাঁরা 'উমারের (রা) আচরণে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ভাতা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। তাঁরা সমতার দাবী জানালেন। 'উমার (রা) তাঁদের দাবী মানতে বাধ্য হলেন। অন্য একটি বর্ণনায় মায়মূনার (রা) কথাও এসেছে এবং বারো হাজারের স্থলে দশ হাজার এসেছে।[১৮]

একদিন সকালে হযরত রাসূলে কারীম (সা) দেখলেন যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) মসজিদে বসে দু'আ করছেন। তিনি চলে গেলেন। দুপুরে এসে তাঁকে একই অবস্থায় পেয়ে বললেন, তুমি সব সময় এ অবস্থায় থাক? সেই অবস্থায় তিনি 'হাঁ' বলে জবাব দিলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে ভালো কিছু কথা শিখিয়ে দিবনা, যা তোমার এই নফল ইবাদাত থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তারপর তিনি তাঁকে এ দু'আ শিখিয়ে দেন ঃ[১৯]

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ (ثلاث مرات) سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ (ثلاث مرات) سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (ثلاث مرات) سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ (ثلاث مرات) -

অবশ্য বিভিন্ন বর্ণনায় কিছু ভিন্নতাও আছে।

ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় এসেছে। এক জুম'আর দিন রাসূল (সা) হযরত

---

১৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬১

১৮. হায়াতুস সাহাবা-২/২১৬

১৯. মুসলিম (২৭২৬); তাবাকাত-৮/১১৯; আল-ইসাবা-৪/২৬৫; মুসনাদ-৬/৩২৪, ৩২৭, ৪২৯, ৪৩০; তারগীব ওয়াত তারহীব-৩/৯৮

জুওয়াইরিয়ার (রা) নিকট আসলেন। সেদিন জুওয়াইরিয়া (রা) রোযা রেখেছিলেন। তিনি যেহেতু একটি মাত্র রোযা রাখা পছন্দ করতেন না, এ কারণে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন 'না'। তিনি আবার জানতে চাইলেন আগামীকাল রাখার ইচ্ছা আছে কি? বললেন ঃ না। তখন রাসূল (সা) বললেন ঃ তাহলে তুমি ইফতার করে রোযা ভেঙ্গে ফেল।[২০]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সব সময় তাঁর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। একবার তাঁর ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন 'খাওয়ার কিছু আছে কি?' তিনি জবাব দিলেন ঃ 'আমার দাসী কিছু সাদাকার গোশ্‌ত দিয়েছিল, শুধু তাই আছে। তাছাড়া আর কিছু নেই।' রাসূল (সা) বললেন ঃ তাই নিয়ে এসো। কারণ, সাদাকা যাকে দেওয়া হয়েছিল তার নিকট পৌঁছে গেছে।[২১]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম দুইটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২২] তাঁর কাছে যাঁরা হাদীস শুনেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ঃ ইবন 'আব্বাস, জাবির, ইবন 'উমার, 'উবাইদ ইবন আস-সাবাক, তুফাইল, আবু আইউব মুরাগী, মুজাহিদ, কুরাইব, কুলসুম ইবন মুসতালিক, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন আল-হাদ প্রমুখ।[২৩]

হিজরী ৫ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বিয়ের সময় হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) বয়স ছিল বিশ বছর। সঠিক মত অনুযায়ী হিজরী ৫০ (পঞ্চাশ) সনের রবীউল আওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর। তৎকালীন মদীনার গভর্নর মারওয়ান জানাযার নামায পড়ান। তাঁর কবর মদীনার আল-বাকী গোরস্তানে। মুহাম্মাদ ইবন 'উমারের বর্ণনামতে তাঁর মৃত্যুসন হিজরী ৫৬।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে উৎপন্ন ফসল থেকে আশি ওয়াসাক খেজুর এবং বিশ-ওয়াসাক যব, মতান্তরে গম হযরত জুওয়াইরিয়ার (রা) জীবিকার জন্য নির্ধারণ করেন।[২৫]

হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন ঃ আমি এই দাসটি মুক্ত করে দিতে চাই। তিনি বললেন ঃ ওকে তুমি তোমার মামাকে দিয়ে দাও– যিনি গ্রামে থাকেন। সে তাঁকে দেখাশুনা করবে। এতে তুমি বেশী সাওয়াব পাবে।[২৬]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁর এ সময়ের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

---

২০. তাবাকাত-৮/১১৯
২১. আল-ইসাবা-৪/২৬৬
২২. বুখারী-৪/২০৩; মুসলিম, (হাদীস নং ১০৭৩, ২৭২৬); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩
২৩. আল-ইসাবা-৪/২৬৬; সাহাবিয়াত-৯৭
২৪. তাবাকাত-৮/১২০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৬৩
২৫. তাবাকাত-৮/১২০
২৬. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৩০

উম্মু হাবীবা (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) কুরাইশ নেতা হযরত আবু সুফইয়ানের (রা) কন্যা। ইসলাম-পূর্ব মক্কার কুরাইশদের তিন ব্যক্তি—'উতবা, আবু জাহল ও আবু সুফইয়ান খুব দাপটের নেতা ছিলেন। কুরাইশদের সামরিক ঝাণ্ডা 'ইকাব' আবু সুফইয়ানের কাছেই থাকতো। তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। শাম, রোম ও আজমে তিনি বাণিজ্য কাফেলা পাঠাতেন। মাঝে মাঝে কাফেলার সাথে তিনি নিজেও যেতেন। এই আবু সুফইয়ানের আসল নাম সাখর ইবন হারব।[১]

আবু সুফইয়ানের এক কন্যা যায়নাব। তার বিয়ে হয় তায়েফের দাউদ ইবন 'উরওয়া ইবন মাস'উদ আস-সাকাফীর সাথে।[২] অপর দুই কন্যার বিয়ে হয় উম্মুল মুমিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের (রা) দুই ভাইয়ের সাথে। ফারি'আকে আবু আহমাদ ইবন জাহাশ এবং উম্মু হাবীবাকে 'উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশ বিয়ে করেন। আবু সুফইয়ানের এক পুত্র হযরত মু'আবিয়া (রা)। আমীরুল মুমিনীন হযরত 'আলীর (রা) সাথে যাঁর সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়। এই মু'আবিয়ার (রা) পুত্র ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহর (সা) নাতি হযরত ইমাম হুসাইনকে (রা) কারবালায় শহীদ করেন। মু'আবিয়া (রা) উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন।

আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিন্‌ত 'উতবা উহুদের প্রান্তরে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবিয়েছিলেন। হিন্দা ছিলেন হযরত মু'আবিয়ার (রা) মা। আবু সুফইয়ানের অন্য এক স্ত্রী সাফিয়্যা বিন্‌ত আবীল 'আস উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবার (রা) মা। মু'আবিয়া (রা) উম্মু হাবীবার (রা) সৎ ভাই। উম্মু হাবীবার মা সাফিয়্যা ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমান ইবন 'আফ্‌ফানের ফুফু। রাসূলুল্লাহর (সা) নুবুওয়াত প্রাপ্তির সতেরো বছর পূর্বে উম্মু হাবীবা (রা) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

আবু সুফইয়ান, তাঁর স্ত্রী হিন্দা ও তাঁর খান্দানের অধিকাংশ মানুষ মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। কিন্তু তখনও আবু সুফইয়ান প্রকৃত মুসলমান হতে পারেন নি। তিনি তখন 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'-এর অন্তর্গত। কোন কোন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন যে, পরে তিনি একজন ভালো মুসলমান হয়ে যান।[৪]

পিতৃ-পরিবার ইসলামের প্রতি মক্কা বিজয় পর্যন্ত বিদ্বেষী থাকলেও উম্মু হাবীবা ও ফারি'আ (রা)-এর স্বামীর পরিবার কিন্তু ইসলামের সূচনা পর্বেই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরাও তাঁদের স্বামীদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. আল-ইসাবা-৪/৩০৫
২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৮
৩. আল-ইসাবা-৪/৩০৫
৪. আসাহ আস-সিয়ার-৬৪২

হযরত উম্মু হাবীবা (রা) স্বামী 'উবাইদুল্লাহ ইবন জাহাশসহ মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরাত করেন। এই হাবশার মাটিতে উবাইদুল্লাহর ঔরসে কন্যা হাবীবার জন্ম হয়। তবে ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, হাবশায় হিজরাতের পূর্বে মক্কায় 'হাবীবা'র জন্ম হয়।[৫] আর এই কন্যার নামে তাঁর উপনাম হয় 'উম্মু হাবীবা'। তাঁর আসল নাম 'রামলা' হারিয়ে যায় এবং এই উপনামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৬]

হাবশায় যাওয়ার কিছুদিন পর স্বামী উবাইদুল্লাহ ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তার ধর্মত্যাগের পূর্বে হযরত উম্মু হাবীবা (রা) একবার স্বপ্নে স্বামীকে বিভৎসরূপে দেখেন। তিনি ভীত-শংকিত হয়ে আপন মনে বলেন, নিশ্চয় তার কোন খারাপ পরিণতি হতে যাচ্ছে। সকাল বেলা 'উবাইদুল্লাহ তাঁকে বললো ঃ 'উম্মু হাবীবা! আমি ধর্মের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি। খ্রিষ্টধর্ম থেকে অন্য কোন ধর্ম বেশী ভালো বলে মনে হয়নি। যদিও আমি মুসলমান হয়েছি, তবে এখন আমি খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছি। হযরত উম্মু হাবীবা (রা) স্বামীর এহেন পথভ্রষ্টতায় যথেষ্ট তিরস্কার করলেন এবং নিজের স্বপ্নের কথাও তাকে বললেন। কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হলো না। সে খ্রিষ্টান থেকেই গেল। এভাবে তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। 'উবাইদুল্লাহ এখন বেপরোয়াভাবে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলো। একদিন অতিরিক্ত মদ পান অবস্থায় পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মতান্তরে মদ্যপ অবস্থায় সাগরে ডুবে মারা যায়।[৭] উম্মু হাবীবা আরও বলেছেন, আমি দেখলাম, কেউ আমাকে 'ইয়া উম্মুল মুমিনীন'– বলে ডাকছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করবেন।[৮]

ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর হযরত উম্মু হাবীবা (রা) কন্যা হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় বসবাস করতে থাকেন। এ খবর মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) কানে পৌঁছলো। উম্মু হাবীবার (রা) ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা থেকে 'আমর ইবন উমাইয়্যা আদ-দামরীকে (রা) একটি চিঠি এবং চার শো দীনার দেন-মোহরের অর্থসহ হাবশার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট পাঠান। চিঠিতে তিনি নাজ্জাশীকে লেখেন– 'আমার সাথেই উম্মু হাবীবার বিয়ের কাজ সমাধা করে দাও।' চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নাজ্জাশী তাঁর দাসী আবরাহাকে উম্মু হাবীবার নিকট পাঠিয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছে দেন। তাঁকে একথাও জানান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে লিখেছেন। এখন এ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য আপনি আপনার পক্ষের একজন উকিল মনোনীত করুন। হযরত উম্মু হাবীবা (রা) এ সুসংবাদ দানের জন্য আবরাহাকে নিজের দুইটি রূপোর চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি দান করেন। আর মামাতো ভাই

৫. তাবাকাত-৮/৯৭
৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৮
৭. প্রাগুক্ত
৮. তাবাকাত-৮/৯৭; শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৭৬; আল-মুসতাদরিক-৪/২০,২২

খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আবীল 'আসকে উকিল নিয়োগ করে নাজ্জাশীর নিকট পাঠান।[৯]

সন্ধ্যার সময় নাজ্জাশী হাবশায় বসবাসরত হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামকে (রা) দরবারে ডেকে পাঠান এবং তাঁদের সবার উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।[১০] নাজ্জাশী নিজেই বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং চার শো দীনার মোহরের অর্থ রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে খালিদ ইবন সা'ঈদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাই যখন উঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন খালিদ ইবন সা'ঈদ সবাইকে থামিয়ে বললেন, নবীদের (সা) সুন্নাত বা রীতি হচ্ছে বিয়ের পর আহার করানো। তারপর তিনি সকলকে আহার করিয়ে বিদায় দেন।[১১] এ বিয়ের দেন-মোহরের পরিমাণের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। মুসতাদরিকের একটি বর্ণনায় চার হাজার দীনারের কথা এসেছে। আবু দাউদের বর্ণনায় চার হাজার দিরহাম এসেছে। ইবন আবী খায়সামা ইমাম যুহরী থেকে চল্লিশ উকিয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। তবে আল্লামা যুরকানী চার শো দীনারের বর্ণনাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[১২]

মোহরের অর্থ হযরত উম্মু হাবীবার (রা) নিকট পৌঁছলে তাঁর থেকে পঞ্চাশ দীনার তিনি দাসী আবরাহাকে দিতে চান। কিন্তু আবরাহা নিতে অসম্মতি জানান এবং বলেন, নাজ্জাশী আমাকে নিতে বারণ করেছেন। উম্মু হাবীবা (রা) পূর্বে যা কিছু তাকে দিয়েছিলেন তাও ফিরিয়ে দেন। বিয়ের পর নাজ্জাশী বহু মিশ্‌ক, আম্বর, সুগন্ধি এবং আরও অন্যান্য জিনিস উপহার হিসাবে উম্মু হাবীবার (রা) নিকট পাঠান। এসব কথা হযরত উম্মু হাবীবা নিজে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় আবরাহা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানায় এবং আমাকে অনুরোধ করে আমি যেন তাঁর ইসলামের কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) অবহিত করি এবং তাঁর সালাম পৌঁছে দিই। উম্মু হাবীবা বলেন, মদীনায় পৌঁছে আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বিয়ের সব কথা বলি এবং আবরাহার সকল আচরণের কথা অবহিত করে তাঁর সালাম পেশ করি। তিনি মৃদু হেসে বলেন ঃ

وَعَلَيْهَا السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ[১৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মু হাবীবার (রা) এ বিয়ে হিজরী ৬, মতান্তরে ৭ সনে সম্পন্ন হয়। তখন উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবার বয়স ৩৬ অথবা ৩৭ বছর হবে। বিয়ের পর নাজ্জাশী শুরাহবীল ইবন হাসানার (রা) মতান্তরে জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা)[১৪] নেতৃত্বে একদল মুহাজিরের সাথে উম্মু হাবীবাকে (রা) জাহাজযোগে মদীনায় পাঠিয়ে

---

৯. আল-বিদায়া-৪/১৪৩; তাবাকাত-৮/৯৮.৯৯;
১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২১
১১. মুসনাদ-৬/৪২৭; তাবাকাত-৮/৯৮; ইবন হিশাম-১/২২২
১২. আল-ইসাবা-৪/৩০৬
১৩. তাবাকাত-৮/৯৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫৯,
১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/২২৯,৪৩৯.

দেন। এই কাফেলা যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে অবস্থান করছিলেন।[১৫]

ইবন হাযাম (রা) দাবী করেছেন যে, উম্মু হাবীবার (রা) 'আকদ হাবশায় হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। এ বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞরা একমত। তবে হযরত কাতাদা (রা) ও ইমাম যুহরীর একটি বর্ণনায় এসেছে যে, উম্মু হাবীবার (রা) এ আকদ অনুষ্ঠিত হয় মদীনায় উসমান ইবন 'আফ্‌ফানের (রা) ব্যবস্থাপনায়।[১৬] এ বিয়েতে ওলীমা করা হয় এবং তাতে তিনি মেহমানদেরকে গোশ্‌ত খাওয়ান। সীরাত বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেছেন, হতে পারে মদীনায় আসার পর আবার একটি আক্‌দ ও ওলীমা অনুষ্ঠান করা হয়।

সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে, মানুষ মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী আবু সুফইয়ানকে সুনজদের দেখতো না এবং তাঁর সাথে উঠাবসাও পছন্দ করতো না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট তিনটি জিনিসের আবেদন জানান। রাসূল (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। সেই তিনটি জিনিসের একটি হলো ঃ আবু সুফইয়ান বলেন, আমার কাছে আরবের সেরা সুন্দরী মেয়ে হলো উম্মু হাবীবা, আপনি তাকে বিয়ে করুন। রাসূল (সা) রাজী হন।[১৭]

এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় আবু সুফইয়ানের (রা) ইসলাম গ্রহণের সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মু হাবীবার (রা) বিয়ে হয়নি। সীরাত বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এটা বর্ণনাকারীর একটি ধারণামাত্র। তাই ইবন সা'দ' ইবন হাযাম, ইনুল জাওযী, ইবনুল আসীর, বায়হাকী, আবদুল 'আজীম মুনজিরী প্রমুখ মুহাদ্দিসীন মুসলিমের উপরোক্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেকে এ বর্ণনার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, মূলতঃ আবু সুফইয়ান দ্বিতীয়বার আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার কথা বলেন।[১৮]

উম্মু হাবীবার (রা) 'আকদ যে হাবশায় হয়েছিল সে ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া এর সপক্ষে আরও একটি ঘটনার কথা সীরাতের গ্রন্থাবলীতে সংকলিত হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি ধারা অনুযায়ী মক্কার পার্শ্ববর্তী খুযা'আ গোত্র মদীনার মুসলমানদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এতে কুরাইশরা এই চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের উপর অত্যাচার চালায়। খুযা'আ গোত্র রাসূলুল্লাহর (সা) সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে মক্কার কুরাইশরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা সন্ধিচুক্তি বলবৎ রাখার জন্য তাদের পক্ষ থেকে আবু সুফইয়ানকে মদীনায় পাঠায়। আবু সুফইয়ান মদীনায় এসে প্রথমে কন্যা উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবার (রা) নিকট যান।

---

১৫. আবু দাউদ : কিতাবুন নিকাহ-বাবুস সুদাক (২১০৭); আন-নাসা'ঈ-৬/১১৯; কিতাবুন নিকাহ; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২১; মুসনাদ-৬/৪২৭

১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২১

১৭. মুসলিম : ফাদায়িলুস সাহাবা-(২৫০১)

১৮. আসাহ আস-সিয়ার-২৯১ ঃ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২২

কন্যা পিতাকে দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানা গুটিয়ে বসতে দেন। আবু সুফইয়ান মেয়েকে প্রশ্ন করেন, মেয়ে! তুমি বিছানা গুটিয়ে নিলে। তা বিছানা আমার বসার উপযুক্ত মনে না করে, না আমাকে বিছানার উপযুক্ত মনে না করে? মেয়ে বললেন, এটা রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানা। আর আপনি একজন মুশরিক (অংশীবাদী) ও অপবিত্র। এ কারণে আমি ইচ্ছা করিনি যে, আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানায় বসুন। মেয়ের এমন কথা শুনে আবু সুফইয়ান সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বসেন এবং মেয়েকে বলেন ঃ

لَقَدْ أَصَابَكِ بَعْدِىْ شَرٌّ -

আমাকে ছাড়ার পর তোমার মধ্যে অনেক মন্দ ঢুকেছে।[১৯]

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় আবু সুফইয়ানের ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। তাছাড়া ইবন সা'দের একটি বর্ণনায় এসেছে। উম্মু হাবীবার (রা) বিয়ের খবর মক্কায় আবু সুফইয়ানের নিকট পৌঁছে। তখন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিপক্ষ ও দুশমন। তবে তিনি এ বিয়েকে অপছন্দ করেননি। তিনি মন্তব্য করেন ঃ

ذاك الفحل، لا يقرع أنفه -

–এ এমন সম্ভ্রান্ত কুফু যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।[২০]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা) তাঁর ভাই হযরত আমীর মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে হিজরী ৪৪ মতান্তরে ৪২ সনে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তাকে মদীনায় দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। মারওয়ান জানাযার নামায পড়ান। তার ভাই ও বোনের ছেলেরা কবরে নেমে তাঁকে সমাহিত করেন।[২১] কবরের ব্যাপারে এতটুকু জানা যায় যে, সেটা হযরত আলীর (রা) গৃহে ছিল। ইমাম যায়নুল আবেদীন (রাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার আমি আমার বাড়ীর একটি কোনা খুড়লাম। সেখানে একটি শীলালিপি পেলাম। তাতে লেখা ছিল–

هذاقبر رملة بنت صخر،

'এটা রামলা বিনত সাখর-এর কবর'। আমি সেটা আবার সেখানে রেখে দিই। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তাঁর কবরটি আলীর (রা) ঘরে ছিল।[২২] তিনি তাঁর ভাই হযরত মু'আবিয়ার (রা) সাথে সাক্ষাতের জন্য দিমাশক সফরে গিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, সেখানে মারা যান এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। ইমাম জাহাবী বলেন,

---

১৯. আল-বিদায়া-৪/২৮০; তাবাকাত-৮/৯৯, ১০০

২০. আনসাবুল-আশরাফ-১/৪৩৯; তাবাকাত-৮/৯৯

২১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪২০

২২. আল-ইসতী'য়াব ঃ আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-৪/৩০৬

এটা ভিত্তিহীন কথা, তাঁর কবর মদীনায়।[২৩]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত আয়িশা (রা) ও হযরত উম্মু সালামাকে (রা) ডেকে আনান। তিনি তাঁদেরকে বলেন, আমার ও আপনাদের মধ্যে তেমন সম্পর্ক ছিল, যেমন সতীনদের পরস্পরের থাকে। যেহেতু আপনারা তেমন চেয়েছিলেন, তাই আমিও তাই পছন্দ করেছিলাম। আপনারা আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলে তিনি খুশী হয়ে বলেন ঃ

سررتنى سرك الله -

–আপনি আমাকে খুশী করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশী করুন।[২৪]

প্রথম স্বামীর ঔরসে দুইটি সন্তান আবদুল্লাহ ও হাবীবা জন্মগ্রহণ করে। হাবীবা রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। সাকীফ গোত্রের এক বড় নেতার সাথে তার বিয়ে হয়।

হযরত উম্মু হাবীবা (রা) খুবই রূপবতী ছিলেন। সহীহ মুসলিমে পিতা আবু সুফইয়ানের বর্ণনা এভাবে এসেছে ঃ

عِنْدِىْ أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأُجْمَلِهِ أُمُّ حَبِيْبَةَ.

–আমার আছে আরবের সেরা সুন্দরী ও সেরা রূপবতী কন্যা উম্মু হাবীবা।

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত উম্মু হাবীবার (রা) পয়ষট্টিটি (৬৫) হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে দুইটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি এবং দুইটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৫] তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ হাবীবা (কন্যা), মু'আবিয়া, 'উতবা (আবু সুফইয়ানের দুই ছেলে), 'আবদুল্লাহ ইবন 'উতবা, আবু সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ সাকাফী, সালিম ইবন সাওয়ার, আবুল জাররাহ, সাফিয়্যা বিন্‌ত শায়বা, যায়নাব বিন্‌ত উম্মু সালামা, 'উরওয়া ইবন যুবাইর, আবু সালিহ আস-সাম্মান, শাহ্‌র ইবন হাওশাব, আনবাসা, শুতাইর ইবন শাকাল, আবুল মালীহ 'আমির আল-হুজালী প্রমুখ।[২৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) অত্যন্ত শক্ত ঈমানদার মহিলা ছিলেন। তিনি যে যুগের মহিলা, সে অনুপাতে যে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন, তা ভেবে দেখলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ইসলামের আবির্ভাবকালেই তিনি স্বীয় মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা সত্যকে চিনতে পেরে আঁকড়ে ধরেন। যে কাজ সে সময়ের অনেক বড়

---

২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২০

২৪. তাবাকাত-৮/১০০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৩; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪০

২৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৯

২৬. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা-৪/৩০৬

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা করতে পারেনি, বা করতে যাদের অনেক সময় লেগেছে, তিনি সহজেই তা করতে পেরেছেন। সত্যের জন্য তিনি মা-বাবা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয় বন্ধুদের ছেড়ে দেশ-ত্যাগ করেছেন। যে স্বামীকে অবলম্বন করে সবকিছু ছাড়লেন, বিদেশ-বিভুঁইয়ে সে স্বামী তাঁকে ছেড়ে গেল। কিন্তু তিনি সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের উপর পর্বত পরিমাণ অটল থাকলেন। কী পরিমাণ বিশ্বাসের জোর থাকলে এতকিছু করা যায়। সম্ভবতঃ তাঁর এই মজবুত ঈমানের জন্যই আল্লাহ পাক পুরস্কার স্বরূপ দুনিয়াতে উম্মুল মুমিনীনের সুমহান মর্যাদা দান করেন।

মজবুত ঈমানের সাথে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসাও তাঁর অন্তরে ছিল। আল্লাহর রাসূলকে (সা) তিনি যে কত বড় ও পবিত্র বলে জানতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মুশরিক পিতাকে রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানায় বসতে না দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি পিতার মুখের উপর বলে দিলেন, আপনি মুশরিক, অপবিত্র। আমি চাইনা আপনি আল্লাহর রাসূলের (সা) বিছানায় বসে অপবিত্র করুন। এরই নাম ঈমান, এরই নাম আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীসের উপর তিনি নিজে যেমন কঠোরভাবে আমল করতেন, তেমনি অন্যদেরও আমল করার তাকীদ দিতেন। তাঁর ভাগিনা আবু সুফইয়ান ইবন সা'ঈদ ইবন আল-মুগীরা একবার দেখা করতে আসেন। তিনি ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করলেন, উম্মুল মুমিনীন বললেন, তোমার ওজু করা উচিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আগুনে পাকানো কোন জিনিস খেলে ওজু করতে হবে।[২৭]

পিতা আবু সুফইয়ানের (রা) ইনতিকালের তিনদিন পর তিনি সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে কপালে মাখেন এবং বলেন ঃ

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة اشهر وعشرا -

–আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মহিলার একমাত্র স্বামী ছাড়া কোন মৃতব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা জায়েয নেই। স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক করবে।[২৮]

একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন বারো রাক'আত নফল নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। উম্মু হাবীবা বলেন, তারপর থেকে আমি সর্বদাই তা আদায় করে থাকি। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, তাঁর ছাত্র

---

২৭. মুসনাদ-৬/৩২৬

২৮. তাবাকাত-৮/৯৯

এবং ভাই 'উতবা, উতবার ছাত্র 'আমর ইবন উওয়াইস এবং 'আমরের ছাত্র নু'মান ইবন সালিম প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ সময়কালে এ নামায সব সময় আদায় করতেন।

স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। একবার তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তুমি কি তা চাও'? বললেন, 'কেন চাইবো না। এতে ক্ষতি কি! আমি এবং আমার কোন বোনকে কোন ভালো অবস্থায় দেখতে বাধা থাকা উচিত নয়।'

আল্লামা জাহাবী তাঁর মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বংশের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন বেগমই তাঁর চেয়ে বেশী নিকটের ছিলেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন বেগমেরই মোহর তাঁর চেয়ে বেশী ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) কোন বেগমকেই তাঁর চেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করা অবস্থায় বিয়ে করেননি।[২৯]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত উম্মু হাবীবাকে (রা) বিয়ে করেন তখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ[৩০]

عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً -

(الممتحنة - ٦٠/٧)

–'যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।' (সূরা আল-মুমতাহিনা-৭)

---

২৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২১৯

৩০. আল-ইসাবা-৪/৩০৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৯

মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার (রা) পরে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনা বিনতুল হারিস আল-হিলালিয়্যাকে (রা) বিয়ে করেন। ইনিই সেই মহিলা যাঁকে রাসূল (সা) সর্বশেষ বিয়ে করেন– একথা বলেছেন ইবন সা'দ। তাঁর পিতা হারিস ইবন হায়ন এবং মাতা হিন্দা বিন্‌ত আওফ।[১]

হযরত মায়মূনা (রা) কুরাইশ গোত্রের মেয়ে। আরবের অনেক বড় নামী-দামী বংশ ও ঘরের সাথে ছিল তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাঁর এক বোন উম্মুল ফাদল লুবাবা আল-কুবরা ছিলেন হযরত 'আব্বাসের (রা) স্ত্রী। যাঁর ছয় ছেলে– ফাদল, আবদুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ, মা'বাদ, কুসাম ও আবদুর রহমান ছিলেন ইসলামের প্রসিদ্ধ সন্তান। তাঁর দ্বিতীয় বোন লুবাবা সুগরা ছিলেন হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের (রা) মা। তৃতীয় বোন বারযাহ্ ছিলেন ইয়াযীদ ইবনুল আসাম-এর মা। ৪র্থ বোন উম্মু হাফীদের নাম হুযায়লা। ইমাম মালিক (রহ) 'আল মুওয়াত্তা' গ্রন্থে বিস্তারিত এবং বুখারী ও মুসলিম একটু সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনার (রা) বাড়ী যান। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) ও হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সামনে গুঁইসাপের গোশ্‌ত উপস্থাপন করা হয়। মায়মূনা (রা) বলেন, এ গোশ্‌ত আমার বোন হুযায়লা বিন্‌ত হারিস পাঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) গুঁইসাপের গোশ্‌ত খেলেন না; কিন্তু তাঁর অনুমতিতে অন্যরা খেলেন। ইমাম তাহাবী সংকলিত একটি বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) না খাওয়ার কারণে হযরত মায়মূনাও (রা) খেলেন না।

উপরে উল্লেখিত বোনেরা সবাই ছিলেন বৈমাত্রেয়। 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিব (রা)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিন্‌ত 'উমাইস (রা) ছিলেন তাঁর বৈপিত্রেয় বোন। হযরত জা'ফরের (রা) ঔরসে 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও আওন নামের তিন ছেলে ছিল। হযরত জা'ফর (রা) মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর ঔরসে মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত আসমাকে (রা) বিয়ে করেন হযরত আলী (রা) এবং তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াহইয়া ও আওন নামের দুই ছেলে। হযরত মায়মূনার (রা) বৈপিত্রেয় আর এক বোন সালমা বিন্‌ত 'উমাইস (রা) ছিলেন হযরত হামযার (রা) স্ত্রী। তাঁর বৈপিত্রেয় আর এক বোন সালামা বিন্‌ত উমাইস। তিনি অমুসলমান থেকে যান।[২]

---

১. তাবাকাত-৮/১৩৪; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৪

২. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৫ ৪৪৬; আল-ইসতী'য়াব-৪/৪০৭

বিয়ে

হযরত মায়মূনার (রা) প্রথম বিয়ে হয় মাস'উদ ইবন 'আমর ইবন 'উমাইর আস-সাকাফীর সঙ্গে। এ বর্ণনা পাওয়া যায় তাবাকাত, যুরকানী ও অন্যান্য গ্রন্থে। তবে 'আল-ইসাবা' গ্রন্থকার ইবন হাজার তাঁর প্রথম স্বামী কে ছিলেন, সে ব্যাপারে কোন আলোচনা করেননি। শুধু এতটুকু বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) পূর্বে তিনি আবু রুহ্‌ম ইবন আবদুল 'উয্‌যার স্ত্রী ছিলেন। যা হোক, বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, মাস'উদ ইবন 'আমরের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর আবু রুহ্‌মের সাথে বিয়ে হয়। হিজরী ৭ম সনে আবু রুহমের মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সর্বশেষ বেগম। তাঁর পর আর কোন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বেগমের মর্যাদা দান করেননি।[৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত মায়মূনার (রা) বিয়ে সম্পন্ন হয় হযরত 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের (রা) অভিভাবকত্বে। রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরী ৭ম সনে 'উমরাতুল কাজা' আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েন তখন হযরত জা'ফর ইবন আবী তালিবকে (রা) বিয়ের পয়গামসহ মক্কায় অবস্থানরত হযরত মায়মূনার (রা) নিকট পাঠান। তিনি ভগ্নিপতি হযরত 'আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে (রা) উকিল নিয়োগ করেন। অনেকের ধারণা হযরত আব্বাস নিজেই রাসূলুল্লাহকে (সা) এ বিয়েতে আগ্রহী করেন।[৪]

ইবন হিশামের বর্ণনা মতে, মায়মূনা (রা) বিয়ের বিষয়টি বোন উম্মুল ফাদলের উপর ছেড়ে দেন। আর তিনি সে দায়িত্ব ছেড়ে দেন স্বামী আব্বাসের (রা) হাতে।[৫]

যাই হোক, এই 'উমরার ইহরামের অবস্থায় হিজরী ৭ম সনের জিলকা'দা মাসে পাঁচ শত মতান্তরে চারশত দিরহাম[৬] দেন-মোহরের বিনিময়ে হযরত রাসূলে কারীম (সা) হযরত মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেন।[৭] 'উমরা আদায়ের পর মদীনা ফেরার পথে মক্কা হতে ছয় থেকে বারো মাইল দূরে 'সারাফ' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। এদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আবু রাফে' হযরত মায়মূনাকে (রা) নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। এই 'সারাফে' রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য নির্মিত তাঁবুতে হযরত মায়মূনা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মিলিত হন।[৮]

ইবন 'আব্বাসের (রা) একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মায়মূনার (রা) বিয়ে হয় 'উমরা আদায়কালীন সময়ে মক্কাতে। 'উমরা উপলক্ষে তিনদিন সেখানে

---

৩. তাবাকাত-৮/১৩৫
৪. উসুদুল গাবা-৫/৫৫০; তাবাকাত-৮/১৩২, ১৩৩
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭২
৬. প্রাগুক্ত-২/৬৪৬
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৯
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৭২

অবস্থান করেন। তৃতীয় দিনে হুয়ায়তিব ইবন আবদুল 'উয্যা আরও কয়েকজন কুরাইশ ব্যক্তিকে সঙ্গে করে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে দেখা করে বলে ঃ 'হুদায়বিয়ার চুক্তি অনুযায়ী আপনার অবস্থানের মেয়াদ আজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি মক্কা ছেড়ে চলে যান।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ 'আমাকে আরও একটু সময় দিলে তোমাদের এমন কি হতো। আমি তোমাদের মধ্যে মায়মূনার সাথে মিলিত হতাম এবং তোমাদের জন্য ওলীমার খাবার তৈরী করতাম।' তারা বললো ঃ 'আপনার এ খাবারের আমাদের প্রয়োজন নেই। আপনি মক্কা ছাড়ুন।'[৯] এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তড়িঘড়ি করে মক্কা থেকে বেরিয়ে 'সারাফে' এসে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেখানে মায়মূনার (রা) সাথে বাসর করেন।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) 'উমরাতুল কাজা'র সময়কালে হযরত মায়মূনাকে (রা) বিয়ে করেন। এ ব্যাপারে সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ একমত। তবে ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে ভীষণ মতপার্তক্য রয়েছে যে, বিয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না হালাল অবস্থায়।[১০]

ইবন হাজার (রহ) এই মতপার্থক্যের সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় বিয়ে সম্পন্ন হয়, আর মিলন হয় 'উমরা আদায়ের পর হালাল অবস্থায়।[১১]

হযরত 'আয়িশা (রা) হযরত মায়মূনার (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

إنها كانت من اتقانالله وأوصلنا للرحم -

–আমাদের মধ্যে মায়মূনা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করতেন এবং সবচেয়ে বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতেন।[১২]

তিনি খুব পরিচ্ছন্ন বিশ্বাস ও শুদ্ধ ধ্যান-ধারণার মহিলা ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা-বিশ্বাসের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন, একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মান্নত মানেন যে, আল্লাহ তাকে সুস্থ করলে বায়তুল মাকদাসে গিয়ে নামায আদায় করবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এখন তিনি মান্নত পূর্ণ করতে বায়তুল মাকদাসে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি হযরত মায়মূনার (রা) নিকট বিদায় নিতে আসেন। হযরত মায়মূনা (রা) তাঁকে বুঝালেন যে, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ে সাওয়াব অন্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। সুতরাং তুমি সেখানে না গিয়ে এখানে থাক।[১৩]

---

৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৫

১০. দেখুন ঃ তাবাকাত-৮/১৩৩-১৩৬; মুসলিম (১৪১১), 'আন-নিকাহ' অধ্যায়; ইবন মাজাহ্-(১৯৬৪); আহমাদ-৬/৩৯৩; আল-মুসতাদরিক-৪/৩১;

১১. আসাহ আস-সিয়ার-৬৪৯

১২. তাবাকাত-৮/১৩৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৪

১৩. তাবাকাত-৮/১৩৯

তিনি মাঝে মধ্যে ধার-করজ করতেন। একবার একটু বেশী ধার করে ফেললেন। তাই কেউ একজন বললেন, এত ধার শোধের উপায় কি হবে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে বক্তি শোধ করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ নিজেই তা শোধ করে দেন।[১৪]

হযরত মায়মূনার (রা) মধ্যে ছিল দাস মুক্ত করার প্রবল আগ্রহ। একবার একটি দাসীকে মুক্তি দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এতে তুমি অনেক সাওয়াব অর্জন করেছো।[১৫]

শরীয়াতের আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন। এ ব্যাপারে কোন রকম নমনীয়তা তাঁর মধ্যে ছিল না। একবার তাঁর এক নিকট-আত্মীয় দেখা করতে আসে। তার মুখ দিয়ে তখন মদের গন্ধ বের হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে শক্ত ধমক দেন। তাকে আর কখনও তাঁর কাছে না আসার জন্য শক্তভাবে বলে দেন।[১৬]

হযরত মায়মূনার (রা) একজন দাসী একবার হযরত ইবন আব্বাসের (রা) বাড়ীতে যেয়ে দেখেন, তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর বিছানা বেশ দূরে দূরে। দাসী মনে করলেন সম্ভবতঃ মিয়া-বিবির মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, না, তা নয়; বরং স্ত্রীর মাসিকের সময় ইবন আব্বাস (রা) পৃথক বিছানায় চলে যান। দাসী ফিরে এসে সব কথা উম্মুল মুমিনীন মায়মূনাকে (রা) জানিয়ে দিলেন। তিনি দাসীকে বললেন, যাও, তাকে বল, রাসূলুল্লাহর (সা) রীতি-পদ্ধতির প্রতি এত উপেক্ষা কেন? তিনি তো সব সময় আমাদের বিছানায় আরাম করতেন।[১৭]

একবার হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) খালা হযরত মায়মূনার (রা) সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত দেখে খালা প্রশ্ন করেন, বেটা, তোমার এ অবস্থা কেন? ইবন আব্বাস বললেন, উম্মু 'আম্মারের বর্তমানে মাসিক অবস্থা চলছে। সেই আমার কেশ পরিপাটি করে থাকে। হযরত মায়মূনা বললেন, বাহ্, খুব ভালো! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যখন আমরা সেই বিশেষ অবস্থায় থাকতাম। সে অবস্থায় মাদুর উঠিয়ে আমরা মসজিদে রেখে আসতাম। বেটা! হাতে কি কিছু থাকে?[১৮]

হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪৬টি, মতান্তরে ৭৬টি। তার মধ্যে সাতটি মুত্তাফাক আলাইহি। একটি বুখারী ও পাঁচটি মুসলিম স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্যগুলি হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীসের মাধ্যমে শরীয়াতের গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

হযরত মায়মূনার (রা) নিকট থেকে যাঁরা হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ

---

১৪. প্রাগুক্ত-৮/১৪০
১৫. মুসনাদ-৬/৩৩২
১৬. তাবাকাত-৮/১৩৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৪
১৭. কানযুল 'উম্মাল-৫/১৩৮; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৯৭; আল-ইসাবা-৪/৪১২
১৮. মুসনাদ-৬/৩৩১

হযরত ইবন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, আবদুর রহমান ইবনুস সায়িব, ইয়াযীদ ইবন আসাম, (তাঁরা সবাই তাঁর বোনের ছেলে) 'উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী, নাদবা (দাসী), আতা ইবন ইয়াসার, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, ইবরাহীম ইবন আবদুল্লাহ ইবন মা'বাদ ইবন 'আব্বাস, কুরাইব, 'উবায়দা ইবন সিবাক, 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা, আলীয়া বিন্ত সুবায় প্রমুখ।[১৯]

হযরত মায়মূনার (রা) মৃত্যুসন নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। বিভিন্ন বর্ণনায় হিজরী ৫১, ৬১, ৬৩ ও ৬৬ সনের কথা এসেছে। তবে ইবন হাজারসহ অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ হিজরী ৫১ সনের মতটি সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২০] তাঁর জীবনের এটাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে, একদিন যে 'সারাফ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে প্রথম মিলিত হন, তার প্রায় ৪৪ বছর পর সেখানেই ইনতিকাল করেন। যে স্থানটিতে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বাসর করেন, ঠিক সেখানেই সমাহিত হন।[২১]

এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় যান। হজ্জ শেষে সেখানেই ইনতিকাল করেন। হযরত ইবন আব্বাসের (রা) নির্দেশে মরদেহ কাঁধে করে 'সারাফে' আনা হয় এবং সেখানে দাফন করা হয়।[২২]

হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) জানাযার নামায পড়ান। ইবন 'আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইবন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবনুল হাদ, আবদুল্লাহ ইবনুল খাওলানী ও ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম লাশ কবরে নামান। যখন লাশটি খাটিয়ায় করে উঠানো হয় তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা) লোকদের বলেন, 'সাবধান! রাসূলুল্লাহর (সা) বেগম। বেশী ঝাঁকি দিবে না। আদবের সাথে নিয়ে চলো। কারণ, তিনি তোমাদের মা।'[২৩]

---

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৯
২০. প্রাগুক্ত-২/২৪৫; আল-ইসাবা-৪/৪১৩
২১. মুসনাদ-৬/৩৩৩; বুখারী-২/৬১১
২২. তাবাকাত-৮/১৪০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৫
২৩. তাবাকাত-৮/১৪০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৭।

সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইবন আখতাব (রা)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইবন আখতাব ছিলেন লাবী ইবন ইয়াকুব-এর বংশধারায় হযরত হারূন ইবন 'ইমরান আলাইহিস সালামের বংশধর। এ কারণে তাঁকে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায় ইসরাঈলিয়্যা বলা হয়। তাঁর পিতা হুয়ায় ইবন আখতাব মদীনার বিখ্যাত ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের এবং মাতা 'বার্‌রা' বিন্‌ত সামাওয়াল ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজার সন্তান।[১]

মূলতঃ হযরত সাফিয়্যার (রা) আসল নাম যায়নাব। যেহেতু তিনি খায়বার যুদ্ধের গনীমাতের মাল হিসেবে মুসলমানদের অধিকারে আসেন এবং বণ্টনের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) ভাগে পড়েন, আর তৎকালীন আরবে নেতা অথবা বাদশার অংশের গনীমাতের মালকে 'সাফিয়্যা' বলা হতো, তাই যায়নাবও সেখান থেকে 'সাফিয়্যা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান এবং তাঁর আসল নামটি হারিয়ে যায়। *'সিয়ারুস সাহাবিয়াত'* গ্রন্থকার যুরকানীর সূত্রে একথা বলেছেন।[২]

হযরত সাফিয়্যার (রা) পিতা ও নানা উভয়ে নিজ নিজ খান্দানের অতি সম্মানীয় নেতা ছিলেন। অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের দুইটি খান্দান– বনু কুরাইজা ও বনু নাদীর অন্যসব আরবীয় ইহুদী খান্দানের চেয়ে বেশী সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতো। তাঁর পিতা হুয়ায় ইবন আখতাবকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। গোত্রের প্রতিটি সদস্য তাঁর হুকুম ও নেতৃত্ব বিনা প্রশ্নে মেনে নিত। নানা সামাওয়াল গোটা আরব উপদ্বীপে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোটকথা, হযরত সাফিয়্যা (রা) পিতৃ ও মাতৃকূলের দিক দিয়ে দারুণ কৌলিন্যের অধিকারিণী ছিলেন।[৩]

বিয়ে

বনু কুরাইজার সালাম ইবন মাশ্‌কাম ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি ও নেতা। তাঁর সাথে হযরত সাফিয়্যার (রা) প্রথম বিয়ে হয়। এ বিয়ে টেকেনি। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর হিজাযের বিখ্যাত সওদাগর ও খায়বারের অন্যতম নেতা আবু রাফে'-এর ভাতিজা কিনানা ইবন আবিল হুকাইক-এর সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কিনানা সালামের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। তিনি খায়বারের অতি প্রসিদ্ধ দুর্গ 'আল-কামূসে'র নেতা এবং বড় কবি ছিলেন।[৪] পরিবার-পরিজনসহ এই দুর্গেই বসবাস করতেন। এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে খায়বার যখন মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং

---

১. তাবাকাত-৮/১২৪; আল-ইসতী'য়াব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা) ৪/৩৪৬
২. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-৮১
৩. সাহাবিয়াত-১০২
৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩১

'আল-কামূস' দুর্গের পতন ঘটে তখন দুর্গের অভ্যন্তরেই হযরত সাফিয়্যার (রা) স্বামী কিনানা নিহত হন এবং সাফিয়্যাসহ তাঁর পরিবারের অন্যসব সদস্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁদের মধ্যে সাফিয়্যার (রা) দুইজন চাচাতো বোনও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেছেন, সাফিয়্যা (রা) ছিলেন কিনানার তরুণী স্ত্রী। মাত্র কিছুদিন আগেই তাঁদের বিয়ে হয়েছিল।[৫]

এ যুদ্ধ খায়বারের ইহুদীদের জন্য এত বিপর্যয়কর ছিল যে, তাদের সকল আশা-ভরসা কর্পূরের মত উড়ে যায় এবং ভবিষ্যতে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবার সকল যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ যুদ্ধে তাদের সকল নামী-দামী-নেতা নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যার (রা) পিতা ও ভাইও ছিলেন। এ কারণে তিনি সকল যুদ্ধ বন্দীর মধ্যে অধিকতর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিলেন।

নিয়ম অনুযায়ী যখন 'মালে গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও দাস-দাসী) মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টনের প্রস্তুতি চললো এবং এ উদ্দেশ্যে সকল বন্দীকে একত্র করা হলো, তখন দাহইয়াতুল কালবী রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর একটি দাসীর প্রয়োজনের কথা জানালেন। রাসূল (সা) তাঁকে বন্দী মেয়েদের মধ্য থেকে পসন্দ করার অনুমতি দিলেন। দাহইয়া (রা) সাফিয়্যাকে (রা) পছন্দ করলেন। যেহেতু মান-মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত সাফিয়্যা (রা) দাহইয়ার (রা) চেয়েও উঁচু স্তরের ছিলেন, এ কারণে সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ. 'সাফিয়্যা (রা) বনু নাদীর ও বনু কুরাইজার নেত্রী। সে আপনারই উপযুক্ত।' রাসূল (সা) এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সাফিয়্যাসহ দাহইয়া কালবীকে ডেকে আনালেন। তিনি দাহইয়াকে অন্য একটি দাসী পছন্দ করতে বলে সাফিয়্যাকে (রা) নিজের কাছে রেখে দিলেন। পরে তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করেন।[৬] সহীহ বুখারীতে এসেছে দাসত্ব থেকে মুক্তিই তাঁর মোহর ধার্য হয়।

عِتْقَهَا صَدَاقَهَا -[৭]

ইমাম শাফি'ঈ 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে আল-ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দাহইয়া কালবীকে সাফিয়্যার (রা) পরিবর্তে তাঁর স্বামী কিনানার বোনকে দান করেন। ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) তাঁকে সাফিয়্যার (রা) চাচাতো বোনকে দান করেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূল (সা) সাতজন বন্দীর বিনিময়ে দাহইয়ার নিকট থেকে সাফিয়্যাকে (রা) খরীদ করেন।[৮] আল্লামা যুরকানী বলেন, খরীদ

---

৫. আসাহ আস-সিয়ার-২৩৭

৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৯০; মুসলিম-১/৫৪৬

৭. বুখারী-৭/৩৬০, বাবু গুযওয়াতু খায়বার; ৯/১১১-আন-নিকাহ : বাবু মান জা'আলা 'ইতকাল আমাতি সুদাকাহা; ৯/২০৫-বাবুল ওয়ালীমা; মুসলিম-(১৩৬৫, ৮৫) আন-নিকাহ; আবু দাউদ-(২০৫৪); তিরমিযী-(১১১৫); নাসা'ঈ-৬/১১৪

৮. তাবাকাত-৮/১২২; মুসলিম (১৩৬৫), (৮৭)-আন-নিকাহ; আবু দাউদ-(২৯৯৭)-আল-খারাজ ওয়া আল-ইমারাহ্

করা কথাটি আসল অর্থে নয়।[৯]

এ হিজরী ৭ম সনের ঘটনা। বুখারীর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) খায়বার অভিযান শেষ করে মদীনায় ফেরার পথে 'সাহ্‌বা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে হযরত আনাসের (রা) মা হযরত উম্মু সুলাইম (রা) সাফিয়্যার (রা) মাথায় চিরুনী করেন, কাপড় পাল্টান এবং তাঁর দেহে সুগন্ধি লাগান। তারপর তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পাঠান। সেখানে বাসর হয় এবং সেখানে ওলীমাও হয়। কেউ খেজুর, কেউ চর্বি, কেউ হাইস অর্থাৎ যার কাছে খাবার যা কিছু ছিল নিয়ে এলো। সব যখন একত্র হলো তখন সবাই এক সাথে বসে আহার করেন। মূলতঃ এটাই ছিল ওলীমা। এই ওলীমার কথা সহীহাইনে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১০] এই 'সাহবা'তে রাসূল (সা) সাফিয়্যার (রা) সাথে তিন দিন কাটান। প্রথম বাসর রাতে হযরত আবু আইউব আল-আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অজান্তে কোষমুক্ত তরবারি হাতে সারা রাত রাসূলুল্লাহর (সা) তাঁবুর দরজায় পাহারা দেন। সকালে রাসূল (সা) তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, এই মহিলার পিতা, স্বামী, ভাইসহ সকল নিকটআত্মীয় নিহত হয়েছে। তাই আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, কোন খারাপ কিছু করে না বসে। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) একটু হেসে দেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন।[১১]

'সাহ্‌বা' থেকে যখন সাফিয়্যাকে (রা) নিজের উটের উপর বসিয়ে যাত্রা করেন তখন লোকেরা বুঝতে পারছিল না যে, রাসূল (সা) তাঁকে বেগমের মর্যাদা দান করেছেন, না দাসী হিসেবে নিজের মালিকানায় রেখেছেন। রাসূল (সা) মানুষের এ মনোভাব বুঝতে পেরে একটি পর্দা টানিয়ে সাফিয়্যাকে (রা) মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যান। মূলতঃ এ পর্দা দ্বারা একথা জানিয়ে দেন যে, সাফিয়্যা (রা) দাসী নন; বরং তিনি পবিত্র বেগমের মর্যাদা লাভ করেছেন।[১২] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (সা) স্বীয় 'আবা' দ্বারা পর্দা করেন। 'সাহবা' থেকে চলার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাফিয়্যার (রা) বাহন উটটি হোঁচট খায়। তাতে পিঠের আরোহীদ্বয় ছিটকে পড়ে যান। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে অক্ষত রাখেন। পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে হযরত আবু তালহা (রা) তাঁর বাহনের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে ছুটে যেয়ে বলেন ঃ ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! আপনি কষ্ট পেয়েছেন কি? তিনি জবাব দেন ঃ 'না। তুমি মহিলাকে দেখ।' সাথে সাথে আবু তালহা কাপড় দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে দিয়ে হযরত সাফিয়্যার (রা) দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর উপর একখানি কাপড় ছুড়ে দেন। সাফিয়্যা (রা) উঠে দাঁড়ান। আবু তালহা নিজের উটটি প্রস্তুত করেন এবং তার উপর রাসূল (সা) সাফিয়্যাকে (রা) নিয়ে আরোহন করেন।[১৩]

---

৯. আসাহ আস-সিয়ার-৬৪৬

১০. মুসলিম ঃ (১৩৬৫,৮৭); সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৫

১১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৩; কানযুল 'উম্মাল-৭/১১৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪০

১২. আল-বিদায়া-৪/১৯৬; তাবাকাত-৮/১২৩

১৩. বুখারী-৬/১৩৪; মুসলিম-(১৩৬৫,৮৭); সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৬

'সাহবা' থেকে যাত্রার সময় রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটুর উপর হযরত সাফিয়্যা (রা) পা রেখে উটের পিঠে আরোহন করেন।[১৪]

হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ সাফিয়্যাকে (রা) যখন রাসূলুল্লাহর (রা) তাঁবুতে ঢোকানো হলো, আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। রাসূল (সা) বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মায়ের কাছ থেকে ওঠো।' সন্ধ্যায় আমরা আবার গেলাম। রাসূল (সা) আমাদের কাছে আসলেন। তখন তাঁর চাদরের মধ্যে দেড় 'মুদ' পরিমাণ 'আজওয়া' খেজুর ছিল। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা তোমাদের মায়ের ওলীমা খাও।'[১৫]

মদীনা পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সাফিয়্যাকে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হারিস ইবন নু'মানের (রা) বাড়ীতে উঠালেন। হযরত হারিস (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) একজন জান-কোরবান সাহাবী। আল্লাহ তাঁকে অঢেল অর্থও দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজনের কথাও সব সময় স্মরণ রাখতেন। প্রয়োজনের সময় দ্রুত এগিয়ে আসতেন। হযরত সাফিয়্যাকেও তিনি সানন্দে থাকার জন্য ঘর ছেড়ে দেন। উম্মু সিনান সালমিয়্যার বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত সাফিয়্যার (রা) রূপ ও সৌন্দর্যের কথা শুনে আনসার মহিলাদের সাথে হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশ, হযরত হাফসা, হযরত 'আয়িশা ও হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) তাঁকে দেখতে এই ঘরে আসেন। 'আতা ইবন ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আনসার মেয়েদের সাথে হযরত 'আয়িশাও (রা) মুখে নিকাব টেনে সাফিয়্যাকে দেখতে আসেন। ফেরার সময় রাসূল (সা) তাঁর পিছনে পিছনে যান এবং প্রশ্ন করেন।

–আয়িশা! তাঁকে কেমন দেখলে?'

–আয়িশা (রা) বললেন ঃ দেখেছি, সে তো এক ইহুদী নারী। রাসূল (সা) বললেন ঃ এমন বলো না। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একজন ভালো মুসলমান হয়েছে।[১৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন খুবই দৃঢ় চিত্তের মহিলা। জীবনে কখনও অধৈর্য্য হয়েছেন এমন কথা জানা যায় না। আল-কামূস দুর্গের পতন ঘটলে এবং গোটা খায়বারে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে হযরত বিলাল (রা) সাফিয়্যা (রা) ও তাঁর চাচাতো বোনদের সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতে থাকেন। ইহুদীদের লাশের পাশ দিয়েই তাঁরা চলছিলেন। সাধারণতঃ এরূপ পরিস্থিতি খুবই মর্মস্পর্শী হয়। অত্যন্ত শক্ত মনের মানুষের অন্তরও কেঁপে ওঠে। এ কারণে তাঁর সাথের মহিলারা এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে। তাঁরা মাথার চুল ছিঁড়ে মাতম করতে থাকে। কিন্তু হযরত সাফিয়্যার (রা) অবস্থা দেখুন। প্রিয় স্বামীর লাশের পাশ দিয়ে বন্দী অবস্থায় চলছেন, তিনি একটুও বিচলিত নন। কোন রকম ভাবান্তর নেই। দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি

---

১৪. আল-বিদায়া-৪/১৯৬

১৫. মুসনাদ-৩/৩৩৩; তাবাকাত-৮/১২৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৬

১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৭, তাবাকাত-৮/১২৫, ১২৬

হেঁটে চলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) পরে এভাবে তাঁদের বাপ-ভায়ের লাশের পাশ দিয়ে আনার জন্য বিলালকে (রা) তিরস্কার করেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি হযরত সাফিয়্যার ছিল অন্তহীন ভালোবাসা। রাসূল (সা) যখন হযরত 'আয়িশার (রা) গৃহে অন্তিম রোগশয্যায় তখন একদিন সাফিয়্যা (রা) সহ অন্য বিবিগণ স্বামীকে দেখতে ও সেবা করতে একত্র হয়েছেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) এক সময় অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহর নবী! আপনার এইসব কষ্ট যদি আমিই ভোগ করতাম, খুশী হতাম।' তাঁর এমন কথা শুনে অন্য বিবিগণ একে অপরের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন, তাঁর কথায় তাঁরা সন্দেহ করছেন। তখন রাসূল (সা) বললেন, 'আল্লাহর কসম! সে সত্য বলেছে।'[১৮]

হযরত সাফিয়্যার (রা) প্রতি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ভালোবাসার অবস্থা ঠিক একই রকম ছিল। সাফিয়্যার (রা) সঙ্গ তিনি পছন্দ করতেন এবং সব সময় তাঁকে খুশী রাখার চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সাফিয়্যাসহ অন্য বেগমগণকে সংগে নিয়ে হজ্জের সফরে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে সাফিয়্যার (রা) বাহন উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ে। সাফিয়্যা (রা) ভয় পেয়ে যান এবং কান্না শুরু করে দেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং নিজের পবিত্র হাতে তাঁর চোখের পানি মুছে দেন। কিন্তু এতেও তাঁর কান্না না থেমে আরও বেড়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে রাসূল (সা) সকলকে নিয়ে সেখানে যাত্রাবিরতি করেন। সন্ধ্যার সময় রাসূল (সা) স্ত্রী হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশকে (রা) বলেন, 'যায়নাব, তুমি সাফিয়্যাকে একটি উট দিয়ে দাও।' হযরত যায়নাব (রা) বললেন, 'আমি উট দিব আপনার এই ইহুদী মহিলাকে?' তাঁর এমন প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) ভীষণ নাখোশ হন এবং দুই অথবা তিন মাস যাবত হযরত যায়নাবের (রা) সাথে কথা বলা এবং কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে হযরত 'আয়িশার (রা) মধ্যস্থতায় অতি কষ্টে রাসূলুল্লাহর (সা) এ অসন্তুষ্টি তিনি দূর করান।[১৯]

আর একবার হযরত 'আয়িশা (রা) হযরত সাফিয়্যার (রা) দৈহিক গঠন সম্পর্কে একটি মন্তব্য করলে রাসূল (সা) বলেন, তুমি এমন একটি কথা বলেছো, যদি তা সাগরেও ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে মিশে যাবে। অর্থাৎ সাগরের পানিও ঘোলা করে ফেলবে।[২০]

ইসলাম গ্রহণ করে পবিত্র হওয়ার পর তাঁকে কেউ ইহুদী বলে কটাক্ষ করলে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'আয়িশা (রা) ও যায়নাব (রা) দাবী করে যে, তাঁরা অন্য বেগমগণের চেয়ে উত্তম। কারণ, তাঁরা আপনার বেগম হওয়া ছাড়াও চাচাতো বোন।'

---

১৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৬; উসুদুল গাবা-৫/৪৯০
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা-২/২৩৫; আল-ইসাবা-৪/৩৪৬
১৯. মুসনাদ-৬/৩৩৭, ৩৩৮; তাবাকাত-৮/১২৬, ১২৭; উসুদুল গাবা-৫/৪৯২
২০. আবু দাউদ-২/১৯৩

রাসূল (সা) তাঁকে খুশী করার জন্য বলেন, তুমি তাদেরকে একথা কেন বললে না যে, আমার বাবা হারূন (আ), আমার চাচা মূসা (আ) এবং আমার স্বামী মুহাম্মাদ (সা)। এ কারণে তোমরা আমার চেয়ে ভালো হতে পার কিভাবে।'[২১]

হযরত সাফিয়্যা (রা) স্বভাবগতভাবেই ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। ইবন সা'দ লিখেছেন, যে ঘরখানিতে তিনি বসবাস করতেন জীবদ্দশায় তা দান করে গিয়েছিলেন। আল্লামা যুরকানীর বর্ণনায় জানা যায়, উম্মুল মুমিনীন হিসেবে মদীনায় আসার পর তিনি নিজের কানের সোনার দুইটি দুল হযরত ফাতিমা (রা) ও অন্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাতের মধ্যে ভাগ করে দেন।[২২]

হিজরী দশ সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে হযরত সাফিয়্যা হজ্জ করেন। এ ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জ।

হিজরী ৩৫ সনে বিদ্রোহীরা তৃতীয় খলীফা হযরত 'উসমানকে (রা) মদীনায় তাঁর গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। সে সময় হযরত সাফিয়্যা (রা) খলীফার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বিদ্রোহীরা যখন খলীফার গৃহে বাইরের সকল সরবরাহ ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, তাঁর গৃহের চতুর্দিকে পাহারা বসায়, তখন একদিন হযরত সাফিয়্যা (রা) খচ্চরের উপর চড়ে খলীফার গৃহের দিকে যেতে থাকেন। সংগে দাস ছিল। তিনি আশতার নাখ'ঈর দৃষ্টিতে পড়ে যান। আশতার তাঁর চলায় বাধা দিয়ে খচ্চরটিকে মারতে শুরু করে। হযরত সাফিয়্যা (রা) বললেন, আমার লাঞ্ছিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি ফিরে যাচ্ছি। তুমি আমার গাধা ছেড়ে দাও। এভাবে গৃহে ফিরে এসে হযরত ইমাম হাসানকে (আ) খলীফার গৃহের সাথে যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যার (রা) গৃহ থেকে খাবার ও পানি খলীফার বাসগৃহে পৌঁছে দিতেন।[২৩]

খলীফা উমার (রা) যখন ভাতার প্রচলন করেন তখন রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বেগমদের প্রত্যেকের জন্য বারো হাজার নির্ধারণ করলেও হযরত জুওয়াইরিয়া ও হযরত সাফিয়্যার (রা) জন্য ছয় হাজার নির্ধারণ করেন। কারণ তাঁদের জীবনের একাংশ দাসত্বে কেটেছে। কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদ করায় বারো হাজার নির্ধারণ করা হয়।[২৪]

---

২১. আল-ইসতী'য়াব-৪/৩৪৬; তিরমিযী-(৩৮৯২)-আল-মানাকিব; আল-মুসতাদরিক-৪/২৯
হাদীসটির ভাব ও বিষয়ের ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। হতে পারে রাসূল (সা) এমন কথা বলেছিলেন। ইবন সা'দ, ইবন হাজার প্রমুখ সীরাত বিশেষজ্ঞ তাঁদের রচনাবলীতে এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। তবে হাদীসটির সনদের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযীর মত হলো ঃ
–এ একটি 'গারীব' হাদীস। একমাত্র হাশিম কূফী ছাড়া আর কারও মাধ্যমে হাদীসটি আমরা পাই না। আর সনদটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।
এই হাশিম সূফী সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের ধারণা তেমন ভালো না।
কিন্তু ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী ভিন্ন সনদে হযরত আনাস থেকে একই মর্মের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সনদ সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। (মুসনাদ-৩/১৩৫, ১৩৬; তিরমিযী-৩৮৯৪)

২২. তাবাকাত-৮/১২৭; শারহুল মাওয়াহিব-৩/২৯৬

২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৭; আল-ইসাবা-৪/৩৪৭; তাবাকাত-৮/১২৯

২৪. হায়াতুস সাহাবা-২/২১৬, ২১৮

সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ হযরত সাফিয়্যার (রা) নৈতিক গুণাবলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইবন 'আবদিল বার লিখেছেন ঃ

كانت صفية حليمة عاقلة فاضلةً -

–'সাফিয়্যা (রা) ছিলেন ধৈর্য্যশীলা, বুদ্ধিমতি ও বিদূষী নারী।'[২৫]

ইবনুল আসীর বলেছেন ঃ

كانت عاقلة من عقلاء النساء -

–'তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতি মহিলা।'[২৬]

আল্লামা জাহাবী বলেছেন ঃ

كانت شريفة عاقلة ، ذات حسب وجمال ودين، رضى الله عنه،

–'হযরত সাফিয়্যা (রা) ছিলেন ভদ্র, বুদ্ধিমতি, উঁচু বংশীয়া, রূপবতী ও দ্বীনদার মহিলা।'[২৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য বেগমগণের মত হযরত সাফিয়্যা (রা)ও ছিলেন ইলম ও মারিফাতের কেন্দ্র। প্রায়ই লোকেরা তার কাছে বিভিন্ন বিষয় প্রশ্ন করতো এবং তারা জবাব পেয়ে তুষ্ট হতো। সুহায়রা বিন্‌ত হায়কার নাম্নী এক মহিলা একবার হজ্জ আদায় করে হযরত সাফিয়্যার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করতে মদীনায় আসেন। তিনি হযরত সাফিয়্যার (রা) গৃহে যখন যান তখন দেখতে পান, সেখানে কূফার বহু মহিলা বসে আছেন এবং তাঁকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করছেন। আর তিনি খুব সুন্দরভাবে তাঁদের জবাব দিচ্ছেন।

সুহায়রাও একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তিনি কূফার মহিলাদের মাধ্যমে 'নাবীজ'-এর হুকুম সম্পর্কে জানতে চান। প্রশ্নটি শুনে হযরত সাফিয়্যা (রা) বলেন, ইরাকীরা এই মাসয়ালাটি প্রায় জিজ্ঞেস করে থাকে।[২৮]

হযরত সাফিয়্যা (রা) থেকে দশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি ইমাম যায়নুল আবেদীন, ইসহাক ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন হারিস, মুসলিম ইবন সাফওয়ান, কিনানা, ইয়াযীদ ইবন মু'আত্তাব প্রমুখ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। দশটির মধ্যে একটি হাদীস মুত্তাফাক আলাইহি।[২৯]

হিজরী ৫০ সনের রমজান মাসে ৬০ বছর বয়সে হযরত সাফিয়্যা (রা) মদীনায় ইনতিকাল করেন। হযরত সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মতান্তরে হযরত মু'আবিয়া (রা) নামায পড়ান, তখন তিনি হজ্জ আদায় করে মদীনায়

---

২৫. আল-ইসতীয়াব-৪/৩৪৮
২৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৯০
২৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩২
২৮. মুসনাদ-৩/৩৩৭
২৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৮; আল-ইসাবা-৪/৩৪৭

ছিলেন।[৩০] আল-বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়।[৩১] মৃত্যুর পূর্বে অসীয়াত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে আমার ভাগ্নে।[৩২]

ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে লিখেছেন, তিনি এক লাখ দিরহাম রেখে যান। ইবন হিশাম তিরিশ হাজারের কথা বলেছেন। হযরত সাফিয়্যার (রা) ভাগ্নে ছিল ইহুদী। এ কারণে লোকেরা তাঁর অসীয়াত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দ্বিধা-সংকোচ করতে থাকে। কিন্তু হযরত 'আয়িশার (রা) কানে কথাটি গেলে তিনি লোক মারফত বলে পাঠান 'লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা সাফিয়্যার (রা) অসীয়াত বাস্তবায়ন কর।' অবশেষে তা বাস্তবায়িত হয়।[৩৩]

ইবন সা'দ আল-ওয়াকিদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সাফিয়্যা বলেছেন ঃ যখন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসি তখন আমার বয়স সতেরো বছর পূর্ণ হয়নি।[৩৪] আল ওয়াকিদী আরও বলেছেন, তিনি হিজরী ৫২ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁর অপর একটি বর্ণনায় হিজরী ৫০ সনের কথা এসেছে। ইবন হাজার ৫০ সনের বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক বলে মনে করেছেন। ইবন মুন্দাহ্ ও ইবন হিব্বান হিজরী ৩৬ সনে তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু ইবন হাজার বলেছেন, এ সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হিজরী ৩৬ সনে 'আলী ইবন হুসাইনের (রা) জন্মই হয়নি। অথচ বুখারী ও মুসলিমে হযরত সাফিয়্যা (রা) থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।[৩৫]

হযরত সাফিয়্যা (রা) খুব সুন্দর খাবার তৈরী করতে পারতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অন্য বেগমদের ঘরে অবস্থান করতেন, তখনও মাঝে মাঝে খাবার তৈরী করে পাঠাতেন। হযরত 'আয়িশার (রা) ঘরে রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থানের সময় একবার তিনি খাবার পাঠিয়েছিলেন, তার বর্ণনা বুখারী, নাসাঈসহ বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে।

একবার হযরত সাফিয়্যা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ছাড়া আপনার অন্য সব বেগমদেরই আত্মীয় স্বজন আছে। আপনার যদি কোন কিছু হয়ে যায়, আমি কোথায় আশ্রয় নিব? রাসূল (সা) বলেন, 'আলীর (সা) নিকট।[৩৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রমজানের শেষ দশদিনের ই'তিকাফে মসজিদে অবস্থান করছেন। সে সময় একদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করতে মসজিদে যান। কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে

---

৩০. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৪
৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৮
৩২. যুরকানী-৩/২৯৬; সাহাবিয়াত-১০৫
৩৩. তাবাকাত-৮/১২৮
৩৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৭; তাবাকাত-৮/১২৯
৩৫. ফাতহুল বারী-৪/২৪০
৩৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৪। ইমাম যাহ্-জাহাবী হাদীসটি 'গারীব' বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী 'আত-তারীখ আল-কাবীর' (৭/৩১১) গ্রন্থে এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী 'মালিক' সম্পর্কে বলেছেন, তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি। এ হাদীস ছাড়া অন্য কোথাও তাঁর নাম পাওয়া যায় না।

কথা বলার পর ঘরে ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ান। রাসূল (সা) উম্মু সালামার দরজার কাছে মসজিদের দরজা পর্যন্ত তাঁর সাথে আসেন। তখন সেই পথে আনসারদের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহকে (সা) সালাম করলো। রাসূল (সা) তাঁদের দুইজনকে বললেন ঃ তোমরা একটু থাম, এ হচ্ছে সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়ায়। এ কথা শুনে তারা– সুবহানাল্লাহ পাঠ করলো, ও তাকবীর ধ্বনি দিল। অতঃপর নবী (সা) বললেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের রক্ত চলাচলের প্রতিটি শিরা উপশিরায় পৌঁছতে পারে। আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম, সে তোমাদের দুইজনের অন্তরে খারাপ কিছু ঢুকিয়ে না দেয়।[৩৭]

হযরত সাফিয়্যার (রা) এক দাসী একবার খলীফা হযরত 'উমারের (রা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, এখনও তাঁর মধ্যে ইহুদী-ভাব বিদ্যমান। কারণ, তিনি এখনও শনিবারকে মানেন এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন। দাসীর কথার সত্যতা যাচায়ের জন্য হযরত 'উমার (রা) লোক মারফত হযরত সাফিয়্যাকে (রা) অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেন, 'যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের পরিবর্তে জুমআকে দান করেছেন, তখন থেকে শনিবারকে মানার কোন প্রয়োজন নেই। আর ইহুদীদের সাথে আমার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার দিকে আমার দৃষ্টি রাখতে হয়।' তারপর তিনি দাসীকে ডেকে জানতে চান, এ অভিযোগ করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছে? দাসী বললেন, শয়তান। হযরত সাফিয়্যা (রা) চুপ হয়ে যান এবং দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।[৩৮]

রাসূলুল্লাহর সাথে বিয়ের পূর্বে হযরত সাফিয়্যা এক রাতে স্বপ্ন দেখেন যে, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর কোলে পড়ছে। স্বপ্নের কথা তাঁর মাকে মতান্তরে স্বামীকে বললে তিনি গালে এক থাপ্পড় মেরে বলেন, তুমি আরবের বাদশা মুহাম্মাদের দিকে ঘাড় লম্বা করছো। রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসার সময় পর্যন্ত সেই থাপ্পড়ের দাগ তাঁর গালে ছিল। রাসূল (সা) কিসের দাগ জানতে চাইলে তিনি ঘটনাটি খুলে বলেন।[৩৯]

---

৩৭. মুসলিম (২১৭৫)-বাবুস সালাম।

৩৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৩৩; আল-ইসতীয়াব-৪/৩৪৮

৩৯. প্রাগুক্ত; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৩৬; আল-ইসাবা-৪/৩৪৭; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৩

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-ইমাম আজ-জাহাবী ঃ

(ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নু'বালা, (বৈরুত, আল-মুওয়াস্‌সাতুর রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০)

(খ) তাজকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, (বৈরুত, দারু ইহ্‌ইয়া আত-তুরাস আল-ইসলামী)

(গ) তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো, মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৬৭ হিঃ)

২. ইবন হাজার ঃ

(ক) তাহজীবুত তাহজীব, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩২৫ হিঃ)

(খ) তাকরীবুত তাহজীব, (লাখ্‌নৌ)

(গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, (বৈরুত, দার আল-ফিক্‌র, ১৯৭৮)

(ঘ) লিসানুল মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হিঃ)

(ঙ) ফাতহুল বারী, (মিসর, ১৩১৯ হিঃ)

৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী ঃ শাজারাতুজ জাহাব, (বৈরুত, আল-মাকতাব আত-তিজারী)

৪. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মুযী ঃ তাহজীব আল-কামাল ফী আসমা আর-রিজাল, (বৈরুত, মুওয়াসসাতুর রিসালা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮)

৫. আবু ইউসুফ ঃ কিতাবুল খারাজ, (বৈরুত, দার আল-মা'রিফা, ১৯৭৯)

৬. ইবন কাসীর ঃ

(ক) আত-তাফসীর, (মিসর, দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা)

(খ) আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা)

(গ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত, মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ)

৭. ইবনুল জাওযী ঃ

(ক) আ'লাম আল-মুওয়াক্কি'ঈন, (দিল্লী, আলরাফুল মাতাবি', ১৩১৩ হিঃ)

(খ) কিতাবুত তানবীহ ওয়াল ইশরাফ, (মিসর, মাতবা'য়াতুল হাসানিয়্যা ১২২৩ হিঃ)

(গ) কিতাবুল আজকিয়া, (সম্পাদনা ঃ আবদুর রহমান ইবন আলী, ১৩০৪ হিঃ)

(ঘ) সিফাতুস্ সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১৩৫৭ হিঃ)

৮. ইবন সা'দ ঃ আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরুত, দারু সাদির)

৯. ইবন আসাকির ঃ আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম, মাতবায়াতুশ শাম, ১৩২৯ হিঃ)

১০. ইয়াকূত আল-হামাবী ঃ মু'জামুল বুলদান, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)

১১. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী ঃ কিতাবুল আগানী, (মিসর, ১৯২৯)

১২. ইবন হাযাম ঃ জামহারাতু আনসাবুল 'আরাব, (মক্কা, দারুল মা'আরিফ ১৯৬২)

১৩. ইবন খাল্লিকান ঃ ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর, মাকতাবাতু আন-নাহদাতুল মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১৪. মুহাম্মাদ আল-আলুসী ঃ বুলুগুল আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আবাব, (১৩১৪ হিঃ)

১৫. ইবনুল আসীর ঃ

(ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরুত, দারু ইহইয়া আত-তুরাস আল-আরাবী)
(খ) আল-তামিল ফিত তারীখ, (বৈরুত)
(গ) তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদ, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, ১ম সংস্করণ, ১৩১৫)

১৬. আল-বালাজুরী ঃ
(ক) আনসাবুল আশরাফ, (মিসর, দারুল মা'য়ারিফ)
(খ) ফুতুহুল বুলদান, (মিসর, মাতবায়াতুল মাওসূয়াত, ১৯০১)

১৭. আয্-যিরিক্লী ঃ আল-আ'লাম, (বৈরুত, দারুল 'ইল্ম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৯)

১৮. ইবন হিশাম ঃ আস-সীরাহ্ (বৈরুত)

১৯. ইউসুফ আল-কান্ধালূবী ঃ হায়াতুস সাহাবা, (দিমাশ্ক, দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ ১৯৮৩)

২০. সা'ঈদ আনসারী, মাওলানা ঃ সিয়ারে আনসার, (ভারত, ১৯৪৮)

২১. ইবন আবদিল বার ঃ আল-ইসতী'য়াব, ('আল-ইসাবা' গ্রন্থের পার্শ্ব টীকা)

২২. ইবন সাল্লাম আল-জামহী ঃ তাবাকাত আশ শু'য়ারা, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, ১৯৮০)

২৩. ইবন কুতায়বা ঃ আশ-শি'রু ওয়াশ শু'য়ারাউ, (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১)

২৪. ডঃ আবদুর রহমান আল-বাশা ঃ সুওয়ারুম মিন হায়াতুস সাহাবা, (সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ)

২৫. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ ঃ রিজালুন হাওয়ালার রাসূল, (বৈরুত, দারুল ফিক্র)

২৬. ডঃ শাওকী দাঈফ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (কায়রো, দারুল মা'য়ারিফ, ৭ম সংস্করণ)

২৭. ডঃ 'উমার ফাররূখ ঃ তারীখুল আদাব আল-আরাবী, (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৫)

২৮. জুরযী যায়দান ঃ তারীখু আদাবিল লুগাহ আল-আরাবিয়্যা, (বৈরুত, দারু মাকতাবাতুল হায়াত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮)

২৯. আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না ঃ বুলূগুল আমানী মিন আসরার আল-ফাতহির রাব্বানী, (কায়রো, দারুশ শিহাব)

৩০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী ঃ কানযুল 'উম্মাল, (বৈরুত, মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৫)

৩১. ডঃ মুস্তাফা আস্-সিবা'ঈ ঃ আস্-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী' আল-ইসলামী, (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৬)

৩২. হাজী-খলীফা ঃ কাশফুজ জুনূন 'আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯০)

৩৩. মুহাম্মদ আল-খাদারী বেক ঃ তারীখুল উমাম আল-ইসলামিয়া, (মিসর, আল-মাকতাবাতু তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)

৩৪. মুহাম্মদ আলী আ-সাবুনী ঃ
(ক) রাওয়ায়ি 'উল কুরআন, তাফসীরু আয়াতিল আহকাম মিনাল কুরআন, (বৈরুত, মুওয়াস্‌সাসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১)
(খ) আত-তিবইয়ান ফী 'উলূমিল কুরআন, (বৈরুত)
৩৫. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী ঃ তাহজীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, (মিসর, আত-তিবায়া' 'আল-মুগীরিয়্যা)
৩৬. ইমাম আহমাদ ঃ আল-মুসনাদ
৩৭. R.A.Nicholson : A Literary History of the Arabs, (Cambridge, University Press, 1969)
৩৮. পবিত্র কোরআনুল করীম ঃ অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।
৩৯. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ।
৪০. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফই ইসলামিয়্যা (উর্দূ)
৪১. কুদামাহ ইবন জা'ফর ঃ নাকদুশ শি'র (বৈরুত)
৪২. ইবন রাশীক ঃ কিতাবুল 'উমদাহ, (কায়রো-১৯৩৪)
৪৩. আবু তাম্মাম ঃ আল-হামাসা, (বৈরুত)
৪৪. আল-বাকিল্লানী ঃ ই'জাযুল কুরআন, (বৈরুত-১৯৯১)
৪৫. আল-জুরজানী ঃ দালায়িলুল ই'জায, (কায়রো-১৯৭৬)
৪৬. বুতরুস আল-বুসতানী ঃ উদাবাউল আরাব ফিল জাহিলিয়্যাতি ওয়া সাদরিল ইসলাম (বৈরুত-১৯৮৯)
৪৭. 'আবদুর রউফ দানাপুরী ঃ আসাহ আস-সীরাহ (করাচী)
৪৮. সা'ঈদ আনসারী ঃ সিয়ারুস সাহবিয়াত, (ভারত, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজম গড় ১৩৪১ হিঃ)
৪৯. নিয়ায ফতেহপুরী ঃ সাহাবিয়াত, (করাচী, নাফীস একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২)
৫০. আবদুস সালাম নাদবী ঃ উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত, (ভারত, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৫৩)
৫১. যুরকানী ঃ শারহুল মাওয়াহিব, (কায়রো)
৫২. ইবন আবদি রাব্বিহি ঃ আল-ইকদুল ফারীদ, (কায়রো, লুজনাতুত তালীফ ওয়াত তারজামা, ১৯৬৮)
৫৩. শিবলী নু'মানী ঃ সীরাতুন নবী, (ভারত, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ১২শ সংস্করণ, ১৯৭৮)
৫৪. ডঃ আবদুল কারীম যায়দান ঃ আল-মুফাস্‌সাল ফী আহকাম আল-মারয়াতি ওয়াল বায়ত ফিশ শারী'আ আল-ইসলামিয়্যা, (বৈরুত, মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭)
৫৫. ডঃ আহমাদ আস-শালবী ঃ আত-তারীখ আল-ইসলামী, (কায়রো, ১৯৮২)।

বাংলাদেশ
ইসলামিক
সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

৬

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আসহাবে রাসূলের জীবনকথা

[ষষ্ঠ খণ্ড]

[মহিলা সাহাবী]

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১২০৫

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 984-31-0707-1 set

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৫

দ্বিতীয় প্রকাশ
মুহাররাম ১৪২৯
মাঘ ১৪১৪
জানুয়ারী ২০০৮

প্রচ্ছদ
সরদার জয়নুল আবেদীন

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : একশত আশি টাকা মাত্র

Ashabe Rasuler Jiban Katha (Vol. VI) Written by Muhammad Abdul Ma'bud and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 First Edition January 2005 Second Edition January 2008 Price Taka 180.00 only.

সূচীপত্র

১. হযরত যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা) ॥ ১৩
২. হযরত রুকাইয়্যা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা) ॥ ২৬
৩. হযরত উম্মু কুলছূম বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা) ॥ ৩৩
৪. হযরত ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা) ॥ ৩৭
৫. হযরত উম্মুল ফাদল বিন্‌ত আল-হারিছ (রা) ॥ ৮২
৬. হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব (রা) ॥ ৮৬
৭. হযরত উম্মু আয়মান বারাকা (রা) ॥ ৯২
৮. হযরত উম্মু হানী বিন্‌ত আবী তালিব (রা) ॥ ৯৮
৯. হযরত হালীমা আস-সা'দিয়্যা (রা) ॥ ১০৪
১০. হযরত আশ-শায়মা' বিন্‌ত আল-হারিছ আস-সা'দিয়্যা (রা) ॥ ১১২
১১. হযরত আসমা' বিন্‌ত আবী বকর (রা) ॥ ১১৭
১২. হযরত উম্মু সুলাইম বিন্‌ত মিলহান (রা) ॥ ১৪১
১৩. হযরত উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা) ॥ ১৫০
১৪. হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়স আল-ফিহ্‌রিয়্যা (রা) ॥ ১৫৪
১৫. হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আল-খাত্তাব (রা) ॥ ১৫৭
১৬. হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আল-আসাদ (রা) ॥ ১৬১
১৭. হযরত সুমাইয়্যা বিন্‌ত খুব্‌বাত (রা) ॥ ১৭০
১৮. হযরত উম্মু 'উমারা (রা) ॥ ১৭২
১৯. হযরত উম্মু ওয়ারাকা বিন্‌ত নাওফাল (রা) ॥ ১৮০
২০. হযরত উম্মু হাকীম বিন্‌ত আল-হারিছ (রা) ॥ ১৮৫
২১. হযরত উমামা বিন্‌ত আবিল 'আস (রা) ॥ ১৯১
২২. হযরত খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা) ॥ ১৯৪
২৩. হযরত খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা) ॥ ২০০
২৪. হযরত হাওয়া বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) ॥ ২০৬
২৫. হযরত শিফা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ (রা) ॥ ২০৯
২৬. হযরত হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা) ॥ ২১৩
২৭. হযরত খানসা' বিন্‌ত 'আমর ইবন আশ-শারীদ (রা) ॥ ২১৭
২৮. হযরত আসমা' বিন্‌ত ইয়াযীদ আল-আনসারিয়্যা (রা) ॥ ২৩০
২৯. হযরত উম্মু রূমান বিন্‌ত 'আমির (রা) ॥ ২৩৬
৩০. হযরত উম্মু 'আতিয়্যা বিন্‌ত আল-হারিছ (রা) ॥ ২৪৬
৩১. হযরত যায়নাব বিন্‌ত আবী মু'আবিয়া (রা) ॥ ২৫০
৩২. হযরত আর-রুবায়্যি'উ বিন্‌ত মু'আওবিয (রা) ॥ ২৫৪
৩৩. হযরত হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা (রা) ॥ ২৬৩
৩৪. হযরত দুররা বিন্‌ত আবী লাহাব (রা) ॥ ২৮২
৩৫. হযরত উম্মু কুলছূম বিন্‌ত 'উকবা (রা) ॥ ২৯০
৩৬. হযরত আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) ॥ ২৯৫
• গ্রন্থপঞ্জি ॥ ৩০০

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নম্র স্বভাব ও কোমল হৃদয়– একজন সৎ মানুষের বড়ো দুইটি গুণ। এমন গুণসম্পন্ন মানুষই সকল প্রকার উপদেশ, নীতিকথা, শিক্ষা-দীক্ষা, সত্য ও সঠিক পথের দিশা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফুলের পাঁপড়ি প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ূর নীরব গতিতে হেলে যায়; কিন্তু শক্ত দণ্ডধারী বৃক্ষকে প্রবল ঝড়ো হাওয়া বিন্দুমাত্র হেলাতে পারে না। চোখের দৃষ্টি শিখা আয়না ভেদ করে যায়; কিন্তু পাথরের উপর তীক্ষ্ণধার তীরও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষেরও ঠিক একই অবস্থা। নরম স্বভাব ও কোমল অন্তরের মানুষ সত্যের প্রতিটি আহ্বান মেনে নেয়: কিন্তু কঠিন হৃদয় ও রুক্ষ মেজায মানুষের উপর বড় বড় মু'জিযাও কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। এ ধরনের পার্থক্যের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত সর্বত্র পাওয়া যেতে পারে। তবে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পুরোটাই এ জাতীয় দৃষ্টান্তে ভরা।

কাফিরদের মধ্যে এমন অনেক দুর্ভাগার নাম আমাদের জানা আছে যারা হাজারো চেষ্টার পরও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সামনে মাথা নত করেনি। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এমন হাজারো বুযর্গ ছিলেন যাঁরা তাওহীদের আওয়ায শোনার সাথে সাথে ইসলামের বেষ্টনীতে প্রবেশ করেন। সাহাবীদের সাথে সাহাবিয়াত বা মহিলা সাহাবীরাও এই মর্যাদার অংশীদার।

শুধু অংশীদারই নন, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা পুরুষেরও অগ্রগামী। কোন রকম চেষ্টা-তদবীর ও জোর-জবরদস্তি ছাড়াই খাদীজা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সামনে মাথা নত করেন। রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন :

'আমি সোমবার দিন নবুওয়াত লাভ করি, আর খাদীজা সেই দিনের শেষ ভাগে নামায পড়ে। 'আলী পরের দিন মঙ্গলবার নামায পড়ে। তারপর যায়িদ ইবন হারিছা ও আবূ বকর নামাযে শরীক হয়।'

রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়, রিসালাত-সূর্য উদয় হওয়ার প্রথম দিন এ বিশ্বের দিগন্তে যে আলো ফেলে, সে আলো এক কোমল হৃদয়, এক পবিত্র-আত্মা মহিলার জ্যোতির্ময় অন্তরকে ভেদ করে।

ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলাম কবুল করার চেয়ে ইসলামের ঘোষণা দানের জন্য সাহস, নির্ভীকতা ও শক্ত মনোবলের প্রয়োজন ছিল বেশী। কাফিরদের বাধা-বিপত্তি ও জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও পুরুষ সাহাবীদের পাশাপাশি মহিলা

সাহাবীরাও চূড়ান্ত রকমের সাহস ও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছেন।

মহিলা সাহাবীরা খুব সহজে শুধু ইসলাম গ্রহণই করেননি, বরং তাঁরা অতি স্বচ্ছন্দভাবে ইসলামের প্রচারও করেছেন। সহীহ বুখারীর তায়াম্মুম' অধ্যায়ে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের এক অভিযানে একজন মহিলাকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করেন। তার নিকট মশক ভর্তি পানি ছিল। সাহাবায়ে কিরাম পানির প্রয়োজনে তাকে বন্দী করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তার পানি নেন, তবে তার মূল্য পরিশোধ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন সততায় মহিলাটি ঈমান আনে এবং তার প্রভাবে তার গোটা গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। উম্মু শুরাইক (রা) মক্কায় প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয় যে, যে সত্য তিনি লাভ করেছেন তা অন্যদের সামনেও তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। তিনি মক্কার বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে মহিলাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে কুরাইশ পাষণ্ডরা তাঁকে ধরে তাঁর গোত্রের লোকদের হাতে তুলে দেয়। তাদের হাতে তিনি অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হন। অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

পুরুষ সাহাবীদের সাথে মহিলা সাহাবীরাও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। সুমাইয়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁর উপর নানা রকম অত্যাচারের কসরত চালায়। মক্কার উত্তপ্ত বালুর মধ্যে লোহার বর্ম পরিয়ে দুপুরের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো। তারপরেও তিনি ইসলামের উপর অটল থাকতেন। একদিন দুপুর রোদে লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত বালুর উপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন সময় রাসূল (সা) সেই পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সুমাইয়্যাকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন : 'ধৈর্য ধর। জান্নাতই হবে তোমার ঠিকানা।' এত অত্যাচার করেও কাফিররা তৃপ্ত হয়নি। অবশেষে আবূ জাহল বর্শা বিদ্ধ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়।

হযরত 'উমারের (রা) বোন ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেকথা তাঁর কানে গেলে এমন নির্দয়ভাবে তাঁকে মারপিট করেন যে, তাঁর সারা দেহ রক্তে ভিজে যায়। তারপরেও তিনি বিন্দুমাত্র টললেন না। 'উমারের (রা) মুখের উপর সাফ বলে দিলেন, যা ইচ্ছা করুন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেই ফেলেছি। ইসলাম গ্রহণের কারণে দাসী লুবাইনাকে (রা) 'উমার (রা) মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে থেমে যেতেন। তখন বলতেন, তোমার প্রতি দয়া ও করুণাবশতঃ থেমে যাইনি, ক্লান্ত হয়ে থেমেছি। লুবাইনাও (রা) ছাড়ার পাত্রী নন। তিনি বলতেন, আপনি ইসলাম

গ্রহণ না করলে আল্লাহও আপনাকে এমন শাস্তি দেবেন।[১] এমনিভাবে যিন্নীরার (স্ত্রীর দাসী) উপরও কঠোর নির্যাতন চালাতেন। উম্মু শুরাইককে (রা) রুটি ও মধু খাইয়ে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে উত্তপ্ত বালুর উপর রাখা হতো। পিপাসায় বুক শুকিয়ে যেত, এক ফোটা পানির জন্য কাৎরাতেন, পানি দেওয়া হতো না।

পুরুষ সাহাবীরা যখন ঈমান আনলেন তখন কাফিরদের সাথে তাদের সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু এতে তাঁদের ঈমানী শক্তিতে কোন রকম তারতম্য সৃষ্টি হয়নি। মহিলা সাহাবীদের অবস্থা এ ব্যাপারে পুরুষ সাহাবীদের চেয়ে বেশী নাজুক ছিল। মানুষ যদিও তার সকল আত্মীয়-বন্ধুর সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তবে একজন নারীর জীবনের সকল নির্ভরশীলতা স্বামীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। জীবনের কোন অবস্থায়ই সে স্বামীর উপর নির্ভরতা ছাড়া চলতে পারে না। পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু একজন নারী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও মহিলা সাহাবীরা এমন এক স্পর্শকাতর সম্পর্ককেও ছিন্ন করে ফেলেছেন এবং নিজেদের কাফির স্বামীদের থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। সুতরাং হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন এ আয়াত–[২] وَلاَ تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ (তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না) নাযিল হলো, তখন পুরুষ সাহাবীরা যেমন তাদের কাফির স্ত্রীদের তালাক দিলেন, তেমনিভাবে বহু মহিলা সাহাবী তাঁদের কাফির স্বামীদের ছেড়ে হিজরাত করে মদীনায় চলে যান এবং তাই হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :[৩]

'আমরা এমন কোন মুহাজির মহিলার কথা জানি না যে ঈমান এনে আবার মুরতাদ হয়েছে।' পুরুষদের ক্ষেত্রে মুরতাদ হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

কাফিররা মহিলা সাহাবীদেরকে নানা রকম শাস্তি দিত। কিন্তু তাঁদের কারও মুখ থেকে কালেমায়ে তাওহীদ ছাড়া শিরকমূলক কোন কথা কোনদিন উচ্চারিত হয়নি। উম্মু শুরাইক (রা) ঈমান আনলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে নিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে দিল। তিনি যখন সূর্যের উত্তাপে জ্বলছেন, তখন তাঁকে রুটির সাথে মধুর মত গরম জিনিস খেতে দিত। পানি পান করতে দিত না। এ অবস্থায় যখন তিন দিন চলে গেল তখন জালিমরা বললো : 'যে দ্বীনের উপর তুমি

---

১. আনসাব আল-আশরাফ-১/১৯৭; ইবন হাজার এ সাহাবিয়ার নাম লাবীবা এবং ডাকনাম উম্মু 'উবাইস বলেছেন। (আল-ইসাবা-৪/৩৯৯, ৩৭৫)

২. সূরা আল-মুমতাহিনা-১০

৩. বুখারী : কিতাবুশ শুরূত; যিকরু সুলহিল হুদায়বিয়া।

আছ তা ত্যাগ কর।' তিনি এমনই বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, তাদের কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। যখন তারা আকাশের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বুঝালো যে, তুমি তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার কর, তখন তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো, "আল্লাহর কসম, আমি তো এখনও সেই বিশ্বাসের উপর অটল রয়েছি"।[৪]

সকল দেশে এবং সবকালে মেয়েরা সাধারণত প্রাচীন রীতি-নীতি, প্রথা ও প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে। আর আরবে অংশীবাদী চিন্তা-বিশ্বাস দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকায় মানুষের অন্তরে তা শক্তভাবে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু মহিলা সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে প্রচলিত সকল বিশ্বাস ও সংস্কারকে অত্যন্ত প্রবলভাবে অস্বীকার করেন। আরববাসী মনে করতো, যদি কোন ব্যক্তি মূর্তির দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ায় তাহলে সে শক্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ কারণে হযরত যিন্নীরা (রা) ইসলাম গ্রহণের পর অন্ধ হয়ে গেলে কাফিররা বলতে শুরু করে যে, লাত ও 'উয্যা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। একথা শুনে তিনি সাফ বলে দিলেন, লাত ও 'উয্যার তার পূজারীদেরই কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমার যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।[৫]

জাহিলী যুগে আরবরা শিশুদের বিছানার নীচে ক্ষুর রেখে দিত। তারা বিশ্বাস করতো, এতে শিশুরা ভূত-প্রেতের আছর থেকে নিরাপদ থাকে। একবার আয়িশা (রা) একটি শিশুর শিথানে ক্ষুর দেখতে পেয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ ধরনের কুসংস্কারকে মোটেই পসন্দ করতেন না।[৬]

আরবে শিরকের প্রধান উপকরণ ও কেন্দ্র ছিল মূর্তি। প্রতিটি বাড়ী, এমনকি প্রতিটি ঘরেই মূর্তি শোভা পেত। কিন্তু মহিলা সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রতি মুহূর্তে, প্রত্যেকটি সুযোগে মূর্তির সাথে তাঁদের নেতিবাচক সম্পর্কের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। হিন্দ বিন্ত উতবা (রা) ঈমান আনার পর তাঁর ঘরে যে মূর্তি ছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। তারপর মূর্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমরা তোর ব্যাপারে বড় ধোঁকার মধ্যে ছিলাম"।[৭]

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ তালহা (রা) যখন উম্মু সুলাইমকে (রা) বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি বললেন : 'আবূ তালহা! তোমার কি একথা জানা আছে, যে খোদার

---

৪. তাবাকাত-৮/১৫৪; নিসা' হাওলার রাসূল-২৪৫
৫. উসুদুল গাবা, খণ্ড-৫ (যিন্নীরা)
৬. আদাবুল মুফরাদ : বাবু আত-তায়র
৭. তাবাকাত, খণ্ড-৮ (হিন্দ বিনত 'উতবা)

তুমি পূজা করো তা একটি কাঠের তৈরী মূর্তি, সেই গাছ মাটিতে জন্মেছিল এবং অমুক হাবশী দাস সেটি কেটে মূর্তি তৈরী করেছিল?' আবূ তালহা বললেন : 'সেকথা আমার জানা আছে।' উম্মু সুলাইম বললেন : 'তাহলে তার পূজা করতে তোমার লজ্জা হয় না?' যতক্ষণ পর্যন্ত আবূ তালহা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করেননি, উম্মু সুলাইম (রা) তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হননি।[৮]

ইসলামের প্রথম যুগের এই সুযোগ্য মহিলারা তাঁদের সন্তানদেরকে এমন যোগ্য করে গড়ে তোলেন যে, বিশ্ববাসী অবাক-বিস্ময়ে তাঁদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে দেখে। তাঁরা ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। তাঁরা খিলাফতের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন, মোটকথা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এমন সব উদাহরণ পেশ করেন যা আজো মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। যেমন : আসমা' বিন্‌ত আবী বকর ও তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবন আয-যুবাইর, ফাতিমা বিনত আসাদ ও তাঁর ছেলে 'আলী (রা), আন-নাওয়ার বিন্‌ত মালিক ও তাঁর ছেলে যায়দ ইবন ছাবিত, সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব ও তাঁর ছেলে জা'ফর, উম্মু আইমান ও তাঁর ছেলে উসামা (রা) এবং আরো অনেকে।

এই মহিয়সী নারীগণ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ)-এর দায়িত্বও সে যুগে পালন করেছেন।

শিক্ষায়ও মহিলারা পুরুষের থেকে কোন অংশে পিছিয়ে থাকেননি। অসংখ্য 'আলিম পুরুষ সাহাবীর নাম পাওয়া যায়। তবে তার পাশাপাশি মহিলাদের সংখ্যাও কম নয়। সর্বাধিক সংখ্যক হাদীছ যে সাতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন তার সপ্তমজন মহিলা। তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা)। আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, শরী'আতের হুকুম-আহকামের ইসতিমবাত ও ইজতিহাদে মহিলারা পুরুষের মতই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে যে ইসলাম সমানভাবে দেখার নির্দেশ-দিয়েছে, কেবল পুরুষগণই তা বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেননি। বরং মহিলাগণও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছেন। উহুদ যুদ্ধে হামযা (রা) শহীদ হলেন। সাফিয়্যা (রা)-হামযার বোন ও রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু, ভাইয়ের কাফনের জন্য দুই খণ্ড কাপড় নিয়ে এলেন। দেখলেন হামযার (রা) লাশের পাশে আরেকজন আনসারী ব্যক্তির নগ্ন লাশ পড়ে আছে। ইসলাম সাফিয়্যার মধ্যে যে মূল্যবোধ সৃষ্টি

---

৮. তাবাকাত, খণ্ড-৮ (উম্মু সুলাইম)

করেছিল তা এই নগ্ন আনসারীর লাশকে উপেক্ষা করতে পারলো না। তিনি একখানা কাপড় এই আনসারীর কাফনের জন্য দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কোনটি দেবেন? কার'আর (লটারী) মাধ্যমে তা নির্ধারণ করেন। এভাবে তিনি সাম্য ও সমতার প্রতীকে পরিণত হন।[৯]

ইসলামের সেবায় ধন-সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন কি কেবল পুরুষরা? না, তা নয়। আমরা আবূ বকর (রা), 'উছমান (রা) ও অন্যদের দানের কথা জানি। কিন্তু উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রা) অঢেল সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেওয়ার কথা ভুলি কি করে? একদিন মদীনায় রাসূল (সা) একটি ঈদের সমাবেশে দান-খায়রাতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন। উক্ত সমাবেশে মহিলারাও ছিলেন। তাঁরা তাঁদের হাতের বালা, কানের দুল, গলার হার, হাতের আংটি খুলে খুলে রাসূলে কারীমের (সা) হাতে তুলে দেন। আসমার (রা) ছিল একটি মাত্র দাসী। তিনি সেটি বিক্রী করে সকল অর্থ ফী সাবীলিল্লাহ দান করেন। উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা) নিজ হাতে চামড়া দাবাগাত করতেন এবং তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

যুদ্ধের ময়দানেও কিছু সংখ্যক মহিলা সাহাবীকে উপস্থিত দেখা যায়। তাঁরা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাফিয়্যা (রা) তো এক ইহুদীর মাথা কেটে ছুড়ে মারেন। এই বীরাঙ্গনাদের মধ্যে উম্মু সুলাইমের (রা) নামটিও শোভা পায়। হুনাইন যুদ্ধে খঞ্জর হাতে উম্মু সুলাইম (রা) দাঁড়িয়ে, রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এ খঞ্জর দিয়ে কি করবে? বললেন : শত্রু নিধন করবো।

ঈছার তথা অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর অগ্রাধিকার দান করা সর্বযুগের সকল মানুষের নিকট নৈতিকতার উচ্চতম স্তরের গুণ বলে স্বীকৃত। এ গুণ অর্জন করা অত সোজা নয়। পুরুষ সাহাবীদের মধ্যে এ গুণের বিকাশ ব্যাপকভাবে আমরা লক্ষ্য করে থাকি। জীবনের অন্তিম ক্ষণে এক ঢোক পানি নিজে পান না করে পাশে আহত আরেক ভাইকে দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করছেন, তিনি আবার অন্যকে দেওয়ার ইঙ্গিত করছেন। এভাবে একগ্লাস পানি তিনজনের নিকট ঘুরে আবার যখন প্রথমজনের নিকট আসে তখন দেখা যায় তিনি আর বেঁচে নেই। এভাবে একে একে পরবর্তী দুইজনের একই পরিণতি হয়। তিনজনের প্রত্যেকেই নিজের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা পুরুষ সাহাবীদের জীবনের একটি চিত্র।

---

৯. আল-মুফাসসাল ফী আহকাম আল-মারআতি ওয়াল বায়ত আল-মুসলিম-৪/৩৫৮, ৩৫৯; আল-ইসতী'আব-৪/৩৩৫

এ ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবীরাও কিন্তু পিছিয়ে ছিলেন না। এ গুণটির ব্যাপক বিকাশ তাঁদের মধ্যেও ঘটেছিল। আয়িশা (রা) একদিন রোযা আছেন। ইফতারের জন্য ঘরে কেবল এক টুকরো রুটি আছে। ইফতারের আগে এক দুঃস্থ মহিলা এসে কিছু খেতে চায়। তিনি দাসীকে রুটির টুকরোটি তাকে দিতে বলেন। দাসী বলে, আপনি ইফতার করবেন কিভাবে? বললেন, 'রুটির টুকরোটি তাকে দাও, ইতফারের কথা পরে চিন্তা করা যাবে।'

একদিন রাসূল (সা) বললেন, যে আজ রাতে এই লোকটিকে মেহমান হিসেবে নিয়ে যাবে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন। আবূ তালহা (রা) তাকে সংগে করে বাড়ীতে এলেন। বাড়ীতে সেদিন ছোট ছেলে-মেয়েদের খাবার ছাড়া অতিরিক্ত কোন খাবার ছিল না। তাই স্ত্রী উম্মু সুলাইম (রা) ভুলিয়ে ভালিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ালেন। তারপর যে সামান্য খাবার ছিল তা মেহমানের সামনে হাজির করেন। এক ছুতোয় আলো নিভিয়ে নিজেরা খাবার না খেয়ে বসে থাকেন, আর মেহমান তা বুঝতে না পেরে পেট ভরে আহার করেন।

এই মহিলা সাহাবীগণ সত্য উচ্চারণে কারো চোখ রাঙ্গানি ও ভীতি প্রদর্শনকে পরোয়া করেননি। উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা মু'আবিয়া (রা) যখন 'আয়িশার (রা) সংগে দেখা করতে আসেন তখন তিনি তাঁকে তাঁর কিছু কাজের জন্য তিরস্কার করেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) ঘাতক স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ আসমার (রা) সাথে দেখা করতে এলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। এমনকি তাকে মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেন। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী উমাইয়্যা খলীফা আবদুল মালিক একদিন রাতে তাঁর এক চাকরকে কোন ত্রুটির কারণে অভিশাপ দেন। ঘটনাক্রমে সে রাতে প্রখ্যাত সাহাবিয়্যা উম্মুদ দারদা (রা) খলীফার মহলে অবস্থান করছিলেন। সকালে তিনি খলীফাকে ডেকে বলেন, গত রাতে তুমি চাকরকে অভিশাপ দিয়েছো। অথচ রাসূল (সা) কাউকে অভিশাপ দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। খলীফা লজ্জিত হন।

এভাবে জীবনের একেকটি দিক যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহিলা সাহাবীগণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানভাবে এগিয়ে গেছেন। আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, ৬ষ্ঠ খণ্ডে আমরা তাঁদের জীবনের এ সকল দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, সাহাবায়ে কিরাম, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে অনেকের ইসলামী জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁদের জীবনের বেশী সময় কেটেছে জাহিলী যুগে। তাই তাঁদের জীবনের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না। মানব জাতির ইতিহাসের বিস্ময়কর নায়ক 'উমারের (রা) জাহিলী জীবনের

দু'একটি ঘটনা ছাড়া পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে অন্যদের ইসলাম-পূর্ব জীবন কতটুকু জানা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃতপক্ষে আমরা মহিলা সাহাবীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ইতিহাস রচনা করতে পারিনি। কারণ, সে তথ্য আমাদের হাতে নেই। যেটুক আমরা করেছি, তা তাঁদের জীবনের একটি খণ্ডচিত্র বলা যেতে পারে। তবে এসব চিত্র যেন একেকটি আলোর ঝলক। যুগে যুগে মুসলিম মহিলারা সেই আলোতে পথ চলার চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষা-ভাষী মহিলারাও যাতে মহিলা সাহাবীদের জীবনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে তাঁদের অনুসরণ করতে পারেন, এই লক্ষ্যে আমাদের এ প্রয়াস। পাঠক-পাঠিকাগণ যদি এ লেখা দ্বারা সামান্য উপকার পান তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আরেকটি কথা যা না বললেই নয়, তা হলো আসহাবে রাসূলের জীবনকথা লেখার পরিকল্পনা আসলে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ সাহেবের। বেশ কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে লেখার জন্য তিনি উৎসাহিত করেন। সেই যে শুরু করেছি, তারপর থেকে এ পর্যন্ত আমার প্রতিটি ধাপে তিনি নানাভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন– এই দু'আ করি।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাদের দৃষ্টিতে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা লেখককে অবহিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর মর্জি মত কাজ করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

২৩ ডিসেম্বর ২০০৪

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
প্রফেসর
আরবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে সায়্যিদা যায়নাব (রা)– যিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণী বর্ণনা করেছেন :[১]

هِيَ خَيْرُ بَنَاتِيْ أُصِيْبَتْ فِيَّ.

'সে ছিল আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে। আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।'

হযরত যায়নাবের (রা) সম্মানিতা জননী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)। যিনি মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাতের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনার অনন্য গৌরবের অধিকারিণী। তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদা এত বিশাল যে বিগত উম্মাত সমূহের মধ্যে কেবল হযরত মারইয়ামের (আ) সাথে যা তুলনীয়।

ইমাম আজ-জাহাবী বলেন :[২]

زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ وَأَكْبَرُ أَخْوَاتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ السَّيِّدَاتِ.

'যায়নাব হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে এবং তাঁর হিযরাতকারিণী সায়্যিদাত বোনদের মধ্যে সবার বড়।'

আবু 'আমর বলেন, যায়নাব (রা) তাঁর পিতার মেয়েদের মধ্যে সবার বড়। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। আর যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁরা ভুলের মধ্যে আছেন। তাদের দাবীর প্রতি গুরুত্ব প্রদানের কোন হেতু নেই। তবে মতপার্থক্য যে বিষয়ে আছে তা হলো, রাসূলুল্লাহর (সা) ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যায়নাব প্রথম সন্তান, না কাসিম? বংশবিদ্যা বিশারদদের একটি দলের মতে আল-কাসিম প্রথম ও যায়নাব দ্বিতীয় সন্তান। ইবনুল কালবী যায়নাবকে (রা) প্রথম সন্তান বলেছেন। ইবনে সা'দের মতে, যায়নাব (রা) মেয়েদের মধ্যে সবার বড়।[৩] ইবন হিশাম রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের ক্রমধারা এভাবে সাজিয়েছেন :[৪]

اَكْبَرُ بَنِيْهِ الْقَاسِمُ، ثُمَّ الطَّيِّبُ، ثُمَّ الطَّاهِرُ، وَأَكْبَرُ بَنَاتِهِ رُقَيَّةُ، ثُمَّ زَيْنَبُ، ثُمَّ أُمُّ كُلْثُوْمَ، ثُمَّ فَاطِمَةُ.

---

১. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭২
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬
৩. তাবাকাত-৮/৩০
৪. আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা-১/১৯০

'রাসূলুল্লাহর (সা) বড় ছেলে আল কাসিম, তারপর যথাক্রমে আত-তায়্যিব ও আত-তাহির। আব বড় মেয়ে রুকাইয়্যা, তারপর যথাক্রমে যায়নাব, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা।'

পিতা মুহাম্মাদ (সা)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে হযরত যায়নাবের (রা) জন্ম হয়। তখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বয়স তিরিশ এবং মাতা হযরত খাদীজার (রা) পঁয়তাল্লিশ বছর। হযরত যায়নাবের (রা) শৈশব জীবনের তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর এ জীবনটি সম্পূর্ণ অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর জীবন সম্পর্কে যতটুকু যা জানা যায় তা তাঁর বিয়ের সময় থেকে।

রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়নাবের (রা) বিয়ে অল্প বয়সে অনুষ্ঠিত হয়। তখনও পিতা মুহাম্মাদ (সা) নবী হননি।[৫] ইমাম আজ- জাহাবী এ মত গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি বলেন :[৬]

ذَكَرَ ابْنُ سَعَدٍ أَنَّ أَبَا الْعَاصِ تَزَوَّجَ بِزَيْنَبَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ وَهذَا بَعِيْدٌ.

'ইবন সা'দ উল্লেখ করেছেন যে, আবুল আ'স যায়নাবকে বিয়ে করেন নবুওয়াতের পূর্বে। এ এক অবাস্তব কথা।'

যাই হোক স্বামী আবুল 'আস ইবন আর-রাবী' ইবন আবদুল 'উয্যা ছিলেন যায়নাবের খালাতো ভাই। মা হযরত খাদীজার (রা) আপন ছোট বোন হালা বিন্‌ত খুওয়াইলিদের ছেলে।[৭]

বিয়ের সময় বাবা-মা মেয়েকে যে সকল উপহার সামগ্রী দিয়েছিলেন তার মধ্যে ইয়ামনী আকীকের একটি হারও ছিল। হারটি দিয়েছিলেন মা খাদীজা (রা)।[৮]

পিতা মুহাম্মাদ (সা) ওহী লাভ করে নবী হলেন। মেয়ে যায়নাব (রা) তাঁর মার সাথে মুসলমান হলেন। স্বামী আবুল 'আস তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন। পরে হযরত যায়নাব (রা) স্বামীকে মুশরিক অবস্থায় মক্কায় রেখে মদীনায় হিজরাত করেন।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাব (রা) ও আবুল 'আসের মধ্যের গভীর সম্পর্ক এবং ভদ্রোচিত কর্মপদ্ধতির প্রায়ই প্রশংসা করতেন।[১০]

আবুল 'আস যেহেতু শিরকের উপর অটল ছিলেন, এ কারণে ইসলামের হুকুম অনুযায়ী উচিত ছিল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া। কিন্তু রাসূল (সা) মক্কায় সে সময় শক্তিহীন ছিলেন। ইসলামী শক্তি তেমন মজবুত ছিল না। তাছাড়া কাফিরদের জুলুম-

---

৫. তাবাকাত-৮/৩০-৩১
৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬
৭. তাবাকাত-৮/৩১
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত-৮/৩২
১০. সুনানু আবী দাউদ-১/২২২

অত্যাচারের প্লাবন সবেগে প্রবহমান ছিল। এদিকে ইসলামের প্রচার প্রসারের গতি ছিল মন্থর ও প্রাথমিক পর্যায়ের। এসকল কারণে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটানোই রাসূল (সা) সমীচীন মনে করেন।

আবুল 'আস স্ত্রী যায়নাবকে (রা) অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সম্মানও করতেন। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে প্রিয়তমা স্ত্রীর নতুন দ্বীন কবুল করতে কোনভাবেই রাজী হলেন না। এ অবস্থা চলতে লাগলো। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ও কুরাইশদের মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে গেল। কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো :

'তোমাদের সর্বনাশ হোক! তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদের বিয়ে করে তার দুশ্চিন্তা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছো। তোমরা যদি এ সকল মেয়েকে তার কাছে ফেরত পাঠাতে তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়তো।' তাদের মধ্যে অনেকে এ কথা সমর্থন করে বললো– 'এ তো অতি চমৎকার যুক্তি।' তারা দল বেধে আবুল 'আসের কাছে যেয়ে বললো, 'আবুল 'আস, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দাও। তার পরিবর্তে তুমি যে কুরাইশ সুন্দরীকে চাও, আমরা তাকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।' আবুল 'আস বললেন, 'আল্লাহর কসম! না তা হয়না। আমার স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করতে পারিনে। তার পরিবর্তে সকল নারী আমাকে দিলেও আমার তা পসন্দ নয়।' একারণে রাসূল (সা) তাঁর আত্মীয়তাকে খুব ভালো মনে করতেন এবং প্রশংসা করতেন।[১১]

হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ত্যাগের অবস্থা নিম্নের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

নবুওয়াতের ১৩তম বছরে রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করেন। হযরত যায়নাব (রা) স্বামীর সাথে মক্কায় থেকে যান।[১২] কুরাইশদের সাথে মদীনার মুসলমানদের সামরিক সংঘাত শুরু হলো। কুরাইশরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদরে সমবেত হলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবুল 'আস কুরাইশদের সাথে বদরে গেলেন। কারণ, কুরাইশদের মধ্যে তাঁর যে স্থান তাতে না যেয়ে উপায় ছিলনা। বদরে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। তাদের বেশ কিছু নেতা নিহত হয় এবং বহু সংখ্যক যোদ্ধা বন্দী হয়। আর অবশিষ্টরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! এই বন্দীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) জামাই হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী আবুল 'আসও ছিলেন। ইবন ইসহাক বলেন, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর ইবন নু'মান (রা) তাঁকে বন্দী করেন। তবে আল-ওয়াকিদীর মতে হযরত খিরাশ ইবন আস-সাম্মাহর (রা) হাতে তিনি বন্দী হন।[১৩]

---

১১. তাবারী-৩/১৩৬; ইবন হিশাম, আস্-সীরাহ-১/৬৫২

১২. আনসাবুল আশরাফ-১/২৬৯

১৩. আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা-৪/১২২

বদরের বন্দীদের ব্যাপারে মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা এবং ধনী-দরিদ্র প্রভেদ অনুযায়ী একহাজার থেকে চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হলো। বন্দীদের প্রতিনিধিরা ধার্যকৃত মুক্তিপণ নিয়ে মক্কা-মদীনা ছুটাছুটি শুরু করে দিল। নবী দুহিতা হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসের মুক্তিপণসহ মদীনায় লোক পাঠালেন। আল-ওয়াকিদীর মতে আবুল 'আসের মুক্তিপণ নিয়ে মদীনায় এসেছিল তাঁর ভাই 'আমর ইবন রাবী'। হযরত যায়নাব মুক্তিপণ দিরহামের পরিবর্তে একটি হার পাঠিয়েছিলেন। এই হারটি তাঁর জননী হযরত খাদীজা (রা) বিয়ের সময় তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) হারটি দেখেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং নিজের বিষণ্ন মুখটি একখানি পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন। জান্নাতবাসিনী প্রিয়তমা স্ত্রী ও অতি আদরের মেয়ের স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন : 'যায়নাব তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে এই হারটি পাঠিয়েছে। তোমরা ইচ্ছে করলে তার বন্দীকে ছেড়ে দিতে পার এবং হারটিও তাকে ফেরত দিতে পার।' সাহাবীরা বললেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাই করবো।' সাহাবীরা রাজী হয়ে গেলেন। তাঁরা আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেন, আর সেইসাথে ফেরত দিলেন তাঁর মুক্তিপণের হারটি। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল 'আসের নিকট থেকে এ অঙ্গিকার নিলেন যে মক্কায় ফিরে অনতিবিলম্বে সে যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।[১৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাবকে (রা) নেওয়ার জন্য আবুল 'আসের সংগে হযরত যায়দ ইবন হারিছাকে (রা) পাঠান। তাঁকে 'বাতান' অথবা 'জাজ' নামক স্থানে অপেক্ষা করতে বলেন! যায়নাব (রা) মক্কা থেকে সেখানে পৌঁছলে তাঁকে নিয়ে মদীনায় চলে আসতে বলেন। আবুল 'আস মক্কায় পৌঁছে যায়নাবকে (রা) মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দান করেন।

হযরত যায়নাব (রা) সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় হিন্দ বিনত 'উতবা এসে হাজির হলো। প্রস্তুতি দেখে বললো : মুহাম্মাদের মেয়ে, তুমি কি তোমার বাপের কাছে যাচ্ছো? যায়নাব (রা) বললেন, এই মুহূর্তে তো তেমন উদ্দেশ্য নেই, তবে ভবিষ্যতে আল্লাহর যা ইচ্ছা হয়। হিন্দ ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললো : বোন, এটা গোপন করার কি আছে। সত্যিই যদি তুমি যাও, তাহলে পথে দরকার পড়ে এমন কোন কিছু প্রয়োজন হলে রাখঢাক না করে বলে ফেলতে পার, আমি তোমার খিদমতের জন্য প্রস্তুত আছি।

মহিলাদের মধ্যে শত্রুতার সেই বিষাক্ত প্রভাব তখনও বিস্তার লাভ করেনি যা পুরুষদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে হযরত যায়নাব (রা) বলেন : হিন্দ যা বলেছিল, অন্তরের কথাই বলেছিল। অর্থাৎ আমার যদি কোন জিনিসের প্রয়োজন হতো, তাহলে অবশ্যই সে তা পূরণ করতো। কিন্তু সে সময়ের অবস্থা চিন্তা করে আমি অস্বীকার করি।[১৫]

---

১৪. ইবন হিশাম-১/৬৫৩; তাবাকাত-৮/৩১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৬

১৫. তাবারী-১/১২৪৭; ইবন হিশাম-১/৬৫৩-৫৪

হযরত যায়নাব (রা) কিভাবে মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন সে সম্পর্কে সীরাতের গ্রন্থসমূহে নানা রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

ইবন ইসহাক বলেন, সফরের প্রস্তুতি শেষ হলে যায়নাবের (রা) দেবর কিনানা ইবন রাবী' একটি উট এনে দাঁড় করালো। যায়নাব উটের পিঠের হাওদায় উঠে বসলেন। আর কিনানা স্বীয় ধনুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি হাতে নিয়ে দিনে দুপুরে উট হাঁকিয়ে মক্কা থেকে বের হলো। কুরাইশদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা ধাওয়া করে মক্কার অদূরে 'জী-তুওয়া' উপত্যকায় তাঁদের দুই জনকে ধরে ফেললো। কিনানা কুরাইশদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে কাঁধের ধনুকটি হাতে নিয়ে তীরের বাণ্ডিলটি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললো : তোমাদের কেউ যায়নাবের নিকটে যাওয়ার চেষ্টা করলে তার সিনা হবে আমার তীরের লক্ষ্যস্থল। কিনানা ছিল একজন দক্ষ তীরন্দাজ। তার নিক্ষিপ্ত কোন তীর সচরাচর লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। তার এ হুমকী শুনে আবু সুফইয়ান ইবন হারব তার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললো :

'ভাতিজা, তুমি যে তীরটি আমাদের দিকে তাক করে রেখেছো তা একটু ফিরাও। আমরা তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।' কিনানা তীরটি নামিয়ে নিয়ে বললো, কি বলতে চান, বলে ফেলুন। আবু সুফইয়ান বললো :

'তোমার কাজটি ঠিক হয়নি। তুমি প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে মানুষের সামনে দিয়ে যায়নাবকে নিয়ে বের হয়েছো, আর আমরা বসে বসে তা দেখছি। গোটা আরববাসী জানে বদরে আমাদের কী দুর্দশা ঘটেছে এবং যায়নাবের বাপ আমাদের কী সর্বনাশটাই না করেছে। তুমি যদি এভাবে প্রকাশ্যে তার মেয়েকে আমাদের নাকের উপর দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে সবাই আমাদেরকে কাপুরুষ ভাববে এবং এ কাজটি আমাদের জন্য অপমান বলে বিবেচনা করবে। তুমি আজ যায়নাবকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কিছুদিন সে স্বামীর ঘরে থাকুক। এদিকে লোকেরা যখন বলতে শুরু করবে যে, আমরা যায়নাবকে মক্কা থেকে যেতে বাধা দিয়েছি, তখন একদিন তুমি গোপনে তাঁকে তার বাপের কাছে পৌঁছে দিও।'[১৬]

কিনানা আবু সুফইয়ানের কথা মেনে নিয়ে যায়নাবসহ মক্কায় ফিরে এল। যখন ঘটনাটি মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল, তখন একদিন রাতের অন্ধকারে সে আবার যায়নাবকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো এবং ভাইয়ের নির্দেশ মত নির্দিষ্ট স্থানে তাঁকে তাঁর পিতার প্রতিনিধির হাতে তুলে দিল। যায়নাব (রা) হযরত যায়দ ইবন হারিছার (রা) সাথে মদীনায় পৌঁছলেন।[১৭]

তাবারানী 'উরওয়া ইবন যুবাইর হতে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যায়নাব বিন্ত রাসূলুল্লাহকে (সা) সাথে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলে কুরায়শদের দুই ব্যক্তি[১৮] পিছু ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে। তারা যায়নাবের (রা) সংগী লোকটিকে কাবু করে যায়নাবকে (রা) উটের পিঠ থেকে ফেলে দেয়। তিনি একটি পাথরের উপর ছিটকে পড়লে শরীর

১৬. আল-বিদায়া-৩/৩৩০; ইবন হিশাম-১/৬৫৪-৫৫

১৭. তাবারী-১/১২৪৯; যুরকানী : শারহুল মাওয়াহিব-৩/২২৩'

ফেটে রক্ত বের হয়ে যায়। এ অবস্থায় তারা যায়নাবকে (রা) মক্কায় আবু সুফইয়ানের নিকট নিয়ে যায়। আবু সুফইয়ান তাঁকে বনী হাশিমের মেয়েদের কাছে সোপর্দ করে। পরে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন। উঠের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তিনি যে আঘাত পান, আমরণ সেখানে ব্যথা অনুভব করতেন এবং সেই ব্যথায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। এজন্য তাঁকে শহীদ মনে করা হতো।[১৯]

হযরত 'আয়িশা (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে যায়নাব কিনানার সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলো। মক্কাবাসীরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম যায়নাবকে ধরে ফেললো। সে যায়নাবের উটটি তীরবিদ্ধ করলে সে পড়ে গিয়ে আঘাত পেল। সে সন্তান সম্ভাবা ছিল। এই আঘাতে তার গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর বানু হাশিম ও বানু উমাইয়্যা তাঁকে নিয়ে বিবাদ শুরু করে দিল। অবশেষে সে হিন্দ বিন্‌ত 'উতবার নিকট থাকতে লাগলো। হিন্দ প্রায়ই তাকে বলতো, তোমার এ বিপদ তোমার বাবার জন্যেই হয়েছে।[২০]

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়দ ইবন হারিছাকে বললেন, তুমি কি যায়নাবকে আনতে পারবে? যায়দ রাজি হলো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যায়দকে একটি আংটি দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যাও, যায়নাবের কাছে পৌঁছাবে।' আংটি নিয়ে যায়দ মক্কার দিকে চললো। মক্কার উপকণ্ঠে সে এক রাখালকে ছাগল চরাতে দেখলো। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কার রাখাল? বললো, 'আবুল 'আসের'। আবার জিজ্ঞেস করলো, 'ছাগলগুলি কার?' বললো, 'যায়নাব বিন্‌ত মুহাম্মাদের।' যায়দ কিছুদূর রাখালের সাথে

---

১৮. সেই দুই ব্যক্তির একজন হাব্‌বার ইবন আল-আসওয়াদ। সে ছিল হযরত খাদীজার (রা) চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। তাই সম্পর্কে সে যায়নাবের মামাতো ভাই। আর দ্বিতীয়জন ছিল নাফে' ইবন 'আবদি কায়স অথবা খালিদ ইবন 'আবদি কায়স। তাদের এমন অহেতুক বাড়াবাড়িমূলক আচরণের জন্য রাসূল (সা) ভীষণ বিরক্ত হন। তাই তিনি নির্দেশ দেন :

إِنْ ظَفَرْتُمْ بِهَبَّار بْنِ الاَسْوَدِ وَالرَّجُلِ الَّذِىْ سَبَقَ مَعَه إِلى زَيْنَبَ، فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّار.

'যদি তোমরা হাব্‌বার ইবন আল-আসওয়াদ ও সেই ব্যক্তিটি যে তার সাথে যায়নাবের দিকে এগিয়ে যায়, হাতের মুঠোয় পাও, তাহলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে।' কিন্তু পরদিন তিনি আবার বলেন :

إِنِّىْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيْقِ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمُوْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ أَنْ يُّعَذِّبَ بِالنَّار إِلاَّ اللهُ، فَإِنْ ظَفَرْتُمْ فَاقْتُلُوْهُمَا.

'আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, যদি তোমরা এ দুই ব্যক্তিকে ধরতে পার, আগুনে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কাউকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। তাই তোমরা যদি তাদেরকে ধরতে পার, হত্যা করবে।' কিন্তু পরে তারা মুসলমান হয় এবং রাসূল (সা) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ : বাবু লা ইউ'য়াজ্জাবু বিআজাবিল্লাহ; আল-ইসাবা : হাব্‌বার ইবন আল-আসওয়াদ, ৩য় খণ্ড; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৫৭, ৩৯৮, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৭; ইবন হিশাম-১/৬৫৭)

১৯. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭১

২০. ইবন হিশাম-১/৬৫৪

চললো। তারপর তাকে বললো, 'আমি যদি একটি জিনিস তোমাকে দিই, তুমি কি তা যায়নাবের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?' রাখাল রাজি হলো। যায়দ তাকে আংটিটি দিল, আর রাখাল সেটি যায়নাবের হাতে পৌঁছে দিল।

যায়নাব রাখালকে জিজ্ঞেস করলো, 'এটি তোমাকে কে দিয়েছে?' বললো, 'একটি লোক'। আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তাকে কোথায় ছেড়ে এসেছো?' বললো, অমুক স্থানে।' যায়নাব চুপ থাকলো। রাতের আঁধারে যায়নাব চুপে চুপে সেখানে গেল। যায়দ তাকে বললো, 'তুমি আমার উটের পিঠে উঠে আমার সামনে বস।' যায়নাব বললো, 'না, আপনিই আমার সামনে বসুন।' এভাবে যায়নাব যায়দের (রা) পিছনে বসে মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই বলতেন, 'আমার সবচেয়ে ভালো মেয়েটি আমার জন্যই কষ্ট ভোগ করেছে।'[২১] সীরাতের গ্রন্থসমূহে হযরত যায়নাবের (রা) মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছার ঘটনাটি একাধিক সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

যেহেতু তাঁদের দুইজনের মধ্যের সম্পর্ক অতি চমৎকার ছিল, এ কারণে হযরত যায়নাবের (রা) মদীনায় চলে যাওয়ার পর আবুল 'আস বেশীর ভাগ সময় খুবই বিমর্ষ থাকতেন। একবার তিনি যখন সিরিয়া সফরে ছিলেন তখন যায়নাবের (রা) কথা স্মরণ করে নিম্নের পংক্তি দুইটি আওড়াতে থাকেন :[২২]

ذَكَرْتُ زَيْنَبَ لَمَّا وَرَكَتْ أَرِمًا + فَقُلْتُ سُقْيًا لِشَخْصٍ يَسْكُنُ الْحَرَمًا

بِنْتُ الأَمِيْنِ جَزَاهَا اللهُ صَالِحَةً + وَكُلُّ بَعْلٍ يُثْنِىْ بِالَّذِىْ عَلِمًا

"যখন আমি 'আরিম' নামক স্থানটি অতিক্রম করলাম তখন যায়নাবের কথা মনে হলো। বললাম, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সজীব রাখুন যে হারামে বসবাস করছেন। আমীন মুহাম্মাদের (সা) মেয়েকে আল্লাহ তা'আলা ভালো প্রতিদান দিন। আর প্রত্যেক স্বামী সেই কথার প্রশংসা করে যা তার ভালো জানা আছে।"

মক্কার কুরায়শদের যে বিশেষ গুণের কথা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে— 'রিহলাতাশ শিতায়ি ওয়াস সাঈফ'— শীতকালে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের দিকে তাদের বাণিজ্য কাফিলা চলাচল করে— আবুল 'আসের মধ্যেও এ গুণটির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। মক্কা ও শামের মধ্যে সবসময় তাঁর বাণিজ্য কাফিলা যাতায়াত করতো। তাতে কমপক্ষে একশো উটসহ দুইশো লোক থাকতো। তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি, সততা ও আমানতদারীর জন্য মানুষ তাঁর কাছে নিজেদের পণ্যসম্ভার নিশ্চিন্তে সমর্পণ করতো। ইবন ইসহাক বলেন, 'অর্থ-বিত্ত, আমানতদারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মক্কার গণমান্য মুষ্টিমেয় লোকদের অন্যতম ছিলেন।'[২৩]

স্ত্রী যায়নাব (রা) থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল 'আস মক্কায় কাটাতে লাগলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ

২১. হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭১-৭২
২২. তাবাকাত-৮/৩২; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৯৮
২৩. আল-ইসাবা-৪/১২২

সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসে তিনি কুরাইশদের ১৭০ উটের একটি বাণিজ্য কাফিলা নিয়ে সিরিয়া যান। বাণিজ্য শেষে মক্কায় ফেরার পথে কাফিলাটি যখন মদীনার কাছাকাছি স্থানে তখন রাসূলুল্লাহ (সা) খবর পেলেন। তিনি এক শো সত্তর সদস্যের একটি বাহিনীসহ যায়দ ইবন হারিছাকে (রা) পাঠালেন কাফিলাটিকে ধরার জন্য। 'ঈস নামক স্থানে দুইটি দল মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনী কুরায়শ কাফিলার বাণিজ্য সম্ভারসহ সকল লোককে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে যায়। তবে আবুল 'আসকে ধরার জন্য তারা তেমন চেষ্টা চালালো না। তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।[২৪]

অবশ্য মূসা ইবন 'উকবার মতে, আবু বাসীর ও তাঁর বাহিনী আবুল 'আসের কাফিলার উপর আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, এই আবু বাসীর ও আরও কিছু লোক হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সন্ধির শর্তানুযায়ী মদীনাবাসীরা তাঁদের আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। ফলে মক্কা থেকে পালিয়ে তাঁরা লোহিত সাগরের তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে মক্কার বাণিজ্য কাফিলার উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে লুটপাট করতে থাকেন। তাঁরা কুরায়শদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের ভয়ে কুরায়শদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে মক্কার কুরায়শরা বাধ্য হয়ে তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) অনুরোধ করে।[২৫]

যাই হোক, আবুল 'আস তাঁর কাফিলার এ পরিণতি দেখে মক্কায় না গিয়ে ভীত সন্ত্রস্তভাবে রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে মদীনায় প্রবেশ করলেন এবং সোজা যায়নাবের (রা) কাছে পৌঁছে আশ্রয় চাইলেন। যায়নাব তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। কেউ কিছুই জানলো না।[২৬]

রাত কেটে গেল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর তাহরীমা বেঁধেছেন। পিছনের মুকতাদীরাও তাকবীর তাহরীমা শেষ করেছে। এমন সময় পিছনে মেয়েদের কাতার থেকে যায়নাবের (রা) কণ্ঠস্বর ভেসে এলো— 'ওহে জনমণ্ডলী, আমি মুহাম্মাদের (সা) কন্যা যায়নাব। আমি আবুল 'আসকে নিরাপত্তা দিয়েছি, আপনারাও তাঁকে নিরাপত্তা দিন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করে লোকদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যা শুনেছি তোমরাও কি তা শুনেছো?"

লোকেরা জবাব দিল, 'হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ, আমি এ ঘটনার কিছুই জানিনে। কী অবাক কাণ্ড! মুসলমানদের একজন দুর্বল সদস্যাও শত্রুকে নিরাপত্তা দেয়। সে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে।'[২৭]

---

২৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৭, ৩৯৯-৪০০; তাবাকাত-৮/৩৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯

২৫. আল-ইসাবা-৪/১২২

২৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৭৭, ৩৯৯

২৭. প্রাগুক্ত-১/৩৯৯-৪০০; তাবাকাত-৮/৩৩

অতঃপর রাসূল (সা) ঘরে গিয়ে মেয়েকে বললেন, 'আবুল আসের থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা করবে। তবে জেনে রেখ তুমি আর তার জন্য হালাল নও। যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে। হযরত যায়নাব (রা) পিতার কাছে আবেদন জানালেন আবুল 'আসের কাফিলার লোকদের অর্থসম্পদসহ মুক্তিদানের জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেই বাহিনীর লোকদের ডাকলেন যারা আবুল 'আসের কাফিলার উট ও লোকদের ধরে নিয়ে এসেছিল। তিনি তাদের বললেন, 'আমার ও আবুল 'আসের মধ্যে যে সম্পর্ক তা তোমরা জান। তোমরা তার বাণিজ্য সম্ভার আটক করেছো। তার প্রতি সদয় হয়ে তার মালামাল ফেরত দিলে আমি খুশী হবো। আর তোমরা রাজী না হলে আমার কোন আপত্তি নেই। আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে তোমরা তা ভোগ করতে পার। তোমরাই সেই মালের বেশী হকদার।' তারা বললো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তার সবকিছু ফেরত দিচ্ছি।'[২৮]

আবুল 'আস চললেন তাদের সাথে মালামাল বুঝে নিতে। পথে তারা আবুল 'আসকে বললো, শোন আবুল 'আস, কুরায়শদের মধ্যে তুমি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। তাছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই এবং তাঁর মেয়ের স্বামী। তুমি এক কাজ কর। ইসলাম গ্রহণ করে মক্কাবাসীদের এ মালামালসহ মদীনায় থেকে যাও। বেশ আরামে থাকবে। আবুল 'আস বললেন, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি আমার নতুন দ্বীনের জীবন শুরু করবো শঠতার মাধ্যমে?[২৯]

আবুল 'আস তাঁর কাফিলা ছাড়িয়ে নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। মক্কায় প্রত্যেকের মাল বুঝে দিয়ে তিনি বললেন, 'হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা! আমার কাছে তোমাদের আর কোন কিছু পাওনা আছে কি?' তারা বললো না। আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমরা তোমাকে একজন চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী রূপে পেয়েছি।

আবুল 'আস বললেন, 'আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা করছি– আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর একজন বান্দা ও রাসূল। মদীনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম। কিন্তু তা দিইনি এ জন্যে যে, তোমরা ধারণা করতে আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমন করেছি। আল্লাহ যখন তোমাদের যার যার মাল ফেরত দানের তাওফীক আমাকে দিয়েছেন এবং আমি আমার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছি, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।'

এ হিজরী সপ্তম সনের মুহাররম মাসের ঘটনা। এরপর হযরত আবুল 'আস (রা) জন্মভূমি মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হন।[৩০]

---

২৮. ইবন হিশাম-১/৬৫৮; তাবাকাত-৮/৩৩

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

হযরত রাসূলে কারীম (সা) সম্মানের সাথে আবুল 'আসকে (রা) গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বিয়ের প্রথম 'আকদের ভিত্তিতে স্ত্রী যায়নাবকেও (রা) তাঁর হাতে সোপর্দ করেন।[৩১]

হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসকে তাঁর পৌত্তলিক অবস্থায় মক্কায় ছেড়ে এসেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। পরে আবুল 'আস যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলেন তখন রাসূল (সা) যায়নাবকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, প্রথম 'আকদের ভিত্তিতে যায়নাবকে প্রত্যর্পণ করেছিলেন, না আবার নতুন 'আকদ হয়েছিল? এ ব্যাপারে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন :[৩২]

اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ إِبْنَتَهُ اِلى أبى الْعَاصِ بَعْدَ سِنِيْنَ بِنِكَاحِهَا الاَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ صُدَاقًا.

'রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মেয়েকে অনেক বছর পর প্রথম বিয়ের ভিত্তিতে আবুল 'আসের নিকট ফিরিয়ে দেন এবং কোন রকম নতুন মাহর ধার্য করেননি।'

ইমাম শা'বী বলেন :[৩৩]

اَسْلَمَتْ زَيْنَبُ وَهَاجَرَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَبُو الْعَاصِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

'যায়নাব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাতও করেন। তারপর আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাননি।'

এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তখনও পর্যন্ত সূরা আল-মুমতাহিনার নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়নি :[৩৪]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ، أَللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ، لاَهُنَّ حِلٌ لَهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ.

"মু'মিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফিদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফিররা এদের জন্যে হালাল নয়।"

এ আয়াত ব্যক্ত করছে যে, যে নারী কোন কাফির পুরুষের স্ত্রী ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিয়ে কাফিরের সাথে আপনা-আপনি বাতিল হয়ে গেছে। এখন তারা একে অপরের জন্যে হারাম।

---

৩১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯; আল ইসাবা-৪/৩১২,

৩২. ইবন হিশাম-১/৬৫৮-৫৯; তিরমিজী (১১৪৩); ইবন মাজাহ (২০০৯); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৯

৩৩. তাবাকাত-৮/৩২

৩৪. সূরা আল-মুমতাহিনা-১০

একই ধরনের কথা হযরত কাতাদাও বলেছেন। তিনি বলেন :[৩৫]

ثُمَّ أُنْزِلَتْ (بَرَاءَةٌ) بَعْدُ فَإِذَا أَسْلَمَتْ إِمْرَأَةٌ قَبْلَ زَوْجِهَا، فَلاَسَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلاَّ بِخِطْبَةٍ.

'এ ঘটনার পরে নাযিল হয় সূরা 'আল-বারায়াত'। অতঃপর কোন স্ত্রী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে নতুন করে 'আকদ ছাড়া স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন প্রকার অধিকার থাকতো না।'

কিন্তু তার পূর্বে মুসলিম নারীরা স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর নতুন 'আকদ ছাড়াই স্বামীর কাছে ফিরে যেতেন।[৩৬]

তবে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে :[৩৭]

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيْدٍ.

'নবী (সা) নতুন বিয়ে ও নতুন মাহরের ভিত্তিতে যায়নাবকে আবুল 'আসের নিকট প্রত্যর্পণ করেন।' ইমাম আহমাদ বলেন : এটি একটি দুর্বল হাদীছ।

সনদের দিক দিয়ে ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণনাটি যদিও অপর বর্ণনাটির উপর প্রাধান্যযোগ্য, তবুও ফকীহরা দ্বিতীয়বার 'আকদের বর্ণনাটির উপর আমল করেছেন। তাঁরা ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণনাটির এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যেহেতু দ্বিতীয় 'আকদের সময় মাহর ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ছিল, তাই তিনি প্রথম 'আকদ বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় এ ধরনের বিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার 'আকদ অপরিহার্য। ইমাম সুহায়লীও এরূপ কথা বলেছেন।[৩৮]

হযরত যায়নাব (রা) পিতা রাসূলুল্লাহ (সা) ও স্বামী আবুল 'আস (রা)— উভয়কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। ভালো দামী কাপড় পরতে আগ্রহী ছিলেন। হযরত আনাস (রা) একবার তাঁকে একটি রেশমী চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। চাদরটির পাড় ছিল হলুদ বর্ণের।[৩৯]

হযরত আবুল 'আসের (রা) ঔরসে হযরত যায়নাবের (রা) দুইটি সন্তান জন্মলাভ করে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলে 'আলী হিজরতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন 'আলী নানার উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। বালেগ হওয়ার পূর্বে পিতা আবুল 'আসের (রা) জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন।[৪০]

---

৩৫. তাবাকাত-৮/৩২
৩৬. আল-ইসাবা-৪/৩১২
৩৭. তিরমিজী (১১৪২); তাবাকাত-৮/৩২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৪৮
৩৮. ইবন হিশাম (টীকা)-১/৬৫৯
৩৯. তাবাকাত-৮/৩৩-৩৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫০
৪০. আল-আ'লাম-৩/৬৭

কিন্তু ইবন 'আসাকিরের একটি বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, 'আলী ইয়ারমূক যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৪১] মেয়ে উমামা (রা) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।

হযরত যায়নাব (রা) স্বামী আবুল 'আসের (রা) সাথে পুনর্মিলনের পর বেশীদিন বাঁচেননি। এক বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশীদিন মদীনায় স্বামীর সাথে কাটানোর পর হিজরী অষ্টম সনের প্রথম দিকে মদীনায় ইনতিকাল করেন।[৪২] তাঁর মৃত্যুর কারণ ও অবস্থা সম্পর্কে ইবন 'আবদিল বার লিখেছেন :[৪৩]

'হযরত যায়নাবের (রা) মৃত্যুর কারণ হলো, যখন তিনি তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে বের হন তখন হাব্বার ইবন আল-আসওয়াদ ও অন্য এক ব্যক্তি তাঁর উপর আক্রমণ করে। তাদের কেউ একজন তাঁকে পাথরের উপর ফেলে দেয়। এতে তাঁর গর্ভপাত ঘটে রক্ত ঝরে এবং তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রোগে ভুগতে থাকেন। অবশেষে হিজরী অষ্টম সনে ইনতিকাল করেন।

হযরত উম্মু আয়মান (রা), হযরত সাওদা (রা), হযরত উম্মু সালামা (রা) ও হযরত উম্মু 'আতিয়্যা (রা), হযরত যায়নাবকে (রা) গোসল দেন।[৪৪] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং নিজে কবরে নেমে নিজ হাতে অতি আদরের মেয়েটিকে কবরের মধ্যে রেখে দেন। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) চেহারা মুবারক খুবই বিমর্ষ ও মলিন দেখাচ্ছিল। তিনি তাঁর জন্য দু'আ করেন এই বলে : হে আল্লাহ! যায়নাবের (রা) সমস্যাসমূহের সমাধান করে দিন এবং তার কবরের সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততায় পরিবর্তন করে দিন।[৪৫]

হযরত উম্মু 'আতিয়া (রা) বলেন, আমি যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) গোসলে শরীক ছিলাম। গোসলের নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই বলে দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, প্রথমে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিন অথবা পাঁচবার গোসল দিবে। তারপর কর্পূর লাগাবে।[৪৬] একটি বর্ণনায় সাতবার গোসল দেওয়ার কথাও এসেছে। মূলত উদ্দেশ্য ছিল তাহারাত বা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যদি তিন বারে অর্জিত হয়ে যায় তাহলে বেশী ধোয়ার প্রয়োজন নেই। তা না হলে পাঁচ/সাত বারও ধুতে হবে। উম্মু 'আতিয়্যা আরও বলেন :[৪৭] আমরা যখন যায়নাবকে গোসল দিচ্ছিলাম তখন রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন : 'তোমরা তার ডান দিক ও ওজুর স্থানগুলি হতে গোসল আরম্ভ করবে।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মু 'আতিয়্যাকে (রা) একথাও বলেন যে, গোসল শেষ হলে তোমরা আমাকে জানাবে। সুতরাং গোসল শেষ হলে তাঁকে জানানো হয়। তিনি নিজের

---

৪১. আল-ইসাবা-৪/৩১২
৪২. তাবাকাত-৮/৩৪; আল-আ'লাম-৩/৬৭
৪৩. আল-ইসতী 'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা) ৪/৩১২
৪৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০
৪৫. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৮; তাবাকাত-৮/৩৪
৪৬. তাবাকাত-৮/৩৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫০
৪৭. প্রাগুক্ত

একখানি তবন (লুঙ্গি) দিয়ে বলেন, এটি কাফনের কাপড়ের মধ্যে প্রতীক হিসেবে দিয়ে দাও।[৪৮] রাসূল (সা) যায়নাবকে (রা) তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) পাশে দাফন করার নির্দেশ দেন।[৪৯]

হযরত যায়নাবের (রা) ইনতিকালের অল্প কিছুদিন পর তাঁর স্বামী আবুল 'আসও (রা) ইনতিকাল করেন।[৫০] বালাজুরী বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি এবং হিজরী ১২ সনে ইনতিকাল করেন। হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) ছিলেন তাঁর মামাতো ভাই। মৃত্যুর পূর্বে তাঁকেই অসী বানিয়ে যান।[৫১]

---

৪৮. বুখারী: বাবু গুসলিল মায়্যিত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫২

৪৯. আনসাবুল আশরাফ-১/২১২

৫০. উসুদুল গাবা-৫/৪৬৮

৫১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০

রুকায়্যা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত খাদীজার (রা) মেঝো মেয়ে হযরত রুকায়্যা (রা)। পিতা মুহাম্মাদের (সা) নবুওয়াত লাভের সাত বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। যুবাইর ও তাঁর চাচা মুসআব যিনি একজন কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ, ধারণা করেছেন, রুকায়্যা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ছোট মেয়ে। জুরজানী এ মত সমর্থন করেছেন। তবে অধিকাংশের মতে যায়নাব (রা) হলেন বড়, আর রুকায়্যা মেঝো। ইবন হিশামের মতে, রুকায়্যা মেয়েদের মধ্যে বড়।[১]

মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক সংকলিত একটি বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স যখন তিরিশ তখন হযরত যায়নাবের (রা) জন্ম হয় এবং তেত্রিশ বছর বয়সে জন্ম হয় হযরত রুকায়্যার (রা)।[২] যাই হোক, সীরাত বিশেষজ্ঞরা হযরত রুকায়্যাকে রাসূলুল্লাহর (সা) মেঝো মেয়ে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বে মক্কার আবু লাহাবের পুত্র 'উতবার সাথে হযরত রুকায়্যার (রা) প্রথম বিয়ে হয়।[৩] রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। কুরায়শদের সাথে তাঁর বিরোধ যখন চরম আকার ধারণ করে তখন তারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার সকল পথ ও পন্থা বেছে নেয়। তারা সকল নীতি-নৈতিকতার মাথা খেয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে মুহাম্মাদের বিবাহিত মেয়েদের স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ অথবা প্রলোভন দেখিয়ে প্রত্যেকের স্ত্রীকে তালাক দেওয়াবে এবং পরে তাদের পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেবে। তাতে অন্তত মুহাম্মাদের মনোকষ্ট ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। তারা প্রথমে গেল রাসূলুল্লাহর (সা) বড় মেয়ের স্বামী আবুল 'আস ইবন রাবী'র নিকট। আবদার জানালো তাঁর স্ত্রী যায়নাব বিনত মুহাম্মাদকে তালাক দিয়ে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেওয়ার। কিন্তু তিনি তাদের মুখের উপর সাফ 'না' বলে দিলেন। নির্লজ্জ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এমন জবাব শুনেও থামলো না। তারা গেল রুকায়্যার (রা) স্বামী 'উতবা ইবন আবী লাহাবের নিকট এবং তার স্ত্রীকে তালাক দানের জন্যে চাপ প্রয়োগ করলো। সাথে সাথে এ প্রলোভনও দিল যে, সে কুরায়শ গোত্রের যে সুন্দরীকেই চাইবে তাকে তার বউ বানিয়ে দেওয়া হবে। বিবেকহীন 'উতবা তাদের প্রস্তাব মেনে নিল। সে রুকায়্যার বিনিময়ে সা'ঈদ ইবনুল 'আস,[৪] মতান্তরে আবান ইবন সা'ঈদ ইবনুল 'আসের একটি মেয়েকে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। কুরায়শ নেতারা সানন্দে তার এ দাবী মেনে নিল। তাদের না মানার কোন কারণ ছিল না। তাদের তো প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে

---

১. সীরাত ইবন হিশাম-১/১৯০

২. আল ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা)-৪/২৯৯

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ-৮/৩৬

৪. আনসাবুল আশরাফ–১/৪০১

কোনভাবে এবং যতটুকু পরিমাণেই হোক মুহাম্মাদকে (সা) দৈহিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা। মুহাম্মাদের (সা) একটু কষ্টতেই তাদের মানসিক প্রশান্তি। নরাধম 'উতবা তার স্ত্রী সয়্যিদা রুকায়্যাকে (রা) তালাক দিল।[৫]

তবে এ ব্যাপারে আরেকটি বর্ণনা এই যে, যখন 'উতবার পিতা-মাতার নিন্দায় সূরা 'লাহাব'– تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ নাযিল হয় তখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল-হাম্মালাতাল হাতাব– ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলে 'উতবাকে বললো, তুমি যদি মুহাম্মাদের মেয়ে রুকায়্যাকে তালাক দিয়ে বিদায় না কর তাহলে তোমার সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই। মাতা-পিতার অনুগত সন্তান মা-বাবাকে খুশী করার জন্যে স্ত্রী রুকায়্যাকে তালাক দেয়।[৬] উল্লেখ্য যে, 'উতবার সাথে রুকায়্যার কেবল আক্‌দ হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসের পূর্বেই তালাকের এ ঘটনা ঘটে।[৭]

হযরত রুকায়্যার (রা) দ্বিতীয় বিয়ে

হযরত 'উছমান (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণ ও বিয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি পবিত্র কা'বার আঙ্গিনায় কয়েকজন বন্ধুর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় কোন এক ব্যক্তি এসে আমাকে জানালো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মেয়ে রুকায়্যাকে 'উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু হযরত রুকাইয়্যা রূপ-লাবণ্য এবং ঈর্ষণীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের জন্যে স্বাতন্ত্রের অধিকারিণী ছিলেন, এ কারণে তাঁর প্রতি আমার খানিকটা মানসিক দুর্বলতা ছিল। আমি তাঁর বিয়ের সংবাদ শুনে কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লাম। তাই উঠে সোজা বাড়ী চলে গেলাম। তখন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন আমার খালা সা'দা। তিনি ছিলেন আবার একজন 'কাহিনা' (ভবিষ্যদ্বক্তা)।[৮] আমাকে দেখেই তিনি অকস্মাৎ নিম্নের কথাগুলো বলতে আরম্ভ করলেন :

أَبْشِرْ وَحُيِّيْتَ ثَلاَثًا وِتْرًا، ثُمَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثًا أُخْرى، ثُمَّ بِأُخْرى كَى تَتَمُّ عَشْرًا، لَقِيْتَ خَيْرًا وَوَقِيْتَ شَرًّا نَكَحْتَ وَاللهِ حَصَانًا زَهْرًا، وَأَنْتَ بِكْرٌ وَلَقِيْتَ بِكْرًا.

'(হে উছমান) তোমার জন্য সুসংবাদ। তোমার প্রতি তিনবার সালাম। আবার তিনবার। তারপর আবার তিন বার। শেষে একবার সালাম। তাহলে মোট দশটি সালাম পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি শুভ ও কল্যাণের সাথে মিলিত হবে এবং অমঙ্গল থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহর কসম, তুমি একজন ফুলের কুঁড়ির মত সতী-সাধ্বী সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছো। তুমি একজন কুমার, এক কুমারী পাত্রীই লাভ করেছো।'

---

৫. সীরাতু ইবন হিশাম–১/৬৫২

৬. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগিল আমানী-২২/৯৯ (হাদীস নং ৮৯৩)

৭. তাবাকাত-৮/৩৬

৮. ইসলাম-পূর্ব আরবের ইতিহাসে বহু কাহিন ও কাহিনার নাম পাওয়া যায়। তারা সাধারণত হেঁয়ালিপূর্ণ ও ধাঁধামূলক কথায় সত্য ও অর্ধসত্য ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতো।

তাঁর এমন কথাতে আমি ভীষণ তাজ্জব বনে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, খালা! আপনি এসব কী বলছেন? তিনি বললেন :

عُثْمَانُ، يَاعُثْمَانُ، يَاعُثْمَانُ! لَكَ الْجَمَالُ وَلَكَ الشَّأْنُ هٰذَا نَبِيٌّ مَعَهُ الْبُرْهَانُ اَرْسَلَهُ بِحَقِّهِ الدَّيَّانُ وَجَاءَ التَّنْزِيْلُ وَالْفُرْقَانُ فَاتَّبِعْهُ لَايَغُرَّنَّكَ الاَوْثَانُ.

'উছমান, উছমান, হে 'উছমান! তুমি সুন্দরের অধিকারী, তোমার জন্যে আছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইনি নবী, তাঁর সাথে আছে দলিল-প্রমাণ। তিনি সত্য-সঠিক রাসূল। তাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ কর, মূর্তির ধোঁকায় পড়ো না।'

আমি এবারও কিছু বুঝলাম না। আমি তাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলার জন্যে অনুরোধ করলাম। এবার তিনি বললেন :

إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ دُوْنِ اللهِ جَاءَ بِنَزِيْلِ اللهِ يَدْعُوْ بِهِ إِلَى اللهِ، مِصْبَاحُهُ مِصْبَاحٌ وَدِيْنُهُ فَلَاحٌ، مَايَنْفَعُ الصَّبَاحُ وَلَوْ وَقَعَ الرِّمَاحُ وَسَلَّتِ الصَّفَاحُ وَمُدَّتِ الرِّمَاحُ.

'মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ যিনি আল্লাহর রাসূল, কুরআন নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর প্রদীপই প্রকৃত প্রদীপ, তাঁর দীনই সফলতার মাধ্যম। যখন মারামারি কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে এবং অসি উন্মুক্ত হবে এবং বর্শা নিক্ষেপ করা হবে তখন শোরগোল হৈচৈ কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।'

তাঁর একথা আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করলো। আমি ভবিষ্যতের করণীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। আমি প্রায়ই আবু বকরের কাছে গিয়ে বসতাম। দুইদিন পর আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম তখন সেখানে কেউ ছিলনা। আমাকে চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, আজ তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাই আমি আমার খালার বক্তব্যের সারকথা তাঁকে বললাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন : 'উছমান, তুমি একজন বুদ্ধিমান মানুষ। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য যদি তুমি করতে না পার তাহলে সেটা হবে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তোমার স্বজাতির লোকেরা যে মূর্তিগুলির উপাসনা করে, সেগুলি কি পাথরের তৈরী নয়- যারা কোন কিছু শুনতে পায় না, দেখতে পারে না এবং কোন উপকার ও অপকারও করার ক্ষমতা তারা রাখেনা? উছমান বললেন, আপনি যা বলছেন, তা সবটুকু সত্য।

আবু বকর বললেন, তোমার খালা যে কথা বলেছেন তা সত্য। মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্যে তাঁকে পাঠিয়েছেন। যদি তুমি তাঁর কাছে যাও এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শোন, তাতে ক্ষতির কী আছে? তাঁর একথার পর আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে. তাঁদের এ আলোচনার কথা শুনে রাসূল (সা) নিজেই 'উছমানের (রা) নিকট

যান। রাসূল (সা) বলেন, শোন উছমান, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দিকে ডাকছেন, তুমি সে ডাকে সাড়া দাও। আমি আল্লাহর রাসূল– তোমাদের তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি আমাকে পাঠানো হয়েছে।

আল্লাহই জানেন তাঁর এ বাক্যটির মধ্যে কী এমন শক্তি ছিল! আমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। অবলীলাক্রমে আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো কালেমায়ে শাহাদাত– আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।[৯]

এ ঘটনার পর মক্কাতেই হযরত উছমানের (রা) সাথে হযরত রুকায়্যার (রা) বিয়ের 'আকদ সম্পন্ন হয়।

হযরত রুকায়্যা (রা) তাঁর মা উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) ও বড় বোন হযরত যায়নাবের (রা) সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১০] অন্য মহিলারা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) বাই'আত করেন তখন তিনিও বাই'আত করেন।[১১]

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে তিনি স্বামী হযরত 'উছমানের (রা) সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। হযরত আসমা বিন্‌ত আবী বকর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) ও আবু বকর হিরাগুহায় অবস্থান করতেন আর আমি তাঁদের দুইজনের খাবার নিয়ে যেতাম। একদিন হযরত 'উছমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হিজরাতের অনুমতি চাইলে তাঁকে হাবশায় যাওয়ার অনুমতি দান করেন। অতঃপর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মক্কা ছেড়ে হাবশার দিকে চলে যান। তারপর আমি আবার যখন তাঁদের খাবার নিয়ে গেলাম তখন রাসূল (সা) জানতে চান : উছমান ও রুকায়্যা কি চলে গেছে? বললাম : জী হাঁ, তাঁরা চলে গেছেন। তখন তিনি আমার পিতা আবু বকরকে (রা) শুনিয়ে বললেন :

إِنَّهُمَا لأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بَعْدَ إِبْرَاهِيْمَ ولوط.

'নিশ্চয় তারা দুইজন ইবরাহীম ও লূত-এর পর প্রথম হিজরাতকারী।'[১২]

কিছুকাল হাবশায় অবস্থানের পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কার কাফিরদের অপতৎপরতার মাত্রা তখন আরো বেড়ে গিয়ে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। তাই সেখানে অবস্থান করা সমীচীন মনে করলেন না। আবার হাবশায় ফিরে গেলেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা) তাঁর স্ত্রী রুকায়্যাকে (রা) নিয়ে হাবশার দিকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের খবর রাসূলুল্লাহর নিকট আসতে দেরী হলো। এরমধ্যে এক কুরায়শ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। সে বললো : মুহাম্মাদ, আমি আপনার জামাইকে তার স্ত্রীসহ যেতে দেখেছি। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : তুমি

৯. আল-ইসাবা-৪/৩২৭-২৮

১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৫১

১১. তাবাকাত-৮/৩৬

১২. আনসাবুল 'আশরাফ-১/১৯৯। হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেন : 'উছমান ইবন 'আফফান সপরিবারে মহান আল্লাহর দিকে প্রথম হিজরাতকারী।' (হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৬)।

তাদের কি অবস্থায় দেখেছো? সে বললো : দেখলাম সে তার স্ত্রীকে একটি দুর্বল গাধার উপর বসিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) তখন মন্তব্য করলেন :

صَحِبَهُمَا اللهُ، إِنْ عُثْمَانَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوْطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

'আল্লাহ তাদের সাথী হোন। লূত আলাইহিস সালামের পরে উছমান প্রথম ব্যক্তি যে সস্ত্রীক হিজরাত করেছে।'[১৩]

তাঁরা দ্বিতীয়বার বেশ কিছুদিন হাবশায় অবস্থান করার পর মক্কায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন মক্কায় থেকে পরিবার-পরিজনসহ আবার চিরদিনের জন্য মদীনায় হিজরাত করেন।[১৪]

দ্বিতীয়বার হাবশায় অবস্থানকালে হযরত রুকায়্যার (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। এ 'আবদুল্লাহর নামেই হযরত 'উছমানের (রা) উপনাম হয় আবু 'আবদিল্লাহ। এর পূর্বে হাবশায় প্রথম হিজরাতের সময় তার গর্ভের একটি সন্তান নষ্ট হয়ে যায়।[১৫] কাতাদা বলেন, 'উছমানের (রা) ঔরসে রুকায়্যার (রা) কোন সন্তান হয়নি। ইবন হাজার বলেন, এটা কাতাদার একটি ধারণা মাত্র। এমন কথা তিনি ছাড়া আর কেউ বলেননি।[১৬] তবে 'আবদুল্লাহর পরে হযরত রুকায়্যার (রা) আর কোন সন্তান হয়নি।[১৭]

'আবদুল্লাহর বয়স যখন মাত্র ছয় বছর তখন হঠাৎ একদিন একটি মোরগ তার একটি চোখে ঠোকর দেয় এবং তাতে তার মুখমণ্ডল ফুলে গোটা শরীরে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই দুর্ঘটনায় হিজরী চতুর্থ সনের জামাদিউল আওয়াল মাসে সে মারা যায়।[১৮] রাসূল (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত 'উছমান (রা) কবরে নেমে তার দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।

মদীনা পৌঁছার পর হযরত রুকায়্যা (রা) হিজরী দ্বিতীয় সনে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন। তখন ছিল বদর যুদ্ধের সময়কাল। হযরত রাসূলে কারীম (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি 'উছমানকে (রা) তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার জন্যে মদীনায় রেখে নিজে বদরে চলে যান। হিজরাতের এক বছর সাত মাস পরে পবিত্র রমজান মাসে হযরত রুকায়্যা ইনতিকাল করেন। উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে রুকায়্যাকে কবর দিয়ে মাটি সমান করছিলাম ঠিক তখন আমার পিতা যায়দ ইবন হারিছা বদরের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূল (সা) আমাকে 'উছমানের সাথে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।[১৯]

---

১৩. আল-বিদায়া-৩/৬৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫১
১৪. তাবাকাত-৮/৩৬
১৫. প্রাগুক্ত; উসুদুল গাবা-৫/৩৫৬
১৬. আল-ইসতী'আব-৪/৩০০
১৭. তাবাকাত-৮/৩৬
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫১
১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৪২-৪৩; আনসাবুল আশরাফ-১/২৯৪, ৪৭৫

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তারা যখন রুকায়্যার (রা) দাফন কাজে ব্যস্ত ঠিক সে সময় 'উছমান (রা) দূর থেকে আসা একটি তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেয়ে উসামার (রা) নিকট জানতে চান এটা কী? তাঁরা তাকিয়ে দেখতে পেলেন যায়দ ইবন হারিছা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীর উপর সওয়ার হয়ে আছেন এবং বদরে মক্কার কুরায়শ নেতাদের হত্যার খবর ঘোষণা করছেন।[২০]

অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য হযরত 'উছমান (রা) বদরের মত এত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে রাসূল (সা) তাঁকে বদরের অংশীদার গণ্য করে গণীমতের অংশ দান করেন। 'উছমান (রা) জানতে চান, জিহাদের সাওয়াবের কি হবে? রাসূল (সা) বলেন : তুমি সাওয়াবও লাভ করবে।[২১]

ইবন 'আব্বাস বলেন, রুকায়্যার (রা) মৃত্যুর পর রাসূল (সা) বলেন :[২২]

اَلْحِقِىْ بِسَلَفِنَا الصَّالِح عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ.

'তুমি আমাদের পূর্বসূরী 'উছমান ইবন মাজ'উনের সাথে মিলিত হও।'[২৩] মহিলারা কাঁদতে থাকে। এসময় 'উমার (রা) এসে তাঁর হাতের চাবুক উঁচিয়ে পেটাতে উদ্যত হন। রাসূল (সা) হাত দিয়ে তাঁর চাবুকটি ধরে বলেন, ছেড়ে দাও। তারা তো কাঁদছে। অন্তর ও চোখ থেকে যা বের হয়, তা হয় আল্লাহ ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে। আর হাত ও মুখ থেকে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তা হয় শয়তান থেকে। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে কবরের ধারে বসেছিলেন। রাসূল (সা) নিজের কাপড়ের কোনা দিয়ে তাঁর চোখের পানি মুছে দিচ্ছিলেন।[২৪]

ইবন সা'দ উপরোক্ত বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, সকল বর্ণনাকারীর নিকট এটাই সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত যে, রুকায়্যার (রা) মৃত্যু ও দাফনের সময় রাসূল (সা) বদরে ছিলেন। সম্ভবত এটা রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য মেয়ের মৃত্যুর সময়ের ঘটনা। আর যদি রুকায়্যার মৃত্যু সময়ের হয় তাহলে সম্ভবত রাসূল (সা) বদর থেকে ফিরে আসার পরে কবরের পাশে গিয়েছিলেন, আর মহিলারাও তখন ভীড় করেছিলেন।[২৫] মুসনাদে ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলের (সা) অনিচ্ছার কারণে উছমানের (রা) পরিবর্তে আবু তালহা (রা) কবরে নেমে রুকায়্যাকে (রা) শায়িত করেন। এ ক্ষেত্রেও

---

২০. আল-ইসাবা-৪/৩০৫

২১. আনসাবুল আশরাফ-১/২৮৯; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৭৮

২২. আল ইসাবা-৪/৩০৪

২৩. 'উছমান ইবন মাজ'উন (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) মামা। তিনি দুইবার হাবশায় হিজরাত করেন। সর্বশেষ মদীনায় হিজরাত করেন। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি হযরত রুকায়্যার (রা) পূর্বে মারা যান। বালাজুরীর বর্ণনা মতে, তিনি হিজরী ২য় সনের জিলহাজ্জ মাসে মদীনায় ফিরে এসে হিজরাতের তিরিশ মাস পরে মারা যান। (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-২/২৭) আর হযরত রুকায়্যা (রা) বদর যুদ্ধের সময় মারা যান, এ ব্যাপারে সকলে একমত। সুতরাং বিষয়টি বোধগম্য নয়।

২৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫২; তাবাকাত-৮/৩৭।

২৫. তাবাকাত-৮/৩৭

একই প্রশ্ন উঠেছে যে, তা কেমন করে সম্ভব? রাসূল (সা) তো তখন বদরে। তাই মুহাদ্দিছগণ বলেছেন, এটা উম্মু কুলছূমের (রা) দাফনের সময়ের ঘটনা। তাছাড়া অপর একটি বর্ণনায় উম্মু কুলছূমের (রা) নাম এসেছে।[২৬]

উল্লেখ্য যে, উম্মু কুলছূম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) তৃতীয় মেয়ে– রুকায়্যার (রা) মৃত্যুর পর 'উছমান (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। কিছুদিন পর তিনি মারা যান।

হযরত রুকায়্যা (রা) খুবই রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন। 'দুররুল মানছূর' গ্রন্থে এসেছে : 'তিনি ছিলেন দারুণ রূপবতী। হাবশায় অবস্থানকালে সেখানকার একদল বখাটে লোক তাঁর রূপ-লাবণ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এই দলটি তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করে। তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করেন এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।[২৭]

প্রিয়তমা স্ত্রী ও সুখ-দুঃখের সাথীর অকাল মৃত্যুতে হযরত 'উছমান (রা) দারুণ কষ্ট পান। তাঁদের দুইজনের মধ্যে দারুণ মিল-মুহাব্বত ছিল। লোকেরা বলাবলি করতো এবং কথাটি যেন উপমায় পরিণত হয়েছিল যে,

أَحْسَنُ الزَّوْجَيْنِ رَآهُمَا الأُنْسَانُ رُقَيَّةَ وَزَوْجُهَا عُثْمَانُ.

'মানুষের দেখা দম্পতিদের মধ্যে রুকায়্যা ও তাঁর স্বামী 'উছমান হলো সর্বোত্তম।[২৮] বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, রুকায়্যা ছিলেন একজন স্বামী-সোহাগিনী এবং পতি-পরায়ণা স্ত্রী। তাঁদের স্বল্পকালের দাম্পত্য জীবনে তাঁরা কখনো বিচ্ছিন্ন হননি। সকল বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল অবস্থা তাঁরা একসাথে মুকাবিলা করেছেন। তিনি নিজে যেমন স্বামীর সেবা করে সকল যন্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা করতেন, তেমনি স্বামী 'উছমানও স্ত্রীর জীবনকে সহজ করার চেষ্টা সব সময় করতেন। একদিন রাসূল (সা) 'উছমানের (রা) ঘরে গিয়ে দেখেন রুকায়্যা স্বামীর মাথা ধুইয়ে দিচ্ছেন। তিনি মেয়েকে বলেন :[২৯]

يابنيَّة أَحْسَنِى إلى أبِىْ عَبْدِ اللهِ فَإِنَّهُ أَشْبَهَ اَصْحَابِىْ لِىْ خُلْقًا.

'আমার মেয়ে! তুমি আবু 'আবদিল্লাহর ('উছমান) সাথে ভালো আচরণ করবে। কারণ আমার সাহাবীদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে আমার সাথে তাঁর বেশী মিল'।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ও 'উছমানের স্ত্রী রুকায়্যার ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে চিরুনী। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) এই মাত্র আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দেখে গেলেন, আমি 'উছমানের মাথায় চিরুনী করছি।[৩০]

---

২৬. আল-ফাতহুর রাব্বানী মা'আ বুলুগিল আমানী-২২/১৯৯
২৭. দুররুল মানছুর-২০৭; সাহাবিয়াত-১২৮
২৮. আল-ইসাবা-৪/৩০৫
২৯. প্রাগুক্ত
৩০. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৪২

উম্মু কুলছূম বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

হযরত উম্মু কুলছূম (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) তৃতীয় মেয়ে। তবে এ ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইমাম আয-যাহাবী তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ বলেছেন।[১] যুবাইর ইবন বাক্‌কার বলেছেন, উম্মু কুলছূম ছিলেন রুকাইয়্যা ও ফাতিমা (রা) থেকে বড়। কিন্তু অধিকাংশ সীরাত লেখক এ মতের বিরোধিতা করেছেন। সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য মত এটাই যে, হযরত উম্মু কুলছূম (রা) ছিলেন হযরত রুকায়্যার (রা) ছোট।[২] তাবারী রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়েদের জন্মের ক্রমধারা উল্লেখ করেছেন এভাবে।[৩]

وولدت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة.

'যায়নাব, রুকায়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।'

হযরত রুকায়্যা (রা) ছিলেন হযরত 'উছমানের (রা) স্ত্রী। হিজরী ২য় সনে তাঁর ইনতিকাল হলে রাসূল (সা) উম্মু কুলছূমকে (রা) 'উছমানের (রা) সাথে বিয়ে দেন।[৪] যদি উম্মু কুলছূম বয়সে রুকায়্যার বড় হতেন তাহলে 'উছমানের (রা) সাথে তাঁরই বিয়ে হতো আগে, রুকায়্যার নয়। কারণ, সকল সমাজ ও সভ্যতায় বড় মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাটা আগেই করা হয়। আর এটাই বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবী।

সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) জন্ম সনের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের ছয় বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। কারণ, একথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত যে, নবুওয়াতের সাত বছর পূর্বে রুকায়্যার এবং পাঁচ বছর পূর্বে হযরত ফাতিমার (রা) জন্ম হয়। আর একথাও মেনে নেয়া হয়েছে যে, উম্মু কুলছূম (রা) ছিলেন রুকায়্যার ছোট এবং ফাতিমার বড়। তাহলে তাঁদের দুইজনের মধ্যবর্তী সময় তাঁর জন্মসন বলে মেনে নিতেই হবে। আর এই হিসেবেই তিনি নবুওয়াতের ছয় বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।[৫]

অনেকের মত হযরত উম্মু কুলছূমেরও (রা) শৈশবকাল অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। আরবের সেই সময়কালটা এমন ছিল যে, কোন ব্যক্তিরই জীবনকথা পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। এ কারণে তাঁর বিয়ের সময় থেকেই তাঁর জীবন ইতিহাস লেখা হয়েছে।

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ২/২৫২
২. সীরাতু ইবন হিশাম, ১/১৯০
৩. তারীখ আত-তাবারী (লেইডেন) ৩/১১২৮
৪. তাবাকাত, ৮/৩৫
৫. সাহাবিয়াত-১২৯

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের পূর্বে আবু লাহাবের পুত্র 'উতবার সাথে রুকায়্যার এবং তার দ্বিতীয় পুত্র 'উতাইবার সাথে উম্মু কুলছূমের বিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের পর যখন আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর নিন্দায় সূরা লাহাব নাযিল হয় তখন আবু লাহাব, মতান্তরে আবু লাহাবের স্ত্রী দুই ছেলেকে লক্ষ্য করে বলে, 'তোমরা যদি তাঁর [মুহাম্মাদ (সা)] মেয়েকে তালাক দিয়ে বিদায় না কর তাহলে তোমাদের সাথে আমার বসবাস ও উঠাবসা হারাম।'[৬] হযরত রুকায়্যার (রা) জীবনীতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, পিতা-মাতার এরূপ কথায় এবং সামাজিক চাপে 'উতবা তার স্ত্রী রুকায়্যাকে তালাক দেয়। তেমনিভাবে 'উতাইবাও মা-বাবার হুকুম তামিল করতে গিয়ে স্ত্রী উম্মু কুলছূমকে তালাক দেয়। এ হিসেবে উভয়ের তালাকের সময়কাল ও কারণ একই।[৭] উভয় বোনের বিয়ে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু স্বামীর ঘরে যাবার পূর্বেই এ ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকায়্যা (রা) মৃত্যুবরণ করলে হযরত 'উছমান (রা) স্ত্রীর শোকে বেশ বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) একদিন তাঁকে বললেন, 'উছমান, তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখছি, কারণ কি? 'উছমান (রা) বললেন, আমি এমন বিমর্ষ না হয়ে কেমন করে পারি? আমার উপর এমন মুসীবত এসেছে যা সম্ভবত: কখনো কারো উপর আসেনি। রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যার ইনতিকাল হয়েছে। এতে আমার মাজা ভেঙ্গে গেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আমার উপায় কি? তাঁর কথা শেষ না হতেই রাসূল (সা) বলে উঠলেন, জিবরীল (আ) আল্লাহর দরবার থেকে আমাকে হুকুম পৌঁছে দিয়েছেন, আমি যেন রুকায়্যার সমপরিমাণ মাহরের ভিত্তিতে উম্মু কুলছূমকেও তোমার সাথে বিয়ে দিই।[৮] অতঃপর রাসূল (সা) হিজরী ৩য় সনের রাবী'উল আউয়াল মাসে হযরত 'উছমানের (রা) সাথে উম্মু কুলছূমের 'আক্দ সম্পন্ন করেন।[৯] 'আকদের দুই মাস পরে জামাদিউস ছানী মাসে তিনি স্বামী গৃহে গমন করেন। হযরত উম্মু কুলছূম কোন সন্তানের মা হননি।[১০]

একটি বর্ণনায় এসেছে, রুকায়্যার (রা) ইনতিকালের পর 'উমার ইবন আল খাত্তাব (রা) তাঁর মেয়ে হাফসাকে (রা) উছমানের (রা) সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। একথা রাসূল (সা) জানতে পেরে 'উমারকে বলেন, আমি হাফসার জন্যে 'উছমানের চেয়ে ভালো স্বামী এবং 'উছমানের জন্যে হাফসার চেয়ে ভালো স্ত্রী তালাশ করবো। তারপর তিনি হাফসাকে বিয়ে করেন এবং উম্মু কুলছূমকে 'উছমানের সাথে বিয়ে দেন।[১১]

---

৬. তাবাকাত-৮/৩৭
৭. উসুদুল গাবা-৫/১২
৮. প্রাগুক্ত-৫/৬১৩
৯. তাবাকাত-৮/৩৭
১০. প্রাগুক্ত
১১. প্রাগুক্ত-৮/৩৮

হযরত উম্মু কুলছূম (রা) তাঁর মা উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে অন্য বোনদের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'আত করেন।[১২] রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[১৩]

হযরত উম্মু কুলছুমের (রা) ইনতিকালের পর রাসূল (সা) বলেন, আমার যদি দশটি মেয়ে থাকতো তাহলে একের পর এক তাদের সকলকে 'উছমানের (রা) সাথে বিয়ে দিতাম।[১৪] একটি বর্ণনায় দশটি মেয়ের স্থলে একশোটি মেয়ে এসেছে।[১৫]

স্বামী 'উছমানের (রা) সাথে ছয় বছর কাটানোর পর হিজরী ৯ম সনের শা'বান মাসে হযরত উম্মু কুলছূম (রা) ইনতিকাল করেন।[১৬] আনসারী মহিলারা তাঁকে গোসল দেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উম্মু 'আতিয়্যাও ছিলেন। রাসূল (সা) জানাযার নামায পড়ান। হযরত আবু তালহা, 'আলী ইবন আবী তালিব, ফাদল ইবন 'আব্বাস ও উসামা ইবন যায়দ (রা) লাশ কবরে নামান।[১৭]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) কন্যা উম্মু কুলছূমের (রা) মৃত্যুতে ভীষণ ব্যথা পান। যখন কবরের কাছে বসেন তখন চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।[১৮]

একটি বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রা) উম্মু কুলছূমকে (রা) রেখা অঙ্কিত রেশমের কাজ করা একটি চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থায় দেখেছেন।[১৯]

নরাধম 'উতায়বা তার জাহান্নামের অগ্নিশিখা পিতা আবু লাহাব এবং কাঠকুড়ানি মা উম্মু জামীল হাম্মালাতাল হাতাব-এর চাপে স্ত্রী উম্মু কুলছূমকে তালাক দানের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে চরম অমার্জিত আচরণ করে। সে রাসূলকে (সা) লক্ষ্য করে বলে : 'আমি আপনার দীনকে অস্বীকার করি, মতান্তরে আপনার মেয়েকে তালাক দিয়েছি। আপনি আর আমার কাছে যাবেন না, আমিও আর আপনার কাছে আসবো না।' একথা বলে সে গোঁয়ারের মত রাসূলুল্লাহর (সা) উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাতে রাসূলুল্লাহর (সা) জামা ছিঁড়ে যায়। এরপর সে শামের দিকে সফরে বেরিয়ে যায়। তার এমন পশুসুলভ আচরণে রাসূল (সা) ক্ষুব্ধ হয়ে বদ-দু'আ করেন এই বলে : আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন তাঁর কোন কুকুরকে তার উপর বিজয়ী করে দেন।'

---

১২. প্রাগুক্ত-৮/৩৭
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫২' হায়াতুস সাহাবা-১/৩৬৯
১৪. আল-ইসতী'আব-৭৯৩
১৫. তাবাকাত-৮/৩৮
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫৩
১৭. তাবাকাত-৮/৩৮-৩৯
১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৫৩; বুখারী ৩/১২৬-১২৭, ১৬৭,
১৯. বুখারী : বাবুল হারীর লিন-নিসা; আবু দাউদ (২০৫৮); নাসাঈ-৮/১৯৭; ইবন মাজাহ্-(৩৫৯৮); তাবাকাত-৮/৩৮

'উতাইবা কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে শামের দিকে বেরিয়ে পড়লো। যখন তারা 'আয-যারকা' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করছিল, তখন একটি নেকড়ে তাদের অবস্থান স্থলের পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। তা দেখে 'উতাইবার মনে পড়ে রাসূলুল্লাহর (সা) বদ-দু'আর কথা। সে তার জীবন নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। সে বলতে থাকে, 'আমার মা নিপাত যাক, মুহাম্মাদের কথা মত এ নেকড়ে তো আমাকে খেয়ে ফেলবে।' যাহোক, কাফেলার লোকেরা তাকে সকলের মাঝখানে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে ঘুমিয়ে পড়ে। নেকড়ে সকলকে ডিঙ্গিয়ে মাঝখান থেকে 'উতাইবাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং কামড়ে, খামছে রক্তাক্ত করে তাকে হত্যা করে।

২০. হায়াতুস সাহাবা-১/২৭৪

ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)

জন্ম ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে উম্মুল কুরা তথা মক্কা নগরীতে হযরত ফাতিমা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সায়্যিদুল কাওনায়ন রাসূলু রাব্বিল 'আলামীন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদুল মুত্তালিব এবং মাতা সারা বিশ্বের নারী জাতির নেত্রী, প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)। ফাতিমার যখন জন্ম হয় তখন মক্কার কুরায়শরা পবিত্র কা'বা ঘরের সংস্কার কাজ চালাচ্ছে। সেটা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। ফাতিমার জন্মগ্রহণে তার মহান পিতা-মাতা দারুণ খুশী হন।[১] ফাতিমা ছিলেন কনিষ্ঠা মেয়ে। মা খাদীজা (রা) তাঁর অন্য সন্তানদের জন্য ধাত্রী রাখলেও ফাতিমাকে ধাত্রীর হাতে ছেড়ে দেননি। তিনি তার অতি আদরের ছোট মেয়েকে নিজে দুধ পান করান। এভাবে হযরত ফাতিমা (রা) একটি পূতঃপবিত্র গৃহে তাঁর মহান পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে ওঠেন এবং নবুওয়াতের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারায় স্নাত হন।

শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

হযরত ফাতিমার (রা) মহত্ব, মর্যাদা, আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব কথা বলা হয় তার কারণ সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১. তাঁর পিতা মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠ সন্তান রাহমাতুল্লিল 'আলামীন আমাদের মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।
২. তাঁর মা বিশ্বের নারী জাতির নেত্রী, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)।
৩. স্বামী দুনিয়া ও আখিরাতের নেতা আমীরুল মু'মিনীন হযরত 'আলী (রা)।
৪. তাঁর দুই পুত্র-আল-হাসান ও আল-হুসায়ন (রা) জান্নাতের যুবকদের দুই মহান নেতা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সুগন্ধি (رَيْحَانَتَان)।
৫. তাঁর এক দাদা শহীদদের মহান নেতা হযরত হামযা (রা)।
৬. অন্য এক দাদা প্রতিবেশীর মান-মর্যাদার রক্ষক, বিপদ-আপদে মানুষের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ খরচকারী, উলঙ্গ ব্যক্তিকে বস্ত্র দানকারী, অভুক্ত ও অনাহার-ক্লিষ্টকে খাদ্য দানকারী হযরত আল-'আব্বাস ইবন আবদিল মুত্তালিব (রা)।
৭. তাঁর এক চাচা মহান শহীদ নেতা ও সেনানায়ক হযরত জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা)।

উল্লেখিত গৌরবের অধিকারী বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ কি আছে?

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৯

ইসলাম গ্রহণ

হযরত রাসূলে কারীমের (রা) উপর ওহী নাযিল হবার পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর রিসালাতকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। আর রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম পর্বে যেসব মহিলা ঈমান আনেন তাঁদের পুরো ভাগে ছিলেন তাঁর পূতঃ পবিত্র কন্যাগণ। তাঁরা হলেন : যায়নাব, রুকাইয়্যা, উম্মু কুলছূম ও ফাতিমা (রা)। তাঁরা তাঁদের পিতার নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনেন তাঁদের মহিয়ষী মা খাদীজার (রা) সাথে।

ইবন ইসহাক হযরত 'আয়িশার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে নবুওয়াতে ভূষিত করলেন তখন খাদীজা ও তাঁর কন্যারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যারা তাঁদের মায়ের সাথে প্রথম ভাগেই ইসলামের আঙ্গিনায় প্রবেশ করেন এবং তাঁদের পিতার রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তাঁরা উন্নত মানের নৈতিক গুণাবলীতে বিভূষিত হন। ইসলামের পরে তা আরো সুশোভিত ও সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ইমাম আয-যুরকানী 'শারহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে ফাতিমা ও তাঁর বোনদের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন এভাবে : 'তাঁর মেয়েদের কথা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কারণ, নবুওয়াতের পূর্বেই তাঁদের পিতার জীবন ও আচার-আচরণ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।' অন্য এক স্থানে আয্-'যুরকানী নবী-দুহিতাদের ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামিতা সম্পর্কে বলছেন এভাবে : মোটকথা, আগেভাগে তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সর্বাধিক সত্য, সর্বাধিক অভিজাত পিতৃত্ব এবং সবচেয়ে ভালো ও সর্বাধিক স্নেহময়ী মাতৃত্বের ক্রোড়ে বেড়ে ওঠার কারণে তাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদের পিতার সর্বোত্তম আখলাক তথা নৈতিকতা এবং তাঁদের মার থেকে পেয়েছিলেন এমন বুদ্ধিমত্তা যার কোন তুলনা চলেনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের কোন নারীর সাথে। সুতরাং নবী পরিবারের তথা তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের ইসলাম ছিল স্বচ্ছ-স্বভাবগত ইসলাম। ঈমান ও নবুওয়াত দ্বারা যার পুষ্টি সাধিত হয়। মহত্ব, মর্যাদা ও উন্নত নৈতিকতার উপর যাঁরা বেড়ে ওঠেন।[২]

শৈশব-কৈশোরে পিতার সহযোগিতা

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) উপর ওহী নাযিল হলো। তিনি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশমত মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন। আর এজন্য তিনি যত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, অত্যাচার-নির্যাতন, অস্বীকৃতি, মিথ্যা দোষারোপ ও বাড়াবাড়ির মুখোমুখী হলেন, সবকিছুই তিনি উপেক্ষা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে কুরায়শরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে চরম বাড়াবাড়ি ও শত্রুতা করতে লাগলো। তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো, তাঁর

---

২. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৫৯২

প্রতি মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে আরম্ভ করলো। হযরত ফাতিমা (রা) তখন জীবনের শৈশব অবস্থা অতিক্রম করছেন। পিতা যে তাঁর জীবনের একটা কঠিন সময় অতিবাহিত করছেন, মেয়ে ফাতিমা এত অল্প বয়সেও তা বুঝতে পারতেন। অনেক সময় তিনি পিতার সাথে ধারে-কাছে এদিক ওদিক যেতেন। একবার দুরাচারী 'উকবা ইবন আবী মু'ঈতকে তাঁর পিতার সাথে এমন একটি নিকৃষ্ট আচরণ করতে দেখেন যা তিনি আজীবন ভুলতে পারেননি। এই 'উকবা ছিল মক্কার কুরায়শ বংশের প্রতি আরোপিত। আসলে তার জন্মের কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। একজন নিকৃষ্ট ধরনের পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত হিসেবে সে বেড়ে ওঠে। তার জন্মের এই কালিমা ঢাকার জন্য সে সব সময় আগ বাড়িয়ে নানা রকম দুষ্কর্ম করে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রীতিভাজন হওয়ার চেষ্টা করতো।

একবার 'উকবা মক্কার পাপাচারী পৌত্তলিক কুরায়শদের একটি বৈঠকে বসা ছিল। কয়েকজন কুরায়শ নেতা বললো : এই যে মুহাম্মাদ সিজদায় আছেন। এখানে উপস্থিতদের মধ্যে এমন কে আছে, যে উটের এই পচাগলা নাড়ী-ভুঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে তাঁর পিঠে ফেলে আসতে পারে? নরাধম 'উকবা অতি উৎসাহ ভরে এই অপকর্মটি করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে বললো : আমি যাচ্ছি। তারপর সে দ্রুত পচা নাড়ী-ভুঁড়ির দিকে চলে গেল এবং সেগুলো উঠিয়ে সিজদারত মুহাম্মাদ (সা)-এর পিঠের উপর ফেলে দিল। দূর থেকে কুরায়শ নেতারা এ দৃশ্য দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। হযরত রাসূলে কারীম (সা) সিজদা থেকে উঠলেন না। সাথে সাথে এ খবর বাড়ীতে হযরত ফাতিমার (রা) কানে গেল। তিনি ছুটে এলেন, অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ হাতে পিতার পিঠ থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলেন এবং পানি এনে পিতার দেহে লাগা ময়লা পরিষ্কার করেন। তারপর সেই পাপাচারী দলটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে অনেক কটু কথা শুনিয়ে দেন।[৩]

রাসূল (সা) নামায শেষ করে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন :

اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعُقْبَةَ بْنِ أَبِىْ مُعَيْطٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ.

'হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবন রাবী'আকে পাকড়াও কর, হে আল্লাহ! তুমি আবূ জাহ্ল ইবন হিশামকে ধর, হে আল্লাহ! তুমি 'উকবা ইবন আবী মু'ঈতকে সামাল দাও, হে আল্লাহ তুমি উমাইয়্যা ইবন খালাফের খবর নাও।'

রাসূলুল্লাহকে (সা) হাত উঠিয়ে এভাবে দু'আ করতে দেখে পাষণ্ডদের হাসি থেমে যায়। তারা ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর দু'আ কবুল করেন। উল্লেখিত চার দুর্বৃত্তের সবাই বদরে নিহত হয়।[৪] উল্লেখ্য যে, 'উকবা বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী

---

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৪৪; হায়াত আস-সাহাবা-১/২৭১

৪. আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/২৭৮, ২৮০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৪৪

হয়। রাসূল (সা) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন সে বলে : মুহাম্মাদ! আমার ছোট্ট মেয়েগুলোর জন্য কে থাকবে? বললেন : জাহান্নাম। তারপর সে বলে, আমি কুরায়শ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তুমি হত্যা করবে? বললেন : হাঁ। তারপর তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরে বলেন : তোমরা কি জান এই লোকটি আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল? একদিন আমি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে সিজদারত ছিলাম। এমন সময় সে এসে আমার ঘাড়ের উপর পা উঠিয়ে এত জোরে চাপ দেয় যে, আমার চোখ দু'টি বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আরেকবার আমি সিজদায় আছি। এমন সময় সে কোথা থেকে ছাগলের বর্জ্য এনে আমার মাথায় ঢেলে দেয়। ফাতিমা দৌড়ে এসে তা সরিয়ে আমার মাথা ধুইয়ে দেয়। মুসলমানদের হাতে এ পাপিষ্ঠ 'উকবার জীবনের সমাপ্তি ঘটে।[৫]

সেই কিশোর বয়সে ফাতিমা পিতার হাত ধরে একদিন গেছেন কা'বার আঙ্গিনায়। তিনি দেখলেন, পিতা যেই না হাজারে আসওয়াদের কাছাকাছি গেছেন অমনি একদল পৌত্তলিক একযোগে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে লাগলো : আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি এমন এমন কথা বলে থাকেন? তারপর তারা একটা একটা করে গুনে বলতে থাকে : আমাদের বাপ-দাদাদের গালি দেন, উপাস্যদের দোষের কথা বলেন, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদেরকে নির্বোধ ও বোকা মনে করেন।

তিনি বলেন : হাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।

এর পরের ঘটনা দেখে বালিকা ফাতিমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি ভয়ে অসাড় হয়ে পড়েন। দেখেন, তাদের একজন তাঁর পিতার গায়ের চাদরটি তাঁর গলায় পেঁচিয়ে জোরে টানতে শুরু করেছে। আর আবূ বকর (রা) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন : তোমরা একটি লোককে শুধু এ জন্য হত্যা করবে যে, তিনি বলেন : আল্লাহ আমার রব, প্রতিপালক?

লোকগুলো আগুন ঝরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। তাঁর দাড়ি ধরে টানলো, তারপর মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরিয়ে ছাড়লো।[৬]

এভাবে আবূ বকর (রা) সেদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে পাষণ্ডদের হাত থেকে মুহাম্মাদকে (সা) ছাড়ালেন। ছাড়া পেয়ে তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন। মেয়ে ফাতিমা পিতার পিছনে পিছনে চললেন। পথে স্বাধীন ও দাস যাদের সাথে দেখা হলো প্রত্যেকেই নানা রকম অশালীন মন্তব্য ছুড়ে মেরে ভীষণ কষ্ট দিল। রাসূল (সা) সোজা বাড়ীতে গেলেন এবং মারাত্মক রকমের বিধ্বস্ত অবস্থায় বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। বালিকা ফাতিমার চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটলো।[৭]

---

৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৪৪; হায়াত আস-সাহাবা-১/২৭১; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২০৬

৬. ইবন হিশাম, আল-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/৩১০

৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৫৯২

ফাতিমা শি'বু আবী তালিবে

কুরায়শরা রাসূলুল্লাহর (সা) উপর নির্যাতন চালানোর নতুন পথ বেছে নিল। এবার তাদের নির্যাতনের হাত বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের প্রতিও সম্প্রসারিত হলো। মক্কার মুশরিকরা তাদেরকে বয়কট করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের কাছে নত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে কেনাবেচা, কথা বলা ও উঠাবসা বন্ধ। একমাত্র আবূ লাহাব ছাড়া বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিব মক্কার উপকণ্ঠে "শি'বু আবী তালিব"-এ আশ্রয় নেয়। তাদেরকে সেখানে অবরোধ করে রাখা হয়। অবরুদ্ধ জীবন এক সময় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। "শি'ব"-এর বাইরে থেকেও সে সময় ক্ষুধা-কাতর নারী ও শিশুদের আহাজারি ও কান্নার রোল শোনা যেত। এই অবরুদ্ধদের মধ্যে ফাতিমাও (রা) ছিলেন। এই অবরোধ তার স্বাস্থ্যের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। এখানে অনাহারে থেকে যে অপুষ্টির শিকার হন তা আমরণ বহন করে চলেন। এই অবরোধ প্রায় তিন বছর চলে।[৮]

অবরুদ্ধ জীবনের দুঃখ-বেদনা ভুলতে না ভুলতে তিনি আরেকটি বড় রকম দুঃখের মুখোমুখী হন। স্নেহময়ী মা হযরত খাদীজা (রা), যিনি তাঁদের সবাইকে আগলে রেখেছিলেন, যিনি অতি নীরবে পুণ্যময় নবীগৃহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন, ইনতিকাল করেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের (সা) যাবতীয় দায়িত্ব যেন কন্যা ফাতিমার উপর অর্পণ করে যান। তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে পিতার পাশে এসে দাঁড়ান। পিতার আদর ও স্নেহ বেশী মাত্রায় পেতে থাকেন। মদীনায় হিজরাতের আগ পর্যন্ত মক্কায় পিতার দা'ওয়াতী কার্যক্রমের সহযোগী হিসেবে অবদান রাখতে থাকেন। আর এ কারণেই তাঁর ডাকনাম হয়ে যায়– "উম্মু আবীহা" (তাঁর পিতার মা)।[৯]

হিজরাত ও ফাতিমা

যে রাতে রাসূল (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন সে রাতে 'আলী (রা) যে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করেন, ফাতিমা (রা) অতি নিকট থেকে তা প্রত্যক্ষ করেন। 'আলী (রা) নিজের জীবন বাজি রেখে কুরায়শ পাষণ্ডদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলের (সা) বিছানায় শুয়ে থাকেন। সেই ভয়াবহ রাতে ফাতিমাও বাড়ীতে ছিলেন। অত্যন্ত নির্ভীকভাবে কুরায়শদের সব চাপ প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর 'আলী (রা) তিন দিন মক্কায় থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণ করে মদীনায় পাড়ি জমান।

ফাতিমা ও তাঁর বোন উম্মু কুলছূম মক্কায় থাকলেন। রাসূল (সা) মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর পরিবারের লোকদের নেয়ার জন্য একজন সাহাবীকে পাঠালেন। আর সেটা ছিল নবুওয়াতের ১৩ তম বছরের ঘটনা। ফাতিমা (রা) তখন অষ্টাদশী। মদীনায় পৌঁছে

---

৮. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২০৬

৯. প্রাগুক্ত-২০৭; উসুদুল গাবা-৫/২৫০; আল-ইসাবা-৪/৪৫০

তিনি দেখেন সেখানে মুহাজিররা শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ের একাকীত্বের অনুভূতি তাঁদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছে। রাসূল (সা) মুহাজির ও আনসাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক করে দিয়েছেন। তিনি নিজে 'আলীকে (রা) দ্বীনি ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[১০]

বিয়ে

হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পরে 'আলীর (রা) সাথে ফাতিমার (রা) বিয়ে হয়। বিয়ের সঠিক সন তারিখ ও বিয়ের সময় ফাতিমা ও 'আলীর (রা) বয়স নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য দেখা যায়। একটি মত এরকম আছে যে, উহুদ যুদ্ধের পর বিয়ে হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) হযরত 'আয়িশাকে (রা) ঘরে উঠিয়ে নেয়ার চার মাস পরে 'আলী-ফাতিমার বিয়ে হয় এবং বিয়ের নয় মাস পরে তাঁদের বাসর হয়। বিয়ের সময় ফাতিমার (রা) বয়স পনেরো বছর সাড়ে পাঁচ মাস এবং আলীর (রা) বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস।[১১] ইবন 'আবদিল বার তাঁর "আল-ইসতী'আব" গ্রন্থে এবং ইবন সা'দ তাঁর "তাবাকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'আলী (রা) ফাতিমাকে (রা) বিয়ে করেন রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার পাঁচ মাস পরে রজব মাসে এবং বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তাঁদের বাসর হয়। ফাতিমার বয়স তখন আঠারো বছর। তাবারীর তারীখে বলা হয়েছে, হিজরী দ্বিতীয় সনে হিজরাতের বাইশ মাসের মাথায় জিলহাজ্জ মাসে 'আলী-ফাতিমার (রা) বাসর হয়। বিয়ের সময় 'আলী (রা) ফাতিমার চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন।[১২]

আবূ বকর (রা) ও 'উমারের (রা) মত উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীগণও ফাতিমাকে (রা) স্ত্রী হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবও দেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। হাকিমের মুসতাদরিক ও নাসাঈর সুনানে এসেছে যে, আবূ বকর ও 'উমার (রা) উভয়ে ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (সা) তাঁদেরকে বলেন : সে এখনো ছোট। একটি বর্ণনায় এসেছে, আবূ বকর প্রস্তাব দিলেন। রাসূল (সা) বললেন : আবূ বকর! তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আবূ বকর (রা) একথা 'উমারকে (রা) বললেন, 'উমার (রা) বললেন : তিনি তো আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর আবূ বকর (রা) 'উমারকে (রা) বললেন : এবার আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিন। 'উমার (রা) প্রস্তাব দিলেন। রাসূল (সা) আবূ বকরকে যে কথা বলে ফিরিয়ে দেন, 'উমারকেও ঠিক একই কথা বলেন। 'উমার (রা) আবূ বকরকে সে কথা বললে তিনি মন্তব্য করেন : 'উমার, তিনি আপনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৩] তারপর 'উমার (রা) 'আলীকে

---

১০. ইবন হিশাম-২/১৫০; আল-ইসতী'আব-৩/১৯৮

১১. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৯

১২. প্রাগুক্ত; তাবাকাত-৮/১১; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২০৮

১৩. তাবাকাত-৮/১১; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৮

(রা) বলেন, আপনিই ফাতিমার উপযুক্ত পাত্র। 'আলী (রা) বলেন, আমার সম্পদের মধ্যে এই একটি মাত্র বর্ম ছাড়া তো আর কিছু নেই। আলী-ফাতিমার বিয়েটি কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা দেখা যায়। সেগুলো প্রায় কাছাকাছি। এখানে কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

তাবাকাতে ইবন সা'দ ও উসুদুল গাবা'র গ্রন্থের একটি বর্ণনা মতে 'আলী (রা) 'উমারের কথামত রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (সা) সাথে সাথে নিজ উদ্যোগে আলীর (রা) সাথে ফাতিমাকে বিয়ে দেন। এ খবর ফাতিমার কানে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। অতঃপর রাসূল (সা) ফাতিমার কাছে যান এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন : ফাতিমা! আমি তোমাকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আলী (রা) প্রস্তাব দানের পর রাসূল (সা) বলেন : ফাতিমা! 'আলী তোমাকে স্মরণ করে। ফাতিমা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। অতঃপর রাসূল (সা) বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।

অন্য একটি বর্ণনা এ রকম : মদীনার আনসারদের কিছু লোক আলীকে বলেন : আপনার জন্য তো ফাতিমা আছে। একথার পর 'আলী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) বলেন : আবূ তালিবের ছেলের কি প্রয়োজন? আলী ফাতিমার প্রসঙ্গে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) শুধু বলেন : মারহাবান ওয়া আহলান। (পরিবারে সুস্বাগতম)। এর বেশী আর কিছু বললেন না। 'আলী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে উঠে অপেক্ষমান আনসারদের সেই দলটির কাছে গেলেন। তারা জিজ্ঞেস করলো : পিছনের খবর কি? 'আলী বললেন : আমি জানিনে। তিনি আমাকে "মারহাবান ওয়া আহলান" ছাড়া আর কিছুই বলেননি। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) পক্ষ থেকে আপনাকে এতটুকু বলাই কি যথেষ্ট নয়? তিনি আপনাকে পরিবারের সদস্য বলে স্বাগতম জানিয়েছেন। ফাতিমার সাথে কিভাবে বিয়ে হয়েছিল সে সম্পর্কে আলীর (রা) বর্ণনা এ রকম : রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমার বিয়ের পয়গাম এলো। তখন আমার এক দাসী আমাকে বললেন : আপনি কি একথা জানেন যে, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমার বিয়ের পয়গাম এসেছে?

বললাম : না।

সে বললো : হাঁ, পয়গাম এসেছে। আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কেন যাচ্ছেন না? আপনি গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে আপনার সাথেই বিয়ে দিবেন।

বললাম : বিয়ে করার মত আমার কিছু আছে কি?

সে বললো : যদি আপনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান তাহলে তিনি অবশ্যই আপনার সাথে তাঁর বিয়ে দিবেন।

'আলী (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! সে আমাকে এভাবে আশা-ভরসা দিতে থাকে। অবশেষে আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম। তাঁর সামনে বসার পর আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর মধ্যে বিরাজমান গাম্ভীর্য ও ভীতির ভাবের

কারণে আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। এক সময় তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন : কি জন্য এসেছো? কোন প্রয়োজন আছে কি?

আলী (রা) বলেন : আমি চুপ করে থাকলাম। রাসূল (সা) বললেন : নিশ্চয় ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছো?

আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যা দ্বারা তুমি তাকে হালাল করবে? বললাম : আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নেই। তিনি বললেন : যে বর্মটি আমি তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা কি করেছো?

বললাম : সেটা আমার কাছে আছে। 'আলীর জীবন যে সত্তার হাতে তার কসম, সেটা তো একটি "হুতামী" বর্ম। তার দাম চার দিরহামও হবে না।

রাসূল (সা) বললেন : আমি তারই বিনিময়ে ফাতিমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। সেটা তার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং তা দ্বারাই তাকে হালাল করে নাও।

'আলী (রা) বলেন : এই ছিল ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) মাহর।[১৪]

'আলী (রা) খুব দ্রুত বাড়ী গিয়ে বর্মটি নিয়ে আসেন। কনেকে সাজগোজের জিনিসপত্র কেনার জন্য রাসূল (সা) সেটি বিক্রি করতে বলেন।[১৫] বর্মটি 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফান (রা) চার 'শো সত্তর (৪৭০) দিরহামে কেনেন। এই অর্থ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে দেয়া হয়। তিনি তা বিলালের (রা) হাতে দিয়ে কিছু আতর-সুগন্ধি কিনতে বলেন, আর বাকী যা থাকে উম্মু সালামার (রা) হাতে দিতে বলেন। যাতে তিনি তা দিয়ে কনের সাজগোজের জিনিস কিনতে পারেন।

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে রাসূল (সা) সাহাবীদের ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি তাঁর মেয়ে ফাতিমাকে চার 'শো মিছকাল রূপোর বিনিময়ে 'আলীর (রা) সাথে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর আরবের প্রথা অনুযায়ী কনের পক্ষ থেকে রাসূল (সা) ও বর 'আলী (রা) নিজে সংক্ষিপ্ত খুতবা দান করেন। তারপর উপস্থিত অতিথি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খোরমা ভর্তি একটা পাত্র উপস্থাপন করা হয়।[১৬]

ফাতিমা ও 'আলীর (রা) বিয়েতে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহর (সা) খুতবা :[১৭]

الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المرهوب من عذابه، المرغوب فيما عنده، النافذ أمره فى سمائه وأرضه الذى خلق الخلق بقدرته، وميزهم بأحكامه،

---

১৪. দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৩/১৬০; উসুদুল গাবা-৫/২৫০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৩৪৬; তাবাকাত-৮/১২

১৫. সাহীহ আল-বুখারীঅ, কিতাব আল-বুয়ূ'; সুনানে নাসাঈ, কিতাব আন-নিকাহ; মুসনাদে আহমাদ-১/৯৩, ১০৪, ১০৮

১৬. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৭

১৭. জামহারাতু খুতাব আল-'আরাব-৩/৩৪৪

وأعزهم بدينه، وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى جعل المصاهرة لاحقًا، وأمرا مفترضا، ووشج ربه الأرحام، وألزمه الانام، قال تبارك اسمه، وتعالى ذكره : "وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ من الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا." فأمر الله يجرى إلى قضائه ولكل قضاء قدر، ولكل قدر أجلٌ "يَمْحُو اللهُ مَايَشَاءُ ويُثِبْتُ وعنده أُمُّ الْكِتَابِ".

ثم إن ربى أمرنى أن أزوج فاطمة من على بن أبى طالب، وقد زوجتها إياه على اربعمائة مثقال فضة، إن رضى بذلك على.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দান ও অনুগ্রহের কারণে প্রশংসিত, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে উপাস্য, শাস্তির কারণে ভীতিপ্রদ এবং তাঁর কাছে যা কিছু আছে তার জন্য প্রত্যাশিত। আসমান ও যমীনে তিনি স্বীয় হুকুম বাস্তবায়নকারী। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, তারপর বিধি নিষেধ দ্বারা তাদেরকে পার্থক্য করেছেন, দীনের দ্বারা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিবাহ ব্যবস্থাকে পরবর্তী বংশ রক্ষার উপায় এবং একটি অবশ্যকরণীয় কাজ করে দিয়েছেন। এর দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা সৃষ্টি জগতের জন্য অবধারিত করেছেন।

যাঁর নাম অতি বরকতময় এবং যাঁর স্মরণ সুমহান, তিনি বলেছেন : "তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার রব সবকিছু করতে সক্ষম।" সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেকটি চূড়ান্ত পরিণতির একটি নির্ধারিত সময় আছে। আর প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময়ের একটি শেষ আছে। 'আল্লাহ যা ইচ্ছা বিলীন করেন এবং বহাল রাখেন। আর মূল গ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।'

অতঃপর, আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেন 'আলীর সাথে ফাতিমার বিয়ে দিই। আর আমি তাঁকে চার শো 'মিছকাল' রূপোর বিনিময়ে তার সাথে বিয়ে দিয়েছি– যদি এতে আলী রাজী থাকে।'

রাসূলুল্লাহর (সা) খুতবার পর তৎকালীন আরবের প্রথা-অনুযায়ী বর 'আলী (রা) ছোট্ট একটি খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করেন। তারপর বলেন :[১৮]

---

১৮. প্রাগুক্ত-৩/৩৪৫

فان اجتماعنا مما قدره الله تعالى اورضيه، والنكاح مـاأمره الله بـه واذن فيـه، وهـذا محمد صلى الله عليه وسـلم قـد زوجنـى فاطمـة ابنتـه علـى صـداق اربعمائـة درهـم وثمانين درهما، ورضيت به فاسئلوه، وكفى بالله شهيدًا.

'আমাদের এই সমাবেশ, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর বিয়ে হলো আল্লাহ যার আদেশ করেছেন এবং যে ব্যাপারে অনুমতি দান করেছেন। এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কন্যা ফাতিমার সাথে চার শো আশি দিরহাম মাহরের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে রাজি হয়েছি। অতএব আপনারা তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'

এভাবে অতি সাধারণ ও সাদাসিধে ভাবে 'আলীর সাথে নবী দুহিতা ফাতিমাতুয যাহরার শাদী মুবারক সম্পন্ন হয়। অন্য কথায় ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ও গৌরবময় বৈবাহিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয়।

সংসার জীবন

মদীনায় আসার পর রজব মাসে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আর হিজরী দ্বিতীয় সনে বদর যুদ্ধের পর আলী (রা) তাঁর স্ত্রীকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য একটি ঘর ভাড়া করতে সক্ষম হন। সে ঘরে বিত্ত-বৈভবের কোন স্পর্শ ছিল না। সে ঘর ছিল অতি সাধারণ মানের। সেখানে কোন মূল্যবান আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক, জাজিম, গদি কোন কিছুই ছিল না। 'আলীর ছিল কেবল একটি ভেড়ার চামড়া, সেটি বিছিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতেন এবং দিনে সেটি মশকের কাজে ব্যবহার হতো। কোন চাকর-বাকর ছিল না।[১৯] আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) যিনি 'আলী-ফাতিমার (রা) বিয়ে ও তাঁদের বাসর ঘরের সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বলেছেন, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি বালিশ-বিছানা ছাড়া তাদের আর কিছু ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে 'আলীর (রা) ওলীমার চেয়ে ভালো কোন ওলীমা সে সময় আর হয়নি। সেই ওলীমা কেমন হতে পারে তা অনুমান করা যায় এই বর্ণনা দ্বারা : 'আলী (রা) তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রেখে কিছু যব আনেন।'[২০] তাঁদের বাসর রাতের খাবার কেমন ছিল তা এ বর্ণনা দ্বারা অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হয় না।

তবে বানূ 'আবদিল মুত্তালিব এই বিয়ে উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ এমন একটা ভোজ অনুষ্ঠান করেছিল যে, তেমন অনুষ্ঠান নাকি এর আগে তারা আর করেনি। সাহীহাইন ও আল-ইসাবার বর্ণনা মতে তাহলো, হামযা (রা) যিনি মুহাম্মাদ (সা) ও 'আলী উভয়ের চাচা, দুটো বুড়ো উট যবেহ করে আত্মীয়-কুটুম্বদের খাইয়েছিলেন।[২১]

---

১৯. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৯; তাবাকাত-৮/১৩; সাহাবিয়াত-১৪৮

২০. তাবাকাত-৮/২৩

২১. তারাজিমু বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৭

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আগত আত্মীয়-মেহমানগণ নব দম্পতির শুভ ও কল্যাণ কামনা করে একে একে বিদায় নিল। রাসূল (সা) উম্মু সালামাকে (রা) ডাকলেন এবং তাঁকে কনের সাথে 'আলীর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁদেরকে একথাও বলে দিলেন, তাঁরা যেন সেখানে তাঁর (রাসূল সা.) যাওয়ার অপেক্ষা করেন।

বিলাল (রা) 'ঈশার নামাযের আযান দিলেন। রাসূল (সা) মসজিদে জামা'আতের ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর 'আলীর (রা) বাড়ী গেলেন। একটু পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাতে ফুঁক দিলেন। সেই পানির কিছু বর-কনেকে পান করাতে বললেন। অবশিষ্ট পানি দিয়ে রাসূল (সা) নীচে ধরে রাখা একটি পাত্রের মধ্যে ওযূ করলেন। সেই পানি তাঁদের দু'জনের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর এই দু'আ করতে করতে যাওয়ার জন্য উঠলেন :[২২]

"اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما فى نسلهما."

'হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনকে কল্যাণ দান কর। হে আল্লাহ! তাদের বংশধারায় সমৃদ্ধি দান কর।'

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, যাবার সময় তিনি মেয়েকে লক্ষ্য করে বলেন : ফাতিমা! আমার পরিবারের সবচেয়ে ভালো সদস্যের সাথে তোমার বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি করিনি।[২৩]

ফাতিমা চোখের পানি সম্বরণ করতে পারেননি। পিতা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর পরিবেশকে হালকা করার জন্য অত্যন্ত আবেগের সাথে মেয়েকে বলেন : আমি তোমাকে সবচেয়ে শক্ত ঈমানের অধিকারী, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে ভালো নৈতিকতা ও উন্নত মন-মানসের অধিকারী ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি।[২৪]

দারিদ্রের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখী

পিতৃগৃহ থেকে ফাতিমা যে স্বামী গৃহে যান সেখানে কোন প্রাচুর্য ছিল না। বরং সেখানে যা ছিল তাকে দারিদ্রের কঠোর বাস্তবতাই বলা সঙ্গত। সে ক্ষেত্রে তাঁর অন্য বোনদের স্বামীদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভালো ছিল। যায়নাবের বিয়ে হয় আবুল 'আসের (রা) সাথে। তিনি মক্কার অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। রুকাইয়্যা ও উম্মু কুলছূমের (রা) বিয়ে হয় মক্কার বড় ধনী ব্যক্তি 'আবদুল 'উয্যা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের দুই ছেলের সাথে। ইসলামের কারণে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর একের পর একজন করে তাঁদের দু'জনেরই বিয়ে হয় 'উছমান ইবন 'আফ্ফানের (রা) সাথে। আর 'উছমান (রা) ছিলেন একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তাঁদের তুলনায় 'আলী (রা)

---

২২. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১০৯

২৩. তাবাকাত-৮/১৫, ২৮

২৪. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৮

ছিলেন একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ। তাঁর নিজের অর্জিত সম্পদ বলে যেমন কিছু ছিল না, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রেও কিছু পাননি। তাঁর পিতা মক্কার সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তবে তেমন অর্থ-বিত্তের মালিক ছিলেন না। আর সন্তান ছিল অনেক। তাই বোঝা লাঘবের জন্য মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর চাচা 'আব্বাস তাঁর দুই ছেলের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। এভাবে 'আলী (রা) যুক্ত হন মুহাম্মাদের (সা) পরিবারের সাথে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, 'আলীর (রা) মত মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয় বুদ্ধিমান যুবক এত সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে থাকলেন কেন? এর উত্তর 'আলীর (রা) জীবনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ (সা) রাসূল হলেন। কিশোরদের মধ্যে 'আলী (রা) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স দশ বছর।[২৫] আর তখন থেকে তিনি নবী মুহাম্মাদের (সা) জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। নবী (সা) যত কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছেন, 'আলীকেও তার মুখোমুখী হতে হয়েছে। মক্কার অভিজাত লোকদের পেশা ছিল ব্যবসা। এখানে 'আলীর (রা) জীবন যেভাবে শুরু হয় তাতে এ পেশার সাথে জড়ানোর সুযোগ ছিল কোথায়? মক্কার কুরাইশদের সাথে ঠেলা-ধাক্কা করতেই তো কেটে যায় অনেকগুলো বছর। মদীনায় গেলেন একেবারে খালি হাতে। সেখানে নতুন জায়গায় নতুনভাবে দা'ওয়াতী কাজে জড়িয়ে পড়লেন। এর মধ্যে বদর যুদ্ধ এসে গেল। তিনি যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধের পর গনীমতের অংশ হিসেবে রাসূল (সা) তাকে একটি বর্ম দিলেন। এই প্রথম তিনি একটি সম্পদের মালিক হলেন।

'আলী (রা) যে একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ ছিলেন তা ফাতিমার জানা ছিল। তাই, বালাযুরীর বর্ণনা যদি সত্য হয়– রাসূল (সা) ফাতেমাকে যখন 'আলীর প্রস্তাবের কথা বলেন তখন ফাতিমা 'আলীর দারিদ্রের কথা উল্লেখ করেন। তার জবাবে রাসূল (সা) বলেন :

'সে দুনিয়াতে একজন নেতা এবং আখিরাতেও সে সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হবে। সাহাবীদের মধ্যে তার জ্ঞান বেশী। সে একজন বিচক্ষণও। তাছাড়া সবার আগে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে।'[২৬]

এই বর্ণনাটি সত্য হতেও পারে। কারণ, বিয়ে-শাদীর এ রকম পর্যায়ে অভাব-দারিদ্র বিবেচনায় আসা বিচিত্র কিছু নয়।

ফাতিমা (রা) আঠারো বছরে স্বামী গৃহে যান। সেখানে যে বিত্ত-বৈভবের কিছু মাত্র চিহ্ন ছিল না, সে কথা সব ঐতিহাসিকই বলেছেন। সেই ঘরে গিয়ে পেলেন খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার বালিশ, বিছানা, এক জোড়া যাতা, দু'টো মশক, দু'টো পানির ঘড়

---

২৫. প্রাগুক্ত-৬১২

২৬. প্রাগুক্ত; হায়াত আস-সাহাবা-৩/২৫৬

আর আতর-সুগন্ধি। স্বামী দারিদ্রের কারণে ঘর-গৃহস্থালীর কাজ-কর্মে তাঁকে সহায়তা করার জন্য অথবা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজগুলো করার জন্য কোন চাকর-চাকরানী দিতে পারেননি। ফাতিমা (রা) একাই সব ধরনের কাজ সম্পাদন করতেন। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে কড়া পড়ে যায়, মশক ভর্তি পানি টানতে টানতে বুকে দাগ হয়ে যায় এবং ঘর-বাড়ী ঝাড়ু দিতে দিতে পরিহিত কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেত।[২৭] তাঁর এভাবে কাজ করা 'আলী (রা) মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর করারও কিছু ছিল না। যতটুকু পারতেন নিজে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। তিনি সব সময় ফাতিমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। কারণ, মক্কী জীবনে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থায় তিনি যে অপুষ্টির শিকার হন তাতে বেশ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ঘরে-বাইরে এভাবে দু'জনে কাজ করতে করতে তাঁরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। একদিন 'আলী (রা) তাঁর মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ ইবনে হাশিমকে বলেন : তুমি পানি আনা ও বাইরের অন্যান্য কাজে রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়েকে সাহায্য কর, আর ফাতিমা তোমাকে বাড়ীতে গম পেষা ও রুটি বানাতে সাহায্য করবে। এ সময় ফাতিমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দীসহ বিজয়ীর বেশে একটি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরলেন। 'আলী (রা) একদিন বললেন : ফাতিমা! তোমার এমন কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। আল্লাহ তা'আলা বেশ কিছু যুদ্ধ বন্দী দিয়েছেন। তুমি যদি তোমার পিতার কাছে গিয়ে তোমার সেবার জন্য যুদ্ধ বন্দী একটি দাসের জন্য আবেদন জানাতে! ফাতিমা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় হাতের যাতা পাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলেন : আমি যাব ইনশা আল্লাহ। তারপর বাড়ীর আঙ্গিনায় একটু বিশ্রাম নিয়ে চাদর দিয়ে গা-মাথা ঢেকে ধীর পায়ে পিতৃগৃহের দিকে বেরিয়ে গেলেন। পিতা তাঁকে দেখে কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : মেয়ে! কেন এসেছো? ফাতিমা বললেন : আপনাকে সালাম করতে এসেছি। তিনি লজ্জায় পিতাকে মনের কথাটি বলতে পারলেন না। বাড়ী ফিরে এলেন এবং স্বামীকে সে কথা বললেন। 'আলী (রা) এবার ফাতিমাকে সংগে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। ফাতিমা পিতার সামনে লজ্জায় মুখ নীচু করে নিজের প্রয়োজনের কথাটি এবার বলে ফেলেন। পিতা তাঁকে বলেন : আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে আমি একটি দাসও দিব না। আহ্‌লুস সুফ্‌ফার লোকেরা না খেয়ে নিদারুণ কষ্টে আছে। তাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছিনে। এগুলো বিক্রি করে সেই অর্থ আমি তাদের জন্য খরচ করবো।

একথা শোনার পর তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন পিতাকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। তাঁদেরকে এভাবে খালি হাতে ফেরত দিয়ে স্নেহশীল পিতা যে পরম শান্তিতে থাকতে পেরেছিলেন তা কিন্তু নয়। সারাটি দিন কর্মক্লান্ত আদরের মেয়েটির চেহারা তাঁর মনের মধ্যে ভাসতে থাকে।

সন্ধ্যা হলো। ঠাণ্ডাও ছিল প্রচণ্ড। 'আলী-ফাতিমা শক্ত বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা

---

২৭. তাবাকাত-৮/১৫৯; আল-ইসাবা-৪/৪৫০

করছেন। কিন্তু এত ঠাণ্ডায় কি ঘুম আসে? এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ। দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পান পিতা মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) দাঁড়িয়ে। তিনি দেখতে পান, এই প্রবল শীতে মেয়ে-জামাই যে কম্বলটি গায়ে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে তা এত ছোট যে দু'জন কোন রকম গুটিশুঁটি মেরে থাকা যায়। মাথার দিকে টানলে পায়ের দিকে বেরিয়ে যায়। আবার পায়ের দিকে সরিয়ে দিলে মাথার দিক আলগা হয়ে যায়। তাঁরা এই মহান অতিথিকে স্বাগতম জানানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁদেরকে ব্যস্ত না হয়ে যে অবস্থায় আছে সেভাবে থাকতে বলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তারপর কোমল সুরে বলেন : তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছিলে তার চেয়ে ভালো কিছু কি আমি তোমাদেরকে বলে দিব?

তাঁরা দু'জনই এক সাথে বলে উঠলেন : বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তিনি বললেন : জিবরীল আমাকে এই কথাগুলো শিখিয়েছেন : প্রত্যেক নামাযের পরে তোমরা দু'জন দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবর পাঠ করবে। আর রাতে যখন বিছানায় ঘুমোতে যাবে তখন সুবহানাল্লাহ তেত্রিশবার, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার, আল্লাহু আকবার চৌত্রিশবার পাঠ করবে। একথা বলে তিনি মেয়ে-জামাইকে রেখে দ্রুত চলে যান।[২৮]

এ ঘটনার শত বর্ষের এক তৃতীয়াংশ সময় পরেও ইমাম 'আলীকে (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) শিখানো এই কথাগুলো আলোচনা করতে শোনা গেছে। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এই কথাগুলো শিখানোর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি একদিনও তা বাদ দিইনি। একবার একজন ইরাকী প্রশ্ন করেন : সিফ্ফীন যুদ্ধের সেই ঘোরতর রাতেও না? তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন : সিফ্ফীনের সেই রাতেও না।[২৯]

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। আলী (রা) একবার দারুণ অভাব-অনটনে পড়লেন। একদিন স্ত্রী ফাতিমাকে (রা) বললেন, যদি তুমি নবী (সা)-এর নিকট গিয়ে কিছু চেয়ে আনতে তাহলে ভালো হতো। ফাতিমা (রা) গেলেন। তখন নবীর (সা) নিকট উম্মু আয়মন (রা) বসা ছিলেন। ফাতিমা দরজায় টোকা দিলেন। নবী (সা) উম্মু আয়মনকে বললেন : নিশ্চয় এটা ফাতিমার হাতের টোকা। এমন সময় সে আমাদের নিকট এসেছে যখন সে সাধারণতঃ আসতে অভ্যস্ত নয়। ফাতিমা (রা) ঘরে ঢুকে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ফেরেশতাদের খাদ্য হলো তাসবীহ-তাহ্লীল ও তাহমীদ। কিন্তু আমাদের খাবার কি? বললেন : সেই সত্তার শপথ যিনি আমাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, মুহাম্মাদের পরিবারের রান্না ঘরে তিরিশ দিন যাবত আগুন জ্বলে না। আমার নিকট কিছু ছাগল এসেছে, তুমি চাইলে পাঁচটি ছাগল তোমাকে দিতে পারি। আর তুমি

---

২৮. হাদীছটি সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া তাবাকাত-৮/২৫; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১১-দ্র.।

২৯. সাহীহ মুসলিম; আদ-দু'আ, খণ্ড-৪, হাদীছ নং-২০৯১; তাবাকাত-৮/১৯

যদি চাও এর পরিবর্তে আমি তোমাকে পাঁচটি কথা শিখিয়ে দিতে পারি যা জিবরীল আমাকে শিখিয়েছেন।

ফাতিমা (রা) বললেন : আপনি বরং আমাকে সেই পাঁচটি কথা শিখিয়ে দিন যা জিরবীল আপনাকে শিখিয়েছেন। নবী (সা) বললেন, বল :

يَاأَوَّلَ الأَوَّلِيْنَ، يَاآخِرِ الآخِرِيْـنَ، وَيَـاذَا الْقُـوَّةِ الْمَتِيْـنَ، وَيَـارَاحِمَ الْمَسَـاكِيْنَ. يَـاأرحم الراحمين.

এই পাঁচটি কথা শিখে ফাতিমা (রা) ফিরে গেলেন 'আলীর (রা) নিকট। ফাতিমাকে দেখে 'আলী (রা) প্রশ্ন করলেন : খবর কি? ফাতিমা বললেন : আমি দুনিয়া পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে তোমার নিকট থেকে গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরে এসেছি আখিরাত নিয়ে। 'আলী (রা) বললেন : আজকের দিনটি তোমার জীবনের সর্বোত্তম দিন।[৩০]

ছোটখাট দাম্পত্য কলহ

সেই কৈশোরে একটু বুদ্ধি-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে হযরত ফাতিমা যে অবস্থায় যৌবনের এ পর্যায়ে পৌঁছেছেন তাতে আনন্দ-ফুর্তি যে কি জিনিস তাতো তিনি জানেন না। পিতা তাঁর কাছ থেকে নিকটে বা দূরে যেখানেই থাকেন না কেন সবসময় তাঁর জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোন অন্ত থাকেনা। তিনি যখন যুদ্ধে যান তখন তা আরো শত গুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া ছোটবেলা থেকেই পিতাকে আগলে রাখতে রাখতে তাঁর নিজের মধ্যেও একটা সংগ্রামী চেতনা গড়ে উঠেছে। তাই সুযোগ পেলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যান। উহুদ যুদ্ধে তাই তাঁকে আহত যোদ্ধাদেরকে পট্টি বাঁধতে, তাদের ক্ষতে ঔষুধ লাগাতে এবং মৃত্যুপথযাত্রী শহীদদেরকে পানি পান করাতে দেখা যায়। যখন ঘরে থাকতেন তখন চাইতেন স্বামীর সোহাগভরা কোমল আচরণ। কিন্তু আলীর (রা) জীবনের যে ইতিহাস তাতে তাঁর মধ্যে এই কোমলতার সুযোগ কোথায়? তাঁর জীবনের গোটাটাই তো হলো কঠোর সংগ্রাম, তাই তাঁর মধ্যে কিছুটা রূঢ়তা থাকা বিচিত্র কিছু নয়। ফলে তাঁদের সম্পর্ক মাঝে মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। পিতার কানেও সে কথা পৌঁছে যেত। তিনি ছুটে যেতেন এবং ধৈর্যের সাথে দু'জনের মধ্যে আপোষ রফা করে দিতেন।

বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন রাসূলকে (সা) সন্ধ্যার সময় একটু ব্যস্ততার সাথে মেয়ের বাড়ীর দিকে যেতে দেখা গেল, চোখে-মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভাব। কিছুক্ষণ পর যখন সেখান থেকে বের হলেন তখন তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে এক অবস্থায় ঢুকতে দেখলাম, আর এখন বের হচ্ছেন হাসি-খুশী অবস্থায়!

তিনি জবাব দিলেন : আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় দু'জনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দিলাম তাতে আমি খুশী হবো না।[৩১]

---

৩০. কান্‌য আল-'উম্মাল-১/৩০২; হায়াত আস-সাহাবা-১/৪৩

৩১. তাবাকাত-৮/৪৯৯; আল-ইসাবা-৪/৩৬৮; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১

আরেকবার ফাতিমা (রা) 'আলীর (রা) রূঢ়তায় কষ্ট পান। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নালিশ জানাবো– একথা বলে ঘর থেকে বের হন। 'আলীও (রা) তাঁর পিছে পিছে চলেন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর প্রতি যে কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন তা পিতাকে বলেন, মহান পিতা বেশ নরমভাবে বুঝিয়ে তাঁকে খুশী করেন। 'আলী (রা) স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বলেন : আল্লাহর কসম! তুমি অখুশী হও এমন কিছুই আমি আর কখনো করবো না।[৩২]

ফাতিমার বর্তমানে আলীর (রা) দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা

ফাতিমা (রা) না চাইলেও এমন কিছু ঘটনা ঘটতো যা তাঁকে ভীষণ বিচলিত করে তুলতো। তাঁর স্বামী আরেকটি বিয়ে করে ঘরে সতীন এনে উঠাবে ফাতিমা তা মোটেই মেনে নিতে পারেন না। 'আলী (রা) আরেকটি বিয়ের ইচ্ছা করলেন। তিনি সহজভাবে হিসাব কষলেন, শরী'আতের বিধান মতে আরেকটি বিয়ে করা তো বৈধ। অন্য মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন এক সাথে চারজনকে রাখা বৈধ তেমনিভাবে নবীর (সা) মেয়ের সাথেও অন্য আরেকজন স্ত্রীকে ঘরে আনাতে কোন দোষ নেই। তিনি ধারণা করলেন, এতে ফাতিমা তাঁর প্রতি তেমন ক্ষ্যাপবেন না। কারণ, তাঁর পিতৃগৃহেই তো এর নজীর আছে। 'আয়িশা, হাফসা ও উম্মু সালামা (রা) তো এক সাথেই আছেন। তাছাড়া একবার বানূ মাখযূমের এক মহিলা চুরি করলে তার শাস্তি মওকুফের জন্য মহিলার আত্মীয়রা উসামা ইবন যায়িদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবেদন করে। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন : তুমি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি রহিত করার জন্য সুপারিশ করছো? তারপর তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তাতে বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে এই জন্য যে, তাদের কোন সম্মানীয় ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার উপর "হদ" বা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করতো। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে আমি তার হাত কেটে দেব।[৩৩] এ বক্তব্যের দ্বারা 'আলী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ফাতিমাও তো অন্য আর দশজন মুসলিম মেয়ের মত।

এমন একটি সরল হিসেবে 'আলী (রা) আরেকটি বিয়ের চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া যে এত মারাত্মক হবে 'আলীর (রা) কল্পনায়ও তা আসেনি। 'আমর ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমীর মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন, একথা প্রকাশ করতেই ফাতিমা ক্ষোভে-উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন। রাসূলও (সা) রাগান্বিত হলেন। 'আমর ইবন হিশাম তথা আবূ জাহলের মেয়ের সাথে 'আলীর বিয়ের প্রস্তাবের কথা ফাতিমার কানে যেতেই তিনি পিতার কাছে ছুটে যেয়ে অনুযোগের সুরে বলেন : আপনার

---

৩২. তাবাকাত-৮/২৬; আল-ইসাবা-৪/৩৬৮

৩৩. সাহীহ আল-বুখারী : আল-আম্বিয়া; মুসলিম : আল-হুদূদ; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬১৮

সম্প্রদায়ের লোকেরা ধারণা করে, আপনার মেয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলেও আপনি রাগ করেন না। এই 'আলী তো এখন আবূ জাহলের মেয়েকে বিয়ে করছে।[৩৪]

আসলে কথাটি শুনে রাসূল (সা) দারুণ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু বিষয়টি ছিল বেশ জটিল। কারণ, এখানে 'আলীর (রা) অধিকারের প্রশ্নও জড়িত ছিল। ফাতিমাকে রেখেও 'আলী আরো একাধিক বিয়ে করতে পারেন। সে অধিকার আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন। এ অধিকারে রাসূল (সা) কিভাবে বাধা দিবেন? অন্যদিকে কলিজার টুকরো মেয়েকে সতীনের ঘর করতে হবে এটাও বড় দুঃখের ব্যাপার। তাই বলে আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা কি তিনি হারাম করতে পারেন? না, তা পারেন না। তবে এখানে সমস্যাটির আরেকটি দিক আছে। তা হলো আলীর প্রস্তাবিত কনে আবূ জাহ্ল 'আমর ইবন হিশামের মেয়ে। 'আলীর গৃহে তাঁর স্ত্রী হিসেবে আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে এক সাথে অবস্থান করতে পারে?

এই সেই আবূ জাহ্ল, ইসলামের প্রতি যার নিকৃষ্ট শত্রুতা এবং নবী (সা) ও মুসলমানদের উপর নির্দয় যুলুম-নির্যাতনের কথা নবী (সা) ও মুসলমানদের স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি। আল্লাহর এই দুশমন একদিন কুরাইশদেরকে বলেছিল : "ওহে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! তোমরা এই মুহাম্মাদকে আমাদের উপাস্যদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে বেড়াতে, আমাদের পূর্বপুরুষকে গালিগালাজ করতে এবং আমাদের বুদ্ধিমান লোকদেরকে বোকা ও নির্বোধ বলে বেড়াতে দেখছো, তা থেকে সে বিরত হবে না। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আগামীকাল আমি বহন করতে সক্ষম এমন একটি বড় পাথর নিয়ে বসে থাকবো। যখনই সে সিজদায় যাবে অমনি সেই পাথরটি দিয়ে আমি তার মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবো। তখন তোমরা আমাকে বানূ আবদি মান্নাফের হাতে সোপর্দ অথবা তাদের হাত থেকে রক্ষা, যা খুশী তাই করবে।"[৩৫]

সে কুরাইশদের সমাবেশে নবী মুহাম্মাদকে (সা) বিদ্রূপ করে বলে বেড়াতো : 'ওহে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! মুহাম্মাদ মনে করে দোযখে আল্লাহর যে সৈনিকরা তোমাদেরকে শাস্তি দিবে এবং বন্দী করে রাখবে তাদের সংখ্যা মাত্র উনিশজন। তোমরা তো তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী। তোমাদের প্রতি এক শো' জনে কি তাদের একজনকে রুখে দিতে পারবে না?' তখন নাযিল হয় কুরআনের এ আয়াত :

"وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا. (المدثر : ٣١)

'আমি ফেরেশতাগণকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি।[৩৬]

এই সেই আবূ জাহ্ল যে আখনাস ইবন শুরায়ককে যখন সে তার কাছে তার শোনা

---

৩৪. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২১৫

৩৫. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-১/৩১৯; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬১৯

৩৬. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-১/৩৩৩, ৩৩৫

কুরআন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, বলেছিল : তুমি কী শুনেছো? আমরা ও বানূ 'আবদি মান্নাফ মর্যাদা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করলাম। তারা মানুষকে আহার করালো, আমরাও করালাম। তারা মানুষের দায়িত্ব কাঁধে নিল আমরাও নিলাম। তারা মানুষকে দান করলো; আমরাও করলাম। এভাবে আমরা যখন বাজির দুই ঘোড়ার মত সমান সমান হয়ে গেলাম তখন তারা বললো : আমাদের মধ্যে নবী আছে, আকাশ থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে। এখন এ নবী আমরা কিভাবে পাব? আল্লাহর কসম! আমি কক্ষনো তার প্রতি ঈমানও আনবো না, তাকে বিশ্বাসও করবো না।[৩৭]

এ সেই আবূ জাহ্ল যে কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনতে পেলে তাকে ভয়-ভীতি দেখাতো, হেয় ও অপমান করতো। বলতো : 'তুমি তোমার পিতাকে, যে তোমার চেয়ে ভালো ছিল, ত্যাগ করেছো? তোমার বুদ্ধিমত্তাকে আমরা নির্বুদ্ধিতা বলে প্রচার করবো, তোমার মতামত ও সিদ্ধান্তকে আমরা ভুল-ভ্রান্তিতে পূর্ণ বলে প্রতিষ্ঠা করবো এবং তোমার মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশিয়ে দিব।'

আর যদি কোন ব্যবসায়ী ইসলাম গ্রহণ করতো, তাকে বলতো : 'আল্লাহর কসম! আমরা তোমার ব্যবসা লাটে উঠাবো, তোমার অর্থ-সম্পদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো।' আর ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল হলে দৈহিক শাস্তি দিয়ে তাকে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিত।

এ সেই আবূ জাহ্ল যে মক্কার শি'আবে আবী তালিবের অবরোধকালে হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদকে তাঁর ফুফু খাদীজার (রা) জন্য সামান্য কিছু খাবার নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। এই অভিশপ্ত ব্যক্তি তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলেছিল : 'তুমি বানূ হাশিমের জন্য খাদ্য নিয়ে যাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এ খাবার নিয়ে তুমি যেতে পারবে না। মক্কায় চলো, তোমাকে আমি অপমান করবো। সে পথ ছাড়তে অস্বীকার করলো। সেদিন দু'জনের মধ্যে বেশ মারপিট হয়। এরই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় :[৩৮]

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ-طَعَامُ الْأَثِيْمِ - كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ -

'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য। গলিত তামার মত তাদের পেটে ফুটতে থাকবে। ফুটন্ত পানির মত।'

এই আবূ জাহ্ল মক্কায় আগত নাজরানের একটি খ্রীস্টান প্রতিনিধি দলের মুখোমুখী হয়। তারা এসেছিল মক্কায় মুহাম্মাদের (সা) নুবুওয়াত লাভের খবর পেয়ে তাঁর সম্পর্কে আরো তথ্য লাভের উদ্দেশ্যে। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর কথা শুনে ঈমান আনে। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পরই আবূ জাহ্ল তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলে :

'আল্লাহ তোমাদের কাফেলাটিকে ব্যর্থ করুন। পিছনে ছেড়ে আসা তোমাদের

---

৩৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২০

৩৮. সূরা আদ-দুখান-৪৩-৪৬; ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-২/২২, ১২৬, ১৩২

স্বধর্মাবলম্বীরা তোমাদেরকে পাঠিয়েছে এই লোকটি সম্পর্কে তথ্য নিয়ে যাবার জন্য। তার কাছে তোমরা একটু স্থির হয়ে বসতে না বসতেই তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বসলে? তোমাদের চেয়ে বেশী নির্বোধ কোন কাফেলার কথা আমার জানা নেই।'[৩৯]

এই আবূ জাহ্ল রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের অব্যবহিত পূর্বে কুরাইশদেরকে বলেছিল, কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি শাখা থেকে একজন করে সাহসী ও চালাক-চতুর যুবক নির্বাচন করে তার হাতে একটি করে তীক্ষ্ণ তরবারি তুলে দেবে। তারপর একযোগে মুহাম্মাদের উপর হামলা চালিয়ে এক ব্যক্তির মত এককোপে তাকে হত্যা করবে। তাতে তার রক্তের দায়-দায়িত্ব কুরাইশ গোত্রের সকল শাখার উপর সমানভাবে বর্তাবে।[৪০]

রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করলেন। পরের দিন সকালে কুরাইশরা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে আবূ জাহ্লও ছিল। তারা আবূ বকরের (রা) বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকডাক দিতে আরম্ভ করলো– আবূ বকরের (রা) মেয়ে আসমা' (রা) বেরিয়ে এলেন। তারা প্রশ্ন করলো : তোমার আব্বা কোথায়? তিনি বললেন : আল্লাহর কসম! আমার আব্বা কোথায় তা আমার জানা নেই। তখন যাবতীয় অশ্লীল ও দুষ্কর্মের হোতা আবূ জাহ্ল তার হাতটি উঠিয়ে সজোরে আসমা'র গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আসমা'র কানের দুলটি ছিট্‌কে পড়ে।

বদরে যখন দু'পক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার তোড়-জোড় করছে তখন কুরাইশ বাহিনী একজন লোককে পাঠালো শত্রু বাহিনীর সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে তথ্য নিয়ে আসার জন্য। সে ফিরে এসে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিল। হাকীম ইবন হিযাম ইবন খুওয়াইলিদ গেলেন 'উতবা ইবন রাবী'আর নিকট এবং তাকে লোক-লস্করসহ ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। 'উতবা নিমরাজি ভাব প্রকাশ করে সে হাকীমকে আবূ জাহ্লের নিকট পাঠালো। কিন্তু আবূ জাহ্ল যুদ্ধ ছাড়া হাকীমের কথা কানেই তুললো না।

এ সেই আবূ জাহ্ল, বদরের দিন রাসূল (সা) যে সাতজন কট্টর কাফিরের প্রতি বদ-দু'আ করেন, সে তাদের অন্যতম। এ যুদ্ধে সে অভিশপ্ত কাফির হিসেবে নিহত হয়। তার মাথাটি কেটে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে আনা হলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন।[৪১] রাসূল (সা) আবূ জাহ্লের উটটি নিজের কাছে রেখে দেন। এর চার বছর পর 'উমরার উদ্দেশ্যে যখন মক্কার দিকে যাত্রা করেন তখন উটটি কুরবানীর পশু হিসেবে সংগে নিয়ে চলেন। পথে হুদায়বিয়াতে কুরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই উটটি কুরবানী করেন।[৪২]

---

৩৯. ইবন হিশাম, প্রাগুক্ত

৪০. তাবাকাত-২/১৫, ১৭

৪১. প্রাগুক্ত; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২১

৪২. তাবাকাত-২/৬৯

ইসলামের এহেন দুশমন ব্যক্তির মেয়ে কি রাসূলুল্লাহর (সা) মেয়ে ফাতিমার (রা) সতীন হতে পারে? তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) তা প্রত্যাখ্যান করেন। রাসূল (সা) রাগান্বিত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদের দিকে যান এবং সোজা মিম্বরে গিয়ে ওঠেন। তারপর উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে নিম্নের ভাষণটি দেন :

'বানূ হিশাম ইবন আল-মুগীরা 'আলীর সাথে তাদের মেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার অনুমতি চায়। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। আমি তাদেরকে সে অনুমতি দিব না। তবে 'আলী ইচ্ছা করলে আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। কারণ, আমার মেয়ে আমার দেহের একটি অংশের মত। তাকে যা কিছু অস্থির করে তা আমাকেও অস্থির করে, আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়। আমি তার দীনের ব্যাপারে সঙ্কটে পড়ার ভয় করছি।

তারপর তিনি তাঁর জামাই আবুল 'আসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তার সাথে বৈবাহিক আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন :

'সে আমাকে কথা দিয়েছে এবং সে কথা সত্য প্রমাণিত করেছে। সে আমার সাথে অঙ্গীকার করেছে এবং তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারাম করতে পারবো না। তেমনিভাবে হারামকেও হালাল করতে পারবো না। তবে আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ের কখনো সহ অবস্থান হতে পারে না।'[৪৩]

'আলী (রা) মসজিদে ছিলেন। চুপচাপ বসে শ্বশুরের বক্তব্য শুনলেন। তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে ধীর পায়ে বাড়ীর পথ ধরলেন। এক সময় বাড়ীতে পৌঁছলেন, সেখানে দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত ফাতিমা বসা আছেন। 'আলী (রা) আস্তে আস্তে তাঁর পাশে গিয়ে বসলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন। কি বলবেন তা যেন স্থির করতে পারছেন না। যখন দেখলেন ফাতিমা কাঁদছেন, তখন ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে আস্তে করে বলেন :

'ফাতিমা! 'তোমার অধিকারের ব্যাপারে আমার ভুল হয়েছে। তোমার মত ব্যক্তিরা ক্ষমা করতে পারে।' অনেক্ষণ কেটে গেল, ফাতিমা কোন জবাব দিলেন না। তারপর এক সময় বললেন : 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' এবার 'আলী (রা) একটু সহজ হলেন। তারপর মসজিদের সব ঘটনা তাঁকে বর্ণনা করেন। তাঁকে একথাও বলেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ের সহঅবস্থান কক্ষনো সম্ভব নয়। ফাতিমার দু' চোখ পানিতে ভরে গেল। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন।[৪৪]

---

৪৩. হাদীছটি সাহীহ আল-বুখারী, আল-মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ, সুনানে ইবন মাজাহ্, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে আহমাদ (৬/৩২৬, ৩২৮) সহ হাদীছের প্রায় সকল গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৪৪. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২৪

দ্বিতীয় বিয়ের অভিপ্রায়ের এ ঘটনাটি ঘটেছিল কখন

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো– 'আলী (রা) কখন এই দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা করেছিলেন? ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহর (সা) উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি বর্ণিত হলেও কেউ তার সময়কাল সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। অথচ এটা নবীর (সা) জীবন ও তাঁর পরিবারের জন্য ছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ বিভিন্নভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটা ছিল 'আলী-ফাতিমার (রা) বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা। আর সুনির্দিষ্টভাবে তা হয়তো হবে হিজরী দ্বিতীয় সন, তৃতীয় সনে তাঁদের প্রথম সন্তান হাসান হওয়ার পূর্বে। অবশ্য এটা সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক মতামত; এর সপক্ষে কোন বর্ণনামূলক দলিল-প্রমাণ নেই।[৪৫]

হাসান-হুসায়নের জন্ম

'আলী-ফাতিমার (রা) জীবনে যে মেঘ ভর করেছিল তা কেটে গেল, জীবনের এক কঠিন পরীক্ষায় তারা উৎরে গেলেন। অভাব ও টানাটানির সংসারটি আবার প্রেম-প্রীতি ও সহমর্মিতায় ভরে গেল। এরই মধ্যে হিজরী তৃতীয় সনে তাঁদের প্রথম সন্তান হাসানের জন্ম হলো। ফাতিমার পিতা নবীকে (সা) এ সুসংবাদ দেয়া হলো। তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন এবং আদরের মেয়ে ফাতিমার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে দু'হাতে তুলে তার কানে আযান দেন এবং গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। গোটা মদীনা যেনো আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। রাসূল (সা) দৌহিত্র হাসানের মাথা মুড়িয়ে তার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রূপা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে দান করে দেন। শিশু হাসানের বয়স এক বছরের কিছু বেশী হতে না হতেই চতুর্থ হিজরীর শা'বান মাসে ফাতিমা (রা) আরেকটি সন্তান উপহার দেন। আর এই শিশু হলেন হুসায়ন।[৪৬]

আবূ জাহলের সেই কন্যার নাম নিয়ে মতপার্থক্য আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে "জুওয়ায়বিয়া"। তাছাড়া আল-'আওরা', আল-হানকা', জাহ্দাম ও জামীলাও বলা হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বায়'আত হন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) কিছু হাদীছও স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন।[৪৭]

'আলী (রা) তাঁর পয়গাম প্রত্যাহার করে নেন এবং আবূ জাহলের কন্যাকে 'উত্তাব ইবন উসায়দ বিয়ে করেন।

এ ঘটনার পর হযরত ফাতিমা (রা) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত 'আলীর (রা) একক স্ত্রী হিসেবে অতিবাহিত করেন। ফাতিমার (রা) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। ফাতিমা হাসান, হুসায়ন, উম্মু কুলছূম ও যায়নাব– এ চার সন্তানের মা হন।

---

৪৫. প্রাগুক্ত

৪৬. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব; মুসলিম-আল-ফাদায়িল

৪৭. আ'লাম-আন-নিসা'-৪/১১২; টীকা নং-১

তিনি শিশু হাসানকে দু'হাতের উপর রেখে দোলাতে দোলাতে নিম্নের চরণটি আবৃত্তি করতেন :[৪৮]

إن بنى شبه النبى ليس شبيها بعلى.

'আমার সন্তান নবীর মত দেখতে, 'আলীর মত নয়।'

হাসান-হুসায়নের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহ-আদর

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অতি আদরের এ দুই দৌহিত্র যেমন তাঁর অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনে তেমনি তাঁদের মা আয-যাহ্‌রার দু' কোল ভরে দেয়। হযরত খাদীজার (রা) ওফাতের পর রাসূল (সা) বেশ কয়েকজন নারীকে বেগমের মর্যাদা দান করেন, কিন্তু তাঁদের কেউই তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেননি। পুত্র সন্তানের যে অভাববোধ তাঁর মধ্যে ছিল তা এই দুই দৌহিত্রকে পেয়ে দূর হয়ে যায়। এ পৃথিবীতে তাঁদের মাধ্যমে নিজের বংশধারা বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনায় নিশ্চিন্ত হন। এ কারণে তাঁর পিতৃস্নেহও তাঁদের উপর গিয়ে পড়ে। আর তাই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তিনি তাঁদের দু'জনকে নিজের ছেলে হিসেবে অভিহিত করেছেন। আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) ফাতিমাকে (রা) বলতেন, আমার ছেলে দুটোকে ডাক। তাঁরা নিকটে এলে তিনি তাঁদের দেহের গন্ধ শুঁকতেন এবং জড়িয়ে ধরতেন।[৪৯] হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেছেন, আমি একদিন কোন একটি প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহর (সা) ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। তিনি গায়ের চাদরে কিছু জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন। আমি বুঝতে পারলাম না চাদরে জড়ানো কি জিনিস। আমার কাজ শেষ হলে প্রশ্ন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চাদরে ঢেকে রেখেছেন কি জিনিস?

তিনি চাদরটি সরালে দেখলাম, হাসান ও হুসায়ন। তারপর তিনি বললেন : এরা দু'জন হলো আমার ছেলে এবং আমার মেয়ের ছেলে। হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে ভালোবাসি, আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন। আর তাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসুন।[৫০]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ফাতিমা আয-যাহ্‌রা'র প্রতি বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে প্রিয় নবী মুসতাফার (সা) বংশধারা সংরক্ষণ করেছেন। তেমনিভাবে 'আলীর (রা) ঔরসে সর্বশেষ নবীর বংশধারা দান করে আল্লাহ তাঁকেও এক চিরকালীন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম জামাই। তাঁর দেহে পরিচ্ছন্ন হাশেমী রক্ত বহমান ছিল। রাসূল (সা) ও 'আলীর (রা) নসব 'আবদুল মুত্তালিবে গিয়ে মিলিত হয়েছে। উভয়ে ছিলেন তাঁর পৌত্র। 'আলীর (রা) পিতা আবূ তালিব মুহাম্মাদকে (সা) পুত্রস্নেহে লালন পালন করেন।

---

৪৮. প্রাগুক্ত-৪/১১৩

৪৯. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২৬

৫০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/২৫১

পরবর্তীতে মুহাম্মাদ (সা) সেই পিতৃতুল্য চাচার ছেলে 'আলীকে পিতৃস্নেহে পালন করে নিজের কলিজার টুকরা কন্যাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট 'আলীর (রা) স্থান ও মর্যাদা ছিল অত্যুচ্চে। 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

একদিন আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করলাম : আমি ও ফাতিমা– এ দু'জনের কে আপনার বেশী প্রিয়? বললেন : ফাতিমা তোমার চেয়ে আমার বেশী প্রিয়। আর তুমি আমার নিকট তার চেয়ে বেশী সম্মানের পাত্র।

এ জবাবের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমা ও 'আলীর (রা) স্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ কারণে শত ব্যস্ততার মাঝে সুযোগ পেলেই তিনি ছুটে যেতেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় এই দম্পতির গৃহে এবং অতি আদরের দৌহিত্রদ্বয়কে কোলে তুলে নিয়ে স্নেহের পরশ বুলাতেন। একদিন তাঁদের গৃহে যেয়ে দেখেন, 'আলী-ফাতিমা ঘুমিয়ে আছেন, আর শিশু হাসান খাবারের জন্য কান্না জুড়ে দিয়েছে। তিনি তাঁদের দু'জনের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইলেন না। হাসানকে উঠিয়ে নিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় বাধা একটি ছাগীর কাছে চলে যান এবং নিজ হাতে ছাগীর দুধ দুইয়ে হাসানকে পান করিয়ে তাকে শান্ত করেন।

আর একদিনের ঘটনা। রাসূল (সা) ফাতিমা-'আলীর (রা) বাড়ীর পাশ দিয়ে ব্যস্ততার সাথে কোথাও যাচ্ছেন। এমন সময় হুসায়নের কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে গেল। তিনি বাড়ীতে ঢুকে মেয়েকে তিরস্কারের সুরে বললেন : তুমি কি জান না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?[৫১]

কন্যা যায়নাব ও উম্মু কুলছুমের জন্ম

এরপর এ দম্পতির সন্তান সংখ্যা বাড়তে থাকে। হিজরী ৫ম সনে ফাতিমা (রা) প্রথম কন্যার মা হন। নানা রাসূল (সা) তার নাম রাখেন "যায়নাব"। উল্লেখ্য যে, ফাতিমার এক সহোদরার নাম ছিল "যয়নাব", মদীনায় হিজরাতের পর ইনতিকাল করেন। সেই যয়নাবের স্মৃতি তাঁর পিতা ও বোনের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল। সেই খালার নামে ফাতিমার এই কন্যার নাম রাখা হয়। এর দু'বছর পর ফাতিমা (রা) দ্বিতীয় কন্যার মা হন। তারও নাম রাখেন নানা রাসূল (সা) নিজের আরেক মৃত কন্যা উম্মু কুলছুমের নামে। এভাবে হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর কন্যার মাধ্যমে নিজের মৃত দু'বোনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখেন। ফাতিমার (রা) এ চার সন্তানকে জীবিত রেখেই রাসূল (সা) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সান্নিধ্যে চলে যান।

ফাতিমার (রা) সব সন্তানই ছিল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কলিজার টুকরা। বিশেষতঃ হাসান ও হুসায়নের মধ্যে তিনি যেন নিজের পরলোকগত পুত্র সন্তানদেরকে খুঁজে পান। তাই তাদের প্রতি ছিল বিশেষ মুহাব্বত। একদিন তিনি তাদের একজনকে

---

৫১. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬২৭

কাঁধে করে মদীনার বাজারে ঘুরছেন। নামাযের সময় হলে তিনি মসজিদে ঢুকলেন এবং তাকে খুব আদরের সাথে এক পাশে বসিয়ে নামাযের ইমাম হিসেবে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় সিজদায় কাটালেন যে পিছনের মুক্তাদিরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। নামায শেষে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত লম্বা সিজদা করেছেন যে, আমরা ধারণা করেছিলাম কিছু একটা ঘটেছে অথবা ওহী নাযিল হয়েছে। জবাবে তিনি বললেন : না, তেমন কিছু ঘটেনি। আসল ঘটনা হলো, আমার ছেলে আমার পিঠে চড়ে বসেছিল। আমি চেয়েছি তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তাই তাড়াতাড়ি করিনি।[৫২]

একদিন রাসূল (সা) মিম্বরের উপর বসে ভাষণ দিচ্ছেন। এমন সময় দেখলেন হাসান ও হুসায়ন দুই ভাই লাল জামা পরে উঠা-পড়া অবস্থায় হেঁটে আসছে। তিনি ভাষণ বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাদের দু'জনকে উঠিয়ে সামনে এনে বসান। তারপর তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলেন : আল্লাহ সত্যই বলেছেন :[৫৩]

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ।'

আমি দেখলাম, এই শিশু দু'টি হাঁটছে আর পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে কথা বন্ধ করে তাদেরকে উঠিয়ে এনেছি।

আরেকদিন তো দেখা গেল, শিশু হুসায়নের দু'কাঁধের উপর রাসূলের (সা) হাত। আর তার দু'পা রাসূলের দু'পায়ের উপর। তিনি তাকে শক্ত করে ধরে বলছেন, উপরে বেয়ে ওঠো। হুসায়ন উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক সময় নানার বুকে পা রাখলো। এবার তিনি হুসায়নকে বললেন : মুখ খোল। সে হা করলো। তিনি তার মুখে চুমু দিয়ে বললেন : হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি এবং সেও আমাকে ভালোবাসে। তাকে যারা ভালোবাসে আপনি তাদের ভালোবাসুন।[৫৪]

একদিন রাসূল (সা) কয়েকজন সাহাবীকে সংগে করে কোথাও দা'ওয়াত খেতে যাচ্ছেন। পথে হুসায়নকে তার সমবয়সী শিশুদের সাথে খেলতে দেখলেন। রাসূল (সা) দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলেন। সে নানার হাতে ধরা না দেওয়ার জন্য একবার এদিক, একবার ওদিক পালাতে থাকে। রাসূল (সা) হাসতে হাসতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এক সময় তাকে ধরে নিজের একটি হাতের উপর বসান এবং অন্য হাতটি তার চিবুকের নীচে রেখে তাকে চুমু দেন। তারপর বলেন : হুসায়ন আমার অংশ এবং আমি হুসায়নের অংশ।[৫৫]

---

৫২. প্রাগুক্ত-৬৩০
৫৩. সূরা আত-তাগাবুন-১৫
৫৪. মুসলিম, আল-ফাদায়িল
৫৫. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬৩০

ফাতিমার বাড়ীর দরজায় আবূ সুফইয়ান

সময় গড়িয়ে চললো। ইসলামের আলোতে গোটা আরবের অন্ধকার বিদূরিত হতে চললো। এক সময় রাসূল (সা) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। মদীনায় ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। নারী-পুরুষ সবাই এ অভিযানে অংশ নিবে। মক্কায় এ খবর সময় মত পৌঁছে গেল। পৌত্তলিক কুরায়শদের হৃদকম্পন শুরু হলো। তারা ভাবলো এবার আর রক্ষা নেই। অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনার পর তারা মদীনাবাসীদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখার জন্য আবূ সুফইয়ান ইবন হারবকে মদীনায় পাঠালো। কারণ, ইতোমধ্যে তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবা রামলা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং রাসূল (সা) তাঁকে বেগমের মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং তাঁকে দিয়েই এ কাজ সম্ভব হবে।

আলী ও ফাতিমা এ অভিযানে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। যাত্রার পূর্বে একদিন রাতে তাঁরা সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। নানা স্মৃতি তাঁদের মানসপটে ভেসে উঠছে। মাঝে মাঝে তাঁরা স্মৃতিচারণও করছেন। আট বছর পূর্বে যে মক্কা তাঁরা পিছনে ফেলে চলে এসেছিলেন তা কি তেমনই আছে? তাঁদের স্মৃতিতে তখন ভেসে উঠছে মা খাদীজা (রা), পিতা আবূ তালিবের ছবি। এমনই এক ভাব-বিহ্বল অবস্থার মধ্যে যখন তাঁরা তখন অকস্মাৎ দরজায় টোকা পড়লো। এত রাতের আগন্তুক কে তা দেখার জন্য 'আলী (রা) দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ফাতিমাও সে দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দরজা খুলতেই তাঁরা দেখতে পেলেন আবূ সুফইয়ান ইবন হারব দাঁড়িয়ে। এই সেই আবূ সুফইয়ান, যিনি মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর পতাকাবাহী এবং উহুদের শহীদ হযরত হামযার (রা) বুক ফেঁড়ে কলিজা বের করে চিবিয়েছিল যে হিন্দ, তার স্বামী।

আবূ সুফইয়ান বলতে লাগলেন, কিভাবে মদীনায় এসেছেন এবং কেন এসেছেন, সে কথা। বললেন : মক্কাবাসীরা মুহাম্মাদের (সা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য, তাঁর সাথে একটা আপোষরফা করার উদ্দেশে তাঁকে পাঠিয়েছে। তিনি নিজের পরিচয় গোপন করে মদীনায় ঢুকে পড়েছেন এবং সরাসরি নিজের কন্যা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা রামলার (রা) ঘরে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) বিছানায় বসার জন্য উদ্যত হতেই নিজ কন্যার নিকট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ, তিনি একজন অংশীবাদী, অপবিত্র। আল্লাহর রাসূলের (সা) পবিত্র বিছানায় বসার যোগ্যতা তাঁর নেই। কন্যা বিছানাটি গুটিয়ে নেন। মনে বড় ব্যথা নিয়ে তিনি নবীর (সা) নিকট যান এবং তাঁর সাথে অভিযানের ব্যাপারে কথা বলেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কোন জবাব পাননি। আবূ বকরের (রা) নিকট থেকেও একই আচরণ লাভ করেন। তারপর যান 'উমারের (রা) নিকট। তিনি তাঁর বক্তব্য শুনে বলেন : আমি যাব তোমার জন্য সুপারিশ করতে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট? আল্লাহর কসম! ভূমিতে উদ্গত সামান্য উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই যদি না পাই, তা দিয়েই তোমাদের সাথে লড়বো।[৫৬]

---

৫৬. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ-৪/৩৮

এ পর্যন্ত বলার পর আবূ সুফইয়ান একটু চুপ থাকলেন, তারপর একটা ঢোক গিলে 'আলীকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন : ওহে আলী! তুমি আমার সম্প্রদায়ের প্রতি সবচেয়ে বেশী সদয়। আমি একটা প্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছি। অন্যদের নিকট থেকে যেমন হতাশ হয়ে ফিরেছি, তোমার নিকট থেকে সেভাবে ফিরতে চাইনে। তুমি আমার জন্য একটু রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট সুপারিশ কর।

'আলী (রা) বললেন : আবূ সুফইয়ান! তোমার অনিষ্ট হোক। আল্লাহর কসম! রাসূল (সা) একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। সে ব্যাপারে আমরা কোন কথা বলতে পারি না।

এবার আবূ সুফইয়ান পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ফাতিমার দিকে তাকালেন এবং পাশের বিছানায় সদ্য ঘুম থেকে জাগা ও মায়ের দিকে এগিয়ে আসা হাসানের দিকে ইঙ্গিত করে ফাতিমাকে বললেন : ওহে মুহাম্মাদের মেয়ে! তুমি কি তোমার এ ছেলেকে বলবে, সে যেন মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তার গোত্রের লোকদের নিরাপত্তার ঘোষণা দিক এবং চিরকালের জন্য সমগ্র আরবের নেতা হয়ে থাক?

ফাতিমা জবাব দিলেন : আমার এই এতটুকু ছেলের মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে কাউকে নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দেওয়ার বয়স হয়নি। আর রাসূলুল্লাহকে (সা) ডিঙ্গিয়ে কেউ কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।

হতাশ অবস্থায় আবূ সুফইয়ান যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে একটু থামলেন। তারপর অত্যন্ত নরম সুরে বললেন : আবুল হাসান ('আলী)! মনে হচ্ছে বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেছে। তুমি আমাকে একটু পরামর্শ দাও।

'আলী (রা) বললেন : আপনার কাজে আসবে এমন কোন পরামর্শ আমার জানা নেই। তবে আপনি হলেন কিনানা (কুরায়শ গোত্রের একটি শাখা) গোত্রের নেতা। আপনি নিজেই জনমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তার আবেদন করুন। তারপর নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যান।

আবূ সুফইয়ান বললেন : এটা কি আমার কোন কাজে আসবে? 'আলী (রা) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন : আল্লাহর কসম! আমি তা মনে করি না। কিন্তু আমি তো আপনার জন্য এছাড়া আর কোন পথ দেখছিনে।

আবূ সুফইয়ান 'আলীর (রা) পরামর্শ মত কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে গেলেন। আর এ দম্পতি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম ক্ষমতার কথা ভাবতে লাগলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন উম্মুল কুরা মক্কা, কা'বা, কুরায়শদের বাড়ীঘর ইত্যাদির কথা।[৫৭]

---

৫৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬৩৩

মক্কা বিজয় অভিযানে ফাতিমা (রা)

দশ হাজার মুসলমান সঙ্গীসহ রাসূল (সা) মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। আট বছর পূর্বে কেবল আবূ বকর সিদ্দীককে (রা) সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় চলে আসেন। নবী পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ফাতিমাও এই মহা বিজয় ও গৌরবজনক প্রত্যাবর্তন প্রত্যক্ষ করার জন্য এই কাফেলায় শরীক হলেন। আট বছর পূর্বে তিনি একদিন বড় বোন উম্মু কুলছূমের সাথে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তাঁর অন্য দুই বোন রুকাইয়্যা ও যয়নাবও হিজরাত করেছিলেন। কিন্তু আজ এই বিজয়ী কাফেলায় তাঁরা নেই। তাঁরা মদীনার মাটিতে চিরদিনের জন্য শুয়ে আছেন। আর কোনদিন মক্কায় ফিরবেন না। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ফাতিমা কাফেলার সাথে চলছেন। এক সময় কাফেলা "মাররুজ জাহ্‌রান" এসে পৌঁছলো এবং শিবির স্থাপন করলো। দিন শেষ হতেই রাতের প্রথম ভাগে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনীর নেতা আবূ সুফইয়ান ইবন হারব এসে উপস্থিত হলেন। মক্কাবাসীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সিদ্ধান্ত জানার জন্য সারা রাত তিনি তাঁর দরজায় অপেক্ষা করলেন। ভোর হতেই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। তারপর সেখান থেকে বের হয়ে সোজা মক্কার পথ ধরেন। মক্কায় পৌঁছে একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দেন : 'ওহে কুরায়শ বংশের লোকেরা! মুহাম্মাদ এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছেন যার সাথে তোমরা কখনো পরিচিত নও। যে ব্যক্তি আবু সুফইয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ, যে নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে সে নিরাপদ, আর যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।'

ঘোষণা শুনে মক্কার অধিবাসীরা নিজ নিজ গৃহে এবং মসজিদুল হারামে ঢুকে পড়লো। রাসূল (সা) 'যী তুওয়া"-তে বাহনের পিঠে অবস্থান করে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগের একজন করে নেতা নিয়োগ করেন এবং কে কোন পথে মক্কায় প্রবেশ করবে তা নির্ধারণ করেন। একটি ভাগের নেতা ও পতাকাবাহী হন সা'দ ইবন 'উবাদা আল-আনসারী (রা)। তিনি আবার 'আলীকে (রা) বলেন : 'পতাকাটি আপনিই নিন। এটি হাতে করে আপনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।[৫৮] এর পূর্বে 'আলী (রা) খায়বারে, বানী কুরায়জার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) এবং উহুদ যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকাবাহী ছিলেন।[৫৯]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) 'আযাখির'-এর পথে মক্কায় প্রবেশ করে মক্কার উঁচু ভূমিতে অবতরণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রা) কবরের অনতিদূরে তাঁর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়। সঙ্গে কন্যা ফাতিমা আয-যাহ্‌রাও ছিলেন। মক্কা থেকে যেদিন ফাতিমা (রা) মদীনায় যাচ্ছিলেন সেদিন আল-হুওয়ায়রিছ ইবন মুনকিয তাঁকে তাঁর

---

৫৮. আত-তাবারী, তারীখ : ফাতহু মাক্কাহ
৫৯. তাবাকাত-২/২৭, ৭৭

বাহনের পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে জীবন বিপন্ন করে ফেলেছিল। সেই স্মৃতি তাঁর দীর্ঘদিন পর জন্মভূমিতে ফিরে আসার আনন্দকে ম্লান করে দিচ্ছিল। রাসূলও (সা) সে কথা ভোলেননি। তিনি বাহিনীকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে একজন পরিচালক নির্ধারণ করে দেন। কারা কোন পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে তাও বলে দেন। তাদেরকে নির্দেশ দেন তারা যেন অহেতুক কোন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। তবে কিছু লোকের নাম উচ্চারণ করে বলেন, এরা যদি কা'বার গিলাফের নীচেও আশ্রয় নেয় তাহলেও তাদের হত্যা করবে। তাদের মধ্যে আল-'হুয়ায়রিছ ইবন মুনকিযও ছিল। তাকে হত্যার দায়িত্ব অর্পিত হয় হযরত ফাতিমার (রা) স্বামী 'আলীর (রা) উপর।[৬০]

রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো বোন উম্মু হানী বিন্‌ত আবী তালিব, মক্কার হুবায়রা ইবন আবী ওয়াহাবের স্ত্রী। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার উঁচু ভূমিতে অবতরণ করার পর বানূ মাখযূমের দুই ব্যক্তি আল-হারিছ ইবন হিশাম ও যুহায়র ইবন আবী উমাইয়্যা ইবন আল-মুগীরা পালিয়ে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়। আমার ভাই 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) আমার সাথে দেখা করতে এসে তাদেরকে দেখে ভীষণ ক্ষেপে যান। আল্লাহর নামে কসম করে তিনি বলেন : আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবো। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি, তিনি একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে গোসল করছেন এবং ফাতিমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাসূল (সা) গোসল সেরে আট রাক'আত চাশ্‌তের নামায আদায় করলেন, তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : উম্মু হানী, কি জন্য এসেছো? আমি তাঁকে আমার বাড়ীর ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন : তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছো আমিও তাদের আশ্রয় দিলাম। যাদের তুমি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আমিও তাদের নিরাপত্তা দান করলাম। 'আলী তাদের হত্যা করবে না।[৬১]

মক্কায় হযরত ফাতিমার (রা) প্রথম রাতটি কেমন কেটেছিল সে কথাও জানা যায়। তিনি বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। প্রিয়তমা মায়ের কথা, দুই সহোদরা যায়নাব ও রুকাইয়্যার স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠছিল। মক্কার অধিবাসীরা তাঁর পিতার সঙ্গে যে নির্মম আচরণ করেছিল সে কথা, মক্কায় নিজের শৈশব-কৈশোরের নানা কথা তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠছিল। সারা রাত তিনি দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। প্রভাতে মসজিদুল হারাম থেকে বিলালের কণ্ঠে ফজরের আযান ধ্বনিত হলো। 'আলী (রা) শয্যা ছেড়ে নামাযে যাবার প্রস্তুতির মধ্যে একবার প্রশ্ন করলেন : হাসানের মা, তুমি কি ঘুমাওনি? তিনি একটা গভীর আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে জবাব দিলেন : আমি সম্পূর্ণ সজাগ থেকে বিজয়ীবেশে এ প্রত্যাবর্তনকে উপভোগ করতে চাই। ঘুমিয়ে পড়লে গোটা ব্যাপারটিই না জানি স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়।

এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যান। নামায শেষে একটু ঘুমিয়ে নেন।

---

৬০. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ-৬৩৫

৬১. প্রাগুক্ত; সাহীহ মুসলিম : সালাতুল মুসাফিরীন

ঘুম থেকে উঠে সেই বাড়ীটিতে যাওয়ার ইচ্ছা করেন যেখান তাঁর জন্ম হয়েছিল। যে বাড়ীটি ছিল তাঁর নিজের ও স্বামী 'আলীর শৈশব-কৈশোরের চারণভূমি। কিন্তু সেই বাড়ীটি তাঁদের হিজরাতের পর 'আকীল ইবন আবী তালিবের অধিকারে চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন উসামা ইবন যায়িদ (রা) রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেন : মক্কায় আপনারা কোন বাড়ীতে উঠবেন? জবাবে তিনি বলেন : 'আকীল কি আমাদের জন্য কোন আবাসস্থল বা ঘর অবশিষ্ট রেখেছে?[৬২]

এই সফরে তাঁর দু'মাসের বেশী মক্কায় অবস্থান করা হয়নি। অষ্টম হিজরীর রামাদান মাসে মক্কায় আসেন এবং একই বছর যুল কা'দা মাসের শেষ দিকে 'উমরা আদায়ের পর পিতার সাথে মদীনায় ফিরে যান। এ সময়ে তিনি জান্নাতবাসিনী মা খাদীজার (রা) কবরও যিয়ারাত করেন।

হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) তৃতীয় কন্যা, হযরত 'উছমানের (রা) স্ত্রী উম্মু কুলছূম (রা) ইনতিকাল করেন। দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী মারিয়া আল-কিবতিয়্যার গর্ভজাত সন্তান হযরত ইবরাহীমও ইহলোক ত্যাগ করেন। এখন রাসূলুল্লাহর (সা) সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা আয-যাহ্‌রা ছাড়া আর কেউ জীবিত থাকলেন না।

পিতা অন্তিম রোগশয্যায়

এর পরে এলো সেই মহা মুসীবতের সময়টি। হিজরী ১১ সনের সফর মাসে ফাতিমার (রা) মহান পিতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী পরিবারের এবং অন্য মুসলমানরা ধারণা করলেন যে, এ হয়তো সামান্য অসুস্থতা, খুব শীঘ্রই সেরে উঠবেন। কেউ ধারণা করলেন না যে, এ তাঁর অন্তিম রোগ। পিতা মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর গৃহের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। রাসূলের (সা) শয্যাপাশে তখন হযরত 'আয়িশা (রা)সহ অন্য বেগমগণ বসা। এ সময় ধীর স্থির ও গম্ভীরভাবে কন্যা ফাতিমাকে এগিয়ে আসতে দেখে পিতা তাঁকে স্বাগতম জানালেন এভাবে–

مَرْحَبًا يَا بِنْتِيْ – আমার মেয়ে! স্বাগতম। তারপর তাঁকে চুমু দিয়ে ডান পাশে বসান এবং কানে কানে বলেন, তাঁর মরণ সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফাতিমা কেঁদে ফেলেন। তাঁর সেই কান্না থেমে যায় যখন পিতা তাঁর কানে কানে আবার বলেন :[৬৩]

إنك أول أهل بيتى لحوقابى. يافاطمة ألاترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين. أو سيدة نساء هذه الأمة؟

'আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। ফাতিমা! তুমি কি

---

৬২. তাবাকাত-২/৯৮

৬৩. তাবাকাত-৮/১৬' বুখারী : বাবু 'আলামাত আন-নুবুওয়াহ্; মুসলিম : ফাদায়িল আস-সাহাবা; কান্‌য আল-'উম্মাল-১৩/৬৭৫

এতে সন্তুষ্ট নও যে, ঈমানদার মহিলাদের নেত্রী হও?' অথবা রাসূল (সা) একথা বলেন, 'তুমি এই উম্মাতের মহিলাদের নেত্রী হও তাতে কি সন্তুষ্ট নও?'

এ কথা শোনার সংগে সংগে ফাতিমার মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। তিনি কান্না থামিয়ে হেসে দিলেন। তাঁর এমন আচরণ দেখে পাশেই বসা হযরত 'আয়িশা (রা) বিস্মিত হলেন। তিনি মন্তব্য করেন :

"مارأيت كاليوم فرحا أقرب إلى حزن!"

'দুঃখের অধিক নিকটবর্তী আনন্দের এমন দৃশ্য আজকের মত আর কখনো দেখিনি।'

পরে তিনি ফাতিমাকে এক সুযোগে জিজ্ঞেস করেন : তোমার পিতা কানে কানে তোমাকে কি বলেছেন? জবাবে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) গোপন কথা প্রকাশ করতে পারিনে।[৬৪]

পিতার রোগের এ অবস্থা দেখে ফাতিমা (রা) সেদিন নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন। এদিকে রাসূল (সা) এ রোগের মধ্যেও নিয়ম অনুযায়ী পালাক্রমে উম্মাহাতুল মু'মিনীন (বেগম)দের ঘরে অবস্থান করতে লাগলেন। যেদিন তিনি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিছ আল-হিলালিয়্যার (রা) ঘরে সেদিন তাঁর রোগের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। তিনি অন্য বেগমদের ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি এ অসুস্থ অবস্থায় হযরত 'আয়িশার (রা) গৃহে অবস্থানের অনুমতি চান এবং তাঁদের অনুমতি লাভ করেন।

নবী কন্যা ফাতিমা (রা) সব সময়, এমনকি রাত জেগে অসুস্থ পিতার সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। ধৈর্যের সাথে সেবার পাশাপাশি অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্রভাবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে পিতার সুস্থতার জন্য দু'আ করতে থাকেন। এত কিছুর পরেও যখন উত্তরোত্তর রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে লাগলো এবং কষ্টের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে চললো, ফাতিমা (রা) তখন হাতে পানি নিয়ে অত্যন্ত দরদের সাথে পিতার মাথায় দিতে থাকেন। পিতার এ কষ্ট দেখে কান্নায় কণ্ঠরোধ হওয়ার উপক্রম হয়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করেন : আব্বা! আপনার কষ্ট তো আমি সহ্য করতে পারছিনে। পিতা তাঁর দিকে স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত দরদের সাথে উত্তর দেন : আজকের দিনের পর তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট নেই।[৬৫]

কন্যাকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে পিতা মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে যাত্রা করলেন। আজ ফাতিমা (রা) সত্যিকারভাবে পিতৃ-মাতৃহারা এক দুঃখী এতীমে পরিণত হলেন। এ দুঃখ-বেদনায় সান্ত্বনা লাভের কোন পথই তাঁর সামনে ছিল না।

পিতাকে হারিয়ে ফাতিমা (রা) দারুণভাবে শোকাতুর হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় দু'দিনের

---

৬৪. তাবাকাত-৮/১৬

৬৫. বুখারী : বাবু মারদিহি ওয়া ওফাতিহি (সা) : ফাতহুল বারী-৮/১০৫; মুসনাদে আহমাদ-৩/১৪১; তাবাকাত-২/২

মধ্যেই সাকীফা বানূ সা'ইদা চত্বরে খলীফা হিসেবে হযরত আবূ বকরের (রা) হাতে বায়'আত সম্পন্ন হয়। ফাতিমা (রা) তাঁর বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থাকে একটু সামলে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে পিতার কবরের নিকট যান এবং কবর থেকে এক মুঠ মাটি উঠিয়ে নিয়ে অশ্রু বিগলিত দু'চোখের উপর বুলিয়ে দেন। তারপর তার ঘ্রাণ নিতে নিতে নিম্নের চরণ দু'টি আওড়াতে থাকেন।[৬৬]

مَاذا على مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أحمد ألا يشمَّ مدى الزّمان غواليا

صُبَّتْ عَلَىَّ مَصَائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا!

'যে ব্যক্তি আহমাদের কবরের মাটির ঘ্রাণ নেয় সারা জীবন সে যেন আর কোন সুগন্ধির ঘ্রাণ না নেয়। আমার উপর যে সকল বিপদ আপতিত হয়েছে যদি তা হতো দিনের উপর তাহলে তা রাতে পরিণত হতো।'

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দাফন-কাফন শেষ করে হযরত ফাতিমার (রা) নিকট আসেন তাকে সান্ত্বনা দানের জন্য। তিনি হযরত আনাসকে (রা) জিজ্ঞেস করে বসেন : আপনারা কি রাসূলকে দাফন করে এসেছেন? তিনি জবাব দিলেন : হাঁ। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহকে (সা) মাটিতে ঢেকে দিতে আপনাদের অন্তর সায় দিল কেমন করে? তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) স্মরণে নিম্নের চরণগুলো আবৃত্তি করেন :[৬৭]

أغبرأفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصر ان

فالأرض من بعد النبى كئيبة اسفار عليه كثيرة الرجفان

فليبكه شرق البلاد وغربها ولتبكه مضروكل يمان

وليبكه الطود العظيم جوده والبيت ذو الأستار والأركان

ياخاتم الرسل المبارك ضؤه صلى عليك منزل القرآن.

'আকাশের দিগন্ত ধুলিমলিন হয়ে গেছে, মধ্যাহ্ন-সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে এবং যুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

নবীর (সা) পরে ভূমি কেবল বিষণ্ন হয়নি, বরং দুঃখের তীব্রতায় বিদীর্ণ হয়েছে।

তার জন্য কাঁদছে পূর্ব-পশ্চিম, মাতম করছে সমগ্র মুদার ও ইয়ামান গোত্র।

তাঁর জন্য কাঁদছে বড় বড় পাহাড়-পর্বত ও বিশালকায় অট্টালিকাসমূহ।

হে খাতামুন নাবিয়্যীন, আল্লাহর জ্যোতি আপনার প্রতি বর্ষিত হোক। আল-কুর'আনের নাযিলকারী আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।'

---

৬৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৩৪; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১৪

৬৭. উসুদুল গাবা-৫/৫৩২; আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১৩

অনেকে উপরোক্ত চরণগুলো হযরত ফাতিমার (রা), আর পূর্বোক্ত চরণগুলো 'আলীর রচিত বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

হযরত ফাতিমা (রা) পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এ চরণ দু'টিও আবৃত্তি করেন :[৬৯]

إنا فقدناك فقد الأرض وإبلها وغاب مذغبت عنا الوحى والكتب

فليت قبلك كان الموت صادفنا لـما نعيت وحالت دونك الكثب.

'ভূমি ও উট হারানোর মত আমরা হারিয়েছি আপনাকে

আপনার অদৃশ্য হওয়ার পর ওহী ও কিতাব

আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হায়! আপনার পূর্বে যদি আমাদের মৃত্যু হতো! আপনার মৃত্যু সংবাদ শুনতে হতো না এবং মাটির ঢিবিও আপনার মাঝে অন্তরায় হতো না।

বিয়ের পরেও হযরত ফাতিমা (রা) পিতার সংসারের সকল বিষয়ের খোঁজ-খবর রাখতেন। অনেক সময় তাঁর সৎ মা'দের ছোটখাট রাগ-বিরাগ ও মান-অভিমানের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন। যেমন হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। একথা গোটা সাহাবী সমাজের জানা ছিল। এ কারণে রাসূল (সা) যেদিন 'আয়িশার (রা) ঘরে কাটাতেন সেদিন তারা বেশী বেশী হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন। এতে অন্য বেগমগণ ক্ষুব্ধ হতেন। তাঁরা চাইতেন রাসূল (সা) যেন লোকদের নির্দেশ দেন, তিনি যেদিন যেখানে থাকেন লোকেরা যেন সেখানেই যা কিছু পাঠাবার, পাঠায়। কিন্তু সে কথা রাসূলকে (সা) বলার হিম্মত কারো হতো না। এই জন্য তাঁরা সবাই মিলে তাঁদের মনের কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূলে কারীমের (সা) কলিজার টুকরা ফাতিমাকে (রা) বেছে নেন। রাসূল (সা) ফাতিমার (রা) বক্তব্য শুনে বললেন, 'মা, আমি যা চাই, তুমি কি তা চাও না?' ফাতিমা (রা) পিতার ইচ্ছা বুঝতে পারলেন এবং ফিরে এলেন। তাঁর সৎ মায়েরা আবার তাঁকে পাঠাতে চাইলেন : কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।[৭০]

জিহাদের ময়দানে

জিহাদের ময়দানে হযরত ফাতিমার (রা) রয়েছে এক উজ্জ্বল ভূমিকা। উহুদ যুদ্ধে হযরত রাসূলে কারীম (সা) দেহে ও মুখে আঘাত পেয়ে আহত হলেন। পবিত্র দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কোন কিছুতে যখন রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছিল না তখন ফাতিমা (রা) খেজুরের চাটাই আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে

---

৬৮. সাহাবিয়াত-১৫০

৬৯. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১১৪

৭০. বুখারী : ফাদায়িলু 'আয়িশা (রা); মুসলিম : ফাদায়িলুস সাহাবা (২৪৪১); আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-৫/৭৩

লাগিয়ে দেন।[৭১] এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-বায়হাকী বলেন : মুহাজির ও আনসার নারীগণ উহুদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। তাঁরা তাঁদের পিঠে করে পানি ও খাদ্য বহন করে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)ও বের হন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তিনি যখন পিতাকে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় দেখলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল :[৭২]

اشتدَّ غضب الله على قوم دموا وجهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'আল্লাহর শক্ত ক্রোধ পতিত হয়েছে সেই জাতির উপর যারা আল্লাহর রাসূলের (সা) মুখমণ্ডলকে রক্তরঞ্জিত করেছে।'

উহুদে হযরত ফাতিমার (রা) ভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান সাহাবী সাহ্ল ইবন সা'দ বলেছেন : রাসূল (সা) আহত হলেন, সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল, মাথায় তরবারি ভাঙ্গা হলো, ফাতিমা বিন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) রক্ত ধুতে লাগলেন, আর 'আলী (রা) ঢালে করে পানি ঢালতে লাগলেন। ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন, যতই পানি ঢালা হচ্ছে ততই রক্ত বেশী বের হচ্ছে তখন তিনি একটি চাটাই উঠিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করলেন– এবং সেই ক্ষতস্থানে লাগালেন। আর তখন রক্তপড়া বন্ধ হয়।[৭৩]

উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা ও ফাতিমার (রা) দাদা হযরত হামযা (রা) শহীদ হন। তিনিই হযরত ফাতিমার (রা) বিয়ের সময় ওলীমা অনুষ্ঠান করে মানুষকে আহার করান। ফাতিমা (রা) তাঁর প্রতি দারুণ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি আজীবন হযরত হামযার (রা) কবর যিয়ারত করতেন এবং তাঁর জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দু'আ করতেন।[৭৪]

অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত ফাতিমার (রা) যোগদানের কথা জানা যায়। যেমন খন্দক ও খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এই খায়বার বিজয়ের পর তথাকার উৎপাদিত গম থেকে তাঁর জন্য রাসূল (সা) ৮৫ ওয়াসক নির্ধারণ করে দেন। মক্কা বিজয়েও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সফরসঙ্গী হন। মূতা অভিযানে রাসূল (সা) তিন সেনাপতি– যায়দ ইবন আল-হারিছা, জা'ফর ইবন আবী তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইব রাওয়াহাকে (রা) পাঠান। একের পর এক তাঁরা তিনজনই শহীদ হলেন। এ খবর মদীনায় পৌঁছলে ফাতিমা (রা) তাঁর প্রিয় চাচা জা'ফরের (রা) শোকে 'ওয়া 'আম্মাহ্' বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে উপস্থিত হন এবং মন্তব্য করেন 'যে কাঁদতে চায় তার জা'ফরের মত মানুষের জন্য কাঁদা উচিত।'[৭৫]

---

৭১. আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২৪

৭২. আল-বায়হাকী : দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৩/২৮৩

৭৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৩৯; তাবাকাত-২/৪৮; বুখারী : আল-মাগাযী; মুসলিম : আল-হুদূদ ওয়াস সিয়ার

৭৪. আল-বায়হাকী : দালায়িল আল-নুবুওয়াহ; আল-ওয়াকিদী : আল-মাগাযী-২/৩১৩

৭৫. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২১৪

হযরত ফাতিমার (রা) মর্যাদা

তাঁর মহত্ব, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অনেক। নবী পরিবারের মধ্যে আরো অনেক মর্যাদাবান ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁদের মাঝে হযরত ফাতিমার (রা) অবস্থান এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে। সূরা আল-আহযাবের আয়াতে তাতহীর (পবিত্রকরণের আয়াত) এর নুযূল হযরত ফাতিমার (রা) বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে।

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.[৭৬]

'হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :[৭৭]

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فألقى عليهم ثوبا فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) দেখলাম, তিনি আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়নকে (রা) ডাকলেন এবং তাদের মাথার উপর একখানা কাপড় ফেলে দিলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবারের সদস্য। তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করুন!'

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূল (সা) এ আয়াত নাযিলের পর ছয়মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে যাওয়ার সময় ফাতিমার (রা) ঘরের দরজা অতিক্রম করাকালে বলতেন :

الصلاة ياأهل البيت،الصلاة.

'আস্-সালাত, ওহে নবী-পরিবার! আস-সালাত।'

তারপর তিনি পাঠ করতেন :[৭৮]

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

ইমাম আহমাদ (রহ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) 'আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়নের (রা) দিকে তাকালেন, তারপর বললেন :[৭৯]

أنا حربٌ لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم.

---

৭৬. সূরা আল-আহযাব-৩৩

৭৭. মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৯৪

৭৮. উসুদুল গাবা, জীবনী নং-৭১৭৫; আদ-দুররুল মানছূর-৬/৬০৫; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২১৯

৭৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৩

'তোমাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে আমি তাদের জন্য যুদ্ধ, তোমাদের সাথে যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করে আমি তাদের জন্য শান্তি।'

এই নবী পরিবার সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) অন্য একটি বাণীতে এসেছে :[৮০]

لايُبْغِضُنَا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار.

'যে কেউ 'আহলি বায়ত' বা নবী-পরিবারের সাথে দুশমনি করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।'

হিজরী ৯ম সনে নাজরানের একটি খ্রীষ্টান প্রতিনিধি দল হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিকট আসে এবং হযরত 'ঈসার (আ) ব্যাপারে তারা অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হয়। তখন নাযিল হয় আয়াতে 'মুবাহালা'। মুবাহালার অর্থ হলো, যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তাহলে তারা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এই মুবাহালা বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে করতে পারে এবং গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য পরিবার-পরিজনকেও একত্রিত করতে পারে। মুবাহালার আয়াতটি হলো :[৮১]

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

'তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল এসো, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে, তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে, তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লা'নত।'

এ আয়াত নাযিলের পর হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রতিনিধি দলকে মুহাবালার আহ্বান জানান এবং তিনি নিজেও ফাতিমা, আলী, হাসান ও হুসায়নকে (রা) সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন এবং বলেন : اَللهُمَّ هؤُلَاءِ أَهْلِىْ - 'হে আল্লাহ! এই আমার পরিবার-পরিজন। আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করুন।' এ কথাগুলো তিনবার বলার পর উচ্চারণ করেন :[৮২]

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

'হে আল্লাহ আপনি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনকে দান করুন

---

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. সূরা আলে ইমরান-৬১

৮২. সাহীহ মুসলিম : ফাদায়িল আস-সাহাবা; মুনসাদ-৪/১০৭; মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-১/২৮৭-২৮৯

যেমন আপনি করেছেন ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনকে। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিন ফাতিমাকে (রা) বলেন :[৮৩]

" إن الله تعالى يرضى لرضاكِ ويغضب لغضبك."

'আল্লাহ তা'আলা তোমার খুশীতে খুশী হন এবং তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন।'

রাসূল (সা) যখন কোন যুদ্ধ বা সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রথমে মসজিদে যেয়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। তারপর ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বেগমদের নিকট যেতেন।[৮৪]

একবার হযরত ফাতিমা (রা) অসুস্থ হলে রাসূল (সা) দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন : মেয়ে! কেমন আছ?

ফাতিমা বললেন : আমার কষ্ট আছে। সেটা আরো বেড়ে যায় এজন্য যে, আমার খাবার কোন কিছু নেই।

রাসূল (সা) বললেন : মেয়ে! তুমি বিশ্বের সকল নারীর নেত্রী হও এতে কি সন্তুষ্ট নও?

ফাতিমা বললেন : আব্বা! তাহলে মারয়াম বিন্ত ইমরানের অবস্থান কোথায়?

জবাবে রাসূল (সা) বললেন : তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের নারীদের নেত্রী, আর তুমি হবে তোমার সময়ের নারীদের নেত্রী।

আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের একজন নেতার সাথে বিয়ে দিয়েছি।[৮৫]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে - سيدة نساء أهل الجنة -

'জান্নাতের অধিবাসী নারীদের নেত্রী' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ইবন 'আব্বাসের (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন :[৮৬]

سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم أسية امرأة فرعون.

'জান্নাতের অধিবাসী নারীদের নেত্রী হলেন ক্রমানুসারে মারয়াম, ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ (সা), খাদীজা ও ফির'আওনের স্ত্রী আসিয়া।'

একবার রাসূল (সা) মাটিতে চারটি রেখা টানলেন, তারপর লোকদের বললেন, তোমরা কি জান এটা কি? সবাই বললো : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সা) ভালো জানেন। তিনি

---

৮৩. তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৪২; আল-ইসাবা-৪/৩৬৬
৮৪. উসুদুল গাবা-৫/৫৩৫
৮৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৬
৮৬. সাহাবিয়াত-১৪০

বললেন : ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মদ, খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদ, মারয়াম বিনত 'ইমরান ও আসিয়া বিন্‌ত মুযাহিম (ফির'আওনের স্ত্রী)। জান্নাতের নারীদের উপর তাদের রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা।

হযরত ফাতিমার (রা) ব্যক্তিত্বের প্রতি যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে তা রাসূলের (সা) এই হাদীছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :[৮৭]

كفاكِ من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون.

'পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তোমার অনুসরণের জন্য মারয়াম, খাদীজা, ফাতিমা ও ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া যথেষ্ট।'

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সবচেয়ে বেশী স্নেহের ও প্রিয় পাত্রী ছিলেন ফাতিমা (রা)। একবার রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করা হলো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয় মানুষটি কে? বললেন : ফাতিমা। ইমাম আয-যাহাবী বলেন :

كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال على.

'নারীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে বেশী প্রিয় ছিলেন ফাতিমা (রা) এবং পুরুষদের মধ্যে আলী (রা)।'

একবার হযরত আলী (রা) রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন : ফাতিমা ও আমি এ দুইজনের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। বললেন : তোমার চেয়ে ফাতিমা আমার বেশী প্রিয়।[৮৮]

আল্লাহর প্রিয় পাত্রী

হযরত ফাতিমা যে, আল্লাহরও প্রিয় পাত্রী ছিলেন কোন কোন অলৌকিক ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে একবার সামান্য খাদ্যে আল্লাহ যে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেছিলেন তা উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন সূত্রে ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা হলো, একদিন তাঁর এক প্রতিবেশিনী তাঁকে দুইটি রুটি ও এক খণ্ড গোশত উপহার হিসেবে পাঠালো। তিনি সেগুলো একটি থালায় ঢেলে ঢেকে দিলেন। তারপর রাসূলকে (সা) ডেকে আনার জন্য ছেলেকে পাঠালেন। রাসূল (সা) আসলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর সামনে থালাটি উপস্থাপন করলেন। এরপরের ঘটনা ফাতিমা (রা) বর্ণনা করেছেন এভাবে :

আমি থালাটির ঢাকনা খুলে দেখি সেটি রুটি ও গোশতে পরিপূর্ণ। আমি দেখে তো বিস্ময়ে হতবাক! বুঝলাম, এ বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমি আল্লাহর প্রশংসা

---

৮৭. তিরমিযী; আল-মানাকিব

৮৮. নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্‌-২১৬

করলাম এবং তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করলাম। তারপর খাদ্য ভর্তি থালাটি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থাপন করলাম। তিনি সেটি দেখে আল্লাহর প্রশংসা করে প্রশ্ন করলেন : মেয়ে! এ খাবার কোথা থেকে এসেছে?

বললাম : আব্বা! আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

রাসূল (সা) বললেন : আমার প্রিয় মেয়ে! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাকে বনী ইসরাঈলের নারীদের নেত্রীর মত করেছেন। আল্লাহ যখন তাঁকে কোন খাদ্য দান করতেন এবং সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো, তখন তিনি বলতেন : এ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।

সেই খাবার নবী করীম (সা), 'আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসায়ন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সকল বেগম খান। তাঁরা সবাই পেট ভরে খান। তারপরও থালার খাবার একই রকম থেকে যায়। ফাতিমা সেই খাবার প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। আল্লাহ সেই খাবারে প্রচুর বরকত ও কল্যাণ দান করেন।[৮৯]

নবী কারীম (সা) একবার দু'আ করেন, আল্লাহ যেন ফাতিমাকে ক্ষুধার্ত না রাখেন। ফাতিমা বলেন, তারপর থেকে আমি আর কখনো ক্ষুধার্ত হইনি। ঘটনাটি এরকম :

একদিন রাসূল (সা) ফাতিমার (রা) ঘরে গেলেন। তখন তিনি যাতায় গম পিষছিলেন। গায়ে ছিল উটের পশমে তৈরী কাপড়। মেয়ের এ অবস্থা দেখে পিতা কেঁদে দেন এবং বলেন : 'ফাতিমা! আখিরাতের সুখ-সম্ভোগের জন্য দুনিয়ার এ তিক্ততা গিলে ফেল।' ফাতিমা উঠে পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিতা কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার মুখমণ্ডল রক্তশূন্য হয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। তিনি বললেন : ফাতিমা! কাছে এসো। ফাতিমা পিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিতা একটি হাত মেয়ের কাঁধে রেখে এই দু'আ উচ্চারণ করেন :[৯০]

اللهم مشبع الجاعة ورافع الضيق ارفع فاطمة بنت محمد.

'ক্ষুধার্তকে আহার দানকারী ও সংকীর্ণতাকে দূরীভূতকারী হে আল্লাহ! তুমি ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদের সংকীর্ণতাকে দূর করে দাও।'

কথাবার্তা, চালচলন, উঠাবসা প্রতিটি ক্ষেত্রে ফাতিমা (রা) ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতিচ্ছবি। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :

فاطمة تمشى ماتخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

'ফাতিমা (রা) হাঁটতেন। তাঁর হাঁটা রাসূলুল্লাহর (সা) হাঁটা থেকে একটুও এদিক ওদিক

---

৮৯. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৬/১১১; হায়াত আস-সাহাবা-৩/৬২৮; তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৩৬০
৯০. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১২৫

হতো না।'[৯১] সততা ও সত্যবাদিতায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। 'আয়িশা (রা) বলতেন :[৯২]

مارأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذى ولدها.

'আমি ফাতিমার (রা) চেয়ে বেশী সত্যভাষী আর কাউকে দেখিনি। তবে তিনি যাঁর কন্যা (নবী সা.) তাঁর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।'

'আয়িশা (রা) আরো বলেন :[৯৩]

مارأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة،

وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هى تصنع به.

'আমি কথাবার্তা ও আলোচনায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ফাতিমার (রা) চেয়ে বেশী মিল আছে এমন কাউকে দেখিনি। ফাতিমা (রা) যখন রাসূলের (সা) নিকট আসতেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু দিতেন, স্বাগত জানাতেন। ফাতিমাও পিতার সাথে একই রকম করতেন।'

রাসূল (সা) যে পরিমাণ ফাতিমাকে (রা) ভালোবাসতেন, সেই পরিমাণ অন্য কোন সন্তানকে ভালোবাসতেন না।

তিনি বলেছেন : فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى

'ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। কেউ তাকে অসন্তুষ্ট করলে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে।'

ইমাম আস-সুহাইলী এই হাদীছের ভিত্তিতে বলেছেন, কেউ ফাতিমাকে (রা) গালিগালাজ করলে কাফির হয়ে যাবে। তিনি তাঁর অসন্তুষ্টি ও রাসূলুল্লাহর (সা) অসন্তুষ্টি এক করে দেখেছেন। আর কেউ রাসূলকে (সা) ক্রোধান্বিত করলে কাফির হয়ে যাবে।[৯৪]

ইবনুল জাওযী বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য সকল কন্যাকে ফাতিমা (রা) এবং অন্য সকল বেগমকে 'আয়িশা (রা) সম্মান ও মর্যাদায় অতিক্রম করে গেছেন।[৯৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন : একজন ফেরেশতাকে আল্লাহ আমার সাক্ষাতের অনুমতি দেন। তিনি আমাকে এ সুসংবাদ দেন যে, ফাতিমা হবে আমার উম্মাতের সকল নারীর নেত্রী এবং হাসান ও হুসায়ন হবে

---

৯১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৩০

৯২. প্রাগুক্ত-১৩১

৯৩. আবূ দাঊদ : বাবু মা জায়াফিল কিয়াম (৫২১৭); তিরমিযী : মানাকিবু ফাতিমা (৩৮৭১)

৯৪. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১২৫, টীকা-২

৯৫ প্রাগুক্ত-৪/১২৬

জান্নাতের অধিবাসীদের নেতা।[৯৬] এক প্রসঙ্গে তিনি 'আলীকে (রা) বলেন : 'ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। সুতরাং তার অসন্তুষ্টি হয় এমন কিছু করবে না।'

পিতার প্রতি ফাতিমার (রা) ভালোবাসা

হযরত রাসূলে কারীম (সা) যেমন কন্যা ফাতিমাকে (রা) গভীরভাবে ভালোবাসতেন তেমনি ফাতিমাও পিতাকে প্রবলভাবে ভালোবাসতেন। পিতা কোন সফর থেকে যখন ফিরতেন তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন। তারপর কন্যা ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের ঘরে যেতেন। এটা তাঁর নিয়ম ছিল। একবার রাসূল (সা) এক সফর থেকে ফিরে ফাতিমার ঘরে যান। ফাতিমা (রা) পিতাকে জড়িয়ে ধরে চোখে-মুখে চুমু দেন। তারপর পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। রাসূল (সা) বলেন : কাঁদছো কেন? ফাতিমা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং আপনার পরিধেয় বস্ত্রও ময়লা, নোংরা হয়েছে। এ দেখেই আমার কান্না পাচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন : ফাতিমা, কেঁদো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে একটি বিষয়ের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। ধরাপৃষ্ঠের শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘরে তিনি তা পৌঁছে দেবেন। সম্মানের সঙ্গে হোক বা অপমানের সঙ্গে।[৯৭]

রাসূলুল্লাহর (সা) তিরস্কার ও সতর্ককরণ

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এত প্রিয়পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখলেও রাসূল (সা) তাঁকে তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হতেন না। রাসূল (সা) পার্থিব ঠাঁটবাট ও চাকচিক্য অপসন্দ করতেন। তিনি নিজে যা পসন্দ করতেন না তা অন্য কারো জন্য পসন্দ করতে পারেন না। একবার স্বামী 'আলী (রা) একটি সোনার হার ফাতিমাকে (রা) উপহার দেন। তিনি হারটি গলায় পরে আছেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং হারটি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে। তিনি বলেন, ফাতিমা! তুমি কি চাও যে, লোকেরা বলুক রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা আগুনের হার গলায় পরে আছে? ফাতিমা পিতার অসন্তুষ্টি বুঝতে পেরে হারটি বিক্রী করে দেন এবং সেই অর্থ দিয়ে একটি দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। একথা রাসূল (সা) জানার পর বলেন :[৯৮]

الحمد لله الذى نجّى فاطمة من النار.

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি ফাতিমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়েছেন।'

আরেকটি ঘটনা। রাসূল (সা) কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরলেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি ফাতিমার (রা) গৃহে যাবেন। ফাতিমা (রা) পিতাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলালেন, দুই ছেলে হাসান ও হুসায়নের (রা) হাতে একটি করে রূপোর

---

৯৬. প্রাগুক্ত-৪/১২৭

৯৭. কান্‌য আল-'উম্মাল-১/৭৭; হায়াত আস-সাহাবা-১/৬৫

৯৮. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-১/৫৫৭; মুসনাদ-৫/২৭৮, ২৭৯; নিসা' হাওলার রাসূল-১৪৯

চুড়ি পরালেন। ভাবলেন, এতে তাঁদের নানা রাসূল (সা) খুশী হবেন। কিন্তু ফল উল্টো হলো। রাসূল (সা) ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন। বুদ্ধিমতি কন্যা ফাতিমা (রা) বুঝে গেলেন, পিতা কেন ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পর্দা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং দুই ছেলের হাত থেকে চুড়ি খুলে ফেলেন। তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের নানার নিকট চলে যায়। তখন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, এরা আমার পরিবারের সদস্য। আমি চাইনা পার্থিব সাজ-শোভায় তারা শোভিত হোক।[৯৯]

একবার রাসূল (সা) ফাতিমা, 'আলী, হাসান ও হুসায়নকে (রা) বললেন : যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ, তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ, যাদের সঙ্গে তোমাদের শান্তি ও সন্ধি তাদের সঙ্গে আমারও শান্তি ও সন্ধি। অর্থাৎ যাদের প্রতি তোমরা অখুশী তাদের প্রতি আমিও অখুশী, আর যাদের প্রতি খুশী, তাদের প্রতি আমিও খুশী।

রাসূল (সা) অতি আদরের কন্যা ফাতিমাকে (রা) সব সময় স্পষ্ট করে বলে দিতেন যে, নবীর (সা) কন্যা হওয়ার কারণে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না। সেখানে মুক্তির একমাত্র উপায় হবে আমল, তাকওয়া ও খাওফে খোদা। একবার তিনি ভাষণে বলেন :[১০০]

يامعشر قريش اشتروا انفسكم لاأغنى عنكم من الله شيئا، ... يافاطمة بنت محمد سلينى شئت ما مالى، لاأغنى من الله شيئا.

'হে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ সত্তাকে ক্রয় করে নাও। আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না।... হে ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ! তুমি আমার সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা আমার নিকট চেয়ে নাও। তবে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারবো না।'

তিনি একথাও বলেন :

يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار، فإنى لاأملك من الله ضرا ولانفعا.

'হে ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ, তুমি নিজকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি আল্লাহর দরবারে তোমার উপকার ও অপকার কিছুই করতে সক্ষম হবো না।'

এক মাখযূমী নারী' চুরি করলে তার গোত্রের লোকেরা রাসূলের (সা) প্রীতিভাজন উসামা ইবন যায়দের (রা) মাধ্যমে সুপারিশ করে শাস্তি মওকুফের চেষ্টা করে। তখন রাসূল (সা) বলেন :[১০১]

---

৯৯. সাহাবিয়াত-১৪৭

১০০. বুখারী-৬/১৬ (তাফসীর সূরা আশ্ শু'আরা); নিসা' হাওলার রাসূল-১৪৯

১০১. বুখারী : আল-হুদূদ; মুসলিম : বাবু কিত'উস সারিক (১৬৮৮)

وإيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها.

'আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদও যদি চুরি করে তাহলে আমি তার হাত কেটে দেব।

পিতার উত্তরাধিকার দাবী

হযরত রাসূলে কারীম (সা) ইনতিকাল করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দেখা দিল। ফাতিমা (রা) সোজা খলীফা আবূ বকরের (রা) নিকট গেলেন এবং তাঁর পিতার উত্তরাধিকার বণ্টনের আবেদন জানালেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) এ হাদীছটি শোনান :

"لانورث، ماتركنا صدقة."

'আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই সবই সাদাকা হয়। তার কোন উত্তরাধিকার হয় না।' তারপর তিনি বলেন, এরপর আমি তা কিভাবে বণ্টন করতে পারি? এ জবাবে হযরত ফাতিমা (রা) একটু রুষ্ট হলেন।[১০২] ফাতিমা (রা) ঘরে ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ রকমও বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকরের (রা) এ জবাবে হযরত ফাতিমা (রা) দুঃখ পান এবং আবূ বকরের (রা) প্রতি এত নারাজ হন যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর সাথে কোন কথা বলেননি। কিন্তু ইমাম আশ-শা'বীর (রহ) একটি বর্ণনায় জানা যায়, ফাতিমা (রা) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আবূ বকর (রা) তাঁর গৃহে যান এবং সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। 'আলী (রা) ফাতিমার (রা) নিকট গিয়ে বলেন, আবূ বকর (রা) তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) 'আলীকে (রা) প্রশ্ন করলেন : আমি তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দিই তাতে কি তোমার সম্মতি আছে? 'আলী (রা) বললেন : হাঁ। ফাতিমা (রা) অনুমতি দিলেন। আবূ বকর (রা) ঘরে ঢুকে কুশল বিনিময়ের পর বললেন : আল্লাহর কসম! আমি আমার অর্থ-বিত্ত, পরিবার-পরিজন, গোত্র সবকিছু পরিত্যাগ করতে পারি আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (সা) এবং আপনারা আহ্‌লি বায়ত তথা নবী পরিবারের সদস্যদের সন্তুষ্টির বিনিময়ে। আবূ বকরের (রা) এমন কথায় হযরত ফাতিমার (রা) মনের সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। তিনি খুশী হয়ে যান।[১০৩] ইমাম আয-যাহাবী (রহ) এ তথ্য উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেছেন, স্বামীর গৃহে অন্য পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে স্বামীর অনুমতি নিতে হয়– এ সুন্নাত সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা) অবহিত ছিলেন। এ ঘটনা দ্বারা সেকথা জানা যায়।[১০৪] এখানে উল্লেখিত এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় হযরত ফাতিমার (রা) অন্তরে পূর্বে কিছু অসন্তুষ্টি থাকলেও পরে তা দূর হয়ে যায়। তাছাড়া একটি বর্ণনায় একথাও জানা যায় যে, ফাতিমা (রা) মৃত্যুর পূর্বে আবূ

---

১০২. মুসলিম : ফিল জিহাদ ওয়াস সায়র (১৭৫৯); বুখারী : ৬/১৩৯, ১৪১; ৭/২৫৯ ফিল মাগাযী : বাব : হাদীছু বানী আন-নাদীর; তাবাকাত-৮/১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা--২/১২০

১০৩. তাবাকাত-৮/২৭

১০৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২১

বকরের (রা) স্ত্রীকে অসীয়াত করে যান, মৃত্যুর পরে তিনি যেন তাঁকে গোসল দেন।[১০৫]

মৃত্যু

হযরত ফাতিমার (রা) অপর তিন বোন যেমন তাঁদের যৌবনে ইনতিকাল করেন তেমনি তিনিও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ওফাতের আট মাস, মতান্তরে সত্তুর দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের দুই অথবা চার মাস অথবা আট মাস পরে তাঁর ইনতিকালের কথাও বলেছেন। তবে এটাই সঠিক যে, হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের ছয় মাস পরে হিজরী ১১ সনের ৩ রমাদান মঙ্গলবার রাতে ২৯ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ভবিষ্যদ্বাণী– 'আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে'– সত্যে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে যদি হযরত ফাতিমার (রা) জন্ম ধরা হয় তাহলে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ২৯ বছর হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, নবুওয়াত লাভের এক বছর পর ফাতিমার (রা) জন্ম হয়, এই হিসাবে তাঁর বয়স ২৯ বছর হবে না। যেহেতু অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মৃত্যুকালে ফাতিমার (রা) বয়স হয়েছিল ২৯ বছর, তাই তাঁর জন্মও হবে নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে।[১০৬]

আল-ওয়াকিদী বলেছেন, হিজরী ১১ সনের ৩ রমাদান ফাতিমার (রা) ইনতিকাল হয়। হযরত 'আব্বাস (রা) জানাযার নামায পড়ান। হযরত 'আলী, ফাদল ও 'আব্বাস (রা) কবরে নেমে দাফন কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর অসীয়াত মত রাতের বেলা তাঁর দাফন করা হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আলী, মতান্তরে আবূ বকর (রা) জানাযার নামায পড়ান। স্বামী 'আলী (রা) ও আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) তাঁকে গোসল দেন।[১০৭]

হযরত ফাতিমার (রা) অন্তিম রোগ সম্পর্কে ইতিহাসে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মারাত্মক কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কিছুকাল শয্যাশায়ী ছিলেন, এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। উম্মু সালমা (রা) বলেন, ফাতিমার (রা) ওফাতের সময় 'আলী (রা) পাশে ছিলেন না। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমার গোসলের জন্য পানির ব্যবস্থা করুন। নতুন পরিচ্ছন্ন কাপড় বের করুন, পরবো। আমি পানির ব্যবস্থা করে নতুন কাপড় বের করে দিলাম। তিনি উত্তমরূপে গোসল করে নতুন কাপড় পরেন। তারপর বলেন, আমার বিছানা করে দিন, বিশ্রাম করবো। আমি বিছানা করে দিলাম। তিনি কিবলামুখী হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তারপর আমাকে বলেন, আমার বিদায়ের সময় অতি নিকটে। আমি গোসল করেছি। দ্বিতীয়বার গোসল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার পরিধেয় বস্ত্রও খোলার প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

---

১০৫. নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-২২৪; টীকা নং-১
১০৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৭
১০৭. আল-ইসতী'আব-৪/৩৬৭, ৩৬৮; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০২, ৪০৫

'আলী (রা) ঘরে আসার পর আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম। তিনি ফাতিমার (রা) সেই গোসলকেই যথেষ্ট মনে করলেন এবং তাঁকে সেই অবস্থায় দাফন করেন।[১০৮] এ রকম বর্ণনা উম্মু রাফি' থেকেও পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, 'আলী (রা), মতান্তরে আবূ বকরের (রা) স্ত্রী তাঁকে গোসল দেন।[১০৯]

জানাযায় খুব কম মানুষ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তার কারণ, রাতে তাঁর ইনতিকাল হয় এবং হযরত 'আলী (রা) ফাতিমার অসীয়াত অনুযায়ী রাতেই তাঁকে দাফন করেন। তাবাকাতের বিভিন্ন স্থানে এ রকম বর্ণনা এসেছে। 'আয়িশা (রা) বলেন, নবীর (সা) পরে ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন এবং রাতের বেলা তাঁকে দাফন করা হয়।[১১০]

লজ্জা-শরম ছিল হযরত ফাতিমার (রা) স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আসমা' বিন্‌ত 'উমাইসকে (রা) বলেন, মেয়েদের লাশ উন্মুক্ত অবস্থায় যে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ আমার পসন্দ নয়। এতে বেপর্দা হয়। নারী-পুরুষের লাশের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয় না। পুরুষরা যে মেয়েদের লাশ খোলা অবস্থায় বহন করেন, এ তাদের একটা মন্দ কাজ। আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূলের কন্যা! আমি হাবশায় একটি ভালো পদ্ধতি দেখেছি। আপনি অনুমতি দিলে দেখাতে পারি। একথা বলে তিনি খেজুরের কিছু ডাল আনলেন এবং তার উপর একটি কাপড় টানিয়ে পর্দার মত করলেন। এ পদ্ধতি হযরত ফাতিমার (রা) বেশ পসন্দ হলো এবং তিনি বেশ উৎফুল্ল হলেন।

হযরত ফাতিমার (রা) লাশ পর্দার মধ্য দিয়ে কবর পর্যন্ত নেওয়া হয়। ইসলামে সর্বপ্রথম এভাবে তাঁর লাশটিই নেওয়া হয়। তাঁর পরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্‌ত জাহাশের লাশটিও এভাবে কবর পর্যন্ত বহন করা হয়।

হযরত 'আলী (রা) স্ত্রী ফাতিমার (রা) দাফন-কাফনের কাজ সম্পন্ন করে যখন ঘরে ফিরলেন তখন তাঁকে বেশ বিষণ্ন ও বেদনাকাতর দেখাচ্ছিল। শোকাতুর অবস্থায় বার বার নীচের চরণগুলো আওড়াচ্ছিলেন :[১১১]

أرى علل الدنيا على كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل

لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذى دون الفراق قليل

وإن افتقادى فاطمة بعد أحمد دليل على أن لايدوم خليل.

'আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মধ্যে দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি প্রচুর পরিমাণে বাসা বেঁধেছে। আর একজন দুনিয়াবাসী মৃত্যু পর্যন্ত রোগগ্রস্তই থাকে।

---

১০৮. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১৩১

১০৯. তাবাকাত-৮/১৭, ১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৯

১১০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১২৭

১১১. আ'লাম আন-নিসা'-৪/১৩১

ভালোবাসার লোকদের প্রতিটি মিলনের পরে বিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদ ছাড়া মিলনের যে সময়টুকু তা অতি সামান্যই।

আহমাদের (সা) পরে ফাতিমার (রা) বিচ্ছেদ একথাই প্রমাণ করে যে, কোন বন্ধুই চিরকাল থাকে না।'

হযরত 'আলী (রা) প্রতিদিন ফাতিমার (রা) কবরে যেতেন, স্মৃতিচারণ করে কাঁদতেন এবং নিম্নের এ চরণ দু'টি আবৃত্তি করতেন :

مالى مررت على القبور مسلما　　قبر الحبيب فلم يرد جوالى

ياقبر مالك لاتجيب مناديا　　أملك بعدى خلة الأحباب.

'আমার একি দশা হয়েছে যে, আমি কবরের উপর সালাম করার জন্য আসি; কিন্তু প্রিয়ার কবর আমার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না।

হে কবর! তোমার কী হয়েছে যে, তোমার আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও না?

তুমি কি তোমার প্রিয়জনের ভালোবাসায় বিরক্ত হয়ে উঠেছো?'

দাফনের স্থান

আল-ওয়াকিদী বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবন আবিল মাওলাকে বললাম, বেশীর ভাগ মানুষ বলে থাকে হযরত ফাতিমার (রা) কবর বাকী' গোরস্তানে। আপনি কী মনে করেন? তিনি জবাব দিলেন : বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়নি। তাঁকে 'আকীলের বাড়ীর এক কোনে দাফন করা হয়েছে। তাঁর কবর ও রাস্তার মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় সাত হাত।[১১২]

হাদীছ বর্ণনা

হযরত ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) আঠারোটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি অর্থাৎ হযরত 'আয়িশার (রা) সনদে বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ্ ও তিরমিযী তাঁদের নিজ নিজ সংকলনে ফাতিমা (রা) বর্ণিত হাদীছ সংকলন করেছেন। আর ফাতিমা (রা) থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : তাঁর কলিজার টুকরা দুই ছেলে– হাসান, হুসায়ন, স্বামী 'আলী ইবন আবী তালিব, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা, সালমা উম্মু রাফি', আনাস ইবন মালিক, উম্মু সালামা, ফাতিমা বিন্‌ত আল-হুসায়ন (রা) ও আরো অনেকে। ইবনুল জাওযী বলেন, একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া রাসূলুল্লাহর (সা) অন্য কোন মেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।[১১৩]

---

১১২. সাহাবিয়াত-১৫৩

১১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৯; আ'লাম আন-নিসা'-১২৮, টীকা নং-১

উম্মুল ফাদল বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)

উম্মুল ফাদল লুবাবা আল-কুবরা, যিনি শুধু উম্মুল ফাদল নামেই পরিচিত। আরবের রীতি অনুযায়ী বড় ছেলে আল-ফাদল ইবন 'আব্বাসের নামে উপনাম ধারণ করেন। তাঁর পিতা আল-হারিছ ইবন হুয্‌ন আল-হিলালী এবং মাতা হিন্দ বিন্‌ত 'আওফ আল-কিনানিয়্যা। এই হিন্দ খাওলা নামেও পরিচিত।[১] রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারাম চাচা হযরত 'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিব (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। সুতরাং উম্মুল ফাদল রাসূলুল্লাহর (সা) একজন গর্বিত চাচী। হযরত 'আব্বাসের ছেলে-মেয়ে : আল-ফাদল, 'আবদুল্লাহ, 'উবাইদুল্লাহ, মা'বাদ, কুসাম, 'আবদুর রহমান ও উম্মু হাবীবের গর্ভধারিনী মা। ইমাম আজ জাহাবী বলেছেন ঃ 'তিনি হযরত আব্বাসের (রা) ছয়জন মহান পুত্রের জননী'।[২] 'আরব কবি 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ আল-হিলালী বলেছেন ঃ 'উম্মুল ফাদলের গর্ভের ছয় সন্তানের মত কোন সন্তান আরবের কোন মহিয়ষী নারী জন্মদান করেননি।'[৩]

তাঁর অনেকগুলো সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ছিলেন, যাঁদের অনেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। যেমন মায়মূনা বিনত আল-হারিছ, সহোদর বোন- রাসূলুল্লাহর (সা) সহধর্মিনী। আল-'আসমা' বিন্‌ত আল হারিছ- যিনি লুবাবা আস-সুগরা নামে পরিচিত, প্রখ্যাত সাহাবী ও সেনানায়ক খালিদ ইবন আল ওয়ালিদের (রা) গর্বিত মা। 'আয্‌যা বিন্‌ত আল-হারিছ ও হুযাইলা-বিন্‌ত আল-হারিছ। শেষোক্ত তিনজন তাঁর বৈমাত্রেয় বোন। আর মাহমিয়্যা ইবন জাযাআ আয-যুবাইদী, সুলমা, আসমা' ও সালামা- সবাই তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই-বোন।[৪] সুতরাং দেখা গেল, তিনি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনার আপন বোন ও সেনাপতি খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের খালা।

বোন সালমা ছিলেন হযরত হামযার (রা) স্ত্রী, এবং আসমা ছিলেন হযরত 'আলীর (রা) ভাই প্রখ্যাত সেনানায়ক ও শহীদ সাহাবী হযরত জা'ফার ইবন আবী তালিবের (রা) স্ত্রী। জা'ফারের শাহাদাতের পর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হন তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। হযরত আবু বকরের (রা) ইনতিকালের পর হযরত 'আলী (রা) হন তাঁর তৃতীয় স্বামী। উম্মুল ফাদলের মা এদিক দিয়ে খুবই সৌভাগ্যবতী যে, তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ ঘরের সর্বোত্তম সন্তানদেরকে কন্যাদের বর হিসেবে লাভ করেন। আর এ সৌভাগ্যের ব্যাপারে অন্য কোন নারী তাঁর সমকক্ষ নেই।[৫]

---

১. তাবাকাত-৮/২৭৭; আল-ইসাবা-৪/৩৯৮
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৪; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪৪৭
৩. তাবাকাত-৮/২৭৭; আল-ইসতী'আব, আল ইসাবার পার্শ্বটীকা-৪/৩৯৯
৪. উসুদুল গাবা-৫/৫৩৯
৫. তাবাকাত-৮/২৭৮; আল-ইসতী'আব-৪/৩৯৯

তিনি মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ভাগে মুসলমান হন। বর্ণিত হয়েছে, তিনি মক্কার প্রথম মহিলা যিনি হযরত খাদীজার (রা) পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬] তবে আল-ইসাবা গ্রন্থে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি হিজরাতের পূর্বে মুসলমান হন।[৭] তবে মুহাদ্দিছগণ এ বর্ণনাটিকে দুর্বল এবং প্রথমোক্ত বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন।[৮] ইমাম জাহাবী তাঁকে প্রথম পর্বের মুসলমান বলেছেন।[৯]

রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম আবু রাফে' বলেছেন, আমি ছিলাম 'আব্বাসের দাস। আমাদের আহলি বায়তের মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করে। 'আব্বাস ও উম্মুল ফাদল ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর আমিও ইসলাম গ্রহণ করি। কিন্তু 'আব্বাস তাঁর ইসলাম গোপন রাখেন।[১০] এটাই সঠিক যে 'আব্বাস প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তা গোপন রাখেন।

মক্কার আদি পর্বের মুসলমান হলেও স্বামী হযরত 'আব্বাসের (রা) মদীনায় হিজরাতের পূর্ব পর্যন্ত শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মক্কার মাটি আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকেন। হযরত 'আব্বাস (রা) অনেক দেরীতে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং একেবারে শেষের দিকে মদীনায় হিজরাত করেন। আর তখনই উম্মুল ফাদল (রা) তাঁর সন্তানদের সহ মদীনায় হিজরাত করেন।[১১] তাই তাঁর ছেলে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) পরবর্তীকালে সূরা আন-নিসার ৭৫ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলতেন, এ আয়াতে যে দুর্বল নারী ও শিশুদের পক্ষে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে, আমার মা ও আমি হলাম সেই নারী ও শিশু।[১২] আয়াতটির মর্ম এরূপ : 'আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী!' হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় তাঁরা হযরত 'আব্বাসের (রা) আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাত করতে অক্ষম ছিলেন। একথা বলেছেন ইমাম আজ-জাহাবী।[১৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মুল ফাদল সহ তাঁর অন্য বোনদেরকে ঈমানদার বলে ঘোষণা দান করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে মায়মূনা, উম্মুল ফাদল, লুবাবা সুগরা, হুযাইলা, 'আয্যা, আসমা ও সালমা—এই বোনদের নাম আলোচনা করা হলো। রাসূল (সা) বললেন : এই সকল বোন মু'মিনা বা ঈমানদার।[১৪] রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের কিছু কিছু ঘটনা দ্বারা জানা যায়, তিনি চাচী উম্মুল ফাদলকে যেমন ভালোবাসতেন, তেমনি

---

৬. তাবাকাত-৮/২৭৭
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫
৮. সাহাবিয়াত-১৭৪
৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫
১০. হায়াতুস সাহাবা-৩/৫৩০
১১. তাবাকাত-৮/২৭৮
১২. সাহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আন-নিসা'
১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫
১৪. তাবাকাত-৮/২৭৮; আল-ইসতী'আব-৪/৪০১

গুরুত্বও দিতেন। চাচীও তাঁকে খুবই আদর করতেন। রাসূল (সা) প্রায়ই চাচীকে দেখার জন্যে তাঁর গৃহে যেতেন এবং দুপুরে কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম নিতেন।[১৫]

আল-আজলাহ যায়দ ইবন আলী ইবন হুসায়নের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত লাভের পর একমাত্র উম্মুল ফাদল ছাড়া অন্য কোন মহিলার কোলে মাথা রাখেননি এবং তা রাখা তাঁর জন্যে বৈধও ছিল না। উম্মুল ফাদল রাসূলুল্লাহর (সা) মাথা নিজের কোলের উপর রেখে সাফ করে দিতেন এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে দিতেন। একদিন তিনি যখন সুরমা লাগাচ্ছেন, তখন হঠাৎ তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি রাসূলুল্লাহর (সা) গণ্ডে পড়ে। তিনি মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করেন : কি হয়েছে? উম্মুল ফাদল বলেন : আল্লাহ আপনাকে মৃত্যু দান করবেন। যদি এ নেতৃত্ব ও ক্ষমতা আমাদের মধ্যে থাকে অথবা অন্যদের হাতে চলে যায় তাহলে আমাদের মধ্যে কে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবে তা যদি বলে যেতেন। রাসূল (সা) বললেন : আমার পরে তোমরা হবে ক্ষমতাহীন, দুর্বল।[১৬] ইমাম আহমাদের বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) অন্তিম রোগ শয্যায় এ ঘটনাটি ঘটে।[১৭]

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মুল ফাদলও হজ্জ করেন। আরাফাতে অবস্থানের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা অবস্থায় আছেন কিনা, সে ব্যাপারে সাহাবীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। এক পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের সে দ্বিধার কথা উম্মুল ফাদলের নিকট প্রকাশ করেন। উম্মুল ফাদল বিষয়টি নিশ্চিত হবার জন্য এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে পেশ করেন এবং তিনি তা পান করেন। এভাবে তাঁদের সব দ্বিধা-সংশয় দূর হয়ে যায়।[১৮]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা) একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার দেহের একটি অঙ্গ আমার ঘরে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : স্বপ্নের তাবীর ইনশাআল্লাহ ভালো। ফাতিমার একটি পুত্র সন্তান হবে এবং আপনি তাকে দুধ পান করাবেন। এভাবে আপনি হবেন তার তত্ত্বাবধায়িকা। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ফাতিমা হযরত হুসাইনকে (রা) জন্ম দেন এবং উম্মুল ফাদল (রা) তাঁকে দুধও পান করান। একদিন তিনি হুসাইনকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আনেন। শিশু হুসাইন নানার কোলে পেশাব করে দেন। উম্মুল ফাদল তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে পেশাব করে দিয়েছো? রাসূল (সা) বলেন: আপনি আমার সন্তানকে ধমক দিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। তারপর পানি দিয়ে পেশাব ধোয়া হয়।[১৯]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) তিরিশটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একথা ইমাম জাহাবী মুসনাদে বাকী ইবন মুখাল্লাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি

১৫. তাবাকাত-৮/২৭৭; উসুদুল গাবা-৫/৫৩৯
১৬. তাবাকাত-৮/২৭৮
১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৩৩৭
১৮. তাবাকাত-৮/২৭৯
১৯. প্রাগুক্ত

মাত্র হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি, একটি ইমাম বুখারী এবং তিনটি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২০]

উম্মুল ফাদল থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন : 'আবদুল্লাহ, তাম্মাম, আনাস ইবন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইবন হারিছ, 'উমাইর, কুরাইব ও ফাবূস।[২১]

হযরত উম্মুল ফাদল একজন উঁচু স্তরের 'আবিদা এবং দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ মহিলা ছিলেন। প্রতি সোম ও বুধবার রোযা রাখা তাঁর অভ্যাস ছিল। একথা তাঁর সুযোগ্য ছেলে মহান সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন।[২২] তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তাঁর স্বামী হযরত 'আব্বাস (রা) জীবিত ছিলেন। হযরত 'উছমান (রা) জানাযার নামায পড়ান।[২৩]

---

২০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫; দ্র. বুখারী-২/২০৪, ৪/২০৬; মুসলিম, হাদীস নং ৪৬২, ১১২৩, ১৪৫১

২১. উসুদুল গাবা-৫/৫৪০

২২. তাবাকাত-৮/২৭৮; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১১৭

২৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৫ সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১১৭

সাফিয়্যা (রা) বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব

হযরত সাফিয়্যা (রা) ও হযরত রাসূলে কারীমের (সা) বংশ ও পূর্বপুরুষ এক ও অভিন্ন। কারণ হযরত সাফিয়্যা (রা) 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) মায়ের সৎ বোন হালা বিন্‌ত ওয়াহাব ছিলেন সাফিয়্যার মা। সুতরাং এ দিক দিয়ে সাফিয়্যার মা রাসূলুল্লাহর (সা) খালা।[১] উহুদের শহীদ সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা) তাঁর ভাই। দুইজন একই মায়ের সন্তান।[২]

জাহিলী যুগে আবু সুফইয়ান ইবন হারবের ভাই হারিছ ইবন হারবের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তার ঔরসে এক ছেলের জন্ম হয়। হারিছের মৃত্যুর পর 'আওয়াম ইবন খুওয়াইলিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং এখানে যুবাইর, সায়িব ও 'আবদুল কা'বা—এ তিন ছেলের মা হন।[৩] উল্লেখ্য যে এই 'আওয়াম ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা'র (রা) ভাই। অতএব দেখা যাচ্ছে তিনি 'আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য হযরত যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের গর্বিত মা এবং জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ও স্বৈরাচারী ইয়াযীদের বাহিনীর হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের দাদী।

হযরত সাফিয়্যা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফুদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য আছে। একমাত্র তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের কোন দ্বিমত নেই। ইবন সা'দ আরওয়া, 'আতিকা ও অন্য ফুফুদের ইসলাম গ্রহণের কথা বলেছেন। তবে সত্য এই যে, একমাত্র সাফিয়্যা ছাড়া অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। ইবনুল আছীর একথাই বলেছেন।[৪] তাঁর হিজরাত সম্পর্কে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি স্বামী 'আওয়ামের সাথে মদীনায় হিজরাত করেন। ইবন সা'দ শুধু এতটুকু বলেছেন :[৫]

هاجرت إلى المدينة. 'তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।'

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এ আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ[৬] নাযিল হয় তখন তিনি দাঁড়িয়ে এভাবে সম্বোধন করেন :[৭]

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৪৯২; আল-ইসাবা-৪/৩৪৮
২. তাহজীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/৩৪৯
৩. তাবাকাত-৮/৪২
৪. উসুদুল গাবা-৫/৪৯২; তাহজীবুল আসমা' ওয়াললুগাত-১/৩৪৯,
৫. তাবাকাত-৮
৬. সূরা আশ-শু'আরা'-২১৪
৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭১

–'হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ, হে সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব, হে 'আবদুল মুত্তালিবের বংশধরেরা, আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের ব্যাপারে কিছুই করতে পারবো না। তোমরা আমার ধন-সম্পদ থেকে যা-খুশি চাইতে পার।'

তিনি কয়েকটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁর সাহস ও দৃঢ়তা বিস্ময়কর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে আছে।

খন্দক, মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) মুসলিম মহিলাদেরকে কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিতের (রা) ফারে' দুর্গে নিরাপত্তার জন্যে রেখে যান। এই ফারে' দুর্গকে 'উতুম' দুর্গও বলা হতো। তাঁদের সাথে হযরত হাস্‌সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যাও ছিলেন। একদিন এক ইহুদীকে তিনি দুর্গের আশে-পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি প্রমাদ গুণলেন, যদি সে মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ, রাসূল (সা) তাঁর বাহিনীসহ তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করছেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) বিপদের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে হাস্‌সানকে বললেন, এই ইহুদীকে হত্যা কর। তা না হলে সে আমাদের অবস্থানের কথা অন্য ইহুদীদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্‌সান (রা) বললেন, আপনার জানা আছে, আমার নিকট এর কোন প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহস থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হাস্‌সানকে (রা) বলেন, যাও, এবার তার সঙ্গের জিনিসগুলি নিয়ে এসো। যেহেতু আমি নারী, আর সে পুরুষ, তাই একাজটি আমার দ্বারা হবে না। এ কাজটি তোমাকে করতে হবে। হাস্‌সান বললেন, ঐ জিনিসের প্রয়োজন নেই।[৮]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সাফিয়্যা (রা) লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্‌সানকে বলেন, ধর, এটা দুর্গের নীচে ইহুদীদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন: এ আমার কাজ নয়। অতঃপর সাফিয়্যা নিজেই মাথাটি ইহুদীদের মধ্যে ছুঁড়ে মারেন। আর ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে সাফিয়্যা (রা) বলতেন :

أنا أول إمرأةٍ قتلتُ رجلاً .

'আমিই প্রথম মহিলা যে একজন পুরুষকে হত্যা করেছে।' একথা উরওয়া বর্ণনা করেছেন।[৯]

উহুদ যুদ্ধ হয় খন্দক যুদ্ধের পূর্বে। এই উহুদ যুদ্ধেও হযরত সাফিয়্যা অংশগ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানরা কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পালাতে থাকে। তখন মূলত এক রকম পরাজয়ই ঘটে গিয়েছিল। তখন হযরত সাফিয়্যা (রা) হাতে একটি নিযা নিয়ে

---

৮. তাবাকাত-৮/৪১; কান্‌যুল 'উম্মাল-৭/৯৯; সীরাতু ইবন হিশাম-২/২২৮; আল-আগানী-৪/১৬৪; আল-বিদায়া-৪/১০৮,

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭০, ৫২২; তাহজীবুল কামাল-৬/২৪

রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপর সৈনিকদের যাকে সামনে পাচ্ছিলেন, পিটাচ্ছিলেন, আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলেন– তোমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ফেলে পালাচ্ছো? এ অবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দৃষ্টিতে পড়েন। রাসূল (সা) যুবাইরকে বলেন, তিনি যেন হামযার লাশ দেখতে না পান। কারণ, কুরায়শরা লাশের সাথে অমানবিক আচরণ করে। কেটে-কুটে তারা লাশ বিকৃত করে ফেলে। ভাইয়ের লাশের এমন বিভৎস অবস্থা দেখে তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়তে পারেন, এমন চিন্তা করেই রাসূল (সা) যুবাইরকে এমন নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত যুবাইর (রা) মার নিকট এসে বলেন, মা, রাসূল (সা) আপনাকে ফিরে যাবার জন্য বলছেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি জেনেছি, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহ জানেন, আমার ভাইয়ের লাশের সাথে এমন আচরণ আমার মোটেও পছন্দ নয়, তবুও আমি অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করবো। ইন্‌শাআল্লাহ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবো। মায়ের এসব কথা যুবাইর (রা) রাসূলকে (সা) জানালেন। তারপর তিনি সাফিয়্যাকে (রা) ভাইয়ের লাশের কাছে যাবার অনুমতি দান করেন। হযরত সাফিয়্যা ভাইয়ের লাশের নিকট যান এবং দেহের টুকরো টুকরো অংশগুলি দেখেন। নিজেকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। মুখে শুধু (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন) উচ্চারণ করে তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে থাকেন। তিনি চলে যাবার পর রাসূল (সা) হযরত হামযার (রা) লাশ দাফনের নির্দেশ দান করেন।[১০]

রাসূল (সা) সেদিন বলেছিলেন, যদি সাফিয়্যার কষ্ট না হতো এবং আমার পরে এটা একটা রীতিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো তাহলে হামযার লাশ এভাবে ময়দানে ফেলে রাখতাম। পশু-পাখীতে খেয়ে ফেলতো।[১১]

হযরত সাফিয়্যার (রা) জীবিকার জন্যে রাসূল (সা) খাইবার বিজয়ের পর সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে বাৎসরিক চল্লিশ ওয়াসক শস্য নির্ধারণ করে দেন।[১২]

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনে ৭৩ (তিয়াত্তর) বছর বয়সে মদীনায় ইনতিকাল করেন। বাকী' গোরস্তানে মুগীরা ইবন শু'বার আঙ্গিনায় অজুখানার পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। অনেকে বলেছেন, তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৩] কিন্তু একথা সঠিক নয়।

কাব্য প্রতিভা

হযরত সাফিয়া (রা) ছিলেন কুরায়শ গোত্রের হাশিমী শাখার একজন মহিলা কবি এবং একজন সুভাষিণী মহিলা। জিহাদ ও অন্যান্য সৎকর্মের অঙ্গনে তিনি যেমন চমক সৃষ্টি করেন, তেমনি শুদ্ধ ও সাবলীল ভাষার জন্যেও খ্যাতি অর্জন করেন। আরবী ভাষাকে বেশ ভালো মতই আয়ত্তে আনেন। তাঁর মুখ থেকে অবাধ গতিতে কবিতার শ্লোক বের হতো।

---

১০. তাবাকাত-৮/৪২; উসুদুল গাবা-৫/৪৯২,

১১. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৫,

১২. তাবাকাত-৮/৪১,

সেই সব শ্লোক হতো চমৎকার ভাব বিশিষ্ট, প্রাঞ্জল ও সাবলীল; কোমল, সত্য ও সঠিক আবেগ-অনুভূতি এবং চমৎকার বীরত্ব ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ। বর্ণিত হয়েছে, তিনি যখন তাঁর ছোট্ট শিশু সন্তান আয-যুবায়রকে কোলে নিয়ে দোলাতেন তখন তাঁর মুখ থেকে বীরত্ব ব্যাঞ্জক কবিতার শ্লোক অবাধে বের হতে থাকতো।[১৪]

ইতিহাস ও সীরাতের (চরিত অভিধান) গ্রন্থসমূহে হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর যে সকল কবিতা সংরক্ষিত দেখা যায় তাতে তিনি যে আরবের একজন বড় মহিলা কবি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ মরসিয়া রচনায় তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করার মত। এ কারণে অনেকে তাঁকে خنساء قريش বা 'কুরায়শ বংশের খানসা' অভিধায় ভূষিত করেন।[১৫]

আল্লামা সুয়ূতী 'আদ-দুররুল মানছুর' গ্রন্থে বলেছেন :[১৬]

'তিনি একজন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী কবি ছিলেন। কথা, কর্মে, সম্মান-মর্যাদা ও বংশ গৌরবে তিনি গোটা আরববাসীর নিকট বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন।'

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর সাফিয়্যা (রা) তাঁর বোনদের ও বানু হাশিমের মেয়েদের সমবেত করে একটি শোক অনুষ্ঠানের মত করেন। সেই অনুষ্ঠানে অনেক মহিলা স্বরচিত মরসিয়া পাঠ করেন। হযরত সাফিয়্যাও একটি মরসিয়া পাঠ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে সেই মরসিয়াটি সংকলিত হয়েছে।[১৭]

তার দুটি শ্লোক নিম্নরূপ :

أرقت لصوت نائحة بليل + على رجل بقارعة الصّعيد

فقاضت عند ذلكم دموعى + على خدى كمنحدر الفريد

উঁচু ভূমির এক ব্যক্তির জন্যে রাত্রিকালীন
বিলাপকারিণীর আওয়াজে আমি জেগে উঠি
অতঃপর আমার দু'গণ্ড বেয়ে এমনভাবে অশ্রু গড়িয়ে
পড়লো যেমন ঢালু স্থান থেকে মতি গড়িয়ে পড়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর তিনি একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তার কিছু অংশ বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। তার কয়েকটি শ্লোক এখানে তুলে ধরা হলো :[১৮]

---

১৩. প্রাগুক্ত-৮/৪২; তাহজীবুল আসমা' ওয়াললুগাত-১/৩৪৯; আল-ইস্তী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্ব টীকা-৪/৩৪৫

১৪. সিয়ারু আ'লাম আনা-নুবালা-১/৪৫,

১৫. নিসা' মিন 'আসরিন নুবুওয়াহ্-৪১৯.

১৬. আদ-দুর্‌রুল মানছুর-২৬১,

১৭. দ্রষ্টব্য : সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৯-১৭৪

১৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭১; দ্রষ্টব্য : হায়াতুস সাহাবা-৩/৩৪৭-৩৪৮

عينُ جودى بدمعة وسهود + واندبى خير هالك مفقود

واندبى المصطفى بحزن شديد + خالط القلب فهو كالمعمود

كدت أقضى الحياة لما أتاه + قدَرٌ خطَّ فى كتاب مجيد

ولقد كان بالعباد رؤوفًا + ولهم رحمة، وخير رشيد

رضى الله عنه حيًا وميتًا + وجزاهُ الجنان يوم الخلود.

'হে আমার চক্ষু! অশ্রু বর্ষণ ও রাত্রি জাগরণের
ব্যাপারে বদান্যতা দেখাও। একজন সর্বোত্তম মৃত,
হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির জন্যে বিলাপ কর।
প্রচণ্ড দুঃখ- বেদনা সহকারে মুহাম্মাদ আল-মুসতাফার
স্মরণে বিলাপ কর। যে দুঃখ-বেদনা অন্তরে মিলে
মিশে একাকার হয়ে তাকে ঠেস দিয়ে বসানো
রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত করে দিয়েছে।

আমার জীবন আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল–
যখন তাঁর সেই নির্ধারিত মৃত্যু এসে যায়,
যা একটি মহা সম্মানিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।
তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি কোমল,
দয়ালু ও সর্বোত্তম পথ প্রদর্শক।

জীবন ও মৃত্যু– সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় থাকুন
এবং সেই চিরন্তন দিনে আল্লাহ তাঁকে দান করুন জান্নাত।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা)-এর স্মরণে রচিত আরেকটি শোকগাঁথার কয়েকটি শ্লোক নিম্নরূপ :[১৯]

ألا يارسول الله كنت رجاءنا + وكنت بنا برًا ولم تك جافيا

وكنت رحيما هاديا معلما + لبيك عليك اليوم من كان باكيا

فدىً لرسول الله أمى وخالتى + وعمى وخالى ثم نفسى ومٰاليا

فلو أن ربَّ الناس أبقى نبيّنا + سعدنا ولكن أمره كان ماضيا

عليك من الله السلام تحية + وأدخلت جنات من العدن راضيا.

---

১৯. শা'ইরাতুল 'আরাব-২০২-২০৫

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ছিলেন আমাদের আশা-ভরসা। আপনি ছিলেন আমাদের সাথে সদাচরণকারী এবং ছিলেন না কঠোর।

আপনি ছিলেন দয়ালু, পথের দিশারী ও শিক্ষক। যে কোন বিলাপকারীর আজ আপনার জন্যে বিলাপ করা উচিত।

আল্লাহর রাসূলের জন্যে আমার মা, খালা, চাচা, মামা এবং আমার জীবন ও ধন-সম্পদ সবই উৎসর্গ হোক।

মানব জাতির প্রতিপালক যদি আমাদের নবীকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতেন, আমরা সৌভাগ্যবান হতাম। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত তো পূর্বেই হয়ে আছে।

আপনার সম্মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! আর সন্তুষ্টচিত্তে আপনি চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করুন।'

উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম সৈনিকরা বিপর্যস্ত অবস্থায় রাসূল (সা) থেকে দূরে ছিটকে পড়ে তখন হযরত সাফিয়্যা যে সাহসের পরিচয় দেন তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সে সময় তিনি হামযার (রা) স্মরণে একটি কবিতাও রচনা করেন। তাতে একটি চিত্র তুলে ধরেন। তার একটি বয়েত নিম্নরূপ :[২০]

إن يومًا أتى عليك ليوم + كورت شمسه وكان مضيئًا.

'আজ আপনার উপর এমন একটি দিন এসেছে– যে দিনের সূর্য অন্ধকার হয়ে গেছে, অথচ তা ছিল আলোকোজ্জ্বল।'

২০. আল-ইসাবা-৪/৩৪৯

উম্মু আয়মান বারাকা (রা)

রাসূলুল্লাহর (সা) আযাদকৃত দাসী উম্মু আয়মান। তাঁর ভালো নাম 'বারাকা'। হাবশী কন্যা। পিতার নাম সা'লাবা ইবন 'আমর। রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মানিত পিতা 'আবদুল্লাহর, মতান্তরে মাতা আমিনার দাসী ছিলেন।[১] উত্তরাধিকার সূত্রে রাসূল (সা) দাসী হিসেবে উম্মু আয়মানকে লাভ করেন। খাদীজার সাথে বিয়ের পর রাসূল (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।[২] তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ধাত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) কোলে-কাঁখে করে যাঁরা বড় করেন, তিনি তাঁদের একজন।[৩] রাসূলুল্লাহর (সা) সাতটি ছাগী ছিল, উম্মু আয়মান সেগুলো চরাতেন।[৪]

রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স যখন ছয় বছর তখন মা আমিনা তাঁকে সংগে করে মদীনায় যান স্বামীর কবর যিয়ারতের জন্য। এ সফরে সাথে ছিলেন 'আবদুল মুত্তালিব ও উম্মু আয়মান।[৫]

'উবাইদ ইবন 'আমর আল-খাজরাজী ইয়াছরিব থেকে মক্কায় এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তিনি উম্মু আয়মান বারাকাকে বিয়ে করেন। তারপর সস্ত্রীক ইয়াছরিবে ফিরে যান। সেখানে ছেলে আয়মানের জন্ম হয়। কিছু দিন পর 'উবাইদ মারা গেলে তিনি আবার মক্কায় রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারে ফিরে আসেন। বালাজুরী বলেন, 'উবাইদের সাথে উম্মু আয়মানের এ বিয়ে হয় জাহিলী যুগে। রাসূলুল্লাহর (সা) সংসারে তিনি বিধবা অবস্থায় জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দেন। অতঃপর রাসূল (সা) একদিন মক্কায় তাঁর সাহাবীদের বললেন : 'তোমাদের কেউ যদি জান্নাতের অধিকারিণী কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায় সে যেন উম্মু আয়মানকে বিয়ে করে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) পালিত পুত্র এবং অতি প্রীতিভাজন যায়দ ইবন হারিছ তাঁকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করলে রাসূল (সা) নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাঁর সাথে উম্মু আয়মানের বিয়ে দেন। যায়দের ঘরে পরবর্তীকালের বিখ্যাত সেনানায়ক উসামার জন্ম হয়। প্রথম স্বামীর ঘরের সন্তান আয়মানের নাম অনুসারে আরবের রীতি অনুযায়ী তিনি উম্মু আয়মান উপনাম গ্রহণ করেন এবং এ নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর আসল নাম 'বারাকা'। এই আয়মান মুসলমান হন এবং হুনাইন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৬]

উম্মু আয়মান (রা) ইসলামের প্রথম পর্বেই মুসলমান হন। যেসব ব্যক্তি হাবশা ও মদীনা উভয় স্থানে হিজরতের গৌরব অর্জন করেন, তিনি তাঁদের একজন। প্রথমে হাবশায়

---

১. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৬
২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৩
৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৬, ৪৭৬
৪. প্রাগুক্ত-১/৫১৩
৫. প্রাগুক্ত-১/৯৪
৬. প্রাগুক্ত-১/৪৭২-৪৭৩; তাবাকাত-৮/২২৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৪

হিজরাত করেন। তারপর মক্কায় ফিরে এসে আবার স্বামী যায়দ ইবন হারিছার সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[৭] তিনি উহুদ ও খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদে সৈনিকদের পানি পান করানো ও আহতদের সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।[৮]

বালাজুরী বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) ধাত্রী উম্মু আয়মান (রা) উহুদ যুদ্ধে আনসার মহিলাদের সাথে মুসলিম মুজাহিদদের পানি পান করাচ্ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে হিব্বান ইবন 'আরাকা একটি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি তাঁর কাপড়ের ঝালরে লাগে এবং তাঁর দেহের কিছু অংশ বেরিয়ে পড়ে। তা দেখে তীর নিক্ষেপকারী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। অতঃপর রাসূল (সা) সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের হাতে একটি তীর ধরিয়ে দিয়ে বলেন : এটি মার। সা'দ তীরটি ছুড়ে মারলেন এবং তা হিব্বানের গায়ে লাগে। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং মারা যায়। তা দেখে রাসূল (সা) এমনভাবে হেসে দেন যে তাঁর দাঁত দেখা যায়।[৯]

আল-হারিছ ইবন হাতিব, ছা'লাবা ইবন হাতিব, সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা, সা'দ ইবন 'উছমান ও আরো কয়েক ব্যক্তি উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসেন। উম্মু আয়মান তাঁদেরকে ভীষণ তিরস্কার করেন। তাঁদের মুখে ধুলো ছুড়ে মারতে লাগেন এবং তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন : যাও, চরকা আছে, সুতা কাট।[১০]

হযরত উম্মু আয়মান (রা) আজীবন রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পরিবারের লোকদের সাথেই তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।[১১] 'আলী ও ফাতিমার বিয়ের সময়ও আমরা উম্মু আয়মানকে (রা) সবার অগ্রভাগে দেখি। রাসূল (সা) আদরের কন্যা ফাতিমাকে স্বামীগৃহে পাঠালেন, পরদিন সকালেই মেয়ে-জামাইকে দেখার জন্য ছুটে গেলেন জামাই বাড়ি। দরজায় টোকা দিলেন। বিয়ে বাড়িতে মহিলাদের বেশ ভিড়। রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতি টের পেয়ে সবাই বেশ সতর্ক হয়ে পড়েছে। উম্মু আয়মান দরজা খুলে দিলে রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : আমার ভাইকে ডেকে দাও। উল্লেখ্য যে, জামাই 'আলী (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই। উম্মু আয়মান (রা) রাতে 'আলীর বাড়িতেই ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আলীকে ভাই বলছেন কেন। সে কি আপনার মেয়ের স্বামী নয়?[১২]

হিজরী ৮ম সনে যায়নাব বিন্‌তু রাসূলিল্লাহর (সা) ইনতিকাল হলে অন্য মহিলাদের সাথে তাঁর গোসলে অংশগ্রহণ করেন। তার পূর্বে বদর যুদ্ধের সময় রুকাইয়্যা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) ইনতিকাল হলে তাঁকেও গোসল দেন উম্মু আয়মান। আল-কালবী বলেন : উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে গোসল দেন উম্মু আয়মান ও উম্মুল ফাদল।[১৩]

---

৭. সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১১১

৮. আনসাবুল আশরাফ-১/৩২০ ৯. প্রাগুক্ত-১/৩২০

১০. প্রাগুক্ত-১/৩২৬

১১. আল-ইসাবা-৪/৪৫০; আল-ইসতী'আব-৪/৪৫০; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৬৯

১২. হায়াতুস সাহাব-২/৬৬৮

১৩. আনসাবুল আশরাফ-১/৪০০, ৪০১, ৪০৬

হযরত রাসূলে কারীম (সা) উম্মু আয়মানকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান করতেন। মাঝে মধ্যে মা বলেও সম্বোধন করতেন। তিনি একথাও বলতেন : 'এই পরিবারের অবশিষ্ট ব্যক্তি।'[১৪] উম্মু আয়মান (রা) একটু সরল বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর সাথে মাঝে মধ্যে একটু হাসি-তামাশাও করতেন। একদিন উম্মু আয়মান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোন বাহনের পিঠে চড়ার ব্যবস্থা করে দিন। রাসূল (সা) বললেন : আমি আপনাকে মাদী উটের বাচ্চার উপর চড়াবো। উম্মু আয়মান বললেন : বাচ্চা তো আমার ভার বহন করতে পারবে না। রাসূল (সা) বললেন : আমি আপনাকে বাচ্চার উপরই চড়াবো। আসলে রাসূল (সা) তাঁর সাথে একটু তামাশা করছিলেন। হাদীছে এসেছে রাসূল (সা) অহেতুক কোন হাসি-তামাশা করতেন না। তার মধ্যেও সত্য নিহিত থাকতো। এক্ষেত্রেও তাই। কারণ, সব উট– তা ছোট হোক বা বড়, কোন না কোন মাদী উটেরই বাচ্চা।[১৫]

হযরত উম্মু আয়মান (রা) সবগুলো আরবী বর্ণধ্বনি ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারতেন না। এক ধ্বনির স্থলে অন্য ধ্বনি উচ্চারণ করে ফেলতেন। তাতে অনেক সময় অর্থের বিকৃতি ঘটতো। যেমন, হুনায়ন যুদ্ধের দিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলতে চাইলেন, ثَبَّتَ اللهُ أَقْدَامُكُمْ

– আল্লাহ আপনাদের পদসমূহ সুদৃঢ় করুন। কিন্তু তিনি ثَبَّتَ -এর স্থলে বললেন– سَبَّتَ । ফলে অর্থ বিকৃতি ঘটলো। তাই রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : أَسْكُتِيْ আপনি চুপ করুন। কারণ, আপনি আরবী ভাষার বর্ণধ্বনি উচ্চারণ করতে পারেন না।[১৬]

আবু জা'ফার আল-বাকির বলেছেন, একদিন উম্মু আয়মান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন এবং সালাম দিতে গিয়ে উচ্চারণ করলেন এভাবে : سَلَامَ لَا عَلَيْكُمْ (সালামা লা 'আলাইকুম)। সেদিন থেকে রাসূল (সা) তাঁকে শুধু اَلسَّلَامُ (আস্-সালামু) বলার অনুমতি দান করেন।[১৭]

রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুবরণ করলে উম্মু আয়মান ভীষণ দুঃখ পান এবং কাঁদতে শুরু করেন। লোকেরা বললো : আপনি কাঁদছেন? জবাবে তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, আমি জানতাম তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আজ থেকে আমাদের নিকট আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর আবু বকর (রা) 'উমারকে (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু আয়মানের সাথে মাঝে মধ্যে যেমন দেখা করতেন, চলো যাই আমরাও তাঁর সাথে একটু দেখা করে আসি। তাঁরা দুইজন উম্মু আয়মানের (রা) নিকট

---

১৪. তাবাকাত-৮/২২৩; আল-হাকিম-৪/৬৩

১৫. আল-বিদায়া-৬/৪৬; আল-আদাব আল মুফরাদ লিল বুখারী- ৪১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৫

১৬. তাবাকাত-৮/২২৫

১৭. প্রাগুক্ত; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৫

পৌঁছলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁরা বললেন : আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর নিকট যা কিছু আছে তা তাঁর রাসূলের (সা) জন্য উত্তম। উম্মু আয়মান বললেন : আমি সে কথা না জেনে কাঁদছিনে। আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এ কথা শুনে আবু বকর ও 'উমার (রা) উভয়ে কাঁদা শুরু করলেন।[১৮] এমনিভাবে দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) শাহাদাত বরণ করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, "আজ ইসলাম দুর্বল হয়ে গেল।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর আনসারগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের অনেক খেজুর বাগান রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে যখন মদীনার ইহুদী গোত্র বানু কুরায়জা ও বানু নাদীর মদীনা থেকে বিতাড়িত হয় এবং তাদের সবকিছু মুসলমানদের হাতে আসে তখন তিনি আনসারদের সেই বাগ-বাগিচা ফেরত দিতে আরম্ভ করেন। তার মধ্যে হযরত আনাসেরও (রা) কিছু ছিল। রাসূল (সা) সেই বাগান উম্মু আয়মানকে দিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) যখন সেই বাগান ফেরত নেওয়ার জন্য উম্মু আয়মানের নিকট গেলেন তখন তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। পরে রাসূল (সা) সেই বাগানের পরিবর্তে তাঁকে দশগুণ বেশী দান করেন।[২০]

রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন উম্মু আয়মানের বাড়িতে যান। উম্মু আয়মান পান করার জন্য শরবত পেশ করেন। রাসূল (সা) রোযা অবস্থায় ছিলেন। এ কারণে পান করতে ইতস্তত: করেন। এতে উম্মু আয়মান খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[২১] সম্ভবত তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) রোযার কথা জানতেন না। আর সে কথা প্রকাশ করা রাসূলুল্লাহ (সা) জরুরী কোন বিষয় বলেও মনে করেননি।

হযরত উম্মু আয়মান (রা) রাসূলাল্লাহর (সা) হাদীছও বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত পাওয়া যায়।[২২] তাঁর সূত্রে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আনাস ইবন মালিক, হান্‌শ ইবন 'আবদিল্লাহ সান'আনী এবং আবু ইয়াযীদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৩]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর প্রথম স্বামীর পক্ষে আয়মান এবং দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষে উসামা– এই দুই ছেলে ছিল। তাঁরা দুইজনই সাহাবী ছিলেন। উসামা অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহর (সা) অতি স্নেহের পাত্র ছিলেন। আয়মানের এক ছেলে ছিলেন হাজ্জাজ ইবন আয়মান। একদিন তিনি মসজিদে ঢুকে রুকু-সিজদা দায়সারাভাবে করে খুব তাড়াতাড়ি নামায শেষ করেন। পাশে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) বসা

---

১৮. সাহীহ মুসলিম; ফাদায়িলস সাহাবা (২৪৫৪); ইবন মাজা: আল-জানায়িয (১৬৩৫); কান্‌য আল-'উম্মাল-৪/৪৮; আল-বিদায়া-৫/২৭৪

১৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭

২০. সহীহ আল-বুখারী; আল-মাগাযী-৭/৩১৬; মুসলিম; আল-জিহাদ ও সায়র-২/৩৪১

২১. মুসলিম-২/৩৪১

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৭

২৩. সাহাবিয়াত-২০০

ছিলেন। তিনি ইবন আয়মানকে (রা) ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি মনে করেছো যে, তোমার নামায হয়েছে? তোমার নামায হয়নি। যাও, আবার পড়। ইবন আয়মান চলে যাওয়ার পর ইবন 'উমার (রা) লোকদের নিকট জিজ্ঞেস বরেন, এ লোকটি কে? লোকেরা বললো : হাজ্জাজ ইবন আয়মান– উম্মু আয়মানের পৌত্র। ইবন 'উমার (রা) তখন মন্তব্য করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে দেখলে আদর করতেন।[২৪]

খলীফা হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে হযরত উম্মু আয়মান (রা) ইনতিকাল করেন। আর ইবনুল আছীর যে বলেছেন, তিনি রাসূল্লাল্লাহর (সা) ওফাতের পাঁচ অথবা ছয় মাস পরে ইনতিকাল করেছেন, তা সঠিক নয়।[২৫]

উম্মু আয়মানের (রা) সাথে সম্পর্কিত একটি অলৌকিক ঘটনার কথা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, তিনি যখন হিজরাত করছিলেন তখন পথিমধ্যে এক স্থানে সন্ধ্যা হলো এবং তিনি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। ধারে কাছে কোথাও পানি ছিল না। এমন সময় আকাশ থেকে সাদা রশিতে ঝোলানো এক বালতি পানি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। তিনি পেট ভরে সেই পানি পান করলেন। ফল এই দাঁড়ায় যে, তিনি জীবনে আর কখনো পিপাসায় কাতর হননি। তিনি বলতেন, প্রচণ্ড গরমের দুপুরেও রোযা অবস্থায় আমার পিপাসা হয়না।[২৬]

তাবারানী বর্ণনা করেছেন। একবার আল-গিফার গোত্রের একদল লোক ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এলো। এ দলটির মধ্যে জাহ্জাহ্ আল গিফারীও ছিলেন। তারা মসজিদে রাসূল্লল্লাহর (সা) সাথে নামায আদায় করলেন। নামাযে সালাম ফেরানোর পর রাসূল (সা) ঘোষণা দিলেন : মুসল্লীদের প্রত্যেকেই তার পাশের অতিথিকে সাথে করে নিয়ে যাবে। জাহ্জাহ্ আল-গিফারী বলেন : সবাই চলে গেল। মসজিদে কেবল আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে গেলাম। আমি ছিলাম একজন দীর্ঘদেহী মোটা মানুষ। রাসূল (সা) আমাকে সংগে করে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার জন্যে একটি ছাগীর দুধ দুইয়ে আনলেন। আমি তা এক চুমুকে শেষ করে ফেললাম। তারপর হাঁড়িতে রান্না করা খাবার আনলেন, তাও সাবাড় করে ফেললাম। এভাবে আমি একের পর এক সাতটি ছাগীর দুধ শেষ করে ফেললাম। এ অবস্থা দেখে উম্মু আয়মান (রা) মন্তব্য করলেন : আজ রাতে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সা) অভুক্ত রাখলো, আল্লাহ যেন তাকে অভুক্ত রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : উম্মু আয়মান, চুপ করুন। সে তার রিযিক খেয়েছে। আর আমাদের রিযিক আল্লাহর দায়িত্বে।

রাত পোহালো। পরদিন দলটির সকলে একত্র হলো। প্রত্যেকেই তার খাবারের কথা বলতে লাগলো। জাহ্জাহ্ও তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন। দিন কেটে গেল। তারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। আগের দিনের মত

---

২৪. তাবাকাত-৮/২২৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২২৬

২৫. তাবাকাত-৮/২২৭; সাহাবিয়াত-২০০

২৬. তাবাকাত-৮/২২৪; হায়াতুস সাহাবা-৩/৬১৮

রাসূল (সা) একই ঘোষণা দিলেন। সবাই যার যার অতিথি সংগে করে চলে গেল। জাহ্জাহ্ বলেন, আজো আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে গেলাম। আসলে আমার এ বিরাট বপু দেখে কেউ আমাকে নেওয়ার আগ্রহ দেখাতো না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। তারপর একটি ছাগী দুইয়ে দুধ আনলেন। আমি পান করলাম এবং তাতেই পরিতৃপ্ত হলাম। আমার আজকের এ অবস্থা দেখে উম্মু আয়মান (রা) বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কি আমাদের সেই মেহমান নয়? তিনি বললেন : হাঁ, সেই মেহমান। তবে আজ রাতে সে খেয়েছে মু'মিনের পেটে, আর গতরাতে খেয়েছিল কাফিরের পেটে। কাফির খায় সাতটি পেটে, আর মু'মিন খায় একটিতে।[২৭]

হযরত উম্মু আয়মান (রা) রাসূলাল্লাহর (সা) জন্য খাবার তৈরি করতেন। একদিন তিনি আটা চাললেন এবং সেই চালা আটা দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য রুটি তৈরি করলেন। রুটি দেখে রাসূল (সা) প্রশ্ন করলেন। এ কি? উম্মু আয়মান বলেন : আমাদের দেশে আমরা এরূপ রুটি তৈরি করে থাকি। তাই আপনাকে এরূপ রুটি খাওয়াতে চেয়েছি। উল্লেখ্য যে, উম্মু আয়মানের (রা) জন্মভূমি ছিল হাবশা। রাসূল (সা) বললেন : এই রুটিগুলো চেলে বের করা ভূষির সাথে মিশিয়ে দিন। তারপর চটকিয়ে আবার আটার দলা বানিয়ে ফেলুন।[২৮]

---

২৭. কান্‌য আল-'উম্মাল-১/৯৩; আল-ইসাবা-১/২৫৩; হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৭-১৯৮

২৮. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-৫/১৫৪; হায়াতুস সাহাবা-২/২৭৩

উম্মু হানী বিন্‌ত আবী তালিব (রা)

ইতিহাসে তিনি উম্মু হানী– এ ডাকনামে প্রসিদ্ধ। আসল নাম ফাখ্‌তা, মতান্তরে হিন্দ। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মুহতারাম চাচা আবূ তালিব এবং মুহতারামা চাচী ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের কন্যা। 'আকীল, জা'ফার, তালিব ও 'আলীর (রা) সহোদরা।[১] তাঁর শৈশব-কৈশোর জীবনের কথা তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বিয়ে সম্পর্কে দু'একটি বর্ণনা দেখা যায়। যেমন রাসূল (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে চাচা আবূ তালিবের নিকট উম্মু হানীর বিয়ের পয়গাম পাঠান। একই সংগে হুবায়রা ইবন 'আমর ইবন 'আয়িয আল-মাখযূমীও পাঠান। চাচা হুবায়রার প্রস্তাব গ্রহণ করে উম্মু হানীকে তার সাথে বিয়ে দেন। নবী (সা) বললেন : চাচা! আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হুবায়রার সাথে তার বিয়ে দিলেন? চাচা বললেন : ভাতিজা! আমরা তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করেছি। সম্মানীয়দের সমকক্ষ সম্মানীয়রাই হয়ে থাকে।[২] এতটুকু বর্ণনা। এর অতিরিক্ত কোন কথা কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে হুবায়রা ইবন 'আমরের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, সে কথা বিভিন্নভাবে জানা যায়।[৩]

উম্মু হানী কখন ইসলাম গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে একটু ভিন্নতা দেখা যায়। ইমাম আয-যাহাবী বলেন :[৪]

تأخر اسلامها وأسلمت يوم الفتح

'তাঁর ইসলাম গ্রহণ বিলম্বে হয়। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।'

তবে রাসূলুল্লাহর (সা) মি'রাজ সম্পর্কিত যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে উম্মু হানীর (রা) একটি বর্ণনাও বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। তাতে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মি'রাজ উম্মু হানীর ঘর থেকে হয়েছিল এবং তিনি তখন একজন মুসলমান। আর এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) ইসরা' (মক্কা থেকে বাইতুল মাকদাসে রাত্রিকালীন ভ্রমণ) আমার ঘর থেকেই হয়। সে রাতে তিনি 'ঈশার নামায আদায় করে আমার ঘরে ঘুমান। আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। ফজরের অব্যবহিত পূর্বে তিনি আমাদের ঘুম থেকে জাগান। তারপর তিনি ফজরের নামায পড়েন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়ি। তারপর তিনি বলেন : উম্মু হানী! তুমি দেখেছিলে, গতরাতে আমি এই উপত্যকায় 'ঈশার নামায আদায় করেছিলাম। তারপর আমি বাইতুল মাকদাসে যাই এবং সেখানে নামায আদায় করি। আর এখন আমি ফজরের নামায তোমাদের সাথে

---

১. সীরাতু ইবন হিশাম, ২/৪২০; আ'লাম আন-নিসা', ৪/১৪ আল-ইসতী'আব, ২/৭৭২

২. আ'লাম আন-নিসা-৪/১৪

৩. উসুদুল গাবা-৫/৬২৪

৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১২

আদায় করলাম, যা তোমরা দেখতে পেলে। তারপর তিনি বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর চাদরের এক কোনা টেনে ধরলাম। ফলে তাঁর পেটের একাংশ বেরিয়ে যায়। তখন তা মিসরীয় কিবতী ভাঁজ করা কাতান বস্ত্রের মত দেখাচ্ছিল। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! একথা আর কাউকে বলবেন না। এমন কথা তারা বিশ্বাস করবে না এবং তারা আপনাকে কষ্ট দিবে। বললেন : আল্লাহর কসম! একথা আমি তাদেরকে বলবই।

আমি আমার হাবশী দাসীকে বললাম : তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) পিছে পিছে যাও এবং শোন তিনি মানুষকে কি বলেন এবং লোকেরা তাঁকে কি বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বেরিয়ে গেলেন এবং মানুষকে ইসরার কথা বললেন। লোকেরা শুনে তো বিস্ময়ে হতবাক! তারা বললো : মুহাম্মাদ! তোমার এ দাবীর সপক্ষে প্রমাণ কি? আমরা তো এমন কথা আর কখনো শুনিনি। বললেন : আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে গিয়েছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, আমি সে উটের সন্ধান দিয়েছি। আমি তখন শাম অভিমুখী ছিলাম। তারপর আমি "দাজনান"– এ অমুক গোত্রের কাফেলাকে পেয়েছি। আমি যখন তাদের অতিক্রম করি তখন তারা ঘুমিয়ে। তাদের একটি পানির পাত্র কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি পাত্র থেকে পানি পান করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। আমার এ দাবীর প্রমাণ হলো এখন সেই কাফেলা বায়দা থেকে তান'ঈমের বাঁকের পথে আছে। যার অগ্রভাগে রয়েছে একটি ধূসর বর্ণের উট। লোকেরা সংগে সংগে তান'ঈমের দিকে ছুটে গেল এবং তাদেরকে দেখতে পেল। তারা তাদেরকে পাত্রে ঢাকা দেওয়া পানির কথা বললো, তারা তার সত্যতা স্বীকার করলো। আর যে কাফেলার উট হারিয়ে গিয়েছিল তারা মক্কায় ফিরে এলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও কথাটি সত্য বলে স্বীকার করলো।[৫]

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মু হানীকে ইতিহাসের দৃশ্যপটে দেখা যায়। তাঁকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ঘটনার কথা সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন এদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর স্বামী মক্কা থেকে পালিয়ে নাজরানের দিকে চলে যান।[৬] স্ত্রী উম্মু হানীর ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে তাঁকে তিরস্কার করে একটি কবিতা তিনি রচনা করেন। কবিতাটির কিছু অংশ সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়।[৭] নিম্নের চরণগুলোতে মক্কা থেকে পালিয়ে যাবার কারণ স্ত্রীর নিকট ব্যাখ্যা করেছেন :[৮]

لعمرك ماوليت ظهرى محمدا + وأصحابه جبنا ولاخيفة القتل

ولكننى قلبت أمرى فلم أجل + لسيفى عناء ان ضربت ولاتبلى

---

৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪০২-৪০৩; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-১/২৯৫

৬. আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬২

৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪২০; উসুদুল গাবা-৫/৬২৮; ইবন দুরাইদ, আল-ইশতিকাক-১৫২

৮. আ'লাম আন-নিসা-৪/১৪

وقفت فلما خفت ضيقة موقفى + رجعت لعود كالهزبرإلى الشبل -

'তোমার জীবনের শপথ! আমি ভীরুতার কারণে ও হত্যার ভয়ে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে আসিনি। তবে আমি নিজের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি, তাতে বুঝেছি এ যুদ্ধে আমার তীর ও তরবারি যথেষ্ট নয়। আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি। কিন্তু যখন আমার অবস্থান সংকীর্ণ হওয়ার ভয় করেছি তখন ফিরে এসেছি যেমন বাঘ তার শাবকের কাছে ফিরে আসে।'

অনেকে তাঁর এই ফিরে আসাকে ইসলামের দিকে ফিরে আসা বলেছেন, কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ, তিনি কুফরীর উপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করেন।

এই মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অবস্থান স্থলে যান এবং তাঁকে গোসল করে চাশ্‌তের আট রাক'আত নামায আদায় করতে দেখেন। এ দিন তিনি দু'জন আত্মীয়কে নিজ গৃহে আশ্রয় দেন এবং সে কথা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানালে তিনিও তাদের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। নিম্নে সেই বর্ণনাগুলো তুলে ধরা হলো।

মক্কা বিজয়ের দিন আল-হারিছ ইবন হিশাম উম্মু হানীর গৃহে আশ্রয় নেয়। এ সময় উম্মু হানীর ভাই 'আলী (রা) সেখানে যান। তিনি আলীকে (রা) আল-হারিছের বিষয়টি অবহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে 'আলী (রা) তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি হাতে তুলে নেন। উম্মু হানী তাঁকে বলেন, ভাই! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। কিন্তু 'আলী (রা) তাঁর কথায় কান দিলেন না। তখন উম্মু হানী ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর দু'হাত শক্তভাবে মুঠ করে ধরে বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পার না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। 'আলী (রা) এক পাও এগোতে পারলেন না। তাঁর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সক্ষম হলেন না।

এ সময় নবী (সা) উপস্থিত হলেন। উম্মু হানী (রা) বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুককে আশ্রয় দিয়েছি, আর 'আলী তাঁকে হত্যা করতে চায়। রাসূল (সা) বললেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। তুমি 'আলীর উপর রাগ করো না। কারণ, 'আলী রাগ করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। তাকে ছেড়ে দাও। উম্মু হানী আলীকে ছেড়ে দেন। রাসূল (সা) বললেন : একজন নারী তোমাকে পরাভূত করেছে। আলী বললেন : আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মাটি থেকে আমার পা উঠাতেই পারলাম না। রাসূল (সা) হেসে দিলেন।[৯]

ইবন হিশাম তাঁর সীরাতে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এভাবে : উম্মু হানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কার উঁচু ভূমিতে অবতরণ করলেন তখন আমার শ্বশুরের গোত্র বনূ মাখযূমের দুই ব্যক্তি আল-হারিছ ইবন হিশাম ও 'আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ পালিয়ে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়। এ সময় আমার ভাই 'আলী এসে উপস্থিত হয় এবং

---

৯. প্রাগুক্ত-৪/১৫; মুসনাদে আহমাদ-৬/২৪২

তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। আমি দরজা বন্ধ করে মক্কার উঁচু ভূমিতে রাসূলুল্লাহর নিকট (সা) ছুটে গেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন : উম্মু হানী! কি উদ্দেশ্যে এসেছো? আমি তখন ঐ দুই ব্যক্তি ও 'আলীর বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। তুমি যাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছো আমরাও তাদেরকে নিরাপত্তা দিলাম। অতএব সে তাদেরকে হত্যা করবে না।[১০]

উম্মু হানী বলেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যাই। দেখলাম তিনি গোসল করছেন এবং ফাতিমা কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে আছেন। আমি সালাম দিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন : কে তুমি? বললাম : আবূ তালিবের মেয়ে উম্মু হানী। বললেন : উম্মু হানী! তোমাকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম! গোসল সেরে তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। একখানা মাত্র কাপড় পরে ও গায়ে জড়িয়ে আট রাকা'আত নামায আদায় করেন। তারপর আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর 'আলী এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। বললেন : উম্মু হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। সেটা ছিল চাশতের নামায।[১১]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল উম্মু হানীর (রা) দারুণ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। মক্কা বিজয়ের সময়কালে একদিন রাসূল (সা) তাঁর গৃহে যান। উম্মু হানী (রা) তাঁকে শরবত পান করতে দিলে তিনি কিছু পান করে উম্মু হানীর দিকে এগিয়ে দেন। উম্মু হানী সেদিন নফল রোযা রেখেছিলেন। তিনি রোযা ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহর (সা) পানকৃত অবশিষ্ট শরবত পান করেন। রাসূল (সা) তাঁর এভাবে রোযা ভাঙ্গার কারণ জানতে চাইলে জবাব দেন : আমি আপনার মুখ লাগানো শরবত পানের সুযোগ ছেড়ে দিতে পারি না। রাসূল (সা) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি বলেন : উম্মু হানী, বকরী গ্রহণ কর। এ অত্যন্ত বরকতের জিনিস।[১২]

উম্মু হানীর (রা) স্বামী হুবায়রা কুফরীর উপর অটল থাকে এবং সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। উম্মু হানী ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে বিয়ের পয়গাম দেন। জবাবে উম্মু হানী বলেন : আল্লাহর কসম! আমি তো জাহিলী যুগেই আপনাকে ভালোবাসতাম। এখন ইসলামী যুগে তো সে ভালোবাসা আরো গভীর হয়েছে। তবে আমি এখন একজন বিপদগ্রস্ত নারী। আমার অনেকগুলো ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। আমার ভয় হয় তারা আপনাকে কষ্ট দেবে। রাসূল (সা) বলেন : বাহনের পিঠে আরোহণকারিণীদের মধ্যে কুরাইশ রমণীরা উত্তম। তারা

---

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪১১; হায়াতুস সাহাবা-১/১৮২; ৩/১৪৫, ১৪৬

১১. সহীহ বুখারী-৩/৪৩; বাবু সালাতিল ফাজরি ফিস সাফর-৬/১৯৫, ১৯৬; কিতাবুল মাগাযী; বাবু মানযিলিন নাবিয়্যি ইউমাল ফাতহি; সাহীহ মুসলিম (৩৩৬) বাবু সালাতিল মুসাফিরীন ওয়া কাসরিহা; বাবু ইসতিহবাবি সালাতিদ দুহা; আল-মুওয়াত্তা-১/১৫২; বাবু সালাতিদ দুহা।

১২. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৩

তাদের শিশুদের প্রতি সর্বাধিক মমতাময়ী এবং স্বামীদের অধিকারের ব্যাপারে অধিক যত্নশীলা।[১৩] অপর একটি বর্ণনায় একথাও এসেছে, তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কান এবং চোখ থেকেও আপনি আমার অধিক প্রিয়। স্বামীর অধিকার অনেক বড় জিনিস। স্বামীর দিকে মনোযোগী হলে আমার নিজের এবং আমার সন্তানদের অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। আর সন্তানদের দিকে মনোযোগ দিলে স্বামীর অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। তাঁর একথা শুনে রাসূল (সা) বলেন : উটের পিঠে আরোহণকারিণীদের মধ্যে কুরাইশ রমণীরা সর্বোত্তম। তারা তাদের শিশু সন্তানদের প্রতি যেমন অধিক মমতাময়ী তেমনি স্বামীর অধিকারের প্রতিও বেশী যত্নশীলা। এরপর রাসূল (সা) বিষয়টি নিয়ে আর উচ্চ-বাচ্চ করেননি।[১৪]

একবার উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আরজ করেন : আমাকে এমন কিছু আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে করতে পারি। তিনি তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন।[১৫]

উম্মু হানী বর্ণনা করেছেন, 'আম্মার ইবন ইয়াসির, তাঁর পিতা ইয়াসির, ভাই 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসির এবং মা সুমাইয়্যাকে আল্লাহর রাস্তায় থাকার কারণে শাস্তি দেওয়া হতো। একদিন তাঁদের পাশ দিয়ে রাসূল (সা) যাওয়ার সময় বলেন : ওহে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্যধারণ কর। তোমাদের ঠিকানা হল জান্নাত। অতঃপর নির্যাতনে ইয়াসির মৃত্যুবরণ করেন। সুমাইয়্যা আবূ জাহলকে কঠোর ভাষায় গালমন্দ করেন। আবূ জাহল তাঁর যৌনাঙ্গে বর্শাঘাত করলে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। আর 'আবদুল্লাহকে তীর নিক্ষেপ করলে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[১৬]

এমনিভাবে উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) যেমন দেখেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁতের চেয়ে সুন্দর দাঁত আর কারো দেখিনি। রাসূলুল্লাহর (সা) পেট দেখে ভাঁজ করা কাগজের কথা মনে হতো। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) মাথার কেশ চারটি গুচ্ছে ভাগ করা দেখেছি।[১৭] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর প্রথম খলীফা আবূ বকরের (রা) নিকট নবী দুহিতা হযরত ফাতিমার পিতার উত্তরাধিকার দাবীর বিষয়টিও উম্মু হানী (রা) বর্ণনা করেছেন।[১৮]

---

১৩. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪২০; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৫৯

১৪. আল-'ইক্দ আল-ফারীদ-৬/৮৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৪; আনসাব-১/৪৫৯; আ'লাম আন-নিসা-৪/১৬

১৫. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৩

১৬. আনসাবুল আশরাফ-১/১৬০

১৭. প্রাগুক্ত-১/৩৯৩

১৮. প্রাগুক্ত-১/৫১৯

হযরত উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ৪৬ (ছেচল্লিশটি) হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর একটি হাদীছ সংকলিত রয়েছে।[১৯] তাঁর সূত্রে যে সকল রাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন হলেন : জা'দা, ইয়াহইয়া, হারূন, আবূ মূররা, আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইবন 'আয়্যাশ, আবদুল্লাহ ইবন আল হারিছ ইবন নাওফাল, 'আবদুর রহমান ইবন আবী লায়লা, শা'বী, 'আতা, কুরাইব, মুজাহিদ, 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়র, মুহাম্মাদ ইবন 'উকবা প্রমুখ।[২০]

হযরত উম্মু হানীর (রা) মৃত্যুসন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে "আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা" গ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, তিনি 'আলীর (রা) মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী বলেন : তিনি হিজরী ৫০ (পঞ্চাশ) সনের পরেও জীবিত ছিলেন।[২১] তাঁর কয়েকজন সন্তানের নাম হলো : 'আমর, হানী, ইউসুফ ও জা'দা। তাঁরা সকলে হযরত 'আলীর (রা) ভাগ্নে। জা'দাকে হযরত 'আলী (রা) খুরাসানের ওয়ালী নিয়োগ করেছিলেন।[২২]

হযরত উম্মু হানীর (রা) জন্য বিশেষ মর্যাদার বিষয় এই যে, হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁর নিকট খাবার চেয়ে খেয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। একদিন রাসূল (সা) উম্মু হানীকে বললেন : তোমার নিকট খাবার কোন কিছু আছে কি?

উম্মু হানী : কিছু শুকনো রুটির টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই। আমি তা আপনার সামনে দিতে লজ্জা পাচ্ছি।

রাসূল (সা) বললেন : সেগুলোই নিয়ে এসো।

উম্মু হানী হাজির করলেন। রাসূল (সা) সেগুলো টুকরো টুকরো করে লবন-পানি মিশালেন। তারপর বললেন : কিছু তরকারি আছে? উম্মু হানী বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিছু সিরকা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই। রাসূল (সা) সিরকা আনতে বললেন। তিনি রুটির টুকরোগুলোতে সিরকা মিশিয়ে আহার করলেন। তারপর আল্লাহর হামদ জ্ঞাপন করে বললেন : সিরকা অতি উত্তম তরকারি। উম্মু হানী! যে গৃহে সিরকা থাকে সে গৃহ অভাবী হয় না।[২৩]

---

১৯. বুখারী-৬/১৯৫, ১৯৬ : বাবু আমান আন-নিসা ওয়া জাওযারিহিন্না; মুসলিম (৩৩৬) বাবু ইসতিহবাব সালাতিদ দুহা

২০. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১২; আ'লাম আন-নিসা-৪/১৬

২১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৩

২২. প্রাগুক্ত-২/৩১২, ৩১৩; সাহাবিয়াত-২২৯

২৩. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ-৩/৪২; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৯৮

হালীমা আস-সা'দিয়্যা (রা)

জাহিলী যুগে অভিজাত আরবদের মধ্যে এ প্রথা ও রীতি প্রচলিত ছিল যে, তাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা ভিন্ন গোত্রের কোন ধাত্রীর হাতে তুলে দিত। তারা মনে করতো, এতে সন্তানের মধ্যে আভিজাত্য ও ভাষার বিশুদ্ধতা সৃষ্টি হয়। মক্কার অভিজাত লোকেরা তাদের শিশু সন্তানকে মরুবাসী বেদুঈনদের নিকট পাঠিয়ে দিত। সেখানে তারা বেদুঈন ধাত্রীদের নিকট দুধ পানের বয়সটি কাটাতো। তারা সন্তানদের জন্য স্বভাবগত বুদ্ধিমতী ও সুরুচির ধাত্রী নির্বাচন করতো। এ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধাত্রীদের উন্নত নৈতিকতা, সুঠাম দৈহিক কাঠামো, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা, সামাজিক সম্মান ও অবস্থানের দিকগুলো প্রাধান্য দিত। এসব গুণ যে মহিলার মধ্যে থাকতো সেই ধাত্রী পেশায় সফল হতো।

দুগ্ধবতী শিশু সন্তানের মায়েরা মরুভূমি থেকে বিভিন্ন শহর ও জনপদে আসতো দুধ পান করাবে এমন শিশুর খোঁজে। সেখান থেকে পারিশ্রমিকের শর্তে শিশু সন্তান সংগ্রহ করে আবার মরুভূমিতে ফিরে যেত। তারা দুধ পান করানোর সাথে সাথে শিশুদেরকে বেদুঈনদের খেলাধুলা, তাঁবু স্থাপনের কলাকৌশল, আদব-আখলাক ও বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা দিত। এ কারণে, নবী (সা) তাঁর অননুকরণীয় বিশুদ্ধ ভাষিতার প্রেক্ষাপট হিসেবে কুরাইশ গোত্রে জন্ম ও বানূ সা'দে দুধ পান ও প্রতিপালিত হওয়ার কথা উল্লেখ করতেন।[১]

তিনি সাহাবীদেরকে বলতেন : 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী। কারণ, আমি কুরাইশ গোত্রের সন্তান এবং বানূ সা'দ গোত্রে দুধ পান করে বেড়ে উঠেছি।' একবার আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার চেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন : এমনটি হতে আমার বাধা কোথায়? আমি কুরাইশ গোত্রের সন্তান এবং বানূ সা'দে দুধ পান করেছি।[২]

আমাদের আলোচ্য হালীমা আস-সা'দিয়্যা (রা) ছিলেন বানূ সা'দ গোত্রের রাসূলুল্লাহর (সা) ভাগ্যবতী ধাত্রী তথা দুধ মা। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে কবি শায়খ ইউসুফ আন-নাবহানী (রহ) বলেছেন :[৩]

وارضعته ذات حظٍّ وافرٍ + حليمة من غرر العشائر

كان لديها القوتُ غير ياسر + فأصبحت أيسر أهل الحاضر

سعيدة قد سعدت من سعد.

---

১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৭

২. ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-১/১১৫; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/১৪৬

৩. আন-নাবহানীর "হুজ্জাতুল্লাহি 'আলাল 'আলামীন" গ্রন্থের সূত্রে "নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ" গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১১

'তাঁকে দুধ পান করান পূর্ণ সৌভাগ্যের অধিকারিণী, গোত্রসমূহের মধ্যে উজ্জ্বল চিহ্ন বিশিষ্ট গোত্রের হালীমা।

তাঁর কাছে খাদ্য ছিল অপর্যাপ্ত। অতঃপর তিনি শহরবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সচ্ছল ব্যক্তিতে পরিণত হন।

তিনি একজন সৌভাগ্যবতী। ভাগ্যগুণে যিনি একজন ভাগ্যবতীতে পরিণত হন।'[৪]

এই ভাগ্যবতী মহিলা হলেন হালীমা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ ইবন আল-হারিছ আস-সা'দিয়্যা (রা)। রাসূলুল্লাহর (সা) ধাত্রী মাতা। তাঁর স্বামীর নাম আল-হারিছ ইবন 'আবদিল 'উয্‌যা ইবন রিফা'আ আস-সা'দী। তাঁর সন্তানরা হলেন : 'আবদুল্লাহ, উনাইসা ও খুযাইমা, মতান্তরে হুযাফা। শেষোক্তজন আশ-শায়মা নামেও পরিচিত। এঁরা সবাই আল-হারিছের ঔরসজাত সন্তান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই ও বোন। রাসূলুল্লাহ (সা) ও 'আবদুল্লাহ একই সাথে দুধ পান করেন। উল্লেখ্য যে, এই আল-হারিছের ডাকনাম আবূ যুওয়ায়িব ও আবূ কাবশা ছিল।[৫]

হালীমা রাসূলুল্লাহর (সা) চাচাতো ভাই আবূ সুফইয়ান ইবন আল-হারিছ ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের ধাত্রী ও দুধ মা ছিলেন। বানূ সা'দ গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সা) চাচা হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের ধাত্রী ও দুধ মা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হালীমার কাছে তখন একদিন হামযার (রা) দুধ মা তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করান। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) হালীমার নিকট যাওয়ার আগে কিছু দিন আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। ছুওয়াইবা কিছুদিন হামযাকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। তাই হামযা বানূ সা'দ ও ছুওয়াইবা দু'দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই।[৬]

হালীমা রাসূলুল্লাহকে (সা) দুধ পান করিয়েছেন। এ কারণে তিনি দুধ পানকারিণী হিসেবে আরবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। রাসূলুল্লাহকে (সা) তিনি দুধের শিশু হিসেবে যেভাবে লাভ করেন তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন : সে ছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের বছর। আমি বানূ সা'দের আরো দশজন মহিলার সাথে সাদা রঙ্গের একটি দুর্বল মাদি গাধার উপর সওয়ার হয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুর খোঁজে বের হলাম। আমাদের সাথে একটা বুড়ো মাদি উটও ছিল। আল্লাহর কসম! তার ওলান থেকে এক কাৎরা দুধও বের হচ্ছিল না। ক্ষিদের জ্বালায় আমাদের শিশুদের কান্নাকাটির কারণে আমরা রাতে মোটেও ঘুমোতে পারতাম না। আমার বুকের ও আমাদের উটনীর দুধে আমার শিশু পুত্র 'আবদুল্লাহর পেট ভরতো না। তবে আমরা বৃষ্টি ও সচ্ছলতার আশা করতাম। অবশেষে আমরা মক্কায় পৌছলাম। আমাদের প্রত্যেকের সামনে শিশু রাসূলুল্লাহকে (সা) উপস্থাপন করা হলো। তিনি ইয়াতীম শিশু– একথা শোনার পর কেউ আর তাঁকে নিতে আগ্রহ

---

৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬০

৫. প্রাগুক্ত; আনসাবুল আশরাফ-১/৯০-৯১

৬. রিজালুন মুবাশ্‌শিরূন বিল জান্নাহ্-১/৭, ২/১৮৯; নিসা' মিন আসর আন-নুবুওয়াহ পৃ. ১১; সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬১; টীকা নং-৬

দেখালো না। কারণ, আমরা শিশুর পিতা-মাতার নিকট থেকে ভালো কিছু লাভের আশা করতাম। আমরা বলাবলি করতাম : শিশুটি ইয়াতীম। তার মা ও দাদা তেমন কী আর দিতে পারবে? এ কারণে আমরা তাকে অপসন্দ করলাম। এর মধ্যে দলের একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাই স্তন্যপায়ী শিশু পেয়ে গেল। যখন আমরা আমাদের গোত্রে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন আমি আমার স্বামীকে বললাম : আল্লাহর কসম! অন্যরা স্তন্যপায়ী শিশু নিয়ে ফিরবে আর আমি শূন্য হাতে ফিরবো, এ আমার মোটেই পসন্দ নয়। আমি এই হাশিমী ইয়াতীম শিশুটির নিকট যাব এবং তাকেই নিয়ে ফিরবো। তিনি বললেন : হাঁ, তুমি তাই কর। হতে পারে আল্লাহ তার মধ্যে আমাদের জন্য বরকত ও সমৃদ্ধি রেখেছেন। অতঃপর তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।[৭]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে। হালীমা বলেন : আমি উপস্থিত হলে 'আবদুল মুত্তালিব স্বাগতম জানিয়ে প্রশ্ন কলেন : তুমি কে? বললাম : বানূ সা'দের এক মহিলা। বললেন : তোমার নাম কি? বললাম : হালীমা।

'আবদুল মুত্তালিব একটু হেসে বললেন : সাবাশ! সাবাশ! সৌভাগ্য ও বুদ্ধিমত্তা। এমন দু'টি গুণ যার মধ্যে সে যেন সকল যুগের কল্যাণ ও চিরকালের সম্মান। আবদুল মুত্তালিব سَعْدٌ ও হালীমা حُلْمٌ শব্দ দু'টির প্রতি ইঙ্গিত করে একথা বলেন। তিনি হালীমাকে নবীর (সা) জননী আমিনার ঘরে নিয়ে যান। তাঁর নিকট থেকেই হালীমা শিশু মুহাম্মাদকে গ্রহণ করেন।[৮] হালীমার ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন ছিল তা সূচনাতেই বিভিন্নভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। যেমন কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, হালীমা যখন আবদুল মুত্তালিবের সাথে নবীর (সা) নিকট পৌঁছেন তখন আবদুল মুত্তালিব এক অদৃশ্য কণ্ঠে নিম্নের শ্লোকগুলোর আবৃত্তি শুনতে পান :[৯]

إنّ ابن أمنة الأمين محمدا خير الأنام وخيرة الأخيار

ماإن له غير الحليمة مرضع نعم الأمينة، هى على الأبرار

مأمونة من كل عيب فاحش نقية الأثواب والأوزار

لاتسلمنه إلى سواها إنه أمرٌ وحُكْمٌ جاء من جبار.

"নিশ্চয় আমিনার ছেলে মুহাম্মাদ পরম বিশ্বস্ত, সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো এবং ভালোদের মধ্যে উত্তম।

হালীমা ছাড়া তাঁকে অন্য কেউ দুধ পান করাবে না। সে পুণ্যবানদের জন্য কত না বিশ্বস্ত!

---

৭. আনসার আল-আশরাফ-১/৯৩-৯৪

৮. প্রাগুক্ত; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্-১/১১২-১১৩; আয-যাহাবী, তারীখ আল-ইসলাম-১/৪৫, ৪৬

৯. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্ পৃ.-১২

অশ্লীল দোষ-ত্রুটি থেকে সে মুক্ত এবং যাবতীয় পাপ ও পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন।

তুমি তাকে তার নিকট ছাড়া আর কারো নিকট সমর্পণ করবে না। মহাপরাক্রমশালী সত্তার নিকট থেকে এ আদেশ ও সিদ্ধান্ত এসেছে।"

নবীকে (সা) গ্রহণের সাথে সাথে হালীমা ও তাঁর স্বামীর নিকট কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নেমে এলো। হালীমা শিশু মুহাম্মাদকে (সা) কোলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরার সাথে সাথে তাঁর শুকনো বুক দুধে ভরে গেল। তিনি পেট ভরে পান করলেন। তারপর হালীমা তাঁর নিজের শিশু সন্তান 'আবদুল্লাহকে স্তন দিলেন, সেও পেট ভরে পান করলো। তারপর দু'শিশুই ঘুমিয়ে পড়লো।

হালীমা ও তাঁর স্বামী দু'জনই ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর ছিলেন। যেহেতু তাঁদের মাদী উটটির ওলান ছিল শুকনো। তাঁরা খাবার বা দুধ পাবেন কোথায়? কিন্তু হঠাৎ করে তাদের অবস্থা বদলে গেল। এ সম্পর্কে হালীমা নিজেই বলছেন : 'আমার স্বামী আমাদের উষ্ট্রীটির কাছে গিয়ে দেখলেন তার ওলানটি দুধে পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি দুধ দুইলেন এবং আমরা দু'জন পেট ভরে পান করলাম, সে রাতটি আমাদের পরম সুখে কাটলো। সকালে স্বামী আমাকে বললেন : আল্লাহর কসম, হালীমা! জেনে রাখ, তুমি একটি কল্যাণময় শিশু গ্রহণ করেছো।

আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমি তাই আশা করি। তারপর আমরা আমাদের পল্লীতে ফেরার জন্য বের হলাম। আমি শিশু মুহাম্মাদকে (সা) নিয়ে আমার মাদী গাধাটির উপর উঠে বসলাম। কী আশ্চর্য! সেটি এত দ্রুত চলতে লাগলো যে আমাদের দলের অন্য কারো গাধা তার সাথে পেরে উঠছিল না। এক সময় আমার সঙ্গী-মহিলারা আমাকে বললো : যুওয়ায়িবের মেয়ে! আচ্ছা বলতো, এটা কি তোমার সেই গাধী যার উপর সোয়ার হয়ে তুমি গিয়েছিলে? আমি বললাম : নিশ্চয়, এটা সেই গাধী। তারা বললো : আল্লাহর কসম, তাহলে অন্য কোন ব্যাপার আছে।[১০]

কাফেলা বানূ সা'দের পল্লীতে পৌঁছলো। সে বছর সেখানে অভাব ও দারিদ্র্যের একটা ছাপ সর্বত্র বিরাজমান ছিল। হালীমা এই ইয়াতীম শিশুর বরকত ও কল্যাণ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। সবকিছুতেই তাদের বরকত ও সমৃদ্ধি হতে লাগলো। তাঁর ছাগল-ভেড়া শুকনো চারণভূমিতে অন্যদের ছাগল-ভেড়ার সাথে চরতে যেত। যখন ফিরতো তখন তাঁর গুলোর ওলান দুধে পূর্ণ থাকতো, কিন্তু অন্যদের গুলো যেমন যেত তেমনই ফিরতো। তাই তাঁর গোত্রের লোকেরা তাদের নিজ নিজ রাখালদেরকে বলতো : তোমাদের কী হয়েছে, আবূ যুওয়ায়িবের মেয়ের রাখাল যেখানে তাঁর ছাগল চরায় সেখানে তোমরা চরাতে পার না? কিন্তু তা করেও তারা দেখলো, তাতে কোন লাভ হয় না।

হালীমার এভাবে দুটি বছর কেটে গেল। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতি দিনই তিনি কল্যাণ ও

---

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৪; উসুদুল গাবা-৫/৪২৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/২৫৫

সমৃদ্ধি দেখতে পেলেন। এর ভিতর দিয়ে নবীর (সা) দুধ পানের সময় সীমা পূর্ণ হয়ে গেল।

নবী (সা) এমনভাবে বেড়ে উঠলেন যা সচরাচর অন্য শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। হালীমা মনে করলেন, এখন তাঁকে মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। তিনি এই শিশুর মধ্যে যে শুভ ও কল্যাণ এ দু'বছর প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে স্বভাবতই তাঁকে আরো কিছু দিন নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা করতেন। তাসত্ত্বেও তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে গেলেন।

মা আমিনা তাঁর প্রিয় সন্তানকে ফিরে পেয়ে দারুণ খুশী হলেন। বিশেষতঃ যখন দেখলেন, তাঁর সন্তান এমনভাবে বেড়ে উঠেছে যেন সে চার বছরের কোন শিশু। অথচ তার বয়স এখনো দু'বছর অতিক্রম করেনি। হালীমা শিশুকে আরো কিছু দিন পল্লীতে তাঁর নিকট রাখার জন্য মা আমিনার নিকট আবদার জানালেন। মা রাজী হলেন। হালীমা উৎফুল্ল চিত্তে শিশুকে নিয়ে পল্লীতে ফিরে এলেন। শিশুটিও পল্লী প্রকৃতিতে ফিরে আসতে পেরে দারুণ খুশী। এভাবে নবী (সা) বানূ সা'দে দ্বিতীয় বারের জন্য ফিরে এলেন। আর এখানেই তাঁর বক্ষ বিদারণের বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটে যখন তাঁর বয়স চার অথবা পাঁচ বছর।

ইমাম মুসলিম তাঁর নিজস্ব সনদে আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য শিশুদের সাথে একদিন খেলছেন, এমন সময় জিবরীল (আ) তাঁর কাছে আসেন। তারপর তাঁকে ধরে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকটি ফেঁড়ে ফেলেন। তারপর তাঁর হৃৎপিণ্ডটি (কাল্‌ব) বের করে তার থেকে একটি রক্তপিণ্ড পৃথক করে বলেন : এ হলো তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ। তারপর সেটা একটি সোনার গামলায় যমযমের পানি দিয়ে ধুইয়ে যথাস্থানে স্থাপন করেন। খেলার সঙ্গীরা এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে তার ধাত্রী মা হালীমার কাছে যেয়ে বলে : মুহাম্মাদকে হত্যা করা হয়েছে। সবাই ছুটে আসে এবং তাঁকে বিবর্ণ অবস্থায় দেখতে পায়।[১১]

এ ঘটনার পর হালীমা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি নবীকে (সা) তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন।

ইবন ইসহাক বলেন, শিশু মুহাম্মাদকে তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে কোন কোন আলিম আমাকে একথা বলেছেন যে, দুধ ছাড়ার বয়স হওয়ার পর দ্বিতীয় বার যখন হালীমা (রা) মুহাম্মাদকে নিয়ে যান তখন হাবশার কিছু খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী লোক তাঁকে দেখে তাঁর পরিচয় জানতে চায় এবং তাঁকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তারপর তারা তাঁকে তাদের দেশে, তাদের রাজার নিকট নিয়ে যেতে চায়। তারা বলে, এই শিশু ভবিষ্যতে বড় কিছু করবে। আমরা তাঁর মধ্যে সেসবের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। হালীমা

---

১১. সহীহ মুসলিম-১/১০১-১০২; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্-১/১৩; আস-সীরাহ্ আল-হাসবিয়্যাহ্-১/১৫০; আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-১/১৩৫

ভয় পেলেন, তারা হয়তো তাঁকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। তাই তিনি তাঁর মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন।[১২] ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হন। তারপর মা ইনতিকাল করেন।

একটি বর্ণনা এ রকম এসেছে যে, হালীমা যখন শিশু মুহাম্মাদকে (সা) শেষ বারের মত তাঁর মায়ের নিকট নিয়ে আসছিলেন তখন মক্কার উঁচু ভূমিতে পৌঁছার পর তাঁকে হারিয়ে ফেলেন। পরে ওয়ারাকা ইবন নাওফাল ও কুরাইশ গোত্রের অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে পান। তাঁরা দু'জন তাঁকে নিয়ে 'আবদুল মুত্তালিবের নিকট এসে বলেন : এই আপনার ছেলে। আমরা তাকে মক্কার উঁচু ভূমিতে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। আমরা তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলে : আমি মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব। তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।[১৩] তারপর আবদুল মুত্তালিব তাকে কাঁধে তুলে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কা'বা তাওয়াফ করেন। কবিতাটির একটি শ্লোক নিম্নরূপ :[১৪]

أعيذه بالله بارى النسم + من كل من يسعى بساق وقدم.

'যারা পায়ের নলা ও পাতার সাহায্যে চলে, এমন প্রত্যেকের থেকে আমি তার জন্য মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

নবীকে (সা) তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিয়ে হালীমা তাঁর জনপদে ফিরে গেলেন। বহু বছর চলে গেল। এ দিকে নবী (সা) যুবক হলেন, বিয়ে করলেন। কিন্তু মা হালীমার স্মৃতি কোন দিন ভোলেননি। তাঁর স্নেহ-মমতার কথা, লালন-পালনের কথা প্রায়ই তিনি স্ত্রী খাদীজার (রা) কাছে বলতেন। খাদীজার (রা) মনেও হালীমাকে একটু দেখার ইচ্ছা জাগতো। একবার এক অভাবের বছর তিনি আসলেন। রাসূল (সা) তাঁকে সসম্মানে বাড়ীতে রাখলেন ও সমাদর করলেন। হালীমা অনাবৃষ্টির কথা বললেন, জীব-জন্তু মারা যাবার কথা শোনালেন এবং তীব্র অভাবের বর্ণনা দিলেন। রাসূল (সা) তাঁকে সাহায্যের ব্যাপারে খাদীজার (রা) সাথে কথা বললেন। খাদীজা (রা) অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে চল্লিশটি ছাগল এবং পানি বহন ও এদিক ওদিক যাওয়ার জন্য একটি উট দান করেন। এ যাত্রায় হালীমা তাঁর পরিবারের লোকদের জন্য অনেক উপহার-উপঢৌকন নিয়ে ফিরে যান।[১৫]

আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদকে (সা) মানবজাতির জন্য নবী ও রাসূল হিসেবে নির্বাচন করে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিলেন তখন হালীমা ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৬] ইবন হাজার "শারহুল হামযিয়্যা" গ্রন্থে বলেন : হালীমার সৌভাগ্য এই

---

১২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৭
১৩. ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্-১/১৫
১৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৬৭; আনসাবুল আশরাফ-১/৯৫
১৫. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৫; নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-১/৩২
১৬. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/৩২

যে, তিনি, তাঁর স্বামী ও সন্তানগণ– 'আবদুল্লাহ, আশ-শায়মা' ও উনাইসা– সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। "আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা"-র লেখক বলেন : তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বেশীর ভাগ আলিমের কোন সন্দেহ নেই। ইবন হিব্বান একটি সহীহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা দ্বারা তাঁর ইসলাম গ্রহণ প্রমাণিত হয়। হাফিজ মুগলাতায়-এর হালীমার ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ আছে যার শিরোনাম হলো : "আত-তুহফাতুল জাসীমাহ্ ফী ইসলামি হালীমা।[১৭]

নবী (সা) ছিলেন কোমল মনের দয়াপ্রবণ মানুষ। নিজের আশে পাশের লোকদেরকে শুধু নয়, বরং নিকট ও দূরের সবাইকে ভালোবাসতেন এবং হাদিয়া-তোহফা পাঠাতেন। আর এর থেকে তাঁর দুধ মা হালীমা বাদ পড়তে পারেন না। নবী (সা) সারা জীবন হালীমার স্নেহ-মমতার কথা মনে রেখেছেন। নবীর (সা) অন্তরের গভীরে ছিল মা হালীমার স্থান। তাই চল্লিশ বছরের বেশী বয়সেও তাঁকে "মা মা" বলে ডাকতে শোনা যায়, নিজের গায়ের চাদরটি খুলে বিছিয়ে তাঁর বসার স্থান করে দিতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর ভালো-মন্দ ও অভাব-অভিযোগের কথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে দেখা যায়। আরো দেখা যায় মায়ের একান্ত অনুগত সন্তানের মত হৃষ্টচিত্তে হাসি মুখে তাঁর সাথে কথা বলতে।[১৮]

কাজী 'আয়্যাজ "আশ-শিফা" গ্রন্থে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট হালীমা ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের স্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আবুত তুফায়ল বলেছেন : আমি আমার কিশোর বয়সে নবীকে (সা) "জি'রানা[১৯] নামক স্থানে একদিন গোশত বণ্টন করতে দেখেছি। সে সময় এক বেদুইন মহিলা আসলেন এবং নবীর (সা) একেবারে কাছে চলে গেলেন। নবী (সা) নিজের চাদরটি বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। মহিলাটি বসলেন। আমি লোকদের কাছে প্রশ্ন করলাম : এই মহিলা কে? লোকেরা বললো : ইনি রাসূলুল্লাহর মা, তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন।[২০]

'উমার ইবন আস-সায়িব বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বসে আছেন। এমন সময় তাঁর দুধ-পিতা আসলেন। তিনি নিজের এক খণ্ড কাপড়ের এক পাশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। একটু পরে রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ ভাই আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ আসলেন। রাসূল (সা) উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সামনে বসালেন।[২১]

বালাযুরী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ বোন আশ-শায়মা' তাঁর মা হালীমার সাথে তাঁকে কোলে নিতেন এবং তাঁর সাথে খেলতেন। এই আশ-শায়মা' হুনায়ন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করা হয়, তখন তিনি বলেন

---

১৭. নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৫

১৮. আল-ইসাবা-৪/২৭৪

১৯. "জি'রানা" তায়িফ ও মক্কার পথে, তবে মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম। (তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-৩/৫৯)

২০. আ'লাম আন-নিসা'-১/২৯০

২১. তাবাকাত-১/১১৪; আল-ইসতী'আব-৪/২৬২; আশ-শিফা-১/২৬০; উসুদুল গাবা-৫/৪২৮

: ওহে জনগণ! আপনারা জেনে রাখুন, আমি আপনাদের নবীর বোন। তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আনা হলে তিনি বললেন : আমি আপনার বোন। আমি আপনাকে আমার মায়ের সাথে কোলে নিতাম, আপনি আমাকে কামড়ে দিতেন। রাসূল (সা) তাঁকে চিনতে পারেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দেন। তাঁকে একটি দাস ও একটি দাসীসহ অনেক উপহার-উপঢৌকন দিয়ে মুক্তি দেন।[২২]

হযরত হালীমার (রা) মৃত্যু সম্পর্কে শায়খ আহমাদ যীনী দাহলান বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, হিজরাত করেন, মদীনায় মারা যান এবং বাকী গোরস্তানে দাফন করা হয়। তাঁর কবরটি সেখানে প্রসিদ্ধ।[২৩] তবে বালাযুরীর একটি বর্ণনায় বুঝা যায় তিনি মদীনায় হিজরাত করেননি এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বর্ণনাটি এ রকম : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন "আবতাহ" উপত্যকায় অবস্থান করছেন তখন তাঁর নিকট হালীমার বোন তাঁর স্বামীর বোনকে সংগে নিয়ে আসেন। তিনি রাসূলকে (সা) এক পাত্র পনীর ও একপাত্র ঘি উপহার দেন। রাসূল (সা) তাঁর নিকট হালীমার অবস্থা জানতে চান। তিনি তাঁর মৃত্যুর খবর দেন। তখন রাসূলের (সা) দু' চোখ পানিতে ভিজে যায়। তারপর রাসূল (সা) তাঁদের অবস্থা জানতে চান। তাঁরা অভাব ও দারিদ্র্যের কথা জানান। রাসূল (সা) তাঁকে পরিধেয় বস্ত্র, একটি ভারবাহী পশু ও দু'শো দিরহাম দানের নির্দেশ দেন। যাবার বেলায় তিনি নবীকে (সা) লক্ষ্য করে বলে যান : আপনি ছোট ও বড় উভয় অবস্থায় চমৎকার দায়িত্বশীল।[২৪]

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা) বর্ণনা করেছেন।[২৫]

---

২২. আনসাবুল আশরাফ-১/৯৩
২৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ.-১৭
২৪. আনসাবুল আশরাফ, পৃ. ৯১; দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-১/১৩৩
২৫. আল-ইসতী'আব-৪/২৬২

আশ-শায়মা' বিন্‌ত আল-হারিছ আস-সা'দিয়্যা (রা)

আশ-শায়মা'র আসল নাম হুযাফা, মতান্তরে জায্‌যামা। ডাকনাম আশ-শায়মা' ও আশ-শাম্মা'। বানূ সা'দের এক বেদুঈন মহিলা। তিনি তাঁর গোত্রে কেবল ডাকনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।[১] সম্ভবত তাঁর দেহে অতিরিক্ত তিল থাকার কারণে তিনি এ নামে আখ্যায়িত হন।[২] উল্লেখ্য যে, মহিলা সাহাবীদের মধ্যে আশ-শায়মা' নামে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁর পিতা আল-হারিছ ইবন 'আবদিল 'উয্‌যা ইবন রিফা'আ আস-সা'দিয়্যা এবং মাতা মহানবীর (সা) দুধমাতা হযরত হালীমা আস-সা'দিয়্যা (রা)। আশ-শায়মা'র বড় পরিচয় তিনি মহানবীর (সা) দুধ বোন।[৩] উল্লেখ্য যে, হযরত হালীমার (রা) সন্তান 'আবদুল্লাহ, উনায়সা ও আশ-শায়মা'– এ তিনজন হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ-ভাই-বোন। আশ-শায়মা' তাঁর মা হালীমাকে শিশু মুহাম্মাদের (সা) প্রতিপালনে অনেক সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

হযরত হালীমা (রা) শিশু মুহাম্মাদকে (সা) দুই বছর দুধ পান ও লালন-পালনের পর মক্কায় তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে আসেন। কয়েক দিন মক্কায় থাকার পর উভয় পক্ষের আগ্রহ ও সম্মতিতে হযরত হালীমা (রা) তাঁর দুধ-সন্তান মুহাম্মাদকে (সা) নিয়ে আবার তাঁর গোত্রে ফিরে যান। তখন তিনি হাঁটতে শিখেছেন, দুধ-ভাই-বোনদের সাথে খেলা করতে শিখেছেন। অন্যসব বেদুঈন ছেলে-মেয়েদের মত হালীমার ছেলে-মেয়েরাও তাদের জনপদের আশে-পাশের চারণভূমিতে ছাগল-ভেড়া চরাতো। তারা তাদের দুধ-ভাই শিশু মুহাম্মাদকেও (সা) মাঝে মধ্যে সঙ্গে নিয়ে যেত। এ সময় আশ-শায়মা' তাঁকে দেখাশুনা করতেন। পথ দীর্ঘ হলে, রোদের তাপ বেশী হলে তাঁকে কোলে তুলে নিতেন। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে হাত ধরে নিয়ে চলতেন। একটু চলার পর আবার ছোট্ট ভাইটিকে বুকে তুলে নিতেন। আবার কখনো তাঁকে নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং দু'হাতে তুলে নাচাতে নাচাতে সুর করে নীচের চরণ দু'টি গাইতেন :[৪]

يارِبنا أبق لنا محمدًا + حتى أراه يافعًاوأمردا

ثم أراه سيّدا مسوّدا + وأكتب أعاديه معًا والحُسَّدا

وأعطهِ عزًّا يدوم أبدًا

---

১. আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-১/১৩২

২. নিসা' মিন 'আসর আনু-নুবুওয়াহ্-৩৩৭, টীকা-২

৩. আল-ইসাবা-৪/৩৩৫

৪. প্রাগুক্ত, ৪/৩৩৬; আহমাদ যীনী দাহলান, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যাহ্-৪/৩৬৬

'হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আপনি আমাদের জন্য মুহাম্মাদকে

বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমরা তাঁকে একজন যুবক হিসেবে দেখতে পাই।

অতঃপর আমরা তাঁকে এমন একজন সম্মানিত নেতা হিসেবে দেখতে পাই যে, তাঁর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী শত্রুর মাথা নত হয়ে যাবে।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে চিরস্থায়ী সম্মান ও মর্যাদা দান করুন।'

কোন কোন বর্ণনায় প্রথম শ্লোকটি এভাবে এসেছে :[৫]

يارِبنا أبق أخى محمدًا.

'হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমার ভাই মুহাম্মাদকে বাঁচিয়ে রাখুন।'

কী চমৎকার দু'আই না ছিল যার প্রতিটি কথা। আল্লাহ পাকের দরবারে সেসব দু'আ কবুল হয়েছিল।

শিশু মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে যে শুভ ও কল্যাণ বিদ্যমান ছিল আশ-শায়মা' ও তাঁর পরিবারের ছোট-বড় সকল সদস্য তা প্রত্যক্ষ করতেন। তাই তাঁর প্রতি সবার তীব্র আবেগ ও ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল। মা হালীমা সবসময় তাঁকে নজরে নজরে রাখতেন। দূরে কোথাও যেতে দিতে চাইতেন না। আশ-শায়মা' কখনো তাঁকে এদিক ওদিক নিয়ে যেতে চাইলে মা তাকে বার বার সতর্ক করে দিতেন মুহাম্মাদ (সা) যেন দৃষ্টির আড়ালে না যায়। এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতেন না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ে গিয়ে দেখে আসতেন মুহাম্মাদ (সা) কোথায় এবং কি করছে।

একদিন দুপুরের প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত হয়ে মা হালীমা বিশ্রাম নিচ্ছেন। একটু পরেই তিনি টের পেলেন আশ-শায়মা' ও মুহাম্মাদ কেউ আশে-পাশে নেই। এই প্রচণ্ড রোদে তারা কোথায় গেল? তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। খুঁজতে বের হলেন। দেখলেন বাড়ীর অদূরে আশ-শায়মা' মুহাম্মাদকে কোলে করে নাচাচ্ছে, আর এ গানটি গাইছে :

هذا أخ لى لم تلده أمى وليس من نسل أبى وعمى

فأنمه اللهم فيما تنمى

'এ আমার ভাই, আমার মা তাকে প্রসব করেনি। সে আমার বাবা-চাচার বংশেরও কেউ নয়। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে সমৃদ্ধি দাও।'

মা হালীমা তিরস্কারের সুরে বললেন : আশ-শায়মা', তুমি তাঁকে নিয়ে এই রোদের মধ্যে খেলছো? আশ-শায়মা' বললেন : মা, আমার ভাইয়ের গায়ে রোদ লাগেনি। আমি দেখছি, মেঘ তার মাথার উপর ছায়া দান করছে। সে দাঁড়ালে মেঘ দাঁড়াচ্ছে, সে চললে

---

৫. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৩৮

মেঘও চলছে। এভাবে আমরা এখানে এসেছি। অবাক দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

একথা কি ঠিক? আশ-শায়মা' বললেন ঃ আল্লাহর কসম! সত্যি। আল্লাহর কসম! সত্যি।[৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত মা হালীমার সাথে বনী সা'দের পল্লীতে অতিবাহিত করেন। মরুভূমিতে নির্মল আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তাদের নির্ভেজাল বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিও আয়ত্ত করেন। একথা তিনি পরবর্তী জীবনে অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন :

أنا أعربكم، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر.

'আমি তোমাদের সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী, কারণ, আমি কুরাইশ বংশের সন্তান এবং বানূ সা'দে দুধ পান করে বেড়ে উঠেছি।' তিনি প্রথম জীবনের এই পাঁচটি বছরের স্মৃতি জীবনে কোনদিন ভুলেননি। মা হালীমা, বোন আশ-শায়মা' এবং তাঁদের পরিবারের অন্য সদস্যদের আদর-যত্ন, ও স্নেহ-ভালোবাসার কথা সারা জীবন মনে রেখেছেন।

সময় গড়িয়ে চললো, সে দিনের সেই ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ বড় হলেন। এক সময় নবুওয়াত লাভ করলেন। মদীনায় হিজরাত করলেন। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেন। হাওয়াযিন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হলে বানূ সা'দের আরো অনেক নারী-পুরুষ সদস্যের সাথে আশ-শায়মা'ও মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন। বন্দী হওয়ার সময় তিনি মুসলিম মুজাহিদদেরকে বলেন : 'আল্লাহর কসম! তোমরা জানতে পারবে যে, আমি তোমাদের নেতার দুধ-বোন।' কিন্তু তারা তাঁর কথা বিশ্বাস না করে তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করে। আশ-শায়মা' বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দুধ-বোন। রাসূল (সা) বললেন : তোমার দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ বা চিহ্ন উপস্থাপন করতে পারবে? বললেন : আমি একদিন আপনাকে পিঠে উঠিয়েছিলাম। আপনি আমাকে কামড় দিয়েছিলেন, এই তার দাগ।[৭] রাসূল (সা) চিহ্নটি চিনতে পারলেন। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার উপর তাঁকে বসালেন ও তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন : তুমি ইচ্ছা করলে আদর-যত্ন ও সম্মানের সাথে আমার নিকট থেকে যেতে পার। আবার ইচ্ছা করলে তোমার গোত্রে ফিরে যেতে পার।

আশ-শায়মা' বললেন : আমি আমার গোত্রে ফিরে যেতে চাই। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেন। রাসূল (সা) মাকহূল[৮] নামের একটি দাস, একটি দাসী, বহু ছাগল-ভেড়া ও উট উপঢৌকনসহ

---

৬. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-১/১৬৭, ১৬৮

৭. ইবন হাযাম, জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/২৬৫

৮. মাকহূল রাসূলুল্লাহর (সা) দাস। ইবন ইসহাক বলেন, নবীর (সা) দুধ-বোন আশ-শায়মা' মাকহূলকে

তাঁকে তাঁর গোত্রে পাঠিয়ে দেন।[৯] ইবনুল কালবী বলেন, আশ-শায়মা' একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন এবং পরিচিতি হিসেবে তাঁর দেহে শিশুকালে রাসূলুল্লাহর (সা) দাঁতের চিহ্ন দেখান।[১০]

মানবতার মহান নবী দুধ-বোন আশ-শায়মা'র প্রতিই কেবল মহানুভবতা দেখাননি, বরং তাঁর ক্ষমা ও মহানুভবতা গোটা বানূ সা'দকে পরিবেষ্টন করে। উল্লেখ্য বানূ সা'দ ছিল বিশাল হাওয়াযিন গোত্রের একটি শাখা গোত্র। হিজরী ৮ম সনে হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্র পরাজিত হলে তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসে এবং তাদের নারী ও সন্তানদেরকে বন্দী করা হয়। তখন হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসে এবং তাদের আনুগত্য ও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। এই দলে রাসূলুল্লাহর (সা) দুধ-চাচাও ছিলেন। তারা ক্ষমা ভিক্ষা চায়, বন্দীদের মুক্তি দাবী করে এবং তাদের জব্দকৃত ধন-সম্পদ ফেরত চায়। এই দলটির মুখপাত্র যুহায়র ইবন সুরাদ উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেন। তার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ

يا رسول الله، إنما فى هذه الحظائر من كان يكفلُك من عماتك وخالاتك وحواضنك، وقد حضناك فى حجورنا، وأرصعناك بثديِّنا... لقد رأيتك مُرضَعًا، فما رأيت مُرضَعًا خيرا منك، ورأيتك فطيمًا، فما رأيت فطيمًا خيرا منك ثم رأيت شابا فيما رأيت شابا خيرا منك، وقد تكاملت فيك خلال الخير، ونحن مع ذلك أصلك وعشيرتك فامنن علينا من الله عليك.

'হে আল্লাহর রাসূল! এই বন্দীদের মধ্যে আপনাকে লালন-পালনকারী আপনার চাচী, ফুফু, খালা ও কোলে-পিঠে বহনকারী রক্ষণাবেক্ষণকারীও রয়েছে। আমরা আপনাকে কোলে-পিঠে করে লালন-পালন করেছি, আমাদের স্তনের দুধ পান করিয়েছি।... আমি আপনাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু দেখেছি। আপনার চেয়ে ভালো কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু আমি আর দেখিনি। আমি আপনাকে দুধ পান বন্ধ করা শিশু দেখেছি। আপনার চেয়ে দুধ পান বন্ধ করা ভালো আর কাউকে দেখিনি। তারপর দেখেছি যুবক হিসেবে। আপনার চেয়ে ভালো যুবক আর দেখিনি। আপনার মধ্যে শুভ ও কল্যাণ স্বভাব পূর্ণতা লাভ করেছে। সবকিছু সত্ত্বেও আমরা হলাম আপনার মূল, শেকড় ও গোত্র। অতএব আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন।' তারপর তিনি নিম্নের এই চরণগুলো আবৃত্তি করেন :

এই দাসীর সাথে বিয়ে দেন। তাদের বংশধারা বিদ্যমান আছে। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৩৬৩, আল-ইসাবা-৩/৪৩৫; আনসাব আল-আশরাফ-১/৯৩

৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া-৩/৩৬৩; তারীখ আত-তাবারী-২/১৭১; আনসাব আল-আশরাফ-১/৯৩; আ'লাম আন-নিসা'-২/৩১৭ আল-আ'লাম-৩/১৮৪

১০. আনসাব আল-আশরাফ-১/৯৩

منن علينا رسول الله فى كرم + فإنك المرءُ نرجوه وننتظر

منن على نسوة قد كنت يرضعها + إذفوك يملؤه من محضها درر

فألبسِ العفو من قد كنت ترضعه + من أمهاتك إنَّ العفو مشتهر

إنَّا نؤمل عفوا منك تلبسه + هذى البرية إذ تعفو وتنتصرُ.

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আপনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর নিকট আমরা আশা করি ও যার অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করি।

আপনি সেই মহিলাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যাদের দুধ পান করেছেন। যখন তাদের বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ দুধে আপনার মুখ পূর্ণ হয়ে গেছে।

আপনার সেই মায়েদেরকে ক্ষমা করুন যাদের দুধ পান করেছেন। নিশ্চয় ক্ষমার গুণটা খুবই প্রসিদ্ধ।

আমরা আপনার ক্ষমার আশা করি। যখন আপনি বিজয়ী হন এবং ক্ষমা করেন তখন এই সৃষ্টিজগত তা পরিধান করে।'

হযরত রাসূলে করীম (সা) তার এই মনোমুগ্ধকর বর্ণনা ও সুমিষ্ট কবিতা শুনার পর বলেন : আমার ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের যা কিছু আছে তা সবই তোমাদের জন্য।

কুরাইশরা বলে উঠলো : আমাদের যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

আনসাররা বললো : আমাদের যা কিছু তা সবই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।

ইবন কাছীর বলেন, এরপর রাসূল (সা) দুধ-পিতার গোত্রের সকলকে সম্মানের সাথে মুক্তি দেন।[১১]

হযরত আশ-শায়মা'র (রা) জীবনের আর কোন কথা জানা যায় না। তিনি কখন, কোথায় ইন্তেকাল করেছেন তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে গেছে। আয-যিরিক্‌লী হি. ৮/খ্রী. ৬৩০ সনের পর তার মৃত্যু হয়েছে এমন কথা বলেছেন।[১২]

---

১১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/৩৬৩, ৩৬৪; তারীখ আত-তাবারী-২/১৭৩; 'উয়ূন আল-আছার-২/২২৩; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/১৭০

১২. আল-আ'লাম-৩/১৮৪

আসমা' বিন্‌ত আবী বকর (রা)

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু, ওফাতের পর তাঁর প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আসমার (রা) পিতা। মাতা কুতাইলা বিনত 'আবদিল 'উয্‌যা। এই 'আবদুল 'উয্‌যা ছিলেন কুরায়শ বংশের একজন বিখ্যাত সম্মানীয় নেতা। আবূ বকরের (রা) সম্মানিত পিতা আবূ কুহাফা বা আবূ 'আতীক তাঁর পিতামহ। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর তাঁর সহোদর ভাই ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) সৎ বোন। রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী তথা বিশেষ সাহায্যকারী যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) স্বামী এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে শহীদ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর পুত্র। হিজরাতের ২৭ (সাতাশ) বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) বয়স বিশ বছরের কিছু বেশী।[১] এ হলো হযরত আসমা' বিন্‌ত আবী বকরের (রা) সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁর আরো কিছু পরিচয় আছে। স্বামী যুবায়র ইবন 'আওয়াম (রা) দুনিয়াতে জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম, আর তাঁর শাশুড়ী হলেন রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারামা ফুফু হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব (রা)। উল্লেখ্য যে, তিনি আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) জ্যেষ্ঠ সন্তান এবং 'আয়িশার (রা) চেয়ে দশ বছরের কিছু বেশী দিনের বড়।[২] বংশ ও ইসলাম উভয় দিক দিয়ে এ মহিলা সাহাবী উঁচু সম্মান ও মর্যাদার অধিকারিণী ছিলেন। বংশগত দিক দিয়ে মক্কার কুরায়শ খান্দানের তাইম শাখার সন্তান। অন্যদিকে তাঁর পিতা, পিতামহ, ভগ্নি, স্বামী, শাশুড়ী, পুত্র সকলেই ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) বিশিষ্ট সাহাবী। একজন মুসলমানের এর চাইতে বেশী সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের বিষয় কী হতে পারে?

হযরত আসমার (রা) লকব বা উপাধি ছিল 'যাতুন নিতাকাইন'। এ উপাধি লাভের একটি ইতিহাস আছে। সংক্ষেপে সেই ইতিহাস এই রকম :

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করার পর তথাকার পৌত্তলিক প্রতিপক্ষ তাঁর উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে। দিনে দিনে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা রাসূলকে (সা) হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তিনি মক্কা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। সে সময় পর্যন্ত মক্কায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবূ বকর (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) অতি বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। একদিন রাতের বেলা সকলের অগোচরে চুপে চুপে আবূ বকরকে (রা) সঙ্গে করে রাসূল (সা) মক্কা থেকে বের হন এবং মক্কার উপকণ্ঠে 'ছূর' পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নেন। এজন্য আবূ বকরকে (রা) 'রফীকুল গার' বা গুহার বন্ধু বলা হয়।

---

১. তাবাকাতু ইবন সা'দ-৮/৪৪৯; উসুদুল গাবা-৫/৩৭২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৭

২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৮

মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁদের খোঁজে পর্বতের এ গুহার মুখ পর্যন্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে (সা) বিশেষ ব্যবস্থায় রক্ষা করেন। এ সময় গোপনে যাঁরা তাঁদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা ও সাহায্য করতেন হযরত আসমা (রা) তাঁদের অন্যতম। তিনি প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে একাকী বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে গুহায় যেতেন এবং তাঁদেরকে আহার করিয়ে আবার ফিরে আসতেন।

হযরত আসমার (রা) ভাই 'আবদুল্লাহ (রা) যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, সারাদিন মক্কার এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে পৌত্তলিকদের পরামর্শ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হতেন এবং রাতের আঁধারে তা রাসূলুল্লাহকে (সা) জানিয়ে আসতেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) বিশ্বস্ত রাখালের নাম ছিল 'আমির। তিনি "ছূর" পর্বতের আশেপাশে ছাগল চরাতেন এবং পাল নিয়ে গুহার মুখে চলে যেতেন এবং দুধ দুইয়ে তাঁদেরকে দিয়ে আসতেন। আর এই ছাগলের পাল নিয়ে যাওয়াতে আসমা (রা) ও আবদুল্লাহর (রা) যাওয়া-আসার পদচিহ্ন মুছে যেত। ফলে পৌত্তলিকরা কোনভাবেই সন্ধান পায়নি।

মক্কার পৌত্তলিকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন তাঁদের কোন খোঁজ পেল না তখন ঘোষণা করে দিল যে, কেউ তাঁদের সন্ধান দিতে পারলে একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় রাতে হযরত আসমা' তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে গেলে রাসূল (সা) বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে 'আলীকে (রা) বলবে, সে যেন আগামী কাল রাতে তিনটি উট এবং একজন পথ প্রদর্শক নিয়ে এই গুহায় আসে। নির্দেশমত 'আলী (রা) তিনটি উট ও একজন পথপ্রদর্শক নিয়ে হাজির হন। আর হযরত আসমা' (রা) তাঁদের দুই-তিন দিনের পাথেয় সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূল (সা) দ্রুত যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলেন। পাথেয় সামগ্রীর পুটলার ও পানির মশকের মুখ বাঁধার প্রয়োজন দেখা দিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে হাতের কাছে কোন রশি পাওয়া গেল না। তখন আসমা' (রা) নিজের 'নিতাক' বা কোমর বন্ধনী খুলে দুই টুকরো করেন। একটি দিয়ে পাথেয় সামগ্রী ও অন্যটি দিয়ে মশকের মুখ বাঁধেন। তা দেখে রাসূলের (সা) মুখ থেকে উচ্চারিত হয় :

قد أبدلكِ الله بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة.

'আল্লাহ যেন এই একটি 'নিতাকের' বিনিময়ে জান্নাতে তোমাকে দুইটি 'নিতাক' দান করেন।'

এভাবে তিনি 'জাতুন নিতাকাইন' (দুইটি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী) উপাধি লাভ করেন।[৩] রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত এ উপাধিটি আল্লাহ কবুল করেন। আর তাই আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও তিনি বিশ্ববাসীর নিকট এ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

---

৩. তাবাকাত-৮/৪৫০; আল-ইসতী'আব-৪/২২৯; উসুদুল গাবা-৫/৩৭২ (৬৬৯৮); আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/৪৭২; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৭

আসমার 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি লাভের কারণ সম্পর্কে আরো কয়েকটি মত আছে। কেউ বলেছেন, তিনি একটি কোমর বন্ধনীর উপর আরেকটি কোমরবন্ধনী বাঁধতেন, তাই এ উপাধি লাভ করেছেন। কেউ বলেছেন, তাঁর দুইটি নিতাক বা কোমরবন্ধনী ছিল। একটি কোমরে বাঁধতেন, আর অন্যটি দ্বারা রাসূলুল্লাহর (সা) প্রয়োজনীয় আহার্য সামগ্রী বেঁধে গুহায় নিয়ে যেতেন। তাই তিনি এই উপাধি পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কোমরবন্ধনী বাঁধা আরব নারীদের সাধারণ অভ্যাস।[৪]

ইবন হাজার (র) বলেন, তিনি তাঁর নিতাকটি ছিঁড়ে দু' টুকরো করেন। একটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকরের (রা) পাথেয় বাঁধেন, আর অন্যটি দ্বারা নিজের কোমর বন্ধনীর কাজ চালান। আর সেখান থেকেই তাকে বলা হতে থাকে 'যাতুন নিতাক' বা 'যাতুন নিতাকাইন' অর্থাৎ একটি কোমর বন্ধনী বা দু'টি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী।[৫]

'নিতাক'-এর এই ঘটনাটি 'ছূর' পর্বতের গুহায় ঘটেছিল, না রাসূল (সা) ও আবূ বকরের (রা) মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় আবূ বকরের (রা) বাড়ীতে, সে সম্পর্কে বর্ণনার ভিন্নতা দেখা যায়। ইমাম বুখারী ও ইবন ইসহাকের সীরাতের একটি বর্ণনায় বুঝা যায়, এটি মক্কায় আবূ বকরের (রা) গৃহ থেকে রাতের অন্ধকারে বের হওয়ার সময়ের ঘটনা।

যেমন একথা বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কার মুসলমানদের আল্লাহ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিলে মক্কার অত্যাচারিত, নির্যাতিত মুসলমানগণ দলে দলে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যেতে থাকে। পৌত্তলিকরা তাতে বাধা দিতে আরম্ভ করলে মুসলমানরা গোপনে একাকী বা ছোট ছোট দলে মক্কা ত্যাগ করতে থাকে। সকলে হিজরাতের অতি বড় ফযীলতের কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তাই সেই সৌভাগ্য অর্জনের জন্য যেন পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা) একদিন প্রিয় নবীর (সা) নিকট গিয়ে হিজরাতের অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) বললেন : 'لاتعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا.' - এত তাড়াহুড়ো করবেন না, আল্লাহ আপনাকে একজন সঙ্গী দিবেন।' আবূ বকর (রা) বুঝলেন, তাঁর সফরের সেই সঙ্গী হবেন খোদ নবী (সা)। আনন্দে আবূ বকরের (রা) হৃদয় মন ভরে গেল। রাসূলুল্লাহর (সা) দারুল হিজরাহ মদীনায় যাবার সফরসঙ্গী হবেন তিনি,এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কী হতে পারে?

রাসূলুল্লাহর (সা) এই ইঙ্গিতময় বাণী শোনার পর আবূ বকর (রা) সে কথা তাঁর দুই কন্যা– আসমা' ও আয়িশাকে (রা) বলেন। তাঁরাও খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন একথা জেনে যে, তাঁদের পিতা হবেন আল্লাহর রাসূলের (সা) হিজরাতের সফরসঙ্গী। এরপর থেকে তাঁরা সেই শুভ ক্ষণটির প্রতীক্ষায় কাটাতে থাকেন।

এরপর একদিন আল্লাহ তাঁর নবীকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দেন। নবী (সা) ঠিক দুপুরের সময় কুরায়শ পৌত্তলিকদের সকল প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে আবূ বকরের (রা)

---

৪. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৩৮, টীকা-১

৫. বানাত আস-সাহাবা -৫০

বাড়ীর পথ ধরেন। নবী (সা) তাঁর স্বাভাবিক গতিতে আবূ বকরের বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আসমা' (রা) বাড়ীর ভিতর থেকে সর্বপ্রথম তা দেখতে পান এবং দৌড়ে পিতার নিকট যেয়ে বলেন : আব্বু! এই যে রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা-মুখ ঢেকে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছেন। এমন সময় তো তিনি কখনও আসেন না। আবূ বকর (রা) বললেন : আমার মা-বাবা তাঁর জন্য কুরবান হোন! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছাড়া এ সময় তিনি আসেননি।

আবূ বকর (রা) নবীকে (সা) স্বাগত জানানোর জন্য ছুটে গেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আবূ বকর (রা) অনুমতি দিলে তিনি ঘরে ঢুকলেন। আবূ বকরকে (রা) বললেন : আপনার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে একটু বের করে দিন। সেখানে আসমা' ও আয়িশা ছিলেন। আবূ বকর (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা আমার দুই কন্যা।

নবী (সা) বললেন : আমাকে বের হওয়ার (হিজরাত করার) অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খুশীর আতিশয্যে আবূ বকর (রা) কেঁদে দেন। বলেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য কি হবে? বললেন : হাঁ। 'আয়িশা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! কেউ যে আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে পারে আমি সেই দিনের পূর্বে কখনো ভাবতে পারিনি। সেদিন আমি আবূ বকরকে কাঁদতে দেখেছি।[৬]

'আয়িশা (রা) 'যাতুন নিতাক' ঘটনা সম্পর্কে আরো বলেছেন : আমরা দুই বোন তাঁদের দু'জনের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয় গুছিয়ে দিচ্ছিলাম। তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস একটি চামড়ার থলিতে ভরলাম। তারপর আসমা' তাঁর নিতাকটি কেটে থলির মুখ বাঁধেন। আর সেখান থেকে তিনি লাভ করেন 'যাতুন নিতাক' উপাধি।[৭]

উপরের এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত আসমার (রা) 'নিতাক' ছিড়ে দু'ভাগ করা এবং 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি লাভ করার ঘটনাটি হযরত আবূ বকরের (রা) গৃহে ঘটে যখন রাসূল (সা) ও আবূ বকর (রা) 'ছূর' পর্বতের দিকে যাত্রা করেন।

আসমার ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) পরবর্তীকালে উমাইয়্যা খলীফাদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন শামের অধিবাসীরা তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন'-এর ছেলে বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। একথা আসমার (রা) কানে গেলে তিনি ছেলেকে বলেন : তারা তোমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে? বললেন : হাঁ। আসমা (রা) বলেন : আল্লাহর কসম! তারা যা বলে, সত্য। এরপর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যখন আসমার (রা) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন তখন তিনি তাঁকে বলেন : তোমরা কিভাবে আবদুল্লাহকে 'যাতুন নিতাকাইন' বলে অপমান করার চেষ্টা কর? হাঁ, আমার একটি মাত্র নিতাক ছিল। আর তা মেয়েদের অবশ্যই থাকতে হয়। আর অন্য একটি নিতাক দিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) খাদ্য সামগ্রী বেঁধেছিলাম।[৮]

---

৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৮; সাহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং-৩৯০৫; তাবাকাত-৮/২৫

৭. সাহীহ আল-বুখারী-হাদীছ নং-৩৯০৫

৮. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৭

বিয়ে ও ইসলাম গ্রহণ

হযরত আসমা' (রা) হযরত আবূ বকরের (রা) জ্যেষ্ঠ সন্তান। মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা পর্বে পুরুষদের মধ্যে আবূ বকর (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করে থাকবেন, আর তাঁরাও দা'ওয়াত কবুল করেছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, আসমা' (রা) সাহাবীদের সন্তানদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী। আর যেহেতু তিনি হিজরাতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই তাঁর বয়স তখন দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি হবে। তিনি তখন একজন কিশোরী মাত্র। ইমাম নাওবী (র) বলেন :[৯]

أسلمت أسماء قديمًا بعد سبعة عشر إنسانًا.

'আসমা' (রা) বহু আগে সতেরোজন মানুষের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।' ইবন 'আবদিল বার (র) বলেন :[১০]

'كان اسلامها قديما بمكة.' - তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল মক্কায় বহু আগে।' ইবন 'আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, আসমা (রা) 'আয়িশার (রা) চেয়ে দশ বছরের বড়। তারপর তিনি মুহাজিরদের ইসলাম বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :[১১]

ثم أسلم ناس من قبائل العرب منهم : أسماء بنت أبى بكر وهى صغيرة.

'তারপর আরব গোত্রগুলোর কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের অন্যতম হলেন আসমা' বিনত আবী বকর (রা)। তিনি তখন অল্প বয়স্কা তবে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিণী মহিলাদের ক্রমধারা এ রকম : খাদীজা, উম্মু আয়মান আল-হাবশিয়্যাহ, হযরত 'আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফাদ্‌ল ও হযরত 'উমারের (রা) বোন ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা)।[১২]

মক্কায় যখন ইসলামের দা'ওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, পৌত্তলিক কুরায়শদের যুলুম-নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে চলছে, আর রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে নির্যাতিত মুসলমানগণ মক্কা থেকে একে একে হিজরাত করছে, এমনই এক সময়ে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ফুফাতো ভাই যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) আসমাকে (রা) বিয়ের পয়গাম পাঠান।

ইসলামের প্রথম পর্বে হযরত আবূ বকরের (রা) দা'ওয়াতে যে সকল যুবক সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন যুবায়র তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর প্রথম পর্বের অন্য মুসলমানদের ন্যায় ইসলামের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন এবং প্রতিপক্ষ পৌত্তলিকদের

---

৯. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৭; বানাত আস-সাহাবা-৪০

১০. আল-ইসতী'আব-১২/১৯৬

১১. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক, (তারাজিম আন-নিসা') ১০

১২. বানাত আস-সাহাবা-৪১

নানা রকম যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। ইসলামকে বিশ্বে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যে সকল নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেন। আর তাই তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) একান্ত সাহায্যকারী ও অশ্বারোহী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

যুবায়র (রা) একজন সাহসী যুবক। তিনি দুনিয়ার উপর দীনকে অগ্রাধিকার দেন। পরকালীন জীবনকে পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দেন। তবে তিনি যখন আবূ বকরের (রা) মত একটি ধনাঢ্য অভিজাত পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব পাঠান তখন সম্পদের মধ্যে তাঁর একটি মাত্র ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আবূ বকরের (রা) পরিবার এই প্রস্তাবে রাযী হয়ে যান এবং আসমা'-যুবায়রের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।

আসমার চাতুরী ও কৌশল

হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নগদে তাঁর হাতে প্রায় এক লাখ দিরহাম ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নও মুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নিজের সব ধন-সম্পদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে তুলে দেন। এ কারণে হিজরাতের সময় তাঁর হাতে দেড় মতান্তরে পাঁচ অথবা ছয় হাজারের মত যে অর্থ ছিল তার সবগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর যিম্মাদারিতে ছেড়ে যান। 'ছূর' পর্বত থেকে রাসূল (সা) ও আবূ বকরকে (রা) বিদায় দিয়ে আসমা' (রা) ঘরে ফিরে আসেন। আবূ বকরের (রা) পিতা আবূ কুহাফা, আসমা'র (রা) দাদা– যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, বয়সের ভারে বড় দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি সকালে লোকমুখে ছেলের নিরুদ্দেশের কথা শুনে ছেলের বাড়ীতে আসেন এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে থাকেন, আফসোস! আবূ বকর নিজেও চলে গেল এবং সব অর্থ-সম্পদ সংগে নিয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে বিপদে ফেলে গেল। হযরত আসমা (রা) সংগে সংগে বলে উঠলেন, না দাদা, তিনি আমাদের জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন।

একথা বলে আসমা (রা) বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দানের জন্য একটি থলিতে পাথর ভরে মুখ বেঁধে সেখানে রাখেন যেখানে আবূ বকর (রা) তাঁর সঞ্চিত অর্থ রাখতেন। তারপর সেটি একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে দেন। এরপর তিনি দাদাকে বলেন, আমাদের আব্বা আমাদের জন্য অনেক অর্থ রেখে গেছেন। তিনি দাদার হাত ধরে সেই অর্থভাণ্ডারের নিকট নিয়ে যান এবং তাঁর একটি হাত ধরে সেই পাথর ভর্তি থলের উপর আস্তে করে ঘোরাতে থাকেন। বৃদ্ধ ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ জমা আছে মনে করে আশ্বস্ত হলেন। হযরত আসমা (রা) বলেছেন, আমি কেবল তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য এমনটি করেছিলাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের জন্য কোন কিছুই রেখে যাননি।[১৩]

---

১৩. আল-ফাতহুর রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ)-২০/২৮২; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪৮; নিহায়াতুল আবির-১৬/৩৩২

ফির'আউনুল উম্মাহ্ আবূ জাহলের হাতের থাপ্পড়

সকাল বেলা যখন মক্কার অলি-গলিতে একথা ছড়িয়ে পড়লো যে, মুহাম্মাদ (সা) ও আবূ বকর (রা) রাতের অন্ধকারে মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন তখন পৌত্তলিকদের যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল। এই উম্মাতের ফির'আউনতুল্য আবূ জাহল ও মক্কার অন্যান্য পৌত্তলিক নেতৃবৃন্দ মক্কার উঁচু ও নীচু ভূমিতে অবস্থিত বানূ হাশিম ও তার শাখা গোত্রগুলোর বাড়ীঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। অভিশপ্ত দুর্বৃত্ত আবূ জাহলের নেতৃত্বে কুরায়শদের একদল মানুষ আবূ বকরের (রা) বাড়ী ঘেরাও করে। দলটির নেতা আবূ জাহল এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দেয়। বাড়ীতে তখন আসমা', তাঁর বোন 'আয়িশা ও 'আয়িশার (রা) মা উম্মু রূমান (রা) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। আসমা' (রা) বলেন : আমি দরজা খুলে তাদের সামনে গেলাম। তারা বললো : আবূ বকরের মেয়ে, তোমার আব্বা কোথায়?

বললাম : আল্লাহর কসম! আমার আব্বা কোথায় তা আমি জানিনে। সাথে সাথে আবূ জাহল তার একটি হাত উঁচু করে। সে ছিল একজন নীচ প্রকৃতির দুষ্কর্মকারী। সে আমার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। আর তাতে আমার কানের দুলটি ছিটকে পড়ে।[১৪]

আবূ জাহল যে কত বড় নীচ পাপাচারী ছিল তা এই ঘটনা দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যায়। যে গৃহে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তখন সেই গৃহে কোন পুরুষ ছিল না। আসমা' (রা) তখন গর্ভবতী এবং তাঁর মহান স্বামী যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা) তখন অনুপস্থিত। তিনি এ ঘটনার আগেই মদীনায় হিজরাত করেছেন।[১৫] এই যুবায়র (রা) ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা। তাঁর উপস্থিতিতে মক্কার কোন পাষণ্ডের এমন বুকের পাটা ছিল না যে, তাঁর স্ত্রীর দিকে চোখ উঁচু করে তাকায়, হাত উঠানো তো দূরের কথা।

হিজরাত ও মুহাজিরদের প্রথম সন্তান

হযরত নবী কারীম (সা) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মদীনা পৌঁছে নতুন স্থানের প্রাথমিক সমস্যা কাটিয়ে একটু স্থির হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কা থেকে মহিলাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখ্য যে, হযরত আসমার স্বামী যুবায়র (রা) নবীর (সা) পূর্বেই মদীনায় পৌঁছে গেছেন। নবী (সা) যায়দ ইবন হারিছা (রা) ও স্বীয় দাস রাফি'কে মক্কায় পাঠালেন। আর এদিকে আবূ বকর (রা) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন।

আবূ বকরের (রা) ছেলে 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর মা, দুই বোন আসমা' ও 'আয়িশা এবং পরিবারের কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মদীনার পথ ধরেন। আসমা (রা) তখন আসন্ন প্রসবা মহিলা। মদীনার কুবা পল্লীতে পৌঁছার পর গর্ভস্থ সন্তান 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়।[১৬]

---

১৪. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক (তারাজিম আন-নিসা'-) পৃ. ৩

১৫. বানাত আস-সাহাবা-৫৩

১৬. তাবাকাত-৮/১২৩; উসুদুল গাবা-৫/৩৯২

এ সম্পর্কে আসমার (রা) বর্ণনা এ রকম :

'আমার তখন পূর্ণ গর্ভাবস্থা। এ অবস্থায় আমি মদীনায় পৌঁছে কুবায় ঠাঁই নিলাম। তারপর আবদুল্লাহকে প্রসব করলাম। তাকে নিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে রাখলাম। তিনি একটি খেজুর আনিয়ে চিবালেন এবং সেই থুথু তার মুখে দিলেন। এভাবে জন্মের পর রাসূলুল্লাহর (সা) থুথুই প্রথমে তার পেটে যায়।

রাসূল (সা) তার মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে দু'আও করেন।[১৭] সে ছিল মদীনার মুহাজিরদের ঘরে জন্ম নেওয়া প্রথম শিশু। মদীনার কোন মুহাজির দম্পতির কোন সন্তান না হওয়ায় লোকেরা বলাবলি করতো যে, ইহুদীরা তাদের জাদু করেছে তাই তাদের কোন সন্তান হবে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলে মুহাজিরদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ইহুদীদের অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানায়।[১৮] রাসূল (সা) সন্তানের নানা আবূ বকরকে (রা) নির্দেশ দেন তার দু'কানে আযান দেওয়ার জন্য। তিনি আযান দেন। রাসূল (সা) শিশুর নাম রাখেন আবদুল্লাহ এবং কুনিয়াত বা ডাকনাম রাখেন নানার ডাক নামে– আবূ বকর। পরবর্তীকালে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) একটু গর্বের সাথে বলতেন : هَاجَرْتُ وَأَنَا فِيْ بَطْنِ أُمِّي 'আমি আমার মায়ের পেটে থাকতেই হিজরাত করেছি।' তিনি আরো বলতেন : আমার মা আমাকে পেটে নিয়ে হিজরাত করেছেন। তিনি যত ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছেন তার সবই আমিও সহ্য করেছি।[১৯]

হযরত আসমা' (রা) তাঁর এই সন্তান আবদুল্লাহকে অন্তর উজাড় করা স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন যাতে পরবর্তীকালে ইসলামের একজন সেরা সন্তান হতে পারে। আসমার (রা) সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। এ পৃথিবীতে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা জীবন দান করে গেছেন তাঁদের সেই তালিকায় আসমার (রা) এই সন্তানও নিজের নামটি অন্তর্ভুক্ত করে যেতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি শিশুকে হাতের উপর দোলাতেন, আর শুভ্র-উজ্জ্বল অসির সাথে তার তুলনা করে কবিতার পংক্তি আওড়াতেন। সেই কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :[২০]

---

১৭. সাহীহ আল-বুখারী-১/৫৫৫

১৮. সাহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং-৩৯০৯, ৫৪৬৭; আত-তাবারী, তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক-২/১০; পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হাজ্জাজের বাহিনীর হাতে শহীদ হলে শামের অধিবাসীরা সে খবর শুনে আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দেয়। সে ধ্বনি শুনে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) প্রশ্ন করেন : এ তাকবীর কিসের জন্য? বলা হলো : শামের অধিবাসীরা 'আবদুল্লাহর (রা) হত্যার খবর শুনে আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছে। তিনি বললেন : যাঁরা তাঁর জন্মের কথা শুনে তাকবীর ধ্বনি দিয়েছিলেন তাঁরা এদের চেয়ে উত্তম যারা আজ তাঁর নিহত হওয়ার কথা শুনে তাকবীর দিচ্ছে। (আল-'ইকদ আল-ফারীদ, ৪/৪১৯; ওয়াফাইয়াত আল-আ'ইয়ান-৩/৭৩, ৭৫)

১৯. আল-ইসাবা-৫/২২৯; নাসাবু কুরায়শ-২৩৭

২০. আনবাউ নুজাবা' আল-আবনা'-৮৫; আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৯; বানাত আস-সাহাবা-৫৫

أبيض كالسيف الحسام الإبريق + بين الحوارى وبين الصديق

ظنى به وربَّ ظن تحقيق + واللهُ أهل الفضل أهل التوفيق

أنْ يحكم الخطبة يعيى المُسليق + ويفرج الكربة فى ساع الضيق

إذا نبت بالمقل الحماليق + والخيل تعدو زيمًا برازيق.

'পিতা রাসূলুল্লাহর (সা) হাওয়ারী এবং নানা আবূ বকর সিদ্দীকের মাঝখানে সে হবে ধারালো চকচকে তরবারির মত শ্বেত-শুভ্র।

তার সম্পর্কে এ আমার ধারণা। আর অনেক ধারণাই বাস্তবে রূপ নেয়। আল্লাহ মর্যাদার অধিকারী, ক্ষমতা দানের অধিকারী।

তিনি তাঁকে এমন বক্তৃতা-ভাষণে পারদর্শী করবেন যে, সে বড় বাগ্মীদেরও অক্ষম করে দিবে এবং অসহায়-অক্ষমদের বিপদাপদ দূরীভূত করবে। যখন চোখের পুত্তলীর পাশে ভ্রূ গজাবে এবং বিচ্ছিন্ন ও দলবদ্ধভাবে ঘোড়া দৌড়াবে।'

হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়ামের (রা) ঔরসে এবং আসমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন : পুত্র আবদুল্লাহ, আল-মুনযির; 'উরওয়াহ, 'আসিম, আল-মুহাজির এবং কন্যা খাদীজাতুল কুবরা, উম্মুল হাসান ও 'আয়িশা।[২১]

দৃঢ় ঈমান

ইসলামী জীবন গ্রহণ করার পর ঈমান তাঁর অন্তরে এমন দৃঢ়মূল হয় যে, শিরক ও কুফরীর সাথে বিন্দুমাত্র আপোষ করেননি। এমনকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে চিন্তা করে নিজের অতি নিকটের অমুসলিম আপনজনদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আসমার (রা) পিতা তাঁর মাকে তালাক দিলে সেই জাহিলী যুগেই তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আসমার (রা) মা তাঁদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং আসমার গোটা পরিবার ইসলামী পরিবারে পরিণত হলো। একদিন আসমার (রা) মা তাঁর মেয়েকে দেখার জন্য আসলে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জানতে চান, তাঁর এই মুশরিক মায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন কিনা? তখন এ আয়াত নাযিল হয় :[২২]

لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين.

তখন রাসূল (সা) তাঁকে তাঁর মুশরিক মায়ের সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন : হাঁ তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।[২৩] 'আমির ইবন 'আবদিল্লাহ তাঁর পিতা

---

২১. হিলয়াতুল আওলিয়া'-২/২৫৫

২২. সূরা আল-মুমতাহিনা-৮

২৩. তাফসীর আল-কুরতুবী-১০/২৩৯; মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৪, ৩৪৭, ৩৫৫

'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন : একবার কুতাইলা বিন্‌ত 'আবদিল 'উয্‌যা কিছু কিসমিস, ঘি, পনির ইত্যাদি উপহার নিয়ে কন্যা আসমা'র গৃহে আসলেন। আসমা (রা) তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এমনকি তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। 'আয়িশা (রা) বিষয়টি রাসূলকে (সা) অবহিত করে তাঁর মতামত জানতে চান। তখন নাযিল হয় সূরা আল-মুমতাহিনার উপরোক্ত আয়াতটি। তখন আসমা (রা) মাকে সাদরে গ্রহণ করে ঘরে নিয়ে বসান এবং তাঁর উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন।[২৪]

হযরত আসমা (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী মানুষ। সংসারের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতে কোন লজ্জাবোধ করতেন না। হযরত আসমা (রা) নিজেই তাঁর স্বামী হযরত যুবায়রের (রা) সংসারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও দৈন্যদশা এবং সেই সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজ হাতে সম্পন্ন করার কাহিনী আমাদেরকে এভাবে শুনিয়েছেন :

যুবায়র ইবনুল 'আওয়ামের সংগে যখন আমার বিয়ে হয় তখন অর্থ-বিত্ত বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। ছিল না কায়িক শ্রমের জন্য কোন দাস। ভীষণ হতদরিদ্র অভাবী মানুষ ছিলেন। থাকার মধ্যে ছিল শুধু একটি ঘোড়া ও একটি উট। আমি নিজেই তার রাখালী করতাম। মদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে তিন ফারসাখ দূরে হযরত রাসূলে কারীম (সা) এক খণ্ড খেজুর বাগান যুবায়রকে দান করেছিলেন। সেখান থেকে খেজুরের বীচি কুড়িয়ে থলিতে ভরে মাথায় করে বাড়ী আনতাম। তারপর নিজ হাতে তা পিষে উট-ঘোড়াকে খাওয়াতাম। কূয়া থেকে বালতি ভরে পানি উঠিয়ে মশকে ভরে বাড়ীতে আনতাম। এছাড়া বাড়ীর যাবতীয় কাজ নিজ হাতে করতাম। যেহেতু আমি ভালো রুটি বানাতে পারতাম না, এ কারণে আটা চটকিয়ে দলা বানিয়ে রেখে দিতাম। আমাদের বাড়ীর পাশেই ছিলেন আনসারদের স্ত্রীরা। তাঁরা ছিলেন খুবই সরল ও সহজ প্রকৃতির। তাঁরা আমাদের ভীষণ ভালোবাসতেন। অন্যের কাজে সাহায্য করতে পারলে দারুণ খুশী হতেন। তাঁরা আমার রুটি বানিয়ে সেঁকে দিতেন। প্রতিদিন আমাকে এ সকল বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হতো।

প্রতিদিনের মত একদিন আমি বাগান থেকে খেজুরের বীচির বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরছি, এমন সময় পথে রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে দেখা। তাঁর সংগে তখন আরো কয়েকজন সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সা) তাঁর উট বসিয়ে আমাকে তাঁর পিছনে বসার জন্য ডাকলেন। আমি আমার স্বামী যুবায়রের মান-মর্যাদার কথা ভেবে লজ্জা পেলাম। তিনি আমার লজ্জা বুঝতে পেরে চলে গেলেন। আমি বাড়ী ফিরে একথা যুবায়রকে জানালাম। তিনি মন্তব্য করলেন, আল্লাহ জানেন তোমার এভাবে মাথায় করে বোঝা আনা রাসূলের (সা) সাথে তাঁর বাহনের পিঠে বসার চাইতে আমার নিকট বেশী পীড়াদায়ক। এ ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে আমার পিতা আবূ বকর (রা) আমার জন্য একটি দাস পাঠান। সেই

---

২৪. মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৪৪; দুররুল মানছূর-৮/১৩১

আমাকে ঘোড়ার রাখালী থেকে মুক্তি দেয় এবং সব বিপদ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি লাভ করি।[২৫]

দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার কারণে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে দারুণ হিসেবী ছিলেন। প্রতিটি জিনিস প্রয়োজন মত মেপে মেপে খরচ করতেন। একথা রাসূল (সা) অবগত হয়ে তাঁকে এভাবে মেপে মেপে খরচ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, এভাবে মেপে খরচ করবে না। অন্যথায় আল্লাহ্ ততটুকু পরিমাণই দিবেন। এরপর তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন।

জীবনের এক পর্যায়ে হযরত আসমা' (রা) প্রচুর অর্থ-বিত্তের মালিক হন। তবে এই প্রাচুর্য তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনধারার উপর কোন রকম প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমরণ মোটা কাপড় পরেছেন এবং শুকনো রুটি দ্বারা উদরপূর্তি করে একেবারে ভোগ-বিমুখভাবে জীবন কাটিয়েছেন। ইরাক বিজয়ের পর তাঁর ছেলে মুনযির যখন ঘরে ফিরলেন তখন উন্নতমানের পাতলা, মোলায়েম ও নকশা করা কিছু মহিলাদের পোশাক সংগে নিয়ে আসেন এবং সেগুলো মায়ের হাতে তুলে দেন। বয়সের কারণে তখন হযরত আসমা (রা) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই কাপড়গুলোর উপর হাত বুলিয়ে তার মান বুঝার চেষ্টা করেন। যখন বুঝতে পারেন এগুলো অতি উন্নম মানের তখন তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। মুনযির যখন মোটা কাপড় নিয়ে এলেন তখন তিনি তা গ্রহণ করেন এবং খুশী হন। তারপর বলেন : ছেলে! আমাকে এমন মোটা কাপড়ই পরাবে।[২৬]

দানশীলতা

হযরত আসমার (রা) চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দানশীতা। আর এ গুণটি তিনি অর্জন করেন আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান ও পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে। পিতা আবূ বকরের (রা) দানশীলতার গুণটি তাঁর তিন কন্যা– আসমা', 'আয়িশা ও উম্মু কুলছূম (রা) পূর্ণরূপে ধারণ করেন। দানশীলতার এ গুণটি তাঁদের সত্তায় পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। এমনকি তাঁদের সময়ে এ ক্ষেত্রে তাঁরা দৃষ্টান্তে পরিণত হন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাঁর মা ও খালার দানশীলতার কথা বলছেন এভাবে :[২৭]

مارأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء، وجودُهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشئ إلى الشئ، حتى إذا اجتمع عندها وضعته فى مواضعه، وأما أسماء فكانت لاتَدَّخِرُ شيئًا لغد.

---

২৫. তাবাকাত-৮/২৫০, ২৫১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯০, ২৯১; মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৫২

২৬. তাবাকাত-৮/২৫০

২৭. তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-৩/১৩৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯২

'আমি আমার মা আসমা ও খালা 'আয়িশা (রা) থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে কিছু ভিন্নতা ছিল। খালা 'আয়িশার স্বভাব ছিল প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে যথেষ্ট পরিমাণে জমা হয়ে গেছে তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা আসমার (রা) স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।'

সম্ভবতঃ আসমা' (রা) এই দানশীলতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) উপদেশ বাণীর অনুসরণ করতেন। তিনি আসমাকে কোন জিনিস জমা করে রাখতে এবং গুনে গুনে খরচ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন তুমি যদি এমন কর তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতিও এমন করবেন। তোমার রুযি-রিযিকের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। রাসূল (সা) বলেন :[২৮]

يا أسماء لا تحصى فيحصى اللهُ عليك.

'হে আসমা! তুমি হিসাব করো না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে দানের ক্ষেত্রে হিসাব করবেন।'

আসমা' (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) এই উপদেশ বাণীর পর থেকে আমি কী খরচ করলাম এবং কী আমার হাতে এলো তা আর হিসাব করিনি। যা কিছুই আমি খরচ করেছি আল্লাহ আমাকে তা পূরণ করে দিয়েছেন।[২৯]

তিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের এই বলে উপদেশ দিতেন যে, তোমার ধন-সম্পদ অন্যের সাহায্য ও উপকারের জন্য দেওয়া হয়, জমা করার জন্য নয়। তুমি যদি তোমার অর্থ-বিত্ত আল্লাহর বান্দাদের জন্য খরচ না কর এবং কৃপণতা কর তাহলে আল্লাহও তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করবেন। তুমি যা কিছু দান করবে অথবা খরচ করবে, প্রকৃতপক্ষে তাই হবে তোমার সঞ্চয়, এ সঞ্চয় কখনো কম হবে না, অথবা নষ্টও হবে না।[৩০]

হযরত আসমা' (রা) কখনো অসুস্থ হলে তাঁর মালিকানার সকল দাসকে মুক্ত করে দিতেন।[৩১] উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) মৃত্যুকালে এক খণ্ড ভূমি রেখে যান যা উত্তরাধিকার হিসেবে আসমা' (রা) লাভ করেন। তিনি সেই ভূমিটুকু এক লাখ দিরহামে বিক্রি করেন এবং সকল অর্থ আত্মীয় ও পরিজনদের মধ্যে বিলি করে দেন।[৩২]

হযরত আসমার (রা) স্বামী হযরত যুবায়র (রা) ছিলেন অনেকটা রূঢ় প্রকৃতির মানুষ। এ কারণে আসমা' (রা) একবার রাসূলকে (সা) জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কি আমার স্বামীর

---

২৮. সাহীহ আল-বুখারী, ফিল হিবা (২৫৯০, ২৫৯১), ফিয যাকাত (১৪৩৩, ১৪৩৪)
২৯. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক (তারাজিম আন-নিসা')-১৯; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ-৩৫৭
৩০. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক-১৬; তাবাকাত-৮/৩৫৭
৩১. তাবাকাত-৮/২৮৩
৩২. সাহীহ আল-বুখারী, বাবু হিবাতিল ওয়াহিদ লিল জামা'আহ্।

সম্পদ থেকে অনুমতি ছাড়াই ফকীর-মিসকীনকে কিছু দান করতে পারি? বললেন : হাঁ, করতে পার।[৩৩]

একবার হযরত আসমার (রা) মা মদীনায় তাঁর নিকট আসেন এবং কিছু অর্থ সাহায্য চান। তিনি তাঁর অভ্যাস মত রাসূলের (সা) নিকট ছুটে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, আমার মা একজন মুশরিক (পৌত্তলিক), আমার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাচ্ছেন, আমি কি তাঁকে সাহায্য করতে পারি? রাসূল (সা) বললেন : তিনি তোমার মা।[৩৪] অর্থাৎ তাঁকে তুমি সাহায্য করতে পার। মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির (মৃ. ১৩০ হি.) যিনি একজন বড় মাপের তাবি'ঈ ছিলেন, বলেন : 'আসমা' ছিলেন একজন উদারপ্রাণ দানশীল স্বভাবের মহিলা।'[৩৫]

শাশুড়ীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি

হযরত আসমার (রা) শাশুড়ী ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফু সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদিল মুত্তালিব (রা)। তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি ছিলেন। ইসলামী জীবনে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য খ্যাতিও অর্জন করেন। তবে স্বভাবে একটু রুক্ষতা ছিল। রেগে গেলে তা অনেকটা মাত্রা ছেড়ে যেত। এসব কারণে পুত্রবধূ আসমার (রা) সঙ্গে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতো। আর তা নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যেও মান-অভিমানের অবতারণা হতো। এ রকম একটি ঘটনা ইবন 'আসাকির 'উরওয়া ইবন আয-যুবায়রের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একবার আসমার কোন ব্যাপার নিয়ে সাফিয়্যা ও তাঁর ছেলে যুবায়রের মধ্যে ক্ষুব্ধ কথাবার্তা হয়। আসমা-যুবায়রের ছোট্ট মেয়ে খাদীজা সব সময় তার দাদীর কাছে থাকতো। সে তার আব্বা-দাদীর কথা শোনে এবং তার মার কাছে গিয়ে বলে : মা, আপনি কেন দাদীকে বকেছেন? তিনি আব্বার নিকট অভিযোগ করেছেন। কথাটি জানাজানি হয়ে গেল। সাফিয়্যা ছেলের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে, তাঁর কথাটি ছেলে বউকে বলে দিয়েছে। তিনি এজন্য ছেলেকে তিরস্কার করেন। যুবায়র (রা) মাকে বললেন : মা, আমি তাকে বলিনি। এতে মা আরো ক্রুদ্ধ হলেন। ভাবলেন, ছেলে তাঁর নিকট সত্য গোপন করছে। আসলে যুবায়রও জানতেন না, আসমা' বিষয়টি কার কাছ থেকে জেনেছেন। রাগের চোটে সাফিয়্যা (রা) তখন ছেলের প্রতি তিরস্কারমূলক বেশ কিছু শ্লোক উচ্চারণ করেন। অবশেষে বিষয়টি পরিষ্কার হলো। যুবায়র (রা) বললেন : মা, আসমাকে একথা বলেছে খাদীজা। সাফিয়্যা বললেন : তাই! সে যেন আর কখনো আমার ঘরে না আসে।[৩৬] উল্লেখ্য যে, হযরত সাফিয়্যা (রা) আসমা-যুবায়রের (রা) সন্তানদেরকে খুবই আদর করতেন। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে তো কোলে করে নাচাতেন, আর সুর করে কবিতার চরণ আবৃত্তি করতেন।[৩৭]

---

৩৩. মুসনাদ-৬/৩৫৩
৩৪. সাহাবিয়াত-১৬০
৩৫. তাবাকাত-৮/২৫৩
৩৬. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্‌ক (তারাজিম আন-নিরসা') পৃ. ১৭, ১৮
৩৭. বানাত আস-সাহাবা-৬২, টীকা-১

খোদাভীতি ও জ্ঞান

আল্লাহর পথে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া, দানশীলতা, উন্নত নৈতিকতা যেমন তাঁর চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিল তেমনিভাবে জ্ঞান, খোদাভীতি, বুদ্ধিমত্তা, ফিকহ্ বিষয়ে পারদর্শিতা তাঁর সত্তাকে আরো মহিয়ান করে তোলে। রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা, জিহাদে অংশগ্রহণ এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজে তাঁর সমান অংশীদারিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বিনীত ও বিনম্রভাবে 'ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং একাগ্রচিত্তে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। বিশেষ কোন আয়াত পাঠের সময় বিগলিত চিত্তে বার বার তা আওড়াতে থাকতেন। তাঁর স্বামী বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি আসমার (রা) ঘরে ঢুকে দেখি সে নামাযে দাঁড়িয়ে এ আয়াত[৩৮]- فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّعِيْرِ.

'অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন।'

পাঠ করলো। তারপর পাঠ করলো আ'উযুবিল্লাহ। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম, কিন্তু সে কাঁদছে আর আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করছে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি বাজারে গেলাম। কাজ সেরে আবার সেখানে ফিরে গিয়ে দেখলাম, তখনো সে কাঁদছে আর আ'উযুবিল্লাহ পাঠ করছে।[৩৯]

ইবনুল জাওযী (রহ) উল্লেখ করেছেন যে, সেকালে এমন একদল কুরআন পাঠক ও শ্রোতার আবির্ভাব ঘটে, যারা কুরআন পাঠ অথবা শোনার সময় অভিনব সব আচরণ করতো। যেমন : অচেতন হওয়া, পরিধেয় বস্ত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলা, মাথা-মুখে চড়-থাপ্পড় মারা ইত্যাদি। তারা মনে করতো এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর পানাহ ও আশ্রয় কামনা করছে। তারা আরো মনে করতো, সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ ও সর্বাধিক সৎকর্মশীল রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণ এমন করতেন এবং তারা কেবল তাঁদেরই অনুসরণ করছে।[৪০] কূফার বিখ্যাত হাফিজ হুসাইন ইবন 'আবদুর রহমান আস-সুলামী (মৃ. ১৩৬ হি.) বলেন : একবার আমি আসমা' বিন্ত আবী বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন তিলাওয়াতের সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণ কেমন করতেন? বললেন : আল্লাহ যেমন তাদের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ এবং গাত্রত্বক রোমাঞ্চিত হয়। বললাম : এখানে এমন কিছু লোক আছে যাদের সামনে কুরআন পাঠ করলে অচেতন হয়ে পড়ে। হযরত আসমা (রা) বললেন : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

'বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাই।'[৪১]

মূলতঃ হযরত আসমা (রা) আল-কুরআনের দু'টি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যাতে কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা চিত্রিত হয়েছে। সেই আয়াত

---

৩৮. সূরা আত-তূর-২৭

৩৯. হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৫৫; আদ-দুররুল মানছূর-৭/৬৩৫

৪০. আল-কুস্সাম ওয়াল-মুযাক্কিরীন-৪০

৪১. আল-বাহর আল-মুহীত-৯/১৯৬; তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক (তারাজিম আন-নিসা'-২০)

দু'টি হলো :[৪২]

وَإِذَا سَمِعُوْا مَاأُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ.

'রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শোনে তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চোখ বিগলিত দেখবে।'

اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثَ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِىَ تَقْشَعِرُّ منه جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ.

'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।'[৪৩]

এই উম্মাতের সর্বাধিক খোদাভীরু ও পুণ্যবান মানুষ হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। তারা সরাসরি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিকট থেকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং তারা যা করেননি, ইবাদাতের নামে তা করা কোনভাবেই সঙ্গত নয়। একথাই হযরত আসমা' (রা) 'আ'উযুবিল্লাহ' পাঠের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি আরো বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঐ সকল লোক যা করে তা মূলতঃ শয়তানের কাজ। সততা ও নিষ্ঠা ছিল হযরত আসমার (রা) স্বভাবগত। গোটা মানব সমাজের প্রতি ছিল তাঁর সহমর্মিতা। একবার হযরত রাসূলে কারীম (সা) সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করছিলেন। নামায খুব দীর্ঘ ছিল। আসমা' (রা) ভয় পেয়ে গেলেন এবং ক্লান্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর অদূরে দাঁড়ানো দুই মহিলার উপর দৃষ্টি পড়লো। ওই দুই মহিলার একজন ছিল একটু স্থূলকায় এবং অন্যজন একটু হালকা-পাতলা ও দুর্বল। তাদের নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে তিনি সাহস ও শক্তি পেলেন। তিনি সরে পড়ার সিদ্ধান্ত পাল্টালেন এবং মনে মনে নিজেকে বললেন, তাদের চেয়েও বেশী সময় আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।[৪৪] যে কথা সেই কাজ। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকলেন। নামাযও ছিল কয়েক ঘণ্টা দীর্ঘ। শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামাল দিতে পারেননি। জ্ঞান হারানোর উপক্রম হয় এবং মাথায় পানি ছিটানোর প্রয়োজন পড়ে।[৪৫]

সে যুগে হযরত আসমা (রা) বহুবিধ জ্ঞানের উৎসস্থল ছিলেন। তিনি স্বপ্নের একজন দক্ষ তা'বীর বা ব্যাখ্যাকারিণীও ছিলেন। আল ওয়াকিদী বলেছেন :[৪৬]

---

৪২. সূরা আল-মায়িদা-৮৩
৪৩. সূরা আয-যুমার-২৩
৪৪. মুসনাদে আহমাদ-৩/৩৪৯
৪৫. সাহীহ আল-বুখারী-১/১৪৪
৪৬. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৮

كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس للرؤيا، وكان أخذ ذلك عن أسماء بنت بكر، وأخذته أسماء عن أبيها.

'সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব (রহ) ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের তা'বীরকারী। তিনি এ জ্ঞান লাভ করেন আসমা' বিনত আবী বকর থেকে। আর আসমা' লাভ করেন তার পিতা আবূ বকর (রা) থেকে।'

হযরত আসমার (রা) বহু ভক্ত ও অনুসারী ছিলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁরা আসতেন তাঁর সাথে দেখা করতে। তাঁর পূতঃ পবিত্রতার ব্যাপক প্রসিদ্ধি ছিল। মানুষ আসতো তাঁর দু'আ নিতে। বিশেষ করে বিপদ-আপদের সময় মানুষ আসতো তাঁর দ্বারা দু'আ করাতে। কখনো কোন জ্বরে আক্রান্ত নারী তাঁর নিকট এলে তিনি তার বুকের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে বলতেন, রাসূল (সা) বলেছেন : জ্বর হল জাহান্নামের আগুন, আর তোমরা তা পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।[৪৭]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) ইনতিকালের সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) একটি জোব্বা হযরত আসমাকে (রা) দিয়ে যান। আসমার (রা) বাড়ীর কেউ অসুস্থ হলে তিনি এই জোব্বা ধোওয়া পানি তাকে পান করাতেন।[৪৮]

হযরত আসমা' (রা) কয়েকবার হজ্জ করেন। প্রথম বার আদায় করেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সঙ্গে।

হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনা

হযরত আসমা' (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের (রা) কন্যাদের অনেককে অতিক্রম করে গেছেন। তবে আবূ বকরের (রা) পরিবারের মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁকে ডিঙ্গিয়ে গেছেন। যে সকল পুরুষ বা মহিলা সাহাবী থেকে এক শো'র কম হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে "আসহাবুল 'আশারা" বলা হয়।[৪৯] তাঁর

---

৪৭. সাহীহ মুসলিম, ফিস সালামি (২২১১); বুখারী, ফিত তিব্ব (৫৭২৪)

৪৮. মুসলিম, ফিল-লিবাসি ওয়ায যীনাতি (২০৬৯); তাবাকাত-১/৪৫৪; মুসনাদ-৬/৩৪৮

৪৯. যে সকল মহিলা সাহাবীকে 'আসহাবুল 'আশরা'-এর মধ্যে গণ্য করা হয় তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন :

১. আসমা' বিনত ইয়াযীদ (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৮১
২. মায়মূনা বিন্‌ত আল-হারিছ, উম্মুল মু'মিনীন (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৭৬
৩. উম্মু হাবীবা, উম্মুল মু'মিনীন (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৬৫
৪. আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৬০
৫. আসমা' বিন্‌ত আবী বকর (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৫৮
৬. উম্মু হানী বিন্‌ত আবী তালিব (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৪৬
৭. ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৩৪
৮. উম্মুল ফাদল বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-৩০
৯. উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-২৪

স্বামী যুবায়র (রা)ও এই শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের অন্তর্গত। তবে তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে বিশটি হাদীছ বেশী বর্ণনা করেছেন। তিনি যেখানে ৫৮ (আটান্ন)টি, মতান্তরে ৫৬টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেখানে তাঁর স্বামীর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩৮ (আটত্রিশ)।

হযরত আসমার বর্ণিত হাদীছ সাহীহাইনসহ সুনান ও মুসনাদের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ১৪ (চৌদ্দ)টি হাদীছ সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমে সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া ৪ (চার)টি বুখারী এবং ৪ (চার)টি মুসলিম এককভাবে সংকলন করেছেন।[৫০]

হযরত আসমা' (রা) থেকে যে সকল মানুষ হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : তাঁর দুই ছেলে– 'আবদুল্লাহ ও 'উরওয়া, তাঁর দৌহিত্র 'আবদুল্লাহ ইবন 'উরওয়া, তাঁর আযাদকৃত দাস 'আবদুল্লাহ ইবন কায়সান, ইবন 'আব্বাস, মুহাম্মাদ ইবন আল-মুনকাদির, ওয়াহাব ইবন কায়সান ও আরো অনেকে। আর মহিলাদের মধ্যে : ফাতিমা বিন্‌ত শায়বা, উম্মু কুলছূম মাওলাতুল হাজাবা ও আরো অনেকে।[৫১]

হযরত আসমার (রা) মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তাছাড়া তিনি একজন বাগ্মী মহিলা ছিলেন। স্বামী যুবায়র (রা) ও পুত্র আবদুল্লাহ (রা) শাহাদাত বরণের পর তিনি যে মরসিয়া রচনা করেন তা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়।[৫২]

তালাক

বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে হযরত যুবায়র (রা) কর্তৃক হযরত আসমা'কে (রা) তালাক দানের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তবে কোন গ্রন্থে এর কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইবনুল আছীর সম্ভাব্য দু'টি কারণের কথা বলেছেন। একটি এই যে, হযরত আসমা' (রা) বার্ধক্যে পৌছে গিয়েছিলেন এবং বয়সের কারণে দৃষ্টিশক্তিও যেতে বসেছিল।[৫৩] আর তাই হযরত যুবায়র (রা) তাঁকে দূরে সরিয়ে দিতে চান। দ্বিতীয়টি এই যে, যে কোন কারণেই হোক দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। আর তা তালাক তথা সম্পর্ক ছিন্ন করার পর্যায়ে গিয়ে পৌছে। প্রথম কারণটি কোনভাবেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। হযরত যুবায়র (রা) যে পর্যায়ের মানুষ তাতে কি একথা কল্পনা করা যায় যে, বার্ধক্যের কারণে বহু সন্তানের জননী স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন? তাও আবার যখন তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন? দ্বিতীয় যে কারণটির কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। আর সে কারণে তালাক দেওয়া সম্ভব। হযরত যুবায়রের (রা) স্বভাব ছিল একটু রুক্ষ ও কঠোর প্রকৃতির।

---

১০. আর-রুবায়্যি' বিন্‌ত মু'আওবিয (রা)। বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-২১ (বানাত আস-সাহাবা-পৃ. ৬৫; টীকা-১)

৫০. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৯; আল-ইসাবা-৪/২৩০ বানাত আস-সাহাবা-৬৫, ৬৬

৫১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯২; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৭; তাহযীব আত-তাহযীব-১০/৪৫১

৫২. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৯

৫৩. উসুদুল গাবা-৫/৩৯৩

ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তা বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। ইবনুল আছীরের আরেকটি বর্ণনায় একথার সমর্থন পাওয়া যায়। একবার কোন একটি কথার কারণে হযরত যুবায়র (রা) স্ত্রী হযরত আসমার (রা) উপর ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। এমনকি তা মারপিট পর্যন্ত গড়ায়। আসমা' (রা) ছেলে আবদুল্লাহকে (রা) ডাকলেন সাহায্যের জন্য। যুবায়র (রা) তাঁকে আসতে দেখে বললেন, তুমি যদি এখানে আস তাহলে তোমার মাকে তালাক। 'আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনি আমার মাকে আপনার কসমের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করলেন? তারপর জোর করে তিনি পিতার হাত থেকে মাকে ছাড়িয়ে আনেন। তারপর আসমা' (রা) পৃথক হয়ে যান।[৫৪] হিশাম ইবন 'উরওয়া বলেন : যুবায়র যখন আসমাকে (রা) তালাক দেন তখন 'উরওয়া ছোট। যুবায়র (রা) 'উরওয়াকে নিজের কাছে নিয়ে নেন।[৫৫] যাই হোক না কেন, তালাকের পর আসমা' (রা) ছেলে 'আবদুল্লাহর (রা) নিকট চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) একজন বাধ্য ও অনুগত সন্তান হিসেবে আমরণ মায়ের সেবা করেন। মায়ের সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

হযরত যুবায়র (রা) যে হযরত আসমার (রা) সঙ্গে কঠোর আচরণ করতেন সে কথা আরো কিছু বর্ণনায় জানা যায়। যেমন আসমা' (রা) একদিন তাঁর পিতা আবূ বকরের (রা) নিকট গিয়ে তাঁর প্রতি যুবায়রের (রা) কঠোর আচরণের অভিযোগ করলেন। আবূ বকর (রা) আসমার (রা) কথা শোনার পর প্রথমে যুবায়রের (রা) প্রশংসা করলেন এবং নানা বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার সাক্ষ্য দিলেন। তারপর তাঁকে উপদেশ দিলেন : আমার মেয়ে! ধৈর্য ধর। একজন নারীর যদি একজন সৎ স্বামী থাকে এবং সে যদি স্ত্রীর পূর্বে মারা যায়, আর স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিয়ে না করে তাহলে জান্নাতে তাদের আবার মিলন হবে।[৫৬]

বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তা

প্রাচীন কাল থেকে আরব ভূমির এ বৈশিষ্ট্য আছে যে, তার প্রতিটি সন্তান হয় উদার ও দানশীল। তেমনিভাবে বীরত্ব ও সাহসিকতাও তাদের বিশেষ প্রকৃতি ও গুণ। এ কারণে হযরত আসমা' (রা) দানশীল হিসেবে যেমন খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি একজন সাহসী বীর মহিলা হিসেবেও প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। সা'ঈদ ইবন আল-আসের (রা) সময় যখন মদীনার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এবং শহরে ব্যাপকভাবে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে তখন হযরত আসমা' (রা) একটি সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর বালিশের নীচে রেখে ঘুমাতেন। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোন চোর-বাটপাড় ও দুষ্কৃতিকারী যদি ঘরে ঢুকে যায় এবং আমার উপর হামলা করে তাহলে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলবো।[৫৭]

---

৫৪. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯২; তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাসাহীর ওয়াল-আ'লাম-৩/১৩৪

৫৫. তাবাকাত-৮/২৫৩; উসুদুল গাবা-৫/৩৯৩

৫৬. আ'লাম আন-নিসা'-২/৪৮; বানাত আস-সাহাবা-৫৯

৫৭. নিসা' হাওলার রাসূল-১৮৪

হযরত আসমা'কে (রা) জিহাদের ময়দানেও দেখা যায়। শাম অভিযানে তিনি স্বামী যুবায়রের (রা) সঙ্গে ছিলেন এবং বিখ্যাত ইয়ারমূক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন।[৫৮]

হযরত আসমার (রা) পুত্র 'আবদুল্লাহর (রা) বয়স যখন পূর্ণ যৌবনকাল তখন উমাইয়্যা খলীফাদের বিরুদ্ধাচরণ করে হিজায, মিসর, ইরাক ও খুরাসানসহ সিরিয়ার বেশীর ভাগ অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে খলীফা বলে মেনে নেয় এবং তার হাতে বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) করে। উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু'আবিয়া (রা) ইনতিকালের পূর্বে তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে যান। কিন্তু ইয়াযীদের এভাবে রাজতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ ও তাঁর অনৈসলামী জীবনধারা ইসলামী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ মেনে নিতে পারেনি। হযরত আবদুল্লাহও (রা) ইয়াযীদের বাই'আত করতে অস্বীকার করেন। তিনি মক্কাকে ইসলামী খিলাফতের রাজধানী ঘোষণা দিয়ে সেখানে অবস্থান নেন। চতুর্দিক থেকে মানুষ দলে দলে এসে তাঁর হাতে বাই'আত করতে থাকে। তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শাসন কাজ পরিচালনা করতে থাকেন। যখন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁর উযীর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ হযরত 'আবদুল্লাহকে (রা) প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বিশাল সমরশক্তি নিয়ে হিজরী ৭২ সনের ১লা যুলহিজ্জা মক্কা অবরোধ করেন। বাইরের সকল যোগাযোগ থেকে মক্কা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একাধারে ছয় মাস উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলে। দীর্ঘ অবরোধের ফলে মক্কার মানুষের জীবনধারা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) সহযোগীদের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। তারা বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে। তিনি তাঁর শেষ মুহূর্তের মুষ্টিমেয় কিছু অনুসারীদের নিয়ে কা'বার হারাম শরীফে অবস্থান নেন। এখানে উমাইয়্যা সেনাবাহিনীর সাথে চূড়ান্ত সংঘর্ষের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি মা আসমার (রা) সাথে শেষবারের মত সাক্ষাৎ করতে যান। হযরত আসমা (রা) তখন বার্ধক্যের ভারে জর্জরিত ও অন্ধ। হযরত আসমার (রা) ঘটনাবহুল জীবনের অনেক কথাই ইতিহাস ধরে রাখতে পারেনি। তবে মাতা-পুত্রের এই শেষ সাক্ষাতের সময় তিনি যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ঈমানী মজবুতী, চরম আত্মত্যাগ, আল্লাহ নির্ভরতা ও সত্যের প্রতি একনিষ্ঠতার পরিচয় দেন ইতিহাসে তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। মাতা-পুত্রের সেই সংলাপটি ছিল নিম্নরূপ :

আবদুল্লাহ : মা, আস্-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।

আসমা' : 'আবদুল্লাহ! ওয়া 'আলাইকাস সালাম। হাজ্জাজ-বাহিনীর মিনজিনিক হারাম শরীফে অবস্থানরত তোমার বাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করছে, মক্কার বাড়ী-ঘর প্রকম্পিত করে তুলছে, এমন চরম মুহূর্তে তোমার আগমন কি উদ্দেশ্যে?

'আবদুল্লাহ : উদ্দেশ্য আপনার সাথে পরামর্শ।

---

৫৮. বানাত আস-সাহাবা-৬৯

আসমা' : পরামর্শ! কি বিষয়ে?

'আবদুল্লাহ : হাজ্জাজের ভয়ে অথবা প্রলোভনে আমার সঙ্গীরা আমাকে বিপদের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, এমন কি আমার সন্তান এবং আমার পরিবারের লোকেরাও আমাকে পরিত্যাগ করেছে। এখন আমার সাথে অল্প কিছু লোক আছে। তাদের ধৈর্য ও সাহস যত বেশীই হোক না কেন দু' এক ঘন্টার বেশী কোন মতেই টিকে থাকতে পারবে না। এদিকে উমাইয়্যারা প্রস্তাব পাঠাচ্ছে, আমি যদি আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানকে খলীফা বলে স্বীকার করে নিই এবং অস্ত্র ত্যাগ করে তাঁর হাতে বাই'আত হই তাহলে পার্থিব সুখ-সম্পদের যা আমি চাইবো তাই তারা দেবে– এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন?

আসমা' (রা) একটু উচ্চস্বরে বলেন : ব্যাপারটি একান্তই তোমার নিজের। আর তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে বেশী জান। যদি তোমার দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, তুমি হকের উপর আছ এবং মানুষকে হকের দিকে আহ্বান করছো, তাহলে যারা তোমার পতাকাতলে অটল থেকে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদের মত তুমিও অটল থাক। আর যদি তুমি দুনিয়ার সুখ-সম্পদের প্রত্যাশী হয়ে থাক, তাহলে তুমি একজন নিকৃষ্টতম মানুষ। তুমি নিজেকে এবং তোমার লোকদের ধ্বংস করছো। পুরুষের মত যুদ্ধ কর এবং জীবনের ভয়ে কোন অপমানকে সহ্য করো না। অবমাননাকর জীবনের চেয়ে সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত খেয়ে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়! তুমি শহীদ হলে আমি খুশী হবো। আর যদি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রত্যাশী হও তাহলে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ আর কে আছে? তুমি যদি এই ভেবে থাক যে, তুমি একা হয়ে গেছো এবং আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাহলে এই কর্মপদ্ধতি কোন সম্মানীয় ব্যক্তির নয়। তুমি কতদিন বেঁচে থাকবে? একটি সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে মর। তাহলে আমি সান্ত্বনা খুঁজে পাব।

আবদুল্লাহ : তাহলে আজ আমি নিশ্চিত নিহত হবো।

আসমা' : স্বেচ্ছায় হাজ্জাজের নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং বনী উমাইয়্যার ছোকরারা তোমার মুণ্ডু নিয়ে খেলা করবে, তা থেকে যুদ্ধ করে নিহত হওয়াই উত্তম।

আবদুল্লাহ : মা, আমি নিহত হতে ভয় পাচ্ছি না। আমার ভয় হচ্ছে, তারা আমাকে নানাভাবে শাস্তি দেবে। আমার হাত-পা কেটে, অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে আমাকে বিকৃত করে ফেলবে।

আসমা' : বেটা! নিহত হওয়ার পর মানুষের ভয়ের কিছু নেই। যবেহ করা ছাগলের চামড়া ছিলার সময় সে কষ্ট পায় না।

মায়ের একথা শুনে হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) মুখমণ্ডলের দীপ্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : আমার কল্যাণময়ী মা, আপনার সুমহান মর্যাদা আরো কল্যাণময় হোক। এ সংকটময় মুহূর্তে আপনার মুখ থেকে কেবল একথাগুলো শোনার জন্য আমি আপনার খেদমতে হাজির হয়েছিলাম। আল্লাহ জানেন, আমি ভীত হইনি, আমি দুর্বল হইনি। তিনিই সাক্ষী, আমি যে জন্য সংগ্রাম করছি, তা কোন জাগতিক সুখ-

সম্পদ ও মান-মর্যাদার প্রতি লোভ-লালসা ও ভালোবাসার কারণে নয়। বরং এ সংগ্রাম হারামকে হালাল ঘোষণা করার প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণেই। আপনি যা পছন্দ করেছেন, আমি এখন সে কাজেই যাচ্ছি। আমি শহীদ হলে আমার জন্য কোন দুঃখ করবেন না এবং আপনার সবকিছুই আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবেন।

আসমা' : যদি তুমি অসত্য ও অন্যায়ের উপর নিহত হও তাহলে আমি ব্যথিত হবো।

আবদুল্লাহ : আম্মা! আপনি বিশ্বাস রাখুন, আপনার এ সন্তান কখনও অন্যায়, অশ্লীল ও অশালীন কাজ করেনি, আল্লাহর আইন লংঘন করেনি, কারো বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, কোন মুসলমান বা যিম্মীর উপর যুলুম করেনি এবং আল্লাহর রিযামন্দী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন কিছু এ দুনিয়ায় তার কাছে নেই। একথা দ্বারা নিজেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমার সম্পর্কে আল্লাহই বেশী ভালো জানেন। তারপর তিনি আকাশের দিকে মুখ উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন : ইলাহী, তুমি ভালো করেই জান যে, আমি আমার মাকে যা কিছু বলেছি তা কেবল তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য। যাতে তিনি আমার এই অবস্থা দেখে কষ্ট না পান।

আসমা' বললেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَكَ عَلَى مَايُحِبُّ وَاُحِبُّ ـ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর ও আমার পছন্দনীয় কাজের উপর তোমাকে অটল রেখেছেন।' আমার ছেলে! আমি আশা করি তোমার ব্যাপারে আমার ধৈর্য হবে এক অতুলনীয় ধৈর্য। তুমি আমার সামনে নিহত হলে, তা হবে আমার ছওয়াবের উপলক্ষ্য। তুমি বিজয়ী হলে তা হবে আমার জন্য আনন্দের বিষয়। এখন আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও। বৎস! তুমি একটু আমার কাছে এসো, আমি শেষবারের মত একটু তোমার শরীরের গন্ধ শুকি এবং তোমাকে একটু স্পর্শ করি। কারণ, এটাই তোমার ও আমার ইহজীবনের শেষ সাক্ষাৎ।

'আবদুল্লাহ (রা) বাঁকা হয়ে মার হাত-পা চুমুতে চুমুতে ভরে দিতে লাগলেন, আর মা ছেলের মাথা, মুখ ও কাঁধে নিজের নাক ও মুখ ঠেকিয়ে শুকতে ও চুমু দিতে লাগলেন এবং তাঁর শরীরে নিজের দু'টি হাতের স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। বিদায় বেলা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে একথা বলতে বলতে তাঁকে আবার দূরে ঠেলে দিলেন : আবদুল্লাহ! তুমি এ কী পরেছো?

– আম্মা, এ তো আমার বর্ম।

– বেটা, যারা শাহাদাতের অভিলাষী, এ তাদের পোশাক নয়।

– মা, আপনাকে খুশী করা ও আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে আমি এ পোশাক পরেছি।[৫৯]

– তুমি এটা খুলে ফেল। তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার সাহস এবং তোমার আক্রমণের পক্ষে উচিত কাজ হবে এমনটিই। তাছাড়া এ হবে তোমার কর্মতৎপরতা, গতি ও চলাফেরার

---

৫৯. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা-১/২১১-২১২

জন্যও সহজতর। এর পরিবর্তে তুমি লম্বা পাজামা পর। তাহলে তোমাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হলেও তোমার সতর অপ্রকাশিত থাকবে।

মায়ের কথামত 'আবদুল্লাহ তাঁর বর্ম খুলে পাজামা পরলেন এবং একথা বলতে বলতে হারাম শরীফের দিকে যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন : মা, আমার জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না– আমার নিহত হওয়ার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়।

– আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে আমি কখনো ভুলবো না। কেউ অসত্যের উপর যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমার এ যুদ্ধ সত্যের জন্য। তারপর তিনি দু'টি হাত আকাশের দিকে তুলে দু'আ করলেন : হে আল্লাহ, রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন থাকে তখন রাত জেগে জেগে তার দীর্ঘ ইবাদাত ও উচ্চকণ্ঠে কান্নার জন্য আপনি তার উপর রহম করুন। হে আল্লাহ, রোযা অবস্থায় মক্কা ও মদীনাতে মধ্যাহ্নকালীন ক্ষুধা ও পিপাসার জন্য তার উপর দয়া করুন। হে আল্লাহ! পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের জন্য তার প্রতি আপনি করুণা বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ, আমি তাকে আপনারই নিকট সোপর্দ করেছি। তার জন্য আপনি যে ফয়সালা করবেন তাতেই আমি রাযী। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের প্রতিদান দান করুন।

মা হযরত আসমার (রা) কথাগুলো হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) অন্তরে প্রশান্তি বয়ে আনে। তিনি চলে যান এবং অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে যুদ্ধ করে শহীদ হন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখ থেকে নিম্নের চরণ দু'টি উচ্চারিত হচ্ছিল :[৬০]

أَسْمَاءُ إِنْ قُتِلْتُ لاَتَبْكِيْنِى + لَمْ يَبْقِ إِلاَّ حَسَبِى وَدِيْنِى

وَصَارِمٌ لاَنَتْ بِهِ يَمِيْنِى

'আমার মা আসমা'! আমি নিহত হলে আমার জন্য কাঁদবেন না। আমার আভিজাত্য ও আমার দীনদারী ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আর অবশিষ্ট আছে একখানি ধারালো তরবারি যা দিয়ে আঘাত করতে করতে আমার ডান হাত দুর্বল হয়ে গেছে।'

সে দিন সূর্য অস্ত যাবার আগেই হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁর মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হন। হত্যার পর হাজ্জাজ তার লাশ ঝুলিয়ে রেখেছিল। দাসীকে সংগে করে মা আসমা' (রা) এলেন ছেলের লাশ দেখতে। দেখলেন, নীচের দিকে মুখ করে লাশ ঝুলানো রয়েছে। লাশের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ়ভাবে বললেন : 'ইসলামের এ অশ্বারোহীর এখনো কি অশ্বের পিঠ থেকে নামার সময় হলো না?' জনতার ভিড় কমানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য হাজ্জাজ লোক পাঠায়। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। সে আবারো লোক মারফত বলে পাঠায়, এবার না এলে চুলের গোছা ধরে টেনে আনা হবে। হযরত আসমা (রা) হাজ্জাজের ভয়ে ভীত হলেন না। তার ধমকে মোটেই কান দিলেন না।

---

৬০. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৭৪; বানাত আস-সাহাবা-৭০

সত্য উচ্চারণ ছিল হযরত আসমার (রা) চরিত্রের উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য। হাজ্জাজের মত নরঘাতক অত্যাচারীর সামনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে সত্য উচ্চারণ করেছেন। তার সামনা সামনি দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তার অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) শাহাদাতের পর হাজ্জাজ হযরত আসমার (রা) নিকট এসে বলে : আপনার ছেলে আল্লাহর ঘরে ধর্ম বিরোধী কাজ করেছে ও নাস্তিকতা প্রচার করেছে। তাই আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন।

দৃঢ় কণ্ঠে আসমা' (রা) জবাব দেন : তুমি মিথ্যাবাদী, আমার ছেলে নাস্তিক ছিল না। সে ছিল সাওম পালনকারী, রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাতকারী, অত্যন্ত আল্লাহভীরু, অত্যধিক ইবাদাতকারী, পিতামাতার অনুগত ও বাধ্য সন্তান। তবে আমি নবী কারীমের (সা) মুখ থেকে শুনেছি, ছাকীফ বংশে একজন মিথ্যাবাদী ভণ্ড এবং একজন যালিম পয়দা হবে। মিথ্যাবাদী (আল-মুখতার আছ-ছাকাফী)-কে তো আগেই দেখেছি। আর যালিম, সে তুমিই– যাকে আমি এখন দেখছি। হযরত আসমার (রা) একথা শুনে হাজ্জাজ ভীষণ উত্তেজিত হয় এবং বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু কোন কিছু বলার সাহস হারিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।[৬১]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। হাজ্জাজ আসমাকে (রা) লক্ষ্য করে বলে : বলুন তো আমি আল্লাহর দুশমন 'আবদুল্লাহর সাথে কেমন ব্যবহার করেছি? আসমা' জবাব দেন : তুমি তার দুনিয়া নষ্ট করেছো, আর সে নষ্ট করেছে তোমার আখিরাত। আমি শুনেছি তুমি নাকি তাকে 'যাতুন নিতাকাইন' তনয় বলে ঠাট্টা করেছো। আল্লাহর কসম, আমিই 'যাতুন নিতাকাইন'। আমি একটি নিতাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকরের (রা) খাবার বেঁধেছি। আরেকটি নিতাক আমার কোমরেই আছে।[৬২] একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জাজ আসমার (রা) নিকট এসে বলে : মা, আমীরুল মু'মিনীন আপনার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? আসমা' (রা) অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেন : আমি তোমার মা নই। আমি রাস্তার মাথায় শূলীতে ঝোলানো ব্যক্তির মা। আমার কোন প্রয়োজন নেই।[৬৩]

হযরত 'আবদুল্লাহর (রা) শাহাদাতের পর একদিন হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমারকে (রা) বলা হলো : আসমা' (রা) মসজিদের এক কোণে বসে আছেন। তিনি তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে বললেন : এই প্রাণহীন দেহ কিছুই না। রূহ তো আল্লাহর নিকট পৌঁছে গেছে। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং ধৈর্য অবলম্বন করুন। আসমা' বললেন : আমাকে তা করতে কিসে বারণ করেছে? নবী ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়ার (আ) মাথাও বনী ইসরাঈলের এক পতিতাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল।[৬৪]

---

৬১. সাহীহ মুসলিম, ফাদায়িল আস-সাহাবা, হাদীছ নং-২৫৪৫; তাবাকাত-৮/২৫৪; মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৫১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৬

৬২. তাবাকাত-৮/২৫৪; তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-৩/১৩৬

৬৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৪

৬৪. প্রাগুক্ত-২/২৯৫; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৩০

উল্লেখ্য যে, ফিলিস্তীনের শাসক হিরোডিয়ান তার ফুফু হিরোডাসকে বিয়ে করতে চাইলে ইয়াহইয়া বাধ সাধেন। কারণ, তাঁদের ধর্মে ফুফু-ভাতিজার বিয়ে সিদ্ধ ছিল না। কিন্তু কন্যা হিরোডাস ও তার মার সম্মতি ছিল। তারা হিরোডিয়ানকে শর্ত দিল, যদি তুমি ইয়াহইয়ার মাথাটি কেটে একটি থালায় করে আমার সামনে আনতে পার তাহলে এ বিয়ে হবে। সে তাই করেছিল। হযরত আসমা' (রা) উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৬৫]

হযরত আবদুল্লাহর (রা) লাশ কয়েক দিন যাবত ঝোলানো অবস্থায় থাকার পর আবদুল্লাহ ইবন মারওয়ানের নির্দেশে নামানো হয়। ছেলের লাশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকার সময় হযরত আসমা' (রা) আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন এই বলে যে, হে আল্লাহ! আবদুল্লাহর গোসল দেওয়া ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থার না করে যেন আমার মৃত্যু না হয়। লাশ নামানোর পর আসমা' (রা) তা চেয়ে এনে অতিকষ্টে যমযমের পানি দিয়ে গোসল দেন।[৬৬] মাংস পঁচে-গলে গিয়েছিল। আসমা (রা) নিজের ছেলের এ অবস্থা দেখেও মোটেই ভেঙ্গে পড়েননি। ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

ইবন মুলাইকা বলেন : গোসলের দায়িত্ব যাদের উপর পড়েছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা একটি অংগ ধরছিলাম, আর আমাদের হাতের সাথে চলে আসছিল। সেটি ধুয়ে আমরা কাফনের উপর রেখে আরেকটি অংগ ধরছিলাম। এভাবে আমরা তাঁর গোসল সম্পন্ন করি। তারপর তাঁর মা আসমা' দাড়িয়ে জানাযার নামায পড়েন। মক্কার আল-মু'আল্লাত গোরস্তানে তাঁকে দাফন করেন।[৬৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) হিজরী ৭৩ সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসের ১৭ তারিখ মঙ্গলবার শাহাদাত বরণ করেন। এর কয়েকদিন পরে হিজরী ৭৩ সনে মক্কায় হযরত আসমা'ও (রা) ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একশো বছর। মুহাজির পুরুষ ও মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৮] এ দীর্ঘ জীবনে তাঁর একটি দাঁতও পড়েনি বা সামান্য বুদ্ধিভ্রষ্টতাও দেখা যায়নি। মক্কায় তাঁর ছেলে আবদুল্লাহর (রা) পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৬৯]

মৃত্যুর পূর্বে তিনি এই বলে অসীয়াত করে যান যে, তোমরা আমার পরিধেয় বস্ত্র সুগন্ধি কাঠ জ্বালিয়ে তাতে সেঁক দেবে, তারপর আমার দেহে খোশবু লাগাবে। আমার কাফনের কাপড়ে কোন সুগন্ধি লাগাবে না, আগুন নিয়ে লাশের অনুসরণ করবে না এবং আমাকে রাতের বেলা দাফন করবে না।[৭০]

---

৬৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৯৫; টীকা-১; কাসাসুল আম্বিয়া-৩৬৯

৬৬. যাদুল মা'আদ-১/১৪০; তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম-১/৫০৩; আল-ফাকিহী বলেন : বরকত হিসেবে মক্কাবাসীরা তাদের মৃতদের যমযমের পানি দিয়ে গোসল করাতো। (নিসা' মুবাশ্শারাত ফিল জান্নাহ্-২৬৬

৬৭. আ'লাম আন-নিসা'-১/৫২; বানাত আস-সাহাবা-৭১

৬৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৯৬; আ'লাম আন-নিসা-১/৫২, ৫৩

৬৯. বানাত আস-সাহাবা-৭২

৭০. তাহ্যীব-আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৫৯৮

উম্মু সুলাইম বিন্‌ত মিলহান (রা)

ডাক নাম উম্মু সুলাইম। আসল নামের ব্যাপারে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। যথা: সাহলা, রুমাইলা, মুলাইকা, আল-গুমাইসা' ও আর-রুমাইসা'। বানু নাজ্জারের প্রখ্যাত মহিলা আনসারী সাহাবী। প্রখ্যাত সাহাবী ও রাসূলুল্লাহর (সা) অতি স্নেহের খাদেম হযরত আনাসের গর্বিত মা। পিতার নাম মিলহান ইবন খালিদ এবং মাতার নাম মুলাইকা বিন্‌তে মালিক ইবন 'আদী ইবন যায়দ ইবন মানাত। অন্য একটি বর্ণনায় 'উনাইকা' বলা হয়েছে।[১] ঐতিহাসিক বীরে মা'উনার ঘটনায় শাহাদাত প্রাপ্ত অন্যতম সাহাবী হযরত হারাম ইবন মিলহান তাঁর ভাই।[২] ইতিহাসে তিনি উম্মু সুলাইম নামে প্রসিদ্ধ।

জাহিলী যুগে প্রথম জীবনে তিনি মালিক ইবন নাদারকে বিয়ে করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের দশ বছর পূর্বে তারই ঔরসে পুত্র আনাসের জন্ম হয়। আনসারদের মধ্যে যাঁরা প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর স্বামী মালিক তাঁকে ও তাঁর সন্তানকে ফেলে দেশান্তরী হয়।[৩]

এ সম্পর্কে আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। উম্মু সুলাইম একদিন স্বামী মালিকের নিকট এসে বললেন : আজ আমি এমন একটি খবর নিয়ে এসেছি যা তোমার পছন্দ নয়। মালিক বললেন : তুমি তো সব সময় এই বেদুঈনের কাছ থেকে আমার অপছন্দনীয় বার্তাই এনে থাক। স্বামীর কথার প্রতিবাদ করে তিনি বললেন : হাঁ, তিনি বেদুঈন, তবে আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করে নবী বানিয়েছেন। মালিক জানতে চাইলো : তা আজ কী খবর আনলে, শুনি। বললেন : মদ হারাম ঘোষিত হয়েছে। মালিক বললো : তোমার ও আমার সম্পর্ক এখানেই শেষ হলো। তারপর সে ঘর-সংসার ও স্ত্রী পুত্র সবকিছু ছেড়ে শামে চলে যায় এবং সেখানেই পৌত্তলিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।[৪]

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় মালিকের সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার অনেক পরে যখন মদ হারাম হয়। পক্ষান্তরে হযরত আবু তালহার (রা) সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে যত বর্ণনা এসেছে, সেগুলি দ্বারা বুঝা যায় রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগেই তিনি আবু তালহাকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। আবার এমন বর্ণনাও দেখা যায় যে, মদীনায় খোদ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতেই আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারপরই উম্মু সুলাইম তাঁকে বিয়ে করেন। এমনি

---

১. আল-ইসাবা-৪/৪৬১, ৪৬২, তাবাকাত-৩/৫০৪
২. হায়াতুস সাহাব (আরবী)-১/৫২৮
৩. আল-ইসাবা-৪/৪৬১
৪. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯০; আল-ইসাবা-৪/৪৬১; তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৫

ধরনের নানাবিধ বর্ণনা দেখা যায়। তবে একথা স্বীকৃত যে রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আসার আগেই উম্মু সুলাইম ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নে আবু তালহার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কিত দুই একটি বর্ণনা তুলে ধরছি। আনাস থেকে বর্ণিত। আবু তালহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উম্মু সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জবাবে উম্মু সুলাইম বলেন : আবু তালহা, আপনি কি জানেন না, যে ইলাহ্‌র ইবাদাত আপনি করেন তা মাটি দ্বারা তৈরী? তিনি বললেন : তা ঠিক। উম্মু সুলাইম আবার বললেন : একটি গাছের পূজা করতে আপনার লজ্জা হয় না? আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আপনার সাথে বিয়েতে আমার আপত্তি থাকবে না। আর সে ক্ষেত্রে আপনার ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মোহরের দাবীও আমার থাকবে না। 'বিষয়টি আমি ভেবে দেখবো'– একথা বলে আবু তালহা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে পাঠ করলেন ঃ 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ'।

অতঃপর উম্মু সুলাইম ছেলে আনাসকে ডেকে বললেন : আনাস! আবু তালহার বিয়ের ব্যবস্থা কর। আনাস তাঁর মাকে আবু তালহার সাথে বিয়ে দিলেন। ঘটনাটি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৫]

অন্য একটি বর্ণনা এসেছে, আনাস বললেন : আবু তালহা বিয়ের প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম তাঁকে বললেন : আমি এ ব্যক্তির ওপর ঈমান এনেছি এবং ঘোষণা দিয়েছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার অনুসারী হলে আপনাকে বিয়ে করতে পারি। আবু তালহা বললেন : বেশ তো, তোমার ধর্ম আমিও গ্রহণ করলাম। এরপর উম্মু সুলাইম তাঁকে বিয়ে করেন। আবু তালহার ইসলামই ছিল এ বিয়ের মোহর। এ সনদে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু তালহা প্রস্তাব দিলে উম্মু সুলাইম বললেন : আনাস বালেগ হয়ে বিভিন্ন মজলিসে বসার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় বিয়ে করবো না। আনাস বলেন, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে মাকে প্রতিদান দিন। তিনি আমাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করেছেন। উম্মু সুলাইমের কথা শুনে আবু তালহা বললেন : আনাস তো মজলিসে বসেছে এবং কথাও বলেছে। অতঃপর আনাস তাঁর মাকে বিয়ে দেন।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, উম্মু সুলাইম বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আবু তালহা তাঁকে বললেন : আল্লাহর কসম, এ হয়তো তোমার মনের কথা নয়। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন : তোমার ইচ্ছা, সোনা-রূপা পাওয়া? উম্মু সুলাইম তখন বললেন : আমি আপনাকে ও আল্লাহর নবীকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে আপনার ইসলামের বিনিময়েই আমি বিয়েতে রাজী আছি। একথা শুনে আবু তালহা বললেন : এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে কে? উম্মু সুলাইম ছেলে আনাসকে বললেন : আনাস, তুমি তোমার চাচার সাথে যাও। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আনাস বলেন : আবু তালহা আমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং এ অবস্থায় আমরা চললাম। যখন আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকটবর্তী হলাম, তিনি আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বলে

---

৫. হায়াতুস সাহাবা-১/১৯৬; আল-ইসাবা-৪/৪৬১; তাবাকাত-৩/৫০৪; তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৫

ওঠেন : এই যে আবু তালহা, তার দু'চোখের মাঝখানে তো ইসলামের সম্মান ও গৌরব দীপ্তিমান। আবু তালহা নবীকে (সা) সালাম দিয়ে বললেন : আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু। অতঃপর ইসলামের বিনিময়েই রাসূল (সা) তাঁকে উম্মু সুলাইমের সাথে বিয়ে দেন।

উম্মু সুলাইমের প্রথম স্বামীর পক্ষে আনাস এবং দ্বিতীয় স্বামী হযরত আবু তালহার পক্ষে দু'ছেলে (১) আবু 'উমাইর ও (২) 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। আবু 'উমাইর শৈশবে মারা যায়। অপর দু'জনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়।

আবু 'উমাইরের মৃত্যুতে উম্মু সুলাইম যে ধৈর্য অবলম্বন করেন তা মানব জাতির জন্য শিক্ষণীয়। আবূ 'উমাইর যখন মারা যায় তখন সে কেবল হাঁটতে শিখেছে। ছোট ছোট পা ফেলে যখন সে হাঁটে বাবা-মা অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন। এমন সময় আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন। ছেলেটি আবু তালহার খুব আদরের ছিল।

অসুস্থ ছেলেকে ঘরে রেখে আবু তালহা কোন কাজে বাইরে গেছেন। এর মধ্যে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। মা উম্মু সুলাইম বাড়ীর অন্য লোকদের বলে রাখলেন, আবু তালহা ফিরে এলে কেউ যেন তাঁকে ছেলের মৃত্যুর খবরটি না দেয়। আবু তালহা ঘরে ফিরে এসে অসুস্থ ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। উম্মু সুলাইম বললেন : যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। স্ত্রীর কথায় আবু তালহা মনে করলেন, ছেলে ভালো আছে। তিনি যথারীতি পানাহার সেরে বিছানায় গেলেন। উম্মু সুলাইমও কাজ সেরে সেজে-গুজে সুগন্ধি লাগিয়ে বিছানায় গেলেন। স্বামী-স্ত্রী গভীর সান্নিধ্যে আসলেন। এরপর উম্মু সুলাইম স্বামীকে ছেলের মৃত্যুর খবর এভাবে দেন : আবু তালহা, যদি কেউ আপনার নিকট কোন জিনিস গচ্ছিত রাখে এবং পরে তা ফেরত নিতে আসে তখন কি তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন? আবু তালহা বললেন : 'কক্ষণো না'। উম্মু সুলাইম বললেন : তাহলে বলছি, ছেলের ব্যাপারে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আবু তালহা জানতে চাইলেন : সে এখন কোথায়? বললেন : এই যে গোপন কুঠরীতে। আবু তালহা সেখানে ঢুকে মুখের কাপড় উঠিয়ে ইন্না লিল্লাহ পাঠ করেন। অন্য একটি বর্ণনা মতে, আবু তালহা ফিরে আসার আগেই উম্মু সুলাইম মৃত ছেলেকে দাফন করে দেন।

এরপর আবু তালহা রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে উপস্থিত হয়ে ছেলের মৃত্যু এবং উম্মু সুলাইমের আচরণের কথা তাঁকে বলেন। রাসূল (সা) সবকিছু শুনে মন্তব্য করেন : আল্লাহ তায়ালা আজকের রাতটি তোমাদের জন্য বরকতময় করেছেন। যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ! আল্লাহ তার রিহমে (গর্ভে) একটি 'জিকর' নিক্ষেপ করেছেন। এ কারণে সে তার ছেলের মৃত্যুতে এত কঠিন ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে।[৭] এ রাতে তাঁদের মিলনে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। তিনিই 'আবদুল্লাহ

---

৬. আল-ইসাবা-৪/৪৬১; দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৩য় খণ্ড)-১১১

৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯০; মুসলিম-২/৩৪২; আল-ইসাবা-৪/৪৬১

ইবন তালহা। আল্লাহ তাঁকে অনেক সন্তান-সন্ততি দান করেন।[৮] অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) সেদিন এই দম্পতির জন্য এই বলে দু'আ করেছিলেন : 'হে আল্লাহ, এ দু'জনের এ রাতটির মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দিন।'

অতঃপর উম্মু সুলাইম সন্তান প্রসব করলেন। রাসূল (সা) এ খবর পেয়ে আনাসকে বলেন : তোমার মায়ের কাছে যেয়ে বল, সন্তানের নাড়ি কাটার পর আমার কাছে না পাঠিয়ে তার মুখে যেন কিছুই না দেয়। আনাস বলেন : আমার মা ছেলেকে আমার হাতে তুলে দেন এবং আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে এনে রাখি। তারপর রাসূল (সা) আনাসকে তিনটি 'আজওয়া খেজুর আনতে বলেন। আনাস তা নিয়ে এলে তিনি সেগুলির আঁটি ফেলে দিয়ে নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ভালো করে চিবান। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করে কিছু তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। শিশুটি মুখ নেড়ে চুষতে থাকে। তা দেখে রাসূল (সা) মন্তব্য করেন : 'আমার আনসাররা খেজুর পছন্দ করে'। তারপর শিশুটিকে আনাসের হাতে দিয়ে বলেন : তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। রাসূল (সা) শিশুটির নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। তিনি এই বলে শিশুটির জন্য দু'আও করেন যে, আল্লাহ তাকে নেককার মুত্তাকী করুন। আনসারদের এক ব্যক্তি বলেন : আমি এ 'আবদুল্লাহর নয় সন্তানকে দেখেছি, তারা সবাই কুরআনের এক একজন বড় কারী।[৯]

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পরপরই উম্মু সুলাইম ছোট্ট ছেলে আনাসের হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বলেন :'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই থাকলো আনাস। সে আপনার খিদমত করবে'। আনাস তখন দশ বছরের বালক মাত্র। তখন থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাত পর্যন্ত আনাস তাঁর খিদমত করেন। এ কারণে তিনি 'খাদিমুন নাবী (সা)' খ্যাতি অর্জন করেন।[১০] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরও 'আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার জন্য একটু দু'আ করুন। রাসূল (সা) তার জন্য দু'আও করেন।[১১]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, একটি বর্ণনা মতে সে বৈঠকটি হয়েছিল উম্মু সুলাইমের বাড়ীতে। হযরত উম্মু সুলাইম অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বড় বড় যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে শরীক হয়েছেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে উম্মু সুলাইম ও অন্য কতিপয় আনসারী মহিলাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তাঁরা সৈনিকদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা করতেন।[১২] তিরমিযীও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় হয় তখনও তিনি অতি সাহসিকতার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। আনাস (রা) বলেন : আমি 'আয়িশা ও উম্মু সুলাইমকে মশক ভরে পানি এনে

---

৮. আল-ইসাবা-৪/৪৬১; দ্রঃ আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (৩য় খণ্ড)-১১৫

৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৫৯০-৫৯১; তারীখে ইবন 'আসাকির-৬/৬

১০. আল-ইসাবা-৪/৪৬২

১১. মুসলিম-২/৯৪৪; বুখারী-২/৩০২

১২. মুসলিম-২/১০৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯২-৫৯৩

আহতদের পান করাতে দেখেছি। মশক খালি হয়ে গেলে তারা আবার ভরে এনে পান করিয়েছেন।[১৩]

হিজরী ৭ম সনে খাইবার যুদ্ধেও তিনি যান। খাইবারে অথবা খাইবার থেকে ফেরার পথে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে হযরত সাফিয়্যার (রা) শাদী মুবারক ও বাসর অনুষ্ঠিত হয়। তিনিই হযরত সাফিয়্যাকে চুল বেঁধে সাজ-গোজ করিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থাপন করেন।[১৪]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকর (রা) থেকে বর্ণিত। হুনাইন যুদ্ধে উম্মু সুলাইম খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এক সময় যুদ্ধের মধ্যে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নজরে পড়লেন। তিনি তখন কোমরে চাদর পেঁচিয়ে স্বামী আবু তালহার পাশে দাঁড়িয়ে। 'আবদুল্লাহ ইবন আবী তালহা তখন তাঁর পেটে। তাঁর সাথে আবু তালহার উট। উটটি বশে আনার জন্য তারা মাথার কেশ ও লাগামের মধ্যে হাত দিয়ে রেখেছেন। রাসূল (সা) ডাকলেন : উম্মু সুলাইম? তিনি সাড়া দিলেন : হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনার বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে, আপনি যেভাবে তাদের হত্যা করছেন, আমিও ঠিক সেভাবে যারা আপনাকে ছেড়ে রণক্ষেত্র থেকে পালাবে তাদের হত্যা করবো। কারণ, তারা হত্যারই উপযুক্ত। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন : উম্মু সুলাইম! আল্লাহ কি এ ব্যাপারে যথেষ্ট নন? উম্মু সুলাইমের হাতে তখন একটি খঞ্জর। সেদিকে ইঙ্গিত করে আবু তালহা বললেন : উম্মু সুলাইম তোমার হাতে এ খঞ্জর কেন? বললেন : কোন মুশরিক (পৌত্তলিক) আমার নাগালের মধ্যে এলে এ খঞ্জর দিয়ে আমি তার পেট ফেঁড়ে ফেলবো। এ কথা শুনে আবু তালহা বললেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ! উম্মু সুলাইম আর-রুমাইসা' যা বলছে তাকি শুনেছেন! এতে রাসূল (সা) মৃদু হেসে দেন।[১৫]

হিজরী ৫ম সনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাবের (রা) বিয়ে হয়। এ উপলক্ষে উম্মু সুলাইম নিজ হাতে অতি সুন্দর কারুকাজ করা পশমী পোশাক তৈরী করে ছেলে আনাসের হাতে পাঠিয়ে দেন। রাসূল (সা) যেন তার এ ছোট্ট উপহার গ্রহণ করেন– এ কথাটি বলার জন্যও তিনি আনাসকে তাকীদ দেন।[১৬]

হযরত উম্মু সুলাইম মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) জন্য খাদ্য তৈরী করে পাঠাতেন। নিজের বাড়ীতে ভালো কিছু তৈরী হলে তার কিছু রাসূলুল্লাহর (সা) জন্যও পাঠাতেন। আবু হাতেম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহর (সা) কোন এক স্ত্রীর সাথে প্রথম মিলন উপলক্ষে উম্মু সুলাইম 'হাইস' (খেজুর, আকিত ও চর্বি দ্বারা তৈরী) নামক এক প্রকার খাবার তৈরী করে পিতল বা কাঠের পাত্রে ঢালেন। তারপর ছেলে আনাসকে ডেকে বলেন : এটা

---

১৩. বুখারী-কিতাবুল মাগাযী-২/৫৮১

১৪. সহীহ মুসলিম-১/৫৪৬; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪০; আল-ইসাবা-৪/৪৬২

১৫. মুসলিম-২/১০৩; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৪৪৬; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭; আল-ইসাবা-৪/৪৬১

১৬. মুসলিম-১/৫৫০

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বলবে, আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া। আনাস বলেন : মানুষ সে সময় দারুণ অন্ন কষ্টে ছিল। আমি পাত্রটি নিয়ে যেয়ে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা উম্মু সুলাইম আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালামও পেশ করেছেন এবং বলেছেন, এ হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে সামান্য হাদিয়া। রাসূল (সা) পাত্রটির দিকে তাকিয়ে বললেন : ওটা ঘরের এক কোণে রাখ এবং অমুক অমুককে ডেকে আন। তিনি অনেক লোকের নাম বললেন। তাছাড়া আরও বললেন : পথে যে মুসলমানের সাথে দেখা হবে, সাথে নিয়ে আসবে। আনাস বলেন : যাদের নাম তিনি বললেন তাদেরকে তো দাওয়াত দিলাম। আর পথে আমার সাথে যে মুসলমানের দেখা হলো তাদের সকলকেও দাওয়াত দিলাম। আমি ফিরে এসে দেখি রাসূলুল্লাহর (সা) গোটা বাড়ী, সুফ্ফা ও হুজরা— সবই লোকে লোকারণ্য।

বর্ণনাকারী আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন : তা কত লোক হবে? বললেন : প্রায় তিন শো। আনাস বলেন : রাসূল (সা) আমাকে খাবার পাত্রটি আনতে বললেন। আমি কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তার ওপর হাত রেখে দু'আ করলেন। তারপর বললেন : তোমরা দশজন দশজন করে বসবে, বিসমিল্লাহ বলবে এবং প্রত্যেকে নিজের পাশ থেকে খাবে। রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মত সবাই পেট ভরে খেলো। তারপর তিনি আমাকে বললেন : পাত্রটি উঠাও। আনাস বলেন : আমি এগিয়ে এসে পাত্রটি উঠালাম। তার মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু আমি বলতে পারবো না, যখন রেখেছিলাম তখন বেশী ছিল না যখন উঠালাম।[১৭]

অন্য একটি ঘটনা আনাস তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মার একটি ছাগী ছিল। তার দুধ থেকে ঘি তৈরী করে একটি চামড়ার পাত্রে ভরেন। একদিন পাত্রটি রাবীবার হাতে দিয়ে বলেন, এটা রাসূলাল্লাহকে (সা) দিয়ে এসো, তিনি তরকারি হিসেবে খাবেন। রাবীবা সেটি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক উক্কা বা পাত্র ঘি উম্মু সুলাইম পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) লোকদের বললেন, তোমরা ঘি ঢেলে রেখে পাত্রটি তাঁকে ফেরত দাও। খালি পাত্রটি তাঁকে ফেরত দেওয়া হলো। তিনি পাত্রটি নিয়ে ফিরে এসে দেখেন উম্মু সুলাইম বাড়ীতে নেই। তিনি পাত্রটি একটি খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। উম্মু সুলাইম বাড়ী এসে দেখেন পাত্রটি হতে ঘি উপচে পড়ছে। তিনি বললেন : রাবীবা, আমি কি তোমাকে এটা রাসূলুল্লাহকে (সা) দিয়ে আসতে বলিনি? রাবীবা বললেন : আমি তো আপনার কথা পালন করেছি। যদি বিশ্বাস না হয় আমার সাথে চলুন, রাসূলুল্লাহকে (সা) জিজ্ঞেস করুন। উম্মু সুলাইম রাবীবাকে সাথে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এর মাধ্যমে এক পাত্র ঘি পাঠিয়েছিলাম। রাসূল (সা) বললেন: হাঁ, সে তা দিয়েছে। উম্মু সুলাইম তখন বললেন : যিনি আপনাকে সত্য এবং সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন, সে সত্তার শপথ। পাত্রটি তো এখনও ঘি-ভরা এবং তা উপচে পড়ছে। একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন : উম্মু সুলাইম!

---

১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬০-৬৬১

আল্লাহ তোমাকে খাওয়ান যেভাবে তুমি তাঁর নবীকে খাইয়েছো, এতে কি তুমি বিস্মিত হচ্ছো? নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। উম্মু সুলাইম বলেন : আমি বাড়ী ফিরে এসে তা কয়েকটি গ্লাসে ভাগ করে রাখলাম এবং এক অথবা দু'মাস যাবত আমরা তা খেয়েছি।[১৮]

ইমাম মুসলিম আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেন : একদিন আবু তালহা আমার মা উম্মু সুলাইমকে বললেন, আজ আমি যেন রাসূলুল্লাহর (সা) কণ্ঠস্বর একটু দুর্বল শুনতে পেলাম। মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? মা বললেন : আছে। তিনি কয়েক টুকরো রুটি আমার কাপড়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠালেন। আমাকে দেখেই রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : আবু তালহা পাঠিয়েছে? বললাম : হাঁ। বললেন : খাবার? বললাম : হাঁ। রাসূল (সা) সাথের লোকদের বললেন : তোমরা ওঠো। তাঁরা উঠলেন এবং আমি তাঁদের আগে আগে চললাম। আবু তালহা সকলকে দেখে স্ত্রীকে ডেকে বললেন : উম্মু সুলাইম, দেখ, রাসূল (সা) লোকজন সংগে করে চলে এসেছেন। সবাইকে খেতে দেওয়ার মত খাবার তো নেই। উম্মু সুলাইম বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সে কথা ভালোই জানেন। আবু তালহা অতিথিদের নিয়ে বসালেন। রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে বললেন : যা আছে নিয়ে এসো। সামান্য খাবার ছিল তাই হাজির করা হলো। তিনি বললেন : প্রথমে দশজনকে আসতে বল। দশজন ঢুকে পেট ভরে খেয়ে বের হয়ে গেল। তারপর আর দশজন। এভাবে মোট সত্তর অথবা আশিজন লোক পেট ভরে সেই খাবার খেয়েছিল।[১৯]

তিনি নবী কারীমকে (সা) সীমাহীন ভালোবাসতেন। নবী কারীমও (সা) প্রায়ই উম্মু সুলাইমের গৃহে যেতেন এবং দুপুরে সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এ সুযোগে উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহর (সা) ঘাম ও ঝরে পড়া লোম সংগ্রহ করতেন।[২০]

আনাস (রা) বলেন : একদিন দুপুরে রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম নিলেন এবং ঘেমে গেলেন। আমার মা একটি বোতল এনে সেই ঘাম ভরতে লাগলেন। রাসূল (সা) জেগে উঠে বললেন : উম্মু সুলাইম, একি করছো? মা বললেন : আপনার এ ঘাম আমাদের জন্য সুগন্ধি। আনাস বলতেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) ঘামের সুগন্ধি থেকে অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত মিশ্‌ক অথবা আম্বর আমার জীবনে আর শুকিনি।[২১] আনাস আরও বলেন : আমার মা উম্মু সুলাইমের আবু তালহার পক্ষের আবু 'উমাইর নামে একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। রাসূল (সা) আমাদের বাড়ীতে এলে তার সাথে একটু রসিকতা করতেন। একদিন দেখলেন আবু 'উমাইর মুখ ভার করে বসে আছে। রাসূল (সা) বললেন : আবু 'উমাইর, এমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন? মা বললেন : তার খেলার সাথী 'নুগাইর'টি মারা গেছে। তখন থেকে রাসূল (সা) তাঁকে দেখলে কাব্যি করে বলতেন :

---

১৮. আল-বিদায়া-৬/১০২; হায়াতুস সাহাবা-২/৬৩৫

১৯. বুখারী-২/৩৪২; মুসলিম-২/১৭৮; আল-বিদায়া-৯/১০৫; হায়াতুস সাহাবা-২/১৯৩-১৯৪

২০. বুখারী-২/৯২৯

২১. তারীখে ইবন 'আসাকির-৩/১৪৪,১৪৫

'ইয়া আবা 'উমাইর, মা ফা'য়ালান নুগাইর'– ওহে আবু 'উমাইর, তোমার নুগাইরটি কি করলো? উল্লেখ্য যে, 'নুগাইর' লাল ঠোঁট বিশিষ্ট চড়ুই-এর মত এক প্রকার ছোট্ট পাখী।[২২]

আনাস (রা) বলেন : রাসূল (সা) তাঁর সহধর্মিনীদের ঘর ছাড়া একমাত্র উম্মু সুলাইমের ঘরে যেভাবে গেছেন সেভাবে আর কোথাও যাননি। একবার রাসূলকে (সা) এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তার প্রতি আমার দয়া হয়। তার বাবা ও ভাই আমার সাথে থেকে শহীদ হয়েছে।[২৩] ইবন হাজার বলেন : উম্মু হারাম ও তাঁর বোন উম্মু সুলাইমের গৃহে রাসূলুল্লাহর (সা) প্রবেশের উত্তর হলো, তারা দু'জন একই বাড়ীতে থাকতেন এবং উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে যেতেন।[২৪]

উম্মু সুলাইম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা) খালা হতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতু 'আমর-এর নসব 'আমির ইবন গানাম-এ গিয়ে আনাসের মার বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।[২৫] তিনি অন্তর দিয়ে রাসূলকে (সা) ভালোবাসতেন, ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। আর রাসূলও (সা) তাঁর কথা কখনও বিস্মৃত হননি। এই সম্মানিত মহিলাকে রাসূল (সা) জান্নাতের সুসংবাদও দান করেছেন।[২৬]

হযরত উম্মু সুলাইমের সম্মান ও মর্যাদা অনেক। রাসূল (সা) বলেছেন : আমি জান্নাতে যেয়ে এক মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। জানতে চাই এ মহিলা কে? আমাকে জানানো হয়, আনাসের মা গুমাইসা বিন্‌তু মিলহান।[২৭]

হযরত উম্মু সুলাইম রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবন মালিক, ইবন 'আব্বাস, যায়দ ইবন ছাবিত, আবু সালামা ইবন 'আবদির রহমান ও আরও অনেক সাহাবী তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। জনসাধারণ তাঁর কাছে জরুরী দীনী মাসায়িল জিজ্ঞেস করতো। একবার হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস এবং হযরত যায়দ ইবন ছাবিতের মধ্যে একটি বিবাদ দেখা দিলে তাঁরা উভয়ে তাঁকেই বিচারক মানেন।[২৮]

তিনি কোন দীনী বিষয় জানার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সা) প্রশ্ন করতে লজ্জা পেতেন না। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন : আনসারদের মেয়েরা কত ভালো। দীনী বিষয়ে প্রশ্ন করতে এবং দীনকে জানার ব্যাপারে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখতে পারেনা। ইমাম আহমাদ উম্মু সুলাইম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) স্ত্রী উম্মু সালামার পাশাপাশি ছিলাম। আমি প্রশ্ন করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মহিলা যদি ঘুমের মধ্যে দেখে যে তার স্বামী তার সাথে সহবাস করছে, তাহলে তাকে কি গোসল করতে হবে?

---

২২. প্রাগুক্ত ৩/১৩৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৫৭০, ৫৭১; তাবাকাত-৩/৫০৬
২৩. মুসলিম-২/৩৪১; আল-ইসাবা-৪/৪৬১
২৪. আল-ইসাবা-৪/৪৬১
২৫. উসুদুল গাবা-১/১২৭; আসাহহুস সীয়ার-৬০৬
২৬. দায়িরা-ই-মা'য়ারিফ-ই-ইসরলামিয়্যা (উর্দু)-৩/৪০২
২৭. মুসলিম-২/৩৪২
২৮. মুসনাদ-৬/৪৩১; আল-ইসাবা-৪/৪৬২

প্রশ্ন শুনে উম্মু সালামা বলে উঠলেন : উম্মু সুলাইম, তোমার দু'হাত ধুলিমলিন হোক! রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে গোটা নারীকুলকে তুমি লজ্জা দিলে। উত্তরে উম্মু সুলাইম বললেন : সত্য প্রকাশে আল্লাহ লজ্জা পাননা। কোন সমস্যার ব্যাপারে অন্ধকারে থাকার চেয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট জিজ্ঞেস করাই উত্তম। উত্তরে রাসূল (সা) বললেন : উম্মু সুলাইম! তোমার দু'হাত ধুলিমলিন হোক। তার ওপর গোসল ফরজ হবে, যদি সে ঘুম থেকে জেগে পানি দেখতে পায়। উম্মু সুলাইম আবার প্রশ্ন করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েদেরও কি পানি আছে? নবী (সা) বললেন : যদি পানিই না থাকবে তাহলে সন্তান তার মত হয় কি করে? তারা তো পুরুষেরই মত।[২৯]

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : একবার আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যেয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই ছোট্ট খাদিমটার জন্য একটু দু'আ করুন। রাসূল (সা) দু'আ করলেন 'হে আল্লাহ! তুমি তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি দান কর। তাকে দীর্ঘজীবী কর এবং তার গুনাহ মাফ করে দাও'। শেষ জীবনে আনাস বলতেন, আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে ৯৮ মতান্তরে ১০২ জনকে শুধু কবরই দিয়েছি। আমার বাগিচায় বছরে দু'বার করে ফুল আসে। এত দীর্ঘ জীবন পেয়েছি যে, জীবনের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছি। আর চতুর্থটির অর্থাৎ গুনাহ্ মাফের আশায় আছি।[৩০]

হযরত আনাস প্রতিদিন রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমাত করে দুপুরে বাড়ী ফিরতেন। একদিন দুপুরে বাড়ীর দিকে চলেছেন। পথে দেখলেন তাঁরই সমবয়সী ছেলেরা খেলছে। তাঁর কাছে খেলাটি ভালো লাগলো। তিনি দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন, রাসূল (সা) তাদের দিকে আসছেন। তিনি এসে আনাসের হাতটি ধরে কোন কাজে পাঠালেন। আনাস ফিরে এলে রাসূল (সা) বাড়ীর দিকে চললেন। আনাসের বাড়ী ফিরতে দেরী হওয়ায় তাঁর মা উম্মু সুলাইম জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরী হলো কেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহর (সা) একটি গোপন কাজে গিয়েছিলাম। এজন্য ফিরতে দেরী হয়েছে। মা মনে করলেন, ছেলে হয়তো সত্য গোপন করছে। এজন্য জানতে চাইলেন : কী কাজ? আনাস জবাব দিলেন : একটি গোপন কথা, কাউকে বলা যাবে না। মা বললেন : তাহলে গোপনই রাখ, কারও কাছে প্রকাশ করোনা।[৩১] হযরত আনাস আজীবন এ সত্য গোপন রেখেছেন।

এভাবে উম্মু সুলাইমের জীবনের অনেক কথা বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা খুবই শিক্ষাপ্রদ। তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

---

২৯. হায়াতুস সাহাবা-৩/২২১,২২২

৩০. প্রাগুক্ত-৩/৩৪৭, ৬৩৩

৩১. আল-ফাতহুর রাব্বানী-২২/২০৪; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৪৩; ২/৫০৩

উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা)

হযরত উম্মু হারাম (রা)-এর আসল নাম জানা যায় না। এ তাঁর ডাকনাম এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা। পিতা মিলহান ইবন খালিদ। মাতার দিক দিয়ে তিনি হযরত উম্মু সুলাইমের(রা) বোন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) খাদিম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিকের খালা। আর দুধপানের দিক দিয়ে ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খালা।[১]

মদীনার নাজ্জার খান্দানের মিলহানের পরিবারটি ছিল একটি অতি সৌভাগ্যবান পরিবার। মদীনায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনালগ্নে এ পরিবারের সদস্যগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। আল্লাহ ও রাসূলের (সা) গভীর প্রেম ও ভালোবাসা এ পরিবারের সদস্যবর্গের অন্তরের অন্তমূলে গেঁড়ে বসে। তাদের নারী-পুরুষ সকলে জিহাদ, জ্ঞানচর্চা, ইসলামের সেবায় জীবন দান, বদান্যতা প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। মিলহানের দুই ছেলে হারাম ও সুলাইম (রা) বদর ও উহুদের যোদ্ধা ছিলেন। উভয়ে বি'রে মা'উনার অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। হারাম ইবন মিলহানের (রা) জীবনের বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁর ঘাতক জাব্বার ইবন সুলামীকে মুসলমান বানিয়ে যেতে সক্ষম হন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই রকম : জাব্বার ইবন সুলামী হারামকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে তাঁর বক্ষ ভেদ করে যায় এবং তিনি জোরে فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ উচ্চারণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বাক্যটির অর্থ 'কা'বার প্রভুর শপথ, আমি কামিয়াব হয়েছি।' অর্থাৎ শাহাদাত লাভে কামিয়াব হয়েছি। ঘাতক জাব্বার যখন فُزْتُ শব্দের অর্থ জানলো তখন তার মধ্যে ভাবান্তর হলো। সে তাওবা করে ইসলামে দাখিল হয়ে গেল। হযরত হারাম ইবন মিলহানের (রা) জীবনের সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্যটি হযরত জাব্বার ইবন সুলামীর (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে যায়।[২]

মদীনার যে সকল মহিয়সী নারী হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাহচর্যে নিজেদের চারিত্রিক শোভা আরো উৎকর্ষমণ্ডিত করে তোলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মিলহানের দুই কন্যা উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম। কেবল 'আত-তাহযীব' গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, উম্মু হারামের (রা) প্রথম স্বামী 'আমার ইবন কায়স আল-আনসারী।[৩] তবে অধিকাংশ গ্রন্থে তাঁর স্বামীর নাম প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'উবাদা ইবন আস-সামিত উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন সা'দের ধারণা, 'উবাদা ইবন আস-সামিত তাঁর প্রথম স্বামী এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামী 'আমর ইবন কায়স।[৪] তবে নির্ভরযোগ্য সীরাতের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে জানা

---

১. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-৩/৭৩

২. বুখারী : বাবুর রাজী'; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ-৪২

৩. আত-তাহযীব-১২/৪৬

৪. তাবাকাত-৮/২৬৮

যায় যে, 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা) তাঁর সর্বশেষ স্বামী।[৫] এই 'উবাদা (রা) একজন প্রথমপর্বের মহান আনসারী সাহাবী, আকাবার সদস্য, নাকীব, বদর-উহুদ-খন্দকের সাহসী মুজাহিদ এবং বাই'আতু রিদওয়ানসহ উল্লেখযোগ্য সকল ঘটনার অংশীদার। হিজরী ৩৪ সনে ফিলিস্তীনের রামলায় ইনতিকাল করেন।[৬]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনার কেন্দ্রস্থল থেকে দুই মাইল[৭] দূরে তাকওয়া ও খোদাভীতির উপর ভিত্তি করে যে মসজিদটি নির্মাণ করেন সেটি হলো– মাসজিদুল কুবা'। এ মসজিদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এ আয়াত :[৮]

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ.

'যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর, তাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য।'

ইসলামের ইতিহাসে এ মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত ইবন 'উমার (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বাহনে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে এ মসজিদে আসতেন এবং এখানে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।[৯] কুবার এই পবিত্র মসজিদের পাশে ছিল উম্মু হারামের পরিবারের বসবাস। রাসূল (সা) হযরত উম্মু হারামকে (রা) যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁর গৃহে যেতেন এবং দুপুরে বিশ্রামও নিতেন।[১০] মাঝে মাঝে নামাযও আদায় করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন : একদিন নবী (সা) আমাদের নিকট আসলেন। তখন বাড়ীতে কেবল আমি, আমার মা (উম্মু সুলাইম) ও আমার খালা উম্মু হারাম ছিলাম। তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা এসো, আমি তোমাদের নিয়ে নামায আদায় করি। তখন কোন নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। তিনি আমাদের নিয়ে নামায আদায় করলেন এবং আমাদের পরিবারের সকলের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ কামনা করে দু'আ করলেন।[১১] একবার রাসূল (সা) উম্মু হারামের (রা) গৃহে এলে তিনি খাবার তৈরী করে তাঁকে খাওয়ান। আহার শেষে একটু বিশ্রাম নিতে থাকেন, আর উম্মু হারাম (রা) রাসূলের (সা) মাথার চুল বিলি দিয়ে উকুন দেখতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় রাসূলের (সা) একটু হালকা ঘুমের ভাব এসে যায়। একটু পরে জেগে উঠে মৃদু হেসে উম্মু হারামকে (রা) শাহাদাতের সুসংবাদ দান করেন। আর সেদিন থেকেই তাঁকে "আল-শাহীদা" (মহিলা শহীদ) বলা হতে থাকে। রাসূল (সা) শাহাদাতের সুসংবাদ অপর যে মহিলাকে দান করেন তিনি হলেন উম্মু ওয়ারাকা আল-আনসারিয়্যা (রা)। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা ছিলেন বানূ

---

৫. সাহাবিয়াত-২১০

৬. তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/২৫৬, ২৫৭; আল-আ'লাম-৩/২৫৮

৭. মু'জামুল বুলদান-৪/৩০২

৮. সূরা আত-তাওবা-১০৮; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যাহ্-৩/৭৩

৯. সাহীহ মুসলিম-৪/১২৭

১০. উসুদুল গাবা-৫/৫৭৪; আল-ইসতী'আব-৪/৪২৪; আয-যাহাবী : তারীখ-৩/৩১৭; আল-ইসাবা-৪/৪৪১

১১. সাহীহ মুসলিম-২/১২৮

নাজ্জারের কন্যা। তাই উম্মু হারাম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) খালা সম্পর্কীয়া হওয়ার কারণে মাহরামা ছিলেন। আর তাই তিনি রাসূলের (সা) মাথা স্পর্শ করে উকুন খুঁটতে পেরেছেন।[১২]

ইমাম আত-তিরমিযী হযরত আনাস ইবন মালিকের বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু হারামের গৃহে আসতেন এবং তিনি রাসূলকে (সা) আহার করাতেন। উম্মু হারাম ছিলেন 'উবাদা ইবন আস-সামিতের স্ত্রী। একদিন রাসূল (সা) আসলেন। তাঁকে আহার করালেন। তারপর রাসূলের (সা) মাথার চুল বিলি দিয়ে উকুন দেখতে শুরু করলেন। রাসূল (সা) ঘুমিয়ে গেলেন। একটু পরে জাগলেন এবং মৃদু হাসলেন। উম্মু হারাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাসলেন কেন? বললেন : ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখানো হলো, আমার উম্মাতের কিছু লোক জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য জলযানে আরোহী হয়েছে। উম্মু হারাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন সে জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন।

এরপর রাসূল (সা) মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মৃদু হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মু হারাম আবার প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাসছেন কেন? জবাবে রাসূল (সা) পূর্বের কথাটিই বললেন। উম্মু হারামও আগের মত আরজ করলেন। এবার রাসূল (সা) বললেন : أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِيْنَ - তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।

সময় গড়িয়ে চললো। রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা আবূ বকর ও 'উমার (রা) একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। ইসলামী খিলাফতের সীমা সরহদের দারুণ বিস্তার ঘটলো। তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান (রা) খিলাফতের মসনদে আসীন। সিরিয়ার আমীর হযরত মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান (রা) খলীফার নিকট সাগর দ্বীপ কুবরুস (সাইপ্রাস) অভিযানের অনুমতি চাইলেন। উল্লেখ্য যে, এ সময় কুবরুস ছিল বাইজান্টাইন রোমান শাসিত একটি দ্বীপ। ইতিপূর্বে মুসলমানদের যেমন কোন নৌ-বাহিনী ছিল না তেমনি ছিল না জলপথে অভিযানের কোন অভিজ্ঞতা। তাই আমীর মু'আবিয়ার (রা) আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত 'উছমান (রা) মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করলেন। দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর নৌ-বাহিনী গঠন ও জলপথে কুবরুস অভিযানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটাই ছিল মুসলমানদের নৌপথে প্রথম অভিযান। তাই দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মুতাবিক হযরত 'উছমান (রা) হিজরী ২৭ সনে সাগর পাড়ি দিয়ে কুবরুস অভিযানের নির্দেশ দেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) একটি নৌ-বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে হযরত আবূ যার আল-গিফারী (রা), আবুদ দারদা' (রা), 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা) প্রমুখের মত বহু উঁচু স্তরের সাহাবীকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

যেদিন রাসূল (সা) উম্মু হারামকে নৌ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং যেদিন

---

১২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৪

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে একথা শোনেন :

أول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا وأنتِ فيهم.

'আমার উম্মাতের প্রথম একটি বাহিনী সাগর পথে যুদ্ধ করবে, তারা নিজেদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিবে। উম্মু হারাম, তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে।'[১৩]

সেদিন থেকে হযরত উম্মু হারাম (রা) এমন একটি নৌ-অভিযানের প্রতীক্ষায় ছিলেন। দীর্ঘদিন পর সে সুযোগ এসে গেল। তিনি স্বামী 'উবাদা ইবন আস-সামিতের (রা) সংগে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে মুসলিম বাহিনী কুবরুস অবতরণ করে এবং রোমান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করে। মূলতঃ যুদ্ধ ছাড়াই কেবল সন্ধির মাধ্যমে কুবরুস বিজিত হয়।

কুবরুস বিজয় শেষে বাহিনী যখন মূল ভূমিতে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন একদিন উম্মু হারাম (রা) একটি বাহন পশুর পিঠে চড়তে গিয়ে পড়ে যান। ভীষণ আঘাত পান এবং সেই আঘাতে সেখানে ইনতিকাল করেন। সাগর দ্বীপ কুবরুসের মাটিতেই তাকে দাফন করা হয়।[১৪]

হিশাম ইবন আল-গায বলেন : উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহানের কবর কুবরুসে। স্থানীয় জনসাধারণ বলে থাকে : এ হচ্ছে একজন সৎকর্মশীল মহিলার কবর।[১৫] তিনি আরো বলেছেন : আমি হিজরী ৯১ সনে বাকাকীস সাগর উপকূলে তাঁর কবর দেখেছি এবং তার পাশে দাঁড়িয়েছি। আজো সেখানে বিভিন্ন মহাদেশের অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে।[১৬]

হযরত উম্মু হারাম (রা) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মহিলা নৌ-যোদ্ধা। তিনি প্রথম মহিলা সাহাবী নৌ-সেনা যিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্বেতসাগর পাড়ি দিয়েছেন।

হাদীছ বর্ণনা

হযরত উম্মু হারাম (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে মোট পাঁচটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সে সব হাদীছ উঁচু স্তরের অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈ বর্ণনা করেছেন। যেমন : আনাস ইবন মালিক (রা), 'আমর ইবন আসওয়াদ (রা), 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা), 'আতা' ইবন ইয়াসার, ইয়া'লা ইবন শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তিনি তিন ছেলে– কায়স, 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদকে রেখে যান। প্রথম দুইজন প্রথম স্বামীর এবং শেষের জন 'উবাদা ইবন আস-সামিতের (রা)।[১৭]

---

১৩. বুখারী : আল জিহাদ; হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আল-আ'লাম-২/৬১; তারীখু দিমাশ্‌ক-৪৮৬ (তারাজিম আন-নিসা')

১৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীছ নং-১৬৪৫; দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/৭১২; নাসাবু কুরায়শ-১২৪-১২৫

১৫. তারীখু দিমাশ্‌ক-৪৯৬ (তারাজিম আন-নিসা')

১৬. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়া-৪৭

১৭. তাবাকাত-৮/৩১৮; আল-ইসাবা-৪/৪৪২

ফাতিমা বিনত কায়স আল-ফিহ্‌রিয়্যা (রা)

হযরত ফাতিমার (রা) পিতা কায়স ইবন খালিদ এবং মাতা উমাইমা বিনত রাবী'আ। ভাই দাহ্‌হাক ইবন কায়স। ফাতিমা দাহ্‌হাকের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। ফাতিমার মা উমাইমা ছিলেন বানূ কিনানার মেয়ে। আবু 'আমর হাফস-ইবন মুগীরার সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়।[১] মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহিলারা যখন মক্কা থেকে হিজরাত করতে শুরু করে, তিনিও হিজরাত করেন।[২]

হিজরী ১০ সনে হযরত 'আলীর (রা) নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইয়ামনের দিকে পাঠানো হয়। ফাতিমার স্বামী আবু 'আমরও এ বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন। পূর্বেই আবু 'আমর ফাতিমাকে দুই তালাক দান করেছিলেন, এখন মদীনা থেকে যাত্রাকালে তাঁদের বিয়ের উকিল 'আয়্যাশ ইবন রাবী'আর (রা) মাধ্যমে তৃতীয় তালাকের খবরটি তাঁকে পৌঁছে দেন। আর সেই সাথে পাঁচ সা' যব ও পাঁচ সা' খুরমাও তাঁর খোরাকি হিসেবে পাঠান। ফাতিমা যখন 'আয়্যাশের নিকট তাঁর খোরপোষ ও থাকার জন্য ঘরের দাবী জানালেন তখন তিনি বললেন, তোমার স্বামী শুধু এই খুরমাগুলি ও যবটুকু পাঠিয়েছেন। এছাড়া আমাদের কাছে আর কিছু নেই। আর এই যতটুকু দেয়া হলো তাও শুধু অনুগ্রহ ও সহমর্মিতা স্বরূপ। অন্যথায় আমাদের কাছে তোমার আর কোন কিছুর অধিকার নেই।

'আয়্যাশের এমন কথা ফাতিমা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি নিজের কাপড়-চোপড় বেঁধে সোজা রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে হাজির হলেন। খালিদ ইবন ওয়ালীদসহ আরো কিছু লোক সেখানে উপস্থিত হলেন। ফাতিমা তাঁর সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : আবু 'আমর তোমাকে কতবার তালাক দিয়েছে? বললেন : তিনবার। রাসূল (সা) বললেন– তাহলে এখন তোমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আবু 'আমরের নেই। এখন তুমি উম্মু শুরাইকের নিকট অবস্থান করে তোমার 'ইদ্দত পূর্ণ করো। কিন্তু উম্মু শুরাইকের বাড়ীতে তার আত্মীয়-পরিজন ছিল, তাই তিনি আবার বললেন, ইবন মাকতুম একজন অন্ধ মানুষ। আর সে তোমার চাচাতো ভাই। তাই তার ওখানে থেকে তোমার 'ইদ্দত পূর্ণ করাই ভালো।

হযরত ফাতিমা রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশ মুতাবিক ইবন মাকতুমের বাড়ীতে থাকতে লাগলেন। 'ইদ্দত পালন শেষ হওয়ার পর চারদিক থেকে বিয়ের পয়গাম আসতে লাগলো। তার মধ্যে মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ান, আবু জাহম ও উসামা ইবন যায়দের পয়গামও ছিল। ফাতিমা (রা) এসব পয়গামের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পরামর্শ করলেন। রাসূল (সা) বললেন : মু'আবিয়া একজন বিত্তহীন মানুষ, তার তেমন কিছু নেই, আর আবু জাহম একজন ঝগড়াটে ও রুক্ষ মেজাজের লোক। উসামা ইবন যায়দ এ

---

১. আল-ইসতী'আব-৪/৩৮৩ (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা) : তাবাকাত-৮/২৭৩

২. উসুদুল গাবা-৫/৫২৬

দুইজনের চেয়ে ভালো। তুমি তাকে বিয়ে কর। ফাতিমার ধারণা ছিল স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দান করবেন। এ কারণে তিনি উসামাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) তাঁকে বলেন, তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কিসে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্য কর। তাতে তোমার জন্য কল্যাণ আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন কথায় ফাতিমা (রা) উসামা ইবন যায়দকে বিয়ে করেন। ফাতিমা (রা) পরবর্তীকালে বলতেন, আমার এ বিয়ের পর আমি মানুষের ঈর্ষার পাত্রীতে পরিণত হই।[৩]

হিজরী ২৩ সনে খলীফা হযরত 'উমারের (রা) ওফাতের পর মজলিসে শূরার অধিবেশন ফাতিমার (রা) বাড়ীতে বসতো।[৪] হিজরী ৫৪ সনে স্বামী উসামার (রা) ইনতিকাল হয়। স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি বেশ কাতর হয়ে পড়েন। বিধবা হিসেবে বাকী জীবন ভাই দাহ্হাকের সংসারে কাটিয়ে দেন। পরবর্তীকালে ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়া (রা) তাঁর খিলাফতকালে দাহ্হাক ইবন কায়সকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করলে ফাতিমা তাঁর সাথে কুফায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।[৫] মৃত্যু সন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবাইরের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৬]

তিনি ছিলেন একজন রূপবতী মহিলা।[৭] সেইসাথে তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধিমত্তা, উন্নত সাংস্কৃতিক রুচি, সঠিক মতামত ও চিন্তা-চেতনার অধিকারিণী পূর্ণ মানের নারী।[৮]

হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দের মেয়ে ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'উছমানের স্ত্রী। ফাতিমা (রা) ছিলেন মেয়েটির খালা। 'আবদুল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন। ফাতিমা মেয়েটিকে তাঁর কাছে চলে আসতে বললেন। মারওয়ান একথা জানতে পেরে কুবায়সাকে তাঁর নিকট পাঠালেন। কুবায়সা ফাতিমার নিকট এসে বললেন, আপনি একজন মহিলাকে তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হওয়ার আগে কিভাবে ঘর থেকে বের করছেন? জবাবে তিনি বললেন, এটা এজন্য যে, রাসূল (সা) আমাকে এমন আদেশই করেছিলেন। তারপর তিনি নিজের জীবনের ঘটনাটি বর্ণনা করেন এবং তার সমর্থনে কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন।[৯]

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَيَخْرُجْنَ اِلاَّ أن يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ.

৩. সহীহ মুসলিম-১/৪৮৩; মুসনাদ-৬/৪১১-৪১৪; তাবাকাত-৮/২৭৪-২৭৫
৪. আল-ইসতী'আব-৪/৩৮৩; উসুদুল গাবা-৫/৫২৭
৫. উসুদুল গাবা-৫/৫২৬
৬. সহীহ মুসলিম-১/৪৮৫
৭. আল-ইসাবা-৪/৩৮৪
৮. উসুদুল গাবা-৫/৫২৬
৯. সূরা আত-তালাক, আয়াত-১-২

এতটুকু পাঠ করার পর বলেন, এ পর্যন্ত হলো তালাকে রিজ'ঈ বা ফিরিয়ে নেয়ার তালাকের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তার পরেই এসেছে :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ.

'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ো না। যদি না তারা সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়।... অতঃপর তারা যখন তাদের 'ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে।'

এই শেষোক্ত আয়াতের ভিত্তিতে তিন তালাকের পরে কোন অবস্থার সম্ভাবনা অবশিষ্ট নেই। তারপর তিনি বলেন, যেহেতু তোমাদের নিকট এ অবস্থায় স্ত্রী সন্তান সম্ভাবা না হলে তাকে খোরপোষ না দেওয়া উচিত, এ কারণে তাকে আর আটকে রাখার কোন অর্থ হয় না।[১০]

হযরত ফাতিমা বিনত কায়স (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা এ হাদীছগুলি শুনে বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন : কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, আবু বাকর ইবন আবু জাহম, আবু সালামা, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, 'উরওয়া, 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদিল্লাহ, আসওয়াদ, সুলায়মান ইবন ইয়াসার, 'আবদুল্লাহ আল-বাহী, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রহমান ইবন ছাওবান, শা'বী, 'আবদুর রহমান ইবন 'আসিম ও তামীম।[১১]

হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন অতি মার্জিত, রুচিশীল ও ভদ্র স্বভাবের মহিলা। বিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম শা'বী ছিলেন তাঁর শাগরিদ। একবার তিনি ফাতিমার সাথে দেখা করতে এলেন। ফাতিমা (রা) তাঁকে খুরমা খেতে দেন ও ছাতু গুলিয়ে পান করান।[১২]

---

১০. সহীহ বুখারী-৯/৪২১-৪২২; সহীহ মুসলিম, তালাক অধ্যায়, হাদীছ নং-১৪৮০; আবু দাউদ, তালাক, হাদীছ নং-২২৮৪; তিরমিযী, নিকাহ, হাদীছ নং-১১৩৫; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-১/৯৮; মুসনাদ-৬/৪১৫-৪১৬

১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৯; আল-ইসতী'আব-৪/৩৮৩; সাহাবিয়াত-১৮০

১২. সহীহ মুসলিম-১/৪৮৪

ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা)

হযরত ফাতিমার (রা) পিতা আল-খাত্তাব ইবন নুফায়ল। মক্কার কুরাইশ গোত্রের আল-'আদাবী শাখার সন্তান। মাতা হানতামা বিন্‌ত হাশিম ইবন আল-মুগীরা কুরাইশ গোত্রের আল-মাখযূমী শাখার কন্যা।[১] ফাতিমার (রা) সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, তিনি হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সহোদরা এবং হযরত সা'ঈদ ইবন যায়দের (রা) সহধর্মিনী। তাঁর ডাক নাম উম্মু জামীল।[২] মক্কায় ইসলামের সেই সূচনা পর্বে রাসূলুল্লাহর (সা) আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের (রা) গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে হাতে গোনা যে কয়েকজন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন এই ফাতিমা (রা) ও তাঁর স্বামী তাদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

ফাতিমা ছিলেন একজন প্রখর বুদ্ধিমতী, দূরদৃষ্টিসম্পন্না, স্বচ্ছ স্বভাব-প্রকৃতি ও পরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণ বিশিষ্ট মহিলা। তাঁর ঈমান এত মজবুত ছিল যে, সেখানে সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র স্থান লাভ করতে পারেনি। বর্ণিত হয়েছে, হযরত খাদীজার (রা) পরে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন যথাক্রমে হযরত 'আব্বাস ইবন 'আবদিল মুত্তালিবের (রা) স্ত্রী উম্মুল ফাদল, হযরত আবূ বকরের (রা) কন্যা আসমা (রা) ও খাত্তাবের কন্যা ফাতিমা (রা)।[৪] ইবন হিশাম মক্কায় প্রথম পর্বে আটজন ইসলাম গ্রহণকারীর নাম উল্লেখ করার পর যে দশজন নারী-পুরুষের ইসলাম গ্রহণের বিষয় আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সা'ঈদ ইবন যায়দ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমার (রা) নামও আছে।[৫]

মক্কার কুরাইশ পৌত্তলিকরা মুসলমানদের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালাতো। 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) তাঁর বোন ফাতিমা (রা) ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর উপরও অত্যাচার চালান। তিনি অন্য মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতেন। কিন্তু তাঁর বোন ফাতিমা তাঁর মধ্যে অনুশোচনার সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনেন।

ইসলামের অভ্যুদয়ের আগেই মক্কার কুরাইশ গোত্রের সা'ঈদ ইবন যায়দ ইবন 'আমর ইবন নুফায়লের সাথে ফাতিমার (রা) বিয়ে হয়। সা'ঈদ মদীনায় হিজরাত করেন এবং বদরসহ সকল অভিযানে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দশজনের অন্যতম। হিজরী ৫১ সনে তিনি

---

১. ইবন সা'দ, তাবাকাত-৮/২৬৭; আল-ইসাবা-৪/৩৭০
২. উসুদুল গাবা-৫/৫১৯; আল-ইসতী'আব-৪/৩৭০
৩. তাবাকাত-৮/২৬৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৬২
৪. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ্-১/৪৪৫
৫. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫২-২৫৪

মদীনায় ইনতিকাল করেন।[৬] বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জন একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ফাতিমা তাঁর স্বামীর আগেই মুসলমান হন।[৭]

ফাতিমা ও 'উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণ

নির্ভরযোগ্য প্রাচীন সূত্রসমূহে হযরত 'উমারের (রা) ইসলাম গ্রহণের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে। এখানে সেইসব বর্ণনার সারকথা উপস্থাপন করা হলো।

রুক্ষ মেজাজ, কঠোর স্বভাব ও রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি চরম শত্রুতামূলক মনোভাবের জন্যে 'উমার প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বের হলেন।

পথে নু'আইম ইবন 'আবদিল্লাহ আন-নাহহামের সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'উমার! কোন দিকে যাওয়া হচ্ছে?

'উমার জবাব দিলেন : মুহাম্মাদকে হত্যা করতে যাচ্ছি।

নু'আইম : মুহাম্মাদকে হত্যা করলে বানূ হাশিম ও বানূ যাহ্‌রা কি তোমাকে ছেড়ে দেবে?

'উমার : মনে হচ্ছে, তুমিও তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গিয়েছো!

নু'আইম : 'উমার! আমি কি তোমাকে একটি অবাক হবার মত কথা শোনাবো? তোমার বোন ও বোনের স্বামী দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করে তুমি যে ধর্মে আছো তা ত্যাগ করেছে।

'উমার (রা) একথা শুনে রাগে ক্ষোভে উত্তেজিত অবস্থায় বোন-ভগ্নিপতির বাড়ীর পথ ধরেন। তাঁদের ওখানে তখন হযরত খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা) ছিলেন। তাঁর সংগে ছিল 'সূরা তাহা' লিখিত একটি পুস্তিকা। তিনি তাঁদের দু'জনকে এই সূরাটি শেখাচ্ছিলেন। তাঁরা যখন 'উমারের (রা) উপস্থিতি টের পেলেন তখন খাব্বাব (রা) বাড়ীর এক কোণে আত্মগোপন করলেন। ফাতিমা পুস্তিকাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব যে তাঁদেরকে কুরআন শেখাচ্ছিলেন, 'উমার (রা) তা বাড়ীর কাছাকাছি এসে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করেন : তোমাদের এখানে যে গুনগুন আওয়াজ শুনতে পেলাম তা কিসের?

তাঁরা বললেন : আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম।

'উমার বললেন : সম্ভবত তোমরা ধর্মত্যাগী হয়েছো। আমি জেনেছি তোমরা মুহাম্মাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে গিয়েছো।

ভগ্নিপতি সা'ঈদ (রা) বললেন : 'উমার! সত্য যদি তোমার নিজের ধর্মের বাইরে অন্য কোথাও থাকে তাহলে তুমি কী করবে?

এবার 'উমার (রা) নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। সা'ঈদের (রা) উপর ঝাঁপিয়ে

---

৬. আল-আ'লাম-৩/১৪৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-১/১২৪

৭. আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা-৪/৩৮৩

পড়লেন। তাঁকে কিল-ঘুষি মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'পায়ে দলতে লাগলেন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর উপর চড়ে বসা 'উমারকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু 'উমার (রা) ফাতিমার (রা) মুখমণ্ডলে এমন এক ঘুষি মারেন যে, তাঁর মুখটি রক্তে ভিজে যায়। এ অবস্থায় ফাতিমা বলেন : 'উমার! সত্য তোমার ধর্মের বাইরে অন্যত্র রয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেই ফেলেছি। এখন তোমার ভয়ে এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন সুযোগ নেই।

বোনের রক্তভেজা মুখ দেখে 'উমার (রা) আঁৎকে উঠলেন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। বললেন : ঠিক আছে, তোমরা যে পুস্তিকাটি পড়ছিলে সেটা আমাকে একটু দাও, আমি পড়ে দেখি। 'উমার লিখতে-পড়তে জানতেন। বোন তাঁর ভাই 'উমারের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : তুমি তো একজন অপবিত্র মানুষ। আর এটা পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া স্পর্শ করতে পারে না। ওঠো, গোসল করে এসো।

সুবোধ বালকটির মত 'উমার উঠে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে এসে পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে পাঠ করলেন :

بسم الله الرحمن الرحيم – পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নামে– এতটুকু পড়ে তিনি মন্তব্য করলেন : অতি সুন্দর পবিত্র নামসমূহ। তারপর পাঠ করলেন : طه (ত্বোহা) থেকে এ আয়াত পর্যন্ত :

إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ أَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِيْ.[৮]

'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব, আমার 'ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।'

এরপর তিনি উৎফুল্ল চিত্তে বলে ওঠেন : এ তো অতি চমৎকার মহিমান্বিত কথা! মুহাম্মাদ কোথায়, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো।

'উমারের (রা) এ আহ্বান শুনে খাব্বাব ইবন আল-আরাত (রা) কাছে ছুটে আসেন। 'উমারকে (রা) লক্ষ্য করে বলেন : 'উমার! তোমার জন্যে সুসংবাদ! আমি আশা করি রাসূলুল্লাহ (সা) গত বৃহস্পতিবারে যে দু'আটি করেছিলেন তা তোমার ক্ষেত্রে কবুল হয়েছে। সেই দু'আটি ছিল এই–

اللهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِعُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ.

'হে আল্লাহ! 'উমার ইবন আল-খাত্তাব অথবা আবূ জাহ্ল ইবন হিশামের দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।' খাব্বাব (রা) আরো অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে আল-আরকামের গৃহে আছেন।

---

৮. সূরা ত্বাহা-১৪

অতঃপর 'উমার (রা) সাফা পাহাড়ের সন্নিকটে আরকামের (রা) গৃহে পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন।[৯]

ফাতিমা (রা) আপন ভাইয়ের হাতে মার খেয়েও ভাইকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসতে পারায় দারুণ খুশী হলেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের আদেশ হলে ফাতিমা ও তাঁর স্বামী সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা) প্রথম পর্বে হিজরাতকারীদের সাথে মদীনায় চলে যান।[১০] সেখানে তিনি অন্যান্য মুসলিম নারীদের সাথে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করেন।

ইবনুল জাওযী (রহ) বলেছেন, ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে কতগুলো তা নির্ধারণ করা যায় না। হাদীছের সহীহ গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত কোন হাদীছ দেখা যায় না।[১১] ইবন হাজার (রহ) তাঁর এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১২]

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاتزال أمتى بخير مالم يظـهر فيـهم حـب الدنيا فى علماء فساق وقراء جهال وجبابرة، فإذا ظهرت خشيت أن يعمهم الله بعقاب.

'আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) একথা বলতে শুনেছি যে, যতদিন পর্যন্ত ফাসিক 'আলিম, জাহিল কারী ও স্বৈরাচারী শাসকদের মাধ্যমে আমার উম্মতের মধ্যে দুনিয়া-প্রীতির প্রকাশ না ঘটবে ততদিন তারা শুভ ও কল্যাণের মধ্যে থাকবে। আর যখন তাদের মধ্যে দুনিয়া-প্রীতির প্রকাশ ঘটবে, আমার আশঙ্কা হয় আল্লাহ তখন তাদের উপর শাস্তি ব্যাপক করে দেবেন।'

"আদ-দুররুল মানছূর" গ্রন্থে তাঁর মহত্ব ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এভাবে :[১৩]

كانت أديبة فاضلة عاقلة محبة للخير كارهة للشر آمرة بالـمعروف ناهية للمنكر.

'তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক, বিদূষী, বুদ্ধিমতী মহিলা। শুভ ও কল্যাণকে ভালোবাসতেন, অশুভ ও অকল্যাণকে ঘৃণা করতেন, সৎকাজের আদেশ করতেন, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতেন।'

হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে চার ছেলে রেখে যান। তাঁরা হলেন : 'আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, আযইয়াদ ও আসওয়াদ।[১৪]

---

৯. ঘটনাটি বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৪৩-৩৪৫; তাবাকাত-৩/২৬৭-২৬৮; উসুদুল গাবা-৪/৫২-৫৩; সিফাতুস সাফওয়া-১/২৬৯-২৭১; আ'লাম আন-নিসা'-৪/৫০; আয-যাহাবী, তারীখ-১/১৭৪-১৭৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৭৭; হায়াতুস সাহাবা-১/২৯৬-২৯৮

১০. আল-ইসতী'আব-২/৫৫৩

১১. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৬৮

১২. আল-ইসাবা-৪/৩৮১

১৩. আদ-দুররুল মানছূর-৩৬৪

১৪. প্রাগুক্ত

ফাতিমা বিন্‌ত আল-আসাদ (রা)

তিনি ছিলেন একজন মহিয়সী সাহাবিয়া যিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যেমন একজন মানুষের বুক তার অন্তরকে এবং চোখের পাঁপড়ি চোখ দুটিকে রক্ষা করে। তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) এমন ভালোবাসতেন যেমন ভালোবাসে একজন মমতাময়ী মা তার একমাত্র সন্তানকে। ইসলামের প্রথম পর্বের ইতিহাসের যে সকল মহিয়সী মহিলার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁদের মধ্যে এই মহিলার নামটিও বিদ্যমান। তিনি অনেক মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারিণী। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর লালন-পালনের সুযোগ লাভে ধন্যা হন। তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা ও রাসূলুল্লাহর (সা) একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বীর সৈনিক সাহাবী 'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) গর্বিতা মা। তিনি ছিলেন জান্নাতের অধিকারী যুবকদের দু' নেতা হযরত হাসান ও হুসায়নের (রা) দাদী। মহান মু'তার যুদ্ধের শহীদত্রয়ীর অন্যতম জা'ফার আত-তায়্যারের (রা) মা। সর্বোপরি তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রিয়তমা কন্যা, হাসান-হুসায়নের (সা) জননী হযরত ফাতিমা আয-যাহ্‌রা'র (রা) শ্বাশুড়ী। ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহ্‌বী (রহ) তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[১]

'فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصى، الهاشمية، والدة على بن أبى طالب.'

'ফাতিমার পিতার নাম আসাদ। পিতামহ হাশিম, প্রপিতামহ 'আবদি মান্নাফ ইবন কুসায়। তিনি কুরায়শ গোত্রের হাশিমী শাখার কন্যা এবং 'আলী ইবন আবী তালিবের মা।' পিতামহ হাশিমে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূলুল্লাহর (সা) বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন একদিকে তাঁর শ্বশুর এবং অন্য দিকে চাচা। প্রথম পর্বে মক্কা থেকে যে সকল মহিলা মদীনায় হিজরাত করেন তিনি তাঁদের একজন।

রাসূলুল্লাহর (সা) দাদা 'আবদুল মুত্তালিব যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তখন তিনি ছেলে আবূ তালিবকে ডেকে তাঁর ইয়াতীম ভাতিজা মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহর লালন-পালনের ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। তিনি চান যেন তাঁর ইয়াতীম পৌত্রটি আবূ তালিব ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠে। তিনি তাঁদেরকে মুহাম্মাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে তাকিদ দেন। আর সেই থেকে বালক মুহাম্মাদ তাঁর চাচা-চাচী আবূ তালিব ও ফাতিমার (রা) সংসারের

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৮

সাথে যুক্ত হন। ফাতিমা তাঁর স্বামীর সাথে একযোগে মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধান ও প্রতিপালনে মনোযোগী হন। বালক মুহাম্মাদ তাঁর পরিবারে যুক্ত হওয়ার পর তিনি দেখতে পান, তাঁর ছেলে-মেয়েরা যখন মুহাম্মাদের সাথে আহার করে তখন তাদের খাবারে দারুণ বরকত হয়। আবূ তালিবের ছিলো অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে। নিতান্ত অভাবী মানুষ। প্রতিবেলা তাঁর পরিবারের জন্য যে খাদ্য-খাবারের ব্যবস্থা করা হতো তা সবাই এক সাথে অথবা পৃথকভাবে খেলে সবার পেট ভরতো না। কিন্তু যখন তাদের সাথে মুহাম্মাদ খেতেন তখন সবারই পেট ভরে যেত। এ কারণে ছেলে-মেয়েরা যখন খেতে বসতো তখন আবূ তালিব বলতেন : 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমার ছেলে মুহাম্মাদ আসুক!' তিনি আসতেন, এক সাথে খেতেন এবং তাদের খাবার বেঁচে যেত। এক পেয়ালা দুধ থেকে তিনি প্রথমে পান করলে তারা সবাই তৃপ্ত হয়ে যেত– যদিও তাদের একজনই সেই পূর্ণ পেয়ালাটি শেষ করে ফেলতে পারতো। তাই আবূ তালিব তাকে বলতেন : তুমি বড় বরকতময় ছেলে।

সাধারণতঃ শিশু-কিশোররা উস্‌কো-খুশকো ও ধুলি-মলিন থাকে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) সবসময় তেল-সুরমা লাগিয়ে পরিপাটি অবস্থায় থাকতেন।[২] ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ এ সবকিছু দেখতেন। আর এতে মুহাম্মাদের (সা) প্রতি স্নেহ-মমতা আরো বেড়ে যেত। তাঁর প্রতি আরো বেশী যত্নবান হতেন। এভাবে তাঁকে শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত, তথা হযরত খাদীজার (রা) সাথে বিয়ের আগ পর্যন্ত নিজের সন্তানের থেকেও অধিক স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করেন। সব রকমের অশুভ ও অকল্যাণ থেকে আঁচলে লুকিয়ে রাখার মত তাঁকে আগলে রাখেন। এ কারণে নবী (সা) সারা জীবন চাচী ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের মধ্যে নিজের মা আমিনা বিন্‌ত ওয়াহাবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন। তাঁকে গর্ভধারিণী মায়ের পরে দ্বিতীয় মা বলে মনে করতেন।

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে লোকেরা যা কিছু বলাবলি করতো, বিশেষত স্বামী আবূ তালিব যে প্রায়ই বলতেন[৩]– আমার এ ভাতিজা একজন বড় সম্মানের অধিকারী ব্যক্তি হবে– কান লাগিয়ে শুনতেন। তিনি স্বামীর মুখে আরো শোনেন সিরিয়া সফরের সময় কিশোর মুহাম্মাদকে (সা) কেন্দ্র করে যেসব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল তার বর্ণনা। তাছাড়া তিনি আরো শোনেন হযরত খাদীজার দাস মায়সারার বর্ণনা যা তিনি যুবক মুহাম্মাদের (সা) সাথে সিরিয়া ভ্রমণের সময় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজে মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে যা কিছু দেখেছিলেন এবং অন্যদের মুখে তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছিলেন তাতে এত প্রভাবিত ও মুগ্ধ হন যে, কলিজার টুকরো 'আলীকে তাঁর তত্ত্বাবধানে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ করেননি।

তিনি অতি নিকট থেকে মুহাম্মাদের (সা) মধ্যে একজন স্নেহময় পিতার রূপ দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন 'আলীর জন্মের পর থেকে তার প্রতি মুহাম্মাদের

---

২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১২০

৩. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ্-১/১৮৯; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৪১

(সা) অত্যধিক আগ্রহ ও উৎসাহকে। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন : 'আলীর জন্মের পর মুহাম্মাদ তার নিজের মুখ থেকে একটু থুথু নিয়ে তার মুখে দেয়। তারপর সে জিহ্বা চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে যায়। পরদিন সকালে আমরা 'আলীর জন্য ধাত্রী ডেকে পাঠালাম। কিন্তু কারো স্তনই গ্রহণ করলো না। আমি মুহাম্মাদকে ডাকলাম। সে তার জিহ্বায় একটু দুধ দিল। আর 'আলী তা চাটতে চাটতে ঘুমিয়ে গেল। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করলেন, এভাবে চলতে লাগলো।[৪] এ সবকিছু দেখে-শুনে মুহাম্মাদের প্রতি ফাতিমা বিন্ত আসাদের স্নেহ-মমতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। তিনি ছেলে 'আলীকে মুহাম্মাদের (সা) সার্বক্ষণিক সহচর হওয়ার তাকিদ দেন।

রাসূল (সা) প্রথম দিকে যখন কা'বার চত্বরে নামায আদায় করতেন তখন কুরায়শরা তেমন গুরুত্ব দিত না। পরে যখন নিয়মিত পড়তে লাগলেন, তখন 'আলী ও যায়দ তাঁকে পাহারা দিতেন। পরে এমন হলো যে, তাঁরা দু'জন রাসূল (সা) ঘর থেকে বের হলে সর্বক্ষণ তাঁর সংগে থাকতেন। একদিন 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, তখন আবূ তালিব তাঁকে ডেকে পেলেন না। 'আলীর মা ফাতিমা বললেন : আমি তাঁকে মুহাম্মাদের সাথে যেতে দেখলাম। আবূ তালিব তাঁদেরকে তালাশ করতে করতে শি'আবে আবী দাব-এ গিয়ে পেলেন। মুহাম্মাদ (সা) নামাযে দাঁড়িয়ে, আর 'আলী (রা) তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন।[৫]

মুহাম্মাদ (সা) নবুওয়াত লাভ করলেন। নিজ গোত্র ও আত্মীয়-বন্ধুদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ লাভ করলেন। আল্লাহ নাযিল করলেন :[৬]

'وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ'

তুমি তোমার নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক কর।

নবী (সা) তাঁর প্রভুর নির্দেশ পালন করলেন। নিকট-আত্মীয়দের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে আহ্বান জানালেন। তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার তাকিদ দিলেন। ইসলামের সেই একেবারে সূচনা পর্বে যে ক'জন মুষ্টিমেয় মহিলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হন তাঁদের মধ্যে ফাতিমা বিন্ত আসাদ অন্যতম। সেদিন তাঁর স্বামী আবূ তালিব ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) আবেদনে সাড়া দিতে অপারগ হলেও তাঁদের কিশোর ছেলে 'আলী (রা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনেন।

এখান থেকেই এ মহিয়সী সাহাবিয়া ফাতিমা বিন্ত আসাদের (রা) জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো। কুরায়শরা মুহাম্মাদ ও তাঁর দীন ইসলামের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে গেল। তারা বানূ হাশিমের সাথে বিবাদে লিপ্ত হলো। যখন তারা দেখলো আবূ তালিব ও

---

৪. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা-১/৪৩২; প্রাগুক্ত

৫. আনসাবুল আশরাফ-১/১১১

৬. সূরা আশ-শু'আরা'-২১৪

তাঁর স্ত্রী মুহাম্মাদকে (সা) সমর্থন ও আশ্রয় দিচ্ছেন তখন তারা মুহাম্মাদকে (সা) তাদের হাতে সমর্পণের দাবী জানালো। কিন্তু চাচা-চাচী ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) পক্ষে অটল থাকলেন। কোন চাপের কাছেই নত হলেন না। মুহাম্মাদকে তাদের হাতে অর্পণের আবদার শক্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে যাঁরা ঈমান এনে মুহাম্মাদের (সা) অনুসারী হয়েছিল তাঁদের প্রতি তারা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠলো।

নবী (সা) যখন দেখলেন কুরায়শরা তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের ক্ষেত্রে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তখন তিনি তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরাতের অনুমতি দান করেন। কুরায়শদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের যে দলটি প্রথম আবিসিনিয়া হিজরাত করেন তার মধ্যে ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের কলিজার টুকরো জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) ও তাঁর স্ত্রী আসমা' বিন্‌ত 'উমাইসও (রা) ছিলেন। যাত্রাকালে মা ফাতিমা (রা) বড় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছেলেকে বিদায় দেন। এই জা'ফার (রা) ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরাতকারী মুসলমানদের আমীর বা নেতা। উল্লেখ্য যে, ফাতিমার (রা) এই ছেলেটি ছিল চেহারা-সুরতে ও আদবে-আখলাকে নবী কারীমের (সা) অনুরূপ। কুরায়শদের যে পাঁচ ব্যক্তিকে লোকেরা রাসূলুল্লাহর (সা) অনুরূপ বলে মনে করতো তাঁরা হলেন : জা'ফার ইবন আলী তালিব, কুছাম ইবন আল-'আব্বাস, আস-সায়িব ইবন 'উবায়দ ইবন 'আবদি ইয়াযীদ ইবন হাশিম ইবন 'আবদিল মুত্তালিব, আবূ সুফয়ান ইবন আল-হারিছ ইবন 'আবদিল মুত্তালিব ও আল-হাসান ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা)।[৭]

কুরায়শরা যখন দেখলো বিষয়টি আস্তে আস্তে তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, তারা বানূ হাশিম ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের নারী-পুরুষ ও শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলকে 'শি'আবে আবী তালিব' উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অন্য নারীদের সাথে এ অবরোধ মেনে নেন। অন্যদের সাথে তিনিও এ অবরুদ্ধ জীবনের তিনটি বছর সীমাহীন ক্ষুধা ও অনাহারের মুখোমুখি হন এবং গাছের পাতা খেয়ে কোন রকম জীবন রক্ষা করেন। অবশেষে তিন বছর পর নবুওয়াতের দশম বছরে তারা অবরোধ তুলে নেয়। অন্য মুসলমানদের সাথে ফাতিমাও (রা) মুক্ত জীবনে ফিরে আসেন। এ তিনটি বছর মহিলারা চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দান করেন।

"শি'আবে আবী তালব" থেকে মুক্ত হওয়ার পর নবুওয়াতের দশম বছরে রাসূলুল্লাহর (সা) অতি আপন দু'ব্যক্তি মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে ইনতিকাল করেন। প্রথমে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা) ও পরে চাচা আবূ তালিব এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এতদিন এ দু'জনই ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনে ঢালস্বরূপ। এখন এ দু'জনের অবর্তমানে অত্যাচারী কুরায়শরা আরো জোরে-

---

৭. নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪২

শোরে নবী (সা) ও তাঁর অনুসারীদের উপর জুলুম-নির্যাতন করতে শুরু করে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম (সা) ও মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দান করেন।

রাসূল (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মদীনায় হিজরাত করলেন। ফাতিমা বিন্‌ত আসাদও (রা) অন্যদের সাথে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। যুবায়র ইবন বাক্‌কার তাঁর ইসলাম ও হিজরাত সম্পর্কে বলেন :[৮]

'وقد أسلمت وهاجرت إلى الله ورسوله.'

' তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরাত করেন।'

তাঁর স্থান ও মর্যাদা

অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাবি'ঈ ইমাম আশ-শা'বী (রহ) তাঁর ইসলাম ও হিজরাত সম্পর্কে বলেন:[৯]

'أم على بن أبى طالب رضى الله عنه فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلمت وهاجرت إلى المدينة.'

'আলী ইবন আবী তালিবের (রা) মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ ইবন হাশিম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরাতও করেন।'

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ইবন সা'দ বলেন :[১০]

'أسلمت فاطمة بنت أسد وكانت امرأة صالحة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل في بيتها.'

' ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি একজন সৎকর্মশীল মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দেখতে যেতেন এবং তাঁর গৃহে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন।'

তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতার কারণে রাসূল (সা) তাঁকে অতিমাত্রায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে লালন-পালন, আদব-আখলাক শিক্ষাদান ও তাঁর সাথে সুন্দর ব্যবহারের প্রতিদানে রাসূলও (সা) তাঁর সাথে সবসময় সদ্ব্যবহার করতেন। তাঁর ছেলে 'আলীর (রা) সাথে রাসূলুল্লাহর কন্যা ফাতিমার (রা) বিয়ে হলো। তখন তিনি একজন মমতাময়ী মা ও একজন আদর্শ শ্বাশুড়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের জীবন তো আর এমন বিত্ত-বৈভবের জীবন ছিল না। সব কাজ নিজেদেরই করতে হতো। নবী দুহিতা ফাতিমাকে (রা) ঘরে আনার পর 'আলী (রা) মাকে বললেন : আমি পানি আনা, প্রয়োজনে এদিক-ওদিক যাওয়ার ব্যাপারে ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহকে সাহায্য করবো,

---

৮. আল-ইসতী'আব-৪/৩৭০

৯. উসুদুল গাবা-(৭১৬৮); আল-ইসাবা-৪/৩৮০

১০. তাবাকাত-৮/২২২; সিফাতুল সাফওয়া-২/৫৪; আল-ইসাবা-৪/৩৮০

আর আপনি তাঁকে ঘরের কাজে, যেমন গম পেষা ও আটা চটকানোর কাজে সাহায্য করবেন।[১১]

ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) অতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকার কারণে তিনি মাঝে মাঝে তাঁকে বিভিন্ন জিনিস উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। জা'দা ইবন হুবায়রা 'আলী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : একবার রাসূল (সা) আমার নিকট এক জোড়া অতি উন্নতমানের নতুন কাপড় পাঠালেন। সাথে সাথে একথাও বলে পাঠালেন যে, 'এ দু'টোকে নিকাবের কাপড় বানিয়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও।' আমি চার টুকরো করলাম। এক টুকুরো দিলাম ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহকে, এক টুকরো ফাতিমা বিন্‌ত আসাদকে এবং আরেক টুকরো ফাতিমা বিন্‌ত হামযাকে (রা)। তবে তিনি চতুর্থ টুকরোটি যে কাকে দেন তা বলেননি। ইবন হাজার (রহ) বলেছেন, সম্ভবত চতুর্থটি দেন 'আকীল ইবন আবী তালিবের স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত শায়বাকে।[১২] উল্লেখ্য যে, ফাতিমা নামের চব্বিশজন মহিলা সাহাবী ছিলেন।[১৩]

ইবনুল আছীর বলেছেন, ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ প্রথম হাশিমী মহিলা যিনি একজন হাশিমী বংশের সন্তান জন্মদান করেন।[১৪] তিনি প্রথম হাশিমী যাঁর গর্ভে একজন খলীফার জন্ম হয়। তারপর ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহর (সা) গর্ভে জন্ম হয় আল-হাসান ইবন 'আলীর (রা)। তারপর খলীফা হারূনুর রশীদের স্ত্রী যুবাইদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন খলীফা আল আমীন।[১৫]

সাহাবায়ে কিরামের অন্তরেও ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) একটা মর্যাদাপূর্ণ আসন ছিল। বিশেষ করে সাহাবী কবিদের নিকট। জা'ফার ইবন আবী তালিব (রা) মু'তায় শহীদ হওয়ার পর কবি হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা) তাঁর স্মরণে যে কবিতাটি রচনা করেন তাতে তাঁর মা ফাতিমারও ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৬]

তেমনিভাবে কবি আল-হাজ্জাজ ইবন 'আলাত আস-সুলামীও উহুদ যুদ্ধে হযরত 'আলীর (রা) বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর মায়েরও প্রশংসা করেন।[১৭]

অনেকের ধারণা যে, তিনি হিজরাতের পূর্বে ইনতিকাল করেন। তবে তা সঠিক নয়। ইমাম আস-সামহূদী (রহ) তাঁর "আল-ওয়াফা বি আখবারি দারিল মুস্তাফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মদীনায় মারা যান এবং তাঁকে "আর-রাওহা'" গোরস্তানে দাফন করা হয়।[১৮]

---

১১. সিফাতুস সাফওয়া-২/৫৪; আয-যাহাবী, তারীখুল ইসলাম-৩/৬২১; উসুদুল গাবা-৫/৫১৭
১২. উসুদুল গাবা-৫/৫১৭; আল-ইসাবা-৪/৩৮০
১৩. নিসাউন মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২২; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪৪
১৪. আল-ইসতী'আব-২/৭৭৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১১৮
১৫. নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৪৫
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৫১
১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৭/৩৩৬; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪৫
১৮. আল-ইসাবা-৪/৩৮০

নবী কারীমের (সা) অন্তরে হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) ছিল বিশেষ মর্যাদার স্থান। তাই তাঁর মৃত্যুর পরেও রাসূল (সা) তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা ভোলেননি। তিনি নিজের জামা দিয়ে ফাতিমাকে কাফন দিয়েছেন। তাঁর কবরে নেমে তাঁর পাশে শুয়েছেন এবং তাঁর ভালো কাজের কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন।[১৯] আস-সামহূদী উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মাত্র পাঁচটি কবর ছাড়া আর কোন কবরে কখনো নামেননি। সেই পাঁচটির মধ্যে তিনটি নারীর এবং দু'টি পুরুষের। তার মধ্যে আবার একটি মক্কায় এবং চারটি মদীনায়। মক্কার কবরটি হলো উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদের (রা)। মদীনারগুলো হলো : ১. খাদীজার (রা) ছেলের কবর। ছেলেটি রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে ও তত্ত্বাবধানে ছিল। ২. "যূ আল-বিজাদাইন" (দুইচাদরের অধিকারী) বলে খ্যাত 'আবদুল্লাহ আল-মুযানীর (রা) কবর। ৩. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) মা উম্মু রূমানের (রা) কবর। ৪. ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের (রা) কবর।[২০]

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের মৃত্যু রাসূল (সা) এবং সাহাবীদের মনে দারুণ বেদনার ছাপ ফেলে। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন, তাঁর প্রশংসা করেন এবং নিজের জামা দিয়ে তাঁর কাফন দেন। হযরত জাবির ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন এসে বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আলী, জা'ফার ও 'আকীলের মা মারা গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা সবাই আমার মা'র কাছে চলো। আমরা উঠলাম এবং এমন নিঃশব্দে পথ চললাম যেন আমাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে পাখী বসে আছে। বাড়ীর দরজায় পৌছার পর রাসূল (সা) গায়ের জামাটি খুলে পরিবারের লোকদের হাতে দিয়ে বলেন : তাঁর গোসল দেওয়া শেষ হলে এটি তাঁর কাফনের নীচে দিয়ে দেবে।

যখন লোকেরা দাফনের জন্য লাশ নিয়ে বের হলো তখন রাসূল (সা) একবার খাটিয়ায় কাঁধ দেন, একবার খাটিয়ার সামনে যান, আরেকবার পিছনে আসেন। এভাবে তিনি কবর পর্যন্ত পৌছেন। তারপর কবরে নেমে গড়াগড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠে আসেন। তারপর বলেন : আল্লাহর নামের সাথে এবং আল্লাহর নামের উপরে তোমরা তাঁকে কবরে নামাও। দাফন কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন : আমার মা ও প্রতিপালনকারিণী! আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন। আপনি ছিলেন আমার একজন চমৎকার মা ও চমৎকার প্রতিপালনকারিণী। জাবির বলেন : আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখানে এমন দু'টি কাজ করেছেন, আমরা কখনো আপনাকে এ ধরনের কাজ করতে দেখিনা। বললেন : সে দু'টি কাজ কি? বললাম : আপনার জামা খুলে দেওয়া এবং কবরে গড়াগড়ি দেওয়া। বললেন : জামাটির ব্যাপার হলো, আমি চেয়েছি তাঁকে যেন কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ না করে। যদি আল্লাহ চান। আর কবরে আমার গড়াগড়ি দেওয়া– আমি চেয়েছি আল্লাহ যেন তাঁর কবরটি প্রশস্ত করে দেন।[২১]

---

১৯. উসুদুল গাবা-৫/৫১৭

২০. ওয়াফা আল-ওয়াফা-৩/৮৯৭; নিসাউন মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৩

২১. কান্‌য আল-'উম্মাল-১৩/৬৩৬; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১১৮

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে নবী (সা) ফাতিমা বিন্‌ত আসাদের কবরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর এই দু'আটি পাঠ করেন :

'الله الذى يحى ويميت وهو حى لايموت، اغفر لأمى فاطمة بنت أسد، ولقِّنْها حُجّتـها، ووسِّع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلى فإنك أرحم الراحمين.'

'আল্লাহ যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আমার মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদকে আপনি ক্ষমা করুন এবং তাঁকে তাঁর যুক্তি-প্রমাণকে শিখিয়ে দিন। আপনার নবী এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দাবির ভিত্তিতে আপনি তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন। আপনি হলেন সকল দয়ালুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দয়ালু।

তারপর তিনি চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন। লাশ কবরে নামান রাসূল (সা), 'আব্বাস ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)।[২২]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, যখন 'আলীর (রা) মা ফাতিমা (রা) মারা গেলেন তখন নবী (সা) নিজের একটি জামা তাঁকে পরান এবং কবরে তাঁর সাথে শুয়ে পড়েন। লোকেরা বললো : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো আপনাকে আর কখনো এমনটি করতে দেখিনে। বললেন : আবূ তালিবের পরে তাঁর চেয়ে বেশী সদাচরণ আর কেউ আমার সাথে করেনি। আমি আমার জামা তাঁর গায়ে এজন্য পরিয়েছি যেন তাঁকে জান্নাতের পোশাক পরানো হয়, আর তাঁর সাথে এজন্য শুয়েছি যেন তাঁর সাথে সহজ আচরণ করা হয়।[২৩]

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) অবশ্যই জান্নাতে যাবেন। ইমাম আল-কুরতুবী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদের (সা) এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, কবরে তাঁর উপর দলন-পেষণ চালানো হবে না। যেহেতু তিনি ফাতিমা বিন্‌তে আসাদের কবরে শুয়েছেন, এজন্য তাঁর বরকতে ফাতিমা (রা) কবরের পেষণ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছেন।[২৪]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বলেছেন, যখন 'আলীর (রা) মা ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) মারা গেলেন তখন রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে গেলেন এবং তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন : হে আমার মা, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। আমার মা'র পরে, আপনি অভুক্ত থেকে আমার পেট ভরাতেন, আপনি না পরে আমাকে পরাতেন এবং ভালো কিছু নিজে না খেয়ে আমাকে খাওয়াতেন। এর দ্বারা আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল লাভের আশা করতেন।[২৫]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এত বড় মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন যে, কেউ তাঁর প্রতি সামান্য

---

২২. নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্-৪৭

২৩. আ'লাম আন-নিসা'-৪/৩৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১১৮

২৪. আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা-২/৬৭৩

২৫. মাজমা' আয-যাওযায়িদ-৯/২৫৬; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৪৮

দয়া ও অনুগ্রহ দেখালে তা কোনদিন ভোলেননি। কথায় ও কর্মের দ্বারা সবসময় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাহলে ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা), যিনি নবীর (সা) জীবনে মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য হিজরাত করেছেন এবং সারাটি জীবন রাসূলের কল্যাণ চিন্তা করেছেন, তাঁকে তিনি ভুলবেন কেমন করে? তাঁর সাথে যেমন আচরণ করা দরকার তা তিনি করেছেন।

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ছেচল্লিশটি (৪৬) হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি মুত্তাফাক 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিমে একই সনদে বর্ণিত হয়েছে)।[২৬]

তাঁর ছেলেরা হলেন : তালিব, 'আকীল, জা'ফার ও 'আলী (রা) এবং মেয়েরা হলেন : হাম্মাদ ও রীতা।[২৭]

---

২৬. আ'লাম আন-নিসা'-৪/৩৩

২৭. তাবাকাত-৮/১৬১

সুমায়্যা বিন্‌ত খুব্‌বাত (রা)

ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমায়্যা (রা) একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর বংশ পরিচয় তেমন একটা পাওয়া যায় না। ইবন সা'দ তাঁর পিতার নাম 'খুব্‌বাত' বলেছেন,[১] কিন্তু বালাজুরী বলেছেন 'খায়্যাত'।[২] প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের (রা) মা এবং মক্কার আবু হুজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর দাসী।[৩]

আল-ওয়াকিদীসহ একদল বংশবিদ্যা বিশারদ বলেছেন, হযরত 'আম্মারের (রা) পিতা ইয়াসির ইয়ামনের মাজহাজ গোত্রের 'আনসী শাখার সন্তান। তবে তাঁর ছেলে 'আম্মার মক্কার বানু মাখযুমের আযাদকৃত দাস। ইয়াসির তাঁর দু'ভাই– আল হারিছ ও মালিককে সংগে নিয়ে তাঁদের নিখোঁজ চতুর্থ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কায় আসেন। আল-হারিছ ও মালিক স্বদেশ ইয়ামনে ফিরে গেলেন, কিন্তু ইয়াসির মক্কায় থেকে যান। মক্কার রীতি অনুযায়ী তিনি আবু হুজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। আবু হুজাইফা তাঁর দাসী সুমায়্যাকে ইয়াসিরের সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁদের ছেলে 'আম্মারের জন্ম হয়। আবু হুজাইফা 'আম্মারকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সাথে রেখে দেন। যতদিন আবু হুজাইফা জীবিত ছিলেন 'আম্মার তাঁর সাথেই ছিলেন।[৪] উল্লেখ্য যে, এই আবু হুজাইফা ছিলেন নরাধম আবু জাহলের চাচা।[৫]

হযরত সুমায়্যা (রা) যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তখন মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হয়। তিনি প্রথম ভাগেই স্বামী ইয়াসির ও ছেলে 'আম্মার সহ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মক্কায় তাঁদের এমন কোন আত্মীয়-বন্ধু ছিল না যারা তাঁদেরকে কুরাইশদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। আর তাই তারা তাঁদের উপর মাত্রা ছাড়া নির্যাতন চালাতে কোন রকম ত্রুটি করেনি।

ইমাম আহমাদ ও ইবন মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন : সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তাঁরা হলেন সাত জন। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, 'আম্মার, আম্মারের মা সুমায়্যা, সুহাইব, বিলাল ও আল-মিকদাদ (রা)। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচার দ্বারা এবং আবু বকরকে তাঁর গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করেন। আর অন্যদেরকে পৌত্তলিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো।[৬]

হযরত জাবির (রা) বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন 'আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গকে শাস্তি দিচ্ছিল তখন সেই পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে বলেন :

---

১. তাবাকাত–৮/২৬৮
২. আনসাবুল আশরাফ-১/১৫৭
৩. তাবাকাত-৮/২৬৮
৪. সীরাতু ইবন হিশাম–১/২৬১; টীকা-৪; আনসাবুল আশরাফ-১/১৫৭
৫. আল-আ'লাম–৩/১৪০
৬. আল-বিদায়া-৩/২৮; কান্‌য আল 'উম্মাল-৭/১৪; আল-ইসাবা-৪/৩৩৫; হায়াতুস সাহাবা-১/২৮৮

'হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি।'[৭]

'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা) বলেন, রাসূল (সা) তাঁদের সেই অসহায় অবস্থায় দেখে বলেন :

'হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ ধৈর্য ধর, হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ ধৈর্য ধর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে।'[৮] ইবন 'আব্বাসের (রা) বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, সুমায়্যাকে (রা) আবু জাহল বল্লম মেরে হত্যা করে। অত্যাচার, উৎপীড়নে ইয়াসিরের মৃত্যু হয় এবং 'আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসিরকে তীরবিদ্ধ করা হয়, তাতেই তিনি মারা যান।

'উছমান (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে 'আল-বাতহা' উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, 'আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতার উপর উত্তপ্ত রোদে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। 'আম্মারের পিতা রাসূলকে (সা) দেখে বলে ওঠেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কালচক্র এ রকম? রাসূল (সা) বললেন : হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! ধৈর্য ধর। হে আল্লাহ! ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন।[৯]

সারাদিন এভাবে শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তাঁরা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে হযরত সুমায়্যা প্রতিদিনের মত একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহল তাঁকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পশুত্বের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সুমায়্যার দিকে বর্শা ছুড়ে মারে এবং সেটি তাঁর যৌনাঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হয় এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১০] ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

মায়ের এমন অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণে ছেলে 'আম্মারের দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন তো জুলুম-অত্যাচার মাত্রা ছাড়া রূপ নিয়েছে। রাসূল (সা) তাঁকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন :

'হে আল্লাহ, তুমি ইয়াসিরের পরিবারের কাউকে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি দিওনা।'[১১]

হযরত সুমায়্যার (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরাতের পূর্বের। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেন : ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন 'আম্মারের মা সুমায়্যা।[১২]

বদর যুদ্ধে নরাধম আবু জাহল নিহত হলে রাসূল (সা) আম্মারকে বললেন :

'আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন।'[১৩]

হযরত সুমায়্যার (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে ৬১৫ খ্রীস্টাব্দে।[১৪]

---

৭. হায়াতুস সাহাবা-১/২৯১

৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২০; আনসাবুল আশরাফ-১/১৬০, হায়াতুস সাহাবা-১/২৯১

৯. তাবাকাত-৩/১৭৭; কান্‌য আল-'উম্মাল-৭/৭২

১০. তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২

১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩১৯; টীকা-৫

১২. তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২

১৩. আল-ইসাবা-৪/৩৩৫

১৪. আল-আ'লাম-৩/১৪০

উম্মু 'উমারা (রা)

মদীনার একজন আনসারী মহিলা। উম্মু 'উমারা উপনামে তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ভালো নাম নুসাইবা। পিতার নাম কা'আব ইবন 'আমর। মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা।[১] রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] বিখ্যাত বদরী সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন কা'ব আল মাযিনীর বোন।[৩]

উম্মু 'উমারার প্রথম বিয়ে হয় যায়দ ইবন 'আসিম ইবন 'আমরের সাথে। এই যায়দ ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। তাঁর মৃত্যুর পর গাযিয়্যা ইবন 'আমরের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। প্রথম পক্ষে 'আবদুল্লাহ ও হাবীব এবং দ্বিতীয় পক্ষে তামীম ও খাওলা নামক মোট চার সন্তানের মা হন।[৪]

ইসলামের একেবারে সূচনাপর্বে হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কায় ও তার আশে-পাশের জনপদে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে চলেছেন এবং দিন দিন কঠোর থেকে কঠোরতর প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছেন। মাঝে মাঝে অন্তর মাঝে নৈরাশ্য ও হতাশা বোধ জন্ম নিলেও আল্লাহর রহমত এবং সাহায্য-সহায়তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে তাবলীগী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মাক্কী জীবনের এমন এক প্রেক্ষাপটে ইয়াছরিবের ছয় ব্যক্তি মক্কায় আসেন এবং রাসূলুল্লাহর সাথে (সা) সাক্ষাৎ করেন, কথা শোনেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াছরিবে ফিরে যান। পরের বছর হজ্জ মওসুমে তাঁরা আরো ছয় জনকে সংগে করে মক্কায় যান এবং গোপনে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সাক্ষাৎ করে বাই'আত করেন। যাকে আকাবার প্রথম বাই'আত বলা হয়। ইয়াছরিব তথা মদীনায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং তাদের অনুরোধে রাসূল (সা) দা'ঈ হিসেবে মুস'আব ইবন 'উমাইরকে (রা) তাঁদের সাথে মদীনায় পাঠান। এই ছোট্ট দলটি পরবর্তী একবছর মদীনায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচারের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁরা এত আন্তরিকভাবে কাজ করেন যে, মাত্র এক বছরের মধ্যে মদীনার প্রতিটি ঘরে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে যায়। এ সময়ের মধ্যে মদীনার অনেক বড় বড় নেতা ও অভিজাত ঘরের নারী-পুরুষ ইসলামের দা'ওয়াত কবুল করেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, পরবর্তী হজ্জ মওসুমে তিয়াত্তর মতান্তরে পঁচাত্তর জনের বিশাল একটি দল নিয়ে মুস'আব মক্কায় যান এবং 'আকাবায় রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে গোপনে সাক্ষাৎ করেন। আর সেখানে অনুষ্ঠিত হয় 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'আত। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরতের পূর্বে

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮
২. সাহাবিয়াত-২০৪
৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮
৪. তাবাকাত-৮/৪১২; আল-ইসাবা-৪/৪৭৯

হযরত মুস'আবের তাবলীগে মদীনার যে সকল নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন উম্মু 'উমারা (রা) তাঁদের একজন। কেবল তিনি নন, এ সময়কালে তাঁর গোটা খানদান মুসলমান হন। এভাবে তিনি হলেন প্রথম পর্বের একজন মুসলমান আনসারী মহিলা।[৫]

হযরত উম্মু 'উমারার জীবনের প্রথম বড় ঘটনা 'আকাবার বাই'আতে অংশগ্রহণ। 'আকাবার দ্বিতীয় বাই'আতে পঁচাত্তর জন মুসলমান অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে দুইজন মহিলা ছিলেন। উম্মু 'উমারা (রা) তার একজন। দ্বিতীয় মহিলা ছিলেন উম্মু মানী' (রা)।[৬] পুরুষদের বাই'আতের শেষে উম্মু 'উমারার স্বামী হযরত গাযিয়্যা ইবন 'আমর মহিলা দুইজনকে ডেকে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করে আরজ করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দুই মহিলাও বাই'আতের উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন : যে অঙ্গীকারের উপর তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করেছি ঐ একই অঙ্গীকারের উপর তাদেরও বাই'আত গ্রহণ করছি। হাত মেলানোর প্রয়োজন নেই। আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাইনা।[৭]

হিজরী দ্বিতীয় সনে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উম্মু 'উমারা (রা) যোগ দেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারাম চাচা হযরত হামযা (রা) সহ বহু মুসলমান শহীদ হন। আল-ওয়াকিদী বলেন :[৮] উম্মু 'উমারা তাঁর স্বামী গাযিয়্যা ইবন 'আমর ও প্রথম পক্ষের দুই ছেলে 'আবদুল্লাহ ও হাবীবের[৯] সাথে উহুদে যোগদান করেন। মূলত তিনি গিয়েছিলেন একটি পুরানো মশক সংগে নিয়ে যোদ্ধাদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এক পর্যায়ে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। চমৎকার রণকৌশলের পরিচয় দেন। শত্রুর বারোটি মতান্তরে তেরোটি আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত হয়।[১০] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে এ যুদ্ধে তিনি তীর-বর্শা দ্বারা বারোজন পৌত্তলিক সৈন্যকে আহত করেন।[১১]

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে শত্রু বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ ছাড়া আর সকলে রাসূলুল্লাহকে (সা) ছেড়ে ময়দান থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। যে কয়েকজন মুজাহিদ নিজেদের জীবন বাজি রেখে রাসূলুল্লাহর (সা) নিরাপত্তা বিধান করেন তাঁদের মধ্যে উম্মু 'উমারা, তাঁর স্বামী গাযিয়্যা ও দুই ছেলে 'আবদুল্লাহ ও হাবীবও ছিলেন।

রণক্ষেত্রের এই নাজুক অবস্থার আগে যখন মুসলিম বাহিনী খুব শক্তভাবে শত্রুবাহিনীর মুকাবিলা করছিল এবং বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল তখনো উম্মু 'উমারা (রা) হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন না। মশকে পানি ভরে নিয়ে মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন যে সবাই ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে। রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে মাত্র

৫. সাহাবিয়াত-২০৪
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৪১
৭. আনসাব আল-আশরাফ-১/২৫০; আল-ইসাবা-৪/৪৭৯; সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৬৬
৮. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮
৯. কোন কোন বর্ণনায় হাবীব-এর স্থলে 'খুবায়ব' এসেছে।
১০. তাবাকাত-৮/৪১২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৯
১১. আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২৫

গুটিকয়েক মুজাহিদ। তিনিও এগিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে জীবন বাজি রেখে অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আর তাঁর পাশে এসে অবস্থান নিলেন স্বামী ও দুই ছেলে। তিনি একদিকে রাসূলুল্লাহর (সা) উপর কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন, অপর দিকে তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে অনেককে ধরাশায়ী করে ফেলছিলেন।

উহুদ যুদ্ধের সেই মারাত্মক পর্যায়ের বর্ণনা উম্মু 'উমারা দিয়েছেন এভাবে : "আমি দেখলাম, লোকেরা রাসূলুল্লাহকে (সা) ছেড়ে পালাচ্ছে। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাদের সংখ্যা দশও হবেনা, রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে আছে। আমি, আমার দুই ছেলে ও স্বামী রাসূলুল্লাহর (সা) পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করেছি। তখন অন্য মুজাহিদরা পরাজিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহর (সা) পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রাসূল (সা) দেখলেন আমার হাতে কোন ঢাল নেই। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে পালাচ্ছে এবং তার হাতে একটি ঢাল। তিনি তাকে বললেন, ওহে, তুমি তোমার ঢালটি যে লড়ছে এমন কারো দিকে ছুড়ে মার। সে ঢালটি ছুড়ে মারে এবং আমি তা হাতে তুলে নিই। সেই ঢাল দিয়েই আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) আড়াল করতে থাকি। সেদিন অশ্বারোহী যোদ্ধারা আমাদের সাথে খুব বাজে কাজ করেছিল। যদি তারা আমাদের মত পদাতিক হতো তাহলে আমরা শত্রুদের ক্ষতি করতে সক্ষম হতাম।"

তিনি আরো বলেছেন, কোন অশ্বারোহী আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাকে তরবারির আঘাত করছিল, আর আমি সে আঘাত ঢাল দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। তারপর যেই না সে পিছন ফিরে যেতে উদ্যত হচ্ছিল অমনি আমি তার ঘোড়ার পিছন পায়ে তরবারির কোপ বসিয়ে দিচ্ছিলাম। ঘোড়াটি আরোহীসহ মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। তখনই রাসূল (সা) আমার ছেলেকে ডেকে বলছিলেন : 'ওহে উম্মু 'উমারার ছেলে! তোমার মাকে সাহায্য কর।' সে ছুটে এসে আমাকে সাহায্য করছিল। এভাবে আমি তাকে মৃত্যুর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম।[১২]

উম্মু 'উমারার ছেলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যখন মুসলিম মুজাহিদরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন আমি ও আমার মা তাঁর নিকট গিয়ে কাফিরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে শুরু করলাম। এসময় রাসূল (সা) আমাকে বললেন, তুমি উম্মু 'উমারার ছেলে? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শত্রুদের দিকে কিছু ছুড়ে মার। আমি আমার সামনের একটি লোকের দিকে একটি পাথর ছুড়ে মারলাম। লোকটি ছিল ঘোড়ার পিঠে। নিক্ষিপ্ত পাথরটি গিয়ে লাগলো ঘোড়ার একটি চোখে। ঘোড়াটি ছট্‌ফট্ করতে করতে তার আরোহীসহ মাটিতে পড়ে গেল। আর আমি লোকটির উপর পাথর ছুড়ে মারতে লাগলাম। আমার একাজ দেখে রাসূল (সা) মৃদু হাসতে থাকেন।[১৩]

---

১২. তাবাকাত-৮/৪১৩-৪১৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৯

১৩. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮০

উহুদের দিন উম্মু 'উমারা (রা) ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলেন। দামরা ইবন সা'ঈদের দাদা—উহুদের একজন যোদ্ধা, তিনি বলেছেন উম্মু 'উমারা সেদিন কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে শত্রুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। এ যুদ্ধে তাঁর দেহের তেরোটি স্থান মারাত্মকভাবে আহত হয়।[১৪]

এ সময় এক কাফিরের নিক্ষিপ্ত একটি আঘাতে হযরত রাসূলে পাকের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। পাষণ্ড ইবন কামিআ রাসূলুল্লাহকে (সা) তাক করে তরবারির একটি কোপ মারে, কিন্তু তা ফসকে যায়। মুহূর্তে উম্মু 'উম্মারা (রা) ফিরে দাঁড়ান। তিনি নরপশু ইবন কামিআর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তার সারা দেহ বর্ম আচ্ছাদিত থাকায় বিশেষ কার্যকর হলোনা। তবে সে উম্মু 'উমারাকে তাক করে এবার একটি কোপ মারে এবং তা উম্মু উমারার কাঁধে লাগে। এতে তিনি মারাত্মক আহত হন।[১৫]

ইবন কামিআ তো ভেগে প্রাণ বাঁচালো। কিন্তু উম্মু 'উমারার আঘাতটি ছিল অতি মারাত্মক। তাঁর সারা দেহ রক্তে ভিজে গেল। তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন : 'আমার মা সেদিন মারাত্মকভাবে আহত হন। রক্ত বন্ধই হচ্ছিল না। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : 'তোমার ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ কর।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে আহত হতে দেখে তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন : তোমার মাকে দেখ, তোমার মাকে দেখ। তার ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ কর। হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে জান্নাতে আমার বন্ধু করে দাও।[১৬] উম্মু 'উমারা বলেন– 'দুনিয়ায় আমার যে কষ্ট ও বিপদ আপদ এসেছে, তাতে আমার কোন পরোয়া নেই।[১৭] সেদিন রাসূল (সা) নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধান। এ সময় রাসূল (সা) কয়েকজন সাহসী সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বলেন : উম্মু 'উমারার আজকের কর্মকাণ্ড তাঁদের কর্মকাণ্ড থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এরপর প্রায় একবছর যাবত তাঁর ক্ষত স্থানের চিকিৎসা করা হয়।[১৮]

উহুদের এই মারাত্মক আক্রমণে উম্মু 'উমারার ছেলে 'আবদুল্লাহও মারাত্মকভাবে আহত হলো। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন : সেদিন আমি মারাত্মকভাবে আহত হলাম। রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছিল না। তা দেখে রাসূল (সা) বলেন : তোমার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধ। কিছুক্ষণ পর আমার মা অনেকগুলো ব্যান্ডেজ হাতে নিয়ে আমার দিকে ছুটে আসেন এবং আমার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন। রাসূল (সা) তখন পাশেই দাঁড়িয়ে। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে মা আমাকে বলেন : বেটা, ওঠো। শত্রু সৈন্যদের গর্দান মার। রাসূল (সা) তখন বলেন : ওহে উম্মু 'উমারা, তুমি যতখানি শক্তি ও সামর্থ্য রাখ, অন্যের মধ্যে তা কোথায়?

'আবদুল্লাহ আরো বর্ণনা করেন, এ সময় যে শত্রু সৈন্যটি আমাকে আহত করেছিল,

---

১৪. তাবাকাত-৮/৪১৩

১৫. প্রাগুক্ত-৮.৪১৪; ইবন হিশাম-২/৮১-৮২

১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮১

১৭. তাবাকাত-৮/৪১৪-৪১৫

১৮. প্রাগুক্ত-৮/৪১২; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৯

অদূরে তাকে দেখা গেল। রাসূল (সা) আমার মাকে বললেন : এ সেই ব্যক্তি যে তোমার ছেলেকে যখম করেছে। আমার মা বললেন : আমি তার মুখোমুখি হবো এবং তার ঠ্যাংয়ের নলা ভেঙ্গে দেব। একথা বলে তিনি তাকে আঘাত করে ফেলে দেন। তা দেখে রাসূল (সা) হেসে দেন এবং আমি তাঁর সামনের দাঁত দেখতে পাই। তারপর তিনি বলেন : উম্মু 'উমারা, তুমি বদলা নিয়েছো। তারপর আমরা দুইজনে মিলে আঘাতের পর আঘাত করে তাকে জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই। তখন রাসূল (সা) বলেন, 'উম্মু 'উমারা, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমাকে সফলকাম করেছেন।[১৯]

উহুদ যুদ্ধ শেষ হলো। মুজাহিদরা ঘরে ফিরতে লাগলেন। রাসূল (সা) 'আবদুল্লাহ ইবন কা'ব মাযিনীকে পাঠিয়ে উম্মু 'উমারার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয়ে ঘরে ফিরলেন না।

উহুদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহর (সা) ঘোষক মদীনার মুজাহিদদেরকে 'হামরা আল আসাদ'[২০] এর দিকে বেরিয়ে পড়ার ঘোষণা দেন। উম্মু 'উমারা সেখানে যাওয়ার জন্য মাজায় কাপড় পেঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান। কিন্তু ক্ষত থেকে রক্ত ক্ষরণের কারণে সক্ষম হননি।[২১]

উহুদ যুদ্ধ ছাড়াও তিনি আরো অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইবন সা'দের বর্ণনা মতে তিনি উহুদ, হুদাইবিয়া, খায়বার, কাজা 'উমরা আদায়, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধ ও অভিযানে যোগ দেন। হাকেম ও ইবন মুন্দার মতে, তিনি বদরেও যোগ দিয়েছেন। তবে ইমাম জাহাবী বলেছেন, তাঁর বদরে অংশগ্রহণের কথাটি সঠিক নয়।[২২] তবে একমাত্র ইয়ামামার যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ ও অভিযানে তার অংশগ্রহণের কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। উম্মু 'উমারার বোনও তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।[২৩]

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর ইয়ামামার অধিবাসী এবং তথাকার নেতা মুসায়লামা আল-কাজ্জাব মুরতাদ হয়ে যায়। সে ছিল একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির অত্যাচারী মানুষ। তার গোত্রে প্রায় চল্লিশ হাজার যুদ্ধ করার মত লোক ছিল। তারা সবাই তাকে সমর্থন করে। নিজের শক্তির অহমিকায় সে নিজেকে একজন নবী বলে দাবী করে এবং তার সমর্থকদের সবার নিকট থেকে জোর-জবরদস্তীভাবে স্বীকৃতি আদায় করতে থাকে। আর যারা তার নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীকে মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতো। হযরত উম্মু 'উমারার (রা) ছেলে হযরত হাবীব ইবন যায়দ 'উমান থেকে মদীনায় আসার পথে মুসায়লামার হাতে বন্দী হন। মুসায়লামা তাঁকে বলেন : 'তুমি তো সাক্ষ্য দিয়ে থাক যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। হাবীব বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। মুসায়লামা তখন বলে : না, তোমাকে একথা বলতে হবে যে, মুসায়লামা

---

১৯. প্রাগুক্ত

২০. মদীনা থেকে জুল হুলাইফার দিকে যেতে রাস্তার বাম দিকে আট মাইলের মাথায় একটি স্থান

২১. তাবাকাত-৮/৪১৩

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৮.২৮২

২৩. ইবন হিশাম-১/৪৬৬

আল্লাহর রাসূল।' হযরত হাবীব অত্যন্ত শক্তভাবে তার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা হযরত হাবীবের একটি হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তারপর সে হাবীবের নিকট একই স্বীকৃতি দাবী করে। তিনি পূর্বের মতই অস্বীকৃতি জানান। পাষাণ মুসায়লামা তাঁর দ্বিতীয় হাতটি কেটে দেয়। মোটকথা, নরাধম মুসায়লামা তার দাবীর উপর অটল থাকে, আর হযরত হাবীবও অটল থাকেন নিজের শক্ত বিশ্বাসের উপর। পাষণ্ড মুসায়লামা একটি একটি করে হযরত হাবীবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা জীবন দেওয়া সহজ মনে করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হওয়া সমীচীন মনে করেননি। এ ঘটনার কথা উম্মু উমারার (রা) কানে পৌঁছলে তিনি মনকে শক্ত করেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যদি কখনো মুসলিম বাহিনী এই ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তখন তিনিও অংশগ্রহণ করবেন এবং আল্লাহ চাইলে নিজের হাতে এই জালিমকে জাহান্নামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।[২৪]

মুসায়লামার এহেন ঔদ্ধ্যত ও বাড়াবাড়ির কথা খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) কানে এলো। তিনি এই ধর্মদ্রোহিতার মূল উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে চারহাজার সৈন্যসহ হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদকে (রা) পাঠান। উম্মু 'উমারা (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। তিনি খলীফার নিকট এই অভিযানে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন। খলীফা অনুমতি দিলেন। উম্মু 'উমারা (রা) খালিদ ইবন ওয়ালীদের (রা) বাহিনীর সাথে ইয়ামামায় গেলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। বারো শো মুজাহিদ শহীদ হলেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে, মুসায়লামার আট/নয় হাজার সৈন্য মারা যায়। অবশেষে মুসায়লামার হত্যার মধ্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়।

প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। উম্মু 'উমারা (রা) সুযোগের অপেক্ষায় আছেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য তাঁর ছেলের ঘাতক পাষণ্ড মুসায়লামা আল-কাজ্জাব। এক সময় তিনি একহাতে বর্শা ও অন্য হাতে তরবারি চালাতে চালাতে শত্রু বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে মুসায়লামার কাছে পৌঁছে যান। এ পর্যন্ত পৌঁছতে তাঁর দেহের এগারোটি স্থান নিযা ও তরবারির আঘাতে আহত হয়। শুধু তাই নয়, একটি হাত বাহু থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়। এতেও তাঁর সিদ্ধান্ত টলেনি। মোটেও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেনি। তিনি আরো একটু এগিয়ে গেলেন। মুসায়লামাকে তাক করে তরবারির কোপ মারবেন, ঠিক এমন সময় হঠাৎ এক সাথে দুইখানি তরবারির কোপ মুসায়লামার উপর এসে পড়ে। আর সে কেটে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে। তিনি বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন, ছেলে 'আবদুল্লাহ পাশে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি তাকে হত্যা করেছো? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন: একটি কোপ আমার এবং অন্যটি ওয়াহশীর। আমি বুঝতে পারছিনে কার কোপে সে নিহত হয়েছে। উম্মু উমারা (রা) দারুণ উৎফুল্ল হলেন এবং তখনই সিজদায়ে শুকর আদায় করলেন।[২৫]

---

২৪. প্রাগুক্ত; সাহাবিয়াত-২০৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮১

২৫. ইবন হিশাম-১/৪৬৬; সাহাবিয়াত-২০৮

উম্মু 'উমারার (রা) যখম ছিল খুবই মারাত্মক। একটি হাতও কাটা গিয়েছিল। একারণে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বাহিনী প্রধান হযরত খালিদ-ইবন ওয়ালীদ ছিলেন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার একজন গুণমুগ্ধ ব্যক্তি। তিনি তাঁকে খুব তা'জীমও করতেন। তিনি আপন তত্ত্বাবধানে তাঁর সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর চিকিৎসায় যাতে কোন ত্রুটি না হয় সে ব্যাপারে সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাই তিনি সুস্থ হয়ে সারাজীবন খালিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তাঁর প্রশংসায় তিনি বলতেন: তিনি একজন সহমর্মী, উঁচুমনা ও বিনয়ী নেতা। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমার সেবা ও চিকিৎসা করেন। মদীনায় ফেরার পর খলীফা আবু বকর (রা) তাঁকে প্রায়ই দেখতে যেতেন।[২৬]

হযরত উম্মু 'উমারা (রা) ছিলেন একজন মহিলা বীর যোদ্ধা। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বিস্ময়কর বাস্তবতা আমরা বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর যে রণমূর্তি আমরা উহুদ ও ইয়ামামার যুদ্ধে দেখি, তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। হযরত রাসূলে কারীম (সা) ছিলেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন উহুদের ময়দানে। রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে যেতেন। একদিন রাসূল (সা) আসলেন। তিনি তাঁকে খাবার দিলেন। রাসূল (সা) তাঁকেও তাঁর সাথে খেতে বললেন। উম্মু 'উমারা বললেন, আমি রোযা আছি। রাসূল (সা) বললেন : যখন রোযাদারের নিকট কিছু খাওয়া হয় তখন ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করে।[২৭]

খলীফা হযরত 'উমারও (রা) উম্মু 'উমারার (রা) সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতকালে একবার গনীমতের মালের মধ্যে কিছু চাদর আসে। তার মধ্যে একটি চাদর ছিল খুবই সুন্দর ও দামী। অনেকে বললেন, এটি খলীফা তনয় আবদুল্লাহর (রা) স্ত্রীকে দেওয়া হোক। অনেকে খলীফার স্ত্রী কুলছূম বিনত 'আলীকে (রা) দেওয়ার কথা বললেন। খলীফা কারো কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন, আমি এ চাদরের সবচেয়ে বেশী হকদার উম্মু 'উমারাকে মনে করি। এটি তাকেই দেব। কারণ, আমি উহুদের দিন তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : 'আমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করছিলাম, শুধু উম্মু 'উমারাকেই লড়তে দেখছিলাম।' অতঃপর তিনি চাদরটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।[২৮]

রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে এ হাদীছগুলি 'উব্বাদ ইবন তামীম ইবন যায়দ, হারিছ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন কা'ব, 'আকরামা ও লায়লা বর্ণনা করেছেন।[২৯]

হযরত উম্মু 'উমারার (রা) মৃত্যুসন সঠিকভাবে জানা যায় না। মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ পর্যন্ত যে জীবিত ছিলেন সেটা নিশ্চিত। তবে তার পরে কতদিন জীবিত ছিলেন তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেননি।

---

২৬. তাবাকাত-৮/৪১৬

২৭. প্রাগুক্ত; মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৩৯; তিরমিজী-(৭৮৫); ইবন মাজাহ-(১৭৪৮)

২৮. তাবাকাত-৮/৪১৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮১; আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২৬

২৯. আল-ইসাবা-৪/৪৮০

হযরত উম্মু 'উমারা (রা) সব সময় রাসূলের (সা) মজলিসে উপস্থিত থাকতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনতেন। এভাবে তাঁর বিশ্বাস প্রতিদিনই দৃঢ় হতো এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পেত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহকে বলেন : আমি দেখতে পাচ্ছি সব জিনিসই পুরুষদের জন্য, মহিলাদের জন্য কোন কিছুর উল্লেখ করা হয় না। অর্থাৎ তাঁর দাবী ছিল কুরআনে পুরুষদের কথা যেমন এসেছে নারীদের কথাও তেমন আসুক। তার এমন দাবীর প্রেক্ষাপটে নাযিল হলো সূরা আল-আহযাবের ৩৫তম আয়াতটি।[৩০]

৩০. তিরমিজী-৪/১১৬; প্রাগুক্ত-৪/৪৭৯

উম্মু ওয়ারাকা বিন্‌ত নাওফাল (রা)

এ পৃথিবীতে এমন অনেক মহিলা আছেন কালচক্র যাঁদেরকে লুকিয়ে রেখেছে এবং ইতিহাসও তাঁদের ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জীবনে এমন কোন ঘটনার সৃষ্টি করেছেন যাতে তাঁদের জীবনী প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আর যখন তাঁদের স্মরণ ও স্মৃতির উপর থেকে পুঞ্জিভূত ধুলি ও আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে গেছে তখন তাঁদের ছবিগুলো উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। তাঁদের একজন হলেন উম্মু ওয়ারাকা আল-আনসারিয়্যা (রা)। উম্মু ওয়ারাকা– এই উপনামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সাহাবীদের চরিত অভিধানের একটিতেও তাঁর আসল নামটি উল্লেখ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে "আশ-শাহীদা" (মহিলা শহীদ) উপাধি দান করেন।[১] তাঁর বংশ পরিচয় এ রকম : উম্মু ওয়ারাকা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ ইবন আল-হারিছ ইবন 'উওয়াইমির ইবন নাওফাল। তবে উসুদুল গাবা গ্রন্থে "উওয়াইমির'-এর স্থলে 'উমাইর' এসেছে। তিনি তাঁর বংশের এক উর্দ্ধতন পুরুষ "নাওফাল"-এর প্রতি আরোপিত হয়ে উম্মু ওয়ারাকা বিন্‌ত নাওফাল বলে পরিচিতি লাভ করেছেন।[২] তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সন সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে একথা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত যে, খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনকাল পেয়েছেন, তেমনিভাবে পেয়েছেন খলীফা আবূ বকরের (রা) খিলাফতকালের পুরোটা এবং 'উমারের (রা) খিলাফতকালের কিছুটা। তিনি সম্ভবত হিজরী বাইশ সনে শাহাদাত বরণ করেন।[৩]

উম্মু ওয়ারাকা ছিলেন একজন আনসারী মহিলা। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের অব্যবহিত পরে যে সকল মহিলা তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করে তাঁর নিকট বাই'আত করেন তিনি তাঁদের একজন।[৪] তিনি ইসলামকে অতি চমৎকার রূপে ধারণ করেন এবং আল্লাহর দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আল-কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং তার বেশীর ভাগ মুখস্থ করে ফেলেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি সমগ্র কুরআন সংগ্রহ করেন।[৫] একথা বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা) যখন কুরআন সংগ্রহ ও সংকলন করেন, তখন এই উম্মু ওয়ারাকার সংগ্রহেরও সাহায্য নেন। তিনি কুরআনের কিছু কিছু সূরা লেখা ছিল এমন কিছু সহীফা (পুস্তিকা) সংরক্ষণ করতেন।[৬] তাঁর কাছে

---

১. আল-ইসাবা-৪/৪৮১
২. উসুদুল গাবা-৫/৬২৬; তাহযীবুত তাহ্‌যীব-১২/৪৮২
৩. তাবাকাত-৯/১৬৫; নিসা' রায়িদাত, পৃ. ১০৮
৪. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৮৪; তাবাকাত-৮/৪৫৭
৫. আল-ইসাবা-৪/৫০৫
৬. নিসা' রায়িদাত-১০৮

সমগ্র কুরআন না হলেও অধিকাংশ লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ঈমানদার মহিলা। দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে অত্যন্ত দক্ষ। রাসূল (সা) মাঝে মাঝে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর গৃহে যেতেন। তিনি ছিলেন সেই সব মুষ্টিমেয় মহিলার একজন যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাসূল (সা) তাঁদের বাড়ীতে যেতেন। রাসূল (সা) তাঁর অর্থ-সম্পদ ও সমাজে উঁচু স্থানের জন্য তাঁকে এভাবে মূল্যায়ন করতেন না, বরং তাঁর আল্লাহর উপর ঈমান, দৃঢ় আকীদা-বিশ্বাস এবং দীনের বিধি-বিধানের দক্ষতা ও 'ইবাদাত-বন্দেগীর কারণে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতেন।

হিজরী ২য় সনে রাসূল (সা) বদরে মক্কার পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ খবর উম্মু ওয়ারাকার নিকট পৌঁছলো। তিনি যুদ্ধে যোগদানের জন্য জিদ ধরে বসলেন। ঘর-গৃহস্থলীর নানা রকম দায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালনের কর্তব্যসমূহ তাঁকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" (আল্লাহর পথে জিহাদ)-এর কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারলো না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ছুটে গেলেন এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন, যুদ্ধে আহতদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধবেন, রোগীদের সেবা করবেন, তাঁদের পানাহারের নিশ্চয়তা বিধান করবেন এবং যুদ্ধ চলাকালে যোদ্ধাদের প্রয়োজনে সাড়া দেবেন। তিনি সেখানে এমন সব ভূমিকা পালন করবেন যার গুরুত্ব যোদ্ধাদের ভূমিকার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাথে এই বের হওয়াতে শাহাদাতও দান করতে পারেন। আল-ইসাবার বর্ণনায় তাঁর বক্তব্য এভাবে এসেছে :[৭]

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধে যেতাম। আপনাদের অসুস্থদের সেবা করতাম, আহতদের ঔষধ পান করাতাম। এতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাহাদাতও দান করতে পারেন।' জবাবে রাসূল (সা) বলেন : 'ওহে উম্মু ওয়ারাকা! তুমি ঘরেই অবস্থান কর। নিশ্চয় আল্লাহ ঘরেই তোমার শাহাদাতের ব্যবস্থা করবেন।' অন্য একটি বর্ণনায় "আল্লাহ তোমাকে শাহাদাত দান করবেন" কথাটি এসেছে।[৮] মূলত এ দিন থেকেই রাসূল (সা) তাঁকে শহীদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে সাহাবীদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। বলতেন :[৯]

'انطلقوا بنا نزور الشهيدة' – 'তোমরা আমার সাথে চলো, আমরা এই মহিলা শহীদকে একটু দেখে আসি।' রাসূলের (সা) এ জাতীয় কথা দ্বারা এই মহিলা যে শহীদ হবেন সেদিকেই ইঙ্গিত করতেন।

---

৭. আল-ইসাবা-৪/৫০৫

৮. তাবাকাত-৮/৪৫৭; আল-ইসতী'আব-৪/৪৮১; সুনানু আবী দাউদ-১/৯৭; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-২/৩৫৭

৯. আবূ নু'আয়ম, হিলয়াতুল আওলিয়া-২/৬৩; উসুদুল গাবা-৫/৬২৬ (৭৭১৮)

ইসলামের ইতিহাসে অনেকগুলো বিষয়ে উম্মু ওয়ারাকার অগ্রগামিতার কথা জানা যায়। যেমন :

১. তিনি প্রথম মহিলা যাঁর গৃহে আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

২. মদীনায় সর্বপ্রথম তিনি মহিলাদের নামাযের জামা'আত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই জামা'আতের ইমামতি করে ন।

৩. তিনি ইসলামের প্রথম মহিলা রাসূল (সা) যাঁকে "শাহীদা" উপাধি দান করেন।

৪. ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা যাঁকে হত্যার অভিযোগে একজন দাস ও একজন দাসীকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়।[১০]

উম্মু ওয়ারাকা তাঁর নিজ বাড়ীতে একটি নামায-ঘর প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক নামাযের ওয়াকতে আযান দেওয়ার জন্য একজন মুআয্যিন নিয়োগের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা) তাঁর বাড়ীতে আযান দেওয়ার জন্য একজন মুআয্যিন ঠিক করে দেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় আযান দিতেন। উম্মু ওয়ারাকার মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।[১১] তিনি প্রথম মহিলা যিনি এ সৌভাগ্য ও গৌরবের অধিকারী হন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেছেন, আমি উম্মু ওয়ারাকার মু'আয্যিনকে দেখেছি। তিনি ছিলেন একজন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির নাম 'আবদুর রহমান।[১২]

রাসূল (সা) তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের কথা জানতেন। তাই তিনি মুআয্যিনের আযান দেওয়ার পর উম্মু ওয়ারাকাকে তাঁর নিজের বাড়ীর ও প্রতিবেশী মেয়েদের নিয়ে তাঁর বাড়ীতে জামা'আত কায়েম করার ও তাতে ইমামতি করার অনুমতি দান করেন। এ ব্যবস্থা 'উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে অর্থাৎ উম্মু ওয়ারাকার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ইসলামের ইতিহাসে তিনি প্রথম মহিলা যাঁর বাড়ীতে মেয়েদের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৩]

উম্মু ওয়ারাকার (রা) বয়স বেড়ে গেল। ছেলে-মেয়েরা বড় হলো। মেয়েদের বিয়ে হলো এবং এক এক করে তারা স্বামীর ঘরে চলে গেল। ছেলেরাও নিজ নিজ দায়িত্বের খাতিরে মায়ের নিকট থেকে দূরে যেতে বাধ্য হলো। উম্মু ওয়ারাকার বাড়ীটি এখন একেবারে শূন্য প্রায়।

তিনি নিজের সেবা ও বাড়ী-ঘর দেখাশুনা করার জন্য একজন দাস ও একজন দাসী রাখলেন। তিনি তাদের সাথে অতি ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁদেরকে কথা দেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তারা স্বাভাবিকভাবে আযাদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই দাস-দাসী খুব শীঘ্র উম্মু ওয়ারাকার মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখতে পেল

---

১০. নিসা' রায়িদাত-১১০

১১. আবূ দাঊদ-১/৯৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৯৭

১২. নিসা' মুবাশ্শারাত বিল জান্নাহ্-২৯৩

১৩. প্রাগুক্ত; সাহাবিয়াত-২১৬

না। তাদের আর তর সইলো না। তারা তাঁর পরিবারের লোকদের অনুপস্থিতিতে খালি বাড়ীতে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। সুযোগ মত এক রাতে তারা একটি কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করলো এবং নিজেদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত মনে করে পালিয়ে গেল।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উম্মু ওয়ারাকার (রা) বাড়ীর আযান ও মেয়েদের জামা'আতের তোড়জোড়ের সাড়া-শব্দ প্রতিদিন শুনতে পেতেন। একদিন তিনি বললেন, আচ্ছা গতকাল থেকে তো উম্মু ওয়ারাকা খালার কুরআন পাঠের শব্দ শুনতে পাচ্ছিনে। তাঁর কি হলো? তাঁর খবর জানার জন্য তিনি লোক পাঠালেন। লোকটি ফিরে এসে বললো বাড়ীটি বাইরে থেকে তালা মারা এবং দরজায় টোকা দিয়ে ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। 'উমারের (রা) সন্দেহ হলো। এবার তিনি নিজে গেলেন। বাড়ীতে কাকেও না দেখে ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকেই দেখলেন একটি চাদরে জড়ানো অবস্থায় তাঁর লাশ মেঝেতে পড়ে আছে। তিনি জোরে "আল্লাহু আকবার" বলে ওঠেন। তারপর মন্তব্য করেন : রাসূল (সা) যখন তাঁকে "শাহীদা" উপাধি দেন তখন সত্যই বলেছিলেন।[১৪]

তারপর 'উমার (রা) মসজিদের মিম্বরে উঠে ঘোষণা দেন যে, উম্মু ওয়ারাকা শহীদ হয়েছেন। তাঁর দুই দাস-দাসী তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে পালিয়েছে। তিনি তাদেরকে খুঁজে বের করে ধরে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। মুহূর্তে জনতা তাদের খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারা পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় ধরা পড়ে এবং তাদেরকে মদীনায় খলীফা 'উমারের (রা) সামনে হাজির করা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রথমে তারা হত্যার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করতে চাইলেও পরে স্বীকার করে যে, দু'জন একযোগে তাঁকে হত্যা করেছে। তখন 'উমার (রা) তাঁর আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন : আল্লাহর রাসূল (সা) সত্য বলেছেন যখন তিনি বলতেন : "انطلقوا بنا نزور الشهيدة"- তোমরা আমার সাথে চলো, এই শহীদকে দেখে আসি। এভাবে উম্মু ওয়ারাকা (রা) হন ইসলামের প্রথম মহিলা যাঁকে "আশ-শাহীদা" অভিধায় ভূষিত করা হয়।

দাস-দাসীর দু'জনের শাস্তি ছিল অবধারিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাদেরকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যার নির্দেশ দেন। তাদেরকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। এ দু'জন দাস-দাসী ছিল মদীনার প্রথম শূলীতে চড়ানো দু'ব্যক্তি, আর উম্মু ওয়ারাকা হলেন ইসলামের প্রথম মহিলা যাঁকে হত্যার কারণে একজন দাস ও একজন দাসীকে শূলীতে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[১৫]

দীনের তাৎপর্য গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, পাড়া-প্রতিবেশী ও তাঁর নিকট আগত মহিলাদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কারণে উম্মু ওয়ারাকা (রা) মুসলিম নারীদের একজন নেত্রীতে পরিণত হন। শাহাদাত লাভের বাসনায় জিহাদে

---

১৪. আল-ইসাবা-৪/৫০৫

১৫. আবূ দাউদ-১/৯৭; তাবাকাত-৮/৪৫৭; আল-ইসতী'আব-৪/৪৮২

যোগদানের যে ইচ্ছার কথা রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রকাশ করেন তাতে তাঁর মহত্ব ও মর্যাদা শতগুণ বেড়ে যায়।

উম্মু ওয়ারাকার (রা) নিহত হওয়ার মধ্যে এমন প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, বিশেষত সেই দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানী যদি হয় অমুসলিম। জগতে এমন বহু দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানীর কথা জানা যায় যারা তাদের মনিবদের জীবনে বহু অকল্যাণ বয়ে নিয়ে এসেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে একথাটি শুনা যায় যে, 'তুমি যার উপকার করেছো তার অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাক'। উম্মু ওয়ারাকা তাঁর দাস-দাসীর প্রতি সুন্দর আচরণ করেছিলেন, তাদেরকে মুক্তির অঙ্গীকার করেছিলেন, আর তারই পরিণতিতে তাদেরই হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। আধুনিক যুগের মুসলিম মহিলাদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

উম্মু ওয়ারাকা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে পৌত্ররা বর্ণনা করেছেন।[১৬]

---

১৬. নিসা' রায়িদাত-১১৩

উম্মু হাকীম বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভের পর মক্কা এবং পরে মদীনায় বিশ বছরের অধিক সময় আরবের লোকদেরকে, বিশেষ করে মক্কাবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। তাদেরকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করেছে। তাদের সে আচরণ ছিল এমন :[১]

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا أَكِنَّةٌ مِمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ وَفِىْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُوْنَ.

'তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'

তারা প্রেম-প্রীতির বদলা দিল শত্রুতা দ্বারা এবং কল্যাণ ও উপকারের বদলা দিল অকল্যাণ ও ক্ষতির দ্বারা, তাদের সে আচরণ ছিল এমন :[২]

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ.

'তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছবে।'

তারা হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়। তাতেও তারা তুষ্ট হতে পারেনি। বার বার যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে সব রকমের সুযোগকে কাজে লাগায়।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাদের উপর বিজয় দান করলেন। মক্কা বিজয় হলো। এতবড় বিশ্ব যখন তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে পড়লো, তারা যখন চতুর্দিকে কেবল অন্ধকার দেখতে লাগলো তখন আল্লাহর রাসূল (সা) তাদের প্রতি মহানুভবতার পরিচয় দিলেন। তাদের বিগত দিনের সকল আচরণ ক্ষমা করে দিলেন। মক্কাবাসীরা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করলো। উম্মু হাকীম, তাঁর পিতা, মাতা ও স্বামী– সকলে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এ চার জনই ছিলেন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর (সা) চরম দুশমন। ইসলামের সূচনা থেকে ঈমান আনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ বছর তাঁদের শত্রুতা ছিল মাত্রা ছাড়া।

---

১. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্-৫

২. সূরা আল-কামার-৩

উম্মু হাকীম মক্কার কুরাইশ গোত্রের আল-মাখযূমী শাখার সন্তান। উম্মু হাকীম ডাক নাম। এর অন্তরালে তাঁর আসল নামটি হারিয়ে গেছে। তা আর জানা যায় না। উম্মু হাকীমের পরিবারটি ছিল কুরাইশ বংশের মধ্যে সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের অন্যতম কেন্দ্র। পিতা আল-হারিছ ইবন হিশাম ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমী, নরাধম আবূ জাহলের ভাই। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। একজন ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইসলামের উপর অটল রাখার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) হুনাইন যুদ্ধের গণীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) থেকে একশো (১০০) উট তাঁকে দান করেন। তিনি একজন ভালো মুসলমান হন। পরবর্তীকালে একজন মুজাহিদ হিসেবে শামে যান এবং সেখানে 'তাঊন' রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[৩]

মা ফাতিমা বিনত আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমিয়্যা প্রখ্যাত সেনানায়ক খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদের (রা) বোন। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন। স্বামী আল-হারিছের শাম অভিযানে তিনিও সফর সঙ্গী হন। আল-হারিছের ঔরসে তিনি ছেলে 'আবদুর রহমান ও মেয়ে উম্মু হাকীমের জন্ম দেন।[৪]

উম্মু হাকীমের স্বামী 'ইকরিমা ইবন আবী জাহল আল-মাখযূমী জাহিলী মক্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং পরবর্তীতে একজন অতি ভালো মুসলমান হন। শাম অভিযানে বের হন এবং হিজরী ১৩ সনে আজনাদাইন, মতান্তরে ইয়ারমূক যুদ্ধে শহীদ হন। উম্মু হাকীমের মামা সাইফুল্লাহ খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ (রা)।

এমনই এক পরিবার ও পরিবেশে উম্মু হাকীম বেড়ে ওঠেন। চাচাতো ভাই 'ইকরিমাকে বিয়ে করেন। মহানবী (সা) মক্কায় রাসূল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। যে দিন তিনি ইসলামের দিকে মক্কাবাসীদেরকে আহ্বান জানালেন সেই দিন থেকে এই পরিবারটি মহানবী (সা) ও ইসলামের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য যত রকম ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার জন্য যত যুদ্ধ হয়েছে, তার সবকিছুতে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উহুদ যুদ্ধে আল-হারিছ, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা, 'ইকরিমা, তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীম ও খালিদ ইবন আল-ওয়ালীদ– কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

ইসলামের বিরোধিতা ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে কোন সুযোগকে তাঁরা হাতছাড়া করেননি। এমনকি হযরত রাসূলে কারীম (সা) যাদেরকে মহা অপরাধী বলে ঘোষণা দেন এবং কা'বার গিলাফের নীচে পাওয়া গেলেও হত্যার নির্দেশ দেন, উম্মু হাকীমের স্বামী 'ইকরিমা তাদের অন্যতম।

---

৩. আয-যাহাবী, তারীখ আল-ইসলাম-২/১৮৩-১৮৪

৪. তারীখু দিমাশ্‌ক-তারাজিম 'আন-নিসা'-৩০৫-৩০৭

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মক্কা বিজয়ের পর যে অবস্থান গ্রহণ করেন মানব জাতির ইতিহাসে তা এক অনন্য আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সে দিন তাঁর দয়া ও করুণা শত্রু-মিত্র, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলকে বেষ্টন করে। দীর্ঘদিন যাবত যারা তাঁর প্রতি অন্ধ বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করেছে, সেদিন তাঁর এই ব্যাপক ক্ষমা ও দয়া তাদের পাষাণ হৃদয়ে পরম প্রশান্তি বয়ে আনে। মুহূর্তে তাদের অন্তর জেগে ওঠে এবং ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে পতঙ্গের ন্যায় আলোর নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করে। উম্মু হাকীম নিজে তাঁর স্বামীর জন্য এই ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ গোত্রের অন্য সব মহিলা, যেমন : ফাতিমা বিন্‌ত আল-ওয়ালীদ, হিন্দ বিনত 'উতবা, ফাখ্‌তা বিন্‌ত আল-ওয়ালীদ প্রমুখের সাথে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বাই'আত করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল (সা) তাঁকে যথেষ্ট সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ কারণে মহিলা সমাজে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন।

উম্মু হাকীমের স্বামী 'ইকরিমা ছিলেন ইসলামের চরম দুশমন। মহানবীর দৃষ্টিতে মহা অপরাধী। তাই রাসূল (সা) তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করেন। মক্কা বিজয়ের পর প্রাণভয়ে তিনি ইয়ামনে পালিয়ে যান। স্ত্রী উম্মু হাকীমের চেষ্টায় তিনি মক্কায় ফিরে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর উম্মু হাকীম (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 'ইকরিমাকে হত্যা করতে পারেন, এ ভয়ে সে ইয়ামনের দিকে পালিয়ে গেছে। আপনি তাঁকে নিরাপত্তা দিন, আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দিবেন। রাসূল (সা) বললেন : সে নিরাপদ।

সেই মুহূর্তে উম্মু হাকীম স্বামী 'ইকরিমার সন্ধানে বের হলেন। সংগে নিলেন তাঁর এক রোমান ক্রীতদাসকে। তাঁরা দু'জন চলছেন। পথিমধ্যে দাসের মনে তার মনিবের প্রতি অসৎ কামনা দেখা দিল। সে চাইলো তাঁকে ভোগ করতে, আর তিনি নানা রকম টালবাহানা করে সময় কাটাতে লাগলেন। এভাবে তাঁরা একটি আরব গোত্রে পৌঁছলেন। উম্মু হাকীম তাদের সাহায্য কামনা করলেন। তারা সাহায্যের আশ্বাস দিল। তিনি দাসটিকে তাদের জিম্মায় রেখে একাকী পথে বের হলেন। অবশেষে তিহামা অঞ্চলে সাগর তীরে 'ইকরিমার দেখা পেলেন। সেখানে তিনি এক মাঝির সাথে কথা বলছেন তাকে পার করে দেওয়ার জন্য, আর মাঝি তাকে বলছেন :

– সত্যবাদী হও।

'ইকরিমা বললেন : কিভাবে আমি সত্যবাদী হবো?

মাঝি বললেন :

– তুমি বলো, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

'ইকরিমা বললেন : আমি তো শুধু এ কারণে পালিয়েছি।

তাদের দু'জনের এ কথোপকথনের মাঝখানেই উম্মু হাকীম উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন :

'হে আমার চাচাতো ভাই! আমি সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম ব্যক্তির নিকট থেকে আসছি। আমি তাঁর কাছে আপনার জন্য আমান (নিরাপত্তা) চেয়েছি। তিনি আপনার আমান মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং এরপরও আপনি নিজেকে ধ্বংস করবেন না।

'ইকরিমা জানতে চাইলেন : তুমি নিজেই তাঁর সাথে কথা বলেছো?

বললেন : হাঁ, আমিই তাঁর সাথে কথা বলেছি এবং তিনি আপনাকে আমান দিয়েছেন। বার বার তিনি তাঁকে আমানের কথা শোনাতে লাগলেন। অবশেষে আশ্বস্ত হয়ে স্ত্রীর সাথে ফিরে চললেন।[৫]

পথে চলতে চলতে উম্মু হাকীম তাঁর দাসটির অসৎ অভিপ্রায়ের কথা স্বামীকে বললেন। ফেরার পথে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই 'ইকরিমা দাসটিকে হত্যা করেন। পথিমধ্যে তাঁরা এক বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। 'ইকরিমা চাইলেন স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হতে। স্ত্রী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলেন : আমি একজন মুসলিম নারী এবং আপনি এখনো একজন মুশরিক। স্ত্রীর কথা শুনে 'ইকরিমা অবাক হয়ে গেলেন। বললেন : তোমার ও আমার মিলনের মাঝখানে যে ব্যাপারটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাতো খুব বিরাট ব্যাপার।

এভাবে 'ইকরিমা যখন মক্কার নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদের বললেন : খুব শিগ্‌গির 'ইকরিমা কুফর ত্যাগ করে মু'মিন হিসেবে তোমাদের কাছে আসছে। তোমরা তার পিতাকে গালি দেবে না। মৃত ব্যক্তিকে গালি দিলে তা জীবিতদের মনে কষ্টের কারণ হয় এবং তা মৃতের কাছেও পৌঁছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে 'ইকরিমা তাঁর স্ত্রী উম্মু হাকীমসহ রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) তাঁকে দেখেই আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাদর গায়ে না জড়িয়েই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর রাসূল (সা) বসলেন। 'ইকরিমা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন :

ইয়া মুহাম্মাদ! উম্মু হাকীম আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে আমান দিয়েছেন।

নবী বললেন : সে ঠিক বলেছে। তুমি নিরাপদ।

'ইকরিমা বললেন : মুহাম্মাদ আপনি কিসের দা'ওয়াত দিয়ে থাকেন?

রাসূল (সা) বললেন : আমি তোমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছি তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তারপর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এভাবে তিনি ইসলামের সবগুলি আরকান বর্ণনা করলেন।

---

৫. আ'লাম আন-নিসা'-১/২৮১

'ইকরিমা বললেন : আল্লাহর কসম! আপনি কেবল সত্যের দিকেই দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং কল্যাণের কথা বলছেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন :

'এ দা'ওয়াতের পূর্বেই আপনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী ও সৎকর্মশীল। তারপর 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্নাকা 'আবদুহু ওরাসূলুহু'– বলতে বলতে রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে হাত বাড়িয়ে দেন।

রাসূল (সা) বললেন : তুমি বলো, 'উশহিদুল্লাহা ওয়া উশহিদু মান হাদারা আন্নি মুসলিমুন মুজাহিদুন মুহাজিরুন'– আল্লাহ ও উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি একজন মুসলিম, মুজাহিদ ও মুহাজির।

'ইকরিমা তাই উচ্চারণ করলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকে বললেন : অন্য কাউকে আমি দিচ্ছি, এমন কোন কিছু আজ যদি আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।'

'ইকরিমা বললেন : আমি চাচ্ছি, যত শত্রুতা আমি আপনার সাথে করেছি, যত যুদ্ধে আমি আপনার মুখোমুখি হয়েছি এবং আপনার সামনে অথবা পিছনে যত কথাই আমি আপনার বিরুদ্ধে বলেছি– সবকিছুর জন্য আপনি আল্লাহর কাছে আমার মাগফিরাত কামনা করুন।

রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! যত শত্রুতা সে আমার সাথে করেছে, তোমার নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হতে যত পথই সে ভ্রমণ করেছে– সবকিছুই তাকে ক্ষমা করে দাও। আমার সামনে বা অগোচরে আমার মানহানিকর যত কথাই সে বলেছে, তা-ও তুমি ক্ষমা করে দাও।

আনন্দে 'ইকরিমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যতকিছু আমি ব্যয় করেছি তার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে ব্যয় করবো এবং আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যত যুদ্ধ আমি করেছি, তার দ্বিগুণ যুদ্ধ আমি আল্লাহর পথে করবো।[৬]

এদিন থেকেই তিনি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কাফেলায় শরীক হলেন এবং ইয়ারমূক যুদ্ধে শাহাদাত বরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কৃত অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেন।

উম্মু হাকীম (রা) স্বামী 'ইকরিমার (রা) সাথে রোমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য শামে যান। ইয়ারমূক রণাঙ্গনে রোমান ও মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশ রমণীরা অসি চালনায় পুরুষ যোদ্ধাদেরকেও হার মানায়। এই রমণীদের মধ্যে উম্মু হাকীমও একজন। এই ইয়ারমূক যুদ্ধে উম্মু হাকীম (রা) স্বামীকে হারান। 'ইকরিমা (রা) এ যুদ্ধে শহীদ হন।[৭] চার মাস দশ দিন 'ইদ্দাত পালনের পর বহু লোক

---

৬. আত-তাবারী, তারীখ-২/১৬০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/২৯৭; আল-আ'লাম-২/২৬৯; উসুদুল গাবা-৫/৫৭৭; আসহাবে রাসূলের জীবনকথা-১/২০৫-২০৮

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/৩২৪; আল-ইসাবা-৪/৪২৬

তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানও (রা) তাঁদের একজন। তিনি সকলকে হতাশ করে খালিদ ইবন সা'ঈদ ইবন আল-'আসের (রা) প্রস্তাবে সাড়া দেন। চার শো দীনার মাহরের বিনিময়ে তাঁর সাথে বিয়ে সম্পন্ন হয়। 'আকদ সম্পন্ন হলেও বাসর শয্যার পূর্বেই দিমাশকের দক্ষিণে সংঘটিত "মারজ আস-সাফার" যুদ্ধের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মুসলিম সৈনিকরা সেখানে চলে যায়। হযরত খালিদ (রা) যুদ্ধে যাওয়ার আগেই স্ত্রীর সাথে বাসর সম্পন্ন করতে চাইলেন। স্ত্রী উম্মু হাকীম বললেন : শত্রু বাহিনীর এই সমাবেশ পর্যুদস্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।

খালিদ (রা) বললেন : আমার অন্তর বলছে এই যুদ্ধে আমি শাহাদাত বরণ করবো। উম্মু হাকীম (রা) আর আপত্তি করলেন না। মারজ আস-সাফারে একটি পুলের ধারে একটি তাঁবুর মধ্যে তাঁদের বাসর শয্যা রচিত হয় এবং সেখানে তাঁরা রাত্রি যাপন করেন।

পরবর্তীকালে এ পুলটির নাম হয়– "কানতারাতু উম্মি হাকীম"– উম্মু হাকীমের পুল। সকালে ওলীমা ভোজও হয়। ভোজ শেষ হতে না হতেই রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। খালিদ (রা) শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বীরের মত যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। উম্মু হাকীম (রা) তখনো নববধূর সাজে। হাতে মেহেদীর রং, দেহে সুগন্ধি। যে তাঁবুতে রাতে বাসর করেছেন, তার একটি খুঁটি উঠিয়ে হাতে তুলে নিলেন। সেই তাঁবুর পাশেই তিনি রোমান সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং সেই খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে সেদিন তিনি সাতজন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।[৮]

উম্মু হাকীম (রা) আবার বিধবা হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে বিয়ে করেন এবং এখানে তাঁর গর্ভে কন্যা ফাতিমা বিনত 'উমারের জন্ম হয়। ফাতিমার চাচা যায়দ ইবন আল-খাত্তাবের ছেলের সাথে এই ফাতিমার বিয়ে হয়।[৯]

বিভিন্ন ঘটনার আলোকে বুঝা যায় উম্মু হাকীম (রা) স্বামী হযরত 'উমারের (রা) জীবদ্দশায় তাঁরই খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন। আল্লামা যিরিক্‌লী সুনির্দিষ্টভাবে হিজরী ১৪ সনের কথা বলেছেন।[১০]

---

৮. আল-ইসতী'আব-৪/৪২৫; তারীখু দিমাশ্‌ক-৫০৬; উসুদুল গাবা-৫/৫৭৭; আ'লাম আন-নিসা'-১/২৮১; আল-ইসাবা-৪/৪২৬

৯. আত-তাবারী, তারীখ-২/৫৬৪; আয-যাহাবী, তারীখ-৩/২৭৪-২৭৫; নাসাবু তুরায়শা-৩০৩

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৮৯

উমামা বিন্‌ত আবিল 'আস (রা)

হযরত উমামার বড় পরিচয় তিনি হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দৌহিত্রী। তাঁর পিতা আবুল 'আস (রা) ইবন রাবী' এবং মাতা যায়নাব (রা) বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা)। উমামা তাঁর নানার জীবদ্দশায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের অনেক আগেই নানী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইনতিকাল করেন। উমামার দাদী ছিলেন হযরত খাদীজার ছোট বোন হালা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ। হিজরী ৮ম সনে উমামার মা এবং দ্বাদশ সনে পিতা ইনতিকাল করেন।[১]

নানা হযরত রাসূলে কারীম (সা) শিশু উমামাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। সব সময় তাকে সংগে সংগে রাখতেন। এমনকি নামাযের সময়ও কাছে রাখতেন। মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, রাসূল (সা) তাকে কাঁধের উপর বসিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। রুকূ'তে যাওয়ার সময় কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতেন। তারপর সিজদায় গিয়ে তাকে মাথার উপর বসাতেন এবং সিজদা থেকে উঠার সময় কাঁধের উপর নিয়ে আসতেন। এভাবে তিনি নামায শেষ করতেন। এ আচরণ দ্বারা উমামার প্রতি তাঁর স্নেহের আধিক্য কিছুটা অনুমান করা যায়।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হযরত আবূ কাতাদা (রা) বলেন, একদিন বিলাল আযান দেওয়ার পর আমরা জুহর, মতান্তরে আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষায় আছি, এমন সময় রাসূল (সা) উমামা বিন্‌ত আবিল 'আসকে কাঁধে বসিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। উমামা তখনও তার নানার কাঁধে একইভাবে বসা।

রাসূল (সা) রুকূ'তে যাবার সময় তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখেন। তারপর রুকূ'-সিজদা শেষ করে যখন উঠে দাঁড়ান তখন আবার তাঁকে ধরে কাঁধের উপর উঠিয়ে নেন। প্রত্যেক রাক'আতে এমনটি করে তিনি নামায শেষ করেন।[২]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) বর্ণনা করেছেন। হাবশার সম্রাট নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহকে (সা) কিছু স্বর্ণের অলঙ্কার উপহার হিসেবে পাঠান, যার মধ্যে একটি স্বর্ণের আংটিও ছিল। রাসূল (সা) সেটি উমামাকে দেন।[৩]

উমামার প্রতি রাসূলুল্লাহর (সা) স্নেহের প্রবলতা আরেকটি ঘটনার দ্বারাও অনুমান করা যায়। একবার রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মুক্তা বসানো স্বর্ণের একটি হার আসে। হারটি হাতে করে ঘরে এসে বেগমদের দেখিয়ে বলেন : দেখ তো, এটি কেমন? তাঁরা সবাই

---

১. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়াতিন নুবুওয়াহ্-৫৩৬-৫৩৭

২. সুনানু নাসাঈ-২/৪৫, ৩/১০; তাবাকাত-৮/২৩২; আল ইসাবা-৪/২৩৬; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৮২

৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৮৯

বলেন : অতি চমৎকার! এর চেয়ে সুন্দর হার আমরা এর আগে আর দেখিনি। রাসূল (সা) বললেন : এটি আমি আমার পরিবারের মধ্যে যে আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় তার গলায় পরিয়ে দেব। 'আইশা (রা) মনে মনে ভাবলেন, না জানি তিনি এটা আমাকে না দিয়ে অন্য কোন বেগমের গলায় পরিয়ে দেন কিনা। অন্য বেগমগণও ধারণা করলেন, এটা হয়তো 'আইশার (রা) ভাগ্যেই জুটবে। এদিকে বালিকা উমামা তাঁর নানা ও নানীদের অদূরেই মাটিতে খেলছিল। রাসূল (সা) এগিয়ে গিয়ে তার গলায় হারটি পরিয়ে দেন।[৪]

হযরত উমামার (রা) পিতা আবুল 'আস ইবন রাবী' (রা) হিজরী ১২ সনে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর মামাতো ভাই যুবাইর ইবন আল-'আওয়ামের সাথে উমামার বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছার কথা বলে যান। এদিকে উমামার খালা হযরত ফাতিমাও (রা) ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বামী 'আলীকে বলে যান, তাঁর পরে তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করেন। অতঃপর উমামার (রা) বিয়ের বয়স হলো। যুবাইর ইবন আল-'আওয়াম (রা) হযরত ফাতিমার (রা) অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় 'আলীর (রা) সাথে উমামার (রা) বিয়ে সম্পন্ন হলো। তখন আমীরুল মু'মিনীন 'উমারের (রা) খিলাফতকাল।

হিজরী ৪০ সন পর্যন্ত তিনি 'আলীর (রা) সাথে বৈবাহিক জীবন যাপন করেন। এর মধ্যে 'আলীর (রা) জীবনের উপর দিয়ে নানা রকম ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। অবশেষে হিজরী ৪০ সনে তিনি আততায়ীর হাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এই আঘাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্ত্রী উমামাকে বলেন, আমার পরে যদি তুমি কোন পুরুষের প্রয়োজন বোধ কর, তাহলে আল-মুগীরা ইবন নাওফালকে বিয়ে করতে পার। তিনি আল-মুগীরাকেও বলে যান, তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করেন। তিনি আশংকা করেন, তাঁর মৃত্যুর পরে মু'আবিয়া (রা) উমামাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন। তাঁর এ আশংকা সত্যে পরিণত হয়। তিনি ইনতিকাল করলেন। উমামা 'ইদ্দত তথা অপেক্ষার নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত করলেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) মোটেই দেরী করলেন না। তিনি মারওয়ানকে লিখলেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে উমামার নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠাও এবং এ উপলক্ষে এক হাজার দীনার ব্যয় কর। এ খবর উমামার (রা) কানে গেল। তিনি সাথে সাথে আল-মুগীরাকে লোক মারফত বললেন, যদি আপনি আমাকে পেতে চান, দ্রুত চলে আসুন। তিনি উপস্থিত হলেন এবং হযরত হাসান ইবন 'আলীর (রা) মধ্যস্থতায় বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়।[৫] এই আল-মুগীরার স্ত্রী থাকা অবস্থায় মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। 'আলীর (রা) ঘরে উমামার (রা) কোন সন্তান হয়নি। তবে আল-মুগীরার ঘরে তিনি এক ছেলের মা হন

---

৪. আল-ইসতী'আব-৪/২৩৮; উসুদুল গাবা-৫/৪০০; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-২/৪৫২; দুররুস সাহাবা ফী মানাকিব আল-কারাবাহ্ ওয়াস সাহাবা-৫৩৫; আ'লাম আন-নিসা'-১/৭৭

৫. আল-ইসাবা-৪/২৩৭

এবং তার নাম রাখেন ইয়াহইয়া। এ জন্য আল-মুগীরার ডাকনাম হয় আবূ ইয়াহইয়া।[৬] তবে অনেকে বলেছেন, আল-মুগীরার ঘরেও তিনি কোন সন্তানের মা হননি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যাদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমা (রা) ছাড়া আর কারো বংশধারা অব্যাহত নেই। হতে পারে আল-মুগীরার ঔরসে ইয়াহইয়া নামের এক সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু শিশুকালেই তার মৃত্যু হয়। উমামার মৃত্যুর মাধ্যমে নবী দুহিতা যায়নাবের (রা) বংশধারার সমাপ্তি ঘটে। কারণ তাঁর পূর্বেই যায়নাবের পুত্রসন্তান আলীর মৃত্যু হয়।[৭]

---

৬. প্রাগুক্ত; উসুদুল গাবা-৫/৪০০; আ'লাম আন-নিসা'-১/৭৭

৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বাতিন নুবুওয়াহ্-৫৩৮; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৮০

খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা)

হযরত খাওলা (রা) মক্কার বানূ সুলাইম গোত্রের হাকীম ইবন উমাইয়্যার কন্যা। ডাকনাম উম্মু সুরাইক।[১] তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) সহধর্মিনী। এই 'উছমান (রা) মদীনায় হিজরাতকারী মুহাজিরদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বদর যুদ্ধের পর মদীনায় ইনতিকাল করেন। রাসূল (সা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনার আল-বাকী' গোরস্তানে দাফন করেন। আল-বাকী' গোরস্তানে দাফনকৃত তিনি প্রথম সাহাবী। খাওলা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) খালা সম্পর্কীয় ছিলেন।[২]

মক্কায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনাপর্বে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন নারী-পুরুষ আগে-ভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদের একজন। ইসলাম গ্রহণের আগেই 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ঈমানের মজাদার স্বাদ পূর্ণরূপে পেয়ে যান এবং সত্যের আলো তাঁর চোখের সকল পর্দা ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য ও সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) আত্মীয়া হওয়ার কারণে এ কাজ আরো সহজ হয়ে যায়। মক্কায় প্রতিদিন রাসূলুল্লাহর (সা) ঘর-গৃহস্থলীসহ সকল সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন। মদীনায় গিয়েও আমরণ এ কাজ অব্যাহত রাখেন। রাসূলুল্লাহর জীবনের কয়েকটি বড় ঘটনার সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইবন 'আবদিল বার (রহ) তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : كانت امرأة صالحة فاضلة

'তিনি ছিলেন সৎকর্মশীলা ও গুণসম্পন্না মহিলা।' হযরত 'উমার ইবন 'আবদিল 'আযীয (রহ)ও তাঁকে সৎকর্মশীলা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে উল্লেখ করেছেন :[৩]

زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون.

'সৎকর্মশীলা মহিলা 'উছমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম ধারণা করেছেন।'

এভাবে অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞই তাঁকে সৎকর্মশীলা মহিলা বলে উল্লেখ করেছেন।

---

১. তাবাকাত-৮/১৫৮; আল-ইসতী'আব-৪/২৮১; উসুদুল গাবা-৫/৪৪৪; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪১৫

২. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪০৯

৩. আল-ইসাবা-৪/২৯৩

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রথমা ও প্রিয়তমা স্ত্রী। রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কী জীবনের সকল সংকটে তিনি ছিলেন একান্ত সংগিনী। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দিতেন, সমবেদনা প্রকাশ এবং পাশে থেকে সকল বাধা অতিক্রমে সাহায্য করতেন। এমন একজন অন্তরঙ্গ স্ত্রী ও বান্ধবীর তিরোধানে রাসূল (সা) দারুণ বিমর্ষ ও বেদনাহত হয়ে পড়েন। তাছাড়া খাদীজা ছিলেন রাসূলুল্লাহর সন্তানদের জননী ও গৃহকর্ত্রী। তাঁর অবর্তমানে মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালন ও ঘর সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উপরন্তু পৌত্তলিকদের জ্বালাতন ও উৎপাতের মাত্রাও বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহর (সা) এমন অবস্থা তাঁর সাহাবীদেরকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে।

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) জীবনের এমনই এক দুঃসময়ে খাওলা একদিন গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এবং তাঁকে বিমর্ষ দেখে বলে ফেললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে হচ্ছে, খাদীজার তিরোধানে আপনি বেদনাকাতর হয়ে পড়েছেন এবং তাঁর অভাব বোধ করছেন। রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, তা ঠিক। সে ছিল আমার সন্তানদের মা এবং ঘরের কর্ত্রী। নানা কথার ফাঁকে এক সময় খাওলা অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে বলে ফেললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : পাত্রীটি কে? খাওলা বললেন : বিধবা ও কুমারী– দুই রকম পাত্রীই আছে। আপনি যাকে পসন্দ করেন তার ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে। তিনি আবার জানতে চাইলেন : পাত্রী কে? খাওলা বললেন : বিধবা পাত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রী আবূ বকরের মেয়ে 'আয়িশা। রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, এ ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য মহিলারা যোগ্যতর।[৪] যাও, তুমি তাদের দু'জনের নিকট আমার প্রস্তাব দাও।

রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে খাওলা সর্বপ্রথম 'আয়িশা না সাওদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটু মতপার্থক্য আছে। যাই হোক, তিনি গেলেন সাওদার গৃহে এবং সাওদাকে দেখেই বলে উঠলেন : আল্লাহ তোমার মধ্যে কী এমন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করেছেন? সাওদা বললেন : একথা কেন? বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার বিয়ের পয়গাম দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। সাওদা বললেন : আমি চাই, তুমি আমার পিতার সাথে কথা বলো।

সাওদার (রা) পিতা তখন জীবনের প্রান্তসীমায়। পার্থিব সকল কর্মতৎপরতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়েছেন। খাওলা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে 'আন'ইম সাবাহান' (সুপ্রভাত) বলে জাহিলী রীতিতে সম্ভাষণ জানান।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করেন : কে তুমি? খাওলা উত্তর দেন : আমি খাওলা বিন্‌ত হাকীম। বৃদ্ধ তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে কাছে বসান। খাওলা বিয়ের পয়গাম পেশ করেন এভাবে : মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ ইবন 'আবদুল মুত্তালিব সাওদাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছেন। বৃদ্ধ বলেন :

---

৪. তাবাকাত-৮/৫৭; সীরাতে 'আয়িশা (রা)-২৪

এতো অভিজাত কুফু। তোমার বান্ধবী সাওদা কি বলে? খাওলা বলেন : তার মত আছে। বৃদ্ধ সাওদাকে ডাকতে বলেন। সাওদা উপস্থিত হলে বলেন : আমার মেয়ে! এই মেয়েটি (খাওলা) বলছে, মুহাম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন। অভিজাত পাত্র। আমি তাঁর সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই, তুমি কি রাজি? সাওদা বলেন : হাঁ, রাজি। তখন বৃদ্ধ খাওলাকে বলেন : তুমি যাও, মুহাম্মাদকে ডেকে আন। রাসূল (সা) বরবেশে উপস্থিত হন এবং সাওদার পিতা সাওদাকে তাঁর হাতে তুলে দেন।[৫]

খাওলা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সম্মতি পেয়ে আবূ বকরের বাড়ীতে গিয়ে 'আয়িশার (রা) মা উম্মু রূমানের (রা) সাথে দেখা করলেন এবং বললেন : উম্মু রূমান! আল্লাহ আপনাদের বাড়ীতে কী এমন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করেছেন? তিনি বললেন : এমন কথা কেন? খাওলা বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে 'আয়িশার বিয়ের পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন। উম্মু রূমান বললেন : একটু অপেক্ষা কর, আবূ বকর এখনই এসে পড়বেন। আবূ বকর ঘরে ফিরলেন এবং খাওলা তাঁর নিকট প্রস্তাবটি পাড়লেন। উল্লেখ্য যে, জাহিলী আরবের রীতি ছিল, তারা আপন ভাইয়ের সন্তানদের যেমন বিয়ে করা বৈধ মনে করতো না, তেমনিভাবে সৎ ভাই, জ্ঞাতি ভাই বা পাতানো ভাইয়ের সন্তানদেরকেও বিয়ে করা সঙ্গত ভাবতো না। এ কারণে প্রস্তাবটি শুনে আবূ বকর বললেন : খাওলা! 'আয়িশা তো রাসূলুল্লাহর (সা) ভাতিজী। সুতরাং এ বিয়ে হয় কেমন করে? খাওলা ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন : রাসূল (সা) বললেন : আবূ বকর আমার দীনী ভাই। আর এ ধরনের ভাইদের সন্তানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা যায়। আবূ বকর (রা) প্রস্তাব মেনে নেন এবং খাওলাকে বলেন রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসতে। অতঃপর খাওলা রাসূলকে (সা) নিয়ে গেলেন এবং বিয়ের কাজ সম্পন্ন হলো।[৬]

হযরত খাওলার (রা) স্বামী হযরত 'উছমান ইবন মাজ'উন (রা) মক্কায় প্রথম পর্বের একজন মুসলমান। পৌত্তলিকদের হাতে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। তিনি হাবশায়ও হিজরাত করেন এবং কিছুকাল পরে আবার মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত খাওলার হাবশায় হিজরাতের কোন কথা পাওয়া যায় না। 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) সঙ্গে খাওলার বিয়ে যদি ইসলামের প্রথম পর্বেই হয়ে থাকে তাহলে তিনিও 'উছমানের পরিবারের সদস্য হিসেবে কুরাইশদের যুলম-নির্যাতনের যাতায় পিষ্ট হয়ে থাকবেন। সেসব তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরাত করেন– একথা জানা যায়।

---

৫. তাবারী : তারীখ-২/২১১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-২/১৩০, আয-যাহাবী : তারীখ-১/১৬৬; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০৮; মুসনাদে আহমাদ-৬/২১০; তাবাকাত-৮/৫৩

৬. সাহীহ বুখারী, বাবু তাযবীয আস-সিগার মিনাল কিবার; ইবন কাছীর, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবীয়্যাহ-১/৩১৬-৩১৮; আসহাবে রাসূলের জীবন কথা-৫/৫৬

হযরত 'উছমান ইবন মাজ'উনের (রা) স্বভাবে রুহবানিয়্যাত বা বৈরাগ্যের প্রতি গভীর ঝোঁক ছিল। 'ইবাদাত ও শবগোজারী ছিল তাঁর প্রিয়তম কাজ। সারা রাত নামায আদায় করতেন। বছরের অধিকাংশ দিন রোযাও রাখতেন। বাড়ীতে একটা ঘর ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। রাত দিন সেখানে ই'তিকাফ করতেন। এক পর্যায়ে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি একেবারেই উদাসীন হয়ে পড়েন। হযরত খাওলার (রা) অভ্যাস ছিল নবীগৃহে আসার এবং রাসূলুল্লাহর বেগমদের খোঁজ-খবর নেওয়ার। একদিন তিনি নবীগৃহে আসেন। নবীর (সা) বেগমগণ তাঁর মলিন বেশ-ভূষা দেখে জিজ্ঞেস করেন : তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার স্বামী তো কুরাইশদের মধ্যে একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তিনি বললেন : তাঁর সাথে আমার কী সম্পর্ক! তিনি দিনে রোযা রাখেন, রাতে নামায পড়েন। বেগমগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহর (সা) গোচরে আনেন। তিনি সাথে সাথে 'উছমান ইবন মাজ'উনের বাড়ীতে ছুটে যান এবং তাঁকে ডেকে বলেন : 'উছমান! আমার জীবন কি তোমার জন্য আদর্শ নয়? 'উছমান বললেন : আমার মা-বাবা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনি এমন কথা বলছেন কেন? রাসূল (সা) বললেন : তুমি দিনে রোযা রাখ এবং সারা রাত নামাযে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও। বললেন : হাঁ, এমনই করে থাকি। ইরশাদ হলো! এমন আর করবে না। তোমার উপর তোমার চোখের, তোমার দেহের এবং তোমার পরিবার-পরিজনের হক বা অধিকার আছে। নামায পড়, আরাম কর, রোযাও রাখ এবং ইফতার কর। এই হিদায়াতের পর তাঁর স্ত্রী খাওলা আবার একদিন নবীগৃহে আসলেন। সেদিন নববধূর সাজে সজ্জিত ছিলেন। দেহ থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল।[৭]

হযরত খাওলা (রা) একজন সুভাষিণী মহিলা ছিলেন। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। কোমল আবেগ-অনুভূতির অধিকারিণী ছিলেন। কাব্যচর্চাও করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী 'উছমানের (রা) ইনতিকালের পর তিনি একটি মরসিয়া রচনা করেন, তার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :[৮]

ياعين جودى بدمع غير ممنون + على رزية عثمان بن مظعون

على امرئ بات فى رضوان خالقه + طوبى له من فقيد الشخص مدقون

طاب البقيع له سكنى وغرقده + وأشرقت أرضه من بعد تفتين

وأروث القلب حزنا لاانقطاع له + حتى الممات فما ترقاله شونى.

হে আমার চক্ষু! অবিরত অশ্রু বর্ষণ কর
'উছমান ইবন মাজ'উনের বড় বিপদে।

---

৭. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-১/১৫৭, ১৫৮; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৬

৮. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৬৯; হায়াতুস সাহাবা-২/৬১১

এমন ব্যক্তির জন্য যে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য রাত্রি অতিবাহিত করেছে,
দাফনকৃত সেই মৃত ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ।
তার জন্য বাকী' আবাসস্থল বানিয়েছে, বৃক্ষ ছায়া দান করেছে,
তার ভূমি আলোকিত হয়েছে প্রস্তরময় ভূমি হিসেবে পড়ে থাকার পর,
অন্তরকে ব্যথা ভারাক্রান্ত করেছে– মৃত্যু পর্যন্ত যার শেষ নেই।
আমার অশ্রু প্রবাহের শিরাগুলো তার জন্য অশ্রু প্রবাহে অক্ষম হয়ে পড়বে।

হিজরী ২য় সনে খাওলা (রা) বিধবা হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। সবসময় বিমর্ষ থাকতেন। হাদীছ ও সীরাতের গ্রন্থসমূহের বর্ণনায় জানা যায়, বেশ কিছু নারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদেরকে নবীর (সা) নিকট বিয়ের জন্য নিবেদন করেছিলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, খাওলা তাঁদের একজন। 'উরওয়া ইবন আয-যুবাইর (রা) বলেন : আমরা বলাবলি করতাম যে, খাওলা নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিজেকে নিবেদন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সৎকর্মশীলা মহিলা। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : যে সকল নারী নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট অর্পণ করেছিলেন, এমন কাউকে তিনি গ্রহণ করেননি। যদিও আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) এমন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। এ এখতিয়ার কেবল তাঁকেই দান করা হয়েছিল। আল্লাহ বলেন :[৯]

وامرأةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِيِّ إنْ أرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا.

'কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ।'[১০]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ ধরনের নারীকে মু'মিন নারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এটা তাঁদের জন্য বিরাট গর্ব, গৌরব ও সফলতা। হযরত খাওলাও এ গর্ব ও গৌরবের অধিকারিণী।

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে জিহাদে অংশগ্রহণের গৌরবও অর্জন করেন। তায়িফ অভিযানে তিনি শরীক ছিলেন। এ সময় তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আবেদন জানান : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তায়িফ বিজয় হয় তাহলে আমাকে বাদিয়া বিন্ত গায়লান অথবা ফারি'আ বিন্ত 'আকীলের অলঙ্কার দান করবেন। উল্লেখ্য যে, এ দু'জনের অলঙ্কার ছিল ছাকীফ গোত্রের মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : তাদের ব্যাপারে এখনো আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং আমি ধারণা করি না যে, এখনই আমরা তাদেরকে জয় করবো। খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট থেকে

---

৯. সূরা আল-আহযাব-৫০

১০. তাফসীর আল-কুরতুবী ও তাফসীর ইবন কাছীর-সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৫০, ৫১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৫/২৫৯; তাবাকাত-৮/১৫৮; আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৭/২৮৭

বেরিয়ে এসে একথা 'উমার ইবন আল-খাত্তাবকে (রা) বললেন। 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! খাওলা যে একটি কথা বলছে এবং সে ধারণা করছে যে আপনি তা বলেছেন– এটা কী? রাসূল (সা) বললেন : আমি তা বলেছি। 'উমার (রা) বললেন : আমি কি প্রস্থানের ঘোষণা দেব? রাসূল (সা) বললেন : হাঁ, দাও। 'উমার (রা) প্রস্থানের ঘোষণা দেন।[১১]

হযরত খাওলা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কিছু হাদীছও সংরক্ষণ করেছিলেন। তাঁর সূত্রে মোট পনেরোটি (১৫) হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ তাঁদের সংকলনে সেগুলো বর্ণনা করেছেন। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও সা'ঈদ ইবন আল-মুসায়্যিব, বিশর ইবন সা'ঈদ, 'উরওয়া (রহ) ও আরো অনেকে তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১২]

---

১১. ইবন হিশাম, আস-সীরাহ্-২/৪৮৪; উসুদুল গাবা-৫/৪৪৪; আল-ইসাবা-৪/২৯১; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যাহ্-৩/৮১. ৮২

১২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৭০; সাহাবিয়াত-২৫১

খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা)

হযরত খাওলার (রা) পিতার নাম ছা'লাবা ইবন আসরাম। ইবন হাজার তাঁর পিতার নাম মালিক ও দাদার নাম ছা'লাবা বলেছেন।[১] মদীনার খাযরাজ গোত্রের বানূ 'আওফের সন্তান। কেউ কেউ তাঁর নাম খাওলার পরিবর্তে 'খুওয়ায়লা' বলেছেন।[২] মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আসার পর তাঁর নিকট বাই'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করেন। তাঁর পরিবারটি ছিল একটি ইসলামী পরিবার। তিন ভাই বাহহাছ, 'আবদুল্লাহ ও ইয়াযীদ (রা)– সবাই ছিলেন বিখ্যাত আনসারী সাহাবা। মদীনায় ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা 'উবাদা ইবন আস-সামিতের (রা) ভাই আওস ইবন আস-সামিত (রা)। এই আওস (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। ফিলিস্তীনের রামাল্লায় হিজরী ৩২ সনে ৭২ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[৩]

'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, ইসলামী যুগে "জিহার" সংক্রান্ত ব্যাপার সর্বপ্রথম আওস ইবন আস-সামিত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।[৪] আর তাঁর স্ত্রী ছিলেন খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা)।

জাহিলী আরব সমাজে প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী-স্ত্রীতে একটু মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ হলে স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে বলতো : أنت كظهر أمي – এই বাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো : তুমি আমার জন্যে এমন, যেমন আমার মায়ের পৃষ্ঠদেশ। এরূপ কথার স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না, বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে যারা তার জন্যে মুহাররাম। এ ধরনের কথা বলাকেই ফিকাহ্‌র পরিভাষায় 'যিহার' (ظهار) বলে। আরবী ভাষায় ظهار শব্দটি ظَهْرٌ হতে নির্গত। এর প্রচলিত অর্থ সওয়ারী, যার উপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবীতে 'যাহ্‌র' (ظهر) বলা হয়। কেননা তার পিঠের উপর আরোহণ করা হয়। জাহিলী যুগের আরবের লোকেরা নিজের স্ত্রীকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো : 'তোমাকে 'যাহ্‌র'– সওয়ারী বানানো আমার জন্যে নিজের মাকে সওয়ারী বানানোর মতই হারাম। এ কারণে এ ধরনের বাক্য বা উক্তি মুখে উচ্চারণ করাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার' (ظهار) বলা হতো। জাহিলিয়াতের যুগে আরবে এ ধরনের বাক্য তালাক– বরং তার চেয়েও বেশী শক্তভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করার সমতুল্য মনে করা হতো।

---

১. আল-ইসাবা-৪/২৮৯

২. তাবাকাত-৮/৩৮৭; তাহযীবুত তাহযীব-১২/৪১৪; উসুদুল গাবা-৫/৪৪২

৩. তাবাকাত-৩/৫৪৭; তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১২৯

৪. ইবন কুতায়বা– আল-মা'আরিফ-২৫৫

কেননা, তাদের নিকট এর অর্থ ছিল স্বামী নিজের স্ত্রীর সাথে শুধু বিয়ের সম্পর্কই ছিন্ন করছে না, তাকে মায়ের মতই নিজের জন্যে হারামও বানিয়ে নিচ্ছে। তাই আরব সমাজে তালাক দানের পরও স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার একটা উপায় থাকতো, কিন্তু 'যিহার' করার পর আর কোন পথই খোলা থাকতো না।[৫]

মুহাদ্দিছগণ হযরত আওসের জিহারের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে দান করেছেন। সেইসব বর্ণনার সার ও মূলকথা হলো যে, আওস (রা) বার্ধক্যে পৌঁছে কিছুটা খিট-খিটে প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর মধ্যে 'পাগলামী'র অবস্থা দেখা দিয়েছিল। হাদীছের বর্ণনাকারীগণ একথা বুঝাবার জন্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাহলো : كَانَ بِهِ لَمَمٌ। আরবী ভাষায় এই لمم শব্দের অর্থ পুরোপুরি পাগলামী নয়, তবে এ এমন এক অবস্থা বুঝায়, যা 'অমুক লোকটি রাগে পাগল হয়ে গেছে' বলে আমরা বুঝাতে চাই। মেযাজ-প্রকৃতির এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণে এর পূর্বেও কয়েকবার তাঁর স্ত্রীর প্রতি 'যিহার' করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হবার কারণে এরূপ ব্যাপার আবার তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়।

এরপর তাঁর স্ত্রী খাওলা (রা) রাসূলে কারীমের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত ব্যাপার খুলে বলার পর আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় আমার ও আমার সন্তানাদির জীবন কঠিন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার কোন উপায় কি হতে পারে?

জবাবে নবী কারীম (সা) যা কিছু বলেছিলেন তা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় তাঁর জবাব ছিল : 'এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাকে কোন হুকুম দেওয়া হয়নি।' কোন বর্ণনার ভাষা হলো : 'আমার মনে হয় তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গিয়েছো।' আর কোন বর্ণনায় তিনি বলেন : 'তুমি তার জন্যে হারাম হয়ে গিয়েছো।' এরূপ জবাব শুনে হযরত খাওলা খুবই কান্নাকাটি, আর্তনাদ ও ফরিয়াদ করতে লাগলেন।

বারবার নবীকে (সা) বলতে লাগলেন : 'তিনি "তালাক" শব্দ তো বলেননি। আপনি এমন কোন পন্থা আমাকে বলুন, যাতে আমার সন্তানাদি ও আমার বৃদ্ধ স্বামীর জীবন কঠিন বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে।' কিন্তু প্রত্যেকবারই নবী কারীম (সা) তাঁকে উক্তরূপ ও একই ধরনের জবাব দিতে থাকলেন। অবশেষে খাওলা (রা) হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে আমার বড় কষ্ট এবং আমার স্বামী থেকে বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালার কথা জানাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে কল্যাণকর হয় এমন কোন কথা আপনার নবীর (সা) মুখ দিয়ে প্রকাশ করে দিন। 'আয়িশা (রা) বলেন, তখন এমন একটি দৃশ্যের সৃষ্টি হয় যে, আমি এবং সেখানে উপস্থিত সকলে খাওলার করুণ আকুতি ও আর্তনাদে কেঁদে ফেলি।

এ সময় রাসূলে কারীমের (সা) উপর ওহী নাযিলের অবস্থা প্রকাশ পেল। 'আয়িশা (রা)

---

৫. তাফহীমুল কুরআন, তাফসীর, সূরা আল-মুজাদালা-১৬/১৮৩

আনন্দের সাথে খাওলাকে (রা) বললেন : 'খাওলা, খুব শিগগীরই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার বিষয়টির ফায়সালা হয়ে যাবে।' এ সময়টি ছিল তাঁর জন্যে খুবই কঠিন সময়। আশা-নিরাশার দোলাচালে তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়েন। এমন আশংকার সৃষ্টি হয় যে, বিচ্ছেদের নির্দেশ আসে, আর তিনি সেই দুঃখে প্রাণ হারান। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) দিকে তাকিয়ে তাঁর হাসিমুখ দেখে আশান্বিত হলেন। খুশীর চোটে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন রাসূল (সা) বললেন : খুওয়ায়লা! আল্লাহ তোমার ও তোমার সংগীর ব্যাপারে ওহী নাযিল করেছেন। তারপর তিনি পাঠ করেন :

قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما ـ إن الله سميع بصير ـ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم ـ إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم ـ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ـ وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ـ ذلكم توعظون به ـ والله بما تعملون خبير .فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ـ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ـ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم .[৬]

'যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্ম দান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফফারা এই : একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দু'মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'

উপরিউক্ত আয়াতগুলো নাযিলের পর রাসূল (সা) খাওলাকে বললেন : তোমার স্বামীকে একটি দাস মুক্ত করে দিতে বলবে।

---

৬. সূরা আল-মুজাদালা : ১-৪

খাওলা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাস মুক্ত করার মত সামর্থ্য তার নেই।

নবী (সা) বললেন : একাধারে দু'মাস সাওম পালন করতে হবে। খাওলা বললেন : সে যে বৃদ্ধ, সাওম পালন করার সামর্থ্য তার কোথায়? দিনে দু' তিনবার পানাহার না করলে তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে।

নবী (সা) বললেন : তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে।

খাওলা বললেন : এর জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য তার নেই। তবে আপনি সাহায্য করলে তা করা যেতে পারে। তখন নবী কারীম (সা) ষাটজন মিসকীনকে দু' বেলা খাওয়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের খাদ্যদ্রব্য দান করলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে নবী কারীম (সা) যত পরিমাণ দ্রব্য দিয়েছিলেন, খাওলা (রা) ঠিক সেই পরিমাণ নিজের নিকট থেকে স্বামীকে দেন তার কাফ্ফারা আদায় করার জন্যে।[৭]

স্ত্রী খাওলা তো গেছেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যিহারের ফায়সালা জানার জন্যে। আর এদিকে স্বামী আওস (রা) অস্থিরভাবে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে বুক তাঁর দুরু-দুরু কাঁপছে, না জানি কি ফায়সালা নিয়ে আসে। এক সময় দূরে খাওলাকে দেখে তিনি অস্থিরভাবে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেন : খাওলা কি হয়েছে?

খাওলা বললেন : ভালো। তুমি সৌভাগ্যবান। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সিদ্ধান্তের কথা জানান ও সেই কাফ্ফারা আদায় করেন।[৮]

আল্লাহ তা'আলা হযরত খাওলাকে (রা) সম্মান দান করে তাঁর ফরিয়াদের জবাবে সূরা আল-মুজাদালার উপরিউক্ত আয়াতগুলো নাযিল করেন। তাতে তিনি কেবল যিহারের বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট ও যন্ত্রণা দূর করার ব্যবস্থাই করেননি, বরং তাঁর মনোরঞ্জনের জন্যে শুরুতেই বলে দেন : যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। 'আয়িশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : সেই সত্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়াজ ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনেন। খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনতে পারিনি। অথচ আল্লাহ তা'আলা সব শুনেছেন।[৯] আয়াতগুলো নাযিলের পর খাওলার (রা) নাম "আল-মুজাদিলা" (বাদানুবাদকারিণী) হয়ে যায়।

খাওলা ছিলেন আনসারদের মধ্যে অন্যতম বিশুদ্ধভাষিণী মহিলা। অলঙ্কার মণ্ডিত ভাষায় চমৎকার ভঙ্গিতে সিদ্ধান্তমূলক কথা বলায় তিনি ছিলেন পারঙ্গম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর

---

৭. আল-ইসাবা-৪/২৯০

৮. তাবাকাত-৮/৩৭৯-৩৮০; সাজারাত আয-যাহাব-১/১৩৮-১৩৯; আনসাব আল-আশরাফ-১/২৫১; তাফহীম আল-কুরআন-১৬/১৮৫-১৮৬

৯. তাফসীরুল কুরতুবী ও তাফসীরু ইবন কাছীর, সূরা আল-মুজাদিলার তাফসীর, আয়াত ১-৪

(সা) নিকট তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে অভিযোগ উত্থাপন করেন, এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেন :[১০]

يا رسول الله! أكل مالى وأفنى شبابى، ونثرت له بطنى، حتى إذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى.

'হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার অর্থ-সম্পদ ভোগ করেছে ও আমার যৌবনকে উপভোগ করে নিঃশেষ করে ফেলেছে। আমি আমার উদরকে তার জন্যে বিছিয়ে দিয়েছি। আর এখন যখন আমার বয়স হয়েছে এবং আমার সন্তানাদি হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তখন সে আমার সাথে "যিহার" করেছে।'

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, তবে তাতে একটি শিল্পরূপ আছে। মনোযোগ আকর্ষণের ক্ষমতা আছে। তাঁর ফরিয়াদ আল্লাহর নিকট শ্রুত ও গৃহীত হওয়া এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহর নিকট থেকে অনুকূল ফরমান জারী হওয়া এমন একটা ব্যাপার যার দরুন সাহাবীদের সমাজে তাঁর এক বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। ইবন আবী হাতিম ও বাইহাকী বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে, হযরত 'উমার (রা) একবার কয়েকজন সঙ্গী সাথীসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালো। 'উমার (রা) দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং মাথা নত করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য শুনলেন। তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়েই থাকলেন। সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন : আপনি এই বৃদ্ধার কারণে কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। 'উমার (রা) বললেন : তোমরা কি জানো, কে এই মহিলা? ইনি খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা। ইনি এমন এক মহিলা, যার অভিযোগ সপ্তম আসমানের উপর শ্রুত হয়েছে। আল্লাহর শপথ! ইনি যদি আমাকে রাত পর্যন্তও দাঁড় করিয়ে রাখতেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেবল সালাতের সময়ই তাঁর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে নিতাম।[১১]

ইবন আবদিল বার তাঁর "আল-ইসতী'আব" গ্রন্থে কাতাদা (রহ) থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এই মহিলা (খাওলা) পথিমধ্যে 'উমারের (রা) সম্মুখীন হলে তিনি তাঁকে সালাম করলেন। মহিলা সালামের জবাব দেয়ার পর বলতে লাগলেন : ওহো, হে 'উমার এমন একটা সময় ছিল যখন আমি তোমাকে উকাজের বাজারে দেখতে পেয়েছিলাম। তখন তোমাকে সকলে 'উমাইর বলতো। হাতে লাঠি নিয়ে ছাগল চরাতে। তারপর কিছু দিন যেতে না যেতেই লোকেরা তোমাকে 'উমার বলতে শুরু করলো। আরো কিছু দিন পর তোমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হতে লাগলো। আমি বলি কি, প্রজা সাধারণের ব্যাপারে আল্লাহকে একটু ভয় করে চলবে। স্মরণ রাখবে, যে লোক আল্লাহর অভিশাপকে ভয় করে, তার জন্যে দূরের লোকও নিকট আত্মীয়ের মত হয়ে

---

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪০৫; হায়াতুস সাহাবা-৩/৩১

১১. তাফহীমুল কুরআন-১৬/১৮২

যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় করে, তার সম্পর্কে আশংকা, সে যে জিনিসকে রক্ষা করতে চায়, তাই হয়তো সে হারিয়ে ফেলবে।

একথা শুনে 'উমারের (রা) সঙ্গী জারূদ আল-'আবদী বললেন : ওহে মহিলা! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের সাথে খুব বেয়াদবীর কথাবার্তা বলছো।

'উমার (রা) বললেন : তাঁকে বলতে দাও। তুমি কি জানো তিনি কে? তাঁর কথা তো সপ্তম আসমানের উপরও শুনা গিয়েছে, 'উমারকে (রা) তো অবশ্যই শুনতে হবে।[১২]

এই হলেন খাওলা বিন্‌ত ছা'লাবা (রা), একজন ঈমানদার আনসারী মহিলা– যাঁর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। যার ওসীলায় ইসলামী শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান প্রবর্তিত এবং মুসলিম নারীদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। তবে বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা জানা যায়, তিনি খিলাফতে রাশিদার বেশীরভাগ সময় জীবিত ছিলেন এবং এ সময়কালেই ইনতিকাল করেছেন।

---

১২. ইযালাতুল খাফা-১/৫১; আল-ইসতী'আব-৪/২৮৩; আল-ইসাবা-৪/২৮৩; কান্‌য আল-'উম্মাল-১/৩৮৫; হায়াতুস সাহাবা-২/৪৩৬

হাওয়া বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা)

হাওয়ার পিতার নাম ইয়াযীদ ইবন সিনান। মদীনার 'আবদুল আশহাল গোত্রের মেয়ে। তিনি মদীনার কায়স ইবন খুতায়মের স্ত্রী ছিলেন। মদীনার মহান আনসারী সাহাবী সা'দ ইবন মু'আয (রা) ছিলেন হাওয়ার মা 'আকরাব বিন্‌ত মু'আযের আপন ভাই। সুতরাং বিখ্যাত সাহাবী সা'দ ছিলেন হাওয়ার মামা। মহান বদরী সাহাবী রাফি' ইবন ইয়াযীদ (রা) হাওয়ার সহোদর। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে, মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে হাওয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) যে সকল মহিলাকে সম্মান ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখতেন তিনি তাঁদের একজন। হাওয়া 'আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাই'আতের মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে থাকবেন।[১]

মদীনার যে ক'জন মহিলা সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বাই'আত করেন, এই হাওয়া তাঁদের অন্যতম। 'আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা উম্মু 'আমির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি, লাইলা বিন্‌ত আল-হুতায়ম ও হাওয়া বিন্‌ত ইয়াযীদ– এই তিনজন একদিন মাগরিব ও ঈশার মাঝামাঝি সময়ে আমাদের চাদর দিয়ে সারা দেহ ঢেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হলাম। আমরা সালাম দিলাম। তিনি আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমরা পরিচয় দিলাম। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে জানতে চাইলেন : তোমরা কি জন্য এসেছো?

আমরা বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট ইসলামের বাই'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) করতে এসেছি। আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি।

রাসূল (সা) বললেন : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের ইসলামের প্রতি হিদায়াত দান করেছেন। আমি তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করলাম। উম্মু 'আমির (রা) বলেন : অতঃপর আমি একটু রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে এগিয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন : আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করি না। হাজার মহিলার উদ্দেশ্যে আমার যে কথা, একজন মহিলার জন্যও আমার সেই এক কথা।

উম্মু 'আমির বলেন : রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আমরা প্রথম বাই'আত গ্রহণকারী।[২]

ইসলামের কারণে যাঁরা জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, হাওয়া তাঁদের অন্যতম। তাঁর স্বামী কায়স ইবন খুতায়ম ছিলেন মদীনার আওস গোত্রের খ্যাতনামা কবি। তিনি পৌত্তলিকতার উপর অটল থাকলেও তাঁর অজ্ঞাতে স্ত্রী হাওয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তা জানতে পেরে তাঁকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য তাঁর উপর নির্যাতন আরম্ভ

---

১. আল-ইসাবা-৪/২৭৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৯১

২. তাবাকাত-৮/১২; আল-ইসাবা-৪/২৭৬

করেন। তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন, নামাযরত অবস্থায় সিজদায় গেলে মাটিতে ফেলে দিতেন।[৩] হাওয়া নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে যেতেন। রাসূল (সা) তখন মক্কায়। মদীনা থেকে যে সকল মুসলমান মক্কায় যেতেন তাঁদের মুখে তিনি মদীনার হাল-হাকীকত অবগত হতেন। তাঁদের কাছেই তিনি হাওয়ার উপর নির্যাতনের কথা অবগত হন। মৃত্যুর পূর্বে একবার কায়স মক্কার "যুল মাজায"-এর মেলায় যান। রাসূল (সা) খবর পেয়ে তাঁর অবস্থানস্থলে গিয়ে হাজির হন। রাসূলকে (সা) দেখে কায়স সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং খুবই সম্মান ও সমাদর করেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি এই বলে সময় নেন যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে আরো একটু চিন্তা করে দেখবেন। রাসূল (সা) তাতে রাজি হন। তারপর তিনি প্রসঙ্গ পাল্টে বলেন, তোমার স্ত্রী হাওয়া বিন্‌ত ইয়াযীদ তো ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়ে থাক। আমি চাই তুমি আর তাকে কোনভাবে কষ্ট দিবে না। আল্লাহকে ভয় কর। তার ব্যাপারে আমার কথা মনে রেখ।[৪]

কায়স বললেন : আবুল কাসিম! আপনার সম্মানে আমি তাকে আর কোন রকম কষ্ট দিব না। রাসূলকে (সা) কথা দিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। স্ত্রীকে বললেন, তোমার সেই বন্ধু আমার সাথে দেখা করেছেন এবং তোমাকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। সুতরাং এখন থেকে আমি আর তোমাকে কিছু বলবো না। তুমি স্বাধীনভাবে তোমার দীন চর্চা করতে পার।[৫]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি স্ত্রীকে বলেন : তুমি তোমার দীন যেভাবে ইচ্ছা পালন করতে পার। আমি আর কোন রকম বাধা দিব না। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর চেহারা ও সুন্দর আকৃতির কোন মানুষ আর দেখিনি।[৬]

এরপর হাওয়া (রা) স্বামীর নিকট ইসলামের যা কিছু গোপন রেখেছিলেন সবই প্রকাশ করে দেন। প্রকাশ্যেই ইসলাম চর্চা করতে থাকেন। কায়স আর মোটেও বাধা দেননি। প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবরা যখন তাঁকে বলতো, তুমিতো পৌত্তলিক ধর্মের উপর অটল আছ, কিন্তু তোমার স্ত্রী তো মুহাম্মাদের (সা) অনুসারী হয়ে গেছেন। তিনি বলতেন : আমি মুহাম্মাদকে কথা দিয়েছি যে, আমি আর তাকে কোন কষ্ট দেব না এবং তাকে দেওয়া কথা আমি রক্ষা করবো। কায়সের এ অঙ্গীকার পালন এবং স্ত্রীকে নির্যাতন না করার কথা রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলে তিনি মন্তব্য করেন : وفى الأديعج অর্থাৎ কাঁচা-পাকা জোড়া ভ্রূ বিশিষ্ট লোকটি কথা রেখেছে।[৭]

এভাবে নির্বিঘ্নে হাওয়া ইসলামী জীবন যাপন করতে লাগলেন। এর মধ্যে রাসূল (সা)

---

৩. আল-ইসাবা-৪/২৭৬
৪. তাবাকাত-৩/৩২৪; ৮/২৩; আ'লাম আন-নিসা'- ১/৩০৪
৫. ইবন সাল্লাম, তাবাকাত আশ-শু'আরা'-১৯২, ১৯৩
৬. আল-বায়হাকী, দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-২/৪৫৬; আ'লাম আন-নিসা'-১/৩০৪
৭. উসুদুল গাবা-৫/৪৩১; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৯৪

হিজরাত করে মদীনায় চলে আসলেন। হাওয়া আরো কিছু আনসারী মহিলাদের সাথে প্রথম পর্বেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে বাই'আত সম্পন্ন করেন।

কায়স ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে হাওয়ার (রা) গর্ভে জন্ম নেওয়া তাঁর দুই ছেলে ইয়াযীদ ও ছাবিত– উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উহুদ যুদ্ধে ইয়াযীদ রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং দেহের বারোটি স্থানে আঘাত পান। এদিন তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে তরবারি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন রাসূল (সা) তাঁকে "জাসির" নামে সম্বোধন করে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এভাবে : "يَاجَاسِرُ أَقْبِلْ، يَاجَاسِرُ أَدْبِرْ" – হে জাসির! সামনে এগিয়ে যাও। জাসির! পিছনে সরে এসো।

আবূ 'উবায়দার (রা) নেতৃত্বে পরিচালিত "জাসর"-এর যুদ্ধে এই ইয়াযীদ শাহাদাত বরণ করেন।[৮] আর ছাবিত, ইবন 'আবদিল বার "আল ইসতী'আব" গ্রন্থে বলেছেন, তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মু'আবিয়ার (রা) খিলাফাতকালে ইনতিকাল করেন।[৯]

উল্লেখ্য যে, কায়স ইবন খুতায়মের দুই বোন– লাইলা ও লুবনা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাই'আত করেন। হযরত হাওয়ার শেষ জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি কখন, কোথায় এবং কিভাবে মারা গেছেন সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। তবে তিনি যে একজন ভালো মুসলমান হতে পেরেছিলেন, ইতিহাসের সকল সূত্র সে কথা বলেছে।[১০]

---

৮. প্রাগুক্ত

৯. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৯২

১০. আল-ইসাবা-৪/২৭৬

শিফা বিন্‌ত 'আবদিল্লাহ (রা)

হযরত শিফা (রা) মক্কার কুরায়শ খান্দানের 'আদী শাখার কন্যা। ডাকনাম উম্মু সুলায়মান। পিতা 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদি শামস', মাতা একই খান্দানের 'আমর ইবন মাখযূম শাখার সন্তান ফাতিমা বিন্‌ত আবী ওয়াহাব।[১] আবূ হুছমা ইবন হুযায়ফা আল-'আদাবীর সঙ্গে শিফার বিয়ে হয়।[২] অনেকে বলেছেন, তাঁর আসল নাম লায়লা এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রতি আরোপিত উপাধি আশ-শিফা নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৩]

হিজরাতের পূর্বে মক্কাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথম পর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতকারী মহিলাদের মধ্যে তিনিও একজন।[৪] যে সকল মহিলা সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাই'আত করেন তিনি তাঁদের অন্যতম।[৫] হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভক্তি ও ভালোবাসা। রাসূল (সা)ও তাঁর এ ভক্তি-ভালোবাসাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে শিফার গৃহে যেতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। হযরত শিফা (রা) তাঁর গৃহে রাসূলের (সা) জন্য একটি বিছানা এবং এক প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র বিশেষভাবে রেখে দেন। রাসূল (সা) তা ব্যবহার করতেন। হযরত শিফার ইনতিকালের পর তাঁর সন্তানরা এসব জিনিস অতি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে থাকেন। কিন্তু উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইবন হাকাম (মৃ. ৬৫ হি.) তাদের নিকট থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নেন। ফলে তা শিফার পরিবারের বেহাত হয়ে যায়।[৬]

হযরত 'উমার (রা) শিফাকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর মতামতের অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। তিনি শিফাকে বাজার পর্যবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কিছু দায়িত্ব প্রদান করেন।[৭]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে একটি বাড়ী দান করেন। সেই বাড়ীতে তিনি ছেলে সুলায়মানকে নিয়ে বাস করতেন।[৮]

একবার খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁকে ডেকে এনে একটি চাদর দান করেন। ঠিক সে সময় উপস্থিত 'আতিকা বিন্‌ত উসাইদকেও অপেক্ষাকৃত একটি ভালো চাদর দান করেন। অভিযোগের সুরে শিফা খলীফাকে বলেন : আপনার হাত ধুলিমলিন হোক।

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৬; আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৪/৩৩৩
২. তাবাকাত-৮/২৬৮; আল-ইসতী'আব-৪/৩৩২
৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, টীকা নং-১, পৃ. ১৫৯
৪. আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
৫. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৫৯
৬. তাহ্‌যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৮৭; আল-ইসতী'আব-৪/৩৫৮
৭. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/১৫০; আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
৮. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৬১

আপনি তাকে আমার চাদরের চেয়ে ভালো চাদর দান করেছেন। অথচ আমি তার আগে মুসলমান হয়েছি এবং আমি আপনার চাচাতো বোন। তাছাড়া আমি এসেছি, আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, তাই। আর সে নিজেই চলে এসেছে। জবাবে 'উমার (রা) বললেন : আমি তোমাকে ভালো চাদরটি দিতাম; কিন্তু সে এসে পড়ায় তাঁকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। কারণ বংশগত দিক দিয়ে সে রাসূলুল্লাহর (সা) অধিকতর নিকটবর্তী।[৯]

হযরত শিফাও ছিলেন হযরত 'উমারের (রা) গুণমুগ্ধা। সময় ও সুযোগ পেলেই 'উমারের (রা) আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরতেন। যেমন, একদিন তিনি কয়েকজন যুবককে তাঁর সামনে দিয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে চাপাস্বরে কথা বলতে বলতে যেতে দেখে প্রশ্ন করলেন এদের অবস্থা এমন হয়েছে কেন? লোকেরা বললো : এরা 'আবিদ– আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল ব্যক্তিবর্গ। হযরত শিফা (রা) একটু রাগত স্বরে বললেন :[১০]

كان والله ـ عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، هو والله الناسك حقا.

'আল্লাহর কসম! 'উমার যখন কথা বলতেন, উচ্চস্বরে বলতেন, যখন হাঁটতেন, দ্রুতগতিতে হাঁটতেন, যখন কাউকে মারতেন, অত্যন্ত ব্যথা দিতেন। আল্লাহর কসম! তিনিই সত্যিকারের 'আবিদ।'

হযরত 'উমার (রা) হযরত শিফার (রা) সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে যেতেন, তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। স্বামী-সন্তানদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদেরকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। শিফা (রা) বলেন : একদিন 'উমার (রা) আমার গৃহে এসে দু'জন পুরুষ লোককে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। উল্লেখ্য যে, লোক দু'জন হলেন তাঁর স্বামী ও ছেলে সুলায়মান। 'উমার প্রশ্ন করলেন : এদের ব্যাপারটি কি? এরা কি সকালে আমাদের সাথে জামা'আতে নামায পড়েনি? বললাম : হে আমীরুল মু'মিনীন! তারা জামা'আতে নামায পড়েছে। সারা রাত নামায পড়ে সকালে ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে ঘুমিয়েছে। উল্লেখ্য যে, তখন ছিল রমাদান মাস। 'উমার বললেন : সারা রাত নামায পড়ে ফজরের জামা'আত ত্যাগ করার চেয়ে ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করা আমার অধিক প্রিয়।[১১]

তিনি কিছু ঝাড়ফুঁক ও লিখতে জানতেন। জাহিলী যুগে এ দু'টি বিষয় অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। একবার তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসেন এবং বিনয়ের সাথে বলেন, জাহিলী জীবনে আমি কিছু ঝাড়ফুঁক জানতাম। আপনি অনুমতি দিলে শোনাতে পারি। রাসূল (সা) অনুমতি দেন এবং তিনি সেই মন্ত্র শোনান। রাসূল (সা) বলেন, তুমি

---

৯. আল-ইসতী'আব-৪/৩৫৮; উসুদুল গাবা-৫/৪৯৭; সাহাবিয়াত, পৃ. ২৪০

১০. তারীখ আত-তাবারী-২/৫৭১; তাবাকাত-৩/২৯০

১১. কান্‌য আল-'উম্মাল-৪/২৪৩; হায়াতুস সাহাবা-৩/১২৩

এই মন্ত্র দিয়ে ঝাড়ফুঁক চালিয়ে যেতে পার। হাফসাকেও (উম্মুল মু'মিনীন) শিখিয়ে দাও।

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সা) তাঁকে বলেন :

علمى حفصة رقية النملة كما عملتيها الكتابة .

'তুমি নামলার মন্ত্র হাফসাকে শিখিয়ে দাও, যেমন তাকে লেখা শিখিয়েছো।' এ বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তিনি হযরত হাফসাকে (রা) লেখা শিখিয়েছিলেন।[১২] উল্লেখ্য যে, আধুনিককালের চিকিৎসাবিদদের মতে "নামলা" একজিমা ধরনের এক প্রকার চর্মরোগ।[১৩] রাসূলুল্লাহর (সা) অনুমতি পেয়ে তিনি সেই মন্তর মহিলাদেরকে শেখাতেন।[১৪]

হযরত শিফা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি এবং 'উমার (রা) থেকে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পুত্র সুলায়মান, পৌত্র আবূ সালামা আবূ বকর ও 'উছমান এবং আবূ ইসহাক ও উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৫] তার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা-১২ (বারো)।[১৬]

তাঁর দুই সন্তানের কথা জানা যায়– পুত্র সুলায়মান এবং এক কন্যা– যিনি শুরাহবীল ইবন হাসানার (রা) স্ত্রী ছিলেন। সুলায়মান ছিলেন একজন জ্ঞানী ধর্মপরায়ণ সজ্জন ব্যক্তি। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।[১৭]

হযরত শিফার (রা) মৃত্যুসন জানা যায় না। তবে অনেকে হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ সনের কাছাকাছি কোন এক সময়ের কথা বলেছেন।[১৮]

হযরত শিফার বর্ণিত একটি অন্যতম হাদীছ হলো :[১৯]

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال : إيمان بالله وجهاد فى سبيله وحج مبرور.

'রাসূলুল্লাহকে (সা) সর্বোত্তম 'আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন :

---

১২. আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
১৩. আ'লাম আন-নিসা'-২/২০১
১৪. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্, পৃ. ১৬০
১৫. তাহ্যীবুত তাহযীব-১২/৪২৮; আল-ইসতী'আব-৪/৩৩৩
১৬. আল-ইসাবা-৪/৩৩৩
১৭. তাবাকাত-৮/২৬৮
১৮. আ'লাম আন-নিসা'-২/১৬৩
১৯. উসুদুল গাবা-৫/৪৮৭; আল-ইসাবা-৪/৩৩৩

আল্লাহর উপর ঈমান, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং হজ্জে মাবরূর বা আল্লাহর নিকট গৃহীত হজ্জ।'

তাবারানী ও বায়হাকী হযরত শিফার (রা) একটি চমকপ্রদ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। শিফা (রা) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলাম এবং কিছু সাদাকার আবেদন জানালাম। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে চললেন, আর আমিও চাপাচাপি করতে লাগলাম। এর মধ্যে নামাযের সময় হয়ে গেল। আমি বেরিয়ে আমার মেয়ের ঘরে গেলাম। মেয়ের স্বামী ছিল শুরাহবীল ইবন হাসানা। আমি এ সময় শুরাহবীলকে ঘরে দেখে বললাম : নামায শুরু হতে চলেছে, আর তুমি এখন ঘরে? আমি তাকে তিরস্কার করতে লাগলাম। সে বললো : খালা! আমাকে তিরস্কার করবেন না। আমার একখানা মাত্র কাপড়, তাও রাসূল (সা) ধার নিয়েছেন। আমি বললাম : আমি যাকে তিরস্কার করছি তার এই অবস্থা, অথচ আমি তার কিছুই জানিনে। শুরাহবীল বললো : আমার একখানা মাত্র তালি দেয়া কাপড় আছে।[২০]

---

২০. কান্‌য আল-'উম্মাল-৪/৪১; হায়াতুস সাহাবা-১/৩২৬

হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা)

হযরত হামনা (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) নিকটাত্মীয়া। রাসূলুল্লাহর (সা) মুহতারামা ফুফু উমাইমা বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিবের কন্যা। তিনি একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহর (সা) ফুফাতো বোন, অন্যদিকে শালীও। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশের সহোদরা।[১] মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর (সা) প্রথম দূত ও দা'ঈ (ইসলাম প্রচারক) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) তাঁর প্রথম স্বামী।[২]

হযরত হামনার (রা) স্বামী মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা) ছিলেন মক্কার বিত্তবান পরিবারের এক সুদর্শন যুবক। তাঁর মা খুনাস বিন্‌ত মালিকের ছিল প্রচুর সম্পদ। শৈশব থেকে তিনি প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। মা তাঁকে সবসময় দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদে সাজিয়ে রাখতো। মক্কায় তাঁর চেয়ে দামী সুগন্ধি আর কেউ ব্যবহার করতো না। পায়ে পরতেন হাদরামাউতের জুতো। পরবর্তীকালে রাসূল (সা) মুস'আবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন :

"مارأيت بمكة أحدًا أحسن لمةً ولاأرقَّ حُلَّةً ولاانعم نعمة من مصعب بن عمير."

'আমি মুস'আবের চেয়ে চমৎকার জুলফী, অধিকতর কোমল চাদরের অধিকারী এবং বেশী বিলাসী মক্কায় আর কাউকে দেখিনি।'

এই যুবক যখন শুনলেন রাসূল (সা) আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের গৃহে অবস্থান করে গোপনে মানুষকে ইসলামের দা'ওয়াত দিচ্ছেন তখন একদিন সেখানে হাজির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেখান থেকে তিনি হলেন মাদরাসায়ে নববীর ছাত্র। নবীর (সা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লাভ করেন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় শিক্ষকের এমন আস্থা অর্জন করেন যে, তিনি তাঁকে দূত ও দা'ঈ হিসেবে মদীনায় পাঠান। এভাবে তিনি হলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দূত ও দা'ঈ।[৩]

মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্বে যে সকল মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) সুহবত বা সাহচর্য লাভের গৌরব অর্জন করেন হামনা তাঁদের একজন। হামনার গোটা পরিবারই ছিল মুসলমান। মক্কায় তাঁদের উপর কুরায়শদের অত্যাচার মাত্রাছাড়া রূপ ধারণ করলে তাঁরা নারী-পুরুষ সকলে মদীনায় হিজরাত করেন। হিজরাতকারী পুরুষরা হলেন : 'আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ, তাঁর ভাই আবূ আহমাদ, 'উকাশা ইবন মিহসান, শুজা', 'উকবা, ওয়াহাবের দুই পুত্র, আরবাদ এবং নারীরা হলেন : যয়নাব বিন্‌ত জাহাশ, উম্মু

---

১. আনসাবুল আশরাফ-১/২৩১; নিসাউন মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্‌-১/২৪৩

২. জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/১৯১; তাবাকাত-৮/২৪১; আল-ইসতী'আব-৪/২৬২

৩. নিসা' মিন আসর আন-নুবুওয়াহ্‌, পৃ. ৫০

হাবীব বিন্‌ত জাহাশ, জুযামা বিন জানদাল, উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান, উম্মু হাবীব বিনত ছুমামা, উমাইয়া বিনত রুকাইস, সাখবারা বিনত তা'মীম ও হামনা বিন্‌ত জাহাশ (রা)।[৪]

মদীনায় আসার পর হযরত হামনা (রা) অন্য ঈমানদার মহিলাদের মত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। নবী (সা) ও স্বামীর নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে আরো শিক্ষিত করে তোলেন। নিজের নৈতিক মান আরো উন্নত করেন। ফলে মদীনার সমাজে তাঁরা একটি সম্মানজনক মর্যাদার আসন লাভ করেন। এখানে তাঁদের কন্যা সন্তান যয়নাব বিন্‌ত মুস'আব জন্মগ্রহণ করে।[৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মাদানী জীবনে যখন প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরম্ভ হয় তখন হামনার (রা) ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসিত ও আদর্শমানের। উহুদ যুদ্ধে হামনা (রা) আরো কিছু মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে মুজাহিদদের সাথে যোগ দেন। সেদিন তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ যুদ্ধের একজন সৈনিক, প্রত্যক্ষদর্শী হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন : 'আমি উহুদের যুদ্ধের দিন উম্মু সুলাইম বিন্‌ত মিলহান ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাকে (রা) নিজ নিজ পিঠে পানির মশক ঝুলিয়ে বহন করতে দেখেছি। হামনা বিন্‌ত জাহাশকে দেখেছি তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাতে এবং আহতদের সেবা করতে। আর উম্মু আয়মানকে দেখেছি আহতদের পানি পান করাতে।'[৬]

উহুদ যুদ্ধে মুস'আব ইবন 'উমাইর (রা)সহ সত্তরজন মুসলিম মুজাহিদ শহীদ হন। যুদ্ধ শেষে হামনা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : হামনা! হিসাব কর।

হামনা : কাকে?

রাসূল (সা) : তোমার মামা হামযাকে।

হামনা : إنا لله وإنا اليه راجعون , আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন এবং তাঁকে জান্নাত দান করুন!

নবী (সা) আবার বললেন : আরেকজনকে গণনা কর।

হামনা : কাকে?

নবী (সা) : তোমার স্বামী মুস'আব ইবন 'উমাইরকে।

হামনা জোরে একটা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন : হায় আমার দুঃখ!

তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) মন্তব্য করেন : "নারীর হৃদয়ে স্বামীর অবস্থান এমন এক স্থানে যা অন্য কারো জন্য নেই।" এ মন্তব্য তখন করেন যখন তিনি দেখেন, হামনা

---

৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৪৭২; দাররুস সাহাবা-৫৫৬

৫. তাবাকাত-৩/১১৬; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৭

৬. আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী-১/২৪৯, ২৫০; দাররুস সাহাবা-৫৫৬

তাঁর মামা ও ভাইয়ের মৃত্যুতে অটল রয়েছেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে ভেঙ্গে পড়েছেন।

রাসূল (সা) হামনাকে জিজ্ঞেস করেন : তোমার স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে এমন আচরণ করলে কেন?

হামনা বললেন : তাঁর সন্তানদের ইয়াতীম হওয়ার কথা মনে হল এবং আমি শঙ্কিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম।[৭]

রাসূল (সা) হামনার জন্য দু'আ করলেন, আল্লাহ যেন তাঁর সন্তানদের জন্য মুস'আবের স্থলে ভালো কাউকে দান করেন। অতঃপর হামনা (রা) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তালহা ইবন 'উবাইদুল্লাহকে (রা) বিয়ে করেন। উল্লেখ্য যে, এই তালহা হলেন, জীবদ্দশায় যে দশজন জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছেন তাদের অন্যতম। এই তালহার ঔরসে হামনা জন্ম দেন ছেলে মুহাম্মাদ ইবন তালহাকে। হামনার (রা) সন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন দারুণ স্নেহশীল।[৮]

উহুদ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে হামনা (রা) যোগদান করতে থাকেন। খায়বারেও তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে যান এবং বিজয়ের পর সেখানে উৎপাদিত ফসল থেকে তিরিশ ওয়াসাক রাসূল (সা) তার জন্য নির্ধারণ করে দেন।[৯]

হযরত হামনার (রা) ছেলে মুহাম্মাদ ইবন তালহার জন্মের পর তিনি তাকে কোলে করে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট নিয়ে যান এবং আবেদন করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর একটা নাম রেখে দিন। রাসূল (সা) তার মাথায় হাত বুলিয়ে নাম মুহাম্মাদ এবং ডাকনাম আবুল কাসিম রাখেন। রাশিদ ইবন হাফস আয-যুহ্‌রী বলেন, আমি সাহাবীদের ছেলেদের কেবল চারজনকে পেয়েছি যাঁদের প্রত্যেকের নাম মুহাম্মাদ এবং ডাকনাম আবুল কাসিম। তাঁরা হলেন : ১. মুহাম্মাদ ইবন আবী বকর (রা), ২. মুহাম্মাদ ইবন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা), ৩. মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা), ৪. মুহাম্মাদ ইবন তালহা (রা)।[১০]

হযরত হামনার (রা) ছেলে এই মুহাম্মাদ ইবন তালহা উত্তরকালে একজন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও সত্যনিষ্ঠ আবেদ ব্যক্তিতে পরিণত হন। অতিরিক্ত সিজদাবনত থাকার কারণে তাঁর উপাধি হয় 'সাজ্জাদ'। হিজরী ৩৬ সনের জামাদি-উল-আওয়াল মাসে উটের যুদ্ধে পিতা তালহার সাথে শাহাদাত বরণ করেন। তালহার (রা) ঔরসে হামনা (রা) আরেকটি পুত্র সন্তান জন্ম দেন। তার নাম 'ইমরান ইবন তালহা (রা)।[১১]

হযরত হামনার (রা) মহত্ব ও মর্যাদা অনেক। তিনি হযরত নবী কারীম (সা) থেকে

---

৭. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৯৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৮

৮. আল-ইসাবা-২/২২১; আনসাবুল আশরাফ-১/৮৮; সুনান আবী দাউদ, হাদীছ নং-১৫৯০

৯. তাবাকাত-৮/২৪১; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫২

১০. আল-ইসাবা-৩/৩৫৭

১১. তাবাকাত-৫/১৬৬; জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব-১/১৩৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৭

হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর পুত্র ইমরান ইবন তালহা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাবের বোন। বর্ণিত হয়েছে, যয়নাবের (রা) জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বোন হামনাকে (রা) বলেন : আমি আমার কাফন প্রস্তুত করে রেখেছি। আমার মৃত্যুর পর খলীফা 'উমার (রা) আমার কাফন পাঠাতে পারেন। যদি পাঠান, তুমি যে কোন একটি সাদাকা করে দিও। যয়নাব (রা) মারা গেলেন। 'উমার (রা) পাঁচ প্রস্থ কাপড় পাঠালেন। সেই কাপড় দ্বারা তাঁকে কাফন দেওয়া হয়। আর যয়নাবের (রা) প্রস্তুতকৃত কাপড় হামনা সাদাকা করে দেন।[১২] এ ঘটনা ইঙ্গিত করে যে, হযরত হামনা (রা) হিজরী ২০ (বিশ) সনের পরেও জীবিত ছিলেন। কারণ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাবের (রা) ইনতিকাল হয় হিজরী বিশ সনে।[১৩] আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্যসহকারে ইবাদাত-বন্দেগীর মাধ্যমে এক প্রশংসিত জীবন-যাপন করে তিনি পরলোকে যাত্রা করেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) পূতঃপবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের ঘটনায় যারা বিভিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন তারা হলেন আবদুল্লাহ ইবন উবায়, যায়দ ইবন রিফা'আ, মিসতাহ ইবন উছাছা, হাস্সান ইবন ছাবিত ও হামনা বিনতে জাহাশ। এদের মধ্যে প্রথম দুইজন মুনাফিক এবং অপর তিনজন মু'মিন। মু'মিন তিনজন নিজেদের কিছু মানবিক দুর্বলতা ও ভ্রান্তিবশতঃ এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।[১৪]

হযরত আয়িশার (রা) পবিত্রতা ঘোষণা করে আল কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) এঁদের সকলকে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপের নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করেন।[১৫] হযরত হামনার (রা) এমন কর্মে জড়িত হওয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, যেহেতু আমার সতীনদের মধ্যে একমাত্র তাঁর বোন যয়নাব ছাড়া আর কেউ আমার সমকক্ষতার দাবীদার ছিলেন না, তাই তিনি তাঁর বোনের কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ফিতনায় জড়িয়ে পড়েন।[১৬]

---

১২. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৩৫; আল-ইসাবা-৪/৩০৮
১৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৫৪
১৪. তাফহীমুল কুরআন, খণ্ড ৩, সূরা আন-নূর, পৃ. ১৩৮; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৮৮
১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/১৬০; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৪৩; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯০
১৬. সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩০০

খান্‌সা বিন্‌ত 'আমর ইবন আশ-শারীদ (রা)

হযরত খানসার আসল নাম 'তুমাদির'। চপল, চালাক-চোস্ত স্বভাব ও মন কাড়া চেহারার জন্যে খান্‌সা নামে ডাকা হতো। খান্‌সা অর্থ বন্যগাভী ও হরিণী। শেষ পর্যন্ত আসল নামটি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় এবং খানসা নামেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।[১] পিতার নাম 'আমর ইবন শারীদ। তিনি ছিলেন কায়স গোত্রের সুলায়ম খান্দানের সন্তান।[২] বানু সুলায়ম হিজায ও নাজদের উত্তরে বসবাস করতো।[৩]

দুরায়দ ইবন আস-সিম্মাহ্ ছিলেন প্রাচীন আরবের একজন বিখ্যাত নেতা। খানসার বিয়ের বয়স হওয়ার পর দুরায়দ একদিন দেখলেন, অতি যত্ন সহকারে খানসা তাঁর একটি উটের গায়ে ওষুধ লাগালেন, তারপর নিজে পরিচ্ছন্ন হলেন। এতে দুরায়দ মুগ্ধ হলেন এবং তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। খানসা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে :[৪]

أترانى تَارِكَةً بَنِى عَمِّى كَأَنَّهُمْ عَوَالِى الرِّمَاحِ وَمُرتَثَّةَ بَنِى جُشَم؟

'তুমি কি দেখতে চাও যে, আমি আমার চাচাতো ভাইদেরকে এমনভাবে ত্যাগ করি যেন তারা তীরের উপরিভাগ এবং বানু জুশামের পরিত্যক্ত বৃদ্ধ?'

দুরায়দ প্রত্যাখ্যাত হয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, বিভিন্ন গ্রন্থে যার কিছু অংশ সংকলিত হয়েছে। তার দুইটি পংক্তি নিম্নরূপ :[৫]

حُيُّوا تُمَاضِرَ وَاربعُوا صَحبى + وقِفُوا فَإِنَّ وَقُوفَكُم حَسبى

أخناسُ قَد هَامَ الفُؤَادُ بِكُم + وَأَصْابَةَ تبلُ مِنَ الحُبِّ.

'হে আমার সাথী-বন্ধুগণ, তোমরা তুমাদিরকে স্বাগতম জানাও এবং আমার জন্য অপেক্ষা কর। কারণ, তোমাদের অবস্থানই আমার সম্বল। খুনাস (হরিণী) কি তোমাদের হৃদয়কে প্রেমে পাগল করে তুলেছে এবং তার ভালোবাসায় তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছো?'

দুরায়দের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর খানসা বিয়ে করেন স্বগোত্রীয় যুবক রাওয়াহা ইবন 'আবদিল 'উয্‌যাকে। তাঁর ঔরসে পুত্র আবূ শাজারা 'আবদুল্লাহর জন্ম হয়। কিছুদিন পর রাওয়াহা মারা গেলে তিনি মিরদাস ইবন আবী 'আমরকে বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে দুই পুত্র- ইয়াযীদ ও মু'আবিয়া এবং এক কন্যা 'উমরা।[৬]

---

১. সাহাবিয়াত- পৃ. ১৮১
২. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১; আল-ইসাবা-৪/২৮৭
৩. ডঃ 'উমার ফাররূখ : তারিখ আল-আদাব-১/৩১৭
৪. ইবন কুতায়বা : আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-পৃ. ১৬০
৫. আল-ইসাবা-৪/২৮৭
৬. আস-সুয়ূতী : দুররুল মানছূর, পৃ. ১১০; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ, পৃ. ১৬০

মক্কায় যখন রিসালাত-সূর্যের উদয় হয় এবং তার কিরণে সারা বিশ্ব আলোকিত হয়ে ওঠে তখন খানসার (রা) দুই চোখ বিশ্বাসের দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। তিনি নিজ গোত্রের কিছু লোকের সাথে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) দরবারে ছুটে যান এবং ইসলামের ঘোষণা দান করেন। এ সাক্ষাতে তিনি রাসূলুল্লাহকে (সা) স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। রাসূল (সা) দীর্ঘক্ষণ ধৈর্যসহকারে তাঁর আবৃত্তি শোনেন এবং তাঁর ভাষার শুদ্ধতা ও শিল্পরূপ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে আরো শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৭]

খানসা (রা) কবি ছিলেন। তবে তিনি কাব্য জীবনের প্রথম পর্বে মাঝে মধ্যে দুই-চারটি বয়েত (শ্লোক) রচনা করতেন। আরবের বিখ্যাত আসাদ গোত্রের সাথে তাঁর গোত্রের যে যুদ্ধ হয়, তাতে তাঁর আপন ভাই মু'আবিয়া নিহত হন এবং সৎ ভাই সাখর প্রতিপক্ষের আবু ছাওর আল-আসাদী নামের এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত নিযায় মারাত্মকভাবে আহত হন। প্রায় এক বছর যাবত সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে ভাইকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ক্ষত খুব মারাত্মক ছিল। প্রিয় বোনকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তিনি একদিন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৮]

খানসা (রা) তাঁর পরলোকগত দুইটি ভাইকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিশেষত সাখরের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য, বীরত্ব, দানশীলতা, সুদর্শন চেহারা ইত্যাদি কারণে তাঁর স্থান ছিল খানসার (রা) অন্তরের অতি গভীরে। একারণে তার মৃত্যুতে তিনি সীমাহীন দুঃখ পান। আর সেদিন থেকেই তিনি সাখরের স্মরণে অতুলনীয় সব মরসিয়া (শোকগাঁথা) রচনা করতে থাকেন।[৯] ইবন কুতায়বা বলেন :[১০]

وَلَم تَزَلَ تَبكِيهِ حَتّى عَمَيَت.

'সাখরের শোকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি অন্ধ হয়ে যান।'

সাখরকে এত গভীরভাবে ভালোবাসার একটি কারণ ছিল। খানসা (রা) বিয়ে করেছিলেন এক অমিতব্যয়ী ভদ্র যুবককে। তিনি তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ বাজে কাজে উড়িয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান। খানসা গেলেন ভাই সাখরের নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু সাখর তাঁর সম্পদের অর্ধেক বোনের হাতে তুলে দিলেন। তিনি তা নিয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। উড়নচণ্ডি স্বামী অল্প দিনের মধ্যে তাও শেষ করে ফতুর হয়ে যায়। খানসা (রা) আবার গেলেন সাখরের নিকট। এবারও সাখর তাঁর সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি বোনকে দিয়ে দেন।[১১] এভাবে সাখর তাঁর সৎ বোনের অন্তরের গভীরে এক স্থায়ী আসন গড়ে তোলেন।

সাখরের স্মরণে রচিত মরসিয়ায় হযরত খানসা (রা) এমন সব অন্তর গলানো শব্দে নিজের তীব্র ব্যথা-বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা শুনে বা পাঠ করে মানুষ অস্থির না হয়ে পারে

---

৭. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১; আল-ইসাবা-৪/৫৫০

৮. আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)-৪/২৯৬

৯. উসুদুল গাবা - ৫/৪৪১

১০. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ- ১৬১

১১. ডঃ উমার ফাররূখ- ১/৩১৭

না। যে কোন লোকের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাতে বিধৃত আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে প্রফেসর আর, এ, নিকলসন বলেছেন :[১২]

'It is impossible to translate the poignant and vivid emotion, the energy of passion and noble simplicity of style which distinguish the poetry of Khansa.'

তার একটি মরসিয়ার কয়েকটি বয়েত নিম্নে উদ্ধৃত হলো, যাতে তার শিল্পরূপ, অলঙ্করণ ও স্টাইল প্রত্যক্ষ করা যায়।

اَعَيْنَىَّ جُودًا وَلاَتَجمُدَا + أَلاَ تَبكِيانِ لِصَخرِ النَّدَى

أَلاَ تَبكِيانِ الجَرِىَّ الجَمِيلَ + أَلاَ تَبكِيانِ الفَتى السَّيِّدى

طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ + وَسَادَ عَشِيرَتَهُ امرَدَا

إذَا القَومُ مَدُّوا بِاَيدِيهِم + إلى المَجدِ ثُمَّ مَضى مَسعدَا

تَرَى المَجدَ يَهدِى إلى بَيتِه + يرى فضَلُ المَجدِ أن يُحمَد

وَإن ذكَرَ المَجدَ اَلفُتيَةُ + تأذَّرَ بِالمجدِ ثُمَّ ارتَدَى

'হে আমার দুই চোখ, উদার হও, কার্পণ্য করোনা। তোমরা কি দানশীল সাখরের জন্য কাঁদবে না? তোমরা কি কাঁদবে না তার মত একজন সাহসী ও সুন্দর পুরুষের জন্য? তোমরা কি কাঁদবে না তার মত একজন যুব-নেতার জন্য?

তার অসির হাতল অতি দীর্ঘ,[১৩] ছাইয়ের স্তূপ বিশালকায়।[১৪] সে তার গোত্রের নেতৃত্ব তখনই দিয়েছে যখন সে ছিল অল্প বয়সী।

যখন তার গোত্র কোন সম্মান ও গৌরবময় কর্মের দিকে হাত বাড়িয়েছে, সেও দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সুতরাং সে সম্মান ও সৌভাগ্য নিয়েই চলে গেছে।

তুমি দেখতে পাবে যে, সম্মান ও মর্যাদা তার বাড়ীর পথ বলে দিচ্ছে। সর্বোত্তম মর্যাদাও তার প্রশংসা করা উচিত বলে মনে করে।

যদি সম্মান ও আভিজাত্যের আলোচনা করা হয় তাহলে তুমি তাকে মর্যাদার চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় দেখতে পাবে।'

প্রাচীন আরবের নারীদের অভ্যাস ও প্রথা অনুযায়ী খানসা (রা) তাঁর ভাইয়ের কবরের পাশে সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে বসতেন, তাকে স্মরণ করে মাতম করতেন এবং স্বরচিত মরসিয়া পাঠ করতেন। সেই সব মরসিয়ার কিছু অংশ নিম্নরূপ :[১৫]

---

১২. A Literary History of the Arabs- P. 126

১৩. 'অসির হাতল দীর্ঘ' হওয়ার অর্থ সে ছিল দীর্ঘাকৃতির।

১৪. সে ছিল খুবই অতিথি সেবক। আর সে কারণে তার গৃহে ছাইয়ের বিশাল স্তূপ হয়ে গেছে।

১৫. সাহাবিয়াত-১৮৪

يُذكِّرُنِى طُلُوعُ الشَّمسِ صَخرا + واذكُرُهُ لَكُلُّ غُرُوبِ شَمسِ

وَلَولاَ كَثرَةُ البَاكِينَ حَولى + على مَوتَا هُم لَقَتَلتُ نَفسِى

'প্রতিদিনের সূর্যোদয় আমাকে সাখরের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমি তাকে স্মরণ করি প্রতিটি সূর্যাস্তের সময়। যদি আমার চার পাশে নিজ নিজ মৃতদের জন্য প্রচুর বিলাপকারী না থাকতো, আমি আত্মহত্যা করতাম।'[১৬]

ألاَ ياَصَخرُ ان بَكَيتَ عَيْنَىَّ + فَقد اضحَكتَنِى زَمَنًا طَوِيلاً

بَكَيتُكَ فِىْ نِسَاءِ مُعوَّلاَت + وكُنتُ أحقُّ مَن أبدَى العَوِيلاَتِ

دَفَعتُ بِكَ الـخُطُوبَ وَانتَ حَىٌّ + فَمَن ذَا يَدفَعُ الـخَطِبَ الـجَمِيلاً

إذَا قَبَحَ البُكَاءُ على قَتِيلٍ + رَأيتُ بُكَاءَكَ الـحُسنَ الـجَمِيلاً.

'ওহে সাখর, যদি তুমি আমার দুই চোখকে কাঁদিয়ে থাক, তাতে কি হয়েছে। তুমি তো একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাকে হাসিয়েছো।

আমি তোমার জন্য কেঁদেছি একদল উচ্চকণ্ঠে বিলাপকারিণীদের মধ্যে। অথচ যারা উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করে তাদের চেয়ে উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করার আমিই উপযুক্ত।

তোমার জীবনকালে তোমার দ্বারা আমি বহু বিপদ-আপদ দূর করেছি। এখন এই বড় বিপদ কে দূর করবে?

যখন কোন নিহত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা খারাপ কাজ, তখন তোমার জন্য কান্নাকে আমি একটি খুবই ভালো কাজ বলে মনে করি।'

সাখরের মান ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :[১৭]

إنَّ صَخرًا لَتَأتَمُّ الهُدَاةُ به + كَأنَّهُ عَلَمٌ فِى رَأسِه نَارٌ

'বড় বড় নেতৃস্থানীয় মানুষ সাখরের অনুসরণ করে থাকে। সাখর এমন একটি পাহাড় সদৃশ যার শীর্ষদেশে আগুন জ্বলছে।'

অর্থাৎ আরবের মানুষ যেমন পর্বত শীর্ষের প্রজ্জ্বলিত আগুনের আলোতে পথ খুঁজে পায়, তেমনিভাবে সাখরের অনুসরণেও পথ পায়।

সাখরের স্মরণে তিনি নিম্নের শোকগাঁথাটিও রচনা করেন :[১৮]

---

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. আশ্-শি'রু ওয়াশ-শু'আরাউ-১৬২

১৮. আল-'ইকদুল ফারীদ-৩/২৬৮

أَلاَ مَالِعَينِى أَلاَ مَا لَهَا + لَقَد أخضلَ الدَّمعُ سِربَالَهَا

أمن بعد صخرٍ من أل الشَّرِيد + حَلَّت به الآرضُ أثقَالَهَا

فَأَلَيتُ أسَى عَلى هَالَكَ + وَأسَألُ بَاكِيَةً مَالَهَا

وَهَمَّت بنَفسِى على خَطَّةٍ + فَإِمَّا عَلَيهَا وَإِمَّا لَهَا

سَأحمل نَفسى على خَطَّةٍ + فَإِمَّا عَلَيهَا وَإِمَّا لَهَا

ওহে আমার চোখের কি হয়েছে, ওহে তার কী হয়েছে? সে তার জামা অশ্রু দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। আস-শারীদের বংশধর সাখরের মৃত্যুর পরে যমীন কি তার ভারমুক্ত হয়েছে? (আরবরা বলে থাকে, একজন দুঃসাহসী অশ্বারোহী যমীনের জন্য ভীষণ ভারী। তার মৃত্যু অথবা হত্যায় যমীন সেই ভার থেকে মুক্ত হয়) অতঃপর আমি একজন ধ্বংস হয়ে যাওয়া ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য শপথ করে বসেছি। আর কান্নারত অবস্থায় প্রশ্ন করছি– তার কী হয়েছে?

সে নিজেই সকল দুঃখ-কষ্ট বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং আমার নিজের জন্য ভালো কষ্টগুলো অধিক উপযোগী।

আমি নিজেকে একটি পথ ও পন্থায় বহন করবো– হয়তো তা হবে তার বিপক্ষে অথবা পক্ষে।

একবার খানসাকে বলা হলো : আপনার দুই ভাইয়ের কিছু গুণের কথা বলুন তো। বললেন :

كَانَ صَخْرُ وَاللهِ جُنَّةَ الزَّمَان الأغـيَرِ، وَزُعَـافَ الخَمِيْـسِ الاخمـرِ وكَـانَ وَاللهِ مُعَاوِيَـةُ اَلقَائِلُ وَالفَاعِلُ.

'আল্লাহর কসম, সাখর ছিল অতীত সময়ের একটি ঢাল এবং পাঁচহাতী নেযার বিষাক্ত লাল ফলা। আর আল্লাহর কসম, মু'আবিয়া যেমন বক্তা, তেমনি করিৎকর্মাও।

আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : দুইজনের মধ্যে কে বেশী উঁচু মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী? বললেন :

أمَّا صخرٌ فَحرُّ الشِّتَاء، وَأمَّا مُعَاوِيَةُ فَبَرَدُ الهَوَاءِ.

'সাখর হচ্ছে শীতকালের উষ্ণতা, আর মু'আবিয়া হচ্ছে বাতাসের শীতলতা।'

আবার প্রশ্ন করা হলো : কার ব্যথা বেশী তীব্র? বললেন :

أمَّا صخرُ فَجَمرُ الكَبِدِ، وَأمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُقَامُ الـجَسَدِ.

'আর সাখর, সে তো হৃদপিণ্ডের কম্পন। আর মু'আবিয়া হচ্ছে শরীরের জ্বর।'

তারপর তিনি নিম্নের পংক্তি দুইটি আবৃত্তি করেন :

أَسَدَانِ مُحمرًا الـمَخَالِبَ نَجَدَةً + بَحرانِ فِى الزَّمنِ الغَضُوبَ الأنمر

قَمَرَانِ فِى النادى رَفِيعًا مُحتَدٍ + فِى الـمجدِ فَرعًا سؤدد متخيرِ.

'তারা দুইজন হলো দুঃসাহসী রক্তলাল পাঞ্জাওয়ালা সিংহ, রুক্ষ মেজাজ ক্রুদ্ধ কালচক্রের মধ্যে দুইটি সাগর, সভা-সমাবেশে দুইটি চন্দ্র, সম্মান ও মর্যাদায় অত্যুচ্চ, পাহাড়ের মত নেতা ও স্বাধীন।'[১৯]

এখানে উদ্ধৃত এ জাতীয় মমস্পর্শী মরসিয়া রচনা ও মন্তব্যের বদৌলতে হযরত খানসা (রা) ইসলাম-পূর্ব গোটা আরবে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মরসিয়া রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যান।

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর হযরত খানসা (রা) মাঝে-মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন। তিনি তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী শোকের প্রতীক হিসেবে মাথায় একটা কালো কাপড় বেঁধে রাখতেন। একবার হযরত 'আয়িশা (রা) তাকে বললেন, এভাবে শোকের প্রতীক ধারণ করা ইসলামে নিষেধ। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পরে আমিও এ ধরনের কোন শোকের প্রতীক ধারণ করিনি। খানসা (রা) বললেন, নিষেধ– একথা আমার জানা ছিলনা। তবে আমার এ প্রতীক ধারণ করার একটা বিশেষ কারণ আছে। 'আয়িশা (রা) কারণটি জানতে চাইলেন।

খানসা (রা) বললেন : আমার পিতা যার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, সে ছিল তার গোত্রের এক নেতা। তবে ভীষণ উড়নচণ্ডি মানুষ। তার ও আমার সকল অর্থ-সম্পদ জুয়া খেলে উড়িয়ে দেয়। আমরা যখন একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়লাম তখন আমার ভাই সাখর তার সব অর্থ-সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে দেয়। আমার স্বামী কিছুদিনের মধ্যে তাও উড়িয়ে ফেলে। সাখর আমার দুরবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করে এবং আবার তার সকল সম্পদ সমান দুই ভাগ করে ভালো ভাগটি আমাকে বেছে নিতে বলে। তার স্ত্রী তখন বলে ওঠে, এর আগে একবার খানসাকে তোমার সম্পদের অর্ধেক দিয়েছো– তাও ভালো ভাগটি, এখনও আবার ভালো ভাগটি বেছে নিতে বলছো। তা এভাবে আর কতকাল চলবে? তার স্বামীর অবস্থা তো সেই পূর্বের মতই আছে। সে জুয়া খেলেই সব শেষ করে ফেলবে। সাখর তখন স্ত্রীকে নিম্নের বয়েত দুইটি আবৃত্তি করে শোনায় :[২০]

وَاللهِ لاَأمنَحُهَا شِرَارَهَا + وَهِىَ حصَانٌ قَد كَفَتنِى عَارَهَا

وَلَو هلَكتُ مَزَّقَت خَمَارَهَا + وَجَعَلَت مِن شَعَر صِدَارَهَار

---

১৯. প্রাগুক্ত-৩/২৬৭

২০. প্রাগুক্ত; আল-ইসাবা-৪/২৯৬

'আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে আমার সম্পদের নিকৃষ্ট অংশ দিবনা। সে একজন সতী-সাধ্বী নারী, আমার জন্য হেয় ও লাঞ্ছনা যথেষ্ট। আমি মারা গেলে সে তার ওড়না আমার শোকে ফেড়ে ফেলবে এবং কেশ দিয়ে শোকের প্রতীক ফেটা বানিয়ে নিবে।'
উম্মুল মু'মিনীন, তাই আমি তার স্মরণে শোকের এই প্রতীক ধারণ করেছি।[২১]

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমারের খিলাফতকালের কোন এক সময় খানসা (রা) গেলেন খলীফার দরবারে। তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর এবং তখনও তিনি মৃত ভাইদের জন্য শোক প্রকাশ করে চলেছেন। তার দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে ঝরতে গণ্ডদেশে দাগ পড়ে যায়। খলীফা প্রশ্ন করেন : খানসা, তোমার মুখে এ কিসের দাগ? তিনি বলেন : এ আমার দুই ভাইয়ের জন্য দীর্ঘদিন কান্নার দাগ। খলীফা বললেন : তাদের জন্য এত শোক কেন, তারা তো জাহান্নামে গেছে। খানসা (রা) জবাব দিলেন :[২২]

ذلِكَ ادعىَ لَحُزنِى عَلَيهِمَا، لَقَد كُنتُ مِن قَبلُ أبكِى لَهُمَا مِنَ الثأر وَأنَـا اليَـومُ أبكِـى لَهُمَا مِنَ النَّار.

'তাদের জন্য আমার শোক করার এটাই বড় কারণ। পূর্বে তাদের রক্তের বদলার জন্য কাঁদতাম, আর এখন কাঁদি তাদের জাহান্নামের আগুনের জন্য।'
ইবন কুতায়বার বর্ণনা মতে খানসা (রা) বলেন :[২৩]

كنتُ أبكى لَصَخرٍ مِنَ القَتلِ فَانَا أبكِى لَهُ اليَومَ مِنَ النَّار.

'আগে কাঁদতাম সাখরের নিহত হওয়ার জন্য। আর এখন কাঁদি তার জাহান্নামের শাস্তির কথা ভেবে।'

হযরত খানসা (রা) জাহিলী জীবন থেকে ইসলামী জীবনে উত্তরণের পর আচার ও সংস্কারে এবং চিন্তা ও বিশ্বাসে একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন। নিরন্তর জিহাদই যে একজন সত্যিকার মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য– একথাটি তিনি অনুধাবনে সক্ষম হন। আর এজন্য তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হননি।

হিজরী ষোল সনে খলীফা 'উমারের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক কাদেসিয়া যুদ্ধ। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনী অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সাথে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করে। উভয় পক্ষের অসংখ্য সৈনিক হতাহত হয়। হযরত খানসা (রা) তাঁর চার ছেলেকে সংগে করে এ যুদ্ধে যোগ দেন। চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে তিনি চার ছেলেকে একত্র করে তাদের সামনে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক যে ভাষণটি দান করেন ইতিহাসে তা সংরক্ষিত হয়েছে। আমরা তার কিছু অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম :[২৪]

---

২১. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১
২২. ডঃ 'উমার ফাররূখ-১/৩১৭
২৩. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১; আল-'ইকদূল ফারীদ-৩/২৬৬
২৪. খাযানাতুল আদাব-১/৩৯৫; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-১/২৩১; আল-ইসাবা-৪/২৮৮

يَابُنَىَّ، أنتم أسلَمتُم طائِعِينَ، وَهَاجَرتُم مُختَارِينَ، وَوَاللهِ الَّذى لاإله غَيرَهُ، إنَّكُم لَبنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا أنَّكُمْ بَنُو إمرَأةٍ وَاحِدَةٍ، مَا خُنتُ أبَاكُمْ، وَلاَنَضَحتُ خَالَكُم، وَلاَهَجَّنتُ حَسَبَكُم، وَلاَغَيَّرتُ نَسَبَكُم، وَقَدْ تَعلَمون مَا عَدَّ اللهُ لَلمُسلِمِينَ مِنَ الثَّوابِ العَظِيمِ فى حَربِ الكَافِرِينَ، وَاعلمُوا أنَّ الدَّارَ البَاقِيَةَ خَيرٌ مِنَ الدَّارِ الفَانِيَةِ، يَقُولُ اللهُ عزَّوَجَلَّ : ياأيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُم تُفْلحُونَ. فَإذَا اَصبَحتُمْ غَدًا، فَاغدُوا إلى قِتالِ عَدُوِّكُم مَستَبصِرِيْنَ، وللهِ عَلى أعدَائِهِ مُستنصِرِينَ.

'আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা আনুগত্য সহকারে ইসলাম গ্রহণ করেছো এবং হিজরাত করেছো স্বেচ্ছায়। সেই আল্লাহর নামের কসম– যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয় তোমরা একজন পুরুষেরই সন্তান, যেমন তোমরা একজন নারীর সন্তান। আমি তোমাদের পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, তোমাদের মাতুল কুলকে লজ্জায় ফেলিনি এবং তোমাদের বংশ ও মান-মর্যাদায় কোন রকম কলঙ্ক লেপনও করিনি। তোমরা জান, কাফিরদের বিপক্ষে জিহাদে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য কত বড় সাওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা এ কথাটি ভালো রকম জেনে নাও যে, ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের চেয়ে পরকালের অনন্ত জীবন উত্তম। মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন : 'হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।' (আলে ইমরান-২০০) আগামীকাল প্রত্যুষে তোমরা শত্রু নিধনে দূরদর্শিতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সাহায্য কামনা করবে।'

মায়ের অনুগত ছেলেরা কান লাগিয়ে মায়ের কথা শুনলো। রাত কেটে গেল। প্রত্যুষে তারা একসাথে আরবী কবিতার কিছু পংক্তি আওড়াতে আওড়াতে রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেল।[২৫] এক পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত রকমের বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে সকলে শাহাদাত বরণ করে। শাহাদাতের খবর মা খানসা (রা) শোনার পর যে বাক্যটি উচ্চারণ করেন তা একটু দেখার বিষয়। তিনি উচ্চারণ করেন :[২৬]

اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذِى شَرَّفَنِى بقَتلِهِم، وَأرجُوا مِن ربِّى أن يَجمَعَنِى بِهِم فِى مُستَقَرِّ رَحمَتِهِ.

---

২৫. আল-কুরতুবী ও ইবন হাজার সেই সব পংক্তির অনেকগুলি তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। (আল-ইসতী'য়াব-৪/২৯৬; আল-ইসাবা-৪/২৮৮)

২৬. উসুদুল গাবা-৫/৪৪২; জামহারাতু খুতাবিল 'আরাব-১/২৩১

'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাদেরকে শাহাদাত দান করে আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর আমি আমার রবের নিকট আশা করি, তিনি আখিরাতে তার অনন্ত রহমতের ছায়াতলে তাদের সাথে আমাকে একত্রিত করবেন।'

যে মহিলা জাহিলী যুগে এক সৎ ভাইয়ের মৃত্যুতে সারা জীবন মরসিয়া লিখে ও শোক প্রকাশ করে গোটা আরবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন, তিনিই এভাবে একসাথে চার ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের জন্য মাতম, শোকগাঁথা রচনা বা শোকের প্রতীক ধারণ– কোন কিছু করেছেন বলে কোন কথা জানা যায় না। ঈমান কী পরিমাণ মজবুত হলে এমন হওয়া যায়?

খলীফা হযরত 'উমার (রা) তাঁর ছেলেদের জীবদ্দশায় প্রত্যেককে এক শো দিরহাম করে ভাতা দিতেন। শাহাদাতের পরেও তাদের ভাতা হযরত খানসার (রা) নামে জারি রাখেন। তিনি আমরণ সে ভাতা গ্রহণ করেন।[২৭]

কবি হিসেবে হযরত খানসার (রা) স্থান

আরবী কবিতার প্রায় সকল অঙ্গনে খানসার (রা) বিচরণ দেখা যায়। তবে মরসিয়া রচনায় তার জুড়ি মেলা ভার। 'আল্লামা ইবনুল আসীর লিখেছেন :[২৮]

أجمَعَ أهلُ العِلمِ بِالشِّعرِ أنَّهُ لَم يَكُن إمرَأةً قَبلَهَا وَلاَبَعدَهَا أشعَرُ مِنهَا.

'আরবী কাব্যশাস্ত্রের পণ্ডিতরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, খানসার পূর্বে ও পরে তাঁর চেয়ে বড় কোন মহিলা কবির জন্ম হয়নি।'

উমাইয়্যা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি জারীর (মৃত্যু-১১০ হি.)। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে? জবাবে তিনি বলেছিলেন :[২৯]

أنَا لَولاَ الـخَنسَاء 'যদি খানসা না থাকতেন তাহলে আমিই।'

বাশশার বিন বুরদ ছিলেন 'আব্বাসী যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তিনি বলেন, আমি যখন মহিলা কবিদের কবিতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তখন তাদের প্রত্যেকের কবিতায় একটা না একটা ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করি। লোকেরা প্রশ্ন করলো : খানসার কবিতারও কি একই অবস্থা? বললেন : তিনি তো পুরুষ কবিদেরও উপরে।[৩০]

সকল আরব কবি উমাইয়্যা যুগের লায়লা উখাইলিয়্যাকে একমাত্র খানসা (রা) ছাড়া আরব মহিলা কবিদের মাথার মুকুট জ্ঞান করেছেন। আধুনিক যুগের মিসরীয় পণ্ডিত ড: 'উমার ফাররূখ হযরত খানসার কাব্য প্রতিভা ও তাঁর কবিতার মূল্যায়ন করেছেন এভাবে :[৩১]

---

২৭. আল-ইসাবা-৪/২৮৮; খাযানাতুল আদাব-১/৩৯৫, ডঃ উমার ফাররূখ-১/৩১৮

২৮. উসুদুল গাবা-৫/৪৪১

২৯. দুররুল মানছূর-১১০

৩০. তাবাকাত আশ-শু'আরাউ-২৭১

৩১. তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী-১/৩১৮

خنسَاءُ أعظَمُ شَوَاعِرَ العَرَبِ عَلى الا طَلاق، شِعرُهَا مُقطَّعَات كُلُّهُ، وَهُـوَ فَصِيـحُ اللَّفـظِ رَقِيقٌ مَتينُ السَّبكِ رَائِقُ الدِّيبَاجَةِ، وَقَد غَلَبَ عَلى شِعرِهَا الفَخرُ قَلِيـلاً والرَّثـاءِ كَثـيرًا لِّمَا رَأينَا مِن فَجيعَتِهَا بِأخوَيهَا خَاصةً. وَرَثَاؤُهَا وَاضِحُ الـمَعَانِى رَقِيقٌ صادِقُ العَاطِفَةِ، بَدَوىُّ الـمَذهَبِ عَلى كَثرَةِ مَافِيه مِنَ التَّلَهُّفِ وَالـمُبَالَغَةِ فِى ذِكرِ مَحَامِد أخَوَيهَا.

'খানসা সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ আরব কবি। তাঁর কবিতা সবই খণ্ড খণ্ড। অত্যন্ত বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, সূক্ষ্ম, শক্ত গঠন ও চমৎকার ভূমিকা সম্বলিত। তার কবিতায় গৌরব' গাথার প্রাধান্য অতি সামান্য। যতটুকু আমরা দেখেছি, বিশেষত তার দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে তিনি যে দুঃসহ ব্যথা পান সেজন্য মরসিয়ার প্রাধান্য অনেক বেশী। তার মরসিয়ার অর্থ স্পষ্ট, সূক্ষ্ম ও কোমল এবং আবেগ-অনুভূতির সঠিক মুখপত্র। তাতে অত্যধিক দুঃখ ও পরিতাপ এবং দুই ভাইয়ের প্রশংসায় অতিরঞ্জন থাকা সত্ত্বেও তা বেদুঈন পদ্ধতি ও স্টাইলের।'

জাহিলী যুগে সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানে মেলা প্রদর্শনী ও সভা-সমাবেশ করার রীতি ছিল। এর উদ্দেশ্য হতো পরস্পর মত বিনিময়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করতো। সমগ্র আরববাসী দূর দূরান্ত থেকে এসব মেলায় ছুটে আসতো। এর সূচনা হতো রাবী'উল আওয়াল মাস থেকে। এ মাসের প্রথম দিন দুমাতুল জান্দালে বছরের প্রথম মেলা বসতো। এই মেলা শেষ করে তারা হিজরের বাজারে চলে যেত। তারপর উমানে, সেখান থেকে হাদারামাউতে। তারপর ইয়ামনের সান'আর আশে-পাশে কোথাও দশ, আবার কোথাও বিশ দিন অবস্থান করতো। এভাবে গোটা আরব ঘোরার পর হজ্জের কাছাকাছি সময়ে জুলকা'দা মাসে মক্কার কয়েক মাইল দূরে 'উকাজের[৩২] বাজারে বছরের সর্বশেষ মেলা বসতো। এ মেলাটি ছিল আরবের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। আরবের সকল গোত্রের লোক, বিশেষত গোত্র-নেতারা এ মেলায় অবশ্যই যোগদান করতো। কোন গোত্র-নেতা কোন কারণে অংশগ্রহণ করতে না পারলে প্রতিনিধি পাঠাতো। এ মেলার অঙ্গনে আরববাসী তাদের গোত্রীয় নেতা নির্বাচন, আন্ত-গোত্র কলহের মীমাংসা, পারস্পরিক হত্যা

---

৩২. 'উকাজ : নাখলা ও তায়িফের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। সেখানে সাধারণভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার বসতো। ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে এ বাজারের পত্তন হয় এবং হিজরী ১২৯ সনে খারেজীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ার সময় পর্যন্ত চালু ছিল। (ড: আবদুল মুন'ইম খাফাজী ও ড: সালাহ উদ্দীন আবদুত তাওয়াব : আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল- জাহেলিয়্যা ওয়া সাদরিল ইসলাম-পৃ. ২৮) তারপর খারেজীদের ভয়ে সেই যে 'উকাজের বাজার বন্ধ হয়ে যায়, আজ পর্যন্ত আর চালু হয়নি। 'উকাজের পর আরবের মাজান্না ও জুলমাজাযের মত প্রাচীন বাজারও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মক্কার এ জাতীয় সর্বশেষ বাজারটি ধ্বংস করা হয় ১৯৭ হিজরীতে। (আল-আযরুকী : আখবারু মক্কাহ্-১২১-২২)

ও সংঘাতের অবসান ইত্যাদি বিষয়ের চূড়ান্ত করতো। এই মেলায় মক্কার কুরাইশ গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সবার উপরে। যখন যাবতীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যেত তখন প্রত্যেক গোত্রের কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতো। সেসব কবিতার বিষয় হতো বীরত্ব, সাহসিকতা, দানশীলতা, অতিথি সেবা, পূর্ব পুরুষের শৌর্য-বীর্য, গৌরব, শিকার, আনন্দ-উৎসব, খুন-খারাবি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি-সন্ধি, প্রেম-বিরহ, শোক ইত্যাদির বর্ণনা। এখানেই নির্ধারিত হতো আরব কবিদের স্থান ও মর্যাদা।

কবি খানসাও এ সকল মেলা ও সমাবেশে অংশগ্রহণ করতেন এবং 'উকাজে তার মরসিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে স্বীকৃতি পায়। তিনি যখন উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসতেন তখন অন্য কবিরা তার চার পাশে ভীড় জমাতো। সবাই তার কবিতা শোনার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকতো। এক সময় সকলকে মরসিয়া শুনিয়ে তৃপ্ত করতেন।

এ সকল মজলিসে খানসার বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে তার তাঁবুর দরজায় একটি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হতো, আর তাতে লেখা থাকতো– أرثى العرب কথাটি। যার অর্থ আরবের শ্রেষ্ঠ মরসিয়া রচয়িতা। ইবন কুতায়বা বলেন :[৩৩]

كانت تَقِفُ بِالـمَوسِمِ فَتَسُومُ هَودَجَهَا بِسُومَةٍ وَتَعَاظَمَ العَرَبُ بِمُصِيبَتِـهَا بِأَبِيـهَا عَمـرٍو وَاخَوِيهَا صَخرٍ وَمُعَاوِيَةَ وَتُنشِدُهُم فَتَبكِي النَّاسُ.

'তিনি এসব মৌসুমী মেলায় অবস্থান করতেন। তার হাওদাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। তার পিতা 'আমর এবং দুই ভাই– সাখর ও মু'আবিয়ার মৃত্যুর বিপদটিকে আরববাসী খুব বড় করে দেখতো। তিনি কবিতা পাঠ করতেন, আর লোকেরা কাঁদতো।'

জাহিলী আরবে বহু বড় বড় কবি জন্মেছিলেন। আন-নাবিগা আজ-জুরইয়ানী (মৃত্যু ৬০৪ খ্রি.) সেই সব বড় কবিদের একজন। তার কাব্যখ্যাতি আজও বিশ্বব্যাপী। তার আসল নাম যিয়াদ ইবন মু'আবিয়া এবং ডাকনাম আবূ উমামা। আবূ উবায়দা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন :[৩৪]

هُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الأُولى الـمُقَدَّمِينَ عَلى سَائِرِ الشُّعَرَاءِ.

'সকল কবির পুরোভাগে অবস্থানকারী প্রথম স্তরের অন্যতম কবি তিনি।' উন্নত মানের প্রচুর কবিতা রচনার কারণে তাঁকে 'আন-নাবিগা' বলা হয়। 'উকাজ মেলায় কেবল তাঁরই জন্য লাল তাঁবু নির্মাণ করা হতো। এ ছিল একটি বিরল সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক, যা কেবল তিনি লাভ করার যোগ্য বলে ভাবা হতো। অন্য কারও জন্য এমন লাল তাঁবু নির্মাণ করা যেত না। এর কারণ, কাব্য ক্ষেত্রে যিনি সর্বজনমান্য, কেবল তিনিই এ মর্যাদা লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন। ইবন কুতায়বা বলেন :[৩৫]

---

৩৩. আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬১; সিফাতু জাযীরাতিল 'আরাব-২৬৩

৩৪. সাহাবিয়াত-১৮৬

৩৫. আস-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬০

وَكَانَ النَّابِغَةُ تُضْرَبُ لَهُ قُبَّةٌ حَمرَاءُ مِن آدَمٍ بِسُوقِ عُكَاظٍ وَتَأتِيهِ الشُعَرَاءُ فَتَعرِضُ عَلَيــهِ أشعَارَهَا.

'আন-নাবিগার জন্য 'উকাজে লাল রঙ্গের চামড়ার তাঁবু টাঙ্গানো হতো। সেই তাঁবুতে কবিরা এসে তাকে কবিতা শোনাতো।'

'উকাজের মেলা উপলক্ষে কবি আন-নাবিগার সভাপতিত্বে কবি সম্মেলন হতো। আরবের বড় বড় কবিগণ এ সম্মেলনে যোগ দিতেন এবং নিজ নিজ কবিতা পাঠ করে স্বীকৃতি লাভ করতেন। একবার এমনি এক সম্মেলনে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ তিন কবি- আল-আ'শা আবূ বাসীর, হাস্সান ইবন ছাবিত ও খানসা যোগ দেন। প্রথমে আল-আ'শা, তারপর হাস্সান কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে পাঠ করেন খানসা। তার পাঠ শেষ হলে সভাপতি আন-নাবিগা তাকে লক্ষ্য করে বলেন :

وَاللهِ لَولاَ أنَّ أبَا بَصِير أنشَدَنِى اَنفًا لَقُلتُ إنَّكَ أشعَرُ الأنسِ وَالـجِنِّ.

'আল্লাহর কসম! এই একটু আগে যদি আবূ বাসীর আমাকে তার কবিতা না শোনাতেন তাহলে আমি বলতাম, জিন ও মানুষের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।'

আন-নাবিগার এ মন্তব্য শুনে কবি হাস্সান দারুণ ক্ষুব্ধ হন। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এভাবে– 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার চেয়ে এবং আপনার পিতা ও পিতামহের চেয়েও বড় কবি। আন-নাবিগা হাস্সানের হাত চেপে ধরে বলেন : 'ভাতিজা, তুমি আমার এ শ্লোকটির চেয়ে ভালো কোন শ্লোক বলতে পারবে কি?

فَإنَّكَ كَاللَّيلِ الَّذِى هُوَ مَدرِكِى + وَإن خِلتُ أنَّ الـمُنَتَآى عَنك وَاسِعُ

'নিশ্চয় তুমি সেই রাত্রির মত, যে রাত্রি আমাকে ধারণ করে। যদিও আমি ধারণা করেছি, তোমার থেকে আমার দূরত্ব অনেক ব্যাপক।' অর্থাৎ রাত্রির মত তুমি আমাকে বেষ্টন করে আছ– তা আমি যত দূরেই থাকি না কেন।

তারপর তিনি খানসাকে বলেন : 'তাকে আবৃত্তি করে শোনাও।'

খানসা তার আরো কিছু শ্লোক আবৃত্তি করেন। তারপর আন-নাবিগা মন্তব্য করেন :

وَاللهِ مَارَأيتُ ذَاتَ ثَدَّينِ أشعَرُ مِنك.

'আল্লাহর কসম! আমি দুই স্তনবিশিষ্ট কাউকে তোমার চেয়ে বড় কবি দেখিনি। অর্থাৎ তোমার চেয়ে বড় কোন মহিলা কবিকে দেখিনি।' সাথে সাথে খানসা আন্-নাবিগার কথার সংশোধনী দেন এভাবে– لا واللهِ وَلا ذَا خُصيَينِ.

'না, আল্লাহর কসম! দুই অণ্ডকোষধারীদের মধ্যেও না।' অর্থাৎ কেবল নারীদের মধ্যে নয়, বরং পুরুষদের মধ্যেও আপনি আমার চেয়ে বড় কোন কবি দেখেননি।[৩৬]

---

৩৬. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী : কিতাবুল আগানী-১১/৬; আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরাউ-১৬০,

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে আন-নাবিগার প্রশ্নের জবাবে হাস্‌সান তাঁর নিম্নের শ্লোকটি পাঠ করে শোনান :

لَنَا الـجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلمَعنَ فِى الضُّحى + وَأسيافُنَا يَقطُرنَ مِنَ نَجدَةٍ دَمًا

'আমাদের আছে অনেক বড় বড় স্বচ্ছ ও ঝকঝকে বরতন, পূর্বাহ্ন বেলায় যা চকচক করতে থাকে। আর আমাদের তরবারিসমূহ এমন যে তার হাতল থেকে ফোটা ফোটা রক্ত ঝরতে থাকে।' কবি হাস্‌সান তাঁর শ্লোকে নিজের অতিথি সেবা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কবি আন-নাবিগা মতান্তরে খানসা হাস্‌সানের শ্লোকটির কঠোর সমালোচনা করে তার ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন এবং তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৭]

মোটকথা, কাব্য শক্তি ও প্রতিভার দিক দিয়ে হযরত খানসার (রা) স্থান দ্বিতীয় স্তরের তৎকালীন আরব কবিদের মধ্যে অনেক উঁচুতে। তার কবিতার একটি দিওয়ান ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতের একটি প্রকাশনা সংস্থা সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দিওয়ানটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ হয়।[৩৮]

হযরত খানসার (রা) মৃত্যু সন নিয়ে একটু মতপার্থক্য আছে। একটি মতে, হযরত 'উসমানের (রা) খিলাফতকালের সূচনা পর্বে হি: ২৪/ খ্রি: ৬৪৪-৪৫ সনে তিনি মারা যান। পক্ষান্তরে অপর একটি মতে, হি: ৪২/খ্রি: ৬৬৩ সনের কথা এসেছে।[৩৯]

---

৩৭. কুদামা ইবন জা'ফার : নাকদুশ শি'র- পৃ. ৬২; আল- আগানী-৯/৩৪০

৩৮. সাহাবিয়াত-১৮৮,

৩৯. ড: 'উমার ফাররূখ-১/৩১৮।

আসমা' বিন্‌ত ইয়াযীদ আল-আনসারিয়্যা (রা)

হযরত আসমা' (রা) একজন মহিলা আনসারী সাহাবী। তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবন আস-সাকান এবং মাতা উম্মু সা'দ ইবন হুযায়স ইবন মাস'উদ। তাঁর স্বামী সা'ঈদ ইবন 'আম্মারা– যিনি আবূ সা'ঈদ আল-আনসারী নামে প্রসিদ্ধ।[১] হযরত আসমা'র ডাকনাম ছিল উম্মু সালামা, মতান্তরে উম্মু 'আমির। তিনি মদীনায় বিখ্যাত আওস গোত্রের বানূ 'আবদিল আশহাল শাখার সন্তান। প্রখ্যাত সাহাবী মুআয ইবন জাবালের (রা) ফুফুর কন্যা।[২] ইবন হাজার তাঁকে মু'আয ইবন জাবালের চাচাতো বোন বলেছেন।[৩]

হযরত আসমা'র (রা) জন্ম ও বাল্যকাল সম্পর্কে বেশী কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে এতটুকু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের পর তিনি মুসলমান হন। তিনি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী দারুণ বাকপটু মহিলা। বুদ্ধিমত্তা, ধর্মভীরুতা, ইবাদাত-বন্দেগী, হাদীছ বর্ণনা ইত্যাদির জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর আরো একটি বড় পরিচয় তিনি একজন বীর যোদ্ধা। মহিলাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কথা বলার জন্য তাঁকে বলা হতো– মহিলাদের মুখপাত্রী। একটি বর্ণনা মতে, তিনি আকাবার শেষ বাই'আতে অংশগ্রহণ করেন।[৪]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় এসেছেন। একদিন সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে আছেন। এমন সময় আসমা' এলেন এবং রাসূলুল্লাহকে (সা) সম্বোধন করে ছোট-খাট এ ভাষণটি দিলেন :

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি একদল মুসলিম মহিলার পক্ষ থেকে তাদের কিছু কথা বলার জন্য এসেছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নারী-পুরুষ উভয় জাতির জন্য পথপ্রদর্শক করে পাঠিয়েছেন। আমরা মহিলারা আপনার উপর ঈমান এনে আপনার অনুসারী হয়েছি। কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আমরা লক্ষ্য করি। আমরা গৃহের চৌহদ্দির মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষের যৌন তৃপ্তি পূরণ করি এবং তাদের সন্তানদের ধারণ করি। আর আপনারা পুরুষরা জুম'আ, নামাযের জামা'আত ও জানাযায় শরীক হতে পারেন। হজ্জে যান। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আপনারা আল্লাহর পথে জিহাদে চলে যান। আর আমরা তখন আপনাদের সন্তানদেরকে লালন-পালন করি, ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করি, কাপড় তৈরীর জন্য চরকায় সূতা কাটি। আমাদের প্রশ্ন হলো, আমরা কি আপনাদের সাওয়াবের অংশীদার হবো না? আমার পিছনে যে সকল মহিলা আছেন, তাদেরও আমার

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৯৬; আল-ইসাবা-৪/৮৯

২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৭৮

৩. আল-ইসাবা-৪/২২৫

৪. হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭; টীকা-৪।

মত একই বক্তব্য ও একই মত।"

রাসূল (সা) আসমা'র বক্তব্য শোনার পর সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : তোমরা কি এর চেয়ে আরো সুন্দর করে দীন সম্পর্কে জানতে চায় এমন কোন মহিলার কথা শুনেছো? তাঁরা বললেন : আমাদের তো ধারণাই ছিল না যে, একজন মহিলা এমন প্রশ্ন করতে পারেন। তারপর রাসূল (সা) আসমা'কে লক্ষ্য করে বলেন : "নারী যদি তার স্বামীর সাথে সদাচরণ করে,তার মন যুগিয়ে চলে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছামত আনুগত্য করে এবং দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব-অধিকার পূরণ করে তাহলে সেও পুরুষের সমান প্রতিদান লাভ করবে। যাও, তুমি একথা তোমার পিছনে রেখে আসা অন্য নারীদেরকে বলে দাও।"

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ থেকে এ সুসংবাদ শুনে আসমা' আনন্দের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করতে করতে ফিরে যান।[৫]

হযরত আসমা' যে মহিলা দলটির প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সেই দলে তাঁর খালাও ছিলেন। তাঁর হাতে সোনার চুড়ি ও আংটি ছিল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন : এই অলঙ্কারের যাকাত দেওয়া হয়? বললেন : না। রাসূল (সা) বললেন : তুমি কি এটা পছন্দ কর যে, আল্লাহ তোমাকে আগুনের চুড়ি ও আংটি পরান? আসমা' তখন খালাকে বললেন : খালা, তুমি এগুলো খুলে ফেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব অলঙ্কার খুলে ছুড়ে ফেলে দেন। তারপর আসমা' বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি অলঙ্কার না পরি তাহলে স্বামীদের নিকট তো গুরুত্বহীন হয়ে পড়বো। বললেন : রূপোর অলঙ্কার বানিয়ে তাতে জাফরানের রং লাগিয়ে নাও। সোনার চাকচিক্য দেখা যাবে। আলোচনার এ পর্যায়ে বাই'আতের সময় হয়ে যায়। রাসূল (সা) তাঁদেরকে কয়েকটি অঙ্গীকার বাক্য পাঠ করান। এই সময় আসমা' বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার একটি হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা স্পর্শ করে আমাদের এ বাই'আত সম্পন্ন করি। রাসূল (সা) বললেন : আমি মহিলাদের সাথে করমর্দন করি না।[৬] কোন কোন সূত্রে অলঙ্কারের ঘটনাটি খোদ আসমা'র বলে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

হযরত আসমা' (রা) সব সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) আশে পাশে অবস্থান করতেন। একদিন রাসূল (সা) তার সামনে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। রাসূল (সা) এ অবস্থায় উঠে চলে গেলেন। ফিরে এসে

---

৫. আল-ইসতী'আব-৪/২৩৩; উসুদুল গাবা-৫/৩৯৮, ৩৯৯; আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-১/১৪৯। আত-তূসী এ ঘটনাটি আসমা' বিন্ত 'উবায়দ আল-আনসারিয়্যার প্রতি আরোপ করেছেন। ইবন মুন্দাহ্ ও আবূ নু'আয়ম এ ঘটনাটি আসমা' বিন্ত ইয়াযীদ আল-আশহালিয়্যার বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আসমা' আল-আশ্হালিয়্যা ও আসমা' বিন্ত ইয়াযীদ ইবন আস-সাকান ভিন্ন দুই মহিলা। ইবন 'আবদিল বার উপরোক্ত দুজনকে একই মহিলা বলেছেন এবং তাঁর মতে এ মহিলাই রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইমাম আহমাদও এ রকম মত পোষণ করেছেন। (আ'লাম আন-নিসা'-১/৬৭; টীকা-১)

৬. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬১

৭. সাহাবিয়াত-৩০২

দেখলেন, আসমা' একই অবস্থায় কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কাঁদছো কেন? আসমা' বললেন : আমাদের অবস্থা এমন যে, দাসী আটা চটকাতে বসে, আর এদিকে আমাদের ক্ষিধেও পেয়ে যায়। তার খাবার তৈরী শেষ না হতেই আমরা খাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। দাজ্জালের সময় যখন অভাব দেখা দেবে তখন আমরা ধৈর্য ধরবো কেমন করে? রাসূল (সা) বললেন : সেদিন তাসবীহ ও তাকবীর ক্ষুধা থেকে রক্ষা করবে। এত কান্নাকাটি ও হাহুতাশের প্রয়োজন নেই। তখন আমি যদি জীবিত থাকি, তোমাদের জন্য ঢাল হয়ে থাকবো। অন্যথায় আমার পরে আল্লাহ প্রত্যেকটি মুসলমানকে রক্ষা করবেন।[৮]

হযরত 'আয়িশা (রা) তাঁর পরিবারের অন্য লোকদের সাথে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করে আসার অল্প কিছুদিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে যান। এই অনুষ্ঠানে হযরত আসমা'ও ছিলেন। 'আয়িশাকে (রা) যারা নববধূর বেশে সাজিয়েছিলেন আসমা' তাঁদের অন্যতম। সাজগোজ শেষ হলে 'আয়িশাকে (রা) একটি আসনে বসিয়ে স্বামী রাসূলকে (সা) সংবাদ পাঠানো হয়। তিনি এসে 'আয়িশার (রা) পাশে বসে পড়েন। মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ একজন এক পেয়ালা দুধ রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে দেন। তিনি সামান্য পান করে 'আয়িশার (রা) হাতে দেন। তিনি লজ্জায় মাথা নত করে রাখেন। তখন আসমা' ধমকের সুরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যা দিচ্ছেন তা গ্রহণ কর। হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাত থেকে দুধের পেয়ালা নিয়ে সামান্য পান করে আবার রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে ফিরিয়ে দেন। তিনি পেয়ালাটি আসমা'র হাতে তুলে দেন। পেয়ালাটির যে স্থানে রাসূল (সা) মুখ লাগিয়ে পান করেছিলেন ঠিক সেখানেই মুখ লাগিয়ে পান করার জন্য আসমা' পেয়ালাটি ঘোরাতে থাকেন। রাসূল (সা) বলেন অন্য মহিলাদেরকেও দাও। কিন্তু উপস্থিত অন্য মহিলারা বললেন, আমাদের এখন পান করার ইচ্ছা নেই। জবাবে রাসূল (সা) বললেন : ক্ষুধার সাথে মিথ্যাও? অর্থাৎ ক্ষুধার সাথে মিথ্যাকে এক করে ফেলছো?[৯]

ইসলামের ইতিহাসে যে সকল বীরাঙ্গনা মুজাহিদের নাম পাওয়া যায় হযরত আসমা'র নামটি তাদের শীর্ষে শোভা পায়। এমনই হওয়া উচিত। কারণ, তিনি এমন এক পরিবারের সন্তান যাদের সকলে আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তার জন্য জীবন কুরবানী করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধসহ রাসূলুল্লাহর (সা) মাদানী জীবনের প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে এই পরিবারের লোকেরা তাঁদের জীবনের বিনিময়ে আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তা বিধান করেছেন।

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের দিন সাতজন আনসার ও দু'জন কুরাইশ, মোট নয়জন মুজাহিদসহ রাসূল (সা) মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

---

৮. মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৩

৯. প্রাগুক্ত-৬/৪৫৮, ৪৬১

শত্রু পক্ষের আঘাতে এক পর্যায়ে রাসূল (সা) আহত হন। তখন রাসূল (সা) তাঁর সংগের এই ক'জন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বলেন : যে এদেরকে আমাদের থেকে দূরে তাড়িয়ে দিতে পারবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। অথবা তিনি একথা বলেন যে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।

আনসারদের এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। রাসূল (সা) আবারো পূর্বের মত একই কথা বললেন। এবারো একজন আনসারী এগিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে একে একে সাতজন আনসারীই শহীদ হলেন।[১০] এর সপ্তম জন ছিলেন আসমা'র ভাই 'আম্মারা ইবন ইয়াযীদ ইবন আস-সাকান। শত্রু পক্ষের আঘাতে মারাত্মক আহত হয়ে তিনি যখন পড়ে গেলেন ঠিক তখনই একদল মুসলিম মুজাহিদ এসে উপস্থিত হন। তারা পৌত্তলিক বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের কবল থেকে আম্মারাকে উদ্ধার করেন। রাসূল (সা) চেঁচিয়ে তাদেরকে বলেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাসূল (সা) নিজের পায়ের উপর তার মাথা রেখে তাকে শুইয়ে দেন। এ অবস্থায় তার যখন মৃত্যু হলো তখন দেখা গেল তার মুখ রাসূলুল্লাহর (সা) পদযুগলের উপর। এই উহুদ যুদ্ধে আসমা'র পিতা ইয়াযীদ, আসমা'র আরেক ভাই 'আমির এবং চাচা যিয়াদ ইবন আস-সাকান (রা) শহীদ হন।[১১]

তাঁর পরিবারের সদস্যদের এভাবে শাহাদাত বরণে জিহাদের প্রতি আসমা'র আগ্রহ ও আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে অনেকগুলো অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন। বাই'আতে রিদওয়ান, মক্কা বিজয় ও খাইবর অভিযান তার মধ্যে অন্যতম। বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, আসমা' (রা) হিজরী ১৫ সনে সংঘটিত ইয়ারমূক যুদ্ধে যোগদান করেন এবং তাঁবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে একাই নয়জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।[১২]

হযরত আসমা' (রা) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য ও সান্নিধ্যে কাটান। সব সময় তাঁর আশে পাশেই থাকতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) সেবার সামান্য সুযোগকেও হাতছাড়া করতেন না। রাসূলের (সা) সকল কথা কান লাগিয়ে শুনতেন এবং স্মরণ রাখতেন। সময়ে-অসময়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে জেনে নিতেন। এ কারণে আনসারী মহিলাদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারীর গৌরব অর্জন করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) ৮১ (একাশি)টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৩]

হযরত আসমা' (রা) থেকে যারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তারা হলেন : মাহমূদ ইবন 'আমর (তাঁর ভাগ্নে) আল-আনসারী, আবূ সুফইয়ান মাওলা ইবন আহমাদ, 'আবদুর

---

১০. সহীহ মুসলিম : বাবু গাযওয়াতি উহুদ।

১১. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৮০

১২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৯৭; আল-ইসাবা-৪/২২৯; আ'লাম আন-নিসা'-১৬৮; মাজমা' আয-হাওয়ায়িদ-৯/২৬০; হায়াতুস সাহাবা-১/৫৯৭

১৩. আ'লাম আন-নিসা'-১/৬৭; নিসা' মিন 'আসর-আন-নুবুওয়াহ্-৮০

রহমান ইবন ছাবিত আস-সামিত আল-আনসারী, মুজাহিদ ইবন জুবায়র, মুহাজির ইবন আবী মুসলিম ও শাহর ইবন হাওশাব। আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর হাদীছ সংকলিত হয়েছে।[১৪] ইমাম আল-বুখারী তাঁর "আল-আদাব আল-মুফরাদ" গ্রন্থেও সংকলন করেছেন।[১৫]

হযরত আসমা' (রা) বর্ণিত হাদীছের মাধ্যমে মোটামুটি আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট, উপলক্ষ, শরী'আতের বিভিন্ন বিধান, রাসূলুল্লাহর (সা) গুণাবলী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো জানা যায়। যেমন সূরা আল-মায়িদা নাযিল হওয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) উষ্ট্রী আল-'আদবা'র লাগাম ধরা ছিলাম। রাসূল (সা) তখন তার পিঠে বসা। এমতাবস্থায় উষ্ট্রীর বাহু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছিল।[১৬]

জামা ছিল রাসূলুল্লাহর (সা) সবচেয়ে প্রিয় পোশাক। আসমা' (রা) সেই জামার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : রাসূলুল্লাহর (সা) জামার হাতা ছিল হাতের কবজী পর্যন্ত।[১৭]

এ হাদীছটিও আসমা' (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ইহুদীর নিকট কিছু খাদ্যের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বর্মটি বন্ধক রাখা অবস্থায় ইনতিকাল করেন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইনতিকালের পর আবূ যার আল-গিফারী (রা) যে শাসকদের কঠোর সমালোচনা করবেন এবং এর জন্য যে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হবে এ বিষয়ের একটি হাদীছ তিনি বর্ণনা করেছেন।[১৮]

হাদীছ, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে মদীনার আনসারদের মহানুভবতা, উদারতা ও অন্যকে প্রাধান্য দানের গুণের অনেক কথা যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে তাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) অনেক মু'জিযা যে প্রকাশ পেয়েছিল সেকথাও এসেছে। ইবন 'আসাকির তাঁর তারীখে আসমা'কে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি মু'জিযার কথা আসমা'র যবানীতে বর্ণনা করেছেন। আসমা' বলেন : আমি একদিন দেখলাম রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করছেন। আমি ঘরে এলাম এবং কিছু হাঁড়ওয়ালা গোশ্‌ত ও রুটি নিয়ে তাঁর সামনে রেখে বললাম : আমার বাবা-মা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এগুলো আপনি রাতের খাবার হিসেবে খেয়ে নিন। তিনি সঙ্গীদের ডেকে বললেন : বিসমিল্লাহ বলে তোমরা খেতে শুরু কর। সেই সামান্য খাবার রাসূলুল্লাহ (সা) খেলেন, তাঁর সঙ্গীরা খেলেন এবং বাড়ীর যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সবাই খেলেন। যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! সর্বমোট চল্লিশজন লোক খাওয়ার পরও আমি দেখলাম বেশীর ভাগ গোশ্‌ত ও রুটি রয়ে গেছে। তারপর রাসূল (সা)

---

১৪. আ'লাম আন-নিসা'-১/৬৭; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৬৬

১৫. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৮১

১৬. তাফসীর ইবন কাছীর-২/২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/২২

১৭. হায়াতুস সাহাবা-২/৭০৫

১৮. ইবন মাজাহ (২৮৩৮); আত-তিরমিযী-(১৭৬৫); হায়াতুস সাহাবা-২/৬৭

আমাদের একটি মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে বিদায় নেন। আমরা সেই মশ্‌কটি সংরক্ষণ করেছিলাম। কারো অসুখ হলে তাকে সেই মশকে পানি পান করানো হতো এবং মাঝে মাঝে বরকত লাভের উদ্দেশ্যেও তাতে পান করা হতো।[১৯]

তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণা ছিলেন। একবার শাহর ইবন হাওশাব তাঁর বাড়ীতে এলেন। তাঁর সামনে খাবার উপস্থিত করা হলো। তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন আসমা' (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি ঘটনা শুনিয়ে বলেন : এখন তো নিশ্চয় আর খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে না। শাহর বললেন : আম্মা! এমন ভুল হবে না।[২০]

হযরত আসমা' (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকালের পর মদীনা ত্যাগ করে শামে চলে যান। এ সময় ইয়ারমূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর তিনি দিমাশ্‌কে অবস্থান করে সেখানে হাদীছ বর্ণনা করতে থাকেন। একথা ইবন 'আসাকির আবূ যুর'আর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আসমা'র (রা) মৃত্যুর সঠিক সন জানা যায় না। 'আল্লামা আয-যাহাবী (রহ) বলেছেন, তিনি ইয়াযীদ ইবন মু'আবিয়ার (রা) শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২১] উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ ১৪ রাবী'উল আউয়াল ৬৪হি. মৃত্যুবরণ করেন। আয-যাহাবী আরো বলেছেন, আসমা' (রা) দিমাশ্‌কে বসবাস করেন এবং দিমাশ্‌কে বাবুস সাগীরে তাঁর কবর বিদ্যমান।[২২] একথারই সমর্থন পাওয়া যায় ইবন কাছীরের মন্তব্যে। হিজরী ৬৯ সনে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের নামের মধ্যে তিনি আসমা'র নামটিও উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, দিমাশ্‌কের বাবুস সাগীরে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের খিলাফতকালে হযরত আসমা' ইনতিকাল করেছেন।[২৩] তার সন্তানাদির কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

---

১৯. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্‌-৮২
২০. আল-ইসতী'আব-৩/৭২৬; মুসনাদে আহমাদ-৬/৪৫৮
২১. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্‌-৮৩
২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২২০, ২৯৬
২৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ-৮৩

উম্মু রূমান বিন্‌ত 'আমির (রা)

হযরত উম্মু রূমানের (রা) পরিচয় এই রকম : উম্মু রূমান বিন্‌ত 'আমির ইবন 'উয়াইমির ইবন 'আবদু শাম্‌স ইবন 'উত্তাব ইবন উযাইনা আল-কিনানিয়া।[১] ইতিহাসে নামটির দুই রকম উচ্চারণ দেখা যায়– উম্মু রূমান ও উম্মু রাওমান। ইবন ইসহাক তাঁর আসল নাম "যায়নাব" বলেছেন, তবে অন্যরা বলেছেন 'দা'আদ'।[২] তিনি উম্মু রূমান ডাকনামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

আরব উপ-দ্বীপের 'আস-সারাত' (السَّرَاةُ)[৩] অঞ্চলে উম্মু রূমানের জন্ম হয় এবং সেখানে বেড়ে ওঠেন। বিয়ের বয়স হলে 'আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছ ইবন সাখবারা আল-আযদীর সাথে বিয়ে হয়। আত-তুফাইল ইবন 'আবদিল্লাহ নামে তাদের এক ছেলে হয়। সে ছিল ইসলামপূর্ব আল-আইয়্যাম আল-জাহিলিয়্যার যুগ। গোটা আরবে তখন অনাচার ও অশান্তি বিরাজমান। আরব উপ-দ্বীপে যতটুকু শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান ছিল, বলা চলে তা কেবল উম্মুল কুরা মক্কা নগরীতেই ছিল।

وإذ قال ابراهيمُ رب اجعل هذا البلد أمنا...[৪]

'ইবরাহীম যখন বলেছিল হে প্রভু! আপনি এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দিন...।' এ সম্মানিত ও গৌরবময় শহরের কেন্দ্রস্থলেই ছিল আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ঘর কা'বা। যুগে যুগে মানুষ এই শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে এসে কা'বার পাশে বসবাস করতে চেয়েছে। উম্মু রূমানের স্বামী 'আবদুল্লাহ ইবন আল-হারিছেরও স্বপ্ন ছিল এই পবিত্র কা'বার প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করার। সেই স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি একদিন স্ত্রী উম্মু রূমান ও ছেলে আত-তুফাইলকে সংগে নিয়ে জন্মভূমি আস-সারাত থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি তৎকালীন আরবের নিয়ম-অনুযায়ী সেখানকার অধিবাসী আবূ বকরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। এভাবে তিনি আবূ বকরের আশ্রয়ে পরিবারসহ মক্কায় বসবাস শুরু করেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি মারা যান। বিধবা উম্মু রূমান তাঁর ছেলেসহ বিদেশ-বিভূঁয়ে দারুণ অসহায় অবস্থায় পড়েন।

এই বিপদের মধ্যে উম্মু রূমান একটা আশার আলো দেখতে পান। তাঁদের আশ্রয়দাতা আবূ বকর ছিলেন একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, উদারতা ও দানশীলতার অধিকারী। মানুষের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর স্বভাব। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার পৌত্তলিক শক্তি আবূ বকরের (রা) উপর বাড়াবাড়ি শুরু করলে তিনি দেশ ত্যাগের ইচ্ছা করেন। তখন ইবন আদ-দিগান্না কুরাইশদের তিরস্কার করে যে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেন

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৫৮৩; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০৯; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৩৫
২. আল-ইসাবা-৪/৪৩৩; আর-রাওদ আল-আন্‌ফ-৪/১২
৩. মু'জাম আল-বুলদান-৩/২০৪-২০৫; السراة দ্র.।
৪. সূরা ইবরাহীম-৩৫

তাতে আবূ বকরের (রা) সদগুণাবলী চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন :[৫]

أتخرجون رجلا يُكسب المعدوم ويصل الرَّحم ويحمل الكلَّ، ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق.

'এমন একটি লোককে তোমরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো যে কিনা হত-দরিদ্রদের সাহায্য করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে, অন্যের বোঝা বহন করে, অতিথিকে আহার করায় এবং বিপদ-আপদে মানুষকে সাহায্য করে?' এমন ব্যক্তি তাঁর আশ্রয়ে থাকা সন্তানসহ এক অসহায় বিধবাকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন কিভাবে? তিনি উম্মু রূমানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁকে বিয়ে করে তাঁর ছেলেসহ নিজের পরিবারের সাথে যুক্ত করেন। এভাবে উম্মু রূমান (রা) একটি চমৎকার ঘর ও সংসার লাভ করেন। আবূ বকরের (রা) সাথে বৈবাহিক জীবনে তিনি তাঁকে এক ছেলে ও এক মেয়ে– 'আবদুর রহমান ও 'আয়িশাকে (রা) উপহার দেন।[৬] এই 'আয়িশা (রা) পরবর্তীকালে 'উম্মুল মু'মিনীন' হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

এখানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, জাহিলী যুগে আবূ বকর (রা) কুতাইলা বিন্‌ত 'আবদিল 'উযযা আল-'আমিরিয়াকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ছেলে 'আবদুল্লাহ ও মেয়ে আসমা' (রা)। ইসলাম গ্রহণ না করায় কুতাইলার সাথে আবূ বকরের (রা) ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ইসলামী জীবনে আবূ বকর বিয়ে করেন 'আসমা' বিন্‌ত 'উমাইসকে (রা)। তাঁর গর্ভে জন্ম হয় ছেলে মুহাম্মাদ ইবন আবূ বকরের (রা)। তিনি হাবীবা বিন্‌ত খারিজাকেও বিয়ে করেন এবং মেয়ে উম্মু কুলছূম মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় আবূ বকর ইনতিকাল করেন।[৭]

ইসলাম গ্রহণ

সকল নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা একথা সমর্থিত যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে যিনি সবকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দেন, স্বভাবতঃই তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুহূর্তে নিজের আপনজনদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করে থাকবেন। একথা জানা যায় যে, তিনি তাঁর মা উম্মুল খায়র সালমা বিন্‌ত সাখর (রা)-এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে নিয়ে হাজির করেন। রাসূল (সা) তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। তিনি স্ত্রী উম্মু রূমানকেও ইসলামের দা'ওয়াত দেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তাঁরা ইসলামী দা'ওয়াতের একেবারে সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণকারী দলটির সদস্য হওয়ার অনন্য গৌরবের অধিকারী হন। হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন :[৮]

---

৫. নিসা' 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-২৬৯-২৭০
৬. প্রাগুক্ত; নিসা' হাওলার রাসূল-২৬৪
৭. নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল-জান্নাহ্-৮৪
৮. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল-লুগাত-২/১৮৩

لم أعقل أبوىّ إلاوهما يدينان الدين -

'আমার পিতাকে চেনার পরই দেখেছি তাঁরা দুইজন এ দীন ধারণ করেছেন।'

ইবন সা'দ বলেন : أسلمت أم رومان بمكة قديمًا وبايعت وهاجرت

'উম্মু রূমান মক্কায় বহু আগে ইসলাম গ্রহণ করে বাই'আত করেন এবং হিজরাতও করেন।'[৯]

ইসলাম গ্রহণের পর মনে-প্রাণে ইসলামের শিক্ষায় নিজেকে ও নিজের পরিবারকে গড়ে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ইসলামের মহত্ব ও বাস্তব চিত্র রাসূলুল্লাহর (সা) সত্তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। ইসলামী দা'ওয়াতের প্রয়োজনে রাসূল (সা) সময়-অসময়ে আবূ বকরের (রা) গৃহে যেতেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) এমন শুভাগমনে উম্মু রূমানসহ বাড়ীর সকলে দারুণ খুশী হতেন। নিজেদের সাধ্যমত এই মহান অতিথির সেবা করতেন। উম্মু রূমানের (রা) ছিল একটা স্বচ্ছ মন, একটা মমতায় ভরা অন্তর যা শক্ত ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। বিপদে ধৈর্য ধরার অসীম শক্তিও তাঁর মধ্যে ছিল। মক্কার দুর্বল মুসলমানদের উপর পৌত্তলিকদের নির্মম অত্যাচার দেখে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। তিনি দেখতেন রাসূল (সা) তাঁর সাহাবীদেরকে ধৈর্যের শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বামী আবূ বকরকে (রা) দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে এবং নিজের অর্থে দাসদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। তাঁর মহৎ কাজে তিনি উৎসাহ দিতেন।

তিনি ঘর-গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি ছেলে 'আবদুর রহমান ও মেয়ে 'আয়িশার (রা) তত্ত্বাবধানে অত্যধিক যত্নবান ছিলেন। আল্লাহ-ভীতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার উপর ছেলে-মেয়েকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন অন্তকরণ প্রথম থেকেই তাঁকে বলছিল, মেয়ে 'আয়িশা ভবিষ্যতে ইসলামের জন্য এক বিশেষ ভূমিকা রাখবে। রাসূল (সা) সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা যখন তখন বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। মাঝে মাঝে তিনি উম্মু রূমানকে ঘর-গৃহস্থালীর কর্ম সম্পাদন ও সন্তানদের লালন-পালনের ব্যাপারে দিক নির্দেশনাও দিতেন।

ছোট বেলায় 'আয়িশা (রা) মাঝে মাঝে মাকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন। মা মেয়েকে শাস্তিও দিতেন। রাসূল (সা) এতে কষ্ট অনুভব করতেন। একবার তিনি উম্মু রূমানকে বলেন :[১০]

يا أم رومانَ استوصى بعائشة خيرا واحفظينى فيها.

'উম্মু রূমান! আপনি 'আয়িশার সাথে ভালো আচরণ করুন এবং তার ব্যাপারে আমার কথা স্মরণে রাখুন।'

একদিন রাসূল (সা) আবূ বকরের (রা) গৃহে এসে দেখেন, দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে 'আয়িশা (রা) কাঁদছেন। তিনি উম্মু রূমানকে বলেন : আপনি আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। উম্মু রূমান বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মেয়ে আমার বিরুদ্ধে তার বাপের কাছে

---

৯. তাবাকাত-৮/২৭৬

১০. প্রাগুক্ত

লাগায়। রাসূল (সা) বললেন : যা কিছু করুক না কেন তাকে কষ্ট দিবেন না।[১১]

সন্তানদের প্রতি মায়া-মমতা, স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও আনুগত্য, সর্বোপরি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা উম্মু রূমান ও তাঁর পরিবারটিকে একটি আদর্শ স্থানে পরিণত করে। স্বামীর সাথে পরামর্শ ছাড়া তিনি কোন সিদ্ধান্তমূলক কাজ করতেন না। রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কন্যা 'আয়িশার (রা) বিয়ের পয়গামের সময় উম্মু রূমানের ভূমিকা এর উত্তম দৃষ্টান্ত।

হিজরাতের তিন বছর পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ইনতিকাল করেন। রাসূল (সা) শোকে কাতর হয়ে পড়েন। একদিন তাঁকে বিষণ্ন দেখে 'উছমান ইবন মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল (সা) জানতে চাইলেন : কাকে? খাওলা বললেন : বিধবা ও কুমারী দুই রকম পাত্রীই আছে, যাকে আপনার পসন্দ হয় তাঁর বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। রাসূল (সা) আবার জানতে চাইলেন : তারা কারা? খাওলা বললেন : বিধবা পাত্রীটি সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রীটি আবূ বকরের মেয়ে 'আয়িশা। রাসূল (সা) বললেন : ভালো। তুমি তার সম্পর্কে কথা বলো।

হযরত খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সম্মতি পেয়ে আবূ বকরের বাড়ীতে যান এবং উম্মু রূমানকে (রা) অত্যন্ত আবেগের সুরে বলেন : উম্মু রূমান! আল্লাহ তা'আলা আপনার বাড়ীতে এত খায়র ও বরকত (কল্যাণ ও সমৃদ্ধি) দান করেছেন কিসের জন্য? উম্মু রূমান (রা) বললেন : কেন, কি হয়েছে খাওলা?

খুশীতে ঝলমল চেহারায় খাওলা (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়িশার কথা বলেছেন (বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছেন)।

উম্মু রূমান (রা) ক্ষণিকের জন্য কি যেন ভাবলেন। আস্তে আস্তে তাঁর চেহারাটি দীপ্তিমান হয়ে উঠলো। বললেন : খাওলা! আপনি একটু বসুন, আবূ বকর এখনই এসে পড়বেন।

আবূ বকর (রা) আসলেন। উম্মু রূমান (রা) তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : মুত'ইম ইবন 'আদী তার ছেলে জুবাইরের সাথে 'আয়িশার বিয়ের প্রস্তাব করেছিল এবং আমি তাঁকে কথাও দিয়েছিলাম। আমি আমার অঙ্গীকার তো ভঙ্গ করতে পারবো না।

আবূ বকর (রা) মুত'ইম ইবন 'আদীর কাছে যেয়ে বললেন : তোমার ছেলের সাথে 'আয়িশার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে। এখন তোমাদের সিদ্ধান্ত কি, বল। মুত'ইম তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। মুত'ইমের পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে স্ত্রী বললেন, এ মেয়ে আমাদের ঘরে এলে আমাদের ছেলে ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। এ প্রস্তাবে আমার মত নেই। আবূ বকর (রা) মুত'ইমের দিকে ফিরে বলেন : তোমার মত কি? মুত'ইম বললেন : সে যা বলেছে, আমার মতও তাই। আবূ বকর (রা) বাড়ী ফিরে এসে খাওলাকে বলেন : আপনি রাসূলুল্লাহকে (সা) নিয়ে আসুন। রাসূল (সা) এলেন এবং বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হলো।[১২]

---

১১. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা-৫/৫৭

১২. মুসনাদে আহমাদ-৬/২১০-২১১; তাবাকাত-৮/৫৮; আয-যাহাবী : তারীখ-১/২৮০-২৮১; সিয়ারু

'আতিয়্যা (রা) এই বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে– 'আয়িশা (রা) অন্য মেয়েদের সাথে খেলছিলেন। তাঁর সেবিকা এসে তাঁকে নিয়ে যায় এবং আবূ বকর (রা) এসে বিয়ে পড়িয়ে দেন। এ বিয়ে যে কত অনাড়ম্বর ছিল তা অনুমান করা যায় 'আয়িশার (রা) একটি বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলছেন : যখন আমার বিয়ে হয়, আমি কিছুই বুঝতাম না। আমার বিয়ে হয়ে গেল। যখন মা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করতে লাগলেন তখন বুঝলাম আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর মা আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেন।[১৩] মোটকথা উম্মু রূমান (রা) মেয়ে আয়িশাকে (রা) ভবিষ্যতের উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে, নবীগৃহের কর্ত্রী হিসেবে এবং তার ঘরে যাতে ওহী নাযিল হতে পারে সে রকম যোগ্য করে গড়ে তোলেন।

হিজরাত

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে আবূ বকর (রা) রাতের অন্ধকারে মদীনার উদ্দেশ্যে বের হলেন। ছূর পর্বতের গুহায় তিন দিন আত্মগোপন করে থাকলেন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় উম্মু রূমানের ঘুম দূর হয়ে গেল। একদিকে আবূ বকর (রা) ছেলে-মেয়েদের জন্য ঘরে কোন অর্থ রেখে যাননি সে দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে প্রিয় নবী (সা) ও স্বামীর নিরাপত্তার দুর্ভাবনা। কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্থির ও অটল থেকে সকল দুশ্চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) নিরাপদে মদীনায় পৌঁছার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকেন।

মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা থেকে পরিবার-পরিজনকে মদীনায় নেওয়ার জন্য যায়িদ ইবন হারিছা (রা) ও রাফি'কে (রা) মক্কায় পাঠান। আবূ বকরও (রা) তাঁদের সাথে 'আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাতকে দুই অথবা তিনটি উট দিয়ে পাঠান। তিনি মক্কায় অবস্থানরত পুত্র 'আবদুল্লাহকে বলে পাঠান যে, সে যেন আসমা', 'আয়িশা ও তাঁদের মা উম্মু রূমানকে নিয়ে মদীনায় চলে আসে। এই সকল লোক যখন মক্কা থেকে যাত্রা করেন তখন তালহা ইবন 'আবদিল্লাহ (রা) হিজরাতের উদ্দেশ্যে তাঁদের সহযাত্রী হন। আবূ রাফি' ও যায়িদ ইবন হারিছার (রা) সংগে উম্মু কুলছূম, ফাতিমা, উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, উম্মু আয়মান ও উসামা ইবন যায়িদ (রা) এবং 'আবদুল্লাহ ইবন আবী বকরের (রা) সংগে উম্মু রূমান, আসমা' ও 'আয়িশা (রা) ছিলেন।[১৪]

এই কাফেলা মক্কা থেকে যাত্রা করে যখন হিজাযের বানূ কিনানার আবাসস্থল 'আল-বায়দ' পৌঁছে তখন 'আয়িশা (রা) ও তাঁর মা উম্মু রূমান (রা) যে উটের উপর ছিলেন সেটি বেয়াড়া হয়ে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন, এই বুঝি হাওদাসহ ছিটকে পড়ছেন। মেয়েদের যেমন স্বভাব, মার নিজের জানের প্রতি

আ'লাম আন-নুবালা'-২/১৪৯

১৩. তাবাকাত-৮/৫৯-৬০

১৪. আনসাব আল-আশরাফ-১/২৬৯-২৭০

কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, কলিজার টুকরো মেয়ে 'আয়িশার (রা) জন্য অস্থির হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। তিনি চেঁচিয়ে বলতে থাকেন : واعروساه وابنتاه!

'নতুন বউকে বাঁচাও, আমার মেয়েকে বাঁচাও!'

হযরত 'আয়িশা (রা) বলেন, এ সময় আমি কাউকে বলতে শুনলাম : أرسلى خطامه، - উটের লাগাম ঢিলা করে দাও।' আমি লাগাম ঢিলা করে দিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় উটটি শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।[১৫] তাঁরা নিরাপদে ছিলেন এবং নিরাপদেই মদীনায় পৌঁছেন।

হযরত উম্মু রূমান (রা) ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মদীনার বানূ আল-হারিছ ইবন খাযরাজের মহল্লায় অবতরণ করেন এবং সাত-আট মাস সেখানে বসবাস করেন। উল্লেখ্য যে, 'আয়িশা (রা) মায়ের সাথেই থাকেন। মক্কা থেকে আগত অধিকাংশ মুহাজিরের জন্য মদীনার আবহাওয়া অনুকূল ছিল না। বহু নারী-পুরুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবূ বকর (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। মা-মেয়ের অক্লান্ত সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। স্বামী সুস্থ হওয়ার পর মেয়ে 'আয়িশা (রা) শয্যা নিলেন। তাঁর অসুস্থতা এত মারাত্মক ছিল যে, মাথার প্রায় সব চুল পড়ে যায়।[১৬] মায়ের সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পর মা উম্মু রূমান (রা) একদিন রাসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন? বললেন : মাহর পরিশোধ করার মত অর্থ এখন আমার হাতে নেই। আবূ বকর (রা) বললেন : আমার অর্থ গ্রহণ করুন। আমি ধার দিচ্ছি। অতঃপর রাসূল (সা) মাহরের সমপরিমাণ অর্থ আবূ বকরের (রা) নিকট থেকে ধার নিয়ে 'আয়িশার (রা) নিকট পাঠিয়ে দেন।

হিজরী ৬ষ্ঠ সনে মুরাইসী' যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী-পরিবারকে কেন্দ্র করে মুনাফিকরা এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এই সফরে হযরত 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে ছিলেন। এই সফর থেকে ফেরার পথে একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে একটা দুষ্টচক্র হযরত 'আয়িশার (রা) চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের উদ্দেশ্যে দুর্নাম রটিয়ে দেয়। প্রায় এক মাস যাবত এই মিথ্যা দোষারোপের কথা মদীনার সমাজে উড়ে বেড়াতে থাকে। স্বয়ং নবী (সা) ও আবূ বকরের (রা) পরিবার এক দারুণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। উম্মু রূমানের (রা) কানে মেয়ের এ অপবাদের কথা পৌঁছানোর পর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান।[১৭] কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা ফিরে পেয়ে নিজেকে শক্ত করেন এবং সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ছেড়ে দেন। প্রথম দিকে লোকেরা যা বলাবলি করতো তা 'আয়িশার (রা) নিকট গোপন রাখা হয়। পরে যখন তিনি জানলেন তখন এই গোপন করার জন্য মাকে বেশ বকাবকি করেন।[১৮] আয়িশা (রা) সফর থেকে মদীনায় ফিরে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই মায়ের কাছে চলে যান। তারপর এই মারাত্মক

---

১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/২২১; আল-ইসতী'আব-৪/৪৩৪
১৬. সাহীহ আল-বুখারী : বাবুল হিজরাহ্; তাবাকাত-৮/৬৩
১৭. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৭২
১৮. নিসা' হাওলার রাসূল-২৬৭

সঙ্কটকালের পুরো এক মাস মায়ের কাছেই থাকেন। এ সময় উম্মু রূমানকে (রা) একজন আদর্শ মা হিসেবে মেয়ের পাশে থাকতে দেখা যায়। তিনি সব সময় মেয়েকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিতেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের উপর ভরসা করার কথা বলতেন। এ সময় একদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) পিতৃ-গৃহে আসলেন। আবূ বকর ও উম্মু রূমান (রা) মনে করলেন আজ হয়তো কোন সিদ্ধান্তমূলক কথা হয়ে যাবে। এ কারণে তাঁরা উভয়ে কাছে এসে বসলেন। রাসূল (সা) 'আয়িশাকে (রা) বললেন : 'আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এসব কথা আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আশা করি আল্লাহ তা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর বাস্তবিকই যদি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, ক্ষমা চাও। বান্দাহ যখন গুনাহ স্বীকার করে, তাওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সা) একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। পিতাকে বললাম : আপনি রাসূলে কারীমের (সা) কথার জবাব দিন। তিনি বললেন : মেয়ে! আমি জানিনা রাসূলুল্লাহকে (সা) আমি কি বলবো। আমি মাকে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহকে (সা) জবাব দিন। বললেন : আল্লাহর রাসূলকে (সা) কি বলবো তা আমার জানা নেই।[১৯]

এরই মধ্যে রাসূলের (সা) উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থা সৃষ্টি হলো। এমনকি তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা মুবারক হতে ঘামের ফোঁটা টপটপ করে পড়তে লাগলো। এমন অবস্থা দেখে আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি তো পূর্ণমাত্রায় নির্ভয় ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আবূ বকর ও মাতা উম্মু রূমানের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। আল্লাহ কোন মহাসত্য প্রকাশ করেন, সেই চিন্তায় তাঁরা ছিলেন অস্থির, উদ্বিগ্ন। ওহীকালীন অবস্থা শেষ হলে রাসূলে কারীমকে (সা) খুবই উৎফুল্ল দেখা গেল। তিনি হাসি মুখে প্রথম যে কথাটি বলেন তা এই : 'আয়িশা, তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে ওহী নাযিল করেছেন। অতঃপর তিনি সূরা আন-নূর-এর ১১ থেকে ২১ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শোনান। আমার মা আমাকে বললেন : ওঠো, রাসূলুল্লাহর (সা) শুকরিয়া আদায় কর।[২০]

আদরের মেয়ে 'আয়িশার (রা) প্রতি কলঙ্ক আরোপের ঘটনায় উম্মু রূমানের (রা) পরিবারে যে উৎকণ্ঠা ও অশান্তি ভর করে তা ওহী নাযিলের পর দূর হয়ে যায়। পূর্ব থেকেই মানুষের নিকট এই পরিবারটির যে মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল তা আরো শতগুণে বেড়ে যায়। মা হিসেবে উম্মু রূমানের (রা) খুশীর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) ঘটনায় মা উম্মু রূমানের (রা) দেহ ও মনের উপর দিয়ে এক বিরাট ধকল যায়। এটি সামাল দেওয়ার পর তিনি নিজে অসুস্থ হয়ে শয্যা নেন। মেয়ে 'আয়িশা (রা) সুস্থ করে তোলার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ

---

১৯. তাফসীর ইবন কাছীর, তাফসীর আল-কুরতুবী : সূরা আন-নূর, আল-আয়াত : ১১-২১; বুখারী-৬/১২৭; তাফসীর সূরা আন-নূর।

২০. মুসলিম : হাওদিছ আল-ইফক (২৭৭০); আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৪/১৬০

হয়। হিজরী ৬ষ্ঠ সনের যিল হাজ্জ মাসে তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন।[২১]

উম্মু রূমান একজন ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টিই ছিল একমাত্র কাম্য। স্বামীর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁকে ইসলামের সেবায় আরো বেশী সময় দানের সুযোগ করে দিতেন। একদিন স্বামী আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকজন মেহমান নিয়ে গৃহে আসলেন। তাঁদেরকে রাতে আহার করাতে হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার থেকে জরুরী তলব এলো। তিনি উম্মু রূমানকে (রা) বলে গেলেন, আমার ফিরতে দেরী হবে, তোমরা মেহমানদেরকে খেতে দিবে। কথা মত উম্মু রূমান (রা) যথাসময়ে ছেলে 'আবদুর রহমানের দ্বারা মেহমানদের সামনে খাবার হাজির করলেন; কিন্তু তাঁরা মেজবানের অনুপস্থিতিতে খেতে অস্বীকার করলেন। গভীর রাতে আবূ বকর (রা) ফিরে এসে যখন জানলেন মেহমানগণ অভুক্ত রয়েছেন। তখন তিনি উম্মু রূমান ও ছেলে 'আবদুর রহমানের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। এমনকি ছেলেকে মারতে উদ্যত হলেন। শেষ পর্যন্ত মেহমানদের মধ্যস্থতায় তিনি শান্ত হন। মেহমানদের সামনে খাবার হাজির করা হয়। সকলে পেট ভরে খাওয়ার পর উম্মু রূমান বলেন, যে খাবার তৈরী করা হয়েছিল তার তিন গুন খাবার এখনও রয়ে গেছে। আবূ বকর (রা) সে খাবার রাসূলুল্লাহর (সা) গৃহে পাঠিয়ে দেন। (বুখারী১/৮৪, ৮৫)

তিনি একজন 'আবিদা (ইবাদাত-বন্দেগীকারিণী) মহিলা ছিলেন। ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি স্বামী তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। একদিন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে চোখ বাঁকা করে এদিক ওদিক দেখছেন। আবূ বকর (রা) লক্ষ্য করে এমন বকুনি দেন যে, তাঁর নামায ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হয়। তারপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি :[২২]

إذا قام أحدكم فى الصلاة فليسكن أطرافه ولايميل ميل اليهود، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة.

'তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়াবে, তার দৃষ্টি স্থির রাখবে। ইহুদীদের মত এদিক ওদিক ঝোঁকাবে না। দৃষ্টির স্থিরতা নামাযের পূর্ণতার অংশ।'

হযরত রাসূলে কারীম (সা) একদিকে শাশুড়ী হওয়া, অন্যদিকে ইসলামের সেবায় অবদানের কারণে উম্মু রূমানের (রা) প্রতি দারুণ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি ছিল তাঁর ভীষণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাই মেয়ে-জামাই যখন তাঁর উপস্থিতিতে কোন কথাবার্তা বলতেন তিনি নীরবে শুনতেন। মাঝে মধ্যে মেয়ে-জামাইয়ের মিষ্টি-মধুর কলহে মধ্যস্থতাও করতেন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) প্রায়ই প্রথমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরার (রা) আলোচনা করতেন, তাঁর নানা গুণের কথা বলতেন। এতে 'আয়িশার (রা) নারী-প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হয়। একদিন তিনি বলে

---

২১. আ'লাম আন-নিসা'-১/৪৭২

২২. হায়াত আস-সাহাবা-৩/১৩৭

ফেলেন, মনে হয় খাদীজা (রা) ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন নারী নেই। আয়িশার (রা) এমন প্রতিক্রিয়ায় রাসূল (সা) বেশ মনঃক্ষুণ্ন হন। মা হিসেবে উম্মু রূমান (রা) এবার সামনে আসেন। তিনি জামাইকে লক্ষ্য করে বলেন, 'আয়িশা ও আপনার কী হলো? তার বয়স অল্প, আপনার মত ব্যক্তির থেকে সে ক্ষমাই পেতে পারে।[২৩]

উম্মু রূমানের (রা) পরিবার সব সময় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট দু'আ চাইতেন। একদিন আবূ বকর (রা) ও উম্মু রূমান (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গেলেন। তিনি বললেন : আপনারা কি জন্য এসেছেন? তারা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সামনে আপনি 'আয়িশার মাগফিরাত কামান করে দু'আ করুন। রাসূল (সা) বললেন :

اللهم اغفر لعائشة بنت أبى بكر مغفرة ظاهرة وباطنة لايغادرها ذنب.

'হে আল্লাহ! তুমি 'আয়িশা বিন্‌ত আবী বকরের জাহিরী ও বাতিনী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও, যাতে তার আর কোন গুনাহ্ না থাকে।'

এই দু'আর পর রাসূল (সা) শ্বশুর-শাশুড়ীকে বেশ উৎফুল্ল দেখে বলেন : 'যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন সেদিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমার উম্মাতের সকল মুসলমানের জন্য এই দু'আ।'[২৪]

হযরত উম্মু রূমানের (রা) মৃত্যুতে মেয়ে 'আয়িশা (রা) ও পরিবারের অন্যরা যেমন শোকাভিভূত হন, তেমনি জামাই রাসূলে কারীমও (সা) দুঃখ পান। তাঁর জীবদ্দশায় যেমন রাসূল (সা) তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, মৃত্যুর পরও তাঁর মরদেহের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) মাত্র পাঁচ ব্যক্তির কবরে নেমে তাঁদের লাশ কবরে শায়িত করেছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন নারী ও দুইজন পুরুষ। মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার কবরে নেমেছেন। আর মদীনায় অপর চারজনের মধ্যে উম্মু রূমান (রা) অন্যতম। বাকী' গোরস্তানে রাসূলে কারীম (সা) কবরে উম্মু রূমানের (রা) লাশ শায়িত করে এই দু'আ করেন :[২৫]

اللهم إنَّه لم يخفَ عليك مالقيت أم رومان فيك وفى رسولك.

'হে আল্লাহ! উম্মু রূমান তোমার এবং তোমার রাসূলের সন্তুষ্টির পথে যা কিছু সহ্য করেছে তা তোমার কাছে গোপন নেই।'

তিনি উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে আরো বলেন :[২৬]

---

২৩. আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা-৩/৪০১

২৪. তুহফাতুস সিদ্দীক ফী ফাদায়িলি আবী বকর আস-সিদ্দীক-৯৭; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/১৫৮

২৫. আল-ইসতী'আব-৪/৪৩১; আল-ইসাবা-৪/৪৩৩; ওয়াফা আল-ওয়াফা-৩/৮৯৭

২৬. তাবাকাত-৮/২৭৭; কান্‌য আল-'উম্মাল-১২/১৪৬; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪২০; আর-রাওদ আল-আন্‌ফ-৪/২১

من سرّه أن ينظر إلى إمرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان.

'তোমাদের কেউ যদি (জান্নাতের) আয়তলোচনা হূর দেখে খুশী হতে চায় সে উম্মু রূমানকে দেখতে পারে।'

যেহেতু الحور العين জান্নাতেই হবে, তাই রাসূলুল্লাহর (সা) এ বাণীতে বুঝা যায় উম্মু রূমান (রা) নিশ্চিত জান্নাতী হবেন। এ বাণীতে সেই সুসংবাদই দেওয়া হয়েছে।

হযরত উম্মু রূমানের (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহর (সা) একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ) হাদীছটি সংকলন করেছেন।

উম্মু 'আতিয়্যা বিন্‌ত আল-হারিছ (রা)

উম্মু 'আতিয়্যা (রা) একজন আনসারী মহিলা। পিতার নাম আল-হারিছ।[১] তিনি একজন উঁচু পর্যায়ের মহিলা সাহাবী। উম্মু 'আতিয়্যা তাঁর ডাকনাম। এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। আসল নাম নুসাইবা বিন্‌ত আল-হারিছ।[২] উল্লেখ্য যে, একই সাথে নুসাইবা নাম ও উম্মু 'আতিয়্যা ডাকনামের দ্বিতীয় কোন মহিলা সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজরাতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে রাসূল (সা) মদীনায় আসার পর পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের যে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং বাই'আত করেন। উম্মু 'আতিয়্যা সেই বাই'আতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় আসলেন তখন আনসার মহিলাদের একটি গৃহে একত্র করলেন। তারপর সেখানে 'উমার ইবন আল খাত্তাবকে (রা) পাঠালেন। তিনি এসে দরজার অপর পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন, মহিলারাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের নিকট এসেছি। আমরা বললাম : রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর প্রতিনিধিকে স্বাগতম। তিনি বললেন : আপনারা একথার উপর বাই'আত করুন যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবেন না, চুরি করবেন না, ব্যভিচার করবেন না, আপনাদের সন্তানদের হত্যা করবেন না, কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করবেন না এবং কোন ভালো কাজে অবাধ্য হবেন না।

আমরা বললাম : হাঁ, আমরা মেনে নিলাম। তারপর 'উমার (রা) দরজার বাহির থেকে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন এবং ঘরের ভিতরে মহিলারাও নিজ নিজ হাত সম্প্রসারিত করেন। (মূলতঃ এ হাত বাড়ানো ছিল বাই'আতের প্রতীকস্বরূপ। কোন মহিলা 'উমারের রা. হাত স্পর্শ করেননি।) তারপর 'উমার (রা) বলেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন! উম্মু 'আতিয়্যা (রা) আরো বলেন : আমাদের ঋতুবতী মহিলা ও কিশোরীদের দুই 'ঈদের সময় 'ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, লাশের পিছে পিছে যেতে বারণ করা হয় এবং আমাদের জুম'আ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এদিন উম্মু 'আতিয়্যা "দোষারোপ" ও 'ভালো কাজে অবাধ্য হওয়া" কথা দুইটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেন।[৩]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মহিলাদের জিহাদে গমনের অনুমতি দান করেছিলেন। বাস্তবে মুহাজির আনসারদের বহু মহিলা, এমনকি রাসূলুল্লাহর (সা) বেগমদের কেউ কেউ জিহাদে যোগদান করেছেন। যেমন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) উহুদ ও বানু আল-

---

১. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৪; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৫৫; উসুদুল গাবা-৫/৬০৩

২. আল-কামূস আল-মুহীত, মাদ্দা "نسب"

৩. হায়াত আস-সাহাবা-১/২৫১-২৫২

মুসতালিক যুদ্ধে এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) খায়বার অভিযান ও মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে মহিলারা সাধারণতঃ সেবামূলক কর্মে, যেমন আহতদের সেবা, ঔষধ খাওয়ানো, খাদ্য প্রস্তুত করা, পানি পান করানো ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকতেন। উম্মু 'আতিয়্যাও রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে যুদ্ধে গেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন :

غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم فى رحالهم فأصنع لهم الطعام وأدارى الجرحى وأقوم على المرضى.[৪]

'আমি নবীর (সা) সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তাঁদের পিছনে তাঁবুতে থেকে তাদের জন্য খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ঔষধ পান করাতাম এবং রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।' খায়বার যুদ্ধে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) বিশজন মহিলার একটি দলের সাথে জিহাদের ছোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন।

নবী পরিবারের সাথে হযরত উম্মু 'আতিয়্যার (রা) গভীর সম্পর্ক ছিল। বিশেষতঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) সাথে সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক। মাঝে মধ্যে হযরত 'আয়িশাকে (রা) হাদিয়া-তোহফা দিতেন। একদিন রাসূল (সা) 'আয়িশার (রা) ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন : তোমার কাছে আহার করার মত কোন কিছু আছে কি? 'আয়িশা (রা) বললেন : নেই। তবে উম্মু 'আতিয়্যা নুসাইবাকে সাদাকার ছাগলের কিছু গোশত পাঠানো হয়েছিল, তিনি আবার তা থেকে কিছু পাঠিয়েছেন। রাসূল (সা) বললেন : তা তার জায়গা মত পৌঁছে গেছে।[৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কন্যাদের সাথেও হযরত উম্মু 'আতিয়্যার (রা) সম্পর্ক ছিল। তার প্রমাণ এই যে, হিজরী অষ্টম সনের প্রথম দিকে হযরত যায়নাবের (রা) ইনতিকাল হলে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) তাঁকে গোসল দেন। তিনি সে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إغسلْنَها وترًا، ثلاثًا أو خمسًا، واجعلن فى الآخرة كافورًا أو شيئا من كافور، فإذا غَسَلْتُنَّهَا فأعلمننى. فلما غسلناها أعطانا حقوه - إزاره - فقال : أشعرنها إياه.[৬]

'যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (সা) মারা গেলে রাসূল (সা) বললেন : তোমরা তাকে

---

৪. আত-তাজ আল-জামি' লিল উসূল-৪/৩৪৪; তাবাকাত-৮/৪৫৫; আল-ইসাবা-৪/৪৫৫; আল-মাগাযী-২/৬৮৫; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৪২

৫. আল-ইসাবা-৪/৪৫৫

৬. মুওয়াত্তা আল-ইমাম মালিক : আল-জানায়িয; তাবাকাত-৮/৩৪, ৩৫; উসুদুল গাবা-৫/৬০৩; আয-যাহাবী : তারীক-২/৫২০

বেজোড়ভাবে তিন অথবা পাঁচবার করে গোসল দিবে। শেষবার কর্পুর বা কর্পুর জাতীয় কিছু দিবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা তার গোসল শেষ করলে রাসূল (সা) নিজের একটি লুঙ্গি আমাদের দিয়ে বলেন : এটি তার গায়ে পেঁচিয়ে দেবে।'

রাসূলুল্লাহর (সা) আরেক কন্যা উম্মু কুলছূম (রা) ইনতিকাল করলে উম্মু 'আতিয়্যা (রা) তাঁকেও গোসল দেন।[৭] এমনিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সময়কালে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ছোয়াব লাভের উদ্দেশ্যে মদীনার বহু মৃত মহিলার গোসল দানের দায়িত্ব পালন করেছেন।

খিলাফতে রাশিদার সময় হযরত উম্মু 'আতিয়্যার (রা) এক ছেলে কোন এক যুদ্ধে যান এবং মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় তাকে বসরায় আনা হয়। এ খবর পেয়ে মা উম্মু 'আতিয়্যা (রা) খুব দ্রুত সেখানে ছুটে যান। কিন্তু তাঁর পৌঁছার একদিন পূর্বে ছেলের ইনতিকাল হয়। বসরায় বানূ খালাফ-এর প্রাসাদে ওঠেন এবং সেখান থেকে আর কোথাও যাননি। ছেলের মৃত্যুর তৃতীয় দিন সুগন্ধি আনিয়ে গায়ে মাখেন এবং বলেন :

لاتحد المرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.[৮]

'একজন নারীর তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা উচিত নয়। স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।'

তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সবসময় মৃত্যু ব্যক্তির জন্য আহাজারি ও মাতম করা থেকে দূরে থাকতেন। বাই'আতের সময় যখন মাতম করতে নিষেধ করা হয় তখন তিনি বলেন, অমুক খান্দানের লোক আমার নিকট এসে কান্নাকাটি করে গেছে, আমাকেও তার বদলা হিসেবে তাদের কোন মৃতের জন্য কেঁদে আসা উচিত। তাঁর এমন কথায় রাসূল (সা) নিষেধাজ্ঞার আওতা থেকে সেই খান্দানটি ব্যতিক্রম ঘোষণা করেন।[৯]

যে সকল আনসারী মহিলা তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী ছিলেন উম্মু 'আতিয়্যা (রা) তাদের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আন-নাওবী (রহ) উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহর (সা) চল্লিশটি হাদীছ উম্মু 'আতিয়্যার (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ছয়টি বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া একটি করে হাদীছ উভয়ের গ্রন্থে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১০] সুনানে আরবা'আতেও তাঁর হাদীছ সংকলিত হয়েছে।

সাহাবীদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)সহ বহু বিশিষ্ট তাবি'ঈ তাঁর থেকে

---

৭. আত-তাবারী : তারীখ-২/১৯২; ইবন মাজাহ, হাদীছ নং-১৪৫৮; তাবাকাত-৮/৩৮; আল-ইসাবা-৪/৪৬৬

৮. সাহীহান : আত-তালাক; তাফসীর আল-খাযিন-১/২৩৯

৯. সাহীহ মুসলিম-১/৪০১; মুসনাদ-৬/৪০৭

১০. তাহযী আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৪

সেই হাদীছগুলো শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন। যেমন : হাফসা বিন্‌ত সীরীন (মৃ. ১০১ হি.), তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবন সীরীন, 'আবদুল মালিক ইবন 'উমাইর, 'আলী ইবন আল-আকমার, উম্মু শুরাহী (রহ) ও অন্যরা।[১১]

ইমাম আয-যাহাবী উম্মু 'আতিয়্যাকে (রা) ফকীহ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিম্নের এ বর্ণনাটির প্রতি লক্ষ্য করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন :

نُهينا عن إتباع الجنازة ولم يُعْزَمْ علينا.

'আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কঠোরভাবে করা হয়নি।' তিনি বলতে চেয়েছেন, মহিলাদেরকে শবাধারের পিছে পিছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা অন্যান্য নিষেধাজ্ঞার মত তেমন কঠোর নয়। সুতরাং তা হারামের পর্যায়ে নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ের।[১২]

ইবন 'আবদিল বার (রহ) উম্মু 'আতিয়্যাকে (রা) বসরার অধিবাসী গণ্য করেছেন। বিখ্যাত মহিলা তাবি'ঈ হাফসা বিন্‌ত সীরীন (রহ)ও এমন কথা বলেছেন।[১৩] বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি মদীনা ত্যাগের পর আর সেখানে ফিরে আসেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বসরায় থেকে যান। বসরাবাসী সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবি'ঈন ও সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেন। আহ্‌লি বায়ত তথা নবী-পরিবারের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক আজীবন বহাল থাকে। হযরত আলী (রা) তাঁর গৃহে আহার করে বিশ্রাম নিতেন।[১৪]

বসরায় তিনি একজন ফকীহ মহিলা সাহাবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর হাদীছের সমঝ-বুঝ, শরী'আতের বিধান সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নৈকট্যের কথা জানাজানি হওয়ার পর সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। যেহেতু তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) দুই কন্যাকে গোসল দিয়েছিলেন এবং সে কথা বর্ণনা করতেন তাই বসরায় বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরাম এবং মুহাম্মাদ ইবন সীরীনের (রহ) মত উঁচু স্তরের ফকীহ তাবি'ঈ তাঁর নিকট এসে মৃতের গোসল দানের নিয়ম-পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতেন।[১৫]

ধারণা করা হয় তিনি হিজরী ৭০ (সত্তর) সনের শেষ দিকে বসরায় ইনতিকাল করেন।[১৬]

---

১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/৩১৮; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৫৫
১২. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১২১, টীকা-১
১৩. প্রাগুক্ত
১৪. তাবাকাত-৮/৪৫৬; আল-ইসাবা-৪/৪৫৫
১৫. আল-ইসতী'আব-৪/৪৫২; আল-ইসাবা-৪/৪৫৫
১৬. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/৩১৮

যায়নাব বিন্‌ত আবী মু'আবিয়া (রা)

সেকালে আরবে যায়নাব নামটি বেশ প্রচলিত ছিল। সীরাতের গ্রন্থাবলীতে এ নামের অনেক মহিলাকে পাওয়া যায়। বিশ্বাস ও কর্ম গুণে যে সকল যায়নাব ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন, আমাদের যায়নাবও তাঁদের একজন। তিনি বিখ্যাত ছাকীফ গোত্রের কন্যা। পিতা 'আবদুল্লাহ আবূ মু'আবিয়া ইবন 'উত্তাব। স্বামী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)।[১]

তিনি একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। নিজ হাতে তৈরী জিনিস বিক্রী করে নিজের ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি অন্যদের সংগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্য মহিলাদের সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'আত করেন। খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।[২]

যে সকল মহিলা সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) হাদীছ স্মৃতিতে ধারণ করে বর্ণনা করেছেন যায়নাব (রা) তাঁদের অন্যতম। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা মোট আটটি। তিনি সরাসরি রাসূল (সা) থেকে এবং স্বামী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ ও 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৩] আর তাঁর সূত্রে এ সকল হাদীছ বর্ণনা করেছেন :

আবূ 'উবায়দা, 'উমার ইবন আল-হারিছ, বিসর ইবন সা'ঈদ, 'উবায়দ ইবন সাব্বাক, তাঁর এক ভাতিজা যার নাম জানা যায় না ও আরো অনেকে।[৪]

হযরত রাসূলে কারীম (সা) মহিলাদেরকে ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় কোন রকম সুগন্ধি ব্যবহার করতে যে বারণ করেছেন তা হযরত যায়নাব (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁকে বলেন : যখন তুমি 'ইশার নামাযের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হবে তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।[৫]

হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের সাহাবী। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) কথা ও কাজ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করতেন। বিন্দুমাত্র হেরফের হওয়া কল্পনাও করতে পারতেন না। নিজের পরিবারের লোকদেরকেও তেমনভাবে গড়ে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। স্ত্রী হিসেবে হযরত যায়নাব (রা) তাঁর নিকট থেকে ইসলামী বিধি-বিধান, জীবন-যাপন প্রণালীর বহু কিছু শিক্ষা লাভ করেন।

---

১. তাবাকাত-৮/২৯০; আল-ইসতী'আব-৪/৩১০; উসুদুল গাবা-৫/৪৭০; তাহযীব আত-তাহযী-১২/৪২২
২. মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ-৬/১০
৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৭২
৪. আল-ইসাবা-৪/৩১৩
৫. তাবাকাত-৮/২৯০; আল-ইসতী'আব-৪/৩১০; আল-ইসাবা-৪/৩১৩

ইমাম আহমাদ (রহ) হযরত যায়নাবের (রা) একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন : 'আবদুল্লাহ (স্বামী) যখন বাইরের কাজ সেরে ঘরে ফিরতেন তখন দরজায় এসে থেমে গলা খাকারি ও কাশি দিতেন, যাতে আমাদের এমন অবস্থায় দেখতে না পান যা তাঁর পছন্দ নয়। একদিন তিনি ফিরে এসে গলাখাকারি দিলেন। তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধা বসে 'হুমরা (حمرة) রোগ থেকে নিরাময়ের উদ্দেশ্যে আমাকে ঝাড়-ফুঁক করছিল। তাড়াতাড়ি আমি তাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। তিনি ঘরে ঢুকে আমার পাশে বসার পর দেখলেন আমার গলায় সুতা ঝুলছে। প্রশ্ন করলেন : এটা কি?

বললাম : এটা আমার জন্য মন্ত্র পড়ে ফুঁক দেওয়া হয়েছে। তিনি সেটা ধরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তারপর বলেন : 'আবদুল্লাহর পরিবার-পরিজন শিরকের প্রতি মুখাপেক্ষীহীন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি : তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবজ ও জাদু-টোনা হলো শিরক।

আমি তাঁকে বললাম : আপনি এমন কথা বলছেন কেন? এক সময় আমার চোখ থেকে ময়লা বের হতো এবং অমুক ইহুদীর নিকট যেতাম। সে আমার চোখে মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিলে ভালো হয়ে যায়।

তিনি বললেন : এটা শয়তানের কাজ। সে তোমার চোখে হাত দিয়ে খোঁচাতো। সে মন্ত্র পড়ে যখন ফুঁক দিত, শয়তান খোঁচানো বন্ধ করে দিত। তোমার জন্য একথা বলাই যথেষ্ট যা নবী (সা) বলেছেন :

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَاشِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا.

'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ বিপদ দূর করে দিন। আপনি নিরাময় দানকারী, আমাকে নিরাময় দিন। আপনার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় নেই। এমন নিরাময় দিন যেন আর কোন রোগ না থাকে।[৬]

ইসলামী ফিকাহ্‌বিদগণ বলেন, স্ত্রীর যদি যাকাত ওয়াজিব হয় এমন পরিমাণ অর্থ থাকে, আর স্বামী যাকাত লাভের যোগ্য হয়, তাহলে স্বামীকে যাকাত দেওয়া উচিত। কারণ, পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্ত্রীর নয়, স্বামীর। সুতরাং অন্যকে যাকাতের অর্থ দেওয়ার চেয়ে স্বামীকে দিলে স্ত্রী অধিক ছোয়াবের অধিকারী হবে।

এ রকম ঘটনা হযরত যায়নাবের (রা) ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। একদিন তিনি রাসূলকে (সা) মহিলাদের সাদাকা করতে ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উৎসাহ দিয়ে বক্তৃতা করতে শুনলেন। ঘরে ফিরে দান করার উদ্দেশ্যে নিজের সকল গহনা একত্র করলেন। স্বামী 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন : এই গহনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

---

৬. বুখারী : আত-তিব্ব, বাবু রাকয়াতুন নাবিয়্যি; মুসলিম : বাবু রাকয়াতিল মারীদ; আবূ দাউদ (৩৮৮৩); ইবন মাজাহ (৩৫৩০); তাফসীর ইবন কাছীর-৪/৪৯৪

বললেন : এগুলো দ্বারা আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করতে চাই।

বললেন : দাও, আমাকে ও আমার ছেলে-মেয়েদেরকে দাও, আমি এগুলো লাভের যোগ্য।[৭]

এরপরের ঘটনা ইমাম বুখারী হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

ইবন মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব বলেন : হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ সাদাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার কিছু গহনা আছে এবং তা সাদাকা করতে চাই। কিন্তু ইবন মাস'উদ (স্বামী) মনে করে, অন্যদের চেয়ে তিনি ও তাঁর ছেলে তা লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন : ইবন মাস'উদ ঠিক বলেছে। তোমার সাদাকা লাভের ক্ষেত্রে তোমার স্বামী ও ছেলে অন্যদের থেকে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ঘটনাটি 'আমর ইবন আল-হারীছ থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

যায়নাব, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদের (রা) স্ত্রী বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

تصدقن يامعشر النساء ولومن حليكنّ.

'হে নারী সমাজ! তোমরা সাদাকা কর– তা তোমাদের গহনাই হোক না কেন।'

যায়নাব বলেন : একথা শুনে আমি 'আবদুল্লাহর নিকট ফিরে এলাম। তাঁকে বললাম, আপনি একজন স্বল্প বিত্তের মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি তাঁর নিকট যান ও জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে সাদাকা করা জায়েয হবে কিনা। জায়েয না হলে আমি অন্যদের দিব।

'আবদুল্লাহ বললেন : তুমিই বরং যাও।

আমি গেলাম। দেখলাম রাসূলুল্লাহর (সা) দরজায় আরেকজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, এই মহিলার নামও যায়নাব এবং তিনি আবূ মাস'উদ আল-আনসারীর স্ত্রী। তার ও আমার উদ্দেশ্য একই। বিলাল (রা) ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাঁকে বললাম : আপনি একটু রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যান এবং তাঁকে বলুন, দরজায় দাঁড়ানো দুইজন মহিলা জানতে চাচ্ছে যে, স্বামী এবং তার ছোট ছেলে-মেয়েদের সাদাকা করা জায়েয হবে কিনা। আমরা কে তা তাঁকে বলবেন না।

বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট গিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন : তারা কে? বিলাল (রা) বললেন : একজন আনসারী মহিলা ও যায়নাব।

রাসূল (সা) আবার প্রশ্ন করলেন : কোন যায়নাব? বিলাল বললেন : 'আবদুল্লাহ ইবন

---

৭. হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাত আসফিয়া-২/৬৯

মাস'উদের স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তারা দুইটি ছোয়াব পাবে : আত্মীয়তার এবং সাদাকার।[৮]

হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) হিজরী ৩২ সনে ইনতিকাল করেন। অন্তিম অবস্থায় তিনি স্ত্রী ও কন্যাদের দেখাশুনা ও বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু ক্ষমতা দিয়ে যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের (রা) পক্ষে একটি অসীয়াত করে যান।[৯] হযরত যায়নাব (রা) কখন কোথায় ইনতিকাল করেন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন জীবিত ছিলেন এবং খিলাফতে রাশিদার শেষের দিকে ইনতিকাল করেন।[১০]

---

৮. বুখারী : আয-যাকাত, বাবুয যাকাত 'আলাল আকারিব; মুসলিম : আয-যাকাত, বাবু ফাদল আন-নাফাকাতি 'আলাল আকরাবীন ওয়া আয-যাওযি ওয়া আল-আওলাদ; উসুদুল গাবা-৫/৪৭০, ৪৭১; আল-ইসাবা-৪/৩১৩

৯. তাবাকাত-৩/১৫৯

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৭৬

আর-রুবায়্যি'উ বিন্‌ত মু'আওবিয (রা)

মদীনার 'আদী ইবন আন-নাজ্জার খান্দানের মেয়ে আর-রুবায়্যি'উ। যে সকল আনসার পরিবার ইসলামের সেবায় মহান ভূমিকা পালন করেছে তাঁর পরিবারটি এর অন্তর্গত। প্রথম পর্বে আল্লাহর রাসূল (সা), ইসলাম ও মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের সেবায় এই পরিবারটির রয়েছে গৌরবময় অবদান। তাঁর মহান পিতা মু'আওবিয ইবন আল-হারিছ আল-আনসারী (রা)। তাঁরা মোট সাত ভাই : 'আওফ, মু'আয, মু'আওবিয, ইয়াস, 'আকিল, খালিদ, ও 'আমির। তাঁদের মা 'আফরা' বিন্‌ত 'উবাইদ আল-আনসারিয়্যা আন-নাজ্জারিয়্যা (রা)। তাঁর প্রথম তিন সন্তানের পিতা আল-হারিছ ইবন রিফ'আ আন-নাজ্জারী। কিন্তু তাঁরা তাঁদের পিতার নামের চেয়ে মা 'আফরার (রা) নামের সাথে অধিক পরিচিত। ইতিহাসে তাঁরা أبناء عفراء ('আফরার ছেলেরা) নামে প্রসিদ্ধ। বাকী চারজনের পিতা আল-বুকাইর ইবন 'আবদি ইয়ালীল আল-লায়ছী। 'আফরার (রা) এই সাত ছেলের সকলে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে হযরত রাসূলে কারীমের (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। মদীনার যে ছয় ব্যক্তি মক্কায় গিয়ে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে গোপনে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন রুবায়্যি'উ-এর চাচা 'আওফ তাঁদের একজন। তিনি একজন 'আকাবীও অর্থাৎ 'আকাবার দুইটি বাই'আতের অংশীদার। তাঁর পিতা মু'আওবিয ও অপর চাচা মু'আয (রা) 'আকাবার প্রথম বাই'আতে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর দাদী 'আফরা' বিন্‌ত 'উবাইদ মদীনায় ইসলামের বাণী পৌঁছার সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় আগমনের পর অন্য আনসারী মহিলাদের সাথে তিনিও বাই'আত করেন। বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর (সা) পতাকাতলে শামিল হয়ে তাঁর সাতটি ছেলে অংশগ্রহণ করেন এবং দু'জন শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মত সৌভাগ্যের অধিকারী মুসলিম নারী জাতির মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ আছেন কি?

আর-রুবায়্যি'উ-এর মা উম্মু ইয়াযীদ বিন্‌ত কায়সও মদীনার 'আদী ইবন আন-নাজ্জার গোত্রের মেয়ে।

আবূ জাহল যে কিনা এই উম্মাতের ফির'আউন অভিধায় ভূষিত, বদরে তাকে 'আফরা'র দুই ছেলে হত্যা করেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নেক দু'আর অধিকারী হন। তিনি দু'আ করেন :[১]

رحم الله ابنَىْ عفراء اشتركا فى قتل فرعون هذه الأمة.

'আল্লাহ 'আফরা'র দুই ছেলের প্রতি দয়া ও করুণা বর্ষণ করুন যারা এই উম্মাতের ফির'আউন আবূ জাহলকে হত্যায় অংশগ্রহণ করেছে।'

---

১. আনসাব আল-আশরাফ-১/২৯৯; আহমাদ যীনী দাহলান, আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-১/৩৮৯

আর-রুবায়্যি'উ-এর মা উম্মু ইয়াযীদ বিন্‌ত কায়স মদীনার আন-নাজ্জার গোত্রের মেয়ে। তাঁর বোন ফুরাই'আ বিন্‌ত মু'আওবিয। তিনিও একজন উঁচু স্তরের সাহাবিয়া ছিলেন। আল্লাহর দরবারে তাঁর দু'আ অতিমাত্রায় কবুল হওয়ার কারণে مُجابة الدعوة (মুজাবাতুদ দা'ওয়াহ্) বলা হতো।[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আর-রুবায়্যি'উ-এর বাবা-চাচারা বদর যুদ্ধের বীর যোদ্ধা ছিলেন। সে দিন তাঁরা জীবন দিয়ে পরবর্তীকালের ইসলামের বিজয়ধারার সূচনা করেন। এদিন কুরায়শ পক্ষের বীর সৈনিক আবুল ওয়ালীদ-'উতবা ইবন রাবী'আ, তার ভাই শায়বা ও ছেলে আল-ওয়ালীদ ইবন 'উতবাকে সংগে নিয়ে পৌত্তলিক বাহিনী থেকে বেরিয়ে মুসলিম বাহিনীর দিকে এগিয়ে এসে তাদেরকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানায়। সাথে সাথে 'আফরার তিন ছেলে মু'আওবিয, মু'আয ও 'আওফ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় তাদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা প্রশ্ন করে : তোমরা কারা? তাঁরা বলেন : আমরা আনসারদের দলভুক্ত। তারা বললো : তোমাদের সাথে আমরা লড়তে চাই না। রাসূল (সা) তাদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরই স্বগোত্রীয় হামযা, 'আলী ও 'উবাইদাকে (রা) সামনে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। তাঁরা এগিয়ে গেলেন এবং একযোগে আক্রমণ করে এই তিন শয়তানের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন।

আর-রুবায়্যি'উ-এর পরিবারের লোকেরা জানতো এই উম্মাতের ফির'আউন আবূ জাহল ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। সে এমন ইতর প্রকৃতির যে আল্লাহর রাসূলকে (সা) কষ্ট দেয়, তাঁকে গালি দেয়। দুর্বল মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালায় এবং তাদেরকে হত্যা করে। তাই আর-রুবায়্যি'উ-এর বাবা মু'আওবিয ও চাচা মু'আয (রা) বাগে পেলে এই নরাধমকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা অঙ্গীকার করেন হয় তাকে হত্যা করবেন, নয়তো নিজেরা শহীদ হবেন। তাঁদের আরাধ্য সুযোগটি এসে গেল। তাঁরা সাত ভাই বদর যুদ্ধে গেলেন। এর পরের ঘটনা বিখ্যাত মুহাজির সাহাবী হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) চমৎকার ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :[৩]

إنى لفى الصف يوم بدر، التفتُّ فإذا عن يمينى وعن يسارى فَتَيَانِ حديثا السن، فكأنى لم آمن مكانهما، إذ قال لى أحدهم سرًّا عن صاحبه : ياعم أرنى أبا جهل؛ فقلت : يابن أخى ماتصنع به؟ قال : عاهدت الله إن رأيته أن اقتله أو أموت دونه. قال لى الآخر سرا من صاحبه مثله. قال عبد الرحمن بن عوف : فما سرَّنى أنى بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدًّا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء.

---

২. আল-ইসতী'আব-৪/৩৭৫

৩. সাহীহ আল-বুখারী : ফী ফারদিল খুমুস (৩১৪১), ফী আল-মাগাযী (৩৯৬৪, ৩৯৮৮) : মুসলিম : ফী আল-জিহাদ (১৭৫২); সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-১/২৫০; বানাত আস-সাহাবা-৬৬

'বদরের দিন আমি সারিতে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি আমার দুই পাশে অল্প বয়সী দুই তরুণ। তাদের অবস্থানকে আমার নিজের জন্য যেন নিরাপদ মনে করলাম না। এমন সময় তাদের একজন অন্য সঙ্গী যেন শুনতে না পায় এমনভাবে ফিস ফিস করে আমাকে বললো : চাচা! আমাকে একটু আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিন। বললাম : ভাতিজা! তাকে দিয়ে তুমি কি করবে? বললো : আমি আল্লাহর সংগে অঙ্গীকার করেছি, যদি আমি তাকে দেখি, হয় তাকে হত্যা করবো, নয়তো নিজে নিহত হবো। অন্যজনও একইভাবে একই কথা আমাকে বললো।

'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ বলেন : তখন তাদের দুইজনের মাঝখানে আমি অবস্থান করতে পেরে কী যে খুশী অনুভব করতে লাগলাম! আমি হাত দিয়ে ইশারা করে তাদের আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। সাথে সাথে দুইটি বাজ পাখীর মত তারা আবূ জাহলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করলো। তারা ছিল 'আফরার দুই ছেলে।'

আবূ জাহলকে হত্যার পর তাঁরা বীর বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বদরেই আর-রুবায়্যি'উ-এর মহান পিতা মু'আওবিয (রা) শাহাদাত বরণ করেন।[৪] আবূ জাহলকে হত্যার ব্যাপারে রাসূলকে (সা) প্রশ্ন করা হয়েছিল : তাকে হত্যার ক্ষেত্রে তাদের দুইজনের সংগে আর কে ছিল? বললেন : ফেরেশতাগণ এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ শেষ আঘাত হানে। আবূ জাহলের হত্যার পর রাসূল (সা) বললেন : আবূ জাহলের অবস্থা কি তা কেউ দেখে আসতে পারবে কি? ইবন মাস'উদ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যাচ্ছি। তিনি গিয়ে দেখেন 'আফরার দুই ছেলে তাকে এমন আঘাত হেনেছে যে সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।[৫]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) মদীনায় হিজরাতের পূর্বে আর-রুবায়্যি'উ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি একজন কিশোরী। রাসূল (সা) মক্কা থেকে কূবায় এসে উঠলেন। সেখানে তিন দিন অবস্থানের পর মদীনার কেন্দ্রস্থলের দিকে যাত্রা করেন এবং মসজিদে নববীর পাশে হযরত আবূ আইউব আল-আনসারীর (রা) গৃহে ওঠেন। তাঁর এই শুভাগমনে গোটা মদীনা আনন্দে ফেটে পড়ে। তাঁর গমন পথের দুই ধারে শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা দাঁড়িয়ে নেচে-গেয়ে তাঁকে স্বাগতম জানায়। তাদের স্বাগত সঙ্গীতের একটি চরণ ছিল এরকম :

نحن جوار من بنى النجار ياحبذا محمد من جار.

'আমরা বানূ আন-নাজ্জারের কিশোর-কিশোরী। কি মজা! মুহাম্মাদ আমাদের প্রতিবেশী।' রাসূল (সা) তাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা কি আমাকে ভালোবাস? তারা বললো : হাঁ। তিনি বললেন : আল্লাহ জানেন, আমার অন্তর তোমাদের ভালোবাসে।

---

৪. আল-ইসতিবসার-৬৬

৫. 'উয়ূন আল-আছার-১/৩১৫; আস-সীরাহ্ আল-হালারিয়্যা-২/৪৩৩

অনেকে বলেছেন, এই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আর-রুবায়্যি'উও ছিলেন।[৬] বয়স বাড়ার সাথে রাসূলে কারীম (সা) ও ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি নানাভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। বিভিন্ন দৃশ্যপটে তাঁকে উপস্থিত দেখা যায়। ইসলামের সেবায় অতুলনীয় ত্যাগের জন্য রাসূল (সা) এই পরিবারের সদস্যদের বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। সব সময় হযরত রাসূলে কারীমের (সা) ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সুখ-সুবিধার খোঁজ-খবর রাখতেন। রাসূল (সা) তাজা খেজুরের সাথে কচি শশা খেতে পছন্দ করতেন। আর-রুবায়্যি'উ বলেন : আমার পিতা মু'আওবিয ইবন 'আফরা (রা) একটি পাত্রে এক সা' তাজা খেজুর ও তার উপর কিছু কচি শশা দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। তিনি শশা পছন্দ করতেন। সেই সময় বাহরাইন থেকে রাসূলের (সা) নিকট কিছু গহনা এসেছিল। তিনি তার থেকে এক মুট গহনা নিয়ে আমাকে দেন। অপর একটি বর্ণনায় স্বর্ণের কথা এসেছে। তারপর বলেন : এ দিয়ে সাজবে। অথবা বলেন : এ দিয়ে গহনা বানিয়ে পরবে।[৭]

বিয়ের বয়স হলে বিখ্যাত মুহাজির সাহাবী ইয়াস ইবন আল-বুকাইর আল-লায়ছীর সাথে বিয়ে হয় এবং তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে ছেলে মুহাম্মাদ ইবন ইয়াস। তাঁর এই বিয়ের বিশেষ মহত্ব ও মর্যাদা এই যে, বিয়ের দিন সকালে রাসূল (সা) তাঁদের বাড়ীতে যান এবং তাঁর বিছানায় বসেন। পরবর্তী জীবনে আর-রুবায়্যি'উ (রা) অত্যন্ত গর্বের সাথে সেকথা বলেছেন এভাবে :[৮]

جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليَّ غداة بُنِيَ بي، فجلس على فراشي، وجويريات لنايضربن بالدوفوف،ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن : وفينا نبي يعلم مافي غدٍ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعي هذا وقولي التي كنت تقولين قبلها. وفي رواية : لاتقولي هذا وقلت ماتقولين.

'আমার বিয়ের দিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের বাড়ীতে এসে আমার ঘরে প্রবেশ করেন এবং বিছানায় বসেন। আমাদের ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত আমার বাপ-চাচাদের প্রশংসামূলক গীত সুর করে গাচ্ছিল। এর মধ্যে একজন গাইলো : আমাদের নবী আছেন যিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। তখন রাসূল (সা) তাকে বললেন : এটা বাদ দাও। আগে তোমরা যা বলছিলে তাই বল। অপর একটি বর্ণনায় এসেছে :

---

৬. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৫০, ১৫১

৭. বুখারী, ফী আল-আত'ইমা-৯/৪৯৫; মুসলিম ফী আল-আশরিবা (২০৪৩); তিরমিযী (১৮৪৫) ও ইবন মাজাহ (৩৩২৫) ফী আল-আত'ইমা; মাজমা'উয যাওয়ায়িদ লিল হায়ছামী-৯/১৩

৮. বুখারী ফী আন-নিকাহ (৫১৪৭); ফী আল-মাগাযী (৪০০১); তিরমিযী-১০৯০; তাবাকাত-৮/৩২৮; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৬০৯

একথা বলো না। বরং আগে যা বলছিলে তাই বল। মূলতঃ তাঁর প্রতি যে ভবিষ্যতের জ্ঞান আরোপ করা হয়েছে, তা থেকে বিরত রাখার জন্য একথা বলেন।

ইমাম আয-যাহাবী এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :[৯]

وقد زارها النبى صلى الله عليه وسلم صبيحة عُرسها صلة لرحمها.

'নবী (সা) তাঁর বিয়ের দিন সকালে তার সাথে আত্মীয়তার সূত্রে তাঁকে দেখতে যান।'

আর-রুবায়্যি'উ-এর বিয়ের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) উপস্থিতি সম্ভবতঃ তাঁর প্রতি তথা তাঁর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ছিল। কারণ, ইসলামের জন্য এ পরিবারটির যে ত্যাগ ও কুরবানী ছিল তা রাসূল (সা) উপেক্ষা করতে পারেননি। ইসলামের জন্য এ পরিবার তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং জীবনও দিয়েছে। সুতরাং পিতৃহারা এই মেয়েটি যার পিতা আবূ জাহলের ঘাতক এবং যিনি বদরে শাহাদাত বরণ করেছেন, তার আনন্দের দিনে রাসূল (সা) কিভাবে দূরে থাকতে পারেন?

যুদ্ধের ময়দানে

আর-রুবায়্যি'উ-এর পিতা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জিহাদের সূচনা করেন, তাঁর মেয়ে হিসেবে তিনি সে ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। পিতার রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল। তাই তাঁর মধ্যে ছিল জিহাদে গমনের অদম্য স্পৃহা। জিহাদের সীমাহীন গুরুত্ব তিনি পূর্ণরূপে অনুধাবন করেন। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে বেশ কিছু জিহাদে যোগ দেন। ইবন কাছীর (রহ) বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে জিহাদে যেতেন। আহতদের ঔষুধ সেবন এবং ক্ষত-বিক্ষতদের পানি পান করাতেন। তিনি নিজেই বলেছেন :[১০]

كنا نغزو مع النبى صلى الله عليه وسلم فنسقى القوم المجاهدين ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.

'আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সংগে জিহাদে যেতাম। মুজাহিদদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা করতাম এবং আহত-নিহতদের মদীনায় পাঠাতাম।'

৬ষ্ঠ হিজরীর যুলকা'দা মাসে হুদায়বিয়াতে মক্কার পৌত্তলিকদের সংগে রাসূলুল্লাহর (সা) যে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই চৌদ্দ শো মুজাহিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। সেখানে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জীবন বাজি রাখার যে বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়, তিনিও সে বাই'আত করেন। এ বাই'আতকে বাই'আতে রিদওয়ান ও বাই'আতে শাজারা বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ বাই'আতের গুরুত্ব

---

৯. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/১৯৮

১০. সিফাতুস সাফওয়া-২/৭১; আত-তাজ আল-জামি' লিল উসূল-৪/৩৪৪

অপরিসীম। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল (সা) যে এ বাই'আতকে খুবই পছন্দ করেছেন তা কুরআন ও হাদীছের বাণীতে স্পষ্ট জানা যায়। যেমন : আল্লাহ বলেন:[১১]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ، يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ـ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا.

'যারা তোমার হাতে বাই'আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। অতঃপর যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দেন।'

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে হাত রেখে বাই'আত করাকে আল্লাহর হাতে হাত রেখে বাই'আত করা বলা হয়েছে। এতে এ বাই'আতের বিরাট গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

হযরত রাসূলে কারীম (সা) এ বাই'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন :[১২]

لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة.

'বৃক্ষের নীচে বাই'আতকারীদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।'

সেদিন বাই'আতকারীদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) বলেন :[১৩]

أنتم اليوم خير أهل الأرض.

'আজ তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ।'

স্পষ্টভাষিণী

আবূ জাহলের ঘাতক তাঁর মহান পিতাকে নিয়ে আর-রুবায়্যি'উর (রা) গর্বের অন্ত ছিল না। আবূ জাহলের মা আসমা' বিন্‌ত মাখরামার সাথে তাঁর একটি ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়। আর-রুবায়্যি'উ (রা) বলেন :

আমি 'উমার ইবন আল-খাত্তাবের (রা) খিলাফতকালে একদিন কয়েকজন আনসারী মহিলার সাথে আবূ জাহলের মা আসমা' বিন্‌ত মাখরামার নিকট গেলাম। আবদুল্লাহ ইবন আবী রাবী'আ (আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই) ছিল তাঁর আরেক ছেলে। তিনি ইয়ামন থেকে মদীনায় তাঁর মা আসমার নিকট আতর পাঠাতেন, আর তিনি তা বিক্রী করতেন। আমরাও তাঁর নিকট থেকে আতর কিনতাম। সেদিন আমার শিশিতে আতর ভরে ওযন দিলেন, যেমন আমার সাথীদের আতর ওযন দিয়েছিলেন। তারপর বললেন :

---

১১. সূরা আল-ফাতহ-১০

১২. মুসলিম (২৪৯৬); তাবাকাত-২/১০০, ১০১

১৩. বুখারী : বাবু গাযওয়াতিল ফাতহ

আপনাদের কার নিকট কত পাওনা থাকলো তা লিখিয়ে দিন। আমি বললাম : আর-রুবায়্যি'উ বিন্‌ত মু'আওবিযের পাওনা লিখুন।

আসমা' আমার নাম শুনেই বলে উঠলেন : حَلْقِى – হালকা। শব্দটি অভিশাপমূলক। অর্থাৎ গলায় যন্ত্রণা হয়ে তোমার মরণ হোক। তারপর বললেন : তুমি কি কুরায়শ নেতার হত্যাকারীর মেয়ে?

বললাম : নেতার নয়, তাদের দাসের হত্যাকারীর মেয়ে।

বললেন : আল্লাহর কসম! তোমার নিকট আমি কিছুই বেচবো না।

আমিও বললাম : আল্লাহর কসম! আমিও আপনার নিকট থেকে আর কখনো কিছু কিনবো না। তোমার এ আতরে কোন সুগন্ধিই নেই। মতান্তরে একথাও বলেন যে, আপনার আতর ছাড়া আর কারো আতরে আমি পঁচা গন্ধ পাইনি। একথাগুলো বলে আমি উঠে চলে আসি। আসলে উত্তেজনাবশতঃ আমি একথা বলি। মূলতঃ তাঁর আতরের চেয়ে সুগন্ধ আতর আমি কখনো শুকিনি।[১৪]

হাদীছ বর্ণনা

কেবল জিহাদে গমনের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল তা নয়, শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় জানা এবং রাসূলুল্লাহর (সা) বাণী শোনা ও আচরণ পর্যবেক্ষণেও তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশার (রা) নিকট যেতেন। তাই তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু সুনানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তেমনি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহর (সা) বেশ কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন : তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাহচর্য যেমন পেয়েছেন তেমনি তাঁর হাদীছও বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) ২১ (একুশ)টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সাহীহ ও সুনানের গ্রন্থাবলীতে এ হাদীছগুলো সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি।[১৫]

উঁচু স্তরের অনেক 'আলিম তাবি'ঈ তাঁর নিকট হাদীছ শুনেছেন এবং তাঁর সূত্রে বর্ণনাও করেছেন। সেই সকল বিখ্যাত তাবি'ঈদের কয়েকজন হলেন :

সুলায়মান ইবন ইয়াসার ও আবূ সালামা ইবন 'আবদির রহমান। এ দুইজন হলেন সাতজন প্রথম সারির আলিম তাবি'ঈর অন্তর্গত। তাছাড়া আবূ 'উবায়দা মুহাম্মাদ ইবন 'আম্মার ইবন ইয়াসির, ইবন 'উমারের (রা) আযাদকৃত দাস নাফি', 'উবাদা ইবন আল-ওয়ালীদ ইবন 'উবাদা ইবন আস-সামিত (রা), খালিদ ইবন যাকওয়ান, 'আবদুল্লাহ ইবন

---

১৪. আল-মাগাযী লিল ওয়াকিদী-১/৮৯; তাবাকাত-৮/৩০০, ৩০১; আনসাব আল-আশরাফ-১/২৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/১৯৯

১৫. জাওয়ামি'উ আস-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা-২৮২; বানাত আস-সাহাবা-১৬৭, ১৬৮

মুহাম্মাদ ইবন 'আকীল, আয়িশা বিন্‌ত আনাস ইবন মালিক প্রমুখ।[১৬]

সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চেহারার দীপ্তি ও সৌন্দর্যের চমৎকার সব বর্ণনা দিয়েছেন। তার মধ্যে কারো কারো বর্ণনার কিছু বাক্যের অনুপম শিল্পরূপ পাঠক ও শ্রোতাকে দারুণ মুগ্ধ করে। যেমন হযরত আবূ হুরায়রার (রা) একটি বাক্য :[১৭]

مارأيت شيئًا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجرى.

'আমি রাসূলুল্লাহর (সা) চেয়ে অধিকতর সুন্দর কোন কিছু কখনো দেখিনি। যেন সূর্য ছুটছে।' রাসূলুল্লাহর (সা) মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের চলমান দীপ্তিকে কক্ষপথে চলমান সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। এ রকম একটি অনুপম উক্তি আর-রুবায়্যি'উ-এর বর্ণনায় পাওয়া যায়। একবার আবূ 'উবায়দা তাঁকে অনুরোধ করলেন রাসূলুল্লাহর (সা) সৌন্দর্যের একটি বর্ণনা দিতে। তিনি বললেন :[১৮]

يا بنيَّ لو رأيته لقلتَ الشمس طالعة.

'বেটা, তুমি যদি তাঁকে দেখতে তাহলে বলতে, সূর্যের উদয় হচ্ছে।' সত্যি এ এক অপূর্ব বর্ণনা।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রুবায়্যি'উ-এর বাড়ীতে ওযু করেন। কিভাবে তিনি ওযু করেছিলেন, রুবায়্যি'উ (রা) তা প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীতে তিনি তা বর্ণনা করতেন। সে বর্ণনা শোনার জন্য বহু মানুষ তাঁর নিকট আসতেন। একবার আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) আসেন এবং রাসূলুল্লাহর (সা) ওযুর অবস্থা বর্ণনা করার অনুরোধ জানান।[১৯] তাঁর সেই বর্ণনাটি হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[২০]

এ পৃথিবীতে এক জোড়া নর-নারীর দাম্পত্য জীবন যাপন যেমন স্বাভাবিক তেমনি সে জীবনে মনোমালিন্য, কলহ এবং বিচ্ছেদও স্বাভাবিক। আর-রুবায়্যি'উ (রা)-এর জীবনেও এমনটি ঘটেছিল। দীর্ঘদিন স্বামী ইয়াস ইবন আল-বুকাইরের সাথে থাকার পর পরস্পরের মধ্যে এমন বিরোধ সৃষ্টি হয় যে কোনভাবেই এক সাথে থাকা সম্ভব হলো না। বিষয়টির বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন : 'আমার ও আমার চাচাতো ভাই অর্থাৎ স্বামীর মধ্যে একদিন ঝগড়া হলো। আমি তাকে বললাম : আমার যা কিছু আছে সব নিয়ে তুমি আমাকে পৃথক করে দাও। সে বললো : ঠিক আছে, আমি তাই করলাম। রুবায়্যি'উ (রা)

---

১৬. আল-ইসতী'আব-৪/৩০২; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪১৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/১৯৮

১৭. মুসনাদে আহমাদ-২/৩৫০, ৩৮০; বানাত আস-সাহাবা-১৬৬

১৮. দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্ লিল বায়হাকী-১/২০০; উসুদুল গাবা-৫/৪৫৫

১৯. তাফসীর আল-কুরতুবী-৬/৮৯

২০. আবূ দাঊদ : ফী আত-তাহারা-বাবু সিফাতি ওয়াদুয়িন নাবীয়্যি (সা); আত-তিরমিযী : আত-তাহারাহ্ (৩৩); ইবন মাজাহ (৪১৮)

বলেন : আল্লাহর কসম! সে আমার সবকিছু নিয়ে নিল, এমনকি বিছানাটিও। আমি 'উছমানের (রা) নিকট গিয়ে সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। তিনি তখন অবরুদ্ধ অবস্থায়। বললেন : শর্ত পূর্ণ করাই উচিত। ইয়াসকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি ইচ্ছা করলে তার যা কিছু আছে সব নিতে পার, এমনকি চুলের ফিতাটি পর্যন্ত।[২১] তাঁদের এই বিচ্ছেদের ঘটনাটি ঘটে হিজরী ৩৫ সনে।

হযরত রুবায়্যি'উ (রা) দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে সুনির্দিষ্টভাবে ওফাতের সনটি জানা যায় না। ইমাম আয-যাহাবী (রহ) বলেছেন, তিনি হিজরী ৭০ (সত্তর) সনের পরে 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের খিলাফতকালে ইনতিকাল করেন।[২২] অবশ্য কোন কোন সূত্র হিজরী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সনে তাঁর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছে। 'আল্লামা আয-যিরিক্‌লী বলেছেন, তিনি হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[২৩]

---

২১. আল-ইসাবা-৪/২৯৪; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-৩/৩০০

২২. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-৩/৩০০

২৩. আল-আ'লাম-৩/৩৯

হিন্দ (রা) বিন্‌ত 'উতবা

'উতবা ইবন রাবী'আ ইবন 'আবদু মান্নাফ ইবন 'আবদু শামস-এর কন্যা হিন্দ। তাঁর মা সাফিয়্যা বিন্‌ত উমাইয়্যা ইবন হারিছা আস-সুলামিয়্যা। মক্কার অভিজাত কুরাইশ খান্দানের সন্তান।[১] ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী আরবে যে সকল মহিলা বিশেষ খ্যাতির অধিকারিণী তিনি তাঁদের একজন। তাঁর বড় পরিচয় তিনি উমাইয়্যা খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মু'আবিয়া ইবন আবী সুফইয়ানের (রা) গৌরবান্বিতা মা।

কুরাইশ বংশের যুবক আল-ফাকিহ্ ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযূমীর সাথে হিন্দ-এর প্রথম বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে টেকেনি। ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই ছাড়াছাড়ি হওয়ার পশ্চাতে একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে, আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সূত্রসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এই রকম :

মক্কার কুরাইশ গোত্রের আল-মাখযূমী শাখার যুবক আল-ফাকিহ্ ইবন আল-মুগীরার সাথে হিন্দ-এর বিয়ে হয়। সে ছিল অতিথিপরায়ণ। অতিথিদের থাকার জন্য তার ছিল একটি অতিথিখানা। বাইরের লোক বিনা অনুমতিতে সব সময় সেখানে আসা-যাওয়া করতো। একদিন আল-ফাকিহ্ স্ত্রী হিন্দকে নিয়ে সেই ঘরে দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। এক সময় হিন্দকে নিদ্রাবস্থায় রেখে সে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এ সময় একজন আগন্তুক আসে এবং একজন মহিলাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে দরজা থেকেই ফিরে যায়। ফেরার পথে লোকটি আল-ফাকিহ্'র সামনে পড়ে এবং তার সন্দেহ হয়। সে ঘরে ঢুকে হিন্দকে জিজ্ঞেস করে : এইমাত্র যে লোকটি তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে গেল সে কে? হিন্দ বললেন : আমি কিছুই জানি না। কাউকে আমি দেখিনি। আল-ফাকিহ্ তার কথা বিশ্বাস করলো না। সে হিন্দকে তার পিতৃগৃহে চলে যাওয়ার জন্য বললো। ব্যাপারটি মানুষের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। হিন্দ-এর পিতা 'উতবা মেয়েকে বললো : তোমার ব্যাপারটি আমাকে খুলে বল। যদি আল-ফাকিহ্'র কথা সত্য হয় তাহলে কোন গুপ্ত ঘাতক দিয়ে আমি তাকে হত্যা করে ফেলবো। তাতে চিরদিনের জন্য তোমার দুর্নাম দূর হয়ে যাবে। আর সে মিথ্যাবাদী হলে আমি ইয়ামনের একজন বিখ্যাত কাহিন (ভবিষ্যদ্বক্তা)-এর নিকট বিচার দিব। হিন্দ বললেন : আব্বা, সে মিথ্যাবাদী।

'উতবা আল-ফাকিহ্'র নিকট গেল এবং তাকে বললো : তুমি আমার মেয়ের প্রতি একটি বড় ধরনের অপবাদ দিয়েছো। হয় তুমি আসল সত্য প্রকাশ করবে, আর না হয় ইয়ামনের কাহিনের নিকট বিচারের জন্য তোমাকে যেতে হবে। সে বললো : ঠিক আছে, তাই হোক। আল-ফাকিহ্ বানূ মাখযূমের নারী-পুরুষের একটি দল নিয়ে যেমন মক্কা

---

১. তাবাকাত-৮/২৩৫; তাযহীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৫; আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা-৪/৪০৯

থেকে ইয়ামনের দিকে বের হলো তেমনি 'উতবাও বের হলো বানূ আবদি মান্নাফের নারী-পুরুষের একটি দল নিয়ে।

যখন তারা কাহিনের বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছলো তখন হিন্দ-এর চেহারা বিরূপ হয়ে গেল। তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে তার পিতা তাকে বললো : মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তোমার চেহারা তো এমন ছিল না? তিনি বললেন : আব্বা! আমি কোন খারাপ কাজ করেছি, এজন্য আমার চেহারার এ অবস্থা হয়নি, বরং আমি চিন্তা করছি, তোমরা যার নিকট যাচ্ছো সে তো একজন মানুষ। সে ভুল ও শুদ্ধ দুটোই করতে পারে। হতে পারে আমার প্রতি দোষারোপ করে বসলো, আর তা চিরকাল আরবের মানুষের মুখে মুখে প্রচার হতে থাকলো। পিতা বললো : তুমি ঠিকই বলেছো।

এক সময় তারা কাহিনের নিকট পৌঁছলো। মেয়েরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কাহিন একেকজনের নিকট গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলছিল : যাও! তুমি তোমার কাজ কর। এক সময় সে হিন্দ-এর নিকট গেল এবং তার মাথায় হাত রেখে বললো :

قومى غير رسحاء ولازانية، وستلدين ملكًا يسمى معاوية.

'যাও, তুমি কোন অশ্লীল কাজ করোনি এবং তুমি ব্যভিচারিণীও নও। ভবিষ্যতে তুমি এক বাদশার জন্ম দেবে যার নাম হবে মু'আবিয়া।'

হিন্দ কাহিনের নিকট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলে আল-ফাকিহ্ তার হাত ধরে; কিন্তু হিন্দ সজোরে হাতটি ছাড়িয়ে নেন এবং আল-ফাকিহ্কে লক্ষ্য করে বলেন : আল্লাহর কসম! আমি চাই অন্য কারো ঔরসে আমার গর্ভে সেই সন্তানের জন্ম হোক। অতঃপর আবূ সুফইয়ান তাঁকে বিয়ে করেন এবং মু'আবিয়ার পিতা হন।

বর্ণিত হয়েছে, আল-ফাকিহ্ থেকে পৃথক হওয়ার পর হিন্দ পিতাকে বললেন : আব্বা! আমার কোন মতামত ছাড়াই এই লোকটির সাথে তুমি আমার বিয়ে দিয়েছিলে। তারপর যা হওয়ার তাই হলো। এবার কোন ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ট্য আমার নিকট বিস্তারিতভাবে বর্ণনা না করে কারো সাথে আমার বিয়ে দেবে না। অতঃপর সুহাইল ইবন 'আমর ও আবূ সুফইয়ান ইবন হারব বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। পিতা 'উতবা হিন্দ-এর নিকট নিম্নের চরণগুলির মাধ্যমে সে পয়গাম এভাবে উপস্থাপন করলো :

أتاك سهيل وابن حرب وفيهما + رضًالكِ ياهند الهنود ومقنَعُ،

ومامنهما إلا يعاشْ بفضله + ومامنهما إلا يضُر وينفع

ومامنهما إلا كريم مرزّأ + ومامنهما إلا أغرّ سَمَيْدعِ

فدونكِ فاختارى فأنت بصيرة + ولاتُخْدِعى إنّ الـمُخادِعَ يَخْدَعُ.

'ওহে নারী জাতির হিন্দ! সুহাইল ও হারবের পুত্র আবূ সুফইয়ান তোমার নিকট এসেছে। তোমার প্রতি তাদের আগ্রহ ও সন্তুষ্টি আছে।

তাদের অনুগ্রহ ও কল্যাণে জীবন যাপন করা যায়। তারা ক্ষতি ও উপকার দুটোই করতে পারে।

তারা দু'জন মহানুভব ও দানশীল। তারা দু'জন উজ্জ্বলমুখমণ্ডল বিশিষ্ট সাহসী বীর।

তোমার নিকট উপস্থাপন করলাম। তুমিই নির্বাচন কর, কারণ তুমি দূরদৃষ্টিসম্পন্না বুদ্ধিমতী মহিলা। ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিও না। কারণ যে প্রতারণা করে সে প্রতারিত হয়।'

হিন্দ বললেন : আব্বা! আমি এসব কিছু শুনতে চাই না। আপনি তাদের দু'জনের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য আমার কাছে একটু ব্যাখ্যা করুন। তাহলে আমার জন্য অধিকতর উপযোগী কে তা আমি নির্ধারণ করতে পারবো। 'উতবা এবার সুহাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললো : একজন তো গোত্রের উঁচু স্থানীয় ও বিত্তবান। তুমি তাঁর আনুগত্য করলে সে তোমার অনুগত থাকবে। তুমি তার প্রতি বিরূপ হলে সে তোমার কাছে নত হবে। তার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে তুমি তার উপর কর্তৃত্ব করবে। আর অন্যজন উঁচু বংশ ও সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য সকলের নিকট পরিচিত। সে তার গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা। প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, অত্যন্ত সতর্ক, সম্পদের পাহারায় উদাসীন হয়ে ঘুমায় না এবং তার পরিবারের উপর থেকে তার লাঠি কখনো নামায় না। হিন্দ বললেন : আব্বা! প্রথম ব্যক্তি হবে একজন স্বাধীন নারীকে বিনষ্টকারী। সেই নারী বিদ্রোহী হলে আর আত্মসমর্পণ করবে না। স্বামীর ছায়াতলে মূলত সেই সবকিছু করবে। স্বামী তার আনুগত্য করলে স্ত্রীর ইশারা-ইঙ্গিতে চলবে। পরিবারের লোকেরা তাকে ভয় করে চলবে। তখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়বে। আর সে সময় সেই নারীর সকল নাজ-নোখরা ও ছলাকলাও নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে যাবে। এমতাবস্থায় সে যদি কোন সন্তানের জন্ম দেয়, সে সন্তান হবে নির্বোধ। এই লোকটির আলোচনা আমার নিকট করবেন না। তার নামও আর আমার নিকট উচ্চারণ করবেন না। আর অন্যজন পূতঃপবিত্র স্বাধীন ও কুমারী নারীর স্বামী হওয়ার যোগ্য। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ যে, তার গোত্র তার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারবে না এবং কোন ভয়-ভীতি তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হবে না। এমন স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিই আমার স্বামী হওয়ার যোগ্য। তার সাথেই আমাকে বিয়ে দিন। 'উতবা আবূ সুফইয়ানের সাথে হিন্দ-এর বিয়ে দেয়। তার ঔরসে হিন্দ মু'আবিয়া নামের পুত্রের জন্ম দেয়। সুহাইল ইবন 'আমর হিন্দকে না পেয়ে দারুণ আহত হয় এবং তার মনোবেদনা একটি কবিতায় প্রকাশ করে। আবূ সুফইয়ান কবিতাটি পাঠ করে মন্তব্য করেন : হিন্দ-এর তালাক ছাড়া যদি আর কোন কিছুতে তার কষ্ট দূর হতো, আমি তা করতাম। উক্ত কবিতায় সুহাইল আবূ সুফইয়ানকে একটু হেয় করারও চেষ্টা করে। আবূ সুফইয়ান একটি কবিতায় তার জবাব দেন।

এর পরের ঘটনা। সুহাইল অন্য মহিলাকে বিয়ে করে এবং তার গর্ভে সুহাইলের এক ছেলের জন্ম হয়। ছেলেটি বড় হলে একদিন সুহাইল তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছে। পথে সে দেখতে পায় এক ব্যক্তি একটি মাদী উটের উপর সওয়ার হয়ে ছাগল চরাচ্ছে।

ছেলেটি পিতাকে বলে : আব্বা! এই ছোটগুলো কি বড়টির বাচ্চা? তার প্রশ্ন শুনে পিতা সুহাইলের মুখ থেকে স্বগতোক্তির মত বের হয় : 'আল্লাহ হিন্দ-এর প্রতি দয়া ও করুণা করুন। এ মন্তব্য দ্বারা সে হিন্দ-এর দূরদৃষ্টির কথা স্মরণ করে।[২]

ইবন সা'দ অবশ্য বলেছেন, হিন্দ-এর প্রথম স্বামী হাফ্স ইবন আল-মুগীরা ইবন 'আবদুল্লাহ এবং তার ঔরসে হিন্দ-এর পুত্র আবান-এর জন্ম হয়।[৩]

হিন্দ ভালোবাসতেন মুসাফির ইবন আবী 'আমরকে। মুসাফিরও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। এই মুসাফির ছিল রূপ-সৌন্দর্যে, কাব্য প্রতিভা ও দানশীলতায় কুরাইশ যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একদিন হিন্দ তাকে বললেন : যেহেতু তুমি দরিদ্র, তাই আমার পরিবার তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হবে না। তুমি পার্শ্ববর্তী কোন রাজার নিকট যাও এবং সেখান থেকে কিছু সম্পদের মালিক হয়ে ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করবে। মুসাফির হিন্দ-এর মাহরের অর্থ লাভের আশায় হীরার রাজা আন-নু'মান ইবন আল-মুনযিরের নিকট গেল। কিছুদিন পর আবূ সুফইয়ান ইবন হারব, মতান্তরে জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হীরায় গেল। মুসাফির তার নিকট মক্কার হাল-হাকীকত জিজ্ঞেস করলো এবং জানতে চাইলো সেখানকার নতুন কোন খবর আছে কিনা। আবূ সুফইয়ান বললো : নতুন তেমন কোন খবর নেই। তবে আমি হিন্দ বিন্ত 'উতবাকে বিয়ে করেছি। মুসাফির নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করতে শুরু করলো :[৪]

ألا إن هنداً أصبحت منك مَحْرما + وأصبحت من ادنى حموّتها حما

وأصبحت كالمقمور جفن سلاحه + يقلب بالكفين قوسا وأسهما.

'ওহে, হিন্দ তোমার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে গেছে এবং নিকৃষ্টতম নিষিদ্ধ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সে এমন খারাপ মানুষের মত হয়ে গেছে যে তার অস্ত্র কোষমুক্ত করে, তীর-ধনুক দু'হাত দিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে।'

এক সময় মক্কায় ইসলামের অভ্যুদয় হলো।

পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত হিন্দ ইসলামের আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত করেননি। বরং তার এ দীর্ঘ সময় আল্লাহর রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের মাত্রাছাড়া বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতায় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময় শত্রুতা প্রকাশের কোন সুযোগই তিনি হাতছাড়া করেননি। স্বর্ণ ও অলঙ্কারের প্রতি মহিলাদের আবেগ স্বভাবগত। কোন অবস্থাতেই তারা এ দু'টো জিনিস হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু হিন্দ দুটোর বিনিময়েও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঠেকাতে মোটেই কার্পণ্য করেননি। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) আবূ সুফইয়ানের

---

২. তারীখু দিমাশ্ক-তারাজিম আন-নিসা'-৪৪০-৪৪১; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৬/৮৯; আস-সাবীহ আল-হালাবিয়্যা-৬/৮৬-৮৯; মাজমা' আয-যাওয়াহিদ-৯/২৬৭-২৬৮

৩. তাবাকাত-৮/২৩৫

৪. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪২

গৃহকে নিরাপদ বলে ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ থাকবে। এ ঘোষণার পর আবূ সুফইয়ান ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে হিন্দ তাকে তিরস্কার করে বলেন : আল্লাহ তোমার অনিষ্ট করুন। তুমি একজন নিকৃষ্ট প্রবেশকারী।[৫] তার এমন মাত্রাছাড়া শত্রুতার কারণে রাসূল (সা) তাকে হত্যার ঘোষণা দেন। ইসলামের এহেন শত্রু মক্কা বিজয়ের সময় ইসলামের ঘোষণা দেন।

হিন্দ ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে একজন অনন্যা মহিলা। তাঁর মধ্যে ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, দুঃসাহস ও চমৎকার বর্ণনা ক্ষমতা। আর ছিল টনটনে আত্মমর্যাদাবোধ। দারুণ বিশুদ্ধভাষিণী ছিলেন। ইমাম আয-যাহাবী বলেছেন : হিন্দ ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মহিলা।[৬] চমৎকার কাব্য প্রতিভাও ছিল তাঁর। বদরে নিহতদের স্মরণে, বিশেষত তাঁর পিতা 'উতবা, ভাই আল-ওয়ালীদ ইবন 'উতবা এবং চাচা শায়বা ইবন রাবী'আ ও অন্যদের স্মরণে তিনি অনেক মরসিয়া রচনা করেছেন।

'উমার রিদা কাহ্হালা হিন্দ-এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[৭]

هند بنت عتبة بن ربيعة من ربات الحسن والجمال والرأى والعقل والفصاحة والبلاغة والأدب والشعر والفروسية وعزة النفس الخ.

'রূপ, সৌন্দর্য, মতামত, সিদ্ধান্ত, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা, ভাষার শুদ্ধতা ও অলঙ্কার, সাহিত্য, কবিতা, বীরত্ব-সাহসিকতা ও আত্মসম্মানবোধের অধিকারিণী ছিলেন হিন্দ বিন্ত 'উতবা।'

বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হয়ে যখন কুরাইশ গোত্রের লোকদের সমবেত করে তাদের সামনে ইসলামের দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন তখন আবূ লাহাব তার প্রতিবাদ করে এবং তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর সে হিন্দ বিন্ত 'উতবার নিকট এসে বলে : 'উতবার মেয়ে! আমি মুহাম্মাদের থেকে পৃথক হয়ে এসেছি এবং সে যা কিছু নিয়ে এসেছে বলে দাবী করছে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। আমি লাত ও 'উয্যাকে সাহায্য করেছি এবং তাদের দু'জনকে প্রত্যাখ্যান করায় আমি মুহাম্মাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছি। হিন্দ মন্তব্য করলেন : 'উতবার বাবা! আল্লাহ আপনাকে ভালো প্রতিদান দিন।[৮]

ইসলামের প্রতি হিন্দ-এর প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অনেক গুণ বিদ্যমান ছিল। ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যাতে তাঁর প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ এবং নারী জাতির প্রতি তীব্র সহানুভূতি ও সহমর্মিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) কন্যা হযরত যায়নাবের (রা) স্বামী আবুল 'আস ইবন রাবী' (রা)

---

৫. আয-যাহাবী, তারখী আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়া আল-আ'লাম-৩/২৯৮
৬. প্রাগুক্ত
৭. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪২
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৬৫৪

কুরায়শ বাহিনীর সঙ্গে বদরে যান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। দুর্ভাগ্য তাঁর, মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলেন। মক্কায় অবস্থানরত স্ত্রী যায়নাবের (রা) চেষ্টায় এবং মুসলমানদের উদারতায় মুক্তি লাভ করে মক্কায় ফিরে যান। তবে মদীনা থেকে আসার সময় রাসূলুল্লাহকে (সা) কথা দিয়ে আসেন যে, মক্কায় পৌঁছে যায়নাবকে সসম্মানে মদীনায় পৌঁছে দেবেন। মক্কায় ফিরে তিনি স্ত্রী যায়নাবকে (রা) সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বললেন। যায়নাব চুপে চুপে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এ খবর হিন্দ-এর কানে গেল। তিনি গোপনে রাতের অন্ধকারে যায়নাবের নিকট গেলেন এবং বললেন : 'ওহে মুহাম্মাদের মেয়ে! শুনতে পেলাম তুমি নাকি তোমার পিতার নিকট চলে যাচ্ছ? যায়নাব (রা) বলেন : এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। হিন্দ মনে করলেন, হয়তো যায়নাব তাঁর কাছে বিষয়টি গোপন করছে, তাই তিনি বললেন : আমার চাচাতো বোন! গোপন করো না। ভ্রমণ পথে তোমার কাজে লাগে এমন কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে, অথবা অর্থের সংকট থাকলে আমাকে বল, আমি তোমাকে সাহায্য করবো। আমার কাছে লজ্জা করো না। পুরুষদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-ফাসাদ তা নারীদের সম্পর্কে কোন রকম প্রভাব ফেলে না। পরবর্তীকালে যায়নাব (রা) বলেছেন, আমার বিশ্বাস ছিল তিনি যা বলছেন তা করবেন। তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে ভয় করেছিলাম। তাই আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা অস্বীকার করেছিলাম।[৯]

একদিন যায়নাব (রা) মক্কা থেকে মদীনার দিকে বের হলেন। কুরাইশরা তাঁকে বাধা দিয়ে আবার মক্কায় ফিরিয়ে দিল। একথা হিন্দ জানতে পেরে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ঘর থেকে বের হলেন এবং সেই সব দুরাচারীদের সামনে গিয়ে তাদের এহেন দুষ্কর্মের জন্য কঠোর সমালোচনা করলেন। তাদের উদ্দেশ্যে নিম্নের চরণটিও আওড়ালেন :[১০]

أفي السلم أعيارًا جفاءً وغلظة + وفي الحرب أشباه النساء العوارك

'সন্ধি ও শান্তির সময় কঠিন ও কঠোর গাধার মত আচরণ করতে পার, আর রণক্ষেত্রে ঋতুবতী নারীর রূপ ধারণ কর।'

কুরাইশ পাষণ্ডরা যায়নাবকে (রা) মক্কায় আবূ সুফইয়ানের নিকট নিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, যায়নাব (রা) সন্তানসম্ভবা ছিলেন। পাষণ্ডরা উটের পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ায় তিনি বেশ আঘাতও পেয়েছিলেন। তাঁর সেবা ও আদর-আপ্যায়ন করার জন্য তাঁকে নিয়ে বানূ হাশিম ও বানূ উমাইয়্যার মেয়েরা বিবাদ শুরু করে দেয়। অবশেষে হিন্দ তাঁকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। এ সময় হিন্দ প্রায়ই তাঁকে বলতেন, তোমার এ বিপদ তোমার বাবার জন্যই।

হিজরী ২য় সনে সিরিয়া থেকে মক্কা অভিমুখী আবূ সুফইয়ানের একটি বাণিজ্য কাফেলা নির্বিঘ্নে পার করা এবং মুসলমানদেরকে চিরতরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মক্কার পৌত্তলিকদের বিশাল একটি বাহিনী বের হয়। এই বাহিনীর পুরোভাগে ছিল কুরাইশদের বাছা বাছা মানুষ ও নেতৃবৃন্দ। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বদরে পৌঁছে উট জবাই করে

---

৯. প্রাগুক্ত
১০. প্রাগুক্ত-১/৬৫৬; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৭২

ভুরিভোজ এবং মদ পান করে আনন্দ ফূর্তি করবে। তারপর মুসলমানদের শিকড়সহ উৎখাত করবে। যাতে আরবের আর কেউ কোন দিন তাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দুঃসাহস না করে।

মক্কার এই পৌত্তলিক বাহিনীতে ছিল হিন্দ-এর পিতা, ভাই, চাচা ও তাঁর স্বামী। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীতে ছিলেন তাঁর এক ভাই আবূ হুযাইফা ইবন 'উতবা (রা) ও তাঁর আযাদকৃত দাস সালিম (রা)। বদর যুদ্ধে এই আবূ হুযাইফার (রা) ছিল এক গৌরবজনক ভূমিকা।

এ যুদ্ধে তিনি পিতা 'উতবাকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানান। হিন্দ তাঁর ভাইয়ের এহেন আচরণের নিন্দায় নিম্নের চরণ দু'টি বলেন :[১১]

الأحول الأثعل المذموم طائره + أبو حذيفة شر الناس في الدين

أما شكرت أبًا ربَّاكَ من صغر + حتى شببتَ شبابًا غير محجون.

'ত্যাড়া চোখ, বাঁকা দাঁত ও নিন্দিত ভাগ্যের অধিকারী আবূ হুযাইফা দীনের ব্যাপারে নিকৃষ্ট মানুষ।

তোমার পিতা যিনি তোমাকে ছোটবেলা থেকে প্রতিপালন করেছেন এবং কোন রকম বক্রতা ছাড়াই তুমি পূর্ণ যুবক হয়েছো, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?'

যুদ্ধের সূচনা পর্বেই হিন্দা'র পিতা, ভাই ও চাচা নিহত হয়। শুধু তাই নয়, পৌত্তলিক বাহিনীর সত্তরজন বাছা বাছা সৈনিকও নিহত হয়। তাদের মৃত দেহ বদরে ফেলে রেখে অন্যরা মক্কার পথ ধরে পালিয়ে যায়। এই পলায়নকারীদের পুরোভাগে ছিল হিন্দ-এর স্বামী আবূ সুফইয়ান। এ বিজয়ে মুসলমানরা যেমন দারুণ উৎফুল্ল হন তেমনি কুরাইশ বাহিনীর খবর মক্কায় পৌছলে সেখানের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে হতবাক হয়ে যায়। প্রথমে অনেকে সে খবর বিশ্বাস করতে পারেনি। পরাজিতরা যখন মক্কায় ফিরতে লাগলো তখন খবরের যথার্থতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকলো না। ঘটনার ভয়াবহতায় মক্কাবাসীদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। আবূ লাহাব তো শোকে দুঃখে শয্যা নিল এবং সে অবস্থায় সাতদিন পরে জাহান্নামের পথে যাত্রা করে। তার জীবনের অবসান হয়। কুরাইশ নারীরা তাদের নিহতদের স্মরণে এক মাস ব্যাপী শোক পালন করে। বুক চাপড়িয়ে, মাথার চুল ছিঁড়ে তারা মাতম করতে থাকে। নিহত কোন সৈনিকের বাহন অথবা ঘোড়ার পাশে সমবেত হয়ে তারা রোনাজারি করতে থাকে। একমাত্র হিন্দ ছাড়া এই শোক প্রকাশ ও মাতম করা থেকে মক্কার কোন নারী বাদ যায়নি। হাঁ, হিন্দ কোন রকম শোক প্রকাশ করেননি। একদিন কিছু কুরাইশ মহিলা হিন্দ-এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করে : তুমি তোমার পিতা, ভাই, চাচা ও পরিবারের সদস্যদের জন্য একটু কাঁদলে না? বললেন : আমি যদি তাদের জন্য কাঁদি তাহলে সে কথা মুহাম্মাদের নিকট পৌঁছে যাবে।

---

১১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-১/১৬৬; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৭২

তারা এবং খাযরাজ গোত্রের নারীরা উৎফুল্ল হবে। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তেল-সুগন্ধি আমার জন্য হারাম। আমি যদি জানতাম কান্নাকাটি ও মাতম আমার দুঃখ-বেদনা দূর করে দেবে তাহলে আমি কাঁদতাম। কিন্তু আমি জানি আমার প্রিয়জনদের বদলা না নেওয়া পর্যন্ত আমার অন্তরের ব্যথা দূর হবে না।

হিন্দ তেল-সুগন্ধির ধারে কাছেও গেলেন না এবং আবূ সুফইয়ানের শয্যা থেকেও দূরে থাকলেন। পরবর্তী উহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত মক্কাবাসীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন। আর বদরে নিহতদের স্মরণে প্রচুর মরসিয়া রচনা করলেন। সেই সকল মরসিয়ার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ :[১২]

أبكى عميدَ الأبطحين كليهما + وحاميهما من كل باغ يريدها

أبى عتبة الخيرات ويحك فاعلمى + وشيبة والحامي الزِّمار وليدها

أولئك آل المجد من آل غالب + في العز منها ينمى عديدها.

'আমি আল আবতাহ উপত্যকাদ্বয়ের নেতা এবং প্রতিটি বিদ্রোহীর অসৎ উদ্দেশ্য থেকে তাকে রক্ষাকারীর মৃত্যুতে কাঁদছি।

তোমার ধ্বংস হোক! জেনে রাখ, আমি কাঁদছি সৎকর্মশীল উতবা, শায়বা এবং গোত্রের নিরাপত্তা বিধানকারী তার সন্তানের জন্য। তারা সবাই গালিবের বংশধরের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী। তাদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক।'

বদর যুদ্ধে হিন্দ-এর পিতা 'উতবা, চাচা শায়বা এবং ভাই নিহত হলো। হিন্দ তাদের স্মরণে মরসিয়া গাইতে থাকেন। তৎকালীন 'আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি আল-খানসা'। জাহিলী আমলের কোন এক যুদ্ধে তাঁর দু'ভাই সাখর ও মু'আবিয়া নিহত হয়। আল-খানসা' সারা জীবন তাদের জন্য কেঁদেছেন, মাতম করেছেন এবং বহু মর্মস্পর্শী মরসিয়া রচনা করে সমগ্র আরববাসীকে তাঁর নিজের শোকের অংশীদার করে তুলেছেন। এ কারণে 'উকাজ মেলায় আল-খানসা'র হাওদা ও তাঁবুর সামনে পতাকা উড়িয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হতো। তিনি বলতেন : আমি আরবের সবচেয়ে বড় মুসীবতগ্রস্ত মানুষ। হিন্দ এসব কথা অবগত হয়ে বলতেন : আমি আল-খানসা'র চেয়েও বড় মুসীবতগ্রস্ত। তারপর তিনিও আল-খানসা'র মত হাওদা বিশেষভাবে চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন এবং উকাজে উপস্থিত হন। তিনি বলেন : আমার উট আল-খানসা'র উটের কাছাকাছি নাও। তাই করা হলো। আল-খানসা'র কাছাকাছি গেলে তিনি বললেন : বোন! আপনার পরিচয় কি? বললেন : আমি হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা– আরবের সবচেয়ে বড় মুসীবতগ্রস্ত মানুষ। আমি জানতে পেরেছি, আরববাসীর নিকট নিজেকে আপনি সবচেয়ে

---

১২. শা'ইরাত আল-'আরাব-৪৬৮; আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৩

বড় বিপদগ্রস্ত মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আপনার সেই বিপদটি কি? বললেন : আমার পিতা 'আমর, ভাই সাখর ও মু'আবিয়ার মৃত্যু

তিনি পাল্টা হিন্দকে প্রশ্ন করলেন : তা আপনার বিপদটা কি? বললেন : আমার পিতা 'উতবা ও ভাই আল-ওয়ালীদের মৃত্যু। আল-খানসা' বললেন : এছাড়া আর কেউ আছে? তারপর তিনি আবূ 'আমর, মু'আবিয়া ও সাখরের স্মরণে একটি মরসিয়া কবিতা আবৃত্তি করেন।[১৩]

উহুদের প্রস্তুতি

বদরের পর থেকে কুরাইশদের অন্তরে শান্তি নেই। তাদের নারীরা নিহত পুত্র, পিতা, স্বামী অথবা প্রিয়জনদের স্মরণে শোক প্রকাশ করে চলেছে। তাদের অন্তরে বড় ব্যথা। অতঃপর মক্কার পৌত্তলিকরা বদরের উপযুক্ত বদলা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মহিলারাও এবার জিদ ধরলো পুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধে যাবার। তবে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা এবং আরো কিছু অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধা মহিলাদের সঙ্গে নিতে রাজি হচ্ছিল না। হিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাকে লক্ষ্য করে বললেন : তুমি তো বদরে প্রাণে বেঁচে গিয়ে নিরাপদে স্ত্রীর নিকট ফিরে এসেছিলে। হাঁ, এবার আমরা যাব এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো। বদরে যাত্রাকালে আল-জুহফা থেকে তোমরা মহিলাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে, এবার কেউ আর তাদেরকে ফেরাতে পারবে না। সেবার তারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছে।

কুরাইশ বাহিনী মক্কা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে চললো। হিন্দ-এর নেতৃত্বে পনেরো জন মহিলাও তাদের সহযাত্রী হলো।[১৪] তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। বদরে মুহাম্মাদের (সা) চাচা হামযা ইবন 'আবদিল মুত্তালিব হিন্দ-এর প্রিয়তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই হিন্দ হাবশী ক্রীতদাস ওয়াহ্শীকে নানা রকম অঙ্গীকার করে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করেছেন। সে যদি হামযাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি তাকে প্রচুর স্বর্ণ, অলঙ্কার ও অর্থ দিবেন। উল্লেখ্য যে, এই ওয়াহ্শী ছিলেন জুবায়র ইবন মুতইমের ক্রীতদাস।

উহুদের ময়দানে উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলো। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। কুরাইশরা বদর ও সেখানে নিহতদের স্মৃতিচারণ করছে। হিন্দ-এর নেতৃত্বে কুরাইশ নারীরা দফ ও তবলা বাজিয়ে নিম্নের এ গানটি গাইতে গাইতে তাদের

---

১৩. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৩

১৪. আনসাবুল আশরাফ-১/৩১২-৩১৩; মক্কা থেকে আর যে সকল নারী উহুদে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলো : সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার স্ত্রী বারযাহ্ বিন্ত মাস'উদ আছ-ছাকাফী, তালহা ইবন আবী তালহার স্ত্রী সালামা বিন্ত সা'দ, আল-হারিছ ইবন হিশামের স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরা ও 'আমর ইবন আল-'আসের স্ত্রী হিন্দ বিন্ত মুনাব্বিহ্। (আল-ওয়াকিদী, আল-মাগাযী-১/২০২-২০৩)

সারিবদ্ধ সৈনিকদের সামনে দিয়ে চক্কর দিতে লাগলো।[১৫]

نحن بنات طارق ر + نمشى على النمارق

إن تقبلوا نعانق + أوتدبروا نفارق.

فراق غير وامق.

'তারকার কন্যা মোরা, নিপুণ চলার ভঙ্গি। সামনে যদি এগিয়ে যাও জড়িয়ে নেবো বুকে। আর যদি হটে যাও পিছে, পৃথক হয়ে যাব চিরদিনের তরে।'

অপরদিকে মুসলমানরা মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর সাহায্যকে স্মরণ করছে। হযরত রাসূলে কারীম (সা) কিছু দক্ষ তীরন্দাযকে পাহাড়ের উপর একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োগ করলেন এবং গোটা বাহিনীকে এমনভাবে সাজালেন যে, কেউ ভুল না করলে আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় অবধারিত।

যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথম দিকে পৌত্তলিক বাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। মুসলিম বাহিনী বিজয়ের দ্বারপান্তে পৌঁছে গেল। কুরাইশ বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। কুরাইশ রমণীরা হেয়, লাঞ্ছিত অবস্থায় যুদ্ধবন্দিনী হতে চলছিল। যুদ্ধের এমন এক পর্যায়ে কিছু মুসলিম সৈনিক শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহে মনোযোগী হয়ে পড়লো, আর পাহাড়ের উপর নিয়োগকৃত তীরন্দায বাহিনীর কিছু সদস্য রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশের কথা ভুলে গিয়ে স্থান ত্যাগ করলো। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের রূপ পাল্টে গেল। পলায়নপর পৌত্তলিক বাহিনী মুসলমানদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করলো। তারা ফিরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করে বসলো। মুসলিম বাহিনী হতচকিত হয়ে পড়লো। আবার যুদ্ধ শুরু হলো। বহু হতাহতসহ সত্তর (৭০) জন মুসলিম সৈনিক শাহাদত বরণের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলো। ওয়াহশীর হাতে হযরত হামযা (রা) শহীদ হলেন।

কুরাইশরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়লো। বদরের কঠিন বদলা নিতে পেরেছে মনে করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করলো। সবচেয়ে বেশী খুশী হলেন হিন্দ। হামযার (রা) হত্যায় তিনি তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি কুরাইশ নারীদের সঙ্গে নিয়ে নিহত মুসলিম সৈনিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁদের নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে চরমভাবে বিকৃতি সাধন করলেন।

আল-বালাযুরী হিন্দ-এর নৃশংসতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন : 'ওয়াহশী হযরত হামযাকে হত্যা করে তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে এনে হিন্দ-এর হাতে দেয়। হিন্দ সেই কলিজা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দেন। তারপর নিজে গিয়ে কেটে-কুটে হামযার (রা) দেহ বিকৃত করে ফেলেন। হিন্দ তাঁর দেহ থেকে দু'হাতের কব্জী, পাকস্থলী ও দু' পা কেটে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। তারপর ফিরে এসে নিজের অঙ্গ থেকে মূল্যবান রত্নখচিত স্বর্ণের অলঙ্কার, যথা পায়ের খাড়ু, গলার হার ও কানের দুল খুলে ওয়াহশীর

---

১৫. আ'লাম আন-নিসা'- ৫/২৪৪; বিভিন্ন বর্ণনায় গানটির কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

হাতে তুলে দেন। পায়ের আংগুলে পরিহিত স্বর্ণের আংটিগুলিও খুলে তাকে দিয়ে দেন। কারণ, এই হামযা বদর যুদ্ধে তার বাবা 'উতবাকে হত্যা করেছিলেন।[১৬]

হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবানোর কথা শুনে হযরত রাসূলে কারীম (সা) বলেন : যদি হিন্দ হামযার কলিজা চিবিয়ে গিলে ফেলতো তাহলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতো না। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জাহান্নামের আগুনের জন্য হামযার গোশ্‌ত স্পর্শ করা নিষিদ্ধ করেছেন।[১৭]

সে এমনই এক নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজ ছিল যার দায়ভার কুরাইশ দলপতি আবূ সুফইয়ানও নিতে অস্বীকার করেন। তিনি একজন মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের নিহতদের যে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে তাতে যেমন আমি খুশী নই, তেমনি অখুশীও নই। আমি কাউকে বারণও করিনি, আবার করতেও বলিনি। সবকিছু শেষ করে হিন্দ একটি উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে নিম্নের চরণগুলি উচ্চারণ করেন :[১৮]

نحن جزيناكم بيوم بدر + والحرب بعد الحرب ذات سعر

ماكان عن عتبة لي من صبر + ولا أخي عمِّه وبكرى

شفيتُ صدري وقضيت نذري + شفيت وحشيُّ عليل صدري.

'আমরা তোমাদেরকে বদরের বদলা দিয়েছি। একটি যুদ্ধের পর আরেকটি যুদ্ধ হয় আগুনওয়ালা। আমার পিতা 'উতবা, ভাই, চাচা ও দলের জন্য আমি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার অন্তরকে সুস্থ করেছি, অঙ্গীকার পূর্ণ করেছি। হে ওয়াহশী! তুমি আমার অন্তরকে রোগমুক্ত করেছো।'

বদরের ক্ষতি, অপমান ও লজ্জা অনেকটা পুষিয়ে নিয়ে অন্তরভরা আনন্দ-খুশী সহকারে কুরাইশরা ফিরে চললো। হিন্দ তখন গাইতে লাগলেন :[১৯]

رجعت وفي نفسي بلابل جمَّة + وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي

ولكني قد نلتُ شيئًا ولم يكن + كما كنتُ أرجو في مسيري ومطلبي

'আমি ফিরে চলেছি, অথচ আমার অন্তরে রয়েছে বহু পুঞ্জিভূত ব্যথা। আমার উদ্দেশ্য যা ছিল তার কিছু অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। তবে আমি কিছু অর্জন করেছি। আমার উদ্দেশ্য এবং আমার চলার পথে যেমনটি আমি আশা করেছিলাম তেমনটি হয়নি।'

মদীনাবাসীদের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কুরাইশদের বেশ কয়েকটি বছর কেটে

---

১৬. আনসাব আল-আশরাফ-১/৩২২
১৭. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৫
১৮. আয-যাহাবী, তারীখ-২/২০৫
১৯. সীরাতু ইবন হিশাম-২/১৬৮

গেল। খন্দকের যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং সবশেষে মক্কা বিজয়। কোন উপায় না দেখে রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কায় প্রবেশের আগের দিন কুরাইশ নেতা হিন্দ-এর স্বামী আবূ সুফইয়ান গেলেন রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট মক্কাবাসীদের নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনার জন্য। সেখানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মক্কায় ফিরে এসে ঘোষণা দেন : ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা শুনে রাখ, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তোমরাও ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ, মুহাম্মাদ তোমাদের নিকট এসে গেছেন এমন শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে যার ধারণাও তোমাদের নেই। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দ তার মাথাটি সজোরে চেপে ধরে বলেন : তুমি সম্প্রদায়ের একজন নিকৃষ্ট নেতা। তারপর হিন্দ মক্কাবাসীদের প্রতি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করতে আহ্বান জানান।[২০]

ইসলাম গ্রহণ ও বায়'আত

এ ব্যাপারে সকল বর্ণনা একমত যে, মক্কা বিজয়ের দিন হিন্দ-এর স্বামী আবূ সুফইয়ানের ইসলাম গ্রহণের পর হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খুব ভালো মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল তথ্য বর্ণিত হয়েছে তা একত্রিত করলে নিম্নের রূপ ধারণ করে :

হিন্দ আবূ সুফইয়ানকে বললেন : আমি ইচ্ছা করেছি, মুহাম্মাদের অনুসারী হবো।

আবূ সুফইয়ান : গতকালও তো দেখলাম তুমি এ কাজকে ভীষণ অপছন্দ করছো।

হিন্দ : আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়েছে, গত রাতের পূর্বে এই মসজিদে আর কোন দিন আল্লাহর সত্যিকার ইবাদাত হয়নি। তারা কিয়াম, রুকূ' ও সিজদার মাধ্যমে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যেই সেখানে এসেছে।

আবূ সুফইয়ান : তুমি যা করার তাতো করেছো। তুমি তাঁর নিকট যাওয়ার সময় তোমার গোত্রের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।[২১]

এ কথার পর হিন্দ 'উছমান, মতান্তরে 'উমারের (রা) নিকট যান। তখন হিন্দ-এর সঙ্গে ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমন কিছু মহিলাও ছিলেন। 'উছমান (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এলেন। হিন্দ-এর ভয় ছিল, হামযার (রা)

---

২০. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৫

২১. মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) ছয়জন পুরুষ ও চারজন মহিলাকে ক্ষমার আওতার বাইরে রাখেন এবং তাদেরকে নাগালের মধ্যে পাওয়া মাত্র হত্যার নির্দেশ দেন। পুরুষরা হলো : 'ইকরিমা ইবন আবী জাহ্ল, হাব্বাব ইবন আল-আসওয়াদ, 'আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবী সারাহ, মুকায়্যিস ইবন সুবাবা, আল-হুয়ায়রিছ ইবন নুকায়য। মহিলারা হলো : হিন্দ বিন্ত 'উতবা, আমর ইবন হাশিম ইবন 'আবদুল মুত্তালিবের দাসী সাবা, হিলাল ইবন 'আবদিল্লাহর দু'জন গায়িকা– ফারতানা ও আরনাব। এ দু' গায়িকা রাসূলুল্লাহর (সা) নিন্দামূলক গান গেয়ে বেড়াতো। (আনসাব আল-আশরাফ-১/৩৫৭; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৮৬) ইবন হাজার এর বাইরে আরো কিছু নারী-পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী-৮/১১-১২)

সাথে তাঁর আচরণের জন্য রাসূল (সা) তাঁকে পাকড়াও করতে পারেন, তাই মাথা-মুখ ঢেকে অপরিচিতের বেশে রাসূলের (সা) নিকট প্রবেশ করেন।

তাঁর সঙ্গে গেলেন আরো অনেক মহিলা। উদ্দেশ্য তাঁদের, রাসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাই'য়াত হওয়া। তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহর (সা) কাছে পৌঁছলেন তখন তাঁর নিকট বসা ছিলেন তাঁর দুই বেগম, কন্যা ফাতিমা ও বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের আরো অনেক মহিলা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় হিন্দ কথা বললেন রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে। উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযার (রা) কলিজা চিবিয়েছিলেন তাই আজ বড় লজ্জা ও অনুশোচনা। মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তাঁর মনোনীত দীনকে বিজয়ী করেছেন। আপনার ও আমার মাঝে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে সূত্রে আমি আপনার নিকট ভালো ব্যবহার আশা করি। এখন আমি একজন ঈমানদার ও বিশ্বাসী নারী– একথা বলেই তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন খুলে পরিচয় দেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা। রাসূল (সা) বললেন : খোশ আমদেদ। হিন্দ বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! হেয় ও অপমান করার জন্য আপনার বাড়ীর চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় বাড়ী ধরাপৃষ্ঠে এর আগে আর ছিল না। আর এখন আপনার বাড়ীর চেয়ে অধিক সম্মানিত বাড়ী আমার নিকট দ্বিতীয়টি নেই।[২২]

রাসূল (সা) বললেন : আরো অনেক বেশী। তারপর তিনি তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনান এবং বাই'আত গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) বললেন : তোমরা একথার উপর অঙ্গীকার কর যে, আল্লাহর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করবে না।

হিন্দ বললেন : আপনি আমাদের থেকে এমন অঙ্গীকার নিচ্ছেন যা পুরুষদের থেকে নেন না। তা সত্ত্বেও আমরা আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

রাসূল (সা) : তোমরা চুরি করবে না।

হিন্দ : আল্লাহর কসম! আমি আবূ সুফইয়ানের অর্থ-সম্পদ থেকে মাঝে মাঝে কিছু নিয়ে থাকি। আমি জানিনে, তাকি আমার জন্য হালাল হবে, নাকি হারাম হবে।

পাশে বসা আবূ সুফইয়ান বলে উঠলেন : অতীতে তুমি যা কিছু নিয়েছো তাতে তুমি হালালের মধ্যে আছ। রাসূল (সা) বললেন : তুমি তো হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা।

হিন্দ : হাঁ, আমি হিন্দ বিন্‌ত 'উতবা। আপনি আমার অতীতের আচরণকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

রাসূল (সা) বললেন : তোমরা ব্যভিচার করবে না।

হিন্দ : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মুক্ত-স্বাধীন নারী কি ব্যভিচার করে?

রাসূল (সা) : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।

---

২২. আসহাবে রাসুলের জীবনকথা-১/২০৫

হিন্দ বললেন : আমরা তো তাদেরকে শিশুকালে লালন-পালন করেছি। আপনি তাদের বড়দেরকে বদরে হত্যা করেছেন। সুতরাং আপনি এবং তারা এ বিষয়টি ভালো জানেন।

তাঁর একথা শুনে 'উমার (রা) হেসে দেন।

রাসূল (সা) : কারো প্রতি বানোয়াট দোষারোপ করবে না।

হিন্দ : কারো প্রতি দোষারোপ করা দারুণ খারাপ কাজ।

রাসূল (সা) : কোন ভালো কাজে আমার অবাধ্য হবে না।

হিন্দ : আমরা এই মজলিসে বসার পরও কোন ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবো?

রাসূল (সা) 'উমারকে বললেন : তুমি এই মহিলাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর নিকট দু'আ কর।

'উমার (রা) তাঁদের বাই'আত গ্রহণ করলেন। রাসূল (সা) মহিলাদের সাথে করমর্দন করতেন না। তিনি তাঁর জন্য বৈধ অথবা মাহরিম নারী ছাড়া অন্য কোন নারীকে স্পর্শ করতেন না, তেমনি তাদেরকে স্পর্শ করার সুযোগও দিতেন না। তাই হিন্দ যখন বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে স্পর্শ করতে চাই। বললেন : আমি মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করি না। একজন নারীর জন্য আমার যে বক্তব্য, এক শো' নারীর জন্য আমার বক্তব্য একই।

অতঃপর রাসূল (সা) আবূ সুফইয়ান ও হিন্দ-এর পূর্বের বিয়েকে বহাল রাখেন।[২৩]

নারী জাতির মধ্যে হিন্দ-এর ব্যক্তিত্বে ছিল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ছাপ। তাঁর মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করার পর তাঁর অন্তরের সকল পঙ্কিলতা দূর করে দেয়, সাহাবিয়া সমাজে তিনি এক অনন্য মহিলা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভিতরের পশুত্ব, তাঁর অন্তরের সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ, বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্নকারী মূর্খতার আবরণ এবং বিবেক ও চেতনাকে আচ্ছাদনকারী সকল অসত্য ও অসারতাকে দূর করে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে দেন। ইসলাম গ্রহণের পর আর কখনো কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের কাছে নত হননি। ইসলামী বিশ্বাসকে তিনি বাস্তবে রূপদান করেন। ইসলাম পূর্ববর্তী জীবনে তাঁর গৃহে একটি মূল্যবান বিগ্রহ ছিল। ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে গিয়ে– তোমার ব্যাপারে আমরা একটা ধোঁকার মধ্যে ছিলাম– একথা বলতে বলতে কুড়াল দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন।[২৪]

একথা প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারিতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহর (সা) রিসালাতকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার পর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট কিছু উপহার পাঠান। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেন। এ প্রসঙ্গে ইবন

---

২৩. তাবাকাত-৮/২৩৬, ২৩৭; আত-তাবারী, তারীখ-২/১৬১, ১৬২; আল-ইসতীআব-৪/৪১১; উসুদুল গাবা-৪/৪০৯; আস-সীরাহ্ আল-হালবিয়্যাহ্-৩/৪৬, ৪৭; এছাড়া বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈসহ বিভিন্ন গ্রন্থে ঘটনাটি কমবেশী বর্ণিত হয়েছে।

২৪. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৫৭; তাবাকাত-৮/২৩৭; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৬০

'আসাকির বলেন : ইসলাম গ্রহণের পর হিন্দ দু'টি ভূনা বকরীর বাচ্চা এবং এক মশক পানি তাঁর দাসীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান। রাসূল (সা) তখন আল-আবতাহ উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। রাসূলের (সা) সঙ্গে তখন উম্মু সালামা, মায়মূনাসহ বানূ 'আবদিল মুত্তালিবের আরো কিছু মহিলা ছিলেন। খাবারগুলি রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে উপস্থাপন করে দাসীটি বললো : এই উপহারটুকু আমার মনিবা পাঠিয়েছেন এবং বিনয়ের সাথে এ অক্ষমতার কথাও বলেছেন : বর্তমান সময়ে আমাদের ছাগীগুলি কমই মা হচ্ছে। রাসূল (সা) বললেন : আল্লাহ তোমাদের ছাগলে বরকত দিন এবং মায়ের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

দাসী ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আর কথা হিন্দকে অবহিত করলে তিনি ভীষণ খুশী হন। পরবর্তীকালে দাসীটি বলতেন, আমরা আমাদের ছাগল ও তার মায়ের সংখ্যা এত বেশী হতে দেখেছি যা পূর্বে আর কখনো হয়নি। হিন্দ বলতেন : এটা রাসূলুল্লাহর (সা) দু'আ ও তাঁর বরকতে হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দান করেছেন। তারপর তিনি এই স্বপ্নের কথা বলতেন : আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখেছিলাম, অনন্তকাল ধরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ছায়া আমার নিকটেই, কিন্তু সেখানে যেতে সক্ষম হচ্ছি না। যখন রাসূল (সা) আমাদের কাছে আসলেন, দেখলাম, আমি যেন ছায়ায় প্রবেশ করলাম।[২৫]

হিন্দ-এর জ্ঞানগর্ভ বাণী

হিন্দ-এর মুখ-নিঃসৃত অনেক জ্ঞানগর্ভ বাণী আছে যা প্রায় প্রবাদ-প্রবচনে পরিণত হয়েছে। শব্দ এত যাদুকরী ও ভাব এত উন্নতমানের যে, তা দ্বারা তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও চমৎকার চিন্তা ও অনুধ্যান ক্ষমতা প্রমাণিত হয়। এই জীবনের রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা, সত্যকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি গুণের কথাও তা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে ইবনুল আছীর তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :[২৬]

كانت امرأة لها نفس وأنفة ورأى وعقل.

'তিনি ছিলেন একজন প্রাণসত্তার অধিকারিণী, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্না এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারিণী মহিলা।'

যেমন তিনি বলেছেন : 'নারী হলো বেড়ি। তার জন্য অবশ্যই একটি কণ্ঠের প্রয়োজন। তোমার কণ্ঠে ধারণ করার পূর্বে ভালো করে দেখে নাও, কাকে ধারণ করছো।' তিনি আরো বলেছেন : 'নারীরা হলো বেড়ি। প্রত্যেক পুরুষ অবশ্যই তার হাতের জন্য একটি বেড়ি ধারণ করবে।'[২৭]

---

২৫. তারীখু দিমাশ্‌ক, তারাজিম আন-নিসা'-৪৫৬, ৪৫৭

২৬. উসুদুল গাবা-৫/৫৬৩

২৭. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-৩/২৬৭; আল-আ'লাম-৮/৯৮

পরবর্তীকালের ঘটনা। খলীফা 'উমারের খিলাফতকাল, মক্কায় আবূ সুফইয়ানের (রা) বাড়ীর দরজার সামনে দিয়ে পানি গড়িয়ে যেত। হাজীদের চলাচলের সময় তাদের পা পিছলে যেত। 'উমার (রা) তাঁকে এভাবে পানি গড়ানো বন্ধ করতে বলেন। আবূ সুফইয়ান (রা) 'উমারের (রা) কথার গুরুত্ব দিলেন না। এরপর 'উমার (রা) একদিন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই দরজার ভিজে স্থানটিতে তাঁর পা পিছলে গেল। তিনি হাতের চাবুকটি আবূ সুফইয়ানের (রা) মাথার উপর উঁচু করে ধরে বলেন : আমি কি আপনাকে এই পানি গড়ানো বন্ধ করতে বলিনি? আবূ সুফইয়ান সঙ্গে সঙ্গে নিজের শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা নিজের মুখ চেপে ধরেন। তখন 'উমার (রা) বলেন : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এমনও দেখালেন যে, আমি মক্কার বাতহা' উপত্যকায় আবূ সুফইয়ানকে পিটাচ্ছি, অথচ তাঁর সাহায্যকারী নেই, আমি তাঁকে আদেশ করছি, আর তিনি তা পালন করছেন।' 'উমারের (রা) এ মন্তব্য শুনে হিন্দ বলে ওঠেন : ওহে 'উমার! তাঁর প্রশংসা কর। তুমি তাঁর প্রশংসা করলে তোমাকে অনেক বড় কিছু দেওয়া হবে।

হযরত 'উমার ইবন আল-খাত্তাব (রা) যখন ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানকে (রা) শামের ওয়ালী নিয়োগ করেন তখন মু'আবিয়া (রা) ইয়াযীদের সংগে শামে যান। এ সময় আবূ সুফইয়ান (রা) একদিন হিন্দকে (রা) বলেন : এখন যে তোমার ছেলে মু'আবিয়া আমার ছেলে ইয়াযীদের অধীন থাকবে– এটা তোমার কেমন লাগবে? হিন্দ বললেন : যদি আরব ঐক্যে অস্থিরতা দেখা দেয় তখন দেখবে আমার ছেলে এবং তোমার ছেলের অবস্থান কি হয়। উল্লেখ্য যে, ইয়াযীদ (রা) ছিলেন আবূ সুফইয়ানের (রা) অন্য স্ত্রীর সন্তান। এর অল্পকাল পরে ইয়াযীদ (রা) শামে মারা যান। 'উমার (রা) তাঁর স্থলে মু'আবিয়াকে (রা) নিয়োগ করেন। এ নিয়োগ লাভের পর হিন্দ মু'আবিয়াকে (রা) বলেন : আমার ছেলে! আল্লাহর কসম! আরবের স্বাধীন নারীরা তোমার মত সন্তান খুব কম জন্ম দিয়েছে। এ ব্যক্তি তোমাকে টেনে তুলেছেন। সুতরাং তোমার পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক তুমি তাঁর মর্জি মত কাজ করবে। হযরত হিন্দ-এর বিভিন্ন সময়ের এ জাতীয় মন্তব্য ও আচরণ দ্বারা বুঝা যায় হযরত 'উমারের (রা) প্রতি ছিল তাঁর দারুণ শ্রদ্ধাবোধ। সব সময় তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন।

হিন্দ একবার খলীফা 'উমারের (রা) নিকট গিয়ে বাইতুল মাল থেকে চার হাজার দিরহাম ঋণের আবেদন জানিয়ে বললেন, এদিয়ে আমি ব্যবসা করবো এবং ধীরে ধীরে পরিশোধ করবো। খলীফা তাঁকে ঋণ দিলেন। তিনি সেই অর্থ নিয়ে কালব গোত্রের এলাকায় চলে যান এবং সেখানে কেনাবেচা করতে থাকেন। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন আবূ সুফইয়ান ও তাঁর ছেলে 'আমর ইবন আবী সুফইয়ান এসেছেন মু'আবিয়ার (রা) নিকট। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মু'আবিয়ার (রা) নিকট চলে যান।

উল্লেখ্য যে, আগেই আবূ সুফইয়ানের (রা) সাথে তাঁর দূরত্বের সৃষ্টি হয়।

মু'আবিয়া (রা) মায়ের এভাবে আসার কারণ জানতে চান। হিন্দ বলেন : আমি তোমাকে

নজরে রাখার জন্য এসেছি। 'উমার তো কেবল আল্লাহর জন্য কাজ করেন। এদিকে তোমার বাবা এসেছেন তোমার নিকট। আমার ভয় হলো তুমি সবকিছু তাঁর হাতে উঠিয়ে না দাও। মানুষ জানতে পারবে না তুমি এসব জিনিস কোথা থেকে তাঁকে দিচ্ছো। পরে 'উমার তোমাকে পাকড়াও করবেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁর বাবা ও ভাইকে একশো দীনারসহ কাপড়-চোপড় ও বাহন দিলেন। ভাই আমর এ দানকে যথেষ্ট বলে মনে করলেন।

আবূ সুফইয়ান বললেন : একে বড় দান মনে করো না। হিন্দ-এর অগোচরে এ দান দেওয়া হয়নি। আর এই যে, সুন্দর পোশাক, এগুলো হিন্দ এনেছে। এরপর তাঁরা সবাই মদীনায় ফিরে আসেন। এক সময় আবূ সুফইয়ান হিন্দকে জিজ্ঞেস করেন : ব্যবসায়ে কি লাভ হয়েছে? হিন্দ বলেন : আল্লাহই ভালো জানেন। মদীনায় আমার কিছু ব্যবসা আছে। মদীনায় এসে হিন্দ তাঁর পণ্য বিক্রি করলেন এবং 'উমারের (রা) নিকট গিয়ে ব্যবসায়ে তাঁর লোকসানের কথা জানালেন। 'উমার বললেন : তোমাকে দেওয়া অর্থ যদি আমার হতো আমি ছেড়ে দিতাম। কিন্তু এ অর্থ তো মুসলমানদের। আর এই যে, সুন্দর পোশাক তুমি আবূ সুফইয়ানকে দিয়েছিলে তাতো এখনো তার নিকট আছে। তারপর 'উমার (রা) লোক পাঠিয়ে আবূ সুফইয়ানকে গ্রেফতার করেন। হিন্দ-এর নিকট থেকে পাওনা উসূল করে তাঁকে ছেড়ে দেন। 'উমার (রা) আবূ সুফইয়ানকে (রা) জিজ্ঞেস করেন : মু'আবিয়া আপনাকে নগদে কত দিয়েছে? আবূ সুফইয়ান বলেন : এক শো দীনার।[২৮]

"আল-'ইকদ আল-ফারীদ" গ্রন্থে এসেছে। আবূ সুফইয়ান মু'আবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় এসে 'উমারের (রা) নিকট গিয়ে বলেন : আমাকে কিছু দান করুন। 'উমার (রা) বললেন : আপনাকে দেওয়ার মত আমার নিকট তেমন কিছু নেই। 'উমার (রা) সীল-মোহর একজনের হাতে দিয়ে হিন্দ-এর নিকট পাঠলেন। তাঁকে বলে দিলেন : তুমি তাকে বলবে, যে দু'টি পাত্র তুমি নিয়ে এসেছো, তা আবূ সুফইয়ান পাঠিয়ে দিতে বলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাত্র দু'টি 'উমারের (রা) নিকট নিয়ে আসা হলো। তার মধ্যে দশ হাজার দিরহাম ছিল। 'উমার (রা) পাত্রসহ দিরহামগুলো বাইতুল মালে পাঠিয়ে দিলেন। 'উমারের (রা) পর 'উছমান (রা) খলীফা হলেন। তিনি সেই অর্থ আবূ সুফইয়ানকে (রা) ফেরত দিতে চাইলেন। কিন্তু আবূ সুফইয়ান তা নিতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে : যে অর্থের জন্য 'উমার আমাকে তিরস্কার করেছেন তা আমি অবশ্যই নেব না।[২৯]

হিন্দ ও মু'আবিয়া

হিন্দ-এর ছেলে মু'আবিয়া (রা)। দুধ পান করানো অবস্থায়ই তিনি ছেলেকে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন, উদার, ভদ্র তথা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি ছেলেকে শিশুকালে কোলে করে নাচাতে নাচাতে নিম্নের চরণগুলি সুর করে আবৃত্তি করতেন :[৩০]

---

২৮. আ'লাম আন-নিসা'-৫/২৪৯

২৯. প্রাগুক্ত; আল-'ইকদ আল-ফারীদ-১/৪৯

৩০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৪৮০

إن بنيَّ معرقٌ كريم + محبَّبٌ أهله حليم

ليس بفحاشٍ ولالئيم + ولابطخرور ولاشؤوم

صخربنى فهر به زعيم + لايخلف الظن ولايخيم.

'আমার ছেলে সম্ভ্রান্ত মূল বা খান্দানের। তার পরিবারের মধ্যে অতি প্রিয় ও বিচক্ষণ। সে অশ্লীল কর্ম সম্পাদনকারী নয় এবং নীচ প্রকৃতিরও নয়। ভীরু ও কাপুরুষ নয় এবং অশুভ ও অকল্যাণের প্রতীকও নয়। বানূ ফিহরের শীলা, তাদের নেতা। মানুষের ধারণা ও অনুমানকে সে মিথ্যা হতে দেয় না এবং ভীত হয়ে পালিয়েও যায় না।'

মু'আবিয়া (রা) যখন ছোট্ট শিশুটি তখন একদিন একটি লোক তাঁকে দেখে মন্তব্য করে : আমার বিশ্বাস এই ছেলেটি তার জাতির নেতৃত্ব দিবে। হিন্দ বলে উঠলেন : তার সন্তান বিয়োগ হোক! সে তো তার জাতির নেতৃত্ব দিবেই।[৩১]

ইয়াযীদ ইবন আবী সুফইয়ানের মৃত্যুর পর অনেকে বলাবলি করতে লাগলো, আমরা আশা করি মু'আবিয়া হবে ইয়াযীদের যোগ্য উত্তরসূরী। একথা শুনে হিন্দ মন্তব্য করেন : মু'আবিয়ার মত মানুষ কারো উত্তরসূরী হয় না। আল্লাহর কসম! গোটা আরব ভূমিকে যদি এক সঙ্গে মিলিত করা হয় এবং তার মাঝখানে তাকে ছুড়ে ফেলা হয় তাহলে যেদিক দিয়ে ইচ্ছা সে বেরিয়ে আসতে পারবে।[৩২] একবার তাঁকে বলা হলো : মু'আবিয়া যদি বেঁচে থাকে তাহলে তার জাতিকে শাসন করবে। হিন্দ বললেন : তার সর্বনাশ হোক! যদি সে তার জাতিকে ছাড়া অন্যদেরকে শাসন না করে। একবার তিনি শিশু মু'আবিয়াকে নিয়ে তায়িফ যাচ্ছেন। উটের পিঠে হাওদার সামনের দিকে মু'আবিয়া বসা। এক আরব বেদুঈন তাকে দেখে হিন্দকে বলে : আপনি শিশুটিকে দু'হাত দিয়ে ভালো করে ধরে রাখুন এবং তাকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করুন। কারণ, ভবিষ্যতে এ শিশু একজন বড় নেতা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি হবে। হিন্দ তার কথার প্রতিবাদ করে বলেন : না, বরং সে একজন উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহ এবং দানশীল ব্যক্তি হবে।[৩৩]

হযরত মু'আবিয়া (রা) তাঁর মায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : হিন্দ ছিলেন জাহিলী যুগে কুরাইশদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামী যুগে একজন সম্মানিত অভিজ্ঞ মহিলা। হযরত মু'আবিয়া (রা) ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, মেধাবী ও দক্ষ মানুষ। তিনি তাঁর যাবতীয় গুণ পিতার চেয়ে মায়ের নিকট থেকেই বেশী অর্জন করেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) পরবর্তী জীবনে কোথাও নিজের গুণ বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ

---

৩১. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-২/২৮৭; 'উয়ূন আল-আখবার-১/২২৪

৩২. আল-'ইকদ আল-ফারীদ-৩/১৪

৩৩. আ'লাম আল-নিসা'-৫/২৫০

উঠলে অকপটে মায়ের প্রতিই আরোপ করতেন। প্রতিপক্ষের সমালোচনার জবাবে তিনি গর্বের সাথে প্রায়ই বলতেন : আমি হিন্দ-এর ছেলে।[৩৪]

হযরত হিন্দ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) অঙ্গীকারের উপর আমরণ অটল ছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। ইয়ারমূক যুদ্ধে যোগদান করেন এবং যুদ্ধের ময়দানে সৈনিকদের রোমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। 'উমারের (রা) খিলাফতকালে তিনি ছেলে মু'আবিয়ার (রা) নিকট যান।[৩৫]

হযরত হিন্দ (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে মু'আবিয়া ও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছের একটি এই :[৩৬]

قلت للنبى صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان شحيح وأنه لايعطينى وولدى إلا أخذت منه وهو لايعلم، فهل على حرج؟ قال : خذى مايكفيك وولدكِ بالمعروف.

'আমি নবীকে (সা) বললাম : আবূ সুফইয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পদ থেকে তাঁর অগোচরে আমি যা কিছু নিই তছাড়া তিনি আমার ছেলে ও আমাকে কিছুই দেন না। এতে কি আমার কোন অপরাধ হবে? তিনি বললেন : তোমার ছেলে ও তোমার প্রয়োজন পূরণ হয় ততটুকু যুক্তিসম্মতভাবে গ্রহণ কর।'

তবে ইবনুল জাওযী 'আল-মুজতানা' গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সরাসরি কিছু বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।[৩৭]

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় হিন্দ (রা) খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ১৪, খ্রীঃ ৬৩৫ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি যে দিন ইনতিকাল করেন সে দিনই হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের (রা) পিতা হযরত আবূ কুহাফা (রা) ইনতিকাল করেন।[৩৮] তবে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ সুফইয়ান (রা) হযরত 'উছমানের (রা) খিলাফতকালে ইনতিকাল করলে জনৈক ব্যক্তি হযরত মু'আবিযার (রা) নিকট হিন্দকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তিনি ভদ্রভাবে একথা বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, তিনি এখন বন্ধ্যা হয়ে গেছেন, তাঁর বিয়ের আর প্রয়োজন নেই।[৩৯]

---

৩৪. আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন-২/৯২

৩৫. তারীখু দিমাশ্‌ক, তারাজিম আন-নিসা'-৪৩৭; আল-আ'লাম-৮/৯৮

৩৬. একমাত্র তিরমিযী ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্য পাঁচটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ-৬/৩৯; তাবাকাত-৮/২৩৭

৩৭. আ'লাম আন-নিসা-৫/২৫০

৩৮. উসুদুল গাবা-৫৬৩; তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৫৭

৩৯. আল-ইসাবা-৪/৪২৬; সাহাবিয়াত-২৭১

দুররা (রা) বিন্‌ত আবী লাহাব

হযরত রাসূলে কারীম (সা) নবুওয়াত লাভের পর তিন বছর যাবত মক্কায় গোপনে ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকেন। অনেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রতি ঈমান আনেন। অনেকের ঈমান আনার কথা প্রকাশ পেলেও অধিকাংশের কথা কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে গোপন থাকে। প্রথম দিকে কুরাইশরা রাসূলের (সা) প্রচারকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি। তিন বছর পর হযরত জিবরীল (আ) এসে রাসূলকে (সা) প্রকাশ্যে ইসলামের আহ্বান জানাতে বলেন এবং তাঁকে একথাও জানিয়ে দেন যে, তিনি হলেন একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী। ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : যখন এ আয়াত–

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ.

'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন'[১]– নাযিল হলো, রাসূল (সা) সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন এবং উচ্চকণ্ঠে আহ্বান জানাতে লাগলেন : ওহে ফিহ্‌র গোত্রের লোকেরা, ওহে 'আদী গোত্রের লোকেরা!

এই আওয়ায শুনে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় সকল লোক একত্রিত হলো। যিনি যেতে পারলেন না তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠালেন কি ব্যাপার তা জানার জন্য। কুরাইশরা হাজির হলো, আবূ লাহাবও তাদের সঙ্গে ছিল। এরপর তিনি বললেন : তোমরা বলো, যদি আমি বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড়সওয়ার আত্মগোপন করে আছে, তারা তোমাদের উপর হামলা করতে চায়, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হাঁ বিশ্বাস করবো। কারণ আপনাকে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। নবী (সা) বললেন তবে শোন, আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করতে প্রেরিত হয়েছি। আবূ লাহাব বললো, তুমি ধ্বংস হও। আমাদেরকে কি একথা বলার জন্য এখানে ডেকেছো?

আবূ লাহাব একথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন। তাতে বলা হয়– تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

'আবূ লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।'[২]

দুর্‌রা (রা) ছিলেন এই আবূ লাহাবের কন্যা এবং 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তাঁর দাদা।

---

১. সূরা আশ-শু'আরা-২১৪

২. সহীহ মুসলিম-১/১১৪; সহীহ বুখারী-২/৭০৬; তাফসীর আল-খাযিন-৭/৩১১; তাফসীর ইবন কাছীর : সূরা আল-মাসাদ

তিনি মক্কার কুরাইশ খান্দানের হাশিমী শাখার সন্তান এবং হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চাচাতো বোন।[৩] দুর্‌রার (রা) জীবন আলোচনার পূর্বে তাঁর পিতা-মাতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহর (সা) এক চাচা। তার আসল নাম 'আবদুল 'উয্‌যা ইবন 'আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম। ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) প্রতি তার ছিল দারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ। তাঁকে কষ্ট দিতে, তাঁর ধর্ম ও সত্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত ছিল না। দৈহিক সৌন্দর্য ও মুখমণ্ডলের দীপ্তির জন্য তাকে "আবূ লাহাব" (অগ্নিশিখা) বলে ডাকা হতো। অথচ দীপ্তিমান মুখমণ্ডলের অধিকারীর জন্য (আবুন নূর) ابو النور অথবা أبـو الضيـاء (আবুদ দিয়া) হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ভবিষ্যতে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম তাই আল্লাহ প্রথম থেকেই মানুষের দ্বারা তার নাম রেখে দেন আবূ লাহাব।[৪]

আবূ লাহাব হযরত রাসূলে কারীমের (সা) চাচা হওয়া সত্ত্বেও ভাতিজার প্রতি তার বিন্দুমাত্র দয়া-মমতা ছিল না। ভাতিজা নবুওয়াত লাভের দাবী ও প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করার সাথে সাথে তাদের সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। ভাতিজাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করার জন্য সে তার পিছে লেগে যায়। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কোন সুযোগ সে হাতছাড়া করতো না। মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে বাজার এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে তাঁর পিছনে লেগে থাকতো। ইমাম আহমাদ (রহ) আবুয যানাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবুয যানাদ বলেছেন, আমাকে রাবী'আ ইবন 'আব্বাদ নামের এক ব্যক্তি, যিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, বলেছেন : আমি একবার যুল-মাজাযের বাজারে নবীকে (সা) দেখলাম, জনতাকে সম্বোধন করে বলছেন :

يايها الناس قولوا لا إله إلا الله تفحلون.

'ওহে জনমণ্ডলী! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা সফলকাম হবে।' তাঁর চারপাশে জনতার সমাবেশ ছিল। আর তাঁকে অনুসরণ করতো দীপ্তিমান চেহারার এক ব্যক্তি। সে মানুষকে বলতো 'এ ধর্মত্যাগী মিথ্যাবাদী'। আমি লোকদের নিকট এই লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে বললো : সে তাঁর চাচা আবূ লাহাব।[৫]

তারিক ইবন 'আবদিল্লাহ আল-মুহারিবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবূ লাহাব নবীর (সা) কথা মিথ্যা প্রমাণ করতেই শুধু ব্যস্ত থাকতো না বরং তাঁকে পাথরও নিক্ষেপ করতো। এতে নবীর (সা) পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যেত।[৬]

শুধু কি তাই? সে মনে করতো তার অর্থ-সম্পদ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অপমান, লাঞ্ছনা ও শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) যখন তাঁর

---

৩. উসুদুল গাবা-৫/৪৪৯; আল-ইসতী'আব-৪/২৯০; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৫

৪. তাফসীর ইবন কাছীর; সূরা লাহাব

৫. প্রাগুক্ত; নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯১

৬. তাফহীমুল কুরআন-৬/৫২২; ফী জিলাল আল-কুরআন-৩/২৮২

সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান জানালেন তখন আবূ লাহাব বললো : আমার ভাতিজা যা বলছে তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি কিয়ামতের দিন আমার অর্থ-বিত্ত ও সন্তান-সন্ততিদের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো। সে উপেক্ষা করে আল্লাহ তা'আলার এ ঘোষণা :[৭]

يَوْمَ لاَيَنْفَعُ مَالٌ وَّبَنُوْنَ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।

রাসূলুল্লাহ (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে আবূ লাহাব তার দুই পুত্র 'উতবা এবং 'উতাইবাকে রাসূলের (সা) দুই কন্যা রুকাইয়্যা এবং উম্মু কুলসুমের সাথে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলের (সা) নবুওয়াত পাওয়ার পর এবং দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচারের শুরুতে আবূ লাহাব নবীর দুই কন্যাকে তালাক দিতে তার দুই পুত্রকে বাধ্য করেছিল।[৮]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) দ্বিতীয় পুত্র 'আবদুল্লাহর ইনতিকালের পর আবূ লাহাব এতো খুশী হয়েছিল যে, তার বন্ধুদের কাছে দৌড়ে গিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলেছিল, মুহাম্মাদ অপুত্রক হয়ে গেছে।[৯]

আবূ লাহাবের স্ত্রী তথা দুর্‌রার (রা) মা উম্মু জামীলের প্রকৃত নাম আরওয়া। সে ছিল হারব ইবন উমাইয়্যার কন্যা এবং আবূ সুফইয়ানের (রা) বোন। হযরত রাসূলে কারীমের (সা) প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে সে স্বামীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। রাসূল (সা) যে পথে চলাফেরা করতেন সেই পথে এবং তাঁর দরজায় কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। সে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষী এবং প্রচণ্ড ঝগড়াটে ছিল। নবীকে (সা) গালাগাল দেওয়া এবং কুটনামি, নানা ছুতোয় ঝগড়া, ফেতনা-ফাসাদ এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা ছিল তার কাজ। এক কথায় সে ছিল নোংরা স্বভাবের এক মহিলা। এ কারণে আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দায় বলেছেন,

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. - এবং তার স্ত্রীও সে ইন্ধন বহন করে।[১০]

এই উম্মু জামীল যখন জানতে পারলো যে, তার নিজের এবং স্বামীর নিন্দা করে আয়াত নাযিল হয়েছে তখন সে রাসূলুল্লাহকে (সা) খুঁজে খুঁজে কা'বার কাছে এলো, রাসূল (সা) তখন সেখানে ছিলেন। সংগে হযরত আবূ বকর সিদ্দীকও ছিলেন। আবূ লাহাবের স্ত্রীর হাতে ছিল এক মুঠ পাথর। রাসূলের (সা) কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুলে আল্লাহ তার দৃষ্টি কেড়ে নেন। ফলে সে রাসূলকে (সা) দেখতে পায়নি, আবূ বকরকে (রা) দেখছিল। সে

---

৭. সূরা আশ-শু'আরা-৮৮-৮৯

৮. তাফহীমুল কুরআন-৬/৫২২; ফী জিলাল আল-কুরআন-৩/২৮২

৯. তাফহীমুল কুরআন-৬/৪৯০

১০. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩৫৫

আবূ বকরের (রা) সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার সাথী কোথায়? আমি শুনেছি তিনি আমার নিন্দা করেছেন। আল্লাহর কসম! যদি আমি তাঁকে পেয়ে যাই তবে তাঁর মুখে এ পাথর ছুড়ে মারবো। দেখ, আল্লাহর কসম! আমিও একজন কবি। এরপর সে নিম্নের চরণ দু'টি আবৃত্তি করে :

مُذَمَّمًا عصينا وأَمْرَه أَبَيْنَا

ودِيْنَه قَلَيْنَا

'মুযাম্মামের অবাধ্যতা করেছি, তাঁর কাজকে অস্বীকার করেছি এবং তাঁর দীনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি।'

উল্লেখ্য যে তৎকালীন মক্কার পৌত্তলিকরা নবী কারীমকে (সা) মুহাম্মাদ না বলে 'মুযাম্মাম' বলতো। মুহাম্মাদ অর্থ প্রশংসিত। আর 'মুযাম্মাম' অর্থ নিন্দিত। এরপর উম্মু জামীল চলে গেল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবীকে (সা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? বললেন : না, দেখতে পায়নি। আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।[১১]

ইবন ইসহাক বলেন, যেসব লোক রাসূলকে (সা) ঘরের মধ্যে কষ্ট দিত তাদের নাম হলো আবূ লাহাব, হাকাম ইবন আবুল 'আস ইবন উমাইয়্যা, 'উকবা ইবন আবী মু'ঈত, 'আদী ইবন হামরা, ছাকাফী ইবনুল আসদা' প্রমুখ। তারা সবাই ছিল রাসূলের (সা) প্রতিবেশী।[১২]

হযরত রাসূলে কারীমের (সা) এহেন চরম দুশমনের পরিণতি কি হয়েছিল তা একটু জানার বিষয়। বদর যুদ্ধের সময় সে মক্কায় ছিল। যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর শোনার পর প্লেগ জাতীয় العَدَسَةُ (আল-আদাসা) নামক একপ্রকার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তিন দিন পর্যন্ত মৃতদেহ ঘরে পড়ে থাকে। সংক্রমণের ভয়ে কেউ ধারে-কাছে যায়নি। যখন পচন ধরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে তখন তার এক ছেলে দূর থেকে পানি ছুড়ে মেরে মৃতদেহকে গোসল দেয়। কুরাইশ গোত্রের কেউ লাশের কাছে যায়নি। তারপর কাপড়ে জড়িয়ে উঠিয়ে মক্কার উঁচু ভূমিতে নিয়ে যায় এবং একটি প্রাচীরের সাথে ঠেস দিয়ে রেখে পাথর চাপা দেয়। এই ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) চরম দুশমনের পার্থিব নিকৃষ্ট পরিণতি।[১৩]

এমন একটি নোংরা ও ভয়াবহ পরিবারে দুর্‌রা বিন্‌ত আবী লাহাব জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন। তিনি সেই শিশুকাল থেকেই পিতা-মাতার এহেন নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ কাজ দেখতেন, কিন্তু তাদের এসব কাজ ও আচরণ মেনে নিতে পারতেন না। মনে মনে পিতা-

---

১১. প্রাগুক্ত-১/৩৫৬

১২. আর রাহীক আল-মাখতূম-১০৩

১৩. নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯২

মাতার এসব ঘৃণ্য কাজকে প্রত্যাখ্যান করতেন। ধীরে ধীরে ইসলামের বাণী তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন। ইসলাম তাঁর অন্তরে আসন করে নেয়। একদিন তিনি পৌত্তলিকতার অন্ধকার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ। (তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে)। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেমন মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন দুররার (রা) ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলা চলে।

হযরত দুররা (রা) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪] তবে কখন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি মদীনায় হিজরাত করেন।[১৫] তাঁর প্রথম স্বামী আল-হারিছ ইবন নাওফাল ইবন আল-হারিছ ইবন আবদুল মুত্তালিব। কুরাইশ পক্ষে বদর যুদ্ধে যেয়ে সে পৌত্তলিক অবস্থায় নিহত হয়। তার ঔরসে দুররা (রা) 'উকবা, আল-ওয়ালীদ ও আবূ মুসলিম– এ তিন ছেলের জন্ম দেন। মদীনায় আসার পর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত দিহইয়া আল-কালবীর (রা) সাথে তাঁর দ্বিতয়ী বিয়ে হয়।[১৬] এই দিহইয়া আল-কালবী (রা) ছিলেন প্রথমপর্বে ইসলাম গ্রহণকারী একজন মহান সাহাবী। বদরের পরে সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) পত্র নিয়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে যান। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। জিবরীল (আ) তাঁর আকৃতি ধারণ করে মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসতেন। হযরত মু'আবিয়ার (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।[১৭]

হযরত দুররা (রা) হিজরাত করে মদীনায় আসার পর যথেষ্ট সমাদর, সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেও কোন কোন মুসলিম মহিলা তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি তাঁর পিতা-মাতার আচরণের কথা মনে করে তাঁরা তাঁকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। দুররা (রা) বড় বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। এ অবস্থা থেকে রাসূল (সা) তাঁকে উদ্ধার করেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে তা একত্র করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

"দুররা বিন্ত আবী লাহাব হিজরাত করে মদীনায় আসলেন এবং রাফি' ইবন আল-মু'আল্লা আয-যুরকীর (রা) গৃহে অবতরণ করেন। বানূ যুরাইক গোত্রের মহিলারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে বললো, আপনি তো সেই আবূ লাহাবের কন্যা যার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে :

تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ، مَاأَغْنٰى عَنْهُ مَالُه وَمَاكَسَبَ.

তাহলে তোমার এ হিজরাতে ফায়দা কোথায়?

---

১৪. আয-যিরিকলী : আল-আ'লাম-২/৩৩৮
১৫. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৭৫
১৬. তাবাকাত ইবন সা'দ-৮/৫০; নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯৩
১৭. তাহ্যীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত-১/১৮৫

অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে দুররা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে যুরাইক গোত্রের নারীদের মন্তব্যের কথা জানালেন। রাসূল (সা) তাঁকে শান্ত করে বললেন : বস। তারপর জুহরের নামায আদায় করে মিম্বরের উপর বসে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন :

أيها الناس، مالى أوذى فى أهلى؟ فوالله إن شفاعتى تنال قرابتى، حتى إن صدا وحكم وسهلب لتنالهايوم القيامة.

'ওহে জনমণ্ডলী! আমার পরিবারের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় কেন? আল্লাহর কসম! আমার নিকটাত্মীয়রা কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভ করবে। এমন কি (ইয়ামানের) সুদা, হাকাম ও সাহ্লাব গোত্রসমূহও তা অবশ্য লাভ করবে।[১৮]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে; রাসূল (সা) দুররার (রা) মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন:

أغضب الله من أغضبكِ.

'যে তোমাকে রাগান্বিত করবে সে আল্লাহকে রাগান্বিত করবে।'[১৯]

নবী পরিবারের সাথে হযরত দুররার (রা) সম্পর্ক দূরের ছিল না। এ কারণে প্রায়ই উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশার (রা) নিকট যেতেন এবং তাঁর থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহর (সা) সেবার ক্ষেত্রে দুইজন পাল্লা দিচ্ছেন। যেমন একদিনের ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'আমি 'আয়িশার (রা) নিকট বসে আছি, এমন সময় রাসূল (সা) ঘরে ঢুকে বলেন, আমাকে ওজুর পানি দাও। আমি ও 'আয়িশা দু'জনই পানির পাত্রের দিকে দৌড় দিলাম। 'আয়িশার আগেই আমি সেটা ধরে ফেললাম, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই পানি দিয়ে ওজু করার পর আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন :

أنتِ منى وأنا منكِ - তুমি আমার (পরিবারের) একজন এবং আমিও তোমার (পরিবারের) একজন।[২০]

হযরত দুররা (রা) ছিলেন অন্যতম কুরাইশ মহিলা কবি। তিনি হাদীছও বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) থেকে সরাসরি ও 'আয়িশার (রা) সূত্রে মোট তিনটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত একটি হাদীছ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

---

১৮. আ'লাম আন-নিসা-১/৪০৯; উসুদুল গাবা-৫/৪৫০; আল-ইসাবা-৪/৪৯০, ৪৯১; হায়াতুস সাহাবা-১/৩৭২

১৯. আশ-শাওকানী, দুররুস সাহাবা-৫৪২

২০. ইমাম আশ-শাওকানী বলেছেন, ইমাম আহমাদ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দুররা থেকে এর বর্ণনাকারীদের সূত্রের সকলে 'ছিকা' বা বিশ্বস্ত। (দুররুস সাহাবা-৫৪৩)

قالت : قام رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهُو على المنبر، فقال : يارسول الله أىُّ الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم : خير الناس أقرؤهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم.

'দুররা (রা) বলেন : রাসূল (সা) মিম্বরের উপর আছেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে : ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো? রাসূল (সা) বললেন : যে বেশী কুরআন পাঠ করে, বেশী তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করে, বেশী বেশী ভালো কাজের আদেশ দেয়, বেশী বেশী খারাপ কাজ করতে বারণ করে এবং বেশী বেশী আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো।'

তাঁর থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীছটি হলো :

قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايؤذى حى بميت.

'কোন মৃত ব্যক্তির কারণে কোন জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।'[২১]

তাঁর মধ্যে এক শক্তিশালী কাব্য প্রতিভা ছিল। কাব্যচর্চা করেছেন। চমৎকার ভাবসমৃদ্ধ কিছু কবিতা তাঁর নামে বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। ফিজার যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর একটি কবিতার কিছু অংশ নিম্নরূপ ঃ[২২]

لاَقَوْا غداة الروع ضمزَرَةً فيها السَّنَوَّرُ من بنى فهر

ملمومةً خرساء تحسبُها لما بدت موجًا من البحر

والجردُ كالعقبان كاسرةً تهوى أمامَ كتائب خُضْر

منها ذعاف الموت أبْرَدُه يغلى بهم وأحرَّه يجرى

قومٌ لو أن الصخر صالدهم صَلُبُوا ولان عرامسُ الصخر.

'ভীতি ও আতঙ্কের দিন প্রত্যুষে তারা পাহাড়ের মত অটল বাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করে যার মধ্যে বনী ফিহ্‌রের যুদ্ধের পোশাক পরিহিত নেতৃবৃন্দও আছে।

পাগলের মত উত্তেজিত ও বোবা বিশাল বাহিনী যখন দৃশ্যমান হয় তখন তোমার মনে হবে তা যেন সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ।

অশ্বারোহী বাহিনী শিকারী বাজপাখীর মত উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছোঁ মেরে ধূসর বর্ণের বাহিনীর সামনে নেমে আসে।

---

২১. আল-ইসতী'আব-৪/২৯১; আল-ইসাবা-৪/২৯১; আল-আ'লাম-২/৩৩৮

২২. আ'লাম আন-নিসা-১/৪০৯; শা'য়িরাত আল-আরাব-১২০; নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯৬

সেই তরবারির মরণরূপী মারাত্মক বিষ তাদের শীতলতম ব্যক্তিকেও উত্তেজিত করে এবং উষ্ণতমকে প্রবাহিত করে দেয়।

তারা এমন সম্প্রদায় যদি পাথর সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তারাও শক্ত হয়ে যায় এবং কঠিন পাথরকেও নরম করে ফেলে।'

হযরত দুররা (রা) রাসূলে কারীমের (সা) নিকট থেকে যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন তা আজীবন বজায় রাখেন। রাসূল (সা) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। আর দুররা (রা) খলীফা হযরত 'উমারের (রা) খিলাফতকালে হিজরী ২০ (বিশ) সনে ইনতিকাল করেন।[২৩]

উল্লেখ্য যে, ইতিহাসে দুররা নামের তিনজন মহিলা সাহাবীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন : দুররা বিন্‌ত আবী সুফইয়ান, দুররা বিন্‌ত আবী সালামা ও দুররা বিন্‌ত আবী লাহাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুন্না।

---

২৩. নিসা মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-১৯৬

উম্মু কুলছূম (রা) বিন্‌ত 'উকবা

মক্কার কুরায়শ খান্দানের কন্যা উম্মু কুলছূম। এটা তাঁর ডাকনাম। আসল নাম জানা যায় না। পিতা 'উকবা ইবন আবী মু'আইত আল-উমাবী, মাতা আরওয়া বিন্‌ত কুরাইয।[১] উল্লেখ্য যে, এই উম্মু কুলছূম নামে মোট সাতজন মহিলা সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়।[২] তিনি আশারা মুবাশ্‌শারার অন্যতম সদস্য ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছমান ইবন 'আফফানের (রা) বৈপিত্রেয় বোন। কারণ, আরওয়া বিন্‌ত কুরাইয হযরত 'উছমানেরও (রা) মাতা। উম্মু কুলছূমের (রা) আপন দুই ভাই আল-ওয়ালীদ ও 'উমারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩]

হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) পিতা ছিল মহানবীর (সা) মাক্কী জীবনের একজন জানি দুশমন। মক্কায় নবী (সা) ও দুর্বল মুসলমানদের উপর বাড়াবাড়ি রকমের নির্যাতনের জন্য ইতিহাসে সে খ্যাত হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয় এবং রাসূলুল্লাহর (সা) নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। উম্মু কুলছূম (রা) তখন মক্কায়। পাষণ্ড পিতার হত্যার খবর শোনার পর তাঁর চোখ থেকে এক ফোঁটা পানিও পড়েনি বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

উম্মু কুলছূম (রা) মক্কায় অল্প বয়সে পিতৃগৃহে থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই রাসূলুল্লাহর (সা) হিজরাতের পূর্বে তাঁর নিকট বাই'আত করেন। তিনি ছিলেন দুই কিবলার দিকে নামায আদায়কারীদের অন্যতম।[৪]

তিনি প্রথম মুহাজির মহিলা যিনি পালিয়ে একাকী মদীনার পথে বের হন।

তাঁর জন্ম হয়েছিল মক্কার এক চরম ইসলামবিদ্বেষী পরিবারে। ইসলাম গ্রহণের কথা জানাজানি হয়ে গেলে মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখী হন। তাঁর উপর যুলম-নির্যাতন নেমে আসে। ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়, যাতে তিনি মদীনাগামী মুহাজিরদের সাথে হিজরাত করতে না পারেন। এ অবস্থায় তাঁকে একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়।

ইবন 'আবদিল বার (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন, হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত উম্মু কুলছূম (রা) হিজরাত করতে পারেননি। হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে তাঁর জীবনে মদীনায় হিজরাতের সুযোগ আসে এবং মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। হুদায়বিয়ার

---

১. উসুদুল গাবা-৫/৬১৪; তাহযীবুল আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৭৬

২. দ্র. উসুদুল গাবা-৫/৬১২-৬১৫

৩. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৮৩

৪. প্রাগুক্ত

সন্ধির একটি শর্ত ছিল, মক্কার কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। উম্মু কুলছূম (রা) মদীনায় পৌঁছার দুই দিন পর তাঁর দুই সহোদর আল-ওয়ালীদ ও 'উমারা ইবন 'উকবা তাঁকে ফেরত দানের দাবী নিয়ে মদীনায় রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছে। তখন সূরা আল-মুমতাহিনার ১০ম আয়াতটি নাযিল হয় এবং তাতে মক্কা থেকে আসা মহিলা মুহাজিরদেরকে ফেরত দিতে বারণ করা হয়। এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা) উম্মু কুলছূমকে (রা) তাঁর ভাইয়ের হাতে অর্পণ করতে অস্বীকার করেন।[৫] তিনি তাদেরকে বলেন :

كان الشرط فى الرجال دون النساء.

'শর্ত ছিল পুরুষদের সম্পর্কে, স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে নয়।'[৬]

হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) মদীনায় হিজরাতের ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, তিনি একাকী মক্কা থেকে বের হন এবং পথে খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন। পায়ে হেঁটে, মতান্তরে উটের পিঠে চড়ে মদীনায় পৌঁছেন। ইবন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেন : একমাত্র উম্মু কুলছূম (রা) ছাড়া অন্য কোন কুরায়শ মহিলার ইসলাম সহকারে একাকী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরাত করার কথা আমাদের জানা নেই।[৭]

হযরত উম্মু কুলছূমের (রা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতের কাহিনী ও কৌশলের কথা তাঁর মুখেই শুনা যাক :

আমার পরিবারের একাংশ গ্রামে (মরুদ্যানে) থাকতো। আমি সেখানে একাকী যেতাম এবং তিন চারদিন সেখানে অবস্থান করে আবার মক্কায় ফিরে আসতাম। আমার এমন যাওয়া-আসাতে কেউ বারণ করতো না। এক পর্যায়ে আমি মদীনায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। একদিন গ্রামের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হলাম। আমাকে যারা এগিয়ে দিতে এসেছিল তারা কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল। আমি একাকী চলছি, এমন সময় খুযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কোথায় যাবে?

আমি জানতে চাইলাম : আপনি এ প্রশ্ন করছেন কেন এবং আপনি কে?

বললেন : আমি খুযা'আ গোত্রের লোক।

তিনি খুযা'আ গোত্রের লোক বলাতে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ, এ গোত্র রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গে সন্ধি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিল। আমি আমার পরিচয় দিয়ে বললাম :

আমি কুরায়শ গোত্রের একজন নারী, রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট যেতে চাই, কিন্তু আমার পথ জানা নেই।

---

৫. আল-বায়হাকী, দালাযিল আন-নুবুওয়াহ্-৪/১৭১; আল-ইসতী'আব-৪/৪৬৫; নাসাবু কুরায়শ-১৪৫

৬. তাফহীমুল কুরআন-খণ্ড-১৭, পৃ. ৭২; ইমাম রাযীর তাফসীরে কাবীর ও ইবনুল আরাবীর আহকামুল কুরআনের সূত্রে তাফহীমুল কুরআনে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. তাবাকাত-৮/২৩০

বললেন : আমি তোমাকে মদীনায় পৌঁছে দিচ্ছি।

তারপর তিনি একটি উট আমার কাছে নিয়ে আসলেন। আমি তার পিঠে চড়ে বসলাম। এক সময় আমরা মদীনা পৌঁছুলাম। তিনি ছিলেন একজন উত্তম সঙ্গী। আল্লাহ তাঁকে ভালো প্রতিদান দিন। আমি উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার (রা) নিকট গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন : মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূলের (সা) দিকে হিজরাত করেছো?

বললাম : হাঁ। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় কিনা।

একটু পরে রাসূল (সা) উম্মু সালামার (রা) নিকট আসলেন। উম্মু সালামা (রা) তাঁকে আমার বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে 'মারহাবান ওয়া 'আহলান' বলে স্বাগত জানালেন।

বললাম : আমি আমার দীনের জন্য আপনার নিকট পালিয়ে এসেছি। আমাকে আশ্রয় দিন। ফেরত পাঠাবেন না। ফেরত পাঠালে আমাকে এমন শাস্তি দিবে যা আমি সহ্য করতে পারবো না।

রাসূল (সা) বললেন : মহান আল্লাহ মহিলাদের ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি অকার্যকর ঘোষণা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির যে ধারাতে মক্কাবাসীদেরকে ফেরত দানের কথা ছিল, তাতে কেবল পুরুষদের কথা উল্লেখ ছিল, মহিলাদের সম্পর্কে কোন কথা ছিল না। এরপর রাসূল (সা) নিম্নের এ আয়াত দুইটি পাঠ করেন :[৮]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ط لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ مَّآاَنْفَقُوْا ط وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ط ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরাত করে এলে তাদের পরীক্ষা করবে; আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা

---

৮. সূরা আল-মুমতাহিনা-১০-১১

ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে মাহর দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখ না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে থেকে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। ভয় কর আল্লাহকে, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মু কুলছূম (রা) এবং তাঁর পরে যে সকল নারী মদীনায় এসেছেন তাঁদের সকলকে এ আয়াতের আলোকে পরীক্ষা করেছেন। হযরত ইবন 'আব্বাসকে প্রশ্ন করা হলো : নারীদেরকে পরীক্ষা করার রাসূলুল্লাহর (সা) পদ্ধতি কি ছিল? বললেন : তিনি মদীনায় আগত মহিলাদের এভাবে শপথ করাতেন : আল্লাহর কসম! স্বামীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষবশত আমি ঘর থেকে বের হইনি। আল্লাহর কসম! এক যমীন থেকে অন্য এক যমীনের প্রতি আকর্ষণবশত বের হইনি। আল্লাহর কসম! পার্থিব কোন লোভ-লালসাবশত ঘর ত্যাগ করিনি। আল্লাহর কসম! কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) মুহাব্বতে ঘর ত্যাগ করেছি।[৯]

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে উম্মু কুলছূমের (রা) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে কেন্দ্র করে ইসলামী শরী'আতের অনেকগুলো বিশেষ বিধান জারী করেন। এ তাঁর জন্য এক বিশেষ মর্যাদার বিষয়।

মাদানী জীবনে হযরত উম্মু কুলছূম (রা) মহিলা সাহাবীদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হন। হযরত রাসূলে কারীম (সা) তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে এবং তাঁর ঈমানী সততাকে খুব বড় করে দেখতেন। কোন কোন জিহাদে তাঁকে সংগে নিয়ে গেছেন এবং আহতদের সেবায় নিয়োগ করেছেন। যুদ্ধলব্ধ গনীমতেও তাঁকে অংশ দিয়েছেন।[১০]

বিয়ে

হিজরাতের আগ পর্যন্ত উম্মু কুলছূম (রা) বিয়ে করেননি। মদীনায় আসার পর প্রখ্যাত চারজন সাহাবী তাঁকে বিয়ের পয়গাম পাঠান। তাঁরা হলেন : যুবায়র ইবন আল-'আওয়াম, যায়দ ইবন হারিছা, 'আবদুর রহমান ইবন 'আউফ ও 'আমর ইবন আল-'আস (রা)। তিনি বৈপিত্রেয় ভাই 'উছমান ইবন 'আফ্‌ফানের (রা) সাথে পরামর্শ করেন। 'উছমান (রা) তাঁকে রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে পরামর্শ করতে বলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর

---

৯. মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর-৩/৪৮৫; তাফসীরুল খাযিন মা'আ হামিশ আল-বাগাবী-৭/৭৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩২৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৭৬; আয-যাহাবী ঃ তারীখ-২/৪০০; যাদুল মা'আদ-৩/৩০০

১০. নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৮৬

(সা) নিকট যান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাঁর পরামর্শ চান। রাসূল (সা) তাঁকে বলেন : তুমি যায়দ ইবন হারিছাকে বিয়ে কর। তোমার জন্য ভালো হবে। তিনি যায়দকে বিয়ে করেন।

হযরত যায়দ (রা) মূতার যুদ্ধে শহীদ হলেন। অতঃপর হযরত যুবায়র ইবন আল-আওয়াম (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত যুবায়রের (রা) স্বভাবে একটু রূঢ়তা ছিল। বেগমদের প্রতি বেশ কঠোর আচরণ করতেন।

এ কারণে হযরত উম্মু কুলছূম (রা) তালাকের আবেদন করেন এবং তিনি তালাক দেন। এভাবে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর হযরত 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। 'আবদুর রহমান রোগাক্রান্ত হয়ে ইনতিকাল করেন। তখন 'আমর ইবন আল-'আস (রা) মিসরের গভর্নর। তিনি উম্মু কুলছূমকে (রা) বিয়ে করেন এবং তাঁর ঘরেই তিনি ইনতিকাল করেন।[১১] তখন চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলীর (রা) খিলাফাতকাল।

সন্তান

হযরত যুবায়র ইবন আল-'আওয়ামের (রা) ঘরে যায়নাব এবং 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফের (রা) ঘরে ইবরাহীম, হুমায়দ, মুহাম্মাদ ও ইসমা'ঈলের জন্ম হয়। হযরত যায়দ ও 'আমর ইবন আল-'আসের (রা) ঘরে কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হুমায়দ একজন তাবি'ঈ এবং বড় মাপের ফকীহ 'আলিম হন। তিনি বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর মামা হযরত 'উছমানের (রা) নিকট থেকে ছোট বেলায় হাদীছ শুনেছেন। ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী বলেছেন : তিনি একজন খ্যাতিমান মর্যাদাসম্পন্ন 'আলিম ছিলেন। হিজরী ৯৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন।[১২]

সেকালে যখন লেখা-পড়ার মোটেই প্রচলন ছিল না তখন যে কয়েকজন কুরায়শ মহিলা কিছু লিখতে পড়তে জানতেন। উম্মু কুলছূম (রা) তাঁদের একজন। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। রাসূলুল্লাহর (সা) দশটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র হুমায়দ ইবন 'আবদির রহমান ও ইবরাহীম ইবন 'আবদির রহমান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুমায়দ ইবন নাফি'ও তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৩] সাহীহাইনে (বুখারী ও মুসলিম) তাঁর হাদীছ সংকলিত হয়েছে। একটি হাদীছ মুত্তাফাক 'আলাইহি। ইবন মাজাহ্ ছাড়া সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থেও হাদীছগুলো সংকলিত হয়েছে।[১৪]

---

১১. তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত-২/৩৬৫; তাহযীব আত-তাহযীব-১২/৪৭৭; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪৭১; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা'-২/২৭৭

১২. শাযারাত আয-যাহাব-১/৩৮৬-৩৮৭

১৩. আল-ইসতী'আব-২/৭৯৪

১৪. সাহাবিয়াত-২৪৩; নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্-৩৮৮

আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস (রা)

আরবের খাস'আম গোত্রের কন্যা আসমা'। পিতা 'উমাইস ইবন মা'আদ এবং মাতা খাওলা বিন্‌ত 'আওফ। মা খাওলা, যিনি হিন্দা নামেও পরিচিত, কিনানা গোত্রের মেয়ে। আসমার ডাক নাম উম্মু 'আবদিল্লাহ।[১] উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনার (রা) সৎ বোন ছিলেন।[২] হযরত 'আলী ইবন আবী তালিবের বড় ভাই জা'ফর ইবন আবী তালিবের (রা) সাথে বিয়ে হয়।[৩] তিনি ছিলেন একদল বিখ্যাত মহিলা সাহাবীর সহোদরা অথবা সৎ বোন। তাদের সংখ্যা নয় অথবা দশজন।[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় দারুল আরকামে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে তিনি মুসলমান হন।[৫] এরই কাছাকাছি সময়ে তাঁর স্বামী হযরত জা'ফারও (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬] ইসলাম গ্রহণের পর তিনি স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। সেখানে তাঁদের তিন ছেলে– 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও 'আওনের জন্ম হয়।[৭]

কয়েক বছর হাবশায় অবস্থানের পর হিজরী সপ্তম সনে খাইবার বিজয়ের সময় হাবশা থেকে সরাসরি মদীনায় পৌঁছেন।[৮] মদীনায় পৌঁছে তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) ঘরে যান। তখন সেখানে হযরত 'উমার (রা) উপস্থিত হন। তিনি প্রশ্ন করেন মহিলাটি কে? বলা হলো : আসমা' বিন্‌ত 'উমাইস। 'উমার বললেন : হ্যাঁ, সেই হাবশী মহিলা, সেই সাগরের মহিলা! আসমা' বললেন : হ্যাঁ, সেই। 'উমার (রা) বললেন : হিজরাতের দ্বারা আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদেরকে অতিক্রম করে গিয়েছি। আসমা' বললেন : হ্যাঁ, তা আপনি ঠিক বলেছেন। আপনারা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ছিলেন। তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহার করাতেন এবং মূর্খদের শিক্ষা দিতেন। আর আমরা দেশ থেকে বহু দূরে অসহায় অবস্থায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য পড়ে ছিলাম। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-মুসীবতের মুকাবিলা করছিলাম। দেখি রাসূল (সা) ফিরে আসুন, বিষয়টি তাঁকে অবহিত করবো। অনেকটা ক্ষোভের সাথে আসমা' এ কথাগুলো বলেন। এরই মধ্যে রাসূল (সা) এসে উপস্থিত হন। আসমা' (রা)

---

১. সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮২
২. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৫৭, টীকা-৭; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৪১
৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ-৮/২৮০; ইবন কুতায়বা; আল-মা'আরিফ-১৭১, ১৭৩
৪. আল-ইসাবা-৪/২৩১
৫. তাবাকাত-৮/২৮০
৬. সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৩৬
৭. প্রাগুক্ত-১/৩২৩, ২/৩৫৯; আনসাবুল আশরাফ-১/১৯৮; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৩; জামহারাত আনসার আল-'আরাব-৩৯০
৮. আনসাবুল আশরাফ-১/১৯৮; সীরাতু ইবন হিশাম-২/৩৫৯, ২৬৯

তাঁকে সবকথা খুলে বলেন। রাসূল (সা) বলেন : তারা তো এক হিজরাত করেছে, আর তোমরা করেছো দুই হিজরাত। এদিক দিয়ে তোমাদের মর্যাদা বেশি।[৯]

'আমির থেকে বর্ণিত হয়েছে। আসমা' অভিযোগ করেন এ ভাষায় : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোকেরা মনে করে যে, আমরা মুহাজির নই। জবাবে রাসূল (সা) বলেন : যারা এমন কথা বলে তারা অসত্য বলে। তোমাদের হিজরাত দুইবার হয়েছে। একবার তোমরা নাজ্জাশীর নিকট হিজরাত করেছো। আরেকবার আমার নিকট।[১০]

রাসূলুল্লাহর (সা) এ মুখ নিঃসৃত সুসংবাদ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে হাবশায় হিজরাতকারী ব্যক্তিরা দারুণ উৎফুল্ল হন। তাঁরা আসমার নিকট এসে এ সুসংবাদের সত্যতা যাচাই করে যেতেন।[১১]

ঐতিহাসিক মূতার যুদ্ধ হয় হিজরী অষ্টম সনে। হযরত আসমার (রা) স্বামী জা'ফার (রা) ছিলেন এ যুদ্ধের একজন অন্যতম সেনা অধিনায়ক। যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। খবরটি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পৌঁছার পর তিনি আসমার (রা) বাড়ীতে ছুটে যান এবং বলেন, জা'ফারের ছেলেদেরকে আমার সামনে নিয়ে এসো। আসমা' ছেলেদেরকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে হাজির করেন। রাসূলুল্লাহর (সা) চোখ দুইটি পানিতে ভিজে গেল। তিনি ছেলেদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেন। আসমা' জিজ্ঞেস করলেন, জা'ফারের কি কোন খবর পেয়েছেন? রাসূল (সা) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, সে শহীদ হয়েছে।" এতটুকু শুনতেই আসমা' চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং বাড়ীতে একটা মাতমের রূপ ধারণ করে। প্রতিবেশী মহিলারা তাঁর পাশে সমবেত হয় এবং তাঁকে বলে, রাসূল (সা) বুকে হাত মারতে নিষেধ করছেন। সেখান থেকে উঠে রাসূল (সা) নিজের ঘরে ফিরে এলেন এবং বললেন : তোমরা জা'ফারের ছেলেদের জন্য খাবার তৈরি কর। কারণ তাদের মা আসমা' শোক ও দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছে।[১২]

অতঃপর রাসূল (সা) ব্যথিত চিত্তে বিমর্ষ মুখে মসজিদে গিয়ে বসেন এবং হযরত জা'ফারের (রা) শাহাদাতের খবর ঘোষণা করেন। ঠিক এ সময় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বলে, জা'ফারের স্ত্রী মাতম শুরু করেছেন এবং কান্নাকাটি করছেন। তিনি লোকটিকে বলেন, তুমি যাও এবং তাদেরকে এমন করতে বারণ কর। কিছুক্ষণ পর লোকটি আবার ফিরে এসে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা তো বিরত হচ্ছে না। তিনি লোকটিকে আবার একই কথা বলে পাঠালেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হলো না। তখন রাসূল (সা) বললেন, তার মুখে মাটি ভরে দাও। সহীহ বুখারীতে একথাও এসেছে যে, হযরত 'আয়িশা (রা) ঐ লোকটিকে বলেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যদি এ কাজ (মুখে

---

৯. ফাতহুল বারী-৭/৩১৭; আল-মাগাযী-বাবু গাযওয়াতি খায়বার; মুসলিম, হাদীছ নং-২৫০৩; ফী ফাদায়িলি আস-সাহাবা; কানযুল 'উম্মাল-৮/৩৩৩

১০. তাবাকাত-৮/২৮১; আল-ইসাবা-৪/২৩১

১১. বুখারী-২/৬০৭-৬০৮; তাবাকাত-৮/২৮১

১২. মুসনাদ-৬/৩৭০; আনসাবুল আশরাফ-১/৩৮০

মাটি ভরা) না কর তাহলে রাসূল (সা) কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন না। তৃতীয় দিন রাসূল (সা) আসমার বাড়ী যান এবং তাঁকে শোক পালন করতে বারণ করেন।[১৩]

দ্বিতীয় বিয়ে

স্বামী হযরত জা'ফারের (রা) শাহাদাতের ছয় মাস পরে অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইন যুদ্ধের সময়কালে হযরত আবু বাক্‌রের সাথে আসমার দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং বিয়েটি পড়ান।[১৪] এই বিয়ের দুই বছর পর দশম হিজরীর জুলকা'দা মাসে আবু বাকরের (রা) ঔরসে ছেলে মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকরের জন্ম হয়। আসমা' তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বিদায় হজ্জের কাফেলার সাথে শরীক হয়ে মক্কার পথে ছিলেন। জুল হুলায়ফা পৌঁছার পর মুহাম্মাদ ভূমিষ্ঠ হয়। এখন তিনি হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে সংশয়িত হয়ে পড়েন। স্বামী আবু বাকরও (রা) তাঁকে মদীনায় ফেরত পাঠাতে চাইলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহর (সা) মতামত জানতে চাওয়া হলো। রাসূল (সা) বললেন, তাকে বলো সে যেন গোসল করে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়।[১৫]

হিজরী অষ্টম সনে প্রথম স্বামী জা'ফারের ইনতিকালে হযরত আসমা' (রা) ভীষণ ব্যথা পান। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের আশায় এই শোক ও দুঃখকে তিনি সবর ও শোকরে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু হিজরী ১৩ সনে দ্বিতীয় স্বামী হযরত আবু বাকরের (রা) মৃত্যুতে তিনি আবার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে তিনি এ শোকও কাটিয়ে ওঠেন। মৃত্যুকালে আবু বাকর (রা) ওসীয়াত করে যান, স্ত্রী আসমা' তাঁকে অন্তিম গোসল দিবেন। আসমা' তাঁকে গোসল দেন।[১৬] গোসল দেয়া শেষ হলে তিনি উপস্থিত মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলেন : আমি রোযা আছি। আর দিনটিও ভীষণ ঠাণ্ডার। আমাকেও কি গোসল করতে হবে? লোকেরা বললো : না।[১৭]

হযরত আবু বাকরের (রা) ইনতিকালের সময় তাঁর ঔরসে আসমার গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তান মুহাম্মাদের বয়স প্রায় তিন বছর ছিল।[১৮] পরবর্তীকালে এই মুহাম্মাদ তৃতীয় খলীফা হযরত উছমানের (রা) হত্যার মত মারাত্মক ট্রাজেডীর এক অন্যতম সাক্ষী অথবা নায়কে পরিণত হন।

দ্বিতীয় স্বামী আবু বাকরের (রা) মৃত্যুর পর হযরত আসমা' হযরত 'আলীকে (রা) তৃতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন। শিশু মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর মায়ের সাথে সৎ পিতা 'আলীর (রা) সংসারে চলে আসেন এবং তাঁর স্নেহছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে হযরত 'উছমান (রা) হত্যার দায়-দায়িত্ব যে অনেকে হযরত 'আলীর (রা) উপর চাপাতে চেয়েছিলেন, তার মূল কারণ এই সৎ পুত্র মুহাম্মাদের আচরণ।

---

১৩. মুসনাদ-৬/৩৬৯
১৪. আল-ইসাবা-৪/২৩১
১৫. তাবাকাত-৮/২৮২; মুসনাদ-৬/৩৬৯; মুসলিম-৩/১৮৫-১৮৬
১৬. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-১/২২৩; তাবাকাত-৮/২৮৩
১৭. মুওয়াত্তা-১/২২২-২২৩; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৬
১৮. তাবাকাত-৮/২৮৪

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করে থাকবেন, হযরত আসমার দুই ছেলের নাম মুহাম্মাদ– মুহাম্মদ ইবন জা'ফার ও মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর। একদিন এই দুই ছেলে একজন আরেকজনের উপর কৌলিন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে বলতে থাকে, আমি তোমার চেয়ে বেশী মর্যাদাবান। আমার পিতা তোমার পিতার চেয়ে বেশী সম্মানীয়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের এ বিতর্ক চলতে থাকে। হযরত 'আলী (রা) তাদের মা আসমাকে বললেন, তুমিই তাদের এ বিবাদের ফয়সালা করে দাও। আসমা' বললেন, আমি আরব যুবকদের মধ্যে জা'ফারের চেয়ে ভালো কাউকে পাইনি, আর বৃদ্ধদের মধ্যে আবু বাকরের চেয়ে বেশী ভালো কাউকে দেখিনি। 'আলী (রা) বললেন, তুমি তো আমার বলার কিছু রাখলে না। তুমি যা বলেছো, তাছাড়া অন্য কিছু বললে আমি বেজার হতাম। আসমা' তখন বলেন, আর ভালো মানুষ হিসেবে আপনি তিনজনের মধ্যে তৃতীয়।[১৯]

হযরত 'আলীর (রা) ঔরসে হযরত আসমা' ছেলে ইয়াহইয়াকে জন্মদান করেন। তবে ইবন সা'দ তাঁর তাবাকাতে মুহাম্মাদ ইবন 'উমারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'আলীর (রা) ঔরসে আসমার গর্ভে দুই ছেলে– ইয়াহইয়া ও 'আওনের জন্ম হয়। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, বেশীর ভাগ সীরাত বিশেষজ্ঞ উক্ত মতটিই গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত মতটিকে 'আল্লামা ইবনুল আছীর ভুল বলেছেন। তিনি লিখেছেন, এটা ইবনুল কালবীর একটা কল্পনা। আর তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী।[২০] তাহলে হযরত আসমার (রা) তিন স্বামীর ঘরে মোট সন্তান সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচজন। হযরত জা'ফারের ঘরে মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ, 'আওন, আবু বাক্‌রের (রা) ঘরে মুহাম্মাদ এবং 'আলীর (রা) ঘরে ইয়াহইয়া।[২১] পাঁচজনই পুত্র সন্তান।

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকর খলীফা 'উছমানের খিলাফতকালের বিদ্রোহ ও বিশৃংখলায় জড়িয়ে পড়েন। আর এরই প্রেক্ষিতে হিজরী ৩৮ সনে তিনি মিসরে নিহত হন। গাধার চামড়ার মধ্যে ভরে তাঁর মৃতদেহ জ্বালিয়ে ফেলে অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয়। ছেলের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে স্বভাবতঃই মা আসমা' ভীষণ দুঃখ পান। কিন্তু ভেঙ্গে না পড়ে ধৈর্য ধারণ করেন। এই মর্মন্তুদ খবর শোনার পর জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যান।[২২]

হযরত আসমা' (রা) হাবশা অবস্থানকালে সেখানকার সাদামাটা ধরনের টোটকা চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অন্তিম রোগশয্যায় এবং পার্থিব জীবনের প্রান্ত সীমায় তখন উম্মু সালামা ও আসমা' (রা) মিলিতভাবে রাসূলুল্লাহর (সা) রোগ 'জাতুল জান্‌ব' বলে নির্ণয় করেন এবং তাঁকে ঔষধ পান করাতে উদ্যোগী হন। রাসূল (সা) কোন প্রকার ঔষধ পান করতে অস্বীকৃতি জানান। ঠিক সে সময় তিনি একটু অচেতন হয়ে পড়েন। এটাকে তাঁরা দুইজন একটি সুযোগ বলে মনে করেন। তাঁরা

---

১৯. প্রাগুক্ত-৮/২৮৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৭

২০. উসুদুল গাবা-৫/৩৯৫; সিয়ারুস সাহাবিয়াত-১৪৪; আল-ইসতী'আব-২/৭৪৫

২১. আনসাবুল আশরাফ-১/৪৪৭

২২. আল-ইসাবা-৪/২৩১; সাহাবিয়াত-১৭৩

রাসূলুল্লাহর (সা) মুখ একটু ফাঁক করে ঔষধ ঢেলে দেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর অচেতন অবস্থা দূর হয়ে গেলে তিনি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করেন এবং বলেন : এ ব্যবস্থাপত্র সম্ভবতঃ আসমা' দিয়ে থাকবে।[২৩]

হযরত আসমা' (রা) থেকে ষাটটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাঁর নিকট যাঁরা হাদীছ শুনেছেন ও বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন– 'আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার, ইবন 'আব্বাস, কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন আল-হাদ, 'উরওয়া, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যিব, উম্মু 'আওন বিন্ত মুহাম্মাদ ইবন জা'ফার, ফাতিমা বিনত 'আলী, আবূ ইয়াযীদ আল মাদানী।[২৪] তিনি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। রাসূল (সা) বিপদ-আপদের সময় পড়ার জন্য তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন। আসমা' সেটি পাঠ করতেন।[২৫]

তিনি স্বপ্নের তা'বীরও ভালো জানতেন। এ কারণে হযরত 'উমার (রা) সচরাচর তাঁর কাছ থেকেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিতেন।[২৬]

হযরত আসমার (রা) তৃতীয় স্বামী 'আলী (রা) হিজরী ৪০ সনে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আসমাও এর কিছু দিন পরে ইনতিকাল করেন।[২৭]

একদিন রাসূল (সা) আসমার প্রথম স্বামী জা'ফারের তিন ছেলেকে খুবই ক্ষীণ ও দুর্বল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, এদের এমন অবস্থা কেন? আসমা' বলেন, তাদের অতিমাত্রায় নজর লাগে। রাসূল (সা) বলেন, তা তুমি ঝাড়-ফুঁক কর না কেন। হযরত আসমার একটি মন্ত্র জানা ছিল। তিনি সেটি রাসূলকে (সা) শোনান। রাসূল (সা) শুনে বলেন, হ্যাঁ, এটি ঠিক আছে।[২৮]

হযরত আসমা' (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) জীবদ্দশায় তাঁর পরিবারের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত ফাতিমার (রা) বিয়ের সময় তিনি বেশ কর্মতৎপরতা দেখান। পাত্রী পক্ষ থেকে তিনি জামাই 'আলীর (রা) বাড়ীতে যান।[২৯]

---

২৩. বুখারী-২/৮৫১; মুসনাদ-৬/৪৩৮; আনসাবুল আশরাফ-১/৫৪৫
২৪. আদ-দুররুল মানছুর-৩৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা-২/২৮৭
২৫. মুসনাদ-৬/৩৬৯; কান্‌য আল-'উম্মাল-১/২৯৯
২৬. কান্‌য আল-'উম্মাল-৩/১৫৩; আল-ইসাবা-৪/২৩১; হায়াতুস্ সাহাবা-৩/৪৫০
২৭. তাহজীবুত তাহজীব-১২/৩৯৯; শাজারাতুজ জাহাজ-১/১৫, ৪৮
২৮. মুসলিম-২/২২৩
২৯. হায়াতুস সাহাবা-২/৬৬৭-৬৬৮

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-ইমাম আয-যাহাবী :
   (ক) সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, (বৈরূত : আল-মুওয়াস্‌সাতুর রিসালা, সংস্করণ-৭, ১৯৯০)
   (খ) তাযকিরাতুল হুফ্‌ফাজ, (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-ইসলামী)
   (গ) তারীখ আল-ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাহীর ওয়াল আ'লাম, (কায়রো : মাকতাবা আল-কুদসী, ১৩৬৭ হি.)
২. ইবন হাজার :
   (ক) তাহযীব আত-তাহযীব, (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৫ হি.; বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
   (খ) তাকরীব আত-তাহযীব, (লাখনৌ)
   (গ) আল-ইসাবা ফী তাময়ীয আস-সাহাবা, (বৈরূত : দার আল-ফিকর, ১৯৭৮)
   (ঘ) লিসান আল-মীযান, (হায়দ্রাবাদ, ১৩৩১ হি.)
   (ঙ) ফাতহুল বারী, (মিসর, ১৩১৯ হি.)
৩. ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী : শাযারাত আয-যাহাব, (বৈরূত : আল-মাকতাব আত-তিজারী)
৪. জামাল উদ্দীন ইউসুফ আল-মিয্‌যী: তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আর-রিজাল, (বৈরূত : মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-১, ১৯৮৮)
৫. আবূ ইউসুফ : কিতাব আল-খারাজ, (বৈরূত : দার আল-মা'রিফা, ১৯৭৯)
৬. ইবন কাছীর :
   (ক) তাফসীর আল-কুরআন আল-'আজীম, (মিসর : দারু ইহইয়া আল-কুতুব আল-'আরাবিয়্যা)
   (খ) মুখতাসার তাফসীর ইবন কাছীর, (বৈরূত : দার আল-কুরআন আল-কারীম, ১৯৮১)
   (গ) আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ্, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা)
   (ঘ) (ঘ) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরূত : মাকতাবাহ্ আল-মা'আরিফ; বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১৯৮৩)
৭. ইবনুল জাওযী : সিফাতুস সাফওয়া, (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৫৭ হি.)
৮. ইবন সা'দ : আত-তাবাকাত আল-কুবরা, (বৈরূত : দারু সাদির)
৯. ইবন 'আসাকির : আত-তারীখ আল-কাবীর, (শাম : মাতবা'আতু আশ-শাম, ১৩২৯ হি.)
১০. ইয়াকূত আল-হামাবী : মু'জাম আল-বুলদান, বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)
১১. আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী : কিতাব আল-আগানী, (মিসর : ১৯২৯)
১২. ইবন হাযাম : জামহারাতু আনসাব আল-'আরাব, (মক্কা : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৬২)
১৩. ইবন খাল্লিকান : ওফায়াতুল আ'য়ান, (মিসর : মাকতাবা আন-নাহ্‌দা আল-মিসরিয়্যা, ১৯৪৮)

১৪. মুহাম্মাদ আল-আলূসী : বুলূগ আল-আরিব ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল 'আরাব, (১৩১৪ হি.)

১৫. ইবনুল আছীর :
(ক) উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী)
(খ) তাজরীদু আসমা' আস-সাহাবা, (হায়দ্রাবাদ : দায়িরাতুল মা'আরিফ, সংস্করণ-১, ১৩১৫ হি.)

১৬. আল-বালাযুরী :
(ক) আনসাব আল-আশরাফ, (মিসর : দার আল-মা'আরিফ)
(খ) ফুতূহ আল-বুলদান, (মিসর : মাতবা'আ আল-মাওসূ'আত, ১৯০১)

১৭. আয-যিরিক্‌লী : আল-আ'লাম, (বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল মালাঈন, সংস্করণ-৪, ১৯৭৯)

১৮. ইবন হিশাম : আল-সীরাহ্ আন-নাবাবিয়্যা, (বৈরূত)

১৯. ইউসুফ আল-কান্‌ধালূবী : হায়াত আস-সাহাবা, (দিমাশ্‌ক : দারুল কালাম, সংস্করণ-২, ১৯৮৩)

২০. সা'ঈদ আল-আনসারী, মাওলানা : সিয়ারে আনসাব, (ভারত : ১৯৪৮)

২১. নিয়ায ফতেহপূরী : সাহাবিয়াত, (করাচী : নাফীস একাডেমী)

২২. ইবন 'আবদিল বার : আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবার পার্শ্বটীকা)

২৩. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' আহলিল বায়ত, (দিমাশ্‌ক : দারুল য়ামামা, সংস্করণ-৩, ১৯৯৮)

২৪. ইবন সাল্লাম আল-জামহী : তাবাকাত আশ শু'আরা', (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, ১৯৮০)

২৫. ইবন কুতায়বা : আশ-শি'রু ওয়াশ শু'আরা' (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮১)

২৬. ড. আবদুর রহমান আল-বাশা : সুওয়ারুন মিন হায়াত আস-সাহাবা, (সৌদি আরব, সংস্করণ-১)

২৭. ড. শাওকী দায়ফ : তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, সংস্করণ-৭)

২৮. ড. 'উমার ফাররূখ : তারীখ আল-আদাব আল-আরাবী, (বৈরূত : দারুল 'ইল্‌ম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫)

২৯. জুরযী যায়দান : তারীখ আল-আদাব আল-লুগাহ্ আল-'আরাবিয়্যা, (বৈরূত : দারু মাকতাবা আল-হায়াত, সংস্করণ-৩, ১৯৭৮)

৩০. 'আলাউদ্দীন 'আলী আল-মুত্তাকী : কান্‌য আল-'উম্মাল, (বৈরূত : মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৫, ১৯৮৫)

৩১. আহমাদ 'আবদুর রহমান আল-বান্না : বুলূগ আল-আমানী মিন আসরার আল-ফাতহির রাব্বানী (শারহুল মুসনাদ), (কায়রো : দার-আশ-শিহাব)

৩২. ড. মুসতাফা আস-সিবা'ঈ : আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফী আত-তাশরী' আল-ইসলামী, (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, সংস্করণ-২, ১৯৭৬)

৩৩. হাজী খালীফা : কাশ্‌ফ আজ-জুনূন 'আন আসামী আল-কুতুব ওয়াল ফুনূন, (বৈরূত : দার আল-ফিক্‌র, ১৯৯০)
৩৪. মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক : তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, (মিসর : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা, ১৯৬৯)
৩৫. মুহিউদ্দীন ইবন শারফ আন-নাওবী : তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল লুগাত, (মিসর : আত-তিবা'আ আল-মুগীরিয়া
৩৬. দায়িরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়া (লাহোর)
৩৭. ইবন 'আবদি রাব্বিহি : আল-'ইকদ আল-ফারীদ, (কায়রো : লুজনাতুত তা'লীফ ওয়াত তারজামা, সংস্করণ-৩, ১৯৬৯)
৩৮. ইবন মানজূর : লিসান আল-'আরাব, (কায়রো : দারু মা'আরিফ)
৩৯. 'উমার রিদা কাহহালা : আ'লাম আন-নিসা', (বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৫, ১৯৮৪)
৪০. মাহমূদ মাহদী আল-ইসতানবূলী ও মুসতাফা আশ-শিলবী : নিসা' হাওলার রাসূল (সা), (জিদ্দা : মাকতাবা আস-সাওয়াদী, সংস্করণ-৯, ২০০১)
৪১. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' মিন 'আসর আন-নুবুওয়াহ্‌, (মক্কা : দারু তায়্যিবা আল-খাদরা, সংস্করণ-২, ২০০০)
৪২. সা'ঈদ আনসারী : সিয়ারুল সাহাবিয়াত, (আজগড়, ১৩৪১)
৪৩. সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী : সীরাতে 'আয়িশা (রা), (করাচী : উরদূ একাডেমী সিন্‌ধ)
৪৪. ড. আবদুর কারীম যায়দান : আল-মুফাস্‌সাল ফী আহকাম আল-মারআতি ওয়াল বায়ত ফী আশ-শারী'আ আল-ইসলামিয়্যা, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-৩, ১৯৯৭)
৪৫. আল-বাকিল্লানী : ই'জাজ আল-কুরআন, (বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুল কুতুব আছ-ছাকাফিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৯১)
৪৬. আস-সুয়ূতী : আদ-দুররুল মানছূর, (বৈরূত : দারুল মা'রিফা)
৪৭. 'আবদুল কাদির আল-বাগদাদী : খাযানাতুল আদাব, (বৈরূত : দারু সাদির)
৪৮. মুহাম্মাদ 'আলী আশ-শাওকানী : দাররুস সাহাবা ফী মানাকিব আল-কারাবা ওয়াস সাহাবা, (দিমাশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র, সংস্করণ-১, ১৯৮৪)
৪৯. 'আলী ইবন বুরহানউদ্দীন আল-হালাবী : আস-সীরাহ্‌ আল-হালাবিয়্যা, (মিসর : সংস্করণ-১, ১৯৬৪)
৫০. আল-বায়হাকী : দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্‌, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮৫)
৫১. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাহ্‌, (বৈরূত : দারু ইবন কাছীর, সংস্করণ-৪, ২০০১)
৫২. মুহিব্বুদ্দীন আত-তারাবী : আর-রিয়াদ আন-নাদিরা ফী মানাকিব আল-'আশারা, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, সংস্করণ-১, ১৯৮৪)
৫৩. আহমাদ যীনী দাহলান : আস-সীরাহ্‌ আন-নাবাবিয়্যা, (বৈরূত : আহলিয়া লিন নাশ্‌র ওয়াত তাওযী', ১৯৮৩)
৫৪. আবূ নু'আইম আল-ইসফাহানী : হিলয়াতুল আওলিয়া, (বৈরূত : দার আল-কিতাব আল-আরাবী, সংস্করণ-২, ১৯৬৭)

৫৫. আহমাদ খলীল জুম'আ : বানাত আস-সাহাবা, (বৈরূত : আল-যামামা, সংস্করণ-১, ১৯৯৯)
৫৬. আস-সামহূদী : ওফা' আল-ওফা', (বৈরূত : দারু ইহইয়া আত-তুরাছ আল-'আরাবী, সংস্করণ-৪, ১৯৮৪)
৫৭. ইবন 'আসাকির : তারীখু দিমাশ্‌ক, (দিমাশ্‌ক : দারুল ফিক্‌র)
৫৮. আল-হায়ছামী : মাজমা' আয-যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, (বৈরূত : মুআস্‌সাসা আল-মা'আরিফ, ১৯৮৬)
৫৯. মুস'আব আয-যুবায়রী : নাসাবু কুরায়শ, (মিসর : দার আল-মা'আরিফ, সংস্করণ-৩)
৬০. ইবন কায়্যিম : যাদ আল-মা'আদ, (বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, সংস্করণ-২, ১৯৮২)
৬১. আল-ওয়াকিদী : আল-মাগাযী, (বৈরূত : 'আলম আল-কুতুব)
৬২. ইবন সায়্যিদ আন-নাস : 'উয়ূন আল-আছার ফী ফুনূন আল-মাগাযী ওয়াস সিয়ার, (মুআস্‌সাসাতু 'ইয্‌যিদ্দীন)
৬৩. ইবন কুতায়বা 'উয়ূন আল-আখবার, (দারুল কুতুব, ১৯৬৩)
৬৪. ইবন কুতায়বা : আল-মা'আরিফ, (মিসর : দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৪, ১৯৭৭)
৬৫. মানসূর 'আলী নাসিফ : আত-আল-জামি' লিল উসূল, (মিসর : মাতবা'আতু আল-বাবী আল-হালাবী, সংস্করণ-৪)
৬৬. আত-তাবারী : তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলূক, (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা সংস্করণ-২, ১৯৮৮)
৬৭. 'আবদুল বাদী' সাকার : শা'ইরাত আল-আরাব, (আল-মাকতাব আল-ইসলামী, সংস্করণ-১, ১৯৬৭)
৬৮. আল-জাহিজ : আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র)
৬৯. আহমাদ খলীল জুম'আ : নিসা' মিনাত তারীখ, (দিমাশ্‌ক : দারুল য়ামামা, সংস্করণ-১, ১৯৯৭)
৭০. ড. 'আয়িশা 'আবদুর রহমান : তারাজিমু সায়্যিদাত বায়ত আন-নুবুওয়াহ্‌, (কায়রো : দার আদ-দায়ান লিত-তুরাছ, সংস্করণ-১, ১৯৮৮)
৭১. ইবন দুরাইদ : আল-ইশতিকাক, (কায়রো, ১৯৫৮)
৭২. ইবন কুদামা আল-মাকদাসী : আল-ইসতিবসার ফী নাসাবিস সাহাবা মিনাল আনসার, (বৈরূত : দারুল ফিক্‌র)
৭৩. ইমাম আল-বুখারী : আল-আদাব আল-মুফরাদ, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০১)
৭৪. 'আবদুর রউফ দানাপুরী : আসাহ আস-সীরাহ্‌, (করাচী)
৭৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ : আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, খণ্ড-১-৫, (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)
৭৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ : আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা, (ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, সংস্করণ-১, ২০০৩)
৭৭. হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা